সৈয়দ মুজতবা আলী

রচনাবলী

সকল পর্ব একত্রে



www.BanglaBook.org

শিবরাম চক্রবর্তী রচনাবলী

প্রথম খণ্ড

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

মিত্র ও ঘোষ

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

www.BanglaBook.org

প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৩৮১
ত্রয়োদশ মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪১৭

—একশ ষাট টাকা—

সম্পাদক
গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ
সবিতেন্দ্রনাথ রায়, মণীশ চক্রবর্তী

প্রচ্ছদপট : সুব্রত চৌধুরী
মুদ্রণ : স্ট্যান্ডার্ড প্রিন্টিং কোং

SYED MUJTABA ALI RACHANAVALI. VOL-I
An anthology of complete works of Syed Mujtaba Ali Vol. I
Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd.,
10 Shyama Charan Dey Street, Kolkata 700 073

Price : Rs. 160/-

ISBN : 81-7293-261-8

॥ বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ॥

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনও রকম পুনর্মুদ্রণ বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনর্ব্যবহার বা পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘন করলে লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শব্দগ্রহণ :
টেকনোগ্রাফ, ১/৯৮ নাকতলা, কলকাতা ৭০০ ০৪৭

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ হইতে পি. দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও অটোটাইপ, ১৫২ মানিকতলা মেন রোড, কলকাতা ৭০০ ০৫৪ হইতে তপন সেন কর্তৃক মুদ্রিত

www.BanglaBook.org

প্রকাশকের নিবেদন

ডক্টর সৈয়দ মুজতবা আলীর সহিত তাঁহার রচনাবলী প্রকাশের ব্যাপারে আমাদের অনেক আলাপ-আলোচনা হইয়াছিল। আমাদের পরম দুঃখের বিষয়, সে আলাপ-আলোচনার বাস্তব পরিণতি তাঁহার হাতে তুলিয়া দিতে পারিলাম না। সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'দেশে-বিদেশে', কিন্তু তাঁহার অনেক রম্যরচনা 'দেশে-বিদেশে' গ্রন্থের পূর্বে লিখিত—সে-কথা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। তাঁহার সম্পূর্ণ রচনাসৃষ্টির বিষয়বৈচিত্র্য এমনই বিপুল ও বিভিন্নধর্মী যে গল্প-উপন্যাস রচয়িতা কথাসাহিত্যিকদের রচনার মত তাহার শ্রেণীবিভাগ করা দুঃসাধ্য। যেহেতু রম্যরচনাই তাঁর লেখনীর প্রথম সৃষ্টি, এই কারণে রচনাবলীর প্রথম দিকের খণ্ডগুলিতে প্রধানত রম্যরচনার গ্রন্থগুলিই অন্তর্ভুক্ত করা হইল। এই রচনাবলী প্রকাশের কাজে ডক্টর আলীর আত্মীয়-স্বজন অগণিত বন্ধু-বান্ধবের নিকট হইতে যে উপদেশ-পরামর্শাদি পাইয়াছি, তাহার জন্য আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ডক্টর আলীর মধ্যম-অগ্রজ সুপণ্ডিত সৈয়দ মুর্তাজা আলী তাঁহার লিখিত ডক্টর আলীর জীবনীটি এই রচনাবলীতে সংযোজিত করিবার অনুমতি দিয়া আমাদের ঋণবদ্ধ করিয়াছেন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

সূচীপত্র

সৈয়দ মুজতবা আলী (জীবনী)	সৈয়দ মুর্তাজা আলী	ক
কথারসিক সৈয়দ মুজতবা আলী	শ্রীপ্রমথনাথ বিশী	চ
ভূমিকা	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	জ

পঞ্চতন্ত্র ১ম পর্ব

বই কেনা	৩
কাইরো	৭
পুলিনবিহারী	১০
আহারাদি—	১২
নেতাজী	১৫
রোগক্ষয়—শিক্ষালাভ	১৭
ইস্কিলাস—শেলি—স্পিটলার	২২
মোপাসাঁ—চেখফ—রবীন্দ্রনাথ	২৪
অনুবাদ সাহিত্য	২৭
'কলচর'	২৯
বর্ষা	৩১
প্যারিস	৩৩
আজব শহর কলকেতা	৩৫
কিসের সন্ধানে?	৩৭
ভক্তি	৪১
'আমার ভাণ্ডার আছে ভরে—'	৪৪
মার্জারনিধন কাব্য	৪৯
বেদে	৫৩
ভাষাতত্ত্ব	৫৫
সিনিয়র এপ্রেন্‌টিস্‌	৫৮
দাম্পত্য জীবন	৫৯
পঁচিশে বৈশাখ	৬২
তোতা-কাহিনী	৬৪
ত্রাহি বিশ্বকর্মা	৬৬
রেডুক্‌ৎসিয়ো আড্‌ আবসুর্ডুম	৬৮
ইয়োরোপে ভারতীয় শাস্ত্রচর্চা	৭০
চরিত্র পরিচয়	৭৩

www.BanglaBook.org

আড্ডা ৭৪
ধূপ-ছায়া ৮২
মেশেদিনী ৮৪
কোন্-ভিনারের মা ৮৮
কোদণ্ড মুথহানা ৯৪
মাদ্রাজ উপকণ্ঠের বেলাভূমি ১১৩
আনিকি পাসিকিভি ১১৫
বিদেশে ১১৭

ময়ূরকণ্ঠী

গুরুদেব ১৩৭
নন্দলালের দেয়াল ছবি ১৩৯
বড় দিন ১৪০
পাণ্ডা ১৪৩
গীতা-রহস্য ১৪৫
বন— ১৪৭
'নেভা'র রাধা ১৪৯
বর্বর জর্মন ১৫২
ফরাসী—জর্মন ১৫৬
'এ তো মেয়ে নয়...'— ১৫৭
স্বয়ংবরচক্র ১৫৯
ইঙ্গ-ভারতীয় কথোপকথন ১৬১
শিক্ষা-সংস্কার ১৬৩
কোন গুণ নাই তার ১৬৫
কালো মেয়ে ১৭০
ঋতালী ১৭২
রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও ইয়োরোপীয় সুরধারা ১৭৫
শ্রমণ রিয়োকোয়ান ১৭৭
প্রব্রজ্যা ১৮৪
কিংবদন্তীচয়ন ১৯০
গাইড ২০৩
আচার্য তুচ্চি ২০৫
নিশীথদা ২০৭
পরিমল রায় ২০৯
মপাসাঁ ২১১
রামমোহন রায় ২১৩
বিশ্বভারতী ২১৫
নাগা ২১৭
হিন্দু-মুসলমান কোড বিল ২১৮
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২২২
'জিদ-ওয়াইল্ড্' ২২৪
এষাস্য পরমাগতি ২২৬
দিস্ ইয়োরোপ ২২৮
শমীম ২২৯
দীনেন্দ্রনাথ ২৩১
ভারতীয় নৃত্য ২৩৩
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—
নির্বাসিতের আত্মকথা ২৩৮
জয়হে ভারতভাগ্যবিধাতা ২৪৪
ইন্দ্রলুপ্ত ২৪৭
নয়রাট ২৪৯
আজাদ হিন্দ ফৌজের সমরসংগীত ২৭৭

দ্বন্দ্বমধুর

নোনাজল ২৮১
নোনামিঠা ২৮৮
মণি ৩০১
চাচা-কাহিনী ৩০৯
বাঁশী ৩১৯

গ্রন্থ-পরিচয় ৩২৩

www.BanglaBook.org

সৈয়দ মুজতবা আলী

সৈয়দ মুজতবা আলীর জন্ম হয় ১৯০৪ সালের শেষের দিকে করিমগঞ্জ শহরে। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের আগে করিমগঞ্জ শহর সিলেট জেলার ভিতরে ছিল। বর্তমানে করিমগঞ্জ আসাম প্রদেশের কাছাড় জেলার অন্তর্ভুক্ত। আমাদের পিতা সৈয়দ সিকান্দার আলী (পরে খানবাহাদুর) তখন সেখানে রেজিস্ট্রেশন বিভাগে চাকরি করতেন। আমাদের আম্মার নাম আমতুন মন্নান খাতুন।

মুজতবা আলীর বাল্যজীবনের একটি ঘটনা থেকে তার সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। তার বয়স যখন পাঁচ তখন মিঃ জে. হেজলেট আই.সি.এস. (ইনস্‌পেক্টর জেনারেল অফ রেজিস্ট্রেশন) আসেন চাড়াভাঙ্গায় বাবার অফিস পরিদর্শন করতে। সেই নিভৃত পল্লীঅঞ্চলে ইংরেজ সাহেবের আগমন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। অফিসের বারান্দা লোকে লোকারণ্য। সাহেব নিবিষ্ট মনে অফিসের কাজ পরিদর্শন করছেন। তাঁর বাম হাতে বাঁধা মূল্যবান হাতঘড়ি। সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে মুজতবা আলী সাহেবের কবজিতে বাঁধা রিস্টওয়াচে হাত রাখল। হেজলেট সাহেব ছিলেন অমায়িক ব্যক্তি। তিনি হেসে জানতে চাইলেন ছেলেটি কে? বাবা কাছেই ছিলেন। পুত্রের আচরণে লজ্জিত হলেন। সাহেব হেসে বললেন, 'নেভার মাইন্ড, হি উইল বি এ জিনিয়াস!' এই ঘটনাটি আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সৈয়দ মুস্তাফা আলীর আত্মস্মৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

ছাত্রজীবনেই তার সাহিত্যপ্রীতির উন্মেষ ঘটে। তখনই সে ছিল ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতের উৎসাহী পাঠক। তখন সবেমাত্র কান্তিচন্দ্র ঘোষের রুবাইয়াতের অনুবাদ প্রমথ চৌধুরীর ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। মুজতবা আলীর ঝোঁক চাপল রুবাইয়াতের বিভিন্ন বাংলা ও ইংরাজী অনুবাদ সংগ্রহ করার দিকে। সে ফিটজেরাল্ডের অনুবাদের বিভিন্ন সংস্করণ উইন্ডফিল্ডের অনুবাদ সত্যেন দত্ত ও কান্তি ঘোষের অনুবাদ সংগ্রহ করে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়ত। পরবর্তী জীবনে নজরুল ইসলামের রুবাইয়াতের অনুবাদে এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সরস ভূমিকা লেখে। ১৯২১ সালে দেশে অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল বন্যা আসে। সৈয়দ মুজতবা আলী তখন সিলেটে সরকারী হাই স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ে। সে তখন ক্লাসের ফার্স্ট বয়। সরস্বতী পূজার সময়ে কয়েকটি হিন্দু ছাত্র ডেপুটি কমিশনারের বাংলো থেকে ফুল চুরি করে। পরের দিন ডেপুটি কমিশনার ডসন সাহেব (I. A. Dawson) চুরির খবর পেয়ে দোষী ছেলেদের ডেকে পাঠান। ছেলেরা উপস্থিত হলে ডেপুটি কমিশনারের হুকুমে চাপরাসীরা ছেলেদের দু-এক ঘা বেত মারে। তখন দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া উত্তপ্ত। ছেলেরা আরম্ভ করল ধর্মঘট। কর্তৃপক্ষ প্রমাদ গুনলেন। তখন যেসব সরকারী কর্মচারীর পুত্রেরা ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিল তাদের অভিভাবকদের উপর কর্তৃপক্ষ চাপ দিলেন। আমার বাবা তখন ডিস্ট্রিক্ট সাবরেজিস্ট্রার। (আসামে তখন এ চাকুরির নাম ছিল—স্পেশাল সাবরেজিস্ট্রার।) ডেপুটি কমিশনার বাবাকে ডেকে নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। বাবা মুজতবাকে স্কুলে ফিরে যেতে বলেন। মুজতবা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আলী কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তার মনোভাব অমনমীয়। সে কিছুতেই স্কুলে ফিরে যেতে রাজী হল না। আমার বাবার মনে হল তাকে সিলেটের রাজনৈতিক আবহাওয়া থেকে দূরে সরাতে পারলে বোধ হয় সব দিক দিয়ে সুবিধা হবে।

ইতিপূর্বে ১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন সিলেটে আসেন তখন তিনি ছাত্রদের কাছে আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। মুজতবা আলীর বয়স তখন চৌদ্দ বছর। বক্তৃতা শুনে কারও সঙ্গে পরামর্শ না করে সে রবীন্দ্রনাথের কাছে চিঠি লেখে। চিঠিতে জিজ্ঞাসা ছিল, 'আকাঙ্ক্ষা উচ্চ করতে হলে কি করা প্রয়োজন?' রবীন্দ্রনাথ সিলেট থেকে আগরতলা গিয়েছিলেন। কবির সিলেট ত্যাগের সপ্তাহখানেক পরে আশমানী রঙের খামে ও আশমানী রঙের চিঠির কাগজে মুজতবা আলীর নামে আগরতলা থেকে কবির নিজের হাতের লেখা জবাব এল। ১০।১২ লাইনের এই চিঠির মর্ম ছিল, 'আকাঙ্ক্ষা উচ্চ করিতে হইবে—এই কথাটার মোটামুটি অর্থ এই—স্বার্থই যেন মানুষের কাম্য না হয়। দেশের মঙ্গলের জন্য ও জনসেবার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ কামনাই মানুষকে কল্যাণের পথে নিয়ে যায়। তোমার পক্ষে কি করা উচিত তা এতদূর থেকে বলে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে তোমার অন্তরের শুভেচ্ছাই তোমাকেই কল্যাণের পথে নিয়ে যাবে।' অপ্রত্যাশিত এই চিঠি আমাদের পরিবারে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। তখন থেকেই বিশ্বকবির সান্নিধ্যলাভের আগ্রহ মুজতবা আলীর হৃদয়ে জাগ্রত হয়। বাবা তাকে সরকারী স্কুলে ফিরে যেতে বললে সে শান্তিনিকেতন যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। তখন সবেমাত্র বিশ্বভারতী স্থাপিত হয়েছে। মুজতবা আলী বোধ হয় বিশ্বভারতীর কলেজ বিভাগে প্রথম বাইরের ছাত্র। তখন রবীন্দ্রনাথ নিজেই বিশ্বভারতীতে পড়াতেন। মুজতবা আলী তাঁর কাছে বলাকা, শেলি ও কীটসের কাব্য অধ্যয়ন করার সৌভাগ্য লাভ করে। একাদিক্রমে পাঁচ বছর অধ্যয়ন করে সে বিশ্বভারতীর স্নাতক হয়। মুজতবা আলী ও গুজরাটের বাচ্চুভাই শুক্লাই বোধ হয় বিশ্বভারতীর প্রথম বছরের গ্রাজুয়েট।

বাল্যকালে মুজতবা আলীর চেহারা অত্যন্ত সুন্দর ছিল। তার বর্ণ গৌর ছিল। মুখের রেখা ছিল ধারালো। শেষ জীবনের মাথাজোড়া টাক থেকে তার যৌবনকালের চেহারার হদিস পাওয়া কঠিন ছিল। বাস্তবিকই সে যৌবনে ছিল কাঞ্চনকান্তি সুপুরুষ। তার ডাকনাম ছিল সিতারা বা নক্ষত্র। সিতারা শব্দ পরে সিতু রূপে সংক্ষিপ্ত হয়। তাই মুজতবা আলী মার্জার-নিধন কাব্যে লিখেছে—

"বাণীরে বন্দিয়া কেচ্ছা খতম বয়ান
দীন সিতু মিয়া ভণে শুন পুণ্যবান।"

শান্তিনিকেতনের পড়া শেষ করে মুজতবা আলী কিছুকাল আলিগড়ে পড়াশুনা করে। সেখানকার পরিবেশ তাকে আকৃষ্ট করতে পারে নি। যদিও সে সেখানে জনপ্রিয়তা অর্জন করে ও ছাত্র ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়।

এই সময়ে তার কাবুল যাওয়ার সুযোগ হয়। আমানুল্লাহ্ খান তখন আফগানিস্তানে। ব্যাপক শিক্ষা সংস্কারে মনোযোগী হয়েছেন। শান্তিনিকেতন থেকে ফরাসী অধ্যাপক বেনোয়া ও রাশিয়ান অধ্যাপক বগদানভ্ তখন কাবুলের শিক্ষাবিভাগে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের সাহায্যে সে কাবুল শিক্ষাবিভাগে চাকরি পায়। তার দায়িত্ব ছিল কৃষিবিজ্ঞান কলেজে সাধারণ বিষয়ে অধ্যাপনা। কাবুলে প্রায় দুই বছর থেকে সে ১৯২৯ সালের মাঝামাঝি দেশে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফিরে আসে। ইতিমধ্যে বাচ্চাই সাকো কাবুলের বাদশাহ হয়েছেন। পড়াশুনার কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আফগানিস্তান থেকে ফিরতে তাকে অনেক বেগ পেতে হয়। আমার আব্বা তৎকালীন ভারতীয় লোকসভার সহ-সভাপতি। সিলেটের সুসন্তান আবদুল মতীন চৌধুরীর সাহায্যে মুজতবা আলীর দেশে ফেরার ব্যবস্থা করে। মুজতবা আলীর কাবুল-প্রবাসজীবনের সরস বর্ণনা আছে 'দেশে-বিদেশে' বইতে। কাবুল থেকে ফিরে এলে মুজতবা আলী বিদেশে যেতে আগ্রহী হয়। এই সময় বিশ্বভারতীর ডিগ্রী বিদেশে স্বীকৃতিলাভ করে নি। শুধু ব্রিটিশের হাতে পরাজিত জার্মান সরকার বিশ্বভারতী ও জামিয়া মিলিয়া ইত্যাদি স্বদেশী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি দিত। মুজতবা আলী Wilhelm Humboldt নামক জার্মান প্রতিষ্ঠান থেকে একশত পঞ্চাশ টাকা মাসিক বৃত্তি লাভ করে। এই বৃত্তি জার্মানীতে পড়াশুনা নির্বাহের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। আমি তাকে মাসে একশ টাকা করে পাঠাতাম। মুজতবা আলী প্রথমে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। কিন্তু বার্লিনের মত বড় শহরের হট্টগোল তার সহ্য হয় নি। কয়েক মাস পরে সে বন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেয়। এখানে দুই বছর পড়াশুনা করে সে পি-এইচ-ডি ডিগ্রী অর্জন করে। তার গবেষণার বিষয় ছিল 'The origin of the khozhas and their religious life to-day'. জার্মানী থেকে শিক্ষা সমাপন করে সে ১৯৩২ সালে দেশে ফিরে আসে।

এর পর সে পুনরায় ইউরোপ যায় ও ইউরোপ থেকে কায়রো গিয়ে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে। সে যখন কায়রোতে তখন বরোদার মহারাজা সয়াজীরাও গাইকোয়াড় আল-আজহার পরিদর্শনে যান।

এখানে মহারাজাকে মুজতবা আলীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। মহারাজা তার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হন এবং দেশে ফিরলে তাকে মহারাজার সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ করেন। ১৯৪৩ সালে দেশে ফিরে মুজতবা আলী বরোদায় যায়। মহারাজা তাকে বরোদা কলেজে অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। মুজতবা আলী প্রায় আট বৎসর বরোদায় অধ্যাপনা করে। এই সময়ে সে গুজরাটের একখানি আরবী ইতিহাস সম্পাদনা করতে শুরু করে। এই কাজ সে শেষ করতে পারে নি। সয়াজীরাও মুজতবা আলীকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন ও বিদেশী পণ্ডিতদের কাছে পরিচিত করিয়ে দিতেন। মহারাজার মৃত্যুর পর বরোদার পরিবেশ মুজতবা আলীর কাছে প্রীতিকর মনে হয় নি। তখন সে বরোদার চাকারি ছেড়ে দিয়ে কলিকাতায় চলে আসে। এই সময় থেকে সে দীর্ঘকাল ৫ পার্ল রোডে তার বন্ধু আবু সৈয়দ আইয়ুবের সাহচার্যে বাস করে। আইয়ুব যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে দক্ষিণ ভারতের মদনাপল্লী যান। মুজতবা আলী তাঁর অনুগমন করেন। এই সময়ে সে কিছুকাল বাঙ্গালোরে বাস করে। বাঙ্গালোরে অবস্থানকালেই সে দেশে-বিদেশে লেখার কাজে হাত দেয়।

মুজতবা আলী পরিণত বয়সে সাহিত্যকর্মে ব্রতী হয়। ১৩৪২ সালের মোহম্মদী পত্রিকায় তার মিশরের শিক্ষায়তন শীর্ষক একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯৩৯ সালে মে মাসে সে সিলেট শহরে কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করে। তার ভাষণ মাসিক মোহম্মদী ও সিলেটের আল-ইস্‌লাহ্ পত্রিকায় ছাপা হয়।

এর পর সে আনন্দবাজারে সত্যপীর ও টেকচাঁদ নামে একটি 'কলম' লিখতে আরম্ভ করে। মুজতবা 'রায়পিথৌরা' এই ছদ্মনামে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড কাগজেও লিখেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

১৯৪৮ সালে সে দেশ পত্রিকায় 'দেশে-বিদেশে' লিখতে আরম্ভ করে। এই বই প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালে। প্রকাশক ছিলেন-নিউ এজ পাবলিশার্স। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এই বই জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

রম্যরচনার ক্ষেত্রে নূতন প্রকাশভঙ্গিতে যে লেখক প্রথম জনপ্রিয়তা অর্জন করেন তিনি যাযাবর। তাঁর অনবদ্য সুন্দর প্রথম গ্রন্থ 'দৃষ্টিপাত' বিস্ময়ের দৃষ্টি নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করে। এর পরেই মুজতবা আলী এই ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করেছে। তার রচনাশৈলীর একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। সে তার মনের ভাব বাচনভঙ্গীর ওপর এঁকে দিতে সমর্থ হয়েছিল। সে অনেক আরবী ফারসী শব্দ ও পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক শব্দকে বাংলাভাষায় প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছে। তার কলমের গুণে তার ব্যবহৃত নতুন শব্দ আঞ্চলিকতাকে অতিক্রম করে গিয়েছে। তার ভাষায় ফরাসী গদ্যসাহিত্যের প্রাঞ্জলতা স্বচ্ছতা ও বুদ্ধিদীপ্ত তীক্ষ্ণতা দেখতে পাওয়া যায়। লঘুচালের ভাষায় বুদ্ধিদীপ্ত রচনাশৈলীতে চমক ও শ্লেষের ব্যবহারে সে এক অভিনব রম্যসাহিত্য সৃষ্টি করেছে। অতি সাধারণ ঘটনাকে তীক্ষ্ণ-পর্যবেক্ষণ-শক্তি আতস কাঁচের ভেতর দিয়ে তাকে তীব্রতর স্বচ্ছ রূপপ্রদানের ক্ষমতা তার অসাধারণ।

১৯৪৯ সালে মুজতবা আলী বগুড়া কলেজে অধ্যক্ষরূপে যোগদান করে। তার প্রগতিশীল মতবাদ কর্তৃপক্ষ সুনজরে দেখেন নি। তার বিরুদ্ধে অন্যতম অভিযোগ ছিল, কলেজ ম্যাগাজিনে একটি প্রবন্ধে একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অশোভন মন্তব্য করা হয়েছিল। তার লেখা পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা পুস্তিকা কর্তৃপক্ষ সুনজরে দেখেন নি। এই সকল কারণে সে বাংলাদেশ ছাড়তে বাধ্য হয় ও ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করে।

পরে সে প্রায় সাত বৎসর অল ইন্ডিয়া রেডিওর কটক স্টেশনের ডিরেক্টার ছিল। এই সময়টা তার সুখে কাটে। এসময় বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র নবকৃষ্ণ চৌধুরী উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। এর পরে সে পাটনা ও দিল্লীতে অল ইন্ডিয়া রেডিওর সঙ্গে যুক্ত ছিল। অল ইন্ডিয়া রেডিওর চাকুরি করার আগে সে ভারত গভর্নমেন্টের Cultural Relation সংস্থার সেক্রেটারী ছিল। অল ইন্ডিয়া রেডিওর চাকরি ছেড়ে শান্তিনিকেতনে সে জার্মান ভাষা অধ্যাপনা করতো। পরে সে বিশ্বভারতীর ইসলামিক কালচার বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়।

মুজতবা আলী ছিল বহুভাষাবিদ। ফরাসী, জার্মান, ইটালিয়ান ইত্যাদি ইউরোপীয় ভাষা ও আরবী, ফারসী, উর্দু, হিন্দী, সংস্কৃত, গুজরাটী, মারাঠী ইত্যাদি প্রাচ্য ও ভারতীয় ভাষায় তার দখল ছিল। সে পনেরোটি ভাষা জানতো।

তার প্রকাশিত গ্রন্থের নাম নিম্নে দেওয়া গেল—দেশে-বিদেশে, চাচা-কাহিনী, পঞ্চতন্ত্র (১ম ও ২য় পর্ব), ময়ূরকণ্ঠী, অবিশ্বাস্য, ধূপছায়া, চতুরঙ্গ, দ্বন্দ্বমধুর, ভবঘুরে, টুনিমেম, দু'হারা, হাস্যমধুর, প্রেম, জলেডাঙায়, শবনম্, শহর ইয়ার, বড়বাবু, পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, কত না অশ্রুজল, হিটলার ইত্যাদি। দ্বন্দ্বমধুর মুজতবা আলী ও রঞ্জনের উভয়ের রচনার সংকলন। এ সকল বই ছাড়া তার শ্রেষ্ঠ গল্প, শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা, পছন্দসই, বহুবিচিত্র ইত্যাদি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। তার আর একখানা বই 'তুলনাহীনা' তার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছে। মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে সে পূর্বদেশ পত্রিকায় 'পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নামে একটি ধারাবাহিক রচনা লেখে।

১৯৫১ সালে তার সঙ্গে বিবাহ হয় রাবেয়া খাতুনের। রাবেয়া আলী কিছুকাল পূর্বে অ্যাসিস্টান্ট ডি.পি.আই পদ থেকে অবসর নিয়েছেন। মুজতবা আলীর দুই পুত্র সৈয়দ মশররফ আলী ও সৈয়দ জগলুল আলী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা কলেজে পড়ছে।

মুজতবা আলী ছিল আমার আব্বার কনিষ্ঠ পুত্র। তার জন্মের পরেই আমার আব্বার চাকুরিতে উন্নতি হয়েছিল। এই কনিষ্ঠ পুত্রের প্রতি আব্বা ছিলেন অত্যন্ত স্নেহশীল। মুজতবা আলীর বন থেকে ডক্টরেট নিয়ে এলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন। তিনি মুজতবার থিসিস সর্বদা তাঁর সঙ্গে রাখতেন। তাঁর ওফাৎ হয় ১৯৩৯ সালে ৭৪ বছর বয়সে। ১৯৪৮ সালে মুজতবা আলী সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতিলাভ করে। পরম পরিতাপের বিষয় আমাদের আব্বা মুজতবা আলীর সাহিত্যখ্যাতি চোখে দেখে যেতে পারেন নি।

সৈয়দ মুর্জাতা আলী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

কথারসিক সৈয়দ মুজতবা আলী

দেশে-বিদেশে বইখানা প্রথম প্রকাশিত হওয়া মাত্র পাঠকসমাজ চমকে উঠল, আর তারপরে বইয়ের পর বই প্রকাশিত হয়ে সেই প্রথম চমককে অব্যাহত রাখলো, শেষ পর্যন্ত সেই চমকের ভাব অব্যাহত ছিল—যদিচ পাঠকের চোখ তখন অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে এসেছে। লেখকের এই ক্ষমতা বিস্ময়কর ও বিরল।

সৈয়দ মুজতবা আলীর নাম আজ দুই বঙ্গে সুপরিচিত, শ্রেষ্ঠ লেখকগণের তিনি অন্যতম। আমার সৌভাগ্য এই যে পাঠক সমাজের কাছে লেখক রূপে পরিচিত হওয়ার অনেক আগেই আমার সঙ্গে তাঁর দেখা ও পরিচয় হয়েছিল। আমার হাতের কাছে কয়েক খণ্ড শান্তিনিকেতন পত্রের পুরাতন ফাইল আছে, তার মধ্যে চোখে পড়লো ১৯২৬ সালে যে সব ছাত্র-ছাত্রী ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন সেই তালিকায় সৈয়দ মুজতবা আলী নামটি। ঠিক কোন্ সালে তিনি শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন মনে নেই, ১৯২১ বা ১৯২২ হওয়া সম্ভব। তাঁকে প্রথম দেখে Curram অঙ্কিত শেলীর ছবির মুখ মনে এসেছিল, সেই উজ্জ্বল উদাস চোখ, সেই এলোমেলো চুলের অজস্রতা, সেই মুখমণ্ডলের ছাঁদ। অপরে এই মিল লক্ষ্য করেছিলেন কিনা জানি না। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করে কলেজে গেলেন না, শান্তিনিকেতনেই কিছু কিছু বিদেশী ভাষা শিখতে শুরু করলেন। কবে তিনি সে-স্থান পরিত্যাগ করলেন এখন আর মনে নেই, আমি ১৯২৭ সালে পরিত্যাগ করেছিলাম, হয়তো তার কিছু পরেই। এবার তাঁর আরম্ভ হল বিদেশ ভ্রমণের পালা—জার্মানীর প্রতি বিশেষ টান ছিল তাঁর। তখন এবং তারপরে একাধিকবার জার্মানীতে গিয়েছেন, ইউরোপের অন্য দেশেও। জার্মান ফরাসী প্রভৃতি বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করে গিয়েছিলেন। ভাষা শিক্ষাতেই তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। ফরাসী ভাষা বেশ ভালো জানতেন।

এই সময়টায় তাঁর সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ যোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, বন্ধুদের মুখে শুনতে পেতাম তিনি কখনো কাবুলে, কাবুল কলেজের আহ্বানে কলেজের অধ্যাপক, কখনো শুনতে পেতাম বরোদা কলেজের অধ্যাপক। তারপরে একদিন শুনলাম দেশে ফিরেছেন, আপাতত বিদেশের পালা শেষ। দেখাও হল। এবারে এসে অল্ ইন্ডিয়া রেডিওর উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হলেন, কখনো পাটনায়, কখনো দিল্লীতে। কিন্তু কোথাও স্থায়ীভাবে বসতে পারলেন না, তাঁর মধ্যে যে ভবঘুরেটা ছিল ঘুরিয়ে মারতো সে। তা ছাড়া চাকুরির ছককাটা জীবন তাঁর পছন্দ নয়। অবশেষে সমস্ত চাকুরি পরিত্যাগ করে মুক্তপুরুষ হয়ে ফিরে এলেন বাংলাদেশে। তখন তাঁর আয়ের একমাত্র পথ কলম। কলম তাঁকে জীবনের শেষ পর্যন্ত খোরাক যুগিয়েছে।

আগে বলেছি তাঁর বিদেশ ভ্রমণের পালা শেষ হল। তবে শেষ হয়েও শেষ হল না, রূপান্তরিত হয়ে দেখা দিল দেশে-বিদেশে গ্রন্থরূপে। এখানাই তাঁর শ্রেষ্ঠ বই, সেই সঙ্গে পঞ্চতন্ত্রকে ধরা যেতে পারে। তাঁর বর্হির্মুখী মনের পরিচয় দেশে-বিদেশে, আর বহুমুখী মনের পরিচয় পঞ্চতন্ত্রে। সমস্তর মূলে তাঁর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা আর সেই সঙ্গে জীবন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সম্বন্ধে কৌতূহল। তাঁর রচনার স্টাইলকে অনায়াসে বৈঠকী চাল বলা যেতে পারে, এ যেন আসর জমিয়ে কথা বলছেন আর সে-সব কথা অনায়াসে কলমের মুখে ঝরছে, কলম তাঁকে এতটুকু বিকৃত করতে পারেনি। এ বড় শক্ত কাজ। অবনীন্দ্রনাথের পথে বিপথে এই চালে রচিত, সে যেন লেখকের হয়ে কলম কথা বলে চলেছে। তবে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে মুজতবা আলীর রচনার পার্থক্য এই যে তাঁর ভাষায় দেশী-বিদেশী, বিশেষ উর্দু-ফারসীর অনায়াস ও অঙ্গাঙ্গী মিশ্রণ, কোথাও এতটুকু ফাটল নেই। কাজী নজরুল ইসলাম যা করেছেন পদ্যে, সৈয়দ মুজতবা আলী তাই করেছেন গদ্যে। এ আলালের ঘরের দুলালের ফারসীবহুল বাংলা নয়—বাংলার সঙ্গে ফারসী মিশিয়ে এক নূতন ধাঁচ—অথচ কখনো অবাংলা বলে মনে হয় না। বৈঠকী রীতির এই বিশেষ স্টাইল বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রধান দান। দ্বিতীয় দান দেশ-বিদেশের আবহাওয়াকে বাঙালীর মনের আবহাওয়ার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া। তৃতীয় দানের কথা বলতে হলে প্রথম দানের উল্লেখ করতে হয়, মনীষাকে বৈঠকী রীতিতে প্রকাশ। বিদ্যা আছে অথচ বিদ্যার ভাব নেই—এ যেন চন্দ্রলোকের আবহাওয়ায় ভারের লঘুভবন। তিনি পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু কোথাও পণ্ডিতী করেন নি—সেইজন্যে সাধারণ পাঠকেরও আকর্ষণ তাঁর রচনার প্রতি। তাঁর অকাল মৃত্যু একটি সম্ভাবনাকে হঠাৎ ছিন্ন করে দিল, কেবলই মনে হতে থাকে না-জানি আরও কী ছিল তাঁর রহস্যময় ঝুলিটার মধ্যে!

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

ভূমিকা

সৈয়দ মুজতবা আলী বা আমাদের সৈয়দদার রচনাবলীর ভূমিকা আমি লিখতে বসেছি, এ সংবাদটি তিনি জীবিতকালে পেলে তখনই কাগজ কলম নিয়ে বসে যেতেন এবং সেই মজার ঘটনাটা নিয়েই পঞ্চতন্ত্রের একটা অধ্যায় লিখে ফেলতেন, আর রচনাটি যে খাসা হ'ত—সে বিষয়েও আমি নিঃসন্দেহ।

ঘটনাটা হাস্যকর বটে, হয়ত সৈয়দদার পক্ষে শোচনীয়ও। কিন্তু কি করব বলুন, যদি আর কেউই লিখতে সাহস না করেন, একজনকে তো অগ্রজকৃত্য, বন্ধুকৃত্য করতেই হয়। আমার দিক থেকে একটা প্রশংসার দাবী এই করতে পারি যে, তাঁর মুখ চেয়ে হাস্যাস্পদ হবারও ভয় করি নি। দেবদূতরা যেখানে পা ফেলতেও ভয় পান, সেখানে আহাম্মুকরা অনায়াসে ছুটে আসে—এই অবশ্যবর্ষণীয় বিদ্রূপবাক্য ভাগ্যে আছে জেনেও, অথবা জেনেই, এ কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছি।

তবে সাফাই একটা আছে। সেটা সৈয়দদাই দিয়ে গেছেন। তিনি নেতাজীকে উপলক্ষ করে যা বলেছেন, তা আমরা তাঁর বেলায়ও কাজে লাগাতে পারি।

"আমাদের মতো সাধারণ লোকের পক্ষে সুভাষচন্দ্রের মতো মহাপুরুষের জীবনী আলোচনা করা অন্ধের হস্তী দর্শনের ন্যায়। তৎসত্ত্বেও যে আমরা সুভাষচন্দ্রের জীবনী দর্শনে প্রবৃত্ত হয়েছি তার প্রধান কারণ, আমাদের মতো অর্বাচীন লেখকেরা যখন মহাপুরুষকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার জন্য ঐ একমাত্র পন্থাই খোলা পায়, তখন তার শ্রদ্ধাবেগ তাকে অন্ধত্বের চরমে পৌঁছিয়ে দেয়—শ্রদ্ধা ও ভক্তির আতিশয্য তখন আমাদের চেয়ে সহস্রগুণে উত্তম লেখককেও বাচাল করে তোলে।

"দ্বিতীয় কারণ, এক চীনা গুণী জনৈক ইংরেজকে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরিজীতে বুঝিয়ে বলেছিলেন, 'সরোবরে জল বিস্তর কিন্তু আমার কাপ ক্ষুদ্র। জল তাতে ওঠে অতি সামান্য। কিন্তু আমার শোক নেই—মাই কাপ ইজ স্মল, বাৎ আই দ্রিঙ্ক অফতেনার...।'

"আমাদের পাত্র ছোট, কিন্তু যদি সুভাষ-সরোবর থেকে আমরা সে পাত্র ঘন ঘন ভরে নিই তাহলে শেষ পর্যন্ত সরোবর নিঃশেষ হোক আর না-ই হোক, আমাদের তৃষ্ণা নিবৃত্তি নিশ্চয়ই হবে। আমার পাত্রে উঠেছে দুই গণ্ডূষ জল, অথবা বলব, আমি অন্ধ, হাত দিয়ে ফেলেছি সৌভাগ্যক্রমে দুটি দাঁতেরই উপর। অবশ্য সব অন্ধই ভাবে সে-ই সবচেয়ে মহামূল্যবান স্থলে হাত দিয়ে ফেলেছে।"

(পঞ্চতন্ত্র, ১ম পর্ব, ষোড়শ মুদ্রণ, পৃঃ ১৭)

সৈয়দ মুজতবা আলী নেতাজী নন—তেমনি আমিও মুজতবা আলী নই। সুতরাং অন্ধের হস্তীদর্শনের উপমাটা এখানে বেমালুম খাটে, আর ঐ কথাটাও—'মাই কাপ ইজ স্মল—বাৎ আই দ্রিঙ্ক অফতেনার।' অনেকবার অনেক রকম ভাবে সৈয়দদার রচনা দেখতে বুঝতে, তা নিয়ে ভাবতে চেষ্টা করেছি; তাতে আমার সামর্থ্যের বাটি যতই ক্ষুদ্র হোক—সে রসের কিছুমাত্র স্বাদ পাই নি, এমন হ'তে পারে না। সুতরাং সৈয়দসাহিত্যচর্চা আমার পক্ষে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একেবার অমার্জনীয় ধৃষ্টতা না-ও হতে পারে।

তবে, নির্বোধ হলেও, গেছো বোকা হয়ত নই (কে জানে, এই পংক্তিটি পড়ে পাঠক খুব একচোট হেসে নিচ্ছেন কিনা)। ঠিক ভূমিকা যাকে বলে তা আমি লিখতে বসি নি। মূল্যবান কোন গ্রন্থের যে সব ভূমিকা লেখা হয়, অন্তত যা রীতি—তাতে কিছুটা সমালোচনা থাকে, কিছুটা থাকে 'উজ্জ্বল অঙ্গুলি করে' গুণগুলো দেখিয়ে দেওয়া, 'অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া'' চক্ষু উন্মীলিত করে দেওয়ার প্রচেষ্টা। এক কথায় কিছু ব্যাখ্যার কাজ করা।

সৈয়দ সাহিত্যে এটা নিষ্প্রয়োজন। তাঁর রচনা দিবালোকের মতো পরিষ্কার, ঝরণার জলের মতো স্বচ্ছ—সেই রকমই সুস্বাদু, সুপেয়, স্বাস্থ্যকর। তাঁর রচনায় আবিলতা নেই, তা সোজাসুজি পাঠকদের হৃদয়ে পৌঁছয় এবং কিছুটা রসায়নের কাজ করে বলেই তিনি এত জনপ্রিয়। নইলে তাঁর মতো পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনার পূর্ণ মূল্য দেওয়া, তার সমস্ত বক্তব্য বুঝে তার রসগ্রহণ করা অধিকাংশ সাধারণ পাঠকদের পক্ষে দুঃসাধ্য। তুলনাটা আর একটু দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্যে আনতে গেলে বলতে হয়—তাঁর রচনা অনেকটা পায়েসের মতো। খাঁটি দুধ, কামিনী বা গোলাপ-সরু চাল, নলেনগুড় সহযোগে প্রস্তুত পরমান্ন সুস্বাদু ও লোভনীয় সন্দেহ নেই কিন্তু কিঞ্চিৎ গুরুপাক, সম্পূর্ণ জীর্ণ করা কঠিন। তবু জীর্ণ না হলেও যেমন রসনামন অনির্বচনীয় ভাবে তৃপ্ত হয়—মুজতবা আলীর রচনা তেমনিই একটা তৃপ্তি দেয়, সবটা না বুঝে, রেফারেন্সগুলো না জেনেও অনেকটা আনন্দলাভে বাধা থাকে না। জ্ঞান বা পাণ্ডিত্যের কথা বাদ দিয়েও অনেক কিছু আছে তাঁর লেখাতে, আর তার আস্বাদে কোন বাধা নেই—কাঁটা-খোঁচা যাকে বলে—সেই জন্যেই আমাদের মতো গোলা লোকও পড়ে প্রচুর আনন্দ পান। ইলিশমাছ সৈয়দদার খুব প্রিয় ছিল—কিন্তু ভাগ্যে তাঁর রচনা অত কণ্টকাকীর্ণ নয়, হিন্দুবিধবার নিরামিষ ব্যঞ্জনের মতো (এও সৈয়দদার প্রিয় অবশ্য) সুস্বাদু ও কিছু হয়ত গুরুপাক—তবু অনায়াসে অন্ধকারেও খেয়ে যাওয়া যায়। এ একটা মস্ত সুবিধে। সবটা, কি দিয়ে কি তৈরী, না বুঝলেও মোটামুটি রসাস্বাদনে বাধা থাকে না।

না, ব্যাখ্যা করারও যেমন প্রয়োজন নেই তেমনি সমালোচনা করারও না। আমি ওঁর সঙ্গে একমত, ''সমালোচনা লেখার মতো শক্তি—দুষ্ট লোকে বলে শক্তির অভাব—আমার এবং আমার মতো অধিকাংশ লোকের নেই। ...আর কীই বা হবে সমালোচনা দিয়ে? কটা সুস্থ লোক সমালোচনা পড়ে?...আলগোছে তফাৎ থেকে সমালোচনা-প্রবন্ধে একটু-আধটু ঠোকর দেয় অনেকেই—অর্থাৎ বোক্কা পয়সা ঢেলে মাসিকটা যখন নিতান্তই কিনেছে তখন পয়সার দাম তোলবার জন্যে একটু-আধটু খোঁচাখুঁচি করে। ফলে চারের রস যত না পেল বঁড়শির খোঁচাতে তার চেয়ে বেশী জখম হয়ে দুত্তোরছাই বলে তাসপাশাতে ফিরে যায়।''

ব্যাখ্যাও করব না সমালোচনাও করব না—তবে ভূমিকা নাম দিয়ে এ কী আবোলতাবোল লিখতে বসেছি?—স্বাভাবিক ভাবেই এ প্রশ্ন উঠতে পারে। হক কথাও। আমি বলব—অন্ধের হস্তীদর্শনের মতো, আমি যেটুকু তাঁকে দেখেছি বুঝেছি—সেইটুকুই এখানে বলব। সহৃদয় পাঠকদের পছন্দ না হয় পড়বেন না। দয়া ক'রে এই পাতা কটা উল্‌টে যাবেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সৈয়দসাহিত্য পড়তে গিয়ে প্রথমেই আমার যা মনে হয়েছে, আমার বিশ্বাস আরও অনেক সুধী পাঠকের হবে—মুজতবা আলী মূলত কবি ছিলেন। চিরজীবন বেশির ভাগ গদ্য রচনা করে গেলেও তাঁর মন ছিল কবির মন, দৃষ্টি ছিল কবির দৃষ্টি। তাই যেখানেই দেখেছেন কোন অবিচার অত্যাচার, দুঃখ ও শোক, সৎ নিরপরাধ লোকের শাস্তিভোগ, সেখানেই তিনি অতি সেন্টিমেন্টাল কোমলহৃদয় ব্যক্তির মতো হাহাকার করে উঠেছেন। সে হাহাকারে কখনও ভাগ্যের প্রতি বিধাতার সম্বন্ধে নিরূপায় ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে—কখনও মানুষের সম্বন্ধে প্রকট উষ্মা। তাঁর 'শমীম', 'ঢেউ ওঠে পড়ে কাঁদার সমুখে ঘন আঁধার' রচনা দুইটি এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হয়ত 'মৃত্যু'কেও এর মধ্যে ফেলা যায়। এমন কি যে আঘাত প্রত্যক্ষভাবে তাঁর ওপর আসে নি, যা তিনি নিজে দেখেন নি—তাও তাঁকে এক এক সময় কত বিচলিত করত তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'মৃত্যু' রচনাটি। মৃত্যুর এই অকরুণ ও অকারণ আঘাতগুলো যদিচ প্রধানত তাঁর গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের ওপরই—লেখাটা পড়লে মনে হয় তাঁকেও কম বাজে নি।

তা ছাড়াও—তাঁর আপাত চটুল মজলিসী লেখার মধ্যে যেখানে যেখানেই তিনি প্রসঙ্গত কোন কাহিনী বলতে বসেছেন—সেখানেই দেখবেন করুণ কোন ঘটনা—করুণ বললেও ঠিক বলা হয় না—প্যাথেটিক* অভিজ্ঞতা। যেমন কোদণ্ড মুথহানার, শামসাদবানুলয়লার ইতিহাস। এই ধরনের ব্যথাতুর, ভাগ্যের-হাতে-মার খাওয়ার কাহিনী তাঁর অজস্র রচনায় মণিমুক্তোর মতো ছড়ানো রয়েছে। 'পছন্দসই' বইয়ের লেখাগুলো তিনিই সাজিয়েছিলেন—তাঁর নিজের প্রিয় লেখার সঙ্কলন হিসাবে—তাতে দেখুন, প্রায় সব রচনাই আসলে এই ধরনের করুণ বা প্যাথেটিক কাহিনী। এগুলি সবই তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বিবৃত করা—হয়ত সামান্য একটু হেরফের অদলবদল আছে, কিন্তু সত্য ঘটনার এক সের দুধে পাঁচপো জল পড়ে নি। 'ক্রন্দসী' গল্পই ধরুন না কেন—বলে-কয়েই শুধু নামটা পাল্টেছেন নায়িকার। বাকী সবই সত্য। তাঁর গুরুদেবের ভাষাতেই বলতে হয়—"শান্তি কোথায় মোর তরে হায় বিশ্বভুবন মাঝে অশান্তি যে আঘাত করে তাই তো বীণা বাজে!"

অশান্তি শুধু নয়,—"অন্যায় অসত্য যত, যত কিছু অত্যাচার পাপ/কুটিল কুৎসিত ক্রূর, এর পরে তব অভিশাপ/বর্ষিয়াছ ক্ষিপ্রবেগে অর্জুনের অগ্নিবাণ সম/তুমি সত্য-বীর, তুমি সুকঠোর নির্মল নির্মম/করুণ কোমল।" রবীন্দ্রনাথ, সৈয়দদারই গুরুদেব তাঁর আর এক প্রিয় কবি সত্যেন দত্তর সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন, তাঁর নিজের বেলাতেও হুবহু তাই খাটে। সত্যবীর না হোক, লেখার সময় কিছুকাল সত্যপীর নামও নিয়েছিলেন সৈয়দদা। 'এর পরে তব অভিশাপ/বর্ষিয়াছ ক্ষিপ্রবেগে অর্জুনের অগ্নিবাণ সম'—এ দৃষ্টান্ত তাঁর রচনায় ভুরি ভুরি। অথবা বলা যায়, এ ছাড়া কিছু নেই।

মুজতবা আলীর রচনা পড়তে শুরু করলে প্রথম একটা কালতো ধারণা হত—তিনি হাসাতে বসেছেন। কারও কারও এমনও ধারণা হত—সাহিত্যের রাজদরবারে তিনি শুধু ভাঁড়ামি করতে চান। এমন কি—হায় হতভাগ্য দেশবাসী—অনেক পড়ার পরও এই ধারণা অনেকের যায় নি। তিনি মজলিসী গল্প বলতেন, আড্ডাবাজী ধরনে—সে কথা বলেও

---

* অভিধানে অর্থ লেখা আছে 'হৃদয়স্পৃক'।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেছেন বারবার—বলতে গেলে বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের তিনিই স্রষ্টা (সে কথায় পরে আসছি) কিন্তু সেটা আর যাই হোক, ভাঁড়ামি নয়। এ বিষয়ে তাঁর এক প্রিয়—অতি প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, পৃথিবীর বোধ করি সর্বশ্রেষ্ঠ ভাঁড়, একদা বিশ্ববাসীর ভোটে স্বীকৃত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পাঁচ ব্যক্তির অন্যতম চার্লি চ্যাপলিনের অভিনয় বা নির্মিত ছায়াচিত্রের সঙ্গে (এসব ছবির গল্প হয় উনি নিজে লিখতেন, নয়ত বেছে বেছে নিজের মতো কাহিনীগুলিই নির্বাচন করতেন, নয়ত কাঠামোটা বলে দিয়ে অন্যকে দিয়ে লেখাতেন) তাঁর রচনাধারার অনেক মিল আছে। চার্লিরও হাসিটা যেমন ঠিক হাসি নয়—কান্নারই ছদ্মবেশ, মুখোশ, অথবা কান্নাকে ব্যঙ্গ করা—সৈয়দদার রচনাও তাই, হাসিতে অশ্রুতে মেশানো, অশ্রুর মাত্রাই বেশী; কোথাও কোথাও তা এসেছে সোজাসুজি, কোথাও বা এসেছে হাসির আড়ালে, তামাশার মুখোশ পরে। ব্যঙ্গবিদ্রূপ যা করেছেন, তার মধ্যেও ভাল করে (পড়লে) চেয়ে দেখলে দেখা যাবে—দুটি করুণ চোখের দৃষ্টি বেদনায় ছলছল করছে।

যথার্থ কবিপ্রকৃতি ছাড়া এ সম্ভব নয়। তিনি কবিতাও লিখেছেন—কিন্তু সে নগণ্য; তাঁর অনেক রচনার ফার্সী গজল বা রুবাইয়ের অনুবাদ করেছেন (সত্যেন দত্তর অনুবাদ পেলে সে চেষ্টা আর করেন নি) কিন্তু সেও কাব্যরচনা হিসেবে এমন কিছু উৎকৃষ্ট মানের নয়। আসলে তাঁর সমস্ত রচনাই মূলতঃ কাব্য, কাব্যধর্মীয় গদ্য—কবিতার মতো করে সাজালে গদ্যকবিতা হতে পারত। যেখানে যেখানে তিনি নিসর্গ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন সেখানে তাঁর লেখনী ছদ্মবেশও রাখতে পারে নি। যেমন, দু-একটি উদাহরণই দিই—

'বসেছিলুম জলের আর জেলেপাড়ার মাঝখানে। পিছনে নারকেল বন—তাতে আগুন লাগিয়ে সূর্য প্রচণ্ড মহিমায় অস্ত গেলেন—গরবিনীর সতীদাহ। সমুদ্রের গর্জন আর ঢেউয়ে-ভেসে-আসা-পোনা-মাছ-লুব্ধ কাকের কর্কশ চিৎকার, নারকেল গাছের উসকোখুসকো মাথার অবিশ্রান্ত আছাড় খাওয়া—অশান্তির চরম আয়োজন।...

"অন্ধকার নামল অতি ধীরে ধীরে। পাটরাণী তো চিতেয় উঠলেন লাল টকটকে হয়ে। আকাশ সিঁদুর মুছলেন অতি অনিচ্ছায়—এমেঘে ওমেঘে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে। সক্কলের শেষ পান্না জল লালে-নীলে মেশা বেগুনি ঝিলিকটুকু মুছে ফেলে আস্তে আস্তে শ্যামলা সবুজ হলেন।

"কোনদিন আবার রঙের রাজা মাত্র তিনটি রঙ নিয়ে খেলায় বসেন। সমুদ্র আর পূবের আকাশকে দেন কালো-নীল, পশ্চিম আকাশকে একটুখানি গোলাপী আর মাথার উপর বাকী সমস্ত আকাশ পায় ফিকে ফিরোজা। যতক্ষণ না কালো পরদায় সব কিছু ঢাকা পড়ে যায়, ততক্ষণ শুধু এই তিন রঙের 'ফিকে ঘন'র খেলা। তাতে কেউই না কারচুপি। এদিকে কালো-নীল যত ঘনিয়ে ঘনিয়ে নীলের রেশ কমাতে লাগল, ওদিকে তেমনি গোলাপী ফিকে হতে হতে শিরীষ রঙের আমেজ নিতে আরম্ভ করল। মাঝখানের আকাশ ফিরোজাতে শ্বেত-চন্দনের প্রলেপ লাগিয়েই যাচ্ছে। এ যেন তিন স্বর নিয়ে খেলা। আর তবলাও ঠিক বাঁধা। পশ্চিমের আকাশ যদি দ্রুত লয়ে রঙ বদলান তবে পূবও সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাল রাখেন। আর সমুদ্রের গর্জন যেন তানপুরোর আমেজ।

"সমে এসে যখন পূব-পশ্চিম মিলে গেল অন্ধকারে, তখন তানপুরোর রেশটুকু মাত্র রইল সাগরপারে। মশালচি এসে আসমানের ফরাশে এখানে-ওখানে তারার মোমবাতি

www.BanglaBook.org

জ্বালিয়ে রেখে গেল। এবার রাত্রির মুশায়েরা (কবিসঙ্গম) বসবে। নারকেল মাথা দোলাবে, ঝিঁঝি নূপুর বাজিয়ে নাচবে, পূবের বাতাস সভার সর্বাঙ্গে গোলাপজল ছিটিয়ে ঠাণ্ডা করে যাবে। তার পর দূর সাগরের ওপারে লাল মদের ভাঁট থেকে মাতাল চাঁদ উঠবেন ধীরে ধীরে পা টেনে টেনে, একটুখানি কাৎ হয়ে। মোসাহেবদের মুখে হাসি ফুটবে—অন্ধকারে যারা গা-ঢাকা দিয়ে বসেছিল। তাদের সবাইকে তখন চেনা যাবে।

* * *

"দূর থেকে রোষে ক্রোধে তর্জনে-গর্জনে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে সিন্ধুপারে লুটিয়ে পড়ে অবশেষে এ কী বিগলিত আত্মনিবেদন!

"তাণ্ডবের ডমরু বাজিয়ে, ছিন্নমস্তার আত্মঘাতে নিজেকে বারে বারে দ্বিখণ্ডিত করে, পাড়ে এসে অবশেষে লক্ষ কিঙ্কিণীর এ কী মৃদু শান্ত নূপুর-গুঞ্জরণ!

"সূর্যোদয়ের লোহিতোজ্জ্বল রক্ত-টিপ, দ্বিপ্রহরের অতি ঘন নীলাম্বরি, সন্ধ্যার গৈরিক পট্টবাস, সর্বশেষে অন্ধকারে সর্বস্ব ত্যাগ করে কার অভিসারে সিন্ধুপারে মৃদুপদসঞ্চারণ!!" (পঞ্চতন্ত্র, ১ম পর্ব, ১৬শ মুদ্রণ, পৃঃ ১১-১৩)

"পশ্চিম বাঙলা যেখানে সত্যই সুন্দর সেখানেই দেখি তার উঁচু-নিচু খোয়াইডাঙা আর দূরদূরান্তের নীলাভ পাহাড়। উঁচু-নিচুর ঢেউ-খেলানো মাঠের এখানে ওখানে কখনো বা দীর্ঘ তালগাছের সারি, আর কখনো বা একা দাঁড়িয়ে একটিমাত্র তালগাছ। এই তালগাছগুলো মানুষের মনে যে অন্তহীন দূরত্বের মায়া রচে দিতে পারে তা সমুদ্রও দিতে পারে না। সমুদ্রপাড়ে বসে মনে হয়, এই আধ মাইল দূরেই বুঝি সমুদ্র থেমে গিয়েছে—আকাশে নেমে গিয়ে নিরেট দেয়ালের মত হয়ে সমুদ্রের অগ্রগতি বন্ধ করে দিয়েছে।

"পশ্চিম বাঙলার খোয়াইডাঙা তাই তার শালতাল দিয়ে, দূর না হয়েও যে দূরত্বের মরীচিকা সৃষ্টি করে, সে মায়াদিশান্ত মানুষের মনকে এক গভীর মুক্তির আনন্দে ভরে দেয়। জানি, মন স্বাধীন; সে কল্পনার পক্ষিরাজ চড়ে এক মুহূর্তেই চন্দ্রসূর্য পেরিয়ে সৃষ্টির ওপার পানে ধাওয়া দিতে পারে, কিন্তু সে স্বপ্নপ্রয়াণে তো আমার রক্তমাংসের শরীরকে বাদ দিয়ে চলতে হয়—আমাকে দেখতে হয় সব-কিছু চোখ বন্ধ করে। আর এখানে আমার দুটি মাত্র চোখই আমাকে এক নিমেষে নিয়ে যায় দূর হতে দূরে, যেখানকার শেষ নীল পাহাড় বলে, 'আরো আছে, আরো দূরের দূর আছে'; সে যেন ডাক দিয়ে বলে, 'তুমি মুক্ত মানুষ, তুমি ওখানে বসে আছ কী করতে—চলে এসো আমার দিকে।'...

"পূব-বাঙলার সৌন্দর্য দূরত্বে নয়, পূব-বাঙলার 'মাঠের শেষে মাঠ, মাঠের শেষে/সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে' নয়, সেখানে মাঠের শেষেই ঘন সবুজ গ্রাম আর গ্রামখানির উপর পাহারা দিচ্ছে সবুজের উপর সাদা ডোরা কেটে কেটে সুদীর্ঘ সুপারি গাছ। আর সে সবুজ কত না আভা, কত না আভাস ধরতে জানে। কচি ধানের কাঁচা-সবুজ হলদে-সবুজ থেকে আরম্ভ করে আম, জাম, কাঁঠালের ঘন সবুজ, কৃষ্ণচূড়া-রাধাচূড়ায় কালো সবুজ; পানার সবুজ, শ্যাওলার সবুজ, কচি বাঁশের সবুজ, ঘন বেতের সবুজ—আর ঝরে-পড়া সবুজ পাতার রস খেয়ে খেয়ে পূব-বাঙলার মা-টি হয়ে গেছেন গাঢ় সবুজ...কৃষ্ণশ্যাম। তাই তাঁর মেয়ের গায়ের রঙে কেমন যেন সবুজের আমেজ লেগে আছে। সে শ্যামশ্রী দেশ-বিদেশে আর কে পেয়েছে, আর কে দেখেছে?" (অবিশ্বাস্য, ২য় মুদ্রণ, পৃঃ ১০-১১)

www.BanglaBook.org

কে জানে প্রথম যৌবনে বা কৈশোর বয়সে অতি ভীরু ভদ্র কোমল মন তাঁর—কোন প্রবল আঘাত পেয়েছিল কিনা, যার ক্ষত সারা জীবনেও শুকোয় নি—তাতে সামান্য দুঃখের কাঁটা লাগলেও তা থেকে রক্তক্ষরণ হয়েছে।

আমাদের এ অনুমানের কিছু সমর্থনও তাঁর রচনাতেই মেলে ঃ—

"আজ না হয় ঠাট্টা-মসকরা রঙ্গ-রসিকতা করে মনের গভীর আবেগ, তার গোপন ক্ষুধা, তার অসম্ভব অসম্ভব স্বপন-চয়ন, তার বদ্ধ পাগলামি যতখানি পারি ঢেকে চেপে বলছি কিন্তু তখন, হায়, এ হালকামি ছিল কোথায়?" (শবনম্, ২য় বিশ্ববাণী সং, পৃঃ ২৮)

উপন্যাসের নায়কের মুখেই বসেছে কথাগুলো—কিন্তু এ নায়ককে লেখকই নিজের সঙ্গে প্রায় একাত্ম করেন নি কি?

সম্ভবত তাঁর এই কবিপ্রকৃতি, বৈদগ্ধ্য এবং সত্যকার আভিজাত্যের জন্যেই তিনি পুরাতন 'সেন্স অফ ভ্যালুজ' বা মূল্যবোধের সমর্থক ছিলেন। ভদ্রতা, শিষ্টাচার, মিথ্যা সম্বন্ধে ঘৃণা—সর্বোপরি কৃতজ্ঞতা—আজ যে গুণগুলোর গুণপনা হারিয়ে যেতে বসেছে, যাকে পৌরাণিক যুগের 'নন্‌সেন্স' বলে মনে করা হয়—সেগুলো সম্বন্ধে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল। তাঁর রচনাতে—যার অধিকাংশ, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ রূপে তাঁর আত্মজীবনেরই অংশ—এই পুরাতন জগতের মূল্যবোধের, বিশেষত কৃতজ্ঞতাবোধের নিদর্শন অসংখ্য। সামান্যতম ঋণও, যা সে পক্ষ ঋণের কোন কারণ বা উপকার বলে মনেই করেন না—তাও প্রথম সুযোগেই উল্লেখ করেছেন।

আমরাও এসব বিষয়ে—বিশেষ জীবনের মূল্যায়নে—প্রাচীনপন্থী। (আমাদের বিশ্বাস অধিকাংশ পাঠকই তাই—নইলে সৈয়দদার বই এত বিক্রী হবে কেন?), সেইজন্যই এই গুণগুলি ভদ্রলোক মাত্রেরই থাকা অত্যাবশ্যক বলে মনে করি। আর, কে না জানে সৈয়দদা সময়ে সময়ে যত বোহেমিয়ান জীবনই যাপন করুন না কেন—মনেপ্রাণে যথার্থ ভদ্রলোক ছিলেন। He was a gentleman first, other things afterwards. অন্য গুণ বা দোষ তাঁর জীবনে পরে—অনেক পরে।

তাঁর এই কৃতজ্ঞতাবোধেরই বড় নিদর্শন তাঁর প্রগাঢ় গুরুভক্তি। গুরুদেব বলতে তিনি রবীন্দ্রনাথকেই বুঝতেন, রবীন্দ্রসাহিত্য বিশেষ রবীন্দ্রসঙ্গীত (রবীন্দ্রসঙ্গীতে তাঁর অসীম অনুরাগ তাঁর প্রতি রচনাতেই প্রকাশ পেয়েছে—একথা যদি বলি, বোধ হয় অত্যুক্তি করা হয় না) তার সঙ্গে যেন ওতপ্রোত ভাবে মিশে ছিল। হয়ত এমন ভাবে দেহের অস্থিমজ্জাতে, প্রতি রক্ত কণিকায় পর্যন্ত না মিশে গেলেই ভাল হত। যখনই গুরুদেবের প্রসঙ্গ এসেছে তখনই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ঐকান্তিক শ্রদ্ধা-ভক্তি—বোধ হয় তার চেয়েও বেশী—ভালবাসা। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে তিনি ভালই বাসতেন, বৈষ্ণবরা যেমন ভাবে তাদের ভগবানকে ভালবাসে—হয়ত সেই রকমই ঃ সখারূপে, নাথরূপে।

রবীন্দ্রনাথ এমনভাবে তাঁর সত্তায় মিশে না গেলেই হয়ত ভাল হত—কথাটা বলেছি ভেবেই। রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে তিনি সুফী সাধকের পীরের বাণী শুনতে পেয়েছিলেন, তার মধ্যে পেয়েছিলেন সেই সাধনার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। তাঁর শহরইয়ার উপন্যাসে শহরইয়ারকে তিনি বার বার এই কথাই বলেছেন, বোঝাতে চেয়েছেন। শহরইয়ার যখন স্বামী ছেড়ে সংসার ছেড়ে এক সুফী পীরের কাছে গিয়ে পড়ে থাকছে—তখন উনি (এ উপন্যাসের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমি' বা বক্তা লেখকের ব্যক্তিগত সত্তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম একরূপ) রবীন্দ্রসঙ্গীতের বাণীর দিকে তার মনোযোগ আকর্ষণ করছেন, বার বার কতকগুলি বিশেষ রেকর্ড বাজাতে বলছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অভিভূত করেছেন, প্রভাবিতও করেছেন। তাই তাঁর উপন্যাসের মধ্যে যেটি প্রথম ও বোধ করি সমধিক জনপ্রিয়—সেই 'শবনম'-এ তাঁর অজ্ঞাতসারেই 'শেষের কবিতা'র প্রভাব এসে পড়েছে। সুভাষিত কথার মালা গেঁথে গেছেন, সেটা ক্রমশ যেন নেশার মতো পেয়ে বসেছে তাঁকে। তাতে উপন্যাসের ক্ষতি হয়েছে। কাহিনী দানা বাঁধতে পারে নি তেমন। বোধ হয় লেখকও সে সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছেন, শেষের ট্র্যাজিক ঘটনাটি দিয়ে তাল সামলাবার চেষ্টা করেছেন—তবু, উপন্যাস হিসেবে যতটা সার্থক হওয়া উচিত ছিল তাঁর মতো বহু-সাহিত্যদর্শী রসবোদ্ধা লেখকের পক্ষে, তা হতে পারে নি।

তাঁর উপন্যাস 'শবনম' ও 'শহরইয়ার' দুয়ের নায়ক তিনি স্বয়ং। শহরইয়ারে তো একেবারে সম্পূর্ণরূপেই নিজেকে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। এটা যেমন একটা প্রচণ্ড বিস্ময়—এমন কি 'স্ট্যান্ট' বললেও বিশেষ অপরাধ ঘটে না—তেমনি বিপুল অসুবিধারও কারণ হয়েছে।

তাঁর উপন্যাস সুলিখিত ও সুললিত তাতে সন্দেহ নেই। বহু করুণ মধুর শাখা কাহিনীতে ভরা—কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই—পণ্ডিত মুজতবা আলী বার বারই এসে ঔপন্যাসিকের কলম কেড়ে নিয়েছেন। তাঁর বলবার কথা অনেক, বলবার অধিকারও যথেষ্ট—প্রবৃত্তিও, তাঁদের পণ্ডিতের বংশ, বহু পুরুষের ঐতিহ্য রক্তে তার কাজ করে যায়—তাঁর মধ্যে একটি সত্যকারের শিক্ষক ছিল—তিনি যা জানতেন তা, পাঠকদের গ্রহণ-ক্ষমতা কত, আধারের পরিধির মাপ বিচার না করেই জানাবার জন্য ব্যগ্র ও ব্যস্ত হয়ে পড়তেন, বস্তুত না জানিয়ে থাকতে পারতেন না। তার ফলে কাহিনী বার বারে হোঁচট খেত, কোথাও দানা বেঁধে ওঠার অবসর পেত না। তা সত্ত্বেও যে—শবনম ও শহরইয়ার—দুটি চরিত্র পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়েছে, সেইটেই ওঁর লেখনীর বৈশিষ্ট্য, ধার; ওঁর অসামান্য শক্তির পরিচায়ক।

এই দুটি উপন্যাসে লেখক স্বয়ং নায়ক বলে তত্ত্বালোচনার মাত্রা একটু বেশী হয়ে পড়েছে। অবিশ্বাস্য ও তুলনাহীনায় এই অসুবিধা নেই। বস্তুত উপন্যাস হিসেবে অবিশ্বাস্য অনেকটা পূর্ণাঙ্গ এবং সার্থক। এর নায়কের জীবনের সুগভীর ট্র্যাজেডি, তীব্র বেদনাময় অন্তর্দ্বন্দ্ব, ভাগ্যের হাতে মার খাওয়ার অসহায়তা—একটা পরিপূর্ণ রূপ নিতে পেরেছে। শেষের চিঠিটি একটু বক্তৃতা ও তত্ত্ববহুল, তৎসত্ত্বেও উপন্যাসের প্রকৃত গুণ বইটিতে বর্তমান।

বোধ হয় অবিশ্বাস্য উপন্যাসের নায়ক ঐ সাহেব চরিত্রের মূল মানুষটিকে—অন্তত অনেকটা ঐ রকম—লেখক কোথাও দেখে থাকবেন। এর ট্র্যাজেডি, এর সকরুণ অন্তর্দ্বন্দ্ব—হয়ত কাল্পনিক, কোন তথ্যে নির্ভর করে সে অনুমান গড়ে উঠেছিল—তাঁকে নাড়া দিয়েছিল, এ কাহিনী বহুদিন ধরেই মাথায় ছিল তাঁর, ভাবনার মধ্যে বহন করেছেন। টুনিনেম গল্পের ও'হারাই যে অবিশ্বাস্য উপন্যাসের ওরেলি তাতে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। এ কাজ তারাশঙ্কর চিরদিন করে গেছেন, তাঁর বহু বিখ্যাত উপন্যাসই আগে বীজগল্পাকারে বেরিয়েছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মুজতবা আলী ঈশ্বরবিশ্বাসী খাঁটি মুসলমান ছিলেন। কিন্তু বহু শাস্ত্র—পৃথিবীর প্রায় তাবৎ ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে অনায়াসে সঙ্কীর্ণতা বা গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন। তাঁর প্রকৃত ধর্মবিশ্বাস ও অসাম্প্রদায়িকতা—অথবা বলা উচিত উদার দৃষ্টি ও সম্প্রদায়নিরপেক্ষতা—তাঁর রচনার মধ্যে পাশাপাশি চলেছে বরাবর। এতটা কেউ ভেবেচিন্তে হিসেব করে লিখতে পারে না, অন্তরের কথা, সহজ সত্য বলেই তা এমন ভাবে ফুটেছে।

তিনি সংস্কৃত ভাল জানতেন (যদিও বার বার আমাদের বলেছেন যে এ বিষয়ে তাঁর দাদারা 'জায়ান্ট'—তিনি কিছুই নন, 'পিগমী'), মূল রামায়ণ মহাভারত পড়েছেন, আমাকে একবার কথায় কথায় স্মৃতি থেকে শান্তি পর্বে ভীষ্মের উক্তি এবং দ্যূতসভায় বিদুরের উক্তির মূল শ্লোক কয়েকটি উদ্ধার করে শোনান। তাঁর রচনাতেও সে প্রমাণ আছে। গীতা বেদ ভাল করেই পড়া ছিল। খাঁটি মুসলমান হিসাবে ইসলামকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে বিশ্বাস করতেন কিন্তু তার পরই যে ধর্মের শিক্ষার ওপর তাঁর অধিক আস্থা ছিল—তা হচ্ছে হিন্দু ধর্ম। এটা কথার কথা নয়, মুখোশও নয়। সে পরিচয় বলতে গেলে ওঁর রচনার ছত্রে ছত্রে আছে। পদাবলী কীর্তনের ওপর যার এত প্রগাঢ় অনুরাগ, রাধাকৃষ্ণর বিরহ-কাহিনী তাকে স্পর্শ করে নি—তা হতে পারে না।

তাঁর স্বভাবেই কোনো কাপট্য বা হীনতা ছিল না। উত্তরকালে যারা শুধু তাঁর লেখাই পড়বে তারাও বুঝবে যে তিনি মনেপ্রাণে অসাম্প্রদায়িক ছিলেন—এবং কোন সঙ্কীর্ণতা তাঁর থাকা সম্ভব নয়। আগেও বলেছি এখনও বলছি—তিনি সর্বপ্রথম ও সর্বদা—ভদ্রলোক ছিলেন, ভদ্রতার সব রকম নিরিখে বিচার করলেও। যথার্থ ভদ্রলোক ও যথার্থ অভিজাত। এ বিষয়ে বংশপরম্পরা ঐতিহ্য তো ছিলই—তার ওপর পড়েছিল রবীন্দ্রনাথের আলোকসামান্য প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের ছাপ—অন্য রকম হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, 'বড়বাবু' অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপর তাঁর যে অসীম অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছিল—যার পরিচয় আমরা বহুবার পেয়েছি তাঁর সঙ্গে আলাপে আড্ডায়—যার পরিচয় তাঁর বহু রচনায়—অপরিমাণ ভক্তি—হয়ত বা, যাকে ইংরেজীতে বলে awe তাও—তাতেই বোঝা যায় তাঁর মনের গঠন ও গতি কোন্ দিক ঘেঁষা ছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন শুদ্ধসত্ত্ব মানুষ, কোন মালিন্য তাঁকে কোনদিন স্পর্শ করতে পারত না, সম্পূর্ণ অহিংস—যে কারণে মহাত্মা গান্ধীও তাঁকে অন্তরঙ্গ-আত্মীয়তা-সূচক 'দাদা' বলে সম্বোধন উল্লেখ করতেন—আর ঠিক সেই কারণেই তিনি অবৈষয়িক অসংসারী ছিলেন, ফলে সাধারণ লোক তাকে বদ্ধ পাগল ভাবত। এই লোককে যিনি ভক্তি করতে পারেন ভালবাসতে পারেন—(সে প্রমাণ তাঁর প্রখ্যাত রচনা 'বড়বাবু'তেই পাবেন পাঠকরা)—এঁর রচনা যিনি শ্রদ্ধাসহকারে পড়েন ও মতের মূল্য দেন—দ্বিজেন্দ্রনাথের 'গীতাপাঠ' বইখানি তাঁর বিছানায় বালিশের পাশে রাখা থাকত দেখেছি—যিনি এঁর মতকে সুফী-সাধকদের সঙ্গে তুলনীয় মনে করতেন—তিনি নিজেও কিছুটা অগ্রসর বৈকি!

তাঁর অন্তরে শুদ্ধ-সৎ চিন্তার, ঈশ্বরবিশ্বাসের একটা পাবক বহ্নি ছিল—তার জন্যই যেন কোন আবর্জনা মনে জমতে পারত না, কোন অভ্যাসের দোষ তাঁর মনকে আবিল করে তুলতে পারে নি। Self-puriying স্বতঃ শোধনশীল উচ্চচিন্তাই তাঁকে চিরদিন পঙ্কিলতা

www.BanglaBook.org

থেকে রক্ষা করে এসেছে। এই নির্মল মনের জন্যই তাঁর উপন্যাসগুলিতে কোন জঘন্য চিন্তা কি যৌনমিলন-চিত্র স্থান পায় নি, গল্প বলতে বসে অমল পবিত্র প্রেমের কথা ছাড়া ভাবতে পারেন নি। 'অবিশ্বাস্য'তে ব্যভিচারের কথা আছে—বস্তুত স্বামী-স্ত্রীর যৌনমিলন বা তার অভাব, অভাবের ফলে ব্যভিচার—সমস্ত কাহিনীটির মূলে এ কথাই —তবু বই পড়ে শেষ করলে কোথাও আধুনিক মার্কিন (আমাদের দেশেও সে প্রবল বাতাস এসে পৌঁচেছে) উপন্যাসের মতো আঁশটে গন্ধ পাওয়া যায় না। দুটি নিরপরাধ জীবন কী ভাবে ভাগ্যের হাতে অকারণ অকরুণ মার খেল—সেই বেদনাতেই পাঠকের মন ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে, যৌন জীবনের প্রশ্ন প্রধান হয়ে ওঠে না। এ-ই তাঁর জীবনদর্শন। অন্তত অনেকখানি।

সৈয়দদার আগে বাংলাসাহিত্যে রম্যরচনার একেবারে অভাব ছিল না। ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়, কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়-দের রচনা হাস্যরসমধুর হলেও এগুলি আসলে রম্যরচনাই। যাযাবরের তো কথাই নেই। তাঁর 'দৃষ্টিপাত' রম্যরচনার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। দিলীপকুমার রায়—যিনি belles Lettres 'বেলে লেৎরস্'কে মঞ্জুভাষা নামকরণ করেছিলেন—তিনিও অনেক রম্যরচনা লিখেছেন। এঁদের কাছে বাংলাসাহিত্যের ঋণ অনেক। রাজশেখর বসু ও তাঁর পূর্বাচার্য অসামান্য শক্তিধর ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়—যিনি সে আমলেই একটি গল্পের জন্য পঞ্চাশ টাকা দক্ষিণা আদায় করতেন বলে শুনেছি—এঁদের আবির্ভাব অপ্রত্যক্ষভাবে সৈয়দ সাহিত্য-রচনার মূলে অনেক রসদ যুগিয়েছে। তবে মুজতবা আলীর লেখাগুলিতে রম্যরচনা ও রসসাহিত্য ছাড়াও কিছু আছে। একে কী নাম দেবেন—'আড্ডাসাহিত্য' বললেই ঠিক বলা হয়, 'মজলিসী সাহিত্য' বললে অভিধানটার ওপর একটু পালিশ পড়ে। এই মজলিসী ঢং—অপর কেউ কেউ চেষ্টা করলেও—পরিপূর্ণ মজলিসী রচনায়—মুজতবা আলী বাংলাসাহিত্যে একক ও অনন্য।

'গালগল্পের'র মেজাজে, কর্মহীন অবসরের অলস উদ্দেশ্যহীন আড্ডার ঢঙে বলে গেলেও কথাগুলি অনেক কাজের কথায় ভর্তি; জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, শাস্ত্রচর্চা ও সার্থক বিচার-সমালোচনায় ঠাসা। আগেই বলেছি তাঁর মধ্যে একটি শিক্ষক ছিলেন, আলীদার স্বভাবে সেটাই প্রধান—তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যে সেই শিক্ষকতা নাই—যাকে সহজ বাংলায় মাস্টারী বলে—প্রবল ও অগ্রগণ্য হয়ে উঠেছে। রসগোল্লা দিয়ে শটকে শেখানোর মতোই আড্ডাবাজী হালকা 'গল্পে'র সুগার-কোটিং বা মধুপ্রলেপ দিয়ে আমাদের অনেক মূল্যবান শিক্ষণীয় তথ্য ও সত্য শেখাতে জানাতে চেয়েছেন। বহু দেশ ঘুরেছেন তিনি, বহু লোক দেখেছেন—পণ্ডিত, গুণী, রাজনৈতিক থেকে শুরু করে একেবারে সাধারণ মানুষ—এই সাধারণের সম্বন্ধেই প্রীতি-ভালবাসা বেশী ছিল তাঁর—সে অভিজ্ঞতাও কম নয়, গল্পের মধ্যে দিয়ে নানাপ্রকার শাখাপ্রসঙ্গে সেই বিশাল, আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত জগৎকে জানতে বোঝাতে চেয়েছেন। আমাদের অজ্ঞতায় ঔদাসীন্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কিন্তু হতাশ হন নি, হাল ছাড়েন নি।

(এই জানবার চেষ্টা এত বেশী ছিল যে আমার মতো সামান্য লেখকের কোন কোন রচনা সাময়িক পত্রে প্রকাশের সময় কোন শব্দার্থে বা শব্দপ্রয়োগে ভুল থাকলে গরজ করে চিঠি লিখে তা জানিয়ে দিতেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় অনুরাগ দেখে—বিশেষ মুঘল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমলের ঘটনা উপলক্ষ করে—তিনি আমাকে Wollaston-এর মহামূল্যবান য়্যাংলো-পার্সিয়ান অভিধানটি কিনতে পরামর্শ দেন। এবং আমি পেয়ে গেলে কৃত্রিম পরিতাপ প্রকাশ করে একটি সরস চিঠি দেন, কারণ বইটি তিনিও খুঁজেছিলেন, পান নি!)

তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে কিছু নেন নি, পরোক্ষভাবে অনেক নিয়েছেন। তাদের মূল্য বুঝেছেন বলেই সেই চলা-পথ ত্যাগ করে নিজের পৃথক রাস্তা করে নিতে পেরেছেন।

কিন্তু তাঁর দ্বারা খুব বেশি লেখক প্রভাবিত হতে পারেন নি। তা বোধ হয় হওয়া সম্ভবও নয়। তাঁর প্রত্যক্ষ উত্তর সাধক বলতে গেলে একটিই—রূপদর্শী বা গৌরকিশোর ঘোষ। তবে শংকরের অপ্রত্যক্ষ ঋণ কিছু আছে। অন্তত মুজতবা আলীর আবির্ভাবের আলোয় তিনি নিজের পথ, নিজের শক্তির বৈশিষ্ট্য দেখতে পেয়েছেন।

সৈয়দদা একটা কথা বার বার বলেছেন যে, রোজগারের দুশ্চিন্তা না থাকলে তিনি কলম ধরেন না। তাই যদি হবে, এতই অর্থ সম্বন্ধে সচেতন তবে রোজগারের সিধা সহজ রাস্তাগুলো—ভাল ভাল চাকরিগুলো ছাড়লেন কেন? এই প্রশ্নটাই মাঝে মাঝে মনে জাগে। এত বড় লেখক—এত শক্তিমান, যিনি রচনাবৈশিষ্ট্যে আজও অনন্য, তিনি কি সাহিত্যসৃষ্টির জন্যই সাহিত্য রচনার প্রেরণা কোন দিন অনুভব করেন নি—সৃষ্টিযন্ত্রণা যাকে বলে? লেখবার, নিজের বক্তব্য বলবার তাগিদ? বিশ্বাস হয় না, কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।

বার বার সেই কথাটাই মনে হয়—জীবন প্রভাতে কোথায় একটা কঠিন আঘাত পেয়েছিলেন, অনুভব করেছিলেন সীমাহীন আশাভঙ্গের বেদনা—তাই আশা বলতে উদ্যম বলতে সার্থকতার স্বপ্ন বলতে আর কিছু তাঁর ছিল না। জীবন, প্রতিভা, যশ, সমস্তগুলো সম্বন্ধেই একটা সীমাহীন ঔদাসীন্য, apathy এসে গিয়েছিল। স্থায়ী যশলাভ বা অমর সাহিত্য রচনা করার কিছুমাত্র উৎসাহ বোধ করতেন না। তৎসত্ত্বেও যেটুকু আমরা পেয়েছি সে নিতান্তই আমাদের, সাহিত্য-পাঠকদের ভাগ্য, সাহিত্য-সরস্বতীর করুণা।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org



The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

পঞ্চতন্ত্র

(প্রথম পর্ব)

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

উৎসর্গ

শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার
মহাশয়ার করকমলে—

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

লেখকের নিবেদন

এই পুস্তিকার অধিকাংশ লেখা রবিবারের 'বসুমতী' ও সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় বেরোয়। অনুজপ্রতিম শ্রীমান কানাই সরকার ও সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মনোজ বসু কেন যে এগুলো পুস্তিকাকারে প্রকাশ করার জন্য আমাকে বাধ্য করলেন সে কথা সহৃদয় পাঠকেরা বিবেচনা করে দেখবেন।

নয়াদিল্লি, আষাঢ় ১৩৫৯ — মুজতবা আলী

www.BanglaBook.org

বই কেনা

মাছি-মারা-কেরানী নিয়ে যত ঠাট্টা-রসিকতাই করি না কেন, মাছি ধরা যে কত শক্ত সে কথা পর্যবেক্ষণশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করে নিয়েছেন। মাছিকে যেদিক দিয়েই ধরতে যান না কেন, সে ঠিক সময় উড়ে যাবেই। কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গিয়েছে, দু'টো চোখ নিয়েই মাছির কারবার নয়, তার সমস্ত মাথা জুড়ে নাকি গাদা গাদা চোখ বসানো আছে। আমরা দেখতে পাই শুধু সামনের দিক, কিন্তু মাছির মাথার চতুর্দিকে চক্রাকারে চোখ বসানো আছে বলে সে একই সময়ে সমস্ত পৃথিবীটা দেখতে পায়।

তাই নিয়ে গুণী ও জ্ঞানী আনাতোল ফ্রাঁস দুঃখ করে বলেছেন, 'হায়, আমার মাথার চতুর্দিকে যদি চোখ বসানো থাকতো, তাহলে আচক্রবালবিস্তৃত এই সুন্দরী ধরণীর সম্পূর্ণ সৌন্দর্য একসঙ্গেই দেখতে পেতুম।'

কথাটা যে খাঁটি, সে-কথা চোখ বন্ধ করে একটুখানি ভেবে নিলেই বোঝা যায়। এবং বুঝে নিয়ে তখন এক আপশোস ছাড়া অন্য কিছু করবার থাকে না। কিন্তু এইখানেই ফ্রাঁসের সঙ্গে সাধারণ লোকের তফাৎ। ফ্রাঁস সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, 'কিন্তু আমার মনের চোখ তো মাত্র একটি কিংবা দুটি নয়। মনের চোখ বাড়ানো-কমানো তো সম্পূর্ণ আমার হাতে। নানা জ্ঞানবিজ্ঞান যতই আমি আয়ত্ত করতে থাকি, ততই এক-একটা করে আমার মনের চোখ ফুটতে থাকে।'

পৃথিবীর আর সব সভ্য জাত যতই চোখের সংখ্যা বাড়াতে ব্যস্ত, আমরা ততই আরব্য-উপন্যাসের এক-চোখা দৈত্যের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করি আর চোখ বাড়াবার কথা তুললেই চোখ রাঙাই।

চোখ বাড়াবার পন্থাটা কি? প্রথমত—বই পড়া, এবং তার জন্য দরকার বই কেনার প্রবৃত্তি।

মনের চোখ ফোটানোর আরো একটা প্রয়োজন আছে। বারট্রান্ড রাসেল বলেছেন, 'সংসারে জ্বালা-যন্ত্রণা এড়াবার প্রধান উপায় হচ্ছে, মনের ভিতর আপন ভুবন সৃষ্টি করে নেওয়া এবং বিপদকালে তার ভিতর ডুব দেওয়া। যে যত বেশি ভুবন সৃষ্টি করতে পারে, যন্ত্রণা এড়াবার ক্ষমতা তার ততই বেশি হয়।'

অর্থাৎ সাহিত্যে সান্ত্বনা না পেলে দর্শন, দর্শনে কুলিয়ে উঠতে না পারলে ইতিহাস, ইতিহাস হার মানলে ভূগোল—আরো কত কি।

কিন্তু প্রশ্ন, এই অসংখ্য ভুবন সৃষ্টি করি কি প্রকারে?

বই পড়ে। দেশ ভ্রমণ করে। কিন্তু দেশ ভ্রমণ করার মত সামর্থ্য এবং স্বাস্থ্য সকলের থাকে না, কাজেই শেষ পর্যন্ত বাকি থাকে বই। তাই ভেবেই হয়ত ওমর খৈয়াম বলেছিলেন,—

Here with a loaf of bread
beneath the bough,
A flask of wine, a book of
verse and thou,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

Beside me singing in the wilderness
And wilderness is paradise enow.

রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে, কিন্তু বইখানা অনন্ত-যৌবনা—যদি তেমন বই হয়। তাই বোধ করি খৈয়াম তাঁর বেহেশ্‌তের সরঞ্জামের ফিরিস্তি বানাতে গিয়ে কেতাবের কথা ভোলেন নি।

আর খৈয়াম তো ছিলেন মুসলমান। মুসলমানদের পয়লা কেতাব কোরানের সর্বপ্রথম যে বাণী মুহম্মদ সাহেব শুনতে পেয়েছিলেন তাতে আছে 'আল্লামা বিল কলমি' অর্থাৎ আল্লা মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন 'কলমের মাধ্যমে'। আর কলমের আশ্রয় তো পুস্তকে।

বাইবেল শব্দের অর্থ বই—বই par excellence, সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক— The Book.

যে দেবকে সর্ব মঙ্গলকর্মের প্রারম্ভে বিঘ্নহন্তারূপে স্মরণ করতে হয়, তিনিই তো আমাদের বিরাটতম গ্রন্থ স্বহস্তে লেখার গুরুভার আপন স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন। গণপতি 'গণ' অর্থাৎ জনসাধারণের দেবতা। জনগণ যদি পুস্তকের সম্মান করতে না শেখে, তবে তারা দেবভ্রষ্ট হবে।

কিন্তু বাঙালি নাগর ধর্মের কাহিনী শোনে না। তার মুখে ঐ এক কথা 'অত কাঁচা পয়হা কোথায়, বাওয়া, যে বই কিনব?'

কথাটার মধ্যে একটুখানি সত্য—কনিষ্ঠাপরিমাণ—লুকনো রয়েছে। সেইটুকু এই যে, বই কিনতে পয়সা লাগে—ব্যস্। এর বেশি আর কিছু নয়।

বইয়ের দাম যদি আরো কমানো যায়, তবে আরো অনেক বেশি বই বিক্রি হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই যদি প্রকাশককে বলা হয়, 'বইয়ের দাম কমাও', তবে সে বলে 'বই যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রি না হলে বইয়ের দাম কমাবো কি করে?'

'কেন মশাই, সংখ্যার দিক দিয়ে দেখতে গেলে বাঙলা পৃথিবীর ছয় অথবা সাত নম্বরের ভাষা। এই ধরুন ফরাসি ভাষা। এ-ভাষায় বাঙলার তুলনায় ঢের কম লোক কথা কয়। অথচ যুদ্ধের পূর্বে বারো আনা, চৌদ্দ আনা, জোর পাঁচ সিকে দিয়ে যে-কোন ভাল বই কেনা যেত। আপনারা পারেন না কেন?'

'আজ্ঞে, ফরাসি প্রকাশক নির্ভয়ে যে-কোন ভালো বই এক ঝট্‌কায় বিশ হাজার ছাপাতে পারে। আমাদের নাভিশ্বাস ওঠে দু'হাজার ছাপাতে গেলেই, বেশি ছাপিয়ে দেউলে হব নাকি?'

তাই এই অচ্ছেদ্য চক্র। বই সস্তা নয় বলে লোকে বই কেনে না, আর লোকে বই কেনে না বলে বই সস্তা করা যায় না।

এ চক্র ছিন্ন তো করতেই হবে। করবে কে? প্রকাশক না ক্রেতা? প্রকাশকের পক্ষে করা কঠিন, কারণ ঐ দিয়ে পেটের ভাত যোগাড় করে। সে ঝুঁকিটা নিতে নারাজ। এক্সপেরিমেন্ট করতে নারাজ—দেউলে হওয়ার ভয়ে।

কিন্তু বই কিনে কেউ তো কখনো দেউলে হয় নি। বই কেনার বাজেট যদি আপনি তিনগুণও বাড়িয়ে দেন, তবু তো আপনার দেউলে হবার সম্ভাবনা নেই। মাঝখান থেকে আপনি ফ্রাঁসের মাছির মত অনেকগুলি চোখ পেয়ে যাবেন, রাসেলের মত এক গাদা নূতন ভুবন সৃষ্টি করে ফেলবেন।

ভেবে-চিন্তে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে বই কেনে সংসারী লোক। পাঁড় পাঠক বই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কেনে প্রথমটায় দাঁতমুখ খিঁচিয়ে, তারপর চেখে চেখে সুখ করে করে, এবং সর্বশেষে সে কেনে ক্ষ্যাপার মত, এবং চুর হয়ে থাকে তার মধ্যিখানে। এই একমাত্র ব্যসন, একমাত্র নেশা যার দরুন সকালবেলা চোখের সামনে সারে সার গোলাপী হাতি দেখতে হয় না, লিভার পচে পটল তুলতে হয় না।

আমি নিজে কি করি? আমি একাধারে producer এবং consumer— তামাকের মিকশ্চার দিয়ে আমি নিজেই সিগারেট বানিয়ে producer এবং সেইটে খেয়ে নিজেই consumer: আরও বুঝিয়ে বলতে হবে? আমি একখানা বই produce করেছি—কেউ কেনে না বলে আমিই consumer; অর্থাৎ নিজেই মাঝে মাঝে কিনি।

* * *

মার্ক টুয়েনের লাইব্রেরিখানা নাকি দেখবার মত ছিল। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত বই, বই, শুধু বই। এমন কি কার্পেটের উপরও গাদা গাদা বই স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকত—পা ফেলা ভার। এক বন্ধু তাই মার্ক টুয়েনকে বললেন, 'বইগুলো নষ্ট হচ্ছে; গোটাকয়েক শেলফ যোগাড় করছ না কেন?'

মার্ক টুয়েন খানিকক্ষণ মাথা নিচু করে ঘাড় চুলকে বললেন, 'ভাই, বলছো ঠিকই— কিন্তু লাইব্রেরিটা যে কায়দায় গড়ে তুলেছি, শেলফ তো আর সে কায়দায় যোগাড় করতে পারিনে। শেলফ তো আর বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার চাওয়া যায় না।'

শুধু মার্ক টুয়েনই না, দুনিয়ার অধিকাংশ লোকই লাইব্রেরি গড়ে তোলে কিছু বই কিনে : আর কিছু বই বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার করে ফেরৎ না দিয়ে। যে-মানুষ পরের জিনিস গলা কেটে ফেললেও ছোঁবে না সেই লোকই দেখা যায় বইয়ের বেলা সর্বপ্রকার বিবেক-বিবর্জিত, তার কারণটা কি?

এক আরব পণ্ডিতের লেখাতে সমস্যাটার সমাধান পেলুম।

পণ্ডিত লিখেছেন, 'ধনীরা বলে, পয়সা কামানো দুনিয়াতে সবচেয়ে কঠিন কর্ম। কিন্তু জ্ঞানীরা বলেন, না, জ্ঞানার্জন সবচেয়ে শক্ত কাজ। এখন প্রশ্ন, কার দাবিটা ঠিক, ধনীর না জ্ঞানীর? আমি নিজে জ্ঞানের সন্ধানে ফিরি, কাজেই আমার পক্ষে নিরপেক্ষ হওয়া কঠিন। তবে একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি, সেইটে আমি বিচক্ষণ জনের চক্ষুগোচর করাতে চাই। ধনীর মেহন্নতের ফল হ'ল টাকা। সে ফল যদি কেউ জ্ঞানীর হাতে তুলে দেয়, তবে তিনি সেটা পরমানন্দে কাজে লাগান, এবং শুধু তাই নয়, অধিকাংশ সময়েই দেখা যায়, জ্ঞানীরা পয়সা পেলে খরচ করতে পারেন ধনীদের চেয়ে অনেক ভালো পথে, চের উত্তম পদ্ধতিতে। পক্ষান্তরে জ্ঞানচর্চার ফল সঞ্চিত থাকে পুস্তকরাজিতে এবং সে ফল ধনীদের হাতে গায়ে পড়ে তুলে ধরলেও তারা তার ব্যবহার করতে জানে না—ওই পড়তে পারে না।'

আরব পণ্ডিত তাই বক্তব্য শেষ করেছেন কিউ. ই. ডি. দিয়ে 'অতএব সপ্রমাণ হল জ্ঞানার্জন ধনার্জনের চেয়ে মহত্তর।'

তাই প্রকৃত মানুষ জ্ঞানের বাহন পুস্তক যোগাড় করার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করে। একমাত্র বাঙলা দেশ ছাড়া।

সেদিন তাই নিয়ে শোকপ্রকাশ করাতে আমার জনৈক বন্ধু একটি গল্প বললেন। এক ড্রইংরুম-বিহারিণী গিয়েছেন বাজারে স্বামীর জন্মদিনের জন্য সওগাত কিনতে। দোকানদার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এটা দেখায়, সেটা শোঁকায়, এটা নাড়ে, সেটা কাড়ে, কিন্তু গরবিনী ধনীর (উভয়ার্থে) কিছুই আর মনঃপূত হয় না। সব কিছুই তাঁর স্বামীর ভাণ্ডারে রয়েছে। শেষটায় দোকানদার নিরাশ হয়ে বললে, 'তবে একখানা ভাল বই দিলে হয় না?' গরবিনী নাসিকা কুঞ্চিত করে বললেন, 'সেও তো ওঁর একখানা রয়েছে।'

যেমন স্ত্রী তেমনি স্বামী। একখানা বই-ই তাদের পক্ষে যথেষ্ট।

অথচ এই বই জিনিসটার প্রকৃত সম্মান করতে জানে ফ্রান্স। কাউকে মোক্ষম মারাত্মক অপমান করতে হলেও তারা ঐ জিনিস দিয়েই করে। মনে করুন আপনার সবচেয়ে ভক্তি-ভালবাসা দেশের জন্য। তাই যদি কেউ আপনাকে ডাহা বেইজ্জৎ করতে চায়; তবে সে অপমান করবে আপনার দেশকে। নিজের অপমান আপনি হয়ত মনে মনে পঞ্চাশ গুণে নিয়ে সয়ে যাবেন, কিন্তু দেশের অপমান আপনাকে দংশন করবে বহুদিন ধরে।

আঁদ্রে জিদে'র মেলা বন্ধুবান্ধব ছিলেন—অধিকাংশই নামকরা লেখক। জিদ রুশিয়া থেকে ফিরে এসে সোভিয়েট রাজ্যের বিরুদ্ধে একখানা প্রাণঘাতী কেতাব ছাড়েন। প্যারিসের স্তালিনীয়ারা তখন লাগল জিদের পিছনে—গালিগালাজ কটুকাটব্য করে জিদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুললো। কিন্তু আশ্চর্য, জিদের লেখক বন্ধুদের অধিকাংশই চুপ করে সব কিছু শুনে গেলেন, জিদের হয়ে লড়লেন না। জিদের জিগরে জোর চোট লাগল—তিনি স্থির করলেন, এদের একটা শিক্ষা দিতে হবে।

কাগজে বিজ্ঞাপন বেরল। জিদ তাঁর লাইব্রেরিখানা নিলামে বেচে দেবেন বলে মনস্থির করেছেন। প্যারিস খবর শুনে প্রথমটায় মূর্ছা গেল, কিন্তু সম্বিতে ফেরা মাত্রই মুক্তকচ্ছ হয়ে ছুটলো নিলাম-খানার দিকে।

সেখানে গিয়ে অবস্থা দেখে সকলেরই চক্ষুস্থির।

যে-সব লেখক জিদের হয়ে লড়েন নি, তাঁদের যে-সব বই তাঁরা জিদকে স্বাক্ষর সহ উপহার দিয়েছিলেন, জিদ মাত্র সেগুলো নিলামে চড়িয়েছেন। জিদ শুধু জঞ্জালই বেচে ফেলছেন।

প্যারিসের লোক তখন যে অট্টহাস্য ছেড়েছিল, সেটা আমি ভূমধ্যসাগরের মধ্যিখানে জাহাজে বসে শুনতে পেয়েছিলুম—কারণ খবরটার গুরুত্ব বিবেচনা করে রয়টার সেটা বেতারে ছড়িয়েছিলেন—জাহাজের টাইপ-করা একশো লাইনি দৈনিক কাগজ সেটা সাড়ম্বরে প্রকাশ করেছিল।

অপমানিত লেখকরা ডবল তিন ডবল দামে আপন আপন বই লোক পাঠিয়ে তড়িঘড়ি কিনিয়ে নিয়েছিলেন—যত কম লোকে কেনা-কাটার খবর জানতে পারে ততই মঙ্গল। (বাঙলা দেশে নাকি একবার এরকম টিকিট বিক্রি হয়েছিল।)

শুনতে পাই, এঁরা নাকি জিদকে কখনো ক্ষমা করেন নি।

* * *

আর কত বলবো? বাঙালির কি চেতনা হবে?

তাও বুঝতুম, যদি বাঙালির জ্ঞানতৃষ্ণা না থাকতো। আমার বেদনাটা সেইখানে। বাঙালি যদি হটেনটট হত, তবে কোনো দুঃখ ছিল না। এরকম অদ্ভুত সংমিশ্রণ আমি ভূ-ভারতের কোথাও দেখি নি। জ্ঞানতৃষ্ণা তার প্রবল, কিন্তু কেনার বেলা সে অবলা। আবার কোনো কোনো বেশরম বলে, 'বাঙালির পয়সার অভাব' বটে? কোথায় দাঁড়িয়ে বলছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লোকটা এ-কথা? ফুটবল মাঠের সামনে দাঁড়িয়ে, না সিনেমার টিকিট কাটার 'কিউ' থেকে।

থাক্ থাক্। আমাকে খামাখা চটাবেন না। বৃষ্টির দিন। খুশ গল্প লিখব বলে কলম ধরেছিলুম। তাই দিয়ে লেখাটা শেষ করি। গল্পটা সকলেই জানেন, কিন্তু তার গূঢ়ার্থ মাত্র কাল বুঝতে পেরেছি। আরব্যোপন্যাসের গল্প।

এক রাজা তাঁর হেকিমের একখানা বই কিছুতেই বাগাতে না পেরে তাঁকে খুন করেন। বই হস্তগত হল। রাজা বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে বইখানা পড়ছেন। কিন্তু পাতায় পাতায় এমনি জুড়ে গিয়েছে যে, রাজা বার বার আঙুল দিয়ে মুখ থেকে থুথু নিয়ে জোড়া ছাড়িয়ে পাতা উল্টোচ্ছেন। এদিকে হেকিম আপন মৃত্যুর জন্য তৈরি ছিলেন বলে প্রতিশোধের ব্যবস্থাও করে গিয়েছিলেন। তিনি পাতায় পাতায় কোণের দিকে মাখিয়ে রেখেছিলেন মারাত্মক বিষ। রাজার আঙুল সেই বিষ মেখে নিয়ে যাচ্ছে মুখে।

রাজাকে এই প্রতিহিংসার খবরটিও হেকিম রেখে গিয়েছিলেন কেতাবের শেষ পাতায়। সেইটে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা বিষবাণের ঘায়ে ঢলে পড়লেন।

বাঙালির বই কেনার প্রতি বৈরাগ্য দেখে মনে হয়, সে যেন গল্পটা জানে, আর মরার ভয়ে বই কেনা, বই পড়া ছেড়ে দিয়েছে।

কাইরো

কাইরো যাওয়ার জন্য আলাদা করে কাঠখড় পোড়াবার প্রয়োজন হয় না। ইয়োরোপ যাবার সময় জাহাজ সুয়েজ বন্দরে থামে। সেখানে নেবে সোজা কাইরো চলে যাবেন। এদিকে আপনার জাহাজ অতি ধীরে মন্থরে সুয়েজ খালের ভিতর দিয়ে পোর্ট সইদের দিকে রওয়ানা হবে। খালের দুদিকে বালুর পাড় যাতে ভেঙে গিয়ে খালটাকে বন্ধ না করে দেয়, তার জন্য কড়া আইন, জাহাজ যেন গরুরগাড়ির গতিতে এগোয়। কাজেই জাহাজ সইদ বন্দর পৌঁছতে না পৌঁছতে আপনি কাইরোতে ঢুঁ মেরে ট্রেনে করে, সেই সইদ বন্দরেই পৌঁছে যাবেন। সেই জাহাজেই চেপে, সেই কেবিনেই শুয়ে ইয়োরোপ চলে যাবেন—ফালতো কোনো খরচা লাগবে না।

অবশ্য তাতে করে কাইরোর মত শহরের কিছুই দেখা হয় না—আর কাইরোতে দেখবার মত জিনিস আছে বিস্তর। পিরামিড দেখা হয়ে যাবে নিশ্চয়ই, এইটুকু যা সান্ত্বনা। জাহাজের অনেকেই আপনাকে বললেন, ঘণ্টা দশেকের জন্য কাইরোতে ওরকমধারা ঢুঁ মেরে বিশেষ কোন লভ্য নেই। আমারও সেই মত; কিন্তু তবু যে যেতে বলছি তার কারণ যদি আপনার পছন্দ হয়ে যায়, তবে হয়ত বিলেত থেকে ফেরার মুখে ফের কাইরোতে নেবে দু'চার সপ্তাহ কাটিয়ে আসতে পারেন। ইয়োরোপে তো দেখবেন কুল্লে এক ইয়োরোপীয় সভ্যতা (ফরাসি, জর্মন, ইংরেজ যত তফাৎই থাক না কেন, তবু তো তারা আপোসে একটা সভ্যতাই গড়ে তুলেছে), আর দেখেছেন ভারতীয় সভ্যতা—তার উপর যদি আরেক তৃতীয় সভ্যতার সঙ্গে মোকাবেলা হয়ে যায়, তবে তাতে নিশ্চয়ই বিস্তর লভ্য।

আমার লেগেছিল কাইরো দেখতে পাক্কা একটি বচ্ছর! অতদিন আপনি থাকবেন না

www.BanglaBook.org

সে আমি জানি। আপনার অতটা সময় লাগবে না—সে কথাও জানি। কারণ আমি কাটিয়েছিলুম প্রথম ছ'টি মাস শুধু আড্ডা মেরে মেরে—বাড়ির ছাতের উপর থেকে পিরামিড স্পষ্ট দেখা যায়, ট্রামে করে হুশ করে সেখানে যেতে কোনোই বাধা নেই, পূর্ণিমায় আবার ইস্পিশল সার্ভিস, তৎসত্ত্বেও ছ'টি মাস কেটে গেল এ-কাফে ও-কাফে করে করে, পিরামিড দেখার ফুরসৎ আর হয়ে ওঠে না। বন্ধুরা কেউ জিজ্ঞেস করলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলতুম, 'সবই ললাটঙ্ক লিখন। কলকাতায় দশ বছর কাটিয়ে "গঙ্গাস্তান" যখন হয়ে উঠেনি, তখন বাবা-পিরামিড দর্শন কি আমার কপালে আছে?' (আসল কারণটা চুপেচুপে বলি;—এক গাদা পাথর দেখায় যে কি তত্ত্ব তা আমি পিরামিড দেখার আগে এবং পরে কোনো অবস্থাতেই ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারি নি।)

সে কথা থাক; সভ্যতা, পিরামিড এ-সব জিনিস নিয়ে অন্য জায়গায় পাণ্ডিত্য ফলাব। 'বসুমতী'র পাঠকরা এতদিনে আমাকে বিলক্ষণ চিনে গিয়েছেন, আমার মুখে পাণ্ডিত্যের কথা শুনলে ঠা-ঠা করে হেসে উঠবেন, তাই সেই আড্ডাতেই ফিরে যাই।

আমি ভালোবাসি হেদো, হাতিবাগান, শ্যামবাজার। ও-সব জায়গায় তাজমহল নেই, পিরামিড নেই। তাতে আমার বিন্দুমাত্র খেদও নেই। আমি ভালোবাসি আমার পাড়ার চায়ের দোকানটি। সেখানে সকাল-সন্ধ্যা হাজিরা দিই, পাড়ার পটলা, হাবুল আসে, সবাই মিলে বিড়ি ফুঁকে গুষ্ঠীসুখ অনুভব করি আর উজির-নাজির মারি। আমার যা কিছু জ্ঞান-গম্মি তা ঐ আড্ডারই ঝড়তি-পড়তি মাল কুড়িয়ে নিয়ে।

তাই যখন কপালের গর্দিশে কাইরোতে বাসা বাঁধতে হল, তখন আড্ডাভাবে তিনদিনেই আমার নাভিশ্বাস উপস্থিত হল। ছন্নের মত শহরময় ঘুরে বেড়াই আর পটলা-হাবলুর বসন্ত রেস্টুরেন্টের জন্য সাহারার উষ্ণ নিশ্বাসের সঙ্গে আপন দীর্ঘ নিশ্বাস মেশাই। এমন সময় সদ্‌গুরুর কৃপায় একটা জিনিস লক্ষ্য করলুম—পাড়ার কফিখানাতে রোজই দেখতে পাই গোটা পাঁচেক লোক বসন্ত রেস্টুরেন্টেরই মত চেঁচামেচি কাজিয়া-ঝগড়া করে আর নেচার কফি খায়, বিস্তর সিগারেট পোড়ায়।

দিন তিনেক জিনিসটা লক্ষ্য করলুম, কখনো কফিখানায় বসে, কখনো ফুটপাথে দাঁড়িয়ে। নূতন শহরের সব কিছুই গোড়ার দিকে সুর-রিয়ালিস্টিক ছবির মতো এলোপাতাড়ি ধরনের মনে হয়? অর্থ খাড়া হতে হতে কয়েকদিন কেটে যায়। যখন ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম তখন আমেজ করলুম, আমাদের বসন্ত রেস্টুরেন্টের আড্ডা যখন গুরুচণ্ডাল সক্কলের জন্যই অবারিত দ্বার, তখন এরাই বা আমাকে ব্রাত্য করে রাখবে কেন? হিম্মৎ করে তাদের টেবিলের পাশে গিয়ে বসলুম আর করুণ নয়নে তাদের দিকে মাঝে মাঝে তাকালুম। শকুন্তলার হরিণও বুঝি ওরকম ধারা তাকাতে পারত না।

দাওয়াই ধরলো। এক ছোকরা এসে অতিশয় বিনয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় নিল এবং জানালো তাদের আড্ডায় বিস্তর সীট ভেকেন্ট, আমি যদি ইত্যাদি। আমাকে তখন আর পায় কে? ভাঙা ফরাসি, টুটাফুটা আরবী, পিজন ইংরিজি সবকিছু জড়িয়ে-মড়িয়ে দু'মিনিটের ভিতরেই তাঁদের সবাইকে বসন্ত রেস্টুরেন্টে নেমন্তন্ন করলুম পটলা-হাবলুর ঠিকানা দিলুম, বসন্ত যে ভেজাল তেল আর পচা হাঁসের ডিম দিয়ে খাসা মামলেট বানায় তার বর্ণনা দিতেও ভুললুম না।

কিন্তু কোথায় লাগে আমাদের আড্ডা কাইরোর আড্ডার কাছে। বাঙালি আড্ডার সব

www.BanglaBook.org

কটা সুখ কাইরোর আড্ডাতে তো আছেই; তার উপর আরেকটা মস্ত সুবিধার কথা এই বেলা বলি, যার জন্য এতক্ষণ ধরে ভূমিকা দিলুম।

দুনিয়ার যত ফেরিওলা কাইরোর কাফেতে চক্কর মেরে যায়। টুথব্রাশ, সাবান, মোজা, আরশি, চিরুনি, নোটবুক, পেন্সিল, তালাচাবি, ফাউন্টেন পেন, ঘড়ি—হেন বস্তু নেই যা ফেরিওলা নিয়ে আসে না! আমি জানি, আপনি সহজে বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু ধর্মসাক্ষী, দর্জি পর্যন্ত বস্তা বস্তা কাপড় মুটের ঘাড়ে চাপিয়ে কাফের ভিতর চক্কর মেরে যায়। কাইরোর লোক দোকানে যেতে ভালোবাসে না। তাতে নাকি সময় নষ্ট হয়, আর দোকানী একা পেয়ে আপনাকে ঠকাবেও নিশ্চয়। আড্ডাতে বন্ধু-বান্ধব রয়েছেন। পাঁচজনে মিলে বরং ফেরিওয়ালাকে ঘায়েল করার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

একপ্রস্ত সুট বানাবার বাসনা ছিল। আড্ডাতে সেটা সবিনয় নিবেদন করলুম। পাশ দিয়ে দর্জি যাচ্ছিল—ডাক দিতে সবাই 'হাঁ হাঁ, করো কি করো কি!' বলে বাধা দিলেন! 'ও ব্যাটা সুট বানাবার কি জানে? প্লাস্তিরাস আসুক। গ্রীক বটে, ঠকাবার চেষ্টা করবে, কিন্তু আমরাও তো পাঁচজন আছি। ও কাপড় আনে ঠকিয়ে, কাস্টম না দিয়ে। আমরাও ওকে ঠকাতে পারলে টাকায় আট আনা লাভ। ঠকলে দু আনা লাভ। অথবা কুইট্‌স।' তারপর আড্ডা আমায় বুঝিয়ে বলল, যে সুট বানাতে চায় সে যেন বর। তার কথা কওয়া ভালো দেখায় না। সে কনেপক্ষের প্যাঁচে পড়ে বানচাল হয়ে যাবে, গয়নাগুলো যাচাই না করে নিয়ে ফেলে আখেরে পস্তাবে।

প্লাস্তিরাস এল। তারপর বাপরে বাপ। সে কী অসম্ভব দরদস্তুর, বকাবকি,—শেষটায় হাতাহাতির উপক্রম। আড্ডা বলে, 'ব্যাটা তুমি দুনিয়া ঠকিয়ে খাও, তোমাকে পুলিশে দেব।' প্লাস্তিরাস বলে, 'ও দামে সুট বানালে আমাকে আপন পাতলুন বন্ধক দিয়ে কাচ্চা-বাচ্চার জন্য আন্ডারুটি কিনতে হবে।'

পাক্কা তিনঘণ্টা লড়াই চলেছিল। এর ভিতর প্লাস্তিরাস তিনবার রাগ করে কাপড়ের বস্তা নিয়ে চলে এল, তিনবার ফিরে এল। আড্ডাও দল বাড়াবার জন্য কাফের ছোকরাকে পাঠিয়ে আমাদের গ্রীক সভ্য পাউলুসকে ডেকে আনিয়েছে। তখন লাগল গ্রীকে গ্রীকে লড়াই। সুড-এটেন্ নিয়ে হিটলার চেম্বারলেনে এর চেয়ে বেশি দর-কষাকষি নিশ্চয়ই হয় নি। যখন রফারফি হল তখন রাত এগারোটা। আমি বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়েছিলুম—আড্ডা তাতে আপত্তি জানান নি, বরের উপস্থিতি অপরিহার্য নয়। কাফের ছোকরা আমাকে বিছানা থেকে টেনে নিয়ে গেল। মাপ দেওয়া হল। তিন দিন বাদে পয়লা ট্রায়েল—অবশ্য কাফেতেই।

তিন দিন বাদে আড্ডা ফুল স্ট্রেন্‌থে হাজির। আমি কাফের পিছনের কামরায় গিয়ে নূতন সুট পরে বেরিয়ে এলুম। সর্বত্র চকের দাগ আর তাঁতীবাড়ির মত আমার সর্বাঙ্গ থেকে সূতো ঝুলছে। সুটের চেহারা দেখে সবাই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'মার লাগাও ব্যাটা প্লাস্তিরাসকে; এ কি সুট বানিয়েছে, না মৌলবী সাহেবের জোব্বা কেটেছে? ও কি পাতলুন, না চিমনির চোঙা? প্লাস্তিরাস দর্জি না হাজাম? ইত্যাদি সর্বপ্রকারের কটূকাটব্য। প্লাস্তিরাসও হেঁকে বলল, সে স্বয়ং বাদশার সুট বানায়। সবাই বললে, 'কোন্ বাদশা? সাহারার?'

তারপর এ বলে আস্তিন কাটো, ও বলে কলার ছাঁটো। কেউ বলে পাতলুন নামাও, কেউ বলে কোট তোলো। প্লাস্তিরাসও পয়লা নম্বরের ঘড়েল—সকলের কথায় কান দেয়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আবার কারো কথায় কান দেয়ও না, অর্থাৎ যা ভালো বোঝে তাই করে।

এই করে করে কাফেতে আড্ডা জমানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনটে ট্রায়েল পেরলুম। সুট তৈরি হল। আমি সেইটে পরে বরের মত লাজুক হাসি হেসে সবাইকে সেলাম করলুম। সুট দীর্ঘজীবী হোক বলে সবাই আশীর্বাদ করলেন। কাফের মালিক পর্যন্ত আমাদের পরবে সামিল হল। আমি সব্বাইকে একপ্রস্থ কফি খাওয়ালুম। সে-সুট পরে আজও যখন ফার্পোতে যাই গুণীরা তারিফ করেন।

পুলিনবিহারী

ছেলেবেলায় যে-রকম গলাজল ঠেলে ঠেলে খাল পেরতুম, ঠিক সেইরকম পূবের হাওয়া ঠেলে ঠেলে সমুদ্রপারে পৌঁছতে হল।

অন্য দিন সমুদ্র থেকে থেকে এক-একখানা করে ঢেউ পাঠায়। সে অনেক দূর থেকে পাঁয়তারা কষে কষে দড়ি পাকিয়ে পাকিয়ে কোমর বেঁধে শেষটায় পাড়ে এসে আছাড় খায়। আজ বিশাল আয়োজন। একসঙ্গে অনেকগুলো পালোয়ান; একজনের পিছনে আরেকজন পাঁয়তারা কষে কষে আসছে। তারপর পাঁড়ে এসে হুটোপুটি—দোস্ত-দুশমনের সনাক্ত হওয়ার গোলমালে আপসে হানাহানি। শেষটায় কোলাকুলিতে মিলে গিয়ে ছোট ছোট দ'য়ে জমে যাওয়া।

সমস্ত আকাশ জুড়ে ছেঁড়া ছেঁড়া রঙিন মেঘ—এলোমেলো, যেন আর্টিস্টের পেলেটে, এলোপাতাড়ি হেথা হোথায় এবড়ো-থেবড়ো রঙ। কিন্তু তবু সবসুদ্ধ মিলে গিয়ে যেন কেমন একটা সামঞ্জস্য রয়েছে—মনে হয় না অদলবদল করলে কিছু ফেরফার হবে।

বসেছিলুম জলের আর জেলেপাড়ার মাঝখানে। পিছনে নারকেল বন—তাতে আগুন লাগিয়ে সূর্য প্রচণ্ড মহিমায় অস্ত গেলেন—গরবিনীর সতীদাহ। সমুদ্রের গর্জন আর ঢেউয়ে-ভেসে-আসা-পোনা-মাছ-লুব্ধ কাকের কর্কশ চিৎকার, নারকেল গাছের উস্কোখুস্কো মাথার অবিশ্রান্ত আছাড় খাওয়া—অশান্তির চরম আয়োজন।

তাই বোধ করি একটি জেলে-ডিঙিও জলে নামে নি। লম্বা সারি বেঁধে কাৎ হয়ে পড়ে আছে ডাঙায়, যেন ডিসেকশান টেবিলের সারি সারি মড়া। সমস্ত তীরে মাত্র দু'টি জেলে সুতো ফেলে গভীর ধৈর্যে মাছ ধরার চেষ্টাতে আছে। জোয়ারের জোর টোপ ধুয়ে নিয়ে যায় ক্ষণে ক্ষণে, নূতন টোপ সাজতে হয়—তবু তাদের ধৈর্য অসীম। বাদবাকি ছেলেবুড়ো বালুপাড়ে বসে আছে—এত মেহন্নত করে লাভ নগণ্য।

অন্ধকার নামল অতি ধীরে ধীরে। পাটরাণী তো চিতেয় উঠলেন লাল টকটকে হয়ে। আকাশ সিঁদুর মুছলেন অতি অনিচ্ছায়—এ মেঘে ওমেঘে অতি বুলিয়ে বুলিয়ে। সকলের শেষ পান্না জল লালে-নীলে মেশা বেগুনি ঝিলিকটুকু মুছে ফেলে আস্তে আস্তে শ্যামলা সবুজ হলেন।

কোনদিন আবার রঙের রাজা মাত্র তিনটি রঙ নিয়ে খেলায় বসেন। সমুদ্র আর পূবের আকাশকে দেন কালো-নীল, পশ্চিম আকাশকে একটুখানি গোলাপী আর মাথার

www.BanglaBook.org

উপর বাকি সমস্ত আকাশ পায় ফিকে ফিরোজা। যতক্ষণ না কালো পরদায় সব কিছু ঢাকা পড়ে যায়, ততক্ষণ শুধু এই তিন রঙের ফিকে ঘন'র খেলা। তাতে কতই না কারচুপি। এদিকে কালো-নীল যত ঘনিয়ে ঘনিয়ে নীলের রেশ কমাতে লাগল, ওদিকে তেমনি গোলাপী ফিকে হতে হতে শিরিষ রঙের আমেজ নিতে আরম্ভ করল। মাঝখানের আকাশ ফিরোজাতে শ্বেত-চন্দনের প্রলেপ লাগিয়েই যাচ্ছে। এ যেন তিন স্বর নিয়ে খেলা। আর তবলাও ঠিক বাঁধা। পশ্চিমের আকাশ যদি দ্রুত লয়ে রঙ বদলান তবে পূবও সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাল রাখেন। আর সমুদ্রের গর্জনে যেন তানপুরোর আমেজ।

সমে এসে যখন পূব-পশ্চিম মিলে গেল অন্ধকারে, তখন তানপুরোর রেশটুকুমাত্র রইল সাগরপারে। মশালচি এসে আসমানের ফরাসে এখানে-ওখানে তারার মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখে গেল। এবার রাত্রির মুশায়েরা (কবিসঙ্গম) বসবে। নারকেল গাছ মাথা দোলাবে, ঝিঁঝি নূপুর বাজিয়ে নাচবে, পূবের বাতাস সভার সর্বাঙ্গে গোলাপজল ছিটিয়ে ঠাণ্ডা করে যাবে। তারপর দূর সাগরের ওপারে লাল মদের ভাঁড় থেকে মাতাল চাঁদ উঠবেন ধীরে ধীরে গা টেনে টেনে, একটুখানি কাৎ হয়ে। মোসাহেবদের মুখে হাসি ফুটবে—অন্ধকারে যারা গা-ঢাকা দিয়ে বসেছিল, তাদের সবাইকে তখন চেনা যাবে।

* * *

সমুদ্রপারে, নীল গম্বুজের তলে, বিশ্ব-সংসারের ঠিক মাঝখানে যখনি বসি তখন মনে হয়, যেন সার্কাসের গোল তাঁবুর মাঝখানে আমাকে কে যেন বসিয়ে দিয়েছে আর চতুর্দিকে গ্যালারিতে লাল হলদে সোনালি মেঘের পাল অপেক্ষা করছে আমি কখন বাঁদর-নাচ আরম্ভ করব।

ভারি অস্বস্তি বোধ হয়।

এই সব রঙচঙা মেঘের দল অত্যন্ত অভদ্র চার-আনী দর্শক।

হঠাৎ একজন যেন হেসে হেসে লাল হয়ে ফেটে পড়ার যোগাড় করে পাশের আরেক চার-আনীকে কি বলে। সেও তখন লাল হয়ে উঠে তার পাশের জনকে সে কথা বলে—দেখতে দেখতে সমস্ত তাঁবুর সবাই লাল হয়ে ওঠে। যেদিকে তাকাই সেদিকেই হাসির লুটোপুটি।

লুকোবার জায়গা নেই।

বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলুম বিরক্ত হয়ে।

কিন্তু তবু সেই মাঝখানেই। তবু যেন তার চার-আনীর দলকে সঙ্গে নিয়ে আমারই চতুর্দিকে ঠিক তেমনি ঘিরে দাঁড়াতে চায়।

বিশ্বসংসার আমাকে বাঁদর-নাচ না নাচিয়ে ছাড়বে না।

* * *

দু'জোড়া কপোত-কপোতী নিত্যি নিত্যি দেখতে পাই। একে অন্যকে পেয়েই তারা খুশি। সে খুশি তাদের বসাতে, চলাতে, তাদের হাত-পা নাড়াচাড়াতে যেন উপচে পড়ে। এক জোড়া সমুদ্রের পারে পারে পা-চারী করে—ছেলেটি যেমন ছ'ফুট ঢ্যাঙা, মেয়েটিও তেমনি পাঁচ ফুটের কমতি। ছেলেটার কর্ম, মেয়েটার দুই জুতো এক ফিতেতে বেঁধে কড়ে আঙুলে ঝুলিয়ে দোলাতে দোলাতে লম্বা-লম্বা পা পেলে এগিয়ে চলা; মেয়েটা শুধু-পায়ে ভিজে বালির উপর দিয়ে চড়ুই পাখির মত লাফ দিয়ে দিয়ে নেচে যায়—কেউ তাড়া করে এলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লাফ দিয়ে এক পাশে সরে যায়, চলে গেলে বেঁকে গিয়ে জলের দিকে এগোয়। খাটো করে পরা ফ্রক, পা দু'টি সুডোল ঘন শ্যামবর্ণ। কথাবার্তা কখনো কইতে শুনি নি—একে অন্যের দিকে তাকায় পর্যন্ত না। এগুতে এগুতে তারা আড়ায়ার পর্যন্ত চলে যায়, তবু দূর থেকেও তাদের চেনা যায়—ঢ্যাঙা আর বেঁটে। ঢ্যাঙা নাক-বরাবর সোজা চলেছে, মেয়েটি এঁকে-বেঁকে।

আরেক জোড়া সমস্তক্ষণ বসে থাকে ডাঙায়-তোলা একটা নৌকোর আড়ালে কুণ্ডলী-পাকানো জালের বস্তায় হেলান দিয়ে। সমুদ্রের দিকে তাকায় না, পিছনের সূর্যাস্তও জালের বস্তায় ঢাকা পড়ে। সমস্তক্ষণ গুজুর গুজুর। কখনো খুব পাশাপাশি ঘেঁষে বসে, ছেলেটা মেয়েটির কোলে হাত রেখে, কখনো দেখি মেয়েটির হাত ছেলেটির কোমর জড়িয়ে। বেড়ায় না, ডাইনে-বাঁয়ে তাকায় না। রাত ঘনিয়ে এলে একই সাইকেলে চড়ে উত্তর দিকে চলে যায়।

* * *

দূর থেকে রোষে-ক্রোধে তর্জন-গর্জনে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে সিন্ধুপারে লুটিয়ে পড়ে অবশেষে এ কী বিগলিত আত্মনিবেদন।

তাণ্ডবের ডমরু বাজিয়ে, ছিন্নমস্তার আত্মঘাতে নিজেকে বারে বারে দ্বিখণ্ডিত করে, পাড়ে এসে অবশেষে লক্ষ কিঙ্কিণীর এ কী মৃদু শান্ত নূপুর-গুঞ্জরণ!

সূর্যোদয়ের লোহিতোজ্জ্বল রক্ত-টিপ, দ্বিপ্রহরের অতি ঘন নীলাম্বরী, সন্ধ্যার গৈরিক পট্টবাস, সর্বশেষে অন্ধকারে সর্বস্ব ত্যাগ করে অভিসারে সিন্ধুপারে মৃদু পদসঞ্চারণ!

আহারাদি—

যে লোক উদ্ভিদতত্ত্ব জানে না, সে দেশী-বিদেশী যে-কোন গাছ দেখলেই মনে করে, এও বুঝি এক সম্পূর্ণ নূতন গাছ। তখন নূতন গাছের সঙ্গে তার চেনা কোনো গাছের কিছুটা মিল সে যদি দেখতে পায় তবে অবাক হয়ে ভাবে, এই চেনা-অচেনায় মেশানো গাছের কি অন্ত নেই। কিন্তু শুনেছি, উদ্ভিদ-বিদ্যা নাকি পৃথিবীর বেবাক গাছকে এমন কতকগুলো শ্রেণীতে ভাগ করে ফেলেছে যে, নূতন কোনো গাছ দেখলে তাকে নাকি কোনো একটা শ্রেণীতে ফেলে নামকরণ পর্যন্ত করা যায়। আশ্চর্য নয়, কারণ ধ্বনির বেলা তো তাই দেখতে পাচ্ছি। ইংরিজি শুনে মনে হয় যে, এই বিকট ভাষায় স্বর-ব্যঞ্জনের বুঝি অন্ত নেই। কিন্তু ডেনিয়েল জোন্‌স এবং পূর্বাচার্যগণ এমনি উত্তম শ্রেণীবিভাগ করে ফেলেছেন যে, আজ আমরা বাপঠাকুরদার চেয়ে বহু কম মেহন্নতে ইংরিজি উচ্চারণ শিখতে পারি।

আহারাদির বেলাও তাই। আপনার হয়ত কোনো কাবুলীওয়ালার সঙ্গে মিতালি হল। সে আপনাকে দাওয়াত করে খাওয়াল। প্রথমটায় আপনি হয়ত ভেবেছিলেন যে, হাতুড়ি বাটালি সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। গিয়ে দেখেন, খেতে দিল তোফা পোলাও আর খাসা মুরগীর ঝোল। তবে ঠিক জাকারিয়া স্ট্রীটের মত রান্না নয়, কলকাতাবাসী পশ্চিমা মুসলমানরা যে রকম রান্না করে ঠিক সে রকম নয়। কেমন যেন একটুখানি আলাদা, কিন্তু খেতে উম্‌দা।

www.BanglaBook.org

অথবা মনে করুন আপনাকে প্যারিসের কোনো রেস্তোরাঁয় আপনার ভারতীয় বন্ধু 'হাঙ্গেরিয়ান গুলাশ' খেতে দিলেন। হয়তো আপনি ইয়োরোপে এসেছেন মাত্র কয়েকমাস হল—নানা প্রকার যাবনিক খাদ্য খেয়ে খেয়ে আপনার পিত্তি (উভয়ার্থে) চটে আছে। তখন সেই 'গুলাশ' দেখে আপনি উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করবেন। সেই রাত্রেই আপনি গিন্নিকে চিঠি লিখলেন, 'বহুকাল পরে মাংসের ঝোল খেয়ে বিমলানন্দ উপভোগ করলুম।' কারণ 'হাঙ্গেরিয়ান গুলাশ' আর সাদা-মাটা মাংসের ঝোলে কোনো তফাৎ নেই।

আর আপনার বন্ধু যদি ন'সিকে গুণী হন এবং সেই গুলাশের সঙ্গে খেতে দেন 'ইতালিয়ান রিসোত্তো', তাহলে আপনাকে হাতি দিয়ে বেঁধেও সেই রেস্তোরাঁ থেকে বের করা যাবে না। ইয়োরোপের বাকি ক'টা দিন আপনি সেই রেস্তোরাঁর টেবিল বেড়ালছানার মত আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকতে চাইবেন। কারণ বহুকাল যাবনিক আহারাদির পর মাংসের ঝোল আর রুটি মুখরোচক বটে, কিন্তু তার সঙ্গে কি পোলাও আর মাংসের ঝোলের তুলনা হয়? ঘড়েল পাঠক নিশ্চয়ই এতক্ষণে ধরে ফেলেছেন যে, 'ইতালিয়ান রিসোত্তো' মানে পোলাও, তবে ঠিক, ভারতীয় পোলাও নয়। কোপ্তা-পোলাওয়ের কোপ্তাগুলোকে যদি ছোট্ট ছোট্ট টুকরো করে পোলাওয়ে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তবে তাই হবে রিসোত্তো।

অথবা মনে করুন, দেশে ফেরার সময় আপনি একদিনের তরে কাইরোতে ঢুঁ মেরে এলেন। কিছু কঠিন কর্ম নয়, পোর্ট সইদে জাহাজ থেকে নেমে ট্রেনে কাইরো, সেখানে ঘণ্টা বারো কাটিয়ে মোটরে করে সুয়েজ বন্দরে পৌঁছে ফের সেই জাহাজই ধরা যায়—কারণ জাহাজ সুয়েজ খাল পেরোয় অতি ধীরে ধীরে।

কাইরোতে খেলেন মিশরী রান্না। চাক্তি চাক্তি মাংস খেতে দিল, মধ্যিখানে ছ্যাঁদা। দাঁতের তলায় ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে বটে, কিন্তু সোওয়াদ খাসা। খাচ্ছেন আর ভাবছেন বস্তুটা কি, কিন্তু কোন হদিস পাচ্ছেন না। হঠাৎ মনে পড়ে যাবে, খেয়েছি বটে আমজাদিয়ায় এইরকম ধারা জিনিস—শিককাবাব তার নাম। তবে মশলা দেবার বেলা কঞ্জুসী করেছে বলে ঠিক শিককাবাবের সুখটা পেলেন না।

এতক্ষণে আপনার শাস্ত্রাধিকার হল। এই যে মশলার তত্ত্বটা আবিষ্কার করতে পেরেছেন, এরই খেই ধরে আপনি রান্নার শ্রেণী বিভাগ নিজেই করে ফেলতে পারবেন।

পৃথিবীতে কুল্লে দুই রকমে রান্না হয়। মশলাযুক্ত এবং মশলাবর্জিত। মশলা জন্মে প্রধানত ভারতবর্ষে, জাভায়, মালয়ে। ইউরোপে মশলা হয় না। তাই ইউরোপীয় রান্না সাধারণত মশলাবর্জিত।

এবার ঈষৎ ইতিহাসের প্রয়োজন। তুর্ক পাঠানরা যখন এদেশে আসে তখন পশ্চিম এবং উত্তর ভারত নিরামিষ খেত। তুর্ক পাঠানরা মাংস খেত বটে, কিন্তু সে রান্নায় মশলা থাকত না। তুর্ক-পাঠান-মোগলরা যে রকম ভারতবর্ষের অলঙ্কার শিল্পকার্যের সঙ্গে তুর্কিস্থানী ইরানী স্থাপত্য মিলিয়ে তাজমহল বানালো, ঠিক সেইরকম ভারতীয় মশলার সঙ্গে তাদের মাংস রান্নার কায়দা মিলিয়ে এক অপূর্ব রান্নার সৃষ্টি করল। আপনারা তাজমহল দেখে 'আহা আহা' করেন, আমি করি না। কারণ তাজমহল চিবিয়ে খাওয়া যায় না। আর খাস মোগলাই রান্না পেলেই আমি খাই এবং খেয়ে 'জিন্দাবাদ বাবুর আকবর' বলি—যদিও তাঁরা বহুকাল হল এ-জিন্দেগীর খাওয়াদাওয়া শেষ করে চলে গিয়েছেন।

* * *

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই 'মোগলাই' রান্না ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের তাবৎ মাংস-খেকোদের ভিতর ছড়িয়ে পড়ে। (বাঙালি আর দ্রাবিড়ের কথা আলাদা; এরা মাংস খায় কম, আর খাস মোগল-পাঠানের সংস্পর্শে এসেছে তারও কম। পিরালী ঠাকুরবাড়ি ব্যত্যয়, তাঁরা মোগলের সঙ্গে খানিকটা মিশেছিলেন বলে তাঁদের রান্নায় বেশ মোগলাই খুশবাই পাওয়া যায়)। এমন কি মোগলের দুশমন রাজপুত মারাঠারা পর্যন্ত মোগলাই খেতে আরম্ভ করল। এখনো রাজপুতানা, বরোদা, কোল্‌হাপুর রাজ্যের সরকারি অতিথিশালায় উঠলে বাবুর্চি প্রথম দিনই শুধায় 'মোগলাই' না নিরামিষ খাবে। আমার উপদেশ—মোগলাইটাই খাবেন—তাতে করে পরজন্মে অজ-শিশু হয়ে জন্মালেও আপত্তি নেই।

মোগল-পাঠানরা এই রান্না আফগানিস্থান-তুর্কীস্থানে প্রচলিত করল। আস্তে আস্তে সেই রান্নাই তাবৎ মধ্যপ্রাচ্য ছেয়ে ফেলল। তবে যত পশ্চিম পানে যাবেন, ততই মশলার মেকদার কমে আসবে। অর্থনীতিতে নিশ্চয়ই পড়েছেন, উৎপত্তিস্থল থেকে কোন বস্তু যতদূরে যাবে ততই তার দাম বেড়ে যায়। আফগানিস্থানের রান্নায় যে হলুদ (কাবুলীরা বলে 'জরদ্ চোপ' অর্থাৎ হলদে কাঠ) পাবেন, ইস্তাম্বুল পর্যন্ত সে হলুদ পৌঁছয় নি।

তুর্করা বল্কান জয় করে, হাঙ্গেরি পেরিয়ে ভিয়েনার দরজায় হানা দেয়। হাঙ্গেরিতে মোগলাই মাংসের ঝোল 'হাঙ্গেরিয়ান গুলাশে' পরিবর্তিত হল এবং মিশরী এবং তুর্কদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে ভেনিসের কারবারীরা 'মিন্‌স্‌ট-মীটে'র পোলাও বা রিসোত্তো বানাতে শিখল। গ্রীস সেদিন পর্যন্ত তুর্কীর তাঁবেতে ছিল, তাই গ্রীসের পোশাকী রান্না আজও চোগা-চাপকান পরে থাকে।

পৃথিবীতে দ্বিতীয় উচ্চাঙ্গের রান্না হয় প্যারিসে কিন্তু মশলা অতি কম, যদিও ইংরিজি রান্নার চেয়ে ঢের ঢের বেশি। এককালে তামাম ইয়োরোপ ফ্রান্সের নকল করত, তাই বল্কান গ্রীসেও প্যারিসি রান্না পাবেন। গ্রীস উভয় রান্নার সঙ্গমস্থল। বাকি জীবনটা যদি উত্তম আহারাদি করে কাটাতে চান, তবে আস্তানা গাড়ুন গ্রীসে (দেশটা বেজায় সস্তা)। লঞ্চ, ডিনার, সাপার খাবেন ফরাসী মোগলাই এবং ঘরোয়া গ্রীক কায়দায়। ভুঁড়ি কমাবার কোমরবন্দ্ সঙ্গে নিয়ে যাবেন—গ্রীসে এ জিনিসের বড্ড বেশি চাহিদা বলে বস্তুটা বেজায় আক্রা।

সুশীল পাঠক, স্পষ্ট বুঝতে পারছি, আপনি অতিষ্ট হয়ে উঠছেন। আপনার মনে আঁকুবাবু প্রশ্ন, রান্না-জগতে বাঙালির অবদান কি?

আছে, আছে। মাছ, ছানা এবং বাঙালি বিধবার নিরামিষ রান্না।

কিন্তু তার আগে তো চীনা রান্নার বয়ান দিতে হয়। মোগলাই, ফরাসী এবং চীনা এই ত্রিমূর্তির বর্ণনা না করে আমি 'প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা'র প্রশ্রয় দিতে চাইনে।

আরেকদিন হবে। বৈদ্যরাজ বলেছেন, দীর্ঘজীবী হয়ে যদি বহুকাল ধরে উদরমার্গের সাধনা করতে চাও, তবে বীজমন্ত্র হচ্ছে 'জীর্ণে ভোজনং'। অর্থাৎ হজম না করা পর্যন্ত পুনরায় আর বসবে না। তাও যদি না মানেন, তবে চটে গিয়ে সুকুমার রায়ের ভাষায় বলব (দোষটা তাঁর, কটু বাক্যটা তিনিই কয়েছেন)—

এত খেয়ে তবু যদি নাহি ওঠে মনটা।
খাও তবে কচু পোড়া, খাও তবে ঘণ্টা॥

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নেতাজী

আমাদের মত সাধারণ লোকের পক্ষে সুভাষচন্দ্রের মত মহাপুরুষের জীবনী আলোচনা করা অন্ধের হস্তী-দর্শনের ন্যায়। তৎসত্ত্বেও যে আমরা সুভাষচন্দ্রের জীবনী দর্শনে প্রবৃত্তি হয়েছি তার প্রধান কারণ, আমাদের মত অর্বাচীন লেখকেরা যখন মহাপুরুষকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার জন্য ঐ একমাত্র পন্থাই খোলা পায়, তখন তার শ্রদ্ধাবেগ তাকে অন্ধত্বের চরমে পৌঁছিয়ে দেয়—শ্রদ্ধা ও ভক্তির আতিশয্য তখন আমাদের চেয়ে সহস্রগুণে উত্তম লেখককেও বাচাল করে তোলে।

দ্বিতীয় কারণ, এক চীনা গুণী জনৈক ইংরেজকে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বুঝিয়ে বলছিলেন, 'সরোবরে জল বিস্তর কিন্তু আমার পাত্র ক্ষুদ্র। জল তাতে ওঠে অতি সামান্য। কিন্তু আমার শোক নেই—মাই কাপ্ ইজ্ স্মল—বাট আই ড্রিঙ্ক অফতেনার (My cup is small but I drink oftener)।'

আমাদের পাত্র ছোট, কিন্তু যদি সুভাষ-সরোবর থেকে আমরা সে পাত্র ঘন ঘন ভরে নিই তাহলে শেষ পর্যন্ত সরোবর নিঃশেষ হোক আর নাই হোক, আমাদের তৃষ্ণা নিবৃত্তি নিশ্চয়ই হবে। আমার পাত্রে উঠেছে দুই গণ্ডুষ জল, অথবা বলব, আমি অন্ধ, হাত দিয়ে ফেলেছি সৌভাগ্যক্রমে দুটি দাঁতেরই উপর। অবশ্য সব অন্ধই ভাবে, সেই সবচেয়ে মহামূল্যবান স্থলে হাত দিয়ে ফেলেছে, কাজেই এ-অন্ধের অভিমত আত্মম্ভরিতাপ্রসূতও হতে পারে।

প্রথম, বর্মায় সুভাষচন্দ্র কি কৌশলে হিন্দু-মুসলমান-শিখকে এক করতে পেরেছিলেন? এবং শুধু তাই নয়, ভারতবর্ষে ফেরার পরও এঁদের অধিকাংশ অখণ্ডবাহিনীরূপে আত্মপরিচয় দিতে চেয়েছিলেন। আমরা জানি, সুভাষচন্দ্রের সাইগন আসার বহুপূর্বে রাসবিহারী বসু অনেক চেষ্টা করেও কোনো আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তুলতে পারেন নি। অথচ রাসবিহারী বসু সুভাষচন্দ্রের তুলনায় জাপানীদের কাছে অনেক বেশি পরিচিত ছিলেন—জাপান-ফের্তা ভারতীয়দের মুখে শুনেছি রাসবিহারী বসুকে জিজ্ঞাসা না করে জাপান সরকার কখনো কোনো ভারতীয়কে জাপানে থাকবার ছাড়পত্র মঞ্জুর করত না।

একদিকে যেমন দেখতে পাই, সুভাষচন্দ্র 'আজাদ হিন্দ' নামটি অনায়াসে সর্বজনপ্রিয় করে তুললেন, অন্যদিকে দেখি, কৃতজ্ঞ মুসলমানেরা তাঁকে 'নেতাজী' নাম দিয়ে ওদিয়ে তুলে নিয়েছে—'কাইদ-ই-আকবর' বা ঐ জাতীয় কোনো দুরূহ আরবী খেতাব তাঁকে দেবার প্রয়োজন তারা বোধ করে নি। পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে, তখন এ-দেশে হিন্দি-উর্দু সমস্যা কংগ্রেসকে প্রায়ই বিচলিত করত, অথচ দেখি সুভাষচন্দ্রকে এ সমস্যা একবারের তরেও কাতর করতে পারে নি। বেতারে আমি সুভাষচন্দ্রের প্রায় সব বক্তৃতাই শুনেছি এবং প্রতিবারই বিস্ময় মেনেছি হিন্দি-উর্দুর অতীত এ ভাষা নেতাজী শিখলেন কি করে? নেতাজী তো শব্দ তাত্ত্বিক ছিলেন না, ভাষার কলাকৌশল আয়ত্ত করবার মত অজস্র সময়ও তো তাঁর ছিল না। এ-রহস্যের একমাত্র সমাধান এই যে, রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি যে মহাত্মার থাকে, দেশকে সত্যই যিনি প্রাণ মন সর্বচৈতন্য সর্বানুভূতি দিয়ে ভালোবাসেন, সাম্প্রদায়িক কলহের

www.BanglaBook.org

বহু ঊর্ধ্বে নির্দ্বন্দ্ব পূণ্যলোকে যিনি অহরহ বিরাজ করেন, যে মহাপুরুষ দেশের অখণ্ড সত্যরূপ ঋষির মত দর্শন করেছেন, বাক্যব্রহ্ম তাঁর ওষ্ঠাগ্রে বিরাজ করেন। তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেন, সে-ভাষা সত্যের ভাষা, ন্যায়ের ভাষা, প্রেমের ভাষা। সে-ভাষা শুদ্ধ হিন্দি অপেক্ষাও বিশুদ্ধ হিন্দি, শুদ্ধ উর্দু অপেক্ষাও বিশুদ্ধ উর্দু। সে-ভাষা তাঁর নিজস্ব ভাষা। এই ভাষাই মহাত্মাজীর আদর্শ ভাষা ছিল।

নিজের মনকে বহুবার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছি, সুভাষচন্দ্র না হয় সর্বদ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে উড্ডীয়মান ছিলেন, কিন্তু সাধারণ সৈন্যকে তিনি কি করে সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত করলেন? যে উত্তর শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করেছি, সেটা ঠিক কি না জানি না; আমার মনে হয়, সুভাষচন্দ্র শুদ্ধ মাত্র সাম্প্রদায়িকতা দূর করার জন্য কখনো কোমর বেঁধে আসরে নামেন নি। আমার মনে হয়, সুভাষচন্দ্র এমন এক বৃহত্তর জাজ্জ্বল্যমান আদর্শ জনগণের সম্মুখে উপস্থিত করতে পেরেছিলেন, এবং তার চেয়েও বড় কথা, এমন এক সর্বজনগ্রহণীয় বীরজনকাম্য পন্থা দেখাতে পেরেছিলেন যে, কি হিন্দু, কি মুসলমান কি শিখ সকলেই সাম্প্রদায়িক স্বার্থের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে দেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে যোগদান করেছিলেন। আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই, সুভাষচন্দ্র বলছেন, 'আগুন লেগেছে, চল আগুন নেভাই, এই আমার হাতে জল। তোমরাও জল নিয়ে এসো।' সুভাষচন্দ্র কিন্তু এ কথা বলছেন না, 'আগুন নেভাতে হলে হিন্দু-মুসলমানকে প্রথম এক হতে হবে, তারপর আগুন নেভাতে হবে। এস প্রথমে মিটিং করি, প্যাক্ট বানাই, শিলমোহর লাগাই তারপর স্বরাজ।'

বৃহত্তর আদর্শের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করেছে,—তা সে ব্যক্তিগত স্বার্থই হোক আর সাম্প্রদায়িক স্বার্থই হোক—এ তো কিছু অভূতপূর্ব জিনিস নয়। স্বীকার করি এ জিনিস বিরল। তাই এ রকম আদর্শ দেদীপ্যমান করতে পারেন অতি অল্প লোকই, তাই সুভাষচন্দ্রের মত নেতা বিরল।

দ্বিতীয় যে গজদন্ত আমি অনুভব করতে পেরেছি, সেটি এই ঃ—

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি তিনজন নেতা স্বেচ্ছায় নির্বাসন বরণ করে দেশোদ্ধারের জন্য মার্কিন-ইংরেজের শত্রুপক্ষকে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। এদের মধ্যে প্রথম জেরুজালেমের গ্র্যান্ডমুফতী এবং দ্বিতীয় ইরাকের আবদুর রশীদ। এঁদের দুজনই আপন আপন দেশের একচ্ছত্র নেতা ছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি আমাদের নেতাজী। তিনি ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান নেতা ছিলেন না।

তিনজনই কপর্দকহীন, তিনজনই সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন আপন আপন যশ এবং চরিত্রবল। প্রথম দুজনের স্বজাতি ছিল উত্তর আফ্রিকায়, অথচ শেষ পর্যন্ত দেখা গেল এঁদের কেউই কোনো সৈন্যবাহিনী গঠন করে তুনিসিয়া আলজেরিয়ায় ইংরেজের সঙ্গে লড়তে পারলেন না; শুধু তাই নয়, জর্মন রমেল যখন উত্তর আফ্রিকায় বিজয় অভিযানে বেরুলেন, তখন এঁদের কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাবারও প্রয়োজন তিনি অনুভব করলেন না। এঁদের কেউই জর্মন সরকারকে আপন ব্যক্তিত্ব দিয়ে অভিভূত করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁদের গতি হল আর পাঁচজনের মত ইতালি থেকে বেতারযোগে আরবীতে বক্তৃতা দিয়ে 'প্রোপাগ্যান্ডা' করার।

অথচ, পশ্য, পশ্য সুভাষচন্দ্র কি অলৌকিক কর্ম সমাধান করলেন। স্বাধীন রাষ্ট্র নির্মাণ করে, ইংরেজের 'গর্ব ভারতীয় সৈন্যদের' এক করে, আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে তিনি

www.BanglaBook.org

ভারতবর্ষ আক্রমণ করলেন। বর্মা-মালয়ের হাজার হাজার ভারতবাসী সর্বস্ব তাঁর হাতে তুলে দিল, স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রাণ দেবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল।

আমরা জানি, জাপান চেয়েছিল সুভাষচন্দ্র ও তাঁর সৈন্যগণ যেন জাপানী ঝাণ্ডার নীচে দাঁড়িয়ে লড়েন (মুফতী এবং আবদুর রশীদ জর্মনীকে সে সুযোগ দিয়েও বাধ্য করাতে পারেন নি)। সুভাষচন্দ্র কবুল জবাব দিয়ে বলেছিলেন, "আমি আজাদ হিন্দ ও তার ফৌজের নেতা। আমার রাষ্ট্র নির্বাসনে বটে, কিন্তু সে-রাষ্ট্র স্বাধীন এবং সার্বভৌম! যদি চাও, তবে সে রাষ্ট্রকে স্বীকার করার গৌরব তোমরা অর্জন করতে পারো। যদি ইচ্ছা হয়, তবে অস্ত্রশস্ত্র এবং অর্থ দিতে পারো—এক স্বাধীন রাষ্ট্র যে রকম অন্য স্বাধীন রাষ্ট্রকে মিত্রভাবে ধার দেয়, কিন্তু আমি কোনো ভিক্ষা চাই না এবং আমার সৈন্যগণ 'আজাদ হিন্দ' ভিন্ন অন্য কোনো রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে যুদ্ধ করবে না।"

এই ইন্দ্রজাল কি করে সম্ভব হল? সুভাষচন্দ্রের আত্মাভিমান যেমন তাঁকে বাঁচিয়েছিল জাপানের বশ্যতা না করা থেকে, তেমনি তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে, জাপান তাঁর কথামত চলতে বাধ্য হবে। তার সঙ্গে সঙ্গে আরো কত গুণ, কত কূটবুদ্ধি, কত দুঃসাহস, কত নির্বিকার ধৈর্য, কত চরিত্রবলের প্রয়োজন হয়েছিল, আমাদের মত সাধারণ লোক কি তার কল্পনাও করতে পারে।

কপর্দকহীন, সামর্থ্যসম্বলহীন সুভাষচন্দ্র টোকিয়োতে একা দাঁড়িয়ে—প্রথম দেখি এই ছবি। তারপর দেখি, সেই সুভাষচন্দ্র নেতাজীরূপে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বাধীন সৈন্যবাহিনীর পুরোভাগে দাঁড়িয়ে, ভারতেরই এক কোণে।

যতই বিশ্লেষণ করি না কেন, এই দুই ছবির মাঝখানের পর্যায়গুলো ইন্দ্রজাল—ভানুমতীই থেকে যায়। এ যুগে না জন্মে এ কাহিনী ইতিহাসে পড়লে কখনই বিশ্বাস করতুম না!

"জিন্দাবাদ নেতাজী"।

রোগক্ষয়—শিক্ষালাভ

মানুষ যেমন বিষের ধুঁয়ো এটম বম বানিয়ে তার আপন ভাইকে অসহ্য যন্ত্রণা দিয়ে মারতে শিখেছে—ঠিক তেমনি এমন মানুষেরও অভাব নেই যাঁরা মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করার জন্য সমস্ত কল্পনাশক্তি, সর্বশেষ রক্তবিন্দু ক্ষয় করতে প্রস্তুত আছেন। কেন জানিনে, আজ হঠাৎ এঁদেরই একজনের কথা মনে পড়লো। এই প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষের নাম মসিয়ো লুই ভোতিয়ে।

আমি তখন জিনীভায়। এক অচেনা ভদ্রলোক এসে আমার সঙ্গে দেখা করে অনুরোধ করলেন, লেজাঁয় তাঁর যক্ষ্মারোগীর সানাটোরিয়ামটি আমি যদি দেখতে যাই তবে তিনি অত্যন্ত খুশি হবেন। ফ্রান্স, জর্মনি, সুইটজারল্যান্ডে বিস্তর সানাটরিয়া দেখেছি, সর্বত্রই সব গুণীর মুখে একই কথা, যক্ষ্মার বিশেষ কোনো চিকিৎসা নেই, তবে রোগী যদি মনস্থির করে ফেলে যে, যমকে চোখের জলে নাকের জলে না করা পর্যন্ত সে মরবে না, অর্থাৎ বিছানায়

www.BanglaBook.org

শুয়ে শুয়েই সে হিম্মৎ নামক অস্ত্রখানি দিয়ে তার সঙ্গে লড়াই দেবেই দেবে, তবে হয়ত, হয়ত কেন, নিশ্চয়ই সে বীরকে বাঁচাবার একটা চেষ্টা করাতে কিছুমাত্র আপত্তি নেই।'

আমি ডক্টর ভোতিয়েকে এ-কথাটি স্মরণ করিয়ে দিতে তিনি ভারী খুশি হলেন। বললেন, 'আপনি যখন এ তত্ত্বটা জানেন আপনারই বিশেষ করে লেজাঁতে আসা উচিত।' তবু আমার যেতে ইচ্ছা করছিল না; কারণ যক্ষ্মার হাসপাতাল দেখা কিছুমাত্র আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা নয়। কিন্তু ভোতিয়ে সেই শ্রেণীর লোক যাঁরা খানিকটে হেসে, খানিকটে যুক্তিতর্ক দিয়ে, খানিকটে অনুনয়-বিনয় করে গররাজি লোককে নিমরাজি নিজের পারে পটিয়ে টেনে নিয়ে যেতে পারেন। আমি খানিকটে ধস্তাধস্তি করেছিলুম, কিন্তু তখন যদি জানতুম যে ভোতিয়ে মুস্‌সোলীন এবং লয়েড জর্জের কাছ থেকে আপন হাসপাতালের জন্য টাকা বাগাতে সমর্থ হয়েছেন, তাহলে নিশ্চয়ই আপত্তি না করে সুবোধ ছেলেটির মত সুড়সুড় করে লেজাঁ চলে যেতুম।

লেজাঁ যেতে হয় চেন-রেলওয়ে ধরে। এমনই ভয়ঙ্কর খাড়া পাহাড়ের উপর যক্ষ্মা সানাটরিয়ামগুলো বানানো হয়েছে যে সাধারণ ট্রেন, এমন কি মোটরও সেখানে পৌঁছতে পারে না।

হোটেল আছে; কিন্তু যখন নিতান্ত এসেই গিয়েছি তখন সানাটরিয়ামের ভিতর থাকলেই তো দেখতে পাবো বেশি।

মসিয়ো ভোতিয়ে, মাদাম, এমন কি বাচ্চা দুটো পর্যন্ত আমাকে দিল-খোলা অভ্যর্থনা জানালেন। বাচ্চা দুটোর বয়স ছয় আর আট। এদের জন্ম হয়েছে এই সানাটরিয়ামেই। তারা সুস্থ। শ'খানেক যক্ষ্মারোগীর সঙ্গে তারা খায়-দায় খেলাধূলা গল্পগুজব করে—বাপ-মা'র তাতে কোনো ভয় নেই। আমিই তাহলে ডরাব কেন?

মসিয়ো ভোতিয়ে বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, যক্ষ্মা রোগটা ছেলেছোকরাদেরই হয় বেশি। বরং এ রোগটার সবচেয়ে বড় ডেরা খাটানো রয়েছে কলেজে কলেজে। কলেজের ছোকরারা এ রোগে মরেও সবচেয়ে বেশি। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক রোগী কিংবা নিতান্ত বাচ্চাকে বাঁচানো অনেক সহজ।

'তার প্রধান—প্রধান কেন, একমাত্র কারণ, যক্ষ্মা হলেই তাদের পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয়। তারা তখন ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখে। ভাবে, পড়াশোনা যদি নাই করতে পারলুম তবে দু'পাঁচ বৎসর পরে সেরে গিয়েই বা করব কি? খাবো কি? সংসারই বা পাতবো কি দিয়ে?

'তাই তারা রোগের সঙ্গে লড়বার আর কোনো প্রয়োজন দেখতে পায় না, সব হিম্মত হারিয়ে ফেলে, এগিয়ে মৃত্যুর হাতে আপন জানটি ভেট দেয়।'

মসিয়ো ভোতিয়ে বললেন, যবে থেকে আমি যক্ষ্মা রোগ নিয়ে কাজ আরম্ভ করেছি তখন থেকেই আমি কাজে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে, অবসর সময়ে অহরহ ভেবেছি এর কোনো প্রতিকার করা যায় কিনা? শেষ পর্যন্ত আমি যে প্রতিকার আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি তারই ভিতরে আজ আপনি আমি বসে কথা বলছি—তার নাম 'সানাটরিয়াঁ ইউনিভেসিতের', অর্থাৎ 'বিশ্ববিদ্যালয় আরোগ্যায়তন'।

'এখানে শুদ্ধমাত্র কলেজের ছেলেমেয়েদের নেওয়া হয়। এবং জিনীভা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমাদের বন্দোবস্ত, যেন আমাদের রোগীদের টার্ম হিসেবে নেওয়া হয়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অর্থাৎ এরা জিনীভায় ক্লাস না করে ক্লাস করছে এই সানাটোরিয়ামে। এরা এখানেই পড়াশোনা করে, সুইট্জারল্যান্ডের সব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যাপকরা এখানে এসে মাঝে মাঝে লেকচার দিয়ে যান, তাছাড়া যক্ষ্মাবৈরী বহু নিমন্ত্রিত রবাহূত গুণী এখানে এসে দু'দশ দিন থেকে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ায় নানাপ্রকারে সাহায্য করে যান।

'বুঝতেই পারছেন, যে-সব বিষয় নিলে ভয়ঙ্কর বেশি খাটতে হয়, সেগুলোর ব্যবস্থা এখানে নেই। তাই নিয়ে ছেলেমেয়েরাও বেশি কান্নাকাটি করে না, তারা জানে, সে ধরনের পড়াশোনা করলে তাদের শরীর কখনো সারবে না। তারা খুশি কোনো কিছু একটা নিয়ে পাশ দিতে পারলেই; কাজেই বিজ্ঞানের ছেলে দর্শন নিতে আপত্তি করে না, ইঞ্জিনিয়ারিঙের ছেলে ইতিহাস উৎসাহের সঙ্গেই পড়ে।

'অবশ্য স্বাস্থ্যের অবস্থার উপর পড়াশোনার মেকদার নির্ভর করে। আমাদের সব সময় কড়া নজর, কেউ যেন বড্ড বেশি না খাটে। কিছুদিন থাকার পর রোগীরাও তত্ত্বটা বুঝে ফেলে, আর নূতন রোগীদের ধমক দিয়ে ব্যাপারটা তাদের কাছে জলের মত তরল করে দেয়। আমাকে তো আজকাল এ-নিয়ে বিলকুল মাথা ঘামাতে হয় না। ওদের চিকিৎসার দিকে এখন আমি আরো বেশি সময় দিতে পারি।'

একটুখানি চোখ টিপে মুচকি হেসে বললেন, 'পড়াশোনা বিশেষ হয় না, সে তো বুঝতেই পারছেন। তা নাই বা হল। ছেলেমেয়েরা সাহস তো পায় বেঁচে থাকবার, সেইটেই হল আসল কথা। জিনীভা বিশ্ববিদ্যালয়ও আমার কলটা বেশ বুঝতে পেরেছেন, আমিই তাদের খোলাখুলি বলে রেখেছি, এখানে মধ্যযামিনীর তৈল ক্ষয় নিষিদ্ধ, বেশি পড়াশোনা এখানে হতেই পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরা তো আর হৃদয়হীন পাষাণ নন; এখান থেকে যারা পরীক্ষা দেয়, তাদের প্রতি তাঁরা সদয়, আর যারা সেরে উঠে বাকি টার্মগুলো জিনীভায় কাটায় তাদের প্রতিও মোলায়েম ব্যবহার করেন।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'কিন্তু টাকা পাই কোথায়? অঢেল টাকার দরকার। আমি পনেরো বছর ধরে তামাম ইয়োরোপ চষে বেড়াচ্ছি টাকার জন্য। মুস্‌সোলীনি, লয়েড জর্জ থেকে আরম্ভ করে যেখানে যে আমাকে সামান্যতম সাহায্য করতে পারে তারই দরজায় হ্যাট পেতে ভিক্ষা মেগেছি।

'এখন আমার ইচ্ছা এ-প্রতিষ্ঠানটিকে ইন্টারনেশনাল—সার্বজনীন সার্বভৌমিক করার। ভারতবর্ষ থেকে যদি রোগী ছাত্র আসে তবে তার জন্য যেন এখানে আমি ব্যবস্থা করতে পারি, সেও যেন নিরাময় হয়, সঙ্গে সঙ্গে জিনীভা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি নিয়ে ফিরতে পারে। আপনাদের দেশে তো রাজা মহারাজদের অনেক টাকা—দানখয়রাতও তাঁরা করেন শুনেছি।'

আমি মনে মনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললুম, 'এককালে রাজ-রাজড়ারা বিস্তর দান-ধ্যান করতেন এ-কথা সত্যি, আজকালও যে একেবারেই নেই সে-কথা আমি বলব না। আপনি যদি স্বয়ং ভারতবর্ষে আসেন তবে একটা চেষ্টা দিয়ে দেখতে পারি। আমার দ্বারা যোগসূত্র স্থাপনের যেটুকু সামান্য সাহায্য সম্ভবপর—

ডক্টর ভোতিয়ে আমার দু'খানা হাত চেপে ধরে নীরবে আমার চোখের দিকে সকৃতজ্ঞ নয়নে তাকিয়ে রইলেন।

আমি দেশে ফিরে এলুম। তারপর লেগে গেল ১৯৩৯-এর লড়াই। সুইট্জারল্যান্ড

www.BanglaBook.org

ছোট্ট দেশ। সীমান্ত রক্ষার জন্য ভোতিয়ের মত ডাক্তারকে উর্দি পরে ব্যারাকে ঢুকতে হল—অবশ্য ডাক্তারের উর্দি! কিন্তু তাঁর এ-দেশে আসাটা আর হয়ে উঠল না।

* * *

মসিয়ো লুই ভোতিয়ে সুইট্‌জারল্যান্ডের লেজাঁ নামক স্থানে যে 'আরোগ্যায়তন বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেখানে যক্ষ্মা সারানোর সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া শেখানোর অভিনব সমন্বয় বহু সুইট্‌জারল্যান্ডবাসীর হৃদয়মন আকৃষ্ট করেছে। তাঁরা অকৃপণ হস্তে এ-প্রতিষ্ঠানে অর্থদান করেছেন এবং তাঁদেরও ইচ্ছা এ-প্রতিষ্ঠানটি ক্রমে ক্রমে বিশ্বজনের সম্পদ হয়ে উঠুক। কিন্তু উপস্থিত জাতীয়তাবাদ নামে যে বর্বরতা পৃথিবীকে শতধা বিভক্ত করে দিচ্ছে, তার সামনে মসিয়ো ভেতিয়ে নিরূপায়। তাই আমার বিশ্বাস, যতদিন সুইট্‌জারল্যান্ডে বিশ্বকল্যাণের জন্য সর্বাঙ্গসুন্দর ব্যবস্থা না হয়, ততদিন এ দেশে আমাদেরও চুপ করে বসে থাকা অনুচিত হবে। লেজাঁতে যে প্রতিষ্ঠান সম্ভবপর হয়েছে, এদেশেই বা তা হবে না কেন? বরঞ্চ এদেশে তার প্রয়োজন অনেক বেশি; কারণ এদেশের ছাত্র-সমাজে যক্ষ্মারোগের যে প্রসার তার সঙ্গে অন্য কোন দেশেরই তুলনা হয় না। অস্মদ্দেশীয় যক্ষ্মাবৈরী সজ্জন সম্প্রদায় আশা করি কথাটা ভেবে দেখবেন।

কিন্তু এ-হেন গুরুতর বিষয় নিয়ে মাদৃশ অর্বাচীন জনের অত্যধিক বাগাড়ম্বর অশোভনীয়। আমার উচিত, যোগাযোগের ফলে আমার যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হয়েছে সেইটে পাঁচজনকে শুনিয়ে দেওয়া। তারপর কে কি করল না করল তা নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই।

লেজাঁয় যক্ষ্মারোগের জন্য কি চিকিৎসা করা হয়, সে সম্বন্ধে সালঙ্কার বিবৃতি দেবার প্রয়োজন নেই। দক্ষিণ ভারতের মদনপল্লীর 'আরোগ্য-বরমে' যে-সব ব্যবস্থা আছে, সেগুলো তো আছেই তার উপর লেজাঁ এবং ডাভোসের অন্যান্য মামুলী সানাটরিয়াতে যক্ষ্মারোগ বাবদে যে-সব গবেষণা অষ্টপ্রহর করা হচ্ছে, তার ফলও মসিয়ো ভোতিয়ে অহরহ পাচ্ছেন।

সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদান। এবং তার এক প্রধান অঙ্গ নানা দেশের নানা গুণীকে লেজাঁতে নিমন্ত্রণ করে তাঁদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করা। তার জন্য ভোতিয়ের প্রতিষ্ঠানে একটি চমৎকার লেকচার থিয়েটার আছে। অন্যান্য সানাটরিয়াতে এরকম হলের প্রয়োজন হয় না।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি লেজাঁ পৌঁছবার ঠিক কয়েকদিন আগে দু-তিনজন বড় বড় পণ্ডিতের গুরু গুরু ভাষণের গুরুভোজনের ফলে ছেলেমেয়েরা ঈষৎ কাতর হয়ে পড়েছিল। তাই বোধ করি, মসিয়ো ভোতিয়ে একটা জব্বর রকমের জোলাপের ব্যবস্থা করেছিলেন।

মসিয়ো ভোতিয়ে আমাকে সোজাসুজি বললেন, 'আপনি একটা লেকচার দিন। জর্মন কিংবা ফ্রেঞ্চ, যে-কোনো ভাষায়!

আমি বললুম, 'আপনি যদিও জাতে সুইস, আপনার মাতৃভাষা ফরাসি এবং আপনি ফরাসি ঐতিহ্যে গড়ে-ওঠা বিদগ্ধজন। কাজেই আপনিও নেপোলিয়নের মত 'অসম্ভব' কথাটায় বিশ্বাস করেন না এবং তাই আপনার পক্ষে এ অনুরোধ করাটা 'অসম্ভব' নয়; আমি কিন্তু ফরাসি নয়, আমি 'অসম্ভব' কথাটা জানি এবং মানি। আমার পক্ষে বক্তৃতা দেওয়া অসম্ভব।

এগারো বৎসর হয়ে গিয়েছে, সম্পূর্ণ কথোপকথনটা আমার আজ আর মনে নেই। তবে চোখ বন্ধ করলে যে ছবিটি এখনো মনের ভিতর দেখতে পাই, তাতে আছে—এক

www.BanglaBook.org

বিরাট ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন যেন আমার দিকে দু'বাহু বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে আর আমি ক্রমেই পিছু হটে হটে শেষটায় দেয়ালের সঙ্গে মিশে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি। আর পিছু হটবার জায়গা নেই। ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দুহাত আমার গলা টিপে ধরেছে। হাত দুখানি বলছে, 'এতগুলো রোগীকে আপনি নিরাশ করবেন?'

আমি অস্ফুট কণ্ঠে বলেছিলুম,

'পড়েছি যবনের হাতে
খানা খেতে হবে সাথে।'

* * *

ঝট্‌পট্ ইশ্‌তিহার বেরিয়ে গেল 'ভারতীয় অমুক কাল সন্ধ্যায় লেজাঁর 'সানাতরিয়াঁ ইউনিভের্সিতের সুইসে' একখানা ভাষণ দেবেন। বিষয়...। লেজাঁর তাবৎ সানাতরিয়াঁর অধিবাসিবৃন্দকে সাদর নিমন্ত্রণ করা হচ্ছে। অর্থাৎ ভোতিয়ে সাহেবের প্রতিষ্ঠানের পাঁচজন তো আসবেনই, অন্যান্য সানাতরিয়াঁর আরো বহু দুশ্‌মনকে ডাকা হয়েছে আমার মুখোশ খসাবার জন্য—কিন্তু ধর্ম সাক্ষী, আমি অনেক মুখোশ পরেছি বটে, পাণ্ডিত্যের মুখোশ কখনো পরি নি।

ভোতিয়ে বললেন, 'চলুন, হলটার ব্যবস্থা কি রকম হল দেখবেন।'

লোকটা নিশ্চয়ই স্যাডিস্ট। এই যে সামনে পুজো আসছে, আমরা তো কখনো বলির মোষটাকে হাড়িকাঠ দেখিয়ে চ্যাটাস্ চ্যাটাস্ করে ঠোঁট চাটিনে।

গিয়ে দেখি মধ্যিখানে বেশ খানিকটে জায়গা ফাঁকা রেখে চতুর্দিকে চেয়ার বেঞ্চি পাতা হয়েছে। তবে কি আমাকে ওখানে ফেলে জবাই করা হবে—আমার ছট্‌ফটানির জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয়েছে? কি হবে বৃথা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে? গর্দিশ, গর্দিশ, সবই কপালের গর্দিশ।

ভোতিয়ে ব্যবস্থাটা দেখে চ্যাটাস্ চ্যাটাস্ করলেন, অদৃশ্য সাবানে হাত দুটো কচলালেন। বুঝলুম, আমার অনুমান ভুল নয়। জবাইটা জব্বর ধরনেরই হবে।

ফ্রম থর্ন টু থর্ন অর্থাৎ কাঁটায় কাঁটায় সাতটায় ভোতিয়ে আমাকে সেই হলে নিয়ে ঢোকালেন।

দেখি ফাঁকা জায়গাটা ভরে গিয়েছে বিস্তর হুইল-চেয়ারে। যে-সব রোগীর পায়ের হাড়ে যক্ষ্মা অথবা যাদের নড়াচড়া করা বারণ, তাদের আনা হয়েছে হুইল-চেয়ারে করে। জন দুই শুয়ে আছে লম্বা লম্বা কৌচ সোফায়। পরে জানলুম, যারা নিতান্তই খাট ছাড়তে পারে না তাদের জন্য ঘরে ঘরে 'ইয়ার ফোনে'র ব্যবস্থা করা হয়েছে।

একজন দেখি হুইল-চেয়ারে বসে পাইপ টানছে। তখন আমার গায়ে ঘি মালিস করা হচ্ছে—অর্থাৎ কে যেন যা-তা আবোল-তাবোল বকে আমার পরিচয় দিচ্ছে। ভোতিয়ে আমার পাশে বসে—পাছে আমি শেষমুহূর্তে পালাবার চেষ্টা করি। কানে কানে জিজ্ঞেস করলুম, 'পাইপ সিগরেট খাওয়া যক্ষ্মারোগীদের বারণ নয়?' ভোতিয়ে বললেন, 'ভিতরে তামাক না থাকলে নিশ্চয়ই বারণ নয়।' আমি বললুম, 'অর্থাৎ?' অর্থাৎ বেচারীর যক্ষ্মা হওয়ার পূর্বে সে দিনরাত পাইপ টানত। অভ্যাসটা সম্পূর্ণ ছাড়তে পারে নি বলে এমন খালি-পাইপ কামড়ায়। ধুঁয়ো বেরুচ্ছে না বলে দাঁত কিড়িমিড়ি খায়, আর হরেদরে প্রতি মাসে গোটা সাতেক ভাঙে। কিন্তু ছেলেটা পাইপ বাবদে জউরি। "ব্রায়ার" ছাড়া অন্য

www.BanglaBook.org

কোনো পাইপ চিবোতে রাজী হয় না।'

আপনি ভাবছেন, শ্রোতারা যক্ষ্মারোগী, তাই তাদের বিবর্ণ বিশীর্ণ মুখচোখ। আদপেই না। আপেলের মত লাল গাল প্রায় সব্বায়ের, চোখে মুখে উৎসাহ আর উত্তেজনা। যার দিকে তাকাই সে-ই যেন আমায় হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে নিচ্ছে, সবাই যেন বলছে, 'কি ভয় তোমার? এত দূর দেশ থেকে এসেছো, যা-ই বলো না কেন আমরা কান পেতে শুনবো।'

তবু আমি মনে মনে গুরুদেবকে স্মরণ করলুম আমাকে ত্রাণ করার জন্য।

তারপর কি হল?

তারপর কি হল? ভয়ে আমার হাত-পা পেটের ভিতর সেঁধিয়ে গিয়েছে; আর আজ যদি আপনাদের কাছে স্বীকারও করি যে তারা বক্তৃতা-শেষে আমার দিকে পচা ডিম আর পচা টমাটো ছুঁড়েছিল, তাহলেও আপনাদের চারখানা হাত গজাবে না।

আমি কি বলেছিলুম?

সে বকবকানি আপনারা তো প্রতি হপ্তায় শোনেন। নূতন করে বলে আর কি লাভ?

ইস্কিলাস—শেলি—স্পিটলার

বিদ্রোহী মানুষকে সমাজের কড়া বাঁধন মেনে নেবার জন্য গ্রীক নাট্যকার ইস্কিলাস যে নাটকখানি লেখেন তার নাম প্রমিথিয়ুস বাউন্ড—শৃঙ্খলবদ্ধ প্রমিথিয়ুস। ইস্কিলাস ইচ্ছে করেই নাটকের পাত্র-পাত্রী দেবসমাজ থেকে বেছে নিয়েছিলেন। ভাবখানা অনেকটা এই ঃ—খুদ দেবতারাই যখন নিয়ম কানুন না মেনে চলতে পারেন না তখন তুমি আমি কোন্ ছার। নাটকের মূল গল্প হচ্ছে ঃ প্রমিথিয়ুস দেবতাদের পরম যত্নে লুকিয়ে-রাখা সাত-রাজার-ধন-মাণিক অগ্নি জিনিসটি চুরি করে মানুষের হাতে তুলে ধরেন, তাই দিয়ে মানবসভ্যতা গড়ে ওঠে। দেবরাজ জুপিটার ভয়ঙ্কর চটে গিয়ে প্রমিথিয়ুসকে পাহাড়ের গায়ে পেরেক পুঁতে বেঁধে রাখলেন, শকুনি দিয়ে বুকের কলিজা, চোখের পাতা খাওয়ালেন, যাতে করে প্রমিথিয়ুস আপন পাপ স্বীকার করে সোজা রাস্তায় চলেন। প্রমিথিয়ুস সে নিপীড়ন সহ্য না করতে পেরে শেষটায় হার মানলেন। জুপিটার খুশি, ইস্কিলাস আরো বেশি খুশি—স্বর্গরাজ্য ধর্মরাজ্যে পরিণত হল।

আমাদের কবিগুরু রামায়ণে এরকম কোনো ধর্মনীতি প্রচার করতে চেয়েছিলেন কি না জানিনে কিন্তু সেখানেও রাবণকে শেষ পর্যন্ত হার মানতে হয়েছিল।

তারপর প্রায় দু'হাজার বছর কেটে গেল। দেবতাদের হুঙ্কারের ভয়ে কি গ্রীস, কি ভারতবর্ষ কেউই প্রমিথিয়ুসের মত তাঁদের সামনে মাথা খাড়া করে দাঁড়াতে সাহস পেল না। কিন্তু তবু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, এই দু'হাজার বৎসর ধরে যাদের বুকের কলিজা, চোখের পাতা খাওয়ানো হল, তারা কি সব সময়ই ভিতরে বাইরে দু'দিকেই আপন 'পাপ' স্বীকার করে নিয়েছিল? তাদের ভিতর কি এমন কেউ ছিল না যে বাইরে ক্ষমা চেয়েছে হয়ত, কিন্তু ভিতরে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে মরেছে যে দেবতার অনুশাসনই চিরন্তন ধর্ম নয় ঃ যেখানে নিপীড়ন দিয়ে ক্ষমা-ভিক্ষা বের করতে হয় সেখানে নিশ্চয়ই কোনো দুর্বলতা,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোনো ত্রুটি লুকানো রয়েছে।

এই কথাটি জোর গলায় বলবার মত সাহস প্রথম দেখালেন ইংরেজ কবি শেলি। তখনকার দিনে রূঢ়ার্থে ভগবান বলতে যা বোঝাত শেলি সে পুরুষকে স্বীকার করলেন, আর সেই ভগবানের নামে গড়া তখনকার দিনের সমাজের আইন-কানুন ভাঙতে কসুর করলেন না। ভগবানের পুলিশমেন অর্থাৎ পাদ্রী পুরুতরা তখন শেলির পিছনে জুপিটারের মতনই শকুনি লাগিয়ে দিলে ঃ শেলির অনেকখানি কলিজা খাওয়ানো হয়, শেলি অসহ্য যন্ত্রণায় বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করলেন, শেলিরও চোখের পাতার অনেকখানি শকুনির পেটে গিয়েছিল। কিন্তু তবু শেলি হার মানেন নি।

এবং সেই না-মানা অজরামর রূপ নিয়ে বেরল তাঁর নাট্যকাব্য 'প্রমিথিয়ুস আনবাউন্ড'—মুক্ত প্রমিথিয়ুস। শুনেছি, এক জাপানী চিত্রকর নাকি তাঁর বুকের জখমের রক্ত দিয়ে তুলি ভিজিয়ে ভিজিয়ে ছবি আঁকতেন বলে তাঁর ছবি সমস্ত জাপানের চিত্ত জয় করতে সমর্থ হয়েছিল। হয়ত রূপক, হয়ত সত্য; কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, শেলির প্রমিথিয়ুস নাট্য বুকের রক্ত দিয়ে আঁকা। অত্যাচার-জর্জরিত মানবাত্মার তীক্ষ্ণতম চিৎকার, ধর্ম-প্রতিষ্ঠান সমাজবিধির বিরুদ্ধে মানবের গভীরতম হুঙ্কার এ কাব্যে যে রূপ, যে রস পেয়েছে তার সঙ্গে তুলনা দেবার মত দ্বিতীয় কাব্য তো সহজে খুঁজে পাইনে।

(আর পাঁচজন হয়ত স্বীকার করবেন না, কিন্তু আমার মনে হয় মধুসূদনের রাবণ চরিত্রে যেন আমি খানিকটা সেই সুর শুনতে পাই। কিন্তু হিন্দু সমাজ তো মধুসূদনের উপর কোনো অত্যাচার করে নি—তাঁর তুলনায় হিন্দু ঈশ্বরচন্দ্রকে তো অনেক বেশি কটুবাক্য শুনতে হয়েছে। তখনকার দিনের কলকাতার বিদগ্ধ ইতর কোনো সমাজই তো মধুসূদনের পিছনে শকুনির পাল চালিয়ে দেয় নি। তবু হয়তো হৃদ্যতার অভাব দেখতে পেয়েছিলেন এবং হয়তো মনে মনে আপন সনাতন ধর্ম বর্জন সম্বন্ধে ঈষৎ বিবেকদংশনে কাতর হয়েছিলেন। তাই বোধ হয় তিনি অন্য চরিত্র না নিয়ে রাবণকে বেছে নিয়েছিলেন, অর্থাৎ রাবণের যে গোড়ার দিকে খানিকটা দোষ আছে একথা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাই হয়ত প্রমিথিয়ুস ও রাবণ এক পাত্র নয়। শেলির প্রমিথিয়ুস বলে, আমি কোন দোষ করিনি। মধুসূদনের রাবণ বলে, 'একবার দোষ করেছিলুম বলেই কি আমাকে বিনষ্ট করার জন্য দেবনরবানর সবাই একজোট হয়ে সর্ব ধর্ম সর্ব ক্ষাত্রনীতি বিসর্জন দেবে?')

তারপর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ধর্মের বাঁধন ঢিলে হয়ে গেল, এমন কি বড় বড় শহরে সমাজের তিরস্কারও গাড়িঘোড়ার শব্দের নীচে চাপা পড়ে গেল। প্যারিস তো এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছল যে, সেখানে যে শুধু সমস্ত পৃথিবীর মুক্তিকামী নর-নারী সম্মিলিত হল তাই নয়, আধা-পাগল বদ্ধপাগল এমন সব চিৎকার কলাবৎকে প্যারিস সয়ে নিল যাঁরা আপন দেশে থাকলে আর কিছু না হোক অন্তত পাগলা গারদের ভিতর জীবনের বেশির ভাগ কাটাতেন।

কিন্তু এ সব মুক্তির বদলে মানুষ তখন আরেক দেবতার বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে। অর্থের এবং সঙ্ঘের অত্যাচার।

না খেয়ে মানুষ যে পূর্বে কখনো মরে নি একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু এবারে কলকারখানার জোরে, মানুষের পয়সা কামাবার হাতিয়ার কেড়ে নিয়ে যে প্রতিষ্ঠান যে সঙ্ঘ গড়ে উঠল তার অত্যাচার দেশ-বিদেশে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে লাগল। লুণ্ঠন যে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আগে ছিল না তা নয়, কিন্তু এখন সাম্রাজ্যবাদের নামে যে শোষণ আরম্ভ হল তার শেষ নেই। চেঙ্গিস নাদির আট্টিলা আসত দু'দিনের তরে; কিন্তু এখন যে পাদ্রী কামান রাজপুরুষ বণিক পুলিশ আসতে লাগল তার আর অন্ত নেই। তাদের শোষণ দিনযামিনী, সায়ং প্রাতঃ, শিশির বসন্ত, যুগ যুগ ধরে। জমিদার ব্যারন যে সুন্দরী ধরে নিয়ে যেত সে তো অজানা নয়। কিন্তু এখন বড় বড় দোকানের চাকরিতে তরুণীদের আর নিস্তার নেই। বড় সায়েবদের বিলাস লালসায় যে নারীমেধ যজ্ঞ জ্বলে তার ইন্ধন অষ্টপ্রহর দেদীপ্যমান রাখবার জন্য আর কোনো তরুণীর বসনভূষণ বাঁচিয়ে রাখবার উপায় নেই।

এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে মহাকাব্য রচনা করলেন সুইট্‌জারল্যান্ডের মহাপুরুষ কার্ল স্পিটলার। সে কাব্যের নাম প্রমেটয়েস উন্ট এপিমেটয়েস (Prometheus und Epimetheus)। এ কাব্যের সঙ্গে তুলনা দিতে পারি এমন আর কোনো কাব্য আমার জানা নেই। গুরুগম্ভীর গদ্যচ্ছন্দে লেখা সে কাব্য, পদ্যের সর্বোচ্চ শিখরে জ্যোতিষ্মান ভাস্করের ন্যায় সে গদ্য। এ গদ্য ছন্দ পাই উপনিষদ, বাইবেল এবং কুরানে। এবং উপনিষদ, বাইবেল, কুরানের অনুবাদ যে-রকম অসম্ভব, এ কাব্যের অনুবাদও মানুষের সাধ্যের বাইরে। এ-কাব্য রচনা করে স্পিটলার নোবেল প্রাইজ পান, তৎসত্ত্বেও এখন পর্যন্ত এ-কাব্যের অনুবাদ হয় নি।

স্পিটলার যে অত্যাচার অবিচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রমিথিয়ুসের কণ্ঠে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন, সে অত্যাচার ইতিমধ্যে আরও রুদ্ররূপ ধারণ করেছে। কলকাতার বুকের উপরই তার নব নব তাণ্ডব আমরা দেখতে পাচ্ছি। মানুষের গড়া দুর্ভিক্ষ, দৈনন্দিন অনশন, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, দৈন্যের দায়ে দেহ বিক্রয়, নিরপরাধের উপর গুলিবর্ষণ, সাম্প্রদায়িক বর্বরতা, মানুষের প্রাণ নিয়ে বিবেকহীন রাজনৈতিকদের ছিনিমিনি খেলা, অরক্ষণীয়ার অন্ধকার ভবিষ্যৎ, অর্থের জোরে সমাজের বুকের উপরে বসে অন্নাভাবে মৃত্যুভয়ে কাতর পিতামাতার সম্মুখে তাদের কুলকামিনীর সর্বনাশ, ভ্রূণহত্যা—সবই তো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

কিন্তু কই সে বাঙালি স্পিটলার??

মোপাসাঁ—চেখফ্‌—রবীন্দ্রনাথ

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অদ্ভুত যোগাযোগের ফলে অনেক তথ্য ও অনেক প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে। শুনেছি র‍্যোন্‌ট্‌গেনের রঞ্জনরশ্মি আবিষ্কার, ফ্যারাডের বৈদ্যুতিক শক্তির আবিষ্কার এ রকম যোগাযোগের ফল। সাহিত্যে এ রকম ধারা বড় একটা হয় না। শুধু ছোট গল্পের বেলা তাই হয়েছে। কিন্তু একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, র‍্যোন্‌ট্‌গেন ও ফ্যারাডে যদি বহু বৎসর ধরে আপন আপন জ্ঞানচর্চায় নিবিষ্ট না থাকতেন, তাহলে যে-সব যোগাযোগের ফলে রঞ্জনরশ্মি ও বৈদ্যুতিক শক্তি আবিষ্কার হল সে সব যোগাযোগ বন্ধ্যাই থেকে যেত। ছোট গল্পের বেলাও তাই—মোপাসাঁ যদি সাহিত্য সাধনায় পূর্বের থেকেই নিযুক্ত না থাকতেন, তবে ফ্লবেরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ সম্পূর্ণ নিষ্ফল হত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফ্লবের যে কি অদ্ভুত সুন্দর ফরাসি লিখে গিয়েছেন, তার বর্ণনা দিতে পারেন শুধু ফ্লবেরই। ভলতেরের পরেই ফ্লবেরের নাম করতে হয় এবং এঁদের মাঝখানের যে-কোনো দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখক পেলেও বাংলা ভাষা বর্তে যাবে। আর ফ্লবেরের আশা শিকেয় তুলে রাখাই ভালো, তাঁর মত লেখক জন্মাবার পূর্বে এদেশের গঙ্গায় বিস্তর চড়া পড়ে যাবে। তার কারণ এ নয় যে আমাদের দেশে শক্তিমান লেখকের অভাব, বেদনাটা সেখানে নয়, আসল বেদনা হচ্ছে আমাদের লেখকেরা খাটতে রাজী নন। ফ্লবেরের লেখা পড়ার সময় বোঝাই যায় না তার পিছনে কি অসম্ভব পরিশ্রম রয়েছে, কারণ সে পরিশ্রমের উপরে ফ্লবেরকে আরো পরিশ্রম করতে হয়েছে গোড়ার পরিশ্রমটা ঢাকবার জন্য। ভলতেরের সরল স্বচ্ছ শৈলীর প্রশংসা করলে তিনি নাকি করুণ হাসি হেসে বলতেন, 'ফরাসি জাতটা কি আর জানে তাদের কষ্ট বাঁচাবার জন্য আমি নিজে কতটা কষ্ট স্বীকার করি?' ফ্লবের এ কথাটা বললে মানাতো আরো বেশি—তিনি তো শেষটায় সে পরিশ্রম সইতে না পেরে লেখাই ছেড়ে দিলেন।

ধুয়ে মুছে কেচে ইস্ত্রি করে পাট না করা পর্যন্ত ফ্লবের ভাষাকে রেহাই দিতেন না। তাই যখন শাগরেদ মোপাসাঁর ভিতর ফ্লবের গুণের সন্ধান পেলেন তখন মোপাসাঁর লেখার উপর নির্মম র‍্যাঁদা চালাতে আরম্ভ করলেন। আর কী সব অদ্ভুত ফরমায়েশ—দশ লাইনে করুণ বর্ণনা লেখো, পনেরো লাইনে বীররস বাৎলাও, এটা ছিঁড়ে ফেলে দাও, ওটা ছাপিয়ো না—অর্থাৎ ফ্লবের শাগরেদ মোপাসাঁকে ধুয়ে মুছে কেচে তৈরি করে প্রায় পকেটস্থ করে ফেলেছেন, এমন সময় তাঁর ডাক পড়লো সেই লোক থেকে যেখানে রসসৃষ্টি করা যায় বিনা পরিশ্রমে—স্বর্গলোকে পরিশ্রম নেই বলেই মর্ত্যলোকের সৃষ্টি হয়েছিল এ-কথা বাইবেলে লেখা আছে।

এই তালিমের ফলেই ছোট গল্পের সৃষ্টি? মোপাসাঁর পূর্বের লেখকরা কি বর্ণনা, কি চরিত্র-বিশ্লেষণ, কি ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত সব কিছুই লিখতেন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। ছোট গল্প লিখতে হলে যে বাকসংযম দরকার, বিস্তর কথা অল্প কথায় প্রকাশ করবার যে কেরামতির প্রয়োজন, প্রকাণ্ড আলোটার চতুর্দিক কালো কাপড়ে ঢেকে তার সামনের দিকে পুরু কাঁচ লাগালে যে রশ্মির তীব্রতা বাড়ে সেই জ্ঞান মোপাসাঁর পূর্বে কারো ছিল না, অথবা তাই নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন কেউ অনুভব করেন নি। সর্বাঙ্গ বেনারসীতে ঢেকে মুখ থেকে শুধু ঘোমটা সরিয়ে ফিক করে এক ঝলক হেসে সুন্দরী চলে গেল—মোপাঁসার পূর্বে ফরাসিরা যেন এ-অভিজ্ঞতার কল্পনাই করতে পারেন নি। তাঁদের কায়দাটা কি ছিল সে কথা ফেনিয়ে বলার সাহস আমার নেই—কলকাতা এ সব বাবদে প্যারিসের মত 'উদার' নয়।

এ সব নিছক যোগাযোগের কথা। মোপাসাঁর আপন কৃতিত্ব তবে কোন্‌খানে? গল্পটাকে বিশেষ এক জায়গায় এনে অকস্মাৎ ছেড়ে দেওয়া, এবং সেই অকস্মাৎ ছেড়ে দেওয়াটাই গল্পের সম্পূর্ণতাকে প্রকাশ করল—ইংরিজিতে যাকে বলে 'ক্লাইমেক্‌স্'—এইখানে মোপাসাঁর বিশেষত্ব। মোপাসাঁর পূর্বের ঔপন্যাসিকেরা তাবৎ নায়ক নায়িকাদের জন্য একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত না করে উপন্যাস বন্ধ করতেন না। নটে গাছটি তাঁরা এমনি কায়দায় মুড়তেন যে, পাঠকের মনে আর কোনো সন্দেহ থাকত না যে এদের জীবনে আর কিছু ঘটতে পারে না, এরা এখন থেকে 'পুত্র কন্যা লাভ করতঃ পরমানন্দে জীবন যাপন করিল' অথবা 'অনুতাপের তুষানলে তিলে তিলে দগ্ধ হইতে লাগিল'।

www.BanglaBook.org

ক্লাইমেকস্ আবিষ্কার মোপাসাঁর একান্ত নিজস্ব।

মোপাসাঁর পর বিস্তর লেখক এস্তার ছোট গল্প লিখেছেন, কেউ কেউ মোপাসাঁর চেয়েও ভালো লিখেছেন; কিন্তু অস্বীকার করবার উপায় নেই যে সব গল্পই মোপাসাঁর ছাঁচে ঢেলে গড়া। মোপাসাঁ যে কাঠামোটি গড়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই কাঠামোটিতে কোন ফেরফার করার সাহস কারোরই হল না।

চেখফ্ই (Chekhov, Tschehoff ইত্যাদি নানা বানানে নামটি লেখা হয়, কিন্তু উচ্চারণ 'চেখফ্') প্রথম এ কাঠামোতে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে ক্লাইমেক্স্ বাদ দিয়েও সরেস ছোট গল্প লেখা যায়। শুধু তাই নয়, মানুষের দৈনন্দিন জীবনে খুব কম ঘটনাই এ রকম ধারা 'বুমস্-প্যাঙ' করে সশব্দে ক্লাইমেক্সে এসে অরকেস্ট্রা শেষ করে। চেখফের অনেক গল্প ক্লাইমেক্সে শেষ হয় সত্য; কিন্তু সেটা গল্পের নিজস্ব প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। সব গল্পেই যদি পাঠক ক্লাইমেক্সের প্রত্যাশা করে করে পড়ে, তবে সেগুলো একঘেয়ে হয়ে যেতে বাধ্য, সব কবিতাই তো আর সনেট নয় যে শেষের দুই ছত্রে কবিতার সারাংশ জোর গলায় বলে দেওয়া হবে। তাই চেখফের বহু ক্লাইমেক্স্-বর্জিত গল্পের ভারকেন্দ্র এমন ভাবে সমস্ত গল্পে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে যে, পাঠক রসিয়ে রসিয়ে নিশ্চিন্ত মনে গল্পগুলো পড়তে পারে—ক্লাইমেক্সের আচমকা ইলেকট্রিক শকের জন্য নাক কান খাড়া করে থাকতে হয় না।

আর ভাষার দিক দিয়ে চেখফ্ মোপাসাঁকেও ছাড়িয়ে যান। টলস্টয় ফ্লবেরের চেয়ে অনেক বড় স্রষ্টা এবং চেখফ্ যদিও টলস্টয়ের শিষ্য নন তবু তিনি বহু বৎসর ধরে টলস্টয়ের সাহচর্য ও উপদেশ পেয়েছিলেন। টলস্টয় স্বয়ং গর্কির চেয়ে চেখফ্কে পছন্দ করতেন বেশি—তিনি নাকি একবার গর্কিকে বলেছিলেন, চেখফ্ মেয়ে হলে তিনি তাঁর কাছে নিশ্চয়ই বিয়ের প্রস্তাব পাড়তেন।

রবীন্দ্রনাথের গোড়ার দিকের গল্পগুলি বড় ঢিলে। প্রমাণ করা কঠিন, কিন্তু আমার মনে হয়, এই ঢিলে ভাব তাঁর প্রথম কাটল মোপাসাঁর গল্পের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর। তখন থেকে রবীন্দ্রনাথের গল্পে মোপাসাঁরই মত ঠাস বুনুনি দেখতে পাওয়া যায়, আর কাঠামোটাও হরেদরে মোপাসাঁর। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত লেখক আপনি বৈশিষ্ট্য বর্জন করে লিখবেন—তা সে কাঁচা লেখাই হোক আর পাকা লেখাই হোক—সে কথা অনায়াসে অস্বীকার করা যায়। রবীন্দ্রনাথের গল্প মোপাসাঁ চেখফ্ দুজনের গল্পকেই হার মানায় তার গীতিরস দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গল্পটি কেমন যেন সঙ্গীতের কোনো এক রাগে বাঁধা। এখানে সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল রয়েছে। মৃৎশকটিকা, শকুন্তলা, রত্নাবলী নাটক গ্রীক কাঠামোতে ফেলা যায় সত্য; কিন্তু এগুলিতে যে গীতিরস রয়েছে, গ্রীক নাটকে তো নেই—তাই আমরা সংস্কৃত নাটকে যে আনন্দ পাই, গ্রীক নাটকে সেটি পাই নে।

রবীন্দ্রনাথ বিশেষ বয়সে শেলি, কীটসের প্রভাবে পড়েছিলেন সত্য, কিন্তু তার চেয়েও বড় সত্য, রবীন্দ্রনাথ সে প্রভাব একদিন সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন। গল্পের বেলাতেও রবীন্দ্রনাথ একদিন মোপাসাঁর প্রভাব ঝেড়ে ফেলে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শেষের দিকের গল্পগুলিতে কি যেন এক অনির্বচনীয়ের প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। 'মিস্টিক' কথাটাতে সব কিছুই ঢাকা পড়ে যায় বলে শব্দটা ব্যবহার করতে বাধো বাধো ঠেকে; কিন্তু মানব-চরিত্রের আলো-অন্ধকারের আবছায়া আঁকুবাঁকু, মানব-

www.BanglaBook.org

চরিত্রের যে দিক দৈনন্দিন জীবনে আমাদের চোখে পড়ে না, মানুষকে যে সব সময় তার বাক্য আর আচরণ দিয়েই চেনা যায় না মানুষের সেই দুর্জ্ঞেয় অন্তঃস্তল রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করেছিলেন আধা-আলোরই ভাষা এবং ভঙ্গি দিয়ে প্রকাশ করতে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ একা, মোপাসাঁ চেখফের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র সেখানে সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।

অনুবাদ সাহিত্য

বাঙলা সাহিত্যের মত অদ্ভুত এবং বেতালা সাহিত্য পৃথিবীতে কমই আছে। রবীন্দ্রনাথ গান আর কবিতা দিয়ে যে বাঙলা গীতিসাহিত্য রচে গিয়েছেন তার কাছে এসে দাঁড়াতে পারে, এমন গীতিসাহিত্য পৃথিবীতে আর নেই বললেও চলে। মেঘদূতের মত গীতিকাব্য পৃথিবীতে নেই—রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান অনেক স্থলে কালিদাসের মেঘদূতকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতিকাব্য দিয়ে বাঙলা সাহিত্যকে যেন একসঙ্গে তেইশটা ডবল প্রমোশন পাইয়ে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পও বিশ্বসাহিত্যের যে-কোন কথাসাহিত্যের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে চলতে পারে। আরো বিস্তর অতুলনীয় সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের কলম দিয়ে বেরিয়েছে, তার উল্লেখ এখানে অবান্তর।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সৃষ্টিকার। তাঁর পক্ষে অন্য লেখকের রচনা অনুবাদ করবার কোন প্রয়োজন ছিল না। এমন কি এ-কথা বললে ভুল বলা হবে না, যেটুকু অনুবাদ তিনি করেছেন তাতে সময় নষ্ট হয়েছে মাত্র। কদমফুলের কেশর ছাড়িয়ে লাট্টু বানিয়ে ছেলেরা জিনিসটাকে কাজে লাগায় বটে, তবু নিষ্কর্মা কদম-ফুলেরই দাম বেশি।

অনুবাদ-চর্চা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বেশি সময় নষ্ট করেন নি বলেই বোধ করি বাঙলা সাহিত্য অনুবাদের দিক দিয়ে এত হীন। তাই বলছিলুম বাঙলা সাহিত্য বেতালা সাহিত্য, গীতিকাব্যে যেন যে পক্ষীরাজের পিঠে চড়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় উড়ে বেড়ায় আর অনুবাদ সাহিত্যের বেলা সে যেন এদোঁ কুয়োর ভেতরে খাবি খায়।

অথচ ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে বাঙলা ভাষায় যে অনুবাদ সাহিত্যের রচনা দানা বাঁধতে আরম্ভ করে, তার তুলনায় আজকের দিনে তাকিয়ে দেখি সে দানা দিয়ে মিঠাই মণ্ডা তো হলই না, তলানির চিনিটুকু দিয়ে আজ যেন সাহিত্য-সভায় পানসে শরবৎ বিলানো হচ্ছে। গীতকাব্যে যে সাহিত্য তেইশটে ডবল প্রমোশন পেয়েছিল, অনুবাদে সেই সাহিত্যকেই বাহান্নটা ডিগ্রেডেশন দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অনুবাদ করতে হলে বিদেশী ভাষা জানার প্রয়োজন। আজকের দিনে কলকাতা শহরে শুধু ফরাসি বই বিক্রয়ের জন্যে দোকান হয়েছে—সত্তর বৎসর আগে, ছিল না।—তবু আমাদের অনুবাদ-সাহিত্যের যেটুকু শরবৎ আজ বিলানো হচ্ছে তার আগাগোড়া ইংরিজি থেকে।

অথচ ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ফরাসি সাহিত্যের উত্তম রস-সৃষ্টি বাঙলায় অনুবাদ করতে আরম্ভ করেন। বিংশ শতকেও তিনি এই কর্মে লিপ্ত

www.BanglaBook.org

এবং মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত তিনি একাজে ক্ষান্ত দেন নি। ঠিক স্মরণ নেই, তবে খুব সম্ভব লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের বিরাট মারাঠী গীতার অনুবাদই তাঁর শেষ দান।

আশ্চর্য বোধ হয় যে, বাঙালি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভুলে গিয়েছে। সংস্কৃত থেকে তিনি যে সব নাটক অনুবাদ করেছিলেন সেগুলোর কথা আজ থাক। উপস্থিত পিয়ের লোতির একখানা বইয়ের কথা স্মরণ করছি।

পিয়ের লোতির মত লেখক পৃথিবীতে কমই জন্মেছেন। শুদ্ধমাত্র শব্দের জোরে, সম্পূর্ণ অজানা, অদেখা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা গড়ে তোলা যে কি কঠিন কর্ম, তা শুধু তাঁরাই বুঝতে পারবেন, যাঁরা কখনো এ-চেষ্টায় দণ্ডমাত্র কালক্ষেপ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করার মত দুর্মতি কোনো বাঙালির হওয়ার কথা নয়, তাই বলতে আপত্তি নেই যে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বাঙালির অদেখা বা অল্প দেখা জিনিস নিয়ে কাব্য সৃষ্টি করাটা পছন্দ করতেন না। সাধারণ বাঙালির সঙ্গে পাহাড় এবং সমুদ্রের পরিচয় অতি কম—তাই বোধ করি রবীন্দ্রনাথ এ দুটো জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন যতদূর সম্ভব কম। শীতপ্রধান দেশের পাতা-ঝরা হেমন্ত ঋতু, শুভ্রমল্লিকা বর্ষণের মত বরফ-পাত যে কি দর্শনীয় বস্তু, সিনেমা থেকেও তার খানিকটে আন্দাজ করা যায়,—রবীন্দ্রনাথ এসব দেখেছেন, উপভোগ করেছেন বহুবার; কিন্তু কোথাও তার বর্ণনা করেছেন বলে তো মনে পড়ে না।

পিয়ের লোতির বৈশিষ্ট্য এইখানেই। তিনি জাপান, তুর্কী, আইসল্যান্ড এবং আরও নানাদেশের যে সব ছবি ফরাসি ভাষায় এঁকে দিয়ে গিয়েছেন, সে-সব পড়ে মনে হয় ভাষার সঙ্গীত, বর্ণ, গন্ধ একসঙ্গে মিলে গিয়ে কি করে এইরূপ রসবস্তু নির্মাণ হতে পারে! মনে হয়, একসঙ্গে যেন পঞ্চেন্দ্রিয় রস গ্রহণ করছে, মনে হয় কারো কলম যদি নিতান্ত অরসিক জনকে দেশ-কাল-পাত্র ভোলাতে সক্ষম হয়, তবে সে কলম পিয়ের লোতির।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লোতি যে বইখানা লিখেছেন তার নাম 'ল্যাঁদ, সাঁজাংলে'। অর্থাৎ 'ভারতবর্ষ, কিন্তু ইংরেজকে বাদ দিয়ে'। অর্থাৎ তিনি ভারতবর্ষের ছবি আঁকতে বসেছেন কিন্তু মনস্থির করে ফেলেছেন যে, এ-দেশের ইংরেজদের সম্বন্ধে তিনি কিছু বলবেন না।

স্বীকার করি, 'ইংরেজ-বর্জিত-ভারত' ('বসুমতী' কর্তৃক প্রকাশিত জ্যোতিরিন্দ্র গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য) 'ল্যাঁদ, সাঁজাংলে'র ঠিক অনুবাদ নয়, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদশাঙ্কে ঐ একটি মাত্র কলঙ্ক। বাদবাকি পুস্তকখানা অনুবাদ-সাহিত্যে যে কি আশ্চর্য কুতুব-মিনার, তার বর্ণনা দিতে হলে লোতির কলমের প্রয়োজন।

ত্রিবাঙ্কুরে লোতি ভারতীয় সঙ্গীত শুনে বিস্ময়ের উচ্ছ্বাসে সে-সঙ্গীতের বর্ণনাতে কত না স্বর কত না ধ্বনি মিশিয়ে দিয়েছেন; জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাংলা সে-সব সে-ধ্বনি অবিকল বাজিয়ে চলেছে। মাদ্রাজে লোতি ভরত-নাট্যম দেখে ভাবাবেগে অভিভূত হয়ে মানবহৃদয়ের যত প্রকারের আশা-নৈরাশ্য, ঘৃণা-ক্রোধ, আকুলি-বিকুলি সম্ভব হতে পারে, সব কটি প্রকাশ করেছেন কখনো গম্ভীর মেঘমন্দ্রে, কখনো মধুর বীণাঝঙ্কারে, কখনো শব্দ সমন্বয়ের চটুল নৃত্যে—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাংলা-বীণা যেন প্রতি মন্দ্র, প্রতি ঝঙ্কার, প্রতি ব্যঞ্জনা ঠিক সেই সুরে রসসৃষ্টি করেছে। ইলোরার স্থাপত্য-ভাস্কর্য লোতিকে বিহ্বল ভয়াতুর করে ফেলেছে, অনির্বচনীয় চিরন্তন সত্তার রসস্বরূপে স্বপ্রকাশ দেখিয়ে—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখনী লোতির বিহ্বল ভয়ার্ত হৃদয়ের প্রতি কম্পন প্রতি স্পন্দন ধরে নিয়ে যেন বীণাযন্ত্রের চিকণ কাজের

www.BanglaBook.org

সঙ্গে মৃদঙ্গের নিপুণ বোল মিশিয়ে দিয়েছে।

এরূপ অদ্ভুত সঙ্গত দিয়ে বাঙলা সাহিত্যের মজলিসে যে অনুবাদ সাহিত্য আরম্ভ হয়েছিল, আজ তার সমাপ্তি দেখতে পাচ্ছি সস্তা, রগরগে ইংরিজি উপন্যাসের অনুবাদে। খেমটা আর 'ফিলমি গানের' সঙ্গে তার মিতালি।

'কলচর'

'পরশুরামে'র কেদার চাটুজ্যেকে বাঘ তাড়া করেছে, ভূত ভয় দেখিয়েছে, হনুমান দাঁত খিঁচিয়েছে, পুলিশ কোর্টের উকিল জেরা করেছে, তবু তিনি ভয় পান নি কিন্তু শেষটায় এক আমেরিকান মেমসায়েবের পাল্লায় পড়ে হিমসিম খেয়ে যান। কেদার চাটুজ্যের প্রতি আমার অগাধ ভক্তি কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাকে সবিনয় বলতে হবে তার তুলনায় আমি দেশভ্রমণ করেছি অনেক বেশি, কাজেই আমাকে ভয় দেখিয়েছে আরো অনেক বেশি ভূত, অদ্ভুত, নাৎসী, কম্যুনিস্ট, মিশনারী, কলাবৎ, সম্পাদক, দারোয়ান ইত্যাদি কিন্তু তবু যদি তামা-তুলসী-গঙ্গাজল নিয়ে শপথ কাটতে হয়, তবে বলব আমি বেশি ভয় পেয়েছি 'কলচরে'র সামনে।

বাঙলা দেশে 'কলচর' আছে কিনা জানিনে; যদি বা থাকে তবে আমি নিজে বাঙালি বলে সে জিনিস এড়িয়ে যাবার অন্ধিসন্ধি জানি। কিন্তু বিদেশ-বিভুঁইয়ে হঠাৎ বেমক্কা এ জিনিসের মুখোমুখি হয়ে পড়লে যে কী দারুণ নাভিশ্বাস ওঠে তার বর্ণনা দেবার মত ভাষা এবং শৈলী আমার পেটে নেই।

পশ্চিম ভারতে একবার এই 'কলচর' অথবা 'কলচরড্' সমাজের পাল্লায় পড়েছিলুম। তার মর্মন্তুদ কাহিনী নিবেদন করছি।

এক যুবতীর সঙ্গে কোনো এক চায়ের মজলিসে আলাপ হল। তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে যাবার নিমন্ত্রণ করলেন। সুন্দরী রমণী। প্রত্যাখ্যান করি কি প্রকারে? তখন যদি জানতুম তিনি আমাকে বাঙালি অতএব 'কলচরড্' ঠাউরে নিমন্ত্রণ করেছেন তাহলে ধর্ম সাক্ষী আমি কেটে পড়তুম। কারণ, আমি 'কলচরড্' নই এবং পূর্বেই বলেছি ও-জিনিসটাকে আমি বড্ড ডরাই।

সুন্দরী মোটর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই বাড়ি খুঁজে বের করার মেহন্নত থেকে রেহাই পেলুম। গাড়ি এসে এক বিপুলায়তন বাড়ির সামনে দাঁড়াল। বাড়ি বলা হয়ত ভুল হল। সংস্কৃতে খুব সম্ভব এই বস্তুকেই 'প্রাসাদ' বলে।

কিন্তু সে কী অদ্ভুত বিভীষিকা। সাঁচীর স্তূপ, অজন্তার প্রবেশদ্বার, অশোকের স্তম্ভ, মাদুরার মণ্ডপ, তাজের জালির কাজ, জামি মসজিদের মেহরাবেসক্, ভারতবর্ষের তাবৎ সৌন্দর্য সেখানে যেন এক বিরাট তাণ্ডব নৃত্য লাগিয়েছে। যে ফিরিস্তিটা দিলুম সেটা পূর্ণাবয়ব কি না জানি নে এবং এসব স্থাপত্য কলার মর্ম এ অধম জানে না সেটাও সে সবিনয় স্বীকার করে নিচ্ছে। আমি সাহিত্য নিয়ে ঈষৎ নাড়াচাড়া করি, কারণ ঐ একমাত্র জিনিসই মাস্টার অধ্যাপকেরা আমাকে স্কুল-কলেজে ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে কিছুটা শিখিয়েছেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাহিত্যের দৃষ্টিবিন্দু দিয়ে তাই যদি সে-প্রাসাদের বর্ণনা দিই তবে বলতে হবে, আমি যেন এক কবিতার সামনে দাঁড়ালুম যার প্রথম লাইন চর্যাপদী, দ্বিতীয় লাইন চণ্ডীদাসী, তৃতীয় লাইন মাইকেলী, চতুর্থ লাইন রঙ্গলালী, পঞ্চম লাইন ঠাকুরী এবং শেষ লাইন নজরুলী। জানি, আজ যদি কেউ এই সব ক'জন মহাজনের শৈলী এবং ভাষা আয়ত্ত করে কাব্য সৃষ্টি করতে পারেন তবে তিনি কি কালিদাস, কি সেক্সপীয়ার, কি গ্যেটে সর্ব যুগের সর্ব কবিরাজকে ছাড়িয়ে যেতে পারবেন। কিন্তু আমি যে বিভীষিকার সামনে দাঁড়ালুম সে তো তা নয়। এ যেন কেউ কাঁচি দিয়ে নানান কবির লেখা নিয়ে হেথা থেকে দু'ছত্র হোথা থেকে তিন পংক্তি কেটে গঁদ দিয়ে জুড়ে দিয়ে বলছে, 'পশ্য, পশ্য, কী অপূর্ব কবিতা; এ-কবিতা মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ যে-কোনো কবির লেখাকে হার মানায় কারণ এ-কবিতা দুনিয়ার তাবৎ কবির বারোয়ারী চাঁদা দিয়ে গড়া। বাঁদর হারালেও এখানে খুঁজে পাবে।'

তখনও পালাবার পথ ছিল, কিন্তু সুন্দরীর—যাক্‌গে। না পালাবার জন্য আরেকটা কারণও মজুদ ছিল। এ বিভীষিকা দেখে গাঙ্গুলি মশাই অথবা ক্রামরিস বীবী পালাবেন, কিন্তু আমি তো 'কলচরড্' নই আমি পালাব কেন?

ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছি লিফ্‌টের সামনে। অপূর্ব সে খাঁচা। এতদিন বাদে আজ আর মনে নেই কোন্ কোন্ শৈলীর ঘুষোঘুষিতে (কোলাকুলিতে নয়) সে লিফ্‌টের চারখানা কাঠের পাট নির্মিত ছিল। প্রত্যেক পাটে অতি সূক্ষ্ম নাজুক, মোলায়েম দারুশিল্প। জয়পুরের মিনা যেন সূক্ষ্মতায় তার কাছে হার মানে।

ভিতরে ঢুকলুম। তখন লক্ষ্য করলুম লিফ্‌টবয় দরজাখানা বন্ধ করল অতিশয় সন্তর্পণে—পাছে কাঠের চিকন কাজে কোনো জখম হয়। কিন্তু ফল হল এই যে লিফ্‌টে আর উড্ডীয়মান হতে চায় না। বয় ধীরে ধীরে চাপ বাড়ায় কিন্তু লিফ্‌ট নড়তে চায় না। তারপর হুস করে বলা নেই কওয়া নেই, লিফ্‌ট উপরের দিকে চলল, পক্ষীরাজের বাচ্চা ঘোড়ার পিঠে হঠাৎ জিন লাগালে সে যে-রকম ধারা আচমকা লম্ফ দিয়ে ওঠে।

তারপর দোতলায় নামবার কথা—লিফ্‌ট সেখান থামে না। থামলো গিয়ে আচম্বিতে দোতলা আর তেতলার মধ্যিখানে।

একে ত গাঁয়ের ছেলে, বয়স হওয়ার পর শহরে এসে প্রথম লিফ্‌ট দেখেছি এবং তখনকার দিনে ধুতিকুর্তা পরা থাকলে লিফ্‌ট চড়তে দিত না বলে এ ফাঁড়া থেকে প্রাণ বাঁচাতে পেরেছি, তার উপর জানি দড়াম করে দরজা বন্ধ না করলে ভালো লিফ্‌টও নড়তে চায় না এবং তার উপর দেখি এই ছোকরা চাকরি যাবার ভয়ে দরজার উপর জোর লাগাতেও রাজী হয় না। এই 'কলচরড্' লিফ্‌টটাকে জখম চোটের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আমার প্রাণটা বলি দিতে হবে নাকি?

আমি তখন হন্যে হয়ে উঠেছি। ধমক দিয়ে বললুন, 'দরজা জোরে বন্ধ করো।'

সে করে না। এই মাগ্‌গীর বাজারে প্রেমের চেয়ে চাকরি খাঁড়। প্রাণ জিনিসটা জন্মে জন্মে বিনা খরচে, বিনা মেহন্নতে পাওয়া যায়; কিন্তু চাকরির জন্য বিস্তর বেদরদ বেইজ্জতী সইতে হয়।

আমি আর কি করি? ধাক্কা দিয়ে ছোঁড়াটাকে পথ থেকে সরিয়ে দরজায় দিলুম বিপুল এক ধাক্কা। হুস করে লিফ্‌ট উঠে গেল তেতলায়। আমি দরজা খুলে নাবতে যাচ্ছি, বয় চেঁচিয়ে বললো, 'আপনি যাবেন দোতলায়, তেতলায় নয়।' আমি বললুম, 'তুমি যাও

www.BanglaBook.org

চুলোয়।' ছোকরা বাঙলা বোঝে না।

তেতলা থেকে সিঁড়ি ভেঙে নামলুম দোতলায়।

ততক্ষণে লিফ্‌টের ধড়াধড় শব্দ শুনে সুন্দরীর ভাই-বেরাদর দু'একজন সিঁড়ির কাছে জমায়েত হয়ে গিয়েছেন। আমি ছোকরার চাকরি বাঁচাবার জন্য নিজের অপরাধ স্বীকার করলুম। ওঁরা যে-রকম ভাবে আমার দিকে তাকালেন তাতে মনে হল আমি যেন তাজমহলের উপর এটম বম মেরেছি অথবা ওস্তাদ ফৈয়াজ খানের গলা কেটে ফেলেছি।

'কলচরড্' নই, তাই বলতে পারব না, 'কলচর' দেশ-কাল-পাত্র মেনে নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত হয় কি না। কিন্তু লিফ্‌টের ভিতরকার 'কলচর'কে সম্মান দেখাতে গিয়ে আমি প্রাণটা দিতে রাজী নই। তাই বলছিলুম, আমি 'কলচর' জিনিসটাকে ডরাই।

বর্ষা

কাইরোতে বছরে ক'ইঞ্চি বৃষ্টি পড়ে এতদিন বাদে সে কথা আমার আর স্মরণ নেই। আধা হতে পারে সিকিও হতে পারে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস মেঘমুক্ত নীল আকাশ দেখে দেখে আমার তো প্রথমটায় মনে হয়েছিল, এদেশে বুঝি আদপেই বৃষ্টিপাত হয় না। আর গাছপালার কী দুরবস্থা, পাতাগুলোর কী অদ্ভুত চেহারা! সাহারার ধুলো উড়ে এসে চেপে বসেছে পাতাগুলোর গায়ে—সিন্দবাদের কাঁধে যে রকম পাগলা বুড়ো চেপে বসেছিল—সে ধূলা সরানো দু-দশটা হৌজের কর্ম নয়। কাফেতে বসে বুলভারের গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে প্রায়ই ভাবতুম, এদের কপালে কি কোন প্রকারের মুক্তিস্নান নেই?

সুদানের একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হল। সে বললে, তার দেশে নাকি ষাট বছরের পর একদিন হঠাৎ কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি নেবেছিল। মেয়েরা, কাচ্চাবাচ্চারা, এমন কি গোটা কয়েক জোয়ান মদ্দরা পর্যন্ত হাউমাউ করে কান্নাকাটি জুড়েছিল, 'আকাশ টুকরো টুকরো হয়ে আমাদের ঘাড়ে ভেঙে পড়লো গো। আমরা যাব কোথায়? কিয়ামতের (মহাপ্রলয়ের) দিন এসে গেছে। সব পাপের তওবা (ক্ষমা-ভিক্ষা) মাঙবার সময় পেলুম না, সবাইকে যেতে হবে নরকে। গাঁও-বুড়োরা নাকি তখন সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, 'এতে ভয় পাবার কিছু নেই। আকাশ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছে না। এ যা নাবছে সে জিনিস জল। এর নাম মৎর্ (অর্থাৎ বৃষ্টি)।' সুদানী ছেলেটি আমায় বুঝিয়ে বললে, 'আরবী ভাষায় মৎর্ (বৃষ্টি) শব্দ আছে; কারণ আরব দেশে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়, কিন্তু সুদানে যে-আরবী ভাষা প্রচলিত সে-ভাষায় মৎর্ শব্দ কখনো ব্যবহৃত হয় নি বলে সে শব্দটি সুদানী মেয়েছেলেদের সম্পূর্ণ অজানা।'

সুদানে যাই হোক। কিন্তু একদিন যখন হঠাৎ কাইরোতে বৃষ্টি নাবল আমি তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে কাফে ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। বিরহী যক্ষ যেরকম দুই বাহু প্রসারিত করে উত্তরের বাতাস আলিঙ্গন করেছিল; আমি ঠিক সেইরকম 'ঝড় নেমে আয়' বেসুরা বেতালা করে গাইলুম আর আমার জোব্বাজাব্বা যে ভিজে কাঁই হল, সে কথা

www.BanglaBook.org

বলাই বাহুল্য।

বৃষ্টি না থামার পূর্বেই ফিরে এলুম পাড়ার কাফেতে। সবাইকে বোঝাবো, বাঙলা দেশে কি রকম অদ্ভুত বর্ষা নামে, তার কি অপূর্ব জৌলুস। দেখি, আড্ডার সদস্যরা কেউ আধভেজা, কেউ ছ'আনা, কেউ দু'আনা। আমাকে দেখা মাত্র সবাই তো মারমার করে তেড়ে এল। আরে, বুঝিয়েই বলো না, কি ব্যাপার, চটছো কেন?

সবাই এক সঙ্গে কথা কয়। কি মুশকিল: ভাবখানা অনেকটা;—এই ড্যাম নুইসেন্স বৃষ্টির প্রশংসা আমি রাস্কেল ইন্ডিয়ান কেন এতদিন ধরে করে আসছি? আর দ্যাট্ পোয়েট টেগোর, যার নামে আমি অজ্ঞান, সে-ই বা এই বৃষ্টির নামে এত কবিতা লিখল কেন? সুট বরবাদ হয়ে গিয়েছে, হিম লেগে কেউ হাঁচ্ছে, কেউ কাঁদছে, কেউ বা পিছলে-পড়ে হাত ভেঙে ফেলেছে। আর সবচেয়ে মারাত্মক খবর, পাউলুসের বান্ধবী বৃষ্টির জন্য আসতে পারে নি বলে পাউলুস মর্মাহত হয়ে পটাসিয়াম সায়ানাইডের সন্ধানে বেরিয়ে গিয়েছে। মহা মুশকিলে পড়লুম। জুৎসই কি উত্তর দিই! মৃৎশকটিকায় বসন্তসেনা বৃষ্টিতে ভিজে যখন চারুদত্তের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন যে কাব্য সৃষ্টি হয়েছিল, তার বর্ণনা এদের সামনে এই বেমক্কায় পেশ করলে এরা আমাকে খুন করবে; মেঘদূতের বয়ান, জয়দেবের 'মেঘৈর্মেদুরম্বরং' এদের সামনে গাইতে গেলে এরা আমাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে। তাই ভাবলুম, কার্ল মার্কসের স্মরণ নেওয়াই প্রশস্ত। অর্থনৈতিক কারণ দেখালে এরা হয়ত মোলায়েম হবে। বললুম, 'বৃষ্টি না হলে গাছপালা, গম-ধান গজাবে কি প্রকারে?'

সবাই আমার দিকে এমন ভাবে তাকালে যেন আমি বেহেড মাতাল অথবা বদ্ধ উন্মাদ। মিশরে পাগলা উটের কামড় খেয়ে বহু লোক মতিচ্ছন্ন হয়ে যায় বলে এরা পাগলকে কি ভাবে সায়েস্তা করতে হয় সে কথা বিলক্ষণ জানে। রমজান বললো, 'কাইরো শহরের ভিতর কি যবগম ফলে যে এখানে বৃষ্টির প্রয়োজন? যবগম ফলে গ্রামাঞ্চলে। সেখানে বৃষ্টি হোক না, কে বারণ করছে। কিন্তু শহরের ভিতরে কেন?'

শরিফ মুহম্মদ বললো, 'সেখানেই বা বৃষ্টি হবে কেন? আমাদের গম-ধান ফলে নাইলের জলে। এই যে বৃষ্টি কখন আসে কখন আসে না তার তো কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই। এর উপর নির্ভর করলে মিশরীদের আর বাঁচতে হত না।' আমি কি উত্তর দেব ভাবছি, এমন সময় গ্রীক সদস্য পাউলুস ফিরে এসে ঝুপ করে একটা চেয়ারে বসে টেবিলে মাথা রেখে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলতে আরম্ভ করল। আমার সঙ্গে তর্কাতর্কির কথা সবাই ভুলে গিয়ে পাউলুসের চতুর্দিকে ঘিরে দাঁড়ালো।

কি হয়েছে, কি ব্যাপার?

অনেক ঝুলোঝুলির পর পাউলুস মাথা না তুলেই ফুঁপিয়ে যা বললো তার অর্থ, মেঘ আর বৃষ্টিতে তার বান্ধবীর বিরহবেদনা তাকে কাবু করে ফেলেছে। এ যন্ত্রণা সে সইতে পারবে না। পটাসিয়াম সায়ানাইড রেশন্ড হয়ে গিয়েছে। মৃত্যুর অন্য কোনো প্রশস্ত পন্থা আড্ডা যদি থাকে না বাৎলায় তবে—ইত্যাদি।

আমাকে তখন আর পায় কে? হুঙ্কার দিয়ে বললুম, 'ওরে মূর্খের দল, জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য বিরহ। আর বিরহ কারে কয়, সে-কথা কি করে জানবি মেঘ না জমলে, বৃষ্টি না ঝরলে? আর শেষ তত্ত্বকথা কবিতা কি করে ওৎরাবে বিরহবেদনা যদি মানুষকে পাগল করে না তোলে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

* * *

আজও ভাবি, আমাদের পদাবলী, জয়দেব, কালিদাস, শূদ্রক যে বিরহ বর্ণনা রেখে গিয়েছেন তার সঙ্গে তো অন্য কোন সাহিত্যের বিরহ বর্ণনার তুলনা হয় না। তার একমাত্র কারণ আমাদের বর্ষা।

জিন্দাবাদ হিন্দুস্থানী বর্ষা!!

প্যারিস

জর্মন ভাষায় একটি গান আছে ঃ

In Paris, in Paris, sind die
Maedels so suess
Wenn sie fluestern Monsieur,
ich bin Dein,–"

অর্থাৎ ঃ

প্যারিসের মেয়েগুলো কি মিষ্টি!
যখন তারা কানের কাছে গুনগুনিয়ে বলে,
'মসিয়ো আমি তোমারি।'
সবাই হেসে হেসে তাকায়, সবাই কথা বলবার
সময় 'তুমি' বলে ডাকে
আর কানে কানে বলে, 'তোমায় ছেড়ে
আর কারো কাছে যাব না।'
কিন্তু হায়, শুধু তোমাকেই না, আরো
পাঁচজনকে তারা ঐ রকমধারাই বলে।'

ইংরেজিতে বলে, 'কেরীং কোল টু নিউ কাসল্', হিন্দিতে বলে, 'বরেলীমে বাঁস লে জানা' (বেরলীতে নাকি প্রচুর বাঁশ জন্মে), রাশানে বলে, 'তুলা শহরে সামোভার নিয়ে যাওয়া' (সেখানে নাকি পৃথিবীর বেশির ভাগ সামোভার তৈরি হয়), গুজরাতীতে বলে, 'ভরা কলসি নিয়ে নদীতে যাওয়া' এবং ফরাসিতে বলে, 'প্যারিসে আপন স্ত্রী সঙ্গে নিয়ে যাওয়া!'

ফরাসি প্রবাদটিই মুখরোচক। কিন্তু প্রশ্ন, সত্যই কি প্যারিস-সুন্দরীরা বড্ডই দিলদরিয়া? উপরের গানটাতে তো খানিকটে হদিস পাওয়া গেল। তবু কেন তামাম ইয়োরোপবাসীর সুখস্বপ্ন অন্তত একবারের মত প্যারিসে যাওয়া? এমন কি যে জর্মন ফরাসি জাতটাকে দু'চোখের দুশমন বলে জানে, সেও ফরাসিনীর নর্ম শুনলে বে-এক্তেয়ার হয়ে পড়ে। হিন্দুর কাশী দর্শনাভিলাষ মুসলমানের মক্কা গমন তার কাছে নস্যি।

এ অধম ছেলেবেলায় এক ভশ্চায্যি বামুনের খপ্পরে পড়েছিল। তিনি তার মাথায় তখনই গবেষণার পোকা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই প্যারিসে নেবেই ভাবলুম, 'সত্য কোন্

www.BanglaBook.org

হিরন্ময় পাত্রে লুক্কায়িত আছেন, তার গবেষণা করতে হবে' এবং তার নির্যাস আজ আপনাদের কাছে নিবেদন করব। এ-নির্যাস বানাতে আমাকে বিস্তর কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে।

প্রথমত প্যারিসের মেয়েরা সুন্দরী বটে। ইংরেজ মেয়ে বড্ড ব্যাটামুখো, জর্মন মেয়েরা ভোঁতা, ইতালিয়ান মেয়েরা অনেকটা ভারতবাসীর মত (তাদের জন্য ইয়োরোপে আসার কি প্রয়োজন?) আর বলকান মেয়েদের প্রেমিকরা হরবকতই মারমুখো হয়ে আছে (প্রাণটা তো বাঁচিয়ে চলতে হবে)। তার উপর আরো একটা কারণ রয়েছে—ফরাসি মেয়ে সত্যি জামা-কাপড় পরার কায়দা জানে —অল্প পয়সায়—অর্থাৎ তাদের রুচি উত্তম।

তা না হয় হল। কিন্তু সুন্দরীরাই যে সব সময় চিত্তাকর্ষণ করেন তা তো নয়। যে-সব দেশে কোর্টশিপ করে বিয়ে হয়, সে-সব দেশে দেখেছি, মেলা সুন্দরীর বর জোটে নি আর এন্তার সাদামাটা মেয়ে খাপসুরৎ বর নিয়ে শহরময় দাবড়ে বেড়াচ্ছে।

তবে কি মানুষ প্রেমে পড়ার বেলা সুন্দরী খোঁজে, বিয়ে করার সময় অন্য বস্তু? তবে কি প্রেম আর বিয়ে ভিন্ন ভিন্ন শিরঃপীড়া? হবেও বা।

তবে একথা অস্বীকার করার যো নেই, ফরাসি মেয়েরা আর পাঁচটা দেশের মেয়েদের তুলনায় ঢের বেশি বিদগ্ধ। গান বোঝে, সাহিত্য নিয়ে নাড়াচাড়া করে, নাচতে জানে, ওয়াইনে বানচাল হয় না, অপ্রিয় সত্য এড়িয়ে চলে, পলিটিক্স্ নিয়ে মাথা ঘামায় কম এবং জাত-ফাত, সাদা কালো, দেশী-বিদেশী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সংস্কার বিবর্জিত। ভালো লেগেছে তাই, হামেশাই দেখতে পাবেন, দেবকন্যার মত সুন্দরী ফরাসিনী যমদূতের মত বিকট হাবশীর সঙ্গে সগর্বে সদম্ভে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছেলেটার সঙ্গে আলাপ করে দেখবেন, নাচে খাসা, গান গায় তোফা, ছবি দেখলেই বলতে পারে কোন্ নম্বরী, আর ডাক্তারি পড়ে বলে এর ব্যান্ডেজ ওর ইন্‌জেকশন্ হামেশাই বিন্‌ফিতে করে দেয়।

জর্মন মেয়ে বিদেশীকে প্রচুর খাতির-যত্ন করে, প্রেমে পড়ে ফরাসিনীর চেয়েও বেশি, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আপনি চিরদিনই তার কাছে 'আউসল্যান্ডার' (আউটল্যান্ডার) বা 'বিদেশী'ই থেকে যাবেন—কিন্তু ফরাসিনীর মনে অন্য ভাগাভাগি। তার কাছে পৃথিবীতে দুই রকম লোক আছে—কলচর্‌ড্ আর অনকলচর্‌ড্। ফরাসি, বিদেশী এই দুই স্পৃশ্য অস্পৃশ্য বাদ-বিচার তার মনে কখনো ঢোকে না।

আপনি দিব্য ফরাসি বলছেন, ফ্রাঁস আপনি পড়েন, রোদাঁকে ভক্তি করেন, শোপাঁর রস চাখতে জানেন, বর্দো বর্গেণ্ডি সম্বন্ধে ওকীবহাল, ব্যস, তবেই হল। কোনো ইংরেজ বন্ধুকে যদি আপনি ফরাসিনীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার সময় সসম্ভ্রমে ভারতীয় কায়দায় বলেন, 'ইনি অক্সফোর্ডের গ্র্যাজুয়েট', তবে ফরাসিনী অত্যন্ত গম্ভীর মুখে শুধাবে, 'কোন্ সব্‌জেক্টে মহাশয়? টেনিস না ক্রিকেট?' ফরাসিনীর বিশ্বাস অক্সফোর্ডে মাত্র ঐ দুই কর্মই হয়। ভাগ্যিস প্যারিসিনী জানে না, ভারতবর্ষে কিছুই হয় না—কাজেই আপনাকে এ রকম ধারা প্রশ্ন কেউ জিজ্ঞেস করবেন না।

কিন্তু ফরাসিনীর সব চেয়ে বড় গুণ—সে ভণ্ডামি করতে জানে না। আর সব শহরে যা হয়, প্যারিসেও তাই হয়, কিন্তু ফ্রান্সের লোক ঢেকে চেপে রাখবার চেষ্টা করে না। যদি কোনো জিনিস চেপে যায়, তবে সেটা দৃষ্টিকটু রুচিবিরুদ্ধ বলে, নিজেকে ধর্মপ্রাণ, নীতিবাগীশ বলে প্রচার করার জন্য নয়।

www.BanglaBook.org

অর্থাৎ ফরাসিনীর কাছে টেস্ট্ বা রসবোধ মরাল্ বা নীতিবোধের চেয়ে বহুৎ বেশি বরণীয়।

আজব শহর কলকেতা

আজব শহর কলকেতা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি। বুড়ো হতে চললুম তবু তার প্রমাণ পেলুম কমই। তাই নিয়ে একখানা প্রামাণিক প্রবন্ধ লিখব ভাবছি এমন সময় নামল জোর বৃষ্টি। সমীরণে পথ হারানোর বেদনা বেজে উঠল কারণ যদিও পথ হারাই নি তবু সমস্যাটা একই। ছাতা নেই, বর্ষাতি নেই, ট্রামে চড়বার মত তাগদও আর নেই—বাস মাথায় থাকুক,—ট্যাক্সি চড়তে বুক কচ কচ করে; কাজেই বাড়ি ফেরার চিন্তার বেদনাটা 'পথ হারানো'র মতই হল। এমন সময় সপ্রমাণ হয়ে গেল 'কলকেতা আজব শহর'—সামনে দেখি বড় বড় হরফে লেখা 'ফ্রেঞ্চ বুক শপ'।

খেয়েছে! নিশ্চয়ই কোনো ফরাসি পথ হারিয়ে কলকাতায় এসে পড়েছে আর যে দুটি পয়সা ট্যাকে আছে তাই খোয়াবার জন্য ফরাসি বইয়ের দোকান খুলেছে। বাঙালি প্রকাশকরা বলেন, 'শুধু ভালো বই ছাপিয়ে পয়সা কামানো যায় না, রদ্দি উপন্যাস গাদা গাদা ছাপতে হয়।' কথাটা যদি সত্যি হয় তবে শুধু ফরাসি বই বেচে এ দোকানে মুনাফা করবে কি প্রকারে? তাই আন্দাজ করলুম, এই 'ফ্রেঞ্চ বুক শপ' বোধ হয় হাতির দাঁতের মত—শুধু দেখবার জন্য চিবোবার জন্য দাঁত রয়েছে লুকোনো অর্থাৎ দোকানের নাম বাইরে যদিও 'ফ্রেঞ্চ বুক শপ', ভিতরে গিয়ে পাবো অন্য মাল—'খুশবাই', 'সাঁঝের পীর', 'লোধ্ররেণু', 'ওষ্ঠ-রাগ'।

সেই ভরসায় ঢুকলুম। বৃষ্টিটাও জোরে নেমেছে। নাঃ, আজব শহর কলকেতাই বটে। শুধু ফরাসি বই বেচেই লোকটা পয়সা কামাতে চায়। গাদা গাদা হলদে আর সাদা মলাটওলা এন্তার ফরাসি বই, কিছু সাজানো-গোছানো, কিছু যত্রতত্র ছড়ানো। ফরাসি দোকানদার কলকাতায় এসে বাঙালি হয়ে গিয়েছে। বাঙালি দোকানদারেরই মত বইগুলো সাজিয়েছে টাইপরাইটারের হরফ সাজানো মত করে। অর্থাৎ সিজিলটা যার জানা আছে সে চোখ বন্ধ করেই ইচ্ছেমত বই বের করে নিতে পারবে, যে জানে না তার কোমর ভেঙে তিন টুকরো হয়ে যাবে।

ফুটফুটে এক মেমসাহেব এসে ইতিমধ্যে ফরাসি হাসি হেসে দাঁড়িয়েছেন। পরশুরামের কেদার চাটুজ্যেকে আমি মুরুব্বি মানি। তারই ভাষায় বললুম, 'সেলাম মেমসাহেব।' মেমসাহেব ফরাসিতে বললেন, 'আপনার আনন্দ কিসে?'—অর্থাৎ 'কি চাই?' মেরেছে। ফরাসি ভাষা কবে সেই প্রথম যৌবনে বলেছি সে কথাই স্মরণ নেই—গোটা ভাষাটার কথা বাদ দিন।

জর্মন ভাষায় একটি প্রেমের গান আছে Dein Mund sagt "Nein" Aber Deine Augen sagen "Ja"। অর্থাৎ, তোমার মুখ বলছে 'না, নো', কিন্তু তোমার চোখ দু'টি বলছে 'হাঁ হাঁ'।

কিন্তু ফরাসি জর্মনির দুশমন। জর্মন যা করে ফরাসি তার ঠিক উল্টো করাটাই

www.BanglaBook.org

জাত্যাভিমানের কৈবল্যানন্দ বলে ধরে নিয়েছে। তাই মেমসাহেব যতই মুখে 'ইয়েস ইয়েস' বলেন ততই দেখি তাঁর চোখে স্পষ্ট লেখা রয়েছে 'না' 'নো'—অর্থাৎ মেমসাহেব আমার ইংরেজি বুঝতে পারছেন না। মহা মুশকিল।

হঠাৎ কখন ফরাসি রাজদূত মসিয়ো ফ্রাঁসোয়া পঁসে'র নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে বোধ হয় কিছুটা ফরাসি বেরিয়ে পড়েছিল, আর যাবে কোথা, মেমসাহেব আদেশ দিলেন, 'মসিয়ো, ফরাসিতে কথা বললেই পারেন।'

বাঙালি জাত্যাভিমানে বড্ডই আঘাত লাগলো স্বীকার করতে যে যদিও ফরাসি ভাষাটা কেঁদেকুকিয়ে পড়ে নিতে পারি, বলতে গেলে আমার অবস্থা ডডনং হয়ে দাঁড়ায়। ভাবলুম, দুগ্‌গা বলে ঝুলে পড়ি। এ মেমসাহেব যদি কলকাতার বুকের উপর বসে বাঙলা (এমন কি ইংরিজিও) না বলতে পারে তবে আমি ফ্রান্স থেকে হাজারো মাইল দূরে দাঁড়িয়ে টুটিফুটি ফরাসি বললে এমন কোন্ বাইবেল অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

দশ বছরের পুরোনো মর্চে-ধরা, জাম-পড়া, ছাতি-মাথা ফরাসি তানপুরোটার তার বেঁধে বরজলালের মত ইমনকল্যাণ সুর ধরলুম। এবং কী আনন্দ, কী আনন্দ, মেমসাহেবও বুড়ো রাজা প্রতাপ রায়ের মত। আমার ফরাসি শুনে কখনো 'আহাহা বাহাবা বাহাবা' বলেন, কখনো, 'গলা ছাড়িয়া গান গাহো' বলেন। এই হল ফরাসি জাতটার গুণ। হাজারো দোষের মধ্যে একটা কিছু ভালো দেখতে পেলেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে।

আমাকে আর পায় কে?

আপনাদের আশীর্বাদে আর শ্রীগুরুর কৃপায় তখন ব্যাকরণকে গঙ্গাযাত্রায় বসিয়ে উচ্চারণের মাথায় ঘোল ঢেলে চালালুম আমার ধেনো মার্কা ফরাসি শ্যাম্পেন। মেমসাহেব খুশ। আম্মো তর।

অতি সযত্নে তিনি আমার বইয়ের ফর্দ টুকে নিলেন, বই আসা মাত্র আমায় খবর দেবেন সে ভরসাও দিলেন; সঙ্গে সঙ্গে সাত সমুদ্র তেরো নদীর এপারে বিদেশীর সঙ্গে মাতৃভাষায় কথা কইতে পাওয়ার আনন্দে সুখ-দুঃখের দু-চারটা কথাও বলে ফেললেন। মাত্র তিন মাস হল এদেশে এসেছেন, তাই ইংরিজি যথেষ্ট জানেন না, তবে কাজ চালিয়ে নিতে পারেন, বইয়ের দোকান তাঁর নয়, এক বান্ধবীর, তার অনুপস্থিতিতে শুদ্ধমাত্র ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার কামনায় দোকানে বসেছেন।

তুলসীদাস বলেছেন—'পৃথিবীর কি অদ্ভুত রীতি। শুঁড়ি দোকানে জেঁকে বসে থাকে আর দুনিয়ার লোক তার দোকানে গিয়ে মদ কেনে। ওদিকে দেখ, দুধওয়ালাকে ঘরে ঘরে ধন্না দিয়ে দুধ বেচতে হয়।'

বুঝলুম কথা সত্যি। একদিন পৃথিবীর লোক প্যারিসে জড়ো হত ফরাসি বেচবার জন্য।

সে কথা থাক্। ইতিমধ্যে একটি বাঙাল ছোকরা দোকানে ঢুকে জিজ্ঞেস করলো, 'কমার্শিয়াল আর্ট সম্বন্ধে কোন বই আছে কিনা?' আমার মনে বড় আনন্দ হল। বাঙালি তাহলে বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে। ফরাসি ভাষায় কমার্শিয়াল আর্টের বই খুঁজছে।

ততক্ষণে আমি একটা খাসা বই পেয়ে গিয়েছি। ন্যুরনবর্গের মোকদ্দমায় যেসব দলিল-দস্তাবেজ পাওয়া গিয়েছিল, তাই দিয়ে গড়া হিটলার চরিত্রবর্ণন। হিটলার সম্বন্ধে তাঁর দুশমন ফরাসিরা কি ভাবে তার পরিচয় বইখানাতে আছে। এ বইখানার পরিচয় আপনাদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেব বলে লেখাটা শুরু করেছিলুম, কিন্তু গৌরচন্দ্রিকা শেষ হতে না হতেই ভোরের কাক কা-কা করে আমায় স্মরণ করিয়ে দিলে, কলম 'ফুরিয়ে গিয়েছে'। আরেক দিন হবে।

কিসের সন্ধানে

হটেনটট্‌দের কথা আলাদা। শিক্ষালাভের জন্য তারা যেখানে খুশি যেতে পারে। একথা তাদের ভাবতে হয় না; 'যে-শিক্ষা লাভ করতে যাচ্ছি সেটা আবার দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে খাপ খাবে তো?' কারণ কোনো প্রকারের ঐতিহ্যের কণামাত্র বালাই তাদের নেই।

ইংরেজ শাসনের ফলে আমরা প্রায় হটেন্‌টটের পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়েছিলুম। আর কয়েকটি বৎসর মাত্র ইংরেজ এদেশে থাকলে আমরা একে অন্যকে কাঁচা খেয়ে ফেলতে আরম্ভ করতুম।

ইংরেজ গিয়েছে। তাই এখন প্রশ্ন উঠেছে আমরা বিদ্যালাভ করতে যাব কোন্ দেশে? এতদিন এ প্রশ্ন কেউ শুধাতো না। টাকা থাকলেই ছোকরারা ছুটতো হয় অক্সফোর্ডের দিকে নয় কেমব্রিজের পানে। সেখানে সীট না পেলে লন্ডন কিংবা এডিনবরা।

কিমাশ্চর্যমতঃপরম্। এই ভারতবর্ষে একদিন বিদ্যা-শিক্ষার এমনি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ছিল যে, গান্ধার, কম্বোজ, বল্‌হীক, তিব্বত, শ্যাম, চীন থেকে বিদ্যার্থী শ্রমণ এদেশে আসত সত্যজ্ঞান লাভ করার জন্য। এবং বিংশ শতকে দেখলুম, এই ভারতবর্ষের লোকই ধেয়ে চলেছে ইংলন্ডের দিকে 'বিদ্যালাভে'র জন্য। ভারতীয় ঐতিহ্য তখন তার দুরবস্থার চরমে পৌঁছেছে।

রাধার দুরবস্থা যখন চরমে পৌঁছেছিল, তখন যমুনার জল উজানে বয়েছিল, একথা তাহলে মিথ্যা নয়।

কিন্তু আমাদের ছেলেরা যে ইংলন্ডের পানে উজান স্রোতের মতো বয়ে চলেছিল, সেটা তো রাতারাতি বন্ধ করে দেওয়া যায় না—পরাধীনতা-মুর্গীটার গলা কাটা যাওয়ার পরও সে খানিকদূর পর্যন্ত ছুটে যায় তারপর ধপ করে মাটিতে পড়ে। তাই এই বেলা জমাখরচ নিয়ে নেওয়া ভালো, ভারতীয় ছেলে ইয়োরোপে পেত কি, যেত কিসের আশায়?

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করার সময় বলেছিলেন, ইয়োরোপকে আমরা চিনলুম ইংলন্ডের ভিতর দিয়ে—তাই আমাদের প্রায় সকলেরই বিশ্বাস ইংলন্ড আর ইয়োরোপ একই জিনিস। ইংলন্ডের অনেক গুণ আছে সে কথা কেউ অস্বীকার করবে না, কিন্তু ইয়োরোপীয় বৈদগ্ধ্যভাণ্ডারে যে ইংলন্ড তেমন কিছু হীরে-মানিক জমা দিতে পারে নি, সে কথাও সত্য। ইয়োরোপীয় বৈগগ্ধ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কুতুবমিনার বলতে যাঁদের নাম মনে আসে—মাইকেল এঞ্জেলো, রদাঁ, রাফায়েল, সেজান, বেটোফন, ভাগনার, গ্যেটে, টলস্টয়, দেকার্ত, কান্ট, পাসত্যোর, আইনস্টাইন ইংলন্ডে জন্মায় নি। তাই রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন বিশ্বভারতীতে যেন ফ্রান্স, জর্মনি, ইটালি, রুশ থেকে গুণীজ্ঞানীরা এসে এদেশে ছেলেমেয়েদের সামনে ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গচিত্র তুলে ধরেন।

রবীন্দ্রনাথ যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন বহু গুণী শান্তিনিকেতনে এসেছেন, বহু ছাত্র

www.BanglaBook.org

তাঁদের কাছ থেকে নানা প্রকারে বিদ্যা আহরণ করেছে, কিন্তু আজ শান্তিনিকেতনে সে-মেলা আর বসে না। তবু আমার বিশ্বাস, বাঙালি যদি আত্মবিশ্বাস না হারায় তবে এই শান্তিনিকেতনেই—দিল্লি, এলাহাবাদ, আমেদাবাদে নয়—এই শান্তিনিকেতনের পঞ্চবটীর তলায়ই একদিন পঞ্চমহাদেশ সম্মিলিত হবে। আমাদের দেখতে হবে, এই পঞ্চবটী যেন ততদিনে শুকিয়ে না যায়।

ভারতীয় ছেলে যে ইংলন্ডে পড়াশোনা করতে যেত তার কারণ এই নয় যে, তাদের সবাই ধরে নিয়েছিল ইংলন্ডই ইয়োরোপের প্রতীক—তারা ধরে নেয় নি যে, ইয়োরোপ থেকে যা কিছু শেখবার মত আছে তার তাবৎ সম্পদ অক্সফোর্ড কেমব্রিজেই পাওয়া যায়। এদের ভিতর অনেক ছেলেই জানতো, শিল্পকলার জন্য ফ্রান্সে, এবং বিজ্ঞানদর্শনের জন্য জর্মনিতেই গঙ্গোদক পাওয়া যায়—অভাববশত তারা যে তখন কূপোদকের সন্ধানে যেতো তাও নয়। তার একমাত্র কারণ চাকরি দেবার বেলা ইংরেজ এ জলেরই কদর দেখাতো বেশি। (এতে আশ্চর্য হবার মত কিছু নেই; আয়ানও চাইতেন না যে রাধা যমুনার জল আনতে যান, পাছে কৃষ্ণের সঙ্গে সেখানে তাঁর দেখা হয়ে যায়—ইংরেজও চাইত না যে, ফ্রান্স জর্মনি গিয়ে আমরা সভ্য ইয়োরোপকে চিনে ফেলি। আয়ান ইংরেজ দু'জনেই তাই কূপোদক-সম্প্রদায়ের মুখপাত্র)।

জানি, আমার পাঠক মাত্রই টিপ্পনি কাটবেন আমি বড্ড বেশি প্রাদেশিক কিন্তু তাই বলে তো আর ডাহা মিথ্যা কথা বলতে পারি নে। নিবেদন করতে বাধ্য হচ্ছি যে, ইংলন্ডে বর্জন করে তবু যে কয়টি ছেলে প্যারিস, বার্লিন, ম্যুনিক, ভিয়েনায় জ্ঞানের সন্ধানে যেত তাদের অধিকাংশই বাঙালি।

আশা করি একথা কেউ বলবেন না যে বাঙালির ট্যাঁকে এত বেশি কড়ি জমে গিয়েছিল যে, সেগুলো ওড়াবার তালে সে প্যারিস যেত, জর্মন ঘুরত। বরঞ্চ বাঙালির বদনাম সে চাকরির সন্ধানে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারে। এক অখ্যাতনামা বাঙালি কবি চাকরি বাঁচানো সম্পর্কে আপিস ধাবমান বাঙালি কেরানীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—

ভরা পেটে ছুটতে মানা? চিবিয়ে খাওয়া
স্বাস্থ্যকর?
চাকরি আগে বাঁচাই দাদা, প্রাণ বাঁচানো
সে তারপর।

যে অন্নের জন্য বাঙালি কেরানীগিরি করে সেই অন্ন পর্যন্ত বাঙালি কেরানী ধীরে-সুস্থে খেয়ে আপিস যেতে পারে না। এত বড় প্যারাডক্স, এত বড় স্বার্থত্যাগ বাঙলা দেশের বাইরে আপনি পাবেন না।

আমি বলি—আর আপনার কথায় কান দেব না—বাঙালিরই ঈষৎ রসবোধ ছিল, তাই সে প্যারিস যেত।

প্যারিসে একপ্রকারের হতভাগা চিত্রকরের দল আছে—এদের নাম পেভমেন্ট আর্টিস্ট। এরা আবার দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এদের ভিতর যারা কিঞ্চিৎ খানদানি তারা আপন ছবি ফুটপাথের রেলিঙের উপর ঝুলিয়ে রেখে একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। আপনি যদি কোনো ছবি সম্বন্ধে কিছু জানতে চান তবে সে পরম উৎসাহে আপনাকে বাৎলে দেবে ছবিটার তাৎপর্য কি! আপনি যদি সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহ দেখান তবে সে তার তাবৎ

www.BanglaBook.org

ছবির ঠিকুজি-কুলজি, নাড়ী-নক্ষত্র সব কিছু গড় গড় করে বলে যাবে, আর যদিস্যাৎ আপনি একখানা ছবি কিনে ফেলেন—এ জাতীয় অলৌকিক ঘটনা অতিশয় রাঙা শুক্কুরবার ছাড়া কখনো দৃষ্টিগোচর হয় না—তবে সে আপনাকে 'ও রিভোয়া' জানাবার সময় কানে কানে বলে দেবে, 'এ ছবি কিনে আপনি ভুল করেন নি, মসিয়ো—এ ছবি দেখবার জন্য তামাম পৃথিবী একদিন আপনার দোরের গোড়ায় ধন্না দেবে।'

অবশ্য ততদিন সে উপোস করে। শেষটায় সে-দিন না দেখেই সে মরে—শীতে এবং ক্ষুধায়।

এদের চেয়েও হতভাগা চিত্রকর আছে। তাদের রঙ আর ক্যানভাস কেনবার পয়সা পর্যন্ত নেই। তাই তারা রঙিন খড়ি দিয়ে ফুটপাথের এক পাশে ছবি এঁকে রাখে। প্যারিসের ফুটপাথে বারোমাস পুজোর ভিড়—তাই এদের ছবি আঁকতে হয় অপেক্ষাকৃত নির্জন ফুটপাথে। সেখানে পয়সা পাবার আশাও তাই কম।

এসব ছবি তো আর কেউ বাড়ি নিয়ে যেতে পারে না, তাই ছবি দেখে খুশি হয়ে কেউ যদি চিত্রকরের হ্যাটের ভিতর—বলতে ভুলে গিয়েছিলুম হ্যাটটা ছবির একপাশে চিৎ করে পাতা থাকে—দু'টি পয়সা ফেলে দেয় তবে সেটা ভিক্ষে দেওয়ার মতই হ'ল। এ শ্রেণীর চিত্রকররা অবিশ্যি বলে, 'পয়সাটা ভিক্ষে নয়, পিকচার গ্যালারির দর্শনী। দর্শনী দিয়েছে বলে কি তোমাকে গ্যালারির ছবি বাড়ি নিয়ে যেতে দেয়?' হক্ কথা।

এদের যদি বেশি পয়সা দিয়ে বলেন, 'ঐ ছবিটা তুমি আমাকে ক্যানভাস আর রঙ কিনে ভালো করে এঁকে দাও', তবে সে পয়সাটা সীনের জলে ফেলারই সমান। এ শ্রেণীর চিত্রকরের সঙ্গে বোতলবাসিনীর বড্ড বেশি দহরম-মহরম।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল বলে মন উদাস হয়ে গিয়েছিল। তাই বেড়াতে বেরিয়েছি আর দেশের কথা ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ দেখি ফুটপাথের উপর অলৌকিক দৃশ্য। পদ্মানদীর গোটাকয়েক ছবি রঙিন খড়ি দিয়ে আঁকা। ছবিগুলো ভালো না মন্দ সেকথা আমি এক লহমার তরেও ভাবলুম না। বিদেশ-বিভুঁইয়ে দেশের লোক পেলে সে পকেটমার না শঙ্করাচার্য, সেকথা কেউ শুধায় না।

বৃষ্টি নামলেই ছবিগুলো ধুয়ে মুছে যাবে। আর্টিস্টের দিকে তাকালুম। শতচ্ছিন্ন কোট পাতলুন। হাতে বেয়ালা। বাঙালি।

আমাকে দেখে তার মুখের ভাব কণামাত্র বদলালো না। বেয়ালাখানা কানের কাছে তুলে ধরে ভাটিয়ালি বাজাতে আরম্ভ করল।

হাড্ডিসার মুখ, ঠোঁট দুটো অনবরত কাঁপছে, চোখ দুটিতে কোনো প্রকারের জ্যোতির বিন্দুমাত্র আভাস নেই, একমাথা উস্কোখুস্কো চুল, কিন্তু সব ছাড়িয়ে চোখে পড়ে তার কপালখানা। এবং সে কপাল দেখে স্বতই মনে প্রশ্ন জাগে, এরকম 'কপালী' মানুষ বিদেশ-বিভুঁইয়ে ভিক্ষে মাঙছে কেন?

তাকে পাশের কাফেতে টেনে নিয়ে যাবার জন্য আমাকে বিস্তর বেগ পেতে হয়েছিল। আমার কোনো কথার উত্তর দেয় না, আমার চেয়ে দেড় মাথা উঁচু বলে তার দৃষ্টি আমার মাথার উপর দিয়ে কোথায় কোন্ দুরান্তে গিয়ে ঠেকেছে তার সন্ধান নেই। একবার হাত ধরে বললুম, 'চলুন, এক কাপ কফি খাবেন'; ঝটকা মেরে হাত সরিয়ে ফেলল।

আমি নিরাশ হয়ে চলে যাচ্ছি দেখে হঠাৎ হ্যাটটা তুলে নিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে

www.BanglaBook.org

চলল। পাশের কাফেতে বসে আমি শুধালুম, 'কফি? চা?' মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালো। আমি মনে মনে বুঝতে পেরেছিলুম সে কি চায়; কিন্তু সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হবার জন্য চা কফির প্রস্তাব পেড়েছিলুম। শেষটায় শুধালুম, 'তবে কি খাবেন?'

একটি কথা বললো, 'আবসাঁৎ।'

দুনিয়ার সবচেয়ে মারাত্মক মাদক দ্রব্য! শতকরা আশিভাগ তাতে এলকহল। এ মদ মানুষ তিন চার বৎসরের বেশি খেতে পারে না। তারই ভিতরে হয় আত্মহত্যা করে, নয় পাগল হয়ে যায়, না হয় এলকহলিক বিভীষিকা দেখে দেখে এক মারাত্মক রোগে চিৎকার করে করে শেষটায় ভির্‌মি গিয়ে মারা যায়। ইঁদুরছানার নাকের ডগা এ মদে একবার চুবিয়ে নিয়ে ছেড়ে দিলে সে মিনিট তিনেকের ভিতর ছট্‌ফট্‌ করে মারা যায়।

কী বিকৃত মুখ করে যে আর্টিস্ট আবসাঁৎটা খেল, তার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। মনে হল, পানীয় যেন আগুন হয়ে পেটে ঢুকতে চায় বলে নাড়ী-ভুঁড়ি উল্টে গিয়ে বমি হয়ে বেরতে চায়, আর সমস্ত মুখে তখন ফুটে ওঠে অসহ্য যন্ত্রণার বিকৃততম বিভীষিকা। চোখ দুটো ফুলে উঠে যেন বাইরের দিকে ছিটকে পড়ে যেতে চায়, আর দরদর করে দু'চোখ দিয়ে জল নেমে আসে।

আমি মাত্র একটা আবসাঁতের অর্ডার দিয়েছিলুম। সেটা শেষ হতেই আমার দিকে না তাকিয়ে নিজেই গোটাতিনেক অর্ডার দিয়ে ঝপাঝপ গিললো।

আমি চুপ করে আপন কফি খেয়ে যাচ্ছিলুম।

গোটাচারেক আবসাঁৎ সে ততক্ষণে গিলেছে। তখন দেখি সে আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এ অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য এর চোখে এল কোত্থেকে?

হঠাৎ বললো, 'আর কেন ছোকরা, এইবার কেটে পড়ো, বীট ইট্‌, গে ভেক্‌, ভিৎ ভিৎ।' ক'টা ভাষায় যে সে আমায় পালাতে বললো তার হিসেবই আমি রাখতে পারলুম না।

আমি চুপ করে বসে রইলুম—নট নড়ন-চড়ন—নট-কিচ্ছু।

একগাল হেসে বলল, 'দেখলি? আমি ভিখিরি নই। এই ভাষা কটি ভাঙিয়েই আমি তোর চেয়ে দামী সুট পরতে পারবো, বুঝলি? আবসাঁৎ দিয়ে প্যারিস শহর ভাসিয়ে দিতে পারবো, বুঝলি, কমপ্রাঁ, ফের্‌শট্‌হেস্ট ডু, পন্নিময়েশ?' আবার চলল ভাষার তুবড়ি।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে মিটমিটিয়ে খানিকক্ষণ হাসলো। শুধালো, ছবি আঁকতে এসেছিস এ দেশে?—না হলে আর্টিস্টের উপর এ দরদ কেন, বাপু? তা তোর অজন্টার কি হল? না বাগ-গুহা? কিংবা মোগল? অথবা রাজপুত?'

তারপর হঠাৎ হো হো করে হেসে কুটি কুটি। 'অবনবাবু? নন্দলাল? যামিনী রায়? এনারা সব আর্টিস্ট! কচু!'

আমি তবু চুপ।

বললে, 'অ-অ-অ। সেজান্‌ রেনোয়া গোগাঁ, আঁরি-মাতিস? বল্‌ না রে ছোকরা।'

আমি পূর্ববৎ।

'তবে শোন্‌ ছোকরা। এদের কাছ থেকে কিচ্ছুটি শেখবার নেই, তোকে সাফ সাফ বলে দিচ্ছি। আমার কথা শোন্‌। আর্ট জিনিসটা কি? আর্ট হচ্ছে—'

বলে সে আমায় প্রথম আর্ট সম্বন্ধে একখানা লেকচার শোনালে। সেই গ্রীকদের আমল থেকে নন্দনশাস্ত্রের ইতিহাস শুরু করে হঠাৎ চলে গেল ভরত দণ্ডিন মম্মট ভট্টে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেখান থেকে গোত্তা খেয়ে নাবলো টলস্টয়ে—মধ্যিখানে গ্যেটেকে খুব একহাত নিল। তারপর বদ্‌লের, মালার্মে। শেষ করল জেমস জয়েসকে দিয়ে।

আরো বিস্তর কাব্য, নাট্য, চিত্রের সে উল্লেখ করে গেল, যার নাম আমি বাপের জন্মে শুনি নি।

তারপর ঝপ করে আরেকটা আবসাঁৎ গিলে বললো, 'উহুঁ! তোর চোখ থেকে বুঝতে পারছি ছবির তুই বুঝিস কচুপোড়া। একবার একটা সাড়া পর্যন্ত দিলি নে। তবে কি তোর শখ মূর্তি গড়াতে? অশোক স্তম্ভের সিংগি, গান্ধারের বুদ্ধ, মথুরার অমিতাভ, এলেফেন্টার ত্রিমূর্তি, মাইকেল এঞ্জেলোর মোজেস, নটরাজ? বল্ না?'

তারপর ছাড়লে আরেকখানা লেকচর। দুনিয়ার কোন্ যাদুঘরের কোন্ কোণে কোন্ মূর্তি লুকনো আছে, সব খবর নখাগ্র-দর্পণে।

এই রকম করে লোকটা আর্টের যত শাখা-প্রশাখা আছে তার সম্বন্ধে আপন মনে কখনো মাথা নেড়ে, কখনো শব্দ ওজন করে করে, কখনো গড়গড়িয়ে মেল গাড়ির তেজে, কখনো বক্রোক্তি করে সন্দেহের দোদুল-দোলায় দুলে ব্যাখ্যান দিল। এদেশ সেদেশ সব দেশ-মহাদেশের সর্বপ্রকারের আর্ট বস্তুর পাঁচমেশালি বানিয়ে।

এরকম পণ্ডিত আমি জীবনে আর কখনো দেখি নি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকে সে চুপ করে আর থাকতে দিল না।

বোধ হয় নেশা একটু কমে গিয়েছিল; তাই চাপ দিয়ে শুধালো, 'বল্, তুই এদেশে এসেছিস কি করতে?'

আমি না পেরে ক্ষীণ কণ্ঠে বললুম, 'লেখাপড়া শিখতে।'

খুব লম্বা একখানা 'অ-অ-অ' টেনে বললো।

'তা তো শিখবি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওয়াইন, শ্যাম্পেন, আবসাঁৎ? তার কি হবে? নানা প্রকারের ব্যামো? তার কি হবে? অদ্ভুত অদ্ভুত নয়া নয়া ইনকিলাবী মতবাদ? তার কি হবে?'

* * *

এই হল মুশকিল। আবসাঁৎ ব্যামোর চেয়েও ভয়ঙ্কর অর্ধসিদ্ধ অর্ধপক্ক মতবাদ। শুধু ইনকেলাবী নয়, অন্য পাঁচরকমেরও।

আজ পর্যন্ত যেটুকু এদেশে এসেছে তাকেই আমরা সামলে উঠতে পারছি নে। আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের শিক্ষার সঙ্গে তাকে কি করে মিল খাওয়াবো, বুঝে উঠতে পারিনে। অথচ পশ্চিমের সঙ্গে লেন-দেনও তো বন্ধ করে দেওয়া যায় না। উপায় কি?

ভক্তি

ভক্তি ও ভালোবাসার ভিতর দিয়ে অনির্বচনীয় সত্তাকে পাবার চেষ্টা মানুষ সব যুগে আর সব দেশেই করেছে। এ-প্রচেষ্টার তুলনাত্মক ইতিহাস আজও লেখা হয় নি। কারণ শেষ পর্যন্ত এ-ইতিহাস লেখা হবে সর্বধর্মের উৎপত্তিস্থল প্রাচ্যেই এবং প্রাচী এখনো আপন ঘৃত-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লবণ-তৈল-তণ্ডুল-বস্ত্র-ইন্ধন নিয়ে এতই উদ্ব্যস্ত যে তিন দেশের শাস্ত্রগ্রন্থ একত্র করে সেদিকে আপন শক্তি নিয়োজিত করবার অবসর পাচ্ছে না।

ভক্তিমার্গের প্রসার ও বিস্তার হয় প্রধানত হিন্দু, মুসলিম এবং খৃষ্টান ধর্মে। হিন্দুধর্মের শাস্ত্ররাশি এতই বিশাল এবং বিক্ষিপ্ত যে, তার ভিতর দিয়ে ভক্তির অভ্যুদয় পদে পদে অনুসরণ করা সহজ কর্ম নয়। তার তুলনায় খৃষ্টধর্মে ভক্তির অনুসন্ধান অনেক সহজ। একমাত্র বাইবেলখানা মন দিয়ে পড়লেই ভক্তির সূত্রপাত ও ক্রমবিকাশ বুঝতে বিশেষ অসুবিধা হয় না।

বাইবেলের প্রথম খণ্ডে (অর্থাৎ ওল্ড টেস্টামেন্ট) ঈশ্বরের যে রূপ পাওয়া যায় সেটি প্রধানত একচ্ছত্রাধিপতি দুর্ধর্ষ, অকরুণ এমন কি বদরাগী এবং খামখেয়ালী রাজার রূপ। তাঁর সামনে পশুপক্ষী দাহ না করলে তিনি তৃপ্ত হন না, তাঁর পদপ্রান্তে কুমারী কন্যাকে বিসর্জন না দিলে তিনি বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দিয়ে দেশ লণ্ডভণ্ড করে দেন। তাই ওল্ড টেস্টামেন্টের দেবতাকে পূজারী আপন অর্ঘ্য দিচ্ছে অতি ভয়ে, সশঙ্ক চিত্তে।

খৃষ্ট এসে এই ভাবধারা সম্পূর্ণ বদলে দিলেন। তিনি বললেন, সৃষ্টিকর্তা রাজাধিরাজ, তাঁর ঐশ্বর্যের সীমা নেই, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তিনি আমাদের পিতা। 'আওয়ার ফাদার উইথ আর্ট ইন হেভ্‌ন্।' এইখানেই ভক্তির সূত্রপাত। ভগবানকে ভয় করার কোনো প্রয়োজন নেই। তাঁর করুণা, তাঁর স্নেহ পেতে হলে তাঁকে ভালবাসতে হবে পিতার মত।

কিন্তু মানুষ একবার ভালবাসার মন্ত্র পেলে সে আর মাটির মানুষ হয়ে থাকতে চায় না। মুক্তপক্ষ বিস্তার করে সে আকাশের সর্বোচ্চ স্তরে উড্ডীয়মান হতে চায়। পিতার প্রতি ভালবাসা মঙ্গলময় জিনিস কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তার চেয়ে অনেক মধুর, বহু নিবিড় মাতার প্রতি পুত্রের ভালবাসা, পুত্রের প্রতি মাতার মমতা। তাই ক্যাথলিক জগৎ গেয়ে উঠলো, 'ধন্য হে জননী মেরি, তুমি মা করুণাময়ী।''

ক্যাথলিক জগতে তাই ভগবানের পূজা প্রধানত মা-মেরি রূপে। এ পূজা 'আভেমারিয়া' মন্ত্র দিয়ে সমাধান হয় এবং সে মন্ত্র যে কত সঙ্গীত-স্রষ্টাকে অনুপ্রাণিত করেছে তার ইয়ত্তা নেই। খৃষ্টবৈরী ইহুদি সম্প্রদায়ের প্রধান সঙ্গীতকার মেন্ডেলজোন এই আভেমারিয়া মন্ত্রের সুর দিয়ে লক্ষ লক্ষ ক্যাথলিক নরনারীর ধর্মপিপাসা সঙ্গীতসুধা দিয়ে তৃপ্ত করেছেন—সঙ্গীতজগতে আপন অক্ষয় আসন রেখে গিয়েছেন।

'ঊর্ধ্বদিকে উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত এই আভেমারিয়া সঙ্গীতের প্রতীক ঊর্ধ্বশির ক্যাথলিক গির্জা। আতুর মানুষের যে প্রার্থনা, যে বন্দনা অহরহ মা-মেরির শুভ্র কোলের সন্ধানে ঊর্ধ্বপানে ধায় তারই প্রতীক হয়ে গির্জাঘর তার মাথা তুলেছে ঊর্ধ্বদিকে। লক্ষ লক্ষ গির্জার লক্ষ লক্ষ শিখর মা-মেরির দিব্য সিংহাসনের পার্থিব স্তম্ভ।'

কিন্তু মানুষ এখানে এসেও থামল না। সত্য হোক, মিথ্যা হোক, মানুষের বিশ্বাস মাতার প্রেম, পুত্রের ভালবাসার চেয়েও শক্তিশালী যুবক-যুবতী, তরুণ-তরুণীর মধ্যে যে প্রেম উদ্ভাসিত হয়। বাইবেলে যখন বলা হয়েছে "For, love is stronger than death" তখন মহাপুরুষ এই প্রেমের কথা ভেবেছিলেন। তাই মানুষ বিচার করল, 'ভগবানকে যদি ভালবাসা দিয়েই পেতে হয়, তবে সে ভালবাসা তার নিবিড়তম রূপ নেবে না কেন? ভগবানকে তবে পিতা অথবা মাতা রূপে কল্পনা না করে তাঁকে হৃদয়ে বসাব বল্লভ রূপে, প্রেমিক রূপে।'

সমস্ত বৈষ্ণব রসসাধনা এই তত্ত্বের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত—সে কথা পরে হবে। কিন্তু

www.BanglaBook.org

ক্যাথলিক রহস্যবাদী ভক্তেরা (Mystic saints)—ও যে এ-রকম রসস্বরূপে আরাধনা করছেন তার সন্ধান আমরা কমই রাখি,—কারণ আমাদের পরিচয় প্রধানত প্রটেস্টান্ট ধর্মের সঙ্গে। ঈষৎ দীর্ঘ হলেও নিচের কবিতাটি উদ্ধৃত করবার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না ঃ—

O Night, that dids't lead us thus,
O Night, more lovely that dawn
of light,
O Night that broughtest us
Lover to lover's sight
Lover with loved in marriage
of delight !
Upon my flowery breast,
Wholly for him, and save himself
for none,
There did I give sweet rest
To my beloved one;
The fanning of the cedars
breathed thereon
When the first morning air
Blew from the bower, and waived
his locks aside,
His hand with gentle care,
Did wound me in the side,
And in my body all my senses
died,
All things I then forgot,
My cheek on him who for my
coming came;
All ceased and I was not,
Leaving my cares and shame
Among the lilies and forgetting
them.

ক্যাথলিক জগতের বিখ্যাত সাধু সান খোয়ান্ দে লা ক্রুসের (San Juan de la Cruz) কবিতা পড়ে কে বলবে—এ কবিতা অধ্যাত্ম জগতের ধর্মরস সৃষ্টি করবার জন্য রচিত হয়েছিল? এ কবিতা তো বৈষ্ণব পদাবলীর সুরে বাঁধা।

কিন্তু ভগবানকে রসস্বরূপে আরাধনা করার প্রচেষ্টাতে ক্যাথলিক জগতের এই চূড়ান্ত।

www.BanglaBook.org

বৈষ্ণব ভক্ত সেই চূড়ান্ত ত্যাগ করে তারপর আকাশে উড্ডীয়মান হন। বৈষ্ণব প্রেমিক বলেন, 'বৈধ প্রণয়ের নিবিড়তা বার বার হার মেনেছে অবৈধ প্রেমের সম্মুখে।' আত্মীয়স্বজন, প্রচলিত ধর্মরীতি যেখানে এসে প্রেমের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, দুর্বার প্রেম এসে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায় সেইখানেই। তাই আমাদের কদম্ববনবিহারিণী বিরহিণী ব্রজসুন্দরী শ্রীরাধা যে প্রেম পাগলিনী, সে প্রেমের সঙ্গে অন্য কোন প্রেমের তুলনা হয় না। বাঙালির রাধা বিবাহিতা,—সমাজ তাঁর প্রেমের পথে অলঙ্ঘ্য প্রাচীর গড়ে তুলেছে। শাশুড়ি-ননদী শঙ্খ-করাতের মত তাঁকে আসতে যেতে যেন খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলছেন।

বহু যুগ পূর্বে উচ্চারিত মন্ত্র তাই তার সম্পূর্ণ অর্থ পেল কৃষ্ণরাধার মিলনে—

যদেৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।
যদেৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।

ভারতের বাইরে একমাত্র ইরানে মাঝে মাঝে এই সর্বোচ্চ রসসাধনার সন্ধান মেলে। কারণ ভারত ও ইরানের আধ্যাত্মিক যোগাযোগ বহু শত শতাব্দীর। তাই ইরানী কবি সুর মিলিয়ে গেয়েছেন ঃ—

'মন্ তু শুদম্ তু মন্ শুদী, মন্ তন্ শুদম্
তু জাঁ শুদী
তা কসী ন গোয়েদ্ বাদ্ আজ্ ঈ মন্ দিগরম্
তু দিগরী।'
আমি তুমি হনু, তুমি আমি হলে, আমি দেহ
তুমি প্রাণ,
এর পরে যেন কেহ নাহি বলে তুমি আন
আমি আন।

* * *

এই বিশাল রসধারার কত স্রোত, কত শাখা-প্রশাখা। কত ধ্বনি, কত সঙ্গীত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে সান খোয়ান, শ্রীরাধা, রুমীর বিরহকাতর বক্ষ থেকে। কিন্তু হায়, এ শতাব্দীর যান্ত্রিক সভ্যতার উন্নতি মানুষকে কাছে এনেও কাছে আনতে পারল না। অর্থের সন্ধানে, স্বার্থের অন্বেষণে আজ পৃথিবীর এক কোণের মানুষ অপর কোণে গিয়ে মাথা কোটে, কিন্তু এ সব সাধক প্রেমিকদের বাণী এক করে দেখবার চেষ্টা কেউ যে করে না!!

'আমার ভাণ্ডার আছে ভরে—'

শব্দপ্রাচুর্যের উপর ভাষার শক্তি নির্ভর করে। ইংরেজি এবং বাংলা এই উভয় ভাষা নিয়ে যাঁদের একটুখানি ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয়, তাঁরাই জানেন, বাঙলার শব্দ-সম্পদ কত সীমাবদ্ধ। ডাক্তারি কিংবা ইঞ্জিনীয়ারিং টেকনিকেল শব্দের কথা তুলছি নে—সে সব শব্দ তৈরি হতে দেরি—উপস্থিত সে শব্দের কথাই তুলছি যেগুলো সাহিত্য ক্ষেত্রেই সর্বদা দরকার হয়।

ইংরেজির উদাহরণই নিন্। ইংরেজি যে নানা দিক দিয়ে ইয়োরোপীয় সর্বভাষার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অগ্রগণ্য তার অন্যতম প্রধান কারণ ইংরেজির শব্দ-সম্পদ। এবং ইংরেজি সে সম্পদ আহরণ করেছে অত্যন্ত 'নির্লজ্জের'র মত পূর্ব-পশ্চিম সর্ব দেশ মহাদেশ থেকে। গ্রীক, লাতিনের মত দুটো জোরালো ভাষা থেকে তার শব্দ নেবার হক তো সে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েইছে, তার উপর ফরাসির উপরও ওয়ারিশান বলে তার ষোল আনা অধিকার। তৎসত্ত্বেও—সুকুমার রায়ের ভাষায় বলি—

এতো খেয়ে তবু যদি নাহি ওঠে মনটা
খাও তবে কচু-পোড়া খাও তবে ঘণ্টা!

ইংরেজ উত্তরে বেশরমের মত বলে, "ঠিক বলেছে, আমার মনে ওঠে নি, আমি কচু-পোড়া এবং ঘণ্টা খেতেও রাজী!"

তাই দেখুন ইংরেজ, আরবী, ফার্সী, তামিল, হিন্দি, মালয়—কত বলবো?—দুনিয়ায় তাবৎ ভাষা থেকে কচু-পোড়া ঘণ্টা সব কিছু নিয়েছে, এবং হজমও করে ফেলেছে। 'এডমিরাল' নিয়েছে আরবী 'আমীর-উল-বহর' থেকে, 'চেক' (কিস্তিমাতের) নিয়েছে পার্সী 'শাহ' থেকে, 'চুরুট' নিয়েছে তামিল 'শুরুট্টু' থেকে, 'চৌকি' নিয়েছে হিন্দি থেকে, 'এমাক' নিয়েছে মালয় থেকে।

(কিন্তু আশ্চর্য, ইংরেজের এই বিদ্ঘুটে গরুড়ের ক্ষুধা শব্দ বাবদেই; আহারাদির ব্যাপারে ইংরেজ নকিষ্যি কুলীনের মত উন্নাসিক, কট্টর স্বপাকে খায়, এদেশে এত কাল কাটানোর পরও ইংরেজ মাস্টার্ড (অর্থাৎ সর্ষেবাটা বা কাসুন্দি) এবং মাছে মিলিয়ে খেতে শেখে নি, অথচ কে না জানে সর্ষেবাটায় ইলিশ মাছ খাদ্য-জগতে অন্যতম কুতুব-মিনার? ইংরেজ এখনো বিস্বাদ ফ্রাইড ফিশ খায়, মাছ বাছতে শিখলো না; আমরা তাকে খুশি করার জন্য পাস্তুয়ার নাম দিলুম লেডিকিনি (লেডি ক্যানিং) তবু সে তাকে জাতে তুললো না, ছানার কদর বুঝলো না। তাই ইংরেজের রান্না এতই রসকষ-বর্জিত, বিস্বাদ এবং একঘেয়ে যে তারই ভয়ে কন্টিনেন্টাল মাত্রই বিলেত যাবার নামে আঁৎকে ওঠে—যদি নিতান্তই লন্ডন যায় তবে খুঁজে খুঁজে সোহো মহল্লায় গিয়ে ফরাসি রেস্তোরাঁয় ঢুকে আপন প্রাণ বাঁচায়। আমার কথা বাদ দিন, আমার পেটে এটম বোম মারলেও আমি ইংরিজি খানা দিয়ে আমার পেট ভরাতে রাজী হবো না।)

শব্দের জন্য ইংরেজ দুনিয়ার সর্বত্র ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায় সে না হয়ে বুঝলুম; কিন্তু ইংরেজের মত দম্ভী জাত যে দুশমনের কাছ থেকেও শব্দ ধার নেয় সেইটেই বড় তাজ্জবকী বাৎ। এই লড়াইয়ের ডামাডোলে সবাই যখন আপন আপন প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত তখনো ইংরেজ গোটা কয়েক শব্দ দুশমনের কাছ থেকে ধার নিয়ে দাঁত দেখিয়ে হেসেছে। লুফ্‌ট-ভাফ্‌ফের মার খেয়ে খেয়ে ইংরেজ যখন মর-মর তখনো সে মনে মনে জপছে, 'লুফ্‌ট-ভাফ্‌ফে, লুফ্‌ট-ভাফ্‌ফে, শব্দটা ভুললে চলবে না', ব্লিৎস্‌ক্রীগের ঠেলায় ইংরেজ যখন ডানকার্কে ডুবু-ডুবু তখনো ইষ্টনাম না জপে সে জপেছে, 'ব্লিৎস-ক্রীগ, ব্লিৎস-ক্রীগ।'

আর বেতামিজীটা দেখুন। গালাগাল দেবার বেলা যখন আপন শব্দে কুলোয় না—মা লক্ষ্মী জানেন সে ভাণ্ডারেও ইংরেজের ছয়লাব—তখনো সে চক্ষুলজ্জার ধার ধারে না। এই তো সেদিন শুনলুম কাকে যেন 'স্বাধিকার প্রমত্ত" বলতে গিয়ে কোনো এক ইংরেজ বড় কর্তা শত্রুপক্ষকে শাসিয়েছেন, "আমাদের উপর ফ্যুরার-গিরার ফপরদালালি করো না।"

পাছে এত সব শব্দের গন্ধমাদন ইংরেজকে জগন্নাথের জগদ্দল পাথরে চেপে মারে

www.BanglaBook.org

তাই তার ব্যবস্থাও সে করে রেখেছে। 'জগন্নাথ' কথাটা ব্যবহার করেই সে বলেছে, "ভেবে চিন্তে শব্দভাণ্ডার ব্যবহার করবে—পাগলের মত ডোন্ট থ্রো ইয়োরসেলভস আন্ডার দি হুইল অব Juggernaut (জগন্নাথ)।"

ব্যাটারা আমাদের জগন্নাথকে পর্যন্ত সমুদ্রযাত্রা করিয়ে দেশে নিয়ে ছেড়েছে। পারলে তাজমহল আর হিমালয়ও আগেভাগেই নিয়ে বসে থাকত—কেন পারে নি তার কারণ বুঝতে বেগ পেতে হয় না।

ফরাসি জাতটা ঠিক তার উল্টো। শব্দ গ্রহণ বাবদ সে যে কত মারাত্মক ছুঁৎবাইগ্রস্ত তা বোঝা যায় তার অভিধান থেকে। পাতার পর পাতা পড়ে যান, বিদেশী শব্দের সন্ধান পাবেন না। মনে পড়ছে, আমার তরুণ বয়সে শান্তিনিকেতনের ফরাসি অধ্যাপক বেনওয়া সায়েবের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। রোমা রলাঁর পঞ্চাশ না ষাট বছর পূর্ণ হওয়াতে পৃথিবীর বড় বড় রলাঁ-ভক্তেরা তখন তাঁকে একখানা রলাঁ-প্রশস্তি উপহার দেন। এ-দেশ থেকে গাঁধী, জগদীশ বসু ওঁরা সব লিখেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন কি না ঠিক মনে পড়ছে না। বেনওয়া সায়েবও সে-কেতাবে একখানা প্রবন্ধ লিখেছিলেন—বিষয়বস্তু 'শান্তিনিকেতনের আশ্রম'। 'আশ্রম' শব্দে এসে বেনওয়া সায়েবের ফরাসি নৌকা বানচাল হয়ে গেল। 'আশ্রম' শব্দটা ফরাসিতে লিখবেন কি প্রকারে, অথচ ফরাসি ভাষায় 'আশ্রম' জাতীয় কোনো শব্দ নেই। আমি বললুম, 'প্যারিস শহর আর ব্রহ্মচর্যাশ্রম যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দুই প্রান্তে অবস্থিত—অন্তত ভাবলোকে—সে কথা সবাই জানে, তবু—ইত্যাদি।' বেনওয়া সায়েব ফরাসি কায়দায় শোলডার শ্রাগ করে বললেন, 'উঁহু বদহজম হবে।' সায়েব শেষটায় কি করে জাতরক্ষা আর পেট ভরানোর দ্বন্দ্ব সমাধান করেছিলেন সে কথাটা এতদিন বাদে আজ আমার আর মনে নেই।

অর্থাভাববশত একদা আমাকে কিছুদিনের জন্য এক ইংরেজ ব্যবসায়ীর ফ্রান্সাগত ফরাসি চিঠি-পত্রের অনুবাদ করে দিতে হয়েছিল। মনে পড়ছে, কারবারে ফরাসি পক্ষ হামেশাই ইংরেজ পক্ষকে দোষারোপ করতো যে ইংরেজ অনেক সময় আপন অভিসন্ধি সাফ সাফ বলে না। ইংরেজি ভাষায় শব্দসম্পদ প্রচুর বলে ইচ্ছে করলেই আপন বক্তব্য ঘোলাটে, আব্‌ছা আব্‌ছা করে লেখা যায়। ফরাসিতে সেটি হবার জো নেই। যা বলার সেটা পরিষ্কার হয়ে বেরবেই বেরবে (লক্ষ্য করে থাকবেন কাচ্চাবাচ্চার শব্দ-সম্পদ সীমাবদ্ধ বলে তাদের কথায় সব জিনিসই হয় কালো নয় ধলা, সব কিছুই পরিষ্কার, কোনো প্রকারের হাফটোন নেই)। তাই ফরাসি এই চিঠিপত্র লেনদেনের ব্যাপারে পড়লো বিপদে।

কিন্তু ফরাসিরাও গম যব দিয়ে দিয়ে লেখাপড়া শেখে না। তাই শেষটায় ফরাসি কারবারি হুমকি দিল, সে ইংরেজ রেখে চিঠি-পত্র ইংরিজিতে লেখাবে। ইংরেজ হন্তদন্ত হয়ে চিঠি লিখল, 'সে কি কথা, আপনাদের বহুৎ তকলিফ হবে, বড্ড বেশি বাজে খর্চা হবে, এমন কম্ম করতে নেই।'

তখন একটা সমঝাওতা হল।

* * *

Gepaeckaufbewahrungstelle !

শব্দটা শুনে মূর্ছা যাই আর কি!

প্রথমবার বার্লিন যাচ্ছি, জর্মন ভাষার জানি শুধু ব্যাকরণ, আর কণ্ঠস্থ আছে হাইনরিশ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাইনের গুটিকয়েক মোলায়েম প্রেমের কবিতা। সে-রেস্ত দিয়ে তো বার্লিন শহরে বেসাতি করা যায় না। তাই একজন ফরাসি সহযাত্রীকে ট্রেনে বার্লিন পৌঁছবার কিছু আগে জিজ্ঞেস করলুম, 'ক্লোক-রুম' বা 'লেফট-লগেজ-অফিসের' জর্মন প্রতিশব্দ কি? বললেন—

Gepaeckaufbewahrungstelle !

প্রথম ধাক্কায়ই এ-রকম আড়াইগজী শব্দ মুখস্থ করতে পারবো, সে দুরাশা আমি করি নি। মসিয়োও আঁচতে পারলেন বেদনাটা—একখানা কাগজে টুকে দিলেন শব্দটা। তাই দেখালুম বার্লিন স্টেশনের এক পোর্টারকে। মাল সেখানে রেখে একদা হোটেল খুঁজে নিলুম। ভাগ্যিস 'হোটেল' কথাটা আন্তর্জাতিক—না হলে ক্লোক-রুমের তুলনায় হোটেলের সাইজ যখন পঞ্চাশগুণ বড় তখন শব্দটা পঞ্চাশগুণ লম্বা হত বই কি।

জর্মন ভাষার এই হল বৈশিষ্ট্য। জর্মন ইংরিজির মত দিল-দরিয়া হয়ে যত্রতত্র শব্দ কুড়োতে পারে না, আবার ফরাসির মত শব্দতাত্ত্বিক বাত-ব্যামোও তার এমন ভয়ঙ্কর মারাত্মক নয় যে উবু হয়ে দু'একটা নিত্যপ্রয়োজনীয় শব্দ কুড়োতে না পারে। শব্দ সঞ্চয় বাবদে জর্মন ইংরেজি ও ফরাসির মাঝখানে। তার সম্প্রসারণক্ষমতা বেশ খানিকটা আছে; কিন্তু ইংরিজি রবারের মত তাকে যত খুশি টেনে লম্বা করা যায় না।

জর্মন ভাষার আসল জোর তার সমাস বানাবার কৌশলে আর সেখানে জর্মনের মত উদার ভাষা উপস্থিত পৃথিবীতে কমই আছে।

এই যে উপরের শব্দটা শুনে বিদগ্ধ পাঠক পর্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলেন সেইটেই নিন। Gepaeck অর্থ যা প্যাক করা যায়, অর্থাৎ লাগেজ, aufbewahrung অর্থ তদারকি করা (ইংরিজি beware কথা থেকে bewahrung); আর stelle কথার অর্থ জায়গা। একুনে হল 'লাগেজ তদারকির জায়গা'। জর্মন সবকটা শব্দকে আলাদা আলাদা রূপে বিলক্ষণ চেনে বলেই সমাসটার দৈর্ঘ্য তাকে কিঞ্চিৎমাত্র বিচলিত করে না।

তুলনা দিয়ে বক্তব্যটা খোলসা করি।

"কিংকর্তব্যবিমূঢ়" কথাটার সামনে আমরা মোটেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হই নে। তার কারণ, কর্তব্য আর বিমূঢ় আমরাই হামেশাই ব্যবহার করি আর কিং কথাটার সঙ্গেও আমাদের ঈষৎ মুখ চেনাচেনি আছে। কাজেই সমাসটা ব্যবহার করার জন্য আমাদের বড্ড বেশি 'প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে'র প্রয়োজন হয় না। যারা সামান্যতম বাঙলা জানে না তাদের কথা হচ্ছে না, তারা 'নিত্যসা ফতেনা দিয়ামা' করে এবং ঘৃত-তৈল-লবণ-তণ্ডুল-বস্ত্র-ইন্ধনের সামনে ঘরপোড়া গোরুর মত সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায়।

বড্ড বেশি লম্বা সমাস অবিশ্যি কাজের সুবিধে করে দেয় না। তাই যারা সমাস বানাবার জন্যই সমাস বানায় তাদের কচকচানি নিয়ে আমরা ঠাট্টা-মস্করা করি। জর্মনরাও করে। রাজনৈতিক বিসমার্ক পর্যন্ত সমাস বানাবার বাই নিয়ে ঠাট্টা করতে কসুর করেন নি। 'ড্রগিস্ট' শব্দটা জর্মনে চলে, কিন্তু তার একটা উৎকট জর্মন সমাস স্বয়ং বিসমার্ক বানিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

Gesundheitswiederherstellungsmittelzusammen mischungverhaeltnisskundiger.

টুকরো টুকরো করলে অর্থ হয়; 'স্বাস্থ্য', 'পুনরায় দান', 'সর্বভৈষজ', 'একসঙ্গে মেশানোর তত্ত্বজ্ঞান'। একুনে হবে 'স্বাস্থ্যপুনরদানসর্বভৈষজসংমিশ্রণশাস্ত্রজ্ঞ'।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

(সমাসটায় কোনো ভুল থেকে গেলে বিদগ্ধ পাঠক বিরক্ত হবেন না—আমার সংস্কৃতজ্ঞান 'নিত্যসা ফতেনা' জাতীয়)।

সংস্কৃত ভাষা সমাস বানানোতে সুপটু, সে-কথা আমরা সবাই জানি এবং প্রয়োজনমতো আমরা সংস্কৃত থেকে সমাস নিই, কিন্তু নতুন সমাস যদি বা আমরা বানাই তবু কেমন যেন আধুনিক বাংলায় চালু হতে চায় না। 'আলোকচিত্র', 'যাদুঘর', 'হাওয়া-গাড়ি' কিছুতেই চললো না।—ইংরিজি কথাগুলোই শেষপর্যন্ত ঠেলে ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢুকে আসন জাঁকিয়ে বসলো। দ্বিজেন্দ্রনাথ নির্মিত automobile কথার 'স্বতশ্চলশকট' সমাসটা চালানোর ভরসা আমরা অবশ্য কোনো কালেই করি নি।

বিশেষ করে এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই এ প্রস্তাবটি আমি উত্থাপন করেছি—এবং এতক্ষণ ধরে তারই পটভূমিকা নির্মাণ করলুম।

ভাষাকে জোরালো করার জন্য যে অকাতরে বিদেশী শব্দ গ্রহণ করতে হয়, সেকথা অনেকেই মেনে নেন, কিন্তু আপন ভাষারই দুটো কিংবা তারও বেশি শব্দ একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে যে তৃতীয় শব্দ নির্মাণ করে ভাষার শব্দভাণ্ডার বাড়ানো যায় সে দিকে সচরাচর কারো খেয়াল যায় না।

এই সমাস বাড়ানোর প্রবৃত্তি এবং ক্ষমতা কোনো কোনো ভাষার নেই। ইংরিজি ফরাসি কেঁদে-কুকিয়ে দৈবাৎ দু'একটা সমাস বানাতে পারে—যথা 'হাইব্রাও', 'রাঁদেভু'। এ প্রবৃত্তি যে ভাষার নেই, তার ঘাড়ে এটা জোর করে চাপানো যায় না।

বাংলার আছে, কিন্তু মরমর। এখানে শুদ্ধ সংস্কৃত সমাসের কথা হচ্ছে না—সে তো আমরা নিইই—আমি খাঁটি বাংলা সমাসের কথা ভাবছি। হুতোমের আমলেও অশিক্ষিত বাঙালি খাঁটি বাঙলা শব্দ দিয়ে খাস সমাস বানাতো। মেছুনি ডাকছে, "ও-'গামছা-কাঁধে', দাঁড়া, ঐ হোথায় 'খ্যাংরা-গোঁপো' তোর সঙ্গে কথা কইতে চায়।"

একেই বলে সমাস। চট করে ছবিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

কিন্তু আজকালকার লেখকেরা এরকম সমাসের দিকে নজর দেন না, নতুন সমাস গড়বার তকলিফ বরদাস্ত করতে তো তাঁরা বিলকুল নারাজ বটেনই। সমাস বানাবার প্রবৃত্তিটা অনাদরে ক্রমেই লোপ পেয়ে যাচ্ছে, কারণ লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকেরা যদি দিশী সমাসকে আপন লেখনে স্থান না দেন, তবে ক্রমে ক্রমে গোটা প্রবৃত্তিটা বেমালুম লোপ পায়—যে-রকম বাউল-ভাটিয়ালী সাহিত্যিকদের কাছে সম্মান পাচ্ছে না বলে ক্রমেই উপে যাচ্ছে—পরে যখন হুঁশ হয় ততদিনে ভাষায় লড়াইয়ের একখানা উমদা-সে উমদা হাতিয়ার অবহেলায় মর্চে ধরে শেষ হয়ে গেছে। তখন শুধু মাথা-চাপড়ানো আর কান্নাকাটি।

রবীন্দ্রনাথ এ তত্ত্বটা শেষ বয়সে বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেই শেষ রাতেই ওস্তাদের মার দেখিয়ে গিয়েছেন ঃ—

'ডাকছে থাকি থাকি
ঘুমহারা কোন্ 'নাম-না-জানা' পাখি,
দক্ষিণের 'দোলা-লাগা', 'পাখি-জাগা'
বসন্ত প্রভাতে'

তাই বলি বাঙলা ভাষা 'লক্ষ্মীছাড়া', 'হতভাগা' নয়! শুধু হাতির মত আমরা নিজেদের তাগদ জানি নে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মার্জারনিধন কাব্য
বা
গুরবে ফুশ্ তন শব-ই আওওয়ল

কোন্ দেবে পূজা করি কোন্ শীর্নী ধরি?
গণপতি, মৌলা-আলী, ধূর্জটি, শ্রীহরি?
মুশকিল্-আসান্ আর মুর্শিদ মস্তান্
কোম্পানি কি মহারানী, ইংরেজ, শয়তান?
হিন্দুস্থান, পাকিস্তান, যেবা আছ যথা
ইস্পাহানী, ডালমিঞা—কলির দেবতা।
সবারে স্মরণ করি সিতুমিঞা ভনে
বেদরদ বেধড়ক ভয় নাহি মনে॥

ইরান দেশের কেচ্ছা শোন সাধুজন
বেহদ্ রঙীন কেচ্ছা, বহুৎ বরণ।
এস্তার তালিম পাবে করিলে খেয়াল
রোশনী আসিবে দিলে ভাঙিয়া দেয়াল।
পুরানা যদিও কেচ্ছা তবু হর্বকৎ
সমঝাইয়া দিবে নয়া হাল হকীকৎ॥

ইরান দেশেতে ছিল যমজ তরুণী।
ইয়া রঙ, ইয়া ঢঙ, নানা গুণে গুণী।
কোথায় লায়লী লাগে কোথায় শিরীন
চোখেতে বিজলী খেলে ঠোঁটে বাজে বীণ।
ওড়না দুলায়ে যবে দুই বোন যায়
কলিজা আছাড় খায় জোড়া রাঙা পায়।
এ্যাসা পীরিতি তোলে ফকিরেরও জানে
বেহুঁশ হইয়া লোক তারীফ বাখানে।
দৌলতও আছিল বটে বিস্তরে বিস্তর
বাপ দাদা রাখি গেলা চাকর-নফর।
ধন জন ঘর বাড়ি তালাব খামার
টাকা কড়ি জওয়াহর এস্তারে এস্তার।
তাই দুই নারী চায় থাকিতে আজাদ
কলঙ্কের ভয়ে শুধু বিয়ে হৈল সাধ।
তখন সে করিল শর্ত সে বড় অদ্ভুত
সে শর্ত শুনিলে ডর পায় যমদূত।

www.BanglaBook.org

বলে কিনা প্রতি ভোরে মিঞার গর্দনে
পঞ্চাশ পয়জার মারি রাখিবে শাসনে!
এ বড় তাজ্জব বাৎ বেতালা বদ্‌খদ্‌
এ শর্ত মানিবে কেবা হয় যদি মর্দ্‌?
দুল্‌হা বরেতে ছিল পাড়া ছয়লাপ
শর্ত শুনে পত্রপাঠ হয়ে গেল সাফ।
সিতু মিঞা বলে সাধু এ বড় কৌতুক
মন দিয়া কেচ্ছা শোনো পাবে দিলে সুখ॥

শীত গেল বর্ষা গেল আসিল বাহার
ফুলে গুলে ইস্‌ফাহান হৈল গুলজার।
শীরাজ তব্রীজ আর আজর বৈজান
খুশিতে ভরপুর ভেল জমিন আসমান।
শুধু দুই ভাই নাম ফিরোজ মতীন
পেটের ধান্দায় মরে দুঃখে কাটে দিন।
অবশেষে ছোট ভাই বলে ফিরোজেরে
"কি করে বাঁচিবে বলো, কি হবে আখেরে।
তার চেয়ে জুতা ভালো চলো দুই জনে
শাদী করি পেট ভরি দু মেয়ের সনে।"
দুআভুআ ফিরোজের মন মাঝে হয়
শাদীতে আয়েশ বটে জুতারও তো ভয়।
হদীসের লাগি ঘাঁটে কুরান পুরাণ
দীন সিতু মিঞা ভণে শুনে পুণ্যবান।।

মজলিস জৌলুস করি দুনিয়া রওশন
জোড়া শাদী হয়ে গেল খুশ ত্রিভুবন।
চলি গেলা দুই ভাই ভিন্ন হাবেলিতে
মগ্ন হইলা মত্ত হইলা রসের কেলিতে।
পয়জারের ভয়ে নারি করিতে বয়ান
সিতু ভণে চুপিসাড়ে শুনে পুণ্যবান॥

তিন মাস পরে বুঝি খুদার কুদ্রতে
আচম্বিতে দু ভায়েতে দেখা হল পথে।
কোলাকুলি গলাগলি গিনা কলিজায়
মরি মরি মেলামেলি করে দুজনায়।

www.BanglaBook.org

"তোমার মাথায় টাক নেই কেন?"
শুধায় ফিরোজ ভাই
মানিয়া তাজ্জব উত্তরে মতীন
"টাক কেন বলো তাই?"
কাঁচুমাচু হয়ে পুছিল ফিরোজ
"জোরে কি মারে না চটি"
"আরে দুত্তোর হিম্মত কাহার
আমি কি তেমনি বটি?
বাখানিয়া বলি শোন কান পেতে
তরতিব কাহারে কয়।
আজব দুনিয়া আজব চিড়িয়া
মামেলা ঝামেলা ময়।
তাই বসিলাম তলওয়ার হাতে
বীবী দিলা খানা আনি
কোর্মা পোলাও তন্দুরী মুর্গী
ঢাকাই বাখরখানী।
খানা আইল যেই বীবীর পেয়ারা
বিড়াল আসিল সাথে
যেই না করিল মরমিয়া 'ম্যাঁও'
খাপটা না তুল্যা হাতে,—
খুল্যা তলোয়ার এক কোপে কাট্যা
ফালাইনু কল্লাডারে
তাজ্জব বীবী আক্কেল গুড়ুম
জবানে রা'টি না কাড়ে।
গুস্‌সা কৈরা কই 'এসব না সই
মেজাজ বহুৎ কড়া
বরদাস্ত নাই বিলকুল আমার
তবিয়ৎ আগুনে গড়া।'
তার পর কার ঘাড়ে দুইডা মাথা
করিবে যে তেড়িমেড়ি?"
সিতু মিঞা কয় নিশ্চয় নিশ্চয়
বাঘিনী পরিল বেড়ি।

"ক্যাবাৎ", "ক্যাবাৎ" বলি হাওয়া করি ভর
চলিলা ফিরোজ মিঞা পৌঁছি গেলা ঘর।
মিলেছে দাওয়াই আর আন্দেশা তো নাই

www.BanglaBook.org

খুদার কুদ্রতে ছিল তালেবর ভাই।
তার পর শোনো কেচ্ছা শোনো সাধুজন
ঠাস্যা দিল সেই দাওয়া পুলকিত মন।
সে রাতে খানার ওক্তে খুল্যা তলোয়ার
কাট্যা না ফালাইল মিঞা কল্লা বিল্লিডার।
চক্ষু দুইডা রাঙ্গা কর‍্যা হুঙকারিয়া কয়
"তবিয়ৎ আমার বুরা গর্বড় না সয়।
হুঁশিয়ার হয়ে থেকো নয় সর্বনাশ।"
সিতু মিঞা শুনে কয়, শাবাশ শাবাশ॥
হায়রে বিধির লেখা, হায়রে কিস্মৎ
জহর হইয়া গেল যা ছিল শর্বৎ।
ভোর না হইতে বীবী লয়ে পয়জার
মিঞার বুকেতে চড়ি কানে ধরি তার।
দমাদম মারে জুতো দাড়ি ছিঁড়ে কয়
"তবিয়ৎ তোমার বুরা, বরদাস্ত না হয়?
মেজাজ চড়েছে তব হয়েছ বজ্জাৎ?
শাবুদ করিব তোমা শুনে লও বাৎ
আজ হৈতে বেড়ে গেল রেশন তোমার
পঞ্চাশ হৈতে হৈল একশ' পয়জার।"
এত বলি মারে কিল মারে কানে টান
ইয়াল্লা ফুকারে সিতু, ভাগ্যে পুণ্যবান॥
কোথায় পাগড়ি গেল কোথায় পাজামা
হোঁচট খাইয়া পড়ে কবু দেয় হামা।
খুন ঝরে সর্ব অঙ্গে ছিঁড়ে গেছে দাড়ি
ফিরোজ পৌঁছিল শেষে মতীনের বাড়ি।
কাঁদিয়া কহিল, "ভাইয়া কি দিলি দাওয়াই
লাগাইনু কামে এবে জান যায় তাই।"
বর্ণিল তাবৎ বাৎ, মতীন শুনিল
আদর করিয়া ভায়ে কোলে তুলি নিল।
বুলাইয়া হাত মাথে বুলাইয়া দেহ
'বিড়াল মেরেছে" কয়, 'নাই তো সন্দেহ।
ব্যাকরণে তবু, দাদা, কৈলা ভুল খাঁটি।
বিলকুল বরবাদ সব গুড় হৈল মাটি।
আসলে এলেমে তুমি করোনি খেয়াল
শাদীর পয়লা রাতে বধিবে বিড়াল।"
বাণীরে বন্দিয়া বন্দিয়া বান্ধিলো বয়ান
দীন সিতু মিঞা ভণে শুনে পুণ্যবান॥

www.BanglaBook.org

* * *

মল্লিনাথস্য { স্বরাজ লাভের সাথে কালোবাজারীরে
মারনি এখন তাই হাত হানো শিরে।
শাদীর পয়লা রাতে মারিবে বিড়াল
না হলে বর্বাদ সব, তাবৎ পয়মাল।। *

বেদে

ঝাড়া বিয়াল্লিশ বছর মিশরে চাকরি করার পর ইংরেজ রাস্‌ল্ পাশা (পাশা খেতাবটি তিনি মিশরীয় সরকারের কাছ থেকে পান) একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ লিখেছেন। সা'দ জগলুল পাশা থেকে আরম্ভ করে বহু বাঘ বহুৎ চিড়িয়ার সঙ্গে তাঁর বিস্তর যোগাযোগের ফলে এই কেতাবখানি লেখা হয়েছে।

এমন কি বেদেরাও এ বইয়ে বাদ পড়ে নি। রাস্‌ল্ পাশার মতে মিশরের বেদেরা আসলে ভারতীয়। শুধু তাই নয়, রাস্‌ল্ পাশা পৃথিবীর আর সব পণ্ডিতদের সঙ্গে একমত হয়ে বলেছেন, পৃথিবীর সব বেদেরই ভাষা নাকি আসলে ভারতীয়—তা সে ইয়োরোপীয় বেদেই হোক্ আর চীনে বেদেই হোক্।

পণ্ডিত নই, তাই চট্ করে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। ইয়োরোপীয় বেদেরা ফর্সায় প্রায় ইংরেজের শামিল, সিংহলের বেদে ঘনশ্যাম। আচার-ব্যবহারেও বিস্তর পার্থক্য, বহুৎ ফারাক। আরবিস্থানের বেদেরা কথায় কথায় ছোরা বের করে, জর্মনীর বেদেরা ঘুষি ওঁচায় বটে, কিন্তু শেষটায় বখেড়ার ফৈসালা হয় বিয়ারের বোতল টেনে। চীন দেশের বেদেরা নাকি রূপালি ঝরণাতলায় সোনালী চাঁদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চুকুস্ চুকুস্ করে সবুজ চা চাখে।

তবু আজ স্বীকার করি গুণীরাই হক্ কথা বলেছেন।।

* * *

আমার বয়স তখন পঁচিশ-ছাব্বিশ। আজ যেখানে জর্মনীর রাজধানী, সেই সাদা-মাটা বন্ (Bonn) শহরে আমি তখন কলেজ যাই। এগারোটার ঝোঁকে কলেজের পাশের কাফেতে বসে এক পাত্র কফি খাই। ও সময়টায় বনের মত আধা-ঘুমন্ত পুরীর কাফেতে খদ্দেরের ঝামেলা লাগে না। খদ্দের বলতে নিতান্ত আমারই মত দু'একটি কফি-কাতর প্রাণী।

সেদিনও তাই। আমি এক কোণে কফি সাঙ্ক করে উঠি-উঠি করছি, এমন সময় অন্য কোণের কাউন্টারে, আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল এসে এক বেদিনী। গোলাপী স্কার্ট, বেগুনি ব্লাউজ, লাল-নীলে ডোরা-কাটা স্কার্ফ, মিশকালো খোঁপাবাঁধা চুল। কেক্ আর কফির গুঁড়ো কিনতে এসেছে।

---

* ইরানে এ কাহিনী সবিস্তরে বলা হয় না। শুধু বলা হয়, 'গুরবে কুশতন, শব-ই আওওয়ল' অর্থাৎ গুরবে=বিড়াল, কুশতন=মারা, শব=রাত্রি, আওওয়ল=প্রথম। সোজা বাঙলার 'পয়লা রাতেই মারবে বিড়াল।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সওদা শেষ হয়ে গেলে পর যখন সে ঘুরে দাঁড়াল তখন হঠাৎ তার চোখ পড়ল আমার উপর। প্রথমটায় থ হয়ে তাকিয়ে রইল প্যাট প্যাট করে। তারপর কি এক বিজাতীয় ভাষায় চিৎকার করে সোল্লাসে এগিয়ে এল আমার দিকে। টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে উত্তেজনায় সর্বমুখ টমাটোর মত লাল করে অনর্গল বকে যেতে লাগল সেই 'যাবনিক' ভাষায়। সে ভাষা আমার চেনা-অচেনা কোনো ভাষারই চৌহদ্দি মাড়ায় না, কিন্তু শোনালো—তারই মুখের মত—মিষ্টি।

আমি জর্মনে বললুম, 'আমি তো আপনার ভাষা বুঝতে পারছি নে।'

মেয়েটি মুখ করল আরও লাল। বুঝলুম, চটেছে। ফের চলল সেই তুবড়ি বাজী—সেই বিজাতীয় বুলিতে। কিছুতেই জর্মন বলতে রাজী হয় না।

আমি কাতর হয়ে কাফের মালিককে বললুম, 'একে বুঝিয়ে বলুন না, আমি ভারতীয়। এর ভাষা বুঝতে পারছি নে।'

আমার সকরুণ নিবেদনটা শেষ হওয়ার পূর্বেই মেয়েটা হুঙ্কার দিয়ে কাফেওয়ালাকে পরিষ্কার জর্মনে বলল, 'সেই কথাই তো হচ্ছে। আমরা বেদে, ভারতবর্ষ আমাদের আদিম ভূমি। এও ভারতীয়। আমার জাত-ভাই। ভদ্রলোক সেজেছে, তাই আমার সঙ্গে কথা কইতে চায় না।'

আমি আর কি বলব? পণ্ডিতেরাও তো এই মতই পোষণ করে। তবু বললুম, 'কিন্তু সত্যি বলছি, আমি আপনার ভাষা বুঝতে পারছি নে।'

চোখে-মুখে—এমন কি আমার মনে হল চুলে পর্যন্ত—ঘেন্না মেখে মেয়েটা গটগট করে কাফে থেকে বেরিয়ে গেল। আমি বোকা বনে তাকিয়ে রইলুম।

কয়েক মিনিট পরে জানলার দিকে নজর যেতে দেখি সেই মেয়েটি আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কফির দাম পূর্বেই চুকিয়ে দিয়েছিলুম—চুপ করে বেরিয়ে পড়ে তার মুখোমুখি হলুম।

ধবধবে দাঁতে হাসির ঝিলিক লাগিয়ে আমায় অভ্যর্থনা করে নিয়ে বললো—দুত্তোর ছাই আমার সেই বিজাতীয় ভাষায়—কি বললো, খোদায় মালুম। গড় গড় করে চোখে-মুখে হাসি মেখে, সুডৌল দু'খানি বাহু দুলিয়ে, সর্বাঙ্গে সৌন্দর্যের ঢেউ তুলে।

আমি আবার জর্মনে বললাম, 'সত্যি ফ্রলাইন (কুমারী), আমি তোমার ভাষা বুঝতে পারছি নে।'

কেউটে সাপের মতো ফণা তুলে যেন আমাকে ছোবল মারতে এল। আমি তড়াক করে তিন কদম পিছিয়ে গেলুম।

হঠাৎ মেয়েটা কি যেন ভেবে নিয়ে আবার হাসিমুখে বলল, যাক্ বাঁচাল, এবার জর্মনে—'সব মানুষেরই কিছু-না-কিছু পাগলামি থাকে, তোমার বুঝি মাতৃভাষায় কথা না বলার? তা আমি সেটা সয়ে নিলুম। কিন্তু কেন এ স্নবারি, আপন ভাষাকে অবহেলা, কাফের লোকের সামনে আপন জনকে অস্বীকার করা? তাই তো তোমাকে বাইরে ডেকে আনলুম।'

আমি বললুম, 'তোমার আপন জন হতে আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু আমি তো তা নই।'

ফের ফণা তুলতে গিয়ে নিজেকে চেপে নিয়ে বলল, 'তোমার আপন জন নই আমি? দেখো দেখিনি তোমার রঙ আর আমার রঙ মিলিয়ে—একই বাদামী না? হাঁ, আমার একটু

www.BanglaBook.org

সোনালী বটে—তা সে আমি রোদবৃষ্টিতে ঘোরাঘুরি করি বলে। দেখো দিকিন চুলের রঙ—মিশকালো, ঢেউ খেলানো। নিজের চোখে দেখনি কখনো আয়না দিয়ে?—আমার চোখের রঙ তোমারই মত কালো। আর সব জর্মনদের দিকে তাকিয়ে দেখো, হাবা-গবার দল, শ্বেত কুষ্ঠের মত সাদা, মাগো!'

আমি চুপ।

বলল, 'বুঝতে পেরেছি, বাপু, বুঝতে পেরেছি; বাপ তোমার দু'পয়সা রেখে গিয়েছে—হঠাৎ-নবাব হয়েছ। এখন আর বেদে বলে পরিচয় দিতে চাও না—হাতে আবার খাতাপত্র—কলেজ যাও বুঝি? ভদ্রলোক সাজার শখ চেপেছে, না?'

আমি বললুম, 'ফ্রলাইন, তুমি ভুল বুঝেছ। আমার সাতপুরুষ লেখাপড়া করেছে, আমিও তাই করছি। ভদ্রলোক সাজা-না-সাজার কোনো কথাই উঠছে না।'

মেয়েটি এমনভাবে তাকালো যার সোজা অর্থ 'গাঁজা গুল'। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ভারতীয় নও?'

আমি বললুম, 'আলবাৎ!'

আনন্দের হাসি হেসে বলল, 'ভারতীয়েরা সব বেদে।'

আমি বললুম, 'সুন্দরী, তোমরা ভারতবর্ষ ছেড়েছ হাজার দু'হাজার বছর কিংবা তারও পূর্বে। বাদবাকি ভারতীয়রা এখনো গেরস্থালী করে।'

কিছুতেই বিশ্বাস করে না। বলল, 'তোমার সঙ্গে আর কাঁহাতক খামকা তর্ক করি। তার চেয়ে চলো আমার সঙ্গে। আমাদের সার্কাসের গাড়ি শহরের বাইরে রেখে এসেছি। বাবা, মা সেখানে। তোমাকে পেলে ভারি খুশি হবেন। তাঁদের সঙ্গে তর্ক করো। তখন বুঝবে ঠ্যালা কারে কয়। বাবা সব জানে। কাচের গোলার দিকে তাকিয়ে তোমাকে সব বাৎলে দেবে।'

অনেকক্ষণ ধরে এ রকম ধারা কথা হয়েছিল। আমি কিছুতেই বোঝাতে পারলুম না, আমি বেদে নই, স্লব নই, সাদা-মাটা ভারতীয়।

* * *

এ-কথাটা কিন্তু সেদিন সাফ বুঝে গেলুম, দু'হাজার কিংবা তার বেশি বছর ধরে যাদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি তারা যদি বিদেশ-বিভুঁইয়ে দেখামাত্র আমাকে ডাক দিয়ে বলে, 'তুমি আমাদের আপন জন', তখন কি করে বুক ঠুকে বলি—যদিও জানি, আজ আমাদের ভাষা আলাদা, আচার-ব্যবহার আলাদা—যে ওরা ভারতীয় নয়?

ভাষাতত্ত্ব

প্যারিসে রেস্তরাঁয় বসে আছি। নিতান্ত একা; যাঁদের আসবার কথা ছিল তাঁরা আসেন নি। এমন সময় একটি অতি সুপুরুষ এসে আমারই টেবিলের একখানা শূন্য চেয়ারে আসন গ্রহণ করলেন—অবশ্য প্রথমে ফরাসি কায়দায় বাও করে, আমার অনুমতি নিয়ে।

নিতান্ত মুখোমুখি তদুপরি কাত্তিকের মত চেহারাখানা—বার বার আমার মুগ্ধ চোখ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাঁর চেহারার দিকে ধাওয়া করছিল। তিনিও নিশ্চয়ই এ রকম পরিস্থিতিতে জীবনে আরো বহুবার পড়েছেন। কি করতে হয় সেটা তাঁর রপ্ত আছে।

সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বলছেন, 'ইচ্ছে করুন।'

আমি ধন্যবাদ জানালুম।

জিজ্ঞেস করলেন, 'ফরাসিটা বলতে পারেন তো? আমি তো আর কোনো ভাষা জানি নে।'

আমি বললুম, 'ফরাসি ভাষাটা সব সময় ঠিক বুঝতে পারি কি না বলা একটু কঠিন। এই মনে করুন, কোনো সুন্দরী যখন প্রেমের আভাস দিয়ে কিছু বলেন, তখন ঠিক বুঝতে পারি আবার যখন ল্যান্ডলেডি ভাড়ার জন্যে তাগাদা দেন তখন হঠাৎ আমার তাবৎ ফরাসি ভাষাজ্ঞান বিলকুল লোপ পায়।'

উচ্চাঙ্গের রসবিকাশ হল না সে কথা আমার সুরসিক পাঠকেরা বুঝতে পেরে নিশ্চয়ই একটুখানি স্মিতহাস্য করবেন। আমিও এ-কথা জানি, কিন্তু বিদেশে যখন মানুষ নিতান্ত একা পড়ে এবং রাম, শ্যাম যে-কোনো কারোর সঙ্গে বন্ধুত্ব জমাতে চায় তখন ঐ হল একমাত্র পন্থা, অর্থাৎ তখন কাঁচা, পাকা যে-কোনো প্রকারের রসিকতা করে বোঝাতে হয় যে, আমি তখন সঙ্গ-সুখলিপ্সু।

ফরাসি ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'দেশভ্রমণ বড় ভাল জিনিস। বিদেশে ভাষা নিয়ে এ ভানটা অনায়াসে করা যায়। আমি করি কি প্রকারে? আমি যে ফরাসি সে তো আর বেশিক্ষণ লুকিয়ে রাখতে পারি নে।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'সে না হয় হল। কিন্তু বলুন তো, শব্দার্থ আপনি ঠিক ঠিক বুঝতে শিখেছেন? এই যদি আমি বলি যে, আমি "জার্নালিস্ট" তাহলে তার মানে কি হল?'

একগাল হেসে বললুম, 'তা আর জানি নে? তার মানে হল আপনি খবরের কাগজে লেখেন।'

'উঁহু হল না। ঠিক তার উল্টো; আমি লিখি নে। সে কথা যাক। আরেকটি উদাহরণ দি। আমি যদি বলি, "আচ্ছা তা হলে আরেকদিন দেখা হবে", তবে তার মানে কি?'

আমি এবারে আরেক গাল আর হাসলুম না; বললুম, 'তার মানে আরেক দিন দেখা হবে, এতে আর অস্পষ্টতাটা কোথায়?'

বললেন, 'ফেল্!' তার মানে হল, 'আপনি এবারে দয়া করে গাত্রোৎপাটন করুন"।

আমি খুশি হয়ে বললুম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরাও যখন বাঙলায় বলি, "এবার তুমি এসো" তখন তার অর্থ "তুমি এবারে কেটে পড়ো"।'

"ঠিক ধরেছেন। তাই বলছিলুম, আমি জার্নালিস্ট; কিন্তু না-লেখার জন্য লোকে পয়সা দেয়। খুলে কই।

'এই ধরুন কয়েক মাস আগে খবর পেলুম, আমাদের ডাকসাইটে রাজনৈতিক মসিয়ো অনুস্বার একটি রমণীর সঙ্গে ঢলাঢলি করছেন। ওদিকে বাজারে তাঁর সুনাম আর খ্যাতি অতিশয় ধর্মভীরুরূপে—কোথায় জানি নে গির্জে মেরামত করে দিয়েছেন, কোন্ সেন্টের জন্মদিনে জাব্বাজোব্বা পরে পরবে পয়লা নম্বরী বনেছিলেন এইরকম ধারা কত কি? আমি খবরটা শুনে বললুম, "বটেরে স্যাঙাৎ, দাঁড়াও তোমাকে দেখাচ্ছি।'

www.BanglaBook.org

'করলুম কি, লাগলুম তত্ত্ব-তাবাশে। ডাক্তাররা নাকি এক্স-রে দিয়ে পেটের মধ্যিখানের ছবি তোলেন? স্রেফ গাঁজা; তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি নাড়ীভুঁড়ির খবর মেলে কয়েক আউন্স রূপো ঢেলে, সোনা ঢাললে তার চেয়েও ভালো।

'সেই নর্তকীর নামধাম সাকিন ঠিকানা হাড়হদ্দের তাবৎ খবর পেয়ে গেলুম এক হপ্তার ভিতর।'

সিগারেট ধরাবার জন্য কথা বন্ধ করে একটুখানি ভেবে নিয়ে বললেন, 'কিন্তু এ কর্মে একটুখানি খাবসুরৎ হতে হয়। আমি—' বলে থামলেন।

আমি বললুম, 'আপনার চেহারা সম্বন্ধে কি আর বলব—'

বাধা দিয়ে বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ। তারপর করলুম কি জানেন, একপ্রস্ত উত্তম সুট পরে, গোঁফে আতর মেখে লেগে গেলুম নর্তকীর পিছনে। প্রেমের কবিতাগুলো ঝালিয়ে নিলুম আচ্ছা করে, টাঙ্গো ওয়ালটস নাচের নবীনতম "অবদানগুলা" রপ্ত করে নিয়ে দিলুম হানা। জানতুম, রাজনৈতিক মসিয়ো অনুস্বারের টাকার জোয়ারের উপর আমি থাড্ডে কেলাস খোলামকুচি, কোথায় ভেসে যাব কেউ পাত্তাটি পাবে না, কিন্তু খোলামকুচি না হয়ে যদি পদ্মফুল হই—চেহারাটা বিবেচনা করুন—তা হলে নর্তকী কি একটুখানি মোলায়েম হবে না?

'আমি অবিশ্যি নর্তকীকে প্রিয়ারূপে চিরকালের জন্য জিতে নিতে চাই নি। মসিয়ো অনুস্বার তাকে নিয়ে প্রেমসে প্রেমের ঢলাঢলি করুন আমার তাতে নস্যি। আমি শুধু চাই একটুখানি খবর।

'কিছুটা ভাবসাব হয়ে যাবার পর আমি আভাসে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলুম যে, তিনি যদি অন্য সূত্র থেকে অর্থাৎ অনুস্বারের কাছ থেকে টাকা মারেন তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। তিনি দু ঘোড়া না চড়ে আড়াই শ'টা চড়ুন আমি আপনাদের দেশের ফকিরের মত নির্বিকার। আমি একটুখানি প্রেমেই খুশি।

'কাজেই আস্তে আস্তে প্রেমের নেশায় বানচাল হয়ে নর্তকী খবর দিয়ে ফেললেন, কোন্ হোটেলে কবে তাঁরা গোপনে স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করেছেন, কোন্ ইয়েটে কবে ক'দিন ক'রাত্তির কাটিয়েছেন। সেই খেই ধরে তাবৎ গোপনীয় খবর যোগাড় করে গেলুম, অনুস্বারের কাছে। তাঁকে বললুম, "নিছক সাহিত্যের খাতিরে আমি তাঁর জীবনী লিখতে চাই, তাতে অবশ্য নর্তকী সম্পর্কীয় কিঞ্চিৎ প্রামাণিক সংবাদও থাকবে। তবে কিনা, কিছু অর্থ পেলে আমি এসব ছাপবো না।"

অনুস্বার জউরি এবং ঘড়েল লোক। যেসব হোটেলে জাল সই করেছেন তার ফোটোগ্রাফ দেখে বুঝলেন আমিও কাঁচা নই।

তারপর বললেন, 'লিখি নি বলেই তো টাকা পেলুম, হাজার দশেক। যাক্‌গে, এখন আমি চললুম।'

ব্যাপারটা বুঝতে আমার মিনিট খানেক লাগল। তখন ছুটে গিয়ে তাঁকে বললুম, 'এটা কি তবে ব্ল্যাক-মেলিং হল না?'

হেসে বললেন, 'অর্থাৎ "না-লিখিয়ে জার্নালিস্ট"। তাই তো বলছিলুম, ভাষা জিনিসটে অদ্ভুত।'

আমি স্বয়ং জার্নালিস্ট—আঁৎকে উঠলুম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সিনিয়ার এপ্রেন্টিস্

কোনো কোনো ধর্মগ্রন্থ যত পুরনো হয় তাদের কদর ততই বেড়ে যায়। নতুন যুগের লোক সে সব গ্রন্থ থেকে নতুন সমস্যার অতি প্রাচীন এবং চিরন্তন সমাধান পায় বলে তারা সব কেতাবকে অনায়াসে হার মানায়। শুধু ধর্মগ্রন্থ নয়, কোনো কোনো গল্পও অজরামর হয়ে থাকে ঐ একই কারণে। তারই একটা অতি মর্মান্তিকভাবে কাল মনে পড়ে গেল—কুড়িটি টাকা জেবে নিয়ে বাজার ঘুরে এলুম, ধুতি পেলুম না। গল্পটি হয়ত অনেকেই জানেন—তাঁরা অপরাধ নেবেন না।

গণেশ বেচারী এপ্রেনটিস্ মাইনে পায় না। কাজ শিখছে, এর ধাঁতানি ওর গুঁতানি চাঁদপানা মুখ করে সয়। আশা, একদিন পাকাপাকি চাকরি, মাইনে সব কিছুই পাবে। চাকরি খালি পড়লও, কিন্তু বড়বাবু সেটা দিয়ে দিলেন তাঁর শালীর ছেলেকে—সে কখনো এপ্রেন্টিসি করে নি। বড়বাবু গণেশকে ডেকে বললেন, 'বাবা গণেশ, কিছু মনে করো না; এ চাকরিটা নিতান্তই অন্য একজনকে দিয়ে দিতে হল। আসছেটা তোমাকে দেব নিশ্চয়ই।'

কাকস্য পরিবেদনা, আবার চাকরি খালি পড়ল, বড়বাবু ফের ফক্কিকারি মারলেন, গণেশকে ডেকে আবার মিষ্টি কথায় চিঁড়ে ভেজালেন। এমনি করে দেদার চাকরি গণেশের সামনে দিয়ে ভেসে গেল, তার এপ্রেন্টিসির আঁকশি দিয়ে একটাকেও ধরতে পারল না। শেষের দিকে বড়বাবু আর গণেশকে ডেকে বাপুরে, বাছারে বলে সান্ত্বনা মালিশ করার প্রয়োজনও বোধ করেন না।

গণেশের চোখ বসে গেছে, গাল ভেঙে গেছে, রগের চুলের দু'এক গাছায় পাক ধরলো, পরনের ধুতি ছিঁড়ে গিয়েছে, জামাটা কোনো গতিকে গায়ে ঝুলে আছে। গণেশ এ-টুলে ও-টুলে, এর কাজ, ওর ফাইফরমাস করে দেয়—আর করে করে আপিসের বেবাক কাজ তার শেখা হয়ে গেল। চাকরি কিন্তু হল না।

এমন সময় বড় সাহেব একদিন বড়বাবুকে দোতলায় ডেকে বললেন, 'আমায় একটা জরুরি রিপোর্ট লিখে আজকেরই মেল ধরতে হবে। কেউ যেন ডিস্টার্ব না করে। দরজার গোড়ায় একজন পাকা লোক বসিয়ে দাও, কাউকে যেন ঢুকতে না দেয়।'

দারোয়ানরা সেদিন করেছিল ধর্মঘট। বড়বাবু গণেশকে দিলেন দোরের সামনে বসিয়ে। বললেন, 'কিছু মনে করো না বাবা গণেশ, হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ, ইত্যাদি। গণেশ টুলে বসে ছেঁড়া ধুতিতে গিঁট দিতে লাগল।

এমন সময় নিচের রাস্তায় হৈহৈ রৈরৈ। এক বদ্ধ পাগল রাস্তা দিয়ে ছুটে যাচ্ছে, পরনে কপ্নিনটুকু পর্যন্ত নেই—ইংরেজিতে যাকে বলে 'বার্থ-ডে-সুট'—আর পিছনে রাস্তার ছোঁড়ারা তাকে লেলিয়ে লেলিয়ে খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

হবি তো হ, পাগলা করল গণেশের আপিসের দিকেই ধাওয়া। সিঁড়ি ভেঙে উপরের তলায় উঠে ঢুকতে গেল বড় সাহেবের ঘরে। গণেশ টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কিন্তু পাগলকে বাধা দিল না।

মারমার কাটকাট কাণ্ড। পাগলের পিছনে পিছনে ছোঁড়াগুলোও গিয়ে ঢুকেছে বড়সাহেবের ঘরে। চিৎকার চেঁচামেচি। পাগলা আবার সাহেবকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে ফেলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রিভলভিং-টিল্‌টিঙ চেয়ারে বসতে চায়।

তাই দেখে কেউ বদ্যি ডাকে
কেউ বা ডাকে পুলিশ,
কেউ বা বলে কামড়ে দেবে
সাবধানেতে তুলিস!

শেষটায় পুরো লালবাজার এসে ঘর সাফ করল।

সায়েব রেগে কাঁই। বড়বাবুকে ধরে তো এই-মার কি তেই-মার লাগান আর কি। বলেন, 'তুমি একটা ইডিয়েট, আর দোরে বসিয়েছিলে তোমার মত একটা ইম্বেসাইলকে। কোথায় সে, ডাকো তাকে।'

গণেশ এসে সামনে দাঁড়াল।

সায়েব মারমুখো হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইউ প্রাইজ-ইডিয়েট, পাগলকে তুমি ঠেকালে না কেন?'

গণেশ বড় বিনয়ী ছেলে। বললে, 'আমি ভেবেছিলুম, উনি আমাদের আপিসের সিনিয়র এপ্রেন্‌টিস্। আমি তো জুনিয়র, ওঁকে ঠ্যাকাবো কি করে?'

সাহেব তো সাত হাত পানিমেঁ। বললেন, 'হোয়াত্যু মীন বাই দ্যাট?'

গণেশ বললে, 'হুজুর, আমি তিন বৎসর ধরে এ আপিসে এপ্রেন্‌টিসি করছি। খেতে পাই নে, পরতে পাই নে। এই দেখুন ধুতি। ছিঁড়ে ছিঁড়ে পট্টি হয়ে গিয়েছে। লজ্জা ঢাকবার উপায় নেই। তাই যখন এঁকে দেখলুম আমাদের আপিসে ঢুকছেন, একদম অবস্তর উলঙ্গ, তখন আন্দাজ করলুম, ইনি নিশ্চয়ই এ-আপিসের সিনিয়র এপ্রেন্‌টিস্। তা না হলে তাঁর এ অবস্থা হবে কেন? এখানে এপ্রেন্‌টিসি করে করে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে সিনিয়র এপ্রেন্‌টিস্ হয়েছে।'

* * *

১৯৪৭ সালে স্বরাজ লাভ হয়। আমাদের এপ্রেন্‌টিসি তখন শুরু হয়। তখনো পরনে ধুতি ছিল, গায়ে জামা ছিল। আর আমাদের সিনিয়র এপ্রেন্‌টিস্ হওয়ার বেশি বাকি নেই। সবই আল্লার কেরামতী।

দাম্পত্য জীবন

যাঁদের ঝড়তি-পড়তি মালা কুড়িয়ে নিয়ে ভাঙিয়ে খাচ্ছি—অর্থাৎ 'পঞ্চতন্ত্র' তৈরি করছি তাঁদের সঙ্গে 'দেশে'র পাঠক-পাঠিকার যোগসূত্র স্থাপন করার বাসনা এ-অধমের প্রায়ই হয়। তাঁদেরই একজন আমার এক চীনা-বন্ধু। সত্যকার জহুরী লোক—লাওৎসে, কন-ফুৎসিয়ে টৈ-টম্বুর হয়ে আছেন। তত্ত্বালোচনা আরম্ভ হলেই শাস্ত্রবচন-ওস্তাদ্‌গ্রে। আমি যে পদে পদে হার মানি সে-কথা আর রঙ ফুলিয়ে, তুলি-বুলিয়ে বলতে হবে না।

ক্লাবের সুদূরতম প্রত্যন্ত প্রদেশে একটি নিমগাছের তলায় বসে তিনি আপিস ফাঁকি দিয়ে চা পান করেন। তাঁর কাছ থেকে আমি এস্তার এলেম হাঁসিল করেছি—তারই একটা আপিস ফাঁকি দেওয়া। কাছে পৌঁছতেই একগাল হেসে নিলেন—অর্থ সুস্পষ্ট—ছোকরা

www.BanglaBook.org

কাবেল হয়ে উঠছে। আর কদিন বাদেই আপিস-যাওয়া বিলকুল বন্ধ করে পুরো তনখা টানবে।

ইতিমধ্যে এক ইংরেজও এসে উপস্থিত।

রসালাপ আরম্ভ হল। কথায় কথায় বিবাহিত জীবন নিয়ে আলোচনা। সাহেব বললে, 'লন্ডনে একবার স্বামীদের এক আড়াই মাইল লম্বা প্রসেশন হয়েছিল, স্ত্রীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য। প্রসেশনের মাথায় ছিল এক পাঁচ ফুট লম্বা টিঙটিঙে হাড্ডি-সার ছোকরা। হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই, ছ'ফুট লম্বা ইয়া লাশ এক ঔরৎ দুমদুম করে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললে, তুমি এখানে কেন, তুমি তো আমাকে ডরাও না। চলো বাড়ি। সুড়সুড় করে ছোকরা চলে গেল সেই খাণ্ডার বউয়ের পিছনে পিছে।'

আমার চীনা বন্ধুটি আদত-মাফিক মিষ্টি মৌরী হাসি হাসলেন। সায়েব খুশি হয়ে চলে গেল।

গুটিকয়েক শুকনো নিমপাতা টেবিলের উপর ঝরে পড়ল। বন্ধু তাই দিয়ে টেবিলক্লথের উপর আল্পনা সাজাতে সাজাতে বললেন, 'কী গল্প! শুনে হাসির চেয়ে কান্না পায় বেশি।' তারপর চোখ বন্ধ করে বললেন,

'চীনা গুণী আচার্য সূ তাঁর প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থে লিখেছেন, একদা চীন দেশের পেপিং শহরে অত্যাচার-জর্জরিত স্বামীরা এক মহতী সভার আহ্বান করেন। সভার উদ্দেশ্য, কি প্রকারে নিপীড়িত স্বামীকুলকে তাঁদের খাণ্ডার গৃহিণীদের হাত থেকে উদ্ধার করা যায়?

'সভাপতির সম্মানিত আসনে বসানো হল সবচেয়ে জাঁদরেল দাড়িওয়ালা অধ্যাপক মাওলীকে। ঝাড়া ষাটটি বছর তিনি তাঁর দজ্জাল গিন্নির হাতে অশেষ অত্যাচার ভুঞ্জেছেন সে কথা সকলেরই জানা ছিল।

'ওজস্বিনী ভাষায় গম্ভীর কণ্ঠে বজ্রনির্ঘোষে বক্তার পর বক্তা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আপন আপন অভিজ্ঞতা বলে যেতে লাগলেন। স্ত্রীলোকের অত্যাচারে দেশ গেল, ঐতিহ্য গেল, ধর্ম গেল, সব গেল, চীন দেশ হটেনটটের মুল্লুকে পরিণত হতে চলল, এর একটা প্রতিকার করতেই হবে! ধন-প্রাণ, সর্বস্ব দিয়ে এ অত্যাচার ঠেকাতে হবে। এস ভাই, এক জোট হয়ে—

'এমন সময় বাড়ির দারোয়ান হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বলল, "হুজুররা একবার আসুন। আপনাদের গিন্নিরা কি করে এ সভার খবর পেয়ে ঝাঁটা, ছেঁড়া জুতো, ভাঙা ছাতা ইত্যাদি যাবতীয় মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এদিকে ধাওয়া করে আসছেন।"

'যেই না শোনা, আর যাবে কোথায়? জানলা দিয়ে, পেছনের দরজা দিয়ে, এমন কি ছাত ফুটো করে, দেয়াল কাণা করে দে ছুট! দে ছুট! তিন সেকেন্ডে মিটিঙ সাফ—বিলকুল ঠাণ্ডা!

'কেবলমাত্র সভাপতি বসে আছেন সেই শান্ত গম্ভীর মুখ নিয়ে—তিনি—বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নি। দারোয়ান তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে বার বার প্রণাম করে বলল, "হুজুর যে সাহস দেখাচ্ছেন তার সামনে চেঙ্গিস খানও তসলীম ঠুকতেন, কিন্তু এ তো সাহস নয়, এ হচ্ছে আত্মহত্যার সামিল। গৃহিণীদের প্রসেশনের সক্কলের পয়লা রয়েছেন আপনারই স্ত্রী। এখনো সময় আছে। আমি আপনাকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি।" সভাপতি তবু চুপ।

www.BanglaBook.org

তখন দারোয়ান তাঁকে তুলে ধরতে গিয়ে দেখে তাঁর সর্বাঙ্গ ঠাণ্ডা। হার্ট ফেল করে মারা গিয়েছেন।'

আচার্য উ থামলেন। আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে 'সাধু সাধু', 'শাবাস, শাবাস' বললুম। করতালি দিতে দিতে নিবেদন করলুম, 'এ একটা গল্পের মত গল্প বটে।'

আচার্য উ বললেন, 'এ বিষয়ে ভারতীয় আপ্তবাক্য কি?'

চোখ বন্ধ করে আল্লা রসুলকে স্মরণ করলুম, পীর দরবেশ গুরু ধর্ম কেউই বাদ পড়লেন না। শেষটায় মৌলা আলীর দয়া হল!

হাত জোড় করে বরজলালের মত ক্ষীণ কণ্ঠে ইমন কল্যাণ ধরলুম।

শ্রীমন্মহারাজ রাজাধিরাজ দেবেন্দ্রবিজয় মুখ কালি করে একদিন বসে আছেন ঘরের অন্ধকার কোণে। খবর পেয়ে প্রধানমন্ত্রী এসে শুধালেন, 'মহারাজের কুশল তো?' মহারাজ রা কাড়েন না। মন্ত্রী বিস্তর পীড়াপীড়ি করাতে হঠাৎ খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠলেন, 'ঐ রাণীটা—ওঃ কি দজ্জাল, কি খাণ্ডার: বাপরে বাপ! দেখলেই আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে।'

মন্ত্রীর যেন বুক থেকে হিমালয় নেমে গেল। বললেন 'ওঃ! আমি ভাবি আর কিছু। তাতে অতো বিচলিত হচ্ছেন কেন মহারাজ! বউকে তো সব্বাই ডরায়—আম্মো ডরাই। তাই বলে তো আর কেউ এরকমধারা গুম হয়ে বসে থাকে না।'

রাজা বললেন, 'ঐ তুমি ফের আরেকখানা গুল ছাড়লে।' মন্ত্রী বললেন, 'আমি প্রমাণ করতে পারি।' রাজা বললেন, 'ধরো বাজি।' 'কত-মহারাজ! দশ লাখ?' 'দশ লাখ।'

পরদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শহরে ঢোল পেটানোর সঙ্গে সঙ্গে হুকুমজারি হল—বিষ্যুদবার বেলা পাঁচটায় শহরের তাবৎ বিবাহিত পুরুষ যেন শহরের দেয়ালের বাইরে জমায়েৎ হয়; মহারাজ তাদের কাছ থেকে একটি বিষয় জানতে চান।

লোকে লোকারণ্য। মধ্যিখানে মাচাঙ—তার উপরে মহারাজ আর মন্ত্রী। মন্ত্রী চেঁচিয়ে বললেন, 'মহারাজ জানতে চান তোমরা তোমাদের বউকে ডরাও কি না। তাই তাঁর হয়ে আমি হুকুম দিচ্ছি যারা বউকে ডরাও তারা পাহাড়ের দিকে সরে যাও আর যারা ডরাও না তারা যাও নদীর দিকে।'

যেই না বলা অমনি হুড়মুড় করে, বাঘের সামনে পড়লে গোরুর পালের মত, কালবৈশাখীর সামনে শুকনো পলাশ পাতার মত সবাই ধাওয়া করলে পাহাড়ের দিকে, একে অন্যকে পিষ, দলে, থেঁৎলে—তিন সেকেন্ডের ভিতর পাহাড়ের গা ভর্তি।

বউকে না-ডরানোর দিক বিলকুল ফর্সা। না, ভুল বললুম। মাত্র একটি রোগা টিঙটিঙে লোক সেই বিরাট মাঠের মধ্যিখানে লিক্‌লিক্ করছে।

রাজা তো অবাক। ব্যাপারটা যে এরকম দাঁড়াবে তিনি তার কল্পনাও করতে পারেন নি। মন্ত্রীকে বললেন, 'তুমিই বাজি জিতলে। এই নাও দশ লখা হার।' মন্ত্রী বললেন, 'দাঁড়ান, মহারাজ। ঐ যে একটা লোক রয়ে গেছে।' মন্ত্রী তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। কাছে এলে বললেন, 'তুমি যে বড় ওদিকে দাঁড়িয়ে? বউকে ডরাও না বুঝি?'

লোকটা কাঁপতে কাঁপতে কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, 'অতশত বুঝিনে, হুজুর। এখানে আসবার সময় বউ আমাকে ধমক দিয়ে বলেছিল, "যেদিকে ভিড় সেখানে যেয়ো না।" তাই আমি ওদিকে যাই নি।'

আচার্য উ আমাকে আলিঙ্গন করে বললেন, 'ভারতবর্ষেরই জিৎ। তোমার গল্প যেন

www.BanglaBook.org

বাঘিনী-বউ। আমার গল্প ভয়ে পালালো।'

তবু আমার মনে সন্দ রয়ে গিয়েছে। রসিক পাঠক, তুমি বলতে পারো কোন্ গল্পটাকে শিরোপা দি??

পঁচিশে বৈশাখ

রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য পেয়েছিলুম, তাই যদি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে দেখি তাহলে আশা করি, সুশীল পাঠক এবং সহৃদয়া পাঠিকা অপরাধ নেবেন না।

রবীন্দ্রনাথ উত্তম উপন্যাস লিখেছেন, ছোট গল্পে তিনি মপাসাঁ, চেখফকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন, নাট্যে তিনি যে-কোন মিস্‌টিকের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন, কবিরূপে তিনি বিশ্বজনের প্রশংসা অর্জন করেছেন, শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি যে গবেষণা করেছেন তার গভীরতা পণ্ডিতদের নির্বাক করে দিয়েছে, সত্যদ্রষ্টা হিসাবে তাঁর ব্যাখ্যান ভক্তজনের চিত্তজয় করতে সমর্থ হয়েছে, তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি আরো কত বৎসর ভারতবাসীকে নব নব শিক্ষা দেবে তার ইয়ত্তা নেই আর গুরুরূপে তিনি যে শান্তিনিকেতন নির্মাণ করে গিয়েছেন তার স্নিগ্ধচ্ছায়ায় বিশ্বজন একদিন সুখময় নীড় লাভ করবে সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই।

আমার কিন্তু ব্যক্তিগত বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ এসব উত্তীর্ণ হয়ে অজরামর হয়ে রইবেন তাঁর গানের জন্য।

সুরের দিক দিয়ে বিচার করব না। সুহৃদ শান্তিদেব ঘোষ তাঁর 'রবীন্দ্রসঙ্গীতে' এমন কোন জিনিস বাদ দেন নি যে সম্বন্ধে আপনি আমি আর পাঁচজনকে কিছু বলে দিতে পারি। আমি বিচার করছি, কিংবা বলুন মুগ্ধ হয়ে ভাবি যে, কতগুলো অপূর্ব গুণের সমন্বয় হলে পর এ রকম গান সৃষ্ট হতে পারে। সামান্য যে দু'চারটে ভাষা জানি তার ভিতর আমি চিরজীবন যে রসের সন্ধান করেছি সে হচ্ছে গীতিরস। শেলি কীটস্, গ্যেটে হাউনে, হাফিজ আত্তার, কালিদাস জয়দেব, গালীব জওক্ এঁদের গান বলুন কবিতা বলুন সব কিছুর রসাস্বাদ করে এ জীবন ধন্য মেনেছি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বার বার বলেছি—

'এমনটি আর পড়িল না চোখে,
আমার যেমন আছে।'

তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বার বার হার মেনেছি। রবীন্দ্রনাথের গান এমনি এক অখণ্ড রূপ নিয়ে হৃদয় মন অভিভূত করে ফেলে যে, তখন সর্বপ্রকারের বিশ্লেষণ ক্ষমতা লোপ পায়।

জর্মন যখন 'লীডার' কিংবা ইরানীরা যখন গজল গায় একমাত্র তখনই আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত জাতীয় কিঞ্চিৎ রস পেয়েছি। তাই একমাত্র সেগুলোর সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের গানের তুলনা করে ঈষৎ বিশ্লেষণ করা যায়।

তখন ধরা পড়ে ঃ

রবীন্দ্রনাথের গানের অখণ্ড, সম্পূর্ণ রূপ। বহু লীডার এবং গজল শুনে মনে হয়েছে এ গান অপূর্ব, এ গান যদি আরো অনেকক্ষণ ধরে চলত তবে আরো ভালো লাগত অর্থাৎ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শুধু যে অতৃপ্ত রেখে গিয়েছে তাই নয়, অসম্পূর্ণ বলেই মনে হয়েছে এ 'লীডার' বা 'গজল' আরো কিছুক্ষণ ধরে চলতে পারতো। রবীন্দ্রনাথের গান কখনই অসম্পূর্ণরূপে আমার সামনে দাঁড়ায় নি। তাঁর গান শুনে যদি কখনো মনে হয়ে থাকে এ গান আমাকে অতৃপ্ত রেখে গেল তবে তার কারণ তার অসম্পূর্ণতা নয়, তার কারণ অতিশয় উচ্চাঙ্গের রসসৃষ্টি মাত্রই ব্যঞ্জনা এবং ধ্বনিপ্রধান। তার ধর্ম সম্পূর্ণ তৃপ্ত করে ও ব্যঞ্জনার অতৃপ্তি দিয়ে হৃদয়মন ভরে দেওয়া। তখন মনে হয়, এ গান আমার সামনে যে-ভুবন গড়ে দিয়ে গেল তার প্রথম পরিচয়ে তার সব কিছু আমার জানা হল না বটে, কিন্তু খেদ নেই, আবার শুনব তখন সে ভুবনের আরো অনেকখানি আমার কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে আর এমনি করে একদিন সে ভুবন আমার নিতান্ত আপন হয়ে উঠবে। কোনো সন্দেহ নেই এরকম ধারাই হয়ে থাকে কিন্তু আরেকটি কথা তার চেয়েও সত্য ঃ রবীন্দ্রনাথের কোনো গানই কখনো নিজেকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে না।

শব্দের চয়ন, সে শব্দগুলো বিশেষ স্থলে সংস্থাপন এবং হৃদয়মনকে অভাবিত কল্পনাতীত নূতন শব্দের ভিতর দিয়ে উন্মুখ রেখে ভাবে, অর্থে, মাধুর্যের পরিসমাপ্তিতে পৌঁছিয়ে দিয়ে গান যখন সাঙ্গ হয় তখন প্রতিবারই হৃদয়ঙ্গম করি, এ গান আর অন্য কোনো রূপ নিতে পারতো না—নটরাজের মূর্তি দেখে যেমন মনে হয়, নটরাজ অন্য কোনো অঙ্গভঙ্গি দিয়ে আমার চোখের সামনে নৃত্যকে রূপায়িত করতে পারতেন না। তাই বলি, নটরাজের প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গির মত রবীন্দ্রনাথের গানের প্রত্যেকটি শব্দ।

লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই, চমৎকার সুর তাল জ্ঞান, মধুরতম কণ্ঠ, তবু কোনো কোনো গায়কের গাওয়া রবীন্দ্রনাথের গান ফিকে, পানসে অর্থাৎ ফ্ল্যাট বলে মনে হয়। কেন এরকম ধারা হয় তার কারণ অনুসন্ধান করলে অধিকাংশ স্থলেই দেখতে পাবেন, গায়কের যথেষ্ট শব্দ সম্মান বোধ নেই বলে প্রতিটি শব্দ রসিয়ে রসিয়ে গাইছেন না আর তাই যেন নটরাজের প্রতিটি অঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে গিয়ে তাঁর নৃত্য বন্ধ হয়ে গেল।

মৃত্তিকার বন্ধন থেকে রবীন্দ্রনাথ কত শতবার আমাদের নিয়ে গিয়েছেন 'নীলাম্বরের মর্মমাঝে'। আবার যখন তিনি আমাদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন তখন এই মৃত্তিকাই স্বর্গের চেয়ে অধিকতর 'মধুময় হয়ে ওঠে'।

'তারায় তারায় দীপ্তশিখার অগ্নি জ্বলে
নিদ্রাবিহীন গগনতলে—'

শুনে কি কল্পনা করতে পারি যে

'ঐ আলোক-মাতাল স্বর্গসভার মহাঙ্গন,
কোথায় ছিল কোন্ যুগে মোর নিমন্ত্রণ।'

তারপর যখন মনকে তৈরি করলুম সেই স্বর্গসভার নব নব অভিজ্ঞতার জন্য তখন আবার হঠাৎ আমি

'কালের সাগর পাড়ি দিয়ে এলেম চলে
নিদ্রাবিহীন গগনতলে।।'

তারপর এ-ধারার কি অপরূপ বর্ণনা

'হেথা মন্দমধুর কানাকানি জলে স্থলে
শ্যামল মাটির ধরাতলে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হেথা ঘাসে ঘাসে রঙিন ফুলের আলিম্পন
বনের পথে আঁধার-আলোয় আলিঙ্গন।'

কখনো স্বর্গে কখনো মর্ত্যে, আপন অজানাতে এই যে মধুর আনাগোনা, মানুষকে দেবতা বানিয়ে, আবার তাকে দেবতার চেয়ে মহত্তর মানুষ করে তোলা—মাত্র কয়েকটি শব্দ আর একটুখানি সুর দিয়ে—এ অলৌকিক কর্ম যিনি করতে পারেন তিনিই 'বিশ্বকর্মা মহাত্মা'।

তোতা কাহিনী

পারস্য দেশের গুণী-জ্ঞানীরা বলেন, আল্লা যদি আরবী ভাষায় কোরান প্রকাশ না করে ফার্সীতে করতেন, তবে মৌলানা জালালউদ্দীন রুমীর 'মসনবি' কেতাবখানাকে কোরান নাম দিয়ে চালিয়ে দিতেন। এ ধরনের তারিফ আর কোন দেশের লোক তাদের কবির জন্য করেছে বলে তো আমার জানা নেই।

মৌলানা রুমী ছিলেন ভক্ত। তিনি ভগবানকে পেয়েছিলেন কদম্ববন-বিহারিণী শ্রীরাধা যেরকম করে গোপীজনবল্লভ শ্রীহরিকে পেয়েছিলেন, অর্থাৎ প্রেম দিয়ে। রুমী তাঁর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা মসনবিতে বর্ণনা করেছেন। বেশির ভাগ গল্পচ্ছলে, তারই একটি 'তোতা কাহিনী'।

ইরান দেশের এক সদাগরের ছিল একটি ভারতীয় তোতা। সে তোতা জ্ঞানে বৃহস্পতি, রসে কালিদাস, সৌন্দর্যে রুডলফ ভেলেন্টিনো, পাণ্ডিত্যে ম্যাক্সমুলার। সদাগর তাই ফুরসৎ পেলেই সেই তোতার সঙ্গে দুদণ্ড রসালাপ, তত্ত্বালোচনা করে নিতেন।

হঠাৎ একদিন সদাগর খবর পেলেন ভারতবর্ষে কার্পেট বিক্রি হচ্ছে আক্রা দরে। তখনই মনস্থির করে ফেললেন ভারতে যাবেন কার্পেট বেচতে। যোগাড়যন্ত্র তদ্দণ্ডেই হয়ে গেল। সর্বশেষে গোষ্ঠীকুটুমকে জিজ্ঞেস করলেন, কার জন্য হিন্দুস্তান থেকে কি সওদা নিয়ে আসবেন। তোতাও বাদ পড়ল না—তাকেও শুধালেন সে কি সওগাত চায়। তোতা বললে, 'হুজুর, যদিও আপনার সঙ্গে আমার বেরাদরি, ইয়ারগিরি বহু বৎসরের, তবু খাঁচা থেকে মুক্তি চায় না কোন্ চিড়িয়া? হিন্দুস্তানে আমার জাতভাই কারোর সঙ্গে যদি দেখা হয় তবে আমার এ অবস্থার বর্ণনা করে মুক্তির উপায়টা জেনে নেবেন কি? আর তারি প্রতিকূল ব্যবস্থাও যখন আপনি করতে পারবেন, তখন এ সওগাতটা চাওয়া তো কিছু অন্যায়ও নয়।'

সওদাগর ভারতবর্ষে এসে মেলা পয়সা কামালেন, সওগাতও কেনা হল, কিন্তু তোতার সওগাতের কথা গেলেন বেবাক ভুলে। মনে পড়ল হঠাৎ একদিন এক বনের ভিতর দিয়ে যাবার সময় একঝাঁক তোতা পাখি দেখে। তখনি তাদের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'তোমাদের এক বেরাদর ইরান দেশের খাঁচায় বন্ধ হয়ে দিন কাটাচ্ছে। তার মুক্তির উপায় বলে দিতে পারো?' কোনো পাখিই খেয়াল করল না সদাগরের কথার দিকে। শুধু দুঃসংবাদটা একটা পাখির বুকে এমনি বাজ হানল যে, সে তৎক্ষণাৎ মরে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। সদাগর বিস্তর আপসোস করলেন নিরীহ একটি পাখিকে বেমক্কা বদ-খবর দিয়ে মেরে ফেলার জন্য। স্থির করলেন, এ মূর্খামি দু-বার করবেন না। মনে মনে নিজের গালে

www.BanglaBook.org

ঠাস-ঠাস করে মারলেন গণ্ডা দুই চড়।

বাড়ি ফিরে সদাগর সওগাত বিলোলেন দরাজ হাতে। সবাই খুশ, নিশ্চয়ই 'জয় হিন্দ্' বলেছিল ব্যাটা-বাচ্চা সবাই। শুধু তোতা গেল ফাঁকি—সদাগর আর ও-ঘরে যান না পাছে তোতা তাঁকে পাকড়ে ধরে সওগাতের জন্য। উঁহু, সেটি হচ্ছে না, ও খবরটা যে করেই হোক চেপে যেতে হবে।

কিন্তু হলে কি হয়—গোঁপ কামানোর পরও হাত ওঠে অজানাতে চাড়া দেবার জন্য (পরশুরাম উবাচ), বে-খেয়ালে গিয়ে ঢুকে পড়েছেন হঠাৎ একদিন তোতার ঘরে। আর যাবে কোথায়—'অস্-সালাম আলাই কুম, ও রহমৎ উল্লাহি, ও বরকত ওহু, আসুন আসুন, আসতে আজ্ঞে হোক। হুজুরের আগমন শুভ হোক' ইত্যাদি ইত্যাদি, তোতা চেঁচাল।

সদাগর 'হেঁ হেঁ' করে গেলেন! মনে মনে বললেন, খেয়েছে!

তোতা আর ঘুঘু এক জিনিস নয় জানি, কিন্তু এ তোতা ঘুঘু। বললে, 'হুজুর সওগাত?'

সদাগর ফাটা বাঁশের মধ্যিখানে। বলতে পারেন না, চাপতেও পারেন না। তোতা এমনভাবে সদাগরের দিকে তাকায় যেন তিনি বেইমানস্য বেইমান। সওগাতের ওয়াদা দিয়ে গড্ড্যাম্ ফক্কিকারি! মানুষ জানোয়ারটা এই রকমই হয় বটে! তওবা, তওবা!

কি আর করেন সদাগর। কথা রাখতেই হয়। দুম করে বলে ফেললেন।

যেই না বলা তোতাটি ধপ করে পড়ে মরে গেল। তার একটা বেরাদর সেই দূর হিন্দুস্থানে আর দুরবস্থার খবর পেয়ে হার্টফেল করে মারা গেল, এরকম একটা প্রাণঘাতী দুঃসংবাদ শুনলে কার না কলিজা ফেটে যায়?

দিলের দোস্ত তোতাটি মারা যাওয়ায় সদাগর তো হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। 'হায়, হায়, কী বেকুব, কী বে-আক্কেল আমি। একই ভুল, দুবার করলুম।' পাগলের মত মাথা থাবড়ান সদাগর। কিন্তু তখন আর আপসোস, ফায়দা নেই—ঘোড়া চুরির পর আর আস্তাবলে তালা মেরে কি লভ্য! সদাগর চোখের জল মুছতে মুছতে খাঁচা খুলে তোতাকে বের করে আঙিনায় ছুঁড়ে ফেললেন।

তখন কী আশ্চর্য, কী কেরামতি! ছুঁড়ে ফেলতেই তোতা উড়ে বসল গিয়ে বাড়ির ছাদে। সদাগর তাজ্জব—হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন তোতার দিকে। অনেকক্ষণ পরে সম্বিত ফিরে শুধালেন, 'মানে?'

তোতা এবারে প্যাঁচার মত গম্ভীর কণ্ঠে বললো, 'হিন্দুস্থানী যে তোতা আমার বদনসিবের খবর পেয়ে মারা যায়, সে কিন্তু আসলে মরে নি। মরার ভান করে আমাকে খবর পাঠালো, আমিও যদি মরার ভান করি, তবে খাঁচা থেকে মুক্তি পাবো।'

সদাগর মাথা নিচু করে বললেন, 'বুঝেছি, কিন্তু বন্ধু, যাবার আগে আমাকে শেষ তত্ত্ব বলে যাও। আর তো তোমাকে পাব না।'

তোতা বললে 'মরার আগেই যদি মরতে পারো, তবেই মোক্ষলাভ। মড়ার ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই, মান-অপমান বোধ নেই। সে তখন মুক্ত, সে নির্বাণ মোক্ষ সবই পেয়ে গিয়েছে। মরার আগে মরবার চেষ্টা করো।'

* * *

এই গল্প ভারতবর্ষে বহু পূর্বে এসেছিল। কবীর বলেছেন,

www.BanglaBook.org

'ত্যজো অভিমানা শিখো জ্ঞানা
সত্‌গুরু সঙ্গত তরতা হৈ
কহৈঁ কবীর কোই বিরল হংসা
জীবতহী জো মরতা হৈ।।'

(অভিমান ত্যাগ করে জ্ঞান শেখো, সৎগুরুর সঙ্গ নিলেই ত্রাণ। কবীর বলেন, 'জীবনেই মৃত্যুলাভ করেছেন সেরকম হংসসাধক বিরল')।

আর বাঙলা দেশের লালন ফকিরও বলেছেন,

'মরার আগে মরে শমন-জ্বালা ঘুচে যায়।
জানগে সে মরা কেমন, মুরশীদ ধরে জানতে হয়।''।।

ত্রাহি বিশ্বকর্মা

দিল্লি শহরে হিন্দু বৌদ্ধ জৈন স্থাপত্যের নিদর্শন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না। শুধু কুৎব্ মিনারের গায়ে লাগানো কুওৎউল্‌ইসলাম মসজিদের কয়েকটি অংশ যে প্রাচীন হিন্দু মন্দির থেকে নেওয়া হয়েছে সে কথা মসজিদের দেয়ালে পাথরে খোদাই করা রয়েছে আর সেগুলোর দিকে তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। কী সুনিপুণ, সুদক্ষ দৃঢ় হস্তের কলাসৃষ্টি! নৈসর্গিক সৌন্দর্য স্থপতি যে রকম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন ঠিক তেমনি বিশ্বভুবনের সর্বরসবস্তুর অভেদ্য, সমষ্টিগত রূপও তিনি হৃদয়ঙ্গম করে উভয়ের অপূর্ব সংমিশ্রণ প্রস্তরগাত্রে প্রকাশ করেছেন কখনো অতি অল্প দু-একটি ইঙ্গিত দিয়ে, কখনো সূক্ষ্মতম অঙ্গ -প্রত্যঙ্গের নিবিড়তম 'বর্ণনা' এবং ব্যঞ্জনা দিয়ে।

এ তো হল কারুকার্যের কথা। কিন্তু যে স্তম্ভগুলোর উপর এসব কারুকার্য খোদাই করা হয়েছে তাদের আকার-প্রকার দেখলেও মনে কোনো সন্দেহ থাকে না যে এ স্তম্ভগুলো নিশ্চয়ই একদা কোনো মহৎ স্থাপত্যের অঙ্গরূপে নির্মিত হয়েছিল। মনে কণামাত্র দ্বিধার অবকাশ থাকে না যে সে যুগের স্থাপত্য গাম্ভীর্যে এবং মধুরতায় অন্য যে-কোনো দেশের স্থাপত্যের সম্মুখে মস্তকোত্তোলন করতে পারত।

তারপর আরম্ভ হল নব পর্যায়। কুৎব্‌মিনার, ইলতুৎমিশের কবর, আলাউদ্দিন খিলজির মসজিদ, গিয়াস্‌উদ্দিন তুগলুকের কবর, সিকন্দর লোদীর মসজিদ, এবং গোর, হুমায়ুনের কবর, খানখানার কবর, জামি মসজিদ, লালকেল্লা, সফদরজঙ্গ আরো কত অজস্র কলা নিদর্শন! দেখতে দেখতে মাসের পর মাস কেটে যায়, দেশকালপাত্রজ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ পায়—দিল্লি ত্যাগ না করা পর্যন্ত সে রসের সায়রে ডুবে মরা থেকে বাঁচতে পারে না।

তারপর ইংরেজের বর্বরতা। সেক্রেটারিয়েট মেমোরিয়েল ও রাজা জর্জের প্রতিমূর্তি দেখলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয় যে হিন্দু-মুসলিম যুগের কলাসৃষ্টি দেখার পরও ইংরেজ কী করে এ সব গর্ভস্রাব (সুশীল পাঠক! ক্ষমা ভিক্ষা করি, অনেক ভাবিয়াও কোনো ভদ্র শব্দ খুঁজিয়া পাইলাম না) যত্রতত্র নিক্ষেপ করে গেল। যে ইংরেজ আপন দেশে চরিত্রবান সেই ইংরেজই বিদেশে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ হলে অসাধু হয়ে যায়—যে ইংরেজ স্বদেশে স্ব-

www.BanglaBook.org

ঐতিহ্যে মধ্যম শ্রেণীর স্থাপত্য নির্মাণে সক্ষম সেই ইংরেজই বিদেশে সাম্রাজ্যবাদের দম্ভে মদোন্মত্ত স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়ে সৃষ্টি করে—কি সৃষ্টি করে? অশ্লীল কথাটার আর পুনরাবৃত্তি করবো না।

ফরাসি গুণী ক্লেমাঁসো দিল্লির ইংরেজ স্থাপত্য দেখে বলেছিলেন, বাই গদ্, হোয়াল ওয়ান্দারফুল রুইন্‌স্ দে উইল মেক!' এরপর এ-স্থাপত্য বাবদে এ অধম আর কি নিবেদন করবে?

* * *

কিন্তু এ সব কিছু হার মানে এক নবীন পরিকল্পনার সম্মুখে। এক অতি আধুনিক শিল্পী মহাত্মাজীর স্মৃতিসৌধ নির্মাণের জন্য একটি 'আজব' প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। পদ্মাসনে আসীন মহাত্মাজীর একটি ১৪০ ফুট উঁচু মূর্তি নির্মাণ করা হবে এবং সেই মূর্তির ভিতরে চারতলা এমারৎ ভী থাকবে। যেহেতু মস্তিষ্ক চিন্তাধার তাই মূর্তির মস্তকে লাইব্রেরি থাকবে এবং সেই হিসেবে বক্ষে থাকবে অন্য কিছু, নাসিকা কর্ণেও তাই সেই রকম জুৎসই কিছু একটা। সমস্ত পরিকল্পনাটা আমার মনে নেই; তবু অনুমান করি উপরের হিসাব মাফিক পেটে থাকবে হোটেল রেস্তোরাঁ!

শান্ত সমাহিত হয়ে ভাবুন দেখি আমরা কোথায় এসে পৌঁচেছি। সেই বিরাট মূর্তি প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে থাকবে তামাম দিল্লি শহরের দিকে অষ্টপ্রহর—হয়ত বা চোখে দুটি জোরালো সার্চ-লাইট জুড়ে দেওয়া হবে। মূর্তিটি যদি কলাসৃষ্টি হিসাবেও অতি উচ্চ পর্যায়ের হয় তবু তার বিরাট আকার আর সব সূক্ষ্মানুভূতিকে গলা টিপে মেরে ফেলে তাবৎ দিল্লিবাসীর মনে হরবকৎ জাগিয়ে রাখবে যে অনুভূতি সেটা হচ্ছে, ভয়-বিহ্বলতা।

অথচ ধর্ম সাক্ষী—মহাত্মাজীকে দেখে কেউ কখনো ভয়ে বিহ্বল হয় নি। অতি পাষণ্ড ইংরেজও তাঁর সামনে শ্রদ্ধায়, সম্ভ্রমে মাথা নত করেছে।

সে কথা থাক্। আমার প্রশ্ন, এই যে ব্যাপারটি হতে চলল—শুনলাম শ্রী গাড়্‌গিল মূর্তিটির মড়্‌ল্ দেখে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করেছেন এবং পরিকল্পনাটির মূর্তমান করার মঞ্জুরী না-মঞ্জুরী তাঁরই শ্রীহস্তে—সেটি কলাসৃষ্টির দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখতে গেলে তাকে কি বলা যায়?

অবিমিশ্র ভাস্কর্য? তা তো নয়। স্থাপত্য? তাও তো নয়। কারণ ভাস্কর্যের ভিতর স্থাপত্য থানা গাড়েন না। তদুপরি সর্বকলাসৃষ্টির একটা বিশেষ পরিমাণ আছে—মহাভারত অষ্টাদশ পর্ব হতে পারেন কারণ তিনি এপিক, কিন্তু মেঘদূত অষ্টাদশ পর্ব হতে পারেন না, এবং মহাভারতও মেঘদূতের আকার ধরতে পারেন না। তাজমহলকে আরও দশগুণ বড় করে বানালে তার মাধুর্য সম্পূর্ণ লোপ পাবে; মার্বেলে তৈরি যে ক্ষুদে ক্ষুদে তাজ লোকে ড্রইংরুমে সাজিয়ে রাখে তার থেকে আসল তাজের কোনো রসই পাওয়া যায় না।—একশ চল্লিশ ফুট উঁচু মূর্তি ভাস্কর্যের রস দিতে পারবে না।—যদি কোনো রস দেয় তবে সে বীভৎস—সে কথা পূর্বেই নিবেদন করেছি। হায়, মহাত্মাজীকে দেখতে হবে বিরাট দানবের মূর্তিতে?

আরেকটি কথা পেশ করতে আমার বড় বাধো বাধো ঠেকছে। কিন্তু না করে উপায়ও নেই। সংক্ষেপে বলি। মূর্তির ভিতর যখন চারতলা বাড়ি থাকবে, লাইব্রেরি হাসপাতাল থাকবে তখন অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে স্নানাগার ও তৎসংলগ্নীয় যাবতীয় শৌচাগারও থাকবে। একদিকে গ্রামের মেয়েরা এসে সেই বিরাট মূর্তির সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এবং সঙ্গে সঙ্গে মূর্তির ভিতরে স্নানাগারে, শৌচালয়ে—থাক্!

হিন্দু-মুসলমান তুর্ক-পাঠান অনেক কিছু রেখে গিয়েছে দিল্লি শহরে—তাই দেখবার জন্যে দুনিয়ার লোক হন্দমুদ্দ হয়ে জমায়েত হয় সেখানে। বিস্ময়ে তারা নির্বাক হয়, বিশুদ্ধ কলারসে তারা নিমজ্জিত হয়, আনন্দে আত্মহারা হয়ে তারা প্রশস্তিবাক্যে আমাদের প্রাণ অতিষ্ট করে তোলে, যেন ওগুলো নিতান্ত আপনার আমার তৈরি, সাতদিন থাকবে বলে দিল্লিতে এসে থাকে সাত মাস, আর প্রাণ ভরে, প্রেমসে অভিসম্পাত দেয় ইংরেজদের বানানো নিউ দিল্লিকে।

আমার মনে হয়, এ মূর্তি গড়া হলে ইংরেজ পর্যন্ত আমাদের অভিসম্পাত না করে হুইস্কি স্পর্শ করবে না।

কিংবা লন্ডনে বসে মূর্তিটির ছবি দেখেই যে ঠাট্টা অট্টহাস্য ছাড়বে তার শব্দ আমরা ভারত-পাকিস্তান সর্বত্র শুনতে পাবো।

রেডুক্‌ৎসিয়ো আড্ আবসুর্ডুম!

গিয়ে দেখলুম ক্লাবের প্রত্যন্ত প্রদেশে সেই নিমগাছের তলায় চীনা বন্ধু, গুণী অধ্যাপক ঊ বসে আছেন। নিমপাতা এখন বর্ষণ রসে টৈটম্বুর বলে টেবিলের উপর ঝরে পড়ে না। তাই ঊ বকুল ফুল দিয়ে আল্পনা আঁকছেন।

আমি চীনা কায়দায় ঝুঁকে ঝুঁকে দুলতে দুলতে বললুম, 'জয় হিন্দ!'

অধ্যাপক মৃদু হাস্য করে মাথা নাড়িয়ে বললেন, 'আলাইকুম সালাম, আজ তোমাদের ইদের পরব না?'

আমি বললুম, 'ছুটির বাজার, তাই আপনার কাছ থেকে তত্ত্বকথা শুনতে এলুম।'

'তৎপূর্বে বল, এ ফুলের নাম কি?'

মূল বক্তব্যের সঙ্গে এ প্রশ্নোত্তরের কোনো যোগ নেই তবু বাঙালির মনে বিমলানন্দের সৃষ্টি হবে বলে নিবেদন করছি।

বললুম, 'বাঙলা, মারাঠী, সংস্কৃতে "বকুল", হেথাকার নেটিভ ভাষাতে "মোলশী"।'*

অনেকক্ষণ ধরে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বললেন, 'বকুল, মোলশী,—মোলশী! বকুল। উহুঁ, বকুলটিই মিষ্টি।' বাঙালির ছাতি তিন বিঘৎ ফুলে উঠল তো?'

আমি বললুম, 'মিষ্টি নামই যদি রাখবেন তবে "প্রাণনাথ" বলে ডাকলেই পারেন।'

ভুরু কুঁচকে বললেন, 'সে আবার কি?'

'প্রাণনাথ মানে, মাই ডার্লিং।'

'আরো বুঝিয়ে বলো।'

আমি বললুম, 'আমি বাঙাল। আমারই দেশের এক 'চুকুমবুদাই" অর্থাৎ এদিকে মুখচোরা ওদিক চটে যায় ক্ষণে ক্ষণে, এসেছে কলকাতায়। গেছে বেগুন কিনতে। দোকানীকে

---

* বানানে ভুল থাকতে পারে, আমি যেরকম শুনেছি, সেই রকমই লিখলুম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বললে, 'দাও তো হে, এক সের বাইগন।" দোকানী পশ্চিম বাঙলার লোক।"বেগুনে"র উচ্চারণ "বাইগন" শুনে একটুখানি গর্বের ঈষৎ মৌরী-হাসি হেসে শুধালো, "কি বললে হে জিনিসটার নাম?" বাঙাল গেছে চটে, উচ্চারণ নিয়ে যত্রতত্র এরকম ঠাট্টা-মস্করা করার মানে?— চতুর্দিকে আবার বিস্তর "ঘটি" দাঁড়িয়ে। তেড়েমেড়ে বলল, "বাইগন কইছি তো বেশ কইছি হইছে কি?"

দোকানী আরেক দফা হাম্বড়াই আত্মম্ভরিতার মৃদু হাসি হেসে বললে, 'ছ্যোঃ, বাইগন, বাইগন। দেখো দিকিনি আমাদের শব্দটা কি রকম মিষ্টি—বেগুন, বেগুন।'

বাঙাল বলল, 'মিষ্টি নামই যদি রাখবা, তবে 'প্রাণনাথ" ডাকলেই পারো। দাও তবে এক সের প্রাণনাথ। প্রাণনাথের সের কত? ছ' পয়সা না সাত পয়সা?'

উ প্রাণভরে হাসলেন উচ্চস্বরে। তারপর চোখ বন্ধ করে মিটমিটিয়ে। সর্ব শেষে চেশায়ার বেড়ালের হাসিটার মত 'আকাশে আকাশে রহিল ছড়ানো সে হাসির তুলনা।'

সুশীল পাঠক, তুমি রাগত হয়েছ, বিলক্ষণ বুঝতে পারছি। এ বাসি মাল আমি পরিবেশন করছি কেন? এ গল্প জানে না কোন্ মর্কট? পদ্মার এ-পারে কিংবা হে-পারে?

তিষ্ঠ, তিষ্ঠ। এ গল্পের খেই ধরে চীনা-গুণী সেদিন তত্ত্ব বিতরণ করেছিলেন বলেই এটাকে 'এনকোর' করতে হল।

* * *

হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'এ গল্পে কি তত্ত্ব লুক্কায়িত আছে?'

খাইছে। আমি করজোড় বললুম, 'আপনিই মেহেরবাণী করুন।'

বললেন, "রেডুক্‌ৎসিয়ো আড্ আবসুর্ডুম" কাকে বলে জানো?

আমার পেটের এলেম আপনারা বিলক্ষণ জানেন। কাজেই বলতে লজ্জা নেই, অতিশয় মনোযোগের সহিত গ্রীবাকণ্ডুয়নে নিযুক্ত হলুম।

বললেন, 'কেন! জানো না, যখন কোনো বিষয় টানাটানি করলে অসম্ভব বলে প্রতীয়মান হয় তখনই তাকে বলে 'রেডুক্‌ৎসিয়ো আড্ আবসু-র্ডু-ম"।'

ততক্ষণে বুঝে গিয়েছি। সোৎসাহে বললুম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, রিডাকশিও এ্যাড এ্যাবসার্ডাম্।' একটুখানি গর্বের হাসিও হেসে নিলুম।

বাঁকা নয়নে তাকিয়ে বললেন, 'কথাটা যখন লাতিন তখন ইংরিজি উচ্চারণ করছো কেন? ইংরেজের মুখ না হলে তোমরা কোনো ঝাল খেতে পারো না বুঝি?'

'সে কথা থাক। শোনো।

'আসল কথা হচ্ছে বাঙাল দেখিয়ে দিল, মিষ্টি নামই যদি রাখবে তবে যাও একস্ট্রিমে। রাখো নাম "প্রাণনাথ"। তৎক্ষণাৎ প্রমাণ হয়ে গেল, মিষ্টত্বের দোহাই দিয়ে অ্যাবসার্ড।

'এ দেখো না, মার্কিন জাতটা কি রকম অ্যাবসার্ড। কোনো কর্মে সুনিপুণ হতে পারাটা অতীব প্রশংসনীয়। এতে সন্দেহ করবে কে? কিন্তু এরও তো একটা সীমা থাকা দরকার। গল্প দিয়ে জিনিসটে বোঝাচ্ছি।

'ব্রুকলিন ব্রিজ যখন বানানো হয় তখন দু'পাড়ি থেকে দু'দল লোক পুল তৈরি করে মাঝ গাঙের দিকে রওয়ানা হল। এমনি চৌকশ তাদের হিসেব, এমনি সুনিপুণ তাদের কলকব্জা যে মধ্যিখানে এসে যখন পুলের দুদিকে জোড়া লাগল তখন দেখা গেল এক ইঞ্চির আঠারো ভাগের উঁচু-নীচুর ফেরফার হয়েছে। তারিফ করবার মত কেরদানী, কোনো

www.BanglaBook.org

সন্দ নেই।'

'পক্ষান্তরে আমার স্বর্ণভূমি চীনদেশে কি হয়? দুদল লোককে এক পাহাড়ের দু'দিকে দেওয়া হয়েছিল সুড়ঙ্গ বানানোর জন্য। এদিক থেকে এনারা যাবেন, ওদিক থেকে ওনারা আসবেন। মধ্যিখানে মিলে গিয়ে খাসা টানেল।

'কিন্তু কার্যত হল কি? দেখা গেল, ডবল সময় চলে গেল তবু মধ্যিখানে দু'দলের দেখা নেই। তারপর এক সুপ্রভাতে দু দল বেরিয়ে এলেন দুদিকে। মধ্যিখানে মেলামেলি, কোলাকুলি হয়নি।'

আমি চোখ টিপে ইসারায় জানালুম, এ কি রঙ্গ বুঝতে পেরেছি।

তিনি বললেন, 'আদপেই না। মার্কিনরা সুনিপুণ, সেই নৈপুণ্যের প্রসাদাৎ তারা পেল কুল্লে একখানা ব্রিজ। আর আমরা পেয়ে গেলুম, 'দু'খানা টানেল। লাভ কার বেশি হ'ল বল তো।'

তাই বলি অত্যধিক নৈপুণ্য ভালো নয়।

'রেড়ুক্‌ৎসিয়ো আড্‌ আবসুর্ডুম!'।

ইউরোপে ভারতীয় শাস্ত্র-চর্চা

সুইটজারল্যান্ডের মত দেশেও লোকে সংস্কৃত পড়ে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সুইসদের কৌতূহলও আছে—যদিও সে দেশে মাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়ানো হয় ও তাতে সংস্কৃতের অধ্যাপক কুল্লে একজনই। সেই অধ্যাপকটি এসেছেন এদেশে—সেদিন দেখা হল এখানে। অমায়িক লোক, চেহারাটি খাবসুরৎ, ইংরেজি বলেন ভাঙা-চাঙা, নিজের ভুলে নিজেই হেসে ওঠেন। ভারতবর্ষের নীল আকাশ, সোনালি রোদ আর সবুজ ঘাসের যা তারিফ করলেন তা শুনে আমি লাজুক হাসি হেসে 'হ্যাঁ, হ্যাঁ' করে গেলুম, এমনি কায়দায় যেন ওগুলো নিতান্ত আমারই হাতে গড়া, এগজিবিশানে ছেড়েছি, দু'চার পয়সা পেলে বিক্রি করতেও রাজী আছি। সুইটজারল্যান্ডের পাল্টা প্রশংসাও করলুম, 'আহা, কী চমৎকার শাদা বরফ, নীল সরোবর আর চকচকে ঝকঝকে বাড়িঘরদোর।' সায়েব হাসিমুখে অনেক ধন্যবাদ দিলেন।

জিজ্ঞেস করলুম, 'সায়েব, তোমার দেশে সংস্কৃত এগোচ্ছে কি রকম?

সায়েব বললেন, 'মন্দ না, তবে কেতাবপত্রের বড় অভাব। আর সংস্কৃত ক'টা ছেলে পড়ে না-পড়ে সেইটেই তো আসল কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পাঁচজন সুইসের জ্ঞানগম্যি কতটুকু। সুইসরা ভাবে, ভারতবর্ষ দেশটা সাপে বাঘে ভর্তি, মধ্যিখানে হরেকরকমের সাধু-সন্ন্যাসী আর ফকিরবৈরাগী ঘুরে বেড়াচ্ছে—তাদের ঝোলা থেকে হরবকত হরেকরকমের সাপ লাফ দিয়ে দিয়ে বেরোচ্ছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান দেবার মত প্রামাণিক বই কেউ তো লেখে না যেগুলো সাধারণ সুইস পড়তে পারে। ইংরিজি জানে ক'টা সুইস?'

এই খেই ধরে দু'দণ্ড রসালাপ হল।

www.BanglaBook.org

* * *

গেল শতকের মাঝামাঝি এবং শেষের দিকে বিস্তর ভারতীয় কেতাবপত্রের ইংরিজি, ফরাসি, জর্মন অনুবাদ হয়। ঠিক সেই সময়েই বিজ্ঞানের প্রসার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপের লোক ক্রমেই ঈশ্বর, ধর্ম এবং পরলোক সম্বন্ধে বিশ্বাস হারাতে থাকে। অথচ গুণী-জ্ঞানীরা জানতেন যে ঈশ্বর ধর্ম আত্মা এসব ব্যাপারে অনেকখানি কুসংস্কার মেশানো থাকলেও সব কিছু 'গাঁজাখুরি' বলে এক ঝটকায় ঝেড়ে ফেলে দেওয়া যায় না, দেওয়া উচিতও নয়। তাই তাঁরা এমন কিছুর সন্ধান করেছিলেন যাতে ঊনবিংশ শতকের 'মুক্ত', 'কুসংস্কারবর্জিত', বৈজ্ঞানিক' মনও চরম তত্ত্বের সন্ধান পায়।

তাই বৌদ্ধধর্ম তাদের মনকে বেশ একটা জোর নাড়া দেয়। কারণ, বৌদ্ধধর্মে ভগবানের বালাই নেই, আত্মাটাকে পর্যন্ত কবুল জবাব দেওয়া যায়। ওদিকে ইরানী কবি ওমর খৈয়ামের 'কিস্মৎ' অর্থাৎ অদৃষ্টবাদ ইয়োরোপকে পাগল করে তুলেছে, তাদের সঙ্গে বুদ্ধদেবের 'ধর্মচক্রে'র অলঙ্ঘ্য নিয়মও বেশ খাপ খেয়ে গেল।

পল্লবগ্রাহীরা ওমরকে নিয়ে পড়ে রইল আর যাঁরা 'এহ বাহ্য' জানতেন তাঁরা বৌদ্ধধর্মের খেই ধরে ভারতবর্ষের আর পাঁচটা তত্ত্বজ্ঞানের অনুসন্ধান করতে লাগলেন। উপনিষদ না জেনে বৌদ্ধধর্মের ঐতিহাসিক পটভূমির সঙ্গে পরিচয় হয় না। তাই বিশেষ করে উপনিষদের উত্তম উত্তম অনুবাদ ইংরিজি, ফরাসি, জর্মনে বেরুলো। তারই দু'একখানা 'দ্য লুক্স' সংস্করণ এখনো আমার চোখের সামনে ভাসছে। আর গীতার তো কথাই নেই।

এবং সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, এসব কেতাবপত্র যে পণ্ডিতেরাই পড়লেন তা নয়—সর্বসাধারণের মধ্যে এসব অনুবাদ এবং তাদের নিয়ে গড়ে তোলা মৌলিক বইও ছড়িয়ে পড়ল। জাতকের বিস্তর গল্প কাচ্চাবাচ্চাদের জন্য অনুবাদ করা হল, মাসিকে ধারাবাহিক হয়ে বেরুতে লাগল।

এমন সময় একটা ঘটনা ঘটলো, তার জন্য কে দায়ী তা আমি জানি নে। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা তখন ভাবখানা দেখাতে আরম্ভ করলেন যে, এ সব তত্ত্বজ্ঞানের বস্তু সাধারণ লোকের বিদ্যেবুদ্ধির বাইরে। এসব জিনিসপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করবেন গুণী-জ্ঞানীরা, এসব কেতাবপত্রের টীকা-টিপ্পনী লিখবেন যাঁদের 'শাস্ত্রাধিকার' আছে তাঁরাই।

তখন ব্যাপারটা কিসে গিয়ে দাঁড়ালো আমি ঠিক বলতে পারব না, তবে কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, যেসব অনুবাদ বেরোয় তাতে অনুবাদের চেয়ে টীকা-টিপ্পনী বেশি, ফুটনোটে ফুটনোটে ছয়লাপ আর অনুবাদের ভাষাও দিনকে দিন এমনি টেকনিক্যাল এবং 'হিং টিং ছটে' ভর্তি হতে লাগল যে সেগুলো সাধারণ পাঠক আর বুঝতে পারে না।

সর্বজনপাঠ্য যে-সব অনুবাদ আগে বেরোত সেগুলোতে ভুল থাকত বটে এখানে ওখানে, কিন্তু সাধারণ মানুষ সেগুলো অন্তত পড়ত এবং পড়ে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারত। শুধু তাই নয়, এমন লোকও আমি চিনি যিনি বৌদ্ধ দর্শন ও নীতি অতি সামান্য মাত্রায় পড়ে নিয়েই আপন জীবন সেই অনুসারে চালাবার চেষ্টা করেছেন। ধর্মাচরণ তো অভ্রভেদী পাণ্ডিত্যের উপর নির্ভর করে না।

ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষ এবং ভারতীয় শাস্ত্রচর্চার জন্য ইয়োরোপের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয়, সেগুলো থেকে প্রতি বৎসর প্রামাণিক অনুবাদ, মূল গ্রন্থ, এমন কি

www.BanglaBook.org

মোটা মোটা ত্রৈমাসিকও বেরুতে লাগল, ইংরিজি, ফরাসি, জর্মন, ইতালিয় রুশ ভাষায়, কিন্তু তার প্রায় সবকটাই এমনি পদ্ধতিতে লেখা এবং তার কায়দা-কেতা এমনি পাকাপোক্ত যে, তাতে কামড় দিতে হলে পাণ্ডিত্যের লৌহদন্তের প্রয়োজন, সাধারণ মানুষ কামড় দিতে গিয়ে দাঁত হারায়, হজমের তো কথাই ওঠে না। এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্বজনবোধ্য অনুবাদের বই বেরতে লাগল কম—যা দু'একখানা বেরলো সেগুলো পল ব্রান্টনের রগরগে বই কিংবা মিস মেয়োর মত প্রপাগান্ডা মেশানো।

ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় আর ওরিয়েন্টালিস্টস্ কনফারেন্সের ভিতর হারেমবদ্ধ হলেন।

তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রবীন্দ্রনাথ যখন ইয়োরোপ গেলেন তখন এল এক নূতন জোয়ার। বিশেষ করে কন্টিনেন্টে রবীন্দ্রনাথের ভিতর দিয়ে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি জানবার জন্য বহু লোকের আগ্রহ দেখা গেল। ফ্রান্সে রেনে গ্রুসের মত লোক আবার চেষ্টা করলেন ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি সাধারণ পাঠকের সামনে তুলে ধরবার জন্য। দু'চারজন পণ্ডিত ব্যক্তিও এ-কর্মে যোগ দিলেন কিন্তু কেন জানি নে, এ আন্দোলন খুব বেশি লোকের ভিতর ছড়াতে পারলো না।

হয়ত ইয়োরোপে তখন যে অশান্তি দেখা দিয়েছিল—কম্যুনিজম নাৎসিজম দুই-ই সে অশান্তির পিছনে ছিল—তার মাঝখানে সাধারণ মানুষ মনস্থির করে কোনো ভালো জিনিসই গ্রহণ করতে পারছিল না। প্রতিদিন নূতন সমস্যা, অন্নবস্ত্রের নূতন নূতন অনটন, চতুর্দিকে পালোয়ানীর পাঁয়তারা কষার হুঙ্কারধ্বনি, এর মাঝখানে মানুষ পড়বেই বা কি, ভাববার সময়ই বা তার কোথায়?

শুধু ভারতীয় সংস্কৃতি নয়, চীনা, আরবী-ফরাসি, প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলনীয় সর্বপ্রকারের প্রাচ্যদেশীয় সভ্যতা সংস্কৃতির অনুসন্ধান তখনো একেবারে নির্মমভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভিতরেই সীমাবদ্ধ। বাইরের লোক তখন প্রাণপণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঠেকাতে ব্যস্ত। অন্য জিনিসের জন্য ফুর্সৎ কই?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধকল কাটতে না কাটতেই এটম বম, চীন, কোরিয়া।

এদিকে ভারতবর্ষ স্বরাজ পেল। দেশ-বিদেশে আমাদের আপন রাজদূতাবাস বসল। অনেকেই আশা করলেন, এইভাবে হয়ত একটা কিছু হবে—কিন্তু সে কাহিনী আরেক দিনের জন্য মুলতবী রইল।

* * *

ইয়োরোপে উপস্থিত যে উত্তেজনা উন্মাদনা চলেছে তার মাঝখানে ইয়োরোপীয় ছাত্র যখন প্লাতো-আরিস্ততল, কিকেরো-টাকিটুস পড়া ছেড়ে দিয়েছে—ক্লাসিক্স্ যখন 'নিজ বাসভূমে' মরমর তখন ভরত-শঙ্কর পড়বে কে?

তবু প্রশ্ন থেকে যায়, আমাদের কি নিতান্তই কোনো কিছুই করবার নেই??

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চরিত্র পরিচয়

গল্প শুনেছি, ইংরেজ, ফরাসি, জর্মন আর স্কচ এই চারজনে মিলে একটা চড়ুইভাতির ব্যবস্থা করল। বন্দোবস্ত হল সবাই কিছু কিছু সঙ্গে নিয়ে আসবেন। ইংরেজ নিয়ে এল বেকন আর আন্ডা, ফরাসি নিয়ে এল এক বোতল স্যাম্পেন, জর্মন নিয়ে এল ডজনখানেক সসেজ, আর স্কচম্যান—? সে সঙ্গে নিয়ে এল তার ভাইকে।

এ জাতীয় বিস্তর গল্প ইয়োরোপে আছে। স্কচদের সম্বন্ধে গল্প আরম্ভ হলেই মনে মনে প্রত্যাশা করতে পারবেন যে গল্পটার প্রতিপাদ্য বস্তু হবে, হয় স্কচদের হাড়কিপ্‌টেমিগিরি নয় তাদের হুইস্কির প্রতি অত্যধিক দুর্বলতা। ওদিকে আবার বিশ্বসংসার জানে স্কচরা ভয়ঙ্কর গোঁড়া ক্রীশ্চান আর মারাত্মক রকমের নীতিবাগীশ (বঙ্গজ হেরম্ব মৈত্র অতুলনীয়)। তাই এই তিন গুণ মিলে গিয়ে গল্প বেরল;—

এক স্কচ পাদ্রী এসেছেন লন্ডনে, দেখা করতে গেছেন তাঁর বন্ধুর সঙ্গে। গিয়ে দেখেন হৈহৈ রৈরৈ, ইলাহি ব্যাপার, পেল্লাই পার্টি, মেয়েমদ্দে গিসগিস করছে। বন্ধুর স্ত্রী হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে কাঁচুমাচু হয়ে পাদ্রীকে অভ্যর্থনা জানালেন। কারণ জানতেন স্কচ পাদ্রীরা এরকম পার্টি পরবের মাতলামো আদপেই পছন্দ করেন না। অথচ ভদ্রতাও রক্ষা করতে হয়, তাই ভয়ে ভয়ে শুধালেন,

'একটুখানি চা খাবেন?'

পাদ্রী হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'নো টী!'

আরো ভয়ে ভয়ে শুধালেন, 'কফি?'

নো কফি!'

'কোকো?'

নো কোকো!'

ভদ্রমহিলা তখন মরীয়া। মৃদুস্বরে কাতর কণ্ঠে শেষ প্রশ্ন শুধালেন, 'হুইস্কি সোডা?'

'নো সোডা!'

অথচ কলকাতায় একবার অনুসন্ধান করে আমি খবর পাই, যে সব ব্রিটিশ এদেশে দানখয়রাত করে গিয়েছেন তাঁদের বেশির ভাগই স্কচ্—ইংরেজের দান অতি নগণ্য। তারপর বিলেতে খবর নিয়ে জানলুম, স্কচরা হুইস্কি খায় কম বেশীর ভাগ রপ্তানি করে দেয়, আর নিজেরা খায় বিয়ার!

ঠিক সেই রকমই বিশ্বদুনিয়ার বিশ্বাসী ফরাসি জাতটা বড্ডই উচ্ছন্নগুলো। পঞ্চমকার নিয়ে অষ্টপ্রহর বে-এক্তেয়ার। তাই ইংরিজি 'ক্যারিইঙ কোল্ টু নিউ কাস্‌ল্‌সের' ফরাসি রূপ নাকি 'ক্যারিইঙ এ ওয়াইফ টু প্যারিস'।

এ প্রবাদটি আমি ফরাসি ভাষায় শুনি নি; শুনেছি ইংরেজের মুখে ইংরেজি ভাষাতে। তাই প্যারিস গিয়ে আমার জানবার বাসনা হল ফরাসিরা সত্যই উপরের প্রবাদবাক্য মেনে চলে কিনা?

খানিকটা চলে, অস্বীকার করা যায় না। যৌন ব্যাপারে ফরাসিরা বেশ উদার কিন্তু একটা ব্যাপারে দেখলুম তারা ভয়ঙ্কর নীতিবাগীশ। ফস্টিনষ্টি তারা অনেকখানি বরদাস্ত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করে—অবশ্য নিয়ম, সেটা যেন বিয়ের পূর্বে না করে পরেই করা হয়—কিন্তু সেই ফষ্টিনষ্টি যদি এমন চরমে পৌঁছয় যে স্ত্রী স্বামীকে কিংবা স্বামী-স্ত্রীকে তালাক দিতে চায় তবে ফরাসি মেয়ে মন্দ দু'দলই চটে যায়।" 'পরিবার' নামক প্রতিষ্ঠানটিকে ফরাসি জাত বড়ই সম্ভ্রমের সঙ্গে মেনে চলে। তাই পরকীয়া প্রেম যতই গম্ভীর হোক না কেন, তারই ফলে যদি কোনো পরিবার ভেঙে পড়ার উপক্রম করে তবে অধিকাংশ স্থলে দেখা যায়, নাগর-নাগরী একে অন্যকে ত্যাগ করেছেন।

কাজেই মেনে নিতে হয়, এ-ব্যাপারে ফরাসিদের যথেষ্ট সংযম আছে।

ঈষৎ অবান্তর, তবু হয়ত পাঠক প্রশ্ন শুধাবেন, তাহলে এই যে শুনতে পাই প্যারিসে হরদম ফূর্তি সেটা কি তবে ডাহা মিথ্যে?

নিশ্চয়ই নয়। প্যারিসে ফূর্তির কমতি নেই। কিন্তু সে ফূর্তিটা করে অফরাসিরা। যৌন ব্যাপারে ইংরেজের ভণ্ডামি সকলেই অবগত আছেন—লরেন্স্ সেটা বিশ্বসংসারের কাছে গোপন রাখেন নি। তাই ইংরজে মোকা পেলেই ছুটে যায় প্যারিসে। পাড়াপ্রতিবেশী তো আর সেখানে সঙ্গে যাবে না—বেশ যাচ্ছেতাই করা যাবে। শুধু ইংরেজ নয়, আরো পাঁচটা জাত আসে, তবে তারা আসে খোলাখুলি সরাসরিভাবে—ইংরেজের মত 'ফরাসি আর্ট' দেখার ভান করে না। কোন জর্মনকে যদি বার্লিনে শুনতে পেতুম বলছে, 'ভাই, হপ্তাখানেকের জন্য প্যারিস চললুম' তখন সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেতুম আর পাঁচজন মিটমিটিয়ে হাসছে—অবশ্য প্রথম জর্মনও সে হাসিতে যোগ দিতে কসুর করছে না।

তা সে যাই হোক, একটা প্রবাদ আমি বিশ্বাস করি। ফরাসিরা বলে, 'পারফিডিয়স অ্যালবিয়ন' অর্থাৎ 'ভণ্ড ইংরেজ'। একটি গল্প শুনুন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগার খবর শুনে এক বুড়ো শিখ মেজর জিজ্ঞেস করলেন, 'কে কার বিরুদ্ধে লড়ছে?'

'ইংরেজ-ফরাসি জর্মনির বিরুদ্ধে।'

সর্দারজী আপসোস করে বললেন, 'ফরাসি হারলে দুনিয়া থেকে সৌন্দর্যের চর্চা উঠে যাবে আর জর্মনি হারলেও বুরি বাৎ, কারণ জ্ঞানবিজ্ঞান কলাকৌশল মারা যাবে।' কিন্তু ইংরেজরা হারা সম্বন্ধে সর্দারজী চুপ।

'আর যদি ইংরেজ হারে?'

সর্দারজী দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, 'তবে দুনিয়া থেকে বেইমানি লোপ পেয়ে যাবে।'

আড্ডা

আড্ডা সম্বন্ধে সম্প্রতি কয়েকটি উত্তম উত্তম লেখা বাঙলায় বেরনোর পর ইংরিজিতেও দেখলুম আড্ডা হামলা চালিয়েছে। চণ্ডীমণ্ডপের ভট্চায্যি এবং জমিদার-হাবেলির মৌলবী যেন হঠাৎ কোট-পাতলুন-কামিজ পরে গট্‌গট করে স্টেটসম্যান অফিসে ঢুকলেন। আমার তাতে আনন্দই হল।

কিন্তু এ সম্পর্কে একটি বিষয়ে আড্ডার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। আড্ডাবাজরা বলতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চান, বাংলার বাইরে নাকি আড্ডা নেই। কথাটা ঠিকও, ভুলও। তুলনা দিয়ে নিবেদন করছি। সিন্ধুনদ উজিয়ে যে মাছ ধরা পড়ে, তার নাম 'পাল্লা'—অতি উপাদেয় মৎস্য। নর্মদা উজিয়ে ভরোচ শহরে যে মাছ ধরা পড়ে তার নাম 'মাদার'—সেও উপাদেয় মৎস্য। আর গঙ্গা পদ্মা উজিয়ে যে মাছ বাঙালিকে আকুল উতলা করে তোলে, তার নাম ইলিশ—খোট্টা (মাফ কীজীয়ে) মুল্লুকে পৌঁছনর পর তার নাম হয় হিল্‌সা।

উপর্যুক্ত সর্ব মৎস্য একই বস্তু—দেশভেদে ভিন্ন নাম। তফাৎ মাত্র এইটুকু যে সরষে বাটা আর ফালি ফালি কাঁচা লঙ্কা দিয়ে আমরা যে রকম ইলিশ দেবীর পুজো দি, বাদবাকিরা ওরকম ধারা পারে না। অর্থাৎ আড্ডা বহু দেশেই আছে, শুধু আমাদের মত তরিবৎ করে রসিয়ে রসিয়ে চাখতে তারা জানে না। অপিচ ভুললে চলবে না সিন্ধীরা আমাদের সরষে-ইলিশ খেয়ে নাক সিঁটকে বলেন, 'কী উম্‌দা চীজকে বরবাদ করে দিলে।' ভৃগুকচ্ছের (ভরোচের) মহাজনগণও সিন্ধীর রান্না পাল্লা খেয়ে 'আল্লা আল্লা' বলে রোদন করেন।

কে সূক্ষ্ম নিরপেক্ষ বিচার করবে? এ যে রসবস্তু—এবং আমার মতে ভোজনরস সর্বরসের রসরাজ।

তাই কাইরোর আড্ডাবাজরা বলেন, একমাত্র তাঁরা নাকি আড্ডা দিতে জানেন।

কাইরোর আড্ডা কক্‌খনো কোনো অবস্থাতেই কারো বাড়িতে বসে না। আড্ডাবাজরা বলেন তাতে করে আড্ডা নিরপেক্ষতা—কিংবা বলুন গণতন্ত্র—লোপ পায়। কারণ যাঁর বাড়িতে আড্ডা বসলো, তিনি পানটা-আসটা, খিচুড়িটা, ইলিশ-ভাজাটা (আবার ইলিশ! সুশীল পাঠক, ক্ষমা করো। ঐ বস্তুটির প্রতি আমার মারাত্মক দুর্বলতা আছে। বেহেশ্‌তের বর্ণনাতে ইলিশের উল্লেখ নেই বলে পাঁচ-বকৎ নামাজ পড়ে সেথায় যাবার কণামাত্র বাসনা আমার নেই) 'ফিরি' দেন বলে তাঁকে সবাই যেন একটু বেশি তোয়াজ করে। আড্ডাগোত্রের মিশরী নিকষ্যি মহাশয়রা বলেন, বাড়ির আড্ডায় 'মেল' মেলে না।

অপিচ, পশ্য পশ্য, কোনো কাফেতে যদি আড্ডা বসে, তবে সেখানে কেউ কাউকে খয়ের খাঁ বানাতে পারে না—যেন পুরীর মন্দির, জাতফাত নেই, সব ভাই, সব বেরাদর।

এবং সব চেয়ে বড় কথা বাড়ির গিন্নি 'মুখপোড়া মিনষেরা ওঠে না কেন' কখনো শুনিয়ে, কখনো আভাসে-ইঙ্গিতে জানিয়ে অকারণে অকালে আড্ডার গলায় ছুরি চালাতে পারেন না। তার চেয়ে দেখো দিকিনি, দিব্যি কাফেতে বসে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিচ্ছ, পছন্দমাফিক মমলেট কটলেট খাচ্ছো, আড্ডা জমজমাট ভরভরাট, কেউ বাড়ি যাবার নামটি করছে না, কারো গিন্নি এসে উপস্থিত হবেন সে ভয়ও নেই—আর চাই কি?

শতকরা নব্বই জন কাইরোবাসী আড্ডাবাজ এবং তার দশ আনা পরিমাণ অর্ধেক জীবন কাটায় কাফেতে বসে আড্ডা মেরে। আমাদের আড্ডা বসত 'কাফে দ্য নীল' বা 'নীলনদ কাফেতে'। কফির দাম ছ' পয়সা ফি পাত্তর। রাবড়ির মত ঘন, কিন্তু দুধ চাইলেই চিত্তির। সবাই কালো কফি খায়, তাই দুধের কোনো ব্যবস্থা নেই। কিচ্ছু ঘাবড়াবেন না, দু'দিনেই অভ্যাস হয়ে যায়। কালো কফি খেলে রঙভী ফর্সা হয়।

আমাদের আড্ডাটা বসত কাফের উত্তর-পূর্ব কোণে, কাউন্টারের গা ঘেঁষে। হরেক জাতের চিড়িয়া সে আড্ডায় হরবকৎ মৌজুদ থাকত। রমজান বে আর সজ্জাদ এফেন্দি খাঁটি মিশরী মুসলমান ওয়াহহাব আতিয়া কপ্ট ক্রীশ্চান অর্থাৎ ততোধিক খাঁটি মিশরী, কারণ তার শরীরে রয়েছে ফারাওদের রক্ত। জুর্নো ফরাসি কিন্তু ক'পুরুষ ধরে 'কাইরোর হাওয়া বিষাক্ত

www.BanglaBook.org

করছে' কেউ জানে না, অতি উত্তম আরবী কবিতা লেখে আর সে কবিতার আসল বক্তব্য হচ্ছে, সে তলওয়ার চালিয়ে আড়াই ডজন বেদুইনকে ঘায়েল করে প্রিয়াকে উটের উপর তুলে মরুভূমির দিগ্‌দিগন্তে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, যদিও আমরা সবাই জানতুম, জুর্নো যেটুকু মরুভূমি দেখেছে সে পিরামিডে বেড়াতে গিয়ে, তাও জীবনে একবার মাত্র, যদিও পিরামিড কাইরো থেকে মাত্র পাঁচমাইল দূরে। উট কখনো চড়ে নি, ট্রামের ঝাঁকুনিতেই বমি করে ফেলে। আর তলওয়ার? তওবা, তওবা! মার্কোস জাতে গ্রীক, বেশি নয় কুল্লে আড়াই হাজার বৎসর ধরে তারা মিশরে আছে। মিশর রাণী, গ্রীক রমণী ক্লিয়োপাত্রার সঙ্গে তার নাকি খেশ-কুটুম্বিতা আছে। হবেও বা, কারণ প্রায়ই ব্যবসাতে দাঁও মেরেছে বলে ফালতো এবং 'ফিরি' এক রোঁদ কফি খাইয়ে দিত। তাতে করে কাফের 'গণতন্ত্র' ক্ষুণ্ণ হত না, কারণ মার্কোসকে 'কাট্যা ফালাইলে'ও আড্ডার ঝগড়া কাজিয়ায় সে কস্মিনকালেও হিস্যা নিত না; বেশির ভাগ সময় চেয়ারের হেলানে মাথা রেখে আকাশের দিকে হাঁ করে ঘুমুতো কিংবা খবরের কাগজ থেকে তুলোর ফটকা বাজারের তেজি-মন্দির (বুল এ্যান্ড বিয়ার) হালহকিকৎ মুখস্থ করতো।

আর বাঙলা দেশের তাবৎ চণ্ডীমণ্ডপ, বেবাক জমিদার-হাবেলীর আড্ডার প্রতিভূ হিসেবে আপনাদের আশীর্বাদে আর শ্রীগুরুর কৃপায় ধূলির ধূলি এ-অধম।

আমার বাড়ির নিতান্ত গা ঘেঁষে বলে নিছক কফি পানার্থে ঐ কাফেতে আমি রোজ সকাল-সন্ধ্যা যেতুম। বিদেশ-বিভুঁই, কাউকে বড় একটা চিনি নে, ছন্নের মত হেথা-হোথা ঘুরে বেড়াই আর দেশভ্রমণ যে কি রকম পীড়ামদায়ক 'প্রতিষ্ঠান' সে সম্বন্ধে একখানা প্রামাণিক কেতাব লিখব বলে মনে মনে পাঁয়তারা কষি। এমন সময় হঠাৎ খেয়াল গেল কাফের কোণের আড্ডাটির দিকে। লক্ষ্য করি নি যে কফি-পানটা ওদের নিতান্ত গৌণকর্ম, ওরা আসলে আড্ডাবাজ।

আম্মো যে আড্ডাবাজ সে তত্ত্বটা এদেরও মনে ঝিলিক দিয়ে গেল একই ব্রাহ্মমুহূর্তে। সে 'মহালগনে'র বর্ণনা আমি আর কি দেব? সুরসিক পাঠক, তুমি নিশ্চয়ই জানো শ্রীহরি শ্রীরাধাতে, ইউসুফ জোলেখাতে, লায়লী মজনুতে, ত্রিস্তান ইজোল্‌দেতে কি করে প্রথম চারি চক্ষু বিনিময় হয়েছিল। কী ব্যাকুলতা, কী গভীর তৃষা কী মহা ভবিষ্যতের প্রগাঢ় সুখস্বপ্ন, কী মরুতীর পার হয়ে সুধাশ্যামলিম নীলাম্বুজে অবগাহনানন্দ সে দৃষ্টি-বিনিময়ে ছিল। এক ফরাসি কবি বলেছেন, 'প্রেমের সব চেয়ে মহান দিবস সেদিন, যেদিন প্রথম বলেছিলুম আমি তোমাকে ভালোবাসি।' তত্ত্বটা হৃদয়ঙ্গম হয় সেই ব্রাহ্ম মুহূর্তে।

তাবাঁ-তুলসী-গঙ্গাজল নিয়ে আসুন, স্পর্শ করে বলব, তিন লহমাও লাগে নি, এই ব্রাত্যের উপনয়ন হয়ে গেল, বেদ শাখা ঋষি স্থির হয়ে গেলেন—খোঁজা বাঙলায় বলে, জাতে উঠে গেলুম। অমিয়া ছানিয়া, নয়ন হানিয়া বললুম, 'এক রোঁদ কফি?'

আড্ডার মেম্বাররা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে পরিতোষের স্মিতহাস্য বিকশিত করলেন। ভাবখানা, ভুল লোককে বাছা হয় নি।

কাফের ছোকরাটা পর্যন্ত ব্যাপারটা বুঝে গিয়েছে। আমার ছন্নছাড়া ভাবটা তার চোখে বহু পূর্বেই ধরা পড়েছিল। রোঁদ পরিবেশন করার সময় নীলনদ-ডেল্টার মত মুখ হাঁ করে হেসে আমি যে অতিশয় ভদ্রলোক—অর্থাৎ জোর টিপ্‌স্ দি—সে কথাটা বলে আড্ডার সামনে আমার কেস রেকমেন্ড করলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জুর্নো তাড়া লাগিয়ে বললেন, 'যা, যা ছোঁড়া, মেলা জ্যাঠামো করিস নে।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খাসা আরবী বলেন আপনি।'

রবিঠাকুর বলেছেন—

'এত বলি সিক্তপক্ষ্ম দুটি চক্ষু দিয়া
সমস্ত লাঞ্ছনা যেন লইল মুছিয়া
বিদেশীর অঙ্গ হতে—'

ঠিক সেই ধরনে আমার দিকে তাকিয়ে জুর্নো যেন আমার প্রবাস-লাঞ্ছনা এক থাবড়ায় ঝেড়ে ফেললেন, আমার অঙ্গ থেকে।

আমি কিন্তু মনে মনে বললুম, 'ইয়া আল্লা, তেরো দিনের আরবীকে যদি এরা বলে খাসা তবে এরা নিশ্চয়ই খানদানী মনিষ্যি।' করজোড়ে বললুম, 'ভারতবর্ষের নীতি, সত্য বলবে, প্রিয় বলবে, অপ্রিয় সত্য বলবে না; আপনাদের নীতি দেখছি আরো এক কদম এগিয়ে গিয়েছে, প্রিয় অসত্যও বলবে।'

আড্ডা তো—পার্লিমেন্ট নয়—তাই হরবকৎ কথার পিঠে কথা চলবে এমন কোনো কসমদিব্যি নেই। দুম্ করে রমজান বে বললে, 'আমার মামা (আমি মনে মনে বললুম, 'যজ্ঞিদাসের মামা') হজ করতে গিয়েছিলেন আর বছর। সেখানে জনকয়েক ভারতীয়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। তারা নাকি পাঁচ বকৎ নামাজ পড়ত আর বাদবাকি তামাম দিনরাত এক চায়ের দোকানে বসে কিচির-মিচির করত। তবে তারা নাকি কোন্ এক প্রদেশের — বিঙ্গালা, বাঙালি—কি যেন—আমার ঠিক মনে নেই—'

উৎসাহে উত্তেজনায় ফেটে গিয়ে চৌচির হয়ে আমি শুধালুম, 'বাঙালা?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

আমি চোখ বন্ধ করে ভাবলুম, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম বাঙালি। কিন্তু কই, কখনো তো এত গর্ব অনুভব করিনি যে, আমি বাঙালি। এই যে নমস্য মহাজনরা মক্কা শহরে আড্ডাবাজ হিসেবে নাম করতে পেরেছেন—নিশ্চয়ই বিশ্রী মাথার ঘাম পায়ে ফেলে—তাঁরা আলবৎ শ্রীহট্ট, নোয়াখালি, চাঁটগা, কাছাড়ের বাঙালি খালাসী, পশ্চিম-বঙ্গের কলিকাতা নগরীর উপকণ্ঠে খিদিরপুরে আড্ডা মারতে শিখে 'হেলায় মক্কা করিলা জয়'!

আস্তে আস্তে চেয়ার থেকে উঠে ডান হাত বুকের উপর রেখে মাথা নিচু করে অতিশয় সবিনয় কণ্ঠে বললুম, 'আমি বাঙালি।'

গ্রীক সদস্য মার্কোস প্রথম পরিচয়ের সময় একবার মাত্র 'সালাম আলাইক্' করে খবরের কাগজের পিছনে ডুব মেরেছিলেন। তাঁর কানে কিছু যাচ্ছিল কিনা জানি নে। আমি ভাবলুম, রাশভারী লোক, হয়ত ভাবছেন, নূতন মেম্বার হলেই তাঁকে নূতন জামাইয়ের মত কাঁধে তুলে ধেই ধেই করেই নাচতে হবে একথা আড্ডার কনসটিট্যুশানে লেখে না। মুখের উপর থেকে খবরের কাগজ সরিয়ে বললেন, 'দাঁও পেয়েছি। একটা শ্যাম্পেন হবে? আমাদের নূতন মেম্বার—।' কাউন্টারের পিছনে দাঁড়িয়েছিল মালিক; তার দিকে তাকিয়ে বাঁ হাত গোল করে বোতল ধরার মুদ্রা দেখিয়ে ডান হাত দিয়ে দেখালেন ফোয়ারার জল লাফানোর মুদ্রা। ম্যানেজার কুল্লে দুই ডিগ্রী কাৎ করে ঘাড় নাড়ল।

আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, 'এ দোকানে তো মদ বেচার লাইসেন্স নেই।'

www.BanglaBook.org

মার্কোস বললেন, 'কাফের পেছনে, তার ড্রইংরুমে। ব্যাটা সব বেচে;—আফিম, ককেইন, হেরোইন, হশীশ যা চাও।'

ছোকরাকে বললেন, 'আর একটা তামাকও সাজিস।'

বলে কি? কাইরোতে তামাক! স্বপ্ন নু মায়া নু মতিভ্রম নু?

দিব্যি ফর্শী হুঁকো এল। তবে হনুমানের ন্যাজের মত সাড়ে তিনগজী দরবারি নল নয় আর সমস্ত জিনিসটার গঠন কেমন যেন ভোঁতা ভোঁতা। জরির কাজ করা আমাদের ফর্শী কেমন যেন একটু 'নাজুক', মোলায়েম হয়—এদের যেন একটু গাঁইয়া। তবে হ্যাঁ, চিলিমটা দেখে ভক্তি হল—ইয়া ডাবর পরিমাণ। একপো তামাক হেসেখেলে তার ভিতর থানা গাড়তে পারে—তাওয়াও আছে। আগুনের বেলা অবিশ্যি আমি টিকের ধিকিধিকি গোলাপী গরম প্রত্যাশা করি নি, কারণ কাবুলেও দেখেছি টিকে বানাবার গুহ্য তথ্য সেখানকার রসিকরাও জানেন না।

আর যা খুশবাই বেরল তার রেশ দীর্ঘ চৌদ্দ বছর পরও যেন আমার নাকে লেগে আছে।

পাঠক, তুমি নিশ্চয়ই জানো সুগন্ধী ইজিপশিয়ন সিগারেট ভুবনবিখ্যাত। কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছ বিশেষ করে মিশরই সুগন্ধী সিগারেট তরিবৎ করে বানাতে শিখল কি করে? আইস সে সম্বন্ধে ঈষৎ গবেষণা করা যাক। এই সিগারেট বানানোর পিছনে বিস্তর ইতিহাস, এস্তার রাজনীতি এবং দেদার রসায়নশাস্ত্র লুক্কায়িত রয়েছে।

সিগারেটের জন্য ভালো তামাক জন্মায় তিন দেশে। আমেরিকার ভার্জিনিয়াতে, গ্রীসের মেসেডোন অঞ্চলে এবং রুশের কৃষ্ণসাগরের পারে পারে। ভারতবর্ষ প্রধানত ভার্জিনিয়া খায়, কিছুটা গ্রীক, কিন্তু এই গ্রীক তামাক এদেশে টার্কিশ এবং ইজিপশিয়ান নামে প্রচলিত। তার কারণ একদা গ্রীসের উপর আধিপত্য করতো তুর্কী এবং তুর্কী গ্রীসের বেবাক তামাক ইস্তাম্বুলে নিয়ে এসে কাগজে পেঁচিয়ে সিগারেট বানাত। মিশরও তখন তুর্কীর কব্জাতে, তাই তুর্কীর কর্তারা কিছুটা তামাক মিশরে পাঠাতেন। মিশরের কারিগররা সেই গ্রীক তামাকের সঙ্গে খাঁটি মিশরের খুশবাই মাখিয়ে দিয়ে যে অনবদ্য রসনলী নির্মাণ করলেন তারই নাম ইজিপশিয়ান সিগারেট।

নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন চায়ের টিন যদি রান্নাঘরে ভালো করে বন্ধ না রাখা হয়, তবে ফোঁড়নের ঝাঁঝে চা বরবাদ হয়ে যায়, অর্থাৎ কিছু না হোক খুশবাইটি আঁতুড়ঘরে নুন-খাওয়ানো বাচ্চার মত প্রাণত্যাগ করে। মালজাহাজ লাদাই করা যে অফিসারের কর্ম তিনিও বিলক্ষণ জানেন, যে জাহাজে কাঁচা তামাক লাদাই করা হয়েছে তাতে কড়া গন্ধওলা অন্য কোনো মাল নেওয়া হয় না—পাছে তামাকের গন্ধ এবং কিঞ্চিৎ স্বাদও নষ্ট হয়ে যায়।

তাই তামাকের স্বাদ নষ্ট না করে সিগারেটকে খুশবাইয়ে মজানো অতীব কঠিন কর্ম। সিগারেটে একফোঁটা ইউকেলিপ্‌টস তেল ঢেলে সেই সিগারেট ফুঁকে দেখুন, একফোঁটা তেল আস্ত সিগারেট একদম বরবাদ করে দিয়েছে। পাঁচ বছরের বাচ্চাও তখন সে সিগারেট না কেশে অনায়াসে ভস্ ভস্ করে ফুঁকে যেতে পারে। (বস্তুত বড্ড বেশি ভেজা সর্দি হলে অনেকে এই পদ্ধতিতে ইউকেলিপ্‌টস্ সেবন করে থাকেন—যাঁরা সিগারেট সইতে পারেন না তাঁরা পর্যন্ত)।

বরঞ্চ এমন গুণী আছেন যিনি এটম বমের মাল-মসলা মেশানোর হাড়হদ্দ

www.BanglaBook.org

হালহকিকৎ জানেন, কিন্তু তামাকের সঙ্গে খুশবাই! তার পিছনে রয়েছে গূঢ়তর রহস্যাবৃত ইন্দ্রজাল।

কিচ্ছু বাড়িয়ে বলছি নে। অজন্তার দেওয়াল এবং ছবির রঙ কোন্ কোন্ মসলা দিয়ে বানানো হয়েছিল, পাঠানযুগে পাথরে পাথরে জোড়া দেবার জন্য কি মাল কোন্ পরিমাণে লাগানো হয়েছিল আমরা সে তত্ত্বগুলো মাথা খুঁড়েও বের করতে পারি নি এবং পারে নি বিশ্বসংসার বের করতে কি কৌশলে, কি মসলা দিয়ে মিশনারীরা মমীগুলোকে পচার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল।

স্বীকার করি, মিশরীরাই একদিন সে কায়দা ভুলে মেরে দিয়েছিল—পাঠান-মোগল যুগে যে রকম আমাদের অনেকখানি রসায়নবিদ্যা অনাদরে লোপ পায়। তবু তো আমরা আজও মকরধ্বজ, চ্যবনপ্রাশ বানাতে পারি—ভেজাল তো শুরু হল মাত্র সেদিন, আমাদেরই চশমার সামনে।

মিশরীরাও ঠিক সেইরকম সুগন্ধ-তত্ত্ব সম্পূর্ণ ভুলে যায় নি। ঝড়তি-পড়তি যেটুকু এলেম তখনো তাদের পেটে ছিল তাই দিয়ে তারা সেই সমস্যা সমাধান করলো, তামাকে কি করে খুশবাই জোড়া যায়, তামাকের 'সোয়াদ'টি জখম না করে।

তাই যখন কোনো ডাকসাইটে তামাক কদরদারের (হায়! এ গোত্র পৃথিবীর সর্বত্র কি কাবুল, কি দিল্লি, কি কাইরো—সুকুমারের ভাষায় বলি—হুশ হুশ করে মরে যাচ্ছে) তদারকিতে কাইরোর কাফেতে তামাক সাজা হয় এবং সেই কদরদার যখন সে তামাকের নীলাভ ধুয়োটি ফুরফুর করে নাকের ভিতর দিয়ে ছাড়েন এবং নীলনদের মন্দমধুর ঠাণ্ডা হাওয়া যখন সেই ধুঁয়োটির সঙ্গে রসকেলি করে তাকে ছিন্নভিন্ন করে কাফের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়, তখন রাস্তার লোক পর্যন্ত উন্নাসিক হয়ে থমকে দাঁড়ায়, পাঁড় সিগারখেকো, পাইকারি সিগারেট ফোঁকা পর্যন্ত বুকের উপর হাত রেখে আসমানের দিকে তাকিয়ে 'অলহমদুলিল্লা' (খুদাতালার তারিফ) বলে।

আর ইলিশের বেলা যে-রকম হয়েছিল, এ অধম ঠিক সেই রকম তাজ্জব মানে, বেহশতের বর্ণনায় এ তামাকের বয়ান নেই কেন? তা হলে পাপ করে নরকে যেত কোন্ মূর্খ?

বাঙালি তার চুলটিকে কেতাদুরস্ত করে রাখতে ভালোবাসে, কাবুলী বেলা-অবেলা মোকা পেলেই তার পায়জারে গুটিকয়েক পেরেক ঠুকিয়ে নেয়, ইংরেজ আয়না সামনে পেলেই টাইটা ঠিক মধ্যিখানে আছে কিনা তার তদারকিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, পেশাওয়ারী পাঠানের প্রধান শিরঃপীড়া তার শিরাভরণ নিয়ে, আর মিশরীর চরম দুর্বলতা তার জুতো জোড়াটিকে 'বালিশ' (আরবী ভাষায় 'প' অক্ষর নেই, তাই ইংরিজি 'পালিশ' কথাটা মিশরীতে 'বালিশ' রূপে ধারণ করেছে) রাখার জন্যে।

অতএব কাফেতে ঢোকামাত্রই কাফের 'বুৎ-বালিশ' (অর্থাৎ বুট পালিশ করনেওলা) ছোকরা এসে আপনাকে সেলাম ঠুকবে। আপনি তাকে বিলক্ষণ চেনেন, তাই দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলবেন, 'যা, যা'—তার অর্থ 'আচ্ছা পালিশ করো।' সে বত্রিশখানা ঝকঝকে দাঁত দেখিয়ে আপনার 'বুৎ-বালিশ' কর্মে নিযুক্ত হবে।

সদস্যদের কেউ বলবেন, 'শুভ দিবস', কেউ 'এই যে', কেউ একটু মৃদু হাস্য করবেন, আর কেউ মুখ খবরের কাগজের আড়ালে রেখেই কাগজখানা ঈষৎ দুলিয়ে দেবেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইতিমধ্যে আপনার কফি এসে উপস্থিত। ওয়েটার ঠিক জানে আপনি কতটা কড়া, কতখানি চিনি আর কোন্ ঢঙের পেয়ালার কফি খেতে পছন্দ করেন। আপনি বলবেন, 'চিঠিপত্র নেই?'

অর্থাৎ গৃহিণীর ভয়ে আপনি প্রিয়াকে কাফের ঠিকানা দিয়েছেন।

জিজ্ঞেস করলেন, 'ফোন?'

'আজ্ঞে না। তবে ইউসুফ বে আপনাকে বলতে বলেছেন, তিনি একটু দেরিতে আসবেন। আপনি যেন না যান।'

'চুলোয় যাক গে ইউসুফ বে। আমি জিজ্ঞেস করছি, চিঠি বা ফোন নেই?'

কাঁচামাচু হয়ে বললে, 'আজ্ঞে না।' জানে আজ আপনি দরাজ হাতে বখশিশ দেবেন না।

'যাও, চিঠির কাগজ নিয়ে এস!'

কাফের নাম-ঠিকানা-লেখা-উত্তম চিঠির কাগজ, খাম, ব্লটিং প্যাড যাবতীয় সাজসরঞ্জাম এক মিনিটের ভিতর উপস্থিত হবে। আপনি পাশের টেবিলে গিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে প্রেমপত্র লিখে যখন ঘণ্টাখানেক পরে আড্ডার টেবিলে ফিরে ওয়েটারকে বলবেন, চিঠিটা ডাকে ফেলতে, তখন হঠাৎ রমজান বে শুধাবে, 'কাকে লিখলে?' যেন কিছুই জানে না।

চটে গিয়ে বলবেন, 'তোমার তাতে কি?'

রমজান বে উদাস সুরে বলবে, 'না, আমার তাতে কি। তবু বলছিলুম, সকালে বিল্‌কিসের সঙ্গে দেখা। সে তোমাকে বলে দিতে বললে, তুমি যেন সাড়ে এগারোটায় "ফামিনা" সিনেমার গেটে তাঁর সঙ্গে দেখা করো।'

আরো চটে গিয়ে বলবেন, 'তাহলে এতক্ষণ ধরে সেটা বলো নি কেন?'

'সাড়ে এগারোটা বাজতে তো এখনো অনেক দেরি।'

'আঃ, সে কথা হচ্ছে না। আমি যে মিছিমিছি এক ঘণ্টা ধরে চিঠিটা লিখলুম।'

রমজান বে আরো উদাস সুরে বলবে, 'জানি নে, ভাই, তোমাদের দেশে প্রেমের রেওয়াজ কি। এদেশে তো জানি, প্রিয়া পাশের ঘরে, আর এঘরে বসে প্রেমিক পাতার পর পাতা প্রেমপত্র লিখে যাচ্ছে।'

এতক্ষণে একটা মুখরোচক আলোচনার বিষয়বস্তু উপস্থিত হয়। রেশনশপ খোলামাত্রই মেয়ে-মদ্দে যে রকম দোকানের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তামাম আড্ডা ঠিক সেই রকম প্রেমপত্র লেখার সময়-অসময়, মোকা-বে-মোকা, কায়দা-কেতা সম্বন্ধে আলোচনা জুড়ে দেবে।

ক্রমে ক্রমে আলোচনার বিষয়বস্তু হটতে হটতে পৌঁছবে সেই সনাতন প্রশ্নে, কোন্ দেশের রমণী সব চেয়ে সুন্দরী হয়।

অবান্তর নয়, তাই নিবেদন করি, দেশ-বিদেশ ঘুরেছি, অর্থাৎ ভ্যাগাবন্ড হিসাবে আমার ঈষৎ বদনাম আছে। কাজেই আমাকে কেউ শুধায় কোন্ দেশের রান্না সবচেয়ে ভাল, কেউ শুধান, তুলনাত্মক কাব্যচর্চার জন্য কোন্ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশস্ততম, আর অধিকাংশ শুধান, কোন্ দেশের রমণী সব চেয়ে সুন্দরী?

আমি কলির পরশুরামের স্মরণে উত্তর দি, 'এনারা আছেন, ওনারাও আছেন।' কারণ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যাঁরা দেশ-বিদেশ ঘোরেন নি, তাঁদের সঙ্গে এ আলোচনাটা দানা বাঁধে না, বড্ড একতরফা বক্তৃতার মত হয়ে যায়, আর সবাই জানেন, বক্তৃতা আড্ডার সব চেয়ে ডাঙর দুশমন।

এ সংসারে যদি কোনো শহরের সত্যতার হক্ক থাকে, উপযুক্ত প্রাণাভিরাম বিষয় নিয়ে আলোচনা করার তবে কসম খেয়ে বলতে পারি, সে শহর কাইরো। কারণ কাইরোতে খাঁটি বাসিন্দারূপে যুগ যুগ ধরে আছে গ্রীক, আরবী, তুর্কী, হাবশী, সুদানী, ইতালিয়, ফরাসিস, ইহুদি। এবং আরো বিস্তর চিড়িয়া। এদের কেউ কেউ বোরখা পরেন বটে, তবু অক্লেশে বলা যেতে পারে, কাফের দরজার দিকে মুখ করে বসে আড্ডা অনায়াসে নিজের মুখে ঝাল খেয়ে নিতে পারে।

আর শীতকাল হলে তো পোয়া বারো। কাইরোতে বছরে আড়াই ফোঁটা বৃষ্টি হয়, সাহারার শুকনো হাওয়া যক্ষ্মারোগ সারিয়ে দেয়, পিরামিড কাইরোর বাইরেই ঠায় বসে, ফুর্তি-ফার্তির নামে কাইরো বে-এক্তিয়ার, মসজিদ কবর কাইরো শহরে বে-শুমার, শীতকালে না-গরম-না-ঠাণ্ডা আবহাওয়া, সবসুদ্ধ জড়িয়ে-মড়িয়ে কাইরো টুরিস্টজনের ভূস্বর্গ এবং টুরিস্টদেরও বটে।

তদুপরি মার্কিন লক্ষপতিরা আসেন নানা ধান্দায়। তাঁদের সন্ধানে আসেন তাবৎ দুনিয়ার ডাকসাইটে সুন্দরীরা। তাঁদের সন্ধানে আসেন হলিউডের ডিরেক্টররা এবং তাঁরা সঙ্গে নিয়ে আসেন আরেক ঝাঁক সুন্দরী।

কিন্তু থাক সুশীল পাঠক, তুমি নিশ্চয়ই জানো, কামিনী-কাঞ্চন সম্বন্ধে আলোচনা শাস্ত্রে নিষেধ। গুরুর বারণ।

* * *

মিশরী আড্ডাবাজরা (দাঁড়ান, ব্যাকরণে ভুল হয়ে গেল, মিশরী মাত্রই আড্ডাবাজ ঃ এমন কি সাদ্ জগলুল্ পাশা পর্যন্ত দিনে অন্তত একবার আড্ডার সন্ধানে বেরোতেন। তবে হাঁ, তিনি কোনো টেবিলে গিয়ে বসলে কেউ সাহস করে সে টেবিলের ত্রিসীমানায় ঘেঁষত না। সেখান থেকে তিনি চোখের ইশারায় এঁকে ওঁকে তাঁকে ডেকে নিয়ে আড্ডা জমাতেন) দৈবাৎ একই আড্ডায় জীবন কাটান। বিষয়টা সবিস্তর বুঝিয়ে বলতে হয়।

এই মনে করুন, আপনি রোজ আপিস ফেরার পথে 'কাফে দা নীলে'র উত্তর-পূর্ব কোণে বসেন। সেই টেবিলটায় আপনার জন-পাঁচেক দোস্ত বসেন। আড্ডা ফুল স্ট্রেনথ্ জন দশ—সবাই কিন্তু সব দিন এ আড্ডাতেই আসেন না। তাই হরে-দরে আপনার টেবিলে জন পাঁচ-সাত নিয়মিত উপস্থিত থাকেন।

এ ছাড়া আপনি সপ্তাহে একদিন—জোর দু'দিন, বাড়ির পাশের সেমিরামিস কাফেতে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বসেন। এ আড্ডার সদস্যরা কিন্তু আপনার 'কাফে দ্য নীলের' সদস্যদের বিলকুল চেনেন না। এঁরা হয়ত চ্যাংড়ার দল, কলেজে পড়ে, কেরানীগিরি করে, বেকার, কিংবা ইনশিওরেন্স এজেন্ট (তার অর্থও বেকার)। এদের আলোচনার বিষয়বস্তু রাজনীতি, অর্থাৎ কোন্ পাশার বউ কোন মিনিস্টারের সঙ্গে পরকীয় করেন বলে তাঁর বোনপো পার্টিতে ভালো নোকরি পেয়ে গেল, কিংবা আলোচনার বিষয়বস্তু সাহিত্য, অর্থাৎ কোন প্রকাশক একহাজারের নাম করে তিন হাজার ছাপিয়ে বেশ দু'পয়সা কামিয়ে নিয়েছে। তা ছাড়া অবশ্যই দুনিয়ার হাজারো জিনিস নিয়ে আলোচনা হয়, তা না হলে আড্ডা হবে কেন। এ আড্ডার সদস্যদের সবাই সবজান্তা। এঁরা মিশর তথা তাবৎ দুনিয়ার এত সব গুহ্য

www.BanglaBook.org

এবং গরম গরম খবর রাখেন যে এঁদের কথাবার্তা, হাবভাব দেখে আপনার মনে কোনো সন্দেহ থাকবে না যে এঁদের প্রত্যেকের চোখের সামনে এক অদৃশ্য, অশ্রুত টেলিপ্রিন্টার খবর জানিয়ে যাচ্ছে এবং সে খবরের যোগান দিচ্ছেন রাশার বেরিয়া, জর্মনির হিমালয় আর কলকাতার টেগার্ট। রোজ বাড়ি ফেরার সময় আপনি তাজ্জব মানবেন, এদের সাহায্য ছাড়া মিশর তথা দুনিয়ার বাদবাকি সরকারগুলো চলছে কি করে। আপনার মনে আর কোনো সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকবে না যে, এঁদের যদি মস্কো, বার্লিন, লন্ডন, দিল্লির বড়কর্তা বানিয়ে দেওয়া হয়, তবে দুনিয়ায় কুল্লে সমস্যার সাকুল্য সমাধান এক লহমায়ই হয়ে যাবে। মনে মনে বললেন, 'হায় দুনিয়া, তুমি জানছো না তুমি কি হারাচ্ছো।'

আপনি এদের চেয়ে বছর দশেক বড়, তাই এরা আপনাকে একটুখানি সমীহ করে, যদিও আড় না হয়েই বিড়ি টানে। কারণ এদেশে সে রেওয়াজটা তেমন নেই। আপনি নিতান্ত বিদেশী বলেই এ আড্ডায় ছিটকে এসে পড়েছেন। এদের কাউকে পয়লা আড্ডায় নিয়ে গিয়ে কোনো লাভ নেই। আমি নিয়ে গিয়েছিলুম; বেচারী সেখানে রা'টি কাড়ে নি যদ্যপি দুসরা আড্ডাতে সে-ই তড়পাতো সব চেয়ে বেশি।

তা ছাড়া আপনি মাসে এক দিন কিংবা দু দিন শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে একটা কাফেতে যান। আপনার এক বন্ধু সে কাফেটারই উপরতলায় থাকেন। খাসা জায়গায়—সামনেই নীল নদ বয়ে যাচ্ছে। আপনারই বন্ধু এখানকার এ-আড্ডার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁকে প্রথম খুঁজবেন কাফেতে—সেখানে না পেলে অবশ্য তাঁর ফ্ল্যাটে যেতে পারেন, তাতে কিন্তু কোনো লাভ নেই।

এ কাফে আপনাকে উদ্বাহু হয়ে অভ্যর্থনা করবে যেন আপনি অনেক দিনের হারিয়ে-যাওয়া ফিরে-পাওয়া ভাই। কারণ আপনি এখানে আসেন কালেভদ্রে। আপনাকে পেয়ে এঁদের বিশেষ আনন্দ কারণ পক্ষাধিক কাল ধরে তাঁরা যে সব বিষয়ে কেটেকুটে ঘষে পিষে চাটনি বানিয়ে ফেলেছিলেন সেগুলো তাঁরা নূতন করে হাড়িকাটে ঢুকিয়ে রাম-দা ওঁচাবেন। আপনার রায় জানতে চাইবেন। যে রায়ই দিন না কেন আপনার উদ্ধার নেই। আপনি যদিও গাঁধীর দেশের লোক—আপনি অবশ্য একশ বার ওঁদের বলেছেন যে, গাঁধীর সঙ্গে আপনার কোনো প্রকারে সাক্ষাৎ যোগাযোগ নেই, কিন্তু তাতে করে কোনো ফায়দা ওৎরায় না—যদিও আপনার জ্ঞানগম্যিতে কারো কোনো সন্দেহ নেই, কারণ আপনি গুহ্য ষষ্ঠেন্দ্রিয় ধারণ করেন ইত্যাদি ইত্যাদি তবু স্বীকার করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আপনি নির্ঘাৎ শেষ বাস্ মিস করবেন। বন্ধুর ফ্ল্যাটে সোফার উপর চতুর্থ যাম যাপন করে পরদিন সকাল বেলা বাড়ি ফিরবেন।

BanglaBook.org

ধূপ-ছায়া

জাহাজে শেষ রাত্রি। পরদিন ভেনিস পৌঁছব।

তিনদিন ধরে কারো মুখে আর কোনো কথা নেই—শেষ রাত্রে যে জব্বর ফ্যান্সি বল হবে তাই নিয়ে সুবো-শাম জল্পনা-কল্পনা! মহিলারা কে কি পরবেন তাই ভেবে ভেবে আকুল

www.BanglaBook.org

হয়ে উঠেছেন কিন্তু কে কোন্ বেশ ধরবেন সে কথা একে অন্যের কাছ থেকে একদম চেপে যাচ্ছেন। নিতান্ত বিপদে পড়লে তবু বরঞ্চ কোনো পুরুষের শরণাপন্ন হওয়া যায় কিন্তু স্ত্রীলোক?—নৈব নৈব চ। বুঝলুম, আমাদের দেশে ভুল বলে না, 'বরঞ্চ যমের হাতে স্বামীকে তুলে দেব তবু সতীনের কোলে নয়।' এস্থলে বরঞ্চ অপরিচিত, অর্ধপরিচিত হুলোর সাহায্য কবুল, তবু কোনো মেনির ছায়া মাড়াব না।

আমি নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ,বয়সে চ্যাংড়া, চব্বিশ হয় কি না হয়। ভয়ে কারোর সঙ্গে কথা কইনে, পাছে এটিকেটের ব্যাকরণ-ভুল হয়ে যায়। আমার কেবিনে—বিবেচনা করুন খুদ কেবিনে, 'ডেকে' না, 'লাউঞ্জে' না—এক গরবিনী ফরাসিনী ভামিনী এসে উপস্থিত, 'মসিয়ো, তিন সত্যি দাও, কাউকে বলবে না, তোমাকে যা বলতে যাচ্ছি।'

বাপ মা আদর করে বলতেন আমার নাকি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। আমি বিলক্ষণ জানি, আমার বর্ণ কি? আমারই এক বন্ধু আমার রঙ দেখিয়ে দোকানদারকে বলেছিলেন, ঐ রঙের বুট-পালিশ দিতে। লজ্জায় সেই বর্ণ টিকেয় আগুন ধরার রঙ চড়ালো। সাত বার খাবি খেয়ে বললুম, 'ইয়েস, ইয়েস, উই, উই, উই; বিলক্ষণ, বিলক্ষণ!'

বললেন, 'আপনার সিল্কের পাগড়িটা এক রাত্রের মত ধার দিন।' আমার মত কালো কুচ্ছিৎকে তিনি প্রেমনিবেদন করবেন সে দুরাশা আমি করি নি কিন্তু নিতান্ত গদ্যময়ী পাগড়ি! কে বলে ফরাসিনী সুরসিকা?

তা যাক্ গে—এইটে আসল বক্তব্য নয়। মোদ্দা কথা, এই করে করে ফ্যান্সি বল্ 'রূপায়িত' হল।

ইলাহি ব্যাপার, পেল্লাই কাণ্ড। শিখের বাচ্চা দাড়িমাড়ি বাগিয়ে ভলগা-মাঝির পোশাক পরে নাচছে চীনা পাজামা-কুর্তা পরা নধরা ভিয়েনা-সুন্দরীর সঙ্গে, বগলে ঝাড়ু দেবে মেথরানীর বেশ পরে ফরাসিনী ধেই ধেই করছেন স্প্যানীয় রাজপুত্রের বেশে মিশকালো নিগ্রোর সঙ্গে, রেড্ ইন্ডিয়ানের রঙ মেখে জাপানী তুর্কী-নাচন নাচছেন এক পার্সী নারীর সঙ্গে—তাঁর সর্বাঙ্গ প্যাকিঙের ব্রাউন-পেপারে মোড়া, তদুপরি কালো হরফে লেখা 'রেজাইল, উইথ কেয়ার'—কাঁচের বস্তু, ভঙ্গুর, সাবধানে নাড়াচাড়া করো।'

এ সব বস্তু রপ্ত হতে বাঙালি ছেলের সময় লাগে।

আমি কি পরে গিয়েছিলুম তা আর বলব না। একেই তো মর্কটের মত চেহারা, তাকে 'ফিন্‌সি' করলে বড়ি শুকনোর সময় কাগ তাড়াবার জন্য পাড়ায় ডাক পড়বে।

'বারে' গিয়ে দাঁড়ালুম।

উঃ! চ্যাংড়া-চিংড়ীরা কী বেদম ফুর্তিটাই না করতে জানে। হোলির দিনে যেমন মানুষ গায়ে রঙ মাখে এঁরা ঠিক তেমনি দু পাত্তর রঙিন জল গিলে মনে রঙ লাগিয়ে নিয়েছেন। চোখ অল্প অল্প গোলাপী হয়ে গিয়েছে—বিশ্বসংসার গোলাপী রঙে ছোপানো বলে মনে আমেজ লাগছে। না হয় খর্চা হয়েই গেল শেষ কড়ি—খর্চা না করলে খুদা আরো পয়সা দেবেন কি করে? না হয় নাচলই লক্ষ্মীছাড়া মেরিটা ঐ খাটাশ-মুখো সেপাইটার সঙ্গে তোমাকে ছোলাগাছি দেখিয়ে—ভয় কি, আরো মেলা মেরি ফেনী রয়েছে। মনে আরেক পোঁচ রঙ লাগিয়ে লাও হে লাটুবাবু, বাবুরা যখন অত করে কইচেন। বেবাক বাৎ ভুলে যাবে। অত সিরিয়স হয়ো না মাইরি, এই শেষ পরবের রাত্তিরে।

তার সঙ্গে এ কোণে ও কোণে, হেথা-হোথা, একে অন্যের কানে কানে কত 'মৃদু মর্মর

www.BanglaBook.org

গানে মর্মের বাণী বলা', কত 'বেদনার পেয়ালা' ভরে গেল কত হিয়ায়, কত গান উঠলো বুকে বুকে, 'পিয়ো হে পিয়ো'।

অরকেস্ট্রা কিন্তু ঢাক ঢোল কত্তাল বাজিয়ে হুঙ্কার দিচ্ছে—

'ওগো, ডনা ক্লারা, তোমাকে আমি নাচতে দেখেছি
ওগো, ডনা ক্লারা, তোমার সোনার ছবি বুকে এঁকেছি।'

* * *

বাইরে এসে ডেকের সুদূরতম প্রান্তে একখানা চেয়ার টেনে একলাটি চুপ করে বসলুম। সিগার সিগারেটের অত্যাচারে সমুদ্রের লোনা হাওয়া জলসাঘরে নাক গলাতে পারে নি; আমাকে পেয়ে খুশি হয়ে আমার সর্বাঙ্গে আদর করে হাত বুলিয়ে গেল।

আজ কি অমাবস্যা? এরকম অন্ধকার শ্রাবণ-ভাদ্রের মেগাচ্ছন্ন অমা-যামিনীতেও দেশে কখনো দেখি নি। গাছপালা, বাড়িঘরদোর যেন অন্ধকারের খানিকটে শুষে নেয় বলে ডাঙার অন্ধকার সমুদ্রের অন্ধকারের চেয়ে অনেকখানি হাল্কা। এখানে দিনের বেলাকার নীল সমুদ্র আর নীল আকাশ রাত্রিবেলায় যেন এক হয়ে মিশে গিয়ে জমে উঠে গড়ে তুলেছে এক ঘনকৃষ্ণ অন্ধপ্রাচীর, না—আরো কাছে এসে আমার চোখে মাখিয়ে দিয়ে গেছে কৃষ্ণাঞ্জন।

শুধু চিলিক মেরে যাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে প্রপেলারের তাড়ায় ভেসে-ওঠা ফেনা আর বুদ্বুদ। ঐ ফেনাটুকু মাঝে মাঝে না দেখতে পেলে মনে ভয় জাগত অন্ধ হয়ে গিয়েছি, জলসাঘরের দিকে ছুটে গিয়ে আলো দেখে সেখান থেকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনতে হত।

জাহাজের হৃৎপিণ্ড যেন ধপ্ ধপ্ করছে—তাই অষ্টপ্রহর একটা একটানা মৃদু শিহরণ জাহাজের সর্বাঙ্গে লেগেই আছে। সে শিহরণ এমনিতে দেহেমনে অস্বস্তি জাগায় কিন্তু আজ এই মৃত্যু-অন্ধকারে সে স্পন্দন যেন আমার চৈতন্যবোধকে গভীরতম সুষুপ্তি থেকে বাঁচিয়ে রাখল।

কান্নার শব্দ?

তাজা হাওয়া পাওয়ার জন্য কে যেন সুদূর জলসাঘরের একখানি জানালা খুলে দিয়েছে। তারই ক্ষীণ আলোতে দেখি একটি মেয়ে রেলিঙে মাথা রেখে কাঁদছে।

এ মেয়ে সিঙ্গাপুর গিয়েছিল তার স্বামীর সঙ্গে হনি-মুন যাপন করতে। সেখানে স্বামী হঠাৎ মারা যায়। দেশে ফিরে যাচ্ছে একা।

মেশেদিনী

আরেক জাহাজে একটি মহিলা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বয়স এই ধরুন চল্লিশের সামান্য এদিক-ওদিক। লিপস্টিক, রুজ, পাউডার মাখলে অনায়াসে পঁয়ত্রিশ বলে চালিয়ে নিতে পারতেন। মুখ আর রঙ দেখে বোঝা গেল ইনি খাঁটি মেম নন, কিন্তু ঠিক কোন্ দেশী সেটা অনুমান করতে পারলুম না। পরনে পুরনো ধরনের লম্বা ফ্রক আর গায়ে লম্বা-হাতা ব্লাউজ। চোখে মুখে ভারী একটা প্রশান্তির ভাব লেগে আছে—একটুখানি কেমন যেন উদাস-উদাস বললেও ভুল বলা হয় না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু তাঁর চেহারা, বেশভূষা, ধরনধারণ সেইটে আসল কথা নয়। তিনি চার দিন যেতে না যেতেই লক্ষ্য করলুম, এ যাবৎ তাঁকে কারো সঙ্গে একটি মাত্র কথাও বলতে শুনি নি। সমস্ত দিন লাউঞ্জের এক কোণে একা বসে বসে কাটান; তাঁর টেবিলে অন্য কাউকে এসে কথা বলতেও দেখি নি। ওঁর চেয়ে দেখতে খারাপ, বয়সে বেশি, এমন রমণীরাও যখন প্রৌঢ়দের নেকনজর পাচ্ছেন, দু'দণ্ড রসালাপ করবার অবকাশও পাচ্ছেন, তখন ইনিই বা জাহাজ-যজ্ঞশালার প্রান্তভূমিতে সঙ্গরসের উপেক্ষিতা কেন?

কাউকে জিজ্ঞেস করার মত সাহসও খুঁজে পাই নে। উনি আমার মা হতে পারেন, বেশি জিজ্ঞেসবাদ করলে ঠোঁটকাটারা হয়তো বলে বসবে, 'ইডিপস কম্‌প্লেক্স' কিংবা ঐ ধরনেরই কিছু একটা।

তখন হঠাৎ একদিন দেখি, আমারই পরিচিত এক সহযাত্রী লাউঞ্জের ভিতর দিয়ে যাবার সময় ওঁকে নমস্কার করলেন, উনিও উত্তর দিলেন। তাঁকে তখন সুবিধেমত এটা, ওটা, পাঁচটা কথার ফাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, মহিলাটি কারো সঙ্গে কথা কন না কেন? ভদ্রলোক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি করে কথা বলবেন? উনি তো ফার্সী ভিন্ন অন্য কোনো ভাষা জানেন না। ওঁর বাড়ি মেশেদ্।' তারপর বললেন, 'আপনি না কাবুলে ছিলেন? সেখানকার ভাষা পশতু না ফার্সী কি যেন?'

আমি বললুম, 'ফার্সী অনেকখানি ভুলে গিয়েছি; তবে এককালে ফার্সীর মাধ্যমে কাবুলে ইংরিজি পড়িয়েছি।'

আর যাবে কোথায়। আমাকে হিড়হিড় করে হাতে ধরে টেনে নিয়ে চললেন সেই মহিলার দিকে—যেন জলে-ডোবা মানুষকে দম দেবার জন্য বদ্যি খুঁজে পেয়েছেন। আমাকে তাঁর সামনে দাঁড় করিয়ে এমন একখানা মিষ্টি হাসি ছাড়লেন, যেন তিনি এখ্‌খুনি আমাকে আপন হাতে গড়ে তৈরি করেছেন। নোবেল-প্রাইজ-পাওয়া ব্যাটাকেও বোধ হয় বাপ এতখানি দেমাকের সঙ্গে দুনিয়ার সামনে পেশ করে না।

তারপর বললেন শুধু একটি কথা—'ফার্সী!'

মহিলাটিও এই হুল্লোড়ের মাঝখানে একটুখানি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছেন। সামলে নিয়ে শুধালেন, 'আপনি ফার্সী বলতে পারেন?'

আমি সবিনয় বললুম, 'এককালে পারতুম।'

ভারী একটা পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, 'বসুন।'

তারপর বললেন, 'আমি যে বেশি কথা কইতে ভালবাসি তা নয়, তবে এই পাঁচদিন ধরে একটি কথাও বলতে না পেরে হাঁপিয়ে উঠেছি। আমি সমস্ত জীবন কাটিয়েছি ইরানের মেশেদ শহরে। তারপর গেল আট বছর লন্ডনে।'

আমি শুধালুম, 'ইংরিজি শেখেন নি সেখানে?'

বললেন, 'না, লন্ডনে তো আমি ইচ্ছে করে যাই নি। আমার স্বামী মেশেদে সর্বস্বান্ত হয়ে লন্ডন গেলেন তাঁর কাকার কাছে। আমরা ইহুদি, জানেন তো, আমরা ব্যবসা করি দুনিয়ার সর্বত্র। সেখানে ওঁর দু'পয়সা হয়েছে, কিন্তু আমাদ্বারা আর ইংরিজি শেখা হল না। ইরান ইহুদিরা যে দু'চারজন লন্ডনে আছেন, তাঁদের সঙ্গেই মেলামেশা করি, কথাবার্তা কই। তবে হাট করতে গিয়ে "গ্রীন পীজ, কলি-ফ্লাওয়ার, টাপেন্স ত্রাপেন্স-হে পেনি" বলতে পারি, ব্যস।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি বললুম, 'ইংরিজি তো তেমন কঠিন ভাষা নয়, আর আপনি যে দু'চারটে ইংরিজি বললেন সেগুলো তো খুব শুদ্ধ উচ্চারণে।'

মহিলাটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'কি করে শিখি বলুন? আমার মন পড়ে আছে সেই মেশেদ শহরে। লন্ডন সাফসুৎরো জায়গা, বিজলি বাতি, জলের কল, খাওয়াদাওয়া, থিয়েটার সিনেমা সবই ভালো—কোথায় লাগে তার কাছে বুড়ো গরিব মেশেদ? তবু যদি জানতুম একদিন সেই মেশেদে ফিরে যেতে পারবো, তাহলেও না হয় লন্ডনটার সঙ্গে পরিচয় করার চেষ্টা করতুম, কিন্তু যখনই ভাবি ঐ শহরে আমাকে একদিন মরতে হবে, আমার হাড় ক'খানা বাপ-পিতামোর হাড়ের কাছে জায়গা পাবে না, তখন যেন সমস্ত শহরটা আমার দুশমন, আমার জল্লাদ বলে মনে হয়।'

আমি বললুম, 'আপনার এমন কি বয়স হয়েছে যে আপনি মরার কথা ভাবতে আরম্ভ করেছেন?'

'তেমন কিছু নয়, জানি, কিন্তু যখন এ কথাও জানি যে, লন্ডনেই মরতে হবে, তখন যেন বয়সের আর গাছ-পাথর থাকে না।'

আমি শুধালুম, 'মেশেদে ফিরে যাওয়া কি একেবারেই অসম্ভব? আপনি না বললেন, আপনাদের দু'পয়সা হয়েছে।'

মহিলাটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অনেকক্ষণ ধরে ভাবলেন। বুঝলুম, সব কিছু আমাকে প্রথম পরিচয়েই বলবেন কিনা, তাই নিয়ে মনে মনে তোলপাড় করছেন। শেষটায় বললেন, 'দুঃখ তো সেইখানেই। আজ আমাদের যা টাকা হয়েছে, তাই নিয়ে আমরা মেশেদের পুরনো ভিটে, জমিজমা সব কিছু কিনতে পারি, নূতন ব্যবসা ফাঁদতে পারি।'

আবার নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'দুঃখ তো সেইখানেই। আমার স্বামী যেতে চান না। লন্ডন তাঁর ভালো লেগে গিয়েছে। ভূতের মত খাটেন, পয়সা কামান আর মোটর-হোটেল, রেস্তরাঁ-ক্লাব, কনসার্ট-কাবারে করে করে বেড়ান। আমার উপরও চোটপাট, আমিও কেন সঙ্গে সঙ্গে হৈ-হৈ করি না।'

বললেন, 'বুঝলেন—এখন তিনি লন্ডনের প্রেমে : বুড়ি মেশেদকে বেবাক ভুলে গিয়েছেন।

জাহাজে যে ক'দিন ছিলুম রোজ দু'একবার ওঁর কাছে গিয়ে বসতুম। ভদ্রমহিলা নিজের থেকেই একদিন বললেন, 'আপনি যেন না আবার ভাবেন আমি আপনার এক বোঝা হয়ে উঠলুম। যাঁদের সঙ্গে হৈহল্লা করতে আপনি ভালোবাসেন তাঁদের বাদ দিয়ে আমার সঙ্গে বেশি সময় কাটাবার কোনো প্রয়োজন নেই।'

আমি আপত্তি জানালুম।

তবু তিনি শান্তভাবে লাউঞ্জে আপন কোণে বসে থাকতেন, কথা বলার জন্য আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার কোনো চেষ্টাই করতেন না। আমি কাছে গেলেই মিষ্টি হেসে বলতেন, 'বসুন'; তার পর শুধাতেন, 'কি খাবেন বলুন।' জাহাজে খাবার ব্যবস্থা কুলীন শ্বশুরবাড়ির মত, কাজেই এ স্থলে 'খাবার' বলতে পানীয়ই বোঝায়।

আমি একদিন বললুম, 'প্রতিবারেই আপনি আমাকে কিছু একটা খেতে বলেন কেন, বলুন তো?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অবাক হয়ে বললেন, 'কী আশ্চর্য! আপনি মেশেদে অর্থাৎ লন্ডনে আমার বাড়িতে এলে আপনাকে ভালোমন্দ খেতে দিতুম না?'

আমি বললুম, 'কিন্তু এটা তো আপনার বাড়ি নয়।'

তিনি বললেন, 'সে কি কথা! আমার কাছে এলেন তার মানে আমার বাড়িতে এলেন।'

তারপর বললেন, 'কিন্তু এখানে দিই বা কি? আচ্ছা বলুন তো, আপনি জাহাজের এই বিলিতি রান্না খেতে ভালোবাসেন?'

আমি বললুম, 'এ জাহাজের রান্নার খুশনাম আছে। আমি কিন্তু আমাদের দিশী রান্নাই পছন্দ করি।'

হেসে বললেন, 'তবে আপনার রসবোধ আছে। এই আইরিশ স্টু আর বাঁধাকপি-সেদ্ধ মানুষ কি করে খায় খোদায় মালুম। সেদিন আবার পোলাও রেঁধেছিল—মাগো! ছিরি দেখে ভিরমি যাই।'

আমি শুধালুম, 'মেশেদের লোক পোলাও খায়?'

বললেন, 'হায়, জাহাজে আপন রান্নাবান্নার ব্যবস্থা নেই তা না হলে আপনাকে এ্যাসা পোলাও খাইয়ে দিতুম যে জীবনভর তার সোয়াদ জিভে লেগে থাকত। ভালো কথা, আপনি তো বোম্বাই যাচ্ছেন সেখানে আপনাকে আচ্ছাসে পোলাও খাইয়ে দেব।'

আমি বললুম, 'আমি তো ভেবেছিলুম আপনি মিশর যাচ্ছেন।'

তিনি বললেন, 'ওঃ, আপনাকে বলি নি বুঝি, আমি বোম্বাই যাচ্ছি—আমার মেয়ের সেখানে বিয়ে হয়েছে। যে ভদ্রলোক আপনাকে আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন তিনি আমার স্বামীর বন্ধু। উনি বিপদে-আপদে সাহায্য করতে পারবেন বলেই এই জাহাজে যাচ্ছি।'

তারপর একটুখানি লাজুক হাসি হেসে বললেন, 'আমি যে দিদিমা হতে চললুম।'

তারপর রোজই গল্প হত তাঁর মেয়ের সম্বন্ধে। আমাকে কতবার জিজ্ঞেস করতেন, বোম্বাইয়ে ভালো ডাক্তার-বদ্যির ব্যবস্থা আছে কি না। আমি বলতুম, লন্ডনের মত না, তবে ব্যবস্থা মেশেদের চেয়ে নিশ্চয়ই ভালো। ইস্তেক জর্মনিতে পাস-করা ইহুদি ডাক্তারও বোম্বাইয়ে আছেন।

বললেন, 'ও কথা বলবেন না, মশাই; মেশেদে আমাদের যে বুড়ি ধাইমা ছিলেন তাঁর হাতে কখনো কোনো পোয়াতী মরে নি, কোনো বাচ্চা কোনো জখম নিয়ে জন্মায় নি। আর তাঁর সব কেরদানি তো শুধুমাত্র দু'খানি খালি হাত দিয়ে—ডাক্তারদের যন্ত্রপাতির তো উনি ধার ধারতেন না।'

আমি বললাম, 'আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে এখনো এ রকম ধাই আছেন তবে বোম্বাই শহর, সেখানে সায়েব-সুবোদের ব্যাপার।'

উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'আপনি ঠিক ধরেছেন কিন্তু আজকের দিনের বড় শহরে কেউ আর একথা মানে না। আমার মেয়েকে চিঠিতে এ কথা লিখেছিলুম, সে তো হেসেই উড়িয়ে দিল।'

চুপ করে থেকে বললেন, 'আর দেবে নাই বা কেন? ওর ছেলেবেলা ও মেশেদে কাটিয়েছে কিন্তু মেশেদের জন্য তো ওর এতটুকু দরদ নেই। আমার স্বামীরই মত, লন্ডন-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্যারিসের নামে অজ্ঞান।'

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, 'আপনি এ নিয়ে এত শোক করেন কেন? সে সব কাল গেছে, জমানা বদলে গিয়েছে। এখনও মানুষ আঁকড়ে ধরে থাকবে নাকি মেশেদ কারবালা, কান্দাহার হিরাত?'

বললেন, 'কেন, আপনি তো প্যারিস ভিয়েনা লন্ডন বার্লিন দেখেছেন—তবু তো ফিরে যাচ্ছেন কোথাকার এক ছোট শহরে।'

আমি ঘাড় চুলকে বললুম, 'আমার যে মা রয়েছেন।'

বললেন, 'একই কথা; মা যা মায়ের শহরও তো।'

* * *

বোম্বাইয়ে জাহাজ ভিড়েছে। এক সুন্দরী তরুণী আর ছোকরাকে দেখে আমার পরিচিতা মহিলা আকুল হয়ে উঠলেন। তাঁরা জাহাজে উঠতেই তিনজনে জড়াজড়ি কোলাকুলি। আমি একটুখানি কেটে পড়লুম।

তা হলে কি হয়, আমার নিষ্কৃতি নেই। আমাকে পাকড়ে ধরে নিয়ে মেয়ে জামাইকে বার বার বলেন, 'এই আমার বন্ধু দিল-জানের দোস্ত, আমার সঙ্গে ফার্সী কথা কয়েছে, ফুর্তি-ফার্তি হৈ-হল্লা ছেড়ে দিয়ে।'

মেয়ে যতই জিজ্ঞেস করে, জাহাজে ছিলে কি রকম, খেলে কি, বাবা কি রকম আছেন, কে বা শোনে কার কথা, সত্য-সত্যই জাহাজে যেন 'সমুদ্রে রোদন'। তিনি বার বার বলেন, 'বুঝলি, নয়মি, এঁকে আচ্ছাসে খাইয়ে দিতে হবে। পোলাওর সব মালমসলা আছে তো বাড়িতে?'

ভেবেছিলুম হোটেলে উঠব। মহিলা শোনামাত্র আমাকে হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চললেন তাঁদের সঙ্গে, আমাকে কড়া নজরে রাখলেন কাস্টম অফিসে, যেন আমি চোরাই মদ—পাছে কাস্টমস্ আমাকে পাকড়ে নিয়ে যায়।

তিন দিন তাঁদের সঙ্গে থেকে অতি কষ্টে নিষ্কৃতি পাই।

সে তিন দিন কি রকম ছিলুম? মাছ যে রকম জলে থাকে। ভুল বলা হল; মাছকে যদি শুধান, 'কি রকম আছো?' তবে সে বলবে, 'সৈয়দের ব্যাটা যে রকম ইহুদি পরিবারে ছিল।'!!

কোন্-ভিনারের মা

বরোদায় চাকরি নেবার কয়েকদিন পরেই ডাঃ এর্নস্ট্ কোন্-ভিনারের (অর্থাৎ ভিয়েনার Cohn) সঙ্গে আলাপ হয়। যদিও নাম থেকে বোঝা যায়, 'কোন্' পরিবার এককালে ভিয়েনায় বসবাস করতেন তবু ইনি বার্লিনেই জন্মান, পড়াশুনো করে সেখানে নামজাদা অধ্যাপক হন এবং হিটলার ইহুদিদের উপর চোটপাট আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই সস্ত্রীক লন্ডন চলে যান। বুড়ো মহারাজ তৃতীয় সয়াজীরাও তাঁকে সেখান থেকে পাকড়াও করে নিয়ে এসে বরোদা যাদুঘরের বড়কর্তা বানিয়ে বসিয়ে দেয়।

লোকটির পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ এবং তাঁর স্ত্রীও এতখানি লেখাপড়া জানতেন যে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তিনি তাঁর স্বামীকে পর্যন্ত কাজকর্মে সাহায্য করতে পারতেন। সয়াজীরাওয়ের পাঠানো 'ভিনাস দি মিলো', মাইকেল এঞ্জেলোর তৈরি 'মোজেস' ও 'মুমূর্ষু দাসের' প্লাস্টার-কাস্ট যেদিন বার্লিন থেকে বরোদা এসে পৌঁছল, সেদিন ফ্রাউ কোন্-ভিনারের কী উত্তেজনা-উৎসাহ! স্টেশনে গিয়ে সেই বিরাট বিরাট বাক্স নিজে তদারকি করে নামালেন, আহার নিদ্রা শিকেয় তুলে দিয়ে কাস্ট্‌গুলোকে যাদুঘরে সাজালেন—সে সময় তিনি যাদুঘরে একটানা চব্বিশ ঘণ্টা কাটিয়েছিলেন,—তারপর ফোলা-ফোলা লাল-লাল চোখ নিয়ে বেরলেন, আমাদের খবর দিতে, প্রভুরা বহাল-তবিয়তে যাদুঘরে আসর জমিয়ে আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছেন। পাছে আমি হুজুরদের কিমৎ ঠিকমত মালুম না করতে পেরে তেনাদের 'তাচ্ছিল্য' করি, তাই আমাকে তাঁর মোটরে তুলে নিয়ে গিয়ে হুজুরদের সঙ্গে নিজে পরিচয় করিয়ে দিলেন। হুজুরদের নাম-গোত্র, হাল-হকিকৎ, হাড়-হদ্দ এমনি গটগট করে বয়ান করে দিলেন যে, তার থেকেই বুঝতে পারলুম যে এঁর এলেমের এক কাহন পেলেও আমি সুবে বোম্বাই-বরোদা-আহমদাবাদের 'কলাবাজারে' বাকি জীবন বেপরোয়া হয়ে দাবড়ে বেড়াতে পারব।

আর হ্যার ডক্টর কোন্-ভিনারের পাণ্ডিত্য আমাকে ফলিয়ে বলতে হবে না। নন্দন-শাস্ত্র এবং বিশ্ব-স্থাপত্যের বিভিন্ন শৈলী সম্বন্ধে তিনি যেসব কেতাব লিখে গিয়েছেন, সেগুলো নাৎসী-পতনের পর ফের ছাপা হতে শুরু হয়েছে।

স্থাপত্যে পণ্ডিত অথচ বাল্যকালে তিনি লেখাপড়া শেখেন রাব্বিদের (ইহুদি পুরুষ-পণ্ডিত) টোলে। তাই ইহুদি ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর; অথচ ইহুদিদের আচার-ব্যবহার, তাদের কঞ্জুসি নিয়ে তিনি ঠাট্টা মস্করা করাতে ইহুদির শত্রু ক্রীশ্চানের চেয়েও ছিলেন বাড়া। সেসব রসিকতা একদিন মোকামাফিক ছাড়িবার বাসনা আমার আছে।

স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। পুত্র-কন্যা হয় নি, অথচ দুজনেরই হৃদয় ছিল স্নেহে ভরা। 'দেশ'র পাঠক এই ইঙ্গিত থেকেই টক্ করে বুঝে যাবেন, আমি তাঁর ন'সিকে সুযোগ নিতে কসুর করি নি। যতদিন কোন্-ভিনাররা এদেশে ছিলেন, ততদিন জর্মন বই, মাসিক, খবরের কাগজের জন্য আমাকে কিছুমাত্র দুর্ভাবনা করতে হয় নি।

'সে বছরে ফাঁকা, পেনু কিছু টাকা' ধরনে কি করে যে কিছু টাকা আমার হাতে '৩৮ ('ইংরেজিতে') জমে গিয়েছিল, সেটা নিতান্ত আমি বলছি বলেই আজ আমার বিশ্বাস হয়—হায়, এখন যা অবস্থা, '৩৮-এর মুজতবা আলীকে পথে পেলে 'দাদা, বাছা' বলে তার কাছ থেকে দু-পয়সা হাতিয়ে নিতুম।

তা সে কথা যাকগে। সে জমানো টাকাটা হাতে বড্ড বেশি চুলকোচ্ছিল বলে বাসনা হল জর্মনিতে গিয়ে সে-টাকাটা পুড়িয়ে আসি। বন্ধুবান্ধব সে দেশে মেলা, ওদিকে হিটলার যা নাচন-কুদন আরম্ভ করেছে, কখন না দুম করে লড়াই লেগে যায়, আর তাঁরাও সেই বেপ্যাঁচে পড়ে প্রাণটা হারান।

বরোদা ছোট্ট জায়গা—তাই খাসা জায়গা। তিন দিনের ভিতর পাসপোর্ট হয়ে গেল। বোম্বাই কাছে; ট্রাঙ্ককল করে জাহাজের টিকিট কাটা হয়ে গেল—আর গরম সুটমুট তো ছিলই। শিকের হাঁড়ি থেকে নামিয়ে ঝেড়ে-ঝুড়ে তৈরি করে নিলুম।

কোন্-ভিনারদের বললুম, জর্মনি যাচ্ছি।

শুনে দুজনেই চমকে উঠলেন। তারপর অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে রইলেন। বুঝলুম, দেশের ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠেছে—যে-দেশ আবার দেখবার সৌভাগ্য হয়ত

www.BanglaBook.org

প্যারিসের নামে অজ্ঞান।'

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, 'আপনি এ নিয়ে এত শোক করেন কেন? সে সব কাল গেছে, জমানা বদলে গিয়েছে। এখনও মানুষ আঁকড়ে ধরে থাকবে নাকি মেশেদ কারবালা, কান্দাহার হিরাত?'

বললেন, 'কেন, আপনি তো প্যারিস ভিয়েনা লন্ডন বার্লিন দেখেছেন—তবু তো ফিরে যাচ্ছেন কোথাকার এক ছোট শহরে।'

আমি ঘাড় চুলকে বললুম, 'আমার যে মা রয়েছেন।'

বললেন, 'একই কথা; মা যা মায়ের শহরও তো।'

* * *

বোম্বাইয়ে জাহাজ ভিড়েছে। এক সুন্দরী তরুণী আর ছোকরাকে দেখে আমার পরিচিতা মহিলা আকুল হয়ে উঠলেন। তাঁরা জাহাজে উঠতেই তিনজনে জড়াজড়ি কোলাকুলি। আমি একটুখানি কেটে পড়লুম।

তা হলে কি হয়, আমার নিষ্কৃতি নেই। আমাকে পাকড়ে ধরে নিয়ে মেয়ে জামাইকে বার বার বলেন, 'এই আমার বন্ধু দিল-জানের দোস্ত, আমার সঙ্গে ফার্সী কথা কয়েছে, ফুর্তি-ফার্তি হৈ-হল্লা ছেড়ে দিয়ে।'

মেয়ে যতই জিজ্ঞেস করে, জাহাজে ছিলে কি রকম, খেলে কি, বাবা কি রকম আছেন, কে বা শোনে কার কথা, সত্য-সত্যই জাহাজে যেন 'সমুদ্রে রোদন'। তিনি বার বার বলেন, 'বুঝলি, নয়মি, এঁকে আচ্ছাসে খাইয়ে দিতে হবে। পোলাওর সব মালমসলা আছে তো বাড়িতে?'

ভেবেছিলুম হোটেলে উঠব। মহিলা শোনামাত্র আমাকে হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চললেন তাঁদের সঙ্গে, আমাকে কড়া নজরে রাখলেন কাস্টম অফিসে, যেন আমি চোরাই মদ—পাছে কাস্টমস্ আমাকে পাকড়ে নিয়ে যায়।

তিন দিন তাঁদের সঙ্গে থেকে অতি কষ্টে নিষ্কৃতি পাই।

সে তিন দিন কি রকম ছিলুম? মাছ যে রকম জলে থাকে। ভুল বলা হল; মাছকে যদি শুধান, 'কি রকম আছো?' তবে সে বলবে, 'সৈয়দের ব্যাটা যে রকম ইহুদি পরিবারে ছিল।'!!

কোন্-ভিনারের মা

বরোদায় চাকরি নেবার কয়েকদিন পরেই ডাঃ এর্নস্ট্ কোন্-ভিনারের (অর্থাৎ ভিয়েনার Cohn) সঙ্গে আলাপ হয়। যদিও নাম থেকে বোঝা যায়, 'কোন্' পরিবার এককালে ভিয়েনায় বসবাস করতেন তবু ইনি বার্লিনেই জন্মান, পড়াশুনো করে সেখানে নামজাদা অধ্যাপক হন এবং হিটলার ইহুদিদের উপর চোটপাট আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই সস্ত্রীক লন্ডন চলে যান। বুড়ো মহারাজ তৃতীয় সয়াজীরাও তাঁকে সেখান থেকে পাকড়াও করে নিয়ে এসে বরোদা যাদুঘরের বড়কর্তা বানিয়ে বসিয়ে দেয়।

লোকটির পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ এবং তাঁর স্ত্রীও এতখানি লেখাপড়া জানতেন যে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তিনি তাঁর স্বামীকে পর্যন্ত কাজকর্মে সাহায্য করতে পারতেন। সয়াজীরাওয়ের পাঠানো 'ভিনাস দি মিলো', মাইকেল এঞ্জেলোর তৈরি 'মোজেস' ও 'মুমূর্ষু দাসের' প্লাস্টার-কাস্ট যেদিন বার্লিন থেকে বরোদা এসে পৌঁছল, সেদিন ফ্রাউ কোন্-ভিনারের কী উত্তেজনা-উৎসাহ! স্টেশনে গিয়ে সেই বিরাট বিরাট বাক্স নিজে তদারকি করে নামালেন, আহার নিদ্রা শিকেয় তুলে দিয়ে কাস্ট্‌গুলোকে যাদুঘরে সাজালেন—সে সময় তিনি যাদুঘরে একটানা চব্বিশ ঘণ্টা কাটিয়েছিলেন,—তারপর ফোলা-ফোলা লাল-লাল চোখ নিয়ে বেরলেন, আমাদের খবর দিতে, প্রভুরা বহাল-তবিয়তে যাদুঘরে আসর জমিয়ে আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছেন। পাছে আমি হুজুরদের কিমৎ ঠিকমত মালুম না করতে পেরে তেনাদের 'তাচ্ছিল্য' করি, তাই আমাকে তাঁর মোটরে তুলে নিয়ে গিয়ে হুজুরদের সঙ্গে নিজে পরিচয় করিয়ে দিলেন। হুজুরদের নাম-গোত্র, হাল-হকিকৎ, হাড়-হদ্দ এমনি গটগট করে বয়ান করে দিলেন যে, তার থেকেই বুঝতে পারলুম যে এঁর এলেমের এক কাহন পেলেও আমি সুবে বোম্বাই-বরোদা-আহমদাবাদের 'কলাবাজারে' বাকি জীবন বেপরোয়া হয়ে দাবড়ে বেড়াতে পারব।

আর হ্যার ডক্টর কোন্-ভিনারের পাণ্ডিত্য আমাকে ফলিয়ে বলতে হবে না। নন্দন-শাস্ত্র এবং বিশ্ব-স্থাপত্যের বিভিন্ন শৈলী সম্বন্ধে তিনি যেসব কেতাব লিখে গিয়েছেন, সেগুলো নাৎসী-পতনের পর ফের ছাপা হতে শুরু হয়েছে।

স্থাপত্যে পণ্ডিত অথচ বাল্যকালে তিনি লেখাপড়া শেখেন রাব্বিদের (ইহুদি পুরুষ-পণ্ডিত) টোলে। তাই ইহুদি ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর; অথচ ইহুদিদের আচার-ব্যবহার, তাদের কঞ্জুসি নিয়ে তিনি ঠাট্টা মস্করা করাতে ইহুদির শত্রু ক্রীশ্চানের চেয়েও ছিলেন বাড়া। সেসব রসিকতা একদিন মোকামাফিক ছাড়িবার বাসনা আমার আছে।

স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। পুত্র-কন্যা হয় নি, অথচ দুজনেরই হৃদয় ছিল স্নেহে ভরা। 'দেশ'র পাঠক এই ইঙ্গিত থেকেই টক্ করে বুঝে যাবেন, আমি তাঁর ন'সিকে সুযোগ নিতে কসুর করি নি। যতদিন কোন্-ভিনাররা এদেশে ছিলেন, ততদিন জর্মন বই, মাসিক, খবরের কাগজের জন্য আমাকে কিছুমাত্র দুর্ভাবনা করতে হয় নি।

'সে বছরে ফাঁকা, পেনু কিছু টাকা' ধরনে কি করে যে কিছু টাকা আমার হাতে '৩৮ ('ইংরেজিতে') জমে গিয়েছিল, সেটা নিতান্ত আমি বলছি বলেই আজ আমার বিশ্বাস হয়—হায়, এখন যা অবস্থা, '৩৮-এর মুজতবা আলীকে পথে পেলে 'দাদা, বাছা' বলে তার কাছ থেকে দু-পয়সা হাতিয়ে নিতুম।

তা সে কথা যাকগে। সে জমানো টাকাটা হাতে বড্ড বেশি চুলকোচ্ছিল বলে বাসনা হল জর্মনিতে গিয়ে সে-টাকাটা পুড়িয়ে আসি। বন্ধুবান্ধব সে দেশে মেল্লা, ওদিকে হিটলার যা নাচন-কুদন আরম্ভ করেছে, কখন না দুম করে লড়াই লেগে যায়, আর তাঁরাও সেই বেপ্যাঁচে পড়ে প্রাণটা হারান।

বরোদা ছোট্ট জায়গা—তাই খাসা জায়গা। তিন দিনের ভিতর পাসপোর্ট হয়ে গেল। বোম্বাই কাছে; ট্রাঙ্ককল করে জাহাজের টিকিট কাটা হয়ে গেল—আর গরম সুটমুট তো ছিলই। শিকের হাঁড়ি থেকে নামিয়ে ঝেড়ে-ঝুড়ে তৈরি করে নিলুম।

কোন্-ভিনারদের বললুম, জর্মনি যাচ্ছি।

শুনে দুজনেই চমকে উঠলেন। তারপর অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে রইলেন। বুঝলুম, দেশের ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠেছে—যে-দেশ আবার দেখবার সৌভাগ্য হয়ত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাঁদের জীবনে আর কখনো আসবে না। আর কিছু বুঝি না বুঝি, বিদেশে দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে বুকটা যে কি রকম তেলে-ফেলা বেগুনের মত ছ্যাঁৎ করে ওঠে, সেটা বিলক্ষণ বুঝি; এবাবতে আমি বিস্তর পোড়-খাওয়া গরু। চুপ করে রইলুম।

কোন্-ভিনার শুধালেন, 'আপনি কি বার্লিন যাবেন?'

আমি বললুম, 'এবারে জর্মনি যাচ্ছি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করতে। তারা তামাম জর্মনি ছড়িয়ে। বন্ন্, কলোন, হানোফার, বার্লিন অনেক জায়গায়ই যেতে হবে।'

কোন্-ভিনার বললেন, 'আমরা বার্লিন ছাড়ি '৩৩এ। এদেশে আসি '৩৫এ। এখানে আসার পর আমার পরিচিত কেউ বার্লিন যায় নি; আমার বুড়ি মাকে এই তিন বৎসরের ভিতর কেউ গিয়ে বলতে পারে নি যে সে আমাকে দেখেছে, আমি ভালো আছি। আমি ছাড়া আমার মায়ের এ সংসারে আর কেউ নেই। আপনি যদি—'

আমি বললুম, 'আমি অতি অবশ্য তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব; আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

খানিকটা কিন্তু-কিন্তু করে কোন্-ভিনার শেষটায় বললেন, 'তবে দেখুন, একখানা পোস্টকার্ড লিখে তার পর যাবেন। আমার মার বয়স আশীর কাছাকাছি। আপনি যদি হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হন তবে তিনি জোর শক্ পাবেন। সেটা সামলাবার জন্য—'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমি খবর দিয়েই যাব।'

কোন্-ভিনার বললেন, 'আর দেখুন, আমার যে হার্ট-ট্রাবল সেটা একদম চেপে যাবেন। কি হবে বুড়িকে জানিয়ে? আমার বাবাও হার্টের রোগে মারা যান।'

আমি বললুম, 'বুঝিয়ে বলতে হবে না। আমি ঠিক ধরতে পেরেছি। এ-জিনিস সবাই করে থাকে। আমি ওঁকে বলব, আপনারা দুজনেই আরামে দিন কাটাচ্ছেন। এই তো?

পবননন্দনপদ্ধতিতে এক লম্ফে বার্লিন পৌঁছই নি। বোম্বাই, জেনওয়া, জিনীভা, লেজাঁ, বন্ন্, কলোন, ডুসেলডর্ফ, হানোফার হয়ে হয়ে শেষটায় বার্লিন পৌঁছলুম। পূর্বেই নিবেদন করেছি, বিষ্ণুচক্রে কর্তিত খণ্ড খণ্ড সতীদেহের ন্যায় আমার বন্ধুবান্ধব ছড়িয়ে আছেন দেশ-বিদেশে।

'৩২এ নাৎসিরা রাস্তায় কম্যুনিস্টদের উপর গুণ্ডামি করতো, '৩৪এ তারা ছিল দম্ভী—এবারে '৩৮এ দিয়ে দেখি, তাদের গুণ্ডামিটা চলছে ইহুদিদের উপর। তার বর্ণনা অনেকেই পড়েছেন, আমাকে আর নূতন করে বলতে হবে না।

পোস্টকার্ডে লিখলুম, 'আমি এর্নস্ট কোন্-ভিনারের মিত্র; বরোদা থেকে এসেছি, আপনার সঙ্গে বুধবার দিন সকাল দশটায় দেখা করতে আসব।'

যে মহল্লায় কোন্-ভিনারের মা থাকতেন আমি সে পাড়ায় পূর্বে কখনো যাই নি। যে বিরাট চক-মেলানো বাড়ির সম্মুখে উপস্থিত হলুম, সেখানে অন্তত চল্লিশটা ফ্ল্যাট থাকার কথা। অথবা অবাক হলুম, জর্মন বাড়ির দেউড়িতে যে রকম সচরাচর সব পরিবারের নাম আর ফ্ল্যাটের নম্বর লেখা থাকে এখানে তার কিছুই নেই। ওদিকে দেউড়ির চেহারা দেখে মনে হল, এককালে নেম্‌প্লেটগুলো দেউড়ির পাশের দেয়ালে লাগানো ছিল। যে দু'একটি লোক আনাগোনা করছে তাদের চেহারা দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল এরা ইহুদি—অনুমান করলুম, সমস্ত বাড়িটাই ইহুদিদের—এবং চোখেমুখে কেমন যেন ভীত সন্ত্রস্ত ভাব। আমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিকে তাকালও সন্দেহের চোখে, আড়নয়নে।

বুড়ির ফ্ল্যাটের নম্বর আমি জানতুম। একজনকে জিজ্ঞেস করলুম, 'বারো নম্বর ফ্ল্যাট যেতে হলে কোন্ সিঁড়ি দিয়ে একতলায় যেতে হয় বলতে পারেন?' 'না' বলে লোকটা কেটে পড়ল। আরো দু-তিনজনকে জিজ্ঞেস করলুম, সবাই বলে 'না'।

আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হলুম, কারণ আমার অজানা ছিল না যে ইহুদিরা পাড়াপ্রতিবেশীর খবর রাখে সবচেয়ে বেশি—এবং বিশেষ করে প্রতিবেশী যদি আপন জাতের লোক হয়।

তখন হঠাৎ আমার মাথার ভিতর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। মনে পড়ল, দশ বৎসর পূর্বে কাবুলেও আমার ঐ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সেখানেও রাস্তায় কেউ কারো বাড়ি বাৎলে দেয় না। কারণ অনুসন্ধান করাতে এক বিচক্ষণ কাবুলী বলেছিলেন, 'বলতে যাবে কেন? তুমি যদি লোকটার বন্ধু হও, তবে তার বাড়ি কোথায়, সে-কথা তো তোমার জানা থাকার কথা। হয়ত তুমি স্পাই, কিংবা রাজার কাছ থেকে এসেছ তাকে তলব করতে। সেখানে হয়ত তার ফাঁসি হবে। লোকটার বাড়ি বাৎলে দিয়ে আমি তার অপমৃত্যুর গৌণ কারণ হতে যাব কেন?'

এখানে ইহুদিরাও ঠিক সেই পন্থাই ধরেছে। হয়ত আমি নাৎসি স্পাই—কি মতলবে এসেছি কে জানে?

শেষটায় অনেক ওঠা-নামা করে বারো নম্বর ফ্ল্যাট খুঁজে পেলুম—ফ্ল্যাটের নম্বর পর্যন্ত ইহুদিরা সরিয়ে ফেলেছে। ঘণ্টা বাজাতে দরজার একটা কাচের ফুটো (এ ফুটোটা আবার পিতলের চাক্তি দিয়ে ভিতর থেকে ঢেকে রাখা হয়) দিয়ে কে যেন আমায় দেখে নিলে। আমি একটু চেঁচিয়ে আমার পরিচয় দিলুম।

একটি তরুণ—তারও মুখে উত্তেজনা আর ভীতি—দরজা খুলে দিল। আমি ঢুকতেই তড়িঘড়ি দরজা বন্ধ করে দিল।

আমাকে নিয়ে গেল ড্রয়িং-রুমে। সেখানে দেখি এক অথর্ব থুরথুরে বুড়ি কৌচের এক কোণে কৌচেরই চামড়ার সঙ্গে হাত আর মুখের শুকনো চামড়া মিলিয়ে দিয়ে বসে আছেন। আমাকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন। আমি বললুম, 'করেন কি, করেন কি, আমি এর্নস্টের বন্ধু, আমার সঙ্গে লৌকিকতা করতে হবে না।'

তবু বুড়ি অতিকষ্টে উঠে দাঁড়ালেন। দুখানা হাড্ডি-সার ফালি ফালি হাত দিয়ে আমার দু-বাহু ধরে বললেন, 'বারান্দায় চলুন—সেখানে আলোতে আপনাকে ভালো করে দেখব।'

বাইরে বসিয়ে আমাকে তাঁর ঘোলাটে চোখ দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন।

তারপর হঠাৎ ঝর ঝর করে দু'চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ল—আমি তাঁর চোখের দিকে তাকিয়েছিলুম, হঠাৎ যে এ রকম দু'চোখ ভেঙে জল নেমে আসবে তার কণামাত্র পূর্বাভাস পাই নি।

চোখ মুছে বললেন, 'মাপ করবেন, আমি কাঁদছিলুম না, আমার চোখ দিয়ে যখন-তখন এ রকম জল নেমে আসে। আমি ঠেকিয়ে রাখতে পারি নে। আমি এখন কাঁদব কেন? আমি কত খুশি। এর্নস্ট কি রকম আছে? তার বউ?'

আমি বললুম, 'বড় আরামে আছেন। জানেন তো, ভারতবর্ষ খারাপ দেশ নয়। এর্নস্টের কাজও শক্ত নয়। ভালো বাড়িঘর পেয়েছেন। আর জানেন তো এর্নস্টের স্বভাব—

www.BanglaBook.org

দু'বছর হয়েছে মাত্র এরই মধ্যে বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে নিয়েছেন। আপনার বৌমা প্রায় প্রতি সপ্তাহেই আমাদের লাঞ্চ-ডিনার খাওয়ান। আমাকে বড্ড স্নেহ করেন।'

দেখি বুড়ি কাঁপছেন আর বার বার রুমাল বের করে চোখ মুচছেন।

আমার হাত দুখানি ধরে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না। আমি বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছি—কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছি নে। আমার বুকের ভিতর কি যেন হচ্ছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি কাল আবার আসতে পারবেন? না,—হয়ত আপনার অনেক কাজ?'

আমি বুঝতে পারলুম, বুড়ি নিজেকে সামলাবার জন্য সময় চান। বললুম, 'নিশ্চয় নিশ্চয়। আমি কাল আসব। আমার কোনো অসুবিধে হবে না। আমার তো এখানে কোনো কাজ-কর্ম নেই; ছুটি কাটাতে এসেছি মাত্র।'

বানিয়ে বানিয়ে গল্প জমাচ্ছি না, তাই যদি বিবরণটি নন্দনশাস্ত্রসম্মত স্বরূপ গ্রহণ না করে তবে আশা করি সুশীল পাঠক অপরাধ নেবেন না। কোন্-ভিনারের মা'র বেদনা নিয়ে সুন্দর গল্প রচনা করা যায় জানি, কিন্তু আমার মনের উপর সে এমনই দাগ কেটে গেছে যে সেটাকে গল্পের খাতিরে ফের-ফার করতে আমার বড্ড বাধো বাধো ঠেকে। সুরসিক পাঠক সেটা হয়ত বুঝতে পারবেন না, তবে সহৃদয় পাঠকের সহানুভূতি পাব সে আশা মনে মনে পোষণ করি।

দ্বিতীয়বারে বুড়ি অতটা বিচলিত হলেন না। এবারেও কাঁদলেন তবে জর্মনি বিজ্ঞানের দেশ বলে তার একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও দিলেন; বললেন, চোখের কাছের যে স্যাক্ থেকে জল বেরোয়, বুড়ো বয়সে মানুষ নাকি তার উপর কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলে। হবেও বা, কিন্তু বিদেশে ছেলের কথা ভেবে মা যদি অঝোরে কাঁদে তবে তার জন্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার কি প্রয়োজন?

শুধালেন, 'এসপেরেগাস্ খাবেন—একটুখানি গলানো মাখনের সঙ্গে?

আমি তো অবাক। এস্‌পেরেগাস্ মানুষে খায় পশ্চিম বাংলায় যে রকম আসল খাওয়া হয়ে গেলে টক খাওয়া হয়। বলা নেই কওয়া নেই, সকাল বেলা দশটার সময় সুস্থ মানুষ হঠাৎ টক খেতে যাবে কেন?

মজাটা সেইখানেই। আমি এস্‌পেরেগাস্ খেতে এত ভালোবাসি যে রাত তিনটের সময় কেউ যদি ঘুম ভাঙিয়ে এস্‌পেরেগাস্ খেতে বলে তবে তক্ষুনি রাজী হই। ভারতবর্ষে এস্‌পেরেগাস্ আসে টিনে করে—তাতে সত্যিকার সোয়াদ পাওয়া যায় না—তাজা ইলিশ নোনা ইলিশের চেয়েও বেশি তফাৎ। সেই এস্‌পেরেগাসের নামেই আমি যখন অজ্ঞান তখন এখানকার তাজা মাল!

মা-ই বললেন, 'আমি যখন এর্নস্টের কাছ থেকে খবর পেলুম, আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন, তখন বউমাকে লিখলুম, আপনি কি খেতে ভালোবাসেন সে খবর জানাতে। বউমা লিখলে পুরো লাঞ্চ খাওয়াতে হবে না, শুধু এস্‌পেরেগাস্ হলেই চলবে। সৈয়দ সাহেব মোষের মত এস্‌পেরেগাস্ খান—বেলা-অবেলায়।'

বুড়ি মধুর হাসি হেসে বললেন, 'পুরো লাঞ্চ এখন আমি আর রাঁধতে পারি নে, বউমা জানে। তাই আমার মনে কিন্তু-কিন্তু রয়ে গিয়েছে, হয়ত আমাকে মেহনত থেকে বাঁচাবার জন্য লিখেছে আপনি বেলা-অবেলায় এস্‌পেরেগাস্ খান।'

www.BanglaBook.org

আমি বললুম, 'আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

'দেশে'র চতুর পাঠকদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখে আর কস্য লভ্য যে আমি পেটুক। উল্টে তাঁরা বুঝে যাবেন, মিথ্যেবাদীও বটে।

এস্‌পেরেগাসের পরিমাণ দেখে আমার চোখ দুটো পটাং করে সকেট্ থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল। মহা মুশকিল সেগুলো কার্পেট থেকে কুড়িয়ে নিয়ে সকেটে ঢুকিয়ে এস্‌পেরেগাস্ গ্রাস করতে বসলুম।

জানি, এক মণ বললে আপনারা বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু প্লীজ, আধ মণ না মানলে আমাকে বড্ড বেদনা দেওয়া হবে। সুকুমার রায়ের 'খাই-খাই' খানেওয়ালাও সে-খানা শেষ করতে পারত না।

আমি ঐ এক বাবদেই আমার মাকে খুশি করতে পারতুম—গুরুভোজনে। ধর্মসাক্ষী, আর সব বাবদে মা আমাকে মাফ্ করে দিয়েছেন। কোন্-ভিনারের মা পর্যন্ত খুশি হলেন, তাতে আর কিমাশ্চর্যম!

হায় রে দুর্বল লেখনী—কি করে কোন্-ভিনারের মায়ের এস্‌পেরেগাস্ রান্নার বর্ণনা বতরিবৎ বয়ান করি। অমিত্রাক্ষর ছন্দে শেষ কাব্য লিখেছেন মাইকেল, শেষ এস্‌পেরেগাস্ রেঁধেছেন কোন্-ভিনারের মা।

আহারাদি শেষ হলে পর কোন্-ভিনারের মা বললেন, 'আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।'

আমি বললুম, 'আদেশ করুন।'

তিনি বললেন, 'আপনি যদি না করতে পারেন, তবে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত হব না।'

একটি অপরূপ হিরে লাগানো সোনার আংটি বের করে বললেন, 'নাৎসিরা এখন আর কোনো দামী জিনিস জর্মনির বাইরে যেতে দেয় না—সে নিয়ে তাদের উপর আমার কোনো ক্ষোভ নেই—আমি কি করে জানবো দেশের মঙ্গল কিসে। কিন্তু এ আংটিটা এর্নস্টের প্রাপ্য। তার বাপঠাকুদ্দা চোদ্দপুরুষ এই আংটিটা পরে বিয়ে করেছিলেন; এ আংটিটা তাকে দেবেন।'

আমার আঙুলে ঠিক লেগে গেল। আমি বললুম, 'আপনাকে ভাবতে হবে না।'

একটা সোনার চেনে ঝোলানো জড়োয়া পদক দিয়ে বললেন, 'এটা এর্নস্টের বাপ আমাকে বিয়ের রাতে বাসরঘরে দিয়েছিলেন, (পঞ্চাশ বছর পরে এই পরবের স্মরণে তিনি একটুখানি লাজুক হাসি হাসলেন) এটা বউমার প্রাপ্য। এটা আপনি তাকে দেবেন।'

আমি কলার খুলে গলায় পরে নিয়ে বললুম, 'নিশ্চিন্ত থাকুন।'

কোন্-ভিনারের পা পই পই করে বললেন, 'কাস্টম্‌সের বিপদে পড়লে জানলা দিয়ে ফেলে দেবেন কিংবা ওদের দিয়ে দেবেন। আমি কোন শোক করব না। ছেলে, বউকে আমি চিঠিতে এ বিষয়ে কিছুই জানাচ্ছি নে। তাদেরও কোনো শোক করতে হবে না।'

বরোদা ফিরে আমি কোন্-ভিনারকে আংটি দিলুম, তাঁর বউকে পদক দিলুম।

* * *

ছ'মাস পরে বুড়ি মারা যান। কোন্-ভিনার এক বছর পরে মারা যান। তাঁর স্ত্রী এখন কোথায় জানি নে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোদণ্ড মুখহানা
(জীবনী)

দ্বিতীয়বার বিলেতে যাওয়ার সময় জাহাজে চড়ে যে অনুভূতিটা হয়, তার সঙ্গে দোজবরের মনের অবস্থা তুলনা করা যেতে পারে। ঔৎসুক্য, আশঙ্কা সব কিছুরই তখন কমতি ঘটে, বাড়িতে থাকে শুদ্ধমাত্র হুঁশিয়ারি, অর্থাৎ প্রথমবারে যে-সব ভুল করেছি, আবার যেন সেগুলো নতুন করে না করতে হয়। প্রথমবারের উৎসাহের চোটে বউকে কুমার জীবনের দু'একটা রোমান্টিক কাহিনী বলে ফেলে যে মারাত্মক ভুল করেছিলুম, এবারে আর সেটি করব না। প্রথমবার বিলেতে যাওয়ার সময় প্রকাশ করে ফেলেছিলুম যে পকেট লাইট-ওয়েট চেম্পিয়ান, এবারে আর সে পাঁচালি না, এবার ব্লাফ দিয়ে স্টুয়ার্ড, কেবিনবয় সক্কলের কাছ থেকে পুরোমাত্রায় খাতিরযত্ন উশুল করে মামুলী টিপ দিয়েই মোকামে পৌঁছাব।

তারই ব্যবস্থা করতে করতে থানার ঘণ্টা বেজে গেল। প্রথমবার বিলেতে যাবার সময় ঘণ্টা শুনে জেলের কয়েদীর মত হন্তদন্ত হয়ে ছুট মেরেছিলুম খানা-কামরার দিকে, এবারে গেলুম ধীরে-সুস্থে, গজ-মন্থরে। এবারে ভয় নেই, ভরসাও নেই।

ভেবেছিলুম, গিয়ে দেখব, সায়েব-মেমের হৈ-হল্লার এক পাশে নেটিভ্‌রা মাথা গুঁজে ছুরি-কাঁটার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে এমনি ব্যস্ত যে একে অন্যের মুখের দিকে তাকাবার ফুরসৎ পাচ্ছেন না, কিন্তু যা দেখলুম, তাতে একেবারে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়।

উত্তম বিলিতি কাটের ডবল-ব্রেস্ট, কোট, মানানসই শার্টকলার, শিষ্ট-সংযত টাই-পরা এক শ্যামবর্ণের দোহারা গঠন দীর্ঘাকৃতি ভদ্রলোক তুর্কী টুপির ট্যাসেল দুলিয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে গল্প বলে আসর জমিয়ে তুলেছেন আর আটজন ভারতীয় অন্নগেলা বন্ধ করে গোগ্রাসে তাঁর গল্প গিলছে। আমি টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াতেই ভদ্রলোক অতিশয় সপ্রতিভভাবে গল্প বলা বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন। ন্যাপকিনে হাত মুছতে মুছতে মৃদু হেসে বললেন, 'এই যে আসুন, ডাক্তার সাহেব, আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলুম। টেবিলের মাথাটা আপনার জন্যেই রেখেছি, আর তো সব ছেলে-ছোকরার দল! এদের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই।' বলে বেশ গট গট করে বোস্, চাটুজ্যে, শুক্ল, মিশ্র, চৌধুরী ইত্যাদি আটজন ভারতীয়ের নাম অবলীলাক্রমে বলে যেতে লাগলেন।

লোকটি গুণী বটে! দশ মিনিট হল যাবার ঘণ্টা পড়েছে। এরি মধ্যে আটজন লোকের সঙ্গে শুধু যে আলাপই করে নিয়েছে তাই নয়, সক্কলের নাম বেশ স্পষ্ট মনেও রেখেছে।

সব শেষে বললেন, 'আমার নাম মুখহানা।'

এ আবার কোন্ দিশী নাম রে বাবা। পরনে সুট, মাথায় তুর্কীর টুপি! গড়গড় করে ভুল-শুদ্ধে-মেশানো ইংরিজি বলছে। মিশরের লোক? উঁহু! সিংহলী? কি জানে। মুসলমান তো নিশ্চয়ই—তুর্কী টুপি যখন রয়েছে।

দু'খানা ফর্ক হাতে তুলে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এঁদের রাস্‌ল্ পাশার গল্প শোনাচ্ছি।' বলে গোড়ার দিকটা যে আমি শুনতে পাই নি, তার জন্যে যেন মাপ চাওয়ার মৃদু হাসি হেসে বললেন, 'আশ্চর্য লোক রাস্‌ল্ পাশা। প্রথম তো মিশর থেকে তাড়ালেন হসীস। তারপর এসে জুটল ককেইন। সে যে কি অদ্ভুত কায়দায় মিশরে ঢুকতো,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তার সন্ধান না পেয়ে সি.আই.ডি. যখন হার মানলো, তখন রাস্‌ল্‌ পাশাই কায়দাটা বের করলেন। কি করে যে লক্ষ্য করলেন, ভিয়েনা থেকে টেবিলের পায়ার ভিতরে করে গুপ্তি ককেইন আসছে, সেটা তাকে না জিজ্ঞেস করে সি আই ডি পর্যন্ত ঠাহর করতে পারে নি। রাস্‌ল্‌ পাশাই বুঝিয়ে বললেন, "ভিয়েনার চেয়ে কাইরোর কাঠের আসবাব অনেক বেশি মিহিন, সস্তাও বটে। তার থেকেই বুঝলুম, নিশ্চয়ই কোনরকম শয়তানির খেল রয়েছে। একটা টেবিলের পায়া ভাঙতেই ককেইন বেরিয়ে পড়ল।" বুঝুন, লোকটার কড়া চোখের তেজ। কাস্টম অফিসে কি মাল আসছে যাচ্ছে, তাতে যেন এক্সরে হয়ে ঢুকছে বেরুচ্ছে।

তারপর গল্প ক্ষান্ত দিয়ে নিপুণ হাতে দু'খানি ফর্ক দিয়ে মাছের কাঁটা বাছতে লাগলেন। ভদ্রলোকের খাওয়ার তরিবৎটা দেখবার মত হেকমৎ—যেন পাকা সার্জনের অপারেশন। এবং তার চেয়েও তারিফ করবার জিনিস তাঁর গল্প করা এবং সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে যাওয়ার মেকদার জ্ঞান। খাওয়ার সময় যারা গল্প বলতে ভালোবাসে, তাদের বেশির ভাগই খাওয়াটা অবহেলা করে শেষের দিকে হড়হড় করে সব কিছু গিলে ফেলে। এ ভদ্রলোক দুটোই একসঙ্গে চালালেন ধীরে-সুস্থে, তাড়াহুড়ো না করে। আমি বললুম, 'আপনি দেখছি মিশরের অনেক কথাই জানেন।' তাঁর মুখে তখন মাছ। কথা না বলে আমার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন। ভাবখানা এই 'একটু দাঁড়ান, গ্রাসটা গিলি, তারপর বলব।' বললেন, 'জানব না? আমি আঠার বছর কাইরোতে কাটালুম যে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'মিশর ছাড়লেন কবে?'

তিনি বললেন, 'ছাড়বো কেন, এখনও তো সেখানেই আছি।'

আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলুম। বললুম, 'বিলাত থেকে ফেরার মুখে কিছুদিন মিশরে কাটানো আমার বাসনা। কাইরোতেই থাকব ভাবছি।'

প্লেটের মাছের দিকে তাকিয়েই বললেন, 'হুঁ।'

আমি তো অবাক! এরকম অবস্থায় দেশের লোক অন্তত পক্ষে বলে, আসবার খবরটা দেবেন, সহৃদয় লোক নানাপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। এ ভদ্রলোকের কথাবার্তা চালচলন দেখে তো মনে হয়েছিল, ইনি কাইরোর মত পাণ্ডববর্জিত দেশে স্বদেশবাসীকে লুফে নিন আর নাই নিন, গতানুগতিক ভদ্রতার সম্বর্ধনাটা অন্তত করবেন। তাই তাঁর দরদহীন 'হুঁ'-টার ভেজাকম্বল আমার সর্বাঙ্গে যেন কাঁপন লাগিয়ে দিল। আর পাঁচজনও যে একটু আশ্চর্য হয়েছেন স্পষ্ট বুঝতে পারলুম। তারপর গালগল্প তেমন করে আর জমলো না।

খাওয়ার পর উপরে এসে ডেকচেয়ারে শুয়ে বিরস বিবর্ণ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছি, এমন সময় সেই ভদ্রলোক আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমার মুখ তিনি ঈষৎ অবহেলার ভাব লক্ষ্য করলেন কিনা জানি নে, তবে বেশ সপ্রতিভভাবেই আমার পাশের ডেকচেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, 'আপনি আমায় মাপ করুন।' আমি বললুম, 'সে কি কথা, কি হয়েছে?' বললেন, 'আমি ভারতবাসী, তাই ভারতীয়দের প্রতি আমার একটু অভিমান আছে। এই আঠার বৎসর ধরে আমি মিশর ভারতবর্ষ করে আসছি। প্রতিবারই দু'চারজন ভারতীয় উৎসাহের সঙ্গে কাইরো আসবে বলে প্রতিজ্ঞা করে—আজ পর্যন্ত কেউ আসে নি। আপনি আসবেন কিনা জানি নে; তবে স্ট্যাটিস্‌টিক্স যদি পাকাপাকি বিজ্ঞান হয়, না আসার সম্ভাবনাই বেশি। তাই আমার অভিমান, এখন কেউ কাইরো যাবার প্রস্তাব করলে আমি গা করি নে।'

www.BanglaBook.org

তারপর তিনি হঠাৎ খাড়া হয়ে বসলেন। বেশ একটু গরম সুরে বললেন, 'আশ্চর্য হই বার বার স্বদেশবাসী ছাত্রদের দেখে। বিলেতে ডিগ্রী পাওয়া মাত্রই ছুট দেয় দেশের দিকে, সেই ক্যাশ সার্টিফিকেট ভাঙাবার জন্যে। কতবার কত ছেলেকে বুঝিয়ে বলেছি, মিশরীয় সভ্যতা ভাল করে দেখবার জিনিস, ওর থেকে অনেক কিছু শেখবার মত আছে, এমন কি নেমন্তন্ন করেছি আমার বাড়িতে ওঠবার জন্যে কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! কি হবে এদের দিয়ে বুঝতে পারি নে।'

আমি চুপ করে শুনে গেলুম। কি আর বলব? তারপর বললেন, 'আমি নিজে লেখাপড়া করবার সুযোগ-সুবিধে পাই নি। বাবা অল্প বয়সে মারা যান বলে। তাই—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'সে কি কথা? আপনি তো চমৎকার ইংরিজি বলছেন।'

মুখহানা মুচকি হেসে বললেন, 'ইংরেজ চাষা আমার চেয়ে ভাল ইংরিজি বলে। তাই বলে সেও শিক্ষিত নাকি? আপনিও এই কথাটা বললেন? আপনি না হের ডক্টর!'

এক মাথা লজ্জা পেলুম।

বললেন, 'তবু আপনার নেমন্তন্ন রইল। ইউরোপ থেকে ফেরবার মুখে আসবেন তবে আলেকজ্যান্ড্রিয়ায় নেমে আমাকে তার করবেন। আমার টেলিগ্রাফী ঠিকানা "মোহিনী টি", আমার চায়ের ব্যবসা।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'মিশরের লোক কি চা খায়?'

বেশ গর্বের সঙ্গে বললেন, 'আগে খেত না। এখন তার বাপ খায়। আমি খাইয়ে ছেড়েছি। আপনি কিন্তু ঠিকই জিজ্ঞেস করেছেন—আগে তারা শুধু কফি খেত।'

আমি আরও আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'আপনি খাইয়ে ছেড়েছেন, তার মানে?'

খুব একগাল হেসে নিয়ে বললেন, 'তাহলে আপনার সামনে একটু উঁচু ঘোড়া চড়ে নিই। আপনাদের তো লেখাপড়ার হাই-জম্প লঙ-জম্প। আমার ব্যবসায়ে—বলব সব?

আমি বললুম, 'ভারতের লোক মিশরে চা বেচছে, একথা শুনে কার না আনন্দ হয়? আপনি ভাল করে সব কিছু বলুন।'

মুখহানা বললেন, 'তবে শুনুন। আমার বাড়ি কুর্গে। বাবা অল্প বয়সে মারা যান, আগেই বলেছি। তাই ১৯১৬ সনে ঢুকে পড়লাম কুর্গ পল্টনে, জানেন তো, কুর্গের লোক আর সব ভারতীয়ের চেয়ে আলাদা। রাইফেলটা, লড়াইটার নাম শুনলে ভয় পায় না। আমাদের পল্টনের সঙ্গে সঙ্গে আমি গেলুম আলেকজ্যান্ড্রিয়া। তারপর তান্তা দামনহুর জগাজিগ্ করে করে শেষটায় কাইরো। আড়াই বছর ছিলুম কাইরোতে। তারপর লড়াই থামল। মহাত্মা গাঁধী শুরু করেছেন অসহযোগ আন্দোলন। ইংরেজের উপর আমারও মন গিয়েছে বিগড়ে—বিশেষ করে লড়াইয়ের সময় কালো-ধলায় তফাৎ করার বাঁদরামি দেখে দেখে। ভাবলুম, কি হবে দেশে ফিরে গিয়ে? তার চেয়ে এখানে যদি জগলুল পাশার দলে ভিড়ে যেতে পারি, তবে ভারতবর্ষের আন্দোলনের সঙ্গে এদের স্বাধীনতা আন্দোলন মেলাবার সুবিধে হলে হয়েও যেতে পারে।

'পড়ে রইলুম কাইরোয়। পল্টন থেকে খালাস পাওয়ার সময় যা-কিছু টাকাকড়ি পেয়েছিলুম, তাই দিয়ে বাঁধলুম ছোট একটি বাসা—অর্থাৎ ফ্ল্যাট। জগলুলের দলের সঙ্গে যোগাযোগও হল, কিন্তু মুশ্‌কিলে পড়লুম অন্নবস্ত্রের সমস্যা নিয়ে। ওঁরা অবশ্যি আমার এ-সব ভাবনা পার্টির কাঁধে তুলে নিতে খুশি হয়েই রাজী হতেন, কিন্তু হাজার হোক ওঁরা

www.BanglaBook.org

বিদেশী, ওঁদের টাকা আমি নেব কেন? তাই ফাঁদতে হল ব্যবসা। খুললুম চায়ের দোকান। পার্টির মেম্বাররাই হলেন প্রথম খদ্দের। ওঁরা আমার ফ্ল্যাটে চা খেয়ে খেয়ে চায়ের তত্ত্ব সমঝে গিয়েছিলেন।

'তখন লাগল আমাতে কফিতে লড়াই। আর সে লড়াই এমনি মারাত্মক হয়ে দাঁড়ালো যে বাধ্য হয়ে আমাকে পলিটিক্স ছাড়তে হল। নেংটি পরে অসহযোগ করতে পারে গাঁধী, আমি পারি নে। অবশ্য লড়াইয়ের লুট তখন কিছু কিছু আসতে আরম্ভ করেছে—অর্থাৎ দু'পয়সা কামাতে শুরু করেছি। পার্টিমেম্বারদের চাটা-আসটা ফ্রি খাওয়াই, তাইতেই তাঁরা খুশি। টাকা-কড়িও মাঝে মাঝে—কিন্তু সেকথা যাক।'

আমি দুটো শরবতের অর্ডার দিলুম। মুখহানা আমার হাত চেপে ধরে বললেন, 'আপনি এখনো কামাতে শুরু করেন নি—আমি কারবারী, বিলটা আমিই সই করি।'

আমি কাঁচুমাচু হয়ে বললুম, 'সামান্য দু'পয়সা—।'

হেসে বললেন, 'ইক্‌সেক্‌ট্‌লি! বেশি হলে দিতুম না।'

আমি শুধালুম, 'আপনার সঙ্গে কফির লড়াইটা কতদিন চলেছিল?'

'বহু বৎসর। এখনো চলছে। কিন্তু পয়লা রোঁদে মার খেয়েই বুঝতে পারলুম, মাত্র একখানা চায়ের দোকান সমস্ত দেশের কফির সঙ্গে কখনই লড়তে পারবে না। তাই আরম্ভ করলুম চায়ের পাতা বিক্রি। কিন্তু ব্রুকবন্ড লিপ্‌টন বিক্রি করে আমার লাভ হয় কম, আর যে ইংরাজকে দেখলে আমার ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে ধুঁয়ো বেরোয়, তার হয়ে যায় প'বারো। কাজেই আনাতে হল চায়ের পাতা আসাম থেকে, দার্জিলিং থেকে, সিংহল থেকে। কিন্তু ব্লেন্ডিঙের জানি নে কিছুই, চায়ের স্বাদও ভাল করে বুঝতে পারি নে—ছেলেবেলা থেকে খেয়েছি কফি, কারণ কুর্গের লোক মিশরীদের মতোই কফি খায়। তখন জিহ্বাটাকে স্বাদকাতর করবার জন্য বাধ্য হয়ে ছাড়তে হল সিগার, খাবারদাবার থেকে বর্জন করতে হল লঙ্কা আর সর্বপ্রকারের গরমমসলা।'

আমি বললুম, 'এর চেয়ে অল্প কৃচ্ছ্রসাধনে তো মিশরের রাজকন্যে পাওয়া যেত!'

'তা যেত। কিন্তু আমি তখনও কফির ড্রাগের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছি। আরেকটা কথা ভুলবেন না। মিশরীয়রা যদি ভারতের কফি খেত, তাহলে আমি ভারতীয় চা'কে ভারতীয় কফির পেছনে লেলিয়ে দিতুম না। ভায়ে ভায়ে লড়াই আমি আদপেই পছন্দ করি নে। যাক্ সেকথা। আমি দেশ থেকে হরেক রকম চা আনিয়ে ব্লেন্ড করে ব্র্যান্ড ছাড়লুম, তারই নাম দিলুম "মোহিনী টি", মোহিনী আমার মায়ের নাম।'

বলে যেন বড় লজ্জা পেলেন। আমি তো বুঝলুম না এতে লজ্জার কী আছে। কফির সঙ্গে একা লড়নেওয়ালা, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের ঘড়েল-ব্যবসায়ী মায়াদয়াহীন কারবারের মাঝখানে যে মায়ের কথা স্মরণ রেখেছে, এ যেন মিশরীয় মরুভূমির মাঝখানে সুধা-শ্যামলিল মরূদ্যান। কিন্তু আমাকে কোনও কথা বলতে না দিয়েই তিনি যেন লজ্জা ঢাকবার জন্যেই উঠে দাঁড়ালেন। 'আরেক দিন হবে' এরকম ধারা কী যেন খানিকটে বলে আস্তে আস্তে আপন কেবিনের দিকে রওয়ানা হলেন।

আমার তখন খেয়াল হল মোহিনী নামটার দিকে। মুসলমান মেয়ের নাম মোহিনী হল কি করে? আর হবেই না বা কেন? বাংলা দেশে যদি 'চাঁদের মা' 'সুরুযের মা' হতে পারে, কুর্গের মেয়ের 'মোহিনী' হতে দোষ কী?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

* * *

আস্তে আস্তে মুখহানা সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানতে পারলুম। কিন্তু সব চেয়ে বেশি দুঃখ হল একদিন যখন শুনলুম, কফিকে খানিকটে হার মানিয়ে তিনি যখন মোহিনীকে চালু করতে সক্ষম হয়েছেন, তখন বাজারে এসে জুটল লিপ্‌টন আর ব্রুকবন্ড, তার তাঁর পাকা ধানে মই দিলে না বটে, কিন্তু ধানের প্রবেশ খানিকটা বড় ভাগ তুলে নিয়ে খেতে লাগল। মুখহানা বললেন, 'আমি হার মানি নি বটে, কিন্তু এদের সঙ্গে লড়বার মত পুঁজি আমার গাঁটে নেই। ভারতবর্ষের দু'একজন চায়ের ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপ করে দেখলুম, তাঁরা আমার লড়াইটাকে বুনো মোষ তাড়া করার পর্যায়ে ফেলে দিয়েছেন—নাইলের জলে আপন রেস্ত ডোবাতে চান না।

অথচ ব্যক্তিগতভাবে কোনও ইংরেজের সঙ্গে তাঁর কোনও দুশমনি নেই। জাহাজ ভর্তি ইংরেজের প্রায় সব কটাই দেখি তাঁর সঙ্গে গায়ে পড়ে কথা কয়। এ-লাইনের সব কটা জাহাজ তিনি ভাল করে চেনেন বলে কি ভারতীয় কি ইংরেজ সকলেরই ছোটখাটো সুখ-সুবিধা অনায়াসে করে দিতে পারেন। ভদ্রলোক যেন প্যাসেঞ্জার আর জাহাজ-কর্তাদের মাঝখানে বেসরকারি লিয়েজোঁ অফিসার।

কিন্তু তাঁর আসল কেরামতি স্বপ্রকাশ হল আদন বন্দরে এসে।

আদন বন্দরে কোনও প্রকারের শুল্ক নেই বলে আদনের আরব ব্যবসায়ীরা দুনিয়ার হরেক রকম জিনিস জাহাজে বেচতে আসে। আর মেমসাহেবরাও এ তত্ত্বটা জানেন বলে হন্যে হয়ে থাকেন দেশের পাঁচজনের জন্য আদন বন্দরে সস্তায় সওগাত কিনবেন বলে।

ডেক-চেয়ারে হেলান দিয়ে চুপ করে দরকষাকষি দেখছিলুম—আর সব ভারতীয়েরা আদন দেখতে গেছেন, প্রথমবারে আমিও গিয়েছিলুম—এমন সময় হেলেদুলে মুখহানা এসে উপস্থিত। আর যায় কোথায়? সব মেম একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলল, 'আসুন, মিস্টার মুখহান্না। এই আরবদের হাত থেকে আমাদের বাঁচান।'

মুখহানা আশ্চর্য হবার ভান করে বললেন, 'সে কি মেদাম, ইংরেজ হল ব্যবসায়ীর জাত। তাকে ঠকাচ্ছে আরব? আর ব্যবসায়ে কানা আমি ভারতীয় বাঁচাবো সেই ইংরেজকে? ড্রাগনকে বাঁচাবো ডেমসেলের হাত থেকে?'

তারপর ছোটালেন আরবী ভাষার তুবড়ি। সঙ্গে সঙ্গে কখনও ব্যঙ্গের হাসি, কখনও ঠাট্টার অট্টহাস্য, কখনও অপমানিত অভিমানের জলদ গর্জন, কখনও সর্বস্ব লুণ্ঠিত হওয়ার ভয়ে দুর্বলের তীক্ষ্ণ আর্তরব, কখনও রুদ্রের দক্ষিণ মুখের প্রসন্ন কল্যাণ অভয়বাণী, সর্বশেষে দু'চার পয়সা নিয়ে ছেলেছোকরার মত কাড়াকাড়ি। আমি গোটাপাঁচেক স্ন্যাপশট্ নিলুম।

কিন্তু আরবরা বেহদ্দ খুব। হুঁ! লোকটা দরদস্তুর করতে জানে বটে। এর কাছে ঠকেও সুখ। তার উপর মুখহানা কপচাচ্ছেন মিশরের আরবী—অতি খানদানী, তার সর্বশরীরে নীল নদের মত নীল রক্ত, আদনের আরবী তার সামনে সুকুমার রায়ের—

"কানের কাছে নানান্ সুরে
নামতা শোনায় একশো উঁড়ে।"

দরদস্তুর, কারবার-বেসাতি শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমি মুগ্ধ হয়ে বললুম, 'কি চমৎকার আরবী বলতে পারেন আপনি!'

মুখহানা বললেন, 'আবার! মিশরের যে-কোনোও গাড়োয়ান আমার চেয়ে ভাল

www.BanglaBook.org

আরবী বলতে পারে এবং গাড়োয়ানের মতই আমি না পারি আরবী লিখতে, না পারি পড়তে।'

আমি বললুম, 'খানিকটে নিশ্চয়ই পড়তে পারেন। মধ্যবিত্ত ঘরের সব মুসলমানই তো ছেলেবেলায় কুরান পড়তে শেখে।' মুথহানা বললেন, 'তুর্কী টুপি দেখে আপনিও আমাকে মুসলমান ঠাউরে নিয়েছেন, কিন্তু আমি তো মুসলমান নই!' তারপর একটুখানি ভেবে নিয়ে বললেন, 'হিন্দুই বা বলি কি প্রকারে? হিন্দুধর্মের কি-ই বা জানি, কি-ই বা মানি!'

তারপর বললেন, 'এবারে যখন মাকে দেখতে গেলুম কুর্গে, তখন গাঁয়ের মুসলমানরা আমার খানিকটা জমি কিনতে চাইল মসজিদ গড়ার জন্য। আমি বললুম, 'এক-রত্তি জমির জন্য আর পয়সা নেব না। মুসলমান দেশের নুন-নিমক খাই, না হয় দিলুম তাদের জাতভাইদের মসজিদ বানাবার জায়গা। ওদিকে মহীশূর দরবারে কে গিয়ে লাগিয়েছে আমি নাকি 'আজাঁ প্রভোকাতর', কম্যুনাল রায়ট লাগাবার তালে ইংরেজ আমাকে দেশে পাঠিয়েছে। কী মুশকিল! এল এক ডেপুটি তদন্ত করার জন্যে। আমাকে দেখেই শুধাল, "আপনি হিন্দু, আপনার মাথায় তুর্কী টুপি কেন?" আমি বললুম, "আপনি হিন্দু, আপনার পরনে কেরেস্তানি সুট কেন? আপনি যদি বিলেতে না গিয়েও সুট পড়তে পারেন তবে মিশরে আঠারো বৎসর থাকার পরও কি আমার তুর্কী টুপি পরার হক্ বর্তালো না?" আশ্চর্য, আপনিই বলুন তো, সিংহের মাথায় 'লর্ড' পরালে যদি মানুষ ইংরেজ না হয় তবে আমার মাথায় তুর্কী টুপি চড়ালেই আমি মুসলমান হয়ে যাব কেন? যে দেশে থাকবে, সে দেশের পাঁচজনকে হিন্দিতে যাকে বলে 'আপনাতে' হবে অর্থাৎ আপন করে নিতে হবে। তার জন্য বেশভূষা, আহার-বিহার, সব বিষয়েই মনকে সংস্কারমুক্ত না রাখলে চলবে কেন? কিন্তু আপনাকে এসব বলার কি প্রয়োজন? আপনিও তো অনেক দেশ দেখেছেন।'

এমন সময় আরব কারবারীরা এসে আমাদের কাছে দাঁড়াল। মুথহানা চেয়ার থেকে উঠে তাদের সঙ্গে হাত মেলালেন। কথা কইলেন এমনভাবে যেন জন্ম-জন্মান্তরে পরম আত্মজন! বুঝলুম, কারবারীরা এসেছিল বিশেষ করে তাঁর কাছ থেকেই বিদায় নেবার জন্য। যাবার সময় বলে গেল, এ জাহাজে তাদের অর্থলাভ হয় নি বটে কিন্তু বন্ধুলাভ হল।

তারপর যে কদিন তিনি জাহাজে ছিলেন, প্রায় সমস্ত সময়টা কাটালেন গাদা গাদা চিঠিপত্র টাইপ করে। কিন্তু লৌকিকতার স্মিতহাস্য, সী-সিকদের তত্ত্ব-তাবাশ, পাঁজনের সাতটা ফরমাইশ-সুপারিশ করাতে তৎপর। আর তুর্কী টুপির ট্যাসেল দুলিয়ে দুলিয়ে খানা-টেবিল যে বিলক্ষণ তপ্ত-গরম রাখলেন, সে-কথা আমি না বললেও এন্‌কর লাইন জাহাজ কোম্পানি হলপ খেয়ে বলবে।

সুয়েজবন্দরে তিনি নেমে গেলেন—জাহাজ অন্ধকার করে। এর চেয়ে ভাল বর্ণনা আমি চেষ্টা করে খুঁজে পেলুম না। এমন সব পুরনো অলঙ্কার আছে যার সামনে হালফ্যাশান হামেশাই হার মানবে।

ইউরোপে দশ মাস কেটে গেল এটা-সেটা দেখতে দেখতে। তার প্রথম চার মাস কাটল কলকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক পণ্ডিত অজিত বসুর সঙ্গে। তিনি সস্ত্রীক ফ্রান্স, সুইটজারল্যান্ড, জর্মনি, অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ঘুরলেন যক্ষ্মা-হাসপাতাল দেখে দেখে—আমি ছিলুম দোভাষী হয়ে। কবি সাদী বলেছেন, 'কয়লাওয়ালার সঙ্গে দোস্তী করলে গায়ে

www.BanglaBook.org

কিছু না কিছু কয়লার গুঁড়ো লাগবেই, আতরওয়ালার সঙ্গে আশনাই হলে গায়ে কিঞ্চিৎ খুশবাই লাগবে।' বিয়াল্লিশটা স্যানাটরিয়া ঘুরে আমার গায়ে কয়লা না আতর লাগল সে সমস্যা এখনও সমাধান করতে পারি নি তবে যক্ষ্মার যে বিশেষ কোনও চিকিৎসা নেই সে কথাটা দোভাষীগিরি করে বেশ ভাল করেই হৃদয়ঙ্গম হল।* ডাক্তারে ডাক্তারে কথা বলার সময় সাধারণত সত্য গোপন করে না।

তারপর একদিন শুভ প্রাতে ভেনিস বন্দরে পৌঁছলুম। শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে লিডোতে সাঁতার কেটে, সিনমার্ক দর্শন করে, চন্দ্রালোকে গন্ডোলা চড়ে, টুরিস্ট ধর্মের তিন আশ্রম পালন করার পর ভেনিস থেকে সন্ন্যাস নিলুম। তিন দিন পরে আলেকজ্যান্ড্রিয়া বন্দর। সেখান থেকে কাইরোয় ট্রেনে চাপবার পূর্বে তার করলুম, 'মোহিনী টি'কে।

এ দশ মাস ইচ্ছে করেই মুখহানাকে কোনও চিঠিপত্র লিখি নি। স্থির করেছিলুম ভদ্রলোককে তাক লাগিয়ে দেব। আর পাঁচটা ভারতীয়ের তুলনায় বাঙালি যে প্রতিজ্ঞা পালনে জান-কবুল, সে কথাটা হাতে-নাতে দেখিয়ে দেব—"বাঙালির বাত নড়ে তো বাপ নড়ে।"

কাইরো স্টেশনে নেমে কিন্তু তাক লাগল আমারই। যে-লোকটি নিজেকে মুখহানা বলে পরিচয় দেয় তার সঙ্গে জাহাজের মুখহানার যে কোনোখানে মিল আছে সে কথা আপন স্মৃতিশক্তিকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস না করে মানবার উপায় নেই। ওঁর গায়ে সুটটি পরা ছিল যেন সার্জেনের হাতে রবারের দস্তানা—এর গায়ে সুট ঝুলছে যেন ভিখিরির ভিক্ষের ঝুলি। ওঁর মুখে ছিল উজ্জ্বল হাসি, ওঁর ছিল পুরুষ্ট টোল-খেকো বাচ্চা ছেলের তুলতুলে গাল, এর দেখি কপালের ঢিপি আর দুই ভাঙা গালের উনুনের ঝিঁক। উঁচু কলারের মাঝখানে এই যে কণ্ঠা প্রথম দেখলুম, সেটাকে তিনি ডবল সাইজ করে দিলেও মাঝখানের ফাঁক ভরবে না!

আর সেই চোখ দুটি গেল কোথায়? কেউ হাসে দাঁত দিয়ে, কেউ হাসে ঠোঁট দিয়ে, বেশির ভাগ লোক মুখ আর গাল দিয়ে—মুখহানা হাসতেন সুদ্ধ দুটি চোখ দিয়ে। আর তার ঝিলিমিলি এতই অদ্ভুত যে, তখনই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে জোয়ার জলের চাঁদের ঝিকিমিকি।

এঁর বয়স তো এখনও আটত্রিশ পেরোয় নি। এ বয়সে তো চোখে ছানি পড়ে না।

ট্যাক্সি ডাকলেন। আমার তো আবছা-আবছা মনে পড়ল, নিজের গাড়ির কথা যেন কোনও কথার ফাঁকে আপন অনিচ্ছায় জাহাজে বলেছিলেন। কি জানি হয়ত গাড়ি কারখানায় গিয়েছে।

কন্তারা-তুল-দিক্কা স্টেশন থেকে দূরে নয়। ফ্ল্যাট পাঁচতলায়। মুখহানা ড্রয়িংরুমের সোফার উপর নেতিয়ে পড়ে প্রাণপণ হাঁপাতে লাগলেন। আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনার কি হয়েছে বলুন।' বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'কিছু না, একটু কাশি।' এই মুখহানা সেই মুখহানা! আমি চুপ করে গেলুম।

স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। নাম হেলেনা। সাইপ্রিস দ্বীপের গ্রীক মেয়ে। গ্রীক ছাড়া জানেন অতি অল্প কিচেন-আরবী আর তার চেয়েও কম ইংরিজি। আমি জানি গ্রীক

* ১৯৩৩-৩৪ এর কথা ঃ এখন অবস্থা অন্যরকম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্যাকরণের শব্দরূপ ধাতুরূপ—ক্লাস নাইনের ছোকরা যেমন উপক্রমণিকা জানে। অনুমান করলুম, গ্রীক রমণী বিদেশীর মুখে ভুল উচ্চারণে আপনার ভাষার ধাতুরূপ শোনার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হবে না। তাই আরবী ইংরিজির গুরু চণ্ডালী দিয়ে যতটা পারি ভদ্রতা রক্ষা করলুম। মুখহানা গ্রীক বললেন অক্লেশে।

দুবার যে ভুল করেছি সে-ভুল আর করলুম না। শুধু জিজ্ঞেস করলুম, 'গ্রীক শিখতে আপনার ক'বৎসর লেগেছিল?' বললেন, 'এই আঠারো বছর ধরে শিখছি। এখানকার কারবারী মহলে গ্রীক না জেনে ব্যবসা করা কঠিন।' ব্যাস, সুদ্ধ প্রশ্নের উত্তরটুকু। জাহাজে হলে এরই খেই ধরে আরো কত রসালাপ জমত।

খানা-কামরা নেই। ড্রইংরুমে টেবিল সাফ করে খানা সাজানো হল। একটি ন'দশ বছরের ছোকরা ছুরিটা, কাঁটাটা এগিয়ে দিল। মোট খাটুনিটা গেল হেলেনার উপর দিয়ে। বুঝলাম রেঁধেছেনও তিনিই। চমৎকার পরিপাটি রান্না।

খাওয়ার সময় টেবিলে বসলেন মুখহানার বিধবা শালী তাঁর ছোট মেয়ে নিয়ে। আভাসে ইঙ্গিতে অনুমান করলুম, এঁরা তাঁর পুষ্যি।

ইতিমধ্যে আমার মনে আরেক দুর্ভাবনার উদয় হল। হাত ধুতে যাবার সময় চোখে পড়েছে মাত্র দু'খানা শোবার ঘর। আমি তবে শোবো কোথায়? হোটেলে যাবার প্রস্তাব মুখহানার কাছে পাড়ি-ই বা কি প্রকারে? ভদ্রলোক যে-রকম ঠোঁট সেলাই করে নীরবতার উইয়ের ঢিবির ভিতর শামুকের মত বসে আছেন তাতে আমি সূচ্যগ্রও ঢোকাবার মত ভরসা পেলুম না। তবে কি ম্যাডামকে জিজ্ঞেস করব, মমিকে যেরকম এদেশে কাঠের কফিনে পুরে রাখে, অতিথিকেও তেমনি রাত্রে কাঠের বাক্সে তালাবন্ধ করে রাখার রেওয়াজ আছে কিনা!

আহারাদির পর হেলেনা আমার প্রথম সিগারেটটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসে রাত্রের মত বিদায় নিলেন। খানিকক্ষণ পরে রান্নাঘরে বাসনবর্তন ধোয়ার শব্দ শুনতে পেলুম।

মুখহানা সোফায় শুয়েছিলেন। আমাকে বললেন, 'পাশে এসে বসুন, কথা আছে। আমি আর একটি সিগারেট ধরালুম। বললেন, 'আপনি আমার দেশের লোক, আপনাকে সব কথা বলতে লজ্জা নেই। সংক্ষেপেই বলব, আমার বেশি কথা বলতে কষ্ট হয়।

'জাহাজে আপনার সঙ্গে অনেক কথাই খোলাখুলি বলেছিলুম। তার থেকে হয়ত আপনি আন্দাজ করেছিলেন, আমার দু'পয়সা আছে, বাড়ি-গাড়িটাও আছে, আর এখন দেখছেন আপনাকে শুতে দেবার মত আমাদের একখানা ফাল্‌তো কামরা পর্যন্ত নেই। হয়ত আপনি ভাববেন, আমি ধাপ্পা দিয়েছিলুম আপনি কখনো মিশরে আসবেন না এই ভরসায়।'

আমি বাধা দিতে যাচ্ছিলুম কিন্তু মুখহানা তাঁর হাড্ডিসার হাতখানা তুলে আমাকে ঠেকালেন। বললেন, 'না ভেবে থাকলে ভালই। আপনাদের শরৎবাবুর এক উপন্যাসে— আমি মাতৃভাষা কানাড়ায় পড়েছি, যে অবিশ্বাস করে লাভবান হওয়ার চেয়ে বিশ্বাস করে ঠকা ভাল। যাক সে কথা।' বলে বেশ একটু দম নিয়ে কি বলবেন সেটা যেন মনের ভিতর গুছিয়ে নিলেন।

'সংক্ষেপেই বলি। যে গ্রীক রাস্কেলটার হাতে আমি আমার ব্যবসা সঁপে দিয়ে দেশে গিয়েছিলুম, ফিরে দেখি সে সব কিছু ফুঁকে দিয়েছে। বাড়িভাড়া দেয় নি, ওভারড্রাফট্ নিয়েছে, শেষটায় স্টকের চা পর্যন্ত জলের দরে বিক্রি করে দিয়েছে। এখানে ওখানে কত ছোটোখাটো ধার যে নিয়েছে, তার পুরো হিসাব এখনও আমি পাই নি। আমার নাম জাল

www.BanglaBook.org

করেছে যখনই দরকার হয়েছে। আপনি ভাবছেন আমি এরকম লোকের হাতে সব কিছু সঁপে দিয়ে গেলুম কেন? কী করে জানব বলুন? দশ বৎসর ধরে সে আমার সঙ্গে কাজ করছে, বিয়েরটা সিগারেটটা পর্যন্ত স্পর্শ করত না। আর সব কিছু ফুঁকে দিয়েছে—' একটুখানি হেসে বললেন, 'ফাস্ট উইমেন আর স্লো হর্সের পিছনে।'

নিজে দুর্দৈবের কাহিনী বলার ভিতরেও রসিকতা করতে পারেন যাঁর মনের কোণে—হয়ত নিজের অজানাতেই ধনজনের প্রতি জন্মলব্ধ বৈরাগ্য সঞ্চিত হয়ে আছে। 'বহু দেশ ঘুরেছি' এ কথাটা বলতে আমার সব সময়েই বাধো বাধো ঠেকে, কিন্তু এখানে বাধ্য হয়ে সে কথাটা স্বীকার করতে হল, মুথহানার এই দুর্লভ গুণটির পরিপ্রেক্ষিত দেখবার জন্য।

জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনার স্ত্রীও জানতে পারেন নি?' বললেন, 'তিনি তখন সাইপ্রিসে, বাপের বাড়িতে। কিন্তু আজকের মত থাক এ-সব কথা। আমার সংসারের অবস্থা দেখে আপনি বাকিটা আন্দাজ করে নিতে পারবেন।

'শুয়ে শুয়ে তাই নিয়ে কিন্তু অত্যধিক দুশ্চিন্তা করবেন না। আমি আবার সব কিছু গড়ে তুলবো। এই আপনার চোখের সামনেই। এখন শুয়ে পড়ুন, আমি ওমরকে ডেকে দিচ্ছি। সে আপনার বিছানা ঐ কোণে দিভানটার উপর করে দেবে। কষ্ট হবে—।' আমি বাধা দিলুম। মুথহানাও চুপ করে গেলেন।

সেই ছোকরা চাকরটি এসে বেশ পাকা হাতে বিছানা করে দিল। বুঝলুম, মুথহানার অতিথিদের জন্য প্রায়ই তাকে এরকম বিছানা করে দিতে হয়।

ঘর থেকে বেরুবার সময় মুথহানা শেষ কথা বললেন, 'আমি কিন্তু সব কিছু আবার গড়ে তুলব। আমি অত সহজে হার মানি নে।' একমাত্র জর্মন বৈজ্ঞানিকদের গলায় আমি এরকম আত্মবিশ্বাসের অকুণ্ঠ ভাষা শুনেছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুথহানার গলা থেকে বেরুল একটু খুসখুসে আওয়াজ।

অতি অল্প, কিন্তু আমার ভাল লাগল না।

শুনেছি রাজশয্যায় নাকি যুবরাজেরও প্রথম রাত্রে ভাল ঘুম হয় না। সত্যি মিথ্যে জানি নে, কিন্তু কাইরোতে যে হবে না সে বিষয়ে আমার মনে দ্বিধা নেই। আধো ঘুম আধো জাগরণে সেই পাঁচতলার উপর থেকে শুনেছিলুম সমস্ত রাত ধরে ফারাও-প্রজাদের ফুর্তির পিছনে ছুটোছুটি হুটোপুটির শব্দ।

কলকাতা ঘুমোয় এগারোটায়, বোম্বাই বারোটায় আর কাইরো দেখলুম অন্ধকারে ঘুমোতে ভয় পায়। সকাল বেলা আটটার সময় বেলকনিতে দাঁড়িয়ে দেখি, কাইরো শহর রাত বারোটার ভাতঘুমে অচেতন। স্থির করলুম, একদিন ভোরের নামাজের সময় মসজিদে গিয়ে দেখতে হবে ইমাম (নমাজ পড়ানেওয়ালা) আর মুয়াজ্জিন (আজান দেনেওয়ালা) ছাড়া কজন লোক মসজিদে সে সময় হাজিরা দেয়। অনুমান করলুম ব্যাপারটা—দত্তের প্রবন্ধ লেখার মত। তিনি লেখার ইমাম আর কম্পজিটর পড়ার মুয়াজ্জিন। কিন্তু যাক এসব কথা—আমি কাইরোর জীবনী লিখতে বসি নি।

সেই অসুস্থ শরীর নিয়ে মুথহানা পরের চিন্তায় মাথা ঘামাতে আরম্ভ করলেন সকালবেলা থেকে। দেখি, দুনিয়ার যত বিপদগ্রস্ত লোক আস্তে আস্তে তাঁর ড্রইংরুমে জড়ো হতে আরম্ভ করেছে। বেশির ভাগ ভারতীয়, প্রায় সকলেরই পাসপোর্ট নিয়ে শিরঃপীড়া।

www.BanglaBook.org

এদের সকলেই দর্জি—এ দেশে আর্মি কনট্রাক্টারদের সঙ্গে এসেছিল চাকরি নিয়ে। কনট্রাকটররা চলে যাওয়ার পর এখানেই ঘর বেঁধেছে—কাইরোর অতি সাধারণ মেয়েও পাঞ্জাবী দর্জির হৃদয়খানা খান্‌খান্‌ করে ফেলতে পারে। কারো কারো হৃদয় ইতিমধ্যে জোড়া লেগে গিয়েছে অর্থাৎ নেশা কেটে গিয়েছে। এখন কেটে পড়তে চায়, কিন্তু পাসপোর্ট হারিয়ে ফেলেছে—মুখহানা যদি ব্রিটিশ কনসুলেটে গিয়ে একটুখানি সুপারিশ করেন। কারো বা মিশরে বসবাস করার মেয়াদ পেরিয়ে গেছে—মুখহানা যদি মিশরে বিদেশী দপ্তরে গিয়ে একটুখানি ধস্তাধস্তি করে আসেন। কেউ বা তার পাসপোর্টখানা কালোবাজারে ইহুদীকে বিক্রি করে দিয়েছিল (ইহুদী কেমিক্যাল দিয়ে তার ফটো মুছে ফেলে প্যালেস্টাইনী জাতভাইয়ের জন্য তাই দিয়ে জাল পাসপোর্ট বানিয়ে ধর্ম আর অর্থ দুইই সঞ্চয় করবে) এখন মুখহানা যদি কোনও মালজাহাজের কাপ্তেনকে বলে কয়ে কিংবা 'টু পাইস' দিয়ে তাকে চোরাই মালের মত দেশে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দেন।

দু-একজন পয়সাওয়ালা পাঞ্জাবী কনট্রাকটারও এলেন। মুখহানা যদি রেজিমেন্টের কর্নেলের সঙ্গে দেখা করে একখানা নতুন বুইক ভেট দিয়ে আসেন। না অন্য কোনও রকম লুব্রিকেশনের খবর তিনি বলতে পারেন?

দুপুর বেলা খাবার সময় মুখহানাকে দু'একখানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেই বুঝতে পারলুম, জাহাজে যে-রকম তিনি প্যাসেঞ্জার ও কর্তাদের মাঝখানের বেসরকারি লিয়েজোঁ অফিসার ছিলেন এখানেও তিনি তেমনি দুঃস্থ ভারতীয় ও মিশরীয়, ইংরেজ সর্বপ্রকার কর্তাব্যক্তির মধ্যিখানের অনাহারী লিয়েজোঁ অফিসার।

শরীর সুস্থ থাকলে বনের মোষ তাড়ানোটা বিচক্ষণ জনের কাছে নিন্দনীয় হলেও স্বাস্থ্যের পক্ষে সেটা ভালো, কিন্তু এই দুর্বল শরীর নিয়ে ভদ্রলোক কেন যে হয়রান হচ্ছেন সে-কথার একটু ইঙ্গিত দিতেই মুখহানা একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আ-আমি কি করব? আমি যে এখানকার ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'মেম্বার কারা?'

'ঐ দর্জির পাল আর দু-চারটে ভ্যাগাবন্ড।'

'আর কেউ সেক্রেটারি হতে পারে না?'

'সব টিপসইয়ের দল। কনসুলেটে গিয়ে ইংরিজিতে কথা বলবে কে?'

'তাহলে প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন না কেন?'

'প্রেসিডেন্টের পক্ষে কন্‌সুলেটে ছুটোছুটি করা কি ভাল দেখায়? এসোসিয়েশনের তো একটা প্রেস্টিজ দেখানো চাই।'

'প্রেসিডেন্ট কে?'

'এক বুড়ো দর্জি। ইংরিজিতে নাম সই করতে পারে।'

আমি আর বাক্যব্যয় করলুম না। এরকম লোককে কোনো প্রকারের সদুপদেশ দেয়া অরণ্যে রোদন—এবং সেই অরণ্যেই যেখানে সে মোষ তাড়াচ্ছে, শুনেও শুনবে না।

মুখহানা আপিসে চলে গেলেন। আমি হেলেনাকে জিজ্ঞেস করলুম, 'মুখহানার এই কাশিটা কবে হল এবং কি করে?'

হেলেনা বললেন, 'খেটে খেটে। ভারতবর্ষ থেকে ফিরে এসে যখন দেখলেন কারবার একবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তখন গাড়ি বেচে দিয়ে বড় বাড়ি ছেড়ে এখানে এসে উঠলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তারপর নূতন করে ব্যবসা গড়ে তোলবার জন্য এই দশ মাস ধরে দিন নেই রাত নেই চব্বিশ ঘণ্টা ঘোরাঘুরি করছেন। বাড়ি ফেরেন রাত দুটো, তিনটে, চারটে। কথা শোনেন না, ফিরে এসে ঠাণ্ডাজলে স্নান করেন, কখনও কখনও আবার খেতেও রাজী হন না, বলেন ক্ষিদে নেই। আগে তিনি সব সময় আমার কথামত চলতেন, এই নূতন করে কারবার গড়ে তোলার নেশা যবে থেকে তাঁকে পেয়েছে তখন থেকে তিনি আর আমার কোনও কথা শোনেন না। এর চেয়ে তিনি যদি অন্য কোনো স্ত্রীলোকের প্রেমে পড়েও আমাকে অবহেলা করতেন, আমি এতটা দুঃখ পেতুম না। তবু তো তিনি সুস্থ থাকতেন!'

আমি কথাটার মোড় ফেরাবার জন্য বললুম, 'জ্বর-টর হয়েছিল?' বললেন, প্রায় মাস তিনেক আগে তিনি ভেঙে পড়েন। দিন পনেরো শুয়ে ছিলেন, আর সেই পনেরো দিনেই যেন শরীর থেকে সব মাংস-চর্বি খসে পড়ে গেল। আর জানেন, তিনি কখনও ডাক্তার ডাকান নি।'

আমি বললুম, 'এ কথা তো বিশ্বাস করা যায় না।'

হেলেনা উঠে চলে গেলেন। আমি থামালুম না। একা একা যতক্ষণ খুশি কাঁদা যায়।

চায়ের সময় আমি মুখহানাকে বেশ পরিষ্কার, জোর গলায় বললুম, তিনি যদি ভাল ডাক্তার না ডাকান, তবে আমি কাল সকালেই বিছানা-পত্র নিয়ে তাঁর বাড়ি ত্যাগ করব। তিনি যদি অভিমান করতে পারেন, ভারতীয়েরা প্রতিজ্ঞা করেও কাইরো আসে না বলে, তবে আমি অভিমান করতে পারি যে-ভারতীয় স্বদেশবাসীর সামান্যতম অনুরোধ পালন করে না, তার মুখদর্শন না করলেও আমার চলবে।

ডাক্তার এল। যক্ষ্মা। বেশ এগিয়ে গেছে। এক্সরে না করেই ধরা পড়ল।

তারপর যে এগারো মাস আমি কাইরোতে কাটালুম তার স্মৃতি আমার মন থেকে কখনো মুছে যাবে না। ওমর খৈয়াম বলেছেন ঃ—

প্রথম মাটিতে গড়া হয়ে গেছে শেষ মানুষের কায়
শেষ নবান্ন হবে যে ধান্যে, তারো বীজ আছে তায়।
সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাতে লিখে রেখে গেছে তাই
বিচারকর্ত্রী প্রলয় রাত্রি পাঠ যা করিবে ভাই॥

—সত্যেন দত্ত

আর আইনস্টাইনও নাকি বলেছেন, পৃথিবীর সব কিছু চলে এক অলঙ্ঘ্য নিয়ম অনুসারে। ওমর খৈয়াম ছিলেন আসলে জ্যোতির্বিদ—কাজের ফাঁকে ফাঁকে গুয়েকটি রুবাঈয়াৎ লিখেছেন মাত্র—এবং আইনস্টাইনের চোখও উপরের দিকে তাকিয়ে। এই দুই পণ্ডিত গ্রহনক্ষত্রের নিয়ম-মানা দেখে যা বলেছেন, আমি মুখহানার জীবনে তাই দেখতে পেলুম।

কত অনুনয়বিনয়, কত সাধ্যসাধনা, কত চোখের জল ফেললেন হেলেনা—আমার কথা বাদ দিচ্ছি—না, না, না, তিনি তাঁর কারবার ফের গড়ে তুলবেনই। ডাক্তার পই পই করে বলে গিয়েছেন, কড়া নজর রাখতে হবে তিনি যেন নড়াচড়া না করেন—কিন্তু থাক্, ডাক্তারের বিধানের কথা তুলে আর কি হবে, মধ্যবিত্ত কোন বাঙালি পাঠক সাক্ষাৎ কিংবা পরোক্ষ ভাবে যক্ষ্মার সঙ্গে পরিচিত নয়—সব কিছু উপেক্ষা করে তিনি বেরুতেন রোজ সকালে চায়ের কারবারে। তাও না হয় বুঝতুম তিনি যদি শুধু অফিসে ডেকচেয়ারে শুয়ে

www.BanglaBook.org

থাকতেন। কতদিন মর্নিং-কলেজ থেকে ফেরার মুখে দেখেছি মুখহানা চলেছেন ক্লান্ত, শ্লথ গতিতে, দ্বিপ্রহর রৌদ্র উপেক্ষা করে, বড়-বড় খদ্দেরের আফিসে আরও কিছু চা গছাবার জন্য। বাড়ি ফিরতেন রাত আটটা, ন'টা, দশটায়।

খৈয়াম আইনস্টাইন ঠিকই বলেছেন সব কিছু চলেছে এক অদৃশ্য অলঙ্ঘ্য নিয়মের বেত্রাঘাতে। মুখহানা-পতঙ্গ ধেয়ে চলেছে কারবারের আগুনে আপন পাখা পোড়াবে বলে।

খুক্ খুক্ তখন অদম্য হয়ে উঠেছে। শালী টের পেয়ে মেয়েকে নিয়ে পালালেন। সুভাষিতে আছে, 'পরান্নং দুর্লভং লোকে' কিন্তু, সে পরান্ন যদি যক্ষ্মার বীজাণুতে ঠাসা থাকে, তবে তা সর্বথা বর্জনীয়।'

হেলেনা কিন্তু হাসিমুখে বোনকে গাড়িতে তুলে দিলেন।

আশ্চর্য এই মেয়ে হেলেনা! মুখহানাকে যা সেবা করলেন, তার কাছে মনে হয়, বাঙালি মেয়ের সেবাও হার মানে। অন্য কোনও দেশে আমি এ জিনিস দেখি নি, হয়ত এরকম দুর্যোগ চোখের সামনে ঘটেনি বলে।

ঘুম থেকে উঠে কতবার তিনি মুখহানার শরীর মুছে দিতেন, সে শুধু তাঁরাই বলতে পারবেন যাঁরা যক্ষ্মা রোগীর সেবা করেছেন। ডাক্তার নিশ্চয়ই বারণ করেছিলেন, তবু হেলেনা মুখহানার সঙ্গে এক খাটেই শুতেন। আমি তাই নিয়ে যখন হেলেনাকে একদিন অত্যন্ত কাতর অনুনয়বিনয় করলুম, তখন তিনি বললেন, 'আমি কাছে শুয়ে তাঁর বুকের উপর হাত রাখলে তিনি কাশেন কম, ঘুম হয় ভাল।' আমি বললুম, 'এ আপনার কল্পনা।' হেসে বললেন, 'ঐ কল্পনাটুকুই তো তিনি বিয়ে করেছেন। আমি তো আর আসল হেলেনা নই।' আমি চুপ করে গেলুম।

কত না হাঁটাহাঁটি খোঁজাখুঁজি করে তিনি নিয়ে আসতেন বাজার থেকে সব চেয়ে সেরা জাফার কমলাবেবু, কী অসীম ধৈর্যের সঙ্গে তৈরি করতেন টমাটোর রস, রান্না করতেন স্বামীর কাছ থেকে শেখা ভারতীয় কায়দায় মাংসের ঝোল, কোপ্তা-পোলাও, মাদ্রাজি রসম্, স্নান করিয়ে দিতেন স্বামীকে আপন হাতে, মুখহানা বেশি কাশলে জেগে কাটাতেন সমস্ত রাত। তিনি নিজে রোগা, কিন্তু ধন্বন্তরী যেন তখন তাঁকে বর দিয়েছেন যমের সঙ্গে লড়বার জন্য।

কাইরোতে বৃষ্টি হয় বছরে দেড় না আড়াই ইঞ্চি, আমার মনে নেই। দিনের পর দিন মেঘমুক্ত নীলাকাশ দেখে দেখে বাঙালির মন যেন হাঁপিয়ে ওঠে। যখনই উপরের দিকে তাকাই, দেখি নীল আকাশ প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। প্রথমবার যখন ইয়োরোপের পাড়াগাঁয়ে বেড়াতে গিয়েছিলুম, তখন মাঝে মাঝে নীলচোখো সাহেবরা আমার দিকে তাকিয়ে থাকত—এই অদ্ভুত জংলী লোকটার বিদ্‌ঘুটে চেহারা দেখে, আর অস্বস্তিতে আমার সর্বাঙ্গ ঘেমে উঠত। কাইরোর সেই নীলাকাশ সেই নির্লজ্জাদের নীল চোখের মত হরবকত আমার দিকে তাকিয়ে আছে, একবার পলক পর্যন্ত ফেলে না; মেঘ জমে না, দরদের অশ্রুবর্ষণ বিদেশী বিরহীর জন্য একবারের তরেও ঝরল না।

পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ থেকে কত রকমের হাওয়া কাইরোর উপর দিয়ে বয়ে গেল, কত না মুখের বোরকা সরিয়ে ক্ষণেকের তরে নিশিকুঞ্জ চোখের বিদ্যুৎ ঝলক দেখিয়ে দিলে, কিন্তু তাদের কেউই এক রত্তি মেঘ সঙ্গে নিয়ে এলো না। সাহারা থেকে লাল দরিয়া পেরিয়ে, হাবশী মুল্লুকের পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে মধ্যসাগরের মধ্যিখান থেকে চার রকমের হাওয়া বইল, যেন হলদে, লাল, কালো, নীল রঙ মেখে কিন্তু মেঘ আর জমে ওঠে না।

www.BanglaBook.org

ভুল বললুম, মেঘ জমে উঠতে লাগল হেলেনার মুখের উপর। পূব-সাগরের পার হতে একদা যে নীল মেঘ সাইপ্রিস রমণীর চিত্তাকাশ প্রেমের বেদনায় ভরে দিয়েছিল, আজ সে মেঘ তার সমস্ত মুখও ছেয়ে ফেলল। দু'চোখের চতুর্দিকে যে কালো ছায়া জমে উঠল, সে যেন চক্রবাল-বিস্তৃত বর্ষণ-বিমুখ খরা মেঘ; আমি মেঘের দেশের লোক, আমার বাড়ি চেরাপুঞ্জির ঘা ঘেঁষে, ছেলেবেলা থেকে মেঘের সঙ্গে মিতালি—কিন্তু হে পর্জন্য! এ রকম ঘন যেন আমাকে আর না দেখতে হয়।

কানাড়া ভাষায় উত্তম বিরহের কবিতা আছে, এ কথা কখনো শুনি নি। কুর্গের লোক খুব সম্ভব মেঘের দিকে নজর দেয় না। মুখহানা হেলেনার মুখের উপর জমে-ওঠা মেঘ দেখতে পেলেন না।

দ্রোণ জিজ্ঞেস করলেন, 'বৎস অর্জুন, তুমি লক্ষ্যবস্তু ভিন্ন অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছ কি? তোমার ভ্রাতৃগণ, তোমার আচার্য, তোমার পিতামহ?

অর্জুন বললেন, 'না গুরুদেব, আমি শুধু লক্ষ্যবস্তু দেখতে পাচ্ছি।'

মুখহানার নজর কারবারের দিকে।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমার মনে ধোঁকা লাগল, মুখহানা লক্ষ্যভেদ করতে পারবেন কিনা। বিশেষ করে যেদিন শুনলুম, তাঁর রেস্ত নেই বলে তিনি ব্যাঙ্কের মুচ্ছুদ্দিগিরিতে মাল ছড়াচ্ছেন। সে মাল মজুদ থাকে ব্যাঙ্কেই—মুখহানা কিছুটা ছাড়িয়ে নিয়ে বিক্রি করে দাম শোধ করলে আরো খানিকটা পান। ওদিকে ব্রুকবন্ড লিপ্টন অঢেল মাল ঢেলে দিয়ে যায় দোকানে দোকানে বিনি পয়সায়, বিনি আগামে। ব্যাঙ্কের গুদোমে রাখা মাল লড়বে দোকানে দোকানে সাজানো মালের সঙ্গে!

ব্যাঙ্কের টাকার সুদ তো দিতেই হয় বুকের রক্ত ঢেলে, তার উপর গুদোমভাড়া। মিশরী ব্যাঙ্কের নির্দয়তার সামনে সাহারা হার মানে।

কাজেই মুখহানার মাথার ঘাম যদি ব্যবসা গড়ে তোলাকে এগিয়ে দেয় এক কদম, যক্ষ্মাকে এগিয়ে দেয় এক ক্রোশ।

এ-তত্ত্বটা মুখহানা বুঝতে পারেন নি। তিনি ব্যবসা নিয়ে মশগুল। আমি তো ব্যবসা জানি নে। কিন্তু সিগারেট যে খায় না, গন্ধ পায় সে-ই বেশি।

মুখহানার সব চেয়ে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়াল ঐ পাঁচতলা বাড়ির বিরাশিখানা সিঁড়ি। সুস্থ মানুষ আমাদের ফ্ল্যাট চড়তে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যায়, ড্রইংরুম পৌঁছে প্রথম দশ মিনিট সোফার উপর নেতিয়ে পড়ে ম্যালেরিয়া রোগীর মত ধোঁকে, অথচ মুখহানাকে ওঠতে হচ্ছে প্রতিদিন অন্তত দুবার করে এই গৌরীশঙ্কর। একতলা বাড়ির জন্য মুখহানা যে চেষ্টা করেন নি তা নয়, কিন্তু কাইরোতে নতুন বাড়ির সন্ধান নতুন কারবার গড়ে তোলার চেয়েও শক্ত। সেলামীর টাকা যা চায়, তা দিয়ে কলকাতায় নতুন বাড়ি তোলা যায়।

ছোকরা চাকর ওমরকে নাকি মুখহানা কোনও এক ডেন থেকে তুলে এনে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন, তার বয়স যখন চার। মুখহানার তখন পয়সা ছিল, ওমরের তখন সেবা করেছে এক ফ্যাশনেবল আয়া আর স্বয়ং হেলেনা। আজ দশ বৎসরের ওমর নিজের থেকে ছোকরা চাকরের জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বাড়ির ছেলের মত অনায়াসে সব কাজ করে, আমার ভুল আরবী শুনে মিটমিটিয়ে হাসে আর হেলেনার গ্রীক পড়ানো থেকে পালাবার জন্য অন্ধি-সন্ধির সন্ধানে থাকে।

www.BanglaBook.org

এইটুকু ছেলে, কিন্তু মুখহানার প্রতি তার ভক্তি-ভালবাসার অন্ত ছিল না। রান্নাঘরে কাজ করছে কিন্তু গাড়ি-ঘোড়ার শব্দ দীর্ণ করে তার কান যেন গিয়ে সেঁটে আছে ফুটপাথের সঙ্গে (আমরা কেউ কিছু শুনতে পাই নি—হঠাৎ কাজকর্ম ফেলে ছুটলো বেতের হালকা চেয়ার নিয়ে নিচের তলার দিকে। কি করে যে সামান্যতম খুক্‌খুক্ শুনতে পেত, তা সে-ই জানে। প্রতি তলায় সে চেয়ার পাতবে, মুখহানা বসে জিরোবেন। এই করে করে সে মুখহানাকে পাঁচতলায় নিয়ে আসত। কেউ বাতলে দেয় নি, আবিষ্কারটা তার সম্পূর্ণ নিজস্ব।

মুখহানাকে কখনো দেখি নি ওমরের সঙ্গে আদর করে কথা কইতে। অল্প কথা বলতেন, না, অন্য কোনও কারণে জানি নে, কিন্তু এটা জানি তাঁর চলাফেরাতে আচারব্যবহারের কি যেন এক গোপন যাদু লুকোনো ছিল, যার দিকে আকৃষ্ট না হয়ে থাকা যেত না—বাচ্চা ওমরও বাদ পড়ে নি।

পয়লা ট্রায়েলেই খুশ হয়ে ওমর ঈদের জোব্বা আঁকড়ে ধরেছিল। মুখহানা কিন্তু তিন-তিন বার এদিকে কাটালেন, ওদিকে ছাঁটালেন। ঈদের দিন ওমর যখন নূতন জোব্বা পরে আমাদের সবাইকে সেলাম করল, তখন মুখহানা বউয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওমর তো আমাদের ডাগর হয়ে উঠেছে, কনের সন্ধানে লেগে যাও।'

মিশরেও আমাদের দেশের মত অল্প বয়সে বিয়ে হয়। ওমর তিন লম্ফে ঘর ছেড়ে পালালো। মিশরের বাচ্চারাও বিয়ের কথা শুনলে লজ্জা পায়।

এ-রকম মানুষকে পরোপকার করার প্রবৃত্তি থেকে ঠেকানো আজরাঈলেরও (যমেরও) অসাধ্য। আমি গিয়েছিলুম ব্রিটিশ কন্‌সুলেটে পাসপোর্ট রেজিস্ট্রি করাতে। গিয়ে দেখি, মুখহানা কন্‌সুলেটের এক কেরানীকে আদি, রৌদ্র, বীর, হাস্য সর্বপ্রকারের রস দিয়ে ভিজিয়ে ফেলে কোন্ এক ভবঘুরের জন্য একখানা পাসপোর্ট যোগাড় করতে লেগে গেছেন। সাহেব যতই বুঝিয়ে বলে, 'ভারতীয় জন্মপত্রিকা না দেখানো পর্যন্ত আমরা পাসপোর্ট দেব কি করে?' মুখহানা ততই ইমান-ইনসাফ্ দয়াধর্মের শোলোক কপচান, কখনো সাহেবের হাত দু'খানা চেপে ধরেন, কখনো রেডক্রসে পয়সা দেবেন বলে লোভ দেখান, কখনও 'দি ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন লিমিটেড, কাইরো'র প্রতিভূ হিসাবে সদম্ভে সগর্বে দু'হাতে বুক চাপড়ান:

রুমাল দিয়ে চোখের কোণ মোছেন নি—নবরসের ঐটুকুই বাদ পড়েছিল। সাহেব না হয়ে কেরানী মেম হলে সেটাও বোধ হয় বাদ পড়ত না।

সাহেব যখন শেষটায় রাজী হল, তখন দেখা গেল, লক্ষ্মীছাড়া ভবঘুরেটার কাছে পাসপোর্টের দাম পাঁচটি টাকা পর্যন্ত নেই। এক লহমার তরে মুখহানা হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। সামলে নিয়ে অতি সপ্রতিভাভাবে জেব থেকে টাকাটা বের করে দিলেন।

এ টাকা তিনি কখনও ফেরত পান নি। আমি যখন বললুম, 'টাকাটা এসোসিয়েশনের খর্চায় ফেলুন,', তখন তিনি হঠাৎ তেড়ে খেঁকখেঁকিয়ে বললেন, 'লোকটা হজে যেতে চায়। সুদিন থাকলে আমি কি শুধু পাসপোর্ট—'

আমি তাড়াতাড়ি মাপ চাইলুম। মুখহানা চুপ করে গেলেন। উঠে যাবার সময় আমার সামনে এসে মাথা নিচু করে বললেন, 'আমার মেজাজটা একটু তিরিক্ষি হয়ে গেছে। আপনি আমায় মাফ করবেন।' আমি তাঁর হাত দুখানি ধরে বললুম, 'আপনি আমার বড় ভাইয়ের মত।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি কাইরো আসার পরও মুখহানা আট মাস কারবার গড়ে তোলবার জন্য লড়াই করেছিলেন। তারপর একদিন হার মানলেন। কারবারের কাছে নয়, যক্ষ্মার কাছে।

গ্রীসের রাজকুমারীর সঙ্গে ইংলন্ডের রাজকুমারের বিয়ে। কাইরোবাসী হাজার হাজার গ্রীক আনন্দে আত্মহারা। সবাই যেন জাতে উঠে যাচ্ছে, চাঁড়াল যেন দৈববেগে পৈতে পেয়ে যাচ্ছে। এবার থেকে গ্রীকদের সমঝে চলতে হবে। রাজপুত্তুরের শালার জাত, বাবা, চালাকি নয়! আমাদের পাড়ার গ্রীক মুদিটা পর্যন্ত পিরামিডের মত মাথা খাড়া করে মোরগটার মত দোকানের সামনের ফুটপাথে গটর-গটর করে টহল দেয়, আমাকে আর সেলাম করে না। কি আর করি, রাজপুত্তুরের শালা, বাবা, চাট্টিখানি কথা নয়, আমি সেলাম করে জিজ্ঞেস করি, 'বর-কনে কিরকম আছেন?' মিশররাণী গ্রীক-রমণী ক্লিওপাত্রার দম্ভ মুখে মেখে আমার দিকে সে পরম তাচ্ছিল্যভরে তাকিয়ে বলে, 'কনগ্রেচুলেট করে তার করেছি, জবাব এলেই খবর পাবে!'

আমি তো ভয়ে মর-মর। সিন্ধী ভাষায় প্রবাদ আছে—সিংহটাও নাকি শালাকে ডরায়।

সেই বিয়ের পরবের ফিল্ম এলো কাইরোয়। গ্রীক মেয়ের গর্ভের বাচ্চা পর্যন্ত ছুটলো সে ছবি দেখতে। আমাদের ওমর আধা-ভারতীয়, আধা-গ্রীক (যদিও রক্তে খাস মিশরী)। সে ধরে বসলো ছবি দেখতে যেতেই হবে। আমিও সায় দিলুম। ভাবলুম মুখহানার মনটা যদি চাঙ্গা হয়। হেলেনা বায়োস্কোপ যেতে ভালবাসতেন। কিন্তু স্বামীর অসুখ হওয়ার পর থেকে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

গিয়ে দেখি 'কিউ' লম্বা হতে হতে প্যাঁচ খেয়ে 'ইউ' হয়ে তখন 'ডবল ইউ' হওয়ার উপক্রম। আমরা সবাই একটা কাফেতে গিয়ে বসলুম। ওমর কালাবাজার থেকে টিকিট আনল।

ভিতরে গোলমাল, চেঁচামেচি, চিৎকার। বাঙালি যজ্ঞিবাড়িকে চিৎকারে গ্রীকরা হার মানায়। মুখহানা যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, আমরা লক্ষ্য করি নি। সিনেমা থেকে ফিরেই গলা দিয়ে অনেকখানি রক্ত উঠল। আমরা বিচলিত হয়ে পড়েছি দেখে হঠাৎ তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'গ্রীকগুলো হন্যে হয়ে উঠেছে। ওদের দেখলে ভাবখানা কি মনে হয় জানেন?'

আমি বললাম, 'না'।

বললেন, 'মনে হয় না, যেন বলতে চায়—"হেই, ঐ ড্যাম দুনিয়াটার দাম কত বল্ তো, আমি ওটা কিনব"?

হাসলেন না কাশলেন ঠিক বুঝতে পারলুম না। অসুখ, খিটখিটেমি আর খাপছাড়া রসিকতা—এ তিনের উদ্ভট সংমিশ্রণের সামনে আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলুম।

অনেক রাত অবধি ঘুম এলো না। মনটা বিকল হয়ে গিয়েছে। যক্ষ্মাতে মরে বহু লোক, তার উপর চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, এ মানুষটা রক্ত-বমি দিয়ে দিনের পর দিন মরণ-বধূর ডান হাতে রাখী বেঁধেই চলেছে। যে ব্যবসামন্ত্র এতদিন তাঁকে অন্ন-বস্ত্র ভোগ-বিলাস দিচ্ছিল, আজ যেন সে-ই হঠাৎ এক ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের মত তাঁর হাতছাড়া হয়ে তাঁরই কণ্ঠরুদ্ধ করে সবলে দুই বাহু নিষ্পেষিত করে বিন্দু-বিন্দু রক্ত নিঙড়ে নিচ্ছে।

হঠাৎ শুনি হেলেনার কান্না। দরজা খুলে বেরুতেই দেখি, মুখহানার শোবার ঘরের দরজা খোলা আর মুখহানা ঠাস ঠাস করে হেলেনার গালে চড় মারছেন। আমি ছুটে গিয়ে তাঁকে ধরতেই তিনি যেন চৈতন্য ফিরে পেয়েছেন এরকমভাবে আমার দিকে তাকালেন।

www.BanglaBook.org

আমি তাঁকে খাটে শুইয়ে দিয়ে আপন ঘরে ফিরে এলুম।

ভোরের দিকে ঘুম ভাঙল। দেখি ঘরে আলো জ্বলছে আর হেলেনা আমার খাটের পাশে দাঁড়িয়ে। আমি আশ্চর্য হলুম না, বললুম, 'বসুন।'

আমি স্থির করেছিলুম, সুযোগ পাওয়া মাত্রই তাঁকে বুঝিয়ে বলব, তিনি যেন মুথহানাকে মাপ করেন। অসুখে ভুগে ভুগে মানুষ কি-রকম আত্মকর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলে, সে কথা বুঝিয়ে বলব। অন্তত এটা তো বলতেই হবে—তা সে সত্যই হোক আর মিথ্যেই হোক—সেবার পরিবর্তে ভারতবাসী আঘাত দেয় না।

কিন্তু আমাকে কিছুই বলতে হল না। হেলেনা চোখের জল দিয়ে আমাকেই অনুনয়-বিনয় করলেন আমি যেন মুথহানাকে ভুল না বুঝি। এ মুথহানা সে মুথহানা নয় যিনি তিন বৎসর ধরে তাঁকে সাধ্যসাধনা করেছিলেন তাঁর প্রেম গ্রহণ করতে। বাড়ি-গাড়ি টাকা-পয়সা, তাঁর সর্বস্ব তিনি হেলেনাকে দিয়ে তিন বৎসর ধরে বার বার তাঁকে বলেছিলেন তিনি তাঁকে গ্রহণ না করলে তিনি দেশত্যাগী হবেন।

হেলেনা বললেন, 'আপনি ভাবছেন, দেশত্যাগী হবেন শুধু কথার কথা। তা নয়। আমার মামা তো ব্যবসায়ের ভিতর দিয়ে মুথহানাকে চিনতেন দশ বৎসর ধরে। তিনিই বলেছেন, 'এই কাইরোর মত শহরে মুথহানা কোনও মেয়ের দিকে একবারের তরে ফিরেও তাকান নি। সাত বছর হল আমাদের বিয়ে হয়েছে, টাকা-পয়সা যখন তাঁর ছিল তখন কত ফরাসী কত হাঙ্গেরিয়ান মেয়ে তাঁর পিছু নিয়েছে, কিন্তু এই সাত বছরের ভিতর একদিন একবারের তরেও আমার মনে এতটুকু সন্দেহ হয় নি যে তিনি আমায় ফাঁকি দিতে পারেন। মুথহানা তো ফাঁকির মানুষ নন।'

আম চুপ করে শুনতে লাগলুম। বললেন, 'আজ না হয় তিনি দুরবস্থায় পড়েছেন বলে আমাকে তাঁর ব্যাঙ্কের হিসেব দেখান না, কিন্তু এমন দিনও তো ছিল যখন তিনি ব্ল্যাঙ্ক চেক দিয়ে বলতেন,—"সব টাকা উড়িয়ে দাও হেলেনা, আমি তাহলে বেশি কামাবার উৎসাহ পাব।" আমার গায়ে হাত তুলেছেন? তুলুন, তুলুন। ঐ করে যদি তাঁর রোগ বেরিয়ে যায় তবে তিনি জুড়োবেন, তাঁর শরীর সেরে যাবে।'

তারপর বললেন, 'বলুন, আপনি মুথহানাকে ভুল বোঝেন নি?'

আমি বললুম, 'না। আমি আরেকটি কথা বলতে চাই। আপনি মুথহানাকে যে সেবা করেছেন, তার চেয়ে বেশি সেবা আমার মাও আমার বাবাকে করতে পারতেন না।'

এর বাড়া তো আমি আর কিছু জানি নে। হেলেনার মুখে গভীর প্রশান্তি দেখা গেল। বললেন, 'আপনি আমায় বাঁচালেন। সব সময় ভয় মুথহানা হয়ত ভাবেন, বিদেশী মেয়ে বিয়ে করে তিনি হয়ত মনের মত সেবা পেলেন না। আমার বুকের কতটা ভার নেবে গেল আপনি বুঝতে পারবেন না।'

কথাটা ঠিক। আমি অতটা ভেবে বলিও নি। পরদিন ছুটি ছিল। মুথহানা এসে কোনও ভূমিকা না দিয়েই বললেন, 'কথা আছে।'

তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বললে, 'স্থির করেছি, কাল্পনীর গুটিয়ে ফেলব।'

আমি আশ্চর্য হলুম, খুশিও হলুম, বললুম, 'সেই ভাল।' বললেন, 'আমি হার মানি নি; গুটোতে হচ্ছে অন্য কারণে। আমার দম নিতে বড্ড কষ্ট হয়। আর এই কাইরোতে আমার শরীর সারবে না। কুর্গে এক মাস থাকলেই আমার শরীর সেরে যাবে।' তারপর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন, 'আপনি তো কখনও কুর্গে যান নি, তা না হলে আমার কথাটার মর্ম বুঝতে পারতেন। এই সাহারার হাওয়া আমি একদম সইতে পারি নে। আমার বুক যেন ঝাঁঝরা করে দেয়।'

কিছু বললুম না। কারণ জানতুম, জেনে-শুনে মিথ্যে কথা বলছেন না। সাহারায় এই বালু-ছাঁকা শুকনো বাতাস দিয়ে ফুসফুস পরিষ্কার করার জন্য অগুণতি ইয়োরোপীয় যক্ষ্মা রোগী প্রতি বৎসর মিশরে আসে।

উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'জানেন হের ডক্টর, ট্যামারিন্ড ট্রি কাকে বলে?'

আমি বললুম 'বিলক্ষণ।'

'আমার বাড়ির সামনে এক বিরাট তেঁতুল গাছ আছে। তারই ছাওয়ায় যদি আমি তিনটি দিন ডেক-চেয়ারে শুতে পারি তাহলে সব কাশি সব ব্রঙ্কাইটিস ঝেড়ে ফেলতে পারব। যক্ষ্মা না কচু! হোয়াট রট্!'

আপন মনে মুচকি মুচকি হাসলেন। বললেন, 'আমি কী বোকা! এতদিন এ কথাটা ভাবিনি কেন বুঝতে পারি নে। আর কাঁজির কথা কেন মাথায় খেলে নি তাও বুঝতে পারিনে। খাবো মায়ের হাতে বানানো কাঁজি, শুয়ে থাকব তেঁতুল-তলায়, দম নেব তেঁতুল-পাতা-ছাঁকা হাওয়া। ব্যস্! তিন দিনে সব ব্যামো বাপ্ বাপ্ করে পালাবে। যক্ষ্মা! হোয়াট ননসেন্স!'

তারপর হঠাৎ কি যেন মনে পড়ল। বললেন, 'হেলেনা যে খারাপ রাঁধে তা নয়। কিন্তু কাঁজি বানানো তো সোজা কর্ম নয়! আর এই মিশরী চালে কাঁজি হবেই বা কী করে?'

উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'কারবার গুটোনোও তো কঠিন কাজ।' তারপর খুব সম্ভব ঐ কথাই ভাবতে ভাবতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কিন্তু রাম উল্টো বুঝলেন। মুথহানা খাটতে লাগলেন টপ গিয়ারে। আমি জেলে নই তাই বলতে পারব না, জাল ফেলাতে মেহনত বেশি না গুটোতে। তবে এ কথা জানি, নদী-পুকুরে আবর্জনা থাকে বলে জাল আকসারই হেথা হোথা জড়িয়ে যায় আর ছাড়াতে গিয়ে চোখের জলে নাকের জলে হতে হয়। মুথহানারও হল তাই।

এখন শুধু আর ওমরের চেয়ারে চলে না। দারোয়ান ধরে ধরে উপরের তলায় উঠিয়ে দিয়ে যায়। আর কথা বলা বেড়ে গিয়েছে।

'বুঝলেন হের ডক্টর, আমার মা অজ পাড়াগেঁয়ে মেয়ে। নামটা পর্যন্ত সই করতে জানে না। আপনার মা জানেন?'

ভাঁড়াবার প্রলোভন হয়েছিল কিন্তু মিথ্যেবাদীর স্মরণশক্তি ভাল হওয়া চাই।

একটু যেন নিরাশ হয়ে বললেন, 'তাহলে আপনি সহজে বিশ্বাস করবেন না কিন্তু আমাদের অঞ্চলের সবাই জানে, হেন ব্যামো নেই মা যার দাওয়াই জানে মা। আসলে কিন্তু দাওয়াই নয়, ডক্টর। মা সারায় পথ্যি দিয়ে। কচু, ঘেঁচু, দুনিয়ার যত সব বিদঘুটে আবোল-তাবোল দিয়ে মা যা রাঁধে, তা একবার খেলেই আপনি বুঝতে পারবেন ওর হাতে যাদু আছে। কিন্তু ওসব কিছুরই দরকার হবে না আমার। ঐ যে বললুম কাঁজি আর তেঁতুলের ছায়া! তারপর ফিরে এসে দেখিয়ে দেব ব্যবসা গড় কারে কয়!'

একদিন লক্ষ্য করলুম, আগে বরঞ্চ মুথহানা মাঝে মাঝে গাড়িতে করে বাড়ি ফিরতেন, এখন প্রতি দিন হেঁটে। তাই নিয়ে একটুখানি মতামত প্রকাশ করলে পর মুথহানা বললেন, 'আপনাকে সব কথা খোলসা করে বলি নি, শুনুন। আমি চাই হেলেনাকে যতদূর

www.BanglaBook.org

সম্ভব বেশি টাকা দিয়ে যেতে। ওর তো কেউ নেই যে ওকে খাওয়াবে। আমি অবশ্যি শিগ্‌গিরই ফিরে আসব। কিন্তু ও বেচারী এ ক'মাস বড্ড কেটেছে, এখন একটুখানি আরাম না করলে ভেঙে পড়বে যে।'

আমি বললুম, 'ওঁকে বলেছেন যে আপনি একা দেশে যাচ্ছেন?'

মুথহানা ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'হুঁ, বড্ড কাঁদছে।'

আমি বললুম, 'দেখুন মিস্টার মুথহানা, আর যা করুন—করুন, কিন্তু দুটি টাকা বেশি রেখে যাবার জন্য ব্যামোটা বাড়াবেন না।'

বুনো শুয়োরের মত মুথহানা ঘোঁৎ করে উঠলেন। বললেন, 'যান যান, বেশি উপদেশ কপচাতে হবে না। বিয়ে তো করেন নি যে বুঝতে পারবেন হেলেনা আমার কে?'

তারপর গট গট করে রান্নাঘরে গিয়ে লাগালেন ওমরকে দুই ধমক। সে অবশ্যি এসব ধমকে থোড়াই কেয়ার করে।

ফিরে এসে বললেন, 'সৈয়দ সাহেব?'

'জী?'

'রাগ করলেন?'

'পাগলা না কি।'

বললেন, 'আমার মা'র কথা বলছিলুম না আপনাকে? অদ্ভুত মেয়ে। বাবা যখন মারা গেলেন তখন আমার বয়স এক। বিশেষ কিছু রেখে যেতেও পারেন নি। কি দিয়ে যে আমায় মানুষ করলো, এখনও তার সন্ধান পাই নি। এই যে আমি কারবারে হার মানি নে, কন্‌সুলেটে ঘাবড়াই নে, ইংরেজ গুপ্তচরকে ডরাই নে—সে-সব ঐ মায়ের কাছ থেকেই পেয়েছি। আপনি বললেন, লেখাপড়া শেখে নি—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'আমি কক্‌খনো বলি নি।'

চোখ দুটি অগাধ স্নেহে ভরে নিয়ে বললেন, 'যদি কোনদিন কুর্গ আসেন তবে নিজেই দেখতে পাবেন।' তারপর হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'আমি না থাকলেও আসতে পারেন—নিশ্চয়ই আসবেন। শুধু বলবেন, 'আমি মুথহানাকে চিনি', ব্যস্ আর দেখতে হবে না। বুড়ি আপনাকে নিয়ে যা মাতামাতি লাগাবে। কিন্তু কথা কইবেন কি করে? মা তো কানাড়া ছাড়া আর কিছু জানে না।'

* * *

পূর্ণ তিনটি মাস আমি মুথহানার কাছ থেকে তাঁর মায়ের গল্প শুনেছি। একই গল্প পাঁচ সাত বার করে। আমার বিরক্তি ধরে নি। কিন্তু এ কথাও মানি আর কেউ বললে আমি এ কথা বিশ্বাস করতুম না। এক মাস যেতে না যেতেই আমার মনে হল, ফটোগ্রাফের দরকার নেই, গলার রেকর্ডের দরকার নেই, মুথহানার মাকে আমি হাজার পাঁচেক অচেনা মানুষের মাঝখানে দেখলেও চিনে নিতে পারব।

কুর্গ গেলে আমি প্রথম দিন কি খাবো তাও জানি, বাইকে যাবার সময় লাল না নীল কোন রঙের গামছা পাবো তাও জানি, শুধু-গায়ে চলাফেরা করলে মায়ের যে আপত্তি নেই তাও জানি এবং বিশেষ করে জেনে নিয়েছি, বিদায় নেবার সাত দিন আগের থেকে যেন রোজই যাবার তাগাদা দিই, না হলে বোম্বায়ে এসে জাহাজ ধরতে পারব না।

এ তিন মাসের প্রথম দু মাস মুথহানার জীবনে মাত্র দুটি কর্ম ছিল। ধুঁকতে ধুঁকতে

www.BanglaBook.org

ঠোক্কর খেয়ে পড়ি-মরি হয়ে এ দোকান, ও দোকান ঘুরে ঘুরে সমস্ত দিন ব্যবসা গুটোনো, আর রাত্রে আমাকে মায়ের গল্প বলা।

তারপর মুথহানাকে শয্যা নিতে হল। এদিকে আমার পয়সাও ফুরিয়ে এসেছে। মুথহানা জানতেন, আমি একমাস পরেই দেশে ফিরব। টাকা থাকতেই আমি টিকিট কেটে রেখেছিলুম। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল আরও কিছু দিন থাকার কিন্তু তাহলে হেলেনার হিস্যায় ভাগ বসাতে হত। সে তো অসম্ভব।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে কান পেতে অপেক্ষা করছেন, আমি কখন বাড়ি ফিরব।

'হের ডক্টর!'

'আপনি আমাকে সব সময় "ডক্টর", "ডক্টর" করেন কেন?'

'রাগ করেন কেন? আমি তো লেখাপড়া শিখি নি। আমার বন্ধু "ডক্টর", সেটা ভাবতে ভাল লাগে না? কিন্তু সে কথা যাক। বলছিলুম কি, আমার 'মা—না থাক্—'

আমি বললম, 'আপনাকে বলতেই হবে।'

'আপনি শক্‌ট্ হবেন। আর কেন যে বলছি তাও জানি নে। আমার মা ব্লাউজ-শেমিজ পরেন না, শুধু একখানা শাড়ি।'

আমি বললুম, 'আমার মাও গরমের দিনে ব্লাউজ শেমিজ পরেন না।'

'আঃ, বাঁচালেন।'

* * *

কাইরো ছাড়ার দিন সাতেক আগে মুথহানা তাঁর ঘরে আমাকে ডেকে পাঠালেন। খান ত্রিশেক খাম দিয়ে বললেন, 'এই ঠিকানা সব খামে টাইপ করে দিন তো।'

দেখি লেখা,

C. D. Muthana
Virarajendrapeth
Marcara
South Coorg. India.

বললেন, 'হেলেনা শুধু গ্রীক লিখতে পারে। তাই এই খামগুলো দেশে যাবার সময় তার কাছে রেখে যাব। আমাকে চিঠি লিখতে তাহলে তার কোনও অসুবিধে হবে না। আমিও তো শিগ্‌গিরই দেশে যাচ্ছি।'

টাইপ করছি আর ভাবছি, এর কটা খামের প্রয়োজন হবে? এ বড় অশ্লীল চিন্তা, পাপ চিন্তা—কিন্তু শত চেষ্টা করেও তার থেকে মুক্ত করতে পারলুম না।

কাইরো ছাড়ার আগের দিন মুথহানা আমাকে ডেকে বললেন, 'ওমর বলছিল আপনি নাকি বিকেলের দিকে আজহর অঞ্চলে যাবেন। আমার জন্যে তিনখানা কুরান শরীফ কিনে আনবেন?'

আমি বললুম, 'কার জন্য কিনছেন?'

'আমার গাঁয়ের মোল্লাদের জন্য। তারা বলেছিল, ভারতবর্ষে ছাপা কুরানে নাকি বিস্তর ছাপার ভুল থাকে। কাইরোর কুরান নিয়ে গেলে তারা যা খুশিটা হবে!'

আমার ভুল অমূলক। বিদায় নেবার দিন দেখি মুথহানা ভারি খুশিমুখ। বার বার বললেন, 'শিগ্‌গিরই ভারতবর্ষে দেখা হবে।' হেলেনা—থাক সে কথা। ও-রকম অসহায়ের

www.BanglaBook.org

কান্না আমি জীবনে কখনও দেখি নি, কখনও দেখতে হবে না, তাও জানি।

দেশে ফিরেই মুথহানাকে চিঠি লিখলুম। জবাব পেলুম না। তখন অতি ভয়ে ভয়ে তাঁর মাকে লিখলুম 'কোদণ্ডের শরীর একটুখানি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল বলে তিনি কিছুদিনের জন্য দেশে আসবেন বলেছিলেন। আপনার কথা আমাকে সব সময় বলতেন আর দেশের ঘরবাড়ির জন্য তাঁর মন অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠেছিল। আমি তাঁর সঙ্গে এক বৎসর একই বাড়িতে ছিলুম। আপনার কথা সব সময় ভাবতেন আর আমাকে রোজই আপনার কথা বলতেন। কম ছেলেই মাকে এত ভালোবাসে। আপনি আমার প্রণাম নেবেন।' বহু ভেবেচিন্তে এই কটি কথা লিখেছিলুম, পাছে আমার কোনও কথা তাঁর মনে ব্যথা দেয়।

এ চিঠিরও উত্তর পেলুম না।

তার মাস খানেক পর কাইরো থেকে খবর পেলুম, কোদণ্ড মুথহানা আমি চলে আসার তিন দিন পর ইহলোক ত্যাগ করেন।

মাদ্রাজ উপকণ্ঠের বেলাভূমি

এই যে সামনের বালুপাড়ের উপর জেলেপাড়া এর সঙ্গে মানব-সভ্যতার কোথায় যোগসূত্র—এই পাড়ার বাইরে যে সংসার তার উপরে সে কথাটা নির্ভর করে, কি পরিমাণ সহযোগিতা পায়?

এদের ঘরে যা তৈজসপত্র তা বিক্রি করলে দু টাকার বেশি উঠবে না। যে সব বাসনকোসন সামনের রাস্তার কলতলায় ধুতে নিয়ে আসে তার অধিকাংশ মাটির। দৈন্য বোধ হয় এদের চরম, কারণ হাঁড়ি-কলসীগুলোও অত্যন্ত মামুলি—তাদের আকারপ্রকারে সামান্যতম সৌন্দর্যের সন্ধান নেই। এমনই এবড়ো-থেবড়ো যে কোনো গতিকে দাঁড় করানো যায় মাত্র—ভার-কেন্দ্র বলে কোনো জিনিস বেশির ভাগ হাঁড়ি-কলসীতে নেই।

পুরুষরা কাজকর্ম করে সুদ্ধু একখানা কালো রঙের এক বিঘৎ চওড়া নেংটি আর ঘুনসি পরে। সন্ধ্যেবেলায় দেখেছি কেউ কেউ ধুতি-শার্ট পরে —বেশীর ভাগ যে জামাকাপড় পরে সেগুলো দেখে মনে হয় যেন মাছের বদলে কুড়িয়ে নেওয়া পরিত্যক্ত বুশ-শার্ট, বোতামহীন শার্ট। ময়লা ঝোলাঝালা শর্ট-শার্ট দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, নিতান্ত হিম বাতাসের কন্‌কনানিতে বাধ্য হয়ে পরেছে।

মেয়েরা পরেছে উত্তর ভারতে তৈরি মিলের শাড়ি। দক্ষিণ ভারতের সুন্দর সবুজ-সোনালি, মেরুন-নীল রঙের মামুলি শাড়ি কেনার পয়সা এদের নেই। একরঙা জামা যা পড়েছে তা সে এমনি বিবর্ণ আর রুক্ষ যে সেটা পরার কোন অর্থ বোঝা যায় না—পরার কি প্রয়োজন? আমাদের জেলেনীরা তো পরে না। দু'একজনের পায়ে আংটি, হাতে বালা, নাকে ফুল—সবই রূপোর।

এরা কেরোসিনের ডিবে জ্বালায় না, রেড়ির তেলের পিদিম এখনো বুঝে উঠতে পারে নি। আর সে জ্বালানোই বা কতক্ষণের জন্য? সন্ধ্যে ভালো করে ঘনাতে-না-ঘনাতেই সাঁজের পিদিম দেখিয়ে এরা আলো নিভিয়ে ফেলে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এদের মাছ-ধরার জাল, খানকয়েক এবড়ো-থেবড়ো তক্তায় জোড়া কাটা মারুন ভেলা, দড়াদড়ি সব কিছুই এদের নিজের হাতে তৈরি—সামান্য সীসের গুল আর লোহার পেরেক হয়ত সভ্য মানবের কাছ থেকে কিনে নেওয়া।

এদের ছেলেমেয়েরা ইস্কুল যায় না, ব্যামো শক্ত না হলে ডাক্তার হাসপাতালের সন্ধান করে না।

শহরের সভ্যতার কাছ থেকে এই নগণ্য,—প্রায় উঞ্ছবৃত্তিলব্ধ—ন্যাকড়াটুকু গুলি-পেরেকটার বদলে এরা সকাল সন্ধ্যা খাটে। যে মাছ ধরে তার অতি সামান্য অংশ খায়, বেশির ভাগ 'বিক্রি' করে দিতে হয় ঐ ন্যাকড়াটুকু, ঐ পেরেকটা আর দু'মুঠো চালের জন্য। 'বেচাকেনা'র নামে এই নগ্ন প্রবঞ্চনা চোখের সামনে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে।

'নগ্ন প্রবঞ্চনা?' চক্ষুষ্মান লোকের সামনে এ নগ্নতা ধরা পড়ে।

আর সবাই দেখছে সেই গল্পের রাজা যেন ফক্কিকারের জামা-কাপড় পরে শোভাযাত্রায় চলেছেন। 'সভ্যতা'র এই শোভাযাত্রার মাঝখানে সেই সরল বালকের চেঁচানো কেউ শুনতে পায় না—কিংবা চায় না।

* * *

সমুদ্রের গর্জন আর বাতাসের হাহাকারে যতক্ষণ বারান্দা মুখরিত থাকে, ততক্ষণ রাস্তার কলতলার শব্দ কানে আসে—না—শুধু দেখি সমুদ্রপারের জেলেরা আসছে পথের পাশের কলতলায় নাইতে অথবা কাপড় কাচতে; মেয়েরা আসছে জল নিতে, বাসন ধুতে, কাপড় কাচতে, কাচ্চা-বাচ্চাদের নাওয়াতে, মাথা ঘষতে। কল থেকে জল বেরোয় অতি মন্দগতিতে—একটি কলসী ভরতে আধ ঘণ্টাটাক লাগে।

বেশী ভিড় না থাকলে দূর গাঁয়ের মেয়েরা শহরে যাবার মুখে মাথা থেকে চুবড়ি নামিয়ে দুদণ্ড জিরিয়ে নেয়, কলে হাত পা ধোয়।

আপিস কিংবা কারখানা যাওয়ার তাড়া থাকলে নিশ্চয়ই কলতলায় ঝগড়াঝাঁটি বেধে যেত। এখানে সব কিছু ধীরে-সুস্থে এগোয়। ঐ যে জেলেটা আরাম করে কলতলায় গা এলিয়ে দিয়েছে তার জন্য কলসী হাতে মেয়েটার কোনো আপত্তি আছে বলে মনে হচ্ছে না। যে কথাবার্তা হচ্ছে তা সমুদ্রের গর্জনে আর বাতাসের শনশনানিতে শোনা যাচ্ছে না।

আজ বাদলার দিন। নাইবার চাড় নেই বলে কলতলায় ভিড় কম। কাচ্চা-বাচ্চারা তো একদম আসে নি। কিন্তু কড়া গরম পড়লে এখানে রীতিমত হাট বসে যায়। কড়া গরম পড়ার মানে যে তখন হাওয়া বন্ধ, কাজেই তখন একটু আধটু চিৎকারও শোনা যায়—মেজাজও তখন কড়া হয়ে যায় বলে।

কলতলায় ভিড় কমে এসেছে। দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখি, একটি জেলেনী কলসী ভরে দাঁড়িয়ে আছে—কলতলায় আর কেউ নেই যে কলসীটা মাথায় তুলে দেবে।

এমন সময় এক রিক্সাওলা যাচ্ছিল। রিক্সা দাঁড় করিয়ে সে কলসীটা তুলে দিয়ে ফের রিক্সা টানতে টানতে চলে গেল।

মেয়েটা একবার কৃতজ্ঞ নয়নে তাকালো পর্যন্ত না। রিক্সাওলাও অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সাহায্যটুকু করে গেল—যেন এরকম ধারা করাটা তার হামেশাই লেগে আছে।

একেই বলে খাঁটি ভদ্রতা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আনিকি পাসিকিভি

এক বাঙালি দম্পতির সঙ্গে জিনীভার এক বড় হোটেলে উঠেছি। প্রথম দিনই খানাঘরে লক্ষ্য করলুম, আমাদের টেবিলের দিকে মুখ করে বসেছেন এক দীর্ঘাঙ্গী যুবতী। দীর্ঘাঙ্গী বললে কম বলা হয়, কারণ আমার মনে হল এঁর দৈর্ঘ্য অন্ততপক্ষে পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি হবে—আর আমরা তিনজন বাঙালি গড়পড়তায় পঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি হই কি না-হই।

দৈর্ঘ্যের সঙ্গে মিলিয়ে সুগঠিত দেহ—সেইটেই ছিল তাঁর সৌন্দর্য, কারণ মুখের গঠন, চুলের রঙ এবং আর পাঁচটা বিষয়ে তিনি সাধারণ ইয়োরোপীয় রমণীদেরই মত।

ভদ্রতা বজায় রেখে আমরা তিনজনই যুবতীটিকে অনেকবার দেখে নিলুম। ফিস ফিস করে তাঁর সম্বন্ধে আমাদের ভিতরে আলোচনাও হল। তখন লক্ষ্য করলুম, আমাদের দিকে তিনিও দু'চারবার তাকিয়ে নিয়েছেন।

সেই সন্ধ্যায় বাঙালি ভদ্রমহিলাটি হোটেলের ড্রয়িংরুমে বারোয়ারি রেডিয়োটা নিয়ে স্টেশন খোঁজাখুঁজি করছিলেন; আমি একপাশে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলুম। হঠাৎ সেই যুবতী ঘরে ঢুকে সোজা মহিলাটির কাছে গিয়ে পরিষ্কার ইংরিজিতে বললেন, 'আপনাকে সাহায্য করতে পারি কি? আপনি কি কোনো বিশেষ স্টেশন খুঁজছেন? আমার বেতারবাই আছে।'

পরিচয় হয়ে গেল। রোজ খাবার সময় আমাদের টেবিলেই বসতে আরম্ভ করলেন। নাম আনিকি পাসিকিভি—দেশ ফিনল্যান্ডে।

ফিনল্যান্ডের আর কাকে চিনব? ছেলেবেলায় ফিন্ লেখক জিলিয়াকুসের 'রুশ বিদ্রোহের ইতিহাস' পড়েছিলুম আর তাঁর ছেলে জিলিয়াকুসও বিখ্যাত লেখক—প্রায়ই 'নিউ স্টেটসম্যানে' উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধাদি লিখে থাকেন। ব্যস্।

কিন্তু তবু যেন পাসিকিভি নামটা চেনা-চেনা বলে মনে হয়। সে কথাটা বলতে আনিকি একটুখানি লজ্জার সঙ্গে বললেন, 'আমার বাবা ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট।'

আমরা তিনজনেই একসঙ্গে বললুম, 'অ।'

আনিকির সঙ্গে আলাপ হওয়াতে আমাদের ভারি সুবিধে হল। বাঙালি দম্পতি ইংরিজি আর বাঙলা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা জানতেন না, কাজেই আমাকে সব সময়ই ওঁদের সঙ্গে বেরতে হত। আনিকি অনেকগুলো ভাষা জানতেন; তিনি তাঁদের নিয়ে বেরতেন আর আমি য়ুনিভার্সিটি, লাইব্রেরি, মিটিং-মাটিং করে বেড়াতুম।

সুইস খানা যদিও বেজায় পুষ্টিকর তবু একটুখানি ভোঁতা—আনিকি ম্যানেজারের সঙ্গে কথা কয়ে তার পরিপাটি ব্যবস্থা করে দিলেন। শামুনিক্স্ দেখতে যাবার জন্য মোটর ভাড়া করতে যাচ্ছি—আনিকি এক দোস্তের গাড়ি ফিরিগ্র্যাটিস-অ্যান্ড-ফরনাথিং যোগাড় করে দিলেন। তা ছাড়া জিনীভা, লজান, মন্ট্রো, ভিল্‌নভ্ (রমাঁ রলাঁ সেখানে থাকতেন) সম্বন্ধে দিনের পর দিন নানাপ্রকারের খবর দিয়ে আমাদের ওয়াকিবহাল করে তুললেন।

সূক্ষ্ম রসবোধও আনিকির ছিল। আমি একদিন শুধালুম, 'আপনি অতগুলো ভাষা শিখলেন কি করে?'

বললেন, 'বাধ্য হয়ে। ইয়োরোপের খানদানী ঘরের মেয়েদের মেলা ভাষা শিখতে হয়

www.BanglaBook.org

বরের বাজার কর্নার করার জন্য। ইংরেজ ব্যারন, ফরাসী কাউন্ট, ইতালিয়ান ডিউক সক্কলের সঙ্গে রসালাপ না করতে পারলে বর জুটবে কি করে?'

তারপর হেসে বললেন, 'কিন্তু সব শ্যাম্পেন টক্! এই পাঁচ ফুট এগারোকে বিয়ে করতে যাবে কোন্ ইংরেজ, কোন্ ফরাসি? তাকে যে আমার কোমরে হাত রেখে নাচতে হবে বিয়ের রাতের বল ডান্সে! যা দেখতে পাচ্ছি, শেষটায় জাতভাই কোনো ফিন্‌কেই পাকড়াও করতে হবে!'

আমি শুধালুম, 'ফিন্‌রা কি বেজায় ঢ্যাঙা হয়?'

বললেন, 'ছয়, ছয় তিন, ছয় ছয় হামেশাই। তাই তো তারা আর পাঁচটা জাতকে আকসার হাইজাম্পে হারায়।'

রসবোধ ছাড়া অন্য একটি গুণ ছিল আনিকির। হাজির-জবাব। কিছু বললে চট করে তার জুৎসই জবাব তাঁর জিভে হামেহাল হাজির থাকত।

একদিন বেড়াতে বেরিয়েছি তাঁর সঙ্গে। এক ডেঁপো ছোকরা আনিকির দৈর্ঘ্য দেখে তাকে চেঁচিয়ে শুধালে, 'মাদমোয়াজেল, উপরের হাওয়াটা কি ঠাণ্ডা?'

আনিকি বললেন, 'পরিষ্কার তো বটেই। তোমার বোটকা প্রশ্বাস সেখানে নেই বলে।'

আনিকির সঙ্গে আমাদের এতখানি হৃদ্যতা হয়েছিল যে তিনি আমাদের সঙ্গে লজান, মন্ত্রো, লুৎর্সেন, ইন্টেরলাকেন, ৎসুরিশ সব জায়গায় ঘুরে বেড়ালেন।

বিদায়ের দিন শ্রীমতী বসু তো কেঁদেই ফেললেন।

* * *

দু'এক বৎসর আমাদের সঙ্গে পত্র ব্যবহার ছিল। তার পর যা হয়—আস্তে আস্তে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল।

তারপর বহু বৎসর কেটে গিয়েছে, এখানে এক ফিন্ মহিলার সঙ্গে আলাপ। শুধালুম, 'প্রেসিডেন্ট পাসিকিভির মেয়েকে চেনেন?'

গুম্ হয়ে রইলেন ভদ্রমহিলা অনেকক্ষণ। তারপর শুধালেন, 'আপনার সঙ্গে এখন কি তাঁর যোগাযোগ নেই?'

আমি বললুম, 'বহু বৎসর ধরে নেই।'

বললেন, 'তিনি চার মাস ধরে হাসপাতালে। পেটের ক্যানসার। বাঁচবেন না। আপনি একটা চিঠি লিখুন না। অবশ্য অসুখের কথা উল্লেখ না করে। জাস্ট, এমনি হঠাৎ যেন মনে পড়ছে।'

সে রাত্রেই লিখলুম।

দিন চারেক পরে আরেক পার্টিতে সেই ফিন্ মহিলার সঙ্গে দেখা। সুধালেন, 'চিঠি লিখেছেন?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ'।

বললেন, 'দরকার ছিল না। কাল দেশের কাগজে পড়লুম, মারা গেছেন।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিদেশে

প্রায়ই প্রশ্ন শুনতে হয়, 'সব চেয়ে কোন্ দেশ ভাল?'

'মাই কানট্রি রাইট অর রঙ, মাই মাদার ড্রান্ক্ অর সোবার্' জাতীয় পাঁড় লোক হলে তো কথা নেই, চট করে বলবে, তার দেশই সবচেয়ে ভালো। কিন্তু আপনি যদি সে গোত্রের প্রাণী না হন তবে কি উত্তর দেবেন? কেউ যদি প্রশ্ন শুধায়, 'সব চেয়ে খেতে ভালো কি?' তা হলে যে রকম মুশকিলে পড়তে হয়।

তখন উল্টে শুধাতে হয়, 'ভালো দেশ' বলতে তুমি কি বোঝো? প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, আবহাওয়া, আহারাদি, জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা, সৌন্দর্যের পূজা, ধন দৌলত, আতিথেয়তা, তুমি চাও কোনটা?' 'সব কটা মিলিয়ে হয় না?' 'আজ্ঞে না।'

তবু যদি কেউ পিস্তল উঁচিয়ে বলে, 'এখ্খুনি তোমায় এদেশ ছাড়তে হবে; কোথায় যাবে বলো!' (যাঁদের ভ্রমণে শখ তাঁরা অবশ্য উল্লসিত হয়ে বলবেন, 'পিস্তল ওঁচাতে হবে না, একবার যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেই হল') তা হলে বোধ হয় সুইটজারল্যান্ডের নামই করব।

ধরে নিচ্ছি খর্চাটা আপনিই দিচ্ছেন—কারণ খর্চা যদি না দেন তবে তো সক্কলের পয়লাই ভাবতে হবে কোন্ দেশে গেলে দু'মুঠো অন্ন জুটবে। তা হলে 'সাউথ সী আয়লেন্ড' বা আফ্রিকার এমন কোন দেশের কথা ভাবতে হবে যেখানে এন্তার কলা-নারকেল রয়েছে, জীবনসংগ্রাম কঠোর নয়—বেঘোরে প্রাণটা যাবার সম্ভাবনা কম। সেদিক দিয়ে অবিশ্যি মালদ্বীপ সবচেয়ে ভালো। ওদেশে কেউ কখনো শখ করে যায় নি তাই 'অতিথি' শব্দটা মালদ্বীপের ভাষায় ঝাঁ চকচকে নূতন হয়ে পড়ে আছে, কখনো ব্যবহার হয় নি। মালদ্বীপের প্রত্যেকটি দ্বীপ এত ছোট যে, যে-কেউ যে-কোনো মুহূর্তে আপন বাড়ি ফিরে যেতে পারে—অতিথি হতে যাবে কে কার বাড়ি? এখানে অবশ্য পালা নেমন্তন্নের কথা উঠছে না। তাই কেউ যদি কখনো পাকে-চক্রে মালদ্বীপ পৌঁছয় তবে তাকে এর বাড়িতে ওর বাড়িতে এ দ্বীপে ও দ্বীপে দু'দিন চারদিন থাকতে গিয়ে হেসেখেলে বছর তিনেক কেটে যায়। আমার জীবনে আমি মাত্র একটি মালদ্বীপবাসীর সঙ্গে কাইরোতে পরিচিত হই। প্রতিবার দেখা হলেই ভদ্রলোক মালদ্বীপ যাবার আমন্ত্রণের কথাটি আমায় স্মরণ করিয়ে দিতেন।

তাই বলছিলুম, খর্চা যখন আপনিই দিচ্ছেন তবে সুইটজারল্যান্ড সই। সুইটজারল্যান্ডের মত আক্রা দেশ ইউরোপে আর নেই—সেখানকার খর্চা যদি আপনি বরদাস্ত করতে পারেন তবে আর সর্বদেশ তো ফাউ। টুক করে প্যারিস, বার্লিন, ভিয়েনা ঘুরে আসতে পারবেন। খর্চা সুইটজারল্যান্ডে থাকলে যা বার্লিন ঘুরে এলেও তা।

স্বপ্নেই যখন খাচ্ছেন, তখন ভাত কেন পোলাওই খান (সিন্ধী প্রবাদে বলে, 'স্বপ্নের পোলাওই যখন রাঁধছো তখন ঘি ঢালতে কঞ্জুসি করছো কেন?) স্বপ্নেই যখন ভ্রমণ করছেন তখন থার্ড ক্লাস কেন, গোটা জাহাজ চার্টার করে ড্যা ব্লুক কেবিনে কিম্বা প্রেসারাইজড্ প্লেনে করে জিনীভা চলে যান।

লেক অব জিনীভার পারে একটি ছোট, অতি ছোট কুটির (শালে) ভাড়া নেবেন আর একটি রাঁধুনী যোগাড় করে নেবেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শুনেই নাভিশ্বাস উঠলো তো? বিদেশ-বিভুঁই জায়গা, তার চুরি-চামারি ঠেকাবে কে? হিসেবে আলুর সের আড়াই টাকা দেখিয়ে বলবে না তো, 'কত্তা, দাঁওয়ে মেরেছি, না হলে আসলে দাম তিন টাকা?'

এই হল সুইটজারল্যান্ডের প্রথম সুখ। ছুঁচোমো, ছ্যাঁছড়ামো ওদেশ থেকে প্রায় উঠে গিয়েছে। সুইটজারল্যান্ডের হোটেলেও তাই। আক্রা বটে—বসবাস খাই-খরচের জন্য হয়ত দৈনিক কুড়ি টাকা নিল কিন্তু তার পরও আপনাকে মাখনটাতে ফাঁকি, মুর্গীটাতে জুচ্চোরি এসব করে না। আপনার খাওয়া দেখে যদি তার সন্দেহ হয় আপনি পেট ভরে খান নি তবে এসে বলবে, 'আপনি বিদেশী, এ রান্না আপনার হয়ত পছন্দ হয় নি। আপনি কি খেতে চান বাৎলে দিন, আমরা সে রকম রেঁধে দেব।'

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন; আপনার রাঁধুনী আপনাকে ফাঁকি দেবে না।

সকাল বেলা ঘুম ভাঙতেই বিছানার পাশের বোতামটি টিপবেন। পাঁচ মিনিটের ভিতর গরম কফি, মুরমুরে রুটি আর শিশির-ভেজা মাখনের গুলি। রাঁধুনী বলবে, 'স্যর, চমৎকার ওয়েদার। আপনি বেরুচ্ছেন তো? আমি বাজার চললুম।'

লেকের পারে এসে একটা বেঞ্চিতে বসবেন। খবরের কাগজটি পাশে রেখে তার উপর হ্যাট চাপা দেবেন।

আহা, কী গভীর নীল জল জিনীভা লেকের! লেকের ওপারে যে আল্‌প্‌স সেও যেন নীল, আর তার মাথায় মাথায় সাদা সাদা বরফের টুপি। তার উপর চুড়োর কাটা-কাটা সাদা ঝালরে সাজানো আকাশের ঘন নীল চন্দ্রাতপ। আর আকাশ-বাতাস, হ্রদের জল, পাহাড়ের গা, বরফের টুপি সব কিছু ভরে দিয়েছে কাঁচা হলুদের সোনালি রোদ। সকাল বেলায় বাতাস একটু ঠাণ্ডা; কিন্তু প্রতিক্ষণে আপনার গালে কানে আদর করে সে বাতাস কুসুম-কুসুম গরম হতে থাকবে। ওভারকোটের বোতামগুলো খুলে দিয়ে পাইপটা ঠাসতে আরম্ভ করবেন। হয়তো গুন্‌গুন্‌ করতে আরম্ভ করবেন, 'আমি চিনি, চিনি, চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী।'

নীল জলের উপর দিয়ে সাদা জাহাজের এ-পার ও-পার খেয়া। জলের উপর আল্‌প্‌সের কালো ছায়া পড়েছে, ফাঁকে ফাঁকে নীল জল, তার উপর সাদা জাহাজ। সেই আল্পনার উপর জাহাজের চাকার তাড়ায় ভেঙে পড়ছে লক্ষ লক্ষ ঢেউয়ের চুমুক। যেন কোন্‌ খেয়ালি বাদশা টাকশাল থেকে এইমাত্র বেরনো টাকা নিয়ে খোলামকুচির খেলা লাগিয়েছেন।

পাল তুলে দিয়ে চলেছে জেলের নৌকো। অতি ধীরে অতি মন্থরে। জাল টেনে তোলার সময় রোদ এসে পড়ছে ভেজা জালে। কালো জাল যাদুর ছোঁয়া লেগে রূপোর জাল হয়ে গেল।

এই রকম রূপোর জাল দিয়ে আপনার প্রিয়া তার খোঁপা জড়াতো না?

তৎক্ষণাৎ বুকটা চড়চড় করে ইস্‌-পার-উস্‌-পার ফেটে যাবে। কোন্‌ মূর্খ বলে দেশ-ভ্রমণে অবিমিশ্র আনন্দ?

রববারে জিনীভার লেকের পাড় আরও চমৎকার।

বিস্তর নরনারী জাহাজ চড়ে বেরিয়েছে ফুর্তি করতে। এসব জাহাজ 'ইস্পিশাল'—লম্বালম্বি লেকের এপার ওপার হয়। সমস্ত দিন জাহাজে কাটিয়ে উত্তম আহারাদি করে (হে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাঙালি, লেকের মাছ খেতে চমৎকার

বাপ রে সে কি বিরাট মাছ উদর আগুময়

মুখে দিলে মাখন যেন জঠর ঠাণ্ডা হয়),

জাহাজের ব্যান্ডের সঙ্গে টাঙ্গোর ধাগিনাতি নাকধিন আর ওয়াল্‌ট্‌সের ধা ধিন না, ধা তিন না নেচে, কিংবা মাউথ-হারমনিয়ম বাজিয়ে, ছোঁড়াছুঁড়িদের সঙ্গে দু'দণ্ড রসালাপ করে, কিংবা জাহাজের এক কোণে আপন মনে বসে খুদাতালার আসমানপানি, পাহাড়-পর্বত দেখে দেখে সমস্ত দিনটা দিব্যি কেটে যায়।

সুইসরা ইংরেজের মত গেরেমভারী লোক নয়। যদি দেখে, আপনি বিদেশী, এক কোণে একা বসে আছেন তবে কোনো একটু ছুতো ধরে আপনার সঙ্গে আলাপ করে নেবেই নেবে। অবশ্য আপনি যদি খেঁকিয়ে ওঠেন তবে আলাদা কথা, কিন্তু আপনি তো বদরসিক নন—স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আপনি 'পঞ্চতন্ত্র' পড়েন—আপনি খুশি হয়েই সাড়া দেবেন।

কিন্তু সুশীল পাঠক, এই বেলা তোমাকে বলে রাখি। দেশভ্রমণের ষোলআনা আনন্দই বরবাদ-পয়মাল যদি তুমি দেশের ভাষায় কথা কইতে না পারো। ভুল বললুম, বলা উচিত ছিল, যদি বুঝতে না পারো। কথা কইবার প্রয়োজন অত বেশি নয়, সুইস যদি দেখে যে তুমি তার ভ্যাচর ভ্যাচর বুঝতে পারছো, মাঝে মাঝে মোকা-মাফিক 'হুঁ' 'হুঁ' করছো কিংবা বুড়া রাজা প্রতাপ রায়ের মত সমে সমে মাথা নাড়ছো তা হলেই সে খুশি।

সুইস কেন, পৃথিবীর প্রায় সব জাতের লোকই বিদেশী সম্বন্ধে কৌতূহলী। বিশেষ করে মেয়েদের উৎসাহ এ বাবদে পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশি। অথচ মেয়েরা লাজুক তাই তারা পুরুষকে অগ্রদূত হিসাবে পাঠায় কলেকৌশলে আলাপ জমাবার জন্য। তার পর

'দীন যথা যায় দূর, তীর্থ দরশনে

রাজেন্দ্র সঙ্গমে—'

কিংবা কালিদাসের বজ্রমণি সমুৎকীর্ণ হওয়ার পর সূত্র যে রকম সুড়ুৎ করে উৎরে যায় (সংস্কৃতটা আর ফলালুম না, ভুল হয়ে যাবার প্রচুর সম্ভাবনা), মেয়েটি আপনার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নেবে।

সাবধানী পথিক, ভয় পেয়ো না। যে মেয়েটি আপনার সঙ্গে আলাপ জমাবার জন্য ছোঁড়াটাকে পাঠিয়েছিলেন সে ফালতো। তার বোন ছোকরাটির ফিয়াঁসে। বোন সঙ্গে আছে, সে বেচারী একা একা কি করে?

চামড়া আর চুলের রঙ তাজ্জব জিনিস।

আমরা ফর্সা রঙের জন্য আকুল, যার চুল একটুখানি বাদামী তার তো দেমাকে মাটিতে পা পাড়ে না। আর বেশির ভাগ উত্তর এবং মধ্য ইয়োরোপীয় বাদামী চামড়া আর কালো চুলের জন্য জান্ কোরবানী দিতে কবুল।

চট করে একটা ঘটনার উল্লেখ করে নেই। এ ঘটনা অধমের জীবনে একাধিকবার হয়েছে।

এরকম এক জাহাজে এক কোণে একা বসে আছি। আমার থেকে একটু দূরে একপাল ইস্কুলের মেয়ে মাস্টারনীর সঙ্গে ফুর্তি করতে জাহাজে চেপেছে। সবাই আপন আপন স্যান্ডউইচ বাড়ি থেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। স্যান্ডউইচগুলো টেবিলের মধ্যিখানে বারোয়ারি করে রাখা হয়েছে, আর জাহাজ থেকে তারা অর্ডার করেছে লেমনেড।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কী চেঁচামেচি! 'দেখ দেখ, ফ্রিডির মা কি রকম খাসা বেকন্-স্যান্ডউইচ পাঠিয়েছে,' ফ্রিডি লজ্জায় টমাটো হয়ে বলছে, 'না না, মাস্টার্ড ছিল না বলে স্যান্ডউইচ ভালো হয় নি', 'ক্লারার মার পাঠানো স্যালাডটা খা ভাই, জানিস ওঁর বাগানে যা লেটিস আর টমাটো হয়!' আর টিচার শুধু বলছেন, 'চুপ চুপ, অত করে চ্যাঁচাতে নেই। লোকে কি ভাববে?'

ধর্ম সাক্ষী লোকে কিছু ভাবে না। বরঞ্চ ওরা না চ্যাঁচালে পাঁচজন অস্বস্তি অনুভব করত; ভাবত কালা-বোবাদের ইস্কুল পিক্‌নিকে বেরিয়েছে।

সব কটা মেয়ে—ইস্তেক টিচার—আড়নয়নে ভদ্রতা বজায় রেখে আপনার কালো চুল আর বাদামী রঙের দিকে তাকাবে।

পরের স্টেশনে হুড়মুড় করে সবাই নেমে গেল। আমার মনটা উদাস হয়ে গেল।

তখন দেখি একটি আট ন'বছরের মেয়ে টেবিলের তলায় লুকিয়ে ছিল, গুড়ি গুড়ি আমার কাছে এসে কার্টসি করে (অর্থাৎ দু হাতে ফ্রক একটুখানি তুলে হাঁটু ভেঙে) বললে, 'গুটেন্ টাখ্ (সুপ্রভাত)!'

আমি চিবুকে হাত দিয়ে আদর করে বললুম, 'গুটেন্ টাখ্, মাইন, জ্যুসষেন (সুপ্রভাত, মিষ্টি মেয়ে)।'

লজ্জায় কাঁচুমাচু হয়ে, চুলের ডগা পর্যন্ত লাল করে বললে, 'আপনি রাগ করবেন না?'

আমি বললুম, 'নিশ্চয় না।'

'তবে বলুন তো, আপনি কি দিয়ে চুল কালো করেছেন! আমি কাউকে বলবো না, তিন সত্যি।'

আমি তখন তার সোনালি চুলের দিকে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে। বললুম, 'ডার্লিং, তোমার কী সুন্দর সোনালি চুল!'

গাল ফুলিয়ে বললে, 'রাবিশ, আমি কালোচুল চাই।'

কিছুতেই বোঝাতে পারি নে, আমি চুলে রঙ মাখাই নি।

শেষটায় হঠাৎ বুদ্ধি খেলল। কোটের আস্তিন সরিয়ে দেখালুম আমার লোমও কালো। বললুম, 'ওগুলো তো আর বসে বসে কালো করি নি।'

বিশ্বাস তখন তার হল। মুখে গভীর বিষাদ মেখে, মাথা হেঁট করে আস্তে আস্তে জাহাজ থেকে নেমে গেল।

দু'টাকা জোর ন'সিকে দিয়ে টিকিট কেটে বসেছেন। এমন আর কি আক্কা হল? সমস্ত দিন কাটাতে গেলে বায়স্কোপেও তার চেয়ে বেশি খর্চা হত।

হুবহু গোয়ালন্দী জাহাজ। কেবিনের বালাই নেই—সব খোলা ডেক। রেলিঙের গা ঘেঁষে ঘেঁষে চারজনের বসবার মত ছোট ছোট টেবিল সাজানো। নীল সাদায় ডোরাকাটা করকরে টেবিল ক্লথ। ক্লিপ দিয়ে টেবিলের সঙ্গে সাঁটা। পাছে হাওয়াতে ভর করে পক্ষীরাজের মত ডানা মেলে লেকের 'হে-পারে' চলে যায়।

'হে-পারে?' চট করে মনটা পদ্মার দিকে ধাওয়া করলো তো?

আমারও মন পড়েছিল পদ্মার কথা। জীবনে কতবার প্রদোষের আধা-আলো-অন্ধকারে চাঁদপুর থেকে জাহাজে করে গোয়ালন্দের দিকে রওয়ানা হয়েছি। বিনিদ্র রজনীর ক্লান্তিতে সর্বদেহমন অবসন্ন—বাড়ি ছাড়ার সময় মা অমঙ্গলের চোখের জল ঠেকিয়ে রাখতে পারেন

www.BanglaBook.org

নি, সে কথা বার বার বুকের ভিতর কাঁটার মত খোঁচা দিচ্ছে, বহু চেষ্টা করেও মন থেকে সেটাকে সরাতে পারছি নে।

পদ্মার সূর্যোদয় মনের অনেকখানি বেদনা প্রতিবারই কমিয়ে দিয়েছে। রেলিঙের পাশে বসে, তারই উপর মাথা কাৎ করে তাকিয়ে আছি আকাশের দিকে, যেখানে কালো-সাদার মাঝখানে আস্তে আস্তে গোলাপী আভা ফুটে উঠছে। পদ্মার জল রাঙা হয়ে গেল, মহাজনী নৌকোর পাল ফুলে উঠে মাঝখানটায় গোলাপী মেখে নিয়েছে, দূরের পাখি আর এ-পৃথিবীর পাখি বলে মনে হচ্ছে না, কোন নন্দনকাননের মেহদি পাতার রস দিয়ে যেন ডানা দুটি লাল করে নিয়েছে।

ঐ তো সূর্য ঐ তো সবিতা!

জাহাজ জোর ফালতো স্টীম ছাড়ছে। তারই উপর ক্ষণে ক্ষণে রামধনুর রঙ খেলে যাচ্ছে। মাঝি-মাল্লাদের চেঁচামেচি কেমন যেন আর কর্কশ বলে মনে হচ্ছে না। পাশে মোল্লাজীর নামাজ পড়া শেষ হয়েছে। সুর করে কোরান পড়তে আরম্ভ করেছেন। হাওয়াতে তাঁর দাড়ি দুলছে, পাগড়ির ন্যাজ দুলছে। বরযাত্রীর দল যাচ্ছে, না কনে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে, কে জানে—একমাথা সিঁদুর-মাখা একটি মেয়ে ঘন ঘন শাঁখ বাজাচ্ছে। হিঁদু বাড়িতে তো শাঁখ শুনেছি সন্ধ্যেবেলায়, ভোরেও বাজায় নাকি? কে জানে?

উত্তমার্ধ নগ্ন, জাহাজের রশির মত মোটা ধবধবে পৈতে-ঝোলানো এক ব্রাহ্মণ বললেন, 'দেখো তো, মিয়া, ঠিক ঠিক রাজবাড়ির টিকিট দিয়েছে তো? যা ভিড় ছিল, কি দিতে কি দিয়ে বসছে কে জানে? চশমাটাও হারিয়ে গিয়েছে।'

রসভঙ্গ হল অস্বীকার করি নে, কিন্তু কাতর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ; অবহেলা অভিনয় করলে মর্শীদ-মুরুব্বীর মারাত্মক অভিসম্পাত লাগবে। বেশ করে দেখে নিয়ে বললুম, 'আজ্ঞে (আগে হলে একথা বলার প্রয়োজন হত না যে মুরুব্বীরা ছেলেবেলাই আমাদের পই-পই করে শিখিয়েছিলেন, হিন্দু গুরুজনদের সঙ্গে কথা কইতে হরদম 'আজ্ঞে'—বাঙাল ভাষায় 'আইগা' বলতে হয়) ঠিকই দিয়েছে; আপনাকে ঠকাতে যাবে কোন্ পাষণ্ড?'

ব্রাহ্মণ ভারী খুশি। আমার পাতা বিছানাতে পরম পরিতৃপ্তিভরে গা এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

হঠাৎ একটা গল্প মনে পড়ে গেল।

তরকারি-বেচনে-ওলা গেছে জাহাজ ইস্টিশানে টিকিট কাটতে—

'বাবু অ—অ—অ, অ—বাবু, নারান্‌জোর (নারায়ণগঞ্জ) এ্যাখ্‌খান টিকস্ দিবাইন নি?'

বাবু বললেন, 'ছ আনা।'

তরকারি-ওলা বললে, 'বাবু অ—অ—অ, চারি আনায় অইব না?'

বাবু পশ্চিম বাঙলার লোক, ওনাদের মেজাজ আমাদের দ্যাশে এলে একটুখানি মিলিটারি হয়ে যায়। খেঁকিয়ে বললেন, দে ব্যাটা 'দে, ছ' আনা দে।'

গভীর বেদনা সহকারে তরকারি-ওলা বললে, 'বাবু অ—অ—, তুমি আমার দোকানে রোজ রোজ আও। কলাডা মুলাডা কিনো। দরদাম করো। আর আমি আইলাম তোমার দোকানে এগ্ দিন। দরদাম করতা গেলাম—তুমি অমন খাটাশের মতন মুখডা করলা ক্যান্?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মনে আমার সন্দেহ জাগছে, চতুর পাঠক বিশ্বাস করতে চান না জিনীভার জাহাজে বসে আমার এ 'নারানজী' (নারায়ণগঞ্জী) গল্প সত্যই মনে পড়েছিল কি না।

কেন পড়েছিল বলছি।

ইয়োরোপের সব দেশের ভিতর সুইটজারল্যান্ডই সবচেয়ে 'এক দরে বিক্রি'। সেখানে দরদস্তুর করতে গেলে (আমি বাঙাল, তাই করেছিলুম) সুইস এমনই বোকার মত তাকায়, কিংবা খেঁকিয়ে ওঠে যেন তাকে আমি ড্যাম্ মিথ্যেবাদী বলে সন্দ করছি।

অথচ দেখুন, ইয়োরোপীয়রা আমার দেশে হামেশাই দরদস্তুর করে। আমি যদি তরকারি-ওলার মত ওদেশে একবার গিয়ে দরদস্তুর করি, তবে ওরা 'খাটাশের মত মুখ করবে ক্যান?'

ইতিমধ্যে মধ্য দিনের তপ্ত হাওয়া আমার মন উদাস করে দিয়েছে। মেঘের ডাকে, নব বরষণে বাঙালির মন কেমন যেন গভীর বেদনায় ভরে যায়, আর সে মনটা উদাস হয়ে যায় দুপুর বেলায় আকাশের দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ যেন বুকে বেজে ওঠে, আমি এ সংসারের নই, এখানকার সুখ-দুঃখের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

কিন্তু ওরকম ধারা মন খারাপের দাওয়াই জাহাজে মজুদ। হঠাৎ অর্কেস্ট্রা বেজে উঠল ঃ

'গোলাপবাগানে সান্‌সুসির গোলাপবাগানে—'

কি হয়েছিল?

'সেই গোলাপবাগানে আমি মেরিকে চুমো খেয়েছিলুম—

প্রথম চুম্বন তো মানুষ জীবনে কখনো ভুলতে পারে না।'

ট্রেনে বসে আছেন; চট করে আপনার সঙ্গে কেউ আলাপ জমাতে যাবে না—আপনি হয়ত চুপ করে বসে থাকাটাই পছন্দ করেন। কিন্তু ফুর্তির জাহাজে যখন বসেছেন, তখন নিশ্চয়ই ফুর্তি করতে চান—বাঙলা কথা। একা বসে বসে ফুর্তি হয় না, তাই কেউ যদি আপনার সঙ্গে পরিচয় করে সুখ-দুঃখের গল্প জুড়তে চায়, তা হলে আপনার আপত্তি না থাকারই কথা এবং আশ্চর্য, মানুষ অনেক সময় পরদেশীর সঙ্গে যতখানি প্রাণ খুলে কথা কইতে পারে স্বদেশবাসীর সঙ্গে ততটা পারে না। প্রাণের কোণে বছরের পর বছরের জমানো কোনো এক গভীর বেদনা আপনি লজ্জায় কখনো কাউকে স্বদেশে প্রকাশ করেন নি; হঠাৎ একদিন দেখতে পাবেন, অজানা-অচেনা বিদেশবিভুঁইয়ে এক ভিনদেশীর সামনে আপনি আপনার সব দুঃখকাহিনী উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন। তার সঙ্গে জীবনে আপনার আর কখনো দেখা হবে না—সেই কারণেই হয়ত আপনার হৃদয়ের আঁকবাঁকু তার বুকের উপর চেপে বসা জগদ্দল পাথর সরিয়ে ফেলে নিষ্কৃতির গভীর আরাম পায়। ইয়োরোপের লোক তাই কোনো এক গোপন বেদনা নিয়ে যখন হন্যে হবার উপক্রম করে, তখন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যায়—সেখানে বেদনার বোঝা নামিয়ে দিয়ে সে আবার সুস্থ মানুষ হয়ে সংসারের দুঃখ-কষ্টের সামনাসামনি হয়!

বোধ হয়, ঐ একই কারণে কখনো কখনো মানুষ বিদেশে স্বদেশবাসীর কাছেও তার বেদনার দ্বার খুলে দেয়।

একদা প্রাগ শহরে দেখি, এক ভারতীয় বৃদ্ধ—খুব সম্ভব দাক্ষিণাত্যের—রাস্তায় বেকুবের মতন দাঁড়িয়ে আছেন। মুখের ফ্যাল-ফ্যাল ভাব দেখে অনুমান করলাম, হয়ত রাস্তা হারিয়ে ফেলেছেন, কিংবা হয়ত পার্সটাও গেছে। কাছে গিয়ে শুধালুম 'ব্যাপার কি?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভদ্রলোক তো আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেন আর কি! শুধু যে হোটেল হারিয়ে বসেছেন তাই নয়, হোটেলের নামটা পর্যন্ত বেবাক ভুলে গিয়েছেন।

কি করে তাঁর হোটেল খুঁজে পেলুম সে এক নয়, পাঁচ—মহাভারত। দ্বিজেন্দ্রলাল তো আর মিছে বলেন নি, 'একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়।' লঙ্কা রাক্ষসের দেশ, প্রাগে ভদ্রসন্তানের বসবাস। আমার মত লেখাপড়ায় পাঁঠা বঙ্গসন্তানের মাথায় এসব ফন্দিফিকির বিস্তর খেলে—সাক্ষাৎ শার্লক হোমস্ আর কি—সে কথা 'দেশে'র পাঠককে হাইজাম্প লঙজাম্প দিয়ে বোঝাতে হবে না।

কিন্তু আমি মনে মনে পাঁচশবার তাজ্জব মানলুম, এই নিরীহ তামিল ব্রাহ্মণের প্রাগে আসার কি প্রয়োজন? তখনকার দিনে প্রতি শহরে মেলা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স বসত না যে, তিনি ভেটেরেনারির 'রিন্ডারপেস্ট' কিংবা ভারত বিদেশে ক'শ' মণ গাঁজাগুলি চালান করতে পারবে, তাই নিয়ে পাণ্ডববর্জিত প্রাগে ভারতের প্রতিভূ হয়ে আলোচনা করতে আসবেন।

হোটেলে পৌঁছতে দেখি, সেখানেও আরেক কুরুক্ষেত্র। এরকম নিরীহ বিদেশী প্রাণী হোটেলের লোকও কখনো দেখে নি—প্রাগ তো প্যারিস নয়—তাই তারা ব্যাকুল হয়ে পড়েছে দশটায় বেরিয়ে লোকটা আটটা অবধি ফেরে নি কেন? তাঁকে বাড়ি ফিরিয়ে আনার জন্য আমি সেখানে শার্লক হোম্সেরই কদর পেলুম।

ভদ্রলোক চেপে ধরলেন, তাঁর সঙ্গে খানা খেতে যেতে হবে।

অপেরার টিকিট আমার কাটা ছিল—প্রাগের অপেরা ডাকসাইটে—কিন্তু আমার মনে হল, 'প্রাগে তামিল ব্রাহ্মণ' যে-কোনো অপেরার টাইটলকে হার মানাতে পারে।

বললেন, 'খানাটা কিন্তু আমার ঘরেই হবে—ডাইনিংরুমে না।'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়।'

ঘরে ঢুকেই তড়িঘড়ি সুট খুলে ফেলে ধুতি বের করে মাদ্রাজি কায়দায় সেটাকে লুঙ্গি বানিয়ে পরলেন, গায়ে চাপালেন শার্ট, আর কাঁধে ঝোলালেন তোয়ালে।

চেয়ারে বসে খাটে দু-পা তুলে দিয়ে বললেন, 'আঃ'!

এরকম দরাজ-দিল লোক আমি জীবনে আর কখনো দেখি নি।

ওয়েটার ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে যখন বলে, এটা আনবো কি, সেটা আনবো কি, তিনি মাথা দুলিয়ে বলেন, 'ইয়েস, ইয়েস, ব্রিং, ব্রিং।'

বড় হোটেল। সেখানে 'আ লা কার্তে' অন্তত একশ' পদ রান্না হয়, তিনশ' রকমের মদ মজুদ আছে। আমি বাধা দিতে গেলে তিনি বলেন, কি জ্বালাতন, ভালো করে খেতে দেবে না কি?'

অথচ তিনি খেলেন, আলু-কপি-মটর-সেদ্ধ, রুটি-মাখন, স্যালাড্ আর চা। বললেন, 'বুড়ো বয়সে আর মাছ-মাংসটা ধরে কি হবে?'

তবে তিনি নিশ্চয়ই এই প্রথম ইয়োরোপ এসেছেন। যে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি বৃদ্ধবয়সে অন্যকে মাংস খাওয়ায় সে যৌবনে এলে নিজেও চেখে নিত।

ক্রমে ক্রমে পরিচয় হল। আই সি এস থেকে পেন্সন নিয়েছেন। ওদিকে শাস্ত্রী ঘরের ছেলে—বিস্তর সংস্কৃত সুভাষিত মুখস্থ। একটানা নানা রকমের গল্প বলে যেতে লাগলেন—প্রধানত শঙ্কর রামানুজের জীবনের চুটকিলা ঘটনা নিয়ে। ইংরেজিতে যাকে বলে, 'লাইটার

www.BanglaBook.org

সাইড'। আমি মুগ্ধ হয়ে শুনে যেতে লাগলুম।

তবে কি রাতের অন্ধকার যেমন যেমন ঘনাতে লাগে, মানুষের মনের অন্ধকার ঘর তার দরজা আস্তে আস্তে খুলে দেয়? আমরা আহারাদির পর বেলকনিতে ডেকচেয়ারে লম্বা হয়ে শুয়েছি, চোখ আকাশের দিকে। চতুর্দিকের ফ্ল্যাটের আলো আর রাস্তার বাতি নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের তারা জ্বল-জ্বল করে ফুটে উঠছে। চেনা ঘরদোরের তুলনায় মানুষ তেমন কিছু ক্ষুদ্র জীব নয়, কিন্তু বিরাট গম্ভীর আকাশের মূর্তি যখন তারায় তারায় ফুটে ওঠে, তখন তার ক্ষুদ্র হৃদয় আর তার ক্ষুদ্রতর লৌকিকতা, সঙ্কীর্ণতা কেমন যেন আস্তে আস্তে লোপ পেয়ে যায়।

কোনো ভূমিকা না দিয়ে বৃদ্ধ হঠাৎ বললেন, 'যার সঙ্গে আলাপচারি হয়; সে-ই ভাবে, এ-বুড়ো ইয়োরোপে এসেছে কি করতে? কি যে বলব, ভেবে পাই নে।'

এ তো তিনি আমাকে বলছেন না, আপন মনে ভাবছেন এবং হয়ত তার অজানাতেই গলা দিয়ে সে ভাবনা প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে। আমি যে শুধু চুপ করলুম তাই নয়, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসও প্রায় বন্ধ করে আনলুম, যাতে তাঁর চিন্তাধারা কোনো প্রকারের টক্কর না খায়।

না, ভুল বুঝেছি। তিনি আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন।

বললেন, 'দেশের অনেকেই জানে কিন্তু কেউ আমাকে কখনো জিজ্ঞেস করে নি। এদেশে জিজ্ঞেস করলেও উত্তর দিই নে। কিন্তু তোমাকে বলি। এত অসাধারণ কিংবা কেলেঙ্কারির কিছুই নেই—থাকলে মানুষ চুপ করে থাকে না, সব সময়ই ফলিয়ে বর্ণনা করে আপন সাফাই গায়।

'আমি বড় সুখী ছিলুম। স্ত্রী, দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে। দুটি ছেলেই ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে এম, এ-তে, সংস্কৃতে আর ইকনমিক্সে। মেয়েটির বিয়ে ঠিক—জামাইয়ের চেহারা কন্দর্পের মত।

'চাকরি-জীবনে মাদুরা, কাঞ্চী, তাঞ্জোর বহু জায়গায় ঘুরেছি, কিন্তু পৈতৃক ভদ্রাসনে যাবার কখনো সুযোগ হয় নি; আমিও গ্রাম ছেড়েছি, ষোল বছর বয়সে পিতার মৃত্যুর পরেই।

'হঠাৎ গৃহিণী চেপে ধরলেন—আমি তখন সবেমাত্র পেন্সন নিয়েছি—তিনি তাঁর শ্বশুরের ভিটে দেখতে যাবেন। ছেলেরাও বলে যাবে, মেয়েটার তো কথাই নেই। আমি অনেক করে বোঝালুম, সেখানে এটা নেই, ওটা নেই, সেটা নেই, সাপ আছে, খবরের কাগজ নেই, মশা আছে, পাইখানার ব্যবস্থা নেই, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা, তাঁরা যাবেই যাবে। আমারও যে সামান্য দুর্বলতা হয় নি, সে কথা হলফ করে বলতে পারব না।

'বিশ্বেস করবে না, বাবা, তারা গ্রাম দেখে মুগ্ধ। আমি তো তিনে পই পই করে গ্রামটাকে যতদূর সম্ভব কালো করে এঁকেছিলুম, তাদের শখটা যেন বড্ড বেশি কঠোর কঠিন না হয়। তা গাইলে উল্টো গান। ইঁদারা থেকে জল তুললো হেঁইয়ো করে—মাদ্রাজে কলের জল বন্ধ হলে এরাই 'দি হিন্দু' কাগজে কড়া কড়া চিঠি লিখত— মেয়েটা দেখি, ছোট ছোট ইঁট নিয়ে বাস্তুভিটের গর্তগুলো বন্ধ করছে, গৃহিণী একনো তুলসীতলায় অনবরত জল ঢালছেন।

'বড় আরাম পেলুম। গৃহিণীর কথা বাদ দাও, তিনি সতী-সাধ্বী, কিন্তু আমার 'মডার্ন' ছেলেমেয়েরাও যে আমার চতুর্দশ পুরুষের ভিটেকে তাচ্ছিল্য করল না, তাই দেখে আমার

www.BanglaBook.org

চোখে জল ভরে এল।

'আমার ছেলেবেলায় যারাই গ্রাম থেকে চলে যেত, তারা আর ফিরে আসত না। আমার বাবা তাই আমাকে কতবার বলেছেন তার ঠিক নেই, ''বেণু-গোপলা, দেশের ভিটেমাটি অবহেলা করিস নি, আর যা কর কর!''

'চাকরির ধান্দায় আমি তাঁর সে আদেশ পালন করতে পারি নি। এখন দেখি, আমার ছেলেমেয়েরা তাঁর সে আদেশ পালন করছে। বসে বসে প্ল্যান কষছে, কোথায় রজনীগন্ধা ফোটাবে, কোথায় পাঁচিল তুলবে, কোথায় নাইট স্কুল খুলবে। আমার গৃহিণী সার্থক গর্ভধারিণী।'

বৃদ্ধ অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে রইলেন। আমি আরো বেশি চুপ। বললেন, 'এর পর আর বলার কিছু নেই, তাই সংক্ষেপে বলি। মাত্র দুদিন কেটেছে; তিন দিনের দিন সকালবেলা মেয়েটার কলেরা হল, ঘণ্টাখানেকের ভিতরে ছেলে দুটোরও। লোক ছুটিয়ে মাদ্রাজে তার করলুম। আরও লোক ছুটলো এখানে-সেখানে ডাক্তার-বদ্যির সন্ধান। দশ ঘণ্টার ভিতরে তিনজনই চলে গেল। গৃহিণীর চোখের সামনে।

'তিনি গেলেন তার পরদিন। কলেরায় না অন্য কিছুতে বলতে পারি নে। আমি তখন সম্বিতে ছিলুম না।'

আমি ক্ষীণকণ্ঠে বললুম, 'থাক, আর না।'

আমার আপত্তি যেন শুনতে পান নি। বললেন, 'মাদ্রাজে ফিরে আসার কয়েকদিন পরে আমার ব্যাঙ্কার আমার স্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা কইতে চাইলে—সে জানতো আমাদের টাকা-পয়সার বিষয় আমি কিছুই জানি নে। তার কাছ থেকে শুনলুম, গৃহিণী ভালো ভালো শেয়ার কিনে লাখ তিনেকের মত জমিয়েছিলেন।

'তাই বেরিয়ে পড়েছি। টমাস কুক যেখানে নিয়ে যায়, সেখানেই যাই।

'ওদের ছবি দেখবে? চলো, ঘরের ভিতর যাই।'

মনোজ বসুর ভাষায় জাহাজে বসে 'কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে' চলে গিয়েছিলুম, হঠাৎ হুঁশ হল আমি পদ্মায় নই, প্রাগে নই আমি বসে আছি জিনীভা লেকের জাহাজে।

জাহাজে অর্কেস্ট্রা গানের পর গান বাজিয়ে যাচ্ছে আর ডেকের মাঝখানে বিস্তর লোক টাঙ্গো, ওয়াল্‌টস্, ফক্স ট্রট নাচছে। আর সে কত জাতবেজাতের লোক— বড় বড় চেক কাটা কোট-পাতলুম-পরা মার্কিন (আমাদের মারোয়াড়ি ভাইয়ারা যে রকম 'বড়া বড়া বুট্টাদার' নক্সা পছন্দ করেন) নিখুঁত, নিপুণ, লিপস্টিক-রুজ-মাখা তন্বী ফরাসিনী, গাদা-গোদা হান্দা-হোদ্দা জর্মন আর ডাচ্, গায়ে কালো নেট্ আর লেসের ওড়না জড়ানো বিদ্যুৎনয়নী হিম্পানি রমণী, আপন হাম্বাইয়ের দম্ভে-ভরা একটুখানি আলগোছে-থাকা ইংরেজ আর তাদের উঁচু-নীচুর-টক্করহীন হকির বাঘিনী, টেনিস-পাগলিনী স্প্যার্টস রমণী।

এই হরতেন রুইতেন সায়েব বিবির তাসের দেশে নিরীহ ভারতসন্তান কক্ষে পাবে কি?

তা পায়—আকসারই পায়।

তার প্রধান কারণ, আর পাঁচটা ইয়োরোপীয় এবং মার্কিন জাত সুইটজারল্যান্ডে এসেছে ফুর্তি করতে, এদেশের মেয়েদের সঙ্গে ভাবসাব জমিয়ে ফষ্টিনষ্টি করতে। তার

www.BanglaBook.org

কলকৌশল—নাচের ভিতর দিয়ে, ভাষার অজ্ঞতার ভান করে, দামী দামী মদ খাইয়ে—এরা বিলক্ষণ জানে, এবং কাজে খাটাতে কিছুমাত্র কসুর করে না। এদের সম্বন্ধে তাই সুইস বাপ, ভাই, মা, দিদি এমন কি মেয়েরাও একটুখানি সাবধান।

ভারতীয় মাত্রই যে এদের তুলনায় 'ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির' এ-কথা আমি বলব না। কিন্তু ইয়োরোপ বাসের প্রথম অবস্থায় ভারতীয় মদ খেতে কিংবা খাওয়াতে জানে না, নাচতে পারে না এবং সবচেয়ে বড় কথা তার ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে সে কণামাত্র তালিম পায় নি বিদেশিনীর সঙ্গে কি করে দোস্তী-ইয়ার্কি জমাতে হয়।

আমি 'ৎসুরিশ সংবাদ' পড়ছিলুম। পড়া শেষ হতে কাগজখানা টেবিলের উপর রাখামাত্রই আমার পাশের টেবিলের এক ছোকরা এসে আমাকে 'বাও' করে বললে, 'আমার 'বাজেল সংবাদে'র বদলে আপনার 'ৎসুরিশ সংবাদ'খানা একমিনিটের জন্য পড়তে পারি কি?'

'নিশ্চয় নিশ্চয়।'—এ ছাড়া আপনি আর কি বলবেন?

কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেল আলাপ জমাবার জন্য সরকারি রাস্তা ধরেই সে যাত্রা শুরু করেছে। কারণ এতক্ষণ ধরে সে তার সঙ্গের দু'টি মেয়ের সঙ্গেই গল্পগুজব বা নাচ-গান করছিল—কাগজ পড়ার ফুর্সৎ কই?

তবু কাগজখানা যখন নিয়ে গিয়েছে তখন দু'মিনিট পড়ার ভান করতে হয়। তাই করল। ফেরৎ দেবার সময় ধন্যবাদ জানিয়ে হেসে বলল, 'আজকাল কিস্‌সু নতুন খবর মেলে না।'

আমি বললুম, 'একদম না; সব যেন দড়কচ্চা মেরে গিয়েছে।'

মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বললো, 'যা বলেছেন।'

এরপর আপনাকে অবশ্যই বলতে হয়, 'দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।'

কিন্তু কিন্তু করে বসবে, তারপর আরো দু' মিনিট না যেতেই বলবে, 'তার চেয়ে চলুন না আমাদের টেবিলে। আমার সঙ্গে দু'টি বান্ধবী রয়েছেন। তাঁরা বড্ড একলা পড়ে গেলেন।'

আপনি বলবেন, 'রাম রাম! বড্ড ভুল হয়ে গেল আপনাকে ঠেকিয়ে রেখে।'

ছোকরা বলবে, 'সে কি কথা, সে কি কথা!'

এই হল প্রধান সরকারি পন্থা আলাপ-পরিচয় করার—অবশ্য আরো বহু গলিঘুঁচিও আছে।

বড়টির নাম গ্রেটে, ছোটটি ট্রুডে। ছেলেটার নাম পিট্। পিট্ বলবে, 'কিছু একটা পান করুন।'

আমি বললুম, 'এইমাত্র কফি খেয়েছি; এখন আর থাক—অনেক ধন্যবাদ।'

এইবারে যে আলাপচারি আরম্ভ হবে তার চৌহদ্দি বাতানো সরল কর্ম নয়। সাধু-সন্ন্যাসীরা সত্যি পেরেকের বিছানায় দিনের পর দিন কাটাতে পারেন কিনা, গোখরোর বিষ ওঝা নামাতে পারে কিনা, কিংবা যোগাভ্যাস করে মাটি থেকে তিন ইঞ্চি উঠে যেতে কাউকে কখনো আমি দেখেছি কিনা?

ছেলেটা যদি দর্শনের ছাত্র হয় তবে হয়ত ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধেই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে বসবে, মেয়েটির যদি বাজনায় শখ থাকে তবে আপনাকে শুধিয়ে বসবে, ভারতীয় সঙ্গীতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক'রকমের তাল হয়।

এসব তাবৎ প্রশ্নের সদুত্তর কে দেবে? ব্রজেন শীল, সুনীতি চাটুয্যে, বিশ্বকোষ, সুকুমার রায়ের 'নোটবুক', গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা সব মিলিয়ে কক্‌টেল্ বানালেও ঐ প্রশ্নমেরু তাকে বেমালুম শুষে নেবে।

বিদেশী একথা বোঝে না যে, তার ঠিক যে জিনিসে কৌতূহল, আপনার তাতে মহব্বৎ নাও থাকতে পার। তার উপরে আরেকটা কথা ভুললে চলবে না, আমরা ইস্কুল-কলেজে যে তালিম পাই তাতে ক্রুসেডের তারিখ মুখস্থ করানো হয়—অজন্তা, ধ্রুপদ শেখানো হয় না।

তবে অতি অবশ্য স্বীকার করবো, একটি প্রাতঃস্মরণীয় প্রতিষ্ঠান আমি চিনি যিনি এসব প্রশ্নের উত্তম উত্তম উত্তর দিতে পারেন।

হেদোর ওতর-পূব কোণের 'বসন্ত রেস্টুরেন্ট'! সেখানে আমরা সুবো শাম রাজা-উজীর কতল করি, হেন সমস্যা, হেন বখেড়া নেই যার ফৈসালা আমরা পত্রপাঠ করে দিতে পারি নে।

'বসন্ত রেস্টুরেন্টে'র আমি আদি ও অকৃত্রিম সভ্য। তস্য প্রসাদাৎ আমি হরমুল্লুকে হর-সওয়ালের জবাব দিতে পারি।

বিদেশীদের সম্বন্ধে ভারতীয়ের কৌতূহল কম। কলকাতায় বিস্তর চীনা থাকে; আমি আজ পর্যন্ত একজন বাঙালিকেও দেখি নি, যিনি উৎসাহী হয়ে চীনাদের সঙ্গে আলাপচারি করেছেন। মাত্র একটি বাঙালি চিনি যিনি ছেলেবেলা থেকে কাবুলিওয়ালাদের সঙ্গে ভাব করে দোস্তী জমিয়েছিলেন—কাবুলিরা এখন এদেশে দুর্লভ হয়ে যাওয়াতে তাঁর আর শোকের অন্ত নেই।

ইয়োরোপীয়রা সংস্কৃত যে রকম পড়ে, আরবী চীনা ভাষারও তেমনি চর্চা করে। তাই আমার মনে সব সময়েই আশ্চর্য বোধ হয়েছে যে, ভারতীয় সম্বন্ধে তাদের কৌতূহল সবচেয়ে বেশি কেন?

পিটুকে জিজ্ঞেস করাতে সে বললে, 'পণ্ডিতেরা কেন ভারতপ্রেমী হন, সে কথা আমরা বলতে পারবো না, তবু আমার মত পাঁচজন সাধারণ লোকের কথা কিছু বলতে পারি।

'প্রাচ্যের তিন ভূখণ্ডের সঙ্গে আমাদের কিছুটা পরিচয় আছে। ভারত, আরবভূমি আর চীন। তুর্কদেরও আমরা ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি, কিন্তু তারা অনেকখানি ইয়োরোপীয় হয়ে গিয়েছে, আর তিব্বত সম্বন্ধে কৌতূহল পুষে আর লাভ কি? তিব্বতীরা তো এদেশে আসে না।

'আরবরা সেমিটি, চীনারা মঙ্গোলিয়। এদের ধরনধারণ এত বেশি আলাদা যে, এরা যেন অন্য লোকের প্রাণী বলে মনে হয়। অথচ ভারতীয়রা আর্য—তাই তারা চেনা হয়েও অচেনা। এই ধরুন না, যখন চীনা বা আরব ফরাসী-জর্মন বলে, তখন কেমন যেন মনে হয় ভিন্ন যন্ত্র বাজছে। অথচ ভারতীয়রা যখন ঐ ভাষাগুলোই বলে তখন মনে হয় একই যন্ত্র বাজছে, শুধু ঠিকমত বাঁধা হয় নি।

'আরেকটা কারণ বোধ হয় খ্রীষ্টের পরই—সময়ের দিক দিয়ে নয়, মাহাত্ম্যে—মহাপুরুষ বলতে আমরা বুদ্ধদেবের কথাই ভাবি। এখন অবশ্য অনেকখানি মন্দা পড়েছে,

www.BanglaBook.org

কিন্তু এককালে এখানে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে প্রচুর বই বেরিয়েছিল। তার কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীর লোক ভগবানে বিশ্বাস হারায়, অথচ একথা জানত না যে, ঈশ্বরকে বাদ দিয়েও শুধু যে ধার্মিক জীবনযাপন করা যায় তাই নয়, ধর্মপত্তন করা চলে। তাই যখন বুদ্ধের বাণী এদেশে প্রথম প্রথম প্রচার হল, তখন বহু লোক সে বাণীতে যেন হারানো-মাণিক ফিরে পেল। কেউ কেউ তো আদমশুমারীর সময় নিজেদের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বলে জাহির করল।

'এযুগে গাঁধী পরম বিস্ময়ের বস্তু। অস্ত্রধারণ না করে বিদেশী ডাকুকে তাড়ানো যায় কিনা জানি না। কিন্তু গাঁধীর প্রচেষ্টাটাই বিশ্বজগৎকে একদম আহাম্মুক বানিয়ে দিয়েছে। আমি অনেক ধার্মিক ক্রীশ্চানকে চিনি, যাঁরা গাঁধীর নাম শুনলেই ভক্তিতে গদগদ হন। একজন তো বলেন, খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেন খ্রীষ্ট এবং মাত্র একটি লোক সে ধর্ম স্বীকার করেছেন, তিনি গাঁধী।'

ট্রুডে বললে, 'টেগোরের নাম করলে না?'

পিট্ বললে, 'টেগোরকে চেনে এদেশের শিক্ষিত লোক। তার কারণও রয়েছে। এ যুগে সাধারণ লোক পড়ে প্রধানত খবরের কাগজ। খবরের কাগজে গাঁধীর কথা দুদিন অন্তর অন্তর বেরয়, কিন্তু টেগোরের কথা বেরোয় তিনি যখন এদেশে আসেন।'

ট্রুডে বললে, 'আর বুদ্ধদেবের কথা বুঝি খবরের কাগজে নিত্যি নিত্যি বেরয়, না তিনি প্রতি বৎসর এখানে স্কেট করতে আসেন?'

গ্রেটে বললে, 'ছিঃ, বুদ্ধদেবকে নিয়ে ওরকম হাল্কা কথা কইলে বুদ্ধদেবের দেশের লোক হয়ত ক্ষুণ্ণ হবেন।'

আমি বললুম, 'আদপেই না। আমাদের দেশে দেবতাদের নিয়ে মজার মজার গল্প আছে।'

পিট্ বললে, 'বুদ্ধদেব যে একশ' বছরের স্টার্ট পেয়ে বসে আছেন।'

ট্রুডে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'আপনাদের ঠাকুর-দেবতাদের নিয়ে যে সব মজার গল্প আছে, তারই একটা বলুন না।'

আমি শিব বেজায়গায় একবার বর দিয়ে যে কি বিপদে পড়েছিলেন, আর শেষটায় বিচক্ষণ নারদ তাঁকে কি কৌশলে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন, সেই গল্পটি বললুম।

তিনজনেই হেসে কুটিকুটি।

ট্রুডে জিজ্ঞেস করলে, 'শিব কি ডাঙর দেবতা?'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়। তবে কিনা তিনি শ্মশানে থাকেন, ভূতের নৃত্য দেখেন, কাপড়চোপড়ও সব সময় ঠিক থাকে না। দেবতাদের পার্লিমেন্টে সচরাচর যান না।'

সবাই অবাক হয়ে শুধায়, 'তবে তিনি ডাঙর হলেন কি করে?'

এখানেই আমি হামেশাই একটু বিপদে পড়ে যাই। নীলকণ্ঠের বৈরাগ্য যে এদেশের ঘোর সংসারী মনকেও মাঝে মাঝে ব্যাকুল করে তোলে, সেটা ইয়োরোপীয়রা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। 'আরো চাই', 'আরো চাই'য়ের দেশে 'কিছু না', 'কিছু না'র তত্ত্ব বোঝাই কি প্রকারে? আমি যে বুঝেছি তা-ও নয়।

তবে ইয়োরোপের সর্বত্রই মেয়েরা হরপার্বতীর বিয়ের বর্ণনা শুনতে বড় ভালোবাসে। বিশেষ করে যখন বরযাত্রায় বলদের পিঠে শিবকে দেখে মেনকা চিৎকার করে তাঁকে খেদিয়ে দেবার জন্যে আদেশ দিলেন, আর যখন শুনলেন তিনিই বর এবং ভিরমি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেলেন—তখন মেয়েরা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

আমি তার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে উত্তেজনাটা বাড়ানোর জন্য ধীরে ধীরে একটি সিগ্‌রেট ধরাই।

'তারপর, তারপর?' সবাই চেঁচায়।

জানি অসম্ভব। তবু তখন এ-ক'টি ছত্র অনুবাদ করার চেষ্টা করি।

ভৈরব সেদিন তব প্রেতসঙ্গীদল রক্ত আঁখি
দেখে, তব শুভ্রতনু রক্তাংশুকে রহিয়াছে ঢাকি
প্রাতঃসূর্য রুচি।
অস্থিমালা গেছে খুলে মাধবীবল্লরী মূলে
ভালে মাখা পুষ্পরেণু—চিতাভস্ম কোথা
গেছে মুছি।
কৌতুকে হাসেন উমা কটাক্ষে লক্ষিয়া কবি পানে—
সে হাস্যে মন্দ্রিল বাঁশি সুন্দরের জয়ধ্বনি গানে
কবির পরাণে॥

* * *

এ দৃশ্য আমি একমাত্র সুইটজারল্যান্ডেই দেখেছি।

পশ্চিমের সূর্য হেলে পড়েছে আর তার লাল আলো এসে পড়েছে পাহাড়ের গায়ের বাড়িগুলোর হাজার হাজার কাচের সার্শীতে। সার্শীগুলা লালে লাল হয়ে গিয়ে একাকার—মনে হয় বাড়িগুলো বুঝি মিনিটখানেকের ভিতরই পুড়ে খাক হয়ে যাবে। আগুনের জিভের মত লালের আঁচ উঠেছে আকাশের দিকে, আর তারই রঙ গিয়ে লেগেছে দূর পাহাড়ের চূড়োয় সাদা বরফে। সেখানেও লেগে গেছে দাউ দাউ করে আগুন। পাহাড়ের কোলে বসা মেঘগুলোও সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে যাচ্ছে; ওদিকে আকাশের এখানে ওখানে যে সব মেঘের টুকরো সমস্ত দিন সাদা ভেড়ার মত আকাশের নীল মাঠে শুয়ে ছিল তারা দেখি পূর্ব-পশ্চিমের আগুনে তেতে গিয়ে গোলাপী হয়ে উঠেছে। সেই লাল রঙের আওতায় পড়ে নীল পাহাড় আর হ্রদের নীল জল ঘন বেগুনী রঙ মেখে নিয়েছে।

চতুর্দিকে হুলস্থূল কাণ্ড, কিন্তু নিঃশব্দে। মেঘে মেঘে, আকাশে আকাশে, পাহাড়পর্বতে, ঘরবাড়িতে এমন কি জলেবাতাসে এই যে বিরাট অগ্নিকাণ্ডটা হয়ে যাচ্ছে তাকে নেভাবার জন্য চেঁচামেচি-চিৎকার হচ্ছে না, আগুনের তাপে কাঠ-বাঁশ ফেটে যাওয়ার ফট্-ফাট্ দু-দ্দড়াম্ শব্দ হচ্ছে না, ঐ যে লেকের পাড়ে সোনালি বেঞ্চিতে বসে আছে মেয়েটি তার সাদা ফ্রকে আগুন লেগেছে, সেও তো চিৎকার করে কেঁদে উঠছে না। এ কী কাণ্ড!

এ আগুনের কি জ্বালা নেই, না এদেশের জনমানব-পশুপক্ষীকে কোনো এক ভানুমতী ইন্দ্রজাল দিয়ে অসাড়-অচেতন করে দিয়েছেন? হাঁ, এ তো ইন্দ্রজালই বটে। এতখানি আগুন, লক্ষ লক্ষ কলসী থেকে উজাড় করে ঢেলে দেওয়া এতখানি গলানো সোনা, হাজার হাজার মণ গোলাপী পাপড়ির লোধ্র-রেণু, না জানি কত শত জালা আবির-গুলাল এরকম অকৃপণ হাতে ঢেলে দিলে, ছড়িয়ে ফেললে স্বর্গপুরীকেও লাল বাতি জ্বালাতে হবে—হয়ত এই আগুন থেকেই পিদিম ধরিয়ে নিয়ে।

এ তো কনে-দেখার আলো নয়; এ তো সতীদাহের বহ্নিকুণ্ড।

www.BanglaBook.org

গ্রেটে আর ট্রুডের ব্লন্ড্ চুল অদৃশ্য হেয়ার-ড্রেসারের হাতে সোনালি হয়ে গেল। পিট্ কথা বলবার সময় ঘন ঘন হাত নাড়ে; মনে হচ্ছে যেন সোনালি জলে হাত দুখানি সাঁতার কাটছে।

সূর্য পাহাড়ের পিছনে অতি ধীরে ধীরে অস্তাচলে নেমে গিয়েছেন। আবার সেই ভানুমতী এসেছে। অদৃশ্যে তিনি ঘন ঘন এখানে ওখানে উড়ে গিয়ে শাড়ির আঁচল দিয়ে মেঘের গা থেকে আবির তুলে নিয়ে কাজল মাখিয়ে দিচ্ছেন, ফুঁ দিয়ে এক এক সার সার্শী থেকে আগুন নিবিয়ে দিচ্ছেন, কখনো বা দেখি লেকের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি জলের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন—যেন গোবর দিয়ে আঙ্গিনা লেপে দেওয়া হল।

এ দৃশ্য সুইটজারল্যান্ডেও নিত্য নিত্য ঘটে না। জাহাজের ব্যান্ড তাই দুই নাচের মাঝখানে এখন অনেকখানি সময় নিচ্ছে। জাহাজের বহু নরনারী স্তব্ধ হয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। এরকম সূর্যাস্ত কমই হয় যেখানে তুমি আমিও হিস্যেদার—স্পষ্ট দেখলুম তোমার কাপড়ের আগুন লেগে গিয়েছিল আমার কাপড়েও। আপন অজানাতে আমাদের দেহ, আমাদের বেশভূষা এ রসের সায়রে ছোট ছোট দ' সৃষ্টি করে তুলেছে।

ট্রুডে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার দেশে এরকম সূর্যাস্ত হয়?'

আমি বললুম, 'কাশ্মীরে হয়; সেখানে বরফ আছে, পাহাড় আছে, লেক আছে। কিন্তু হাজার হাজার চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে জানলার সার্শী নেই বলে হয়ত এতখানি আগুন ধরে না। তবে যদি হিমালয়কে ভারত বলে গোনা হয় তবে নিশ্চয়ই এর চেয়েও বেশি আগুন-জ্বালা সূর্যাস্ত সেখানে হয়—সুইস পর্যটকদেরই লেখাতে পড়েছি।'

ভানুমতী দিকে দিকে কাজলধারা বইয়ে দিয়েছে। চতুর্দিক অন্ধকার।

শুধু ফুটে উঠেছে অন্ধকার ঘাসের উপর লক্ষ লক্ষ বিজলি-বাতির ফুল। আকাশের ফরাশেও দেবতারা জ্বালিয়ে দিয়েছেন অগুণতি তারার মোমবাতি। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, পাহাড়ের উপরের দিকে যে আলোগুলো জ্বলছে সেগুলো মানুষের প্রদীপ না দেবতার তারা। মানুষ স্বর্গের দিকে ধাওয়া করে উঠেছে পাহাড়ে, আর দেবতারা নেমে এসেছেন পৃথিবীর দিকে ঐ পাহাড়ের চূড়ো পর্যন্ত—একে অন্যকে অন্ধকারের এপার ওপার থেকে সাঁঝের পিদিম দেখাবার জন্য।

"মাটির প্রদীপখানি আছে মাটির ঘরের কোলে,
সন্ধ্যাতারা তাকায় তারি আলো দেখবে ব'লে।
সেই আলোটি নিমেষহত প্রিয়ার ব্যাকুল চাওয়ার মতো,
সেই আলোটি মায়ের প্রাণের ভয়ের মত দোলে॥
সেই আলোটি নেবে জ্বলে শ্যামল ধারার হৃদয়তলে,
সেই আলোটি চপল হাওয়ায় ব্যথায় কাঁপে পলে পলে।
নামল সন্ধ্যাতারার বাণী আকাশ হতে আশিস আনি,
অমরশিখা আকুল হল মর্তশিখায় উঠতে জ্বলে॥"

পিট্ বললে, 'একটি প্রেমের গল্প বলুন।'

আমি বললুম, 'ভারতবর্ষে সত্যকার প্রেমের গল্প আছে একটি, যার সঙ্গে অন্য কোনো দেশের গল্প পাল্লা দিতে পারে না। সে কাহিনীতে মাটির মানুষ তার আপন বিরহবেদনার বর্ণনা শুনতে পায়, আবার ভগবদপ্রেমের জন্য ব্যাকুলজনও সেই কাহিনীতে আপন আকুলি-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিকুলির নিবিড়তম বর্ণনাও শুনতে পায়। কিন্তু রাধামাধবের সে কাহিনী বলবার মত ভাষা আমার নেই।'

ট্রুডে বললে, 'আমি একখানি ছবি দেখেছি তাতে রাধা কৃষ্ণের গায়ে পিচকারি দিয়ে লাল রং মারছেন। চমৎকার ছবি!'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আমি পিট্‌কে বললুম, 'তার চেয়ে বরঞ্চ আপনি আপনার প্রেমের কাহিনী বলুন না?'

পিট্ তো বেশ খানিকটা ঠা ঠা করে হাসল—দু পাত্রের পর মানুষ অল্পেতেই হাসে কাঁদে—তারপর বললে, 'হ্যারগট্ হ্যারগট্ (রামচন্দর!), এ যুগে কি আর সে রকম প্রেম কারো জীবনে আসে যা নিয়ে রসিয়ে গল্প জমানো যায়?'

ট্রুডে বললে, 'বলেই ফেল না ছাই তোমার সাদা-মাটা গল্পটা।'

গ্রেটে দেখি চুপ করে আছে।

পিট্ বললে, 'আমার প্রেমে পড়ার কাহিনীতে মাত্র সামান্য একটু বিশেষত্ব আছে। সেইটুকুই বুঝিয়ে বলি।

'আমি তখন সবে কলেজে ঢুকেছি। ফার্স্ট পিরিয়ডে ক্লাস থাকত না বলে আমি বাড়ি থেকে বেরতুম ন'টার সময়। একদিন ন'টার কয়েক মিনিট পরে কলেজের কাছেই একটি মেয়ে আমার পাশ দিয়ে উল্টো দিকে চলে গেল। হাবভাব দেখে মনে হল কলেজেরই ছাত্রী কিন্তু আসল কথা সেইটে নয়—আসল কথা হচ্ছে ওরকম সুন্দরী আমি আর কখনো দেখি নি।

'আমার বুকের রক্ত দুম্ করে জমে গেল; আমার হার্টটা যেন লাফ দিয়ে গলার কাছে পৌঁছে গেল। আমি অনেকক্ষণ সেই রাস্তার উপর ঠায় দাঁড়িয়ে রইলুম। সেদিন আর ক্লাস করা হল না; কলেজের বাগানে বসে বসে সমস্ত সকালটা কাটল।

'পরদিন ঠিক ঐ সময়ই মেয়েটি আমাকে রাস্তায় ক্রস্ করল। এবারে দুজনাতে চোখাচোখি হল—এক ঝলকের তরে। তারই ফলে আমাকে রাস্তার পাশের রেলিঙ ধরে সে নজরের ধাক্কা সামলাতে হল।

'তারপর রোজই ঐ সময় রাস্তায় দেখা হয়, এক লহমার চোখাচোখি হয়। বুঝলুম মেয়েটির সেকেন্ড পিরিয়েড ফ্রী তাই বোধ হয় বাড়ি কিংবা অন্য কোথাও যায়।

'আগেই বলেছি, মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী। রোজ সকালে নটার পর তার সেই এক ঝলকের তরে আমার দিকে তাকিয়ে দেখা যেন আমার গলায় এক পাত্র সোনালি মদ ঢেলে দিত আর বাদবাকি দিন আমার কাছে আসমানজমীন গোলাপী রঙে রাঙা বলে মনে হত।

'করে করে তিন মাস কাটল।'

পিট্ মদের গেলাসে মুখ ঠেকাতে আমি শুধালুম, 'পরিচয় করবার সুযোগ হল না, তিন মাসের ভিতর? কলেজ ডান্‌সে, কলেজ রেস্তোরাঁ—কোথাও?'

পিট্ বলল, 'ভয়, ভয়, ভয়। আমার মনে হত এরকম সুন্দরী কখনোই, কোন অবস্থাতেই আমার মত সাদা-মাটাকে ভালোবাসবে না, বাসতে পারে না, অসম্ভব, অসম্ভব, সম্পূর্ণ অসম্ভব। বিশ্বাস করবেন না, পাছে আলাপচারি হয়ে যায় আর সে আমায় অবহেলা করে সেই ভয়ে কোনো নাচের মজলিসে দেখা হলে আমি তৎক্ষণাৎ ঊর্ধ্বশ্বাসে সে স্থল পরিত্যাগ করতুম। তার চেয়ে পরিচয় না হওয়াটাই ঢের ঢের ভালো।'

www.BanglaBook.org

আমি বললুম, 'টেগোরেরও গান আছে—

'সেই ভালো সেই ভালো আমারে না হয় না জানো
দূরে গিয়ে নয় দুঃখ দেবে কাছে কেন লাজে লাজানো?'

পিট্ বলল, 'আশ্চর্য, টেগোর তো অতি সুপুরুষ ছিলেন। তিনি এরকম মর্মান্তিক অনুভূতিটা পেলেন কোথায়?'

আমি শুধালুম, 'কিন্তু মেয়েটিও তো আপনার দিকে তাকাত!'

'ঠিক বলেছেন, কিন্তু আমার মনে হত মেয়েটি শুধু দেখতে চায়, এই বেশরম বাঁদরটা কত দিন ধরে এ তামাশা চালায়।'

আমি শুধালুম, 'তার পর?'

'তিন মাস হয়ে গিয়েছে। আমি প্রেমের পাখায় ভর করে চন্দ্রসূর্য ঘুরে বেড়াচ্ছি। প্রেমের এ পাখা দানা-পানি অর্থাৎ প্রতিদানের তোয়াক্কা করে না বলে এর কখনো ক্লান্তি হয় না; এ প্রেম আমার মনের বাগানে ফোটা জুঁই,—কারো অবহেলা-অনাদরের খরতাপে এ ফুল কখনো শুকোবে না।

'কলেজের বাগানে বসে একদিন চোখ বন্ধ করে আমি আমার প্রিয়াকে দেখছি, এমন সময় কাঁধে হাত পড়ল। চোখ মেলে দেখি আমার গ্রামের একটি পরিচিত ছেলে আর তার পাশে দাঁড়িয়ে আমার স্বপ্নের ফুল। পালাবার পথ ছিল না, পরিচয় হয়ে গেল।'

'তারপর?'

'আমার একদম মনে নেই। যেটুকু মনে আছে বলছি. হঠাৎ দেখি ছেলেটি উধাও, আর আমার স্বপ্ন তখনো মূর্তি ধরে পাশে বসে আছে। কিন্তু আসল কথায় ফিরে যাই। সেই যে ভয়ের কথা বলেছিলুম। প্রথম আলাপেই আমি যে তার সঙ্গে পরিচয় করতে ডরাই সেকথা কি জানি কি করে বেরিয়ে গেল। মেয়েটি অবাক হয়ে শুধাল, "কিসের ভয়?" আমি বললুম, "আপনি বড় বেশি সুন্দর।" তখন যা শুনলুম সে আমি তখনো বিশ্বাস করি নি এখনো করি নে—তার বিশ্বাস, আমি একটা আস্ত এ্যাডনিস্ এবং তাই আমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে সে ভয় পেয়েছিল। শুনুন কথা!'

আমি বললুম, 'আপনারা দুজনাই দেখতে চমৎকার কিন্তু সেইটে আসল কথা নয়। আসল কথা আছে এক ফার্সী প্রবাদে, "লায়লীরা বায়দ্ ব্ চশ্‌মে মজনূন দীদ!" লায়লীকে দেখতে হয় মজনুর চোখ দিয়ে।'

জাহাজ পাড়ে এসে ভিড়ল। সবাই নেমে পড়লুম। আবার দেখা হবে বলে পিট্ গ্রেটে, ট্রুডে বিদায় নিল।

আপন মনে বাড়ির দিকে চলতে চলতে একটা কথা ভাবতে লাগলুম; এই যে ইয়োরোপীয়রা প্রাণ খুলে ফুর্তি করে, হৈ-হল্লা করে, আমরা এ-রকম ধারা আপন দেশে করতে পারি নে কেন? সায়েবসুবোদের লেখাতে পড়েছি, আমরা নাকি বড্ড সিরিয়স, সংসারকে আমরা নাকি মায়াময় অনিত্য ঠাউরে নিয়ে মুখ গুমসো করে বসে আছি, ফুর্তি-ফার্তি করার দিকে আমাদের আদপেই মন নেই।

'জাতক' তো খ্রীষ্টের বহু পূর্বে লেখা। তাতে যে হরেক রকম পালা পরবের বর্ণনা পাই তার থেকে তো মনে হয় না, আমরা সে যুগে বড্ড রাশভারি মেজাজ নিয়ে আত্মচিন্তা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর তত্ত্বালাপে দিন কাটাতুম। স্পষ্ট মনে পড়ছে কোন এক পরবের দিনে এক নাগর তার প্রিয়ার মনস্তুষ্টির জন্য রাজবাগানে ফুল চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে শূলের উপর প্রাণ দেয়। মরার সময় সে আক্ষেপ করেছিল, 'প্রিয়া, আমি যে মরছি তাতে আমার কোনো ক্ষোভ নেই, কিন্তু তুমি যে পরবের দিনে ফুল পরে যেতে পারলে না সে দুঃখ আমার মরার সময়ও রইল।'

আমাদের কাব্যনাটক রাজরাজড়াদের নিয়ে—সেখানে হদিস মেলে না আমাদের সাধারণ পাঁচজন আনন্দ উৎসব করত কি না এবং করলে কি ধরনের করত। শুধু 'মৃৎশকটিকা' আর 'মালতীমাধবে' সাধারণ লোকের সবিস্তর বর্ণনা রয়েছে এবং এ দুটি পড়ে তো মনে হয় না এ সময়ের সাধারণ পাঁচজন আজকের দিনের ইয়োরোপীয়দের তুলনায় কিছু কম আয়েস করত। 'মৃৎশকটিকা'য় রান্নাঘরের যে বর্ণনা পাই তার তুলনায় সুইটজারল্যান্ডের যেকোনো রেস্তরাঁ নস্যাৎ। আর 'মালতীমাধবে'র নাগর মাধববাবু তো জাহাজের পিট্ সাহেবকে প্রেমের লীলাখেলায় দু কলম তালিম দিতে পারে।

তবে কি নিতান্ত এ যুগে এসেই আমরা হঠাৎ বুড়িয়ে গিয়েছি? তাও তো নয়। হুতোমের কেতাবখানায় একবার চোখ বুলিয়ে নি—বাবুরা তো কিছুমাত্র কম ঢলাঢলি করেন নি। তবে কি একি বিংশ শতকে এসে হঠাৎ আমাদের ভীমরতি ধরল? তাও তো নয়। ফুটবল খেলা দেখতে এক কলকাতা শহরই যা পয়সা উড়োয় তার অর্ধেক বোধ হয় তামাম সুইটজারল্যান্ডও করে না।

ফুটবল সিনেমা লোকে দেখুক—আমার আপত্তি আছে কি নেই সে প্রশ্ন উঠছে না। আমি শুধু ভাবি এসব আনন্দে উত্তেজনার ভাগটা এতই বেশি যে মানুষ যেন সেখানে স্থায়ী কোনো কিছু সন্ধান পায় না। আমার মনে হয়, স্টীমারে বা ট্রেনে, সত্যযুগে, যখন ভিড় বেশি হত না তখন ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করাতেও আনন্দ ছিল অনেক বেশি। বহু বৎসর হয়ে গিয়েছে তবু এখনো মনে পড়ছে দু'একজন যথার্থ সুরসিককে। এঁরা কামরায় উঠেই পাঞ্জাবির বোতাম খুলে দিয়ে কোঁচা দিয়ে হাওয়া খেতে খেতে যা গল্প জুড়তেন তার আর তুলনা হয় না। আমরা গুটিকয়েক প্রাণী রোজই এক কামরায় উঠতুম আর এঁরা কামরাখানিকে গালগল্প দিয়ে প্রতিদিন রঙিন করে দিতেন। অসুখ করে আমাদের কেউ দু'দিন কামাই দিলে এঁরা রীতিমত ব্যস্ত হয়ে উঠতেন, কোনো কৌশলে দুটো ডাব কিংবা চারটি ডালিম পাঠানো যায় কি না তার আন্দেশা করতেন, কিন্তু যাক্, এ বাবতে 'রূপদর্শী' আমার চেয়ে ঢের বেশি ওকীব-হাল।

আমি ভাবছি, সেই সব আনন্দের কথা যেখানে অজানা জনকে চেনবার সুযোগ হয়। উদয়াস্ত তো আমরা বসে আছি সাংসারিকতার মুখোশ পরে। আপিসে যারা আমার কাছে আসে তারা আসে স্বার্থের খাতিরে, বাড়িতে যাঁরা আসেন তাঁরা বন্ধুজন, তাঁদের আমি চিনি, তাঁরা আমায় চেনেন কিন্তু নূতন পরিচয় হবে কি প্রকারে?

তাই ট্রেনের স্বল্পক্ষণের পরিচয় অনেক সময় গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়। ট্রেনে তুমি আমাকে চেন না, আমি তোমাকে চিনি নে। আলাপচারিতা কোনো স্বার্থের খাতিরে আরম্ভ হয় না বলে শেষ পর্যন্ত সে যে কত অন্তরঙ্গতায় দুজনকে নিয়ে যেতে পারবে তার কোনো স্থিরতা নেই।

অবশ্য এখন আমরা সব মেকি সায়েব হয়ে গিয়েছি। আগের আমলের মত কেউ যদি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সুধান, 'বাবাজীর আসা হচ্ছে কোন্ থেকে' কিংবা 'বাবাজীরা—?' অর্থাৎ 'বাবাজী বামুন, কায়েত, না বদ্যি?' তাহলে আমরা বিরক্ত হই। কেন হই, তা এখনো আমি বুঝে উঠতে পারি নে।

ইংরেজ শুনেছি হয়। আমি বলতে পারব না। কারণ আমি পারতপক্ষে কোনো ইংরেজের সঙ্গে আলাপ জমাতে চাই নে। অবশ্য কোনো ইংরেজ আলাপ করতে চাইলে আমি খেঁকিয়ে উঠে তাকে স্নাবও করি নে। কিন্তু ফরাসী জর্মন সুইস অন্য ধরনের। তারা অনেক বেশি মিশুকে। কাফে বা মদের দোকানে তারা যে রোজ সন্ধ্যায় আড্ডা জমায় সেখানে কোনো সদস্য যদি কোনো নূতন লোক নিয়ে উপস্থিত হয় তবে আর পাঁচজন আনন্দিত হয়। ইংরেজের ক্লাবে যদি কোনো সদস্য আপন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে তবে আর পাঁচজন তার দিকে আড়নয়নে তাকায়। কোনো কোনো ক্লাবে তো কড়া আইন, আপনি মাসে ক'দিন ক'জন অতিথিকে নিমন্ত্রণ করতে পারেন।

জর্মন, ফরাসী, সুইসদের ভিন্ন রীতি। 'পাবে', কাফেতে ইয়ারদোস্ত যোগাড় করার পরও তাদের প্রাণ ভরে ওঠে না বলে তারা যায় ফুর্তির জাহাজ চড়তে। সেখানে কত দেশের কত লোকের সঙ্গে আলাপ হবে—

কত অজানারে জানাইলে তুমি কত ঘরে দিলে ঠাঁই
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

ময়ূরকণ্ঠী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

উৎসর্গ

মমাগ্রজ সুসাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা আলী সাহেবকে—

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

নিবেদন

'পঞ্চতন্ত্র' বাঙালি পাঠকের কাছে আশাতীত সমাদর লাভ করাতে আমার জানা-অজানা পাঠকের কেউ কেউ ঐ-জাতীয় আরেকখানি সংকলন প্রকাশ করার জন্য আমাকে অনুরোধ জানান। আমার শরীর অসুস্থ থাকায় শিষ্য ও সখা দিল্লীবাসী শ্রীমান বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য আমার পুরনো লেখা থেকে অশেষ পরিশ্রম করে আপন রুচি-অনুযায়ী এই সংকলনটি প্রস্তুত করেছেন। এ পুস্তিকার অধিকাংশ লেখা 'আনন্দবাজার', 'বসুমতী' ও 'দেশ'-এ বেরিয়েছিল। কোনো কোনো লেখা 'দেশে-বিদেশে'র চেয়েও পুরনো।

গজনী সুলতান মাহমুদের সভাপণ্ডিত অল-বীরুনী একাদশ শতাব্দীতে সংস্কৃত শিখে আরবী ভাষায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একখানা প্রামাণিক পুস্তক রচনা করেন। পুস্তকে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বর্ণনা দেবার সময় তিনি বলেন যে, ঐ সব ধর্মের মহাজনগণ আপন আপন ধর্মের যে ধারণা হৃদয়মনে পোষণ করেছেন তিনি সে-গুলোর বর্ণনা করেছেন মাত্র—কোনো মতের সমর্থন কিংবা খণ্ডন তিনি করতে চান নি। নানা ধর্ম বর্ণনার সময় আমি প্রাতঃস্মরণীয় অল-বীরুনীর পদাঙ্ক অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি।

'বাঙালি' বলতে আমি উভয় বাঙলার এবং বাঙলার বাইরেরও হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান-বৌদ্ধ বাঙলাভাষী জনকেই বুঝি।

সৈয়দ মুজতবা আলী

www.BanglaBook.org

গুরুদেব

রবীন্দ্রনাথের শিষ্যদের ভিতর সাহিত্যিক হিসাবে সর্বোচ্চ আসন পান শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী। তিনি যে রকম রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য পেয়েছেন সবচেয়ে বেশি, তেমনি বিধিদত্ত রসবোধ তাঁর আগের থেকেই ছিল। ফলে তিনি সরস, হালকা কলমে রবীন্দ্রনাথের দৈনন্দিন জীবন, খুশ-গল্প, আড্ডা-মজলিস সম্বন্ধে যা লিখেছেন তারপর আর আমার কিছু লিখবার মত থাকতে পারে না। কারণ বিশীদা যে মজলিসে সবচেয়ে উঁচু আসন পেয়েছেন সে মজলিসে রবীন্দ্রনাথের শিষ্য হিসাবে যদি নিতান্তই আমাকে কোনো স্তোকাসন দেওয়া হয় তবে সেটা হবে সর্বনিম্নে।

কিন্তু বহু শাস্ত্রে বিধান আছে সর্বজ্যেষ্ঠ যদি কোনো কারণে শ্রদ্ধাঞ্জলি না দিতে পারে, তবে দেবে সর্বকনিষ্ঠ। এই ছেলেধরার বাজারে কিছু বলা যায় না—গুরুদেবকে স্মরণ করার সময় আমরা সবাই একবয়সী ছেলেমানুষ, রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে আজকের শিশুবিভাগের কনিষ্ঠতম আশ্রমিক—কাজেই বিশীদার যদি ভালো-মন্দ কিছু একটা হয়ে যায় তবে আমার আকন্দাঞ্জলির প্রয়োজন হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে মা 'বসুমতীর' কাছে এটি গচ্ছিত রাখছি।

ব্যাপকার্থে রবীন্দ্রনাথ তাবৎ বাঙালির গুরু, কিন্তু তিনি আমাদের গুরু শব্দার্থে। এবং সে গুরুর মহিমা দেখে আমরা সবাই স্তম্ভিত হয়েছি। ব্যক্তিগত কথা বলতে বাধো-বাধো ঠেকে কিন্তু এ স্থলে ছাত্রের কর্তব্য সমাধান করার জন্য বলি, শান্তিনিকেতন ছাড়ার পর বার্লিন, প্যারিস, লন্ডন, কাইরো বহু জায়গায় বহু গুরুকে আমি বিদ্যাদান করতে দেখেছি কিন্তু এ গুরুর অলৌকিক ক্ষমতার সঙ্গে কারোরই তুলনা হয় না। কত বৎসর হয়ে গেল, কিন্তু আজও মনের পটের উপর রবীন্দ্রনাথের আঁকা কীটসের 'অটামে'র ছবি তো মুছে গেল না। কীটস হেমন্তের যে ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন তাকে যে আরও বেশি উজ্জ্বল করা যায়, এ কথা তো কেউ সহজে বিশ্বাস করবেন না। ইংরাজিতে প্রবাদ আছে "You do not paint a lily"—তাই মনে প্রশ্ন জাগা অস্বাভাবিক নয় রবীন্দ্রনাথ কীটসের হেমন্ত-লিলিকে মধুরতর প্রিয়তর করতেন কোন জাদুমন্ত্রের জোরে?

তুলনা না দিয়ে কথাটা বোঝাবার উপায় নেই। ইংরিজি কবিতা পড়ার সময় আমাদের সব সময় মনে হয়, ইংরিজি কবিতা যেন রূপকথার ঘুমন্ত সুন্দরী। তার সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করি, কিন্তু তার বাক্য-হাস্য-নৃত্য রস থেকে বঞ্চিত থাকি বলে অভাবটি এতই মর্মন্তুদ হয় যে, শ্যামলী স্থূলাঙ্গী জাগ্রতা গৌড়জনের সঙ্গসুখ তখন অধিকতর কাম্য বলে মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের বর্ণনশৈলী ভানুমতী মন্ত্র দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সৃজনীশক্তি তাঁর সোনার কাঠির পরশ দিয়ে কীটসের হৈমন্তীকে জাগিয়ে দিয়েছিল আমাদের বিদ্যালয়ের নিভৃত কোণে। গুরুদেব কীটসের এক ছত্র কবিতা পড়েন, নিদ্রিতা সুন্দরীকে চোখের সামনে দেখতে পাই। তিনি তাঁর ভাষার সোনার কাঠি ছোঁয়ান, সঙ্গে সঙ্গে হৈমন্তী নয়ন মেলে তাকায়। গুরুদেবের কণ্ঠে প্রাণ প্রতিষ্ঠার মন্ত্র উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, সুন্দরী নৃত্য আরম্ভ করে। গুরুদেব

www.BanglaBook.org

তাঁর বীণার তারে করাঙ্গুলিস্পর্শে ঝঙ্কার তোলেন, সুন্দরী গান গেয়ে ওঠে।

কীটস, শেলি, ব্রাউনিং, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের এ ইন্দ্রজাল কতবার দেখেছি আর ভেবেছি, হায়, এ বর্ণনা যদি কেউ লিখে রাখত তাহলে বাঙালি তো তার রস পেতই, বিলেতের লোকও একদিন ওগুলো অনুবাদ করিয়ে নিয়ে তাদের নিজের কবির কত অনাবিষ্কৃত সৌন্দর্য দেখতে পেত। কিন্তু জানি ভানুমতীর ছবি ফটোগ্রাফে ওঠে না, গুরুদেবের এ বর্ণনা কারো কলম কালিতে ধরা দেয় না। যেটুকু দিয়েছে সেটুকু আছে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের ভাণ্ডারে।

তারপর একদিন বেলজিয়মে থাকার সময় বিলেত যাবার দরকার হল। ইচ্ছে করেই যাওয়াটা পিছিয়ে দিলুম— তখন বসন্ত ঋতু। কীটসের 'হৈমন্তী'র সঙ্গে দেখা হতে অনেক বাকি। সায়েব-মেমসায়েবরা অসময়ে দেখা করেন না।

বিলিতী হৈমন্তীকে দেখে মুগ্ধ হলুম, অস্বীকার করব না। কীটসের ফিরিস্তি মিলিয়ে 'নখশির' বর্ণনা টায়-টায় মিলে গেল, কিন্তু গুরুদেবের হৈমন্তীর সন্ধান পেলুন না। কীটসের সুন্দরীকে বার বার তাকিয়ে দেখি আর মনে হয়, আগের দিনের বেলাভূমিতে কুড়িয়ে-পাওয়া ঝিনুক ঘরের ভিতরে এসে ম্লান হয়ে গিয়েছে। গুরুদেবের গীতিশৈলী পূর্বদিনের সূর্যাস্তের সময় যে লীলাম্বুজ নীলাম্বরের সৃষ্টি করেছিল, যার মাঝখানে এই শক্তিই ইন্দ্রধনু বর্ণচ্ছটা বিচ্ছুরিত করেছিল, গৃহকোণের দৈনন্দিনতার মাঝখানে সে যেন নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছে, 'তুলসীর মূলে' যে 'সুবর্ণ দেউটি' দশদিক উজ্জ্বল করেছিল সেই দেউটি দেবপদস্পর্শলাভ থেকে বঞ্চিত হয়ে ম্লানমুখে আপন দৈন্য প্রকাশ করতে লাগল।

তারপর আরও কয়েক বৎসর কেটে গেল। হঠাৎ একদিন শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীর কাছ থেকে তার পেলুম, জর্মনির মারবুর্গ শহরে গুরুদেব আমাকে ডেকেছেন— জানতেন আমি কাছাকাছি আছি।

মারবুর্গের সে জনসভার বর্ণনা আমি অন্যত্র দিয়েছি। আজ শুধু বলি, গুরুদেব সেদিন যখন 'ঘন ঘন সাপ খেলাবার বাঁশী' বাজালেন তখন মারবুর্গের পরবে জমায়েত তাবৎ জার্মানির 'গুণী-জ্ঞানী মানী তত্ত্ববিদের সেরারা' মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের মত অপলক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। দীর্ঘ এক ঘণ্টাকাল গুরুদেব বক্তৃতা দিলেন,— একটি বারের মত সামান্যতম একটি শব্দও সেই সম্মিলিত যোগসমাধির ধ্যান-ভঙ্গ করল না। আমার মনে হল গুরুদেব যেন কোন এক অজানা মন্ত্রবলে সভাস্থ নরনারীর শ্বাস-প্রশ্বাস পর্যন্ত স্তম্ভন করে দিয়েছেন— ডাইনে বাঁয়ে তার শব্দটুকুও শুনতে পাই নি।

আমার মনে হয়েছিল, সভাগৃহ থেকে বেরুতে গিয়ে দেখব সেই বিপুলকলেবর অট্টালিকা বল্মীকস্তূপে নিরুদ্ধ নীরন্ধ্র হয়ে গিয়েছে।

সেই জনতার মাঝখানেই গুরুদেবকে প্রণাম করলুম— জানি নে তো কখন আবার দেখা হবে। এত সব গুণী-জ্ঞানীর মাঝখানে আমার জন্য কি আর বিশেষ সময় নির্দিষ্ট করা সম্ভবপর হবে? কিন্তু ভুলে গিয়েছিলুম গুরুদেবেরই কবিতা ঃ—

আমার গুরুর পায়ের তলে
শুধুই কি রে মানিক জ্বলে?
চরণে তাঁর লুটিয়ে কাঁদে লক্ষ মাটি ঢেলারে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার গুরুর আসন কাছে
সুবোধ ছেলে কজন আছে
অবোধ জনে কোল দিয়েছেন
তাই আমি তাঁর চেলারে।

বিশাল জনতার উদ্বেলিত প্রশংসা-প্রশস্তি পাওয়ার পরও, আমি যখন প্রণাম করে দাঁড়ালুম, তিনি মৃদুকণ্ঠে শুধালেন, 'কি রকম হল?'

আমি কোনো উত্তর দিই নি।

শহরের উজির-নাজীর-কোটালরা গুরুদেবকে তাঁর হোটেলে পৌঁছে দিলেন। আমি পরে সেখানে গিয়ে শ্রীযুক্ত চক্রবর্তীর কাছ থেকেই বিদায় নিতে চাইলুম। তিনি বললেন, 'সে কি কথা, দেখা করে যান।'

আমি দেখা হবে শুনে খুশি হয়ে বললুম, 'তাহলে আপনি গিয়ে বলুন।'

শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী বললেন, 'সে তো আর পাঁচজনের জন্য। আপনি সোজা গিয়ে নক্ করুন।'

গুরুদেব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তবু হাসিমুখে বসতে বললেন। তারপর ভালো করে তাকিয়ে বললেন, 'এত রোগা হয়ে গিয়েছিস কেন?'

আমি মাথা নীচু করে চুপ করে রইলুম।

কিছু কথাবার্তা হল। আমার লেখাপড়া সম্বন্ধে। যখন উঠলুম তখন বললেন, 'অমিয়কে ডেকে দে তো।'

চক্রবর্তী বলেন। গুরুদেব বললেন, 'অমিয়, একে ভালো করে খাইয়ে দাও।'

জানি পাঠকমণ্ডলী এই তামসিক পরিসমাপ্তিতে ক্ষুব্ধ হবেন। কিন্তু সোক্রাতেসের চোখে যখন মরণের ছায়া ঘনিয়ে এল আর শিষ্যের কানের কাছে চিৎকার করে শুধালেন, 'গুরুদেব, কোনো শেষ আদেশ আছে?'

তখন সোক্রাতেস বললেন, 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে। পরশুদিন যে মুরগিটা খেয়েছিলুম তার দাম দেওয়া হয় নি। দিয়ে দিয়ো।' এই সোক্রাতেসের শেষ কথা।

সব দিকে যাঁর দৃষ্টি তিনিই তো প্রকৃত গুরু এবং তাও মৃত্যুর বহু পূর্বে।

নন্দলালের দেওয়াল-ছবি

তুর্কী-নাচন নাচেন নন্দবাবু
চতুর্দ্দিকে ছেলেরা সব কাবু।
তুলির গুত্তা ডাইনে মারেন, মারেন কভু বাঁয়ে
ঘাড় বাঁকিয়ে, গোঁফ পাকিয়ে, দাঁড়িয়ে এক পায়ে।
অষ্টপ্রহর চর্কীবাজী কীর্তি-মন্দিরে
ছেলেরা সব নন্দলালকে ঘিরে
মাছি যেমন পাকা আমের চতুর্দিকে ফিরে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হচ্ছে 'নটীর পূজা'
রানীর সঙ্গে হল নটীর পূজা নিয়ে যুঝা।
বরাঙ্গনা ভিক্ষু নটীর নৃত্যচ্ছন্দ ধূপ—
তুলির আগুন পরশ পেয়ে নিল আবার সেই অপরূপ রূপ
—বহু যুগের পরে—
চৈত্যভবন ভরে।
গানের আসর পারা
—সন্ধ্যাকাশে ফোটে যেন তারার পরে তারা—
হেথায় সেতার কাঁপে ভীরু, হোথায় বীণার মীড়
আধফোটা গুঞ্জরণের ভিড়
তার পিছনে মৃদু করুণ-বাঁশি
গুমগুমিয়ে থেকে থেকে উঠছে ভেসে খোল-মৃদঙ্গের হাসি।

এ যেন সুন্দরী—
প্রথমেতে নীলাম্বরী পরি,
সর্ব অঙ্গে জড়ায় যেন অলঙ্কারের জাল;—
তিলোত্তমা গড়েন নন্দলাল।
চিত্রপটে কিন্তু নটী ফেলে অলঙ্কার
শুনি যেন বলে চিত্রকার,—
"তথাগতের দয়ায় যেন তেমনি ঘুচে তোমা সবার সকল অহঙ্কার।"

সাদামাটার রক্তবিহীন ঠোঁটে
লজ্জা সোহাগ ফোটে,
পাংশু দেয়াল আনন্দে লাল নন্দলালের লালে
তুলির চুমো যেই না খেলো গালে।*

বড় দিন

বাইবেলে বলা হয়েছে পূব থেকে তিন জন ঋষি প্যালেস্টাইনের জুডেয়া প্রদেশের রাজা হেরোডের কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইহুদিদের নবীন রাজা কোথায় জন্ম নিয়েছেন? আমরা পূর্বাকাশে তাঁর তারা দেখতে পেয়ে তাঁকে পুজো করতে এসেছি।'

সেই তারা-ই তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল বেথলেহেম—যেখানে প্রভু যীশু জন্ম

BanglaBook.org

* শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর বরদারাজ্যের 'কীর্তি-মন্দিরে' রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পূজা'র ফ্রেস্কো ছবি আঁকিবার সময় লেখক কর্তৃক এক বান্ধবীকে আসিয়া দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণপত্র।

www.BanglaBook.org

নিয়েছিলেন। মা মেরী আর তাঁর বাগদত্ত যোসেফ পান্থশালায় স্থান পান নি বলে আশ্রয় নিয়েছিলেন পান্থশালার অশ্বালয়ে। তারই মাঝখানে কুমারী মেরী জন্ম দিলেন এ জগতের নব জন্মদাতা প্রভু যীশুকে।

দেবদূতরা মাঠে গিয়ে রাখাল ছেলেদের সুসংবাদ দিলেন—প্রভু যীশু, ইহুদিদের রাজা জন্ম নিয়েছেন। তারাও এসে দেখে, গাধা-খচ্চর, খড়-বিচুলির মাঝখানে মা-জননীর কোলে শুয়ে আছেন রাজাধিরাজ।

এই ছবিটি এঁকেছেন যুগ যুগ ধরে বহু শিল্পী, বহু কবি, বহু চিত্রকর। নিরাশ্রয়ের ঘরে এসে আশ্রয় নিলেন বিশ্বজনের আশ্রয়-দাতা।

* * *

বাইরের থেকে গম্ভীর গুঞ্জরণ শুনে মনে হল বিদ্যালয়ের ভিতর বুঝি তরুণ সাধকেরা বিদ্যাভ্যাস করছেন। জানা ছিল টোল-মাদ্রাসা নয়, তাই ভিতরে ঢুকে ভিরমি যাই নি।

ক'শ নারী পুরুষ ছিলেন আদম-শুমারী করে দেখি নি। পুরুষদের সবাই পরে এসেছেন ইভ্‌নিং ড্রেস। কালো বনাতের চোস্ত পাতলুন—তার দুদিকে সিল্কের চকচকে দু ফালি পট্টি; কচ্ছপের খোলের মত শক্ত শার্ট, কোণভাঙা কলার—ধবধবে সাদা; বনাতের ওয়েস্ট্ কোট আর কোটের লেপেলে সেই সিল্কের চকচকে ট্যারচা পট্টি; কালো বো ফুটে উঠেছে সাদা শার্ট কলারের উপর—যেন শ্বেত সরোবরে কৃষ্ণা কমলিনী। পায়ে কালো বার্নিশের জুতো—হাতে গেলাস।

কিংবা শার্ক-স্কিনের ধরনের সাদা মসৃণ পাতলুন। গায়ে গলাবন্ধ 'প্রিন্‌স্ কোট'—সিক্‌স্-সিলিন্ডারি অর্থাৎ ছ-বোতামওয়ালা। কারো বোতাম হাইদ্রাবাদী চৌকো, কারো বা বিদরী গোল—কালোর উপরে সাদা কাজ। একজনের বোতামগুলো দেখলুম খাস জাহাঙ্গীর-শাহী মোহরের।—হাতে গেলাস।

তারি মধ্যিখানে বসে আছেন এক খাঁটি বাঙালি নটবর। সে কী মোলায়েম মিহি চুনট-করা শান্তিপুরে ঘি রঙের মেরিনার পাঞ্জাবি আর তার উপরে আড়করা কালো কাশ্মীরী শালে সোনালি জরির কাজ। হীরের আংটি বোতাম ম্যাচ করা, আর মাথায় যা চুল তাকে চুল না বলে কৃষ্ণমুকুট বললেই সে তাজমহলের কদর দেখানো হয়। পায়ে পাম্পসু—হাতে গেলাস।

'দেশসেবক'ও দু'একজন ছিলেন। গায়ে খদ্দর—হাতে? না, হাতে কিচ্ছু না। আমি আবার সব সময় ভালো করে দেখতে পাই নে—বয়স হয়েছে।

কিন্তু এ সব নস্যি। দেখতে হয় মেয়েদের। ব্যাটাছেলেরা যখন মনস্থির করে ফেলেছে, সাঁঝের ঝোঁকে সাদা কালো ভিন্ন অন্য রঙ নিয়ে খেলা দেখাবে না তখন এই দুই স্বর সা আর রে দিয়ে কি ভেল্কিই বা খেলবে?

হোথায় দেখো, আহা-হা-হা। দুধের উপর গোলাপী দিয়ে ময়ূরকণ্ঠী-বাঙ্গালোরী শাড়ি! জরির আঁচল। আর সেই জরির আঁচল দিয়ে ব্লাউজের হাতা। ব্লাউজের বাদ-বাকি দেখা যাচ্ছে না, আছে কি নেই তাই বলতে পারব না। বোধ হয় নেই—না থাকাতেই সৌন্দর্য বেশি। ফরাসীরা কি এ জিনিসকেই বলে 'দোকোল্‌তে'? বুক-পিঠ-কাটা মেমসায়েবদের ইভ্‌নিং ফ্রক এর কাছে লজ্জায় জড়সড়।

ডান হাতে কনুই অবধি সোনার চুড়ি—বাঁ হাতে কবজের মত বাঁধা হোমিওপ্যাথিক রিস্টওয়াচ। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ডিনারের কত বাকি? কটা বেজেছে?' বলেই

www.BanglaBook.org

লজ্জা পেলেন, কারণ ভুলে গিয়েছিলেন নিজের হাতেই বাঁধা রয়েছে ঘড়ি। কিন্তু লাল হলেন না, কারণ রুজ আগে-ভাগেই এত লাল করে রেখেছে যে, আর লাল হবার 'পার্কিঙ-প্লেস' নেই।

হাতে? যান মশাই,—আমার অতশত মনে নেই। হালকা সবুজ জর্জেটের সঙ্গে রক্তে-রাঙা ব্লাউজ। কপালে সবুজ টিপ। শাড়ির সঙ্গে রঙ মিলিয়ে বাঁ হাতে ঝুলছে ব্যাগ, কিন্তু ব্যাগের স্ট্র্যাপটার রঙ মেলানো রয়েছে রক্ত-রাঙা ব্লাউজের সঙ্গে এবং তাকে ফের মেলানো হয়েছে স্যান্ডেলের স্ট্র্যাপের সঙ্গে। আর কোথায় কোথায় মিল অমিল আছে দেখবার পূর্বেই তিনি সরে পড়লেন। ডান হাতে কিছু ছিল? কী মুশকিল!

আরে! মারোয়াড়ি ভদ্রলোকরা কি পার্টিতে মহিলাদের আনতে শুরু করেছেন? কবে থেকে জানতুম না তো।

একদম খাঁটি মারোয়াড়ি শাড়ি। টকটকে লাল রঙ—ছোটো ছোটো বোট্টাদার। বেনারসী র‍্যাপার। সেই কাপড় দিয়েই ব্লাউজ—জরির বোট্টা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সকাল বেলা হাওড়ায় নামলে ব্রিজ পেরিয়ে হামেশাই এ রকম শাড়ি দেখতে পাই—মহিলারা স্নান সেরে ফিরছেন। সেই শাড়ি এখানে? হাতে আবার লাইফ বেল্ট সাইজের কাঁকন।

মাথার দিকে চেয়ে দেখি, না, ইনি মারোয়াড়ি নন। চুলটি গুটিয়েছেন একদম পাকাপোক্ত গ্রেতা গার্বো স্টাইলে। কাঁধের উপর নেতিয়ে পড়ে ডগার দিকে একটুখানি ঢেউখেলানো। শুধু চুলটি দেখলে তামা-তুলসী স্পর্শ করে বলতুম, জীবনের শেষ স্বপ্ন সফল হল—গ্রেতার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে। কিন্তু কেন হেন জঙ্গলি শাড়ির সঙ্গে মডার্ন চুল?

নাসিকাগ্রে মনোনিবেশ করে ধ্যান করে হৃদয়ঙ্গম করলুম তত্ত্বটা। শাড়ি ব্লাউজের কন্‌ট্রাস্ট্ ম্যাচিঙের দিন গেছে। এখন নব নব কন্‌ট্রাস্ট্-এর সন্ধান চলেছে। এ হচ্ছে প্রাচীন পন্থা আর আধুনিক ফ্যাশানের দ্বন্দ্ব। গলার নীচে ত্রয়োদশ শতাব্দী—উপরে বিংশ। প্রাণভরে বাঙালি মেয়ের বুদ্ধির তারিফ করলুম। উচ্চকণ্ঠে করলেও কোনো আপত্তি ছিল না। সে হট্টগোলের ভিতর এটম বমের আওয়াজও শোনা যেত না। কি করে খানার ঘণ্টা শুনতে পেলুম, খোদায় মালুম।

হাওড়া থেকে শেয়ালদা সাইজের খানা-টেবিল। টার্কি পাখিরা রোস্ট হয়ে উর্ধ্বপদী হয়েছেন অন্তত শ'জনা, মুরগী-মুসল্লম অগুনতি, সাদা কেঁচোর মত কিলবিল করছে ইতালির মাক্করোনি হাইনৎসের লাল টমাটো সসের ভিতর, আন্ডার রাশান স্যালাড গায়ে কম্বল জড়িয়েছে প্যোর ব্রিটিশ মায়োনেজের ভিতর, চকলেট রঙের শিককাবাবের উপর আঁকা হয়েছে সাদা পেঁয়াজ-মূলোর আলপনা, গরমমশলার ক্বাথের কাদায় মুখ গুঁজে আছেন রুইমাছের ঝাঁক, ডাঁটার মত আটা আটা এস্‌পেরেগাস টিন থেকে বেরিয়ে শ্যাম্পেনের গন্ধ পেয়ে ফুলে উঠেছে, পোলাওয়ের পিরামিডের উপর সসেজের ডজন ডজন কুতুবমিনার।

কন্‌ট্রাস্ট্, কন্‌ট্রাস্ট্, সবই কন্‌ট্রাস্ট।

প্রভু যীশু জন্ম নিলেন খড়বিচুলির মাঝখানে—আর তার পরব হল শ্যাম্পেনে টার্কিতে!!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাণ্ডা

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

'নামিনু শ্রীধামে। দক্ষিণে বামে পিছনে সমুখে যত
লাগিল পাণ্ডা, নিমেষে প্রাণটা করিল কণ্ঠাগত।'

এর পর পাণ্ডাদের সহৃদয় অত্যাচারের কথা ফলিয়ে বলবার মত সাহস আমাদের মত অর্বাচীন জনের হওয়ার কথা নয়। ওস্তাদরা যখন 'মিয়াকী তোড়ী' অর্থাৎ মেয়া তানসেন রচিত তোড়ী রাগিণী গান তখন গাওয়া আরম্ভ হওয়ার পূর্বে দুহাত দিয়ে দুটি কান ছুঁয়ে নেন। ভাবখানা এই 'হে গুরুদেব, ওস্তাদের ওস্তাদ, যে-গান তুমি গেয়েছ সেটি গাইবার দম্ভ যে আমি প্রকাশ করলুম, তার জন্য আগে-ভাগেই মাপ চাইছি।' সাহিত্যক্ষেত্রে আমাদেরও তাই করা উচিত—মাইকেলও তাই করেছেন। আদি কবির স্মরণে বলেছেন, 'রাজেন্দ্রসঙ্গমে দীন যথা যায় দূর তীর্থদরশনে।' কালিদাসও বলেছেন,—সংস্কৃতটা মনে নেই—'বজ্রমণি ছেদ করার পর সূত্র যেমন অনায়াসে মণির ভিতর দিয়ে চলে যেতে পারে, বাল্মীকির রামায়ণের পর আমার রঘুবংশ ঠিক সেইরূপ।'

শুধু এইটুকু বলে রাখি, পাণ্ডা বলতে ভারতীয় যে মহান জাতের কথা ওঠে তার কোনো জাত নেই। অর্থাৎ শ্রীধামের পাণ্ডা আর আজমীঢ়ের মুসলমান পাণ্ডাতে কোনো পার্থক্য নেই—যাত্রীর প্রাণটা নিমেষে কণ্ঠাগত করবার জন্য এঁদের বজ্রমুষ্টি ভারতের সর্বত্রই এক প্রকার। ভারতের হিন্দু-মুসলমান মিলনের এর চেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ আর কি হতে পারে? কংগ্রেস যদি এঁদের হাতে দেশের ভারটা ছেড়ে দিতেন তবে ভারত ছেদের যে কোনো প্রয়োজন হ'ত না সে বিষয় আমি স্থির-নিশ্চয়। এর জন্য মাত্র একটি প্রমাণ পেশ করছি। উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে সর্বপ্রকারের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ সে কথা সবাই জানেন; কিন্তু এ তথ্যটি কি লক্ষ্য করেছেন যে, শিখরা তীর্থ করবার জন্য দিব্য পাকিস্তান যাচ্ছেন, পাকিস্তানের মুসলমানেরা হিন্দুস্থানের আজমীঢ় আসছেন, পূর্ব-পাঞ্জাবের কাদিয়ান গ্রাম যাচ্ছেন? পাণ্ডার ব্যবসা দুনিয়ার প্রাচীনতম ব্যবসা—ওটাকে নষ্ট করা কংগ্রেস লীগের কর্ম নয়।

সে কথা যাক। আমি বলছিলুম, বিদেশ যাওয়ার পূর্বে আমার বিশ্বাস ছিল পাণ্ডা-জগতের অশোক-স্তম্ভ এবং কুতুবমিনার ভারতীয় হিন্দু এবং মুসলমান পাণ্ডা। জেরুজালেমে গিয়ে সে ভুল ভাঙল।

আমি তীর্থপ্রাণ। অর্থাৎ তীর্থ দেখলেই ফুল চড়াই, 'শীরণী' বিলাই। ভারতীয় তাবৎ তীর্থ যখন নিতান্তই শেষ হয়ে গেল তখন গেলুম জেরুজালেম। ইহুদি, খ্রীষ্টান, মুসলমান এই তিন ধর্মের ত্রিবেণী জেরুজালেমে। বিশ্বপাণ্ডার ইউ.এন. ও. ঐখানেই। সেখান থেকে গেলুম বেৎলেহেম—প্রভু যীশুর জন্মস্থান।

বড়দিনের কয়েক দিন পরে গিয়েছিলুম। জেরুজালেম-বেৎলেহেমের বাস সার্ভিস আমাদের স্টেট বাসের চেয়ে অনেক ভালো (বাসের উপর পলায়মান ব্যাঘ্রের ছবি এঁকে কর্তারা ভালই করেছেন—বাঘ পর্যন্ত ভিড় দেখে ভয়ে পালাচ্ছে)। পকেটে গাইড বুক—পাণ্ডার 'এরজাৎস'—কাঁধে ক্যামেরা—হাতে লাঠি। আধ ঘণ্টার ভিতর বেৎলেহেম গ্রামে নামলুম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভেবেছিলুম, দেখতে পাবো, বাইবেল-বর্ণিত ভাঙাচোরা সরাই আর জরাজীর্ণ আস্তাবল—যেখানে যীশু জন্ম নিয়েছিলেন। সব কপ্পুর। সব কিছু ভেঙেচুরে তার উপর দাঁড়িয়ে এক বিরাট গির্জা।

গির্জাটি প্রিয়দর্শন অস্বীকার করি নে। আর ভিতরে মেঝের উপর যে মোজায়িক বা পাথরে-খচা আলপনা দেখলুম তার সঙ্গে তুলনা দেবার মত রসদৃষ্টি সেন্ট সোফিয়া, সেন্ট পল কোথাও আমি দেখি নি। সে কথা আরেক দিন হবে।

গাইড বুকে লেখা ছিল, গির্জার নিচে ভূগর্ভে এখনো আছে সেই আস্তাবল—যেখানে প্রভু যীশু জন্মগ্রহণ করেন। সেই গহ্বরে ঢুকতে যেতেই দেখি সামনে এক ছ-ফুটি পাণ্ডা। বাবরী চুল, মান-মনোহর গাল-কম্বল দাড়ি, ইয়া গোঁপ, মিশকালো আলখাল্লা, মাথায় চিমনির চোঙার মত টুপি, হাতে মালা—তার এক একটি দানা বেবি সাইজের ফুটবলের মত। পাদ্রী-পাণ্ডার অর্ধ-নারীশ্বর।

গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে শুধাল, 'হোয়াট ল্যান্‌গুইজ্? কেল লাঁগ? বেলশে শপ্রাখে? লিসান এ?'—প্রায় বারোটা ভাষায় জিজ্ঞেস করল আমি কোন্ ভাষা বুঝি।

সবিনয় বললুম, 'হিন্দুস্থানী।'

বলবে, 'দস্ পিয়াস্তর।' অর্থাৎ দশ পিয়াস্তর (প্রায় এক টাকা) দর্শনী দাও।

'দস্' ছাড়া অন্য কোন হিন্দুস্থানী সে জানে না বুঝলুম, কিন্তু তাই বা কি কম? আমি অবাক হয়ে ইংরেজিতে বললুম, 'প্রভু যীশুর জন্মভূমি দেখতে হলে পয়সা দিতে হয়?'

বললে, 'হ্যাঁ।'

অনেক তর্কাতর্কি হল। আমি বুঝিয়ে বললুম, 'আমি ভারতীয়, খ্রীষ্টান নই, তবু সাত-সমুদ্র-তেরো-নদী পেরিয়ে এসেছি সেই মহাপুরুষের জন্মভূমি দেখতে যিনি সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করেছিলেন গরিব-ধনীর তফাত-ফারাক ঘুচিয়ে দেবার জন্য, যিনি বলেছিলেন কেউ কামিজটা চাইলে তাকে জোব্বাটি দিয়ে দেবে—আর তাঁর জন্মভূমি দেখবার জন্য দিতে হবে পয়সা?'

শুধু যে চোরাই ধর্মের কাহিনী শোনে না তা নয়। আমি উলটো পথ নিলুম—পাণ্ডা ফিরে পর্যন্ত তাকাল না।

গাইড বুকে লেখা ছিল, গহ্বরে যাবার দুটি রাস্তা। একটি গ্রীক অর্থডক্স্ প্রতিষ্ঠানের জিম্মায়, অন্যটি রোমান ক্যাথলিকদের। গেলুম সেটির দিকে—গির্জাটি ঘুরে, সেদিকে পৌঁছতে হয়।

এখানে দেখি আরেক পাণ্ডা—যেন পয়লাটার যমজ। বেশভূষায় ঈষৎ পার্থক্য।

পুনরপি সেই সদালাপ। 'ফেলো কড়ি মাখো তেল।' অম্মো না-ছোড়-বন্দা।

দিল-দরাজ, খোলা-হাত পাঠক হয়ত অসহিষ্ণু হয়ে বলবেন, 'তুমি তো আচ্ছা ত্যাঁদোড় বাপু; এত পয়সা খর্চা করে পৌঁছলে মোকামে—এখন দু-পয়সার চাবুক কিনতে চাও না হাজার টাকার ঘোড়া কেনার পর?' তা নয়, আমি দেখতে চাইছিলুম পাণ্ডাদের দৌড়টা কতদূর অবধি।

এবারে হার মানবার পূর্বে শেষ বাণ হানলুম।

বললুম, 'দেশে গিয়ে কাগজে লিখব, রোমান ক্যাথলিক প্রতিষ্ঠান কি রকম প্রভু যীশুর জন্মস্থান ভাঙিয়ে পয়সা কামাচ্ছে। আমাদের দেশেও কমুনিটি আছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলে লাঠিটা বার তিনেক পাথরে ঠুকে ফিরে চললুম ঘোঁত-ঘোঁত করে বাস স্ট্যান্ডের দিকে।

পাণ্ডা ডাকলে, 'শোন।'

আমি বললুম, 'হুঁঃ!'

'তুমি সত্যি এত টাকা খরচ করে এখানে এসে দশ পিয়াস্তরের জন্য তীর্থ না দেখে চলে যাবে?'

'আলবত। প্রভুর জন্মভূমি দেখার জন্য পয়সা দিয়ে প্রভুর স্মৃতির অবমাননা করতে চাই নে।'

খ্যাঁস-খ্যাঁস করে দাড়ি চুলকোল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর ফিস্-ফিস্ করে কানের কাছে মুখ—বোটকা রসুনের গন্ধ—এনে বলল, 'যদি প্রতিজ্ঞা করো কাউকে বলবে না ফ্রী ঢুকতে দিয়েছি, তবে—'

আমি বললুম, 'আচ্ছা, এখানে তোমার ব্যবসা মাটি করব না। কিন্তু দেশে গিয়ে বলতে পারব তো?'

তখন হার মানল। আমরা বহু লঙ্কা জয় করেছি!!

গীতা-রহস্য

গীতার মত ধর্মগ্রন্থ পৃথিবীতে বিরল। তার প্রধান কারণ, গীতা সর্বযুগের সর্ব মানুষকে সব সময়েই কিছু না কিছু দিতে পারে। অধ্যাত্মলোকে চরম সম্পদ পেতে হলে গীতাই অত্যুত্তম পথপ্রদর্শক, আর ঠিক তেমনি ইহলোকের পরম সম্পদ পেতে হলে গীতা যেরকম প্রয়োজনীয় চরিত্র গড়ে দিতে পারে, অন্য কম গ্রন্থেরই সে শক্তি আছে। ঘোর নাস্তিকও গীতাপাঠে উপকৃত হয়। অতি সবিনয়ে নিবেদন করছি, এ কথাগুলো আমি গতানুগতিকভাবে বলছি নে, দেশ-বিদেশে গীতাভক্তদের সাথে একসঙ্গে বসবাস করে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এ বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ়ভূমি নির্মাণ করেছে।

তাই গীতার টীকা রচনা করা কঠিনও বটে, সহজও বটে। সর্বধর্ম সর্বমার্গের সমন্বয় যে গ্রন্থে আছে তার টীকা লেখার মত জ্ঞানবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা অল্প লোকেরই থাকার কথা; আর ঠিক তেমনি প্রত্যেক ব্যক্তিই যখন আপন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কিছু না কিছু সমর্থন গীতাতে পায় তখন তার পক্ষে একমাত্র গীতার টীকা লেখাই সম্ভবপর হয়—একমাত্র গীতাই তখন সে-ব্যক্তির সামান্য অভিজ্ঞতা বিশ্বজনের সম্মুখে রাখবার মত সাহসে প্রলোভিত করতে পারে।

লোকমান্য বালগঙ্গাধর টিলকের 'গীতারহস্য' প্রথম শ্রেণীর টীকা। 'গীতা রহস্যে' লোকমান্যের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিগত অভিমতও আছে বটে, কিন্তু এ গ্রন্থের প্রধান গুণ, তার তুলনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী। এই তুলনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে এবং এই শতকের প্রথম দিকেই সর্বপ্রথম সম্ভবপর হয়,—কারণ তার পূর্বে সর্বধর্মে জ্ঞান আহরণ করতে হলে সর্বভাষা আয়ত্ত করতে হত, এবং সে কর্ম অসাধারণ পণ্ডিতের পক্ষেও

www.BanglaBook.org

অসম্ভব। ঊনবিংশ শতকে নানা ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ হল এবং বিংশ শতকে সমস্ত উপাদান এরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর সুসজ্জিত হয়ে গেল যে, তখনই প্রথম সম্ভবপর হল তুলনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে গীতা বিচার করা।

এ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে দেশে-বিদেশে বহুতর সাধক, গুণীজ্ঞানী গীতাকে কেন্দ্র করে নানা ধর্মালোচনা করেছেন। বাংলা ইংরেজি এই দুই ভাষাতেই গীতা সম্বন্ধে এত পুস্তক জমে উঠেছে যে, তাই পড়ে শেষ করা যায় না। ভারতবর্ষীয় অন্যান্য ভাষা, ফরাসী এবং বিশেষ করে জর্মনে গীতা সম্বন্ধে আমরা বহু উত্তম গ্রন্থ দেখেছি।

তৎসত্ত্বেও বলতে বাধ্য, লোকমান্যের গ্রন্থখানি অনন্যসাধারণ। এ পুস্তক লোকমান্য মান্ডালে জেলে বসে মারাঠী ভাষায় লেখেন।

"অনুবাদ সাহিত্য" প্রবন্ধ লেখার সময় আমি এই পুস্তকখানার প্রতি ইঙ্গিত করেছিলুম। স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এ পুস্তকখানির অনবদ্য অনুবাদ বাংলা ভাষায় করে দিয়ে গিয়ে গৌড়জনের চিরকৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়ে গিয়েছে। এ অনুবাদের সঙ্গে করুণ রসও মিশ্রিত আছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলি,—

'লোকমান্য বালগঙ্গাধর টিলক তাঁহার প্রণীত 'গীতা-রহস্য' বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিবার ভার আমার প্রতি অর্পণ করিয়া আমাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তাঁহার অনুরোধক্রমে, বঙ্গবাসীর কল্যাণ কামনায় বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে,—অতীব দুরূহ ও শ্রমসাধ্য হইলেও আমি এই গুরুভার স্বেচ্ছাপূর্বক গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমি অনুবাদ শেষ করিয়া উহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ক্রমশ প্রকাশ করিতেছিলাম। ভগবানের কৃপায়, এতদিন পরে উহা গ্রন্থাকারেও প্রকাশ করিয়া আমার এই কঠিন ব্রত উপ্‌যাপন করিতে সমর্থ হইয়াছি।'

তারপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যা বলেছেন, পাঠকের দৃষ্টি আমি সেদিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করতে চাই ঃ—

'কেবল একটি আক্ষেপ রহিয়া গেল—এই অনুবাদ গ্রন্থখানি মহাত্মা টিলকের করকমলে স্বহস্তে সমর্পণ করিতে পারিলাম না। তাহার পূর্বেই তিনি ভারতবাসীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া দিব্যধামে চলিয়া গেলেন।'

যতবার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদখানা হাতে নিই ততবারই আমার মন গভীর বিস্ময়ে ভরে ওঠে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাংলা অনুবাদ ৮৭২ পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ। এই অনুবাদ কর্ম প্রায় ষাট বৎসর বয়সে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আরম্ভ করেন। যৌবনে তিনি বড় ভাই সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে যখন মহারাষ্ট্রে ছিলেন তখন মারাঠী শিখেছিলেন এবং ততদিনে নিশ্চয়ই সে ভাষার অনেকখানি ভুলে গিয়েছিলেন—রাঁচীতে বসবাস করে দূর মারাঠা দেশের সঙ্গে সাহিত্যিক কেন, কোনো প্রকারের যোগ রাখাই কঠিন। তাই ধরে নিচ্ছি, সেই বৃদ্ধ বয়সে তিনি নূতন করে মারাঠী শিখে প্রায় তিন লক্ষ মারাঠী শব্দ বাংলায় অনুবাদ করেছেন, মাসের পর মাস তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তার প্রকাশের তত্ত্বাবধান করেছেন, এবং সর্বশেষে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছেন। ভূমিকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখেছেন,—

'গ্রন্থের প্রুফ সংশোধনে আদি-ব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।'

অর্থাৎ প্রুফ দেখার ভারও আসলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উপরেই ছিল।

www.BanglaBook.org

তাই বিস্ময় মানি যে, এই হিমালয় উত্তোলন করার পর যখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখলেন লোকমান্য ইহলোকে নেই তখন তিনি সেই শোক প্রকাশ করলেন, 'কেবল একটি আক্ষেপ রহিয়া গেল' বলে। এ শোক, এ আক্ষেপ প্রকাশ করার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভাণ্ডারে কি ভাষা, বর্ণনশৈলী, ব্যঞ্জনা-নৈপুণ্য ছিল না? মৃচ্ছকটিকা, রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা, নীলপাখি অনুবাদ করার পরও কি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে করুণ রস প্রকাশ করার ক্ষমতা অলব্ধ ছিল?

তাই মনে হয়, যিনি বহু রসের সাধনা আজীবন করেছেন, বৃদ্ধ বয়সে সর্বরস মিলে গিয়ে তাঁর মনে এক অনির্বচনীয় সামঞ্জস্যের অভূতপূর্ব শান্তি এনে দেয়। অথবা কি দীর্ঘ দিনযামিনী গীতার আসঙ্গ লাভ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেই বৈরাগ্যবিজয়ী কর্মযোগে দীক্ষা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, যেখানে মানুষ কর্ম করে অনাসক্ত হয়ে কেবলমাত্র বিশ্বজনের উপকারার্থে? তাই মনে হয়, সাধনার উচ্চমত স্তরে উত্তীর্ণ হয়েও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্পর্শকাতরতা লোপ পায় নি—লোকমান্যকে সম্পূর্ণ পুস্তক স্বহস্তে নিবেদন করতে পারেন নি বলে ব্যথিত হয়েছিলেন। কিন্তু সে বেদনা প্রকাশ করেছেন শোকে আতুর না হয়ে, গাম্ভীর্য এবং শান্তরসে সমাহিত হয়ে।

কিন্তু এ সব কথা বলা আমার প্রধান উদ্দেশ্য নয়। আমার ইচ্ছা বাঙালি যেন এ অনুবাদখানা পড়ে, কারণ লোকমান্য রচিত 'গীতা-রহস্যে'র ইংরেজি অনুবাদখানা অতি নিকৃষ্ট। যেমন তার ভাষা খারাপ, তেমনি মূলের কিছুমাত্র সৌন্দর্য কণামাত্র গাম্ভীর্য সে অনুবাদে স্থান পায় নি। অথচ বাংলা অনুবাদে, আবার জোর দিয়ে বলি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাংলা অনুবাদে, মূলের কিছুমাত্র সম্পদ নষ্ট হয় নি, মূল মারাঠী পড়ে মহারাষ্ট্রবাসী যে বিস্ময়ে অভিভূত হয়, অনুবাদ পড়ে বাঙালিও সেই রসে নিমজ্জিত হয়।

কিন্তু অতিশয় শোকের কথা—এ অনুবাদ গত আট বৎসর ধরে বাজারে আর পাওয়া যায় না। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হওয়ার পর এ পুস্তকের আর পুনর্মুদ্রণ হয় নি। আমার আন্তরিক ইচ্ছা কোনো উদ্যোগী বাঙালি প্রকাশক যেন পুনার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে এ পুস্তক পুনরায় প্রকাশ করেন।

আমার কাছে যে অনুবাদখানি রয়েছে তাতে লেখা আছে ঃ—

All rights reserved by
Messrs, R. B. Tilak and S. B. Tilak,
568 Narayan Peth, Poona City. *

বন

পশ্চিম-জর্মনীর রাজধানী বনবাসী হতে চলেছেন শুনে পাঠক যেন বিচলিত না হন। এ 'বনে'র উচ্চারণ 'ঘরে'র মত। বাংলা উচ্চারণের অলিখিত আইন অনুযায়ী 'ন' অথবা 'ণ' পরে থাকিলে একমাত্রিক শব্দে 'অ'-কারটি 'ও'-কারে পরিণত হয়। যথা—মন, বন

* সম্প্রতি খবর এসেছে, বিশ্বভারতীতে পুস্তকখানি পাওয়া যাচ্ছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উচ্চারিত হয় মোন বোন—ইত্যাদি রূপে। কিন্তু এই জর্মন Bonn শব্দের উচ্চারণে 'ব'য়ের স্বরবর্ণটি 'ঘ'রের অ-কারের মত উচ্চারিত হয়। তাই পরাধীন জর্মনী আজ বনে রাজধানী পেয়ে যেন ঘর পেয়েছে একথা অনায়াসে বলা যায়।

কাগজে বেরিয়েছে বনের লোকসংখ্যা এক লক্ষ। আমাদের দেশে যেমন বলা হয়, পাঁচ বৎসর লালন করবে, দশ বৎসর তাড়না করবে এবং ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করলে পুত্রের সঙ্গে মিত্রের ন্যায় আচরণ করবে, জর্মনীতে ঠিক তেমনি আইন, কোনো শহরের লোকসংখ্যা যদি একলক্ষে পৌঁছে যায় তবে তিনি সাবালক হয়ে গেলেন, তাঁকে তখন 'গ্রোস-স্টাট্' বা বিরাট নগররূপে আদর-কদর করে বার্লিন ম্যুনিক কলোন হামবুর্গের সঙ্গে একাসনে বসাতে হবে। অর্থাৎ মার্কিন ইংরেজ কর্তাদের মতে বন বিরাট নগর এবং জর্মনীর রাজধানী তাঁরা বিরাট নগরেই স্থাপনা করেছেন।

কিন্তু এই কেঁদে ককিয়ে টায়ে-টায়ে এক-লক্ষী শহরেই রাজধানী কেন করতে হল? আমি বন শহরে বহু কর্মক্লান্ত দিবস এবং ততোধিক বিনিদ্র যামিনী যাপন করেছি। বনের হাড়হদ্দ আমি বিলক্ষণ জানি। তার লোকসংখ্যা কি কৌশলে ১৯৩৮ সালে এক লক্ষ করা হয়েছিল সেও আমার অজানা নয়। একলক্ষী হয়ে সাবালকত্ব পাবার জন্য বন কায়দা করে পাশের একখানা গ্রামকে আদমশুমারীর সময় আপন কণ্ঠে জড়িয়ে নিয়েছিল—যদিও সে গ্রামটি বনের উপকণ্ঠে অবস্থিত নয়, দুয়ের মাঝখানে বিস্তর যব-গমের তেপান্তরী ক্ষেত।

আসল তত্ত্ব হচ্ছে বন রুশ সীমান্ত থেকে অনেক দূরে। মার্কিন ইংরেজ ধরে নিয়েছে আসছে লড়াই-এ জর্মনী রুশের বিরুদ্ধে লড়বে এবং তখন রাজধানী যদি রুশ সীমান্তের কাছে থাকে, তবে তাতে মেলা অসুবিধা—প্যারিস ফ্রান্সের উত্তর সীমান্তে থাকায় তাকে যেমন প্রতিবারেই মার খেতে হয়, বেড়ালের মত রাজধানীর বাচ্চা নিয়ে কখনো লিয়োঁ কখনো ভিশিময় ঘুরে বেড়াতে হয়।

কিন্তু বনে রাজধানী নির্মাণে আরেকটি মারাত্মক তথ্য আবিষ্কৃত হয়ে গেল। বেলজিয়ম যে রকম প্রতিবার জর্মনীকে ঠেকাতে গিয়ে বেধড়ক মার খেয়েছে, এবার জর্মনী রুশকে ঠেকাতে গিয়ে সেইরকম ধারাই মার খাবে। বার্লিন গেছে, ফ্রাঙ্কফুর্ট যাবে, বনও বাঁচবে না।

কিন্তু থাক এসব রসকষহীন রাজনীতি চর্চা। বরঞ্চ এসো সহৃদয় পাঠক, তোমাকে বনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

এপারে বন, ওপারে 'সিবেন গেবির্গে' অর্থাৎ সপ্তশ্রীলাচল। মাঝখানে রাইন্ নদী। সে নদীর বুকের উপর দিয়ে জাহাজ চড়ার জন্য প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক তামাম ইউরোপ আমেরিকা থেকে জড়ো হয়। নদীটি এঁকে বেঁকে গিয়েছে, দুদিকে সমতল জমির উপর গম-যবের ক্ষেত, মাঝে মাঝে ছবির মত ঝকঝকে তকতকে ছোট্ট ছোট্ট ঘরবাড়ি, সমতল জমির পিছনে দু সারি পাহাড় নদীর সঙ্গে সঙ্গে এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছে—মেঘমাশ্লিষ্টসানুং।

আর বন শহরের ভিতরটাও বড় মনোরম। বার্লিনের মত ওঁওড়া রাস্তা নেই, পাঁচতলা বাড়িও নেই। মোটরের গাঁক-গাঁকও নেই। আছে কাশী আগ্রার মত ছোট ছোট গলিঘুঁচি, ছোট্ট ছোট্ট বাড়ি-ঘর-দোর, ঘুমন্ত কাফে, অর্ধ-জাগ্রত রেস্তোরাঁ। আর বিশাল বিরাটবিপুল কলেবর আধখানা শহর জুড়ে ভুবনবিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়েই জর্মনীতে প্রথম সংস্কৃত চর্চা আরম্ভ হয়। হেরমান য়াকোবি এখানেই অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর শিষ্য কির্ফেল এখনো সেখানে সংস্কৃত পড়ান। পুরাণ সম্বন্ধে তাঁর মোটা কেতাবখানার তর্জমা

www.BanglaBook.org

ইংরেজিতে এখনো হয় নি। কির্ফেলের সতীর্থ অধ্যাপক লশ উপনিষদ নিয়ে বছর বিশেক ধরে পড়ে আছেন। তাঁর সুহৃদ্ রুবেনসের শরীরে ঈষৎ ইহুদি রক্ত ছিল বলে তিনি জর্মনী ছাড়তে বাধ্য হন। উপস্থিত তিনি তুর্কীর আঙ্কারা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়ান। বহুকাল ধরে রামায়ণখানা কামড়ে ধরে পড়ে আছেন—প্রামাণিক পুস্তক লেখবার বাসনায়।*

আর রাইনের ওয়াইনের প্রশংসা করার দায় তো আমার উপর নয়। ফ্রান্সের বর্দো বার্গেন্ডির সঙ্গে সে কাঁধ মিলিয়ে চলে।

আমি যখন প্রথম দিন আমার অধ্যাপকের সঙ্গে লেখাপড়া সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলুম, তখন তিনি ভূরি-ভূরি খাঁটি তত্ত্বকথা বলার পর বললেন ঃ

'এখানে ফুল প্রচুর পরিমাণে ফোটে, তরুণীরা সহৃদয়া এবং ওয়াইন সস্তা। বুঝতে পারছেন, আজ পর্যন্ত আমার কোনো শিষ্যেরই বদনাম হয় নি যে নিছক পড়াশুনো করে সে স্বাস্থ্যভঙ্গ করেছে। আপনিই বা কেন করতে যাবেন?'

রাজধানী ঠিক মোকামেই থানা গাড়লো!

'নেভা'র রাধা

অনেক প্রেমের কাহিনী পড়েছি, এমন সব দেশে বহু বৎসর কাটিয়েছি যেখানে প্রেমে না পড়াতেই ব্যত্যয়—তাই চোখের সামনে দেখেছি প্রেমের নিত্য নব প্যাটার্ন—কিন্তু একটা গল্প আমি কিছুতেই ভুলতে পারি নে। তার প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে গল্পটি বলেছেন ওস্তাদ তুর্গেনিয়েফ। এবং শুধু তাই নয়—ঘটনাটি তাঁর নিজের জীবনে সত্য সত্যই ঘটেছিল।

দস্তয়েফস্কি, তলস্তয়ের সৃজনীশক্তি তুর্গেনিয়েফের চেয়ে অনেক উঁচুদরের, কিন্তু তুর্গেনিয়েফ যে স্বচ্ছসলিল ভঙ্গিতে গল্প বলতে পারতেন, সেরকম কৃতিত্ব বিশ্বসাহিত্যে দেখাতে পেরেছেন অতি অল্প ওস্তাদই। তুর্গেনিয়েফের শৈলীর প্রশংসা করতে গিয়ে এক রুশ সমঝদার বলেছেন, 'তাঁর শৈলী যেন বোতল থেকে তেল ঢালা হচ্ছে—ইট ফ্লোজ্ লাইক্ অয়েল।'

তুর্গেনিয়েফ ছিলেন খানদানী ঘরের ছেলে—তলস্তয়েরই মত। ওরকম সুপুরুষও নাকি মস্কো, পিটার্সবুর্গে কম জন্মেছেন। কৈশোরে তাঁর একবার শক্ত অসুখ হয়। সেরে ওঠবার পর ডাক্তার তাঁকে হুকুম দেন নেভা নদীর পারে কোনো জায়গায় গিয়ে কিছুদিন নির্জনে থাকতে। নেভার পারে এক জেলেদের গ্রামে তুর্গেনিয়েফ পরিবারের জমিদারি ছিল। গ্রামের এক প্রান্তে জমিদারের একখানি ছোট্ট বাঙলো—চাকর-বাকর নিয়ে ছোকরা তুর্গেনিয়েফ বাঙলোয় গিয়ে উঠলেন।

সেই ছবিটি আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই। জমিদারের ছেলে, চেহারাটি

---

* হালে খবর পেয়েছি তিনি রুশদেশে গিয়ে সেখান থেকে রামায়ণের প্রামাণিক পাঠ প্রকাশ করেছেন।

www.BanglaBook.org

চমৎকার আর অসুখ থেকে উঠে সে চেহারাটি দেখাচ্ছে করুণ, উদাস-উদাস, বেদনাতুর। তার উপর তুর্গেনিয়েফ ছিলেন মুখচোরা এবং লাজুক, আচরণে অতিশয় ভদ্র এবং নম্র। আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই, গ্রামে হুলস্থুল পড়ে গিয়েছে—জেলে-মেয়েরা দূর থেকে আড়নয়নে দেখছে তুর্গনিয়েফ মাথা নিচু করে, দুহাত পিছনে একজোড় করে নদীর পারে পাইচারি করছেন। জরাজীর্ণ গ্রামে হঠাৎ যেন দেবদূত নেমে এসেছেন।

মেয়েরা জানে এরকম খানদানী ঘরের ছেলে তাদের কারো দিকে ফিরেও তাকাবে না, কিন্তু তা হলে কি হয়, তরুণ হৃদয় অসম্ভব বলে কোনো জিনিস বিশ্বাস করে না। সে রববারে জেলে-তরুণীরা গির্জায় গেল দুরুদুরু বুক নিয়ে—বড়দিনের ফ্রক-ব্লাউজ পরে।

তরুণীদের হৃদয় ভুল বলে নি। অসম্ভব সম্ভব হল। তুর্গেনিয়েফ মেয়েদের দিকে তাকালেন। তাঁর মনও চঞ্চল হল।

তুর্গেনিয়েফ পষ্টাপষ্টি বলেন নি, কিন্তু আমার মনে হয় মস্কো পিটার্সবুর্গের রঙ-মাখানো গয়না-চাপানো লোক-দেখানো সুন্দরীদের নখরা-ককেট্রি তাঁর মন বিতৃষ্ণায় ভরে দিয়েছিল বলে তিনি জেলে-গ্রামের অনাড়ম্বর সরল সৌন্দর্যের সামনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। আমার মনে হয়, তুর্গেনিয়েফের কবিহৃদয় অতি সহজেই হীরার ফুল অনাদর করে বুনো ফুল আপন বুকে গুঁজে নিয়েছিল।

কিন্তু আশ্চর্য, গ্রামের সুন্দরীদের পয়লানম্বরি কাউকে তিনি বেছে নিলেন না। এই উল্টো স্বয়ম্বরে যাকে তিনি হৃদয় দিলেন সে স্বপ্নেও আশা করতে পারে নি, এই প্রিয়দর্শন তরুণটি সুন্দরীদের অবহেলা করে তাকেই নেবে বেছে। সত্য বটে মেয়েটি কুৎসিত ছিল না, এবং তার স্বাস্থ্যও ছিল ভালো; কিন্তু তাই দিয়ে তো আর প্রেমের প্রহেলিকার সমাধান হয় না।

মেয়েটির মনে যে কী আনন্দ, কী গর্ব হয়েছিল সেটা কল্পনা করতে আমার বড় ভালো লাগে। তুর্গেনিয়েফ তার অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন—নিজের জীবনে ঘটেছিল বলে হয়ত তিনি এ ঘটনাটিকে বিনা অলঙ্কারে বর্ণনা করেছেন। আমার কিন্তু ভারি ইচ্ছে হয়, মেয়েটির লজ্জা-মেশানো গর্ব যদি আরো ভালো করে জানতে পারতুম—তুর্গেনিয়েফ যদি আরো একটুখানি ভালো করে তাঁর হৃদয়ের খবরটি আমাদের দিতেন।

শুধু এইটুকু জানি মেয়েটি দেমাক করে নি। ইভানকে পেয়ে সে যে-লোকে উঠে গিয়েছিল সেখানে তো দেমাক দম্ভের কথাই উঠতে পারে না। আর তুর্গেনিয়েফ হিংসা, ঈর্ষা থেকে মেয়েটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন অন্য মেয়েদের সঙ্গে অতি ভদ্র মিষ্টি আচরণ দিয়ে—কোনো জমিদারের ছেলে নাকি ওরকমধারা মাথা থেকে হ্যাট তুলে নিচু হয়ে জেলেনীদের কখনো নমস্কার করেনি।

কৈশোরের সেই অনাবিল প্রেম কিরূপে আস্তে আস্তে তার বিকাশ পেয়েছিল, তুর্গেনিয়েফ তার সবিস্তার বর্ণনা দেন নি—তাই নিয়ে আমার শোকের অন্ত নেই।

দুজনে দেখা হত। হাতে হাত রেখে তারা নদীর ওপারের ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকত। চাঁদ উঠত। সন্ধ্যার ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে আরম্ভ করলে তুর্গেনিয়েফ তাঁর ওভারকোট দিয়ে মেয়েটিকে জড়িয়ে দিতেন। সে হয়ত মৃদু আপত্তি করত—কিন্তু নিশ্চয়ই জানি ইভানের কোনো ইচ্ছায় সে বেশিক্ষণ বাধা দিতে পারত না।

তুর্গেনিয়েফ সম্পূর্ণ সেরে উঠেছেন। বাড়ি থেকে হুকুম এসেছে প্যারিস যেতে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিদায়ের শেষ সন্ধ্যা এল। কাজ সেরে মেয়েটি যখন ছুটে এল ইভানের কাছ থেকে বিদায় নিতে, তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

অঝোরে নীরবে কেঁদেছিল শুধু মেয়েটি। তুর্গেনিয়েফ বারে বারে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন 'তুমি এরকম ধারা কাঁদছো কেন? আমি তো আবার ফিরে আসব—শিগগিরই। তোমার কান্না দেখে মনে হচ্ছে, তুমি ভাবছ, আমি আর কখনও ফিরে আসব না।'

কিন্তু হায়, এসব কথায় কি ভাঙা বুক সান্ত্বনা মানে? জানি, তুর্গেনিয়েফের তখনো বিশ্বাস ছিল তিনি ফিরে আসবেন, কিন্তু যে ভালোবেসেছে সমস্ত সত্তা সর্বৈব অস্তিত্ব দিয়ে তার হৃদয় তো তখন ভবিষ্যৎ দেখতে পায়—বিধাতা পুরুষেরই মত।

তুর্গেনিয়েফ বললেন, 'তোমার জন্য প্যারিস থেকে কি নিয়ে আসব?'

কোনো উত্তর নেই।

'বল কি নিয়ে আসব?'

'কিচ্ছু না—শুধু তুমি ফিরে এসো।'

'কিছু না? সে কি কথা? আর সবাই তো এটা, ওটা, সেটা চেয়েছে। এই দেখো, আমি নোটবুকে সব কিছু টুকে নিয়েছি। কিন্তু তোমার জন্য সব চেয়ে ভালো, সব চেয়ে দামী জিনিস আনতে চাই। বলো কি আনব?'

'কিচ্ছু না।'

তুর্গেনিয়েফকে অনেকক্ষণ ধরে পীড়াপীড়ি করতে হয়েছিল, মেয়েটির কাছ থেকে কোন একটা কিছু একটার ফরমাইশ বের করতে। শেষটায় সে বললে, 'তবে আমার জন্য সুগন্ধি সাবান নিয়ে এসো।'

তুর্গেনিয়েফ তো অবাক। 'এই সামান্য জিনিস! কিন্তু কেন বলো তো, তোমার আজ সাবানে শখ গেল? কই তুমি তো কখনো পাউডার সাবানের জন্য এতটুকু মায়া দেখাও নি—তুমি তো সাজগোজ করতে পছন্দ কর না।'

নিরুত্তর।

'বলো।'

'তা হলে আনবার দরকার নেই।' তারপর ইভানের কোলে মাথা রেখে কেঁদে বলল, 'ওগো, শুধু তুমি ফিরে এসো।'

'আমি নিশ্চয়ই সাবান নিয়ে আসব। কিন্তু বল, তুমি কেন সুগন্ধি সাবান চাইলে?'

কোলে মাথা গুঁজে মেয়েটি বলল, 'তুমি আমার হাতে চুমো খেতে ভালোবাসো আমি জানি। আর আমার হাতে লেগে থাকে সব সময় মাছের আঁশটে গন্ধ। কিছুতেই ছাড়াতে পারি নে। প্যারিসের সুগন্ধি সাবানে শুনেছি সব গন্ধ কেটে যায়। তখন চুমো খেতে তোমার গন্ধ লাগবে না।'

অদৃষ্ট তুর্গেনিয়েফকে সে গ্রামে ফেরবার অনুমতি দেন নি।

সে দুঃখ তুর্গেনিয়েফও বুড়ো বয়স পর্যন্ত ভুলতে পারেন নি॥

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বর্বর জর্মন

ন্যুরন্‌বের্গের মকদ্দমা এগিয়ে চলেছে, চতুর্দিকে আটঘাট বেঁধে তরিবত করে তামাম দুনিয়ায় ঢাকঢোল বাজিয়ে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ওঃ, কী বাঁচনটাই না বেঁচে গেছে! এয়সা দুশমনের জাত যদি লড়াই জিতত, তা হলে তোমাদের দমটি পর্যন্ত ফেলতে দিত না। ভাগ্যিস আমরা ছিলাম, বাঁচিয়ে দিলাম।

বিলেতী কাগজগুলো যে দাপাদাপি করে, তাতে আশ্চর্য হবার বিশেষ কিছু নেই। তারা মার খেয়েছে, এখন শুধু মার দিয়েই খুশি হবে না, হরেক রকমে দুশমনকে অপমান করবে, তাতে ডবল সুখ; সে-সব কথা সবাইকে ইনিয়ে-বিনিয়ে শোনাবে, তাতে তেহাই সুখ; তারপর দেশটার কলকব্জা অর্থাৎ তার জিগর-কলিজা, নাড়িভুঁড়ি বিনা ক্লোরফর্মে টেনে টেনে বের করে তাকে আচ্ছা করে বুঝিয়ে দেবে, বেলজেন কাকে বলে।

কিন্তু এ দেশের ইংরেজি কাগজগুলো যখন ফেউ লাগে, তখন আর বরদাস্ত হয় না। ছিলি তো বাবা যুদ্ধের বাজারে বেশ, না হয় স্কচ না খেয়ে সোলান খেয়েছিস, না হয় এসপেরেগাস আরটিচোক খেতে পাস নি, না হয় তুলতুলে ফ্ল্যানেল আর নানা রকমের হ্যাট ও ক্যাপ পাস নি বলে সর্দি ও গর্মির ভয়ে একটুখানি পা সামলে চলেছিলি, তাই বলে যা বুঝিস নে, মালুম নেই, তা নিয়ে এত চেল্লাচেল্লি করিস কেন? টু পাইস তো করেছিস, সে কথাটা ভুলে যাস কেন, তাই নিয়ে দেশে যা, দুদিন ফুর্তি কর, যে জায়গা নাগাল পাস নে, সেখানে চুলকোতে যাস নি। কিন্তু শোনে কে! সেই জিগির—জর্মন বর্বর, 'বশ', 'হান'!

পরশুদিন জর্মন বর্বরতার প্রমাণ পেলুম, পুরনো বইয়ের দোকানে—একখানা কেতাব, আজকালকার জলের চেয়েও সস্তা দরে কিনলাম। তার নামধাম—

BENGALISCHE ERZAEHLER / DER SIEG DER SEELE / AUS DEM INDISCEHN / INS DEUTSCH UEBERTAGEN / VON/REINHARDT WAGNER /

অর্থাৎ 'বাঙালি কথক'। (Erzaehler ধাতুর অর্থ কাহিনী বলা) 'আত্মার জয়, ভারতীয় ভাষা হইতে জর্মনে রাইনহার্ট ভাগনার কর্তৃক অনুদিত।'

চমৎকার লাল মলাটের উপর সোনালী লাইনে একটি অজন্তা ঢঙের সুন্দরী বাঁশি বাজাচ্ছে। ছবিখানি এঁকেছেন, কেউ-কেটা নয়, স্বয়ং অধ্যাপক এড্‌মুন্‌ড্‌শেফার।

কেতাবখানা যত্রতত্র বিক্রির জন্য পাওয়া যাবে না—এস্তেহার রয়েছে। 'ব্যুশারফ্রয়েন্ডে' সংঘের সভ্যরা কিনতে পাবেন। বর্বর জর্মন বটতলা ছাপিয়ে, পেঙ্গুইন বেচে পয়সা করতে চায় না, তার বিশ্বাস—দেশে যথেষ্ট সত্যিকারের রসিক পাঠক আছে, তারা সংঘের সদস্য হয়ে বাছা বাছা বই কিনবে। আর যদি তেমনটা নাই হয়, হল না, চুকে গেল—বাংলা কথা।

'বাংলা কথা' ইচ্ছে করেই বললাম, কারণ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ভাগনার সাহেব খাসা বাংলা জানেন। প্রথম আলাপে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মহাশয় কোন্ ভাষার অধ্যাপক?

বাংলার।

বাংলার? বার্লিন ইউনিভার্সিটিতে?

আজ্ঞে।

ছাত্র কটি?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেল পাঁচবছরের হিসেব নিলে গড়পড়তা ৩/৫।

গর্বে আমার বুক ফুলে উঠল। আমি যে ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি, সেখানে ফি-ক্লাসে নিদেনপক্ষে দেড়শটা বাঁদর ঝামেলা লাগাত। আদর্শ ছিল—৩০০ আপন ওয়ান প্রফেসারের। বললাম, ৩/৫ একটু কম নয়?

ভাগনার বিরক্ত হয়ে বললেন, রবিবাবুর লেখা পড়েন নি—The rose which is single need not envy the thorns which are many ?

উঠে গিয়ে ধনধান্যে পুষ্পে ভরা রেকর্ডখানি লাগালেন। ভাব হয়ে গেল। কিন্তু মনে মনে বললাম, 'কুল্লে ৩/৫-এর জন্যে একটা আস্ত প্রফেসার। জর্মনরা বর্বর।

অবতরণিকাটি ভাগনার সাহেব নিজেই লিখেছেন; আগাগোড়া তর্জমা করে দিলুম।

'সঙ্কলনটি আরম্ভ স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ গদ্য রচনাগুলোকে বাংলার tschota galpa (ছোট গল্প) বলা হয়। ছোট গল্পগুলোকে এক রকমের ছোটখাটো উপন্যাস বলা যেতে পারে; শুধু নায়কনায়িকার সংখ্যা কম। গল্পগুলোর কাঠামো পশ্চিম থেকে নেওয়া হয়েছে, ভিতরকার প্রাণবস্তু কিন্তু খাঁটি ভারতীয়। মাঝে মাঝে দেখা যায় সমস্ত গল্পটার আবহাওয়া একটিমাত্র মূল সুরের চতুর্দিকে গড়া। কতকগুলো আবার গীতিরসে ভেজানো। আবার এও দেখা যায়, ভারতবাসীর ধর্ম তার আচার-ব্যবহারের সঙ্গে এমনই বাঁধা যে গল্পের বিকাশ ও সমস্যা সমাধান এমন সব কারণের উপর নির্ভর করে, যেগুলো পশ্চিমে নভেলে থাকে না। আশা-নিরাশার দোলা-খাওয়া কাতর হৃদয় এই সব গল্প কখনও বা ধর্মের কঠিন কঠোর আচারের সঙ্গে আঘাত খেয়ে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে, কখনও বা তার ছোট গণ্ডির ভিতর শান্তি খুঁজে পায়; সেই ধুকধুক হৃদয়ের কঠোর দুঃখ, চরম শান্তির বর্ণনা করা হয়েছে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। আন্দ্রেয়াস হয়েসলারের সঙ্গে আমরা সুর মিলিয়ে বলতে পারি, "মানুষের আত্মার ভাঁজে ভাঁজে যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি।"

'ভারতীয়দের প্রেম বড় উদার, তাতে গণিকারও স্থান আছে। গণিকাদের কেউ কেউ আবার জন্মেছে বেশ্যার ঘরে, বদ খেয়ালে বেশ্যা হয় নি। গ্যেটের গণিকাকে ভগবান অবহেলা করেন নি, এঁদেরও হয়তো অবহেলা করবেন না।

'সঙ্কলনটি সুখে-দুঃখের গল্পেই ভর্তি করা হয়েছে; হাস্যরসের গল্প নিতান্ত কম দেওয়া হয়েছে। তার কারণও আছে, দুঃখ-যন্ত্রণা সব দেশের সব মানুষেরই এক রকম, কিন্তু হাস্যরস প্রত্যেক জাতিরই কিছু না কিছু ভিন্ন প্রকৃতির। করুণ রসে মানুষ মানুষকে কাছে টানে, হাস্যরস আলাদা করে। তবু তিনটি হাস্যরসের গল্প দেওয়া হল; হয়তো পশ্চিম দেশবাসীরা সেগুলোতে আনন্দ পাবেন।

'বিশ্বসাহিত্যের সেবা যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে সব চেয়ে ভাল রচনা বাদ দেওয়া অন্যায়। কাজেই রবীন্দ্রনাথকে বাদ দেওয়া চলে না। তাঁর 'লিপিকা' থেকে তাই কয়েকটি সব চেয়ে ভাল লিখন দেওয়া হল; এগুলোকে ছোট ছোট গল্প বলা ভুল হবে।[১] লেখাগুলো সহজেই দুভাগে আলাদা করা যায়, কতকগুলো মহাকাব্যের কাঠামোয় গড়া বলে গভীর সত্যের রূপ প্রকাশ করে তোলে, আর কতকগুলো ছবির মত কিসের যেন প্রতীক, কেমন যেন অস্বচ্ছ অর্ধ-অবগুণ্ঠিত অনাদি অনন্তের আস্বাদ দেয়, অথবা যেন নিগূঢ় আত্মার অন্তর্নিহিত কোমল নিশ্বাস আমাদের সর্বাঙ্গে স্পর্শ দিয়ে যায়।

www.BanglaBook.org

'সর্বশেষে যাঁরা তাঁদের লেখার অনুবাদ করবার অনুমতি দিয়েছেন তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, বিশেষ করে যাঁরা এই সঙ্কলনের গোড়াপত্তন ও সম্পূর্ণ করাতে সাহায্য করেছেন। সদুপদেশ দিয়েছেন ও অনুবাদে যাতে ভুলত্রুটি না থাকে তার জন্য আমি নিম্নলিখিত মহাশয়দের কাছে কৃতজ্ঞ,—হের দ. প. রায়চৌধুরী, ডি. ফিল. (গ্যোটিঙেন); ইঞ্জিনিয়র বিদ্যার্থী অ. ভাদুড়ী; য. চ. হুই, এম.এস-সি; য.ভ.বসু, ডি.ফিল, (বার্লিন) এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমাধারী স.চ. ভট্টাচার্য।[২] সুরসিক, বহু ভাষায় সুপণ্ডিত ল.ভ. রামস্বামী আইয়ার[৩] এম.এ.বি.এল. বেশির ভাগ মূল লেখাগুলি পাঠিয়েছেন ও সঙ্কলন আরম্ভ করার জন্য উৎসাহিত করে শেষ পর্যন্ত সাহায্য করেছেন। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার জন্য গৃহিণীকে ধন্যবাদ।[৪]

অবতরণিকাটি নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা করা যায় কিন্তু আমার উদ্দেশ্য পাঠক যেন নিজেই ভাগনার সাহেবের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন। আমার শুধু একটি বক্তব্য যে অবতরণিকার ভাষ্যটি সরল, যাঁরা মূল জর্মনে কানট হেগেল এমন কি টমাস মান্‌ও পড়েছেন তাঁরাই জানেন জর্মনে কি রকম আড়াইগজী সব বাক্য হয়। ভাগনারের জর্মন অনেকটা বাংলা ছন্দের—কিছুটা প্রমথ চৌধুরীর মত। বাক্যগুলো ছোট ছোট; সাদামাটা খাস জর্মন কথার ব্যবহার বেশি কিন্তু দরকারমত শক্ত লাতিন কথা লাগাতে সায়েব পিছ্‌পা হন নি। জর্মন গুরুচণ্ডালীর সম্বন্ধে বাংলার মত ভয়ঙ্কর সচেতন নয়। বাগনার আবার সাধারণ জর্মনের চেয়েও অবচেতন।

পাঠকের সব চেয়ে জানার কৌতূহল হবে যে, কার কার লেখা বাগনার সাহেব নিয়েছেন। তার ফিরিস্তি দিচ্ছি ঃ—

১। আমার দেশ (কবিতা) ঃ শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়[৪]
(Schridvidschendralal Raj)

২। সন্ন্যাস ঃ শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (বিল্বদল)

৩। অঙ্কিত; গোলাপ; চোর; কুসুম; শিউলি ঃ শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় (সিঁদুর চুপড়ি, মধুপর্ক)

৪। দেবতার ক্রোধ; রত্নপ্রদীপ ঃ শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (আল্পনা ও জলছবি)

৫। পদ্মফুল; জন্ম-মৃত্যু শৃঙ্খল (আংশিক অনূদিত) ঃ শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু (মায়াপুরী)

৬। একাকী; প্রেমের প্রথম কলি ঃ শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী (হাসি ও অশ্রু)

৭। বউ চোর, রসময়ীর রসিকতা ঃ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (ষোড়শী, গল্পাঞ্জলি)

১। রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ' থাকতে ভাগনার কেন যে সেগুলো কাজে লাগালেন না, তা বোঝা গেল না।

২। D.P.Roy Chowdhury; A. Bhaduri; J.C.Hui; S.Bose; S.C.Bhattacharya.

৩। ইনি শব্দতাত্ত্বিকদের সুপরিচিত।

৪। জীবিত মৃত সকলের নামের পূর্বেই ভাগনার "শ্রী" ব্যবহার করেছেন। বাংলা "শ" বুঝতে হলে জর্মানে sch (ইংরাজিতে Schedule-এর Sch), "জ" বুঝাতে হলে 'dsch', চ বুঝাতে হলে 'tsch', "য়" বুঝাতে হলে 'J' ব্যবহার করা হয়েছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

৮। গলি; পরীর পরিচয়; নূতন পুতুল; ছবি; সুয়োরানীর সাধ; সমাপ্তি; সমাধান; লক্ষ্যের দিকে; সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়; পায়ে চলার পথ; কণ্ঠস্বর; প্রথম শোক; একটি দিবস ; শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর Schrirabindranath Thakur (লিপিকা)

৯। আঁধারে আলো ঃ শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (মেজদিদি)

১০। পাষাণ হৃদয় ঃ শ্রীমতী সুনীতি দেবী (বঙ্গবাণী)

এখনই বলে দেওয়া ভাল যে পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়েছে ১৯২৬ সালে। তার মানে এই নয় যে, এই কজনই তখন নামজাদা লেখক ছিলেন। বরঞ্চ মনে হয়, ভাগনার ১৯১২-২০ এর সময় বাংলা শিখতে আরম্ভ করেন ও সে যুগে এঁদেরই যে খুব প্রতিপত্তি ছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় যে কেন বাদ পড়লেন ঠিক বোঝা গেল না। অবশ্যি মনে রাখতে হবে যে, নির্বাচনটা ঠিক ভাগনারের হাতে ছিল না। এ দেশ থেকে যে সব বই পাঠানো হয়েছিল, তা থেকে ভাল হোক, মন্দ হোক তাঁকে বাছতে হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের নাম ভাগনার চলতি জর্মন কায়দায় 'টেগোর' লেখেন নি।

নানা টীকা-টিপ্পনী করা যেত, কিন্তু সেটা পাঠকের কাছে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। জর্মন-মন এই গল্পগুলোতেই কেন সাড়া দিল, তার কারণ অনুসন্ধান তাঁরাই করুন।

সাধারণ জর্মনের পক্ষে দুর্বোধ্য কতকগুলো শব্দ পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে; যেমন—অগ্নি (দেবতা), অলকা, অন্নপূর্ণা, আরতি, আষাঢ়, B.A বেলপাতা, ভৈরবী রাগিণী, ভর্তৃহরি, ফুলশয্যা, চোরা বাগান, দোয়েল, জয়দেব যোগাসন, হাতের নোয়া, একতারা, হোলি, হুলুধ্বনি, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাসের মহাভারত, মেদিনীপুর, শালিগ্রাম, সমুদ্রমন্থন, পয়সা, পানি কৌড়ি, রজনীগন্ধা, রাসলীলা, সাহানা, শুভদৃষ্টি, রথযাত্রা, ব্রাহ্ম সমাজ, ইংরেজি, উড়িয়া বামুন।

সবগুলোর, মানে সব কটাই অতি সংক্ষেপে ঠিক ঠিক দেওয়া হয়েছে। মাত্র একটি ভুল—মেঘদূতকে Eops বা মহাকাব্য বলা হয়েছে। উড়ে বামুনরা যে গঙ্গাস্নানের সময় ডলাই-মলাই ও ফোটা-তিলক কেটে দেন সে কথাটি বলা হয়েছে, কিন্তু আমাদের যে রান্নার নামে কি বিষ খেতে দেন, সেটা বলতে ভাগনার ভুলে গিয়েছেন। B.A. উপাধি ভাগনার জর্মনদের বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং M.A. যে লাতিন Magister Artium সেটা বলতে ভোলেন নি। আশা করতে পারি আমাদের প্রতি জর্মনদের ভক্তি বেড়েছে।

আম-কাঁঠাল, শিউলি-বকুল বহু গল্পে বার বার এসেছে, কিন্তু ফুল আর ফলের ছয়লাপে ভাগনার ঘাবড়ে গিয়ে সেগুলো বোঝাবার চেষ্টা করেন নি। তবে তিনি রজনীগন্ধার প্রতি কিঞ্চিৎ পক্ষপাতদুষ্ট।

অনুবাদ কি রকম হয়েছে? অতি উৎকৃষ্ট সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, পদে পদে ছত্রে ছত্রে এই কথাটি বার বার বোঝা যায় যে, দূর বার্লিনে বসে কি গভীর ভালবাসা দিয়ে ভাগনার অনুবাদগুলো করেছেন এবং সেই ভালবাসাই তাঁকে বাংলার ছোট গল্পের অন্তস্তলে নিয়ে গিয়েছে।

ভৈরবী কোন্ সময় গাওয়া হয়, ফুলশয্যাতে কে শোয়, মেদিনীপুর কোন্ দিকে, হাতের নোয়া আর হুলুধ্বনি কাদের একচেটে, কৃত্তিবাস কাশীরাম দাস কে এই সব বিস্তর বায়নাক্কা বরদাস্ত করে জর্মন ১৯২৮ সালে এই বই পড়েছে আর সুদূর বাংলার হৃদিরস আস্বাদন করবার চেষ্টা করেছে।

বর্বর নয় তো কি!!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফরাসী—জর্মন

গল্প শুনিয়াছি, এক পাগলা মার্কিন নাকি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, 'হস্তী' সম্বন্ধে যে সর্বাৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিবে তাহাকে এক লক্ষ পৌণ্ড্ পারিতোষিক দেওয়া হইবে। প্রবন্ধের বিষয়টি যে বৃহৎ সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই; তাহা না হইলে মার্কিন বিশেষ করিয়া ঐ বিষয়টিই নির্বাচন করিবেন কেন?

সে যাহাই হউক, খবর শুনিবামাত্র ইংরাজ তৎক্ষণাৎ কুকের আপিসে ছুট দিল। হরেক সাজসরঞ্জাম যোগাড় করিয়া পক্ষাধিককাল যাইতে না যাইতেই সে আমাদের বনে উপস্থিত হইল ও বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই কেতাব লিখিল 'আসামের পার্বত্যাঞ্চলে হস্তী শিকার'।

ফরাসী খবর শুনিয়া ধীরে সুস্থে চিড়িয়াখানার দিকে রওয়ানা হইল। হাতিঘর বা পিলখানার সম্মুখে একখানা চৌকি ভাড়া লইয়া আস্তে আস্তে শ্যাম্পেনে চুমুক দিতে লাগিল। আড়নয়নে হাতিগুলির দিকে তাকায় আর শার্টের কফে নোট টুকে। তিন মাস পর চটি বই লিখিল 'লামুর পারমি লেজেলেফাঁ' অর্থাৎ 'হস্তীদের প্রেমরহস্য'।

জর্মন খবর পাইয়া না ছুটিল কুকের আপিসে, না গেল চিড়িয়াখানায়। লাইব্রেরিতে ঢুকিয়া বিস্তর পুস্তক একত্র করিয়া সাত বৎসর পর সাত ভলুমে একখানা বিরাট কেতাব প্রকাশ করিল; নাম 'আইনে কুৎসে আইনক্যুরুঙ ইন ডাস স্টুডিয়ম ডেস এলোফান্টেন', অর্থাৎ 'হস্তীবিদ্যার সংক্ষিপ্ত অবতরণিকা'।

গল্পটি প্রাক্-সভিয়েট যুগের। তখনকার দিনে রুশরা কিঞ্চিৎ দার্শনিক ভাবালু গোছের ছিল। রুশ খবর পাইয়া না গেল হিন্দুস্থান না ছুটিল চিড়িয়াখানায়, না ঢুকিল লাইব্রেরিতে। এক বোতল ভদকা (প্রায় 'ধান্যেশ্বরী' জাতীয়) ও ত্রিশ বাণ্ডিল বিড়ি লইয়া ঘরে খিল দিল। এক সপ্তাহ পরে পুস্তক বাহির হইল, 'ভিয়েদিল লিলি ডি এলেফান্ট'? 'তুমি কি কখনও হস্তী দেখিয়াছ'? অর্থাৎ রুশ যুক্তি-তর্ক দ্বারা প্রমাণ করিয়া ছাড়িল যে হস্তী সম্বন্ধে যে সব বর্ণনা শোনা যায় তাহা এতই অবিশ্বাস্য যে তাহা হইতে এমন বিরাট পশুর কল্পনা পর্যন্ত করা যায় না। অর্থাৎ হস্তীর অস্তিত্ব প্রমাণাভাবে অস্বীকার করিতে হয়।

আমেরিকান এইসব পন্থার একটিও যুক্তিযুক্ত মনে করিল না। সে বাজারে গিয়া অনেকগুলি হাতি কিনিল ও বক্রার্থে নয়, সত্য সত্যই 'হাতি পুষিল'। কুড়ি বৎসর পরে তাহার পুস্তক বাহির হইল 'বিগার এ্যান্ড বেটার এলেফেন্টস—হাউ টু গ্রো দেম?' অর্থাৎ 'আরো ভালো ও আরও বৃহৎ হাতি কি করিয়া গজানো যায়।' শুনিয়াছি আরো নানা জাতি প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলেন, তন্মধ্যে হস্তীর স্বদেশবাসী এক ভারতবাসীও নাকি ছিলেন। কিন্তু 'নেটিভ' 'কালা আদমী' বলিয়া তাঁহার পুস্তিকা বরখাস্ত-বাতিল-মকুব-নামঞ্জুর-ডিসমিস-অসিদ্ধ করা হয়। অবশ্য কাগজে-কলমে বলা হইল যে, যেহেতুক ভারতবাসী হস্তীকে বাল্যাবস্থা হইতে চিনে তাই তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাহাকে পক্ষপাতদুষ্ট করিতে পারে!

গল্পটি শুনিয়া হস্তী সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়ে না সত্য, কিন্তু ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও মার্কিন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ঘোলাটে ধারণা তবুও হয়। সব জাতির বিশেষত্ব লইয়া আলোচনা সম্ভবপর নহে, করিবার প্রয়োজনও নাই, কারণ প্রাচ্য জাতিসমূহের কথা ছাড়িয়া দিলে (আর ছাড়িতেই হইবে, কালা-ধলা একাসনে বসিতে পারে শুধু দাবার ছকেই) সত্যই বিদগ্ধ বলিতে

www.BanglaBook.org

বোঝায় জর্মন ও ফরাসীকে। বাদবাকি সকলেই ইহাদের অনুকরণ করে। তবে জর্মনরা নতমস্তকে স্বীকার করে যে 'কন্‌সানট্রেশন ক্যাম্পের' অনুপ্রেরণা তাহারা ইংরাজের নিকট হইতে পাইয়াছিল। নিতান্ত তাহারা কোনো জিনিস অর্ধপক্ক রাখিতে চাহে না বলিয়াই এই প্রতিষ্ঠানটিকে পূর্ণ বৈদগ্ধ্যে পৌঁছাইয়াছিল।

জর্মন যদি কোনো ভারতবাসীকে পায় তবে ইতি-উতি করিয়া যে কোনো প্রকারে তাহার সঙ্গে আলাপ জুড়িবার চেষ্টা করিবেই। আলাপ হওয়া মাত্র কালবিলম্ব না করিয়া আপনাকে এক গেলাস বিয়ার দিবে, তারপর আপনার কালো চুলের প্রশংসা করিবে ও আপনার বাদামী (তা আপনি যত ফর্সাই হউন না কেন) অথবা কালো রঙের প্রশস্তি গাইবে। তারপর আপনাকে প্রশ্নবাণের শরশয্যায় শোয়াইয়া ছাড়িবে, 'আপনারা দেশে কি খান, কি পরেন, সাপের বিষে মানুষ কতক্ষণে মরে, সাধুরা শূন্যে উড়িতে পারেন কি না, কান্ট বড় না শঙ্কর, তাজমহল নির্মাণ করিতে কত খরচ হইয়াছিল, অজন্তার কলা মারা গেল কেন, কামশাস্ত্রের প্রামাণিক সংস্করণ কোথায় কোথায় পাওয়া যায়, সর্পপূজা এখনও ভারতবর্ষে চলে কি না, সাধারণ ভারতবাসীর গড়পড়তা কয়টি স্ত্রী থাকে, হিন্দু মুসলমান ঝগড়া কেন?'

'কিন্তু হাঁ', বার তিনেক মাথা নাড়াইয়া বলিবে, হ্যাঁ, গান্ধী একটা লোক বটে। ওরকম লোক যীশুখ্রীষ্টের পরে আর হয় নাই (ইংরাজকে কী ব্যতিব্যস্তই না করিল)। গোলটেবিল বৈঠকের পর তাঁহার কথা ছিল বাইমার শহরে আসিবার। কিন্তু আসিলেন না : আমরা বড়ই হতাশ হইয়াছিলাম। সত্যই কি গান্ধী গ্যোটেকে এত ভক্তি করেন যে তামাম ইউরোপে ঐ একমাত্র বাইমারই তাঁহার মন কাড়িল?'

ভারতবাসীর প্রতি সাধারণ জর্মনের ভক্তি অসীম ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাহার কৌতূহলের অন্ত নেই।।

'এ তো মেয়ে মেয়ে নয়—'

সংবাদপত্রের পাঁজে যাঁরা পোড় খেয়ে ঝামা হয়ে গিয়েছেন, তাঁরা অত্যন্ত আত্মজনের মৃত্যুতেও বিচলিত হন না। হবার উপায়ও নেই। কারণ, যদি সে আত্মজন প্রখ্যাতনামা পুরুষ হন, তবে সাংবাদিককে অশ্রু সংবরণ করে সে মহাপুরুষ সম্বন্ধে রচনা লিখতে বসতে হয়। এ অধম পাঁজাতে ঢুকেছে বটে, পোড়ও খেয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণ ঝামা হয়ে যায় নি বলে তার চোখের জল মুছতে অনেকখানি সময় কেটে গিয়েছে।

বহু সাহিত্যিক, বহু কবি, বহু ঔপন্যাসিকের সঙ্গে দেশবিদেশে আমার আলাপ হয়েছে কিন্তু সরোজিনী নাইডুর মত কলহাস্যমুখরিত, রঙ্গরসে পরিপূর্ণ অথচ জীবনের তথা দেশের সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য সম্বন্ধে সচেতন দ্বিতীয় পুরুষ বা রমণী আমি দেখি নি। কতবার দেখেছি দেশের গভীরতম দৈন্য-দুর্দশা নিয়ে গম্ভীরভাবে, তেজীয়ান ভাষায় কথা বলতে বলতে হঠাৎ কথার মোড় ঘুরিয়ে তিনি রঙ্গরসে চলে গিয়েছেন। লক্ষ্য করে তখন দেখেছি যে, রসিকতার কথা বলেছেন বটে, কিন্তু তখনও চোখের জল ছলছল করছে। আমার মনে হয়েছে, দুঃখ-বেদনার কথা বলতে বলতে পাছে তিনি সকলের সামনে হঠাৎ কেঁদে ফেলেন,

www.BanglaBook.org

সেই ভয়ে কথার বাঁক ফিরিয়ে হাসি তামাসায় নেমে পড়েছেন।

চটুল রসিকতাই হোক আর গুরুগম্ভীর রাজনীতি নিয়েই কথা হোক, সরোজিনী যে ভাষা যে শৈলী ব্যবহার করতেন তার সঙ্গে তুলনা দিতে পারি, এমন কোন সাহিত্যিক বা কবির নাম মনে পড়ছে না। রবীন্দ্রনাথ গল্প বলতে অদ্বিতীয় ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সরোজিনীর মত কখনও শতধা উচ্ছ্বসিত হতেন না। সরোজিনী আপন-ভোলা হয়ে দেশকালপাত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে যে গল্পগুজব করে যেতেন, তাতে মজলিস জমত ঢের বেশি। রবীন্দ্রনাথ যেমন কখনও কাউকে খুব কাছে আসতে দিতেন না, সরোজিনীর মজলিসে কারো পক্ষে দূরে বসা ছিল অসম্ভব।

এরকম প্রতিভা নিয়ে জন্মেছেন অল্প লোক। অথচ সরোজিনীর চেয়ে অল্প প্রতিভা নিয়ে অনেকেই সরোজিনীর চেয়ে সফলতর সৃষ্টিকার্য করতে সক্ষম হয়েছেন। সরোজিনীর ভাব গম্ভীর ছিল, ভাষা মিষ্ট ছিল। তৎসত্ত্বেও তাঁর কাব্য-সৃষ্টি তাঁর ক্ষমতার পিছনে পড়ে রইল কেন?

আমার মনে হয়, সরোজিনীকে যাঁরা বক্তৃতা দিতে শুনেছেন, তাঁর মজলিসে আসন পাবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে, তাঁরাই স্বীকার করবেন বিদেশী মায়ামৃগের সন্ধানে বেরিয়ে সরোজিনী স্থায়ী যশের সতী সীতাকে হারালেন। এতে অবশ্য সরোজিনীর দোষ নেই। অল্প বয়সে তিনি যে ভাষা শিখেছিলেন, পরিণত বয়সে সেই ভাষাতেই তিনি আত্মপ্রকাশ করলেন। কিন্তু মাতৃস্তন্য না খেয়ে তিনি হরলিকস্ খেয়েছিলেন বলে তাঁর কবিতা কখনও মাতৃরসের স্নিগ্ধতা পেল না। আমি জানি পৃথিবীতে আজ ইংরেজ ছাড়া কোনো বিদেশী সরোজিনীর মত ইংরেজি ভাষায় কবিতা লিখতে পারবেন না। এ বড় কম কথা নয়, কিন্তু এ কৃতিত্বও আমাদিগকে সান্ত্বনা দিতে পারে না। কারণ নিশ্চয় জানি, উর্দু, বাংলা, ইংরেজি দ্বন্দ্বের বাতাবরণে যদি সরোজিনী বাল্যকাল না কাটাতেন, বাংলা মায়ের কোলে বসে যদি তিনি শুধু বাংলাই শুনতেন, তা হলে কৈশোরে বিদেশী ভাষা তাঁর কবিত্ব-প্রতিভাকে ভস্মাচ্ছাদিত করতে পারত না,—মাইকেলের প্রতিভা যে রকম বিদেশী ভস্মকে অনায়াসে সরিয়ে ফেলতে পেরেছিল। তাই সরোজিনী আমাদের সামনে দৃষ্টান্ত হয়ে রইলেন। সরোজিনী প্রমাণ করে দিলেন, বিদেশী ভাষায় কখনও স্থায়ী সৃষ্টি-কর্ম সম্ভবপর হয় না। আর কোনো ভারতবাসী ভবিষ্যতে মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষাতে কবিতা লিখবে না। পূর্ব-পাকিস্তান উর্দু গ্রহণ না করে বিচক্ষণের কার্য করছে। পশ্চিমবঙ্গ যেন হিন্দি-মৃগের সন্ধানে না বেরোয়।

পাঠক যেন না ভাবেন, আমি সরোজিনীর কবিতা পড়ে মুগ্ধ হইনি। আমি শুধু বলতে চাই, সরোজিনীর কবিতার চেয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব বহুগুণে বৃহত্তর ছিল। তিনি আর পাঁচজন কবির মত অবসর সময়ে কবিতা লিখে বাদবাকি সময় সাধারণ লোকের মতন কাটাতেন না। তাঁর কথা, তাঁর হাসি, তাঁর গালগল্প, তাঁর রাগ, তাঁর অসহিষ্ণুতা, তাঁর ধৈর্য্যচুতি, তাঁর আহার বিহার ভ্রমণ বিলাস সব কিছুই ছিল কবিজনোচিত। রাজনৈতিক সরোজিনী, জনপদকল্যাণী সরোজিনী বাক্‌নিপুণা সরোজিনী—এই তিন এবং অন্য বহুরূপে যখন তিনি দেখা দিতেন, তখন সেসব রূপই তাঁর কবিরূপের নীচে চাপা পড়ে যেত। কবিতা রচয়িত্রী সরোজিনীর চেয়েও কবি সরোজিনী বহু বহু গুণে মহত্তর।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে বাংলার এক কবি লিখেছিলেন বাংলার কুঁড়েঘরে রবির উদয় হল, এ বিস্ময় আমাদের কখনও যাবে না। ঠিক তেমনি ভারত এমন কি পুণ্য করেছিল যে তার বুকে ফুটে উঠল সরোজিনী?

www.BanglaBook.org

স্বয়ংবর চক্র

ট্রামে বাসে মেয়েদের জন্য আসন ত্যাগ করা ভদ্রতা অথবা অপ্রয়োজনীয়, এ সম্বন্ধে সর্বত্র আলোচনা শোনা যায় এবং আলোচনা অনেক সময় অত্যধিক উষ্মাবশত মনকষাকষি সৃষ্টি করে। একদল বলেন, মা-জননীরা দুর্বল, তাহাদিগকে স্থান ছাড়িয়া দেওয়া কর্তব্য; অন্য দল বলেন, মা-জননীরা যখন নিতান্তই বাহির হইয়াছেন, তখন বাহিরের কষ্টটা যত শীঘ্র সহ্য করিতে শেখেন ততই মঙ্গল।

মেয়েরা যদি শব্দার্থেই ট্রামে-বাসে বাহির হইতেন, তাহা হইলে বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ ছিল না, কিন্তু তাঁহারা যে শীঘ্রই ব্যাপকার্থে অর্থাৎ নানা প্রকার চাকরি ব্যবসায় ছড়াইয়া পড়িবেন সে বিষয়ে আমার মনে সন্দেহের অবকাশ নাই। কারণ অন্যান্য দেশে যাহা পঁচিশ বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল এদেশে তাহার পূর্বাভাস দেখা যাইতেছে। সব কিছু ঘটিবে, এমন কথাও বলিতেছি না।

১৯১৪-এর পূর্বে জর্মন পরিবারকর্তা দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারিতেন, পুত্রকে শিক্ষাদানের গ্যারান্টি দিতে আমি প্রস্তুত, কন্যাকে বর দানের। দেশের অবস্থা সচ্ছল ছিল; যুবকেরা অনায়াসে অর্থোপার্জন করিতে পারিত বলিয়াই যৌবনেই কিশোরীকে বিবাহ করিয়া সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশলাভ করিবার পূর্বেই কিশোরীদের বিবাহ হইয়া যাইত; তাহারা বড় জোর আবিটুর বা ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়িবার সুযোগ পাইত।

১৯১৪-১৮ সনের যুদ্ধে দেশের প্রায় সকল যুবককেই রণাঙ্গনে প্রবেশ করিতে হইল। মেয়েদের উপর ভার পড়িল খেত-খামার করিবার, কারখানা দোকান আপিস চালাইবার, ইস্কুলে পড়াইবার, ট্রাম ট্রেন চালু রাখিবার। জর্মনীর মত প্রগতিশীল দেশেও মেয়েরা স্বেচ্ছায় হেঁসেল ছাড়ে নাই, নাচিতে-কুঁদিতে বাহির হয় নাই। সামরিক ও অর্থনৈতিক বন্যা তাহাদের গৃহবহ্নি নির্বাপিত করিয়াছিল, হোটেলের আগুন শতগুণ আভায় জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

যুদ্ধের পর যুবকেরা ফিরিয়া দেখে, মেয়েরা তাহাদের আসনে বসিয়া আছে। বেশির ভাগ মেয়েরা আসন ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিল, যদি উপার্জনক্ষম বর পাইয়া ঘরসংসার পাতিবার ভরসা তাহাদিগকে কেউ দিতে পারিত। কিন্তু সে ভরসা কোথায়? জর্মনীতে তখন পুরুষের অভাব। তদুপরি ইংরাজ ফরাসি স্থির করিয়াছে জর্মনীকে কাঁচা মাল দেওয়া বন্ধ করিয়া তাহার কারবার রুদ্ধশ্বাস করিবে; জর্মনীর পুঁজির অভাব ছিল তো বটেই।

তখন এক অদ্ভুত অচ্ছেদ্য চক্রের সৃষ্টি হইল। মেয়েরা চাকরি ছাড়ে না, বর পাইবার আশা দুরাশা বলিয়া চাকরি ছাড়িলে খাইবে কি, পিতা হৃতসর্বস্ব ভ্রাতা যুদ্ধে নিহত অথবা বেকার। বহু যুবক বেকার, কারণ মেয়েরা তাহাদের আসন গ্রহণ করিয়া তাহাদের উপার্জন-ক্ষমতা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। বিবাহ করিতে অক্ষম। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে সমস্যাটি জটিল নয়। যুবকেরা পত্নীর উপার্জনে সন্তুষ্ট হইলেই তো পারে। কিন্তু সেখানে পুরুষের দম্ভ যুবকের আত্মসম্মানকে আঘাত করে। পত্নীর উপার্জনের উপর নির্ভর করিয়া পুরুষ জীবনযাপন করাকে কাপুরুষতা মনে করে। মেনীমুখো, ঘরজামাই হইতে সহজে কেহ রাজী হয় না; বিদেশে না, এদেশেও না। ইংলন্ডে তো আরো বিপদ। বিবাহ করা মাত্র

www.BanglaBook.org

যুবতীকে পদত্যাগ করিতে হইত—স্বামী উপার্জনক্ষম হউন আর নাই হউন (রেমার্কের 'ডের বেকৎস্যুক্'—দ্রষ্টব্য)।

যত দিন যাইতে লাগিল গৃহকর্তারা ততই দেখিতে পাইলেন যে, মেয়েকে বর দিব,—ভালোই হউক আর মন্দই হউক—এ গ্যারান্টি আর জোর করিয়া দেওয়া যায় না। কাজেই প্রশ্ন উঠিল, পিতার মৃত্যুর পর কন্যা করিবে কি? সে তো ম্যাট্রিক পাস করিয়া বাড়িতে বসিয়া অলস মস্তিষ্ককে শয়তানের কারখানা করিয়া বসিল। এদিকে ওদিকে তাকাইতেও আরম্ভ করিয়াছে। না হয় তাহাকে কলেজেই পাঠাও; একটা কিছু লইয়া থাকিবে ও শেষ পর্যন্ত যদি সেখানে কোনো ছোকরাকে পাকড়াও না করিতে পারে তবু তো লেখাপড়া শিখিবে, তাহারি জোরে চাকরি জুটাইয়া লইবে।

আমি জোর করিয়া বলিতে পারি ১৯২৪-৩২-তে যে সব মেয়েরা কলেজে যাইত তাহাদের অল্পসংখ্যকই উচ্চশিক্ষাভিলাষিণী হইয়া, কারণ বারে বারে দেখিয়াছি ইহারা উপার্জনক্ষম বর পাওয়া মাত্রই 'উচ্চশিক্ষাকে' ভালো করিয়া নমস্কার না করিয়াই অর্থাৎ কলেজ-আপিসে রক্ষিত সার্টিফিকেট মেডেল না লইয়াই—ছুটিত গির্জার দিকে। আরেকটি বস্তু লক্ষ্য করিবার মত ছিল—তাহা সভয় নিবেদন করিতেছি। ইহাদের অধিকাংশই দেখিতে উর্বশী মেনকার ন্যায় ছিলেন না। সুন্দরীদের বিবাহ ম্যাট্রিকের সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া যাইত—তাহারা উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে আসিবে কোন্ দুঃখে? কলেজে যে কয়টি সুন্দরী দেখা যাইত, তাহাদের অধিকাংশ অধ্যাপক-কন্যা।

অচ্ছেদ্য চক্র ঘুরিতে লাগিল আরও দ্রুত বেগে। কলেজের পাস করা মেয়ে আস্কারা পাইয়াছে বেশি। যে চাকুরিবাজারে সাধারণ মেয়ে প্রবেশ করিতে ভয় পাইত তাহারা সেই সব চাকুরির বাজারও ছাইয়া ফেলিল—চক্রের গতি দ্রুততর হইল। পার্থের সন্ধান নাই—তিনি তখনো অজ্ঞাতবাসে—স্বয়ংবর চক্র ছিন্ন করিবে কে?

কিন্তু ইতোমধ্যে সেই নিয়ত ঘূর্ণ্যমান স্বয়ম্বর চক্রের একটি স্ফুলিঙ্গ নৈতিক জগতে অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করিল। সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি।

মেয়েরা অর্থোপার্জন করিতেছে। পিতা মৃত। পরিবার পোষণ করিতে হয় না। বিবাহের আশা নাই। অর্থ সঞ্চয় করিবে কাহার জন্য? নিরানন্দ, উত্তেজনাহীন শুষ্ক জীবন কেনই বা সে যাপন করিতে যাইবে? অভিভাবকহীন যুবতী ও প্রৌঢ়ারা তখন বিলাসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দোষ দিয়া কি হইবে? পিতা বা ভ্রাতা না থাকিলে অরক্ষণীয়ার কি অবস্থা হয় তাহা বেদেই বর্ণিত হইয়াছে—যতদূর মনে পড়িতেছে কোন্ এক বরুণ মন্ত্রেই—ঋষি সেখানে অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন।

উপার্জনক্ষম যুবতীরা বিলাসের প্রশ্রয় দেওয়া মাত্রই চক্র দ্রুততর হইল। যে সব যুবকেরা অন্যথা বিবাহ করিত, তাহারা এই পরিস্থিতির সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিল। মুক্ত হট্টে দুগ্ধ যখন অপর্যাপ্ত তখন বহু যুবক গাভী ক্রয় করা অবিমৃষ্যকারিতার লক্ষণ বলিয়া স্থির করিল। বিবাহ-সংখ্যা আরো কমিয়া গেল—গির্জার বিবাহ পুরোহিতদের দীর্ঘতর অবকাশ মিলিল। নাইট ক্লাবের সৃষ্টি তখনই ব্যাপকভাবে হইল, 'গণিকা' জাতির জন্ম হইল—ইহাদের নাম ইউরোপীয় সর্বভাষায় জিগোলো। যে পুরুষ স্ত্রীর উপার্জনে জীবন ধারণ করিতে ঘৃণা বোধ করিত, সে-ই গোপনে, কখনো প্রকাশ্যে এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হইল (মাউরার জর্মনী 'পুটস দ ক্লক ব্যাক' দ্রষ্টব্য)।

www.BanglaBook.org

তখন পুরুষ বলিল, 'স্ত্রীপুরুষে যখন আর কোনো পার্থক্যই রহিল না, তখন পুরুষ ট্রামে-বাসে স্ত্রীলোকদিগের জন্য আসন ত্যাগ করিবে কেন?' উঠিয়া দাঁড়াইলেও তখন বহু মেয়ে পরিত্যক্ত আসন গ্রহণ করিতে সম্মত হইত না। সব কিছু তখন ৫০/৫০। আমার দৃঢ় অন্ধবিশ্বাস কলিকাতা কখনও ১৯৩২-এর বার্লিনের আচরণ গ্রহণ করিবে না। বাঙালি দুর্ভিক্ষের সময় না খাইতে পাইয়া মরিয়াছে; কুকুর বিড়াল খায় নাই। তবুও সমাজপতিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম—অর্থনৈতিক কারণে মানুষ কি করিয়া নৈতিক জগতে ধাপের পর ধাপ নামিতে বাধ্য হয়।

অনুসন্ধিৎসু প্রশ্ন করিবেন, জর্মনীর স্বয়ংবর চক্র কি কেহই ছিন্ন করিতে সক্ষম হন নাই? হইয়াছিলেন। সে বীর হিটলার। পার্থের ন্যায় তাঁহারও নানা দোষ ছিল, কিন্তু অজ্ঞাতবাসের পর তিনিই চক্রভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৯৩৪ সালে ড্রেসডেন শহরে এক নির্দিষ্ট দিনে চারিশত যুবক-যুবতীকে সগর্বে শোভাযাত্রা করিয়া দল বাঁধিয়া বিবাহ করিতে যাইতে দেখিলাম। অন্য শহরগুলিও পশ্চাৎপদ রহিল না; সর্বত্র সপ্তপদী সচল হইয়া উঠিল। ১৯৩৮ সালে গিয়া দেখি কলেজগুলি বৌদ্ধ মঠের ন্যায় নারীবর্জিত। হিটলার কি কৌশলে চক্রভেদ করিয়াছিলেন সে কথা আরেক দিন হইবে!

ইঙ্গ-ভারতীয় কথোপকথন

দেশে বিদেশে বহুবার দেখিয়াছি যে, ইংরাজ ও ফরাসির প্রশ্নে ভারতীয় সদুত্তর দিতে পারিতেছেন না। তাহার প্রধান কারণ (১) ভারতীয়রা স্বীয় ঐতিহ্য ও বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে সুপরিচিত নহেন—ইহার জন্য প্রধান আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিই দায়ী। (২) বিদেশী রীতিনীতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা—সে জ্ঞান থাকিলে ভারতীয় তৎক্ষণাৎ বিদেশীকে চক্ষে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া দেখাইয়া দিতে পারে যে, সে যাহা করিতেছে তাহা অন্যরূপে বা অল্প কিয়দ্দিন পূর্বে বিদেশীরাও করিত। নিম্নলিখিত কথোপকথন হইতে আমাদের বক্তব্যটি পরিস্ফুট হইবে ও আশা করি কোনো কোনো ভারতীয়ের উপকারও হইবে।

বিদেশী ঃ তোমাকে সেদিন ফির্পোতে দাওয়াত করিয়াছিলাম। তুমি টালবাহানা দিয়া পলাইলে। শুনিলাম, শেষটায় নাকি আমজাদীয়া হোটেলে খাইতে গিয়াছিলে। ফির্পোর খানা রাঁধে ত্রিভুবন-বিখ্যাত ফরাসিস শেফ্ দ্য কুইজিন। সেই শেফ্‌কে উপেক্ষা করিয়া তুমি কোন্ জঙ্গলীর রান্না খাইতে গেলে!

ভারতীয় ঃ তোমাদের রান্নার অন্য গুণাগুণ বিচারের পূর্বে একটি অত্যন্ত সাধারণ বস্তুর দিকে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। লক্ষ্য করিয়াছ কি না জানি না যে, তোমাদের রান্নায় তিক্ত টক ও ঝাল এই তিন রসের অভাব। অর্থাৎ ছয় রসের অর্ধেক নাই—ঝাল কিছু কিছু দাও বটে কিন্তু তাও বোতলে পুরিয়া টেবিলে রাখ, কারণ ঐ রসটির প্রতি তোমাদের সন্দেহ ও ভয় এখনও সম্পূর্ণ ঘুচে নাই। কাজেই তোমাদের খানা খাইয়াই বলা যায় যে, আর যে গুণই থাকুক, বৈচিত্র্য তোমাদের রান্নায় থাকিবে না। শুধু লবণ আর মিষ্ট এই সা, রে লইয়া তোমরা আর কি সুর ভাঁজিবে? দুই-তারা লইয়া বীণার সঙ্গে টক্কর দিতে চাও?

www.BanglaBook.org

আমজাদীয়ার 'জঙ্গলী'ও তাই তোমার শেফ্‌কে অনায়াসে হারাইয়া দিবে। দ্বিতীয়ত, তোমাদের ডাইনিং টেবিলে ও রান্নাঘরে কোনো তফাত নাই। তোমরা ক্রুয়েট নামক ভাঙা-বোতল-শিশিওয়ালার একটা ঝুড়ি টেবিলের উপর রাখ। নিতান্ত রসকষহীন সিদ্ধ অথবা অগ্নিপক্ক বস্তু যদি কেহ গলাধঃকরণ না করিতে পারে তবে তাহাতে ডাইনিং টেবিলে পাকা রাঁধুনী সাজিতে হয়। স্নেহ জাতীয় পদার্থ সংযোগ করিতে গিয়ে অলিভ ওয়েল ঢাল, উগ্রতা উৎপাদনের জন্য রাই সরিষার (মাস্টার্ড) প্রলেপ দাও, কটু করিবার জন্য গোলমরিচের গুঁড়া ছিটাও,—বোতলটার আবার ছিদ্র রুদ্ধ বলিয়া তাহাকে লইয়া ধস্তাধস্তি করিতে স্কন্ধদেশস্থ অস্থিচ্যুতি ও ধৈর্যচ্যুতি যুগপৎ অতি অবশ্য ঘটে,—ভীতু পাচক বড় সাহেবের ভয়ে লবণও দিয়াছে কম,—লক্ষ্য করিয়াছি কি শতকরা আশিজন সুপ মুখে দিবার পূর্বেই নুন ছিটাইয়া লয়?—অতএব লবণ ঢালো। তৎসত্ত্বেও যখন দেখিলে যে ভোজদ্রব্য পূর্ববৎ বিস্বাদই রহিয়া গিয়াছে তখন তাহাতে সস্ নামক কিম্ভূতকিমাকার তরল দ্রব্য সিঞ্চন করো। তোমার গাত্র যদি পাচক রক্ত থাকে অবশ্য তুমি তাবৎ প্রলেপশিঞ্চন অনুপান-সম্মত বা মেকদার-মাফিখ করিতে পারো, কিন্তু আমি বাপু 'ভদ্রলোকে'র ছেলে, বাড়িতে মা-মাসিরা ঐ কর্মটি রান্নাঘরে রন্ধন করিবার সময় করিয়া থাকেন। খানার ঘর আর রান্নাঘরে কি তফাৎ নেই?

সায়েব ঃ রুচিভেদ আছে বলিয়াই তো এত বায়নাক্কা।

ভারতীয় ঃ ঐ সব জ্যেষ্ঠতাতত্ত্ব আমার সঙ্গে করিও না। তাই যদি হইবে তবে খানাঘরেই আগুন জ্বালাইয়া লইয়া মাংস সিদ্ধ করো না কেন, গ্রিল কাবাব ঝলসাও না কেন? কেহ অর্ধপক্ক মাংস পছন্দ করে, কেহ পূর্ণপক্ক। সেখানেও তো রুচিভেদ; তবে পাচকের হাতে ঐ কর্মটি ছাড়িয়া দাও কেন? আসল কথা, এই রুচিভেদ স্বীকার করিয়াও পাচক বহুজনসম্মত একটি মধ্যপন্থা বাহির করিয়া লহে ও গুণীরা সেইটি স্বীকার করিয়া অমৃতলোকে পৌঁছেন। রুচিভেদ থাকা সত্ত্বেও গুণীরা সেক্সপীয়র কালিদাস পছন্দ করেন। কবি কখনো যমক, অনুপ্রাস, উপমা আখ্যানবস্তুর পৃথক পৃথক নির্ঘন্ট পৃথক পৃথক পুস্তকে দিয়া বলেন না রুচিমাফিক মেকদার-অন পানযোগে কাব্যসৃষ্টি করিয়া রসাস্বাদন করো।

সায়েব ঃ সে কথা থাকুক। কিন্তু আমজাদীয়ার খানা খাইলে তো হাত দিয়া; সেখানে তো ছুরি-কাঁটার বন্দোবস্ত নাই।

ভারতীয় ঃ না, আছে। ভারতবর্ষ তোমাদের পাল্লায় পড়িয়া দিন দিন এমনি অসভ্য হইয়া পড়িতেছে যে, ভারতীয়রাও ছুরি-কাঁটা ধরিতে শিখিবার চেষ্টা করিতেছে। এ নোংরামি করিবার কি প্রয়োজন তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

সায়েব ঃ নোংরামি? সে কি কথা?

ভারতীয় ঃ নিশ্চয়ই। ঐ তো রহিয়াছে তোমার ছুরি, কাঁটা, চামচ; ঐ তো ন্যাপকিন। ঘষো আর দেখো, কতটা ময়লা বাহির হয়। আর যেটুকু বাহির হইবে না, তাহা খাদ্যরস সংযোগে অগোচরে পেটে যাইবে। আর আমি আমার আঙুল ঘষি দেখো কতটা ময়লা বাহির হয়। আর যদি আমার আঙুল ময়লা হয়ই, তবে আমি এখনই টয়লেট ঘরে গিয়ে আচ্ছা করিয়া হাত ধুইয়া লইব। তুমি যদি ছুরি-কাঁটা লইয়া এদিকে ধাওয়া করো তবে ম্যানেজার পুলিশ ডাকিবে, ভাবিবে চৌর্যবৃত্তিতে তোমার হাতেখড়ি হইয়াছে মাত্র। আর শেষ কথাটিও শুনিয়া লও, আমারি আঙুল আমি আমারি মুখে দিতেছি; তুমি যে কাঁটা-চামচ মুখে দিতেছ সেগুলি যে কত লক্ষ পায়োরিয়াগ্রস্তের অধরোষ্ঠে এবং আস্যগহ্বরেও নিরন্তর যাতায়াত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করিতেছে তাহার সন্দেশ রাখো কি? চীনারা তোমাদের তুলনায় পরিষ্কার। খাইবার কাঠি সঙ্গে লইয়া হোটেলে প্রবেশ করে।

সায়েব ঃ সে কথা থাকুক (ধুয়া)।

ভারতীয় ঃ হ্যাঁ, আলোচনাটাই আমার পক্ষেও মর্মঘাতী। আমারি এক বাঙালি খ্রিস্টান বন্ধু কাঁটা দিয়া ইলিশ মাছ খাইতে যান—বেজায় সায়েব কিনা—ফলে ইলিশাস্থি তাঁহার গলাস্থ হয় এমনি বেকায়দা বেদুরস্তভাবে যে, তাঁহার শরীরের অস্থিগুলি এখন গোরস্তানে চিরতের বস্তি গাড়িয়াছে (অশ্রু বর্ষণ)।

সায়েব ঃ আহা! তবে ইলিশ না খাইলেই হয়।

ভারতীয় ঃ ইংরাজ হইয়া বেকন-আন্ডা না খাইলেই হয়; ফরাসি হইয়া শ্যাম্পেন না খাইলেই হয়; জর্মন হইয়া সসিজ না খাইলেই হয়; বাঙালি হইয়া ইলিশ না খাইলেই হয়, অনশনে প্রাণত্যাগ করিলেও হয়; আত্মহত্যা করিলেও হয়। লজ্জা করে না বলিতে? বাংলার বুকের উপর বসিয়া হোম্ হইতে টিনস্থ বেকন না পাইলে 'ব্রিটিশ ট্রেডিশন ইন্ ডেঞ্জার' বলিয়া কমিশন বসাইতে চাহো, আর আমি গঙ্গার পারে বসিয়া গঙ্গার ইলিশ খাইব না? তাজ্জব কথা!

সায়েব ঃ সে কথা থাকুক (ধুয়া)। কিন্তু ঐ বলিলে তোমাদের মেয়েরা রান্না করেন, তাঁহারা কি শুধুই রান্না করেন? তাঁহারা এই নির্মম পর্দাপ্রথা মানেন কেন?

ভারতীয় ঃ সে তাঁহারা মানেন; তাঁহাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিও।

সায়েব ঃ তাঁহাদিগের সঙ্গে তো দেখাই হয় না।

ভারতীয় ঃ সে আমাদের পরম সৌভাগ্য।

সায়েব ঃ (চিন্তিত মনে) কথাটা কি একটু কড়া হইল না? আমরা কি এতই খারাপ?

ভারতীয় ঃ খারাপ ভালোর কথা জানিনা সাহেব। তবে ১৭৫৭ সালে তোমাদের সাথে পীরিতিসায়রে সিনান করিতে গিয়া শুধু যে আমাদের সকলি গরল ভেল তাহা নয়, স্বরাজগামছাখানা হারাইয়া ফেলিয়া দুইশত শীত বৎসর ধরিয়া আকণ্ঠ দৈন্য-দুর্দশা-পঙ্কে নিমগ্ন-ডাঙ্গায় উঠিবার উপায় নাই। পুরুষদের তো এই অবস্থা তাই মেয়েরা অন্তরমহলে তোমাদিগকে quit করিয়া বসিয়া আছেন।

সায়েব ঃ এ সব তো বাইরের কথা; তোমাদের কৃষ্টি, ঐতিহ্য—

ভারতীয় ঃ আরেকদিন হইবে। উপস্থিত আমাকে Quit India গাহিতে রাস্তায় যাইতে হইবে।

(ডিসেম্বর ১৯৪৫)

শিক্ষা-সংস্কার

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি সংস্কার করা হইবে এই রকম একটি খবর শুনিতে পাইলাম।

পণ্ডিতেরা একত্র হইয়া এই বিষয়ে নানা তর্ক নানা আলোচনা করিবেন; সেই সব পণ্ডিতের নামাবলীতে দেশবিদেশের নানা ডিগ্রী নানা উপাধির লাঞ্ছনা অঙ্কিত থাকিবে; নানা ভাষায় নানা কণ্ঠে তাঁহারা জ্ঞানগর্ভ মতামত প্রকাশ করিবেন। সেখানে আমাদের ক্ষীণ নেটিভ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কষ্ঠ পৌঁছিবে এমন দুরাশা আমরা করি না। আমাদের প্রধান দোষ অবশ্য যে আমরা 'ওল্ড ফুলজ' 'ধর্মপ্রাণ'; আমাদের যুক্তিতর্ক ধর্মশাস্ত্র হইতে সঞ্চয় করি, সেগুলি এযুগে বরবাদ রদ্দি জঞ্জাল। কিন্তু আমরা নাচার। পরমহংসদেব বলিয়াছেন, যে মূলা খাইয়াছে তাহার ঢেকুরে মূলার গন্ধ থাকিবেই, আমরা 'মূলা' না খাইয়া থাকিলেও জানি যে তত্ত্বজ্ঞান সঞ্চয় করিতে হইলে 'মূলের' অনুসন্ধান নিতান্ত প্রয়োজনীয়। শুনিতে পাই সায়েবরাও নাকি তাই করেন—নদীর মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া নাকি তাঁহারা বিস্তর পাহাড় পর্বত অতিক্রম করেন।

দেশে যখন ধনদৌলত পর্যাপ্ত ছিল তখন বহু লোক তীর্থ করিতে যাইতেন এবং বহু পণ্ডিতের এই ধারণা যে তাবৎ উত্তর ভারতে রেলগাড়ি প্রচলিত হইবার পূর্বেও যে ভাঙা-ভাঙা হিন্দি দিয়া কাজ চালানো যাইত তাহার কারণ যাত্রীদের তীর্থ পরিক্রমা। দেবীর ব্রহ্মরন্ধ্র পীঠ বেলুচিস্থানের হিঙ্গুলা হইতে বামজঙ্ঘা পীঠ শ্রীহট্ট পর্যন্ত বহু বহু যাত্রী বহু যুগ ধরিয়া গমনাগমন করিয়াছেন, বহু ভাষার বহু শব্দের আদান-প্রদান সংমিশ্রণের ফলে পণ্ডিতজন নিন্দিত একটি 'চলতি'ভাষা যুগ যুগ ধরিয়া রূপ পরিবর্তন করিয়া অধুনা হিন্দুস্থানী নামে পরিচিত। সে যাহাই হোক, এই অবদানের স্মরণে তীর্থযাত্রীদের প্রশংসা করিবার সদুদ্দেশ্য লইয়া বক্ষ্যমাণ আলোচনা নিবেদন করিতেছি না।

তীর্থে পুণ্যসঞ্চয় হইত কিনা সে তর্ক অধুনা নিষ্ফল, কিন্তু এ বিষয়ে তো বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে, জ্ঞান সঞ্চয় হইত, অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইত, সঙ্কীর্ণতা হ্রাস পাইত এবং নানা বর্ণ, নানা জাতি, নানা আচার ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করিয়াও যাত্রী হৃদয়ঙ্গম করিত ভারতবর্ষের অখণ্ড রূপ। আবার বলি, নানা পার্থক্য নানা বৈষম্যের গন্ধধূপধূম্রের পশ্চাতে ভারতমাতার সুস্পষ্ট প্রতিকৃতি প্রস্ফুটিত হইত। গ্রামের বৈচিত্র্যহীন সমাজে ফিরিয়া আসিয়াও তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিত সেই সুস্পষ্ট আলেখ্য।

শিক্ষার এক মূল অঙ্গ ছিল তীর্থভ্রমণ, দেশভ্রমণ বলিলে একই কথা বলা হয়।

প্রশ্ন এই, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তো অজস্র ডিগ্রি প্রতি বৎসর অকৃপণভাবে বর্ষণ করেন, কিন্তু কখনো তো বিদ্যার্থীকে বার্ষিক পরিক্রমার সময় জিজ্ঞাসা করেন না, 'তুমি দেশভ্রমণ করিয়াছ, ভারতবর্ষের অখণ্ড রূপ হৃদয়ে আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছ?'

বোধ হয় করা হয় না, তাই যখন সাধারণ বাঙালি গ্রাজুয়েট লিলুয়ার টিকিট কাটে তখন বলিয়া বেড়ায়, 'ভাই, কি আর করি, হাওয়া বদলাইতেই হয়, পশ্চিম চলিলাম।'

অসহিষ্ণু পাঠক বলিবেন, 'কী বিপদ! বিশ্ববিদ্যালয় কি বুকিং আপিস, যে তুমি বাতায়নস্থ হইলেই তোমাকে সস্তায় বিদেশে যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন?'

নাই বা দিলেন, কিন্তু এমন বন্দোবস্ত কি সম্পূর্ণ অসম্ভব যে, বাঙালি ছেলে ছয় মাস এলাহাবাদে পড়িল, আরো ছয় মাস লাহোরে এবং সর্বশেষ তিন বৎসর কলিকাতায়? নিন্দুকে বলে যে, কলেজের ছেলেরা নাকি প্রায় দুই বৎসর গায়ে হাওয়া দিয়া বেড়ায়, শেষের চারি মাস, তিন মাস, অবস্থাভেদে দুই মাস নোট মুখস্থ করিয়া পাস দেয়। তবেই জিজ্ঞাসা, চারি বৎসরের এক বৎসর অথবা এম.এ. পাসের জন্য ছয় অথবা সাত বৎসরের দুই অথবা তিন বৎসর যদি কোনো ছেলে প্রদেশে প্রদেশে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঞ্চয়ার্থে (সে শতকরা এক শত নাই হউক) তীর্থভ্রমণ অর্থাৎ এই কলেজ সেই কলেজ করে, তবে কি পাপ হয়?

এমন কি একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ও নাই যেখানে তাবৎ ভারতের ছেলে অধ্যয়ন করিতে সমবেত হয়, একে অন্যকে চিনিতে পারে? (কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ও আলীগড়ে

www.BanglaBook.org

ঈষৎ হয়, কিন্তু নানা কারণে এস্থলে তাহার আলোচনা আজ আর করিব না) অথচ সংস্কৃত পড়িবার জন্য ভারতবর্ষের সর্বপ্রদেশের ছাত্র কাশীর চতুষ্পাঠীতে সমবেত হয়, মুসলমান ছাত্র দেওবন্দ যায়। (বিশ্বভারতীর কথা তুলিলাম না, কারণ সরকারি ছাপ লইতে হইলে সেখানকার ছাত্রকে এখনো কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খিড়কি দরজা দিয়া ঢুকিতে হয়)।

অবিশ্বাসী পাঠক বলিবেন, 'কথাটা মন্দ শুনাইতেছে না, তবে ঠিক সাহস পাইতেছি না। অন্য কোনো দেশে কি এ ব্যবস্থা আছে?" 'হোমে'র অর্থাৎ সদাশয় সরকারের দেশের কথা বলিতে পারি না এবং তাহাতে কোনো ক্ষতি নাই, কারণ শুনিয়াছি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সৃষ্টি স্থিতি নাকি ইট্‌ন্ হ্যারোর ক্রীড়াভূমিতে। তাই যদি হয়, তবে দেব পতঞ্জলির ভাষায় বলি, "হেয়ং দুঃখমনোগতম্'। স্বরাজ পাইয়া বিদেশে অপ্রতিহতভাবে দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করিবার কুমতি ভারতের যেন কদাচ না হয়; তাহাতে পরিণামে যে দুঃখ পাইতে হইবে তাহা পূর্ব হইতেই বর্জনীয়।

কিন্তু ফ্রান্সে আছে, জর্মনীতে আছে, সুইটজারল্যান্ডে আছে, অস্ট্রিয়ায় আছে, তাবৎ বলকানে আছে, অথবা ১৯৩৯ পর্যন্ত ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বলকান রাজ্য হইতে প্রতি বৎসর শত শত ছাত্র বার্লিন, ভিয়েনা, প্যারিস, জিনিভা যাইত, এক বৎসর দুই বৎসর নানা কলেজ নানা দেশ ঘুরিয়া পুনরায় ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া গিয়া বাড়ির বিশ্ববিদ্যালয়ে পাস দিত, বিদেশের 'টার্ম' স্বদেশে গোনা হইত, আর দেশের অভ্যন্তরস্থ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তো কথাই নাই। এমন জর্মন ছেলে কস্মিনকালেও খুঁজিয়া পাইবেন না যে ঝাড়া পাঁচ বৎসর একই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যার্জন করিয়া পদবী লইয়াছে। হয়ত উত্তরায়ণ কাটাইয়াছে রাইনল্যান্ড, কলোনে অথবা হাইডেলবের্গে—দক্ষিণায়ন কীল অথবা হমবুর্গে, তার পরের বৎসর ম্যুনিকে ও সর্বশেষ দুই বৎসর স্বপুরী কোনিগসবের্গে। শুধু তাহাই নহে। দেশের এক প্রান্তের ছাত্র যাহাতে অন্য প্রান্তে যায় তাহার জন্য রেল কোম্পানি তাহাকে সিকি ভাড়ায় লইয়া যাইতে বাধ্য। ছুটির সময় যখন বাড়ি যাইবে, ফিরিয়া আসিবে, তাহার জন্যও সিকি ভাড়া।

কিন্তু আমি অরণ্যে রোদন করিতেছি। কারণ স্মরণ আছে, শান্তিনিকেতনের নন্-কলেজেট হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি.এ. পাস করা একটি গুজরাতী ছেলের বাসনা হয় এম.এ. বোম্বাই হইতে দিবে। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় আবেদন নামঞ্জুর করিলেন, কারণ সে কলকাতার নন্-কলেজেট! কর্তাদের বুঝাইবার বিস্তর প্রয়াস করিলাম যে কবিগুরু প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাপীঠের নন্-কলেজেট বহু কলেজেটের অপেক্ষা শ্রেয়, অন্তত বিশ্বভারতী কলেজ অনেক মার্কামারা সফরীপ্রোষ্ঠী কলেজ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অধ্যাপকমণ্ডলী ধারণ করে, কিন্তু অরণ্যে রোদন।

ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে কি অপূর্ব বিশ্বপ্রেম, সহযোগিতা!

কোন গুণ নেই তার—

বেহারী ভাইয়ারা (সদর্থে) বাংলা ভাষা এবং বাঙালির উপর খড়্গহস্ত হয়েছেন শুনে বহু বাঙালি বিচলিত হয়েছেন। বাঙালির প্রতি অন্যান্য প্রদেশের মনোভাব যদি বাঙালিরা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সবিস্তর জানতে পান তবে আরো বিচলিত হবেন—কিন্তু সৌভাগ্য বলুন আর দুর্ভাগ্যই বলুন, বাংলা দেশের লোক মারাঠী-গুজরাতী ভাষা নিয়ে অত্যধিক ঘাঁটাঘাঁটি করে না বলেই ও সব ভাষায় আমাদের সম্বন্ধে কি বলা হয় না হয় সে সম্বন্ধে কোনো খবর পায় না। তাবৎ মারাঠী-হিন্দি-গুজরাতী আমাদের প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ করেন এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু উত্তর-ভারতবর্ষের সর্বত্রই যে ঈষৎ বাঙালি-বিদ্বেষ বর্তমান আছে সে কথা অস্বীকার করবার যো নেই।

কিন্তু বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। তবে বাংলা ভাষা তথা বাঙালি বৈদগ্ধ্য সম্বন্ধে অন্যান্য প্রদেশ কেন যে ঈর্ষাপরায়ণ সে তত্ত্বের অনুসন্ধান করলে আমরা অনেকখানি ক্ষমা করতে পারব। ক্ষমা মহতের লক্ষণ তো বটেই, তদুপরি আমরা যখন সর্বপ্রদেশের মধ্যে প্রীতি এবং সৌহার্দ্য কামনা করি, তখন এ বিষয়ে আমাদেরই সকলের চেয়ে বেশি সচেতন হওয়া উচিত। আপন প্রদেশ সম্বন্ধে আমরাই যেমন সর্বপ্রথম গর্ব অনুভব করে 'সপ্তকোটি কণ্ঠে' উল্লাসধ্বনি করে উঠেছিলুম, ঠিক তেমনি আমরাই সর্বপ্রথম ক্ষুদ্র প্রাদেশিকতা বর্জন করে পাঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল- বঙ্গের ভিতর দিয়ে ভারতভাগ্যবিধাতার রূপ দেখতে চেয়েছিলুম। আজ না হয় বাংলাদেশ সর্বজনমান্য নেতার অভাবে অনাদৃত, আজ না হয় কেন্দ্রে আমরা চক্রবর্তী নেই, তাই বলে বাংলা দেশ আরো বহুকাল যে এরকম ধারা সর্বযজ্ঞশালার প্রান্তভূমিতে অনাদৃত থাকবে ও কথা বিশ্বাস করার চেয়ে আত্মহত্যা বহুগুণে শ্লাঘানীয়। তাই প্রাদেশিক ক্ষুদ্রতা দূর করার কর্তব্য আমাদেরই স্কন্ধে।

অবাঙালিরা যে বাঙালির দিকে বক্রদৃষ্টিতে তাকান তার প্রধান কারণ এই নয় যে বাঙালি যেখানে যায় সেখানকার হনুমানজী, রণঝোড়জী (আসলে ঋণছোড়জী অর্থাৎ যিনি মানুষকে সর্বপ্রকার ঋণমুক্ত করতে সাহায্য করেন) বা অম্বামাতার সেবা না করে কালীবাড়ি স্থাপনা করে কিংবা বিদ্যার্জন করবার জন্য গণপতিকে পুজো না করে সরস্বতীকে আহ্বান করে—কারণ সকলেই জানেন এ বাবদে তাবৎ ভারতবাসী একই গড্ডালিকার তাঁবেতে পড়েন। খুলে বলি।

বেদের ইন্দ্র, বরুণ, যম, প্রজাপতিকে দৈনন্দিন ধর্মজীবন থেকে বাদ দিয়ে শুধু বাঙালিই যে ব্রাত্য হয়ে গিয়েছে তা নয়, ভারতবর্ষের কোনখানেই এদের জন্য আজ আর কোনো মন্দির নির্মিত হয় না। শিব আর বিষ্ণু কি করে যে এঁদের জায়গা দখল করে নিলেন সে আলোচনা উপস্থিত নিষ্প্রয়োজন—অথচ বেদে এদের অনুসন্ধান করতে হয় মাইক্রোস্কোপ দিয়ে—এমন কবি বাঙালি যেমন সামাজিক ধর্মচর্চায় মা কালীকে ডাকাডাকি করে, উত্তর-ভারতে তেমনি হনুমানজী, গুজরাতে রণছোড়জী, মহারাষ্ট্রে অম্বামাতা।

বেদনাটা সেখানে নয়। বাঙালির পয়লা নম্বরের 'দোষ' সে মাছ-মাংস খায়। কি উত্তর, কি দক্ষিণ—সর্বত্রই ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা মাছ-মাংস খান না এবং উভয় বস্তুর খাদককে ঘৃণার চক্ষে দেখেন। মহারাষ্ট্রের সারস্বত ব্রাহ্মণগণ মাছ খান (এঁদের এক শাখার নাম গৌড়ীয় সারস্বত ও কিম্বদন্তী এই যে, তাঁরা আসলে বাঙালি), তাই সেখানকার চিৎপাবন, দেশস্থ এবং করাড় ব্রাহ্মণগণ সারস্বতদের অবজ্ঞার চোখে দেখেন—যেন মাছ খেয়ে সারস্বত ব্রাহ্মণরা হিন্দু-সমাজ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছেন। এই মাছ খাওয়াটা দোষ না গুণ সে আলোচনা পণ্ডিত এবং বৈদ্যরাজ করবেন; উপস্থিত আমার বক্তব্য এই যে, মাছ-মাংস খায় বলেই বাঙালি সনাতন হিন্দুধর্মের কাছাকাছি থাকতে পেরেছে। নিরামিষে

www.BanglaBook.org

আসক্তি জৈন ধর্মের লক্ষণ—কারণ বৌদ্ধ গৃহীরা পর্যন্ত মাছ-মাংস খান এবং নিমন্ত্রিত শ্রমণও উভয় বস্তু প্রত্যাখ্যান করেন না। জৈনদের প্রতি আমাদের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নেই ও 'হস্তিনাং তাড্যমানপি ন গচ্ছেৎ জৈন মন্দিরম্' উপদেশটি অবাঙালিই দিয়েছেন। রাজপুতরা মাছ-মাংস খান, তাই বোধ করি মীরাবাঈ গেয়েছেন—

ফলমূল খেয়ে হরি যদি মেলে
তবে হরি হরিণের।

কাজেই মাছ-মাংস খাওয়ার জন্যে যদি বাঙালি অন্যান্য প্রদেশের বিরাগভাজন হয় তাতে শোক করবার কিছুই নেই। তার অর্থ শুধু এই যে, বাঙালি ভারতব্যাপী জৈন্য প্রভাবের ফলে সনাতন ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয় নি।

আমাদের দুই নম্বরের দোষ আমরা পরীক্ষা, আত্মা ইত্যাদি শব্দ সংস্কৃত কায়দায় পরীক্ষা আত্মা উচ্চারণ করি না। সংস্কৃত ভাষা পড়বার সময় এ সব শব্দ কি ভাবে উচ্চারণ করতে হবে সে আলোচনা পরে হবে, উপস্থিত দ্রষ্টব্য আমরা কেন বাঙলায় এ সব শব্দ বাঙলা কায়দায় উচ্চারণ করি।

এর উত্তরে প্রথমেই বলতে হয়, হিন্দি-গুজরাতী-মারাঠীরাও করেন। সাধারণ হিন্দি বলার সময় সবাই ক্ষত্রিয়কে শত্রিয় বলেন, লক্ষ্মণঝোলাকে লছমনঝোলাই বলে থাকেন। অর্থাৎ যে ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে বাঙলা দেশ থেকে সংস্কৃত উচ্চারণ লোপ পায়, সেই ধ্বনি পরিবর্তন অন্যান্য প্রদেশেও ঘটেছিল—যার ফলে লক্ষ্মী লছমন হয়ে যান। পরবর্তী যুগে দেশজ হিন্দি, বাঙলা, গুজরাতীর উপর যখন সংস্কৃত তার আধিপত্য চালাতে গেল তখন আর সব প্রদেশ সে আধিপত্য মেনে নিল, কিন্তু বাঙলা স্বীকার করল না। বাঙালি তখন সেই ধ্বনি পরিবর্তনের আইন মেনে নিয়ে সংস্কৃত শব্দও বাঙলা কায়দায় উচ্চারণ করতে লাগল। এস্থলে বাঙালি পৃথিবীর আর সব জাত যা করেছে তাই করল—ইংরেজ, ফরাসি অথবা জর্মন যখন তার ভাষাতে গ্রীক বা লাতিন শব্দ উচ্চারণ করে তখন সেগুলো আপন আপন ভাষার ধ্বনি পরিবর্তন দিয়েই করে, এমন কি গোটা বাক্যও আপন কায়দায় উচ্চারণ করে (ইংরেজ এবং ভারতীয় আইনজ্ঞেরা nisi শব্দকে লাতিন নিসি উচ্চারণ না করে নাইসাই করেন, a priori কে আ প্রিয়োরি না বলে এ প্রায়োরাই বলেন)। হিন্দি গুজরাতী মারাঠী ইত্যাদি ভাষা সাধারণ শব্দের ধ্বনি পরিবর্তন মেনে নিয়েছে (এমন কি মারাঠীরা জ্ঞানেশ্বরকে দানেশ্বর বলেন!), কিন্তু অপেক্ষাকৃত অচলিত সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত পদ্ধতিতে উচ্চারণ করে।

অর্থাৎ আমরা consistent এবং অন্যান্য প্রদেশ এ নীতিটা মানেন না।

অবাঙালিরা তাই ভাবেন আমরা সংস্কৃত উচ্চারণ 'বিকৃত' করে তার উপর 'অত্যাচার' করেছি।

কিন্তু ফলে দাঁড়িয়েছে এই যে, বাংলা খুব তাড়াতাড়ি স্বাধীন হতে পেরেছে। আজ যে বাঙলা সাহত্য হিন্দি, মারাঠী বা গুজরাতীকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে এগিয়ে যেতে পেরেছে, তার অন্যতম প্রধান কারণ আমরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছি। একবার ভেবে দেখলেই হয়, আমরা যদি আজও বিদ্যাসাগরী বাঙলা লিখতুম তাহলে 'মেজদিদি', 'বিন্দু', 'জ্যাঠাইমা' চরিত্র আঁকা অসম্ভবপর হত কি-না? ইংরেজের অত্যাচার-জর্জরিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে প্রশ্ন করলেন, 'এই ভূতের খাজনা দেবো কিসে?' উত্তরে বললেন,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'শ্মশান থেকে মশান থেকে, ঝোড়ো হাওয়ায় হা হা করে উত্তর আসে, আক্র দিয়ে, ইজ্জৎ দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে।' এ উত্তর কি বিদ্যাসাগরী বাঙলায় কখনো রূপ পেত?

ভাষা এবং সাহিত্য সৃষ্টিতে আমাদের স্বাধীন হবার প্রচেষ্টা দম্ভপ্রসূত নয়, সংস্কৃতের প্রতি অবজ্ঞানজনিত নয়। ধর্ম জানেন, ভট্টপল্লী, নবদ্বীপ তথা বাঙলা দেশে সংস্কৃত চর্চা অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় কিছুমাত্র কম নয়, কিন্তু বাঙলা বাঙলা এবং সংস্কৃত সংস্কৃত। বাঙলা ভাষা যখন আপন নিজস্বতা খুঁজছিল তখন সে জানত না যে ইংরিজি ফরাসি জর্মন একদা লাতিনের দাস্যবৃত্তি থেকে মুক্তিলাভ করেই যশস্বিনী হয়েছে। বাঙলার এই প্রচেষ্টা ভগবানের দান এবং এই প্রচেষ্টার ফল-স্বরূপ জন্মেছিলেন বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথ।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে এখনও বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন নি। প্রার্থনা করি, তাঁরা যেন মহত্তর রবীন্দ্রনাথ, বিরাটতম বঙ্কিম পান; কিন্তু ততদিন যদি আমরা এঁদের নিয়ে গর্ব না করি তবে আমাদের নিমক-হারামির অন্ত থাকবে না।

* * *

অবাঙালিরা যখন বাঙালির প্রতি বিরক্ত হন তখন তাদের মুখে অনেক সময়ই শুনতে পাওয়া যায়, তোমরা বাঙালিরা আর কিছু পারো না পারো একটা জিনিসে তোমরা যে ওস্তাদ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—তোমাদের কেউ যদি সামান্য একটুখানি কিছু করতে পারে, তবে তাই নিয়ে তোমরা এত লাফালাফি মাতামাতি, সোজা ইংরিজিতে তাকে এত 'বুসট' করো যে অবাঙালি পর্যন্ত সেই প্রোপাগাণ্ডার ঠ্যালায় শেষটায় মেনে নেয় যে, যাকে নিয়ে কথা হচ্ছে সে লোকটা সত্যি জব্বর কিছু একটা করেছে বটে। এই যেমন তোমাদের রবীন্দ্রনাথ।

বাঙালি মাত্রেই এরকম ধারা কথা শুনলে পঞ্চাশ গোনবার উপদেশটা যে নিতান্ত অর্বাচীনের ফতোয়া সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হয়ে অবাঙালিকে বেশ দু কথা শুনিয়ে দেয় এবং আমিও স্বীকার করি যে শোনবার হক তার তখন আলবত আছে।

আমি শোনাই না, কারণ আমি জানি অবাঙালি বেচারী পড়েছে মাত্র গীতাঞ্জলি, গার্ডেনার এবং চিত্রাঙ্গদার অনুবাদ। হয়তো আরও দু-একখানা পড়েছে কিন্তু তবু আমি বিশ্বাস করি যে, ইংরেজি যার মাতৃভাষা নয় তার পক্ষে বুঝে ওঠা কঠিন যে এগুলোর মধ্যে এমন কি কবিত্ব, এমন কি তত্ত্ব আছে, যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি খেতাব দিয়ে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করা যায়! ইয়েট্‌স্ সাহেব যখন গীতাঞ্জলিকে প্রশংসা করে সপ্তম স্বর্গে তোলেন তখন তার একটা অর্থ করা যায় ঃ—রবীন্দ্রনাথের ইংরিজিতে হয়তো এমন কোনো অদ্ভুত গীতিরস লুকোনো আছে যার স্বাদ পেয়ে ইংরিজিভাষী ইয়েট্‌স্ প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন কিন্তু আমার মত বাঙালি অতটা উচ্চাঙ্গ ইংরিজি জানে না এবং আর পাঁচজন অবাঙালি যদি আমারই মত হয় তাতে আমার রাগ করার কি আছে?

সাধারণ বাঙালি যখন অবাঙালির এই 'নীচ' আক্রমণে খার মার করে তেড়ে যায় তখন সে ধরে নিয়েছে যে অবাঙালি রবীন্দ্রনাথের উত্তম উত্তম কাব্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েও নিছক টিটেমি করে বাঙালির নিন্দে করছে। কাজেই ঝগড়াটা শুরু হয় ভুল-বোঝা নিয়ে। কিন্তু একবার ঝগড়া শুরু হয়ে গেলে কাদামাটি ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে দু-চারটে পাথরও ছোঁড়া হয়, তখন মানুষ জানা অজানাতে অন্যায় কথাও বলে ফেলে। তর্কের ঝোঁকে তখন অবাঙালি আমাদের অন্যান্য মহাপুরুষও যে কেবলমাত্র বিজ্ঞাপনের জোরেই খ্যাতনামা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়েছেন সে কথা বলতেও কসুর করেন না।

আমি বাঙালি, কাজেই আমার পক্ষে নিরপেক্ষ হওয়া কঠিন। তাই কি করে বুক ঠুকে বলি বলুন যে, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ঘোষের বিজ্ঞাপন দেবার প্রয়োজন আমরা কখনো অনুভব করি নি। এঁরা বাঙালির ধর্মজগতের গুরুর আসন গ্রহণ করে বাঙালি জাতটাকে গড়ে তুলেছেন। এ সত্যটা জানি এবং হিন্দি, গুজরাতী, মারাঠী, উর্দু নিয়ে চর্চা করছি বলে এ তথ্যটাও জানি যে ভগবান বোধ হয় বাঙালিকে নিতান্ত নিষ্কর্মা জেনেই দয়া করে একমাত্র তাকেই অকৃপণ হস্তে এতগুলি ধর্মগুরু দিয়ে ফেলার পর হুঁশিয়ার হয়ে অন্য প্রদেশগুলোর উপর কঞ্জুসি চালিয়েছেন।

আজকাল অবশ্যি ধর্ম রায়বাহাদুর খেতাব নিয়ে কি বাঙলা, কি বোম্বাই, কি দিল্লি সর্বত্রই পেনশন টানছেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য বিবেকানন্দ এবং দূর শিষ্য সুভাষচন্দ্র এবং দেবেন্দ্রনাথের শিষ্য রবীন্দ্রনাথ এই বাঙালির জাতীয়তাবোধ কতখানি জাগ্রত করে দিয়ে গেছেন, সে কথা আমরাই এখনো ভালো করে বুঝে উঠতে পারি নি—বিজ্ঞাপন দেবে কে, বুসট্ আপ করবার গরজ কার? হা ধর্ম!

রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশব সেন আমাদের অচলায়তনের অন্ধ প্রাচীরে অনেকগুলো জানলা তৈরি করে দিয়েছেন—তার ভিতর দিয়ে আমরা পশ্চিমের জ্ঞানবিজ্ঞানের সন্ধান পেলুম। শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য ও জনগণের সঙ্গে সে ঐতিহ্যের যোগসূত্র সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে দিয়ে গেলেন। তাই এক দিক দিয়ে আমরা যেমন বাইরের জিনিস নিতে শিখলুম, অন্য দিক দিয়ে ঠিক তেমনি আপন জিনিসকে অবহেলা না করে আপন সংস্কৃতি সভ্যতা গড়ে তুললুম।

সব চেয়ে স্বপ্রকাশ হয়েছে এই তত্ত্বটি আমাদের সাহিত্যে। মাইকেল খ্রিস্টান, নজরুল মুসলমান এবং প্রমথ চৌধুরীকে ফরাসি বললে কিছুমাত্র ভুল বলা হয় না। অথচ তিনজনই বাঙালি এবং তাঁরা যে সাহিত্য গড়ে তুলেছেন সেটি বাংলা সাহিত্য। কিন্তু এঁরাই শুধু নন, আর যে পাঁচজন বাঙালি সাহিত্য গড়ে তুলেছেন তাঁদের সকলেই জানা-অজানাতে আমাদের ধর্মগুরুদের উপদেশ সাহিত্যক্ষেত্রে মেনে নিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের দরদী ঘরোয়া সাহত্যের পশ্চাতে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের সরলতা, রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার পিছনে রয়েছে রামমোহনের বিদগ্ধ মনোবৃত্তি।

বহু আকস্মিক ঘটনা, বহু যোগাযোগের ফলে বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠেছে। ইংরেজি তথা ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান, সাহিত্যকলার চর্চা প্রধানত হয়েছিল কলকাতা এবং মাদ্রাজে। কিন্তু তামিল-ভাষাভাষীদের মধ্যে যাঁরা এসব দিকে আকৃষ্ট হলেন তাঁরা মাতৃভাষার সেবা করলেন না। ফলে তাঁরা বাঙালির চেয়ে ভালো ইংরিজি শিখলেন বটে—আদিও সে ইংরিজি সাহিত্যে স্থান পাবার উপযুক্ত হল না—কিন্তু তামিল ভাষা সমৃদ্ধ হতে পারল না। মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটের লোকমান্য টিলক (কথাটা তিলক নয়) এবং স্বামী দয়ানন্দ জন্মালেন বটে কিন্তু সে সব প্রদেশে ইউরোপীয় সাহিত্য প্রচেষ্টার যথেষ্ট প্রসার হল না বলে মারাঠী, গুজরাতী সাহিত্য আজও বাঙলার অনেক পিছনে।

অবজ্ঞাপ্রসূত প্রাদেশিক বিদ্বেষ তাহলে ঘুচবে কবে? যেদিন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অন্য প্রদেশের ভাষা শেখবার ব্যাপক ব্যবস্থা হবে সেদিন থেকে। ইংরেজ এ ব্যবস্থা করবার কোনো প্রয়োজন বোধ করে নি—তার কারণটাও অনায়াসে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বোঝা যায়—কিন্তু আমাদের বেশ ভালো করে মেনে নেওয়া উচিত, সর্বপ্রদেশের সর্বপ্রচেষ্টার সঙ্গে যদি আমাদের বহু ছাত্রছাত্রী বহু প্রাদেশিক ভাষার মাধ্যমে সংযুক্ত না হয়, তবে অবজ্ঞাপ্রসূত এ সব বিদ্বেষ কস্মিনকালেও যাবে না, এবং কেবলমাত্র রাষ্ট্রভাষা শিখলেই সব সমস্যার সমাধান হবে না।

প্রত্যেক ছাত্রই যে বারোটা প্রাদেশিক ভাষা শিখবে এ প্রস্তাব কেউ করবে না, মানবেও না। ব্যবস্থাটা হবে এই যে বহু ছাত্র মারাঠী, বহু ছাত্র গুজরাতী, অন্যেরা তালিম অথবা কানাড়া অথবা অন্য কোনো প্রাদেশিক ভাষা শিখবে, তারা ঐসব ভাষা থেকে উত্তম উত্তম পুস্তক বাঙলায় অনুবাদ করবে, ঠিক সেইরকম বাঙলা বইও নানা ভাষায় অনূদিত হবে। ফলে এক প্রদেশ অন্য প্রদেশের সাহিত্য চিনতে শিখবে এবং তারপরেও যদি বিদ্বেষ থেকে যায় তবে তার জন্য অন্তত আমাদের শিক্ষা-প্রদ্ধতিকে দোষ দেওয়া যাবে না।

কালো মেয়ে

কত করুণ দৃশ্য, কত হৃদয়বিদারক ঘটনা দেখি প্রতিদিন—সত্য বলতে কি, তাই রাস্তায় বেরুতে ইচ্ছে করে না—কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করেন, সব চেয়ে মর্মন্তুদ আমার কাছে কি লেগেছে, তবে বলব, আমাদের পাড়ার কালো মেয়েটি।

সকালবেলা কখন বেরিয়ে যায় জানি নে। সন্ধ্যের সময় বাড়ি ফেরে—আমি তখন রকে বসে চা খাচ্ছি। মাথা নিচু করে, ক্লান্ত শ্লথগতিতে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে চলে যায়। আজ পর্যন্ত আমাদের রকের দিকে একবারও ঘাড় তুলে তাকায়নি—আমার মনে হয়, এ জীবনে কোনোদিনই সে কোনো দিকে তাকিয়ে দেখে নি।

দেবতা ওকে দয়া করেন নি। রঙ কালো এবং সে কালোতে কোনো জৌলুস নেই—কেমন যেন ছাতা-ধরা-মসনে-পড়া ছাবড়া-ছাবড়া। গলার হাড় দুটি বেরিয়ে গিয়ে গভীর দুটো গর্ত করেছে, গায়ের কোথাও যেন একরত্তি মাংস নেই, গাল ভাঙা, হাত দুখানা শরের কাঠি, পায়ে ছেঁড়াচপ্পল, চুলে কতদিন হল তেল পরে নি কে জানে! আর সমস্ত মুখে যে কী বিষাদ আর ক্লান্তি তার বর্ণনা দেবার মত ভাষা আমার নেই। শুধু জানি—স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—দিনের পর দিন তার মুখের বিষাদ আর ক্লান্তি বেড়েই চলেছে। আরো জানি একদিন তাকে আর দেখতে পাবো না। শুনবো, যক্ষ্মা কিংবা অন্য কোনো শক্ত ব্যামোয় পড়েছে, কিংবা মরে গিয়েছে।

শুনলুম মাস্টারনীগিরি করে বিধবা মা আর ছোট ভাইকে পোষে। তার নাকি পয়সাওলা এক দাদাও আছে—সে থাকে অন্যত্র বউ নিয়ে, এদের দিকে তাকায় না।

বাপ দাদা করেছিলেন তাই আমিও ভগবানে বিশ্বাস করি গতানুগতিকতাকে, কিন্তু যদি এ মেয়ের কোনদিন বর জোটে তবেই ভগবানে আমার সত্যকার বিশ্বাস হবে।

জানি না জানি, এর চেয়েও অনেক বেশি নিদারুণ জিনিস সংসারে আছে, কলকাতাতেই আছে। কিন্তু আমি পাড়াগেঁয়ে ছেলে, মেয়েছেলে নিষ্ঠুর সংসারে লড়াই করে অপমান-আঘাত সহ্য করে টাকা রোজগার করে, এ জিনিস দেখা আমার অভ্যাস নেই,

www.BanglaBook.org

কখনো হবে না। গাঁয়ের মেয়েও খাটে—আমার মাও কম খাটতেন না—কিন্তু তাঁর খাটুনি তো বাড়ির ভিতরে। সেখানেও মান-অপমান দুঃখ-কষ্ট আছে স্বীকার করি,—কিন্তু এই যে পাড়ার কালো মেয়েটি, যে সকাল হতে না হতেই নাকে-মুখে দুটি গুঁজে, এর কনুই, ওর হাঁটুর ধাক্কা খেয়ে ট্রামে-বাসে উঠছে, দুপুর বেলা কিছু খাবার জুটবে না, জুটবে হয়তো হেড মিসট্রেসের নির্মম ব্যবহার, ছাত্রীদের অবজ্ঞা অবহেলা—হয়তো তার শ্রীহীনতা নিয়ে দু-একটা হৃদয়হীন মন্তব্যও তাকে শুনতে হয়। ক্লাস শেষ হলে সে খাতা দেখতে আরম্ভ করবে, সন্ধ্যার আবছায়ায় যখন ক্ষুদে লেখা পড়বার চেষ্টায় গর্তে-ঢোকা চোখ দুটো ফেটে পড়বার উপক্রম করবে তখন উঠবে বাড়ি ফেরার জন্য। আজ হয়তো বাসের পয়সা নেই, বাড়ি ফিরতে হবে হেঁটে হেঁটে। ক'মাইলের ধাক্কা আমি জানি নে।

কিন্তু জানি, আমি যে গ্রামে জন্মেছি, সেখানে এককালে সব মেয়েরই বর জুটত। ভালো হোক, মন্দ হোক জুটত এবং ছোট হোক, বড় হোক কোনো না কোনো সংসারে গিয়ে সে আশ্রয় পেত।

আজ আর সেদিন নেই। মধ্যবিত্ত পরিবারের কটি ছেলে আজ পয়সা কামাতে পারে যে বিয়ে করবে? এককালে গ্রামে সকলেরই দুমুঠো অন্ন জুটত—তা সে গতর খাটিয়ে, চাকরি করেই হোক, আর না করেই হোক—তাই শেষ পর্যন্ত শ্রীহীনা মেয়েরও বর জুটত। আজ যে দু-চারটি ছেলে পয়সা কামাবার সুযোগ পায়, তারা কনের বাজারে ঢুকে বেছে নেয় ডানাকাটা পরীদের। সাধারণ মেয়েরাও হয়ত বর পায়, শুধু শেষ পর্যন্ত পড়ে থাকে আমাদের পাড়ার মাস্টারনী আর তারই মত মলিনারা।

এ সমস্যা যে শুধু আমাদের দেশেই দেখা দিয়েছে তা নয়। বেকার-সমস্যা যেখানে থাকবে সেখানেই, ছেলেরা বিয়ে করতে নারাজ। মেয়েরাও বুঝতে পারে, বর পাবার সম্ভাবনা তাদের জীবনে কম, তাই তারাও কাজের জন্য তৈরি হয়—বাপ-মা তো একদিন মারা যাবেন, দাদারা তাকে পুষতে যাবে কেন? এই একান্ন পরিবারের দেশেই দাদারা ক্রমশ সরে পড়ছে, যে দেশ কখনো একান্ন পরিবার ছিল না সেখানে অরক্ষণীয়াকে পুষবে কে? কিন্তু আর আর দেশ আমাদের মত মারাত্মক গরিব নয় বলে টাইপিস্ট মেয়েটির পেট-ভরা অন্ন জোটে, মাস্টারনী যখন বাড়ি ফেরে তখন তার মুখে ক্লান্তি থাকলেও মাঝে মাঝে সিনেমা-থিয়েটার যাবার মত পয়সা সে কামায়ও বটে। বর জুটবে না, মা হতে পারবে না, সে দুঃখ তার আছে, কিন্তু ইয়োরোপের মেয়ের অনেকখানি স্বাধীনতা আছে বলে প্রেমের স্বাদ কিছুটা পায়। নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতার নিন্দা বা প্রশংসা করা আমার কর্ম নয়, ও দেশের মেয়েরা পরিণয়বন্ধনের বাইরে প্রেমের সন্ধানে ফিরুক, এ কথা বলাও আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু বলতে চাই, পশ্চিমের অরক্ষণীয়া তবু কোনো গতিকে বেঁচে থাকার আনন্দের কিছুটা অংশ পায়—আমাদের পাড়ার মেয়েটি যে এ জীবনে কোনো প্রকার আনন্দের সন্ধান পাবে সে দুরাশা আমি স্বপ্নেও করতে পারি নে।

এ মেয়ের দুরবস্থার জন্য দায়ী কে?

আমি সোজাসুজি বলবো, আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক কর্তারা। পাঠক জানেন, এ অধম সপ্তাহের পর সপ্তাহ লিখে যাচ্ছে, কিন্তু কারো নিন্দে সে কখনো করতে যায় নি। সে চেষ্টা করেছে আপনাদের আনন্দ দিতে—তারই ফাঁকে ফাঁকে যে সপ্তাহে সে তত্ত্ব বা তথ্য পরিবেশন করবার সুযোগ পেয়েছে, সেদিন তার আনন্দের অবধি থাকে

www.BanglaBook.org

নি; এর গলদ, ওর ত্রুটি নিয়ে সে আলোচনা বা গালাগালি করে কোনো সস্তা রুচিকে সে টক-ঝাল দিয়ে খুশি করতে চায় নি। কিন্তু এখন যদি না বলি যে আমাদের কর্তারা আজ পর্যন্ত দেশের অন্ন-সমস্যা সমাধানের জন্য কিছুই করতে পারেন নি, কোনো পরিকল্পনা পর্যন্ত করতে পারেন নি, তা হলে অধর্মাচার হবে। বেকার-সমস্যা ঘোচাতে পারুন আর নাই পারুন, মধ্যবিত্তকে অন্ন দিতে পারুন আর নাই পারুন, অন্তত তাঁরা যেন তরুণ-তরুণীদের মনে একটুখানি আশার সঞ্চার করে দিতে পারেন। ভালো করে ভাত না জুটলেও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে, যদি তার মনে আশা উদ্দীপ্ত করে দেওয়া যায়।

আমাদের কালো মেয়ের কোনো ভবিষ্যৎ নেই—এ কথা ভাবতে গেলে মন বিকল হয়ে যায়—কিন্তু এদের সংখ্যা বেড়েই চলবে, এ কথা ভাবলে কর্তাদের বিরুদ্ধে সর্বদেহমন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

আশাটুকুরও সঞ্চার যদি কর্তারা না করতে পারেন, তবে তাঁরা আসন ত্যাগ করে সরে পড়েন না কেন? হায়, অরক্ষণীয়ার অভিসম্পাতকেও এঁরা আর ভয় করেন না!

ঋতালী

ইসমাইলি খোজা সম্প্রদায়ের গুরুপুত্র প্রিন্স আলী খানের সঙ্গে শ্রীমতী ঋতা (স্পেনিশ ভাষায় যখন t অক্ষরের উচ্চারণ বাংলা 'ত'য়ের মত হয় তখন r টাকে 'ঋ' বানাতে কারো বড় বেশি আপত্তি করা উচিত নয়) হেওয়ার্থের শাদী হয়েছে আর বিয়ের দাওয়াতে নাকি হাজার দেড়েক বোতল শ্যাম্পেন খাওয়া হয়েছে।

ফ্রান্সের যে অঞ্চলে শাদীটা হয়েছে সেখানে শ্যাম্পেন মাগগী নয়। তবু যে বেশ কিছু পয়সা খরচা হয়েছে, সে বিষয়ে আমাদের মনে কোনো সন্দেহ নেই; কারণ জর্মনরা নাকি ফ্রান্স ত্যাগ করার পূর্বে প্রাণভরে শ্যাম্পেন খেয়ে ফ্রান্সের তাবৎ শ্যাম্পেনের গুদোম উজাড় করে দিয়ে যায়। বছর সাতেক না যাওয়া পর্যন্ত ১৯৪৫-এর শ্যাম্পেন খাওয়ার মত 'পরিপক্ক' হবে না।—কাজেই আলী খান নিশ্চয়ই ৪৫-এর আগেকার লুকোনো মাল গৌরীসেন পয়সা দিয়ে কিনেছেন। তা কিনুন, তাঁর পয়সার অভাব নেই। কিন্তু প্রশ্ন, মুসলমান ধর্মে যখন মদ বারণ তখন ধর্মগুরুর বড় ব্যাটা (পরে ইনিই গুরু হবেন) এ খবরটা ছাপতে দিলেন কোন্ সাহসে?

বোম্বায়ে যখন বাস করতুম তখন আলী খানের খোজা সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছিল। তখন কিছুদিন তাঁদের ইতিহাস, শাস্ত্র, আচার ব্যবহার নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিলুম। সেগুলি সত্যিই বহু রহস্যে ভরা।

খোজাদের বিশ্বাস, আদমকে সৃষ্টি করার সময় আল্লা তাঁর জ্যোতির খানিকটা তাঁর শরীরে ঢেলে দেন। সে জ্যোতি আদম থেকে বাংশানুক্রমে মহাপুরুষ মোসেজ (মুসা), নোয়া (নূহ), ইব্রাহাম (ইব্রাহিম), সলমন (সুলেমান), ডেভিড (দায়ুদ) হয়ে হয়ে শেষটায় মহাপুরুষ মুহম্মদের পিতামহে পৌঁছোয়। তারই এক অংশ তখন বর্তে মহম্মদে, অন্য অংশ তাঁর খুড়োর ছেলে আলীতে। আলী মুহম্মদের মেয়েকে বিয়ে করেন। তাঁর ছেলে হুসেনের শরীরে

www.BanglaBook.org

আবার সেই দ্বিখণ্ডিত জ্যোতি সংযুক্ত হয়। তারপর সেই জ্যোতি বংশানুক্রমে চলে এসেছে প্রিন্স আলী খানের পিতা আগা খানের শরীরে। তিনি মারা গেলে আলী খান সেই জ্যোতি পাবেন।

কিন্তু এই বিশ্বাসের সঙ্গে ভারতবর্ষের খোজারা আরেকটা বিশ্বাস জুড়ে দিয়েছেন। সে মত অনুসারে খোজারা বিশ্বাস করেন, বিষ্ণু নয়বার মৎস্য কূর্ম ইত্যাদি রূপে পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছেন এবং দশমবারে কল্কিরূপে যে অবতীর্ণ হওয়ার কথা আছে, সেও খাঁটি; কিন্তু হিন্দুরা জানে না যে কল্কি বহুদিন হল অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছেন আলীরূপে মক্কা শহরে। এবং শুধু তাই নয়, সেই কল্কি অবতারের জ্যোতি তাঁর ছেলে হুসেনে বর্তে ক্রমে ক্রমে বংশপরম্পরায় নেমে এসে উপস্থিত বিরাজ করছে আলী খানের পিতা আগা খানের শরীরে।

তাই হজরত আলী হলেন কল্কি অবতার এবং সেই কল্কির জ্যোতি আগা খানের শরীরে আছে বলে তিনিও কল্কি অবতার। তাই খোজা ধর্মগ্রন্থে আগা খানের সম্পূর্ণ নাম লেখা হয় 'দশবাঁ নকলঙ্কী অবতার আগা সুলতান মুহম্মদ সাহ'।

কিন্তু প্রশ্ন, খোজারা এই অদ্ভুত সংমিশ্রণ করল কি প্রকারে? অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, দশম-একাদশ শতাব্দীতে ইরানের ইসমাইলি সম্প্রদায় আপন দল বাড়াবার জন্য চতুর্দিকে মিশনারি পাঠান। (আরো নানা সম্প্রদায় তখনকার দিনে ইরানের বন্দর আব্বাস থেকে জাহাজে করে সমুদ্রতীরবর্তী সিন্ধু প্রদেশ আর কাঠিয়াওয়াড়ে এসে আপন আপন মতবাদ প্রচার করতেন)। এই মিশনারিদের উপর কড়া হুকুম ছিল, দল বাড়াবার জন্য কারো ধর্মমত যদি খানিকটা গ্রহণ করতে হয় তাতে কোনো আপত্তি নেই—মোদ্দা কথা হচ্ছে, সংখ্যাবৃদ্ধি যে করেই হোক করতে হবে।

এই মিশনারিদের একজন এসে কাজ আরম্ভ করেন কাঠিয়াওয়াড় এবং কচ্ছের লোহানা রাজপুত সম্প্রদায়ের মধ্যে। এঁরা ছিলেন বৈষ্ণব—কিন্তু পাঞ্চরাত্র মতবাদের। এঁরা ইসমাইলি মতবাদের দিকে কেন আকৃষ্ট হলেন তার খবর পাওয়া যায় না। কিন্তু এঁরা যে এই নূতন ধর্ম গ্রহণ করার সময় বিষ্ণুর অবতারবাদটা সঙ্গে এনেছিলেন, সে কথাটা আজও খোজাদের 'জমাতখানা'তে (খোজারা অন্যান্য মুসলমানদের মসজিদে যান না, তাঁদের আপন মসজিদের নাম 'জমাতখানা' বা সম্মেলনালয়) প্রকাশ পায় তাঁদের উপাসনার সময়। সর্বপ্রথম বিষ্ণুর নয় অবতারের নাম স্মরণ করা হয় বসে বসে এবং দশম অবতার আলী এবং হিজ হাইনেস দি আগা খানের নাম আরম্ভ হতেই সবাই উঠে দাঁড়ান।

গোঁড়া খোজারা বিশ্বাস করেন, স্বর্গে ঈশ্বর নেই। তিনি শরীর ধারণ করে আছেন আগা খান রূপে।

চন্দ্র, সূর্য তাঁর আদেশে চলে, তিনিই ইচ্ছে করলে এক মুহূর্তে সব সৃষ্টি ধ্বংস করতে পারেন, নূতন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও সৃষ্টি করতে পারেন।

এরকম বিশ্বাস যে বিংশ শতাব্দী—বা অন্য যে কোনো শতাব্দীতে—কেউ করতে পারে সেটা আমার ধারণার বাইরে ছিল, কিন্তু যখন স্বকর্ণে শুনলুম, তখন আর অবিশ্বাস করি কি প্রকারে?

ভারতবর্ষে সুন্নি সম্প্রদায় খোজাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে অজ্ঞ। কিন্তু ইরাণের সুন্নিরা অনেক কিছু জানেন বলে খোজা এবং তাঁদের জনক সম্প্রদায় ইসমাইল মতবাদকে বিধর্মী বলে ফতোয়া দিয়েছেন। কোরানে যখন বিষ্ণু এবং নয় অবতারের উল্লেখ নেই, এবং

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যেহেতু কোরান অবতারদের বিরুদ্ধে আপন বক্তব্য সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে তখন সুন্নি মতবাদ যে খোজা সম্প্রদায়কে বিধর্মী বলবে, তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? খোজারা অবশ্য তা নিয়ে মাথা ঘামান না, কারণ খোজার যদিও কোরানকে 'ভালো কেতাব' রূপে স্বীকার করেন, তবু কর্মক্ষেত্রে তাঁরা মানেন কচ্ছী এবং গুজরাতী ভাষায় লিখিত নিজস্ব 'গিনান' গ্রন্থাবলীকে। 'গিনান' শব্দ সংস্কৃত 'জ্ঞান' শব্দ থেকে বেরিয়েছে এবং এ সব গিনান লিখেছেন খোজা ধর্মগুরুরা।

খোজারা তিনবার নামাজ পড়েন, এবং রোজার মাসে মাত্র একদিন উপোস করেন। তাও বেলা বারোটা পর্যন্ত।

কিন্তু সব চেয়ে বড় তত্ত্বকথা, আগা খান এত টাকা পেলেন কোথায়? তাঁর ঠাকুর্দা তো ইরান থেকে পালিয়ে এসেছিলেন গত শতকের মাঝামাঝি। এইখানেই খোজা ধর্মের গুহ্যতত্ত্ব লুক্কায়িত।

প্রতি জামাতখানাতে একটা করে প্রকাণ্ড লোহার সিন্দুক থাকে। প্রতি অমাবস্যা পূর্ণিমায় প্রত্যেক খোজা এই সিন্দুকে আপন মুনাফা (কোনো কোনো স্থলে আমদানির) থেকে অষ্টমাংস ফেলে দেয় এবং এই সব টাকা যায় আগা খানের তহবিলে। তা ছাড়া পালা-পরবে দান বলতে যা কিছু বোঝায় সবই ফেলা হয় এই সিন্দুকে এবং বহু খোজা মরার আগে তার তাবৎ ধনসম্পত্তি গুরু আগা খানের নামে উইল করে দিয়ে যায়। খোজা সম্প্রদায়ের কারবার ব্যবসা জগৎজোড়া—শাঙ্গাই থেকে জিব্রাল্টার পর্যন্ত। কাজেই আগা খানের মাসিক আয় কত তার হিসাব নাকি স্বয়ং আগা খান ছাড়া কেউ জানে না।

তা জেনে আমাদের দরকারও নেই। এবং আমি জানি, এত সব তত্ত্বকথা শোনার পরও পাঠক শুধাবেন, কিন্তু যে শ্যাম্পেন নিয়ে আরম্ভ করেছিলে তার তো কোনো হিল্লে হল না। মদ যখন বারণ তখন আলী খান শ্যাম্পেন খান কি প্রকারে? তবে কি শ্যাম্পেন মদ নয়?

বিলক্ষণ! শ্যাম্পেনে আছে শতকরা প্রায় পনেরো অংশ মাদকদ্রব্য বা এলকহল। এবং যেহেতু শ্যাম্পেন খুললেই সোডার মত বুজবুজ করে, তাই তাতে আছে ছোট ছোট বুদ্বুদ। সেগুলো পেটে গিয়ে খোঁচা দেয় বলে নেশা হয় চট করে এবং স্টীল ওয়াইন বা শান্ত মদের তুলনায় অনেক বেশি। তবে?

খোজারা বলেন, 'আলী খান একদিন স্বয়ং কল্কি অবতারের জ্যোতি পাবেন বলে তিনি এখন থেকেই পূতপবিত্র। কোনো বস্তু তাঁকে অপবিত্র করতে পারে না। তাই অপবিত্র মদ তাঁর হস্তস্পর্শ লাভ করা মাত্রই পবিত্র হয়ে যায়।'

এতক্ষণ যা নিবেদন করলুম, সেগুলো দলিল দস্তাবেজ অর্থাৎ খোজাদের শাস্ত্র-গ্রন্থ থেকে প্রমাণ করা যায়, কিন্তু এবারে যেটি বলব সেটি আমার শোনা গল্প—এক নাস্তিক খোজার কাছ থেকে।

একদিন নাকি খানা খেতে খেতে পঞ্চম জর্জ আগা খানকে জিজ্ঞেস করেন, এ কথা কি সত্যি, ইয়োর হাইনেস, যে, আপনার চেলারা আপনাকে পুজো করে?'

আগা খান নাকি উত্তরে বলেছিলেন, 'তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে, ইয়োর ম্যাজেস্টি? মানুষ কি গোরুকেও পুজো করে না?'

উত্তরটার দর আমি আর যাচাই করলুম না॥

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও ইয়োরোপীয় সুরধারা

প্রায়ই প্রশ্ন শুনতে পাওয়া যায়, ইয়োরোপ রবীন্দ্রনাথকে কতখানি চিনতে পেরেছিল, আর আজ যে ইয়োরোপে রবীন্দ্রনাথের নাম কেউ বড় একটা করে না তার কারণ কি?

এ প্রশ্নের উত্তর দেবার পূর্বে আরেকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। সে প্রশ্ন স্বগত—আমরা, অর্থাৎ বাঙালিরাই রবীন্দ্রনাথকে কতখানি চিনি? রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা, নাট্যনির্মাণক্ষমতা, দার্শনিক চিন্তাশক্তি, সার্বভৌমিক ধর্মানুভূতি, ঔপন্যাসিক অন্তর্দৃষ্টি, বৈজ্ঞানিক কৌতূহল, ঐতিহ্যগত শিক্ষাদান প্রচেষ্টা বৈয়াকরণিক অনুসন্ধিৎসা—সব কিছু মিলিয়ে তাঁর অখণ্ডরূপ হৃদয়মনে আঁকার কথা দূরে থাক, যেখানে তিনি ভারতের তথা পৃথিবীর সব কবিকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন তারই সম্পূর্ণ পরিচয় পেয়েছেন কজন বাঙালি?

কবিতার কথাই ধরা যাক। সেখানে দেখি কেউ কেউ 'কল্পনা' ছাড়িয়ে কবির সঙ্গে কল্পলোকে 'হংসবলাকা'র পাখা মেলতে নারাজ, কেউবা 'মহুয়া'তে পৌঁছে বঁধূকে, 'মহুয়া' নাম ধরে ডেকেই সন্তুষ্ট, আর 'রোগশয্যায়' কবিকে সঙ্গ দিতে রাজী অতি অল্প দুঃসাহসী রসজ্ঞ। কাউকে দোষ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়; আমি নিজে গুরুদেবের গদ্যকবিতার রস পাই না। কাজেই আমরা সকলেই পরমানন্দে অন্ধের হস্তীদর্শন করছি—কিন্তু আমাদের চরম সান্ত্বনা, এ সংসারের অধিকাংশ অন্ধ আপন আপন যষ্টি ত্যাগ করে বৃহত্তর লোকের ক্ষীণতম আভাস পাওয়ার জন্য অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ উদ্‌গ্রীব নয়।

এ-কথাও বলা বৃথা যে রবীন্দ্র-কাব্যের সম্পূর্ণ রস পাই আর না-ই পাই, তাঁর কাব্যজগতের মূল সুরটি আমরা ধরতে পেরেছি। মনে পড়ছে বিশ্বভারতীর সাহিত্যসভায় এক তরুণ লেখক রবীন্দ্রনাথ ও কালিদাসের কাব্যে প্রধান দুটি মিল দেখিয়ে একখানা সরেস প্রবন্ধ পড়েছিলেন—বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ও কালিদাস উভয়েই বর্ষার ও প্রেমের কবি। প্রবন্ধ পাঠ শেষ হলে সভাপতিরূপে কবিগুরু লেখাটির প্রচুর প্রশংসা করে বলেন যে, 'যদিও মিল দুটি স্বকার্য তৎসত্ত্বেও প্রশ্ন এই দুই বস্তু বাদ দিয়ে ভারতীয় কোন কবি কি লিখতে পারতেন? রবীন্দ্রনাথ সালঙ্কার আপন বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন,—এতদিন পরে স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে তার প্রতিবেদন দেওয়া আমার পক্ষে 'সাহিত্যিক' সাধুতার পরিচায়ক হবে না, তবে ভাবখানা অনেকটা এই ছিল যে রাফায়েল মাদোন্না এঁকেছেন, অজন্তাকারও মাতাপুত্র এঁকেছেন কিন্তু দুজনের ভিতর সত্যিকার মিল কতদূর?

অর্থাৎ রবীন্দ্র-কাব্যের মূল সুর যদি এই শ্রেণীরই হয় তবে তার কোনো মূল্য নেই।

(এস্থলে অবান্তর হলেও একটি কথা না বললে হয়তো প্রবন্ধলেখকের প্রতি অন্যায় করা হবে। যদিও রবীন্দ্রনাথের মতে প্রবন্ধটি স্বতঃসিদ্ধ বস্তু সপ্রমাণ করে ব্যর্থতার প্রমাণ দিয়েছিল তবু সভাস্থ আর পাঁচজন সে মত পোষণ করেন নি, এবং বিশ্বভারতীর যে কোনো ছাত্র এ রকম প্রবন্ধ লিখতে পারলে আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন।)

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভার মহত্তম এবং সুন্দরতম বিকাশ তাঁর গানে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলতেন যে তিনি তাঁর গানে প্রকৃতিকেও হারাতে পেরেছেন এবং সে গর্বটুকু একটা গানে অতি অল্প কথায় প্রকাশ করেছেন ঃ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আজ এনে দিলে, হয়ত দিবে না কাল—
রিক্ত হবে যে তোমার ফুলের ডাল।
এ গান আমার শ্রাবণে শ্রাবণে
তব বিস্মৃতি স্রোতের প্লাবনে
ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে তরণী
বহি তব সম্মান॥

শুধু কদম ফুল। প্রকৃতির কত নগণ্য সৌন্দর্যবস্তু, মানুষের মত উচ্চা আশা-আকাঙ্ক্ষা, ক্ষুদ্র দুঃখ-দৈন্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত স্পর্শমণির স্পর্শে হেমকান্ত সফল পরিপূর্ণতায় অজরামর হয়ে গিয়েছে, এবং ভবিষ্যতে,—ক্যাথলিকদের ভাষায় বলি,—ক্যাননাইজ্‌ড হয়ে যুগ যুগ ধরে বাঙালির স্পর্শকাতর হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি আকর্ষণ করবে।

অথচ আজকের দিনে এ-কথাও সত্য সে অল্প বাঙালিই রবীন্দ্রনাথের আড়াই হাজার গানের আড়াইশ গান শোনবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

তবে কি আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিত্বে প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় পাই নি? সেকথাও সত্য নয়। আমরা এতক্ষণ বাঙালি যুধিষ্ঠিরকে শুধু তাঁর নরক দর্শন করাচ্ছিলুম এবং সেই সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করছিলুম যে বাঙালির পক্ষেও যদি রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণরূপে চেনা এত কঠিন হয় তবে অবাঙালির পক্ষে, বিশেষত সাহেবের পক্ষে—তা তিনি ইংরেজই হোন আর জর্মনই হোন—সম্পূর্ণ অসম্ভব।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রবীন্দ্রনাথ যখন ইউরোপ যান তখন তিনি বিশেষ করে জর্মনীতে রাজাধিরাজের সম্মান পান। সে সম্মানের কাহিনী বিশ্বভারতী লাইব্রেরিতে নানা ভাষায় সযত্নে রক্ষিত আছে।

তারপর রবীন্দ্রনাথ আবার জর্মন যান ১৯৩০ সালে। মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশস্ততম গৃহে রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কি এক জয়ন্তী উপলক্ষে সমস্ত জর্মনির বিদ্বজ্জন তখন মারবুর্গে সমবেত; তাঁরা সকলেই সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজিতে ধর্ম সম্বন্ধে একটি রচনা পাঠ করেন। অধ্যাপক অটো সে বক্তৃতার জর্মন অনুবাদ করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় রচনা পাঠ শুনেছিল এবং পাঠ শেষ হলে যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাধ্বনি উঠেছিল, তার তুলনা দেবার মত ভাষা আমার নেই।

সেদিন বিকেলবেলা মারবুর্গের পুস্তকবিক্রেতাদের দোকানে গিয়ে অনুসন্ধান করলুম, রবীন্দ্রনাথের কোন্ কোন্ পুস্তকের জর্মন অনুবাদ পাওয়া যায়। নির্ঘণ্ট শুনে আশ্চর্য হলুম—গীতাঞ্জলি, গার্ডেনার, চিত্রা, ডাকঘর, সাধনা এবং নেশানালিজম! মাত্র এই কখানি বই নিয়ে আর ইংরেজি ভাষায় একটি বক্তৃতা শুনে জর্মনরা এত মুগ্ধ! আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এবং এখনো আছে যে ইংরেজি বা জর্মনে এই কখানা বই পড়ে রবীন্দ্রনাথের আসল মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব।

তখনই আমার বিশ্বাস হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে জর্মনির এই উচ্ছ্বাস দীর্ঘস্থায়ী হবে না। গীতাঞ্জলির ধর্মসঙ্গীত জর্মন মনকে চমক লাগাতে পারে, গার্ডেনারের প্রেমের কবিতাও জাদু বানাতে পারে, সাধনার রচনাও বিদ্যুৎশিখার মত ঝলকাতে পারে কিন্তু এসব দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠতর এবং শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টির অনুবাদ অপরিহার্য।

কিন্তু কোনো ব্যাপক অনুবাদকার্য কেউ হাতে তুলে নেন নি। তার কারণ অনুসন্ধান

www.BanglaBook.org

করতে হলে অনেক গবেষণার প্রয়োজন। উপস্থিত শুধু সব চেয়ে বড় দুঃখটা নিবেদন করি।

রবীন্দ্রনাথের গানের মত হুবহু গান জর্মনে আছে এবং সেগুলি জর্মনদের বড় প্রিয়। এগুলোকে 'লীডার' বলা হয় এবং শুধু লীডার গাইবার জন্য বহু জর্মন গায়ক প্রতি বৎসর প্যারিস, লন্ডন যায়। এসব লীডারের কোনো কোনো গানের কথা দিয়েছেন গ্যোটের মত কবি, আর সুর দিয়েছেন বেটোফোনের মত সঙ্গীতকার।

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের গানে গ্যোটে বেটোফেনের সমন্বয়। একাধারে এই দুই সৃজন পন্থার সম্মেলন হয়েছিল বলে রবীন্দ্র-সঙ্গীত জর্মন লীডারের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। অনুভূতির সূক্ষ্মতা, কল্পনার প্রসার, এবং বিশেষ করে সুর ও কথার অঙ্গাঙ্গী বিজড়িত অর্ধনারীশ্বর পৃথিবীর কোনো গান বা 'লীডার' জাতীয় সৃষ্টিতে আজ পর্যন্ত অবতীর্ণ হন নি—রবীন্দ্রসঙ্গীতের যে রকম হয়েছে।

বাঙালিকে বাদ দিলে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রকৃত মূল্য একমাত্র জর্মনিই ঠিক বুঝতে পারবে।

কোনো ব্যাপক অনুবাদ তো হ'লই না, এমন কি রবীন্দ্রনাথের গানও জর্মন-কণ্ঠে গীত হ'ল না।

কাজেই 'সাত দিনের ভানুমতি' আট দিনের দিন কেটে গেল। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যেদিন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মত অনুবাদক কবি ইয়োরোপে জন্মাবেন সেদিন ইয়োরোপ

'চিনে নেবে চিনে নেবে তারে।'॥

শ্রমণ রিয়োকোয়ান

বাস্তুবাড়ি আমূল ভস্মীভূত হওয়ার পরমুহূর্তেই ক্ষতির পরিমাণটা ঠিক কতদূর হয়েছে অনুমান করা যায় না। যেমন যেমন দিন যায়, এটা ওটা সেটার প্রয়োজন হয় তখন গৃহস্থ আস্তে আস্তে বুঝতে পারে তার ক্ষতিটা কত দিক দিয়ে তাকে পঙ্গু করে দিয়ে গিয়েছে।

ইংরেজ রাজত্বের অবসান হয়েছে। আগুন নিবেছে বলে উপস্থিত আমরা সকলেই ভারী খুশি কিন্তু ক্ষতির খতিয়ান নেবার সময়ও আসন্ন। যত শীঘ্র আমরা এ-কাজটা আরম্ভ করি ততই মঙ্গল।

ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্পের যে ক্ষতি হয়েছে সে সম্বন্ধে আমরা ইচ্ছা-অনিচ্ছায় অহরহ সচেতন হচ্ছি কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কৃতি বৈদগ্ধ্যলোকে আমাদের যে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে গিয়েছে তার সন্ধান নেবার প্রয়োজন এখনো আমরা ঠিক ঠিক বুঝতে পারি নি। অথচ নূতন করে সব কিছু গড়তে হলে যে আত্মবিশ্বাস, আত্মাভিমানের প্রয়োজন হয় তার মূল উৎস সংস্কৃতি এবং বৈদগ্ধ্যলোকে। হটেনটট্‌দের মত রাষ্ট্রস্থাপনা করাই যদি আমাদের আদর্শ হয় তবে আমাদের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির কোন প্রকার অনুসন্ধান করার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি আর পাঁচটা সর্বাঙ্গসুন্দর রাষ্ট্রের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবার বাসনা আমাদের মনে থাকে তবে সে প্রচেষ্টা 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ'।

www.BanglaBook.org

আত্মাভিমান জাগ্রত করার অন্যতম প্রধান পন্থা, জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে সে-ও একদিন উত্তমর্ণ ছিল, ব্যাপক অর্থে সে-ও মহাজনরূপে বহু দেশে সুপরিচিত ছিল।

কোন্ দেশ কার কাছে কতটা ঋণী, সে তথ্যানুসন্ধান বড় বড় জাল পেতে আরম্ভ হয় গত শতাব্দীতে। ভৌগোলিক অন্তরায় যেমন যেমন বিজ্ঞানের সাহায্যে লঙ্ঘন করা সহজ হতে লাগল, অন্যের ইতিহাস পড়বার সুযোগও তেমনি বাড়াতে লাগল। কিন্তু সে-সময়ে আমরা সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত, ইংরেজের সম্মোহন মন্ত্রের অচৈতন্য অবস্থায় তখন সে যা বলেছে আমরা তাই বলেছি, সে যা করতে বলেছে তাই করেছি।

আমাদের কাছে কে কে ঋণী সে-কথা বলার প্রয়োজন ইংরেজ অনুভব করে নি, আমরা যে তার কাছে কত দিক দিয়ে ঋণী সে কথাটাই আমাদের কানের কাছে অহরহ ট্যাঁটরা পিটিয়ে শুনিয়েছে। কিন্তু ইংরেজ ছাড়া আরো দু-চারটে জাত পৃথিবীতে আছে, এবং ইংরেজই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ভুবনবরেণ্য মহাজন জাতি এ-কথা স্বীকার করতে তারা প্রস্তুত নয়, এমন কি ইংরেজ যার উপর রাজত্ব করেছে সে যে একদিন বহু দিক দিয়ে ইংরেজের চেয়ে অনেক বেশি সভ্য ছিল সে-কথাটা প্রচার করতেও তাদের বাধে না। বিশেষ করে ফরাসি এবং জর্মন এই কর্মটি পরমানন্দে করে থাকে। কোনো নিরপেক্ষ ইংরেজ পণ্ডিত কখনো জন্মান নি, এ-কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় কিন্তু অনুভূতির সঙ্গে দরদ দিয়ে ভারতবাসীকে 'তোমরা ছোট জাত নও' এ-কথাটি বলতে ইংরেজের চিরকালই বেধেছে।

তাই ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমরা খবর পেলুম যে চীন ও জাপানের বহুলোক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং বৌদ্ধধর্ম চীন ও জাপানের আত্মবিকাশ বহু দিক দিয়ে যুগ-যুগ ধরে সাহায্য করেছে, তবু সেই গানের ভিতর দিয়ে আমরা এঁদের সঙ্গে নূতন কোনো যোগসূত্র স্থাপনা করতে পারলুম না। এমন সময় এসেছে, চীন ও জাপান যে-রকম এ-দেশে বৌদ্ধ ঐতিহ্যের অনুসন্ধানে অধিকতর সংখ্যায় আসবে ঠিক তেমনি আমাদেরও খবর নিতে হবে চীন এবং জাপানের উর্বর ভূমিতে আমাদের বোধিবৃক্ষ পাপী-তাপীকে কি পরিমাণ ছায়া দান করেছে।

এবং এ-কথাও ভুললে চলবে না যে প্রাচ্যলোকে যে তিনটি ভূখণ্ড কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে যশ অর্জন করেছে তারা চীন ভারতবর্ষ ও আরবভূমি। এবং শুধু যে ভৌগোলিক হিসাবে ভারতবর্ষ আরব ও চীন ভূখণ্ডের ঠিক মাঝখানে তা নয়, সংস্কৃতি সভ্যতার দিক থেকেও আমরা এই দুই ভূখণ্ডের সঙ্গমস্থলে আছি। এক দিকে মুসলমান ধর্ম ও সভ্যতা এ-দেশে এসে আমাদের শিল্পকলাকে সমৃদ্ধ করেছে, আবার আমাদের বৌদ্ধধর্মের ভিতর দিয়ে আমরা চীন-জাপানের সঙ্গে সংযুক্ত। কাজেই ভারতবাসীর পক্ষে আর্য হয়েও এক দিকে যেমন সেমিতি (আরব) জগতের সঙ্গে তার ভাবের আদান প্রদান চলে, তেমনি চীন-জাপানের (মঙ্গোল) শিল্পকলা চিন্তাধারার সঙ্গেও সে যুক্ত হতে পারে। অথচ চীন আরব একে অন্যকে চেনে না।

তাই পূর্ব-ভূখণ্ডে যে নবজীবন সঞ্চারের সূচনা দেখা যাচ্ছে, তার কেন্দ্রস্থল গ্রহণ করবে ভারতবর্ষ। (ব্যবসা-বাণিজ্যের দৃষ্টিবিন্দু থেকে আমাদের লক্ষপতিরা এ তথ্যটি বেশ কিছুদিন হল হৃদয়ঙ্গম করে ফেলেছেন—জাপান হাট থেকে সরে যেতেই অহমদাবাদ ডাইনে, পারস্য-আরব বাঁয়ে জাভা-সুমাত্রাতে কাপড় পাঠাতে আরম্ভ করেছে।) ভৌগোলিক ও কৃষ্টিজাত উভয় সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ যদি আপন আসন গ্রহণ না করে তবে

www.BanglaBook.org

দোষ ভগবানের নয়।

উপস্থিত দেখতে পাচ্ছি, আমাদের মৌলভী-মৌলানারা আরবী-ফারসী জানেন। এঁরা এত দিন সুযোগ পান নি—এখন আশা করতে পারি, আমাদের ইতিহাস-লিখনের সময় তাঁরা 'আরবকে ভারতের দান' অধ্যায়টি লিখে দেবেন ও যে স্থপতিকলা মোগল নামে পরিচিত তার মধ্যে ভারতীয় ও ইরান-তুর্কী কিরূপে মিশ্রিত হয়েছে সে বিবরণ লিপিবদ্ধ করবেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমরা চীন এবং জাপানের ভাষা জানি নে। (বিশ্বভারতীর 'চীনা-ভবনে'র দ্বার ভালো করে খুলতে হবে, এবং সেই চীনা-ভবনকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে চীন সভ্যতার অধ্যয়ন আলোচনা আরম্ভ করতে হবে।)

জাপান সম্বন্দে আমাদের কৌতূহল এতই কম যে জাপানে বৌদ্ধধর্মের সম্প্রসারণ সম্বন্ধে আমাদের কোনো জ্ঞানই নেই। (তাই শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র বীরভদ্র রাও চিত্র যখন তাঁর 'শিল্পী' কাগজে জাপানে সংগৃহীত ভারতীয় সংস্কৃতির নিদর্শন প্রকাশ করেন তখন অল্প পাঠকই সেগুলো পড়েন। বিশ্বভারতীর আরেক প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান্ হরিহরণ সাত বৎসর জাপানে থেকে উৎসাহের অন্ত নেই—তাঁর স্ত্রীও জাপানী মহিলা—কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো বিদ্যার্থী তাঁর কাছে উপস্থিত হয় নি।)

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধ-লেখক জাপানী ভাষা জানে না। কিন্তু তার বিশ্বাস, জাপান সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে কৌতূহল জাগাবার জন্য ইংরিজি এবং অন্যান্য ভাষায় লেখা বই দিয়ে যতটা সম্ভবপর ততটা কাজ আরম্ভ করে দেওয়া উচিত। জাপানী ছাড়া অন্য ভাষা থেকে সংগৃহীত প্রবন্ধে ভুল থাকার সম্ভাবনা প্রচুর, তাই প্রবন্ধ-লেখক গোড়ার থেকেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে।

ভারতবর্ষীয় যে-সংস্কৃত চীন এবং জাপানে প্রসারলাভ করেছে সে-সংস্কৃতি প্রধানত বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষীয় তথা চৈনিক বৌদ্ধধর্ম ও জাপানী বৌদ্ধধর্ম এক জিনিস নয়—তুলনাত্মক ধর্মতত্ত্বর এক প্রধান নীতি এই যে, প্রত্যেক ধর্মই প্রসার এবং বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন বাতাবরণের ভিতর নূতন নূতন রূপ ধারণ করে। জেরুজালেমের খ্রিস্টধর্ম ও প্যারিসের খ্রিস্টধর্ম এক জিনিস নয়, মিশরী মুসলিমে ও বাঙালি মুসলিমে প্রচুর পার্থক্য।

জাপানে যে-বৌদ্ধধর্ম বিস্তৃত লাভ করেছে সে-ধর্মও দুই দিক থেকে চর্চা করতে হবে। প্রথমত, জাপানীতে অনূদিত ও লিখিত বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ, —এ কর্ম করবেন পণ্ডিতেরা, এবং এঁদের কাজ প্রধান গবেষণামূলক হবে বলে এর ভিতর সাহিত্য-রস থাকার সম্ভাবনা কম। দ্বিতীয়ত, জাপানী শ্রমণ-সাধু-সন্তদের জীবনী-পাঠ। আমার বিশ্বাস, উপযুক্ত লেখকের হাতে পড়লে সে-সব জীবনী নিয়ে বাঙলায় উত্তম সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে।

অধ্যাপক য়াকব ফিশারের লেখা বৌদ্ধ শ্রমণ রিয়োকোয়ানের জীবনী পড়ে আমার এ-বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়েছে। অধ্যাপক ফিশার জাতে জর্মন, রিয়োকোয়ান জাপানী ছিলেন,—কিন্তু শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে বইখানি লেখা হয়েছে বলে সার্থক সাহিত্য সৃষ্ট হয়েছে। পুস্তকখানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগার সামান্য কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল বলে এ-দেশে প্রচার এবং প্রসার লাভ করতে পারে নি। বইখানি ইংরিজিতে লেখা, নাম Dew drops on a Lotus Leaf। আর কিছু না হোক, নামটি আমাদের কাছে অচেনা নয়—'নলিনীদল-

www.BanglaBook.org

আত্মাভিমান জাগ্রত করার অন্যতম প্রধান পন্থা, জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে সে-ও একদিন উত্তমর্ণ ছিল, ব্যাপক অর্থে সে-ও মহাজনরূপে বহু দেশে সুপরিচিত ছিল।

কোন্ দেশ কার কাছে কতটা ঋণী, সে তথ্যানুসন্ধান বড় বড় জাল পেতে আরম্ভ হয় গত শতাব্দীতে। ভৌগোলিক অন্তরায় যেমন যেমন বিজ্ঞানের সাহায্যে লঙ্ঘন করা সহজ হতে লাগল, অন্যের ইতিহাস পড়বার সুযোগও তেমনি বাড়াতে লাগল। কিন্তু সে-সময়ে আমরা সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত, ইংরেজের সম্মোহন মন্ত্রের অচৈতন্য অবস্থায় তখন সে যা বলেছে আমরা তাই বলেছি, সে যা করতে বলেছে তাই করেছি।

আমাদের কাছে কে কে ঋণী সে-কথা বলার প্রয়োজন ইংরেজ অনুভব করে নি, আমরা যে তার কাছে কত দিক দিয়ে ঋণী সে কথাটাই আমাদের কানের কাছে অহরহ ট্যাঁটরা পিটিয়ে শুনিয়েছে। কিন্তু ইংরেজ ছাড়া আরো দু-চারটে জাত পৃথিবীতে আছে, এবং ইংরেজই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ভুবনবরেণ্য মহাজন জাতি এ-কথা স্বীকার করতে তারা প্রস্তুত নয়, এমন কি ইংরেজ যার উপর রাজত্ব করেছে সে যে একদিন বহু দিক দিয়ে ইংরেজের চেয়ে অনেক বেশি সত্য ছিল সে-কথাটা প্রচার করতেও তাদের বাধে না। বিশেষ করে ফরাসি এবং জর্মন এই কর্মটি পরমানন্দে করে থাকে। কোনো নিরপেক্ষ ইংরেজ পণ্ডিত কখনো জন্মান নি, এ-কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় কিন্তু অনুভূতির সঙ্গে দরদ দিয়ে ভারতবাসীকে 'তোমরা ছোট জাত নও' এ-কথাটি বলতে ইংরেজের চিরকালই বেধেছে।

তাই ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমরা খবর পেলুম যে চীন ও জাপানের বহুলোক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং বৌদ্ধধর্ম চীন ও জাপানের আত্মবিকাশ বহু দিক দিয়ে যুগ-যুগ ধরে সাহায্য করেছে, তবু সেই গানের ভিতর দিয়ে আমরা এঁদের সঙ্গে নূতন কোনো যোগসূত্র স্থাপনা করতে পারলুম না। এমন সময় এসেছে, চীন ও জাপান যে-রকম এ-দেশে বৌদ্ধ ঐতিহ্যের অনুসন্ধানে অধিকতর সংখ্যায় আসবে ঠিক তেমনি আমাদেরও খবর নিতে হবে চীন এবং জাপানের উর্বর ভূমিতে আমাদের বোধিবৃক্ষ পাপী-তাপীকে কি পরিমাণ ছায়া দান করেছে।

এবং এ-কথাও ভুললে চলবে না যে প্রাচ্যলোকে যে তিনটি ভূখণ্ড কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে যশ অর্জন করেছে তারা চীন ভারতবর্ষ ও আরবভূমি। এবং শুধু যে ভৌগোলিক হিসাবে ভারতবর্ষ আরব ও চীন ভূখণ্ডের ঠিক মাঝখানে তা নয়, সংস্কৃতি সভ্যতার দিক থেকেও আমরা এই দুই ভূখণ্ডের সঙ্গমস্থলে আছি। এক দিকে মুসলমান ধর্ম ও সভ্যতা এ-দেশে এসে আমাদের শিল্পকলাকে সমৃদ্ধ করেছে, আবার আমাদের বৌদ্ধধর্মের ভিতর দিয়ে আমরা চীন-জাপানের সঙ্গে সংযুক্ত। কাজেই ভারতবাসীর পক্ষে আর্য হয়েও এক দিকে যেমন সেমিতি (আরব) জগতের সঙ্গে তার ভাবের আদান প্রদান চলে, তেমনি চীন-জাপানের (মঙ্গোল) শিল্পকলা চিন্তাধারার সঙ্গেও সে যুক্ত হতে পারে। অথচ চীন আরব একে অন্যকে চেনে না।

তাই পূর্ব-ভূখণ্ডে যে নবজীবন সঞ্চারের সূচনা দেখা যাচ্ছে, তার কেন্দ্রস্থল গ্রহণ করবে ভারতবর্ষ। (ব্যবসা-বাণিজ্যের দৃষ্টিবিন্দু থেকে আমাদের লক্ষপতিরা এ তথ্যটি বেশ কিছুদিন হল হৃদয়ঙ্গম করে ফেলেছেন—জাপান হাট থেকে সরে যেতেই অহমদাবাদ ডাইনে, পারস্য-আরব বাঁয়ে জাভা-সুমাত্রাতে কাপড় পাঠাতে আরম্ভ করেছে।) ভৌগোলিক ও কৃষ্টিজাত উভয় সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ যদি আপন আসন গ্রহণ না করে তবে

www.BanglaBook.org

দোষ ভগবানের নয়।

• উপস্থিত দেখতে পাচ্ছি, আমাদের মৌলভী-মৌলানারা আরবী-ফারসী জানেন। এঁরা এত দিন সুযোগ পান নি—এখন আশা করতে পারি, আমাদের ইতিহাস-লিখনের সময় তাঁরা 'আরবকে ভারতের দান' অধ্যায়টি লিখে দেবেন ও যে স্থপতিকলা মোগল নামে পরিচিত তার মধ্যে ভারতীয় ও ইরান-তুর্কী কিরূপে মিশ্রিত হয়েছে সে বিবরণ লিপিবদ্ধ করবেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমরা চীন এবং জাপানের ভাষা জানি নে। (বিশ্বভারতীর 'চীনা-ভবনে'র দ্বার ভালো করে খুলতে হবে, এবং সেই চীনা-ভবনকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে চীন সভ্যতার অধ্যয়ন আলোচনা আরম্ভ করতে হবে।)

জাপান সম্বন্দে আমাদের কৌতূহল এতই কম যে জাপানে বৌদ্ধধর্মের সম্প্রসারণ সম্বন্ধে আমাদের কোনো জ্ঞানই নেই। (তাই শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র বীরভদ্র রাও চিত্র যখন তাঁর 'শিল্পী' কাগজে জাপানে সংগৃহীত ভারতীয় সংস্কৃতির নিদর্শন প্রকাশ করেন তখন অল্প পাঠকই সেগুলো পড়েন। বিশ্বভারতীর আরেক প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান্ হরিহরণ সাত বৎসর জাপানে থেকে উৎসাহের অন্ত নেই—তাঁর স্ত্রীও জাপানী মহিলা—কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো বিদ্যার্থী তাঁর কাছে উপস্থিত হয় নি।)

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধ-লেখক জাপানী ভাষা জানে না। কিন্তু তার বিশ্বাস, জাপান সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে কৌতূহল জাগাবার জন্য ইংরিজি এবং অন্যান্য ভাষায় লেখা বই দিয়ে যতটা সম্ভবপর ততটা কাজ আরম্ভ করে দেওয়া উচিত। জাপানী ছাড়া অন্য ভাষা থেকে সংগৃহীত প্রবন্ধে ভুল থাকার সম্ভাবনা প্রচুর, তাই প্রবন্ধ-লেখক গোড়ার থেকেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে।

ভারতবর্ষীয় যে-সংস্কৃত চীন এবং জাপানে প্রসারলাভ করেছে সে-সংস্কৃতি প্রধানত বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষীয় তথা চৈনিক বৌদ্ধধর্ম ও জাপানী বৌদ্ধধর্ম এক জিনিস নয়—তুলনাত্মক ধর্মতত্ত্বর এক প্রধান নীতি এই যে, প্রত্যেক ধর্মই প্রসার এবং বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন বাতাবরণের ভিতর নূতন নূতন রূপ ধারণ করে। জেরুজালেমের খ্রিস্টধর্ম ও প্যারিসের খ্রিস্টধর্ম এক জিনিস নয়, মিশরী মুসলিমে ও বাঙালি মুসলিমে প্রচুর পার্থক্য।

জাপানে যে-বৌদ্ধধর্ম বিস্তৃত লাভ করেছে সে-ধর্মও দুই দিক থেকে চর্চা করতে হবে। প্রথমত, জাপানীতে অনূদিত ও লিখিত বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ, —এ কর্ম করবেন পণ্ডিতেরা, এবং এঁদের কাজ প্রধান গবেষণামূলক হবে বলে এর ভিতর সাহিত্য-রস থাকার সম্ভাবনা কম। দ্বিতীয়ত, জাপানী শ্রমণ-সাধু-সন্তদের জীবনী-পাঠ। আমার বিশ্বাস, উপযুক্ত লেখকের হাতে পড়লে সে-সব জীবনী নিয়ে বাঙলায় উত্তম সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে।

অধ্যাপক য়াকব ফিশারের লেখা বৌদ্ধ শ্রমণ রিয়োকোয়ানের জীবনী পড়ে আমার এ-বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়েছে। অধ্যাপক ফিশার জাতে জর্মন, রিয়োকোয়ান জাপানী ছিলেন,—কিন্তু শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে বইখানি লেখা হয়েছে বলে যথার্থ সাহিত্য সৃষ্ট হয়েছে। পুস্তকখানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগার সামান্য কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল বলে এ-দেশে প্রচার এবং প্রসার লাভ করতে পারে নি। বইখানি ইংরিজিতে লেখা, নাম Dew drops on a Lotus Leaf। আর কিছু না হোক, নামটি আমাদের কাছে অচেনা নয়—'নলিনীদল-

www.BanglaBook.org

গতজলমতিতরলং' বাক্যটি আমাদের মোহাবস্থায়ও আমরা ভুলতে পারি নি। শঙ্করাচার্য যখন 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' আখ্যায় নিন্দিত হয়েছেন তখন হয়তো জীবনকে পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায় দেখার উপমাটাও তিনি বৌদ্ধধর্ম থেকে নিয়েছেন।

বহু মানবের হিয়ার পরশ পেয়ে
বহু মানবের মাঝখানে বেঁধে ঘর
—খাটে, ছেলে যারা মধুর স্বপ্ন দেখে—
থাকিতে আমরা নেই তো অরুচি কোনো।
তবুও এ-কথা স্বীকার করিব আমি,
উপত্যকার নির্জনতার মাঝে
—শীতল শান্তি অসীম ছন্দে ভরা—
সেইখানে মম জীবন আনন্দঘন॥

শ্রমণ রিয়োকোয়ানের এই ক্ষুদ্র কবিতাটি দিয়ে অধ্যাপক ফিশার তাঁর রিয়োকোয়ান-চরিতের অবতরণিকা আরম্ভ করেছেন।

ফিশার বলেন ঃ রিয়োকোয়ানের আমলের বড় জাগীরদার মাকিনো তাঁর চরিত্রের খ্যাতি শুনে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে শ্রমণকে সাদরে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। তাঁর বাসনা হয়েছিল, শ্রমণের কাছ থেকে ধর্মশিক্ষা গ্রহণ করবেন।

মাকিনোর দূত রিয়োকোয়ানের কুঁড়েঘরে পৌঁছাবার পূর্বেই গ্রামের লোক খবর পেয়ে গিয়েছিল যে স্বয়ং মাকিনো রিয়োকোয়ানের কাছে দূত পাঠাচ্ছেন। খবর শুনে সবাই অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি তাঁর কুটিরের চারদিকের জমি বাগান সব কিছু পরিষ্কার করে দিল।

রিয়োকোয়ান ভিনগাঁয়ে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখেন কুঁড়েঘরের চতুর্দিক সম্পূর্ণ সাফ। মাকিনোর দূত তখনো এসে পৌঁছয় নি। রিয়োকোয়ানের দুই চোখ জলে ভরে গেল, বললেন, "হায় হায়, এরা সব কি কাণ্ডটাই না করেছে। আমার সব চেয়ে আত্মীয় বন্ধু ছিল ঝিঁঝি পোকার দল। এই নির্জনতায় তারাই আমাকে গান শোনাত। তাদের বাসা ভেঙে ফেলা হয়েছে হায়, তাদের মিষ্টি গান আমি আবার শুনব কবে কে জানে?"

রিয়োকোয়ান বিলাপ করছেন, এমন সময় দূত এসে নিমন্ত্রণপত্র নিবেদন করল। শোকাতুর শ্রমণ উত্তর না দিয়ে একটি ক্ষুদ্র কবিতা লিখে দূতকে দিলেন,

আমার ক্ষুদ্র কুটীরের চারি পাশে,
বেঁধেছিল বাসা ঝরা পাতা দলে দলে—
নৃত্যচটুল, নিত্য দিনের আমার নর্ম্য-সখা
কোথা গেল সব? আমার আতুর হিয়া
সান্ত্বনা নাহি মানে।
হায় বলো মোর কি হবে উপায় এবে
জুলে গিয়ে তারা করিত যে মোর সেবা,
এখন করিবে কেবা?

ফিশার বলেন, দূত বুঝতে পারল নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

আমরা বলি, তাতে আশ্চর্য হবারই বা কি আছে? আমাদের কবি, জাপানের কবি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এবং ঝরা পাতার স্থান তো জাগীরদারের প্রাসাদকাননে হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন ঃ

ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে
অনেক হাসি অনেক অশ্রুজলে।[১]

ফিশার বলেন, এই জাপানী শ্রমণ, কবি, দার্শনিক এবং খুশখৎকো[২], তিনি আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চান।

রিয়োকোয়ান বহু বৎসর ধরে জাপানের কাব্যরসিক এবং তত্ত্বান্বেষীগণের মধ্যে সুপরিচিত, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে তাঁর খ্যাতি ছড়ায় মাত্র বৎসর ত্রিশ পূর্বে। যে প্রদেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর প্রব্রজ্যাভূমিতে তিনি কিংবদন্তীর রাজবৈদ্য তাৎসুকিচি ইরিসওয়া বলেন, "আমার পিতামহী মারা যান ১৮৮৭ সনে। তিনি যৌবনে রিয়োকোয়ানের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁর সম্বন্ধে অনেক গল্প আমাকে বলেছেন।"

রিয়োকোয়ানের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৯১১ সনে প্রকাশিত এক ক্ষুদ্র পুস্তিকায়। স্বয়ং হকুওসাই সে পুস্তকের জন্য ছবি এঁকে দিয়েছিলেন। তার প্রায় পঁচিশ বৎসর পর রিয়োকোয়ানের প্রিয়া শিষ্যা ভিক্ষুণী তাইশিন রিয়োকোয়ানের কবিতা থেকে 'পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দু' নাম দিয়ে একটি চয়নিকা প্রকাশ করেন। রিয়োকোয়ানকে কবি হিসাবে বিখ্যাত করার জন্য ভিক্ষুণী তাইশিন এ চয়নিকা প্রকাশ করেন নি। তিনিই তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে চেনবার সুযোগ পেয়েছিলেন সব চেয়ে বেশি—আর যে পাঁচজন তাঁকে চিনতেন, তাঁদের ধারণা ছিল তিনি কেমন যেন একটু বেখাপ্পা, খামখেয়ালী ধরনের লোক, যদিও শ্রমণ হিসাবে তিনি অনিন্দনীয়। এমনকি রিয়োকায়নের বিশিষ্ট ভক্তেরাও তাঁকে ঠিক চিনতে পারেন নি। তাঁদের কাছে তিনি অজ্ঞেয়, অমর্ত্য সাধক হয়ে চিরকাল প্রহেলিকা রূপ নিয়ে দেখা দিতেন। একমাত্র ভিক্ষুণী তাইশিনই রিয়োকোয়ানের হৃদয়ের সত্য পরিচয় পেয়েছিলেন, চয়নিকা প্রকাশ করার সময় তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, সর্বসাধারণ যেন তাঁর কবিতার ভিতর দিয়ে তাঁর মহানুভব হৃদয়ের পরিচয় পায়।

এ-মানুষটিকে চেনা কারো পক্ষেই খুব সহজ ছিল না। তিনি সমস্ত জীবন কাটিয়েছিলেন কবিতা লিখে, ফুল কুড়িয়ে আর ছেলেদের সঙ্গে গ্রামের রাস্তার উপর খেলাধূলা করে। তাতেই নাকি পেতেন তিনি সবচেয়ে বেশি আনন্দ। খেলার সাথী না পেলে তিনি মাঠে, বনের ভিতর আপন মনে খেলে যেতেন। ছোট ছোট পাখি তখন তাঁর শরীরের উপর এসে বসলে তিনি ভারী খুশি হয়ে তাদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিতেন। যখন ইচ্ছে ঘুমিয়ে পড়তেন, মদ পেলে খেতে কসুর করতেন না, আর নাচের দলের সঙ্গে দেখা হলে সমস্ত বিকেল-সন্ধ্যা তাদের সঙ্গে ফুর্তি করে কাটিয়ে দিতেন।

বসন্ত-প্রান্তে বাহিরিনু ঘর হতে
ভিক্ষার লাগি চলেছি ভাণ্ড ধরে—
হেরি মাঠ-ভরা নাচে ফুলদল
নাচে পথ-ঘাট ভরে।

BanglaBook.org

১ শেলির 'What if my leaves are falling' ভিন্ন অনুভূতিতে, ঈষৎ দম্ভপ্রসূত।

২ Calligrapher = সুদর্শন লিপিকর।

www.BanglaBook.org

দাঁড়াইনু আমি এক লহমার তরে
কথা কিছু ক'ব বলে
ও মা, এ কি দেখি! সমস্ত দিন
কি করে যে গেছে চলে!

এই আপন-ভোলা লোকটির সঙ্গে যখন আর আর সংসার-বিমুখ শ্রমণদের তুলনা করা যায় তখনই ধরা পড়ে শ্রমণ-নিন্দিত প্রকৃতির সঙ্গে এঁর কবিজনসুলভ গভীর আত্মীয়তা-বোধ। এই 'সর্বং শূন্যং সর্বং ক্ষণিকং' জগতের প্রবহমাণ ঘটনাবলীকে তিনি আর পাঁচ জন শ্রমণের মত বৈরাগ্য ও বিরক্তির সঙ্গে অবহেলা করছেন না, আবার সৌন্দর্য-বিলাসী কবিদের মত চাঁদের আলো আর মেঘের মায়াকেও আঁকড়ে ধরতে অযথা শোকাতুর হচ্ছেন না। বেদনা-বোধ যে রিয়োকোয়ানের ছিল না তা নয়—তাঁর কবিতার প্রতি ছত্রে ধরা পড়ে তাঁর স্পর্শকাতর হৃদয় কত অল্পতেই সাড়া দিচ্ছে—কিন্তু সমস্ত কবিতার ভিতর দিয়ে তাঁর এমন একটি সংহত ধ্যানদৃষ্টি দেখতে পাই যার মূল নিশ্চয়ই বৌদ্ধ-ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বের অন্তস্থল থেকে আপন প্রাণশক্তি সঞ্চয় করছে।

অথচ তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুরা বলে গিয়েছেন, তিনি কখনা কাউকে আপন ধর্মে দীক্ষা দেবার জন্য চেষ্টা করেন নি, অন্যান্য শ্রমণের মত বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন নি।

তাই এই লোকটিকে বুঝতে জাপানেরও সময় লেগেছে। ফিশার বলেন, ১৯১৮ সনে শ্রীযুক্ত সোমা গায়েফু কর্তৃক 'তাইগু রিয়োকোয়ান' পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পর সমগ্র জাপানে এই শ্রমণের নাম ছড়িয়ে পড়ে।

আজ তাঁর খ্যাতি শুধু আপন প্রদেশে, আপন প্রব্রজ্যাভূমিতে সীমাবদ্ধ নয়। জাপানের সর্বত্রই তাঁর জীবন, ধর্মমত, কাব্য এবং চিন্তাধারা জানবার জন্য বিপুল আগ্রহ দেখা দিয়েছে।

সেই উত্তেজনা, সেই আগ্রহ বিদেশী শিক্ষক গায়ক ফিশারকেও স্পর্শ করেছে। দীর্ঘ আড়াই বৎসর একাগ্র তপস্যার ফলে তিনি যে গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন তার কল্যাণে আমরাও রিয়োকোয়ানের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছি। উপরে উল্লিখিত রিয়োকোয়ানের সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত সোমা গায়েফু ফিশারের গ্রন্থকে সপ্রেম আশীর্বাদ করেছেন, এবং এ-কথাও বলেছেন যে ফিশারই একমাত্র ইউরোপীয় যিনি শ্রমণ রিয়োকোয়ানের মর্মস্থলে পৌঁছাতে পেরেছেন।

জাপানের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে সমুদ্রপারের এক গ্রামে ১৭৫৮ সালে রিয়োকোয়ানের জন্ম হয়। রিয়োকায়ান-বংশ সে অঞ্চলে আভিজাত্য ও প্রতিপত্তির জন্য সুপরিচিত ছিল। রিয়োকোয়ানের পিতা গ্রামের প্রধান বা অগ্রণীরূপে প্রচুর সম্মান পেতেন।

রিয়োকোয়ানকে বুঝতে হলে তাঁর পিতার জীবনের কিছুটা জানতে হয়। তিনিও কবি ছিলেন এবং তাঁর কবিতাতেও এমন একটি দ্বন্দ্ব সব সময়ই প্রকাশ পায় যে দ্বন্দ্বের অবসান কোন কবিই এ জীবনে পান নি। সাধারণ কবি এ-রকম অবস্থায় কাব্য-জীবন ও ব্যবহারিক জীবনকে পৃথক করে নিয়ে পাঁচ জনের সঙ্গে যতদূর সম্ভব মিলে-মিশে চলার চেষ্টা করেন, কিন্তু রিয়োকোয়ানের পিতার দ্বন্দ্বমুক্তি প্রয়াস এতই নিরঙ্কুশ ও পরিপূর্ণ আন্তরিকতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল যে তিনি শেষ পর্যন্ত কোনো সমাধান না পেয়ে আত্মহত্যা করেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রিয়োকোয়ানের অন্যান্য ভাই-বোনরাও কবিতা রচনা করে জাপানে খ্যাতিলাভ করেছেন। কিন্তু তাঁদের জীবনও সমাজের আর পাঁচজনের জীবনের মত গতানুগতিক ধারায় চলতে পারে নি। রিয়োকোয়ানের ছোট দুই ভাই ও এক বোন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।

ধন-সম্পত্তি খ্যাতি-প্রতিপত্তি সব কিছুই ছিল, রাজধানীতে রিয়োকোয়ানের পিতা সুপরিচিত ছিলেন, বসত-গ্রামের অধিবাসীরা রিয়োকোয়ান-পরিবারকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখত, তৎসত্ত্বেও কেন পরিবারের পিতা আত্মহত্যা করলেন, তিন পুত্র এক কন্যা চীরবস্ত্র গ্রহণ করলেন—এ রহস্যের সমাধান করার চেষ্টা রিয়োকোয়ান-জীবনীকার অধ্যাপক য়াকব ফিশার করেন নি। তবে কি জাপানের রাজনৈতিক ও সমাজিক জীবন সে-যুগে এমন কোন পক্ষের বিরুদ্ধে হয়ে উঠেছিল যে স্পর্শকাতর পরিবার মাত্রকেই হয় মৃত্যু অথবা প্রব্রজ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে সর্ব সমস্যার সমাধান করতে হত? ফিশার সে-রকম কোন ইঙ্গিতও করেন নি।

ফিশার বলেন, 'রিয়োকোয়ান শিশু বয়স থেকেই অত্যন্ত শান্তপ্রকৃতির পরিচয় দেন। আর সব ছেলেমেয়েরা যখন খেলাধূলায় মত্ত থাকত তখন বালক রিয়োকোয়ান তন্ময় হয়ে কন-পুৎসিয়ের তত্ত্ব-গম্ভীর রচনায় প্রহরের পর প্রহর কাটিয়ে দিতেন। তাঁর এই আচরণে যে তাঁর পিতা-মাতা ঈষৎ উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন তার ইঙ্গিত ফিশার দিয়েছেন।

রিয়োকোয়ানের সব জীবনী-লেখকই দুটি কথা বার বার জোর দিয়ে বলেছেন। রিয়োকোয়ান বালক বয়সেও কখনো মিথ্যা কথা বলেন নি এবং যে যা বলত তিনি সরল চিত্তে তাই বিশ্বাস করতেন। এই প্রসঙ্গে ফিশার রিয়োকোয়ানের বাল্যজীবনের একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

রিয়োকোয়ানের বয়স যখন আট বৎসর তখন তাঁর পিতা তাঁরই সামনে একটি দাসীকে অত্যন্ত কঠিন বাক্য বলেন। দাসীর দুঃখে রিয়োকোয়ান বড়ই ব্যথিত হন ও ক্রুদ্ধ-নয়নে পিতার দিকে তাকান। পিতা তাঁর আচরণ লক্ষ্য করে বললেন, "এ রকম চোখ করে বাপ-মায়ের দিকে তাকালে তুমি আর মানুষ থাকবে না, ঐ চোখ নিয়ে মাছ হয়ে যাবে।" তাই শুনে বালক রিয়োকোয়ান বাড়ি ছেড়ে অন্তর্ধান করলেন। সমস্ত দিন গেল, সন্ধ্যা হয়ে এল, তবু তাঁর কোন সন্ধান পাওয়া গেল ন। উদ্বিগ্ন পিতা-মাতা চতুর্দিকে সংবাদ পাঠালেন। অবশেষে এক জেলে খবর পাঠাল, সে রিয়োকোয়ানকে সমুদ্রপারের পাষাণস্তূপের কাছে দেখতে পেয়েছে। পিতা-মাতা ছুটে গিয়ে দেখেন, তিনি পাষাণস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে আছেন, আর সমুদ্রের ঢেউ তাঁর গায়ে এসে লাগছে। কোলে করে বাড়ি এনে বাপ-মা জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি ওখানে নির্জনে সমস্ত দিন কি করছিলে?" রিয়োকোয়ান বড় বড় চোখ মেলে বললেন, "তবে কি আমি এখনো মাছ হয়ে যাই নি, আমি যা দুষ্টু ছেলের মত তোমাদের অবাধ্য হয়েছিলুম?"

রিয়োকোয়ান কেন যে সমস্ত দিন সমুদ্রপারে জলের কাছে কাটিয়েছিলেন তখন বোঝা গেল। মাছই যখন হয়ে যাবেন তখন জলের কাছে গিয়ে তার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকাই তো প্রশস্ততম পন্থা।

সংসার ত্যাগ করেও রিয়োকোয়ান পিতা-মাতা সম্বন্ধে কখনো উদাসীন হতে পারেন নি। মায়ের স্মরণে বৃদ্ধ শ্রমণ রিয়োকোয়ান যে কবিতাটি রচনা করেন সেটি মায়েরই ভালোবাসার মত এমনি সরল সহজ যে অনুবাদে তার সব মাধুর্য নষ্ট হয়ে যায় ঃ—

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সকাল বেলায় কখনো গভীর রাতে
আঁখি মোর ধায় দূর 'সাদো'[১] দ্বীপ পানে
শান্ত-মধুর কত না স্নেহের বাণী
মা আমার যেন পাঠায় আমার কানে।

প্রব্রজ্যা

রিয়োকোয়ানের বয়স যখন সতেরো তখন তাঁর পিতা রাজধানীতে চলে যাওয়ায় তিনি গ্রামের প্রধান নির্বাচিত হলেন। তার দুই বৎসর পরে রিয়োকোয়ান সংসার ত্যাগ করে সঙ্ঘে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ধনজন সুখ-সমৃদ্ধি সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে যৌবনের প্রারম্ভেই কেন যে রিয়োকোয়ান সংসার ত্যাগ করলেন তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ফিশার প্রচলিত কিংবদন্তী বিশ্লেষণ করেছেন। কারো মতে রিয়োকোয়ানের কবিজনসুলভ অথচ তত্ত্বান্বেষী মন জনপদপ্রমুখের দৈনন্দিন কূটনৈতিক কার্যকলাপে এতই ব্যথিত হত যে তিনি তার থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে সঙ্ঘের শরণ নেন; কারো মতে ভোগ-বিলাসের ব্যর্থতা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরে তিনি সংসার ত্যাগ করেন।

রিয়োকোয়ান নাকি এক সন্ধ্যায় তাঁর প্রণয়িনী এক গাইশা[২] তরুণীর বাড়িতে যান। এমনিতেই তিনি গাইশাদের কাছ থেকে প্রচুর খাতির-যত্ন পেতেন, তার উপর তখন তিনি গ্রামের প্রধান। গাইশা-তরুণীরা রিয়োকোয়ানকে খুশি করার জন্যে নাচল, গাইল—প্রচুর মদও খাওয়া হল। কিন্তু রিয়োকোয়ান কেন যে চিন্তায় বিভোর হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিলেন তার কোন কারণ বোঝা গেল না। তাঁর প্রিয়া গাইশা-তরুণী বার বার তাঁর কাছে এসে তাঁকে আমোদ-আহ্লাদে যোগ দেওয়াবার চেষ্টা করল কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হল না। তিনি মাথা নিচু করে আপন ভাবনায় মগ্ন রইলেন।

প্রায় চারশ টাকা খরচ করে সে রাত্রে রিয়োকোয়ান বাড়ি ফিরলেন।

পরদিন সকাল বেলা রিয়োকোয়ান বাড়ির পাঁচ জনের সঙ্গে খেতে বসলেন না। তখন সকলে তাঁর ঘরে গিয়ে দেখে, তিনি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। কি হয়েছে বোঝবার জন্য যখন কম্বল সরানো হল তখন বেরিয়ে এল রিয়োকোয়ানের মুণ্ডিত মস্তক আর দেখা গেল তার সর্বাঙ্গ জাপানী শ্রমণের কালো জোব্বায় ঢাকা।

আত্মীয়-স্বজনের বিস্ময় দূর করার জন্য রিয়োকোয়ান বিশেষ কিছু বললেন না, শুধু একটুখানি হাসলেন। তার পর বাড়ি ছেড়ে পাশের কহ্‌শহ্‌জী সঙ্ঘের (মন্দির) দিকে রওয়ানা হলেন। পথে তাঁর বল্লভা গাইশার বাড়ি পড়ে। সে দেখে অবাক, রিয়োকোয়ান শ্রমণের

---

১ রিয়োকোয়ানের মাতা 'সাদো' দ্বীপে জন্মেছিলেন।

২ 'গাইশা' ঠিক বেশ্যা বা গণিকা নহে; মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনা অথবা প্রাচীন গ্রীসের 'হেটেরে' শ্রেণীরা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কৃষ্ণবাস পরে চলে যাচ্ছেন। ছুটে গিয়ে সে তাঁর জামা ধরে কেঁদে, অনুনয়-বিনয় করে বলল, 'প্রিয়, তুমি এ কি করেছ! তোমার গায়ে এ বেশ কেন?''

রিয়োকোয়ানেরও চোখ জলে ভরে এল। কিন্তু তবু দৃঢ় পদক্ষেপে তিনি সঙ্ঘের দিকে এগিয়ে গেলেন।

হায়, অনন্তের আহ্বান যখন পৌঁছয় তখন সে ঝঞ্ঝার সামনে গাইশা-প্রজাপতি ডানা মেলে কি বল্লভকে ঠেকাতে পারে?

ফিশার বলেন, এ-সব কিংবদন্তী তাঁর মনঃপুত হয় না। তাঁর মতে এগুলো থেকে রিয়োকোয়ানের বৈরাগ্যের প্রকৃত কারণ পাওয়া যায় না।

ফিশারের ধারণা, রিয়োকোয়ান প্রকৃতির দ্বন্দ্ব থেকে সন্ন্যাসের অনুপ্রেরণা পান। তিনি যে-জায়গায় জন্মগ্রহণ করেন সে-জায়গায় প্রকৃতি গ্রীষ্ম বসন্তে যে-রকম মধুর শান্তভাব ধারণ করে ঠিক তেমনি শীতকালে ঝড়-ঝঞ্ঝার রুদ্র রূপ নিয়ে আঘাত আবেগ দিয়ে জনপদবাসীকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ফিশারের ধারণা—রিয়োকোয়ানের প্রকৃতিতে এই দুই প্রবৃত্তিই ছিল; এক দিকে ঋজু সান্ত পাইন-বনের মন্দ-মধুর গুঞ্জরণ, অন্য দিকে হিম ঋতুর ঝঞ্ঝা-মথিত বীচি-বিক্ষোভিত সমুদ্রতরঙ্গের অন্তহীন উদ্বেল উচ্ছ্বাস।

প্রকৃতিতে এ দ্বন্দ্বের শেষ নেই—রিয়োকোয়ান তাঁর জীবনের দ্বন্দ্ব সমাধানকল্পে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ফিশার দৃঢ়কণ্ঠে এ কথা বলেন নি—এই তাঁর ধারণা।

মানুষ কেন যে সন্ন্যাস নেয় তাঁর সদুত্তর তো কেউ কখনো খুঁজে পায় নি। সন্ন্যাসী চক্রবর্তী তথাগত জরা-মৃত্যু দর্শনে নাকি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন; আরো তো লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রতিদিন জরা-মৃত্যু চোখের সামনে দেখে, কিন্তু কই তারা তো সন্ন্যাস নেয় না? বার্ধক্যের ভয়ে তারা অর্থসঞ্চয় করে আরো বেশি, মৃত্যুর ভয়ে তারা বৈদ্যরাজের শরণ নেয় প্রাণপণে—ত্রিশরণের শরণ নেবার প্রয়োজন তো তারা অনুভব করে না। যে জরা-মৃত্যু বুদ্ধদেবকে সন্ন্যাস এবং মুক্তি এনে দিল সেই জরা-মৃত্যুই সাধারণ জনকে অর্থের দাস এবং বৈদ্যের দাস করে তোলে।

গাইশা-তরুণীর প্রেমের নিষ্ফলতা আর ক্ষণিকতা হৃদয়ঙ্গম করে রিয়োকোয়ান সন্ন্যাস গ্রহণ করেন? তাই বা কি করে হয়? প্রেমে হতাশ হলেই তো সাধারণ মানুষ বৈরাগ্য বরণ করে,—রিয়োকোয়ানের বেলা তো দেখতে পাই গাইশা-প্রণয়িনী তাঁকে করুষ কণ্ঠে প্রেম-নিবেদন করে সন্ন্যাস-মার্গ থেকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছে।

এবং অতি সামান্য কারণেও তো মানুষ সন্ন্যাস নেয়। কন-ফুৎসিয় কেন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তার কারণ ছন্দে বেঁধে দিয়েছেন ঃ

মসৃণ দেহ উচ্চপৃষ্ঠ উদ্ধত বলীয়ান
বৃষ চলিয়াছে ভয়ে তার কাছে কেহ নহে আগুয়ান
সে করিল এক ধেনুর কামনা অমনি শৃঙ্গাঘাত
আমি লইলাম ভিক্ষাপাত্র; সংসারে প্রণিপাত।

(সত্যেন দত্ত)

এবং এ সব কারণের চেয়েও ক্ষুদ্রতর কারণে মানুষ যে সন্ন্যাস নেয় তার উদাহরণ তো আমরা বাঙালি জানি। 'ওরে বেলা যে পড়ে এল'—অত্যন্ত সরল দৈনন্দিন অর্থে এক চাষা আর এক চাষাকে এই খবরটি যখন দিচ্ছিল তখন হঠাৎ কি করে এক জমিদারের কানে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সকাল বেলায় কখনো গভীর রাতে
আঁখি মোর ধায় দূর 'সাদৌ'[১] দ্বীপ পানে
শান্ত-মধুর কত না স্নেহের বাণী
মা আমার যেন পাঠায় আমার কানে।

প্রব্রজ্যা

রিয়োকোয়ানের বয়স যখন সতেরো তখন তাঁর পিতা রাজধানীতে চলে যাওয়ায় তিনি গ্রামের প্রধান নির্বাচিত হলেন। তার দুই বৎসর পরে রিয়োকোয়ান সংসার ত্যাগ করে সঙ্ঘে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ধনজন সুখ-সমৃদ্ধি সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে যৌবনের প্রারম্ভেই কেন যে রিয়োকোয়ান সংসার ত্যাগ করলেন তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ফিশার প্রচলিত কিংবদন্তী বিশ্লেষণ করেছেন। কারো মতে রিয়োকোয়ানের কবিজনসুলভ অথচ তত্ত্বান্বেষী মন জনপদপ্রমুখের দৈনন্দিন কূটনৈতিক কার্যকলাপে এতই ব্যথিত হত যে তিনি তার থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে সঙ্ঘের শরণ নেন; কারো মতে ভোগ-বিলাসের ব্যর্থতা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরে তিনি সংসার ত্যাগ করেন।

রিয়োকোয়ান নাকি এক সন্ধ্যায় তাঁর প্রণয়িনী এক গাইশা[২] তরুণীর বাড়িতে যান। এমনিতেই তিনি গাইশাদের কাছ থেকে প্রচুর খাতির-যত্ন পেতেন, তার উপর তখন তিনি গ্রামের প্রধান। গাইশা-তরুণীরা রিয়োকোয়ানকে খুশি করার জন্যে নাচল, গাইল—প্রচুর মদও খাওয়া হল। কিন্তু রিয়োকোয়ান কেন যে চিন্তায় বিভোর হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিলেন তার কোন কারণ বোঝা গেল না। তাঁর প্রিয়া গাইশা-তরুণী বার বার তাঁর কাছে এসে তাঁকে আমোদ-আহ্লাদে যোগ দেওয়াবার চেষ্টা করল কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হল না। তিনি মাথা নিচু করে আপন ভাবনায় মগ্ন রইলেন।

প্রায় চারশ টাকা খরচ করে সে রাত্রে রিয়োকোয়ান বাড়ি ফিরলেন।

পরদিন সকাল বেলা রিয়োকোয়ান বাড়ির পাঁচ জনের সঙ্গে খেতে বসলেন না। তখন সকলে তাঁর ঘরে গিয়ে দেখে, তিনি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। কি হয়েছে বোঝবার জন্য যখন কম্বল সরানো হল তখন বেরিয়ে এল রিয়োকোয়ানের মুণ্ডিত মস্তক আর দেখা গেল তার সর্বাঙ্গ জাপানী শ্রমণের কালো জোব্বায় ঢাকা।

আত্মীয়-স্বজনের বিস্ময় দূর করার জন্য রিয়োকোয়ান বিশেষ কিছু বললেন না, শুধু একটুখানি হাসলেন। তার পর বাড়ি ছেড়ে পাশের কহ্শহ্জী সঙ্ঘের (মন্দির) দিকে রওয়ানা হলেন। পথে তাঁর বল্লভা গাইশার বাড়ি পড়ে। সে দেখে অবাক, রিয়োকোয়ান শ্রমণের

---

১ রিয়োকোয়ানের মাতা 'সাদো' দ্বীপে জন্মেছিলেন।

২ 'গাইশা' ঠিক বেশ্যা বা গণিকা নহে; মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনা অথবা প্রাচীন গ্রীসের 'হেটেরে' শ্রেণীরা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কৃষ্ণবাস পরে চলে যাচ্ছেন। ছুটে গিয়ে সে তাঁর জামা ধরে কেঁদে, অনুনয়-বিনয় করে বলল, 'প্রিয়, তুমি এ কি করেছ! তোমার গায়ে এ বেশ কেন?''

রিয়োকোয়ানেরও চোখ জলে ভরে এল। কিন্তু তবু দৃঢ় পদক্ষেপে তিনি সঙ্ঘের দিকে এগিয়ে গেলেন।

হায়, অনন্তের আহ্বান যখন পৌঁছয় তখন সে ঝঞ্ঝার সামনে গাইশা-প্রজাপতি ডানা মেলে কি বল্লভকে ঠেকাতে পারে?

ফিশার বলেন, এ-সব কিংবদন্তী তাঁর মনঃপুত হয় না। তাঁর মতে এগুলো থেকে রিয়োকোয়ানের বৈরাগ্যের প্রকৃত কারণ পাওয়া যায় না।

ফিশারের ধারণা, রিয়োকোয়ান প্রকৃতির দ্বন্দ্ব থেকে সন্ন্যাসের অনুপ্রেরণা পান। তিনি যে-জায়গায় জন্মগ্রহণ করেন সে-জায়গায় প্রকৃতি গ্রীষ্ম বসন্তে যে-রকম মধুর শান্তভাব ধারণ করে ঠিক তেমনি শীতকালে ঝড়-ঝঞ্ঝার রুদ্র রূপ নিয়ে আঘাত আবেগ দিয়ে জনপদবাসীকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ফিশারের ধারণা—রিয়োকোয়ানের প্রকৃতিতে এই দুই প্রবৃত্তিই ছিল; এক দিকে ঋজু সান্ত পাইন-বনের মন্দ-মধুর গুঞ্জরণ, অন্য দিকে হিম ঋতুর ঝঞ্ঝা-মথিত বীচি-বিক্ষোভিত সমুদ্রতরঙ্গের অন্তহীন উদ্বেল উচ্ছ্বাস।

প্রকৃতিতে এ দ্বন্দ্বের শেষ নেই—রিয়োকোয়ান তাঁর জীবনের দ্বন্দ্ব সমাধানকল্পে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ফিশার দৃঢ়কণ্ঠে এ কথা বলেন নি—এই তাঁর ধারণা।

মানুষ কেন যে সন্ন্যাস নেয় তাঁর সদুত্তর তো কেউ কখনো খুঁজে পায় নি। সন্ন্যাসী চক্রবর্তী তথাগত জরা-মৃত্যু দর্শনে নাকি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন; আরো তো লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রতিদিন জরা-মৃত্যু চোখের সামনে দেখে, কিন্তু কই তারা তো সন্ন্যাস নেয় না? বার্ধক্যের ভয়ে তারা অর্থসঞ্চয় করে আরো বেশি, মৃত্যুর ভয়ে তারা বৈদ্যরাজের শরণ নেয় প্রাণপণে—ত্রিশরণের শরণ নেবার প্রয়োজন তো তারা অনুভব করে না। যে জরা-মৃত্যু বুদ্ধদেবকে সন্ন্যাস এবং মুক্তি এনে দিল সেই জরা-মৃত্যুই সাধারণ জনকে অর্থের দাস এবং বৈদ্যের দাস করে তোলে।

গাইশা-তরুণীর প্রেমের নিষ্ফলতা আর ক্ষণিকতা হৃদয়ঙ্গম করে রিয়োকোয়ান সন্ন্যাস গ্রহণ করেন? তাই বা কি করে হয়? প্রেমে হতাশ হলেই তো সাধারণ মানুষ বৈরাগ্য বরণ করে,—রিয়োকোয়ানের বেলা তো দেখতে পাই গাইশা-প্রণয়িনী তাঁকে করুষ কণ্ঠে প্রেম-নিবেদন করে সন্ন্যাস-মার্গ থেকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছে।

এবং অতি সামান্য কারণেও তো মানুষ সন্ন্যাস নেয়। কন-ফুৎসিয় কেন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তার কারণ ছন্দে বেঁধে দিয়েছেন ঃ

মসৃণ দেহ উচ্চপৃষ্ঠ উদ্ধত বলীয়ান
বৃষ চলিয়াছে ভয়ে তার কাছে কেহ নহে আগুয়ান
সে করিল এক ধেনুর কামনা অমনি শৃঙ্গাঘাত
আমি লইলাম ভিক্ষাপাত্র; সংসারে প্রণিপাত।

(সত্যেন দত্ত)

এবং এ সব কারণের চেয়েও ক্ষুদ্রতর কারণে মানুষ যে সন্ন্যাস নেয় তার উদাহরণ তো আমরা বাঙালি জানি। 'ওরে বেলা যে পড়ে এল'—অত্যন্ত সরল দৈনন্দিন অর্থে এক চাষা আর এক চাষাকে এই খবরটি যখন দিচ্ছিল তখন হঠাৎ কি করে এক জমিদারের কানে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই মামুলী কথা কয়টি গিয়ে পৌঁছল। শুনেছি, সে জমিদার নাকি অত্যাচারীও ছিলেন এবং এ-কয়টি কথা যে পূর্বে কখনো তিনি শোনেন নি সে-ও তো সম্ভবপর নয়। তবে কেন তিনি সেই মুহূর্তেই পালকি থেকে বেরিয়ে এক বস্ত্রে সংসার ত্যাগ করলেন?

সমুদ্রবক্ষে বারিবর্ষণ তো অহরহ হচ্ছে, শুক্তির অভাব নেই। কোটি কোটি বৃষ্টিবিন্দুর ভিতর কোনটি মুক্তায় পরিণত হবে কেউ তো বলতে পারে না, হয়ে যাওয়ার পরেও তো কেউ বলতে পারে না কোন শুক্তি কোন মুক্তায় মুক্তি পেল।

রাজার ডাকঘর অমলের জানালার সামনেই বসল কেন? অমলই বা রাজার চিঠি পেল কেন?

শুধু পতঞ্জলি বলেছেন, 'তীব্র সংবেগানামাসন্নঃ' (১, ২৯)। অর্থাৎ যাঁদের বৈরাগ্য ভাব প্রবল তাঁরাই চিত্তবৃত্তি নিরোধ করে মোক্ষ পান। কিন্তু কাদের বৈরাগ্য ভাব প্রবল হয় আর কেনই বা প্রবল হয় তার সন্ধান পতঞ্জলি তো দেন নি।

তাই বোধ হয় শাস্ত্রকাররা এই রহস্যের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছেন, 'সন্ন্যাসের সময়-অসময় নেই। যে মুহূর্তে বৈরাগ্য ভাবের উদয় হয়, সেই মুহূর্তেই সন্ন্যাস গ্রহণ করবে।'

রিয়োকোয়ান উনিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

এ-প্রসঙ্গে ফিশার বলেন, আপাতদৃষ্টিতে রিয়োকোয়ানের সন্ন্যাস গ্রহণ স্বার্থপরতা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু পরবর্তী জীবনে তিনি জনসাধারণের উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তার থেকে তাঁকে স্বার্থপর বলা চলে না।'

এই সামান্য কথাটিতেই ফিশার ধরা দিয়েছেন যে তিনি ইয়োরোপীয়। সন্ন্যাস গ্রহণ কোনো অবস্থাতেই স্বার্থপরতার চিহ্ন নয়। অন্তত ভারতবর্ষে নয়।

সর্বস্ব ত্যাগ করে শান্তির সন্ধানে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেন, তাঁদের সম্মুখে কি কি বাধা-বিপত্তি উপস্থিত হতে পারে, তার বর্ণনা ভারতবর্ষের সাধকেরা দিয়ে গিয়েছেন। সংসার ত্যাগের প্রথম উত্তেজনায় মানুষ যে তখন সম্ভব-অসম্ভবের মাঝখানে সীমারেখা টানতে পারে না, সে সাবধান-বাণী ভারতীয় গুরু বার বার সাধনার ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন এবং সব চেয়ে বেশি সাবধান করে দিয়ে গিয়েছেন উৎকট কৃচ্ছ্রসাধনের বিরুদ্ধে।

ভারতবর্ষ নানা দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়ে এই সব চরম সত্য আবিষ্কার করতে পেরেছে বলেই পরবর্তী যুগের ভারতীয় সাধকের ধ্যান-মার্গ অপেক্ষাকৃত সরল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু চীন জাপান প্রভৃতি বৌদ্ধভূমি ভারতবর্ষের এ ইতিহাসের সঙ্গে সুপরিচিত নয়। তারা নিয়েছে আমাদের সাধনার ফল—আমাদের পন্থা যে কত পতন-অভ্যুদয় দ্বারা বিক্ষুব্ধ, তার সন্ধান ভারতবর্ষের বাইরে কম সাধকই পেয়েছেন। তাই অতি অল্প সময়ের মধ্যে অসম্ভবের প্রত্যাশা করতে গিয়ে ভারতবর্ষের বাইরে বহু নবীন সাধক সাধনার দৃঢ় ভূমি থেকে বিচ্যুত হন।

রিয়োকোয়ানের জীবনী-লেখক অধ্যাপক ফিশারের বর্ণনা হতে তাই দেখতে পাই, তিনি সঙ্ঘে প্রবেশ করে কি অহেতুক কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের ভিতর দিয়ে নির্বাণের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করলেন। স্বয়ং বুদ্ধদেব যে সব আত্মনিপীড়নকে বর্জনীয় বলে বার বার সাধককে সাবধান করে দিয়েছেন, বহু জাপানীসঙ্গে সেই আত্মনিপীড়নকেই নির্বাণ লাভের প্রশস্ততম পন্থা বলে বরণ করে নেওয়া হয়েছিল।

ফিশার বলেন, 'সঙ্ঘের চৈত্যগৃহে কুশাসনের উপর পদ্মাসনে বসে দেওয়ালের দিকে

www.BanglaBook.org

মুখ করে নবীন সাধককে প্রহরের পর প্রহর আত্মচিন্তায় মনোনিবেশ করতে হত। একমাত্র আহারের সময় ছাড়া অন্য কোনো সময়েই দেয়াল ছাড়া অন্য দিকে চোখ ফেরাবার অনুমতি তাদের ছিল না। একটানা কুড়ি ঘণ্টা ধরে কখনো কখনো তাদের ধ্যানে নিমজ্জিত থাকতে হত এবং সেই ধ্যানে সামান্যতম বিচ্যুতি হলে পিছন থেকে হঠাৎ স্কন্ধোপরি গুরুর নির্মম লগুড়াঘাত।'

ধ্যানে নিমজ্জিত হবার চেষ্টা যাঁরাই করেছেন, তাঁরাই জানেন, প্রথম অবস্থায় নবীন সাধক ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে। একেই বলে জড়-সাধনা এবং পতঞ্জলি তাই যে উপদেশ দিয়েছেন, তার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, অল্প সময়ে ফললাভের আশা করা সাধনার প্রতিকূল। অত্যধিক মানসিক কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে কত সাধক যে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যান, সে কথা ভারতীয় গুরু জানেন বলেই শিষ্যকে অতি সন্তর্পণে শারীরিক ও মানসিক উভয় সাধনাতে নিযুক্ত করে ধীরে ধীরে অগ্রগামী হতে উপদেশ দেন।

আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে, রিয়োকোয়ান সঙ্ঘের উৎকট কৃচ্ছ্রসাধনায় ভেঙে পড়েন নি। নয় বৎসর ধ্যান-ধারণার পর তাঁর গুরুর মৃত্যু হয়। রিয়োকোয়ান তখন সঙ্ঘ ত্যাগ করে পর্যটকরূপে বাহির হয়ে যান। রিয়োকোয়ানের পরবর্তী জীবনযাপনের পদ্ধতি দেখলে স্পষ্ট অনুমান করা যায়, তিনি অত্যধিক কৃচ্ছ্রসাধনের নিষ্ফলতা ধরতে পেরেছিলেন বলেই সঙ্ঘ ত্যাগ করে পর্যটনে বাহির হয়ে যান।

দীর্ঘ কুড়ি বৎসর রিয়োকোয়ান ধ্যান-ধারণা ও পর্যটনে অতিবাহিত করেন। তাঁকে তখন কোন্ সব দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছিল, তার সন্ধান আমরা কিছুটা পাই তাঁর কবিতা থেকে; কিন্তু সেগুলি থেকে রিয়োকোয়ানের সাধনার ইতিহাস কালানুক্রমিকভাবে লেখবার উপায় নেই।

কিন্তু একটি সত্য আমরা সহজেই তাঁর কবিতা থেকে আবিষ্কার করতে পারি। দ্বন্দ্ব থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি রিয়োকোয়ান কখনো পান নি। মাঝে মাঝে দু'একটি কবিতাতে অবশ্য রিয়োকোয়ানকে বলতে শুনি তিনি শান্তির সন্ধান পেয়েছেন, কিন্তু পরক্ষণেই দেখি, ভিন্ন কবিতায় তিনি হয় নব বসন্তের আগমনে উল্লসিত, নয় বৃষ্টি-বাদলের মাঝখানে দরিদ্র চাষার প্রাণান্ত পরিশ্রম দেখে বেদনানুভূতিতে অবসন্ন। আমার মনে হয়, রিয়োকোয়ান যে চরম শান্তি পান না, সেই আমাদের পরম সৌভাগ্য। নির্দ্বন্দ্ব জীবনের সন্ধান যাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের তো কবিতা রচনা করবার কোনো আবেগ থাকার কথা নয়। শান্ত রস এক প্রকারের রস হতেও পারে, কিন্তু সে রস থেকে কবিতা সৃজন হয় কি না তা তো জানিনে, এবং হলেও সে রস আস্বাদন করবার মত স্পর্শকাতরতা আমাদের কোথায়? দাক্ষিণাত্যের আলঙ্কারিকেরা তাই শঙ্করাবরণম্‌কে সন্ন্যাস রাগ বলে সঙ্গীতে উচ্চস্থান দিতে সম্মত হন নি। তাঁদের বক্তব্য সন্ন্যাসীর কোন অনুভূতি থাকতে পারে না, আর অনুভূতি না থাকলে রসসৃষ্টিও হতে পারে না।

রিয়োকোয়ানের কবিতা শঙ্করাবরণম্ বা সন্ন্যাসী রাগে রচিত হয় নি। শুধু তাই নয়, দীর্ঘ কুড়ি বৎসর সাধনা ও পর্যটনের পর যখন তিনি খবর পেলেন যে, তাঁর পিতা জাপানের রাজনৈতিক অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাবার জন্য আত্মহত্যা করেছেন তখন এক মুহূর্তেই তাঁর সমস্ত সাধনা-ধন তাঁকে বর্জন করল।

খ্রিস্ট বলেছেন, "The foxes have holes and the birds of the air have nests; but

www.BanglaBook.org

the Son of man hath not where to lay his head." অর্থাৎ মুক্ত পুরুষের জন্মভূমি নেই, আবাসভূমিও নেই। কিন্তু পিতার মৃত্যুতে রিয়োকোয়ান বিচলিত হয়ে হঠাৎ যেন বাল্যজীবনে ফিরে গেলেন।

হেথায় হোথায় যেখানে যখন আমি
তন্দ্রামগন,—সুপ্তির কোলে আপনারে দিই ছাড়া
সেই পুরাতন নিত্য নবীন স্বপ্নের মায়া এসে
গুঞ্জরে কানে, চিত্ত আমার সেই ডাকে দেয় সাড়া।
এ স্বপ্ন নয়, ক্ষণেকের খেদ, উড়ে-যাওয়া আবছায়া
এ স্বপ্ন হানে আমার বক্ষে অহরহ একই ব্যথা
ছেলেবেলাকার স্নেহ ভালোবাসা, আমার বাড়ির কথা।
এ কি শ্রমণের বাণী, এ কি সন্ন্যাসের নিরাবলম্বতা!

ফিশার বলেন, 'মাতৃভূমির আহ্বান রিয়োকোয়ানকে এতই বিচলিত করে ফেলল যে তিনি স্বগ্রামের দিকে যাত্রা করলেন। ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনকে সান্ত্বনা দেবার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠল।'

অসম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের মনে হয়, সান্ত্বনা দেবার চেয়ে হয়ত সান্ত্বনা পাওয়ার জন্যই তাঁর হৃদয় তৃষাতুর হয়েছিল বেশি। আত্মজনের সঙ্গসুখ শ্রমণ রিয়োকোয়ান কখনো ভুলতে পারেন নি; সে-সুখ থেকে বঞ্চিত হওয়া 'ক্ষণেকের খেদ' নয়, চিত্তাকাশে 'উড়ে-যাওয়া আবছায়া' নয়, সে বেদনা অবচেতন মনে বাসা বেঁধে ক্ষণে ক্ষণে নির্বাণ অন্বেষণের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু এই ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্বল্যের হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলে কবি রিয়োকোয়ান শ্রমণ রিয়োকোয়ান হতে পারতেন না। কবি ও শ্রমণের মাঝখানে যে অক্ষয় সেতু রিয়োকোয়ান নির্মাণ করে গিয়েছেন, যে সেতু আমাদের কাছে চিরবিস্ময়ের বস্তু, সেই সেতুর বিশ্বকর্মা তিনি কখনই হতে পারতেন না।

ফিশার বলেন, কিন্তু বাড়ির কাছে পৌঁছে রিয়োকোয়ান থমকে দাঁড়ালেন, নিজের আচরণে লজ্জিত হলেন এবং চিত্তসংযম আয়ত্ত করে দৃঢ় পদক্ষেপে দ্বিতীয় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। ফিশার বলেন, বোধ হয় রিয়োকোয়ানের সন্ন্যাসবৃত্তি তাঁর নীচাশক্তি থেকে প্রবলতর ছিল বলেই শেষ মুহূর্তে তিনি স্বগ্রামে প্রবেশ করলেন না। তাই হবে। কারণ, উপেন দুই বিঘে জমি কিছুতেই না ভুলতে পেরে শেষকালে যখন আপন বাস্তুভিটায় ফিরে এল, তখন সে দুটি আমের লোভ সম্বরণ করতে পারল না। আর যে-চিত্ত সন্ন্যাসের দৃঢ় ভূমি নির্মাণে তৎপর সে-চিত্ত ক্ষণিক দুর্বলতার মোহে স্বগৃহে ফিরে এলেও গৃহসংসারের প্রকৃত রূপ হঠাৎ তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে ও প্রবাসের দূরত্বে যে গৃহ তার কাছে মধুময় বলে মনে হয়েছিল ('নিকটে ধূসর-জর্জর অতি দূর হতে মনোলোভা') তার বিকট রূপ দেখে সে তখন পুনরায় 'আমি লইলাম ভিক্ষাপাত্র সংসারে প্রথিপাত' বলে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে।

বৌদ্ধ দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখতে গেলে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন সন্ন্যাসধর্মকে ক্ষুণ্ণ করে না। স্বয়ং বুদ্ধদেব বোধিলাভের পর কপিলাবস্তুতে ফিরে এসেছিলেন। শ্রমণ রিয়োকোয়ান বোধিলাভ করতে পারেন নি বলেই স্বগ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

এই সময় রিয়োকোয়ানের পিতার নিজের হাতের লেখা একটি কবিতা পুত্রের হাতে

www.BanglaBook.org

এসে পড়ে; কবিতাটি তিন লাইনে লেখা জাপানী হাক্‌কু পদ্ধতিতে রচিত ঃ—

কি মধুর দেখি রেশমের গাছে ফুটিয়াছে ফুলগুলি;
কোমল পেলব করিল তাদের
ভোরের কুয়াশা তুলি!

রিয়োকোয়ানের মৃত্যুর পর এই কবিতাটি পাওয়া গিয়েছে। আর এক প্রান্তে রিয়োকোয়ানের নিজের হাতে লেখা, 'হায়, এই কুয়াশার ভিতর বাবা যদি থাকতেন! কুয়াশা সরে গেলে তো বাবাকে দেখতে পেতুম।'

বোধ হয়, এই সময়কারই লেখা আর একটি কবিতা থেকে রিয়োকোয়ানের মনের সংগ্রাম স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে ঃ—

এই যে জীবন, এই যে মৃত্যু প্রভেদ কোথাও নাই,
যে জন জানিল তার কাছে বাঁচা হয়ে ওঠে মধুময়।
কিন্তু হায় রে মাটি দিয়ে গড়া অন্ধ আমার হিয়া
ফিরে চারি দিকে—রিপুর জঞ্জা যখন যেদিকে বয়।
দুর্বার রণ! তার মাঝখানে শিশু আমি, অসহায়
ধুক্‌ধুক্ বুকে বাজে 'ভুল' বাজে 'ঠিক'—
চরম সত্য স্মরণ ছাড়িয়া লুপ্ত হয়েছে হায়!

এই দ্বন্দ্বই তো চিরন্তন দ্বন্দ্ব। সর্বদেশের সর্বকালের বহুলোক এই দ্বন্দ্বের নিদারুণ বর্ণনা দিয়েছেন। সত্য দেখতে পেয়েছি, কিন্তু আমার রিপু যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে—এই প্রতিবন্ধক ভিতরের না বাইরের, তাতে কিছুমাত্র আসে-যায় না, রাধার বেলা শাশুড়ি ননদী, হাফিজের বেলা,—

প্রেম নাই প্রিয় লাভ আশা করি মনে
হাফিজের মত ভ্রান্ত কে ভব-ভবনে।

এ দ্বন্দ্বের তুলনা দিয়েছেন সব কবিই আপন হৃদয় দিয়ে। পূর্ববঙ্গের কবি হাসান রাজা চিঁড়ে-ভানার সঙ্গে তুলনা দিয়ে বলেছেন,—

হাসন জানের রূপটা দেখি ফাল্‌দি ফাল্‌দি উঠে
চিঁড়া-বারা হাসান রাজার বুকের মাঝে কুটে।

রিয়োকোয়ান কান পেতে বুকের ধুকধুকে শুনতে পেয়েছেন, 'ভুল, ঠিক', 'ভুল, ঠিক', 'ভুল, ঠিক'!

এ তো গেল রিয়োকোয়ানের মনের দ্বন্দ্বের কথা, কিন্তু বাইরের দিকে রিয়োকোয়ানের জীবন অত্যন্ত সহজ গতিতেই চলেছিল। আহার শয়ন বাসস্থান সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নির্বিকার ছিলেন বলে সন্ন্যাস-আশ্রমের অভাব অনটন তাঁকে কিছুমাত্র স্পর্শ করতে পারে নি। তাঁর ভ্রাম্যমান জীবন সম্বন্ধে জাপানে বহু গল্প প্রচলিত আছে এবং সে গল্পগুলির ভিতর দিয়ে স্পষ্ট দেখা যায়, শ্রমণ রিয়োকোয়ান আর কিছু না হোক, খ্যাতি-প্রতিপত্তি, বিলাসব্যসনের মোহ সম্পূর্ণ জয়লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু এই গল্পগুলির কয়েকটি অনুবাদ করার পূর্বে বলে নেওয়া ভালো যে, বৃদ্ধ বয়সে রিয়োকোয়ান স্ব-গ্রামের দিকে ফিরে আসেন, আর পাশের পাহাড়ের এক পরিত্যক্ত আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই জরাজীর্ণ গৃহে বহুকাল ধরে কেউ বসবাস করে নি, তার অর্ধেক ধ্বসে গিয়েছে, বাকিটুকু লতা-পাতার নিচে

www.BanglaBook.org

ঢাকা পড়ে গিয়েছে, কিন্তু ফিশার বলেন, বহু বৎসরের পরিভ্রমণে শ্রান্ত-ক্লান্ত শ্রমণের কাছে এই ধ্বংসস্তূপই শান্তিনীড় বলে মনে হল।

এই প্রত্যাবর্তন নিয়ে ফিশার দীর্ঘ আলোচনা করেন নি। আমাদেরও মনে হয়, করার কোনো প্রয়োজন নেই। গৃহী হোন আর সন্ন্যাসীই হোন, বার্ধক্যে আশ্রয়ের প্রয়োজন। রিয়োকোয়ানের বেলা শুধু এইটুকু দেখা যায় যে, সর্বসঙ্ঘের দ্বার তাঁর সামনে উন্মুক্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি শ্রমণমণ্ডলীর প্রধান তো হতে চানই নি[১], এমন কি কারো সেবা পর্যন্ত গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ ছিলেন।

রিয়োকোয়ানের প্রত্যাবর্তন-সংবাদ পেয়ে তাঁর ভাই-বোনেরা তাঁকে গৃহে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করেন, কিন্তু সফল হতে পারেন নি।

বুদ্ধদেব কপিলাবস্তুতে ফিরেছিলেন বটে, কিন্তু রাজপ্রাসাদে আশ্রয় গ্রহণ করেন নি।

এই সময়ের লেখা একটি কবিতাতে রিয়োকোয়ানের শান্ত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় ঃ—

এই তো পেয়েছি শান্তিনিলয়, খরতাপ হেথা নাই
জীবন-সাঁঝের শেষ ক'টি দিন কাটাব হেথায় আমি
স্বপ্নের মোহে, কল্পনা বুনে। গাছেতে ছায়াতে হেথা
আমারে রাখিবে সোহাগে ঘিরিয়া—কাটাব দিবস-যামী।

কিংবদন্তীচয়ন

লুকোচুরি খেলা

রিয়োকোয়ান প্রকৃতি আর ছেলেপিলেদের নিয়েই বেশির ভাগ জীবন কাটিয়েছেন। ফিশার বলেন, তিনি কোনো জায়গাতেই কিছুদিন থাকলেই ছেলেমেয়েরা তাঁকে চিনে নিত। ফিশার বলেন নি কিন্তু আমরা দৃঢ় বিশ্বাস, প্রকৃতি তাঁকে চিনে নিত এবং রবীন্দ্রনাথের 'হাজার হাজার বছর কেটেছে কেহ তো কহে নি কথা' কবিতাটি আমরা মতের সায় দেবে।

রিয়োকোয়ান গাঁয়ের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় ছেলেমেয়েরা লুকোচুরি খেলছিল। রিয়োকোয়ানকে দেখে তাদের উৎসাহ আর অনন্দের সীমা নেই। বেশি ঝুলোঝুলি করতে হল না। রিয়োকোয়ান তো নাচিয়ে বুড়ি, তার উপর পেয়েছেন মৃদঙ্গের তাল। তদ্দণ্ডেই খেলাতে যোগ দিলেন। খেলাটা বনের ভিতর ভালো করে জমবে বলে সবাই গ্রাম

---

১ জাতকের গল্পে আছে এক বৃদ্ধ শ্রমণ কোন সংঘে আশ্রয় গ্রহণ করতে চাইলে সেই সংঘের প্রধান শ্রমণ ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন। হয়তো জাতকের এই গল্পটি রিয়োকোয়ানের অজানা ছিল না, কারণ ফিশার বলেন, রিয়োকোয়ান বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন এবং জাতক বৌদ্ধধর্মের কতখানি স্থান অধিকার করেছে, সে কথা অমরাবতী, সাঁচীর ভাস্কর্যস্থাপত্য দেখলে আজও চোখের সামনে পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছেড়ে সেখানে উপস্থিত। সবাই হেথায় হোথায় লুকোলো। রিয়োকোয়ান এ খেলাতে বহু দিনের অভ্যাসের ফলে পাকাপোক্ত—তিনি লুকোলেন এক কাঠুরের কুঁড়েঘরে। ঘরের এক কোণে কাঠ গাদা করা ছিল, তিনি তার উপরে বসে ঝোলা-ঝোলা আস্তিন দিয়ে মুখ ঢেকে ভাবলেন, ওখানে তাঁকে কেউ কক্‌খনো খুঁজে পাবে না, আর পেলেই বা কি, তাঁর তো মুখ ঢাকা, চিনবে কি করে?

খেলা চলল। সবাইকে খুঁজে পাওয়া গেল। রিয়োকোয়ান যে কুঁড়েঘরে লুকিয়েছিলেন, সে-কথা কারো অজানা ছিল না, কিন্তু ছেলেরা বলল, 'দেখি, আমরা সবাই চুপচাপ বাড়ি চলে গেলে কি হয়?'

রিয়োকোয়ান সেই কাঠের গাদার উপর বসে সমস্ত বিকেল বেলাটা কাটালেন—পরদিন সকাল বেলা কাঠুরের বউ ঘরে ঢুকে চম্‌কে উঠে বলল, 'ওখানে কে ঘুমুচ্ছ হে?' তার পর চিনতে পেরে 'থ' হয়ে বলল, 'সে কি, সন্ন্যাসী ঠাকুর যে! আপনি এখানে কি করছেন?'

রিয়োকোয়ান আস্তিন-পাস্তিন নাড়িয়ে মহা ব্যতিব্যস্ত হয়ে বললেন, 'আরে চুপ, চুপ, চুপ। ওরা জেনে যাবে যে। বুঝতে পারো না!'

'চলো' খেলা

রিয়োকোয়ানকে যে ছেলেমেয়েরা হামেশাই বোকা বানাতে পারত, সে-কথা সবাই জানে, আর পাঁচ জনও তাঁকে আকসার ঠকাবার চেষ্টা করত। কিন্তু প্রশ্ন, রিয়োকোয়ানের কাছে এমন কি সম্পদ ছিল যে মানুষ তাঁকে ঠকাবার চেষ্টা করবে? ফিশার বলেন, রিয়োকোয়ানের হাতের লেখা ছবির চেয়েও বেশি কদর পেত এবং সেই হাতের লেখায় তাঁর কবিতার মূল্য অনেক লোকই জেনে গিয়েছিল। কিন্তু রিয়োকোয়ান চট করে যাকে-তাকে কবিতা দিতে রাজী হতেন না, বিশেষ করে যারা তাঁর কবিতা বিক্রি করে পয়সা মারার তালে থাকত, তাদের ফন্দী-ফাঁদ এড়াবার চেষ্টা সব সময়ই করতেন। গল্পগুলো থেকে জানা যায়, তিনি ফাঁদে ধরা পড়েছেনই বেশি, এড়াতে পেরেছেন মাত্র দু-এক বার।

জাপানে 'চলো' খেলার খুবই চলতি, আর রিয়োকোয়ানকে তো কোন খেলাতেই নামাবার জন্য অত্যধিক সাদাসাদি করতে হত না।

রিয়োকোয়ান বন্ধু মনসুকের সঙ্গে একদিন দেখা করতে গিয়েছিলেন। মনসুকে বললেন, 'এসো, "চলো" খেলা খেলবে? রিয়োকোয়ান তো তৎক্ষণাৎ রাজী। মনসুকে খেলা আরম্ভ করার সময় বললেন, 'কিছু একা বাজি ধরে খেললে হয় না? তাহলে খেলাটা জমবে ভালো।'

রিয়োকোয়ান বলেন, 'তা তো বটেই। যদি আমি জিতি তাহলে তুমি আমাকে কিছু কাপড়-জমা দেবে—শীতটা তো বেড়েই চলেছে।'

মনসুকে বললেন, 'বেশ, কিন্তু যদি আমি জিতি?'

রিয়োকোয়ান তো মহা দুর্ভাবনায় পড়লেন। তাঁর কাছে আছেই বা কি, দেবেনই বা কি? বললেন, 'আমার তো, ভাই, কিছুই নেই।'

মনসুকে অতি কষ্টে তাঁর ফুর্তি চেপে বললেন, 'তোমার চীনা হাতের লেখা যদি দাও

www.BanglaBook.org

তাইতেই আমি খুশি হব।' রিয়োকোয়ান অনিচ্ছায় রাজী হলেন। খেলা আরম্ভ হল। রিয়োকোয়ান হেরে গেলেন। আবার খেলা শুরু আবার রিয়োকোয়ানের হার হল। করে করে সবসুদ্ধ আট বার খেলা হল, 'রিয়াকোয়ান আট বারই হারলেন। আর চীনা হাতের লেখা না দিয়ে এড়াবার যো নেই।

রিয়োকোয়ান হস্তলিপি দিলেন। দেখা গেল, আটখানা লিপিতেই তিনি একই কথা আট বার লিখেছেন ঃ

'চিনি মিষ্টি
ওষুধ তেতো।'[১]

মনসুকে যখন আপত্তি জানিয়ে বললেন, আট বার একই কথা লেখা উচিত হয় নি তখন রিয়োকোয়ান হেসে উত্তর দিলেন, 'কিন্তু "চলো" খেলা কি সব বারই একই রকমের হয় না? তাই একই কথা আট বার লিখে দিয়েছি।'

কুড়িয়ে-পাওয়া

রিয়োকোয়ানকে কে যেন এক বার বলেছিল রাস্তায় পয়সা কুড়িয়ে পাওয়াতে ভারী আনন্দ। একদিন আশ্রমে ফেরার পথে তিনি মনে মনে সেই কথা নিয়ে চিন্তা করতে করতে বললেন, 'একবার দেখাই যাক না, কুড়িয়ে পাওয়াতে কি আনন্দ লুকনো আছে।' রিয়োকোয়ান ভিক্ষা করে কয়েকটি পয়সা পেয়েছিলেন। সেগুলো তিনি একটা একটা করে রাস্তায় ছড়িয়ে ফের তুলে নিলেন। অনেকবার ছড়ালেন, কুড়োলেন, কিন্তু কোন রকম আনন্দই পেলেন না। তখন মাথা চুলকে আপন মনে বললেন, 'এটা কি রকম হল? আমায় সবাই বললে, কুড়িয়ে পাওয়াতে ভারী ফুর্তি, কিন্তু আমার তো কোন ফুর্তি হচ্ছে না। তারাও তো ঠকাবার লোক নয়।' আরো বহু বার ছড়ালেন, কুড়োলেন, কিন্তু কোন সুখই পেলেন না। এই রকম করতে করতে শেষটায় বেখেয়ালে সব কটি পয়সাই ঘাসের ভিতর হারিয়ে গেল।

তখন তাঁকে অনেকক্ষণ ধরে পয়সাগুলো খুঁজতে হল। যখন পেলেন তখন মহা ফুর্তির সঙ্গে চেঁচিয়ে বললেন, 'এইবারে বুঝতে পেরেছি। কুড়িয়ে পাওয়াতে আনন্দ আছে বৈকি।'

ধূর্ত নাপিত

রিয়োকোয়ানের হাতের লেখা এতই সুন্দর ছিল আর তাঁর কবিতাতে এমনি অপূর্ব রসসৃষ্টি হত যে তাঁর হাতের লেখা কবিতা কেউ যোগাড় করতে পারলে বিক্রি করে বেশ দুপয়সা কামাতে পারত। রিয়োকোয়ান নিজে শ্রমণ; কাজেই তিনি এসব লেখা বিক্রি করতেন না—গরিব-দুঃখীকে বিলিয়ে দিতেন। কিন্তু কেউ ধাপ্পা দিয়ে তাঁর কাছ থেকে লেখা আদায় করার চেষ্টা করলে তিনি ফাঁদ এড়াবার চেষ্টা করতেন।

শ্রমণকে মাথা নেড়া করতে হয়। তাই রিয়োকোয়ান প্রায়ই এক নাপিতের কাছে যেতেন। নাপিতটি আমাদের দেশের নাপিতের মতই ধূর্ত ছিল এবং রিয়োকোয়ানের কাছ

---

১ খুব সম্ভব কবিতাটির গূঢ়ার্থ, 'বাজী জেতাতে বড় আনন্দ, আর বাজী হারাতে বড় দুঃখ।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থেকে অনবরত কিছু লেখা আদায় করার চেষ্টা করত। তাঁকে তাই নিয়ে বড্ড বেশি জ্বালাতন করলে তিনিও 'দেব' 'দিচ্ছি' করে কোনগতিকে এ অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পাবার চেষ্টা করতেন।

শেষটায় ধূর্ত নাপিত একদিন তাঁর মাথা অর্ধেক কামিয়ে বলল, 'ঠাকুর, হাতের লেখা ভালোয় ভালোয় এই বেলা দিয়ে দাও। না হলে বাকী অর্ধেক আর কামাবো না।' এ-রকম শয়তানির সঙ্গে রিয়োকোয়ানের এই প্রথম পরিচয়। কি আর করেন? হাতের লেখা দিয়ে মাথাটি মুড়িয়ে—উভয়ার্থে—আশ্রমে ফিরলেন। নাপিতও সগর্বে সদম্ভে লেখাটি ফ্রেমে বাঁধিয়ে দোকানের মাঝখানে টাঙালো—ভাবখানা এই, সে এমনি গুণী যে রিয়োকোয়ানের মত শ্রমণ তাকে হাতের লেখা দিয়ে সম্মান অনুভব করেন।

কিন্তু খদ্দেরদের ভিতর দু'চারজন প্রকৃত সমঝদার ছিলেন। তাঁরা নাপিতকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, লেখাতে একটা শব্দ সম্পূর্ণ বাদ পড়ে গিয়েছে। নাপিত ছুটে গিয়ে রিয়োকোয়ানের ভুল দেখিয়ে শুদ্ধ করে দেবার জন্যে বলল। তিনি বললেন, 'ওটা ভুল নয়। আমি ইচ্ছে করেই ও রকম ধারা করেছি। তুমি আমার অর্ধেক কামিয়ে দিয়েছিলে। আমিও তাই লেখাটি শেষ করে দিই নি। আর ঐ যে বুড়ি আমাকে সিম বিক্রি করে সে সর্বদাই আমাকে কিছুটা ফাউ দেয়। তোমার লেখা লেখায় যেটুকু বাদ পড়েছে সেটুকু বুড়িকে লেখা দেবার সময় ফাউ করে জুড়ে দিয়েছি। বিশ্বাস না হয় গিয়ে দেখে এসো।'

তার পর রিয়োকোয়ান অনেকক্ষণ ধরে মাথা দুলিয়ে হাসলেন।

রিয়োকোয়ান ও মোড়ল তোমিতোরি

শ্রমণদের দিন কাটে নানা ধরনের লোকের আতিথ্য নিয়ে। রিয়োকোয়ান একবার অতিথি হলেন মোড়ল তোমিতোরির। জাপানে তখন 'চলো' খেলার খুব চলতি এবং রিয়োকোয়ান সর্বদাই এ-খেলাতে হারেন বলে সকলেই তাঁর সঙ্গে খেলতে চায়।

তাই খেলা আরম্ভ হল। কিন্তু রিয়োকোয়ানের অদৃষ্ট সেদিন ভালো ছিল। বাজীর পর বাজী তিনি জিতে চললেন। বাড়ির ছেলে-মেয়েরা ভারী খুশি—রিয়োকোয়ানও আনন্দে আত্মহারা। তোমিতোরি রিয়োকোয়ানকে বিলক্ষণ চিনতেন, তাই রগড় দেখবার জন্য হঠাৎ যেন ভয়ঙ্কর চটে গিয়ে বললেন, 'তুমি তো আচ্ছা লোক হে! অতিথি হয়ে এসেছ আমার বাড়িতে আর জিতে জিতে আমার সর্বস্ব কেড়ে নিতে তোমার একটুকু লজ্জা হচ্ছে না? এ-রকম স্বার্থপর ছোটলোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব ভদ্রত্ব কি করে বজায় রাখা যায় আমি তো ভেবেই পাচ্ছি নে।'

রিয়োকোয়ান রসিকতা না বুঝতে পেরে ভারী লজ্জা পেলেন। তাড়াতাড়ি কোনোগতিকে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন বন্ধু কেরার বাড়িতে। কেরা বন্ধুর চেহারা দেখেই বুঝলেন, কিছু একটা হয়েছে। জিজ্ঞেস করলে, 'কি করেছ, খুলে বলো।' রিয়োকোয়ান বললেন, 'ভারী বিপদগ্রস্ত হয়েছি। তোমিতোরির সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। কি যে করব ভেবেই পাচ্ছি নে। তুমি কিছু বুদ্ধি বাৎলাতে পারো? তোমিতোরিকে যে করেই হোক খুশি করতে হবে।'

কেরা ব্যাপারটা শুনে তখনই বুঝতে পারলেন যে রিয়োকোয়ান রসিকতা বুঝতে

www.BanglaBook.org

পারেন নি। কিন্তু তিনিও চেপে গিয়ে দরদ দেখিয়ে বললেন, 'তাই তো! তা আচ্ছা, কাল তোমাকে তোমিতোরির কাছে নিয়ে গিয়ে মাপ চাইব।'

রিয়োকোয়ান অনেকটা আশ্বস্ত হলেন।

পরদিন ভোরবেলা দুজনা মোড়লের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলেন। রিয়োকোয়ান দোরের বাইরে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইলেন। কেরা ভিতরে গিয়ে যেন ভয়ঙ্কর কিছু একটা হয়েছে, এ-রকম ভাবে গম্ভীর গলায় রিয়োকোয়ানের হয়ে তোমিতোরির কাছে মাপ চাইলেন। রিয়োকোয়ান উদ্বেগে কাতর হয়ে কান খাড়া করে শুনতে পেলেন তোমিতোরি তাঁকে মাপ করতে রাজী আছেন। তদ্দণ্ডেই দুশ্চিন্তা কেটে গেল আর মহা খুশি হয়ে তৎক্ষণাৎ তোমিতোরির সামনে গিয়ে হাজির। তোমিতোরি প্রচুর খাতিরযত্ন করে রিয়োকোয়ানকে বসালেন। রিয়োকোয়ানকে আর তখন পায় কে! খুশিতে সব কিছু বেবাক ভুলে গিয়ে এক লহমার ভিতরেই বললেন, 'এসো, "চলো" খেলা আরম্ভ করা যাক।'

রিয়োকোয়ান এমনই সরল মনে প্রস্তাবটা করলেন যে সবাই হেসে উঠলেন। খেলা আরম্ভ হল।

এবারও রিয়োকোয়ান জিতলেন।

কী বিপদ

রিয়োকোয়ান ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে খেলা-ধুলো করতে ভালোবাসতেন। তারা মাঝে মাঝে তাঁকে বড় বিপদগ্রস্ত করত।

কথা নেই বার্তা নেই একদিন হঠাৎ একটা ছেলে চেঁচিয়ে বলল, 'ঠাকুর, আমায় একটা রায়ো দাও (রায়ো মুদ্রার দাম প্রায় চার টাকার মত)।'

রিয়োকোয়ান তো অবাক। এক রায়ো? বলে কি? তাঁর কাছে দুগণ্ডা পয়সা হয় কি না হয়।'

ছেলেরা ছাড়ে না। আরেকজন বলল, 'আমাকে দুটো রায়ো দাও।' কেউ বলে তিনটে, কেউ বলে চারটে। নিলমের মত দাম বেড়েই চলল আর রিয়োকোয়ান বিস্ময়ে হতবাক হয়ে হাত দুখানা মাথার উপর তুলে দাঁড়িয়ে ভাবছেন অত টাকা তিনি পাবনে কোথায়?

যখন নিলাম দশ রায়ো পেরিয়ে গেল তখন তিনি হঠাৎ দড়াম করে লম্বা হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

ছেলেরা তো এতক্ষণ নিলামের ফুর্তিতে মশগুল হয়ে ছিল। রিয়োকোয়ানকে হঠাৎ এ-রকম ধারা মাটিতে পড়ে যেতে দেখে ভয়ে-ভয়ে কাছে এগিয়ে এসে ডাকল, 'ও ঠাকুর, ওঠো। এ-রকম করছ কেন?' কোনো সাড়াশব্দ নেই। আরো কাছে এগিয়ে এসে দেখে তাঁর চোখ বন্ধ, সমস্ত শরীরে নড়া-চড়া নেই।

ভয় পেয়ে সবাই কানের কাছে এসে চেঁচাতে লাগল, ও ঠাকুর, ওঠো। ও-রকম ধারা করছ কেন?' তখন কেউ কেউ বলল, 'ঠাকুর মারা গিয়েছেন।' দু-চারজন তো হাউ-মাউ করে কেঁদে ফেলল।

যখন হট্টগোলটা ভালো করে জমে উঠেছে তখন রিয়োকোয়ান আস্তে আস্তে চোখ মেললেন। ছেলেরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। যাক্, ঠাকুর তাহলে মারা যান নি। সবাই তখন তাঁর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আস্তিন ধরে ঝুলোঝুলি করে চেঁচাতে লাগল, 'ঠাকুর মরে যান নি, ঠাকুর বেঁচে আছেন।'

রায়োর কথা সবাই তখন ভুলে গিয়েছে। কানামাছি খেলা আরম্ভ হয়েছে। ঠাকুর হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

* * *

ফিশার আরও বহু কিংবদন্তী উদ্ধৃত করে তাঁর পুস্তিকাখানি সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলেছেন। সেগুলো থেকে দেখা যায়, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রিয়োকোয়ান বয়স্ক লোকের সংসর্গ ত্যাগ করে ক্রমেই ছেলে-মেয়ে, প্রকৃতি আর প্রাণজগৎ নিয়ে দিনযাপন করেছেন। কিংবদন্তীর চেয়ে রিয়োকোয়ানের কবিতাতে তাঁর এই পরিবর্তন চোখে পড়ে বেশি।

বস্তুত, রিয়োকোয়ানের জীবনী আলোচনার চেয়ে বহু গুণে শ্রেয় তাঁর কবিতা পাঠ। কিন্তু তিনি তাঁর কবিতা লিখেছেন এমনি হাল্কা তুলি দিয়ে যে তার অনুবাদ করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

কোনো প্রকৃত সমঝদার যদি এই গুরুভার গ্রহণ করেন তবে আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লেখা সার্থক হবে।

মহাপরিনির্বাণ

ভিক্ষুণী তেইশা (তাইশিন) রিয়োকোয়ানের শিষ্যা ছিলেন সে-কথা এ জীবনীর প্রথম ভাগেই বলা হয়েছে। রিয়োকোয়ানের শরীর যখন তেহাত্তর বৎসর বয়সে জরাজীর্ণ তখন তিনি খবর পেলেন শ্রমণের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। সংবাদ পেয়ে তেইশা গুরুর পদপ্রান্তে এসে উপস্থিত হলেন।

সেই অবসন্ন শরীর নিয়ে শ্রমণ যে মধুর কবিতাটি রচনা করেছেন তার থেকে আমরা তাঁর স্বর্শকাতর হৃদয়ের খানিকটা পরিচয় পাই,—

নয়ন আমার যার লাগি ছিল তৃষাতুর এত দিন
ভুবন ভরিয়া আজ তার আগমন
তারই লাগি মোর কঠোর বিরহ মধুর বেদনা ভরা
তারই লাগি মোর দিন গেল অগণন।
এত দিন পরে মনের বাসনা পূর্ণ হয়েছে আজ
শান্তি বিরাজে ঝঞ্ঝা-মথিত ক্ষুব্ধ হৃদয়-মাঝ।

শেষ দিন পর্যন্ত তেইশা রিয়োকোয়ানের সেবা-সুশ্রুষা করেছিলেন। গুরুর মন প্রসন্ন রাখার জন্য তেইশা সব সময়ই হাসিমুখে থাকতেন, কিন্তু আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় ভিক্ষুণী কতটা কাতর হয়ে পড়েছিলেন ফিশার তাঁর পুস্তকে সে বেদনার কিছুটা বর্ণনা দিয়েছেন।

শেষ মুহূর্ত যখন প্রায় এসে উপস্থিত তখনো রিয়োকোয়ান তাঁর হৃদয়াবেগ কবিতার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন—

নলিনীর দলে শিশিরের মত মোদের জীবন, হায়—
শূন্যগর্ভ বাতাহত হয়ে চলিছে সুমুখ পানে।
আমার জীবন তেমনি কাটিল, ভোর হয়েছে শেষ
কাঁপন লেগেছে আমার শিশিরে—চলে যাবে কোন্‌খানে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রিয়োকোয়ান শান্তভাবে শেষ মুহূর্তের প্রতীক্ষা করেছিলেন, কিন্তু ভিক্ষুণী তেইশার নারী-হৃদয় যে কতটা বিচলিত হয়ে পড়েছিল, সে-কথা তেইশার ঐ সময়ের লেখা কবিতাটি থেকে বোঝা যায় ঃ—

গভীর দুঃখে হৃদয় আমার সান্ত্বনা নাহি মানে
এ মহাপ্রয়াণ দুর্দমনীয় বেদনা বক্ষে হানে।
সাধনায় জানি, জীবন মৃত্যু প্রভেদ কিছুই নেই
তবুও কাতর বিদায়ের ক্ষণ সমুখে আসিল যেই।

এ কবিতা পড়ে আমাদের মত গৃহী একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়ে। সর্বস্ব ত্যাগ করে, আজীবন শান্তির সন্ধান করার পরও যদি ভিক্ষুণীরা এ-রকম কথা বলেন তবে আমরা যাব কোথায়? আমরা তো আশা করেছিলুম, দুঃখের আঘাত সয়ে সয়ে কোনো গতিকে শেষ পর্যন্ত হয়ত আত্মজনের চিরবিচ্ছেদ সহ্য করার মত খানিকটা শক্তি পাব, কিন্তু তার আর ভরসা রইল কোথায়? ঋষি বলেছেন, 'একমাত্র বৈরাগ্যেই অভয়'; কিন্তু তেইশার কবিতা পড়ে মানুষের শেষ আশ্রয় বৈরাগ্য সম্বন্ধেও নিরাশ হতে হল।

জানি, এ কবিতা পড়ে রিয়োকোয়ান উত্তরে লিখেছিলেন—

রক্তপদ্মপত্রের মত মানব জীবন ধরে,
একে একে সব খসে পড়ে ভূমি 'পরে
ঝরার সময় লাগে তার গায়ে যে ক্ষুদ্র কম্পন
সেই তো জীবন।

কিন্তু রিয়োকোয়ান তো ও-পারের যাত্রী—তাঁর দুঃখ কিসের? বিরহ-বেদনা তো তাদের তরেই, যারা পিছনে পড়ে রইল।

"—কিন্তু যারা পেয়েছিল প্রত্যক্ষ তোমায়
অনুক্ষণ, তারা যা হারালো তার সন্ধান কোথায়,
কোথায় সান্ত্বনা?" (রবীন্দ্রনাথ)

তাই ফিশার বলেন, 'শত শত লোক শ্রমণের সব-যাত্রার সঙ্গে গিয়েছিল। আর যেসব অগণিত ছেলে-মেয়ের সঙ্গে তিনি খেলা-ধুলো করেছিলেন, তারাই যেন শ্রমণের শোকসন্তপ্ত বিরাট পরিবার।'

ফিশার তাঁর পুস্তিকা শেষ করেছেন রিয়োকোয়ানের সর্বশেষ কবিতাটি উদ্ধৃত করে,—

চলে যাবো যবে চিরতরে হেথা হতে
স্মৃতির লাগিয়া কী সৌধ আমি গড়ে যাবো কোন্ পথে?
কিন্তু যখন আসিবে হেথায় ফিরে ফিরে মধু ঋতু
পেলব-কুসুম মুকুলিত মঞ্জরি
নিদাঘের দিন স্বর্ণ-রৌদ্রে ভরা
কোকিল কুহরে, শরৎ-পবন গান গায় গুঞ্জরি
রক্তপত্র সর্ব অঙ্গে মেপল লইবে ধরে
এরাই আমার স্মৃতিটি রাখিবে ধরে।
এরাই তখন কহিবে আমার কথা
ফুল্লকুসুম মুখর কোকিল যথা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রক্তবসনা দীপ্তা মেপল শাখা
প্রতিবিম্বিত আমার আত্মা—এদেরই হিয়ায় আঁকা।

ফুটবল

'পরশুরামে'র কেদার চাটুজ্যে মশাই দূর থেকে বিস্তর মেমসাহেব দেখেছিলেন; আমিও দূর থেকে বিস্তর সিনেমা স্টার, পলিটিশিয়ান আর ফুটবল খেলোয়াড় দেখেছি। দেখে ওঁদের প্রতি ভক্তি হয়েছে এবং গদ্‌গদ হয়ে মনে মনে ওঁদের পেন্নাম জানিয়েছি।

তাই কি করে যে 'ইস্টবেঙ্গল' ক্লাবের কয়েকজন খেলোয়াড় এবং ম্যানেজার মশায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল তার সঠিক ব্যাখ্যা আমি এখনো সমঝে উঠতে পারি নি। তবে শুনেছি আমরা যে-রকম খাঁচার ভিতর সিংহ দেখে খুশি হই, সিংহটাও নাকি আমাদের দিকে কৌতূহলের সঙ্গে তাকায়, তার বিশ্বাস মানুষকে নাকি জড়ো করা হয় নিছক তাকে আনন্দ দেবার জন্য, যেদিন লোকের সংখ্যা কম হয় সেদিন নাকি সিংহ রীতিমত মন-মরা হয়ে যায়। (আরো শুনেছি, একটা খাঁচার গোটাকয়েক শিক ভেঙে যাওয়াতে গরিলা নাকি দস্তুরমত ভয় পেয়ে গিয়ে পেছন-ফিরে দাঁড়িয়েছিল—তার বিশ্বাস ছিল খাঁচাটার উদ্দেশ্য তাকে মানুষের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য।)

তাই যখন 'ইস্টবেঙ্গলে'র গুটিকয়েক রয়েল বেঙ্গল টাইগার আমার দিকে তাকালেন তখন আমি খুশি হলুম বইকি। তারপর তাঁদের মাধ্যমে আর সক্কলের সঙ্গেও মোলাকাত হয়ে গেল। সব কটি চমৎকার ভদ্রসন্তান, বিনয়ী এবং নম্র। আমি বরঞ্চ সদম্ভে তাদের শুনিয়ে দিলুম ছেলেবেলার 'বী' টিমের খেলাতে কি রকম কায়দাসে একখানা গোল লাগিয়ে দিয়েছিলুম, অবশ্য সেটা সুইসাইড্ গোল ছিল।

কেউ কেউ জিজ্ঞেস করলেন, আমি তাঁদের খেলা দেখতে যাবো কি না? বললুম, ফাইনালের দিন নিশ্চয়ই দেখতে যাবো। ম্যানেজার বললেন, তা হলে তো যে-করেই হোক ফাইনাল পর্যন্ত উঠতে হবে—বিবেচনা করুন, একমাত্র নিতান্ত আমাকে খুশি করার জন্যই তাঁদের কি বিপুল আগ্রহ!

ফাইনালের দিন ম্যানেজার আমাকে আমার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

* * *

দিল্লিতে ফুটবলের কদর কম। খেলা আরম্ভ হওয়ার পনেরো মিনিট পূর্বে গিয়েও দিব্য সীট পাওয়া গেল। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলুম আমার এক চ্যালাকে—শিটিফিটি দেওয়ার জন্য। পরে দেখলুম, ও ওসব পারে না, সে জন্মেছে পশ্চিমে। বললুম, 'আরে আপু' মুখে আঙুল পুরে যদি হুইসিলই না দিতে পারিস তবে ফুটবল খেলা দেখতে এসেছিস কেন? রবিঠাকুরের "ডাকঘর" দেখতে গেলেই পারিস।'

খেলা দেখতে এসেছে বাঙালি—তাদের অধিকাংশ আমার পদ্মার ও-পারের —আর মিলিটারি; এই দুই সম্প্রদায়। মিলিটারি এসেছে গোর্খা টিমকে সাহস দেবার জন্য, আর আমরা কি করতে গিয়েছি সে-কথা তো আর খুলে বলতে হবে না। অবশ্য আমাদের ভিতর যে 'মোহনবাগান' কিংবা 'কালীঘাট' ফ্যান ছিলেন না, সে-কথা বলব না, তবে কলকাতা থেকে এত দূরে বিদেশে তাঁরা তো আর গোর্খাদের পক্ষ নিতে পারেন না। 'দোস্ত নীস্ত,

www.BanglaBook.org

লেকিন দুশমন ই-দুশমন হস্ত' অর্থাৎ 'মিত্র নয়' তবে 'শত্রুর শত্রু' এই ফার্সী প্রবাদ সর্বত্র খাটে না।

পিছনে দুই সর্দারজী বড্ড ভ্যাচর ভ্যাচর করতে লাগল। ইস্টবেঙ্গল নাকি ফাইনাল পর্যন্ত উঠেছে নিতান্ত লাক্‌সে কপাল জোরে, ওরা নাকি বড্ড রাফ খেলে। সবুট গোর্খার সঙ্গে রাফ্ খেলবে ইস্টবেঙ্গল! আর পদে পদে নাকি অফ-সাইড্। ইচ্ছে হচ্ছিল লোকটাকে ধু'ঘা বসিয়ে দি কিন্তু তার বপুটা দেখে সাহস হল না।

* * *

খেলার পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই আমার মনে দৃঢ়প্রত্যয় হল ইস্টবেঙ্গল নিশ্চয় জিতবে। দশ মিনিটের ভিতর গোর্খারা গোটাচারেক ফাউল করলে আর ইস্টবেঙ্গল গোটাতিনেক গোল দেবার মোকা নির্মমভাবে মিস করলে। একবার তো বলটা গোল-বারের ভিতরে লেগে দুম করে পড়ে গেল গোল লাইনের উপর। গোলি সেটা তড়িঘড়ি সরিয়ে ফেললে। আমি দু'হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে বললুম, 'হে মা কালী, বাবা মৌলা আলী, তোমাদের জোড়া পাঁঠা দেব, কিন্তু এরকম আস্কারা দিয়ে মস্কোরা কোরো না, মাইরি।' বলেই মনে পড়ল 'মাইরি' কথাটা এসেছে 'মেরি' থেকে। থুড়ি থুড়ি বলে 'দুর্গা, দুর্গা, দুর্গতি-নাশিনী'কে স্মরণ করলুম।

হাফ-টাইম হতে চলল গোল আর হয় না—এ কী গব্বযন্তনা রে, বাবা। ওদিকে অবশ্য ফাউলের সংখ্যা কমে গিয়েছে—রেফারি দেখলুম বেজায় দড় লোক। কেউ পাউল করলে তার কাছে ছুটে গিয়ে বেশ দু'কথা শুনিয়েও দেয়। জীতা রহো বেটা। ফাউলগুলো সামলাও, তারপর ইস্টবেঙ্গলকে ঠ্যাকাবে কেডা।

নাঃ, হাফ-টাইম হয়ে গেল। খেলা তখনো আঁটকুড়ী—গোল হয় নি।

ওহে চানাচুর-বাদাম-ভাজা, এদিকে এসো তো, বাবা। না, থাক, শরবতই খাই। চেঁচাতে চেঁচাতে গলাটা শুকিয়ে গিয়েছে। চ্যালাই পয়সাটা দিলে; তা দেবে না? যখন হুইসিল দিতে জানে না। রেফারি আর কবার হুইসিল বাজালে? সমস্তক্ষণ তো বাজালুম আমিই।

* * *

হাফ-টাইমের পর খেলাটা যদি দেখতেন! সপাসপ আরম্ভ হল পোলো দিয়ে রুই ধরার মত গোল মারা।

আমি তো খেলার রিপোর্টার নই, তাই কে যে কাকে পাস করলে, কে কখন প্যার্টন উইভ করলে, কে কজন দুশমনকে নাচালে লক্ষ্য করি নি, তবে এটা স্পষ্ট দেখলুম, বলটাই যেন মনস্থির করে ফেলেছে, সবাইকে এড়িয়ে গোর্খার গোলে ঢুকবেই ঢুকবে। একে পাশ কাটিয়ে, ওর মাথার উপর দিয়ে, কখনো বা তিন কদম পেছিয়ে গিয়ে, কখনো বা কারো দু'পায়ের মধ্যিখানের ফাঁক দিয়ে বলটা হঠাৎ দেখি ধাঁই করে হাওয়ায় চড়ে গোর্খা গোলের সামনে! সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃৎপিণ্ডটা এক লম্ফ দিয়ে টনসিলে এসে আটকে গিয়েছে—বিকৃতস্বরে বেরল 'গো—অ—অ—ল!' ('রূপদর্শী' দ্রষ্টব্য)।

ফুটবল ভাষায় একটি তীব্র 'সট'-এর ('Sot'-Shot নয়) ফলে গোলটি হল।

পিছনের সর্দারজী বললেন, 'ইয়ে গোল বচানা মুশকিল নহী থা।'

আমি মনে মনে বললুম, 'সাহিত্যে একে আমরা বলি, 'মুখবন্ধ''। এরপর আরো

www.BanglaBook.org

গোটা দুই হলে তোমার মুখ বন্ধ হবে। লোকটা জোরালো না হলে—।'

* * *

এ সব ভাবাভাবির পূর্বেই আরেকখানা সরেস গোল হয়ে গিয়েছে। কেউ দেখল, কেউ না। একদম বেমালুম। তারই ধকল কাটাতে কাটাতে আরেকখানা, তিসরা অতিশয় মান-মনোহর গোল! সেটি স্পষ্ট দেখতে পেলুম। ও গোল কেউ বাঁচাতে পারত না। দশটা গোলি লাগিয়ে দিলেও না।

এবার ম্যানেজারকে অভিনন্দন জানানো যেতে পারে। উঠে গিয়ে তাকে জোর শ্যাকহ্যান্ড করলুম। ভারী খুশি। আমায় বললে, 'প্রত্যেক গোলে আপনার রি-একশন লক্ষ্য করছিলুম। আমরা আমাদের কথা রেখেছি (অর্থাৎ ফাইন্যালে উঠেছি) আর আপনিও আপনার কথা রেখেছেন (আমি কথা দিয়েছিলুম ওরা 'ফাইনালে জিতবেই)।' তার সঙ্গী তো আমার হাতখানা কপালে ঠেকালে।

মোরগ যে রকম গটগট করে গোবরের ঢিবিতে ওঠে আমি তেমনি আমার চেয়ারে ফিরে এলুম। ভাবখানা, তিনটে গোলই যেন নিতান্ত আমিই দিয়েছি।

তারপর শাঁ করে আরো একখানা।

দশ-বারো মিনিটের ভিতর ধনাধন চারখানা আদি ও অকৃত্রিম, খাঁটি-নির্ভেজাল গোল!

পিছনের সর্দারজী চুপ।

চ্যালাকে বললুম, 'চলো বাড়ি যাই। খেলা কি করে জিততে হয়, হাতে-কলমে দেখিয়ে দিলুম তো!'

রাত্রে সব খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানাতে গেলুম। গিয়ে দেখি এক ঢাউস ট্রফি। সঙ্গে আরেকটা বাচ্চা। বললুম, 'বাচ্চাটাই ভালো। বড়টা রাখা শক্ত (উভয়ার্থে)।'

ওদের-ই বিস্তর নাইন-নাইন্টি পুড়িয়ে বাড়ি ফিরলুম।

বেমক্কা

বন্ধুবর

গুলাম কুদ্দুসকে—

লোকসঙ্গীত ও বিদগ্ধ সঙ্গীতে যে পার্থক্য সেটা সহজেই আমাদের কানে ধরা পড়ে, তেমনি লোকসাহিত্য ও বিদগ্ধ সাহিত্যের পার্থক্য সম্বন্ধেও আমরা বিলক্ষণ সচেতন। আর্টের যে-কোনো বিভাগেই—নাট্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য—তা সে যাই হোক না কেন, এই বিদগ্ধ এবং লোকায়ত রসসৃষ্টির মধ্যে পার্থক্যটা আমরা বহুকাল ধরে করে আসছি।

তাই বলে লোকসঙ্গীত কিম্বা গণ-সাহিত্য নিন্দনীয় এ-কথা কোনো আলঙ্কারিকই কখনো বলেন নি। বাউল ভাটিয়াল বর্বরতার লক্ষণ কিম্বা বারমাসী যাত্রাগান রসসৃষ্টির পর্যায়ে পড়ে না, এ-কথা বললে আপন রসবোধের অভাব ঢাক পিটিয়ে বলা হয় মাত্র।

কিন্তু যখন এই লোকসঙ্গীত বা লোকনৃত্য শহরের মাঝখানে স্টেজের উপর সাজিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাড়ম্বরে শোনানো এবং দেখানো হয় তখনই আমাদের আপত্তি। যখনই বলা হয় এই সাঁওতাল নাচের সামনে ভরতনৃত্যম হার মানে কিম্বা বলা হয় এই 'রাবণবধ' পালা 'ডাকঘরে'র উপর ছক্কা-পাঞ্জা মেরেছে—তোমরা অতিশয় বেরসিক বর্বর বুর্জুয়া বলে

www.BanglaBook.org

এ তত্ত্বটা বুঝতে পারছো না, তখন নিরীহ বুর্জুয়া হওয়া সত্ত্বেও আপত্তি না করে থাকতে পারি নে।

কথাটা খুলে বলি। লোকসঙ্গীত (এবং বিশেষত গণ-নৃত্য) ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পার্থক্য অনেক জায়গায় আছে, কিন্তু একটা পার্থক্য এস্থলে বলে নিলে আমার প্রতিবাদের মূল তত্ত্বটা পাঠক সহজেই ধরে নিতে পারবেন। এই ধরুন, সাঁওতাল কিংবা গুজরাতের গরবা নাচ। এগুলো গণ-নৃত্য এবং এর সবচেয়ে বড় জিনিস এই যে, এ নাচে সমাজ বা শ্রেণীর সকলেই হিস্যাদার। চাঁদের আলোতে, না-ঠাণ্ডা না-গরম আবহাওয়াতে জনপদবাসী যখন দুদণ্ড ফুর্তিফার্তি করতে চায়, তখন তারা সকলেই নাচতে শুরু করে। যাদের হাড় বড্ড বেশি বুড়িয়ে গিয়েছে তারা ঘরে শুয়ে থাকে, কিন্তু যারা আসে তাদের কেউই নাচ থেকে বাদ যায় না। হয় নাচে, না হলে ঢোল বাজায়—বাচ্চা কোলে নিয়ে আধবয়সী মাদেরও নাচের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় না। তাই বলা যেতে পারে সাঁওতাল কিম্বা গরবা নাচ—অর্থাৎ তাবৎ গণ-নৃত্যই—নাচা হয় আপন আনন্দের জন্য, লোককে দেখানোর জন্য কিম্বা 'লোক দেখানো'র জন্য নয়। অর্থাৎ লোকনৃত্যে দর্শক থাকে না।

কিন্তু যখন উদয়শঙ্কর নাচেন তখন আমরা সবাই ধেই ধেই করে নেচে উঠি নে, কিম্বা যখন খানসায়েব চোখ বন্ধ করে জয়জয়ন্তী ধরেন তখন আমরা আর সবাই চেল্লাচেল্লি করে উঠি নে। ইচ্ছে যে একদম হয় না সে-কথা বলতে পারি নে, তবু যে করি নে তার একমাত্র কারণ উদয়শঙ্করের সঙ্গে পা মিলিয়ে কিম্বা খানসাহেবের সঙ্গে গলা মিলিয়ে রসসৃষ্টি আমরা এক মুহূর্তের তরেও করতে পারি নে। (যদি পারতুম তবে উদয়শঙ্করের নাচ দেখবার জন্য, খানসাহেবের গান শোনবার জন্য গাঁটের পয়সা খরচ করতুম না—কিম্বা বলতে পারেন, সিংগীর গলায় আপন মাথা ঢোকাতে পারলে সার্কাসে যেতুম না)।

তাই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত কিম্বা নৃত্যের জন্য শ্রোতা এবং দর্শকের প্রয়োজন।

লোকনৃত্যে যখন সবাই হিস্যা নিতে পারে আপন পা চালিয়েই, তখন এ কথা আশা করি সকলেই মেনে নেবেন যে, সে নৃত্য খুব সরল হওয়াই স্বাভাবিক। তাতে সূক্ষ্ম পায়ের কাজ থাকার কথা নয়, ভাবভঙ্গী প্রকাশের জন্য দুর্বোধ্য মুদ্রা সেখানে থাকতেই পারে না এবং তাই বলা যেতে পারে, সে নৃত্যে আর যা থাকে থাকুক, বৈচিত্র্য থাকতে পারে না।

তাই গণ-নৃত্য মাত্রই একঘেয়ে।

কমুনিস্ট ভায়ারা (কমরেডরা) মনস্থির করেছেন গণ-কলা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ কলা এবং সেই গণ-নৃত্য শহরে বুর্জুয়াদের দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিতে হবে। তাই মেহন্নত, ততোধিক তকলিফ বরদাস্ত করে তাঁরা শহরে স্টেজ খাটান, পর্দা ঝোলান, রঙ-বেরঙের আলোর ব্যবস্থা করেন আর তারপর চালান হৈদ্রাবাদী কিম্বা কুয়াম্বতুরেও হতে পারে,—জানি নে, ধোপার নাচ। কিম্বা গুজরাতী গরবা। বলেন, 'পশ্য, পশ্য'—থুড়ি, 'দ্যাখ, দ্যাখ, এরেই কয় লাচ।'

পূর্বেই নিবেদন করেছি গণ-নৃত্য নিন্দনীয় নয়, কিন্তু যে গণ-নৃত্য একঘেয়ে এবং বৈচিত্র্যহীন হতে বাধ্য, সেই নাচ দেখতে হবে ঝাড়া আধঘণ্টা ধরে? ঘন ঘন হাততালি দিয়ে বলতে হবে 'মরি, মরি'? দু-চার মিনিটের তরে যে এ নাচ দেখা যায় না, সে কথা বলছি নে।

আলো-অন্ধকারে ভিন্ গাঁয়ে যাচ্ছেন, দেহ ক্লান্ত, মন অবসন্ন, চাঁদ উঠি উঠি করেও

www.BanglaBook.org

উঠছেন না—এমন সময় দেখতে পেলেন গাঁয়ের মন্দিরের আঙিনায় একপাল মেয়ে মাথায় ছ্যাঁদা-ওলা কলসীতে পিদিম রেখে চক্কর বানিয়ে ধীরে ধীরে মন্দমধুর পা ফেলে নাচছে। জানটা তর হয়ে গেল। দু মিনিট দাঁড়িয়ে আলোর নাচ আর মেয়েদের গান, 'সোনার দেওর, আমার হাত রাঙাবার জন্য মেহেদী এনেছ কি?' দেখে নিলেন। কিন্তু তারপর? যে নাচ আস্তে আস্তে বিকাশের দিকে এগিয়ে যায় না, বিচিত্র অঙ্গভঙ্গ, পদবিন্যাসের ভিতর দিয়ে যে নাচ পরিসমাপ্তিতে পৌঁছয় না, সে নাচ দেখবেন কতক্ষণ ধরে? এ-নাচের পরিসমাপ্তি কোনো রসসৃষ্টির আভ্যন্তরীণ কারণে হয় না, এর পরিসমাপ্তি হয় নর্তকীরা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েন তখনই।

আলো-অন্ধকার, চাঁদ উঠি-উঠি, শ্যাওলামাখা ভাঙা দেউলের পরিবেশ থেকে হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে-নিয়ে-আসা নৃত্য শহরের স্টেজে মূর্ছা তো যায় বটেই, তার উপর মাইক্রোফোনযোগে চিৎকার করে তারস্বরে আপনাকে বলা হয়, 'এ নাচ বড় উমদা নাচ—'। এ নাচ আপনাকে দেখতে হয় আধঘণ্টা ধরে! আধঘণ্টা ধরে দেখতে হয় সেই নাচ, যার সর্ব পদবিন্যাস মুখস্থ হয়ে যায় আড়াই মিনিটেই।

পনরো টাকার সীটে বসে (টাকাটা দিয়েছিলেন আমার এক গোলাপী অর্থাৎ নিম-কমুনিস্টি কমরেড) আমি আর থাকতে না পেরে মুখে আঙুল পুরে শিটি দিয়েছিলুম প্রাণপণ। হৈ হৈ রৈ রৈ। মার মার কাট কাট। এ কী বর্বরতা?

আমি বললুম, 'কেন বাওয়া, আপত্তি জানাবার এই তো প্রলেটারিয়েটস অব দি প্রলেটারিয়েট কায়দা।'

আমরা হাসি কেন?

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে কবিগুরু বিশ্বভারতী সাহিত্য-সভায় এক খ্যাতনামা লেখকের সদ্য-প্রকাশিত একটা রচনা পাঠ করেন। রচনার আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল, 'আমরা হাসি কেন'?

এতদিন বাদে আজ আর সব কথা মনে নেই, তবে এইটুকু স্পষ্ট স্মরণে পড়ছে যে, বের্গসন হাসির কারণ অনুসন্ধান করে যে সব তত্ত্বকথা আবিষ্কার করেছিলেন, প্রবন্ধটি মোটের উপর তারই উপর খাড়া ছিল।

প্রবন্ধ পাঠের পর রবীন্দ্রনাথ আপন বক্তব্য বলেন।

সভায় উপস্থিত অন্যান্য গুণীরাও তখন নানারকম মতামত দেন এবং সবাই মিলে প্রাণপণ অনুসন্ধান করেন, 'আমরা হাসি কেন?' যতদূর মনে পড়ছে, শেষ পর্যন্ত সর্বজনগ্রাহ্য কোনো পাকাপাকি কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না।

পরদিন আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন সবার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, 'হাসির কারণ বের করতে গিয়ে সকলের চোখের জল বেরিয়ে গিয়েছিল।' (ঠিক কি ভাষায় তিনি জিনিসটি রসিয়ে বলেছিলেন আজ আর আমার সম্পূর্ণ মনে নেই—আশা করি আচার্য অপরাধ নেবেন না)।

* * *

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিল্লির ফরাসিস ক্লাবের (সের্কল ফ্রাসেঁ' অর্থাৎ 'ফরাসি-চক্র') এক বিশেষ সভায় মসিয়ে মার্তে নামক এক ফরাসি গুণী গত বুধবার দিন ঐ একই বিষয় নিয়ে অর্থাৎ 'আমরা হাসি কেন?' একখানি প্রামাণিক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

ফরাসি রাজদূত এবং আরো মেলা ফরাসি-জাননেওয়ালা ফরাসি অ-ফরাসি ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা সভায় উপস্থিত ছিলেন। ফরাসি কামিনীগণ সর্বদাই অত্যুত্তম সুগন্ধ ব্যবহার করেন বলে ক্ষণে ক্ষণে মনে হচ্ছিল আমি বুঝি প্যারিসে বসে আছি।

(এ কিছু নূতন কথা নয়—এক পূর্ববঙ্গবাসী শিয়ালদা স্টেশনে নেমেও গেয়েছিলেন,—

ল্যামা ইস্টিশানে গাড়ির থনে
মনে মনে আমেজ করি
আইলাম বুঝি আলী-মিয়ার রঙমহলে
ঢাহা জেলায় বশ্যাল ছাড়ি।)

শুধু প্যারিস নয় আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন 'কোতি', 'উবিগাঁর' কুশবায়ের দোকানে বসে আছি।

ডাঃ কেসকর উত্তম ফরাসি বলতে পারেন। তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করে প্রাঞ্জল ফরাসিতে বক্তার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

বের্গসন আর সেই চিরন্তন কারণানুসন্ধান, 'হাসি কেন'? আমি তো নাকের জলে চোখের জলে হয়ে গেলুম—ত্রিশ বৎসর পূর্বে যে রকমধারা হয়েছিলুম—কিন্তু তবু কোনো হদিস মিলল না।

কিন্তু সেইটে আসল কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে, এই দিল্লিশহর যে ক্রমে ক্রমে আন্তর্জাতিক মহানগরী হতে চলল সেইটেই বড় আনন্দের কথা।

এতদিন ধরে আমরা ইয়োরোপকে চিনতে শিখলুম ইংরেজের মাধ্যমে এবং তাতে করে মাঝে মাঝে আমরা যে মারাত্মক মার খেয়েছি, তার হিসেব-নিকেশ এখনো আরম্ভ হয় নি। একটা সামান্য উদাহরণ নিন।

ইংরেজের আইরিশ স্টু, মাটন রাস্ট আর প্লামপুডিং খেয়ে খেয়ে আমরা ভেবেছি ইয়োরোপবাসী মাত্রই বুঝি আহারাদি বাবতে একদম হটেনটট। তারপর যেদিন উত্তম ফরাসি রান্না খেলুম, তখন বুঝতে পারলুম, ক্রোয়াসাঁ রুটি কি রকম উপাদেয়, একটি মামুলী অমলেট বানাতে ফরাসি কতই না কেরদানি-কেরামতি দেখাতে পারে, পাকা টমাটো, কাঁচা শসা আর সামান্য লেটিসের পাতাকে একটুখানি মালমশলা লাগিয়ে কী অপূর্ব স্যালড্ নির্মাণ করতে পারে। মাস্টার্ড, উস্টারসস আর বিস্তর গোলমরিচ না মাখিয়েও যে ইয়োরোপীয় রান্না গলাধঃকরণ করা যায় সেইটি হৃদয়ঙ্গম হল ফরাসি রান্না খেয়ে।

তাই আমার আনন্দ যে, ধীরে ধীরে একদিন ফ্রান্সের মঙ্গে আমাদের মোলাকাত এ-দেশে বসেই হবে।

সের্কল ফ্রাসেঁ দিল্লিবাসীকে তার জন্য তৈরি করে আনছেন।

* * *

প্রবন্ধ পাঠের পর মসিয়ো মার্তে কয়েকটি রসালো গল্প বলেন। তিনি যে অনবদ্য ভাষায় এবং তার সঙ্গে অঙ্গভঙ্গী সঞ্চালনে গল্পগুলো পেশ করেছিলেন সে জিনিস তো আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কালি-কলমে ওতরাবে না—তাই গল্পটি পছন্দ না হলে মসিয়োর নিন্দা না করে দোষটা আমারই ঘাড়ে চাপাবেন।

এক রমণী গিয়েছেন এক সাকিয়াট্রিস্টের কাছে। তিনি ডাক্তারের ঘরে ঢুকতেই ডাক্তার তাঁকে কোনো কথা বলবার সুযোগ না দিয়েই আধঘণ্টা ধরে বক্তৃতা দিতে লাগলেন। অত কষ্টে সুযোগ পাওয়ার পর রমণী বললেন, 'ডাক্তার, আমাকে অতশত বোঝাচ্ছেন কেন? আমি এসেছি আমার স্বামীর চিকিৎসা করাতে।'

ডাক্তার বললেন, 'ও! তাঁর কি হয়েছে?'

রমণী বললেন, 'ঠিক ঠিক বলতে পারব না তবে এইটুকু জানি, তাঁর বিশ্বাস তিনি সীল মাছ।'

'বলেন কি? তা তিনি এখন কোথায়?'

'তিনি বারান্দায় বসে আছেন।'

'তাঁকে নিয়ে আসুন তো, দেখি, ব্যাপারটা কি।'

ভদ্রমহিলা বাইরে গিয়ে সঙ্গে নিয়ে এলেন একটা সীল মাছ।

গাইড

দিল্লিতে একটি সরকারি টুরিস্ট ব্যুরো বসেছে। তার প্রধান কর্ম টুরিস্টদের সদুপদেশ দেওয়া, এটা সেটা করে দেওয়া এবং বিচক্ষণ গাইডের তদারকিতে শহরের যাবতীয় দ্রষ্টব্য বস্তু দেখানো।

এই সম্পর্কে এক ভদ্রলোক খবরের কাগজে চিঠি লিখতে গিয়ে জানিয়েছেন, দিল্লিতে বিচক্ষণ গাইডের বিলক্ষণ অভাব। আমি পত্রলেখকের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

'পাণ্ডা' এবং 'গাইড' হরেদেরে একই মাল। তীর্থস্থলের গাইডকে পাণ্ডা বলা হয়—তাই গয়াতে আপনি পাণ্ডা ধরেন, কিংবা বলুন পাণ্ডা আপনাকে ধরে—আর ঐতিহাসিক ভূমি এবং তীর্থক্ষেত্রের যদি সমন্বয় ঘটে তবে সেখানে পাণ্ডা এবং গাইডের সমন্বয় হয়। যেমন জেরুজালেম। তিন মহা ধর্ম—ক্রীশ্চান, ইহুদী এবং মুসলমান—এখানে এসে সম্মিলিত হয়েছে। তার উপর জেরুজালেমের অভেজাল ঐতিহাসিক মূল্যও আছে। ফলে পৃথিবীর হেন দেশ হেন জাত নেই যেখান থেকে তীর্থযাত্রী (পাণ্ডার বলির পাঁঠা) এবং টুরিস্ট (গাইডের কুরবানীর বকরি) জেরুজালেমে না আসে।

দিল্লি অনেকটা জেরুজালেমের মত। এর ঐতিহাসিক মূল্য তো আছেই, তীর্থের দিক দিয়ে এ জায়গা কম নয়। চিশতী সম্প্রদায়ের যে পাঁচ গুরু এদেশে মোক্ষলাভ করেছেন তাঁদের তিনজনের কবর দিল্লিতে। কুতুব-মিনারের কাছে কুৎব উদ্‌দীন বখতিয়ার কাকীর (ইনি ইলতুৎমিশ-অলতমশের গুরু) কবর, হুমায়ুনের কবরের কাছে নিজামউদ্‌দীন আওলিয়ার কবর (ইনি বাদশা আলাউদ্‌দীন খিলজী এবং মুহম্মদ তুঘলুকের গুরু) আর দিল্লির বাইরে শেষ গুরু নাসিরউদ্‌দীন 'চিরাগ-দিল্লি'র কবর। আর কালকাজী, যোগমায়া তো আছেনই।

www.BanglaBook.org

এসব জায়গায় পাণ্ডারা যা গাঁজাগুল ছাড়ে সে একেবারেই অবর্ণনীয়। এদিকে বলবে যেটা হচ্ছে আকবরের দু-ভাইয়ের কবর, ওদিকে বলবে, তিন হাজার বছরের পুরনো এই কবরের উপরকার এমারত!

বেঙ্গল কেমিকেলের আমার এক সুহৃদ গিয়েছিলেন বৃন্দাবন। পাণ্ডা দেখালে এক দোলনা—ভক্তিভরে বললে, এ দোলায় দোল খেতেন রাধাকৃষ্ণ পাশাপাশি বসে। বন্ধুটি নাস্তিক নন, সন্দেহপিশাচ। বললেন, 'যে কড়ির সঙ্গে দোলনা ঝোলানো রয়েছে, তাতে তো লেখা রয়েছে, টাটা কোম্পানির নাম; আমি তো জানতুম না, টাটা এত প্রাচীন প্রতিষ্ঠান!'

পরদিন বৃন্দাবন থেকে সজল নয়নে বিদায় নেবার বেলা বন্ধু সে জায়গায় গিয়ে দেখেন, কড়িতে প্রাণপণ পলস্তারার পর পলস্তারা রঙ লাগানো হচ্ছে।

* * *

দিল্লিতে ভালো গাইডের সত্যই অভাব। সখা এবং শিষ্য শ্রীমান বিবেক ভট্টাচার্য কপালী লোক। তিনি কখনো কখনো ভালো গাইড পেয়ে যান—সে বিষয়ে তিনি 'দেশে' মনোরম প্রবন্ধ লিখেছেন কিন্তু সচরাচর আপনার কপালে এখানে যা গাইড জুটবে তার না জানে ইতিহাস এবং না পারে ছড়াতে গাঁজাগুল।

ভালো গাইড মানে কথকঠাকুর, আর্টিস্ট। তাঁর কর্ম হচ্ছে, ইতিহাস আর কিম্বদন্তী মিলিয়ে মিশিয়ে আপনাকে গল্পের পর গল্প বলে যাওয়া, আর সে সব গল্প শুনে আপনি এত খুশি যে দিনের শেষে তাঁকে পাঁচ টাকা দিতে আপনার বুক কচকচ করে না।

একদা ভিয়েনা শহরে আমি এই রকম একটি গাইড পেয়েছিলুম। শহরের দ্রষ্টব্য বস্তু দেখাতে দেখাতে বললে, 'এই দেখুন শ্যোনব্রুন প্রাসাদ। রাজাধিরাজ ফ্রান্‌ৎস্‌য়োসেফ এখানে বেলকনিতে দাঁড়িয়ে দেখতেন পলটনের কুচকাওয়াজ। দেশ-বিদেশের গেরেমভারী রাজকর্মচারি রাজদূতেরা হুজুরের চতুর্দিকে দাঁড়িয়ে দেখতেন আমাদের শৌর্য বীর্য আমাদের ঐশ্বর্য। তারপর হুজুর বেরতেন সোনার-পাত মোড়া গাড়িতে, বিবিসাহেবা বেরতেন রূপোর গাড়িতে। আহা, কোথায় গেল সে সব দিন!'

খানিকক্ষণ পর বাড়ি ফেরার পথে গাইড বলল, 'দেখুন দেখুন, এই ছোট্ট বাড়িখানা, ফ্রান্‌ৎস্‌য়োসেফ যে রকম রাজার রাজা ছিলেন, ঠিক তেমনি সঙ্গীতে রাজার রাজা বেটোফেন দৈন্যে-ক্লেশে কাতর হয়ে এই লঝঝড় বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর শেষ কটি সিমফনি—সেই ত্রিলোকবিখ্যাত স্বর্গীয় সঙ্গীতসুধা কে না পান করেছে বলুন—তিনি এইখানেই রচেছিলেন।'

আমি করজোড়ে সে বাড়িকে নমস্কার করলুম দেখে গাইডের হৃদয়ে বিষাদে হরিষ দেখা দিল। ট্যাক্সিওয়ালাকে বললে, 'একটুখানি চক্কর মেরে বেটোফেন যে বাড়িতে দেহত্যাগ করেছিলেন সেইটে দেখিয়ে দাও।'

সে বাড়ির সামনে আমরা দুজনাই নিস্তব্ধ। এই জীর্ণ শীর্ণ দরিদ্র গৃহে রাজাধিরাজ বেটোফেন দেহত্যাগ করলেন!

* * *

আমরা বাড়ি ফিরছি। হঠাৎ গাইড ট্যাক্সিওয়ালাকে বললেন, 'একটু তাড়াতাড়ি চালাও বাছা, ঐ পাশের বাড়িতে আমার শাশুড়ি থাকেন, খাণ্ডার রমণী, পাছে না দেখে ফেলে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আচার্য তুচ্চি

দিল্লির ইন্ডিয়ান কালচারেল এসোসিয়েশন গত শুক্রবার দিন ইতালির খ্যাতনামা অধ্যাপক জিয়োসেপ্পে তুচ্চিকে এক সভায় নিমন্ত্রণ করে সাদর অভ্যর্থনা জানান। সভাস্থলে ইতালির রাজদূত ও শ্রীযুক্তা তুচ্চিও উপস্থিত ছিলেন।

ভারত-তিব্বত-চীনের ইতিহাস এবং বিশেষ করে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি, বিকাশ এবং দেশদেশান্তরে তার প্রসার সম্বন্ধে আজকের দিনে অধ্যাপক তুচ্চির যে জ্ঞান আছে তার সঙ্গে বোধ হয় আর কারোর তুলনা করা যায় না। বিশেষ করে মহাযান বৌদ্ধধর্মের যে সব শাস্ত্র সংস্কৃতে লোপ পেয়ে গিয়েছে কিন্তু তিব্বতী এবং চীনা অনুবাদে এখানে পাওয়া যায়, সেগুলো থেকে অধ্যাপক তুচ্চি নানাপ্রকারের তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করে বৌদ্ধধর্মের যে ইতিহাস নির্মাণ করে যাচ্ছেন, সে ইতিহাস ভারতের গৌরব বর্ধন করে চলেছে। ঠিক বলতে পারব না কিন্তু অনুমান করি, প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধরে তিনি এই কর্মে নিযুক্ত আছেন। তাঁর স্বাস্থ্য এখনো অটুট; তাই আশা করা যেতে পারে তিনি আরো বহু বৎসর ভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যার সেবা করতে পারবেন।

* * *

ইতালির স্কুলে থাকতেই তুচ্চি সংস্কৃত শিখতে আরম্ভ করেন। কলেজে ঢোকার পূর্বেই তাঁর মহাভারত, রামায়ণ ও কালিদাসের প্রায় সব কিছুই পড়া হয়ে গিয়েছিল—টোলে না পড়ে এতখানি সংস্কৃত চর্চা এই ভারতেরই কটি ছেলে করতে পেরেছে? কলেজে তুচ্চি সংস্কৃতের বিখ্যাত অধ্যাপক ফরমিকির সংস্রবে আসেন। অধ্যাপক ফরমিকির নাম এদেশে সুপরিচিত নয়, কিন্তু ইতালির পণ্ডিত মাত্রই জানেন, সে দেশে সংস্কৃত চর্চার পত্তন ও প্রসারের জন্য তিনি কতখানি দায়ী। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁর ছিল অবিচল অনুরাগ এবং গভীর নিষ্ঠা। অধ্যাপক তুচ্চি তাঁর অন্যতম সার্থক শিষ্য।

* * *

অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি, উইনটারনিৎস ও লেসনি শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করে স্বদেশে চলে যাওয়ার পর এদেশ থেকে রবীন্দ্রনাথ নিমন্ত্রণ করেন অধ্যাপক ফরমিকি এবং তুচ্চিকে। ১৯২৫-এ এঁরা দুজন ভারতবর্ষে আসেন।

অধ্যাপক ফরমিকি শান্তিনিকেতনে সংস্কৃত পড়াবার সুযোগ পেয়ে বড় আনন্দিত হয়েছিলেন। একদিন তিনি আমাকে বলেন, 'জানো সমস্ত জীবনটা কাটল ছাত্রদের সংস্কৃত ধাতুরূপ আর শব্দরূপ শিখিয়ে। রসিয়ে রসিয়ে কাব্যনাট্য পড়ানো আরম্ভ করার পূর্বেই তাদের কোর্স শেষ হয়ে যায়—তারা তখন স্বাধীনভাবে সংস্কৃত চর্চা আরম্ভ করে দেয়। জীবনে এই প্রথম শান্তিনিকেতনে সুযোগ পেলুম পরিণত-জ্ঞান ছেলেমেয়েদের নিয়ে কাব্যনাট্য পড়ার। ব্যাকরণ পড়াতে হচ্ছে না, এটা কি কম আরামের কথা।'

এবং আশ্চর্য, আমার মত মূর্খদেরও তিনি অবহেলা করতেন না। এবং ততোধিক আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তার—কঠিন জিনিস সরল করে বোঝাবার। সাংখ্য বেদান্ত তখনো জানতুম না, এখনো জানি নে, কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে বসুমতী বেহ্নের বাড়ির বারান্দায় মোড়াতে বসে সাংখ্য এবং বেদান্তের প্রধান পার্থক্য তিনি কি অদ্ভুত সহজ ভাষায় বুঝিয়ে

www.BanglaBook.org

বলেছিলেন। তিতিক্ষু পাঠক অপরাধ নেবেন না, যদি আজ এই নিয়ে গর্ব করি যে অধ্যাপক ফরমিকি আমাকে একটুখানি স্নেহের চোখে দেখতেন। রাস্তায় দেখা হলেই সাংখ্য বেদান্তর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে বাজিয়ে নিতেন, যা শিখিয়েছেন আমার ঠিক ঠিক মনে আছে কি না।

হেমলেট চরিত্রের সাইকো-এনালেসিস ইয়োরোপে তিনিই করেন প্রথম। হেমলেট যে কেন প্রতিবারে তার কাকাকে খুন করতে গিয়ে পিছু-পা হত সে কথা তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন।

* * *

গুরু পড়াতেন সংস্কৃত আর শিষ্য পড়াতেন ইতালিয়ান। অধ্যাপক তুচ্চির অন্যতম মহৎ গুণ, তিনি ছাত্রের মনস্তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি রেখে অধ্যাপনা করেন। আমরা একটুখানি ইতালিয়ান শিখে নিয়ে বললুম, এইবারে আমরা দানুন্দ্জিয়ো পড়ব।

তুচ্চি বললেন, 'উপস্থিত মাদ্জিনি পড়ো।'

তারপর বুঝিয়ে বললেন, 'তোমরা এখন স্বাধীনতার জন্য লড়ছো। তোমাদের চিন্তাজগতে এখন স্বাধীনতা কি, স্বাধীনতা সংগ্রাম কাকে বলে এই নিয়ে তোলপাড় চলছে। আর এসব বিশ্লেষণ মাদ্জিনি যে রকম করে গিয়েছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশবাসীকে তিনি যেরকম উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত করতে পেরেছিলেন এ রকম আর কেউ কখনো পারেননি। তোমাদের চিন্তাধারার সঙ্গে এগুলো মিলে যাবে, ভাষা শেখাটাও তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাবে।'

হলও তাই। অধ্যাপক তুচ্চি শান্তসমাহিত গম্ভীর প্রকৃতির পণ্ডিত নন—তাঁর ধাঁচ অনেকটা ফরাসিস। অল্পেতেই উত্তেজিত হয়ে যান আর মাদ্জিনির ভুবন-বিখ্যাত বক্তৃতাগুলোতে যে উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রচুরতম খোরাক রয়েছে তা যাঁরা মাদজিনি পড়েছেন তাঁরাই জানেন—এমন কি এই গত বিশ্বযুদ্ধের সময়ও চার্চিল মাদ্জিনির বক্তৃতা আপন বক্তৃতায় কাজে লাগিয়েছেন। তুচ্চি পড়াতে পড়াতে উৎসাহে দাঁড়িয়ে উঠতেন আর দিক্‌চক্রবালের দিকে হাত বাড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে মাদ্জিনির ভাষায় বলতেন,

"আভান্তি, আভান্তি ও ফ্রাতেল্লি।"

"অগ্রসর হও, অগ্রসর হও, হে ভ্রাতৃবৃন্দ—"

'আসবে সে দিন আসবে, যেদিন নবজীবনের সর্বোচ্চ শিখরে দাঁড়িয়ে তোমরা পিছন পানে তাকাবে—পিছনের সব কিছু তখন এক দৃষ্টিতেই ধরা পড়বে, তার কোনো রহস্যই তোমাদের কাছে তখন আর গোপন রইবে না; যেসব দুঃখবেদনা তোমরা একসঙ্গে সয়েছ সেগুলোর দিকে তাকিয়ে তোমরা তখন আনন্দের হাসি হাসবে।'

এসব সাহসের বাণী সর্বমানবের সুপরিচিত। আমরা যে উৎসাহিত হয়েছিলুম তাতে আর বিচিত্র কি?

* * *

তারপর দীর্ঘ সাতাশ বৎসর কেটে গিয়েছে। এর ভিতর অধ্যাপক তুচ্চি পাণ্ডুলিপির সন্ধানে ভারত-তিব্বত বহুবার ঘুরে গিয়েছেন এবং তাঁর পরিশ্রমের ফল ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডার এবং ইতালির সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

ইতালির প্রাচ্যবিদ্যামন্দির আচার্য তুচ্চির নিজের হাতে গড়া বললে অত্যুক্তি করা হয় না। শুধু যে সেখানে সংস্কৃত, পালির চর্চা হয় তাই নয়, বাঙলা, হিন্দি শেখাবার ব্যবস্থাও সেখানে আছে, এবং চীনা, জাপানী, তিব্বতী ভাষার অনুসন্ধান করে ভারতের সাংস্কৃতিক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইতিহাস সেখানে লেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যে তুচ্চি নিজে যে সব প্রাচীন পুস্তক প্রকাশ করেছেন, যে সব সারগর্ভ পুস্তক রচনা করেছেন, তার সম্পূর্ণ তালিকা দিতে গেলেই এ গ্রন্থের আরো দু'পৃষ্ঠার প্রয়োজন হবে।

* * *

সম্বর্ধনা-সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে আচার্য তুচ্চি বলেন, 'বহু প্রাচীনকাল থেকে ভারত-ইতালিতে যে ব্যবসা-বাণিজ্যের যোগসূত্র স্থাপিত ছিল সে কথা আপনারা সকলেই জানেন (দক্ষিণ-ভারতে আজও প্রতি বৎসর বহু রোমান মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়), কিন্তু সেইটেই বড় কথা নয়। ভারত-ইতালির আত্মায় আত্মায় যে ভাব বিনিময় হয়েছিল সেইটেই সবচেয়ে মহান তত্ত্ব এবং সেই তত্ত্বানুসন্ধান করে নূতন করে আমাদের ভাবের লেনদেন, আদানপ্রদান করতে হবে।

'আমি ইতালিতে যে প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছি সেটিকে সফল করবার জন্য আপনাদের সহযোগিতা কামনা করি।'

* * *

আমরা একবাক্যে বলি ভগবান আচার্য তুচ্চিকে জয়যুক্ত করুন।।

নিশীথদা

কলকাতা কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র, খ্যাতনামা ব্যারিস্টার, নিঃস্বার্থ দেশসেবক শ্রীযুক্ত নিশীথচন্দ্র সেন ইহলোক ত্যাগ করেছেন। এদেশের বহু গুণী জ্ঞানী, বহু প্রখ্যাত কর্মী তাঁর সংস্রবে এসেছিলেন—এমন কি একথা বললে ভুল বলা হবে না যে, দেশসেবা করেছেন, কিন্তু শ্রীযুক্ত নিশীথ সেনের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র স্থাপিত হয় নি, এরকম লোক বাঙলা দেশ দেখে নি। তাই নির্ভয়ে বলতে পারি, কৃতী নিশীথ সেনের কর্মজীবনের প্রশস্তি কীর্তন করার লোকের অভাব হবে না।

আমি কিন্তু নিশীথদাকে সেভাবে চিনি নি। আমি তাঁকে পেয়েছিলুম বন্ধুরূপে, তাঁর জীবন-অপরাহ্নে। তিনি তখন কলকাতার ভিতর-বাইরে এতই সুপরিচিত যে প্রথম আলাপের দিন কেউ আমাকে বুঝিয়ে বলল না, নিশীথ সেন বলতে কি বোঝায়। তারপর নানা রকম গাল-গল্পের মাঝখানে কে যেন আমাকে বললে, 'আনন্দবাজারে যে ইংরেজকে কটু-কাটব্য আরম্ভ করেছ (আমি তখন 'সত্যপীর' নাম নিয়ে ঐ কাগজে কলমে ধার দিচ্ছি) তার আগে খবর নিয়েছ কি, 'সিডিশন'', ''ডিফেমশন'', ''মহারাণীর বিরুদ্ধে লড়াই'', এসব জিনিসের অর্থ কি?' আমি কোনো কিছু বলবার আগেই নিশীথ সেন বললেন, 'আমরাই জানি না, উনি জানবেন কি করে? আপনি তো দর্শনে ডক্টর, না?' আমি সবিনয়ে বললুম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।' নিশীথ সেন আমার দিকে চেয়ার ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, 'ইংরেজ তার সমালোচককে জেলে ঠেলবার জন্য যেসব আইনকানুন বানিয়েছে, সেগুলো কোন্ স্থলে প্রযোজ্য, কাকে সেই ডাণ্ডা দিয়ে ঠ্যাঙানো যায়, তার টীকাটিপ্পনী, নজীর-দলিল ইংরেজ আপন হাতেই রেখেছে। সুবিধেমত কখনো সেটা টেনে টেনে রবারের মত লম্বা করে, কখনো ফাঁদ ঢিলে করে পাখিকে উড়ে যেতেও দেয়। এ দেখুন না, লোকমান্য টিলককে যে

www.BanglaBook.org

আইনের জোরে জেলে পুরল, সে আইন ওরকম ধারা কাজে লাগানো যায় সে কথা একেবারে আনাড়ি উকিলও মানবে না। তবু টিলককে তো জেলে যেতে হল। তাই সিডিশন কিসে হয় আর কিসে হয় না, সেকথা ঝানু উকিলরা পর্যন্ত আগেভাগে বলতে পারে না। ইংরেজ যদি মনস্থির করে আপনাকে আলিপুর পাঠাবে তবে সে তখন আপনার বিরুদ্ধে অনেক নূতন-পুরাতন আইন বের করবে। আমরা—অর্থাৎ উকিল ব্যারিস্টাররা—তখন তার বিরুদ্ধে লড়ি, সব সময়ে যে হারি তাও বলতে পারি নে।' তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'আমার ফোন নম্বরটা জানেন তা? কোনো অসুবিধে হলে ফোন করবেন। আমি যা পারি করে দেব।'

প্যারীদা কান পেতে শুনছিল, লক্ষ্য করি নি। তক্ষুনি বললে, 'নম্বরটা টুকে নাও, ওহে আলী। কাজে লাগবে।'

পরে খবর নিয়ে জানতে পারলুম, নিশীথদা কত বড় ডাকসাইটে ব্যারিস্টার এবং তার চেয়েও বড় কথা, সেই আলিপুরের আলম থেকে আজ পর্যন্ত পাঁচজনের জানা অজানাতে কত অসংখ্যবার ফীজ না নিয়ে বিপ্লবীদের জন্য লড়েছেন। লোকটির প্রতি শ্রদ্ধায় মন ভরে উঠলো।

কিন্তু থাক এসব কথা। পূর্বে নিবেদন করেছি, এসব কথা গুছিয়ে বলবার জন্য লোকের অভাব হবে না।

নিশীথদা প্রায় আমার বাপের বয়সী ছিলেন, কিন্তু কি করে তিনি যে একদিন দাদা হয়ে গেলেন এবং আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলুম, তাঁকে 'তুমি' বলতে আরম্ভ করে দিয়েছি—সে শুধু যাঁরা নিশীথদাকে চিনতেন তাঁরাই বলতে পারবেন।

একই প্লেনে শিলং গেলুম, সেখানে প্যারীদার বাড়িতে উঠলুম। সিগার ফুঁকতে ফুঁকতে আমার ঘরে ঢুকে খাটের একপাশে বসে বললেন, 'কবি (বিশ্বসাক্ষী, আমি কবি নই), চমৎকার ওয়েদার, বাইরে এসো।' বাইরে মুখোমুখি হয়ে বসলুম, তিনি নানা রকমের প্রাচীন কাহিনী বলে যেতে লাগলেন; অরবিন্দ ঘোষ, সুরেন বাঁড়ুয্যে, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, রাসবিহারী ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ, আশুতোষ মুখুজ্যে, আব্দুর রসুল এঁদের সম্বন্ধে এমন সব কথা বললেন, যার থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারলুম যে, কতখানি পাণ্ডিত্য, কত গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং বিশ্লেষণ ক্ষমতা থাকলে পরে মানুষ এত সহজে বাঙলা দেশের পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস এবং তার কৃতী সন্তানদের জীবনী একবার মাত্র না ভেবে অনর্গল বলে যেতে পারে। আজ আমার দুঃখের অবধি নেই, কেন সেসব কথা তখন টুকে রাখলুম না।

আমি মূর্খের মত মাঝে মাঝে আপত্তি উত্থাপন করেছি এবং খাজা গবেটের মত আইন নিয়েও। নিশীথদার চোখ তখন কৌতুক আর মৃদু হাস্যে জ্বলজ্বল করে উঠত। চুপ করে বাধা না দিয়ে শুনতেন। তারপর মাত্র একদিন চোখা যুক্তি দিয়ে আমাকে দু টুকরো করে কেটে ফেলতেন। আমার তাতে বিন্দুমাত্র উত্তাপ বোধ হয় নি। তাই শেষের দিকে যখন যে সব জিনিস নিয়ে আমি মনে মনে দম্ভ পোষণ করি, এই লোকটির সংস্পর্শে আসতে পেরেছি বলে।

কী অমায়িক অজাতশত্রু পুরুষ! আর কী একখানা স্নেহকাতর হৃদয় নিয়ে জন্মেছিলেন তিনি। আইন আদালতের খররৌদ্র তাঁর সে শ্যামমেদুর হৃদয়ে সামান্যতম বাণ হানতে পারে নি।

তাঁর বয়স তখন সত্তর। সেই শিলঙে একদিন সকাল বেলা দেখি, ড্রেসিং গাউনের পকেটে হাত পুরে বারান্দায় ঘন ঘন পাইচারি করছেন, মুখে সিগার নেই। কথা কয়ে ভালো

www.BanglaBook.org

করে উত্তর পাইনে। কি হয়েছে, ব্যাপার কি নিশীথদা?

তিন দিন ধরে স্ত্রীর চিঠি পান নি।

সে কি নিশীথদা, সত্তর বছর বয়সে এতখানি?

সেই জ্বলজ্বলে চোখ—সে চোখ দুটি কেউ কখনো ভুলতে পারে—দিয়ে বললেন, 'কবি, সব জানো, সব বোঝো, কিন্তু বিয়ে তো করো নি, তাহলে এটাও বুঝতে।'

নিশীথদা বউদিকে বড্ড ভালোবাসতেন। আমি জানি নিশীথদা আরো কিছুদিন কেন এ সংসার থাকলেন না।

ফেব্রুয়ারি মাসে অখণ্ডসৌভাগ্যবতী শ্রীমতী শোভনা ইহলোক ত্যাগ করেন। সঙ্গে সঙ্গে নিশীথদার জীবনের জ্যোতি যেন নিভে গিয়েছিল।

আজ বোধ হয় নিশীথদার আর কোন দুঃখ নেই—আমাদেরও দুঃখের অন্ত নেই।

ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি॥

পরিমল রায়

পরিমল রায়ের অকালমৃত্যুতে কেউ সখা, কেউ গুরু, কেউ সহকর্মী, কেউ প্রতিবেশী এবং দিল্লি শহর একটি উৎকৃষ্ট নাগরিক থেকে বঞ্চিত হল।[১] মৃত্যুকালে পরিমল রায় নিউইয়র্কে ছিলেন কিন্তু এ আশা সকলেই মনে মনে পোষণ করতেন যে আমেরিকায় বহু প্রকারের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তিনি আবার দিল্লিতেই ফিরে আসবেন এবং তার বন্ধুবান্ধব, তাঁর শিষ্যমণ্ডলী তথা বাংলা সাহিত্যমোদীজন তাঁর সে অভিজ্ঞতার ফল লাভ করতে সক্ষম হবেন।

পরিমল রায় সত্যই নানা গুণের আধার ছিলেন।

একদা 'মৌলানা খাফী খান' আমাকে একটি ক্ষুদ্র বিতর্ক-সভাতে নিয়ে যান। সে সভাতে পরিমল রায় ভারতবর্ষে কি প্রকারে কলকব্জা কারখানা ফ্যাক্টরি তৈরি করার জন্য পুঁজি সংগ্রহ করা যেতে পারে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এরকম আলোচনা আমি জীবনে কমই শুনেছি। পরিমল রায় জানতেন, তাঁর শ্রোতারা অর্থনীতি বাবদে এক একটি আস্ত 'বিদ্যাসাগর'; তাই তিনি এমন সরল এবং প্রাঞ্জল ভাষায় মূল বক্তব্যটি বলে গেলেন যে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং সে পাণ্ডিত্যকে অজ্ঞজনের সামনে নিতান্ত স্বতঃসিদ্ধ দৈনন্দিন সত্যরূপে প্রকাশ করার লৌকিক পদ্ধতি দেখে আমি মুগ্ধ হলুম। তাঁর ভাষণ শেষ হলে আমি দু-একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলুম। আমার প্রশ্ন শুনে তিনি বাঘা পণ্ডিতের মত আঁকিয়ে উঠলেন না। অতিশয় সবিনয়ে তিনি আমার দ্বিধাগুলোকে এক লহমায় সরিয়ে দিলেন। আমার আর শ্রদ্ধার অন্ত রইল না। পণ্ডিতজনের বিনয় মূর্খের চিত্তজয় করতে সদাই সক্ষম।

সেদিন তাঁর সঙ্গে আলাপচারি হয় নি। তার কয়েকদিন পরে আর এক সভাতে তাঁর সঙ্গে দেখা। সুধালেন, 'চিনতে পারছেন কি?'

আমি বললুম, 'বিলক্ষণ।' আর সঙ্গে সঙ্গে গড় গড় করে তাঁর ভাষণের আটটি

---

১ স্বর্গীয় পরিমল রায়ের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সহানুভূতি জানাই।

www.BanglaBook.org

পয়েন্ট একটার পর একটা আউড়ে গেলুম। এ আমার স্মৃতিশক্তির বাহাদুরি নয়। এর কৃতিত্ব সম্পূর্ণ পরিমল রায়ের। পূর্বেই নিবেদন করেছি, পরিমল রায় তাঁর বক্তব্য এমন চমৎকার গুছিয়ে বলতে পারতেন যে, একবার শুনলে সেটি ভুলে যাওয়ার উপায় ছিল না। আজ যে বিশেষ করে পরিমল রায়ের শিষ্যেরাই সবচেয়ে বেশি শোকাতুর হয়েছেন, সেটা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

কিন্তু এসব কথা থাক। অর্থনীতিতে পরিমল রায়ের পাণ্ডিত্য যাচাই করার শাস্ত্রাধিকার আমার নেই।

নিছক সাহিত্যিকের চেয়ে যাঁরা আর পাঁচটা কাজে জড়িত থেকেও সাহিত্য চর্চা করেন, তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে আমি বড়ই উল্লসিত হই। পেটের ধান্দার একটা হেস্তনেস্ত কোনোগতিকে করে নেওয়ার পর যে লোক তখনো বাণীকে স্মরণ করে, সে ব্যক্তি পেশাদারী সাহিত্যসেবীর চেয়েও শ্রদ্ধার পাত্র। পরিমল রায়ের কর্তব্যবোধ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল বলে তাঁর বেশি সময় কাটত অধ্যাপন অধ্যয়নে। তারপর যেটুকু সময় বাঁচত তাই দিয়ে তিনি বাণীর সেবা করতেন।

এবং সকলেই জানেন সাহিত্যিকদের দুটি মহৎ গুণ তাঁর ছিল। তাঁর পঞ্চেন্দ্রিয় রসের সন্ধানে অহরহ সচেতন থাকত এবং তিনি সে রস বড় প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠকের সামনে তুলে ধরে দিতে পারতেন। পরিমল রায়ের চোখে পড়ত দুনিয়ার যত সব উদ্ভট ঘটনা, আর সে সব উদ্ভট ঘটনাকে অতিশয় সাদামাটা পদ্ধতিতে বর্ণনা করার অসাধারণ ক্ষমতা তেমনি পরিশ্রম করে আয়ত্ত করেছিলেন।

এদেশের লোকের একটা অদ্ভুত ভুল ধারণা আছে যে, রসিক লোক ভাঁড়ের শামিল। এ ভুল ধারণা ভাঙাবার জন্যই যেন পরিমল রায় বাঙলা দেশে জন্ম নিয়েছিলেন। সকলেই জানেন, তিনি কথা বলতেন কম, আর তাঁর প্রকৃতি ছিল গম্ভীর—একটুখানি রাশভারি বললেও হয়তো বলা ভুল হয় না। চপলতা না করেও যে মানুষ সুরসিক হতে পারে পরিমল রায় ছিলেন তার প্রকৃষ্টতম উদাহরণ; আমাদের নমস্য 'পরশুরাম' এস্থলে পরিমল রায়ের অগ্রজ।

আর যে গুণের জন্য পরিমল রায়কে আমি মনে মনে ধন্য বলতুম সেটা তাঁর লেখনী সংযম। এ গুণটি বাংলা দেশে বিরল। ভ্যাজর ভ্যাজর করে পাতার পর পাতা ভর্তি না করে আমরা সামান্যতম বক্তব্য নিবেদন করতে পারি না। সংক্ষেপে বলার কায়দা রপ্ত করা যে কি কঠিন কর্ম সেটা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যকে বোঝানোর চেষ্টা পণ্ডশ্রম। এ গুণ আয়ত্ত করার জন্য বহু বৎসর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়। তিন লাইনে যে নন্দলাল একখানা হাসিমুখ এঁকে দিতে পারেন কিম্বা একটি মাত্র 'সা' দিয়ে আরম্ভ করেই যে ওস্তাদ শ্রোতাকে রসাপ্লুত করতে পারেন তার পশ্চাতে যে কত বৎসরের মেহন্নত আর হয়রানি আছে সে কি দর্শক, শ্রোতা বুঝতে পারে?

তাই আমার শোকের অন্ত নেই যে, বহুদিনের তপস্যার ফলে যখন পরিমল রায়ের আপন সংক্ষিপ্ত নিরলঙ্কার ভাষাটি শান দেওয়া তলওয়ারের মত তৈরি হল, যখন আমরা সবাই এক গলায় বললুম, 'ওস্তাদ, এইবারে খেল দেখাও', ঠিক তখন তিনি তলওয়ারখানা ফেলে দিয়ে অন্তর্ধান করলেন।

এই তো সেদিনকার লেখা। একটি মোটা লোক রায়েব বাড়ির সামনে দিয়ে রোজ ঘোঁত ঘোঁত করে বেড়াতে বেরোন। আরেকটি রোগাপটকা পনপন করে সেই সময় বেড়াতে

www.BanglaBook.org

বেরোয়। একজনের আশা ঘোঁতঘোঁতিয়ে রোগা হবে, আর একজনের বাসনা পনপনিয়ে সে মোটা হবে। ফলং? যথা পূর্বম্ তথা পরম্।

এ জিনিস চোখের সামনে নিত্যি নিত্যি হচ্ছে। কিন্তু কই, আমরা তো লক্ষ্য করি নি। পরিমল রায় এ তত্ত্বটি আবিষ্কার করে এমনি কায়দায় সামনে তুলে ধরলেন যে, এখন রোগা মোটা যে কোন লোককে যখন ঘোঁত ঘোঁত কিম্বা পনপন করতে দেখি তখন আর হাসি সামলাতে পারি নে।

আমার বড় আশা ছিল পরিমল রায় দেশে ফিরে এসে মার্কিনদের নিয়ে হাসির হর্‌রা, মজার বাজার গরম করে তুলবেন। দ্বিজেন্দ্রলাল, সুকুমার রায়, পরশুরাম এঁরা কেউ মার্কিন মুল্লুক যান নি। আশা ছিল পরিমল রায়ের মার্কিনবাস রসের বাজারে আসর জমাবে।

একটি আড়াই ছত্রের টেলিগ্রামে সব আশা চুরমার হল। কাকে সান্ত্বনা দিই? আমিই সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছি নে॥

মপাসাঁ

বাঙালায় বলি, 'গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না', পদ্মার ওপারে বলি,—

'পীর মানে না দেশে-খেশে,
পীর মানে না ঘরের বউয়ে,'

আর পশ্চিমারা বলেন, 'ঘরকী মুর্গী দাল বরাবর' অর্থাৎ পরে পোষা মুর্গী মানুষ এমনি তাচ্ছিল্য করে খায়, যেন নিত্যকার ডাল-ভাত খাচ্ছে।

কিন্তু একবার গাঁয়ের কদর পাওয়ার পর আবার যে মানুষ গেঁয়ো যোগী হতে পারে, সে সম্বন্ধে কোনো প্রবাদ আমার জানা নেই। কিন্তু তাই হয়েছে, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মপাসাঁর বেলায়।

মাস তিনেক পূর্বে মপাসাঁর কয়েকখানা চিঠি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। তারি সমালোচনা করতে গিয়ে ফরাসী একাডেমির সদস্য—অর্থাৎ তিনি অতিশয় কেষ্ট-বিষ্টু জন—মসিয়ো আঁদ্রে বিইঈ (Billy) মপাসাঁ সম্বন্ধে মিঠে-কড়া দু-চারটি কথা বলেছেন।

এক ফরাসী সাহিত্য-প্রচারক নাকি বিইঈকে বললেন, 'কেম্ব্রিজের ছেলে-মেয়েরা আজকাল যে মপাসাঁ পড়ে, সে শুধু অস্বাস্থ্যকর কৌতূহল নিয়ে।' (অর্থাৎ মপাসাঁর যৌন গল্পগুলোই তারা পড়ে বেশি)। উত্তরে বিইঈ বললেন, 'বিদেশীরা, বিশেষত কেম্ব্রিজ অক্সফোর্ডের লোক আজকাল আর মপাসাঁ পড়ে না, তারা পড়ে প্রুস্ত, ভালেরি, মালার্মে, র‍্যাঁবো। মপাসাঁর কদর এখনো আছে জর্মনি এবং রাশায়। খুদ ফ্রান্সে ছোকরার দল তো মপাসাঁকে একদম পাঁচের বাদ দিয়ে বসে আছে। ভুল করেছে না ঠিক করেছে? কিছুটা ভুল কিছুটা ঠিক—কারণ মপাসাঁ একদিক দিয়ে যেমন অত্যাশ্চর্য কলাসৃষ্টি করেছেন, অন্যদিকে আবার অত্যন্ত যাচ্ছেতাইও লিখেছেন।'

এ সম্পর্কে মপাসাঁর চিঠি প্রকাশ করতে গিয়ে সম্পাদক মেনিয়াল[১] বলছেন,

১ M. Edouard Mayniai এবং Artine Artinian কর্তৃক প্রকাশিত Correspondence inedite.

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমেরিকার লোকে মপাসাঁ পড়ে উঁচুদরের ক্লাসিক হিসেবে। মপাসাঁর সর্বাঙ্গসুন্দর ভাষাকে সেখানকার ফরাসী পড়ুয়া মাত্রই আদর্শরূপে মেনে নেয়। তাঁর ভাষার স্বচ্ছতার জন্যই (সে স্বচ্ছতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন আনতোঁল ফ্রাঁসের মত গুণী) আমেরিকাতে মপাসাঁর লেখা উদ্ধৃত করে অন্তত কুড়িখানা পাঠ্য বই বেরিয়েছে।'

উত্তরে বিইঈ সাহেব অবিশ্বাসের সুরে বলেছেন, 'জানতে ইচ্ছে করে, এখনো কি মার্কিন পাঠক মপাসাঁকে এতটা কদর করে? আর ইংলন্ডের অবস্থা কি? মেনিয়াল তো কিছু বললেন না; আমার মনে হয়, মপাসাঁর লেখাতে যেটুকু খাঁটি ফরাসি ইংরেজ সেটা এড়িয়ে চলে।'

চলতে পারে, নাও চলতে পারে। সে কথা উপস্থিত থাক। এর পর কিন্তু বিইঈ সায়েব যেটা বলেছেন সেটা মারাত্মক। সকলেই জানেন, মপাসাঁ ছিলেন ফ্লবেরের অতি প্রিয় শিষ্য—ফ্লবের তাঁকে হাতে ধরে লিখতে শিখিয়েছিলেন। বিইঈ বলেছেন, 'ফ্লবের তাঁর প্রিয় শিষ্যের কোনো দোষই দেখতে পেতেন না কিন্তু তিনি পর্যন্ত বেঁচে থাকলে মপাসাঁর অত্যধিক (Surabondant = Superabundant) লেখার নিন্দা করতেন।'

এ কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না, তবে এ সম্পর্কে হিটলারের একটা মন্তব্য মনে পড়ল। হিটলার বলতেন, 'আজকালকার ছোকরারা বড্ড বেশি বই পড়ে আর তার শতকরা নব্বুই ভাগ ভুলে যায়। তার চেয়ে যদি দশখানা বই পড়ে ন'খানা মনে রাখতে পারে, তবে সেই হয় ভালো।' মাস্টার হিসেবে আমার জানা আছে, দশখানা বই পড়লে ছেলেরা ভুলে মেরে দেয় ন'খানা। কিম্বা বলতে পারেন, পাঁচ দু'গুণে দশের শূন্য নেমে হাতে রইবে পেন্সিল!

মপাসাঁ যদি তাঁর লেখার ত্রিশ ভাগ কমিয়ে দিতেন, তবে সে ত্রিশ ভাগে কি শুধু তাঁর খারাপ লেখাগুলিই—বিইঈর বিচারে—পড়ত? কাটা পড়ত দুইই। তাহলে অন্তত শতকরা কুড়িটি উত্তম গল্প আমরা পেতুমই না। ইংরেজিতে বলে, 'টবের নোংরা জল ফেলার সময় বাচ্চাকেও ফেলে দিয়ো না।' ফেলা যায় বলেই এ সতর্কবাণী!

ভাল লেখা বার বার পড়ি। খারাপ লেখা একবার পড়ে না পড়লেই হল।

কিন্তু মোদ্দা কথায় আসা যাক।

ইংরেজ, জর্মন, রাশান, স্পেনিশ, এমন কি আরবী, ফারসী বাঙলা, উর্দু নিন এমন কোন্ সাহিত্য আছে যে মপাসাঁর কাছে ঋণী নয়? ছোট গল্প লেখা আমরা শিখলুম কার কাছ থেকে? উপন্যাসের বেলা বলা শক্ত কে কার কাছ থেকে শিখল, কিন্তু ছোট গল্প লেখা সবাই শিখেছেন মপাসাঁর কাছ থেকে। কিম্বা দেখবেন রাম যদি শ্যামের কাছ থেকে শিখে থাকেন, তবে শ্যাম শিখেছেন মপাসাঁর কাছ থেকে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ মপাসাঁর কাছে ঋণী—যদিও জানি অসাধারণ প্রতিভা আর অভূতপূর্ব সৃষ্টিশক্তি ধারণ করতেন বলে রবীন্দ্রনাথ বহুতর গল্পে মপাসাঁকে ছাড়িয়ে বহুদূরে চলে গিয়েছেন। গীতিরস ছিল রবীন্দ্রনাথের হস্তস্তলে—মপাসাঁর যেখানে ছিল কিঞ্চিৎ অনটন—তাই ছোট গল্পে গীতিরস সঞ্চার করে তিনি এক নতুন রসবস্তু গড়ে তুললেন, কবিতাতে সুর দিয়ে যে রকম ঐন্দ্রজালিক গান সৃষ্টি করেছিলেন।

শেষ কথা, কার ভাণ্ডার থেকে মানুষ সবচেয়ে বেশি চুরি করেছে? যে কোনো একখানা হেজিপেজি মাসিক হাতে তুলে নিন। দেখবেন ভালো গল্পটি মপাসাঁর লোপাট

www.BanglaBook.org

চুরি—দেশকালপাত্র বদলে দিয়ে। আর আশ্চর্য মপাসাঁর বেলাই এ জিনিসটা করা যায় সব চেয়ে বেশি, কারণ তাঁর অধিকাংশ গল্পই সব কিছুর সীমানা ছাড়িয়ে যায়।

এত চুরির পরও যাঁর ভাণ্ডার অফুরন্ত তিনি প্রাতঃস্মরণীয়॥

রামমোহন রায়

ভারত এবং আরব ভূখণ্ডের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদান-প্রদান কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে, তার সম্যক আলোচনা এখনো হয় নি। গোড়ার দিকে যেসব সংস্কৃত বইয়ের আরবী তর্জমা হয়, সেগুলো থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, অনুবাদকদের সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান খুব গভীর ছিল না। পরবর্তী যুগে দেখা দিলেন এক পণ্ডিত, যাঁর সঙ্গে তুলনা দিতে পারি এমন পণ্ডিত পৃথিবীতে কমই জন্মেছেন।

সেই দশম-একাদশ শতাব্দীতে যখন 'ম্লেচ্ছে'র পক্ষে সংস্কৃত শেখার কোন পন্থাই উন্মুক্ত ছিল না, তখন গজনীর মামুদ বাদশার সভাপণ্ডিত আলবীরুনী অতি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত শিখে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বাঙ্গসুন্দর চর্চা করে আরবী ভাষাতে একখানা অতি উপাদেয় প্রামাণিক গ্রন্থ লেখেন। বইখানি সে-যুগের হিন্দু জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনের একখানা ছোটখাট বিশ্বকোষ বলা যেতে পারে।

পাঠান যুগে আরবী-ফার্সীতে কিঞ্চিৎ সংস্কৃত চর্চা হয়, কিন্তু আসল চর্চা আরম্ভ হয় আকবরের সময় এবং আল-বিরুনীর পর যদি সত্য পণ্ডিতের অনুসন্ধান কেউ করে তবে যেতে হয় আকবরের পৌত্রের যুগে, শাহ্‌জাহানের পুত্র দারা-শীকূহ'র কাছে। আরবী-ফার্সী-সংস্কৃত এ তিন ভাষাতেই তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ এবং ভক্তিমার্গে—তা সে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক—হেন সূক্ষ্মতত্ত্ব নেই, যা তাঁর পাণ্ডিত্যের চৌহদ্দীর বাইরে পড়ে।

তারপর ভারতবর্ষের যে অবিশ্বাস্য অধঃপতন আরম্ভ হয়, তার ইতিহাস সকলেই জানেন। টোল-চতুষ্পাঠী, মক্তব-মাদ্রাসার সংস্কৃত এবং আরবী-ফার্সী কোন গতিকে বেঁচে রইল মাত্র—এর বেশি জোর করে কিছু বলা যায় না।

তারপর এই হতভাগ্য ভারতবর্ষেই এই আমাদের পরম শ্লাঘার সম্পদ এই বাংলা দেশেই জন্মালেন এক বাঘাপণ্ডিত, এক 'জবরদস্ত মৌলবী'—যিনি কি আল্‌বিরুনী, কি দারা-শীকূহ যে কারো সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে পারেন।

শুধু তাই নয়, নানা দ্বন্দ্ব নানা সংঘাতের ঊর্ধ্বে যে সত্যশিবসুন্দর আছেন, যাঁর অস্তিত্ব স্বীকার করলে পরস্পরবিরোধী সংঘাত মাত্রই লোপ পায়, সেই সত্যশিবসুন্দরকে তিনি হৃদয়ে অনুভব করেছিলেন, মনোজগতে স্পষ্টরূপে ধারণা করতে পেরেছিলেন বহুবিধ ঐতিহ্যের সম্মিলিত সাধনার ভিতর দিয়ে। বাল্যকালে তিনি শিখেছিলেন আরবী-ফার্সী, পরবর্তীকালে সংস্কৃত এবং সর্বশেষে হীব্রু, গ্রীক, লাতিন। হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী, খ্রিস্ট—এই চার ধর্মজগতে তিনি অনায়াসে অতি স্বচ্ছন্দে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে, অন্তরের খাদ্য অন্বেষণ করে যে শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন, সে শক্তি যে শুধু সে-যুগের মূঢ়তা-জড়তাকে জয় করতে পেরেছিল তাই নয়, সে শক্তির প্রসাদাৎ পরবর্তী বাঙলা দেশ এবং ভারতবর্ষ যে নব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নব অভিযানের পথে বেরিয়েছিল, তার কিঞ্চিৎ কল্পনা আমরা আজ করতে পারি আমাদের অদ্যকার জীবন্মৃত অবস্থা থেকে।

রামমোহন বলতে কি বোঝায় তার সর্বাঙ্গসুন্দর ধারণা রবীন্দ্রনাথের ছিল, ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, তাঁর বহুমুখী পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার সম্যক চর্চা এখনো হয়নি। 'দেশে'র এক পৃষ্ঠা সে কর্মের জন্য প্রশস্ত নয় এবং এ অধম সে-শাস্ত্রাধিকার থেকে বঞ্চিত।

নিপীড়িত হলেই সে ব্যক্তি মহাজন, একথা বলা চলে না, কিন্তু মহাজন মাত্রই নিপীড়িত হন, সে বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ নেই। রাজার ভাগ্যে সে নিপীড়িন এসেছিল, চাষীদের কাছ থেকে নয়—সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না—তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন সর্বধর্মের পণ্ডিতগণ।

আরবী ভূমিকা (মুকদ্দমা) সম্বলিত তিনি যে ফার্সী কেতাব রচনা করেন, তার নাম 'তুহফাতু ল্ মুওয়াহ্হিদীন' (একেশ্বরবাদীর উদ্দেশ্যে উপঢৌকন) এবং সে-গ্রন্থে তিনি আল্লার সত্যরূপের যে-বর্ণনা মুসলমান ধর্মশাস্ত্র তন্ন তন্ন করে বয়ান করলেন, সে-রূপ সে-বর্ণনা ক্রিয়াকাণ্ডে নিমজ্জিত তৎকালীন মুসলমান পণ্ডিতজনকে বিন্দুমাত্র উল্লসিত করে নি। পরবর্তী যুগে মৌলবী-মৌলানা, আলি-উলামা তাঁকে জবরদস্ত মৌলবীরূপে স্বীকার করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁকে 'মুতাজিলা' (স্বাধীনচেতা)—গোঁড়ারা যেরকম ভদ্র ব্রাহ্মকে 'বেহ্মজ্ঞানী' নাম দিয়ে তাচ্ছিল্য করেন—নাম দিয়ে তাঁর সৎ ধর্ম প্রচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রচার করেছিলেন।

হুবহু সেই বিরুদ্ধাচরণই তো তিনি পেয়েছিলেন 'স্বধর্মী'দের কাছ থেকে। অদ্বৈতের অনুসন্ধানকে ঊনবিংশ শতাব্দী প্রায় ম্লেচ্ছাচারের মত বর্জনীয় বলে মনে করেছিলেন—এ-ইতিহাস সকলেই জানেন।

আবার হুবহু তৃতীয় দফায় তিনি বিরুদ্ধাচরণ পেলেন খ্রীষ্টান মিশনারীদের কাছ থেকে। যে খ্রীষ্টধর্ম তখন বাঙলা দেশে প্রচারিত হচ্ছিল, সে-ধর্ম কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু বা মুসলমান যে কোন ধর্মের চেয়ে কোন দিক দিয়ে আধ্যাত্মিকতায় উৎকৃষ্ট ছিল না। হিন্দু এবং মুসলমান ধর্মে রামমোহন যে সত্য উপলব্ধি করেছিলেন, সেই আগের অনুসন্ধানে তিনি বাইবেলে যে খ্রিস্টকে আবিষ্কার করলেন, যে-খ্রীষ্ট 'কেরামতি' করেন না, অর্থাৎ তিনি জলকে মদ বানাবার ভেল্কিবাজি দেখান না, সাতখানা রুটি দিয়ে পাঁচহাজার লোককে পরিতৃপ্ত করার চেষ্টাও করেন না।

যে খ্রীষ্টান মিশনারীরা এতকাল ধরে রামমোহনের কুসংস্কারবর্জিত স্বাধীন চিন্তাবৃত্তির প্রশংসা করেছিলেন, তাঁরাই হলেন সবচেয়ে বেশি ক্রুদ্ধ, উচ্চকণ্ঠে সর্বত্র ঘোষণা করলেন, 'রামমোহন মূর্খ, রামমোহন যীশুকে চিনতে পারে নি, অলৌকিক কর্ম (কেরামতি) বাদ দিলে যে যীশু দাঁড়ান, তিনি প্রকৃত যীশু নন।

হিন্দু-মুসলমান সে-যুগে কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তাঁদের বিরুদ্ধ-ব্যবহার রামমোহনকে বিস্মিত কিংবা বিচলিত করে নি। কিন্তু খ্রীষ্টানদের এ ব্যবহারে তিনি নিশ্চয়ই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন—আজ ডীন ইনগ্ সেটা বুঝতে পারবেন।

তিন ধর্মের গলা-মেলানো একই প্রতিবাদে রামমোহন বিচলিত কিংবা পথভ্রষ্ট হন নি—সে আমাদের পরম সৌভাগ্য॥

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিশ্বভারতী

কবি, শিল্পী—স্রষ্টামাত্রই স্পর্শকাতর হয়ে থাকেন। এবং সেই কারণেই আর পাঁচজনের তুলনায় এ জীবনে তাঁরা এমন সব বেদনা পান যার সঙ্গে আমাদের কোনো পরিচয় নেই। রাজনৈতিক কিংবা ব্যবসায়ী হতে হলে গণ্ডারের চামড়ার প্রয়োজন—গণ্ডারের চামড়া নিয়ে কোনো কবি আজ পর্যন্ত সার্থক সৃষ্টি করে যেতে পারেন নি।

জীবনের বহু ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বহু অপ্রত্যাশিত আঘাত পেয়েছিলেন। তরুণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের আশীর্বাদ পান; তৎসত্ত্বেও বাঙলাদেশ বহুদিন ধরে তাঁকে কবি বলে স্বীকার করতে চায় নি। শুধু তাই নয়, তাঁর বিরুদ্ধে বহু গণ্যমান্য লোক এমন সব অন্যায় আক্রমণ এবং আন্দোলন চালান যে রবীন্দ্রনাথকে হয়তো অল্প বয়সে কীটসের মতো ভগ্নহৃদয় নিয়ে ইহলোক পরিত্যাগ করতে হত। রবীন্দ্রনাথ যে বহু বেদনা পেয়েও কীটসের মতো ভেঙে পড়েন নি তার অন্যতম প্রধান কারণ, ধর্মে তাঁর অবিচল নিষ্ঠা ছিল এবং দ্বিতীয়টি মহর্ষি স্বহস্তে রবীন্দ্রনাথের নৈতিক মেরুদণ্ডটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

এ জীবনে রবীন্দ্রনাথ বহু বেদনা পেয়েছেন এবং তার খবর বাঙালিমাত্রই কিছু না কিছু রাখেন। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, বিশ্বভারতীয় নবপ্রতিষ্ঠান উপলক্ষে, তারই একটি নিবেদন করি।

১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বভারতীর' প্রতিষ্ঠা করেন কিংবা বলতে পারি যে ইস্কুলটি ('পূর্ব বিভাগ') প্রায় কুড়ি বৎসর ধরে বাঙলা বা বাঙলার বাইরে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিল তার সঙ্গে একটি কলেজ ('উত্তর বিভাগ') যোগ দিয়ে দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের নানাপ্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণা করারও ব্যবস্থা হল।

তাই গুরুদেবের বাসনা ছিল, পূর্ব-পশ্চিমের গুণীজ্ঞানীরা যেন শান্তিনিকেতনে সম্মিলিত হয়ে একে অন্যের সহযোগিতায় বৃহত্তর ও ব্যাপকতর সাধনায় নিযুক্ত হন।

সেই মর্মে রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রণ জানালেন প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা পণ্ডিত অধ্যাপক সিলভা লেভিকে। ভারতীয় সংস্কৃতির সর্ববিষয়ে লেভির অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল তো বটেই; তদুপরি বৌদ্ধধর্মে বোধ করি তখনকার দিনে পশ্চিমে এমন কেউ ছিলেন না যিনি তার সামনে সাহস করে দাঁড়াতে পারতেন।

শান্তিনিকেতনে তখন বহুতর পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীযুত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীযুত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, শ্রীযুত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় এন্ড্রুজ এবং পিয়ার্সন, শ্রীযুত নিতাইবিনোদ গোস্বামী, অধ্যাপক কলিন্‌স্ বগ্‌দানফ বেনওয়া, ক্রামরিশ, শ্রীযুত মিশ্রজী, শ্রীযুত হিডজিভাই মরিস, শ্রীযুত প্রভাত মুখোপাধ্যায় ও আরো বহু খ্যাতনামা লোক তখন শান্তিনিকেতনে অধ্যয়ন অধ্যাপনা করতেন।

সঙ্গীতে ছিলেন প্রাতঃস্মরণীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কদের ভিতর ছিলেন শ্রীযুত অমিয় চক্রবর্তী, শ্রীযুত প্রমথনাথ বিশী।[১]

১ সিংহলের শ্রমণ পণ্ডিতদ্বয় এবং আরও কয়েকজনের নাম ভুলে যাওয়ার জন্য তাঁদের কাছে লজ্জিত আমি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এবং আশ্রমের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে সংযুক্ত না হয়েও এক ঋষি আশ্রমটিকে আপন আশীর্বাদ দিয়ে পুণ্যভূমি করে রেখেছিলেন। বাংলাদেশ তাঁকে প্রায় ভুলে গিয়েছে। ইনি রবীন্দ্রনাথের সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরবর্তীকালে লেভি এঁর পদপ্রান্তে বসবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

শান্তিনিকেতন তখন পণ্ডিত এবং পাণ্ডিত্যের কিছুমাত্র অনটন ছিল না। রবীন্দ্রনাথ সে ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁর সর্বশেষ কপর্দক দিয়ে—এবং এস্থলে ভক্তিভরে একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে এই সব বড় বড় পণ্ডিতেরা যে দক্ষিণা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতেন সে দক্ষিণা আজকের দিনে দিতে গেলে অনেক অপণ্ডিতও অপমান বোধ করবেন।

কিন্তু ছাত্র ছিল না। বিশ্বভারতী তখন পরীক্ষা নিত না, উপাধিও দিত না।

এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে, তখনকার দিনে বিশ্বভারতীর অন্যতম প্রধান নীতি ছিল ঃ "দি সিস্টেম অব এগজামিনেশন উইল হ্যাভ নো প্লেস্ ইন বিশ্বভারতী, নর উইল দ্যার বী এনি কন্‌ফারিং অব ডিগ্রীজ।"

এ অবস্থায় বিশ্বভারতীতে অধ্যয়ন করতে আসবে কে?

তবে এই যে এত অর্থব্যয় করে বিদেশ থেকে পৃথিবীবরেণ্য পণ্ডিত লেভিকে আনানো হচ্ছে, ইনি বক্তৃতা দেবেন কার সামনে, ইনি গড়ে তুলবেন কোন্ ছাত্রকে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে তখন কোনো যোগসূত্র ছিল না। তবু রবীন্দ্রনাথ ব্যবস্থা করলেন যাতে করে কলকাতার ছাত্ররা শান্তিনিকেতনে এসে সপ্তাহে অন্তত একটি বক্তৃতা শুনে যেতে পারে। শান্তিনিকেতনে রবিবার অনধ্যায় নয় কাজেই শনিবার বিকেল কিংবা রবির সকালের ট্রেন ধরে যে কোনো ছাত্র কলকাতা থেকে এসে লেভির বক্তৃতা শোনবার সুযোগ পেল।

যেদিন প্রথম বক্তৃতা আরম্ভ হওয়ার কথা সেদিন রবীন্দ্রনাথ খবর নিয়ে জানতে পারলেন কলকাতা থেকে এসেছেন মাত্র দুটি ছাত্র: তারও একজন রসায়নের ছাত্র আর পাঁচজন যে রকম 'বোলপুর দেখতে' আসে এই সুযোগে সেও সেই রকম এসেছে!

বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রী সংখ্যা তখন বারো জনও হবে না। তার মধ্যে সংস্কৃত পড়তেন জোর চারজন।

এই ছটি ছাত্রের সামনে (অবশ্য পণ্ডিতরাও উপস্থিত থাকবেন) বক্তৃতা দেবেন সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এসে ভুবনবিখ্যাত পণ্ডিত লেভি। রবীন্দ্রনাথ বড় মর্মাহত হয়েছিলেন।

তাই প্রথম বক্তৃতায় ক্লাসের পুরোভাগে খাতাকলম নিয়ে বসলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। লেভির আর কোনো খেদ না থাকারই কথা।।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নাগা

৩১শে আগস্ট সংসদে প্রশ্নোত্তরকালে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহয়াহর[১] লাল নেহরু বলেন যে, গত ২৪শে মে একদল নাগা : ভারতীয় নাগা-অঞ্চলে হানা দেয় ও ৯৩টি মুণ্ডু কেটে নিয়ে চলে যায়।

আসামে মিরি, মিশমি, আবর, আকা, দফলা, কুকী, গারো, লুসাই, খাসী, নাগা ইত্যাদি বহু প্রকারের উন্নত, অনুন্নত, সভ্য অসভ্য জাতি আছে। এদের ভিতর খাসী, লুসাই, গারোয়া এবং আরো কয়েকটি জাতি বড়ই ঠাণ্ডা মেজাজের, এবং সবচেয়ে মারাত্মক নাগারা। এরা এখনো পরমানন্দে নরমাংস ভক্ষণ করে এবং কে কতটা শৌর্যশালী তার বিচার হয় কে কটা মুণ্ডু কাটতে পেরেছে তাই দিয়ে।

নাগা পাহাড়ের যে অংশুটুকু ইংরেজ দখল করে সেখানে ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তর মিশনারি যায় এবং ফলে অনেক নাগা খ্রীষ্টান হয়ে যায়। মিশনারীদের ধর্মপ্রচার ও ইংরেজের আইনকানুনের ভয়ে ব্রিটিশ নাগারা বড় অনিচ্ছায় মানুষ কেটে কেটে খাওয়া বন্ধ করে; কিন্তু স্বাধীন ও বর্মী নাগারা এসব 'ম্লেচ্ছ-সংস্কারে'র কিছুমাত্র তোয়াক্কা না করে সুযোগ পেলেই ব্রিটিশ নাগা অঞ্চলে হানা দিয়ে মুণ্ডু কেটে নিয়ে যেতে থাকে।

বিশেষ করে ব্রিটিশ (বর্তমান ভারতীয়) অঞ্চলেই এরা হানা দেয় কেন?

তার একমাত্র কারণ ব্রিটিশ আইন করে—এবং সে আইন ভারতীয়রাও চালু রেখেছেন—ব্রিটিশ নাগাদের ভিতরে এক গ্রাম অন্য গ্রামকে হানা দেওয়ার রেওয়াজ বন্ধ করে দেয়। অবশ্য এ আইন নাগারা চাঁদপানা মুখ করে সয়ে নেয় নি—বিস্তর মার খাওয়ার পর অতি অনিচ্ছায় তারা হানাহানি বন্ধ করে। ফলে তারা নিবীর্য ও শান্তিপ্রিয় হয়ে পড়ে ও সঙ্গে সঙ্গে হানাহানির জন্য যেসব অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন সেগুলো লোপ পেতে থাকে।

ওদিকে স্বাধীন নাগারা দেখল এ বড় উত্তম ব্যবস্থা। আপসে তারা মাঝে মাঝে হানাহানি করে বটে, কিন্তু সেখানে যেমন অন্যের মুণ্ডুটি কাটবার সম্ভাবনা আছে ঠিক তেমনি নিজের মুণ্ডুটি কাটা যাওয়ার বিলক্ষণ সম্ভাবনাও আছে, কারণ উভয় পক্ষই উদয়াস্ত লড়াইয়ের পাঁয়তারা কষে, তীর চোখা রাখে, ধনুকের ছিলা বদলায়। অপিচ ব্রিটিশ নাগারা লড়াই করতে ভুলে গিয়েছে, তীরধনুক যা আছে তা দিয়ে হানাহানি করা যায় না। এদের হানা দিলে প্রাণ যাবার ভয় নেই, গোলায় মজুদ ধান লুট করা যায় আর শূয়ার ছাগল তো নিতান্তই ফাউ। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, একগাদা মুণ্ডু কপাকপ কেটে নিয়ে বিনিদ্র বাড়ি চলে যাওয়া যায়। অন্ততপক্ষে একটা মুণ্ডু না দেখাতে পারলে স্বাধীন নাগা অঞ্চলে বউ

---

১ বাঙলাতে সাধারণত 'জওহর' লেখা হয় এবং এ ভুল সংশোধন করা উচিত। 'জওহর' কথাটি ফার্সীতে একবচন এবং অর্থ বাংলাতে যা তাই। 'জওয়াহির' কিংবা 'জওয়াহির' শব্দটি 'জওহর' শব্দের আরবী ব্যাকরণসম্মত বহুবচন। পণ্ডিতজী তাঁর নাম বহুবচনে ব্যবহার করেন এবং আমাদেরও তাই করা উচিত। এস্থলে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে ফার্সীতে আসলে শব্দটি 'গওহর'; কিন্তু আরবী বর্ণমালায় 'গ' নেই বলে আরবরা 'জওহর' লেখেন পরবর্তী যুগে 'গওহর'ও প্রচলিত হয়। তাই মুসলমানী নাম 'গৌহর' ও 'জওহর' একই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জোটে না; কাজেই নাগা সম্বরণদের গত্যন্তর কোথায়?

ভারতীয় নাগারা ফরিয়াদ করে আমাদের বলে, 'হানাহানি বন্ধ করে দিয়ে তোমরা আমাদের নিবীর্য করে ফেলেছ। তাই সই। কিন্তু তার ঝুঁকিটা কি তোমাদেরই নেওয়া উচিত নয়? স্বাধীন নাগারা যখন আমাদের গ্রাম আক্রমণ করে তখন আমরা আত্মরক্ষা করতে অক্ষম। তোমাদের কি তখন কর্তব্য নয় পুলিশ সেপাই রেখে আমাদের বাঁচানো?'

অতি হক কথা। কিন্তু প্রশ্ন, এ কর্মটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যায় কি প্রকারে? আমাদের সেপাইরা যে নাগাদের ডরায় তা নয়, কারণ নাগাদের হাতে বন্দুক থাকে না। গোটা দুস্তিন মেসিনগান দিয়েই এক পাল নাগাকে কাবু করা যায়, কিন্তু বেদনাটা তখন সেখানে নয়। মুশকিল হচ্ছে এই, স্বাধীন নাগারা হানা দেবার পূর্বে শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে দিনক্ষণ জানিয়ে দিয়ে শুভাগমন করে না এবং আমাদের পক্ষেও প্রতি পাহাড়ের চূড়োয় সেপাই মোতায়েন করা সম্ভব নয়।

নাগারা দল বেঁধে গাঁ বানিয়ে সমতলভূমিতে বসবাস করে না। তারা থাকে পাহাড়ের চূড়োয় চূড়োয় এবং সে চূড়োগুলোর উচ্চতা তিন থেকে ছ হাজার ফুট। কাজেই এক পাহাড়ের চূড়ো থেকে যদি দেখাও যায় যে অন্য চূড়ো আক্রান্ত হয়েছে তবু সেখানে পৌঁছতে পৌঁছতেই সব কেচ্চা খতম হয়ে যায়।

তবে কি নাগাদের আপন হাতে কিছু কিছু বন্দুক-টন্দুক দেওয়া যায় না? সেখানে মুশকিল হচ্ছে, নাগাদের ঠিক অতটা বিশ্বাস করা যায় না। কারণ বন্দুক পেলে তারা সোল্লাসে অবিচারে অন্য নাগাদের আক্রমণ করবে। তাহলে সে একই কথায় গিয়ে দাঁড়ালো।

নাগারা এই ব্যবস্থাটাই চায়। তারা বলে, তোমরা যখন আমাদের বাঁচাতে পারছ না তখন আমরাই আপন প্রাণ বাঁচাই। এটাতেও আমাদের মন সাড়া দেয় না।

আচ্ছা, তবে কি আমাদের সৈন্যরা স্বাধীন নাগা অঞ্চল আক্রমণ করে তাদের বেশ কিছু ডাণ্ডা বুলিয়ে দিতে পারে না?

পারে। তবে তাতেও ঝামেলা বিস্তর॥

হিন্দু-মুসলমান-কোড বিল

শাস্ত্রে সব পাওয়া যায়—কোনো কিচ্ছুর অনটন নেই। সম্পত্তি বিলিয়ে দিতে চান, না বিলিয়ে দিতে চান; পুজো করতে চান, না করতে চান—একখানা কিংবা বিশখানা; পুজো-পাজা করতে চান কিংবা ব্যোম ভোলানাথ বলে বুঁদ হয়ে থাকতে চান, এমন কি মরার পর পরশুরামী স্বর্গে গিয়ে অপ্সরাদের সঙ্গে দুদণ্ড রসালাপ করতে চান কিংবা রবি ঠাকুরী 'কোণের প্রদীপ মিলায় যথা জ্যোতিঃ সমুদ্রেই' হয়ে গিয়ে নির্গুণ নির্বাণানন্দ লাভ করতে চান, তাবৎ মালই পাবেন।

তা না হলে সতীদাহ বন্ধ করার সময় উভয় পক্ষই শাস্ত্র কপচালেন কেন? বিধবা-বিবাহ আইন পাস করার সময়, শারদা বিলের হাঙ্গামহুজ্জুতের সময় উভয় পক্ষই তো শাস্ত্রের দোহাই পেড়েছিলেন, এ-কথা তো আর কেউ ভুলে যায় নি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শুধু হিন্দুশাস্ত্র না, ইহুদি খ্রীষ্টান মুসলিম সব শাস্ত্রেরই ঐ গতি। শুধু হিন্দুশাস্ত্র এঁদের তুলনায় অনেক বেশি বনেদী বলে এঁর বাড়িতে দালান-কোঠার গোলকধাঁধাঁ ওঁদের তুলনায় অনেক বেশি, পথ হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা পদে পদে। তাতে অবশ্য বিচলিত হওয়ার মত কিছুই নেই, কারণ স্বয়ং যীশুখ্রীষ্ট নাকি বলেছেন, যে হোভার আপন বাড়িতে দালান-কোঠা বিস্তর।

তাই শাস্ত্রের প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা। তাতে ফয়দাও এস্তার। মুসলিম শাস্ত্রের কিঞ্চিৎ চর্চা করেছি বলেই মোল্লা-মৌলবীকে আমি বড্ড বেশি ডরাই নে। কুঁড়েমি করে জুম্মার নমাজে যাই নি, মোল্লাজী রাগত হয়ে প্রশ্ন শুধালেন, যাই নি কেন? চট করে শাস্ত্র-বচন উদ্ধৃত করলুম, আমি যে জায়গায় আছি সেটাকে ঠিক শহর (মিস্‌র্) বলা চলে না অতএব জুম্মার নমাজ অসিদ্ধ। ব্যস, হয়ে গেল। ঠিক তেমনি বিয়ে যখন করতে চাই নি, তখন আমি শাস্ত্রের দোহাই পেড়েছি আবার ওজীর সাহেব ফজলু ভায়া যখন পরিপক্ক বৃদ্ধ বয়সে তরুণী গ্রহণ করলেন, তখন তিনিও হদীস (স্মৃতি) কপচালেন।

গ্রামাঞ্চলে থাকতে হলে কুইনিনের মতো শাস্ত্র নিত্য সেব্য।

সে কথা থাক।

হিন্দু-রমণী তালাক (লগ্নচ্ছেদ) দিয়ে নবীন পতি বরণ করতে পারবেন কি না, সে সম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলেন তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই নে। আমার শিরঃপীড়া, আমার গৃহিণী বেঁকে গিয়ে কিছু একটা করে ফেলবেন না তো! এ প্রশ্ন মনে উঠত না, কিন্তু হিন্দু কোড বিল আসর গরম করে তোলাতে মুসলমান ভায়াদের টনক নড়েছে। খুলে কই।

হঠাৎ এক গুণী খবরের কাগজে পত্রাঘাত করলেন,—তিনি হিন্দু না মুসলমান মনে নেই—হিন্দু রমণী যদি লগ্নচ্ছেদ করবার অধিকার পায়, তবে মুসলমান রমণীতেও সে অধিকার বর্তাবে না কেন? ঠিকই তো। কিন্তু উত্তরে আর পাঁচজন মুসলমান বললেন,—কেউ খেঁকিয়ে, কেউ মুরুব্বীর চালে, কেউ বা হিন্দু ভায়াদের পিঠে আদরের থাবড়া দিয়ে—মুসলমান শাস্ত্র নূতন কোড দিয়ে রদ-বদল করার কোনো প্রয়োজন নেই। মুসলমান রমণীর যে অধিকার আছে তাই নিয়ে তারা সন্তুষ্ট—ওসব মালের প্রয়োজন হিন্দুদের।

লক্ষ্য করলুম, কোনো মুসলমান রমণী খবরের কাগজে এ বিষয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না।

তাই প্রশ্ন, লগ্নচ্ছেদ করার জন্য মুসলমান পুরুষ রমণীর কতটুকু অধিকার? এ আলোচনায় মুসলমানদের কিছুটা লাভ হবে, হিন্দুদের কোনো ক্ষতি হবে না।

মৌলা বখ্‌শ্ মিঞা যে-কোনো মুহূর্তে বেগম মৌলাকে তিনবার 'তালাক, তালাক, তালাক' বললেই তালাক হয়ে গেল—স্বয়ং শিবেরও সাধ্য নেই তিনি তখন সে তালাক ঠেকান, এস্থলে 'শিব' বলতে অবশ্য মোল্লা-মৌলাবী বোঝায়।

বেগম মৌলা সতীসাধ্বী। আজীবন স্বামীর সেবা করেছেন। তাঁর তিনটি পুত্রকন্যা, সবচেয়ে ছোটটির বয়স দশ কিংবা বারো। তাঁর বাপের বাড়িতে কেউ নেই। তিনি বিগতযৌবনা—বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ তিনি পুনরায় বিয়ে করতে চাইলেও নূতন বর পাবেন না।

বেগম মৌলাকে তদ্দণ্ডেই পতিগৃহ ত্যাগ করতে হবে। কাচ্চাবাচ্চাদের উপরও তাঁর কোনো অধিকার নেই—নিতান্ত দুগ্ধপোষ্য হলে অবশ্য আলাদা কথা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তালাক, তালাক, তালাক' বলার জন্য মৌলা সাহেবকে কোনো কারণ দর্শাতে হবে না, কেন তিনি গৃহিণীকে বর্জন করছেন; তাঁর কোন অপরাধ আছে কি না, তিনি অসতী কিংবা চিররুগ্না, কিংবা বদ্ধ উন্মাদ—এর কোনো কারণই দেখাবার জন্য কেউ তাকে বাধ্য করতে পারে না। এস্থলে নিরঙ্কুশ, চৌকশ 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'।

(জানি, মৌলা সাহেব হেড আপিসের বড়বাবুর মতো বড় শান্ত স্বভাব ধরেন। হঠাৎ তিনি ক্ষেপে গিয়ে এরকম ধারা কিছু একটা করবেন না, কিন্তু সেকথা অবান্তর। এখানে প্রশ্ন, মৌলার হক কতটুকু, বেগম মৌলারই বা কতটুকু? তুলনা দিয়ে বলতে পারি, ভদ্র হিন্দু সচরাচর বিনা কুসুরে একমাত্র পুত্রকে ত্যাজ্য পুত্র করে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেন না। কিন্তু কস্মিনকালেও করেন না একথা বললে সত্যের অপলাপ হয়।)

যাঁরা তালাক আইনের কোনো পরিবর্তন চান না তাঁরা উত্তরে বলবেন, আরে বাপু, তালাক দেওয়া কি এতই সোজা কর্ম? 'মহরে'র কথাটি কি বেবাক ভুলে গেলে? মৌলার মাইনে তিন শ টাকা। 'মহরে'র টাকা পাঁচ হাজার। অত টাকা পাবে কোথায় মৌলা সাহেব?

হিন্দু পাঠককে এই বেলা 'মহর' জিনিসটি কি সেটি বুঝিয়ে বলতে হয়। 'মহর' অর্থ মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে স্ত্রীধন। বিয়ের সময় মৌলাকে প্রতিজ্ঞা করতে হয়, তাঁর বেগমকে তিনি কতটা স্ত্রীধন দেবেন। মৌলা বলেছিলেন, পাঁচ হাজার (অবস্থাভেদে পঞ্চাশ একশ, এক হাজার বা পাঁচ লক্ষ্যও হতে পারে) এবং এ প্রতিজ্ঞাও করেছিলেন, বেগম সাহেবা যে-কোনো মুহূর্তেও স্ত্রীধন তলব করলে তিনি তদ্দণ্ডেই নগদা-নগদি আড়াই হাজার ঢেলে দেবেন এবং বাকী আড়াই হাজার কিস্তিবন্দিতে শোধ দেবেন।

এসব শুধু মুখের কথা নয়। এ সমস্ত জিনিস বিয়ের রাতে দলিল লিখে তৈরি করা হয় ও পরে 'মেরেজ রেজিস্ট্রারে'র আপিসে পাকাপোক্ত রেজিস্ট্রি করা হয়। মৌলা এ টাকাটা ফাঁকি দিতে পারবেন না, সে কথা সুনিশ্চিত।

উত্তরে নিবেদন ঃ

মৌলার গাঁঠে পাঁচ হাজার টাকা থাক আর নাই থাক, তিনি যে স্ত্রীকে তালাক দিলেন, সেটা কিন্তু অসিদ্ধ নয়। টাকা না দিতে পারার জন্য শেষ তক্ মৌলার সিভিল জেল হতে পারে, কিন্তু তালাক তালাকই থেকে গেল। অর্থাৎ একথা কেউ মৌলাকে বলতে পারবে না, তোমার যখন পাঁচ হাজার টাকা রেস্ত নেই, তাই তালাক বাতিল, বেগম মৌলা তোমার স্ত্রী এবং স্ত্রীর অধিকার তিনি উপভোগ করবেন।

মোদ্দা কথা, তালাক হয়ে গেল, টাকা থাক আর নাই থাক।

* * *

পুনরায় নিবেদন করি, শাস্ত্র কি বলেন সে-কথা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে না। কুরানশরীফ যা বলেছেন, তার যেসব টীকা-টিপ্পনী লেখা হয়েছে, তার উপর যে বিরাট শাস্ত্র গড়ে উঠেছে তার সঙ্গে দেশাচার-লোকাচার মিলে গিয়ে উপস্থিত যে পরিস্থিতি বিদ্যমান তাই নিয়ে আমাদের আলোচনা। সেই পরিস্থিতি অনুযায়ী বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষে একে অন্যের উপর কতখানি অধিকার, বিশেষ করে একে অন্যকে বর্জন করার অধিকার কার কতটুকু সেই নিয়ে আলোচনা।

পূর্বেই নিবেদন করেছি স্বামী যে কোনো মুহূর্তে স্ত্রীকে বর্জন করতে পারেন। তাঁকে তখন কোনো কারণ কিংবা অজুহাত দর্শাতে হয় না। তবে তিনি যে 'মহর' বা স্ত্রীধন দেবেন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সে অর্থ তাঁকে দিতে হবে। অবশ্য না দিতে পারলে যে তালাক মকুব হবে তাও নয়। স্ত্রী তাঁর ভূতপূর্ব স্বামীর মাইনে 'অ্যাটাচ' করতে পারেন, আদালতের ডিগ্রি নিয়ে সম্পত্তি ক্রোক করতে পারেন; এক কথায় উত্তমর্ণ অধমর্ণকে যতখানি নাস্তানাবুদ করতে পারেন ততখানি তিনিও করতে পারেন।

উত্তম প্রস্তাব। এখন প্রশ্ন স্ত্রী যদি স্বামীকে বর্জন করতে চান তবে তিনি পারেন কি না? যদি মনে করুন, স্ত্রী বলেন, 'এই রইল তোমার স্ত্রী-ধন, আমাকে খালাস দাও' কিম্বা যদি বলেন, 'তুমি আমাকে যে স্ত্রীধন দেবে বলেছিলে সে স্ত্রীধনে আমার প্রয়োজন নেই, আমি তোমাকে বর্জন করতে চাই', তবু স্বামী সাফ 'না' বলতে পারেন। অবশ্য স্ত্রী স্বামীকে জ্বালাতন করার জন্য তাঁর স্ত্রীধন তদ্দণ্ডেই চাইতে পারেন—কারণ স্ত্রীধন তলব করার হক স্ত্রীর সব সময়ই আছে, স্বামী তালাক দিতে চাওয়া না-চাওয়ার উপর সেটা নির্ভর করে না। স্বামী যদি সে ধন দিতে অক্ষম হন তা হলেও স্ত্রী তালাক পেলেন না। অর্থাৎ তিনি যদি পতিগৃহ ত্যাগ করে ভিন্ন বিবাহ করতে চান তবে সে বিবাহ অসিদ্ধ; শুধু তাই নয়, পুলিশ স্ত্রী এবং নবীন স্বামী দুজনের বিরুদ্ধে 'বিগেমি'র মোকদ্দমা করতে পারবে।

পক্ষান্তরে আবার কোনো স্ত্রী যদি স্ত্রীধনটি ভ্যানিটি-ব্যাগস্থ করে বাপের বাড়িতে গিয়ে বসে থাকেন তবে স্বামীও তাঁকে জোর করে আপন বাড়িতে নিয়ে আসতে পারেন না। আইন স্বামীকে সে অধিকার দেয়, কিন্তু আনবার জন্য পুলিশের সাহায্য দিতে সম্পূর্ণ নারাজ। আপনি যদি জোর করে আনতে যান তবে শালী-শালাজের হস্তে উত্তমমধ্যমের সমূহ সম্ভাবনা।

তখন আপনি আর কি করতে পারেন? তাঁকে তালাক দিয়ে হৃদয় থেকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করতে পারেন আর আপনি যদি প্রতিহিংসা-পরায়ণ হন তবে আপনি তালাক না দিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারেন। তাতে করে আর কিছু না হোক স্ত্রী অন্তত আরেকটা লোককে বিয়ে করতে পারবেন না।

খুব বেশি না হলেও কোনো কোনো সময় এরকম হয়ে থাকে। পরিস্থিতিটা দু রকমের হয়।

হয় স্বামী বদরাগী, কিংবা দুশ্চরিত্র। স্ত্রীকে খেতে পরতে দেয় না, মারধোর করে। সহ্য না করতে পেরে স্ত্রী বাপ কিংবা ভাইয়ের বাড়িতে পালাল (বাপ বেঁচে না থাকলে ভাইও আশ্রয় দিতে বাধ্য হয়, কারণ ভাই যে সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে তাতে বোনেরও অংশ আছে)। সেখান থেকে সে স্ত্রীধনের তলব করে মোকদ্দমা লাগাল। স্বামীর কণ্ঠশ্বাস—অত টাকা যোগাড় করবে কোথা থেকে?

তখন সাধারণত মুরুব্বীরা মধ্যিখানে পড়েন—বিশেষত সেই মুরুব্বীরা যাঁরা বিয়েটা ঠিক করে দিয়েছিলেন। তাঁরা পতিকে বোঝাবার চেষ্টা করেন, 'তোমাতে ওতে যখন মনের মিল হয় নি তখন কেন বাপু মেয়েটাকে ভোগাচ্ছ। তালাক দিয়ে ওকে নিষ্কৃতি দাও, বেচারী অন্য কোথাও বিয়ে করুক।'

বেয়াড়া বদমায়েশ স্বামী হলে বলে, 'না, মরুকগে বেটি। আমি ওকে তালাক দেব না।'

মুরুব্বীরা বলেন, 'তবে ঢালো ''মহরে''র ঢাকা! না হলে বসতবাড়ি বিক্রি হবে, কিংবা মাইনে অ্যাটাচ্‌ড হবে। তখন বুঝবে ঠ্যালাটা।'

বিশ্বাস করবেন না, এরকম দুশমন ধরনের স্বামীও আছে যে বাড়ি বিক্রয় করে

www.BanglaBook.org

মহরের শেষ কপর্দক দেয় কিন্তু তালাক দিতে রাজী হয় না।

কিংবা সে শেষ পর্যন্ত রাজী হয় যে বিবি তাঁর স্ত্রীধন তলব করবেন না। আর সেও তাকে তালাক দিয়ে দেবে।

কিন্তু এটা হল আপোসে ফৈসালা। আইনের হক স্ত্রীলোকের নেই যে সে পতিকে বর্জন করতে পারে। তবু এস্থলে পুনরায় বলে রাখা ভালো, "মহরে"র টাকা দেবার ভয়ে অনেক স্বামী স্ত্রীর উপর চোট-পাট করা থেকে নিরস্ত থাকেন।

এখন প্রশ্ন, স্বামীর যদি গলিত কুষ্ঠ হয়, কিংবা সে যদি বদ্ধ উন্মাদ বর্তায়, যদি তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়, যদি সে বার বার কুৎসিতরোগ আহরণ করে স্ত্রীকে সংক্রামিত করে, যদি সে লম্পট বেশ্যাসক্ত হয় তবে কি স্ত্রী তাকে আইনত তালাক দিতে পারেন না?

শুনেছি, স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে 'তুমি আমার মায়ের মতো' অর্থাৎ এই উক্তি দ্বারা সে প্রতিজ্ঞা করে যে স্ত্রীকে সে তার ন্যায্য যৌনাধিকার থেকে বঞ্চিত করবে তবে নাকি সে স্ত্রী মোকদ্দমা করে আদালতের পক্ষ থেকে তালাক পেতে পারে॥

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইস্কুলে পড়ি; ষোল বছর বয়স। বিশ্বাস হয়, বিশ্ববিখ্যাত অবনীন্দ্রনাথ তাকে প্রথম দর্শনেই পূর্ণ দু ঘণ্টা ধরে ভারতীয় কলার নবজাগরণের ইতিহাস শোনালেন?

সত্যিই তাই হয়েছিল। আমার এক বন্ধু আমাকে নিয়ে গিয়েছিল অবনীন্দ্রনাথের কাছে। তিন মিনিট যেতে না যেতেই তিনি হঠাৎ সোৎসাহে এক ঝটকায় হেলান ছেড়ে খাড়া হয়ে বসে আমাকে সেই প্রাচীন যুগের কথা—কি করে তিনি ছবি আঁকা শিখতে আরম্ভ করলেন, সে ছবি দেখে দ্বিজেন্দ্রনাথ কি বললেন, হ্যাভেলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ, টাইকানের সঙ্গে তাঁর সহযোগ, ওরিয়েন্টাল সোসাইটির গোড়াপত্তন, নন্দলাল অসিতকুমারের শিষ্যত্ব, আরো কত কী যে বলে গেলেন তার অর্ধেক লিখে রাখলেও আজ একখানা সর্বাঙ্গসুন্দর কলা-ইতিহাস হয়ে যেত।

আর কী ভাষা, কী রঙ। আজ যখন পিছন পানে তাকাই তখন মনে মনে দেখি, সেদিন অবনীন্দ্রনাথ কথা বলেন নি, সেদিন যেন তিনি আমার সামনে ছবি এঁকেছিলেন। রঙের পর রঙ চাপাচ্ছেন; আকাশে আকাশে মেঘে মেঘে সূর্যাস্ত সূর্যোদয়ের যত রঙ থাকে তার থেকে তুলে নিয়ে ছবির এখানে লাগাচ্ছেন, ওখানে লাগাচ্ছেন আর যতই ভাবি এর পর আর নতুন নতুন রঙ বানিয়ে ছবির উপর চাপাচ্ছেন।

তার কী উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে তাঁর সুখদুঃখ, তাঁর পতন-অভ্যুদয়ের অনুভূতি অজানা অচেনা এক আড়াই ফোঁটা ছোকরার মনের ভিতর সঞ্চালন করার প্রচেষ্টা। বুঝলুম, তিনি তাঁর জীবন দিয়ে ভালোবেসেছেন ভারতীয় কলাশিল্পকে আর 'আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে' প্রদীপ্ত করে দিয়েছেন আমাদের দেশের নির্বাপিত কলাপ্রচেষ্টার অন্ধ-প্রদীপ।

* * *

তারপর একদিন তিনি এলেন শান্তিনিকেতনে। সেখানেও আমি কেউ নই। রবীন্দ্রনাথ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নন্দলাল এবং নন্দলালের কৃতী শিষ্যগণ তাঁর চতুর্দিকে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আম্রকুঞ্জে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন, বিশ্বকবিরূপে, শান্তিনিকেতনে আচার্যরূপে। আর সেদিন রবীন্দ্রনাথ যে ভাষা দিয়ে অবনীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতনে আসন নিতে অনুরোধ করলেন সে রকম ভাষা আমি রবীন্দ্রনাথের মুখে তার পূর্বে কিংবা পরে কখনো শুনি নি। রবীন্দ্রনাথ সেদিন যেন গদ্যে গান গেয়েছিলেন, আমার মনে হয়, সেই দিন তিনি প্রথম গদ্য কবিতা লেখা আরম্ভ করলেন। দেশেবিদেশে বহু সাহিত্যিককে বক্তৃতা দিতে শুনেছি, কিন্তু এরকম ভাষা আমি কোথাও শুনি নি—আমার মনে হয়, দেবদূতরা স্বর্গে এই ভাষায় কথা বলেন—সেদিন যেন ইন্দ্রপুরীর একখানা বাতায়ন খুলে গিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে উর্বশীর বীণা গুঞ্জরণ করে উঠেছিল।

* * *

অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। আমি উত্তরায়ণের কাছে দাঁড়িয়ে আছি। দেখি—অবনীন্দ্রনাথ সদলবলে আসছেন। আমাকে চিনতে পারলেন বলে মনে বড় আনন্দ হল।

তখন আমাদের সবাইকে বললেন, 'জানো, বৈজ্ঞানিকরা বড় ভীষণ লোক—আমাদের সব স্বপ্ন ভেঙে দেয়। এই দেখো না, আজ সন্ধ্যায় আমি দক্ষিণের দিকে তাকিয়ে দেখি কালো কালো মেঘ এসে বাসা বাঁধছে ভুবনডাঙার ওপারে ডাক-বাঙলোর পিছনে। মেঘগুলোর সর্বাঙ্গে কেমন যেন ক্লান্তির ভাব আর বাসা বাঁধতে পেরে তারা একে অন্যকে আনন্দে আলিঙ্গন করছে।

রথী শুনে বলেন, 'মেঘ কোথায়? এ তো ধানকলের ধোঁয়া!'

এক লহমায় আমার সব রঙীন স্বপ্ন বরবাদ হয়ে গেল। তাই বলছিলুম বৈজ্ঞানিকগুলো ভীষণ লোক হয়।'[১]

সে-যাত্রায় যে কদিন ছিলেন তিনি যে কত গল্প বলেছিলেন, তরুণ শিল্পীদের কত অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন তার ইতিহাস, আশা করি একদিন সেই শিল্পীদের একজন লিখে দিয়ে আমাদের প্রশংসাভাজন হবেন।

* * *

আবার সেই প্রথম দিনের পরিচয়ে ফিরে যাই।

আমি তখন অটোগ্রাফ শিকারে মত্ত। প্রথম গগনেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করলুম আমার অটোগ্রাফে কিছু এঁকে দিতে। তাঁর কাছে রঙ তুলি তৈরি ছিল। চট করে পাঁচ মিনিটের ভিতর আকাশে ঘন মেঘ আর তার ফাঁকে ফাঁকে গুটি কয়েক পাখি এঁকে দিলেন।

এর কয়েক দিন পূর্বে শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েরা কলকাতায় এসে 'বর্ষামঙ্গল' করে গিয়েছে। গগনেন্দ্রনাথ ছবি এঁকে দিয়ে বললেন, 'পাখিরা বর্ষামঙ্গল করছে।'

অবনীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করতে তিনি বললেন, 'তুমি নিজে ছবি আঁকো না কেন?'

আমি সবিনয়ে বললুম, 'আমি ছবি দেখতে ভালোবাসি।'

বললেন, 'দাও তোমার অটোগ্রাফ। তোমাকে কিছু একটা লিখে দিচ্ছি আর যেদিন তুমি তোমার প্রথম আঁকা ছবি এনে দেখাবে সেদিন তোমার বইয়ে ছবি এঁকে দেব।'

বলে লিখলেন, 'ছবি দেখে যদি আমোদ পেতে চাও তবে আকাশে জলে স্থলে প্রতিমুহূর্তে এত ছবি আঁকা হচ্ছে যে তার হিসেব নিলেই সুখে চলে যাবে দিনগুলো।

---

১ পাঠক, অবনীন্দ্র যে ভাষায় বলেছিলেন তার সন্ধান এতে পাবেন না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আর যদি ছবি লিখে আনন্দ পেতে চাও, তবে আসন গ্রহণ করো এক জায়গায়, দিতে থাকো রঙের টান, তুলির পোঁচ। এ দর্শকের আমোদ নয়, স্রষ্টার আনন্দ'।।[১]

'জিদ-ওয়াইল্ড্'

আঁদ্রে জিদের বই এবং বিশেষ করে তাঁর 'জুর্নাল'গুলো (ডায়েরি) বিশ্ববিখ্যাত। আর পাঁচজনের মতো আমিও সেগুলো পড়েছি, তাঁর পরলোকগমনের পর ফ্রান্স দেশে তাঁর সম্বন্ধে যেসব লেখা বেরিয়েছে তারও কিছু কিছু নেড়েচেড়ে দেখেছি, কিন্তু তবু মেনে নিতেই হল যে, ঠিক ঠিক হদিসটি পেলুম না—জিদকে ফেলি কোন্ পর্যায়ে, কপালে টিকিট সাঁটি কোন্ রঙের? অথচ গুরুর আদেশ জিদ সম্বন্ধে লিখতে হবে—উপায় কি?

একটা উপায় আছে, সেটি হচ্ছে জিদের বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আলোচনা করা। এই ধরুন না, অস্কার ওয়াইল্ড্। জিদ তাঁকে বিলক্ষণ চিনতেন এবং ওয়াইল্ড্ও তাঁকে স্নেহ করতেন। ওয়াইলড্ তখন খ্যাতনামা পুরুষ, প্যারিসে এলে তাঁর পিছনে ফেউ লেগে যেত; তার উপর ওয়াইল্ড্ বলতে পারতেন খাসা ফরাসী। জিদই তাঁর চটি বই 'অস্কার ওয়াইল্ডের স্মরণেতে লিখেছেন, 'ওয়াইল্ড্ অত্যুৎকৃষ্ট ফরাসী জানতেন তবু মাঝে মাঝে ভান করতেন যেন জুতসই শব্দ খুঁজে পাচ্ছেন না—অবশ্য তখন তাঁর মতলব হত ঐ কথাগুলোর উপর বিশেষ করে জোর দেবার। উচ্চারণে তাঁর প্রায় কোনো ভুলই ছিল না—শুধু ইচ্ছে করে দুটো একটা শব্দ এমনভাবে উচ্চারণ করতেন যাতে করে সেগুলো ভারি নূতন ধরনের চমক দিয়ে দিত। প্রথম যে সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় সেদিন তিনি একটানা আমাদের গল্প শুনিয়েছিলেন কিন্তু কেমন যেন খাপছাড়া, আর সে সন্ধ্যার গল্পগুলো তাঁর সবচেয়ে ভালো গল্প বলেও ধরে নেওয়া যায় না। হয়তো ওয়াইল্ড্ আমাদের চিনতেন না বলে আমাদের গ্রহণ করার ক্ষমতা পরখ করে নিচ্ছিলেন। ঐ ছিল তাঁর স্বভাব—তা সে বুদ্ধিমানের হোক আর বোকারই হোক—যে লোক যে জিনিসের রস বুঝতে পারবে না তাকে চিনি সে জিনিস কক্খনো পরিবেশন করতেন না। যার সে রকম রুচি তাকে ঠিক সেই রকমেরই মাল দিতেন তিনি। যারা তাঁর কাছ থেকে কোনো জিনিসের প্রত্যাশা করত না তারা পেতও না কিছু—কিংবা হয়ত পেত সামান্য একটুখানি গোঁজলা। আর সবচেয়ে তিনি পছন্দ করতেন খুশগল্প বলে পাঁচজনকে খুশ্ করে রাখতে, তাই অনেকেই যাঁরা ভেবে নিয়েছেন যে, তাঁরা ওয়াইলড্কে চিনতে পেরেছেন, তাঁরা শুধু তাঁকে চিনেছেন খুশি দেনেওয়ালা হিসেবে (amuseur = amuser)।'

জিদ এখানে একটুখানি ইঙ্গিত করেছেন যে, বেশির ভাগ লোকই ওয়াইলড্কে চিনেছে কেমন যেন একটু 'ভাঁড়' 'ভাঁড়' রূপে এবং সেইটিই তাঁর আসল রূপ ছিল না।

মনে হচ্ছে এর থেকে জিদ কিঞ্চিৎ শিক্ষে নিয়েছিলেন। কারণ পূর্বেই তিনি বলেছিলেন, 'ঐ ছিল তাঁর স্বভাব—তা সে বুদ্ধিমানের হোক, আর বোকারই হোক—

---

১ পাঠক, অবনীন্দ্র যে ভাষায় বলেছিলেন তার সন্ধান এতে পাবেন না।

www.BanglaBook.org

সবাইকে আপন রুচি অনুযায়ী পরিবেশন করার।' তাই বোধ করি; জিদ সেই প্রথম যৌবনেই মনস্থির করে ফেলেছিলেন যে, ওটা বোকারই কর্ম, আর তিনি অন্য কারোর রুচির বিলকুল তোয়াক্কা না করে টক-টক হক কথা বলে যাবেন।

সে না হয় বুঝলুম। অপরকে টক কথা শুনিয়ে দেওয়া খুব কঠিন কর্ম নয়—আমরা সবাই জানা-অজানাতে হরদম কয়ে থাকি—কিন্তু প্রশ্ন, নিজের সম্বন্ধে টক কথা পাঁচজনকে শুনিয়ে বলতে পারে কটা লোক? জিদ পারতেন কি না?

ওয়াইল্ড্ কোন্ অপরাধে জেলে গিয়েছিলেন সে-কথা সকলেই জানেন। জেল থেকে বেরিয়ে ওয়াইল্ড্ দেখেন লন্ডন-সমাজ তার তাবৎ দরজা দড়াম করে তাঁর মুখের উপর বন্ধ করে দিয়েছে। তিনি তখন গেলেন ফ্রান্স। প্যারিসেও গোড়ার দিকে ঐ একই অবস্থা হতে পারে ভেবে তিনি গেলেন একটি ছোট নির্জন শহরে। খবর পেয়ে জিদ তৎক্ষণাৎ সেখানে ছুটে গিয়ে জখমী ওয়াইল্ডের বিস্তর তত্ত্বতাবাশ করলেন। জিদ তাঁর অতি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন উপযুক্ত চটি বইয়ে। পাঁচজনে কি বলবে না বলবে তার তোয়াক্কা জিদ তখন করেন নি; সে কথাটা তিনি না বললেও স্পষ্ট বোঝা যায়।

তারপর ওয়াইল্ড্ ফিরে এলেন প্যারিসে। জিদের সঙ্গে তাঁর দুচার বার দেখাসাক্ষাৎ হল। ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, প্যারিসও যে শুধু ওয়াইল্ডের হুঁকো-নাপিতই বন্ধ করেছে তা নয়, তাঁর বন্ধুবান্ধবের অনেকেও তাঁকে কুষ্ঠরোগীর মতো বর্জন করতে আরম্ভ করেছেন। জিদ লিখেছেন, 'ওয়াইল্ড্ যখন দেখতে পেলেন দু-চারখানা দরজা তাঁর জন্য বন্ধ তখন তিনি আর কোনা দরজাতেই কড়া নাড়লেন না—ছন্নের মত এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

এমন সময় একদিন জিদ দেখতে পেলেন, ওয়াইল্ড্ এক কাফের বারান্দায় বসে আছেন। স্বীকার করি, ও রকম জায়গায় হঠাৎ মোলাকাত হয়ে যাওয়াতে আমি একটুখানি অস্বস্তি অনুভব করলুম—চতুর্দিকে ভিড়। বন্ধু 'জি—' ও আমার জন্য ওয়াইল্ড্ দুটো ককটেল অর্ডার দিলেন। আমি তাঁর মুখোমুখি হয়ে বসতে যাচ্ছিলুম যাতে করে লোকজনের দিকে পিঠ ফিরানো থাকে কিন্তু ওয়াইল্ড্ ভাবলেন, আমি পাশে বসতে বোকার মতো নিরর্থক লজ্জা পাচ্ছি (হায়, ওয়াইলড্ সম্পূর্ণ ভুল করেন নি) তাই পাশের চৌকি দেখিয়ে বললেন, 'আঃ, আমার পাশে এসে বসো না; আমি আজকাল বড্ড একলা পড়ে গিয়েছি।'

তারপর দুজনাতে কি কথাবার্তা হল সে কথা আরেক দিন হবে। উপস্থিত লক্ষ্য করার বস্তু যে, জিদও জনমতের ঠেলায় কাবু হয়ে পড়েছিলেন। এবং যে ব্যবহার করলেন তাকে স্নব, ক্যাডের আচরণ বলা যেতে পারে। বাঙলা কথায় একদম ছোটলোকোমি করলেন।

একদিন জিদ নির্ভয়ে যেচে গিয়ে ওয়াইল্ডের সঙ্গে দেখা করেছিলেন লোকনিন্দার পরোয়া না করে, এবং আশ্চর্য তাই নিয়ে তিনি বিন্দুমাত্র গর্ব করেন নি এবং আরো যখন অন্যায় আচরণ করলেন তখনও সেটা লুকোলেন না। শুধু তাই নয়, পাঠক যাতে অতি নির্মমভাবেই তাঁর মাথায় ঘোল ঢালতে পারে তাই কোনো প্রকারের অজুহাত বা আত্মনিন্দাও পেশ করলেন না।

কি উপন্যাস, কি ছোট গল্প, কি জুর্নাল, সর্বত্রই জিদ এই আশ্চর্য সাধুতা দেখিয়েছেন।।[১]

---

১ Andre Gide : Oscar Wilde. In memoriam, Paris, Mercure de France.

www.BanglaBook.org

এযাস্য পরমাগতি

প্রাচ্যভূমি থেকে শ্বেতের প্রাধান্য কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে যেমন রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক নব নব আন্দোলনের সূত্রপাত হচ্ছে, ঠিক তেমনি সংস্কৃতির ভূমিতেও নূতন নূতন চাষ-আবাদ আরম্ভ হয়েছে। চীনদেশ থেকে আরম্ভ করে ইন্দোনেশিয়া, ভারত-পাকিস্তান হয়ে আফগানিস্থান, ইরান, আরব ভূমি পেরিয়ে একদিকে মরক্কো পর্যন্ত এবং অন্য দিকে তুর্কী ইস্তক। সবগুলোর খবর রাখা অসম্ভব—এতগুলো ভাষা শেখার শক্তি এবং সময় আছে কার?—তবু মোটামুটিভাবে তার খানিকটা জরিপ করা যায়।

তিনটে বড় বড় বিভাগ করে প্রাথমিক জরিপ করা যায়। চীন, ভারত, পাকিস্তান এবং আরব ভূমি। ইন্দোনেশিয়া, ইরান এবং তুর্কীকেও সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া যায় না, কিন্তু উপস্থিত সেগুলোকে হিসেবে নিলে আলোচনাটা একদম কব্জার বাইরে চলে যাবে।

এ তিন ভূখণ্ডেই দেখা যাচ্ছে, সংস্কৃতির বাজারে দিশী-বিদেশী দুই মালই চলছে। দর্শন, বিজ্ঞানের তুলনায় সাহিত্যই উপস্থিত এ তিন ভূখণ্ডে সংস্কৃতির প্রধান বাহন—এবং সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি যে বস্তু লেখা এবং পড়া হচ্ছে সে হল উপন্যাস এবং ছোট গল্প। এ দুই জিনিসই প্রাচ্যদেশীয় নিজস্ব ঐতিহ্যগত সম্পদ নয়; ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজের কাছ থেকে শেখা। চিত্র-ভাস্কর্য-স্থাপত্যের বেলাও তাই—সেজান, রেনওয়া, রদাঁ এপস্টাইনের প্রভাব কি কাইরো কি কলকাতা সর্বত্রই দেখা যায়। ইয়োরোপীয় দর্শন এবং বিশুদ্ধ বিজ্ঞান নিয়ে সবচেয়ে বেশি মাথা ঘামাচ্ছে ভারত—কিছুটা কাইরো, তেলাভিভ এবং বাইরুত। একমাত্র ওস্তাদী সঙ্গীতের বেলা বলা যেতে পারে যে, ইয়োরোপীয় প্রভাব এর উপর কোন চাপই দিতে পারে নি।

কিন্তু এরকম পদ গুনে গুনে ফিরিস্তি বানাতে গেলে একখানা ছোটখাটো বিশ্বকোষ লিখতে হয়। সেটা এড়াতে হলে অন্য পন্থা অবলম্বন করতে হয়।

বৈদগ্ধ্য সংস্কৃতি নির্মিত হয় বিশেষ মনোবৃত্তি হৃদয়াবেগ দ্বারা। তার কিছুটা হদিস পেলে মোটামুটিভাবে বলতে পারা যায়, বৈদগ্ধ্য সংস্কৃতি চলছে কোন্ পথে।

শ্বেতের প্রভাব কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম যে আন্দোলন এ তিন ভূখণ্ডে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছে, তাকে 'ছুঁৎবাই', 'বিশুদ্ধীকরণ' বা 'সত্যযুগে প্রত্যাবর্তন' নাম দেওয়া যেতে পারে। এর প্রধান ধর্ম, বৈদেশিক সর্বপ্রকার প্রভাব বর্জন করে বিশেষ কোন প্রাচীন ঐতিহ্যকে নূতন করে চাঙ্গা করে তোলা। এই ভারতবর্ষেই কেউ চায় বৈদিক যুগে ফিরে যেতে (ক্রিয়াকাণ্ডে যাদের ভক্তি অত্যধিক), কেউ চায় উপনিষদের যুগ জাগাতে (দার্শনিক মনোবৃত্তিওয়ালারা), কেউ বা গুপ্ত যুগ (সাহিত্য-কলায় যাদের মোহ), কেউ বা ভক্তি যুগে (বৈষ্ণবজন) ডুব মারতে চান। কেউ বলেন, রবারের জুতো পরে কাঁচা শাকসব্জি খাও, কেউ বলেন, ছেলেমেয়েরা বড্ড বেশি মেশামেশি করছে, তাদের সিনেমা যেতে বারণ করে দাও। পাকিস্তানে এ আন্দোলন 'ইসলামী রাষ্ট্রে'র নামে শক্তি সঞ্চয় করতে চায়। কাইরোর আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কট্টর মৌলানারা এ-দলেরই শামিল। ইন্দোনেশিয়ায় এদেরই নাম দার-উল-ইস্‌লাম সম্প্রদায়। ইবন-ই-সউদ গোষ্ঠীর ওয়াহ্‌হাবী আন্দোলন এই মনোবৃত্তি নিয়েই আরম্ভ হয়। এ-দলের মান্দারিনরা চীনে কিন্তু বিশেষ পাত্তা পাচ্ছেন না।

প্রমাণ করতে পারব না, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, এ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত

www.BanglaBook.org

বানচাল হবে। তার প্রধান কারণ, কোন দেশেরই যুবক সম্প্রদায় এ আন্দোলনে যোগ দিতে রাজী হচ্ছে না।

দ্বিতীয় আন্দোলন ঠিক এর উল্টো। এর চাঁইরা বলেন, 'প্রাচ্য প্রাচ্য করে তো ইংরেজ ফরাসী ওলন্দাজের হাতে মার খেলে বিস্তর। প্রাচ্য ঐতিহ্য সর্বপ্রকার প্রগতির "এনিমি নাম্বার ওয়ান"। আমাদের সর্বপ্রকার বৈদগ্ধ্য-সংস্কৃতি প্রচেষ্টা যদি আধুনিকতম, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রগতির সঙ্গে বিজড়িত না হয়, তবে তার কোন প্রকারেরই ভবিষ্যৎ নেই।' এ আন্দোলনের বড় কর্তাদের অধিকাংশই কম্যুনিস্ট ভায়ারা। এঁদের বিশ্বাস, সংস্কৃতি-বৈদগ্ধ্যের রঙচং সম্পূর্ণ নির্ভর করে বিত্তোৎপাদন এবং ধন-বন্টন পদ্ধতির উপর এবং যেহেতু প্রাচ্যভূমিও একদিন মার্কসের অলঙ্ঘ্য নিয়মানুযায়ী প্রলেতারিয়ারাজে পরিণত হবে, সেই হেতু প্রাচ্যেরও সংস্কৃতি গড়ে উঠবে গণ-নৃত্য, গণনাট্য, গণ-সাহিত্যের উপর। তাই ঐতিহ্যগত সর্বপ্রকার বৈদগ্ধ্য-সংস্কৃতি 'বুর্জুয়া'—সুতরাং বর্জনীয়।

ভারত-পাকিস্তানে এ আন্দোলন সুবিধে করে উঠতে পারছে না, কিন্তু বিশেষ করে তুর্কীতে এবং কিছুটা কাইরো বাইরুতে এর প্রভাব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কম্যুনিস্ট ছাড়াও বহু যুবক-যুবতী এ আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। তার অন্যতম কারণ অবশ্য এই যে প্রথম আন্দোলনে যোগ দিতে হলে ক্ল্যাসিক্স্ পড়তে হয়, সঙ্গীতের শখ থাকলে দশ বছর সা রে গা মা করতে হয়, কুরানহাদিস কণ্ঠস্থ করতে হয়—তাতে বায়ানাক্কা বিস্তর। এতো হাঙ্গামা পোয়ায় কে? তাই দ্বিতীয়টাই সই।

এ দুই আন্দোলনের ভবিষ্যৎ ঠিক করবেন ট্রুমান স্তালিন। আমাদের মাথা ঘামাতে হবে না।

তৃতীয় আন্দোলন প্রাচ্যভূমিতে আরম্ভ করেন রাজা রামমোহন। তাঁর প্রচেষ্টা বাঙালী পাঠককে নূতন করে বলতে হবে না। প্রাচ্যভূমির ঐতিহ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির মূল্যবান সম্পদ মিলিয়ে নিয়ে তিনি নব নব সৃষ্টির স্বপ্ন দেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দ তাঁদের স্বপ্নকে বৈদগ্ধ্যের বহু ক্ষেত্রে মূর্তমান করেছেন। কাইরোর তাহা হোসেন, বাইরুতের খলীল গিবরানী, ঢাকার বাঙালী সাহিত্যিক সম্প্রদায়, লাহোরে ইকবালের শিষ্যমণ্ডলী এবং ইন্দোনেশিয়ার সুতান শহরীর এ সম্প্রদায়ভুক্ত।

বিশেষ করে সুতান শহরীরের নাম ভক্তি ভরে স্মরণ করতে হয়। জাভা সুমাত্রা বালীর অনাড়ম্বর জীবনযাপন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যে সদানন্দ কৃত্রিমতা বিবর্জিত সংস্কৃতি ইন্দোনেশিয়ায় এতদিন ধরে গড়ে উঠেছে, ওলন্দাজ বর্বরতা যাকে বিনষ্ট করতে পারে নি, সেই সংস্কৃতির সঙ্গে শহরীর চান উত্তম উত্তম ইয়োরোপীয় চিন্তাবৃত্তি, অনুভবসম্পদ যোগ দিয়ে নূতন সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়ে তুলতে। এবং সে চাওয়ার পিছনে রয়েছে শরীরের নিরঙ্কুশ আত্মত্যাগ আর কঠোরতম সাধনা। বিশ্বসংসারের সব আন্দোলন সব প্রচেষ্টার সঙ্গে তিনি নিজেকে অহরহ সংযুক্ত রেখে সেই পন্থার অনুসন্ধান করছেন, যে পন্থা শুধু যে ইন্দোনেশিয়ার চিন্তাবিকাশ কলাপ্রকাশ মূর্তমান করবে তাই নয়, তাবৎ প্রাচ্যভূমি তার থেকে অনুপ্রেরণা আহরণ করতে পারবে।

এ পন্থা অন্বেষণে নিজেকে অহরহ সজাগ রাখতে হয়—গীতার সংযমী, যিনি সদাজাগ্রত তিনিই এ মার্গের অধিকারী। শহরীর এ মার্গের প্রকৃষ্টতম উদাহরণ।

এষাস্য পরমাগতি॥

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিস্ ইয়োরোপ!

গিরিজা মুখুজ্জে দেশে থাকতে বার দুই জেলে যান—সে কিছু না, নস্যি। (কেন বলছি, বাকিটুকু পড়লেই বুঝতে পারবেন) তারপর ছিটকে গিয়ে লন্ডন, সেখান থেকে প্যারিস। দিব্য আছেন, সর্‌বন্ যান, ফরাসী গুণীদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে, দু পয়সা কামানও বটে। এমন সময় দেখা গেল, জর্মনরা প্যারিসের ঘাড়ে এসে পড়ল বলে। মুখুজ্জে গুটিকয়েক ফরাসী আত্মজনের সঙ্গে আরো সব লক্ষ লক্ষ ফরাসিদের মতো দক্ষিণের পথ ধরলেন। পায়ে হেঁটে, মালবোঝাই বাইসিকেল কিংবা হাত-গাড়ি ঠেলে ঠেলে যখন ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ক্লান্তিতে ভিরমি যাবার উপক্রম (ওদিকে মনে মনে ভাবছেন, জর্মনদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন), তখন হঠাৎ মালুম হল, জর্মন বাহিনী তাঁকে পিছনে ফেলে রাতারাতি অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে। তখন সামনে পিছনে সবই সমান; ফিরে এলেন প্যারিস।

মুখুজ্জে ভারতীয়, কাজেই ইংরেজের দুশমন। কিন্তু তাহলে কি হয়—পাসপোর্টে যে পাকাপোক্ত ইস্টাম্পো মারা রয়েছে, মুখুজ্জে ব্রিটিশ প্রজা, অর্থাৎ তিনি জর্মনির শত্রু। কাজেই যদিও পাদমেকং ন গচ্ছামি করে আপন কুঠুরিতে সুবো-শাম ঘাপটি মেরে বসে থাকেন, তবু।

একদা কেমনে জানি ভারতীয় মহাশয়
পড়িলেন ধরা, আহা, দুরদৃষ্ট অতিশয়।[১]

জর্মন পুলিশের তদারকিতে ফরাসী জেলখানায় মুখুজ্জে তখন ইস্টদেবতার নাম জপ করতে লাগলেন। সে-জেলে ইংরেজের শত্রু-মিত্র বিস্তর 'ব্রিটিশ' প্রজার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হল। তার বর্ণনাটি মনোরম।

কিছুদিন পর জেল থেকে নিষ্কৃতি পেলেন।

তখন নাম্বিয়ার তাঁকে বললেন, তাঁর সঙ্গে বার্লিন যেতে। সেখানে গিয়ে দেখেন, সুভাষচন্দ্র ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য হরেক রকম তরিবত-তত্ত্বতাবাশ আরম্ভ করে দিয়েছেন। মুখুজ্জেকে 'আজাদ হিন্দ' বেতারে বেঁধে দেওয়া হল নানা প্রকারের ব্রডকাস্টের জন্যে। সুভাষের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ যোগাযোগ হল। গ্র্যান্ড মুফতির সঙ্গেও বিস্তর দহরম মহরম হল।

সুভাষ সম্বন্ধে মুখুজ্জে অনেক কিছু লিখেছেন। উপাদেয়।

তারপর সুভাষ দেখলেন, বার্লিনে থেকে কাজ হবে না। ওদিকে ইংরেজ সিঙ্গাপুরে শিঙে ফুঁকেছে। জাপানীরা বর্মায় ঢুকছে। সুভাষ চলে গেলেন জাপান। এদিকে 'আজাদ হিন্দ' বেতার দড়কচ্চা মেরে গেল। মুখুজ্জেরা কিন্তু ক্ষান্ত দেন নি।

তারপর জর্মনির পতন আরম্ভ হল। বোমার ঠেলায় বার্লিনে কাজ করা দায়। তাবৎ ভারতীয়কে সরানো হল হল্যান্ডে; সেখান থেকে 'আজাদ হিন্দে'র বেতারকর্ম চালু থাকল বটে, কিন্তু মুখুজ্জেরা বুঝলেন, সময় ঘনিয়ে এসেছে। তারপর প্রায় সবাই একে একে ফিরে এলেন বার্লিন। সেখান থেকে মুখুজ্জে গেলেন দক্ষিণ-জর্মনিতে। ইতিমধ্যে রাশানরা ঢুকল বার্লিনে।

এবারে তিনি আইনত রাশার শত্রু। কারণ রাশার মিত্র ইংরেজদের বিরুদ্ধে তিনি

---

১ সুকুমার রায়ের অচলিত কবিতা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিস্তর বেতার বক্তৃতা ঝেড়ে বসে আছেন। আইনত তিনি অ্যামেরি, হো হো'র সমগোত্র। কাজেই পালাতে হলে 'নিরপেক্ষ' সুইটজারল্যান্ডে। এক দরদী জর্মন সীমান্ত পুলিশই তাঁকে বাতলে দিলে কি করে নিষুতি রাতে রাইন নদী সাঁতরে ওপারে যাওয়া যায়।

আমরা ভাবি সুইসরা বড্ডই নিরপেক্ষ মোলায়েম জাত। মুখুজ্জে সেখানে যে বেইজ্জতি আর লাঞ্ছনার ভিতর দিয়ে গেলেন, তার বর্ণনা আমি আর এখানে দিলুম না।

সুইসরা মুখুজ্জেকে আত্মহত্যার দরজায় পৌঁছিয়ে হঠাৎ একদিন প্রায় 'কানে ধরে' ধাক্কা মেরে ঢুকিয়ে দিল জর্মনিতে। জর্মনির যে অঞ্চলে তাঁকে ফেরত-ডাকে পাঠানো হল, সেটি ফরাসীর তাঁবেতে। কাজেই তাঁকে পত্রপাঠ গ্রেপ্তার করা হল। কিন্তু মুখুজ্জে যখন কমান্ডান্টকে বুঝিয়ে দিলেন, তিনি জর্মনিতে যা কিছু করেছেন সে শুধু 'পাত্রি'র (দেশের) জন্য, তখন ফরাসীরা—আর এ শুধু ফরাসীরাই পারে—মুখুজ্জের বিগত জীবনটা যেন বেবাক ভুলে গেল। শুধু তাই নয়, খেতে পরতে দিল। বলল, 'তুমি যখন দিব্য ফরাসিজর্মন জানো, তখন আমাদের সঙ্গে থেকে কাজ করো না কেন?' তাই সই। ব্যবস্থাটা স্থানীয় জর্মনদেরও মনঃপূত হল—অবিশ্যি বিজয়ী ফরাসীরা তখন তার থোড়াই পরোয়া করত—কারণ মুখুজ্জে তাদের সামনে 'দম্ভী বীরে'র মূর্তিতে দেখা দেন নি।

তারপর সেই ফরাসী রেজিমেন্ট দেশে চলে গেল। মুখুজ্জের আবার জেল। ইংরেজ তখন অ্যামেরি হো হো'র মতো মুখুজ্জেকে পেলে তাঁকেও ঝোলায়।

কিন্তু ঝোলাবার সুযোগ পায় নি। ফরাসীরা মুখুজ্জেকে ইংরেজের হাতে তুলে দেয় নি।

তারপর স্বরাজ হয়ে গেল। দেশের ছেলে দেশে ফিরে এল।

* * *

কিন্তু বইখানা মুখুজ্জের আত্মজীবনী নয়। বইটিতে মুখুজ্জে ইয়োরোপ দেখেছেন নানা দৃষ্টিকোণ থেকে, নানা পটপরিবর্তনের সামনে, পয়লা সারিতে বসে। উত্তম বই।[২]

শমীম

আমার বন্ধু শমীম মারা গিয়েছে। শমীম এ-সংসারে কোনো কীর্তি রেখে যেতে পারে নি, যার জন্যে লোকে সভাস্থলে কিংবা কাগজে শোক প্রকাশ করবে। তার আত্মজন এবং নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া তাকে কেউ বেশিদিন স্মরণ করবে না।

তার কথা আপনাদের জোর করে শোনাবার অধিকার আমার নেই, কারণ পূর্বেই নিবেদন করেছি, শমীম কোন কীর্তি রেখে যেতে পারে নি। তবু যে কেন তার সম্বন্ধে লিখছি, তার কারণ সে আমার বন্ধু, আর তাই আশা, আমার বহু সহৃদয় পাঠক সেই সূত্রে তাকে স্নেহের চোখে দেখবেন, এবং বহু দেশ দেখবার পর বলছি, ওরকম সচ্চরিত্র ছেলে আমি কোথাও দেখি নি।

শমীম আমার ছেলের বয়সী। তার জন্মের প্রায় প্রথম দিন থেকেই আমি তাকে চিনি।

---

২ Girija Mukherjee, This Europe. Saraswaty Library, Calcutta.

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর এমন সুন্দর চেহারা নিয়ে সে জন্মাল, আর সে সৌন্দর্য দিন দিন এমনি বাড়তে লাগল যে, বাড়িতে যে আসত, সে-ই ছেলেটির দিকে না তাকিয়ে থাকতে পারত না। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল, কী বিনয়নম্র ভদ্রসংযত ব্যবহার এবং পরদুঃখকাতর হৃদয়ভগবান তাকে দিয়েছেন। আমি নিশ্চয়ই জানি বাড়ির ভিতরে বাইরে এমন কেউ ছিল না যে শমীমের উপর বিরক্ত হয়েছে কিংবা রাগ করেছে।

কিন্তু তবু বলব, শমীম মন্দ অদৃষ্ট নিয়ে জন্মেছিল।

ধরা পড়ল সে সন্ন্যাস রোগে ভুগছে। সন্ন্যাসের চিকিৎসা আছে কি না জানি নে, কিন্তু একথা জানি, তার পিতা (আমার অগ্রজ-প্রতিম) চিকিৎসক হিসেবে আর আমরা পাঁচজনে বন্ধুবান্ধব হিসেবে তার চিকিৎসার কোন ত্রুটি করি নি। আর মায়ের সেবা সে কতখানি পেয়েছিল, সেকথা কি বলব? সর্বকনিষ্ঠ চিররুগ্ন কোন্ ছেলেকে তার মা হৃদয় উজাড় করে সেবা-সুশ্রুষা করে না?

ভগবান এতেও সন্তুষ্ট হলেন না,—তাকে দিলেন মারাত্মক টাইফয়েড্ জ্বর। আমি দেশে ছিলুম না, ফিরে এসে দেখি জ্বর যাবার সময় শমীমের একটি চোখ নিয়ে গিয়েছে। আমি অনেক দুঃখকষ্ট অবিচার-অত্যাচার দেখেছি, সহজে কাতর হই নে, কিন্তু শমীমের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি যে আঘাত পেয়েছিলুম সে আঘাত যেন আমার চেয়ে দুর্বল লোককে ভগবান না দেন।

শমীমের বাপ খুড়া ঠাকুর্দা সকলেই গম্ভীর প্রকৃতির—শমীমও ছেলেবেলা থেকে শান্তস্বভাব ধরত, এখন সে ক্রমে ক্রমে গম্ভীর হতে লাগল। পড়াশোনা তার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং কখনো যে করতে পারবে সে ভরসা ক্রমেই ক্ষীণ হতে লাগল। হয়তো তাই নিয়ে মনে মনে তোলপাড় করত—আশ্চর্য কি, যে ছেলে অল্পবয়সে লেখাপড়ায় সকলের সেরা ছিল তার সব লেখাপড়া চিরতরে বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো মর্মন্তুদ ব্যাপার কি হতে পারে?

বিশ্বাস করবেন না, ঐ গাম্ভীর্যের পিছনে কিন্তু তার ছিল প্রচুর রসবোধ। আমাকে খুশি করবার জন্য সে আমাদের বাড়ি—নং পার্ল রোড সম্বন্ধে একটি রচনা লেখে। তাতে আমাদের সকলের রসময় (অনেকটা আইরিশ ধরনের হিউমার) বর্ণনার পর ছিল উপরের তলায় তার দাদামশায়ের বর্ণনার ফিনিশিং টাচ্। দাদামশায় আসলে কুষ্ঠিয়ার লোক, 'এটা' 'সেটা' না বলে বলেন 'ইডা', 'সিডা', আর বুড়োমানুষ বলে সমস্ত দিন বাড়ির এঘর ওঘর করে বেড়ান। তার বর্ণনা শমীম দিল এক লাইনে—'আর দাদামশাই তো সমস্ত দিন "ইডা" "সিডা" নিয়ে আছেন।

শমীমের বড় ভাই শহীদ তখন প্রেমে পড়েছে। মেয়েটির নাম হাসি। খানার টেবিলে একদিন জল্পনাকল্পনা হচ্ছে, একটা চড়ুই-ভাত করলে হয় না? শহীদ গম্ভীর হয়ে বসে আছে—আমি শুধালুম, 'তুমি আসছো তো?' শহীদ বলল, 'না।'

শমীম বলল, 'ও আসবে কেন? আমরা তো "হাসি" না।'

অর্থাৎ তার ডার্লিং 'হাসি' তো আমাদের সঙ্গে চড়ুইভাতে আসবে না এবং আহা, শহীদ কতই না Jolly Chap —আমরাই শুধু গম্ভীর।

কিন্তু আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করত তার পরোপকার করার প্রচেষ্টা। ৪৭-এর দাঙ্গার সময় আমাদের বাড়িতে প্রায় সত্তর জন হিন্দু নরনারী আশ্রয় নেন—আমি তখন দক্ষিণে—ফিরে এসে শুনি গুণ্ডারা বাড়ি আক্রমণ করেছিল, শমীম নির্ভয়ে এদের সেবা করেছে; আমি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আশ্চর্য হই নি।

তার পর ৫০ সনে হোলির কয়েকদিন আগে যখন সাম্প্রদায়িক কলহের ফলে বিস্তর মুসলমান নরনারী এসে আমাদের পাড়ায় আশ্রয় নিল তখন শমীম তার মা, বাবা, বোনের সঙ্গে যোগ দিয়ে ক্যাম্পে ক্যাম্পে গিয়ে তাদের সেবা করল, তার বাবার ডিসপেনসারিতে বসে রুগীদের জন্য ওষুধ তৈরি করাতে, ইনজেকশন-ভেকসিনেশন দেওয়াতে সর্বপ্রকারে সাহায্য করলে। পৃথিবীর সবাই শমীমকে ভুলে যাবে কিন্তু দু-একটি আর্ত হয়তো এই সুহাস, সুভাষ, প্রিয়দর্শন ছেলেটিকে মনের কোণে একটুখানি ঠাঁই দেবে।

সেই সময়ে দিল্লীর এক হিন্দু ভদ্রলোক আমাদের এবং পাড়ার মুসলমানদের অনেক সাহায্য করেন। আমরা স্থির করলুম, দিল্লীর লোক, এঁকে নিমন্ত্রণ করে কোর্মা-পোলাও খাওয়াতে হবে। সব ঠিক, এমন সময় শমীম তার মাকে গিয়ে বললে, 'এই দুর্দিনে লোকে খেতে পাচ্ছে না, আর তোমরা দাওয়াত করে খাওয়াচ্ছ কোর্মা-পোলাও! আমি তা হলে খাব না। যদি নিতান্তই খাওয়াতে হয়, তবে খাওয়াও আমরা যা রোজ খাই।'

আমরা মামুলী খানাই পরিবেশন করেছিলুম।

* * *

খবর পেলুম, শমীম ট্রেনের সামনে পড়ে আত্মহত্যা করেছে। আমি কিছুই ভাবতে পারছি নে। এত সহৃদয়, পরোপকারী ছেলে বুঝতে পারল না যে তার মা, বাপ, খুড়ো, ভাই, বোন, আমাকে, তার বন্ধু শুকুরকে এতে কতখানি আঘাত দেবে?

দিনেন্দ্রনাথ

'দেশে'র ৪১শ সংখ্যা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি সর্বাঙ্গসুন্দর সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখে দিনেন্দ্রভক্ত, দিনেন্দ্র-সখাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। গুপ্ত মহাশয় দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয়, দিনেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রবীন্দ্রসঙ্গীতানুরাগী মাত্রেরই অবশ্য জ্ঞাতব্য তত্ত্ব এবং তথ্য, দিনেন্দ্রনাথের মধুর, সহৃদয়, বন্ধুবৎসল হৃদয়ের এ বর্ণনা দিয়েছেন, তার সঙ্গে আমার মনে দিনেন্দ্রনাথের যে ছবি আছে সেটি হুবহু মিলে গেল। একাধিকবার ভেবেছি, দিনেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এত অল্প লোকই লিখেছেন যে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার যেটুকু জানা আছে তাই লিখে ফেলি, কিন্তু প্রতিবারেই মনে হয়েছে, দিনেন্দ্র-জীবন আলোচনা করার শাস্ত্রাধিকার আমার নেই। গুপ্ত মহাশয় এখন আমার কর্তব্যটি সরল করে দিলেন। আমার বক্তব্যের কোনো কথা যদি গুপ্ত মহাশয়ের কাজে লেগে যায়, তবে আমি শ্রমসাফল্যের আনন্দ পাব।

স্বীকার করি, রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন-মন্দিরে যে বক্তৃতা দিতেন, তা অতুলনীয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করি, যেদিনকার উপাসনা দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গীত দিয়ে আরম্ভ হত, সেদিন সে সঙ্গীত যেন আমাদের মনে করে রবীন্দ্রনাথের উপাসনার জন্য সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তুত এবং উন্মুখ করে তুলত। দিনেন্দ্রনাথের বিশাল গম্ভীর কণ্ঠ আমাদের হৃদয়মন ভরে দিত, তার পর সমস্ত মন্দির ছাপিয়ে দিয়ে ভাঙা-খোয়াই পেরিয়ে যেন কোথা থেকে

www.BanglaBook.org

কোথা চলে যেত। তাই আমার সব সময় মনে হয়েছে দিনেন্দ্রনাথের কণ্ঠ একজনকে শোনাবার জন্য, এমন কি একটা সম্পূর্ণ আসরকেও শোনাবার জন্য নয়, তাঁর কণ্ঠ যেন ভগবান বিশেষ করে নির্মাণ করেছিলেন সমস্ত দেশের জনগণকে শোনাবার জন্য তাই বোধ হয় তাঁর কণ্ঠে যে রকম 'জনগণমন অধিনায়ক' গান শুনেছি আজ পর্যন্ত কারো কণ্ঠে সেরকম ধারা শুনলাম না।

এরকম গলা এ দেশে হয় না—এ গলার ভলুম পেলে ইতালির শ্রেষ্ঠতম অপেরা-গাইয়ে জীবন ধন্য মনে করেন।

হয়তো আমার কল্পনা, কিন্তু প্রায়ই আমার মনে হয়েছে, মন্দিরে দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গীত যেন অনেক সময় রবীন্দ্রনাথকে শ্রেষ্ঠতর ধর্মব্যাখ্যানে অনুপ্রাণিত করেছে।

একথা সবাই জানেন, দিনেন্দ্রনাথ যে শুধু গায়কই ছিলেন তাই নয়, তিনি অতিশয় উচ্চদরের সঙ্গীতরসজ্ঞও ছিলেন। কি উত্তর কি দক্ষিণ, কি ইয়োরোপীয় সর্বসঙ্গীতে সর্ববাদ্যের খবর তিনি তো রাখতেনই—তার উপর তিনি জানতেন কি করে গায়ক এবং যন্ত্রীকে উৎসাহ দিয়ে দিয়ে তার সর্বশ্রেষ্ঠ নৈপুণ্য টেনে বের করে আনতে হয়। প্রায় ত্রিশ বৎসর হয়ে গিয়েছে, তাই আজ আর ঠিক মনে নেই, তবে বোধ হয় সে গুণীর নাম ছিল সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী, পিঠাপুরুম্ মহারাজের বীণকার—তিনি এসেছেন রবীন্দ্রনাথকে বীণা শোনাতে। রবীন্দ্রনাথ আর দিনেন্দ্রনাথ উদ্‌গ্রীব হয়ে বসেছেন; তার পর আরম্ভ হল বীণাবাদন।

আমার সন্দেহ হয়েছিল দক্ষিণের গুণীর মনে কিঞ্চিৎ দ্বিধা ছিল, উত্তর ভারতের শান্তিনিকেতন তাঁর সঙ্গীত সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে কি না। দশ মিনিট যেতে না যেতেই রবীন্দ্রনাথ আর দিনেন্দ্রনাথ যেমন যেমন তাঁদের সূক্ষ্ম রসানুভূতি ঘাড় নেড়ে, মৃদু হাস্য করে বা বাহবা বলে প্রকাশ করতে লাগলেন সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গমেশ্বর বুঝতে পারলেন তিনি যে সমঝদার শ্রোতার সামনেই বাজাচ্ছেন তাই নয়, এ রকম শ্রোতা তিনি জীবনে পেয়েছেন কমই। সে রাত্রে কটা অবধি মজলিস্ চলেছিল আজ আর ঠিক মনে নেই, তবে শান্তিনিকেতনের 'খাবার ঘণ্টা'র অনেক পর অবধি—বারোটা হতে পারে, দুটাও হতে পারে।

সে যুগে ইয়োরোপ থেকেও বহু কলাবিৎ আসতেন রবীন্দ্রনাথকে গান কিংবা বাজনা শোনাতে। দুজনকে স্পষ্ট মনে আছে, কিন্তু নাম ভুলে গেছি। একজন ডাচ মহিলা গাইয়ে (বিনায়ক রাও এঁর নাম স্মরণ করতে পারবেন) এবং অন্যজন বেলজিয়ান বেহালা-বাজিয়ে। ডাচ মহিলাটি খুব বেশি দিন আশ্রমে থাকেন নি, কিন্তু বেলজিয়ানটি দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে একদম জমে যান। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি বাজিয়ে যেতেন—ভদ্রলোক দিনে অন্তত বারো ঘণ্টা আপন মনে, একা একা, বেহালা বাজাতেন—আর দিনেন্দ্রনাথ তাঁর সূক্ষ্মতম কারুকার্যের সময় মাথা নড়ে নেড়ে রসবোধের পরিচয় দিয়ে তাঁর উৎসাহ বাড়াতেন।

বেলজিয়ানটি দিনেন্দ্রনাথের কাছ থেকেও অনেক কিছু শিখেছিলেন—তার অন্যতম, সিগার বর্জন করে গড়গড়া পান। আশ্রম ছাড়ার দিন ভদ্রলোক দুঃখ করে আমাকে বলেছিলেন, 'দেশে যেতে মন চাইছে না, সেখানে তামাক পাব কোথায়?' যদিস্যাৎ পেয়ে যান সেই আশায় ভদ্রলোক তাঁর আলবোলাটি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।

দিনেন্দ্রনাথ সাহিত্যের উচ্চাঙ্গ সমঝদার ছিলেন। প্রাপ্তবয়সে তিনি ফরাসীও শিখেছিলেন এবং স্বচ্ছন্দে ফরাসী উপন্যাস পেতে পারতেন। ওদিকে ভারতের সংস্কৃতি

www.BanglaBook.org

ইতিহাসের প্রতি ছিল তাঁর গভীর প্রেম। তাই কি লেভি, কি উইনটার্‌নিৎস সকলের সঙ্গে ছিল তাঁর হৃদ্যতা। বিদেশীকে কি করে খানা খাইয়ে, আড্ডা জমিয়ে, সঙ্গীতের চর্চা করে, সৌজন্য ভদ্রতা দেখিয়ে—আমি একমাত্র দিনেন্দ্রনাথকেই চিনি যিনি পৃথিবীর সকল জাতের লোকেরই ম্যানারস এটিকেট জানতেন—তার দেশের কথা ভুলিয়ে দেওয়া যায় এ কৌশল তাঁর যা রপ্ত ছিল এর সঙ্গে আর কারো তুলনা হয় না। তাই তাঁর বাড়ি ছিল বিদেশীদের কাশীবৃন্দাবন।

দিনেন্দ্রনাথ গাইতে পারতেন, বাজাতে পারতেন, অন্যের গানবাজনার রস চাখতে পারতেন এ-কথা পূর্বেই নিবেদন করেছি; তদুপরি তিনি ছিলেন সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ। এ বড় অদ্ভুত সমন্বয়। শাস্ত্রজ্ঞের রসবোধ কম, আবার রসিকজন শাস্ত্রের অবহেলা করে—দিনেন্দ্রনাথ এ নীতির ব্যত্যয়—শাস্ত্রের কচকচানি তিনি ভালবাসতেন না। কিন্তু সঙ্গীতের বিজ্ঞানসম্মত চর্চার জন্য যেখানেই শাস্ত্রের প্রয়োজন হত, তিনি সেখানেই সত্য শাস্ত্র আহরণ করে ছাত্রের সঙ্গীতচর্চা সহজ সরল করে দিতে জানতেন।

আমাদের ঐতিহ্যগত রাগপ্রধান সঙ্গীতচর্চার জন্য প্রাচীন অর্বাচীন বহু শাস্ত্র আছে, রবীন্দ্রনাথ এ যুগে সঙ্গীতের যে নূতন ভুবন সৃষ্টি করে দিলেন, তার রহস্য ভেদ করার জন্য কোনো প্রামাণিক শাস্ত্র নেই। এ-শাস্ত্র নির্মাণ করার অধিকার একমাত্র দিনেন্দ্রনাথেরই ছিল। বহু অনুনয়-আবেদন করার পর তিনি সে শাস্ত্র রচনা করতে সম্মত হলেন।

কয়েকটি অধ্যায় তিনি লিখেছিলেন। সেগুলি অপূর্ব। শুধু যে সেগুলিতে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত 'দর্শনে'র সন্ধান মেলে তাই নয়, সেগুলিতে ছিল ভাষার অতুলনীয় সৌন্দর্য অমিত ঝঙ্কার—সে ভাষার সঙ্গে তুলনা দিতে পারি একমাত্র 'কাব্যের উপেক্ষিতা'র ভাষা।

এ শাস্ত্র তিনি কখনো সমাপ্ত করতে পেরেছিলেন কিনা জানিনে। হয়তো আমার ভুল, কিন্তু প্রথম অধ্যায়গুলো শুনেই আমার মনে হয়েছিল এ ছন্দে শেষরক্ষা করা সহজ কর্ম নয়। এর জন্য যতখানি পরিশ্রমের প্রয়োজন, দিনেন্দ্রনাথের হয়তো ততখানি নেই।

আমি দিনেন্দ্রনাথের নিন্দে করছি নে। কিন্তু আমি জানি তিনি গান গাইতে, বাজনা বাজাতে, গানবাজনা শুনতে, সাহিত্যরস উপভোগ করতেন, প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকতে, আড্ডা জমাতে, বন্ধুবান্ধবকে খাওয়াতে, বিদেশীদের আদর-আপ্যায়ন করাতে এত আনন্দ পেতেন যে কোনো প্রকারের কীর্তি নির্মাণ করাতে ছিলেন তিনি সম্পূর্ণ পরাঙ্মুখ, নিরঙ্কুশ বীতরাগ।

নাই বা হল সে শাস্ত্র সে কীর্তি গড়া! আজ যদি দিনেন্দ্র-শিষ্যেরা আপন আপন নৈবেদ্য তুলে ধরেন, তবে তার থেকেই নূতন শাস্ত্র গড়া যাবে॥

ভারতীয় নৃত্য

নৃত্য জীবনীশক্তির চরম বিকাশ। যে-সব কলা দ্বারা মানুষ তাহার সৌন্দর্যানুভূতি প্রকাশ করে, তাহাদের গভীরতম মূল নৃত্যরস হইতে প্রাণসঞ্চয় করে। অন্যান্য কলা সৃষ্টি হইবার বহু পূর্বে মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত, আড়ম্বরহীন নৃত্য দ্বারা তাহার অনুভূতি প্রকাশ করিয়াছে—অপরের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হৃদয়ে সেই রস সঞ্চারিত করিবার জন্য এই সরল কলাই তখন তাহার একমাত্র আশ্রয়ও ছিল। আদিম মানবের বাদ্যযন্ত্র ছিল না, ধ্বনি বিশ্লেষণ করিয়া সঙ্গীত সৃষ্টি করিতে সে তখনও শিখে নাই, প্রতিমা নির্মাণের যন্ত্রপাতি তাহার ছিল না, চিত্রাঙ্কনের সরঞ্জাম তাহার কাছে তখনও অজানা। অনুভূতি প্রকাশ করিবার একমাত্র পন্থা ছিল তাহার নিজের দেহ; সেই দেহ সে সাবলীল ছন্দে তালে তালে আন্দোলিত করিয়া তাহার সুখ-দুঃখ, ভয়-ঘৃণা প্রকাশ করিত। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অনুভূতি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর রূপ গ্রহণ করিতে লাগিল—নৃত্যও তাহার সঙ্গে যোগ রাখিয়া সুকুমার কলায় পরিণত হইল; মানুষ নৃত্য দ্বারা তাহার সূক্ষ্মতম ও গভীরতম অনুভূতিকে রূপ দিতে শিখিল।

সলিল ছন্দে, তালমানযোগে দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আন্দোলন দ্বারা মানুষ যখন তাহার জীবনীশক্তির চরম সত্তাকে সপ্রকাশ করিয়া তুলে তখনই তাহা নৃত্যের রূপ ধারণ করে। নৃত্য তখন মানুষের নব নব সৌন্দর্যানুভূতি, সত্যের সঙ্গে তাহার অন্তরতম পরিচয় নব নব রূপে উন্মোচন করিয়া প্রকাশ করে। তাই শুদ্ধ, অকৃত্রিম নৃত্য সম্পূর্ণ বাধাবন্ধহীন। দেশ ও কালের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে তাহাকে রুদ্ধ করা, কুসংস্কার দ্বারা তাহাকে আচ্ছন্ন করার অর্থ আর কিছুই নয়—তাহার অফুরন্ত জীবন-উৎসকে রুদ্ধ করা, তাহার স্বাধীনতাকে পঙ্গু করা। আমাদের দেশের হৃদয় একদিন স্বতঃস্ফূর্ত, বাধাবন্ধহীন আনন্দের নৃত্যছন্দে আন্দোলিত হইয়াছিল, আজ সেই ধারা বন্ধ হইয়া ব্যবসায়ী নটনটীদের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্ধকূপের সৃষ্টি করিয়াছে। রোগজীর্ণ, বিষাক্ত, বিলাসব্যসনীদের উত্তেজনা দানেই আজ তাহার চরম আনন্দ, পরম লাভ। ক্ষুদ্র হৃদয়ের অবসর বিনোদন ও ক্ষণস্থায়ী চিত্তচাঞ্চল্যের প্রকাশ করাকেই এখন নৃত্যের আদর্শ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

কিন্তু ধীরে ধীরে আমাদের সুস্থবুদ্ধি পুনরায় ফিরিয়া আসিতেছে; নৃত্যের বিকৃত বিকলাঙ্গ দেহে পুনরায় প্রাণ সঞ্জীবিত হইতেছে। ভারতীয় নৃত্যের নবজীবন সন্ধিক্ষণের তাৎপর্য বুঝিতে হইলে ভারতের উচ্চাঙ্গ ও জনপদ নৃত্যের বিভিন্ন ধারার সহিত পরিচিত হওয়ার একান্ত প্রয়োজন।

সাঁওতাল, কোল, ভীল প্রভৃতি অনুন্নত জাতির ভিতরে যে-সব নৃত্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূলে রহিয়াছে ফসল কাটা, নবান্নের আনন্দ অথবা বৃষ্টিপাত, ঝঞ্ঝাবাত, ভূতপ্রেতের লীলাখেলা। বসুন্ধরার আদিম সন্তান নৃত্যযোগে প্রয়োজন মত কখনো প্রকৃতির রুদ্র মূর্তিকে তুষ্ট করিতে চাহিয়াছে, কখনো তাহার দক্ষিণ মুখের কামনা করিয়াছে। দুর্বিক ঢোলের বৈচিত্র্যহীন তালের সঙ্গে সে তখন তাহার দেহের ছন্দ মিলাইয়া নাচিয়াছে। সে নৃত্য মার্জিত, কিন্তু তবু কখনও কখনও তাহাতে হিল্লোলের সন্ধান পাওয়া যায়। অর্ধবৃত্তাকারে তাহারা নাচে, গান গায় ও মধ্যস্থলে দুইজন পুরুষ মাদল বাজাইয়া তীক্ষ্ণ চিৎকার ও উন্মত্ত নৃত্যে স্ত্রীলোকদিগকে দ্রুততর নৃত্যে উত্তেজিত করে। পুরুষেরাও কখনো মূল নর্তকরূপে অপ্রসন্ন দেবতাকে তুষ্ট করিবার জন্য অথবা দর্শকের মনে বিচিত্র ভাব সঞ্চারের জন্য নৃত্য করিয়া থাকে। অসভ্য সমাজে ইহাদের প্রতিপত্তিও অসীম; সমাজ তাহাদিগকে ভক্তিভরে পূজা করে।

আমাদের দেশের জনপদ নৃত্য বলিতে প্রধানত গুজরাতের গরবা, মালাবারের কৈকট্টকলি, উত্তর-ভারতের কাজরী ও মণিপুরের রাসলীলাই বুঝায়। ইহাদের মূলে ধর্মের অনুপ্রেরণা, অঙ্গভঙ্গিতে ইহারা সুমার্জিত ও আঙ্গিকের দিক দিয়া যে ইহাদের যথেষ্ট বিকাশ

www.BanglaBook.org

হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই নৃত্যগুলি পুনরাবৃত্তিবহুল বলিয়া দর্শকের মন সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তৎসত্ত্বেও ইহাদের মাধুর্য ও প্রাণশক্তি অস্বীকার করা যায় না। গুজরাতের গরবাতে যথেষ্ট লালিত্য ও প্রাণশক্তি আছে, কিন্তু পদভঙ্গির অভাব; মালাবারের কৈকট্টকলিতে সবল অঙ্গ সঞ্চালন ও বিচিত্র পদভঙ্গির প্রাচুর্য আছে, কিন্তু মাধুর্যের অভাব। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ প্রয়োজন যে, একমাত্র গুজরাতের জনপদ নৃত্যেই স্ত্রী-পুরুষেরা যেমন পৃথক পৃথক মণ্ডলীতে নৃত্য করিয়া থাকে, সেইরূপ উভয়ে সম্মিলিত হইয়াও নৃত্য করিবার রীতি প্রচলিত আছে। নর্তকীরা বহু ছিদ্রবিশিষ্ট মৃৎপাত্রে জ্বলন্ত প্রদীপ রাখিয়া অথবা মস্তকে সুগঠিত পিত্তল কলসী ধারণ করিয়া মনোরম অঙ্গভঙ্গিতে চক্রাকারে নৃত্য করে; সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম ও রাসগীতি গায়, করতালি দিয়া তাল লয় রক্ষা করে। কখনও কখনও দুইটি ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড দিয়া নাচিবার সময় তাল বাজায়; অজন্তা ও অন্যান্য প্রাচীন চিত্রে ঐ কাষ্ঠখণ্ডের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে সঙ্গীত সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়; তখন কেবলমাত্র মাদলের তালে শুদ্ধ স্বাধীন নৃত্য আরম্ভ হয়; অঙ্গভঙ্গি তখন সবল হইয়া ওঠে ও পদসঞ্চালন দ্রুততর গতিতে হইতে থাকে।

জনপদনৃত্যের মধ্যে মণিপুরী রাসলীলাতেই সর্বাধিক সাধনা ও শিক্ষার প্রয়োজন হয়; আঙ্গিকের দিক দিয়াও উন্নত বলিয়া রাসলীলাকে উচ্চাঙ্গ নৃত্যরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। মণিপুরের রাসলীলা ভক্তিরসে পরিপূর্ণ—গোপ ও গোপীগণের আবেষ্টনীতে শ্রীকৃষ্ণের জীবনকাহিনী বর্ণনা করাই এই নৃত্যের উদ্দেশ্য। রাজবাড়িতে রাসলীলার নাচ শিখানো হয়, ও দেশের জনসাধারণের রসের দিক দিয়া ইহার বিচার করিয়া ইহার প্রতি গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে। রাসলীলায় তরুণীরা ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলীতে গোপীরূপে নৃত্য করে ও রাধার ভূমিকায় বালককে নামানো হয়। তরুণীদের নৃত্য অপেক্ষাকৃত শান্ত ও সরল; তরুণ ও বয়স্কদের নৃত্য সবল ও ছন্দ-বৈচিত্র্যবহুল। নাচের তাল রক্ষা হয় মৃদঙ্গের জ্ঞাতি, খোল সংযোগে।

উচ্চাঙ্গ নৃত্যের মধ্যে প্রধান—উত্তর-ভারতের কথক, দক্ষিণ-ভারতের ভরত নাট্যম্ ও মালাবারের কথাকলি ও মোহিনী আট্যম্। পরিতাপের বিষয় এই সব কয়টি নৃত্যই ব্যবসাদার নটনটীর কবলগ্রস্ত হইয়া উচ্ছৃঙ্খল বিত্তশীলাদের ঘৃণ্য লালসাগ্নি উদ্দীপ্ত ও চরিতার্থ করিবার জন্য নিযুক্ত হইতেছে। যে দুষ্ট পরিবেষ্টনীর মধ্যে এইসব নৃত্যের চর্চা আজকাল দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে এই মহৎ কলার প্রাণবন্ত সৌন্দর্য ও পূর্ণাবয়ব আঙ্গিকের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব। মুসলিম সভ্যতার প্রভাবে উত্তর-ভারতের উচ্চাঙ্গ নৃত্য কঠিন ও জটিল তাল-লয়ের সৃষ্টি করে, সে-তাল প্রকাশ করিলে তবলার বোল পদধ্বনিতে শোনা যায়। শুধু তাই নয়, হাবভাব, নিতম্ব ও কটিসঞ্চালন, কটাক্ষভঙ্গি, স্কন্ধান্দোলন, এক কথায় সর্ব অঙ্গের চালনা ও ভাবপ্রকাশ শুদ্ধমাত্র দর্শকের হৃদয়ে পাশবিক আনন্দদানের জন্য ব্যবহৃত হয়। এইসব নৃত্যে বিকাশপ্রাপ্ত আঙ্গিকের সন্ধান মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, কিন্তু বেশির ভাগই হীন ও অশ্লীল।

দক্ষিণে প্রচলিত ভরত নাট্যম্ শুদ্ধ হিন্দুকলা। ভরত নাট্যে যেসব 'মুদ্রা' দ্বারা দেবদেবী, পশুপক্ষী ও বিভিন্ন অনুভূতির প্রকাশ করা হয় সেইগুলি এই নৃত্যের মুখ্য বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। উত্তরের কথক্ নৃত্যের তুলনায় ভরত নৃত্যে পদসঞ্চালনের কারুকার্য নাই এবং দেহের অন্যান্য অঙ্গসঞ্চালনও অপেক্ষাকৃত কর্তিত ও সংযত। মালাবারের মোহিনী আট্যম অনেকটা ভারত নাট্যের ন্যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই নৃত্য মরণোন্মুখ—সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। দক্ষিণের সব কয়টি উচ্চাঙ্গ নৃত্যই কেবলমাত্র

www.BanglaBook.org

স্ত্রীলোকেরাই নাচিয়া থাকে—অতি অল্প বয়সেই বালিকারা পুরুষ পেশাদারের কাছে শিক্ষা আরম্ভ করে ও বহুবৎসরব্যাপী কঠিন নিয়ম রীতিমত পালন করিয়া নৃত্যকলায় পারদর্শিনী হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সব নৃত্যে আজকাল কেবলমাত্র শুষ্ক আঙ্গিকের পরিচয় পাওয়া যায়, শুদ্ধ কলার চিহ্নমাত্র নাই। যে নৃত্য সৃষ্টি করে না, কেবলমাত্র পূর্বানুকরণ করিয়াই সন্তুষ্ট হয়, তাহার যে এই গতি হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি!

আজকাল কথাকলি অত্যন্ত লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে ও এ-সম্বন্ধে প্রচুর বাক্যবিন্যাস করা হইয়াছে বলিয়া এই সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বলার প্রয়োজন। এদেশের সর্বত্রই নর্তক-নর্তকী, গায়ক-গায়িকা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে রামায়ণ মহাভারতের উপাখ্যান অভিনয় করিয়া থাকে; বিভিন্ন প্রদেশে ইহারা বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়। মালাবারে ইহারা কথাকলি নামে পরিচিত—'কথা' অর্থ 'গল্প' ও 'কলি' অর্থ 'নাট্য'। কথাকলির অভিনেতারা অন্যান্য প্রদেশের নটনটীর ন্যায় বাক্য উচ্চারণ করে না; তাহারা মূক অভিনয় করে, তবলা ও মন্দিরা সহযোগে নাচে ও তাহাদের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া দুইজন গায়ক গল্পগুলি গান গাহিয়া শুনায়। মুক্ত আকাশের নীচে অভিনয় হয় ও সূর্যোদয় পর্যন্ত আনন্দোৎসব চলে। অভিনেতারা বৃহৎ চুনটদার জামাকাপড় পরে ও বিচিত্র প্রসাধনের দ্বারা একপ্রকার অভিনব মুখোশ নির্মাণ করে। কথাকলি নৃত্যের কটাক্ষ, মুখের মাংসপেশী নিয়ন্ত্রণ, নানাপ্রকার 'মুদ্রা'র ব্যবহার ও বিশেষত পদদ্বয়ের সম্প্রসারণ দ্বারা নৃত্যকে প্রাণদান প্রভৃতি আঙ্গিক অত্যন্ত দুরূহ ও বহুবৎসরব্যাপী কঠিন সাধনা ব্যতীত এই কলায় দক্ষতা লাভ অসম্ভব। নয় দশ বৎসর বয়স হইতে না হইতেই বালিকাকে নৃত্যে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিতে হয় ও পূর্ণ যৌবন লাভ না করা পর্যন্ত নর্তকীকে কঠোর সাধনার ভিতর দিয়া জীবনযাপন করিতে হয়।

কথাকলি নিছক নৃত্য নয়, নৃত্যনাট্যও নয়। বরঞ্চ মুখোশপরা তামাসা-নাচের সঙ্গেই ইহার সাদৃশ্য অধিক; নৃত্যকলা ইহাতে স্ফুরিত হয় না। নৃত্যের প্রারম্ভেই যবনিকান্তরালে দুই-একটি আবাহন নৃত্য করা হয় ও তারপর প্রত্যেক শ্লোক বা গান গাওয়া শেষ হইতেই অভিনেতারা চক্রাকারে 'কলসম' নৃত্য করে। তারপর স্ত্রী চরিত্রের 'সরি' নৃত্য ও রাজহংস বা ময়ূরের পক্ষীনৃত্য করা হয়।

কথাকলি নৃত্য শক্তি ও তেজঃপ্রধান, কিন্তু অন্যান্য উচ্চাঙ্গ নৃত্যে পদসঞ্চালনের যে কারুকার্য ও গতিছন্দের বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় ইহাতে তাহার অত্যন্ত অভাব। অভিনেত্রীদিগকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অঙ্গভঙ্গি শিক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও যে কেন তাহাদের নৃত্য এত রূঢ় ও অপক্করূপে প্রকাশ পায়, তাহা অনেক সময় বুঝিয়া উঠা যায় না। কথাকলি গতিবৈচিত্র্য বলিয়া পূর্বানুকরণ করিয়াই সন্তুষ্ট ও মাঝে মাঝে তাহার বস্তুতান্ত্রিকতা অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইয়া দাঁড়ায়। শুধু আঙ্গিকের দিক দিয়াই আজ কথাকলি আমাদের কৌতূহল ও দৃষ্টি আকর্ষণ করে; সুকুমার কলা হিসাবে এই নৃত্য ভারতবর্ষের অন্যান্য উচ্চাঙ্গ নৃত্যের ন্যায় আজ মৃত।

মাত্র কুড়ি বাইশ বৎসর হইল এদেশে নৃত্যকে বিষাক্ত পরিবেষ্টনী হইতে মুক্ত করিয়া আমাদের সামাজিক জীবনে স্থান দিবার চেষ্টা করা হইতেছে ও সঙ্গীত চিত্রাঙ্কনের ন্যায় নৃত্যও সুকুমার কলা হিসাবে গ্রহণ করিবার প্রয়াস দেখা যাইতেছে। তাই আজকাল সঙ্গীতের মজলিসে, স্কুল-কলেজের আমোদ অনুষ্ঠানে, পারিবারিক ও সামাজিক উৎসব-আনন্দে নৃত্যচর্চা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, কণ্ঠসংগীতের সঙ্গে মিলাইয়া কেবলমাত্র তালসংযুক্ত পদসঞ্চালন থাকিলেই তাহা পূর্বের ন্যায় এখনও নৃত্য নামে নন্দিত

www.BanglaBook.org

হয়। সেই নৃত্যকলা এখন 'ফ্যাশান' হইয়া দাঁড়াইয়াছে—কোনো রকম শিক্ষা-দীক্ষা না লইয়াই চ্যারিটি-রিলিফ ফান্ডের অজুহাতে যত্রতত্র নৃত্য করা ক্রমশ বাড়িয়াই চলিয়াছে। এখনও কি এই সরল তত্ত্বটি বুঝিবার সময় হয় নাই যে নৃত্য অর্থহীন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিক্ষেপের মূল্যহীন সমষ্টিমাত্র নহে? এখনও কি দেশবাসী বুঝিবে না যে, নৃত্য অন্যান্য সুকুমার কলার ন্যায় একনিষ্ঠ ও আজীবন সাধনাসাপেক্ষ কলা বিশেষ? অতি অল্পসংখ্যক নর্তকনর্তকীই এযাবৎ অর্থহীন অঙ্গসঞ্চালন ত্যাগ করিয়া প্রকৃত নৃত্যরসে মনঃসংযোগ করিয়াছেন। এবং ইঁহাদের ভিতরেই বা কয়জন সত্যাসত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন যে নৃত্যের ন্যায় উচ্চাঙ্গের সুকুমার কলায় পারদর্শী হইতে হইলে তাহার প্রতি কী অবিচল নিষ্ঠা ও কঠোর সাধনার প্রয়োজন হয়? বেশির ভাগই তো দেখিতে পাই দুই-একদিনের ছন্নছাড়া শিক্ষায় দুই একটি নৃত্যেই সন্তুষ্ট। তাহাতে তো শুধু লোক ভুলানো চলে—সে তো কলা নহে। তাই সামান্য যে কয়জন প্রকৃত নৃত্যকলা হিসাবে গ্রহণ করিয়া সাধনা করিতেছেন তাঁহারা সত্যই প্রশংসনীয়। সমাজের বাধাবন্ধ উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা সাহসের ভরে লোকচক্ষুর সম্মুখে নৃত্যকলা দেখাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহারাও সেই প্রাচীন ঐতিহ্যগত নৃত্য দেখাইয়াই সন্তুষ্ট। তাঁহাদের নৃত্যে ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ নাই। পেশাদার নর্তকেরা যে দৈন্য বহু সাধনালব্ধ আঙ্গিকের দ্বারা লুকাইয়া রাখিতে সমর্থ হয়, তাঁহাদের নৃত্যে তাহা বার বার ধরা পড়ে। ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা যে কাহারও নাই এমন নহে, কিন্তু আছে অতি অল্পসংখ্যক গুণীর ভিতরে। তাঁহারা যে শুধু গভীর সাধনার দ্বারা নৃত্য আয়ত্ত করিয়াছেন এমন নহে, তাঁহারা যে শুধু প্রাচীন ঐতিহ্যগত নৃত্য সর্বাঙ্গসুন্দররূপে প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও নহে, তাঁহাদের বিশেষত্ব এই যে, বর্তমান যুগের রুচি অনুযায়ী তাঁহার নৃত্যের প্রাচীন বিষয়বস্তুকে নূতন রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত গুণীর চরম লক্ষ্য তো ইহাও হইতে পারে না; তিনি সৃষ্টিকর্তা, তাঁহাকে নব নব বিষয়ের কল্পনা করিতে হইবে, নব নব রূপে সেগুলিকে প্রকাশ করিতে হইবে—জরাজীর্ণ বৃদ্ধাকে নবীনবেশে সজ্জিত করিয়া তিনি কেন বিড়ম্বিত হইবেন? জীবনীশক্তির যে দ্রুত, অবিশ্রান্ত স্পন্দন আমরা আমাদের ধমনীতে ধমনীতে প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি। অতি সনাতন ভাবনা-কামনা একদিন যে রূপ, যে বর্ণ নিয়া প্রকাশিত হইত তাহার সঙ্গে আমাদের অদ্যকার সুখ-দুঃখ, জীবন-মরণ সংগ্রাম, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বের কোথায় যোগসূত্র? সুকুমার কলা কি কখনো মৃতদগ্ধ চিন্তা অনুভূতির অন্ধকূপে প্রাণধারণ করিতে পারে? নৃত্য তো শুধু তাললয়যোগে অঙ্গসঞ্চালন নয়, নৃত্য তো সুচারু পদক্ষেপের নামান্তর নয়; আঙ্গিকের উৎকর্ষ নৃত্য, অঙ্গবিন্যাস দ্বারা সুদর্শন আলিম্পন সৃষ্টি করাও নৃত্য নয়। প্রকৃত নৃত্যের চরম আদর্শ আমাদের জীবনের দ্বন্দ্বানুভূতি প্রকাশ করা, সত্য ও সুন্দরকে উন্মোচন করিয়া আমাদের চক্ষুর গোচর করা। জিজ্ঞাসা করি রাধা-কৃষ্ণ, শিব-পার্বতী নৃত্য কি যথেষ্ট নাচা হয় নাই, প্রচুর দেখা হয় নাই? এখনও কি ধর্মের আচ্ছাদনে আবৃত কুসংস্কারের নাগপাশ ছিন্ন করিবার সময় হয় নাই? এ যুগের মানুষের কি নিজস্ব কোনোও অনুভূতি, কোনো দ্বন্দ্ব, কোনো আশা, কোনো আদর্শ নাই? তাহাদের কি কিছুই বক্তব্য নাই—মানবসংসারে চিরন্তন দীপান্বিতা প্রজ্জ্বলিত করিবার কোন প্রদীপ নাই? বাহির হইয়া আসুক এ দেশের তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী, মোহমুক্ত হইয়া প্রকাশ করুক তাহাদের আশা-অনুভূতি আপন সবল কণ্ঠে, শুধু কর্মে নয়,—সাহিত্যে, চিত্রে, ভাস্কর্যে, সঙ্গীতে ও নৃত্যে।।— (শ্রীমতী ঠাকুরের গুজরাতি লিখন হইতে অনূদিত)।

www.BanglaBook.org

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—নির্বাসিতের আত্মকথা

কোনো কোনো বই পড়ে লেখকেরা আপন আপন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বড় নিরাশ হন। যাদের সত্যকার শক্তি আছে, তাদের কথা হচ্ছে না, আমি ভাবছি আমার আর আমার মত আর পাঁচজন কমজোর লেখকের কথা।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পর পুনরায় 'নির্বাসিতের আত্মকথা' পুস্তিকাখানি আদ্যন্ত পড়লুম। পাঠকমাত্রই জানেন, ছেলেবেলার পড়া বই পরিণত বয়সে পড়ে মানুষ সাধারণত হতাশ হয়। 'নির্বাসিতের' বেলা আমার হল বিপরীত অনুভূতি, বুঝতে পারলুম, কত সূক্ষ্ম অনুভূতি, কত মধুর বাক্যভঙ্গি, কত উজ্জ্বল রসবাক্য, কত করুণ ঘটনার ব্যঞ্জনা তখন চোখে পড়ে। সাধুভাষার মাধ্যমে যে এত ঝকঝকে বর্ণনা করা যায়, সে ভাষাকে যে এতখানি চটুল গতি দিতে পারা যায়, 'নির্বাসিত' যাঁরা পড়েন নি, তাঁরা কল্পনামাত্র করতে পারবেন না।

কিন্তু প্রশ্ন, এই বই পড়ে আপন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হলুম কেন?

হায়, এ রকম একখানা মণির খনির মত বইয়ের চারিটি সংস্করণ হল ত্রিশ বৎসরে! তাহলে আর আমাদের ভরসা রইল কোথায়?

* * *

১৯২১ (দু-চার বছর এদিক-ওদিক হতে পারে) ইংরেজিতে একদিন শান্তিনিকেতনে লাইব্রেরিতে দেখি একগাদা বই গুরুদেবের কাছ থেকে লাইব্রেরিতে ভর্তি হতে এসেছে। গুরুদেব প্রতি মেলে বহু ভাষায় বিস্তর পুস্তক পেতেন। তাঁর পড়া হয়ে গেলে তার অধিকাংশ বিশ্বভারতীর পুস্তাকাগারে স্থান পেত। সেই গাদার ভিতর দেখি, 'নির্বাসিতের আত্মকথা'।

বয়স অল্প ছিল, তাই উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম জানা ছিল না। বইখানা ঘরে নিয়ে এসে এক নিঃশ্বাসে শেষ করলুম। কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলছি নে, এ বই সত্যসত্যই আহার-নিদ্রা ভোলাতে পারে। 'পৃথিবীর সব ভাষাতেই এরকম বই বিরল; বাঙলাতে তো বটেই।'

পরদিন সকালবেলা গুরুদেবের ক্লাসে গিয়েছি। বই খোলার পূর্বে তিনি শুধালেন 'উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ''নির্বাসিতের আত্মকথা'' কেউ পড়েছ?' বইখানা প্রকাশিত হওয়ামাত্র রবীন্দ্রনাথের কাছে এসেছে; তিনি সেখানা পড়ে লাইব্রেরিতে পাঠান, সেখান থেকে আমি সেটাকে কব্জা করে এনেছি, অন্যেরা পড়বার সুযোগ পাবেন কি করে? বয়স তখন অল্প, ভারি গর্ব অনুভব করলুম।

বললুম, 'পড়েছি।'

শুধালেন, 'কি রকম লাগল?'

আমি বললুম, 'খুব ভালো বই।'

রবীন্দ্রনাথ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আশ্চর্য বই হয়েছে! এ রকম বই বাঙলাতে কম পড়েছি।'

বহু বৎসর হয়ে গিয়েছে বলে আজ আর হুবহু মনে নেই রবীন্দ্রনাথ ঠিক কি প্রকারে তাঁর প্রশংসা ব্যক্ত করেছিলেন। আমার খাতাতে টোকা ছিল এবং সে খাতা কাবুল-বিদ্রোহের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সময় লোপ পায়। তবে একথা আমার পরিষ্কার মনে আছে যে, রবীন্দ্রনাথ বইখানার অতি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন।

বিখ্যাত লেখককে দেখার সাধ সকলেরই হয়। আমি যে সে কারণে উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম তা নয়। আমার ইচ্ছা ছিল দেখবার যে বারো বৎসর নরক-যন্ত্রণার পর তিনি যে তাঁর নিদারুণ অভিজ্ঞতাটাকে হাসি-ঠাট্টার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করলেন তার কতখানি সত্যই তাঁর চরিত্রবলের দরুন এই বিশেষ রূপ নিল আর কতখানি নিছক সাহিত্যশৈলী মাত্র। অর্থাৎ তিনি কি সত্যই এখনো সুরসিক ব্যক্তি, না অদৃষ্টের নিপীড়নে তিক্তস্বভাব হয়ে গিয়েছেন।

গিয়ে দেখি পিতা-পুত্র বসে আছেন।

বেশ নাদুস-নুদুস চেহারা (পরবর্তী যুগে তিনি রোগা হয়ে গিয়েছিলেন), হাসিভরা মুখ আর আমার মত একটা আড়াই ফোঁটা ছোকরাকে যে আদর করে কাছে বসালেন, তার থেকে তৎক্ষণাৎ বুঝে গেলুম যে, তাঁর ভিতরে মানুষকে কাছে টেনে আনবার কোন আকর্ষণী ক্ষমতা ছিল, যার জন্যে বাঙলা দেশের তরুণ সম্প্রদায় তাঁর চতুর্দিকে জড় হয়েছিল।

ছেলেটিকেও বড় ভালো লাগলো। বড্ড লাজুক আর যে সামান্য দু'একটি কথা বলল, তার থেকে বুঝলুম, বাপকে সে শুধু যে ভক্তি-শ্রদ্ধাই করে তা নয়, গভীরভাবে ভালোও বাসে।

অটোগ্রাফ-শিকারের ব্যসন তখন বাঙলা দেশে চালু হয় নি। তবে সামান্য যে দু'একজন তখনকার দিনে এ ব্যসনে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা শুধু স্বাক্ষরেই সন্তুষ্ট হতেন না, তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কুটেশন বা আপন বক্তব্য লিখিয়ে নিতেন। আমার অটোগ্রাফে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ, প্রফুল্ল রায়, লেভি, অ্যান্ড্রুজ ইত্যাদির লেখা তো ছিলই, তার উপর গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিতকুমার, কারপেলেজের ছবিও ছিল।

উপেনবাবুকে বইখানা এগিয়ে দিলুম।

এর পিছনে আবার একটুখানি ইতিহাস আছে।

বাজে-শিবপুরে শরৎচন্দ্রকে যখন তাঁর স্বাক্ষর এবং কিছু একটা লেখার জন্য চেপে ধরেছিলুম, তখন তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন বিশেষ করে তাঁর কাছেই এলুম কেন? আমি আশ্চর্য হয়ে বলেছিলুম, 'আপনার লেখা পড়ে আপনার কাছে না আসাটাই তো আশ্চর্য!'

শরৎবাবু একটুখানি ভেবে লিখে দিলেন, 'দেশের কাজই যেন আমার সকল কাজের বড় হয়।'

আমি জানি শরৎচন্দ্র কেন ঐ কথাটি লিখেছিলেন। তখন তিনি কংগ্রেস নিয়ে মেতেছিলেন।

তারপর সেই বই যখন রবীন্দ্রনাথকে দিলুম, তখন তিনি শরৎচন্দ্রের বচন পড়ে লিখে দিলেন,—

'আমার দেশ যেন উপলব্ধি করে যে, সকল দেশের সঙ্গে সত্য সম্বন্ধ দ্বারাই তার সার্থকতা।'

এর ইতিহাস বাঙালিকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না। জাতীয়তাবাদ ও বিশ্বমৈত্রী নিয়ে তখন রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের তর্ক আলোচনা হচ্ছিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উপেনবাবুকে অটোগ্রাফ দিতে তিনি দুটি লেখা পড়ে লিখে দিলেন,—

'সবার উপর মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।'

* * *

ছেলেবেলায় বইখানা পড়েছিলুম এক নিশ্বাসে কিন্তু আবার যখন সেদিন বইখানা কিনে এনে পড়তে গেলুম তখন বহুবার বইখানা বন্ধ করে চুপ করে বসে থাকতে হল। বয়স হয়েছে, এখন অল্পতেই চোখে জল আসে আর এ বই-য়েতে বেদনার কাহিনী 'অল্পে'র উপর দিয়ে শেষ হয় নি। সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব বোধ হয় বইখানির সেখানেই। উপেন্দ্রনাথ যদি দস্তয়েফ্স্কির মতো পুঙ্খানুপুঙ্খ করে তাঁর কারাবাস আর আন্দামান-জীবন (জীবন না বলে 'মৃত্যু' বলাই ঠিক) বর্ণনা করতেন তবে আমাদের মনে কোন্ জাতীয় অনুভূতির সৃষ্টি হত বলা সুকঠিন কিন্তু এই যে তিনি নির্বাসিতদের নিদারুণ দুঃখ-দুর্দৈবের বহুতর কাহিনী প্রতিবারেই সংক্ষিপ্ততম বর্ণনায় শেষ করে দিয়েছেন এতে করেই আমাদের হৃদয়কে মথিত করেছে কত বেশি। সেটা হল প্রকৃত শক্তিশালী লেখকের লক্ষণ। যেটুকুর ব্যঞ্জনার পাখা প্রয়োজন উপেন্দ্রনাথ সেইটুকু মাত্র দিয়েই আমাদের উড়িয়ে দিলেন। উপেন্দ্রনাথ স্বয়ং যে উদ্ধৃতি আপন পুস্তকে ব্যবহার করেছেন আমি সেইটে দিয়ে তাঁর এ অলৌকিক ক্ষমতার প্রশস্তি গাই;

"ধন্য ধন্য পিতা দশমেস গুরু
যিন চিড়িয়াঁসে বাজ তোড়ায়ে"

"ধন্য ধন্য পিতঃ, হে দশম গুরু! চটক দিয়া তুমি বাজ শিকার করাইয়াছিলে; তুমি ধন্য।"[১]

উপেন্দ্রনাথ দস্তয়েফ্স্কির মতো শক্তিশালী লেখক নন; দস্তয়েফ্স্কির মতো বহুমুখী প্রতিভা তাঁর ছিল না কিন্তু এ-কথা বার বার বলব দস্তয়েফ্স্কির সাইবেরিয়া কারাবাস উপেন্দ্রনাথের আত্মকথার কাছে অতি নিশ্চয় হার মানে।

সবচেয়ে মামুলী জিনিস নিয়েই উপেন্দ্রনাথের শক্তির পরিচয় দিই। ভাষার দখল অনেক লোকেরই আছে কিন্তু একই ভাষার ভিতর এত রকমের ভাষা লিখতে পারে কজন? এক শ সত্তর পাতার বইয়ে ফলাও করে বর্ণনা দেবার স্থান নেই অথচ তার মাঝখানেই দেখুন, সামান্য কয়টি ছত্রে কী অপরূপ গুরুগম্ভীর বর্ণনা;—

"গানটা শুনিতে শুনিতে মানস-চক্ষে বেশ স্পষ্টই দেখিতাম যে, হিমাচলব্যাপী ভাবোন্মত্ত জনসঙ্ঘ বরাভয়করার স্পর্শে সিংহগর্জনে জাগিয়া উঠিয়াছে; মায়ের রক্তচরণ বেড়িয়া বেড়িয়া গগনস্পর্শী রক্তশীর্ষ উত্তাল তরঙ্গ ছুটিয়াছে; দ্যুলোক ভূলোক সমস্তই উন্মত্ত রণবাদ্যে কাঁপিয়া উঠিয়াছে। মনে হইত যেন আমরা সর্ববন্ধনমুক্ত—দীনতা, ভয়, মৃত্যু আমাদের কখনও স্পর্শ করিতে পারিবে না।"[২]

পড়ে মনে হয় যেন বিবেকানন্দের কালীরূপ বর্ণনা শুনছি;—

"নিঃশেষে নিবেছে তারাদল
মেঘ আসি আবরিছে মেঘ

---

১ নির্বাসিতের আত্মকথা, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ৯৬০

২ আত্মকথা, পৃঃ ৬৬।

www.BanglaBook.org

স্পন্দিত ধ্বনিত অন্ধকার
গরজিছে ঘূর্ণ বায়ুবেগ
লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত পরান
বহির্গত বন্দীশালা হতে
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি
ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে"[৩]

উপরের গম্ভীর গদ্য পড়ার পর যখন দেখি অত্যন্ত দিশী ভাষায়ও তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন ঠিক তেমনি জোর দিয়ে তখন আর বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। শুধু যে সংস্কৃত শব্দের ওজস্ এবং প্রসার সম্বন্ধে তিনি সচেতন তাই নয়, কলকাতা অঞ্চলের পুরো-পাক্কাতে তো কড়া ভাষাতেও তাঁর তেমনি কায়েমি দখল।

'বারীন বলিল—"এতদিন স্যাঙ্গাতেরা পট্টি মেরে আসছিলেন যে তাঁরা সবাই প্রস্তুত; শুধু বাঙলাদেশের খাতিরে তাঁরা বসে আছেন। গিয়ে দেখি না; সব টুঁটু। কোথাও কিছু নেই; শুধু কর্তারা চেয়ারে বসে বসে মোড়লি কচ্ছেন। খুব কষে ব্যাটাদের শুনিয়ে দিয়ে এসেছি"।[৪]

এ-ভাষা হুতোমের ভাষা; এর ব্যবহার অতি অল্প লেখকেই করেছেন।

এককালে পশ্চিম-বাঙলার লোকও আরবী-ফার্সী শব্দে প্রসাদগুণ জানতেন ও কায়দামাফিক সেগুলো ব্যবহার করে ভাষার জৌলুস বাড়াতে কসুর করতেন না। ক্রমে ক্রমে এ ঐতিহ্য পশ্চিমবঙ্গে লোপ পায় অথচ পূর্ববাঙলার লেখকদের মেকদারবোধ কম ছিল বলে তাঁরা এ বাবদে অনেক জায়গায় লাভের বদলে লোকসানই করেছেন বেশি। উপেন্দ্রনাথ তাগমাফিক আরবী-ফার্সীও 'এস্তেমাল' করতে জানতেন।

"কোনরূপে হিন্দুকে মুসলমান ভাণ্ডারীর খানা খাওয়াইয়া তাহার গোঁফ ছাঁটিয়া দিয়া একবার কলমা পড়াইয়া লইতে পারিলে বেহস্তে যে খোদাতাল্লা তাহাদের জন্য বিশেষ আরামের ব্যবস্থা করিবেন, এ বিশ্বাস প্রায় সকল মোল্লারই আছে।[৫]

কিন্তু উপেন্দ্রনাথ ছিলেন একদম ন-সিকে বাঙালি। তাই,

"আমরা হিন্দু-মুসলমান সকলকার হাত হইতে নির্বিচারে রুটি খাই দেখিয়া মুসলমানেরা প্রথম প্রথম আমাদের পরকালের সদ্গতির আশায় উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিল, হিন্দুরা কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল; শেষে বেগতিক দেখিয়া উভয় দলই স্থির করিল যে, আমরা হিন্দুও নই, মুসলমানও নই—আমরা বাঙালি।"[৬]

বাঙালির এরকম নেতিবাচক রমণীয় সংজ্ঞা আমি আর কোথাও শুনি নি। কিন্তু, এসব তাবৎ বস্তু বাহ্য।

না সংস্কৃত, না আরবী-ফারসি, না কলকত্তাই সব কিছু ছাড়িয়ে তিনি যে খাঁটি মেটে বাঙলা লিখতে পারতেন তার কাছে দাঁড়াতে পারেন আজকের দিনের ক'জন লেখক?

"শচীনের পিতা একদিন তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। জেলে কিরকম খাদ্য খাইতে হয় জিজ্ঞেস করায় শচীন লপসীর নাম করিল। আছে লপসীর স্বরূপ প্রকাশ পাইয়া পিতার মনে কষ্ট হয় সেই ভয়ে শচীন লপসীর গুণগ্রাম বর্ণনা করিতে করিতে বলিল,

---

৩ সত্যেন দত্তের অনুবাদ। ৪ আত্মকথা, পৃঃ ৩৩।
৫ পৃঃ ১১৯। ৬ পৃঃ ১২১।

www.BanglaBook.org

'লপসী খুব পুষ্টিকর জিনিস।' পিতার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। তিনি জেলার বাবুর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—'বাড়িতে ছেলে আমার পোলাও-এর বাটি টান মেরে ফেলে দিত; আর আজ লপসী তার কাছে পুষ্টিকর জিনিস।' ছেলের এ অবস্থা দেখিয়া বাপের মনে যে কি হয় তাহা কখনও ভাল করিয়া বুঝি নাই, তবে তাহার ক্ষীণ আভাস যে একেবারে পাই নাই তাহাও নয়। একদিন আমার আত্মীয়স্বজনেরা আমার ছেলেকে আমরা সহিত দেখা করাইতে লইয়া আসিয়াছিলেন। ছেলের বয়স তখন দেড় বৎসর মাত্র; কথা কহিতে পারে না। হয়তো এ জন্মে তাহার সহিত আর দেখা হইবে না ভাবিয়া তাহাকে কোলে লইবার বড় সাধ হইয়াছিল। কিন্তু মাঝের লোহার রেলিংগুলো আমরা সে সাধ মিটাইতে দেয় নাই। কারাগারের প্রকৃত মূর্তি সেইদিন আমার চোখে ফুটিয়াছিল।[৭]

* * *

স্থাপত্যের বেলা ব্যাপারটা চট করে বোঝা যায়, কিন্তু সাহিত্যে অতটা সোজা নয়। তাজমহলকে পাঁচগুণ বড় করে দিলে তার লালিত্য সম্পূর্ণ লোপ পেত, যদিও ঐ বিরাট বস্তু তখন আমাদের মনকে বিস্ময়বিমূঢ় করে দিত, আর আমরা স্তম্ভিত হয়ে বলতুম, 'এ কী এলাহী ব্যাপার!' ফলে শাহ্‌জাহান যে প্রিয়ার বিরহে কাতর হয়ে ইমারতখানা তৈরি করেছিলেন, সেকথা বেবাক ভুলে যেতুম।

আর তাজমহলকে ছোট করে দিলে কি হয়, তা তো নিত্যি নিত্যি স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। শ্বেতপাথরের ক্ষুদে তাজমহল মেলা লোক ড্রইংরুমে সাজিয়ে রাখেন। পাঁচজন তার দিকে ভালো করে না তাকিয়েই গৃহস্বামীকে জিজ্ঞেস করেন তিনি আগ্রায় গিয়েছিলেন কবে? ভদ্রলোকের আগ্রা গমন সফল হল—ক্ষুদে তাজ যে কোণে সেই কোণেই পড়ে রইল।

সাহিত্যের বেলাও অনেক সময় প্রশ্ন জাগে, 'এ উপন্যাসখানা যেন বড্ড ফেনিয়ে লেখা হয়েছে কিংবা অন্য আরেকখানা এতটা ঊর্ধ্বশ্বাসে না লিখে আরো ধীরে-মন্থরে লিখলে ঠিক আয়তনে গিয়ে দাঁড়াত।' 'যোগাযোগ' পড়ে মনে হয় না, এই বইখানাকে বড় কিংবা ছোট করা যেত না, 'গোরা'র বেলা মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগে, হয়তো এ অনবদ্য পুস্তকখানা আরো ছোট করলে তার মূল্য বাড়ত।

আমার মনে হয় 'আত্মকথা' সংক্ষেপে লেখা বলে সেটি আমাদের মনে যে গভীর ছাপ রেখে গিয়েছে, দীর্ঘতর হলে হয়তো সেরকম অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারত না। আবার মাঝে মাঝে মনে হয়, এ বইখানা লিরিক না করে এপিক করলেই ভালো হত। এ বই যদি 'ওয়র অ্যান্ড পীসের' মত বিরাট ক্যানভাস নিয়ে চিত্রিত করা হত তবে বুঝি তার উপযোগী মূল্য দেওয়া হত। কিন্তু এ বিষয়ে কারো মনে দ্বিধা উপস্থিত হবে না যে, লিরিক হিসাবে এ বই এর চেয়ে কি বড়, কি ছোট কিছুই করা যেত না।

বই আরম্ভ করতেই চোখে পড়ে প্রথম বিপ্লবী যুগের এই তরুণদের হৃদয় কি অদ্ভুত সাহস আর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কী অবিশ্বাস্য তাচ্ছিল্যে ভর্তি ছিল। পরবর্তী যুগে ইংরেজের জেলখানার স্বরূপ আমরা চিনেছিলুম এবং শেষের দিকে জেল-ভীতি সাধারণের মন থেকে তো এক রকম প্রায় উঠেই গিয়েছিল, কিন্তু যে যুগে এঁরা হাসিমুখে কারাবরণ করেছিলেন,

---

৭ পৃঃ ৬৯, ৭০।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে যুগের যুবকদের মেরুদণ্ড কতখানি দৃঢ় ছিল, আজ তো আমরা তার কল্পনাই করতে পারিনে। উল্লাস, কানাই মৃত্যুদণ্ডের আদেশ শুনে হেসেছিল—যেন কাঁধ থেকে বেঁচে থাকার একটা মস্ত বোঝা নেমে গেল। আজ যখন বাঙলাদেশের দিকে তাকাই, তখন বারংবার শিরে করাঘাত করে বলতে ইচ্ছে করে, 'হে ভগবান, সে যুগে তুমি অকৃপণ হস্তে বাঙলা দেশকে এত দিয়েছিলে বলেই কি আজ তোমার ভাণ্ডার সম্পূর্ণ রিক্ত হয়ে গিয়েছে?'

অথচ রুদ্র মহাকাল এই তরুণদের হৃদয়ে এবং জীবনে যে তাণ্ডব নৃত্য করে গেলেন, যার প্রতি পদক্ষেপে বঙ্গদেশের লক্ষ লক্ষ কুটির আন্দোলিত হল, বাঙালি হিন্দুর ইষ্টদেবী কালী করালী যখন বারংবার হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'মৈঁ ভূখা হুঁ' তখন যে এই বঙ্গসন্তানগণ প্রতিবারে গম্ভীরতর হুঙ্কার দিয়ে বলল,—

"কালী তুই করালরূপিণী/আয় মাগো আয় মোর কাছে,"

যূপকাষ্ঠে স্বেচ্ছায় স্কন্ধ দিয়ে বলল, 'হানো, তোমার খড়্গ হানো,' তখনকার সেই বিচিত্র ছবি উপেন্দ্রনাথ কী দম্ভহীন অনাড়ম্বর অনাসক্তিতে চিত্রিত করে গেলেন।

দক্ষিণ ভারতের মথুরা, মাদুরায় এক তামিল ব্রাহ্মণের বাড়িতে কয়েক মাস বাস করার সৌভাগ্য আমার একবার হয়েছিল। গৃহকর্ত্রী প্রতি প্রত্যূষে প্রহরাধিককাল পূর্বমুখী হয়ে রুদ্র-বীণা বাজাতেন। একদিন জিজ্ঞাসা করলুম, 'আজ আপনি কি বাজালেন বলুন তো। আমার মনের সব দুশ্চিন্তা যেন লোপ পেল।' বললেন, 'এর নাম "শঙ্করবরণম্"—সন্ন্যাসী রাগও একে বলা হয় কারণ এ রাগে আদি, বীর, করুণ কোনো প্রকারের রস নেই বলে একে শান্তরসও বলা হয়। কিন্তু শান্ত অবস্থাকে তো রসাবস্থা বলা চলে না, তাই এর নাম সন্ন্যাস রাগ।'

উপেন্দ্রনাথের মূল রাগ সন্ন্যাস রাগ।

অথচ এই পুস্তিকা হাস্যরসে সমুজ্জ্বল।

তাহলে তো পরস্পরবিরোধী কথা বলা হল। কিন্তু তা নয়। উপেন্দ্রনাথ তাঁর সহকর্মীদের জীবন তথা বাঙলাদেশের পতনঅভ্যুদয়বন্ধুরপন্থা নিরীক্ষণ করছেন অনাত্মীয় বৈরাগ্যে—তাই তার মূল রাগ সন্ন্যাস—এবং তার প্রকাশ দিয়েছেন হাস্যরসের মাধ্যমে, দুঃখ-দুর্দৈবকে নিদারুণ তাচ্ছিল্যের ব্যঙ্গ দিয়ে এ বড় কঠিন কর্ম—কঠোর সাধনা এবং বিধিদত্ত সাহিত্যরস একাধারে না থাকলে এ ভানুমতী অসম্ভব।

আমার প্রিয় চরিত্র জন কুইক্‌সট্। উপেন্দ্রনাথ বিপরীত ডন।

ডন এবং উপেন্দ্রনাথের সাহস অসীম; দুইজনেই পরের বিপদে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে শাণিত তরবারি নিয়ে আক্রমণ করেন, অন্যায় অত্যাচারের সামনে দুজনই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লোহিতরঙে রঞ্জিত দেখেন।

পার্থক্য শুধু এইটুকু, উইন্ডমিলকে ডন মনে করেন দৈত্য, দাসীকে মনে করেন রাজনন্দিনী, ভেড়ার পালকে মনে করেন জাদুকরের মন্ত্রমোহিত পরীর দল।

আর উপেন্দ্রনাথ দেখেন বিপরীত। কারাগারকে ভাবেন রঙ্গালয়, কারারক্ষককে মনে করেন সার্কাসের সং, পুলিশ বাহিনীকে মনে করেন ভেড়ার পাল।

এই নব ডন কুইক্‌সট্‌কে বার বার নমস্কার॥

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জয়হে ভারতভাগ্যবিধাতা

ম্যাট্রিক পাশের লিস্টে নাম দেখে যেমন 'ইয়া আল্লা' বলে ছেলে-ছোকরারা লম্ফ দিয়ে ওঠে আমাদের অখণ্ড স্বরাজলাভের আনন্দোল্লাস তার সঙ্গে তুলনীয়। এমন কি, ম্যাট্রিকেও যদি পাঠকের মন সন্তুষ্ট না হয় তাহলে বি.এ. এম.এ. পি.এইচ. ডি. ডি. লিট যা খুশি বলতে পারেন তাতেও কোনো আপত্তি নেই। শুধু তাই নয়—এ স্বাধীনতা পাশের আনন্দ অন্য সব পাশের চেয়ে অনেক, অনেক বেশি। কারণ অন্য যে-কোনো পরীক্ষায় দু-একজনের ইয়ার-বক্সী ফেল মারেনই মারেন—নিতান্ত পরশ্রীকাতর এবং বিঘ্ন-সন্তোষী ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কারোরই কোনো পরীক্ষা পাশ নিরঙ্কুশ আনন্দদায়ক হয় না—এ-পরীক্ষায় কিন্তু সবাই পাশ, সবাই রাজা। চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী আজ স্বাধীন হলেন, আপনিও হলেন, আমিও হলুম।

কিন্তু প্রশ্ন অতঃ কিম? অবশ্য বলতে পারেন পরীক্ষা পাশ করে জ্ঞানার্জন হল এবং জ্ঞানার্জন স্বয়ংসম্পূর্ণ, আপন মহিমায় স্বপ্রতিষ্ঠিত। এর পর কিছু না করলেও কোনো আপত্তি নেই। এটা একটা উত্তর বটে কিন্তু কোনো জিনিস একদম কোনো কাজে লাগল না এ-কথাটা ভেবে কেমন যেন সুখ পাওয়া যায় না। প্রবাদ আছে, 'ইট ইজ বেটার টু ব্রেক দি হার্ট ইন লাভ দেন ডু নাথিং উইথ ইট'—স্বাধীনতাটা কোনো কাজে লাগাব না একথা ভেবে মন কেমন যেন সুখ পায় না; বাসনা হয়, দেখাই যাক না, রাজনৈতিক স্বরাজের মই চড়ে আরো পাঁচ রকমের স্বরাজ হস্তগত হয় কি না। এ লোভ সকলেরই থাকবে সে-কথা হলপ করে বলা যায় না, কিন্তু অন্ততপক্ষে এ তত্ত্বটা স্বীকার করে নিতে হবে যে, পাশের পর লেখা-পড়া বন্ধ করে দিলে জ্ঞান যে রকম কর্পূরের মতো বিনা কারণেই উবে যেতে থাকে, স্বাধীনতাটাকেও তেমনি চালু না রাখলে ক্রমে ক্রমে সেও তার রূপ বদলাতে থাকে। স্বাধীনতা লাভের পরমুহূর্তেই যদি বেধড়ক ধর-পাকড় আরম্ভ করে দেন, মনে মনে ভাবেন পাঁচটা লোকের স্বাধীনতা কেড়ে নিলেই পাঁচশ লোকের স্বাধীনতার বাঁচা তো হয়ে যাবে কিংবা যদি ব্যক্তি-স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে কালোবাজারীদের ল্যাম্পপোস্টে না ঝোলান তবে শেষ পর্যন্ত আমাদের স্বরাজ লাভটা ঠিক কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে আগেভাগে হলফ করে কিছু বলা যায় না।

হিটলারের পূর্বেও জর্মনি স্বাধীন ছিল কিন্তু জর্মনিকে সর্বাঙ্গসুন্দর স্বাধীনতা দিলেন হিটলার। লেনিনের পূর্বে রাশার জনসাধারণ স্বাধীনতার স্বাদ পায় নি, লেনিন এক ধাক্কায় গোটা দেশটাকে অনেকখানি এগিয়ে দিলেন। এখন আবার স্তালিন দেশটাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে এসেছেন যে এর পর কি হয় না হয় বলা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। শেষ পর্যন্ত তিনিও হিটলারের গতি লাভ করবেন নাকি?

কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে, আমাদের চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবার কোনো উপায় নেই—কিছু একটা করতেই হবে। স্বাধীনতার ঘোড়া চড়ি আর নাই চড়ি সেটাকে অন্তত বাঁচিয়ে রাখার জন্য দানা-পানির খর্চা হবেই হবে।

আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের অনেকখানি বিলিতি ছিল বলে আমাদের স্বরাজলাভও অনেকখানি বিলিতি কায়দায় হয়েছে। এখনও আমাদের লাটবেলাটরা বিলিতি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কায়দায় লঞ্চ-ডিনার খাওয়ান, পেরট দেখেন, সেলুট নেন, এডিসি ফেডিসি কত ঝামেলা, কত বখেড়া। তাই স্বাধীনতা নিয়ে কি করব কথাটা উঠলেই গুণীরা বলেন, 'ইয়োরোপ কি বলছে, কান পেতে শোনো তো; তারপর বিবেচনা করে ভালো-মন্দ যা হয় একটা কিছু করব।'

ইয়োরোপ কি বলছে সে বিষয়ে কারো মনে কোনো ধোঁকা নেই। ইয়োরোপ বলছে, 'হয় মার্কিন ইংরেজের ডিমোক্রেসি গ্রহণ করে তাদের দলে যোগ দাও, নয় লালরক্ত মেখে রুশের সঙ্গে এক হয়ে যাও। এ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।'

ক্ষীণকণ্ঠে কেউ কেউ বলেন, 'কেন? টিটো?'

উত্তরে শুনি অট্টহাস্য। টিটো ইংরেজ বন্দুক-কামান কেনা-বেচার সমঝওতাও নাকি হয়ে গিয়েছে কিংবা হব-হব করছে। টিটো মিয়ার 'তৃতীয় পন্থা' তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার মতো তিন দিনও টিকল না। তাঁকেও আস্তে আস্তে মার্কিন-ইংরেজের আস্তিন পাকড়ে এগোতে হচ্ছে।

এর পর আর কোন্ সাহসে ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ডের কথা তুলি?

এবং তার চেয়েও মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে ইয়োরোপীয় সাহিত্যিক, চিত্রকর, কবি, দার্শনিকদের নিরঙ্কুশ নৈরাশ্যবাদ। ইংরেজি, ফরাসি, জর্মন, ইতালি যে কোনো মাসিক খুললেই দেখতে পাবেন ইয়োরোপের চিন্তাশীল ব্যক্তিই মাথায় হাত দিয়ে বলেছেন, 'কোনো পন্থাই তো দেখতে পাচ্ছি নে—মার্কিনের দেখানো পথ মনঃপূত হয় না, রুশের পথই বা ধরি কি প্রকারে? মার্কিন ইংরেজের "ডিমোক্রেসি" এমনিতেই শোষণ-পন্থী, তার উপর আমরা যদি তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কম্যুনিজমকে নির্মূল করে দি তাহলে এখনো তারা রুশ জুজুর ভয়ে যেটুকু সমঝে চলত, চাষামজুরকে দুমুঠো অন্ন দিত তাও আর দেবে না। আর রুশের কলমা পড়ে যদি মার্কিন-ইংরেজকে সাবড়ে দিই তাহলে স্তালিনকে ঠেকাবে কে? যুগ যুগ সঞ্চিত ইয়োরোপের তাবৎ সভ্যতা তাবৎ সংস্কৃতিকে তো তিনি "বুর্জোয়া" বলে নাকচ করে দিয়েছেন, এমন কি তাঁর আপনজন ভার্গা, ভাভিলফ, কল্‌ৎসফ হয় "পেনশনে" নয় নির্বাসনে কিংবা মাটির নীচে। স্তালিন যদি বিশ্বজয় করতে পারেন তবে এ-দুনিয়াতে বাইবেল-কুরান, বেদ-পুরাণ তো থাকবেনই না, প্লাতো-শেকস্‌পীয়র থাকবেন কিনা তাই নিয়ে অনায়াসে জল্পনা-কল্পনা করা যেতে পারে। আণ্ডা-মাখনের ছয়লাফ হয়তো হবে, কিন্তু এই পৃথিবীর লোক প্লাতোশেকস্‌পীয়র পড়তে পাবে না শুনে স্তালিনী কলমা পড়তে কিছুতেই মন মানে না।'

এবং তার চেয়েও মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি এঁদের নৈরাশ্যের অনুযোগ। একমাত্র পেশাদারী পাদ্রি-পুরোত ছাড়া ইয়োরোপের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা আজ আর এ-বিশ্বাস করেন না যে প্রভু যীশুর সাম্যের বাণী বিশ্বসমস্যার সমাধান করতে পারবে। একদিন সে-বাণী দাসকে মুক্তি দিয়েছিল, অত্যাচারকে শান্ত করতে পেরেছিল, জড়লোক থেকে অধ্যাত্মলোকের অনির্বাণ দীপশিখার চিরন্তন দেওয়ালির উৎসবপ্রাঙ্গণে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু আজ সে বাণী ভার্টিকানের আপন দেশেই লুণ্ঠন অগ্নিবর্ষণ বন্ধ করতে পারছে না।

ইয়োরোপ মরা ঘোড়ার মতো পড়ে আছে। ধর্মের চাবুকে সে আর খাড়া হবে না।

অতএব? অতএব কোনো দিকেই যখন আর কোনো ভরসা নেই তখন যা-খুশি একটা

www.BanglaBook.org

বেছে নাও। আর দয়া করে আমাদের শান্তিতে মরতে দাও, আর তাও যদি না করতে দাও তবে আত্মহত্যা করতে দাও। রুশিয়া এবং পশ্চিম-ইয়োরোপে আত্মহত্যার প্রচেষ্টা চিন্তাশীল ব্যক্তিদের ভিতরই আজ বেশি।

* * *

আমরা যদি হটেনটট হতুম তাহলে আমাদের কোনো দুর্ভাবনা থাকতো না। আত্মহত্যা ছাড়া—অসভ্যদের ভিতর আত্মহত্যার সংখ্যা অতি নগণ্যও বটে—অন্য যে-কোনো দুটো পন্থার ভিতরে একটা বেছে নিয়ে 'দুর্গা' বলে ঝুলে পড়তুম। তারপর যা-হবার মত। (কিছুটা যে হয়েছে সে-কথা অস্বীকার করা যায় না। কম্যুনিস্টরা তো আছেনই, আরেক দল যে রুশের বিরুদ্ধে ঝটপট শত্রুতা জানিয়ে মার্কিন কল-কব্জা হাতিয়ে এ-দেশটা শোষণ করতে চান সে তত্ত্বটাও আমাদের অজানা নয়।)

'ধন্য সেই জাত, যার কোনো ইতিহাস নেই।' সে নির্ভয়ে যা-কিছু একটা বেছে নিতে পারে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যই বলুন, আর সৌভাগ্যই বলুন আমাদের ঐতিহ্য রয়েছে। সে ঐতিহ্যে আমরা শ্রদ্ধা হারাই নি—হয়তো তার প্রধান কারণ এই যে, বিদেশী শাসনের ফলে আমরা সে ঐতিহ্য অনুযায়ী চলবার সুযোগ এ যাবৎ পাই নি।

কিন্তু যতদিন সে-শ্রদ্ধা আমাদের মনে রয়েছে ততদিন তো আমরা বিগতযৌবনা অরক্ষণীয়ার মতো নিরাশ হয়ে গিয়ে মার্কিন কিংবা রুশের গলায় মালা পরিয়ে দিতে পারি নে। স্বরাজের জন্য যারা জেল খাটল, প্রাণ দিল তাদের অনেকেই তো মনে মনে স্বপ্ন দেখেছিল ভারতবর্ষের লুপ্ত ঐতিহ্য উদ্ধার করে তারই আলোকে ভবিষ্যতের পথ বেছে নেব, এমন কি গোপনে গোপনে হয়তো এ দম্ভও পোষণ করেছিল যে বিশ্বজনকেও সেই 'আলোকমাতাল স্বর্গসভার মহাঙ্গনে' নিমন্ত্রণ করতে পারবে। কৃষ্ণের দেশ, বুদ্ধের দেশ, চৈতন্যের দেশ আজ কপর্দকহীন, দেউলে, একথা মন তো সহজে মেনে নিতে চায় না।

কিন্তু সেখানে আরেক বিপদ। ঐতিহ্যের কথা তুললেই আরেক দল উল্লসিত হয়ে বলেন, 'ঠিক বলছ, চলো, আমরা বেদ-উপনিষদের সত্যযুগে ফিরে যাই।'

কোনো বিশেষ 'সত্যযুগে' ফিরে যাওয়ার অর্থই মেনে নেওয়া যে, আমাদের ভবিষ্যৎ বলে কোনো জিনিস নেই, সেই যুগকে প্রাণপণ আঁকড়ে ধরার অর্থই হল এ-কথা মেনে নেওয়া যে আমরা যুগ যুগ ধরে শুধু অবনতির পথেই চলে আসছি এবং নূতন জীবন, নবীন ভবিষ্যৎ গড়ে তোলবার মতো কোনো ক্ষমতা আমাদের নেই। তাই এঁরা তখন সেই বিশেষ 'সত্যযুগে'র আচার-ব্যবহার, ক্রিয়াকর্ম (এমন কি কুসংস্কার পর্যন্ত, কারণ আমরা বিশেষ কোনো সর্বাঙ্গসুন্দর 'সত্যযুগে' বিশ্বাস করিনে বলে সব যুগেই কিছু না কিছু কুসংস্কার মূঢ়তা ছিল বলে ধরে নিই) পদে পদে অনুসরণ অনুকরণ করতে লেগে যান, তখন জিগির ওঠে, ইয়োরোপীয় সব কিছু বর্জন করো, মার্কিন রুশের গা ছুঁয়েছ কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, ছড়াও চতুর্দিকে গোবরের জল, ঠেকাও তাই দিয়ে শুদ্ধ "ভারতীয় সংস্কৃতি"-কে "অস্পৃশ্যের পাপ-স্পর্শ থেকে"।

এঁরা গড়ে তুলতে চান আবার সেই 'অচলায়তন' যার অন্ধ প্রাচীর ভেঙে ফেলবার জন্য কবিগুরু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত লাঞ্ছিত, অপমানিত হয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন নবযুগের প্রতীক নূতন 'ডাকঘর' যার ভিতর দিয়ে রুগ্ন অমলকে বাণী পাঠাবেন প্রাচীন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাজা, যিনি জনগণের অধিনায়ক, ভারতভাগ্য-বিধাতা।

মার্কিন না রুশ না, এমন কি ভারতীয় কোন বিশেষ 'সত্যযুগ'ও না—এসব এড়িয়ে বাঁচিয়ে ভারতীয় ঐতিহ্যের চলিষ্ণু সদাজাগ্রত শাশ্বত সত্যধর্মের পথে আমাদের চালাবেন কে? সর্বব্যাপী দ্বন্দ্ব, আদর্শে আদর্শে সংঘাত, ঐতিহ্যে ঐতিহ্যে সংগ্রাম, এর মাঝখানে শান্তসমাহিত হয়ে ধ্রুব সত্যের সন্ধান দেবেন কে?

তিনি এলে আমরা তাঁকে চিনতে পারব তো? আমরা মনে হয় পারব। কারণ তিনি কোন্ ভাষায় তাঁর বাণী প্রচার করবেন তার কিছুটা সন্ধান আমরা পেয়ে গিয়েছি—তিনি স্বীকার করে নেবেন প্রথমেই জনগণমন-অধিনায়ক ভারত-ভাগ্যবিধাতাকে, তাঁর উদার বাণীতেও অহরহ প্রচারিত থাকবে সেই আহ্বান যে আহ্বানে সাড়া দেবে হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-জৈন-পারসিক-মুসলমান-খ্রীষ্টান, তাঁর কণ্ঠে শুনতে পাবো সেই চির-সারথির রথচক্রঘর্ঘর, যিনি পতন অভ্যুদয়ের বন্ধুর পন্থার উপর দিয়ে নিয়ে এসেছেন আমাদিগকে এই নবযুগের অরুণোদয়ের সামনে।

শত মূঢ়তার মাঝখানে যে আমরা আজ কোটিকণ্ঠে ভারত-ভাগ্যবিধাতাকে স্বীকার করে নিলুম—জাতীয়-সঙ্গীত নির্বাচনে পথভ্রান্ত হই নি—এ বড় কম আশার কথা নয়॥

ইন্দ্রলুপ্ত

(আবু সঈদ আইয়ুবকে)

ঘরের দাওয়ায়, তেঁতুলের ছাওয়ায়, মাঠের হাওয়ায়
খাওয়া-দাওয়ায়
শান্তি নেই, গরমেরও ক্লান্তি নেই।
সবুজ ঘাস হল হলদে, তারপর ফিকে।
দস্যি কাল-বোশেখী বাঁশের বনে ত্রিবিক্রমে বিক্রমে
তাদের কোমর ভেঙে নামল মাঠে।
লাথি মেরে ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেল তার শুকনো শেকড়
বেরিয়ে পড়ল শুভ্র, উষ্ম, নগ্ন মৃত্তিকা।
মাঠের টাক—
আমার টাকের মতো।

কলনের ঘন বনে
নিদাঘের তপ্ত কাফে কোণে
তুমি বসে আনমনে
—আমার চুলের ঘুঙুর তোমার নাচাল নয়ন নীল
কালোকে নীলেতে নাৎসি হারাতে পেল কি গোপন মিল?—

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাইনের ওয়াইনের মৃদু গন্ধ,
অন্ধ ভিখারির ছবি দেয়ালেতে ডাইনে,
একচোখা রেডিয়োটা করে কটমট
ভয়ে ভয়ে বললাম, 'ফ্রলান, Gruess Gott !
বেতারের সুরটা টাঙ্গো না ফক্স-ট্রট?'
চট করে চটে যাও পাছে!
তুমি রূপসিনী বন্দিনী
নরদিশী নন্দিনী।
তোমার প্রেম এল যে
শ্রাবণের বর্ষণের ধারা নিয়ে
চারদিকে টেনে দিয়ে
ঘনকৃষ্ণ সজল যামিনী যননিকা।
সে বিরাট বিলুপ্তির বিস্মরণে
শুধু আমার চেতনার ছয় ঋতু
আর তোমার চেতনার চার ঋতুর বিজড়িত নিবিড় স্পর্শ—

লাল ঠোঁট দিয়া বঁধূয়া আমার
পড়িল মন্ত্র কাল
দেহলি রুধিয়া হিয়ারে বান্ধিল
পাতিয়া দেহের জাল।
মুখে মুখ দিয়া হিয়ায় হিয়ায়
পরশে পরশে রাখি
বাহু বাহুপাশে ঘন ঘন শ্বাসে
দেহে দেহ দিল ঢাকি।
হঠাৎ দামিনী ধমকালো
বিদ্যুৎ চমকালো
দেখি, নীল চোখ
কাতরে শুধাই একি
তোমার নয়নে দেখি,
তোমার দেশের নীলাভ আকাশ
মায়া রচিছে কি?
তোমার বক্ষতলে
আমার দেশের শ্বেতপদ্ম কি
ফুটিল লক্ষ দলে?
রাত পোহাল। বর্ষণ থেমেছে।
কিন্তু কোথায় শরতের শান্তি, হেমন্তের পূর্ণতা?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঋতুচক্র গেল উলটে—
যমুনার জলও একদিন উজান বয়েছিল।—
কোন্ ঝড় তোমাকে নিয়ে গেল ছিনিয়ে
কোন্ ঝড় আমাকে নিয়ে গেল ঝেঁটিয়ে?
বেরিয়ে এল মাঠের টাক,
আমার টাক।
আমার জীবনে ইন্দু লুপ্ত
আমার কপালে ইন্দ্রলুপ্ত॥

নয়রাট

দেশভ্রমণের সময় যারা ছন্নের মতো ছুটোছুটি করে—অর্থাৎ সকালে মিউজিয়ম, দুপুরে চিত্রশালা, বিকেলে গির্জে দর্শন, সন্ধ্যায় অপেরা, রাতদুপুরে কাবারে, আমি তাদের দলে নেই। দেশে ফেরার পর কোনো পাক্কা টুরিস্ট যদি আশ্চর্য হয়ে বলেন, 'সে কি হে? তুমি প্রাগে তিন দিন কাটালে অথচ বলছ রাজা কার্লের বর্মাভরণ-অস্ত্রশস্ত্রের মিউজিয়াম দেখ নি—এ তো অবিশ্বাস্য', আমি তাহলে তা নিয়ে তর্কাতর্কি করিনে কারণ মনে মনে জানি আমি প্রত্যেকটি কড়ির পুরো দাম তোলার জন্য দেশভ্রমণে বেরই নি। ছ পয়সার টিকিট আমাকে শ্যামবাজার পর্যন্ত নিয়ে যায়—আমি নামব হেদোয়—তাই আমাকে শ্যামবাজার পর্যন্ত গিয়ে সেখানে নেমে, পায়ে হেঁটে ঘষ্টাতে ঘষ্টাতে হেদোয় এসে বেঞ্চিতে বসে ধুঁকতে হবে নাকি? আটনম্বরের জুতো ছ টাকায় দিচ্ছে বলে আমার ছ-নম্বরী পা-কে আট-নম্বরী পরাতে যাব নাকি?

তাই আমার উপদেশ ও কর্মটি করতে যাবেন না। খাওয়ার যেরকম সীমা আছে, ভালো জিনিস দেখারও একটা সীমা আছে। ক্লান্তি বোধ হলেই দেখা ক্ষান্ত দিয়ে একটা কাফেতে বসে যাবেন কিংবা যদি বাগানে বসবার মতো আবহাওয়া হয় তবে বাগানে বসে কফি, চা, বিয়ার কিছু একটা অর্ডার দিয়ে সিগারেটটি ধরিয়ে আরামসে গা এলিয়ে দেবেন।

এই হল জাবর-কাটার মোকা। এ কদিনে যা কিছু দেখেছেন তার মধ্যে যে ক'টি মনে ঢেউ তুলেছিল সেই ঢেউগুলি গুনবেন। কিংবা বলব আপনার মনের ফিল্ম যে ছবিগুলো তুলেছিল তার গুটিকয়েক ডিভালাপ প্রিনটিং করবেন, চোখ বন্ধ করে এক-একটা দেখবেন আর মনের ঘাড় নাড়িয়ে বলবেন, উত্তম হয়েছে, খাসা হয়েছে।

আমার পাশের টেবিলে দুই পাঁড় দাবাখেলনেওলা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে দাবা খেলছিলেন। দু'কাপ কফি হিম হয়ে গিয়েছে—উপরে কফির ঘন সর পড়েছে। জামবাটি সাইজ অ্যাশ-ট্রে পোড়া সিগারেটে ভর্তি। আরো জনতিনেক লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে, কিন্তু কারো মুখে কথা নেই, এ দৃশ্য বাঙালিকে রঙ ফলিয়ে দেখাতে হবে না। কৈলাস খুড়োর যে ছবি শরচ্চন্দ্র এঁকে গিয়েছেন তার দোহার গাইবার প্রয়োজন বাঙলাদেশে বহুকাল ধরে হবে না।

www.BanglaBook.org

খেলোয়াড়দের একজন দেখলুম ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে আসছেন। আধ ঘণ্টাতেই কাবু হয়ে গেলেন। গজের কিস্তিতে যখন মাত হবু-হবু, তখন ঘাড়গর্দানে 'শ্রাগ' করে বললেন, 'স্পাঞ্জ ফেলে দিলুম,' অর্থাৎ আমার খেলা গয়াগঙ্গাগদাধরহরি।

দর্শকদের একজন তখন মিনমিনিয়ে বললেন, 'কেন? ঐ বড়েটা একঘর ঠেলে দিলে হয় না?'

খাসা চাল তো! ওদিকে কারো নজরই যায় নি। এ চালে আরো খানিকক্ষণ লড়াই দেওয়া যেতে পারে।

খেলোয়াড়টি উঠে দাঁড়িয়ে সেই দর্শককে বললেন, 'আপনি তাহলে বসেন।' দর্শক তখন খেলোয়াড়রূপে বসে প্রথম সামলালেন আপন ঘর, তার পর দিতে আরম্ভ করলেন ধীরে ধীরে চাপ। স্পষ্ট বোঝা গেল ইনি উচ্চাঙ্গের লেঠেল। এবার অন্য পক্ষের প্রাণ যায় আর কি। শেষটায় তাই হল। পয়লা বারের কসাই এবারে বকরি হয়ে বললেন—যা বললেন—তার অর্থ "হরিবোল বল হরি!"

আমরা লক্ষ্য করি নি কে-ই বা এরূপ স্থলে করে—আরো জনতিনেক দর্শক তখন বেড়ে গিয়েছেন। তাঁদেরই একজন তখন মিনমিনিয়ে বললেন, 'কেন, গজটা পেছিয়ে নিলে হয় না?'

এ চালের অর্থটা আমার কাছে ধরা পড়ল না। কিন্তু কসাই দেখলুম ধরতে পেরেছেন। শুধু বললেন, 'হুঁ।' তখন পয়লা বারের কসাই, দুসরা বারের বকরি উঠে বললেন, 'আপনি তা হলে বসুন।'

অর্থাৎ খোল-নলচে দুইই তখন বদলে গিয়েছে।

এবারে সত্যি সত্যি লাগল মোষের লড়াই।

শেষটায় খেলা চাল-মাত হল।

* * *

ফিরে এসে আপন চেয়ারে বসলুম।

খেলোয়াড়দের একজন তখন পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। এক চণ্ডু-খানায় যখন এতক্ষণ একসঙ্গে আফিং খেয়েছি তখন খানিকটে পরিচয় হয়ে গিয়েছে বই কি—একটা ছোট নড় করলুম। ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে বললেন, 'সুপ্রভাত।' আমি বললুম, 'বসুন, বসুন।'

ঝুপ করে বসে পড়ে বললেন, ' "বসুন", হুঁঃ, "বসুন"। ওদিকে আমার প্রাণ যায় আর কি?'

আমি শুধালুম, 'কেন, কি হয়েছে?' বুঝলুম লোকটি দিলখোলা।

বললেন, 'জবাই করবে, মশাই, জবাই করবে আমাকে—বউ। বলেছিলুম, এই এলুম বলে। কি করে জানব বলুন, দাবার চক্করে পড়ে যাব। বলতে পারেন, মশাই, এই বিদ্‌ঘুটে খেলা বের করেছিল কে? হাঁ, হাঁ, ভারতবর্ষেই তো এর জন্মভূমি। কিন্তু এদেশে এল কি করে?'

'শুনেছি পারসিকরা আমাদের কাছ থেকে শেখে, আরবরা তাদের কাছ থেকে, তারপর ক্রুসেডের লড়াইয়ে বন্দী ইয়োরোপীয়রা শেখে আরবদের কাছ থেকে, তারা দেশে ফিরে—'

'আমাদের মজালে। কিন্তু এখন আমার উপায় কি? আপনারা এ অবস্থায় দেশে কি

www.BanglaBook.org

করেন?'

'চাঁদ-পানা মুখ করে গাল সই।'

'ব্যস্! ব্যামোটা বাধিয়ে বসে আছেন ঠিক; ওষুধটা বের করতে পারেন নি। কিন্তু আমি পেরেছি। চলুন, আমার সঙ্গে, লঞ্চ খাবেন।'

'আর গালও খাব? না?'

'না, না, আপনাকে বকবে কেন? আমি বলব, এঁর সঙ্গে গল্প করতে করতে কি করে যে বেলা বয়ে গেল ঠাহর করতে পারি নি। চলুন, চলুন আর দেরি করা নয়।'

চললুম।

ভদ্রলোকের বয়স—এই ধরুন ৪৫-৪৬। স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ, পরনে উত্তম রুচির কোট-পাতলুন-টাই। সব কিছু পরিপাটি। তাই অনুমান করলুম তাঁর অর্ধাঙ্গিনী তাঁকে বকুন-ঝকুন আর যা-ই করুন না কেন, গৃহিণী হিসেবে তিনি ভালোই।

বললেন, 'যা খুশি তাই বউকে বলে যাবেন, কিচ্ছু ভয় করবেন না। তাঁকে যদি ভুলিয়ে-ভালিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুণী বানিয়ে সিংহলে পাঠিয়ে দিতে পারেন, তাতেও আমি কোনো আপত্তি করব না, কিন্তু স্যর, দয়া করে ঐ দাবা খেলার কথাটি চেপে যাবেন।'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়ই।'

দরজা খুলে দিলেন স্বয়ং স্ত্রী। কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তার পূর্বেই ভদ্রলোক আলাপ করিয়ে দিলেন, 'ইনি আমার স্ত্রী, ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা—ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা নয়রাট্।' আমি বললুম, 'আমার নাম আলী।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কার বয়স ৩৫-৩৬ হবে। সুইজারল্যান্ডে এই বয়সে মেয়েদের পূর্ণ যুবতী বলে ধরা হয়। এ-যৌবনে কুমারীর রূপের নেশা আর মাতৃত্বের মাধুরী মিশে গিয়ে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে তার রস মানুষ নির্ভয়ে উপভোগ করতে পারে—স্বামী সন্দেহের চোখে দেখে না, রমণী আপনার চোখে চটক লাগাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে না। মেয়েদের আচরণ এ সময় সত্যই বড় মধুর হয়; কখনো তারা তরুণীর মতো ভাবে বিহ্বল আত্মহারা হয়ে অকারণ বেদনার কাহিনী বলে যায়, কখনো আবার মাতৃত্বের গর্ব নিয়ে আপনাকে নানা সদুপদেশ দেয়, বিয়ে-থা করে ঘর-সংসার পাতবার জন্য স্নিগ্ধচোখে অনুনয়-বিনয় করে।

স্ত্রীকে কিছু বলতে না দিয়েই হ্যার নয়রাট্ বকে যেতে লাগলেন, 'বুঝলে ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা, আমি ঠিক সময়েই ফিরে আসতুম কিন্তু এই হ্যার আলীর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। ইনি ভারতবর্ষের লোক—শুনেছ তো ভারতবর্ষের লোক কি রকম গুণী-জ্ঞানী হয়। ইনি তাঁদেরই একজন। তার প্রমাণও আমি হাতে-নাতে পেয়ে গিয়েছি। রাস্তায় আসছে আসতে তাঁকে জিজ্ঞেস করে জানতে পেলুম, সাতদিন ধরে এসেছেন জিনীভায়, এখনো লীগ অব নেশনসের "চিড়িয়াখানা" দেখতে যান নি, শামুনিক্‌স্ চড়েন নি, অপেরা-থিয়েটার কিছুই দেখেন নি। আর সব টুরিস্টদের মতো সুইটজারল্যান্ডের প্রত্যেক দ্রষ্টব্য বস্তুকে পিঁপড়ে নিঙড়ে ঘি বের করাবার জন্য উঠে পড়ে লাগেন নি। আমার তো মনে হয়, এ-দেশের উচিত এঁকে এঁর খর্চার পয়সা কিছু ফেরৎ দেওয়া। কী বল?'

পাছে ভদ্রমহিলার অভিমানে ঘা লাগে, আমি তাঁর দেশের কুতুব তাজ ভারতীয় দম্ভের নেশায় তাচ্ছিল্য করছি তাই তাড়াতাড়ি বললুম, 'আমি বড় দুর্বল, বেশি ঘোরাঘুরি করলে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। আস্তে আস্তে সব-কিছুই দেখে নেব।'

www.BanglaBook.org

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'সেই ভালো। শামুনিক্স্ পাহাড় তো আর বসন্তের বরফ নয় যে দুদিনে গলে যাবে, সুইটজারল্যান্ড ভ্রমণ তো আর দাবাখেলা নয় যে সুযোগ পেয়েও দুটি কিস্তি না দিলে—'

বাকিটা আমি আর শুনতে পাই নি। আমি তখন ওয়াল-পেপার হয়ে দেওয়ালের সঙ্গে মিশে যাবার জন্য আস্তে আস্তে পিছুপা হতে আরম্ভ করেছি।

শুনি, হ্যার নয়রাট্ ব্যথা-ভরা সুরে বলছেন, 'গিন্নি, ছিঃ।'

আমার অবস্থা তখন এক মাতাল আরেক স্যাঙাত মাতালকে সাফাই গাইবার জন্য নিয়ে এসে ধরা পড়লে যা হয়।

নাঃ, ভুল করেছি। ফ্রান্‌ৎসিস্‌কার কামড়ানোর চেয়ে ঘেউ-ঘেউটাই বেশি। বললে, 'আঃ, আপনারাও যেমন। মেয়েছেলে এরকম দু-একটা কথা সব সময়েই কয়ে থাকেন—ওসব কি গায়ে মাখতে আছে? তুমি দাবা-খেলায় দু-একটা আজেবাজে চাল মাঝে মাঝে দাও না—দুশমন কি করে তাই দেখবার জন্য?'

আবার দাবা। খেয়েছে।

ফ্রানৎসিস্‌কা স্বামীকে বললেন, 'আজ তো লাঞ্চের ব্যবস্থা বড় মামুলী। সুপ্' ফিশ্ আ লা রুস (রাশান কায়দায়) আর অ্যাপল টার্ট উইথ হুইপ্‌ট্ ক্রীম। তার চেয়ে বরঞ্চ চল রেস্তোরাঁয়—জিনীভা লেকের মাছ সুইস কায়দায় রান্না—ভালোমন্দ এটা সেটা।' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে শুধালেন, 'আপনি কি খেতে ভালোবাসেন?'

আমি নির্ভয়ে বললুম, 'সুপ্, ফিশ্ আ লা রুস, অ্যাপল টার্ট উইথ হুইপ্‌ট্ ক্রীম।'

হ্যার নয়রাট্ তো আনন্দে গদগদ। বললেন, 'দেখলে গিন্নি, কি রকম অদ্ভুত আদব-কায়দা। তুমি যদি বলতে আজ রেঁধেছি স্ট্রিকনিন-সুপ, পটাসিয়াম সায়ানাইড-ফ্রাইড, আর্সেনিক-পুডিং আর কোবরা-রসের কফি তা হলে উনি বলতেন, "দি আইডিয়া, আমি দু বেলা ঐ জিনিস খাই"।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'দেখো, পেটার, বিশ্বসংসারের লোককে তুমি আপন মাপকাঠি দিয়ে মেপো না। তোমার মত ওঁর পেট অজুহাতের মানওয়ারী জাহাজ নয়।'

পেটার বললেন, 'সব দাবা-খেলোয়াড়কেই অজুহাত-বিদ্যে আয়ত্ত করতে হয়। বিয়ের পরেই যে রকম হনিমুন, দাবা-খেলার পরই সেই রকম অজুহাত অন্বেষণ!'

আমি বললুম, 'কিন্তু আমি তো দাবা খেলি নে।'

কথা শুনে দুজনাই খানিকক্ষণ থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। শেষটায় পেটার বললেন, 'দেখলে গিন্নি, অজুহাতের রাজা কারে কয়? একদম কবুল জবাব উনি দাবা খেলেন না! বাপস! মারি তো হাতি লুটি তো ভাণ্ডার। অজুহাত যদি দিতেই হয় তবে এমন একখানা ঝাড়ব যে মানুষ রা কাড়বার ফাঁকটি পাবে না। পাক্কা আড়াই ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে দেখলেন আমাদের খেলা, আর এখন অম্লান বদনে বলছেন উনি দাবা খেলেন না!'

আমি সবিনয়ে শুধালাম, 'আপনি কনসার্ট শুনতে যান? আচ্ছা, সেখানে তো পাকি সাড়ে তিন ঘণ্টা বাজনা শোনেন; তাই বলে কি আপনি পিয়ানো, ব্যালা, চেল্লো কণ্ডাল বাজান?'

ওদিকে দেখি ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা আমাদের তর্কাতর্কিতে কান দিচ্ছেন না; শুধু বললেন, 'তাই বলো, দাবা খেলা হচ্ছিল।'

www.BanglaBook.org

চাণক্য বান্ধবের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, রাজদ্বারে যে সঙ্গ দেয় সে বান্ধব। আমার বিশ্বাস চাণক্য কখনো বিয়ে করেন নি। তা না হলে তিনি 'রাজদ্বারে' না বলে 'জায়াদ্বারে' বলতেন।

জানি, অতিশয় অভদ্রতা হল—তবু বললুম, 'আমার ক্ষিদে পেয়েছে।'

বন্ধুর ফাঁসিটাকে মুলতুবী করাতে পারলুম—এই বা কি কম সান্ত্বনা।

* * *

আমরা বাড়িতে রান্নাঘরের বারান্দায় বসে যেরকম হাপুসহুপুস শব্দ করে আহারাদি সমাপন করি, নেমন্তন্ন খেতে গিয়েও প্রায় সেই রকমই করে থাকি। তফাত মাত্র এইটুকু যে, বাড়িতে চিৎকার করে বলি, 'আরো দুখানা মাছভাজা দাও', নেমন্তন্ন বাড়িতে বলি, 'চৌধুরী মশাইকে আরো দুখানা মাছভাজা দাও।'

সায়েব-সুবোদের কিন্তু বাড়ির খাওয়াতে, রেস্তোরাঁয় আহারে এবং নেমন্তন্নের ভোজনে ভিন্ন ভিন্ন কায়দা-কেতায় খাওয়া-দাওয়া করতে হয়। সায়েবরা বাড়িতে খেতে বসে গোগ্রাসে গোস্ত গেলে আর পোশাকী ডিনারে কিংবা ব্যানকুয়েটে একরকম না খেয়েই বাড়ি ফেরে। ব্যানকুয়েটে আপনাকে সুপ দেওয়া হবে আড়াই চামচ, তার থেকে আপনি খাবেন দেড় চামচ। ডিনারে সুপ খেয়ে ন্যাপকিন দিয়ে মোলায়েম কায়দায় ঠোঁট ব্লট করবেন, কিন্তু ড্যুক অব উইন্ডসরের সঙ্গে ব্যানকুয়েট খেতে বসলে ঠোঁট ব্লট করাও নিষিদ্ধ, অর্থাৎ তখন ধরে নেওয়া হয়, আপনি এতই কম সুপ খেয়েছেন যে, আপনার ঠোঁট পর্যন্ত ভেজে নি। তারপর পদের পর পদ উত্তম খাদ্য আসবে—আপনি আপন প্লেটে তুলে নেবেন কখনো আড়াই আউন্স, কখনো দু আউন্স এবং খাবেন তার থেকে এক আউন্স কিংবা তার চেয়েও কম। মুর্গীর হাড্ডি থেকে যে ছুরি দিয়ে মাংস চাঁচবেন তার উপায় নেই এবং গ্রেভিটুকুর মোহ করেছেন কি মরেছেন। সাইড প্লেটে যে এক স্লাইস টোস্ট দিয়েছিল তার এক-দশমাংসের বেশি খেলে পাঁচজনে ভাববে, আপনি রায়লসীমার দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত 'পারিয়া' কিংবা মধ্য-আফ্রিকার মিশনারি-খেকো হটেনটট্।

বিশ্বাস করবেন না, এক খানদানী ক্লাবে আমি দুই পক্ষকে পাকি দু ঘণ্টা ধরে তর্কাতর্কি করতে শুনলুম, সসেজ কি করে খেতে হয়। সমস্যাটা এইরূপঃ—(ক) সসেজ থেকে ছুরি দিয়ে চাক্তি কেটে নিয়ে তার উপর মাস্টার্ড মাখাবে কিংবা (খ) প্রথম সসেজের ডগায় মাস্টার্ড মাখিয়ে নিয়ে পরে সসেজ থেকে চাক্তি কেটে তুলবে? আমি প্রথম পক্ষের হয়ে লড়াই করেছিলুম এবং শেষটায় আমরা ভোটে হেরে গেলুম। এর থেকেই বুঝতে পারছেন, আমি খানদানী খানা খেতে শিখি নি—ব্যানকুয়েটে আমার নাভিশ্বাস ওঠে।

বিশ্বাস করবেন না, মাসখানেক হল এক সুইস খবরের কাগজে দেখি, এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করেছেন, প্লেটে যে গ্রেভি পড়ে থাকে, তার উপর রুটি টুকরো টুকরো করে ফেলে সেই গ্রেভি চেটেপুটে নেওয়া (জর্মন শব্দ tunken) ব্যাকরণসম্মত—অর্থাৎ কায়দাদুরস্ত—কি না?

উত্তরে এক 'খানদানী মনিষ্যি' বলেছেন, কিছুকাল পূর্বেও এ-অভ্যাস কি বাড়িতে, কি রেস্তোরাঁয়, কি ব্যানকুয়েটে সর্বত্রই অতিশয় নিন্দনীয় বলে গণ্য করা হত, কিন্তু আজকের বিশ্বময় খাদ্যাভাবের দিনে বাড়িতে—আপন ডাইনিং রুমে কর্মটি ক্ষমার্হ।

মুর্গীর ঠ্যাংটি হাতে তুলে নিয়ে 'কড়কড়ায়তে, মড়মড়ায়তে' বাড়িতে বেশির ভাগ ইউরোপীয়ই করে, কিন্তু বাইরে নৈব নৈব চ। তবে কোন কোন জর্মন এবং সুইস্ রেস্তোরাঁয়

www.BanglaBook.org

রোস্ট সার্ভ করবার সময় মুর্গীর ঠ্যাংগুলো উপরের দিকে সাজিয়ে রাখে এবং ঠ্যাংগুলোর ডগায় বাটার পেপারের ক্যাপ পরিয়ে দেয়, যাতে করে আপনি হাত নোংরা না করে ঠ্যাংটা চিবুতে পারেন। এ ব্যবস্থা দেখে ইংরেজের জিভে জল আসে, কিন্তু সেটা চেপে গিয়ে বলে, 'জর্মনরা বর্বর!'

অপিচ এসপেরেগাস এবং আর্টিচোক ছুরি-কাঁটা দিয়ে খাওয়া গো-হত্যার ন্যায় মহাপাপ—খেতে হয় হাত দিয়ে।

ইংরেজ যদিস্যাৎ কখনো রাইস-কারি কিংবা ইটালিয়ান রিসোত্তো (এক রকমের কিমা-পোলাও) খায়, তবে টেবিল কিংবা ডেসার্ট স্পুন দিয়ে সে খাদ্য মুখে তোলে। তাই দেখে ফরাসি-ইতালি আঁতকে ওঠে—বলে, কী বর্বরতা! একটা আস্ত চামচ মুখে পুরছে—বাপ্‌স্। তারা রাইস-কারি খায় ডান হাতে কাঁটা নেয়—বিনা ছুরিতে। তাই দেখে চীনা ভদ্রসন্তান আবার ভিরমি যায়। বলে, একটা আস্ত ফর্ক মুখে ঢোকাচ্ছে—কী বর্বরতা! তার চেয়ে চপস্টিক কত পরিষ্কার, কত পরিপাটি।

আর বঙ্গসন্তান আমি বলি, এ সবকটা পদ্ধতিই বর্বর না হোক, অন্তত নোংরা। ফর্ক, স্পুন, এমন কি চপস্টিক পর্যন্ত আমার আপন আঙুলের চেয়ে নোংরা। সব চেয়ে বঢ়ীয়া হোটেলের স্পুন নিয়ে আপনি আচ্ছাসে ন্যাপকিন দিয়ে ঘষুন—দেখতে পাবেন ন্যাপকিন কালো হয়ে গেল। অথচ আপনি হাত ধুয়ে যে খেতে বসেন, তখন কাপড়ে আঙুল ঘষলে কাপড় ময়লা হয় না।

কিন্তু আমার প্রধান আপত্তি টেবিলে বসে খাওয়াতে। টেবিল ক্লথ বাঁচিয়ে, ছুরি-কাঁটা না বাজিয়ে, জল খাওয়ার সময় গ্লাসে ঠোঁটের দাগ না লাগিয়ে টেবিলের তলায় পাশের কিংবা আসনের লোকের পায়ে গুত্তা না মেরে আপন গেলাস আর পরের গেলাসে খিচুড়ি না পাকিয়ে, আঁত্রের ফর্ক আর জয়েন্টের ফর্কে গোলমাল না বাধিয়ে, প্লেট শেষ হওয়ার পূর্বে ছুরি-কাঁটা পাশাপাশি না রেখে, ডাইনে-বাঁয়ে সব কিছু রদ্দিবরবাদ না করে, এবং আহারান্তে ঘোত ঘোত করে ঢেকুর না তুলে আহার করা আমার পক্ষে কঠিন, সুকঠিন। বিলিতি ডিনার খেতে পারেন মাত্র ম্যাজিশিয়ানরাই যাঁদের হাত-সাফাই আছে, যাঁরা চিড়িতনের টেক্কাকে বেমালুম হরতনের নয়লা বানিয়ে দিতে পারেন।

এবং সব চেয়ে গর্ভ-যন্ত্রণা, খাওয়ার দিকে আপনি সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারবেন না। এর সঙ্গে ওর সঙ্গে আপনাকে মধুর মধুর বাক্যালাপ করতে হবে। আবহাওয়া থেকে আরম্ভ করে আপনাকে রিলেটিভিটি পর্যন্ত কপচাতে হবে। আবার শুধু গল্প করলে চলবে না—সঙ্গে সঙ্গে খেতে হবে। এর পরিমাণ সঠিক রাখা সেও এক কঠিন কর্ম। আপনি যদি প্রধান অতিথি হন, তবে আপনাকে বকর বকর করতে হবে বেশি, যদি আমার মতো ব্যাক-বেঞ্চার হন, তবে চুপ করে সব কিছু শুনে যেতে হবে—তা সে যতই নিরস নিরানন্দ হোক না কেন?

বলুন তো মশাই, ভোজনের নেমন্তন্ন কি এগজামিনেশন হল?

* * *

নয়রাট লোকটি খুশ গল্প করে ঘরবাড়ি জমজমাট করে রাখতে চান সে কথাটা দু মিনিটেই বুঝে গেলুম, আর গৃহিণীর ভাবসাব দেখে অনুমান করলুম ইনিও সাদাসিধে লোক, লৌকিকতার বড় ধার ধারেন না। খানাটেবিলের পাশে পৌঁছেই বললেন, 'এ বাড়িতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পোলিশ গর্ভমেন্ট, (পোল্যান্ডের ইতিহাসে এত ঘন ঘন অরাজকতা আর বিদ্রোহ হয়েছে যে, জর্মন ভাষায় 'পোলিশ গভর্নমেন্ট' বলতে 'এলো-মেলো' 'ছন্নছাড়া' বোঝায়) যে যেখানে খুশি বসতে পারেন।'

নয়রাট বাধা দিয়ে বললেন, 'সে কি করে হয়? আমি বসব আমার পশ্চাদ্দেশের উপর, তুমি বসবে—।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা রাগ করে বললেন, 'ছিঃ, পেটার, ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে এই আজ সকালে; আর এরই ভিতর তুমি আরম্ভ করে দিয়েছ যত সব অশ্লীল কথা! তার উপর উনি আবার বিদেশী।'

নয়রাট বললেন, 'দেখো, প্রিয়া, তুমি অনেকগুলো ভুল করেছ। প্রথমত তুমি বিলক্ষণ জানো, আমি দিশি-বিদেশীতে কোন ফারাক দেখতে পাই নে। যার সঙ্গে আমার মনের মিল, রুচির মিল হয় সে-ই আমার আত্মজন। কি বলেন আলিসাহেব?'

আমি বললুম, 'অতি খাঁটি কথা। তবে ভারতীয় ঋষি বলেছেন, "আমি" "তুমি"তে পার্থক্য করে লঘুচিত্তের লোক, যার চরিত্র উদার তার কাছে সর্ব বসুধা আত্মজন।

নয়রাট গুম্ মেরে শুনলেন। অনেকক্ষণ ধরে ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় নাড়িয়ে শেষটায় বললেন, 'এটা হজম করতে আমার একটু সময় লাগবে—ফ্রান্‌ৎসিস্‌কার রান্নার মতো।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা ভয়ঙ্কর চটে যাওয়ার ভান করে (আমার তাই মনে হল) বললেন, 'দেখো', পেটার, তুমি খাওয়া বন্ধ করে এখ্‌খুনি রেস্তোরাঁ যাও; না হলে এই ডিশ ছুঁড়ে তোমার মাথা ফাটাব।'

পেটার অতি ধীরে ধীরে আরেক চামচ টমাটো সুপ গিলে নিয়ে প্রথম গিন্নিকে শুধালেন, আরো সুপ আছে কি না, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সবাইকে আত্মজ করা কি কখনো সম্ভব? এই দেখুন না, সেদিন ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, একজোড়া ফেন্সি নূতন জুতো কিনবে—দাম চল্লিশ ফ্রাঁ (৩৮)—আমি বললুম, আমার অত টাকা নেই, ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললে, সে আমার কাছ থেকে টাকা চায় না, তার মা আসছেন দু'দিন পরে, তিনি টাকাটা দেবেন। কি আর করি বলুন তো? তদ্দণ্ডেই টাকাটা ঝেড়ে দিলুম। ফ্রান্‌ৎসিস্‌কার মা! বাপরে বাপ্! আপনি কখনো ম্যান-ইটার বাঘের মুখোমুখি হয়েছেন?'

আমি কিছু বলবার পূর্বেই ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা আমাকে বললেন, 'দোহাই মা-মেরির! এই পেটারটা যে কি মিথ্যাবাদী আপনাকে কি করে বোঝাই? (পেটারের আপত্তি শোনা গেল, 'ডার্লিং, অশ্লীল গল্পের চেয়ে গালি-গালাজ অনেক বেশি খারাপ') আমার মা রাতে বড়দিন একা-একা না কাটান তার জন্য নিজে—আমাকে না বলে—লুৎর্সেন গিয়ে তাঁকে এখানে নিয়ে এল। তার পর বছরের শেষ রাত্রে তাঁর সঙ্গে ধেই ধেই করে নাচলে ভোর চারটে অবধি—ওঁর সঙ্গে নাচলে অন্তত পঁচিশটা নাচ, আমার সঙ্গে দুটো, জোর তিনটে। বুড়িকে শ্যাম্পেন খাইয়ে খাইয়ে টং করিতে দিয়ে, যত সব অদ্ভুত পুরানো রাশান আর পোলিশ নাচ। কখনো সে মাটিতে বসে উবু থাবড়ায়—মা তখন তার চতুর্দিকে পাঁই পাঁই করে চক্কর খাচ্ছেন—কখনো বাঁদরের মত লম্ফ দিয়ে ছাতে মাথা ঠেকে—মা তখন ১৫ ডিগ্রীতে কাত হয়ে স্কার্ট তুলেছেন হাঁটু অবধি। তারপর তাঁকে কাঁধের উপরে তুলে নিয়ে বাঁই বাঁই করে ঘুরলে ঝাড়া দশ মিনিট। বাদবাকি নাচনে-ওলা-নাচনে-ওলীরা ততক্ষণে ফ্লোর তাদের জন্য সাফ করে দিয়ে আপন আপন টেবিলে চলে গিয়েছে। অরকেস্ট্রাও বদ্ধ পাগল হয়ে গিয়েছে,

www.BanglaBook.org

একটা নাচের জন্য ওরা বাজনা বাজায় দশ, জোর পনের মিনিট—ঐ মাৎসুর্কা না কি পাগলা নাচের জন্যে ওরা বাজনা বাজালে পাকা এক ঘণ্টা। নাচের শেষে মা তো নেতিয়ে পড়ল চেয়ারে, ওদিকে কিন্তু চোখ বন্ধ করে বুড়ি মিটমিটিয়ে হাসছে—খুশিতে ডগোমগো!'

পেটার বললেন, 'ডার্লিং, কিন্তু সে রাত্রের সব চেয়ে সেরা নাচের জন্য কে প্রাইজ পেল সেটা তো বললে না।'

তারপর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'মা পেলেন ফার্স্ট প্রাইজ, আমি সেকেন্ড। তাই তো আমি শাশুড়িদের বিলকুল পছন্দ করি নে।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'আচ্ছা আহাম্মুক তো! নাচের পয়লা প্রাইজ হামেশাই রমণী পায়। দুসরাটা পুরুষ। এটা হচ্ছে শিভালরি। তোমাকে কি করে পয়লা প্রাইজ দিত?'

পেটার আমার দিকে মুখ করে বললেন, 'গিন্নির রাগ, আমি ওর সঙ্গে নাচলুম না কেন? আচ্ছা মশায়, বলুন তো, আপনি যদি কবিতা পড়ে শোনান, খোশগল্প করেন, বাজনা বাজান কিংবা কালোয়াতি করেন তবে যে সমে সমে মাথা নাড়তে পারে তাকে আদর-কদর করবেন, না আপন স্ত্রীকে? যেহেতু তিনি আপন স্ত্রী। রসের বাজারে আপন পর করা যায়?'

আমি উল্লসিত হয়ে বললুম, 'তাই তো আমি নিবেদন করলুম, "যাঁর চরিত্র উদার—অর্থাৎ যিনি রসিক জন—তাঁর কাছে সর্ব বসুধা আত্মজন"'।'

পেটার নয়রাট বললেন, 'গিন্নি অবশ্যি একটা কথা ঠিক বলেছেন, আমরা কেউ এটিকেটের ধার ধারি নে। এ বিষয়ে চমৎকার একটা 'ট্যুনিস", "শেলে"র গল্প আছে। "ট্যুনিস-শেল" কে চেনেন?'

আমি বললুম, 'ঠিক মনে পড়ছে না।'

'আগাগোড়া একটি "প্রতিষ্ঠান" বলতে পারবেন। 'ট্যুনিস্‌" কথাটা এসেছে লাতিন "আন্তনিয়ুস" থেকে। আন্তনিয়ুস গালভরা, গেরেমভারী, খানদানী ঐতিহাসিক নাম। আর ট্যুনিস্‌ অতিশয় প্লিবিয়ান অপভ্রংশ—নামটাতেই তাই একটুখানি রসের আমেজ লাগে।'

আমি বললুম, 'আমাদের "পঞ্চানন" নামটাও গেরেমভারী কিন্তু তার গার্হস্থ্য সংস্করণ "পাঁচু"টাতেও ঐরকম রসসৃষ্টি হয়।'

'তাই নাকি? আপনারাও তাহলে এ রসে বঞ্চিত নন? আর "শেল" কথাটার মানে "ট্যারা"। বুঝতেই পারছেন পিতৃদত্ত নাম নয়, পাড়া দত্ত। এবং নাম থেকেই বুঝতে পারছেন, এরা দুজন ড্যুক ব্যারন নন—খাঁটি ওয়ার্কিং কেলাস। খায়দায়, ফুতিফার্তি করে, ফোকটে দু পয়সা মারার তালে থাকে, কাজে ফাঁকি দিতে ওস্তাদ আর বিয়ার-খানায় আড্ডা জমাতে পারলে এরা আর কিছু চায় না।'

'একদিন হয়েছে কি, ট্যুনিস্‌-শেল রাস্তায় একখানা দশ টাকার নোট কুড়িয়ে পেয়েছে—তা ওরা হামেশাই ওরকমধারা রাস্তায় টাকা কুড়িয়ে পায়, না হলে গল্পই বা জমবে কি করে?'

'ট্যুনিস্‌ বললে, "চ, শেল; এই দিয়ে উত্তমরূপে আহারাদি করা যাক।" দুজনা ঢুকল গিয়ে এক রেস্তোরাঁয় আর অর্ডার দিলে দুখানা কটলেটের।

'ওয়েটার এসে ছুরিকাঁটা আর দুখানা প্লেট সাজিয়ে দিয়ে আনল একখানা বড় ডিশে করে দুখানা কটলেট।'

নয়রাট বললেন, 'কটলেট তো আর অ্যারোপ্লেনের স্ক্রু নয় যে ফিতে দিয়ে মেপেজুপে

www.BanglaBook.org

কিংবা ছাঁচে ঢেলে, ঠিক একই সাইজে বানানো হবে, কাজেই একখানা কটলেট আরেকখানার চেয়ে সামান্য একটু বড় হবে তাতে আর আশ্চর্য কি?'

'ট্যুনিস তাই ঝপ করে বড় কাটলেটখানা আপন প্লেটে তুলে নিল। শেল চুপ করে দেখল। তারপর আস্তে আস্তে ছোট কটলেটখানা তুলে নিয়ে ট্যুনিসকে বললে, "ট্যুনিস, তুই আদব-কায়দা একদম জানিস নে।"—যেন নিজে সে মহা খানদানী ঘরের ছেলে।

'ট্যুনিস শুধালে, "কেন, কি হয়েছে?"

'শেল বললে, "ভদ্রতা হচ্ছে, যে ডিশ থেকে প্রথম খাবার তুলবে, সে নেবে ছোট টুকরোটা।"

'ট্যুনিস বললে, "অ। আচ্ছা, তুই যদি প্রথম নিতিস তবে তুই কি করতিস?"

'শেল দম্ভ করে বলল, "নিশ্চয়ই ছোট কাটলেটটা তুলতুম।"

'তখন ট্যুনিস বললে, "সেইটেই তো পেয়েছিস, তবে ভ্যাচর ভ্যাচর করছিস কেন?"

নয়রাট গল্প শেষ করে খানাতে মন দিলেন।

বলতে পারব না, আমার পাঠকদের গল্পটা কি রকম লাগল—আমার কিন্তু উত্তম মনে হল, তাই প্রাণভরে খানিকক্ষণ হেসে নিলুম।

নয়রাট বললেন, 'তাই যখন কেউ এটিকেট নিয়ে বড্ড বেশি কপচাতে শুরু করে তখনই আমার এই গল্পটা মনে পড়ে আর হাসি পায়। আরে বাবা, সংসারে থাকবি মাত্র দু'দিন। তার ভিতর কত হাঙ্গামা কত হুজ্জত। সেই সব সামলাতে গিয়েই প্রাণটা খাবি খায়। তার উপর যদি এটিকেটের নাগপাশ দিয়ে সর্বাঙ্গ আর নবদ্বার বেঁধে দাও (ফ্রান্‌ৎসিস্‌কার আপত্তি শোনা গেল, "পেটার, আবার অশ্লীল কথা!") তবে দম ফেলবে কি করে? হাঁচবার এটিকেট, কাশবার এটিকেট, থুথু ফেলার এটিকেট, গা চুলকাবার এটিকেট—প্রাণটা যায় আর কি।'

আমি সায় দিলুম।

তখন নয়রাট শুধালেন, 'বলুন তো, কি সে জিনিস যা চাষা অনাদরে, তাচ্ছিল্যে, এমন কি বলতে পারেন, ঘেন্নাভরে রাস্তায় ফেলে দেয়, আর ভদ্রলোক সেটাকে ধোপদুরস্ত দামী রুমালে ঢেকে, পকেটে পুরে অতি সন্তর্পণে বাড়ি নিয়ে আসেন?'

আমি খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বললুম, 'তা তো জানি নে।'

বললেন, 'সিকনি। চাষা ফাঁত করে রাস্তায় নাক ঝেড়েও ওদিকে আর তাকায় না, ভদ্রলোক রুমাল খুলে ছিঁক করে তারই উপর একটুখানি নাক ঝেড়ে সেটিকে সযত্নে ভাঁজ করে, পকেটে পুরে বাড়ি ফেরেন।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা হঠাৎ বললেন, 'পেটার, তুমি তো বকবক করে এটিকেটের নিন্দাই করে যাচ্ছ, ওদিকে একদম ভুলে গিয়েছে, ভদ্রলোক প্রাচ্যদেশীয়, সেখানে এটিকেটের অন্ত নেই; এদেশে তো প্রবাদই রয়েছে, "ওরিয়েন্টাল্‌ কার্টসি"। যে আচার এঁদের প্রিয় তুমি তাই নিয়ে মস্করার পর মস্করা করে যাচ্ছ।'

পেটার বললেন, 'আদপেই না। আমি তো ভদ্রতার (ম্যানার্স) নিন্দে করছিন, আমি করছি এটিকেটের। দুটো তো এক জিনিস নয়।'

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনাদের দেশে ব্যবস্থাটা কি রকম?'

আমি বললুম, 'অনেকটা আপনাদের দেশেরই মতো। অর্থাৎ, ভদ্রতারক্ষার চেষ্টা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমরাও করে থাকি তবে এটিকেটের বাড়াবাড়ি দেখলে তাই নিয়ে আপনার-ই মতো টীকাটিপ্পনী কেটে থাকি। তবে কি না ভারতবর্ষ বিরাট দেশ—তার নানা প্রদেশে নানা রকমের এটিকেট। এই ধরুন লক্ষ্ণৌ। সেখানে কোনো খানদানী বাড়িতে নিমন্ত্রণে যেতে হলে বাড়িতে উত্তমরূপে আহারাদি সেরে যেতে হয়। কারণ, খানার মজলিসে গল্প উঠবে, কোন্ মৌলানা দিনে আড়াই তোলা খেতেন, কোন্ সাহেব-জাদা দুই তোলা, কোন পীর-জাদা এক তোলা আর কোন্ নওয়াব একদম খেতেনই না। অথচ সংস্কৃত আপ্তবাক্য এ বিষয়ে যাঁরা রচনা করেছেন তাঁরা এ এটিকেট আদপেই মানতেন না।'

কর্তা-গিন্নি উভয়েই শুধালেন, 'আপ্ত-বাক্য কি?'

আমি বললুম,—

'পরান্নং প্রাপ্য দুর্বুদ্ধে, মা প্রাণেষু দয়াং কুরু।
পরান্নং দুর্লভং লোকে প্রাণাঃ জন্মনি জন্মনি॥

অর্থাৎ,—

ওরে মূর্খ, নেমন্তন্ন পেয়েছিস, ভালো করে খেয়ে নে। প্রাণের মায়া করিস নি, কারণ ভেবে দেখ, নেমন্তন্ন কেউ বড় একটা করে না। বেশি খেয়ে যদি মরে যাস তাতেই বা কি—প্রাণ তো ভগবান প্রতি জন্মে ফ্রি দেয়, তার জন্য তো আর খর্চা হয় না।'

* * *

আমি বললুম, 'চমৎকার রান্না হয়েছে'—রান্না সত্যই মামুলী রান্নার চেয়ে অনেক ভালো হয়েছিল, পোশাকী রান্না বললেও অত্যুক্তি হয় না। তারপর জিজ্ঞেস করলুম, 'রুশ কায়দায় মাছ কি করে রাঁধতে হয়?'

ফ্রান্ৎসিস্কা বললেন, 'আপনার বুঝি রান্নার শখ?'

আমি বললুম, 'না; তবে আমার মা খুব ভালো রাঁধতে পারেন আর নূতন নূতন দিশী-বিদেশী পদ শেখাতে তাঁর ভারি আগ্রহ। আমি প্রতিবার দেশ-বিদেশ ঘুরে যখন বাড়ি ফিরি তখন সবাই আমাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নানা রকম গল্প শোনে, মাও শোনে, কিন্তু বলার প্রথম ধাক্কা কেটে যাওয়ার পর তিনি আমাকে একলা-একলি শুধান, নূতন রান্না কি কি খেলুম। আমি ভালো ভালো পদগুলোর নাম করলে পর মা শুধাতেন ওগুলো কি করে রাঁধতে হয়। গোড়ার দিকে রন্ধনপদ্ধতি খেয়াল করে শিখে আসতুম না বলে মাকে কষ্ট করে এক্স্পেরিমেন্ট করে করে শেষটায় পদটা তৈরি করার পদ্ধতি বের করতে হত। এখন তাই মোটামুটি পদ্ধতিটা লিখে নিই; মাকে বলা মাত্রই দুই ট্রায়েলের পরই ঠিক জিনিস তৈরি করে দেন।'

ফ্রান্ৎসিস্কা আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'বলেন কি?'

বললুম, 'হ্যাঁ, আশ্চর্য হবারই কথা। আমিও একদিন মাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, তিনি কোনো পদ না দেখে না চেখে তৈরি করেন কি করে? মা বলেছিলেন,—এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে—"আরে বাপু, রান্না মানে তো হয় সেদ্ধ করা, নয় তেলে-ঘিয়ে ভাজা, কিংবা শুকনো শুকনো ভাজা অথবা শিকে ঝলসে নেওয়া। এর-ই একটা, দুটো কিংবা তিনটে কায়দা চালালেই পদ ঠিক উতরে আসবে। আর তুইও তো বলেছিস আমাদের দেশের বাইরে এমন কোনো মশলা জন্মায় না যা এদেশে নেই। তা হলে তুই যা বিদেশে খেয়েছিস, আমি তৈরি করতে পারব না কেন?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তারপর বললুম, 'অবশ্য মা আমাকে কখনো এস্‌পেরেগাস্ কিংবা আর্টিচোক খাওয়ান নি কারণ ওগুলো আমাদের দেশে গজায় না। তাই নিয়ে মায়েরও কোনো খেদ নেই—কারণ যে সব শাক-সব্জী আমাদের দেশে একদম হয় না সেগুলোর কথা আমি মায়ের সামনে একদম চেপে যেতুম।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বুদ্ধিমতী মেয়ে, বললেন, 'ওঃ, পাছে তাঁর দুঃখ থেকে যায়, তিনি তাঁর ছেলের সব প্রিয় খাদ্য খাওয়াতে পারলেন না।'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ। কিন্তু তিনি যে তরো-বেতরো রান্না শেখার জন্য উঠে পড়ে লেগে যেতেন তার আরো একটা কারণ রয়েছে। রান্না হচ্ছে পুরোদস্তুর আর্ট। আর আমার মা—'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'থামলেন কেন?'

আমি লজ্জার সঙ্গে বললুম, 'নিজের মায়ের কথা সত্যি হলেও বলতে গেলে কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেকে। আপনারা হয়তো ভাববেন ফুলিয়ে বলছি।'

নয়রাট এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন, এখন হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'ব্যস! হয়েছে। আপনাকে আর এটিকেট দেখাতে হবে না। ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা আপনাকে বলে নি, এ বাড়িতে এটিকেট বারণ?'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা তাড়াতাড়ি বললেন, 'ছিঃ, পেটার, তুমি ওরকম কড়া কথা কও কেন?'

আমি সঙ্গে সঙ্গে উল্লসিত হয়ে বললুম, 'আদপেই না। ওঁর ধমক থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, আপনারা সরল প্রকৃতির লোক, আপনাদের সামনে সব কিছু অনায়াসে খুলে বলা যায়। তা হলে শুনুন, যা বলেছিলুম, রান্না হচ্ছে পুরোদস্তুর আর্ট বিশেষ আর আমার মা খাঁটি আর্টিস্ট। ঠিক আর্ট ফর আর্টস সেক নয়, অর্থাৎ তিনি মনের আনন্দে খুদ-খুশির জন্য রেঁধেই যাচ্ছেন, কেউ খাচ্ছে না, কিংবা খেয়েও কেউ ভালোমন্দ কিছু বলছে না—তা নয়। তিনি রান্নার নূতন নূতন টেকনিক্ শিখতে ভালোবাসতেন সত্যকার আর্টিস্ট যে রকম নূতন নূতন টেকনিক্ শিখতে ভালোবাসে। আপনি ভালো প্যাস্টেল পেন্টিং করতে পারেন, কিন্তু অয়েলপেন্টিং দেখে কিংবা তার কথা শুনে আপনারও কি ইচ্ছে হবে না সেই টেকনিক্ রপ্ত করার? কিংবা আপনি উড্‌কাট করেন—যদি লাইন এন্‌গ্রেভিং, এচিং, মেদজোটিন্ট, আকওয়াটিন্টের খবর পান, তবে সেগুলোও আয়ত্ত করার বাসনা আপনার হবে না?

'অথচ দেখুন, খাঁটি আর্টিস্ট অজানা জিনিস আয়ত্ত করার জন্য যত উদ্‌গ্রীবই হোক না কেন, হাতের কাছের সামান্যতম মালমশলাও সে অবহেলা করে না—নানা রঙের মাটি, শাক-সব্জী থেকেও নূতন রঙ্ আহরণ করার চেষ্টা করে।

'ভারতবর্ষের যে প্রান্তে আমার দেশ, সেখানে সব সময় জাফরান পাওয়া যায় না। তাই মা তারই একটা "এরজাৎস" সব সময়ে হাতের কাছে রাখেন। বুঝিয়ে বলছি—

'আমাদের দেশে এক রকম ফুল হয় তার নাম শিউলি। শিউলির বোঁটা সুন্দর কমলা রঙের আর পাপড়ি সাদা। ফুল বাসি হয়ে গেলে মা সেই বোঁটাগুলো রোদ্দুরে শুকিয়ে বোতলে ভরে রাখেন। সেই শুকনো বোঁটা গরম জলে ছেড়ে দিলে চমৎকার সুগন্ধ আর কমলা রঙ বেরয়। মেয়েরা সাধারণত ঐ রঙ দিয়ে শাড়ি ছোপায়। মা খুব সরু চালের ভাত ঐ রঙে ছুপিয়ে নিয়ে চিনি, কিসমিস, বাদাম দিয়ে ভারি সুন্দর 'মিঠাখানা' তৈরি করেন।

'এটা মায়ের আবিষ্কার নয়। কিন্তু তবু যে বললুম, তার কারণ প্রকৃত গুণী কলাসৃষ্টির

www.BanglaBook.org

জন্য দেশী-বিদেশী কোনো উপকরণ অবহেলা করেন না।'

নয়রাটদের বাড়িতে এটিকেট বারণ, তবু আপন মায়ের কথা একসঙ্গে এতখানি বলে ফেলে কেমন লজ্জা পেলুম।

* * *

রুশ কবি পুশ্‌কিনের রচিত একটি কবিতার সারমর্ম এই,—

'হে ভগবান, আমার প্রতিবেশীর যদি ধনজনের অন্ত না থাকে, তার গোলাঘর যদি বারো মাস ভর্তি থাকে, তার সদাশয় সচ্চরিত্র ছেলেমেয়ে যদি বাড়ি আলো করে, তার খ্যাতি-প্রতিপত্তি যদি দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে, তবু তাতে আমার কণামাত্র লোভ নেই; কিন্তু তার দাসীটি যদি সুন্দরী হয় তবে—তবে, হে ভগবান, আমাকে মাপ করো, সে অবস্থায় আমার চিত্তচাঞ্চল্য হয়।'

পুশ্‌কিন সুশিক্ষিত, সুপুরুষ এবং খানদানী ঘরের ছেলে ছিলেন, কাজেই তাঁর 'চিত্তদৌর্বল্য' কি প্রকারের হতে পারত সেকথা বুঝতে বিশেষ অসুবিধে হয় না। এইবারে সবাই চোখ বন্ধ করে ভেবে নিন কোন্ জিনিসের প্রতি কার দুর্বলতা আছে।

আমি নিজে বলতে পারি, সাততলা বাড়ি, ঢাউস মোটরগাড়ি, সাহিত্যিক প্রতিপত্তি, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এ সবের প্রতি আমার কণামাত্র লোভ নেই। আমার লোভ মাত্র একটি জিনিসের প্রতি—অবসর। যখনই দেখি, লোকটার দু'পয়সা আছে অর্থাৎ পেটের দায়ে তাকে দিনের বেশির ভাগ সময় এবং সর্বপ্রকারের শক্তি এবং ক্ষমতা বিক্রি করে দিতে হচ্ছে না তখন তাকে আমি হিংসে করি। এখানে আমি বিলাসব্যসনের কথা ভাবছি নে পেটের ভাত '—'র[১] কাপড় হলেই হল।

অবসর বলতে আমি কুঁড়েমির কথাও ভাবছি নে। আমার মনে হয়, প্রকৃত ভদ্রজন অবসর পেলে আপন শক্তির সত্য বিকাশ করার সুযোগ পায় এবং তাতে করে সমাজের কল্যাণলাভ হয়। এই ধরুন, আমার বন্ধু 'শ্রী 'ক' দাশগুপ্ত। বদ্যির ছেলে—পেটে অসীম এলেম, তুখোড় ছোকরা, তালেবর ব্যক্তি। সদাগরী আপিসে কর্ম করে, বড় সাহেবকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়—মোটা তন্‌খা ভী পায়।

বয়স তার এখনো তিরিশ পেরোয় নি। পার্টিশনের পর মারোয়াড়ি কারবারীরা যখন 'বস্'কে ঘায়েল করে ব্যবসা কেনবার জন্য উঠে পড়ে লাগল, তখন আমার এই বদ্যির ব্যাটা সায়েবকে এমন সব 'কৌশল' বাতলালে যে উল্টে ওনারা চোখের জলে নাকের জলে।

সায়েবও বড় নেমকহালাল[২] লোক। প্রায়ই 'হ্যালো, ড্যাস্-গুপ্টা' বলে বাড়িতে ঢোকেন, 'লৌচি' (লুচি) খেয়ে যান, ড্যাস্-গুপ্টার ছেলেদের জন্য পূজার বাজারে দু'চারখানা 'ডৌটি' (ধুতিও)ও রেখে যান। আমি বরাবর সকলটা দাশগুপ্তের বাড়িতে

---

১ শব্দটা গ্রাম্য; কিন্তু পূজনীয় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অভিধানে শব্দটিকে অবহেলা করেন নি বলে আমি ড্যাস দিয়ে সারলুম। তিনি গুরুজন—তাঁর শাস্ত্রাধিকার আছে।

২ 'নেমকহারাম' অর্থাৎ 'অকৃতজ্ঞ', সমাসটা বাংলায় চলে। 'নেমকহালাল' ঠিক তার উল্টো অর্থাৎ 'কৃতজ্ঞ'। 'নেমকহারাম' 'নেমকহালাল' কথাগুলা কিন্তু 'কৃতজ্ঞ' 'অকৃতজ্ঞে'র চেয়ে জোরদার। 'নমক' = 'নুন'—তার 'অপমান' (হারাম) কিম্বা 'সম্মান' (হালাল)।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাটাই, তাই সায়েবের সঙ্গে মাঝে মাঝে মোলাকাত হয়ে যায়। লোকটি এদেশে-আসা সাধারণ ইংরেজদের মত গাড়ল নয়, ইংরিজি শোলোক খাসা কপচাতে পারে, অর্থাৎ মধুরকণ্ঠে উচ্চ-স্বরে শেলি-কীটস্ আবৃত্তি করতে পারে।

সায়েবের কথা উপস্থিত থাক। দাশগুপ্তের কথায় ফিরে যাই।

আমি জানি দাশগুপ্ত কোনো চেম্বার অব্ কমার্সের বড়কর্তা হবার জন্য লালায়িত নয়। দেড় হাজার টাকার মাইনেকেও সে থোড়াই কেয়ার করে।

আমি জানি, আজ যদি তাকে কেউ পাঁচশ টাকা প্রতি মাসে দেয়, তবে সে কলকাতা শহরের হেথা-হোথা সর্বত্র দশখানা নাইট স্কুল খুলবে। এখন সে আপিসে দিনে সাতঘণ্টা কাটায়—নাইট স্কুল খোলবার মোকা পেলে সে পরমানন্দে দিনে চোদ্দ ঘণ্টা সেগুলোর তদারকিতে, ক্লাস নেওয়াতে কাটাবে। বিশ্বাস করবেন না, সে তার উড়ে চাকরটাকে স্বাক্ষর করার জন্য উড়ে কায়দায় বর্ণমালা পর্যন্ত শিখিয়েছে—চোখ বন্ধ করে মাথা দুলিয়ে দিব্য বলে যায়,—

'ক'রে কমললোচন শ্রীহরি।
করেন শঙ্খ-চক্রধারী॥
'খ' রে খগ-আসনে খগপতি।
খটস্তি লক্ষ্মী-সরস্বতী॥
'গ' রে গরুড়—ইত্যাদি—

(আমার সহৃদয় উড়িষ্যাবাসী পাঠকবৃন্দ যেন কোনো অপরাধ না নেন—যদি নামতাতে কোনো ভুল থেকে যায়; আমি দাশগুপ্তের মুখে মাত্র দু'তিনবার শুনেছি; কেউ যদি আমাকে পুরো পাঠটা পাঠিয়ে দেন, তবে বড় উপকৃত হই)।

অর্থাৎ আজ যদি দাশগুপ্তকে পেটের ধান্দায় আপিস না যেতে হয়, তবে সে তার জীবন্মৃত্যুর চরম কাম্য কাজে ফলাতে পারবে। ক ক'লক্ষ মণ পাট কিনল, কে ধাপ্পা এবং ঘুষ দিয়ে ক'খানা ওয়াগন বাগালে তাতে দাশগুপ্তের কোনো প্রকারের চিত্তদৌর্বল্যও (হেথাকার ভাষায় 'দিল্‌চস্‌পী') নেই। দেড় হাজার টাকার মাইনে কমে গিয়ে পাঁচশ হলে সে দুম করে মোটরখানা বিক্রি করে দিয়ে ট্রামে চড়ে ইস্কুলগুলোর তদারক করবে।

আপনি বিচক্ষণ লোক, আপনি শুধাবেন, এ পাগলামি কেন?

এটা পাগলামি নয়।

আসলে দাশগুপ্ত ইস্কুল মেস্টার। তার বাবা টোলে আয়ুর্বেদ শেখাতেন, তার ঠাকুরদাও তাই, তাঁর বাপও তাই, তাঁর উপরের খবর জানি নে।

এবং আমার সুহৃদ যে কী অদ্ভুত ইস্কুল-মেস্টার সে কথা কি করে বোঝাই? চাকরির ঝামেলার মধ্যিখানেও সে একটা নাইট ইস্কুল চালায়।

একদিন ফুটপাতে দাঁড়িয়ে দেখি, সে তার ইস্কুলে ইংরেজি পড়াচ্ছে। চেঁচিয়ে বলছে, 'আই গো!'

ছোঁড়ারা তীব্রকণ্ঠে ঐক্যস্বরে বলছে, 'আই গো!'

'উই গো!'

'উই গো!'

'ইউ গো!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ইউ গো!'

'উই গো!'

'হী গোজ!'

'হী গোজ!'

'রাম গোজ!'

'রাম গোজ!'

'শ্যাম গোজ!'

'শ্যাম গোজ!'

দাশগুপ্ত সর্দার-পোড়োর মত বলে যাচ্ছে আর ছোঁড়ারা চিৎকার করে দোহার গাইছে।

সর্বশেষে দাশগুপ্ত লাফ দিয়ে উচ্চতম কণ্ঠে চেঁচাল, 'রাম অ্যান্ড শ্যাম গো গো গো!'

দাশগুপ্তের স্বপ্ন কখনো বাস্তবে পরিণত হবে না। এমন দিন কখনো আসবে না যে, সে পেটের চিন্তার ফৈসালা করে নিয়ে তামাম শহর নাইট স্কুলে নাইট স্কুলে ছয়লাপ করে দিতে পারে।

দাশগুপ্তের কথা যাক। আমি তার উল্লেখ করলুম নয়রাট-জীবনীটা তুলনা দিয়ে খোলসা করার জন্য।

ইয়োরোপে এ জিনিসটা হামেশাই হচ্ছে।

নয়রাট মেট্রিক পাস করেন ১৮ বছর বয়সে, সংসারে ঢোকেন ১৯ বছর বয়সে। তারপর ঝাড়া ছাব্বিশটি বছর ব্যবসা-বাণিজ্য করে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে দেখেন এতখানি পুঁজি জমেছে যে, বাকী জীবন তাঁকে আর সংসার-খরচের জন্য ভাবতে হবে না।

নয়রাটের ভাষাতেই বলি,

'টাকা জমানোর নেশা আমাকে কখনো পায় নি। আমি জানি এ দুনিয়ার বহু লোকই আমার ধারণা নিয়ে সংসারে ঢোকে কিন্তু বেশির ভাগই শেষ পর্যন্ত ধর্মচ্যুত হয়। জীবনে আমার কতকগুলো শখ ছিল—কিন্তু হিসেব করে দেখলুম, সেগুলো বাগে আনতে হলে পেটের একটা ফৈসালা পয়লাই করে নিতে হবে। তাই খাটলুম ছাব্বিশ বছর ধরে একটানা। আমার অসুখবিসুখ করে না, আমি একদিনের তরে কাজে কামাই দিই নি—ঐ শুধু বিয়ের সময় যে সাতদিন হনিমুনে কাটাই বাধ্য হয়ে তারই জন্য ছুটি নিতে হয়েছিল।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'তা ছুটি নিয়েছিলে কেন? আমি বলি নি, তোমার আপিস-ঘরে, কিম্বা সেখানে জায়গা না হলে তোমার গুদোমঘরে পাদ্রী ডেকে মন্ত্র পড়লেই হবে।'

নয়রাট বললেন, 'অন্য মতলব ছিল, ডার্লিং, তোমাকে তো আর সব কিছু খুলে বলি নি।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'বটে!'

নয়রাট আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনাকে খুলে কই।

'বিয়ে করেই বউকে নিয়ে চলে গেলুম এক অজ পাড়াগাঁয়ে। সে গাঁ'টা খুঁজে বের করতে আমার বেশ বেগ পেতে হয়েছিল এবং সে গাঁ থেকেও আধ মাইল দূরে একটি 'শালে' ভাড়া নিলুম সাতদিনের জন্য। সেখানে ইলেকট্রিক আছে—ব্যস্‌ আর কিছু না। জলের কল না, খবরের কাগজ না, দুধওয়ালা দুধ পর্যন্ত দিয়ে যায় না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'রাত্তিরের ডিনার খেয়েই আমরা সে বাড়িতে গিয়ে উঠলুম।

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বাড়িতে ঢুকেই সোহাগ করে বললে—'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'চোপ্‌।'

নয়রাট বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা' চোপ্‌।' তারপর আমাকে বললেন, 'আচ্ছা, তাহলে কমিয়ে-সমিয়ে বলছি—বাদবাকিটা পরে আপনাকে একলাএকলি বলব।'

'ভোর তিনটের সময় আমি চুপসে খাট ছেড়ে উঠে পা টিপে টিপে নামলুম নিচের তলায়। পিছনের বাগানে গিয়ে সেখান থেকে জল সংগ্রহ করে গেলুম রান্নাঘরে। সেখানে নাকে-মুখে বিস্তর ধুঁয়ো গিলে ধরালুম উনুন। তারপর বেকন ফ্রাই করে, গরম কফি, টোস্ট ইত্যাদি বানিয়ে যাবতীয় বস্তু একখানা বিরাট খুঞ্চাতে সাজিয়ে গেলুম উপরের তলায় ফ্রান্‌ৎসিস্‌কার বিছানার কাছে। আস্তে আস্তে জাগিয়ে বললুম, "ব্রেকফাস্ট তৈরি।"

'ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললে (আবার "চোপ" এবং "আচ্ছা, আচ্ছা, চোপ্‌" শোনা গেল), "ডার্লিং" তুমি আমাকে কত ভালোবাসো—এই ভোরে এই শীতে আমাকে কিছু না বলে তুমি এত সব করেছ।" '

'আমি বললুম, "ডার্লিং না কচু, ভালোবাসা না হাতি। আমি এসব তৈরি করে আনলুম শুধু তোমাকে দেখাবার জন্য যে, বাদবাকি জীবন তোমাকে এই রকম ধারা করতে হবে। আর আমি শুয়ে শুয়ে ব্রেকফাস্ট খাবো।"'

আমি প্রাণ খুলে হাসলুম।

দেখি নয়রাটও মিটিমিটিয়ে হাসছেন। ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'আপনি এই তাড়িখানার বেহুদা প্রলাপটা বিশ্বাস করলেন?'

আমি বললুম, 'কেন করব না? শাদীর পয়লা রাতে শুধু ইরানেই নয়, আরো মেলা দেশে মেলা বর বেড়াল মেরেছে, এ তো আর নূতন কথা কিছু নয়। এবারে সুইস সংস্করণটি শেখা হল এই যা।'

দুজনেই জিজ্ঞেস করলেন, 'সে আবার কি?'

আমাকে বাধ্য হয়ে শাদীর পয়লারাতে বেড়াল মারার গল্পটা বলতে হল, কিন্তু নয়রাটের মত জমাতে পারলুম না—রসিয়ে গল্প বলা আমার আসে না, সে আমার বন্ধুবান্ধব সকলেই জানেন।

দুজনেই স্বীকার করলেন, ইরানী গল্পটাই ভালো।[৩]

তখন ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'পেটারের বকুনিতে অনেকগুলো ভুল রয়েছে। প্রথমত আমরা হনিমুন যে বাড়িতে কাটাই, সেখানে গ্যাস ছিল, উনুন ধরাবার কথাই ওঠে না, দ্বিতীয়ত পেটার কক্‌খনো ব্রেকফাস্ট খায় না এবং সর্বশেষ বক্তব্য, যে-ব্রেকফাস্টের বর্ণনা সে দিল সেটা ইংলিশ ব্রেকফাস্ট। কোনো কন্‌টিনেন্টাল শূয়ারের মতো ব্রেকফাস্টের সময় একগাদা বেকন আর আণ্ডা গেলে না। পেটার গল্পটা শুনেছে নিশ্চয়ই কোনো ইংরেজের কাছ থেকে, আর সেটা পাচার করে দিলে আপনার উপর দিয়ে।'

পেটার বললেন, 'রেমব্রান্ট একবার এক ভদ্রলোকের মায়ের পট্রেট এঁকেছিলেন। ভদ্রলোক ছবি দেখে বললেন, 'তাঁর মায়ের সঙ্গে মিলছে না। রেমব্রান্ট বললেন, "একশ

---

৩ 'পঞ্চতন্ত্র ১ম পর্ব, দ্রষ্টব্য।

www.BanglaBook.org

বছর পর আপনার মায়ের সঙ্গে কেউ এ ছবি মিলিয়ে দেখবে না—তারা দেখবে ছবিখানি উতরেছে কিনা।" '

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গল্পটি ভালো কি না সেইটেই হচ্ছে আসল কথা। ঘটেছিল কি না, সে প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর; আপনি কি বলেন?'

আমি বললুম, 'সুন্দর-ই সত্য—না ঘটলেও ঘটা উচিত ছিল।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'বটে!'

নয়রাট বললেন, 'আমার শখ ছিল দাবা-খেলাতে এবং সে ব্যসনে মেতে আমার কত সময়-সামর্থ্য বরবাদ গিয়েছে তার হিসেব-নিকেশ আমি কখনো করি নি। দাবা-খেলা আমি আরম্ভ করি সাত বছর বয়সে। আমার বাবা কাকা দুজনেই পাঁড় দাবাড়ে ছিলেন আর কাকা রোজ রাত্তিরে বাবার সঙ্গে দাবা খেলতে আসতেন। এক রাত্রে আসতে পারলেন না জোর বরফের ঝড় বইছিল ব'লে, আর ওদিকে বাবা তো মৌতাতের সময় হন্যে হয়ে উঠলেন। আমি থাকতে না পেরে বললুম, "তা আমার সঙ্গেই খেলো না কেন?" বাবা তো প্রথমটা হেসেই উড়িয়ে দিলেন, কিন্তু জানেন তো, দাবার নেশা কী নিদারুণ জিনিস—বরঞ্চ মদের মাতাল খুনীর সঙ্গে এক টেবিলে মদ খেতে রাজী হবে না, দাবার মাতাল তার সঙ্গে খেলতে কণামাত্রও আপত্তি জানাবে না। বাবা অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে খেলতে বসলেন, প্রথম দু'বাজি জিতলেনও কিন্তু তৃতীয় বাজি হল চালমাত এবং তারপর তিনি আর কখনো জেতেন নি। তবে তাঁর হল বুড়ো হাড়, এখনো খুব শক্ত শক্ত চালের চমৎকার চমৎকার উত্তর বাতলে দিতে পারেন।'

আমার আশ্চর্য লাগল, কারণ শরৎ চাটুজ্জেও কৈলাস খুড়োর বর্ণনাতেও ঐ কথাই বলেছেন; খুড়োর শেষ বয়সে আটপৌরে খেলা ভুলে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু কঠিন সমস্যা সমাধানের জন্য খেলোয়াড়রা তাঁর কাছে যেত। সে কথাটা নয়রাটকে বলতে তিনি বললেন, 'অতিশয় হক্ কথা। পৃথিবীতে মেলা ধর্ম আছে—তাই ক্রীশ্চান, জু এবং দাবাড়ে। দাবাখেলা ধর্মের পর্যায়ে পড়ে, আর যারাই এ ধর্ম মানে তারা সব-ভাই-সব-ব্রাদার। দাবাড়েদের "পেন্‌ফ্রেন্ড" পৃথিবীর সর্বত্র যে রকম ছড়ানো তার সঙ্গে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের তুলনা হয় না।'

তারপর বললেন, 'সেই যে বাবা দাবা ধরিয়ে দিলেন তারপর ওর হাত থেকে আমি আর রেহাই পাই নি। একবার এক পাঁড় মাতালকে বলতে শুনেছিলুম, সে নাকি জীবনে মাত্র একবার মদ খেয়েছে। আমরা সবাই আসমান থেকে পড়লুম, উল্লুকটা বলে কি—উদ্‌ভ্রান্ত যে লোকটা "ট্যানিসে"র উপর থাকে, সে কি না জীবনে কুল্লে একটিবার মদ খেয়েছে! বেহেড মাতাল এরেই কয়। তখন মাতাল বললে সে মদ খেয়েছে একবারই—তারপর থেকে এ অবধি শুধু তার খোঁয়ারিই ভাঙছে।'

আমি বললুম, 'ওমর খৈয়াম এ বাবদে যা নিবেদন করেছেন সেটা ঠিক হুবহু এর সঙ্গে খাপ খায় না, তবু অনেকটা এরই কান ঘেঁষে। খৈয়াম বলেছেন, "রোজার পয়লা রাত্রিতে অ্যায়সা পীনা পীউংগা যে তারই নেশার রেশটাতে কেটে যাবে রোজার ঝাড়া পুরো মাসটা। হুঁশ হবে ঈদের দিন। ঈদ মানে পরব (পরব par excellence), পরব মানতে হয়, না হলে জাত যাবে, ধর্ম যাবে, তাই তখন ফের বসে যাব সুরাহী পেয়ালা প্রিয়া নিয়ে।" তারপর খৈয়াম কি করেছিলেন সে হদিস তাঁর রুবাইতে মেলে না, তবে বিবেচনা করি, দুসরা

www.BanglaBook.org

রমজান তক্ তিনি তাঁর কায়দা-কানুনে কোনো রদ্‌বদল করেন নি।'[৪]

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা এতক্ষণ কোন কথা বলেন নি। এখন বললেন, 'আমি তো এ রুবাই ফিটজিরাল্ডে পাই নি। আপনি কি ফার্সীতে পড়েছেন?'

আমি বললুম, 'ফিটজিরাল্ড তো তর্জমা করেছেন মাত্র বাহাত্তর না বিরাশীটি রুবাইয়াৎ। ওমরের নামে প্রচলিত আছে আট শ' না এক হাজার, আমি ঠিক জানি নে। তবে এ রুবাইটি আপনি নিশ্চয়ই হুইনসফিল্ড কিংবা নিকোলার অনুবাদে পাবেন। ওঁরা ওমরের প্রায় কোনো রুবাই[৫]-ই বাদ দেন নি।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা শুধালেন, 'আপনি যে বললেন, "ওমরের নামে প্রচলিত রুবাইয়াৎ" তার অর্থ কি? আপনি কি বলতে চান, এগুলো ওমরের রচনা নয়?'

আমি বললুম, 'গুণীদের মুখে শুনেছি, ওমরের বেশির ভাগ রুবাইয়াতের মূল বক্তব্য ছিল, "এই বিরাট বিশ্ব-সংসার কোন্ নিয়মে চলে, কি করলে ঠিক কর্ম করা হয় এসব বোঝা তোমার আমার সাধ্যের বাইরে। অতএব যে দু'দিন এ সংসারে আছ সে দু'দিন ফুর্তি করে নাও; মরার পর কে কোথায় যাবে, কি হবে, না হবে তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই।" তারপর থেকে অন্য যে কোনো কবি এই মতবাদ প্রচার করে নূতন রুবাই লিখতেন তিনি তক্ষুনি সেটা ওমরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতেন। তার কারণও সরল। ওমর রাজানুগ্রহ পেয়েছিলেন, প্রধান মন্ত্রী নিজাম-উল-মুলুকও ছিলেন তাঁর ক্লাসফ্রেন্ড। তাই তিনি নির্ভয়ে ইসলাম-বিরোধী এই চার্বাকী মতবাদ প্রচার করে যেতে পেরেছিলেন; কিন্তু পরের আমলে আর সব কবির সৌভাগ্য তা হয় নি—তাঁরা মোল্লাদের বিলক্ষণ ডরাতেন। তাই তাঁরা তাঁদের বিদ্রোহী মতবাদ ওমরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আপন প্রাণ বাঁচাতেন—ওদিকে যা বলবার তাও প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে যেতেন।

তাই দেখতে পাবেন, হাফিজের (এবং অন্য আরও কয়েক কবির) দিওয়ানে (তথাকথিত 'কম্‌প্লীট ওয়ার্কসে') ওমরের কবিতা, আবার ওমরের দিওয়ানে হাফিজের কবিতা। এ জট ছাড়িয়ে ওমরের কোন্‌গুলো, হাফিজের কোন্‌গুলো সে বের করা আজকের দিনে অসম্ভব।'

নয়রাট বললেন, 'আপনাদের ওমর কোনো কম্মের নয়। তার স্বর্গপুরীর বর্ণনাতে তিনি বলেছেন,

"সেই নিরালা পাতায়-ঘেরা
বনের ধারে শীতল ছায়
খাদ্য কিছু, পেয়ালা হাতে,
ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়।
মৌন ভাঙ্গি তার কাছেতে
গুঞ্জে তবে মঞ্জু সুর
সেই তো সখি, স্বর্গ আমার,
সেই বনানী স্বর্গপুর।"

BanglaBook.org

৪ সুফীরা মদ্য 'ভগবদ্-প্রেম' অর্থে ব্যাখ্যা করেন।

৫ 'রুবাই' একবচন, 'রুবাইয়াৎ' বহুবচন।

www.BanglaBook.org

'অত সব বায়নাক্কার কী প্রয়োজন!

'এক দাবাতেই যখন তাবৎ কিস্তি মাত হয়?'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা শুধালেন, 'ওমর সম্বন্ধে নানারকমের আজগুবী গল্প শোনা যায়—আমার মন সেগুলো মানতে রাজী হয় না, কিন্তু সেগুলো মানা না-মানার চেয়েও বড় প্রশ্ন, খুদ সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে, ইসলামের মত কট্টর ধর্মাবলম্বীদের দেশে তিনি তাঁর বিদ্রোহ জাহির করলেন কোন্ সাহসে? বুঝলুম না হয় রাজা আর প্রধানমন্ত্রী তাঁকে রক্ষা করছিলেন কিন্তু সেইটেই তো শেষ কথা নয়। সে যুগে দেশের পাঁচজন কি ভাবতো না ভাবতো তার হয়ত খুব বেশি মূল্য ছিল না কিন্তু মোল্লা সম্প্রদায়? সে যুগের রাজারাও তো ওদের সঙ্গে চলতেন।'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, কিন্তু ভেবে দেখুন তো, রাজাতে পোপেতে যদি ঝগড়া লাগে তবে শেষ পর্যন্ত কি হয়? হুকুম চালাবার জন্য রাজারা সৈন্যের উপর নির্ভর করেন। সৈন্যরা যদি রাজার প্রতি সহানুভূতি রাখে তবে তারা হুকুম পাওয়া মাত্রই মোল্লাদের ঠ্যাঙাতে রাজী; পক্ষান্তরে তারা যদি মোল্লাদের মতবাদে বিশ্বাস রাখে তবে তারা বিদ্রোহ করে, অর্থাৎ রাজাকে ধরে ঠ্যাঙায়।

'এ তো হল কমন-সেন্স। তাই এস্থলে প্রশ্ন ইরানের লোক সে আমলে কতখানি ইসলাম-অনুরাগী ছিল?

'ইতিহাস থেকে আমার যেটুকু জ্ঞান হয়েছে—কিন্তু থাক, এসব কচকচানি হয়ত হ্যার নয়রাট পছন্দ করছেন না—'

নয়রাট বললেন, 'ফের এটিকেট? আর এটিকেট হলই বা—আমি আপনার বক্তব্যটা শুনছি ইন টার্মস্ অব্ চেস্। আপনি এখন ওপনিং গেম্ আরম্ভ করেছেন, তারপর মিড্ গেম্ আসবে—আমি দেখছি আপনি ঘুঁটিগুলো কি কায়দায় এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন—যা বলছিলেন বলে যান।'

আমি বললুম ইরানের সভ্যতা সংস্কৃতি আরবদের চেয়ে বহু শত বৎসরে খানদানী। ইরান ইসলাম প্রচারের বহু পূর্বেই রাজ্য-বিস্তার করতে গিয়ে গ্রীসের সঙ্গে লড়েছে, ভারতের পশ্চিম-সীমান্ত দখল করেছে, মিশরীদের সঙ্গে টক্কর দিয়েছে, রোমানদের বেকাবু করেছে, অর্থাৎ রাষ্ট্র হিসেবে ইরান বহু শত বৎসর ধরে পৃথিবীর পয়লা শক্তি হিসেবে গণ্য হয়েছে। পৃথিবীর সম্পদ ইরানে জড়ো হয়েছিল বলে ইরানীরা যে স্থাপত্য, যে ভাস্কর্য নির্মাণ করেছিল তার সঙ্গে তুলনা দেবার মতো কলানিদর্শন আজও পৃথিবীতে খুব বেশি নেই। আর বিলাসব্যসনের কথা যদি তোলেন তবে আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস ইরানীরা যে রকম পঞ্চেন্দ্রিয়ের পূর্ণতম আনন্দ গ্রহণ করেছে সেরকম ধারা তাদের পূর্বে বা পরে কেউ কখনো করতে পারে নি।

'এই ধরুন না, আরব্য-উপন্যাস। অথচ বেশির ভাগ গল্পে যে ছবি পাচ্ছেন সেগুলো আরবের নয়, ইরানের—আমার ব্যক্তিগত 'ফেন্সি' মত নয়, পণ্ডিতেরা এ কথাই বলেন।

'মনে পড়ছে সেই গল্প?—যেখানে এক সুন্দরী তরুণী এসে এক ঝাঁকামুটেকে নিয়ে চলল হরেক রকমের সওদা করতে। মাছমাংস ফলমূল কেনার পর সে তরুণী যে সব সুগন্ধি দ্রব্য কিনল তার সব কটা জিনিসের অনুবাদ কি ইংরিজি, কি ফরাসি, কি বাঙলা কোনো ভাষাতেই সম্ভব হয় নি—কারণ, এসব জিনিসের বেশির ভাগই আমাদের অজানা। এমন কি

www.BanglaBook.org

আজকের দিনের আরবরা পর্যন্ত সে-সব বস্তু কি, বুঝিয়ে বলতে পারে না। তুলনা দিয়ে বলছি, আজকের দিনে প্যারিসে যে পাঁচশ' রকমের সেন্ট বিক্রি হয় সেগুলার বয়ান, ফিরিস্তি, অনুবাদ কি এস্‌কিমো ভাষায় সম্ভবে?

'ইরানের তুলনায় সে-যুগে আরবরা ছিল প্যারিসের তুলনায় অনুন্নত—অর্থাৎ সভ্যতা-সংস্কৃতি নিম্ন পর্যায়ে। সেই আরবরা যখন ধর্মের বাঁধনে একজোট হয়ে ইরানে হানা দিল তখন বিলাস-ব্যসনে ফুর্তি-ফার্তিতে বে-এক্তেয়ার ইরানীরা লড়াইয়ে হেরে গেল। আপনাদের ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত দিতে গেলে গ্রীস-রোমের কাহিনী বলতে হয়, সে কাহিনী আমরা বলার প্রয়োজন নেই। সেটা হবে "সুইটজারল্যান্ডে ঘড়ি আনার মত"।

'ইরানীরা মুসলমান হয়ে গেল, কেন হল সে-কথা আরেকদিন হবে, যারা হতে চাইল না অথচ জানত দেশে থাকলে অর্থনীতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে একদিন হতেই হবে, তারা পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিল আমার দেশ ভারতবর্ষে—সে ইতিহাসও এস্থলে অবান্তর।

'আরবরা মরুভূমির সরল, প্রিমিটিভ মানুষ; তারা ইরানের বিলাসব্যভিচার দেখে স্তম্ভিত—"শক্‌ট্", "আউট-রেজ্‌ড্"। আবার ইরানীরাও আরবদের বেদুইন ধরন-ধারণ দেখে ততোধিক স্তম্ভিত এবং "শক্‌ট্"।

'তদুপরি আরেকটা কথা ভুললে চলবে না, আরবরা সেমিটি বংশের (ইহুদী গোত্রের সঙ্গে তাদের 'মেলে'), আর ইরানীরা আর্য। জীবনাদর্শ ভিন্ন ভিন্ন; ধর্ম এক হলে কি হয়? প্যারিসের ক্রীশ্চান আর নিগ্রো ক্রীশ্চান কি একই ব্যক্তি?

'এইবার মোদ্দা কথায় ফিরে যাই; ইরানীরা মুসলমান হল বটে (এবং এদের অনেকেই খাঁটি মুসলিম) কিন্তু তাদের মজ্জাগত মদ্যাদি পঞ্চ'মকার ছাড়তে পারলো না। তাই ইরানের জনসাধারণ ওমরের মধ্য-দর্শনবাদ খুশিসে বরদাস্ত করে নিল।

'দেশের লোক যখন গোপনে গোপনে মদ খায় তখন রাজার আর কি ভাবনা? মোল্লারা যা বলে বলুক, যা করে করুক—এবং একথাও রাজার অজানা ছিল না যে, বহু লোক আপন হারেমে বসে ঐতিহ্যগত মদ্যপানে কার্পণ্য করেন না।

'তাই ওমর বেঁচে গেলেন, রাজাও কোনো মুশকিলে পড়লেন না।'

* * *

নয়রাট বললেন, 'আপনাদের ওমর খৈয়াম যা আমার ট্যুনিস-শেল্‌ও তা।'

আমি ঠিক বুঝতে না পেরে শুধালুম, 'ট্যুনিস-শেল্ নিয়ে তো সব রসিকতার গল্প, আর খৈয়াম তো রচেছেন চতুষ্পদী।'

নয়রাট বললেন, 'মিলটা অন্য জায়গায়। আপনিই বললেন না, দুনিয়ার যত ঈশ্বর-বিদ্রোহী, মধ্যোৎসাহী চতুষ্পদী—তা সে ওমরের হোক, হাফিজের হোক, আত্তারের হোক, সব কটা এসে জুটেছে ওমরের চতুর্দিকে, ঠিক তেমনি রসিকতার গল্পে নায়ক যদি মাত্র দুজন হয়, আর তার একজন আর একজনের উপর টেক্কা মারার চেষ্টা করে তবে শেষ পর্যন্ত সেগুলো ট্যুনিস-শেলের নামে চালু হবেই হবে। এগুলোকে তাই সাইক্‌ল্ (চক্র) বলা হয়। ওমর সাইক্‌ল্, ট্যুনিস-শেল সাইক্‌ল্ কিম্বা পল্‌ডি সাইক্‌ল্। ওমর যেরকম ইরানের, ট্যুনিস-শেল্ তেমনি জর্মনীর কলোন শহরের আবার পল্‌ডি সুইটজারল্যান্ডের। আপনাদের ভারতবর্ষে এরকম সাইক্‌ল্ আছে?'

আমি বললুম, 'এস্তার! হর-পার্বতী সাইক্‌ল্, গোপালভাঁড় সাইক্‌ল্, শেখ চিল্লী

www.BanglaBook.org

সাইক্‌ল্ এবং আরো বিস্তর। কিন্তু পল্‌ডি সাইক্‌লের বিশেষত্ব কি?'

নয়রাট বললেন, 'পল্‌ডি হলেন অতিশয় খানদানী ঘরের ছেলে, উত্তম বেশভূষায় ছিমছাম না হয়ে বেরোন না, সকলের সঙ্গে অতিশয় ভদ্র ব্যবহার—এ তো সব হল; কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, তিনি একটি পয়লা নম্বরের বক্কেশ্বর, আনাড়ির চূড়ামণি—বে-অকুফের শিরোমণি। দু-একটা উদাহরণ দিচ্ছি—'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'কিন্তু প্লীজ, অশ্লীলগুলো না।'

নয়রাট বেদনাতুরতার ভান করে বললেন, 'ফ্রান্‌ৎসিস্‌কাকে নিয়ে ঐ তো বিপদ। একশ বার বোঝাবার চেষ্টা করেছি, শ্লীল-অশ্লীল—একেবারে স্বতঃসিদ্ধরূপে, অর্থাৎ perse—পৃথিবীতে নেই, যেরকম নিজের থেকে 'ডার্ট'' বা ময়লা বলে কোন জিনিস হয় না। অস্থানে পড়লেই জিনিস ডার্ট হয়। ডাস্টবিনের ভিতরকার ময়লা ময়লা নয়—একথা কেউ বলে না, ''ডাস্টবিন ময়লা হয়ে গিয়েছে, ওটা সাফ করো'', বলে, ''ডাস্টবিন ভর্তি হয়ে গিয়েছে।'' ঠিক তেমনি সুন্দরীর ঠোঁটের উপর লিপস্টিক ডার্ট নয়, কিন্তু যদি সেই লিপস্টিক আমার গালে লেগে যায়—'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'পেটার! আবার!'

আমার মনে হল, ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বাড়াবাড়ি করছেন, তাই নয়রাটকে সমর্থন করার জন্য গুনগুন করলুম,

'অধরের তাম্বুল বয়ানে লেগেছে
ঘুমে ঢুলুঢুলু আঁখি'

দুজনেই জিজ্ঞেস করলেন, 'মানে?'

আমি সালঙ্কার সবিস্তর নন্দকুমার গণ্ডে চন্দ্রাবলীর তাম্বুলরাগের বর্ণনা দিলুম।

নয়রাটকে আর পায় কে?—চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে বললেন, 'শুনলে, গিন্নি শুনলে? শ্রীকৃষ্ণ ভারতীয়দের স্বয়ং ভগবান, আমাদের যেরকম যীশুখ্রীষ্ট। তিনি যদি রাধা ভিন্ন অন্য রমনীকে দয়া দেখাতে পারেন, তবে আমার গালে কিংবা ইভনিং শার্টে লিপস্টিক আবিষ্কার করলে তুমি মর্মাহত হও কেন?'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বাধা দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী ঢিড্ মিথ্যেবাদী রে, বাবা! আমি আর মা-বোন ভিন্ন অন্য মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে হলে যে পুরুষ—হ্যাঁ পুরুষই বটে—শব্দের জন্য পকেট-ডিক্সনারি বের করে তার গালে লিপস্টিক! ডু লিবার হ্যার গট ফন বেনটাইম (বাঙলায়—''হে পিণ্ডিদাদন খানের মা কালী!'')'

আমি বললুম, 'কিন্তু হ্যার নয়রাট, একটা ভুল করবেন না। দেবতা যা করবার অধিকার রাখেন, সাধারণ মানুষের তা নেই। কিন্তু সে কথা থাক, শ্লীল-অশ্লীল সম্বন্ধে আপনি কি যেন বলছিলেন?'

নয়রাট বললেন, 'Perse' বাই ইটসেলফ যে রকম ডার্ট হয় না, ঠিক তেমনি স্ব-হক্কে কোনো জিনিস অশ্লীল নয়। উদাহরণ দিয়ে বলি,—যেখানে বাইবেল পাঠ হচ্ছে, সেখানে হঠাৎ পেটের ব্যামো নিয়ে আরম্ভ করা অশ্লীল এবং তার চেয়েও ভালো দৃষ্টান্ত, ডাক্তাররা যেখানে যৌন সম্পর্কের আলোচনা করছেন, সেখানে বেমক্কা বাইবেল পাঠ আরম্ভ করা তার চেয়েও বেশি অশ্লীল।

'অর্থাৎ বক্তব্য বস্তু প্রতীয়মান, জাজ্জ্বল্যমান করার জন্য যে কোন দৃষ্টান্ত, যে কোন

www.BanglaBook.org

তথ্য, যে কোন গল্প অশ্লীল—তা সে পঁচিশবার দাস্তের বয়ানই হোক, গণিকাজীবনকাহিনীই হোক। পক্ষান্তরে ইর্‌রেলেভেন্ট আউট অব প্লেস (বেমক্কা) জিনিস, তা সে ধর্মসঙ্গীতই হোক আর টমাস আকুনিয়াসের জীবনই হোক।'

আমার আশ্চর্য লাগল। কারণ দেশে ভটচাজ মসাই ('পদটীকা' দ্রষ্টব্য) এবং কাবুলের মৌলানা মীর আসলম ('দেশে-বিদেশে' দ্রষ্টব্য) ঐ একই কথা বলেছিলেন।

আমি বললুম, 'খাঁটি কথা। কিন্তু এসব থাক না এখন। বরঞ্চ একটা পল্‌ডি গল্প বলুন।'

নয়রাট বললেন, 'সেই ভালো।'

'পিয়ন পল্‌ডিকে মনি অর্ডারের টাকা দিলে। পল্‌ডি দিল জোর টিপস্। পাশে বসেছিলেন বন্ধু, তিনি বললেন, 'পল্‌ডি, অত বেশি টিপস্ দিলে কেন?' পল্‌ডি পরম সন্তোষ সহকারে মাথা হেলিয়ে দুলিয়ে বললে, 'ঐ তো! কিসসু জানো না, কিসসু সমঝো না; জোর টিপস্ দিলে ঘন ঘন মনি অর্ডার নিয়ে আসবে না?'

আমার হাসি শেষ হবার পূর্বেই নয়রাট বললেন, 'কিংবা ধরুন, পল্‌ডির বুকে ব্যথা। ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে বুক-পিঠ বাজিয়ে বললেন, ঠিক ডায়গ্‌নোজ করতে পারছি নে। তবে মনে হচ্ছে অত্যধিক মদ্যপানই কারণ।'

পল্‌ডি হেসে বললেন, 'তাই নিয়ে বিচলিত হবেন না, ডাক্তার, আমি না-হয় আরেকদিন আসব, যেদিন আপনি অত্যধিক মদ্যপান করে মাতাল হয়ে যান নি।'

নয়রাট বললেন, 'পল্‌ডি রসিকতাতে শুধু থাকে রস। ও-গুলোর ভিতর দিয়ে পল্‌ডির দেশ, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি সম্বন্ধে বিশেষ কোনো খবর পাওয়া যায় না কিন্তু ট্যুনিস-শেলের গল্পের ভিতর দিয়ে জর্মনি, কলোনের শ্রমিকশ্রেণী এবং তাদের জীবনধারণ সম্বন্ধে অনেক খবর পাওয়া যায় এবং তাতে করে গল্পগুলো বেশ একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের রঙ ধরে। এই ধরুন পাদ্রী সম্প্রদায়কে নিয়ে আমরা প্রায়ই ব্যঙ্গ করে থাকি। তার-ই একটা ট্যুনিস-শেল্ সাইক্লে বেশ খানিকটে রসের সৃষ্টি করেছে।

'ট্যুনিস আর শেল্ একখানা দশ টাকার নোট কুড়িয়ে পেয়েছে (কটলেটের গল্পে পূর্বেই বলেছি তারা হরদম রাস্তায় টাকা কুড়িয়ে পায়) এবং ঝগড়া লেগে গিয়েছে টাকাটার ওপর কার হক্। ট্যুনিস বলে সে আগে দেখেছে; শেল্ বলে সে আগে কুড়িয়ে নিয়েছে এবং পজেশন ইজ থ্রি-ফোর্থ অব ল'। তারপর এ বলে ও মিথ্যেবাদী ও বলে এ মিথ্যেবাদী। করতে করতে হঠাৎ ট্যুনিস বললে, "তাই সই, মিথ্যেবাদী হওয়াটাও কিছু সোজা কর্ম নয়, আমি হচ্ছি পাঁড় মিথ্যেবাদী আর তুই হচ্ছিস পেঁচি (এমেচার) মিথ্যেবাদী।" শেল্ বললে, 'গাঁজা, ঠিক তার উল্টো।"

'তখন স্থির হল পাল্লা দিয়ে দুজনে মিথ্যে কথা বলবে, যে সব চেয়ে বেহুদা বেশরম মিথ্যে বলতে পারবে, টাকাটা সে-ই পাবে।

'তখন ট্যুনিস বিস্‌মিল্লা বলে আরম্ভ করলে,—

"পরশুদিন ঘরে মন টিকছিল না বলে বাইরে এসে এক লম্ফে চলে গেলুম আমেরিকায়। সেখানে পৌঁছলুম এক সমুদ্রপারের 'লিডো'তে। দেখি হাজার হাজার মেয়েমদ্দ সেখানে চান করছে, সাঁতার কাটছে। আর ছুঁড়িগুলো কী বেহায়া! আমার এই একটা নেক্‌টাইয়ের কাপড় দিয়ে তিনটে মেয়ের সুইমিং কস্টুম হয়ে যায়।' (ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'পেটার, আবার?' নয়রাট বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা, টাপেটোপে বলছি'।) আমার ভয়ঙ্কর রাগ হল। করলুম কি, সব কটা হুলো-মেনিকে ধরে একটা ব্যাগে পুরে দিলুম আরেক লাফ। এবারে পৌঁছলুম, ফুজি-আমা পাহাড়ের কাছে। ব্যাগের ভিতর তিন হাজার বেড়াল ক্যাঁও ম্যাঁও করছিল বলে আমার দারুণ বিরক্তি বোধ হল। তাই আস্ত ব্যাগটা গিলে ফেলে গোটা আড়াই ঢেকুর তুললুম, তারপর—"

'শেল্ বাধা দিয়ে বললে, "এতে আর মিথ্যে কোন্‌খানটায় হল? আমি তো তোর সঙ্গেই ছিলুম, পষ্ট দেখলুম, তুই এসব করছিলি।" '

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা গল্পটা আগে শোনে নি বলে হাসলেন। আমিও বললুম, 'এ গল্পটা ভারি নতুন ধরনের। শেলের উত্তরটা অত্যন্ত আচমকা একটা ধাক্কা দিলে।'

নয়রাট বললেন, 'গল্পটা এখনো শেষ হয় নি।'

আমরা বললুম, 'সে কি কথা?'

নয়রাট বললেন, 'গল্পটিও যদিও খাস কলোন শহরের, তবু তার টেকনিকে একটু চীনা পদ্ধতি এসে গিয়েছে। এ গল্পে দুটো 'সারপ্রাইজ', কিংবা বলতে পারেন দুটো কিক আছে। খুলে বলছি;

'ট্যুনিস আর শেল্ যখন রাইন নদীর পাড়ের রেলিঙে ভর করে মিথ্যের জাহাজ ভাসাচ্ছিল, তখন এক পাদ্রী সাহেব পাশে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্তসৌন্দর্য নিরীক্ষণ করছিলেন। অনিচ্ছায় কিংবা স্বেচ্ছায়ও হতে পারে, ট্যুনিস শেলের বিকট মিথ্যের বহর তাঁর কানে এসে পৌঁছেছিল। থাকতে না পেরে বললেন, "ছি, ছি, বাছারা; এ-রকম ডাহা মিথ্যে তোমরা মুখ দিয়ে বার করছো কি করে? জানো না, মিথ্যা কথা মহাপাপ? আমি জীবন কখনো মিথ্যা বলি নি।"

'ট্যুনিস পাদ্রীর কথা শুনে প্রথম হকচকিয়ে গেল, তারপর থ মেরে গেল। সম্বিতে ফিরে শেষটায় ক্ষীণকণ্ঠে, বাজি হারার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শেল্‌কে বললে, "ভাই শেল্, নোটটা ওকেই দে, টাকাটা ওরই পাওনা। তুই এ-রকম পাঁড় মিথ্যে বলতে পারবি নে; আম্মো পারবো না।" '

আমি বললুম, 'খাসা গল্প; এটা মনে রাখতে হবে।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'কিন্তু আমি জানি, পেটার ওখানে থাকলে প্রাইজটা সে-ই পেত।'

আমি নয়রাটকে বললুম, 'গল্পটি সুন্দর, কিন্তু এতে টিপিকাল কলোনের কি আছে? আমাদের মোল্লা-পুরুত সম্বন্ধেও তো এরকম বদনাম আছে।'

নয়রাট বললেন, 'আমি জানতুম না। তবে শুনুন আরেকটা—আর এর জবাব আপনি দিতে পারবেন না।

'ট্যুনিস-শেল্ আবার একখানা দশ টাকার নোট পেয়েছে (ট্যুনিস-শেল্ সাইক্লের ভিতরে এ হচ্ছে "নোটের সাব্-সাইকেল্")। এবারে ঝগড়া হয় নি। দুজনে সেই টাকা দিয়ে মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়েছে রাস্তায়। পুলিশ তাদের পৌঁছে দিয়েছে হাসপাতালে। সকালবেলা তাদের ঘুম ভেঙেছে আর নেশা কেটেছে। দেখে চতুর্দিক ফিটফাট, ছিমছাম। ট্যুনিস শুধালে, "ওরে শেল্, এ আবার এলুম কোথায়?" শেল্ বললে, 'আমিও তাই ভাবছি। দাঁড়া, দেখে আসছি।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'শেল্ গেল ঘরের বাইরে। পাঁচ সেকেন্ডের ভিতর ছুটে এসে বললে, 'ওরে ট্যুনিস—আমরা ভারতবর্ষে পৌঁছে গিয়েছি—রাতারাতি আমাদের ভারতে পাচার করে দিয়েছে।''

'ট্যুনিস তো তাজ্জব। শুধালে, ''কি করে জানলি?''

'বললে, 'করিডরে মোটা হরপে লেখা আছে, "Die Toiletten befinden sich auf jenseits des Ganges".'

নয়রাট বললেন, 'অর্থাৎ, ''করিডরের দুপাশে বাথরুমের ব্যবস্থা আছে।'' এখন 'করিডর' শব্দ জর্মনে Gang আর Gang-এর দুপাশে—অর্থাৎ ষষ্ঠীতৎপুরুষ Ganges, তার মানে বাথরুম গঙ্গার (নদীর) দুপারে।'

'তাই ট্যুনিস-শেল্ রাতারাতি ভারতে পৌঁছে গিয়েছে।'

নয়রাট বললেন, 'দেশভ্রমণের গল্পই যদি উঠল তবে সেই সাব-সাইক্লই চলুক।'

আমি বললুম, 'উত্তম প্রস্তাব।'

নয়রাট বললেন, 'ট্যুনিস-শেল্ পেটের ধান্দায় হামবুর্গ গিয়ে জাহাজের খালাসির চাকরি নিয়ে পৌঁচেছে গিয়ে ইস্তাম্বুল শহরে, সেখানে—'

ফ্রান্ৎসিস্কা বললেন, 'না, পেটার, ওটা চলবে না।'

নয়রাট ব্যথা-ভরা নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'গল্পটা কিন্তু ছিল খাসা; তার আর কি করা যায়! তবে তাদের নিয়ে যাই নিউ ইয়র্কে।

'হয়েছে কি, ট্যুনিসের এক মামা নিউ ইয়র্কে দুপয়সা রেখে মারা গিয়েছে। ট্যুনিস উকিলের চিঠি পেয়েছে তাকে সেখানে সশরীরে উপস্থিত হয়ে নিজের সনাক্ত দিয়ে টাকাটা ছাড়িয়ে আনতে হবে। ওদিকে ট্যুনিস আবার ভয়ানক ভীতু ধরনের লোক। একা বিদেশ যেতে ডরায়—শেল্কে বললে, ''ভাই, তুই চ।'' শেল্ ভাবলে—আর আমিও তাই ভাবতুম—মন্দ কি, ফোকটে মার্কিনমুল্লুকটা দেখা হয়ে যাবে।

'তারা নিউ ইয়র্ক পৌঁছল ঠিক বড়দিনের দিন। তামাম মার্কিন দেশ ঝেঁটিয়ে এসে জড়ো হয়েছে নিউ ইয়র্কে পরব করার জন্য, সব হোটেল আগাগোড়া ভর্তি, করিডরে পর্যন্ত ক্যাম্প্ কট্ পেতে শোবার ব্যবস্থা ফালতো গেস্টদের জন্য করা হয়েছে।

'মহা দুর্ভাবনায় পড়ল দুই ইয়ার। ডিসেম্বরের শীতে আশ্রয় না পেলে শীতেই অক্কা-লাভ। দুই বন্ধু কলোন গির্জের মা-মেরিকে স্মরণ করে এক ডজন মোমবাতি মানত করলে। আপনি তো মুসলমান, এসব মানেন না, কিন্তু—'

আমি বললুম, 'আলবত মানি। একশবার মানি। কলকাতায় মৌলা আলীর দর্গায় মোমবাতি মানত করলে বহু বাসনা পূর্ণ হয়। আর আমাদের দেশে এমন জায়গাও আছে যেখানে মানত করলে মোকদ্দমা পর্যন্ত জেতা যায়।'

ফ্রান্ৎসিস্কা শুধালেন, 'ডিভোর্স পাবার দরগা আছে?'

আমি বললুম, 'বিলক্ষণ, তবে সেখানে স্বামী-স্ত্রীকে একসঙ্গে গিয়ে কামনাটা জানাতে হয়।'

নয়রাট আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ।' তারপর গল্পের খেই তুলে নিয়ে বললেন, 'কলোনের মা-মেরি বড় জাগ্রত দেবতা। একটা হোটেলে শেষটায় একটা ডবল রুম জুটে গেল, কিন্তু ব্যবস্থাটা শুনে দুই ইয়ারই আঁতকে উঠলেন।

'ঘর পঞ্চাশ তলায়, আর লিফট্ বিগড়ে গিয়েছে!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'দুইজনাই একসঙ্গে বললে, 'হে মা-মেরি, এতটা দয়াই যখন করলে, তখন লিফট্‌টা সারাতে পারলে না মা?''

আমি বললুম, 'আমাদের গোপালভাঁড়ও তাই বলেছিল,—

''এত দয়াই যদি করলি, মা কালী,
তবে আরেকটু দয়া করে,
বনে আছে দেদার ফড়িং
খা না দুটো ধরে।'' '

নয়রাট বললেন, 'গল্পটা কি?'

আমি বললুম, 'আপনাকে একদিন সময়মত আমাদের ''গোপালভাঁড়-সাইক্ল'' শোনাব, তার অনেকগুলি ফ্রান্‌ৎসিস্‌কার সামনে বলা চলবে না।

নয়রাট বললেন, 'তবে নিয়ে চলুন আপনাদের ডিভোর্স-দর্গায়।'

সিগরেট ফুরিয়ে গিয়েছিল বলে ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা ভাঁড়ারঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। আমি বললুম, 'অত তাড়া কিসের? ভারত যাবার জাহাজ আরো সপ্তাহখানেক পর ছাড়ে।'

নয়রাট বললেন, ''তখন ট্যুনিস শেল্‌কে বললে, 'ভাই, এ ছাড়া আর উপায় যখন নেই তখন চ, সিঁড়ি ভাঙি আর কি?''

'শেল্ বললে, 'একটা ব্যবস্থা করলে হয় না, প্রতি তলা উঠতে উঠতে তুই এক-একটা করে গল্প বলবি আর তাতেই মশগুল হয়ে আমরা পঞ্চাশতলা বেয়ে নেব। তুই তো মেলা গল্প জানিস।''

'ট্যুনিস বললে, ''যা বলেছিস, সাধে কি আর তোকে সঙ্গে এনেছিলুম? তবে শোন,'' বলে আরম্ভ করলে সিঁড়ি ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে গল্প-বলা।'

নয়রাট বললেন, 'সে কত বাহারে গল্প! আমি গল্প কলেক্‌ট্ করি নে, কিন্তু আমার এক বন্ধু আছেন, তাঁর সঙ্গে আমি আপনাকে আলাপ করিয়ে দেব, তিনি সব কটা জানেন।

'তা সে কথা থাক।

'ট্যুনিস আর শেল্ এক এক তলার সিঁড়ি ভাঙে আর ট্যুনিস এক-একখানা জান্—তর্-র-র্ গল্প ছাড়ে। হেসেখেলে বিন্-মেহন্নত, বিন্-কসরতে তারা পঁচিশতলা এক ঝটকায় মেরে দিলে।

'তখন ট্যুনিস বললে, 'ভাই শেল, আমার সব গল্প খতম। আর কোন্ গল্প মনে পড়ছে না।''

'তখন শেল্ বললে, 'ঘাবড়াস নি। আমারো কিছু পুঁজি আছে।''

'বলে তখন শেল্ আরম্ভ করল গল্প বলতে। সেও কিছু কম বাহারে নয়, তবে ট্যুনিস তালেবর ব্যক্তি, তার সঙ্গে তুলনা হয় না।

'করে করে তারা আরো চব্বিশখানার সিঁড়ি ভাঙলে—গল্প বলার সঙ্গে সঙ্গে।'

'মাত্র একতলা বাকি। শেল্ দুম্ করে মাটিতে বসে পড়ল। এক ঝটকায় হোক আর ঊনপঞ্চাশ ঝটকায়ই হোক পা-গুলো তো আর গল্প শুনতে পায় না। শেল্ ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়ে বললে, 'ভাই আমার গুদোমও খতম।''

'তখন ট্যুনিশ বললে, 'কুছ্ পরোয়া নদারদ। আমার একখানা গল্প মনে পড়েছে—একদম সত্যি গল্প।—আমরা ফ্লাটের চাবি সঙ্গে আনতে ভুলে গিয়েছি।''

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

* * *

লঞ্চ খেতে এসে তখন প্রায় চায়ের সময় হয়ে গিয়েছে অথচ গাল-গল্পের কম্বলের ভিতর এমনি ওম জমে গিয়েছে যে সে কম্বল ফুটো করে বেরতে ইচ্ছে করে না। শীতের দেশ তো—উভয়ার্থে শীতের দেশ, ইয়োরোপীয়দের মনেও শীত; আড্ডা জমিয়ে সঙ্গ-সুখের আলিঙ্গনে সেটাকে গরম করতে জানে না—তাই এদের কুণ্ডুলিতে বহুদিন পরে যেন 'বসন্ত রেস্টুরেন্টে'র আনন্দ পেলুম।

শেষটায় একটা হাফ্-মোকা পেয়ে বললুম, 'আমি তা হলে উঠি।'

নয়রাট একটি কথা বললেন, 'কেন?'

আমি একটু অবাক হয়ে গেলুম। এরকম অবস্থায় সচরাচর বলা হয়, 'সে কি কথা? এখনই যাবেন কেন?' কিংবা 'বড্ড কাজ পড়ে আছে বুঝি?' অথবা অন্য কিছু। আমার কোনো জবাব যোগাল না।

নয়রাট বললেন, 'দেখুন মশাই, আপনাকে বলি নি, কিন্তু আপনাকে আমি বিলক্ষণ চিনি। গেল কয়েকদিন ধরে যখনই লেকের পাড় দিয়ে কাজকর্মে কোথাও যেতে হয়েছে, তখনই আপনাকে দেখেছি, ঐ একই বেঞ্চের উপর—তাও আবার একই পাশে—বসে আছেন। শুনেছি, ইংলন্ডের পার্কে চেয়ারে বসলে তার জন্যে ট্যাক্স দিতে হয়—'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'সেখানে দম ফেলতেও ট্যাক্স দিতে হয় এবং তারই ভয়ে কেউ যদি দম বন্ধ করে, তবে মরে গিয়ে তাকে ডেথ্-ট্যাক্স দিতে হয়।'

নয়রাট বললেন, 'তাহলে বিবেচনা করি সেখানে বিয়ের উপরও ট্যাক্স আছে। আহা, ইংলন্ডে জন্মালে হত।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'আহা আমি যদি তিব্বতে জন্মাতুম। সেখান প্রত্যেক রমণীর পাঁচটা করে স্বামী থাকে, আর সব কটাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়।'

আমি বললুম, 'ষাট, ষাট (ইংরিজিতে tut tut), ও রকম অলুক্ষণে কথা কইবেন না।'

সমস্বরে, 'কেন?'

আমি বললুম, 'তাহলে আসছে জন্মে পেটারকে জন্মাতে হবে ইংলন্ডে আর মাদাম ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা (ব'লে তাঁর দিকে 'বাও' করে বললুম), আপনাকে জন্ম নিতে হবে তিব্বতে।'

দুজনাই কিচির-মিচির করে উঠলেন। তার থেকে যে প্রশ্ন ওতরালো তার মোটামুটি জিজ্ঞাসা, 'আসছে জন্মে' কথাটার মানে কি? আমরা তো মরে গিয়ে হয় স্বর্গে যাব, কিংবা নরকে, কিংবা কপ্পুর হয়ে যাব, 'আসছে জন্মে' তার অর্থ কি?

আমি বললুম, 'এই যে পেটার শুধালেন, আমি বেঞ্চিতে সর্বসময় বসে থাকি কেন? তার অর্থ আমি চলাফেরা, হাঁটাহাঁটি করি না কেন? সুইট্‌জারল্যান্ডে যদি ইংলিশ্ কায়দায় বেঞ্চিতে বসতে হত তাহলে ট্যাক্স দিয়ে দিয়ে আমি ফতুর হয়ে যেতুম সেকথা আমি খুব ভালো করেই জানি কিন্তু চলাফেরা করলে আমাকে খেসারতি দিতে হবে অনেক বেশি।'

লাইন কোন্ দিকে চলেছে ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা যেন তার খানিকটা আভাস পেয়েছেন বলে মনে হল। পেটার কিন্তু রাত-ভর হদিস না পেয়ে শুধালেন, 'এর কোনো মানে হয় না আপনি রাস্তায় হাঁটছেন, তার জন্য ট্যাক্স দিতে হবে কেন? ইংলন্ডের মতো বর্বর দেশেও ও-রকম ট্যাক্স নেই।'

আমি বললুম, 'পরজন্মে মানুষ এ পৃথিবীতে আসে পূর্বজন্মের কামনা নিয়ে। আমি

www.BanglaBook.org

সমস্ত দিন যতদূর সম্ভব চুপচাপ বসে থাকি যাতে করে ভগবান পরজন্মে আমাকে এমন জায়গায় বসান যেখানে আমাকে কোন কিছু না করতে হয়। আমি যদি হাঁটাহাঁটি করি, তবে ভগবান ভাববেন, আমি ঐ কর্মই পছন্দ করি, আর আমাকে এ জগতে পাঠাবেন পোস্টম্যান করে। তখন মরি আর কি, জলঝড়ে, বিষ্টিতুফানে এর বাড়ি ওর বাড়ি চিঠি-পার্শল বয়ে বয়ে।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা শুধালেন, 'আমি ঠিক ঠিক বুঝতে পারছি নে কিন্তু কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছি। আপনি বলতে চান, মানুষ মরে গিয়ে এই পৃথিবীতে আবার ফিরে আসে। সে কি করে হয়?'

জ্ঞানী পাঠক! অপরাধ নেবেন না। আপনি সেস্থলে থাকলে আমার অনেক পূর্বেই বুঝে যেতেন, 'জন্মান্তরবাদ' এরা জানে না এবং আপনি সেইটি বুঝতে পেরে তক্‌খুনি তার শাস্ত্রসম্মত সদুত্তর দিয়ে দিতেন। কিন্তু আমি তো পণ্ডিত নই, দেশ আমাকে আদর করে না, দেশ আমাকে খেতে-পরতে দেয় না, তাই তো আমি লক্ষ্মীছাড়া গৃহহারা হয়ে গিয়েছি বিদেশ, আমি অতশত বুঝতে পারব কি করে?

তদুপরি আরেক কথা আছে। আমি মুসলমানের ছেলে। ইসলাম জন্মান্তরবাদ মানে না; যদিও প্রাগৈতিহাসিক যুগে মক্কাবাসীরা জন্মান্তরে বিশ্বাস করতো। সেই যুগের একটি আরবী কবিতা এই সুবাদে মনে পড়ল।

কবিতাটির গীতিরস বাঙলাতে অনুবাদ করার মত বাঙলা-ভাষা-জ্ঞান আমার নেই কিন্তু কল্পনা-চতুর পাঠক হয়তো আমার অনুবাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি পেরিয়ে গিয়ে ঠিক তত্ত্বটি সমঝে যাবেন। মরুভূমির আরব বেদুইন প্রিয়াকে উদ্দেশ করে বলছে,

প্রিয়ে,
আরবভূমি মরুভূমি, নীরস কর্কশ
তোমার আমার প্রেমের সুধাশ্যামলিম-রস
কেউ বুঝতে পারল না।
তাই সর্বদেহমনহৃদয় দিয়ে প্রার্থনা করি,
তুমি যেন এমন দেশে জন্মাও,—
—আসছে জন্মে—
কত শত শতাব্দীর পরে তা জানিনে,
যেখানে মানুষ জলে ডুবে আত্মহত্যা করার
আনন্দ অনায়াসে অনুভব করতে পারে।'

এর টীকা অনাবশ্যক। আরব দেশে হাঁটু-জলের বেশি গভীরতর কোনো প্রকার নদীপুকুর নেই। তাই কবি জন্মান্তরে সেই দেশের কামনা করেছেন যেখানে মানুষ জলে ডুবে চরম শান্তি পায়।

সে দেশ বাঙলা দেশ। চেরাপুঞ্জির দেশ, যেখানে সব চেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়। নদীনালা, পুকুর-হাওরে জলের থৈ থৈ।

আরব বেদুইন কবি এই দেশই মনে মনে কামনা করেছিল।

* * *

আমি বললুম, 'আসছে জন্মের কথা থাক। আপনি যে এ জন্মের কাহিনী আরম্ভ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করেছিলেন সেইটি তো শেষ করলেন না। আপনি বলছিলেন আপনার গুটিকয়েক শখ পূরণ করার জন্য আপনি এক-টানা ছাব্বিশ বছর খেটে পয়সা জমিয়ে এখন দিব্য আরাম করতে পারছেন। আপনার শখগুলো কি?'

নয়রাট বললেন, 'এক নম্বর দাবা-খেলা আর দু নম্বর—বলতে একটু বাধোবাধো ঠেকছে।'

আমি বললুম, 'এইবার আপনারা ভদ্রতা "আরম্ভ" করলেন।'

নয়রাট বললেন, 'ভদ্রতায় ঠেকছে না। ঠেকছে অন্য জায়গায়। তবু না হয় বলেই ফেলি। আমি যখন ইস্কুল যেতুম তখন একটি জারজ ছেলেকে আমার ক্লাসের ছেলেরা বড় ক্ষ্যাপাত—ছেলেরা এ বিষয়ে যে কী রকম ক্রূর আর নিষ্ঠুর হতে পারে তার বর্ণনা আপনি নিশ্চয়ই মোপাসাঁয় পড়েছেন। আমি তখনো গল্পটি পড়ি নি কিন্তু আজ মনে হয় ছেলেটির দুর্দৈব কাহিনী মোপাসাঁ শতাংশের একাংশও বর্ণনা করতে পারেন নি। আমার নিজের বিশ্বাস যৌনবোধ না জন্মানো পর্যন্ত মানুষের মনে স্নেহ করুণা ইত্যাদি কোনো প্রকারের সদ্‌গুণ দেখা দেয় না। তাই বালকেরা হয় সচরাচর অত্যন্ত নিষ্ঠুর —আমি ক্লাসের আর সকলের চেয়ে ছিলুম বয়সে একটু বড়, আমার তখন নিজের অজানাতেই যৌনবোধ আরম্ভ হয়েছে এবং তাই ঐ হতভাগ্য ছেলেটার জন্য আমার হৃদয়ে গভীর বেদনার উদ্রেক হত। কিন্তু বয়সে বড় হলে কি হয়, আমি ছিলুম একে রোগাপটকা, তার উপর মারামারি হাতাহাতির প্রতি আমার আন্তরিক ঘৃণা। তাই আমি তাকে কোনো প্রকারে সাহায্য না করতে পেরে মনে মনে বড় লজ্জা বোধ করতুম। তবে সুযোগ পেলেই, আর পাঁচটা ছেলের চোখে আড়ালে ওর হাতে একটা চকোলেট দিতুম, রাস্তায় দেখা হলে একটা আইসক্রীম খাইয়ে দিতুম।

'প্রথম যে-দিন তাকে চকলেট দিয়েছিলুম সেদিন সে আমার দিকে বদ্ধ ইডিয়টের মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল, তারপর দরদর করে তার দু চোখ বেয়ে জল বেরিয়ে এসেছিল। ক্লাসের তিরিশটে কসাইয়ের ভিতরেও যে একটি ছেলে গোপনে গোপনে তার জন্য হৃদয়ে দরদ ধরে এর কল্পনাও যে কখনো তার মনের কোণে ঠাঁই দিতে পারে নি।'

তাকিয়ে দেখি ফ্রান্‌ৎসিস্‌কার চোখ ছলছল করছে। অথচ তিনি নিশ্চয়ই এ-কাহিনী আগে শুনে থাকবেন। মনে মনে বললুম, নয়রাট সত্যই 'সহধর্মিণী' পেয়েছেন। বাইরে বললুম, 'থামলেন কেন?'

বললেন, 'এখনো বাধো-বাধো ঠেকছে। তবু বলছি, কারণ এ বিষয়ে আমি মিশনারি।'

'ছেলেটাকে ধমক দিয়ে বললুম, "এই ফুল! চোখ মুছে ফেল। আর কেউ দেখে ফেললে তোকে জ্বালাবে আরো বেশি, আমাকেও রেহাই দেবে না।"

'চোখের জলের সঙ্গে আনন্দ আর কৃতজ্ঞতা মিশে গিয়ে তার চেহারা যে কি রকম বিকৃত হয়ে গিয়েছিল তার ছবি আমি আজো দেখতে পাই।

'আপনাকে কি বলবো, তারপর সেদিন ক্লাসে বসে যখনই আড়নয়নে তাকিয়েছি তখনই দেখেছি, সে চোখ বন্ধ করে আছে, তার ঠোঁটের কোণে গভীর প্রশস্তির মৃদু হাস্য, আর গালের আপেল দুটো খুশিতে উপরের দিকে উঠে চোখ দুটো যেন চেপে ধরেছে। আমি তো ভয়ে মরি, মূর্খটা আবার কি বলতে গিয়ে কি না বলে ফেলে।

'তার পর দিন থেকে আরম্ভ হল আরকে আজব কেচ্ছা। ছেলেরা রুটিনমাফিক তাকে 'ব্যা—ড' বললে, চুলে ধরে টান দিলে, অন্যান্য প্রকরণেরও কোনো খাঁকতি হল না কিন্তু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেও রুটিনমাফিক চিৎকার চেঁচামেচি গালাগাল দিলে না—সে দেখি, চোখ বন্ধ করে মিটমিটিয়ে হাসছে—আমি ভাবলুম, হয়েছে, ছোঁড়াটা বোধ করি ক্ষেপে গেছে।

'বহু পরে সে আমাকে একদিন বলেছিল, এ নাকি তখন খুশিতে ডগোমগো, তার নাকি ভারী আনন্দ, তার আর কি ভয়, এই ক্লাসেই তার একটি বন্ধু রয়েছে, সে তাকে চকলেট খাইয়েছে।'

আমি বললুম, 'অতিশয় হক্ কথা! ফার্সীতে প্রবাদ আছে,—

"দুশমন্ চি কুনদ্, আগর, মেহেরবান বাশদ্ দোস্ত!"

"দুশ্‌মন্ কি করতে পারে, দোস্ত যদি মেহেরবান্ হয়!" '

নয়রাট উল্লসিত হয়ে ফ্রান্‌ৎসিস্‌কাকে বললেন, 'বউ, প্রবাদটা টুকে নাও তো, কাউকে দিয়ে পার্সীতে লিখিয়ে নিজে জর্মনে গথিক হরফে তর্জমা লিখে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখবো।'

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এতদিন ধরে আমি জুতসই একটা প্রবাদের সন্ধানে ছিলুম—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

তারপর বললেন, 'ছোঁড়াটা অদ্ভুত। আমাকে বিপদে না ফেলার জন্য আমার কাছে এসে ন্যাওটামি করতো না। একলা-একলি দেখা হলে শুধু আমার দিকে তাকিয়ে একটুখানি মুচকি হেসে চোখ বন্ধ করত।

'তার কয়েকদিন পরে আমার জন্মদিন। ক্লাসের ছোঁড়াগুলোর প্রতি যদিও আমি ঐ ছোকরাটাকে জ্বালাতন করার জন্য বিরক্ত হতুম তবু অন্য বাবদে ওরাই তো আমার সঙ্গী; তাই তাদের নেমন্তন্ন করলুম, আর না করলে মা-ই বা কী ভাববে? তারা আমার জন্য উপহার আনলে বই, পেন্সিল, চুরি, কলের লাটিম এবং আর পাঁচটা জিনিস। আমরা কেক্ লেম্‌নেড খাচ্ছি, জোর হৈ-হুল্লোড় চলছে, এমন সময় বাড়ির দাসী আমার কানে কানে বললে, "ছোটবাবু, তোমার জন্য একটি ছেলে নিচের তলায় গেটে দাঁড়িয়ে। কিছুতেই উপরে আসতে চায় না; তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছে।"

'আমার সব বন্ধুই তো গটগট করে উপরে আসে। এ আবার কে?

'গিয়ে দেখি সেই পাগলা। হাতে এক ঢাউস বাক্স। লজ্জায় লাল হয়ে বললে—"তোর জন্মদিনে একটা প্রেজেন্ট এনেছি। ছোট্ট একটা পাল-লাগানো ইয়ট।"

'বলে কি? 'ইয়ট' তখন আমাদের স্বপ্নের বাইরে। পুরো বছরের জলখাবারের পয়সা জমালেও আমাদের ক্লাসের ধনী ছোকরা আডল্‌ফ্ পর্যন্ত 'ইয়ট' কিনতে পারে না—তখনো জানতুম না, সে পয়সাওলা ছেলে।

'লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল। বললুম, "তুই উপরে চ, কেক খাবি।"

'বললে, "না, ভাই, তুই যা, উপরে আরো অনেক সব রয়েছে।"

'আমি তাকে জোর করে উপরে টেনে নিয়ে এলুম। কোত্থেকে সাহস পেলুম আজো জানি নে। বোধ হয় ইয়টের কৃতজ্ঞতায়।'

আমি থাকতে না পেরে বললুম, 'ছিঃ', জিনিস নিয়ে খাঁটা করবেন না।'

নয়রাট বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ। তার পর উপরে কি হল ঠিক বলতে পারব না। প্রথমটায় সবাই থ মেরে গেল। তারপর একে একে সক্কলেই পাগলার সঙ্গে শেক-হ্যান্ড করলে। তার চোখ দিয়ে আবার সেই পয়লা দিনের মতো ঝরঝর করে জল নেমে এল।

'সেই দিনই আমি মনস্থির করলুম, বড় হলে আমি সর্বত্র এরকম ছেলেদের অন্যায়

www.BanglaBook.org

অত্যাচার থেকে বাঁচাবো। ভগবান আমাকে আজ দেখিয়ে দিয়েছেন, এ শক্তি আমার ভিতর আছে।'

নয়রাট হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে বললেন, 'এখ্‌খুনি আসছি; আমি একটা টেলিফোন করতে ভুলে গিয়েছিলুম।'

বুঝলুম, বিনয়ী লোক, লজ্জা ঢাকবার অবকাশ খুঁজছেন॥

আজাদ হিন্দ ফৌজের সমর-সঙ্গীত

কদম্ কদম্ বঢ়ায়ে জা
খুশিকে গীত্ গায়ে জা
ইয়েহ্ জিন্দগী হ্যায় কৌম কী
(তো) কৌম পৈ লুটায়ে জা॥

এগিয়ে যা এগিয়ে যা
খুশির গীত গাইতে যা।
দেশের তরে জীবন ধন
দেশের লাগি করবি নে পণ?

তু শেরে হিন্দ্ আগে বঢ়্
মরণেসে ফিরভি তু ন ডর্
আসমান তক্ উঠায়ে শির্
জোশে ওতন্ বঢ়ায়ে জা॥

শেরে হিন্দ এগিয়ে যা।
সামনে মরণ ফিরে না চা॥
আকাশ বিঁধে তুলবি শির
দেশের জোশ বাড়বে বীর।

তেরে হিম্মৎ বঢ়তী রহে
খুদা তেরী সুন্‌তা রহে
জো সামনে তেরে চঢ়ে
(তো) খাক্‌মে মিলায়ে জায়॥

বাড়ুক বাড়ুক সাহস তোর
খুদা তোরে দেবেন জোর।
সামনে বাধা পরোয়া না কর
ধুলায় তারা পাবে যে গোর॥

চলো দিল্লী পুকারকে
কৌমী নিসান সম্ভাল্‌কে
লাল কিল্লে গাঢ়কে
লহ রায়ে জা লহ রায়ে জা॥
কদম্ কদম্ বঢ়ায়ে জা॥

হুঙ্কারিয়া দিল্লী চল
কৌমী নিশান জাগিয়ে তোল
লালকেল্লায় ঝাণ্ডা খোল
এগিয়ে যা ফুর্তিতে চল॥
এগিয়ে যা, এগিয়ে যা॥

BanglaBook.org

শেরে হিন্দ্ = হিন্দুস্থানের ব্যাঘ্র, জোশ্ = শক্তি, কৌমী নিশান = জাতীয় পতাকা।

www.BanglaBook.org

দ্বন্দ্বমধুর

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

উৎসর্গ

বাংলা সাহিত্যকে সর্বপ্রথম সঙ্কীর্ণতার গণ্ডি থেকে মুক্ত করে,
তার অধিকার ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সচেতন উভয় বাংলার
যে-সব পাঠক-পাঠিকা লেখক-লেখিকা বাংলাকে
সুন্দর ও কল্যাণের পথে নিয়ে যেতে
সত্যবদ্ধ—তাঁদের উদ্দেশে

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

নোনাজল

সেই গোয়ালন্দ চাঁদপুরী জাহাজ। ত্রিশ বৎসর ধরে এর সঙ্গে আমার চেনাশোনা। চোখ বন্ধ করে দিলেও হাতড়ে হাতড়ে ঠিক বের করতে পারব, কোথায় জলের কল, কোথায় চা-খিলির দোকান, মুর্গীর খাঁচাগুলো রাখা হয় কোন্ জায়গায়। অথচ আমি জাহাজের খালাসী নই—অবরের-সবরের যাত্রী মাত্র।

ত্রিশ বৎসর পরিচয়ের আমার আর সবই বদলে গিয়েছে, বদলায়নি শুধু ডিসপ্যাচ স্টীমারের দল। এ-জাহাজের ও-জাহাজের ডেকে-কেবিনে কিছু কিছু ফেরফার সব সময়ই ছিল, এখনও আছে, কিন্তু সব কটা জাহাজের গন্ধটি হুবহু একই। কীরকম ভেজা-ভেজা, সোঁদা-সোঁদা যে গন্ধটা আর সব কিছু ছাপিয়ে ওঠে, সেটা মুর্গী-কারি রান্নার। আমার প্রায়ই মনে হয়েছে, সমস্ত জাহাজটাই যেন একটা আস্ত মুর্গী, তার পেটের ভেতর থেকে যেন তারই কারি রান্না আরম্ভ হয়েছে। এ-গন্ধ তাই চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ, গোয়ালন্দ, যে কোন স্টেশনে পৌঁছানো মাত্রই পাওয়া যায়। পুরনো দিনের রূপরসগন্ধস্পর্শ সবই রয়েছে, শুধু লক্ষ্য করলুম ভিড় আগের চেয়ে কম।

দ্বিপ্রহরে পরিপাটি আহারাদি করে ডেকচেয়ারে শুয়ে দূর-দিগন্তের দিকে তাকিয়ে ছিলুম। কবিত্ব আমরা আসে না, তাই প্রকৃতির সৌন্দর্য আমার চোখে ধরা পড়ে না, যতক্ষণ না রবি ঠাকুর সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। তাই আমি চাঁদের আলোর চেয়ে পছন্দ করি গ্রামোফোনের বাক্স। পোর্টেবলটা আনব আনব করছি, এমন সময় চোখে পড়ল একখানা মর্দিতা 'দেশ'—মালিক না আসা পর্যন্ত তিনি যদি পরহস্তে কিঞ্চিৎ 'ভ্রষ্টা'ও হয়ে যান, তা তাঁর স্বামী বিশেষ বিরক্ত হবেন না নিশ্চয়ই।

'রূপদর্শী' ছদ্মনাম নিয়ে এক নতুন লেখক খালাসীদের সম্বন্ধে একটি দরদ-ভরা লেখা ছেড়েছে। ছোকরার পেটে এলেম আছে, নইলে অতখানি কথা গুছিয়ে লিখল কী করে, আর এত সব কেচ্ছা-কাহিনীই বা যোগাড় করল কোথা থেকে? আমি তো একখানা ছুটির আর্জি লিখতে গেলেই হিমসিম খেয়ে যাই। কিন্তু লোকটা যা সব লিখেছে, এর কি সবই সত্যি? এতবড় অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে খালাসীরা লড়াই দেয় না কেন? হুঁঃ! এ আবার একটা কথা হল! সিলেট নোয়াখালির আনাড়ীরা দেবে ঘুঘু ইংরেজের সঙ্গে লড়াই—আমিও যেমন!

জাহাজের মেজো সারেঙের আজ বোধ হয় ছুটি। সিল্কের লুঙ্গি, চিকনের কুর্তা আর মুগার কাজ-করা কিস্তি টুপি পরে ডেকের ওপর টহল দিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে আবার আমার দিকে আড়নয়নে তাকাচ্ছেও। ডিসপ্যাচের পুঁটি ও মানওয়ারির তিমি দুই-ই মাছ—একেই জিজ্ঞাসা করা যাক না কেন, 'রূপদর্শী' দর্শন করেছে কতটুকু আর কল্পনায় বুনেছে কতখানি!

একটুখানি গলা খাঁকারি দিয়ে শুধালুম, 'ও সারেঙ সাহেব, জাহাজ লেট যাচ্ছে না তো?'

লোকটা উত্তর দিয়ে সবিনয়ে বলল, 'আমাকে "আপনি" বলবেন না সাহেব। আমি আপনাকে দু-একবারের বেশি দেখি নি, কিন্তু আপনার আব্বা সাহেব, বড় ভাই সাহেবেরা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এ-গরিবকে মেহেরবানি করেন।'

খুশি হয়ে বললুম, 'তোমার বাড়ি কোথা? বস—না, তার ফুরসত নেই?' ধপ করে ডেকের উপর বসে পড়ল।

আমি বললুম, 'সে কী? একটা টুল নিয়ে এসো। এসব আর আজকাল—' কথাটি শেষ করলুম না, সারেঙও টুল আনল না। তারপর আলাপ পরিচয় হল। দ্যাশের লোক—সুখ-দুঃখের কথা অবশ্যই বাদ পড়ল না। শেষটায় মোকা পেয়ে 'রূপদর্শী-দর্শন' তাকে আগাগোড়া পড়ে শোনালুম। সে গভীর মনোযোগ দিয়ে তার জাতভাই চাষারা যেরকম পুঁথিপড়া শোনে সে রকম আগাগোড়া শুনল, তারপর খুব লম্বা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

আল্লাতালার উদ্দেশে এক হাত কপালে ঠেকিয়ে বললে, 'ইনসাফের (ন্যায়ধর্মের) কথা তুললেন, হুজুর, এ-দুনিয়ায় ইনসাফ কোথায়? আর বে-ইনসাফি তো তারাই করেছে বেশি, যাদের খুদা ধনদৌলত দিয়েছেন বিস্তর। খুদাতালাই কার জন্যে কী ইনসাফ রাখেন, তাই বা বুঝিয়ে বলবে কে? আপনি সমীরুদ্দীকে চিনতেন, বহু বছর আমেরিকায় কাটিয়েছিল, অনেক টাকা কামিয়েছিল?'

আমেরিকার কথায় মনে পড়ল। 'চৌতলি পরগণায় বাড়ি, না, যেন ওই দিকেই কোন্‌খানে।'

সারেঙ বললে, 'আমারই গাঁ ধলাইছড়ার লোক। বিদেশে সে যা টাকা কামিয়েছে ওরকম কামিয়েছে অল্প লোকই। আমরা খিদিরপুরে সইন (Sign) করে জাহাজের কামে ঢুকেছিলাম—একই দিন একই সঙ্গে।'

আম শুধালুম, 'কী হল তার? আমার ঠিক মনে পড়ছে না।'

সারেঙ বললে, 'শুনুন।'

'যে লেখাটি হুজুর পড়ে শোনালেন, তার সব কথাই অতিশয় হক। কিন্তু জাহাজের কাজে, বিশেষ করে গোড়ার দিকে যে কী জান মারা খাটুনি তার খবর কেউ কখনও দিতে পারবে না যে সে জাহান্নামের ভিতর দিয়ে কখনও যায় নি। বয়লারের পাশে দাঁড়িয়ে যে লোকটা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কয়লা ঢালে, তার সর্বাঙ্গ দিয়ে কী রকম ঘাম ঝরে দেখেছেন—এই জাহাজেই যার দুদিক খোলা, পদ্মার জোর বাতাসের বেশ খানিকটা যেখানে স্বচ্ছন্দে বেশ আনাগোনা করতে পারে। এ তো বেহেশ্‌ৎ। আর দরিয়ার জাহাজের গর্ভের নীচে যেখানে এঞ্জিন-ঘর, তার সব দিক বন্ধ, তাতে কখনও হাওয়া-বাতাস ঢোকে না। সেই দশ বারো চোদ্দ হাজার-টনী ডাঙর ডাঙর জাহাজের বয়লারের আকারটা কত বড় হয় এবং সেই কারণে গরমিটার বহর কতখানি, সে কি বাইরের থেকে কখনও আন্দাজ করা যায়? খাল বিল নদীর খোলা হাওয়ার বাচ্চা আমরা—হঠাৎ একদিন দেখি, সেই জাহান্নামের মাঝখানে কালো-কালো বিরাট-বিরাট শয়তানের মত কলকব্জা লোহালক্কড়ের মুখোমুখি।

'পয়লা পয়লা কামে নেমে সবাই ভিরমি যায়। তাদের তখন উপরে টেনে জলের কলের নীচে শুইয়ে দেওয়া হয়, হুঁশ ফিরলে পর মুঠো মুঠো নুন গেলান হয়, গায়ের ঘাম দিয়ে সব নুন বেরিয়ে যায় বলে মানুষ তখন আর বাঁচতে পারে না।

'কিংবা দেখবেন কয়লা ঢেলে যাচ্ছে বয়লারে ঠিক ঠিক, হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই, বেলচা ফেলে ছুটে চলেছে সিঁড়ির পর সিঁড়ি বেয়ে, খোলা ডেক থেকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে। অসহ্য গরমে মাথা বিগড়ে গিয়েছে, জাহাজী বুলিতে একেই বলে

www.BanglaBook.org

'এমখ''—'

আমি শুধালুম 'একেই কি ইংরাজিতে বলে এমাক্ (amuck) ? কিন্তু তখন তো মানুষ খুন করে!'

সারেঙ বললে, 'জী হাঁ। তখন বাধা দিতে গেলে হাতের কাছে যা পায়, তা দিয়ে খুন করতে আসে।' তারপর একটু থেমে সারেঙ বললে, 'আমাদের সকলেরই দু-একবার হয়েছে, আর সবাই জাবড়ে ধরে চুবিয়ে আমাদের ঠাণ্ডা করেছে—শুধু সমীরুদ্দী কক্‌খনো একবারের তরেও কাতর হয় নি। তাকে আপনি দেখেছেন, সায়েব? বাং মাছের মত ছিল তার শরীর, অথচ হাত দিয়ে টিপলে মনে হত কচ্ছপের খোল। জাহাজের চীনা বাবুর্চির ওজন ছিল তিন মণের কাছাকাছি—তাকে সে এক থাবড়া মেরে বসিয়ে দিতে পারত। লাঠি খেলে খেলে তার হাতে জমেছিল বাঘের থাবার তাগদ। কিন্তু সে যে ভিরমি যায় নি, ''এমখ'' হয় নি, তার কারণ তার শরীরের জোর নয়—দিলের হিম্মৎ—সে মন বেঁধেছিল, যে করেই হোক পয়সা সে কামাবেই, ভিরমি গেলে চলবে না, বিমারি পাকড়ানো সখ্‌ মানা।'

সারেঙ বললে, 'কী বেহদ তকলীফে জানপানি হয়ে যে কুলুম শহরে পৌঁছলাম—'

আমি শুধুলাম, 'সে আবার কোথায়?'

বললে, 'বাংলায় যারে লঙ্কা কয়।'

আমি বললুম, 'ও, কলম্বো!'

'জী। আমাদের উচ্চারণ তো আপনাদের মত ঠিক হয় না। আমরা বলি কুলুম শহর। সেখানে ডাঙায় বেড়াবার জন্য আমাদের নামতে দিল বটে, কিন্তু যারা পয়লা বার জাহাজে বেরিয়েছে, তাদের উপর কড়া নজর রাখা হয়, পাছে জাহাজের অসহ্য কষ্ট এড়াবার জন্যে পালিয়ে যায়। সমীরুদ্দী বন্দরে নামলেই না। বললে, নামলেই তো বাজে খরচা। আর সে-কথা ঠিকও বটে, হুজুর, খালাসীরা কাঁচা পয়সা বন্দরে যা ওড়ায়! যে জীবনে কখনও পাঁচ টাকার নোট দেখে নি, আধুলির বেশি কামায় নি, তার হাতে পনের টাকা। সে তখন কাগের বাচ্চা কেনে।

'আমরা পেট ভরে যা খুশি তাই খেলাম। বিশেষ করে শাক-সবজি। জাহাজে খালাসীদের কপালে ও জিনিস কম। নেই বললেও হয়—দেশে যার ছড়াছড়ি।

'তারপর কুলুম থেকে আদন বন্দর।'

আমার আর ইংরিজি 'এইডন' বলার দরকার হল না।

'তারপর লাল-দরিয়া পেরিয়ে সুসোর খাড়ি—দু দিকে ধু-ধু মরুভূমি, বালু আর বালু, মাঝখানে ছোট্ট খাল।'

বুঝলুম, 'সুসোর খাড়ি' মানে সুয়েজ কানাল।

'তারপর পুর্সই। সেখানে খালের শেষ। বাড়িয়া বন্দর। আমরা শাকসবজি খেতে নামলাম সেখানে। ঝানুরা গেল খারাপ জায়গায়।'

পোর্ট সঈদের গণিকালয় যে বিশ্ববিখ্যাত, দেখলুম, সারেঙের পো সে খপরটি রাখে।

পুর্সই থেকে মার্সই, মার্সই থেকে হামবুর—জর্মানির মুলুকে।'

ততক্ষণে সিলেটি উচ্চারণে বিদেশী শব্দ কী ধ্বনি নেয়, তার খানিকটা আন্দাজ হয়ে গিয়েছে, তাই বুঝলুম, মারসেইলজ, হামবুর্গের কথা হচ্ছে। আর এটাও লক্ষ্য করলুম যে, সারেঙ বন্দরগুলোর নাম সোজা ফরাসি-জর্মন থেকে শুনে শিখেছে, তারা যে-রকম উচ্চারণ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করে, ইংরিজির বিকৃত উচ্চারণের মারফতে নয়।

সারেঙ বলল, 'হামবুরে সব মাল নেমে গেল। সেখান থেকে আবার মাল গাদাই করে আমরা দরিয়া পাড়ি দিয়ে গিয়ে পৌঁছলুম নুউক বন্দরে—মিরকিন মুলুকে।

'নয়া ঝুনা কোন খালাসীকে নুউক বন্দরে নামতে দেয় না। বড় কড়াকড়ি সেখানে। আর হবেই বা না কেন? মিরকিন মুলুক সোনার দেশ। আমাদের মত চাষাভূষাও সেখানে মাসে পাঁচ-সাত শো টাকা কামাতে পারে। আমাদের চেয়েও কালা, একদম মিশকালা আদমীও সেখানে তার চেয়েও বেশি কামায়। খালাসীদের নামতে দিলে সব কটা ভেগে গিয়ে তামাম মুলুকে ছড়িয়ে পড়ে প্রাণভরে টাকা কামাবে। তাতে নাকি মিরকিন মজুরদের জবর লোকসান হয়। তাই আমরা হয়ে রইলাম জাহাজে বন্দী।'

'নুউক পৌঁছবার তিন দিন আগে থেকে সমীরুদ্দীর করল শক্ত পেটের অসুখ। আমরা আর পাঁচজন ব্যামোর ভান করে হামেশাই কাজে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করতাম, কিন্তু সমীরুদ্দী এক ঘণ্টার তরেও কোন প্রকারের গাফিলি করে নি বলে ডাক্তার তাকে শুয়ে থাকবার হুকুম দিলে।'

'নুউক পৌঁছবার দিন সন্ধ্যেবেলা সমীরুদ্দী আমাকে ডেকে পাঠিয়ে কসমকিরে খাইয়ে কানে কানে বললে, সে জাহাজ থেকে পালাবে। তারপর কী কৌশলে সে পারে পৌঁছবে, তার ব্যবস্থা সে আমায় ভাল করে বুঝিয়ে বললে।

'বিশ্বাস করবেন না সায়েব, কী রকম নিখুঁত ব্যবস্থা সে কত ভেবে তৈরি করেছিল। কলকাতার চোরা-বাজার থেকে সে কিনে এনেছিল একটা খাসা নীল রঙের সুট, শার্ট, টাইকলার, জুতা, মোজা।

'আমাকে সাহায্য করতে হল শুধু একটা পেতলের ডেগচি যোগাড় করে দিয়ে। সন্ধ্যার অন্ধকারে সমীরুদ্দী সাঁতারের জাঙিয়া পড়ে নামল জাহাজের উলটো ধার দিয়ে, খোলা সমুদ্রের দিকে। ডেগচির ভিতরে তার সুট, জুতো, মোজা আর একখানা তোয়ালে। বুক দিয়ে সেই ডেগচি ঠেলেঠেলে বেশ খানিকটা চক্কর দিয়ে সে প্রায় আধ-মাইল দূরে গিয়ে উঠবে ভাঙায়। পাড়ে উঠে, তোয়ালে দিয়ে গা মুছে, জাঙিয়া ডেগচি জলে ডুবিয়ে দিয়ে শিস দিতে দিতে চলে যাবে শহরের ভিতর। সেখানে আমাদেরই এক সিলেটি ভাইকে সে খবর দিয়ে রেখেছিল হামবুর থেকে। পুলিশের খোঁজাখুঁজি শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে কয়েকদিন তারপর দাড়িগোঁফ কামিয়ে চলে যাবে নুউক থেকে বহুদূরে, যেখানে সিলেটিরা কাঁচা পয়সা কামায়। পালিয়ে ডাঙায় উঠতে পুলিশের হাতে ধরা পড়ার যে কোন ভয় ছিল না তা নয়, কিন্তু একবার সুটটি পরে রাস্তায় নামতে পারলে পুলিশ দেখলেও ভাববে, সে নুউকবাসিন্দা, সমুদ্রপারে এসেছিল হাওয়া খেতে।

'পেলেনটা ঠিক উতরে গেল, সায়েব। সমীরুদ্দীর জন্য খোঁজ-খোঁজ রব উঠল পরের দিন দুপুরবেলা। ততক্ষণে চিড়িয়া যে শুধু উড় গিয়া তা নয় সে বনের ভিতর বিলকুল উধাও। একদম না-পাত্তা। বরঞ্চ বনের ভিতর পাখিকে খোঁজলেও পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু নুউক শহরের ভিতর সমীরুদ্দীকে খুঁজে পাবে কোন্ পুলিশের গোসাঁই?'

গল্প বলায় ক্ষান্ত দিয়ে সারেঙ গেল জোহরের নমাজ পড়তে। ফিরে এসে ভূমিকা না দিয়েই সারেঙ বললে, 'তারপর হুজুর আমি পুরো সাত বচ্ছর জাহাজে কাটাই। দু-পাঁচবার খিদিরপুরে নেমেছি বটে, কিন্তু দেশে যাবার আর ফুরসৎ হয়ে ওঠে নি। আর কী-ই বা হত

www.BanglaBook.org

গিয়ে, বাপ-মা মরে গিয়েছে, বউ-বিবিও তখন ছিল না। যতদিন বেঁচে ছিল, বাপকে মাঝে মাঝে টাকা পাঠাতাম—বুড়া শেষের ক বছর সুখেই কাটিয়েছে—খুদাতালার শুকুর—বুড়ি নাকি আমার জন্য কাঁদত। তা হুজুর দরিয়ার অথৈ নোনা পানি যাকে কাতর করতে পারে না, বুড়ির দু ফোঁটা নোনা জল তার আর কী করতে পারে বলুন!'

বলল বটে হক কথা, তবু সারেঙের চোখেও এক ফোঁটা নোনা জল দেখা দিল।

সারেঙ বললে, 'যাক সে কথা। এ সাত বছর মাঝে মাঝে এর মুখ থেকে ওর মুখ থেকে খবর কিংবা গুজব, যাই বলুন, শুনেছি, সমীরুদ্দী বহুত পয়সা কামিয়েছে, দেশেও নাকি টাকা পাঠায়, তবে সে আস্তানা গেড়ে বসেছে মিরকিন মুলুকে, দেশে ফেরার কোন মতলব নেই। তাই নিয়ে আমি আপসোস করি নি, কারণ খুদাতালা যে কার জন্য কোন্ মুলুকে দানাপানি রাখেন, তার হদিস বাতলাবে কে?

'তারপর কল-ঘরের তেলে-পিছল মেঝেতে আছাড় খেয়ে ভেঙে গেল আমার পায়ের হাড্ডি। বড় জাহাজের কাম ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে এসে ঢুকলাম ডিসপ্যাচারের কামে। এ-জাহাজে আসার দুদিন পরে, একদিন খুব ভোরবেলা ফজরের নমাজের ওজু করতে যাচ্ছি, এমন সময় তাজ্জব মেনে দেখি, ডেকে বসে রয়েছে সমীরুদ্দী! বুকে জাবড়ে ধরে তাকে বললাম, ভাই সমীরুদ্দী! এক লহমায় আমার মনে পড়ে গেল, সমীরুদ্দীকে এককালে আমি আপনার ভাইয়ের মতন কতই না প্যার করেছি।

'কিন্তু তাকে হঠাৎ দেখতে পাওয়ার চেয়েও বেশি তাজ্জব লাগল আমার, সে আমার প্যারে কোন সাড়া দিল না বলে। গাঙের দিকে মুখ করে পাথরের পুতুলের মত বসে রইল সে। শুধালাম, "তোর দেশে ফেরার খবর তো আমি পাই নি। আবার এ জাহাজে করে চলেছিস তুই কোথায়? কলকাতা? কেন? এদেশে মন টিকল না?"

'কোন কথা কয় না। ফকির-দরবেশের মত বসে রইল ঠায়, তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে, যেন আমাকে দেখতেই পায় নি।

'বুঝলাম কিছু একটা হয়েছে। তখনকার মত তাকে আর কথা কওয়াবার চেষ্টা না করে, ঠেলেঠুলে কোন গতিকে তাকে নিয়ে গেলাম আমার কেবিনে। নাশতার পেলেট সামনে ধরলাম, আণ্ডা ভাজা ও পরটা দিয়ে সাজিয়ে—ওই খেতে সে বড় ভালবাসত—কিছু মুখে দিতে চায় না। তবু জোর করে গেলালাম, বাচ্চাহারা মাকে মানুষ যে রকম মুখে খাবার ঠেসে দেয়, কিন্তু হুজুর, পরের জন্য অনেক কিছু করা যায়, জানতক কুরবানি দিয়ে তাকে বাঁচানো যায়, কিন্তু পরের জন্য খাবার গিলি কী করে?

'সেদিন দুপুরবেলা তাকে কিছুতেই গোয়ালন্দে নামতে দিলাম না। আমার, হুজুর, মনে পড়ে গেল বহু বৎসরের পুরনো কথা—নুউক বন্দরেও আমাদের নামতে দেয় নি, তখন সমীরুদ্দী সেখানেই গায়েব হয়েছিল।

'রাত্রের অন্ধকারে সমীরুদ্দীর মুখ ফুটল।

'হঠাৎ নিজের থেকেই বলতে আরম্ভ করল, কী ঘটেছে।'

সারেঙ দম নেবার জন্য না অন্য কোন কারণে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল বুঝতে পারলুম না। আমিও কোন খোঁচা দিলুম না। বললে, 'তা সে দুঃখের কাহিনী—ঠিক ঠিক বলি কী করে সাহেব? এখনও মনে আছে, কেবিনের ঘোরঘুট্টি অন্ধকারে সে আমাকে সব-কিছু বলেছিল। এক-একটা কথা যেন সে অন্ধকার ফুটো করে আমার কানে এসে বিন্ধেছিল,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর অতি অল্প কথায়ই সে সব কিছু সেরে দিয়েছিল।

'সাত বছরে সে প্রায় বিশ হাজার টাকা পাঠিয়েছিল দেশে তার ছোট ভাইকে। বিশ হাজার টাকা কতখানি হয়, তা আমি জানি নে, একসঙ্গে কখনও চোখে দেখি নি—'

আমি বললুম, 'আমিও জানি নে, আমিও দেখি নি।'

'তবেই বুঝুন হুজুর, সে-টাকা কামাতে হলে কটা জান কুরবানি দিতে হয়।

'প্রথম পাঁচশো টাকা পাঠিয়ে ভাইকে লিখলে, মহাজনের টাকা শোধ দিয়ে বাড়ি ছাড়াতে। তার পরের হাজার দেড়েক বাড়ির পাশের পতিত জমি কেনার জন্য। তারপর আরও অনেক টাকা দিঘি খোদাবার জন্য, তারপর আরও বহুত টাকা শহুরী ঢঙে পাকা চুনকাম করা দেয়াল-ওলা টাইলের চারখানা বড় ঘরের জন্য, আরও টাকা ধানের জমি, বলদ, গাই, গোয়ালঘর, মরাই, বাড়ির পিছনে মেয়েদের পুকুর, এসব করার জন্য এবং সর্বশেষে হাজার পাঁচেক টাকা টঙি ঘরের উল্টোদিকে দিঘির এপারে পাকা মসজিদ বানাবার জন্য।

'সাত বছর ধরে সমীরুদ্দী মিরকিন মুলুকে, অসুরের মত খেটে দু শিফ্‌ট্ আড়াই শিফ্‌টে গতর খাটিয়ে জান পানি করে পয়সা কামিয়েছে, তার প্রত্যেকটি কড়ি হালালের রোজকার, আর আপন খাই-খরচার জন্য সে যা পয়সা খরচ করেছে, তা দিয়ে মিরকিন মুলুকের ভিখারিরও দিন গুজরান হয় না।

'সব পয়সা সে ঢেলে দিয়েছে বাড়ি বানাবার জন্য, জমি কেনার জন্য। মিরকিন মুলুকের মানুষ যে-রকম চাষবাসের খামার করে, আর ভদ্রলোকের মত ফ্যাশানের বাড়িতে থাকে, সে দেশে ফিরে সেই রকম করবে বলে।

'ওদিকে ভাই প্রতি চিঠিতে লিখেছে, এটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে—করে করে যেদিন সে খবর পেল মসজিদ তৈরি শেষ হয়েছে, সেদিন রওয়ানা দিল দেশের দিকে। নুউক বন্দরে জাহাজে কাজ পায় আনাড়ী কালা আদিমও বিনা তকলিফে। তার ওপর সমীরুদ্দী হরেক রকম কারখানার কাজ করে করে কলকব্জা এমনি ভাল শিখে গিয়েছিল যে, তারই সার্টিফিকেটের জোরে, জাহাজে আরামের চাকরি করে ফিরল খিদিরপুর। সন্ধ্যের সময় জাহাজ থেকে নেমে সোজা চলে গেল শেয়ালদা। সেখানে প্লাটফর্মে রাত কাটিয়ে পরদিন ভোরে চাটগাঁ মেল ধরে শ্রীমঙ্গল স্টেশনে পৌঁছল রাত তিনটেয়। সেখান থেকে হেঁটে রওয়ানা দিল ধলাইছড়ার দিকে—আট মাইল রাস্তা, ভোর হতে না-হতেই বাড়ি পৌঁছে যাবে।

'রাস্তা থেকে পোয়াটাক মাইল ধানক্ষেত, তারপর ধলাইছড়া গ্রাম। আলের উপর দিয়ে গ্রামে পৌঁছতে হয়।

'বিহানের আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে সমীরুদ্দী পৌঁছল ধানক্ষেতের মাঝখানে।

'মসজিদের একটা উঁচু মিনার থাকার কথা ছিল, কারণ মসজিদের নকশাটা সমীরুদ্দীকে করে দিয়েছিলেন এক মিশরী ইঞ্জিনিয়ার, আর হুজুরও মিশর মুলুকে বহুকাল কাটিয়েছেন, তাদের মসজিদে মিনারের বাহার হুজুর দেখেছেন, আমাদের চেয়ে ঢের বেশি।

'কত দূর-দরাজ থেকে সে-মিনার দেখা যায়, সে আপনি জানেন, আমিও জানি সমীরুদ্দীও জানে।'

'মিনার না দেখতে পেয়ে সমারুদ্দী আশ্চর্য হয়ে গেল, তারপর ক্রমে ক্রমে এগিয়ে

www.BanglaBook.org

দেখে—কোথায় দিঘি, কোথায় টাইলের টঙি ঘর!'

আমি আশ্চর্য হয়ে শুধালাম, 'সে কী কথা!'

সারেঙ যেন আমার প্রশ্ন শুনতে পায় নি। আচ্ছন্নের মত বলে যেতে লাগল, 'কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, সেই পুরনো ভাঙা খড়ের ঘর, আরও পুরনো হয়ে গিয়েছে। যেদিন সে বাড়ি ছেড়েছিল, সেদিন ঘরটা ছিল চারটা বাঁশের ঠেকনায় খাড়া, আজ দেখে ছটা ঠেকনা। তবে কি ছোট ভাই বাড়ি-ঘরদোর গাঁয়ের অন্য দিকে বানিয়েছে? কই, তা হলে তো নিশ্চয়ই সে-কথা কোন-না-কোন চিঠিতে লিখত। এমন সময় দেখে গাঁয়ের বাসিত মোল্লা। মোল্লাজী আমাদের সবাইকে বড্ড প্যার করে। সমীরুদ্দীকে আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

'প্রথমটায় তিনিও কিছু বলতে চান নি। পরে সমীরুদ্দীর চাপে পড়ে সেই ধানক্ষেতের মধ্যিখানে তাকে খবরটা দিলেন। তার ভাই সব টাকা ফুঁকে দিয়েছে। গোড়ার দিকে শ্রীমঙ্গল, কুলাউড়া, মৌলবীবাজারে, শেষের দিকে কলকাতায়—ঘোড়া, মেয়েমানুষ আরও কত কী।'

আমি থাকতে না পেরে বললুম, 'বল কী সারেঙ! এ-রকম ঘা মানুষ কি সইতে পারে? কিন্তু বল দিকিন, গাঁয়ের কেউ তাকে চিঠি লিখে খবরটা দিলে না কেন?'

সারেঙ বললে, 'তারাই বা জানবে কি করে, সমীরুদ্দী কেন টাকা পাঠাচ্ছে। সমীরুদ্দীর ভাই ওদের বলেছে, বড় ভাই বিদেশে লাখ টাকা কামায়, আমাকে ফূর্তি-ফার্তির জন্য তারই কিছুটা পাঠায়। সমীরুদ্দীর চিঠিও সে কাউকে দিয়ে পড়ায় নি—সমীরুদ্দি নিজে আমারই মত লিখতে পড়তে জানে না, কিন্তু হারামজাদা ভাইটাকে পাঠশালায় পাঠিয়ে লেখাপড়া শিখিয়েছিল। তবু মোল্লাজী আর গাঁয়ের পাঁচজন তার টাকা ওড়াবার বহর দেখে তাকে বাড়িঘরদোর বাঁধতে, জমি-খামার কিনতে উপদেশ দিয়েছিলে। সে নাকি উত্তরে বলেছিল, বড় ভাই বিয়ে শাদি করে মিরকিন মুলুকে গেরস্থালী পেতেছে, এ দেশে আর ফিরবে না, আর যদি ফেরেই বা, সঙ্গে নিয়ে আসবে লাখ টাকা। তিন দিনের ভিতর দশখানা বাড়ি হাঁকিয়ে দেবে।'

আমি বললুম, 'উঃ! কী পাষণ্ড! তারপর?'

সারেঙ বললে, সমীরুদ্দী আর গাঁয়ের ভিতর ঢোকে নি। সেই ধানক্ষেত থেকে উঠে ফিরে গেল আবার শ্রীমঙ্গল স্টেশনে। সমীরুদ্দী আমাকে বলে নি কিন্তু মোল্লাজী নিশ্চয়ই তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলেন, কিন্তু সে ফেরে নি। শুধু বলেছিল, যেখান থেকে এয়েছে, সেখানেই আবার ফিরে যাচ্ছে।

'কলকাতার গাড়ি সেই রাত আটটায়। মোল্লাজী আর গাঁয়ের মুরুব্বীরা তার ভাইকে নিয়ে এলেন স্টেশনে—টাকা ফুরিয়ে গিয়েছিল বলে সে গাঁয়েই ছিল। সমীরুদ্দীর দু পা জড়িয়ে ধরে সে মাপ চেয়ে তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাইলে। আরও পাঁচজন বললেন, বাড়ি চল, ফের মিরকিন যাবি তো যাবি, কিন্তু এতদিন পরে দেশে এসেছিস, দুদিন জিরিয়ে যা।'

আমি বললুম, 'রাস্কেলটা কোন্ মুখ নিয়ে ভাইয়ের কাছে এল সারেঙ?'

সারেঙ বললে, 'আমিও তাই পুছি। কিন্তু জানেন সায়েব, সমীরুদ্দী কী করলে? ভাইকে লাথি মারলে না, কিছু না, শুধু বললে সে বাড়ি ফিরে যাবে না।

'তার পরদিন ভোরবেলা এই জাহাজে তার সঙ্গে দেখা। আপনাকে তো বলেছি, শা-বন্দরের বারুণীর পুতুলের মত চুপ করে বসে।'

www.BanglaBook.org

দম নিয়ে সারেঙ বললে, 'অতি অল্প কথায় সমীরুদ্দী আমাকে সব কিছু বলেছিল। কিন্তু হুজুর, শেষটায় সে যা আপন মনে বিড়বিড় করে বলেছিল, তার মানে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি। তবে কথাগুলো আমার স্পষ্ট মনে আছে। সে বলেছিল, "ভিখিরি স্বপ্নে দেখে সে বড়লোক হয়ে গিয়েছে, তারপর ঘুম ভাঙতেই সে দেখে সে আবার দুনিয়ায়। আমি দেশে টাকা পাঠিয়ে বাড়ি ঘরদোর বানিয়ে হয়েছিলাম বড়লোক, সেই দুনিয়া যখন ভেঙে গেল তখন আমি গেলাম কোথায়?"

বাস্তব ঘটনা না হয়ে যদি শুধু গল্প হত, তবে এইখানেই শেষ করা যেত। কিন্তু আমি যখন যা শুনেছি তাই লিখছি তখন সারেঙের বাদবাকি কাহিনী না বললে অন্যায় হবে।

সারেঙ বললে, 'চৌদ্দ বছর হয়ে গিয়েছে কিন্তু আমার সর্বক্ষণ মনে হয় যেন কাল সাঁঝে সমীরুদ্দী আমার কেবিনের অন্ধকারে তার ছাতির খুন ঝরিয়েছিল।

'কিন্তু ওই যে ইনসাফ বললেন না হুজুর তার পাত্তা দেবে কে?'

'সমীরুদ্দী মিরকিন মুলুকে ফিরে গিয়ে দশ বছরে আবার তিরিশ হাজার টাকা কামায়। এবারে আর ভাইকে টাকা পাঠায় নি। সেই ধন নিয়ে যখন দেশে ফিরছিল তখন জাহাজে মারা যায়। ত্রিসংসারে তার আর কেউ ছিল না বলে টাকাটা পৌঁছল সেই ভাইয়েরই কাছে। আবার সে টাকাটা ওড়াল।'

ইনসাফ কোথায়?

নোনামিঠা

ব্যারোমিটার দেখে, কাগজপত্র ঘেঁটে জানা যায়, লাল-দরিয়া এমন কিছু গরম জায়গা নয়। জেক্কাবাদ পেশওয়ার দূরে থাক্, যাঁরা পাটনা-গয়ার গরমটা ভোগ করেছেন তাঁরা আবহাওয়া-দপ্তরে তৈরি লাল-দরিয়ার জন্ম-কুণ্ডলী দেখে বিচলিত তো হবেনই না, বরঞ্চ ঈষৎ মৃদু হাস্যও করবেন। আর উন্নাসিক পর্যটক হলে হয়তো প্রশ্ন করেই বসবেন, 'হালকা আল্‌স্টারটার দরকার হবে না তো!'

অথচ প্রতিবারেই আমার মনে হয়েছে, লাল-দরিয়া আমাকে যেন পার্ক সার্কাসের হোটেলে খোলা আগুনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শিক-কাবাব ঝলসাচ্ছে। ভুল বললুম, মনে হয়েছে, যেন হাঁড়িতে ফেলে, ঢাকনা লেই দিয়ে সেঁটে আমাকে 'দম-পুখতের' রান্না বা 'পুটপক্ক' করেছে। ফুটবলীদের যে রকম 'বগি-টিম' হয়, লাল-দরিয়া আমার 'বগি-সী।'

সমস্ত দিনটা কাটাই জাহাজের বৈঠকখানায় হাঁপাতে হাঁপাতে আর বরফভর্তি গেলাসটা কপালে ঘাড়ে নাকে ঘষে ঘষে, আর রাতের তিনটে যামই কাটাই রকে অর্থাৎ ডেকে তারা গুনে গুনে। আমার বিশ্বাস ভগবান লাল-দরিয়া গড়েছেন চতুর্থ ভূতকে বাদ দিয়ে। ওর সমুদ্রে যদি কখনও হাওয়া বয় তবে নিশ্চয়ই কিম্‌ভূতই বলতে হবে।

তাই সে রাত্রে ব্যাপারটা আমার কিম্ভূত বলেই মনে হল।

ডেক-চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ঠিক ঘুম নয়, তন্দ্রা। এমন সময় কানে এল, সেই লাল-দরিয়ায়, দেশ থেকে বহু দূরের সেই সাত সমুদ্রের এক সমুদ্রে—সিলেটের বাঙাল

www.BanglaBook.org

ভাষা। স্বপ্নই হবে। জানতুম, সে-জাহাজে আমি ছাড়া আর কোন সিলেটি ছিল না। এ-রকম মরমিয়া সুরে মাঝ রাতে, কে কাকে 'ভাই, হি কথা যদি তলচস'—বলতে যায়? খেয়ালী-পোলাও চাখতে, আকাশ-কুসুম শুঁকতে, স্বপ্নের গান শুনতে কোনও খরচা নেই; তাই ভাবলুম চোখ বন্ধ করে স্বপ্নটা আরও কিছুক্ষণ ধরে দেখি।

কিন্তু ওই তো স্বপ্নের একটিমাত্র দোষ। ঠিক যখন মনে হবে, বেশ জমে আসছে, ঠিক তখনই ঘুমটি যাবে ভেঙে। স্থলেও সে আইনের ব্যত্যয় হল না। চোখ খুলে দেখি, সামনে—আমার দিকে পিছন ফিরে দুজন খালাসী চাপা গলায় কথা বলছে।

বেচারীরা! রাত বারোটার পর এদের অনুমতি আছে ডেকে আসবার। তাও দল বেঁধে নয়। বাকী দিনের অসহ্য গরম তাদের কাটাতে হয় জাহাজের পেটের ভিতরে।

সিলেট-নোয়াখালির লোক যে পৃথিবীর সর্বত্রই জাহাজে খালাসীর কাজ করে সে-কথা আমার অজানা ছিল না। কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল, তারা কাজ করে মাল-জাহাজেই; এ ফরাসি যাত্রী-জাহাজে রাত্রি দ্বিপ্রহরে, তাও আবার নোয়াখালি চাটগাঁয়ের নয়, একদম খাঁটি আমার আপন দেশ সিলেটের লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে তার সম্ভাবনা স্বপ্নেই বেশি, বাস্তবে কম।

এরা কথা বলছিল খুবই কম। যেটুকু শুনতে পেলুম, তার থেকে কিন্তু এ-কথাটা স্পষ্ট বোঝা গেল, এদের একজন এই প্রথম জাহাজের 'কামে' ঢুকেছে এবং দেশের ঘরবাড়ির জন্য তার মন বড্ড উতলা হয়ে গিয়েছে। তার সঙ্গী পুরনো লোক; নতুন বউকে যে-রকম বাপের বাড়ির দাসী সান্ত্বনা দেয় এর কথার ধরন অনেকটা সেই রকমের।

আমি চুপ করে শুনে যাচ্ছিলুম। শেষটায় যখন দেখলুম ওরা উঠি-উঠি করছে তখন আমি কোনও প্রকারের ভূমিকা না দিয়েই হঠাৎ অতি খাঁটি সিলেটিতে জিজ্ঞেস করলুম, 'তোমাদের বাড়ি সিলেটের কোন্ গ্রামে?'

সিলেটের খালাসীরা দুনিয়ায় তাবৎ দরিয়ার মাছের মত কিলবিল করে এ-সত্য সবাই জানে, কিন্তু তার চেয়ে ঢের সত্য—সিলেটের ভদ্রসন্তান পারতপক্ষে কখনও বিদেশ যায় না। তাই লাল-দরিয়ার মাঝখানে সিলেটি শুনে আমার মনে হয়েছিল, ওটা স্বপ্ন; সেইখানে সিলেটি ভদ্রসন্তান দেখে ওদের মনে হল, আজ মহাপ্রলয় (কিয়ামতের দিন) উপস্থিত। শাস্ত্রে আছে, ওই দিনই আমাদের সকলের দেখা হবে এক-ই জায়গায়; ভূত দেখলেও মানুষ অতখানি লাফ দেয় না। দুজন যেভাবে একই তালে-লয়ে লাফ দিল তা দেখে মনে হল ওরা যেন এই কর্মটি বহুদিন ধরে মহড়া দিয়ে আসছে।

উভয় পক্ষ কথঞ্চিৎ শান্ত হওয়ার পর আমি সিগারেট-কেস খুলে ওদের সামনে ধরলুম। দুজনেই একসঙ্গে কানে হাত দিয়ে জিভ কাটল। আমাকে তারা চেনে না বটে—আমি দেশ ছেড়েছি ছেলেবেলায়—তবে আমার কথা তারা শুনেছে এবং আমার বাপ-ঠাকুর্দার পায়ের ধুলো তারা বিস্তর নিয়েছে, খুদাতালার বেহদ্ মেহেরবানি আজ তারা আমার দর্শন পেল, আমার সামনে ওসব —তওবা, তওবা ইত্যাদি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার দেশের চাষারা ইয়োরোপীয় চাষার চেয়ে ঢের ভদ্র।

খালাসী-জীবনের কষ্ট এবং আর পাঁচটা সুখ-দুঃখের কথাও হল। দুঃখের কথাই পনের আনা তিন পয়সা। বাকী এক পয়সা সুখ—অর্থাৎ মাইনেটা, সেই এক পয়সাই পঁচাত্তর টাকা। ওই দিয়ে বাড়িঘর ছাড়াবে, জমি-জমা কিনবে।

www.BanglaBook.org

শেষটায় শেষ প্রশ্ন শুধালুম, 'আহারাদি?' রাত তখন ঘনিয়ে এসেছে।

বললে, 'ওই তো আসল দুঃখ হুজুর। আমি তো তবু পুরোন লোক। পাঁউরুটি আমার গলায় গিঁট বাঁধে না। কিন্তু এই ছেলেটার জান পান্তাভাতে পোঁতা। পান্তাভাত! ভাতেরই নেই খোঁজ, ও চায় পান্তাভাত। মূলে নেই ঘর, পূব দিয়া তিন দোর। হুঁঃ।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'সে কী কথা! আমি তো শুনেছি, আর কিছু না হোক তোমাদের ডাল ভাত প্রচুর খেতে দেয়। জাহাজের কাম করে কেউ তো কখনও রোগা হয়ে দেশে ফেরে নি!'

বললে, 'ঠিকই শুনেছেন সায়েব। কিন্তু ব্যাপার হয়েছে কী, কোনও কোনও বন্দরে চাল এখন মাগ্‌গি। সারেঙ আমাদের রুটি খাইয়ে চাল জমাচ্ছে ওই সব বন্দরে লুকিয়ে চাল বিক্রি করবে বলে। সারেঙ দেশের জাতভাই কি না, না হলে অমন মারার কৌশল জানবে কী করে?'

আমি বললুম, 'নালিশ ফরিয়াদ কর নি?'

বললে, 'কে বোঝে কার বুলি? এদের ভাষা কি জানি "ফ্রিঞ্চি" না কী, সারেঙই একটুখানি বলতে পারে। ইংরিজি হলেও না হয় আমাদের মুরুব্বীদের কেউ কেউ ওপরওয়ালাদের জানাতে পারতেন। ওই তো সারেঙের কল! ধন্যি জাহাজ; ব্যাটারা শুনেছি কোলা ব্যাঙ ধরে ধরে খায়। সেলাম সায়েব, আজ উঠি! দেরি হয়ে গিয়েছে। আপনার কথা শুনে জানটা—'

আমি বললাম, 'বাস্‌ বাস।'

মাঝরাতের স্বপ্ন আর শেষরাতের ঘটনা মানুষ নাকি সহজেই ভুলে যায়। আমার আবার চমৎকার স্মৃতিশক্তি—সব কথাই ভুলে যাই। তাই ভাতের কেচ্ছা মনে পড়ল, দুপুরবেলা লাঞ্চের সময় রাইস-কারি দেখে।

জাহাজটা ফরাসিস, ফরাসিসে ভর্তি। আসলে এটা ইন্ডো-চীন থেকে ফরাসি সেপাই লস্কর লাদাই করে ফ্রান্স যাবার মুখে পণ্ডিচেরিতে একটা ঢুঁ মেরে যায়। প্যাসেঞ্জার মাত্রই পল্টনের লোক, আমরা গুটিকয়েক ভারতীয়ই উটকো মাল। খানাটেবিলে আমার পাশে বসত একটি ছোকরা সু-লিয়োৎনা—অর্থাৎ সাব অলটার্ন। আমার নিতান্ত নিজস্ব মৌলিক ফরাসিতে তাকে রাত্রের ঘটনাটি গল্পচ্ছলে নিবেদন করলুম।

শুনে সে তো মহা উত্তেজিত। আমি অবাক! ছুরি কাঁটা টেবিলে রেখে, মিলিটারি গলায় ঝাঁজ লাগিয়ে বলতে শুরু করলে, 'এ ভারি অন্যায়, অত্যন্ত অবিচার, ইনহুই—অন-হার্ড-অব— ফাঁতাস্তিক—ফেনটাসটিক আরও কত কী!'

আমি বললুম, 'রোস রোস। এত গরম হচ্ছ কেন? এ অবিচার তো দুনিয়ায় সর্বত্রই হচ্ছে, আকছারই হচ্ছে। এই যে তুমি ইন্দোচীন থেকে ফিরছ, সেখানে কি কোন ড্যানিয়েলগিরি করতে গিয়েছিলে, যো গাঁর্সো (বাছা)! ওসব কথা থাক, দুটি খাও।'

ছোকরাটির সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল বলেই কথাটা বলবার সাহস হয়েছিল। বরঞ্চ ইংরেজকে এ-সব কথা বললে, ফরাসিকে বললে হাতাহাতি বোতল-ফাটাফাটির সম্ভাবনাই বেশি।

চুপ মেরে একটু ভেবে বললে, 'হুঁঃ। কিন্তু এস্থলে তো দোষী তোমারই জাতভাই ইন্ডিয়ান সারেঙ!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি বিষম খেয়ে বললুম, 'ওই-য্-যা!'

পৃথিবীতে এমন কোন দেশ এখনও দেখলুম না যেখানে মানুষ সুযোগ পেলে দুপুরবেলা ঘুমোয় না। তবু কেন বাঙালির ধারণা যে, সে-ই এ ধনের একমাত্র অধিকারী, এখনও বুঝে উঠতে পারি নি। আপন আপন ডেকচেয়ারে শুয়ে, চোখে ফেটা মেরে আর পাঁচটি ফরাসিসের সঙ্গে কোরাসে ওই কর্মটি সবেমাত্র সমাধান করেছি, এমন সময় উর্দি-পরা এক নৌ-অফিসার আমার সামনে এসে অতিশয় সৌজন্য সহকারে অবনত মস্তকে যেন প্রকাশ্যে আত্মচিন্তা করলেন, 'আমি কি মসিয়ো অমুকের সঙ্গে আলাপ করার আনন্দ করছি?'

আমি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠে, আরও অবনত মস্তকে বললুম, 'আদপেই না। এ শ্লাঘা সম্পূর্ণ আমার-ই।'

অফিসার বললেন, 'মসিয়ো ল্য কমাদাঁ—জাহাজের কাপ্তান সাহেব—সিয়োকে—আমাকে—তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দাভিবাদন জানিয়ে প্রার্থনা করছেন যে, তিনি যদি মসিয়োর উপস্থিতি পান তবে উল্লসিত হবেন।'

পাপাত্মা আমি। ভয়ে আঁতকে উঠলুম। আবার কী অপকর্ম করে ফেলেছি যে, মসিয়ো ল্য কমাদাঁ আমার জন্য হুলিয়া জারি করেছেন। শুকনো মুখে ঢোঁক গিলে বললুম, 'সে-ই হবে আমার এ-জীবনের সব চেয়ে বড় সম্মান। আমি আপনার পথপ্রদর্শনের জন্য ব্যাকুল।'

মসিয়ো ল্য কমাদাঁ যদিও যাত্রী-জাহাজের কাপ্তান, তবু দেখলুম তাঁর ঠোঁটের উপর ভাসছে আর-একখানি জাহাজ এবং সেটা সবপ্রকার বিনয় এবং স্তুতিস্তোকবাক্যে টৈটম্বুর লাদাই। ভদ্রতার মানওয়ারী বললেও অত্যুক্তি হয় না। তবে মোদ্দা কথা যা বললেন, তার অর্থ আমার মত বহুভাষী পণ্ডিত ত্রিভুবনে আর হয় না, এমন কী প্যারিসেও হয় না।

এত বড় একটা মারাত্মক ভ্রমাত্মক তথ্য তিনি কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন এই প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করব করব করছি, এমন সময় তাঁর কথার তোড় থেকেই বেরিয়ে গেল, তিনি তিনশো তিরানব্বই বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে এই প্রথম একটি মহাপণ্ডিত আবিষ্কার করেছেন, যিনি তাঁর খালাসীদের কিচির-মিচিরের একটা অর্থ বের করতে পারেন। যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। তা হলে আমার মত আরও বহু লক্ষ পণ্ডিত সিলেট জেলায় আছেন। তারপর তিনি অনুরোধ করলেন, আমি যদি দয়া করে তাঁর খালাসীদের অসন্তুষ্টির কারণটি খোলসা করে বর্ণনা করি, তবে তিনি বড় উপকৃত হন। আমি তা-ই করলুম। তখন সেই খালাসীদের আর সারেঙের ডাক পড়ল। তারা কুরবানির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে উপস্থিত হল।

কাপ্তান আর জজ ভিন্ন শ্রেণীর প্রাণী। সাক্ষীর বয়স কত, সেই আলোচনায় জজেরা হেসে-খেলে সাতটি দিন কাটিয়ে দেন; কাপ্তানরা দেখলুম, তিন মিনিটেই ফাঁসির হুকুম দিতে পারেন। মসিয়ো ল্য কমাদোঁ অতি শান্তকণ্ঠে এবং প্রাঞ্জল ফরাসিতে সারেঙকে বুঝিয়ে দিলেন, ভবিষ্যতে তিনি যদি আর কখনও এরকম কেলেঙ্কারির খবর পান, তবে তিনি একটিমাত্র বাক্যব্যয় না করে সারেঙকে সমুদ্রের জলে ফেলে তার উপর জাহাজের প্রপেলারটি চালিয়ে দেবেন।

যাক। বাঁচা গেল। মরবে তো সারেঙটা!

www.BanglaBook.org

পানির পীর বদর সায়েব। তাঁর কৃপায় রক্ষা পেয়ে 'বদর বদর' বলে কেবিনে ফিরলুম।

খানিকক্ষণ পর চীনা কেবিন-বয় তার নিজস্ব ফরাসিতে বলে গেল, খালাসীরা আমাকে অনুরোধ জানিয়েছে আজ যেন আমি মেহেরবানি করে কেবিনে বসে তাদের পাঠানো 'ডাল-ভাত' খাই।

গোয়ালন্দী জাহাজের মামুলী রাইস-কারি খেয়েই আপনারা আ-হা-হা করেন, সেই জাহাজের বাবুর্চিরা যখন কোর্মা কালিয়া পাঠায়, তখন কী অবস্থা হয়? নাঃ, বলব না। দু-একবার ভোজনের বর্ণনা করার ফলে শহরে আমার বদনাম রটে গিয়েছে, আমি পেটুক এবং বিশ্বনিন্দুক। আমি শুধু অন্যের রন্ধনের নিন্দা করতেই জানি। আমার ভয়ঙ্কর রাগ হয়েছে। তামা-তুলসী স্পর্শ করে এই শপথ করলুম—না, থাক, আপনার আমার বাড়িতে মা-বোনদের আমি একটি লাস্ট চান্স দিলুম।

কাপ্তান সাহেব আমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে আছেন। খালাসীরা তাই এখন নির্ভয়ে খাবার নিয়ে আমার কেবিনে আসে।

এমনি করে জাহাজের শেষ রাত্রি উপস্থিত হল। সে রাত্রের খালাসীদের তৈরি গ্যালা ব্যানকুয়েট খেয়ে যখন বাঙ্কে এ-পাশ ও-পাশ করছি, এমন সময় খালাসীদের মুরুব্বীটি আমার পায়ের কাছটায় পাটাতনে বসে হাতজোড় করে বললে, 'হুজুর, একটি নিবেদন আছে।'

মোগলাই খানা খেয়ে তখন তবিয়ত বেজায় খুশ। মোগলাই কণ্ঠেই ফরমান জারি করলুম, 'নির্ভয়ে কও।'

বললে, 'হুজুর ইটা পরগণার ঢেউপাশা গাঁয়ের নাম শুনেছেন?'

আমি বললুম, 'আলবত! মনু গাঙ্গের পারে।'

বললে, 'আহা, হুজুর সব জানেন।'

মনে মনে বললুম, 'হায়, শুধু কাপ্তান আর খালাসীরাই বুঝতে পারল আমি কত বড় বিদ্যোসাগর। যারা বুঝতে পারলে আজ আমার পাওনাদারদের ভয় ঘুচে যেত তারা বুঝল না।'

বললে, 'সেই গ্রামের করীম মুহম্মদের কথাই আপনাকে বলতে এসেছি, হুজুর। করীম ব্যাটা মহাপাষণ্ড, চোদ্দ বছর ধরে মার্সই (মার্সেলেস) বন্দরে পড়ে আছে। ওদিকে বুড়ি মা কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো কানা করে ফেলেছে, কত খবর পাঠিয়েছে। হা—কিছুতেই দেশে ফিরবে না। চিঠিপত্রে কিছু হল না দেখে আমরা বন্দরে নেমে তার বাড়ি গিয়েছিলাম, তাকে বোঝাবার জন্য। ব্যাটার বউ এক রেঙখেকী, এমন তাড়া লাগালে যে আমরা পাঁচজন মদ্দা মানুষ প্রাণ বাঁচিয়ে পালাবার পথ পাই নে। তবে শুনেছি, মেয়ে-মানুষটা প্রথম প্রথম নাকি তার ভাতারের দেশের লোককে আদর-কদর করতে। যবে থেকে বুঝেছে আমরা তাকে ভাঙচি দিয়ে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার তালে আছি, সেই থেকে মারমুখো খাণ্ডার হয়ে আছে।'

আমি বললুম, 'তোমরা পাঁচজন লেঠেল যে-কর্মটি করতে পারলে না, আমি সেইটে পারব? আমাকে কি গামা পাহলওয়ান ঠাউরেছ?'

বললে, 'না, হুজুর, আপনকে কিছু বলবে না। আপনি সুট টাই পরে গেলে ভাববে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আপনি এসেছেন অন্য কাজে। আমাদের লুঙ্গি আর চেহারা দেখেই তো বেটি টের পেয়ে যায়, আমরা তার ভাতারের জাত-ভাই। আপনি হুজুর, মেহেরবানি করে "না" বলবেন না, আপনার যে কতখানি দয়ার শরীর সে-কথা বেবাক খালাসী জানে বলেই আমাকে তারা পাঠিয়েছে। আপনার জন্যই আজ আমরা ভাত—'

আমি বললুম, 'বাস্ বাস, হয়েছে হয়েছে। কাপ্তান পাকড়ে নিয়ে শুধাল বলেই তো সব কথা বলতে হল। না হলে আমার দায় পড়েছিল।'

বললে, 'তওবা, তওবা। শুনলেও গুনা হয়। তা হুজুর, আপনি দয়া করে আর "না" বলবেন না। আমি বুড়ির হয়ে আপনার পায়ে ধরছি।'

বলে সত্য-সত্যই আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরল। আমি 'হাঁ হাঁ, কর কী, কর কী' বলে পা দুটো ছাড়ালুম।

ওরা আমাকে যা কোর্মা-পোলাও খাইয়েছে তার বদলে এ-কাজটুকু না করে দিলে অত্যন্ত নেমকহারামি হয়, ওদিকে আবার এক ফরাসিনী দজ্জাল। ঝাঁটা কিংবা ভাঙা ছাতা নয়, পিস্তল হাতে নিয়ে তাড়া লাগানোই ওদের স্বভাব।

কোন্ মূর্খ বেরয় দেশভ্রমণে! কত না বাহান্ন রকমের যত সব বিদ্‌কুটে খুদার খামকা গেরো!

বন্দরে নেমে দেখি, পরদিন ভোরের আগে বার্লিন যাবার সোজা ট্রেন নেই। ফাঁকি দিয়ে গেরোটা কাটাব তারও উপায় আর রইল না। দুজন খালাসী নেমেছিল সঙ্গে—ঢেউপাশার নাগরের বাড়ি দেখিয়ে দেবে বলে। তাদের পরন লুঙ্গি, গায়ে রঙিন শার্ট, মাথায় খেজুর-পাতার টুপি, পায়ে বুট, আর গলায় লাল কম্ফর্টার। ওই কম্ফর্টারটি না থাকলে ওদের পোশাকী সজ্জাটি সম্পূর্ণ হয় না—বাঙালির যে-রকমী রেশমী উড়ুনি।

দুই হুজুরে আমাকে 'হুজুর' 'হুজুর' করতে করতে নিয়ে গেল বন্দরের এক সাবার্বে। সেখানে দূরের থেকে সন্তর্পণে ছোট্ট একটি ফুটফুটে বাড়ি দেখিয়ে দিয়েই তারা হাওয়া হয়ে গেল। আমি প্রমাদ গুনতে গুনতে এগলুম। পানির পীর বদর সায়েবকে এখন আর স্মরণ করে কোনও লাভ নেই। তাই সোঁদরবনের ডাঙার বাঘের পীর গাজী সাহেবের নাম মনে মনে জপতে লাগলুম—যাচ্ছি বাঘিনীরই সঙ্গে মেলাকাত করতে।

বেশ জোরেই বোতাম টিপলুম—চোরের মায়ের বড় গলা।

কে বলে খাণ্ডার? দরাজ খুলে একটি ত্রিশ-বত্রিশ বছরের অতিশয় নিরীহ চেহারার গো-বেচারী যুবতী এসে আমার সামনে দাঁড়াল। 'গো'-বেচারী বললুম তার কারণ আমাদের দেশটা গরুর। আসলে কিন্তু ওদের দেশের তুলনা দিয়ে বলতে হয়, 'মেরি হ্যাড এ লিট্‌ল ল্যাম্'-এর ভেড়াটি যেন মেরির রূপ নিয়ে এসে দাঁড়াল। ওদিকে আমি তৈরি ছিলুম পিস্তল, মেশিনগান, হ্যান্ড গ্রেনেডের জন্য। সামলে নিয়ে জাহাজে যে চৌস্ত ফরাসিস আদব-কায়দার তালিম পেয়েছিলেন, তারই অনুকরণে মাথা নিচু করে বললুম, 'আমি কি মাদম মা-ও মের (মুহম্মদের ফরাসি উচ্চারণ) সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ লাভ করেছি?' ইচ্ছে করেই কোন্ দিশী লোক সেটা উল্লেখ করলুম না। ফরাসিরা চীনা ভারতীয় এবং আরবীদের মধ্যে তফাত করতে পারেন না। আমরা যে রকম চীনা, জাপানী এবং বর্মী সবাইকে একই রূপে দেখি।

চেহারা দেখে বুঝলুম মাদাম গুবলেট করে ফেলেছেন। বললেন, 'আঁদ্রে (প্রবেশ

www.BanglaBook.org

করুন), মসিয়ো।'

ভরসা পেয়ে বললুম, 'মসিয়ো মাওমের সঙ্গে দেখা হতে পারে কি?'

'অবশ্য!'

ড্রইংরুমে ঢুকে দেখি, শেখ করীম মহম্মদ উত্তম ফরাসি সুট পরে টেবিলের উপর রকমারি নকশার কাপড়ের ছোট ছোট টুকরোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

আমি ফরাসিতে বললুম, 'আমি মাদ্রাজ থেকে এসেছি, কাল বার্লিন চলে যাব। ভাবলুম, আপনাদের সঙ্গে দেখা করে যাই।' সে যে ভারতীয় এবং তার ঠিকানা জানলুম কী করে সে-কথা ইচ্ছে করেই তুললুম না।

ভাঙা-ভাঙা ফরাসিতে অভ্যর্থনা জানাল।

আমি ইচ্ছে করেই মাদামের সঙ্গে কথাবার্তা জুড়ে দিলুম। মার্সেলেস যে কী সুন্দর বন্দর, কত রকম-বেরকমের রেস্তোরাঁ-হোটেল, কত জাত-বেজাতের লোক কতশত রকমের বেশভূষা পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আরও কত কী!

ইতিমধ্যে একটি ছেলে আর মেয়ে চিৎকার-চেঁচামেচি করে ঘরে ঢুকেই আমাকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

কী সুন্দর চেহারা! আমাদের করীম মুহম্মদ কিছু নটবরটি নন, তার বউও ফরাসি দেশের আর পাঁচটা মেয়ের মতো, কিন্তু বাচ্চা দুটির চেহারায় কী অপূর্ব লাবণ্য! কে বলবে এরা খাঁটি স্প্যানিশ নয়? সে দেশের চিত্রকরদের অয়েলপেন্টিঙে আমি যে রকম দেবশিশুর ছবি দেখেছি। ইচ্ছে করে, কোলে নিয়ে চুমো খাই। কিন্তু আশ্চর্য লাগল, পূর্বেই বলেছি, বাপের চেহারা তো বাংলা দেশের আর পাঁচজন হাল-চাষের শেখের যা হয় তা-ই, মায়ের চেহারাও সাধারণ ফরাসিনীর মত। তিন আর তিনে তা হলে সব সময় ছয় হয় না। দশও হতে পারে—ইনিফিনিটি অর্থাৎ পরিপূর্ণতাও হতে পারে। প্রেমের ফল তা হলে অঙ্কশাস্ত্রের আইন মানে না।

মাদাম ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইনি তোদের বাবার দেশের লোক। ছেলেটি তৎক্ষণাৎ আমার কাছে এসে গা ঘেঁষে দাঁড়াল। আমি আদর করতেই বলে উঠল, ল্যাঁদ, সে ত্যাঁ প্যাই ঈ ফাঁতাস্তিক নেস্‌পা?'—অর্থাৎ ভারতবর্ষ ফেনটাসটিক দেশ, সে দেশের অনেক ছবি সে দেখেছে, ভারি ইচ্ছে সেখানে যায়, কিন্তু বাবা রাজী হয় না—অঁক্‌ল্‌ (কাকা), আমাকে নিয়ে চল,' ওই ধরনের আরও কত কী!

আমি আবার প্রমাদ গুনলুম। কথাটা যে-দিকে মোড় নিচ্ছে তাতে না মাদাম পিস্তল বের করে।

অনুমান করতে কষ্ট হল না, আলোচনাটা মাদামের পক্ষেও অপ্রিয়। তিনি শুধালেন, 'মসিয়ের রুচি কিসে—চা, কফি, শোকালো (কোকো), কিংবা—'

আমি বললুম, 'অনেক ধন্যবাদ।'

তবু শেষটায় কফি বানাতে উঠে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে করীম মুহম্মদ উঠে দাঁড়িয়ে সিলেটি কায়দায় পা ছুঁয়ে সেলাম করতে গেল। বুঝলুম, ওর চোখ ঠিক ধরতে পেরেছে। আমি সিলেটিতেই বললুম, 'থাক্‌ থাক্‌।'

যে ভাবে তাকাল তার থেকে বুঝতে পারলুম, সে পায়ের ধুলো নিতে যাচ্ছে না, সে পায়ের ধুলো নিচ্ছে তার দেশের মুরুব্বীদের যাঁর ভিতর রয়েছেন আমার পিতৃ-পিতামহও,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে তার মাথায় ঠেকাচ্ছে দেশের মাটির ধুলো, তার মায়ের পায়ের ধুলো। আমি তখন বারণ করবার কে? আমার কী দম্ভ! সে কি আমার পায়ের ধুলো নিচ্ছে?

শুধু একটি কথা জিজ্ঞেস করলে, 'হুজুর কোন হোটেলে উঠেছেন?' আমি নাম বললুম। স্টেশনের কাছেই।

আমি বললুম, 'বস।' সে আপত্তি জানাল না। তারপর দুজনই আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলুম। কারও মুখে কোনও কথা নেই।

এমন সময়ে মেয়েটি কাছে এসে দাঁড়াল। আমি তার গালে চুমো খেয়ে বললুম, 'মধু।'

বাপ হেসে বললে, 'এবারে জন্মদিনে ওকে যখন জিজ্ঞেস করলাম ও কী সওগাত চায় তখন চাইলে ইন্ডিয়ান বর। আমাদের দেশের মেয়েরা বিয়ের কথা পাড়লেই ঘেমে ওঠে।'

তার গলায় ঈষৎ অনুযোগের আভাস পেয়ে আমি বললুম, 'মনে মনে নিশ্চয়ই পুলকিত হয়। আর আসলে তো এসব বাড়ির দেশের দশের আবহাওয়ার কথা। এরা পেটের অসুখের কথা বলতে লজ্জা পায়, আমরা তো পাই নে।'

ইতিমধ্যে কফি এল। মাদাম বললেন, 'মেয়ের নাম সারা (Sara ইংরিজিতে Sarah), ছেলেটির নাম রোমাঁ।' বাপ বললে, 'আসলে রহমান।' বুঝলুম লোকটার বুদ্ধি আছে। 'সারা' নাম মুসলমান মেয়েদেরও হয়। আর রহমানের উচ্চারণ ফরাসিতে মোটামুটি রোমাঁই।

বেচারী মাদাম। কফির সঙ্গে দিলে দুনিয়ার যত রকমের কেক, পেসট্রি, গাতো, ব্রিয়োশ, ক্রোয়াসাঁ। বুঝলুম, পাড়ার দোকানের যাবতীয় চায়ের আনুষঙ্গিক ঝেঁটিয়ে কিনে আনিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য, প্যাঁজের ফুলুরিও। মাদাম বললে, 'ম মারি—ইল লেজ এম।' আমার স্বামী এগুলো ভালবাসেন।

ছেলেটি চেঁচিয়ে বললে, 'মোয়া ওসি, মামি'—আমিও মা।

মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'মোয়া ওসি, মনোঁকল'—আমিও চাচা।

আমি আর সইতে পারলুম না। কী উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি সে-সম্বন্ধে আমি সমস্তক্ষণ সচেতন ছিলুম। রোমাঁর ভারত যাওয়ার ইচ্ছে, সারার ভারতীয় বরের কামনা এসব আমায় যথেষ্ট কাবু করে এনেছিল, কিন্তু ফ্রান্সের সেরা সেরা মিষ্টির কাছে ফুলুরির প্রশংসা—এ কোন্ দেশের রক্ত চেঁচিয়ে উঠে আমাকে একেবারে অভিভূত করে দিলে?

আমি দাঁড়িয়ে উঠে বললুম, 'আজ তবে আসি। বার্লিনের টিকিট আমার এখনও কাটা হয় নি। সেটা শেষ না করে মনে শান্তি পাচ্ছি নে।'

সবাই চেঁচামেচি করতে লাগল। ছেলেটা বললে, 'কিন্তু আপনি তো এখনও আমাদের অ্যালবাম্ দেখেন নি।' বলেই কারও তোয়াক্কা না করে অ্যালবাম্ এনে পাতার পর পাতা উল্টে যেতে লাগল। 'এই তো বাজান (বাবা + জান, সিলেটিতে বাজান), কী অদ্ভুত বেশে এদেশে নেমেছিলেন, এটার নাম লুঙ্গি না বাজান? কিন্তু ভারি সুন্দর, আমায় একটা দেবে, অঁক্‌ল্—চাচা? বাবারটা আমার হয় না, (মাদাম বলেন, 'চুপ', ছেলেটা বললে, 'পার্দো' অর্থাৎ অর্থাৎ বে-আদবি মাফ কর) এটা মা, বিয়ের আগে, ক্যাল্ এ জনি, কী সুন্দর—'

ওঃ!

গুষ্টিসুদ্ধ আমাকে ট্রাম-টার্মিনাসে পৌঁছে দিতে এল। পৃথিবীর সর্বত্রই সর্বমহল্লা থেকে

www.BanglaBook.org

অন্তত একটা ট্রাম যায়—বিনা চেঞ্জে—স্টেশন অবধি। বিদেশীকে সেই ট্রামে বসিয়ে দিলেই হল। মাদাম কিন্তু তবু পই পই করে কন্ডাক্টরকে বোঝালেন, আমাকে যেন ঠিক স্টেশনে নাবিয়ে দেওয়া হয়। 'মসিয়ো এ (ত্) এত্রাঞ্জের, স্ট্রেঞ্জার, বিদেশী, (তারপর ফিশ্ ফিস্ করে) ফরাসি বলতে পারেন না—'

মনে মনে বড় আরাম বোধ করলুম। যাক, তবু একটি বুদ্ধিমতী পাওয়া গেল, যে আমার ফরাসি বিদ্যের চৌহদ্দি ধরতে পেরেছে।

মাদাম, কাচ্চাবাচ্চারা চেঁচালে, 'ও রভোয়ার।'

করীম মুহম্মদ বললে, 'সেলাম সায়েব।'

আহারাদির পর হোটেলের লাউঞ্জে বসে ওপরে ঘুমুতে যাব-যাচ্ছি, যাব-যাচ্ছি করছি, এমন সময় করীম মুহম্মদ এসে উপস্থিত। পরনে লুঙ্গি কম্ফর্টার।

ইয়োরোপের কোনও হোটেলে ঢুকে আপনি যদি লাউঞ্জে জুতো খুলতে আরম্ভ করেন, তবে ম্যানেজার পুলিশ কিংবা অ্যাম্বুলেন্স ডাকবে। ভাববে আপনি খেপে গেছেন। এ-তত্ত্বটি নিশ্চয়ই করীমের জানা; তাই তার সাহস দেখে অবাক মানলুম। বরঞ্চ আমিই ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি তাকে বারণ করলুম। কিন্তু তারপর বিপদ, সে চেয়ারে বসতে চায় না। বুঝতে পারলুম, পরিবারের বাইরে এসে সে ঢেউপাশায় 'কেরীম্যা' হয়ে গিয়েছে। জুতো পরবে না; চেয়ারে বসবে না, কথায় কথায় কদম্‌বোস্—পদচুম্বন—করতে চায়।

বিরক্ত হয়ে বললুম, 'এ কী আপদ!'

লজ্জা পেয়ে বললে, 'হুজুরের বোধ হয় অস্বস্তি বোধ হচ্ছে সকলের সামনে আমার সঙ্গে কথা বলতে! তা হলে, দয়া করে আপনার কামরায়—'

আমি উষ্মা প্রকাশ করে বললুম, 'আদপেই না।' এবং এ অবস্থায় শ্রীহট্টের প্রত্যেক সুসন্তান যা বলে থাকে, সেটাও জুড়ে দিলুম, 'আমি কি এ ঘরে 'মাগনা' বসেছি, না এদের জমিদারির প্রজা। কিন্তু তুমি এ-রকম করছ কেন? তুমি কি আমার কেনা গোলাম নাকি? চল উপরে।'

সেখানে মেঝেতে বসে একগাল হেসে বললে, 'কেনা গোলাম না তো কী? আমার চাচাতো ভাই আছমত ছিল আপনাদের বাসার চাকর। এখন আমি মাকে যখন টাকা পাঠাই সেটা যায় আপনার সাহেবের (পিতার) নামে। আমি আপনাদের বাসায় গিয়েছি, আপনার আম্মা আমাকে চীনের বাসনে খেতে দিতেন। আমি আপনাকে চিনি হুজুর।'

আমি শুধালুম, 'বউকে ফাঁকি দিয়ে এসেছ?'

বলল, 'না হুজুর। খেতে বসে রোমাঁর মা আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বললে। আপনাকে সে রাত্রে খেতে বলতে পারে নি তার জন্য দুঃখ করলে। ও সত্যি বললে যে, আপনাতে আমাতে বাড়িতে নিরিবিলি কথাবার্তা হবে না, তাই আপনাকে খাওয়ার জন্য অনুরোধ করে নি। আসবার সময় বললে, "উনি যা বলেন তাই হবে"।'

আমি শুধালুম, 'তবু না বললে তুমি আসতে না?'

কিছুমাত্র না ভেবে বললে, 'নিশ্চয়ই আসতাম। তবে ওকে খামকা কষ্ট দিতে চাই নে বলে না-বলে আসতুম।' বলে লাজুক বাচ্চাটির মত ঘাড় ফেরালে। আমার বড় ভাল লাগল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি শুধালুম, 'আমি তোমাদের বাড়িতে বলতে গিয়েছিলুম তোমরা জানলে কী করে? আমি শুনেছি, তোমার বউ দেশের লোককে তাড়া লাগায়। আমাকে লাগাল না কেন?'

যেন একটু লজ্জা পেয়ে বলল, 'তা একটু-আধটু লাগায় বটে, হুজুর, ওরা যে বলে বেড়ায় আমাকে রোমাঁর মা ভ্যাড়া বানিয়ে রেখেছে সে-খবরটা ওর কানে পৌঁছেছে। তাই গেছে সে ভীষণ চটে। আসলে ও বড় শান্তপ্রকৃতির মেয়ে, ঝগড়া-কাজিয়া কারে কয় আদপেই জানে না।'

'আর মানুষকে কি কখনও ভ্যাড়া বানানো যায়? কামরূপে না, কোনখানেই না।'

'আপনি তা হলে সব কিছু শুনে বিবেচনা করুন, হুজুর।

'সতেরো বছর বয়সে আমি আর-পাঁচজন খালাসীর সঙ্গে নামি এই বন্দরে। কেন জানি নে, হুজুর, হঠাৎ পুলিশ লাগালে তাড়া। যে যার জান নিয়ে যেদিকে পারে দিলে ছুট। আমি ছিটকে পড়লাম শহরের এক অজানা কোণে। জাহাজ আর খুঁজে পাই নে। শীতের রাতে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে শেষটায় এক পোলের নীচে শুয়ে পড়লাম জিরব বলে। যখন হুঁশ হল তখন দেখি, আমি এক হাসপাতালে শুয়ে। জ্বরে সর্বাঙ্গ পুড়ে যাচ্ছে—দেশে আমার ম্যালেরিয়া হত। তারপর ক-দিন কাটল হুঁশে আর বেহুঁশে তার হিসেব আমি রাখতে পারি নি। মাঝে মাঝে আবছা আবছা দেখতে পেতাম ডাক্তাররা কী সব বলাবলি করছে। সেরে উঠে পরে শুনতে পাই ওদের কেউ কখনও ম্যালেরিয়ায় রোগীর কড়া জ্বর দেখে নি বলে সবাই ভড়কে গিয়েছিল। আর জ্বরের ঘোরে মাঝে মাঝে দেখতে পেতাম একটি নার্সকে। সে আমায় জল খাইয়ে রুমাল দিয়ে ঠোঁটের দু-দিক মুছে দিত। একদিন শেষরাতে কম্প দিয়ে এল আমার ভীষণ জ্বর। নার্স সব কখানা কম্বল চাপা দিয়ে যখন কম্প থামাতে পারল না তখন নিজে আমাকে জড়িয়ে ধরে পড়ে রইল। দেশে মা যেরকম জড়িয়ে ধরত ঠিক সেই রকম। তারপর আমি ফের বেহুঁশ।

কিন্তু এর পর যখন জ্বর ছাড়ল তখন আমি ভাল হতে লাগলাম। শুয়ে শুয়ে দেশের কথা, মায়ের কথা ভাবি আর ওই নার্সটিকে দেখলেই আমার জানটা খুশিতে ভরে উঠত। সে মাঝে মাঝে আমার কপালে হাত বুলিয়ে দিত আর ওদের ভাষায় প্রতিবারে একই কথা বলত। আমি না বুঝেও বুঝতাম, বলছে, ভয় নেই, সেরে উঠবে।

'তারপর একদিন ছাড়া পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম বন্দরের দিকে। সেখানে জাত-ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। অন্য এক জাহাজের—আমাদের জাহাজ তো কবে ছেড়ে দিয়েছে। সে সব কথা শুনে বললে—"ভাগো ভাগো, এখুনি ভাগো। তোমার নামে হুলিয়া জারি হয়েছে, তুমি জাহাজ ছেড়ে পালিয়েছ। ধরতে পারলেই তোমাকে পুলিশ জেলে দেবে।"

'ক বছর? কে জানে? এক হতে পারে, চোদ্দও হতে পারে। আইন-কানুন হুজুর আমি তো কিছুই জানি নে।

'কিন্তু যাই-ই বা কোথায়? যে দিকে তাকাই সে-দিকেই দেখি পুলিশ। খানা-পিনার কথা তুলব না হুজুর, সে তখন মাথায় উঠে গিয়েছে। কিন্তু রাতটা কাটাই কোথায়?

'শেষটায় শেষ অগতির গতির কথা মনে পড়ল। হাসপাতাল ছাড়ার সময় সেই নার্সটি আমার সঙ্গে শেকহ্যান্ড করে দিয়েছিল একখানা চিরকুট। তখনও জানতাম না, তাতে কী লেখা। যাকে দেখাই সে-ই হাত দিয়ে বোঝায়—আরও উত্তর দিকে যাও। শেষটায়

www.BanglaBook.org

একজন লোক আমাকে একটা বড় বাড়ির দেউড়ি দেখিয়ে চলে গেল।

'সেখানে ঘণ্টাতিনেক দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রোঁদের পুলিশ আমাকে সওয়াল করতে লাগল। হাসপাতালে দু মাস ওদের বুলি শুনে শুনে যেটুকু শিখেছিলাম তার থেকে আমেজ করতে পারলাম, ওর মনে সন্দ হয়েছে, আমি কী মতলবে ওখানে দাঁড়িয়ে আছি—আর হবেই না কেন? বুঝলাম রাশিয়তে জেল আছেই। মনে মনে বললাম, কী আর করি, একটা আশ্রয় তো চাই। জেলই কবুল। চাচা মামু অনেকেই তো লাঠালাঠি করে গেছেন, আমি না হয় না করেই গেলাম।

'এমন সময় সেই নার্সটি এসে হাজির। পুলিশকে কী একটা সামান্য কথা বলে আমাকে হাতে ধরে নিয়ে গেল তার ছোট্ট ফ্ল্যাটে—পুলিশ যেভাবে তাকে সেলাম করে রা'টি না কেড়ে চলে গেল তার থেকে আন্দেশা করলাম, পাড়ার লোক ওকে মানে।

'আমাকে খেতে দিল গরম দুধের সঙ্গে কাঁচা আণ্ডা ফেটে নিয়ে। বেহুঁশির ওক্তে কী খেয়েছি জানি নে, হুজুর, কিন্তু হুঁশের পর দাওয়াই হিসেবেও আমি শরাব খাই নি। তাই "বরান্দি"টা বাদ দিল।

'রাতে খেতে দিল রুটি আর মাংসের হালকা ঝোল। চারটি ভাতের জন্য আমার জন্য তখন কী আকুলি-বিকুলি করেছিল আপনাকে কখনও সমঝাতে পারব না, হুজুর।'

জাহাজের খালাসীদের স্মরণে আমি মনে মনে বললুম, 'সমঝাতে হবে না।' বাইরে বললুম, 'তারপর?'

একটুখানি ভেবে নিয়ে বললে, 'সব কথা বলতে গেলে রাত কাবার হয়ে যাবে সায়েব। আর কী-ই বা হবে বলে? ও আমাকে খাওয়ালে পরালে, আশ্রয় দিলে—বিদেশে-বিভুঁইয়ে সেখানে আমার জেলে গিয়ে পাথর ভাঙার কথা—এ সব খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে না বললে কি তার দাম কমে যাবে!

'দাম কমবে না বলেই বলছি হুজুর, সুজন নার্সের কাম করে—'

আমি শুধালুম, 'কী নাম বললে?'

একটু লজ্জা পেয়ে বললে, 'আমি ওকে সুজন বলে ডাকি—ওদের ভাষায় সুজান।'

বুঝলুম ওটা ফরাসি Suzzanne, এবং আরও বুঝলুম, যে-জাতের লোক আমাদের দেশে মরমিয়া ভাটিয়ালি রচেছে তাদেরই একজনের পক্ষে নামের এটুকু পরিবর্তন করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কিছু কঠিন কর্ম নয়। অতখানি স্পর্শকাতরতা এবং কল্পনাশক্তি ওদের আছে।

আমি শুধালুম, 'তার পর কী বলছিলে?'

বললে, 'সুজন নার্সের কাম করে আমাকে যে এক বছর পুষেছিল তখন আমি তার বাড়ির কাজ করেছি। বেচারীকে নিজের রান্না নিজেই করতে হত—হাসপাতাল থেকে গতর খাটিয়ে ফিরে আসার পর। আমি পাক-রসুই করে রাখতাম। শেষ দিন পর্যন্ত সে আপত্তি করেছে, কিন্তু আমি কান দিই নি।'

আমি শুধালুম, 'কিন্তু তোমার পাড়ার পুলিশ কিছু গোলমাল করলে না?'

একটুখানি মাথা নিচু করে বললে, 'অন্য দেশের কথা জানি না হুজুর, কিন্তু এখানে মহব্বতের ব্যাপারে এরা কোন রকম বাগড়া দিতে চায় না। আর এরা জানত যে ওর বাড়িতে ওঠার এক মাস পরে ওকে আমি বিয়ে করি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কিন্তু হুজুর, আমার বড় শরম বোধ হত; এ যে ঘর-জামাই হয়ে থাকার চেয়েও খারাপ। কিন্তু করিই বা কী?

'আল্লাই পথ দেখিয়ে দিলেন।

'সুজন আমাকে ছুটি-ছাটার দিনে সিনেমায়-টিনেমায় নিয়ে যেত। একদিন নিয়ে গেল এক মস্ত বড় মেলাতে। সেখানে একটা ঘরে দেখি নানা দেশের নানা রকম তাঁত জড় করে লোকজনকে দেখানো হচ্ছে তাঁতগুলো কী করে চালানো হয়, সেগুলো থেকে কী কী নকশার কাপড় বেরয়। তারই ভিতর একটা দেখতে গেলাম, অনেকটা আমাদের দেশেরই তাঁতের মত।

'আমার বাপ-ঠাকুরদা জোলার কাজ করেছে, ফসল ফলিয়েছে, দরকার হলে লাঠিও চালিয়েছে।

'অনেক ইতি উতি কিন্তু-কিন্তু করে সুজনকে জিজ্ঞেস করলাম, "তাঁতের দাম কত?" বুঝতে পারল, ওতে আমার শখ হয়েছে। ভারি খুশি হল, কারণ আমি কখনও কোন জিনিস তার কাছ থেকে চাই নি। বললে, 'ওটা বিক্রির নয়, কিন্তু মিস্ত্রী দিয়ে আমাকে একটা গড়িয়ে দেবে।

'ও দেশে ধুতি, শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা কিনবে কে? আমি বানালাম স্কার্ফ, কম্ফর্টার। দিশী নকশায়। প্রথম নকশায় আধখানা ফুটতে না ফুটতেই সুজনের কী আনন্দ! স্কার্ফ তাঁত থেকে নামাবার পূর্বেই সে পাড়ার লোক জড় করে বসেছে, আজগুবী এক নূতন জিনিস দেখাবে বলে। সবাই পই-পই করে দেখলে, অনেক তারিফ করলে। সুজনের ডবল আনন্দ, তার স্বামী নিষ্কর্মা ভবঘুরে নয়। একটা হুনুরী, গুণী লোক।

'গোড়ার দিকে পাড়াতে; পরে এখানে-সেখানে বিস্তর স্কার্ফ বিক্রি হল। বেশ দু পয়সা আসতে লাগল। তারপর এখানকার এক তাঁতীর কাছে দেখে এলাম কী করে রেশমের আর পশমের কাজ করতে হয়। শেষটায় সুজন নিয়ে এল আমার জন্য বহুত কেতাব, সেগুলাতে শুধু কাশ্মীরী নকশায় নয়, আরও বহুত দেশের বহুত রকম-বেরকমের নকশাও আছে। তখন যা পয়সা আসতে লাগল তারপর আর সুজনের চাকরি না করলেও চলে। সেই কথা বলতে সে খুশির সঙ্গে রাজী হল। শুধু বলল, যদি কখনও দরকার হয় তবে আবার হাসপাতালে ফিরে যেতে পারবে। রোমাঁ তখন পেটে। সুজন সংসার সাজাবার জন্য তৈরি।

'আপনি হয়তো ভাবছেন আমি কেন বুড়ির কথা পাড়ছি নে। বলছি, হুজুর, রাতও অনেক ঘনিয়ে এসেছে, আপনি আরাম করবেন।

'আপনি বিশ্বাস করবেন না, দু পয়সা হতে সুজন বললে, "তোমার মাকে কিছু পাঠাবে না?" আমি আগের থেকেই বন্দরের ইমানদার লোক খুঁজছিলাম। রোমাঁর মা-ই বললে, ব্যাঙ্ক দিয়েও নাকি দেশে টাকা পাঠানো যায়।

'মাসে মাসে বুড়িকে টাকা পাঠাই। কখনও পঞ্চাশ কখনও একশো। ঢেউপাশাতে পঞ্চাশ টাকা অনেক টাকা। শুনি বুড়ি টাকা দিয়ে গাঁয়ের জন্য জুম্মা-ঘর বানিয়ে দিয়েছে। খেতে-পরতে তো পারছেই।

'টাকা দিয়ে অনেক কিছুই হয়, দেশে বলে, টাকার নাম জয়রাম, টাকা হইলে সকল কাম—কিন্তু হুজুর, টাকা দিয়ে চোখের পানি বন্ধ করা যায় না। একথা আমি খুব ভাল করেই জানি। বুড়িও বলে পাঠিয়েছে, টাকার তার দরকার নেই, আমি যেন দেশে ফিরে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যাই।

'আমার মাথায় বাজ পড়ল, সায়েব; যেদিন খবর নিয়ে শুনলাম, দেশে ফিরে যাওয়া মোটেই কঠিন নয়, কিন্তু ফিরে আসা অসম্ভব। আমি এখন আমার মহল্লার মুরুব্বীদের একজন। থানার পুলিশের সঙ্গেও আমার বহুত ভাব-সাব হয়েছে। আমার বাড়িতে প্রায়ই তারা দাওয়াত-ফাওয়াত খায়। তারা প্যারিস থেকে পাকা খবর আনিয়েছে, ফিরে আসা অসম্ভব। মুসাফির হয়ে কিংবা খালাসী সেজে পালিয়ে এলেও প্যারিসের পুলিশ এসে ধরে নিয়ে দেশে চালান দেবে। এমন কি তারা আমাকে বারণ করেছে আমি যেন ওই নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া না করি। প্যারিসের পুলিশ যদি জেনে যায় আমি বিনা পাসপোর্টে এ দেশে আছি তা হলে তারা আমাকে মহল্লার পুলিশের কদর দেখাবে না। এ দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে। আপনি কী বলেন, হুজুর?'

ডাহা মিথ্যে বলি কী প্রকারে? আমার বিলক্ষণ জানা ছিল, ফ্রান্স চায় টুরিস্ট্ সে দেশে এসে আপন গাঁটের পয়সা খরচ করুক, কিন্তু তার বেকারীর বাজারে কেউ এসে পয়সা কামাক এ-অবস্থাটা সে যে করেই হোক রুখবে।

আমি চুপ করে রইলুম দেখে করীম মুহম্মদ মাথা নীচু করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

অনেকক্ষণ পর মাথা তুলে বললে, 'রোমাঁর মা আমার মনের সব কথা জানে। দেশের লোক ভাঙচি দেয়, আমি ভেড়া বনে গিয়েছি এ-কথা বলে—এ-সব শুনে সে তাদের পছন্দ করে না, কিন্তু মাঝে মাঝে ভোরের ঘুম ভেঙে গেলে দেখি সেও জেগে আছে। তখন আমার কপালে হাত দিয়ে বলে, "তোমার দেশে যদি যেতে ইচ্ছে করে, তবে যাও। আমি একাই বাচ্চা দুটোকে সামলাতে পারব।" এ-সব আরম্ভ হল, নিজে মা হওয়ার পরের থেকে।

'আজ আপনার কথা তুলে বললে, "এ ভদ্রলোকের শরীরে দয়ামায়া আছে। আমার ছেলেমেয়েকে কত আদর করলেন।" আমি বললাম, 'সুজন, তুই জানিস নে, আমাদের দেশের ভদ্রলোক আমাদের কত আপনজন। এই যে ভদ্রলোক এলেন, এঁর সায়েব (পিতা) আমার বাবাকে "পাতী" (ছেলে) বলে ডাকতেন। এ দেশের ভদ্রলোক তো গরিবের সঙ্গে কথা কয় না।" আপনি-ই বলুন, হুজুর।'

তার 'আপনজন'। ওইটুকুই বাকী ছিল।

'সুজনই আজ বললে, "ওঁর কাছে গিয়ে তুমি হুকুম নাও। উনি যা বলেন তাই হবে।" এইবার আপনি হুকুম দিন, হুজুর।'

আমি হাত জোড় করে বললুম, 'তুমি আমায় মাপ কর।'

সে আমার পায়ে ধরে বললে, 'আপনার বাপ-দাদা আমার বাপ-দাদাকে বিপদে-আপদে সলা দিয়ে হুকুম করে বাঁচিয়েছেন, আজ আপনি আমায় হুকুম দিন।'

আমি নির্লজ্জের মত পূর্ব-ঐতিহ্য অস্বীকার করে বললুম, 'তুমি আমায় মাপ কর।'

অনেক কান্নাকাটি করল। আমি নীরব।

শেষ রাত্রে আমার পায়ে চুমো খেল, আমি বাধা দিলুম না। বিদায় নিয়ে বেরবার সময় দোরের গোড়ায় তার বুক থেকে বেরল, 'ইয়া আল্লা!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মণি

'কাব্যের উপেক্ষিতা'য় ভারতের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের কবিগুরু বাল্মীকির বিরুদ্ধে অনুযোগ করেছেন, তিনি তাঁর কাব্যে ঊর্মিলার প্রতি অবিচার করেছেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলেছেন, রসসৃষ্টিতে তাবৎ-নায়িকাকে সমান সম্মান, সমান অধিকার দেওয়া সম্ভবপর নয়।

তবু তো ঊর্মিলার উল্লেখ রামায়ণে আছে। কিন্তু রামচন্দ্র আর সীতাদেবীর কি আরও বহু অনুচর সখা বান্ধবী পরিচারিকা ছিলেন না, যাঁদের উল্লেখ আদিকবি আদপেই করেন নি? তাঁদের জীবনে সুখ-দুঃখ উৎসব-ব্যসন বিরহ-বেদনা মিলনানন্দ সব-কিছুই ছিল। এতৎসত্ত্বেও আদিকবি তাঁদের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেন নি। তিনি তো কিছু নিছক কাল্পনিক চরিত্রসৃষ্টি করেন নি, নির্ভেজাল রূপকথাতে যে-রকম হয়। তিনি তো লিখেছিলেন ইতিহাস, অবশ্য রসের গামলায় চুবিয়ে নিয়ে, বাটিক প্রক্রিয়ায় হলই বা। তাই বলে কি শেষমেশ ওইসব অভাগাদের জ্যান্ত পোঁতা হল না?

জানি নে, আদিকবিকে এ-ফরিয়াদ জানালে তিনি কী উত্তর দিতেন। যে চন্দ্রবৈদ্য শ্রীরামচন্দ্রের নখ-চুল কেটে দিত, যে শুক্লবৈদ্য মা-জননী জনকতনয়ার দুকূল-কাঁচুলি কেচে দিত তারা যদি কবিসমীপে নিবেদন করত, তাদেরই বা তিনি ভুলে গেলেন কেন? ঊর্মিলার মত নিদেন তাদের নামোল্লেখ করলেই তো তারা অজরামর হয়ে যেত, তবে তিনি কী উত্তর দিতেন?

অত দূরে যাই কেন? কবিগুরু শ্রীরবীন্দ্রনাথকে যদি জিজ্ঞেস করা হত, বিনয় এবং ললিতার মত দুটি অত্যুত্তর চরিত্রসৃষ্টি করার পর—হায়, বাংলার সচ্চরিত্র কী দুর্লভ—তিনি সে-দুজনকে পথমধ্যে গুম করলেন কেন, তা হলে তিনি কী উত্তর দিতেন?

আমি বাল্মীকি নই, রবীন্দ্রনাথও নই। এমন কি আমার আপন গ্রামের প্রধান লেখক নই। আমার গ্রামের শুকুরুল্ল এবং পাগলা মাধাই যে-সব ভাটিয়ালি রচে গিয়েছে, আমার রচনা তাদের সামনে লজ্জায় ঘোমটা টানে। মাধাইয়ের একটি ভাটিয়ালির ভুলে-যাওয়া অন্তরা আমি তিরিশ বছর ধরে চেষ্টা করেও পূরণ করতে পারি নি। মাধাই আমি একই পাঠশালাতে একই শ্রেণীতে পড়েছি। মাধাই ফি বচ্ছর ফেল মারত, আমি ফার্স্ট হতুম।

তাই, বিশেষ করে তাই, আমি মোক্ষম মনঃস্থির করেছি, আমি আমার সৃজনে যাদের প্রতি অনিচ্ছায় অবজ্ঞা প্রকাশ করেছি, তাদের প্রত্যেককে জ্যান্তগোর থেকে খুঁড়ে তুলে প্রাণবন্ত করব। অর্থাৎ অর্ধমৃত করব। কারণ, আমি শক্তিমান লেখক নই। অদ্যাবধি বর্ণিত আমার তাবৎ চরিত্রই জীবন্মৃত। অতএব এঁরাও অমৃত না হয়ে আমৃত হবেন। কিন্তু আমি তো নিষ্কৃতি পাব আমার জন্মপাপ থেকে।

আমি কাবুলে ছিলাম, তখন সেখানকার ব্রিটিশ লিগেশনের সঙ্গে আমার কণামাত্র হৃদ্যতা হয় নি। 'দেশে-বিদেশে' যাঁরা পড়েছেন তাঁরা সে-কথা হয়তো স্মরণ করতে পারবেন। তবে লিগেশনের একজন প্রধান কর্মচারির সঙ্গে আমার অত্যন্ত হার্দিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ইনি পেশাওয়ারের খানদানী বাসিন্দা। অতিশয় খাস পাঠান। এঁর চতুর্দশ পুরুষের কেউ কখনও আপন গোষ্ঠীর বাইরে বিয়ে-শাদি করেন নি। পেশাওয়ারের পুলিশ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইন্‌স্‌পেক্‌টর আহম্মদ আলীর অগ্রজ। নাম শেখ মহবুব আলী। ব্রিটিশ লিগেশনে তিনি ছিলেন ওরিয়েন্টাল সেক্রেটারি।

এঁর মত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ কূটনৈতিক আমি অষ্টকুলাচল সপ্তসমুদ্র পরিক্রমা করেও দেখতে পাই নি। আমার বিশ্বাস পাঠান-প্রকৃতি ধরে। কথাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু এইসব সরল পাঠানদের যাঁরা সর্দার হন, যেমন মনে করুন ইম্পাইয়ের ফকীর, ইংরেজিতে বলে ফকির অব ইপি (Ipi), তাঁদের মত ধুরন্ধর ইহসংসারে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। শেখ মহবুব আলীই বলতেন, 'পাঠানরা হয় গাড়ল, নয় ঘড়েল। মাঝখানে কিছু নেই। পিগমিজ অ্যান্ড জাইন্টস, নো নর্মেলস্।' অধ্যাপক বগদানফ এবং বেনওয়ার সঙ্গে তাঁর প্রচুর হৃদ্যতা ছিল। বগদানফ গত হয়েছেন। বেনওয়া আছেন, সৃষ্টিকর্তা তাঁকে শতায়ু দিন, তাঁকে জিজ্ঞেস করলেই মহবুব আলীর বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে সত্যাসত্য জানতে পারবেন।

মহবুব আলী বিলক্ষণ জানতেন, লিগেশনের ইংরেজ কর্তাদের সঙ্গে আমার অহি-নকুল সম্পর্ক। ওদিকে তিনি যদিও ইংরেজের সেবা করতেন, তবু ভিতরে ভিতরে ওদের তিনি দিল-জান্ দিয়ে করতেন ঘেন্না, 'ঘৃণা' নয়—ঘেন্না। এটা অবশ্য আমার নিছক অনুমান। মহবুব আলীর মত ঝাণ্ডু চাণক্য বাক্য বা আচরণে সেটা প্রকাশ করবেন, সে-চিন্তাও বরাহভক্ষণসম মহাপাপ! বোধ হয় প্রধানত এই কারণেই তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তদুপরি আমি আহমদ আলীর বন্ধু। এবং সর্বশেষ সত্য, আমি বহু-দূরদেশাগত রোগা-পটকা, নির্বান্ধব, দুনিয়াদারি-বাবদে-বেকুব বাঙালি। এমত অবস্থায় আপনি ভগবানের শরণ না নিয়ে পাঠানের শরণ নিয়েই বিবেচকের কর্ম করবেন। তবে এ-কথাও বলব, আমি তাঁর শরণ নিই নি। তিনিই আমাকে অনুজরূপে তাঁর হৃদয়ে গ্রহণ করেছিলেন।

সে-কথা থাক্। আমি আজ তাঁর জীবনী লিখতে বসি নি। আমি লিখতে বসেছি তাঁর স্ত্রীর পরিচারিকা সম্বন্ধে। উল্লসিত পাঠক বিরক্ত হয়ে আমার বাকী লেখাটুকু পড়বেন না, সে-কথা আমি জানি; কিন্তু তার চেয়েও মোক্ষম জানি, আমি যে গুণীজনের মজলিসে দৈবেসৈবে মুখ খোলার অনুমতি পাই, তাঁদের পৌনে ষোল আনা সহৃদয় সদাশয় জন। তাঁদের অকৃপণ হৃদয় জন্মদাসী রাজরানী সবাইকে আসন দিতে জানে।

আমার সঙ্গে মহবুব আলীর হৃদ্যতা হওয়ার কয়েকদিন পর আমার ভৃত্য এবং সখা আবদুর রহমান আমাকে যা জানালে তার সারাংশ এই ঃ

মহবুব আলীর পরিবার এবং অন্য এক পরিবারের দুশমনী-লড়াই ক্ষান্ত দেবার জন্য একদা স্থিরীকৃত হয়, দুই পরিবার যেন বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। মহবুব আলী এ পরিবারের বড় ছেলে। তাই তাঁকেই বিয়ে করতে হল অন্য পরিবারের বড় মেয়েকে। নবদম্পতি গোড়ার দিকে সুখেই ছিলেন। ইতিমধ্যে বলা নেই—কওয়া নেই, হঠাৎ মহবুব আলীর এক অতি দূর চাচাতো ভাই তাঁর শ্বশুর-পরিবারের ততোধিক দূর এক মামাতো ভাইকে খুন করে। ফলে মহবুব আলীর স্ত্রী পিতৃগণের আদেশানুযায়ী স্বামীগৃহ বর্জন করে পিত্রালয়ে চলে যান।

আবদুর রহমানের কাহিনী অনুযায়ী এ-ঘটনা ঘটেছিল বছর দশেক পূর্বে। বলতে গেলে এই অবধি মহবুব আলী অকৃতদার। অধুনা অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। তিনি শীঘ্রই হিন্দুস্থান থেকে বিয়ে করে অন্য বিবি নিয়ে আসছেন।

সুহৃদ সম্বন্ধে তার অপরোক্ষ আলোচনা করা অসঙ্গত, তা সে ভৃত্যের সঙ্গেই হক আর পিতৃব্যের সঙ্গেই হক—এই আমার বিশ্বাস। কিন্তু আবদুর রহমান যখন একবার কথা

www.BanglaBook.org

বলতে আরম্ভ করে তখন তাকে ঠেকানো অসাধ্য ব্যাপার।

শেষটায় আমি বিরক্ত হয়ে বলেছিলুম, 'তোমারই বা এসব বলার কী দরকার? আমারই বা জেনে কী হবে? তিনি তো আমাকে এসব কিছু বলেন নি?'

আবদুর রহমান বললে, 'তিনি কেন বলেন নি সে-কথা আমি কী করে জানব? (পরে মহবুব আলীর কাছে শুনেছিলাম, দুঃখের কথা নাকি বন্ধু বন্ধুকে বলে না) তবে আপনার তো জানা উচিত।' আলোচনা এখানেই সমাপ্ত হয়।

তবে রাত্রে আমার গায়ে লেপকম্বল জড়িয়ে দেবার সময় আবদুর রহমান বলেছিল, 'শেখ মহবুব আলী খান বড় ভালো লোক।'

আবদুর রহমান সার্টিফিকেট দেবার সময় রবীন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করে না। এ-কথা বলে রাখা ভাল।

* * *

শেখ মহবুব আলীর বাসাতে আমি সময় পেলেই যেতুম। তাঁর বাসাটি লিগেশনের প্রত্যন্ত-প্রদেশে অবস্থিত ছিল বলে ইংরেজের ছায়া না মাড়িয়ে সেখানে পৌঁছানো যেত। তিনি দফতরে থাকলে তাঁর ছেলেবেলাকার বন্ধু এবং চাকর গফুর খান তাঁকে খবর দিতে যেত। আমি ততক্ষণে ড্রইং-রুমে বসে আগুন পোয়াতুম আর বাবুর্চিকে সবিস্তর বয়ান দিতুম কোন্ কোন্ বস্তু খাওয়া আমার বাসনা।

শেখ গফুর ফিরে এসেই আমার পায়ের কাছে বসে ভাঙা ভাঙা উর্দু ফার্সী পাঞ্জাবী পশতুতে মিশিয়ে গল্প জুড়ে দিত। পাঠানদের ভিতর জাতিভেদ নেই। শেখ গফুর আর মহবুব আলী খান প্রভু-ভৃত্য হলেও তাদের সম্পর্ক ছিল সখ্যের। তাই গফুর আমার সঙ্গে গল্প করাটা তার কর্তব্য বলে মনে করত; আমি 'ভদ্রসন্তান', তার সঙ্গে গল্প করে যে তাকে 'আপ্যায়িত' করছি, সে-কথা তাকে বললে সে নিশ্চয়ই আশ্চর্য হত। আবদুর রহমান এবং গফুরে যে সৌহার্দ্য ছিল, সে-কথা বলা বাহুল্য।

সচরাচর মহবুব আলীর ড্রয়িং-রুম খোলাই থাকত।

আবদুর রহমান রচিত মহবুব আলীর 'পারিবারিক প্রবন্ধ' শোনার কয়েকদিন পর তাঁর বাড়িতে গিয়ে ড্রইংরুমের দরজায় ধাক্কা দিয়ে দেখি, সেটা ভিতর থেকে বন্ধ। দরজার হ্যান্ডেলের কাছে তখন দেখি বিজলির বোতাম, কলিং বেল। একটুখানি আশ্চর্য হয়ে ভাবনু, মহবুব আলী আবার কবে থেকে পর্দানশিন হলেন, তাঁর গৃহে মাতা নেই, অপ্রিয়বাদীনী ভার্যা পর্যন্ত নেই, তাঁর গৃহ তো অরণ্যসম। অরণ্যকে ছিটকিনি দিয়ে বন্ধ করার কা কস্য প্রয়োজন? দিলুম বোতাম টিপে, সঙ্গে সঙ্গে ডাকলুম, 'ভাই গফুর!'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে গেল। ভেবেছিলুম দেখব গাট্টাগোট্টা গালকম্বল গাড়ি সম্বলিত বেঁটে কেলে গফুর মহম্মদ খান। দেখি,—হকচকিয়ে গেলুম,—দেখি, দীর্ঘ এবং তন্বঙ্গী একটি মেয়ে। পরনে লম্বা শিলওয়ার আর হাঁটু পর্যন্ত নেমে-আসা কুর্তা। ওড়না দিয়ে মাথার অর্ধেক অবধি ঘোমটা।

শ্যামা। এবং সে অতি মধুর শ্যামবর্ণ। পেশওয়ার কাবুলে মানুষের রঙ হয় ফরসা, কিংবা রোদে-পোড়া বাদামী। এ মেয়ের রঙ সেই শ্যাম, যেটি পর্দানশিন বাঙালি মেয়ের হয়। তার কী তুলনা আছে?

বলতে সময় লাগল। কিন্তু প্রথম দিন তাকে দেখেছিলুম এক লহমার তরে। আমি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাকে ভাল করে দেখবার পূর্বেই সে দিয়েছিল ভিতরপানে ছুট। তখন লক্ষ্য করছিলুম, সেও আধ লহমার তরে, গুরুগামিনী রমণীর যে যে স্থলে বিধাতা সৌন্দর্য পুঞ্জীভূত করে দেন, তন্বঙ্গীর ক্ষীণ দেহে তার কিছুমাত্র কার্পণ্য করেন নি; বরঞ্চ বলব, তিনি অজন্তার চিত্রকরের মত একটু যেন বাড়াবাড়ি করেছেন। অথচ বয়স পনের-ষোল হয় কি না-হয়। তবে কি বিধাতা মানুষের আঁকা ছবি দেখে তাঁর সৃষ্টির সৌন্দর্য বাড়ান?

তা সে যাক গে। তখন কি আর অত করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিলুম, না, ওই বিষয়ে চিন্তাই করেছিলুম!

আমি আগুনের কাছে গিয়ে বসলুম। খানিকক্ষণ পরে মহবুব আলী এলেন। পাশে বসে ডাক দিলেন, 'ম-অ-অ-ণি—'

মণি দোরের আড়ালে দাঁড়ালে দুজনাতে পশতু ভাষায় কথাবার্তা হল। আমি তার এক বর্ণও বুঝতে পারলুম না। মহবুব আলী আমাকে বললেন, 'মোটা রান্না এখনও বাবুর্চিই করে কিন্তু মণির হাতে তৈরি নাশতা না হলে আমার বিবির চলে না। মণি বললে, আপনি কী খেতে ভালবাসেন সে ইতিমধ্যে জেনে নিয়েছে এবং তৈরি করছে। ভালই হল। ও বড় তেজী মেয়ে। যাকে অপছন্দ করে তার রুটিতে হয়তো সেঁকো বিষ দেবে।'

দাবা খেলতে বসলুম এবং যথারীতি হারলুম। খেলার মাঝখানে মণি এসে অন্য টেবিলে নাশতা সাজালে।

সময় নিয়েছে বটে কিন্তু রেঁধেছে ভাল। মমলেটের রঙটি সর্বাঙ্গে সোনালী হলদে। এখানে বাদামী, সেখানে হলদে, ওখানে সাদা নয়। তে-কোণা পরোটাও তৈরি করেছে যেন টিস্কয়ার সেটস্কয়ার দিয়ে। ভিতরে ভাঁজে ভাঁজে কোন জায়গায় কাঁচাও নয়।

খাওয়া শেষ হলে আমি বললুম, 'আধ ঘণ্টাটাক বসে যাই। সেঁকো বিষ দিয়েছে কি না তার ফলাফল দেখে যাই।' মণি দাঁড়িয়ে ছিল। সে মহবুব আলীর মুখের দিকে তাকাল। তিনি পশতুতে অনুবাদ করলেন। মণি 'যাঃ' কিংবা ওই ধরনের কিছু একটা বলে চলে গেল।

ভবিষ্যৎ দেখতে পেলে তখন ওই কাঁচা রসিকতাটুকুও করতাম না।

ইতিমধ্যে মহবুব আলী আমার বাড়িতে একবার এসেছিলেন বলে আমি তাঁর বাড়ি গেলুম দিন পনের পরে। এবারে বাইরের বোতামে চাপ দেওয়া মাত্রেই খুট করে দরজা খুলে গেল।

মণি আমাকে দেখে নিঃসঙ্কোচে পশতু ভাষায় কিচির-মিচির করে উঠল। কিছুতেই থামতে চায় না। আমি একবার সামান্য সুযোগ পেয়ে বললুম, 'পশতু', তারপর আঁ হাত উপরের দিকে তুলে ভরতনাট্যম কায়দায় পদ্মফুল ফোটাবার মুদ্রা দেখিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলুম, 'ডডনং'। অর্থাৎ আমি পশতু বুঝিনে। কিন্তু কে বা শোনে কার কথা! ভরতনাট্যমে আমি যদি হই খুচরো কারবারী, মণির বেসাতি দেখলুম পাইকিরি লাটের। ডান হাত দিয়ে এক অদৃশ্য ঝাঁটা নিয়ে আকাশের বেশ খানিকটা ঝাঁট দেবার মুদ্রা দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলে, 'কুছ পরওয়া নহী।' কিন্তু শুধু মুদ্রা দিয়ে তো আর বেশিক্ষণ কথাবার্তা চালানো যায় না। তা হলে মানুষ ভাষার সৃষ্টি না করে শুধু নেচে কুদে ও মুদ্রা দেখিয়েই শঙ্করদর্শনের আলোচনা চালাত, একে অন্যকে এটম বম্ বানাবার কৌশল শেখাত।

ইতিমধ্যে গফুর এসে আমার পায়ের কাছে কার্পেটের উপর বসে জানালে মহবুব আলী শহরে গেছেন, ফিরতে দেরি হবে। তবে পই পই করে বলে গিয়েছেন, আমাকে যেন

www.BanglaBook.org

আটকে রাখা হয়। মণি ততক্ষণে রান্নাঘরে চলে গিয়েছে।

গফুর তার মনিবের সঙ্গে যে-রকম খোলা-দিলে গল্প জমায় আমার সামনে সেই ভাবেই উজির-নাজির কতল করতে আরম্ভ করল। আশকথা-পাশকথা বলে সে শুধালে, 'মণিকে আপনার কী রকম লাগে?'

আল্লা জানেন, মৌলা আলীর দোহাই, আমি স্নব নই। দাসী পরিচারিকা সম্বন্ধে আন্তরিকতার সঙ্গে আলোচনা করতে আমার কণামাত্র আপত্তি নেই। আমার সেবক আবদুর রহমানের সঙ্গে আমার বে-ভাবের আদান-প্রদান রস-রসিকতা চলত, সে-রকম ধারা আমি বহু 'শিক্ষিত' 'খানদান' লোকের সঙ্গে করতে রাজী নই। কিন্তু এখানে তো ব্যাপারটা অতখানি সরল নয়। তাই একটু বিরক্তির সুরে বললুম, 'আমার লাগা না-লাগার কী আছে?'

গফুর আমরা উত্তর শুনে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। খানিকক্ষণ পরে সামলে নিয়ে বললে, 'এ আপনি কী বলছেন! আপনি শেখ মহবুব আলীর দোস্ত। তাঁর ইষ্টকুটুম, গোষ্ঠীপরিবারের পাঠান-পখতুনের চেয়ে আপনাকে উনি ঢের ঢের বেশি ভালবাসেন। আর আপনি যেভাবে কথা বললেন, তাতে মনে হল ওঁর পরিবারের জন্য আপনার যেন কোন দরদ নেই। আজ যদি মণির বিয়ের সম্বন্ধ আসে তবে কি মহবুব আলী আপনার সঙ্গে ওই বাবদে সলা পরামর্শ না নিয়ে থাকতে পারবেন?'

আমি শুধালুম, 'এসেছে নাকি?' সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে বললুম, থুড়ি, ভুল করলুম, এতখানি ঔৎসুক্য দেখানো উচিত হয় নি। 'শাদির পয়লা রাতে বেড়াল মারবে, এ যে দুসরা রাত খতম হবার উপক্রম!'

আমার ভাবান্তর লক্ষ্য না করেই গফুর সোৎসাহে বললে, 'গণ্ডায় গণ্ডায়। সুবে পেশওয়ার-কোহট, বন্নু দেরা-ইসমাইল খান, ইস্তেক জম্মু-জলন্ধর অবধি। লিগেশনের সব কটা পাঠান চাপরাসী-দফতরি, কেরানী খাজাঞ্চী মণিকে শাদি করতে চায়।'

আমি জানতুম, পাঠানদের আপন গোষ্ঠীর ভিতর জাতবিচার নেই। কিন্তু সেটা ছিল থিয়োরেটিকল জানা, এখন দেখলুম সেটা কীরকম মারাত্মক প্র্যাকটিকাল। লিগেশনের খাজাঞ্চী মেলের লোকও পরিচারিকা মণিকে বিয়ে করতে চায়!

ইতিমধ্যে মণি দু-তিনবার ঘরে এসে অগ্নিবাণ হেনে গফুরের দিকে তাকিয়েছে। ভাষা না জেনেই বুঝতে পেরেছে, ওর সম্বন্ধেই কথাবার্তা হয়েছে। আমি গতিক সুবিধের নয় দেখে বললুম 'থাক্ থাক্।'

মণি আমার জন্য এক অজানা পেশাওয়ারি কাবাব বানিয়েছে। ভারি মোলায়েম। দেখে মনে হয় কাঁচা, কিন্তু হাত দিয়ে মুখের কাছে তুলতে না তুলতেই ঝর ঝর করে ঝরে পড়ে। আমি আগের থেকেই হাঁ করে ছিলুম; মুখে কিছু পৌঁছল না দেখে মণি খিলখিল করে হেসে উঠল। ওড়না দিয়ে মুখ ঢেকে ভিতরের দরজা দিয়ে অন্তর্ধান করল।

মহবুব আলী এলেন। দাবার ফাঁকে বললেন, 'মণিকে নিয়ে বড় বিপদে পড়েছি।'

আমি বললুম, 'কিস্তি সামলান। ঘোড়া উঠে, নৌকা মোড়ার ডবল কিস্তি।'

মহবুব আলী বললেন, 'মণিকে নিয়ে বড় বিপদে পড়েছি।'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, আমিও বিপদে পড়েছি। আবদুর রহমান বলছিল, এখন থেকে সবাইকে রাস্তায় দেরেশী পরে বেরুতে হবে। দর্জির দোকানে ভিড় লেগেছে। কী করি, বলুন তো?'

www.BanglaBook.org

ততক্ষণে খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে। আমি যথারীতি হেরে গিয়েছি।

পূর্বেই বলেছি, মহবুব আলী চাণক্যস্য চাণক্য। তাই এটাও জানেন, কখন সাফসাফ খোলাখুলি কথা কইতে হয়। বললেন, 'মণিকে বিয়ে করার জন্য সব কটা পাঠান আমার দোরে ধন্না দিচ্ছে। ওদিকে মণি বলে, সে কাউকে বিয়ে করতে চায় না। কেন? আমার বিবি বললেন, সে নাকি—'

আমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললুম, 'বাস্, বাস্।'

মহবুব আলী আমার উষ্মার জন্য তৈরি ছিলেন। আমার দুখানা হাত ধরে বললেন, 'দোস্ত, আমি জানি, এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আপনি সৈয়দবংশের ছেলে। আপনারা পাঠান-মোগলে বিয়ে শাদি করেন না। যদিও কুরান হদিসের রায়, যে-কোনও মুসলমান যে-কোনও মুসলমানীকে বিয়ে করতে পারে। হক কথা। কিন্তু লোকাচার দেশাচারও আছে। সেগুলো মানতে হয়। আজ যদি আপনি আমার বোন কিংবা শালীকে বিয়ে করে দেশে ফেরেন তবে আমি কোনও রকম দুশ্চিন্তা করব না। কিন্তু মণিকে বোঝাই কী করে, আপনার সঙ্গে তার বিয়ে সম্পূর্ণ অসম্ভব। সে ছেলেবেলা থেকে দেখেছে যে-কোনও মেয়ের সঙ্গে যে-কোনও ছেলের বিয়ে হয়। তা যে শুধু পাঠানদের ভিতরেই, সে কী করে জানবে বলুন? বাইরের সংসারে যে অন্য ব্যবস্থা, কী করে বুঝবে বলুন?'

আমি আরও বিরক্ত হয়ে বললুম, 'আঃ! কী এক স্টর্ম ইন এ টি-পট! তিলকে তাল! আপনার বাড়ির মেয়ে কাকে বিয়ে করতে চায়, না-করতে চায়, তাতে আমার কী?'

মহবুব শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ, আপনার তাতে কী?'

আবদুর রহমানের উপদেশ স্মরণে এল। বললুম, 'না, না, আপনি আমাকে এতখানি হৃদয়হীন মনে করবেন না। কিন্তু ভেবে দেখুন, আমাকে যেখানে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে এবং যেস্থলে আমার হাতে কোনও সমাধা নেই, সেখানে আমি উপদেশই বা দিই কী প্রকারে?'

* * *

কাবুলে এপিডেমিক সর্দিকাসি দেখা দিল। ঝাড়া দশ দিন ঘরে বন্ধ থাকতে হল। সেরে উঠে শুনি, মহবুব আলী আমার চেয়েও বে-এক্তেয়ার। ভেবেছিলুম কিছুদিন ও-পাড়া মাড়াব না। তবু যেতে হল।

এবারে মণি দরজা খুলেই যা পশতুর তুবড়ি বাজি, বিডন্-বিশপ ফল্স্ চালালে, তার সামনে আমি একদম হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। কুমারী পার্বতী কাম্য পতিনিন্দা শুনে ন যযৌ ন তস্থৌ হয়েছিলেন, আমি উলটো অবস্থায়। ফল কিন্তু একই।

লক্ষ্য করলুম, মণিকে ভয়ঙ্কর রোগা দেখাচ্ছে। ফার্সীতে শুধালুম, 'সর্দি হয়েছে নাকি?' মণি এক বর্ণ ফার্সী বোঝে না। খলখল করে হেসে বাড়ির ভিতর চলে গেল।

মহবুব এলেন লাঠিতে ভর করে। ঠাণ্ডা দেশের সর্দি, যাবার বেলা মানুষকে অর্ধমৃত করে দিয়ে যায়। বিশেষ করে যাদের চর্বি নিয়ে কারবার।

আমি জানতুম ওই কথাই উঠবে, যদিও আশা করেছিলুম, নাও উঠতে পারে। মণির বেশ উত্তেজনা থেকে অবশ্য আমেজ করেছিলুম, এখানে কিছু একটা হয়েছে।

বললেন, 'ওই যে আমাদের ছোকরা চাপরাসী মাহমুদ জান, রাসকেল না ইডিয়ট কী বলব! সে-ই ঘটিয়েছে কাণ্ডখানা। আপনি যখন দিন সাতেক এলেন না, তখন ওই মাহমুদ মণিকে একটা খাসা আরব্য উপন্যাস শোনালে। রাসকেলটা গল্প বানাতে আস্ত পাঠান। সে

www.BanglaBook.org

মণিকে বললে, ''বাদশা আমানুল্লা খান সৈয়দ সায়েবকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, এদেশে বিয়ে না করে দামড়ার মত ঘুরে বেড়ানো অত্যন্ত অনুচিত। লোকনিন্দা হয়, বিশেষ করে আপনি যখন শিক্ষক। তারপর সৈয়দ সায়েবের হাত ধরে তাঁকে নিয়ে গেলেন তাঁর মেয়ে-ইস্কুলে। সেখানে দু'শো মেয়েকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে হুকুম দিলেন, বেছে নাও। সৈয়দ সাহেব আর কি করেন! শাহানবাদশার হুকুম। না মানলে গর্দান। আর মেয়েগুলোই বা কি কম খাপসুরত! সৈয়দ সায়েব বিয়ে করে মশগুল। তাই এদিকে আসার ফুরসৎ তাঁর আর কই?'

আমি জীবনে ওই একবারই গীতাবর্ণিত নিষ্কম্প প্রদীপ-শিখাবৎ!

মহবুব আলী বললেন, 'মণি তো চিৎকার করে কান্নাকাটি জুড়ে দিল। তার পর শয্যা নিল, এই ড্রইং-রুমের দরজার গোড়ায়। একটানা রোজার উপবাস। রাত্রেও খায় না—'

আমিও শুধালুম, 'মণি বিশ্বাস করলে ওই গাঁজাখুরি?'

'কেন করবে না? মণি মাঝে মাঝে মোটরে করে আমার বিবির সঙ্গে শহরে যায়। পথে পড়ে মেয়ে-ইস্কুল! দেখেছে, মেয়েগুলোর বরফের মত ফরসা রঙ, বেদানার মত ট্যাবাট্যাবা লাল গাল, ধনুকের মত ভুরু—'

আমি বললুম, 'থাক্ থাক্। আপনাকে আর কবিত্ব করতে হবে না। কিন্তু আমি তো পছন্দ করি শ্যামবর্ণ—'

এইবার মহবুব আলীর মুখে ফুটল মধুর হাসি। ন্যাকরা-গলা আবদেরে-আবদেরে সুরে বললেন, 'তা হলে মণিকে ডেকে সেই সুসমাচার শুনিয়ে দি এবং এটাও বলব কি যে, আপনি মণিকে কাবুলী মেয়েদের চেয়ে বেশি খাপসুরত বলে মনে করেন?'

আমি তো রেগে টঙ। চিৎকার করে বললুম, 'বলুন, বলুন, বিশ্বসুদ্ধকে বলুন। আমার কী আপত্তি? মণি যখন বিশ্বাস করে আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে, তখন তো আপনার সব সমস্যা সমাধান হয়ে গিয়েছে।'

মহবুব আলী হাসলেন, আরও মধুর হাসি। আমার গা জ্বলে গেল।

অমিয় ছানিয়া বললেন, 'ওই তো আপনার ভুল। তাই যদি হত তবে আপনাকে দেখামাত্রই মণি হাসির বন্যা জাগাল কেন? চিৎকার করে তখন কী বলেছে, শুনেছেন? না, আপনি পশতু বোঝেন না। বলেছে, ওঁর হাতে মেহদীর দাগ নেই, উনি বিয়ে করেন নি।'

আমি চুপ। শেষটায় কাতর কণ্ঠে শুধালুম, 'মেহদীর দাগ ছাড়া কি কখনও বিয়ে হয় না?'

মহবুব আলী বললেন, 'বোঝান গিয়ে মণিকে। আপনাকে কতবার বলেছি, ও পাঠান-মেয়ে, ও বোঝে পাঠানদের কায়দাকানুন। ও শ্বাসপ্রশ্বাস নেয় পাঠানজগতে। বিশ্বভুবনের খবর ও রাখে না।'

আমি শুধালুম, 'আপনাকে গতবারে দেখেছিলুম, এ-ব্যাপার নিয়ে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। সেটা হঠাৎ কেটে গেল কী প্রকারে? আমার তো মনে হচ্ছে জিনিসটে আরও বেশি প্যাঁচালো হয়ে যাচ্ছে।'

তিন বললেন, 'পাঠান-মেয়েরা সচরাচর বাপ-চাচার আদেশমত নাক কান বুজে বিয়ে করে। কিন্তু হঠাৎ কখনও যদি পাঠান মেয়ে কাউকে ভালবেসে ফেলে তখন সে আগুনে হাত না দেওয়াই ভাল। ব্যাপারটায় গুরুত্ব গোড়ার দিকে আমি বুঝতে পারি নি; তাই তার একটা সমাধান খুঁজেছিলুম। এখন নিরাশ হয়ে অভয় মেনে বসে আছি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি আর কী বলব! অত্যন্ত চিন্তিত মনে বাড়ি ফিরলুম।

* * *

সমস্যার ফয়সালা করে দিল বাচ্চায়ে সকাও কাবুল আক্রমণ করে। আমি থাকি শহরের মাঝখানে, ব্রিটিশ লিগেশন শহরের বাইরে মাইল দেড়েক দূরে। বাচ্চা এসেছে সেদিক থেকেই এবং থানা গেড়েছে লিগেশন আর শহরের মাঝখানে। লিগেশন আর শহর একে অন্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। সেখানে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

কয়েকদিন পরে বাচ্চা হটে গেল। তখন ব্রিটিশ প্লেন এসে বিদেশী মেয়েদের পেশাওয়ার নিয়ে যেতে লাগল। খবর পেয়েই ছুটে গেলুম আমার বন্ধু মৌলানা জিয়াউদ্দীনের স্ত্রীর জন্য একটা সীট যোগাড় করতে।

মহবুব আলীর কলিং-বেল টেপা মাত্রই এবারে দরজা খুলল না। তখন হ্যান্ডেল ঘোরাতেই দরজা খুলে গেল।

খানিকক্ষণ পর মহবুব আলী এলেন। মুখ বিষ। কোন ভূমিকা না দিয়েই বললেন, 'কাবুল নিরাপদ স্থান নয় বলে লিগেশনের সব মেয়েদের পেশাওয়ারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার স্ত্রী চলে গিয়েছেন। মণিও গেছে।'

আমি বলতে চাইলুম, 'ভালই হল', কিন্তু বলতে পারলুম না।'

তারপর বললেন, 'আপনাকে বলে কি হবে, তবু বলি। যে কদিন শহর লিগেশন থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল সে কদিন এখানে অনেক রকম গুজব পৌঁছত, কেউ বলত কাবুলে লুঠতরাজ আরম্ভ হয়ে গেছে, কেউ বলত বিদেশীদের সব খুন করে ফেলা হয়েছে। আর মণি ছুটোছুটি করেছে, এ-চাপরাসী থেকে ও-চাপরাসীর কাছে, এ-আরদালীর কাছ থেকে ও-আরদালীর কাছে। টাকা দিয়ে লোভ পর্যন্ত দেখিয়েছে, আপনার কুশল সংবাদ নিয়ে আসবার জন্যে।'

আমি চুপ।

'তারপর যখন সে জানতে পারলে তাকেও আমার স্ত্রীর সঙ্গে পেশাওয়ার চলে যেতে হবে তখন এক বিপর্যয় কাণ্ড করে তুললে। কান্নাকাটি জুড়ে দিয়ে বললে, সে কিছুতেই দেশে ফিরে যাবে না। এক রকম গায়ের জোরে তাকে প্লেনে তুলে দিতে হল।'

আমি কিছু বলি নি।

* * *

একদিন কাবুলে অনেক কষ্ট সওয়ার পর খবর পেলুম, অ্যারোপ্লেনে জিয়াউদ্দীন ও আমার জন্য জায়গা হয়েছে। আগের রাত্রে মহবুব আলী আমাকে গুড্‌জানি বাঁভইয়াজ জানাতে এলেন। বিদায়ের সময় আমাকে একটা মোটা খাম দিয়ে বললেন, 'আপনি পেশাওয়ারে পৌঁছে আমার শ্বশুরবাড়ি গিয়ে মণিকে খবর দেবেন। মণি এলে তার হাতে খামটা দিয়ে বলবেন—এটা মহবুব আলীর স্ত্রীর হাতে দিয়ো।'

আমি বললুম, 'আমি তো পশতু বলতে পারি নে।'

তিনি কথা কটি উর্দু হরফে লিখে বার তিনেক আমাকে দিয়ে পড়িয়ে নিলেন।

অ্যারোপ্লেনে বসে পরের দিন অনেক চিন্তা করেছিলুম। কী চিন্তা করেছিলুম, সে-কথা দয়া করে জিজ্ঞাসা করবেন না।

পেশাওয়ার পৌঁছেই গেলুম মহবুব আলীর শ্বশুরবাড়ি। বৈঠকখানায় ঢুকে দেখি, দুই

www.BanglaBook.org

বৃদ্ধ মুরুব্বী স্থানীয় লোক বসে আছেন। আমি মহবুব আলীর কুশল সংবাদ জানিয়ে তাঁদের অনুরোধ জানালুম, মণিকে একটু খবর দিতে। ভদ্রলোকেরা একটু চমকে উঠলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিয়ে বললেন, 'খবর দিচ্ছি'। এঁরা চমকে উঠলেন কেন? তবে কি এ-বাড়ির মেয়েরা বৈঠকখানায় আসে না? তাহলে মহবুব আলীর সেটা বোঝা উচিত ছিল।

মণি এল। আমাকে দেখে অন্দরের দোরের গোড়ায় স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়াল। মুখে কথা নেই। মুরুব্বীদের দিকে একবার তাকালে। তাঁরা তখন অন্য দিকে ঘাড় ফিরিয়ে নিয়েছেন। মণি মৃদু কণ্ঠে একটি শব্দ শোধালে, 'সলামত?' কথাটা ফার্সী। হয়তো পশতুতেও চলে। অর্থ 'কুশল?'

আমি ঘাড় নাড়িয়ে বললুম, 'হ্যাঁ।'

তারপর তার কাছে গিয়ে খামটা দিয়ে সেই শেখা বুলিতে পশতুতে বললুম, 'এটা মহবুব আলীর স্ত্রীর হাতে দিয়ো।' মণির মুখ খুশিতে ভরে উঠল। যা বলল সে-ভাষা না জেনেও বুঝতে পারলুম, সে বলছে, 'পশতু তা হলে শিখেছেন?'

আমি দুঃখ দেখিয়ে ঘাড় নেড়ে 'না' জানালুম।

মণি ভিতরে চলে গেল।

আমি উঠি-উঠি করছিলুম এমন সময় চাকর এসে বললে কিছু খেয়ে যেতে। পাঠানের বাড়িতে না খেয়ে চলে যাওয়া বড় বেয়াদবি।

মণি টেবিলে খাবার সাজিয়ে দোরের আড়ালে দাঁড়াল।

একটি কথা বলল না।

বাড়ি থেকে বেরবার সময় একবার পিছনের দিকে তাকালুম, মণিকে শেষ সেলাম জানাবার জন্য। কোথাও পেলুম না।

টাঙ্গাতে উঠে উলটো দিকে মুখ করে বসতেই নজর গেল দোতলার বারান্দার দিকে। দেখি মণি দাঁড়িয়ে। মাথায় ওড়না নেই। আর দু চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরছে, লম্বা লম্বা ধারা বেয়ে।

টাঙ্গা মোড় নিল।

সে রাত্রে দেশের ট্রেন ধরলুম।

চাচা-কাহিনী

বার্লিন শহরের উলান্ড স্ট্রীটের উপর ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুস্থান হৌস নামে একটি রেস্তোরাঁ জন্ম নেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে, বাঙালির যা স্বভাব, রেস্তোরাঁর এক কোণে একটি আড্ডা বসে যায়। আড্ডার গোসাঁই ছিলেন চাচা, বরিশালের খাজা বাঙাল মুসলমান, আর চেলারা— গোসাঁই, মুখুজ্জে, সরকার, রায়, চ্যাংড়া গোলাম মৌলা ইত্যাদি।

রায় চুক চুক করে বিয়ার খাচ্ছিলেন আর গ্রাম-সম্পর্কে তাঁর ভাগনে গোলাম মৌলা ভয়ে ভয়ে তাঁর দিকে মিট মিট করে তাকাচ্ছিল, পাছে তিনি বানচাল হয়ে যান। এ-মামলা চাচা রোজই দেখেন, কিছু বলেন না, আজ বললেন, 'অত ডরাচ্ছিস কেন?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মৌলা লাজুক ছেলে। মাথা নিচু করে বললে, 'ওটা খাবার কী প্রয়োজন? আপনি তো কখনও খান নি, এতদিন বার্লিনে থেকেও। মামুরই বা কী দরকার?'

চাচা বললেন, 'ওর বাপ খেত, ঠাকুরদা খেত, দাদামশাই খেত, মামারা খায় এ দেশে না এসেও। ও হল পাইকারি মাতাল, আর পাঁচটা হিন্দুস্থানীর মত পেঁচী মাতাল নয়। আর আমি কখনও খাই নি তোকে কে বললে?'

আড্ডা একসঙ্গে বললে, 'সে কী চাচা?'

এমন ভাবে কোরাস গাইলে, মনে হল, যেন বছরের পর বছর তারা ওই বাক্যগুলোই মোহড়া দিয়ে আসছে।

ডান হাত গলাবন্ধ কোটের মধ্যিখান দিয়ে ঢুকিয়ে, বাঁ হাতের তেলো চিত করে চাচা বললেন, 'মদকে ইংরিজিতে বলে স্পিরিট, আর স্পিরিট মানে ভূত। অর্থাৎ মদে রয়েছে ভূত। সে-ভূত কখন কার ঘাড়ে চাপে তার কি কিছু ঠিক-ঠিকানা আছে? তবে ভাগ্যিস, ও-ভূত আমার ঘাড়ে মাত্র একদিনই চেপেছিল, একবারের তরে।'

গল্পের সন্ধান পেয়ে আড্ডা খুশ! আসন জমিয়ে সবাই বললে, 'ছাড়ুন চাচা।'

রায় বললেন, 'ভাগিনা, আরেকটা বিয়ার নিয়ে আয়।'

মৌলা অতি অনিচ্ছায় উঠে গেল। উঠবার সময় বললে, 'এ নিয়ে আঠারটা।'

রায় শুধালেন, 'বাড়তি না কমতি?'

ফিরে এলে চাচা বললেন, 'ফ্রলাইন ফন্ ব্রাখেলকে চিনিস?'

লেডি-কিলার পুলিন সরকার বললে, 'আহা কৈসন্ সুন্দরী,

রূপসিনী ব্লন্দিনী
নরদিশি নন্দিনী।'

শ্রীধর মুখুজ্জে বললে, 'চোপ্—।'

চাচা বললেন, 'ওর সঙ্গে প্রেম করতে যাস নি। চুমো খেতে হলে তোকে উদূখল সঙ্গে নিয়ে পেছনে ঘুরতে হবে।'

বিয়ারের ভুড়ভুড়ির মত রায়ের গলা শোনা গেল, 'কিংবা মই।'

গোসাঁই বললেন, 'কিংবা দুই-ই। উদূখলের উপর মই চাপিয়ে।'

শ্রীধর বললে, 'কী জ্বালা! শাস্ত্র শ্রবণে এরা বাধা দিচ্ছে কেন? চাচা, আপনি চালান।'

চাচা বললেন, 'সেই ফন্ ব্রাখেল আমায় বড় স্নেহ করত, তোরা জানিস। ভরাগ্রীষ্মকালে একদিন এসে বললে, "ক্লাইনার ইডিয়ট (হাবা-গঙ্গারাম), এবারে আমার জন্মদিনে তোমাকে আমাদের গাঁয়ের বাড়িতে যেতে হবে। শহরে থেকে থেকে তুমি একদম পিলা মেরে গেছ, গাঁয়ের রোদে রঙটিকে ফের একটু বাদামির আমেজ লাগিয়ে আসবে।"

আমি বললুম, "অর্থাৎ জুতোতে পালিশ লাগাতে বলছ? রোদ্দুরে না বেরিয়ে বেরিয়ে কোনও গতিকে রঙটা একটু 'ভদ্রস্থ' করে এনেছি, সেটাকে আবার নেটিভ-মার্কা করব? কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তুমি না হয় আমাকে সয়ে নিতে পার; কিন্তু তোমার বাড়ির লোক? তোমার বাবা, কাকা?"

ব্রাখেল বললে, "না হয় একটু বাঁদর-নাচই দেখালে।"

চাচা বললেন, 'যেতেই হল। ব্রাখেল আমার যা-সব উপকার করেছে তার বদলে আমি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পেও যেতে পারি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মৌলা চট করে একবার ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে নিলে।

চাচা বললে, 'অজ পাড়াগাঁ ইস্টিশান। প্যাসেঞ্জারে যেতে হল। গাড়ি থেকে নামতেই দেখি, স্বয়ং স্টেশনমাস্টার সেলাম ঠুকে সামনে হাজির। তার পিছনে ছোটবাবু, মালবাবু—অবশ্য দ্যাশের মত খালি গায়ে আলপাকার ওপর ব্রেস্ট্‌কোট পরা নয়, টিকিট-বাবু, দু-চারজন তামাশা দেখনেওলা, পুরো পাক্কা প্রসেশনে বলেই হয়। ওই অজ স্টেশনে আমিই বোধ হয় প্রথম ভারতীয় নামলুম, আর আমিই বোধ হয় শেষ।

স্টেশনমাস্টার বললে, "বাইরে গাড়ি তৈরি, এই দিকে আজ্ঞা হোক।"

বুঝলুম, ফন্ ব্রাখেলেরা শুধু বড়লোক নয়, বোধ হয় এ-অঞ্চলের জমিদার!

বাইরে এসে দেখি, প্রাচীন ফিটিং গাড়ি, কিন্তু বেশ শক্তসমর্থ। কোচম্যান তার চেয়েও বুড়ো, পরনে মর্নিং স্যুট, মাথায় চোঙার মত অপ্‌রা হ্যাট, আর ইয়া হিন্ডেনবুর্গি গোঁফ, এডওয়ার্ডী দাড়ি, আর চোখ দুটো এবং নাকের ডগাটি সুজ্জি রায়ের চোখের মত লাল, জবাকুসুমসঙ্কাশং।

কী একটা মন্ত্র পড়ে গেল; দাড়ি-গোঁপের ছাঁকনি দিয়ে যা বেরোল তার থেকে বুঝলুম, আমাকে ফিউডাল পদ্ধতিতে অভিনন্দন জানানো হচ্ছে। এ চাপানের কী ওতোর মন্ত্র গাইতে হয় ব্রাখেল আমাকে শিখিয়ে দেয় নি। কী আর করি, "বিলক্ষণ, বিলক্ষণ" বলে যেতে লাগলুম, আর মনে মনে ব্রাখেলকে প্রাণ ভরে অভিসম্পাত করলুম, এ-সব বিপাকের জন্য আমাকে কায়দা-কেতা শিখিয়ে দেয় নি বলে।

আমি গাড়িতে বসতেই কোচম্যান আমার হাঁটুর উপর একখানা ভারী কম্বল চাপিয়ে দু-দিকে গুঁজে দিয়ে মিলিটারি কায়দায় গটগট করে গিয়ে কোচবাক্সে বসল। তারপর চাবুকটা আকাশে তুলে সার্কাসের হান্টারওয়ালি ফিয়ারলেস নাদিয়ার মত ফটাফট করে মাঠের মধ্যিখান দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিলে। ইতিমধ্যে স্টেশনমাস্টারের ফুটফুটে মেয়েটি আমার অটোগ্রাফ আর স্ন্যাপ্ দুইই তুলে নিয়েছে।

মাঠের পর ঈষৎ খাড়াই, তারপর ঘন পাইন বন; বন থেকে বেরুতেই সামনে উঁচু পাহাড় আর তার উপর যমদূতের মত দাঁড়িয়ে এক কাসল্। মহাভারতের শান্তিপর্বে শরশয্যায় শুয়ে শুয়ে ভীষ্মদেব মেলা দুর্গের বয়ান করেছেন, এ দুর্গ যেন সব কটা মিলিয়ে লাবড়ি-ভর্তা।

আমি ভয় পেয়ে শুধালুম, "ওই আকাশে চড়তে হবে?"

কোচম্যান ঘাড় ফিরিয়ে গর্বের হাসি হেসে বললে, "ইয়াঃ মাইন হের।" চাবুকের ঠ্যালায় তার গোঁপের ডগা দুটো আরও আড়াই ইঞ্চি প্রমোশন পেয়ে গেল। তারপর ভরসা দিলে, 'এক মিনিটে পৌঁছে যাব স্যার্।' আমি মনে মনে মৌলা আলীকে স্মরণ করলুম।

এ কী বিদ্‌ঘুটে ঘোড়া রে বাবা, এতক্ষণ সমান জমিতে চলছিল আমাদের দিশী টাট্টুর মত কদম আর দুলকি চাল মিশিয়ে, এখন চড়াই পেয়ে চলল লম্বা চালে। রাস্তাটা অজগরের মত পাহাড়টাকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উপরে উঠে যেন কাসলটায় ফণা মেলেছে; কিন্তু ফণার কথা থাক্, উপস্থিত প্রতি বাঁকে গাড়ি যেন দু চাকার উপর ভর দিয়ে মোড় নিচ্ছে।

হঠাৎ সামনে দেখি বিরাট খোলা গেট। কাঁকরের উপর দিয়ে গাড়ি এসে যেখানে দাঁড়ালো তার ওপর থেকে গলা শুনে তাকিয়ে দেখি, ভিলিকিনি থেকে—'

মৌলা শুধাল, 'ভিলিকিনি মানে?'

www.BanglaBook.org

চাচা বললেন, 'ও ব্যালকনি, আমাদের দেশে বলে ভিলিকিনি—সেই ভিলিকিনি থেকে ফন্ ব্রাখেল চেঁচিয়ে বলছে, যোহানেস, ওঁকে ওঁর ঘর দেখিয়ে দাও; গুস্টাফ টেবিল সাজাচ্ছে।'

তারপর আমাকে বললে, "ডিনারের পয়লা ঘণ্টা এখুনি পড়বে, তুমি তৈরি হয়ে নাও।"

চাচা বললেন, 'পরি তো কারখানার চোঙার মত পাতলুম আর গলাবন্ধ কোট, কিন্তু একটা নেভি-ব্লু সুট আমি প্রথম যৌবনে হিম্মৎ সিং-এর পাল্লায় পড়ে করিয়েছিলুম, তার রঙ, তখন বাদামীতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, এর পর কোন্ রঙ নেবে যেন মনঃস্থির করতে না পেরে ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে আছে। হাতমুখ ধুয়ে সেইটি পরে বেডরুমটার ফেন্সি জিনিসপত্রগুলো তাকিয়ে দেখছি এমন সময় ব্রাখেল আমাকে নক্ করে ঘরে ঢুকল। আমার দিকে তাকিয়ে বললে, "এ কী? ডিনার-জ্যাকেট পর নি?"

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, "ওসব আমার নেই, তুমি বেশ জান।"

ফন্ ব্রাখেল বললে, "উঁহু, সেটি হচ্ছে না। এ বাড়িতে এসব ব্যাপারে বাবা জ্যাঠা দুজনাই জোর রিচুয়াল মানেন, বড্ড পিটপিটে। তোমাদের পুজোপাজা নেমাজ-টেমাজের মত সসেজ থেকে মাস্টার্ড খসবার উপায় নেই।" তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললে, "তা তুমি এক কাজ কর। দাদার কাবার্ডভর্তি ডিনার-জ্যাকেট, শার্ট, বো—তারই এক প্রস্থ পরে নাও। এটা তারই বেডরুম; এই কাবার্ডে সব-কিছু পাবে।"

আমি বললুম, "তওবা, তোমার দাদার জামা-কাপড় পরলে কোট মাটি পৌঁছে তোমার ডিনার গাউনের মত টেল করবে।"

বললে, "না, না, না। সবাই কি আমার মত দিক-ধেড়েঙ্গে! তুমি চট্‌পট্ তৈরি হয়ে নাও, আমি চললুম।"

চাচা বললেন, 'কী আর করি, খুললুম কাবার্ড। কাতারে কাতারে কোট পাতলুম ঝুলছে—সদ্য প্রেস্‌ড, দেরাজ ভর্তি শার্ট, কলার, বো হীরে-বসানো স্লীভ-লিন্‌ক্‌স, আরও কত কী!

'মানিকপীরের মেহেরবানি বলতে হবে, জুতোটি পর্যন্ত ফিট করে গেল দস্তানার মত।

'তারপর চুল ব্রাশ করতে গিয়ে আমার কেমন যেন মনে হল, এ বেশের সঙ্গে সঙ্গে মাথার মধ্যিখানে সিঁথি জুতসই হবে না, ব্যাকব্রাশ করলেই মানাবে ভাল। আর আশ্চর্য, বিশ বছরের দু ফাঁক করা চুল বিলকুল বেয়াড়ামি না করে এক লম্ফে তালুর উপর দিয়ে পিছনে ঘাড়ের উপর চেপে বসল, যেন আমি মায়ের গর্ভ থেকে ওই ঢঙের চুল নিয়েই জন্মেছি। আয়নাতে চেহারা দেখে মনে হল, ঠিক জংলীর মত তো দেখাচ্ছে না, তোরা অবিশ্যি বিশ্বাস করবি নে।'

চাচার ন্যাওটা ভক্ত গোসাঁই বললে, 'চাচা, এ আপনার একটা মস্ত দোষ; শুধু আত্মনিন্দা করেন। ওই যে আপনি মহাভারতের শান্তিপর্বের কথা বললেন, সেখানেই ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে আত্মনিন্দার প্রচণ্ড নিন্দা করে গেছেন।'

চাচা খুশি হয়ে বললে, 'হেঁ-হেঁ', তুই তো বললি, কিন্তু ওই পুলিনটা ভাবে সে-ই শুধু লেডি-কিলিং লটবর। তা সে কথা যাক গে, ঈভনিং-ড্রেসে কালা কেষ্ট সেজে আমি তো শিস দিতে দিতে নামলুম নীচের তলায়—'

www.BanglaBook.org

পুলিন শুধালে, 'স্যার্, আপনাকে তো কখনও শিস দিতে শুনি নি, আপনি কি আদপেই শিস দিতে পারেন?'

চাচা বললেন, 'ঠিক শুধিয়েছিস। আর সত্যি বলতে কী, আমি নিজেই জানি নে, আমি শিস দিতে পারি কি না। তবে কি জানিস, হাফপ্যান্ট পরলে লাফ দিতে ইচ্ছা করে, জোব্বা পরলে পদ্মাসনে বসে থাকবার ইচ্ছা হয়, ঠিক তেমনি ঈভনিং ড্রেস পরলে কেমন যেন সাঁঝের ফষ্টি-নষ্টি করবার জন্য মন উতলা হয়ে ওঠে, না হলে আমি শিস দিতে যাব কেন? শিস কি দিয়েছিলুম আমি, শিস দিয়েছিল বকাটে সুটটা। তা সে কথা যাক।'

ততক্ষণে ডিনারের শেষ ঘণ্টা পড়ে গিয়েছে। আন্দাজে আন্দাজে ড্রইংরুম পেরিয়ে ঢুকলুম গিয়ে ব্যানকুয়েট-হলে।

কাস্‌লের ব্যানকুয়েট-হল আমাদের চণ্ডীমণ্ডপ-সাইজ হবে। তার আর বিচিত্র কী এবং সিনেমার কৃপায় আজকাল প্রায় সকলেরই তার বিদ্‌ঘুটে ঢপ-ঢং দেখা হয়ে গিয়েছে; কিন্তু বাস্তবে দেখলুম ঠিক সিনেমার সঙ্গে মিলল না। আমাদের দিশী সিনেমাতে চণ্ডীদাস পাঞ্জাবির বোতাম লাগাতে লাগাতে টিনের ছাতওলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন, যদিও বোতাম আর টিন এসেছে ইংরিজি আমলে। আর হলিউড যদি ব্যানকুয়েট-হল্ দেখায় অষ্টাদশ শতাব্দীর, তবে আসবাবপত্র রাখে সপ্তদশ শতাব্দীর, জাস্ট টু বী অন্ দি সেফ্ সাইড।

ফন ব্রাখেলদের কাস্‌ল্ কোন্ শতাব্দীর জানি না কিন্তু হলে ঢুকেই লক্ষ্য করলুম, মান্ধাতার আমলের টেবিল-চেয়ারের সঙ্গে সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর সুখ-সুবিধার সরঞ্জামও মিশে রয়েছে। তবে খাপ খেয়ে গিয়েছে দিব্যি, এঁদের রুচি আছে কোনও সন্দেহ নেই। এসব অবশ্য পরে খেতে খেতে লক্ষ্য করেছিলুম।

টেবিলের এক প্রান্তে ক্লারা ফন ব্রাখেল, অন্য প্রান্তে যে ভদ্রলোক বসেছেন তাঁকে ঠিক ক্লারার বাপ বলে মনে হল না, অতখানি বয়স যেন ওঁর নয়।

প্রথম দর্শনেই দুজন কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন। বাপের হাত থেকে তো ন্যাপকিনের আংটিটা ঠং করে টেবিলের উপর পড়ে গেল। আমি আশ্চর্য হলুম না, ভদ্রলোক হয়তো জীবনে এই প্রথম ইন্ডার (ভারতীয়) দেখেছেন, কালো ঈভনিং-ড্রেসের ওপর কালো চেহারা—গোসাঁইয়ের পদাবলীতে—

'কালোর উপরে কালো।'

হকচকিয়ে যাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয় কিন্তু ক্লারা কেমন যেন অদ্ভুতভাবে তাকালে ঠিক বুঝতেই পারলুম না। তবে কি বো'টা ঠিক হেডিং মাফিক বাঁধা হয় নি! কই, আমি তো একদম রেডিমেডের মত করে বেঁধেছি, এমন কি হালফ্যাশান মাফিক তিন ডিগ্রি ট্যারচাও করে দিয়েছি। তবে কি ঈভনিং ড্রেস আর ব্যাকব্রাস করা চুলে আমাকে ম্যাজিসিয়ানের মত দেখাচ্ছিল?

সামলে নিয়ে ক্লারা ভদ্রলোককে বললে, "পাপা, এই হচ্ছে আমার ইন্ডিয়ার আফে!"

অর্থাৎ, ভারতীয় বাঁদর।

বাপও ততক্ষণে সামলে নিয়েছেন। মিষ্টি হেসে আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে শেক-হ্যান্ড করলেন। ক্লারাকে বললেন, "প্‌ফুই—ছিঃ, ও-রকম বলতে নেই।"

আমি হঠাৎ কী করে বলে ফেললুম, 'আমি যদি বাঁদর হই তবে ও জিরাফ।"

বলেই মনে হল, তওবা, তওবা, প্রথম দিনেই ও-রকম জ্যাঠামো করা উচিত হয় নি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পিতা কিন্তু দেখলুম, মন্তব্যটা শুনে ভারি খুশ। বললেন "ডাঙ্কে—ধন্যবাদ—ক্লারাকে ঠিক শুনিয়ে দিয়েছ। আমরা তো সাহস পাই নে।"

পালিশ-আয়নার মত টেবিল, স্বচ্ছন্দে মুখ দেখা যায়। তার উপর ওলন্দাজ লেসের গোল গোল হালকা চাকতির উপর প্লেট পিরিচ সাজানো। বড় প্লেটের দুদিকে সারি বাঁধা অন্তত আটখানা ছুরি, আটখানা কাঁটা, আধ ডজন নানা ঢঙের মদের গেলাস। সেরেছে! এর কোন্ ফর্ক দিয়ে মুরগী খেতে হয়, কোন্‌টা দিয়ে রোস্ট আর কোন্‌টা দিয়েই বা সাইড্ ডিশ?

আসল খাবার পূর্বের চাট—'আর দা অভ্‌রে'র নাম দিয়েছি আমি চাট, তখন দেওয়া হয়ে গিয়েছে। খুঞ্চার ছ পদ থেকে আমি তুলেছি মাত্র দু পদ, কিঞ্চিৎ সসেজ আর দুটি জলপাই, এমন সময় বাটলার দুহাতে গোটা চারেক বোতল নিয়ে এসে শুধাল, শেরি? পোর্ট? ভেরমুট? কিংবা হুইস্কি সোডা?

আমি এসব দ্রব্য সসম্ভ্রমে এড়িয়ে চলি। হঠাৎ কী করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "নো বিয়ার!"

বলেই জিভ কাটলুম। আমি কী বলতে কী বললুম! একে তো আমি বিয়ার জীবনে কখনও খাই নি, তার উপরে আমি ভাল করেই জানি, বিয়ার চাষাড়ে ড্রিঙ্ক, ভদ্রলোকে যদি-বা খায় তবে গরমের দিনে, তেষ্টা মেটাবার জন্যে। অষ্টপদী ব্যানকুয়েটে বিয়ার! এ যেন বিয়ের ভোজে কালিয়ার বদলে শুঁটকি তলব করা!

ক্লারা জানত, আমি মদ খাই নে, হয়তো বাপকে তাই আগের থেকে বলে রেখে আমার জন্যে মাফ চেয়ে রেখেছিল, তাই সে আমার দিকে অবাক হয়ে তাকালে।

বাটলার কিন্তু কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে এক ঢাউস বিয়ারের মগ নিয়ে এল, তার ভিতর অনায়াসে দু বোতল বিয়ারের জায়গা হয়।

যখন নিতান্তই এসে গিয়েছে তখন খেতে হয়। ভাবলাম, একটুখানি ঠোঁটে ভেজাব মাত্র, কিন্তু তোমরা বিশ্বাস করবে না, খেতে গিয়ে ঢক ঢক করে প্রায় আধ মগ সাফ করে দিলুম।

মৌলা এক বিঘত হাঁ করে বললে, 'এক ধাক্কায় এক বোতল? মামুও তো পারবে না।'

চাচা বললেন, 'কেন শরম দিচ্ছিস, বাবা? ওরকম ঈভনিং-ড্রেস পরে ব্যানকুয়েট হলে বসলে তোর মামাও এক ঝটকায় দু পিপি বিয়ার গিলে ফেলত। বিয়ার কি আমি খেয়েছিলুম? খেয়েছিল ওই শালার ড্রেস!'

গোসাঁই মর্মাহত হয়ে বললে, 'চাচা!'

চাচা বললেন, 'অপরাধ নিস নি গোসাঁই, ভাষা বাবদে আমি মাঝে মাঝে এট্টুখানি বে-এক্তেয়ার হয়ে যাই। জানিস তো আমার জীবনের পয়লা গুরু ছিলেন এক ভশ্চায, তিনি শ'কার ব'-কার ছাড়া কথা কইতে পারতেন না। তা সে কথা থাক্।'

তখনও খেয়েছি মাত্র আড়াই চাক্তি সসেজ আর আধখানা জলপাই, পেট পদ্মার বালুচর। সেই শুধু-পেটে বিয়ার দু মিনিট জিরিয়েই কচ্‌চড় করে চড়ে উঠল মাথার ব্রহ্মরন্ধ্রে।

এমন সময় হের ফন ব্রাখেল জিজ্ঞেস করলেন, 'বার্লিনে কী রকম পড়াশোনা হচ্ছে?"

বুঝলুম এ হচ্ছে ভদ্রতার প্রশ্ন, এর উত্তরে বিশেষ কিছু বলতে হয় না, হুঁ হুঁ করে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেলেই চলে কিন্তু আমি বললুম, "পড়াশোনা? তার আমি কী জানি? সমস্ত দিন, সমস্ত রাত বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না, তো কাটে হৈ-হৈ করে ইয়ার-বকশীদের সঙ্গে।"

বলেই অবাক হয়ে গেলুম। আমার তো দিনের দশ ঘণ্টা কাটে স্যাটস্ বিবলিওটেকে, স্টেট লাইব্রেরিতে, ক্লারারও সে খবর বেশ জানা আছে। ব্যাপার কী? সেই গল্পটা তোদের বলেছি?—পিপের ছ্যাঁদা দিয়ে হুইস্কি বেরুচ্ছিল, ইঁদুর চুক চুক করে খেয়ে তার হয়ে গিয়েছে নেশা, লাফ দিয়ে পিপের উপরে উঠে আস্তিন গুটিয়ে বলছে, "ওই ড্যাম ক্যাটটা গেল কোথা? ব্যাটাকে ডেকে পাঠাও, তার সঙ্গে আমি লড়ব।"

কিন্তু এত সাত-তাড়াতাড়ি কি নেশা চড়ে?

ইতিমধ্যে আপন অজানাতে বিয়ারে আবার লম্বা চুমুক দিয়ে বসে আছি।

করে করে তিন-চার পদ খাওয়া হয়ে গিয়েছে। যখন রোস্ট টার্কীতে পৌঁছেছি, তখন দেখি অতি ধোপদুরস্ত ঈভনিং-ড্রেস-পরা আর এক ভদ্রলোক টেবিলের ওদিকে আমার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালেন। ক্লারা তাঁকে বললে, "জ্যাঠামশাই, এই আমাদের ইন্ডার।" বড় নার্ভাস ধরনের লোক। হাত অল্প অল্প কাঁপছে। আর বার বার বলছেন, "তোমরা ব্যস্ত হয়ো না, সব ঠিক আছে, সব ঠিক আছে, আমি শুধু ইয়ে—" তারপর আমার দিকে একটু তাকিয়ে নিয়ে বললেন, "আমি শুধু রোস্ট আর পুডিং খাই বলে একটু দেরিতে আসি।"

তারপর আমি কী বকর-বকর করেছিলুম আমার স্পষ্ট মনে নেই। সঙ্গে সঙ্গে চলছে বিয়ারের পর বিয়ার, কখনও বা বেশ উঁচু গলায় বলে উঠি, "গুস্টাফ, আরও বিয়ার নিয়ে এস।"

এ কী অভদ্রতা! কিন্তু কারও মুখে এতটুকু চিত্তবৈকল্যের লক্ষণ দেখতে পেলুম না, কিংবা হয়তো লক্ষ্য করি নি। আর ভাবছি, ডিনার শেষ হলে বাঁচি।

শেষ হলও। আমরা ড্রইংরুমে গিয়ে বসলুম। কফি লিকার সিগার এল। আমি অভদ্রতার চূড়ান্তে পৌঁছে বললুম, "নো লিকার, বিয়ার প্লীজ!"

বাবা হেসে বললেন, "আমাদের বিয়ার তোমার ভাল লাগাতে আমি খুশি হয়েছি। কিন্তু একটু বিলিয়ার্ড খেললে হয় না? তুমি খেলো?"

বললুম, "আলবত!" অথচ আমি জীবনে বিলিয়ার্ড খেলেছি মাত্র দু'দিন, কলকাতার ওয়াই.এম.সি.এ-তে। এখানকার বিলিয়ার্ড টেবিলে আবার পকেট থাকে না, এতে খেলা অনেক বেশি শক্ত।

জ্যাঠামশাই দাঁড়িয়ে বললেন, "গুড বাই, তোমরা খেলোগে।"

ক্লারাও আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে 'গুড নাইট" বললে।

খুব নিচু ছাতওয়ালা, প্রায় মাটির নীচে বিরাট জলসাঘর, তারই এক প্রান্তে বিলিয়ার্ড-টেবিল। দেওয়ালের গায়ে গায়ে সারি সারি বিয়ারের পিপে। এত বিয়ার খায় কে? এরা তো কেউ বিয়ার খায় না দেখলুম।

ইতিমধ্যে লিকারের বদলে ফের শ্যাম্পেন উপস্থিত। আমি বললুম, "নো শ্যাম্পেন।" আবার চলল বিয়ার।

মার্কার কিউ এনে দিলে। আমি সেটা হাতে নিয়ে একটু বিরক্তির সঙ্গে বললুম, "এ আবার কি কিউ দিলে?"

মার্কারের মুখ কোন অসহিষ্ণুতা ফুটে উঠল না। বরঞ্চ যেন খুশি হয়েই আলমারি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খুলে একটি পুরনো কিউ এনে দিলে। আমি পাকা খেলোয়াড়ির মত সেটা হাতে ব্যালান্স্ করে বললুম, "এইটেই তো, বাবা, বেশ; তবে ওই পচা মাল পাচার করতে গিয়েছিলে কেন?"

আমার বেয়াদবি তখন চূড়া ছেড়ে আকাশে উঠে ঢলাঢলি আরম্ভ করে দিয়েছে। অবশ্য তখনও ঠিক ঠিক ঠাহর হয় নি, মালুম হয়েছিল অনেক পরে।

গ্রামের একঘেয়ে জীবনের ঝানু খেলোয়াড়কে আমি হারাব এ আশা অবিশ্যি আমি করি নি; কিন্তু খেলতে গিয়ে দেখলুম, খুব যে খারাপ খেলছি তা নয়, তবে আমার প্রত্যাশার চেয়ে ঢের ভাল। আর প্রতিবারেই আমি লীড পেয়ে যাচ্ছিলুম অতি খাসা, স্বপ্নের বিলিয়ার্ডেও মানুষ ও রকম লীড পায় না।

রাত ক'টা অবধি খেলা চলেছিল বলতে পারব না। আমি তখন তিনটি বলের বদলে কখনও ছটা কখনও নটা দেখছি, কিন্তু খেলে যাচ্ছি ঠিকই, খুব সম্ভব ভাল লীডের লাকে।

হের ফন্ ব্রাখেল শেষটায় না বলে থাকতে পারলেন না, "তোমার লাক বড় ভাল।"

অত্যন্ত বেকসুর মন্তব্য। আমি কিন্তু চটে গিয়ে বেশ চড়া গলায় বললুম, "লাক, না কচুর ডিম! নাচতে না জানলে শহর বাঁকা। আই লাইক্ দ্যাট্!"

ব্রাখেল কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, আমিও অষ্টমে উঠে আরও কথা শুনিয়ে দিলুম। ওদিকে দেখি মার্কার ব্যাটা মিটিমিটিয়ে হাসছে। আমি আরও চটে গিয়ে হুঙ্কার দিলুম, 'তোমার মূলোর দোকান বন্ধ কর, এখন রাত সাড়ে তেরোটায় কেউ মূলো কিনতে আসবে না।' অথচ বেচারি বুড়ো থুত্থুড়ো, সব কটা দাঁত জগন্নাথ দেবতাকে দিয়ে এসেছে।

চিৎকার-চেল্লাচেল্লির মধ্যিখানে হঠাৎ দেখি সামনে জ্যাঠামশাই, পরনে তখনও পরিপাটি ঈভনিং-ড্রেস।

আবার সেই নার্ভাস স্বরে বললেন, "সরি সরি, তোমরা কিছু মনে কোর না, আমি শব্দ শুনে এলুম।" তারপর ক্লারার বাপের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুই বড় ঝগড়াটে, ভল্ফ্গাঙ, নিত্য নিত্য এর সঙ্গে ঝগড়া করিস।" তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, "তার চেয়ে বরঞ্চ একটু তাস খেললে হয় না? আমার ঘুম হচ্ছে না।"

আমি বললুম, "হুঁ হুঁ হুঁ।"

তাসের টেবিল এল।

আমি স্কাট খেলেছি বিলিয়ার্ডের চেয়েও কম।

জ্যাঠা বললেন, 'কী স্টেক?'

বাপ বললেন, 'নিত্যিকার।'

'নিত্যিকার' বলতে কী বোঝাল জানি নে। ওদিকে আমার পকেটে তো ছুঁচো ডিগবাজি খেলছে। জ্যাঠা হিসাব করে বললেন, 'হানস্ পনেরো মার্ক ভল্ফ্গাঙ্ দুই।'

আপনার থেকে আমার বাঁ হাত কোটের ভিতরকার পকেটের দিকে রওনা হল। তখনই মনে পড়ল, এ কোট তো ক্লারার দাদার। আমার মনিব্যাগ তো পড়ে আছে আমার খাটে, উপরের তলায়। কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে হাত গিয়ে ঠেকল এক তাড়া করকরে নোটে। ঈশ্বর পরম দয়ালু, তাঁহার কৃপায় টাকা গজায়, এই টাকা দিয়েই আজকের ফাঁড়া কাটাই, পরের কথা পরে হবে। ক্লারাকে বুঝিয়ে বললে সে নিশ্চয়ই কিছু মনে করবে না। আর নিজের মনিব্যাগে রেস্ত আছেই বা কী? দশ মার্ক হয় কি না-হয়।

www.BanglaBook.org

এদিকে রেস্ত নেই, ওদিকে খেলার নেশাও চেপেছে। পরের বাজিতে আবার হারলুম, এবার গেল আরও কুড়ি মার্ক, তারপর পঞ্চাশ, তারপর কত তার আর আমার হিসেব নেই। নোটের তাড়া প্রায় শেষ হতে চলল। আমি যুধিষ্ঠির নই, অর্থাৎ কোন রমণীর উপর টুয়েন্টি পার্সেন্ট অধিকারও আমার নেই, না হলে তখন সে রেস্তও ভাঙাতে হত, এমন সময় আস্তে আস্তে আমার ভাগ্য ফিরতে লাগল। দশ কুড়ি করে সব মার্ক তোলা হয়ে গেল, তারপর প্রায় আরও শ দুই মার্ক জিতে গেলুম।

ওদিকে মদ চলছে পাইকারি হিসেবে আর জ্যাঠামশাই দেখি হারার সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশি নার্ভাস হয়ে যাচ্ছেন। আমি তো শেষটায় না থাকতে পেরে খলখল করে হেসে উঠলুম। কিছুতেই হাসি থামাতে পারি নে। গলা দিয়ে এক ঝলক বিয়ার বেরিয়ে এল, কোন গতিকে সেটা রুমাল দিয়ে সামলালুম। কিন্তু হাসি আর থামাতে পারি নে। বুঝলুম, এরেই কয় নেশা।

জ্যাঠামশাই নার্ভাস সুরে বলেন, "হেঁ-হেঁ, এটা যেন, কেমন যেন,—হেঁ-হেঁ, তোমার লাক্—হেঁ-হেঁ—নইলে আমি খেলাতে—"

আবার লাক্! এক মুহূর্তে আমার হাসি থেমে গিয়ে হল বেজায় রাগ। বিলিয়ার্ডের বেলায়ও আমাকে শুনতে হয়েছিল ওই গুড্‌ড্যাম লাকের দোহাই।

টং হয়ে এক ঝটকায় টেবিলের তাস ছিটকে ফেলে বললুম, "তার মানে? আপনারা আমাকে কী পেয়েছেন? ইউ অ্যান্ড ইয়োর ড্যাম্ লাক্, ড্যাম্, ড্যাম—"

বাপ-জ্যাঠা কী বলে আমায় ঠাণ্ডা করতে চেয়েছিলেন আমরা সেদিকে খেয়াল নেই। কতক্ষণ চলেছিল তাও বলতে পারব না, আমরা গলা পর্দার পর পর্দা চড়ে যাচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার যত কটুকাটব্য।

এমন সময় দেখি, ক্লারা।

কোথায় না আমি তখন হুঁশে ফিরব—আমি তখন সপ্তমে না, একেবারে সেঞ্চুরির নেশায়। শেষটায় বোধ হয়, 'ছোটলোক', 'মীন', এইসব অশ্রাব্য শব্দও ব্যবহার করেছিলুম।

ক্লারা আমার কাঁধে হাত দিয়ে নিয়ে চলল দরজার দিকে। অনুনয় করে বললে, "অত চটছ কেন, ওঁদের সঙ্গে না খেললেই হয়, ওঁরা ওই রকমই করে থাকেন।"

বেরুবার সময় পর্যন্ত শুনি ওঁরা বলছেন, "সরি, সরি, প্লীজ প্লীজ। আমাদের দোষ হয়েছে।"

তবু আমার রাগ পড়ে না।'

চাচা কফিতে চুমুক দিলেন। রায় বললেন, 'ঢের ঢের মদ খেয়েছি, ঢের ঢের মাতলামো দেখেছি, কিন্তু এরকম বিদঘুটে নেশার কথা কখনও শুনি নি।'

চাচা বললেন, 'যা বলেছ! তাই আমি রাগ ঝাড়তে ঝাড়তে গেলুম শোবার ঘরে! ঈভনিং-কোট, পাতলুন খোলার সঙ্গে সঙ্গে মাথা কিন্তু ঠাণ্ডা হতে আরম্ভ করেছে, বিয়ারের মগও হাতের কাছে নেই।

বালিশে মাথা দিতে না দিতেই স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, সমস্ত সন্ধ্যা আর রাতভোর কী ছুঁচোমিটাই না করেছি!' ছি-ছি, ক্লারার বাপ-জ্যাঠামশায়ের সামনে কী ইতরোমোই না করে গেলুম ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর এদেশে সবাই ভাবে ইন্ডিয়ার লোক কতই না বিনয়ী, কতই না নম্র!

যতই ভাবতে লাগলুম, মাথা ততই গরম হতে লাগল। শেষটায় মনে হল, কাল সকালে, আজ সকালেই বলা ভাল, কারণ ভোরের আলো তখন জানলা দিয়ে ঢুকতে আরম্ভ করেছে, এঁদের আমি মুখ দেখাব কী করে? জানি, মাতালকে মানুষ অনেকখানি মাফ করে দেয়, কিন্তু এ যে একেবারে চামারের মাতলামো!

তা হলে পালাই।

অতি ধীরে ধীরে কোন প্রকারের শব্দটি না করে সুটকেসটি ওখানেই ফেলে গাছের আড়ালে আড়ালে কাস্‌ল্‌ থেকে বেরিয়ে স্টেশন পানে দে ছুট। মাইলখানেক এসে ফিরে তাকালুম; নাঃ, কেউ পিছু নেয় নি।

চোরের মত গাড়িতে ঢুকে সোজা বার্লিন।'

মৌলা বললে, 'শুনলেন, মামা?'

চাচা বললেন, 'আরে শোনই না শেষ অবধি।'

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় তখন ঘরে বসে মাথায় হাত দিয়ে ভাবছি, এমন সময় ঘরের দরজায় টোকা, আর সঙ্গে সঙ্গে ক্লারা। হায়, হায়, আমি ল্যান্ডলেডিকে একদম বলতে ভুলে গিয়েছিলুম, সবাইকে যেন বলে, আমি মরে গিয়েছি কিংবা পাগলা-গারদে বন্ধ হয়ে আছি কিংবা ওই ধরনের কিছু একটা।

শেষটায় মর-মর হয়ে ক্লারার কাছে মাতলামোর জন্য মাফ চাইলুম।

ক্লারা বললে, 'অত লজ্জা পাচ্ছ কেন? ও তো মাতলামো না, পাগলামো। কিংবা অন্য কিছু, তুমি সব কিছু বুঝতে পার নি, আমরাও যে পেরেছি তা নয়।

'তুমি যখন দাদার সুট পরে ডিনারে এলে তখনই তোমার সঙ্গে কোথায় যেন দাদার সাদৃশ্য দেখে বাবা আর আমি দুজনাই আশ্চর্য হয়ে গেলুম, বিশেষ করে ব্যাকব্রাশ করা চুল আর একটুখানি ট্যারচা করে বাঁধা বো দেখে। তার পর তুমি জোর গলায় চাইলে বিয়ার, দাদাও বিয়ার ভিন্ন অন্য কোন মদ খেত না; তুমি আরম্ভ করলে দাদারই মত বকতে, 'লেখাপড়ার সময় কোথায়? আমি তো করি হৈ-হৈ''—আমি জানতুম একদম বাজে কথা; কিন্তু দাদা হৈ-হৈ করত আর বলতেও কসুর করত না।'

'শুধু তাই নয়। দাদাও ডিনারের পর বাবার সঙ্গে বিলিয়ার্ড খেলত এবং শেষটায় দুজনাতে ঝগড়া হত। জ্যাঠামশাই তখন নেমে এসে ওদের সঙ্গে তাস খেলা আরম্ভ করতেন এবং আবার হত ঝগড়া। অথচ তিনজনাতে ভালবাসা ছিল অগাধ।'

'তোমাকে আর সব বলার দরকার নেই; তুমি যে ঘরে উঠছিলে ওই ঘরেই একদিন দাদা আত্মহত্যা করে।'

''কিন্তু আসলে যে কারণে তোমার কাছে এলুম, তুমি মনে কষ্ট পেয়ো না; বাবা-জ্যাঠামশাই আমাকে বলতে পাঠিয়েছেন, তাঁরা তোমার ব্যবহারে কিছু মাত্র আশ্চর্য কিংবা দুঃখিত হন নি।'

চাচা থামলেন।

রায় বললেন, 'চাচা, আপনি ঠিকই বলেছিলেন, শিস দিয়েছিল সুটটাই, বিয়ারও ও-ই খেয়েছিল।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চাচা বললেন, 'হক কথা। মদ মানে স্পিরিট, স্পিরিট মানে ভূত, তাই স্পিরিট স্পিরিট খেয়েছিল।'

বাঁশী

আজ আর সে শান্তিনিকেতন নেই।

তার মানে এ নয়, গুরুদেব নেই, দিনুবাবু নেই, ক্ষিতিমোহনবাবু ক্লাস নেন না। সে তো জানা কথা। কোম্পানির রাজত্ব, মহারানীর সরকারই যখন চলে গেল তখন এঁরাও যে শালবীথি থেকে একদিন বিদায় নেবেন, সে তো আমাদের জানাই ছিল; কিন্তু এটা জানা ছিল না যে, আশ্রমের চেহারাটিও গুরুদেব সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন।

খুলে কই।

তখন আশ্রমের গাছপালা ঘর-বাড়ি ছিল অতি কম। গাছের মধ্যে শালবীথি, বকুলতলা, আম্রকুঞ্জ আর আমলকি-সারি। বাস্। হেথা-হোথা খানসাতেক ডরমিটরি, অতিথিশালা আর মন্দির। ফিরিস্তি কম্‌প্লিট। তাই তখনকার দিনে আশ্রমের যেখানেই বসো না কেন, দেখতে পেতে দূরদূরান্তব্যাপী, চোখের সীমানা-চৌহদ্দি ছাড়িয়ে—খোয়াইয়ের পর খোয়াই, ডাঙার পর ডাঙা—চতুর্দিকে তেপান্তরী মাঠ। ভোরবেলা সুজ্জিঠাকুরের টিকিটি বেরুনোমাত্র সিটিও আমাদের চোখ এড়াতে পারত না। রাত তেরটার সময় চাঁদের ডিঙির গলুইখানা ওঠামাত্রই আমরা গেয়ে উঠতুম—'চাঁদ উঠেছিল গগনে।' যাবে কোথায়, চতুর্দিকে বেবাক ফাঁক। আর আজ? গাছে গাছে ছয়লাপ। আম জাম কাঁঠাল খানদানী ঘরানারা তো আছেনই, তার সঙ্গে জুটেছেন যত সব দেশ-বিদেশের নাম-না-জানা কালো নীল হলদে ইয়া-ইয়া ফুলের গাছ। এখন আশ্রমের অবস্থা কলকাতারই মত। সেখানে পাঁচতলা এমারত সুজ্জি-চন্দর ঢেকে রাখে, হেথায় গাছপালায়।

ওই দূরদূরান্তে, চোখের সীমানার ওপারে তাকিয়ে থাকা ছিল আমাদের বাই। অবশ্য যারা লেখাপড়ায় ভাল ছেলে তারা তাকাত বইয়ের দিকে, আর আমার মত গবেটরা এক হাত দূরের বইয়ের পাতাতে চোখের চৌহদ্দি বন্ধ না রেখে তাকিয়ে থাকত সেই সুদূর বাটের পানে—তাকিয়ে আছে কে তা জানে। গুরুরা, অর্থাৎ শাস্ত্রীমশাই মিশ্রজী কিছু বলতেন না। তাঁরা জানতেন, বরঞ্চ একদিন শালতলার শালগাছগুলো নর-নরৌ-নরাঃ, গজ-গজৌ-গজাঃ উচ্চারণ করে উঠতে পারে কিন্তু আমাদের দ্বারা আর যা হোক, লেখাপড়া হবে না। অন্য ইস্কুল হলে অবশ্য আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হত, কিন্তু তাঁরা দরদ দিয়ে বুঝতেন, আমি বাপ-মা-খেদানো ছেলে, এসেছি এখানে, এখান থেকে খেদিয়ে দিলে হয় যাব ফাঁসি নয় যাব জেলে।

এই দূরের দিকে তাকিয়ে থাকার নেশা আপনাদের বোঝাই কী প্রকারে? আমি নিজেই যখন সেটা বুঝে উঠতে পারি নি, তখন সে চেষ্টা না করাই শ্রেয়। তবে এইটুকু বলতে পারি, এ-নেশাটা সাঁওতাল ছোঁড়াদের বিলক্ষণ আছে। আকাশের সুদূর সীমানা খুঁজতে গিয়ে তারা বেরিয়েছিল সাঁজে, তারপর অন্ধকার রাতে, পথ হারিয়ে একই জায়গায় সাত শো বার চক্কর খেয়ে পেয়েছে অক্কা। বুড়ো মাঝিরা বলে, পেয়েছিল ভূতে। সে-কথা পরে হবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি শান্তিনিকেতনে আসি ১৯২১ সনে। গাঁইয়া লোক। এখানে এসে কেউ বা নাচে ভরতনৃত্যম, কেউ বা গায় জয়জয়ন্তী, কেউ বা লেখে মধুমালতী ছন্দে কবিতা, কেউ বা গড়ে নব নটরাজ, কেউ বা করে বাতিক, লেদার-ওয়ার্ক, ফ্রেস্কো, স্টুক্কো, উড-ওয়ার্ক, এচিং, ড্রাই-পয়েন্ট, মেদজো-টিন্‌ট্ আরও কত কী। এক কথায় সবাই শিল্পী, সবাই কলাবৎ।

আমারও বাসনা গেল—শিল্পী হব। আর্টিস্ট হব। ওদিকে তো লেখাপড়ায় ডডনং, কাজেই যদি শিল্পীদের গোয়ালে কোন গতিকে ভিড়ে যেতে পারি তবে সমাজে আমাকে বেকার-বাউণ্ডুলে না বলে বলবে শিল্পী, কলাবৎ, আর্‌তিস্‌ৎ।

অথচ আমার বাপ-পিতামোর চোদ্দপুরুষ, কেউ কখনও গাওনা-বাজনার ছায়া মাড়ানো দূরে থাক্, দূর থেকে ঝঙ্কার শুনলেই রামদা নিয়ে গাওয়াইয়ার দিকে হানা দিয়েছেন। আমরা কট্টর মুসলমান। কুরানে না হোক আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রে গাওনা-বাজনা বারণ, বাঁদর-ওলার ডুগডুগি শুনলে আমাদের প্রাচিত্তির করতে হয়। আমার ঠাকুদ্দাদার বাবা নাকি সেতারের তার দিয়ে সেতারীকে ফাঁসি দিয়ে শহীদ হয়েছিলেন।

কাজেই প্রথম দিন ব্যালাতে ছড় টানা মাত্রই আশ্রমময় উঠল পরিত্রাহি অট্টরব। কেউ শুধালে, গরু জবাই করছে কে; কেউ ছুটলে গুরুদেবের কাছে হিন্দু ব্রহ্মচর্যাশ্রমে মামদো ভূতের উপদ্রব থামাবার জন্য অনুরোধ করতে। গুরুদেব পড়লেন বিপদে। তাঁর মনে পড়ল আপন ছেলেবেলাকার কাহিনী—তাঁর পিতৃদেব তাঁর প্রথম কবিতা শুনে কী রকম বাঁকা হাসি চেপে ধরেছিলেন। তাই তিনি সে রাত্রে কবিতা লিখলেন,

'আমার রাত পোহালো শারদ প্রাতে
বাঁশী তোমায় দিয়ে যাব কাহার হাতে?'

কার হাতে আর দেবেন? দিলেন আমারই হাতে। সবাই বুঝিয়ে বললে, 'ভাই ব্যালাটা ক্ষান্ত দাও। বাঁশী বাজাও; কিন্তু দোহাই আশ্রম-দেবতার আশ্রমের বাইরেই রেওয়াজটা কোর।'

সেদিনই সন্ধ্যাবেলা বাঁশী হাতে নিয়ে গেলুম সাঁওতাল-গাঁয়ের দিকে। পশ্চিমাস্য হয়ে, অস্তমান সূর্যের দিকে তাকিয়ে ধরলুম তোড়ি।

সাঁওতাল-গাঁয়ের কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে মেলা 'এন্‌কোর', 'সাধু সাধু' রব কাড়লে।

সুদূর দিক্‌প্রান্তের দিকে, অস্তমান সূর্যের পানে তাকিয়ে আমার মাথায় তখন চাপল সেই বাই, যেটা পূর্বেই আপনাদের কাছে নিবেদন করেছি—হোথায় যেথায় সূর্য অস্ত যাচ্ছে, আমাকে সেখানে যেতে হবে।

নেমে পড়লুম খোয়াইয়ে।

গোধূলির আলো ম্লান হয়ে আসছে। তারই লালিমা খোয়াইয়ের গেরুয়াকে কী রকম যেন মেরুন রঙ মাখিয়ে দিচ্ছে। চতুর্দিকে কী রকম যেন একটা ক্লান্তি আর অবসাদ। আমি সুদূরের নেশায় এগিয়ে চললুম।

হঠাৎ দুম্ করে অন্ধকার হয়ে গেল।

প্রথমটায় বিপদ বুঝতে পারলুম না। বুঝলুম মিনিট পাঁচেক পরে। অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে, উঁচু ঢিপি থেকে গড়গড়িয়ে সর্বাঙ্গ ছড়ে গিয়ে নীচে পড়ে, হঠাৎ উঁচু ঢিপির সঙ্গে আচমকা নাকের ধাক্কা লেগে, কখনও বা কারও অদৃশ্য পায়ে বেমক্কা ল্যাং খেয়ে মুখ থুবড়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পড়ে গিয়ে।

উঠি আর পড়ি, পড়ি আর উঠি।

দশ মিনিটে সাঁওতাল-গাঁয়ে ফেরার কথা। পনের, পঁচিশ মিনিট, আধঘণ্টাটাক হয়ে গেল, গাঁয়ের কোনও পাত্তাই নেই।

ততক্ষণে রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছি। জাহান্নমে যাক গে আকাশের সীমানা-ফিমানা, এখন আশ্রমের ছেলে আশ্রমে ফিরতে পারলে বাঁচি। কিন্তু কোথায় আশ্রম, কোথায় সাঁওতাল-গ্রাম! একই জায়গায় চক্কর খাচ্ছি, না, কোন একদিকে এগিয়ে যাচ্ছি তাই আল্লার মালুম।

এমন সময় কানের কাছে শুনি—

অদ্ভুত তীক্ষ্ণ কেমন যেন এক আর্তরব! একটানা নয়, থেমে থেমে। কেমন যেন—ফিঁৎ, ফিঁৎ, ফিঁৎ, ফী -ী -ী -ীৎ!

ভয়ে ছুট লাগাবার চেষ্টা করলুম। সেই ফিঁৎ ফিঁৎ যেন কলরব করে উঠে আরও জোরে চেঁচাতে লাল—ফীঁৎ ফীঁৎ!

ইয়া আল্লা, ইয়া পয়গম্বর, ইয়া মৌলা আলীর মুরশীদ। বাঁচাও বাবারা, এ কী ভূত, না, প্রেত, না ডাইনী!

হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলুম গড়গড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গে সেই ভূতুড়ে শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। ব্যাপার কী!

আস্তে আস্তে ফের রওয়ানা দিলুম। সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই শব্দ—প্রথমে ক্ষীণ, আমি যত জোরে চলতে থাকি শব্দটাও সঙ্গে সঙ্গে জোরালো হতে থাকে। প্রথমটায় আস্তে আস্তে—ফিঁৎ, ফিঁৎ, ফিঁৎ। আমি যত জোরে চলতে আরম্ভ করি শব্দটাও দ্রুততর হতে থাকে—ফিঁৎ ফিঁৎ ফিঁৎ।

আর সে কী প্রাণঘাতী, জিগরের খুন-জমানেওলা শব্দ!

যেন কোন কঙ্কালের নাকের ভিতর দিয়ে আসছে দীর্ঘনিশ্বাস—কখনও ধীরে ধীরে আর কখনও বা দ্রুতগতিতে। একদম, আমার সঙ্গে কদম কদম বাঢ়হায়ে যাচ্ছে, আমার কানের কাছে যেন সেঁটে গিয়ে, লম্বা লম্বা হাতের আঙুল দিয়ে কানের পর্দাটা ছিঁড়ে দিচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল গুরুদেবের "কঙ্কাল" গল্পটা। কিন্তু গুরুদেব মহর্ষির সন্তান; তিনি ভয় পান নি। বেশ জমজমাট করে খোশগল্প করেছিলেন কঙ্কাল আর ভূতের সঙ্গে। আমি পাপী—নেমাজ-রোজা নিত্য নিত্য কামাই দিই।

সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার যেন আমার গলার টুঁটি চেপে ধরল।

আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লুম। দেখি, যেন আমার চতুর্দিকে লক্ষ লক্ষ তারা ফুটে উঠছে। কিন্তু হলদে রঙের। 'প্যোর কোলমনস্ মাস্টার্ড।'

কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম, বলতে পারব না।

যখন হুঁশ হল তখন গায়ে লাগল পুবের বাতাস। তাই উলটো দিকে চলতে আরম্ভ করলুম। ওই রকম যদি চলতে থাকি, তবে একদিন না একদিন আশ্রম, ভুবনডাঙা, কিংবা রেল লাইনে পৌঁছবই পৌঁছব।

সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগুণ জোরে সেই—ফিঁৎ ফিঁৎ ফিঁৎ।

কিন্তু এবারে সঙ্গে সঙ্গে একটা ঢিপিতে উঠতেই দেখি—উত্তরায়ণ। তারই বারান্দায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গুরুদেবের সৌম্য মূর্তি। টেবিল-ল্যাম্পের পাশে বসে মিশ্রজীর সঙ্গে গল্প করছেন।

আমি চিৎকার করে উঠলুম—

ওয়া গুরুজীকি ফতে।

গুরুর জয়, গুরুদেবের জয়।

তিনিই আমাকে বাঁচিয়েছেন। তাঁরই কৃপায় রক্ষা পেয়েছি।

কিন্তু 'ওয়া গুরুজীকী ফতে' বেরিয়েছিল—'ওবা গরজীকী ফত' হয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে, চাপা সুরে।

ততক্ষণে ধড়ে জান ফিরে এসেছে।

শব্দটা তবে কিসের ছিল?

বাঁশীর। আমার চলার সঙ্গে সঙ্গে বাঁশীতে হাওয়া ঢুকে ফিঁৎ ফিঁৎ করছিল। জোরে চললে হাত ঘন ঘন দোলা খেয়েছে, ফিঁৎ ফিঁৎও জোরে বেজেছে। আস্তে চললে আস্তে আস্তে।

বাঁশীটা ছুঁড়ে ফেলে দিলুম। শেষবারের মত ফিঁৎ করে কাতর আর্তনাদ ছেড়ে সে নীরব হল।

আমি কলাবৎ হবার চেষ্টা করি নি।

গুরুদেব যখন গেয়েছেন—

'বাঁশী তোমায় দিয়ে যাব কাহার হাতে?'

তখন আমার কথা ভাবেন নি।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

শিবরাম চক্রবর্তী রচনাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট ★ কলিকাতা-৭৩

www.BanglaBook.org

সূচীপত্র

ভূমিকা	গৌরকিশোর ঘোষ	[ক]
ধূপছায়া		
দেশভ্রমণ	...	৩
রসগোল্লা	...	৭
চাপরাসী ও কেরানী	...	১৪
চিল্কা	...	২১
বাঙালী	...	২৭
সুকুমার রায়	...	৩০
ভাষার জমা-খরচ	...	৩৪
দর্শনচর্চা	...	৩৭
লেসে ফ্যের	...	৪০
মার্কিনী তাত	...	৪৩
বাঙ্গালী মেনু	...	৪৫
রন্ধন-যজ্ঞ	...	৪৮
'বাঁশবনে—'	...	৫১
বাংলার গুণ না জর্মন গুণী	...	৫৬
শিক্ষা-প্রসঙ্গে	...	৫৮
পোলেমিক	...	৬১
চরিত্র-বিচার	...	৬৪
দেয়ালি	...	৬৬
গানের কথা ঃ ভারত ও কাবুল	...	৬৮
উনো, হিন্দী, ক্রিকেট	...	৬৯
বুদ্ধং শরণং	...	৭২
আর ট্রাভেল	...	৭৫
ভাষা ও জনসংযোগ	...	৮৩
ইংরেজী বনাম মাতৃভাষা	...	৮৫
টুকিটাকি	...	৯৪
খেলাচ্ছলে	...	৯৫
পিকনিকিয়া	...	৯৮
সাহিত্যিকের মাতৃভাষা	...	৯৮
আসা-যাওয়া	...	৯৯
দেহলি-প্রান্ত	...	১০১
পঞ্চতন্ত্র (২য় পর্ব)		
ঐতিহাসিক উপন্যাস	...	১০৭
কচ্ছের রাণ	...	১১০
দর্শনাতীত	...	১১৪

www.BanglaBook.org

মা-মেরীর রিস্ট-ওয়াচ	...	১১৭
অনুবাদ সাহিত্য	...	১২০
বাবুর শাহ্	...	১২৩
ফের্ডিনান্ট জাওয়ারব্রুখ্	...	১২৬
হিডজিভাই পি মরিস্	...	১৩০
'আধুনিক' কবিতা	...	১৩৫
মূর্খের উপাসনা অপেক্ষা পণ্ডিতের নিদ্রা শ্রেয়ঃ	...	১৩৯
আলবের্ট শ্বোয়াইৎসার	...	১৪৫
মরহুম ওস্তাদ ফৈয়াজ খান	...	১৪৭
'পঞ্চাশ বছর ধরে করেছি সাধনা।' 'কটা ভাষা?' 'হা কপাল! বাঙলাই হল না।'		১৫০
ইণ্টারভ্যু		১৫৪
অর্থং অর্থং		১৫৮
অদ্যাপিও সেই খেলা খেলে গোরা রায়। মধ্যে মধ্যে ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥	...	১৬২
সাবিত্রী	...	১৬৬
আধুনিকা	...	১৬৯
ফরাইজ্	...	১৭২
চোখের জলের লেখক	...	১৭৫
ছাত্র বনাম পুলিশ	...	১৭৮
রাসপুতিন	...	১৯৩
বিষ্ণুশর্মা	...	২০৭
বার্লাম ও য়োসাফট্	...	২১০
রবি-মোহন-এনড্রুজ	...	২১৪
'ইজরায়েল বিশ্বের প্রবাদ-সত্য রূপে গণ্য হবে' —বাইবেল		২১৯
এমেচার ভার্সস স্পেশালিস্ট		২২৪
মিজোর হেপাজতী		২২৮
গাড়োলস্য গাড়োল		২৩৩
ভাষা		২৩৮
কবিগুরু ও নন্দলাল		২৪০
খেলেন দই রমাকান্ত		২৪২
চতুরঙ্গ		
রবি-পুরাণ		২৪৯
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব		২৫২
পুষ্পধনু		২৬৩
মরহুম মৌলানা		২৬৫
নস্রুদ্দীন খোজা (হোকা)		২৭০
নজরুল ইসলাম ও ওমর খৈয়াম		২৭৮
ত্রিমূর্তি (চাচা-কাহিনী)		২৯১

www.BanglaBook.org

মাম্‌দোর পুনর্জন্ম	...	২৯৬
দিল্লী-স্থাপত্য	...	৩০৩
বেজো না চরণে চরণে	...	৩১৩
ইভান সের্গেভিচ তুর্গেনেফ	...	৩১৭
গাঁজা	...	৩২৩
হরিনাথ দে'র স্মরণে	...	৩২৯
অনুকরণ না হনুকরণ?	...	৩৩৫
ফরাসী-বাঙলা	...	৩৪০
চার্লি চ্যাপলিন	...	৩৪৭
ফিল্মের ভাষা	...	৩৫১
ক্রন্দসী	...	৩৫৫
ছুঁছুন্দর কা সির্‌পর চামেলি কা তেল	...	৩৬০
আর্ট না অ্যাক্‌সিডেণ্ট	...	৩৬৪
আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন	...	৩৬৭
গ্রন্থপরিচয়	...	৩৭২

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

ধূপছায়া

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

ছেলেবেলায় মাস্টারমশাই গোরু সম্বন্ধে রচনা লিখতে হুকুম দিতেন। এখনও মনে পড়ছে, তালুর ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে যেত কিন্তু কিছুতেই ভেবে পেতুম না, গোরু সম্বন্ধে লিখব কী? শেষটায় মনে হত, আমি একটা আস্ত গোরু, না হলে গোরু সম্বন্ধে কিছুই লিখতে পারছি না কেন—যে গোরু ইস্কুল আসতে-যেতে নিত্যি নিত্যি দেখতে পাই। সে-কথা একদিন এক বন্ধুকে বলতে সে বাঁকা হাসি হেসে বলেছিল, আত্মজীবনী লেখা তো কঠিন নয়।

শেষটায় অনেক ভেবে-চিন্তে লিখতুম, গোরুর চারখানা পা, দুটো শিঙ আর একটা ন্যাজ আছে। গুরুমশাই তারই উপর চোখ বুলিয়ে যেতেন, পেটের অসুখ থাকলে দিতেন ছ নম্বর, মর্জি ভাল থাকলে দিতেন আট। আমিও খুশী হয়ে ভাবতুম, এই গোরুর ন্যাজ ধরে পরীক্ষা-বৈতরণী ঠিক ঠিক পেরিয়ে যাব।

কিন্তু মাঝে মাঝে ভাবতুম, দুটো শিঙ বলার অর্থ হয়, কারণ গণ্ডারের নাকি একটা শিঙ। চার পা বলাও অবান্তর নয়, কারণ চার না হয়ে গোরুর দু পাও হতে পারত কিন্তু একটা ন্যাজ বলার ত কোন মানে হয় না—আজ পর্যন্ত ত কোন জানোয়ারের দুটো ন্যাজের কথা শুনি নি। একদিন মাস্টারমশাইকে প্রশ্নটা শুধালে তিনি বললেন, ইংরেজী ভাষার আইন অনুসারে বলতে হয়, দি কাউ হ্যাজ এ টেল। 'এ'টা না দিলে ব্যাকরণের গলতি হয়। তখন বুঝলুম এ টেল'টা গোরুর ন্যাজ নয়, ইংরেজী ব্যাকরণের ন্যাজ। কিন্তু তবু প্রশ্ন রয়ে গেল, বাংলাতে যখন 'একটা' ব্যবহার না করে দিব্য বলতে পারি 'গোরুর ন্যাজ আছে' তখন ইংরেজের মত সুসভ্য জাত সৃষ্টির প্রথম পূর্বাহ্নে বৃক্ষাবতরণকালে তার মর্কট রূপটি ত্যাগ করার সময় এই বৈয়াকরণিক কিংবা আলঙ্কারিক পুচ্ছটিও বর্জন করল না কেন?

আমি ইংরেজী লিখতে পারি নে। যাঁরা ওই ভাষাতে নাম করেছেন, তাঁদের মুখে শুনেছি, ওই 'এ'র ন্যাজ নাকি এখনও তাঁদের মুখের উপর মাঝে মাঝে ঝাপটা মারে। তাই শুনে বিঘ্নসন্তোষী মন বিমলানন্দ লাভ করে।

সে-কথা থাক্।

কিন্তু যখন মাস্টারমশাই হুকুম দিতেন, 'দেশভ্রমণের উপকারিতা সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় কিঞ্চিৎ বর্ণনা কর', তখন সে-বৈতরণীর ও-পার আর চোখে দেখতে পেতুম না। গোরু জানোয়ারটা উৎকৃষ্ট হোক নিকৃষ্ট হোক সেটাকে তবু চিনি, না-হক্ক এ-কথা কখনই বলে ফেলব না, 'গোরু বড় প্রভুভক্ত জীব, সে রাত জেগে চোর-ডাকু খেদায় কিংবা পাড়ার মোন্দারমশাই গোরু চড়ে আদালতে পেশকারি করতে যান।' কিন্তু দেশভ্রমণ বলতে ত বুঝি সাদীর বাড়ি যাবার সময় নৌকোর ছৈয়ের ভিতরের দিকটা—ছৈয়ের বাইরে যেতে চাইলেই বাবা রাশভারী গলায় বলতেন, 'থাক্ থাক্, আর বিলে ডুবে মরতে হবে না।' বাংলা ভাষাটা নিতান্ত পশ্চিম-বাঙলার ভাষা। না হলে 'ডানপিটের মরণ গাছের ডগায়' না বলে বলত, 'ডানপিটের মরণ বিলের তলায়'। সেই ছৈয়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ত আর দেশভ্রমণের উপকারিতা সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান জন্মায় না। কাজেই

www.BanglaBook.org

তখন বাধ্য হয়ে সন্ধান নিতে হত, কোন্ 'এসে বুক' মুখস্থ করে বীরভূমের হেতমপুর ইস্কুলের বিশ্বম্ভর ভড় গেল-বার ম্যাট্রিকে ফার্স্ট হয়েছে। 'চিত্তের প্রসার', 'অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য', 'কষ্টসহিষ্ণুতার পরিপূর্ণতা' ইত্যাদি যাবতীয় উত্তম উত্তম গুণরাজিতে প্রবন্ধটি ভরে দিতে তাই আমাদের তখন আর কণামাত্র অসুবিধে হত না—ইস্কুল-ঘরের চারিটি বেড়ার ভিতর বসে বসে। মাস্টারমশাইও কোন আপত্তি জানাতেন না, কারণ আমরা বিলক্ষণ জানতুম তাঁর দৌড়, 'মোল্লার দৌড় মসজিদ তক'—অর্থাৎ, তাঁর এক ভাগ্নে ম্যাট্রিক ফেল মেরে আগরতলায় পালিয়ে যাওয়াতে তিনি ভয়ে ভয়ে 'দুর্গা দুর্গা, দুর্গতিনাশিনী' জপ করতে করতে অতি অনিচ্ছায় আগরতলা অবধি একবার 'দেশভ্রমণ' করেছিলেন। জাত যাবার ভয়ে তিনি সেই যাওয়া-আসাটা সেরেছিলেন নিরম্বু, অপর্ণব্রতে। ফিরে এসে তিনি প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন, কারণ ভিড়ে মেলা জাত-বেজাতের লোক হয়ত তাঁর গাত্রস্পর্শ করে ফেলেছে। এবং সবচেয়ে মারাত্মক অগ্নিপরীক্ষা তাঁকে তখন পেরতে হয়েছিল, তার সঙ্গে অন্য কোন পরীক্ষার তুলনা হয় না, সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ দেশভ্রমণের ঝাড়া বারোটি ঘণ্টা তিনি নর্মসখী কৃশানুদীপ্ত তাম্রকূটশীর্ষ ডাবাসুন্দরীর সুচিক্কণ কৃষ্ণগণ্ডে একটি মাত্র নিবিড় চুম্বন দিতে পারেন নি। তিনি 'পথি নারী বিবর্জিতা' এই আপ্তবাক্যটির স্মরণে শুচিস্মিতাকে সজল নয়নে তাঁর সপত্নীর হাতে সমর্পণ করে দৃঢ়পদে পশ্চিমাভিযান করেছিলেন।

এ-জাতীয় গুরু পৃথিবী থেকে লোপ পেয়েছেন। টোলো-পণ্ডিত, আপন চেষ্টায় ইংরেজী শিখেছিলেন, কিন্তু কোনও ডিগ্রী ছিল না বলে ক্লাস সিক্সের উপরে যাবার তাঁর হক্ ছিল না।

কিন্তু সেইটে আসল কথা নয়। আসল কথা এই, তিনি যখন দেশভ্রমণের উপকারিতা সম্বন্ধে 'পয়েণ্ট' দেবার সময় উচ্চাঙ্গের বক্তৃতা ঝাড়তেন তখন, কেন জানি নে, একমাত্র আমারই মনে সন্দেহ হত যে, তাঁর ভ্রমণ-প্রশস্তি হিন্দু গৃহিণীর ভিন্ন হেঁশেলে মুর্গী রান্না করার মত। ছেলে-ছোকরারা খাবে, তিনি রান্নার পর গঙ্গাস্নান করে বুনেদী হেঁশেলে পুঁই-চচ্চড়ি চড়াবেন।

আমি তাই একদিন সাহস করে বলেছিলুম, ঘোরাঘুরি করলেই যদি এত বিদ্যে হয় তবে ত গার্ডসাহেব আজমল আলী আমাদের শহরের সবচেয়ে জ্ঞানী পুরুষ। আশ্চর্য, পণ্ডিতমশাই রাগ করলেন না। সন্দিগ্ধ নয়নে, অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন শুধু : আমি তাঁর চোখের ভাষাতে পড়লুম, 'তবে কি রাস্কেলটা আমার মনের গোপন খবর পেয়ে গিয়েছে?'

তা সে যাই হোক, পণ্ডিতমশাই কিন্তু তখন একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তার অর্থ, আর পাঁচটা জিনিসের মত দেশভ্রমণও খুদাতালা আপন হাতে কব্জা করে রেখেছেন। পাঁচটা জিনিসের মত দেশভ্রমণের উপকারিতা সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চয় হওয়ার পরই মানুষ দেশভ্রমণে বেরয় না ; যার কপালে ওটা লেখা আছে, কিংবা বলুন কপালে নয়, যার পায়ে চক্কর আছে, সে-ই বেরয় দেশভ্রমণে। কেউ বেরয়, পণ্ডিতমশায়ের মত গজরাতে গজরাতে, কেউ বেরয় চেন-ছাড়া পাখির মত তিড়িং তিড়িং করে, তিন লম্ফে গেট পেরিয়ে।

দেশভ্রমণ করেছি, এ-রকম একটা খ্যাতি আমার আছে। এ-সম্বন্ধে কোন প্রকারের উচ্চবাচ্য আমি করি নে। অর্থাৎ আমি যে-সব ভূমি দেখেছি, শুধুমাত্র

www.BanglaBook.org

সেগুলোর সাদামাটা বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত থাকি। দেশভ্রমণ ভাল কি মন্দ, কোন কোন দেশে গিয়েছিলাম এ-সম্বন্ধে কোন প্রকারের ইঙ্গিত দেবার প্রয়োজন মনে করি নে। অথচ, আমার বহু সহৃদয় পাঠক ধরে নিয়েছেন যে, আমি দেশভ্রমণের নাম শুনলেই মুক্তকচ্ছ হয়ে তদ্দণ্ডেই বন্দর পানে ধাওয়া করি।

এ-ধারণাটা সত্য নয়। কিন্তু তবু এটার প্রতিবাদ আমি করতুম না যদি না এ-ধারণা আমার প্রতি কিঞ্চিৎ অবিচার করত। কিম্বা এটা যদি নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার হত তা হলেও চুপ করে থাকলে কোন ক্ষতি হত না। কিন্তু এ ব্যাপারে আমিই সবেধন উজ্জ্বল নীলমণি নই, আমার চেয়েও হতভাগা গুটি কয়েক আছেন। তাই ব্যক্তিগত কাহিনী বলার সঙ্কোচ অনিচ্ছায় কাটাতে হল।

কেউ যখন বলে 'ফলনা দেশভ্রমণ করতে ভালবাসে' তখন সে-বাক্যে আমি প্রশংসার চেয়ে নিন্দাই দেখতে পাই বেশী। এ যেন অনেকটা 'ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে, গামছা পর গিয়ে'। তার অর্থ মেয়েটা এমনি মারাত্মক রকমের হন্যে হয়ে উঠেছে বিয়ে করবার জন্য যে, বাপ-মার স্নেহ-ভালবাসার তোয়াক্কা সে আর করে না, আপন বাড়ি-ঘর ছেড়ে যেতে তার আর কোন ক্ষোভ নেই, বিয়ের অপরিহার্য আনুষঙ্গিক শাড়ি-গয়না, বাজনাবাদ্যিরও তার প্রয়োজন নেই, আপন গামছা পরেই পাড়ি-মরি হয়ে সে সাতপাক ঘুরবে।

পাঁড় দেশভ্রমণকারীর অর্থও তা-ই। যে মাটিতে তার নাড়ি পোঁতা আছে, যে নদীর জল খেয়ে সে আজ চলতে শিখেছে, যে আমজামকাঁঠাল তাকে ছায়া দিয়ে শ্যামল শীতল করে রেখেছে, যার প্রতিটি দূর্বাদল তার পদ-তাড়না কামনা করে—তারা যেন কিছুই নয়, তারা যেন বানের জলে ভেসে-আসা, ফেল্‌না। গুরুদের আশীর্বাদ, বাপ-মায়ের স্নেহ, ভাইবোনের ভালবাসা, বন্ধুজনের সদান্তরিকতা, এসব কথা আর তুললুম না, সেগুলো এতই শুচি-শুদ্ধ পবিত্র যে, ওদের স্মরণকে কলঙ্কিত করে মহাপাতকী হতে চাই নে।

অসহিষ্ণু হয়ে শান্ত পাঠক বললেন, 'কী জ্বালা, লোকটা ত আর চির-কালের তরে দেশত্যাগী হয়ে চলে যাচ্ছে না। দু'দিন কিংবা দু'বছর পরে আবার তো ফিরে আসবে। ইতিমধ্যে তোমার গাছগুলো ত আর রবি ঠাকুরের "হংস-বলাকা"র মত ডানা মেলে আকাশের কিনারা খুঁজতে বেরিয়ে যাবে না, কিংবা নদীটি জনকতনয়ার অভিসম্পাতে অন্তঃসলিলা হয়ে যাবেন না, কিংবা—'

বেশ কথা। তা হলে কিছু বলার নেই। এবং সত্যি বলতে কী, সেইটেই কাম্য। আমাদের মুনিঋষিরা সেই নির্দেশই দিয়ে গিয়েছেন ; আমাদের বাপ-পিতেমো তাই করেছেন। মুসলমান মৌলানা-দরবেশরা তাই বলেছেন। তাঁদের ব্যাটা-বাচ্চারা তাই করেছে।

তাই শাস্ত্রকার আদেশ দিয়েছেন, গুরুগৃহে বিদ্যাচর্চা সমাপ্ত হলে পর তীর্থভ্রমণান্তে ('দেশভ্রমণ' কিংবা হালফিলের কথা 'টুরিজম্') স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করত গৃহস্থাশ্রম-প্রবেশ কর্তব্য। তারপর আর দেশভ্রমণ-টেশভ্রমণের রা-টি কেড়ো নি। নিতান্তই যদি বাউণ্ডুলেপনা করতে হয় তবে কর, প্রাণভরে কর, সন্ন্যাস নেবার পর। এমন কী বাণপ্রস্থ বনে জনপদভূমির প্রান্ত প্রদেশে। সে-অবস্থায়ও যত্রতত্র পর্যটন গর্হিত।

কিন্তু সন্ন্যাসের বাউণ্ডুলেগিরির প্রতি কর্তারা এত সদয় কেন ? তার এক কারণঃ

www.BanglaBook.org

ভোগে রোগভয়ং, কুলে চ্যুতিভয়ং, বিত্তে নৃপাদ্ ভয়ং
মানে দৈন্যভয়ং, বলে রিপুভয়ং, রূপে তরুণ্যা ভয়ং,
শাস্ত্রে বাদীভয়ং, গুণে খলভয়ং, কায়ে কৃতান্তাদ্ ভয়ং,
সর্ববস্তু ভয়ান্বিতং, ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ং॥

শুধু বৈরাগ্যেই অভয়। তাই শাস্ত্রকার বলেছেন, যে মুহূর্তে মনে বৈরাগ্যের উদয় হবে সেই মুহূর্তেই সন্ন্যাস গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করবে। ব্রহ্মচর্য সমাপ্ত না করে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করা যায় না, গার্হস্থ্য সমাপন না করে বাণপ্রস্থ গ্রহণ গর্হিত ; কিন্তু সন্ন্যাস নেওয়া যায় যে-কোনও সময়ে—ডবল, ট্রিপ্‌ল প্রমোশন নিয়ে।

কিন্তু সন্ন্যাস নেওয়ার পর আর গৃহে ফিরতে পারবে না। সেইটেই হল সবচেয়ে বড় কথা এবং সেই দিকেই বিশেষ করে আমি আমার পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সন্ন্যাস গ্রহণের পর কোন জায়গাতেই তিন দিনের বেশী থাকবার নিয়ম নেই, এক বর্ষাকাল ছাড়া। বৌদ্ধ শ্রমণদেরও এই 'বিনয়'।

এর সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য কী? সন্ন্যাস গ্রহণ করলে আত্মার কি প্রসার হয় না-হয় সে সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করবার অধিকার আমার নেই ; কিন্তু তাতে করে সমাজ ও সংস্কারের কী ক্ষতিবৃদ্ধি হয় সে সম্বন্ধে বলার অধিকার আমাদের মত সংসারীদের নিশ্চয় আছে।

আমার মনে হয়, সন্ন্যাস নিয়ে পর্যটন করুন, আর সন্ন্যাস না নিয়ে টুরিস্টের মত বাউণ্ডুলেপনা করুন, ফল একই। নানা দেশ নানা লোক, বহু সমাজবন্ধন, বহু উচ্ছৃঙ্খলতা, বিস্তর ধর্মাচার এবং ততোধিক চার্বাকাচরণ দেখে দেখে মানুষের চিত্তের প্রসার হয় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই 'প্রসার'ই তাকে দেশের রীতিনীতি সম্বন্ধে একদিক দিয়ে করে দেয় নির্বিকল্প উদাসীন, অন্যদিক দিয়ে আপন মাটি আপন গ্রামের কল্যাণকামনায় নিস্পৃহ। ইংরেজীতে একেই বলে 'জেডেড' ফরাসীতে 'ব্লাজে'! এই অবস্থার কল্পনা করেই জার নিকোলাস বলেছিলেন, 'পরের বেদনা বুঝিতে না পারে' না ভাবে আপন সুখ'। গ্রাম্য ভাষায় একেই বলে 'দড়কচ্চা হয়ে "ল্যাদা" মেরে যাওয়া'।

এইসব 'ভবঘুরে' তখন আর সমাজের ভিতর আপন আসন গ্রহণ করে কর্তব্যাচরণে আত্মনিয়োগ করতে পারে না। প্রত্যেক সমাজেরই কতকগুলি অন্যায় বন্ধন থাকে, এককালে হয়ত সেগুলোর কোন অর্থ ছিল, এখন লোকে ভুলে গিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে আবার মুক্তির রন্ধ্রও থাকে। এ-দুয়ের টানাটানির মাঝখানের উত্তম পন্থাটি বের করার নামই সমাজ। আমাদের বাউণ্ডুলেটির কাছে দুটোই অর্থহীন। সে ঘোরাঘুরির ফলে দেখেছে বহু সমাজ, যেখানে অন্য বন্ধন, অন্য মুক্তি। দেশের সমাজের মূঢ়তা যেমন তাকে বিচলিত করতে পারে না, তার আদর্শবাদও তাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। তাই পূর্বেই নিবেদন করেছি, সন্ন্যাসগ্রহণের পর স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন নিষিদ্ধ।

আর যদি ধ্যান-ধারণা সাধনা-তপস্যার কথা তোলেন, তবে তার পরম শত্রু দেশভ্রমণ। গ্যোটে বলেছেন, 'চরিত্রবল সৃষ্টি করতে হলে জনসমাজে মেশো, কিন্তু যদি প্রতিভার সম্যক প্রস্ফুরণ তোমার কামনা হয়, তবে সাধনা কর নির্জনে।'

আর আমাদের অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ছবি দেখে যদি আমোদ পেতে চাও

www.BanglaBook.org

তবে আকাশে জলে-স্থলে প্রতি মুহূর্তে এত ছবি আঁকা হচ্ছে যে, তার হিসেব নিলেই সুখে চলে যাবে দিনগুলো—'

'আর যদি ছবি লিখে আনন্দ পেতে চাও তবে আসন গ্রহণ কর এক জায়গায়, দিতে থাক তুলির টানে রঙের পোঁচ। এ দর্শকের আমোদ নয়, স্রষ্টার আনন্দ।'

চতুর্দিকে নিজেকে বিক্ষিপ্ত বিকীর্ণ করে দিলে এ-আনন্দ পাওয়া যায় না॥

রসগোল্লা

'চুঙ্গিঘর' কথাটা বাংলা ভাষাতে কখনও খুব বেশী চালু ছিল না বলে আজকের দিনে অধিকাংশ বাঙালী যদি সেটা ভুলে গিয়ে থাকে, তবে তাই নিয়ে মর্মাহত হবার কোন কারণ নেই। ইংরেজীতে একে বলে 'কাস্টম্ হাউস', ফরাসীতে 'দুয়ান্', জর্মনে 'ৎসল্-আম্ট্', ফার্সীতে 'গুমুরুক' ইত্যাদি ইত্যাদি। এতগুলো ভাষাতে যে এই লক্ষ্মীছাড়া প্রতিষ্ঠানটার প্রতিশব্দ দিলুম তার কারণ আজকের দিনে আমার ইয়ার, পাড়ার পাঁচু, ভুতো সবাই সরকারী, নিম সরকারী, মিন-সরকারী পয়সায় নিত্যি নিত্যি কাইরো কান্দাহার প্যারিস-ভেনিস সর্বত্র নানা-বিধ কনফারেন্স করতে যায় বলে, আর পাকিস্তান হিন্দুস্থান গমনাগমন ত আছেই। ওই শব্দটি জানা থাকলে তড়িঘড়ি তার সন্ধান নিয়ে আর পাঁচজনের আগে সেখানে পৌঁছতে পারলে তাড়াতাড়ি নিষ্কৃতি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। ওটাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা কস্মিনকালেও করবেন না। বরঞ্চ রহমত কাবুলীকে তার হক্কের কড়ি থেকে বঞ্চিত করলে করতেও পারেন কিন্তু তার দেশের 'গুমুরুক'টিকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করবেন না। 'কাবুলি-ওয়ালা' ফিল্ম আমি দেখি নি। রহমত বোধ করি সেটাতে তার 'গুমুরুক'কে এড়াবার চেষ্টা করে নি।

কেন? ক্রমশ প্রকাশ্য।

ডাক্তার, উকিল, কসাই, ডাকাত, সম্পাদক এবং (সম্পাদকরা বলবেন, লেখক) এদের মধ্যে সক্কলের প্রথম কার জন্মগ্রহণ হয় সেকথা বলা শক্ত। যারই হোক, তিনি যে চুঙ্গিঘরের চেয়ে প্রাচীন নন সে-বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। মানুষে মানুষে লেনদেন নিশ্চয়ই সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছিল এবং সেই মুহূর্তেই তৃতীয় ব্যক্তি বলে উঠল, 'আমার ট্যাক্সোটা ভুলো না কিন্তু'—তা সে তৃতীয় ব্যক্তি গাঁয়ের মোড়লই হন, পঞ্চাশখানা গাঁয়ের দল-পতিই হন, কিংবা রাজা অথবা তাঁর কর্মচারীই হন। তা তিনি নিন, আমার তাতে কোন আপত্তি নেই, কারণ এযাবৎ আমি পুরনো খবরের কাগজ ছাড়া অন্য কোনও বস্তু বিক্রি করি নি। কিন্তু যেখানে দু পয়সা লাভের কোন প্রশ্নই ওঠে না, সেখানে যখন চুঙ্গিঘর তার না-হক্কের কড়ি না-হক চাইতে যায়, তখনই আমাদের মনে সুবুদ্ধি জাগে, ওদের ফাঁকি দেওয়া যায় কী প্রকারে?

এই মনে করুন, আপনি যাচ্ছিলেন ঢাকা। প্যাক করতে গিয়ে দেখেন, মাত্র দুটি শার্ট ধোপার মারপিট থেকে গা বাঁচিয়ে কোন গতিকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে। ইস্টিশানে যাবার সময় কিনলেন একটি নয়া শার্ট। ব্যস্,

www.BanglaBook.org

আপনার হয়ে গেল। দর্শনা পৌঁছতেই পাকিস্তানী চুঙ্গিঘর হুলুধ্বনি দিয়ে দর্শনী চেয়ে উঠবে। তারপর আপনার শার্টটির গায়ে হাত বুলবে, মস্তক আঘ্রাণ করবে এবং শেষটায় ধৃতরাষ্ট্র যে-রকম ভীমসেনকে আলিঙ্গন করেছিলেন ঠিক সেই রকম বুকে জড়িয়ে ধরবে।

আপনার পাঁজর কখানা পটপট করতে আরম্ভ করেছে, তবু শুকনো মুখে চিঁ চিঁ করে বলবেন, 'ওটা ত আমি নিজের ব্যবহারের জন্য সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। ওতে ত ট্যাক্স লাগবার কথা নয়।'

আইন তাই বলে।

হায় রে আইন! চুঙ্গিওলা বলবে, 'নিশ্চয়। কিন্তু ওটা যদি আপনি ঢাকাতে বিক্রি করেন?'

তর্কস্থলে ধরে নিলুম, আপনার পিতামহ তর্কবাগীশ ছিলেন তাই আপনি মুখের ন্যায় তর্ক তুললেন, 'পুরনো শার্টও ত ঢাকাতে বিক্রি করা যায়।'

এই করলেন ভুল। তর্কে জিতলেই যদি সংসারে জিত হত তবে সক্রাতেসকে বিষ খেতে হত না, যীশুকে ক্রুশের উপর শিব হতে হত না।

চুঙ্গিওলা জানে, জীবনের প্রধান আইন চুপ করে থাকা, তর্ক করার বদভ্যাসটি ভাল নয়। এক্কেবারেই হয় না ওতে বুদ্ধিশক্তির চালনা।

কী যেন এক অজানার ধেয়ানে, দীর্ঘ অ্যারস্ট্রেপের পশ্চাতের সুদূর দিক-চক্রবালের দিকে তাকিয়ে বলবে, 'তা পারেন।'

তারপর কাগজ পেনসিল নিয়ে কী সব টরে-টক্কা করবে। তারপর বলবে, 'পনের টাকা।'

আপনার মনের অবস্থা আপনিই তখন জানেন—আমি আর তার কী বলে দেব! ব্যাপারটা যখন আপনার সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হল, তখন আপনি ক্ষীণতম কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু ওই শার্টটার দামই ত মাত্র চার টাকা।'

চুঙ্গিওলা একখানা হলদে কাগজে চোখ বুলিয়ে নেবে। আপনি এটাতে দরখাস্ত করেছিলেন এবং নূতন শার্টটার উল্লেখ করেন নি। চুঙ্গিওলার কাছে তার সরল অর্থ, আপনি এটা স্মাগ্‌ল করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, পাচার করতে চেয়েছিলেন, হাতে-নাতে বেআইনী কর্ম করতে গিয়ে ধরা পড়লে তার জরিমানা দশ টাকা, জেলও হতে পারত, আফিং কিংবা ককেইন হলে—এ যাত্রা বেঁচে গেছেন।

সেই হলদে কাগজখানা অধ্যয়ন করে কোন লাভ নেই। কারণ তার প্রথম প্রশ্ন ছিল,

১। আপনার জন্মের সময় যে কাঁচি দিয়ে নাড়ি কাটা হয়েছিল, তার সাইজ কত?

এবং শেষ প্রশ্ন,

২। আপনার মৃত্যুর সন তারিখ কী?

আপনি তখন শার্টটির মায়া ত্যাগ করে ঈষৎ অভিমানভরে বললেন, 'তা হলে ওটা আপনারা রেখে দিন।'

কিন্তু ওইটি হবার জো নেই। আপনি ঘড়ি চুরি করে পেয়েছিলেন তিন মাসের জেল। ঘড়ি ফেরত দিলেই ত আর হাকিম আপনাকে ছেড়ে দেবে না। শার্ট ফেরত দিতে চাইলেও রেহাই নেই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তখন শার্টটা চড়বে নিলামে। এক টাকা পেলে আপনি মহা ভাগ্যবান। জরিমানাটার অবশ্য নড়নচড়ন হল না।

ঢাকা থেকে ফিরে আসবার সময় ভারতীয় চুঙ্গিওলা দেখে ফেললে আপনার নতুন পেলিকান ফাউন্টেন পেনটি। কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করে লাভ নেই। আপনি ভাবলেন, ভারত এবং পাকিস্তান উভয়েই এ কর্মে নতুন, তাই প্যাসেঞ্জারকে খামকা হয়রান করে। বিলেত-ফিলেতে বোধ হয় চুঙ্গিঘর টুরিস্টদের নিছক মনোরঞ্জনার্থে। তবে শুনুন।

আমার এক বন্ধু প্রায়ই ইউরোপ আমেরিকা যান। এতই বেশী যাওয়া-আসা করেন যে, তাঁর সঙ্গে কোথাও দেখা হলে বলবার উপায় নেই, তিনি বিদেশ যাচ্ছেন না ফিরে আসছেন। ওই যে রকম ঢাকার কুট্টি গাড়ওয়ান, এক ভদ্রলোককে ভি-শেপের গেঞ্জি উল্টো পরে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কর্তা আইতেছেন, না যাইতেছেন?'

তিনি নেমেছেন ইটালির ভেনিস বন্দরে জাহাজ থেকে। ঝান্ডু ব্যবসায়ী লোক। তাই চুঙ্গিঘরের সেই হলদে কাগজখানায় যাবতীয় প্রশ্নের সদুত্তর দিয়ে শেষটায় লিখেছেন, 'এক টিন ভ্যাকুয়াম প্যাক্‌ড্‌ ভারতীয় মিষ্টান্ন। মূল্য দশ টাকা।' অস্কার ওয়াইল্ড যখন মার্কিন মুল্লুকে বেড়াতে গিয়েছিলেন, তখন চুঙ্গিঘর পাঁচজনের মত তাঁকেও শুধিয়েছিল, 'এনিথিং টু ডিক্লেয়ার?' তিনি আঙুল দিয়ে তাঁর মগজের বাক্সটি বার কয়েক ট্যাপ করে উত্তর দিয়েছিলেন, 'মাই জিনিয়াস্‌।' আমার পরিচিতদের ভিতর ওই ঝান্ডুদাই একমাত্র লোক, যিনি মাথা ত ট্যাপ করতে পারতেনই, সঙ্গে সঙ্গে হার্টটা ট্যাপ করলেও কেউ কোন আপত্তি করতে পারত না।

জাহাজখানা ছিল বিরাট সাইজের—ঝান্ডুদার বপুটি স্বচক্ষে দেখেছেন যাঁরা, তাঁরাই আমার কথায় সায় দেবেন যে, তাঁকে ভাসিয়ে রাখা যে-সে জাহাজের কর্ম নয়—তাই সেদিন চুঙ্গিঘরে লেগে গিয়েছিল মোহনবাগান ভর্সস ফীল্ম-স্টার-টীম ম্যাচের ভিড়। ঝান্ডুদা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। হঠাৎ মনে পড়ল ইতালির 'কিয়ান্তি' জিনিসটি বড়ই সরেস এবং সরস। চুঙ্গিঘরের কাঠের খোঁয়াড়ের মুখে দাড়িয়েছিল এক পাহারাওলা। তাকে হাজার লিরার একখানা নোট দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন কয়েক বোতল 'কিয়ান্তি' রাস্তার ওধারের দোকান থেকে নিয়ে আসতে। পাহারাওলা খাঁটি খানদানী লোকের হাতে এসেছে ঠাহর করতে পেরে খাঁটি নিয়ে এল তিন মিনিটেই। পূর্বেই বলেছি ঝান্ডুদা জন্মেছিলেন তাগড়াই হার্ট নিয়ে—জাহাজের পরিচিত অপরিচিত তথা চুঙ্গিঘরের পাহারাওলা, সেপাই, চাপরাসী, কুলী, সবাইকে 'কিয়ান্তি' বিলোতে লাগলেন দরাজ দিলে। 'স্বাস্থ্যপান' আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই ঝান্ডুদার ডাক পড়ে গেল চুঙ্গির কাউন্টারে। মাল খালাসিতে তাঁর পালা এসে গেছে। নিমন্ত্রিত রবাহূত সবাইকে দরাজ হাত দুখানা পাখির মত মেলে দিয়ে বললেন, 'আপনারা ততক্ষণে ইচ্ছে করুন ; আমি এই এলুম বলে।' 'কিয়ান্তি' রানীকে বসিয়ে রাখা মহাপাপ।

ঝান্ডুদার বাক্স-পেটরায় এত সব জাত-বেজাত হোটেলের লেবেল লাগানো থাকত যে, অগা চুঙ্গিওলাও বুঝতে পারত এগুলোর মালিক বাস্তুভিটার

www.BanglaBook.org

তোয়াক্কা করে না—তাই জীবন কাটে হোটেলে হোটেলে। আজকের চুঙ্গিওলা কিন্তু সেগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে আরম্ভ করলে, প্রথম ভাগের ছেলে যে-রকম বানান ভুল করে করে বই পড়ে। লোকটার চেহারা বদখত। টিঙটিঙে রোগা, গাল দুটো ভাঙা, সে-গালের হাড় দুটো জোয়ালের মত বেরিয়ে পড়েছে, চোখ দুটো গভীর গর্তের ভিতর থেকে নাকটাকে প্যাঁসনের মত চেপে ধরেছে, নাকের তলায় টুথব্রাশের মত হিটলারী গোঁপ। পূর্বেই নিবেদন করেছি, ঝান্ডুদা ঝানু লোক, তাই তিনি মানুষকে তার চেহারা থেকে যাচাই করেন না। এবারে কিন্তু তাঁকেও সেই নিয়মের ব্যভিচার করতে হল। লোকটাকে আড়চোখে দেখলেন, সন্দেহের নয়নে আমার কানে কানে বললেন, 'শেক্‌স্‌পিয়ার নাকি বলেছেন, রোগা লোককে সমঝে চলবে। আমার বিশ্বাস, আজ যে শেক্‌স্‌-পিয়ারের এত নামডাক সেটা ওই দিন থেকেই শুরু হয়—কারণ ঝান্ডুদা আত্ম-নির্ভরশীল মহাজন, কারও কাছ থেকে কখনও কানাকড়ি ধার নেন নি।' তিনি ঋণ স্বীকার করাতে ওই দিন থেকে শেক্‌স্‌পিয়ারের যশ-পত্তন হয়।

চুঙ্গিওলা শুধালে, 'ওই টিনটার ভিতর আছে কী?'

'ইন্ডিয়ান সুইট্‌স।'

'ওটা খুলুন।'

'সে কী করে হয়? ওটা আমি নিয়ে যাব লণ্ডনে। খুললে বরবাদ হয়ে যাবে যে?'

চুঙ্গিওলা যে-ভাবে ঝান্ডুদার দিকে তাকালেন তাতে যা টিন খোলার হুকুম হল, পাঁচশো ঢ্যাঁটরা পিটিয়ে কোন বাদশাও ও-রকম হুকুমজারি করতে পারতেন না।

ঝান্ডুদা মরীয়া হয়ে কাতর নয়নে বললেন, 'ব্রাদার, এ-টিনটা আমি নিয়ে যাচ্ছি আমার এক বন্ধুর মে'য়ের জন্য লণ্ডনে—নেহাতই চিংড়ি মেয়ে। এটা খুললে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

এবারে চুঙ্গিওলা যে-ভাবে তাকলে, তাতে আমি হাজার ঢ্যাঁটরার শব্দ শুনতে পেলুম।

বিরাট-লাশ ঝান্ডুদা পিঁপড়ের মত নয়ন করে সকাতরে বললেন, তাহলে ওটা ডাকে করে লণ্ডন পাঠিয়ে দাও, আমি ওটাকে সেখানেই খালাস করব।'

আমরা একবাক্যে বললুম, 'কিন্তু তাতে ত বড্ড খরচা পড়বে। পাউন্ড পাঁচেক—নিদেন।'

হুস্বশ্বাস ফেলেই বললেন, 'তা আর কী করা যায়।'

কিন্তু আশ্চর্য, চুঙ্গিওলা তাতেও রাজী হয় না। আমরাও অবাক। কারণ এ আইন ত সক্কলেরই জানা।

ঝান্ডুদা একটুখানি দাঁত কিড়মিড় খেয়ে লোকটাকে আইনটার মর্ম প্রাঞ্জল ভাষায় বোঝালেন। তার অর্থ টিনের ভিতরে বাবা ভাল্লুক ককেইন-হেরয়িন যা-ই থাক, ও-মাল যখন সোজা লণ্ডনে চলে যাচ্ছে তখন তার পুণ্যভূমি ইতালি ত আর কলঙ্কিত হবে না।

আমরা সবাই কসাইটাকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম, ঝান্ডুদার প্রস্তাবটি অতিশয় সমীচীন এবং আইনসঙ্গতও বটে। আমাদের দল তখন বেশ বিরাট আকার ধারণ করেছে। 'কিয়ান্তি'-রানীর সেবকের অভাব ইতালিতে কখনও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয় নি—প্রাচুর্য থাকলে পৃথিবীতেও হত না। এক ফরাসী উকিল কাইরো থেকে পোর্ট সঈদে জাহাজ ধরে—সে পর্যন্ত বিন্ ফীজে লেকচার ঝাড়লে। চুঙ্গিওলার ভাবখানা সে পৃথিবীর কোন ভাষাই বোঝে না।

ঝান্ডুদা তখন চটেছেন। বিড়বিড় করে বললেন, 'শালা, তবে খুলছি। কিন্তু ব্যাটা তোমাকে না খাইয়ে ছাড়ছি নে।' তারপর ইংরেজীতে বললেন, কিন্তু তোমাকে ওটা নিজে খেয়ে পরখ করে দেখতে হবে ওটা সত্যি ইণ্ডিয়ান সুইটস কিনা।'

শয়তানটা চট করে কাউণ্টারের নীচে থেকে টিন-কাটার বের করে দিলে। ফরাসী বিদ্রোহের সময় গিলোটিনের অভাব হয় নি।

ঝান্ডুদা টিন-কাটার হাতে নিয়ে ফের চুঙ্গিওলাকে বললেন, 'তোমাকে কিন্তু ওই মিষ্টি পরখ করতে হবে নিজে, আবার বলছি।'

চুঙ্গিওলা একটু শুকনো হাসি হাসলে। শীতে বেজায় ঠোঁট ফাটলে আমরা যে-রকম হেসে থাকি।

ঝান্ডুদা টিন কাটলেন।

কী আর বেরবে? বেরল রসগোল্লা। বিয়ে-সাদিতে ঝান্ডুদা ভুরি ভুরি রসগোল্লা স্বহস্তে বিতরণ করেছেন—ব্রাহ্মণ-সন্তানও বটেন। কাঁটা-চামচের তোয়াক্কা না করে রসগোল্লা হাত দিয়ে তুলে প্রথমে বিতরণ করলেন বাঙালীদের, তারপর যাবতীয় ভারতীয়দের, তারপর আর সবাইকে অর্থাৎ ফরাসী, জার্মান, ইতালীয় এবং স্প্যানিয়ার্ডদের।

মাতৃভাষা বাংলাটাই বহুত তকলিফ বরদাস্ত করেও কাবুতে আনতে পারি নি, কাজেই গণ্ডা তিনেক ভাষায় তখন বাঙালীর বহু যুগের সাধনার ধন রসগোল্লার যে বৈতালিক গীতি উঠেছিল তার ফটোগ্রাফ দি কী প্রকারে?

ফরাসীরা বলেছিল, 'এপাতাঁ!'

জর্মনরা, 'ক্লর্কে!'

ইতালিয়ানরা, 'ব্রাভো!'

স্প্যানিশরা, 'দেলিচজো, দেলিচজো।'

আরবরা, 'ইয়া সালাম, ইয়া সালাম!'

তামাম চুঙ্গিঘর তখন রসগোল্লা গিলছে। আকাশে বাতাসে রসগোল্লা। কিউবিজ্‌ম বা দাদাইজ্‌মের টেক্‌নিক দিয়েই শুধু এর ছবি আঁকা যায়। চুঙ্গিঘরের পুলিস-বরকন্দাজ, চাপরাসী স্পাই সক্কলেরই হাতে রসগোল্লা। প্রথমে ছিল ওদের হাতে 'কিয়ান্তি', আমাদের হাতে রসগোল্লা। এক লহমায় বদলা-বদলি হয়ে গেল।

আফ্রিকার এক ক্রিশ্চান নিগ্রো আমাকে দুঃখ করে বলেছিলেন, 'ক্রিশ্চান মিশনারিরা যখন আমাদের দেশে এসেছিলেন তখন তাঁদের হাতে ছিল বাইবেল, আমাদের ছিল জমিজমা। কিছুদিন বাদেই দেখি, ওঁদের হাতে জমিজমা, আমাদের হাতে বাইবেল।'

আমাদের হাতে 'কিয়ান্তি'।

ওদিকে দেখি, ঝান্ডুদা আপন ভুঁড়িটি কাউণ্টারের উপর চেপে ধরে চুঙ্গিওলার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলছেন বাংলাতে—'একটা খেয়ে দেখ।' হাতে তাঁর একটি সরেস রসগোল্লা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চুঙ্গিওলা ঘাড়টা একটু পিছনের দিকে হটিয়ে গম্ভীর রূপ ধারণ করেছে।

ঝান্ডুদা নাছোড়বান্দা। সামনের দিকে আরেকটু এগিয়ে বললেন, 'দেখছ তো, সবাই খাচ্ছে। ককেইন নয়, আফিঙ নয়। তবু নিজেই চেখে দেখ, এ বস্তু কী!'

চুঙ্গিওলা ঘাড়টা আরও পিছিয়ে নিলে। লোকটা অতি পাষন্ড। একবারের তরে 'সরি-টরি'ও বললে না।

হঠাৎ, বলা-নেই, কওয়া-নেই, ঝান্ডুদা তামাম ভুঁড়িখানা কাউন্টারের উপর চেপে ধরে ক্যাঁক করে পাকড়ালেন চুঙ্গিওলার কলার বাঁ হাতে আর ডান হাতে থেবড়ে দিলেন একটা রসগোল্লা ওর নাকের উপর। ঝান্ডুদার তাগ সব সময়েই অতিশয় খারাপ।

আর সঙ্গে সঙ্গে মোটা গলায়, 'শালা, তুমি খাবে না! তোমার গুষ্টি খাবে। ব্যাটা, তুমি মস্করা পেয়েছ! পই পই করে বললুম, রসগোল্লাগুলো নষ্ট হয়ে যাবে, চিংড়িটা বড্ড নিরাশ হবে, তা তুমি শুনবে না!—আরও কত কী।

ততক্ষণে কিন্তু তাবৎ চুঙ্গিঘরে লেগে গিয়েছে ধুন্দুমার। চুঙ্গিওলার গলা থেকে যেটুকু মিহি আওয়াজ বেরুচ্ছে তার থেকে বোঝা যাচ্ছে সে পরিত্রাণের জন্য চাপরাসী থেকে আরম্ভ করে ইল্‌দুচে মুস্‌সোলিনী—মাঝখানে যত সব কনসাল, লিগেশন মিনিসটার, অ্যাম্বসেডর প্লেনিপটিনশিয়ারি—কারুরই দোহাই কাড়তে কসুর করছে না। মেরি মাতা, হোলি যিসস, পোপঠাকুর ত বটেনই।

আর চিৎকার-চেচামেচি হবে না কেন? এ যে রীতিমত বে-আইনী কর্ম। সরকারী চাকুরেকে তার কর্তব্যকর্ম সমাধানে বিঘ্ন উৎপাদন করে তাকে সাড়ে তিনমণী লাশ দিয়ে চেপে ধরে রসগোল্লা খাওয়াবার চেষ্টা করুন আর সে'কো খাওয়াবারই চেষ্টা করুন, কর্মটির জন্য আকছারই জেলে যেতে হয়। ইতালিতে এর চেয়ে বহুত অল্পেই ফাঁসি হয়।

ঝান্ডুদার কোমর জাবড়ে ধরে আমরা জনাপাঁচেক তাঁকে কাউন্টার থেকে টেনে নামাবার চেষ্টা করছি। তিনি পর্দার পর পর্দা চড়াচ্ছেন, 'খাবি নি, ও পরান আমার, খাবি নি, ব্যাটা—' চুঙ্গিওলা ক্ষীণকণ্ঠে পুলিসকে ডাকছে। আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে আমার মাতৃভূমি সোনার দেশ ভারতবর্ষের ট্রাঙ্ককলে যেন কথা শুনছি। কিন্তু কোথায় পুলিস? চুঙ্গিঘরের পাইক বরকন্দাজ ডান্ডা-বরদার, আস-সরদার বেবাক চাকর-নফর বিলকুল বেমালুম গায়েব! এ কি ভানুমতী, এ কি ইন্দ্রজাল!

দেখি, ফরাসী উকিল আকাশের দিকে দু হাত তুলে অর্ধনিমীলিত চক্ষে, গদগদ কণ্ঠে বলছে, 'ধন্য পুণ্যভূমি ইতালি, ধন্য পুণ্যনগর রোমস! এ ভূমির এমনই পুণ্য যে হিদেন রসগোল্লা পর্যন্ত এখানে মিরাক্‌ল্ দেখাতে পারে। কোথায় লাগে 'মিরাক্‌ল্ অব মিলান' এর কাছে—এ যে সাক্ষাৎ জাগ্রত দেবতা, পুলিস-মুলিস সবাইকে ঝেঁটিয়ে বার করে দিলেন এখান থেকে! ওহোহো, এর নাম হবে "মিরাক্‌ল্ দ্য রসগোল্লা"।'

উকিল মানুষ, সোজা প্যাঁচ না মেরে বলতে পারে না। তার উচ্ছ্বাসের মূল বক্তব্য, রসগোল্লার নেমকহারামি করতে চায় না ইতালীয় পুলিস-বরকন্দাজরা। তাই তারা গা-ঢাকা দিয়েছে।

আমরা সবাই একবাক্যে সায় দিলুম। কিন্তু কে এক কাষ্ঠরসিক বলে

www.BanglaBook.org

উঠল, 'রসগোল্লা নয়, কিয়ান্তি।' আরও দু'চার পাষণ্ড তায় সায় দিলে।

ইতিমধ্যে ঝাণ্ডুদাকে বহু কষ্টে কাউণ্টারের এদিকে নামানো হয়েছে। চুঙ্গিওলা রুমাল দিয়ে রসগোল্লার থ্যাব্‌ড়া মুছতে যাচ্ছে দেখে তিনি চেঁচিয়ে বললেন, 'ওটা পুঁছিস নি ; আদালতে সাক্ষী দেবে—ইর্গাজিবিট নাম্বার ওয়ান।'

ওদিকে তখন বেটিং লেগে গিয়েছে, ইতালিয়ানরা 'কিয়ান্তি' পান করে, না রসগোল্লা খেয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে? কিন্তু ফৈসালা করবে কে? তাই এ-বেটিঙে রিস্‌ক্‌ নেই। সবাই লেগে গিয়েছে।

কে একজন ঝাণ্ডুদাকে সদুপদেশ দিলে, 'পুলিস ফের এসে যাবে। ততক্ষণে আপনি কেটে পড়ুন।'

তিনি বললেন, 'না, ওই যে লোকটা ফোন করছে। আসুক না ওদের বড় কর্তা।'

তিন মিনিটের ভিতর বড় কর্তা ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন। ফরাসী উকিলের বোধ হয় সবচেয়ে বড় যুক্তি ঘুষ। এক বোতল 'কিয়ান্তি' নিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। ঝাণ্ডুদা বাধা দিয়ে বললেন, 'নো।'

তারপর বড় সাহেবের সামনে গিয়ে বললেন, 'সিন্নোর, বিফো ইউ প্রসীড, অর্থাৎ কিনা ময়না-তদন্ত আরম্ভ হওয়ার পূর্বে আপনি একটি ইণ্ডিয়ান সুইট্‌স চেখে দেখুন।' বলে নিজে মুখে তুললেন একটি। আমাদের সবাইকে আরেক প্রস্থ বিতরণ করলেন।

বড় কর্তা হয়ত অনেক রকমের ঘুষ খেয়ে ওকিবহাল এবং তালেবর। কিংবা হয়ত কখনও ঘুষ খান নি। 'না বিইয়ে কানাইয়ের মা' যখন হওয়া যায় এবং স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র যখন এ-প্রবাদটি ব্যবহার করে গেছেন তখন 'ঘুষ না-খেয়েও দারোগা' ত হওয়া যেতে পারে।

বড় কর্তা একটি মুখে তুলেই চোখ বন্ধ করে রইলেন আড়াই মিনিট। চোখ বন্ধ অবস্থায়ই আবার হাত বাড়িয়ে দিলেন। ফের। আবার।

এবারে ঝাণ্ডুদা বললেন, 'এক ফোঁটা কিয়ান্তি?'

কাদম্বিনীর ন্যায় গম্ভীর নিনাদে উত্তর এল, 'না। রসলোল্লা।'

টিন তখন ভোঁ-ভোঁ।

চুঙ্গিওলা তার ফরিয়াদ জানালে।

কর্তা বললেন, 'টিন খুলেছ ত বেশ করেছ, না হলে খাওয়া যেত কী করে?' আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কী করতে? আরও রসগোল্লা নিয়ে আসুন।' আমরা সুড় সুড় করে বেরিয়ে যাবার সময় শুনতে পেলুম, বড় কর্তা চুঙ্গিওলাকে বলছেন, 'তুমিও ত একটা আস্ত গাড়ল। টিন খুললে আর ওই সরেস মাল চেখে দেখলে না?'

'কিয়ান্তি না রসগোল্লা' সে-বেটের সমাধান হল।

ইতালির প্রখ্যাত মহিলা-কবি ফিলিকাজা গেয়েছেন,

'ইতালি, ইতালি, এত রূপ তুমি কেন ধরেছিলে, হায়!
অনন্ত ক্লেশ লেখা ও-ললাটে নিরশ্চিত্র কালিমায়।'

আমিও তাঁর স্মরণে গাইলুম,

রসের গোলক, এত রস তুমি কেন ধরেছিলে, হায়!
ইতালির দেশ ধর্ম ভুলিয়া লুটাইল তব পায়!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চাপরাসী ও কেরানী

কিছুদিন পূর্বে বক্তৃতা দেবার সময় পণ্ডিতজী বলেন, চাপরাসীদের মাইনে মাস্টারদের চেয়ে বেশী কিংবা ওই ধরনের কিছু একটা। আমার ঠিক মনে নেই! তার জন্য পণ্ডিত সম্প্রদায় আমার অপরাধ নেবেন না। বিবেচনা করে দেখলে তাঁরা বুঝতে পারবেন, আমি তাঁদের উপকারই করেছি। কারণ পণ্ডিতজীর সব কথা বিশেষ করে তাঁর সব শপথ এবং প্রতিজ্ঞা সর্বসাধারণ স্মরণ রাখলে বড় বিপদ হত। আমার মত কোন কোন আহাম্মুক এখনও ভুলতে পারে নি, পণ্ডিতজী স্বরাজলাভের ঊষাকালে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তিনি কালোবাজারীদের ল্যাম্পপোস্টে ঝোলাবেন। কেউ যদি কাউকে ওই ভাবে ঝুলে থাকতে দেখে থাকেন, তবে দয়া করে জানাবেন। দৃশ্যটি নয়নাভিরাম না হলেও প্রাণাভিরাম। একটু তাড়াতাড়ি জানাবেন। কারণ আমার জীবন-সায়াহ্ন আসন্ন।

অতএব, পণ্ডিতজী প্রাতঃস্মরণীয় বটেন, কিন্তু তাঁর বচনামৃত প্রাতঃস্মরণীয় নয়।

খয়ের। বাংলা 'খয়ের' নয়, উর্দু 'খয়ের'। তার অর্থ 'তা সে যাকগে'। এই উর্দু 'খয়ের'টি এই বেলাই একটু ভাল করে শিখে নিন। বিস্তর 'ফায়দা' ওঠাতে পারবেন। বুঝিয়ে বলি।

উর্দুওয়ালারা দেশ সম্বন্ধে বক্তৃতার আরম্ভেই শুরু করেন তার দুঃখ-কাহিনীর বর্ণনা দিয়ে। 'আমরা খেতে পাইনে, পরবার কিছু নেই, আশ্রয় জোটে না, শিক্ষার ব্যবস্থা হয় নি, মেয়েরা গর্ভযন্ত্রণায় মারা যায়, ডাক্তারবদ্যির ব্যবস্থা হল না, ইত্যাদি ইত্যাদি।' আমরা যখন উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করি, এইবারে বুঝি দেশের কর্ণধাররা বাতলে দেবেন, তাঁরা এসব বালাই-আপদ দূর করবার জন্য কী সব পরিপাটী ব্যবস্থা করেছেন, দেশের কোন্ কোন্ জায়গায় এ সব অভাব-অনটন তাঁদের সম্মার্জনী-সঞ্চালনে দূরীভূত হয়েছে, এইবারে আমাদের সবুরের মেওয়া ফলবে কবে, এই ধরনের কোন কিছু।

বারমাস্যা শেষ হওয়ার পর বক্তা দম নেবেন। চতুর্দিকে সূচীভেদ্য নৈঃশব্দ্য। আমরা কান পেতে আছি, এইবার শুনতে পাব, 'চাপানে'র 'ওতর' এইবারে শুরু হবে উল্টো "বারমাস্যা', এইবারে আরম্ভ হবে আমাদের আশার বাণী, ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন।

ও হরি! কোথায় কী?

শুনতে পাবেন, বক্তা গুরুগম্ভীর নিনাদে একটি কথা বললেন, সেটি 'খয়ের'।

মানে? এর অর্থটা ত তাহলে বুঝতে হয়। কারণ ইতিমধ্যে বক্তা 'জাপানের ড্রাই ফার্মিং' কিংবা 'জানিজবারের কো-অপারেটিভ সিস্টেমে' চলে গিয়েছেন। তা হলে নিশ্চয়ই ও 'খয়ের' শব্দে ভাবৎ সমস্যার সমাধান ঘাপটি মেরে বসে আছে। ওঁ-তে যে রকম হিন্দুর ব্রহ্ম লাভ, ক্রুশে যে রকম খ্রীশ্চানের গড লাভ। 'সকলং হস্ততলং শব্দমাত্রেণ যদি অর্থধনং কোঽপি লভেৎ।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এইবারে 'খয়ের'-কলমার গূহ্য অর্থ শোনার পূর্বে ভাল ডাক্তারকে দিয়ে হার্টটি দেখিয়ে নিন! শক-টি মারাত্মক রকমের হবে ; ছাপাখানায় সদ্‌ব্রাহ্মণও আছেন। আর কেউ না পড়লেও তাঁরা বাধ্য হয়ে আমার লেখা কম্পোজ করেন, প্রুফ দেখেন। অকালে ব্রহ্মহত্যা করলে লোক-সভায়ও আমার ঠাঁই হবে না।

'খয়ের' কথার সাদামাটা প্লেন 'নির্ভেজাল' অর্থ, 'তা সে যাক্‌গে—অন্য কথা পাড়ি'। অর্থাৎ এতক্ষণ আপনি যে সব দুঃখ-কাহিনীর ফরিয়াদ-প্রতিবাদ আগড়ম্‌-বাগড়ম্‌ যা কিছু বলেছেন, তার উত্তর দেবার দায় আর আপনার রইল না। আপনি এখন কালীঘাট, মৌলা আলী সর্বত্রই লম্ফ-ঝম্প দিতে পারেন। কারণ 'খয়ের' শব্দের প্রসাদাৎ আপনি আপনার পুচ্ছটি ইতিমধ্যে কপাত করে কর্তন করে ফেলেছেন।

'খয়ের' বাক্যের শব্দার্থ আরবী ডিক্‌শনারি ঘেঁটে বের করেও পুলি-পিঠের ন্যাজ গজাবে না। ওতে পাবেন 'খয়ের' অর্থ 'উত্তম', 'শিব', 'মঙ্গল'। তবে কি বক্তা যে গোড়ার দিকে ফুল্লরার বারমাস্যা গেয়েছিলেন সেটা 'ভাল'?

না। আমরা অর্থাৎ বাঙালীরাও এ-রকম জায়গায় 'উত্তম' বলে থাকি, কিন্তু বিপরীত অর্থে। আমাদের পণ্ডিতগণ কোনও কিছুর সুদীর্ঘ অবতারণা করার পর সর্বশেষে বলেন, 'উত্তম প্রস্তাব'। তার অর্থ এই নয়, 'এতক্ষণ যা বললুম সে সব খুব ভাল জিনিস'—তার সরল অর্থ 'এ-দিককার কথা বলা হল, এবার অন্য পক্ষের বক্তব্য নিবেদন করছি এবং সেইটেই আমার বক্তব্য এবং তাতেই পাবেন প্রশ্নের সমাধান, রহস্যের মীমাংসা।'

'খয়ের'-এর এরূপ ব্যবহারকে ফার্সীতে বলা হয়, 'তাকিয়া-ই-কালাম'—'কথার' (কালামের) 'বালিশ' (তাকিয়া)। অর্থাৎ যে কথার উপর ভর করে নিশ্চিন্ত মনে গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়তে পারেন। বিপক্ষ রা'টি কাড়তে পারবে না, আপনি কেল্লা ফতেই করে দিয়েছেন, ভাগ্যিস, আপনি, মোকামাফিক 'খয়ের' শব্দটি প্রয়োগ করতে জানতেন, 'রাখে খয়ের মারে কে?'

মুসলমানরা নাকি এদেশের মন্দির ভেঙেছে, পার্ক সার্কাসে শিককাবাব চালিয়েছে, ইদানীং নূতন শুনছি, খামখেয়ালিতে খেরাল আমদানি করে ধ্রুপদ-ধামার বরবাদ করেছে। করেছে ত করেছে, তাই বলে কি উম্মাভরে গোস্‌সাঘরে এখনও খিল দিয়ে বসে রইবেন? গড়ের মাঠে গিয়ে রাষ্ট্রভাষায় (কটকে আমার বৃদ্ধ বাঙালী কেরানী সরকারী ইশ্‌তিহার পড়ে ভীত কণ্ঠে আমাকে শুধিয়েছিল 'আমাকেও লোষ্ট্রভাষা শিখতে হবে নাকি, স্যার?') কী ভাবে 'খয়ের' শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগ করতে হয়, সেটি শিখবেন না? ওইটে ঠিকমত, তাগমাফিক, বাংলায় 'এস্‌তেমাল' করতে পারলে পাড়ায় তর্কবাগীশ, তাকিয়া (ই-কালামের)-র কল্যাণে তর্কবালিশ হতে কতক্ষণ?

চিন্তা করে দেখুন, 'খয়ের' শব্দের কত গুণ! রাষ্ট্রভাষা হিন্দী তাঁর শব্দ-ভাণ্ডার থেকে লাথি ঝাঁটা মেরে তাবৎ আরবী-ফার্সী শব্দ বের করে দিচ্ছেন—কারণ হিন্দী বাংলার তুলনায় অনেক ধনী (!) কিন্তু—কিন্তু কই, 'খয়ের' শব্দটি তাড়াবার প্রস্তাব ত কেউ করে না। কট্টর কাম-কাটা হিন্দীতে 'ভারতওয়ার্ষ কী উন্নতি ঔর সোওয়াধীন্তা গড়তন্তর ঔর সামওয়াদ' ইত্যাদি 'কঠন্‌ কঠন্‌' (কঠিন কঠিন) সমস্যায়ে নির্মাণ করার পর সে-ইন্দ্রজাল তাঁরা ছিন্নভিন্ন করেন কোন মোহমুদ্‌গরে? সেই সনাতন—রাম! রাম!—সেই যাবনিক, ম্লেচ্ছ খ-য়ের দ্বারা।

www.BanglaBook.org

এবং সেই 'খয়ের'-এর 'খ'ও উচ্চারণ করেন অ্যাসন্ ঘর্ষণ দ্বারা যে শুনে মনে হয় বড়ী মসজিদের সামনে জাকারিয়া স্ট্রীটে কাবলীওলা 'খ' উচ্চারণ করার ছলে গলা সাফ করছে। কোথায় লাগে তার কাছে স্কচ 'লখ' শব্দের 'খ', জর্মন 'বাখ' শব্দের ওই একই ব্যঞ্জন?

মুসলমানরা মন্দির ভেঙে অতিশয় অপকর্ম করেছে, কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই রাগে 'খয়ের' শব্দের যে বিরাট বালাখানা তৈরি করে দিলে তার উপরে বসে হাওয়া খাবেন না?

শুধু মন্দ দিকটাই দেখবেন, ভাল দিকটা দেখবেন না?

তবে একটা গল্প শুনুন।

হয়ত অনেকেই শুনেছেন, তাঁরা অপরাধ নেবেন না। কারণ, বিবেচনা করে দেখুন, পুরনো গল্পের পুনরাবৃত্তি না করলে সেটি বেঁচে থাকবে কী করে? মহাভারতের গল্প সবাই জানে, তাই বলে কি আমরা মহাভারতের চর্চা বন্ধ করে দিয়েছি?

খয়ের।

গল্পটা কমিয়ে-সমিয়ে বলছি।

কালীঘাটের মন্দিরের সামনে দিয়ে যেতে গিয়ে এক ভদ্রসন্তানের হৃদয়ে ধর্মভাবের উদয় হল। মন্দিরে ঢুকে পাণ্ডাকে ডেকে যথারীতি যাবতীয় পুজো-পাটা করালে এবং শেষটায় উত্তম দক্ষিণা পেয়ে পাণ্ডা ভদ্রসন্তানের কপালে ইয়া একখানা খাসা তিলক কেটে দিল। বহর আর চেহারা দেখে মনে হয় ওই দিয়ে লাইটনিং কণ্ডাক্টরের কাজ অনায়াসে চালানো যায়। দেখলেই ভক্তি হয়। গড় হয়ে পেন্নাম করতে ইচ্ছে যায়। ভক্তিতে গদগদ হয়ে 'তারা ব্রহ্মময়ী মা, ব্রজ-যোগিনী মা' ইত্যাদি জপ করতে করতে ভদ্রসন্তান বাড়িমুখো হল।

কিন্তু হায়, সংসারে কত না সর্বজনীন অনাচার, রঙিন প্রলোভন। হবি ত হ, কিছুদূর যেতে না যেতে পথে পড়ল বাহারে একখানা 'বার'। সেদিন ছিল মঙ্গলবার, ড্রাই ডে, শরাব বারণ, তাই ভদ্রসন্তান প্রলোভনের ভয় নেই জেনে সে-পথ নিয়েছিল, কিন্তু বিধি বাম, বড়দিন না কিসের যেন জব্বর পরব ছিল বলে 'ইম্পশেল' কেস হিসাবে 'বার' খোলা।

এখন এগোই কী প্রকারে? ভদ্রসন্তানের রাস্তায় এগোবার কথা হচ্ছে না। আমি গল্পটা নিয়ে এগোই কী প্রকারে? পাঠকরা জীবনে একটিমাত্র অপকর্ম করে থাকেন, সেটি আমার রচনাপঠন। তাঁদের আমি অধর্মের কাহিনী শোনাই কী করে? কিন্তু তাঁরা যখন এতাবৎ এতখানি দয়া করেছেন তখন গোপাল-ভাঁড়ের মা-কালীর মত জোড়া মোষ থেকে নেমে নেমে শেষ পর্যন্ত দুটো বুনো ফড়িং নিজেই ধরে খেতে রাজী হবেন—এই আমার ভরসা।

পাঁট। ইংরেজীবাগীশ ছোঁড়ারা বলে 'পাইন্ট'। চিন্ন কোয়ার্টার খেতে না খেতেই হয়ে গেল। রঙিন পাখনায় ভর করে সে পুনরায় নামল রাস্তায়। কোয়াটারটুকু ফেলা যাবে বলে বোতলটা পকেটে। বোতলবাসিনীর সেবকেরা বরঞ্চ জীবনের বেটার-হাফকে বিসর্জন দিতে রাজী আছে, ওই 'ব্যাড' কোয়ার্টারকে নয়।

যেতে যেতে পথে পূর্ণিমা রাতে চাঁদ উদয় হয়েছিলেন কি না বলতে পারব না, কারণ আমি জ্যোতির্বিদ নই। তবে উদয় হলেন পাড়ার মৈত্রমশাই, নিষ্ঠা-

www.BanglaBook.org

বান সদাচারী ব্রাহ্মণ, কালেভদ্রে বাড়ি থেকে বেরন। এক মৈত্র মিনার্ভা থিয়েটার কোথায় জেনেও বলেন নি। ইনি কিন্তু বোতল দেখে বললেন, 'পাষণ্ড মাতাল।'

পকেটে বোতল থাকলেই, এমন কী সঙ্গে সঙ্গে টলটলায়মান হলেই মানুষ মাতাল হয় না। কিন্তু মৈত্রমশাই ন্যায়শাস্ত্রের চর্চা করতেন। তাতে আছে,—

১। দেবদত্ত বিরাট লাশ।

২। দেবদত্তকে দিনের বেলায় কেউ কখনও ভোজন করতে দেখে নি।

অতএব, দেবদত্ত রাত্রে খায়।

এটাকে বলে নলেজ বাই ইনফারেন্স্।

আমাদের ভদ্রসন্তান সচরাচর কথা কাটাকাটি করে না। কিন্তু দ্রব্যগুণ অনস্বীকার্য। বেদনাভরা কণ্ঠে, গদগদ ভাষে করুণ নয়নে শুধু বললে, 'মৈত্রমশাই, বোতলটা শুধু দেখলেন, তিলকটা দেখলেন না।'

মন্দির ভাঙাটাই শুধু দেখলেন, 'খয়ের'টা শুনলেন না।

আমার অনেক পাঠক আমাকে বাচনিক এবং পত্র দ্বারা মাঝে মাঝে জানান যে, আমার কোন কোন গল্প তাঁরা বন্ধু-মিলনে ব্যবহার করে থাকেন। আমি শুনে বড় উল্লাস বোধ করি। কারণ পাণ্ডিত্য বিতরণ করার শক্তি মুর্শিদ আমাকে দেন নি। আমি বিদুর, যা পারি তাই দি। তাঁরা হয়ত বলবেন, এ-গল্পটা সর্বত্র বলা যাবে না। তাই তাঁদের জন্য একটা গার্হস্থ্য সংস্করণ নিবেদন করছি। ইটি অনায়াসে পুত্র-কন্যার হাতে দিতে পারবেন।

ঢাকার কুট্টি গাড়োয়ানের গল্প। কুট্টি বসে আছে ছ্যাকরা কোচবাক্সে। বাবু জামাকাপড় পরে উপর থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামছে। পা গেল হড়কে! বহুতর ধাক্কা আর গোত্তা খেয়ে খেয়ে বাবু গড়িয়ে পেঁছিলেন নীচে। তিন লম্ফে কুট্টি কোচবাক্স থেকে নেমে কর্তাকে কোলে তুলে নিলে। সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দরদ ভরা কণ্ঠে কয়, 'অহো-হো, কত্তার বড় লাগছে। আহা-হা-হা এইহানে লাগছে, এ হে-হে-হে, ওইহানে লাগছে। গা বুলোয় আর আদর করে, আদর করে আর গা বুলোয়। শেষটায় কিন্তু সান্ত্বনা দিয়ে বললে, 'কিন্তু কত্তা আইছেন জল্‌দি।'

জখম-চোটের কথাই শুধু ভাবছ, তাড়াতাড়ি যে এসেছ সেটা দেখছ না। কিন্তু কেরানী আর চাপরাসীদের কী হল?

খয়ের।

চাপরাসীদের মাইনে কোতওয়ালের মত হোক সেই আমার প্রার্থনা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চাপরাসীদের কাছে নিবেদন, কোতওয়ালের মাইনে যেন কমে গিয়ে চাপরাসীদের আজকের মাইনেতে না দাঁড়ায়। আমার ধারণা, সক্কলেরই যেন কোটালের মাইনে হয়—অর্থাৎ আই-জি-র মাইনে হয়। আমি ধনী হব, তুমি ধনী হবে, সবাই ধনী হবে—এই হল সত্যকার প্রার্থনা। ঋষি যখন বিশ্বজনকে আহ্বান করে জানিয়েছেন সকলেই অমৃতের পুত্র তখন ওই সত্যই ঘোষণা করেছেন। পাঁড় কমিউনিস্টও ওই আদর্শের জন্য লড়ে। পেঁতিরা বলে, 'মজদুর ভাইরা শুধু সোনার খাটে বসে রুপোর শানকি থেকে দু হাত ভরে গুড় খাবে

www.BanglaBook.org

এবং আর সবাই রাস্তায় পাথর ভাঙবে।' এটা কোন কাজের কথা নয়। আমাদের পণ, আমরা সবাই রাজা হব।

কিন্তু বেদান্তের এই অতি প্রাচীন সত্যটি পুনরায় জানাবার জন্য আমি এ-প্রবন্ধের অবতারণা করি নি। মূল কথায় ফিরে যাই।

মনে করুন, আপনি দিল্লির কোনও সরকারী দফতরে কাজ করেন। সেখানে গেলে না করেও উপায় নেই ; কেন নেই, সে কথা পরে হবে। বিশ্বাস না হয়, ১৯৪৭ সনের একখানি টেলিফোন ডাইরেক্টরির সঙ্গে ১৯৫৭ সনের খানার তুলনা করে দেখুন, চাকুরের সংখ্যা কত গুণ বেড়েছে। ওখানে একদিন রুটিওলা আন্ডাওলা আর থাকবে না—এই আমার বিশ্বাস।

আপনার চাপরাসী চৈতরাম কিংবা ব্রিজমোহন ৯৫ টাকা মাইনে পায়। কেরানী বোধ হয় ১১৫ টাকা পায়। আমি লেটেস্ট খবর দিতে পারব না—তবে অনুপাতটা মোটামুটি এই। অংকশাস্ত্র এস্থলে বলবে, 'অতএব চাপরাসী কেরানীর চেয়ে বিশ টাকা কম পায়।' ওই করলেন ভুল। শুনুন!

আপনি চৈতরামকে ঘণ্টি বাজিয়ে বললেন, 'যাও ত চৈতরাম, এক পাকিট গোল্ডফ্লেক নিয়ে এস।'

সরকারী আইন অনুসারে চৈতরাম অনায়াসে বলতে পারে, 'আমি যাব না। আমি মাইনে পাই সরকারী কাজের জন্য। আপনার জন্য সিগরেট আনা সরকারী কাজ নয়।' আপনি কিচ্ছু বলতে পারবেন না। বলা উচিতও নয়।

কিন্তু চৈতরাম তা বলবে না। সে ভদ্রলোক। তদ্দণ্ডেই বলবে, 'বহৎ (উচ্চারণ 'বোহৎ') আচ্ছা, হুজুর।' এবং লম্ফ দিয়ে এমন তীরবেগে বেরিয়ে যাবে যে, আপনি মনে মনে শাবাশি দিয়ে বলবেন, 'সোনার চাঁদ ছেলে, কী স্মার্ট!'

এক মিনিটের ভিতর চৈতরাম আপনার টেবিলের উপর প্যাকেটটা রাখবে। সিগরেটের দোকানে আসতে-যেতে পনের মিনিট লাগার কথা। কী করে হল?

চৈতরাম ডাইনের বুক পকেটে রাখে গোল্ডফ্লেক, বাঁয়ের পকেটে ক্যাপস্টান, পাতলুনের পকেটে রেড আন্ড হোয়াইট, মেপোল ইত্যাদি। নিতান্ত কর্কশ ব্যবসায়ী হিসাবে সে পরিচয় দিতে চায় না বলে, বারান্দায় গিয়ে পকেট থেকে প্যাকেটটি বের করে এনেছে। আসলে সিগরেট বিক্রয় চৈতরামের উটকো ব্যবসা। ঠিকমত নোটিস দিলে সে আপনাকে বলকান্ সবরনী সিগরেটও এনে দিতে পারে। ও-মাল সুধমাত্র এম্বেসিগুলোর ক্যান্টিনে পাওয়া যায়।

আইন বলে, সরকারী চাকরির সঙ্গে সঙ্গে অন্য ব্যবসা করতে পারবে না। কিন্তু আপনি যখন পুরনো খবরের কাগজ বিক্রি করলে সরকারি আপনাকে হুড়ো দেয় না, তখন চৈতরামের সিগরেট বিক্রিতে দোষ কি? কিচ্ছু না। আমি তাকে আশীর্বাদ জানাচ্ছি, তার ব্যবসা বাড়ুক।

কিন্তু কেরানী এ-ব্যবসা করতে পারে না। কে কত মাইনে পায়, এ-কথা এখন আর তুলবেন না। সিগরেট বিক্রি করে এখন চৈতরাম কেরানীর মাইনে ছাড়িয়ে গিয়েছে। এই হল আরম্ভ।

প্রায়ই আপনি লক্ষ্য করেন, দশটা থেকেই চৈতরাম টুলের উপর ঢোলে। তার মানে অবশ্য এ নয় যে, ডাকলে তার সাড়া পাবেন না। বরঞ্চ ঘণ্টি বাজার

www.BanglaBook.org

সঙ্গে সঙ্গেই সে দর্শন দেওয়াতে কখনও গাফিলতি করে নি। একদিন আমি তাকে শুধালুম তার ইন্‌সম্‌নিয়া আছে কি না। সে মাথা নিচু করে ঘাড় নেড়ে শুধু জানালে, 'না।' হেড ক্লার্ক ওই সময় আমার ঘরে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর ঠোঁটের কোণে একটুখানি মৃদু হাস্যের রেখা দেখতে পেলুম। পরে তাঁকে শুধালুম, 'ব্যাপারটা কী?'

নাঃ! চৈতরাম প্রতি রাত্রে অভিসারে বেরয় না—যদিও তার যমুনা-পারে বাস এবং পিতৃপিতামহের সাবেক মোকাম বৃন্দাবন এবং মথুরার মাঝখানে। নাঃ! 'বৃন্দাবনকে কুন্‌জ্‌ গলিয়ে শ্যামরিয়া কা দরসন' ইত্যাদি যাবতীয় সমুদায় ব্যাপার সে মায়ের গব্ব থেকেই শুনে আসছে, ও সব রোমান্‌সে তার কোনও চিত্তদৌর্বল্য নেই।

সে করে অতিশয় গদ্যময়ী ব্যবসা। খবরের কাগজ বেচে। সাতটার ভিতর ওই কর্ম শেষ হয়ে যায় বলে সরকারী চাকরির সঙ্গে এতে ওতে কোন দ্বন্দ্ব বাধে না। দুধের ব্যবসাও আটটার ভিতর শেষ হয়ে যায় বলে এককালে তাও করেছে। এখন নাকি ভাবছে, দুটোই কম্বাইন করা যায় কি না। চোর পালিয়ে যাওয়াতে বাবু তম্বি করে দরওয়ানকে পুছেছিলেন, 'চোর ভাগা কিঁউ?' দরওয়ান বললে, 'মেরা এক হাথ মে তলওয়ার, দুসরেমে ঢাল ; পকড়ে কৈসে?' চৈতরাম তাকে ছাড়িয়ে যাবে। তার এক হাথমে দুধ, দুস্‌রেমে পাইপর (পেপর) এবং সঙ্গে সঙ্গে সে নৌকরিকেও পাকড়ে ধরে থাকবে।

এইবারে চিন্তা করুন, চৈতরামের আয় কতখানি বেড়ে গেল। কেরানী বেচারি ত আর সকালবেলা দুধ কিংবা খবরের কাগজ বিক্রি করতে পারে না। সমাজে মুখ দেখাবে কী করে? পারে টুইশানি করতে। কিন্তু সেখানকার কম্পিটিশন কী রকম মারাত্মক, সে কথা আপনারা না জানতে পারেন, আমি বিলক্ষণ জানি—বেকার হওয়ার পরের থেকে এই আট মাস ঘুরে ঘুরে একটাও যোগাড় করতে পারি নি। অধম কুলীন সন্তান—এর চেয়ে অনেক অল্পায়াসে পাঁচটি বিয়ে করতে পারতুম। চারটি আইনত—'হিন্দু কোড-বিল' আমার উপর অর্সায় না।

হেড ক্লার্ক আপনাকে বলবেন, 'স্যর, আপনি যে চাপরাসীদের য়ুনিফর্মের জন্য দরদ নিয়ে পার্সনাল ইনট্রেস্ট নেন, সে বড় ভাল কথা। কিন্তু স্যর, এদের য়ুনিফর্ম ছেঁড়ে সরকারী ফাইল এ-ঘর থেকে ও-ঘর নিয়ে যাবার সময় নয়, ছেঁড়ে বাইসিকলের সেডলে বসে দুধ বিক্রি করার ফলে। চাপরাসীদের পাতলুন দেখে বলে দেওয়া যায়, সকাল বেলা কে কোন্ ব্যবসা করে।'

ভুলে গিয়েছিলুম, য়ুনিফর্মের সাফসুতরায়ের জন্য চৈতরাম সরকারের কাছ থেকে 'ওয়াশিং অ্যালাওয়েন্‌স্‌' পায়। অবশ্য ক্যাসুয়েল লীভ নিলে সেদিনের জন্য অ্যালাওয়েন্‌স্‌টি কাটা যায়। অ্যাকাউণ্ট্যান্টের অর্ধেক সময় যায় পাঁচ টাকাকে একত্রিশ ভাগ করে দুই কিংবা তিন দিয়ে গুণ করার খেজালতী কর্মে—আপনাদের মোটা মাইনের হিসেব রাখতে নয়। এই 'ওয়াশিং অ্যালাওয়েন্‌স্‌ শীটখানা ঠিকমত টানতে পারেন কটি ঝানু অ্যাকাউণ্টেণ্ট, তাই নিয়ে বিরাট বিরাট আলোচনা হয়ে গিয়েছে। একবার এক আনা, তিন কড়া, দুই ক্রান্তির গোলমালে আপিসসুদ্ধ সবাই অডিটার-জেনারেলের কাছে কী হুড়োটাই না খেয়েছিলুম! শনিবার হাফ ডে—অ্যাকাউণ্টেণ্ট হাফ ওয়াশিং

www.BanglaBook.org

চার্জ কেটেছিলেন বলে। কাগজের সম্পাদক যখন তাঁর স্তম্ভে বলেন, সরকারী পয়সার প্রতি আমাদের দরদ নেই তখন আমাদের প্রতি বড় অবিচার করেন। অবশ্য 'দামোদরে' কত লক্ষ টাকা কোন্ দিকে ভেসে যায়, সে-কথা আমি বলতে পারব না, তবে এ-কথা আল্লার কসম খেয়ে বলব, বেহেস্তের দোহাই দিয়ে বলব, 'তাঁবা-তুলসী-গঙ্গাজল' স্পর্শ করে বলব, সরকারী নোকরি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার পরও এই 'ওয়াশিং শীটে'র দুঃস্বপ্ন দেখে এখনও মাঝে মাঝে ঘুম থেকে এক গা ঘেমে জেগে উঠি। গিন্নি জানেন। বুকে হাত বোলান আর গুরুদত্ত 'ওয়াশিং-ওচাটন' আওড়ান।

কেরানী ওয়াশিং অ্যালাওয়েন্স্ পায় না। য়ুনিফর্ম যখন নেই তখন ওয়াশিং অ্যালাওয়েন্স্ হয় কী প্রকারে? শিশুবোধ ব্যাকরণ। অথচ তাকে ঠাট বজায় রেখে দফতরে আসতে হয়। বুশ শার্ট ইস্ত্রি না করা থাকলে বছরের শেষে তার কনফিডেনশিয়েল রিপোর্টে লিখি, 'শ্যাবি।' আপনি হয়তো বলবেন, 'ওই ওয়াশিং অ্যালাওয়েন্স্ আর ক'পয়সা?' বটে! ছ পয়সা হোক আর ছ গণ্ডাই হোক—দেখুন না একবার রাস্তায় নেমে, ছ পয়সা কামাতে কতক্ষণ লাগে।

ওই যা-যা। ভুলে গিয়েছিলুম, বর্ষাকাল এসেছে—চৈতরাম বর্ষার ছাতা আর বর্ষাতি পায়। মহামূল্যবান সরকারী সব ফাইল এ-দফতর থেকে ও দফতরে নিয়ে যাবার সময় যদি ভিজে যায় তবেই ত চিত্তির—একদম অক্ষরার্থে।

কিন্তু কেরানী পায় না। যদিও সরকারী কাজেই তাকে এ-দফতর ও দফতর করতে হয়—বগলে ফাইলও থাকে। কেরানীরা সচরাচর চাপরাসীর ছাতা ধার চায়।

একবার এক কেরানী ছাতাখানা হারিয়ে ফেলে। চাপরাসী বলে, 'ছাতা কিনে দাও।' সরকারী ফাইল বাঁচাবার প্রেমে নয়, দুধ বাঁচাবার জন্য। কেরানী বলে, 'সরকারী কাজে খোওয়া গিয়েছে, ওটা "রাইট অফ্" হবে।' দুধের স্মরণে নাকি উপদেশ দিয়েছিল, 'তা বেরবার সময় দুধে জল দিস্ নি, বৃষ্টির জলে ওটা পুষিয়ে নিস।' শেষটায় কী হয়েছিল, জানি নে। সি. সি. বিশ্বাস বলতে পারবেন! তখন আইন-মন্ত্রী ছিলেন তিনি!

চৈতরাম শীতকালে কম্বল পায়। কেরানী পায় না। তার চামড়া বোধ করি গণ্ডার ব্র্যান্ড। সদাশয় সরকার বলতে পারবেন।

চৈতরাম কোয়ার্টারও পায়। একখানা ঘর। এক ফালি বারান্দা। এক ডুমো উঠোন। ঘরখানা সে একজন রেফুজীকে পঁচিশ টাকায় ভাড়া দিয়ে তার প্রাণ বাঁচিয়েছে। সে চৈতরামের কাছে চিরকৃতজ্ঞ ও তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। চৈতরাম বারান্দায় শোয়, মাঝে-মধ্যে ওদের সঙ্গে নাশতা খেবরায় খায়-টায়। চৈতরাম দুখানা ঘর পেলে বড় ভাল হত। একখানাতে সে মাথা গুঁজতে পারত বলে? উঁহু। দুখানাই ভাড়া দিতে পারত বলে। তাই চণ্ডীগড়ের নূতন ক্যাপিটালে তারা দুখানা ঘরের জন্য আবেদন-নিবেদন চালিয়েছে। আমি সেই আবেদনে সানন্দে স্বাক্ষর নিয়েছি।

কোয়ার্টার কেরানীও পায়—যাদের সত্যকার মুরুব্বীর জোর আছে। কিন্তু সেটা ভাড়া দিয়ে থাকবে কোথায়? বারান্দায়? মুশকিল।

এই তো গেল মোটামুটি জরিপ। তার ওপর পুজো-আর্চায় বখশিশটা

www.BanglaBook.org

আসাটা : কোন জিনিস বড় সাহেবের জন্য কিনে আনলে তিনি কি আর চেঞ্জটা সব সময় ফেরত চান? কেরানী এসব রসে বঞ্চিত।

এই কাঁড়া কাঁড়া টাকা নিয়ে চৈতরাম করে কী?

ওই জানলেই ত পাগল সারে।

কেরানীদের সঙ্গে লগ্নির ব্যবসা করে। এটা সবিস্তার বর্ণনা করতে আমার বাধো-বাধো ঠেকছে। তবে এইটুকু বলতে পারি, কেরানীরা অসন্তুষ্ট নয়। এবং আপনি খুশী, মাসের পয়লা তারিখে কাবুলীওয়ালাদের দফতরের আনাচে-কানাচে ঘোরার কটু দৃশ্য দেখতে হয় না বলে। চাপরাসী ওদের ঠেকিয়ে রেখেছে!

জনৈক বন্ধু গল্পটি বলেছেন—

আহাম্মুখ জামাই শ্বশুরকে শোধাচ্ছে, 'সসুরমশাই, সসুরমশাই, আপনার বিয়ে হয়েছে?'

'হ্যাঁ।' (মনে মনে, 'ব্যাটা না হলে তুই বউ পেলি কোত্থেকে?')

'কার সঙ্গে, সসুরমশাই?'

রাগত কণ্ঠে, 'তোমার শাশুড়ীর সঙ্গে।'

জামাই, গদগদ কণ্ঠে, 'আহাহা, ভালই হয়েছে, ভালই হয়েছে, ঘরে ঘরে বিয়ে হয়েছে।'

দফতরের ভিতর আপোসে এই ব্যবস্থা আপনারও পছন্দসই হওয়ার কথা। চিন্তা করে দেখুন।

* * *

শুনেছি, একদম টপে উঠলে, অর্থাৎ মন্ত্রী-টন্ত্রী হয়ে গেলে নাকি অনেক রকম সুখ-সুবিধা আছে। অবশ্য চাপরাসীদের মত টায় টায় এ রকম নয়! তবে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। কোনও বিশেষজ্ঞ যদি সেটা বাতলে দেন তবে ঠিক আন্দাজ করতে পারব, দশ পার্সেন্ট উচ্ছুগ্‌গো করাতে তারা কী পরিমাণ আত্মোৎসর্গ করেছেন।

চিল্কা

সন্ধ্যাবেলা গোলাপের কুঁড়িটির দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলুম। প্রকৃতি যেন যুগ যুগ ধরে কোটি কোটি কুঁড়ি তৈরী করার পর আজ এ-কুঁড়িতে তার পরিপূর্ণতা পেয়েছে।

সকালবেলা বাগানে গিয়ে দেখি, সে-কুঁড়িটি ফুটেছে। কুঁড়ির ভিতরে প্রকৃতি গোপনে গোপনে পাপড়ির যে নিখুঁত সামঞ্জস্য সাজিয়ে রেখেছিল সেই সামঞ্জস্য নিয়েই পাপড়িগুলো বাতাসের গায়ে শরীর মেলে দিয়েছে। রেণু যেন রাজকুমারী, আর চতুর্দিকে সার বেঁধে তাঁর সখীরা এক নিস্তব্ধ নৃত্য আরম্ভ করে দিয়েছেন।

চুপ করে দেখতে দেখতে আমার মনে হল, সন্ধ্যেবেলার কুঁড়িতে দেখেছিলুম এক সৌন্দর্য আর সকালবেলাকার ফোটা-ফুলে দেখছি আরেক সৌন্দর্য। এই পরিবর্তনটি যদি আমার চোখের সামনে ঘটত তবে এই দুই সৌন্দর্যের ভিতর আরও সৌন্দর্য দেখতে পেতুম। কিন্তু সে ত হবার নয়। ফুল ফোটে

www.BanglaBook.org

এত ধীরে ধীরে যে তার বিকাশ আর পরিবর্তন ত চোখে পড়ে না। সমস্ত রাত কুঁড়ির কাছে জেগে রইলেও সৌন্দর্যের ক্রমবিকাশে তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ আমার চোখ এড়িয়ে যাবে।

ভগবান আমার সে-ক্ষোভ চিল্কার পারে ঘুচিয়ে দিলেন।

অতি ভোরে চিল্কার সার্কিট হাউসে ঘুম ভাঙল, বারান্দায় কাচ্চাবাচ্চাদের কিচির কিচির শুনে। লাগুল-আশ্রমের ছেলেমেয়েগুলো তা হলে নিশ্চয়ই দুপুর রাতে এসে পৌঁছেছে।

দরজা খুলে পুব আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, আমার বাগানের সেই গোলাপকুঁড়ি। শুধু এ-কুঁড়ির রঙ একটু বেশী লালচে। আমার আর পূর্ব আকাশের মাঝখানে বিস্তীর্ণ জলরাশির উপর এক ফালি সিঁথির সিঁদুর। কিংবা যেন কোন রক্তাম্বরধারিণী গরবিনী চিল্কার উপর দিয়ে পুব সাগরের পানে যেতে যেতে রক্তাম্বরী নিংড়ে নিংড়ে জল ফেলে ফেলে আমার ওই কুঁড়ির পিছনে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন।

সুন্দরীর কথা ভুলে গিয়ে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলুম কুঁড়ির দিকে। সে কুঁড়ি ফুটতে আরম্ভ করেছে। শুধু এর পাপড়ির আকার অন্য রকমের। সোজা, ধারালো তলোয়ারের মত এক একটি সূর্যরশ্মি দিগ্বলয়ের অন্তরাল থেকে হঠাৎ পূর্ব গগন পানে ধেয়ে ওঠে। অসংখ্য রশ্মি অর্ধচক্রাকারে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। তাদের কেন্দ্র—ঘুমন্ত রাজকুমারীর এখনও দেখা নেই। আকাশের লাল ক্রমেই কমে আসতে লাগল। চিল্কার রাঙা জলের ফালি গোলাপী হয়ে হয়ে শেষটায় নীলাম্বরী পরতে আরম্ভ করেছে।

চতুর্দিকে আর সব কিছু পাণ্ডুর, যেন হিমানীর গ্লানি মাখা।

সবিতা স্বপ্রকাশ হলেন। আলোতে আলোতে হিমানীর সর্ব-গ্লানি ঘুচে যাচ্ছে। পুব আকাশের দিকে ধেয়ে-ওঠা সূর্য-অসিরাজি সবিতা সংহরণ করে নিয়েছেন। জাদুকর তার ভানুমতীর ইন্দ্রজাল অদৃশ্য করে পূর্ণ মহিমায় রঙ্গ-মঞ্চে একা দাঁড়িয়ে রইলেন।

আমারই চোখের সামনে আমার বাগানের গোলাপের কুঁড়িটি ফুটে উঠল। এর সম্পূর্ণ ফোটাটি আমি প্রাণভরে দেখলুম। এর কিছুই ফাঁকি গেল না। কিন্তু এ-ফোটা গোলাপের ফোটার চেয়ে কত লক্ষ গুণে গম্ভীর। এর ব্যাপ্তি বিশ্বচরাচর ছড়িয়ে এবং হয়ত ছাড়িয়ে।

আমার মনে আর কোন ক্ষোভ রইল না।

আলো ফুটেছে, কিন্তু জলে বাতাসে, ডাঙায় আকাশে এখনও যেন কী এক আবেশ জড়ানো। চিল্কার জল কেমন যেন একটা নীলুফর রঙ মেখে নিয়েছে। এ-রঙ সমুদ্রের জল চেনে না, দেশের বিলে; বিদেশের রু ড্যানিয়ুবেও নীলের এ-আভাস আমি কখনও দেখি নি। তবে কি চিল্কা একদিকে যেমন হ্রদ, অন্যদিকে তেমনি সমুদ্রের সঙ্গে জোড়া বলে সাদায় আর নীলে মিশে গিয়ে নীলুফর রঙ ধরেছে? তাই হবে। বর্ষায় নাকি নদীর অপরিমিত জল হ্রদে নেমে এসে তার লোনা জলকে মিঠা করে দেয়। শীতে নাকি সমুদ্রের জোয়ারের মারে জল ফের লোনা হয়ে যায়।

নীলুফরির মাঝখানে ওই বিরাট কালো পোঁচ কিসের? মন্দমধুর ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে বলে সে-পোঁচ আবার অল্প অল্প দুলছে। স্টীমলঞ্চ ক্রমেই

www.BanglaBook.org

কালো পোঁচের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ দেখি সেই কালো ফালিটা জল ছেড়ে আকাশের দিকে হাওয়ায় ভর করে উড়ে চলল—লক্ষ লক্ষ পাখি। এরা নাকি এসেছে সাইবেরিয়া থেকে, হিমালয় থেকে। ঠিকই ত ; এদেরই ত আমি দেখেছি খাসিয়া পাহাড়ের পায়ের কাছে, ডাউকির হাওরে হাওরে, চেরাপুঞ্জির জলে ভর্তি বিলে বিলে।

চিল্কার সমস্ত সৌন্দর্য এক মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে গেল। হৃৎপিণ্ডটা কে যেন শক্ত হাতে মুচড়ে দিল, বুক থেকে কী যেন একটা উঠে এসে গলাটাকে বন্ধ করে দিল। আর যেন ঢোক গিলতে পারছি নে।

মাথার উপরকার সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলে শুভ্র মল্লিকার পাপড়ি ছড়ালে কে? পাপড়িগুলো অতি ধীরে ধীরে কেঁপে কেঁপে, এদিক ওদিক হয়ে হয়ে জলের দিকে নেমে আসছে। বিলেতের বরফ-বর্ষণ এর কাছে হার মানে।

এ ত সেই পাখিগুলোর বুক। এদের পিঠের রঙ কালো। তাই তারা যখন জলে বসে থাকে তখন মনে হয়, এরা হ্রদের নীল চোখের কৃষ্ণাঞ্জন, আর আকাশ থেকে যখন নেমে আসে তখন উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি সিত-মল্লিকা-বর্ষণ।

পাশে ভাগ্নী কৃষ্ণা বসে ছিল। বললে, 'মামা, ওই দেখ, চিল্কার দেবী কালী-মার দ্বীপ। ওখানে জল নেই, ঘাস নেই, তোমার টাকের মত সব কিছু খা-খা করছে।'

টাকের কথা ওঠাতে বিরক্ত হয়ে দ্বীপের দিকে না তাকিয়ে তাকালুম রোষ-কষায়িত লোচনে কৃষ্ণার চোখের দিকে। সেখানে দেখি চিল্কার মাধুরী। কৃষ্ণার চোখের সাদা যেন সাদা হতে হতে নীলুফরি হয়ে গিয়েছে আর তার গায়ের কালো রঙ দিয়ে চোখের চতুর্দিকে স্বয়ং বিশ্বকর্মা এঁকে দিয়েছেন কৃষ্ণাঞ্জন।

ভগবান একই সৌন্দর্য কত না ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখান! শিশুর খলখলে হাসি আমি শুনেছি নির্ঝরিণীর কলকল রোলে, বিগলিত মাতৃস্তন্য দেখেছি আরবের মরুভূমির বুক ফেটে বেরিয়ে আসা, সুধারসে, নবজাত শিশুর গাত্র-গন্ধে পেয়েছি প্রথম আষাঢ়ের ভিজে মাটির গন্ধ।

রসময় পাঠক, এইবারে আমি তোমার একটু করুণা ভিক্ষা করি। আমি কাব্যরস ভিন্ন অন্য আরও দু-একটি রসের সন্ধান করি। তারই একটি খাদ্য-রস। চিল্কার এ-পাখির রস আমি চেখেছি দেশে। আবার লোভ হল। সঙ্গে ছিল স-বন্দুক পারিকুদের রাজা। তার এবং তার বন্দুকের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালুম। সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে চিল্কার কালীকে স্মরণ করে বললুম, 'গোটা পাঁচেক পাখি দাও না, মা! তারপর ভাবলুম, না, অত বেশী চাওয়া-চাওয়ি ভাল নয়, দেবীকে দেখাতে হবে, আমি কত অল্পতেই সন্তুষ্ট হই। মনে মনে বললুম, 'আচ্ছা, না হয়, পাঁচটা না-ই বা দিলে। গোটা দুত্তিন দিলেই হবে। আমার খাঁই মাইজী বড্ডই কম।'

বলেই একটা ইরানী গল্প মনে পড়ে যাওয়াতে হাসি পেল। এক ইরানী দরবেশ ভগবানকে উদ্দেশ করে বললে, 'হে আল্লাতালা, আমাকে হাজার পঁচিশেক তুমান দাও। আমি তোমার কিরে কেটে বলছি, তার থেকে পাঁচ হাজার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তুমান গরিব-দুঃখীদের ভিতর দান-খয়রাত করে বিলোব। আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না? আচ্ছা, তা হলে তোমার পাঁচ হাজার তুমান কেটে নিয়ে আমাকে বিশ হাজারই দাও।'

চিল্কা হ্রদ বিস্তর ছোট ছোট দ্বীপে ভর্তি। মাত্র একটি ছাড়া নাকি সব কটাতেই মিষ্টি জল পাওয়া যায়। এসব দ্বীপে থাকে গরিব জেলেরা। ডাঙার সঙ্গে এদের কোন যোগসূত্র নেই। এদের পোস্ট অফিস নেই, টেলিগ্রাফের তার ডাঙার সঙ্গে দ্বীপের মানুষকে কাছাকাছি এনে দেয় নি। আর আপন দ্বীপের বাইরে বিশ্বসংসারের কাকেই বা এরা চেনে যে ওরা এদের টেলিগ্রাম পাঠাবে, ওরা এদের কুশল সংবাদ জানতে চাইবে।

আমি ভাবলুম, আমার দেশে নাগা-গারোরা পর্যন্ত মাঝে মাঝে পাহাড় থেকে নেমে, পায়ে হেঁটে কিংবা বাসে করে যায়। এটা সেটা দেখে ফুটপাতের দোকানে বসে চা খায়, সিনেমা যায়, কেনাকাটাও করে। এই উড়িষ্যারই আদি-বাসীরা মাঝে মাঝে বন থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের বাড়িঘরদোর দেখে, হয়ত মনে মনে সংকল্প করে, বনের ভিতরই ওদের জীবনকে আরও সমৃদ্ধ করবে। কিন্তু চিল্কার দ্বীপবাসীরা সৃষ্টির সেই আদিমকাল থেকেই দ্বীপবাসী। আজ যে-সব জিনিসপত্র দিয়ে তারা মাছ ধরে, দুহাজার বৎসর পূর্বেও তাই দিয়ে তারা মাছ ধরেছে। সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি, বিজ্ঞানের প্রসার এদের কোনও কাজে লাগে নি।

হয়ত ভালই আছে। ফার্সীতে বলে, 'দূর বাশ্, খুশ বাশ্।' দূরে আছে ; ভালই আছে। টমাস কেম্পিসও বলেছেন, 'যতবার আমি মানবসমাজে গিয়েছি ততবারই আমি খানিকটে মনুষ্যত্ব হারিয়ে বাড়ি ফিরেছি।' হয়ত 'সভ্যতা'র আওতায় না এসে এরা সত্যই সভ্যতর।

চিল্কার বড় দ্বীপ পারিকুদ। ডাঙা থেকে মাইল আষ্টেক দূরে হবে। দ্বীপে নেমে খানিকক্ষণ চলার পর মনে হল, কোথায় চিল্কা, কোথায় তার নীলু-ফরি জল, কোথায় দূর-দূরান্তের সিন্ধুরেখা আর কোথায়ই বা কৃষ্ণপক্ষ পক্ষীর শুভ্র বক্ষের মল্লিকা বর্ষণ। এ ত দেখছি, পূব-বাংলার পাড়া-গাঁ। রাস্তার উপর সাদা ধুলো। দু দিকে রাস্তার জন্য মাটি তোলার ফলে লাইন বেঁধে ডোবার সারি। তাতে ফুটেছে ছোট ছোট শ্বেতপদ্ম রক্তপদ্ম। মাছরাঙা ওড়াওড়ি করছে আর মাঝে মাঝে এক পায়ে দাঁড়িয়ে ধ্যানমগ্ন বক। মোষগুলো গলা অবধি ডুবিয়ে চোখ বন্ধ করে ধীরে গম্ভীরে মাথা নাড়ছে। শুধু পূব-বাংলার জমির মত এ-জমি উর্বরা নয় ; তাই ক্ষেত-খামারের চিহ্ন কম।

রোদ চড়ছে। দূর গ্রামের শ্যামশ্রীর দিকে তাকিয়ে চোখ জুড়য়। ওই-খানে পৌঁছতে পারলে হয়। শহরের লোক ; এতখানি হেঁটে অভ্যেস নেই। ক্লান্তি বোধ হচ্ছে।

সঙ্গে পারিকুদের রাজা। রাজবাড়িতে এসেছি দু দণ্ড জিরিয়ে নিলুম। সেখানে বিরাট বিরাট কৌচ সোফা, দশ-হাতী খাড়া আয়না, জগদ্দল কাবার্ড আলমারি, সোনার সিংহাসন, মার্বেল-টপ টেবিল, বাথ-টাব, ঝাড়-ফানুস, আরও কত কী! এসব ওই গরিব জেলেদের পয়সায়? অবিশ্বাস্য।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কলকাতা থেকে ট্রেনে এসেছে চিল্কার পার অবধি। তারপর কত চেল্লা-চেল্লি হৈ-হুল্লোড়ের ভিতর এগুলোকে নৌকায় চাপানো হয়েছে, নাবাতে হয়েছে, কত লোক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এগুলোকে রাজবাড়ি পর্যন্ত কাঁধে করে বয়ে এনেছে, পড়ি-মরি হয়ে উপরের তলায় তুলেছে।

শুধু রাজপরিবার এগুলো ব্যবহার করেন। রাজপরিবার বলতে উপস্থিত রাজা আর রাণী। আর আজ সকালের মত আমরা।

সূর্য মধ্যগগনে। লঞ্চ পূর্বদিকে সমুদ্রের পানে ধাওয়া করেছে, যেখানে হ্রদের সঙ্গে সমুদ্রের সঙ্গম।

পূর্বদিগন্তে যেখানে সমুদ্র আর হ্রদ আকাশের সঙ্গে মিশেছে সে-জায়গা ঝাপসা হয়ে আছে। মনে হয়, হ্রদ দূরে যেতে যেতে হঠাৎ যেন কোথাও অসীম শূন্যে লীন হয়ে গিয়েছে। গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে গরমের দেশের দগ্ধতাম্র দিগন্তে যে আস্বচ্ছ ছায়ানৃত্য আরম্ভ হয়, এখানে যেন তারই এক অন্যরূপ। এখানে যেন অশরীরী বাষ্প-নৃত্য আরম্ভ হয়েছে আর তারই আড়ালে হ্রদের শেষ, সমুদ্রের আরম্ভ, সমুদ্রবক্ষে আকাশের চুম্বনে সব কিছু ঢাকা পড়ে গিয়েছে।

তাই পশ্চিমমুখো হয়ে বসলুম ডাঙার দিকে তাকিয়ে।

পাখিরা সব গেল কোথায়? শুধু দু-একটি ঝাঁক হেথা হোথায়! বোধ হয় ঠাণ্ডা দেশের প্রাণী বলে দ্বীপের গাছতলার ঠাণ্ডাতে আশ্রয় নিয়েছে।

কত রকমের নীল রঙ দেখছি।

হ্রদের জল দুপুর-রোদে অতি হাল্কা ফিকে নীল হয়ে গিয়েছে। হ্রদের পরে পাড়ের গ্রামের রঙ এমনিতে ঘন সবুজ কিন্তু এখন দেখাচ্ছে হ্রদের জলের চেয়ে একটুখানি ঘনতর নীল: গ্রামের পিছনে পাহাড়, তার রঙ আরও একটু বেশী ঘন নীল। এবং সর্বশেষে পাহাড়ের পিছনের আকাশ ঘোর নীল।

এ কী করে সম্ভব হয় জানি নে। গ্রামের গাছপালা, পাহাড়ের ঝোপ-ঝাড় হয় সবুজ রঙের কিন্তু আজ এরা নীলের ছোপ মেখে নিল কী করে? তবে কি আমার আর পাড়ের মাঝখানে দীর্ঘ নীল বিস্তৃতি আমার চোখদুটিকে নীলাঞ্জন --কিংবা নীল চমশা পরিয়ে দিয়েছে যে আমি সব কিছুই নীল দেখছি?

মেজিশিয়ানরা দেখেছি মাথার উপরে হাত তুলে এক প্যাক তাস ছেড়ে দেয় আর আলগা আলগা তাসগুলো জুড়ে গিয়ে ভাঁজে ভাঁজে নেমে আসে। এখানে যেন আকাশের অন্তরাল থেকে কোন এক জাদুকর আকাশ, পাহাড়, বন, জল, এই হরতন, চিরিতন, রুহিতন, ইশকাপনের চারখানা তাস জুড়ে দিয়ে ভাঁজে ভাঁজে লটকে দিয়েছেন। কিন্তু এ-ওস্তাদ লাল-কালোর দু-রঙা না নিয়ে, মেলাই তসবির না এঁকে, এক নীলের ভিন্ন ভিন্ন আভাস দিয়ে অপূর্ব এক ভেল্‌কি-বাজি দেখাচ্ছেন।

হ্রদের বুকে হাওয়া এতটুকু আঁচড় কাটে নি--একেবারে সম্পূর্ণ নিখিরকিচ। শুধু আমাদের লঞ্চ যেন চিরুনির মত ইন্দ্রপুরীর কোন এক রমণীর দীর্ঘ বিন্যস্ত নীলকুন্তলে সিঁথি কেটে কেটে সমুদ্র-সীমান্তের দিকে এগিয়ে চলেছে। সিঁথির দু দিকে চূর্ণ কুন্তলের ফেনা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে কিন্তু এ গরবিনীর কুন্তলদাম এমনই বিপুল যে চিরুনি বেশীদূর এগতে-না এগতেই দেখতে পাই,

www.BanglaBook.org

দু দিকের ঘন কুন্তল সিঁথিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

চতুর্দিকে অসীম শান্তি পরিব্যাপ্ত। শুধু লঞ্চের মোটরটার একটানা শব্দ কর্ণে পীড়া দেয়। সান্ত্বনা শুধু এইটুকু, এই নীলিমার সৌন্দর্য-মাধুরীতে ডুব দিলে কানে এসে মোটরের শব্দ পৌঁছয় না।

যোগশাস্ত্রে পতঞ্জলি চিত্তবৃত্তি-নিরোধের অনেক পন্থার নির্দেশ দিয়েছেন। এটা দিলেন না কেন?

এবারে সূর্যাস্ত। পশ্চিমের আকাশ হয়ে গিয়েছে টুকটুকে লাল। আকাশ যেন প্রথমটায় তাঁর নীল কপালের সিঁথিতে এক ফালি সিঁদুর মেখেছিলেন, তারপর তার খোকা কচি হাতের এলোপাতাড়ি থাবড়া দিয়ে এখানে-ওখানে খাবলা-খাবলা সিঁদুর লাগিয়ে দিয়েছে! মা শেষটায় সমস্ত মাথায় সিঁদুর মেখে নিয়েছেন।

নীলে লালে মিশে গিয়ে বেগুনী হয়? তাই বোধ হয়। হ্রদের জলে বেগুনী হয়ে গিয়েছে।

আজকের সূর্যাস্ত বড় অল্প সময়েই শেষ হয়ে গেল। আকাশে মেঘ থাকলে তারা সূর্যাস্তের লালিমা খানিকটে শুষে নেয় এবং সূর্য পাহাড়ের আড়ালে চলে যাওয়ার পরও মহফিল-শেষের তানপুরোর রেশের মত খানিকক্ষণ আকাশ বাতাস জলস্থল রাঙিয়ে রাখে।

দিল্লির কবি গালিব সাহেব এই 'শেষ রেশটুকু'র উপর হাড়ে হাড়ে চটা ছিলেন। তাঁর দুরবস্থা তখন চরমে। বাড়িখানা ঝুরঝুরে। এক বন্ধুকে চিঠি লিখেছিলেন, 'অগর পানী বরস্তা এক ঘণ্টা, তো ছৎ বরসতী দো ঘণ্টে—'জল যদি বর্ষে এক ঘণ্টা ত ছাত বর্ষে দু ঘণ্টা!'

দু-এক ঝাঁক পাখি এখানে ওখানে। পারিকুদের রাজাকে বললুম, 'দু-একটা মার না।'

রাজার রাজকীয় চাল। পাখি দেখলে চাকরকে ধীরেসুস্থে বলেন: 'বন্দুকো।' চাকর রাজার রাজা! তার চাল আরও ভারিক্কি। আরও ধীরে সুস্থে কেস খুলে বন্দুক এগিয়ে দেয়। রাজা গদাইলস্করী চালে 'বন্দুকো' জোড়া লাগিয়ে বলেন, 'কার্তুজো।' ক-রে, ক-রে সব যখন তৈরী তখন পাখিরা সাইবেরিয়ায় চলে গিয়েছে। তবে কি রাজার তাগ খারাপ?

তবু ভদ্রতার খাতিরে দু-একটা গুলি ছুঁড়লেন। ফলং শূন্যং।

আমার একটা গল্প মনে পড়ে গেল।

বড়লাট গেছেন বরোদায় পাখি শিকারে। আমাদের ওস্তাদ শিকারী রহমৎ মিয়া গেছেন সঙ্গে। সন্ধ্যায় যখন ওস্তাদ বাড়ি ফিরলেন তখন বাচ্চা শিকারীরা উদ্‌গ্রীব হয়ে শুধালে, বড়লাট সায়েবের তাগ কী রকম? ওস্তাদ প্রথমটায় রা কাড়েন না। শেষটায় চাপে পড়ে বললেন, 'বড়লাটের মত শিকারী হয় না, আশ্চর্য তাঁর তাগ। কিন্তু আজ খুদাতালা পাখিদের প্রতি সদয় (মেহেরবান) ছিলেন।'

পূর্ব পশ্চিমে যেন দেখন-হাসি, ইলেকট্রিসিটিতে খবর পাঠাল, না বয়স্কাউটের নিশানে নিশানে কথাবার্তা। পশ্চিমের লালের ইশারায় পুব লাল হয়। সেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লাল ফিকে হচ্ছে—কী গোপন কায়দায় তার খবর পূর্বে পৌঁছচ্ছে? মাঝের বিস্তীর্ণ আকাশ ত ফিকে, কোনও রঙ নেই, ফেরফার নেই। কী করে এর হাসি ওর গায়ে গিয়ে লাগে, এর বেদনা ওর বুকের সাড়ায় প্রকাশ পায়?

আধা আলো-অন্ধকারে সাতপাড়া দ্বীপে নামলুম। আম-বাগানের ভিতর ছোট একটি ডাক-বাংলো। লাঙ্গুল-আশ্রমের কাচ্চাবাচ্চারা কিচিমিচির করছে। খানিক পরে চিল্কা হ্রদের তাজা মাছ-ভাজার গন্ধ নাকে এল। সর্বাঙ্গে ক্লান্তি, কখন খেলুম, কখন ঘুমিয়ে পড়লুম, কিচ্ছু মনে নেই।

শেষ রাত্রে ঘুম ভাঙল। দেখি আমার অজানতে বাতিওলারা এসে আসমানের ফরাশে এখানে ওখানে তারার মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখে গিয়েছে। এবারে শেষ রাত্রের মুশায়েরা বসবে। আম গাছ মাথা দোলাবে, ঝিঁঝি নূপুর বাজাবে, পূবের বাতাস মজলিসের সর্বাঙ্গে গোলাপ-জল ছিটিয়ে ঠাণ্ডা করে যাবে।

তারপর দেখি দূর সাগরের ওপারে লাল মদের ভাঁড় থেকে চাঁদ উঠলেন ধীরে ধীরে, গা টেনে টেনে। সকলের মুখে হাসি ফুটল। অন্ধকার আকাশে যে সব মোসাহেবরা গা-ঢাকা দিয়েছিলেন তাঁদেরও চেনা গেল। ছোট বাচ্চা যেমন মুশায়েরার মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়ে, আমি আবার তেমন ঘুমিয়ে পড়লুম।

ভোর হল। আজ আমার ছুটি শেষ। আপিসের কথা মনে পড়তেই সর্বাঙ্গ হিম হয়ে গেল। লণ্ডে উঠে পাড়ের পানে রওয়ানা দিলুম। সে সকালেও অনেক নবীন সৌন্দর্য দেখা দিয়েছিল কিন্তু আপিসের জুজু আমার পঞ্চেন্দ্রিয় অসাড় করে দিয়েছে। যেন ডুব-সাঁতার দিয়ে ডাঙায় পৌঁছে, আপিস আর অদৃষ্টকে অভিসম্পাত দিতে দিতে কটক এলুম।

বাঙালী

এই যে কলকাতা। জয় মা গঙ্গা!

আর যেন মা তোমায় কুলত্যাগ করে ভিন-দেশে যেতে না হয়।

আহা, মাইকেল কি কবিতাই না রচেছিলেন—

'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়।
তাই ভাবি মনে—'

কিন্তু আশাকে আমি দোষ দিই নে। আশাকে তখনই দোষ দেওয়া যায়, যখন মানুষ হেথাকার শান্তি-সুখ বর্জন করে হোথাকার খ্যাতি-প্রতিপত্তির জন্য ছোটে। কিন্তু বঙ্গসন্তান মাত্রই কলকাতা ছাড়ে পেটের দায়ে। হেথায় অন্ন জুটছে না বলেই সে হোথাপানে ধেয়ে যায়—হায়, তার জীবনে স্বাধীনতা কোথায়? 'তার জীবন' কথাটিই ভুল। তা না হলে আজ ঢাকার পয়সাওলা ছেলে কলকাতার রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করছে কেন, কলকাতার বাচ্চাই বা দিল্লির এর দোরে ওর দোরে হানা দিচ্ছে কেন? তার জীবন ত এখন দৈন্যের জীবন, দু মুঠো অন্নের কাছে গচ্ছিত, এক টুকরো কাপড়ের কাছে বেচে দেওয়া।

কিন্তু থাক এসব অপ্রিয় আলোচনা। আপনাদের ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে

www.BanglaBook.org

এসেছে, আপনারা শাঁক বাজান আর না-ই বাজান 'মম চিত্ত মাঝে' ঘন ঘন শাঁখ বাজছে।

বড্ড ব্যক্তিগত হয়ে যাচ্ছে—না? তবে কিনা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, যার জন্মদিন, তা সে পাঁচ বছরের ছেলেই হোক সেদিন সে রাজা। তার চতুর্দিকে সেদিন পরব জমে ওঠে, তাকেই সবাই কথা কইতে দেয়। আজ কলকাতায় আমার পুনরায় নবজন্মদিনে আমার সহৃদয় পাঠকরা আমার ভ্যাচর ভ্যাচর কিঞ্চিৎ বরদাস্ত করে নেবেন বইকি। শাস্ত্রেও তার ব্যবস্থা আছে। আমি স্মার্ত নই, তাই আবছা-আবছা মনে পড়ছে, কেউ যদি চৌদ্দ বৎসর (কিংবা সাতও হতে পারে) নিরুদ্দেশ থাকে, তবে তার শ্রাদ্ধ করতে হয়, কিন্তু তারপর যদি হঠাৎ সে ফিরে আসে, তবে তার জন্য নূতন করে জন্মোৎসব ইত্যাদি যাবতীয় ক্রিয়া-কর্ম করতে হয়। তাকেও মাতৃগর্ভস্থ ছোট বাচ্চাটির মত দু' মুঠো বন্ধ করে আস্তে আস্তে ভূমিষ্ঠ হওয়ার ভান করতে হয়। তার নামকরণ, চূড়াকরণ এমন কী নূতন করে উপনয়নও হয়। মনে পড়ছে না, তবে বিবেচনা করি, ব্রহ্মচর্যের পর তাকে পুনরায় তার স্ত্রীকে বিয়েও করতে হয়—বিলিতি ধরনের সিলভার, গোল্ডেন ওয়েডিংয়ের মত। তাতেই বা কী কম আনন্দোল্লাস, অবশ্য সব কিছুই হয় ঘণ্টাখানেকের ভিতর। এ সব ক'টা ব্যবস্থাই আমার বড়ই মনঃপূত, ভাবতে গেলেই হৃদয় প্রসন্ন হয়ে ওঠে। বিশেষ করে যখন বাচ্চাটির অর্থাৎ লোকটার মায়ের ছবি মনের ওপর ভেসে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের ভাষা একটু পরিবর্তন করে বলি, তিনিও কি সেদিন বধূবেশ পরে সীমন্তের উপর অর্ধাবগুণ্ঠন টেনে নিয়ে অন্যান্য অন্তঃপুরিকা কুললক্ষ্মীদের ন্যায় প্রসন্নকল্যাণ মুখে মাঙ্গল্য রচনায় নিরতিশয় ব্যস্ত হন না?

কিন্তু হায় যার মা নেই?

দিল্লি ভাল জায়গা; ভালবাসি কিন্তু কলকাতাকে।

আসানসোল কিংবা বর্ধমানের কাছে রেলগাড়িতে ঘুম ভাঙল। আগের রাত্রে যুক্তপ্রদেশের কোন নাম-না-জানা জায়গায় ঘুমিয়ে পড়েছিলুম মনে গভীর প্রশান্তি নিয়ে যে, পরদিন সকালবেলাই চোখ মেলব বাঙলা দেশে; তাই না জাগলে আমি হাওড়া পেরিয়ে, শেয়ালদা ছাড়িয়ে যে কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে চলে যেতুম, তার খবর কি আই. বি. পর্যন্ত রাখতে পারত? ডাক্তাররা বলেন, মনের শান্তি সর্বোত্তম নিদ্রাদায়িনী—ওনারা তত্ত্বটা লাতিনে বলেন বলে, আমি অনুবাদটি ঈষৎ সংস্কৃত-ঘেঁষা করে দিলুম। ঘুম কেন বর্ধমানের কাছাকাছি ভাঙল সেকথাও নিবেদন করছি। চায়ের গন্ধ পেয়ে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, আসাম-বাঙালার বাইরে কেউ চা তৈরি করতে জানে না—বাঙলা প্ল্যাটফর্মের রদ্দি চা-ও দিল্লি লাহোরের উত্তম উত্তম খানদানী পরিবারের চা-কে খুশবাইতে হার মানাতে পারে। বাঙলার চায়ের খুশবাই ঘুম ভাঙাল।

চোখ খুলে দেখি সমুখে বাঙলা।

অবশ্য মানতে হবে যুক্তপ্রদেশ-বিহার দুম করে বাঙলা দেশে পরিবর্তিত হয় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যদি 'আলোক-মাতাল স্বর্গসভার মহাঙ্গন থেকে' কালের সাগর' পাড়ি দিয়ে এক মুহূর্তেই 'শ্যামল মাটির ধরাতলে' চলে আসতে পারেন তবে আপনিই বা কেন এক ঘুমের ডুব-সাঁতার কেটে এলাহাবাদ থেকে বর্ধমান পৌঁছতে পারবেন না? এমন কী গেল রাত্রিতে যে-লোকটা আপনার কামরায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঢুকে উপরের বার্থে শুয়েছিল, যাকে আপনি 'ছাতু' ভেবে অবহেলা করেছিলেন, সে-ব্যক্তি বর্ধমান পৌঁছে দেখবেন দিব্যি বাংলা বলতে আরম্ভ করেছে। আপনার জানটা অকারণে খুশ হয়ে যাবে, গায়ে পড়ে বলবেন, 'এক কাপ চা হবে স্যার!'

পাঞ্জাবীদের তুলনায় এরা কালো, বেঁটে, রোগা, অনেকেই হাড্ডিসার, এদের সুট কেনার পয়সা নেই, যদি বা থাকে তবু মাসে দুবার করে প্রেস করিয়ে ব-তরিবত পরতে জানে না, এদের রমণীরা এখনও সেই মান্ধাতার আমলের শাড়ি ব্লাউজ পরে, পেট-কাটা একবিঘতী কাঁচুলির উপর অবহেলার দোপাট্টা ফেলে এরা গ্যাট-ম্যাট করে হাঁটতে শিখলে না, এদের বাচ্চারা ট্যাঁশ উচ্চারণে 'ড্যাডি' 'মাম্মি' 'ও কে' 'নো কে' বলতে শিখলে না—এরাই বাঙালী?

দিল্লির লোক একদা মাংস রুটি খেত; এখনও তারা রুটি মাংসই খায়। শুনেছি বাঙালীরা নাকি এককালে মাছ-ভাত খেত। ঠিক বলতে পারব না, এখনও খায় কি না! রেশনে যে-বস্তু পাওয়া যায়, তাকে চাল বলে তারা তাদের বাপ-পিতেমোর খাদ্য চালকে অসম্মান করতে চায় না। এই কিছুদিন পূর্বে হঠাৎ কিছু মাছ ধরা পড়াতে বাঙালী উদ্বাহু হয়ে যে-নৃত্যটা দেখালে, তাতে মনে হল—আমি দিল্লিতে বসে 'আনন্দবাজারে' পড়েছিলুম—যেন স্বয়ং উর্বশী স্বর্গ থেকে সুধাভান্ড নিয়ে বাংলা দেশে অবতীর্ণা হয়েছেন! ছেলে-বেলায় দেখেছি, উদ্বৃত্ত মাছ পচিয়ে পোড়াবার জন্য তেল আর ক্ষেতে দেবার জন্য সার তৈরি করা হয়েছে। যাঁরা এসব করেছেন, তাঁরাও বাঙালী, এরাও বাঙালী।

এককালে এ দেশের শিক্ষিত লোক মাত্রই সংস্কৃত জানতেন কিংবা আরবী-ফার্সী জানতেন। ঊনবিংশ শতকে বাঙলা দেশে যে সাহিত্য গড়ে উঠল, যার তুলনা ভারতের অন্য কোনও প্রদেশে নেই—সে এমারত গড়াতে চুনসুর্কি যোগালে সংস্কৃত এবং কিছুটা আরবী-ফার্সী, আজ সে-সৌধের স্তম্ভ তোরণ দেখে বাঙালী মুগ্ধ, কিন্তু শুনতে পাই দু-মুঠো অন্নের জন্য সে আজ এতই কাতর যে, জোর করেও তাকে আজ আর সংস্কৃত পড়ানো যাচ্ছে না। তবে এ-কথা ঠিক, তাই নিয়ে সে লজ্জা অনুভব করে, খবরের কাগজে প্রকাশিত চিঠিতে তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। (রাষ্ট্রভাষার পীঠভূমিতে সংস্কৃতচর্চার জন্য চেল্লাচেল্লি হয়, কিন্তু কেউ গা করে না।)

এই লজ্জাটুকু নিয়েই বাঙালী।

তবুও এই বাঙলা দেশ।

এখনও ধুলো কমে নি, সে-ধুলো এখনও লাল, পুরোপুরি বাঙলা দেশ এখনও আরম্ভ হয় নি।

হঠাৎ দেখি লাইনের পাশে পুকুর ভরে রক্তপদ্ম ফুটেছে। সবুজ বাঁশবনের মাঝখানে ছোট্ট পুকুরটি—কৃষ্ণনীরে রক্ত-সরোজিনী! দিল্লির নিজাম-প্রাসাদের লাল গোলাপের কথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, ক্ষণেকের তরে বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল, কিন্তু পরমুহূর্তে মনে পড়ল, তরুণ বয়সে যখন এই অঞ্চলে বসবাস করতে এসেছিলুম, তখন প্রথম দর্শনেই এরা আমার হৃদয়ের কতখানি জুড়ে নিয়ে বসেছিল। শরৎ হেমন্ত, এমন কী, বেশ শীত পড়ার পরও কত দূর পুকুরে পদ্মের সন্ধানে গিয়েছি, কখনও ফিরেছি একটিমাত্র পদ্ম নিয়ে, হাতে ধরে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে, কখনও বা এক আঁটি বগলে করে। প্রিয়জনকে বিলিয়েছি হাসি-মুখে, লোভীজন জোর করে কিছুটা কেড়ে নিয়ে গিয়েছে, ক্ষণেকের তরে ক্ষুণ্ণ হয়েছি, কিন্তু বিরক্ত হই নি। ঘরে এসে কলসীতে তাদের জিইয়ে রাখবার চেষ্টা করেছি যতদিন পারা যায়। তারপর তারা একে একে শুকনো মুখে বিদায় নিয়েছে—আজ সকালে একজন, কাল সকালে দুজন। বুকে লেগেছে, মনে ভেবেছি, আর পদ্ম আনতে যাব না, আনলেও সব-কটি বিলিয়ে দেব, ঘরে রেখে বিদায়-বেদনার ব্যবস্থা করব না।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা কি মনে রাখা সোজা? একেই তো জ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন শ্মশান-বৈরাগ্য।

শ্মশান থেকে ফিরে এসে মানুষ আবার কিছুদিন পরে বিয়ে করে সংসার পাতে, আবার বিরহ-বেদনা, মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে। আমিও শ্মশান-বৈরাগ্য ভুলে গিয়ে নূতন করে সংসার পেতেছি, আবার তাদের বিদায়-বেলার ম্লান মৃদু গন্ধে বিধুর হয়েছি।

কিন্তু ওই যে লোকে বলে, মার খেতে খেতে মানুষ শক্ত হয়, কই, আমি তো হতে পারলুম না!

তারপর ত দেশ-বিদেশে ঘুরেছি। নরগিস দেখেছি, দায়ুদী কিনেছি, লিলি শুঁকেছি, বসরার গোলাপ বুকে গুঁজেছি, বড় বড় ফুলের বাজারে পুষ্প-প্রদর্শনীতে অবাক হয়ে বিদেশী ফুলের জলুস দেখেছি, কিন্তু কখনও বেশী-ক্ষণের জন্য ভুলে থাকতে পারি নি আমার রক্তপদ্মকে।

বিদেশী বন্ধুরা জিজ্ঞেস করেছেন মতামত। আমি তাদের ফুলের অকুণ্ঠ প্রশংসা গেয়ে শেষটায় বলেছি, কিন্তু আমাদের পদ্ম ভারি চমৎকার ফুল। এক বন্ধু তখন মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'এ-লোকটা বিদেশে ঘোরে স্বদেশ আপন পকেটে রেখে রেখে।'

এইবার দেশে ফিরেছি। স্বদেশ আর পকেটে পুরে রাখতে হবে না।

জয় মা, গঙ্গে,
ত্রিভুবনতারিণী তরল তরঙ্গে।

সুকুমার রায়

গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।

আঙিনা পেরুতে-না-পেরুতেই একখানা খাসা নেমন্তন্ন পেয়ে গেলুম।

এলগিন রোড অঞ্চলের কয়েকটি ছেলেমেয়ে 'হরবোলা' নাম দিয়ে একটি দল গড়েছে। এদের উদ্দেশ্য হাস্যরসের উত্তম উত্তম পালার অভিনয় করে বাঙালীর হৃদয়ে তার লুপ্তপ্রায় হাস্যরসকে আবার বইয়ে দেওয়া। হরবোলার প্রযোজকদের ভাষায় বলি, 'হাসতে ভুলে গেছি বলে দুর্নাম আছে আমাদের (বাঙালীর)। সুকুমার রায়কে কেন্দ্র করে সেই দুর্নাম কিছুটা যদি আমরা দূর করতে পারি, তাহলেই এই উদ্যোগ সার্থক হবে।' হরবোলা নেমন্তন্ন করেছেন, তাঁদের প্রথম পালা দেখতে।

সুকুমার রায় যে বাঙলা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক সে-বিষয়ে কারও

www.BanglaBook.org

মনে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। তাঁরই রচিত 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' বেছে নিয়ে হরবোলা আপন রুচি ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন।

'সকের থিয়েটার', তার উপর হরবোলার অধিকাংশ সদস্য অভিনয় করতে নেমেছেন, গান ধরতে শুরু করেছেন জীবনে এই প্রথম, কাজেই পালা এবং তার বন্দোবস্তে যে দোষত্রুটি থাকবে সেটা আগের থেকেই বলা যেতে পারে, কিন্তু দোষত্রুটি সত্ত্বেও তাঁরা যে রস সৃষ্টি করতে পেরেছেন, সেইটেই সব চেয়ে আনন্দের কথা।

আমি কিন্তু একটা ধোঁকা নিয়ে বাড়ি ফিরলুম।

সিরিয়স নাট্য কী ভাবে অভিনয় করতে হয়, সে সম্বন্ধে আমাদের মোটা-মুটি একটা ধারণা আছে, কিন্তু যে নাট্য মূলে হাস্যরসে টইটম্বুর তার অভিনয় হবে কী প্রকারে? বিশেষ করে সুকুমার রায়ের পালা, যেখানে প্রতি ছত্রে, না, প্রতি শব্দে রস আর রস। নট যদি সেখানে তার অভিনয় নিয়ে সে-রস শুধু প্রকাশই করেন, তবে ত আর কোন হাঙ্গামা থাকে না, কিন্তু যদি সে রস প্রকাশ করতে গিয়ে নট সেখানে 'থিয়েটারি' (অর্থাৎ করুণকে করুণতর, বীরকে বীরতর, হাস্যরসঘনকে ঘনতর) করে ফেলেন, তা হলে সেটা চপলতায় পরিণত হয়। সুকুমার রায়ের রচনা হাস্যরসে এতই কানায় কানায় ভরা যে, তাতে কোনও কিছুই যোগ দিতে গেলেই, তা সে আঙ্গিকের মাত্রাধিক্যেই হোক অথবা অন্য যে-কোন বস্তুই হোক, রস নষ্ট হয়ে যায় এবং রসিকতা তখন প্রগল্‌ভতা হয়ে যায়।

এই বিপদে না পড়ার জন্যই বাস্টার কীটন হামেশাই প্যাঁচার মত মুখ করে হাস্যরসের অভিনয় করতেন, কিন্তু চার্লি চেপলিন তাঁর অভিনয়ে যৎকিঞ্চিৎ 'থিয়েটারি' এনে হাস্যরসকে আরও জম-জমাট ভর-ভরাট করে তোলেন, কিন্তু এ দুজনেরই সমস্যা হরবোলা সম্প্রদায়ের চেয়ে অনেক সহজ। এঁদের রসিকতা ঘটনা কিংবা অ্যাক্‌শান নিয়ে—কেউ কলার খোসায় পা দিয়ে পিছলে পড়লেন, কেউ 'পিয়া মিলন কো' গিয়ে খাণ্ডার স্ত্রীর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে পড়লেন, কাজেই তাঁর অভিনয় অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু সুকুমার রায়ের রসিকতা সূক্ষ্মতর হাস্যরসের জগতে সূক্ষ্মতম বললেই ঠিক বলা হয়, সে-রসিকতা প্রধানত ভাষায় এবং ভাষা ছাড়িয়ে ব্যঞ্জনায়। অভিনয়ের ভিতর দিয়ে তাকে বাহ্য রূপ দেওয়া চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলা (একসটেরিয়োরাইজ করা) ত সহজ কর্ম নয়। করিই বা কি প্রকারে? বাস্টার কীটনের মত প্যাঁচা-চক্ষু, না চার্লির মত একটুখানি রসিয়ে?

এই হল আমার ধোঁকা।

'হরবোলা' সম্প্রদায়ের মস্ত একটা সুবিধে, তাঁরা 'সখের দল' গড়েছেন। কাজেই তাঁরা একসপেরিমেণ্ট করতে ভয় পাবেন না জানি, সেই আমার ভরসা। আঙ্গিক নিয়ে ধোঁকা থাকলেও এ-বিষয়ে আমার মনে কণামাত্র সন্দেহ নেই যে, তাঁরা সে-আঙ্গিক ব্যবহারে অভিনয়ের দিক দিয়ে প্রচুর সফলতা অর্জন করেছেন। সুতরাং তাঁরা যদি সুকুমার রায়ের আসছে পালা কীটন-আঙ্গিকে করে দেখেন তবে মন্দ হয় না। এই ধরনের এক্সপেরিমেণ্ট করে করেই শেষটায় পরিষ্কার হয়ে যাবে ঠিক কোন্ আঙ্গিক সুকুমার রায়ের হাস্যরসকে রঙ্গমঞ্চে রূপায়িত করার উপযুক্ত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'শক্তিশেল'-এর সঙ্গীতের পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন আমার জনৈক বন্ধু, ওস্তাদ ফৈয়জ খানের শিষ্য। আমি তাঁর অন্ধ ভক্ত ; কাজেই এস্থলে তাঁর সঙ্গীত পরিচালনার গুণাগুণ যদি আমি বিচার না করি, তবে আশা করি তিনি অপরাধ নেবেন না।

শেষ কথা, কর্মকর্তাগণ অভ্যাগত-অতিথিদের প্রচুর খাতির-যত্ন করেন। শুধু লৌকিকতা বা মুখের কথা নয়, আমি সর্বান্তঃকরণে 'হরবোলা'র হরবকং হরেকরকমের উন্নতি কামনা করি।

সুকুমার রায়ের মত হাস্যরসিক বাঙলা সাহিত্যে আর নেই সে-কথা রসিকজন মাত্রেই স্বীকার করে নিয়েছে, কিন্তু এ-কথা অল্প লোকেই জানেন যে, তাঁর জুড়ি ফরাসী, ইংরেজী, জর্মন সাহিত্যেও নেই, রাশানে আছে বলে শুনি নি। এ-কথাটা আমাকে বিশেষ জোর দিয়ে বলতে হল, কারণ আমি বহু অনুসন্ধান করার পর এই সিদ্ধান্তে এসেছি।

একমাত্র জর্মন সাহিত্যের ভিলহেল্‌ম্‌ বুশ সুকুমারের সমগোত্রীয়—স্ব-শ্রেণী না হলেও। ঠিক সুকুমারের মত তিনি অল্প কয়েকটি আঁচড় কেটে খাসা ছবি ওতরাতে পারতেন। তাই তিনিও সুকুমারের মত আপন লেখার ইলাসট্রেশন নিজেই করেছেন। বুশের লেখা ও ছবি যে ইয়োরোপে অভূতপূর্ব সে-কথা 'চরুয়া' ইংরেজ ছাড়া আর সবাই জানে।

বুশ এবং সুকুমার রায়ে প্রধান তফাত এই যে, বুশ বেশীর ভাগই ঘটনা-বহুল গল্প ছড়ায় বলে গিয়েছেন এবং সে-কর্ম অপেক্ষাকৃত সরল, কিন্তু সুকুমার রায়ের বহু ছড়া নিছক 'আবোল-তাবোল' : তাতে গল্প নেই, ঘটনা নেই, কিছুই নেই—আছে শুধু মজা আর হাসি। বিশুদ্ধ উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত যে-রকম শুধুমাত্র ধ্বনির উপর নির্ভর করে, তার সঙ্গে কথা জুড়ে দিয়ে গীত বানাতে হয় না, ঠিক তেমনি সুকুমার রায়ের বহু বহু ছড়া স্রেফ হাস্যরস, তাতে অ্যাকশান নেই, গল্প নেই অর্থাৎ আর-কোন দ্বিতীয় বস্তুর সেখানে স্থান নেই, প্রয়োজনও নেই। এ বড় কঠিন কর্ম। এ-কর্ম তিনিই করতে পারেন, যাঁর বিধিদত্ত ক্ষমতা আছে। এ-জিনিস অভ্যাসের জিনিস নয়, ঘষে মেজে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এ-বস্তু হয় না।

বুশ আর সুকুমারের শেষ মিল, এঁদের অনুকরণ করার ব্যর্থ চেষ্টা জর্মন কিংবা বাংলায় কেউ কখনও করেন নি, এঁদের ছাড়িয়ে যাবার ত কথাই ওঠে না।

একদা প্যারিস শহরে আমি কয়েকজন হাস্যরসিকের কাছে 'ঘোম্বাগড়ের রাজা'র অনুবাদ করে শোনাই—অবশ্য আমসত্ত্বভাজা কী তা আমাকে বুঝিয়ে বলতে হয়েছিল (তাতে করে কিঞ্চিৎ রসভঙ্গ হয়েছিল, অস্বীকার করি নে) এবং 'আলতা'র বদলে আমি লিপস্টিক ব্যবহার করেছিলুম, আমার ঠোঁটে কিংবা চোখে নয়—অনুবাদে)।

ফরাসী কাফেতে লোকে হো-হো করে হাসে না, এটিকেটে বারণ, কিন্তু আমার সঙ্গীগণের হাসির হর্‌রাতে আমি পর্যন্ত বিচলিত হয়ে তাঁদের হাসি বন্ধ করতে বার বার অনুরোধ করেছিলুম। কিছুতেই থামেন না। শেষটায় বললুম, 'তোমরা যেভাবে হাসছ, তাতে লোকে ভাববে, আমি বিদেশী গাড়ল, বেফাঁস কিছু একটা বলে ফেলেছি আর তোমরা আমাকে নিয়ে হাসছ—আমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বড় লজ্জা করছে।' তখন তাঁরা দয়া করে থামলেন, ওদিকে আর পাঁচজন আমার দিকে আড়নয়নে তাকাচ্ছিল বলে আমি ত ঘেমে কাঁই।

তারপর একজন বললেন, 'এরকম weird. ছন্নছাড়া, ছিষ্টিছাড়া কর্মের ফিরিস্তি আমি জীবনে কখনও শুনি নি।'

আরেকজন বললেন, 'ঠিক। এবার একটা চেষ্টা দেওয়া যাক, এ-লিস্টে আর কিছু জুতসই বাড়ানো যায় কি না।'

সবাই মিলে অনেকক্ষণ ধরে আকাশপাতাল হাতড়ালুম, দু-একজন একটা দুটো অদ্ভুত কর্মের নামও করলেন, কিন্তু আর সবাই সেগুলো পত্রপাঠ ডিসমিস করে দিলেন। আমরা জন পাঁচ প্রাণী আধ ঘণ্টা ধস্তাধস্তি করেও একটা মাত্র জুৎসই এপেন্‌ডিক্‌স্‌ পেলুম না। গোটা কবিতার ত প্রশ্নই ওঠে না।

আগের থেকেই জানতুম, কিন্তু সেদিন আবার নূতন করে উপলব্ধি করলুম: যদিও সুকুমার রায় স্বয়ং বলেছেন, 'উৎসাহে কি না হয়, কি না হয় চেষ্টায়', যে-জগতে সুকুমার বিচরণ করতেন, সেখানে তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্‌।

সিগনেট প্রেস সুকুমার রায়কে পুনরায় বাঙালী পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন বলে বাংলার ভিতরে বাইরে বহু লোক ওই প্রতিষ্ঠানের প্রশংসা করেছেন। আমিও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছি। আমার বাসনা, সিগনেট যত শীঘ্র পারেন সুকুমার রায়ের অন্যান্য গদ্য পদ্য লেখা যেন পুনরায় প্রকাশ করেন। বহু অতুলনীয় অনবদ্য অভূতপূর্ব লেখা 'সন্দেশ'-এর ফাইলে চাপা পড়ে আছে। 'পাগলা দাশু'কে পেয়ে যেন লঙ লস্ট ব্রাদারকে পাওয়ার আনন্দে তাকে জড়িয়ে ধরেছি কিন্তু তার আর সব ভাই-বেরাদররা কোথায়? তারা যেন আর বেশী-

'খাই-খাই' কাব্যের 'পরিবেশন' কবিতায় আপ্তবাক্য দেখছি—

দু-একটি অসাবধানতা লক্ষ্য করেছি, তারই একটা এ-স্থলে নিবেদন করি।

'খাই-খাই' কাব্যের 'পরিবেশন' কবিতায় আপ্তবাক্য দেখছি—

'কোনো চাচা অন্ধপ্রায় ('মাইনাস' কুড়ি)
ছড়ায় ছোলার ডাল পথঘাট জুড়ি।
মাতব্বর যায় দেখ মুদি চক্ষু দুটি
"কারো কিছু চাই" বলি তড়বড় ছুটি
বীরোচিত ধীর পদে এসে দেখি হস্তে
ওই দিকে খালি পাত, চল হাঁড়ি হস্তে।'

অথচ আমার অর্ধবিশ্বাস্য স্মরণশক্তি বলেছে:—

'কোনো চাচা অন্ধপ্রায় (মাইনাস কুড়ি)
ছড়ায় ছোলার ডাল পথঘাট জুড়ি।
মাতব্বর যায় দেখ মুদি চক্ষু দুটি
"কারো কিছু চাই" বলে' তড়বড় ছুটি।
হঠাৎ ডালের পাঁকে পদার্পণ মাত্রে
হুড়মুড়ি পড়ে কারো নিরামিষ পাত্রে।
বীরোচিত ধীরপদে'
—ইত্যাদি ইত্যাদি

'হঠাৎ ডালের পাঁকে' ইত্যাদি লাইন দুটো বাদ পড়াতে অর্থ অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু থাক্, আর না। সুকুমার রায় বলেছেনঃ

'বেশ বলেছ, ঢের বলেছ
ঐখেনে দাও দাঁড়ি,
হাটের মাঝে ভাঙবে কেন
বিদ্যে বোঝাই হাঁড়ি॥'

ভাষার জমা খরচ

পুব-বাংলার বিস্তর নরনারী চিরকালই কলকাতায় ছিলেন ; কিন্তু এবারে কলকাতায় এসে দেখি তাঁদের সংখ্যা এক লপ্‌তে গুয়া গাছের ডগায় উঠে গিয়েছে। কিছুদিন পূর্বেও পুব-বাংলার উপভাষা দক্ষিণ কলকাতাতেই শোনা যেত, এখন দেখি তামাম কলকাতাময় বাঙাল ভাষার (আমি কোন কটু অর্থে শব্দটি ব্যবহার করছি নে—শব্দটি সংক্ষিপ্ত এবং মধুর) ছয়লাপ।

বাঙাল ভাষা মিষ্ট এবং তার এমন সব গুণ আছে যার পুরো ফায়দা এখনও কোন লেখক ওঠান নি। পুব-বাংলার লেখকেরা ভাবেন, 'ক'রে' শব্দকে 'কইরা' এবং অন্যান্য ক্রিয়াকে সম্প্রসারিত করলেই বুঝি বাঙাল ভাষার প্রতি সুবিচার করা হয়ে গেল। বাঙাল ভাষার আসল জোর তার নিজস্ব বাক্যভঙ্গীতে বা ইডিয়মে—অবশ্য সেগুলো ভেবেচিন্তে ব্যবহার করতে হয় যাতে করে সে-ইডিয়ম পশ্চিমবঙ্গ তথা পুব-বাংলার সাধারণ পাঠক পড়ে বুঝতে পারে। যেমন মনে করুন, বড়লোকের সঙ্গে টক্কর দিতে গিয়ে যদি গরিব মার খায় তবে সিলেট অঞ্চলে বলে, 'হাতির লগে পাতি খেলতায় গেছলায় কেন?' অর্থাৎ 'হাতির সঙ্গে পাতি খেলতে গিয়েছিলে কেন?' কিন্তু পাতিখেলা যে Polo খেলা সেকথা বাংলা দেশের কম লোকই জানেন, (চলন্তিকা এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহনে শব্দটি নেই) কাজেই এ-ইডিয়ম ব্যবহার করলে রস ঠিক ওতরাবে না। আবার,

'দুষ্টুলোকের মিষ্ট কথা,
দিঘল-ঘোমটা নারী
পানার তলার শীতল জল।
তিনই মন্দকারী।'

'কামুফ্লাজ' বোঝাবার উত্তম ইডিয়ম। পুব, পশ্চিম কোন বাংলার লোকের বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধে হবে না।

ইডিয়ম, প্রবাদ, নিজস্ব শব্দ ছাড়া বাঙাল সভ্যতায় আরেকটি মহদ্‌গুণ আছে এবং এ-গুণটি ঢাকা শহরের 'কুট্টি' সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ—যদিও তার রস তাবৎ পুব-বাংলা এবং পশ্চিম-বাংলারও কেউ কেউ চেখেছেন। কুট্টির রস-পটুতা বা wit সম্পূর্ণ শহুরে বা 'নাগরিক'—এস্থলে আমি নাগরিক শব্দটি প্রাচীন সংস্কৃত অর্থে ব্যবহার করলুম, অর্থাৎ চটুল, শৌখিন, হয়ত বা কিঞ্চিৎ ডেকাডেণ্ট।

কলকাতা, লখনউ, দিল্লী, আগ্রা বহু শহরে আমি বহু বৎসর কাটিয়েছি এবং স্বীকার করি লখনউ, দিল্লিতে (ভারত বিভাগের পূর্বে) গাড়োয়ান সম্প্রদায় বেশ সুরসিক। কিন্তু এদের সব্বাইকে হার মানতে হয় ঢাকার কুট্টির কাছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তার উইট, তার রিপার্টি (মুখে মুখে উত্তর দিয়ে বিপক্ষকে বাক্‌শূন্য করা, ফার্সী এবং উর্দুতে যাকে বলে 'হাজির-জবাব') এমনই তীক্ষ্ণ এবং ক্ষুরস্য ধারার ন্যায় নির্মম যে আমার সলা যদি নেন তবে বলব, কুট্টির সঙ্গে ফস করে মস্করা না করতে যাওয়াটাই বিবেচকের কর্ম।

প্রথম তা হলে একটি সর্বজন-পরিচিত রসিকতা দিয়েই আরম্ভ করি। শাস্ত্রও বলেন, অরুন্ধতী-ন্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায় অর্থাৎ পাঠকের চেনা জিনিস থেকে ধীরে ধীরে অচেনা জিনিসে গেলেই পাঠক অনায়াসে নূতন বস্তুটি চিনতে পারে—ইংরেজীতে এই পন্থাকেই 'ফ্রম স্কুলরুম টু দি ওয়াইড ওয়ার্লড' বলে।

আমি কুট্টি ভাষা বুঝি কিন্তু বলতে পারি নে। তাই পশ্চিমবাংলার ভাষাতেই নিবেদন করি।

যাত্রী, 'রমনা যেতে কত নেবে?'

কুট্টি গাড়োয়ান, 'এমনিতে ত দেড় টাকা, কিন্তু কর্তার জন্য এক টাকাতেই হবে।'

যাত্রী, 'বল কী হে? ছ আনায় হবে না?'

কুট্টি, 'আস্তে কন, কর্তা, ঘোড়ায় শুনলে হাসবে।'

এর জুতসই উত্তর আমি এখনও খুঁজে পাই নি।

মোটেই ভাববেন না যে, এ-জাতীয় রসিকতা মান্ধাতার আমলে একসঙ্গে নির্মিত হয়েছিল এবং আজও কুট্টিরা সেগুলো ভাঙিয়ে খাচ্ছে।

'ঘোড়ার হাসি'র মত কতকগুলো গল্প অবশ্যই কালাতীত, অজরামর, কিন্তু কুট্টি হামেশাই চেষ্টা করে নূতন নূতন পরিবেশে নূতন নূতন রসিকতা তৈরি করার।

প্রথম যখন ঢাকাতে ঘোড়দৌড় চালু হল তখন এক কুট্টি গিয়ে যে-ঘোড়াটাকে ব্যাক করল সেটা এল সর্বশেষে। বাবু বললেন, 'এ কী ঘোড়াকে ব্যাক করলে হে? সক্কলের শেষে এল?'

কুট্টি হেসে বললে, 'কন্ কী কর্তা, দেখলেন না, ঘোড়া ত নয়, বাঘের বাচ্চা, বেবাকগুলোকে খেদিয়ে নিয়ে গেল।'

আমি যদি নীতি-কবি ঈসপ কিংবা সাদী হতুম, তবে নিশ্চয়ই এর থেকে 'মরাল' ড্র করে বলতুম, একেই বলে 'রিয়েল, হেলথী, অপটিমিজ্‌ম'।

কিংবা, আরেকটি গল্প নিন, এটা একেবারে নিতান্ত এ-যুগের।

পাকিস্তান হওয়ার পর বিদেশীদের পাল্লায় পড়ে ঢাকার লোকও মর্নিং সুট, ডিনার জ্যাকেট পরতে শিখেছেন। হাঙ্গামা বাঁচাবার জন্য এক ভদ্রলোক গেছেন একটি কালো লঙ কোট বা প্রিন্স-কোট বানাতে। ভদ্রলোকের রঙ মিশ্‌কালো, তদুপরি তিনি হাড়কিপটে। কালো বনাত দেখলেন, সার্জ দেখলেন, আলপাকা দেখলেন, কোনও কাপড়ই তাঁর পছন্দ হয় না, অর্থাৎ দাম পছন্দ হয় না। দোকানী শেষটায় বিরক্ত হয়ে ভদ্রলোককে সদুপদেশ দিল, 'কর্তা', আপনি কালো কোটের জন্য খামকা পয়সা খরচা করতে যাবেন কেন? খোলা গায়ে বুকের উপর ছটা বোতাম, আর দু হাতে কব্জির কাছে তিনটে তিনটে

www.BanglaBook.org

করে ছোট বোতাম লাগিয়ে নিন। খাসা প্রিন্স-কোট হয়ে যাবে।'

তিন বৎসর পূর্বেও কলকাতায় মেলা অনুসন্ধান না করে বাখরখানী (বাকির খানি) রুটি পাওয়া যেত না ; আজ এই আমীর আলী অ্যাভিন্যুতেই অন্তত আধাডজন দোকানে সাইনবোর্ডে বাখর-খানী লেখা রয়েছে। তাই বিবেচনা করি, কুটির সব গল্পই ক্রমে ক্রমে বাখরখানীর মতই পশ্চিম-বাংলায় ছড়িয়ে পড়বে এবং তার নূতনত্বে মুগ্ধ হয়ে কোন কৃতি লেখক সেগুলোকে আপন লেখাতে মিশিয়ে নিয়ে সাহিত্যের পর্যায়ে তুলে দেবেন—পরশুরাম যে-রকম পশ্চিমবাংলার নানা হাল্কা রসিকতা ব্যবহার করে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, হুতোম যে-রকম একদা কলকাতার নিতান্ত কক্‌নিকে সাহিত্যের সিংহাসনে বসাতে সমর্থ হয়েছিলেন।

এটা হল জমার দিকে, কিন্তু খরচের দিকে, একটা বড় লোকসান আমার কাছে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসছে, নিবেদন করি।

ভদ্র এবং শিক্ষিত লোকেরই স্বভাব অপরিচিত, অর্ধপরিচিত কিংবা বিদেশীর সামনে এমন ভাষা ব্যবহার না করা, যে-ভাষা বিদেশী অনায়াসে বুঝতে না পারে। তাই খাস কলকাতার শিক্ষিত লোক পূব-বাঙালীর সঙ্গে কথা বলবার সময় খাস কলকাত্তাই শব্দ, মোটামুটিভাবে যেগুলোকে ঘরোয়া অথবা 'স্ল্যাঙ' বলা যেতে পারে, ব্যবহার করেন না। তাই এন্তার, ইলাহি, বেল্লো, বেহেড, দো গেড়ের চ্যাং এ-সব শব্দ এবং বাক্য কলকাতার ভদ্রলোক পূব-বাঙালীর সামনে সচরাচর ব্যবহার করেন না। অবশ্য যদি বক্তা সুরসিক হন এবং আসরে মাত্র একটি কিংবা দুটি ভিন্ন প্রদেশের লোক থাকেন তবে তিনি অনেক সময় আপন অজানতেই অনেক ঝাঁঝ-ওলা ঘরোয়া শব্দ ব্যবহার করে ফেলেন।

ত্রিশ বৎসর পূর্বে শ্যামবাজারের রক্-আড্ডাতে পূব-বাঙালীর সংখ্যা থাকত অতিশয় নগণ্য। তাই শ্যামবাজারী গল্প ছোটালে এমন সব ঘরোয়া শব্দ, বাক্য, প্রবাদ ব্যবহার করতেন এবং নয়া নয়া বাক্য-ভঙ্গী বানাতেন যে, রসিকজনই বাহবা শাবাশ না বলে থাকতে পারত না।

আজ পূব-বাংলার বহু লোক কলকাতার আসর সরগরম করে বসছেন বলে খাঁটি কলকাত্তাই আপন ভাষা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন হয়ে গিয়েছেন এবং ঘরোয়া শব্দ-বিন্যাস-ব্যবহার ক্রমেই কমিয়ে দিচ্ছেন। হয়ত এঁরা বাড়িতে এসব শব্দ এখনও ব্যবহার করেন ; কিন্তু আড্ডা তো বাড়ির লোকের সঙ্গে জমে জমাট হয় না—আড্ডা জমে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে এবং সেই আড্ডাতে পূব-বাংলার সদস্যসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে বলে খাস কলকাত্তাই আপন ঘরোয়া শব্দগুলো ব্যবহার না করে করে ক্রমেই এগুলো ভুলে যাচ্ছেন। কোথায় না এসব আস্তে আস্তে ভদ্র ভাষায় স্থান পেয়ে শেষটায় অভিধানে ঠাঁই নেবে, উল্টে এগুলো কলকাতা থেকে অন্তর্ধান করে যাবে।

আরেক শ্রেণীর খানদানী কলকাত্তাই চমৎকার বাংলা বলতেন। এঁরা ছেলেবেলায় সাহেবী ইস্কুলে পড়েছিলেন বলে বাংলা জানতেন অত্যন্ত কম এবং বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক ছিল ভাসুর ভাদ্রবধূর। তাই এঁরা বলতেন ঠাকুরমা দিদিমার কাছে শেখা বাংলা এবং সে বাংলা যে কত মধুর এবং ঝলমলে ছিল তা শুধু তাঁরাই বলতে পারবেন যাঁরা সে-বাংলা শুনেছেন। ক্রীক

www.BanglaBook.org

রোর মন্মথ দত্ত ছিলেন সোনার বেনে, আমার অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু, কলকাতার অতি খানদানী ঘরে জন্ম। মন্মথদা যে-বাংলা বলতেন তার উপর বাংলা সাহিত্যের বা পূব-বাংলার কথ্য ভাষার কোনও ছাপ কখনও পড়ে নি। তিনি যখনই কথা বলতে আরম্ভ করতেন, আমি মুগ্ধ হয়ে শুনতুম আর মন্মথদা উৎসাহ পেয়ে রেকাবের পর রেকাব চড়ে চড়ে একদম আসমানে উঠে যেতেন। কেউ অন্যমনস্ক হলে বলতেন, 'ও পরান, ঘুমুলে?' মন্মথদার কাছ থেকে এ-অধম এন্তার বাংলা শব্দ শিখেছে।

আরেকজনকে অনেক বাঙালীই চেনেন। এঁর নাম গাঙ্গুলিমশাই—ইনি ছিলেন শান্তিনিকেতন অতিথিশালার ম্যানেজার। ইনি পিরিল ঘরের ছেলে এবং গল্প বলার অসাধারণ অলৌকিক ক্ষমতা এঁর ছিল। বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত হরিনাথ দে, সুসাহিত্যিক সুরেশ সমাজপতি ছিলেন এঁর বাল্যবন্ধু, এবং শুনেছি এঁরা এঁর গল্প মুগ্ধ হয়ে শুনতেন।

কলের এক দিক দিয়ে গোরু ঢোকানো হচ্ছে, অন্য দিক দিয়ে জলতরঙ্গের মত ঢেউয়ে ঢেউয়ে মিলিটারি বুট বেরিয়ে আসছে, টারাল্যাপ্ টারালাপ্ করে, গাঙ্গুলি মশাই আর অন্যান্য ক্যাডেটরা বসে আছেন পা লম্বা করে, আর জুতোগুলো ফটাফট করে ফিট হয়ে যাচ্ছে—এ গল্প শুনে শান্তিনিকেনের কোন্ ছেলে হেসে কুটিপাটি হয় নি?

হায়, এ শ্রেণীর লোক এখন আর দেখতে পাই নে। তবুও এখনও আমার শেষ ভরসা শ্যামবাজারের উপর।

দর্শনচর্চা

মাদ্রাজে দর্শনশাস্ত্রের ছাত্রগণের এক সভায় শ্রীযুত রাজাগোপালাচারী বলেন, প্রাচীনকালে চরম ও পরম সত্যের অন্বেষণার জন্য যাঁহারা দর্শনশাস্ত্রের অধ্যয়ন প্রবর্তন করেন, তাঁহারা ইহাকে কেবল বাস্তব ক্ষেত্রে সম্ভবপর বলিয়াই মনে করিতেন না, তাঁহারা ইহাকে অতিশয় প্রয়োজনীয় বলিয়াও মনে করিতেন। ক্রমে ক্রমে পরবর্তী কালে দার্শনিকগণ যে-সমস্ত কথা লিখিলেন তাহা অর্থহীন হইয়া পড়িল এবং শেষ পর্যন্ত সে-সমস্ত কথা একত্র গ্রথিত কতকগুলি কথার মালা ব্যতীত আর কিছুই হইল না।'

ঠিক এই উক্তিটিই আজকাল নানা গুণী জ্ঞানীর মুখে শুনতে পাওয়া যায় বলে এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন।

এককালে দর্শনচর্চার প্র্যাকটিকাল মূল্য ছিল, এখন আর নেই : এখন দার্শনিকদের কেতাবে শুধু শব্দ আর শব্দ, এই হল রাজাজীর মূল বক্তব্য।

এককালে 'ক' ছিল এখন 'খ' হয়ে গিয়েছে, এ-কথা কেউ বললেই দার্শনিকরা তার জবাবে বলেন, কারণ বিনা কার্য হয় না, অতএব দেখতে হবে দর্শনের বাস্তব মূল্য হঠাৎ উবে গেল কেন।

এ-কথা যদি প্রমাণ করা যায় যে, দার্শনিকেরা আস্তে আস্তে চরম ও পরম সত্যের সন্ধান ছেড়ে দিয়ে একদিন অসত্যের সন্ধানে লেগে গেলেন তা হলে অবশ্য এটা অসম্ভব নয় যে, সেই কারণেই তাদের পুস্তকরাজি আজ অবোধ্য

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়ে উঠেছে ; কিন্তু এযাবৎ, কি এদেশে, কি বিদেশে, কেউ ত দার্শনিকদের এ-রকম সন্দেহের চোখে কখনও দেখে নি। বরঞ্চ বেশ জোর দিয়ে বলতে হবে, সত্য দার্শনিক চরম সত্য ছাড়া অন্য কোনও জিনিসের সন্ধান কখনও করে নি—ধাপ্পাবাজি জাল-জোচ্চুরি করার ক্ষমতা যার আছে, সে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নে মন দেবে কেন, এসব ত করে অন্য লোকেরা। এই দার্শনিকই তাই দুঃখ করে বলেছেন,

প্রতারণাসমর্থজনে বিদ্যয়া কিম্
প্রয়োজনম্ !

অর্থাৎ যে প্রতারণা করতে জানে তার বিদ্যার কি প্রয়োজন? তারপরই তিনি আবার বলেছেন ঠিক ওই একই বাক্য,

প্রতারণাসমর্থজনে বিদ্যয়া কিম্
প্রয়োজনম্ !

কিন্তু এবারে প্রতারণাসমর্থ শব্দের সন্ধি ভাঙতে হবে প্রতারণা+অসমর্থ দিয়ে, অর্থাৎ তুমি যদি প্রতারণা না করতে জান তবে বিদ্যে নিয়ে তোমার কী কাজ হবে?

তাই বিদ্যা বিদ্যারই জন্য, দর্শন দর্শনেরই জন্য, অর্থাৎ সত্যানুসন্ধান সত্যানুসন্ধানেরই জন্য। সত্য নিরূপিত হলে সেটা যদি তোমার আমার কাজে না লাগে তবে সত্যের সেটা দোষ নয়। শিবলিঙ্গ দিয়ে যদি মশারীর পেরেক ঠোকা না যায় তবে সেটা শিবলিঙ্গের দোষ নয়।

মানুষ কোনও যুগেই সম্পূর্ণ সত্যের সন্ধান পায় নি—পেয়ে থাকলে তার আর অবনতি উন্নতি কিছুই হত না। সম্পূর্ণ সত্য ভগবানের হাতে, মানুষের কাজ হচ্ছে প্রাণপণ চেষ্টা করা সেই সত্যের যতদূর সম্ভব কাছে পৌঁছনোর। তাই করতে গিয়ে তার প্রচেষ্টার ফল যদি অবাস্তব (ইমপ্র্যাকটিকাল) হয় তবু তাকে সত্যেরই সন্ধান করতে হবে।

এ-স্থলে আর একটি কথা ওঠে। সত্য নিরূপিত হলে তাকে কাজে লাগাবার ভার কার হাতে? এখানে বিজ্ঞান থেকে একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। এটম বম্ বানাবার সূত্রটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করলেন তারপর এটম বম্ বানানো হবে কি না এবং হলে পর সেটা হিরোসিমার মাথায় ফাটানো হবে কি না সেটা স্থির করেন রাজনৈতিকরা, সমাজপতিরা, জাঁদরেলরা। তাঁরা যদি না চান, তবে বৈজ্ঞানিকদের সাধ্য নেই যে, তাঁরা এটম বম্ হাতে নিয়ে ভুবনময় দাবড়ে বেড়াবেন। এবং শেষ পর্যন্ত এটা বানানো হোক আর নাই হোক, এটম বম্ ভাল কাজে লাগুক আর মন্দ কাজেই লাগুক, এটম বম্ তৈরি করার পিছনে যে বৈজ্ঞানিক সত্য সূত্র আবিষ্কৃত হল সেটা সত্যই থেকে যাবে।

কিন্তু এগুলো হল আংশিক সত্য—বৈজ্ঞানিকের সন্ধানের আদর্শ। দার্শনিক সন্ধান করেন চরম সত্যের। যে সত্য কখনও কারও অমঙ্গল করতে পারে না। কারণ পৃথিবীর সর্বত্রই স্বীকৃত হয়েছে যাহা সত্য তাহাই শিব এবং তাহাই সুন্দর। এই তিনের চরম রূপ কখনই একে অন্যকে আঘাত করতে পারে না।

বৈজ্ঞানিক-তথ্যের বেলা যে-রকম, দার্শনিক-সত্যের বেলাও ঠিক তেমনি। রাজনৈতিক, সমাজবিদ্ এবং আর পাঁচজন স্থির করবেন দার্শনিক-সত্যের

www.BanglaBook.org

কতখানি মানব-সমাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। রাজাজী দার্শনিকদের প্রতি কটাক্ষ করে বলেছেন, 'আধুনিক যুগের দার্শনিকগণের আরম্ভ সংশয়ে, পরিসমাপ্তি সংশয়ে এবং তারা চিরসংশয়বাদী। এই সংশয় ধর্মবিশ্বাসের স্থান অধিকার করিয়াছে।' যদি বা এ-মন্তব্য স্বীকার করে নিই, তবু আবার বলতে হবে, সংশয়বাদ ধর্মের আসন কেড়ে নেবে কিনা সে-কথা স্থির করবেন সমাজ-পতিরা। দার্শনিকেরা সত্য নিরূপণ করাটাই তাঁদের চরম স্বধর্ম বলে বিশ্বাস করেন, সে-নিরূপণ সমাজে কী স্থান নেবে, সে সম্বন্ধে তাঁরা উদাসীন।

এককালে চিত্রকলা, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি সর্ব কলা-শিল্পধর্মের সেবা করত। ছবি আঁকা হত দেবদেবীর, গান গাওয়া হত দেবদেবীর, নৃত্য করা হত দেবতার সামনে। আজ নন্দলাল দেবদেবীর ছবি আঁকেন, আবার খোয়াইডাঙারও ছবি আঁকেন (এবং নন্দলালও খাঁটি বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকদের ন্যায় সম্পূর্ণ উদাসীন যে, লোকে তাঁর দেবদেবীর ছবিকে পুজো করছে কি না, তিনি সুন্দরের রূপ দিয়েই আনন্দিত), রবীন্দ্রনাথ রচেছেন শত শত বর্ষার গান, উদয়শঙ্করের রচা সার্থক নৃত্যের বেশীর ভাগ সামাজিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে। তাই বলে আজ কি কেউ এ-অপবাদ দেয় যে, এদের কলা-সৃষ্টি প্র্যাকটিক্যাল নয়, রবীন্দ্র-নাথের গান 'একত্র গ্রথিত কতকগুলি কথার মালা ব্যতীত আর কিছুই নয়', উদয়শঙ্করের নৃত্যে আছে শুধু কতকগুলো অর্থহীন অঙ্গসঞ্চালন এবং পদবিন্যাস!

মোদ্দা কথা এই, যাঁরা 'ধর্মপ্রাণ' তাঁরা এঁদের সৃষ্টিকর্ম, বৈজ্ঞানিকের তথ্য, দার্শনিকের সত্য, ধর্মের সেবায় নিয়োজিত করতে পারছেন না বলে দোষ দিচ্ছেন বৈজ্ঞানিককে, কলাকারকে, দার্শনিককে।

কেন পারছেন না, এ-প্রশ্ন যদি কেউ শুধায় তবে অপ্রিয় সত্য বলতে হবে, এবং আজ যখন অপ্রিয় সত্য দিয়েই তত্ত্বালোচনা আরম্ভ করেছি তবে সেই আলাপই এখন তালে চলে আসুক। আসল কথা হচ্ছে এই, আজ যাঁরা 'হা ধর্ম হা ধর্ম' করেন, তাঁদের অধিকাংশই (রাজাজীর কথা বলছি নে, তিনি সত্যই ধর্মপ্রাণ কি না সে বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত কোন অভিজ্ঞতা নেই) ধর্মে একনিষ্ঠ নন। স্বধর্মে, সত্য ধর্মে, সনাতন ধর্মে যদি তাঁদের শ্রদ্ধা ঐকান্তিক এবং অবিচল হত তবে তাঁরা আজ দার্শনিককে, কাল বৈজ্ঞানিককে হিরণ্যকশিপু, হিরণাক্ষ্য নামে অভিহিত করতেন না।

কিন্তু আমি কে? আমার ছোট মুখে বড় কথা কেন?

অতএব সে আপ্ত-বাক্য সন্ধান করে, এক ঋষির বচন উদ্ধৃত করে তাঁরই পশ্চাতে আশ্রয় নিই।

সে ঋষি প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবিগুরুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁর মত ধর্মনিষ্ঠ ঋষি ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্মেছেন অতি কম। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি এরকম ধর্মবিৎপ্রেমিক আমি আমার জীবনে অল্পই দেখেছি।

তিনি লিখেছেন,

'একটা ক্রন্দন এবং বিলাপের অভিনয় সম্প্রতি আমাদের দেশের একদল নিষ্কর্মা লোকের একটা বাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাঁদুনি গায়কদিগের ধুয়া এই যে, আমাদের দেশের এমন যে একটি সেকেলে পৈতৃক সম্পত্তি—বৈরাগ্য,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একেলে সভ্যতার হস্তে পড়িয়া তাহার অন্তিম দশা ঘনাইয়া আসিয়াছে—তিনি আর বেশি দিন টেঁকেন না! এইরূপ ক্রন্দন শুনিলে আমাদের হাসি পায়, কান্নাও পায়। হাসি পায় তার কারণ এই যে, বৈরাগ্য যদি তোমার এতই প্রিয়বস্তু, তবে তার পথ অবলম্বন কর—ক্রন্দন কেন? একেলে সভ্যতা ত আর তোমার হাত পা বাঁধিয়া রাখে নাই; কোতোয়ালের প্রতি মহারাণীর (ভিক্টোরিয়া) এমন কোনও শক্ত রাজাজ্ঞা নাই যে 'কাহাকেও বৈরাগ্যের পথে চলিতে দেখিয়াছ কি আর অমনি তাহার শির লইবে'। বৈরাগ্য ত আর বাজারের সামগ্রী নয় যে, সেকালের বাজারে তাহা সুলভ ছিল, একালের বাজারে তাহা দুর্মূল্য হইয়াছে। বাজারের সামগ্রী স্বতন্ত্র; আর অন্তঃকরণের সামগ্রী স্বতন্ত্র; বাজারের সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের বস্তু—অন্তঃকরণের সামগ্রী সাধনের বস্তু। তুমি বলিবে যে কাল পড়িয়াছে শক্ত; চব্বিশ ঘণ্টা সংসারকার্যে ষোল আনা লিপ্ত থাকিলে যদি এক আনা কাজ হাসিল হয় তবে তাহাই গৃহী ব্যক্তির পরম সৌভাগ্য; দেখিতেছ না—একটা কেরানীগিরি খালি হইয়াছে কি আর অমনি দলকে দল বি এ, এম এ কাতারে কাতারে পিঁপড়ার পালের ন্যায় আপিস অঞ্চলে গতায়াত করিতে থাকে। ইহার উত্তরে আমি এই বলি যে, প্রকৃত বৈরাগ্য সংসারে কোন কর্তব্য সাধনেরই প্রতিবন্ধকতাচরণ করে না—তাহা দূরে থাকুক, সেরূপ বৈরাগ্য কর্তব্য সাধনের পথ আরও পরিষ্কার করিয়া দেয়। বৈরাগ্য অভ্যাস আর কিছু না—মনের সুর বাঁধা; সেতারের সুর বাঁধা থাকিলে যেমন তাহাতে যে রাগিণী ইচ্ছা, সেই রাগিণীই বাজানো যাইতে পারে, তেমনি অন্তঃকরণে বৈরাগ্যের সুর বাঁধা থাকিলে—যখন যাহা কর্তব্য তাহাই সুচারুরূপে নির্বাহ করা যাইতে পারে।' (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নানা চিন্তা, সাধনা—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রবন্ধ, পৃ ১—২, বিশ্বভারতী)।

এই উদ্ধৃতিতে যেখানে যেখানে 'বৈরাগ্য' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানে 'ধর্ম' শব্দ ব্যবহার করলেই আমার বক্তব্য সুস্পষ্ট হবে।

লেসে ফ্যের

নৃতত্ত্ববিদের কৈলাস, কৈলাস পর্বতে নয়, তাঁদের স্বর্গ আসামের পর্বতে। এ-কথা ভূ-ভারতে তাবৎ নৃতত্ত্ববিদ্ উত্তমরূপে জানেন বলেই আসামে আসবার জন্য তাঁদের ছোঁকছোঁকের অন্ত ছিল না। কিন্তু ইংরেজ তখন আসামের ম্যানেজার, কাজেই ব্যাপারটা দাঁড়াল ইংরেজী প্রবাদে যাকে বলে 'ডগ ইন দি মেঞ্জার' নয় 'ডগ্ অ্যান্ড দি ম্যানেজার।' ইংরেজ নিজে অনুন্নত পার্বত্যজাতির ভিতর বসবাস করে তাদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধতর করত না, অন্য উৎসাহী পণ্ডিতকেও তাদের সঙ্গে মিশতে দিত না।

ইংরেজ কস্মিন্‌কালেও কোনও প্রকারের তত্ত্বানুসন্ধান করে নি একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু ওই কর্ম সে করেছে রাজ্যবিস্তার এবং আনুষঙ্গিক ধনার্জনের বহু পূর্বে। নৃতত্ত্ব এবং সমাজতত্ত্বের যখন প্রচার এবং প্রসার হল, টাকার গরমিতে ইংরেজ তখন কোনও প্রভু হস্তীদেহ ভুঁড়িখানা ভারী গোছ হয়ে গিয়েছেন, মা সরস্বতীর পিছনে আসামের বনে-বাদাড়ে ঘোরার মত গতি

www.BanglaBook.org

আর তাঁর গায়ে নেই। যে দু-চারখানা বই ইংরেজ আসামের অনুন্নত সম্প্রদায়-গুলি সম্বন্ধে লিখেছে সেগুলো প্রাচীন পদ্ধতিতে লেখা—নৃতত্ত্বের নব নব তত্ত্বাবিষ্কারের দৃষ্টিবিন্দুর সন্ধান এ-কেতাবগুলোতে পাবেন না।

কিন্তু জানা-অজানায় ইংরেজ এদের অনেকের সর্বনাশ করে দিয়ে গিয়েছে, এদের ভিতর মিশনারিদের ঘোরাঘুরি এবং বসবাস করতে দিয়ে।

খ্রীষ্টধর্ম অতি উত্তম ধর্ম। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান কোনও ধর্ম থেকেই সে নিকৃষ্ট নয়। কোটি কোটি লোক শত শত বৎসর ধরে খ্রীষ্টের বাণী থেকে নব নব আদর্শের অনুপ্রেরণা পেয়েছে, খ্রীষ্টের অনুকরণ করে বহু সাধুসন্ত ভগবানের কাছে পৌঁছে গিয়েছেন, তাঁদের দেখে সংশয়বাদীরা বলেছেন, ভগবান আছেন কি না জানি নে কিন্তু যদি থাকেন তবে তাঁর স্বরূপ এঁদেরই মত।

কিন্তু সেই মহান ধর্ম প্রচারের ভার যদি অজ্ঞের হাতে পড়ে তবে তার ফল বিষময় হয়। কারণ সে তখন খ্রীষ্টের নামে যে বাণী প্রচার করে সে উচাটন শয়তানের।

আসামের সব মিশনারি যে শয়তান ছিলেন, এ-কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু অজ্ঞের স্কন্ধে শয়তান ভর করে যে কী কুকর্ম করতে পারে সে তত্ত্ব হজরৎ মহম্মদ (দঃ) জানতেন বলেই বলেছেন,

মূর্খের উপাসনা অপেক্ষা জ্ঞানীর নিদ্রা শ্রেয়ঃ।

যে মিশনারি এসে আসামের বনের ভিতর বাসা বাঁধল তার বাংলো দেখে আমরা দূরের থেকে মুগ্ধ হই। অনেকটা যেন—

'ওই যেখানে দিঘির উঁচু পাড়ি,
সিসু গাছের তলাটিতে,
পাঁচিলঘেরা ছোট্ট বাড়ি
ওই যে রেলের কাছে,
ইস্টেশনের বাবু থাকে,
আহা এরা কেমন সুখে আছে॥'

টিলার উপর ফুটফুটে বাংলো, চতুর্দিকে ফুলের কেয়ারি, ঝকঝকে তক-তকে বারান্দায় বেতের চেয়ার-টেবিল সাজানো—মনে হয়, আহা, পাদরী কেমন সুখে আছে।

যাদের ভিতর পাদরী সাহেব খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে এসেছেন, তাদের তুলনায় তিনি আছেন অনেক সুখে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু বিলেতের যে-কোনও মজুরের বাড়ি পাদরীর বাসার চেয়ে অনেক বেশী আরাম-দায়ক, মজুর পাদরী সাহেবের চেয়ে খায় ভাল এবং পাদরীর সবচেয়ে বড় দুঃখ যে তাকে আত্মীয়স্বজন স্বদেশবাসী বর্জন করে আমরণ থাকতে হয় স্বদেশ থেকে বহু দূরে অনাত্মীয়ের মাঝখানে। তাই রবীন্দ্রনাথ এঁদেরই একজনকে দিয়ে বলিয়েছেন,

'আপনার জন আপনার দেশ
হয়েছি সর্বত্যাগী,
হৃদয়ের প্রেম সব ছেড়ে যায়
তোমার প্রেমের লাগি।
সুখসভ্যতা রমণীর প্রেম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বন্ধুর কোলাকুলি,
ফেলি দিয়া পথে তব মহাব্রত
মাথায় লয়েছি তুলি।
এখনো তাদের ভুলিতে পারিনে
মাঝে মাঝে জাগে প্রাণে,
চিরজীবনের সুখবন্ধন
সেই গৃহমাঝে টানে।

কিন্তু এটা হল পাদরীর হৃদয়ের দিক। এবং বাইরের দিক দিয়ে দেখতে গেলে পাদরী আপন দেশের তুলনায় যত দৈন্যেই থাকুক না কেন, এদেশের মধ্যবিত্ত সন্তানের চেয়েও তাদের আর্থিক অবস্থা ঢের ঢের ভাল এবং চাষা-ভুষোদের সঙ্গে এদের কোন তুলনাই হয় না।

কিন্তু পার্থক্যটা সবচেয়ে মারাত্মক হয় যখন পাদরী পার্বত্য অনুন্নত জাতির ভিতর গিয়ে বাংলো বাঁধে।

অনুন্নত জাতি বুঝতে পারে না যে, ক্রীশ্চান হয়ে গেলেই সে পাদরী সায়েবের বাংলো ভেট পেয়ে যাবে না। পাদরীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সে পাদরীর বাড়ি-ঘর-দোর, জামা-কাপড়, বাসন-কোসন, টেবিল-চেয়ার দেখে মুগ্ধ হয় এবং এই সব জিনিস যোগাড় করার জন্য তার সরল মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু নাগা কিংবা লুসাইয়ের যা আমদানি, তা দিয়ে এসব বস্তুর কল্পনাও সে করতে পারে না। ফলে তার জীবন বিষময় হয়ে ওঠে।

পাদরী সায়েবরা এই সর্বনাশটি করেছেন অনুন্নত জাতিদের। চোখের সামনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন যে ছিমছাম স্টান্ডার্ড অব্ লিভিংটি তুলে ধরেছেন, সে-স্টান্ডার্ডে পৌঁছানোর ক্ষমতা নাগা কিংবা লুসাইয়ের কস্মিনকালেও হবে না—দ্বন্দ্ব তার লেগেই থাকবে।

অন্য বাবদে এই সব অনুন্নত সম্প্রদায়গুলোর প্রতি ইংরেজের নীতি ছিল 'লেসে ফোর' অর্থাৎ তাদের জীবনধারণ-পদ্ধতিতে কোনপ্রকার পরিবর্তন না আনা, এবং আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, একমাত্র নাগাদের বাদ দিয়ে আর সব অনুন্নত সম্প্রদায়কে যত কম ঘাঁটানো যায় ততই মঙ্গল। তার কারণ এদের অনেকেই এমন শান্ত, সরল, ও নির্দ্বন্দ্ব জীবনযাপন করে যে, আমাদের 'সভ্যতা' তাদের জীবনে নূতন কিছু ত আনবেই না, বরঞ্চ নানা প্রকারের দৈন্য দুর্দশা সৃষ্টি করবে। অন্তত একজন অতিশয় জ্ঞানবৃদ্ধ ঋষিতুল্য ভারতীয়কেও আমি এই মত পোষণ করতে দেখেছি। প্রাতঃস্মরণীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচয় হয় সাঁওতালদের সঙ্গে গত শতকের শেষের দিকে। তখনও বোলপুর অঞ্চলে ধানকল হয় নি, সেখানকার কৃত্রিম জীবন তখনও সাঁওতালদের চরিত্র নষ্ট করে দিতে সক্ষম হয় নি। দ্বিজেন্দ্রনাথ সেই সকল অনাড়ম্বর সাঁওতালদের জীবনধারণপদ্ধতি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখেছিলেন এবং আমাকে একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, এদের জীবনে আমরা যেন হস্তক্ষেপ না করি। তবে তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, সাঁওতালরা যে অহেতুক ভূতপ্রেতকে ডরায়, সেটা সারাবার জন্য সর্বশক্তিমান ভগবানের ধারণা এদের ভিতর প্রচার করলে ভাল হয়। সে-ধারণা প্রচার করার কতটুকু প্রয়োজন, গুণীরা তার বিচার করবেন

www.BanglaBook.org

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রথম উপদেশ আমি সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করে নিয়েছি।

আমি জানি, এর বিরুদ্ধে আপত্তি উঠতে পারে। যারা শিক্ষাদীক্ষায় বিশ্বাস করেন, মড়ক এবং অন্যান্য ব্যাধি যাঁরা নির্মূল করতে চান, তাঁরা হয়ত সহজে আমাদের 'লেসে ফোর' পন্থা মেনে নেবেন না। উত্তরে আমার নিবেদন, এই সব অনুন্নত জাতির সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এখনও এত কম যে, বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করবেন যে, এদের সম্বন্ধে আরও অনেক অনুসন্ধান করার পর বিস্তর ভেবে-চিন্তে কাজ আরম্ভ করতে হবে—অবশ্য ততদিন বেঁচে থাকলে আমি তখনও আপত্তি জানাব। কারণ ধর্মের মিশনারি আর 'সভ্যতা'র মিশনারিদের ভিতর আমি পার্থক্য দেখতে পাই অতি কম॥

মার্কিনী তন্ত্র

মার্কিনরা হন্যে হয়ে উঠেছে। বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছে। যেদিকে তাকায় সেদিকেই কম্যুনিস্ট-জুজু দেখে। দেশে যে-রকম ছেলে-ধরার জুজু দেখা দিলে মানুষ কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে যাকে তাকে ধরে বেধড়ক মার লাগায়, অনেকটা সেই রকমই। তফাত এই যে, এদেশের কর্তাব্যক্তিরা এ-রকম মারধোর থেকে দূরে থাকেন, আর যতখানি পারেন জুজুর ভয়টা তাড়াবার চেষ্টা করেন। মার্কিন মুলুকে কিন্তু কম্যুনিস্ট ডাইনী পোড়ানোর ভারটা আপন হাতে তুলে নিয়েছেন ওই দেশের কর্তাব্যক্তিরা।

তা তাঁরা আপন দেশে যা খুশি করুন, আমরা রা-টি কাড়ব না। আমরা বলি—

'হরি হে রাজা কর রাজা কর
যার ধারি তারে মার
যার ধারি দুচারখানা
তারে কর দিন-কানা
যার ধারি দু শ চার শ
তারে কর নির্বংশ
যে আমার আধলা ধারে
ব্যাটা যেন দিয়ে মরে।'

কম্যুনিস্টরা আমাকে কিছুই ধারে না, তারা এখন মরুক তখন মরুক আমার কিছুটি যায় আসে না।

কিন্তু মার্কিনরা যখন এদেশে এসে দাবড়াতে থাকে তখন আমি বিদ্রোহ করি। ভারতবর্ষের যত্রতত্র আজকাল দেখতে পাবেন মার্কিন অধ্যাপক অমুক তার তমুক 'গণতন্ত্র' 'নবীন জীবন পদ্ধতি' 'দর্শনের নব সূত্রপাত' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছেন। ওগুলো হচ্ছে মুখোশ—যে কোনো বক্তৃতায় যান, দেখতে পাবেন তিন মিনিট যেতে-না-যেতেই, দর্শন, বিজ্ঞান, কলাশিল্পের বাহানা ধরে তাঁরা ঠিক পৌঁছে গেছেন আসল মোকামে, 'এস ভাই ভারতীয়, তোমরা আমরা সবাই মিলে রুশকে ঘায়েল করি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইংরেজীতে একেই বলে 'ওয়ার-মংগারিং', বাঙলায় বলে, 'তাতানো', 'ওসকানো', 'খ্যাপানো'।

ধর্মসাক্ষী, স্বেচ্ছায় যাই নি। অকালে বৃষ্টি নেমেছিল, আশ্রয়ের সন্ধানে বারান্দায় উঠেছিলুম। যজ্ঞির যজমানরা আমার আসল মতলব ধরতে না পেরে সভাস্থলে বসিয়ে দিলেন। ভোজনের নিমন্ত্রণে নয়, পঞ্চাশী-আইনে পড়ে না। বক্তৃতার সারাংশ পূর্বেই নিবেদন করেছি। অবাক মানলুম দেশের লোক এই 'তাতানো'টা ধরতে পারল না। যে-রকমভাবে তাবৎ বক্তৃতাটা গলাধঃকরণ করে মিষ্টি মিষ্টি প্রশ্ন শুধাল, তার থেকে মনে হল তারা যেন আরও মণ্ডাটা মিঠাইটা চাইছে।

থাকতে না পেরে শুধালুম, 'সায়েব, তোমার আসল মতলব আমরা যেন তোমাদের সঙ্গে এক হয়ে বলশিদের সঙ্গে লড়ি—নয় কি? ঠিক বুঝেছি ত?'

সায়েব একগাল হেসে আমার বুদ্ধির তারিফ করলেন। আমি শুধালুম, 'বলশিদের সঙ্গে কোনও সমঝোতা হয় না? আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেন, "অসম্ভব নয়"। তাই তিনি কোন দলেই ভিড়ছেন না।'

সায়েব বললেন, 'রুশরা চলে যাক চেকোশ্লোভেকিয়া হাঙ্গেরি রুমানিয়া পোলান্ড ছেড়ে। তারা কী রকম সেখানে রাজত্ব চালাচ্ছে জান? সেখানে তারা সর্বপ্রকার স্বাধীনতার টুঁটি চেপে তার দম বন্ধ করে মারছে, জান সে কথা?' এবার আমি পাল্টা একগাল হেসে বললুম, 'বিলক্ষণ জানি সায়েব। কিন্তু বল ত, তোমারই রুজভেল্ট আর চার্চিল যখন ইয়ালটা, তেহরান, পৎসদামে এসব দেশ রুশের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, তখন কি তাঁরা এত গবেট ছিলেন যে জানতেন না, রুশ সেখানে কোন্ ধরনের রাজত্ব কায়েম করবে? তোমারই মার্কিন জাত, ইংরেজ আর ফরাসী বেরাদর পশ্চিম জার্মানিতে কি বলশি প্যাটার্ন বুনছে, না নিজেদের প্যাটার্ন? তা নয় সায়েব, রুজভেল্ট চার্চিল বিলক্ষণ জানতেন রুশনাগর বলকানসুন্দরীকে দিয়ে কোন্ রংগরস করবেন। কিংবা বলতে পারি শেয়ালকে যদি দাওয়াত করে' মুর্গীর খাঁচায় ঢোকাও, তবে সকাল-বেলাকার মমলেটের আশাটা সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ করাই ভাল।

সায়েবের মুখ সেদ্ধ-হ্যামবর্ণ : সেটা লিপস্টিক হল কিনা বুঝতে পারলুম না—চোখে চশমা ছিল না—তবে কণ্ঠে উষ্মা প্রকাশ পেল ; বললেন, 'তোমরা গণতন্ত্র মান। বিশ্বজোড়া গণতন্ত্রের বিপদে তোমরা হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে?'

বললুম, 'তাতে করে ত আমরা মার্কিনেরই অনুসরণ করব। ভুলে গেছ, ১৯৩৪ সালে লয়েড জর্জ যখন তোমাদের দরজায় ধন্না দিয়ে কান্নাকাটি করেছিলেন, পাশ্চাত্ত্য গণতন্ত্র বাঁচাও, তখন তোমরা সাড়া দিয়েছিলে? না বলেছিলে, "ও ইয়োরোপের ঘরোয়া ব্যাপার?" শেষটায় চেম্বারলেন চার্চিল একই কান্না কাঁদলেন, ফ্যাসিজমের হাত থেকে গণতন্ত্র বাঁচাও, তখনও কি পত্রপাঠ লস্ফিত হয়ে লড়াইয়ে যোগ দিয়েছিলে? না পার্লহারবারে আঁতে যখন ঘা পড়ল, তখন "গণতন্ত্র বাঁচাবার" টনক নড়ল? এখন দেখছ রুশ বড্ড বেশী তাগড়া হয়ে উঠেছে, তাতেই এত শিরঃপীড়া। সে-কথা থাক। কিন্তু এ-কথাও মানবে

www.BanglaBook.org

যে, আজ যদি আমরা কোনও পক্ষে যোগ না দিই, তবে সে শুধু তোমাদের ইতিহাস থেকে হদিস নেওয়ার মত হবে। ইংরেজ, ফরাসী, জর্মন, জাপান লড়াই করে মরল, তাই আজ তোমরা পয়লা নম্বর। এবার তোমরা আর রুশরা মারামারি করে দুর্বল হও, তখন আমরা পৃথিবীতে রাজত্ব করব।'

কথাটা সায়েবের বড্ড টক লাগল। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল, 'কিন্তু এই যে লড়াইয়ের বিপদ ঘনিয়ে আসছে, তার থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখতে পারবে কি?'

আমি বললুম, 'সে হচ্ছে অন্য কাহিনী। দুর্ভিক্ষের সময় বাঙালী ডাস্টবিন থেকে ভাত কুড়িয়ে খেয়েছে; তাই বলে ওটা তার কর্তব্য এ-কথা ত কেউ বলতে যাবে না। লড়াই এড়াতে পারব না, তাই তৈরী হয়ে জেতার পক্ষ নিই, সে হচ্ছে এক কথা; আর তোমাদের পক্ষে স্বেচ্ছায় খুশ এক্তেয়ারে, বহালতবিয়তে "কর্তব্যবোধে" "গণতন্ত্র বাঁচাতে" যোগ দি, সে হচ্ছে অন্য কথা। আমাদের সে বোধটা হচ্ছে না।"

ততক্ষণে বৃষ্টি থেমে গেছে। দেশ ত আমি চালাই নে। কেটে পড়লুম।

কিন্তু প্রশ্ন, এই যে হরেক রকম চিড়িয়া নানারকম মুখোস পরে এদেশে এসে 'ওয়ার-মঙ্গারিং' করে, তার কি কোন দাওয়াই নেই?

বাঙ্গালী মেনু

বয়স হয়েছে, যখন খুশি রেস্তোরাঁয় ঢুকে মমলেট-কটলেট হুকুম দিতে লজ্জা করে। আর যখন বয়স হয় নি তখন জেবে সিঙ্গল চায়েরও রেস্ত থাকত না বলে রেস্তোরাঁয় ঢোকবার উপায় ছিল না।

ভগবান দয়াময়। তিনি সব কিছুই দেন: কিন্তু তাঁর 'টাইমিং'টা বড্ডই খারাপ। বৃদ্ধকে দেন তরুণী ভার্যা এবং হোটেলে যাবার পয়সা। উনিশ শতকের নাটক-নভেলে একেই বলা হত 'অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস'।

অসময়ে বৃষ্টি। ট্রাম থেকে নেমেই রেস্তোরাঁতে ঢুকতে হল। বহুকাল পরে কলকাতা ফিরেছিও বটে—পুরনো যাবতীয় প্রতিষ্ঠান আগেরই মত চালু আছে কি না দেখার বাসনাটাও রয়েছে।

একখানা আলুর চপ আর এক কপ্ চা।

শুনেছি, সায়েবরা মাস্টার্ড খান শুধু শূকর এবং আরেকটা নিষিদ্ধ মাংসের সঙ্গে। মুর্গী, মটন, মাছের সঙ্গে তাঁরা রাই খান না। মুর্গী, মটনের সঙ্গে না-ই বা খেলেন, কিন্তু মাছের সঙ্গে সরষে যেন রবীন্দ্রসঙ্গীতে কথার সঙ্গে সুরের মিল—এ-তত্ত্বটা সায়েবরা এদেশে দু'শ বছর থেকেও শিখল না দেখে তাজ্জব মানতে হয়।

তা সে যা-ই হোক, আমি সরষে খাই সব জিনিসের সঙ্গে—এই নিতান্ত সন্দেশ-রসগোল্লা ছাড়া। তাই আলুর চপের মটনকিমা সরষে সংযোগে খেতে খেতে ছোকরাকে বললুম, 'সরষেটা ভাল না।'

ম্যানেজার শুনতে পেয়ে বললে, 'হক্ কথা বলেছেন, স্যার, কিন্তু বিলিতী

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাস্টার্ডের উপর সরকার ট্যাক্সো যা লাগিয়েছেন তার ঝাঁঝটা মাস্টার্ডের চেয়েও বেশী।'

আমি বললুম, 'তবে নাকচ করে দিন বিলিতী মাস্টার্ড ; চালান দেশের তৈরী খাঁটি প্লেন কাসুন্দি। খরচাও কম পড়বে।'

ম্যানেজার আমার দিকে হাবার মত তাকালে। বোধ হয় ভাবলে, আমি নিতান্তই গাঁইয়া। তা আমি বটিও।

দিশীবিলিতী কোন মাস্টার্ডই কাসুন্দির সামনে দাঁড়াতে পারে না। কাসুন্দিতে থাকে মিঠে-কড়া, মোলায়েম-মোলায়েম ঝাঁজ—আর বিলিতী মাস্টার্ডের ঝাঁজ চাষাড়ে, ফরাসী মাস্টার্ডে বদ্‌খদ্‌ মিষ্টি-মিষ্টি ভাব।

যবে থেকে আমার পাশের বাড়িতে এক দার্শনিক এসে উঠেছেন, পাড়ার আমাদের সক্কলের গায়ে দর্শনের হাওয়া লেগেছে। আমরা এখন আর তথ্য নিয়ে তর্ক করি নে, তত্ত্ব কারে কয় তারই চিন্তা করি। আমি তাই কাসুন্দির খেই ধরে তত্ত্বচিন্তায় মনোনিবেশ করলুম। আমরা আপন জিনিসের সম্মান দিতে জানি নে। হিন্দীতে যাকে বলে 'ঘরকী মুগী দাল বরাবর' অর্থাৎ 'গেঁয়ো যোগী ভিখ্‌ পায় না'।

তখন মনে পড়ে গেল, গেল লড়াইয়ের সময় আমাকে এক মার্কিন অফিসার আফ্‌সোস করে বলেছিল, কলকাতায় বাঙালী-রান্না খাবার রেস্তোরাঁ নেই। তাকে এক বাঙালী নিমন্ত্রণ করে ডাল-চচ্চড়ি খাইয়েছিল, সেই থেকে বেচারী তামাম কলকাতা চষে বেড়িয়েছে বাঙালী-রান্নার সন্ধানে, আর পেয়েছে শুধু মমলেট-কটলেট-ডেভিল কিংবা কোর্মা-পোলাও-কালিয়া। সে চেয়েছে এক ঘটি জল, পেয়েছে তিনখানা বেল।

দর্শনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শোপেনহাওয়ার বলেছেন, 'অমা যামিনীর অন্ধকার অঙ্গনে অন্ধের অনুপস্থিত অসিত অশ্বডিম্বের অনুসন্ধান।' কলকাতায় বাঙালী রান্নার রেস্তোরাঁ অনুসন্ধান এই একই গোত্রীয়—কলকাতায় প্রথম আশ্চর্য!

অথচ দেখুন ইংরেজী (কিংবা ট্যাঁশ বলতে পারেন), মোগলাই, চীনা, মাদ্রাজী, গুজরাতী ('অন্নপূর্ণা' দ্রষ্টব্য—খাওয়া না-খাওয়ার জিম্মেদার আপনি) বহু রকমের রান্নাই এই কলকাতায় পাবেন। রোস্ট কবাব চপ্‌ সুয়েজ ইডলিডোসে করহী, ফরাসী এস্‌কেলোপ দ্য ভো ও শাতোব্রিয়া, এমন কি ভিয়েনার ভীনার শ্নিৎসেল পর্যন্ত পাবেন। পাবেন না শুধু ঘাঁটি বাঙাল।

তাই ভাবছি, আপনাতে আমাতে একটা বাঙালী রেস্তোরাঁ খুললে হয় না?

বাঙালী সর্বভুক। তাই বাঙালী প্রবাদ 'লোহা খাই নে শব্দ বলে, "—" খাই নে গন্ধ বলে।' তাই বলে কি আমাদের রেস্তোরাঁয় সব কিছু থাকবে? উঁহু! আমাদের মাপকাঠি হবে—বাড়িতে আমাদের মা-মাসীরা আটপৌরে এবং পোশাকী যে-সব রান্না করেন।

তা হলে এইবারে 'মেনু'টা তৈরি করা যাক।

কিন্তু তার পূর্বেই স্থির করতে হয়, খেতে দেবেন কিসে?

আমি মনস্থির করেছি—কাঁসা কিংবা পেতলের থালায়। সাদা কিংবা কালো পাথরের থালারও ব্যবস্থা থাকবে, নিতান্ত সাত্ত্বিক জনের জন্য শালপাতা, কলাপাতার ব্যবস্থাও থাকবে। সব কটা থাক্‌ আর নাই থাক্‌—চীনে বাসন ছুরি-

www.BanglaBook.org

কাঁটা বারণ।

এখন আহারাদি।

১। ভাত—আতপ এবং সেদ্ধ, লুচি, পরোটা, বাকর-খানী (বাদ দিলে চলবে না, পূব-বাঙলার বিস্তর লোক কলকাতায় আস্তানা গেড়েছেন), ঘি-ভাত, পোলাও। কিছু বাদ পড়ল না ত? ভেবে দেখুন। এ 'মেনু' তৈরী করা ত একজনের কর্ম নয়। আমি শুধু একটা পয়লা খসড়া করে দিচ্ছি।

এ-স্থলে আরেকটি তত্ত্ব খুলে কই। রেস্তোরাঁ প্রতিষ্ঠানটি মোটামুটি ইয়োরোপীয়; তাই কোনও কোনও বাবদে আমাদের নকল করতে হবে ইয়োরোপকে—অর্থাৎ প্যারিসকে, কারণ রেস্তোরাঁ-লোকের বৈকুণ্ঠ প্যারিসে। তাই 'মেনু' বানাবার পরিচ্ছেদ, অনুচ্ছেদ, পদ ফরাসী কায়দাতেই যুক্তিসম্মত এবং অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ফরাসী 'মেনু' আরম্ভ হয় হরেক রকম রুটির বর্ণনা দিয়ে (আমিও তাই ভাত-লুচি-পোলাও দিয়ে বিসমিল্লা পড়েছি), তারপর অর দ্য অভ্র, সূপ্, ডিম, ফিশ ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব—

২। তেতো ঃ—

উচ্ছেভাজা, করেলাসেদ্ধ, নালতে শাক (ইন সীজন—মৌসুমী কালে)। এইবারে ভাবুন, কিংবা মা-মাসীকে জিজ্ঞেস করুন, আর কী কী তেতো আছে—আমার দুর্ভাগ্য, যে-অঞ্চলে জন্ম আমার, সেখানে তেতোটার খোলতাই নেই। পশ্চিমাঞ্চলে স্টাফ্‌ট—অর্থাৎ মাংসের পুর দেওয়া—করেলা খায়, কিন্তু বিবেচনা করি তার রেওয়াজ বাংলা দেশে নেই।

৩। ডাল ঃ—

মুগ, ছোলা, মসুর, কলাই ইত্যাদি। তারপর ডালের সঙ্গে সজনের ডাঁটা, কেউ বা দু-চারটে বড়ি দেয়। অতএব ডালের দুভাগ—প্লেন এবং মেশানো, যেমন পূর্বেই বলেছি ডাল আ লা ডাঁটা; কিংবা আ লা নারকেল, অর্থাৎ ডালে নারকোলের টুকরো থাকবে।

৪। ভাজা ঃ—

নিয়ে কিন্তু বিপদ। কারণ এতক্ষণ দিব্যি নিরামিষ চলছিল, এখন ভাজা নিরামিষ, আমিষ, ডিম তিন প্রকারই হতে পারে।

অতএব

(ক) আলু, পটল, বেগুন, কুমড়ো...

(খ) ডিমভাজা, মমলেট...

(গ) মাছভাজা (ইলিশ, রুই, পুঁটি, পোনা...)

কাজেই খ এবং গ-কে হয়তো 'ডিম' এবং 'মাছের অনুচ্ছেদে' পুনরাবৃত্তি করতে হবে। 'ক্রস রেফেরেন্‌স্' দিতে পারেন, কিন্তু ভয়, তাহলে 'মেনু' হয়ত জর্মন ডক্‌টরেট্ থিসিসের প্রকার এবং আকার নিয়ে নেবে। উপস্থিত অবশ্য আমি সেই নিষ্ঠা নিয়েই এই মহামূল্যবান নির্ঘণ্ট নির্মাণের প্রয়াসী হচ্ছি, কিন্তু তৈরী মালে ত ও জিনিস ওতরালে চলবে না।

৫। ছে চকি—ছোঁকা—ছক্ক—চচ্চড়ি—লাবড়া (লাফড়া)।

এইবারে আমার পেটের এলেম বেরিয়ে গেল। এগুলোর মধ্যে একটা আরেকটার সূক্ষ্ম পার্থক্য আমি জানি নে। যদিও খাবার সময় রাঁধুনীকে অপটু ঠাওরালে এ-বিষয়ে উচ্চাঙ্গের বক্তৃতা দিতে কসুর করি নে। আর পাঁচ-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জন কান পেতে শোনে, কারণ তারা জানে আমার চেয়েও কম। দু-একবার যে কান-মলা খাই নি তাও নয়। সে কথা যাক। এখন প্রশ্ন, এ-অনুচ্ছেদের মূল হেডিং নেবেন কী এবং তার পদ বাতলাবেন কী কী?

করে করে আসবেন, মাছ মাংস—তার কত অনুচ্ছেদ, তস্য ছেদ, পদ, পদ-ভেদ—ডালনা, ঝোল, কালিয়া, মালাই সহযোগে, ডাবের ভিতর, কলাপাতায় পেঁচিয়ে, দমে দিয়ে, সরষে মেখে—খোদায় মালুম, কোথায় গিয়ে পৌঁছব।

তাই আমার প্রস্তাব ; একখানা ফুলস্ক্যাপ কাগজ নিন এবং রেস্তোরাঁর মেনুর কায়দায় একখানা বাঙালী মেনু তৈরী করুন দু পাতা জুড়ে, অর্থাৎ ফুলস্ক্যাপ কাগজের ভাঁজ খুলে যতটা জায়গা পান। এর বেশী কাগজ নিতে পারবেন না কারণ পূর্বেই বলেছি মেনু থিসিস নয়। আবার শীটখানা যেন টায়-টায় ভর্তি হয়। ফাঁক থাকলে চলবে না। আমি যে পরিচ্ছেদ-অনুচ্ছেদ দিয়ে প্যাটার্ন বাতলালুম সেটা একদম অবজ্ঞা করে আপনি আপন মেনু বানাবেন। কোন্ জিনিসের কত দাম সেটা আপনি বলতে পারেন, না-ও পারেন। না-বলাই ভাল। কারণ 'কস্টিং' ব্যাপারটা বড়ই কঠিন। রেস্তোরাঁ ম্যানেজার অভিজ্ঞতা থেকে সেটা স্থির করবেন।

'একস্ট্রা' অনুচ্ছেদটি ভুলবেন না। তাতে থাকবে, কাঁচা লঙ্কা, চাটনি (ধনে, পুদিনা...), আচার (আম, জারক নেবু...) ইত্যাদি এবং কাসুন্দি।

যে-কাসুন্দি নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করেছিলুম।

এইবারে বিবেচনা করুন॥

রন্ধন-যজ্ঞ

খবর এসেছে লণ্ডনে এক বিরাট রন্ধন-যজ্ঞ হবে। সে-যজ্ঞে পৃথিবীর আঠারোটি দেশ আপন আপন সুস্বাদু রান্না পেশ করবেন। অতি উত্তম প্রস্তাব, কিন্তু হায়, আমাকে বিচারকর্তা করে ডেকে পাঠাচ্ছে না কেন? রন্ধন-মার্গে সত্যের সন্ধানে আমি বিস্তর ইন্ধন পুড়িয়েছি, আকাশের অ্যারোপ্লেন, মাটির ট্রেন আর জলের জাহাজ এই তিন সচল বস্তু ভিন্ন আর সবই ত আমি খেয়ে দেখেছি। তাও আবার দেশী বিদেশী নানা কায়দায়। জর্মন কায়দায় রান্না ভারতীয় 'রাইস-কারী' (অতিশয় অখাদ্য) খেয়েছি, শিখের বানানো বাঙালী লেডিকেনি খেয়েছি (সেফ পেল্লাদ-মারা গুলি—প্রহ্লাদকে খাইয়ে দিলে হিরণ্যকশিপুকে আর ভাবতে হত না), আরব বেদুইনের হাতে 'পাকানো' দিল্লীর বিরিয়ানী খেয়েছি, জাপানীর স্বহস্তে তৈরী চেঙ্গিসখানী কাবাব ভী খেয়েছি (এর নির্মাণ কৌশল একদিন সবিস্তর নিবেদন করব—আহা, অতি খাসা জিনিস), আর কত বলব!

তা সে-কথা যাক গে, সে নিয়ে দুঃখ করে কোন লাভ নেই, গুণীর আদর কি আর এ মূঢ় সংসার করেছে কিংবা করবে?

লণ্ডন থেকে আরও খবর এসেছে, ভারতীয় 'টীম' চলবে শ্রীমতী ভট্টাচার্য, শ্রীমতী বসু এবং শ্রীমতী রায়ের কর্তৃত্বে। তিনজনই বাঙালী, কাজেই বাঙালী হিসেবে, হে পাঠক, তোমার আমার দুজনেরই মনে বিমল আনন্দ অনুভূত হল,

www.BanglaBook.org

এ-কথা অস্বীকার করে খামোখা মিথ্যেবাদী হতে যাব কেন? কে না জানে, আজ বাঙালী সর্বত্র অনাদৃত, কেন্দ্রীয় সরকার তাকে উপেক্ষা করে, বিদেশে তার খ্যাতি-প্রতিপত্তি শনৈঃ শনৈঃ কমে যাচ্ছে, বিশেষজ্ঞের পাল-পরবে শ্রাদ্ধ নিমন্ত্রণে সে প্রায় ব্রাত্য—অপাঙ্‌ক্তেয় হতে চলল। এরই মধ্যিখানে যদি বিশ্ব-রন্ধনযজ্ঞে তিন বঙ্গরমণী ভারতের প্রতিভূ হিসেবে আমন্ত্রণ পান, তবে কোন্ বাঙালীর ছাতি তিন ফুট ফুলে উঠবে না?

কিন্তু আমার নিবেদন, গর্ব অনুভব করেছি বটে কিন্তু আনন্দিত হই নি।

আমি বাঙালী, আমি এই 'দেহলিপ্রান্তে' বসেও বাঙালী-রান্না খাই। আমি আতপ চালের ভাত, কিঞ্চিৎ ঘৃত, সোনা মুগের ডাল (দিল্লীতে অতিশয় নিকৃষ্ট), সর্ষে বাটায় মাছের ঝাল ইত্যাদি খেয়ে থাকি। বাঙালীর অন্যান্য রান্না নিয়েও আবার দম্ভের অন্ত নেই, কিন্তু বিশ্বের দরবারে যদি আমাদের অর্থাৎ ভারতীয় রান্নার কেরদানি দেখাতে হয় তবে শুধু বাঙালী হেঁশেল দেখালেই চলবে না।

হাঁ, আলবত, অতি অবশ্য আমি স্বীকার করি, বাঙালীর সর্ষে-ইলিশ, মালাই-চিংড়ি, ডাব-চিংড়ি, বাঙালী বিধবার নিরামিষ (বিশেষ করে 'বোষ্টমের পাঁঠা' এঁচোড়), জলখাবারের লুচি, আলুর দম, সিঙাড়া, মাছের ডিমের বড়া, মোচার পুর দেওয়া সমোসা ইত্যাদি, তারপর ছানার মিষ্টি, রসগোল্লা, লেডিকেনি, সন্দেশ, চিনিপাতা দই, মিহিদানা সীতাভোগ আরও কত কী! (মুদ্রাকর মহাশয়, আপনার জিভে জল আসছে, অথচ এ-লেখা কম্পোজ না করে আপনার বাইরে যাবার উপায় নেই, তদুপরি আজকের দিনে আপনি আমি কেউই এ-সব সুস্বাদু বস্তু চাখবার সামর্থ্য রাখি নে, অতএব অপরাধ নেবেন না।)

এমন কী, আমাদের উচ্ছেভাজা, আমের অম্বল, কিসমিস-টমাটোর টক (প্রধানত বীরভূম, মেদিনীপুর অঞ্চলের) নগণ্য জিনিস নয়, ভোজনরসিক মাত্রেই জানেন।

আর পিঠে—তার ফিরিস্তি আর দেব না।

কিংবা যাকে বলে 'ফেনসি-খানা' বিশেষ জেলা বা মহকুমার আপন বৈশিষ্ট্য। বাইরের—এমন কী, বাংলা দেশের ভেতরের লোকই যেগুলো জানে না, যেমন মনে করুন ব্যাঙের ছাতা, ইংরেজীতে যাকে বলে মাশরুম, মেদিনীপুর এ-বস্তুর পাক্কা কদরদার, ভোজনরাজ ফরাসীও এর নামে অজ্ঞান। কিংবা পূব-সিলেটের 'চোঙা-পিঠে' (এক রকম হাল্কা বাঁশের চোঙায় ভেজা চাল ভরে দিয়ে সে-চোঙা খোলা আগুনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঝলসানো হয়, তারপর চোঙা ভেঙে ফেললে একখানা আস্ত লম্বা টুকরো বেরিয়ে আসে—এক ফুট লম্বা; খেতে হয় শুকনো মালই কিংবা করকরে কই মাছ ভাজার সঙ্গে), কত বলব!

শুঁটকি? নাক সিঁটকাচ্ছেন ত? কিন্তু আমার বিশ্বাস শুঁটকির আপন মূল্য আছে। ইংরেজ, ফরাসী, জর্মন সব ভোজন-রসিকজনই 'স্মোকড্-ফিস' অর্থাৎ শুঁটকির কদর জানেন।

আরও কত কী!

www.BanglaBook.org

কিন্তু ভুললে চলবে না যে, বাঙালী মাছ, নিরামিষ, পিঠে, সন্দেশ সুচারুরূপে তৈরি করতে জানলেও সে পারে না—এবং একদম পারে না মাংস রাঁধতে।

বাঙালী-বাড়িতে মাংস খেতে গেলে আমার চোখে জল আসে। মাংস আর ঝোল নন্-কো-অপারেশন করে বসে আছেন—এদিকে শক্ত মাংস ওদিকে টলটলে ঝোল। মাংসের নিতান্ত আপন 'সোওয়াদ' আছে বলেই খাওয়া যায়, কিন্তু আসলে অখাদ্য।

কিংবা মাংস-চালে মিশিয়ে বিরিয়ানি পোলাও বাঙালী রাঁধতে জানে না (বাঙালীর উপাদেয় ঘি-ভাত, মটরশুঁটি-ঘি-ভাত অন্য জিনিস) অথবা মাংসে তরকারিতে মিলিয়ে আলু-গোশ্‌ৎ, মটর-গোশ্‌ৎ, গোবি (কপি) গোশ্‌ৎ বাঙালী বিলকুল চেনে না।

একেবারে কেউই পারে না—একথা আমি বলব না। ঢাকার নবাববাড়ি, সিলেটের কাজীবাড়ি এবং মজুমদার-বাড়ি (শুনেছি—খাই নি), মুর্শিদাবাদের ও মাটিয়াবুরুজের নবাববাড়ি এসব বস্তু সত্যই ভাল রাঁধেন। আর পারে উত্তম মুর্গী-ঝোল রাঁধতে গোয়ালন্দ, নারায়ণগঞ্জ-চাঁদপুর জাহাজের খালাসীরা ; যে একবার খেয়েছে, সে কখনও ভুলতে পারে না।

কিন্তু এসব মাংস রান্না বড়ই সীমাবদ্ধ, বাংলা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে নি। আমার আশ্চর্য বোধ হয়, বিক্রমপুরের মেয়ে প্রতি বৎসর গোয়ালন্দী জাহাজে করে কলকাতা-হস্টেলে যায়, যাবার সময় জাহাজে 'রাইস-কারি' খায়, সে রাঁধতে-বাড়তেও জানে, কিন্তু জাহাজের ওই মুর্গী-ঝোল সে কখনও রাঁধতে পারল না!

মাত্র একটি বাঙালী কাপালিককে আমি চিনি, যিনি সত্যই মাংস রাঁধতে জানতেন। পাঁঠার মাংস কষে তিনি পেঁয়াজ-রশুন-লঙ্কা দিয়ে যে অপূর্ব, না অভূতপূর্ব 'মহাপ্রসাদ' রাঁধতেন তার সঙ্গে তুলনা দেবার মত সুখাদ্য আমি এ জীবনে কখনও খাই নি। কিন্তু তিনি ব্যতায়। তিনি এখন সেই লোকে, বিবেচনা করি, যেখানে আহারাদির কোন ঝামেলা নেই, তাই আমাদের শহরে এখন আর কেউ 'মহাপ্রসাদে'র সন্ধান পায় না। আমার মত দু-একজন এখনও তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় তাঁর স্মরণে চোখের জল ফেলে।

অথচ দেখুন, পশ্চিম-ভারতে বহুতর তরো-বেতরো মাংস রান্না হয়। নানা রকমের সুরুয়া (সুপ্), শিক-শামী-টিকিয়া-বড়ী-আফগানী-মিশ্রী-মুরগিস কত রকমের কাবাব, ছ-সাত রকমের পোলাও, বিরিয়ানি, কুর্মা, কালিয়া, পসিন্দা, গুর্দা, কলিজা, তন্দুরীমুর্গী, মুর্গীমুসল্লম, মুর্গীশাহী, রওগান যুষ, তারপর মাংসে তরকারিতে মেশানো আলু-গোশ্‌ৎ, গোবী-গোশ্‌ৎ, দইয়ে মাংস মাখানো রায়তা-গোশ্‌ৎ, মাংস কুচি কুচি করে কোফতা, কীমা এবং তার থেকে কোফতা-ঝোল, কীমা-ঝোল, বাহান্ন রকমের সমোসা, এবং আরও কত কী।

এক কথায় আমরা বাঙালী যে-রকম মাছ দিয়ে পঁয়ষট্টি রকমের ভেল্কি-বাজি দেখাই, এরাও তেমনি মাংস দিয়ে নিপুণ বোল চিকন কাজ দেখাতে জানে।

আমার মনে সন্দেহ জাগছে বাঙালী রমণীরা লন্ডনে এসব রান্না রাঁধবেন

www.BanglaBook.org

কী করে?

কিংবা পার্সীদের ধনে-শাক? উপাদেয় বস্তু।

মাছের রাজা আমরা, কিন্তু ভৃগুকচ্ছ নগরের পার্সীদের রান্না ইলিশ-মশালাও ত ফেলনা নয়। মাছটিকে ঠিক মধ্যিখানে লম্বালম্বি কেটে ফাঁকা জায়গাটা সবুজ পেশা মশলা দিয়ে ভরে গোটা মাছটাকে কলাপাতায় মুড়ে আগুনে সেঁকা হয়। তিনখানা আড়াই-সেরী আস্ত ইলিশ খেয়েও আপনার পেটের অসুখ করবে না, এর বাড়া কী প্রশংসা আছে বলুন?

গুজরাতীদের পতৌড়ি। ঘোলের ভিতর বেসন ভিজিয়ে রাখবেন রাত্রি বেলা। সকালে তাই দিয়ে চাপাটির মত পাতলা রুটি বানাবেন, তেলে ভেজে নিয়ে ফালি ফালি করে কেটে 'রোল অপ' করে নেবেন। মুখে দিলে মাখনের মত মিলিয়ে যাবে। নিরামিষের ভিতর এ-রকম মুখরোচক বস্তু এ-ভারতে কমই আছে। মিষ্টির ভিতর শ্রীখণ্ড এবং দুধ-পাক।

মারাঠীদের দহি-ভাত। বেহারীদের আচার। তামিলদের মালে-গাটানি সুপ, রসম, ইডলি-ডোসে। কাশ্মীরীদের বসন্ত ঋতুর বাচ্চা ভেড়ার কাবাব। পাঞ্জাবীদের হালুয়া, লস্‌সী; আরও কত প্রদেশের কত অনবদ্য 'অবদান'!

ক্রিকেট-টীমে আর রন্ধন-টীমে কোনও তফাত নেই। ক্রিকেটে এগার জন নাইডু পাঠানো হয় না—তা তিনি যত ভাল ব্যাট্‌স্‌ম্যানই হোন না কেন। ফাস্ট মিডিয়ম স্লো গুগলি বোলার, উত্তম উইকেট কীপার, এমন কী, না-ব্যাট্‌স্‌ম্যান না-বোলার সুধমাত্র ফীল্ডার (যথা ভাইয়া) দু-একজন রাখতে হয়।

অতএব এই রন্ধন-যজ্ঞে ভারতের সর্ব প্রদেশ থেকে বহুতর ভীমসেনকে পাঠাতে হবে।

'বাঁশবনে—'

প্যারিসের এক সুবিখ্যাত 'গুর্মে' অর্থাৎ 'খুশখানেওলা' বা ভোজনরসিক একবার তুর্কীতে বেড়াতে যান। ইয়োরোপে উত্তম ভোজনের মক্কা-মদীনা যে রকম প্যারিস, এশিয়া আফ্রিকায় সেই রকম তুর্কী। অন্তত ইয়োরোপীয়দের বিশ্বাস তাই—যদিও আমার ব্যক্তিগত ধারণা প্রাচ্যদেশীয় ভোজন-মক্কা তুর্কী নয়—দিল্লী, লখনউ, আগ্রা। কিন্তু সে-কথা থাক্‌।

প্যারিস গুর্মের কন্‌স্তুন্‌তুনিয়া (কন্‌স্টানটিনোপোল) আগমন-বার্তা সেখানকার ভোজন-রসিক-সমাজে ছড়িয়ে পড়তে বেশীদিন লাগল না। তাঁদের চক্রবর্তী যে পাশা ওই মার্গে বহুদিন ধরে সাধনার ফলে স্বর্গত মহামান্য আগা খানকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন, তিনি প্যারিসের গুর্মেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নৈশভোজনে নিমন্ত্রণ জানালেন—গুর্মেও তারই প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছিলেন।

সে-ভোজনের বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। বরঞ্চ যে এখনও ইউরোপীয় সঙ্গীত শোনে নি, তাকে বেটোফেন সমঝাতে আমি রাজী আছি।

গুর্মে পরের দিনই প্যারিস রওয়ানা দিলেন। তাঁর তীর্থদর্শন সমাপন হয়েছে—তিনি ত আর সিন্‌সোফিয়া মসজিদ দেখতে কন্‌স্তুন্‌তুনিয়া আসেন

www.BanglaBook.org

নি।

প্যারিসে ফিরে যাওয়া মাত্রই সেখানকার গুর্মে-সমাজ তাঁকে শুধালে, 'কী রকম খেলে?'

তিনি বললেন, 'অপূর্ব, অপূর্ব! এ-রকম খানা এ-জন্মে কখনও খাইনি। তুর্কী গিয়ে আমার উদর ধন্য হয়েছে, আমার রসনা তার চরম মোক্ষলাভ করেছে।'

একপ্রকার বহুবিধ উচ্ছ্বসিত প্রশংসার পর তিনি কিঞ্চিৎ তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করলেন। তার পর বললেন, 'কিন্তু...'

সবাই বললে, 'কিন্তু...?'

'পদ ছিল বড্ড বেশী।'

ভোজন-মার্গে যাঁরা মন্ত্রসিদ্ধ তাঁরাই শুধু এ-বাক্যের অর্থ বুঝতে পারবেন।

কেউ কখন বলে, 'ওঃ, যা খাইয়েছে! ডাল ছিল চার রকমের, পোলাও ছিল পাঁচ রকমের, অমুক ছিল তমুক রকমের—'

তখন আমার ভুরু ইঞ্চিখানেক উপরের দিকে ওঠে।

চার রকমের ডাল? লোকটা কি তবে জানে না তার বাড়িতে কোন্ ডাল সবচেয়ে ভাল রান্না হয়? আর চার রকমের ডাল এবং পাঁচ রকমের পোলাও-ই যদি আপনি খান তবে রসগোল্লা সন্দেশে পৌঁছবেন কী করে? যদি বলেন, 'রুচির পার্থক্য রয়েছে, তাই চার রকমের ডাল', তবে শুধাই সার্থক কবি সুন্দরীর বর্ণনাকালে কি পঁচিশটা বিশেষণ দিয়ে বলেন, 'রুচি-মাফিক তোমরা বিশেষণটা বেছে নাও' কিংবা চিত্রকর হনুমানের ছবি আঁকার সময় তাঁর পশ্চাদ্দেশে পাঁচটা পাঁচ রকমের ন্যাজ এঁকে দিয়ে বলেন, 'পছন্দ-সই তোমার ন্যাজটা বেছে নাও।'

কাগজে পড়েছি ডাচেস অব উইনজার কখনও সূপ খেতে দেন না। ডিনারের অবতরণিকায় গাদা-গুচ্ছের তরল বস্তু পেটে ঢুকিয়ে দিলে বাদ-বাকী পদ মানুষ ভাল করে খাবে কী করে? অতিশয় হক্ কথা। আমার ভাল পাচক নেই বলে আমি পারতপক্ষে কাউকে নিমন্ত্রণ করি নে। যদিস্যাৎ করি, তবে ছোট্ট একটি টমাটো ককটেল দিই (শেরির গেলাস ভর্তি টমাটো রস এবং দশ ফোঁটা 'মাগ্‌গী' —তদভাবে উস্টাস সস্+চার ফোঁটা তাবাস্কো সস্—তদভাবে চীনা চিলি সস্ —তদভাবে একটি চিমটি লাল লঙ্কাগুঁড়ো+প্রয়োজনীয় নুন। এসব ভাল করে মিশিয়ে খুশবায়ের জন্য উপরে অতি সামান্য গোল-মরিচের গুঁড়ো ভাসিয়ে দেবেন)। এটা খাদ্য নয়—ক্ষুধা-উত্তেজক মাত্র।

তবে রেস্তরাঁর কথা আলাদা। কারণ রেস্তরাঁয় তাবৎ ষোলটি পদ খাবার জন্য কেউ পীড়াপীড়ি করে না। ভোজে আপনি পদের শেষ পদ স্কিপ্ করতে থাকলে গৃহস্বামী তথা অন্য নিমন্ত্রিতেরা সন্দ করবেন, আপনি একটা স্নব্। রেস্তরাঁয় সে-আশঙ্কা নেই।

এবং ভাল রেস্তরাঁতে আ লা কার্তের ষোলটি পদ থাকার পরও গোটা তিনেক তাব্‌ল দোৎ (tuble d'hote) বা ফিক্‌স্‌ড্ দামে ফিক্‌স্‌ড্ পদের ভোজন থাকে। যেমন মনে করুন দু টাকাতে আছে (১) সেলেরি সূপ, (২) রোস্ট মাটন, (৩) পুডিং; আড়াই টাকাতে, (১) সেলেরি সূপ, (২) বয়েল্‌ড

www.BanglaBook.org

ফিস, (৩) রোস্ট মাটন, (৪) পুডিং ; এবং তিন টাকাতে আছে (১) সেলেরি সুপ, (২) বয়েল্ড ফিশ্, (৩) রোস্ট চিকেন্, (৪) পুডিং কিংবা আইসক্রীম।

এই তাব্‌ল্ দোৎ বাতলে দেবার প্রধান উদ্দেশ্য ডোমকে বাঁশ-বাছতে সাহায্য করা। বিশেষ করে এই সাহায্যের প্রয়োজন মহিলাদেরই বেশী। ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন, মহিলারা মেনু কার্ড অর্থাৎ আ লা কার্ত হাতে নিলে পুরুষদের কী হয়। এই ফাঁকে মর্নিং ওয়াক সেরে এসে দেখবেন, ম্যাডাম তখনও মনস্থির করতে পারেন নি কোন্ সুপ তাঁর বিম্বাধর ছুঁয়ে কম্বু কণ্ঠ পেরিয়ে লম্বোদরে বিলম্বিত হবেন। ইতিমধ্যে ওয়েটারের দাড়ি গজিয়ে গিয়েছে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘড়ির কাঁটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছে—অবশ্য আসলে তা নয়, ইতিমধ্যে পাকা চব্বিশ ঘণ্টা পেরিয়ে গিয়েছে।

দা-ঠাকুরের পাইস-হোটেলে মেনু বাছতে আমাদের কোনও অসুবিধে হয় না। কখন তেতো খেতে হয় আর কখনই বা টক, সে-তত্ত্ব আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি। আমাদের সময়ে পাইস হোটেলে তাব্‌ল্ দোৎও থাকত। ওই জিনিস সে-দিন রান্না হয়েছে লাটে ; কাজেই সেইটে সেদিন অর্ডার দিলে ভোজনপর্ব সমাধান হত সস্তায়।

সায়েবী হোটেলে গিয়ে আমরা পড়ি বিপদে। সে-রেস্তরাঁ যদি আবার ঐয়াসিক হয়, তবে প্রায় সমস্ত মেনুখানাই লেখা থাকে ফরাসী ভাষায়। 'বাছুরের কাটলেট' নাম দেখে আপনি হিন্দুসন্তান আঁতকে উঠলেন, কিন্তু ওইটেই হয়ত খেতে দেখলেন আপনার মুসলমান বন্ধুকে। শুধালেন, 'কী বস্তু?' বললে, 'এস্কালপ্ দ্য ভো ভিয়েনোওয়াজ'—তাতে বাছুরের নাম-গন্ধ নেই, 'ভো' যে বাছুর আপনি জানবেন কী করে? আপনি তাই দিব্যি অর্ডার দিয়ে বসলেন। রেস্তরাঁ যদি আরেক কাঠি সরেস হয়, তবে ওই বস্তুরই নাম পাবেন জর্মনে—'ভিনার স্নিৎসেল্'। 'স্নিৎসেল' অর্থ 'এস্কালপ', তার মানে ইংরেজীতে 'স্ক্যালপ', সোজা বাংলায়, 'মাংসের টুকরো'। ওটা কিসের মাংস তার কোনও হদিস ওতে নেই। শুয়োরেরও 'স্নিৎসেল্' হয়, চীনদেশে হয়ত কুকুরেরও হয়। শুনেছি, আমাদের মুনিঋষিরা গণ্ডার খেতেন। অনুমান করি, তাঁরা তাহলে গণ্ডারের 'স্নিৎসেল' খেতেন।

আমি ইংরেজী জানি নে। মুসলমান মুরুব্বীদের কাছে শুনেছি, শুয়োরের মাংসের নাম ইংরেজীতে 'পর্ক' এবং ওটা খাওয়া মহাপাপ। তাই 'পর্কচপ' না খেয়ে আশ্বস্ত হতুম, ধর্মরক্ষা করেছি। তার পর একদিন আবিষ্কার করলুম, 'হ্যাম', 'বেকন' শুয়োরের মাংস, এমন কী ওই মাংসের কটলেট, সসেজও হয়—এবং মেনুতে তার উল্লেখও থাকে না। আবিষ্কারের পর অহোরাত্র জলস্পর্শ করি নি এবং মোল্লাবাড়িতে গিয়ে 'তওবা' অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত করেছিলুম। মোল্লা সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন 'অজান্তে খেলে পাপ হয় না।' কিন্তু আমার পাপিষ্ঠ মন চিন্তা করে দেখলে, অজান্তে খেলেও স্বাদে ভাল লাগতে পারে!

কিন্তু ইংরেজী রেস্তরাঁ বাবদে আমার আপনার বিশেষ কোন দুশ্চিন্তা নেই। বন্ধুবান্ধবদের ভিতর আকছারই দু-একজন বিলেত-ফেরতা থাকেন। মেনু সম্বন্ধে তাঁদের সুগভীর জ্ঞান দেখাবার মোকা পেয়ে তাঁরা বিমলোল্লাস অনুভব করেন, আমরাও উপকৃত হই। তদুপরি 'বয়' যখন বিল হাজির করে, তখন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি হঠাৎ জানলা দিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করতে থাকি—এটিকেট-দুরস্ত বিলেত-ফেরতাকেই এক্ষেত্রে বিল শোধ করতে হয়। উদাস, ভাবালু হওয়ার ভান করতে পারলে বিস্তর লাভ।

বাঙালীর দুর্বলতা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বা ইংলিশ্ রান্নার প্রতি নয়—তার প্রাণ ছোঁক ছোঁক করে মোগলাই রান্নার জন্য। কিন্তু মেনু পড়তে জানে না বলে যা-তা অর্ডার দিয়ে বসে এবং নিতান্ত পয়সা ঢেলে দিয়েছে বলে সেটা যখন অতি অনিচ্ছায় খায়, তখন দেখতে পায়, পাশের টেবিলে এক ভাগ্যবান ঠিক সেই সেই জিনিসই পরম পরিতোষ সহকারে খাচ্ছে, যে-সব খাবার সৎ-কামনা নিয়ে সে রেস্তরাঁয় এসেছিল।

একেই বলে অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস!

জীবনের মেজর ট্র্যাজেডি বা 'অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে'র নিঘণ্টু যদি দিতে হয়, তবে আমার প্রথম যৌবনের প্রথমা প্রিয়া যে আমাকে জিল্‌ট করেছিলেন সেটার উল্লেখ আমি করব না, কিন্তু এটার উল্লেখ অতি অবশ্য করব। সুখাদ্যের জিল্‌টিং ভোলার জন্য একটা জীবন যথেষ্ট দীর্ঘ নয়।

বাঙালী-রান্না বললে কী বোঝায় সেটা আমরা মোটামুটি জানি, কিন্তু সব বাঙালী-রান্না এক রকম নয়। পুব আর পশ্চিম বাংলার রান্নাতে এন্তার তফাত। পুবের রান্নাতে ঝালের প্রাচুর্য, পশ্চিমের রান্নাতে চিনি। কে যেন বলেছিল, 'মাই মোটর কার ইজ সাউণ্ড ইন্ এভ্‌রি পার্ট একসেপ্‌ট ইন দি হর্ন'—ঠিক সেই রকম পশ্চিম-বাংলার রান্নাতে 'সুগার ইন্ এভ্‌রিথিং এক্‌সেপ্‌ট্ ইন্ রসগোল্লা।'

সব মোগলাই রান্না এক রকমের নয়। কলকাতায় এই কয়েক বছর পূর্বেও প্রচলিত ছিল একমাত্র 'কলকাত্তাই মোগলাই' রান্না। হালে 'লাহোরী মোগলাই'ও প্রচলিত হয়েছে। দেশ-বিভাগের পর লাহোর-পিণ্ডির 'শেফ'রা দিল্লির কনট সার্কাসে এসে 'পাঞ্জাবী মোগলা'ই রান্না প্রবর্তন করেন (দিল্লীর মোগলাই এখন চাঁদনী চৌকে আশ্রয় নিয়েছে) এবং তারই ব্রাঞ্চ এখন কলকাতা এসে পৌঁছেছে।

এ রান্নার বৈশিষ্ট্য তিনটি জিনিসেঃ—

(১) আফগানী নান্! কলকাতার আদিম ও অকৃত্রিম নান্ রুটির (ফার্সীতে 'নান্' শব্দেরই অর্থ রুটি—'নান্‌রুটি' তাই হুবহু পাঁউরুটির মত, কারণ পর্তুগীজ 'পাঁউ শব্দের অর্থ রুটি) সঙ্গে এর অতি অল্প মিল। আফগানী নান্ দৈর্ঘ্যে প্রায় এক হাত এবং আকারে অনেকটা সিংহল-দ্বীপের ন্যায়। রুটির পাশগুলো মোলায়েম, মধ্যিখানটা বিস্কুটের মত ক্রিস্‌প্ (ওই দিয়ে ভোজনের শেষ অঙ্কে দিব্যি 'চীজ্ অ্যাণ্ড বিস্‌কিট্'ও খাওয়া যায়)। এই নান্ আপনি কতখানি মোলায়েম বা ক্রিস্‌প্ খেতে পছন্দ করেন সেটা দু-চার দিন খাওয়ার পরেই খানসামাকে বলে দিতে পারবেন।

(২) তন্দুরী মাছ। মাঝারি সাইজের একটা আস্ত মাছ সাফসুতরো করে, মসলাদি মাখিয়ে তন্দুর-(আভ্‌ন) এর ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। যখন বেরিয়ে আসে তখন মনে হয়, বোধ হয় ভালমত রান্না হয় নি। কিন্তু খেয়ে দেখবেন, অপূর্ব স্বাদ! আমাদের বাড়িতে তন্দুর নেই বলে আমরা পাঞ্জাবীদের এই 'তন্দুরী ফিশ' 'অবদানটি মুক্তকণ্ঠে এবং সরস জিহ্বায় মেনে নিয়েছি।

(৩) তন্দুরী চিকেন্। এতে প্রায় কোনও মশলাই ব্যবহার করা হয় না

www.BanglaBook.org

বলে এ-জিনিস যত খুশি খান অসুখ করবে না। অতি মোলায়েম এবং উপাদেয়। আস্ত মুগীটি হাত দিয়ে ভাঙবেন, এবং হাত দিয়েই নান্ সহযোগে খাবেন—ছুরিকাঁটার পাশ মাড়াবেন না।

সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে শিক কাবাব, শামী কাবাব, বড়ী কাবাব, মিশ্রী (মিশরীয়) কাবাব অল্প অল্প খেতে পারেন। একটুখানি গ্রেভি-ওলা ভিজে বস্তুর প্রয়োজন হলে কোফ্তা-নরগিস্ (অনেকটা ডেভিলের মত) অর্ডার দিতে পারেন। আমি কিন্তু এ-পর্বে শুকনোই পছন্দ করি।

উপরোল্লিখিত এক, দুই, তিন নম্বরের জিনিস খাস কলকাত্তাই মোগলাই রেস্তরাঁয় পাবেন না। তবে শুনেছি, ইদানীং কোনও কোনও রেস্তরাঁ চাপে পড়ে রাখতে আরম্ভ করেছেন।

এবার ভেজার পালা।

মুটন পোলাও, চিকেন পোলাও, আণ্ডা পোলাও এবং মটর পোলাও। ফিশ পোলাও অল্প রেস্তরাঁয় পাওয়া যায়।

এর সঙ্গে দুনিয়ার জিনিস খেতে পারেন। কোর্মা, কালিয়া, দোলমা, রেজালা যা খুশি। যাঁরা ঝাল খেতে ভালবাসেন অথচ অসুখের ভয়ে খান না, তাঁরা 'দহী-ওলা-গোশ্ৎ'—অর্থাৎ দই-মাংস (সাধারণত মটনের হয়) খাবেন। দিল্লিওলারা যে এত ঝাল খেয়েও কাল কাটাচ্ছে তার একমাত্র কারণ, হয় দহি-ওলা গোশ্ৎ খায়, নয় খাওয়ার পর এক ভাঁড় টক দই খায়।

পেটটাকে যদি আরও ধাতস্থ রাখতে চান তবে খাবেন 'শাকওলা-গোশ্ৎ'—অর্থাৎ শাকের সঙ্গে মাংস। এটা শিখদের প্রিয় খাদ্য—যে রকম ওরা করেলার ভিতর কিমা মাংস পুরে দোলমা খায়।

আর ঝাল-ফুজী, রওগন যুষ, শাহী কুর্মা এবং লাটের মাল চিকেন কারি, কটন কারি ইত্যাদি ত রয়েছেই। ভেজিটেরিয়নদের জন্য মটর-পোলাও এবং চীজ-আলু, কিংবা চীজ-মটর কারি। তবে মাংসহীন সাদা পোলাওয়ের সঙ্গেই চীজ-মটর ঝোল মানায় বেশী।

আমি মটর-পোলাওয়ের সঙ্গে মটন কিংবা চিকেন কারি খাই ; কারণ মটন-পোলাওয়ের সঙ্গে মটর-কারিতে মটনের বাড়াবাড়ি হয়, আবার চিকেন পোলাওয়ের সঙ্গে মটন-কারিতে দুটো মাংসের ককটেলকে আমার গুবলেট বলে মনে হয়। তবে এটা নিছকই রুচির কথা। আর ভুলবেন না গ্রেভির অপ্রাচুর্য হলে, সব সময়ই ওটা আলাদা করে অর্ডার দেওয়া যায়।

সর্বশেষ উপদেশ, বয়স্ক ওয়েটারকে মেনু বাছাই করার সময় ডেকে নিয়ে তার সদুপদেশ নেবেন। না নিলে কী হয়?

এক ইংরেজ স্নব গেছেন প্যারিসের রেস্তরাঁয়। তিনি কারও উপদেশ নেবেন না। মেনুর প্রথম পদে আঙুল দিয়ে বোঝালেন কী চাই। নিশ্চয়ই সুপ। এল তাই। উত্তম প্রস্তাব।

তারপর আঙুল নামালেন অনেকখানি নীচে। ভাবলেন মাছ, মাংস আণ্ডা কিছু একটা আসবে। এল আবার সুপ। ইংরেজ জানতেন না, ফরাসীরা বাইশ রকমের সুপ রাখে।

খেয়েছে! এখন কী করা যায়? আঙুল দিলেন সর্বশেষে পদে। পুডিঙ কিংবা আইসক্রীম হবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এল খড়কে—টুথ-পেক্ !!

বাংলার গুণ না জর্মন গুণী

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের হল-করিডরে দু-পিরিয়ডের মাঝখানে লেগে যায় গোরু-হাটের ভিড়, কিংবা বলতে পারেন আমাদের সিনেমা-হলের সামনের জনারণ্য। তফাত শুধু এইটুকু যে, জর্মনরা আইনকানুন মেনে চলতে ভালবাসে বলে ধাক্কাধাক্কি চেঁচামেচি বড় একটা হয় না, করিডোরে ত রীতিমত উজোন-ভাঁটা দুটো স্রোতের মত ছেলেমেয়েরা চলে এক ক্লাস থেকে আরেক ক্লাসের দিকে, কিংবা ইউনিভার্সিটি- রেস্তরাঁর দিকে অথবা কমন-রুম পানে।

তার মাঝখানে মাঝে মাঝে হঠাৎ দেখতে পেতুম বুড়ো আইনস্টাইন, হন্ত-দন্ত হয়ে ছুটে চলেছেন ক্লাস নিতে। আলুথালু কেশ, লজ্‌ঝড় বেশ। কোন্ খেয়ালে মগ্ন ছিলেন খোদায় মালুম। শেষ মুহূর্তে টনক নড়েছে সেদিন তাঁর ক্লাস আছে—রুম নম্বর গিয়েছেন ভুলে, কী পড়াতে হবে খেয়াল নাই। ছেলেরা সমীহভরে পথ করে দিত আর বুড়ো আইনস্টাইন ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে তাবৎ ইউনিভার্সিটি-বিল্ডিং চষে বেড়াতেন আপন রুমের সন্ধানে। মুখে শুধু 'পারদোঁ, পারদোঁ' (মাফ করুন, মাফ করুন), কারণ জানেন, কলিসন লাগলে দোষ তাঁরই।

অথবা দেখতে পেতুম, অর্থশাস্ত্রের বাঘা কৌটিল্য সমবার্ট চলেছেন হেলে-দুলে। বগলে একগাদা কেতাব, তারই ধাক্কায় টাইটা একটু বেঁকে গিয়েছে, সঙ্গে গোটা দশেক শিষ্য-শিষ্যা। চলতে চলতেই পড়ানো চলছে। সমবার্ট আর কতদিন বাঁচবেন কে জানে, তাই—

ছেলেরা সব সমবার্টেরে ঘিরে
মাছি যেমন পাকা আমের চতুর্দিকে ফিরে—

তাঁর শেষ জ্ঞানবিন্দুটুকু শুষে নিতে চায়।

কিংবা দেখতুম কাঁচাপাকা চুল, একচোখ কানা সংস্কৃতের অধ্যাপক ল্যুডার্স। তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য বেদে। মোন-জো দড়ো সভ্যতা আর্য, অনার্য, না প্রাক-আর্য, তাই নিয়ে যখন ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা খুন-খারাপি করার মত অবস্থায় এসে পড়েছেন, তখন সবাই বললেন, 'মোন-জো-দড়ো বৈদিক, না প্রাক-বৈদিক, সেকথা ঠাহর করার মত এলেম মার্শালের পেটে নেই। সেখানে পাঠাও ল্যুডার্সকে। চতুর্বেদ আর সে-সময়কার আহার-বিহার, ক্ষেত-খামার, হাতিয়ার-তলোয়ার সর্ববিষয় তাঁর নখদর্পণে। মোন-জো-দড়ো সভ্যতার গোপনতম কোণেও যদি বৈদিক সভ্যতার কণামাত্র প্রভাব গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকে, তবু সে ল্যুডার্সকে ফাঁকি দিতে পারবে না—

'করাচী বন্দরে নেমেই ল্যুডার্স তার গন্ধ পাবেন, ওই একটি চোখ দিয়েই তাকে খুঁজে নেবেন আর ক্যাঁক করে ধরে দিয়ে বিশ্বজনকে দেখিয়ে দেবেন, বেদের ইন্দ্রদেব কোন্ ময়ূরের প্যাখম পরে সেখানে ঘাপটি মেরে বসে আছেন।

'আর ল্যুডার্স যদি বলেন, "না, বৈদিক সভ্যতার সঙ্গে মোনো-জো-দড়োর কোনও প্রকারের যোগসূত্র নেই", তাহলে নাককান বুজে সেই রায় মেনে নিয়ে

www.BanglaBook.org

তাবৎ ঝগড়া-কাজিয়ার উপর ধামাচাপা দিয়ে দাও।'

আইনস্টাইন, সমবার্ট, ল্যাডার্স এঁরা সব ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তম্ভ, তোরণ, শিখর-বিশেষ। তা ছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো শুষে নেবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীরে কত যে নাম-না-জানা ঘুলঘুলি গবাক্ষ ছিলেন তার হিসেব রাখবে কে?

এঁরা যে বিশ্ববিদ্যালয়-যজ্ঞশালার প্রত্যন্ত প্রদেশে অনাবৃত উপেক্ষিত ছিলেন তা নয়, কিন্তু এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ হতে সময় লাগত একটু বেশী। এঁদেরই একজন ছিলেন, অধ্যাপক ভাগনার, ইনি পড়াতেন বাংলা ভাষা।

জর্মন ভাষা বিশ্ববরেণ্য ভাষা। সে-ভাষা পড়াবার জন্য কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ব্যবস্থা আছে কিনা জানি নে, কিন্তু বাংলার মত অর্বাচীন ভাষা পড়াবার ব্যবস্থা যে সুদূর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে, এ-সংবাদ শুনে পুলকিত হয়েছিলুম।

ভাগনারের সঙ্গে আলাপ হতেই তিনি তাঁর বাড়িতে আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন। যথেষ্ট বঙ্গভাষাভাষীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয় নি বলে তিনি কথা কইলেন জর্মন ভাষায়, মাঝে মাঝে বাংলা মসলার ফোড়ন দিয়ে। অদ্ভুত শোনাল, কিন্তু সেই নির্বান্ধব পাণ্ডববর্জিত দেশে বিদেশীর মুখে বাংলা শুনে জানটা যে তর হয়ে গেল, সে-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই!

ভাগনারের বাড়ি গিয়ে দেখি, ভদ্রলোক একখানা বাংলা বই নিয়ে ধস্তা-ধস্তি করছেন। ডাইনে বাঁয়ে বিস্তর বাংলা অভিধান, ব্যাকরণ—এক পাশে বোট্‌লিঙ্ক-রোটের পর্বতপ্রমাণ সংস্কৃত-জর্মন অভিধান।

বাংলা অভিধানে হদিস না মিললে সংস্কৃত দিক-সুন্দরীর (ডিক্সনারি) নিকট দিক্‌দর্শন যাচঞা করবেন বলে।

ভূমিকা না করেই বললেন, 'আমায় একটু সাহায্য করুন।'

এতদিন পর আজ আর ঠিক মনে নেই কিন্তু খুব সম্ভব গল্পটা ছিল শরৎ চাটুয্যের 'আঁধারে আলো'। 'হাবুবাবু ছোরা চালাতে শিখেছে' এইরকম ধারা কী জানি কী একটা ছিল। যোগরূঢ়ার্থে 'নীলকণ্ঠ' শিব এ-কথা ভাগনার জানতেন কিন্তু 'হাবুবাবু' যোগরূঢ়ার্থে যে শান্ত-শিষ্ট গোবেচারী—নিন্‌কমপুপ—সে কথাটার সন্ধান ভাগনার কোথাও পান নি, অবশ্য আভাসে-আন্দাজে শব্দটার খানিকটে মানে আন্দাজ করে নিতে পেরেছিলেন।

কিন্তু ভগবান দেখলুম তাঁর ওয়াটার্লুতে এসে ঠেকেছেন, সেই গল্পের মধ্যে বিদ্যাপতির এক উদ্ধৃতিতেঃ—

"আজু রজনী হম ভাগে পোহাইনু
পেখনু পিয়া-মুখ চন্দা
জীবনযৌবন সফল করি মাননু
দশদিশ ভেল নিরানন্দা—"

আজু-ফাজু, পেখনু-টেখনু খাঁটি বাংলা কথা নয়, কিন্তু হুঁশিয়ার ভাগনার কেঁদে-কেকিয়ে এসব কথার মানে বেশ কিছুটা রপ্ত করে ফেলেছেন, কিন্তু নিরানন্দা' কথায় এসে যে মানে তিনি করেছেন, সেটা মন মেনে নিলেও হৃদয় নিরানন্দা'ই থেকে যায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভাগনার বললেন, 'তবে কি এই বুঝতে হবে, প্রিয়মুখচন্দ্র দর্শন করাতে আমার এতই আনন্দ হল যে, মনে হচ্ছে দশদিশ নিরানন্দ হয়ে গিয়েছে, কারণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল আনন্দ আমাতে এসে ঠাঁই নেওয়ায় "দশদিশ নিরানন্দ" হয়ে গিয়েছে?

অভিনবগুপ্তের না হোক, অভিনব টীকা তো বটেই।

সবিনয়ে বললুম, বিদ্যাপতি বিনা টীকায় পড়ার মত বিদ্যা আমার নেই তবে যতদূর মনে পড়ছে, কথাটা এখানে 'নিরানন্দ' নয়, আসলে আছে বোধ হয় 'নিরদ্বন্দ্ব'। আমাতে প্রিয়াতে মিলন হয়েছে ঐক্য হয়েছে, দশদিশে আমি আর কোনও দ্বন্দ্ব দেখতে পাচ্ছি নে। যেখানে যত দ্বন্দ্ব অর্থাৎ বিরহ ছিল সেখানেই মিলন এসে গিয়েছে—দশদিশে এখন শান্তি।

আর বেদেও ত ঋষি প্রার্থনা করেছেন, "সর্বপ্রকারের দ্বন্দ্বের সমাধান হোক।"

ভাগনার বললেন, উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু ছাপার ভুল হতে যাবে কেন?

এর কোনও সদুত্তর আমি দিতে পারি নি। আপনারা যদি বাতলে দেন। ঘটনাটি যে এত সবিস্তর বয়ান করলুম তার 'মরাল' কী?

সুকুমারী ভাষায় বলিঃ—

'হাসতে হাসতে যারা হচ্ছে কেবল সারা
রাম্‌গরুড়ের লাগছে ব্যথা
বুঝছে না কি তারা?'

প্রকাশক আর ছাপাখানা যে 'নিরদ্বন্দ্ব' হয়ে ছাপার ভুল করেই যাচ্ছেন, 'ভাগনারেরই লাগছে ব্যথা, বুঝছে না কি তারা??'

শিক্ষা-প্রসঙ্গে

কিছুকাল আগে বোম্বায়ে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণণ বলেন এদেশের সবচেয়ে বড় কর্তব্য আপামরজনসাধারণের ভিতর শিক্ষার প্রচার ও প্রসার করা এবং বেকার-সমস্যার নিরঙ্কুশ সমাধান করা।

এ অতি সত্য কথা—এমন কি পৃথিবীর বর্বরতম দেশও এ-তত্ত্ব মেনে নেবে। কিন্তু প্রশ্ন, শিক্ষার বিস্তার এবং প্রসার করা যায় কী প্রকারে? পূর্ববঙ্গে একটি প্রবাদ আছেঃ—

'যত টাকা জমাইছিলাম
শুঁটকি মাছ খাইয়া
সকল টাকা লইয়া গেল
গুলবদনীর মাইয়া।'

যত রকমের খাজনা হতে পারে, যত প্রকারের ন্যায্য অন্যায্য ট্যাক্স হতে পারে সবই ত চাঁদপানা মুখ করে দিচ্ছি। সরকারের হাতে সে-টাকা জমা হচ্ছে এবং তার বেবাক খরচ হয়ে যাচ্ছে এ-খাতে ও-খাতে সে-খাতে, অর্থাৎ গুলবদনীর মাইয়াই সব টাকা নিয়ে যাচ্ছে, শিক্ষা-বিস্তারের জন যে-অর্থের প্রয়োজন তার শতাংশের এক অংশও উদ্বৃত্ত থাকছে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাজেই গ্রামে গ্রামে পাঠশালা খুলি কী করে, পুরনোগুলিই বা চালু রাখি কোন্ কৌশলে?

কিন্তু আমার মনে হয় পুরনো স্কুল চালু রাখা আর নূতন স্কুল খোলাই শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রধান কর্ম নয়।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা দিয়েছে, কোন বিশেষ গ্রামে গত পঞ্চাশ বৎসর ধরে একটি ভাল পাঠশালা উত্তমরূপে চালু আছে, প্রতি বৎসর দশ বারোটি ছেলে শেষ পরীক্ষা পাস করে বেরিয়ে যাচ্ছে, কেউ কেউ বৃত্তিও পাচ্ছে, কিন্তু তবুও যে-কোনও সময় আপনি সে-গ্রামে গিয়ে যদি হিসেব নেন, কটি ছেলে লিখতে পড়তে পারে, তবে দেখবেন দশ-বারোটির বেশী না : বাদবাকী আর সবই লেখা-পড়া ভুলে গিয়েছে এবং যে দশ-বারোটি কেঁদে-কেকিয়ে পড়তে পারে তারাও শীঘ্রই সম্পূর্ণ নিরক্ষর হয়ে যাবে। অবশ্য আমি এস্থলে সাধারণ চাষা-মজুরের কথাই ভাবছি—মধ্যবিত্ত কিংবা বিত্তশালী পরিবারের কথা উঠছে না।

এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখতে পাবেন—আমরা চাষার ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে দিয়ে ভাবি আমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এ কথা ভাবি নে, তারা পরীক্ষায় পাস করার পর পড়বে কী! তারা যে পুনরায় নিরক্ষর হয়ে যায় তার একমাত্র কারণ তাদের কাছে পড়বার মত কিছু থাকে না।

ইয়োরোপের চাষা-মজুর আমাদের মত গরিব নয়। তারা যে নিরক্ষর হয়ে যায় না, তার একমাত্র কারণ তারা খবরের কাগজ পড়ে এবং মেয়েরা ক্যাথলিক হলে প্রেয়ার বুক আর প্রটেস্টাণ্ট হলে বাইবেল পড়ে। অবসর সময়ে হয়ত একখানা নভেল কিংবা ভ্রমণ-কাহিনী পড়ে, কাজ না থাকলে হয়ত তারা চিঠি-চাপাটিও লেখে, কিন্তু এগুলো আসল কারণ নয়—আসল কারণ খবরের কাগজ, প্রেয়ার বুক এবং বাইবেল।

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আমাদের চাষা খেতে পায় না, সে খবরের কাগজ কিনবার পয়সা পাবে কোথায়?

তাই দেখতে পাবেন, যে-চাষা কোন গতিকে তার ছেলেকে পাঠশালা পাসের সময় একখানা রামায়ণ কিংবা মহাভারত কিনে দিতে পেরেছিল তার বাড়িতে তবু কিছুটা সাক্ষরতা বেঁচে থাকে। এই আংশিক বাঁচাওতাটা কিন্তু প্রধানত বাংলা দেশে। হিন্দীভাষীদের তুলসী রামায়ণ পড়ে সে-লাভ হয় না, কারণ তুলসীদাসের ভাষা আর আধুনিক হিন্দীতে প্রচুর তফাত। তুলসীদাসের ভাষা দিয়ে আজকের দিনে চিঠি লেখা যায় না—কাশীরাম কিংবা কৃত্তিবাসের ভাষার সঙ্গে কিন্তু আধুনিক বাংলার খুব বেশী পার্থক্য নেই।

তাই দেখতে পাবেন মুসলমান চাষা পাঠশালা পাসের পর খুব শিগগিরই নিরক্ষর হয়ে যায়, কারণ সে রামায়ণ মহাভারত পড়ে না এবং বাংলা ভাষায় এ-রকম ধরনের সহজ সরল মুসলমানী ধর্মপুস্তক নেই। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে পরিস্থিতিটা কী রকম তার খবর আমার জানা নেই, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এর পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করলে আমরা শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিস্তর হদিস পাব।

তা হলে ওষুধ কী?

যে-উত্তর সকলের প্রথম মনে আসবে সে হচ্ছে, গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরি

www.BanglaBook.org

বসানো। কিন্তু অত টাকা যোগাবে কোন্ গৌরী সেন? সরকার ত দেউলে। তা হলে?

এইখানে এসে আমিও আটকা পড়ে যাই। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি নূতন ইস্কুল খোলার চেয়েও বড় কাজ, পড়ার জিনিস সাক্ষর ছেলেমেয়েদের হাতে দেওয়া—বিনি পয়সায় কিংবা অতি অল্প দামে।

আমি বহু বৎসর ধরে এ-সমস্যা নিয়ে মনে তোলপাড় করেছি, বহু গুণীর সঙ্গে আলোচনা করেছি, দেশ-বিদেশে উন্নত অনুন্নত সমাজে অনুসন্ধান করেছি—তারা এ-সমস্যার সমাধান কী প্রকারে করে, কিন্তু কোন ভাল ওষুধ এখনও খুঁজে পাই নি। আমার পাঠকেরা যদি এ-সম্পর্কে তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত আমাকে জানান, তবে তার আলোচনা করলে আমরা লাভবান হব সন্দেহ নেই।

অন্য এক বক্তৃতায় শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণণ বলেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কর্তব্য ছাত্রদের 'স্পিরিচুয়াল' ডিরেক্‌শান্ দেওয়া।

আমার মনে হয়, এইমাত্র আমরা যে-সমস্যা নিয়ে বিব্রত হয়েছিলুম সে সমস্যারই এ আরেকটা দিক।

'স্পিরিচুয়াল' বলতে শ্রীরাধাকৃষ্ণণ নিশ্চয় 'রিলিজিয়ান' বলতে চান নি—তাহলে হাঙ্গামা অনেকখানি কমে যেত—তাই মোটামুটি ধরা যেতে পারে, তিনি আমার প্রয়োজনের দিকটাতেই ইঙ্গিত করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান কর্ম ছাত্রকে তার দেশের বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করা এবং এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ভারতীয় বৈদগ্ধ্যে আত্মার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য প্রয়োজনের অধিক সুস্বাদু আহার্য রয়েছে। কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে, অধ্যাপকেরা যদি ছাত্রকে ভারতীয় বৈদগ্ধ্যের প্রতি অনুসন্ধিৎসু করতে পারেন, সে-বৈদগ্ধ্যের উত্তম উত্তম বস্তুর রসাস্বাদ করাতে শেখান, তবে ছাত্র নিজের থেকেই তার প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক ধন চিনে নিতে পারবে। সকলেরই কাজে লাগবে এমন মুষ্টিযোগ যখন মুষ্টিগত নয়, তখন ছাত্রের সামনে গন্ধমাদন রাখা ছাড়া উপায় নেই—যে যার বিশল্যকরণী বেছে নেবে।

কিন্তু সমস্যা তৎসত্ত্বেও গুরুতর। ছেলেদের পড়তে দেব কী? ভারতীয় বৈদগ্ধ্যের শতকরা পঁচানব্বই ভাগ সংস্কৃত-পালিতে, তিন ভাগ ইংরেজীতে, আর মেরে কেটে দুভাগ বাংলায়। অথচ আজকের দিনে সব ছেলেকে ত আর জোর করে বি. এ. অনার্স অবধি সংস্কৃত পড়াতে পারি নে। এবং তাতেই বা কী লাভ? কজন সংস্কৃত অনার্স গ্রাজুয়েটকে অবসর সময়ে সংস্কৃত বইয়ের পাতা ওল্টাতে আপনি আমি দেখেছি? সংস্কৃত গড় গড় করে পড়া শিখতে হলে টোল ছাড়া গত্যন্তর নেই।

অতএব মাতৃভাষাতেই আমাদের বৈদগ্ধ্যচর্চা করতে হবে!

এবং সেখানেই চিত্তির। আজ যদি আপনি বেদ, উপনিষদ, ষড়দর্শন, কাব্য, অলঙ্কার, নৃত্যনাট্য-সঙ্গীতশাস্ত্র বাংলা অনুবাদে পড়তে চান তবে একবার ঘুরে আসুন কলেজ স্কোয়ারে বইয়ের দোকানগুলোতে। যে-সব বইয়ের বাংলা অনুবাদ হয়ে গিয়েছে সেগুলোই যোগাড় করতে গিয়ে আপনাকে চোখের জলে নাকের জলে হতে হবে।

www.BanglaBook.org

আর কত শত সহস্র পুস্তক যে আপনার পড়তে ইচ্ছা হবে, অথচ অনুবাদ নেই তার হিসেব করবে কে?

হিন্দীওয়ালাদের ত আরও বিপদ। আমাদের চেয়ে ওদের অনুবাদ-সাহিত্য অনেক বেশী কম-জোর; এই দিল্লির কনট সার্কাসে আমি হিন্দী বইয়ের দোকানে সার্কাসের ঘোড়ার মতই চক্কর লাগাই—আজ পর্যন্ত কোন সংস্কৃত বইয়ের উত্তম হিন্দী অনুবাদ চোখে পড়ল না, যেটি বাড়িতে এনে রসিয়ে রসিয়ে পড়ি।

মারাঠী ভাষায় তবু কিছু আছে, গুজরাতীতে তারও কম। আসামীতে প্রায় কিছুই নেই, ওড়িয়ার খবর জানি নে—তবে যেহেতু শিক্ষিত আসাম এবং উড়িষ্যা-সন্তান মাত্রই বাংলা পড়তে পারেন তাই তাঁদের জন্য বিশেষ দুশ্চিন্তা করতে হবে না।

মোদ্দা কথায় ফিরে যাই। রাধাকৃষ্ণণ ত দায় চাপিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর অর্থাৎ অধ্যাপকদের উপর। কিন্তু হায়, তাঁদের ত দরদ নেই এসব জিনিসের প্রতি। আর স্বয়ং রাধাকৃষ্ণণের যদি দরদ থাকত তবে তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয় ছেড়ে উপরাষ্ট্রপতি হতে গেলেন কেন??

পোলেমিক

কলকাতাতে বর্ষা বসন্ত আছে বটে, কিন্তু তাতে করে কলকাতাবাসীর জীবন-যাত্রায় কোনও প্রকারের ফেরফার হয় না। হৈ-হুল্লোড়, পার্টিপরব, কেনাকাটা, মারামারি একই ওজনে চলে। দিল্লিতে কিন্তু ভিন্ন ব্যবস্থা। এখানে দুই ঋতু গ্রীষ্ম আর শীত। শীতকালে এন্তার দাওয়াত-নেমন্তন্ন, দিনে দশটা করে মীটিং, হপ্তায় দুটো করে আর্টপ্রদর্শনী, আজ ভরতনাট্যম, কাল কথাকলি, পরশু য়েহুদী মেনুহিন, আর এক গাদা সঙ্গীত সম্মেলন, কবিসঙ্গম, মুশাইরা। গ্রীষ্মকালে এ-সব-কিছুতে মন্দা পড়ে যায়, শুধু যে সব দেশের রাজদূতেরা বাধ্য হয়ে "রিসেপশন" দেন, আর সবাই শার্ক স্কিন আর কালো বনাতের মধ্যিখানে প্রচুর পরিমাণে ঘামেন। পার্টি-গুলোর জলুসেরও খোলতাই হয় না, কারণ ডাকসাইটে সুন্দরীরা পাহাড়-পর্বতে ঘুরতে গেছেন—পার্টিতে যদি রঙবেরঙের শাড়ির ব্যবহারই না থাকল তবে সে-পার্টি অতি নিরামিষ (নিরম্বু ত বটেই : এসব পার্টিতে জল মানা)। তাই পাঁচজন পার্টি থেকে ভদ্রতা রক্ষা করেই তাড়াতাড়ি কেটে পড়েন।

এসব হল নিউ দিল্লির কাহিনী। পুরানী দিল্লিতে কিন্তু একটা জিনিসের অভাব কখনও হয় না। প্রায় প্রতিদিনই কোনো-না-কোন নাগরিককে, অভিনন্দন করার জন্য কোন-না-কোন পার্কে তাঁবু আর শামিয়ানা খাটিয়ে, দিগধিড়িংগে লাউডস্পীকার ঝুলিয়ে যা চেল্লাচেল্লি আরম্ভ হয় তাতে পাড়ার লোক ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে—দরজা জানলা বন্ধ করে একে অন্যের সংগে কথা পর্যন্ত কওয়া যায় না।

এ-রকম একটা অভিনন্দন-পার্টিতে আমি দিনকয়েক পূর্বে গিয়েছিলুম। যে দুজনকে অভিনন্দন করা হল, আমি তাঁদের নাম শুনি নি, দিল্লীর কজন

www.BanglaBook.org

লোক তাঁদের নাম শুনেছে তাও বলতে পারব না।

দুজনারই যে প্রশস্তি গাওয়া হল, তা শুনে আমার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটি ছোট লেখার কথা মনে পড়ল। এ লেখাটি সচরাচর কেউ পড়েন না বলে উদ্ধৃতির প্রলোভন সম্বরণ করতে পারলুম না।

'কবিকুলতিলকস্য কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' এই ছদ্মনামে বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখেছেন ঃ—

'আমি এ স্থলে—নাথ বিদ্যারত্নকে নদীয়ার চাঁদ বলিলাম। কিন্তু শ্রীমতী যশোহরহিন্দুধর্মরক্ষিণীসভাদেবী—মোহন বিদ্যারত্নকে নবদ্বীপচন্দ্র অর্থাৎ নদীয়ার চাঁদ বলিয়াছেন। উভয়ই বিদ্যারত্ন উপাধিধারী, উভয়েই স্ব স্ব বিষয়ে সর্বপ্রধান বলিয়া গণ্য, বিদ্যাবুদ্ধির দৌড়ও উভয়ের একই ধরনের। সুতরাং উভয়েই নবদ্বীপচন্দ্র অর্থাৎ নদীয়ার চাঁদ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হবার যোগ্য পাত্র, সে বিষয়ে সংশয় নাই কিন্তু এ পর্যন্ত এক সময়ে দুই চাঁদ দেখা যায় নাই। সুতরাং একজন বই, দুইজনের নদীয়ার চাঁদ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উভয়ের মধ্যে একজন একবারেই বঞ্চিত হইবেন, সেটাও ভাল দেখায় না : এবং ঐ উপলক্ষে দুজনে হুড়হুড়ি গুঁতাগুঁতি করিয়া মরিবেন সেটাও ভাল দেখায় না। এজন্য আমার বিবেচনায় সমাংশ করিয়া দুজনকেই এক এক অর্ধচন্দ্র দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করা উচিত। শ্রীমতী যশোহরহিন্দুধর্মরক্ষিণীসভাদেবী আমার এই পক্ষপাতবিহীন ফয়তা ঘাড় পাতিয়া লইলে আর কোনও গোলযোগ বা বিবাদ-বিসংবাদ থাকে না। এক্ষণে তাঁর যেরূপ মরজি হয়।'

নিত্যি নিত্যি কারণে-অকারণে হৈ-হুল্লোড় করার অভ্যাস দিল্লিবাসী বাঙালীর উপরও বেশ কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছে। আজ এখানে সাহিত্য-সভা, কাল ওখানে বর্ষামঙ্গল প্রায়ই এসব 'পরব' হয়।

এবং অনেক সময় মনে হয়েছে, এ-সব পরবে সত্যকার কাজ যেন ঠিকমত হচ্ছে না।

তাই আমি চেষ্টা করেছি, ছোট গণ্ডির ভিতর অল্প সংখ্যক লোক নিয়ে প্রতি সপ্তাহে কিংবা প্রতি পক্ষে "স্টাডি সার্কাল" বসাবার, কিন্তু দুঃখের বিষয় এ-যাবৎ কৃতকার্য হতে পারি নি। আমার বয়স হয়েছে তদুপরি আমি খ্যাতনামা সাহিত্যিক নই, কাজেই আমার দ্বারা এ-জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পত্তন সম্ভবপর নয়, অথচ এর প্রয়োজন আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি।

কেন্দ্র হিসাবে দিল্লির মাহাত্ম্য ক্রমেই বাড়ছে। কেন্দ্রের হাতে অর্থ আছে এবং সে-অর্থের কিছুটা প্রাদেশিক সরকারও পান—সাহিত্য এবং সাহিত্যিকদের সেবার্থে। বাংলার প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রের কাছ থেকে বাংলা সাহিত্যের জন্য কত টাকা বাগাতে পারবেন, সে তাঁরা জানেন, কিন্তু আমরা যারা দিল্লিতে আছি, এ বাবদে আমাদেরও যথেষ্ট কর্তব্য আছে। আমরা যদি ছোট ছোট সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারি, তবে শেষ পর্যন্ত আমাদের কর্মতৎপরতা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। আজ যে বাংলা সাহিত্যের প্রতি আমাদের দরদের অভাব, তার প্রধান কারণ আমরা সাহিত্যের সত্যকার চর্চা করি নে।

তার অন্যতম জাজ্বল্যমান উদাহরণ, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও আমরা বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের জন্য কিছুই করে উঠতে পারি নি, অথচ সেখানে রুশ ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে।

www.BanglaBook.org

এদিকে আবার দিল্লিতে ব্যাঙের ছাতার মত একটা জিনিস বড্ড বেশী গজাচ্ছে। এঁরা হচ্ছেন আর্ট ক্রিটিক সম্প্রদায়। এঁরা ছবি বোঝেন, মেনুহিন শোনেন, আবার আলাউদ্দিন সায়েবকেও হাততালি দেন ; এঁরা ভরতনাট্যম আর মণিপুরী নিয়ে কাগজে কপচান, চীনা সেরামিক এবং দক্ষিণ-ভারতের ব্রোঞ্জ সম্বন্ধে এঁদের 'জ্ঞানে'র অন্ত নেই।

এঁদের একজন ত সবজান্তা হিসেবে এক বিশেষ গণ্ডিতে রাজপুত্রের আদর পান, বিলক্ষণ দু পয়সা তাঁর আয়ও হয়। তা হোক, আমার তাতে কণামাত্র আপত্তি নেই—পারলে আমিও ওঁর ব্যবসা ধরতুম।

কিন্তু আমার দুঃখ ভদ্রলোকটি বড্ডই বাংলা এবং বাঙালী-বিদ্বেষী। অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল এবং তাঁদের শিষ্য-উপশিষ্যেরা যে 'বেঙ্গল স্কুল' গড়ে তুলেছেন, সেটাকে মোকা পেলেই এবং মাঝে মাঝে না পেলেও বেশ কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দেন।

তাঁর মতে যামিনী রায়, যামিনী রায় এবং আবার যামিনী রায়। বাংলা দেশের আর সব মাল বরবাদ, রদ্দী।

ইনি যে সব 'আর্ট সমালোচনা' প্রকাশ করেন, তার সুস্পষ্ট প্রতিবাদ হওয়া উচিত। যাঁরা এসব জিনিসের সত্য সমঝদার, তাঁদের উচিত বেরিয়ে এসে আপন দেশের সুসন্তানদের কীর্তি বার বার স্বীকার করা। 'ডেকাডেন্স' বা 'গোল্লায় যাওয়া'র অন্যতম লক্ষণ আপন দেশের মহাজনকে অস্বীকার করা বা খেলো করে দেখানো।

এ-জাতীয় লেখাকে 'পোলেমিক' বলে—বাংলায় 'মসীযুদ্ধ' বলতে পারি। এবং মসীযুদ্ধে বাঙালীর পর্বতপ্রমাণ ঐতিহাসম্পদ আছে। ভারতচন্দ্রের পদ্যময় পোলেমিক, আর বাঙলা গদ্য ত আরম্ভ হল খাঁটি মসীযুদ্ধ দিয়ে। রামমোহন ত কলমের লড়াই লড়লেন, হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের গোঁড়াদের সঙ্গে। তার পরের বাঘ বিদ্যাসাগর। তিনি যে পোলেমিক লিখেছেন, সে-কথা লিখতে পারলে পৃথিবীর বড় আইনজীবী নিজেকে ধন্য মনে করবেন—অধমের মতে পোলেমিকে বিদ্যাসাগর মশাই মিলটনের বাড়া। আর মসীযুদ্ধে ব্যঙ্গ কী করে প্রয়োগ করতে হয় তার উদাহরণ ত আপনারা একটু আগে 'অর্ধচন্দ্র' দানে স্পষ্ট দেখতে পেলেন। তারপর তিন নম্বরের মল্লবীর বঙ্কিম। তিনি হেস্টি সাহেবের (নাম ঠিক মনে নেই) বিরুদ্ধে সনাতন হিন্দুধর্মের হয়ে, যে লড়াই লড়লেন সে ত অতুলনীয়। বরঞ্চ বলব, 'কৃষ্ণচরিত্র'-এর চেয়েও বড় ক্ষেত্রভাসে কাজ করেছেন বঙ্কিম এ-মসীযুদ্ধে এবং এ-সত্যও আজ স্বীকার করব যে আজ যদি কোন হেস্টি পুনরায় দেখা দেয় তবে তার সঙ্গে ও-রকম পাণ্ডিত্য আর ইংরেজী জ্ঞান নিয়ে (এখানে সাহিত্যিক বঙ্কিমের কথা হচ্ছে না—সে সাহিত্যিক যে নেই সে-কথা ইস্কুলের ছোঁড়ারা পর্যন্ত জানে) লড়বেওয়ালা আজ বাংলা দেশে নেই।

তারপর রবীন্দ্রনাথ ; তিনিও কম লড়েন নি। তবে তাঁর রুচিবোধ বিংশ শতাব্দীর ছিল বলে তাঁর লেখাতে ঝাঁজ কম, কিন্তু ইংরেজের বিরুদ্ধে লেখা চিঠিতে কী তিক্ততা, কী ঘেন্না!

গল্প শুনেছি উর্দুর কবি-সম্রাট গালিব সাহেব তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী জওক্ সাহেবের একটি দোহা মুশাইরায় (কবি-সংগমে) শুনে বার বার জওক্‌কে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তসলীম করে বলেছিলেন, 'আপনি দয়া করে ওই দুটি ছত্র আমায় দিয়ে দিন, আর তার বদলে আমি আমার সম্পূর্ণ কাব্য আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি।'

রবীন্দ্রনাথের ওই শেষ চিঠির পরিবর্তে পৃথিবীর যে কোন পোলেমিস্ট তাঁর সব পোলেমিক দিতে সোল্লাসে প্রস্তুত হবেন।

শরৎচন্দ্র যদি তাঁর মসীযুদ্ধ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে না করে সে-যুগের আর যে-কোন লোকের সঙ্গে করতেন, তবে তিনিও মসীযোদ্ধা হিসেবে নাম কিনে যেতে পারতেন।

তাঁর 'নারীর মূল্য' পোলেমিকের প্রথম চাল। বাংলা দেশ এ-পুস্তকের বিরুদ্ধে কলম ধরলে তিনি যে কী মাল ছাড়তেন, তার কল্পনা করতেও আমি ভয় পাই। ধর্মে বিবেকানন্দ পোলেমিস্ট, ব্যঙ্গ কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলাল!

এতখানি ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও কোনও বাঙালী এই সব ভুঁইফোড় 'আর্ট ক্রিটিক'দের জোরসে দু-কথা শুনিয়ে দেয় না কেন??

চরিত্র-বিচার

অঙ্কশাস্ত্রে প্রশ্ন ওঠে না, এ-বাবদে আপনার কিংবা আমার অভিজ্ঞতা কী। রসনির্মাণে ঠিক তার উল্টো। সেখানে লেখক আপন অভিজ্ঞতা থেকে চরিত্র নির্মাণ করেন, আর পাঠক আপন অভিজ্ঞতা দিয়ে সেটাকে অল্পবিস্তর যাচাই করে নেন। কিন্তু যখন কোনও জাতির চরিত্র নিয়ে আলোচনা হয় তখন সেটাকে একদিক দিয়ে যেমন অঙ্কশাস্ত্রের মত নৈর্ব্যক্তিক করা যায় না, ঠিক তেমনি সেটাকে সম্পূর্ণ নিজের অভিজ্ঞতার উপরও ছেড়ে দেওয়া যায় না। এবং তখন আবার এ-প্রশ্নও ওঠে যে-সব লোক এ আলোচনায় যোগ দিলেন তাঁদের অভিজ্ঞতা এ-বাবদে কতখানি।

আমার অতি সামান্য আছে। তাই এই ভূমিকা দিয়ে আরম্ভ করতে হল। এবং অনুরোধ, নিজের অভিজ্ঞতার দোহাই যদি মাত্রা পেরিয়ে যায় তবে যেন পাঠক অপরাধ না নেন। সেটা সম্পূর্ণ অনিচ্ছায়। 'বাঙালীচরিত্র' সম্বন্ধে যদি প্রামাণিক পুঁথি প্রবন্ধ থাকত, তবে তারই উপর নির্ভর করে আলোচনা অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারত। তা নেই। বস্তুত আমাদের অভিজ্ঞতা সীমিত হয় অন্য প্রদেশের লোক দ্বারা বাঙালী সম্বন্ধে অকৃপণ, অকরুণ মিথ্যাবাদ থেকে। যথা 'বাঙালী বড় দম্ভী', 'বাঙালী অন্য প্রদেশের সঙ্গে মিশতে চায় না'। সহৃদয় মন্তব্য যে একেবারেই শুনতে পাওয়া যায় না, তা নয়—যেমন শুনবেন, 'বাঙালী মেয়ে ভাল চুল বাঁধতে জানে', কিংবা 'ব্যবসাতে বাঙালীকে ঘায়েল করা (অর্থাৎ ঠকানো) অতি সরল'।

আমি ভারতবর্ষের সব প্রদেশেই বাস করেছি। দিল্লিতেই প্রায় চার বৎসর ছিলুম। চোখ-কান খোলা-খাড়া না রাখলেও সেখানে আপনাকে অনেক খবর অনেক গুজব শুনতে হয়।

বাঙালীর প্রতি আপনার যদি কোন দরদ থাকে তবে কিছুদিনের মধ্যেই

www.BanglaBook.org

আপনি কতকগুলি জিনিস বুঝে যাবেন।

(১) সিন্ধী পাঞ্জাবী দেশহারা হয়ে দিশেহারা হয় নি। সিন্ধীরা বোম্বাই অঞ্চলে, পাঞ্জাবীরা দিল্লি অঞ্চলে আপন ব্যবসা-বাণিজ্য দিব্য গোছগাছ ছিমছাম করে নিয়েছে। বরঞ্চ অনেক স্থলে এদের সুবিধেই হয়েছে বেশী। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। দিল্লির কনট সার্কাস থেকে মুসলমান হোটেলওয়ালারা চলে যাওয়াতে সেখানে পাঞ্জাবীরা গাদা গাদা রেস্তরাঁ খুলেছে। ফলে খাস দিল্লির মোগলাই রান্না সেখান থেকে লোপ পেয়েছে—এখন যা পাবেন সে বস্তু পাঞ্জাবী রান্না, লাহোর অঞ্চলের। (দিল্লির রান্নার কাছে সে রান্না অজ পাড়াগেঁয়ে।) এই পাঞ্জাবীদের প্রতি আমার শ্রদ্ধার অন্ত নেই। এদের কেউ কেউ পারমিট-গিরমিট ব্যাপারে আমার কাছে দৈবেসৈবে সাহায্য নিতে এসেছে—কিন্তু কখনও হাত পাতে নি। এরা যা খাটছে এবং খেটেছে তা দেখে আমি সর্বান্তঃকরণে এদের কল্যাণ এবং শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেছি।

তাই অতিশয় সভয়ে শুধুই, পূব-বাংলার লোক পশ্চিম-বাংলায় এসে অনেক করেছে, কিন্তু পাঞ্জাবী-সিন্ধীরা যতখানি পেরেছে ততখানি কি তাদের দ্বারা হয়েছে? এ বড় বে-দরদ এবং বেয়াদব প্রশ্ন। পূর্ববঙ্গবাসীরা এ প্রশ্নে আমার উপর চটে গিয়ে অনেক কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দেবেন। আমি নতশিরে সব উত্তর মেনে নিচ্ছি এবং এস্থলে আগেভাগেই বলে রাখছি, আমি তাঁদের উকিল হয়েই এ-আলোচনা আরম্ভ করেছি, তাঁদেরই সাফাই গাইবার জন্য। একটু ধৈর্য ধরুন।

(২) চাকরি যেখানে ব্যক্তিবিশেষ কিংবা ব্যবসাবিশেষের চাকরি, সেখানে সে-চাকরির মূল্য চাকুরের পক্ষে যথেষ্ট কিন্তু দেশের পক্ষে তা যৎসামান্য। কিন্তু চাকরি যখন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে হয়, তখন তার গুরুত্ব অসাধারণ। সকলেই জানেন, দেশের শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মুখে অনেকগুলো বিরাট বিরাট পরিকল্পনা রয়েছে। এ-সব পরিকল্পনা ফলবতী করার দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত বর্তায় কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের উপর।

তাই প্রশ্ন, এই সব চাকরি পাচ্ছে কজন বাঙালী? পূর্বের তুলনায় এদের উপস্থিত রেশিয়ো কী? পূর্বের তুলনা বাদ দিলেও, প্রাদেশিক জনসংখ্যার হিসাবে তারা তাদের ন্যায্য হকগত রেশিয়ো পাচ্ছে কি?

দিল্লিবাসী বাঙালীমাত্রই একবাক্যে তারস্বরে বলবেন, 'না, না, না।' পরশ্রীকাতর অবাঙালীও সে-ঐক্যতানে যোগ দেন। মনে মনে হয়ত বলেন, 'ভালই হয়েছে।' তা সে-কথা থাক্।

কেন পায় নি তার জন্য আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষ দেব না। দোষ বাঙালীর। কে কেন পারলে না, সে সাফাই গাইবার জন্যই এ-আলোচনা। একটু ধৈর্য ধরুন।

(৩) অথচ দ্রষ্টব্য, দিল্লির সাংস্কৃতিক মজলিসে বাঙালী এখনও তার আসন বজায় রাখতে পেরেছে। এই কিছুদিন পূর্বেই শম্ভু মিত্র দিল্লিতে যা ভেল্কিবাজি দেখালেন সে-কেরামতি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। অল্পের ভিতর লিটল থিয়েটার চালান চাটুয্যে। দিল্লিতে যাবতীয় চিত্র-ভাস্কর্য প্রদর্শনী হয় বাঙালী উকিলবাবুর তাঁবুতে। গাওনা-বাজনাতে বাঙাল আলাউদ্দীন সায়েব—

www.BanglaBook.org

রবিশঙ্করের কথা নাই বা তুললুম। শিক্ষাদীক্ষায় মৌলানা আজাদ সাহেব। সাহিত্যে হুমায়ুন কবীর।

ইতিমধ্যে সত্যজিৎ রায়ের তোলা 'পথের পাঁচালী' দিল্লি ছাড়িয়েও ক'হা ক'হা মুল্লুকে চলে গিয়েছে। নভেম্বরে বুদ্ধ-জয়ন্তী হওয়ার পূর্বেই হাঁকডাক পড়ে গিয়েছে, কে করে তবে 'নটীর পূজা', কাকে ডাকা যায় 'চণ্ডালিকা'র জন্য?

অর্থাৎ বাঙালীর রসবোধ আছে, অর্থাৎ স্পর্শকাতর। তাই সে সেনসিটিভ এবং অভিমানী।

আলিপুর বোমা মামলার সময় শমসুল হক্ (কিংবা ইসলাম) নামক এক-জন ইন্সপেক্টর আসামীদের সঙ্গে পিরিত জমিয়ে ভিতরের কথা বের করে ফাঁস করে দেয়। বোমারুরা তাই তার উল্লেখ করে বলত, 'হে শমসুল, তুমিই আমাদের শ্যাম, আর তুমিই আমাদের শূল।'

স্পর্শকাতরতাই বাঙালীর 'শ্যাম' এবং স্পর্শকাতরতাই তার 'শূল'। সুধ-মাত্র কিছু না দিয়ে স্টেজ সাজিয়ে নিয়ে দশটা বাঙালী তিন দিনের ভিতর যে-রকম একটা নাট্য খাড়া করে দিতে পারে অন্য প্রদেশের লোক সে-রকম পারে না। আবার যেখানে পাঁচটা সিন্ধী পারমিটের জন্য বড় সায়েবের দরজায় পঞ্চান্ন দিন ধন্না দেবে সেখানে বাঙালীর নাভিশ্বাস ওঠে পাঁচ মিনিটেই। সংসারে করে খেতে হলে ড্রিল-ডিসিপ্লিনের দরকার। আর ওসব জিনিস পারে বুদ্ধিতে যারা কিঞ্চিৎ ভোঁতা, অনুভব-অনুভূতির বেলায় একটুখানি গণ্ডারের চামড়া-ধারী।

স্পর্শকাতরতা এবং ডিসিপ্লিন এ-দুটোর সমন্বয় হয় না? বোধ হয় না। লাতিন জাতটা স্পর্শকাতর, তাদের ভিতর ডিসিপ্লিনও কম। ইংরেজ সাহিত্য ছাড়া প্রায় আর সব রসের ক্ষেত্রে ভোঁতা—তাই তার ডিসিপ্লিনও ভাল।

এ-আইনের ব্যত্যয় জর্মনিতে। চরম স্পর্শকাতর জাত মোক্ষম ডিসিপ্লিন মেনে নিলে কী মারাত্মক অবস্থা হতে পারে হিটলার তাঁর সর্বোত্তম উদাহরণ। হালের জর্মনরা তাই বলে, 'অতখানি ডিসিপ্লিন ভাল নয়।' কিন্তু এ-কথা কাউকে বলতে শুনি নি, 'অতখানি স্পর্শকাতরতা ভাল নয়।'

কোনও জিনিসেরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়, সে ত আমরা জানি, কিন্তু আসল প্রশ্ন, লাইন টানব কোথায়? জাতীয় জীবনে স্পর্শকাতরতা থাকবে কতখানি আর ডিসিপ্লিন কতখানি? কিংবা শুধাই উপস্থিত যে মেকদার বা প্রোপর্শন আছে সেটাতে বাড়াই কোন্ বস্তু—স্পর্শকাতরতা, বা ডিসিপ্লিন?

গুণীরা বিচার করে দেখবেন।

দেয়ালি

ভারতবর্ষের সর্বত্রই দেয়ালি-উৎসব হয় এবং সর্বত্রই ওই দিন আলো জ্বালানো হয়। দিল্লিতেও বিস্তর আলো জ্বালানো হয়েছিল—বহু রঙের বহু ধরনের আলো জ্বালিয়ে দিল্লিবাসীরা তাদের ভিন্ন ভিন্ন রুচির প্রকাশ দিতে চেষ্টা করেছিলেন; মোটামুটিভাবে বলতে গেলে কলকাতাতেও এই রকম রঙ বেরঙা আলো জ্বালানো হয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার কিন্তু এখনও ভাল লাগে ছোট শহরের দেয়ালি দেখতে—যেখানে বিজলী বাতি নেই। বিজলীর প্রধান দোষ মানুষ নানা রঙের প্রদীপ জ্বালাবার জন্য সহজেই প্রলুব্ধ হয় এবং তাতে যেন রুচির অভাব লক্ষ্য হয়। দ্বিতীয়ত, পিদিমের শিখার কাঁপনে কেমন যেন একটা প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়, বিজলীর নিষ্কম্প আলো বড় ঠাণ্ডা বড় নির্জীব বলে মনে হয়। তৃতীয়ত, বিজলী বাতি একবার জ্বালিয়েই খালাস, তার জন্য কোন তদারকি করতে হয় না। তাতে করে কেমন যেন জীবনস্পন্দনের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না—মনে হয় সিনেমা সাজানোর আলোই জ্বালানো হয়েছে, তবে সিনেমা-কোম্পানির অঢেল পয়সা নেই বলে রোশনাইটার খোলতাই হয় নি।

তার চেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে যখন দেখি, একটি মেয়ে তার ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে এ-পিদিমে তেল ঢালছে, ও-পিদিমের পলতে উস্কে দিচ্ছে, পিদিমের আলো তার মুখে এসে পড়েছে, ছোট ভাইকে হাতে ধরে এক পিদিম থেকে আর এক পিদিম জ্বালাতে শেখাচ্ছে, তখন মনের উপর যে-ছবিটি আঁকা হয় সে-ছবি বহু বৎসর পরে স্মরণ করেও প্রবাসীর মনে আনন্দ হয়, তার সঙ্গে খানিকটে মধুর বেদনাও এনে দেয়।

দিল্লি শহরও পিদিম জ্বালে। কিন্তু পাশের বাড়িতে বিজলী বাতির রোশনাই থাকলে পিদিমের আলো কেমন যেন ম্লান আর বে-জলুস মনে হয়। তদুপরি দিল্লির যে-সব জায়গায় পিদিম জ্বালানো হয় সে-সব জায়গার সঙ্গে আমার ত কোনও হার্দিক সম্পর্ক নেই, তাই 'অতীত প্রাণ যেন মন্ত্রবলে নিমেষে প্রাণে নাহি জাগে'।

এই দেয়ালি দেখে আরেক দেয়ালির কথা মনে পড়ে গেল। আর যে বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন তার সঙ্গে তুলনীয় বর্ণনা তিনি তাঁর দীর্ঘ কবি-জীবনে অল্পই দিতে পেরেছেন ঃ—

'কবি বলে, যাত্রী আমি, চলিব রাত্রির নিমন্ত্রণে
যেখানে সে চিরন্তন দেয়ালির উৎসব প্রাঙ্গণে
মৃত্যুদূত নিয়ে গেছে আমার আনন্দদীপগুলি,
যেথা মোর জীবনের প্রত্যুষের সুগন্ধি শিউলি
মাল্য হয়ে গাঁথা আছে অনন্তের অঙ্গদে কুণ্ডলে,
ইন্দ্রাণীর স্বয়ম্বর বরমাল্য সাথে ; দলে দলে
যেথা মোর অকৃতার্থ আশাগুলি, অসিদ্ধ সাধনা,
মন্দির-অঙ্গনদ্বারে প্রতিহত কত আরাধনা
নন্দন-মন্দারগন্ধ-লুব্ধ যেন মধুকর পাঁতি,
গেছে উড়ি মর্তের দুর্ভিক্ষ ছাড়ি।'

দেয়ালির উৎসব-আলো দেখে বার বার মনে পড়ল, জীবনের বড় বড় আনন্দদীপগুলি অনন্ত ওপারে তুলে নিয়ে চলে গিয়েছেন। হায়, কজনের জীবনে কবার তারা এপারের দেয়ালি সর্বাঙ্গসুন্দর করে জ্বালাতে পারে!!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গানের কথা : ভারত ও কাবুল

শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, কে জানিত কাবুলীও গান গায়!

কিন্তু সত্যই কাবুলী গান গাইতে আর শুনতে ভালবাসে।

কাবুলে কিন্তু লোকসঙ্গীতেরই রেওয়াজ বেশী। কাবুলে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা কম, এবং সে-সঙ্গীতে তার নিজস্ব কোনও ঐতিহ্য নেই বলে সে সম্পূর্ণ নির্ভর করে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের উপর। কাবুল শহরে যে দু-চারজন কালোয়াত আছেন তাঁরা প্রায় সকলেই উত্তর ভারতে বাস করে সদ্-গুরুর কাছ থেকে কলাচর্চা শিখে গিয়েছেন। তবে উচ্চারণের বেলায় খাঁটি হিন্দী গানে তাঁরা একটুখানি বিব্রত হয়ে পড়েন যদিও উর্দু গজল গাইতে তাঁদের তেমন কোনও অসুবিধা হয় না।

যাঁদের রেডিও আছে, তাঁরা প্রায়ই ভারতীয় কেন্দ্র থেকে আমাদের ওস্তাদী-গজল গীত শুনে থাকেন।

কাবুলীরা খাস আরবী, ইরানী বা তুর্কীস্থানী সঙ্গীত শুনে সুখ পান না।

তাই যখন খবর এল, পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর কাবুলে গান গাইতে গিয়েছেন তখন আনন্দিত হলুম। এঁর পূর্বে কজন সত্যকার ওস্তাদ কাবুলে গিয়েছেন সে-কথা আমার জানা নেই, তবে দু-চারজন গিয়ে থাকলেও ওঙ্কার-নাথ যে সেখানে রাজসম্মান পাবেন সে-বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ ছিল না।

কার্যত তাই হয়েছে।

একদা কাবুলের রাজা যে-রকম শ্রমণ হিউয়েন সাঙকে সাদর অভ্যর্থনা করেছিলেন ঠিক তেমনি কাবুলের আজকের রাজা পণ্ডিত ওঙ্কারনাথকে সহৃদয় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। রাজা জহীর শাহ পণ্ডিতজীকে বলেন, রেকর্ডে পণ্ডিতজীর সঙ্গীত শোনার সৌভাগ্য তাঁর পূর্বেই হয়েছিল ; কিন্তু মুখোমুখি তাঁর আপন কণ্ঠের গান শোনার সুযোগ তাঁর জীবনে এই প্রথম।

কাবুলীরা তাগড়া জাত ; তারা সঙ্গীতে গুরুগম্ভীর কণ্ঠ পছন্দ করে। ঠিক ওই বস্তুটিই পণ্ডিতজীর আছে—তিনি গাইতে আরম্ভ করলে সভাস্থল গমগম করতে থাকে। তিনি যে শুধু এদেশে সুখ্যাত তাই নয়, ইয়োরোপও তাঁর গলা শুনে মুগ্ধ হয়েছে। আমার এক জর্মন বন্ধু পণ্ডিতজীর 'নীলাম্বরী'তে গাওয়া 'মিতুয়া' রেকর্ডখানা বাজিয়ে বার বার আনন্দোল্লাস প্রকাশ করেন।

তাই ওঙ্কারনাথ যে কাবুলে অকুণ্ঠ উচ্চকণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করতে পেরেছেন তাতে আশ্চর্য হবার কী!

কিন্তু এই কি শেষ?

হাউই জ্বলে ছাই হয়ে যাওয়ার পূর্বে তার শিখা দিয়ে যে-লোক তার মাটির প্রদীপটি জ্বালিয়ে নেয় সে-ই বুদ্ধিমান। ওঙ্কারনাথ কাবুলে যে আতশ-বাজি দেখিয়ে দিলেন তার জের এখানেই শেষ হওয়া উচিত নয়। ওরই খেই ধরে অনেক কিছু করবার আছে।

বিদেশে কত ছাত্র ভারতীয় সরকারের বৃত্তি নিয়ে এদেশে এসে ইঞ্জিনীয়ারিং, ডাক্তারি শিখে যায়। এসব বিদ্যা আমাদের নিজস্ব নয়, ইয়োরোপের কাছ থেকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শেখা। এগুলোতে আমাদের আপন কোনও গর্ব নেই। কিন্তু কাবুলী 'শাগরেদ' যদি ভারতে এসে আমাদের নিজস্ব সঙ্গীত শিখে যায় তবে তাতে ভারতের গর্ব ষোল আনা ; এই করেই পুনরায় ভারত-আফগানিস্তানে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপিত এবং দৃঢ়ীভূত হবে। ভারত সরকারের উচিত তার সুব্যবস্থা করা—আফগানিস্তান আমাদের তুলনায় গরিব দেশ। (আরেকটা কথা ভুললে চলবে না, কাবুলে পাশ্চাত্ত্য 'জাজ' ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে ; আমরা যদি এই বেলা জোর হাতে হাল না ধরি তবে একদিন দেখতে পাব, কাবুল আর ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুনতে চায় না।)

দ্বিতীয়ত এদেশ থেকে ছাত্র কিংবা অধ্যাপক পাঠাতে হবে কাবুল গিয়ে অনুসন্ধান করতে, আমাদের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত এবং নৃত্য একদা কাবুলে কতখানি প্রচারিত এবং প্রসারিত ছিল এবং অদ্যকার পরিস্থিতিই বা কী! তাঁকে প্রস্তাব করতে হবে, কী করলে আমাদের সঙ্গীত সে-দেশে আপন অর্ধলুপ্ত গৌরব পুনরায় উদ্ধার করতে সক্ষম হবে।

এ সব কর্ম যত শীঘ্র করা যায় ততই মঙ্গল।

আমি চেষ্টা করছি, কাবুলী খবরের কাগজ থেকে পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের বিজয়-অভিযান উদ্ধার করতে।—শক্ত কাজ। দিল্লিতে ত আর কাবুলী সংবাদপত্র বিক্রয় হয় না! পেলেই কিন্তু পেশ করব॥

উনো, হিন্দী, ক্রিকেট

প্রাতঃস্মরণীয় কবিরাজ সুকুমার রায় বলেছেন,

'গোঁফকে বলে তোমার আমার—গোঁফ কি কারো কেনা?
গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা।'

অর্থাৎ মানুষ দিয়ে গোঁফের বিচার হয় না—গোঁফ দিয়ে মানুষের বিচার করতে হয়।

কথাটা আমাদের কাছে আজগুবী মনে হলেও আসলে তা নয়। চোখ খোলা রাখলে নিত্যি নিত্যি তার উদাহরণ স্পষ্ট দেখতে পাবেন। এই মনে করুন কলকাতা শহর। কী লোকসংখ্যা, কী আয়তন, কী ব্যবসা-বাণিজ্য, কী জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা—সব দিক দিয়েই কলকাতা শহর দিল্লিকে একশবার হার মানাতে পারে, কিন্তু হলে কী হয়, দিল্লী যে রাজধানী। অতএব দিল্লির মাহাত্ম্য কলকাতার চেয়ে বেশী।

অর্থাৎ রাজধানীর গোঁফ দিয়ে শহর যাচাই করতে হয়। শহরের প্রাধান্য থেকে রাজধানী হয় না।

তবেই দেখুন, সুকুমার রায়ের বাণীটি আপ্তবাক্য কিনা।

তাই দিল্লির ধারণা ইউ এন ও'র পালা-পরব করার অধিকার তাই সবচেয়ে বেশী এবং সপ্তাহে দিল্লি বিস্তর ঢাকঢোল বাজিয়ে সে-পরব সমাধান করেছেও বটে।

মেলা গুণী বিস্তর ভাষণ দিয়েছেন। কী গলা, কী বলার ধরন, কী হাত-পা নাড়া, কী উচ্ছ্বাস—সব দেখে শুনে মনে কণামাত্র সন্দেহ আর থাকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না, এঁরা যদি দিল্লিতে বক্তৃতা না দিয়ে উনোতে দিতেন তবে অনায়াসে আমাদের জন্য কাবুল-কান্দাহার জয় করে আনতে পারতেন।

এঁরা কী বক্তৃতা দিলেন? আমার নীরস ভাষা দিয়ে তাঁদের বক্তব্য প্রকাশ করলে গুণীদের প্রতি অবিচার করা হবে. তাই প্রতীকের সাহায্যে, অর্থাৎ অ্যালজেব্রা দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করব।

এঁদের প্রায় সকলেই একই কথা বললেন। সেটা হচ্ছে এই ; যদিও উনো ক, খ, গ করতে সক্ষম হন নি, তবু চেষ্টা করলে ভবিষ্যতে চ, ছ, জ হয়ত বা করলে করতেও পারেন এবং ট, ঠ, ড-ও যে তাঁদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব এ-কথাই বা বুক ঠুকে বলতে পারে কে?

যেন ইস্কুলের মাস্টার মশায় জমিদারবাবুর ফেল করা ছেলের প্রোগ্রেস-রিপোর্ট লিখছেন। জমিদারবাবুকে না চটিয়ে তাঁর গর্দভ ছেলের হাল-হকিকৎ বাতলানো সোজা কর্ম নয়। উনোর প্রশস্তিগায়করা সেই টাইপ-রোপ-ডানসিং কর্মটি দিল্লিতে সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন।

হায় কাশ্মীর, হায় কোরিয়া, হায় ইন্দোচীন, হায় তুনিস্, আরও কত হায়, হায়!

আমি কিন্তু উনোর কামকেরদানি থেকে দুটো শিক্ষা লাভ করেছি।

প্রথমত মীটিঙে গালিগালাজ মারামারি না করা। কিছুদিনের কথা, ফ্রান্সের পার্লামেন্টে সদস্যেরা অন্য কোনও অস্ত্রশস্ত্র পাননি বলে গলার চেন খুলে একে অন্যকে জোরসে ঠুকেছেন—ফলে রক্তারক্তিও নাকি হয়েছিল। বাংলা দেশের পার্লিমেন্টেও নাকি অনেক কিছু হয়েছে, যদিও রক্তারক্তি হয়েছে বলে স্মরণ হচ্ছে না। তবে মারামারিই ত শেষ কথা নয়। ভাষা অনেক সময় ডাণ্ডার চেয়েও কঠিন কঠোরতর। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মাস্টাররা এখন ছেলেদের চাবুক মারেন না বটে, তবে সে-চাবুক এসে আশ্রয় নিয়েছে তাঁদের জিভে ; তাঁদের জিভ এখন চাবুকের চেয়ে নিষ্ঠুরতর।

কিন্তু সে-তত্ত্বালোচনা উপস্থিত থাক্।

আমার কাছে আশ্চর্স বোধ হয়, এখন উনোতে হাতাহাতি কিংবা পুরো-দস্তুর একে অন্যকে অপমান না করেও তাঁরা কাজকর্ম (তা সে যতই নগণ্য কিংবা অর্থহীন হোক না কেন) সমাধান করছেন কী করে?

কাষ্ঠরসিকেরা এর উত্তরে কী বলবেন তাও আমি বিলক্ষণ জানি। তাঁরা বলবেন, 'আরে বাপু, যেখানে শুধু তর্কাতর্কি—বাকযুদ্ধ, যেখানে কোনও প্রকারের জীবন-মরণ-সমস্যার সমাধান হবে না, যেখানকার কোনও বাগাড়ম্বরই আমার আপন দেশে কোনও প্রকারের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে না অর্থাৎ আমার দেশকে এক গিরে জমি কিংবা এক কড়ির আমদানি খোয়াতে হবে না, সেখানে মারামারি হাতাহাতি করতে যাব কোন্ দুঃখে?

হক কথা। দুনিয়ার বহু জাতই এ-তত্ত্ববাক্যে সায় দেবে। কিন্তু আমি বাঙালী। আমার মন বলে কথাটা হক্ হলেও ঠিক করে মেনে নিতে আমার বাধছে। 'মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলে'র খেলাতে কে জেতে কে হারে, তাতে আমার কণামাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, তবু ত তাই নিয়ে তর্ক করে আমি সেদিন দুটো চড় খেয়েছি, তিনটে কিল মেরেছি। সে রাত্রে না-খেয়ে শুতে গিয়েছি, পাশের বাড়ির শা—রা সাত টাকা সেরে ইলিশ কিনে ফিষ্টি করেছে।

www.BanglaBook.org

দ্বিতীয় তত্ত্ব ততোধিক গুরুত্বব্যঞ্জক (সোজা বাংলায় ইমপর্টেন্ট)। হিন্দী ভাষা রাষ্ট্রভাষা। তাঁর জয় হোক। তিনি দেশ-বিদেশ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুন ; আমার বুক ফাটবে না। কিন্তু যখন বলা হয়, হিন্দী না শিখলে (এবং ইংরেজী বর্জন করার পর) আমরা দিল্লির পার্লিমেণ্টে একে অন্যকে বুঝব কী করে, তাই সবাই হিন্দী শেখ, তখন আমার মনে আসে উনোর কথা। সেখানে কত গণ্ডা ভাষা নিয়ে কারবার চলে ঠিক বলতে পারব না, তবে বিবেচনা করি ভারতে যে-কটি ভাষা চালু আছে তার চেয়ে অনেক বেশী ভাষা-ভাষী সেখানে জমায়েত হন। তাঁদের বেশির ভাগই বক্তৃতা দেন আপন আপন মাতৃভাষাতে। বর্মার সদস্য যখন আপন মাতৃভাষায় বক্তৃতা দেন, সঙ্গে সঙ্গে সে-বক্তৃতা ইংরেজী, ফরাসী, স্পেনিশ ইত্যাদি বহু ভাষায় অনূদিত হয়। প্রত্যেক সদস্যের কানে 'ইয়ার-ফোন' লাগানো। সমুখে ছোট একটি কল। তিনি যে-ভাষায় অনুবাদ চান, সে-ভাষার উপর কলের কাঁটাটি লাগিয়ে অনুবাদটি শুনে নেন। যেমন যেমন বক্তৃতা হয়, অনুবাদও সঙ্গে সঙ্গে চলে। বক্তৃতা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনুবাদ শেষ হয়—সব সদস্যই জেনে যান, বক্তা কী বললেন। যে-সব সদস্য বক্তার মাতৃভাষা জানেন, একমাত্র তাঁরাই তখন 'ইয়ার-ফোন' ব্যবহার করেন না।

তবে দিল্লির পার্লিমেণ্টেই বা এ-ব্যবস্থা হতে পারে না কেন? ভারতসুদ্ধ লোককেই বা হিন্দী-উর্দু-হিন্দুস্থানী শিখতে হবে কেন?

হিন্দী-উর্দু-হিন্দুস্থানীর কথায় মনে পড়ল ক্রিকেট-কমেণ্টারির কথা।

এবারকার ক্রিকেট টেস্টম্যাচের খেলাতে হিন্দীতেও 'সমসাময়িক টীকা' ধাবমান মল্লীনাথ (রানিং কমেণ্টারি) দেওয়া হচ্ছে। যেদিন আপিসের অত্যাচারে খেলা দেখতে যেতে পারি নি, সেদিন লাঞ্চের সময় টীকা শুনো দুধের আশ ঘোল নয়, জল দিয়ে মিটিয়েছি। মাঝে মাঝে হিন্দী টীকাও ইচ্ছা-অনিচ্ছায় শুনতে হয়েছে।

সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।

এই টীকাকার যুক্তপ্রদেশের অতি খানদানী ঘরের ছেলে। তিনি জানেন, আমির ইলাহী বহুদিনের মুরুব্বী খেলোয়াড়। তাই তিনি বার বার বললেন, এর পর আমির ইলাহী সাহেব বড়ী খুবসুরতকে সাথ (বড় সৌন্দর্যের সঙ্গে) গেন্দ (বল) পাকড়লী (ফিল্ড করলেন)। আমির ইলাহীকে 'সাহেব' বলার পূর্বে তিনি অন্য দু-একজনকে 'সাহেব' উপাধি দেন নি, এর পর তাঁর মনে হল সবাইকে 'সাহেব' বলা উচিত, তাই তিনি আঠার বছরের ছোকরা হাফিজকেও 'সাহেব' সম্বোধন করতে লাগলেন!

ক্রিকেট গণতান্ত্রিক খেলা। ক্রিকেটের দেবেন্দ্র ব্র্যাডমানকেও কোনও ইংরেজ টীকাকার মিস্টার ব্র্যাডমান কিংবা 'রেসপেকটেড' ব্র্যাডমান বলে উল্লেখ করেন না, কিন্তু ভারতবর্ষ সৌজন্য—ভদ্রতার দেশ, ক্রিকেট খেলি আর যাই খেলি, পিতৃবয়স্ক আমির ইলাহী, কিংবা মুরুব্বী অমরনাথকে 'সাহেব' না বলে বাক্য-স্ফুরণ করি কি প্রকারে?

টীকাকার আবার হিন্দী-উর্দু দুই-ই জানেন। আবার তিনি এ-তথ্যও জানেন, করাচি-লাহোরে বিস্তর মুসলমান তাঁর টীকা রেডিওর পাশে বসে কান পেতে শুনছেন। তাঁরা কট্টর হিন্দী বুঝতে পারেন না—টীকাকার তাঁদেরই বা নিরাশ করেন কী প্রকারে? তাই সমস্তক্ষণ তিনি ছিলেন আপসের তালে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দৃষ্টান্ত দি।

পাকিস্তানের 'অবস্থা তখন বড়ই বিপদসংকুল', হিন্দীতে প্রকাশ করতে গেলে বলতে হয়, 'বিপজ্জনক পরিস্থিতি', উর্দুতে বলতে হয়, 'খতর্‌নাক হালৎ'। টীকাকার দু কূল রক্ষা করলেন, 'খুতর্‌নাক পরিস্থিতি'। আশা করলেন, পাকিস্তান হিন্দুস্থান উভয়েই বুঝে যাবে 'অবস্থা সঙ্গিন'!

আমি কিন্তু সত্যিই স্বীকার করি, ভাষার উপর ভদ্রলোকের দখল আছে। মাকড় 'আরামকে সাথ' (অক্লেশে, আরামের সঙ্গে) গেন্দ (বল) বোলারকে ফিরিয়ে দিলেন, পঙ্কজবাবু 'আহ্‌সানীসে' (অনায়াসে, অবহেলায়) বলটাকে পাকড়ে নিলেন, গুলমহম্মদ বড় 'শানদার' (মহিমাময়) খেলা দেখালেন, নাজির মহম্মদ 'কাইম' (কায়েমী'—অর্থাৎ সেটেলড্‌ ডাউন) হয়ে গিয়েছেন—আরও কত কী!

আর অদ্ভুত তাঁর নিরপেক্ষতা। বরের মাসী, কনের পিসী। একে বলেন, সাধু সাধু, ওকে বলেন, শাবাশ শাবাশ! কেউ ক্যাচ ধরলে তিনি 'অচৈতন্য', কেউ সিঙ্গল করলে তিনি 'বেহুঁশ'।

খেলা না দেখেও খেলা দেখার আনন্দ পেয়েছি॥

বুদ্ধং শরনং

সারিপুত্ত ও মহামৌদ্‌গল্যায়নের পূতাস্থি প্রায় এক শতাব্দীর পর পুনরায় তাঁদের সমাধিস্থলে রক্ষিত হচ্ছে।

প্রায় এক শ বছর পূর্বে সাঁচীর স্তূপের উপর থেকে নীচের দিকে সুড়ঙ্গ কেটে তলার দিকে দুটি পেটিকা পাওয়া যায় এবং তাদের উপরের লেখা থেকে সপ্রমাণ হয় যে, পেটিকাদুটিতে এই দুই মহাস্থবিরের দেহাবশেষ রক্ষিত আছে। আপাত দৃষ্টিতে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে এই দুই মহাপুরুষের দেহাস্থি বের করা বর্বরতা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু সে-যুগের তার সত্যই একান্ত প্রয়োজন ছিল ; সে-যুগে বিদেশী শাসন-কর্তারা এই ত্রিভুবনে আমাদের যে কোনও গৌরবস্থল থাকতে পারে সে-কথা আদপেই স্বীকার করতে চাইতেন না—শুধুমাত্র একটি বিষয়ে তাঁরা আমাদের বাহাদুরির শাবাশি দিতে অকুণ্ঠ ছিলেন, সে নাকি কল্পনাশক্তি—উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল কল্পনা-প্রবণতা। এই 'প্রশস্তি' দিয়ে তার পর মুহূর্তেই তাঁরা তার সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়ে বলতেন, 'এদের বুদ্ধ, এদের আনন্দ, সারিপুত্ত মৌদ্‌গল্যায়ন, জনপদকল্যাণী সবই এদের কল্পনাপ্রসূত—অভদ্র ভাষায় গাঁজা-গুল।'

দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ ইংরেজ পণ্ডিতগণ এ মতে ঠিক সায় দিতেন না বলেই সাঁচীর স্তূপ খুঁড়ে এই দুই শ্রমণের দেহাস্থি বের হয়েছিল! পেটিকা দুটি না বেরলে আমাদের আরও কতখানি এবং কতদিন ধরে গালাগাল খেতে হত তার ঠিক হিসেব করা কঠিন।

তারপর এই দুই পেটিকা বিলেতে প্রায় এক শ বছর বাস করার পর বহু দেশে বহু লক্ষ নরনারীর সশ্রদ্ধ অভিবাদন পেয়ে আবার সাঁচীতে ফিরে এসেছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, খোঁড়া না হয় হয়েছিল, কিন্তু পেটিকা দুটি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিলেতে নিয়ে যাওয়ার কী প্রয়োজন ছিল?

সেখানেও এঁদের জীবনের মাহাত্ম্য এক অদৃশ্য ইঙ্গিত দেখায়। এঁদের দেহাস্থি যদি একদা বিদেশে না যেতেন তবে তাঁদের দেশে ফিরে আসার উপলক্ষ্য নিয়ে এতগুলো ভিন্ন ভিন্ন দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারত না এবং আজ সাঁচীতে তার চরম উৎসব উপলক্ষ্যে এতগুলি দেশের গুণী, জ্ঞানী, সাধু, তাপস একত্র হয়ে তাঁদের জীবন-মাহাত্ম্য কীর্তন করে, একমন হয়ে, তাঁদের জীবনাদর্শের স্মরণে পৃথিবীতে পুনরায় শান্তির বাণী প্রচার এবং প্রসার করতে নবীন ভাবে অনুপ্রাণিত হতেন না।

এখানে ঈষৎ একটু অপ্রিয় মন্তব্য করে দ্বিতীয় প্রস্তাব আরম্ভ করি।

এ-দেশের সরস্বতীপূজা, দুর্গাপূজা যে আজ জাঁকজমক আর বাহ্যাড়ম্বরেই শেষ হয় সে-কথা বাংলা দেশের বিচক্ষণ লোক মাত্রেই স্বীকার করে নিয়েছেন, তাই সাঁচীর উৎসব যে বাগাড়ম্বরেই শেষ হতে পারে, সে-ভয় আমাদের সম্পূর্ণ অমূলক নাও হতে পারে। তাই প্রশ্ন, সাঁচীতে সমবেত মনীষীগণ যে এক-বাক্যে শপথ গ্রহণ করলেন, পৃথিবীতে পুনরায় শাক্যমুনির শান্তিবাণী প্রচারিত হোক, তার সম্ভাবনা কতটুকু?

এ-আশা দুরাশা যে পৃথিবীতে বহু লোক এখন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করবে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এ-পর্বের প্রধান পুরোহিত পণ্ডিতজী, শ্যামাপ্রসাদ এবং রাধাকৃষ্ণণ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা কিংবা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন নি। তাই আজ যদি আমরা সবাই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ না করেও বুদ্ধদেবের শিক্ষা জীবনে সফল করবার চেষ্টা করি তাহলে আমরা কপটাচারী, এ-কথা বলা অন্যায় হবে।

আমার মনে হয়, ধর্ম পরিবর্তনের যুগ আর নেই, প্রয়োজনও নেই। একদা এ-পৃথিবীতে অন্য ধর্মের তত্ত্ব এবং সার অনুসন্ধান করতে হলে স্বধর্ম পরিত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ এবং সে-সমাজে সম্পূর্ণ প্রবেশ না করে সে-ধর্মের ফললাভ করার কোন পন্থা উন্মুক্ত থাকত না—কারণ তখন প্রত্যেক ধর্ম আপন আপন সংকীর্ণ গণ্ডির ভিতর সীমাবদ্ধ থাকত। আজ সর্ব ধর্মগ্রন্থ অনায়াসলভ্য, আজ আমরা অন্য ধর্মের সাধুসজ্জনদের সহবাস করতে পারি, ভিন্ন ভিন্ন সমাজের দোষগুণ আপন অভিজ্ঞতা দিয়ে বিচার করে নিতে পারি। ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য, এ-কর্ম সহজ, সরল করে দেওয়াও বটে। সুতরাং আজ আর ধর্ম পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই : আজ হিন্দু খ্রীষ্টান না হয়েও আপন সমাজে অস্পৃশ্যতা বর্জন করতে পারে, মুসলমান হিন্দু না হয়েও শঙ্করদর্শন মেনে নিয়ে জীবন সে ধারায় চালাতে পারে।

শান্তির বাণী ত সব ধর্মই প্রচার করেছে : তাই এখন প্রশ্ন, শান্তির বাণীর জন্য বৌদ্ধধর্মের কাছেই হাত পাতবার প্রয়োজন!

প্রয়োজন এই, প্রত্যেক ধর্মই কোন না কোন এক কিংবা একাধিক নীতির উপর জোর দিয়েছে বেশী। বৌদ্ধধর্ম সবচেয়ে বেশী জোর দিয়েছে পৃথিবীতে শান্তি আনার জন্য (কেন দিয়েছিল সে প্রশ্নের উত্তর তৎকালীন রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে বিজড়িত) এবং তারই ফলে মৌর্যযুগে তাবৎ ভারতবর্ষ পৃথিবীর ইতিহাসে একদিন অখণ্ড রাষ্ট্ররূপে দেখা দিয়েছিল। সারিপুত্ত, মহামৌদ্‌গল্যায়ন প্রমুখ শ্রমণেরা যদি আপন প্রাণ হাতে নিয়ে প্রদেশ হতে প্রদেশান্তরে শান্তির বাণী প্রচার না করতেন (জাতকে বার বার দেখতে

www.BanglaBook.org

পাই, যে-কোনও দেশ বা প্রদেশের প্রত্যন্ত প্রদেশে যাওয়ার অর্থ সে-যুগে ছিল আপন প্রাণ নিয়ে খেলা করা) তাহলে প্রদেশ-প্রদেশের সীমান্তরেখা বিলীন হত না এবং ফলে ঐক্যবদ্ধ অবিচ্ছিন্ন ভারত কবে সে রূপ নিত—এবং আদৌ নিত কি না—আজ তার কল্পনা করা যায় না।

এবং এইখানেই তথাগতের প্রেম এবং মৈত্রী অভিযানের শেষ নয়—আরম্ভ মাত্র। পুনরায় বলি, আরম্ভ মাত্র।

তারপর এই বৌদ্ধবাণীর কল্যাণেই সিংহল গমন সহজ হল, দুর্ধর্ষ আফগানিস্থানের সঙ্গে মিত্রতা-সূত্রে বদ্ধ হল, (কাবুলের গ্রীক, বৌদ্ধ হয়ে গিয়ে গান্ধার শিল্প নির্মাণে সাহায্য করল এবং আজ যে আমরা প্রভু বুদ্ধের মূর্তি দেখে শান্তিরসে পূর্ণ হই, তার গোড়াপত্তন করে এই গ্রীকরাই), দুর্লঙ্ঘ্য হিন্দুকুশ অতিক্রম করে বৌদ্ধ শ্রমণরা বামিয়ান পৌঁছলেন (সেখানকরা বুদ্ধ-মূর্তি পৃথিবীর আর যে-কোনও বৌদ্ধ-অবৌদ্ধ মূর্তির চেয়ে উচ্চ), তারপর বর্বর তাতার তুর্কমান পর্যন্ত বৌদ্ধ মন্ত্র গ্রহণ করল, সর্বশেষে তখনকার দিনের সবচেয়ে সভ্যদেশ চীন পর্যন্ত তথাগতের শরণ নিল!

এ দিকে বর্মা, শ্যাম, মালয়, যবদ্বীপ, বলীদ্বীপ ভূখণ্ড।

ভারতের মত বিরাট দেশকে চীনের মত বিশালতর দেশের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে এই বৌদ্ধ অভিযান যে মানব সভ্যতাকে কতখানি এগিয়ে দিল তার সুস্পষ্ট ধারণা দূরে থাক, তার কল্পনামাত্রও আজ আমরা করতে পারি নে। জানি পরবর্তী যুগে খৃষ্টধর্ম আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত সাগর পর্যন্ত ভূখণ্ডকে এক করে দিয়েছিল, কিন্তু সে ত অসংখ্য দ্বন্দ্ব অগণিত সংগ্রামের ভিতর এবং আজও তার শেষ হয় নি।

ভারত-চীন, ভারত-তিব্বত এবং ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের যে যোগ-সূত্র স্থাপিত হয়েছিল তা প্রধানত বৌদ্ধ ধর্মের মাধ্যমে। এ-কথা বললে ভুল বলা হবে না যে, যেদিন ভারত বৌদ্ধধর্ম বর্জন করল (কেন করল, এবং না করলে তার গত্যন্তর ছিল কি না, সে প্রশ্নের উত্তর দীর্ঘ এবং এখানে অবান্তর), সেইদিন থেকেই ভারতের সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্ক ক্ষীণ হতে হতে একদিন সম্পূর্ণ লোপ পেল।

কিন্তু ভারত বৌদ্ধধর্ম বর্জন করেছে এ-কথা ভুল। তথাগতের বাক্য-নীতি, অবদান (প্রাচীনার্থে), ধম্ম সনাতন হিন্দু ধর্মের শিরা-উপশিরায় আজ এমনই মিশে গিয়েছে যে, তার বিশ্লেষণ অসম্ভব এবং অপ্রয়োজন।

পরম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণও আজ সেগুলো হিন্দু ধর্ম থেকে বর্জন করতে সম্মত হবেন না। তাই আজ ব্রাহ্মণ শ্যামাপ্রসাদ, রাধাকৃষ্ণণ ও জওয়াহিরলালের শ্রমণাস্থি স্কন্ধে গ্রহণ কিঞ্চিন্মাৎ গুরুভার বলে প্রতীয়মান হচ্ছে না।

এবং শুধু কি তাই? অমিতাভের বাণীতে কী অমিত অমৃত লুকানো রয়েছে যে, বর্তমান যুগে যেদিন তাঁর বাণী ইয়োরোপে পৌঁছল সেদিন ফ্রান্সের বুর্নফ ইত্যাদি পণ্ডিতগণ আগ্রহের সঙ্গে সে বাণী গ্রহণ করলেন! ইয়োরোপের জনসাধারণও কী অদ্ভুত সাড়া দিলে সে বাণী শুনে! ইয়োরোপ তখন আজকের চেয়ে বেশী ধর্মবিমুখ—বিগত দুই যুদ্ধ ইয়োরোপকে আবার আত্মার সন্ধানে তাড়া দিয়েছে—তবু তারা কী আগ্রহেই না বৌদ্ধ-ধর্মগ্রন্থ সংস্করণের পর সংস্করণ শেষ করল!

www.BanglaBook.org

খুদ পরমেশ্বরকে বাদ দিয়ে, পাদরী-পুরুতের তোয়াক্কা না করেও ধর্মচর্চা করা যায়, একমাত্র নিজের উপর নির্ভর করে, ক্রিয়াকাণ্ড বর্জন করে, তথাগতের উপদেশের সঙ্গে সাধনাগত অভিজ্ঞতা মিলিয়ে নিয়ে, তথাগত যেখানে আগত হয়েছেন সেখানে পৌঁছনো যায়, এ-স্বপ্ন ইয়োরোপের কোন জ্ঞানী কোন গুণী দার্শনিকই দেখবার সাহস করেন নি। বুদ্ধের অশ্রুতপূর্ব বাণী এক মুহূর্তেই ইয়োরোপের সামনে এক নবীন ভুবন আলোক দিয়ে জাজ্বল্যমান করে দিল।

তাই উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমে আজ ওই এক মহাপুরুষ—বুদ্ধদেব—যাঁর পায়ের কাছে আজ সর্ব নাস্তিক সর্ব আস্তিক স্বধর্ম-ভ্রষ্ট না হয়েও দীক্ষা গ্রহণ করতে পারে, ত্রিশরণ জপ করতে পারে—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্মং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি ॥

আর ট্রাভেল

পঁচিশ বৎসর পূর্বে প্রথম অ্যারোপ্লেন চড়েছিলুম। দশ টাকা দিয়ে কলকাতা শহরের উপর পাঁচ মিনিটের জন্য খুশ-সোওয়ারি বা 'জয় রাইড' নয়, রীতিমত দ'শ মাইল রাস্তা—পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে নদী-নালা পেরিয়ে এক শহর থেকে অন্য শহর যেতে হয়েছিল। তখনকার দিনে এদেশে প্যাসেঞ্জার সার্ভিস ছিল না, কাজেই আমার অভিজ্ঞতাটা গড়পড়তা ভারতীয়দের পক্ষে একরকম অভূতপূর্বই হয়েছিল বলতে হবে।

তারপর ১৯৪৮ থেকে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের বহু জায়গায় প্লেনে গিয়েছি এবং যাচ্ছি। একদিন হয়ত পুষ্পরথে করেই স্বর্গে যাব, অর্থাৎ প্লেন-ক্র্যাশে অক্কালাভ করব—তাতে আমি আশ্চর্য হব না, কারণ এ ত জানা কথা, 'ডানপিটের মরণ গাছের ডগায়'। সে-কথা থাক্।

কিন্তু আশ্চর্য হয়ে প্রতিবারই লক্ষ্য করি, পঁচিশ বৎসর পূর্বে প্লেনে যে সুখ-সুবিধে ছিল আজও প্রায় তাই। ভুল বলা হল, 'সুখ-সুবিধে' না বলে 'অসুখ-অসুবিধেই' বলা উচিত ছিল, কারণ প্লেনে সফর করার চেয়ে পীড়াদায়ক এবং বর্বরতর পদ্ধতি মানুষ আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারে নি। আমার পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যাঁরা প্লেনে চড়েন তাঁরা ওকীব-হাল, তাঁদের বুঝিয়ে বলতে হবে না। উপস্থিত তাই তাঁদেরই উদ্দেশ্যে নিবেদন, প্লেনে চড়ার সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য যাঁদের এ-যাবৎ হয় নি।

রেলে কোথাও যেতে হলে আপনি চলে যান সোজা হাওড়া। সেখানে টিকিট কেটে ট্রেনে চেপে বসুন—ব্যস, হয়ে গেল। অবশ্য আপনি যদি বার্থ রিজার্ভ করতে চান তবে অন্য কথা, কিন্তু তবু এ-কথা বলব, হঠাৎ খেয়াল হলে আপনি শেষ মুহূর্তেও হাওড়া গিয়ে টিকিট এবং বার্থের জন্য একটা চেষ্টা দিতে পারেন এবং শেষ পর্যন্ত কোন গতিকে একটা বার্থ কিংবা, নিদেনপক্ষে একটা সীট জুটে যায়ই।

প্লেনে সেটি হবার জো নেই। আপনাকে তিন দিন, পাঁচ দিন, কিংবা সাত

www.BanglaBook.org

দিন পূর্বে যেতে হবে 'অ্যার আপিসে'। আপনাকে সব জায়গার টিকিট দেয় না—কেউ দেবে ঢাকা, কেউ দেবে আসাম, মাদ্রাজ অঞ্চল, কেউ দেবে দিল্লির।

এবং এ-সব অ্যার আপিস ছড়ানো রয়েছে বিরাট কলকাতার নানা কোণে, নানা গহ্বরে। এবং বেশীর ভাগই ট্রাম-লাইন, বাস-লাইনের উপর নয়। হাওড়া যান ট্রামে, দিব্য মা-গঙ্গার হাওয়া খেয়ে ; অ্যার আপিসে যেতে হলে প্রথমেই ট্যাক্সির ধাক্কা।

অ্যার আপিসে ঢুকেই আপনার মনে হবে, ভুল করে বুঝি জঙ্গী দফতরে এসে পড়েছেন। পাইলট, রেডিও-অফিসার তো উর্দি পরে আছেনই, এমন কি টিকিটবাবু পর্যন্ত শার্টের ঘাড়ে লাগিয়েছেন নীল সোনালীর ব্যজ-ঝিল্লা বিরণ-পট্টি, যা খুশি বলতে পারেন। রেলের মাস্টারবাবু গার্ড সাহেবরাও উর্দি পরেন, কিন্তু সে-উর্দি জঙ্গী কিংবা লস্করী উর্দি থেকে স্বতন্ত্র, অ্যার আপিসে কিন্তু এমনি উর্দি পরা হয়—খুব সম্ভব ইচ্ছে করেই—যে আমার মত কুনো বাঙালী সেটাকে মিলিটারী কিংবা নৌভির য়ুনিফর্মের সঙ্গে গুবলেট পাকিয়ে আপন অজানাতে দুম্ করে একটা স্যালুট করে।

তারপর সেই উর্দি-পরা ভদ্রলোকটি আপনার সঙ্গে কথা কইবেন ইংরেজিতে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন আপনি ধুতি-কুর্তা-পরা নিরীহ বাঙালী, তবু ইংরেজী বলা চাই। আপনি না হয় সামলে নিলেন, বি-এ এম-এ পাস করেছেন—কিন্তু আমি মশাই পড়ি মহা বিপদে। তিনি আমার ইংরেজী বোঝেন না, আমি তাঁর ইংরেজী বুঝতে পারি নে—কী জ্বালা! এখন অবশ্য অনেক পোড় খাওয়ার পর শিখে গিয়েছি যে জোর করে বাংলা চালানোই প্রশস্ততম পন্থা। অন্তত তিনি বক্তব্যটা বুঝতে পারেন।

তখ্‌খুনি যদি রোক্কা টাকা ঢেলে দিয়ে টিকিট কাটেন তবে ত ল্যাঠা চুকে গেল, কিন্তু যদি শুধু 'বুক' করান তবে আপনাকে আবার আসতে হবে টাকা দিতে। নগদা টাকা ঢেলে দেওয়াতে অসুবিধা এই যে, পরে যদি মন বদলান তবে রিফাণ্ড পেতে অনেক হ্যাপা পোয়াতে হয়। সে না হয় হল, রেলের বেলাও হয়।

কিন্তু প্লেনের বেলা আরেকটা বিদকুটে নিয়ম আছে। মনে করুন, আপনি ঠিক সময় দমদম উপস্থিত না হতে পারায় প্লেন মিস্ করলেন। রেলের বেলায় তখ্‌খুনি টিকিট ফেরত দিলে শতকরা দশ টাকার খেসারতির আক্কেলসেলামি দিয়ে ভাড়ার পয়সা ফেরত পাবেন। প্লেনের বেলা সেটি হচ্ছে না। অথচ আপনি পাকা খবর পেলেন, প্লেনে আপনার সীট ফাঁকা যায় নি, আর-এক বিপদগ্রস্ত ভদ্রলোক পুরো ভাড়া দিয়ে আপনার সীটে ট্র্যাভেল করেছেন, অ্যার কোম্পানিও স্বীকার করল, কিন্তু তবু আপনি একটি কড়িও ফেরত পাবেন না। আর কোম্পানির ডবল লাভ। এ নিয়ে দেওয়ানি মোকদ্দমা লাগালে কী হবে বলতে পারি নে, কারণ আমি আদালতকে ডরাই অ্যার কোম্পানির চেয়েও বেশী।

টিকিট কেটে ত বাড়ি ফিরলেন। তারপর সেই মহা মূল্যবান 'মূল্য পত্রিকা'-খানি পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন তাতে লেখা রয়েছে প্লেন দমদম থেকে ছাড়বে দশটার সময়, আপনাকে কিন্তু অ্যার আপিসে হাজিরা দিতে হবে আটটার সময়! বলে কী? নিতান্ত খাড্ডো কেলাসে যেতে হলেও ত আমরা এক ঘণ্টার পূর্বে হাওড়া যাই নে—কাছাকাছির সফর হলে ত আধ ঘণ্টা পূর্বে গেলেই যথেষ্ট,

www.BanglaBook.org

আর যদি ফার্স্ট কিংবা সেকেণ্ডের (প্লেনে আপনি ভাড়া দিচ্ছেন ফার্স্টের চেয়েও বেশী—অনেক সময় ফার্স্টের দেড়া) বার্থ রিজার্ভ থাকে তবে ত আধ মিনিট পূর্বে পৌঁছলেই হয়।

আপনি হয়ত প্লেনে থাকবেন পৌনে দু ঘণ্টা, অথচ আপনাকে অ্যার আপিসে যেতে হচ্ছে পাকা দু ঘণ্টা পূর্বে (মোকামে পৌঁছে সেখানে আরও কত সময় যাবে সে-কথা পরে হবে)।

এইবার মাল নিয়ে শিরঃপীড়া। আপনি চুয়াল্লিশ (কিংবা বিয়াল্লিশ) পাউণ্ড লগেজ ফ্রী পাবেন। অতএব

"সোনামুগ সরু চাল সুপারি ও পান
ও হাঁড়িতে ঢাকা আছে দুই চারিখান
গুড়ের পাটালি কিছু ঝুনা নারিকেল
দই ভাণ্ড ভাল রাই সরিষার তেল
আমসত্ত্ব আমচুর—"

ইত্যাদি মাথায় থাকুন, বিছানাটি যে নিয়ে যাবেন তারও উপায় নেই। অথচ আপনি গোহাটি নেমে হয়ত ট্রেনে যাবেন লামডিং, সেখানে উঠবেন ডাকবাংলোয়। বিছানা বিশেষ করে মশারি বিনা কী করে পোয়াবেন দিনরাতিয়া?

বিছানাটা নিলেন কি? না। তার ভেতরে যে ভারী জিনিস কিছু কিছু লুকোবেন ভেবেছিলেন সেটিও তাহলে হল না। অবশ্য লুকিয়ে কোন লাভ হত না, কারণ জিনিসটাকে ওজন ত করা হতই—মালে আপনি ফাঁকি দিতে পারতেন না।

অ্যার ট্র্যাভেল করবেন—মাত্র চুয়াল্লিশ পাউণ্ড ফ্রী লগেজ—অতএব আপনি নিশ্চয়ই বুদ্ধিমানের মত পিচবোর্ডের কিংবা ফাইবারের সুটকেসে মালপত্র পুরে—সেটার অবস্থা কি হবে মোকামে পৌঁছলে পরে বলব—রওয়ানা দিলেন অ্যার আপিসের দিকে, ছাতা বরষাতি অ্যাটাচি হাতে, তার জন্যে ফালতো ভাড়া দিতে হবে না (থ্যাঙ্ক ইউ!)।

ট্যাক্সি যখন নিতেই হবে তখন সঙ্গে চললেন দু-একজন বন্ধুবান্ধব। যদি-স্যাৎ দৈবাৎ প্লেন মিস করেন তবে একটি কড়িও ফেরত পাবেন না বলে দু-দশ মিনিট আগেই রওনা দিলেন এবং অ্যার আপিসে পৌঁছলেন পাকি সোয়া দু ঘণ্টা পূর্বে—আমার জাতভাই বাঙালরা যে রকম ইস্টিশানে গাড়ি ছাড়ার তিন ঘণ্টা পূর্বে যায়।

অ্যার আপিসের লোক হন্তদন্ত হয়ে ট্যাক্সি থেকে আপনার মাল নামাবে। যে-লোকটা কুলি চাপরাসী সমন্বয়—তা হোক গে—কিন্তু তার বাই বাই সে হিন্দীতে—রাষ্ট্রভাষাতে—অর্থাৎ তার অউন, আরিজিন্যাল হিন্দীতে কথা বলবেই—যে-রকম তার বসের ইংরেজী বলার বাই অথচ উভয়পক্ষই বাঙালী।

আমাদের বঙ্কিম, আমাদের রবীন্দ্রনাথ বলতে আমরা অজ্ঞান, কিন্তু এই বাংলা দেশের মহানগরী, রামমোহন, রবীন্দ্রনাথের লীলাভূমিতেই আপিস আদালতে, রাস্তাঘাটে 'আ মরি বাংলাভাষার' কী কদর কী সোহাগ!

কলকাতা বাঙালী শহর। বাঙালী বলতে আপনি আমি মধ্যবিত্ত বাঙালীই বুঝি, তাই আমাদের অ্যার আপিসগুলোর অবস্থা মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের

www.BanglaBook.org

মত। অর্থাৎ মাসের পয়লা তিন দিন ইলিশ মুগী তারপর আলুভাতে আর মশুর ডাল।

ঢাক ঢোল শাঁক-করতাল বাজিয়ে যখন প্রথম আমাদের অ্যার আপিস-গুলো খোলা হয় তখন সাহেবী কায়দায় বড় বড় কৌচ, বিরাট বিরাট সোফা, এন্তার ফ্যান, হ্যাট-স্ট্যান্ড, গ্লাস-টপ টেবিল—তার উপরে থাকত মাসিক, দৈনিক, অ্যাশট্রে আরও কত কী! সাহস হত না বসতে, পাছে জামাকাপড়ের ঘষায় সোফার চামড়া নোংরা হয়ে যায়—চাপরাসীগুলোর উর্দিই ত আমার পোশাকের চেয়ে ঢের বেশী ধোপদুরস্ত ছিমছাম।

আর আজ? চেয়ারগুলোর উপর যা ময়লা জমেছে তাতে বসতে ঘেন্না করে। ফ্যানগুলো ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে ছুটির জন্য আবেদন জানাচ্ছে, দেয়ালে চুনকাম করা হয় নি সেই অন্নপ্রাশনের দিন থেকে—সমস্তটা নোংরা এলোপাতাড়ি আর আবহাওয়াটা ইংরাজিতে যাকে বলে ড্রেয়ারী ডিসমেল।

একটা অ্যার আপিসে দেখেছি—ভিতরে যাবার দরজায় যেখানে হাত দিয়ে ধাক্কা দিতে হয় সেখানে যা ময়লা জমেছে তার তুলনায় আমাদের রান্নাঘরের তেলচিটে-কালি-মাখা দরজাও পরিষ্কার। আপনি সহজে বিশ্বাস করবেন না। আসুন একদিন আমার সঙ্গে, দেখিয়ে দেব।

এইবারে একটু আনন্দের সন্ধান পাবেন। দশাসই লাশদের যখন ওজন করা হবে তখন আড়নয়নে ওজনের কাঁটাটার দিকে নজর রাখবেন। ১৬০ থেকে তামাশা আরম্ভ হয়, তারপর ডবল সেঞ্চুরি পেরিয়ে কেউ কেউ মুস্তাক আলীর মত ট্রিপলের কাছাকাছি পৌঁছে যান। আমার বন্ধু '—মুখুজ্যে' যখন একবার ওজন নিতে উঠেছিল তখন কাঁটাটা বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে ঘুরতে শেষটায় থপ করে শূন্যেতে এসে ভিরমি গিয়েছিল। মুখুজ্জে আমাকে হেসে বলেছিল, 'কিন্তু ভাড়া তুমি যা দাও আমিও তাই।'

কী অন্যায়!

তারপর আবার সেই একটানা একঘেয়ে অপেক্ষা।

তিন কোয়ার্টার পরে খবর আসবে মালপত্র সব বাসে তোলা হয়ে গিয়েছে। আপনারা গা-তুলুন।

রবি ঠাকুর কী একটা গান রচেছেন না?

"আমার বেলা যে যায় সাঁঝবেলাতে
তোমার সুরে সুর মেলাতে—"

অ্যার কোম্পানির বাসগুলো কিন্তু আপিসগুলোর সঙ্গে দিব্য সুর মিলিয়ে বসে আছে। লড়াইয়ের বাজারে যখন বিলেত থেকে নূতন মোটর আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তখন কচু-বন থেকে কুড়িয়ে আনা যে-সব বাস গ্রামাঞ্চলে চড়েছিলুম, আমাদের অ্যার কেম্পানির বাস প্রায় সেই-রকম। ওদেরই আপিসের মত নোংরা, নড়বড়ে আর সীটগুলোর স্প্রিং অনেকটা আরবীস্তানের উটের পিঠের মত। 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুঈন' হওয়ার শখ যদি আপনার হয়, আরব দেশ না গিয়ে, তবে এই বাসের যে-কোন একটা দু দণ্ডের তরে চড়ে নিন। আপনার মনে আর খেদ থাকবে না।

মধ্য-কলকাতা থেকে দমদম ক মাইল রাস্তা সে-খবর বের করা বোধ হয় খুব কঠিন নয়; কিন্তু সেই বাসে চড়ে আপনার মনে হবে—

www.BanglaBook.org

'যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ!'

মোটর, ট্যাক্সি, স্টেট বাস, বে-সরকারী বাস এমন কি দু-চারখানা সাইকেল রিক্‌শাও আপনাকে পেরিয়ে চলে যাবে। ত্রিশ না চল্লিশ যাত্রীকে এক খেপে দমদম নিয়ে যাবার জন্য তৈরি এই ঢাউশ বাস—প্রতি পদে সে জাম্‌ হয়ে যায়, ড্রাইভার করবে কী, আপনিই বা বলবেন কী?

দিল্লি থেকে কলকাতা আসবার সময় একবার দেখেছিলুম, যে যাত্রী প্লেনের দোলাতে কাতর হয় নি সে এই বাসের ঝাঁকুনিতে বমি করেছিল।

দমদম পৌঁছলেন। এবারে প্লেন না-ছাড়া পর্যন্ত একটানা প্রতীক্ষা। সেও প্রায় তিন কোয়ার্টারের ধাক্কা।

তবে সময়টা অত মন্দ কাটবে না। জায়গাটা সাফ-সুতরো, বইয়ের স্টল আছে, দমদম অন্তর্জাতিক অ্যার পোর্ট বলে জাত-বেজাতের লোক ঘোরাঘুরি করছে, ফুটফুটে ফরাসী মেম থেকে কালো-বোরকায়-সর্বাঙ্গ-ঢাকা পর্দানশিনী হজ-যাত্রিণী সব কিছুই চোখের সামনে দিয়ে চলে যাবে।

তবে একথাও ঠিক, হাওড়ার প্লাটফর্মের তুলনায় এখানে উত্তেজনা এবং চাঞ্চল্য কম।

প্লেনে যখন মাল আর আপনার জায়গা হবেই তখন আর হুড়োহুড়ি করার কী প্রয়োজন?

তবু ভারতবর্ষ তাজ্জব দেশ। দিন কয়েক পূর্বে দমদম অ্যার পোর্ট রেস্তরাঁয় ঢুকে এক গ্লাস জল চাইলুম। দেখি জলের রঙ ফিকে হলদে। শুধালুম, শরবত কি ফ্রি বিলানো হচ্ছে?

বয় বললে, জলের টাঁকি সাফ করা হয়েছে, তাই জল ঘোলা, এবং মৃদু-স্বরে উপদেশ দিলে, ও জল না খাওয়াই ভাল।

শুনেছি ইয়োরোপের কোন কোন দেশে নরনারী এমন কি কাচ্চা-বাচ্চারাও নাকি জল খায় না। দমদমাতে যদি কিছুদিন ধরে নিত্যি নিত্যি টাঁকি সাফ করা হয় তবে আমরা সবাই সায়েব হয়ে যাব।

শুধু কি তাই, জলের জন্য উদ্বাস্তুরা উদ্বাস্ত করে তুলবে না কলকাতা কর্পোরেশনকে! আমরা সবাই এখন রুটির বদলে কেক খাব। সে-কথা থাক্‌।

কিন্তু দমদম অ্যার পোর্টের সত্যিকার জলুস খোলে যেদিন ভোরে কুয়াশা জমে। কাণ্ডটা আমি এই শীতেই দুবার দেখেছি। ভোর থেকে যে সব প্লেনের দমদম ছাড়ার কথা ছিল তার একটাও ছাড়তে পারে নি। তার পাসেঞ্জার সব বসে আসে অ্যার পোর্টে।

আরও যাত্রী আসছে দলে দলে, তাদেরও প্লেন ছাড়তে পারছে না। করে করে প্রায় দশটা বেজে গেল। এক দিক থেকে যাত্রীরা চলে যাচ্ছে, অন্য দিক থেকে আসছে: এই স্রোত বন্ধ হয়ে যাওয়াতে তখন দমদমাতে যে যাত্রীর বন্যা জাগে তাদের উৎকণ্ঠা, আহারাদির সন্ধান, খবরের জন্য অ্যার কোম্পানির কর্মচারীদের বার বার একই প্রশ্ন শোধানো, 'হ্যাভ কালকাটা ওয়েদার' ইত্যাদি কটুবাক্য, নানা রকমের গুজব—কোথায় নাকি কোন্ প্লেন ক্র্যাশ করেছে, কেউ জানে না—যে-সব বন্ধুরা 'সী-অফ্‌' করতে এসেছিলেন তাঁদের আপিসের সময় হয়ে গেল অথচ চলে গেলে খারাপ দেখাবে বলে কষ্টে আত্মসম্বরণ, প্লেন 'টেক

www.BanglaBook.org

অফ' করতে পারছে না, ওদিকে ব্রেকফাস্টের সময় হয়ে গিয়েছে বলে যাত্রীদের ফ্রী খাওয়ানো হচ্ছে, কঞ্জুস কোম্পানিরা গড়িমসি করছে বলে তাদের যাত্রীদের অভিসম্পাত—আরও কত কী!

লাউড স্পীকার ভোর ছটা থেকে রা কাড়ে নি। খবর দেবেই বা কী?

দমদম নর্থ-পোল হলে কী হত জানি নে। শেষটায় কুয়াশা কাটল। হঠাৎ শুনি লাউড স্পীকারটা কুয়াশায়-জমা গলার কাশি বার কয়েক সাফ করে জানালে, 'অমুক জায়গার প্যাসেঞ্জাররা অমুক প্লেনে (ডি বি জি, হি বি জি, হিজিবিজি কী নম্বর বললে বোঝা গেল না) করে রওয়ানা দিন।'

আমি না হয় ইংরেজী বুঝি নে, আমার কথা বাদ দিন, কিন্তু লক্ষ্য করলুম, আরও অনেকে বুঝতে পারেন নি। গোবেচারীরা ফ্যাল ফ্যাল করে ডাইনে বাঁয়ে তাকালে, অপেক্ষাকৃত চালাকেরা অ্যার আপিসে খবর নিলে, শেষটায় যে প্লেন ছাড়বে তার কোম্পানির লোক আমাদের ডেকে-ডুকে জড়ো করে প্লেনের দিকে রওয়ানা করে দিলে—পাণ্ডারা যে-রকম গাইয়া তীর্থযাত্রীদের ধাক্কাধাক্কি দিয়ে ঠিক-গাড়িতে তুলে দেয়।

আমার সঙ্গে পাশাপাশি বসে যাচ্ছিলেন এক মারোয়াড়ী ভদ্রলোক। আমাকে বললেন, 'আজকাল ত অনেক ইংরেজী না-জাননেওয়ালা যাত্রী-ভী প্লেনে চড়ছে। তব্ বাঙালী জবান মে প্লেনকা খবর বলে কাহে?'

ওই বুঝলেই ত পাগল সারে।

দেবরাজকে সাহায্য করে রাজা দুষ্মন্ত যখন পুষ্পক রথে চড়ে পৃথিবীতে ফিরছিলেন, তখন যেমন যেমন তিনি পৃথিবীর নিকটবর্তী হতে লাগলেন, সঙ্গে সঙ্গে পাহাড় পর্বত, গৃহ অট্টালিকা অতিশয় দ্রুত গতিতে তাঁর চক্ষুর সম্মুখে বৃহৎ আকার ধারণ করতে লাগল। যতদূর মনে পড়ছে, রাজা দুষ্মন্ত তখনই তাই নিয়ে রথীর কাছে আপন বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন।

পুনরায় জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তারই উল্লেখ করে আমার কাছে সপ্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে দুষ্মন্তের যুগ পর্যন্ত ভারতীয়েরা নিশ্চয়ই খ-পোত নির্মাণ করতে পারতেন, না হলে রাজা ক্রমাসন্ন পৃথিবীর এহেন পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিলেন কী প্রকারে?

তার বহু বৎসর পরে একদা রমণ মহর্ষি একটা ঘটনা বিশদভাবে পরিস্ফুট করার জন্য তুলনা দিয়ে বলেন, উপরের থেকে নীচের দিকে দ্রুতগতিতে আসার সময় পৃথিবীর ছোট ছোট জিনিস যে রকম হঠাৎ বৃহৎ অবয়ব নিতে আরম্ভ করে, ঠিক সেই রকম ইত্যাদি, ইত্যাদি।

মহর্ষির এক প্রাচীন ভক্ত আমার কাছে বসে ছিলেন। আমাকে কানে কানে বললেন, 'এখন ত তোমার বিশ্বাস হল যে, মহর্ষি যোগবলে উড্ডীয়মান হতে পারেন।' আমার এ-কথাটি তাঁর বিশেষভাবে বলার কারণ এই যে, আমি এক-দিন অলৌকিক ঘটনার আলোচনা প্রসঙ্গে একটি ফার্সী প্রবাদবাক্য উল্লেখ করে বলেছিলুম:—

"পীরহা নমীপরন্দ
শাগিরদান উন্থারা মীপরানন্দ।"

অর্থাৎ 'পীর (মুরশীদ) ওড়েন না, তাঁদের চেলারা ওঁদের ওড়ান (cause them fly)।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তার কিছুদিন পরে আমি রমণ মহর্ষির পীঠস্থল তীরু-আন্নামালাই (শ্রীআন্নামালাই) গ্রামের নিকটবর্তী অরুণাচল পর্বত আরোহণ করি। মহর্ষি এই পর্বতে প্রায় চল্লিশ বৎসর নির্জনে সাধনা করার পর তীরু-আন্নামালাই গ্রামে অবতরণ করেন—সাধারণ ভাষায় অবতীর্ণ হন।

পাহাড়ের উপর থেকে রমণাশ্রম দ্রৌপদী-মন্দির সব কিছু খুব ছোট দেখাচ্ছিল। তারপর নামবার সময় পাহাড়ের সানুদেশে এক জায়গায় খুব সোজা এবং বেশ ঢালু পথ পাওয়ায় ছুটে সেই পথ দিয়ে নামতে আরম্ভ করলুম এবং আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলুম, আশ্রম, দ্রৌপদী-মন্দির কী রকম অদ্ভুত দ্রুতগতিতে বৃহৎ আকার ধারণ করতে লাগল।

আমার এ-অভিজ্ঞতা থেকে এটা কিছু সপ্রমাণ হয় না যে পুষ্পক রথ কল্পনার সৃষ্টি কিংবা রমণ মহর্ষি যোগবলে আকাশে উড্ডীয়মান হন নি, কিন্তু আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, দ্রুতগতিতে অবতরণ করার সময় ভূপৃষ্ঠ কীরূপ বৃহৎ আকার ধারণ করতে থাকে।

কিন্তু এর উল্টোটা করা কঠিন, কঠিন কেন, অসম্ভব। অর্থাৎ দ্রুতগতিতে উপরের দিকে যাচ্ছি আর দেখছি পৃথিবীর তাবৎ বস্তু ক্ষুদ্র হয়ে যাচ্ছে—এ-জিনিস অসম্ভব কারণ দৌড় দিয়ে উপরের দিকে যাওয়া যায় না।

সেটা সম্ভব হয় অ্যারোপ্লেন চড়ে।

মাটির উপর দিয়ে প্লেন চলছিল মারাত্মক বেগে, সেটা ঠাহর হচ্ছিল অ্যারোড্রোমের দ্রুত পলায়মান বাড়িঘর, হ্যাঙ্গার, ল্যাম্পপোস্ট থেকে ; কিন্তু সেই প্লেন যখন শ পাঁচেক ফুট উপরে উঠে গেল, তখন মনে হল আর যেন তেমন জোর গতিতে সামনের দিকে যাচ্ছি নে।

উপরের থেকে নীচের দিকে তাকাচ্ছি বলে খাড়া নারকেল গাছ, টেলিফোনের খুঁটি, তিনতলা বাড়ি ছোট ত দেখাচ্ছিলই, কিন্তু সব কিছু যে কতখানি ছোট হয়ে গিয়েছে, সেটা মালুম হল পুকুর, ধানক্ষেত আর রেল-লাইন দেখে। ঠিক পাখির মত প্লেনও এক-একবার গা-ঝাড়া দিয়ে এক এক ধাক্কায় উঠে যাচ্ছিল বলে নীচের জিনিস ছোট হয়ে যাচ্ছিল এক এক ঝটকায়।

জয় মা-গঙ্গা! অপরাধ নিয়ো না মা, তোমাকে পবননন্দন পদ্ধতিতে ডিঙিয়ে যাচ্ছি বলে। কিন্তু মা, তুমি যে সত্যি মা, সেটা ত এই আজ বুঝলুম তোমার উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময়। তোমার বুকের উপর কৃষ্ণাম্বরী শাড়ি আর তার উপর শুয়ে আছে অগুনতি খুদে খুদে মানওয়ারী জাহাজ, মাঝারী নৌকা—আর পানসি-ডিঙির ত লেখাজোখা নেই। এতদিন এদের পাড় থেকে অন্য পরিপ্রেক্ষিতে দেখেছি বলে হামেশাই মনে হয়েছে জাহাজ নৌকা এরা তেমন কিছু ছোট নয়, আর তুমিও তেমন কিছু বিরাট নও, কিন্তু 'আজ কী এ দেখি, দেখি, দেখি, আজ কী দেখি—' এই যে ছোট ছোট আড়াবাচ্চারা তোমার বুকের উপর নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে আছে, তারা তোমার বুকের তুলনায় কত ক্ষুদ্র, কত নগণ্য! এদের মত হাজার হাজার সন্তান-সন্ততিকে তুমি অনায়াসে তোমার বুকের আঁচলে আশ্রয় দিতে পার।

প্লেন একটুখানি মোড় নিতেই হঠাৎ সর্বব্রহ্মাণ্ডের সূর্যরশ্মি এসে পড়ল মা-গঙ্গার উপর। সঙ্গে সঙ্গে যেন এ-পার ও-পার জুড়ে আগুন জ্বলে উঠল, কিন্তু এ আগুন যেন শুভ্র মল্লিকার পাপড়ি দিয়ে ইস্পাত বানিয়ে।

www.BanglaBook.org

সেদিকে চোখ ফিরে তাকাই তার কী সাধ্য? মনে হল স্বয়ং সূর্যদেবের—রুদ্রের মুখের দিকে তাকাচ্ছি; তিনি যেন শুধু স্বচ্ছ রজত-যবনিকা দিয়ে বদন আচ্ছাদান করে দিয়েছেন। এ কী মহিমা, এ কী দৃশ্য! কিন্তু এ আমি সইব কী করে? তোমার দক্ষিণ মুখ দেখাও, রুদ্র! হে পূষন্, আমি উপনিষদের জ্যোতিদ্রষ্টা ঋষি নই, যে বলব—

'হে পূষন্, সংহরণ
করিয়াছ তব রশ্মিজাল
এবার প্রকাশ করো
তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে-পুরুষ
তোমার আমার মাঝে এক।'

আমি বলি, তব রশ্মিজাল তুমি সংহরণ কর, তুমি আমাকে দেখা দাও, তোমার মধুর রূপে, তোমার রুদ্র রূপে নয়। তোমার বদন যবনিকা ঘনতর করে দাও।

তাই হল—হয়ত প্লেন তাঁরই আদেশে পরিপ্রেক্ষিত বদলিয়েছে—এবার দেখি গঙ্গাবক্ষে স্নিগ্ধ রজত-আস্বাদন, আর তার উপর লক্ষ কোটি অলস সুর-সুন্দরীরা শুধু তাদের নূপুর দৃশ্যমান করে নৃত্য আরম্ভ করেছেন। কিন্তু এ-নৃত্য দেখবার অধিকার আমার আছে কি? রুদ্র না হয় অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর চেলা নন্দীভৃঙ্গীরা ত রয়েছেন! স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সমঝে চলতেন, যদিও ওদিকে পূষনের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল, তাই বলেছেন:—

'ভৈরব, সেদিন তব প্রেতসঙ্গী দল
রক্ত-আঁখি!'

অস্ট্রিচ পাখি যে-রকম ভয় পেয়ে বালুতে মাথা গুঁজে ভাবে, কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না, আমিও ঠিক তেমনি পকেট থেকে কালো চশমা বের করে পরলুম—এইবারে নূপুর-নৃত্য দেখতে আর কোন অসুবিধে হচ্ছে না।

শুনি, 'স্যার, স্যার!' এ কী জ্বালা। চেয়ে দেখি প্লেনের স্টুয়ার্ড ট্রেতে করে সামনে লজেঞ্জুস ধরেছে। বিশ্বাস করবেন না, সত্যি লজেঞ্জুস! লাল-নীল, ধলা, হরেক রঙের। লোকটা মস্করা করছে নাকি—আমি ছোঁড়ার বাপের বয়সী—আমাকে দেখাচ্ছে লজেঞ্জুস! তারপর কি ঝুমঝুমি দিয়ে বলবে, 'বাপধন, এইটে দোলাও দেখিনি, ডাইনে বাঁয়ে, ডাইনে—আর—বাঁয়ে।'

এদিকে প্রকৃতির রসরঙ্গ, ওদিকে লজেঞ্জুসের রস। আমি মহাবিরক্তির সঙ্গে বললুম, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

লোকটা আচ্ছা গবেট ত! শুধালে, 'থ্যাঙ্ক ইউ, ইয়েস্? অর থ্যাঙ্ক ইউ, নো?' মনে মনে বললুম, 'তোমার মাথায় গোবর।' মুখে বললুম, 'নো।' কিন্তু এবারে আর 'থ্যাঙ্ক ইউ' বললুম না।

কিন্তু বিশ্বাস করবেন না, মশাইরা, বেশীর ভাগ ধেড়েরাই লজেঞ্জুস নিলে এবং চুষলে।

তবে কি হাওয়ায় চড়ে ওদের গলা শুকিয়ে গিয়েছে, আর ওই বাচ্চাদের মাল নিয়ে গলা ভেজাচ্ছে? আল্লায় মালুম।

ও মা, ততক্ষণে দেখি সামনে আবার গঙ্গা। কাটোয়ার বাঁক।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্লেন আবার গঙ্গা ডিঙল। ওকে ত আর খেয়ার পয়সা দিতে হয় না। কে বলেছে ঃ—

'ভাগ্যিস আছিল নদী জগৎ সংসারে
তাই লোকে কড়ি দিয়ে যেতে পারে
ও-পারে ??'

ভাষা ও জনসংযোগ

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র দোল সংখ্যায় (১৯৫৩) শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র সেন 'বাংলাসাহিত্যের অতীত এবং ভবিষ্যৎ' শীর্ষক একটি সুচিন্তিত এবং তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন। হিন্দী ইংরেজী বনাম বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে যাঁরা কৌতূহলী তাঁদের সকলকে আমি এই প্রবন্ধটি পড়তে অনুরোধ করি—তাঁরা লাভবান হবেন।

আমার আলোচনায় জানা-অজানাতে প্রবোধচন্দ্রের অনেক যুক্তি এসে গিয়েছে এবং আসবে। প্রবোধচন্দ্র না হয়ে অন্য কোন কাঁচা লেখক হলে আমি আমার লেখাতে পদে পদে তাঁর উদ্ধৃতির ঋণ স্বীকার করতুম—কিন্তু এঁর বেলা সেটার প্রয়োজন নেই, কারণ প্রবোধবাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত, তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য বাংলা ভাষা যেন তাঁর ন্যায্য হক্ক পায় এবং সেই হক্ক সপ্রমাণ করার জন্য কে তাঁর লেখা থেকে কতখানি সাহায্য পেল, সে সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। এবং আমার বিশ্বাস, দরকার হলে তিনিও অন্য লেখকের রচনা থেকে যুক্তি-তর্ক আহরণ করতে কুণ্ঠিত হবেন না। আমার লেখা তাঁকে সাহায্য না-ই করল।

প্রাচ্যে যে-সব বড় আন্দোলন হয়ে গিয়েছে, সে-সব আন্দোলন শুধু যে তার জন্মভূমিতেই সফল হয়েছে তাই নয়, তার ঢেউ পশ্চিমকেও তার সুপ্তিতে জাগরণ এনে দিয়েছে, সে-সব আন্দোলনকে আমরা সচরাচর ধর্মের পর্যায়ে ফেলে নবধর্মের অভ্যুদয় নাম দিয়ে থাকি। ভারতবর্ষে তাই বৌদ্ধ ও জৈনদের দুই বৃহৎ আন্দোলনকে আমরা ধর্মের আখ্যা দিয়েছি ; সেমিতি ভূমিতে ঠিক ওই রকমই দুই মহাপুরুষকে কেন্দ্র করে দুটি জোরাল আন্দোলন সৃষ্ট হয়—তাদের নাম খ্রীষ্টধর্ম এবং ইসলাম।

আজকের দিনে ধর্ম বলতে আমরা প্রধানত বুঝি, মানুষের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক। পূজা-অর্চনা কিংবা কৃচ্ছ্রসাধন ধ্যানাদি করে কী করে ভগবানকে পাওয়া যায় ধর্ম সেই পন্থা দেখিয়ে দেয়, এই আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু একটুখানি ধর্মের ইতিহাস অধ্যয়ন করলেই দেখতে পাবেন, ভগবানকে পাওয়ার জন্য ধর্ম যতখানি মাথা ঘামিয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশী চেষ্টা করেছে, মানুষে মানুষে সম্পর্ক সভ্যতর করার জন্য। ধর্ম চেষ্টা করেছে, ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য কমাতে, অন্ধ-আতুরের আশ্রয় নির্মাণ করাতে—এক কথায় এমন এক নবীন সমাজ গড়ে তুলতে যেখানে মানুষ মাৎস্যন্যায় বর্জন করে, একে অন্যের সহযোগিতায় আপন আপন শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ করতে পারে। বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম এই সব কাজেই মনোযোগ করেছে বেশী—ভগবানের সান্নিধ্য এবং তার সাহায্য সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিত্তশালী এবং পণ্ডিতের সংখ্যা সংসারে সব সময়েই কম ছিল বলে বড় আন্দোলনকারী মাত্রই এদের উপেক্ষা করে জনগণকে কাছে আনতে—এমন কী 'খেপিয়ে তুলতে'—চেষ্টা করেছেন প্রাণপণ। তাই তাঁরা বিত্তশালী এবং পণ্ডিতের ভাষা উপেক্ষা করে যে-ভাষার কথা বলেছেন, সেটা জনগণের ভাষা। তথাগতের ভাষা তৎকালীন গ্রাম্য ভাষা পালি এবং মহাবীরের ভাষা অর্ধমাগধী, খ্রীষ্টের ভাষা হিব্রুর গ্রাম্য সংস্করণ, আরামেয়িক এবং মুহম্মদের (দঃ) ভাষা আরবী। আরবী সে-যুগে এতই অনাদৃত ছিল যে, আরবেরাই আশ্চর্য হল, এ-ভাষায় আল্লা তাঁর কুরআন প্রকাশ (অবতরণ=নাজিল) করলেন কেন? তারই উত্তর কুরআনে রয়েছে।

আল্লা বলেছেনঃ

"Had we sent as
A Quaran (in a language)
Other than Arabic, they would
Have said : why are not
It's verses explained in detail ?
What ! (a book) not in Arabic
And (a Messenger an Arab ?)"

অর্থাৎ "আমরা যদি আরবী ভিন্ন অন্য কোন ভাষাতে কুরআন পাঠাতুম তা হলে তারা বলত, এর বাক্যগুলো ভাল করে বুঝিয়ে বলা হয়নি কেন? সে কি! বই আরবীতে নয় অথচ পয়গম্বর আরব?"

আল্লা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, আরব পয়গম্বর যে আরবী ভাষায় কুরআন অবতরণের ভাষা ব্যবহার করবেন সেই ত স্বাভাবিক, অন্য যে কোন ভাষায় (এবং সে যুগে হীব্রু ছিল পণ্ডিতের ভাষা) সে কুরআন পাঠানো হলে মক্কার লোক নিশ্চয়ই বলত, 'আমরা ত এর অর্থ বুঝতে পারছি নে।'

গণ-আন্দোলনে সবচেয়ে বড় কথা—আপামর জনসাধারণ যেন বক্তার বক্তব্য স্পষ্ট বুঝতে পারে।

তাই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের চতুর্দিকে যে-আন্দোলন গড়ে উঠল, তার ভাষা বাংলা, তুকারামের ভাষা মারাঠী (তিনি ব্যঙ্গ করে বলেছেন, সংস্কৃতই কেবল সাধুভাষা?—তবে কি মারাঠী চোরের ভাষা), কবীরের ভাষা সে-সময়ে প্রচলিত হিন্দী এবং তিনিও বলেছেন, "সংস্কৃত কূপজল (তার জন্য ব্যাকরণের দড়ি-লোটার প্রয়োজন) কিন্তু 'ভাষা' (অর্থাৎ চলতি ভাষা) 'বহতা' নীর—এখন খুশি ঝাঁপ দাও, শান্ত হবে শরীর।" রামমোহন, দয়ানন্দ আপন আপন মাতৃ-ভাষায় তাঁদের বাণী প্রচার করেছিলেন, আর শ্রীরামকৃষ্ণ যে বাংলা ব্যবহার করে গিয়েছেন, তার চেয়ে সোজা সরল বাংলা আজ পর্যন্ত কেউ বলতে পেরেছেন? এমন কি বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁর বিপক্ষ দলকে উপদেশ দিয়েছিলেন সংস্কৃত না লিখে বাংলায় উত্তর দিতে। তিনি নিজেও সংস্কৃতে লেখেন নি, যদিও তিনি সংস্কৃত জানতেন আর সকলের চেয়ে বেশী।

আমার মনে হয় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের পতনের অন্যতম কারণ সেদিনই জন্ম নিল, যেদিন বৌদ্ধ ও জৈন পণ্ডিতেরা দেশজ ভাষা ত্যাগ করে সংস্কৃতে শাস্ত্রালোচনা আরম্ভ করলেন। দেশের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল ; ওদিকে

www.BanglaBook.org

সংস্কৃতে শাস্ত্রচর্চা করতে ব্রাহ্মণদের ঐতিহ্য ঢের ঢের বেশী—বৌদ্ধ-জৈনদের হার মানতে হল।

পৃথিবী জুড়ে আরও বহু বিরাট আন্দোলন হয়ে গিয়েছে—পণ্ডিতী ভাষাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, মাতৃভাষার উপর পরিপূর্ণ নির্ভর করে।

এইবারে নিবেদন, ইতিহাস আলোচনা করে দেখান ত পৃথিবীর কোথায় কোন্ মহান্ এবং বিরাট আন্দোলন হয়েছে জনগণের কথা এবং বোধ্য ভাষা বর্জন করে?

এ-তত্ত্ব এতই সরল যে, এটাকে প্রমাণ করা কঠিন। স্বতঃসিদ্ধ জিনিস প্রমাণ করতে গেলেই প্রাণ কণ্ঠাগত হয়।

আটঘাট বেঁধে পূর্বেই প্রমাণ করেছি, এসব আন্দোলন নিছক ধর্মান্দোলন (অর্থাৎ আত্মা-পরমাত্মার্জনিত) নয়; এদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অংশ অনেক বেশী গুরুত্বব্যঞ্জক।

তাই ভারতবর্ষ এখন যে নবীন রাষ্ট্র নির্মাণের চেষ্টা করছে, তার সঙ্গে এই সব আন্দোলনের পার্থক্য অতি সামান্য এবং তুচ্ছ। এই যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করা হয়েছে, তার সাফল্যের বৃহদংশ নির্ভর করবে জনগণের সহযোগিতার উপর এ-কথা পরিকল্পনার কর্তাব্যক্তিরা বহুবার স্বীকার করেছেন এবং ক্রমেই বুঝতে পারছেন, উপর থেকে পরিকল্পনা চাপিয়ে কোন দেশকে উন্নত করা যায় না—যদি নীচের থেকে, জনগণের হৃদয় মন থেকে সাড়া না আসে, সহযোগিতা জেগে না ওঠে।

আমাদের সর্ব প্রচেষ্টা, সর্ব অর্থব্যয়, সর্ব কৃচ্ছ্রসাধন সম্পূর্ণ নিষ্ফল হবে যদি আমরা আমাদের সর্ব পরিকল্পনা সর্ব প্রচেষ্টা জনগণের বোধ্য ভাষায় তাদের সম্মুখে প্রকাশ না করি। এ-বিষয়ে আমার মনে কণামাত্র সন্দেহ নেই।

আমি জানি, ভারতবর্ষ এগিয়ে যাবেই, কেউ ঠেকাতে পারবে না। শুধু যাঁরা অনন্তহীনকাল ধরে ইংরেজীর সেবা করতে চান, তাঁরা ভারতের অগ্রগামী গতিকে মন্থর করে দেবেন মাত্র।

এ বিশ্বাস না থাকলে আমি বার বার নানা কথা এবং একাধিকবার একই কথা বলে বলে আপনাদের বিরক্তি ও ধৈর্যচ্যুতির কারণ হতুম না।

ইংরেজী বনাম মাতৃভাষা

হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড-এ সুপণ্ডিত, প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার 'কম্পালসরি হিন্দী—ইট্স্ এফেকট্ অন্ এডুকেশন' শীর্ষক একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধের পূর্বার্ধে তিনি দুটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন। প্রথমত, অ-হিন্দী অঞ্চলের আপন ভাষা—যথা বাংলা, মারাঠী, দক্ষিণী ভাষা-গুলোর স্থান হিন্দী দখল করে নিয়ে সে সব অঞ্চলে একে অন্যের যোগসূত্রের এবং সাহিত্যে কলাসৃষ্টির মাধ্যম হতে পারবে কি? দ্বিতীয়ত, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার জগতে আমরা যদি দূরদৃষ্টি দিয়ে দেখি, তবে এটা কি কাম্য হবে যে, হিন্দী ইংরেজীর জায়গা দখল করে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হয়ে উঠুক?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নানা যুক্তি তর্ক দিয়ে শ্রীযুত সরকার সপ্রমাণ করেছেন, বাংলা, মারাঠী ইত্যাদির স্থান হিন্দী কখনও দখল করতে পারবে না। আমরাও তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরেও তিনি বলেছেন, ইংরেজীর স্থলে হিন্দী কাম্য হতে পারে না। শ্রীযুক্ত সরকার তাই ব্যবসা-বাণিজ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য ভারতবর্ষে ইংরেজীই চালু রাখতে চান। বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি ইংরেজীকেই শিক্ষার মাধ্যমরূপে রাখতে চান—না হিন্দী, না বাংলা, এবং তাঁর লেখাতে তিনি এমন কেনও ইঙ্গিতও দেননি যে, আজ হোক কিংবা একশ বছর পরেই হোক, শেষ পর্যন্ত বাংলাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হবে। তাঁর ব্যবস্থা অনুযায়ী দেখতে পাচ্ছি, ইংরেজীই অজরামররূপে চিরকাল আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যম হয়ে থাকবে।

সরকার মহাশয় ইংরেজী ভাষার যে গুণকীর্তন করেছেন তার সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ একমত। ইংরেজীর মত আন্তর্জাতিক ভাষা পৃথিবীতে আর নেই, অদ্যকার (বিশেষ জোর দিয়ে আমিও বলছি অদ্যকার) দিনে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং দর্শনের চর্চা করতে হলে ইংরেজী ভিন্ন গত্যন্তর নিই।

কিন্তু ইংরেজী চিরকাল এদেশের শিক্ষার মাধ্যম, তথা উচ্চাঙ্গ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার বাহন হয়ে থাকবে এ ব্যবস্থা আমরা কাম্য বলে মনে করি নে।

এ কথা ঠিক যে, আজই যদি আমরা ইংরেজী বর্জন-করি, তবে সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হব, কিন্তু কোনও দিনই শিক্ষার মাধ্যমরূপে বর্জন করতে পারব না একথা আমরা বিশ্বাস করি নে।

পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচ্য দেশের অবস্থা আজ কী? আরব ভূখণ্ড বিশেষ করে মিশরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা কি দিল্লি-কলকাতার চেয়ে অনেক কম? মিশরে জ্ঞানচর্চার মাধ্যম আরবী, ইংরেজী না ফরাসী? 'অজহর' মুসলিম শাস্ত্রালোচনার পীঠস্থল—সেখানে যে আরবী মাধ্যম হবে, তাতে আর কী সন্দেহ! তাই সে দৃষ্টান্ত দেব না, কিন্তু য়ুরোপীয় ঢঙে নির্মিত বাকী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম ত ফরাসী নয়, ইংরেজীও নয়। অথচ তারা দিব্য আরবীর মাধ্যমেই অ্যালোপ্যাথি, য়ুরোপীয় ইঞ্জিনীয়ারিং শিখছে, তাদের পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রতিবেদন (রিপোর্ট) আরবীতেই বেরয়। বিদেশী অধ্যাপকদের আরবী শিখে সে-ভাষাতেই পড়াতে হয়।

আংকারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যম ফরাসীস্? বা তেহরানে?

এই যে চীনে এতবড় রাজনৈতিক ও সামাজিক নবজাগরণ হয়েছে সে কি রাশানকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যম করে? না, আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাশান শিক্ষার মাধ্যম, কিংবা চীনারা তাঁদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা রাশান ভাষায় আরম্ভ করে দিয়েছেন?' পণ্ডিতজী তাঁর চিন্তার ফল ইংরেজীতে প্রকাশ করেন, কিন্তু মাওৎসে তুঙ রাশানে কেতাব লিখেছেন, এ কথা ত কখনও শুনি নি।

জাপানে শিক্ষার মাধ্যম কি ইংরেজী? জাপানীদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বেরয় কোন্ ভাষায়?

শ্রীযুক্ত সরকার বলেছেন,—"Even in the Latin Republics of South America, English is fast advancing as the medium of commercial communication and displacing (except for 'petty purely local

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

transactions) Portuguese and in some of the States corrupt Spanish by the people."

লাতিন-আমেরিকা সম্বন্ধে আমার সাক্ষাৎ জ্ঞান নেই, তাই 'পেটি প্যারলি লোকাল ট্রানজ্যাকশনস্' বলতে শ্রীযুক্ত সরকার কী বলতে চেয়েছেন, ঠিক বুঝতে পারলুম না। তবে কি ওইসব অঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী? এমন কথা ত কখনও শুনি নি—বরঞ্চ আমার ঠিক ঠিক জানা আছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে, জর্মানির ইস্কুলে যারা লাতিন গ্রীক পড়ত না তাদের বাধ্য হয়ে ইংরেজী, ফরাসী এবং স্প্যানিশের মধ্যে যে-কোনও দুটো শিখতে হত এবং লাতিন-আমেরিকায় ইংরেজীর চেয়ে স্প্যানিশের মাধ্যমেই ব্যবসা-বাণিজ্য ভাল চলবে এ-তত্ত্ব জানা থাকায় বহু ছেলেমেয়ে স্প্যানিশ শিখত।

লাতিন-আমেরিকা অনেক দূরের পাল্লা—এবারে ইংলণ্ডের খুব কাছে চলে আসা যাক—ইংরেজী ভাষার গুণ-গরিমা প্রতিবেশী হিসাবে যারা সব চাইতে বেশী জানে এবং বোঝে। এরা সংখ্যায় খুব নগণ্য, তবু ইংরেজীকে শিক্ষার মাধ্যম করে নেয় নি। হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কি শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী, না তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করে ইংরেজীতে? এদের ব্যবসা-বাণিজ্যের বেশ একটা বড় হিস্যা ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে, কিন্তু কই, তারাও ত তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী অবশ্য পাঠ্য করে নি? আজকের দিনের সঠিক খবর বলতে পারব না, তবে যতদূর জানা আছে, যারা উচ্চশিক্ষাভিলাষী তাদের হয় শিখতে হয় লাতিন-গ্রীক, নয় ইংরেজী, ফরাসী, জর্মন, স্প্যানিশ ইত্যাদির যে-কোন দুটো ভাষা।

এখন প্রশ্ন, যারা মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য একটি কিংবা দুটি ভাষা শেখে তাদের জ্ঞানগম্যি ওসব ভাষাতে কতখানি হয়? পণ্ডিতদের কথা হচ্ছে না, তাঁদের সংখ্যা অতিশয় নগণ্য। জর্মন পণ্ডিতমাত্রই ক্লাসিক্স্ এবং ফরাসী, ইংরেজী, ইতালীয় পড়ে বুঝতে পারেন, ইংরেজ পণ্ডিতদের বেশীর ভাগ ফরাসী জর্মন পড়তে পারেন—বিশেষ করে যাঁরা অর্থনীতির চর্চা করবেন তাঁদের মাসিক পত্রিকায় জমবার্ট, শুমপেটার পড়ার জন্য বাধ্য হয়ে জর্মন শিখতে হত। অ্যাটম-বমের গবেষণা করেছেন আমেরিকাতে জর্মনরাই, কিংবা যাঁরা জর্মন জানতেন।

কিন্তু ইয়োরোপে আর যারা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজী শেখে, ইস্কুল কলেজ ছাড়ার পর তারা ওই ভাষাতে জ্ঞান-চর্চা করে কতটুকু? উচ্চশিক্ষিত ইংরেজ মাত্রই অন্তত আট বছর ফরাসী শেখেন—কিন্তু কলেজ ছাড়ার বছর পাঁচেক পরই এঁরা আর ফরাসী বই কেনেন না। আমি এঁদের বাড়ির কেতাবের শেল্‌ফ্ মনোযোগ করে দেখেছি—পাঠ্যাবস্থায় যে-সব ফরাসী বই তাঁরা কিনেছিলেন তার উপর আর কিছু কেনবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। এঁদের 'দ্বিতীয় ভাষা' সম্বন্ধে জ্ঞান শেষ পর্যন্ত কতটুকু থাকে সে সম্বন্ধে জেরম কে জেরমের ঠাট্টা-মস্করা পড়ে দেখবেন।

বস্তুত বহু গবেষণা করে শিক্ষকগণ এই চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতেই এসেছেন যে, মানুষকে ব্যাপকভাবে দোভাষী করা যায় না। গোলামদের কথা আলাদা। তারা যখন দেখে অর্থাগমের একমাত্র পন্থা 'মুনিবের ভাষা শেখা' তখন সব-কিছু বিসর্জন দিয়ে প্রভুর ভাষা শেখে—আমি যে-রকম শিখেছিলুম, ফলে আজ না পারি উত্তম বাংলা বলতে, না পারি মধ্যম ইংরেজী লিখতে! কিন্তু আমার ছেলে

www.BanglaBook.org

গোলাম নয়—আমার আশা সে একদিন বাংলাতেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করবে। আমার ছেলে না পারুক, যদি আপনার ছেলে পারে তাতেই আমি খুশি এবং যদি সেদিন তার খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে ইংরেজ ফরাসী আপন আপন মাতৃ-ভাষাতে তার কেতাব অনুবাদ করে—আজ যে-রকম মাওৎসে তুঙের চীনা বই বেরনোমাত্রই ইংরেজ গায়ে পড়ে তৎক্ষণাৎ স্ব-ভাষায় তার অনুবাদ করে, এখনও যে-রকম ইংরেজ 'শকুন্তলা' নাটোর অনুবাদ করে—তবে আমি অমর্তলোক থেকে তাকে দু হাত তুলে আশীর্বাদ করব। অনন্তকাল ধরে আমরা শুধু ইংরেজী থেকে নেবই, কিছু দেবার সময় কখনও আমাদের আসবে না, এ-কথা ভাবতেও আমার মন বিরূপ হয়।

তবে কি বাংলাভাষী লোকসংখ্যা পৃথিবীতে এতই কম যে, আমরা কখনও বাংলাকে ফরাসী কিংবা জর্মনের মত সমৃদ্ধশালী করতে পারব না?

ভাষা	(ভাষীদের সংখ্যা হাজার সমষ্টিতে)
বাংলা	৬০০০০
আরবী	২৫০০০
চীন	৪৩০০০০
গ্রীক	৫৫০০
জাপানী	৫৫০০০
জর্মন ...	৮০০০০
হিন্দুস্থানী (অর্থাৎ হিন্দী উর্দু দুই মিলিয়ে ; না হলে সুদ্ধ হিন্দীভাষীর সংখ্যা বাংলায় চেয়ে কম)	৯০০০০
ওলন্দাজ	১০০০০
ইংরেজী	১৮০০০০
ফরাসী	৪৫০০০
রুশ	৮৫০০০
তুর্কী ...	৭০০০

এবারে ভাষার ভিত্তিতে না নিয়ে লোকসংখ্যা নিন ; কারণ যে বর্ষপঞ্জী থেকে সংখ্যাগুলি পেয়েছি, দুর্ভাগ্যক্রমে তাতে নরউইজিয়ন, সুইডিশ, ডেনিশ, ফিনিশ ভাষীর সংখ্যা দেওয়া হয় নি!

নরওয়ে	২৯৫২
ডেনমার্ক	৩৯৭৩
ফিনল্যান্ড ...	৩৭৩৪

আমার যতদূর মনে পড়ছে, চীনা, ইংরেজী, রুশীয়, জর্মন এবং স্প্যানিশের পরেই পৃথিবীতে বাংলার স্থান।

নরওয়ে, সুইডেন তাদের ২৯,৫২ : ৬৫,২৩ নিয়ে আপন আপন ভাষায় দর্শন লেখে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করে, ডাক্তারি শেখ, ইঞ্জিনীয়ারি করে আর আমরা ৬০০,০০ হয়েও চিরকাল ইংরেজীর ধামা-ধরা হয়ে থাকব?

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি আমরা কল্পনা করতে পারি নি, ফার্সী যদি এদেশ থেকে চলে যায়, তবে আমরা রাজকার্য চালাব কী করে! ইংরেজ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে, ইংরেজীতেও চালানো যায়। আজ আমরা কল্পনা করতে পারছি নে, ইংরেজী ছেড়ে আমরা যাব কোথায়?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু অধমের বক্তব্য এইখানেই শেষ নয়।

বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন, পণ্ডিতজনের মতের বিরুদ্ধে যেয়ো না, কারণ পণ্ডিতের জ্ঞান আছে, তোমার নেই।

তবে কি মূর্খের বিরুদ্ধে মতানৈক্য প্রকাশ করব? সে ত আরও ভয়ঙ্কর। আমার আপন অজানাতে যে-সব অসিদ্ধ যুক্তি-তর্ক উত্থাপন করব, যে-সব ভুল ঐতিহাসিক তথ্য পেশ করব, মূর্খ অজ্ঞতাবশত সেগুলো মেনে নিয়ে আমকে আরও বিপদে ফেলবে।

তাই আমি শ্রীযুত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের সঙ্গে মতানৈক্য প্রকাশ করছি। তিনি জ্ঞানবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ এবং সুপণ্ডিত : আমার মত অর্বাচীনের যুক্তি-তর্কে বিশেষত ঐতিহাসিক নজির পেশ করার সময় যদি ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে, তবে তিনি সেগুলো সানন্দে এবং অনায়াসে মেরামত করে দিয়ে আমার জ্ঞানবৃদ্ধি করে দেবেন। বাঘা টেনিস-খেলোয়াড় টিল্‌ডেনও বলেছেন, 'সব সময় তোমার চেয়ে ভাল খেলোয়াড়ের সঙ্গে খেলবে—না হলে খেলাতে তোমার কখনও উন্নতি হবে না।' ইতিহাসে শ্রীযুত সরকার ভুবন-বিখ্যাত—তাঁর সঙ্গে দ্বিমত হয়ে আমিই লাভবান হব।

ইংরেজী ভাষার জ্ঞানভাণ্ডার দেখে আমরা আজ কিছুতেই কল্পনা করতে পারি নে, এ-ভাষা বাদ দিয়ে আমরা চলব কী করে? বাংলায় এ-রকম ভাণ্ডার নির্মাণ করব কী প্রকারে?

ইতিহাস বলেন, একদা ইয়োরোপের সর্বত্র জ্ঞানচর্চা হত লাতিনের মাধ্যমে। ইংরেজী, ফরাসী, জর্মনের নামও কেউ মুখে আনত না। ওই সব অপোগণ্ড অর্বাচীন ভাষা যে কখনও জ্ঞানচর্চার মাধ্যম হতে পারে একথা কেউ বললে তখন নিশ্চয়ই তাকে পাগলা-গারদে পাঠানো হত, কিংবা ডাইনী 'ভর করেছে' ভেবে জ্যান্ত পুড়িয়ে ফেলা হত। অথচ এমন দিনও এল যখন ফ্রান্সের লোক লাতিন বর্জন করে ফরাসী ভাষাকেই জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার মাধ্যম বলে মেনে নিল। জর্মনি তখনও শিক্ষাদীক্ষায় ফ্রান্সের অনেক পিছনে, তাই জর্মন রাজা-রাজড়া, নবাব সুবেদাররা উত্তম ফরাসী-চর্চা করাটাই জীবনের সর্বপ্রধান কাম্য বলে ধরে নিয়েছিলেন। কাচ্চা-বাচ্চাদের পর্যন্ত ফরাসী 'পার্লিয়েরেন' ('স্প্রেয়েন' ক্রিয়া খাঁটি জর্মন, তার অর্থ 'কথা বলা' কিন্তু জর্মনরা তখন অনুকরণে এমনি মত্ত যে ফরাসী 'পার্লে' ক্রিয়া পর্যন্ত ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে—তুলনা দিয়ে বলি, আমি ছেলেবেলা থেকে ইংলিশ 'স্পীক' করে আসছি) করতে শেখানো হত এবং জর্মন ভাষাটাকে চাকরবাকরের ভাষা (গ্রেজিন্‌ডে-স্প্রাখে) বলে গণ্য করা হত। ফ্রিডরিক দি গ্রেট মাতৃভাষা জর্মনকে হেয় জ্ঞান করে ফরাসীতে কবিতা লিখতেন এবং সেই রদ্দী কবিতা মেরামত করতে গিয়ে গুণী ভল্‌টেয়ারের নাভিশ্বাস উঠত।

তারপর একদিন ফরাসী নিজের থেকেই ব্যাঙাচির ল্যাজের মত খসে পড়ল। জর্মনই জ্ঞানচর্চার মাধ্যম হয়ে গেল।

তারপর জর্মন এল ইংরেজীর আওতায়। শ্রীযুত যদুনাথ এই সম্পর্কে লিখেছেন—

"The late German Emperor, Wilhelm II, before world-war

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

No. 1, had made English a Compulsory second language in all the secondary schools of his Empire. Was that a sign of his slavery to the British people? No, like a shrewd practical politician he felt that this was the best way of promoting Germany's trade all over the world." (Hindusthan Standard, Feb. 1st, '53.)

এবার দেখা যাক এই ইংরেজীর প্রভাব খুদ জর্মনরা পরবর্তী যুগে কী চোখে দেখেছে।

ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুত য়োহান ভীসনার 'জর্মন-ভাষা শিক্ষা (ডয়েচ্‌শে স্প্রাখলেরে) নামক একখানি পুস্তিকা লেখেন। এ পুস্তিকা অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির শিক্ষা-বিভাগ (কুলটুস্‌ মিনিস্টেরিয়ুমের) কলেজের জন্য পাঠ্যপুস্তক হিসাবে নির্বাচন করেন।

জর্মনের উপর লাতিন, ফরাসী তথা ইংরেজীর প্রভাব আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক ভীসনার যা বলেছেন সেটি আমি তুলে দিচ্ছি। অনুবাদের সঙ্গে মূল জর্মন এখানে তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্য যে, অনুবাদে কোনও ভুল থাকলে গুণী পাঠক সেদিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে পারবেন। (ডবল স্পেস্‌ওলা শব্দগুলো ইংরেজী--পাঠকের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করছি)।

Dem 19 Jhdt war es vorbehalten, unser Deutch mit englischen Woertern xu ueberfluten Die weit verbreitete Kenntnis der englischen Weltsprache, dazu der maechtige Einfluss englischer Sitte und Mode bewirkten, dass der deutche Gentlemanm Smoking oder Sweater wenigstens bis zum Weltkriege den Englaender ebenso nachaeffte wie frueher der deutsche Cavalier den Franzosen, Jede Kneipe bis dahin warein Bar, jedes Dampfschiff ein Steamer, jeder Fahrstuhl ein Lift (mi. einem Liftboy) jede Fuellfeder eine Fountain-pen jeder Fuenfuhr-Tee ein Fiveo'-clocktea, Deutsche Fabrikanten schrieben auf ihre fure Deutschland bestimmten Erzeugnisse Koh-i-noor made by L. & C. Hardmuth in Austria, British graphite drawing pencil, compressed lead. Am ueppigsten wucherte das englische natuerlich auf dem Gebiete des Sports; deutsche Mittelschulen veranstalten Football-meetings und Lawn-tennis matches wobei alles englisch war. auch das Zaehlen, nur mcht die Auesprache, Wie leichtferting der Deutsche sein Volkstum vollends preisgibt, wenc er mit dem Auslande in unmittelbare Beziehung tritt, sieht man an der gemixten Sprache des Deutsch-Amerikhaners; immer bissitg (busy), kauft sich dieser eme goldene Watschen (watch) startet-forhom (geht nach Hause) und ringt die Bell (laeutet die Glocke) order bellt (laeutet einfach.—ভীসনার, ডয়েচ্‌শে স্প্রাখলেরে, পৃঃ ৮৫।

"আর ঊনবিংশ শতাব্দী রইলেন আমাদের জর্মন ভাষা ইংরেজী শব্দের বন্যায় ভাসিয়ে দেবার জন্য। বিশ্বভাষা হিসেবে ইংরেজীর প্রসার এবং ইংরেজী

www.BanglaBook.org

রীতিনীতির প্রভাব হওয়ার ফলে বিশ্বযুদ্ধ (প্রথম) না লাগা পর্যন্ত জর্মন Gentleman Smoking কিংবা Sweater পরে পরে বাঁদরের মত ইংরেজের অনুকরণ করেছিল—একদা যে-রকম জর্মন Cavalir ফরাসীর অনুকরণ করেছিল। স্নাইপেকে বলা হত bar, ডামপফশিফকে বলা হত steamer, ফারস্ট লকে lift (এবং তার ভিতরে থাকত lift-boy), ফুলফেডারকে fountain pen, ফুনফউরটিকে five o clock tea. জর্মন কারখানাওয়ালারা জর্মনিরই জন্য নির্মিত মালের উপর লিখতেন, Koh-I-noor mady by L. & C. Hardmuth in Austria, British graphite drawing pencil, compressed lead. এই (শব্দের) আগাছা অবশ্য সবচেয়ে বেশী পল্লবিত হল sports-এর জমিতে। জর্মন হাইস্কুলগুলো football meetings এবং Lawn-Tennis-matches-এর ব্যবস্থা করল এবং সেখানে সবই ইংরেজীতে চলত, এমন কী সংখ্যা গোনা পর্যন্ত—একমাত্র উচ্চারণটি ছাড়া (লেখক ব্যঙ্গ করে ইঙ্গিত করেছেন—ওই কর্মটি সরল নয় বলেই)। বিদেশীর সঙ্গে সোজা সংস্পর্শে এলে জর্মন কী অবহেলায় তার জাত্যাভিমান বর্জন করে তার উদাহরণ দেখা যায় তার খিচুড়ি জর্মন-মার্কিন ভাষাতে, 'বিজিক' (Busy) ঘড়ি কিনলে সেটা Watschen (Watch) startet for hom (বাড়ি রওয়ানা দিল) এবং ringt die bell (ঘণ্টা বাজায়) কিংবা শুধু belt (এখানে লেখক একটু রসিকতা করেছেন, শুদ্ধ জর্মনে belt অর্থ 'ঘেউ ঘেউ করা')।"

তারপর লেখক দুঃখ করেছেন যে, এই করে করে জর্মন ভাষা একটা জোব্বার মত হয়ে উঠল যার সর্বাঙ্গে রঙিন তালি এবং সে-তালির টুকরোগুলোর নানা রঙের নানা জামা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া!

আমি অধ্যাপক ভীসনারের সঙ্গে ষোল আনা একমত নই। বাংলা এখনও অতি দুর্বল ভাষা ; তাকে এখনও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রচুর বিদেশী শব্দ নিতে হবে। আমি যে এই নাতিদীর্ঘ উদাহরণটির অতি কষ্টে নকল এবং অনুবাদ পেশ করলুম (ভুল করলুম, অ্যাদ্দিন বাজারে জোর ঢোল বাজিয়েছি, আমি খুব ভাল জর্মন জানি, এইবারে অনুবাদের বেলায় ধরা পড়ব) তার উদ্দেশ্য এই যে, জর্মন যদি সুসময়ে এই পাগলামি বন্ধ না করত তবে সে এতদিনে কথামালার চিত্রিতা গর্দভী হয়ে যেত।

অর্থাৎ আমরা যদি অনন্তকাল ধরে ইংরেজীরই সেবা করি, তবে আমাদের বাংলা ভাষাটি চিত্রিতা মর্কটী হয়ে যাবেন।

এ বিষয়ে আরও অনেক বক্তব্য আছে। কিন্তু এতখানি লেখার পর আজ সকালের (রবিবারের) কাগজ এসে পৌঁছল। সে কাগজ পড়ে আমি উল্লাসে মুক্তকচ্ছ হয়ে নৃত্য করেছি। বাংলা ভাষার প্রতি দরদী-জন মাত্রই খবরটি পড়ে উল্লসিত হবেন। খুলে কই।

আশা করি, আমার পাঠকেরা বিজ্ঞানে শ্রীযুত সত্যেন বসু এবং শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পাণ্ডিত্যে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করেন না। যে সব গুণী আমার বৈজ্ঞানিক কৌতূহলজাত প্রশ্ন এক লহমায়, বিনা কসরতে ফৈসালা করে দেন, তাঁরাই দেখছি, এই দুই পণ্ডিতের নাম উচ্চারিত হলেই মাথা নীচু করেন।

শ্রীযুত বসু বলেন, (আমি খবরের কাগজ থেকে তুলে দিচ্ছি, সভাতে যাবার

www.BanglaBook.org

আমার অধিকার নেই—তাই প্রতিবেদনে ভুল থাকলে বসু মহাশয় যেন নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করেন) কেউ কেউ এই ধারণা পোষণ করেন যে, অন্তত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষাকে মাধ্যমরূপে স্বীকার করে নিতেই হবে, কিন্তু তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস (confident) যতদিন না বাংলাতে বিজ্ঞানের চর্চা হয় ততদিন পশ্চিম বাংলায় বিজ্ঞানের প্রসার হতেই পারবে না।

তাঁর বিশ্বাস বাংলাতেই প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক শব্দ কিছুটা আছে, কিছুটা বানানো যেতে পারে, এবং বাদবাকী বিদেশী ভাষা থেকে নিতে কোনও সংকোচ করার প্রয়োজন নেই।

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও বলেন, বৈজ্ঞানিক শব্দের বাংলা পরিভাষা নির্মাণের সময় হয়ে গিয়েছে।

এর পর আর কী চাই? আমি যে-জিনিস অন্ধভাবে অনুভব করেছি, আমার যেসব দরদী পাঠক আমার সঙ্গে এতদিন মোটামুটিভাবে একমত, তাঁরা কি এই দুই পণ্ডিতের উক্তি শুনে উল্লসিত হলেন না?

একটা জিনিসকে আমি বড্ড ডরাই, আপনাদের অনুমতি নিয়ে সেটি আজ আপনাদের কাছে নিবেদন করব।

গণ-আন্দোলন বাদ দিয়ে কোনও দেশেই কোনও বড় কাজ করা সম্ভব হয় না। যতদিন পর্যন্ত শুধু ভারতীয় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই স্বরাজ-আন্দোলনের জন্য চেষ্টা করেছিলেন ততদিন ইংরেজ আমাদের খোড়াই পরোয়া করেছিল, কিন্তু যখন ভারতের জনগণ ইংরেজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল—অবশ্য সেটা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আত্মত্যাগের ফলেই সম্ভবপর হল—তখন বাধ্য হয়ে ইংরেজকে এদেশ ছাড়তে হল। তাই আবার বলছি, গণজাগরণ, গণ-আন্দোলনের শক্তিই আমাদের স্বরাজ এনে দিয়েছে।

এবং সবচেয়ে বড় কথা, আজ যদি ভারতীয় রাষ্ট্র তার স্বরাজ্যকে সর্বাঙ্গ-সুন্দর করতে চায় তবে তার দরকার অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক স্বরাজ্য লাভ। রাজনৈতিক স্বরাজ্যের আপন মূল্য আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু তার ব্যবহারিক মূল্যের দিকটা ভুললে চলবে না। রাজনৈতিক স্বাধীনতার ফলে আমাদের হাতে যে-শক্তি এল তারই প্রয়োগ করে এখন আমাদের জয় করতে হবে অন্য সর্ব-স্বাধীনতা। এক কথায় এখন আমাদের প্রধান কর্তব্য, নবীন রাষ্ট্র গড়ে তোলা।

আমরা ভাবি, রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য 'চাষাভুষো'কে খ্যাপাবার' দরকার ছিল, এখন যখন স্বরাজ হয়ে গিয়েছে, তখন এদের দিয়ে আর কোনও দরকার নেই, এরা ফিরে যাক ক্ষেতে-খামারে, ফলাক ধানচাল। আর মধ্যবিত্ত-শ্রেণী, আমরা শহরে বসে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করব আর তাই দিয়ে নবীন রাষ্ট্র গড়ে তুলব! তাই আমরা সে-চর্চা ইংরেজীতে করব, বাংলায় করব, না বান্টু ভাষায় করব তাতে কিছু আসে-যায় না, আমরা বুঝতে পারলেই হল, ওরা ওদের কম-জোর মাতৃভাষা নিয়ে পড়ে থাক্। ভাবতেই আমার সর্বাঙ্গ ঘেন্নায় রী রী করে ওঠে।

বহু দেশ ভ্রমণ করে, বহু গুণীর সাহচর্যে এসে, আপন মনে নির্জনে বসে বহু তোলপাড় করে আমার সুদৃঢ় প্রত্যয় হয়েছে, এ বড় ভুল ধারণা, এ অতি

www.BanglaBook.org

মারাত্মক বিশ্বাস। আমার মনে আজ কণামাত্র সন্দেহ নেই যে, জনগণের সহযোগিতা ভিন্ন আমরা নবীন রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারব না। আমি আমার সহৃদয় পাঠকসম্প্রদায়কে কখনও কোনও তত্ত্বে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস স্থাপন করতে অনুরোধ করি নি—তার পক্ষে, স্বপক্ষে যুক্তি তর্ক পেশ করেই ক্ষান্ত দিয়েছি—কিন্তু আজ যুক্তিতর্ক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের অনুরোধ করেও বলছি, সাহস দিচ্ছি, জনগণের ভিতর বিশ্বাস অনুপ্রাণিত করুন, তাদের সহযোগিতা আহ্বান করুন—আপনারা লাভবান হবেন। এ ছাড়া অন্য পন্থা নেই।

এখন প্রশ্ন, জনগণের সহযোগিতা, জনগণমন আমরা জয় করব কী প্রকারে?

বিদেশী প্রবাদ : সব লোককে কিছুদিন ঠকাতে পার, কিছু লোককে সর্বদিন ঠকাতে পার, কিন্তু সব লোককে সব দিন ঠকাতে পারবে না। আমাদের অধঃপতনের যুগে আমাদের সব লোককে—অর্থাৎ জনগণকে—আমরা অন্ধানুকরণ করতে শিখিয়েছিলুম, কিন্তু আজ আর সে-কর্ম সম্ভবপর নয়। আমরা চাইও না। আজ আমরা চাই, জনগণ যেন আমাদের আদর্শ বুঝতে পেরে, সেই মর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে নবীন রাষ্ট্র নির্মাণে আমাদের সহায়তা করে।

তাই প্রশ্ন, জনগণ আমাদের আদর্শ বুঝবে কী প্রকারে? আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করে, ভারতীয় ইতিহাসের ধারা অনুসন্ধান করে যদি তাবৎ বস্তু ইংরেজীতে লিপিবদ্ধ করে সপ্রমাণ করি, আমাদের পক্ষে এই কর্ম কাম্য, আমাদের পক্ষে ওই নীতি প্রয়োজনীয়, আমাদের পক্ষে আরেক পন্থা সুধর্ম তবে তারা এ-সব বুঝবে কী করে?

চট্ করে আপনি উত্তর দেবেন, মাতৃভাষাতে লিখলেই কী তারা সব কিছু বুঝতে পারবে?

এর সদুত্তর দিতে হলে আপনাকে আবার একটুখানি কষ্ট স্বীকার করে ইউরোপে যেতে হবে।

ফ্রান্স, জর্মনি, হল্যাণ্ডে বেশীর ভাগ লোক শিক্ষা সমাপন করে ম্যাট্রিকের সঙ্গে সঙ্গে। এবং ওদের ম্যাট্রিক আমাদের ম্যাট্রিকের চেয়ে উচ্চস্তরের বলে তারা আর-কিছু শিখুক আর না-ই শিখুক, মাতৃভাষাটা অতি উত্তমরূপে শেখে। তারপর টাকা-পয়সা রোজগারের ধান্ধার ভিতর কেউ করে সাহিত্যের চর্চা, কেউ করে ইতিহাসের, কেউ দর্শনের—ইত্যাদি। এবং তাই প্রায়ই দেখা যায়, বহু সুসাহিত্যিক উত্তম উত্তম পুস্তক লিখে যাচ্ছেন অথচ তাঁরা সুধর্মস্থ ম্যাট্রিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছায়া মাড়ান নি। আমাদের রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এই ধরনের—রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র অন্য ধরনের। কিন্তু ইয়োরোপে রবীন্দ্র-শরতের গোষ্ঠী বৃহত্তর।

এ ত হল সৃষ্টিকর্ম—এ অনেক কঠিন কাজ—এর চেয়ে অনেক সোজা, বই পড়ে বোঝা এবং সাধনা দ্বারা ক্রমে ক্রমে সুসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক অধ্যয়ন করে করে দেশের উচ্চতম আদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত থাকা। এ-জিনিসটি ইয়োরোপে অহরহ হচ্ছে এবং তাই ইয়োরোপের যে-কোনও দেশে গুণীজ্ঞানী যে শুধু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভিতরেই পাওয়া যায় তা নয়, জনসাধারণের ভিতরেও বহু বিজ্ঞ ব্যক্তি পাওয়া যায় যাঁরা অনায়াসে অধ্যাপকের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাদের দেশের বাংলা দৈনিকগুলো যে ইংরেজীর তুলনায় পিছিয়ে আছে সে-কথা আমরা সবাই জানি, তবুও দেখেছি, একমাত্র 'আনন্দবাজার'-পড়নেওলা গ্রাম্য বাঙালী অনেক সময় ওরই মারফতে এতখানি জ্ঞান সঞ্চয় করতে পেরেছে যে, ইংরেজী-জাননেওলা শহুরেকে তর্কে কাবু করে আনতে পারে।

আমার তখন বড় দুঃখ হয় যে, আমাদের বড় বড় পণ্ডিতেরা ইংরেজীতে না লিখে যদি বাংলা কাগজে লিখতেন, তবে আমার গাঁয়ের পড়ুয়া জ্ঞানলোকে আরও কত দিগ্বিজয় করতে পারত।

মিল্টন বলেছেন ঃ—

'ক্ষুধার্ত হৃদয় নিয়ে ঊর্ধ্বমুখে চায় এরা কে দেবে এদের খাদ্য!'

আমাদের পণ্ডিতেরা এতদিন এঁদের বঞ্চিত রেখেছেন ; স্বরাজ পাওয়ার পরও এঁরা তাদের জন্য কিছু করতে চান না। (আমি অবশ্য এঁদের দোষ দিই নে—এঁদের কাছে আমরা বহু দিক দিয়ে ঋণী—কিন্তু এঁরা অন্য যুগের লোক, ইংরেজী লেখাতে তাঁরা এত অভ্যস্ত যে, আজ বাংলা লিখতে এঁদের সত্যই কষ্ট হয়।)

মুসলমানেরা প্রাদেশিক ভাষাগুলোকে কিছু কিছু সাহায্য করেছিলেন সে কথা আমরা জানি, ক্রীশ্চান মিশনারিরাও তাই করেছিলেন, কিন্তু এ-কথা ভুললে চলবে না যে, মুসলমানেরা ফার্সী এবং ইংরেজ ইংরেজীকেই সম্মানের স্থান দিয়েছিল। ফলে মুসলমান যুগে যাঁরা ফার্সী জানতেন তাঁরা ছিলেন 'শরীফ' অর্থাৎ 'ভদ্র' আর ব্রিটিশ যুগে (বলা উচিত 'ক্রীশ্চান যুগে' কারণ ভারতের ইতিহাসের প্রথম দুই যুগ যদি 'হিন্দু পিরিয়ড এবং 'মুসলিম পিরিয়ড' হয়, তবে তৃতীয় যুগ 'ক্রীশ্চান পিরিয়ড' হবে না কেন?—এ-তত্ত্বটির প্রতি আমার ক্ষীণদৃষ্টি জ্যোতিষ্মান করেছেন ছন্দ-সম্রাট শ্রীপ্রবোধ সেন) যাঁরা ইংরেজী জানতেন, তাঁরা ছিলেন 'ভডরোলোগ্ ক্লাস', অর্থাৎ 'শরীফ' অর্থাৎ 'ভদ্র'।

অথচ, ভদ্র, 'ভদ্র বলতে আমরা আবহমান কাল এমন কিছু বুঝেছি যার সঙ্গে ফার্সী কিংবা ইংরেজী জানা-না-জানার কোনও সম্পর্ক নেই।

মুসলমান যুগে বরঞ্চ ভদ্রে গ্রাম্যে কিঞ্চিৎ যোগাযোগ ছিল, কারণ মুসলমান যুগে আমাদের সভ্যতা ছিল গ্রাম্য, অর্থাৎ জনপদ সভ্যতা ; কিন্তু ক্রীশ্চান আমলে সভ্যতা ইংরেজী-অভিজ্ঞ এবং ইংরেজী-অনভিজ্ঞের মাঝখানে এমনি এক বিরাট, নিরেট পাঁচিল তুলে দিলে যে, আজও আমরা সে-দেয়াল ভাঙতে পারি নি, এবং ভাঙবার চেষ্টা করতে চাই নে। আমরা এখন ইংরেজী-জাননেওলা আর ইংরেজী-না-জাননেওলার মাঝখানে সেই প্রাচীন অন্ধপ্রাচীর, অচলায়তন খাড়া রাখতে চাই।

এই ব্যবস্থাটাকেই আমি ডরাই, বড্ড ডরাই। এ ব্যবস্থা মেনে নিলে আপনারা একদিন আবার পরাধীন হবেন। সে-কথা আরেক দিন হবে।

টুকিটাকি

দাবা খেলার জন্মভূমি কোথায়?

দাবা খেলার ইতিহাস সম্পর্কে নানা মুনি নানা কথা কয়ে থাকেন। দাবার শেষের দিকের ইতিহাস সুস্পষ্ট এবং সেখানে তর্কাতর্কির অবকাশ নেই। ইরান

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জয় করার পরে আরবরা সেদেশে প্রথম দাবা খেলা শেখে। সকলেই জানেন, কোনও খেলা সম্পূর্ণ আপন করে নেওয়ার পরও তার মূল পরিভাষা অনেক সময় আগাগোড়া পরিবর্তিত হয় না। তাই আরবরা ইরানী দাবা খেলা শেখার পরও দাবার রাজাকে ইরানী শব্দ 'শাহ' (রাজা) দিয়ে চিহ্নিত করে, এবং 'তোমার শাহ্ বিপদে' বলার সময়, অর্থাৎ কিস্তি দেওয়ার সময় শুধু শাহ্ বলত।

এর পর ক্রুসেড লড়াইয়ের সময়ে বন্দী ইয়োরোপীয়রা আরবদের কাছ থেকে দাবা খেলা শেখে এবং তারাও কিস্তি দেওয়ার সময় 'শাহ্' বলত। সেই 'শাহ্' লাতিনের ভিতর দিয়ে ইংরেজীতে রূপ নেয় 'শেক্' এবং সর্বশেষে 'চেক্' রূপে (ব্রিটিশ 'একস্‌চেকারের' নাম ওই 'চেক্' থেকে এসেছে)।

কিস্তিমাতের 'মাত' কথাটা ওই ভাবেই আরবী, 'শাহ্ মাতা' অর্থাৎ 'তোমার রাজা মারা গিয়েছে' ইংরেজীতে রূপ নিয়েছে 'চেক মেট' হয়ে।

এখন প্রশ্ন, ইরানীরা দাবা খেলা শিখল কার কাছ থেকে? দাবা ইরানী খেলা এ-দাবি পারস্য দেশে কখনও করা হয় নি। বরঞ্চ সে-দেশে কিংবদন্তী প্রচলিত যে, এ খেলা 'পঞ্চতন্ত্র' পুস্তকের মত ভারতবর্ষথেকে ইরানে গিয়েছে।

একাদশ শতাব্দীতে গজনীর পণ্ডিত অল-বীরুনী তাঁর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লিখিত পুস্তকে দাবা খেলার ছক এঁকে দিয়েছেন ও ঘুঁটিরও বর্ণনা করেছেন। তবে আজকের দাবা আর সে-দাবার পার্থক্য প্রচুর। তখনকার দিনে দাবা খেলা হত চারজনে—ছকের চার কোণে চার খেলোয়াড় আপন ঘুঁটি নিয়ে বসতেন এবং চালও দিতে হত পাশা (ডাইস বা অক্ষ) ফেলে।

তাই নিয়ে বিচলিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ আজ ভারতীয় দাবা ও বিলিতী দাবা হুবহু এক খেলা নয়।

কাজেই সম্পূর্ণ নূতন কোন প্রমাণ উপস্থিত না হলে ভারতবর্ষ যে দাবা খেলার জন্মভূমি তা নিয়ে তর্ক করবার কোনও কারণ নেই।

খেলাচ্ছলে

কিছুকাল আগে পার্লিমেণ্টে জনৈক সদস্য যে প্রশ্ন শুধান তার সারমর্ম এই ঃ—

হেলসিন্‌কিতে যে ওলিম্পিক খেলা হয় সেখানে খেলার শেষে যখন সব দেশ আপন আপন জাতীয় পতাকা নিয়ে পরিক্রমা করে তখন ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করে সেই শোভাযাত্রায় যোগ দেবার জন্য কোনও ভারতীয়কে খুঁজে পাওয়া যায় নি! অবশেষে নাকি এক 'ফিন্' যুবক ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করে!

প্রশ্নকর্তা কোনও কোনও ভারতীয়কে এই ঘটনার জন্য তীব্র নিন্দাও করেন।

উত্তরে সহ-শিক্ষামন্ত্রী বলেন যে, তিনিও এই রকম কথা শুনেছেন।

আমাদের মনে হয়, এর একটা কড়া তদন্ত হওয়া উচিত।

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস ভারতীয়রা অন্যান্য জাতির তুলনায় অভদ্র নয়। এককালে ভারতীয় সৌজন্য-শালীনতা বিদেশী বহু পর্যটককে মুগ্ধ করেছিল

www.BanglaBook.org

বলে তাঁরা তাঁদের ভ্রমণ-কাহিনীতে ভারতবাসীদের উদ্দেশ্যে বিস্তর প্রশস্তি গেয়ে গিয়েছেন। মেগাস্তেনেস থেকে এ-ইতিহাস আরম্ভ হয় এবং যদিও কোনও লেখক আমাদের কোনও কোনও আচার-ব্যবহারের নিন্দা করেছেন বটে, কিন্তু আমরা অভদ্র, এ-কথা কাউকে বড়-একটা বলতে শোনা যায় নি। বিদেশে ভারতীয়েরা আরও সাবধানে চলে বলে সেখানেও তারা প্রচুর খাতির-যত্ন পায়।

তবে হঠাৎ আজ এ-রকম একটা পীড়াদায়ক ঘটনা ঘটল কেন?

আমার মনে হয়, আমাদের টীমের কর্তাব্যক্তিরা পরবটার কথা বেবাক ভুলে গিয়েছিলেন, কিংবা ব্যাপারটার গুরুত্ব ঠিক মেকদারে যাচাই করতে পারেন নি বলে সবাই মিলে রঙ্গভূমি ত্যাগ করে শহরে ফুর্তিফার্তি করতে চলে গিয়েছিলেন আর তাই চ্যাংড়ারাও যে চলে যাবে তার আর কী সন্দেহ।

কর্তারা শহরে বেড়াতে যান নি, চ্যাংড়াদের তাঁরা যেতে বারণ করলেন, তবু তারা বে-পরোয়া চলে গেল, এ-কথা বিশ্বাস করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। এ-টীমে যারা গিয়েছিল তাদের দু-একজনকে আমি চিনি। পতাকা তোলার জন্য তাদের আদেশ করলে তারা নিশ্চয়ই, অতি অবশ্যই, শহরে চলে যেত না—সেখানে শেষ পরবের জন্য সানন্দে অপেক্ষা করত।

বিদেশে আপন দেশের পতাকা উত্তোলন করার জন্য নির্বাচিত হওয়া কি কম শ্লাঘার বিষয়?

কাজেই মুরুব্বীদের প্রশ্ন শোধানো উচিত, তাঁরা তখন ছিলেন কোথায়, তাঁরা কাকে কী আদেশ দিয়েছিলেন, কেউ সে আদেশ অমান্য করেছিল কি না?

এরই পিঠে-পিঠে সংবাদপত্রে আরেকটা খবর পড়লুম।

পার্লিমেন্টে যেদিন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, সেদিনই শ্রীযুত পঙ্কজ গুপ্ত জিওলজিক্যাল সার্ভে রিক্রিয়েশান ক্লাবে বক্তৃতা দেবার সময় বলেন, ভারতের খেলোয়াড়রা যখন বিদেশে খেলতে যান তখন তাঁরা প্রায়ই অভদ্র ভাষায় লেখা বেনামী চিঠি পান এবং তাঁরা যে মন না দিয়ে ফুর্তি-ফার্তি, আরাম-আয়েশ করে বিলেতে দিন কাটাচ্ছেন সে কটুবাক্যও চিঠিগুলোতে বর্ষিত থাকে।

গুপ্তমহাশয় বলেন, এ-ধারণা ভুল এবং এ-অভিযোগ কখনও সম্ভবপর হতে পারে না, কারণ প্রতি সপ্তাহে এক নাগাড়ে ছদিন জীবন-মরণ পণ করে খেলা প্র্যাকটিস করতে হয়, এ সময় ঢলাঢলির ('ঈজী লাইফ') কথাই উঠতে পারে না।

এ অতি হক কথা—বিদেশে নানা শ্রেণীর খেলোয়াড়দের সংস্রবে এসে আমারও ওই একই ধারণা হয়েছে। তবে সব অভিজ্ঞতারই আরেকটা সাবধান হওয়ার দিকও আছে, অর্থাৎ ভূরি ভূরি অভিজ্ঞতা থাকলেও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সতর্ক হওয়ার রাশে ঢিল দেওয়া বিচক্ষণের কর্ম নয়।

এ-সংসারে দুষ্টু লোকের অভাব নেই। দেশবিদেশের বহু জায়গায় এরা ওই সন্ধানে থাকে, খেলোয়াড়দের খেলার মাঠের বাইরে এমনভাবে বেকাবু করা যায় কিনা, যাতে করে পরের দিন তারা ভাল করে খেলতে না পারে। তাই তারা খেলা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে এবং যে-কদিন খেলা হচ্ছে সে-কদিন রোজ সন্ধ্যায় নেটিভ-স্টেট স্টাইলে জব্বর জব্বর ককটেল পার্টি দেয় এবং দেশবিদেশের এমন সব হোমরা-চোমরাদের নেমন্তন্ন করে যে, সেখানে বিদেশী খেলোয়াড়দের, ওদের সম্মান রক্ষার্থে ইচ্ছা না থাকলেও বাধ্য হয়ে যেতে হয়। তারপর নানা কায়দায়-কৌশলে খেলোয়াড়দের মদ খাওয়াবার চেষ্টা সমস্ত সন্ধ্যা ধরে চলে। যারা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পালা-পরবে নিতান্ত অল্প খায় তাদের নিস্তার নেই, আর যারা খেতে ভালবাসে তারা অনেক সময় প্রলোভন সামলাতে পারে না। দলের ম্যানেজার এবং কাপ্তেন অবশ্য মুর্গীর মত চিলের ছোঁ থেকে বাচ্চাদের বাঁচাবার চেষ্টা করেন কিন্তু অনেক সময় পেরে ওঠেন না, তাই ওদের দোষ দিয়ে কোনও লাভ নেই।

কোনও কোনও সময় এমন প্রলোভনও রাখা হয় যে-সম্বন্ধে লিখতে আমার বাধো-বাধো ঠেকছে। ফার্সীতে বলে 'দানিশমন্দরা ইশারা বশ অস্ত'—অর্থাৎ বুদ্ধিমানকে ইশারাই যথেষ্ট।

ফলং? পরের দিন তারা এমন খেলা খেলে যে, দেখে মনে হয় এরা নিতান্তই খেলাধুলো করতে এসেছে।

ভারতীয় খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে আমার ভয় হয়ত অমূলক, হয়ত আমি খামখাই ঘুমের ফোঁটায় কুমির দেখছি, হয়ত আসলে ওটা কুমির নয়, ফুসকুড়ি, কিন্তু ওকীবহাল হওয়ার জন্য বলতে হয়,

সাবধানের মার নেই
(যদিও জানি
'মারেরও সাবধান নেই')।

মনে করুন সি কে নাইডু, সি এস নাইডু জাম সাহেব, ব্র্যাডম্যান, লারউড, অমরনাথ, অমর সিং, মুশতাক, ওয়াজির আলী এবং একমাত্র এঁদের মত পয়লা নম্বরওয়ালারা যদি আজ ইহলোক পরলোক ছেড়ে দিল্লিতে একখানা সরেস ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে আসেন, তবে আপনার মানসিক চাঞ্চল্যটা কী রকমের হয়?

স্বীকার করি, গেল শনিবার দিন এখানে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড ও প্রেসিডেন্টস্ এস্টেট ক্লাবে যে একদিনের ক্রিকেট ম্যাচ খেলা হয়, তাতে নিমন্ত্রণ সত্ত্বেও 'অনিবার্য' কারণে এঁদের কোনও মহারথীই উপস্থিত হতে পারেন নি। তাই বলেই যদি আপনারা ভাবেন খেলা উচ্চাঙ্গের হয় নি, তাহলে মারাত্মক ভুল করা হবে। 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' দিল্লির রীতিমত পুরাদস্তুর কেউ-কেটা কাগজ, এবং রাষ্ট্রপতির আপন এস্টেট ক্লাবও ত আমাদের শ্লাঘার প্রতিষ্ঠান। অতএব বিবেচনা করুন, এ খেলার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি কি অতিশয় প্রয়োজনীয় কর্তব্য সমাধান করছি নে?

কিন্তু হায়, আমার দারুণ দুর্ভাগ্য, এ খেলার মল্লীনাথরূপে আপনাদের সমীপে কোনও টীকা নিবেদন করার উপায় আমার নেই। কারণ ও-খেলাতে আমি সশরীরে উপস্থিত হতে পারি নি, যদিও আমার চিত্ত, হৃদয়, চৈতন্য, আত্মা, সর্ব অস্তিত্ব ওই খেলাতে উপস্থিত ছিল। দরদী পাঠক শুধোবেন, কেন উপস্থিত হতে পার নি?

অভিমান।

এই যে আমি 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে'র এত বড় সম্ভ্রান্ত দৈনন্দিন পাঠক, ওই কাগজের গুণী কর্মচারীগণের সঙ্গে আমার বহু যুগের হৃদ্যতা, তাঁরা আমার মত একটা ওস্তাদ ক্রিকেটিয়ারকে ওই পরবের দিনে বেবাক ভুলে গেলেন? কেন, আমি কি রান্নাঘরের পিছনে বাতাবি লেবু দিয়ে ঘন ঘন সেঞ্চুরি করি নি? অবশ্য স্বীকার করি, উইকেট ছিল না—কিন্তু উইকেট ত থাকে ক্লান্ত হলে বসবার জন্য, আমি ত ক্লান্ত হইনে।

ম্যাচ ড্র গেছে! যাবে না? আমাকে না নিলে!!

www.BanglaBook.org

পিকনিকিয়া

গল্প শুনেছি, এক ইংরেজ, ফরাসী, জর্মন এবং স্কট নাকি বারোয়ারী চড়ুই-ভাতির ব্যবস্থা করে। কথা ছিল সবাই কিছু কিছু সঙ্গে আনবেন। ইংরেজ আনল বেকন-আণ্ডা, ফরাসী এক বোতল শ্যাম্পেন, জর্মন এক ডজন সসেজ আর স্কট নিয়ে এল তার ভাইকে।

দিল্লিতে কিন্তু পিকনিকিয়ারা শুধু ভাইকে সঙ্গে আনেন না, আনেন ভাইয়ের শালী শালাদের, তারা আনে কাকা-মামাদের এবং তারা ফের কাদের নিয়ে আসে তার হদিস এখনও পাই নি। সঙ্গে আনে ক্রিকেট, ফুটবল, গ্রামোফোন, পোর্টেবল রেডিও, মণ তিনেক পুরি, তদনুপাতের তরকারি এবং মাংস, গোলগাপ্পা (ফুচকা) এবং মিঠা পান।

এঁদের পীঠস্থল কুতুবমিনার, হাউজ-খাস এবং লোধি গার্ডেনস্। পাঁচ-সাত জনের পিকনিক হেথা-হোথা ছড়ানো থাকলে যত না গোলমাল আর উপদ্রব হয়, তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী পীড়াদায়ক হয় এই সব পাইকারী পিকনিকে। বে-খেয়ালে থাকলে হঠাৎ যে কখন দুম্ করে ক্রিকেট-বলটা আপনার ঘাড়ে এসে পড়বে তার কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই।

এঁরা আনন্দ করুন, আমার তাতে কি আপত্তি, কিন্তু এই যে সাক্ষাৎ মরু-ভূমিসম দিল্লি শহরে এত তকলিফ বরদাস্ত করে বহুত মেহন্নত করে ঘাস গজানো হয়, তারই উপর যখন অত্যাচার চলে তখন আমার মত শান্ত লোকেও এই দিল্লির শীতে উষ্ণ হয়ে ওঠে। লনে খোলা আগুন জ্বালানো বারণ, তাঁরা জ্বালাবেনই এবং চৌকিদার আপত্তি জানালে তাঁরা ঝগড়া-কাজিয়া লাগিয়ে দেন। কিংবা দেখি, চৌকিদার আর কোন আপত্তি করছে না, যেন সে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। রৌপ্যচক্র অস্বচ্ছ, তার ভিতর দিয়ে দেখবেই বা কী করে!

তাই দিল্লিতে আগমনেচ্ছু রসিকজনকে সাবধান করি, যদি শান্ত সমাহিত চিত্তে স্থাপত্যানন্দ উপভোগ করতে চাও তবে রবির সকালে কদাচ কুতুব, হাউজ-খাস এবং লোধি উদ্যান দেখতে যেয়ো না।

নিতান্তই যদি যেতে চাও তবে যেয়ো সরযুকুণ্ডে। অতি চমৎকার স্থল এবং ভিড় নেই বললেও চলে।

সাহিত্যিকের মাতৃভাষা

শ্রীযুক্ত নীরদ চৌধুরী তাঁর 'অজানা ভারতীয়ের আত্মজীবনী' লিখে দেশবিদেশে সুনাম (কারো কারো মতে কুনাম) অর্জন করেছেন। বইখানা পাঠ করবার সুযোগ—কিংবা কুযোগ—আমার এখনও হয় নি, তবে পুস্তকখানার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কী, সে কথা আমি চৌধুরী মহাশয়ের নিজের মুখেই শুনেছি এবং তিনি তাঁর ভুবনবিখ্যাত পুস্তক থেকে পুটকতক অধ্যায় আমাদের পড়ে শুনিয়েছেন। ও! সে কী ইংরেজীর বাহার—তার ভিতর কত ভাষা থেকে, কত কেতাব থেকে কত রকম-বেরকমের আলপনা, কত ব্যঙ্গ, কত হুঙ্কার, কত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাকচাতুরী—ছত্রে ছত্রে হাউই উড়ছে, পটকা ফাটছে—মূল বিষয়ের দিকে ধ্যান দেয় কার ঠাকুরদার সাধ্যি!

তা সে বইয়ের কথা যাক। ও-রকম বই পড়ার বয়স আমার বহুকাল হল গেছে। এই ধরনের বই আনাতোল ফ্রাঁস কেন পড়েন না, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'আমার সে বয়েস গেছে, যখন মানুষ যা বোঝে না তাই ভালবাসে। আমি আলো ভালবাসি। নীরদ চৌধুরী যে-রকম এ-যুগের ভলতেয়ার, আম্মো এ যুগের ফ্রাঁস!!

শ্রীযুত চৌধুরী পত্রান্তরে একখানা প্রবন্ধ লিখেছেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, তিনি এককালে বাংলায় লিখতেন এবং ইচ্ছে করলেই বাংলায় সর্বশ্রেষ্ঠ লেখকদের একজন হতে পারতেন।

চৌধুরী মশাই মানুষ : তাঁরও নানা দোষ আছে। কিন্তু তিনি যে অত্যধিক বিনয়-ভারে অবনত এ কথা তাঁর পরম শত্রুও বলবে না।

ইংরেজী লেখক হিসেবে মিঃ চাওডরি কতখানি নাম করেছেন জানি নে—জানার প্রয়োজনও বোধ করি নি। বিবেচনা করি অ্যাদ্দিনে তিনি ল্যাম, রাসকিনকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তিনি 'হেলায় লঙ্কা করিত জয়' শুনে আমার মনোরাজ্যে নানাপ্রকারের খণ্ড বিদ্রোহের সৃজন হয়েছে।

তাঁর বাংলা লেখা আমার কিছু কিছু পড়া আছে। বাংলা সাহিত্যের কিঞ্চিৎ সাধনা আমিও করেছি, যদিও শ্রেষ্ঠ লেখকদের অন্যতম হওয়ার চেষ্টায়, দিল্লি আমার জন্য এখনও বিলক্ষণ দূর অস্ত্। তিনি কাঁচা বা নিকৃষ্ট বাংলা লিখতেন একথা আমি বলব না, কিন্তু তিনি যে কীট্সের মত কোন ভয়ংকর অমৃতভাণ্ড নিয়ে বাংলা সাহিত্যে নামেন নি, সে-কথাও আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে।

তবে এ দম্ভ কেন? এর সোজা অর্থ কি এই নয়ঃ ওহে বাঙালী গ—ভগণ, তোমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও সাহিত্যের যে এভারেস্টে উঠতে পারছ না, আমি ইচ্ছা করলে পবননন্দন পদ্ধতিতে এক লম্ফেই সেখানে উঠতে পারতুম।

দ্বিতীয়ত, ছোঃ, বাংলা আবার একটা সাহিত্য, তাতে আবার নাম করা। মারি তো হাতি, লুটি তো ভাণ্ডার। নাম করতে হয় ত ইংরেজীই সই।

অর্থাৎ আপন মাতৃভাষাকেও তাচ্ছিল্য।

বৃথা তর্ক। আমি শুধু শেষ প্রশ্ন শুধাই—স্বজাতীয় লেখক, আপন আপন মাতৃভাষাকেও তাচ্ছিল্য করে কে কবে সত্য বড় হয়েছে??

আসা-যাওয়া

পূব ও পশ্চিম দেশবাসীদের ভিতর মেলা মিল আর গরমিল দুইই রয়েছে বলে কেউ বলেন (কিপলিং), এ দুয়ে মিলন অসম্ভব, আর তার বহু পূর্বে গ্যোটে বলে গিয়েছেন, 'পূব পশ্চিম এখন আর আলাদা আলাদা হয়ে থাকতে পারবে না।'

যেখানে কিপলিং, গ্যোটে, রবি ঠাকুর, লিন্ যুটাং একমত হতে পারছেন না সেখানে আমি কথা কইতে যাব কোন্ সাহসে? যেখানে ফৈয়াজখানে আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হীরু গাঙ্গুলীতে লড়াই লেগে গিয়েছে সেখানে আমি বেমক্কা বে-সমে হাত-তালি দিয়ে মরি আর কী?

তবু সামান্য একটা কথা নিবেদন করতে চাই।

পশ্চিমের লোক কখনও কারও সঙ্গে কথা ঠিক না করে, অর্থাৎ পাকাপাকি এনগেজমেণ্ট না করে দেখা করতে আসে না। এবং টম যদি ডিকের বাড়িতে কিংবা আপিসে আসতে চায় তবে ডিকের অনুমতি না নিয়ে কখনও আসবে না। কিন্তু, পশ্য, টম ডিকের অনুমতি নিয়ে এল বটে—কটার সময় ভেট হবে—কিন্তু সে যখন খুশি চেয়ার ছেড়ে বলতে পারে 'তবে এখন চললুম'—তার জন্য ডিকের কোন অনুমতি প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ ইয়োরোপে কারও বাড়িতে যাওয়াটা তার হাতে, বেরিয়ে আসাটা আপনার হাতে।

প্রাচ্যের প্রায় সব দেশেই ব্যবস্থাটা উল্টো। আপনি যখন খুশি রায় মহাশয়ের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হতে পারেন। 'এই যে রায় সাহেব' বলে হুঙ্কার দিয়ে আপনি রায় মহাশয়ের বৈঠকখানায় ঢুকবেন, আর রায়ও 'এই যে চৌধুরী মশায়, আসতে আজ্ঞে হোক, বসতে আজ্ঞে হোক' বলে কোল-বালিশ আর হুঁকোর নলটা আপনার দিকে এগিয়ে দেবেন। আপনি বালিশ জাবড়ে ধরে ফুরুৎ ফুরুৎ করে আলবোলায় দম টানতে টানতে মৃদু পা দোলাতে থাকবেন।

কিন্তু যখন বললেন, 'এবারে উঠি?' তখন কিন্তু রায়ের পালা। আপনি যে দুম করে চলে আসবেন সেটি হচ্ছে না, সে অধিকার আপনার নেই। রায় বলবেন, 'আরে বসুন, স্যার। এত তাড়া কিসের?' আপনার তখন জোর করে চলে আসাটা অভদ্র ও বে-আদবী।

এর গূঢ় কারণ, হয়ত আপনি বহুদিন পরে এসেছেন, হয়ত কাশীবাস সেরে ফিরেছেন রায়-গৃহিণী খবর পেয়ে আপনার জন্য সিঙাড়া ভাজবার তোড়-জোড় করেছেন, আপনি হট্ করে চলে এলে তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হবেন, অতএব আপনাকে আরও কিছুক্ষণ বসতে হবে।

অর্থাৎ বিদায় নেবার বেলা আপনাকে অনুমতি নিতে হবে।

বিশেষ করে ইরান-আফগানিস্তানে এ-নিয়ম অলঙ্ঘ্য। ভেঙেছেন কি, আপনার নামে গোটা পাঁচেক ব্যঙ্গ-কবিতা লেখা হয়ে যাবে! মাহমুদকে নিয়ে ফিরদৌসীর ব্যঙ্গ-কবিতা তার সামনে লজ্জায় বোরকা টানবে।

রুশ দেশ প্রাচ্য প্রতীচ্যের মধ্যিখানে। তাই তারা খানিকটে এদের মানে, খানিকটে ওদের মানে। শার্ট তারা সায়েবদের মত পাতলুনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়, কিন্তু তারা যখন আপন 'ন্যাশনাল ব্লাউস' জাতীয় কুর্তা পরে, তখন সেটা আমাদেরই পাঞ্জাবির মত সামনে পিছনে ঝুলিয়ে দেয়।

তারা দেখা করতে আসে খবর দিয়ে, না-দিয়ে, দুইই। বিদেয় নেবার সময় তারা কিন্তু তৃতীয় পন্থা অবলম্বন করে। গাল-গপ্পের মাঝে একটুখানি মোকা পেলে বলে, 'এইবার ভাই, তোমার সঙ্গে আরেকটি পেয়ালা চা খেয়ে বাড়ি যাব।

এ বড় উত্তম পন্থা। আন্তোন যদি ভাচোর-ভ্যাচোর করে আপনার প্রাণ এতক্ষণ অতিষ্ঠ করে তুলে থাকে, তবে আপনি তদ্দণ্ডেই উল্লসিত হয়ে উঠবেন, 'যাক, লক্ষ্মীছাড়াটা তাহলে আর বেশী ভোগাবে না।' আপনার তখন উপেক্ষার ভাবটা ঝেড়ে ফেলে খুশী মুখে দু-চারটি কথা বলতে কিছুমাত্র কষ্ট হবে না।

www.BanglaBook.org

পক্ষান্তরে আন্তোন যদি আপনার দিলের দোস্ত হয় তবে তার আসন্ন বিচ্ছেদ-বেদনাটার জন্য আপনি নিজেকে খানিকটা সামলে নিতে পারবেন।

এবং দ্বিতীয়ত, ইয়োরোপে দেখা হওয়া মাত্রই প্রথম প্রয়োজনীয় কথা পাড়া হয়. পরে গাল-গল্প। প্রাচ্য দেশে তার উলটো—পাঁচটি টাকা চাইবার হলে বিদেয় নিয়ে দোরের গোড়ায় এসে তখন আমতা-আমতা করে চাইতে হয়, বাড়িতে ঢুকেই হুঙ্কার দিয়ে নয়।

রুশ দেশে ওই শেষ সিগারেটের সময় যা কিছু 'বিজিনেস talk' এবং শিবরাম চক্রবর্তী অনুপুনএ 'টক বিজিনেস'॥

• দেহলি-প্রান্ত

দিল্লি ছাড়ার সময় আমার ঘনিয়ে এল। বিচক্ষণ জন দিল্লিতে বেশীদিন থাকে না। পঞ্চপাণ্ডব পর্যন্ত মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল দেখে হিমালয়-মুখো রওয়ানা দেন। এমন কী সামান্য কুকুরটা পর্যন্ত এখানে পড়ে থাকে নি!

তবে কি যাঁরা এখানে পড়ে থেকে শেষটায় শিব হয়ে যান, তাঁরা অবিবেচক? আদপেই না। এই দুশমনের ভূমি, গরমে শিককাবাব-বানানেওলা, শীতে কুলফী-জমানেওলা, সেক্রেটারি-জয়েন্ট লুসস্কু-আণ্ডার-তস্য-আণ্ডারকাভার, জাত-বেজাতের কর্মচারী-কণ্টকিত এই ভূমিতে যে ব্যক্তি 'অশেষ ক্লেশ ভুঞ্জিয়া' পরলোকগমন করে সে 'পরশুরামী' স্বর্গে গিয়ে অপ্সরাদের সঙ্গে দুদণ্ড রসালাপ করতে পারুক আর নাই পারুক, তাকে অন্ততপক্ষে নরকদর্শন করতে হয় না। কারণ এক নরক থেকে বেরিয়েই অন্য নরকে যাবার ব্যবস্থা কোনও ধর্মগ্রন্থই দিতে পারে না। আমি বিস্তর ধর্মের ঘাটে মেলা জল খেয়েছি—এ কথাটা আপনারা প্রায় আপ্ত বাক্যরূপে মেনে নিতে পারেন।

কিন্তু এসব নিছক রাগের কথা।

এই যে আমি দেহলি-বাসীদের সঙ্গে রাশানদের মত শেষ একটা (না, দু-তিনটে) সিগারেট খাওয়ার হুমকি দিচ্ছি সে শুধু তাঁদের আপনজন ভেবে অভিমানবশত।

আপনারা আমার সাহিত্যিক প্রচেষ্টার কদর করলেন না, আমার গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ আপনাদের সাহিত্য-সভায় পড়তে দিলেন না, যদি বা প্রধান বক্তা কোন আণ্ডার-সেক্রেটারির নেমন্তন্ন পেয়ে শেষ-মুহূর্তে কামাই দিলেন বলে আমাকে রচনা পড়তে দিলেন, তখন আবার আমার গুরুগম্ভীর রচনা শুনে আপনারা হাসলেন, যখন রসরচনা (আহা আজকাল রসরচনা লিখে কত লোক রাতারাতি নাম কিনে নিলে) পড়লুম তখন আপনারা গম্ভীর হয়ে গেলেন, সেক্রেটারিদের মস্করা করে কবিতা পড়ে শুনালুম—আপনারা সভয়ে গোপনে একে একে সভাস্থল ত্যাগ করলেন, যখন তাঁদের প্রশস্তি গেয়ে রচনা পাঠ করলুম তখন স্পষ্ট শুনতে পেলুম, আপনারা ফিসফিস করে বলছেন আমি তেলমালিশের ব্যবসা (মাসাজ ইনস্টিটিউট নয়) খুলেছি, কিছু না পেয়ে শেষটায় যখন গান গাইলুম তখন পাড়ার ছোঁড়ারা ঠিক সেই সময় গাধার লেজে টিনের কেনেস্তারা

www.BanglaBook.org

বেঁধে তাকে পাড়াময় খেদিয়ে বেড়াল, ভরতনৃত্যম্ নাচি নি—তাহলে বোধ হয় আপনারা হনুমানের ছবি এঁকে তার তলায় আমার নাম লিখে বছরের শেষে 'নরসিং দাস' প্রাইজের বদলে এই প্রাইজ দিতেন।

তবু আমি আপনাদের উপর এক ফোঁটাও রাগ করি নি। বরঞ্চ আমি আপনাদের কাছে উপকৃত হয়ে রইলুম। আপনাদের সংস্রবে না এসে এই যে সাহিত্যরচনার মামদো ভূত আমাদের কাঁধে ছিল সে কি কস্মিনকালেও নামত?

বিবেচনা করি এখন কলকাতা ফিরে গেলে পাড়ার ছোঁড়ারা আমাকে দেখা মাত্রই পরিত্রাহি চিৎকার করে পালাবে না, তরুণীরা হয়ত কিঞ্চিৎ ঘাড় বেঁকিয়ে 'এই যে বলে একটুখানি মিঠে হাসিও জানাবেন, 'ওইরে, আবার এসেছে বলে দুদ্দাড় করে দরজা জানলা বন্ধ করবেন না।

ব্যালাটা বেচে দিয়েছি। পাণ্ডুলিপিগুলো কাঞ্জিলালকে 'অবদান' করেছি। তার বন্ধু পরিমল দত্ত নাকি গাঁটের পয়সা খরচা করে সেগুলো ছাপাবে। তা ছাপাক ; আপনারা শুধু নজর রাখবেন সে যেন অ্যাকাউণ্টস্ বিভাগে বদলি না হয়—ছোকরা তালে তবিল তছরূপের দায়ে পড়বে। পরিমলকে আমি স্নেহ করি।

যতই ভাবছি, ততই দিল্লি দেখি খারাপ নয়।

দিল্লির গরম অসহ্য! কিন্তু বিবেচনা করুন সেই গ্রীষ্মের শেষে যখন কালো যমুনার ওপার থেকে দূর-দিগন্ত পেরিয়ে আকাশ-বাতাস ভরে দিয়ে বিজয় মল্লের মত গুরুগুরু করে নবীন মেঘ দেখা দেয়, তারই আবছায়া অন্ধকারে আপনি খাটিয়াখানা বাইরে পেতে নব বরিষণের প্রতীক্ষায় প্রহর গোনেন আপনার ত্রিযামা-যামিনীর সখা তারার দল একে একে ম্লান মুখে আপনার কাছ থেকে বিদায় নেয়, অল-ইণ্ডিয়া-রেডিয়োর ঘড়িটা আবার তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই অন্ধকার বিদীর্ণ করেই আপনারই চারপাইখানার কাছে এসে আপনাকে সঙ্গসুখ দেয়, দূর বৃন্দাবনের প্রথম বর্ষণে ভেজা মিঠে হাওয়া এসে আপনার গালে চুমোর পর চুমো খেয়ে যায়, হঠাৎ আকাশের এস্পার-ওস্পার ছিঁড়ে-ফেঁড়ে বিদ্যুৎ চমকে দিয়ে নিজাম প্রাসাদের চূড়ো, রাশান রাজদূতাবাসের ফটক, নিমগাছে এর গায়ে ওর বুকে মাথা কোটা এক ঝলকের তরে দেখিয়ে দেয় এবং তারপর সবশেষে অতি ধীরে ধীরে রিমঝিম করে বৃষ্টিধারা যখন আপনার সর্বাঙ্গে গোলাপজল ছিটিয়ে দেয়—তখন আপনি খাটিয়া ঘরের ভিতর টেনে নিয়ে যাবার চিন্তাটা পর্যন্ত করেন না, ভিজে মাটির গন্ধ দিয়ে বুকের রন্ধ্র ভরে নেন, ইতিমধ্যে শুনতে পান—আরকিয়োলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের দরোয়ান রামলোচন সিং তুলসীদাস কৃত রামায়ণ সুর করে পড়তে আরম্ভ করে দিয়েছেন, আর আপনার প্রতিবেশী সারস্বত ব্রাহ্মণের মেয়ে ভৈরবীতে গান ধরেছে।

দিল্লি কি সত্যই খুব মন্দ জায়গা?

কিংবা এই শীতকালের কথাটাই নিন। নিতান্ত যদি সন্ধ্যের পর আপনাকে না বেরতে হয় তবে পুনরায় বিবেচনা করুন...

এ-রকম দিনের পর দিন গভীর নীলাকাশ আপনি কোথায় পাবেন? সকাল বেলায় সোনালী রোদ ট্যারচা হয়ে আপনার চোখের উপর এসে পড়েছে, ক্রমে ক্রমে লেপ কাঁথা গরম হয়ে উঠল, নাকে টোস্ট স্যাঁকার সোঁদা সোঁদা গন্ধ এসে পৌঁছচ্ছে, এইবার ছাঁৎ করে ডিম-ভাজার শব্দ আর গন্ধ আসবে, আপনি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ড্রেসিংগাউনটা গায়ে চাপিয়ে দিয়ে বারান্দায় এসে বসলেন।

আহা! সবুজ ঘাসে শিশিরের ঝিলিমিলি, প্রাতঃস্নাত শান্ত ঋজু ঝাউ সামনে দাঁড়িয়ে, শীতের বাতাসে বুগনভেলিয়ার মৃদু কম্পন, তারপর ধীরে ধীরে প্রখর হতে প্রখরতর রৌদ্রে বিশ্বাকাশের আলিঙ্গন, ধূপছায়াতে কালো-সবুজের স্নেহচিক্কণ আলিম্পন, আপনার আমার মত গরিবের ফালি অঙ্গনটুকু নন্দন-কানন হয়ে উঠল—আপনি সেই সৌন্দর্যের মোহে আপিস কামাই দিয়ে আনন্দঘন দিন স্বর্ণরৌদ্রে চক্ষু মুদ্রিত করে কাটালেন—

এ শুধু দিল্লিতেই সম্ভব।

দিল্লি ত্যাগ তাই সহজ কর্ম নয়॥

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

পঞ্চতন্ত্র

২য় পর্ব

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

ডাক্তার রণজিৎ রায়কে
স্নেহ ও কৃতজ্ঞতার
চিহ্নস্বরূপ

সৈ. মুজতবা আলী

বোলপুর
১।৬।৬৬

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

ঐতিহাসিক উপন্যাস

কলকাতায় এসে শুনতে পেলুম, বর্তমানে নাকি ঐতিহাসিক উপন্যাসের মরসুম যাচ্ছে। আশ্চর্য লাগলো। বঙ্কিম আরম্ভ করলেন ঐতিহাসিক উপন্যাস দিয়ে, রবীন্দ্রনাথ লিখলেন সামাজিক—কিঞ্চিৎ রোমান্টিক-ঘ্যাঁষা—উপন্যাস, শরৎচন্দ্র লিখলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিয়ে, তারাশঙ্কর তথাকথিত নিম্ন সম্প্রদায় নিয়ে। এর পর আবার হঠাৎ ঐতিহাসিক উপন্যাস কি করে যে ডুব-সাঁতারে রিটার্নজার্নি মারলে ঠিক বোঝা গেল না। আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি ; কাজেই আর পাঁচ-জনের মত হতভম্ব হতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের নাকি এখন জোর কাটতি। আবার একাধিক জন বলছেন, এগুলো রাবিশ। পাঁচজনের মত আমি আবার হতভম্ব।

কিন্তু এতে করে আমার ব্যক্তিগত উপকার হয়েছে। বছর পঁচিশেক পূর্বে আমাকে বিশেষ কারণে মোগল সাম্রাজ্যের পতন ও মারাঠা শক্তির অভ্যুদয় নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করতে হয়। সে যুগের প্রায় সব কেতাবপত্রই ফার্সীতে। বহু কষ্টে তখন অনেক পুস্তক যোগাড় করেছিলুম। তার কিছু কিছু এখনো মনে আছে। মাঝে মাঝে আজকের দিনের কোনো ঘটনা হুবহু 'শেষ মোগলদের' সঙ্গে মিলে যায় এবং লোভ হয় সেদিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কিন্তু সে সব কেতাবপত্র এখন পাই কোথায় ? স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করলে হয়তো ইতিহাসের প্রতি অবিচার করা হবে।

কিন্তু ঐ ঐতিহাসিক উপন্যাসই এক্ষণে আমার পরিত্রাণ এনে দিয়েছে। ধরে নিন, আমি ঐতিহাসিক উপন্যাসই লিখছি।

মারাঠারা যখন গুজরাত সুবা (বা সুবে অর্থাৎ প্রদেশ, প্রভিন্স) দখল করে তার রাজধানী অহমদাবাদে ঢুকল তখন সেখানকার দেওয়ান (প্রাদেশিক প্রধান মন্ত্রী) মুহাফিজ্‌খানার (আর্কাইভ্‌স্‌-এর) তাবৎ কাগজপত্র বাড়ি নিয়ে গিয়ে গুজরাত-কাঠিয়াওয়াড়ের একখানা প্রামাণিক ইতিহাস লেখেন। বইখানি তিনি দিল্লির বাদশা-সালামৎ মুহম্মদ শাহ বাদশাহ রঙ্গীলাকে ডেডিকেট করেন। ইতিহাসের নাম 'মিরাৎ-ই-আহমদী'। পুস্তকের 'মোকদ্দমায়'[১] তিনি বাদশা-সালামৎকে উদ্দেশ করে বলেন, যে রাজনীতি অনুসরণ করার ফলে দিল্লির বাদশারা গুজরাতের মত মাথার-মণি প্রদেশ হারালেন সে নীতি যদি না বদলানো হয় তবে তাবৎ হিন্দুস্থানই যাবে। সেই নীতির প্রাথমিক স্বর্ণযুগ, ক্রমবিকাশ ও অধঃপতন তিনি সেই ইতিহাসে ধারাবাহিক লিপিবদ্ধ করেছেন।

সেই ইতিহাস থেকে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ল। স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে লিখছি—তাই আবার বলছি ভুলচুক হলে ধরে নেবেন, এটি

১· বাংলায় মোকদ্দমা বলতে মামলা, 'কেস' বোঝায়। আরবীতে অর্থ অবতরণিকা। 'কদম' মানে পদক্ষেপ ('কদম্‌ কদম্‌ বঢ়হায়ে যা') ; মোকদ্দমা প্রথম পদক্ষেপ, অবতরণিকা। আবার প্রথম পদক্ষেপ বলে তার অর্থ মামলা রুজু করার প্রথম কদম-একদিক দিয়ে দেখতে গেলে লাতিনে যাকে বলে প্রিমা ফাশি কেস্‌—কিন্তু বাঙলায় এখন মোকদ্দমা বলতে পুরো কেসটাই বোঝায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে একবার পর পর কয়েক বৎসর ধরে গুজরাতে বৃষ্টি না হওয়ার ফলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দলে দলে লোক আহমদাবাদ পানে ধাওয়া করে ; সেখানে যদি দু'মুঠো অন্ন জোটে। অগণিত পিতামাতা তাদের পুত্র-কন্যাকে দাস-দাসীরূপে বিক্রয় করে দেয়। গুজরাতি মেয়েরা যে টাকা-মোহর ফুটো করে অলঙ্কার হিসেবে পরে সেগুলো পর্যন্ত বিক্রয় করে দেয়। বিস্তর লোক উপবাসে মরলো।

গুজরাত সুবার সুবেদার (গভর্নর কিন্তু বর্তমান গভর্নরের চেয়ে অনেক বেশী ক্ষমতা ধরতেন এবং দেওয়ানের সঙ্গে এক জোটে প্রদেশ চালাতেন) তখন অহমদাবাদের সব চেয়ে ধনী শ্রেষ্ঠীকে পরামর্শের আমন্ত্রণ জানালেন। এইসব শ্রেষ্ঠীরা প্রধানত জৈন, এবং স্মরণাতীত কাল থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য করে করে বহু অর্থের অধিকারী হয়েছিলেন (বর্তমান দিনের শ্রেষ্ঠী কস্তুরভাই লাল-ভাই, হর্টিসিং এই গোষ্ঠীরই লোক।

সুবেদার সেই শ্রেষ্ঠীকে শুধালেন, দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য কিছু করা যায় কি না। শ্রেষ্ঠী বললেন, মালওয়া অঞ্চলে এবারে প্রচুর ফসল ফলেছে, সেখানে গম চাল পাওয়া যাবে। তবে দুই প্রদেশের মাঝখানে দারুণ দুর্ভিক্ষ। মালবাহী গাড়ি লুট হবে। অতএব তিনি দুই শর্তে দুর্ভিক্ষ-মোচনের চেষ্টা করতে পারেনঃ ১। সুবেদার নিরাপদে মাল আনানোর জন্য সঙ্গে গার্ডরূপে ফৌজ পাঠাবেন, ২। মাল এসে পৌঁছলে সুবেদার শ্রেষ্ঠীতে মিলে যে দাম বেঁধে দেবেন মুদীরা যদি তার বেশী দাম নেয় তবে তদ্দণ্ডেই তাদের কঠোর সাজা দেবার জিম্মাদারী সুবেদার নেবেন। সুবেদার সানন্দে সম্মতি দিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য শ্রেষ্ঠী সুবেদারের কাছ থেকে অর্থ-সাহায্য চান নি।

বাড়িতে এসে শ্রেষ্ঠী বংশানুক্রমে সঞ্চিত অর্থ, অলঙ্কার-জওহরাৎ বের করলেন, স্ত্রী কন্যাকে তাঁদের অলঙ্কার পর্যন্ত খুলে দিতে বললেন।

সেই সমস্ত ঐশ্বর্যভাণ্ডার নিয়ে শ্রেষ্ঠীর কর্মচারীরা সুবেদারের ফৌজ সহ মালওয়া পানে রওয়ানা দিলেন। কিছুদিন পরেই মুখে মুখে অহমদাবাদে রটে গেল, মাল পৌঁছল বলে। পথে লুটতরাজ হয় নি।

সেই সব গম ধান ও অন্যান্য শস্য যখন অহমদাবাদে পৌঁছল তখন শ্রেষ্ঠী তাঁর একাধিক হাভেলি—বিরাট চক-মেলানো বাড়ি, একসঙ্গে গোষ্ঠীর বহু পরিবার একই বাড়িতে বসবাস করতে পারে—খুলে দিয়ে আঙিনার উপর সেসব রাখলেন। তারপর সুবেদারের সঙ্গে হিসেব করলেন, কি দরে কেনা হয়েছে, রাহ-খর্চা (ট্রান্সপোর্ট) কত পড়েছে এবং তাহলে এখন কি দরে বেঁধে দেওয়া যায়? সুবেদার বললেন, 'আর আপনার মুনাফা?' শ্রেষ্ঠী বললেন, 'যুগ যুগ ধরে মুনাফা করেছি ব্যবসা বাণিজ্যে! এ ব্যবসাতে করবো না। যা খর্চা পড়েছে সেই দর বেঁধে দিন। মুদীর সামান্য লাভ থাকবে।' দাম বেঁধে দেওয়া হল।

এবারে শুনুন, সব চেয়ে তাজ্জবকী বাৎ। শ্রেষ্ঠী শহরের তাবৎ মুদীদের ডেকে পাঠালেন এবং কোন্ মুদী কটা পরিবারের গম যোগায় তার শুমারী (গণনা) নিলেন। সেই অনুযায়ী তাদের শস্য দেওয়া হল। সোজা বাঙলায় আজকের দিনে একেই বলে রেশনিং। এবং তার সঙ্গে গোড়াতেই ব্যবস্থা, যাতে

www.BanglaBook.org

হোর্ডিং না হতে পারে। এবং ফেয়ার প্রাইস।

অহমদাবাদে চতুর্দিকে আনন্দোচ্ছ্বাস। ইতিমধ্যে শ্রেষ্ঠীর চর এসে জানালে অমুক মহল্লার দু জন মুদী ন্যায্যমূল্য থেকে এক না দু পয়সা বেশী নিয়েছে।

শ্রেষ্ঠী তৎক্ষণাৎ স্বয়ং সেই মহল্লায় গিয়ে সর্বজন সমক্ষে তদন্ত করলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে সোজা সুবেদারের বাড়ি গেলেন। সুবেদার তখন ইয়ার-বক্সি[২] সহ গমাগমন সেলেব্রেট করছিলেন। কিন্তু পূর্বপ্রতিজ্ঞা অনুযায়ী বেরিয়ে এসে সব কিছু শুনে সেপাই পাঠালেন মুদীদের ধরে আনার জন্য। সাক্ষী-সাবুদও যেন সঙ্গে সঙ্গে আনা হয়।

তদ্দণ্ডেই সুবেদারের সামনে সাক্ষীসাবুদ তদন্ত-তফ্‌তীশ হয়ে গেল। প্রমাণ হয়ে গেল সত্যই তারা বেশী দাম নিয়েছে।

সুবেদার হুকুম দিলেন, বড্ড বেশী 'খেতে চেয়েছিল' বলে মুদী দুটোর পেট কেটে ফেলা হোক। তাই করা হয়। নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে গেল।

সবাই যেন এই দৃষ্টান্ত থেকে সজাগ সতর্ক হুঁশিয়ার খবরদার হয় সেই উদ্দেশ্যে সুবেদার হুকুম দিলেন, শহরের সব চেয়ে উঁচু দুটো উটের পিঠে তাদের লাশ বেঁধে দিয়ে নগর-পরিক্রমা করা হোক।

সমস্ত রাত ধরে তাই করা হল।

এরপর ঐতিহাসিক যেন নিতান্ত সাদামাটা ডালভাতের কথা বলছেন, ঐভাবে মন্তব্য করছেন, 'অতঃপর আর কেউ অন্যায্য মুনাফা করার চেষ্টা করে নি।'

(আমার হাতে যে পাণ্ডুলিপিখানা পৌঁচেছিল তাতে দেখি এ জায়গাটায় এ যুগের কোন্ এক সুরসিক পাঠক লিখছেন, 'we are not surprised !')

আমি আর কি মন্তব্য করবো? রেশনিং, ফেয়ার-প্রাইস, নো চান্‌স্ ফর হোর্ডিং, তৎমুহূর্তে তদন্ত, তদ্দণ্ডে দণ্ড, জনগণকে হুঁশিয়ারী দেওয়া এসবই হয়ে গেল চোখের সামনে। অবশ্য আমি নিরীহ প্রাণী, পেট কেটে নাড়িভুঁড়ি বের করার আদেশ শুনলে আমার গা শিউরে উঠে। তবে যাঁরা দিনের পর দিন রেশন-শপের লাইনে দাঁড়িয়েছেন, চোখের সামনে কালো-বাজার এবং যাবতীয় অনাচার দেখেছেন, পুত্রকন্যাকে কচুঘেঁচু খাওয়াতে বাধ্য হয়েছেন এবং বিত্তশালীরা কি কৌশলে তোফা খানাপিনা করছেন সবিশেষ অবগত আছেন, তাঁরা হয়তো উল্লাস বোধ করবেন। আমি আপত্তি করবো না—কারণ পূর্বেই

---

২. বক্‌সী বা বখ্‌শী (বখ্‌শিশ কথা একই ধাতু থেকে), অর্থ, একাউন্টেন্ট জেনারেল, অডিটার জেনারেল ও ফৌজের চীফ পে-মাস্টার—এ তিনের সমন্বয়। কায়স্থরা প্রধানত এই দায়িত্বপূর্ণ চাকরি করতেন। প্রধান বা মীর বখ্‌শী নিয়োগ করতেন স্বয়ং দিল্লির বাদশা-সালামৎ। আর সরাসরি নিয়োগ হতেন কাজী উল কুজ্জাৎ অর্থাৎ চীফ জাস্টিস, সদর্-উস্-সদর্ (সেই অঞ্চলে বাদশা সালামতের আপন-জমিজমা তদারকের জন্য, তথা কেউ নিঃসন্তান মারা গেলে তার সম্পত্তি অধিকার করতে)। সরকার=চীফ সেক্রেটারী, কানুনগো=লিগেল রিমেম্‌ব্রেনসার পরে নিযুক্ত হতেন। বখ্‌শীর কাছ থেকে টাকা পেয়ে ব্যবসায়ীরা সঙ্গে সঙ্গে সামনের বাজারে হুণ্ডি কাট্‌তো বলে সে বাজারকে 'বখ্‌শী বাজার' বলা হত। বখ্‌শী সরকার ইত্যাদি বড় বড় এডমিনিস্ট্রেটিভ চাকরি প্রধানত কায়স্থরাই করতেন। ইংরেজ মোটামুটি এই পদ্ধতিই চালু রাখে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলেছি, আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি।

কচ্ছের রণ

ঐতিহাসিক উপন্যাস নিয়ে কথা হচ্ছিল। আর বলছিলুম, এতে করে আমার বড্ডই উপকার হয়েছে। ইতিহাস নিজেকে মাঝে মাঝে পুনরাবৃত্তি করে। চোখের সামনে যখন তাই কোনো কিছু একটা ঘটে, তখন স্মৃতিপথে আসে প্রাচীন দিনের ঐরকম কোন একটি ঘটনা। প্রথম যৌবনে কোনো এক প্রাচীন ইতিহাসে পড়েছি। সে বই এখন আর পাবো না। এতে ফার্সীতে লেখা, তদুপরি বইখানা হয়তো সে ভাষার পুস্তকের মাঝেও দুষ্প্রাপ্য। স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করলে হয়তো ঐতিহাসিকের প্রতি অবিচার করা হবে।[১]

ইতিমধ্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস এসে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। কেউ যদি ত্রুটিবিচ্যুতি দেখিয়ে দেয় তবে নিঃশরমে বলবো, আমি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছি।

গুজরাতের ইতিহাস 'মিরাৎ-ই-আহমদী'র কথা হচ্ছিল। বইখানা লেখা হয়, নাদির শাহ যখন ভারতবর্ষ লণ্ডভণ্ড করে যান মোটামুটি সেই সময়। এ পুস্তক গ্রন্থকার আরম্ভ করেছেন জৈন সাধু মেরুতুঙ্গাচার্যের সংস্কৃতে লেখা গুজরাতের প্রাক্-মুসলিম যুগের ইতিহাসের[২] সারাংশ নিয়ে, তারপর আছে গজনীর সুলতান মাহমুদ[২] কর্তৃক সোমনাথ আক্রমণ।

সুলতান মাহমুদ এমনিতে বলতেন, তিনি কাফিরের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন, কিন্তু সিন্ধুদেশ সপ্তম অষ্টম শতাব্দী থেকে মুসলমান অধিকারে। সে দেশ কি করে আক্রমণ করা যায়? সুলতান বললেন, 'সিন্ধুদেশের মুসলমানরা যদিও কাফির নয়, তবু কাফির-তুল্য—তারা হেরেটিক ; অতএব আক্রমণ করা যায়।'

তা সে যাই হোক, তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল কাঠিওয়াড়ের সোমনাথ মন্দিরের বিরাট ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করা। সেটা সিন্ধুদেশ জয় না করে হয় না।

কিন্তু তার পরই আসে কচ্ছের রাণ। সেটা অতিক্রম করা সিন্ধু-বিজয়ের চেয়েও কঠিন। মাহমুদের সাঙ্গোপাঙ্গো তাঁকে নিরস্ত করার চেষ্টা দিয়ে নিষ্ফল হলেন।

কচ্ছের রাণ অতিক্রম করতে গিয়ে মাহমুদের ফৌজের অসংখ্য সৈন্য ও অশ্ব তৃষ্ণায় প্রাণ হারালো। চোরাবালিতেও অনেকে। তখনকার দিনের ঐতিহাসিকরা তার জন্য গাইডকে জিম্মেদার করেছেন, সে নাকি বিশ্বাস-ঘাতকতা করে। কিন্তু মাহমুদকে বাধ্য হয়ে ঐ পথেই ফিরে যেতে হয়েছিল। মাহমুদ ছিলেন ল্যাণ্ডলক্‌ট্ (অর্থাৎ যে দেশের কোনো সমুদ্রের কোনো সংস্পর্শ

---

১. সংস্কৃত বইখানার নাম আমার মনে পড়ছে না. বোধ হয় 'প্রবন্ধ চিন্তামণি'।

২. মাহমুদ ও মুহম্মদ দুই ভিন্ন নাম। যে রকম হাসন, হুসেন ও হাস্‌সান (সুহ্রাওয়ার্দী) তিনটি ভিন্ন ভিন্ন নাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নেই) দেশের লোক—হিটলারের মত।[৩] তাই দ্বারকা থেকে নৌবহর যোগাড় করে 'ঠাট্টা' (করাচীর কাছে প্রাচীন বন্দর) যাবার সাহস করেন নি।

* * *

এর পর পাগলা রাজা মুহম্মদ তুগলুক এই কচ্ছের রাণের কাছে মার খান।

ফার্সী ঐতিহাসিক লিখেছেন 'তগী', ফার্সীতে 'ঠ' ধ্বনি নেই—শব্দটা বোধ হয় তাই 'ঠগী'। সেই তগী মধ্য-পশ্চিম ভারতে লুটতরাজ আরম্ভ করে। বাদশাহী ফৌজ বার বার তার বিরুদ্ধে অভিযানে বেরিয়ে বার বার বিফল-মনোরথ হয়ে দিল্লি ফিরে আসে। মুহম্মদ রেগে টঙ। বললেন, 'আমি স্বয়ং যাবো।'

একটা সামান্য ডাকুর বিরুদ্ধে স্বয়ং হুজুর যাবেন!

না, যাবোই।

হুজুর স্বয়ং আসছেন জেনে তগী অহমদাবাদ পালালো। হুজুর বললেন, চলো অহমদাবাদ। পারিষদরা মহা অসন্তুষ্ট। সেই সুদূর অহমদাবাদ—দিল্লি থেকে কতদিনের রাস্তা! হুজুর কিন্তু গোঁ ছাড়লেন না। অহমদাবাদে পৌঁছলে পর জানা গেল, তগী পালিয়েছে কাঠিয়াওয়াড়ে। হুজুর বললেন, 'চলো কাঠিয়াওয়াড়।' কিন্তু তখন বর্ষা নেমে গিয়েছে। এবং শ্রান্তি-ক্লান্তিতে হুজুরের হল জ্বর। কি জ্বর, আমি বর্ণনা থেকে বুঝতে পারি নি। ম্যালেরিয়া খুব সম্ভব নয়। ম্যালেরিয়া বোধ হয় এ-দেশে পরে এসেছে। তা সে যাই হোক, হুজুর তামাম বর্ষাকালটা অহমদাবাদে জ্বরে ধুঁকে ধুঁকে রোগা-দুবলা হয়ে গেলেন। কিন্তু বর্ষা-শেষেও গোঁ ছাড়লেন না—তাঁকে যে পাগলা রাজা বলা হত সেটা প্রধানত তাঁর গোঁর জন্যই—চললেন কাঠিয়াওয়াড়। তগী পালালো কচ্ছে। হুজুর গেলেন কচ্ছ। তগী পালালো কচ্ছের রাণের উপর দিয়ে সিন্ধুদেশে। সে ডাকাত—রাণের কোথায় কি, জানে—সেখানে একাধিক বার আশ্রয় নিয়েছে। তদুপরি সে তো আর বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে যাচ্ছে না : তার দানাপানির আর কতটুকুই বা দরকার!

এবারে পারিষদরা তারস্বরে প্রতিবাদ জানালেন। গজনীর মাহমুদ বাদশা যে রাণে কি রকম নাজেহাল হয়েছিলেন সে কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। সঙ্গে ছিলেন রাজসভার সরকারী ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরনী (ইনি 'দিল্লি দূর অস্ত'-এর সাধু নিজামুদ্দীন আউলিয়া ও কবি আমির খুসরুর নিত্যালাপী বন্ধু ছিলেন); তিনিও নিশ্চয়ই প্রাচীন ইতিহাস কীর্তন করেছিলেন। তদুপরি তুগলুক নিজে ছিলেন সুপণ্ডিত। ইতিহাস ভূগোল উত্তমরূপেই

৩· ফ্রান্স জয়ের পর হিটলার ইংলণ্ড আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। এর নাম অপারেশন 'সী লায়েন' (সমুদ্রসিংহ, 'জে লোয়ে') কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটা বাতিল করে দেওয়া হয়। তার বহুবিধ কারণ নিয়ে নানা গুণী নানা আলোচনা করেছেন। অন্যতম কারণ বলা হয়, হিটলার ল্যান্ডলকট্ দেশের লোক ছিলেন বলে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে আড়ুআ করতেন। গ্রীস জয় করার পর তিনি তাই মল্টাবর্ষী আক্রমণ ক্রমাগত পিছিয়ে দিয়ে ভুল করেন। ফলে রমেলও পুরো সাহায্য পেলেন না। এ-দেশের মোগল-পাঠান রাজাদের বেলাও তাই। নৌ-বাহিনীর সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল না বলে তাঁরা ইংরেজকে অবহেলা করেন। ফলে ভারতবর্ষ সমুদ্রপথে বিজিত হয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জানতেন। কিন্তু হিটলার যদিও অত্যুত্তমরূপেই নেপোলিয়নের রুশ-অভিযান ও তার মারাত্মক ফলাফল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং যদিও তাঁর সেনাপতিরা তাঁকে বার বার রুশ অভিযান থেকে নিরস্ত থাকতে উপদেশ দেন, তবুও তিনি সেই কর্মটি করেছিলেন। এখানেও তাই হল। তুগলুক নিরস্ত হলেন না।

কচ্ছের রাণে বাদশা মুহম্মদ তুগলুকের কী নিদারুণ দুরবস্থা হয়েছিল, তার বর্ণনা একাধিক ঐতিহাসিক দিয়েছেন। আজ আমার আর ঠিক মনে নেই, তাঁর সৈন্য এবং ঘোড়া খচ্চরের ক'আনা বেঁচেছিল, আর ক'আনা মরেছিল।

এ সময়ের একটি ঘটনা ঐতিহাসিক বর্ণনা করেছেন। রোগে জীর্ণ দুর্বল দেহ নিয়ে ঘোড়ার উপরে বসে মুহম্মদ তুগলুক ধুঁকতে ধুঁকতে এগোচ্ছেন। এমন সময় তিনি ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বরনীকে ডেকে পাঠালেন—কাউকে ডেকে না পাঠালে হুজুরের কাছে যাবার কারো অনুমতি ছিল না। বরনী কাছে এলে তুগলুক তাকে বললেন, 'আচ্ছা বরনী, তুমি তো জানো আমি আমার প্রজাদের কতখানি ভালোবাসি। আমি যে-সব ফরমান-হুকুম জারি করেছি সে তো একমাত্র তাদেরই মঙ্গলের জন্য। তবে তারা একগুঁয়েমি করে আমার আদেশ অমান্য করে কেন? তারপর শুধোলেন, 'আচ্ছা বরনী, তোমার কি মনে হয়, আমি বড্ড কড়া হাতে শাসন করেছি, প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত শাস্তি দিয়েছি? তবে কি এখন আমার উচিত আরো ক্ষমা-দয়ার সঙ্গে শাসন করা?'

বরণী লিখছেন, 'এই শেষকালে যদি হুজুর হঠাৎ তাঁর নীতি বদলান তবে হয়তো আরো বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে ভেবে আমি নীরব থাকাটাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করলুম।'

এদিকে দিল্লিতে বসে তুগলুকের প্রধান মন্ত্রী পড়েছেন মহাবিপদে। হুজুরের কোনো খবর নেই। রাণ থেকে তো দূত পাঠানো যায় না, যে দিল্লি আসবে। দূত আর তার পার্টি পথে জল পাবে কোথায়? পিছনপানে অবশ্য মৃত্যু—সম্মুখ দিকে তবু বাঁচবার আশা আছে। কাজেই দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে, হুজুরের কোনো খবর নেই। প্রধান মন্ত্রীর ভয়, খবরটা রটে গেলে তুগলুকের কোনো আত্মীয় বা অন্য কোন দুঃসাহসী রাজা মরে গেছেন এই সংবাদ রটিয়ে কিছু সৈন্যসামন্ত যোগাড় করে দিল্লির তখতে না বসে যায়। রাজকোষ তখন তার হাতে এসে যাবে এবং ফলে সে আরো সৈন্য সংগ্রহ করে নেবে। হুজুর যখন ফিরে আসবেন তাঁর সঙ্গের সৈন্যদল পরিশ্রান্ত ক্লান্ত। হুজুর তখন লড়াই দেবেন কি করে? প্রধান মন্ত্রী তখন শুরু করলেন স্রেফ ধাপ্পা। হুজুর রোজ সকালে যে ঝরোকায় দাঁড়িয়ে দেখা দিতেন সেখানে প্রধান মন্ত্রী দাঁড়িয়ে বলতেন, 'বড় আনন্দের বিষয়, আজও হুজুরের চিঠি পেয়েছি। হুজুর বহাল তবীয়তে আছেন। শিগগিরই রাজধানীতে ফিরে আসছেন।' তারপর আগরখার (অগ্রক্ষা) ভিতরের জেব থেকে বগাস্ চিঠি বের করে, গভীর সম্মানের সঙ্গে সেটি চুম্বন করে উচ্চকণ্ঠে সেটি পড়ে শোনাতেন—আগাগোড়া নিছক গুল! তার পর আরো সসম্মানে চিঠিখানা চুম্বন করে পকেটে রেখে দিতেন।

প্রধান মন্ত্রী হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। ধাপ্পা, গুল, থিয়েডারি সব

www.BanglaBook.org

কুছকা এলেম পেটে ধরতে হয়।

ওদিকে অশেষ ক্লেশ ভুঞ্জে হুজুর সিন্ধুনদের তীরে এসে পৌঁছলেন। তগীর কি হল আমার মনে নেই। পৌঁছেই হুজুর দিল্লি-পানে ঘোড়সওয়ার রওনা করলেন। তারা দিল্লি পৌঁছলে প্রধান মন্ত্রীর ধড়ে জান এল।

হুজুর আর কচ্ছের রাণ ধরে দিল্লি ফিরলেন না। স্থির হল, নৌকায় করে সিন্ধু উজিয়ে উজিয়ে তারই উপনদী দিয়ে লাহোর পৌঁছবেন। উত্তম ব্যবস্থা। ইতিমধ্যে রোজার মাস বা রমজান এল। হুজুর বললেন, 'উপোস করবো।' আমীর-ওমরাহ বললেন, 'হুজুর একে অসুস্থ, দুর্বল, তদুপরি ভ্রমণকালে উপবাস করা ইচ্ছাধীন—কুরান শরীফের আদেশ।' হুজুর তেড়ে বললেন, 'যে মুসাফিরীতে (ভ্রমণে) তকলীফ হয় আল্লাতালা সেইটের কথাই বলেছেন। আমরা তো যাচ্ছি আরামসে নৌকায় শুয়ে শুয়ে। আমি উপোস করবোই।' পুনরায় গোঁ। তর্ক করবে কে? মুহম্মদ তুগলুকের সঙ্গে শাস্ত্র নিয়ে তর্ক করবার মত এলেম কারো পেটে ছিল না। (আরেক ধনুর্ধর পণ্ডিত ছিলেন ঔরঙ্গজেব)।

কয়েকদিন পরে ধরা পড়ল একটি চমৎকার মাছ। কিন্তু এ জাতের মাছ দিল্লিবাসীরা কখনো দেখেন নি। তাঁরা বললেন, 'যে মাছ চিনি নে সেটা খাব না।' হুজুর বললেন, 'কুরান, হদীস কোনো শাস্ত্রে এ জাতীয় মাছের বর্ণনা দিয়ে যেতে যখন বারণ করা হয় নি তখন আমি ইটি খাবই। আবার গোঁ।

খেলেন! দারুণ তেলওলা মাছ ছিল। হুজুরের শরীরও ছিল রোগা, রাণের ধকলে দুর্বল। পেট ছাড়লো। কিছুতেই বন্ধ হয় না। বোধ হয় তৃতীয় দিনে হুজুর ইন্তিকাল করলেন, অর্থাৎ পটল তুললেন।

ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন লিখছেন, 'এই প্রকারে হুজুর তাঁর অবাধ্য প্রজাকুলের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে রক্ষা পেলেন ; প্রজাকুলও হুজুরের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বাঁচলো!'

* * *

আমি বঙ্গসন্তান। মাছের নামে অজ্ঞান। আমার মনে প্রশ্ন জাগলো, বাদশা-সালামৎ কি মাছ খেয়ে শহীদ হলেন!

বরনী, মিরাৎ দিয়েছেন মুসলীম চান্দ্র মাসের হিসাবে তুগলুকের মৃত্যু-দিবস। তার থেকে কোন্ ঋতুতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ধরা যায় না। বিস্তর ক্যালেণ্ডার ঘেঁটে যোগাবিয়োগ করে বের করলুম ঋতুটি।

আমার এক সিন্ধী দোস্ত আছেন ; ইতিহাসে তাঁর বড়ই শখ। তাঁর বাড়ি গিয়ে তাঁকে শুধালুম।

তিনি বললেন, 'নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, পাল্লা মাছ।'

* * *

গঙ্গা উজিয়ে যেটা আসে বা একদা আসতো, সেটা ইলিশ—হিল্‌সা। নর্মদা উজিয়ে ঐ মাছটা যখন আসে তখন ব্রোচের (broach—ভৃগুকচ্ছ) লোক এটাকে বলে মদার, পার্সীরা বলে বিম্। সিন্ধু উজলে এই মাছকেই বলে পাল্লা।

অনেকেই অনেক কিছু চড়ে স্বর্গে যান ; ঐরাবত, পুষ্পকরথ, কত কি? শাহ-ইন-শাহ বাদশা-সালামৎ মুহম্মদ তুগলুক শাহ ইলিশ চড়ে স্বর্গে

www.BanglaBook.org

গেলেন। স্বর্গে যাবেন না তো কোথায় যাবেন? ইলিশ খেয়ে যে প্রাণ দেয় সে তো শহীদ—মার্টার!

দর্শনাতীত

ছন্নের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি বিরাট বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডরে। সবে এসেছি 'দ্যাশ' থেকে—হাইকোর্টটি দেখিয়ে দেখিয়ে দেবার মতো কোন খাটাশকে পাচ্ছি নে। কিন্তু রমণীজাতি দয়াশীলা—বেদরদীরা বলে হরবকৎ শিকার-সন্ধানী—আমার সঙ্গে কথা কইলে নিজের থেকে। আমি তখন বিবর্ণ বিস্বাদ বদখদ কোন এক মাংস, ততধিক বিজাতীয় হর্স-ক্যাবেজ (সচরাচর এ বস্তু ঘোড়া ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দেওয়া হয়) খাবার চেষ্টা করছি, চোখের জলে নাকের জলে। সব শুনে বললে, 'দর্শন? তাহলে শিমটকে মিস্ করো না; বুড়োর বয়স আশী পেরিয়ে গেছে, কখন যে পটল তুলবে (জর্মনে বলে 'আপজেগ্‌লেন') ঠিক নেই।'

পোড়ার দেশে লেকচার-রুমে সীট রিজার্ভ করতে হয়। প্রাগুক্ত যুবতীটি ধানীলংকার মত এফিশেণ্ট। সাত দিন পরে প্রথম লেকচারে গিয়ে দেখি, একদম পয়লা কাতারে পাশাপাশি দু'খানা চেয়ার রিজার্ভ করে বসে আছে প্রফেসারের চেয়ার থেকে হাত আষ্টেক দূরে।

অধ্যাপক এলেন ঘণ্টা পড়ার মিনিট পাঁচেক পরে। বয়েস আশী না, মনে হবে সোয়া-শো—যেভাবে আস্তে আস্তে পা ফেলে ফেলে ঘরে ঢুকলেন। ইয়া বিরাট লাশ। ফ্লাইন উরজুল লাফ দিয়ে গেলেন তাঁর দিকে। বুড়ো রোষ-কষায়িত লোচনে তাঁর দিকে তাকিয়ে হাত দু'খানা অল্প তুলে ধরলেন। উরজুল এক দিকের ওভারকোটটা তাঁর দেহ থেকে মুক্ত করার পর তিনি অতি কষ্টে শরীরে একটু মোচড় দিলেন। এই গুহ্যতম তান্ত্রিক মুষ্টিযোগ প্রসাদাৎ তিনি তাঁর ওভারকোটের নাগপাশ থেকে মুক্তিলাভ করলেন। শেষনাগকেও বোধ হয় তাঁর বাৎসরিক খোলস থেকে মুক্ত হতে এতখানি মেহন্নৎ বরদাস্ত করতে হয় না।

ধীরে ধীরে প্ল্যাটফর্মে উঠে চেয়ারে আসন নিলেন। সচরাচর অধ্যাপকরা প্ল্যাটফর্মের নিকটতম কোণে উঠেই বক্তৃতা ঝাড়তে আরম্ভ করেন। ইনি চুপচাপ বসে রইলেন ঝাড়া পাঁচটি মিনিট। ধবধবে সাদা কলারের উপর হাঁড়িপানা তাঁর বিরাট মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি তাতে অন্তত ডজনখানেক কাটাকুটির দাগ। লেকচার আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত ফিস্‌ফিস্ করে কথা কইতে বারণ নেই। আমি উরজুলকে শুধালুম, 'মুখে ওগুলো কিসের দাগ?'

'ফেনাসিঙের। সিনেমাতে দেখ নি, লম্বা সরু তলোয়ার দিয়ে একে অন্যের কলিজা ফুটো করার পাঁয়তারা কষে? পণ্ডিত বোঝা যাচ্ছে, তলোয়ার নাকের কাছে এলেও ইনি পিছু-পা তো হনই নি, মাথাটা পর্যন্ত পিছনের দিকে ঠেলে দেন নি। প্রত্যেকটি কাটাতে ক'টা স্টিচ লেগেছিল ওঁকে শুধোতে পারো।'

আমি বললুম, 'উনি না দর্শনের অধ্যাপক!'

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ, কিন্তু ওঁর বাপ-পিতামো ছিলেন কট্টর প্রাশান ঐতিহ্যের পাঁড় জেনারেল গুষ্টি। তাঁদের বর্মের মত শক্ত হৃদয় ভেঙে ইনি দর্শনের অধ্যাপক হয়ে গেলেন। কৈশোরে বোধ হয় সে মতলব ছিল না। তাই দুঁদে দুঁদে ফেনসারদের চেলেঞ্জ করে এসব অস্ত্র-খেলার কলেক্‌শ্‌ন্‌ আপন মুখে নিয়ে বাকী জীবন দর্শন পড়াচ্ছেন। তাইতে বাপ-দাদার ততোধিক মনস্তাপ যে, এমন পয়লানম্বরী তলওয়ারবাজ হয়ে গেল মেনিমুখো মেস্টার-মেলের একজন।'

আমি বললুম, 'পেন্‌ ইজ মাইটিয়ার দেন সর্ড!'

'ছোঃ! ভদ্রলোক জীবনে এক বর্ণ কাগজে কলমে লেখেন নি—সাত ভলুমি কেতাব দূরে থাক, এক কলমের প্রবন্ধ পর্যন্ত না। কলমই ওর নেই। বোধ হয় টিপসই দিয়ে—'

অধ্যাপক ছাদ-ছোঁয়া গ্যালারির উপর-নিচ ডান-বাঁ'র উপর চোখ বুলিয়ে আরম্ভ করলেন—ওঃ, সে কি গলা! যেন নাভিকুণ্ডলী থেকে প্রণবনাদ বেরুচ্ছে, 'মাইনে ডামেন্‌ উন্‌ট্‌ হেরেন্‌!'—'আমার মহিলা ও মহোদয়গণ!' তার পর দম নিয়ে বললেন, 'অন্যবারের মত এবারেও আমি রেকটরকে'—তার পর গলা নামিয়ে বিড়বিড় করে বললেও সমস্ত ক্লাসই শুনতে পেল—'আস্ত একটা গাধা—'

আমার তো আক্কেল গুড়ুম। রেকটর যিনি কিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বময় কর্তা, তাঁকে গর্দভ বলে উল্লেখ করা—তা সে বিড়বিড় করেই হোক আর রাসভকণ্ঠেই হোক—এ যে অবিশ্বাস্য!

অধ্যাপক বলে যেতে লাগলেন, 'রেকটরকে আমি অনুরোধ জানালুম, আমাকে এই টার্ম থেকে নিষ্কৃতি দিতে। অর্বাচীন বলে কিনা, আমাকে না হলে তার চলবে না। এ উত্তর আমি ইতিপূর্বেও শুনেছি। তার পূর্বের রেকটর—' আবার বিড়বিড় করলেন, 'বলদ, বলদ! স্রেফ বলদ—তাকেও আমি একই অনুরোধ করেছিলুম, এবং একই উত্তর পেয়েছিলুম। তার পূর্বের রেকটর—কিন্তু কাহিনী সম্প্রসারিত করার প্রয়োজন নেই—এবং তার পূর্বেরও সবাই একই উত্তর দেয়। বস্তুত, মাইনে ডামেন্‌ উন্‌ট্‌ হেরেন্‌, গত বাইশটি বৎসর ধরে আমি এই একই উত্তর শুনে আসছি। মনে হচ্ছে, অরিজিনালিটি রেকটর সম্প্রদায়কে এড়িয়ে চলেন। তা সে যাক, তাদের বক্তব্য, আমাকে ছাড়া চলবে না, আমি ইনডেস্‌পেন্‌সিবল!'

এবারে তিনি স্বয়ং সিন্ধী বলদের মত ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তবে কি সাতিশয় সন্তাপের সঙ্গে স্বীকার করতে হবে, জার্মানি এমনই চরম অবস্থায় পৌঁছেছে যে, এদেশে আর দার্শনিক নেই? কিন্তু এই আমার শেষ টার্ম। আমি মনস্থির করে ফেলেছি। তারপর চোখ বন্ধ করে খুব সম্ভব প্রথম বক্তৃতায় প্রথম কি বস্তু দিয়ে আরম্ভ করবেন তার চিন্তা করতে লাগলেন। উরজুল আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন, 'তাঁর শেস টার্ম! এ ভয় তিনি নিদেন পঁচিশ বচ্ছর ধরে দেখাচ্ছেন—প্রতি টার্মের গোড়ায়।' বুড়োর চোখ বন্ধ হলে কি হয়, কান দিব্য সজাগ। চোখ খুলে বললেন, 'নো, আবার নো। এই আমার শেষ টার্ম—কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

www.BanglaBook.org

তার পর গ্রীক দর্শন নিয়ে আরম্ভ করলেন। তাঁর পড়াবার পদ্ধতি অনুকরণ করা অসম্ভব। কারণ, তাঁর পড়ানোটা সম্পূর্ণ নির্ভর করতো তাঁর স্মৃতিশক্তির উপর। যে স্মৃতিশক্তি বিধিদত্ত। কোন্ সালের, কোন্ বইয়ের, কোন্ অধ্যায়ে, এমন কি মাঝে মাঝে কোন্ পাতায় কি তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে সেগুলো বলে যেতে লাগলেন কোনো প্রকারের নোট না দেখে। প্রত্যেকটি সেন্টেন্স স্বয়ংসম্পূর্ণ। ভাষা সরল। এবং মাঝে মাঝে প্লাতো, আরিস্ততল বোঝাতে গিয়ে হঠাৎ মারেন দু'হাজার বছরের ডুব-সাঁতার। এ যুগের কে তার সর্বোত্তম ব্যাখ্যা করেছেন, কোথায়, কোন্ পরিচ্ছেদে—তার সবিশদ বর্ণন। আমি হতভম্ব।

ঘণ্টা পড়তে আস্তে আস্তে উঠলেন। ফ্লাইন উরজুল তাঁকে পুনরায় ওভারকোট পরিয়ে দিলেন। ধীরে মন্থরে করিডরে নামলেন।

আমি উরজুলকে বললুম, 'এ কী কাণ্ড! গণ্ডাখানেক রেকটরকে ইনি গাধা-বলদের সঙ্গে—?'

'ওঃ! এ রা সবাই এসব জানেন। এঁরা সবাই তাঁর ছাত্র।'

'ওঁকে ছুটি দেয় না কেন?'

'সঙ্কলেরই বিশ্বাস, সঙ্গে সঙ্গে তিনি পটল তুলবেন বলে। মাধ্যাকর্ষণ নয়, দর্শনাকর্ষণ তাঁকে ইহলোকে আটকে রেখেছে।'...

এখানে রোল-কল হয় না। টার্মের গোড়াতে ও শেষে আপন আপন 'স্টুডেণ্টস বুকে' অধ্যাপকের নাম দু'বার সই করিয়ে নিতে হয়।

গোড়ার দিকে ভিড় ছিল বলে হাল্কা হলে পর আমি আমার 'বুক' নিয়ে পাতলুম। এযাবৎ অন্য কারো সঙ্গে তিনি বাক্যবিনিময় করেন নি। আমাকে দেখে চেয়ারে আরামসে হেলান দিয়ে বললেন, 'আঃ! বাঃ বাঃ! তার পর? আচ্ছা। বলুন তো আপনি কি জর্মন বেশ বুঝতে পারেন?'

আমি বললুম, 'অল্প, অল্প।'

'বেশ, বেশ। তা—তা, আপনি কোন্ দেশ থেকে এসেছেন?'

'ইণ্ডিয়া।'

কেন যে এতখানি তাজ্জব হয়ে তাকালেন বুঝতে পারলুম না। বললেন, 'ইণ্ডিয়া? কিন্তু ইণ্ডিয়াই তো দর্শনের দেশ। আপনি এখানে এলেন কেন?'

আমি সবিনয় বললুম, 'নিশ্চয়, কিন্তু আধুনিক দর্শনে জর্মনির সেবা ও দান তো অবহেলার বিষয় নয়।'

কী আনন্দে, কী গর্বে অধ্যাপকের সেই কাটাকুটি-ভরা মুখ যে প্রসন্ন হাস্যে ভরে গেল, সেটি অবর্ণনীয়। শুধু মাথা দোলান আর বলেন, 'বস্তুত তাই, প্রকৃতপক্ষে তাই।'

এবারেও যখন তিনি 'আপনি' বলে সম্বোধন করলেন তখন আমি যেন 'তুমি' শুনতে পেলুম। তাঁর বিরাট সাদা মাথাটা আমার দিকে ঠেলে কাছে এনে বেদনা-ভরা গলায় বললেন, 'কিন্তু জানো, ভারতীয় দর্শন—অবশ্য সব দর্শনই দর্শন—শেখবার সুযোগ আমি পাই নি। ব্যাপারটা হয়েছে কি, আমার যৌবনে ভারতীয় দর্শনের জর্মন-ইংরেজি অনুবাদ পড়তে গিয়ে দেখি সব পরস্পরবিরোধী বাক্যে পরিপূর্ণ। আমি বললুম, "এ কখনই হতে পারে না। ভারতের জ্ঞানী ব্যক্তিরা এরকম কথা বলতে পারেন না। যাঁরা অনুবাদ করেছেন তাঁরা কতখানি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জর্মন জানেন জানি নে, কিন্তু দর্শন জানেন অত্যল্প, এবং ভারতীয় দর্শনে তাঁদের অপরিচিত যে দৃষ্টিভঙ্গি, দৃষ্টিকোণ সেটা আদৌ বুঝতে পারেন নি।" ছেড়ে দিলুম পড়া, বিরক্তিতে। কিন্তু জানো, বছর দশেক পূর্বে আমার ছাত্র—তিনি রেকটরের নাম করলেন—'অমুক—ভারী ব্রিলিয়ান্ট ছেলে—আমাকে বললে, এখন নাকি কম্পিটেন্ট অনুবাদ বেরুচ্ছে। কিন্তু ততদিনে আমি বড্ড বুড়িয়ে গিয়েছি। নূতন করে নূতন "স্কুলে" যাবার শক্তি নেই। বড় দুঃখ রয়ে গেল।'

আমি একটু ভেবে যেন সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, 'তার জন্য আর অত ভাবনা কিসের, স্যর? হিন্দুরা পরজন্মে বিশ্বাস করে। আপনি এবারে জন্ম নেবেন কাশীর কোন দার্শনিকের ঘরে।'

এবারে তাঁর যে কী প্রসন্ন অট্টহাস্য! শুধু বলেন, 'ঐ তো! ঐ তো! বাঃ, বাঃ! বেশ, বেশ। যাক, শেষ দুশ্চিন্তা গেল।'

তারপর শুধালেন, 'বক্তৃতা সব বুঝতে পারো তো?'

আমি বললুম, 'আজ্ঞে, জর্মন ভালো জানি নে বলে মাঝে মাঝে বুঝতে অসুবিধে হয়।'

অধ্যাপক বললেন, 'তখন হাত তুলো; আমি সব ভালো করে বুঝিয়ে বলবো।'

আমি কাঁচু-মাঁচু হয়ে বললুম, 'আমার জর্মন জ্ঞানের অভাববশত সমস্ত ক্লাস সাফার করবে—এটা কেমন যেন—'

গুরু গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললেন—প্রত্যেকটি শব্দ যেন আমার বুকের উপর হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঠুকে—'আমি একশজনকে পড়াবো না একজনকে পড়াবো, কাকে পড়াবো আর কাকে পড়াবো না, সেটা স্থির করি একমাত্র আমি।'

* * *

আমার দুর্ভাগ্য, আমি খুব বেশী দিন তাঁর কাছ থেকে শিক্ষালাভের সুযোগ পাই নি। পরের টার্মেই ওপারে চলে যান।

তারপর প্রায় ৩৫ বৎসর কেটে গিয়েছে।

আমার ব্যক্তিগত সংস্কার যে, সৃষ্টিকর্তা মানুষকে পৃথিবী নামক জায়গাটিতে একবারের বেশী দু'বার পাঠান না। একই নিষ্ঠুর স্থলে একাধিকবার পাঠিয়ে একই দণ্ড দেওয়ার মধ্যে কোনও বৈদগ্ধ্য (রিফাইনমেণ্ট) নেই। তবু যখন কোনো যুবাজনের মুখে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা শুনে মনে হয়, এ-তরুণ এর কিছুটা গভীরে ঢুকতে পেরেছে, তখন আপন অজান্তে তার চেহারায় জর্মনগুরুর বিরাট কাটাকুটি-ভরা, হাঁড়াপানা চেহারার সাদৃশ্য খুঁজি।

BanglaBook.org

মা-মেরীর রিস্ট-ওয়াচ

একদা রম্য রচনা কি রীতিতে উত্তমরূপে লেখা যায়, এই বাসনা নিয়ে কলেজের ছেলের বয়সীরা আমাকে প্রশ্ন শুধাতো; অধুনা শুধোয়, ঐতিহাসিক উপন্যাস কি প্রকারে লেখা যায়? আমি বাঙালী, কাজেই বাঙালীর স্বভাব খানিকটে

www.BanglaBook.org

জানি—পাঁচু, ভূতো আর পাঁচজন যে ব্যবসা করে—যথা পাবলিশিং হাউস কিংবা লন্ড্রী—পয়সা কামিয়েছে, সে সেইটেই করতে চায়, নূতন ব্যবসার ঝুঁকি নিতে সে নারাজ। অতএব হাল-বাজারে যখন ঐতিহাসিক উপন্যাস ছেড়ে দিয়ে কালোবাজারের চেয়েও সাদা-বাজারে লাভ বেশী, তবে চলো ঐ লালকেল্লা ফতেহ করতে ; মা-মেরীতে বিশ্বাস রাখলে কড়ি দিয়েও কিনতে হবে না, সায়েবের মুনশীও ঐ আশ্বাস দিয়েছেন।

যাঁরা পণ্ডিত লোক, ইতিহাস জানেন ও উপন্যাস লেখার কায়দাটাও যাঁদের রপ্ত আছে, তাঁরাই ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে পারেন। আমি ও আমার মত আর পাঁচজন পারে না, আমরা পণ্ডিত নই। কিন্তু পণ্ডিত না হয়েও দিব্য বুঝতে পারি, ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে যাওয়ার বিপদটা কি?—পাখীর মত উড়তে না জেনেও চমৎকার বুঝতে পারি মনুমেণ্টের উপর থেকে লাফ দিয়ে পাখীর মত ওড়বার চেষ্টা করলে হালটা মোটামুটি কি হবে।

এই তো হালে একটি সাপ্তাহিকের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে অলস নয়নে পড়লুম, 'তুমি ওমরাহ নও।

সর্বনাশ! এটা কি প্রকার হল? 'ওমরাহ' তো 'আমীরে'র সাদামাটা বহুবচন—যে রকম 'গরীব' থেকে 'গুর্বাহ' ; তাই বলি 'গরীব-গুর্বো'। সেই আইনেই বলি 'আমীর-ওমরাহ' ('আমীর-ওমরো'ও শুনেছি ; আকারান্ত শব্দ বাঙলায়, 'এ' 'ও'-তে আকছারই পরিবর্তিত হয়, যেমন 'ফিতে' 'জুতো'—এর কোনো পাকা নিয়ম নেই। আরবী বা ফার্সী শব্দের একবচন এবং বহুবচন পাশাপাশি বসিয়ে আমরা অনেক সময় বাঙলায় কালেকটিভ নাউন তৈরি করি—যেমন 'আমীর-ওমরাহ' অর্থাৎ 'আমীরসম্প্রদায়' কিংবা 'গরীব-গুরবো' 'দীন-সম্প্রদায়' 'দীনজন'। তা সে যাই হোক, 'ওমরাহ' কথাটা বরহক্ বহুবচনেই আছে। কাজেই যে রকম আপনি 'আমীর সম্প্রদায় নন' ব্যাকরণে ভুল, তুমি 'ওমরাহ্ নও' ভুল।

(ঠিক সেই রকম 'আলিম্' পণ্ডিতের বহুবচন 'উলেমা'—জমিয়ৎ-ই-উলাম-ই-হিন্দ ; অনেকেই না জেনে ইংরিজীতে লেখেন ulemas।)

কাজেই প্রথম চোরাবালী শব্দ নিয়ে। ঠিক ঠিক অর্থ না জানলে আমাদের মত অপণ্ডিত জন খায় মার। ঠিক সেই রকম গুপ্তযুগের উপন্যাস লিখতে গিয়ে না ভেবে ফুটিয়ে দিলুম রজনীগন্ধা, কৃষ্ণচূড়া—শব্দ দুটো থেকে বিশেষ করে যখন সংস্কৃতের সুগন্ধ বেরিয়েছে—অথচ দুটো ফুলই এদেশে এসেছে অতি হাল আমলে। এবং শুধু শব্দার্থ জানলেই হল না—রূঢ়ার্থে তার ব্যবহার জানতে হয়। তসবী[১]-খানা কথাটির দুটো শব্দই আমরা চিনি—যে ঘরে বসে বাদশা তসবীমালা জপ করেন। মোগল আমলে কিন্তু ঐ ঘর ছিল অতিশয়

---

১ কত না হস্ত চুমিলাম আমি
তসবীমালার মত,
কেউ খুলিল না কিস্মতে ছিল
আমার গ্রন্থি যত!

অর্থাৎ তসবীমালা জপ করে এক সাধু অন্য সাধুর হাতে তুলে দেন, কিন্তু কেউই দয়া করে মালার সুতোটি কেটে মুক্তোগুলোকে মুক্তি দেন না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গোপন (top secret) মন্ত্রণালয়।

কেউ যদি লেখেন 'অতঃপর সম্রাট ঔরঙ্গজেব সমস্যা সমাধানের জন্য সমস্ত রাত কুরান শরীফ ঘেঁটেও কোনো হদীস পেলেন না', তবে বাঙালী পাঠক এ-বাক্যে কোন দোষ পাবেন না। কারণ হদীস বা হাদিশ বলতে বাঙ্গালী পাঠক প্রিসিডেন্স বা পূর্ব উদাহরণ বোঝে। কিন্তু কুরানে হদীস খোঁজা আর বেদে মনুসংহিতা খোঁজা একই রকমের ভুল। কুরানে আছে পয়গম্বরের কাছে প্রেরিত ঐশী বাণী—আপ্তবাক্য। আর হদীসে আছে পয়গম্বর কি ভাবে জীবনযাপন করতেন, কাকে কখন কি করতে আদেশ বা উপদেশ দিয়েছিলেন ইত্যাদি (এগুলোও অতিশয় মূল্যবান—কিন্তু আপ্তবাক্য নয়)। কাজেই এগুলোর (হদীসের) সন্ধান কুরানে পাওয়া যাবে কি করে? বস্তুত কোনো অর্বাচীন সমস্যা ও তার সমাধান কুরানে না পেলে আমরা হদীসে (শাস্ত্রে 'স্মৃতি'র সঙ্গে তুলনীয়) যাই। সেখানে না পেলে ইজমাতে এবং সর্বশেষে কিয়াসে। কিন্তু শেষের দুটো স্মৃতিশাস্ত্রের গভীরে—ঐতিহাসিক উপন্যাসে প্রতিবিম্বিত হওয়ার সম্ভাবনা অত্যল্প। তা সে যাই হোক, মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধে যে কিছুটা জ্ঞান বাঞ্ছনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কিন্তু তার চেয়েও বেশী প্রয়োজন, মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে পরিচয়। ঐতিহাসিক উপন্যাসে সেটা প্রধানত বিস্ময়বোধক বাক্যে। তুলনা দিয়ে বলতে পারি, ফরাসী উপন্যাসের ইংরিজী অনুবাদে 'মঁ দিয়ো' 'পার ব্ল্যা', 'ভাঁত্র ব্ল্যা'-গুলো ইংরেজ ফরাসীতেই রেখে দেয়; জর্মন উপন্যাসের অনুবাদে 'মাইন গট্' 'হ্যার গট্' 'ডনার ভেটার' মূলের মত রেখে দেয়। এগুলোর অনুবাদ সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়। অবশ্য স্মরণ রাখা উচিত, মঁ দিয়ো, মাইন গট্ এবং মাই গড একই জিনিস, একই বাক্য হলেও ইংরেজের পক্ষে 'মাই গড' বলা নিন্দনীয়; নিতান্ত বিপাকে না পড়লে ইংরেজ 'মাই গড' বলে না। পক্ষান্তরে ফরাসী জর্মন কথায় কথায় 'মঁ দিয়ো' 'মাইন গট্' বলে থাকে। তাই ইংরিজী অনুবাদের সময় মূলের আবহাওয়া রাখবার জন্য অনুবাদক এগুলো অনুবাদ করেন না।

অলহমদুলিল্লা, ইয়া আল্লা, তওবা তওবা, বিসমিল্লা এগুলো অবস্থাভেদে ব্যবহৃত হয়। 'আপনার ছেলে এম-এ পাস করেছে? তওবা তওবা!' (বা তোবা তোবা!) বললে যে ভুল হয় সেটা সাধারণ জনও বোঝে। তাই এসব বাক্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে অনেকটা কারো প্রথম বংশধর জন্মালে আপনি যদি উচ্চকণ্ঠে 'বল হরি, হরিবোল বলে ওঠেন' তা হলে যেরকম হয়! এসব ভুল সাধারণ সামাজিক উপন্যাসে পাঠক শুধু একটুখানি মুচকি হাসে, কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস যিনি লেখেন তাঁর কাছ থেকে পাঠক একটু বেশি প্রত্যাশা করে।

'শার্ঙ্গদেবে'র মত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গভীরে যাঁরা গিয়েছেন তাঁরাই জানেন, পাঠান-মোগল যুগের সঙ্গীত তথা এদের আগমনের পূর্বে ভারতীয় সঙ্গীতের প্রকৃত স্বরূপ কি ছিল; এ নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁদের কতখানি ফার্সী ভাষার সঙ্গে পরিচিত হবার প্রয়োজন। ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের অতখানি ফার্সী জানার প্রয়োজন নেই, কিন্তু তিনি যদি রানী রিজিয়ার দরবারে সেতার বাজাতে আরম্ভ করেন তবে বোধ হয় সঙ্গীতজ্ঞদের অনেকেই আপত্তি

www.BanglaBook.org

জানাবেন। আমি বিশেষজ্ঞ নই, তাই পণ্ডিতেরা যখন কিছু বলেন তখন সেটা মনে রাখবার চেষ্টা করি। মৌলানা আজাদ আমাকে বলেন, 'সেতার তৈরি করেন আমীর খুসরো। এটা বীণার অনুকরণে তৈরি, কিন্তু বীণার চেয়ে সহজ।'

আমি উত্তরে বললুম, 'আমি আরেক পণ্ডিতের কাছে শুনেছি, বাদ্যযন্ত্র-নির্মাতার পক্ষে সেতার-নির্মাণ বীণার চেয়ে কঠিনতর। কিন্তু বাজানেওলার পক্ষে সেতার বাজানো সহজতর। ঐ পণ্ডিত আমাকে বলেন, "অনেক সময় যে জটিল বাদ্যযন্ত্র নির্মাণ করা হয় সেটা বাজানেওলার পক্ষে বাজানো সহজ করে দেবার জন্য"।' (শার্ঙ্গদেব হয়তো খাঁটি খবর রাখেন।)

এসব ঝামেলার মাঝখানে পাঠান বা মোগল দরবারের গানের মজলিস বর্ণনা করা যে বিপদসংকুল, সে কথা পাঠকমাত্রেই বুঝতে পারবেন।

ঠিক তেমনি মোগল আমলের ফিস্টির বর্ণনা। কোরমা, কালিয়া, রোফ্‌তা কবাব (শিক্-কবাব প্রাক-মুসলিম যুগেও ছিল—শূল্যপক্ক মাংস—কিন্তু সেটা আঁকাবাঁকা শিকের ভিতর ঢুকিয়ে করা হত, না শূলের ডগায় ঝুলিয়ে ঝলসানো হত, তা জানি নে) যে সব কটাই যাবনিক খাদ্য তা জানি, কিন্তু মোগল ফিস্টিতে বাঁধাকপির পাতার ভিতর কিমা দিয়ে যে দোলমা তৈরি হয়, সেটা কি চলবে? কপি জাতীয় জিনিস এদেশে এল কবে? এমন কি যে সিম জিনিসটা ঘরোয়া বলে মনে হয় সে সম্বন্ধেও একখানি চিরকুটে দেখি ঋষিতুল্য দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রীকে শুধোচ্ছেন, 'সংস্কৃতে আপনি সিম জিনিসটার উল্লেখ পেয়েছেন কি?'

মোগল ছবিতে তাদের জামাকাগড় গয়নাগাঁটি পরিষ্কার দেখতে পাই। কিন্তু সব কটার নাম তো জানি নে। মা-দুর্গার নাকের নথ দেখে দ্বিজেন্দ্রনাথ চিত্রকরকে শুধান, 'নথ কি মুসলমান আগমনের পূর্বে ছিল?'

কিন্তু আপত্তি কি? গদাযুদ্ধে নামার সময় ভীমের পকেটে যদি ফাউণ্টেন-পেন দেখা যায়, তবে কী আপত্তি! জেরুজালেমের এক মেরী মূর্তির বাঁ-কব্জিতে দেখি ছোট্ট দামী একটি রিস্টওয়াচ! ভক্তের চোখে মা-মেরীর বাঁ-হাতখানা বড্ড ন্যাড়া ন্যাড়া দেখাচ্ছিল, তাই। জানি নে, বারোয়ারি দুর্গাপূজোয় মা-দুর্গা নাইলন পরতে আরম্ভ করেছেন কি না!

অনুবাদ সাহিত্য

কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছি, অনুবাদ যে অনুবাদ সেটা স্বীকার করতে প্রকাশক, সম্পাদক, স্বয়ং লেখকেরও কেমন যেন একটা অনিচ্ছা। কেন, এ প্রশ্ন শুধাতে একজন প্রকাশক সোজাসুজি বললেন, 'বাঙালী অনুবাদ পড়তে ভালবাসে না, তাই অসাধু না হয়ে যতক্ষণ পারি ততক্ষণ তথ্যটা চেপে রাখি।' কিছু-কাল পূর্বে আমিও একটি বড় গল্প অনুবাদ করি ও তার প্রথম বিজ্ঞাপনে সোঁট যে অনুবাদ সে কথা প্রকাশিত হয় নি। আমি সেই সম্পাদককে বেনিফিট অব্ ডাউট দিয়ে মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছি এই বুঝিয়ে যে দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনে এই গাফিলতি মেরামত করা হবে। ঐ সময়ে আমারই সহকর্মী (কারণ দুজনাই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেশ-সেবক এবং তিনি অনর্থেও) শ্রীযুত বিদুর ঐ নিয়ে কড়া মন্তব্য করে যা বলেন তার নির্যাস, যত বড় লেখকই হোন না কেন, তিনি যদি অনুবাদ-কর্ম করেন তবে সেটা যেন পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়। অতিশয় হক্ কথা। তবে এটা আমি গায়ে মাখছি নে, কারণ আমি 'যত বড়' কেন অ্যাটটুন বড় লেখকও নই। আমি বরঞ্চ গোড়াতেই চেয়েছিলুম যে ফলাও করে যেন বলা হয়, এটি অনুবাদ। এবং সেই মূল প্রখ্যাত লেখকের অনুবাদ প্রসাদাৎ তাঁর সঙ্গ পেয়ে আমিও কিছুটা খ্যাত হয়ে যাবো—'রাজেন্দ্র সংগমে, দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে।'[১] কিংবা কালিদাস রঘুবংশের অবতরণিকায় যে কথা বলেছেন—বজ্র কর্তৃক মণি সছিদ্র হওয়ার পর আমি সুতো সুরুৎ করে বেতকলিফ উৎর যাবো।

এবং এস্থলে এটাও স্মরণ রাখা উচিত, কালিদাস বা মধুসূদন কেউই বাল্মীকির আক্ষরিক কেন, কোনো প্রকারেরই অনুবাদ করেন নি। সম্পূর্ণ নিজস্ব, মৌলিক কৃতিত্ব দেখিয়েও এঁরা অতখানি বিনয় দেখিয়েছেন। মর্ডান কবিতা যে আমার পিত্তি চটিয়ে দেয়, তার অন্যতম কারণ এঁদের অনেকেরই অভ্রংলিহ দম্ভ। 'আধুনিক' গাওয়াইদের কণ্ঠেও সেই সুর শুনতে পাই। আর মর্ডান পেন্টাররা কি করেন—অন্তত তাঁদের দু'জনার ব্যবহার সম্বন্ধে তো অনেক কথাই বেরিয়েছে।

কিন্তু সেকথা থাক। আমার প্রশ্ন, অনুবাদ পড়তে বাঙালী ভালবাসে না কেন?

আমার কিন্তু কথাটা কেন জানি বিশ্বাস করতেই ইচ্ছে যায় না।

বাংলা ভাষার কচিকাঁচা যুগে কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাভারতের অতি বিশুদ্ধ আক্ষরিক অনুবাদ করেন। আজ পর্যন্ত যে তার কত পুনর্মুদ্রণ হল তার হিসেব হয়তো আজ বসুমতীই দিতে পারবেন না। পাঠকদের শতকরা ক'জন নিছক পুণ্য-সঞ্চয়ার্থে এ অনুবাদ পড়েছে? এমন কি রাজশেখর বসুর অনুবাদও—যদিও একটি বারো বছরের ছেলেকে বলতে শুনেছি, 'ঐ বসুমতীরটাই ভালো। বেশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে লেখা—ধীরেসুস্থে পড়া যায়। রাজশেখর বাবুরটায় বড্ড ঠাসাঠাসি।' 'বেতালপঞ্চবিংশতি' 'বত্রিশ সিংহাসন' এ যুগের ছেলেমেয়েরাও তো গোগ্রাসে গেলে। (বিষ্ণুশর্মার 'পঞ্চতন্ত্রে'র আরবী অনুবাদ ইরাক থেকে মরক্কো পর্যন্ত আজও 'আরব্য রজনী'র সঙ্গে পাল্লা দেয়।) ঈশান ঘোষের জাতক জনপ্রিয় হওয়ার পূর্বেই বাজার থেকে উধাও হয়ে গেল। (পরম পরিতাপের বিষয় যে এখনো তার পুনর্মুদ্রণ হল না) অথচ তার থেকে নেওয়া

---

১ এই সূত্রে একটি ঘটনার কথা মনে পড়লো। গুরুদেব আমাকে কয়েক পাতা প্রুফ নেরামত করতে দেন। সেটা তৈরী হলে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে গিয়ে দেখি তিনি ক্ষিতিমোহন ও বিধুশেখরের সঙ্গে গল্প করছেন। আমি থামের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে শুনি, তিনি বলছেন, 'বনমালী (কিংবা সাধুও হতে পারে, কিন্তু যে গুরুদেবের সঙ্গে ছিল অল্প দিন) তো গেল আমার সঙ্গে এলাহাবাদ। আমি বললুম, "ওরে বনমালী, প্রয়াগে এসেছিস; স্নান করে নিস্।" কিন্তু মশাই কি বলবো, সে ও-পাশই মাড়ালো না। বোধ হয় আমার সঙ্গে থেকে থেকে দেবদ্বিজে আর ভক্তি নেই। কিংবা ঐ ধরনেরই।' মাইকেলের কথা তা হলে সব সময়ে ফলে না।

www.BanglaBook.org

বাচ্চাদের জাতক তাদের ভিতর খুব চলে। জ্যোতি ঠাকুরের সংস্কৃত নাটক ও ফরাসী কথাসাহিত্যের অনুবাদ এককালে বিদগ্ধ বাঙালীই পড়তো। ওদিকে এসবের বহু পূর্বে আলাওল অনুবাদ করলেন—যদিও আক্ষরিক নয়—জয়সীর 'পদুমাবৎ'। এবং তার পর পর বেরুলো 'ইউসুফ-জোলেখা', 'লায়লা-মজনু' ইত্যাদি। মোল্লার বাড়িতে এবং পূব-বাঙলার খেয়াঘাটে, বটতলায় এখনো তাদের রাজত্বের অবসান হয় নি ; ওদিকে কাশীরাম, কৃত্তিবাস। 'আরব্যোপন্যাস', 'হাতিমতাই', 'চহারদরবেশ' ঊনবিংশ শতাব্দীতেই বাঙলা দেশে নাম করেছে। তারপর 'রবিনসন ক্রুসো', 'গালিভার্স ট্রেভল' এবং ফরাসী থেকে 'লে মিজেরাবল' এদেশে কী তোলপাড়ই না সৃষ্টি করলো।

আমি অতি সংক্ষেপে সারছি। কিন্তু আমার বয়েসী কোন্ পাঠক 'তীর্থসলিল' 'তীর্থরেণু'র কথা ভুলতে পারবেন? সত্যেন দত্ত অনুবাদের যাদুকর। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সত্যেন দত্তের শোকসভাতে বলেছিলেন, 'যে-দিন দেখলুম সত্যেন আমার চেয়ে ঢের ভালো অনুবাদ করতে পারেন ও ছন্দের উপর তাঁর দখল আমার চেয়ে অনেক বেশী, সেই দিনই অনুবাদ-কর্ম থেকে অবসর নিলুম। তারপর ভাল কবিতা চোখে পড়লেই সত্যেনকে অনুবাদ করতে বলতুম।' (এস্থলে যদিও অবান্তর তবু স্মরণে আনি, রবীন্দ্রনাথ নিজের মৌলিক রচনা কিছুক্ষণের জন্য ক্ষান্ত দিয়ে সত্যেন দত্তের 'চম্পা' কবিতাটির ইংরেজী অনুবাদ করেন।)

আর বর্তমান যুগের হীরেন দত্ত মহাশয়ের 'তিন সঙ্গী' যাঁরাই পড়েছেন, তাঁরাই স্বীকার করবেন, এরকম অনবদ্য অনুবাদ হয় না।

এর একটু তথাকথিত 'নিম্নপর্যায়ে' নামলেই দীনেন্দ্রকুমারের 'রহস্যলহরী'। বাংলাদেশের হাজার হাজার নারী-নরকে এঁর অনুবাদ আনন্দ দিয়েছে। দীনেন্দ্রকুমার লিখতেন অতি সরল, ছলছল-গতির বাংলা—পাঠককে কোনো জায়গায় হোঁচট খেতে হত না। তাঁর মৌলিক গ্রন্থ 'পল্লীচিত্র'—নামটি আমার ঠিক মনে নেই—পড়লে তাঁর বাংলা-শৈলী ও ভাষার সরলতা ও আপন বৈশিষ্ট্য পাঠককে আরাম ও চমক দুই-ই দেয়। (অরবিন্দ ঘোষ যখন বরোদায় চাকরি নিয়ে বাংলা শেখার জন্য গুরুর সন্ধান করেন, তখন দীনেন্দ্রকুমারকে সেখানে পাঠানো হয়। পরবর্তী যুগে যখন তিনি তাঁর অতুলনীয় মধুর বাংলায় পাঠকের কৌতূহল সদাজাগ্রত রেখে তাঁর জীবনস্মৃতি—বিশেষ করে বরোদার ইতিহাস ও শ্রীঅরবিন্দের সাহচর্য সম্বন্ধে লেখেন, তখন তিনি দুর্ভাগ্যক্রমে দু-একটি বিতর্কমূলক তথ্য বলে ফেলেন। আমার ব্যক্তিগত মতে তিনি সম্পূর্ণ সত্যভাষণই করেছিলেন। ও আমার অগ্রজ, কাঙাল হরিনাথ, দীনেন্দ্রকুমার, মীর মুশর্‌রফ হুসেন কুণ্ঠিয়ায় সরজমিনে গবেষণা করে ঐ সিদ্ধান্তেই পৌঁছন। ফলে তখনকার দিনের মাসিক-সাহিত্য মহলের এক বজ্রবান ক্লিক্ দীনেন্দ্রকুমারকে, জাস্ট হাউণ্ডেড্ হিম আউট অব বেঙ্গলী লিটারেচার। সেই অনুপম জীবনস্মৃতি শেষ করার সুযোগও তখন তিনি পাননি। অথচ আমি যখন তাঁর লিখিত শ্রীঅরবিন্দের সহকর্মী খাসেরাও যাদব অংশ বরোদার যাদব গোষ্ঠী ও অন্যান্য মারাঠাদের অনুবাদ করে শোনাই তখন তাঁরা অশ্রুবিসর্জন করে বলেন, 'বাংলাদেশই শুধু সে যুগের মারাঠী বিপ্লবীদের স্মরণে রেখেছে। বাঙালী প্রাদেশিক, এ কুসংস্কার আমাদের ভাঙলো।' এর পর হঠাৎ যখন

www.BanglaBook.org

দীনেন্দ্রকুমারের ধারাবাহিক বন্ধ হয়ে গেল, তখনো তাঁরা উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনতে চাইলেন পরের পর্বের কথা। আমি কোন্ লজ্জায় স্বীকার করি কেন তাঁর লেখা বন্ধ হয়ে গেল।)

কোথা থেকে কোথা এসে পড়লুম! কিন্তু এই বিষয় নিয়ে আমার বহু-দিনের মনস্তাপ—আজ বেমোকায় বেরিয়ে গেল, পাঠক ক্ষমা করবেন।

আমার মনে একটা সন্দেহ জাগে। প্রাচীন যুগের সব অনুবাদই যে উত্তম ছিল, একথা ঠিক নয়। কিন্তু এঁদের বেশীর ভাগই উত্তম সংস্কৃত ও তৎকালীন প্রচলিত বাঙলা ভাষার সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। এবং পণ্ডিতজন যত বাঁকা বাংলাতেই অনুবাদ করুন না কেন, তাঁদের শব্দভাণ্ডারের দৈন্য ছিল না বলে অনুবাদ মূল থেকে দূরে চলে যেত না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কৃত পিয়ের লোতির 'ইংরেজবর্জিত ভারত'-এর অনুবাদ পড়লেই পাঠক আমার বক্তব্য বুঝতে পারবেন। লোতির শব্দভাণ্ডার ছিল অফুরন্ত (উত্তর-মেরু-সমুদ্রের আলো-বাতাসের বর্ণনা দিতে গিয়ে এক জায়গায় তিনি পর পর তিনটি শব্দ দিয়েছেন, ডায়াফনাস, এফিমেরাল, কাইমেরিক—এর অনুবাদ তো দীন শব্দভাণ্ডার নিয়ে হয় না!)। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জানতেন অত্যুত্তম সংস্কৃত—ভাসের নাটক তখনো ছাপায় প্রকাশিত হয় নি বা তাঁর হাতে পৌঁছয় নি—ভাসকে বাদ দিলে তিনি সংস্কৃতের প্রায় সব নাট্যলেখকের অনুবাদ করেছেন—তাই সে ভাষা থেকে তিনি অনায়াসে শব্দচয়ন করে মূলের বৈচিত্র্যের মর্যাদা রক্ষা করতে পারতেন। অক্ষম অনুবাদকের হস্তে সেস্থলে অনুবাদ হয়ে যায় একঘেয়ে—পড়তে গিয়ে পাঠকের ক্লান্তি এসে যায়।

অধুনা একাধিক যোগ্য ব্যক্তি অনুবাদ-কর্মে লিপ্ত হয়েছেন। এঁদের কেউ কেউ ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। এঁরা আমার চেয়ে অনেক বেশী যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রমাণ করতে পারেন, ইংরিজী সাহিত্য বহু ভাষা থেকে বহু বস্তু অনুবাদ করে কি ভাবে পরিপুষ্ট হয়েছে, নব নব অনুপ্রেরণা পেয়েছে, নব নব অভিযানে বেরিয়েছে—সেই আদিযুগের শুভক্ষণ থেকে।

আমি অনুবাদ করতে গিয়ে পদে পদে নিজের কাছে লাঞ্ছিত হয়েছি। এই লেখাটি তারই অভিজ্ঞতাপ্রসূত।

বাবুর শাহ

এদেশে তিন রকমের ইংরেজ এসেছিল। বড় দলের কাজ ছিল পৃথিবীর সামনে আমাদের হেয় প্রমাণ করে এদেশে শ্বেত (আমি বলি ধবল কুষ্ঠ) রাজত্ব যুক্তি ও নীতির উপর খাড়া করা। এক কথায় যাকে বলে, 'হোয়াইট ম্যানস বার্ডেন' যে কী ভীষণ ভারী এবং ইংরেজ স্বদেশের বেকন-মার্কা ঘোড়দৌড়ের জুয়ো-খেলা, খেঁকশেয়ালি শিকার করা স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়ে এই 'নচ্ছার' দেশে এসে পৃথিবীর ইতিহাসে যে কী অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে, সেটা সপ্রমাণ করা। অতি দৈবেসৈবে দু একজন তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন সহৃদয় মহাজন এ ভণ্ডামি ধরতে পেরেছিলেন। তাঁরই একজন প্রখ্যাত হাস্যরসিক জেরম কে জেরম। তিনি মারাত্মক ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন—পড়ে মনে হয়, তিনি যেন সিকনি ঝাড়ছেন—

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'বার্ডেন যদি হেভিই হয় তবে ওটা বইছিস কেন, মাইরি? আমি তো খবর পেয়েছি, ইণ্ডিয়ানরা সেই সেবা, সেই হোলি ক্রুসেডের জন্য থ্যাঙ্কু-টি পর্যন্ত বলে না। তবে ফেলে আয় না ঐ লক্ষ্মীছাড়া বোঝাটা হতভাগাদেরই ঘাড়ে!

কিন্তু প্রাগুক্ত ঐ বড় দলের ইংরেজদের একটি 'আপ্তবাক্য' নিয়ে আজ আমার আলোচনা। এরা মোকা বেমোকায় বলতো, 'পাঠান-মোগল আদৌ ইতিহাস লিখতে জানতো না—শুধু লড়াই আর লড়াই।'

অন্য দল সংখ্যায় নগণ্য। এঁরা এসব কথায় কান না দিয়ে সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী শিখতেন, বাঙলায় বাইবেল অনুবাদ করতেন, এবং প্রাচ্যভাষায় লিখিত জ্ঞানবিজ্ঞানের বই ইংরিজীতে অনুবাদ করতেন। ফার্সী ইতিহাস যে শুধু 'লড়াই আর লড়াই' নয় (আহা! তাই যদি হত আর আমরা তাই পড়ে ক্ষেপে গিয়ে সেই আমলেই ইংরেজকে ঠ্যাঙাতে আরম্ভ করতুম!) সেটার বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ তাঁরা জানিয়েছেন ফার্সী ইতিহাস অনুবাদ করে।

এক তৃতীয় শ্রেণীর পিচেশও এদেশে এসেছিল। এরা প্রথম শ্রেণীর মত অশিক্ষিত বর্বর নয়, আবার দ্বিতীয় শ্রেণীর মত নিরপেক্ষ সাধুজনও নয়। এরা অল্পবিস্তর সংস্কৃত আরবী ফার্সী চর্চা করে, অল্প বিদ্যা যে ভয়ংকরী সেইটে আপন অজানতে প্রমাণ করে দিত এই বলে, 'ওসব তাবৎ মাল আমাদের পড়া আছে ; সব রাবিশ!'

দুর্ভাগ্যক্রমে এদেশের ইংরিজী 'শিক্ষিতেরা' এদেরই বিশ্বাস করে বসলেন।

আমার বক্তব্য, নিজের মুখেই ঝাল চেখে নিলে পারেন। বিশেষত যখন কিছু দিন ধরে 'শেষ মোগলদের' সম্বন্ধে ঐতিহাসিক উপন্যাস বেশ কিছুটা জনপ্রিয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে আমি ভারী খুশী হয়েছি, কারণ অনেক স্থলে সাধারণ পাঠক এই করেই উচ্চতর পর্যায়ে উপনীত হয়। আমারই ন্যাওটা একটি ম্যাট্রিক ফেল ছোকরা—কিন্তু র‍্যাপিড-রীডিঙের ফলে সে দিব্য শিলিং-শকার, পেনি-থ্রিলার পড়তে পারতো—আমার কাছ থেকে রোম সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'আই ক্লাউডিউস' পড়ে এমনই 'ক্ষেপে যায়' যে, সে তারপর দুনিয়ার যত রোমান ইতিহাস পড়তে আরম্ভ করে, এস্তেক জুলিয়াস সিজারের 'ব্রিটন বিজয়' পর্যন্ত।

হালে বাবুর বাদশার আত্মজীবনী বেরিয়েছে—বাঙলা অনুবাদে। অবশ্য সে অনুবাদ এসেছে তিন ঘাটের জল খেয়ে। বাবুরের মাতৃভাষা ছিল তুর্কী—চুগতাই-তুর্কী অর্থাৎ তুর্কোমানিস্তানের তুর্কী : টার্কির (যার রাজধানী আঙ্কারা) ভাষা ওসমানলি-তুর্কী। আমার যতদূর জানা আছে, মোগল আমলে যদিও দরবারী ভাষা ছিল ফার্সী, তবু শেষ বাদশা বাহাদুর শাহ পর্যন্ত অন্তঃপুরে তুর্কীতেই কথাবার্তা বলেছেন, উর্দুতে কবিতা লিখেছেন[১]—দিল্লির বিখ্যাত বিখ্যাত মুশায়েরায় (কবি-সম্মেলনে) দূত মারফৎ আপন কবিতা পাঠিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন (সে আমলের প্রখ্যাত কবি ছিলেন

১ 'শুনেছ, রাজা কবিতা লেখে, এ আবার কেমন রাজা!' এই বলে তখনকার দিনের ইংরেজ বাদশা-হাসলামংকে নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতো। পরবর্তী যুগের এক জহুরী ইংরেজ এই নিয়ে মন্তব্য করে দেখলেন, ঐসব বর্বর ইংরেজ জানতো না যে, ওয়ারেন হেস্টিংসও কবিতা লিখতেন, এবং বাহাদুর শা'র তুলনায় অতিশয় নিরেস।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উর্দুর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি গালিব)—এবং রাজকার্য করেছেন ফার্সীতে।

বাবুরের সেই আত্মজীবনী অনূদিত হয় ফার্সীতে, ফার্সী থেকে ইংরেজীতে ও বিবেচনা করি, এই বাঙলা অনুবাদ সেই ইংরিজী থেকে। তাতে করে যে খুব মারাত্মক ক্ষতি হবে সে ভয় আমার নেই, কারণ অনুবাদে সবচেয়ে বেশী জখম হয় গীতিরস, এবং বাবুরের সাহিত্যসৃষ্টি গীতিরসপ্রধান নয়। এবং লড়াইয়ের কথা যদিও এটাতে আছে, তবু সেইটেই প্রধান কথা নয়। আসল কথা বাবুরের পর্যবেক্ষণশক্তি। ভারতবর্ষ—প্রধানতঃ দিল্লী-আগ্রা অঞ্চল—তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন এবং অতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে তার বর্ণনা দিয়েছেন। আমি যখন কাবুলে ছিলুম তখন বাবুর-বর্ণিত, কাবুল পাঞ্জশীর (পাঞ্জশীর অর্থ পঞ্চ-ক্ষীর, সংস্কৃত 'ক্ষীর' শব্দ ফার্সীতে 'শীর', কিন্তু অর্থ দুধ, আর পাঞ্জ অর্থ পঞ্চ—ঐ জায়গায় পাঁচটি নদী বয় ; আমাদের পায়েসকে কাবুলীরা বলে শীর-বিরঞ্জ—(বিরঞ্জ অর্থ চাল) ইত্যাদি আমি আপন অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি। বস্তুত বাবুর বর্ণিত কাবুল ও আমার দেখা কাবুলে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। হালে যাঁরা কাবুল দেখে ফিরছেন তাঁরা বলেন, গত দশ বৎসরে নাকি কাবুলের চেহারা একদম পালটে গিয়েছে।

কাবুলীরা বাবুরকে ঘৃণা করে। কারণ ইব্রাহিম লোদী ছিলেন আফগানিস্থানের পাঠান। তাঁকে পরাজিত করে হিন্দুস্থানের তখৎ ছিনিয়ে নেন তুর্কমানিস্থানের মোগল বাবুর। আমাকে এক সম্ভ্রান্ত, সুশিক্ষিত, বিশ্বপর্যটক পাঠান কূটনৈতিক বেদনাবিকৃত কণ্ঠে বলেন, 'আপনি কি কল্পনা করতে পারেন, ডক্টর, এই বর্বর বাবুর কি করেছিল? কল্পনা করতে পারেন, সেই নরদানব ইব্রাহিম লোদীর অন্তঃপুরের পুণ্যশীলা অসূর্যম্পশ্যাদের খোলা বাজারে ক্রীতদাসী হিসাবে বিক্রয় করেছিল! এ শুধু বর্বর যাযাবর তুর্কীদের পক্ষেই সম্ভব।'

কাজেই আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, কয়েক বৎসর আগে পর্যন্ত বাবুরের কবরের উপরে না ছিল আচ্ছাদন (একদা নাকি ছিল, কিন্তু সেটা লুট হয়ে, কিংবা ভেঙে পড়ে যাওয়ার পর আফগানরা স্বভাবতই সেটা মেরামত করে দেবার কোন প্রয়োজন অনুভব করে নি), না ছিল কোনো অলঙ্কার-আভরণ ; কয়েক ফালি পাথর দিয়ে তৈরী অতিশয় সাদামাটা একটি কবর। হালে নাকি আফগান সরকার বাবুরের ঐতিহাসিক মর্যাদা অনুভব করতে পেরেছেন—জাত্যভিমান কিঞ্চিৎ সংযত করার ফলে—এবং কবরের সুব্যবস্থা করেছেন।

আজকের দিনের বাঙালী ইনফ্লেশন কারে কয়, সেটা চোখের জলে নাকের জলে শিখেছে। রোক্কা একটি টাকার ক্রয়মূল্য আজ কতখানি, সে তা বিলক্ষণ জানে। বাঙালী তাই বাবুরের ইনফ্লেশন-জ্ঞান দেখে আনন্দিত হবেন। দিল্লি-জয়ের পর বাবুরের আমীর-ওমরাহ্ বিস্তর ধনদৌলত লুট করে বললেন, 'এবারে চলো কাবুল ফিরে গিয়ে নবাবী করা যাবে।' বাবুর তখন তাদের বুঝিয়েছিলেন যে, তাদের সিন্দুকে কাঁড়া কাঁড়া টাকা থাকলেই সঙ্গে সঙ্গে কাবুল উপত্যকার শরাব-কবাবের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে না। যেখানে আণ্ডার দাম আগে এক পয়সা ছিল সেখানে ওদের এখন দিতে হবে আষ্ট গণ্ডা (কিংবা ঐ ধরনের কিছু একটা—বইখানা আমার হাতের কাছে নেই)। কারণ সেপাই-পেয়াদারাও কিছু কম মাল লুট করে নি, তারাও এখন নিত্যি নিত্যি আণ্ডা খেতে চাইবে।

www.BanglaBook.org

এর পর যে বইখানা পড়ে বাঙালী পাঠক আনন্দ পাবেন সেটা ফার্সীতে লেখা বাঙলার (খুব সম্ভব প্রথম পূর্ণাঙ্গ) ইতিহাস। 'বাহারিস্তানে গায়েবী'[২] —অজানা বসন্তভূমি। লেখক দিল্লী-আগ্রা-বিহারের শুকনো দেশ দেখে দেখে বাঙলার দেহলিপ্রান্তে এসে পেলেন, চতুর্দিকে শ্যামল শ্যামল আর নীলিমায় নীল। তাঁর চোখ জুড়িয়ে গেল।

এর কথা আরেক দিন হবে।

ফের্ডিনাণ্ট জাওয়ারব্রুখ্

বৈদ্যরাজ জাওয়ারব্রুখকে নিয়ে আবার সুইস জর্মন কাগজে বাদ-প্রতিবাদ আরম্ভ হয়েছে। প্রথম দলের বক্তব্য, সত্যই বৃদ্ধ বয়সে তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছিল ; অন্য দলের বক্তব্য তিনি পূর্ব-বার্লিনের সোভিয়েৎ কূটনীতির বলির পাঁঠা হয়েছেন। বার্লিনের সবচেয়ে বড় হাসপাতাল 'শারিতে' (charite—চ্যারিটি—খয়রাতি) প্রতিষ্ঠানের তিনি অধ্যক্ষ ছিলেন, এবং বার্লিন ভাগাভাগির পর শারিতে পড়েছিল পূর্ব-বার্লিনে, রাশান আওতায়।

এই কলকাতা শহরের অন্তত একজন খ্যাতনামা চিকিৎসককে আমি চিনি, যিনি জাওয়ারব্রুখের শিষ্য। তিনি মুনিকে তাঁর কাছে বুকের যক্ষ্মার অপারেশন শেখেন—জাওয়ারব্রুখ বহু বৎসর মুনিক হাসপাতালেরও বড় কর্তা ছিলেন। এছাড়া তাঁর অন্যান্য শিষ্যও হয়তো কলকাতায় আছেন। অবশ্য বুকের, মাথার ও ক্যানসারের সার্জারি নিয়েই যাঁদের কারবার তাঁরাই জাওয়ারব্রুখের গবেষণার সঙ্গে অল্পাধিক পরিচিত।

জর্মন সার্জন-সমাজ মনে করেন, পৃথিবীর তিনজন সার্জনের নাম করতে হলে জাওয়ারব্রুখের নাম কালানুক্রমে তৃতীয়। অন্য দুজন বোধ হয় হিপপোক্রাতেস ও নেপোলিওনের সার্জন—কিন্তু আমি কি চিকিৎসা-শাস্ত্র, কি সে শাস্ত্রের ইতিহাস কোনোটারই বিন্দুবিসর্গ জানি নে বলে হলপ খেয়ে কিছুই বলতে পারবো না। তদুপরি এ ধরনের নির্ঘণ্ট নির্ণয় সব সময়ই কিঞ্চিৎ উদ্দাম হয়ে থাকে—যেরকম পৃথিবীর সপ্তমাশ্চর্য নির্ণয়ে ভিন্ন লোক ভিন্ন নির্ঘণ্ট দেয়।

অতএব অতিশয় সারবান আপত্তি উঠতে পারে, চিকিৎসা-শাস্ত্রের কিছুই যখন আমি জানি নে, তখন হাতের নাগালের বাইরে যে শল্যরাজ জাওয়ারব্রুখ বিরাজ করছেন, তাঁর প্রতি আমি উদ্বাহু হয়েছি কেন? উত্তর অতি সরল। এই শল্যরাজ মৃত্যুর পূর্বে একখানি নাতিবৃহৎ আত্মজীবনী লেখেন—বস্তুত পুস্তকখানি প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর এবং সেটি আদৌ শল্যরাজ বা বৈদ্য-সম্প্রদায়ের উদ্দেশে রচা হয় নি ; রচনা হয়েছে আপনার আমার মত মামুলী জনের জন্য। এমন কি সে পুস্তকে ক্যানসার সম্বন্ধে তাঁর দীর্ঘ জীবনব্যাপী গবেষণার ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ যে প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করেছেন, সেটিও সাধারণ জনের উদ্দেশে লিখিত, কারণ তিনি সেটি সর্বসাধারণের উপকারার্থে

---

২ বাঙলা আজগুবি অর্থ—'আজ' মানে 'হতে' 'from' ; 'গায়েবী' মানে 'অজানা' 'লুপ্ত' 'অদৃশ্য' 'বিধিকৃৎ'। অর্থাৎ অজানা থেকে আগত বলে অদ্ভুত।

www.BanglaBook.org

জর্মন রেডিও থেকে বেতারিত করেন। অতি সরল জর্মনে, সর্বপ্রকারের চিকিৎসাসংক্রান্ত পারিভাষিক শব্দ সযত্নে বর্জন করে তিনি এই বেতার-ভাষণটি নির্মাণ করেছিলেন বলে সেটি জর্মনবালকেও বুঝতে পারে—বাঙলায় অনুবাদ করলে বঙ্গবালকও বুঝতে পারবে।[১]

কিন্তু এইটেই সর্বপ্রধান বা সর্বশেষ তত্ত্ব নয়। তাঁর আত্মজীবনীর সাহিত্যিক মূল্য আছে, এবং তাঁর লেখার ভিতর দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে তাঁর হাস্যকৌতুকোজ্জ্বল নীল চোখ দুটি প্রকাশ পায়। তার সামান্য একটি উদাহরণ দি।

ব্যঙ্গরস অতিশয় প্রাচীন রস—করুণ ও বীর রসের সমবয়সী সে। প্রাচীনতম গ্রীক সাহিত্যে তার ভূরি ভূরি নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু অসূয়া সে-রসের উৎস বলে আমাদের রসপ্রিয় মনও সেটা সব সময় গ্রহণ করতে পারে না। বিশুদ্ধ হাস্যরস—যেটা সৃষ্টি করার জন্য কাউকে পীড়া দিতে হয় না, নট আট দি কস্ট অব এনি ওয়ান—আপন আনন্দে উচ্ছল এবং সেটা ব্যঙ্গরসের বহু পরবর্তী যুগের রস। এবং আমার ব্যক্তিগত শাবাসী সেই হাস্যরসের, সেই ব্যঙ্গরসের উদ্দেশে যেখানে রসস্রষ্টা নিজেকে নিয়ে নিজে হাসেন, নিজেকে ব্যঙ্গ করেন, লাফট অ্যাট হিজ ওন কস্ট। তারই একটি উদাহরণ দিঃ

জাওয়াররুখ বলেছেন, তাঁর সময়কার এক বিখ্যাত চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যাপক ছাত্রদের মৌখিক (ভাইভা) পরীক্ষা নেওয়ার পর প্রতিবারেই অতিশয় গম্ভীর কণ্ঠে বলতেন, 'এই পৃথিবীতে বিস্তর গর্দভ নিজেদের ডাক্তার রূপে পরিচয় দিয়ে নির্ভয়ে অগুনতি লোক মেরে বেড়াচ্ছে ; তার উপর যদি আরো একটা গর্দভ বাড়ে তাতে করে কণামাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না। তুমি পরীক্ষা পাস করলে।' জাওয়াররুখও তাই তাঁর যুগের শিক্ষার্থীদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন না। কিন্তু অন্তত একবার তাঁরও শিক্ষা হয়ে যায় এ বাবদে। জাওয়াররুখ লিখছেন, 'সকাল দশটায় তিনটি ছেলে আসবে আমার কাছে ভাইভা দিতে। আমি নার্সকে বললুম, ক্যান্ডিডেটরা এলে অমুক রোগীকে পাঠিয়ে দিয়ো—তার পেটে ছিল টিউমার। ওরা এলে আমি কাগজপত্র দস্তখৎ করতে করতে একজনকে বললুম, রুগীকে পরীক্ষা করে বলতে তার কি হয়েছে। আমি কাজে ডুব মারলুম। দশ মিনিট পরে শুধালুম, "কি হল?" ছেলেটা ভয়ে ভয়ে বললে, "কিছুই তো পেলুম না, সার।" আমি হুংকার দিয়ে বললুম,

---

১ এবং এর অনুবাদ করার বাসনা আমার ছিলও—অবশ্য সাবধানের মার নেই বলে ক্যানসার-রোগ-বিশেষজ্ঞ আমার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে দিয়ে সেটি সেনসর করিয়ে নিতুম। এ বেতার-ভাষণটি এখনো আদৌ গাজীমিয়ার বস্তানীতে আশ্রয় নেয় নি, অর্থাৎ আউট-অব-ডেট হয়ে যায় নি। ঐ ভ্রাতুষ্পুত্রীর আদেশে আমি সর্বাধুনা প্রকাশিত জর্মন বিশ্বকোষ সবিস্তর লিখিত ক্যানসার প্রবন্ধটি পড়ি। এবং যদিও সব জিনিস বুঝতে পারি নি (বিশেষ করে কুআন্টুম্ থিয়োরী দিয়ে ক্যানসার রোগের কারণ নির্ণয়ের আধুনিক প্রচেষ্টা!) তবু এটা লক্ষ্য করলুম যে ক্যানসারের পূর্বাভাস সম্বন্ধে জাওয়াররুখ অজ্ঞজনকে যেসব দিকে লক্ষ্য রাখতে বলেছেন, সর্বাধুনিক জর্মন-বিশ্বকোষও তাই বলেছেন।...উল্লেখযোগ্য যে, ক্যানসার গবেষণা আরম্ভ করার পূর্বে জাওয়াররুখ বার্লিনের ইণ্ডলজি ডিপার্টমেণ্টে গিয়ে খবর নেন, প্রাচীন ভারতীয় বৈদ্যেরা ক্যানসার সম্বন্ধে কি বলে গিয়েছেন।

www.BanglaBook.org

"গেট আউট"—আর নামে দিলুম ঢ্যারা কেটে। তারপর একই আদেশ দিলুম দু নম্বর ক্যান্ডিডেটকে। একেও যখন শুধালুম, কি পেল সে—সে প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে একই উত্তর দিল। ছাড়লুম আরেক হুঙ্কার, কাটলুম আরেক ঢ্যারা। এবারে তিন নম্বরের পালা। সে-ও যখন ফেল মারলে তখন আমি ছাড়লুম শেষ হুঙ্কার। এ ছেলেটি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া না হয়ে শান্ত কণ্ঠে বললে, "তা হলে আপনি দেখান না স্যর, কি হয়েছে।" কী! এত বড় আস্পদ্দা! দেখাচ্ছি! লম্ফ দিয়ে গেলুম রুগীর কাছে, পেটে দিলুম হাত। ও হরি! কোথায় টিউমার? ভুলে অন্য লোক পাঠিয়েছে নার্স! তখন শুরু হয় আমার আর্তরব। "আরে, আরে, কোথায় গেল সেই দুই ক্যান্ডিডেট। নিয়ে এসো তাদের।" এস্থলে যে ক্যান্ডিডেট বিশ্ববিখ্যাত জাওয়ারব্রুখকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল, তাকে বোধ হয় আর কোনো পরীক্ষাতে না ফেলে সঙ্গে সঙ্গে পয়লা নম্বরী ডিগ্রী দেওয়া উচিত।'

এ রকম আরো বহু মজার মজার কথা আছে এই অসাধারণ পুস্তকে; বস্তুত পুরো বইখানাই হাস্যরসের কুমকুমে কুমকুমে ভর্তি। পাঠকের চটুল-হৃদয়ে একটুখানি চাপ পড়লেই আবীরে আবীরে ছয়লাপ। কিন্তু এর ফাঁকে ফাঁকে আবার ট্র্যাজেডির করুণ রসও আসে বলে সে রস যেন জল এনে দেয় চোখের পাতায়, বুক ভরে দেয় নিবিড়তর ব্যথায়—আরো বেশী।

একবার একটি মহিলা তাঁর কাছে এসে বললেন, তাঁর নিশ্চয়ই ক্যানসার হয়েছে। ডাক্তার তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন ভিন্ন ভিন্ন ল্যাবরেটরিতে যেখানে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রোগের জাতগোত্রের বিচার হয়। নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাঁরা সবাই এক বাক্যে সমস্বরে বললেন, 'ক্যানসার নয়'।

সব শুনে মহিলাটি মাথা নেড়ে বললেন, 'না, হোর প্রফেসর, এটা ক্যান-সারই বটে।'

মহিলাটি কয়েক দিন পর আবার এসে ক্যানসারের ফরিয়াদ করলেন। আবার গোড়ার থেকে তাবৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হল, আবার নির্দ্বন্দ্বনেতি-বাচক উত্তর এল। এই করে করে ছ'মাস ধরে মহিলাটি আসেন—তাঁর মনে কোনো সন্দেহ নেই, তাঁর উদরবেদনা ক্যানসারজনিত।

শেষটায় জাওয়ারব্রুখ স্থির করলেন, কাটাই যাক পেট। মাদামকে তখন বলতে পারবেন, স্বচক্ষে দেখেছি পেটে কোনো ক্যানসার নেই। কিংবা হয়তো তিনি ভেবেছিলেন, অনেক বর্ষীয়সী মহিলার এই অপারেশন-মেনিয়া থাকে; হয়তো তাঁরা আপন জানা-অজানায় সেন্টার অব অ্যাট্রাকশন বা কৌতূহলের কেন্দ্র হতে চান। তাঁকে অস্ত্রোপচারের জন্য তৈরি করা হল।

তারপর কবিরাজ জাওয়ারব্রুখ যা বলেছেন তার মেদো কথাঃ 'আমরা তো নিশ্চিন্ত মনে পেট খুললুম। সর্বনাশ! এ কি দেখি! পেট ভর্তি ক্যানসার! এবং এখন যে চরমে পৌঁচেছে সে অবস্থায় অপারেশনের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সন্তপ্ত চিত্তে আমরা পেট সেলাই করে দিলুম। মহিলা সম্বিতে ফিরলে আমি তাঁকে বললুম, 'হ্যাঁ, ক্যানসারই ছিল; আমরা সেটা কেটে সরিয়ে দিয়েছি।'

জাওয়ারব্রুখ তার পর বলেছেন, 'মহিলাটি প্রথম যেদিন আমার কাছে এসে-

www.BanglaBook.org

ছিলেন, তার সঙ্গে সঙ্গে যদি অপারেশন করতুম, তবে হয়তো তাঁকে বাঁচাতে পারতুম। কিন্তু প্রশ্ন, আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি যখন নঙর্থক উত্তর দেয়, তখন শুধুমাত্র রোগীর অনুমানের উপর নির্ভর করে পেট কাটা যায় কি প্রকারে?'

জাওয়াররুখ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আপনাদের কাছে আরো নিবেদন করার বাসনা রইল। কিন্তু আমার বিশ্বাস, কোনো বাঙলাভাষী সার্জন সেটা করলেই ভালো হয়; আমার মত আনাড়ী তা হলে অনধিকার প্রবেশ থেকে নিষ্কৃতি পায়।

কলকাতা ও বোম্বাইয়ে যে সব ক্যানসার প্রতিষ্ঠান আছে, তাঁরা মাঝে মাঝে খবরের কাগজে বিবৃতি প্রকাশ করে সাধারণ জনকে সাবধান করে দেন, শরীরে কোন্ কোন্ আকস্মিক বা মন্দগতিতে বর্ধমান পরিবর্তন দেখলে ক্যানসারের সন্দেহ করতে হয়। এগুলি আমি সর্বদাই শ্রদ্ধা ও মনযোগ সহকারে পড়ি।

ঠিক ঐ একই সুবাদে প্রফেসর ডক্টর গেহাইম্‌রাট জাওয়াররুখ অবতরণিকা হিসাবে কয়েকটি কথা বলেছেন এবং আপন বক্তব্য বোঝাতে গিয়ে এমন একটি অত্যুৎকৃষ্ট বিরল তুলনা দিয়েছেন, যেটি ব্যবহার করতে পারলে যে কোন যশস্বী সাহিত্যিকও শ্লাঘা অনুভব করবেন। বৈদ্যরাজ যা বলেছেন, তার নির্যাসঃ অধিকাংশ রোগই কোনো না কোনো সাবধান-বাণী, ইঙ্গিত, ওয়ার্নিং দিয়ে আসে। যেমন, সামান্য মাথা ধরলো—সেইটে ওয়ার্নিং—পরের দিন জ্বর হল। কিন্তু ক্যানসার কোনো ওয়ার্নিং তো দেয়ই না, বরঞ্চ সে নিতান্ত নিরপরাধীর মত দেখা দেয়। যেমন, আপনার জিভে একটি দানা দেখা দিল। সেটাতে কোনো বেদনা নেই, আপনার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না, আপনি ভাবলেন, এরকম তো কত দানা এখানে সেখানে দেখা দেয় আবার মিলিয়ে যায়, এটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করার বা চিকিৎসকের কাছে যাবার কোনো প্রয়োজন নেই। তারপর সেটা অতি ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলো, কিন্তু কোনো বেদনা বা অস্বস্তি নেই বলে আপনি তখনো কোনো প্রতিকার করলেন না। তারপর একদিন ঢোক গিলতে, খাবার গিলতে আপনার অসুবিধা হতে লাগলো। আপনি তখন গেলেন ডাক্তারের কাছে, কিন্তু হায়, ততদিনে বস্তু দেরি হয়ে গিয়েছে, তখন আর অপারেশন করা যায় না। আপনি যদি, দানা যখন ছোট ছিল, তখন আসতেন, তবে সার্জন আপনাকে অনায়াসে ক্যানসারমুক্ত করতে পারতেন—অবশ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর। তাই জাওয়াররুখ বলছেন, 'দানাটি আদৌ অপরিচিত শত্রুরূপে বেদনা যন্ত্রণা সঙ্গে নিয়ে এল না। ক্যানসার এল যেন আপনার কোনো বন্ধুজনের চেহারার সঙ্গে হুবহু মিলিয়ে একটি মুখোশ তৈরি করে সেটা পরে। তার পর কাছে এসে হঠাৎ মুখোশ সরিয়ে ফেলে আপনার বুকে মারলো ছোরা!'

এর পরই অধ্যাপক কতকগুলো চিহ্নের উল্লেখ করেছেন—এগুলোকে তিনি ওয়ার্নিং বলেন নি বটে, কিন্তু সেগুলো দেখলেই তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত। জিভেতে বা অন্য কোথাও দানা বা ঐ জাতীয় বস্তু বা পরিবর্তন, কণ্ঠস্বর অকারণে কর্কশ হয়ে যাওয়া, আপনার পেটের অসুখ ছিল না—হঠাৎ আরম্ভ হল দিনের পর দিন পেট খারাপ হতে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু

www.BanglaBook.org

এটা আমার অনধিকার প্রবেশ। আপনার উচিত, আমাদের যে কোনো ক্যানসার-প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁদের সুলিখিত প্রামাণিক বিবৃতি সংগ্রহ করা। বিবৃতিতে সব ক'টা চিহ্নের পরিপূর্ণ (exhaustive) লিস্ট থাকে। আমি এযাবৎ যা লিখেছি সেটা ভুলে গিয়ে ঐ বিবৃতি মন দিয়ে পড়বেন। কারণ, এগুলো আমাদের জন্যই লেখা—ডাক্তারদের জন্য নয়[২]॥

হিডাজিভাই পি মরিস

একদা 'স্ট্যান্ড্' পত্রিকা একটি নতুন ধরনের অনুসন্ধানের সূত্রপাত করে সাহিত্যের মহা মহা মহারথীদের শুধোয়, তাঁরা সর্বজন-সম্মানিত, সর্বশিক্ষিত-জনের অবশ্যপাঠ্য কোন্ কোন্ পুস্তক, যে কোনো কারণেই হোক, পড়ে উঠতে পারেন নি। উত্তরে এমন সব তথ্য আবিষ্কৃত হল যাকে 'মোহনে'র ভাষায় লোমহর্ষক বলা যেতে পারে? যেমন, কথার কথা কইছি—বার্নাডশ পড়েন নি অলিভার টুইস্ট, কিংবা মনে করুন—রবীন্দ্রনাথ পড়েন নি 'একেই কি বলে সভ্যতা'?

কাজেই বিখ্যাত সাহিত্যিকদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে এই অখ্যাত সাহিত্য-সেবক যে তাঁরা যেন তড়িঘড়ি শ্রীযুত বিশী মহাশয়ের শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে বইখানা পড়ে নেন।

এই পুস্তকে 'কাব্যের উপেক্ষিতা' জাতীয় দু'চারটি চরিত্রের উল্লেখ করে বিশী মহাশয় বহু প্রাক্তন শান্তিনিকেতনবাসীদের সাধুবাদ পেয়েছেন। তাঁদেরই একজন হিডাজিভাই মরিস্।

তাঁর পুরো নাম হিডাজিভাই পেস্তনজি মরিসওয়ালা। গুজরাতীদের প্রায় সকলেরই পারিবারিক নাম থাকে ; যেমন গাঁধী, জিন্না (আসলে ঝিঁড়া ভাই), হটিসিং ইত্যাদি। পার্সীদের অনেকেরই ছিল না বলে কেউ কেউ তাঁদের ব্যবসার নাম পারিবারিক নাম রূপে গ্রহণ করতেন। যেমন ইঞ্জিনীয়ার, কনট্রাকটর ইত্যাদি। এই নিয়ে পার্সীরা ঠাট্টা করে একটি চরম দৃষ্টান্ত দেন—সোডা-ওয়াটারবট্‌লওপনারওয়ালা!

বোম্বাইয়ের পতীত্ পরিবার বিখ্যাত। এঁরা ফরাসী 'পতী' (Petit) ফার্মে কাজ করতেন বলে প্রথমে পতীত্‌ওয়ালা ও পরে পতীত্ নামে পরিচিত হন। ঠিক সেইরকম মরিস কোম্পানিতে কাজ করে আমাদের অধ্যাপক মরিসওয়ালা পরে শুধু মরিস নামে বোম্বাই অঞ্চলে নাম করেন।

অত্যুত্তম ফরাসী ও লাতিন শেখার পর না জানি কোন্ যোগাযোগে তিনি

---

২ এ-প্রবন্ধ "দেশে" প্রকাশিত হওয়ার পর আমি চিকিৎসক অচিকিৎসক একাধিক সজ্জন পাঠকের কাছ থেকে অনুরোধ পেয়েছি, ক্যানসার সম্বন্ধে জাওয়ারব্রুখের প্রাগুক্ত প্রবন্ধটি যেন আমিই অনুবাদ করি। আমি করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করছি, কারণ অসুস্থতা-বশত আমার দেহে শক্তি মনে উৎসাহ বড়ই হ্রাস পেয়েছে। তবে এটাও নিবেদন, আমৃত্যু দুটি প্রবন্ধ অনুবাদ করতে পারার দুরাশা আমি কখনো সম্পূর্ণ ত্যাগ করবো না : ক্যানসার সম্বন্ধে প্রবন্ধটিও অধ্যাপক ভিণ্টারনিতস্ রচিত ক্ষুদ্রাকার রবীন্দ্র-জীবনী।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শান্তিনিকেতন পেঁছে সেখানে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন।

দুটো বিষয়ে তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালী—সেণ্টিমেণ্টাল এবং আদর্শবাদী। আমার আশ্চর্য লাগতো, কারণ অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে যেসব গুজরাতী ছেলেরা—এবং পাঠিকারা অপরাধ নেবেন না, মেয়েরাও—শান্তিনিকেতন আসে, তারা পর্যন্ত টাকা আনা পাই হিসেব করতো ; শুনেছি, ছাত্রেরা আকছারই আদর্শবাদী হয়। (নইলে অত নিঃস্বার্থ ট্রাম-বাস পোড়ানোর সৎকর্মটা করে কে? কিন্তু এ সম্বন্ধে আর কথা না। হক্ কথা কইলে পুলিস ধরবে।) তাই গুজরাতী মরিস সাহেবের আদর্শবাদ আমাকে বিস্মিত করেছিল।

সামান্য বাঙলা শেখার পরই মরিস সাহেবের প্রেম উপচে পড়ল রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রতি এবং তিনি সম্মোহিত হলেন

"তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার
নামাতে পারি যদি মনোভার" শুনে।

অন্যত্র আলোচনা করেছি, ভারতের বাইরে কোনো ভাষাই 'ত' এবং 'ট'-র উচ্চারণে পার্থক্য করে না ; এমন কি ভারতীয়দের ভিতর যাঁদের গায়ে প্রচুর বিদেশী রক্ত তাঁরাও এ-দুটোতে গুবলেট করেন। উদাহরণস্থলে, গুজরাতের বোরা সম্প্রদায়—এখানকার রাধাবাজারে এঁদের ব্যবসা আছে—ব্রহ্ম উপত্যকার আসামবাসী ও পার্সী সম্প্রদায়।

তাই মরিস সাহেবের উচ্চারণে ছত্র দুটি বেরুতোঃ

"টাহাটে এ জগটে ক্ষটি কার
নামাটে পারি যডি মনোভার।"

আমরা আর কি করে ওঁকে বোঝাই যে 'ত' 'দ'-এর অনুপ্রাস ছাড়াও গুরুদেবের গান আছে।

মরিস সাহেব নূতন বাঙলা শেখার সময় যে না বুঝে বিশীদাকে 'বেটা ভূত' বলেছিলেন, তার চেয়েও আরো মারাত্মকতম উদাহরণ আমি শুনেছি। তিনি আমাদের ফরাসী শেখাতেন এবং শ্রদ্ধেয় বিধুশেখর, ক্ষিতিমোহন এবং আরো কিছু অধ্যাপকও তাঁর ক্লাসে যেতেন। আমার হাসি পেত যখন গুরু মরিস ছাত্র বিধুশেখরকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন ও ছাত্র বিধুশেখর তাঁকে 'তুমি' বলে। একদিন হয়েছে কি, ফরাসী ব্যাকরণের কি একটা কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ফেলেছেন অধ্যক্ষ বিধুশেখর। মরিস সাহেব বললেন, 'চমৎকার! শাস্ত্রী মশায়, সত্যি, আপনি একটি আস্তো ঘুঘু।'

শাস্ত্রী মশাইয়ের তো চক্ষুস্থির! একটু চুপ করে থাকার পর গুরু, গুরু—যদ্যপি ছাত্র, তথাপি গুরু-কণ্ঠে শুধালেন, 'মরিস, এটা তোমাকে শেখালে কে?'

নিরীহ মরিস বোধ হয় কণ্ঠনিনাদ থেকে বিষয়টার গুরুত্ব খানিকটে আন্দাজ করতে পেরে বললেন, 'ডিন্‌ডা (দিনদা, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর)। উনি বলেছেন ওটার আর্ট "অসাডারণ বুড্‌ডিমান"। টবে কি সেটা ভুল?'

শাস্ত্রী মশাই শুধু ঈষৎ কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'আচ্ছা, আমি দিনেন্দ্রনাথকে বোঝাবো।'

দিনুবাবু নাকি বিদেশীকে ভাষা শেখাবার সময় কর্তব্যবোধহীন চপলতার

www.BanglaBook.org

জন্য বেশ কিছুটা ভালোমন্দ শুনেছিলেন শাস্ত্রী মশাইয়ের কাছ থেকে।

ঐ সময় প্যারিস থেকে অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে আসেন। উভয়েই একাধিকবার বলেন, মরিস সাহেব উল্লেখ না করা পর্যন্ত তাঁরা কখনো বিশ্বাস করতে পারেন নি, ফ্রান্স না গিয়ে মানুষ কি করে এরকম বিশুদ্ধ ফরাসী শিখতে পারে। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে বড়ই কৃতজ্ঞ যে তিনি আমাকে রলাঁর 'যীশুজীবনী' পড়ান। এ বই আমার মহদুপকার করেছে এবং করছে।

বলা বাহুল্য এই সরল সজ্জন যুবা পণ্ডিতটি সকলেরই হৃদয়ে স্থান পেয়েছিলেন। গুরুদেবের তো কথাই নেই, মরিস সাহেব ঋষিতুল্য দ্বিজেন্দ্রনাথেরও অশেষ স্নেহ পেয়েছিলেন। বড়বাবু বিদেশী পণ্ডিতদের সঙ্গে বাক্যালাপ কালক্ষয় বলে মনে করতেন; বলতেন, 'এরা সব তো জানে কোন্ শতাব্দীতে প্রজ্ঞাপারমিতা কিংবা একাক্ষরপারমিতা প্রথম লেখা হয়, প্রথম ছাপা হয়। ওসব জেনে আমার কি হবে? তার চেয়ে নিয়ে আসো না ওদের কোনো একজন, যে কাণ্টের দর্শন সমর্থন করতে পারে, আর আমি নেব বিরুদ্ধ মতবাদ, কিংবা সে নেবে বিরুদ্ধ মতবাদ, আমি নেব কাণ্টপক্ষ—তার যেটা খুশী।' মরিস সাহেব তাঁকে তখন অনুনয়-বিনয় করে সম্মত করাতেন বিদেশী পণ্ডিতকে দর্শন দিতে। অবশ্য দু' মিনিট যেতে না যেতেই বড়বাবু সব ভুলে গিয়ে কোনো কিছু অন্য তত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় তন্ময় হয়ে যেতেন। আমাদের মতন ছেলে-ছোকরাদের কিন্তু তাঁর কাছে ছিল অবাধ গমন। আমার মনে পড়তো খৃষ্টের কথা; তিনি যেহোভার মন্দির থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বিস্তর তথাকথিত কুলাঙ্গার ভি আই পি-কে, এবং আদেশ দিতেন 'লেট দি চিলড্রেন কাম্ আনটু মী'!

মরিস সাহেব প্রথমটায় সম্মত ছিলেন না; আর সকলের চাপাচাপিতে তিনি প্যারিসের সরবনে গিয়ে ডক্টরেটের জন্য প্রস্তুত হতে রাজী হলেন।

প্যারিসের ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে তাঁর সঙ্গে আমার অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা। আমাকে আপনি বলে সম্বোধন করাতে আমি দুঃখ প্রকাশ করলুম। তিনি বললেন, 'তুমি এখন বড় হয়েছ; জর্মনিতে ডক্টরেট করবে। আমিও এখানে তাই করছি। আমরা এখন এক-বয়েসি।' আমার বয়েস তখন চব্বিশ, তাঁর বত্রিশ। তারপর আমাকে রেস্তোরাঁয় উত্তমরূপে খানদানী ডিনার খাওয়ালেন। বিনয় এবং সঙ্কোচের সঙ্গে পরের দিন বললেন, 'তোমাকে ভালো করে এণ্টারটেন করতে পারলুম না। তোমাকে বলতে লজ্জা নেই, আমার এ মাসের টাকাটা এখনো দেশ থেকে আসে নি।' আমি তারস্বরে প্রতিবাদ জানালুম। বহু বৎসর পরে ঐ সময়কার এক প্যারিসবাসী ভারতীয়ের কাছে শুনতে পাই মরিস সাহেব অন্যান্য দুঃস্থ ভারতীয় ছাত্রদের টাকা 'ধার' দিয়ে মাসের বেশীর ভাগ দেউলে হওয়ার গহ্বর-প্রান্তে পড়ি পড়ি করে বেঁচে থাকতেন। আসলে তাঁর পরিবার বিত্তশালী ছিল।...তাঁর সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা। কিন্তু এখনো তাঁর সেই শান্ত সংযত প্রসন্ন বদনটি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

কিন্তু তার পূর্বের একটি ঘটনা চিরকাল ধরে আমার ও আমার সতীর্থদের চিত্তে কৌতুক রস এনে দেবে, প্রতিবার সেটার স্মরণে।

গুরুদেব শারদোৎসবের মোহড়া নিচ্ছেন। তিনি স্বয়ং, দিনুবাবু—এমন কি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জগদানন্দবাবুর মত রাশভারী লোক—অজিন ঠাকুর এ'রা সব অভিনয় করবেন। এক প্রান্তে বসে আছেন শুষ্কাস্য বিষণ্ণবদন মরিস সাহেব। আমি হোম্‌টাস্‌ক্‌ না করলে তাঁর মুখে যে বিষণ্ণতা আসতো তিনি যেন তারই গোটাদশেক 'হেলপিং' নিয়েছেন। মোহড়ার শেষে দিনুবাবু কাচুমাচু হয়ে গুরুদেবকে অনুরোধ জানালেন, মরিস সাহেবকে ড্রামাতে একটা পার্ট দিতে।

গুরুদেবের ওষ্ঠাধর প্রান্তের মৃদুহাস্য সব সময় ঠাহর করা যেত না। এবারে গেল। কিন্তু ইতিমধ্যে সব পার্টেরই বিলিব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। গুরুদেব বললেন, 'ঠিক আছে। একে শ্রেষ্ঠীর পার্ট দিচ্ছি।' হয় মূল নাটকে শ্রেষ্ঠীর পার্ট আদৌ ছিল না, ঐটে মরিস সাহেবের জন্য 'ইস্‌পিসিলি' তৈরি হয় কিংবা হয়তো তখন মাত্র বড় বড় পার্টগুলোর বণ্টনব্যবস্থা আছে।

তা সে যা-ই হোক, শ্রেষ্ঠীর অভিনয় করবেন 'নটরাজ' মরিস—শাস্ত্রী মশাই তাঁর নাম দিয়েছিলেন মরীচি (ব্রহ্মার পুত্র, কশ্যপের পিতা ও তিনি সূর্যীকরণও বটেন)—মরিসও সগর্বে কাঁচা-হাতে সেই নামই সই করতেন। এবারে শুনুন, পার্টটি কি?

রাজাঃ ওগো শ্রেষ্ঠী!

শ্রেষ্ঠীঃ আদেশ করুন, মহারাজ!

রাজাঃ এই লোকটিকে হাজার কার্ষাপণ গুনে দাও।

শ্রেষ্ঠীঃ যে আদেশ!

বাস্‌! ঐটুকু! আমার শব্দগুলো ঠিক ঠিক মনে নেই, কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে মরিসকে ঐ পাঁচটি শব্দ বলতে হবে, গুরুদেব সায়েবের বাঙলা উচ্চারণ সম্বন্ধে বিলক্ষণ ওকীব-হাল ছিলেন বলে। কিন্তু মরিস সাহেব বেজায় খুশ, জান্‌ তর্‌র্‌র্‌—ড্যাম্‌ল্যাডে—হোক না পার্ট ছোট, তাতেই বা কি? বলেন নি স্বয়ং গুরুদেব, 'The rose which is single need not envy the thorns which are many?'

কিন্তু এইবারে শুরু হল ট্রবল। গুরুদেবের ভাষাতেই বলি, মরিসকে শুতে হল কণ্টকশয্যায়, গোলাপ-পাপড়ির আচ্ছাদিত পুষ্পশয্যায় নয়—যদিও থর্ন মাত্র একটি। গুরুদেব যতই বলেন 'আদেশ করুন, মহারাজ' মরিস বলেন, 'আডেস করুন, মহারাজ।' মহা মুশকিল! মরিস আপন মরীচ-তাপে ঘর্মাক্তবদন। শেষটায় গুরুদেব বরাত দিলেন দিনুবাবুকে, তিনি যেন সাহেবের 'ত' 'ট'র জট ছাড়িয়ে দেন। আফটার অল—তিনিই তো খাল কেটে ঘরে কুমির এনেছেন; বিপদ, এক্‌স্‌কিউজ মি—বিপডটা টাঁরই তৈরি।

মরিস সাহেব ছন্নের মত হয়ে গেলেন। সেই প্রফেট জরথুস্ত্রের আমল থেকে কোন্‌ পার্সী-সন্তান এই 'ত' 'ট'য়ের গর্দিশ মোকাবেলা করেছে—এই আড়াই হাজার বছর ধরে—যে আজ এই নিরীহ, হাড্ডিসার মরিস, বিদেশ-বিভুঁইয়ে একা একা এই 'ত'য়ের তাবৎ 'দ'য়ের দানব—আই মীন ডেনিস, টাবড ডানবের সঙ্গে লড়াই দেবে?

মরিস ছন্নের মত আশ্রমময় ঘুরে বেড়ান—দৃষ্টি কখনো হেথায় কখনো হোথায়, আর ঠোঁট দুটি বিড়বিড় করে কি যেন বলছে। আমি বললুম, 'নমস্কার, স্যার।' সম্বিতে এসে বললেন, 'আ! সায়েড (সৈয়দ)—' ও হরি! এখনো 'সায়েড'! তবে তো আডেশ এখনো মোকামে কায়েম আছে, রাজাদেশেরই মত

www.BanglaBook.org

—'শোনো টো ঠিক হচ্ছে কি না "আডেশ করুন, মহারাজ"।' আমি সন্তপ্ত চিত্তে চুপ করে রইলুম। বার দশেক আডেশ আডেশ করে বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়ে এগিয়ে গেলেন।

একটা ডরমিটরি-ঘরের কোণ ঘুরতেই হঠাৎ সমুখে মরিস—বিড়বিড় করছেন 'আডেশ আডে—।' রেললাইনের কাছে নির্জনে 'আডেশ—!' দূর অতি দূর খোয়াইয়ের নালা থেকে মাথা উঠছে সায়েবের, আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। চন্দ্রালোকে, খেলার মাঠে মরিস, আসন্ন উষার প্রদোষে শ্মশানপ্রান্তে কার ঐ ছায়ামূর্তি? মরিস। হিন্দী কবি সত্যি বলেছেন, গুরু তো লাখে লাখে, উত্তম চেলা কই। আশ্রমের ছেলেবুড়ো এখন সবাই সায়েবের গুরু। এস্তেক শিশু-বিভাগের কানাই, সাগর কেউ বাদ পড়ে নি। পড়ে থাকলে তাদের দোষ। সবাইকে টেস্ট করতে অনুরোধ করেন তাঁর আডেশ আডেশানুযায়ী হচ্ছে কি না। ইতিমধ্যে এক সন্ধ্যায় মোহড়া শেষে দিনুবাবু গুরুদেবকে ভয়ে ভয়ে অনুরোধ জানালেন, 'আদেশে'র বদলে অন্য কোনো শব্দ দিতে, যেটাতে "ত" "দ" নেই। গুরুদেব বললেন, 'না ; মরিসকে "ত" "দ" শিখতেই হবে।'

এর পর দ্বিতীয় পর্ব। হঠাৎ সক্কলের সামনে এক দিন বেরিয়ে গেল "আদেশ" অত্যুত্তম 'দ' সহ। আমি 'ইয়াল্লা' বলে লম্ফ দিলুম। কেউ 'সাধু সাধু', কেউ বা 'কনগ্রাচুলেশনস্' বললেন। কিন্তু হা অদৃষ্ট! আমরা বন থেকে বেরুবার পূর্বেই হর্ষধ্বনি করে ফেলেছি! সায়েব পরক্ষণে আডেশ-এ ল্যাপস্ করেছেন। তারপর তাঁর ক্ষণে আসে 'দ' ক্ষণে 'ড'। কলকাতার বাজারে মাছ ওঠা-না-ওঠার মত বেটিঙের ব্যাপার! এই করে করে চললো দিন সাতেক। সম্মুখে আশার আলো।

এর পর তৃতীয় পর্ব। দ্বিতীয় পর্বের মত এটাও অপ্রত্যাশিত। সায়েব এখন চাঁচাছোলা, ভোরবেলার নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক শিশিরবিন্দুর ন্যায় 'দ' বলতে পারেন। পয়গম্বর জরথুস্ত্র এবং তাঁর প্রভু আহুর মজদাকে অশেষ ধন্যবাদ!

আমরাও আমাদের সঙ্কটটা ভুলে গেলুম। মোহড়ায় প্রতিবার ঋষি মরীচি বৈদিক পদ্ধতিতে 'দ' উচ্চারণ করেন।

মরিস সাহেব স্টেজে নামলেন পার্সী দস্তুর বা যাজকের বেশ পরে। সব-কিছু ধবধবে সাদা। শুধু মাথার টুপিটি দাদাভাই নোরজী স্টাইলের, লেটার বক্স্ প্যাটার্নের কালোর উপর সফেদ বুট্টাদার। গুরুদেব এই বেশই চেয়ে বলেছিলেন, 'তোমরা পার্সীরা বাপু এ দেশের শ্রেষ্ঠী। তোমরা যা পরবে তাই শ্রেষ্ঠীর বেশ।'

নাট্যশালা গম গম করছে। ওঃ, সে কী অভিনয়! গুরুদেবকে দেখাচ্ছে দেবদূতের মত। অজিনের চেহারা এমনিতেই খাপসুরত, এমন দেখাচ্ছে রাজ-পুত্রের মত। গুরুমশাই জগদানন্দ রায়ের কী বেহাল্লিপনা! আশ্রমে বেতের বেসাতি বিলকুল বে-আইনি। এ মোকায় জগদানন্দবাবু যেন হৃতোপবীত-দ্বিজ লুণ্ঠিত যজ্ঞোপবীত ফিরে পেয়েছেন। তাঁর কঠিনদর্শন মুখচ্ছবি ঈষৎ স্নিগ্ধতা ধরেছে।

মরিস সাহেব প্রবেশ করলেন রঙ্গমঞ্চে।

রাজা দিলেন ডাক।

www.BanglaBook.org

মরিস সাহেব—হে ইন্দ্র, তোমার বজ্র কেন তৎপূর্বেই অবতীর্ণ হল না?

উৎকণ্ঠা, উত্তেজনায় মরিস বলে ফেলেছেন, 'আ ডে শ।'

অট্টহাস্যে ছাদ যেন ভেঙে পড়ে। তিনি কিন্তু ঐ একই উত্তেজনার নাগ-পাশে বদ্ধ বলে সে অট্টহাস্য শুনতে পান নি।

সে সন্ধ্যার অভিনয়ের জন্য অধ্যাপক হিড্‌জিভাই মরিসই পেয়েছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনন্দন। আমাদের বিবেকবুদ্ধি সেই আদেশই দিয়েছিল—খুব সম্ভব আডেশই।[১]

'আধুনিক' কবিতা

'সুশীল পাঠক—'

ছেলেবেলায় এ ধরনের সম্বোধন পড়ে হৃদয়ে বড় আনন্দ হত। মনে হত, কত মহান লেখক এই কালীপ্রসন্ন সিঙি· যিনি কিনা মহাভারতের মত বিরাট গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন, তিনি আমাকেই সম্বোধন করে কথা বলেছেন! এটা যে নিছক সাহিত্যিক ঢং, বলার একটা আড়, সেটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতুম না। বিশেষ করে যখন আমার ধারণা হল—সেটা হয়তো ভুল—যে দরদ-ভরা-কথা কয়ে যখন তিনি আমার সহানুভূতি আকর্ষণ করতে চান, তখনই 'পাঠক' বলে সম্বোধন করেন। এবং আরো বেশী করে 'সহৃদয় পাঠক' বলে সম্বোধন করতেন সিঙি মশাইয়ের মত দরদী লেখককুল যখন তাঁরা এমন কোনো অভিজ্ঞতার বর্ণনা করতে যেতেন, যেটার মোক্ষম মার বেশীর ভাগ পাঠকই খেয়েছে। এ অধম প্রাচীনপন্থী। সে এখনো পাঁচকড়ি দে গোপনে পড়ে। এবং বটতলাতে কিছুক্ষণ হল একখানা 'সচিত্র প্রেমপত্র' কিনে সে বড় ভরসা পেয়েছে। যৌবনে ভাষার উপর দখল ছিল না—এখনই বা হল কই?—মরমিয়া প্রেমপত্র লিখতে পারতো না বলে রায়ের ভাষায়, "উনিশটি বার প্রেমেতে সে ঘায়েল করে থামলো শেষে।" আর ভয় নেই! এখন এই অমূল্য গ্রন্থ থেকে নকল করে ফিলিমস্টার থেকে মেয়ে-পুলিশ সকলেরই 'সজল নয়নে হৃদয়-দুয়ারে ঘা' দেওয়া যাবে। বইখানার প্রথম চার লাইন পড়লেই বুঝতে পারবেন, মাইকেল রবীন্দ্র-নাথ এর থেকে কতখানি পিছিয়ে আছেন;

'প্রিয়তমা চারুশীলা পিতৃগৃহে গিয়ে
আছে তো সুখেতে তুমি গোষ্ঠিজন নিয়ে?
তুমি মোর জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট ধন।
তুমি মোর হৃদয়ের শান্তিনিকেতন।'

জানি, জানি—বাধা দেবেন না, জানি আপনারা বলবেন, এই মর্ডান যুগে এসব পণ্য অচল। কিন্তু আপনারা কি এ তত্ত্বটাও জানেন না যে, ফ্যাশন হর-

---

১ মরিস সর্বদাই ঈষৎ বিষণ্ণ বদন ধারণ করতেন—খুব সম্ভব এটাকেই বলে 'মেলানকলিয়া'। প্যারিস থেকে ফেরার পথে তিনি জাহাজ থেকে অন্তর্ধান করেন। আমার মত আর পাঁচজন তার কারণ জানে না। শুনেছি, তিনি উইল করে তাঁর সর্বস্ব বিশ্বভারতীকে দিয়ে যান।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হামেশা বদলায় এবং আকছারই প্রাচীন যুগে ফিরে যায়? পিকাস্‌সো ফিরে গেছেন প্রাগৈতিহাসিক গুহাবাসীর দেয়াল-ছবিতে, অবনঠাকুর মোগলযুগে, নন্দলাল অজন্তায়, যামিনী রায় কালীঘাটের পটে। কাব্যে দেখুন, দুর্বোধ্য মালার্মে র‍্যাঁবো যখন অনুবাদের মারফৎ ইংলণ্ডও জয় করে বসে আছেন, তখন হাউসম্যান লিখলেন সরল প্রাঞ্জল 'শ্রপশার ল্যাড'। বলা হয়, ইংলণ্ডে কবির জীবিতাবস্থায় তাঁর একখানা বইয়ের এত বিক্রির অন্য উদাহরণ নেই। কোনো ভয় নেই। বাঙলা দেশের মডার্ন কবিতাও একদিন 'পাখি সব করে রবে'র অনবদ্য শাশ্বত ভঙ্গিতে লেখা হবে।

আমি মডার্ন কবিতা পছন্দ করি নে, তাই বলে মডার্ন কবিতার কোনো 'রোজো দেত্রর্' রীজন ফর এগজিস্‌টেনস্ অর্থাৎ পুচ্ছটি তার উচ্চে তুলে নাচাবার 'রোজোঁ' রীজন, ন্যায্যহক্‌ নেই এ কথা কে বলবে।

প্রথমেই নিন মিলের অত্যাচার। এবং এই মিলটা আমাদের খাঁটি দিশী জিনিস নয়। সংস্কৃতের উত্তম উত্তম মহাকাব্যে, কাব্যে মিল নেই। যদিস্যাৎ থাকে, তবে সেটা আকস্মিক দুর্ঘটনা, প্রায় কবির অনিচ্ছায় ঘটেছে। সংস্কৃতে প্রথমে মিল পাই—আমার জানা মতে—মোহমুদ্গরে। এবং তিনিও সেটা বহিরাগত ভাষা থেকে নিয়েছিলেন, এমত সন্দেহ আছে। সংস্কৃতে সহোদরা ভাষা গ্রীক-লাতিনে কি মিল আছে? এ দেশেই দেখুন, উর্দু তার জননী সংস্কৃত ভাষা থেকে বহু দূরে চলে গিয়েছে, জোব্বাজাব্বা পরে প্রায় মুসলমান হয়েছে (প্রায় বললুম কারণ এখনো বহু হিন্দুর মাতৃভাষা উর্দু; উর্দু কবি-সম্মেলনে তাঁরা সম্মানিত সক্রিয় অংশীদার। কিন্তু, পণ্ডিত নেহরু, তেজবাহাদুর সপ্রু ইত্যাদির মাতৃভাষা ছিল উর্দু), তথাপি আজও উর্দুতে বিনা মিলে দোঁহা রচনা করা হয়, সংস্কৃত সুভাষিতের অনুকরণে। 'মিল' শব্দটা কি শুদ্ধ সংস্কৃত? সংস্কৃতে একে বলে 'অন্ত্যানুপ্রাস্'—স্পষ্ট বোঝা যায়, বিপদে পড়ে মাথায় গামছা বেঁধে ম্যানুফেকচার্ড এরজাৎস মাল। অতএব যদি মডার্ন কবিরা সে-বস্তু এড়িয়ে চলেন তবে পাঠক তুমি গোস্‌সা করো কান্? ওঁরা তো মাইকেলেরই মত' আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য পুনর্জীবিত করছেন। এই যাবনিক ম্লেচ্ছাচারের যুগে সেটি কি চাট্টিখানি কথা!

তারপর ছন্দ? ছন্দহীন কবিতা হয় না, আপনাকে বলেছেন কোন্ অলংকার-শাস্ত্রের গোসাঁই? উপনিষদ পড়েছেন? তার ছন্দটি কান পেতে শুনেছেন? ছন্দে-বাঁধা কবিতা আসতে পারে তার কাছে? বস্তুতঃ বেদমন্ত্রে ছন্দ মেনে মেনে হায়রান হয়ে ঋষিকবি উপনিষদে পৌঁছে কি যুগপৎ তাঁর আধ্যাত্মিক ও কাব্যিক মোক্ষ লাভ করলেন না? এ অধম অশিক্ষিত—তথাপি গুণীজনের কাছে শোনা উপনিষদের একটি সামান্য সাদামাটা প্রশ্ন নিনঃ—

'সূর্য অস্ত গেছে, চন্দ্রও অস্ত গেছে, অগ্নি নির্বাপিত (অর্থাৎ আগুন জ্বালিয়ে যে একে অন্যকে দেখবো তার উপায় নেই), কথাও বন্ধ (অর্থাৎ চিৎকার করে ডাকবারও উপায় নেই)। তখন কোন্ জ্যোতি নিয়ে মানুষ (বেঁচে) থাকে, বলুন তো যাজ্ঞবল্ক্য?'

এবার সংস্কৃতটা শুনুনঃ—

'অস্তমিতে আদিত্যে, যাজ্ঞবল্ক্য, চন্দ্রমস্যস্তমিতে, শান্তেঽগ্নৌ, শান্তায়াং বাচি, কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষঃ?'

www.BanglaBook.org

প্রচলিত মন্দাক্রান্তা বা শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে এই অতুলনীয় সঙ্গীত-মন্দ্রিত-স্পন্দিত ছত্র বেঁধে দিলে কি প্রভু যীশুর ভাষায় লিলিফুলের উপর তুলি নিয়ে রঙ বোলানো হত না?

এতেও যদি আপনাদের মন না ভরে তবে পড়ুন ইংরেজী অনুবাদে বাইবেল —রাজা দায়ুদের গান, সুলেমান বাদশার গীতি (সং অব্ সংজ, সং অব্ সলোমন)। সে তো গদ্যে, এবং স্বয়ং বার্নার্ড শ বলেছেন, ঐ সলোমনের গীতিটি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতা।

আবার আপনি যদি মুসলমান হন তা হলে তো কথাই নেই। আপনি জানেন প্রাক-পয়গম্বর যুগেও আরবদের ছিল বহু বিচিত্র ছন্দে, মিলের কঠোরতম আইনে বাঁধা অত্যুৎকৃষ্ট কাব্যসৃষ্টি। গদ্য ছিল না, কিংবা প্রায় না থাকারই মত। তথাপি আল্লা-তালা পয়গম্বরকে যে কুরানের বাণী পাঠালেন সে তো গদ্যে। অথচ আরবী-ভাষা নিয়ে যাঁরা সামান্যতম চর্চা করেছেন তাঁরাই শপথ করে বলবেন, এঁর ছন্দোময় গদ্য যে কোনো বাঁধা কাব্যকে হার মানায়। পয়গম্বরকে যখনই তাঁর বিরুদ্ধপক্ষ কোনো মিরাকল্ (অলৌকিক কীর্তি) দেখাতে আহ্বান করতো তখনই তিনি সবিনয়ে বলতেন, আমি নিরক্ষর আরব। তৎসত্ত্বেও আল্লা-তালা আমার কণ্ঠ দিয়ে যে কুরান পাঠালেন তার কাছে কি আসতে পারে তোমাদের শ্রেষ্ঠতম কাব্য? এইটেই হল সবচেয়ে বড় মিরাক্ল্।'

অতএব মর্ডান কবিরা যদি ছন্দ অস্বীকার করেন তবে আপনি চটেন ক্যান্?

তৎসত্ত্বেও মর্ডান কবিতার দুশ্মনরা হয়তো বলবেন, তারা সুন্দর সুন্দর জিনিসের সঙ্গে বিৎকুটে সব জিনিসের তুলনা দেয়—যেমন তালগাছের ডগায় চাঁদ দেখে লিখলে, এ যেন আকাশের সুচিক্কণ সুমসৃণ তাল! কিংবা প্রিয়ার বিনুনি দেখে কবির মনে এল পানউলীর দোকানে ঝোলানো অগ্নিমুখ নারকোলের পাকানো দড়ি—যার ডগায় লাগিয়ে আমি আকছারই বিড়ি ধরাই। সেই দড়ি হাওয়ায় দুলে কবির কুর্তা পুড়িয়ে দিয়ে পিঠে ছ্যাঁকা দিয়েছে, ঠিক তেমনি প্রিয়ার বিনুনি দেখা মাত্রই তাঁর বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে।

এটা পড়ে তাজ্জব মানছেন কেন?

রাজা শূদ্রকের 'মৃৎ-শকটিকা' পড়েন নি? জর্মনরা সংস্কৃতের সমজদার এস্তেক গ্যোটে হাইনে সংস্কৃত না জেনেও ভারতীয় নাট্যের স্মরণে উদ্ধাহু হয়ে নৃত্য করতেন। শূদ্রকের এই নাটকটি জর্মন ভাষাতে ক'বার যে ভিন্ন ভিন্ন রসিকজন দ্বারা অনূদিত হয়েছে বলা কঠিন, ক'বার যে জর্মনিতে মঞ্চস্থ হয়েছে সেটা বলা তার চেয়েও কঠিন। সেই নাট্যে আছে, ক্ষুধিত সূত্রধার বাড়ি ফেরার সময় গভীর দুশ্চিন্তায় মগ্ন—বাড়িতে তো চালডাল কিছুই নেই, গৃহিণী কি আদৌ রন্ধন করতে পেরেছেন? বাড়ি ঢুকেই সূত্রধার সানন্দে সবিস্ময়ে দেখেন, সাদা মাটির উপর লম্বা লম্বা কালো কালো আঁজি আঁজি দাগ—কালিমাখা হাঁড়ি মাটিতে ঘষে ঘষে গৃহিণী সাফসুৎরো করেছেন। অতএব ধুম্র দেখলে যে রকম বহ্নির উপস্থিতি স্বীকার করতেই হয়, হাঁড়ি পরিষ্কার করা হয়ে থাকলে রান্নাও যে হয়েছে সে বিষয়ে কি সন্দেহ? সূত্রধার তখন সোল্লাসে উপমা দিয়ে বললেন, ওহো! সাদা মাটির উপর এই কালো কালো আঁজি যেন তুষারধবলা গৌরীর ললাটে কৃষ্ণাঞ্জনতিলক!

www.BanglaBook.org

কী মারাত্মক গদাময় হাঁড়িকুঁড়ি, মাটিতে সেগুলো ঘষার ফলে নোংরা কালো আঁজির সঙ্গে শিবানী গৌরীর অসিত তিলকের তুলনা! এ যে রীতিমত হেরেসি, এ হেন তুলনা চার্বাকের বেদ-নিন্দার চেয়েও ধর্মঘ্ন কটু-ভাষণ।

এর পরও আপনি আপত্তি করে বলবেন মর্ডান কবিতা ন দেবায় ন ধর্মায়?

বুদ্ধিমান তথা না-ছোড়-বান্দা পাঠক, আমি বিলক্ষণ জানি, আপনার প্রধান আপত্তি কোন্‌খানে—ছোটখাটোগুলো উপস্থিত না হয় বাদই দিলুম। আপনি বলবেন ওদের কবিতা পড়ে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারি নে। আম্মো পারি নে —ধাপ্পা না মেরে হক কথাই কই। সে তো আপনার দোষ, আমার দোষ। আপনি আমি পয়সাওয়ালার ছেলে হয়ে জন্মালে সত্যকার অপ্‌টুডেট্‌ chic, dernier cri, লেটেস্ট মডেলের হাইয়ার এডুকেশন পেতুম; আপনি, আমি আমরা নিদেন যদি অধ্যাপক হতুম, তারো নিদেন যদি আমরা তাঁদের শিষ্য হবার সুযোগ পেতুম, তবে তো আজ এ প্রশ্ন তুলতুম না। কিন্তু এহ বাহ্য।

'বুঝতে পারি নে' কথাটার অর্থ কি? আপনি ভৈরবী বা পুরবী শুনে যদি রস না পান তবে কি গায়ককে প্রশ্ন শুধান, 'ভৈরবীর অর্থ আমায় বুঝিয়ে দাও?' আরো সহজ দৃষ্টান্ত দি। পশ্চাদ্বক্ষে আপনি সূর্যোদয় দেখে মুগ্ধ হলেন, মাঝি হলো না। সে যদি আপনার তন্ময় ভাব দেখে শুধোয়, 'কত্তা, সূর্যি তো উঠলেন, কিন্তু আপনি এমন বে-এক্তেয়ার হলেন কেন? এ সূর্যি ওঠাতে কি আছে আমাকে বুঝিয়ে দেন' তাহলে আপনি কি বোঝাবেন? তাজমহল দেখে হাক্‌স্‌লি মুগ্ধ হন নি, কিন্তু তিনি তো গাইডকে এ প্রশ্ন শুধোন নি, 'তাজমহলের অর্থ আমায় বুঝিয়ে বলো'। কিংবা ভরতনাট্যম দেখে আপনি যদি 'অর্থ' বুঝতে চান, তবে হয়তো অভিনয়াংশের অর্থ আপনাকে বোঝানো যাবে কিন্তু বিশুদ্ধ নাট্যরসের (যেমন যন্ত্রসঙ্গীতের) অর্থ-ই বা কি, আর বোঝাবেই বা কে? চিত্রে একদা লোকে কোনো বস্তুর সঙ্গে তার সাদৃশ্য দেখে কিছুটা অর্থ পেত কিন্তু এখন ক্যুবিজম্‌, দাদাইজমে কেউ সাদৃশ্য খোঁজে না, অর্থও খোঁজে না। কাঠের একটা গুঁড়ি নিয়ে বিখ্যাত ভাস্কর ছ'মাস ধরে প্রাণপণ খাটলেন; প্রদর্শনীর মধ্যকক্ষে সেটি স্থাপিত করে তলায় নাম লিখলেন কাঠের একটা গুঁড়ি। কাঠের গুঁড়ি, কাঠের গুঁড়ি; ভৈরবী, ভৈরবী। তার আবার অর্থ কি?

মনে হচ্ছে আপনি তন্ত্রের কিছুই জানেন না। তন্ত্রের নিগূঢ়তম মন্ত্রের অর্থ শোধান না গুরুকে? যদি তিনি প্রকৃত গুরু হন তবে আপনার হাড় ক'খানা আর আস্ত থাকবে না। আর অত গভীরে যাবার কি প্রয়োজন? এই যে পৃথিবীর কোটি কোটি নর-নারী উপাসনা করে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায়, তার ক'টা ভাষা লোকে বোঝে? আপনি উত্তরে হয়তো বলবেন, আমরা রস নিয়ে বিচার করছি। তা হলে স্মরণে আনুন, সেই বুড়ি—দাড়িওয়ালা কথকঠাকুরের কথকতা শুনে হাউ-হাউ করে কেঁদেছিল—কথকতার একবর্ণ না বুঝেও। তার স্মরণে কি এসেছিল সেটা অবান্তর। তার কান্নাটা সত্য। তার রসবোধটা সত্য।

অলঙ্কার-শাস্ত্র অধ্যয়ন করে তলিয়ে দেখুন, অর্থ বোঝা মাত্রই রসোৎপন্ন হয় না—অর্থ পেরিয়ে যে ব্যঞ্জনা যে ধ্বনি যে অনির্বচনীয়তার সৃষ্টি হয়, রস সেই

www.BanglaBook.org

গভীর গুহায়। উপনিষদে আছে সত্য (এবং সত্যই অনুভূতির ক্ষেত্রে রস—কারণ সৎ আনন্দ এবং চিৎ নিয়ে সচ্চিদানন্দ) আছেন সোনার পাত্রে লুকানো। সাধারণ জন সোনার পাত্র দেখেই মুগ্ধ, ভিতরে তাকিয়ে দেখে না। কাব্যে, সঙ্গীতে সর্বত্রই অর্থ জিনিসটা সুবর্ণ পাত্র, তাই দেখে লোক মুগ্ধ। রস কিন্তু ভিতরে। তার সঙ্গে পাত্রের কি সম্পর্ক? পাত্রস্থিত অমৃতরসের সঙ্গে যে ধাতু (অর্থ) দিয়ে পাত্র নির্মিত হয়েছে তার কি সম্পর্ক? কিছুই না। তাই, এ সব বুঝেই কবি দ্বিজেন্দ্রলাল গেয়েছিলেন,

'জননী বঙ্গভাষা, এ জীবনে চাহি না অর্থ!'

৪।৯।৬৫

অর্থের উপাসনা অপেক্ষা পণ্ডিতের নিদ্রা শ্রেয়ঃ

আমাকে অনেকেই প্রশ্ন শুধান, হিন্দু ধর্ম, হিন্দু শাস্ত্র নিয়ে যে অফুরন্ত কাহিনী কিংবদন্তী আছে—যেরকম যমদূত একবার ভুল করে মৃত্যুর নির্ধারিত দিবসের পূর্বে এক নায়েবকে নরকে নিয়ে যাওয়ার ফলে কি রকম তুমুলকাণ্ড ঘটেছিল—মুসলমানদের ভিতরও তেমনি আছে কি না। আছে, কিন্তু সেগুলো প্রধানত লোকশিক্ষার জন্য এবং অনেকগুলোতেই প্রচুর হাস্যরসও আছে। এসব গল্পের প্রাচুর্য ইরানেই বেশী, এবং তুর্কীতে খুবই কম। তুর্কীরা নাকি বড্ড বেশী সিরিয়াস। অতএব গোঁড়া। অতএব রসকষহীন।

আমার একটি গল্প মনে পড়ল এবং সেটা সকলেরই কৌতূহল জাগাবে। কারণ কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ইহুদি, কি খৃষ্টান সকলেই জানতে চায় মহাপ্রলয় (আরবীতে কিয়ামৎ) কবে আসবে? সর্ব ধর্মের শাস্ত্র-গ্রন্থেই তার কিছু কিছু ইঙ্গিত আছে, কিন্তু পাকাপাকি কোনো-কিছু জানার উপায় নেই। একদা নাকি খৃষ্টানদের বিশ্বাস ছিল, খৃষ্টজন্মের ১০০০ বৎসর পূর্ণ হলে মহাপ্রলয় আসবে। শুনতে পাই, অনেক লোকেই নাকি তার কিছুদিন পূর্বে সর্বস্ব বিক্রয় করে দানখয়রাতে উড়িয়ে দেয়।

১০০০ খৃষ্টাব্দ পূর্ণ হওয়ার দিনে শেষটায় যখন মহাপ্রলয় হল না তখন এরা পস্তিয়ে ছিলেন কি না জানি নে, তবে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হওয়া ভালো। এখন ১৯৬৬। যদি রটে যে, ২০০০-এ মহাপ্রলয় তবে এখন যারা যুবা এবং বালক তারা যেন ঐ সময়টায় একটু ভেবেচিন্তে দান-খয়রাৎ করেন।

মহাপ্রলয় কবে আসবে, সে সম্বন্ধে আরবদের ভিতর একটি কাহিনী প্রচলিত আছে।

আল্লা-পাক নাকি একদিন প্রধান ফিরিশ্‌তা (বাঙলায় ফেরেস্তা লেখা হয়; অর্থ এঞ্জেল, দেবদূত) জিব্রাইলকে (ইংরিজিতে গেব্রিয়েল) ডেকে আদেশ দেবেন, যাও তো, মানুষের ছদ্মবেশ ধরে পৃথিবীতে। যে কোনো একজন মানুষকে শুধোও, জিব্রাইল এই মুহূর্তে কোথায় আছেন। জিব্রাইল পৃথিবীতে নেমে একজন মর্ত্যবাসীকে সেই প্রশ্ন শুধোলেন। লোকটা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়ে বললো, 'এরকম বেফায়দা প্রশ্ন করে লাভটা তোমার কি? আমার এসব জিনিসে কোনো কৌতূহল নেই, তবে যখন নিতান্তই শুধোলে তবে—দাঁড়াও, বলছি।' লোকটি দুই লহমা চিন্তা করে বলল, 'হুঁ, ঠিক বলতে পারবো না—তবে এ বিষয়ে

www.BanglaBook.org

কোনো সন্দেহ নেই, সে (আরবীতে ইংরিজীর মত he-র সম্মানার্থে কোনো 'তিনি' শব্দ নেই) এখন পৃথিবীতে। বেহেশ্‌তে নয়।' জিব্রাইল স্বর্গে ফিরে আল্লাকে উত্তরটা জানালে তিনি বললেন, 'ঠিক আছে।' তার পর কেটে যাবে আরো বহু সহস্র বৎসর। তার পর আবার আল্লা-পাক ঐ একই প্রশ্ন একই ভাবে শুধোবার জন্য জিব্রাইলকে পৃথিবীতে পাঠাবেন। এবারে যে মর্ত্যবাসীকে শুধোনো হল, সে বিরক্ত হল আরো বেশী। বললে, 'কি আশ্চর্য! এখনো মানুষ এরকম সম্পূর্ণ বাজে বেকার প্রশ্ন করে! হিসেব কষলে যে এরকম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না তা নয়, তবে দেখো, এসব ব্যাপারে আমার কোন উৎসাহ নেই। আচ্ছা...' এক সেকেণ্ড চিন্তা করে লোকটা বললে, 'স্বর্গে তো নয়, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে...'; ফের দু'সেকেণ্ড চিন্তা করে বললে, পৃথিবীতেই যখন, দাঁড়াও, হাঁ, কাছেপিঠেই কোথাও—আমি চললুম।' জিব্রাইল বেহেশ্‌তে ফিরে এসে আল্লাকে সব কিছু বয়ান করলেন। আল্লা বললেন, 'ঠিক আছে।' তারপর কেটে যাবে আরো কয়েক হাজার কিংবা কয়েক লক্ষ বৎসর। আবার জিব্রাইল সেই হুকুম নিয়ে ধরাভূমিতে আসবেন। এবার যাকে শুধালেন সে তো রীতিমত চটে গেল—'এসব বাজে বাজে প্রশ্ন...ইত্যাদি।' জিব্রাইল বেশ কিছুটা কাকুতি-মিনতি করাতে সে নরম হয়ে বললো, 'তাহলে দেখি! হুঁঃ, স্বর্গ নয়, পৃথিবীতে।' তারপর আরেক সেকেণ্ড চিন্তা করে বললে, 'কাছে-পিঠে কোথাও।' তারপর আরো দু'সেকেণ্ড চিন্তা করে তাজ্জব মেনে বলবে, 'কী আশ্চর্য যে এরকম মস্করা করো। তুমিই তো জিব্রাইল—তবে শুধাচ্ছো কেন? এবার জিব্রাইল সব খবর দিলে আল্লা-পাক হুকুম দেবেন মহা-প্রলয়ের শিঙা বাজাতে।

কথিকাটির তাৎপর্য কি?

প্রথমত, মানুষ তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করে করে এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছবে যে স্বর্গের খবর পর্যন্ত তার কাছে আর অজানা থাকবে না।

দ্বিতীয়তঃ, কিন্তু, তার তাবৎ জ্ঞান-বিজ্ঞান বিদ্যাচর্চার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে সাংসারিক, বৈষয়িক, প্র্যাকটিকাল জিনিস নিয়ে।[১] ইহলোক ভিন্ন পরলোক, পাপপুণ্যের বিচার, সে স্বর্গে যাবে না নরকে জ্বলে পুড়ে খাক হবে—এ সম্বন্ধে তার কোনো কৌতূহল থাকবে না, কারণ স্বয়ং জিব্রাইলকে হাতের কাছে পেয়েও সে এসবের কোনো অনুসন্ধান করলো না। এমন কি সৃষ্টিকর্তা আল্লা—দীন দুনিয়ার মালিক—যাঁকে পাবার জন্য কোটি কোটি সর্বযুগে শত শত কোটি মর্ত্যের মানুষ স্বর্গের দেবদূত আমৃত্যু দেবদুর্লভ সাধনা করেছে, তাঁর প্রতিও সে উদাসীন।

তৃতীয়ত, যেহেতু সে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব, তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছা সম্বন্ধে

---

১ ইমাম গজ্‌জালী মুসলিম জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ—কেউ কেউ বলেন সর্বশ্রেষ্ঠ—মনীষী। তিনি একাধারে দার্শনিক, শাস্ত্রী ও সূফী (রহস্যবাদী ভক্ত) ছিলেন। আরব্যোপন্যাস যুগের বিখ্যাত বাগদাদ নগরীর বিদ্যাবিদ্যালয় সে যুগের মধ্য-প্রাচ্যের সর্বোত্তম জ্ঞানকেন্দ্র ছিল। ইমাম গজ্‌জালী তার রেক্‌টর (শেখ) ছিলেন। অধুনা তাঁর একখানা বইয়ে দেখি, তিনি মনস্তাপ করছেন যে, তাঁর কালের (মৃত্যু ১১১১ খৃষ্টাব্দে) লোক শুধু প্র্যাকটিক্যাল বিদ্যা শেখে। আমি ভরসা পেলুম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সম্পূর্ণ উদাসীন অতএব কল্পনা করা কঠিন নয় যে, সে তখন বিশ্বভুবন তার খেয়ালখুশী মর্জি-মাফিক নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টায় লেগে যাবে। ফলে হয়তো বেরুবে শত শত আইষমান কোটি কোটি ঈশ্বরসৃষ্ট জীবকে বিনাশ করতে।

* * *

ভরসা হচ্ছে, বিশ্ববিবর্তনে যদ্যপি সেই চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ মানুষ ক্রমেই সত্যসুন্দরের (অল্-হক্ অল্-জমীল) সাধনার পথ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে তবু এখনো বোধ হয় পরিপূর্ণ জড়বাদে পৌঁছতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। পক্ষান্তরে ইসলাম একথাও বলেন, কিয়ামৎ যে-কোনো মুহূর্তে আসতে পারে। তার অর্থ, মানুষ হয়তো হঠাৎ এক লম্ফে জড়বাদে পৌঁছে যেতে পারে।

পয়গম্বর বলেছেন, "আল্লার থেকে মানুষকে দূরে নিয়ে যায় শয়তান।" সেই শয়তান জড়বাদের প্রতিভূ এবং প্রতীক। অতএব সত্য-জ্ঞানান্বেষীর প্রধান কর্তব্য জড়বাদ অর্থাৎ শয়তানের কীর্তিকলাপ কি প্রকারে বাহ্যজগতে স্বপ্রকাশ হয় সে সম্বন্ধে সচেতন থাকা—তথা শয়তান প্রলোভন নিয়ে উপস্থিত হলে আত্মহারা না হয়ে জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা তার স্বরূপ চিনতে পারা। শুদ্ধমাত্র আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে সরল জীবন যাপনই যথেষ্ট নয় ; জ্ঞানানুসন্ধান নিত্য-প্রয়োজনীয় অবশ্যকর্তব্য। এই মর্মে আরেকটি কাহিনী আছে ঃ—

একদা শয়তানের রাজা, ধাড়ি শয়তান এক বাচ্চা শয়তানকে তালিম দিচ্ছিল, সৎপথগামীদের কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে বিপথগামী করা যায়। ধাড়ি শয়তান অতিশয় ধুরন্ধর গুরু এবং বিশ্বপর্যটক (জাহানদীদা) রূপে অপর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সম্যক অবগত আছে, কোন্ প্রকারের মানুষ কোন্ পদ্ধতিতে চলে, কাকে সমঝে চলতে হয়, আর কেই বা অগা আহাম্মুখ। ঐ অনুচ্ছেদে এসে ধাড়ি বললে, 'কিন্তু বৎস, হুঁশিয়ার! আচারনিষ্ঠ সাধুজনকে বরঞ্চ আমাদের পথে (মানবীয় ভাষায় কুপথে) নিয়ে যাবার চেষ্টা করো কিন্তু জ্ঞানী পণ্ডিতকে সমঝে-বুঝে চলো। ওরা বড়ই ভীষণ প্রাণী। সৃষ্টির আদিম কাল থেকে ওরাই আমদের অদিম দুশমন।'

শাগরেদ ক্ষুদে শয়তান আশ্চর্য হয়ে বললে, 'সে কি কথা! আচারনিষ্ঠ জন তো সদাই জপতপ নিয়ে ব্যস্ত থাকে ; আমার কথা ভাববার তার ফুরসৎ কই? আর পণ্ডিতদের কথা যখন বললেনই, প্রভু, তবে নিবেদন করি, আজকের দিনে তাদের অবস্থাটা একটু পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখুন। খেতে পায় না, পরতে পায় না আর আকাট-মূর্খ নিষ্কর্মারা বড় বড় চাকরির পদবী নিয়ে ওদের মাথায় ডাণ্ডা বোলায়। নিজে মেস্টার, ওদিকে ছেলেটাকে কলেজে পাঠাতে পারে না। এসব হাভাতেদের লোভ দেখিয়ে পথ ভোলাতে কতক্ষণ?'

ধেড়ে হেসে বলল, 'খুব তো মুখে মুখে হাই-জাম্প লঙ-জাম্প দেখালি। কাজের বেলা কি হয় সেটা বোঝা যাবে পরশু দিন প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে।'

পরশু দিনের দিন প্র্যাকটিক্যাল। সে বড় কঠিন তালিম। তাবৎ হপ্তার এলেম হাতেনাতে বাৎলাতে হয়। আমাদের ইস্টুডেণ্টরা টুকলি-নকল করলে আমরা যে রকম সেটাকে 'শয়তানী' নাম দিয়ে চোটপাট করি, এখানে তেমনি সাধু সরল পন্থায় কর্ম উদ্ধার করতে গেলে সেটাকে 'সাধুমী' বলে গুরু কান

www.BanglaBook.org

মলে দেয় শিষ্যের।

ধেড়ে আদেশ দিলেন, 'ঐ যে হোথা একটি সরল সাধু জপ করছে ওকে আমাদের পথে নিয়ে আসার ডিমন্‌স্ট্রেশনটি করো তো, বৎস।'

বাচ্চা শয়তান প্রমাদ গুনলো। এই সৌম্যদর্শন, কৃচ্ছ্রসাধনজনিতপাণ্ডুর তথাপি মধুরবদন সাধুকে ধর্মপথ থেকে বিচলিত করা কি তার মত চ্যাংড়া শাগরেদের কর্ম! না জানি, আজ কপালে কি আছে!

ক্লাসে যে নোট দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো সে দফে দফে স্মরণে আনলো। তার পরে বিএলজব্‌ব, ইব্‌লিস, ডিয়াবলুস, শয়তান-উস্‌শয়াতীন সবাইকে মনে মনে হাজার হাজার আদাব-বন্দেগী জানিয়ে গেল বেশ ধারণ করতে।

আহা! সে কী চিত্তহারিণী ভূষা! ধেড়ে, আণ্ডা, সব শয়তানকে লড়তে হয় ফিরিশ্‌তা অর্থাৎ দেবদূতের সঙ্গে—তাই ওঁদের চালচলন বেশভূষা তারা খুব ভালো করেই চেনে। এ যুগে হিটলার পোলাণ্ড আক্রমণ করার পূর্বে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কিছু জর্মনদের পরিয়ে দেন পোলিশ সৈন্যের উর্দী। সেই উর্দী পরে তারা 'আক্রমণ' করে একটি জর্মন বেতারকেন্দ্র—পোলিশ-জর্মন সীমান্তে। সেই 'আক্রমণে'র ও 'আক্রমণে নিহত পোলিশ সৈন্যে'র ছবি হিটলার বিশ্বময় প্রকাশ করে সপ্রমাণ করেন যে পোলরাই প্রথম জর্মনি আক্রমণ করে!

হিটলার, হিমলার, আইষমান, হ্যোস এঁরা তো খাস শয়তানের তুলনায় শিশু।[২] ছদ্মবেশ ধারণে এনারা এমন আর কি 'কৈশল' দেখাবেন!

বাচ্চা শয়তান ধারণ করলো দেবদূত—ফিরিশ্‌তার বেশ।

অঙ্গ থেকে বেরুচ্ছে দিব্যজ্যোতি এবং নন্দনকাননমন্দারসৌরভ ; তার প্রতি পদক্ষেপে ঝংকৃত হচ্ছে অপ্সরাবিনিন্দিত সঙ্গীত-নিক্কণ—সঙ্গে এসেছে বসন্ত-পবনের মৃদু হিল্লোল মলয়ানিল-বিলোলানন্দোল্লাস!

বাচ্চা শয়তান সম্মুখীন হলো সাধুর। বললে, 'তোমার তপশ্চর্যায় পরিতুষ্ট হয়ে আল্লা-তালা আমাকে পাঠিয়েছেন তোমাকে সশরীরে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য। তুমি আমার স্কন্ধে আরোহণ করো।'

বলা মাত্রই সে বুরাকের বেশ ধারণ করলো।

বুরাক্‌ অনেকটা পক্ষীরাজের মত। সর্বাঙ্গ অত্যুত্তম অশ্বনায় এবং উভয় স্কন্ধে দুটি পক্ষ।[৩]

কিন্তু বাচ্চা শয়তান ক্লাসের থিয়োরেটিকাল সর্ব আদেশ মেনে চলতে

২। অনেকে মনে করেন এ অধম নাৎসি দলের নির্ভেজাল দুশমন। তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি, যুদ্ধের গোড়ার দিকে হিটলার যে ইংরেজকে বেধড়ক চড় কষায় সেটা এ অধমের চিত্তে সাতিশয় বিমলানন্দ দিয়েছিল। আমার মতে হিটলারের সব চেয়ে মারাত্মক ভুল হয়, তিনি ফ্রান্সের পতনের পর যখন ইংলণ্ড আক্রমণ করলেন না। না হয় তিনি নিষ্ফলকাম হতেন। তাতেই বা কি! মহৎ কর্ম করতে গিয়ে নিষ্ফল হওয়া অপকর্মে (রুশ আক্রমণ) সফল হওয়ার চেয়ে শ্রেয়ঃ!

৩। মুসলমানী ও পার্সী রেস্তোরাঁতে নাত্যুচ্চাসিক হিন্দু পাঠকও এই ছবি দেখে থাকবেন। পয়গম্বর হজরৎ মুহম্মদ সাহেব এই বুরাকে চড়েই সৃষ্টিকর্তা সন্নিধানে যান। বিরুদ্ধ পক্ষ বলেন, তিনি সশরীরে যান নি ; তার রূহ, অর্থাৎ আত্মা গিয়েছিল। অর্থাৎ বুরাক ইত্যাদি রূপকার্থে নিতে হবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চলতে ভয়ে বেপথু-কম্প্রমান, এই সামান্য ফাঁদটা সাধু না ধরে ফেলেন!

কিন্তু ধেড়ে শয়তান দূর থেকে নিশ্চিন্ত মনে সব-কিছু দেখছে। সে বিলক্ষণ জানে, এসব আচারনিষ্ঠ জন বড় দম্ভী হয়। এরা ভাবে, সংসারের সর্বভোগ যখন ত্যাগ করেছি, তখন আর স্বর্গের সর্বসুখ আমি পাবো না কেন?

এই দম্ভই তাঁদের সর্বনাশ আনে, সে তত্ত্ব শয়তান দেখেছে, যুগ যুগ ধরে।[৪]

তপস্বী সাধু ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে চেপে বসলেন সেই ভেজাল বুরাকের স্কন্ধে।

তারপর কি হল, সেটা বর্ণনা করতে আমার বাধে। কারণ সেটাতে আছে বীভৎস রস। সংক্ষেপে বলি, সাধুর যখন জ্ঞান হল তখন তিনি বিষ্ঠাকুণ্ডে। বাচ্চা শয়তান একবার তাঁকে কাঁধে পেয়ে পেয়েছে বাগে। ক্লাসের নোট-মাফিক তাঁকে সর্বযন্ত্রণা দিয়ে অজ্ঞানাবস্থায় ফেলে দিয়ে গেল পুরীষ-গহ্বরে।

সুশীল পাঠক। তুমি বলবে, আচারনিষ্ঠ সজ্জনের এই অসদ্‌গতি হল কেন? আমিও গল্পের এই পর্যায়ে কাহিনী-কীর্তনিয়া মৌলানাকে ঐ একই প্রশ্ন শুধোই।

তিনি শান্তকণ্ঠে বললেন, 'পুচ্ছাংশ দেখিয়াই সর্বাঙ্গ বিচার করা যায় না। অবহিত চিত্তে সর্বাঙ্গসুন্দর কাহিনীটি প্রণিধান করহ।'

এধারে ধেড়ে শয়তান বাচ্চাকে বললে, 'ঐ যে দেখা যাচ্ছে দূরে এক আলিম। এবারে বাবাজী, সাবধান!'

বাচ্চা কিন্তু ভয় পাওয়ার মত কিছুই দেখলো না। পণ্ডিত বটে লোকটি, কিন্তু নামাজ রোজায় যে তাঁর মাঝে মাঝে ত্রুটি হয়ে যায়, সে তো জানা কথা। বইয়ের নেশায় তাঁর কাটে অষ্টপ্রহর। এটাকে বাগে আনতে আর কতক্ষণ?

পূর্ববৎ দেবদূত-বেশ ধারণ করে বাচ্চা শয়তান পণ্ডিতের সামনে এসে দাঁড়ালো। পূর্ববৎ তাঁকে স্বর্গে নিয়ে যাবার প্রস্তাব জানালো।

পণ্ডিত তখন রকে বসে বদনা থেকে জল ঢেলে মুখ ধুচ্ছিলেন।

ভুললে চলবে না, ইনি পণ্ডিত। সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার প্রস্তাব শুনেই তাঁর চড়াকসে মনে পড়ে গেল ইতিপূর্বে কে কে আল্লার সমীপবর্তী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। মুসা (Moses), ঈসা (যীশু), হজরৎ পয়গম্বর—ব্যস্।

তাই পণ্ডিত উত্তমরূপেই জানতেন, তিনি এমন কিছু পুণ্যশীল মহাপুরুষ

৪। কবি রবীন্দ্রনাথ কৃচ্ছ্রসাধনে দম্ভ দেখে সর্বত্যাগী ভৈরব-শঙ্করকে উদ্দেশ করে বলেছেন—

'আমাকে চেনে না তব শ্মশানের বৈরাগ্যবিলাসী
দারিদ্র্যের উগ্র দর্পে খলখল ওঠে অট্টহাস
দেখে মোর সাজ।'

সর্বত্যাগী শঙ্কর হিন্দুর উপাস্য। কিন্তু তাঁর সর্বস্ব ত্যাগের অন্ধানুকরণ ও তৎসহ তাই নিয়ে দম্ভ, সেই ত্যাগের luxury যেমন মূর্খ চেলারা করেন, কবি সেইটে এই কবিতায় বুঝিয়েছেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'প্যাকম্বর' নন যে আল্লা তাঁকে স্বর্গে যাবার জন্য ডেকে পাঠাবেন।

'বটে রে, ব্যাটা!' মনে মনে বললেন পণ্ডিত। 'মস্করা করার জায়গা পাও না! আজ তোমারই একদিন, আর আমারই একদিন।'

সুহাস্য-আস্যে মৌলবী বললেন, 'কী আনন্দ, কী আনন্দ! স্বর্গে যাবার জন্য তো আমি হামেহাল তৈরি। কিন্তু, ভদ্র, এ যুগে বড় ভেজাল চলছে। কি করে জানবো, তুমি সত্যই দেবদূত। শুনেছি, দেবদূতেরা মুআজিজা কেরামৎ (miracle) দেখাতে পারেন। তুমি কিছু একটা দেখাতে পারলেই আমি তোমার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত।'

বাচ্চা শয়তান বলল, 'আপনি কি মিরাক্‌ল দেখতে চান, বলুন।' তার মনে বড় আনন্দ, অর্ধেক কেল্লা ফতেহ্‌ করে ফেলেছে!

পণ্ডিত বললেন, 'শুনেছি, দেবদূত অনায়াসে ক্ষুদ্র, বৃহৎ, সর্ব আকার গ্রহণ করতে পারেন। তুমি পারো?'

'নিশ্চয়!'

'তাহলে তুমি ক্ষীণ কলেবর গ্রহণ করে আমার এই বদনার নালি দিয়ে ভিতরে ঢুকতে পারো?'

বাচ্চা শয়তান উল্লাসে মনে মনে নৃত্য করছে, পণ্ডিত এর চেয়ে অন্য কঠিন কর্ম করতে ইচ্ছা জানান নি বলে। তাকে তো অনায়াসে তিনি আরবীস্তানের বিরাট মরুভূমি, কিংবা ইউফ্রাতেস নদী, কিংবা আকাশের সূর্য বা দিবাভাগে পূর্ণচন্দ্র হতে বলতে পারতেন।

পাছে তিনি মত পরিবর্তন করে ফেলেন, তাই সে তম্মুহূর্তেই পণ্ডিতের বদনার নালির ভিতর দিয়ে ঢুকে পড়লো।

যেই না ঢোকা, পণ্ডিতের আর কোনো সন্দেহ রইল না, ব্যাটা বদমাশ। তিনি ভালো করেই জানেন, আল্লার আপন দূত একটা বদনাতে ঢুকতে যান না। তিনি বহুবিধ শাস্ত্র পড়েছেন, তাতে এমন মিরাক্‌ল, কেরামতের উল্লেখ নেই।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাশের পিঁড়িটা বদনার উপর চেপে তার উপর আরো ভালো করে চেপে নিজে বসে পড়লেন এবং বদনার নালিতে ঢুকিয়ে দিলেন একটা খেজুর। বেশ মোলায়েম ফল : টায়ে টায়ে বদনায় সেঁটে যায়।

এবং চিৎকার:—

'গিন্নী, গিন্নী! নিয়ে এসো তাড়াতাড়ি উনুনটা। ব্যাটাকে আজ সেদ্দ করে হালুয়া বানাবো। ব্যাটা আমার সঙ্গে মস্করা করতে এসেছে! শা—, হা—জা—, বা—।[৫]

হৈহৈ রৈরৈ কাণ্ড। বুড়ো শয়তান দূর থেকেই বুঝেছে ব্যাপারটা সঙ্গীন।

সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত-মৌলবীর পায়ে এসে পড়লো।

---

৫ পণ্ডিত মাত্রই কি ভারত, কি আরব সর্বত্র আমাদের আজকের দিনের বিচারে বড় অশ্লীল গালাগাল দেন। 'তোমার সঙ্গে আলোচনা বন্ধ্যাগমন' আমাকে একাধিক পণ্ডিত বলেছেন। আমি তখন শান্তিপুরে নব্যন্যায় শিক্ষার 'বন্ধ্যাগমন' করছি। দোষ আমারই, তাঁদের নয়। কাইরোতেও একই অবস্থা!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাচ্ছাটাকে বাঁচাবার জন্য সন্ধি-আপোস করতে চায়।

সন্ধির শর্ত হল, শয়তান এবং তস্য গোষ্ঠী ঐ মৌলবী-পণ্ডিত গোষ্ঠীর কাউকে প্রলোভিত করতে পারবে না।

* * *

প্রথম গল্পের সঙ্গে এ গল্পের কি সম্পর্ক?

যতক্ষণ অবধি পণ্ডিত-মৌলবী-মৌলানা-রাব্বী-ফাদার-দস্তুর সুধমাত্র প্র্যাকটিক্যাল বিষয়ে মত্ত হবেন না, ততদিন মহাপ্রলয় আসবে না।

* * *

কিন্তু পাঠক, তোমার মস্তিষ্কে, হৃদয়ে যে প্রশ্ন আমারো তাই। কী দরকার সেই মহা-মহাপ্রলয় ঠেকিয়ে? যেখানে পৌঁচেছি, চাল নেই, তেল নেই, মাছ নেই—

২।১০।৬৫

আলবের্ট শ্বোয়াইৎসার্

"আজিকে একেলা বসি শোকের প্রদোষ-অন্ধকারে,
মৃত্যুতরঙ্গিণীধারা-মুখরিত ভাঙনের ধারে
তোমারে শুধাই,—আজি বাধা কি গো ঘুচিল চোখের
সুন্দর কি ধরা দিল অনিন্দিত নন্দনলোকের
আলোকে সম্মুখে তব,—উদয়শৈলের তলে আজি
নবসূর্য বন্দনায় কোথায় ভরিলে তব সাজি
নবছন্দে, নূতন আনন্দগানে?"

এই কবিতাটি রচিত হবার পর প্রায় চল্লিশ বৎসর কেটে গিয়েছে। আমার চেনা-অচেনা অনেক প্রখ্যাত পুণ্যশ্লোক জন ইহলোক ত্যাগ করেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এ প্রশ্নটি তাঁদের উদ্দেশে শুধাই নি। হয়তো ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু আজ আর এ-প্রশ্ন না শুধিয়ে থাকা গেল না।

কারণ এই মহাপুরুষ জীবনে সত্য সুন্দর শিবের যে সাধনা করেছিলেন সেটা সর্বযুগেই বিরল। এবং তার চেয়েও আশ্চর্য, তিনি একই পথে আজীবন সাধনা করেন নি।

আল্‌সেসের কাইজারবের্ক অঞ্চলে ১৪ই জানুয়ারী ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে[১] এঁর জন্ম। সে অঞ্চল তখন জর্মন ছিল বলে তিনি জর্মন। ধর্মতত্ত্ব (প্রটেস্টান্ট বা এভানজেলিক) পড়ে তিনি চব্বিশ বছর সহপাদ্রিরূপে ঈশ্বর-মানুষ-গির্জার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। কিন্তু বছর তিন যেতে না যেতেই খৃষ্টধর্মের মূলতত্ত্ব নিয়ে তাঁর মনে যে-সব প্রশ্নের উদয় হয় সেগুলো নিয়ে চিন্তা, গবেষণা ও সাধনা গির্জার সেবায় নিযুক্ত থেকে হয় না। তাই তিনি বিখ্যাত স্ট্রাসবুর্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার হয়ে কাজে যোগ দেন। এই অল্প বয়সেই তিনি যে গবেষণা করেন সেটা খৃষ্টধর্মের ইতিহাসবিদ্‌দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এবং সে

১ মৃত্যু : ৪।৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ কঙ্গতে।

www.BanglaBook.org

গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য পাণ্ডিত্য সঞ্চয় বা পাণ্ডিত্য প্রকাশ আদৌ নয়। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কি প্রকারে খৃষ্টের বাণী ও তৎপরবর্তী খৃষ্টধর্মের প্রথম উৎপত্তিযুগের একটি অর্থপূর্ণ সর্বাঙ্গসুন্দর ছবি পাওয়া যায়, যেটা আজও এবং আবার নূতন করে খৃষ্টসমাজে নূতন প্রাণ, নূতন ভক্তি, চরিত্র-সংগঠন ও সমাজবাস করার জন্য নূতন নীতি নির্মাণ করে দেবে।

এদেশে রামমোহন তাই করেছিলেন। অর্থাৎ উপনিষদের স্বর্ণযুগ পুনরায় আলোকিত করতে চেয়েছিলেন।

সউদী আরবের রাজা ইব্‌ন্ সউদ যে সম্প্রদায়ভুক্ত তার প্রতিষ্ঠা ওয়াহ্‌হাবও তাই করেছিলেন।

শ্বোয়াইৎসার্ এই সব তত্ত্বচিন্তায় ধ্যানধারণায় নিযুক্তকালীন প্রচুর সময় ব্যয় করেন সঙ্গীতস্রষ্টা য়োহান্ সেবাস্টিয়ান্ বাখ্-এর উপর। এখানেও সেই নবাবিষ্কারের কথা। এটা সত্য যে, বহু বৎসর দু-চারিটি কেন্দ্র ভিন্ন অন্য সর্বত্র বাখ্ অনাদরে থাকার পর সঙ্গীতস্রষ্টা মেণ্ডেলজোন্ পুনরায় রসিক-জনের দৃষ্টি বাখ-এর দিকে আকৃষ্ট করেন। এর পরেই বাখ-এর অন্যতম প্রধান ভাষ্যকার শ্বোয়াইৎসার। গির্জার অর্গেনসঙ্গীত তাঁরই প্রচেষ্টা ও প্রচারের ফলে পুনরায় নবজীবন লাভ করে। (অর্গেন ও অর্গেল এদেশের সঙ্গীতকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রচুর প্রভাবান্বিত করে। এই নিয়েই কিঞ্চিৎ গবেষণা কিছুদিন পূর্বে এদেশে হয়। তার অন্যতম প্রশ্ন তখন ছিল অর্গেনকে কেটে হারমোনিয়া-মরূপে প্রবর্তিত করে কে জনপ্রিয় হন কি করে, এর প্রতি আকাশবাণীর এত রাগ কেন, যদিও খান আবদুল করীম খানের মত মহাপুরুষ যখন এরই সঙ্গতে গেয়েছেন? এ নিয়ে আরো আলোচনা হলে ভাল হয়। আবার কৃতজ্ঞচিত্তে শার্ঙ্গদেবের শরণ নিচ্ছি। এবং এর সঙ্গে আরেকটি নিবেদন, ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচয়কামী নবীন ভারতীয় শাগরেদকে একাধিক ইয়োরোপীয় বাখ্ নিয়ে আরম্ভ করতে বলেন। বাখ-এর রস পাওয়া আমাদের পক্ষে সহজতর। এ বিষয় নিয়েও তুলনাত্মক সঙ্গীতমহলে আলোচনা হওয়া উচিত।) এমন কি বলা হয় শ্বোয়াইৎসার্ স্বহস্তে উত্তম অর্গেনও নির্মাণ করতে শেখেন।

উপরের দুটি সাধনা—খৃষ্টের জীবনানুসন্ধান ও বাখ্—ভিন্ন তাঁর প্রধান অনুসন্ধান ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞানে, রাষ্ট্রচালনায়, ধর্মনীতিকে পুনরায় দৃঢ় ভূমিতে স্থাপন করা।

* * *

সাধনা, অধ্যয়ন, ধ্যানধারণা, বাখ-এর ভগবদ্‌সঙ্গীত এ সমস্ত নিয়ে যখন শ্বোয়াইৎসার্ তন্ময়, যখন তাঁর খ্যাতি জর্মনির বাইরে বহুদূরে চলে গিয়েছে, তখন এই মহাত্মা হঠাৎ একদিন ত্রিশ বৎসর বয়সে, অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে ভর্তি হলেন মেডিকেল কলেজে। কারণটি সরল অথচ সুদূরে নিহিত।

ফরাসী-কঙ্গ অঞ্চলে যে-সব অনাচার হয়ে গিয়েছে তার খেসারতি মেরামতি করতে হবে। কঙ্গর গভীরতম জঙ্গলে যে শত শত আফ্রিকাবাসী কুষ্ঠরোগে দিন দিন ক্ষয় হচ্ছে তাদের সেবা করতে হবে।

তার পূর্বে কিন্তু তা হলে তো চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হয়। ঠিক সেই জিনিসটিই সমাধান করে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে মিশনারি ডাক্তাররূপে তিনি

www.BanglaBook.org

ফরাসী-কঙ্গর দুর্গম অরণ্যের লাঁবারেনে-অঞ্চলে গিয়ে কুষ্ঠরোগীদের জন্য হাসপাতাল খুললেন। তাঁর স্ত্রী দেশে নার্সের ট্রেনিং নিয়ে সেখানে সেবিকার কাজ গ্রহণ করলেন।

কিন্তু এই কঙ্গবাসী কুষ্ঠরোগীদের অর্থসামর্থ্য কোথায়? শ্বেয়াইৎসার্ আবার সর্বশ্রেষ্ঠ ওষধি, সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি, সর্বোত্তম সহকর্মী নিয়ে চিকিৎসা করতে চান। তার জন্য অর্থ কোথায়?

এর পরের ইতিহাস দীর্ঘ। তাতে আছে আদর্শবাদ, নৈরাশ্য, অকস্মাৎ অযাচিত দান এবং সর্বোপরি শ্বেয়াইৎসারের অকুণ্ঠ বিশ্বাস: "মানুষের জীবন বিধিদত্ত রহস্যাবৃত—এর প্রতি প্রত্যেকটি মানুষের ভক্তি বিস্ময় ভয় থাকা উচিত।" এই অটল বিশ্বাস নিয়ে তিনি কিছুদিন পর পর সেই দুর্গম জঙ্গল অতিক্রম করে, ইয়োরোপে এসে অত্যুৎকৃষ্ট স্বরচিত আপন অভিজ্ঞতাপূর্ণ (বিশেষ করে অন্ধকার-কঙ্গর) পুস্তক প্রকাশ করে, প্রাচীন দিনের বাখ-এর সঙ্গীত বাজিয়ে অর্থোপার্জন করতেন। প্রথম যুদ্ধের সময় তাঁর কাজে বাধা পড়ে; কারণ তিনি জাতে জর্মন হয়েও বাস করছেন ফরাসী কলোনিতে—কিন্তু সেটা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি এতই ভুবনবিখ্যাত যে দুই যুযুধান সৈন্যদলই তাঁর হাসপাতালকে এড়িয়ে বাঁচিয়ে যুদ্ধ করে।

কিন্তু ১৯১৩ থেকে ১৯৬৫—এই দীর্ঘ বাহান্ন বৎসরের একনিষ্ঠ সাধনা তো ক্ষুদ্র একটি প্রবন্ধে শেষ করা যায় না। যদি কখনো সে সাধনার সিকি পরিমাণ খবরাখবর সংগ্রহ করতে পারি তবে পুনরায় চেষ্টা নেব![২]

৯।১০।৬৫

মরহুম ওস্তাদ ফৈয়াজ খান

বিসমিল্লাতেই অতিশয় সবিনয় নিবেদন—আর্জ্ করে রাখি, এ অধম উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মারপ্যাঁচ বিলকুল বোঝে না, ভরত থেকে আরম্ভ করে ধূর্জটি-প্রসাদতক্ যে সব গুণীজ্ঞানী সঙ্গীতশাস্ত্র নির্মাণ করে গেছেন তাঁদের প্রতি আমার অগাধ ভক্তি, কিন্তু তাঁদের বর্ণিত রাগরাগিণীর পুত্রকন্যা গোষ্ঠী-কুটুম কে যে কোন্ মেলে পড়েন, কিছুতেই মনে রাখতে পারি নে। শুধু তাই নয়, সবচেয়ে মারাত্মক তত্ত্ব, আমি পূর্ণ একটি বছর রেওয়াজ করেও তবলার গভীরে কেন—কানি পর্যন্ত পৌঁছতে না পেরে নিরাশ হয়ে সাধনাটি ছেড়ে দি, অতি দুঃখে অতি অনিচ্ছায়; অবশ্য নিতান্ত সত্যের অপলাপ হবে—তাই এটাও ক্ষীণ কণ্ঠে বলে রাখি, দ্রুতের রেওয়াজ করতে গিয়ে আমার হাতের কড়াতে আর্তরাইটিস হয়।

দ্বিতীয়ত, এ ক্ষুদ্র রচনাটি মজলিস্-রৌশন্ সমঝদারের জন্য নয়, নয়, নয়।

---

২ শ্বেয়াইৎসার্ ভারতীয় চিন্তাধারা সম্বন্ধে ১৯৩৫ সালে Die Weltanschauung der indischen Denker নামক একখানা বই লেখেন। এই বই সম্বন্ধেও অনেক-কিছু বলার আছে। আমি বহু বৎসর পূর্বে পড়েছি। সেখানি ফের পেলে কিছু লেখার দুরাশা আছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি খান সাহেবকে পেয়েছিলুম মানুষ হিসাবে, বন্ধু হিসাবে। তিনি আমাকে মুগ্ধ করেছিলেন, সম্মোহিত করেছিলেন তাঁর মধুর ব্যক্তিত্ব দিয়ে—যদিও তিনি খুব ভালো করেই জানতেন, আমি তাঁর জয়-জয়ন্তীতে যত না রস পাই, তার চেয়ে বেশী পাই তাঁর কাফি হৌলিতে।

তাই দয়া করে মেনে নিন, এ লেখাটি সাধারণ পাঁচজনের জন্য, যারা যুগর্ষি স্রষ্টাদের দৈনন্দিন জীবন, তাঁদের সুখ-দুঃখ, মান-অভিমান সম্বন্ধে জানতে চায় মাত্র—কারণ তারা আমারই মত সুরকানা, তালকানা হওয়া সত্ত্বেও গান শুনতে ভালোবাসে এবং যেহেতু সংগীতের গভীরে পৌঁছতে পারে না, তাই স্রষ্টাদের জীবনটা, তাঁদের চালচলন, ওঠনবৈঠন নিয়েই সন্তুষ্ট। অশ্বত্থামার সঙ্গে আমাদের তুলনা করুন, আমাদের কোন আপত্তি নেই।

১৯৩৫ সালে, এই সময়ে, আজ হতে ঠিক ত্রিশ বৎসর আগে এ-অধম বরদা শহরে ঢাকরি নিয়ে পৌঁছয় এবং স্টেট্ গেস্ট হাউসে অতিথিরূপে স্থান পায়। মহারাজা স্বর্গত সয়াজীরাওয়ের সঙ্গে দেখা শেষ হওয়া মাত্রই আমার মনে যে অদম্য বাসনা জাগলো সেটা নিতান্ত স্বাভাবিক।

ওস্তাদের ওস্তাদ রাজানুগ্রহপ্রাপ্ত শ্রীযুত ফৈয়াজ খান বাস করেন এই বরদা শহরেই। তাঁর কণ্ঠসঙ্গীত শুনতে না পেলে এই দুনিয়াতে জন্মালুমই বা কেন, আর এই বরদা শহরে এলুমই বা কেন? তার চেয়ে বাঁ-হাতের তেলোতে জল নিয়ে সেটাতে ডুবে আত্মহত্যা করলেই হয়!

খবর নিয়ে শুনতে পেলুম, তাঁর বাড়িতে রোজ সন্ধ্যায় মহ্ফিল-জলসা বসে, আর প্রায় প্রতি সকালে শাগরেদান সহ রেওয়াজ।

ইতিমধ্যে একটি অতিশয় অজানা-অচেনা বঙ্গসন্তানের সঙ্গে আলাপ হল। তার নাম বলবো না, কারণ ছেলেটি এখনো বড় লাজুক। তবে সে যদি চিঠি লিখে আপত্তি না জানায় তবে অন্য সুবাদে তার নাম প্রকাশ করে দেব। উপস্থিত ধরে নিন, তার নাম পরিতোষ চৌধুরী! ওস্তাদের শিষ্য—অবশ্য ন'সিকে পাকা কথা বলতে হলে, ওস্তাদের বড় ভাইয়ের কাছেই সে রেওয়াজ করে বেশী। কারণ একাধিক সমঝদার আমাকে বলেছেন—আমার টুঁটি চেপে ধরবেন না! —যে যদিও দাদাটি নিজে সভাস্থলে গাইতেন না, তবু সংগীতশাস্ত্র তিনি জানতেন ওস্তাদ ফৈয়াজের চেয়ে বেশী। তাঁরাই বলেছেন, ওস্তাদ তাই শাগরেদদের কণ্ঠস্বর সুললিত গম্ভীর মধুর করার ভার নিতেন নিজে—অন্য 'কাজের' জন্য ভিড়িয়ে দিতেন দাদার কাছে, বিশেষ করে অচলিত প্রায়-লুপ্ত রাগরাগিণীতে যাদের দিল্‌চসপী-শখ অত্যধিক।

চৌধুরী তার গুরু খান সাহেবকে কি বলেছিল জানি নে, এক রবিবার সকালে তিনি সশরীরে আমার ডেরায় এসে উপস্থিত! আমি হতভম্ব। কোথায় তাঁকে বসাবো, কী আপ্যায়ন করবো, আমার মাথায় কিছুই খেলছে না। মহারাজ সয়াজীরাও এলেও আমি অতখানি গর্ব এবং নিজেকে এত অসহায় অনুভব করতুম না।

আর ওস্তাদ—বিশ্বাস করবেন না—বার বার শুধু আমার হাত দুখানা ধরে নিজের বুকে চেপে ধরেন। তিনি আমার চেয়েও বে-এক্তেয়ার! আর বার বার দরবারী (কানাড়া নয়!) কায়দায় আমাকে কুর্নিশ করেন।

বহুদিন ধরে সে বেইমান পাষণ্ডকে খুঁজেছি যে আমায় দুশমনী করে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাঁকে বলেছিল, আমি গুরুঘরের ছেলে এবং মুসলিম-বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান কেন্দ্রভূমি কাইরোতে এ্যাসান্ মুসলিমশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি যে স্বয়ং মহারাজা আমাকে সেখান থেকে বরদা রাজ্যে নিয়ে এসেছেন।

আমি আদৌ অস্বীকার করছি নে আমি গুরুবংশের ছেলে, এ ভারতে সে রকম শতলক্ষ আছে। কিন্তু তার চেয়ে আমার গুরুতর আপত্তি, আমার ক' পুরুষ পূর্বে কে যে শেষ-গুরু হয়ে গেছেন, সেটাও প্রত্নতত্ত্বের বিষয়। এবং আমার সর্বাপেক্ষা মারাত্মক আপত্তিঃ কাইরোতে আমি যেটুকু আরবী শিখেছি সেটি আমি আপনাকে ছ'মাসে শিখিয়ে দিতে পারি।

এ বিষয়টা আমি উল্লেখ করলুম কেন? এই যে গানের রাজার রাজা, এই ফৈয়াজ খান কী অদ্ভুত সরল ছিলেন সেটা বোঝাবার জন্য। পরে আমি চিন্তা করে বুঝেছি, তিনি সঙ্গীতের সর্বোচ্চ শিখরে উঠে গিয়েছিলেন বলে সরল বিশ্বাসে ভাবতেন, সয়াজীরাও যখন আমাকে খাতির করেন তখন আমিও নিশ্চয়ই আমার শাস্ত্রের সর্বোচ্চ শিখরে। তাঁর সঙ্গীতজ্ঞানের জন্য তিনি যখন রাজবল্লভ হয়েছেন, তখন আমিও তাই। একই লজিক!

এর পর কতবার আমাদের দেখাশোনা হয়েছে—গানের মজলিস-মহ্‌ফিলের তো কথাই নেই। আমি প্রতিবার তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি, 'দেখুন ওস্তাদ! কত রাজা আসবে যাবে, কত শম্‌স্ উল্-উলিমা (মহামহোপাধ্যায়) কত পাণ্ডিত্য দেখিয়ে যাবেন—এমন কি এই যে আমাদের বরদার দেওয়ান সাহেব, যাঁর হাম্বাই-তাম্বাইয়ের অন্ত নেই—তিনিও চলে যাবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আরেক দেওয়ান এসে উপস্থিত হবেন, কিন্তু আপনার মত লোক আবার কবে আসবে কে জানে? আমি বেঁচে থাকলে আরো রাজা দেখব, আরো দেওয়ান দেখব, কিন্তু আপনার মত কাকে পাবো?'

আর কী সুদর্শন পুরুষ ছিলেন তিনি! চেহারা রং গোঁপ সব মিলিয়ে তিনি যেন তাঁরই গানের '(বন্দে) নন্দকুমারম্'—শুধু নন্দকুমার ছিলেন শ্যাম, আর ইনি গোরাচাঁদ।

আমাকে শুধোলেন, 'কবে এসে একটু গান—

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'তওবা, তওবা! আপনি আসবেন এখানে! আমি যাবো যে কোনো সন্ধ্যায়, আপনার ইজাজৎ পেলেই।'

তিনি কিছুতেই রাজী হলেন না।

কতবার তিনি সন্ধ্যে সাতটায় এসে ভোর পাঁচটায় উঠেছেন। আমাকে কতবার তিনি বেহেশৎ দেখিয়েছেন। তাঁর ওফাতের (মৃত্যুর) পর আর কেউ দেখায় নি।

বিশ্বাস করবেন না, আমি নন্দকুমার গানটি ভালোবাসি জেনে একদিন তিনি আমাকে—আবার বলছি আমার মত অতি-সাধারণ শ্রোতাকে—পুরো দেড় ঘণ্টা ধরে ঐ গানটি শুনিয়েছিলেন।

কিন্তু কত লিখব! আমার স্মৃতির কত বড় অংশ জুড়ে এখনো তিনি বিরাজ করছেন!

তাই একটি ছোট্ট ঘটনার উল্লেখ করে শেষ করি।

একটি বরদাগত বাঙালী মহিলার অনুরোধে আমার বাড়িতে মহ্‌ফিল বসেছে। ওস্তাদ সেদিন বড় মৌজে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুপুরে বরদায় ১১৪ ডিগ্রী গরম পড়েছিল। রাতদুপুরেও অসহ্য গরম, বর্ষা নামতে তখনো দু'মাস বাকি। ওস্তাদ অনেক-কিছু গাওয়ার পর শুধোলেন, 'আদেশ করুন, কি গাইব।' সেই মহিলাটি অনেক চাপাচাপির পর ক্ষীণ কণ্ঠে অনুরোধ জানালেন, 'মেঘমল্লার।'

ওস্তাদ সঙ্গে সঙ্গে গান ধরলেন।

যেন তিনি তাঁর সমস্ত সাধনা, সমস্ত ঘরানা (হয়তো ভুল হল, কারণ 'রঙিলা' ঘরানা মেঘমল্লারের প্রতি কোনো বিশেষ দিল্‌চস্‌পী ধরেন কিনা আমার জানা নেই), সমস্ত সৃজনীশক্তি, বিধিদত্ত গুরুদত্ত সর্বকলাকৌশল সেই সঙ্গীত সম্মোহন ইন্দ্রজালে ঢেলে দিলেন। আমরা নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে যেন সর্ব লোমকূপ দিয়ে সে মাধুরী শোষণ করছি।

এমন সময় বাইরে নামল কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি।

মহ্‌ফিলে হুলস্থূল পড়ে গেল। কে কি ভাবে ওস্তাদকে অভিনন্দন জানিয়েছিল, কে সুদ্ধমাত্র কুমড়ো-গড়াগড়ি দিয়েছিল, কে ওস্তাদের দিকে নিস্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল মাত্র—এ সবের বর্ণনা দেওয়ার শক্তি আমার নেই। অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা তো শুধু তিনিই দিতে পারেন যাঁর লেখনীতে অলৌকিক শক্তি আছে।

অন্য দিন ওস্তাদ আমাদের অভিনন্দন, প্রশংসাবাদ, মরহাবা যতখানি ঝুঁকে ঝুঁকে সেলাম জানিয়ে গ্রহণ করতেন, আজ তিনি সেরকম করলেন না। দু'এক-বার সেলাম জানিয়ে গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে রইলেন। আমার একটু আশ্চর্য লাগলো।

অবশ্য তার পরও তিনি গেয়েছিলেন ভোর অবধি।

শেষ ভৈরবী গেয়ে তিনি আমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এলেন। আমি বললুম, 'ওস্তাদ, বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন ; একটু বিশ্রাম নেবার জন্য বসুন।'

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর যে কী বিষণ্ণতা মুখে মেখে আমার দিকে তাকালেন তার অর্থ আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না। করুণ কণ্ঠে বললেন, 'আচ্ছা, সৈয়দ সাহেব, লোকে আমাকে এরকম লজ্জা দেয় কেন বলুন তো? আমি কি গান গেয়ে বৃষ্টি নামাতে পারি?'

আমি ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে বললুম, 'সে জানেন আল্লা। আমি শুধু জানি, অন্তত আজ রাত্রে তিনি আপনার সম্মান রাখতে চেয়েছিলেন।'

৯।১০।৬৫

'পঞ্চাশ বছর ধরে করেছি সাধনা।'
'কটা ভাষা?' 'হা কপাল! বাঙলাই হল না।'

প্রথমেই নিবেদন জানাই, আকাশবাণীর বিরুদ্ধে আমার ব্যক্তিগত কোনো ফরিয়াদ নেই। কেন নেই, যখন চৌদ্দআনা পরিমাণ লোকের আছে, এ সব তর্কের ভিতর আমি ঢুকতে নারাজ। বিশেষত যখন খুব ভালো করেই জানি, এই বিশ্ব-সংসারটা রিফর্ম করার গুরুভার আল্লা-তালা আমার স্কন্ধে চাপান নি। আমি শুধু আজ আকাশবাণী বাবদে একটি কাহিনী নিবেদন করবো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শোনা গল্প। সত্য না-ও হতে পারে। তবে ক্যারেকটারিস্টিক—অর্থাৎ গল্পটা শুনেই চট করে চোখের সামনে ভেসে ওঠে আকাশবাণীর একটি বিশেষ স্থূলাঙ্গের ছবি।

'সুনন্দ' রাগে বিতৃষ্ণায় বিকৃতকণ্ঠে তাঁর জুর্নালে ইণ্টারভ্যু নামক প্রতিষ্ঠানটির ব্যঙ্গ করেছেন। হায় রে কপাল! তিনি কখনো ইণ্টারভ্যুর রাজার রাজা 'অডিশনিং' নামক খাটাশটির দাঁত-ভ্যাংচানি দেখেছেন—ঈভন ফ্রম এ ভেরি লঙ সেফ ডিসটেন্স? তা হলে বুঝতেন ঠ্যালা কারে কয়। আমি স্বয়ং একাধিক 'অডিশনিং' বোর্ডের কর্মকর্তা ছিলুম বেশ কিছুকাল ধরে। আমার জানার কথা! কিন্তু আমি এ সুবাদে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের একটি কাহিনী কীর্তন করবো।

একদা 'গ্রামে গ্রামে এই বার্তা রটি গেল' যবে যে, বড় কী ছোট তাবৎ সঙ্গীতকাররা পরীক্ষা (এরই 'ভদ্র' নাম অডিশনিং) দিয়ে তবে গান গাইবার প্রোগ্রাম পাবেন, তখন পরীক্ষকদেরই একজন আপত্তি তুলে বললেন, 'বাজারে যাঁদের গ্রামোফোন-রেকর্ড রয়েছে, এবং/কিংবা স্টুডিয়ো-রেকর্ড রয়েছে তাঁদের আবার অডিশনিং-এর কি প্রয়োজন? যাঁদের নেই তাঁদের কথা আলাদা, কিন্তু তখনকার দিনের আকাশবাণী রাজাধিরাজ স্বাধিকারমত্ত। মোকা যখন পেয়েছেন তখন ছাড়বেন কেন?

তখন, ধরুন, এই লখ্‌নৌ শহরে ছোট-বড় তাবৎ গাওয়াইয়া বাজানেওলারা একজোটে স্থির করলেন, তাঁরা পরীক্ষা দেবেন না। তাঁদের আপত্তি, যারা পরীক্ষা নেবে তারাই বা সঙ্গীত-জগতের কী এমন বাঘ-সিঙ্গি?

আবার বলছি, এটা গল্প।

অবস্থা যখন চরমে তখন দুনিয়ার হালচাল বাবদে সম্পূর্ণ বেখেয়াল, লখ্‌নৌয়ের সবচেয়ে বড় ওস্তাদ একদিন ভোরবেলা শিষ্য-সমাবৃত হয়ে রেওয়াজ করতে করতে হঠাৎ শুধোলেন, 'হ্যাঁ মিয়া, "আডিশনিং আডিশনিং" চারো তরফ লোগ শোরগোল মচা রহে হৈঁ, সো ক্যা বলা?' (পাঠক, আমার উর্দুজ্ঞান সঞ্চিত হয়েছে কলকাতার পানওয়ালাদের দোকান থেকে—অপরাধ নিয়ো না, বরায়ে মেহেরবানী!) মোদ্দা কথা, তিনি জানতে চাইলেন, চতুর্দিকে যে এই আডিশনিং আডিশনিং রব উঠেছে, সেটা আবার কি বালাই (আপদ, গেরো)।

শিষ্যেরা প্রাঞ্জল ভাষায় সে 'বালাইয়ের' জন্ম, বয়োবৃদ্ধি ও বর্তমান পরিস্থিতি গুরুকে বুঝিয়ে দিলেন, এবং তাঁদের কেউই যে এই অপ্রীতিকর প্রতিষ্ঠানের সম্মুখীন হবেন না সেটাও জানিয়ে দিলেন।

গুরু তাজ্জব মেনে বললেন, 'সে কী? ইম্‌তিহান্ (পরীক্ষা) দিতে তোমাদের কি আপত্তি? ভেবে দেখো আমি যখন বিরাট জলসায় গান ধরি তখন কি শেষ কাতারের পানওয়ালাটা পর্যন্ত আমার পরীক্ষা আরম্ভ করে দিয়ে ভাবে না, আমি রসসৃষ্টি করতে পারবো কি না, তার দিল্ ভিজিয়ে নরম করতে পারবো কি না? সোজা কথায় বলতে গেলে, হর্‌ফিলের সবাই প্রতিবারেই আমার পরীক্ষা নেয়। হাঁ, আল্‌বত্তা, তারা মুখ বলে পরীক্ষা নেয়, এরা বলে কয়ে নিচ্ছে। তাতে কীই বা এমন ফারাক?'

শিষ্যেরা অচল অটল।

ওস্তাদ হেসে বললেন, 'মৈঁ তো জাউংগা জরুর।'

www.BanglaBook.org

শিষ্যরা বজ্রাহত। আর্তরব ছেড়ে পাঞ্জাবী, যুক্তপ্রদেশী, বাঙালী, হিন্দু, মুসলমান তাবৎ শাগরেদ আরজ্ করলে, 'আমরা যাচ্ছি নে ঐ সব পাঁ—দের সামনে পরীক্ষা দিতে, আর আপনি যাবেন হুজুর?'

হুজুর বললেন, 'য়েকীনান্—নিশ্চয়ই।'

শিষ্যেরা তখন 'ফারাম' 'form'-এর ভয় দেখালে। তাতে মেলা অভদ্র প্রশ্ন আছে। ওস্তাদ বললেন, 'সে তো আদমশুমারীর সময়ও আমার বুড্ঢী বীবীকে শুধিয়েছিল, তিনি অন্য কোনো পন্থায় কিছু আমদানি করেন কি না? ওসব বাদ দাও। ফারাম ভর দো।'

* * *

অডিশনিং-এর দিন টাঙা চড়ে গুরু চললেন, স্টুডিয়োর দিকে। সঙ্গে মাত্র একটি চেলা। বাকি চেলারা চালাকি করে আকাশবাণীকে জানায় নি যে তাঁদের ওস্তাদ অডিশনিঙে আসছেন—ওদের শেষ ভরসা এপয়েন্টমেন্ট নেই বলে শেষ-মেষ যদি সবকুছ বরবাদ-ভণ্ডুল হয়ে যায়। অবশ্য এ-কথাও ঠিক, ওস্তাদ ওদের পরীক্ষা দেবার জন্য হুকুম দেন নি। নইলে ওরা নিশ্চয়ই অমান্য করতো না।

লখ্নৌয়ের—কথার কথা বলছি—আকাশবাণী সেদিন কারবালার ময়দানের মত খাঁ-খাঁ করছে। এমন সময় নামলেন গুরু টাঙা থেকে।

আকাশবাণীর 'চ্যাংড়াদের যত দোষ দিন, দিন—প্রাণভরে দিন, কিন্তু একথা কখনো বলবেন না, এরা ওস্তাদদের সম্মান করে না। আমার চোখের সামনে কত বার দেখেছি, প্রোগ্রাম-এসিসটেন্ট কুলীনস্য কুলীন ব্রাহ্মণসন্তান কী রকম মুসলমান গুরুর পায়ের কাছে কুমড়ো-গড়াগড়ি দিচ্ছে, মুসলমান পীরের ছেলে হিন্দু গুরুর পায়ে ধরে বসে আছে। এঁদের অসম্মান করে—অবশ্য সেটা ওদের রুচির অভাব—ওপরওয়ালারা যারা সংগীত বাবতে দীর্ঘকর্ণ।[১]

ছোকরা কর্মচারীরা তো তন্মুহূর্তেই ওস্তাদকে তাদের চোখের পাতার উপর তুলে নিয়ে ঢুকিয়ে দিলো অডিশনিং রুমে—যেখানে 'পরীক্ষকরা' বেকার উকীলদের মত অনুপস্থিত মাছি মারছিলেন আর নিষ্ফল আক্রোশে আর্টি-

---

* প্যারিসে একবার একটি উৎকৃষ্ট সংগীতানুষ্ঠান কর্তাদের নেকনজর পায় নি শুনে ভলতেয়ার সেই সংগীতস্রষ্টাকে একটি চৌপদী লিখে সান্ত্বনা জানান, 'হায়, বড়লোকদের যে কানও বড় হয়' (অর্থাৎ গাধা)। আমি ব্যক্তিগতভাবে একটি উদাহরণ জানি। গুণী, ওস্তাদ রবিশঙ্কর তখন দিল্লি-আকাশবাণীর সংগীতাধিনায়ক। গাঁধীর জন্মদিনে সেক্রেটারি তাঁকে ডেকে হুকুম দেন, ঐ উপলক্ষে তিনি গাঁধীর তাবৎ জীবনী—দক্ষিণ-আফ্রিকা, বরদলৈ, উপবাস, সলট্-মার্চ-প্রতিফলিত করে যেন নূতন কিছু 'কম্পোজ' করেন। বিহ্বল, প্রায়ান্ধ উদ্ভ্রান্তদৃষ্টি রবিশঙ্কর চলেছেন করিডর দিয়ে—আমার সঙ্গে অচেনা কলিশন। সম্বিতে এসে আমাকে দেখে করুণ হাসি হেসে তাবৎ বাৎ বয়ান করে শুধোলেন, 'এ কখনো হয়?' আমি বললুম, 'আপনি যখন বাজান তখন আমার মত সংগীতে আনাড়ীরও মনে হয়, আপনার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। তবে কি না—হে হোক সেক্রেটারি বোধ হয় বিলিতী সিমফনি, পাস্তোরাল-টাস্তোরাল বই পড়ে (শুনে নয়) আমেজ করছেন, এ দেশেই বা হবে না কেন?' রবি শুধোলেন, 'করি কি?' আমি সবিনয়ে বললুম, 'একটা বাবদে আমার মত আকাটও একটা সাজেশন দিতে পারে।' 'কি কি?' 'ঐ সলট্-মার্চের জায়গায় এসে আপনি যন্ত্রের তারগুলোতে করকচ-নুন মাখিয়ে নেবেন।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফিশেল দাঁতে দাঁতে কিড়মিড় খাচ্ছিলেন।

ওস্তাদকে দেখে তাঁরা স্তম্ভিত। এ কী কান্ড! যে-সব আনাড়ী ছোকরা গাওয়াইয়ারা দিনকে দিন বেতারকেন্দ্রের ছারপোকা-ভর্তি বেঞ্চিতে বসে দশ রুপেয়ার প্রোগ্রামের জন্য ধন্না দেয় তারা পর্যন্ত আসে নি অডিশনিঙে—আর এই ওস্তাদের ওস্তাদ লখ্‌নৌয়ের কুৎব্‌মিনার, তানসেনের দশমাবতার তিনি এসে গেছেন—এ যে অবিশ্বাস্য, বিলকুল গয়ের মুম্‌কিন্‌ তিলিস্‌মাৎ।

একথা অনস্বীকার্য তাঁরা ওস্তাদকে প্রচুরাধিক ইজ্জৎ দেখিয়ে ইস্‌তিক্‌বাল (অভ্যর্থনা) জানালেন, সর্বোত্তম তাকিয়াটি তাঁর পিছনে চলন দিলেন। ওস্তাদের মুখ যথারীতি পানে ভর্তি ছিল। একটি ছোকরা ছুটে গিয়ে ওগলদ্‌ন্‌ (পিকদান) নিয়ে সামনে ধরলো।

কেউ কিছু বলার পূর্বেই ওস্তাদ বললেন, 'সব যব্‌ জম্‌গয়ে তব কুছ হো জায়—' অর্থাৎ সঙ্গীতামোদীরা যখন একজোট হয়ে গিয়েছি তখন হোক কিঞ্চিৎ গাওনা-বাজনা! সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। নইলে কে তাঁকে সাহস করে পরীক্ষা দিতে বলতো? ওস্তাদ সবিনয় শুধোলেন, 'কি গাইবো?' তার-স্বরে চিৎকার উঠলো, 'সে কি, সে কি? গজব কী বাৎ! আপনার যা খুশী!' (সাধারণ পরীক্ষার্থী জানে, এদের মামুলী পেশা বিৎকুটে, অচেনা রাগ বৎখৎ তালে গাইবার আদেশ দেওয়া।)

ইতিমধ্যে বেতারকেন্দ্রের যে পয়লা-নম্বরী সারেঙ্গীওয়ালা ও ওস্তাদ তবলচী অডিশনিং বয়কট করে কেণ্টনে চা খাচ্ছিল তারা টাট্টু-ঘোড়ার মত ছুটে এসেছে সংগত দিতে—কর্তারা এদের অভাবে যে দুটি আকাট যোগাড় করে-ছিলেন, তারা বহু পূর্বেই গা-ঢাকা দিয়েছে।

ওস্তাদ ধরলেন তোড়ি। আলাপের সময় প্রত্যেকটি ধ্বনি যেন বকুলগাছ থেকে এক একটি ফুল হয়ে এদিক ওদিক ছিটকে পড়তে লাগলো। যখন তানে এলেন তখন যেন ফুল নিয়ে সাতলহরা মালা গাঁথতে লাগলেন, প্রিয়ার কুন্তল-দামে পরাবেন বলে।

আর সমস্তক্ষণ মুখে কী খুশীর ছটা! জান্‌টা যেন ফূর্তিতে ভরপুর! ক্ষণে সারেঙ্গীওলার দিকে মুখ বাড়িয়ে তার বাজনার তারিফ করে বলেন, 'ক্যা বাৎ, ক্যা বাৎ!' ক্ষণে তবলচীর দিকে দুই হস্ত প্রসারিত করে হুংকার দেন, 'শাবাশ, শাবাশ, আফরীন, আফরীন!' যেন ওরাই সব জমিয়ে চলছে! ওঁর কোন কৃতিত্ব নেই।

গান থামলো। আনন্দে বিস্ময়ে সবাই এমনই স্তম্ভিত যে পুরো এক মিনিট পরে হর্ষধ্বনি ও সাধুবাদ রব উঠলো।

ইতিমধ্যে 'পরীক্ষক'দের একজন ওস্তাদের সঙ্গী ছোকরা শাকরেদের কাছ থেকে অন্য সকলের অজানতে সেই ফারাম্‌খানা চেয়ে নিয়েছে। ঐটেতে পাস না ফেল, কোন্‌ হারে দক্ষিণা বেঁধে দিতে হবে সে-বস্তু লিখে দিতে হয়।

হঠাৎ তাঁর চোখে পড়লো, সেখানে প্রশ্ন, 'আপনি কোন্‌ রাগ-রাগিণী জানেন?' তার উত্তরে লেখা মাত্র একটি শব্দ 'তোড়ি'।

বিস্ময়! বিস্ময়!! এ কখনো হয়!!! পরশু দিনের কাঁচা গাওয়াইয়াও তো লিখতো ডজন দুই। ওস্তাদ জানেন কত শত, এ তো রসজ্ঞদেরও কল্পনার বাইরে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অতিশয় বতরিবৎ এবং প্রচুর মাফ চেয়ে সেই 'পরীক্ষক'টি বৃদ্ধ ওস্তাদকে শুধোলেন—অল্প অবিশ্বাসের স্মিতহাস্য হেসে, 'ওস্তাদ, এ কখনো হয় যে, আপনি একমাত্র তোড়ি ছাড়া আর কিছুই জানেন না?'

সকলের মুখেই প্রসন্ন মৃদু হাস্য। সারেঙ্গী-তবলা মাথা নিচু করে জাজিমের দিকে তাকিয়ে।

যে কোনো বিদ্যাতেই তোমার যদি অভিমান থাকে তবে, পণ্ডিত পাঠক, এই বেলা তুমি কান পেতে শোনো,—আমার জীবনে তাঁর উত্তরটি নিবিড় ঘন আঁধারে ধ্রুবতারার মত জ্বলে—তিনি কি উত্তর দিলেন।

ঠণ্ডী সাঁস লে কর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ওস্তাদ বললেন, 'পচাস সালসে তোড়ি গা রহাহুঁ—অভী ঠিক তর্‌হ্‌সে নহী নিকলতী।'

অর্থাৎ পঞ্চাশ বছর ধরে তোড়ি গাইছি। এখনও ঠিকমত বেরয় না। অন্য রাগ-রাগিণীর কথা কেন বৃথা শুধোও॥

১৬।১০।৬৫

ইণ্টারভ্যু

'ইণ্টারভ্যু' নামক চরম বেইজ্জতীর মস্করা যে কত নব নব রূপে প্রকাশিত হয় তার বর্ণনা আরেক দিন দেব। 'দেশে' এই মর্মে একাধিক চিঠি বেরিয়েছে, এবং আগে ভাগে কাকে চাকরি দেওয়া হবে সেটা ঠিক করে নিয়ে যে চোট্টামির ইণ্টারভ্যু-প্রহসন করা হয় তারও বর্ণনা এ-চিঠিগুলোতে ও আমার সতীর্থের মূল প্রবন্ধে আছে। তবে এ বাবদে শেষ কথা বলেছে আমার এক তুখোড় তালেবর ভাগিনা। ডাঙর নোকরি করে, ঢাউস যা গাড়ি ব্যাঙ্ক দিয়েছে তার ভিতর এক পক্ষে মা সহ তার তিন মাসী অন্য পক্ষে তার তিন মামী রীতিমত ব্যূহ নির্মাণ করে কাশ্মীর-শিয়ালকোট-কচ্ছের রণের[১] রণমোহড়া দিতে পারেন (বলা বাহুল্য মামীরাই হারেন, কারণ তাঁরা এসেছেন তিন ভিন্ন ভিন্ন পরিবার থেকে)। ভাগিনাটিকে প্রায়ই ইণ্টারভ্যু নিতে হয়—অর্থাৎ সিট্‌স্ অন দি রাইট্ সাইড্ অব দি টেব্‌ল্। একদিন বেজায় উত্তেজিত হয়ে সে আমাকে একটি কর্ম-খালির বিজ্ঞাপন পড়ে শোনালে। তাতে ওমেদারের বয়স কত হবে, কি কি পাস থাকা চাই, এপেন্‌ডিক্‌সের দৈর্ঘ্য তার কতখানি হবে, তার পরিবারের কদিন কটা খুন হয়ে থাকা চাই ইত্যাদি বেবাক বাৎ ছিল। ভাগিনা তারপর ভ্রূকুঞ্চিত করে খানিকক্ষণ খুঁত খুঁত করে বললে 'খাইছে! ফোটোগ্রাফ্ দ্যাওনের বাৎ বেবাক ভুল্যা গ্যাছে। হুইডার তলায় লেখা থাগ্‌বো, "None need apply whose appearance does not resemble the above photograph." কি কন, মামু?' আমি আর কি বলবো? এটা করলে তো অত্যন্ত সাধু-জনোচিত আচরণ হত। এর চেয়ে ঢের ঢের মাস্টি (ইচ্ছে করে ন্যাস্টি উচ্চারণ করতে, সে উচ্চারণে ঘেন্নাটার খোলতাই হয় বেশী যেমন 'পিশাচ'

১ আমার বন্দুর জানা, কচ্ছবাসীরা জায়গাটার নাম কচ্ছী বা গুজরাতী বা কাঠিয়াওয়াড়ীতে বানান করে কচ্ছের 'রণ'—'রান' বা 'রাণ' নয়।

www.BanglaBook.org

বা 'পিচাশ' না বলে সর্বোৎকৃষ্ট হয় 'পিচেশ' বললে!) উদাহরণ আমি একটা জানি।

ফার্সীর লেকচারার নেওয়া হবে। আমাকে স্পেশালিস্ট হয়ে যেতে হবে। আমি বে-কসুর না-মঞ্জুর করে দিলুম। যদিও চাকরির বিজ্ঞাপন দেখে মনে হল না, এর ভিতরে কোনো নষ্টামী আছে। তবু, আমি এই 'জামাই ঠকানো'র —সুনন্দের ভাষায়—ফিস্কির-মস্করার হিস্যেদার হতে চাই নে। দু'দিন পর মৌলানা আজাদ ফোন করে জানতে চাইলেন, আমি যেতে আপত্তি করছি কেন? তখন বুঝলুম, উনিই আমার নাম স্পেশালিস্ট-রূপে প্রস্তাব করেছিলেন এবং এখন আমি সেটি গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হচ্ছি বলে কর্তৃপক্ষ তাঁকে সেটা জানিয়ে ফরিয়াদ করেছেন—। মৌলানার পাণ্ডিত্যের প্রতি আমার অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল। তাই কাচুমাচু হয়ে এই ইন্টারভ্যু বাবদে পরীক্ষক হিসেবেই, আমার পূর্ব পূর্ব নোংরা (ন্যাস্টি!) তজরুবা-অভিজ্ঞতা জানালুম। দেখি, মৌলানা সমুচাহ্ ওয়াকিফ্-হাল! কোনো প্রকারের তর্কাতর্কি না করে বললেন, 'আপনি গেলে ওরা সোজা পথে চলবে। যদি অন্যায় আচরণ দেখেন, আমাকে জানাবেন।' ইন্টারভ্যুতে যে-সব অনাচার হয় তার কোনো বিচার নেই বলে, আমি টেবিলের কি এদিকে কি ওদিকে কোনো দিকে বসতে চাইনে (পেত্যয় না পেলে শ্রীযুত কালিদাস ভশ্চাযকে শুধোন!); কিন্তু এক্ষেত্রে মৌলানা আমার কাছ থেকে অনাচার-সংবাদ পেলে যে ওদের কান মলে দেবেন সেই ভরসায় গেলুম।

আমার সঙ্গে আরেকটি স্পেশালিস্ট ছিলেন। বাকীরা পাকা মেম্বার। তাঁদের একমাত্র কামনা, কাম খতম করে বাড়ি ফেরার। বিশেষত 'লেড়ে'র ব্যাপার—চাকরিটা মিম্বরুল্লা পেল না মৃদম খান পেল সে নিয়ে তাদের 'মাতাব্যাতা' হবে কেন, ছাই!

তবু ভদ্রতার খাতিরে তাঁরা দু-একটি প্রশ্ন শুধোলেন। সে ভারী মজা। যেমন, 'আপনার মাদ্রাসায় ইংরিজীও পড়ানো হত?'—কথাবার্তা অবশ্য আংরেজীতেই হচ্ছে। কারণ প্রশ্নকর্তারা ফারসী ও ফরাসীর তফাৎ জানেন না।

'জী, হ্যাঁ।'

'কি পড়েছেন?'

'জী রাস্কিনের "সিসেম অ্যান্ড লিলিজ", মিলটনের "এরিয়োপেজি—"'

'শেকস্পীয়র?'

'জী।'

'কি?'

'হ্যামলেট।'

এবারে প্রশ্নকর্তা দারুণ উত্তেজিত হয়ে বললেন, বাব্বা, বাব্বা! বেশ, বেশ। সুপ্রস্তাব!'

তার পর তিনি সোৎসাহে আরম্ভ করলেন, হ্যামলেটের আত্ম-আর্তনাদ—সলিলকি—"To be or not to be—"। তাকিয়ে আছেন কিন্তু আমার দিকে, ওমেদারের দিকে না—আমার অপরাধ? ইংরিজী খবরের কাগজেও একটা অত্যন্ত বেকার খবর বেরিয়েছে, আমার কি একটা বই কি যেন একটা প্রাইজ পেয়েছে, এবং স্বয়ং রাষ্ট্রপতি নাকি আমাকে প্রাইজটি দেবেন স্বহস্তে!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাকেই ইম্‌প্রেস্‌ করা এখন তাঁর জীবন্‌মৃত্যুর চরম কাম্য—বলা তো যায় না, এখন থেকেই যদি রীতিমত আমাকে তোয়াজ করে ইম্‌প্রেস্‌ করা যায় তবে আমি হয়তো প্রাইজ নেবার সময় কানে কানে রাষ্ট্রপতিকে বলে দেবো, 'হুজুরের আণ্ডার-সেক্রেটারি অনন্তভূত-পরাশরলিংগম্‌কে এখন একটি প্রমোশন দেওয়া উচিতস্য উচিত!' অবশ্য সেটা সেরকম মোকা নয়। কিন্তু বলা তো যায় না —যদি হয়েই যায়। নেপোলিয়ন (আজকালকার 'জ্ঞানীরা' যাকে নাপোলেও বলেন, যেন আমাদের মত সে-যুগের রাম-পণ্টরা খাঁটি উচ্চারণ জানতো না বলে বাংলাতে তদনুযায়ী সঠিক বানান লিখতে পারে নি!) বলেছেন, অসম্ভব বলে কিছুই নেই। নিশ্চয়ই তিনি জানতেন, কখন কিভাবে কাকে লুব্রিকেট—তেলাতে হয়!

তা সে যাই হোক, আমাকে নার্সকে ইম্‌প্রেস্‌ করে হকচকিয়ে দেবার পর ওমেদারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাকিটা কও কি? "Or to take arms against a sea of—" বাকিটা বলে যাও তো?'

কালো চামড়ার তৈরী সর্বোৎকৃষ্ট স্প্রিং-সম্বলিত, পঞ্চাধিক কুশন্‌বিজড়িত গভীর আরাম-কেদারার তলা থেকে তিনি হাস্যরসের তুফানে ওঠা-নাবা করতে করতে বার বার বলেন, 'তার পর কি, go on! ইউ সেড্‌ ইউভ্‌ রেড হ্যামলেট, against a sea of troubles—আরো সাহায্য করলুম তোমাকে। বাকিটা বলে যাও!' আবার তিনি সোফাতে বৃন্দাবনের রসরাজসুলভ হিন্দোল-দোলে দুলতে লাগলেন।

আমি তাজ্জব! বেচারী ওমেদার এসেছে ফার্সী ভাষায় মেস্টারির চেষ্টায়। আঁ পাসাঁ, বেচারী একটুখানি ইংরেজী শিখেছিল বটে, কিন্তু সেইটেই তার ফর্‌ fort, সেইটেই তার pie'ce de res'istance, সেইটেই তার বলতে গেলে, কিছুই নয়—ইংরিজীর মাধ্যমে ফার্সী পড়াতে গেলে যতখানি ইংরিজী জানবার প্রয়োজন তার চেয়েও সে বেশী জানে সেটা তো ইতিমধ্যে তার কথাবার্তাতেই প্রমাণ হয়ে গেছে। তা সে যাকগে। ওমেদার বেচারী তো ঘেমে-নেয়ে ঢোল। আমি তখন তার দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বললুম, 'ওরকম নার্ভাস হবেন না। আপনি কতখানি ইংরিজী জানেন না-জানেন তার গুরুত্ব সামান্যই। ওটা আপনি ভুলে যান। এবারে চলুন ফার্সীতে। সেইটে কিন্তু আসল। ঐ যে আপনার সামনে ফার্সী বই কয়েকখানি রয়েছে তারই যে কোনো একখানা থেকে কয়েক লাইন পড়ুন—প্রথম আপন মনে চুপে চুপে, পরে আমাদের শুনিয়ে। অনুবাদ? না, না, অনুবাদ করতে হবে না। আপনার পড়ার থেকেই তো বুঝে যাবো, আপনি ফার্সী বোঝেন কি না। আর যেটা পড়বেন তার দু-একটা শব্দ আপনার জানা না থাকলে কোনো ক্ষতি নেই। সবাই কি আর সব ফার্সী শব্দ জানে? তাহলে দুনিয়াতে অভিধান লিখত কে, পড়ত কে? তা সে যাক। আমার আর কোনো প্রশ্ন-ট্রশ্ন নেই।'

এবারে ছেলেটার—হ্যাঁ, আমার ছেলের বয়সি—মুখে শুকনো হাসি ফুটলো; একটুখানি ভর্সা পেয়েছে। সেই হ্যামলেটওলা লোকটিও আসলে কিন্তু মানুষ ভালো। পাঁচটা কুশন দুলিয়ে ঠাঠা করে হেসে উঠলেন। বললেন—তাঁরই হ্যামলেটের স্মরণে—'জস্টিস্‌ ডিলেড হয় নি। হা হা, হা হা।'

ছেলেটি সুন্দর উচ্চারণে গড় গড় করে ফার্সী পড়ে গেল। কাশ্মীরী

www.BanglaBook.org

ব্রাহ্মণসন্তান ; এবং পরে দেখা গেল, আরো হিন্দু ওমেদার ছিল। ফার্সী আবহাওয়াতে আপন ঠাকুন্দার কাছে লেখাপড়া শিখেছে। চেয়ারম্যান বললেন, 'আপনি এখন যেতে পারেন!' ছেলেটি সবাইকে মুসলমানী কায়দায় সেলাম জানালে, আমার দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতার একটু শুকনো হাসি হাসতে গিয়ে থেমে গেল—কি জানি ওটা ঠিক হবে কি না, যদি ওতে করে নম্বর কাটা যায়! আমি মনে মনে বললুম 'মারো ঝাড়ু, স্লা নোকরি ওর উসকী ইণ্টারভ্যু পর্।

উহুঁ! এটা শেষ নয়, এটা আরম্ভ মাত্র। ছেলেটির সেলামপর্ব শেষ হওয়ার পূর্বে আমার সঙ্গের দ্বিতীয় স্পেশালিস্টটি বললেন, 'একটু বসুন'—এবং সঙ্গে সঙ্গে আপন পকেট থেকে একটি চিরকুট বের করে তার হাতে দিয়ে বললেন, 'পড়ুন।'

হায় বেচারা ক্যাণ্ডিডেট! ভেবেছিল তার গব্বযন্তনা শেষ হল। এখন এ আবার কি ফাঁসি! বেচারী পর্চাখানির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। স্পেশালিস্ট দশ সেকেণ্ড অন্তর অন্তর গুঁতোচ্ছেন 'পড়ুন। পড়ছেন না কেন?' ছেলেটি হোঁচট ঠোকর খেতে খেতে খানিকটা পড়লো। স্পেশালিস্ট বললেন, 'অনুবাদ করুন।' রাম পাঠা! পড়ার কায়দা থেকেই তো পরিষ্কার হয়ে গেছে যে পাঠ্যবস্তু তার এলেমের বাইরে, তবে স্যাডিস্টের মত মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা কেন?

ছেলেটা নড়বড়ে পায়ে বেরিয়ে গেল।

আমি পর্চাটির জন্য স্পেশালিস্টের দিকে হাত বাড়ালুম। তিনি 'কুছ নহী, কুছ নহী বলে সেটি পকেটে পুরে নিলেন। দুস্‌রা ক্যাণ্ডিডেট এল। এবারে হ্যামলেটের বদলে গ্রে'র কবিতা। সর্বশেষে আবার ঐ অভিনয় সেই পর্চা নিয়ে। আমি স্পেশালিস্টের উদ্দেশে মনে মনে বললুম, 'তুমি ব্যাটা খোট্টা মুসলমান, আম্মো হালা বাঙাল পাঁতি ল্যাড়ে! দেখাচ্ছি তোমাকে।' এবারে ক্যাণ্ডিডেট পর্চাটি যেই ফেরত দিতে যাচ্ছে অমনি, তৈরী ছিলুম বলে, আমি সেটা নিয়ে নিলুম। ওমা! যত পড়ি, আগা-পাস্তালা ঘুরিয়ে দেখি, ততই কোনো মানে ওৎরায় না। ইতিমধ্যে আরেক ওমেদার এসে গেছে এবং চসার না পোণ্ড কি যেন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। আমার দৃষ্টি ঐ পর্চাটির দিকে নিবদ্ধ।

ইয়াল্লা! অব্ সমঝ্‌লেন বা। যে দুলাইন কবিতা ছিল সেটা অনেকটা আমাদের—

হরির উপরে হরি
হরি বসে তায়
হরিকে দেখিয়া হরি
হরিতে লুকায়!

'হরি' শব্দের কটা মানে হয়, আমি সত্যই জানিনে—কান ছুঁয়ে বলছি। কিন্তু ছিঃ। কারো বাংলা জ্ঞানের পরীক্ষা যদি নিতান্তই নিতে হয় তবে এই ধরনের 'জামাই-ঠকানো' কবিতাই কি ন্যায্যতম, প্রশস্ততম!!

কিন্তু এহ বাহ্য।

পরে, অন্তত আমি বুঝতে পারলুম দই খাচ্ছেন কোন্ রমাকান্ত আর বিকার হচ্ছে কোন্ গোবন্দনের?

দু-একটি পাকা মেম্বরও হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন ব্যাপারটা কি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লেখাপড়ায় এক-একটি আস্ত বিদ্যাসাগর বলেই ওঁদের নাসিকায় থাকে সার-মেয়বিনিন্দিত গন্ধসন্ধানী অন্ধিসন্ধি।

ক্যান্ডিডেটের পরে ক্যান্ডিডেট—কেউ ভালো, কেউ মন্দ, কেউ মাঝারি, সংসারে যা হয়—ইণ্টারভ্যু স্বয়ংবরে আমাদের মত ইন্দুমতীর সামনে স্বপ্রকাশ হলেন। কিন্তু সবাই মার খেলেন, ঐ পর্চাটুকুর সামনে, ঐ চিরকুট্‌টি সব্বাই-কার ওয়াটারলু।

ইতিমধ্যে কী আশ্চর্য, কী তিলিস্মাৎ—একটি ওমেদার পর্চাটি পাওয়া মাত্রই সেটি গড়গড়িয়ে পড়ে গেল, আদ্যন্ত! যেন তার প্রিয়ার আড়াইশ' নম্বরী প্রেমপত্র!

* * *

ইণ্টারভ্যু শেষে লাঞ্চ। সরকারী লাঞ্চকে আমি বলি লাঞ্চনা। অবশ্য সর্বোচ্চ মহলে নয়। সেখানে লাঞ্চের অজুহাতে আপনার জন্য পেলেটে করে রোলস্‌-রইস গাড়ি আসতে পারে তন্বঙ্গী পরী-পয়কারী চালিতা। ড্রাই-ভারিশীটি ফাউ, থ্রোন ইন্‌ ফর গুড মেজার!

পালাবার চেষ্টা করার সময় ধরা পড়লুম সেই পঞ্চ-ক্যুশন-মর্দন মহাজনের হাতে! বললেন, 'হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ, আপনাদের ঐ স্পেশালিস্টটি আপন ওমে-দারকে একটু ভালো করে রিহার্সেল করালেন না কেন? ও যদি সাতবার ঢোঁক গিলতো, এগারো বার হোঁচট খেয়ে খেয়ে চিরকুটটির কবিতা পড়তো, তবে হয় তো, আমাদেরও বিশ্বাস জন্মাতো, সে ঐ কবিতাটি ইতিপূর্বে কখনো দেখে নি।'

৩০।৯০।৬৫

অর্থং অর্থং

একটা 'ফরেন'-ওলার কথাই বলি।

ইণ্টারভ্যুতে আমিও ছিলুম। সেই ছাব্বিশ বছরের 'ফরেন'—বাট্‌ ড্যাম কালা আদমী ছোকরাটা তার বাপের বয়সী ওমেদার অধ্যাপককে যা বেহায়া প্রশ্ন শুধোতে লাগলো তাতে আমি স্তম্ভিত। কারণ সেই অধ্যাপকের কিছু কিছু লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। এ যুগে আর কটা হিন্দু ফার্সী শিখে ভারতবর্ষের সাতশ বছরের ইতিহাস অধ্যয়ন করে? ইনি তাদেরই একজন। অথচ ওই 'ফরেন'-পণ্টক ফার্সীর এক বর্ণও জানে না। শুধু ইতিহাসের অধ্যাপক—ঠিক ইতিহাসও নয়, ইণ্ডলজির—বলেই গুণধর বোর্ডে এসেছেন, এবং যে-মোগল ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি নিরেট আকাট, সেই সম্বন্ধে চোখা-চোখা প্রশ্নবাণ ঝাড়ছেন। সেগুলো তৈরি করে নিয়ে এসেছেন গতকাল লাইব্রেরি থেকে, দু'তিনখানা মোগল ইতিহাসের ইংরেজী অনুবাদ পড়ে—প্রধান উদ্দেশ্য, বাদবাকী মেম্বরদের তাক লাগিয়ে দেওয়া। সে সব মেম্বররা এসেছেন অপরাপর য়ুনি থেকে। ফলে সে সব য়ুনিতে তিনি একস্‌টেন্‌শন্‌ লেকচারে নিমন্ত্রিত হবেন, এগ্‌জামিনার হবেন, বহুবিধ কনফারেন্সে নিমন্ত্রিত হবেন, তাঁর প্রিয় ছাত্রের অখাদ্য থীসিসে তাঁরা এক্‌স্‌টারনেল পরীক্ষক হিসেবে

www.BanglaBook.org

ডিটো মারবেন, তিন্নো এ-বাগে তাই করবেন, গয়রহ, ইত্যাদি, এট্‌সেটেরা। কি কি প্রশ্ন শুধিয়েছিলেন, আমার ঠিক মনে নেই, তবে রেডুক্‌ৎসিয়ো আড্‌ আব্‌সুর্ডুমে পরিণত করতে যদি অনুমতি দেন তবে কাল্পনিক দু-একটি পেশ করতে পারিঃ 'আকবর যখন আহমদাবাদ আক্রমণ করেছিলেন তখন সাবরমতী বেয়ে হাওয়া পূর্ব না দক্ষিণ থেকে বইছিল?' 'সিলেটের শাহজলাল মসজিদে পূর্বে যে জালালী কবুতর ছিল তারা এখন চলে যাচ্ছে কোথায়?'

এবং এমনই খাজা ইংরিজী উচ্চারণে যে আমি একবার দু'প্রশ্নের ফাঁকে তাঁকে কানে কানে বললুম, 'I am glad. Oxbridge has not been able to damage your original pronunciation.'

আমি সবিনয়ে নিবেদন করছি, আমি সে অধ্যাপককে বাঁচাতে পারি নি। সেই প্রাচীন গল্প তা হলে আবার বলি। বার্নার্ড শ'র একটি নাট্য করে থিয়েটার থেকে গম্‌ গম্‌ করে তুলে ধরেছে, দ্রষ্টাদের সপ্রশংস চিৎকার, 'নাট্যলেখককে স্টেজে বেরুতে বলো, আমরা তাকে দেখব।' শ' এলেন। মিনিট পাঁচ ধরে চললো তুমুল হর্ষরব, করতালি যাবতীয়। সবাই যখন শান্ত হলেন, এবং শ তাঁর ধন্যবাদ জানাবার জন্য মুখ খুলতে যাবেন এমন সময় সর্বশেষ সস্তা গ্যালারি থেকে একটা আওয়াজ এল 'বু বু বু বু'! শ' ওই দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ব্রাদার, ঠিক বলেছ ; এ নাটাটা রদ্দী। কিন্তু তোমাতে-আমাতে, মাত্র দুজনাতে, এই শত শত লোকের পাগলামি ঠেকাই কি করে!'

* * *

তার পরই আমি বিদেশে চলে যাই। না, স্যর! Sorry, কোনো সোভিয়েট, মার্কিন, বার্লিন ডেলিগেশনে নয়। তা সে যাক্‌। ফিরে এসে বোম্বায়ে আমার বন্ধু প্রসাদদাস মানিকলাল শুক্লের বাড়িতে উঠলুম। ওই অক্‌সব্রিজওলার কথা কি করে উঠলো জানি নে, কারণ লেখাপড়ির ব্যাপারে আমরা charleton-ধাপ্পা-বাজদের নিয়ে কখনো আলোচনা করতুম না।

শুক্ল বললে, 'সে বড় মজার ব্যাপার। তোমার ওই ব্রাদার চৌধুরী শনৈঃ শনৈঃ উঠতে লাগলেন খ্যাতির শিখর পানে। আজ এই কলেজে, কাল অন্য য়ুনিভার্সিটিতে—আস্ত একটা হনুমানের মত চড় চড় করে পদোন্নতির অশত্থ গাছের মগ-ডালে, বয়েস পঁয়ত্রিশ পেরুতে না পেরুতে। ইতিমধ্যে তাঁর নিজস্ব উম্‌দা গ্যোবেল্‌সী শানাই তাঁর গুণের রাগ-রাগিণী বাজাতে বাজাতে এটাও জাহির করেছে যে, ওই চৌধুরী স্বচেষ্টায় ফরাসী, জর্মন, রুশ গয়রহ ভাষাও আয়ত্ত করে ফেলেছেন।'

শুক্ল ফিক করে একটুখানি হেসে বললে, 'সে বড় মজার। তোমার ওই চৌধুরীর তখন এমনই আস্পদ্দা বেড়ে গেছে যে, সে ছ্যাঁৎ দিলে বুর্নফের একটি অচলিত ছোট লেখার অনুবাদ ইংরিজীতে—চীটিং বই, রশ্যর বলতে পারো। আসলে সে সেটা করেছিলো এক আনাড়ি ছোকরার সাহায্যে, যার ফরাসী জ্ঞান ছিল অত্যন্ত কাঁচা—কিন্তু ছোকরা ধাপ্পা মারতে জানতো চৌধুরীর চেয়েও দুই বাঁও বেশী।'

শুক্ল বললে, 'ওঃ! সে বই নিয়ে এ দেশে কী তুলকালাম, ফাঁ ফাঁর! অবশ্য তার চোদ্দ আনার উৎপত্তি চৌধুরীর গ্যোবেল্‌লী কলসী থেকে। এবং

www.BanglaBook.org

এখনো এ দেশের লোকের বিশ্বাস এ রকম অনুবাদ হয় না। মাত্র দু একটি প্রাণী জানে যে, কি করে যেন ওই অনুবাদ প্যারিসে পৌঁছে গেলে তাদের এক পত্রিকায় বেরোয়—"The originality of the translator has come out with extraordinary success in those passages where he has failed to understand the original!" অবশ্য তাতে করে চৌধুরীর রত্তিভর লোকসান হয় নি, কারণ এই ফরাসীতে লেখা সমালোচনা—তাও প্রকাশিত হয়েছে পণ্ডিতীয়া কাগজে—এই দেশে পড়ে কটা লোক! তা সে যাক।

ইতিমধ্যে এ-দেশে একটি পোলিটিশিয়ানের প্রাণ হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলো জননী ভারতের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করার জন্য। আসলে তুমি তো জানো, এ সব নির্জলা ব্লাফ্। ভদ্রলোক চান, তিনি যেন 'কল্‌চর'-জগতেও সম্মানিত হোন। অবশ্য পরের হাত দিয়ে তামাক খেয়ে। সেই "পরে"রও অভাব হল না। এ অঞ্চলের শেঠীয়াদের টাকের ঠিক জায়গায় হাত বুলোতে পারলে গৌরীশঙ্করের শিখরে মরুদ্যান নির্মাণের জন্যও পিল পিল করে টাকা বেরিয়ে আসে।

তারপর শ্যানায় শ্যানায়[১] কুলোকুলি। তোমার এই প্যারা চৌধুরী—'

আমি বললুম, 'শট্ অপ্।'

'আহা, চটো কেন? তারপর সাড়ম্বর স্থাপিত হল, "জম্বুদ্বীপ-সমন্বিতা সমুদ্র—" যাক্‌গে যাক, আমার নামটা ঠিক মনে নেই, ওই "কল্‌চর" "মলচর" নিয়ে কি যেন একটা প্রতিষ্ঠান, আর চৌধুরী হলেন তার "সর্বাধিকারী" "মহাস্থবির" না কি যেন একটা।...কিছুদিন পর—ইতিমধ্যে অবশ্য প্ল্যান মাফিক দু-দশখানা ভালো-মন্দ-মাঝারি "কলচরল" বই "জম্বুদ্বীপসমন্বিত—" দুচ্‌ছাই আবার ভুলে গেলুম প্রতিষ্ঠানের নামটা—বই বেরিয়েছে। সর্বাধিকারী চৌধুরী প্রতিষ্ঠানের কর্তাকে বোঝালেন—

(ক) ঋগ্বেদের যে সব অনুবাদ গত এবং এই শতকে ইংরিজী-বাংলা-ফরাসী-জর্মনে বেরিয়েছে, সেগুলো ইতিমধ্যে বিলকুল বেকার ঔট অব্ ডেট হয়ে গিয়েছে, (খ) একটি নূতন অনুবাদ দরকার, (গ) সেটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে হলে বড় বড় পণ্ডিতদের সাহায্য নিতে হবে, (ঘ) এবং তাঁদের দক্ষিণা এবং ছাপা বাবদ লাগবে আশী হাজার টাকা।'

আমি তাজ্জব মেনে বললুম, 'কি বললে, আশী হাজার টাকা? বলো কি!

'বিলক্ষণ! আশী হাজার টাকা! ব্যাপারটা হল গিয়ে, ওই যে প্রতিষ্ঠাতা পলিটিশিয়ান কল্‌চরড্ হতে চান, তিনি শেয়ারবাজার, টেন্ডর-টেন্ডর থেকে ওমরা তুলো, শিবরাজপুর মেঙ্গানীজ সব বোঝেন, কিন্তু—কিচ্ছু বড় বড় পণ্ডিতদের তেজীমন্দী বাবদে বিলকুল না-ওয়াকিফহাল। ঢেলে দিলেন টাকাটা। তার পর বেরুতে লাগল কিস্তিতে কিস্তিতে বেদের নবীন ইংরিজী অনুবাদ! যে রকম আমাদের হরিবাবুর বাংলা কোষ বেরিয়েছিল। উত্তম প্রস্তাব! কিন্তু, ব্রাদার,

---

১ 'চলন্তিকা' বলেন 'সজ্ঞান' থেকে সেয়ানা। বড়বাবু বলেন, শোনদৃষ্টি রাখে যে জন তার থেকে শেয়ানা, শ্যানা।

www.BanglaBook.org

নিরবচ্ছিন্ন শান্তি এই দগ্ধ সংসারে কোথায়? হঠাৎ পুণার এক পণ্ডিত আমাদের কল্‌চর-প্রতিষ্ঠাতার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে অনুবাদের খুনিয়া খুনিয়া সব ভুল দেখাতে লাগলেন। যেমন মনে করো—কথার কথা কইচি, আমি তো ওখানে ছিলুম না—"রবিকর" অনুবাদে হয়েছেন, "সূর্য যে খাজনা দেন" কিংবা "রাজকর" অনুবাদে হয়েছেন "রাজা যে রশ্মি দেন"।...এ রকম বিদকুটে বরবাদ অনুবাদ কেন হল কিছুই বোঝা গেল না। সামান্যতম বৈদিক ভাষা যে জানে সেও তো এরকম ভুল করবে না। হ্যাঁ, আলবৎ, 'ক্রন্দসী' 'রোদসী' ধরনের অচলিত শব্দ নিয়ে সাতিশয় সাধু মতান্তর হতে পারে, কিন্তু এ ধরনের আকাট, বর্বর—? রহস্যটা তবে কি?'

আমিও সায় দিয়ে বললুম, 'রহস্যটা তবে কি?'

'ওই কল্‌চরকামী প্রতিষ্ঠাতা বেদবেদান্ত বাবদে বেকুব হতে পারেন, কিন্তু তিনি "ইঁদুরের গন্ধ পান"—শয়তানীর শ্বাস পান। নইলে সাদা-কালো-গেরুয়া বাজার কনট্রোল করছেন বৃথাই। তিন দিন যেতে না যেতে স্বয়ং চৌধুরীই এসে যা বললেন তার থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, তিনি কি ভারতীয়, কি ফরাসী, কি ইংরেজ, কি জর্মন কোনো পণ্ডিতকেই অনুবাদ-কর্মে নিযুক্ত করেন নি। তাবৎ কর্ম করিয়েছেন একটি দুঃস্থা জর্মন রমণীকে দিয়ে। সে বেচারী সংস্কৃতের এক বর্ণ জানে না—বেদের ভাষা মনোজের ভাষায় কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে! সে স্রেফ জর্মন পণ্ডিত গেল্টনার-কৃত কয়েক বৎসর পূর্বে প্রকাশিত বেদের অনবদ্য জর্মন অনুবাদ ইংরিজীতে অনুবাদ করে গেছে। মেয়েটি ভালো জর্মন জানে বটে, কিন্তু তার ইংরিজী কাঁচা। কিন্তু সেইটেই মূলতত্ত্ব নয়। আসল বিপদ হয়েছে, বেদের অনেক বস্তু অস্পষ্ট, রহস্যময়, দ্ব্যর্থক কেন—বহু অর্থসূচক। সেগুলো জর্মন পণ্ডিত গেল্টনারও করেছেন সন্তর্পণে, 'আবছা-আবছা রেখে—যেন সান্ধ্যভাষায়। এ নারী তাই তার অনুবাদে—আদৌ সংস্কৃত জানে না বলে—রবিকর, রাজকর, নরকর, হাতীর কর (কথার কথা কইচি!) গুবলেট করে বসেছে। তখন পরিষ্কার হল রহস্যটা।

'তস্য বিগলিতার্থ, চৌধুরী দশ-বিশজন পণ্ডিত লাগিয়ে, তাদের ন্যায্য দক্ষিণা দিয়ে অনুবাদ করান নি। মেমসাহেবকে দিয়ে কম্মটি করিয়ে নিয়েছেন।

'আরো, অর্থাৎ—এবং সেখানেই অর্থ', মেমসাহেবকে তিনি দিয়েছেন এক হাজার টাকা, ছাপার খরচা বাদ দিয়ে তিনি পকেটস্থ করেছেন সত্তর হাজার টাকা! হল?'

* *

চৌধুরী এখন ফট্‌কা-বাজারে ভালো পয়সা কামায়।

৬।১১।৬৫

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অদ্যাপিও সেই খেলা খেলে গোরা রায়।
মধ্যে মধ্যে ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

এই 'দেশ' পত্রিকাতেই আমার এক সতীর্থ কিছুদিন পূর্বে 'ফরেন ডিগ্রী'-ধারীর দম্ভের প্রতি ক্ষণতরে ঈষৎ ভ্রূকুটিকুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মর্মঘাতী আপন মূল বক্তব্যে চলে যান। হয়তো সে-স্থলে এ বিষয় নিয়ে সবিস্তর আলোচনা করার অবকাশ ছিল না, অর্থাৎ তিনি শেখ চিল্লীর মত মূল বক্তব্যের লাভ এবং ঈষৎ অবান্তর বক্তব্যের ফাউ দুটোই হারাতে চান নি।

ওঃ! গল্পটি বোধ হয় আপনি জানেন না, কারণ শেখ চিল্লী জাতে খোট্টা এবং বাঙলা দেশে কখনো পদার্পণ করেন নি। যদ্যপি শ্রীযুক্তা সীতা এবং শান্তা এবং খুব সম্ভব তাঁদের অগ্রজও মিয়া শেখ চিল্লীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন উপকথার মারফতে—স্বর্গত রামানন্দের পরিবার যে খোট্টাই দেশে বাল্যকাল কাটিয়েছেন সে কথা আগে জানা না থাকলেও তাঁর শতবার্ষিকী উপলক্ষে লিখিত প্রবন্ধাদি পড়ে বহু বাঙালীই জেনে গিয়েছেন। কিন্তু এস্থলে আমার যে গল্পটি স্মরণে এল সেটি বোধ হয় তাঁরা ইতিপূর্বে সবিস্তর বয়ান করে আমাকে পরবর্তী যুগের 'চোর' প্রতিপন্ন করার সুব্যবস্থা করে যান নি—এই ভরসাতেই সেটি উল্লেখ করছি। করে গেলেও ঝুটমুট 'ঝেপবার' ভয় নেই—কারণ গল্পটি ক্লাসিক পর্যায়ের, অর্থাৎ এর বিষয়-বস্তু সর্বসাধারণের কার্যকলাপে নিত্য নিত্য সপ্রকাশ হয় বলে এটি নিত্য-দিনের ব্যবহার্য গল্প।

মা সরস্বতীর বর পাওয়ার পূর্বে কালিদাস যে আক্কেল-বুদ্ধি ধারণ করতেন, হিন্দী-উর্দু ভাষীদের শেখ চিল্লীও সেই রকম আস্ত একটি 'পণ্টক' ('কণ্টক' থেকে 'কাঁটা', সেই সূত্রানুযায়ী 'পণ্টক' থেকে কি উৎপন্ন হয় সে তত্ত্ব সুচতুর পাঠককে বুঝিয়ে বলতে হবে না; আসলে এই গূঢ় তত্ত্বটি আবিষ্কার করার ফলেই শ্রীযুত সুনীতি চট্টো অস্মদ্দেশীয় শব্দতাত্ত্বিকদের পঙ্‌ক্তিতে আপন তখ্‌ৎ-ই-তাউসে গ্যাঁট হয়ে বসবার হক্‌ কব্জা করেন)।

সেই শেখ চিল্লীকে তাঁর মা হাতে একটি বোতল আর পয়সা দিয়ে বাজার থেকে তেল কিনে আনবার আদেশ দিলেন এবং পুত্রের পেটে কি পরিমাণ এলেম গজগজ করছে সেটা জানতেন বলে পইপই করে স্মরণ করিয়ে দিলেন, আসল তেলটা পাওয়ার পর সে যেন ফাউ আনতে না ভোলে। শেখ চিল্লী এক গাল হেসে বললেন, 'তা-ও কখনো হয়!'

আমি জানি, আজকের দিনের পাঠক কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না যে, কোনো জিনিসের দাম বাজারে কস্মিনকালে কখনো কমে। কিন্তু করতেই হবে, এই হালের সুকুমার রায়ের যুগেও 'বাড়তি' 'কমতি' ছিল—এমন কি বয়সের বেলাও। আমি যে যুগের বয়ান দিচ্ছি সেটা তারও বহু পূর্বেকার। তাই মিয়া চিল্লীর আম্মাজানের অজানতেই বাজারে তেলের দর হঠাৎ কমে গিয়েছিল! হয়তো কোনো 'রাধা'কে নাচবার জন্য নবাব সাহেবের 'ন মন তেলে'র প্রয়োজন হওয়াতে তিনিও শায়েস্তা খানের মত তেলের দর সস্তায় বেঁধে দিয়ে বাজার শায়েস্তা করেছিলেন। সেটা এ যুগের 'সন্দেশ' শায়েস্তা করতে গিয়ে স্বহস্তে স্বপৃষ্ঠে ভূতের কিল খাওয়া নয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তা সে যা-ই হোক্, তেল সস্তা হয়ে যাওয়ার দরুন মূল তেলেই বোতল কানায় কানায় ভরে গেল। শেখ চিল্লীর ঘটে বুদ্ধি কম ছিল সত্য কিন্তু তার স্মৃতিশক্তিটি আমাদের 'দাদখানী তেল, মসুরির বেল'-এর মত ছিল না। তিনি দোকানীকে বললেন, 'ফাউ?'

দোকানী বললে, 'কী আপদ, বোতলে জায়গা কোথায়?'

শেখ বললেন, 'বটো! চালাকি পেয়েছ? এই তো জায়গা।' বলে তিনি বোতলটি উপুড় করে বোতলের তলার গর্তটি দেখিয়ে দিলেন। মোর মাগডেলেন যে খৃষ্টের পদদ্বয় তৈলাক্ত করেছিলেন সেটাকেও হার মানালেন শেখ—অবশ্য স্বহস্তে। দোকানী মুচকি হেসে সেই গর্তটি এক কাঁচ্চা তেল নিয়ে ভরে দিয়ে শেখের ফাউয়ের খাঁইও ভরে দিল।

বোতলটি অতি সন্তর্পণে 'স্টাটুস কুয়ো' বজায় রেখে ধরে ধরে শেখ বাড়ি পৌঁছে আকে বললেন, 'এই নাও আম্মা, তোমার ফাউ।' তারপর বোতলটি উল্টে খাড়া করে ধরে বললেন, 'আর ভিতরে তোমার আসল।'

আম্মা-জানের পদদ্বয় অবশ্য খৃষ্টের তুলনায় অল্পই অভিষিক্ত হল।

* * *

দেশ থেকে যে বোতলটি নিয়ে এ-দেশের ছাত্র বিদেশে বিদ্যার তেল—না ভুল বললুম, ডিগ্রীর তেল কিনতে যায়, সেটি নিয়ে সে কোন্ শেখ চিল্লীর মত কি বেসাতি করে সে তত্ত্বটি অনেকেরই জানা নেই। না জানারই কথা, কারণ ইংরেজ আমলের পূর্বে এ-দেশে কখনো এই 'ফরেন' ভূতের উপদ্রব হয় নি। মুসলমান আমলে কি হয়েছিল সেটা পরের কথা। তার পূর্বে কোনো ভারত-সন্তান 'ফরেন' ডিগ্রির জন্য কামচাটকা থেকে কাসাব্লাংকা কোথাও গিয়েছে বলে শুনি নি। তবে জাতক পড়লে পাই, ঐ যুগে তক্ষশিলা ছিল বৌদ্ধজ্ঞানবিজ্ঞান-চর্চার কেন্দ্র এবং বারাণসী ছিল সনাতন ধর্ম-জ্ঞানবিজ্ঞান-চর্চার জন্য সর্বপ্রসিদ্ধ তীর্থ। তাই জাতকের একাধিক গল্পে পাই, বৌদ্ধ কিংবা বৌদ্ধভাবাপন্ন বারাণসী গৃহী পুত্রকে তক্ষশিলায় বিদ্যার্জনের জন্য পাঠাতেন। তদ্রূপ কাশী সর্বকালেই সনাতন ধর্ম ও জ্ঞানবিজ্ঞানের কেন্দ্রভূমি থাকা সত্ত্বেও হয়তো বিক্রমাদিত্যের যুগে সারা-ভারতের কোনো কোনো অঞ্চল থেকে কিছু ছাত্র উজ্জয়িনীতে বিদ্যাভ্যাস করতে গিয়েছে।

মুসলমান আমলে রাজকার্য তথা জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা ফার্সীতে হত। (বৌদ্ধধর্ম লোপ পাওয়ার ফলে বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো লোপ পায়, কিন্তু কাশী ও পরবর্তী যুগে বৃন্দাবনে হিন্দুশাস্ত্র চর্চার ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল এবং এখনো আছে।) কিন্তু ফার্সী যদিও পারস্যের ভাষা, তবু এ দেশের কোনো ফার্সী শিক্ষার্থী তেহরান বা মেশেদ শহরে ফার্সী শিখতে যেত না। ধর্ম-চর্চার জন্য ছাত্রেরা পড়তো আরবী, কিন্তু তারাও মক্কা, মদিনা বা কাইরোতে গিয়ে 'ফরেন' ডিগ্রী নিয়ে আসতো না। অবশ্য কোনো কোনো ছাত্র এ দেশে পাঠ সমাপন করে মক্কায় গিয়ে হজ্ করার সময় তাঁরা চতুর্দিকে যে পাণ্ডিত্য-পূর্ণ বক্তৃতা দেওয়া হয়, সেগুলো শুনে নিতেন। অধীনের মাতামহ তাই করে-ছিলেন।

বিদেশে না যাওয়ার কারণ এ-দেশেই আরবী-ফার্সীর মাধ্যমে উত্তম জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ব্যবস্থা ছিল। এবং পাঠান-মোগল যুগেও কাবুল, কান্দাহার বা

www.BanglaBook.org

মজার-ই-শরীফে কোনো বড় কেন্দ্র গড়ে ওঠে নি—উঠেছিল দেওবন্দ, রামপুর, সুরট অঞ্চলের রাঁদেরে, হায়দ্রাবাদে, ঢাকায়, সিলেটে। বস্তুত কাবুল অঞ্চলের মেধাবী ছাত্র মাত্রই আমানুল্লার আমল পর্যন্ত দিল্লী অঞ্চলেই পড়াশুনো করতে আসত। আমি কাবুলে যাই ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে। তখন যে কয়টি আরবী-ফার্সীজ্ঞ পণ্ডিতের সঙ্গে সেখানে আমার আলাপ-পরিচয় হয় তাঁরা সকলেই উর্দুও জানতেন, কারণ সকলেই বিদ্যাভ্যাস করেছিলেন ভারতে। ঠিক যে রকম বৌদ্ধ যুগে চীনা তথা অন্যান্য বৌদ্ধধর্মাবলম্বী শ্রমণরা এদেশে শিক্ষালাভের জন্য আসতেন, এখনো অল্পবিস্তর আসেন।

এমন কি, যে কাইরোর আজহর বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় এক হাজার পনরো বছর ধরে ধীরে ধীরে মুসলিম শাস্ত্রচর্চার সর্বশ্রেষ্ঠ সর্ববৃহৎ সর্বাপেক্ষা বিত্তশালী কেন্দ্ররূপে স্বীকৃত হয়েছে, সেখানেও ভারত থেকে কখনো খুব বেশী ছাত্র যায় নি। আমি যখন (১৯৩৪-৩৫) কাইরোতে ছিলুম তখন পাক (বর্তমান) ভারত উভয়ে মিলিয়েও ত্রিশ-পঁয়ত্রিস জনারও বেশী ছাত্র ছিল না। পক্ষান্তরে, সেখানে আরবী দর্শনের যে পাঠ্যপুস্তক সম্মানিত ছিল, সেটি জনৈক ভারতীয় মৌলানা দ্বারা লিখিত।

এস্থলে সম্পূর্ণ অবান্তর নয় বলে উল্লেখ করি, সাতশ বছর আরবী-ফার্সীর কঠিন একনিষ্ঠ সাধনা করে ভারতীয় মৌলবীরা জ্ঞানবিজ্ঞান ধর্মচর্চায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন সত্য, কিন্তু আরবী দূরে থাক, ফার্সী সাহিত্যেও কোনো কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। তার একমাত্র কারণ মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোনো ভাষায় সাহিত্যের কুৎবুমিনার গড়া অসম্ভব। তাই যখন দেখি, মাত্র একশ বছর ইংরেজী চর্চার পর এদেশে কেউ কেউ সে সাহিত্যে চিপি তৈরি করে ভাবছেন সেটি মিনার তখন বড়ই বিস্ময় বোধ হয়। তাঁরা কি সত্যই ভাবেন, সেই সাতশ বছরের তাবৎ গুণীজ্ঞানীরা—এবং তাঁরা রাজার্থানুকূল্য পেয়েছিলেন চেরাপুঞ্জির বর্ষণের চেয়েও বেশী—এঁদের তুলনায় অতিশয় কুক্কুট-মস্তিষ্কধারী ছিলেন? তাই যখন দেখি র‍্যাঁবোর বদলে হ্যাঁবো—তা হলে 'rare' অর্থাৎ 'বিরল' হবে 'হ্রাহ্র', France হবে ফ্হাঁস এবং যেখানে 'র' অক্ষরের সঙ্গে উ-কার যুক্ত, যেমন 'প্রুস্ত', সেখানে গতি কি? কারণ 'প'র নিচে 'হ' তারও নিচে উ-কার দিয়ে তৈরি কোন 'হাঁসজারুই' (হাঁস+সজারু+রুই) জাতীয় অক্ষর তো বাংলা ছাপাখানায় নেই—তখন শুরু সবিনয় সকাতর সভয়ে প্রশ্ন শুধোতে ইচ্ছা করে, 'আপনারা তরুণরা, যে নানাবিধ ভাষা শিখেছেন সেটা বড়ই আনন্দের কথা, কিন্তু একবার একটু ভেবে নিলেই তো হয় যে মাইকেল, জ্যোতি ঠাকুর, বীরবল, ধ্বনিবিদ সুনীতি চট্টো, শহীদুল্লা এঁরা কেউই এই বিদকুটে ফরাসী 'র' ধ্বনি যে আলাদা সেটা লক্ষ্য করলেন না, এটা কি প্রকারে সম্ভবে?' এবং শেষ নিবেদন—জানি আপনারা পেত্যয় যাবেন না, ফরাসী জর্মন এমন কি ইংরাজি r-ও বাঙলা 'র'-এর মত নয় সেটা সত্য, কিন্তু তাদের 'r'-এর সঙ্গে যে আমাদের 'র' মিলছে না সেটা আমরা 'র'-এর উচ্চারণ করার সময় মুখ গহ্বরের অন্য জায়গা থেকে করি বলে নয়—তাদের আপত্তি আমরা 'r' উচ্চারণের সময়ে সেটিকে 'ট্রিল' করি বলে, অর্থাৎ আমরা যখন বলি 'পারি' (প্যারিস) তখন ফরাসী শুনতে পায় যেন আমরা 'র'-টা তিনবার উচ্চারণ করে বসে আছি। বিচক্ষণ ফরাসী গুরু তদ্দণ্ডেই বলেন,

www.BanglaBook.org

'কিন্তু মসিয়ো, Paris শব্দে মাত্র একটি "r", আপনি তিনটে 'r' উচ্চারণ করলেন যে?' আমি আরো জানি—আপনারা আরো পেত্যয় যাবেন না যদি বলি, ফরাসী জর্মন উভয় অভিনেতাই [এবং উচ্চারণের ক্ষেত্রে ধ্বনিবিদ্ পণ্ডিতের চেয়ে এঁরাই সর্বসাধারণের কাছে অধিকতর সম্মান লাভ করেন—ইংলণ্ডেও বার্নার্ড শ-কে যে বি বি সি উচ্চারণ-বোর্ডে সসম্মানে নিমন্ত্রণ করা হত তার কারণ তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি নয়, নাট্যে উচ্চারণ বাবদে তাঁর ওয়াকিবহালত্ব]। চেষ্টা করেন বাঙালীর 'র'-র মত আপন 'r' উচ্চারণ করতে!!!—কিন্তু ট্রিল না করে! অর্থাৎ জর্মনে যাকে বলে হ্যাল[১]—উজ্জ্বল, ফরাসীতে যাকে বলে ক্লার—ক্রিয়ার, পরিষ্কার, স্বচ্ছ 'r' উচ্চারণ করাটাকে আদর্শ 'r' উচ্চারণ মনে করেন। তাই মোটামুটি ভাবে বলা যায় ফরাসী বা জর্মন এমন ইংরিজী 'r' উচ্চারণ করার সময় যদি জিভটাকে মুখের ভিতর ঝুলিয়ে রেখে—অর্থাৎ সেটাকে তালু, মূর্ধা বা দাঁতের পিছনে ছুঁতে না দিয়ে, এবং কাজে কাজেই কোনো প্রকারের ট্রিল বা ফ্ল্যাপ করবার সুযোগ না দিয়ে—বাঙলা 'র' ধ্বনি উচ্চারণ করা হয় তবে ঐ তিন ভাষার ধ্বনিবিদ্ পণ্ডিতরাই আদর্শ 'r' উচ্চারিত হয়েছে বলে মনে করেন। তার পর অবশ্য যদি কেউ সেটাকে খাঁটি প্যারিসিয়ান করতে চান তবে সেটা গলা থেকে আরবী 'গাইন' ঘেঁষা করবেন, দক্ষিণ-ফ্রান্সের মত করতে হলে ফার্সী 'খে' ঘেঁষা করবেন এবং জর্মন বলার সময় কলোন-বন্ অঞ্চলের 'r' উচ্চারণ করতে হলে সেটাকেও ঐ ফার্সী 'খ' ঘেঁষা করবেন। কিন্তু সর্বক্ষণ সাবধান থাকতে হবে যে, ট্রিলিং দুষ্কর্মটি যেন করা না হয়। বীরভূম অঞ্চলে যখন 'রাম'-এর পরিবর্তে 'আম' উচ্চারণ শোনা যায় তখন ঐ ট্রিলটি করা হয় না বলে—এবং রেড়ুকর্ৎসিয়ো আড্ আব্সুর্ডুম হয়ে যাওয়ার ফলে 'r' এর সর্বনাশ হয়ে 'অ' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। ইংরিজীতেও তাই, কিংবা প্রায় তাই হয়—যখন 'r' কোনো স্বরবর্ণের পরে আসে। যথা 'hard'; এস্থলে 'r' শুধু আগের a-টিকে দীর্ঘ করে। 'r'-এর পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনধর্ম লোপ পায় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে বলে কোনো কোনো ধ্বনিবিদ্ উচ্চারণ দেখাবার সময় তাই 'r' হরফটি উল্টো করে দিয়ে লেখেন এবং ছাপাখানায়ও হরফটি উল্টো করে ছাপা হয়—লাইনো বা টাইপ-রাইটারে অবশ্য সেটা সম্ভব নয়। আর 'r' বলার সময় যদি বাঙলার মত সেটাকে ট্রিল করতে চান, তবে প্রাণভরে করা যায় ইতালির 'r' উচ্চারণ করার সময়। ইংরিজীতে যে স্থলে 'Irregular' বলার সময় প্রথম যে দুটো 'r' একসঙ্গে এল, সে দুটোকে দু'বার উচ্চারণ করতে তো দেয়ই না, একবারই—বাঙলার হিসেবে—প্রাণভরে করতে দেয় কই? সেখানে ইটালিয়ান 'birra' (বিয়র) বলার সময় যদি 'r'টা প্রেমসে ট্রিল না করেন কম-সে কম দুবার—তবে বিয়ারের বদলে সেই যে ফুটোয় ভর্তি একরকম পনির হয়, বেয়ারা তারই ফুটোগুলো শুধু প্লেটে করে হয়তো নিয়ে আসবে! এবং শেষ কথাঃ ফরাসী জর্মন ধ্বনিবিদ্ যে তাঁদের 'r' পরিষ্কার ক্লার হ্যাল উজ্জ্বল

---

১ কথাটা জর্মনে hell, কিন্তু বাঙলায় আমি 'হেল' না লিখে হ্যাল কেন লিখলুম সে বিষয় নিয়ে সুদূর ভবিষ্যতে আলোচনা করবার আশা রাখি। কারণ জনৈক পত্রলেখক ইা৮কে আমার 'হিমালয়ান ব্লাণ্ডার' পর্যায়ে ফেলেছেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাখতে চান, তার অন্যতম কারণ, গ্রীক এবং লাতিনে যে 'r' আছে সেটা সংস্কৃত 'র'-এরই মত পরিষ্কার উজ্জ্বল—এবং জানা-অজানাতে ইয়োরোপীয় পণ্ডিত মাত্রই গ্রীক-লাতিন থেকে খুব দূরে চলে যেতে চান না। (এরই উদাহরণ 'গুডবাই, মিঃ চিপ্‌স্‌' ফিল্মে আছে।)

সত্য জ্ঞানলাভের জন্য তৃষ্ণার্ত জন যুগে যুগে বিদেশে গিয়েছে, বিধর্মীর কাছে গিয়েছে। পয়গম্বর বলেছেন, 'জ্ঞানলাভের জন্য যদি চীন যেতে হয় তবে সেখানে যেয়ো'—বলা বাহুল্য, তাঁর আমলে চীন দেশে কোনো মুসলমান ছিলেন না এবং তাই ধরে নিতে পারি বিধর্মী 'কাফেরে'র কাছ থেকে জ্ঞানসঞ্চয় করতেও তিনি আপত্তিজনক কিছু পান নি।

কিন্তু এই যে 'ফরেন' যাওয়ার হিড়িক আরম্ভ হল প্রায় শ'খানেক বছর আগে এবং স্বরাজ পাওয়ার পর—কিমাশ্চর্যমতঃপরম্‌—এখনো বাড়তির দিকে, তার বেশীর ভাগই ছিল 'ইস্টাম্বো' নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে—পেটটাকে এলেমে ভর্তি করার জন্য নয়। পাঠান এবং মোগল রাজারা এ দেশেই বাস করতেন, এইটেই তাঁদের মাতৃভূমি, কাজেই বিদেশের ইস্টাম্বোর প্রতি তাঁদের কোনো অহেতুক মোহ ছিল না—যদিও বিদেশাগত হুনুরী গুণীকে তাঁরা আদর করে দরবারে স্থান দিতেন। কিন্তু ইংরেজ কলকাতায় বসেও চোখ বন্ধ করে তাকিয়ে থাকতো লণ্ডনের দিকে, Kedgeree ('কেজরীঃ—খিচুড়ি—কৃশর, কৃশরান্ন ?—) খাওয়ার সময় চিন্তা করতো আল্লায় মালুম কিসের!

অতএব সেখানে থেকে যদি কপালে একটি 'ইস্টাম্বো' মারিয়ে নিয়ে আসা যায় তবে পেটে আপনার এলেম গজ্‌গজ্‌ করুক আর নাই করুক, আপনি 'ফ্রেশ ফ্রম্‌ ক্রিস্টিয়ান হোম', আপনিও এখন গোরা রায়। তাই স্বরাজ লাভের পরও।

অদ্যাপিও সেই খেলা খেলে গোরা রায়।
দিবাভাগে মন্দ ভাগ্যে তার মার খায়॥

৯৬।১০।৬৫

সাবিত্রী

দক্ষিণ ভারতের একটি সানাটারিয়ামে আমার এক বন্ধুকে নিয়ে যেতে হয়েছিল। ব্যামো গোড়াতেই ধরা পড়েছিল বলে কেস্‌ খারাপ হতে পায় নি। আমাকেও তাই কোন প্রকারের সেবা-শুশ্রূষা করতে হত না। হাতে মেলা সময়। তাই কটেজে কটেজে—এ-সব কটেজে থাকে অপেক্ষাকৃত বিত্তশালীরা, আর বিরাট বিরাট লাটের একাধিক জেনারেল ওয়ার্ড তো আছেই। ডাক্তাররা সকালবেলা-কার রোগী-পরীক্ষার রোঁদ সেরে বেরিয়ে যাবার পরই আমি বেরুতাম আমার রোঁদে। বেচারাদের অধিকাংশকেই দিনের পর দিন একা একা শুয়ে শুয়ে কাটাতে হয় বলে কেউ তাদের দেখতে এলে সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুখ যে কী রকম খুশীতে উজ্জ্বল—এবং যে-ক'টি ফোঁটা রক্ত গায়ে আছে, সব ক'টি মুখে এসে যেত বলে রাঙা—হয়ে যেত, সেটা সত্যই অবর্ণনীয়।

করে করে প্রায় সব্বাইকেই আমি চিনে গিয়েছিলুম—তরুণ-তরুণী

www.BanglaBook.org

যুবক-যুবতীই বেশী।

একটি কটেজে আমি কখখনো যাই নি, ডাক্তার ভিন্ন আর কাউকে কখনো যেতেও দেখি নি। রোগীর পাশে সর্বক্ষণ দেখা যেত একটি যুবতী—বরঞ্চ তরুণী ঘেঁষা যুবতী বললেই ঠিক হয়—মোড়ার উপর বসে উলের কাজ করে যাচ্ছেন ; তাই বোধ হয় কেউ তাঁদের বিরক্ত করতে চাইতো না।

একদা রোঁদ শেষে, পথিমধ্যে হঠাৎ আচমকা বৃষ্টি। উঠলুম সেই কটেজ-টাতেই।

যুবতীটি ধীরে ধীরে মোড়া ছেড়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে অতি ক্ষীণ ম্লান হাসি হেসে বললেন, 'আসুন, বসুন। কী ভাগ্য বৃষ্টিটা নেমেছিল। নইলে আপনি হয়তো কোনদিনই এ কটেজে পায়ের ধুলি দিতেন না।'

কী মিষ্টি গলা! আর সৌন্দর্যে ইনি রাজরানী হওয়ার উপযুক্ত। কিন্তু সে কী শান্ত সৌন্দর্য! গভীর রাত্রে, ক্ষীণ-চন্দ্রালোকে, আমি নিস্তব্ধ, নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে দেখেছি এই শান্ত ভাব—দিক্-দিগন্ত জুড়ে। আমরা প্রাচীন যুগের বাঙালী। চট করে অপরিচিতার মুখের দিকে তাকাতে বাধো বাধো ঠেকে। এঁর দিকে তাকানো যায় অসঙ্কোচে।

রোগীও সুপুরুষ, এবং এই পরিবেশে খাটে শুয়ে না থাকলে বলতুম, রীতিমত স্বাস্থ্যবান। শুধু মুখটি অস্বাভাবিক লালচে—যেন গোরা অফিসারের মুখের লাল।

স্ত্রীর কথায় সায় দিয়ে হেসে বললেন—গলাটা কিন্তু রোগীর—'রোজ ভোরবেলা দেখি আপনাকে এ-পথ দিয়ে আসতে যেতে। পাশের কটেজে শুনি আপনার উচ্চহাস্য। শুধু আমরাই ছিলুম অস্পৃশ্য। অথচ দেখুন, আমি মুখুজ্যে বামুন—'

আমি গল্প জমাবার জন্যে বললুম, 'কোন্ মেল? আমার হাতে বাঁড়ুজ্যে ফুলের মেল একটি মেয়ে আছে।'

এবারে দুজনার আনন্দ অবিমিশ্র। এ লোকটা তাহলে পরকে 'আপনাতে' জানে! তিলমুহূর্তে জমে গেল।

খানিকক্ষণ পরে আমি বললুম, 'আপনারা দুজনাই বড় খাঁটি বাঙলা বলেন, কিন্তু একটু যেন পুরনো পুরনো।'

মুখুজ্যে বললেন, 'আমি ডাক্তার—অবশ্য এখন অবস্থা "কবরাজ! ঠেকাও আপন যমরাজ।" তা সে যাকগে! আসলে কি জানেন, আমরা দুজনাই প্রবাসী বাঙালী। তিনপুরুষ ধরে লক্ষ্ণৌয়ে। আমার মা কাশীর ঠাকুরমা ভট্টপল্লীর। সেই ঠাকুরমার কাছে শিখেছি বাঙলা—শাস্ত্রীঘরের সংস্কৃতঘেঁষা বাঙলা। সেইটে বুনিয়াদ। সবিতা আমাদের প্রতিবেশী। আমার ঠাকুরমার ছাত্রী। আমরা দুজনা হুবহু একই বাঙলা পড়েছি, শিখেছি, বলেছি। তবে ম্যাট্রিক পর্যন্ত উর্দু শিখেছি বলে মাঝে মাঝে দু-একটি উর্দু শব্দ এসে যায় —আমার ভাষাতে, সবিতার না। আপনার খারাপ লাগে?

আমি প্রতিবাদ করে বললুম, 'তওবা তওবা! আমি বাঙালী মুসলমান ; আমরা ইঁওহী দু'চারটে ফাল্‌তো আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহার করি।'

পাশ ফিরে, আপন দুই বাহু আমার দিকে প্রসারিত করে দিলেন। আমি আমার হাত দিলুম। দু'হাত চেপে ধরে, চোখ বন্ধ করে, গভীর আত্মপ্রসাদের

www.BanglaBook.org

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'বাঁচালেন। আপনি মুসলমান!'

আমি একটু দিশেহারা হয়ে চুপ করে রইলুম।

জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি যত্রতত্র খান এখানে? ডাক্তার হিসেবে বলছি, সেটা কিন্তু উচিত নয়।'

আমি বললুম, 'আমি যত্রতত্র যা-তা খাই এবং ভবিষ্যতেও খাবো। অপরাধ নেবেন না।'

'বাঁচালেন!' এবারে আমি আরো দিশেহারা। আমি তাঁর পরামর্শ অমান্য করছি দেখে তিনি খুশী!

'বাঁচালেন! জানেন, প্রথম দিনই আমার আপনার চেহারা দেখে, অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য করলুম আমার এক মুসলমান বন্ধুর সঙ্গে।'

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমায় বলি নি, সবিতা?'

সবিতা এতক্ষণ ধরে শুধু উল বুনে যাচ্ছিলেন। মাথা তুলে সম্মতি জানিয়ে বললেন, 'এমন কি চলার ধরনটি, গলার সুরও!'

মুখুজ্জ্যে বললেন, 'সেই' বন্ধুটি যদি আজ এ-লোকে থাকতো, তবে আজ আমার এ-দুর্দশা হত না! সে কথা থাক। মূল বক্তব্য এই: ঠাকুরমা প্লাস তামাম পরিবার, প্লাস সেই সখার পরিবার—সবাইকে লুকিয়ে, বিস্তর ছলনা-জাল বিস্তার করে আমি ছেলেবেলা থেকে খেয়েছি ওর মায়ের তৈরী মুর্গী-মটন। সে খেত আমাদের বাড়িতে নিশ্চিন্ত মনে। আপনি বোধ হয় জানেন না—'

'বিলক্ষণ জানি, স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—আপনার ঠাকুরমার পাড়ার লোক—বাড়িতে দিশী-বিদেশী সবাইকে খাওয়াতেন। তাঁর ছেলে, স্বর্গত বিনয়তোষ তিনিও নিষ্ঠাচারী ছিলেন। ঝাড়া আটটি বছর প্রতি রোববারে, তাঁর সামনে বসে, তাঁর সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন করেছি আমি, মুসলমান।'

ডাক্তার বললেন, 'তারপর ঠাকুরমা মা আর সবাই গত হলেন। রইল ঐ দোস্ত-ইয়ার-সখা বেদার্-বখ্শ্। একই বছরে দুজনায় ডাক্তারি পাস করলুম। ইতিমধ্যে আমার বিয়ে হয়েছে। সবিতা রাঁধে ভালো, কিন্তু তার মা তাকে বলে গিয়েছিলেন, 'অন্তত রান্নার ব্যাপারে বাপের বাড়ির ঐতিহ্য ভুলে গিয়ে, স্বামী যেভাবে খেতে চায় ঠিক সেইভাবে খাওয়াবি।' তাই সবিতা বেদারের মায়ের কাছ থেকে শিখলো বিরয়ানী থেকে ফালুদা, বুরহানী থেকে আজওয়ান রুটি। অতএব স্যার, কাল দ্বিপ্রহরে এখানে একটু হবিষ্যান্ন করবেন—' হেসে বললেন, 'অবশ্যই, মোগলাই! আসলে কি জানেন, এই যে চোখের সামনে সবিতা উদয়াস্ত উল বোনে, এটা, it gets on my nerves! আর সবিতা একটি পারফেকট আর্টিস্ট। রন্ধনে। তার অনুশীলন নেই, রেওয়াজ নেই। আপনার শোক হয় না? আমার তো ওসব খাওয়া বারণ। নিজের জন্য—'

আমি সবিতার দিকে তাকিয়ে আমার মাকে দেখতে পেলুম; বাড়িতে কেউ না থাকলে মা হাঁড়ি পর্যন্ত চড়াতো না। চেলে-মুড়ি খেয়ে শুয়ে পড়তো। আর এই সবিতা নাকি বিস্বাদ বিবর্ণ মাছসেদ্ধ, কপিসেদ্ধ, পাতলাসে পাতলা যেন কড়াই-ধোয়া-জল সুপ নামে পরিচিত গন্ধযন্ত্রণা স্বামীকে খেতে দিয়ে নিজে গণ্ডারগ্রাসে খাবে বিরয়ানি, বুরহানী কাবাব-মুসল্লম!

আমি বললুম, 'ফিন্‌সে তওবা। তা-ও কখনো হয়! কিন্তু আমি একা-

www.BanglaBook.org

একা খাব?—কেমন যেন?

অর্তনাদ করে বললেন, 'আপনি বিশ্বাস করতে পারেন না, রান্নাঘর থেকে সবিতার রেওয়াজের গন্ধ আমার নাকে আসবে—আচ্ছা, আপনি না-হয় আড়ালেই খাবেন, শুধু আমি পদগুলো কম্পোজ করে দেব। আপনাকে এ-নিমন্ত্রণ সাহস করে জানালুম, আপনি যত্রতত্র খান শুনে। নইলে—'

আমি বললুম, 'ডাক্তার, আমি জানি আপনাদের অনেকক্ষণ ধরে কথা বলা বারণ। কাল সকালের রোদ সেরেই আসবো। দুপুরে খাব।'

সবিতা রাস্তা অবধি নেমে এসে বললেন—মাথা নিচু করে, প্রায় হাতজোড় করে, 'এই দু'বছর ধরে আমরা এখানে আছি। এই প্রথমবার তিনি পুরো আধ ঘণ্টা ধরে খুশিতে আনন্দে সময় কাটালেন। আপনি দয়া করে আসতে ভুলবেন না। বড় ডাক্তার বলেছে, উনি ফুর্তিতে থাকলে তাড়াতাড়ি সেরে উঠবেন। আমি ওঁকে বাঁচাতে চাই। আপনি আমার প্রতি দয়া করুন—'

হঠাৎ ধপ্ করে রাস্তার পাশে হাঁটু গেড়ে আমার পায়ের উপর তার মাথা ঠুকে দিল। এত দুঃখের ভিতরও আমি দেখলুম, বন্যার জলের মত একমাথা গোছা গোছা গাদা গাদা কালো চুল ঘোমটার বাঁধ সরিয়ে আমার দুই গোড়ালির হাড় পেরিয়ে, মাঝ হাঁটু অবধি ছাপিয়ে দিল। এ-চুল আমি দেখেছি, অতিশয় শৈশবে, আজ মনে হয়, যেন আধাস্বপ্নে, যেন কুয়াশার ভিতর দিয়ে, আমার মায়ের মাথায়।

সতীসাধ্বী যুবতীকে স্পর্শ করা গুনাহ্। জাহান্নামে যাক্ গুনাহ্!

দু'হাত দিয়ে তাকে তুলে ধরলুম। বললুম, 'মা! ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখো!'

সীমন্তিনী বললে, 'আমি আল্লাকে ইয়াদ করি।'॥

১৩।১১।৬৫

আধুনিকা

থেকে থেকে 'মডার্ন' মেয়েদের বিরুদ্ধে খবরের কাগজে নানা জাতের চিঠি বেরোয়। সেগুলোর মূল বক্তব্য কি, তার সবিস্তার বয়ান দেবার প্রয়োজন নেই এবং সেগুলো যে সর্বৈব ভিত্তিহীন সে-কথাও বলা যায় না। হালে পাড়ার বুড়োরা আমাকে দফে দফে মডার্নীদের 'কুকীর্তি'র কাহিনী কয়ে গেলেন। সেই সুবাদে আমার একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল।

ত্রিশ বছর আগেকার কথা। তখনও এদেশে 'পেট-কাটা' 'নখরাঙানো' মডার্নীদের আবির্ভাব হয় নি, এ তো জানা কথা, কিন্তু মডার্ন মেয়ে সর্বযুগে সর্বদেশেই থাকে। আমার মনে হত, সে যুগের মডার্নতম দেখা যেত চাঁদপুর—নারায়ণগঞ্জ—গোয়ালন্দী জাহাজে। এরা ঐসব অঞ্চলের ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়েথদের মেয়ে—তবে বৈদ্যই বেশী—কলকাতায় আসছে যেতো কলেজে পড়বে বলে। এক-একটির চেহারা ছিল অপূর্ব। তন্বী, শ্যামাঙ্গী, স্বাস্থ্যবতী—আপন আনন্দে থার্ড ক্লাস ডেকের যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়, চায়ের স্টলে বসে খেতেও ওদের বাধে না। প্রাচীনরা ওদের দিকে একটু বাঁকা নয়নে তাকালেও একথা আমি

www.BanglaBook.org

কিছুতেই স্বীকার করবো না, ওরা বেহায়া বা বেশরম ছিল।

সে-আমলে ইণ্টার ক্লাস প্যাসেঞ্জারের জন্য দুটো জালে ঘেরা কামরা—বা খাঁচা থাকতো। একটা পুরুষ, একটা মেয়েদের। খুব যে আরামের ছিল তা নয়, তবে যে-সব লাজুক বউঝিরা পরপুরুষের সামনে কখনো বেরোয় নি তারা সেখানে খানিকটে আরাম বোধ করতো।

সেকেণ্ড ক্লাসের কামরাতেই শুয়ে শুয়ে শুনতে পেলুম, থার্ড ক্লাস ডেক ও দুটো খাঁচা অঞ্চলে হঠাৎ আন্দোলন উত্তেজনা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। বয়েস আমার তখনো কম, তাই কৌতূহল ছিল বেশী। কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে শুধোই, ব্যাপারটা কি?

হট্টগোল হচ্ছে বটে, কিন্তু যাকেই প্রশ্ন শুধোই সে-ই পাশ কাটিয়ে যায়। এস্তেক চা'র স্টলের দোকানটি পর্যন্ত এমন ভাব করলে যেন আমার প্রশ্নটা আদৌ শুনতে পায় নি।

সুর্-বিয়ালিজম দাদাইজম যাঁরা জানেন তাঁরা বুঝতে পারবেন, আমি যদি তখনকার অবস্থার বর্ণনাটা দিতে গিয়ে বলি, ডেকের সর্বত্র যেন 'ছি ছি' আঁকা, কানে আসছে 'ছি ছি' স্বর, নাকের ভিতরও যেন 'ছি ছি' ঢুকছে।

টুয়েণ্টিনাইন খেলা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, দশ-পঁচিশের দান একদিকে অবহেলে পড়ে আছে, এদিকে ওদিকে ছোট ছোট দলের ঘোটালা, আর সারেঙ্গ জাহাজময় হন্তদন্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে। কিন্তু সর্বোপরি ঐ ছি ছি ভাব।

তখন হঠাৎ চোখে পড়ল, মেয়েদের ইণ্টারক্লাসের খাঁচা বেবাক ফাঁক—খানিকক্ষণ পূর্বেও যেটাকে কাঁঠালবোঝাই দেখে গিয়েছি—অবশ্য আড়নয়নে। আরো ভালো করে তাকিয়ে দেখি, খাঁচাটার এক কোণায় আপাদমস্তক চাদরে ঢাকা কি যেন একটা বস্তু—মানুষই হবে—পড়ে আছে মেঝেতে। মনে হল, সেটা গোঙরাচ্ছে, কিন্তু ঐ 'ছি ছি'-র ভিতর দিয়ে ঠিক ঠিক ধরতে পারলুম না।

এমন সময় খানসামার সঙ্গে দেখা। পূর্বেই লোকটির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল—সে সিলেটি।

ইতিউতি করে বললে, 'কেলেঙ্কারি ব্যাপার। ইণ্টার ক্লাসের ঐ মেয়েটি গর্ভযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'সে কী ব্যাপার! একে কেউ সাহায্য করছে না কেন? স্টীমারে তো গণ্ডায় গণ্ডায় বুড়ী-হাবড়ী রয়েছে যারা কুড়িবুড়িতে আণ্ডাবাচ্চা বিইয়েছে?'

খানসামার পো ঈষৎ লাজুক প্রকৃতি ধরে। আবার গাঁই-গুঁই করে বললে, 'ব্যাপারটা কি হয়েছে, হুজুর, মেয়েটার বিয়ে হয় নি।'

'তা হলে এল কোত্থেকে? সঙ্গীসাথী নেই?'

'যা শুনেছি, তাই বলছি হুজুর। কেউই সঠিক খবর জানে না। মেয়েটার সঙ্গে একটা ছোকরা ছিল ওরই বয়সী। সে মাঝে মাঝে ওকে চা-টা পৌঁছে দিয়েছে। ছেলেটা আমার কাছেই মুর্গী-কারি খেয়েছে। মেয়েটা কোনো কিছুই খেতে রাজী হয় নি। শুধু চা-টি খেয়েছে অনেক চাপাচাপির পর—বোধ হয় জাতঘরের হিন্দু মেয়ে।'

www.BanglaBook.org

আমি অসহিষ্ণু হয়ে বললুম, 'তা তো বুঝলুম, কিন্তু ছেলেটা কোথায়? সেই তো জিম্মেদার।'

'গর্ভযন্ত্রণার প্রথম লক্ষণ দেখা দিতেই সে গা-ঢাকা দিয়ে মাঝখানের স্টেশনে নেমে পড়ে পালিয়েছে। লোকে অনুমান করছে, মেয়েটাকে সে নিয়ে যাচ্ছিল কলকাতায় কোনো একটা ব্যবস্থা করার জন্য। দেশ থেকে বেরুতে দেরি হয়ে যায়, তাই হঠাৎ এ গর্দিশ এসে পড়েছে।'

আমি বললুম, 'সেও বুঝলুম, কিন্তু মেয়েটা বিপদে পড়েছে, আর কেউই সাহায্য করছে না!' এটা একটা কথার কথা হল?'

অসহায় ভাব দেখিয়ে বললে, 'হিন্দুদের ব্যাপার, কি করে বুঝি বলুন! দু'একটি মুসলমান আছে, তারাও হিন্দুদের ঐ সব দেখে বোধ হয় সাহস পাচ্ছে না।'

আমি বললুম, 'জাহাজে ডাক্তার নেই? প্যাসেঞ্জারের ভিতরেও?'

'তারই সন্ধান চলছে, হুজুর।'

তারপর খানসামা বিজ্ঞভাবে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে যেন আপন মনে বললে, 'যত সব নাদান বেকুবের কারবার। আরে বাপু, মেয়েটার মাথায় এক থাবড়া সিঁদুর আগে লেপটে দিলেই তো পারতো!'

(জানি নে, তাতে করে কি হত! হালে এ্যারোপ্লেনে নাকি এমতাবস্থায় এ্যারহোস্টেস সাহায্য করতে রাজী হয় নি।)

আপন ক্যাবিনে ফিরে যাচ্ছি। এমন সময় এক সহৃদয় প্যাসেঞ্জার আমাকে পাকড়ে বললে, 'আপনি চলুন না স্যার।'

তাজ্জব মেনে বললুম, 'আমি!'

'কেন? আপনি তো ডাক্তার!'

বুঝলুম, আমার ট্রাঙ্কে বা রিজার্ভেশন কার্ডে দেখেছে, লেখা, Dr.। কাতর কণ্ঠে বোঝাতে চেষ্টা করলুম, সেটা ভিন্ন বস্তু, বেকার, 'ফরেন'। এটা দিয়ে মাছিটার ছেঁড়া পাখনাও জোড়া দেওয়া যায় না। লোকটি বড়ই সরল। তাকে কিছুতেই বোঝাতে পারি নে, চিকিৎসার ডাক্তার এক প্রাণী, আমার ডক্টরেট ত্রিসংসারে কারো কোনো কাজে লাগে না। এ ধরনের গেরো আমার জীবনে আরো দু'দুবার হয়ে গিয়েছে।

ইতিমধ্যে জাহাজে নূতন চাঞ্চল্য। কোত্থেকে পাওয়া গেছে এক না-পাস কম্পাউণ্ডার। সে বোধ হয় 'শ্মশান-চিকিৎসাটা' করতে রাজী হয়েছে। তবে বলছে, একটি মেয়েছেলের সাহায্য পেলে ভালো হত।

তারপর যা দেখলুম, সে দৃশ্যটি আমার জীবনে ভুলবো না।

ঐ যে পূর্বে বলছিলুম, জাহাজে তখনকার দিনের কলেজের দু'-পাঁচটা 'আধুনিকা' নিঃসঙ্কোচে ঘুরে বেড়াতো, তাদেরই একটি—লম্বা, ছিপছিপে শ্যামবর্ণ, পরনে সাদামাটা শাড়ি ব্লাউজ—গমগম করে কম্পাউণ্ডারের দিকে এগিয়ে গেল দু হাত দিয়ে ভিড় ঠেলে ঠেলে। তখন চতুর্দিক থেকে উঠেছে তার দিকে 'ছ্যা ছ্যা ছি ছি' রব। সক্কলের চক্ষেই তখন ঐ আসন্নপ্রসবা নয়—তখন এই ভদ্রকন্যা।

আমি জীবনে দু'জন পরমহংস দেখেছি।

আর এই দেখলুম, একটি পরমহংসী। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে নয়, সর্ব ধিক্কার,

www.BanglaBook.org

সব ব্যঙ্গ, সব বিদ্রূপ উপেক্ষা করে প্রসন্ন বদনে সে এগিয়ে যাচ্ছে!!
১৩।১১।৬৫

ফরাইজ্

'বাপের বাড়ি', 'শ্বশুরবাড়ি', 'পিতৃগৃহ', 'পতিগৃহ', 'মুখ্যগৃহ', 'গৌণ গৃহ' ইত্যাকার বহু প্রকার 'গৃহে'র নবীন নামকরণের প্রস্তাব পত্রান্তরে হয়ে যাচ্ছে। এই সুবাদে মুসলমানদের ভিতরে কি রীতি প্রচলিত আছে সেটার উল্লেখ বোধ হয় সম্পূর্ণ অবান্তর হবে না। কারণ হিন্দু এবং মুসলমান ধর্মের লোকাচারে, বিষয়-সম্পত্তি বণ্টন বাবদে যতই পার্থক্য থাক না কেন, উভয় ধর্মাবলম্বীরই ভাষা বাঙলা এবং মুসলমান মেয়েও বলে 'বাপের বাড়ি' 'শ্বশুরবাড়ি'। তবু একটা ব্যাপারে সামান্য তফাত আছে।

অল্প হোক, বিস্তর হোক, পিতার মৃত্যুর পর মুসলমান মেয়ে বাপের সম্পত্তির কিছুটা হিস্যে পায়। অর্থাৎ পৈতৃক ভদ্রাসনেও তার আইনত অংশ বিদ্যমান থাকে। একেই বলে 'ফরাইজ্'।

কার্যত কিন্তু সে এ-ফরাইজ্ দাবি করে না। এমন কি পতিগৃহে তার লোভী স্বামী যদি তকে ন্যায্য হক্ক পাওয়ার জন্য ক্রমাগত টুইয়ে দিতে থাকে তবু সে সেটার দাবি করে না, মোকদ্দমা করতেও রাজী হয় না—আর স্বামী নিজের থেকে কোনো দাবি-দাওয়া করতে পারে না, কারণ হক্ক তার স্ত্রীর, তার নয়।

বোন কেন মোকদ্দমা করে না, তার একাধিক কারণ আছে। লোকাচারে বাধে (এতে হয়তো কিছুটা প্রতিবেশী হিন্দুর প্রভাব আছে), এবং দ্বিতীয় তার অন্য স্বার্থ আছে। সে যদি তার ন্যায্য পাওনা নিয়ে নেয়, তবে সে অর্থ হয়তো খর্চা হয়ে যাবে, এবং স্বামীর মৃত্যুর পর সে যদি কোনো কারণে অসহায় হয়ে যায়—দেবর ভাশুর তাকে অবহেলা করে—তবে তার অন্য আশ্রয় থাকে না। পক্ষান্তরে সে যদি ফরাইজ্ না নেয়, তবে সে তারই হক্কের জোরে বাপের বাড়িতে এসে আশ্রয় নিতে পারে। এমন কি শ্বশুর ভাশুর স্বামীর জীবিতাবস্থায়ও যদি তার উপর অত্যধিক চোটপাট হয় তবে সে ফরাইজের হক্কে বাপের বা (বাপ মরে গিয়ে থাকলে) ভাইয়ের বাড়িতে এসে আশ্রয় নিতে পারে।

আরো একটা কারণ আছে। মুসলমান মেয়ে মাত্রই আশা করে, সে যেন বছরে অন্তত একবার তার বাপ-মা, ভাইবোন, ছেলেবেলার পাড়াপ্রতিবেশীকে দেখতে যেতে পায়। এস্থলে স্মরণ করিয়ে দি, বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান মেয়ের নাম পদবী বদলায় না। মুসলমান বিবাহ একটা সিভিল ম্যারিজের মত কনট্রাকট্ ম্যারিজ—সেক্রেমেণ্টাল নয়। অপরাধ যদি না নেন, তবে উল্লেখ করি, আমার পিতার নাম ছিল সৈয়দ সিকন্দর আলী। অথচ আমার মা চিরকালই নাম সই করেছেন, আমতুল মন্নান খাতুন চৌধুরী। মিসেস আলী, মিসেস সৈয়দ—বা বেগম আলী এসব হালে ইংরেজের অনুকরণে হয়েছে।

* * *

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এবারে গরীব দুঃখী চাষীবাসীদের একটি উদাহরণ দি। পূব বাঙলার। মনে করুন চাষা কেরামতুল্লা মারা গেছে। তার মেয়ে জয়নবের বিয়ে হয়েছে বেশ দূরে ভিন্ গাঁয়ে। জয়নবের বাল্যাবস্থায় তার মা মারা যায় বলে কেরামতুল্লা দুসরা শাদী করেছিল। সে পক্ষের ছেলে আকরম বিধবা মাকে নিয়ে, বিয়ে করে মোটামুটি সুখে-স্বচ্ছন্দেই আছে। সৎ-বোনকে আর স্মরণেই আনে না। তার মাও সতীনের মেয়ে জয়নবকে দু' চোখে দেখতে পায় না। অতএব জয়নব বেচারী বাপের বাড়ির মুখ দেখতে পায় না। জয়নবের শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ের লোকে তাই নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা করে। ওদিকে লোভী স্বামীও বলে, 'ফরাইজ্ চেয়ে নে।'

জয়নব বেচারী তখন যদি দৈবযোগে বাপের গাঁয়ের কাউকে পেয়ে যায় তখন তাকে দিয়ে ভাইকে খবর পাঠায় তাকে যেন এসে বাপের বাড়িতে কয়েকদিনের জন্য নিয়ে যায়—একেই বলে 'নাইওর' যাওয়া। ভাই খবর পেয়েও গা করে না আর সৎমার তো কথাই নেই। বেচারী জয়নব একাধিকবার খবর পাঠিয়ে হয়রান হয়ে গেল। ওদিকে বাপের গাঁয়ের লোক তো আর তার শ্বশুরের গাঁয়ে নিত্যি নিত্যি আসে না যে নিত্যি নিত্যি খবর পাঠাবে!

তখন সে ধরে অন্য পন্থা। নদীতে জল আনতে গিয়ে সুযোগ পেলেই সময় কাটায় বিস্তর। এবং স্বভাবতই তার গাঁয়ের সব মাঝিদের সে চেনে। তাদের কাউকে দেখতে পেলে পাড়ে বসেই চিৎকার করে তার ফরিয়াদটি জানিয়ে দেয়। সবিস্তারে বলতে হয় না—সবাই সব খবর জানে।

তাতেও যদি ওষুধ না ধরে, তখন সে ধরে রুদ্রমূর্তি।

শাসিয়ে দেয়, তাকে নাইওর না নিয়ে গেলে সে ফরাইজের মোকদ্দমা করবে।

এইবার ভাইয়ের কানে কিঞ্চিৎ জল যায়। তাও পুরোমাত্রায় না। ইতিমধ্যে গাঁয়ের মুরুব্বীদের কানেও তাবৎ ফরিয়াদ পৌঁচেছে—বিশেষত সেই সব বৃদ্ধদের কানে যাঁরা বিয়ের ঘটকালি করেছিলেন। তাঁরা তখন ছোকরাকে বুঝিয়ে বলেন, 'তোর আছে কুল্লে আড়াই বিঘত জমি—আচ্ছা, তর না হয় কিছুটা গেল ; কিন্তু তোর বসত বাড়িতেও যে ছুড়ির হিস্যে রয়েছে। সেইটেও তুই লাটে তুলবি নাকি? যা, যা, বোনকে নিয়ে আয়।'

আমি এতক্ষণ যা বললুম, এসব পূব-বাঙলার লোকসঙ্গীতেও আছে। তারই একটির শেষ দুই লাইনে আছে,

"থাকো গো বোন, থাকো গো বোন,
কিলগুঁতা খাইয়া,
আষাঢ়[১] মাসে লইয়া যাইমু
পঙ্খীরাজ ওড়াইয়া॥"

ভাই নৌকা নিয়ে আসার খবর পাওয়া মাত্রই বোন লেগে যায় নানারকম মিষ্টি পিঠে বানাতে। শাশুড়ী গজর গজর করে, কিন্তু জা-রা তো একই

---

১ লেখকের মনে ঈষৎ সন্দেহ আছে, এস্থলে ভাই বোধ হয় বোনকে কিঞ্চিৎ ধাপ্পা দিচ্ছে। বোনকে সচরাচর নাইওর নেওয়া হয় অঘ্রাণ মাসে ধান কাটার পর। কিন্তু আমি সঠিক বলতে পারবো না। কারণ দেশ ছেড়েছি দুই যুগ পূর্বে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গোয়ালের গাই, তারা সাহায্য করে।

নৌকা এল। বোন সগর্বে হাঁড়ি-ভর্তি মিঠে পিঠে নিয়ে নৌকায় চাপলো। গাঁয়ের মেয়েরা এখন আর তাকে খোঁটা দিতে পারবে না। এ তো সতীর নিঃসঙ্গ হিমালয়-যাত্রা নয়।

* * *

বুদ্ধিমতী মেয়ে বলে বাপের বাড়ি গিয়ে জয়নব পাড়াময় চর্কিবাজি মেরে দিন কাটায় না। অবশ্য সর্বপ্রথম মিঠে পিঠে নিয়ে আত্মীয়-স্বজন, সইইটদের সঙ্গে দেখা করতে যায়, কিন্তু তারপরই লেগে যায় নতুন ধানচাল যা উঠেছে তার দুরুস্ত ব্যবস্থা করতে। অবশ্য একথাও ঠিক, কেউ তা সে যে কোনো স্ত্রী-পুরুষই হোক যদি সুবো-শাম বেঘোরে ঘুমোয় তবে লোকে প্রবাদটা বলে, 'দেখো খোদার খাসিটা ঘুমুচ্ছে যেন "নাইওরী-মাগীটার" মত!'

এই করে করে 'নাইওর' বাস যখন শেষ হয়, তখন বাপের বাড়িতে আবার মিঠে পিঠে তৈরী আরম্ভ হয়—এগুলো নিয়ে যাবে শ্বশুরবাড়িতে। ভাই অন্তত একখানা শাড়ি, একটি কুর্তা কিনে দেবে বোনকে—জামা-ফ্রক ভাগ্নিকে।

জয়নব কিন্তু ধান ভানা কোটাতে এমনই সাহায্য করে যেন ভাই, সৎমা স্ত্রী চীপ-লেবারের প্রলোভনে তাকে আসছে বছর নিজের থেকেই 'নাইওর' নিয়ে আসে—ফরাইজের মোকদ্দমার শাসানি যেন মাঝি মল্লা মারফত না পাঠাতে হয়। শ্বশুরবাড়ি ফিরে জয়নব আবার দেমাক করে, 'আমি মাগনা খাই নে পরি নে। যদ্দিন ওখানে ছিলুম সৎমাকে কুটোটি পর্যন্ত কুড়োতে দি নি!'

* * *

এতক্ষণ যা নিবেদন করলুম এটা হিন্দুদের বেলাও প্রযোজ্য। প্যাটার্ন মোটামুটি একই, তবে তফাৎটা কোথায়?

তফাৎ ঐ ফরাইজের হক্ক, ডুরেস, ব্ল্যাকমেল (অবশ্য বে-আইনী নয়) দিয়ে সে বাপের বাড়ি যাবার হক্ক আজীবন জিইয়ে রাখে। স্বামীর সঙ্গে না বনলে সেই হক্কের জোরে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বাপের বাড়ি চলে আসে। অবস্থা চরমে পৌঁছলে সেখানে বসে স্বামীর বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ন্যায্য স্ত্রীধনের মোকদ্দমা লাগায়। কিংবা যদি স্বামীর মৃত্যুর পর ভাশুর-দেওর তাকে অসম্মান করে তবে সে চলে আসে বাপের বাড়িতে, ঠুকে দেয় ওদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা। এগুলোই আসল তত্ত্ব বলে পুনরাবৃত্তি করলুম।

* * *

এসব সম্ভব বাপের বাড়ির ফরাইজের জোরে।

তাই সেটি সে কখনো হাত-ছাড়া করে না। লোভী স্বামী যতই চোটপাট করুক না কেন।

হিন্দু মেয়েরা একটু চিন্তা করে দেখবেন।

২৭।১১।৬৫

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চোখের জলের লেখক

ইংরিজির শব্দভাণ্ডার অতুলনীয়। তন্মধ্যে একটি শব্দ 'গ্যাগা'—এর সঠিক উচ্চারণ না জানা থাকলেও ক্ষতি নেই। 'গ্যাগা' শব্দের অর্থ, লোকটার ব্রেন্-বক্সে যা আছে—যদি কিছু আদৌ থাকে—সেটা এমনই হযবরল গোবলেট পাকানোর জগা-খিচুড়ি যে কেউ কিছু বললে তার গলা দিয়ে যে ধ্বনি বেরয় সেটা 'গাগা', 'গ্যাগো', 'গ্যাগ্যা' গোঙরানো ঢপের—কাজেই শব্দটির যে কোনো উচ্চারণই মঞ্জুর। অর্থাৎ গাগার সঙ্গে ইম্‌বেসাইল, ইডিয়ট, ('পণ্টক' বললুম না, কারণ সুনীতিবাবু শব্দটির কপি-রাইট মেরে দিয়ে সেটার পাইরেটিং সংস্করণ বের করার দরুন পাড়ার ছোঁড়ারা আমাকে 'কণ্টক' থেকে 'কাঁটা', 'পণ্টক' থেকে 'পাঁঠা' বের না করে আড়াল থেকে আমাকে 'পন্‌ঠক্' বলতে আরম্ভ করেছে) গোবর-গণেশ যে-কারো সঙ্গে তুলনা করলে শেষোক্তদের অপমান করা হয়।

সেই গ্যাগাদের গ্যাগা—গ্যাগায়েস্টের মত আমি শুধু অর্থহীন কতকগুলো ধ্বনি বের করলুম যখন আমার এক নিত্যালাপী গুণী বললেন, জনৈক অধ্যাপক[১] নাকি প্রকাশ্য সভাস্থলে রায় প্রকাশ করেন, স্বর্গত, প্রাতঃস্মরণীয় শিল্পীরাজ শরৎচন্দ্র চ'ট্টোপাধ্যায় নাকি থাড্ডোকেলাস 'চোখের জলের লেখক'! আচ্ছা, পাঠক তুমিও কও, সেস্থলে তুমি কি করতে! শরৎচন্দ্র কাঁদিয়েছেন! শরৎচন্দ্র হাসান নি! সামাজিক নিষ্ঠুরতার কাঁটাবনের উপর দিয়ে আমাদের কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যান নি!—কাঁদাবার জন্য নয়, যন্ত্রণায় চিৎকার করার জন্য! ব্যঙ্গ, শ্লেষ, বিদ্রূপ-বাণে আমাদের জর্জরিত করেন নি?

এই পুণ্য বঙ্গভূমিতে শতাধিক বর্ষ ধরে দুটি দল আছে। রামমোহন বনাম সতীদাহের দল, বিদ্যাসাগর বনাম নিরম্বু উপবাসের দল, রবীন্দ্রনাথ বনাম—তা সে যাই হোক্। সেই দল চেষ্টা করেছিলেন শরৎচন্দ্রকে নেতা বানিয়ে রবীন্দ্রনাথকে অতিষ্ঠ করে তুলতে। তাঁরা মাষা পরিমাণ কৃতকার্য হয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল শরৎচন্দ্র দলের বাইরে। শরৎচন্দ্র যেমন 'দত্তা'র 'রাসবিহারী' চরিত্র আঁকেন, ঠিক তেমনি 'নারীর মূল্য'ও লিখতে জানেন। (আশা করি বলার প্রয়োজন নেই যে শরৎচন্দ্র এই অমূল্য গ্রন্থ কাঁদাবার জন্য লেখেন নি ; পাঠক, আপনি সে বই পড়ে কি ভেবেছেন সঠিক বলতে পারবো না ; আমার মনে হয়েছে, আমি যেন দু গালে চড় খাচ্ছি এবং জানি যখন এ-ই আমার প্রাপ্য তাই আমি তখন কাঁদি নি—কারণ কাঁদবার হক্কও সঞ্চয় করতে হয়।)

এদিকে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'অন্ধভক্তের দল—ডেকে আন্ বললে যাঁরা বেঁধে আনে—(যদিও আমি রবীন্দ্র-শিষ্য হিসেবে শপথ করে বলতে পারি, তিনি ডেকে আনতেও বলেন নি) লাগলেন শরৎচন্দ্রের পিছনে। তার জের আজও চলেছে। অবশ্য এস্থলে আমি করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে নিবেদন করি, পূর্বোল্লিখিত অধ্যাপক এ-'দলে'র নাও হতে পারেন। তিনি হয়তো তাঁর স্বাধীন ধর্মবুদ্ধি অনুযায়ী তাঁর বক্তব্য বলেছেন।

কিন্তু এসব বৃথা বাক্য। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একটি 'তুলনাহীনা' কবিতা

---

১ যে কোনো কারণেই হোক, বন্ধুবর নাম উল্লেখ করলেন না, আমিও শুধোই নি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লিখতে লিখতে হঠাৎ লিখেছেন, 'বৃথা বাক্য থাক্'। গুরুবাক্য স্মরণে এবং সেই নীতি অনুযায়ী আমারও মন তাই এতক্ষণ ধরে বৃথা বাক্য ভুলে গিয়ে শুধু আঁকুবাঁকু করছে, মেজদার স্মরণে—যিনি দুর্দান্ত শীতের রাতে লেপের ভিতর কচ্ছপটির মত শুয়ে আছেন আর শ্রীকান্ত তাঁর জন্য পাতা উল্টে দিচ্ছেন, হঠাৎ ব্যাঘ্ররূপী 'বউরূপী'র আবির্ভাব, ভিরমি কাটলে পর মেজদা ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার'—ইতিমধ্যে থুড়ম পেটাতে পেটাতে (আহা, কী সুন্দর ছবিটি!) কটুবাক্য, 'খোট্টার ব্যাটারা কাঁঠাল পাকা দিয়া'—এবং সর্বশেষে পিসীমার সাত পাকের সোয়ামীর প্রতি অত্যন্ত প্র্যাকটিক্যাল সময়োপযোগী সদুপদেশ,—কাটা ন্যাজটি ভবিষ্যতের সুব্যবহারার্থে তরিবৎ করে তুলে রাখার জন্য—সেকালে বোধ হয় ভাগলপুরে ব্যাঙ্কে ভলটের ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু সাবধান! আমাকে সর্বক্ষণ সচেতন হয়ে থাকতে হবে যেন ফাঁদে পা না দি ;—শরৎচন্দ্র যে বাঙলা দেশকে হাসিয়েছেন তার উদ্ধৃতি দেবার প্রলোভন সম্বরণ না করলে বর্তমানে যাদের হাতে শরৎ-গ্রন্থাবলীর কপিরাইট তাঁরা আমাকে জেলে পুরবেন—পাতার পর পাতা নিছক পুনর্মুদ্রণ তাঁরা বরদাস্ত করবেন কেন? অথচ আমার বক্তব্য তো স্পষ্টতম হবে, যদি আমি একটি মাত্র বাক্যব্যয় না করে নিছক উদ্ধৃতির পর উদ্ধৃতি দিয়ে যাই।

তর্কস্থলে স্বীকার করছি কাঁদানো সহজ। হাসানো কঠিন। টেকো ভদ্রলোক তাঁর বাদবাকি কুল্লে আড়াইগাছা চুল দিয়ে মাথার সামনের দিকের চালটা যেন খড় দিয়ে ছাওয়ার নিষ্ফল প্রচেষ্টা করেছেন—তাই দেখে রকে বসে আমার তিন ভাগনে যে 'সেব্রামীয়' টিপ্পনী কাটলে সেটি অনায়াসে অলিম্পিকে পাঠানো যায় এবং সেটি আমি ঘরের ভিতর থেকে স্পষ্ট শুনতে পেলুম। কিন্তু, হায়, ওদের সঙ্গে যোগ দিতে পারলুম না, কারণ, সরলতম কারণ, আমার আপন টাকটি—থাক্, 'বৃথা বাক্য থাক্'। কিন্তু ঠিক ঐ সময় অন্য একটি ভদ্রলোক রাস্তা দিয়ে যাবার সময় রক্ থেকে যদি শব্দ আসতো, 'আহা বেচারা, কাল রাত্রে তার ছেলেটি—জানিস, কি হয়েছে?'—বাকীটা শুনতে পেলুম না বলে হেঁকে শুধালুম, 'কেন রে, কি হয়েছে?' 'টাইফয়েডে একটা চোখ গেছে।' আমি তখন রকেরই একজন হয়ে গেলুম।

কিংবা সরলতর উদাহরণ দি।

ঐ বৈঠকখানায়ই বসে আছি। বাড়ির বউঝিরা রান্নাঘরে ফিস ফিস করে গালগল্প করতে করতে—রাঁধে মেয়ে কি চুল বাঁধে না—হঠাৎ সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলো। আমি যত গ্যাগা-ই হই না কেন, উঠে শুধবো না, 'হ্যাঁ বউমা, তোমরা হাসছিলে কেন?'

কিন্তু তারা যদি হঠাৎ একসঙ্গে ডুকরে কেঁদে ওঠে তবে আমি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গিয়ে জানতে চাইবো তারা এরকম ধারা হঠাৎ কেঁদে উঠলো কেন? অর্থাৎ হাসি একে অন্যের কাছ থেকে দূরে নিয়ে যায়, কান্না কাছে টেনে আনে।

* * *

শরৎচন্দ্র 'চোখের জলের লেখক? আর বিদ্যাসাগর? বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের সময় তিনি যে সব ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন, তখন আমরা ঠাঠা করে হেসেছি?—না? তাঁর 'শকুন্তলা' পড়তে পড়তে আমি তো হেসেই গড়াগড়ি! রবীন্দ্রনাথের হাস্যরস নিশ্চয়ই অত্যন্ত অপ্রচুর ছিল। নইলে তিনি লিখবেন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কেন, কেহ দুঃখ পায় ইহা তিনি (শ্রীকণ্ঠবাবু) সহিতে পারিতেন না—ইহার কাহিনীও তাঁহার পক্ষে অসহ্য ছিল। এই বালকদের কেহ যখন কৌতুক করিয়া তাঁহাকে পীড়ন করিতে চাহিত তখন বিদ্যাসাগরের "সীতার বনবাস" বা "শকুন্তলা" হইতে কোনো একটি করুণ অংশ তাঁহাকে পড়িয়া শোনাইত, তিনি দুই হাত তুলিয়া নিষেধ করিয়া অনুনয় করিয়া কোনো মতে থামাইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন।'

আশ্চর্য! আমি তো গ্রন্থ দু'খানা পড়ে হেসেই কুটিকুটি! তবে হ্যাঁ, আমি পূর্বেই স্বীকার করেছি আমি গ্যাগা।

সাহিত্যিক বিদ্যাসাগর মশাইকে লোকে চেনে তাঁর 'চোখের জলে'র বইয়ের জন্য। অবতার বিদ্যাসাগরকে বাঙালী চেনে তিনি মানুষের চোখের জল মুছিয়ে দিতেন বলে। বিদ্যাসাগর মশাই দুটোই পারতেন। কিন্তু সবাই তো তা পারে না। সমাজের অত্যাচার অনাচার দেখে সত্য সাহিত্যিক মানুষকে কাঁদায়। তাঁদের ভিতরে যাঁরা সত্যকার মানুষ তখন তাঁদের অনেকেই সে-সব অনাচারের বিরুদ্ধে নগ্ন তলওয়ার নিয়ে জেহাদ ঘোষণা করে। কারণ আমাদের অধিকাংশই জড়। সাহিত্যিক স্পর্শকাতর। সে যখন করুণ বর্ণনা দিয়ে আমাদের কাঁদায়, তখন আমাদেরই মত জড়ভরতদের কেউ কেউ ঐ সম্বন্ধে সচেতন হয়।[২]

ড্রাইফুসের প্রতি নষ্টামির ফরাসী মিলিটারী মদমত্ত হয়ে যে অবিচার করে তার প্রতিকারের জন্য তাঁর সতীসাধ্বী স্ত্রী প্যারিসের বড় বড় রাজনৈতিক শক্তিধর শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারে দ্বারে গিয়ে করুণ আর্তনাদ করেছে। কিন্তু সে বেচারী তো আমাদের 'তুলনাহীনা' লেখিকা আশাপূর্ণা নয়। শেষটায় চরম দীনজন যে রকম ভিক্ষুকের কাছে ভিক্ষা চায়, ঠিক সেই রকম সে গেল সাহিত্যিক এমিল জোলার কাছে। তাঁর তখন বয়স হয়ে গিয়েছে। তিনি মাফ চাইলেন। শেষটায় বেচারী তার কাগজপত্র জোলার টেবিলে ফেলে রেখে চলে গেল।

এই পৃথিবীর পরম সৌভাগ্য সেরাত্রে জোলার কোনো কিছু করার ছিল না। এটা ওটা নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ সেই রমণীর কাগজপত্র চোখে পড়লো। অলস-ভরে পড়া আরম্ভ করে, বুড়ো হঠাৎ সোজা হয়ে বসল—তারপর গেল ক্ষেপে! তখন লিখল জ্যাক্যুজ (Jaccuse) আই একুজ'। 'ফরাসী সরকারকে আমি একুজ করি'।

তারপর কি হল সেটা বলতে গেলে ঐ বইখানা ছাড়িয়ে আরো দু'খানা বই লিখতে হয়।

মনে নেই, ক'বছর নির্বাসনের কারাযন্ত্রণা ভোগ করে 'কাঁদানো'র লেখক জোলার কৃপায় ড্রাইফুসের প্রতি সুবিচার হল।

শেষ কথাঃ বহু বহু প্রকৃত লেখক, 'চোখের জলের লেখক' নন কিংবা শুধু 'হাসাবার' লেখক নন। দুইই।

তবে কে কোথায় হাসবে, কে কোথায় কাঁদবে, বলা কঠিন। সেই

---

২ বিদ্যেসাগর ছদ্মনামে হাস্য—বরঞ্চ বলা উচিত ব্যঙ্গ রসও করে গেছেন। কিন্তু তাঁর খ্যাতি সেজন্য নয়। বস্তুত তাঁর সে সব ছদ্মনামে লেখা পুনরায় 'আবিষ্কৃত' হয় বহু বিশ-ত্রিশ পূর্বে।

www.BanglaBook.org

"অরক্ষণীয়া" মেয়েটি যখন পড়ি-মরি হয়ে 'সেজেগুজে' কনে দেখবার পক্ষের সামনে বেরুতে যাচ্ছিল তখন একটি ছোট মেয়ে হাসি থামাতে না পেরে বলেছিল, পিসিমা সং সেজেছে।

আমি গ্যাগা। আমি ষোল বছর বয়সে কে'দেছিলুম॥

৪।১২।৬৫

ছাত্র বনাম পুলিশ

॥ ১ ॥

'দেখি! বের করো অভিজ্ঞান-পত্র—আইডেনটিফিকেশন কার্ড!'

কী আর করে বেচারী—দেখাতে হল কার্ডখানা। নামধাম ঠিকানা তো রয়েইছে, তদুপরি রয়েছে বেচারীর ফোটোগ্রাফ, তার নিচে ছোকরার দস্তখত, এবং দুটোর দু'কোণ জুড়ে য়ুনিভার্সিটির স্ট্যাম্প। হোমিওপ্যাথিক পাসপোর্ট আর কি!

হায় বেচারা! যখন য়ুনিভার্সিটিতে প্রবেশ করার ওক্তে সগর্বে কর্তৃপক্ষের সম্মুখে ফোটোগ্রাফের নিচে দস্তখত করেছিলে তখন কি জানতে এটা 'দস্তখত নয়, এই 'কুকর্ম', করে তার 'দস্ত্' (হাত) 'ক্ষত' হয়েছিল—এ 'পান'টি আমার নয়, বিদ্যেসাগর মশাইয়ের। তাঁর প্রোতেজে মাইকেল পান করতেন প্রচুর, স্বয়ং বিদ্যেসাগর 'পান্' করতেন অত্যল্পই।

প্রাগুক্ত সরস প্রেমালাপ হচ্ছিল জর্মনির কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং পুলিশম্যানে (চলতি জর্মনে 'শুপো')। ছোকরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে রাত দুটোর সময় কাঁকর ছুঁড়ছিল একটি বিশেষ জানলার শার্সিকে নিশান করে, এবং যেহেতু তৎপূর্বে—অর্থাৎ শনির সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত দুটো অবধি চেন-স্মোকারদের মত এ্যাট্টুখানি, মানে ইয়ে, ঐ যাকে বলে বিয়ার—পান করেছিল ব'লে তাগটা স্বভাবতই টালমাটাল হয়ে পাশের যার-তার জানলার শার্সির উপর পড়েছিল। অবশ্য একথা অবিসম্বাদিত সত্য যে, সে কাপুরুষের মত শুপোর হাতে আত্মসমর্পণ করে নি—আপ্রাণ পলায়ন-প্রচেষ্টায় নিষ্ফল হয়ে তবে ধরা পড়ে।

ব্যাপারটা সবিস্তার কি?

অতি সরল। জর্মন ছাত্রছাত্রী ডিগ্রী লাভের পূর্বের তিন বৎসর ভূতের মত খাটে। কিন্তু শনির সন্ধ্যা থেকে রবির সকাল পর্যন্ত দল বেঁধে 'পাবে' ব'সে প্রেমসে বিয়ার পান করে। এবং যেহেতু বাড়াবাড়ি না করলে খৃষ্টধর্ম মদ্যপান সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করে না, তাই কোনো কোনো প্রেমানুরাগী ছেলে ভোর সাতটার 'মেস'-এ (উপাসনায়) যোগ দিতে যায় 'পাব' থেকেই, সোজা গির্জার দিকে—শনির সন্ধ্যা থেকে রবির ভোর ছ'টা সাড়ে ছ'টা অবধি বিয়ার পান করার পর। অবশ্যই মত্তাবস্থায় নয়—তবে ইংরিজীতে যাকে বলে ঈষৎ মডলিন।

তা সে যাক। এ লেখনের বিষয়বস্তু—পুলিশ বনাম স্টুডেণ্ট ('স্টুডেণ্ট' বলতে জর্মনে একমাত্র য়ুনিভার্সিটি স্টুডেণ্টই বোঝায়—স্কুলবয়কে বলে 'শুলার')। এই দুই দলের মধ্যে হামেহাল—অবশ্য সাধারণত সন্ধ্যার পর থেকে

www.BanglaBook.org

ভোর পর্যন্ত এবং বিশেষ করে শনির দিনগত রাতে—একটা অঘোষিত বৈরিতা বিরাজ করছে, য়ুনিভার্সিটি সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে। আমি যা নিবেদন করতে যাচ্ছি তার ঐতিহাসিক পটভূমিটি কিন্তু কিংবদন্তীমূলক, অর্থাৎ পুরাণ জাতীয়। সেইটুকু সয়ে নিন। তার পরই মাল।

আমরা সকলেই জানি কতকগুলো উপাধি মানুষের নামের অচ্ছেদ্য অংশঃ যেমন (১) রেভারেন্ড, (২) কর্নেল, বা (৩) ডক্টর (শুধু চিকিৎসক অর্থে নয়; যে কোনো বিষয়ে পি-এইচ ডি, ডি এস সি জাতীয় ডক্টরেট পাস করা থাকলে)। প্রথম শ্রেণীর উপাধিগুলো বিধিদত্ত, দ্বিতীয়গুলো রাজদত্ত এবং তৃতীয়গুলো য়ুনিভার্সিটি-দত্ত।

রাজাতে চার্চে লড়াই বহু যুগ ধরে চলেছে। এ-লড়াইয়ে শেষের দিকে এলেন য়ুনিভার্সিটি। তার পূর্বে শিক্ষা-দীক্ষার ভার ছিল প্রধানত পাদ্রীদের হাতে। কিন্তু মহামতি লুথারের আন্দোলনের ফলে বহু পিতা পুত্রকে আর 'কুসংস্কারাছন্ন' যাজক সম্প্রদায়ের কাছে মানসিক, হার্দিক এমন কি আধিভৌতিক উন্নতির জন্য পাঠাতে চাইলেন না। এ ছাড়া আরো বিস্তর কারণ ছিল, কিন্তু সেগুলো এস্থলে অবান্তর না হলেও নীরস। মোদ্দা কথা, চার্চ ও রাজার লড়াইয়ের মধ্যিখানে য়ুনিভার্সিটিগুলো তক্কে তক্কে রইল আপন আপন স্বয়ংসম্পূর্ণ-স্বাধীনতা-স্বরাজ লাভের জন্য। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল লুথারপন্থী এবং তাদের মূল নীতি ছিল অনেকটা—'যখন পোপের "গুরু-বাদ" ত্যাগ করে স্বয়ং স্বাধীনভাবে বাইবেল পড়তে চাও, এবং তদ্দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে একমাত্র স্বাধীন চিন্তার উপর নির্ভর করে জীবন যাপন করতে চাও, তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দিতে হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীনতা, (অটোনমাস ইণ্ডিপেনডেন্স)—নইলে তারা স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন বিচার-বিশ্লেষণ করবে কি প্রকারে?'

যে করেই হোক সে স্বাধীনতা য়ুনিভার্সিটি-টাউনগুলোর (অর্থাৎ যে শহরগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়ই সর্বপ্রধান সর্বজনমান্য প্রতিষ্ঠান) রাস্তাঘাটেও সক্রিয় হয়ে উঠলো। অর্থাৎ নিতান্ত খুন, ধর্ষণ জাতীয় পাপাচার না করলে স্বয়ং বিশ্ববিদ্যালয়ই ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আপন জেলে (?) পুরো দিতো—বিচারের ভার নিতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ল' বা আইন, জুরিস্‌প্রুডেন্সের প্রফেসরগণ—'ছাত্র আসামী' এঁদেরই একজন বা একাধিকজনকে আপন উকীল নিয়োগ করতো—এবং সবকুছ ফ্রী-গ্র্যাটিস-এ্যাণ্ড-ফর-নাথিং!

সে-সব দিন গেছে। তবু শুনেছি, হাইডেলবের্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংবা অন্য কোনো একটা হতে পারে—আমার ঠিক মনে নেই—জেলখানাটি নাকি এখনো মিউজিয়ামের মত বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। এবং সেটি নাকি সত্যই দ্রষ্টব্য বস্তু!

যে পাঠক বাঙলা ভাষার অতুলনীয় (অমার মতে বাঙলা ভাষায় 'অদ্বিতীয়') পুস্তক, উপেন বাঁড়ুয্যের 'নির্বাসিতের আত্মকথা' পড়েছেন, তিনি হয়তো স্মরণে আনতে পারবেন (আমিও স্মৃতির উপর নির্ভর করে বলছি ; তাই ভুল-চুক হবে নিশ্চয়ই, এবং তার জন্য মাফ চাইছি) যে, যখন অরবিন্দ-বারীন-উল্লাস-উপেন-কানাই-সত্যেন এট আল্‌-এর বিরুদ্ধে আলীপুরে বোমার মামলা হয় তখন হাজতে থাকাকালীন ছোকরাদের মধ্যে যাদের অদম্য কবিত্বপ্রকাশব্যাধি

www.BanglaBook.org

ছিল তারা লেখনীমস্যাধারাভাবাৎ কাঠকয়লা দিয়ে দেয়ালে পদ্য লিখত। তারই একটি,

'ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে পাট শরীর হইল কাঠ
সোনার বরণ হৈল কালি
প্রহরী যতেক ব্যাটা বুদ্ধিতে তো বোকা-পাঁঠা
দিনরাত দেয় গালাগালি।'

যতদূর মনে পড়ছে, 'উপীন'বাবু যেন মুচকি হেসে মন্তব্য করছেন, আহা কী 'সোনার বরণ'ই না বঙ্গসন্তানের হয়!

তারপর যা লিখছেন তার সারমর্ম; মাঝে মাঝে দু-একটি ভালো কবিতাও চোখে পড়ত। উদাহরণ-স্বরূপ দিয়েছেন,

'রাধার দুটি রাঙা পায়ে
অনন্ত পড়েছে ধরা,
ওঠে ভাসে কত বিশ্ব
চিদানন্দে মাতোয়ারা।'

এবারে তিনি যেন তাঁর চোখে একফোঁটা জল আসতে না আসতে দুঃখ করছেন, হায় রে মানুষের মন! কারাগারের পাষাণ-প্রাচীরের ভিতরেও রাধার দুটি রাঙা পায়ের জন্য সে আছাড় খায়।[১]

* * *

জর্মন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন যুগের আপন জেলখানার কথা হচ্ছিল। তার অন্যতম প্রাচীনতমের নিঃসন্দেহ সর্বোৎকৃষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন মার্ক টুয়েন। সে বর্ণনাটি এমনই সদ-জাতের-বাড়া চৌম্বকীয় আকর্ষণীয় বর্ণনা যে তারই টানে আমারই চেনা এক সহযাত্রী জর্মন-সীমান্তে পেঁছেই নাক-বরাবর চলে যান ঐ জেল দেখতে—সাঁ সুসি প্রাসাদ, ড্রেসডেনে সঞ্চিত রাফায়েলের মাদোনা নস্যাৎ করে।

আলীপুরের যে সব 'কবিরা' প্রহরীকে পাঁঠা নাম দিয়েছেন, কিংবা চোখ বন্ধ করে রাধার দুটি রাঙা পায়ের ধ্যানে মজে গেছেন, তাঁরা কিন্তু বিলক্ষণ জানতেন, তাঁদের জন্য মৃত্যু জেলের চতুর্দিকে ঘোরাফেরা করছে—শহীদ হওয়ার সম্ভাবনা কবি, অকবি সকলেরই প্রায় সমান। কিন্তু জর্মন-বিশ্ববিদ্যালয়-জেলে ছাত্রেরা যেত অল্প কয়েক দিনের জন্য, ফাঁসির তো কথাই ওঠে না। তাই মার্ক টুয়েনের পক্ষে সম্ভব হয়েছে অপূর্ব হাস্যরসে রঞ্জিত করে সেই জেলটির বর্ণনা দেবার। কাজেই উপস্থিত আলীপুরের কথা ভুলে যান।

* * *

বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাঁসি-কাঠ না থাকতে পারে, ক্যাবারে-কা কাঁর ব্যবস্থা না থাকতে পারে, কিন্তু লেখনী-মস্যাধারের অভাব!—এটা কল্পনাতীত। যদিস্যাৎ ঐ জর্মনীরই সর্বোৎকৃষ্ট দশ লিটার বিয়ার প্রসাদাৎ কল্পনাটা করেই ফেলি,

---

১ অধীন পারতপক্ষে আপন বইয়ের বরাত দেয় না, কিন্তু এ-স্থলে নিতান্ত বাধ্য হয়ে নিবেদন, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'নির্বাসিতের আত্মকথা'র উপর মল্লিখিত প্রশস্তি ময়ূরকণ্ঠীতে পশ্য। তবে অনুরোধ এই, মূল বইখানা প্রথম পড়বেন। তারপর আমার বই পড়ার প্রয়োজন আশা করি আর হবে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তখন চোখের সামনে, বিকল্পে ভেসে উঠবে পেন্‌সিল্‌—একথা তো ভুললে চলবে না, এদেশের কেতাবপত্রে মহামান্য কাইজারের (ভারতীয় কাইসর-ই-হিন্দ পদক, লাতিন সীজার ইত্যাদি) নাম পড়ার বহু পূর্বেই ভারতীয় ছেলেবুড়ো ব্যবহার করেছে, Koh-i-noor, made by L. & C. Hardmuth in Austria, graphite[২] drawing pencil. compressed lead.

তাই সেই পেন্‌সিল্‌ অকৃপণ হস্তে ব্যবহৃত হয়েছে ছাত্র 'কয়েদী'র দল দ্বারা বংশপরম্পরায়—সাদা দেয়ালের উপর। শুধু কবিতা না, বহুবিধ অন্যান্য চীজ্‌।

কিন্তু তৎপূর্বে তো জানতে হয়, এরা জেলে আসতো কোন্‌ কোন্‌ 'অপরাধ' করে। এর অনেকগুলোই আমি স্বচক্ষে দেখেছি, এবং সাতিশয় সন্তোষ সহকারে স্বীকার করছি, সবল সক্রিয় হিস্যেদারও হয়েছি বহু ক্ষেত্রে অর্থাৎ 'শুপো-স্টুডেণ্টেন, পুলিশ ভর্সস্‌ ছাত্র 'যুদ্ধে'—কিংবা যুদ্ধ আসন্ন দেখে দ্রুততম গতিতে পলায়নে। কিন্তু সেটা অন্য অধ্যায়।

॥ ২ ॥

'পাজীটা এখনো এল না যে, ব্যাপারটা কি? বলেছিল না, তার কাকা আসছে ডান্‌ৎসিগ থেকে, ওর জন্য নিয়ে আসবে কয়েক বোতল অত্যুৎকৃষ্ট ডান্‌ৎসিগার গোল্ট্‌ ভাসার্‌ (ডান্‌ৎসিগের স্বর্ণবারি—সোনালী সোমরস), আমরা সবাই হিস্যে পাবো।'

'একটা ফোন করলে হয় না?'

'হুঁ! সেই আনন্দেই থাকো! টেলিফোন! বুড়ির বাড়িতে এখনো দড়ি টেনে ভিতরের ঘণ্টা বাজাতে হয়। ইলেকট্রিক বেল্‌ পর্যন্ত নেই। তবে, হ্যাঁ, গার্ল ফ্রেণ্ডদের যখন তখন আপন কামরায় নিয়ে যেতে দেয়। তদুপরি বুড়ি বধির কালা। শুনেছি, পায়ের উপর গরম ইস্ত্রিটা হঠাৎ হাত থেকে ফসকে পড়ে গিয়েছিল—শুনতে পায় নি।'

রসালাপ হচ্ছিল শনির সন্ধ্যায় 'পার্ব'-এ। জনসাতেক মেম্বর জমায়েৎ হয়ে একটা গোল টেবিল ঘিরে বিয়ার পান করছেন। সেটার উপর কোনো টেবিল-ক্লথ নেই। আছে গত একশ বছরের স্টুডেণ্ট খদ্দেরদের নাম, যারা প্রতি শনিবারে এই টেবিলটা ঘিরে গুলতানি করেছে—ছুরি দিয়ে খোদাই করা। আমাদের পলের বাপ ভিল্‌ হেল্‌মের নামও এই টেবিলে আছে। সমস্ত টেবিলটা নামে নামে সম্পূর্ণ ভর্তি হয়ে গিয়েছে—আর নতুন নাম খোদাই করার উপায় নেই।

এদের গুলতানির বর্ণনা বা ইতিহাস দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। কারণ সবাই জানেন, সেই সোক্রাতেসের যুগ থেকে ইয়োরোপে গুণীজ্ঞানী থেকে চোরচোট্টা সবাই মদ্যালয়ে বসে বিশ্রম্ভালাপ করেছেন এবং সহজেই অনুমেয়,

---

২ এসব বাবদে জর্মনী অস্ট্রিয়া একই ধরা হয়। হিটলার নিজে অস্ট্রিয়ান হয়েও জর্মনীর ফুয়ারার হয়েছিলেন, এ সব তো জানা কথা। উভয় দেশের ভাষাও এক।

www.BanglaBook.org

চোরচোট্টারা প্লাতোর 'আইডিয়া'র সংজ্ঞা খুঁজতে গিয়ে ছোরাছুরি করে নি, আর সোক্রাতেস প্রতিবেশীর তালাটি কি প্রকারে নিঃশব্দে বে-কার করা যায় তাই নিয়ে মদ্যপান করতে করতে শিষ্যদের সঙ্গে কূট ষড়যন্ত্রে ত্রিযামা যামিনী যাপন করেন নি। অর্থাৎ যে যার বৈদগ্ধ্য, জ্ঞানবুদ্ধি, যাতে তার চিত্তাকর্ষণ, তাই নিয়ে কথাবার্তা কইতে ভালোবাসে। তবে হ্যাঁ, মদ্যপানের মেক্‌দার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আলোচনার বিষয়বস্তু যে ঈষৎ নিম্নস্তরে নেমে যায় সেটা অনেকেই লক্ষ্য করেছেন। জর্মনির স্টুডেন্টদের বেলায়ও তাই।

আমার ছিল মেজাজমর্জি অত্যন্ত খারাপ। ঠিক সেদিনই খবর পেয়েছি ইংরেজ গোল্ড স্ট্যাণ্ডার্ডকে তালাক দিয়েছে। তারই ফলে আমার কুল্লে বচ্ছরের খরচার জন্য ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার এক-তৃতীয়াংশ (বেশী হতে পারে, কমও হতে পারে, এতকাল পর সঠিক বলা কঠিন) কর্পূর হয়ে গেল। অর্থাৎ এখন যে য়ুনিভার্সিটি রেস্তোরাঁয় সবচেয়ে সস্তা ডিনারটি (সে যুগে দাম ছিল 'এদেশী পয়সায় কুল্লে বারো আনা) খাবো, তারো উপায় রইল না। কাল সন্ধ্যা থেকে রাত্তিরের খাওয়াটা নিজেকেই রাঁধতে হবে। ওদিকে দেশের ইয়াররা ভাবছেন, লেখাপড়ায় আস্ত একটা গর্দভ ঐ ছেলে জর্মনি গিয়ে তোপা মজাটা লুটে নিলে, মাইরি!'

ইতিমধ্যে এসব 'পাবে' শনির সন্ধ্যায় যা-সব হয় সে-সবই হয়ে গেছে। ঠেলায় করে গরম গরম সসেজ এসেছে, দু'চারটে আনাড়ি বাজিয়ে ব্যাঞ্জোর উপর উৎপাত করে যৎসামান্য কামিয়ে গিয়েছে, পিকচার পোস্টকার্ড জুতোর ফিতে বিক্রির ছলে ভিখিরি তার রোঁদ মেরে গেল।

করে করে রাত একটা বাজলো। বিস্ময়বোধক চিহ্ন দেবার জন্য ঐ চিহ্নেরই বিন্দুটির বিন্দুবৎ প্রয়োজন নেই; শনির রাত্রি জর্মনিতে আরম্ভ হয় বারোটায় —যদ্যপি গ্রিনিজ ফয়তা ঝাড়ে ঐ সময়টায় নাকি তার পরের দিন আরম্ভ। কিন্তু রাত একটার পর সাধারণ মদ্যালয় বন্ধ। এর পর করা যায় কি? আমি বিশেষ করে তাদেরই কথা ভাবছি যাদের তখনো তেষ্টা মেটে নি—জর্মনদের বিশ্বাস তারা বিয়ার পান করে তৃষ্ণা নিবারণার্থে। সাধারণ মদ্যালয় যখন বন্ধ তখন খোলা রইল অসাধারণ মদ্যালয়। সেগুলো একটু ইয়ে অর্থাৎ বিশেষ শ্রেণীর মহিলায় ভর্তি আর কি। তবে স্টুডেন্টরা দল বেঁধে যখন সেখানে ঢুকে আপন গালগল্পে মত্ত হয় তখন ঐ পূর্বোক্ত 'ইয়েরা' ওদের জ্বালাতন দূরে থাক্—ডিস্টার্বও করে না। ওদের পকেটে আছেই বা কি?

ইতিমধ্যে সেই যে আমাদের টেওডর যাকে নিয়ে কাহিনী পত্তন করেছি, তার হঠাৎ পুনরায় শোক উথলে উঠলো ঐ ডান্‌ৎসিগ নগরীর প্রখ্যাত স্বর্ণবারির জন্য। বার বার বলে, 'দেখলে ব্যাটার কাণ্ডখানা! রাত একটা তক্ আমাদের বসিয়ে রাখলে একটা সুরালয়ে—যখন কিনা প্রত্যেক বাপের প্রত্যেক সু-পুত্তুরের কর্তব্য আপন আপন সুনির্মিত স্নেহময় নীড়ে নিদ্রাদেবীর শান্ত্যাঞ্চলে আশ্রয় নেওয়া।'

কে একজন বললে, 'এই খানিকক্ষণ আগেই না তুইই বললি, পেটারের বাড়িটা আসলে অ্যাডাম এবং ঈভ তৈরী করেছিলেন ঝুরঝুরে থুরথুরে?'

টেওডরের কিন্তু তখন কারো টিপ্পনীতে কান দেবার মত মরজি নয়—সে তখন মৌজে। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে, যেন এক নবীন রিলেটিভিটি আবিষ্কার

www.BanglaBook.org

করার উৎসাহ দেখিয়ে বললে, 'আর পেটার ব্যাটা নিশ্চয়ই আরামসে ঘুমুচ্ছে। চলো, ব্যাটাকে গিয়ে জাগানো যাক।'

এস্থলে কারো পক্ষে রণে ভঙ্গ দেওয়া জর্মন-স্টুডেণ্ট-মনু-শাস্ত্রে গোমাংস ভক্ষণের চেয়েও গুরুতর পাপ। তুমি তা হলে আস্ত একটা কাপুরুষ! পুলিশকে—অর্থাৎ দুশমনকে—ডরাও। তোমার কলিজা বক্‌রির, তোমার সীনা চিড়িয়ার। অতিষ্ঠ হয়ে আপনি শুধোবেন, 'রাত্রি একটাই হোক্, আর তিনটেই হোক্, কেউ কাকে জাগালে পুলিশের পূর্বতর অধস্তন চতুর্দশ পুরুষের কিবা ক্ষতিক্ষয়, জখম-লোকসান? ওদেশে কি রেতে-বেরেতে টেলিগ্রাফ পিয়ন আসে না?'

দাঁড়াও পাঠকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এসব ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

বলা বাহুল্য রাত তেরটার সময়—গ্রিনিজ যদিও সেটাকে দিবাভাগ বলেন—আপনি যদি বাড়ির, অবশ্য অন্য বাড়ির, দোস্ত দুশমন—যে-ই হোক কাউকে জাগাবার চেষ্টা করেন, তা সে সীমেন-হালেস্কে-শুকের্টের নব্যতম বিজলি-বেল্ বাজিয়েই হোক, আর পৌরাণিক যুগীয় ঘণ্টাকর্ণ কানে যে-ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখতো যাতে করে সে তার জন্মবৈরী শ্রীহরির নাম-কীর্তন শুনতে না পায়—সেই ঘণ্টাটিই বাজান, বাড়িউলী দরজা খুলে শনির রাতে ঐ জবাকুসুমসঙ্কাশ টেওডরের নয়নযুগল দেখতে পাবে—আমরা আর-সবাই না হয় পাশের গলিতে গা-ঢাকা দিয়েই রইলুম—তখন তার কণ্ঠ থেকে—ভুল বললুম, নাভিকুণ্ডলী থেকে যেসব মুরজ-মুরলীধ্বনি বেরুবে তার ঈষদ্‌তমাংশ শুনতে পেলে ঐ যে খানিকক্ষণ আগে কি-সব 'ইয়েদের কথা বলছিলুম তারা পর্যন্ত নোকের সামনে লজ্জা পাবে। অতএব ঐ কবোষ্ণ অন্ধকারেও আমাদের কাছে জাজ্বল্যমান হল যে ফ্রণ্টাল এটাকের স্ট্র্যাটেজি বিলকুল ঔট্ অব্ ডেট্।

আমাদের হস্তে তৎসত্ত্বেও আশার একটি ক্ষীণ প্রদীপ মিদির্ মিদির্ করছে। পেটারের কামরাটা দোতলায়, এবং একদম রাস্তার উপরে। অতএব আমরা সেদিক বাগে যেতে যেতে হেথাহোথা ক্ষুদ্রাকারের নুড়ি, কাঁকর, সোডার ছিপি ইত্যাকার মারণাস্ত্র কুড়িয়ে নিয়ে সুসজ্জিত হয়ে পৌঁছলুম পেটারালয়ে—বঙ্কিম সঙ্কীর্ণ পথ দুর্গম নির্জন পেরিয়ে।

পেটার থাকে মাউস ফাডে (সার্থক নাম, বাবা,—'ইঁদুরের পথ!')।

টেওডরই আমাদের হিণ্ডেনবুর্গ বলুন, লুডেনডর্ফ বলুন, আমাদের রাইষ মার্শাল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, যদিও সে পেটারের ঘরে আসে সপ্তাহে নিদেন দশ দিন, তবু তার জানলা যে ঠিক কোন্‌টা সেটা ঠাহর করতে পারছে না—আশা করি তার কারণ আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। অবশেষে হান্‌স্-ই লোকেট্ করলে জানলাটা। হান্‌স্ বটনির ছাত্র—পেটারের জন্মদিনে তাকে একটা অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ সাতিশয় বিরল ফণীমনসা উপহার দেয়। একটা জানলার বাইরের চৌকাঠ-পানা ফালি কাঠের উপর হান্‌স্ সেটি আবিষ্কার করলে—রাত্রের হিম খাওয়াবার জন্য পেটার সেটি ঐ সিল্ না লেজ্ কি যেন বলে ইংরিজীতে—তারই উপর রেখে দিয়েছিল। কালিদাসের যুগে দ্বারে আঁকা থাকতো ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন যেমন শঙ্খচক্র—হেথায় কেক্‌টাস্।

পয়লা রৌণ্ডে টেওডর ছুঁড়ে মারল সোডার ছিপি। লাগলো গিয়ে ডান-

www.BanglaBook.org

পাশের জানালাটায়। আমরা ফিসফিস করে পেটারকে সাবধান করতে কসুর করি নি, কিন্তু কেবা শোনে কার কথা, সে তখন জাঁদরেল জনরৈল সিং, আমরা নিতান্ত ডালভাত দাবাখেলার বড়ে-পেয়াদা। দুসরা রৌণ্ডে টেওডর বোধ হয় ফইর করেছিল একটা স্নো কোঁটোর ঢাকনা। এটা ধন্-ন্ ন্ করে গিয়ে লাগলো বাঁ-পাশের জানলাটায়। আমরা তাকে কিছু বলতে যেতেই সে ধমক দিয়ে বললে, 'চোপ! এই হল আর্টিলারির আইন। প্রথম মারবে তাগের চেয়ে দূরে, তার পর তাগের চেয়ে কাছে, শেষটায় ম্যাথম্যাটিকলি মেজার করে ঠিক মধ্যিখানে। হবেও বা। ও তো প্রাশান য়ুংকার ঘরের ছেলে—জানার কথা। এবং আমাদের তুলনায় তার পকেট-শস্ত্রাগার পরিপূর্ণ। কারণ আমরা জর্মনীর ধোপ-দুরস্ত রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি কীই বা এমন কামান-ট্যাঙ্ক। পক্ষান্তরে যুযুধান টেওডর ঘিনপিৎ উপেক্ষা করে 'পার্বের সামনের 'বিন্' থেকে মেলা অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে এনেছে। তাই এবারে ছুঁড়লে ছোট্ট একটি মার্কিং ইঙ্কের খালি শিশি। লাগলো গিয়ে তেতলার একটা জানলায়। তখন বুঝতে পারলুম জর্মনী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কেন জিততে পারে নি। দ্বিতীয়টা-তখনো হয় নি! সে সময় হিট্লার যদি আমাকে কন্সল্ট করতো তবে আমি নিশ্চয়ই তাকে বারণ করে দিতুম—বিশেষত এই অভিজ্ঞতার পর।

তার চেয়েও স্পষ্ট বুঝতে পারছি, টেওডর এখন যে অবস্থায় পেঁাচেছে সেখানে আপন নাক চুলকোতে চাইলে গুত্তা মারবে পিঠে। কিন্তু সে-তত্ত্বটি তখন তাকে বলতে গেলে সেই সুপ্রাচীন জর্মন কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি হবে মাত্র; এক মাতাল রাত চৌদ্দটায় বাড়ি ভুল করে বার বার চেষ্টা করছে চাবি দিয়ে সদর দরজা খোলবার এবং সঙ্গে সঙ্গে কটুকাট্য। সেই শব্দে শেষটায় দোতলায় একজনের ঘুম ভেঙে গেল। নিচের দিকে মাতালকে দেখে বললে, 'হেই, তুমি ভুল বাড়ির তালা খোলবার চেষ্টা করছো। মাতাল উপরের দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে বললে, 'হে হে হে হে! তুমিই ভুল বাড়িতে ঘুমুচ্ছো।'

এই একতরফা লড়াই—আইনে যাকে বলে ইন্আব সন্শিয়া—কিংবা বলতে পারেন ডন্-কুইক্সটের জলযন্ত্র আক্রমণ—আধঘণ্টাটাক চলার পর টেওডর ছাড়লে—বলতে গেলে তার প্রায় শেষ সিক্স্ পৌণ্ডার—সার্ডিনমাছের খালি একটা টিন। ঝন্ ঝন্ করে শব্দ হল। কিন্তু পরে মনে হয়েছিল সে যেন ওস্তাদ এনায়েৎ খানের সেতার—কারণ সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু ছাপিয়ে কানে গেল পুলিশের ভারি ভারি বুটের শব্দ। এটা হল কি প্রকারে? সচরাচর শানবাঁধানো রাস্তার উপর রোঁদের পুলিশের বুটের শব্দ সেই নিঝুম নিশীথে অনেক দূরের থেকে শোনা যায়, এবং টেওডর ছাড়া আমাদের আর সকলের আধখানা কান খাড়া ছিল তারই আশংকায়। অতএব দে ছুট্ দে ছুট! কোন্ মূর্খ বলে যুদ্ধে পলায়ন কাপুরুষের কর্ম! ইংরেজ অরিন্দমদের সঙ্গে যুদ্ধে পালালে পর এ দেশের জোয়ানদের বুঝিয়ে বলতো, এর নাম বাহাদুরীকে সাথ্ পিছে হঠনা!

কিন্তু ছুটতে ছুটতে আমি শুধু ভাবছি, এতগুলো বুটের শব্দ একসঙ্গে হল কি করে, রোঁদে তো বেরোয় প্রতি মহল্লায় হার্টের, sorry, হার্টলেস সিংগ্লটন! তা সে যা-ই হোক, এখন তো প্রাণটা বাঁচাই।

পূর্বেই বলেছি, পেটারের গলিটার নাম মূষিকমার্গ। আসলে কিন্তু বন্

www.BanglaBook.org

শহরের আঁকাবাঁকা হাঁসুলি বাঁকের মোড়, পায়ের বেঁকি-গয়নার প্যাঁচ-খাওয়া আড়াই বিঘৎ চওড়া নিরানব্বুইটি 'রাস্তাকেই' মূষিকমার্গ বলা যেতে পারে—তার জন্য কল্পনাশক্তিটিকে বহু সুদূরে সম্প্রসারিত করতে হয় না।

কিন্তু একটি তত্ত্ব সর্বজনবিদিত। এই গলিঘুঁচি কোথায় যে হঠাৎ বেঁকে গেছে, কোথায় যে রাস্তার একপাশে বহু প্রাচীন কালেই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত একটি কারখানার অন্ধকার অঙ্গনে অশরীরী হওয়া যায়, অর্থাৎ লুকানো যায় (হংসমিথুনের কথা অবশ্য আলাদা), কোথায় যে একটা গারাজের আংটাতে পা দিয়ে সামান্য তকলিফেই ছাতে ওঠা যায়, এ সব তথ্য পুলিশ যতখানি জানে আমরাও ঠিক ততখানিই জানি। এমন কি লেটেস্ট খবরও আমরা রাখিঃ অমুক দেউড়ির ঠিক সামনের রাস্তার বাতিটি বরবাদ হয়ে গিয়েছে, এখনো মেরামত হয় নি, কিংবা অমুক জায়গায় পরশুদিন থেকে এক ডাঁইপিপে জুটেছে—পিছনে দিব্য অন্ধকার। অর্থাৎ পুলিশ তার আপন হাতের তেলো যতখানি চেনে, আমরাও আমাদের তেলো ততখানিই চিনি।

মূষিকমার্গ ধরে খানিকটে এগোলেই সেখানে তেরাস্তা। আমাদের স্ট্র্যাটেজি অতি সনাতন, সুপ্রাচীন। সঙ্গে সঙ্গে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে দু দিকে ছুট লাগালাম। আবার তেরাস্তা পেলে আবার দু ভাগ হব। ধরা যদি পড়িই তবে দলসুদ্ধ ধরা পড়বো কেন? এবং যুদ্ধেরু নীতিও বটে, 'আক্রমণের সময় দল বেঁধে ; পলায়নে একলা-একলি।' খুদে বন শহরে পুলিশ গিস্ গিস্ করে না—আর এই রাত চোদ্দটায় ফাঁড়ি-থানা কটাই বা স্পেয়ার করতে পারে? কাজেই প্রতি তেরাস্তায় তারা যদি আমাদেরই স্ট্র্যাটেজি অনুসরণ করে তবে যাদের 'মেন পাওয়ার' কম বলে, কয়েকটা রাস্তা ফোলো অপ্ করতে পারবে না বলে শেষ পর্যন্ত হয়ত কেউই ধরা পড়বে না। কিন্তু এই 'শুপো' নন্দনগণ ঘড়েল। এবম্প্রকার বহু যুদ্ধে তারা জয়ী এবং পরাজয়ী হয়ে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে সেটা তাদের শেখায় অন্য স্ট্র্যাটেজি।

পাঠক, তুমি কখনো পোষা চিতা বাঘ দিয়ে হরিণ-শিকার দেখেছ? না দেখারই সম্ভাবনা বেশী, কারণ সেই রাজারাজড়াদের আমলেও এ খেলাটি অস্মদ্দেশে ছিল বিরল। আমাকে দেখিয়েছিলেন বরোদার বুড়ো মহারাজ।

মহারাজার খাস রিজার্ভ ফরেস্টে ছিল বিস্তর হরিণ। তাদের পিছনে লেলিয়ে দেওয়া হত একটা পোষা, ট্রেনড্ চিতে বাঘ। বাঘ দেখা মাত্রই হরিণের পাল দে ছুট দে ছুট। এবং মাচাঙের উপর থেকে স্পষ্ট দেখতে পেলুম, একটু সুবিধা পাওয়া মাত্রই তারা দু ভাগ হয়ে গেল, তার পর আবার দু ভাগ, ফের দু ভাগ—ক'রে ক'রে হরিণের পাল আর পাল রইল না, হয়ে গেলো চিত্তিরমিত্তির।

কিন্তু আমাদের নেকড়ে মহাশয়টিও অতিশয় সুবুদ্ধিমান। এ ভাগ, ও ভাগকে খামোখা তাড়া করে সে বর্বরস্য শক্তিক্ষয় করলো না। সে প্রথম থেকেই তাগ করে নিয়েছে একটা বিশেষ হরিণ। প্রতিবারে পাল যখন দু ভাগ হয়, তখন সে ঐ বিশেষ হরিণটার ভাগেরই পিছন নেয়। পরে চিতার ট্রেনার আমাকে বলেছিল, 'সব চেয়ে যে হরিণটা ধুমসো, চিতে সব সময়ই একমাত্র ঐটের পিছু নেয়—এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে শক্তিক্ষয় করে না, কারণ চিতে জানে ঐটেই হাঁপিয়ে পড়বে সক্কলের পয়লা। ধরতে পারলে পারবে ঐটেকেই—সব সময়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যে পারে তাও নয়।'

বন্ শহরের শুপো সম্প্রদায় ঠিক তাই করলে। আমাদের মধ্যে যে দুটি ছিল সবচেয়ে হোঁৎকা, ওরা প্রতি দু' ভাগ হওয়ার সময় ওদেরই পিছু নিল। শেষটায় ধরতে পেরেছিল অবশ্য একজনকে। সে কিন্তু টেওডর নয়, এবং জসট্ টু কীপ কম্পানি, ছুঁড়েছিল মাত্র নিতান্ত খুদে দু'চারটি কাঁকর। তার কথাই আপনাদের খেদমতে ইতিপূর্বে পেশ করেছি।

আগের জমানায় পুলিশ তাকে দিয়ে দিত য়ুনিভার্সিটির হাতে—সে যেত য়ুনিভার্সিটির জেলে। শুনেছি, এস্তেক স্বয়ং প্রিনস আউটো এডওয়ার্ড লেওপোল্ড ফন্ বিস্মার্ক অবধি গেছেন। এবং সে তখন জেলের দেয়ালের উপর পেন্সিলযোগে আপন জিঘাংসা, কিংবা অনুশোচনা, কিংবা মধ্যিখানে, কিংবা কটূবাক্য—যথা যার অভিরুচি—কভু গদ্যে কভু ছন্দে, সেও কী বিচিত্র, কখনো আলেক্জেন্ড্রিয়ান কখনো—সে কথা আরেক দিন না হয় হবে—লিখতোঃ আমার আমলে আমাদের যেতে হত শহরের জেলে—একদিনের তরে (সেও এক মাসের ভিতর দিনটা বাছাই করে নেওয়া 'আসামী'র এক্তেয়ারেই ছেড়ে দেওয়া হত, বাইরে থেকে আপন খানা আনানো যেত, এবং যেহেতু যেসব সহযুযুধানবর্গ সে যাত্রায় পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁরা নেমকহারাম নন, তাঁরাই চাঁদা তুলে উত্তম লঞ্চ ডিনার বাইরে থেকে পাঠাতেন) ; কিংবা (ভারতীয় মুদ্রায়) সোয়া তিন টাকা জরিমানা দান—যথা অভিরুচি।

কিন্তু প্রশ্ন, এতগুলো পুলিশ সে রাত্রে হঠাৎ এক জোট হল কি করে?

খাঁটি বন্ বাসিন্দারা আমাদের যুদ্ধে নিরপেক্ষ। কিন্তু লক্ষভ্রষ্ট কাঁকর বা সোডার ছিপি যদি তার জানলায় লেগে গিয়ে তার নিদ্রাভঙ্গ করে তবে সে জানলা খুলে কটূবাক্য আরম্ভ করার পূর্বেই আমরা অকুস্থল ত্যাগ করি। কেউ কেউ আবার হঠাৎ এক ঝটকায় জানলা খুলে আমাদের মাথার উপর ঢেলে দেয় এক জাগ্ হিমশীতল জল। আমরা অবশ্য এজাতীয় অহেতুক উপদ্রবের জন্য সদাই সতর্ক থাকি।

কিন্তু আজ ছিল আমাদের পড়তা খারাপ। টেওডরের সক্কলের পয়লা বুলেট, বা সোডার ছিপি, যাই বলুন, পড়ে একদম পাশের ফ্ল্যাটে এক নবাগত বিদেশীর জানলায়—কেন যে বিদেশীগুলো বন-শহরটাকে বিষাক্ত করার জন্য আসে, আল্লায় মালুম—সে কিন্তু জানতো, বন্ শহরের খাস বাসিন্দারা এই (মোর্ দ্যান্) হানড্রেড্ ইয়ার ওয়ারে ভদ্র সুইটজারল্যাণ্ডের মত সেই যুদ্ধারম্ভের রাত্রি থেকেই নিরপেক্ষ জোর কটূকাটব্য (অর্থাৎ ডিপ্লোমাটিক প্রটেস্ট)। কিংবা এক জাগ্ জল। তা সে এমন কীই বা অপকর্ম তে ইউরোপীয়রা তো চান করে একমাত্র যখন জাহাজ-ডুবি হয়। জল ঢেলে সে তো পুণ্যসঞ্চয় করলো, ডাক্তারদের শ্রদ্ধাভাজন হল। কিন্তু আজকের এই বিদেশী পাপিষ্ঠটা কটূবাক্য করে নি, জল ঢালে নি, করেছে কি, সে-ফ্ল্যাটে ফোন ছিল বলে চুপি-সাড়ে ফাঁড়ি-থানাকে জানিয়ে দিয়েছে। ওদিকে আমার ইয়ার টেওডরের অগুনতি সখা এই শহরে। এবং বছর দুই ধরে সে প্রাগুক্ত পদ্ধতিতে শহরের এ-মহল্লায়, ও-মহল্লায় শনির রাতে—এবং সেটা যত গভীর হয় ততই উম্দা—আজ একে, পরের শনিতে অন্য কাউকে জাগাবার চেষ্টা করে যাচ্ছে। পুলিশ বিস্তর গবেষণার পর লক্ষ্য করলো যে সর্বত্রই ওয়ার্কিং মেথড বা মডুস অপেরাণ্ডি

www.BanglaBook.org

হুবহু এক—বড় বড় ব্যাঙ্ক-ডাকাতরা যে রকম পুলিশের এই জাতীয় গভীর গবেষণার ফলেই শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে। তাই তারা সেই ডেঞ্জরস্ ক্রিমিনাল টেওডরের প্রতীক্ষাতেই ছিল।

আর আপনাদের সেবক এই অধম? সে কি কখনো ধরা পড়েছিল?

॥ ৩ ॥

অধীর পাঠক! শান্ত হও, তোমার মনে কি কুচিন্তা সে আমি জানি; ইতিমধ্যে ঐ বাবদে দু'খানা চিঠিও পেয়েছি, আমার কিন্তু-কিন্তু-কিন্তু ভাবটা যাচ্ছে না। আমি জানি, তোমার জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবল, তাই জানতে চাও আমি কখনো ধরা পড়ে শ্রীঘরবাস করেছিলুম কিনা। আমার সে 'দুরাবস্থার'[৩] বর্ণনা শুনে তোমার হৃদয়মনে কোন্ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টে হবে সেই নিয়ে আমার দুর্ভাবনা। তাহলে একটি ছোট কাহিনী দিয়ে আমার সংকোচটা বোঝাই।

মাত্র কয়েকদিন আগে, ১৬ই অগ্রহায়ণ, আমরা স্বর্গত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুদিন পালন করলুম। এঁর বহু বহু সদ্‌গুণ ছিল, তার অন্যতম, তিনি নিজে সাহিত্য নাট্য সৃষ্টি করুন আর নাই করুন সে যুগের সবাই মেনে নিয়েছিলেন যে তাঁর মত শাস্ত্রজ্ঞ রসজ্ঞ জন বাঙলা দেশে বিরল—এবং শুদ্ধমাত্র রসজ্ঞ হিসাবে অদ্বিতীয়। তাই কাঁচা পাকা সর্ব লেখকই তাঁকে তাঁদের বই পাঠিয়ে মতামত জানতে চাইতেন। ওদিকে গুরুদাস ছিলেন কর্ম-ব্যস্ত পুরুষ। সেই ডাঁই ডাঁই বই পড়ে স্বহস্তে উত্তর লেখার তাঁর সময় কই? তাই একখানা পোস্টকার্ডে যা ছাপিয়ে নিয়েছিলেন তার মোটামুটি মর্ম এই ঃ—'মহাশয়, আপনার পাঠানো পুস্তকের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি উহা মনোযোগ সহকারে পড়িয়াছি। সত্য বলিতে কি পড়িতে পড়িতে—' এখানে এসে থাকতো একটা লম্বা লাইন এবং তার উপরে ছাপা থাকতো, 'হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই এবং লাইনের নিচে ছাপা থাকতো, 'অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই।' তিনি নাকি পাঠানো বইখানা পড়ে যথোপযুক্তভাবে হয় লাইনের উপরের 'হাস্য সম্বরণ' বা নিচের 'অশ্রু সম্বরণ' কেটে দিতেন। তিনি ছিলেন অজাতশত্রু, তাই নিশ্চয়ই কোনো বদরসিক কাহিনীটির সংগে আরো জুড়ে দিত যে, অধিকাংশ স্থলেই তিনি নিজে বইখানি পড়তেন না, তাঁর সেক্রেটারি সেটি পড়ে বা না পড়ে উপরের 'হাস্য' কিংবা নিচের 'অশ্রু' কেটে দিত।[৪]

---

৩. এ-যুগের ছেলে ছোকরারা বিদ্যাসাগর পড়ে না বলে বলতে দোষ নেই যে একদা এক পিতা-পুত্র বিদ্যাসাগর মশায়ের কাছে তাদের দুঃখের কাহিনী শেষ করলে এই বলে, 'আমাদের দুরাবস্থাটা দেখুন।' বিদ্যাসাগর নাকি মুচকি হেসে বললেন, 'তা সেটা আকার (আ-কার) থেকেই বুঝতে পারছি।'

৪। ভিক্টর য়্যুগো (Hugo) সম্বন্ধে বলা হয়, একবার এক অখ্যাতনামা কবি য়্যুগোকে তাঁর কবিতার বই পাঠিয়ে তাঁর মতামত জানতে চাইলেন। সংগে সংগে য়্যুগোর সানন্দ অভিনন্দন এসে পৌঁছল সেই কবির হাতে, তাঁর কাব্যসৃষ্টির অজস্র প্রশংসাবাদ করে য়্যুগো শেষ করেছেন এই বলে, 'হে নবীন কবি, আমি তোমাকে সাদর আলিংগন করে ফ্রান্সের

www.BanglaBook.org

তাই আমার কিন্তু-কিন্তু, তুমি লাইনের উপরের না নিচের, কোন্ বাক্যটি কাটবে—আমার কাহিনী শুনে। তা সে যাক্‌গে, বলেই ফেলি। কোন্ দিন আবার দুম করে মরে যাবো।

পূর্বেই নিবেদন করেছি, চিতে বাঘ হরিণের পালের গোদাটাকেই সব সময় ধরবার চেষ্টা করে তারই পিছনে ধাওয়া করে যখন সব কটা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে—শহরের পুলিশও ঠিক সেই রকম আমাদের মত 'পিশাচ-সম্প্রদায়ে'র সব চেয়ে হোঁৎকাটাকেই ধরবার চেষ্টা করতো, আমরা যখন তাড়া খেয়ে হরিণের টেকনিকই অনুসরণ করে ইদিকের ওদিকের গলিতে ছড়িয়ে পড়তুম। কিন্তু কিছুদিন পরে আমরা লক্ষ্য করলুম, একই গোদাকে বার বার শিকার করে পুলিশ যেন আর খাঁটি স্পোর্টসম্যানের নির্দোষানন্দ লাভ করছে না। তখন তারা দুসরা কিংবা তেসরা মোট্‌কাটাকে ধরবার চেষ্টা করতে লাগলো। তাদেরও ট্রেনিং হচ্ছে, আস্মোগোরও। কখনো তারা জেতে, কখনো আমরা জিতি। সেই যে গুলিখোর শিকারী বয়ান দিচ্ছিল, 'তারপর আমি তো ফইর করলুম বন্দুক, আর কুত্তাকেও দিলুম শিকারের দিকে লেলিয়ে। তার-পর বন্দুকের গুলি আর কুত্তাতে কী রেস্! কভী কুত্তা কভী গোলী, কভী গোলী কভী কুত্তা!' আমাদের বেলাও তাই, 'কভী ইস্‌টুডেণ্ট কভী পুলিশ, কভী পুলিশ কভী ইস্‌টুডেণ্ট! আমার অবশ্য কোনই ডর ভয় ছিল না। কারণ আমি তখন এমনিতেই ছিলুম বেহদ্ রোগা টিঙটিঙে—পাঁচ ফুট সাড়ে ছ'ইঞ্চি নিয়ে একশ পাঁচ পৌণ্ড ওজন অর্থাৎ হোঁৎকা মোট্‌কা জর্মন সহ-পাঠীদের তুলনায় তো আধটিপ নস্যি! তদুপরি আমি সর্বদাই সুনির্মল বসুর সেই তিরস্কারটি মনে রাখি, 'বাঙালী হয়েছো, পালাতে শেখ নি!

কিন্তু বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, এই রাত্রে দেখি, পুলিশ অন্য ব্যবস্থা করেছে। এতদিন যেই আমি একা হয়ে যেতুম, পিছনে আর বুটের শব্দ শুনতে পেতুম না। সেরাত্রে দেখি, পুলিশ নিতান্ত আমাকেই ধরবার জন্য যে মনস্থির করেছে তাই নয়, আগের থেকে, বেশ সুচিন্তিত ফাইভ ইয়ারস প্ল্যানিং করে যেন জাল পেতেছে। আমি তাড়া খেয়ে যেদিকেই যাই, পিছনে তো বুটের শব্দ শুনতে পাই-ই, তদুপরি দেখি, ঐ দূরে গলির মুখে আরেকটা পুলিশ দাঁড়িয়ে রয়েছে—যেন বিরহজর্জরিত ফিলমের নায়ক প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকাকে আলিঙ্গনার্থে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু আমি মহাভারত পড়েছি, জানি, এ আলিঙ্গন হবে ধার্তরাষ্ট্র। অতএব মারি গুত্তা অন্য বাগে।

অনেকক্ষণ ধরে এই খেলা চললো। ইতিমধ্যে আমি কয়েক সেকেণ্ডের তরে সব পুলিশের দৃষ্টির বাইরে ; এবং সঙ্গে সঙ্গে ঢুকলুম একটা 'পাবে'। ঝটকা মেরে 'বার' থেকে অন্য কারো অর্ডারী এক কাপ কফি যেন ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে বসলুম, 'পাব'-এর সুদূরতম প্রান্তে। সঙ্গে সঙ্গে ঢুকলো একটা পুলিশ।

খাইছে। এবারে এসে পাকড়াবে। বৈদ্যরাজ ঠিক বলেন, 'এ অবস্থায়

কবিচক্রের আমন্ত্রণ জানাই।' তিন দিন পরে বুক-পোস্টে পাঠানো কবির সেই কবিতার বই ফেরত এল তাঁর কাছে। উপরের পিঠে পোস্ট অফিসের রবর স্ট্যাম্পে ছাপ, 'যথেষ্ট টিকিট লাগানো হয়নি বলে গ্রহণকারী বেয়ারিং হারে ফালতো পয়সা দিতে নারাজ, অতএব প্রেরকের কাছে ফেরত পাঠানো হল।'

www.BanglaBook.org

হরিনামের বটিকা খেয়ে শুয়ে পড়বে!'

সে কিন্তু হাঁপাতে হাঁপাতে প্রথমটায় 'বার' কীপারের মুখোমুখি হয়ে আমার দিকে পিছন ফিরে এক গেলাস বিয়ার কিনে একটা অতি দীর্ঘ চুমুক দিলে। আমি বুঝলুম, মাইকেল সত্যই বলেছেন, সীতাদেবীকে রাবণের রাক্ষসী প্রহরিণীরা কোনো গাছতলায় বসিয়ে বেপরোয়া ঘোরাঘুরি করতো।

'হীনপ্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে'

গদ্যময় ইংরিজীতে যাকে বলে নিতান্তই 'ক্যাট অ্যান্ড মাউস প্লে'। বরঞ্চ রবীন্দ্রনাথেরটাই ভালো, 'এ যেন পাখি লয়ে বিবিধ ছলে শিকারী বিড়ালের খেলা'!

এবারে সে গেলাস হাতে করে 'বার-এর দিকে পিছন ফিরে আমার দিকে মুখ করে তাকাল।

আমিও অলস কৌতূহলে একবার তার দিকে তাকালুম। 'পাব'-এ নূতন নিরীহ খদ্দের ঢুকলে যেরকম অন্য নিরীহ খদ্দের তার উপর একবার একটি নজর বুলিয়ে অন্য দিকে চোখ ফেরায়।

আমি যদিও তখন মাথা নিচু করে কাপের দিকে তাকিয়ে আছি—যেন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে বৈজ্ঞানিক অণুপরমাণু পর্যবেক্ষণ করছেন—তবু স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, লোকটা কি ভাবছে। তারপর শুনলুম, 'গুটে নাখট্'! আমি মাথা তুলে দেখি পুলিশ তার বিয়ার শেষ করে 'পাব'ওলাকে 'গুড নাইট' জানিয়ে চলে যাচ্ছে। (জর্মনীর অলিখিত আইন, 'বিয়ার খাবে ঢক ঢক করে, ওয়াইন খাবে আ-স্তে, আ-স্তে।')

ঠিক বুঝতে পারলুম না কেন? তবু হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম বলি নি। এদের তো রাবণের গুষ্টি। এবার যিনি আসবেন, তিনি এঁয়ার মত বাপের সুপুত্তুর নাও হতে পারেন। আবার বাইরে যাবারও উপায় নেই। জাল গুটিয়ে সবাই চলে গেছেন, না ঘাপটি মেরে বসে আছেন, কে জানে?

ঘণ্টাখানেক পর যখন 'পাব' নিতান্তই বন্ধ হয়ে গেল, তখন দেখি সব ফাঁকা। তবু সাবধানের মার নেই। অকুস্থলের উল্টো মুখে রওয়ানা দিয়ে অনেকখানি চক্কর খেয়ে বাড়ি ফিরলুম 'তড়পত হুঁ জৈসে জলবিন মীন' হয়ে।

* * *

তার দু-তিনদিন পর সকালবেলা যখন পাত্তাড়ি নিয়ে য়ুনি (ভার্সিটি) যাচ্ছি, তখন একজন পুলিশ হঠাৎ সামনে দাঁড়িয়ে বুটের গোড়ালি গোড়ালিতে ক্লিক্ করে আমাকে সেলুট দিলে। আমি হামেশাই পুলিশের সামনে ভারী সুবিনয়ী—বার তিনেক 'গুটেন মর্গেন' 'গুটেন মর্গেন' বললুম, যদ্যপি এক-বারই যথেষ্ট।

কোন প্রকারের লৌকিকতা না করে সোজা শুধোলে, 'তুমি ইণ্ডিয়ান?'

তালেবর পুলিশ মানতে হবে! বলেছে 'ইণ্ডার'। 'ইণ্ডিয়ানার' বা রেড ইণ্ডিয়ান বলে নি। এদেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকও সে পার্থক্যটি জানে না। বললুম, 'হ্যাঁ।'—

শুধোলে, 'এখান থেকে ইণ্ডিয়া কতদূর?'

www.BanglaBook.org

আমি বললুম, 'এই হাজার পাঁচেক মাইল হবে। সঠিক জানি নে, তবে জাহাজে যেতে বারো-তেরো দিন লাগে।'

বললে, 'বাপ-মা এই পাঁচ হাজার মাইল দূরে পাঠিয়েছে বাঁদরামি শেখবার জন্যে?'

এতক্ষণে আমার কানে জল গেল। বুঝলুম, উইথ রেফারেন্স্ টু দি কনটেকসট যে, লোকটা সেই রাত্রের আমাদের দলের দুষ্কর্ম এবং পরবর্তী লুকোচুরির কথা পাড়ছে। আমি তবু নাক-টিপলে-দুধ-বেরোয়-না গোছ হয়ে বললুম, 'কিসের বাঁদরামি?'

জর্মনে 'ন্যাকা' শব্দের ঠিক ঠিক প্রতিশব্দ নেই। কিন্তু যে কটি শব্দ পুলিশম্যান প্রয়োগ করলে তার অর্থ ঐ দাঁড়ায়। তারপর নামলো সম্মুখ সমরে! বললে, 'সেরাত্রে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য চোখের আড়াল হয়ে যেতে পেরেছিলে বলে তোমাকে ধরি নি। এবারে কিন্তু ছাড়বো না।'

'অনেক ধন্যবাদ!' তারপর আমিও রণাঙ্গনে নেমে বেহায়ার মত বললুম, 'সে দেখা যাবে।'

যেন একটু দরদী গলায় বললে, 'কিন্তু কেন, কেন এসব করো?'

আমি তখন একটু নরম গলায় বললুম, 'এদেশে কি শুধু য়ুনিতে পড়তেই এসেছি? ওদেশে বসেও তো এ-দেশের বই কিনে পড়া যায়। আমি এসেছি সব শিখতে, আর-সব স্টুডেণ্টরা যা করে, তাই করি।'

'সব ছেলে এরকম বাঁদরামি করে?'

আমাকে বাধ্য হয়ে স্বীকার করতে হল সবাই করে না।

'তবে?'

তখন বললুম, 'ব্রাদার শোনো। এই স্টুডেণ্ট বনাম পুলিশ লড়াই সর্বপ্রথম আরম্ভ হয় চতুর্দশ শতাব্দীতে হাইডেলবের্গে। এখানে আরম্ভ হয় ১৭৮৬তে। তারপর কয়েক বছর য়ুনি বন্ধ ছিল—কেন, সঠিক জানি নে, বোধ হয় নেপোলিয়ন তার জন্য দায়ী—ফের য়ুনি খোলার সঙ্গে সঙ্গে ১৮১৮ থেকে। এবারে তুমিই কও, বুকে হাত দিয়ে, এই আমরা আজ যারা স্টুডেণ্ট, আমরা যদি আজ লড়াই ক্ষান্ত দি তবে ভবিষ্যৎ-বংশীয় স্টুডেণ্টরা ইতিহাসে লিখে রাখবে না "অতঃপর বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এক দল কাপুরুষ ছাত্র আগমনের ফলে—তাহাদের মধ্যে একটা অপদার্থ ইণ্ডিয়ানও ছিল—সেই সংগ্রাম বন্ধ হইয়া যায়—স্টুডেণ্টরা পরাজয় স্বীকার করিয়া লইল।" তারপর ভারতীয় নাটকীয় পদ্ধতিতে 'হা হতোস্মি' করার পর বললুম, 'এই যে মহাকবি হাইনে, তিনি পর্যন্ত এখানে—'

এই করলুম ব্যাকরণে ভুল। বাধা দিয়ে শুধোলে, 'তুমি তার মত কবিতা লিখতে পারো?'

নিশারণে সে জিতেছিল না আমি জিতেছিলুম, সেটা সমস্যাময়, সেটাকে 'ড্র' বললেও বলা যেতে পারে, কিন্তু দিবাভাগে এই তর্ক-যুদ্ধে আমি হার মেনে বললুম, 'বাকিটা আর একদিন হবে, ব্রাদার। এখন তোমার নামটা বলো। সেই শনির রাত্রে যেখানে আমাদের প্রথম চারি চক্ষুর মিলন হয়েছিল সেখানেই দেখা হবে। আমি ফোন করে ঠিক করে নেব। এখন চলি, আমার ক্লাস আছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে হেসে যা বললে সেটাকে বাঙলায় বলা চলে, 'ডুডু খাবে টামাকও ছাড়বে না।'

* * *

এবারে ধরতে পারলে ছাড়বে না—সে তো বুঝলুম। ওদিকে এক মাস পরে আমার পরীক্ষা। 'তিনটে ভাইভা। শনির রাত জেগে তামাম রববার শুধু মুখস্থ আর মুখস্থ। হাসি পায় যখন এদেশে শুনি, এখানে বড্ড বেশী মুখস্থ করানো হয়; মুখস্থ না করে কে কবে কোন্ দেশে কোন্ পরীক্ষা পাশ করেছে! তা সে পেসতালদ্জির দেশেই হোক আর ফ্রোবেলের দেশ, এই জর্মনিতেই হোক। তাই আমাকে আর যুদ্ধে না ডেকে আমাদের ফীলড মার্শেল আমাকে রিজার্ভে রাখলেন। মাত্র এক রাত্রে ডাক পড়েছিল, তবে সেটা শহরের অন্য প্রান্তে। আর এক দিন, সেই দৈত্যকুলের 'প্রহ্লাদ-পো'টির সঙ্গেই একটা 'পাব'-এ বসে দু-দণ্ড রসালাপ করেছিলুম। লোকটি সত্যই অমায়িক।

* * *

এদেশে পরীক্ষার পূর্বে এত সাতান্ন রকমের কাগজপত্র মায় থীসিস্ ডীনের দফ্তরে জমা দিতে হয় যে, সবাই শরণ নেয় আন্কোরা হালের যে দুদিন আগে পাস বা ফেল করেছে। তারাই শুধু এসব হাবিজাবির লেটেস্ট খবর রাখে। সে রকম দুজনা অনেকক্ষণ ধরে বসে, দফে দফে একাধিক বার মিলিয়ে নিয়ে এক বাণ্ডিল কাগজ, ফর্ম, সার্টিফিকেট আমাকে দিয়ে বললে, এইবারে যাও বৎস, ডীনের দফ্তরে। সব মিলিয়ে দিয়েছি। আর, শোনো, সব কাগজের নিচে রাখবে একখানা পাঁচ মার্কের (তখনকার কালে পাঁচ টাকার একটু কম) নোট। এটা কেরানীর অন্যায্য প্রাপ্য—কিন্তু পূর্ণ শত বৎসরের ঐতিহ্য।'

দুরু দুরু বুকে—প্রায় নার্ভাস ব্রেক ডাউনের সীমান্তে পৌঁছে—দাঁড়ালুম গিয়ে ডীনের দফ্তরে, কাউণ্টারের সামনে। পাঁচ টাকার চেয়ে বেশীই রেখেছিলুম।

যে কেরানী এসে সম্মুখে দাঁড়ালেন তাঁর এ্যাব্বড়া হিণ্ডেনবুর্গী গোঁফ, আর বয়েসে বোধ হয় তিনি য়ুনির সমান। সাতিশয় গম্ভীর কণ্ঠে আমার গুড্মর্নিঙের কি একটা বিড়বিড় করে উত্তর দিয়ে দফে দফে কাগজ গুনলেন, টাকাটা কি কায়দায় যে সরালেন ঠিক ঠাহর করতে পারলুম না। কিন্তু মুখে হাসি ফুটলো না। বরঞ্চ গম্ভীর কণ্ঠ গম্ভীরতর করে শুধোলেন, অমুক সার্টিফিকেটটা কই?'

আমি তো সেই দুই যোগানদারদের উপর রেগে টঙ্। পই পই করে আমি শুধিয়েছি, ওরা আরো পই পই করে বলেছে, সব কাগজ ঠিকঠাক আছে, এখন এ কী গেরো রে বাবা! বুঝলুম, কি একটা সার্টিফিকেট আনা হয় নি। কিন্তু সে সার্টিফিকেট কিসের, কোনোই অনুমান করতে পারলুম না। যোগানদারদের মুখেও শুনি নি।

ভয়ে ভয়ে শুধালুম, 'কি বললেন, সার?'

এবার যেন নাভিকুণ্ডলি থেকে ফৈয়াজখানি কণ্ঠে কি একটা বেরুলো।

গুরু-মুর্শীদ, ওস্তাদ-মুরুব্বীদের আশীর্বাদ-দোওয়া আমার উপর নিশ্চয়ই ছিল; হঠাৎ অর্থটা মাথার ভিতরে যেন বিদ্যুতের মত ঝিলিক মেরে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে আপন অজান্তে এক গাল হেসে বলে ফেলেছি, 'চেষ্টা তো দিয়েছি, স্যর, দু বচ্ছর ধরে প্রায় প্রতি শনির রাত্রে—মাফ করবেন স্যর—বলা উচিত রবির ভোরে। তা ওরা ধরতে না পারলে আমি কি করবো? —বললে পেত্যয় যাবেন না স্যর—'

ইতিমধ্যে বুড়ো হঠাৎ ঠাঠা করে হেসে উঠেছেন। যেমন তাঁর গাম্ভীর্য তেমন তার হাসি। বিশেষ করে তাঁর বিরাট গোঁপ জোড়ার একটা দিক নেমে যায় নিচে, তো অন্যটা উঠে যায় উপরের দিকে। সে হাসি আর থামে না। ইতিমধ্যে ছোকরা কেরানীরাও হাসির রগড় দেখে তাঁর চতুর্দিকে এসে দাঁড়িয়েছে। এবারে থেমে বললেন, 'ধরা দেবার চেষ্টা করলে, আর ওরা ধরতে পারলো না, এটা কি রকম কথা?'

আমি বললুম, 'যে-পুলিশ আরেকটু হ'লে ধরতে পারতো, তাকে সাক্ষী স্বরূপ হাজির করতে পারি যে, আমি চেষ্টার ত্রুটি করি নি, এই জেলে যাবার সার্টিফিকেট যোগাড় করার।'

সংক্ষেপে বললেন, 'খুলে কও।'

আমি সেই প্রকৃতির লোক যারা নার্ভাস ব্রেকডাউনের ভাঙন থেকে পড়ি-পড়ি করতে করতে বেঁচে গিয়ে হঠাৎ নিষ্কৃতি পেয়ে হয়ে যায় অহেতুক বাচাল সেও আরেক রকমের নার্ভাস্‌নেস্‌। গড় গড় করে বলে গেলুম, পুলিশের সেই জাল পাতার কাহিনী—বিশেষ করে আমার উপকারার্থে—'পাব'-এর ভিতর-কার বয়ান ও সর্বশেষে সেই পুলিশম্যানের সঙ্গে পথিমধ্যে আমার যম-নাচিকেতা কথোপকথন। বক্তৃতা শেষ করলুম, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, 'এর পর এই পরীক্ষার পড়া নিয়ে বড্ড ব্যস্ত ছিলুম বলে সলিড্‌ কিছু করে উঠতে পারি নি, স্যর। শুধু ঐ যে, দিন পনেরো আগে হঠাৎ এক সকালে দেখা গেল লর্ড মেয়ারের বিরাট দফতরের উচ্চতম টাওয়ারে একটা ছেঁড়া ছাতা বাঁধা, বাতাসে পৎপৎ করছে, ফায়ার ব্রিগেড পর্যন্ত নামাতে পারে নি, ঐ উপলক্ষে অধীন কিঞ্চিৎ, অতি যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করতে—'

একজন ছোকরা কেরানী আঁতকে উঠে বললে, 'সর্বনাশ! ওটার তালাশী যে এখনো শেষ হয় নি!'

বুড়ো বললেন, 'আমরা তো কিছু শুনছি না।'

বুড়োর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরুতে গেলে তিনি কাউন্টারের ফ্ল্যাপ্‌টা তুলে আমার সঙ্গে দোর পর্যন্ত এলেন—পরে শুনলুম, এ-রকম বিরল সম্মান ইতিপূর্বে নাকি মাত্র দু'একজন বিদেশীই পেয়েছেন। আমি কিছু শুধাবার পূর্বেই তিনি যেন বুঝতে পেরে তাঁর মাথাটি আমার কানের কাছে নিচু করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো আঙুলের ডগা বুকে ঠুকে ঠুকে ফিস ফিস করে বললেন, 'আমি তিনবার, আমি তিনবার! তারপর অত্যন্ত সিরিয়াসলি শুধোলেন 'বছর তিনেক পূর্বে এক ডাচ্‌ স্টুডেন্ট বললে—বুঝতেই পারছো, এ রসিকতাটা আমি শুধু বিদেশী ছাত্রদের সঙ্গেই করে থাকি, সুদুমাত্র জানবার জন্য, তারা কতখানি সত্যকার জর্মন ঐতিহ্যের য়ুনি ছাত্র হতে পেরেছে স্টুডেন্টরা নাকি ক্রমেই হারছে!' কণ্ঠে রীতিমত আশঙ্কার উৎপীড়ন।

আমি তাঁর প্রসারিত হাত ধরে হ্যাণ্ডশেক করতে করতে বললুম, 'তিন বছর পূর্বে, ইয়া। কিন্তু তারপর জানেন তো, আমি আর আপনার মত

www.BanglaBook.org

মুরুব্বীকে কি বলবো, কৃষ্ণতম মেঘেরও রুপালী সীমন্তরেখা থাকে—এল জর্মনিতে অভূতপূর্ব বিরাট বেকার সমস্যা, যেটা এখনও চলছে। ফলে ছেলেরা ম্যাট্রিক পাস করে এদিক ওদিক কাজে ঢুকতে না পেরে বাধ্য হয়ে ঢুকছে য়ুনিতে, আগে যেখানে ঢুকতো একজন এখন ঢোকে দশজন। ওদিকে সরকারের পয়সার অভাবে পুলিশের গুষ্টি না বেড়ে বরঞ্চ কমতির দিকে। আমরা এখন দলে ভারি। বস্তুতঃ আমরা এখন নিশাচরবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্বক দিবাভাগেই তাদের সম্মুখ-সমরে আহ্বান করতে পারি—করি না, শুধু শতাধিক বৎসরের ঐতিহ্য ভঙ্গ হবে বলে।' তারপর একটু থেমে গম্ভীরতর কণ্ঠে বললুম, 'আর যদি কখনো সে দুর্দিনের চিহ্ন দেখি, তবে সেই সুদূর ভারত থেকে ফিরে আসবো আ-মি। সামনের পরীক্ষায় পাস করি আর ফেলই মারি, সেই পরাজয় প্রতিরোধ করার জন্য য়ুনিতে ঢুকে ছাত্র হব আবার—আ-মি।

'আম্মো'।

১।১।৬৬

রাসপুতিন

এক একটা দুঃখ মানুষ আমৃত্যু বয়ে চলে। আমার নিজের কথা যদি বলার অনুমতি দেন, তবে নিবেদন করি, অধ্যাপক বগ্‌দানফের আমাকে বলা তাঁর নিজের জীবনের কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আমি যে কেন তখনই লিখে রাখি নি সেই নিয়ে আমার শোক, এ-শোক আমার কখনো যাবে না। তারই একটি ১৯১৭-র কম্যুনিস্ট বিপ্লব। তিনি অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং সমস্ত ঘটনাটি বর্ণনা করতে তাঁর লেগেছিল পুরো ন'টি ঘণ্টা। শান্তিনিকেতনে আশ্রমের ইস্কুলের শোবার ঘণ্টা পড়ে রাত ন'টার সময়; আমি কলেজে পড়তুম বলে অধ্যাপকের ঘরে ঐ সময়ে যেতে কোনো বাধা ছিল না। পর পর তিন রাত্রি ধরে রাত বারোটা-একটা অবধি তিনি আমাকে সে ইতিহাস বলে যান। অবশ্য অনেকেই বলতে পারেন, ঐ যুগপরিবর্তনকরী আন্দোলন সম্বন্ধে বিস্তর প্রামাণিক পুস্তক লেখা হয়ে গিয়েছে এবং অধ্যাপক বুগদানফের পাঠ্য খোয়া গিয়ে থাকলে এমন কীই বা ক্ষতি। হয়তো সেটা সত্য, কিন্তু ঐ বিষয়ে আমি যে কটি সামান্য বই পড়েছি তার সব কটাই বড়ই পাণ্ডিত্যপূর্ণ বৈজ্ঞানিক। বগ্‌দানফ তাঁর কাহিনী বলেছিলেন একটি ষোল বছরের ছোকরাকে—ঘটনার মাত্র চার-পাঁচ বৎসর পরে এবং সেটি তিনি তাই করেছিলেন সেই অনুযায়ী রসময়, অর্থাৎ সাহিত্যরসে পরিপূর্ণ। এস্থলে বলে রাখা প্রয়োজন মনে করি, অধ্যাপকের বর্ণনভঙ্গিটি ছিল অসাধারণ, তাই পরবর্তী যুগে তাঁর ইরান ও আফগানিস্থান (এ দুটি দেশে তিনি দীর্ঘকাল বাস করেন) সম্বন্ধে লিখিত গবেষণামূলক পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধরাজি পণ্ডিত-মণ্ডলীতে সাহিত্যিক খ্যাতিও পায়। মাতৃভাষা রাশানে তিনি লিখেছেন কমই—তাঁর পাণ্ডিত্যপ্রকাশ-যুগে রাশাতে এ ধরনের গবেষণার কোনোই মূল্য ছিল না বলে সেগুলো সেখানে

www.BanglaBook.org

ছাপানোই ছিল অসম্ভব। তিনি প্রধানত লেখেন ফরাসী ইংরাজী ও ফার্সীর মাধ্যমে। এবং সব চেয়ে বেশী সম্মান পান ফার্সী পণ্ডিতজন মধ্যে।[১]

তিনি যে দ্বিতীয় কাহিনী বলেন, সেটি রাসপুতিন সম্বন্ধে। প্রথমটির তুলনায় এটি অনেক হ্রস্ব। রাসপুতিনকে নিহত করা হয়, পুরনো ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী ১৬ই ডিসেম্বর, নতুন ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী ৩০ ডিসেম্বর ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে। এর প্রায় কুড়ি বৎসর পর রাসপুতিনকে নিয়ে আমেরিকায় একটি ফিল্‌ম্‌ তৈরী হয় (এবং আমার যতদূর মনে পড়ে লায়োনেল বেরিমোর রাসপুতিনের অংশ কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেন) এবং ঐ সময় রাসপুতিন-হন্তা রাশার শেষ জারের নিকটাত্মীয় গ্র্যাণ্ড ডিউক ইউসুপফ (আরবী হীব্রুতে ইউসুফ, ইংরিজীতে জোসেফ) ইয়োরোপে। ১৯১৭-র রুশ বিপ্লবের মধ্যে তিনি ও তাঁর স্ত্রী সেই সব ভাগ্যবানদের দুজনা, যাঁরা প্রাণ নিয়ে রাশা থেকে পালাতে সক্ষম হন। তিনি লণ্ডন আদালতে মোকদ্দমা করেন ফিল্‌ম্‌ নির্মাতাদের (বোধ হয় MGM) বিরুদ্ধে যে, তাঁরা যে ফিল্‌মের ইঙ্গিত দিয়েছেন, রাসপুতিন তাঁর অর্থাৎ ইউসুপফের স্ত্রীকে পর্যন্ত তাঁর কামানলের দিকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তিনি মোকদ্দমাটি হেরে যান বটে, কিন্তু ঐ মোকদ্দমাটি তখন এমনই cause celebre কজ্‌ সেলেব্র রূপে—যেমন আমাদের ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মোকদ্দমা—প্রখ্যাতি লাভ করে যে তার অল্প দু'এক বৎসর পর ঐ মোকদ্দমায় প্রধান অংশগ্রহণকারী একজন উকিল মোকদ্দমাটি সম্বন্ধে একটি প্রামাণিক—এবং আমি বলবো —সাহিত্যিক উচ্চপর্যায়ের প্রবন্ধ লেখেন। তিনি যদিও ইউসুপফের বিরুদ্ধ পক্ষের উকিল ছিলেন, তবু আদালতে ইউসুপফ দম্পতির খানদানী সৌম্য আচরণের অকৃপণ প্রশংসা করেন। তারপর হয়তো আরো অনেক কিছু ঘটেছিল। কিন্তু তার খবর আমার কানে পৌঁছয় নি। হঠাৎ গত মাসের 'আনন্দবাজারের এক ইস্যুতে দেখি, ইউসুপফ ফের মোকদ্দমা করেছেন—এবার কিন্তু আমেরিকায়, কলাম্‌বিয়া বেতার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে রাসপুতিন ও তাঁর জীবন নিয়ে নাট্যপ্রচার করার জন্য—এবং আবার মোকদ্দমা হেরেছেন। সেই সুবাদে আমার মনটা চলে গেল ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে, যখন অধ্যাপক বগ্‌দানফ রাসপুতিন-কাহিনী আমাকে ঘণ্টা তিনেক ধরে শোনান।

পরবর্তী যুগে ফিল্‌ম্‌ বেরুলো, তার পর লণ্ডনের উকিল তাঁর বক্তব্য বললেন, এবং 'আনন্দবাজার' বিদেশ থেকে যে সংবাদ পেয়েছেন, তাই প্রকাশ করেছেন। এদের ভিতর পরস্পর বিরোধ তো রয়েইছে, কিন্তু আমার পক্ষ থেকে এ-স্থলে আসল বক্তব্য এই যে, বগ্‌দানফ বলেছিলেন, সম্পূর্ণ না হোক্‌ অনেকখানি ভিন্ন কাহিনী। আমি আদৌ বলতে চাই নে, তাঁর বিবরণী, জবানী বা ভার্শন—যাই বলুন—সেইটেই নির্ভুল আপ্তবাক্য; বস্তুত তিনি নিজেই আমাকে বার বার বলেছিলেন, 'মাই বয়! সেণ্ট পিটেরসবুর্গে তখন এত হাজারো রকমের গুজোব নিত্য নিত্য ডিউক সম্প্রদায় থেকে আস্তাবলের

BanglaBook.org

১। এ'র উল্লেখ শ্রীযুত প্রভাত মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্র-জীবনী'তে করেছেন ; আমিও 'দেশে-বিদেশে' বইয়ে অল্পবিস্তর আলোচনা করেছি।

www.BanglaBook.org

ছোকরাটা পর্যন্ত গরমাগরম এ-মুখ থেকে ও-মুখ হয়ে রাশার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে যে আমারটাই যে অভ্রান্ত সেই বা বলি কোন্ সাহসে? তবে এটা সত্য আমার জীবনের সর্বপ্রধান কাজ "টেক্স্ট্ ক্রিটিসিজ্ম্"—তখনো ছিল, এখনো আছে—অর্থাৎ কোনো পুস্তকের পেলুম তিনখানি পাণ্ডুলিপি, তাতে একাধিক জায়গায় লেখক বলেছেন পরস্পর-বিরোধী তিনরকম কথা। আমার কাজ, যাচাই করে সত্য নিরূপণ করা, কিংবা সত্যের যতদূর কাছে যাওয়া যায় তারই চেষ্টা দেওয়া। অতএব, বুঝতেই পারছো, রাসপুতিন সম্বন্ধে গুজোবগুলো আমি সরলচিত্তে গোগ্রাসে গিলি নি, আমার বুদ্ধিবিবেচনা প্রয়োগ করে যেটা সর্বাপেক্ষা সত্যের নিকটতম সেইটেই বলছি।'

অধ্যাপক রাসপুতিনের প্রথম জীবনাংশ সংক্ষেপে সারেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে এই চাষী পরিবারের ছেলে রাসপুতিনের জন্ম সাইবেরিয়াতে। 'রাসপুতিন' তাঁর আসল নাম নয়—সেটা পরে অন্য লোকে তাঁর উচ্ছৃংখল আচরণ বিশেষ করে কামাদি ব্যাপারে, জানতে পেরে তাঁর উপর চাপায়। লেখাপড়ার চেষ্টা তিনি ছেলেবেলায় কিছুটা দিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু সেদিকে ছিলেন, ক্লাসের মামুলী চাষার ছেলেরও অনেক নিকৃষ্ট। এর পর তিনি তাঁর সমাজের ভদ্রঘরেই বিয়ে করেন—আর পাঁচটা ছেলের মত। কিন্তু তার কিছুকাল পরেই হঠাৎ তাঁর ঝোঁক গেল 'ধর্মে'র দিকে, কিন্তু প্রচলিতার্থে আমরা ধর্মাচারণ বলতে যা বুঝি সেদিকে নয়। হিন্দুধর্মে যে-রকম একাধিক মতবাদ, শাখা-প্রশাখা—বুদ্ধের প্রচলিত (অর্থডক্স) সনাতন খৃষ্টধর্মেও তাই। তারই একটার দিকে আকৃষ্ট হলেন গ্রেগরি (রাসপুতিন)। এস্থলে উল্লেখ প্রয়োজন বলে মনে করি, অধ্যাপক বগ্দানফ ছিলেন অতিশয় 'গোঁড়া'—আমি সজ্ঞানে শব্দটি ব্যবহার করছি—রাশার সরকারী ধর্ম 'গ্রীক অর্থডক্স' চার্চে বিশ্বাসী এবং আচারনিষ্ঠ খৃষ্টান। শান্তিনিকেতনে তাঁর কামরায় (তখনকার দিনের অতিথিশালা, এখন বোধ হয় 'দর্শন-ভবন') দেয়ালে ছিল ইকন এবং তার নিচে অষ্টপ্রহর জ্বলতো মঙ্গলপ্রদীপ এবং তারই নিচে তিনি অহরহ দাঁড়িয়ে স্বদেহে আঙুল দিয়ে ক্রুশ চিহ্ন অংকিত করতে করতে—ঠিক আমাদের বুড়িদের মত—বিড়বিড় করে দ্রুতগতিতে মন্ত্রোচ্চারণ করতেন। বলা বাহুল্য রাসপুতিন যে খ্লিস্তি (khlisti) সম্প্রদায়ে প্রবেশ করলেন সেটাকে অধ্যাপক অপছন্দ করতেন। এ সম্প্রদায় উন্মত্ত নৃত্য, সংগীত (এবং লোকে বলে যৌনাভিচার) ইত্যাদির মাধ্যমে পরমাত্মাকে মানবাত্মায় অবতীর্ণ করিয়ে স্বয়ং পরমাত্মায় পরিবর্তিত হওয়ার চেষ্টা করে। এ মার্গ বিশ্বসংসারে কিছু আজগুবী নূতন চীজ নয়। তবে এঁরা বলতে কসুর করতেন না যে, স্ত্রী পুরুষের যৌনসম্পর্ক সম্বন্ধে এঁরা উদাসীন, অর্থাৎ এ বাবদে কে কি করে সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। রাসপুতিন এটাকে নিয়ে গেলেন তার চরমে। তিনি প্রচার করতে লাগলেন, 'পাপ না করলে ভগবানের ক্ষমা পাবে কি করে? অতএব পাপ করো!' এ ছাড়া তাঁর আরেকটি বক্তব্য ছিল, তিনি পরমাত্মার অংশাবতার এবং তাঁর সংগে দেহে মনে আত্মায় আত্মায় যে কেউ সম্মিলিত হবে তারই চরম মোক্ষ তদ্দণ্ডেই। তাঁর শিষ্যাগণের সংগে তাঁর সেই সম্মিলিত হওয়াটা কোন্ পদ্ধতিতে হতো সেটা বলতে শ্লীলতায় বাধে, এবং একথা প্রায় সর্ববাদিসম্মত যে তিনি তাঁর শিষ্য-শিষ্যাগণকে নিয়ে একই কামরায় যে সব 'সম্মেলন' ঘটাতেন সেটা শুধু তিনি

www.BanglaBook.org

নিজেতেই সীমাবদ্ধ রাখতেন না শিষ্য-শিষ্যাগণ নিজেদের মধ্যেও সম্মিলিত হতেন। ইংরিজীতে একেই 'অর্জি' 'সেটারনেলিয়া' ইত্যাদি বলে থাকে।

এটা সত্য, রাসপুতিনের কথা আমিই উত্থাপন করেছিলুম এবং অধ্যাপকও রাসপুতিন সম্বন্ধে তাঁর যা জানা ছিল সেটি সবিস্তর বলেছিলেন, কিন্তু তিনি রাসপুতিনের ধর্মসম্প্রদায় সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তাঁর পূর্ণ বক্তব্যের প্রায় অর্ধাংশ ব্যয় করেন ঐ সম্প্রদায় নিয়ে, এবং বিশ্বের অন্যান্য ধর্মে কোথায় কোথায় এ-প্রকারের 'অর্জি' স্বীকৃত এবং কার্যে পরিণত হয়েছে তাই নিয়ে। এ বাবদে তাঁর শেষ বক্তব্য আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে ; ধর্মের নামে এ ধরনের অনাচার কেন যুগে যুগে হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, কিংবা গোপনে গোপনে বিশেষ কয়েকটি পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে প্রাচীন ধারাটি অক্ষুণ্ণ রাখে, এ তত্ত্বটি সাতিশয় গুরুত্ব ধারণ করে এবং এর অধ্যয়ন প্রচলিত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম-শাস্ত্রীয় পুস্তক অধ্যয়ন করে হয় না, এর জন্য প্রথমত প্রয়োজন নৃতত্ত্ব এবং পরে সমাজতত্ত্বের গভীর অধ্যয়ন (এর পূর্বে Anthropology ও Sociology এ দুটো শব্দ আমি কখনো শুনিই নি)।

আমি তখন বুঝতে পারি নি, পরে পারি যে আর পাঁচজনের মত তিনিও রাসপুতিনের রগরগে কাহিনী কীর্তন করতে প্রস্তুত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল ওরই মাধ্যমে—ফাঁকি দিয়ে শটকে শেখানোর মত—আমাকে সাধারণ ভারতীয় ছাত্রের পাঠ্যবস্তুর গণ্ডি থেকে বের করে পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সংগে প্রথম পরিচয় করিয়ে দেওয়া। বলা বাহুল্য, এসব আমার সম্বন্ধে নিছক ব্যক্তিগত কথা হলে আমি এগুলো উল্লেখ করতুম না, আমার অন্যতম উদ্দেশ্য, এই সুবাদে তখনকার দিনের স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ-চালিত বিশ্বভারতীয় (স্কুল ও কলেজ—যথাক্রমে 'পূর্ব' ও 'উত্তর' বিভাগ) অধ্যাপকগণ কি প্রকৃতি ধারণ করতেন তারই যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা।

অধ্যাপক বলেছিলেন, এ ধরনের উচ্ছৃংখল আচরণ অবাধে করা যাচ্ছে এবং তদুপরি সেটা ধর্ম নামে প্রচারিত হচ্ছে, এটা যে জনপ্রিয় হবে—অন্তত জন-গণের অংশবিশেষে—সেটা তো অতিশয় স্বাভাবিক। কিন্তু এই যে এক অজানা-অচেনা অর্ধলুপ্ত খ্লিস্তি সম্প্রদায় হঠাৎ নবজীবন লাভ করে খুদ জারের প্রাসাদ পর্যন্ত পৌঁছে গেল, এটা তো আর একটা আকস্মিক অকারণ কর্তা-বিহীন কর্ম নয়। এরকম একটা নব আন্দোলন আনয়নকারী পুরুষের কোনো-না-কোনো অসাধারণ গুণ, আকর্ষণ বা সম্মোহনশক্তি থাকা নিশ্চয়ই প্রয়োজন।

পূর্বেই বলেছি, অধ্যাপক ছিলেন কট্টর 'অর্থডক্স্' গ্রীক চার্চ-এর অন্ধ ভক্ত। কিন্তু এস্থলে এসে তিনিও স্বীকার করলেন, রাসপুতিন একাধিক অলৌকিক শক্তি ধারণ করতেন। তিনি যে কঠিন দুরারোগ্য রোগ কোনো প্রকারের ঔষধ প্রয়োগ না করে প্রশম করতে পারতেন সেটারও উল্লেখ করলেন। কি প্রকারে? কেউ জানে না।

ইতিমধ্যে জার-প্রাসাদের উপর মৃত্যু যেন তার করাল ছায়া বিস্তার করেছে। হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে বালক যুবরাজ আহত হন। তাঁর রক্তক্ষরণ আর কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না। ভিয়েনা বার্লিন থেকে বড় বড় চিকিৎসক এসেছেন। আমি অধ্যাপককে শুধিয়েছিলুম, 'চিকিৎসা-শাস্ত্রে কি রাশা তখনো এতই পশ্চাৎপদ?' তিনি বলেছিলেন, 'বলা শক্ত। তবে সাহিত্যের বেলা চেখফ্

www.BanglaBook.org

যা বলেছেন এস্থলেও হয়তো সেটা প্রযোজ্যঃ তোমার প্রিয় লেখক চেখফ্ বলেছেন, "হ্যাঁ, আলবৎ আমরা রুশ সাহিত্য পড়ি। কিন্তু সেটা ঐ যে রকম আমরা 'কুটিরশিল্প'কে মেহেরবানী করে সাহায্য করি। আসলে মালের জন্য যাই ফরাসী সাহিত্যে।" হয়তো চিকিৎসার বেলাও তখন তাই ছিল।'

দাসী না ডাচেস্—সমাজের দুই প্রান্তের দুজনা—কে প্রথম রাসপুতিনকে নিয়ে গেল জারের রাজপ্রাসাদে?

সে কে? যুবরাজ মৃত্যুশয্যায়, আপন 'কটেজ ইনডাস্ট্রি'র রাশান ডাক্তাররা তো হার মেনেছেনই, ভিয়েনা-বার্লিনের রাজবৈদ্যরাও, যাঁরা কিনা কাইজারের, এম্পেরার ফ্রানৎস যোজেফের প্রাসাদের গণ্যমান্যদের চিকিৎসা করে করে বিশ্ব-বিখ্যাত হয়েছেন তাঁরা পর্যন্ত রাশা ছেড়ে পালাতে পারলে বাঁচেন। কারণ রুশ যুবরাজের যে রোগ হয়েছে সেটার নাম হ্যামোফিলিয়া—আমরা গরীবদের, না জানি কোন্ পুণ্যের ফলে, আমাদের হয় না—ব্যামোটা শব্দার্থেই রাজসিক, শুধু রাজা-রাজড়াদের ভিতরেই সীমাবদ্ধ। পূর্বে ছিল এই বিশ্বাস; পরে দেখা গেল, গরীবদেরও হয়। আমরা বললুম, 'সেই কথাই কও! ভগবান যে হঠাৎ খামোখা এহেন দুরারোগ্য ব্যাধি শুধু বড়লোকদের জন্যই রিজার্ভ করে রেখে দেবেন, এটা তো অকল্পনীয়। ব্যামোগুলো তো আমাদের মতন গরীবদের জন্যই তৈরি হয়েছে। ভগবান স্বয়ং তো রাজাদের দলে। কিংডম অব্ দি হেভেন্ বা স্বর্গরাজ্যে যাঁর বাস তিনি তো ফেভার করবেন তাঁর জাতভাই তাঁদেরই, যাঁদের কিংডম্ অব্ দি আর্থ বা পৃথিবীরাজ্য আছে।[২] তাই যদি হয়, তবে স্বর্গরাজ্যই হোক, আর ভূস্বর্গই হোক ভিয়েনা-বার্লিনের অশ্বিনীকুমারদ্বয় যেখানে রুগীকে হরি নামের গুলি দিয়ে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ার তালে, সেখানে দাসী 'ফার্সী পড়বে'? হয়তো ঠিক সেইখানেই, কিন্তু অন্য কারণও আছে।

আমরা এ-দেশে যত কুসংস্কারাচ্ছন্নই হই না কেন, একাধিক বাবদে অন্তত সে যুগে, অর্থাৎ এ শতাব্দীর প্রারম্ভে জারের রাশা আমাদের অনায়াসে হার মানাতে পারতো। সে রাশার গ্রীক অর্থডক্স্ চার্চ ছিল শব্দার্থেই অর্থডক্স্ গোঁড়া, কট্টর কুসংস্কারাচ্ছন্ন। আর চাষাভুষোদের তো কথাই নেই। তন্ত্রমন্ত্র, জড়িবুড়ি, মাদুলী-কবচ থেকে আরম্ভ করে নিরপরাধ 'প্রভু যীশুর হত্যাকারী' ইহুদিদের সুযোগ পেলেই বেধড়ক মার, এবং সেখানেই শেষ নয়—আপন রক্তের, আপন ধর্মের জাতভাই যারা এসব কুসংস্কার থেকে একটুখানি মুক্ত হয়ে, অগুষ্ঠ পরিমাণ স্বাধীনভাবে প্রভু যীশুর বাণী জীবন দিয়ে গ্রহণ করার চেষ্টা করতো যেমন 'দুখবর', 'স্তান্দিস্ত' সম্প্রদায়—তাদের উপর কী বীভৎস

---

২ স্বয়ং স্বামীজী নাকি বলেছেন, "যে ভগবান আমাকে এ-দুনিয়ায় এক মুঠো ভাত দেয় না, সে নাকি মৃত্যুর পর আমাকে স্বর্গরাজ্য দেবে—why, even an imbecile would not believe it; much less I!" তাঁর এটা প্রক্ষিপ্তও হতে পারে। তবু এ-কথা অতিশয় সত্য, তিনি এই পৃথিবীতেই স্বর্গরাজ্য স্থাপনা করতে চেয়েছিলেন। বঙ্কিম নাকি বলতেন, মানুষকে ভগবান হতে হবে, আর তিনি নাকি বলতেন, মানুষকে মানুষ হতে হবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অত্যাচার।[৩] এবং চাষাভুষোদের এই অত্যাচার-ইন্ধনে কাষ্ঠ সরবরাহ করতেন জার-সম্প্রদায় এবং তাঁদের অনুগ্রহে লালিত-পালিত বিলাস-ব্যসনে গোপন পাপাচারে আকণ্ঠ নিমগ্ন অর্থডক্স্ চার্চ তার আপন 'পোপ'—হোলি সিনড্‌কে নিয়ে। যে ইউসুপফ এর কয়েক বৎসর পর রাসপুতিনের ভবলীলা সাঙ্গ করেন, তিনি বা তাঁর ভাই, আরেক গ্র্যাণ্ড ডিউক প্রকাশ্য 'ডুমা' বা মন্ত্রণা-সভায় প্রস্তাব করেন এবং বহু বিনিদ্র যামিনী যাপন করে স্বহস্তে নির্মিত পরিকল্পনা সঙ্গে সঙ্গে পেশ করেন, ইহুদিদের সবংশে বিনাশ করার জন্য কি প্রকারে, স্তরে স্তরে শল্য প্রয়োগ দ্বারা তাদের পুরুষদের সন্তান প্রজনন ক্ষমতা হরণ করা যায়? বগ্‌দানফ সাহেব বলেছিলেন, 'মাই বয়, হি সাব্‌-মিটেড্ ইট ইন্ অল্ সিরিয়াসনেস্!' অবশ্য তৎসত্ত্বেও মার্জিত রুচিসম্পন্ন ভদ্রসন্তান অধ্যাপক বগ্‌দানফ ইহুদিদের ঘৃণা করতেন—হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে, ঐ জাতীয় আর পাঁচটা বর্বর রুশের মত। বিশ্বভারতীতে তখন একটি সুন্দরী, বিদেশীনী, ইহুদি অধ্যাপিকা ছিলেন; কি প্রসঙ্গে তাঁর কথা উঠতে বগ্‌দানফ তিক্ত অবজ্ঞায় মুখ বিকৃত করে বললেন, 'আই উড্ নট্ টাচ হার উইথ এ পেয়ার অব টংস!'—সাঁড়াশি দিয়েও তিনি তাঁকে স্পর্শ করতে রাজী হবেন না!

এ কথা সবাই বলেছেন, রাজধানী সেণ্ট পেটের্‌স্‌বুর্গে (তখন অবশ্য রাশা জর্মনীর সঙ্গে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত বলে তাদের সভ্যতায় জর্মনদের যে শতকরা আশী ভাগ অবদান, মায় তাদের ভাষায় প্রবেশপ্রাপ্ত জর্মন শব্দ, যেমন সেণ্ট পেটের্‌স্‌বর্গের জর্মন অংশ 'বুর্গ'—'প্রাসাদ', 'কাসল'—সমূলে উৎপাটিত করে নামকরণ করেছে 'পেত্রোগ্রাদ'। সর্বশেষে এর নামকরণ হয় 'লেনিনগ্রাদ', কিন্তু ততদিনে রাজধানী চলে গেছে মস্কোতে। জারের 'উইণ্টার পেলেস' প্রাসাদে বিরাজ করতো কেমন যেন এক অদ্ভুত রহস্যময় (প্রধানত ধার্মিক—mysticism) বাতাবরণ। সম্রাজ্ঞী—জারিনা—ছিলেন অতিশয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন, আচার-অনুষ্ঠানে সদালিপ্ত, প্রতি মুহূর্তে পুত্রের পুনর্বার রক্তক্ষরণ রোগে আক্রান্ত হবার ভয়ে উদয়াস্ত সশঙ্কিত; বিশেষ করে যখন হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, প্রচলিত চিকিৎসাপদ্ধতি এই কঠিন পীড়ার সম্মুখে সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে, তখন যে তিনি প্যগলিনীর মত রাজ্যের যত প্রকারের টোটকামোটকা, তাবিজমাদুলির সন্ধানে লেগে যাবেন সেটা অবাঞ্ছনীয় হলেও অবোধ্য নয়—এমন কি কট্টর বৈজ্ঞানিকও সেখানে সহানুভূতি দেখাবে। একেই তো শীত-প্রাসাদে বিরাজ করতো রহস্যময় বাতাবরণ, যেন সেখানে যে কোন মুহূর্তে যে-কোন প্রকারের অলৌকিক কাণ্ড ঘটে যেতে পারে, তদুপরি নানাশ্রেণীর কুটিলভাগ্যান্বেষী সেই প্রাসাদে কোনো প্রকারের চতুরতা দ্বারা অর্থ সঞ্চয়ের জন্য গমনাগমন করছে, সেখানে যদি নিত্যসঙ্গিনী দাসীটিও বলে যে, সে একজন 'হোলিম্যান', 'সাধুতপস্বী'কে চেনে, যাঁর হৃদয়ে প্রভু যীশুর সামান্যাংশ প্রবেশ করার ফলে ('সেই শাশ্বত সত্তার একটি কণা আমাতে

BanglaBook.org

৩ সে অত্যাচার-সংবাদে কাতর হয়ে তলস্তয় 'রেসারেক্‌শন' বই লিখে, টাকা তুলে এদের অনেককে কানাডা পাঠিয়ে দেন।

www.BanglaBook.org

অবতাররূপে অবতীর্ণ হয়েছে'—রাসপুতিনের আপন ভাষায়) তিনি প্রভুরই মত বহু দুরারোগ্য ব্যাধি, কোনো ঔষধ প্রয়োগ না করে অবলীলাক্রমে আরোগ্য করতে পারেন, তবে মহারানী যে নিমজ্জমানার ন্যায় সেই তৃণখণ্ডকেও দৃঢ়-হস্তে ধারণ করবেন সেটা তো তেমন-কিছু অসম্ভব আচরণ নয়।

অন্যপক্ষ বলেন, দাসী নয় ডিউক।

রাসপুতিন দিগ্বিজয় করতে করতে পেত্রোগ্রাদ—সম্ভব হলে রাজপ্রাসাদ—জয় করবেন বলে মনস্থির করেছেন। এদিকে সেখানকার যাজক সম্প্রদায়ের কেউ বা তাঁর জনপ্রিয়তার সংবাদ শুনে, কেউ বা তাঁর ধর্মের নবজাগরণ প্রচেষ্টার খ্যাতি শুনে, কেউ বা তাঁর অলৌকিক কর্মক্ষমতার জনরবে আকৃষ্ট হয়ে সেটা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার জন্য, এক কথায় অনেকেই অনেক কারণে তাঁর সঙ্গে যোগ-সূত্র স্থাপনা করতে উদ্‌গ্রীব। রাসপুতিন সশিষ্য-শিষ্যা পেত্রোগ্রাদে প্রবেশ করে—সে প্রবেশ প্রায় খৃষ্টের পূতপবিত্র জেরুজালেমের পুণ্যভূমিতে প্রবেশ করার সমতুল—সাড়ম্বরে প্রতিষ্ঠিত হলেন এক প্রভাবশালী শিষ্যের গৃহে। শীঘ্রই যোগসূত্র স্থাপিত হল পেত্রোগ্রাদের সর্বোৎকৃষ্ট ধর্মশিক্ষাশালার সুপণ্ডিত অধ্যক্ষের সঙ্গে। ইনি আবার মহারানীর আপন ব্যক্তিগত পুরোহিত—অর্থাৎ এঁরই সামনে মহারানী প্রতি সপ্তাহে একবার 'কনফেস্' করেন, ঐ সপ্তাহে তিনি যে সব পাপচিন্তা করেছেন, কর্মে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন, সেগুলি স্বীকার করে শাস্ত্রাদেশ অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্তাদেশ গ্রহণ করেন—প্রায়শ্চিত্ত সাধারণতঃ উপবাস ও মালাজপের গণ্ডিতেই আবদ্ধ থাকে।[৪] এই কনফেশন গ্রহণ করে যে পুরোহিত প্রায়শ্চিত্তাদেশ প্রদান করেন তাঁর পদটি স্বভাবতই সাতিশয় গাম্ভীর্য ও গুরুত্ব ধারণ করে। তিনি সম্রাজ্ঞী-হৃদয়-কন্দরের অন্তরতম রহস্য জানেন বলেন—এমন কি স্বীকারোক্তির সময় তিনি প্রশ্ন জিজ্ঞাসার অধিকারও ধরেন—তাঁকে থাকতে হয় অতি সাবধানে।

তাঁর প্রধান কৌতূহল রাসপুতিন কোন্ কোন্ কারণে কি ভাবে হৃদয়ে ভগবানের প্রত্যাদেশ পেয়ে সমস্ত জীবনধারা পরিবর্তিত করে 'নবজন্ম' পেলেন। গ্রীক অর্থডক্স্ চার্চ, ক্যাথলিক তথা অন্যান্য সম্প্রদায়ের ইতিহাসে এই 'নব-জীবন' লাভ, গৃহী খৃষ্টানের সন্ন্যাস-গ্রহণের জন্য এই কনভার্সনের উপ-ইতিহাস এক বিরাট অংশ গ্রহণ করে আছে। খৃষ্ট সাধু মাত্রই এটি মনোযোগ সহকারে বারংবার পাঠ করে তার থেকে প্রতি দিন নবীন উৎসাহ, তেজস্বী অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করেন। মহারানীর আপন যাজক ধর্ম-একাডেমির অধ্যক্ষ-

---

৪ এই কনফেশন বা পদস্খলন স্বীকারোক্তি একাধিক ধর্মে প্রচলিত আছে। এদেশে জৈনদের ভিতর সেটি নিষ্ঠা সহকারে মানা হয়, এবং এরই নাম 'পর্যুষণ'। তবে আমাদের যতদূর জানা, পর্যুষণ বৎসরে মাত্র একবার হয় এবং সম্প্রদায়ের সকলেই সেটা একই সময়ে করেন বলে বর্ষার শেষে সেটা পর্বদিবস রূপে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধ শ্রমণরাও বর্ষাকালে পর্যটন নিষিদ্ধ বলে কোনো সংঘে আশ্রয় নিয়ে বর্ষাযাপন-শেষে পাপ স্বীকারোক্তি করে পুনরায় পর্যটনে নেমে পড়েন। মুসলমানরা হজের সময় করে থাকেন, এবং মৃত্যু আসন্ন হলে 'তওবা' করেন। 'তওবা' শব্দার্থে 'প্রত্যাবর্তন'। অর্থাৎ তওবাকারী আপন পাপ সম্বন্ধে অনুশোচনা করে ধর্মমার্গে প্রত্যাবর্তন করলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রূপে এই উপ-ইতিহাসে অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন, সেই পুস্তক তাঁর শিষ্য-মণ্ডলীর সম্মুখে সটীকা প্রতিদিন পড়িয়ে শোনাতেন এবং স্বভাবতই সেই পুস্তকের ভিন্ন ভিন্ন সাধুসন্তদের নিয়ে গভীর এবং সূক্ষ্ম আলোচনা করতেন। কিন্তু কোনো পাপাত্মা কি ভাবে অকস্মাৎ দৈবাদেশ পেয়ে সর্বস্ব ত্যাগ করে ধর্মসংঘে প্রবেশ করে, কিংবা জনসেবায় আত্মনিয়োগ করে, অথবা পাণ্ডিত্য থাকলে সংঘে প্রবেশ ক'রে নির্জনে নিভৃতে বাইবেল বা অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থের এক নবীন টীকা নির্মাণে বাকী জীবন কাটিয়ে দেয় এ সম্বন্ধে তাঁর কোন ব্যক্তিগত অব্যবহিত অভিজ্ঞতা ছিল না, এবং অতি সহজেই অনুমান করা যায় যে, এ-রকম একটা আকস্মিক 'কনভার্সনে'র নায়ক যদি তাঁর আপন কর্মস্থলে হঠাৎ এসে পৌঁছন তবে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনা করবেন। পূর্বেই বলেছি, রাসপুতিনের ভিতর কেমন যেন একটা বৈদ্যুতিক আকর্ষণ শক্তি ছিল, তাঁর স্বাভাবিক অবস্থায়ও তিনি সাধারণ কেন, অসাধারণ জনকেও মন্ত্র-মুগ্ধবৎ মোহাচ্ছন্ন করতে পারতেন। খৃষ্ট ধর্মশাস্ত্রে তাঁর শিক্ষাদীক্ষা জ্ঞান-প্রজ্ঞা ছিল অতিশয় সীমিত, কিন্তু প্রভু যীশুর যে কটি সরল উপদেশ তিনি বহু কণ্ঠে কণ্ঠস্থ করতে পেরেছিলেন সেগুলি তিনি অতিশয় দৃঢ় বিশ্বাসের বীর্যশীল সরলতায় প্রকাশ করতে পারতেন। সঙ্গে সঙ্গে এ সত্যটিও নিবেদন করা উচিত যে, রাশায় ধর্মশিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে যে পণ্ডিতকুলমান্য সর্বোত্তম শাস্ত্রজ্ঞ অধ্যয়ন অধ্যপনা করেন তিনি এই অশিক্ষিত হলধরসন্তানের কাছে আসবেন না শাস্ত্রের টীকাটিপ্পনী শ্রবণার্থে। তিনি আসবেন অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে। এস্থলেও প্রভু যীশুর সঙ্গে রাসপুতিনের সাদৃশ্য আছে। ইসরায়েলের স্মার্ত পণ্ডিতরা যখন প্রভু যীশুর সঙ্গে তর্কযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত তখন তিনি যেন তাচ্ছিল্যভরে বলেছিলেন আমি শাস্ত্রকে কার্যে পরিপূর্ণ ভাবে দেখাবো।

এসব কারণ অনুসন্ধান অপ্রয়োজনীয়। যা বাস্তবে ঘটে সেটা সর্ব তর্কের অবসান এনে দেয়। পণ্ডিতের পণ্ডিত রাসপুতিনকে দেখে, তাঁর আচার-ব্যবহার, তাঁর প্রতি শিষ্য-শিষ্যাদের সহজ ভক্তি ও সুদৃঢ় বিশ্বাস ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে বিস্মিত হলেন, কিন্তু মুগ্ধ হলেন যখন রাসপুতিনের কাছ থেকে শুনলেন, তাঁর আবেগভরা কণ্ঠে তিনি বলে যেতে লাগলেন, কি ভাবে এক দৈবজ্যোতি তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হল আর তিনি ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে স্বর্গীয় প্রভুর পদপ্রান্তে আত্মসমর্পণ করলেন।

এ প্রকারের আকস্মিক পরিবর্তন ইতিহাস শাস্ত্রজ্ঞ অধ্যক্ষ পড়েছেন, পড়িয়েছেন প্রচুর কিন্তু এ-জাতীয় পরিবর্তনের একটি সরল সজীব দৃষ্টান্ত স্বচক্ষে দেখা, স্বকর্ণে শোনা সে যে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন অভিনব, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। যে কোনো অধ্যাপক, যে কোনো শিক্ষক এ প্রকারের অভিজ্ঞতাকে অসীম মূল্য দেন, কারণ পরের দিন থেকেই ছাত্রমণ্ডলীতে বেষ্টিতাবস্থায় তিনি অর্ধবিশ্বাসী তর্কবাগীশদের উদ্দেশে সবল, আত্মপ্রত্যয়জাত সুদৃঢ় কণ্ঠে বলতে পারেন, 'পবিত্র রুশ দেশের পবিত্রতর সন্তদের [illegible] অলৌকিক পরিবর্তনের কথা তোমরা পড়ছো, সেগুলো কাহিনী নয়, ইতিহাস, এবং শুষ্ক পত্রে লিখিত জীর্ণ ইতিহাস নয়, নিত্যদিনের বাস্তব প্রত্যক্ষ সত্য ; সে জিনিস ভাগ্যবান চক্ষুষ্মান দেখতে পায়।' অস্মদ্দেশীয় প্রচলিত নীতিবাক্য আছেঃ

www.BanglaBook.org

"অদ্যাপিও সেই লীলা খেলে গোরা রায়।
মধ্যে মধ্যে ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

এবং তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন, এই সাধুপুরুষকে তিনি রাজপ্রাসাদে নিয়ে গিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত সম্রাজ্ঞীর সম্মুখীন করবেন। সর্ব ধর্মের সর্ব ইতিহাস বলে, সাধুজনের পক্ষে অসম্ভব কিছু নেই। সম্রাজ্ঞীকে এই সাধু তাঁর অলৌকিক শক্তি প্রয়োগ করে এনে দেবেন সান্ত্বনা, আত্মপ্রত্যয় এবং ধর্মবিশ্বাস স্থাপন করবেন দৃঢ়তর ভূমিতে।

অতি সহজেই তিনি রাসপুতিনের গুণমুগ্ধ রাজপরিবারের একাধিক নিকটতম আত্মীয়-আত্মীয়ার সহানুভূতি ও সহযোগ পেলেন। রাসপুতিন রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন।

কেউ কেউ বলেন, সেটা ছিল আকস্মিক যোগাযোগ। অধিকতর বিশ্বাসীরা বলেন, মা, যুবরাজের কঠিনতম সংকটময় অবস্থান, যখন রাজবৈদ্যগণ তাঁর জীবন রক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ্বাস, তখন রাসপুতিন তাঁকে অনুরোধ করার পূর্বেই স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে শিষ্যগণকে প্রত্যয় দেন, তিনি যুবরাজকে সম্পূর্ণ নিরাময় করতে পারবেন।

এ তো কোনো হাস্যকর আত্মপ্রত্যয় নয়। অভিজ্ঞতম প্রবীণ চিকিৎসকও বার বার মস্তকান্দোলন করে স্বীকার করেন, কত অগুণিত রোগী যমদূতের দক্ষিণহস্ত ধরে যখন পরপারে যাত্রার জন্য প্রথম পদক্ষেপ করেছে, রূঢ় সরল ভাষায় ঐ সব রোগীদের সম্বন্ধে যখন বহু পূর্বেই সর্ব বিশেষজ্ঞ একই বাক্যে আপন দৃঢ় নৈরাশ্য প্রকাশ করেছেন, ঠিক সেই সময় হঠাৎ অকারণে, চিকিৎসকের কোন প্রকারের সাহায্য না নিয়ে সেই জীবন্মৃত ব্যক্তি শ্মশান-সংকট উত্তীর্ণ হয়ে ধীরে ধীরে পুনরায় লুপ্ত স্বাস্থ্য ফিরে পায়।

* * *

সম্রাট এবং মহিষী উভয়েই নাকি সাধুর প্রথম দর্শন লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে মুগ্ধ হয়ে যান। বিশেষ করে রাজমহিষী।

অধ্যাপক বগ্‌দানফের মতে, অর্থাৎ তিনি যে জনরব সর্বাপেক্ষা নির্ভরশীল বলে গ্রহণ করেছিলেন সেই অনুযায়ী রাসপুতিন নাকি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মহারানীকে আশ্বাস দেন, যুবরাজ রোগমুক্ত হবেন, এবং তিনিই তাঁকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। রাজমহিষী স্বয়ং তাঁকে নিয়ে রুগীর কক্ষের দিকে অগ্রসর হলেন। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ উচ্চকণ্ঠে, তারস্বরে প্রতিবাদ জানালেন। যে-ব্যক্তিকে সম্রাজ্ঞী নিয়ে যাচ্ছেন সে-ব্যক্তি যে চিকিৎসাশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং অনভিজ্ঞ, সে-কথা সে-ই একাধিকবার স্বীকার করেছে, এমতাবস্থায় যখন তাঁরা আশা করছেন যে, যে-কোনো মনুষ্য বা ইতর প্রাণীর ন্যায় যুবরাজও প্রকৃতিদত্ত শক্তিবলে—যে শক্তি সর্বজনের অলক্ষিতে জীবদেহে বেঁচে থাকার জন্য সর্বব্যাধির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম দ্বারা আপন কর্তব্য করে যায়—হয়তো নিরাময় হয়ে যেতে পারেন সেই সংকটজনক অবস্থায় এই নবাগত হয়তো আপন অজ্ঞতাবশত সেই শক্তির প্রতিবন্ধক হয়ে তার কর্মক্ষমতা নষ্ট করে দিতে পারে।

তৎসত্ত্বেও মহারানী রাসপুতিনকে রোগীর কক্ষে নিয়ে গেলেন।

www.BanglaBook.org

চিকিৎসকরাও সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করলেন। রাসপুতিন বললেন, তিনি কোনো তৃতীয় ব্যক্তির সম্মুখে চিকিৎসা করবেন না। তৃতীয় বলতে সম্রাজ্ঞীকেও বোঝায় ; তিনি নিঃশঙ্কচিত্ত দৃঢ় পদক্ষেপে দেহলীপ্রান্ত উত্তীর্ণ হলেন।

অতি অল্পক্ষণ পরেই রাসপুতিন দোর খুলে রানীর দিকে সহাস্য ইঙ্গিত করলেন। রানীমা কক্ষে প্রবেশ করে স্তম্ভিত। যেন কত যুগ পরে তিনি দেখলেন রাসপুতিনের দেওয়া কি যেন একটা জিনিস হাতে নিয়ে যে কোনো সুস্থ বালকের মত যুবরাজ খেলা করছেন।

রাসপুতিন প্রকৃতই যুবরাজকে তাঁর রক্তমোক্ষণ রোগ থেকে নিরাময় করেছিলেন কিনা সে বিষয়ে মতানৈক্য আছে—তবে এটাও স্মরণে আনা কর্তব্য বিবেচনা করি যে, এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে গবেষণা, পাণ্ডিত্য, সত্যানুসন্ধান বললেই বোঝাতো—অবিশ্বাস। এই মূলমন্ত্র ঐ সময়ে এমনই সুদূরপ্রসারী হয় যে, তৎকালীন লিখিত পুস্তক, এনসাইক্লোপীডিয়াতে একাধিক, যশস্বী লেখক স্বয়ং বুদ্ধ, মহাবীর, এমন কি তাঁদের আপন খৃষ্টের অস্তিত্ব পর্যন্ত সন্দেহাতীতরূপে সপ্রমাণ না হওয়ায় (দু হাজার, আড়াই হাজার বৎসরের পরের একতরফা বা এক্‌স্‌পার্টি তদন্তে!) তাঁদের জীবনী এবং বাণীকে কাল্পনিক কিংবদন্তী আখ্যা দিয়েছেন, এবং কেউ কেউ তাঁদের অস্তিত্ব পর্যন্ত সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করেছেন। অতএব সে যুগের পুস্তক যে রাসপুতিনের মত চিকিৎসানভিজ্ঞজন যুবরাজকে রোগমুক্ত করেছেন সে কথা হয় অস্বীকার করে, কিংবা নীরব থাকে। তবে এ কথা সকলেই স্বীকার করেছেন, রাসপুতিনের প্রাসাদ গমনাগমনের পর থেকেই যুবরাজের স্বাস্থ্যোন্নতি দিনে দিনে সুস্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়।

আর সে যুগের সম্রাজ্ঞীদের ভিতর ধনে-ঐশ্বর্যে খ্যাতি-প্রতিপত্তিতে নিঃসন্দেহে সর্বাগ্রগণ্যা না হলেও যাঁকে ইয়োরোপের রাজন্যবর্গ রাজপরিবার সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রমের চক্ষে দেখতেন সেই জারিনা? তিনি তো কৃতজ্ঞতার প্রতিদানস্বরূপ রাসপুতিনের পদপ্রান্তে কী যে রাখবেন তার সন্ধানই পাচ্ছেন না, কারণ সাধারণজনের মত ভবন-যানবাহন রজতকাঞ্চনে তাঁর লোভ ছিল না—তাঁর আসক্তি কিসে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন—ওদিকে জারিনা আবার জাতমিস্টিক, অলৌকিক ক্রিয়াকর্মে তিনি বিশ্বাস করেন এবং যাঁদের এসব মিরাকল দেখাবার শক্তি আছে বলে তিনি বিশ্বাস করেন তাঁদের কাছে তিনি তাঁর দেহ-মন-আত্মা সর্বস্ব নিয়ে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত।

জিতেন্দ্রিয় পরোপকারী সাধুসজ্জনদেরই না কত প্রকারের কুৎসা রটে—দু হাজার বৎসর হয়ে গেল এখনো খৃষ্টবৈরীরা বলে, তিনি নাকি অসচ্চরিত্রা যুবতীদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন ও মদ্যপানে তাঁর আসক্তি ছিল ঈষৎ মাত্রাধিক—সেস্থলে রাসপুতিন! যিনি কিনা তাঁর কামানল নির্বাপিত করার চেষ্টা তো করেনই না, তদুপরি ঐ বিশেষ রিপুর চর্চিতার্থতাকে তুলে ধরেছেন সর্বোচ্চ ধর্মের পর্যায়ে এবং ফলে শিষ্যশিষ্যাগণসহ বহুবিধ অনাচারে লিপ্ত হন—এসব অর্জি 'সেটারনেলিয়া'র উল্লেখ আমরা পূর্বেই করেছি—তাঁর পূর্ববর্তী মফঃস্বল জীবনের তুলনায় রাজধানীতে তাঁর বর্তমান কেলেঙ্কারির বিবরণ তথা পল্লবিত জনরব চতুর্দিকে যে অধিকতর ছড়িয়ে পড়বে তাতে আর কী সন্দেহ! কিন্তু ক্রমে ক্রমে মোক্ষমতর মারাত্মক কলঙ্ককাহিনী রটতে আরম্ভ করলে

www.BanglaBook.org

চতুর্দিকে ; এসব দলবদ্ধভাবে কৃত দুষ্কর্মের 'অর্জি' এখন নাকি রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে—এবং সেখানে তো সব-কিছুই নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়—পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। সম্ভ্রান্ততম ডিউক ডাচেস, অর্থাৎ সম্রাটের নিকটতম আত্মীয়-আত্মীয়ারাও নাকি এই সব অনাচারে অংশ নিচ্ছেন। এবং সর্বশেষে যে কলঙ্ককাহিনী পেত্রোগ্রাদে জন্মলাভ করে সর্ব রুশের সর্ব সমাজের উচ্চতম থেকে অধস্তন শ্রেণী পর্যন্ত প্রচারিত হয়ে আপামর জনসাধারণকে দিল রূঢ়তম পদাঘাত সেটি আর কিছু নয়, স্বয়ং জারিনা তাঁর দেহ সমর্পণ করেছেন রাসপুতিনকে। অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মহিলাদের তো কথাই নেই।

গ্র্যান্ড ডিউক ইউসুপফের দুটি মোকদ্দমাই ছিল এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে। এই সব কলঙ্ককাহিনীর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীকে জড়িয়ে প্রথমে ফিল্ম তৈরি করা হয়েছে, পরে টেলিভিশনে দেখানো হয়েছে, অথচ তাঁর মতে, তাঁর সতী-সাধ্বী স্ত্রী পূর্বোল্লিখিত পাপানুষ্ঠানের সঙ্গে মোটেই বিজড়িত ছিলেন না! সে কথা পরে হবে।

আমি এতক্ষণ আপ্রাণ চেষ্টা দিয়ে রুশ রাজনীতি এড়িয়ে গিয়েছি কিন্তু এখন থেকে আর সেটা সম্ভবপর হবে না, কারণ এই সময়েই কূটরাজনৈতিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হলধর-সন্তান রাসপুতিন হিস্যে নিতে আরম্ভ করেছেন দেশবিদেশের গুরুত্বপূর্ণ কঠিন কঠিন সঙ্কটসমস্যায়। ইতিমধ্যে যে সব সরল ধর্মযাজকগণ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁরা ধীরে ধীরে বিশ্বস্ততম সূত্রে তাঁর 'কীর্তিকলাপে'র সম্পূর্ণ বিবরণ অবগত হয়ে তাঁর সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছেন। কিন্তু স্বয়ং জারিনা এবং রাশার 'পোপ' হোলি সিন্ড যতক্ষণ তাঁর সম্মোহন-ক্ষমতায় অর্ধচেতন ততক্ষণ তাঁকে তো মুহূর্তের তরে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। পাঠক, স্মরণ করুন সেই সুপ্রাচীন আরবী প্রবাদঃ কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে, কিন্তু কাফেলা (ক্যারাভান) চলে এগিয়ে।' রাসপুতিন এই কুকুরগুলোর ঘেউ ঘেউকে থোড়াই পরোয়া করেন।

কিন্তু রাসপুতিন কি করে এরকম নির্বিকারচিত্তে উপেক্ষা করলেন রুশ দেশের জনগণের রাজনৈতিক নবজাগরণকে! জার দ্বিতীয় নিকলাস যত না রক্ষণশীল সম্রাটের সার্বভৌমিকত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, তাঁর চেয়ে শতগুণ স্থবির জড়ভরত ছিলেন তাঁর আমির-ওমরাহ। ওদিকে রুশ-সিংহ যখন সদম্ভে মূষিক জাপানের সঙ্গে সংগ্রাম করতে গিয়ে তার কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে নির্মম-রূপে পরাজিত হল, তখন আর 'হোলি' রাশার অন্তঃসারশূন্যতা গোপন রাখা সম্ভব হল না। জনমত নির্ভয়কণ্ঠে জারের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে স্বায়ত্তশাসন দাবি করলো। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে যে বৎসর রাসপুতিন সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন, ঠিক সেই বৎসরেই জার প্রথম 'বিধানসভা' (এরই নাম পূর্বোল্লিখিত 'ডুমা') নির্মাণের অনুমতি দিলেন। সে এক সত্যকার সার্কাস—নইলে তার কোন সম্মানিত সদস্য সেখানে অস্ত্রোপচার দ্বারা ইহুদিকুলকে শিখণ্ডীরূপে পরিণত করার প্রস্তাব গুরুত্বপূর্ণ গাম্ভীর্যমণ্ডিত পদ্ধতিতে পেশ করতে পারেন?

কিন্তু 'ডুমা' প্রতিষ্ঠান বন্ধ্যা হয়ে রইল কি না রইল সে তত্ত্ব রাসপুতিন-জীবনকে স্পর্শ করতে পারে নি যতদিন না রাজপ্রাসাদচক্রের দু-একজন ধুরন্ধর অতিশয় রক্ষণশীল রাজনৈতিক মনস্থির করলেন যে, রাসপুতিনকে দিয়ে তাঁরা এমন সব রাজকর্মচারী নিযুক্ত করিয়ে নেবেন, যারা ডুমার প্রতি পদক্ষেপের

www.BanglaBook.org

পথে লৌহপ্রাচীরবৎ দণ্ডায়মান হয়ে থাকবে। কূটনীতিতে আনাড়ি রাসপুতিনের হাত দিয়ে তামাক খাওয়াটা কিছুমাত্র দুঃসাধ্য হল না, কিন্তু এসব অপদার্থ নিয়োগের পশ্চাতে কে, সে তথ্যটিও গোপন রইল না। বস্তুত স্বয়ং রাসপুতিন প্রত্যেক পার্টিতে জালা জালা মদ আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সুমিষ্ট কেক্‌খণ্ড (তাঁর জন্য বিশেষ করে কেকে তিন ডবল চিনি দেওয়া হত—এ বাবদে হিটলারের সঙ্গে তাঁর সম্পূর্ণ মিল) চাষাড়ে পদ্ধতিতে প্রচুর শব্দ আর বিরাট আস্যব্যাদানসহ চিবুতে চিবুতে দম্ভ করতেন, 'এই যে দেখছো স্কার্ফখানা, এটি আপন হাতে বুনেছেন স্বয়ং জারিনা', (কিংবা হয়তো তাঁর আদরের ডাকনাম সোহাগভরে উল্লেখ করতেন—আমার যেন মনে পড়ছে, তাই), কিংবা 'জানো হে, ভরনাভাকে পাঠালুম তবল্‌স্কের বিশপ করে'। প্রভু রাসপুতিনের অন্ধভক্ত, অত্যধিক মদ্যপানবশত অর্ধমত্ত শিষ্যেরাও নাকি দ্বিতীয় সংবাদটি শুনে অচৈতন্য হবার উপক্রম! কারণ প্রভুর নিত্যসঙ্গী ঐ ভরনাভা যে একেবারে আকাট নিরক্ষর! সে হবে বিশপ!

মরীয়া হয়ে অন্যতম প্রধান পাদ্রী নিযুক্ত করলেন গুপ্তঘাতক। রাসপুতিন শুধু যে অনায়াসে সঙ্কট অতিক্রম করলেন তাই নয়, এ 'সুবাদে রাজপ্রাসাদে তাঁর প্রভাব এমনই নিরঙ্কুশ হয়ে গেল যে, স্বয়ং জার পর্যন্ত আর এখন উচ্চবাচ্য করেন না। অবশ্য সমস্ত ইয়োরোপই বিলক্ষণ অবগত ছিল যে, জার অতিশয় দুর্বল চরিত্রের 'যাক্‌গে, যেতে দাও না'—ধরনের নির্বীর্য 'শাসক'। কার্যত তাঁকে শাসন করেন জারিনা। এবং তাঁর সম্মুখে রাসপুতিনের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করার মত সাহস তখন কারো ছিল না।

রাসপুতিনকে হত্যা করার চেষ্টা নিষ্ফল হওয়ার পরই তিনি জারিনাকে সর্বজনসমক্ষে গম্ভীর প্যাকম্বরীকণ্ঠে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন (বা শাসান), 'আমার মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যে গোষ্ঠীসুদ্ধ রমানফ পরিবার (অর্থাৎ সপরিবারে তখনকার জার) নিহত হবে।' নিহত তাঁরা হয়েছিলেন, এবং অতিশয় নিষ্ঠুর পদ্ধতিতেই, কিন্তু সেটা ঠিক এক বৎসরের ভিতরই কিনা বলতে পারবো না, দু' বৎসরও হতে পারে।

কিন্তু জারিনা? তাঁর শোচনীয় অবস্থা তখন দেখে কে? কুসংস্কারাচ্ছন্ন অতিপ্রাকৃতে অন্ধবিশ্বাসী এই মূঢ় রমণীর যত দোষই থাক, একটা কথা অতিশয় সত্য, তিনি তাঁর পুত্রকন্যাকে বুকে চেপে ধরে রেখেছিলেন পাগলিনী-পারা। উদয়াস্ত তাঁর আর্ত সশঙ্ক দৃষ্টি, না জানি কোন্ অজানা অন্ধকার অন্তরাল থেকে কোন্ অজানা এক নূতন সঙ্কট অকস্মাৎ এসে উপস্থিত হবে, তাঁর কোনো একটি বৎসকে ছিনিয়ে নেবার জন্য!

অতএব প্রাণপণ প্রহরা দাও রাসপুতিনের চতুর্দিকে। তিনি একমাত্র মুশকিল্-আসান্। এই 'হোলিম্যান' আততায়ীর হস্তে নিহত হলে সর্বলোকে সর্বনাশ!

কিন্তু বিশ্বসংসারের সকলেই রাসপুতিনের সাবধানবাণী বা শাসানোতে বিশ্বাস ক'রন নি এবং ভয়ও পান নি। বিশেষ করে রাজপ্রাসাদের সর্বোচ্চস্তরের রাজরক্তধারী একাধিক ব্যক্তি। এঁরা ক্রমাগত জার-জারিনাকে রাসপুতিন সম্বন্ধে সাবধান হতে বলেছেন, এবং ফলে তাঁদের প্রতি বর্ষিত অপমানসূচক কটূবাক্য মাত্রায় বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতিদিন। রাজপ্রাসাদে এঁরা হচ্ছেন অপমানিত—অথচ

www.BanglaBook.org

রাসপুতিনের 'শুভাগমনে'র পূর্বে এঁরাই ছিলেন সেখানে প্রধান মন্ত্রণাদাতা। এখন তাঁদের এমনই অবস্থা যে, বাইরের সমাজে তাঁরা আর মুখ দেখাতে পারেন না। তাঁদের পদমর্যাদা, অভিজাত রক্ত প্রকাশ্য ব্যঙ্গবিদ্রূপ থেকে তাঁদের বাঁচিয়ে রেখেছে সত্য, কিন্তু ভিতরে বাইরে, স্ফুট-অস্ফুট নিত্যদিনের এ অপমান আর কাঁহাতক সহ্য করা যায়! ওদিকে 'হোলি রাশা' যে কোন্ জাহান্নমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন কে জানে!

অপমানিত সর্বোচ্চ অভিজাতবংশজাত তিনজন বসলেন মন্ত্রণাসভায়।

স্থির হল, ইউসুপফই হত্যা করবেন রাসপুতিনকে। তাই আজও লোকে বলে, 'তোমার স্ত্রীকে রাসপুতিন ধর্ষণ করেছিল বলেই তো তুমি প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলে, নইলে রাশাতে কি আর অন্য লোক ছিল না?' ইউসুপফ এটা অস্বীকার করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, প্রধানদের আদেশনুযায়ীই তিনি ঐ কর্মে লিপ্ত হন, আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় নিজেকে ভলন্টিয়ার করেন যদিও তাঁর স্ত্রী ধর্ষিতা হন নি। এ সম্বন্ধে ইউসুপফের আপন জবানী পাঠক বিশ্বাস করতে পারেন, নাও করতে পারেন; আমি শুধু বগ্‌দানফ সাহেবের জবানীটি পেশ করছি। না হয় সেটা ভ্রান্তই হল, তাতেই বা কি? তদুপরি আমার স্মৃতিশক্তি আমার কলম নিয়ে কি যে খেলছে, জানবো কি করে?

এবং আশ্চর্য! হত্যা করবেন আপন বাড়িতেই তাঁকে সসম্মান নিমন্ত্রণ করে! পুলিসকে ভয় করতেন এঁরা থোড়াই। কিন্তু জারিনা? তিনি যে শেষ পর্যন্ত হত্যাকারী কে, সে খবরটা প্রায় নিশ্চয়ই জেনে যাবেন, এবং তার ফলাফল কি হতে পারে, না পারে, সে নিয়েও বিস্তর আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল এ ছাড়া গত্যন্তর নেই—নানা পন্থা বিদ্যতে।

ইউসুপফ পক্ষ যে রাসপুতিনের শত্রু, তিনি এটা জেনেশুনেও ইউসুপফের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে এলেন কেন? কেউ বলে, ইউসুপফের সুন্দরী স্ত্রী ইরেনে তাঁকে 'বিশেষ' প্রলোভন দেখিয়ে ফাঁদে ফেলেন, কেউ বলে, রাসপুতিন সত্যই আশা করেছিলেন, মুখোমুখি আলাপ-আলোচনার ফলে হয়তো প্রাসাদের এই শত্রুপক্ষের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপিত হতে পারে, কেউ বলে, রাসপুতিন প্রাসাদ জয় করেছিলেন বটে কিন্তু ইউসুপফের মত অভিজাতবংশের কেউ কখনো তাঁকে নিমন্ত্রণ করা দূরে থাক, বাড়িতে পর্যন্ত ঢুকতে দিতেন না। ইউসুপফ জয় অর্থই পেত্রোগ্রাদ-অভিজাতকুল জয়। তার অর্থ, নূতন শিষ্য, নূতন একটা সম্পূর্ণ নূতন ভাণ্ডার!

প্রায় সবাই বলেছেন, মদে দেওয়া হয়েছিল প্রচুর পটাশিয়াম সায়েনাইড, কিন্তু অধ্যাপক বলেছিলেন, মধুভরা বিরাট কেকের সঙ্গে মিশিয়ে। আমার মনে হয় দ্বিতীয় পন্থাতেই আততায়ীর ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম। মহামান্য অতিথি রাসপুতিনকে অবশ্যই দিতে হত বংশানুক্রমে সযত্নে রক্ষিত অত্যুৎকৃষ্ট খানদানী মদ্য; এবং ভদ্রতা রক্ষার জন্য অতিথি-সেবককেও নিতে হত সেই বোতল থেকেই। এইটেই সাধারণ রীতি। কিন্তু পার্টিতে সবাই তো আর কেক খায় না—তাও আবার তিন-ডবল মধুভর্তি স্পেশাল 'রাসপুতিন কেক্'—তদুপরি বিরাট কেকের দু-আধা দুই পদ্ধতিতে নির্মাণ করে জোড়া দেওয়া অতি সহজ।

www.BanglaBook.org

তা সে কেক্‌ই হোক্‌ আর খানদানী মদই হোক—রাসপুতিন তাঁর বীভৎস অভ্যাসমত সে-বস্তু খেয়ে গেলেন প্রচুরতম পরিমাণে, এবং তাজ্জব কী বাৎ! তাঁর কিছুই হল না। চোখের পাতাটি পর্যন্ত নড়লো না। আমার সুস্পষ্ট মনে আছে এস্থলে অধ্যাপকও আপন বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'মাই বয়! দেয়ার উয়োজ ইনাফ পয়জন টু নক অফ্‌ সিক্‌স্‌ বুল্‌জ।'[৫] অর্থাৎ ঐ বিষে ছ'টা আস্ত বলদ ঘায়েল হয়! কিন্তু রাসপুতিন নির্বিকার! ইউসুপফরা জানতেন না, রাসপুতিনকে ইতিপূর্বে একাধিকবার বিষপ্রয়োগে হত্যা করার চেষ্টা নিষ্ফল হয়। ম্যাজিশিয়ানরা যে রকম ব্লেড খায়, রাসপুতিন ঠিক সেই রকম হরেক জাতের বিষ খেতে তো পারতেনই, হজমও করতেন অক্লেশে।

ষড়যন্ত্রকারীরা পড়লেন মহা ধন্দে। তাঁদের সব প্ল্যান ভণ্ডুল।

তখন ইউসুপফ অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীদের ফিস ফিস করে বললেন, 'এ রকম সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। আমি ওকে গুলি করে মারবো।'

পিছন থেকে ঠিক ঘাড়ের উপর, অর্থাৎ সবচেয়ে মারাত্মক জায়গায়, একেবারে কাছে এসে ইউসুপফ গুলি ছুঁড়লেন। রাসপুতিন রক্তাক্ত দেহে অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন।

সে তো হল। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা এখন সম্মুখীন হলেন এক সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত নূতন সমস্যার। জখমহীন মৃতদেহ যত সহজে হস্তান্তর করা যায়, রক্তাক্ত দেহ নিয়ে কর্মটা তো অত সহজ নয়। এখন কি করা কর্তব্য সেটা স্থির করার জন্য দলের আর যাঁরা সন্দেহ না জাগাবার জন্য পার্টিতে যোগ না দিয়ে উপরের তলায় অপেক্ষা করছিলেন তাঁদের সঙ্গে ইউসুপফাদি যোগ দিলেন। তার পূর্বে তিনি লাশটা টেনে টেনে সেলারে (মাটির নিচে কয়লা এবং আর পাঁচটা বাজে জিনিস রাখার গুদোম) রেখে এলেন। পাছে হঠাৎ কেউ ডাইনিংরুমে ঢুকে লাশটা আবিষ্কার করে ফেলে।

স্থির হল, রাসপুতিনের লাশ ইউসুপফের বাড়ির কাছে নেভা নদীতে ডুবিয়ে দেওয়া হবে। সেটা ডিসেম্বর মাস।[৬] নেভার উপরকার জল জমে বরফ হয়ে গিয়েছে। সেইটে ভেঙে লাশ ভিতরে ঢুকিয়ে গায়েব করে দেওয়া কঠিন কর্ম নয়।

এইবার সবাই হলেন—যাকে বলে বজাহত! এবং ভুলবেন না, এঁদের অধিকাংশই ফৌজের আপিসার।[৬] এঁদের কাউকে হক্‌চকাতে হলে রীতিমত কসরত করতে হয়, আর মৃত্যুভয়? ছোঃ!

---

৫ রাসপুতিনের মৃত্যুদিবস ১৫।১৬ ডিসেম্বর ১৯১৬ বলা হয়। আবার ৩০ ডিসেম্বরও বলা হয়। তার কারণ অর্থডক্স রুশ ক্যালেন্ডার ও কন্টিনেন্টের গ্রেগরিয়ন ক্যালেন্ডারে ১৩।১৪ দিনের পার্থক্য।

৬ অধ্যাপক আমাকে গল্পচ্ছলে একদা বলেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে রাশান অফিসারদের সবচেয়ে প্রিয় খেলা (প্যাস্টাইম) ছিল প্রচুর মদ্যপানের পর লটারিযোগে দুজন অফিসারের নাম স্থির করা। তারপর একজন একটা ঘরে ঢুকে সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়স্থান বেছে নিয়ে ঘরের সব আলো নিবিয়ে দেবে। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকবে অন্য অফিসার, হাতে সবচেয়ে ছোট সাইজের পিস্তল নিয়ে। প্রথম অফিসার আশ্রয়স্থল থেকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তা নয়! সবাই সেলারে ঢুকে দেখেন, রাসপুতিনের লাশ উধাও! ঘাড়ের সবচেয়ে মারাত্মক জায়গায় গুলি খেয়ে যে-লোকটা পড়ে গিয়ে 'মরলো', সে যে শুধু আবার বেঁচে উঠলো তাই নয়, আপন পায়ে হেঁটে বাড়ি ছেড়ে উধাও হয়ে গেল!

অবশ্য এ-কথা ঠিক, ইউসুপফ সেলারের দরজা বাইরের থেকে তালাবন্ধ করেন নি, এবং খামোকা বেশী লোক যাতে না জানতে পারে তাই সেরাত্রে অধিকাংশ চাকর-বাকরকে ছুটি দিয়ে রেখেছিলেন।

রাসপুতিন যদি এখন কোনো গতিকে জারিনার কাছে পৌঁছে সব বর্ণনা দেন—এবং নিশ্চয়ই তিনি করবেন তবে ইউসুপফের অবস্থাটা হবে কি?

কিন্তু তিনি অতশত ভাবেন নি—অন্যান্যদের জবানী তাই। তাঁরা বলেন, তিনি পাগলের মত পিস্তল হাতে নির্জন রাস্তায় ছুটতে ছুটতে হঠাৎ দেখেন, চতুর্দিকের সেই শুভ্র শুভ্রতাময় বরফের ভিতর দিয়ে টলতে টলতে রাসপুতিন এগিয়ে যাচ্ছেন। রক্তক্ষরণও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এবারে ইউসুপফ আর কোনো চান্স্ নিলেন না। পিস্তলে যে কটা গুলি ছিল সব কটা ছুঁড়লেন তাঁর ঘাড়ের উপর। তারপর সবাই মিলে তাঁকে টেনে নিয়ে নেভা নদীর উপরকার জমে যাওয়া বরফ ভেঙে লাশটা ঢুকিয়ে ঠেলে দিলেন ভাটির দিকে।

কিন্তু জারিনা সে-দেহ উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। চার্চেরই মত একটি বিশেষ উপাসনাগারসহ নির্মিত চেপেলে তাঁর দেহ সযত্নে গোর দেওয়া হল একটি রমণীয় পার্কের ভিতর। মহারানী প্রতি রাত্রে যেতেন সেই গোরের পাশে, নীরবে অঝোরে অশ্রুবর্ষণ করার জন্য, রাসপুতিনের আত্মার সদ্‌গতি কামনা করে॥

২২।১।৬৬

বিষ্ণুশর্মা

মিশরের পসারী—গন্ধবণিক—যে রকম ভারতের শঙ্খচূর্ণ[১] এবং অগুরু আতর বিক্রি করে, ঠিক তেমনি কাইরোর পুস্তক-বিক্রেতা বিষ্ণুশর্মার 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'বুদ্ধজীবনী' বিক্রি করে। কিন্তু সে 'বুদ্ধজীবনী' কে লিখেছেন, কেউ জানে না।

কোকিলের মত ডাক ছাড়বে, "কু"; অন্যজন সঙ্গে সঙ্গে সেই অন্ধকারে সুধমাত্র ধ্বনির উপর নির্ভর করে পিস্তল মারবে। তখন সেই অন্ধকারে 'শিকার' জায়গা বদলাবে, কিন্তু "কু" ডাক না ছাড়া পর্যন্ত পিস্তল মারা বারণ। কতক্ষণ পরে দুজনের পার্ট বদলায়, আমার মনে নেই।

১ এই শঙ্খচূর্ণ নিয়ে কয়েক বৎসর পূর্বে এদেশে একটা 'কেলেঙ্কারি' হয়ে যায়। যেসব শাঁখারী পূর্বে বাঙলা থেকে এসে পশ্চিম বঙ্গে আশ্রয় নিয়েছে তাদের দরকার শঙ্খের। শঙ্খ প্রধানত বিক্রি হয় মাদ্রাজ অঞ্চলে এবং তার অন্যান্য খরিদ্দার আরব দেশ, মিশর ইত্যাদি। তারা শাঁখ গুঁড়ো করে ওষুধ বানায়। আমাদের গরীব শাঁখারীরা যে দাম দিতে প্রস্তুত ছিল (সোজাসুজি, না পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মারফৎ, আমার ঠিক মনে নেই)

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অবশ্য পঞ্চতন্ত্র সেখানে অন্য নামে পরিচিত। আরবীতে বলে 'কলীলা ওয়া' দিম্না'। এ দুটি—কলীলা ও দিম্না—দুই শৃগালের নাম। সংস্কৃতে করকট ও দমনক। কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন, গোড়াতে পঞ্চতন্ত্রের ঐ নামই ছিল। পরবর্তী যুগে ওটিকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে পঞ্চতন্ত্র নাম দেওয়া হয়। পাঁচ সংখ্যায় কেমন যেন একটা ম্যাজিক আছে কিংবা চোখের সামনে আপন হাতের পাঁচটা আঙুল যেন কোনো ইতস্তত প্রক্ষিপ্ত তথ্য, গল্প, প্রবাদ-সমষ্টিকে পাঁচের কোটায় ফেলতে চায়। বাইবেলের 'প্রাচীন নিয়মে' (ওল্ড টেস্টামেণ্ট) হয়তো সেই কারণেই 'পেণ্টাটয়েশ'=পঞ্চগ্রন্থ' আছে। এদানিং আমরা পাঁচ-শালার পরিকল্পনা করি।

তা সে যাই হোক, আমাদের এই তৃতীয়/দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত পঞ্চতন্ত্র ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাচীন ইরানে পেহ্লেভি (সংস্কৃতে পহ্লভী) ভাষাতে অনূদিত হয়। তার একটা বাইরের কারণও ছিল। প্রাচীন ইরানের সঙ্গে প্রাচীন গ্রীস রোমের সম্পর্ক বহুকালের। কখনো যুদ্ধের মারফতে, কখনো শান্তির। শান্তির সময় উভয়ে একে অন্যের উপর সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু দ্বিতীয়/তৃতীয় শতাব্দীতে ইরানীরা গ্রীসের উপর বিরক্ত হয়ে (ফেড্ অপ্) পূবের দিকে মুখ ফেরালে। ফলে ষষ্ঠ শতাব্দীতে পঞ্চতন্ত্র রাজা খুসরৌ অনুশিরওয়ানের[৩] আমলে পহ্লভীতে এবং অল্পকালের ভিতরই পহ্লভী থেকে সিরিয়াকে অনূদিত হল।

এই প্রথম—সর্বপ্রথম কিনা বলা কঠিন—একখানা আর্য ভাষায় লিখিত পুস্তক আর্যেতর ভাষায় অনূদিত হল,[৪] কারণ সিরিয়াক ভাষা হীব্রু, আরামায়িক ও আরবীর মত সেমিতি ভাষা। ইরাক সিরিয়া অঞ্চলে প্রচলিত এই সিরিয়াক ভাষা ও সাহিত্য (৩য় থেকে ১৪ শতাব্দী পর্যন্ত এর আয়ু) বরাবরই ইরানের সঙ্গে লেনদেন রাখতো বলে পহ্লভীতে কোনো উত্তম গ্রন্থ অনূদিত হলে সেটি সিরিয়াকেও অনূদিত হত। (পঞ্চতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে আরেকখানি ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ বা গ্রন্থাংশ পহ্লভী হয়ে সিরিয়াকে অনূদিত হয়, এর পরবর্তী যুগে মধ্যপ্রাচ্য ও ইয়োরোপে পঞ্চতন্ত্রের চেয়ে ঢের বেশী সম্মান পায়

আরবরা তার কিঞ্চিৎ বেশী দাম দিতে রাজী ছিল বলে মাদ্রাজ তাবৎ শঙ্খ বিক্রি করে দেয় ওদের। ফলে বহু শাঁখারী বেকার হয়ে যায়।

২ কোনো কোনো পণ্ডিতের ধারণা আরবীর এই 'ওয়া='অ্যাণ্ড'=এবং থেকে বাঙলা 'ও' এসেছে!

৩। এই খুসরৌর আমলেই চতুরঙ্গ খেলা ভারত থেকে ইরানে যায়।

৪ তার অর্থ অবশ্য এ নয় যে, এই সর্বপ্রথম সেমিতি জগতে ভারতীয় সাহিত্য পরিচিত হল। বস্তুত এর অনেক পূর্বেই জাতকের বহু গল্প কাহেন্সা [ক্যারাভান] ও চট্টির কথকদের [স্টরি-টেলার] মারফতে গ্রীস রোম পর্যন্ত চলে গিয়েছে। বৌদ্ধ শ্রমণরা খৃস্ট-জন্মের পূর্বেই মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তারও পূর্বে লোহিত সমুদ্রের কূল ধরে ধরে মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে; এমন কি প্রাচীনতম মোহেন্জোদাড়োর সঙ্গে ইরাকের সম্পর্ক ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু উপস্থিত এগুলো আমাদের আলোচনার বাইরে। এবং বৌদ্ধধর্ম চীনে প্রবেশ করলে যে সব গ্রন্থ অনূদিত হয় সেও এ আলোচনার বাইরে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—তার কথা পরে হবে।)

বিষ্ণুশর্মা রচিত পঞ্চতন্ত্রের কপাল ভালো। পহ্‌লভীতে যিনি এ পুস্তক অনুবাদ করেন তিনি ছিলেন রাজ-বৈদ্য, অতএব সুপণ্ডিত। সিরিয়াকে যিনি তস্যানুবাদ করেন তিনিও জ্ঞানীজন, কারণ এ গ্রন্থ অনুবাদ করার পূর্বেই তিনি কিয়ৎপরিমাণ গ্রীক দর্শনও কৃতিত্বসহ সিরিয়াকে অনুবাদ করেছিলেন।

পহ্‌লভী অনুবাদটি লোপ পেয়েছে, কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীতে অনূদিত সিরিয়াক অনুবাদটি ("কলিলগ্ ও দমনগ্") এখনো পাওয়া যায়।

এর প্রায় দুশ বৎসর পর—মোটামুটি হজরৎ মুহম্মদের জন্মের দেড়শ' বৎসর পর—জনৈক আরব আলঙ্কারিক পঞ্চতন্ত্র আরবীতে অনুবাদ করেন। আরবী সাহিত্যের তখন কৈশোরকাল। এই পুস্তক অনুবাদ করার সময় অনুবাদক আব্দুল্লা ইব্‌ন্ অল্-মুকাফফার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তরুণ আরব সাহিত্যিকদের শৈলী বা স্টাইল শেখানো—বিশেষ করে যারা 'ব্যাল-ল্যাংর্' রম্যরচনায় হাত পাকাতে চান।[৫] পহ্‌লভীসিরিয়াক হয়ে আরবীতে পৌঁছতে গিয়ে বিষ্ণুশর্মা নামটি কিন্তু এমনিই রূপান্তরিত হয়ে যায় যে আরবরা ভাবে, ইনি বিদ্যাপতি, এবং সেই অনুসারে তাঁর নাম লেখা হয় বীদ্‌বা বীদপা বীদপাই (আরবীতে 'প' অক্ষর নেই, কিন্তু মাঝে মাঝে কাছাকাছি অন্য দুই অক্ষর দিয়ে 'প' ও 'চ' বোঝবার চেষ্টা করা হয়)। আরবী অনুবাদ হয় অষ্টম শতাব্দীতে এবং তার হীব্রু অনুবাদ দ্বাদশ শতকে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জনৈক ক্যাথলিক কার্ডিনালের জন্য এটি লাতিনে 'ডিরেক্‌টোরিয়ুম ভিটো হুমানো' (অর্থাৎ মোটা-মুটি 'মানব-জীবনের জন্য হিতোপদেশ—'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশ' যে সংশ্লিষ্ট সে কথা মধ্যপ্রাচ্যে জানা ছিল) নাম নিয়ে ইয়োরোপে প্রচারিত হয়, এবং এই অনুবাদের উপর নির্ভর করে পরবর্তীকালে ইয়োরোপের প্রায় তাবৎ অর্বাচীন ভাষাতে 'বীদপাই-এর নীতিগল্প' বা 'কলীলা ও দিম্‌না' রূপে অনূদিত হয়ে প্রখ্যাতি লাভ করে।

'জাতক', 'পঞ্চতন্ত্র', 'হিতোপদেশে'র বিজয়-যাত্রা সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করেছেন স্বর্গত ঈশান ঘোষ। তাঁর অতুলনীয় জাতক অনুবাদের ভূমিকায় তিনি লেখেন, 'পঞ্চতন্ত্রের কথাগুলি পৃথকভাবে কথিত নহে। এক একটি তন্ত্রে এক একটি কথাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহার আশেপাশে অন্য বহু কথা সংযোজিত হইয়াছে। উত্তরকালে অস্মদ্দেশে বেতাল পঞ্চবিংশতি ও হিতোপদেশ প্রভৃতি আরবে নৈশোপাখ্যানমালা এবং য়ুরোপে Decameron, Pentameron, Heptameron, Canterbury Tales প্রভৃতি গ্রন্থের রচনাতেই এই পদ্ধতি

---

৫ অধীন এই উদ্দেশ্য নিয়েই বছর ষোল পূর্বে 'পঞ্চতন্ত্র' সিরিজ 'দেশ' পত্রিকায় আরম্ভ করে। নইলে বিষ্ণুশর্মার অনুকরণ করার মত দম্ভ আমার তখনো ছিল না। এর অল্প পরেই Indian Council for Cultural Relations-এর সঙ্গে সংযুক্ত থাকা-কালীন মরহুম মৌলানা আজাদের নেতৃত্বে আমরা একখানা আরবী ত্রৈমাসিক ('সকাফৎ-উল হিন্দ্' 'ভারতীয় সংস্কৃতি') প্রকাশ করি ও ঐ সময় মিশরাদি একাধিক দেশ থেকে অনুরোধ আসে যে, যেহেতু অদ্যকার 'কলীলা ওয়া দিম্‌না' ও 'পঞ্চতন্ত্রে' প্রচুর তফাৎ, অতএব আমরা যেন একখানি নূতন অনুবাদ প্রকাশ করি। আমরা সে কাজ সানন্দে প্রাগুক্ত পত্রিকায় আরম্ভ করি।

www.BanglaBook.org

অনুসৃত হইয়াছে। পঞ্চতন্ত্রের কথাগুলি উত্তরূপে এক সূত্রে নিবন্ধ না থাকিলে বোধ হয় দেশদেশান্তরে ভ্রমণের সময় ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইত।' এ অনুচ্ছেদ ঈশান ঘোষ শেষ করেছেন এই বলে—'হিন্দুই হউন, বৌদ্ধই হউন, পঞ্চতন্ত্রকার অতি শুভক্ষণে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। লোকমুখে বা গ্রন্থাকারে তাঁহার কথাগুলি সভ্য অসভ্য সর্ব দেশে যেরূপভাবে পরিজ্ঞাত হইয়াছে, পৃথিবীতে অন্য কোনো পুস্তকের ভাগ্যে সেরূপ ঘটে নাই।'[৬]

অজহর বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলে যে পুস্তক-বিক্রেতা আমাকে 'কলীলা ওয়া দিম্‌না' বিক্রি করে, সে ইঙ্গিত দেয়, আরেকখানি ভারতীয় পুস্তক কপ্ট খৃষ্টানরা (এঁরা নিজেদের ফারাওয়ের বংশধর বলে দাবী করে) কিছুদিন পূর্বে আরবীতে পুনঃপ্রকাশ করেছেন।

তখন কপ্ট বন্ধুদের কাছে অনুসন্ধান করে জানতে পারি, এর আরবী নাম 'সুংরহ বার্লাম ওয়া য়ুআসফ'। এ পুস্তকের প্রধান নায়ক দুজন খৃষ্টধর্মে সেণ্টরূপে স্বীকৃত হয়েছেন—ক্যাথলিক উভয়কে স্মরণ করেন ২৭ নভেম্বর ও য়ুআদফকে গ্রীক চার্চ স্মরণ করেন অগস্ট (সেণ্টস্ ডে)।

তখন অনুসন্ধান করে দেখি, য়ুআসফ' নাম এসেছে 'বোধিসত্ত্ব' থেকে ও 'বার্লাম' এসেছে 'বুদ্ধ ভগবান্'-এর 'ভগবান্'[৭] থেকে!

এ পুস্তকের কাহিনী পঞ্চতন্ত্রের চেয়েও বিস্ময়জনক॥

২।৪।৬৬

বার্লাম ও য়োসাফট্

ইয়োরোপীয় ও মধ্যপ্রাচ্যের চার-পাঁচটি ভাষা নিয়ে প্রায় ষাটটি ভাষায় অনূদিত 'বার্লাম ও য়োসাফট্' ইয়োরোপে ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়া থেকে খৃষ্টান মঠে তথা সাধুসন্ত ও পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সমাদৃত হয়ে ক্রমে ক্রমে অসাধারণ জনপ্রিয় হয়ে দাঁড়ায়। তার প্রধান কারণ, অতি সুমধুর সরল গল্পচ্ছলে এই পুস্তকে বর্ণিত খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্য ও প্রাধান্য ইতিপূর্বে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের কোনো ভাষাতেই রচিত হয় নি—এমন কি খৃষ্টধর্মের প্রাচীনতম প্রধান বাহক গ্রীক, লাতিন এবং হীব্রুতেও না। তাই দেখতে পাই, ইংলণ্ডে ছাপাখানা নির্মিত হওয়ার পর উইলিয়াম ক্যাকস্‌টন যে-সব পুস্তক ছাপান, তার মধ্যে এই পুস্তকটিও ১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজী অনুবাদে আছে। অবান্তরণিকারূপে

---

৬ ঈশান ঘোষের বাংলা জাতক কী জর্মন, কী ইংরিজি, কী হিন্দী সব জাতকানুবাদের চেয়ে শতগুণে শ্রেষ্ঠ। অসাধারণ পরিশ্রম ও অতুলনীয় পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ঈশান এই অনুবাদ সম্পন্ন করে বঙ্গবাসীকে চিরঋণে আবদ্ধ করে গেছেন। এ অনুবাদ প্রকাশিত হলে পর পালিপাণ্ডিত্যে আরেক ধনুর্ধর বিশ্বভারতীর অধ্যক্ষ বিধুশেখর শাস্ত্রী এর সমালোচনা করেন। পরম লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় ঈশানের অনুবাদ বহু বৎসর পূর্বে নিঃশেষ হওয়া সত্ত্বেও এর পুনর্মুদ্রণ হয়নি। শুনতে পাই, সাহিত্য আকাদেমী স্বর্গত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙলা কোষ পুনর্মুদ্রণ করেছেন। তাঁরা যদি (বিধুশেখরের আলোচনা সহ) এই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণে সহায়তা করেন তবে গৌড়জন তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এখানে এ-পুস্তক সম্বন্ধে আরো বহু বিস্তর চিত্তাকর্ষক ও মূল্যবান তত্ত্ব তথ্য নিবেদন করা যায়, কিন্তু আমাদের ধারণা, পুস্তকের উপাখ্যানটি এস্থলে অতিশয়তম সংক্ষেপে বর্ণনা করে নিলেই সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন করা হবে—পাঠক নিজের থেকেই অনেক-কিছু কল্পনা করে নিতে পারবেন।

ভারতবর্ষে এক পরাক্রমশালী নরপতি পুত্রহীন অবস্থায় অতিশয় মনোকষ্টে দীর্ঘকাল জীবনযাপন করার পর এক অভূতপূর্ব সর্বসুলক্ষণসম্পন্ন পুত্রসন্তান লাভ করেন। মহাসমারোহে তাঁর নামকরণ করা হল য়োসাফট্ (গ্রীক অনুবাদে Josaphat) এবং রাজা সে-যুগের শ্রেষ্ঠতম শ্যালডীয় (Chaldaean) জ্যোতিষীদের নিমন্ত্রণ ক'রে রাজপুত্রের জন্মকুণ্ডলী নির্মাণ করার আদেশ দিলেন। তাঁরা সবাই একবাক্যে রাজাকে জানালেন, নবজাত কুমারের ভবিষ্যৎ সর্ব গৌরব ধারণ করে এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে তিনি হবেন বিরলতম মহাত্মাদের মধ্যে বিরল, কিন্তু তিনি পিতৃ-পিতামহের সনাতনধর্ম পরিত্যাগ করে সত্যধর্মের সন্ধানে গৃহত্যাগ করবেন। বলা বাহুল্য, নৃপতি নিতান্ত ক্ষুব্ধ হলেন এবং মর্মন্তুদ ভবিষ্যদ্বাণী যাতে সফল না হয়, তার জন্য মন্ত্রণা গ্রহণ করে আদেশ দিলেন, রাজপুত্রকে যেন পরম রমণীয় এক রাজপ্রাসাদের ভিতর চিত্তাকর্ষণীয় সদানন্দময় পরিবেশে রাখা হয়। প্রাসাদ থেকে বাইরে এসে তিনি যেন কোনো অবস্থাতেই জরামৃত্যুর (ইংরেজী অনুবাদ আছে misery and death, জর্মনে আছে ঐ একই—Elend und Tod, খুব সম্ভব জরার প্রকৃত প্রতিশব্দ ইয়োরোপীয় কোনো ভাষাতেই নেই বলে তৎপরিবর্তে 'মিজরি' ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে) সংস্পর্শে না আসতে পারেন ; রাজা অনুমান করে নিয়েছিলেন, সদাসুখীজন যে পরিবেশে আনন্দ লাভ করেছে, সেটা পরিবর্তন করে সে অন্য পরিবেশের সন্ধানে যাবে 'কোন দুঃখে'?

কাহিনীর এই অংশটুকু শোনামাত্রই যে-কোনো ভারতীয়, সিংহলী, তিব্বত-চীন-জাপান-শ্যামবাসীর মনে উদয় হবে, এ যেন বড় চেনা-চেনা ঠেকছে, এ কি যুবরাজ সিদ্ধার্থের জীবনী নয়? তাই যদি হয়, তবে সে কাহিনী সর্বধর্মের সর্ব-সজ্জনকে উৎসাহ এবং আনন্দ দান করলেও সেটা খৃষ্টধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থরূপে সম্মানিত হবে কি প্রকারে? কাহিনীর পরের অংশটুকু শুনলেই সেটা আস্তে আস্তে পরিষ্কার হবে। কিছুটা আগেও বলা হয়েছে, সেটা আমি ইচ্ছে করেই আগে বলিনি, কারণ তা হলে সিদ্ধার্থকে চিনতে পাঠকের অসুবিধা হত।

কাহিনীতে আছে, রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করার পূর্বেই ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল (এটা অবশ্যই সত্য নয়, এবং এরকম আরো পরিবর্তন পরিবর্ধন পাঠক পাবেন ; কি উদ্দেশ্য নিয়ে সেগুলো করা হয়েছিল, পাঠক ক্রমশ বুঝতে পারবেন)[১] কিন্তু যুবরাজের পিতা সে ধর্মের ঘোষিতর শত্রু ছিলেন এবং

---

১ ধর্মের ইতিহাসে এটা কিছু নূতন নয়। কাঠিয়াবাড়ের হিন্দু লোহানা রাজপুতদের ইসমাঈলীয়া (ইসলামেরই এক) সম্প্রদায়ের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য কাহিনী নির্মিত হয় যে, হিন্দুদের যে কল্কি অবতারের আবির্ভূত হওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, ইতিমধ্যে মক্কা নগরে হজরৎ আলীরূপে তিনি অবতীর্ণ হয়ে গেছেন। সত্যপীরও তুলনীয়।

কয়েক সপ্তাহ পূর্বে যে ফন হফমান্‌স্‌টালের কবিতার বাংলা অনুবাদ নিয়ে আলোচনা

www.BanglaBook.org

রাজ্যে তার প্রসার বেড়ে যাচ্ছে দেখে রাজাদেশ প্রচারিত করেন যে প্রজাসাধারণ, পাত্র-অমাত্য যে কেউ এই নবীন ধর্ম গ্রহণ প্রচার প্রসার করবে, সে দণ্ডনীয় হবে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রাজারই এক অন্তরঙ্গ সখা এবং মন্ত্রী খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে নির্জনে ধ্যান-ধারণা করার জন্য মরুভূমিতে চলে যান (মিশরের খৃষ্টান সাধুরা দ্বিতীয় তৃতীয় শতাব্দীতে প্রায়শ লীবিয়া মরুভূমিতে অন্তর্ধান করতেন)। রাজাদেশে তাঁকে খুঁজে মরুভূমি থেকে ফিরিয়ে আনলে পর তিনি রাজসভায় তাঁর আচরণ বোঝাতে চেষ্টা করেন ও ক্ষমাভিক্ষাও করেন। রাজা আরো ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে নিজ রাজ্য থেকে নির্বাসিত করেন।

এদিকে রাজপুত্র যৌবনে পদার্পণ করে আর প্রাসাদে বন্দী হয়ে থাকতে চাইলেন না ; তাঁর ইচ্ছা, তিনি বাইরের বিশাল জগতে বেরিয়ে গিয়ে সেখানে নব নব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন এবং সেই মর্মে পিতার অনুমতি ভিক্ষা করলেন। অতিশয় অনিচ্ছায় তিনি সম্মত হলেন। ফলে রাজপুত্র ক্রমে ক্রমে এক এক জন করে অন্ধ, কুষ্ঠরোগী, জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ ও সর্বশেষে একটা মৃতদেহ দেখতে পেয়ে ব্যথাতুর হয়ে এঁর কারণ সম্বন্ধে কাতর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে থাকেন এবং উত্তরে শুনতে পান, এসব দুঃখ-দুর্দৈব মানুষমাত্রেরই ললাটে লেখা আছে। অত্যন্ত বিচলিত ও অভিভূত হয়ে তিনি অনুসন্ধানের ফলে আরো জানতে পান, এসব দুঃখ-দুর্দৈব থেকে চিরতরে নিষ্কৃতি পাবার পন্থা জানেন শুধু এক শ্রেণীর সাধুসন্ত—তাঁরা সংসার ত্যাগ করে নির্জনে ধ্যান-ধারণায় মগ্ন থাকেন। রাজপুত্রের প্রবল ইচ্ছা হল, এঁদেরই মুখ থেকে তিনি তত্ত্বকথা শুনবেন, কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ করা অসম্ভব, কারণ তাবৎ সাধুসন্তকে রাজাদেশে দেশ থেকে নির্বাসিত করে দেওয়া হয়েছে।

ইতিমধ্যে এক অতিশয় পূতপবিত্র তথা ধর্মজ্ঞ সাধু মণিকারের ছদ্মবেশ পরে রাজসভায় আবির্ভূত হলেন এবং রাজপুত্রের সঙ্গে একাধিকবার সাক্ষাৎ করে ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বকথা তাঁকে বোঝাতে লাগলেন। সে সময়ে তিনি নানা গল্প, নানা কাহিনী কীর্তন করে সংসারের অসারতা ও প্রকৃতধর্ম কি, সে-সব সপ্রমাণ করেন।

(এই গল্পগুলো গ্রন্থের চিত্তাকর্ষক অংশ গ্রহণ করে আছে। এগুলোর অধিকাংশেরই উৎপত্তিস্থল যে ভারতবর্ষ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীতে সে নিয়ে ইউরোপে প্রচুর গবেষণা করা হয় তবু সবগুলোর মূল তখনো খুঁজে পাওয়া যায় নি, হয়তো কখনো পাওয়া যাবে না। তবে কয়েকটি নিঃসন্দেহে জাতক থেকে নেওয়া হয়েছে [আশ্চর্য! স্বয়ং বোধিসত্ত্ব যে-সব গল্প জাতকে বলে গেলেন, য়োসাফট্‌রূপে তাঁকে আবার সেগুলোই উপদেশরূপে শুনতে হল!] এবং কিছু মহাভারত থেকেও। এদেশে কোথায় কি পরিমাণ গবেষণা হয়েছে সেকথা বলা কঠিন—এই গ্রন্থ নিয়ে কোনো গবেষণা আমার চোখে পড়ে নি। এ কর্ম করার সর্বাপেক্ষা শাস্ত্রাধিকার ছিল স্বর্গত ঈশান ঘোষের। তিনি তাঁর জাতক-অনুবাদের উপক্রমণিকায় এ পুস্তক নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছেন, কিন্তু সেখানে স্থান সংকীর্ণ এবং

হয় তিনিও এই গ্রন্থের গল্প মূলসূত্ররূপে নিয়ে তাঁর সৃজনীশক্তির প্রকাশ দেখিয়েছেন। নাম 'ইয়েডেরমান'='এভরিবডি'।

www.BanglaBook.org

এর গল্পগুলো ইয়োরোপের ভিন্ন ভিন্ন পাঠে বড়ই ভিন্ন ভিন্ন—এমন কি জাপানী 'শক জিৎসুরকু'ও যে এ-আলোচনায় স্থান পায় সে তত্ত্ব কয়েক বৎসর পূর্বে জর্মন গবেষকগোষ্ঠী উল্লেখ করে গেছেন এবং এ দেশে বসে সেগুলো সংগ্রহ করা অসম্ভব না হলেও সুকঠিন।)

যে-মণিকার রাজপুত্রকে উপদেশ দিলেন তিনিই এই গ্রন্থের বার্লাম। রাজপুত্র মনস্থির করলেন, তিনি বার্লামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করবেন। এ সংবাদ শুনে রাজা ক্ষোভে ক্রোধে উন্মত্তপ্রায়। সর্ব প্রথমেই তিনি বার্লামকে বন্দী করবার আদেশ দিলেন, কিন্তু তিনি ততক্ষণে নগর ত্যাগ করেছেন। রাজা যখন দেখলেন পুত্র কিছুতেই সংকল্প ত্যাগ করবেন না তখন তিনি ধূর্ত পন্থা অবলম্বন করলেন। নাকোর নামক এক অচেনা জনকে তিনি নিযুক্ত করলেন, সে এসে সভাস্থলে খৃষ্টধর্মের স্বপক্ষে দুর্বল, ভ্রমাত্মক যুক্তি প্রয়োগ করে তর্ক-যুদ্ধে সভাপণ্ডিতদের কাছে হেরে যাবে : এই করে খৃষ্টধর্ম সর্বজনসমক্ষে লাঞ্ছিত হলে যুবরাজ নিশ্চয়ই বার্লামের অনুসরণ করার ব্যর্থতা বুঝতে পারবেন। কিন্তু রাজপুত্র সংবাদ পেয়ে গোপনে নাকোরকে এমনই তিরস্কার করলেন যে, সে শেষ পর্যন্ত রাজসভায় বাগ্মিতাসহ অব্যর্থ যুক্তিজাল বিস্তার করে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করল। এর পর নাকোরও খৃষ্ট সাধুরূপে নির্জন ভূমিতে অন্তর্ধান করে। রাজা তখন যাদুকরের শরণাপন্ন হলেন। সে তখন পার্থিব ভোগবিলাসের মায়াজাল বিস্তার করে যুবরাজকে প্রলোভিত করার চেষ্টা দিয়ে নিষ্ফল তো হলই, পক্ষান্তরে যুবরাজ তাঁকে একটি কাহিনী বলে স্বধর্মে দীক্ষিত করলেন। এর সঙ্গে মার-এর মিল দেখা যাচ্ছে, তবে বৌদ্ধ-শাস্ত্রে সে ধ্যানী বোধিসত্ত্বকে প্রচুর মারণাস্ত্র দিয়ে ভয়ও দেখায়।

সর্বশেষে রাজপুত্র বোধিসত্ত্ব বা য়োসাফট্‌রূপে রাজপুরী ত্যাগ করে বার্লামকে খুঁজে পেলেন। তাঁকে সখা ও সঙ্গীরূপে গ্রহণ করে উভয়ের ধ্যান-ধারণায় নিমজ্জিত হলেন।

* * *

এ গ্রন্থে বৌদ্ধধর্মের কাহিনী নিয়ে তার সঙ্গে খৃষ্টধর্ম জুড়ে দিয়ে সে ধর্মের যে জয়জয়কার করা হল তার প্রণেতা কে জানবার উপায় নেই। পঞ্চতন্ত্রের মত এ-গ্রন্থও রাজা খুসরৌর আমলে পহ্‌লভীতে অনূদিত হয় এবং ওরই মত, তারপর সিরিয়াকে। তার থেকে হয় গ্রীক অনুবাদ এবং উপক্রমণিকায় বলা হয় 'একটি উপকারী কাহিনী...আবিসিনিয়ার প্রত্যন্ত প্রদেশ—যার নাম ভারতবর্ষ (!)—সেখান থেকে এটি আনয়ন করেন সাধুজন।' এদিকে আরবী অনুবাদও হয়ে গিয়েছে এবং সেখানে গ্রীক অনুবাদের চেয়েও স্পষ্টতররূপে ধরা পড়ে যে এর মূল ভারতে ও বৌদ্ধধর্মে। এর পর লাতিন অনুবাদ এবং তার থেকেই ইয়োরোপীয় সর্বভাষায়।

'বিষ্ণুশর্মা' প্রসঙ্গে নিবেদন করছি য়োসাফট্ এসেছে 'বোধিসত্ত্ব' থেকে (আরবীতে আদ্যস্থলে 'ব' ও 'য়'-তে মাত্র একটি বিন্দুর পার্থক্য আছে বলে হয়ে যায় য়োদাসাফ) এবং বার্লাম (বুদ্ধ) 'ভগবান' থেকে।

অতএব এক বুদ্ধদেব যদি দুই মূর্তি ধারণ করে খৃষ্টধর্মে সেণ্ট বা সন্ত রূপে পূজা পান তবে নিশ্চয়ই আমাদের আনন্দের কথা॥

৯।৪।৬৬

www.BanglaBook.org

রবি-মোহন-এন্‌ড্রুজ

কয়েক দিন পূর্বে একখানা চিট বইয়ে রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মাজী ও এন্‌ড্রুজ সম্বন্ধে একটি বিবরণীতে দেখি আর সবই আছে, নেই শুধু একটি কথাঃ—এন্‌ড্রুজের পরলোকগমনের পর তাঁর স্মৃতিরক্ষা সম্বন্ধে সচেতন হলেন কে, এবং সেই মহৎ চিন্তা মূল্ময়রূপ দেবার জন্য সর্বপ্রথম উদ্যোগী হলেন কে, এবং এন্‌ড্রুজ ফাণ্ডের আজো সামান্য যেটুকু অবশিষ্ট আছে—যদি আদৌ থাকে—তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাবো কাকে?

অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ[১] হয় যে সময়, তখন রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমে। শুনেছি, সে-সময় তিনি নাকি সে-আন্দোলনের প্রশংসাই করেছিলেন। ফেরার সময় বোম্বাইয়ে নেমে তাঁর মত পরিবর্তন হয়, এবং আন্দোলনের বিরুদ্ধে স্পষ্ট ভাষায় একাধিক প্রবন্ধে আপন মতামত ব্যক্ত করেন (দ্বিজেন্দ্রনাথ কিন্তু বরাবরই গাঁধীকে উৎসাহ-হিম্মৎ যুগিয়ে যান)। এন্‌ড্রুজ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও গাঁধীর উভয়েরই অতিশয় অন্তরঙ্গ বন্ধু—(এবং দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা সহ-কর্মী বিধুশেখর বা ক্ষিতিমোহনের মতো তো ছিল বটেই, বেশী বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না)—তাই অনেকেই তাঁকে শান্তিনিকেতন-সাবরমতী-সেতু নাম ধরে উল্লেখ করতেন।

এন্‌ড্রুজের ধর্ম ছিল দীননারায়ণের সেবা। ধর্মসঙ্গত রাজনৈতিক আন্দোলন-বিবর্তন সবর্দা দীনের উদ্দেশে নিয়োজিত হয়; তাই সাক্ষাৎ রাজ-নীতি এড়িয়ে চললেও এন্‌ড্রুজ গাঁধী-আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাই এই মহান আন্দোলনের ব্যাপারে ভারতবর্ষের দুই মনীষীর মধ্যে মতানৈক্য যে সর্বপ্রকারের ক্ষতিসাধন করতে পারে, সে বিষয়ে তিনি সচেতন হন; তিনি মন স্থির করলেন, পত্র-পত্রিকার মারফৎ উভয়ের মধ্যে যে বাদানুবাদ হচ্ছে, তার চেয়ে অনেক ভালো হয়, উভয়ে একসঙ্গে মিলিত হয়ে যদি ভাবের আদান-প্রদান করেন। বলা বাহুল্য গাঁধী-রবীন্দ্রনাথের সৌহার্দ্য জন্মায়, যখন গাঁধী এর কয়েক বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথের সহৃদয় আমন্ত্রণে আফ্রিকা ত্যাগ করে সদলবলে শান্তিনিকেতন আশ্রমে যোগ দেন ও স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে সেখানে ছয় মাস থাকেন (তখনো কলেজ-বিভাগ বা বিশ্ব-ভারতীর জন্ম হয় নি)।

---

১ গুরুচণ্ডালী নিয়ে আলোচনা একাধিক স্থলে দেখেছি। চলতি ভাষা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে এটাকে অমার্জনীয় অপরাধের অনুশাসনরূপে সম্মান করা হত—যদিও যে দ্বিজেন্দ্র-নাথকে কবি রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞরূপে সশ্রদ্ধ সম্মান জানাতেন, তিনি স্বয়ং সে অনুশাসন তাঁর কঠিনতম সংস্কৃত শব্দে পরিপূর্ণ বাংলা দর্শনগ্রন্থে পদে পদে লঙ্ঘন করতেন, এবং সকলকেই সে উপদেশ দিতেন। চলতি ভাষা চালু হওয়ার পর, পরলোকগমনের মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও লেখেন, গুরুচণ্ডালী এখন আর অপরাধ নয় (বাংলা-অলঙ্কারের পিনাল-কোড থেকে গুরুচণ্ডালী সরিয়ে দেওয়া হল—ধরনের অভিব্যক্তি)। অধীন দ্বিজেন্দ্রনাথের আদেশ বাল্যাবস্থা থেকেই মেনে নিয়েছে, যদ্যপি সে সদাই 'লড়াই শুরু হল' এবং 'যুদ্ধ আরম্ভ হল' তথা 'মোকদ্দমা শুরু হল' এবং 'তর্কবিতর্ক আরম্ভ হল এ'দুয়ে পার্থক্য মেনে চলেছে।

www.BanglaBook.org

এ আলোচনা হয় কলকাতায়, এবং এক এনড্রুজ ছাড়া সেখানে চতুর্থ ব্যক্তি ছিলেন না।

কিন্তু কবির মত চিত্রকরও শুধু যে নব নব সৃজন-কর্মে লিপ্ত থাকেন তাই নয় নব নব গোপন তত্ত্ব, সৌন্দর্য আবিষ্কার করে রসিকজনের সম্মুখে রাখতে চান। কবি রবির ভ্রাতুষ্পুত্র 'ছবি-রবি' অবন ঠাকুর তাই মনে মনে ভাবলেন, রবীন্দ্রনাথ ও গাঁধীর মত মনীষী এ দেশে নিত্যি জন্মায় না ; নিভৃতে এ দোঁহার মিলনের অত্যন্ত সামান্য কিছুটাও যদি না দেখতে পেলুম, তবে এ-জীবনে দেখলুমটা কি? কথাটা ঠিক ; হিমালয় আল্‌প্‌সে মিলন হয় না,—কিন্তু এ-মিলন তো তারো বড়ো।

উপযুক্ত তাবৎ কাহিনী আমি অন্যত্র সবিস্তর দিয়েছি বলে এস্থলে সংক্ষেপে সারি, কারণ অদ্যকার কীর্তন ভিন্ন। 'অবন ঠাকুর' চুপসে দরজার চাবির ফুটো দিয়ে এক লহমায় তাঁর স্থিরদৃষ্টিতে দেখে নিলেন ভিতরকার 'ছবিটি'। সেইটেই তিনি এঁকে পাঠিয়ে দিলেন শান্তিনিকেতনের কলাভবনে —যেখানে ঐ তিনজনের দুজনা, অর্থাৎ কবি ও এন্‌ড্রুজ স্থায়ীভাবে বাস করেন।

কিন্তু মূল কথায় ফিরে যাই—এটুকু সুধমাত্র এ-তিন মহাপুরুষের অন্তরঙ্গতা বোঝাবার জন্য পটভূমি নির্মাণ।

* * *

১৯৪২ খৃষ্টাব্দে (খুব সম্ভব) গ্রীষ্মকালে অকস্মাৎ মহাত্মাজী অবতীর্ণ হলেন বোম্বাইয়ের জুহুবীচে। যুদ্ধ এবং জনরবে ভারতবর্ষ তথা তাবৎ পৃথিবী তখন গমগম করছে। প্রায় সম্পূর্ণ পূর্ব ও উত্তর ইয়োরোপ জয় করার পর হিটলার তখন সদর্পে ককেশাসের তেল পানে ধাওয়া করবেন বা করেছেন—এমন সময় টলটলায়মান ইংরেজের চরম দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে ডমিনিয়ন বিয়ণ্ড দি সীজ-এর অন্যতম ভারতবর্ষ আরেকটা স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ করবে কি? এই ছিল তখন দেশবিদেশে সর্বমুখে একমাত্র প্রশ্ন।

এমন সময় গাঁধী নামলেন জুহুবীচে। এবং তার চেয়েও বিস্ময়জনক ব্যাপার :—যে গাঁধীকে আপাতদৃষ্টিতে সরল, ভালোমানুষ বলে মনে হয়, তিনি যে সাংবাদিকদের এড়াবার জন্য কত হুনুর-হেকমৎ রপ্ত করে বসে আছেন সে তত্ত্বটি হাড়ে হাড়ে বিলক্ষণ জানে ভুক্তভোগী সাংবাদিকরা—সেই গাঁধীই ডেকে পাঠিয়েছেন, নিজে যেচে, প্রেস-কানফারেন্‌স্! তিনি নাকি সব প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

এদিকে তিনি জুহুবীচে নেমেই খবর পাঠিয়েছেন বোম্বাইয়ের আশ্রমিক সঙ্ঘকে। তিনি রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনবেন।

বোম্বাইয়ে বিস্তর শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী আছে—তাঁদের প্রায় সবাই গুরুদেবের দুদশটা গান গাইতে পারে, আর মহারাষ্ট্রবাসী হলে তো কথাই নেই, তাঁরা গুরুদেবের কালোয়াতী গান পর্যন্ত গাইতে পারে, দুএকজন নিখুবাবু ঢঙে গুরুদেবের টপ্পা তক দখল করে বসে আছে। কিন্তু সব সময় সবাই তো আর বোম্বায়ে থাকে না। তবু ছিলেন সর্বাধিকারী স্বর্গত বচুভাই শুক্ল ; ইনি শান্তিনিকেতনে প্রচলিত—অর্থাৎ সেখানে দৈনন্দিন এবং পালপরবে গীত—সব কটার এবং আরো প্রচুর অচলিত সুর আপন বিরাট দিলরুবাতে

www.BanglaBook.org

বাজাতে পারতেন। তারপর ছিলেন পিনাকিন দ্বিবেদী, গোবর্ধন মপারা, সুশীলা আসর ইত্যাদি। আমিও ছিলুম বচুভাইয়ের অতিথিরূপে। কিন্তু সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কারণ আমার মত 'বেতালাকে' কাবু করতে পারেন এমন বেতাল-সিদ্ধ এখনো জন্মান নি!

আশ্রমিক সংঘ এবং অধিনায়করূপে বচুভাই পড়লেন দুশ্চিন্তায়। গাঁধীজী কোন্ কোন্ গান শুনতে চাইবেন, বা কেউ গাইলে শুনতে ভালোবাসবেন সে সম্বন্ধে কারোরই কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা বা আপন ধারণা নেই—বস্তুত শান্তিনিকেতনে বাসকালীন এবং বিশেষ করে সে-স্থল ছাড়ার এত যুগ পরেও যে, তাঁর রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ রয়েছে সে তত্ত্ব প্রাক্তন ছাত্রদের প্রায় কেউই জানতো না। অবশ্য অনেকেই জানতো 'জীবন যখন শুকায়ে যায়—' গানটি তাঁর বড়ই প্রিয় (এবং সেই কারণেই নিউমেনের 'লীড কাইনড্‌লি লাইট এমিড্‌স্‌ট দি এন্‌সারক্লিং গ্লুম')।

আমি বললুম, 'এটা তো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, গাঁধীজী যে-সময়টা আশ্রমে কাটান, ঠিক সেই সময়ে রচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতই পাবে পয়লা নম্বর—বা ফার্স্ট প্রেফারেন্‌স্, তারপর নিশ্চয়ই স্বদেশী গান (এখন যাকে গাল-ভরা নামে ডাকা হয় 'দেশাত্মবোধক সঙ্গীত'), তার পর মন্দিরে উপাসনার সময় যে কটি ব্রহ্মসঙ্গীত গাওয়া হয়। এর পরও আছে—কিন্তু অদ্দূর আমার এলেম যায় না, যেমন মনে করো গুরুদেব তাঁর আপন পছন্দের যে-সব গান বাছাই করে তাঁকে শুনিয়েছেন তার হদীস পাবো কোথায়! সবাই এক বাক্যে আমার বক্তব্য স্বীকার করে বললে, 'এই তিন দফেতে যে-সব গান পড়ে তারই সব কটা এত অল্প সময়ে কোরাসে তৈরি করা প্রায় অসম্ভব। অতএব এই নিয়েই উপস্থিত সন্তুষ্ট থাকা যাক।' আমি তখন স্কেল টি-স্কোয়ার সেট-স্কোয়ারসহ—কথার কথা কইছি—লেগে গেলুম জরিপ করতে, মহাত্মাজী যে-সময়টায় শান্তি-নিকেতনে ছিলেন ঠিক সেই সময়ে গুরুদেব কোন্ কোন্ গান রচেছিলেন (এস্থলে একটি ফরিয়াদ জানিয়ে রাখিঃ যাঁরাই গুরুদেব নিয়ে কোনো কাজ করতে চান, তাঁরাই চান, গুরুদেবের কবিতা যে রকম কালানুক্রমিক পাওয়া যায়, গানের বেলাও ঠিক সেই রকম হওয়া উচিত, বরঞ্চ বেশী উচিত। আমার এক মিত্র 'রবীন্দ্রনাথের ধর্ম' নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে এরই অভাবে দিশেহারা হয়ে এগুতে পারছেন না। তাঁর মূল প্রশ্ন, একটা বিশেষ সময়ের পর—মোটামুটি ১৯১৮—রবীন্দ্রনাথ কি একেবারেই আর কোন ধর্মসঙ্গীত রচনা করেন নি? করে থাকলে কটি?)? অবশেষে কষ্টেশ্রেষ্ঠে মোটামুটি একটি ফিরিস্তি তৈরি হল। বেশীর ভাগ গায়কই গুজরাতী; তাদের পছন্দের ধর্মসঙ্গীত—যেগুলো কারো না কারো ভালো করে জানা ছিল—সেগুলোও কোরাসে শিখে নেওয়া হল। সকলেরই এক ভরসা—গাঁধীজীর সুরজ্ঞান খুব একটা টনটনে নয়, মহারাষ্ট্রের মত গাঁধীর জন্মভূমি কাঠিওয়াড়-গুজরাতে গান-বাজনার প্রাচীন সর্বব্যাপী কোনো ঐতিহ্য নেই।

"শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর" শেষটায় এল। ওরা ধরে নিয়েছিল আমি সঙ্গে যাব। আমার এক কথা 'ক্ষেপেছ! আমি না পারি গাইতে, না জানি বাজাতে। আমাদ্বারা কোনোপ্রকারের শোভাবর্ধনই হবে না—"শোভা" জিনিসটাই গাঁধীজী আদৌ পছন্দ করেন না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

* * *

মহাত্মাজী বললেন, 'গাও!'

ওরা কাঁচুমাচু হয়ে বললে, 'কি গান...?'

'তোমাদের যা জানা আছে।'

এসব আমার শোনা কথা। তার উপর ইতিমধ্যে দীর্ঘকাল কেটে গিয়েছে। সঠিক মনে নেই, প্রাক্তনদল সক্কলের পয়লাই রঙের টেক্কা, অর্থাৎ 'জীবন যখন শুকায়ে যায়— মেরেছিল, না সেটাকে তাঁর আদেশের জন্য জীইয়ে রেখেছিল। কিন্তু মোদ্দা, তারা এক একটা গান শেষ হলে যখন থামে, তখন তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি জানান এবং আরো গাইবার ইঙ্গিত করেন। তারা দু'একবার চেষ্টা দিয়েছিল গাঁধীজীর আপন পছন্দ জানাবার জন্য—ফলোদয় হয় নি।

সর্বশেষে মহাত্মাজী দু একটি প্রশ্ন শুধোন। কেউ উত্তর দিতে পারে নি। মারাঠী-মপারা বাড়ি ফিরে তো আমাকে এই মারে কি তেই মারে। আমি থাকলে নাকি চটপট উত্তর দিয়ে দিতুম। আমি বললুম, 'এগুলোর উত্তর তো বচুভাইও জানে, তদুপরি সে ওয়াডওয়ান অর্থাৎ গাঁধীজীর মতই কাঠিওয়াড়ের লোক—গুজরাতী—না, খাস কাঠিওয়াড়িতেই উত্তর দিয়ে তাঁর জান ঠাণ্ডা করে দিতে পারতো!' সে নাকি নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল। 'আমি হতুম না, কি করে জানলে! ঐ সিংগির সামনে!'

কিন্তু এহ বাহ্য!

আসলে পূর্বোল্লিখিত প্রেস-কন্‌ফারেন্‌স্ গাঁধীজী ডাকিয়েছিলেন ঐ দিনই, ঐ সময়ই, ঐ স্থলেই।

এখন আমি যা নিবেদন করবো সেটা ঐ সময়কার খবরের কাগজ নিয়ে চেক্ অপ্ করে সন্দেহ-পিচেশ তথা গবেষক-পাঠক ধরে ফেলতে পারবেন, আমি কী "দারুণ" "গুল্‌মগীর"! আলংকারিকার্থে কিন্তু আমি "যদু" পতি বা "রাখাল" রাজা হওয়ার মত তাদের লক্ষাংশের একাংশ শক্তি ধরি নে বলে আমি নাচার ; বেচারার পক্ষে গুল্ মারাই একমাত্র চারাহ।

যতদূর মনে পড়ে সেই এণ্ডেমণ্ডে বিজড়িত ভারতের সর্বজাতের সাংবাদিকগণই সেদিন রবীন্দ্র-সঙ্গীত শোনবার সৌভাগ্য লাভ করেছিল।

গান শেষ হলে মহাত্মাজী ওঁদের বললেন, 'তোমাদের কি কি প্রশ্ন আছে, শুধোও!' আর যায় কোথায়! দুনিয়ার যত রকম প্রশ্ন ; আবার নূতন করে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হবে কি, এই কি তার জন্য উৎকৃষ্টতম ধুমোকা নয়—মিত্রপক্ষ চতুর্দিকে বেধড়ক মার খাচ্ছে, আরম্ভ হলে কি প্রকারে হবে, ট্যাক্‌স বন্ধ করে না নক্কা কোনো টেকনীকে, ১৯২০-এর মত ছাত্রদের ডাকা হবে কি না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

গাঁধীজী তাঁর চিরাচরিত ধৈর্যসহ উত্তর দিয়ে যেতে লাগলেন—যদ্যপি আমার মনের উপর তখনকার, অর্থাৎ পরের দিনের খবরের কাগজ পড়ার পর যে দাগ পড়েছিল সেটা বোধ হয় এই যে মোক্ষম প্রশ্নগুলো মহাত্মাজী এড়িয়ে গিয়েছিলেন। অবশ্য ঐ সময়ে ভবিষ্যতের তাবৎ প্ল্যান ফাঁস করে দেওয়া যে সম্বুদ্ধির কর্ম হত না, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

হঠাৎ মহাত্মাজী দু হাত তুলে প্রশ্নধারা নিরুদ্ধ করে বললেন, 'আমি বেনে। বেনে কাউকে কোনো জিনিস মুফতে দেয় না। আমিও খয়রাৎ করার

www.BanglaBook.org

জন্য তোমাদের ডাকি নি। রবীন্দ্র-সঙ্গীত তো শুনলে। এবার আমার কথা শোনো। পোয়েট গত হওয়ার পূর্বে (তখনো বোধ হয় এক বছর পূর্ণ হয় নি। আমাকে আদেশ করেন, আমাদের উভয়ের বন্ধু এন্‌ড্রুজের স্মৃতিরক্ষার্থে যা কর্তব্য তা যেন আমি আপন কাঁধে তুলে নি। এখন দেখতে পারছি, আসন্ন ভবিষ্যৎ বড়ই অনিশ্চিত। তাই আজই আমি "এনড্রুজ মেমোরিয়াল ফাণ্ড"এর জন্য অর্থসঞ্চয় আরম্ভ করলুম। দাও।'

মপারা রিপোর্ট দিতে গিয়ে আমায় বলেছিল, 'গাঁধীজী অনেকক্ষণ ধরে এনড্রুজ সম্বন্ধে বলেছিলেন, in a very touching manner। আর তার পর মহাত্মাজীর সামনে পড়তে লাগল, টাকা, পুরো মনিব্যাগ, গয়না, রিস্টওয়াচ, আংটি, কত কী! যেন বানের জলে ভেসে আসছে দুনিয়ার কুল্লে মূল্যবান জিনিস। অনেকে এমনই যথাসর্বস্ব দিয়ে ফেলেছিল যে, বোম্বায়ে ফেরার জন্য টিকিট কাটার পয়সা পর্যন্ত তাদের কাছে অবশিষ্ট ছিল না। কিন্তু জানেন তো, রেলও এখন আর পুরোপুরি ইংরেজের নয়। ভিলেপার্লে থেকে চার্চ গেট স্টেশন—সবাই জানে, কেন এদের টিকিট নেই।'

ফাণ্ডের টাকা যখন জমে উঠছে, তখন কে একজন বললে, 'মহাত্মাজী, এখন এসব কেন? স্বরাজ পাওয়ার পর এসব কাজ তো রাতারাতি হয়ে যাবে।'

আজ সত্যই আমার হাসিকান্নায় মেশানো চোখের জল নেমে আসে—এই ব্যক্তিটির ঐ মন্তব্যটির স্মরণে। তারই মত আমরা সবাই তখন ভাবতুম, ইংরেজই সর্ব নষ্টের মূল। বিহারে ভূমিকম্প হলে ইংরেজই দায়ী, মেদিনীপুরে সাগর জাগলে ওটা ঐ ইংরেজেরই দুষ্কর্ম! ইংরেজকে খেদিয়ে দিয়ে স্বাধীন হওয়া মাত্রই—

When we shall have attained liberty, all those will be mere trifles!

গাঁধীজী সঙ্গে সঙ্গে মোক্ষম গরম বড়া গলায় জবাব দেন, 'But Tagore did not wait to be born till India attained her liberty.'

পরাধীন ভারতে যদি কবি জন্ম নেন, তবে তাঁর সখার স্মৃতিরক্ষার ভার পরাধীন ভারতের স্কন্ধেই।

তাই বলছিলুম, হাসি পায়, কান্নাও পায়—তখন আমরা কী naif (প্রায় 'ন্যাকার' মত)-ই না ছিলুম, যে বিশ্বাস করতুম—স্বরাজ পাওয়ার পরই 'পাঁচ আঙুল ঘিয়ে' আর 'ডেগ-এর ভিতর গর্দান ঢুকিয়ে ভোজন'!

তাই কি রবীন্দ্রনাথ সাবধানবাণী বলেছিলেন, (উদ্ধৃতিতে ভুল থাকলে ক্ষমা চাইছি) 'একদিন (স্বরাজ লাভের পর) যেন না বলতে হয়, ইংরেজই ছিল ভালো!'

কিন্তু কোথায় গেল সেই 'এনড্রুজ ফাণ্ড' যার মেদ্দা টাকাটা তুলেছিলেন গাঁধীজী?

তা সেটা যেখানে যাক, যাক! দুঃখ এই সেই চিট বইয়ে এবং অন্যত্র 'এ্যান্‌ড্রুজ ফাণ্ডের' কথা উঠলে কেউ আর গাঁধীকে স্মরণ করে না, তিনি যে সেই সুদূর বোম্বায়ে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনিয়ে ফাণ্ডের গোড়াপত্তন করেছিলেন সেটা সবাই ভুলে গেছে!!

৫।২।৬৬

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ইজরায়েল বিশ্বের প্রবাদ-সত্য রূপে গণ্য হবে'

—বাইবেল

ঘরে ঢুকতেই বললেন, এদিক এসো। অসাধারণ পণ্ডিত লোক। আমি তাঁকে বড্ডই শ্রদ্ধা করি, বলতে কি, ভালবাসি। তিনিও আমাকে স্নেহ করেন। সত্যকার পণ্ডিত কখনোই মূর্খকে অবহেলা করে না।

ঘরে আর কেউ নেই। তবু তিনি ফিসফিস করে বললেন, 'তোমরা কাল বৌদ্ধধর্মের সৃষ্টিরহস্য নিয়ে আলোচনা করছিলে না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তা তোমার আটকাচ্ছিল কোথায়?'

'আজ্ঞে, আমি শুধাচ্ছিলুম আল্লা যদি না-ই থাকবেন তবে এই দুনিয়াটা পয়দা করলে কে? আপনারাও তো—'

বাধা দিয়ে বললেন, 'আমাদের কথা বাদ দাও...তোমার মুশকিলটা কোথায় সেইটে খুলে কও।'

'শরণঙ্করসাধু' হীনযানপন্থী বৌদ্ধঃ সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। তিনি বলছিলেন, সৃষ্টির আদিও নেই অন্তও নেই। অতএব সৃষ্টি-কর্তারও প্রয়োজন নেই। তারপর বললেন, যদি তর্কস্থলে ধরেও নেওয়া হয় সৃষ্টিকর্তা আছেন, তবুও তো শেষ সমস্যার সমাধান হয় না। প্রশ্ন উঠবে, সৃষ্টিকর্তাকে সৃষ্টি করলেন কে? শুনুন আজগুবী কথা! তারপর তিনি তাঁর গেরুয়া আলখাল্লার ভিতর থেকে নোটবুক বের করে আঁকলেন একটা চক্কর—সার্কল। বললেন এই সার্কলের যেমন কোনও জায়গায় আরম্ভ নেই, শেষও নেই, সৃষ্টিও হুবহু তেমনি। তারপর আপনি ঘরে ঢুকলেন। পাছে আপনাকে ডিস্টার্ব করা হয় তাই আমরা আরো খানিকক্ষণ ফিসফিস করে কথা বলার পর উনি চলে গেলেন।

ওরিয়েন্টাল সেমিনারি অর্থাৎ প্রাচ্য বিদ্যায়তন। তারই একটা কামরায় আমরা তিনজন কাজ করি। একজনের বিষয়বস্তু ইরানী ফাইয়াঁস-পর্সেলিন—বিশ্বকলাসৃষ্টিতে তাঁর স্থান। অন্যজন বাইবেলের ওল্ড-টেস্টামেন্টের হীব্রু পাঠের নয়া সম্পাদনা করেছেন। আর আমি—তা সে যাক্‌গে। দুজনাই বছর দশেক পূর্বে সর্বোত্তম শ্রেণীর ডক্টরেট নিয়েছেন; একজন আবার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

শুধোলেন, 'চক্কর এঁকে সাধু বললেন সৃষ্টি এরই মত আদি অন্তহীন। তা এতে আবার দুর্বোধ্য কি আছে? তবে হ্যাঁ, আরো সোজা করে বলা যেতে পারতো। আচ্ছা, স্কচদের বিশেষত্ব কি—অন্তত তাদের কোন্ বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিশ্বের লোক হাসিঠাট্টা করে?'

এক গাল হেসে বললুম, 'সে আর বলতে! কিপ্টেমী!'

'বিলক্ষণ! সেই গল্পটা জান তো—লণ্ডনের এক ইংরেজ কোম্পানি স্কট-ল্যাণ্ডের এবার্ডীন শহরে খুললে ট্রামওয়ে। হার্ডকিপ্ট স্কচরা ট্রাম চড়বে না কিছুতেই। কোম্পানি লাটে ওঠার উপক্রম। তখন লণ্ডন থেকে পাঠানো হল স্পেশালিস্ট—তাঁকে বের করতে হবে দাওয়াই, স্কচকে কি প্রকারে ট্রামে ঢোকানো যায়। তিনি এবার্ডীনে এসেই ট্রাম ভাড়া থ্রাপেন্স থেকে এক ঝটকায় এক

www.BanglaBook.org

পেনি কমিয়ে দিলেন টাপেন্স। পরের দিন তাঁর আপিসের সামনে মহাপ্রলয়ের ভিড়। তিনি তো ড্যাম গ্লাড—নিশ্চয়ই তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছে, ভাড়া কমিয়ে দেবার জন্য। ইয়াল্লা, তওবা, তওবা! এরা যে তাঁরই জানলা তাগ করে পচা ডিম হাজা টমাটো ছুঁড়ছে আর চীৎকার করছে, "কোত্থেকে এসেছে এই নচ্ছার আগে আমরা পায়ে হেঁটে, ট্রাম ভাড়ার তিন পেনি বাঁচাতে পারতুম, এখন কুল্লে দু'পেনি! নিকালো রাস্কেলকো এবাউট্‌ নিসে।" আচ্ছা, হলো। এবার বলো তো ইহুদিদের বৈশিষ্ট্য কি? পারলে না? আমিই বলছি, হুবহু একই গাধার এ-কান ও-কান। কিপ্টেমীতে।'

ইহুদিদের কিপ্টেমী সম্বন্ধে আমি কোনো গল্প জানি নে, অতখানি বে-খবর বেরসিক আমি নই, কিন্তু বিশেষ কারণে আমি চুপ করে রইলুম। সে-কারণ একটু পরে পাঠক নিজের থেকেই বুঝে যাবেন।

তিনি বলে যেতে লাগলেন, 'একবার এক ইহুদি আর স্কচে ঝগড়া লেগেছে, কে কতক্ষণ ধরে ডুবসাঁতার দিতে পারে—দু'জনা দুই সুইমিং পুলে কাজ করতো আর দুই পুলের মধ্যে ছিল উৎকট রেষারেষি। শেষ পর্যন্ত বাজি ধরা হল এক শিলিঙ। বাজে লোকের কৌতূহল এড়াবার জন্য তারা নদীর এক নিভৃত জায়গায় দিল ডুব।'

তিনি চুপ মারলেন, আমি ভাবলুম, ওস্তাদ কথকের মত তিনি পজ্‌ দিয়েছেন আমার মনের উপর গল্পটা কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে সেইটে দেখবার জন্য। কিন্তু কই? তা তো নয়। তিনি দেখি, পকেট থেকে ছুরি বের করে আপন মনে দিব্য পেনসিল কাটতে আরম্ভ করেছেন। তখন থাকতে না পেরে আমি শুধালুম, 'তারপর?'

উদাস সুরে বললেন, 'কি করে বলবো ভাই কও। দু'জনার কেউই তো উঠলো না জলের তলা থেকে।' তারপর হন্তদন্ত হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, বলতে ভুলে গিয়েছিলুম, ভাগ্যিস তারা বাজিটা পাকাপোক্ত করার জন্য তাদের এক উকীল বন্ধুর কাছে কাগজ-কলমে লিখিয়ে নিয়ে—অবশ্য সবকুছ মুফতমে—তারই জিম্মায় রেখে এসেছিল; নইলে শহরের লোক কস্মিনকালেও জানতে পেতো না, এ দুটো শান্ত, অজাতশত্রু লোক হঠাৎ ইহসংসার থেকে কি করে কপ্পুর হয়ে গেল। হুঁ! এক শিলিঙ—বাপ্‌রে! চাট্টিখানি কথা!'

'কিন্তু—'

'এর মধ্যে "কিন্তু" "but" "mais" 'aber' কিছুই নেই, ভাই। কিন্তু সেই যে, অন্তহীন চিরচক্রের দৃষ্টান্ত দিলেন সিংহলের মহাস্থবির, বলছিলুম কিনা, সেটা আরো সোজা করে বলা যেতে পারতো। তাই তোমাকে পয়লা বাজিয়ে নিলুম। তুমি ইহুদি স্কচ সম্বন্ধে চালু গল্পগুলোর খবর রাখো কিনা। সবাই বলে, ওরিয়েন্টালরা—এবং বিশেষ করে ইণ্ডিয়ানরা—নাকি সর্বক্ষণ মুখ গুমড়ো করে, নাসিকাগ্রে মনোনিবেশ করে আত্মচিন্তায় মগ্ন, রসকষের বালাই নেই। যতো সব! হ্যাঁ, অন্তহীন চিরচক্র সহজ করে বোঝাতে হলে বলতে হয় —স্কচ বিল শোধ করবে না আর পাওনাদার ইহুদিও তাকে ছাড়বে না। সে ধাওয়া করেছে স্কচের পেছনে। শহরটাও ছোট। তখন কি হয়? অন্তহীন চিরচক্র। এখনো যদি বুঝে না থাকো তবে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কোনো ইহুদির দোকানে এপ্রেন্টিসি করগে।'

www.BanglaBook.org

আমি বললুম, 'একটি কথা শুধোতে পারি—অপরাধ যদি না নেন, ব্যক্তিগত কথা।'

তিনি বললেন, 'মাই লাইফ ইজ এন ওপ্‌ন্‌ বুক। যা-খুশি শুধোতে পারো।'

'আচ্ছা, আপনি তো, বোধ হয় ইজরায়েলাইট—'

বাধা দিয়ে মৃদু হাসি হেসে বললেন, 'অত ভদ্রতা করে, অন্য লোক হলে বলতুম ভণ্ডামি করে, ইজরায়েলাইট না বলে য়ুডে (Jude=ইহুদি) বলতে পারো, তার চেয়েও অবজ্ঞাসূচক Jut বলতে পারো, এমন কি পাঁচজন জর্মন আড়ালে যে "ফীজার য়োট" (মোটামুটি, "ঘৃণ্য ইহুদির বাচ্চা") ব্যবহার করে সেও করতে পারো। আমি নির্বিকার।'

আমি জিভ কেটে বললুম, 'ছি ছি, কি যে বলেন—'

ফের বাধা দিয়ে বললেন, 'শোনো, ভদ্র! তুমি কি বললে, কি না বললে কিচ্ছুটি এসে যায় না। এই দেখ আমার নাকটা—কি রকম বেঁকে গিয়ে হুকের মত ঝুলে আছে, তারপর আমার কান দু'খানা—মাথার সঙ্গে লেপটে না গিয়ে একটা ডান দিকে আরেকটা বাঁ দিকে যেন উড়ে যাবার পণ করেছে, দাঁড়াও, তোমাদের দেশের হাতীর বোধ হয় এ রকম কান হয়, তারপর আমার চুল—কানের কাছে কি রকম যেন কোঁকড়া কোঁকড়া, নিগ্রোদের মত, আমাদের মিশরবাসের সামান্য অবশিষ্ট—'

'থাক না। প্লীজ।'

একটু হাসলেন, তাতে কোনো তিক্ততা ছিল না। বললেন, 'এক ফার্লং দূরের থেকে লোক চিনতে পারে, ঐ আরেক ব্যাটা ইহুদি আসছে! তুমি ইজরায়েলাইট বললে না য়ুডে বললে তাতে কি যায় আসে? তা সে যাক্‌ গে। তুমি কি যেন শুধোচ্ছিলে!'

'আপনি তো ইহুদি—'

'বলে ইহুদি! রীতিমত খানদানী মনিষ্যি আমি। কেন, নাম থেকে বুঝতে পারছো না? তোমাদের কুরান শরীফেও যে প্রফেট ইয়াকুবের (জেকব্‌) উল্লেখ আছে তাঁর তৃতীয় পুত্রের নাম লেভি। কিংবা বাইবেলের প্রথম অধ্যায় জেনেসিসেও পাবে এ-গোষ্ঠীর খবর। কিন্তু থাক্‌, প্রপিতামহের শুকনো হাড় চিবিয়ে বেঁচে থাকা যায় না। তবে এ-কথা ঠিক, আমাদের পরিবারের বংশানুক্রমে ইহুদি ধর্ম ও হীব্রু সাহিত্যের চর্চা আছে।'

'তাহলে আপনি ইহুদিদের কঞ্জুসী নিয়ে, আপন চেহারার ইহুদিলক্ষণ নিয়ে অত ঠাট্টা-মস্করা করেন কি করে?'

মিটমিট করে হেসে বললেন, 'কেন, শোন নি, স্কচদের সম্বন্ধে যে সব নূতন নূতন গল্প বেরোয় তার অধিকাংশের জন্মস্থল এডিনবরা, জনক স্কচরা স্বয়ং? তত্ত্বটার সত্যি মিথ্যে জানি নে, কিন্তু ইহুদির কঞ্জুসী, সে নোংরা—স্নান করে না, যে-দেশে বাস করে সেটাকে মাতৃভূমিরূপে স্বীকার করে না, আরো কত কী—এসব নিয়ে যে-সব গল্প আছে তার একটা বিরাট ভাণ্ডার আছে আমার কাছে। পেয়েছি উত্তরাধিকারসূত্রে ঠাকুর্দার কাছ থেকে এবং এর অধিকাংশই ইহুদিদের তৈরি—কোনো সন্দেহ নেই সে-বিষয়ে। বাবার এসবেতে শখ নেই। তিনি পড়ে আছেন হিব্রুশাস্ত্র নিয়ে আর অবসর সময়ে ঐ একই

www.BanglaBook.org

অভিনিবেশ, সহকারে, জর্মন সাহিত্যচর্চা। কারো সঙ্গে মেশেন না বড় একটা, কিন্তু তোমাকে যতটুকু চিনতে পেরেছি তার থেকে মনে হয়, তোমাকে বাড়ি নিয়ে গেলে তিনি খুশী হবেন। প্রাণভরে তাঁর কাছ থেকে জর্মন সাহিত্যের খুঁটিনাটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বের করতে পারবে। আসবে একদিন ডিনারে? বেশ। মাকে শুধিয়ে দিন ঠিক করে তোমাকে বলবো।'

'আচ্ছা, বলুন তো, এদেশে নাকি একটা পোলিটিকাল পার্টি দিন দিন শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে, আর তারা নাকি নির্বিচারে সব ইহুদিদের এ দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে চায়—যারা পাঁচশ' সাতশ' বছর ধরে জর্মানিতে আছে তাদেরও, যারা এক বর্ণ হীব্রু জানে না, সিনাগগে যায় না, নাস্তিক্যবাদের পক্ষ সমর্থন করে প্রামাণিক গ্রন্থ লিখেছে তাদেরও। দোষটা কি ওদের?'

এই তার মুখ একটুখানি গম্ভীর হল। সেটা যেন মুছে ফেলে মুচকি হেসে বললেন, 'এ তো কিছু নূতন নয়। বাইবেলের "এস্টার" পুস্তিকা পড়েছ?'

আমি অভিমানের সুরে বললুম, 'আমি অগা। কিন্তু এস্টার পড়ি নি, এ-সন্দেহ কেন করছেন? তবে হ্যাঁ, ওল্ড-টেস্টামেন্ট পড়া উচিত, তারই নির্মাতা কোনো ইহুদি রাব্বির কাছ থেকে। আমি পড়েছি খৃস্টান—তাও লুথেরীয় অর্থাৎ কিনা প্রটেস্টান্ট্—পাদ্রির কাছে। ওনরা তো এস্টারের ঐতিহাসিকতায় আদৌ বিশ্বাস করেন না।'

'সে কথা পরে হবে। উপস্থিত অন্তত এটুকু মেনে নিতে পারো, সেখানে যে চিন্তাধারা প্রকাশ পেয়েছে তার অনেকখানি খাঁটি সত্য—তা সে যার মুখ দিয়েই বলানো হয়ে থাক না কেন এবং ইরানের রাজা গ্রীস-মিশর-বিজয়ী Xerxes ইহুদি-বালা এস্টারকে বিয়ে করে থাকুন, আর না-ই করে থাকুন, সেখানে Xerxes (বাইবেলের 'অহস্‌ভেরুস')-এর মন্ত্রী তাঁকে একদিন বললেন, "মহারাজের বিশাল সাম্রাজ্যে এক শ্রেণীর লোক সর্বদাই পাওয়া যায় (ইহুদি) যাদের আইনকানুন অন্য সব জাতদের থেকে ভিন্ন, এমন কি রাজাদেশও তারা মানে না অতএব এক বিশেষ দিনে এদের সবংশে নির্বংশ করা হোক।"... তখনও প্রভু যীশুর জন্ম হয় নি, খৃস্টধর্মের সঙ্গে বৈরীভাবের প্রশ্নই ওঠে না, আর ঐ যে নয়া পলিটিকাল পার্টির কথা বলছিলে, যারা জাতে অ্যারিয়ান—তাদের ভিতর আবার নীল চোখ, কুণ্ড চুল ওলা সর্বশ্রেষ্ঠ নর্ডিক জাত সম্বন্ধে প্রচার করতে গিয়ে তারা পিঠপিঠ বলে ইহুদিরা মানুষ পর্যায়ের নিম্নে (untermensch=underman)! সে পার্টি তো পশুদিনের—নিতান্ত শিশু। তা সে যাক্ গে—এই আড়াই হাজার বছরের ইতিহাস জেনে তোমার যে কি লাভ হবে জানি নে। তোমাদের দেশে—'

'হালে আমাদের দেশে ইহুদিরা এসেছে ইয়োরোপ থেকে। তার বহু শতাব্দী পূর্বে ঝড়ের মারে একখানা নৌকায় করে সাতজন পুরুষ আর সাতজন স্ত্রীলোক এসে পৌঁছয় বোম্বাইয়ের ত্রিশ মাইল দক্ষিণে, অধুনালুপ্ত চেমুল বন্দরের কাছে[১]। শাস্ত্রাদি সব লোপ পায় বলে তাঁকে এদের ইহুদি পরিচয়

১ মারাঠীতে 'চ' অক্ষরের উচ্চারণ 'ৎস'-এর মত। তাই টলেমি এ বন্দরকে তিমুল্লা, সিমুল্লা দুই উচ্চারণেই লিখেছেন। চিৎপাবন ব্রাহ্মণদের (টিলক, গোখলে ও যদি বেয়াদপি মাফ করেন তবে উল্লেখ করি, অধীনের অধুনা প্রকাশিত 'দু-হারা' পুস্তকের চরিত্র কাণে)

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পায় নি ; শুধু শনিবারে এরা বিশ্রাম নিত বলে (ইহুদির সাব্বাৎ) এবং তেলীর ব্যবসা করতো বলে (বোধ হয় মধ্য-প্রাচ্যের অলিভ তেল তৈরির কায়দা এরা তিল-সর্ষের উপর চালায়) এদের নাম হয়েছিল "শনিবার-তেলী"। একশ' বছরও বোধ হয় হয় নি, তর্কাতীত সিদ্ধান্ত হয়েছে, এরা জাত-ইহুদি। কিন্তু এদের পিছনে তো কেউ কখনো লাগে নি—এস্টার কেতাবের পাইকিরি কচু কাটার নৃশংস প্রস্তাব কহাঁসে কঁহা!'

'জানি তাই বলছিলুম, তোমার কি লাভ? আর এদেশের আর্যেরা বলেন, ইহুদি লাভ, টাকা, সোনারুপো ভিন্ন অন্য চিন্তা অন্য বস্তু বোঝে না। রুপোর কথাই যদি উঠলো তবে একটি ইহুদি কথিকা—কঞ্জুসীবাবদ—ঠিক পপুলার গল্প নয়, হাফশাস্ত্র বাক্যের মত বলি,—শ্রবণ করো, এবং তারপর—'

ইঙ্গিত বুঝে বললুম, 'যাচ্ছি আপন টেবিলে হীব্রু ব্যাকরণ কণ্ঠস্থ করতে।'

ব্যাগ খুলে একটা আপেল বের করে এগিয়ে বললেন, 'একদা জনৈক অর্থ-পিচেশ মজ্জা-কিপটে কোটিপতি—কখনো কানা কড়িটি দান করেছে এ কথা তার কোনো হাতই জানে না—এসেছে এক রাব্বির কাছে। জানলার কাছে নিয়ে গিয়ে রাব্বি তাকে বললেন, "বাইরের দিকে তাকিয়ে আমায় বলো, কি দেখতে পাচ্ছো।"

ধনী বললেন, "লোকজন—বিস্তর মানুষ।"

রাব্বি বললেন, "উত্তম প্রস্তাব।" তারপর একটা আয়নার সামনে তাকে দাঁড় করিয়ে শুধোলেন, "এবারে কি দেখছ?"

"আমি নিজেকে দেখতে পাচ্ছি—" বললে কিপটে।

অনেকেরই নীল চোখ, কটা চুল; এঁদের ভিতরেও কিংবদন্তী, এঁরাও ঝড়ের মারে কোঁকণ অঞ্চলে পৌঁছন।

বরদার সয়াজীরাও যেরকম রমেশ, অরবিন্দ, আম্বেডকরকে পৃষ্ঠপোষকতা দেন, ঠিক তেমনি এই সাত স্ত্রীপুরুষের বংশধর পণ্ডিত কাহিম্‌করকে বোম্বাই থেকে ধরে এনে বরদা হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত করেন। ভারতবর্ষের এঁরা প্রাচীনতম ইহুদি। এঁরা ইয়োরোপীয় বহু ইহুদির ন্যায় 'ইহুদি' শব্দটাকে অত্যন্ত অপছন্দ করেন এবং নিজেদের 'বেনে-ইজরায়েল' [বেনে—আরবী বিন—ইবন=পুত্র; ইবন্ বৎতুতা তুলনীয়]='ইজরায়েল-সন্তান' রূপে পরিচয় দেন। আমার পরম সৌভাগ্য বরদাবাসকালীন এই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা হয়। এই মাটির মানুষটির যৎপরোনাস্তি অনাড়ম্বরে প্রকাশিত বেনে-ইজরায়েল' পুস্তিকা ইয়োরোপীয় পণ্ডিতসমাজে, বিশেষ করে রাব্বিদের ভিতর যেন টর্পেডোর মত পড়ে। বস্তুত তারপর যে যা লিখেছেন বিশেষ করে ভিন্ন ভিন্ন এনসাইক্লোপিডিয়ায়—তার বেশীর ভাগ জজ কাহিম্‌করের কাছ থেকে নেওয়া। সপ্রশংস কৃতজ্ঞতা সহ। বরদার স্থিতির ইহুদি ছিলেন জর্মন। এ-লেখনের ডঃ লেভির মত, ডঃ কোন্‌-ভীনার ('কোন-ভীনারের মা' পশ্য—পঞ্চতন্ত্র, ১ম)। —ইয়োরোপীয় ইহুদি ও কাহিম্‌করের কোঁকণী ইহুদিদের পাল পরবের ক্যালেণ্ডার ভিন্ন ভিন্ন—আল্লাকে বে-শুমায় শোকরিয়া। আমি কখনো রাব্বি জজ সাহেবকে নিয়ে কোন্‌-ভীনারের গৃহে, কখনো বা কোন্‌-ভীনারকে নিয়ে জজের বাড়িতে বহু বিচিত্র বহুবান্ন ভক্ষণ করে—একই পরব দু'-দুবার যথা গোস্বামী মতে ইত্যাদি পালন করে, ধর্ম রক্ষা করতুম। বেনে-ইজরায়েলদের সম্বন্ধে আমার যেটুকু সামান্য জ্ঞানগম্যি সেটুকু সমুচয় জজের খয়রাৎ।

www.BanglaBook.org

"ততোধিক উত্তম প্রস্তাব"—বললেন রাব্বি, "এইবারে শোনো, বৎস, কান পেতে মন দিয়ে। জানলার শার্সি কাঁচের তৈরি, আয়নাও কাঁচের তৈরি—তফাৎ কি? আয়নার পিছনে রয়েছে অতিশয়, হাল্কার চেয়ে হাল্কা সামান্য একটু রুপোর প্রলেপ—ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। কিন্তু বৎস, যেই না এল সামান্যতম রুপো, অমনি তুমি আর অন্য মানুষকে দেখতে পাও না, দেখতে পাও শুধু নিজেকে।[২]

২৩।৪।৬৬

এমেচার ভার্সস স্পেশালিস্ট

সব ব্যাপারেই আজকাল স্পেশালিস্ট। সেদিন মার্কিন মুল্লুকে এক স্পেশালিস্টই আবিষ্কার করেন যে শোভাযাত্রা, বয়কট বা ধর্মঘটে যারা কালো ঝাণ্ডা তুলে হই হই করে, তাদের অনেকেই ভাড়াটে। এ তত্ত্ব আমাদের কাছে নূতন নয়; দিল্লিতে থাকাকালীন স্বর্গত অশ্বিনী গুপ্ত আমাকে দিল্লিতে যে 'হাঙার স্ট্রাইকে'র জন্য প্রতিষ্ঠান আছে, যিনি হাঙার স্ট্রাইক করবেন তাঁর জন্য শামিয়ানা, তাকিয়া-বালিশ, নির্জলা না হলে নিম্বুপানি—তদভাবে জিন্ (যদি তিনি মদ্যপ হন), কারণ বলতে গেলে একমাত্র জিনই সহজলভ্য কড়া ড্রিঙ্কের ভিতর জলের রঙ ধরে, আহারাদি, হ্যাঁ, আহারাদিই বলছি কারণ লুকিয়ে লুকিয়ে হাঙার স্ট্রাইকার যদি খেতে চান তবে গভীর রাত্রে তার সুব্যবস্থা—সেদিকে আমার ভোঁতা দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এবং যিনি আজো এ-প্রতিষ্ঠানটি চালিয়ে যাচ্ছেন, তিনি মার্কিনী স্পেশালিস্ট নন, নিতান্ত দিশী মাল—এবং সর্বোপরি তিনি 'এমেচার'!

এসব তো মস্করার কথা—যদিও দুটোই ডাহা 'ইমানসে' সত্য। তবে দিল্লির প্রতিষ্ঠানটি নাকি 'সদাচার কদাচারে'র উৎপাতে এদানিং বড়ই উৎপীড়িত ('তংগ্ আ গয়ে'); তার অর্থ অবশ্য এ-নয় যে 'হাঙার স্ট্রাইক' করার কারণের কিংবা/এবং অকারণের অজুহাত অছিলার অভাব ঘটেছে কিংবা 'হাঙার-এর' হাঙরদের ক্ষুধা নিবৃত্তি ঘটেছে—আসল কারণ ওটা নাকি রেশন্ড হয়ে গিয়েছে,

---

২ এ লেখনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও আমার অন্তরঙ্গ পাঠকদের না জানিয়ে কিছুতেই থাকতে পারলুম না যে ২৬ মার্চ (১৯৬৬) সন্ধ্যেবেলা প্যারিস বেতার থেকে ইন্দিরাজীর ফরাসীতে প্রদত্ত মঁসিয়ে দ্য গলের অভ্যর্থনার প্রত্যুত্তরের রেকর্ডিং। অনবদ্য রিসেপশনে—কলকাতা 'খ'-য়ের চেয়ে কোটিগুণে শ্রেয়। ইন্দিরাজীর ফরাসী উচ্চারণ অতি সুন্দর, পরিষ্কার। অনভ্যাসবশত মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছিলেন বটে, কিন্তু উচ্চারণে বিদেশী আড় প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। যুদ্ধের সময় আমি চার্চিলের ফরাসী ভাষণ বেতারে শুনেছি। ইংরেজীর জোরালো একসেন্ট দ্বারা স্যান্ডেপৃষ্ঠে বাঁধা ফরাসী উচ্চারণ। দন্তত-মুখ খিঁচিয়ে, বেতার-যন্ত্রে কান সেঁটে না শুনলে মনে হবে, গাঁক গাঁক করে ইংরেজ সাবলটর্ন কুচকাওয়াজের 'হুকুমদার' ঝাড়ছে। ফরাসীতে আনুনাসিকে ছয়লাপ। ইংরেজের কাছে সে বহু গোমাংস। অতএব বাংলার 'চাঁদ' যেন ইংরেজের মুখে 'চ্যানড্' হয়ে বেরুচ্ছিল। ইন্দিরাজীর ফরাসী উচ্চারণ চার্চিলের চেয়ে ইনফিনিটি পার্সেন্ট শ্রেয়।

www.BanglaBook.org

'অর্থাৎ লুকিয়ে হাঙার স্ট্রাইক', 'ফাস্ট আন্‌টু ডেথ এসব করতে হলে সেগুলো এখন করবেন সরকার স্বয়ং! আনাড়ি এমেচারদের হাতে আর এ-সব টপ প্রায়োরিটির বস্তু ছেড়ে দেওয়া যায় না। দেশ-বিদেশে বড্ড বেইজ্জতী হয়। আইরল্যাণ্ডের কে যেন ম্যাকসুইনি না কি যেন নাম সে নাকি বাষট্টি বা বিরানব্বই দিন নাগাড়ে উপোস মেরেছিল—এমতাবস্থায় ভারত যদি বাহান্ন দিনের রেকর্ড দেখায় তবে সেটা হবে সত্যই 'শরম্‌কী—' থুড়ি 'লজ্জাকী, ঔর আফসোস—' থুড়ি পশ্চাত্তাপকী বাৎ!

তৎসত্ত্বেও এমেচারকে ঠেকানো যায় না—বারট্রাণ্ড রাসলের মত নিরহংকার লোক পর্যন্তও চেষ্টা দিয়ে হার মেনেছেন।[১] স্বয়ং রবি ঠাকুর এই এমেচারি কর্মে বড্ডই সুখ পেতেন। আমি তামা-তুলসী স্পর্শ করে একশ' বার কিরে কাটতে রাজী আছি, তাঁকে মধ্যম শ্রেণীর হোমিওপ্যাথ ডাক্তার বললে তিনি সেটাকে কবিতায় নোবেল প্রাইজ পাওয়ার চেয়ে লক্ষ গুণে শ্লাঘনীয় বলে মনে করতেন। ঠিক তেমনি স্পেশালিস্ট সত্যেন বোস তাঁকে দিলেন টুইয়ে—বিজ্ঞান শিখতে নয়, সেও না হয় বুঝি—শেখাতে! অর্থাৎ 'মেস্টারি' করতে। তাহলে পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন। বাজারে যেগুলো মেলে সেগুলো লিখেছেন বটে বিশেজ্ঞরা—একশ' বার মানি—কিন্তু যে বাঙলা ভাষায় লিখেছেন সেটা, ওই যে ফরাসীতে বলে, 'ইল্‌জ এক্সিভ ফ্রাঁসে কম্‌লে ভাশ্‌ এস্‌পানিয়োল'—তেনারা ফরাসী লেখেন স্প্যানিশ গাইয়ের মত।[২] রবি ঠাকুর আর যা করুন, তাঁর বাঙলাটা অন্তত বোধগম্য হবে। থাক না দু-পাঁচটা ভুল এদিক ওদিক। সেগুলো মেরামত করার জন্য তো ঐ হোথায় সত্যেন বোস বসে।

যৌবনে রবীন্দ্রনাথ একদিন শব্দতত্ত্ব নিয়ে তর্কাতর্কির দায়ে মজে যান।

---

১ এ বাবদে তাঁর বিদকুটে রায়ঃ সর্ব পণ্ডিত যখন কোনো তত্ত্ব এক বাক্যে স্বীকার করে নেন, তখন তুমি এমেচার সেখানে ফপরদালালী করতে যেয়ো না। আর যেখানে তাঁরাই একমত হতে পারছেন না সেখানে তুমি নাক গলাতে যাও কোন দুঃসাহসে? এর বিগলিতার্থ তুমি এমেচার ঠোঁট দুটি সেলাই করে বসে থাকো। এমন কি কেউ যদি বলে, Fine Weather—eh? তুমি হ্যাঁ না বলতে পারবে না। তুমি ওয়েদারের জানো কি? প্রথম গ্রীনিজকে শুধোবে আবহাওয়ার দফতরে। তাহা যদি বলে 'ফাউল' তবে ফাউল—তা তুমি যেখান থেকে কথা বলছো সেখানে থাক না মলয় পবন আর সূর্যাস্তের লালিমায় রঙিন গোলাপী আকাশ! এস্তেক তোমার নাম যদি 'অতুল' হয়, তবে তোমার বিপদ প্রত্যাসন্ন। শিশির ভাদুড়ী বলতেন অ (ঘর-এ যে 'অ' উচ্চারণ), আর রবি ঠাকুর বলতেন 'ওতুল'—কিন্তু তিনিও আবার 'ওতুলনীয়' না বলে বলতেন 'অতুলনীয়'। অর্থাৎ বারট্রাণ্ড রাসলের অনুশাসন মানলে তোমাকে নাম বদলে 'মাকাল-টাকাল' কিছু একটা 'দশদিশি নিরুপমা' নাম রাখতে হবে।

২ আমার টায়-টায় মনে নেই তবে রাজশেখর লেখেন, 'নেত্রজনের উপস্থিতিতে অসিতলীনের উপর কুলহরনীর প্রতিক্রিয়া' শুনে মনে হয় সকলের সজাগ দৃষ্টির সামনে (এখানে পাঠক আমার তরফ থেকে একটা ভদ্রজনোচিত গলাখাঁকরি অনুমান করে নেবেন! ধন্যবাদ!) কোনো বেহেড্‌ বেল্লেল্লাপনা। উহুঁ, আপনার পাপ মনে, পাঠক, আপনার পাপ মতি। ওর অর্থ হচ্ছে—আবার বলছি টায়-টায় মনে নেই—The reaction of chlorine (কুলহরনীর) on acitylene (অসিতলীন) where nitrogen (নেত্রজন) is present.

www.BanglaBook.org

বৃদ্ধ বয়সে—বোধ হয় সুনীতিবাবু এবং/কিংবা গোসাঁইজীর প্ররোচনায়—তাবৎ বাঙলা ভাষাটা নিয়ে খুব একচোট তলওয়ার খেলা দেখিয়ে দিলেন। আহা সে কী স্বচ্ছ সুন্দর তরল ভাষা—যেন বোতল থেকে তেল ঢালা হচ্ছে। কে বলবে, বিষয়বস্তু নিরস শব্দতত্ত্ব—হুস্ হুস্ করে পাতার পর পাতা সিনেমার ডেলি ক্যালেণ্ডারের পাতার পর পাতা ওড়ার মত পেরিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দুম করে সম্বিতে ফিরে আসবেন। এমেচার আর্টিস্ট যেন লাজুক হাসি হেসে ঘন ঘন করতালির মধ্যিখানে শেষ বক্তব্য নিবেদন করছেন। কি বলছেন? বলছেন, তিনি শব্দতাত্ত্বিক নন—নিতান্ত এমেচার—তাই খুব সম্ভব হেথা হোথা বিস্তর গলদ থেকে যাবে।

তারপর তিনি যে মুষ্টিযোগের শরণ নিয়েছেন সেইটে তিনি কালিদাসের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন। সেটা তাঁর শক্তি (fort-ও বটে, দুর্বলতাও যদি অপরাধ না নেন—বটে, কিন্তু এস্থলেও তিনি যে তুলনাটি ব্যবহার করেছেন সেটি উপমা কালিদাসসাকেও হার মানায়। তিনি বলছেন, 'কোনো কোনো বিখ্যাত রূপশিল্পী শরীরতত্ত্বের যথাতথ্যে ভুল করেও চিত্রকলায় প্রশংশিত হয়েছেন, (যেমন সেজানের ওয়েস্ট কোট-পরা ছোকরাটির হাত আজানুলম্বিত না বলে আগুল্‌ফ-লম্বিত বললেই ঠিক হয়—কিন্তু তৎসত্ত্বেও ছবিটি রসে ভর্তি—যাকে আজকের দিনে 'রসোত্তীর্ণ' বলা হয়।) ঠিক তেমনি কবির ভাষা সম্বন্ধে এ-বইয়ে দু-পাঁচটা ভুল বা অর্ধসত্য পরিবেশিত হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু এসব ভুল মেনে নিয়েও দেখা যায় এরকম তুলনাহীন প্রবন্ধ হয় না। কারণ তথ্য-পরিবেশনে অসম্পূর্ণতা থাক আর নাই থাক, সবসুদ্ধ মিলিয়ে প্রবন্ধটি বাঙলা ব্যাকরণ (খাঁটি বাঙলা ব্যাকরণ—বাঙলার ছদ্মবেশ পরে সংস্কৃত ব্যাকরণ নয়।) এবং খাঁটি বাঙলা অলঙ্কার নিয়ে এক অভূতপূর্ব রচনা। যেমন তিনি বলছেন, চলতি বাঙলাতে গুরুচণ্ডালী এখন আর দোষের মধ্যে গণ্য নয়।

ঠিক এই জিনিসটেই আমরা অন্যান্য সাহিত্যিকের কাছে প্রত্যাশা করি। কারণ সাহিত্যিকের সঙ্গে ভাষার যে পরিচয় হয় সেটা আদৌ শব্দতাত্ত্বিক বা ভাষাতাত্ত্বিকের মত নয়। সে ভাষা ব্যবহার করে নূতন নূতন সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে। তাই তার ভাষা সদা পরিবর্তনশীল। অত্যুত্তম গ্রন্থ লিখে ভাষাবাবদে আপামর জনসাধারণ তথা বৈয়াকরণিকের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেলেও লেখক তার পরবর্তী পুস্তকে সেই অনুমোদিত ভাষার পুনরাবৃত্তি করতে চায় না; রবীন্দ্রনাথের তুলনায়, আপনার মালের রিসীভার অব স্টোলেন প্রপার্টি হতে চায় না। তাই তাকে প্রতিদিন নিত্য নবীন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং সেখানে সে কোনো বৈয়াকরণিক, কোনো শব্দতাত্ত্বিকের সাহায্য পায় না। তাই, প্রাচীন লেখক—যখন নূতন শব্দভাণ্ডার বচনভঙ্গী নিয়ে পুনরায় একখানা সার্থক গ্রন্থ লেখেন, তখন সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও শ্রীবৃদ্ধি হয়। এ কর্ম শব্দতাত্ত্বিক করতে পারেন না—অবশ্য তিনি যদি সাহিত্যিকও হন ও তাঁর তত্ত্বগ্রন্থখানি সাহিত্যের পর্যায়ে তুলতে পারেন তবে অন্য কথা।

তাই ভাষার নব নব রূপ দেখাবার জন্য সাহিত্যিককেও এমেচারি শব্দতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে হয়।

এবং শুধু সাহিত্যিকই না, যে-ব্যক্তিই জ্ঞান-বিজ্ঞান বা অন্য যে-কোনো

www.BanglaBook.org

চিন্ময় বিষয় নিয়ে চিন্তা করেন, আলোচনা করেন, তাঁকেই কিছু-না-কিছু শব্দতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে হয়। এই তত্ত্বটি আজ হঠাৎ আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে ফুটে উঠলো, মুসলমানদের সন্ত ইমাম আবু হানীফার বিরাট ন'ভলুমী গ্রন্থের একটি জায়গা পড়ে।

ইমাম আবু হানীফা শিষ্যসমাবৃত হয়ে প্রতি প্রাতে বসতেন মুসলিম ধর্ম আলোচনায়। তাঁর রায় লিখে রাখা হত তো বটেই, তাঁর প্রধান শিষ্যদের কেউ ভিন্ন রায় (মিনিট অব ডিসেন্ট) প্রকাশ করলে সেটিও সযত্নে পাশাপাশি লিখে রাখা হত।

একদা প্রশ্ন উঠলো, 'নগরে জুম্মার নমাজ অবশ্য পালনীয় : কিন্তু গ্রামে জুম্মার নমাজ হয় না'—এ-আদেশ শিরোধার্য করবো কিনা? ইমাম সাহেব, বললেন, 'শিরোধার্য করা, না-করার পূর্বে প্রথম দেখতে হবে "নগর" বলে কাকে, আর "গ্রাম" বলে কাকে?' জনৈক শিষ্য বললেন, 'অভিধান দেখলেই হয়।' এবারে ইমাম যা বললেন, সেটি মোক্ষম তত্ত্বকথা—সর্বভাষাতে সর্বকালে প্রযোজ্য। তিনি বললেন, 'কোষকার দেবে সাধারণ প্রচলিত অর্থ। পক্ষান্তরে আমরা ধর্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন করে জনসাধারণের জন্য অনুশাসন প্রচার করি (অর্থাৎ আমরা theologians); থিওলজিয়ানের দৃষ্টিবিন্দু থেকে কোন্‌টা শহর—যেখানে জুম্মার নমাজ সিদ্ধ—এবং কোন্‌টা গ্রাম যেখানে জুম্মার নমাজ অসিদ্ধ—তার শেষ বিচার তো আমাদের হাতে।'

অত্যন্ত খাঁটি কথা। যেমন ধরুন গরুর বাথান, যেখানে রাখালরা শীতকালে থাকে। সেটাকে হয়তো গ্রামের পর্যায়েও ফেলা যাবে না। কিংবা উত্তম মরুদ্যান পেয়ে হাজার লোকের কাফেলা (ক্যারাভান) কয়েক দিন বিশ্রাম করলো। সেখানে জুম্মার নামাজ সিদ্ধ না অসিদ্ধ?

ইমাম সাহেব বলছেন, থিয়োলজিকাল অর্থে কোন্‌টা গ্রাম, আর কোন্‌টা শহর, তার সংজ্ঞার (definition-এর) জন্য কোষকার তো আসবে আমাদেরই কাছে।

ঠিক তেমনি আইনজ্ঞ পণ্ডিতরা সংজ্ঞা দেন কোন্‌টা crime, আর কোন্‌টাই বা tort; তবে তো কোষকার সেটা তার অভিধানে লিপিবদ্ধ করে। সে তো আর বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যেকটিতে বিশেষজ্ঞ নয় যে নিছক আপন বুদ্ধির উপর নির্ভর করে প্রত্যেক শব্দের সংজ্ঞা দেবে, বর্ণনা দেবে, প্রতিশব্দ দেবে।

ঠিক এই জিনিসটি বাঙলা দেশে এখনো আরম্ভ হয় নি।

সবাই তাকিয়ে আছেন কোষকারের দিকে। সে পরিভাষা বানিয়ে দেবে। আর সে বেচারী তাকিয়ে আছে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসা, আইন ইত্যাদির পণ্ডিতদের দিকে। তাঁরা সংজ্ঞা দেবেন—এবং তাঁদের অধিকাংশই শব্দ বা ভাষা-তাত্ত্বিক নন, সে বাবদে নিতান্তই এমেচার—তবে তো কোষকার সেগুলো লিপিবদ্ধ করবে॥

২৬।২।৬৬

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মিজোর সেপাজতী

নেফা অঞ্চল বাদ দিলে আসামে যে কটি পার্বত্য অঞ্চল গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, তার ভিতর পড়ে খাসিয়া, গারো, নাগা ও লুসাই। এর সঙ্গে ত্রিপুরার কুকি অঞ্চলেরও নাম করতে হয়, কিন্তু নানা কারণে সেখানকার কুকিরা এযাবৎ কোনো সমস্যার সৃষ্টি করে নি—এবং যেহেতু ত্রিপুরা আসামের অংশরূপে গণ্য হয় নি, তাই সে-দেশ এ প্রবন্ধের আলোচ্য নয়। কিন্তু মণিপুর সম্বন্ধে এস্থলে কিছু না বললে তাদের ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম তথা বাঙালী-ধর্মপ্রচারকদের প্রতি অবিচার করা হয়।

আসামের অন্যান্য পার্বত্য জাতির মত মণিপুর অনুন্নত নয়। মহাভারতের অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার মণিপুর ও বর্তমান মণিপুর একই কিনা সে নিয়ে তর্কা-তর্কি করার শাস্ত্রাধিকার আমার নেই—এবং যেহেতু মণিপুর অধীশের জন্ম-ভূমির প্রত্যন্ত ভূমিতে অবস্থিত, সে তার প্রতিবেশীকে অহেতুক ক্ষুব্ধ করতে চায় না, কিন্তু এ কথা সত্য যে, যদ্যপি সাধারণ মণিপুরীদের চেহারার ছাপ মঙ্গোলীয়, ওদের ভিতর হঠাৎ বিশুদ্ধ আর্য টাইপও পাওয়া যায়—এবং যেহেতু পার্শ্ববর্তী আর্য বাংলা-ভাষাভাষী সিলেট কাছাড়ে এ টাইপ দুর্লভ, তাহলেই প্রশ্ন উঠবে, কান্যকুব্জ অঞ্চলের এই আর্য টাইপ হঠাৎ মণিপুরে আবির্ভূত হল কি প্রকারে? পশ্চিমবাংলার সঙ্গে মণিপুরের সরাসরি যোগসূত্র না থাকা সত্ত্বেও বাঙালী আজ মণিপুরী নৃত্যের কথা ও সে নৃত্য যে রাধাকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে জন্ম ও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে, সে-কথা জানে—বস্তুত ভারতবর্ষে অধুনা যে চার রকমের শাস্ত্রীয় নৃত্য-পদ্ধতি স্বীকৃত হয়, এ নৃত্য তারই অন্যতম—কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম মণিপুরে প্রচার ও প্রসার লাভ করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে, অতএব এ নৃত্যকে আড়াই হাজার বছরের ঐতিহ্য দিয়ে মহাভারতের সঙ্গে সংযুক্ত করা কঠিন।[১]

কিন্তু এহ বাহ্য। আসল প্রশ্ন এই: ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে রাজাদেশে মণিপুর যে বৈষ্ণবধর্ম 'রাষ্ট্রধর্ম'-রূপে গ্রহণ করল সেটা সম্ভব হল কি প্রকারে? আসামের আর পাঁচটা পার্বত্য জাতি যে রকম আর্য জনপদ থেকে দূরে হাজার হাজার বৎসর ধরে আপন আপন প্যাটার্ন অব্ কালচার বুনে যাচ্ছিল মণিপুরও করছিল তাই। তাদের মাঝখানে একমাত্র মণিপুরই বৈষ্ণব হয়ে গেল কেন? এ কথা সত্য যে শিলচর থেকে মণিপুর পৌঁছানো সহজতর। কিন্তু মৈমনসিং থেকে গারো পাহাড় যাওয়াও তো কঠিনতর নয়, গারোরা অতিশয় শান্তিপ্রিয় এবং দু-একটি গারো মুসলমানের সঙ্গেও আমার আলাপ-পরিচয় হয়েছে।

---

১ দক্ষিণ ভারতের ভরতনাট্যম নিয়ে যতখানি গবেষণা এই উত্তর ভারতেই হয়েছে, এই উত্তর ভারতের ঘনিষ্ঠতর মণিপুরী নৃত্য নিয়ে তার এক দশমাংশও হয় নি। এ নৃত্য সত্যই রহস্যময়। মূল নৃত্য শান্ত ও লাস্যরসাশ্রিত কিন্তু প্রারম্ভিক অবতরণ নৃত্য (এর টেকনিক্যাল নামটি আমি ভুলে গিয়েছি) অত্যন্ত প্রাণবন্ত, দুর্দান্ত—তাণ্ডব নৃত্যের কাছাকাছি এবং পার্শ্ববর্তী অনুন্নত অঞ্চলের সংগ্রাম-নৃত্যের সঙ্গে সাদৃশ্য ধরে। হয়তো বৈষ্ণব হয়ে যাওয়ার পরও মণিপুরীরা তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যগত পার্বত্য নৃত্য ত্যাগ করতে চায় নি বলে 'অর দ্য ভুর' রূপে—প্রস্তাবন রূপে—সেটিকে রক্ষা করেছে।

www.BanglaBook.org

পক্ষান্তরে নেফার অধিবাসীদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনা করা কঠিনতর ; অথচ লোকমুখে শোনা, সেখানকার কোনো কোনো উপজাতি সর্ববাবদে অ-হিন্দু হয়েও মাথার এক দিকের খানিকটা চুল কামায় ও চিহ্নস্বরূপ দেখিয়ে বলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নাকি তাদের অর্ধ-হিন্দুরূপে পরিণত করে বলেন যে, তিনি আবার এসে তাদের পূর্ণ-হিন্দু করে দেবেন—তারা এখনো সেই প্রতীক্ষায় আছে। তা সে যা-ই হোক, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের বাঙালী শিষ্যেরাই যে মণিপুরে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মণিপুরী ভাষা বাংলা অক্ষরে লেখা হয় ; পক্ষান্তরে পরবর্তী যুগে খৃষ্টান মিশনারিরা পার্বত্য-বাসীদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করার পর তাদের ভাষা রোমান বা অদ্যকার দিনের ইংরিজী অক্ষরে লেখেন।[২]

কিন্তু সব চেয়ে বড় তত্ত্বকথা, মণিপুরবাসী বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করতে (এবং পরবর্তী যুগে কাছাড়ে আশ্রয়গ্রহণকারী কিছু মণিপুরী ইসলাম গ্রহণ করাতে) কোনো সভ্যতা-সংস্কৃতিগত বা অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্ট হয় নি। রাজনৈতিক সমস্যার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কারণ বাঙালী মিশনারিরা মণিপুরের সিংহাসনে কোনো বাঙালীকে বসাতে চান নি। অর্থনীতির দিক দিয়ে দেখতে গেলে মণিপুরবাসী ও পার্শ্ববর্তী কাছাড়বাসীর মধ্যে দ্রব্য বিনিময়ের ফলে উভয়েই উপকৃত হন। এই অর্থনীতিক দিকটা পাঠক বিশেষভাবে মনে রাখবেন। আমার মনে হয়, নাগা এবং মিজোদের অর্থনৈতিক সমস্যাটা কেউ সবিশেষ চিন্তা করে দেখেন নি।

আমার বাল্যকালে সিলেট জেলার একাধিক জায়গায় নিয়ত বর্ধিষ্ণু খৃষ্টান মিশন ছিল এবং সে যুগে ভারতের তাবৎ প্রটেস্টান্ট্ মিশনারিদের ভিতর দক্ষিণ-শ্রীহট্টে কর্মরত ওয়েল্শ্ মিশনের (এখনো মিজোদের ভিতর এই মিশনই সর্বপ্রধান এবং যে ক'জন মিশনারির খবর অধুনা পাওয়া যাচ্ছিল না তাঁরা খুব সম্ভব এই মিশনেরই।) রেভারেণ্ড পিন্‌গোয়র্ন জোন্‌স্ তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতা—বাংলা, ইংরেজী, ওয়েল্শ্ তিন ভাষাতেই—চরিত্রবল ও ধর্মানুরাগের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। আমি পাঠশালা যাবার সময় থেকেই তাঁর গির্জা ও সান্‌ডে স্কুলের রীতিমত অনুরাগী অংশগ্রহণকারী ছিলুম বলে প্রায়ই টিলার উপরে অবস্থিত তাঁর ছিমছাম বাংলোতেও যেতুম। মিশনে বাস করতো আরো বিস্তর ছেলেমেয়ে—প্রধানত চা-বাগিচার সাহেব ও দিশী রমণীর মিলনজাত পুত্রকন্যা এবং কিছু কিছু খাসিয়া, গারো, নাগা ও লুসাই (মিজো) খৃষ্টান। খাস বাঙালী প্রায় চোখেই পড়ে নি। আমি বিশেষ করে এই পার্বত্য খৃষ্টানদের সম্বন্ধেই কৌতূহলী ছিলুম এবং হাইস্কুলে ঢোকার সময় একটি লুসাই ছেলের সঙ্গে হৃদ্যতা হয়। সে সময় লুসাই ভাষা শিখতে গিয়ে—যদিও শেখা হয় নি

---

২ এ যুগে মণিপুরে যে রকম হঠাৎ বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে হিন্দুধর্ম প্রচারিত হয়, সে রকম উদাহরণ কী অদূর অতীত কী বর্তমানে আমি এখনো কোথাও পাই নি। মালকানা রাজপুতদের অল্পসংখ্যক লোকই বিংশ শতাব্দীতে 'শুদ্ধি সমাজে' দীক্ষা নেয়। শিলং শহর প্রায় শত বৎসর ধরে হিন্দুপ্রধান। সেখানে ব্রাহ্ম ও ইসলাম মিশন স্থাপিত হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত খৃষ্টান মিশনারিরাই সব চেয়ে বেশী সাফল্য অর্জন করেন। এখনও আসামের সর্ব পার্বত্য অঞ্চলে খৃষ্টান মিশনারিই অগ্রগামী—এবং কোনো কোনো লাগোয়া সমতল ভূমিতেও।

www.BanglaBook.org

—আবিষ্কার করি যে, অন্তত লুসাই ভাষাতে বাংলার বহু বহু শব্দের কোনো প্রতিশব্দ নেই (পরে জানতে পারি, অলিখিত ভাষা মাত্রেরই সাধারণত এই হাল)।

জোন্‌স্‌ সায়েব থাকতেন ছিমছাম বাংলোয়, জানলায় পর্দা টানানো। সায়েব-মেম খানা খেতেন ছুরি কাঁটা দিয়ে, ধবধবে সাদা টেবিলক্লথে ঢাকা খানা-টেবিলের পাশে। আমার বয়স তখন তেরো ; কিন্তু তখনই মনে হয়েছিল, ধর্মযাজকের এতখানি বিলাস ভালো না—বিশেষ করে তিনি যখন মিশনের আর সবাইকে তাঁর মত 'বিলাসে' রাখতে পারেন না। (পরবর্তী যুগে ইংলণ্ড এবং কণ্টিনেণ্ট ঘুরে বুঝতে পারলুম, জোন্‌স্‌ সাহেব তাঁর দেশের পাদ্রী-ভাইদের তুলনায় কতখানি আত্মত্যাগ করে ওই বিদেশ-বিভূঁইয়ে কতখানি সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন ; তাঁর আত্মাকে স্মরণ করে আজ ক্ষমা ভিক্ষা করি)।

আমার এবং আমার হিন্দু-মুসলমান বন্ধুদের মনে পাদ্রী সায়েবের ছিম-ছাম বাড়ি, আসবাবপত্র কোনো প্রলোভনের উদ্রেক করতো না। আমরা যেন কিছুটা বুঝে কিছুটা না বুঝে মনে মনে যুক্তি করতুম, 'খৃস্টান হলে এ সব পাওয়া যায় ; কিন্তু আমরা তো ধর্ম বেচতে চাই নে।' তাই বোধ হয় জোন্‌স্‌ সায়েব তাঁর জোরদার বাগ্মিতা-শক্তি দ্বারাও কোনো বাঙালী হিন্দু-মুসলমানকে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করতে পারেন নি—করে থাকলেও অত্যন্ত দুঃস্থ দূর গ্রামাঞ্চলের তথাকথিত নিম্নতম শ্রেণীর মধ্যে। আমরা কখনো তার খবর পাই নি।

আমার কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগতো, মিশনের এই খাসি লুসাইরা কি জোন্‌স্‌ সায়েবের মত ফিটফাট বাড়িতে থাকতে চায় না?

মণিপুরে যে সব বৈষ্ণব 'মিশনারিরা' গিয়েছিলেন তাঁরা নিশ্চয়ই সেখানে কোনো উচ্চতর মানের জীবনযাপন করেন নি। বস্তুত আজও মণিপুরের গ্রামবাসী সুর্মা উপত্যকার চাষার চেয়ে অনেক সচ্ছল। কাজেই এ নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব সেখানে উপস্থিত হয় নি।

কিন্তু নাগা-লুসাইদের মধ্যে কি হল?

যারা লেখাপড়ায় সামান্য ভালো—এ কথা মানতেই হবে, খৃস্টান মিশনারিরা তাঁদের সামর্থ্যে যতখানি কুলোয় ততখানি অর্থ শিক্ষার জন্য পাহাড়ে পাহাড়ে ঢেলে দিয়েছিলেন এবং একদা সেখানে সাক্ষরের সংখ্যা বাংলার তুলনায় ছিল বেশি—তারা কোহিমা আইজলে পড়তে এল, পরে শিলঙে এবং কেউ কেউ কলকাতা পর্যন্ত। এবং যারা আপন গ্রাম থেকে বেরুলো না, তারা, অন্তত পাদ্রী সায়েবের বাড়ি, তাঁর তৈজসপত্র দেখেছে। শিলঙে গিয়ে দু-চারজন চাকরি নিয়ে থেকে গেল তাদের কথা আলাদা, কিন্তু যারা বাড়ির টানে গাঁয়ে ফিরে গেল, এবং যারা গাঁয়েই ছিল এদের অনেকেই কি তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নততর করে পাদ্রী সায়েবের মানের কাছে আসতে চাইলো না?

এ তো আমাদের চোখের সামনে নিত্য নিত্য ঘটছে। আমাদেরই গ্রামের ছেলে শহরে এসে আর গ্রামে ফিরে গিয়ে নিম্নমানের জীবনযাপন করতে চায় না। বস্তুত ফ্রান্স, জর্মনি সর্বত্রই ক্রন্দনরব উঠেছে, গ্রামের বুদ্ধিমান কর্মঠ ছেলে মাত্রই আর গ্রামে ফিরে যেতে চান না। পড়ে থাকে নিষ্কর্মাগুলো। দি

www.BanglaBook.org

ভিলেজেস আর বীইং ড্রেনড অব দেয়ার ব্রেনস—শহর ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে গ্রামের প্রতিভাকে। বিশ্বব্যাপী এই যে একতরফা ভাঁটা, এরই ফলে যে গ্রামোন্নয়ন করা যাচ্ছে না এ সম্বন্ধে 'উনেস্কা' বহুকাল ধরে সচেতন, বিস্তর গবেষণা করেছেন, দাওয়াই খুঁজে পাচ্ছেন না।

কিন্তু এই সমস্যা নিয়ে আমাদের মধ্যে মারামারি খুনোখুনি হয় না, কারণ, যে গ্রামের ছেলে শহরে থাকতে চায় তার জন্য আশেপাশে বিস্তর ছোট-বড় শহর আছে—বোলপুর, শিউড়ি, বর্ধমান, শেষটায় যদি তাতেও প্রাণ না ভরে, তবে কলকাতা। রেলের চাকরি করে ভাগলপুর, পাটনা হয়ে কত কী?

কিন্তু মিজো-লুসাইবাসী যাবে কোথায়? আইজল, লুঙলে তাদের কি দিতে পারে? তারপর শতাধিক মাইলের ধাক্কা পেরিয়ে শিলচর—সে আমাদের সিউড়িবর্ধমানের তুলনায় কসমপলিটান শহর বটে—কিন্তু তারই বা মুরদ কতটুকু? তার নিজেরই দুঃখের অবধি নেই। আসাম সরকার তাকে—যাক্, আবার না আরেকটা বাঙ্গাল খ্যাদানো আরম্ভ হয়ে যায় (ভালো তো কারো করতেই পারি নে, মন্দটা না-ই বা করলুম।), আর কেন্দ্রীয় সরকার? কতবার বুঝিয়েছি, এই শিলচরে বেতারের কেন্দ্র বানিয়ে নাগা-লুসাইদের কণ্ট্রোল করো—কে বা শোনে কার কথা (এস্থলে বলে রাখা ভালো আমার জন্মভূমি কাছাড় নয়)! থাক সে কথা। মিজো যদি বা শিলচর পেরুতে চায় তবে সামনে যে খাঁড়া পাঁচিল—হিল্ সেকশন—তারপর সেই সুদূর গৌহাটি। এখানে খাসিয়াদের সঙ্গে তুলনা করলেই দেখা যাবে, একে তাদের চাষের পদ্ধতি উন্নত, শিলঙ গৌহাটির ভাষা তারা মোটামুটি জানে, জিনিসপত্র সেখানে বেচতে পারে, চাকরিনোকরি মিস্ত্রিগিরি করে পয়সা কামাতে পারে। আর শিক্ষিত সম্পদশালী বহু খাসিয়া শিলঙ শহরের পাদ্রীর বাঙলোর চেয়েও ফিটফাট বাঙলোয় বাস করেন। তাই স্বভাবতই খাসিয়ারা অনেকখানি সন্তুষ্ট এবং তাই শান্ত।

কিন্তু মিজো যায় কোথায়?

১৯১০।১৯১১ থেকে তাদের ভিতর আরম্ভ হয় খৃষ্টধর্ম প্রচার এবং ১৯৩১ নাগাদ অর্ধেক লুসাইবাসী হয়ে গেছে খৃষ্টান। তারপর কি হয়েছে জানি নে। নিশ্চয়ই বেড়েছে। কারণ মিশনারিদের কাজ বন্ধ হয় নি। আদম-শুমারীর হিসাব দেখে লাভ নেই। ঐ সময় থেকেই আরম্ভ হয়, পরের সেনসাসে কার স্বার্থ অনুযায়ী কি দেখাতে হবে তাই নিয়ে ছিনিমিনি, ইংরিজীতে যাকে বলে 'কুকিং'।

পার্বত্যাঞ্চলবাসী অনেক সময় আমাদের হিসেবে নিষ্ঠুর কিন্তু তারা সরল। সরল বিশ্বাসে তারা মনে আশা পোষণ করেছিল, যারা তাদের খৃষ্টান করেছে তাদেরই জাতভাই ইংরেজ সরকার একদিন তাদের বাসনা-কামনা পূর্ণ করে দেবে। 'জুম' খেত করে যে তার পয়সায় পাদ্রীর বাঙলো বানানো যায় না সেটা তারা বোঝে না। আমার মনে হয়, ইংরেজ-রাজ থাকলেও আজ না হোক কাল বা পরশু মিজোদের রুদ্ধ আক্রোশ ইংরেজকেই আক্রমণ করতো। তবে ইংরেজ ধাপ্পা মারতে ওস্তাদ—বাঙালীর মত চালাক জাতকেও কতবারই না একটা কুমীরছানাকে বারোটা করে দেখিয়েছে! কবিগুরুর মত বিচক্ষণ জন

www.BanglaBook.org

এবং তাঁর চেয়েও দুঁদে বহু পলিটিসিয়ান 'ব্রিটিশ জস্টিসে' বহুকাল ধরে বিশ্বাস রেখে আশা করতেন, সময় এলে আমরা ইংরেজের কাছ থেকে জস্টিস —সুবিচার পাবো।

অবশ্য এ-কথাও স্বীকার করি—যাঁরা আমার সঙ্গে একমত নন তাঁদের কাছে মাফ চাইছি যে, দেশ-শাসন-ব্যাপারে ইংরেজের অনেকগুলো সদ্‌গুণ আছে এবং সেই অনুপাতেই আসাম সরকার,—থাক, আবার কেন? তবে আসাম সরকার না হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার মিজোদের ভার নিলেই যে মুশকিল আসান হয়ে যেত সেটা আমি বিশ্বাস করি নে। যাই বলুন, যাই কন, আসাম সরকার বাস করেন শিলঙে—খাসিয়াদের মধ্যিখানে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উত্তরে নেফা অঞ্চলেও রয়েছে আরো গণ্ডায় গণ্ডায় উপজাতি। তাদের অনেকেই প্রতি হাট-বারে নেমে আসে সমতলে, ক্ষেতের জিনিস, এটা-সেটা (তখনকার দিনে চামর, মৃগনাভি, হাতীর এবং গণ্ডারের দাঁত—ভয়ঙ্কর মূল্যবান জিনিস, মধ্যপ্রাচ্যে 'হারেম' পোষণের জন্য মৃতসঞ্জীবনীর ন্যায় নিত্যকাম্য এফ্‌রডিসিয়াক ইত্যাদি) বিক্রি করে প্রধানতঃ নুন, কেরোসিন[৩] (সর্বনাশ! আমাদেরই যা হাল, ওদের হচ্ছে কি? তবে হ্যাঁ, ডিগবয় ওদের অতি কাছে) কিনে নিয়ে যাবার জন্য। ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকাবাসী আসামীদের অনেকেই তাদের চেনেন। কাছাড়বাসী ক'জন সদস্য আসাম মন্ত্রিমণ্ডলীতে আছেন সঠিক জানি নে; যে কজন আছেন এক-মাত্র তাঁরাই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাবাসীদের তুলনায় নাগা-মিজোদের বিলক্ষণ চেনেন, সদুপদেশ দিতে পারবেন, অবশ্য শর্ত, যদি কেউ চায়। এঁদের তুলনায় নাগা-মিজোদের সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের জ্ঞান সীমাবদ্ধ—এ বিষয়টি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাকে বুঝিয়েছিলেন নাগাদের প্রথম গ্র্যাজুয়েট, সে-সময় আপন মাতৃভূমি নাগা পাহাড়েই এস ডি ও শ্রীযুক্ত কে ভি চুসা, ট্রেনে শিয়ালদা থেকে সিলেটের কুলাউড়া পর্যন্ত দিল্লি থেকে মুকুকচঙ ফেরার পথে। সুযোগ পেলে সে কাহিনী আরেক দিন হবে। শ্রীচুসা অর্থনৈতিক দিকটারও উল্লেখ করেন।

মিজোরা সরল বিশ্বাসে ভাবছে, আমার—তা সে কেন্দ্রীয় সরকারই হোক, আর আসাম সরকারই হোক—বিধর্মী (নাগারাও কড়া সুরে বলে, 'যারা আমাদের সঙ্গে আমাদের গির্জায় গিয়ে উপাসনা করে না তারা আমাদের ঘৃণা করে।' সেটা না হয় করা গেল, কিন্তু খেতেও হবে তাদের সঙ্গে এবং স্বর্গস্থ

---

৩ এক সিলেটী মুসলমান ডাক্তার বহু বৎসর আইজল-লুঙলেতে কাটিয়ে এসে আমায় বলেন, মিজোরা দু-দিন তিন-দিনের পাহাড়ের চড়াই-ওৎরাই পথ পেরিয়ে লুঙলে আসতো কেরোসিন কিনতে। সে কেরোসিন আসতো শিলচর থেকে, বেশীর ভাগ পথ মানুষের কাঁধে, বাঁকে করে। একবার একজন বাহকের কলেরা হয় নির্জন পথিমধ্যে। বাঁশের স্ট্রেচার বানিয়ে অন্য চারজন বেহারা রোগীকে নিয়ে লুঙলে পানে রওনা দেয়—দশ টিন কেরোসিন পায়ে চলার 'পথের' উপর রেখে দিয়ে! গণ্ডায় গণ্ডায় কেরোসিনকামী খৃস্টান অখৃস্টান চলেছে লুঙলের দিকে, কিন্তু তাদের ধর্মবোধ এমনই প্রবল যে তারা কেরোসিনের দিকে ফিরেও তাকালে না। বেহারারা লুঙলে থেকে ফিরে এসে সমুচা সব কটা টিন যথাস্থানে পার—তারাও জানতো, লোপাট হবে না, তাই লুকিয়ে রাখার প্রয়োজনও বোধ করে নি। সেই মিজোরাই এখন লুঙলেতে লুটতরাজ করলো!

www.BanglaBook.org

প্রভু জানেন, একমাত্র চারপাই ছাড়া সব চতুষ্পদই তারা খায়! সঙ্গে সঙ্গে পান করতে হবে শুকনো লাউয়ের পাত্রে ভর্তি ভাত পচিয়ে তৈরী লিটার লিটার বিয়ার! কোহিমার ছোকরা ইংরেজ শাসনকর্তা এ-তিনটির প্রথমটি করে পুণ্যসঞ্চয় করতেন, বাকি দুই বাবদেও তেনারা সমগোত্রীয়, এমন কি প্রয়োজন হলে village belle-কেও তাঁরা নিরাশ করতেন না—কারণ ব্যাচেলার ভিন্ন অন্য কাউকে সেখানে সচরাচর পাঠানো হত না) এবং যেহেতু আমরা বিধর্মী তাই আমরা তাদের নাষ্য পাওনা দিচ্ছি না। আমরা সরে গেলেই তাদের সর্ব বাসনা কামনা পূর্ণ হয়ে যাবে। মোস্ট প্রিমিটিভ জুম চাষ করে যে এবসার্ড জীবন-মান উচ্চ পর্যায়ে তোলা যায় না সেটা বোঝাবে কে?

অবশ্য মিজোদের অসন্তোষের অন্যান্য কারণও আছে। শুধু একটা কারণ দেখালুম—অন্তত মার্কসিস্টরা খুশী হবেন—তাঁদের অনেকেরই মতে এইটেই একমাত্র কারণ। একমাত্র কারণই হোক আর প্রধানতম কারণই হোক, অর্থনৈতিক কারণটা সন্ধান নেওয়া সর্বক্ষেত্রেই বাঞ্ছনীয়। লেনিনের সমসাময়িক ভিয়েনার অর্থডক্স অর্থনীতি পণ্ডিত শুমপেটার এবং তাঁরই মত কট্টর বার্লিনের জমবার্ট কেউই এই দৃষ্টিবিন্দুটি অবহেলা করেন নি।

স্বীকার করে নিচ্ছি, আমার এ বিশ্লেষণ ভুল হতে পারে, কিন্তু তথ্য-গুলো সঙ্গত হয়েছে বিশ্বস্তজনের কাছ থেকে।[৪]

গাড়োলস্য গাড়োল

আদরের ডাক-নাম য়প্‌প্‌ বা ইয়ুপ্‌—সারা দেশটা জুড়ে। তোলা-নাম হ্যার ডক্টর ইয়োজেপ (য়প্‌প্‌) গ্যোবল্‌স্‌, রাষ্ট্রের প্রপাগাণ্ডা মন্ত্রী, রাজধানী বার্লিনের গাও-লাইটার (অঞ্চলাধিকারী) এবং ফুরার অ্যাডলফ্‌ হিটলারের শেষ জুয়োখেলার পাশা যখন ব্লাঙ্কো মেরে মেরে যাচ্ছে, তখন সর্বাত্মক, টোটাল ওয়ারের জন্য কুল্লে তাগৎ 'ইকট্রে' করার জন্য সর্বাধিকারী। পার্টির ব্রেন-বাক্সো। শত্রু-মিত্র সবাই এক সুরে বলেছেন, 'হাঁ, প্রপাগাণ্ডা কারে কয়, সে-

---

৪ (ক) মিজো প্রবন্ধটি লিখে 'দেশ' দপ্তরে পাঠিয়ে দেবার পর দুটি তাৎপর্যপূর্ণ খবর বেরিয়েছে। প্রথমটিতে মাদ্রাজের প্রাক্তন গভর্ণর শ্রীযুক্ত বিষ্ণুরাম মেধী বলেছেন—'যাতে করে মাল চলাচল জাম্‌ না হয়ে যায় ("transport bottleneck") মিজো, নাগা এবং অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চলের সঙ্গে রেল-লাইন বসানো উচিত।' তিনি General council meeting of the All-India Railwaymen'sFederation-এতে এ বিবৃতিটি দেন ও ২৭-৩-৬৬র কাগজে এটি বেরোয়। মিজো নাগারা যে রেলের অভাবে বাদবাকি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন, সে-কথা আমি প্রবন্ধে নিবেদন করেছি।

(খ) পার্বত্য-অঞ্চল সম্বন্ধে ব্যাপক রিপোর্ট দেবার জন্য যে পাটস্‌কর্‌ কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল তার রিপোর্টের কয়েকটি প্রধান সুপারিশ ৩১ মার্চ বেরিয়েছে। সম্পূর্ণ রিপোর্ট না পড়ে কিছু বলার উপায় নেই, কিন্তু যেটুকু বেরিয়েছে তার থেকে মনে হল 'আধুনিক ঘটনার আলোকে' রিপোর্টটি আউট অব ডেট—তামাদি না হলেও বর্তমানের প্রশ্নবাণ সইতে পারবে না।

১৬।৪।৬৬

www.BanglaBook.org

বস্তু দেখিয়ে গেছে ঐ ব্রেন-বাক্সোটা।' বাক্সোটির এক দিক দিয়ে ঢুকতো সাদা-মাটা তথ্য, হাফ-তথ্য, ডাহা মিথ্যে, ঘৃতলবণতৈলতণ্ডুলবস্ত্রইন্ধন বেরিয়ে আসতো অন্য দিক দিয়ে। এক-একখানা চাঁছাছোলা, নিটোল, অব্রণ, অনিন্দনীয় কলাসৃষ্টি! দাঁড়ান, এই 'কলাসৃষ্টি' রহস্যটা একটু গুছিয়ে বলতে হয়—কারণ এ বাবদ তাবৎ টেকনিক্যাল টার্ম একমাত্র ফরাসীর মারফত প্রকাশ করা সম্ভব। তদুপরি গ্যোবল্‌স্‌ সায়েবের দিলের দোস্ত থেকে জান্‌-এর দুশ্‌মন্‌তক, স্বীকার করেছেন, ভোঁতা হোঁৎকা টিউটন নাৎসী পাঁঠাদের ভিতর ঐ গ্যোবল্‌স্‌ই ছিলেন একমাত্র জিনিয়াস, যাঁর স্কন্ধে বিরাজ করতো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মস্তিষ্ক-কুণ্ডলী পরিপূর্ণ লাতিন মাথা—তাই তাঁর লিখন-কথন উভয়েতেই ছিল, ফরাসীসুলভ স্ফটিক স্বচ্ছতা।[১] এ-কলাসৃষ্টিকে অ্যভ্‌র্‌ দা'র বলা যেতে পারে, মাস্টার পীস অব আর্ট বললে ঠিক ঠিক মানেটা ওৎরায় না। অব্‌জে দা'র শব্দসমষ্টি আমি শুনেছি ; এটা বোধ হয় morale-এর মত ইংরিজিতে চালু ভেজাল ফরাসী মাল (আমরা যেরকম কলকাত্তাই উর্দুতে 'একঠো' 'দুঠো'র ভেজাল বরাব্বর ব্যবহার করে আসছি!)—অর্থ, যে কলাসৃষ্টি কোনো কাজে লাগে না, যেমন 'পাপিয়ে মাশেঁতে তৈরী কাশ্মীরী-ফুলদানি-পারা সৃষ্টি-ছাড়া বস্তু, যেটাতে ফুল রাখা যায় না বটে, কিন্তু দেখতে খাসা। গ্যোবল্‌স্‌ সায়েবের বেতার বক্তৃতা বা সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বিলকুল বেকার নয়—টায়-টায় কাজে লাগতো। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে তিনি টলস্টয়কে নিশ্চয়ই পরম আপ্যায়িত করতে পারতেন ; পার্থক্য মাত্র এইটুকু যে, টলস্টয় তাঁর কলা দ্বারা নির্মাণ করতেন স্বর্গারোহণের সোপান, য়প্‌প্‌ নির্মাণ করতেন রসাতলের খাদ্ডায় সবেগে নিপতিত হওয়ার তরে অত্যুত্তম পিচ্ছল সানুপ্রদেশ। আর ইহুদিকুলের কল্যাণার্থে গ্যাস-চেম্বার!

হিটলারের বক্তৃতা-গর্জনও রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্যতুল্য প্রলয়ংকর, কিন্তু সেটাকে অত সহজে বিশ্লেষণ করা যায় না। সেটাও কলাসৃষ্টি এবং সেটি য়প্‌প্‌-মার্কার চেয়ে লক্ষগুণে কার্যকরী। কড়া পাক।

দুজনার মুখে একই জিগির ঃ ইহুদিকুল সর্বনেশে। এদের সমূলে বিনাশ করতে হবে।[২]

---

১ অক্সফোর্ডের ইতিহাস-অধ্যাপক ট্রেভর রোপারের মত জর্মনির জাতশত্রু শতেকে গোটেক; তদুপরি তিনি একটি আস্ত স্নবশ্য স্নব। তিনি বলেন, 'and it was the Latin lucidity of his (Goebbels') mind, the un-German suppleness of his argument which made him so much more successful as a preacher than the forthblowing nationalists of the South.'

অবশ্য অধ্যাপককে বোঝা ভার। তিনি শতাধিক বার বলেছেন, জর্মনরা অতিশয় অগা জাত। উত্তরে বলি, অগারা পরিষ্কার যুক্তি বোঝে না; রহস্যের সন্ধানে কোটে মাথা। তাই জর্মন দার্শনিকদের ভিতর লাতিন ধরনের স্বচ্ছ লেখক শোপেনহাওয়ার ভোঁতা লেখক হেগেল্‌-এর তুলনায় অবহেলিত।

২। ন্যুরনবেরগের মোকদ্দমায় যখন আসামী নাৎসদের বিরুদ্ধে বলা হলো যে তাঁদের ফ্যুরার গুরুই ইহুদিদের ausrotten—'সবংশে নির্বংশ' করবেন বলে একাধিকবার সর্বজন সমক্ষে কবুল করেছিলেন, তখন আসামী পক্ষ' বলে, 'ওসব কথার কথা। কেউ যখন বলে

www.BanglaBook.org

কিন্তু দুজনের মনের ভিতর দু'প্রকারের যুক্তি। য়প্‌পের বিশ্বাস, ইহুদিরা সর্ব ব্যাপারেই সাতিশয় ধুরন্ধর। এদের সঙ্গে 'নর্ডিক আর্যরা' অর্থাৎ জর্মনরা কিছুতেই পাল্লা দিতে পারবে না। পক্ষান্তরে হিটলার এটা মানতে পারেন না—জান্‌ কবুল। তাঁর মতে, এই বসুন্ধরায় যে-কটা ডাঙর ডাঙর জাত, গোষ্ঠী, বংশ—যা খুশি বলুন, ইংরেজীতে Race—, জর্মনে Rasse—তার মধ্যে 'আর্য রেস সর্বোত্তম। এবং সেই আর্য রেসের ভিতর সর্বোত্তমেরও সর্বশ্রেষ্ঠ জর্মনির নর্ডিক, নীল চোখ, ব্লন্ড্‌ (সোনালী, কোনো কোনো ক্ষেত্রে রুপালীও—যেটাকে বলা হয় প্লাটিনাম ব্লন্ড্‌) চুলধারী 'আর্য' রেস। ইহ-বিশ্বের সর্ববাবদে তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্পন্ন শক্তিমান যুবার শরীরেও যেমন ক্যানসার দেখা দিতে পারে, ঠিক তেমনি জর্মন সমাজে এসে ঢুকেছে ইহুদি গোষ্ঠী। এবং ছারপোকার মত ভার্মিন। ছারপোকা বেশী বুদ্ধিমান না মানুষ বেশী বুদ্ধি ধরে, এ প্রশ্ন বুদ্ধিমান মানুষ তুলবে না—বুদ্ধিমান বা মূর্খ ছারপোকা তুলবে কি না, সেটা হিটলার বলেন নি।

য়প্‌প্‌ বললেন, 'এটা হল তুলনা। তুলনা যুক্তি নয়।'

ফ্যুরার বললেন, 'তুলনা মাত্রই তিন ঠ্যাঙের উপর দাঁড়ায়। টায়-টায় যুক্তির স্থান নিতে পারে না সত্য, কিন্তু আপন বক্তব্য জোরদার ও প্রাঞ্জল করার জন্য তুলনার ব্যবহার করেছেন সর্বগুণীজ্ঞানীই।'

য়প্‌প্‌ বললেন, 'তর্কস্থলে মেনে নিলুম।' গ্যোবল্‌স্‌ বড়ই প্রভুভক্ত ছিলেন। নইলে প্রভুর আত্মহত্যার চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর তাঁর ছ'টি শিশু-পুত্রকন্যাদের ডাক্তার দিয়ে খুন করিয়ে সস্ত্রীক আত্মহত্যা করবেন কেন?[৩] বললেন, 'তাই সই। কিন্তু আমি আপনাকে হাতেনাতে দেখিয়ে দেব, ইহুদিরা অন্তত ব্যবসার ক্ষেত্রে আর্যের চেয়ে বেশী বুদ্ধি ধরে।'

'কোনো ক্ষেত্রেই না।'

'বাজী ধরুন।'

'বিলক্ষণ! কত?'

'এক লাখ।'

'গেমাখ্‌ট—পাক্কী বাৎ।'

দুজনাতে ছদ্মবেশে বেরলেন। তার জন্য বেশী বেগ পেতে হল না। এমনিতেই ঠোঁটকাটা বার্লিন-কক্‌নিরা বলতো ফ্যুরারের চুল নেবে পড়ে কপাল ঢাকে নি—অকল্পনীয়; আর গ্যোবল্‌স্‌ এক লহমার তরে বকর বকর বন্ধ করেছে—এটা ততোধিক অবিশ্বাস্য। হিটলার তাই চ্যাটচেটে পমেটম দিয়ে যেন প্রায় ভৈরবচণ্ডীর মত চুড়ো-খোঁপা বাঁধলেন—এবারে আর চুল খসে পড়ে, কপাল ছাপিয়ে চোখ এস্তেক ঢেকে দেবে না। ব্যস্‌—এতেই হয়ে গেল ছদ্মবেশ। আর য়প্‌প্‌? তিনি বললেন, তিনি প্রতি দশ মিনিটে মাত্র

"তোমার চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাবো" (বাঙলায় বলতে গেলে এই অনুবাদই জুৎসই) তখন অন্য পক্ষ সেটা সিরিয়াসলি শব্দার্থে নিয়ে বিশ্বের সব ডুগডুগি বানাবার যন্ত্রপাতি বিনষ্ট করতে মাথায় গামছা বাঁধে না।

৩ সবিস্তর কাহিনী পাঠক পাবেন, অধীনের 'দু-হারা' পুস্তকে, হিটলারের 'শেষ দশ দিন' প্রবন্ধে।

www.BanglaBook.org

একটি সেনটেনস বলবেন। এ-রকম বিকট চুপচাপ লোককে কে চিনবে য়প্‌প্‌ বলে!

য়প্‌পেরই প্রস্তাবমত দুজনাতে ঢুকলেন এক পাঁচমিশিলি খাঁটি আর্য দোকানে। চাইলেন একটা টী-সেট। দোকানী একটি রমণীয় ট্রের উপর সব কিছু সাজিয়ে সামনে ধরলো। গ্যোবল্‌স্‌ তো তাঁর মুণ্ডটি ডান থেকে বাঁয়ে, ফের বাঁ থেকে ডাইনে নাড়িয়ে নির্বাক প্রশস্তি শুনিয়ে দিলেন। তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়লো ঐরকম ভাবখানা করে বললেন, 'কিন্তু আমার যে-দোস্তকে আমি এই জন্মদিনের সওগাৎটা দেব তিনি তো ন্যাটা ; আপনাদের কাছে কি লেফট-হ্যাণ্ডারদের জন্যে কোনো টী-সেট আছে?' হিটলার বললেন, 'হুঁ।' ভদ্র আর্যসন্তান আমাদের দোকানী তো বেবাক বে-বাক্‌—অবাক। 'লেফট-হ্যাণ্ডারস টী-সেট?' সে আবার কি গব্বযন্ত্রণা রে বাপু! বাপের জন্মে নাম এস্তেক শোনে নি। অনেকক্ষণ ঘাড় চুলকে, বিস্তর আন্দেশা করে আপসা-আপসি করে সবিনয় জানালে, তার কাছে নেই।

হিটলার দিল্‌দরাজ আদমী। এক গাল হেসে বললেন, 'মাখ্‌ট্‌নিক্‌স্‌, মাখ্‌ট্‌নিক্‌স্‌—বিলক্ষণ, বিলক্ষণ! তাতে এসে যায় না। আমরা অন্য দিন দুসরা জিনিসের জন্য আসবো'খন—খাসা দোকানটি কিন্তু! কি বলো হ্যার ডক্‌—থুড়ি! ঔফ বীডার জেএন! গুটে নাখ্‌ট্‌! আসি তবে। হেঁ হেঁ, হেঁ হেঁ।'

এবারে য়প্‌প্‌ প্রভুকে নিয়ে ঢোকালেন এক ইহুদির দোকানে।

দোকানী ছিল না। তার চোদ্দ বছরের ছেলে ছুটে এসে অদৃশ্য স্যাম্‌পুতে (কথাটা আজকাল বড্ডই 'ফেশিনিবিল' হয়েছে ; আম্মো ব্যাভার করতে চাই) হাত কচলাতে কচলাতে একবারের জায়গায় তিন-তিনবার বলে বসলো, 'য়ুটেন ময়েন, য়ুটেন ময়েন, য়ুটেন ময়েন (গুটেন্‌ মর্গেনের অর্ধশিক্ষিত উচ্চারণ), মাইনে হেরেন!'

উত্তরে হিটলার বিড়বিড় করে কি একটা বললেন, ঠিক ঠাহর করা গেল না। দক্ষিণের কোনো কোনো ব্রাহ্মণ নাকি একদা রাস্তায় ('সড়ক' 'সরকে' বা 'সরণিতে'—ওঃ! কী স্টর্ম ইন এ টী 'সেট'!) বেরলে চিৎকার করতেন, অস্পৃশ্য যেন সরে যায়, তার ছায়া যেন ওঁর গায়ে না পড়ে—তবে এদের পঞ্চাশ বা ষাট লক্ষকে বামুন গ্যাস চেম্বারে[৪] খুন করে পুড়িয়েছে একথা কখনো শুনি নি। অতএব হিটলার যে ইহুদি ছোকরাকে হেল-ফেলো-উয়েল-মেট

---

৪ এর অন্যতম বড়কর্তা হ্যোস নুরেনবের্গ মোকদ্দমায় সাক্ষী দেন, এবং পরে এ'র ফাঁসি হয়। দু'জন হাড়ে-পাকা মনস্তত্ত্ববিদ মার্কিন চিকিৎসক এঁর আগা-পাশতলা পুন পুন পরীক্ষা করেও এ'র ভিতর কোনো কিছু অ্যাব্‌নরমাল পান নি। ইনি বলেন, 'হাজার খানেক মানুষ গ্যাস দিয়ে মারতে আমার ১০ থেকে ১২ মিনিট সময় লাগতো, কিন্তু আসল মুশকিল ছিল এদের পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করা—দিনের পর দিন নাগাড়ে চব্বিশ ঘণ্টা চুল্লিগুলো চালু রেখেও কাজ খতম হত না।' গ্যাস চেম্বারে ইহুদিদের চাবুক মেরে মেরে ঢোকানো থেকে, চুল্লি চব্বিশ ঘণ্টা চালু রেখে তাতে লাশ পুড়িয়ে ছাই করে জলে ভাসানো পর্যন্ত সব কাজ করতো কোনো কোনো স্থলে ইহুদিরাই। তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে এই প্রলোভনে। পরে অবশ্য তাদেরও ঘাড়ে গুলি করে করে মারা হত, পিছন থেকে, অতর্কিতে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

(hail-fellow-well-met) করেন নি, সেটা স্পষ্টই বোঝা যায়। ইহুদি ছোকরা কাঁচুমাচু হয়ে বললে, 'আমার বলে দেওয়া উচিত, সরকারের হুকুম, কোনো "আর্য" যদি ইহুদির দোকানে ঢোকেন তবে দোকানদার যেন তাঁকে সতর্ক করে দেয়, এটা ইহুদির দোকান, এখানে কেনাকাটা করলে আর্যই দায়ী। সাইন-বোর্ডেও স্পষ্ট করে লেখা আছে, আপনারা হয়তো লক্ষ্য করেন নি।'

হিটলার বিড়বিড় করলেন, 'শোন্ গুট্ শোন্ গুট্'—অনেকটা যেন ঠিক আছে, ঠিক আছে, মেলা বকো না।

টী সেট চাওয়া হল। এল। গ্যোবল্‌স্ ন্যাটার সেট্ চাইলেন।

ছোকরা প্রথমটায় হকচকিয়ে গেল।

পরমুহূর্তেই সম্বিতে ফিরে এক গাল হেসে বললে, 'এখুনি নিয়ে আসছি, স্যার! বলে যে সেট ট্রের উপর সাজিয়ে রেখে দেখিয়েছিল সেইটে তুলে নিয়ে গুদোমঘরে অদৃশ্য হলো। দু-মিনিট পরেই আরেকটা আরো বাড়িয়া ট্রে'র উপর সাজিয়ে নিয়ে এল ন্যাটাদের সেট্।

তালেবর ছোকরা করেছে কি, এবারে ঐ আগেকার সেটই উল্টো করে সাজিয়েছে, অর্থাৎ টী-কাপগুলোর আঙটীগুলো রয়েছে খদ্দেরের বাঁ দিকে; তার মানে, খদ্দের বাঁ-হাত বাড়ালে আঙুল ঠিক আঙটার যথাস্থানে পড়বে।

গ্যোবল্‌স্ বাক্যব্যয় না করে যথামূল্যে সেট্ কিনে নিলেন।

বেরিয়ে এসে বললেন, 'দেখলেন ইহুদিটার চালাকিটা?'

হিটলার অতিশয় সরল দরদী কণ্ঠে বললেন, 'চালাকিটা আবার কোথায়? বেচারী আর্যের ন্যাটা সেট্ ছিল না স্টকে তো সে আর করবে কি?'

* * *

এবারে সিরিয়স কথা ঃ—ব্যাটারা বলে, তারা নাকি আর্যোত্তম! আরে মোলো, আর্যোত্তম যদি হবিই, তবে সর্ব-আর্যের—তা সে গ্রীকই হোক, লাতিনই হোক কিংবা তাদের বহু পূর্বের মিটানির হিটাইটই হোক—সর্বপ্রাচীন সংহিতা চতুর্বেদ আছে ভারতীয় আর্যের শ্রুতিতে ভিন্ন অন্য কোন্ আর্য গোসাঁইয়ের খট্টাঙ্গ প্রত্যঙ্গে?

কিন্তু, আমরা তো দিয়েছি আশ্রয়—প্রথম ইহুদিরা যখন জীবনমৃত্যুর অবস্থায় নিমজ্জমান তরণীতে করে বোম্বাই উপকূলে পৌঁছয়। গ্যাস-চেম্বারের কথা এই দু বা আড়াই হাজার বছর ধরে আমাদের মাথায়ই খেলেনি! তবে, হ্যাঁ, এদানির কেউ কেউ বলেন, আমরা যে অসম্মদেশে ইজরায়েল প্রেসিডেন্টের শুভানুগমনোপলক্ষে উদ্বাহু হয়ে 'লুত্ত' করি নি সেটা গ্যাস চেম্বারে পোরার চেয়েও সখ্‌ৎ গুনাহ্! তোবা! তোবা!!

৩০।৪।৬৬

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাট-বাজার, শাক-সবজি,[১] দান-খয়রাৎ, দুখ-দরদ, ফাঁড়া-গর্দিশ, মান-ইজ্জৎ, লজ্জা-শরম, ভাই-বেরাদর, দেশ-মুল্লুক, ধন-দৌলত, রাজা-বাদশা, ঝড়-তুফান, হাসি-খুশী, মায়া-মহব্বৎ, জন্তু-জানোয়ার, সীমা-সরহদ—ইত্যাদি ইত্যাদি।

এস্থলে লক্ষ্য করার প্রথম তত্ত্ব এই যে, প্রত্যেক সমাসের প্রথম শব্দটি খাঁটি দিশি ভারতীয় শব্দ ; হাট, শাক, দান, দুখ, মান, লজ্জা, দেশ ইত্যাদি এবং দ্বিতীয় শব্দটি যাবনিক (আরবী, ফার্সী, তুর্কী, হীব্রু গয়রহ্), যেমন বাজার, সবজী, খয়রাৎ, দর্দ ইত্যাদি। এবং দুটি শব্দই প্রায় সমার্থ-সূচক।

তাহলে প্রশ্ন, এ 'কুকর্মের' কি প্রয়োজন ?

আমরা যখন সাধারণের কোনো অজানা ভাষা থেকে উদ্ধৃতি দিই, তখন বাঙলা অনুবাদটি দি তার পরে। তাই আমরা যদি ইংরিজী প্রবন্ধে সংস্কৃত বা বাঙলা উদ্ধৃতি দিই তবে ইংরিজী অনুবাদটি দি পরে। অর্থাৎ যাকে বোঝাতে যাচ্ছি, তার ভাষা আসে পরে।

তা হলে মনে করুন, মুসলমানের আগমনের কিছুকাল পরে কোনো হিন্দু (বা নবদীক্ষিত মুসলমানও হতে পারে কারণ হিন্দু ধর্মবর্জন করে মুসলমান হয়ে গেলে রাতারাতি তার আরবী ফার্সী রপ্ত হয়ে যায় না) গেল মুসলমান শাসনকর্তার কাছে বিচারের আশায়। বললে, 'ধর্মাবতার' হুজুর!—দেশ—' বলেই থমকে দাঁড়ালো। ভাবলে 'হুজুর কি "দেশ" শব্দটা জানেন! হুজুর তো হাট-বাজারে ঘোরাঘুরি করে দিশী শব্দ শেখবার ফুর্সৎ পান না'—(অথচ আমাদের হিন্দুটি পেটের দায়ে, কাজের তাড়ায় বিদেশাগত মুসলমানদের সঙ্গে মেলামেশা করার ফলে কিছু কিছু যাবনিক শব্দ শিখে গিয়েছে) তাই 'দেশ' বলে থমকে গিয়ে বললে 'মুল্লুক'—ওটা হুজুরের যাবনিক শব্দ। অতএব শেষ পর্যন্ত তার নিবেদন দাঁড়ালো, 'দেশ-মুল্লুক ছারখার হয়ে গেল। রাজা-বাদশা (আবার রাজা বলে থমকে গিয়ে যাবনিক "বাদশা" বললে) আমাদের মত কাঙাল-গরীবের (গরীব আরবী) দুখ-দরদ্ (দরদ্, দর্দ ফার্সী) কে বুঝবে ? আমাদের মান-ইজ্জৎ (ইজ্জৎ আরবী) ধনদৌলত (দৌলত যাবনিক) সব গেল। মেয়েছেলের লজ্জা-শরম (শর্ম যাবনিক)-ও আর বাঁচে না। রাস্তায় বেরোলেই দেখতে পাবেন, কারো মুখে হাসি-খুশী (খুশী ফার্সী) নেই। হুজুর অনুমতি দেন—ভাই-বেরাদর (বেরাদর ফার্সী) নিয়ে মগের মুল্লুকে চলে যাই।'

মনে করুন, কথার কথা কইছি, হুজুর সত্যকার হুজুর ছিলেন। হুঙ্কার দিয়ে প্রতিবিধান করলেন।

আমাদের বঙ্গসন্তানটি বাড়ি ফিরে গৃহিণীকে আনন্দে ডগমগ হয়ে বললে, 'বুঝলে গিন্নী, হুজুর যা আমায় খাতির—' (এইখানেই থমকে দাঁড়ালো ; হুজুরের দরবারে 'খাতির' কথাটি খুবই চালু, সেইটেই এতক্ষণ ধরে দরবারে সে শুনেছে, তাই দুম্ করে সেটা ব্যবহার করে ফেলে চিন্তায় পড়লো, গিন্নী তো

---

১ কিন্তু শাক-ভাত, শাক-পাত, শাক-পাতেড়, শাকান্ন, শাক মাছ অন্য সমস্যার অঙ্গ। স্থানাভাব না হলে সেটিরও আলোচনা করা হবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যাবনিক শব্দটা বুঝবে না, গিন্নী তো হাট-বাজারে গিয়ে যবনের সঙ্গে মেলা-মেশা করে এসব শব্দ শেখে নি—তাই সঙ্গে সঙ্গে বললে) 'যত্ন—হুজুর যা খাতির-যত্ন করলেন কি বলবো। আবার দোকান (ফের মুশকিল—দোকান ফার্সী শব্দ, তাই বললে "হাট" [হট্ট] হাট খুলবে,—কোনো চিন্তা করো না গিন্নী! নারায়ণ, নারায়ণ।'

এ যুগে আবার ফিরে আসবো। কিন্তু তার পরবর্তী যুগে দেখুন, ইংরেজ boss-কে বলছি, 'স্যার! আমি উকিল—(বলেই থমকে দাঁড়ালুম, উকিল যদ্যপি আসলে আরবী শব্দ, এদানির ইটি খাঁটি বাঙলা, স্যার কি বুঝবেন?—তাই হন্তদন্ত হয়ে বললুম) ব্যারিস্টার (উকিল-ব্যারিস্টার) লাগিয়েছিলুম। ঘটি (ঐ যা! স্যার বুঝবেন কি?) গেলাস (glass—এবার স্যার বুঝবেন!) ঘটি-গেলাস বন্ধক দিয়েছি—তেনাদের জন্য এরেক (ফের ইংরাজি 'ব্রান্ডি') ব্রান্ডি, বিড়ি-সিগারেট (দ্বিতীয়টা ইয়োরোপীয়) যা গেছে সে আর বলে কাজ নেই।'

এই সব বলে-কয়ে তো ছুটি নিয়ে দেশে গেলুম। প্রথমেই ঠাকুরমাকে পোন্নাম।

বললুম, 'ঠাকুমা' পরে সব গুছিয়ে বলবো, এই বেলা শুনে নাও সংক্ষেপে। বড় মাসীর গুণধর ছোট ভাইটি নিয়েছেন ফ্ল্যাট (আবার সেই হাংগামা—ঠাকুমা তো 'ফ্ল্যাট' বুঝবে না, অতএব বললুম), ফ্ল্যাট-বাড়ি। আমাদের কাউকে না শুনিয়ে করেছেন বিয়ে। কিন্তু ঠাকুমা, মেয়েটি কী সুন্দর! এক্কেবারে ডল (doll—সর্বনাশ, ঠাকুমা তো বুঝবে না, তা হলে 'পুতুল' বলি)—পুতুলের মত। কিন্তু হলে কি হয়! গুরু আছেন, ধম্মো আছেন। ব্যাস! এল তেড়ে টাইফয়েড-জ্বর (টাইফয়েড তো জ্বরই বটে—তবু ঠাকুমা যদি না বোঝেন, অতএব 'জ্বর'টা বলতে হল) : তুমি ভাবছো আমরা কিছুই করিনি। ডাক্তার-(আবার সেই বিপদ, তাই বলতে হল) বদ্যি (ডাক্তার-বদ্যি) নিয়ে এলুম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।'

তাই আবার নিবেদন করছি, যাকে বোঝাচ্ছি তার বোধ্য শব্দটি আসে পরে।

এটা কিছু নূতন তত্ত্ব, আমাদের দেশের আজগুবী ব্যাপার নয়। ইংলণ্ডেও নরমান বিজয়ের পর ইংরেজ যখন বিদেশী হুজুরের কাছে গিয়ে ফরিয়াদ বা রিপোর্ট দিত, তখন বলতো, 'He is very meek and humble (meek খাঁটি ইংরিজি, কিন্তু humble বিজয়ী নরমানদের শব্দ), Sir, but it is odd and strange (odd ইংরিজী, strange নরমান), that although we thought it meet & proper (meet ইংরিজী, proper নরমান) that we should search every nook and corner (nook ইংরিজী, corner নরমান), our sorrow and grief (sorrow ইংরিজী, grief নরমান) know no bound that we did not find him.'

তফাৎ শুধু এইটুকু যে ইংরেজ তখন দিশী ও বিদেশী শব্দের মাঝখানে and বসিয়েছে—meek and humble, odd and strange ; আমরা বাঙালীরা 'and' 'এবং' বসাই নি ; আমরা বলেছি, হাসি-খুশী, মান-ইজ্জৎ, দেশ-মুল্লুক।

www.BanglaBook.org

পাঠক কিন্তু ভাববেন না, আমাদের সব সমাসই এ রকম।

জল-পানি, বাজার-উটকো, মাল-মশলা, ঘটি-বাটি, টোল-চতুষ্পাঠী, মক্তব-মাদ্রাসা, ইস্কুল-কলেজ অন্য ধরনের সমাস॥

১২।৩।৬৬

কবিগুরু ও নন্দলাল

রসাচার্য নন্দলাল বসুর জীবন এমনই বহু বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত হয়েছে, তিনি এতই নব নব অভিযানে বেরিয়েছেন যে তার পরিপূর্ণ পরিচয় দেওয়া অতি কঠিন, শ্রমসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। তদুপরি যিনি সে পরিচয় দিতে যাবেন তাঁর সর্বরসসৃষ্টিতে অপর্যাপ্ত কৌতূহল ও সে রস আস্বাদন করার মত অপ্রচুর স্পর্শকাতরতা থাকার একান্ত, অত্যন্ত প্রয়োজন। মানবসমাজে নন্দলাল ছিলেন স্বল্পভাষী তথা আত্মগোপনপ্রয়াসী—তার নীরবতার বর্ম ভেদ করে তাঁকে সর্বজন সম্মুখে প্রকাশ করার মত ক্ষমতা, সে প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় শৈলী ও ভাষার উপর অধিকার এ-যুগে অত্যল্প আলঙ্কারিকেরই আছে। আমাদের নেই ; আমরা সে দুঃসাহস করি নে।

আমরা তাঁকে চিনেছি, গুরু রূপে, রসসৃষ্টির জগতে বহু বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সতত রত স্রষ্টা রূপে এবং কবিগুরুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য ও সহ-কর্মী রূপে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বভারতীতে প্রধানত পণ্ডিতদেরই আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন—আচার্য বিধুশেখর, ক্ষিতিমোহন, অ্যানড্রুজ, কলিন্‌স, শ্যামের রাজগুরু উইনটারনিৎস, লেভি, গোস্বামী নিত্যানন্দ, জগদানন্দ ইত্যাদিকে। এঁদের কেউই রসস্রষ্টা ছিলেন না, এমন কি যে দিনেন্দ্রনাথ সঙ্গীতে, কাব্যে অসাধারণ সৃজনশক্তি ধরতেন তিনি পর্যন্ত তাঁর নিজস্ব সৃজনশক্তির দ্বার রুদ্ধ করে সব ক্ষমতা নিয়োজিত করেছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের রক্ষণাবেক্ষণ কর্মে। একমাত্র নন্দলালই এই পরিপূর্ণ পাণ্ডিত্যময় বাতাবরণের মাঝখানে অপ্রমত্ত চিত্তে আপন সৃষ্টিকর্মে নিয়োজিত ছিলেন।

রবি নন্দ সম্মেলন যেন মণিকাঞ্চন সংযোগ। এ তত্ত্ব অনস্বীকার্য যে রস কি, চিত্রে প্রাচীরগাত্রে তথা দৃশ্যমান কলার অন্যান্য মাধ্যমে তাকে কি প্রকারে মূর্ময় করা যায় এ-সম্বন্ধে নন্দলাল তাঁর গুরু অবনীন্দ্রনাথের কাছে উৎকৃষ্টতম শিক্ষাদীক্ষা লাভ করেন। তাই নন্দলাল শান্তিনিকেতনে আগমন করার পূর্বেই বঙ্গদেশ তথা ভারতে সুপরিচিত ছিলেন ও পশ্চিমের বহু সদাজাগ্রত রসিকজনের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু কবিগুরুর নিত্যালাপী সখা, সহকর্মী ও শিষ্য রূপে শান্তিনিকেতনে আসন গ্রহণ করার পর তাঁর চিন্ময়ভুবন ধীরে ধীরে সমৃদ্ধতর হতে লাগলো ও রবীন্দ্রাহূত পণ্ডিতমণ্ডলীর সংস্পর্শে এসে তিনি এমন সব বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হলেন যেগুলো সচরাচর আর্টিস্টকে আকৃষ্ট করে না। একটি মাত্র উদাহরণ নিবেদন করিঃ দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন, বিশ্বভারতীর সাহিত্য সভায় তথা অন্যান্য জ্ঞানচক্রে শতাধিক-বার আলোচনা করেছেন, তর্কবিতর্ক উদ্বুদ্ধ করেছেন। ১৯২১ থেকে পূর্ণ

www.BanglaBook.org

কুড়িটি বৎসর এসব সম্মেলনে নন্দলাল উপস্থিত থাকতেন, কিন্তু আমি তাঁকে কখনো (১৯২১-২৬) এ সবেতে অংশগ্রহণ করতে দেখি নি।

অথচ ১৯৩৬/৩৭-এ বরোদার মহারাজা যখন তাঁকে সেখানকার কীর্তি-মন্দিরে দেয়ালছবি (মুরাল) আঁকতে অনুরোধ করলেন তখন তিনি চার দেয়ালে এঁকে দিলেন 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা'। ১। 'গঙ্গাবতরণ' (গঙ্গা বিনা যে ভারতে আর্যসভ্যতার পত্তন ও বিকাশ হত না সে কথা বলাই বাহুল্য), ২। 'কুরুক্ষেত্র', ৩। 'নটির পূজা', ৪। 'মীরাবাঈ' ('সন্তন সঙ্গ বৈঠ বৈঠ লোক লাজ খোঈ'—চিত্রে)। আর্য, হিন্দু, বৌদ্ধ, মধ্যযুগীয় ভক্তি এই চার দৃষ্টিবিন্দু থেকে নন্দলাল দেখেছেন ভারতের সমগ্র ইতিহাস।

কিন্তু এহ বাহ্য। আসলে যদ্যপি চিত্রের মাধ্যমে রসসৃষ্টি সম্বন্ধে নন্দলাল পরিপূর্ণ শিক্ষাদীক্ষা গুরু অবনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পেয়েছিলেন, সে রস কাব্যে, সঙ্গীতে, নৃত্যে কি ভাবে প্রকাশ পায় সেটি তিনি দেখতে পেলেন দিনের পর দিন, বহু বৎসর ধরে শান্তিনিকেতনে। রসের প্রকাশে কোন্ কলার অধিকার কতখানি নন্দলাল সে সম্বন্ধে পরিপূর্ণ মাত্রায় সচেতন হলেন শান্তিনিকেতনে, রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যে। কারণ রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত আলঙ্কারিকের (নন্দনতত্ত্বজ্ঞের) ন্যায় রস নিয়ে আলোচনা করার সময় নিজেকে সাহিত্য, সঙ্গীত বা নাট্যরসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতেন না। স্বনামধন্যা স্টেলা ক্রামরিশের সঙ্গে তিনি দিনের পর দিন রস নিয়ে যে আলোচনা (হোয়াট ইজ আর্ট?) করেন তাতে টলস্টয়ের অলঙ্কার শাস্ত্রও বাদ পড়তো না এবং তিনি বেটোফনের 'ক্রয়েৎসার সনাটা'-র বিরুদ্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন সেটিও উভয়ের মধ্যে আলোচিত হত। এসব আলোচনা সাধারণত হত বিশ্বভারতীর সাহিত্য সভায়—এবং নন্দলাল সে-স্থলে নিত্য-নীরব শ্রোতা। সে-সময় নন্দ-লালের চিন্তাকুটির ললাটের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেই স্পষ্ট বোঝা যেত, আর্ট সম্বন্ধে তাঁর যা ধারণা, অভিজ্ঞতা, তাঁর যা আদর্শ সেগুলোর সঙ্গে তিনি এ-সব আলোচনার মূল সিদ্ধান্ত, মীমাংসাহীন জল্পনা-কল্পনা সব কিছু মিলিয়ে দেখছেন।

স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, নৃত্য যতখানি গতিশীল (ডাইনামিক) চিত্র তত-খানি হতে পারে না। পক্ষান্তরে নটনটী রঙ্গমঞ্চ থেকে অন্তর্ধান করার সঙ্গে সঙ্গেই তার ভানুমতী থেকে যায় শুধু স্মৃতিতে—বাস্তবে সে অবলুপ্ত। কিন্তু চিত্র চোখের সামনে থাকে যুগ যুগ ধরে—এবং চিত্রের মত চিত্র হলে প্রতিবারেই যে তার থেকে আনন্দ পাই তাই নয়, প্রতিবারেই সেই প্রাচীন চিত্রে নব নব জিনিস আবিষ্কার করি, নিত্য নিত্য নবীন রসের সন্ধান পাই। তাই কোনো নৃত্য-দৃশ্য যদি চিত্রে সার্থকরূপে পরিস্ফুট করা যায়, তবে মঞ্চ থেকে অন্তর্ধান করার সঙ্গে সঙ্গে যে-চিত্রের চিরতরে অবলুপ্ত হওয়ার কথা ছিল, সে হয়ে যায় অজর অমর। কিন্তু চিত্রে সার্থকরূপে 'পরিস্ফুট' করার অর্থ, সে যেন ফটোগ্রাফ না হয়—তা হলে মনে হবে, নর্তক-নর্তকী নৃত্যকলা প্রকাশ করার সময় হঠাৎ যেন মুহূর্তের তরে পাষাণ-পুত্তলিকায় পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন। যাঁরাই নন্দলালের 'নটীর পূজা' চিত্রটি প্রাচীরগাত্রে দেখেছেন, তাঁরাই আমার সামান্য বক্তব্যটি সম্যক উপলব্ধি করতে পারবেন। সে চিত্র তো স্টাটিক নয়, 'স্তম্ভিত' নয়—বস্তুত তার দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে মনে

www.BanglaBook.org

হয়, এই বুঝি নটী আরেকখানি অলংকার গাত্র থেকে উন্মোচন করে দর্শকের দিকে, আপনারই দিকে অবহেলে উৎক্ষেপ করবে, এই বুঝি মৃদঙ্গে ভিন্ন তাল ভিন্ন লয়ের ইঙ্গিত ভেসে উঠবে আর সঙ্গে সঙ্গে নটী তার নৃত্য দ্রুততর করে দেবে, লাস্য-নৃত্য তাণ্ডবে পরিণত হবে, মন্দমন্থর 'নমো হে নমো' অকস্মাৎ অতিশয় দ্রুত 'পদযুগ ঘিরে' 'চন্দ্রভানু'র মলয়ে নৃত্যে নবীন বেশ গ্রহণ করবে।

বস্তুত আপন মনে তখন প্রশ্ন জাগবে, নন্দলাল মঞ্চে বিভাসিত যে-নৃত্য স্বচক্ষে দেখেছিলেন, সে-নৃত্য কি সত্যই এতখানি প্রাণবন্ত, উচ্ছ্বসিত—শান্ত থেকে মন্থর, মন্থর থেকে উন্মত্ত—প্লাবন বেগে ধাবিত ছিল, না তিনি অংকন করেছেন তাঁর নিজস্ব কল্পলোকের মৃন্ময় নৃত্যের আদর্শ প্রকাশ।

* * *

সুন্দরের পরিপূর্ণ আনন্দ-রূপের ধ্যানের বীজমন্ত্র নন্দলাল গ্রহণ করেন কবিগুরুর কাছ থেকে। এবং তার সর্বোচ্চ বিকাশে সে বীজের যেন কোনো চিহ্নই নেই। সে যেন পত্রপুষ্পে বিকশিত মহীরুহ।

এবং একমাত্র নন্দলালই তাঁর গুরুর উপরও প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। সকলেই জানেন, পরিপূর্ণ বৃদ্ধ বয়সে কবি রবীন্দ্রনাথ চিত্রের মাধ্যমে আপন সৃজনী-শক্তি প্রকাশ করেন। কিন্তু কবির প্রভাবে ছবির নন্দলাল তো কখনো কবিতা রচনা করেন নি!॥

১৪।৫।৬৬

খেলেন দই রমাকান্ত

ইহুদি যাজক সম্প্রদায়ের সুপুত্র শ্রীযুত লেভির সঙ্গে তাঁর বাড়িতে খানা খেতে যাচ্ছি। তাঁর আছে গল্পের অফুরন্ত ভাণ্ডার। তারই একটা ছাড়লেনঃ

"জারের আমলে রববার দিন গির্জেয় গেছে গ্রামের সবাই। রুশ জাতটা একদা ছিল বড়ই ধর্মানুরাগী! কুলোকে বলে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভূতপ্রেত-তাবিজ-কবচে-বিশ্বাসী উজবুকের ভায়রাভাই। এবং সাতিশয় পাষণ্ডেরা বলে, সেই প্রাচীন কুসংস্কারই আজ তাদের টেনে নিয়ে যায় লেনিনের দর্গায় শিণী চড়াতে। তা সে যাক্ গে—মোদ্দা কথাঃ তারা কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করে, তাদের গাঁয়ের পাদ্রি সায়েব যা বলেন তাই আপ্তবাক্য। যদ্যপি এসব পাদ্রিদের অনেকেই নিজের নামটি পর্যন্ত সই করতে পারে না—"

আমি শুধালুম, "নিরক্ষর জন গির্জায় ধর্মোপদেশ দেয় কি প্রকারে?"

বললেন, "আশ্চর্য! রাসপুতিন যে কী মাথার ঘা পায়ে ফেলে কুল্লে আড়াই আউন্স বাইবেল গলাধঃকরণ করতে পেরেছিলেন সে-সংবাদ হয় পড়ো নি, তাই জানো না। নিচ্চেভো—অর্থাৎ কুছ পরোয়া নেহী। সেই আড়াই আউন্স বাইবেল ডাইলুট করে তিনি মহারাণী জারিনা মায় জার প্রাসাদ জয় করলেন। তাঁকেও নাম সই করতে হলে ঘেমে নেয়ে কাঁই হতে হত।

আর এরই উল্টো দিক—অর্থাৎ ভালোর দিকের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ খুঁজতে হলে অন্তত তোমাকে তো আর উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু অবধি ঝাকু মারতে হবে না। তোমার নবী পয়গম্বর তো ছিলেন সম্পূর্ণ নিরক্ষর! তা সে যাক্ গে।

www.BanglaBook.org

সে রববারে পাদ্রি সায়েবের সারমন বা বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল ইহুদিরা কী অন্যায়ভাবে প্রভু যীশুকে ক্রুশের উপর খুন করলো। এ বিষয়ে বক্তৃতা শিক্ষিত অশিক্ষিত সব পাদ্রিই দেন। তফাৎ শুধু এইটুকু যে, শিক্ষিত পাদ্রি জানেন, প্রভু যীশু ক্রুশের উপর থেকে তাঁর হত্যাকারীদের ক্ষমা করে গিয়েছিলেন। তাই তিনি বক্তৃতা দেবার সময় সতত সতর্ক থাকেন, অজ্ঞ খৃষ্টানগণ যেন উত্তেজিত হয়ে ইহুদি নির্যাতন আরম্ভ না করে। কিন্তু ঐ যে রুশ পাদ্রির কথা বলছিলুম, তিনি সেদিন উঠে পড়ে লেগে গিয়েছেন, কি প্রকারে মূঢ় জনতাকে প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তোলা যায়। অবশ্য তার জন্য অত্যধিক বাগ্মিতাশক্তির কোনো প্রয়োজন নেই—কারণ রুশ দেশে আবহমান কাল থেকে ইহুদিবৈরিতা বংশানুক্রমে চলে আসছে। কাজেই সারমন শেষেই বিক্ষুব্ধ চাষীরা একজোট হয়ে ধাওয়া করলো মাঠের অন্য প্রান্তের খাস ইহুদি গ্রামটার দিকে। দূর থেকে তাদের চিৎকার হুঙ্কার শুনে ইহুদিরা ব্যাপার কি জানবার জন্য গ্রাম থেকে বেরিয়ে এল। তাদের চিৎকারে তখন পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে —'খুন করবো, ব্যাটাদের খুন করে রক্ত দিয়ে রক্তের দাদ নেব!'

সবাই একে অন্যকে চেনে। তাই ইহুদি গাঁওবুড়ারা করজোড়ে শুধালে, 'আমরা কি অপরাধ করেছি যে আমাদের খুন করবে, এতকাল ধরে পাশাপাশি গ্রামে বাস করছি—'

উত্তেজিত জনতা বললে, 'চালাকি রাখো। তোমরা আমাদের প্রভুকে খুন করেছ, তার দাদ আমরা নেবই নেব।'

যেন পরদিনের ঘটনা! লেভি গল্প বলা ক্ষান্ত দিলেন। কারণ হঠাৎ পিটির পিটির করে বৃষ্টি নামলো। এই পোড়ার দেশে মনসুন নেই বলে বারো মাসের যে কোনো দিন আচমকা বৃষ্টি নামে। আমি বললাম, "চলুন, হ্যার ডক্টর, ট্রাম শেড-এ আশ্রয় নি।"

বললেন, "ছোঃ! কিস্‌সু জানো না। ইহুদিরা ছাতা কেনে না কেন, তার খবর রাখো? খৃষ্টানদের বিশ্বাস, ইহুদিরা এমনই দুর্দান্ত চালাক যে, বৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে জামাকাপড় বাঁচিয়ে দিব্য চলাফেরা করতে পারে। তারপর কি বলছিলুম?—সেই রুশ ইহুদিদের কথা। তারা ছিল সত্যই চালাক! চট করে ভেবে নিয়ে দেখলে, ঐ সব জড়ভরত কেরেস্তান রুশদের বোঝানো হবে অসম্ভব, ঘটনাটা ঘটেছে দু'হাজার বছর পূর্বে, রুশ দেশে নয়—বহু দূর-দূরান্তের প্যালেস্টাইনে—যারা মেরেছিল, তারা সেই দেশ ছেড়ে কবে কোন্ আদ্যিযুগে ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর সর্বত্র, বিয়ে করেছে জাতেরেজাতে—এখন যাদের ঠ্যাঙাতে যাচ্ছো—"

আমি বললুম, "বুঝেছি। খেলেন দই রমাকান্ত, সবকারের বেলা গোবিন্দন!"

লেভি বললেন, "লাখ কথার এক কথা!"

অতএব ইহুদি ডাঙরিয়ারা হন্তদন্ত হয়ে বললে, 'ইহুদিরা প্রভু যীশুকে না হক্ক খুন করেছিল, এ তো অতিশয় সত্য কথা—বিশ্ব-সংসার জানে। কিন্তু ভাই, তোমরা করেছ ভুল। আমরা, এ গাঁয়ের লোক, ওঁকে মারি নি—তা কখনো পারি! মেরেছে—' বলে আঙুল দিয়ে দেখালে পাশের গাঁ। বলল, 'মেরেছে ঐ ও—ই গাঁয়ের ইহুদি রাস্কেলরা। বুঝলে তো ভায়া?" বলে লেভি

www.BanglaBook.org

গম্ভীর হয়ে গেলেন।

আমি একগাল হেসে বললাম, "যা শত্রু পরে পরে। কিন্তু গল্পটা তো সে রকম ঝাঁঝালো না—আপনার সেদিনকার রাশ্বি, জানলার শার্সি আর আয়নাতে তফাৎ নিয়ে গল্পটার মত?"

লেভি বললেন, "ক্যারেকটারিস্টিক গল্পের ফান্‌কশন হচ্ছে কোনো বিশেষ জাত বা শ্রেণী বা যা-ই হোক না কেন, তার ক্যারেকটার, তার বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা। ভেড়ার বাচ্চা আর নেকড়ে বাঘের মধ্যে তর্কাতর্কি নিয়ে যে গল্প ঈসপ লিখেছেন, সেটাতে ঝাঁঝ কোথায়? কিন্তু গল্পটা সাতিশয় ক্যারেকটারিস্টিক—অর্থাৎ ভেড়া আর নেকড়ের ক্যারেকটার ওতে চমৎকার ফুটে উঠেছে—নইলে গল্পটা দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়লো কি করে, আর এত যুগ ধরে বেঁচে আছেই বা কি করে? আমি রুশ ইহুদিদের সম্বন্ধে যে গল্পটা বললুম—গল্প না হয়ে সত্য ঘটনাও হতে পারে—সেটা কিন্তু সর্ব-ইহুদিদের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। বিপদকালে তারা এক হতে তো জানেই না, বরঞ্চ নিজেকে বাঁচাবার জন্য জাতভাই অন্য ইহুদিকে বিসর্জন দিতেও তার বাধে না।"

আমি বললুম, "উঁহু।"

"মানে?"

আমি বললুম, "আমার দেশ বাঙলার উত্তর প্রান্তে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁদের সম্বন্ধে বলা হয়, স্বার্থ থাক আর নাই থাক তাঁরা একে অন্যের সাহায্য কস্মিনকালেও করেন না। একটা নদী পেরুবার সময় নাকি পর পর পাঁচজন ব্রাহ্মণ একটা পাথরে ঠোক্কর খান, কিন্তু কেউই পরের জনকে হুঁশিয়ার করে দেবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। শেষটায় একজন যখন 'বাপ রে' বলে অন্যদের সাবধান করে দিলে, তখন তাঁরা সবাই সমস্বরে চিৎকার করে বললেন, 'ব্যাটা নিশ্চয়ই আমাদের শ্রেণীর ব্রাহ্মণ নয়।' তখন ধরা পড়লো, সত্যি সে অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণ—বর্ণচোরা আঁবের মত এঁদের সঙ্গে মিশে এঁদেরই একজন হতে চেয়েছিল। গল্পটা আপনারই সংজ্ঞা অনুযায়ী খুবই ক্যারেকটারিস্টিক বটে, কিন্তু আমার মনে এ বাবদে একটা ধোঁকা রয়ে গেছে।"

লেভি বললেন, "তুমি দেখ হেরোডকেও হেরোডত্ব শেখাতে চললে—অর্থাৎ যারে বলে গুরুমারা বিদ্যেতে ওস্তাদ হয়ে উঠছো। বুঝিয়ে বলো।"

আমি বললাম, "যে ব্রাহ্মণ শ্রেণীর গল্পটি আপনাকে বললাম, তাঁরা যে অতিশয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ধরেন, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, এবং বুদ্ধিমান জীব মাত্রেই ঐক্যে বিশ্বাস করে। তাই আমি বহুকাল ধরে পর্যবেক্ষণ করে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছলুম, এঁরা একে অন্যকে খুবই সাহায্য করে থাকেন—যে রকম ফ্রীমেসনরা একে অন্যের প্রতি বড়ই সদয়—কিন্তু যে সাহায্যটি করেন অতিশয় সঙ্গোপনে। এবং অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণরা যাতে করে এ-তত্ত্বটি আবিষ্কার না করতে পারেন, তাই তাঁরা নিজেরাই বাজারে বহ্বাধিক কামুফ্লাজ গল্প ছেড়েছেন এই মর্মে যে, তাঁদের ভিতর মারাত্মক ঐক্যাভাব। তাই আমার মনে হয়, আপনি যে গল্প দিয়ে প্রমাণ করতে চাইলেন, ইহুদিরা সঙ্ঘবদ্ধ হয় না, সেটা স্বয়ং ইহুদিরাই তৈরি করেছেন, খৃষ্টানদের সন্দেহ না জাগানোর জন্য।"

ইহুদি আর স্কচমেনের একটা মহৎ গুণ—তাদের নিয়ে কেউ রসিকতা করলে সেটা তারা উপভোগ করতে পারে। লেভি আমার সত্য-সিদ্ধান্ত শুনে

www.BanglaBook.org

হেসে বললেন, "এটা আজ খানা-টেবিলে আমি পেশ করবো। দেখি, ঠাকুন্দা-বাবা কি বলেন। কিন্তু জানো, এর থেকে একটা গুরুতর সমস্যায় উপনীত হওয়া যায়। তুমিই সেদিন প্রশ্ন করেছিলে, ইহুদিরা যে প্যালেস্টাইনে 'হোম' বানাতে চায়, সেটা ভালো না মন্দ? আমি বলেছিলুম, সময় এলে আলোচনা করা যাবে। তাই এস্থলে প্রশ্ন শুধানো যায়, পৃথিবীর সব ইহুদি এই হোম চায় কিনা? এই দাবির পিছনে কি তারা ঐক্যবদ্ধ? তোমার প্যারা কবি হাইনে একদা এই আন্দোলনের সঙ্গে—ঠিক ঠিক বলতে গেলে ঐ আন্দোলনের আলোচনাচক্রের সঙ্গে—সংযুক্ত হন। কিন্তু কিছুদিনের ভিতরই তিনি সে-চক্র থেকে নিজেকে মুক্ত করে ফেলেন। তার থেকে অবশ্য এটা বলা চলে না, প্যালেস্টাইনে ইহুদি হোম নির্মাণের ব্যাপারে তাঁর কোনো ঔৎসুক্য ছিল না। আসলে ব্যাপারটা অন্য ধরনের; সংখ্যালঘুদের ভিতর এক রকম লোক থাকে, যারা আপন সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতর নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখতে চায় না—তারা ভাবে, বাড়িতে বাপ-ভাই তো সে-গণ্ডি বানিয়ে রেখেছেনই, বাইরে গিয়েও তাঁদেরই জাতভাইদের সঙ্গে মিশে কি লাভ? আমার মনে হয়, হাইনের বেলা হয়েছিল তাই।" তারপর হঠাৎ রাস্তার উপরই থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, "তোমার দেশে তুমিও তো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক। তুমি দেশে কাদের সঙ্গে মেলামেশা করো?" উত্তর দেবার পূর্বেই তিনি বললেন, "এ বিষয় নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা চলতে পারে, অতএব এটা এখন মুলতুবী থাক, কারণ বাড়ি পৌঁছে গিয়েছি।"

বাউমশুলে আলের শেষ প্রান্তে ছোট্ট একখানা ছিমছাম তেতলা বাড়ি।

ল্যাচ-কী দিয়ে দরজা খুলে বললেন, "স্বাগত জানাই তোমাকে। মঙ্গল হোক, জয় হোক তোমার। তোমার বংশধর যেন অসংখ্য হয়।॥"

২১।৫।৬৬

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

চতুরঙ্গ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

রবি-পুরাণ

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে প্রচুর বক্তৃতা প্রচুরতর প্রবন্ধ এবং অল্প-বিস্তর বেতার কার্যকলাপের ব্যবস্থা এদেশের গুণী-জ্ঞানীরা করে থাকেন। সেই অবসরে কেউ কেউ আমাকেও স্মরণ করেন। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে এঁরা আমার কল্যাণ কামনা করেন ; সরল জনের পক্ষে অনুমান করা অসম্ভব নয় যে এই করে হয়তো দেশে আমার নামটা কিঞ্চিৎ ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু আসলে যাঁরা আমাকে স্মরণ করেন তাঁরা আমার প্রাণের বৈরী। এঁরা আমাকে সর্বজনসমক্ষে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলতে চান, 'দেখো, এ লোকটা কত বড় গণ্ডমূর্খ ; কবিগুরুর সংস্পর্শে এসেও এর কিছু হল না। সাধে কি আর তুলসীদাস রামচরিতমানসে বলেছেন,

"মূরখ হৃদয় ন চেৎ, যদপি মিলয়ে
গুরু বিরিঞ্চি শত"
"শত ব্রহ্মা গুরুপদ নিলেও মূর্খের
হৃদয়ে চেতনা হয় না"

আমি মূর্খ হতে পারি কিন্তু এতখানি মূর্খ নই যে তাঁদের দুষ্টবুদ্ধিজাত নষ্টামির চিন্তা ধরতে পারবো না।

তাই ঐ সময়টায় আমি গা-ঢাকা দিয়ে থাকি। নিতান্ত কারো সঙ্গে দেখা হলে বলি, এন্‌জাইনা থ্রম্‌বোসিস হয়েছে। এন্‌জাইনা পিক্‌টরিস্‌ কিংবা করোনারি থ্রম্‌বোসিস-এর যে কোনো একটার নাম শুনলেই সুস্থ মানুষের হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম করে—আমার ঐ দ্বন্দ্ব সমাস শুনে আমাকে তখন আর কেউ বড় একটা ঘ্যাঁটায় না।

অথচ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলবার সাধ যে আমার হয় না, তাও নয়। অবশ্য তাঁর কাব্য, নাট্য কিম্বা জীবনদর্শন সম্বন্ধে নয়। অতখানি কাণ্ডজ্ঞান বা কমনসেনস্‌ আমার আছে। আমার বলতে ইচ্ছে করে সেই জিনিস, ইংরিজিতে যাকে বলে লাইটার সাইড। এই যেমন মনে করুন, তিনি গল্প-গুজোব করতে ভালোবাসতেন কিনা, প্রিয়জনের সঙ্গে হাস্যপরিহাস করতেন কিনা, ডাইনিঙ্ক-রুমে বসে চেয়ার টেবিলে ছুরিকাঁটা দিয়ে ছিমছাম ভাবে সায়েবী কায়দায় খেতেন, না রান্নাঘরের বারান্দায় হাপুস-হুপুস শব্দে মাদ্রাজী স্টাইলে পাড়া সচকিত করে পর্বটি সমাধান করে সর্বশেষে কাবুলী কায়দায় ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ঢেঁকুর তুলতে তুলতে বাঙালী কায়দায় চাঁট ফটফটিয়ে খড়কের সন্ধানে বেরতেন? কেউ তাঁকে প্রেমপত্র লিখলে তিনি কি করতেন? কিম্বা ডিহি শ্রীরামপুর দুই নম্বর বাই লেন তাদের কম্বল-বিতরণী সভায় তাঁকে প্রধান অতিথি করার জন্য ঝুলাঝুলি লাগালে তিনি সেটা এড়াবার জন্য কোন্‌ পন্থা অবলম্বন করতেন? কিম্বা কেউ টাকা ধার চাইলে?

ভালোই হল টাকা ধারের কথা মনে পড়ল।

'দেহলী'র উপরে থাকতেন তিনি, নীচের তলায় তাঁর নাতি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ওরফে দিনুবাবু।

তাঁরই বারান্দায় বসে আশ-কথা-পাশ-কথা নানা কথা হচ্ছে। হতে হতে টাকা ধার নেওয়ার কথা উঠলো। হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ বললেন, "বুঝলি দিনু,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার কাছ থেকে একবার একজন লোক দশ টাকা ধার নিয়ে গদগদ কণ্ঠে বললে, 'আপনার কাছে আমি চিরঋণী হয়ে রইলুম"।' সভায় যাঁরা ছিলেন তাঁরা পয়েণ্টটা ঠিক কি বুঝতে না পেরে চুপ করে রইলেন। আফ্টার অল্, গুরুদেবের পক্ষেও কালে-কস্মিনে কাঁচা রসিকতা করা অসম্ভব নাও হতে পারে।

খানিকক্ষণ পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে গুরুদেব বললেন, 'লোকটার শত-দোষ থাকলেও একটা গুণ ছিল। লোকটা সত্যভাষী। কথা ঠিক রেখেছিল। চিরঋণী হয়েই রইল।'

শ্রীযুত বিধুশেখর শাস্ত্রী, নেপালচন্দ্র রায় ইত্যাদি মুরুব্বীরা অট্টহাস্য করেছিলেন। আমরা, অর্থাৎ চ্যাংড়ারা, থামের আড়ালে ফিক্‌ফিক্ করে-ছিলুম।

এ গল্পটি আমি একাধিক লোকের মারফৎ পরেও শুনেছি। হয়তো তিনি গল্পটি একাধিক সভা-মজলিসে বলেছেন। এবং গল্পটি আদৌ তাঁর নিজের বানানো না অন্যের কাছ থেকে ধার নেওয়া সে-কথাও হলফ করে বলতে পারবো না। কারণ কাব্যানুশাসনের টীকা লিখতে গিয়ে আলঙ্কারিক হেমচন্দ্র বলেছেন, 'নাস্ত্যা চৌরঃ কবিজন নাস্ত্যা চৌরো বণিক্‌জনঃ'—অর্থাৎ 'বড় বিদ্যাটি বিলক্ষণ রপ্ত আছে স্যাকরার এবং কবি মাত্রেরই।

তা হক। মহাকবি হাইনরিষ্ হাইনে তাতে কণামাত্র আপত্তি না তুলে বলেছেন, 'যারা কবির রচনাতে "নির্ভেজাল" অরিজিনালিটি খোঁজে তারা চিবাক মাকড়ের জাল, কারণ একমাত্র মাকড়ই তার জালটি তৈরি করে আপন পেটের মাল দিয়ে, ষোল আনা অরিজিনাল ; আমি কিন্তু খেতে ভালোবাসি মধু, যদিও বেশ ভালো ভাবেই জানি মধুভাণ্ডের প্রতিটি ফোঁটা ফুলের কাছ থেকে চোরাই করা মাল।'

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রচলিত গল্পের ভিতর আমার সব চেয়ে ভালো লাগে 'গুরুদেব-ভাণ্ডারে' কাহিনী! অবশ্য আমার মনে হয়, গল্পটির নাম 'ভাণ্ডারে গুরুদেব' কাহিনী দিলে ভালো হয়, কারণ কাহিনীটি সম্পূর্ণ নির্ভর করছে, ভাণ্ডারের একটি সৎকর্মের উপর। তুলনা দিয়ে বলতে পারি, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু যখন তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার জগজ্জন সম্মুখে প্রকাশ করলেন তখন কালা আদমির কেরদানী বরদাস্ত না করতে পেরে ইংরেজ আবিষ্কারটার নামকরণ করলে 'আইনস্টাইন-বোস থিয়রি'। স্বয়ং আইনস্টাইন তখন নাকি প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলেন, ওটার নাম হয় হবে শুধু মাত্র 'বোস থিয়রি' নয় 'বোস-আইনস্টাইন থিয়রি'। এ-সব অবশ্য আমাদের শোনা কথা। ভুল হলে পুজোর বাজারের বিলাস বলে ধরে নেবেন।

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ইংরেজ পছন্দ করতো না বলে শান্তিনিকেতন আশ্রমটিকে নষ্ট করার জন্য ইংরেজ একটি সূক্ষ্ম গুজোব বাজারে ছড়ায়—শান্তিনিকেতনের ইস্কুল আসলে রিফরমেটরি। অন্তত এই আমার বিশ্বাস।

খুব সম্ভব তারই ফলে আশ্রমে মারাঠী ছেলে ভাণ্ডারের উদয়।

ইস্কুলের মধ্য বিভাগে বীথিকা-ঘরে ভাণ্ডারে সীট পেল। এ ঘরটি এখন আর নেই তবে ভিতটি স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। তারই সমুখ দিয়ে গেছে শালবীথি। তারই এক প্রান্তে লাইব্রেরি, অন্য প্রান্তে দেহলী। গুরুদেব তখন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থাকতেন দেহলীতে।

দেহলী থেকে বেরিয়ে, শালবীথি হয়ে গুরুদেব চলেছেন লাইব্রেরীর দিকে। পরনে লম্বা জোব্বা, মাথায় কালো টুপি। ভাণ্ডারে দেখামাত্রই ছুটলো তাঁর দিকে। আর সব ছেলেরা অবাক। ছোকরা আশ্রমে এসেছে দশ মিনিট হয় কি না হয়। এরই মধ্যে কাউকে কিছু ভালো-মন্দ না শুধিয়ে ছুটলো গুরুদেবের দিকে।

আড়াল থেকে সবাই দেখলে ভাণ্ডারে গুরুদেবকে কি যেন একটা বললে। গুরুদেব মৃদু হাস্য করলেন। মনে হল যেন অল্প অল্প আপত্তি জানাচ্ছেন। ভাণ্ডারে চাপ দিচ্ছে। শেষটায় ভাণ্ডারে গুরুদেবের হাতে কি একটা গুঁজে দিলে। গুরুদেব আবার মৃদু হাস্য করে জোব্বার নিচে হাত চালিয়ে ভিতরের জেবে সেটি রেখে দিলেন। ভাণ্ডারে এক গাল হেসে ডরমিটরিতে ফিরে এল। প্রণাম না, নমস্কার পর্যন্ত না।

সবাই শুধালে, 'গুরুদেবকে কি দিলি?'

ভাণ্ডারে তার মারাঠী-হিন্দীতে বললে, 'গুরুদেব কৌন্? ওহ্ তো দরবেশ হৈ।'

'বলিস কি রে, ও তো গুরুদেব হ্যায়!

'ক্যা "গুরুদেব" "গুরুদেব" করা হৈ। হম্ উসকো এক অঠ্ঠন্নী দিয়া।

বলে কি? মাথা খারাপ না বদ্ধ পাগল? গুরুদেবকে আধুলি দিয়েছে!

জিজ্ঞেসাবাদ করে জানা গেল, দেশ ছাড়ার সময় ভাণ্ডারের ঠাকুরমা তাকে নাকি উপদেশ দিয়েছেন, সন্ন্যাসী দরবেশকে দানদক্ষিণা করতে। ভাণ্ডারে তাঁরই কথামত দরবেশকে একটি আধুলি দিয়েছে। তবে হ্যাঁ, দরবেশ বাবাজী প্রথমটায় একটু আপত্তি জানিয়েছিল বটে, কিন্তু ভাণ্ডারে চালাক ছোকরা, সহজে দমে না, চালাকি নয়, বাবা, একটি পুরী অঠ্ঠন্নী!

চল্লিশ বছরের আগের কথা। অঠ্ঠন্নী সামান্য পয়সা, এ-কথা কেউ বলে নি। কিন্তু ভাণ্ডারেকে এটা কিছুতেই বোঝানো গেল না যে তার দানের পাত্র দরবেশ নয়, স্বয়ং গুরুদেব।

ভাণ্ডারের ভুল ভাঙতে কতদিন লেগেছিল আশ্রম পুরাণ এ-বিষয়ে নীরব। কিন্তু সেটা এ-স্থলে অবান্তর।

ইতিমধ্যে ভাণ্ডারে তার স্বরূপ প্রকাশ করেছে। ছেলেরা অস্থির, মাস্টাররা জ্বালাতন, চতুর্দিকে পরিত্রাহি আর্তরব।

হেডমাস্টার জগদানন্দবাবু এককালে রবীন্দ্রনাথের জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করেছিলেন। লেঠেল-ঠ্যাঙানো ছিল তাঁর প্রধান কর্ম। তিনি পর্যন্ত এই দুঁদে ছেলের সামনে হার মেনে গুরুদেবকে জানালেন।

আশ্রম-স্মৃতি বলেন, গুরুদেব ভাণ্ডারেকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ রে, ভাণ্ডারে, এ কি কথা শুনি?'

ভাণ্ডারে চুপ।

গুরুদেব নাকি কাতর নয়নে বললেন, 'হ্যাঁরে ভাণ্ডারে, শেষ পর্যন্ত তুই এসব আরম্ভ করলি? তোর মত ভালো ছেলে আমি আজ পর্যন্ত দেখি নি। আর তুই এখন আরম্ভ করলি এমন সব জিনিস যার জন্য সকলের সামনে আমাকে মাথা নিচু করতে হচ্ছে। মনে আছে, তুই যখন প্রথম এলি তখন কি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রকম ভালো ছেলে ছিলি? মনে নেই, তুই দান-খয়রাত পর্যন্ত করতিস? আমাকে পর্যন্ত তুই একটি পুরো আধুলি দিয়েছিলি? আজ পর্যন্ত কত ছাত্র এল গেল কেউ আমাকে একটি পয়সা পর্যন্ত দেয় নি। সেই আধুলিটি আমি কত যত্নে তুলে রেখেছি। দেখবি?'

* * *

তার দু'এক বৎসরের পর আমি শান্তিনিকেতনে আসি। মারাঠী সঙ্গীতজ্ঞ স্বর্গীয় ভীমরাও শাস্ত্রী তখন সকালবেলার বৈতালিক লীড করতেন। তার কিছু দিন পর শ্রীযুত অনাদি দস্তিদার। তারপর ভাণ্ডারে।

চল্লিশ বছর হয়ে গিয়েছে। এখনো যেন দেখতে পাই ছোকরা ভাণ্ডারে বৈতালিকে গাইছে,

এ দিন আজি কোন্ ঘরে গো
খুলে দিল দ্বার।
আজি প্রাতে সূর্য ওঠা
সফল হল কার॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

ধর্মের ইতিহাসে দেখা যায়, কোনো সভ্য জাতির বিত্তশালী সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা কিংবা অন্য কোনো বোধ্য ভাষাতে যদি ধর্মচর্চা না থাকে তবে সে সম্প্রদায় ক্রিয়া-কর্ম ও পাল-পার্বণ নিয়েই মত্ত থাকে। এই তত্ত্বটি ভারতবাসীর ক্ষেত্রে অধিকতর প্রযোজ্য। কারণ, তারা স্বভাবতঃ এবং ঐতিহ্যবশতঃ ধর্মানুরাগী। তার কোনো বোধ্য ভাষাতে সত্যধর্মের মূল স্বরূপ সম্বন্ধে কোনো নির্দেশ না থাকলে সে তখন সব কিছু হারাবার ভয়ে ধর্মের বহিরাচরণ অর্থাৎ তার খোলস ক্রিয়াকর্মকেই আঁকড়ে ধরে থাকে।[১]

কলকাতা অর্বাচীন শহর। যে সব হিন্দু এ শহরের গোড়াপত্তনকালে ইংরেজের সাহায্য করে বিত্তশালী হন, তাঁদের ভিতর সংস্কৃত ভাষার কোনো চর্চা ছিল না। বাঙলা গদ্য তখনো জন্মলাভ করে নি। কাজেই মাতৃভাষার মাধ্যমে যে তাঁরা সত্যধর্মের সন্ধান পাবেন তারও কোনো উপায় ছিল না। ওদিকে আবার বাঙালী ধর্মপ্রাণ। তাই সে তখন কলকাতা শহরে পাল-পার্বণে যা সমারোহ করলো তা দেখে অধিকতর বিত্তশালী শাসক ইংরেজ-সম্প্রদায় পর্যন্ত স্তম্ভিত হল। এর শেষ-রেশ 'হুতোমে' পাওয়া যায়।

জাতির উত্থান-পতনেও এ অবস্থা বার বার ঘটে থাকে এবং সমগ্রভাবে বিচার করতে গেলে তাতে করে জাতির বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় না। গরীব-

---

১ বর্তমান লেখকের মনে সন্দেহ আছে, শাক্য মুনির আবির্ভাবের ঠিক পূর্বেই এই পরিস্থিতি হয়েছিল। বৈদিক ভাষা তখন প্রায় অবোধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলেই ক্রিয়াকর্ম-যাগযজ্ঞ-পশুহত্যা তখন সত্য-ধর্মের স্থান অধিকার করে বসেছিল। বুদ্ধদেব তখন এরই বিরুদ্ধে সত্যধর্ম প্রচার করেন ও সর্বজনবোধ্য লোকায়ত প্রাকৃত (পরে পালি নামে পরিচিত) ভাষার শরণ নেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুঃখীর তথা সমগ্র সমাজের জন্য এর একটা অর্থনৈতিক মূল্য তো আছে বটেই, তদুপরি এক যুগের অত্যধিক পালপার্বণের মোহকে পরবর্তী যুগের ঐকান্তিক ধ্যান-ধারণা অনেকখানি ক্ষতিপূরণ করে দেয়।

কিন্তু বিপদ ঘটে, যখন ঐ ক্রিয়াকর্মের যুগে হঠাৎ এক বিদেশী ধর্ম এসে উপস্থিত হয়, তার চিন্তাধারা তার সত্যপথ সন্ধানের আন্দোলন-আলাড়ন নিয়ে। এবং এই ধর্মজিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে যদি অন্যান্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক (কঁৎ, মিল ইত্যাদি) প্রশ্নের যুক্তিতর্কমূলক, আলোচনা-গবেষণা বিজড়িত থাকে তবে ক্রিয়াকর্মাসক্ত সমাজের পক্ষে তখন সমূহ বিপদ উপস্থিত হয়। বাঙালী সমাজের অগ্রণীগণ ইংরেজের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে গিয়ে অনেকখানি ইংরেজী শিখে ফেলেছেন এবং খৃষ্টধর্মের মূলতত্ত্ব, তার মহান আদর্শবাদ, সেই ধর্মে অনুপ্রাণিত মহাজনগণের সমাজসংস্কার প্রচেষ্টা তাঁদের মনকে বার বার বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে—তাঁদের মনে প্রশ্ন জেগেছে, আমাদের ধর্মে আছে কি, আছে তো শুধু দেখতে পাই অন্তঃসারশূন্য পূজা-পার্বণ, আর ওদের ধর্মে দেখি, স্বয়ং ভগবান পিতারূপে মানুষের হৃদয়দ্বারের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে পেলে এই অর্থহীন জীবন আপন চরম মূল্য লাভ করে, দুঃখ-দৈন্য আশা-আকাঙ্ক্ষা এক পরম পরিসমাপ্তিতে অনন্ত জীবন লাভ করে।

হিন্দুশাস্ত্রের অতি সামান্য অংশও যাঁরা অধ্যয়ন করেছেন তাঁরাই জানেন, এ সব কিছু নূতন তত্ত্ব নয়। বস্তুতঃ জীবনসমস্যা ও ধর্মে তার সমাধান এই অবলম্বন করেই আমাদের সর্বশাস্ত্র গড়ে উঠেছে। একদিকে দৈনন্দিন জীবনের অন্তহীন প্রলোভন, অন্য দিকে সত্যনিষ্ঠার প্রতি ধর্মের কঠোর কঠিন আদেশ—এ দুয়ের মাঝখানে মানুষ কি প্রকারে সার্থক গৃহী হতে পারে, সেই পন্থাই তো আমাদের শাস্ত্রকারগণ যুগে যুগে দেখিয়ে গেছেন।

কিন্তু এ সব তত্ত্ব যাঁরা জানতেন তাঁরা থাকতেন গ্রামে, তাঁরা পড়তেন পড়াতেন টোল চতুষ্পাঠীতে এবং তাঁরা ইংরেজের সংস্পর্শে আসেন নি বলে ওদের ধর্ম যে নাগরিক হিন্দুকে নানা প্রশ্নে বিচলিত করে তুলেছে সে সংবাদও তাঁদের কানে এসে পৌঁছয় নি!

আর সব চেয়ে আশ্চর্য, এই সব 'টোলো' 'বিটলে বামুন'রা যে শুধু পাদ্রী সাহেবদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে আপন ধর্মের মর্যাদা মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারতো তা নয়, তারা যে কান্ট-হেগেলের চেলাদের সঙ্গে বিশুদ্ধ দর্শনের ক্ষেত্রেও সংগ্রাম করতে প্রস্তুত ছিল—এ তত্ত্বটিও নাগরিক হিন্দুদের সম্পূর্ণ অজানা ছিল। 'ঘরের কাছে নিই নে খবর, খুঁজতে গেলাম দিল্লি শহর' লালন ফকিরের অর্থহীন গীত নয়।[২] এঁরা সত্যই জানতেন না, আমাদের টোলে শুধু স্মার্ত নন, নৈয়ায়িকও ছিলেন, এবং স্মার্তরাও যে শুধু তৈলকল্প নিয়ে বিধান দিতেন তাই নয়, তাঁরা সে বিধানের সামাজিক মূল্যও যুক্তি-তর্ক দিয়ে প্রমাণ করতে

২ শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের গাওয়া গান এরই কাছাকাছি:

আপনাতে আপনি থেকো মন যেও নাকো কারু ঘরে
যা চাবি তা বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তপুরে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, অনিল গুপ্ত সংস্করণ, ১ম খণ্ড, ২১৩ পৃঃ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারতেন।

কলকাতায় চিন্তাশীল গুণীজন তখন এই পরিস্থিতি দেখে বিচলিত হয়েছিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে এই সময় রাজা রামমোহন রায়ের উদয় হল। তাঁর ব্রাহ্ম-আন্দোলন যে বাঙালী জাতির কি পরিমাণ উপকার করেছে, এই ব্রাহ্মসমাজের কীর্তিমান পুরুষসিংহ রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যকে যে কি পরিমাণ ঐশ্বর্যশালী ও বহুমুখী করে গিয়েছেন, তার সম্পূর্ণ হিসাবনিকাশ এখনো শেষ হয় নি। বাঙালী সাধক, বাঙালী লেখক, বাঙালী পাঠক সকলেই সে-কথা স্বীকার করেছেন। স্বয়ং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন—

এদানির ব্রাহ্মধর্ম যায় ছড়াছড়ি
তাহারেও বার বার নমস্কার করি॥

'ছড়াছড়ি' শব্দে তখনকার দিনে প্রচলিত একটু ক্ষুদ্র তাচ্ছিল্য লুকানো রয়েছে। পরমহংসদেব সেটিকেও নমস্কার করেছেন।

রাজা রামমোহন খৃষ্টধর্মে মহাপণ্ডিত ছিলেন, মুসলমান ধর্মের 'জবরদস্ত মৌলবী' ছিলেন এবং সব চেয়ে বড় কথা, সে যুগে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে যে বস্তু সম্পূর্ণ অবান্তর এমন কি অন্তরায়, সেই হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অতুলনীয় ব্যুৎপত্তি এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল।

রাজা জানতেন, সে যুগের হিন্দুকে তর্ক-বিতর্ক করতে হবে খৃষ্টধর্মের সঙ্গে। অর্থাৎ খৃষ্টান মিশনারীর সামনে 'ক' অক্ষরে 'কৃষ্ণনাম' স্মরণে 'একঘটি'[৩] চোখের জল ফেললেই আপন ধর্মের মাহাত্ম্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না—খুব বেশী হলে, ভদ্র মিশনারী হয়ত তাকে ভক্ত বলে স্বীকার করবে মাত্র। তাই তাকে প্রমাণ করতে হবে যে, কলকাতার হিন্দুর ক্রিয়াকর্মের পিছনে রয়েছে, হিন্দুর ষড়দর্শন, বুদ্ধ এবং মহাবীরের বিশ্বপ্রেম এবং সর্বপশ্চাতে রয়েছে অহরহ জাজ্বল্যমান বেদবেদান্তের অখণ্ড দিব্যদৃষ্টি।

দেশের আপামর জনসাধারণের ভিতর হিন্দুধর্মের নব উন্মাদনা আনতে হলে রাজা রামমোহন হিন্দুধর্মের কোন্ কোন্ সম্পদ গ্রহণ এবং প্রচার করতেন সে কথা বলা শক্ত ; কিন্তু এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, সে যুগের কলিকাতাবাসী সুসভ্য অথচ আপন শাস্ত্রে অজ্ঞ হিন্দুর সামনে তিনি সর্বশাস্ত্র মন্থন করে উপনিষদগুলিই তুলে ধরে প্রকৃত ঋষির গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। উপনিষদ থেকেই শংকর-দর্শনের সূত্রপাত এবং শংকরের অদ্বৈতবাদ অতিশয় অক্লেশে, পরম অবহেলায় খৃষ্টানের ট্রিনিটিকে সম্মুখ সংগ্রামে আহ্বান করতে পারে। উপনিষদের গুণকীর্তন এ ক্ষুদ্র এবং অক্ষম রচনার উদ্দেশ্য নহে,—অনুসন্ধিৎসু পাঠক তুর্কী পণ্ডিত আলবীরুণী, মোগল সুফী দারাশীকুহ, (ঔরঙ্গজীবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা[৪] এবং জর্মন দার্শনিক শোপেন-

৩ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় কথার আড়।

৪ দারা তাঁর অতুলনীয় ধর্মগ্রন্থ আরম্ভ করেছেন এই বলেঃ "হে প্রভু, তুমি তোমার সুন্দর মুখ কুফ্‌র (অবিদ্যা) কিম্বা ইমান (বিদ্যা) দু'পাশের কোনো অলকগুচ্ছ (জুলুফ) দিয়ে ঢেকে রাখো নি।" এই শ্লোক ঈশোপনিষদের 'অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽ বিদ্যামুপাসতে। ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥'-রই অনুবাদ।

www.BanglaBook.org

হাওয়ারের রচনাতে তার ভূরি ভূরি উদাহরণ পাবেন।

ধর্মের যে সব বাহ্যানুষ্ঠান সত্যধর্ম থেকে অতি দূরে চলে গিয়ে অধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে তার বিরুদ্ধে রাজা সংগ্রাম আরম্ভ করলেন সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করে এবং সে সংগ্রামের জন্য তিনি অস্ত্রশস্ত্র সঞ্চয় করলেন হিন্দু স্মৃতি থেকেই। এ স্থলে রাজা বিশ্বজনীন যুক্তিতর্ক ব্যবহার না করে প্রধানতঃ ব্যবহার করলেন হিন্দুশাস্ত্রসম্মত ন্যায় এবং উদাহরণ। রাজা প্রমাণ করলেন যে তিনি দর্শনে যে রকম বিদগ্ধ, ক্রিয়াকর্মের ভূমিতেও অনুরূপ স্মার্ত মল্লবীর।

শাস্ত্রালোচনায় ঈষৎ অবান্তর হলেও এস্থলে বাংলা সাহিত্যানুরাগীর দৃষ্টি তার অতি প্রিয় একটি বস্তুর দিকে আকর্ষণ করি। রাজাকে তাঁর আন্দোলন চালাতে হয়েছিল কলকাতার বাঙালীদের ভিতর। এঁরা সংস্কৃত জানেন না। তাই তাঁকে বাধ্য হয়ে লিখতে হয়েছিল বাঙলা ভাষাতে। পদ্য এসব যুক্তি-তর্কের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বাহন। তাই তাঁকে বাঙলা গদ্য নির্মাণ করে তার-ই মাধ্যমে আপন বক্তব্য প্রকাশ করতে হয়েছিল। রাজার পূর্বে যে বাঙলা গদ্য লেখা হয় নি এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু হিন্দুধর্মের এই তুমুল আন্দোলন আকর্ষণ মন্থনের ফলে যে অমৃত বেরুল তারই নাম বাঙলা গদ্য। পৃথিবীর ইতিহাসে এ জাতীয় ঘটনা বহুবার ঘটেছে; তথাগতের কৃপায় পালি, মহাবীরের কৃপায় অর্ধমাগধী। হজরৎ মুহম্মদের কৃপায় আরবী গদ্য, লুথারের কৃপায় জর্মন গদ্যের সৃষ্টি। পূর্বেই নিবেদন করেছি, গণবোধ্য মাতৃভাষাতে শাস্ত্রালোচনা না থাকলে ক্রিয়াকর্মের আত্যন্তিক প্রসার পায় ; তার বিরুদ্ধে নবধর্ম পত্তন কিম্বা সনাতন ধর্মের সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হয় ;[৫] এবং সে আন্দোলনকে বাধ্য হয়েই গণভাষার আশ্রয় নিতে হয়।

রাজার প্রচলিত সংস্কার উপনিষদে আপনার দৃঢ়ভূমি নির্মাণ করার ফলে কতকগুলি জিনিস সে অস্বীকার করল। তার প্রথম, সাকার উপাসনা। দ্বিতীয়, বৈষ্ণবধর্মের তদানীন্তন প্রচলিত রূপ ; ক্রমে ক্রমে গণ-ধর্মের (Folk religion) প্রতি ব্রাহ্মদের অবজ্ঞা স্পষ্টতর হতে লাগল।[৬] প্রমাণ-স্বরূপ বলতে পারি, তখনকার দিনে কেন আজও যদি কেউ ব্রাহ্ম-মন্দিরের বক্তৃতা দিনের পর দিন শোনে তবু সে উপনিষদের পরবর্তী যুগের ধর্মসাধনার অল্প ইঙ্গিতই শুনতে পাবে। তার মনে হবে, উপনিষদ-আশ্রিত ধর্মদর্শনের শেষ হয়ে যাওয়ার পর আজ পর্যন্ত হিন্দুরা আর কোনো প্রকারের উন্নতি করতে পারেন

---

৫ বস্তুতঃ, সম্পূর্ণ নূতন ধর্ম পৃথিবীতে কোনো মহাপুরুষ কখনোই আরম্ভ করেন নি। বুদ্ধদেব বলতেন, তাঁর পূর্বে বহু বুদ্ধ জন্ম নিয়েছেন, মহাবীর জৈনদের সর্বশেষ তীর্থঙ্কর বা জিন। খৃষ্ট বলেন, তিনি বিধির বিধান ভাঙতে আসেন নি—তিনি এসেছেন তাকে পূর্ণরূপ দান করতে। হজরৎ মুহম্মদ বলতেন, তাঁর পূর্বে সহস্র পয়গম্বর আবির্ভূত হয়েছেন। বস্তুতঃ এঁদের কেউ বলেন নি, আমি প্রথম। প্রায় সকলেই বরঞ্চ বলেছেন, আমিই শেষ।

৬ একটা অবিশ্বাস্য গল্প শুনেছি, কোনো ব্রাহ্ম ভক্ত নাকি বদম্বতরুকে 'অশ্লীল বৃক্ষ' নাম দিয়েছিলেন। কিন্তু এর থেকে অন্ততঃ এইটুকু বোঝা যায়, হিন্দুরা ব্রাহ্মদের 'গোঁড়ামি' সম্বন্ধে তখনকার দিনে কি ধারণা পোষণ করতেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নি। এমন কি গীতার উল্লেখও আমি অল্পই শুনেছি। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের কথা প্রায় কখনোই শুনি নি। বৃন্দাবনের রসরাজ-রসমতীর অভূতপূর্ব অলৌকিক প্রেমের কাহিনী থেকে কোনো ব্রাহ্ম কখনো কোনো দৃষ্টান্ত আহরণ করেন নি।

ধর্ম জানেন, আমি ব্রাহ্মদের নিকট অকৃতজ্ঞ নই। পাছে তাঁরা ভুল বোঝেন তাই বাধ্য হয়ে ব্যক্তিগত কথা তুললুম এবং করজোড়ে নিবেদন করছি, আমি মুসলমান, আমার কাছে হিন্দু যা ব্রাহ্মও তা, আমি হিন্দু ব্রাহ্ম উভয় পন্থার (আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস পন্থা ভিন্ন নয়) সাধু-সন্তদের বার বার নমস্কার করি।

ব্রাহ্মধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ যতই অধ্যয়ন করি ততই দেখতে পাই, ব্রাহ্মরা যেন ক্রমে ক্রমেই জনগণ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলেন। জনগণকে ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত করে এক বিরাট গণ-আন্দোলন আরম্ভ করার প্রচেষ্টা যেন তাদের ভিতর ছিল না। এ যুগেও তার উদাহরণ পাই নি। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত আমি বহু ব্রাহ্ম পরিবারের আতিথ্য লাভ করেছি, ফলে গভীর হৃদ্যতা হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো ব্রাহ্ম পরিবারের হিন্দু চাকর-বাকরকে ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত করার প্রচেষ্টা দেখি নি। মুসলমান খ্রীষ্টানরা সর্বদাই করে থাকেন বলেই এটা আমার কাছে আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়েছিল। আমার মনে হয়, ব্রহ্মমন্ত্র সার্বজনীন কিন্তু এ কথাও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ব্রহ্মজ্ঞানীরা যে কোন কারণেই হোক সর্বজনকে আহ্বান জানাতে পারেন নি। মুসলমানের সমাজে মুটে-মজুর চাকর-বাকরের সংখ্যাই বেশী, হিন্দুর সংকীর্তনে ভাবোল্লাসে নৃত্য করে 'নিম্নশ্রেণী'র প্রচুর হিন্দু, আর মন্দিরে আরতির সময় শিক্ষিত হিন্দুকে তো আজকাল দেখতেই পাওয়া যায় না। অথচ পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্ম-সম্মেলনে ব্রাহ্ম চাকর-নফর দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

তার জন্য আমি ব্রহ্মবাদীদের আদৌ ত্রুটি ধরছি না। এঁরা অক্ষম ছিলেন, একথা আমি কখনো স্বীকার করবো না। আমার মনে হয়, এঁরা প্রধানতঃ সমাজের নেতৃস্থানীয়দের নিয়েই আপন আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন এবং তাঁদের মাধ্যমে যে আমাদের মত বহু হিন্দু-মুসলমান প্রচুর উপকৃত হয়েছিলেন সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে হিন্দু-ধর্মের গণরূপ তখন একেবারেই অভিভাবকহীন হয়ে পড়ল। তার জন্য ব্রাহ্মদের দোষ দিলে অত্যন্ত অন্যায় হবে; দোষ হিন্দুদের। তাঁদের নেতৃস্থানীয়েরা তখন ইয় দীক্ষা নিয়েছেন কিম্বা ব্রাহ্মদের প্রতি সহানুভূতিশীল, আপন গরীব জাত-ভাই কি ধর্মকর্ম করছে এবং তার কল্যাণে সত্যধর্মের সন্ধান পাচ্ছে কিনা এ বিষয়ে তাঁরা তখন উদাসীন। যেন গণধর্ম ধর্মই নয়, যেন ধর্মে একমাত্র শিক্ষিত জনেরই শাস্ত্রাধিকার।

অতিশয় মারাত্মক পরিস্থিতি। দেশের দশের তা হলে সর্বনাশ হয়। শিক্ষিতজনকেও শেষ পর্যন্ত তার তিক্ত ফল আস্বাদ করতে হয়।[৭]

---

৭ রাজনীতির ক্ষেত্রে এই শিক্ষিত-অশিক্ষিতের ব্যবধানের জন্য আমরা যে কি কর্মফল ভোগ করেছি, সে তথ্যের উত্থাপন এ-স্থলে অবান্তর।

www.BanglaBook.org

* * *

ঠিক সেই সময়ে করুণাময়ের কৃপায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাব।

পরমহংসদেবকে সমগ্র এবং সম্পূর্ণ ভাবে ধারণা করা আমাদের মতো অতি সাধারণ প্রাণীর পক্ষে অসম্ভব, কারণ, আমরা সব কিছুই গ্রহণ করি আমাদের বুদ্ধি দিয়ে—যুক্তিতর্কের ছাঁচে ফেলে। অথচ কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে সাধুসন্তদের ধারণা করতে গেলে আমরা পাই বরফের সেই অতি অল্প অংশ-টুকুর খবর, যেটি জলের উপর ভাসছে। অর্থাৎ বেশীর ভাগ বস্তুটি যে ষষ্ঠেন্দ্রিয় তৃতীয় চক্ষু দিয়ে দেখতে হয় সেটি আমাদের নেই। তৎসত্ত্বেও যারা তার বিচার করে তাদের নিয়ে মৃদু হাস্য করে বাউল গেয়েছেন

ফুলের বনে কে ঢুকেছে সোনার জহুরী
নিকষে ঘষয়ে কমল, আ মরি আ মরি।

যার যেমন মাপকাঠি। স্যাকরার ক্রাইটেরিয়ন তার নিকষ পাথর। সে তাই দিয়ে পদ্মফুলের গুণ বিচার করতে যায়। কিন্তু এর চেয়েও মারাত্মক অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন স্বয়ং পরমহংসদেব—একাধিক বার। নুনের পুতুল সমুদ্রে নেমেছিল তার গভীরতা মাপবে বলে। তিন পা যেতে না যেতেই সে গলে গিয়ে জলের সঙ্গে মিশে গেল।[৮]

তাই নিয়ে কিন্তু কিছুমাত্র শোক করার প্রয়োজন নেই। স্বয়ং রামকৃষ্ণদেবই বলেছেন, তোমার এক ঘটি জলের দরকার। পুকুরে কত জল তা জেনে তোমার কি হবে?[৯]

তাই মা ভৈঃ। যারা বলে আমাদের মত পাপীতাপীর অধিকার নেই পরমহংসের মত মহাপুরুষের জীবন নিয়ে আলোচনা করার—তারা ভুল বলে। অধিকার আমাদেরই—এক মহাপুরুষ অন্য মহাপুরুষের জীবনী লিখতে যাবেন কেন? সে অধিকার গ্রহণ করতে গিয়ে ভুল-ত্রুটি হলে মহাত্মাদের কিছু-মাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। হীন প্রাণকে নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

পরমহংসদেবের কাছে আসার পূর্বেই চোখে পড়বে, লোকটি কী সরল। এগিয়ে এলে বোঝা যায়, বাহির ভিতর দুই-ই সরল। এঁর শরীরটি যেমন পরিষ্কার, এঁর মনটিও তেমনি পরিষ্কার। মেদিনীপুর অঞ্চলে যাকে বলে 'নিখিরকিচ'—চাঁচা-ছোলা। যেন এইমাত্র তৈরী হয়েছে কাঁসার ঘটিটি—কোন জায়গায় টোল পড়ে নি।

এঁর মত সরল ভাষায় কেউ কখনো কথা বলে নি। এঁর ভাষার সঙ্গে সব চেয়ে বেশী সাদৃশ্য খ্রীষ্টের ভাষা ও বাক্যভঙ্গীর। আমাদের দেশের এক আলঙ্কারিক বলেছেন, 'উপমা কালিদাসস্য'। এর অর্থ শুধু এই নয় যে কালিদাস উত্তম উপমা প্রয়োগ করতে পারতেন, এর অর্থ উপমামাত্রই কালিদাসের,

---

৮ আমাদের ব্যক্তিগত প্রার্থনা, তাই যেন হয়। বাউল গেয়েছেন, 'যে জন ডুবলো, সখী, তার কি আছে আর বাকি গো?' ঠাকুর প্রায়ই গাইতেন 'ডোব ডোব, ডোব।'

৯। এক চীনা সাধক এরই কাছাকাছি এসে বলেছেন, 'মাই কাপ্ ইজ স্মল; বাট্ আই ড্রিঙ্ক অফনার।'

www.BanglaBook.org

অর্থাৎ উপমার রাজ্যে কালিদাস একচ্ছত্রাধিপতি। আমার মনে হয়, উপমা-বৈচিত্র্যে পরমহংসদেব কালিদাসকেও হার মানিয়েছেন। কালিদাস ব্যবহার করেছেন শুধু সুন্দর মধুর তুলনা—যেগুলো কাব্যের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে। রামকৃষ্ণের সেখানে কোনো বাছ-বিচার ছিল না। ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে, 'তার জাঁতায় যাই ফেলো না কেন, ময়দা হয়ে বেরিয়ে আসে।' পরমহংসের বেলাও ঠিক তাই। কিছু একটা দেখলেই হল। সময়মত ঠিক সেটি উপমার আকার নিয়ে বেরিয়ে আসবে। এমন কি, যেসব কথা আমরা সমাজে বলতে কিন্তু কিন্তু করি, পরমহংসদেব সর্বজনসমক্ষে অক্লেশে সেগুলো বলে যেতেন। ভগবানকে পেতে হলে কি ধরনের 'বেগে'র প্রয়োজন সে সম্বন্ধে তাঁর তুলনাটির উল্লেখ এখানে না-ই বা করলুম।

ঠিক এইখানেই আমরা একটি মূল সূত্র পাব। তিনি জনগণের ধর্ম (ফোক রিলিজিয়ন), আচার-ব্যবহার, ভাষা—সব জিনিসকেই তার চরম মূল্য দেবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন বলেই জনগণের ভাষা, বাচনভঙ্গী সানন্দে ব্যবহার করে যেতেন। জনগণের অন্যায় অধর্ম তিনি স্বীকার করতেন না। কিন্তু যেখানে সুদ্ধমাত্র রুচির প্রশ্ন সেখানে তিনি 'ধোপদুরস্ত' 'ফিটফাট' হবার কোনো প্রয়োজন বোধ করতেন না। ভাষাতে সেদিনকার 'ছুঁৎবাই' রোগ আমরা পেয়েছিলুম ভিক্টোরীয় পুরিটানিজম থেকে—তখন কে জানতো পঞ্চাশ বছর যেতে-না-যেতেই লরেন্স জয়েস এসে আমাদের ছুঁৎবাইয়ের 'ভন্ডামি' লন্ডভন্ড করে দেবেন।[১০]

পরমহংসদেব গণধর্ম স্বীকার করে তার চরম মূল্য দিলেন। সাকার উপাসনা গণধর্মের প্রধান লক্ষণ। বাঙালী সেই সাকারের পূজা করে প্রধানতঃ কালীরূপে। কালীমূর্তি দেখলে অ-হিন্দু রীতিমত ভয় পায়। পরমহংসদেব সেই কালীকে স্বীকার করলেন।

অথচ 'দূরের কথা' বিচার করলে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি বলে পরমহংসদেব আসলে বেদান্তবাদী। কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, এ-তিন মার্গ তিনি আস্থাভেদে একে ওকে বরণ করতে বলেছেন। কিন্তু সব কিছু বলার পর তিনি সর্বদাই বলেছেন, 'কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ব্রহ্ম ব্যতীত সব কিছু মিথ্যা বলে অনুভব করতে পারো নি ততক্ষণ পর্যন্ত সাধারণ সর্বোচ্চ স্তরে উঠতে পারবে না।' 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' বড় কঠিন পথ। জগৎ মিথ্যা হলে তুমিও মিথ্যা, যিনি বলেছেন তিনিও মিথ্যা, তাঁর কথাও স্বপ্নবৎ। বড় দূরের কথা।

'কি রকম জানো, যেমন কর্পূর পোড়ালে কিছুই বাকী থাকে না। কাঠ পোড়ালে তবু ছাই বাকী থাকে। শেষ বিচারের পর সমাধি হয়। তখন

১০। বিদ্যাসাগর মহাশয় এ স্বল্পের সমাধান না করতে পেরে দু'রকম ভাষাই ব্যবহার করতেন। 'সীতার বনবাসে'র ভাষা সকলেই চেনেন, কিন্তু যেখানে তিনি রামা-শ্যামাকে বিধবা-বিবাহের শত্রুদের বিপক্ষে ক্ষেপাতে চেয়েছেন, সেখানে 'কস্যচিৎ ভাইপোস্য' এই বেনামীতে, 'ফাজিল-চালাক', 'দিলদরিয়া তুখোড় ইয়ার' তাঁর একটি বেদড়া মন্ত্রী আছে—এটি তারই ত্যাঁদড়ামি', 'লোকটা লক্ষ্মীছাড়া বক্কেশ্বর আনাড়ির চূড়ামণি বে-অকুফের শিরোমণি'। ইত্যাদি 'গ্রাম্য' বাক্য পরমানন্দে ব্যবহার করেছেন। তিনি যে-সব আদিরসাত্মক গল্প ছাপায় (!) প্রকাশ করেছেন সেগুলো সমাজে বললে এখনও সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমি" "তুমি", "জগৎ", এ সবের খবর থাকে না।'

অথচ গণধর্মে নেমে এসে বলেছেন, 'যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী'। যখন নিষ্ক্রিয়, তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এইসব কাজ করেন, তাকে শক্তি বলে কই। স্থির জল ব্রহ্মের উপমা। জল হেলছে দুলছে শক্তি বা কালীর উপমা। কালী 'সাকার আকার নিরাকারা'। তোমাদের যদি নিরাকার বলে বিশ্বাস, কালীকে সেইরূপ চিন্তা করবে।[১১] আর একটি কথা—তোমার নিরাকার বলে যদি বিশ্বাস, দৃঢ় করে তাই বিশ্বাস করো কিন্তু মতুয়ার (dogmatism) বুদ্ধি করো না। তাঁর সম্বন্ধে এমন কথা জোর করে ব'লো না যে, তিনি এই হতে পারেন, আর এই হতে পারেন না। ব'লো আমার বিশ্বাস তিনি নিরাকার, আর কত কি হতে পারেন তিনি জানেন। আমি জানি না, বুঝতে পারি না।[১২]

জনগণপূজ্য শক্তির সাকার সাধনা ('পৌত্তলিকতা' শব্দটা সর্বথা বর্জনীয়—এটাতে তাচ্ছিল্য এবং ব্যঙ্গের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে) স্বীকার করে পরমহংসদেব তৎকালীন ধর্মজগতের ভারসাম্য আনয়ন করলেন বটে কিন্তু প্রশ্ন, জড়-সাধনার অন্ধকার দিকটা কি তিনি লক্ষ্য করলেন না?

এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব এবং মহত্ত্ব। এই সাকার-সাধনার পশ্চাতে যে জ্ঞেয়-অজ্ঞেয় ব্রহ্মের বিরাট মূর্তি অহরহ বিরাজমান, পরমহংসদেব বার বার

১১। শক্তিকে নানা দেশের কবি এবং সাধকগণ নানারূপে কল্পনা করেছেন। কাব্যে বিবেকানন্দের কবিতাই শ্রেষ্ঠতম।

"মৃত্যুরূপা মাতা
নিঃশেষে নিবিছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ্যবায়ু-বেগ!
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দিশালা হ'তে,
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে।
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরিচূড়া জিনি'
নভস্তল পরশিতে চায়। ঘোররূপা হাসিছে দামিনী,
প্রকাশিছে দিকে দিকে তা'র মৃত্যুর কালিমামাখা গায়
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর!—দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,—
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে; মৃত্যুরূপা মা আমার আয়।
করালি! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে
কালি, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মা গো, আয় মোর পাশে
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়,—মৃত্যুরে যে বাঁধে নিজ পাশে
কালনৃত্য করে উপভোগ—মাতৃরূপা তা'রি কাছে আসে।"

(সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ)

ইংরেজীতে এর প্রথম ছত্র "The Stars are blotted out!"—আশ্চর্য বোধ হয় রবীন্দ্রনাথও অতি বাল্যবয়সে (১৪?) কালী সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখেছিলেন।

১২ ডগমাটিজম্ না করে মনকে খোলা এবং জানা-অজানার মাঝখানেই যে সত্য পন্থা—এর উৎকৃষ্ট প্রকাশ কেনোপনিষদে:—

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই ভারসাম্যই ব্রহ্মজ্ঞানী কেশব সেন, বিজয়কৃষ্ণ এবং তাঁদের শিষ্যদের আকর্ষণ করতে পেরেছিল। তিনি যদি 'মতুয়া' কালীপূজক হতেন তবে তিনি পরমহংস হতেন না।

বস্তুতঃ একটি চরম সত্য আমাদের বার বার স্বীকার করা উচিত ঃ যেখানেই যে কোন মানুষ যে কোন পন্থায় ভগবানের সন্ধান করেছে তাকেই সম্মান জানাতে হয়। এমন কি ক্ষুদ্র শিশু যখন সরস্বতীর দিকে তাকিয়ে তাঁর সাহায্য কামনা করে (হায়, কলকাতায় সরস্বতী পূজার বাহ্য আড়ম্বর দেখে অনেক সময় মনে হয়, এরাই বুঝি এ যুগে দেবীর একমাত্র সাধক) তাকেও মানতে হয়,—গাছের পাতা, জলের ফোঁটা যখন মানুষ মাথায় ঠেকায় তারও বিলক্ষণ মূল্য আছে। গীতাতে এ সত্যটি অতি সরল ভাষায় বলা হয়েছে।

কিন্তু সাকার-নিরাকার নিয়ে আজ আর তর্ক করে লাভ কি? বাঙলা দেশে আজ আর ক'জন লোক নিরাকার পূজা করেন তার খবর বলা শক্ত—কারণ সে পূজা হয় গৃহকোণে, নির্জনে। আর কলকাতায় বারোয়ারী সাকার পূজার যা আড়ম্বর তা দেখে বাঙলার কত গুণীজ্ঞানী যে বিক্ষুব্ধ হন তার প্রকাশ খবরের কাগজে প্রতি বৎসর দেখি। এই মাত্র নিবেদন করেছি, এরও মূল্য আছে —তাই আমার এক জ্ঞানী বন্ধু বড় দুঃখে বলেছিলেন, 'কিন্তু কি ভয়ংকর স্ট্রেন করে এস্থলে সে সত্যটি স্বীকার করি'।

সাকার নিরাকারের আধ্যাত্মিক মূল্য যা আছে তা আছে, কিন্তু এই দ্বন্দ্ব সমাধানের সামাজিক মূল্য কি?

হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম সকলেই বাঙালী সমাজে সমান অংশীদার। এঁদের ধর্মাচরণ যা-ই হোক না কেন, সমাজে তাঁরা মেলামেশা করছেন অবাধে। একবার ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে এই সহজ মেলামেশা না থাকলে খ্রীষ্টান মাইকেল, মুসলমান মুশররফ হুসেন, নজরুল ইসলাম এবং জসীমউদ্দিন বাঙলা কাব্যে খ্যাতি অর্জন করতে পারতেন না। সমঝদার ও রসিক জনের গুণগ্রাহিতা ও উৎসাহ লাভ না করে কম কবিই এ সংসারে সার্থক কাব্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন। এবং এঁদের সকলেরই উৎসাহী পাঠক এবং গুণগ্রাহী বন্ধু ছিলেন প্রধানতঃ হিন্দুরাই।[১৩]

"নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥"

'আমি এইরূপ মনে করি না যে, আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছি; অথবা 'জানি না' ইহাও মনে করি না, এবং "জানি" ইহাও মনে করি না। "জানি না যে তাহাও নহে— এবং জানি যে তাহাও নহে" আমাদের মধ্যে যিনি এই বচনটির মর্ম জানেন, তিনিই ব্রহ্মকে জানেন।'—গম্ভীরানন্দ।

চতুর্থ পাদটীকা পুনরায় দ্রষ্টব্য।

১৩ পূর্ববর্তী যুগে পরাগল, ছুটি খাঁর মত মুসলমান গুণগ্রাহী ছিলেন বলেই হিন্দুরা মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন ; পরবর্তী যুগে হিন্দু সমঝদার ছিলেন বলেই সৈয়দ মরতুজা প্রমুখ বহুতর মুসলমান বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শ্রীযতীন্দ্র-মোহন ভট্টাচার্যের বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবিগণ সম্বন্ধে অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক যে কোনো মতবৈষম্যের ফলে যদি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় একই সমাজের ভিতর অন্তরঙ্গ ভাব বর্জন করেন তবে সেই অখণ্ড, সমগ্র সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি—'মহতী বিনষ্টি' হয়; এই তত্ত্বটি সম্বন্ধে সে যুগে কয়জন গুণী সচেতন ছিলেন? মুসলমান সাকার মানে না, কিন্তু তাই বলে তো সে যুগে বাঙালী সমাজে হিন্দু-মুসলমানের মিলন ক্ষুণ্ণ হয় নি? তবে কেন ঐ কারণেই ব্রাহ্মে হিন্দুতে সামাজিক অন্তরঙ্গ গতিবিধি বন্ধ হবে?

পরমহংসদেব এই বিরোধ নির্মূল করতে চেয়েছিলেন বলেই সাকার-নিরাকারের অর্থহীন, অপ্রিয় আলোচনা বর্জন করেন নি। তাই বার বার দেখি, তিনি আপন হিন্দু ভক্তবৃন্দ নিয়েই সন্তুষ্ট নন। বার বার দেখি, তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করছেন, বিজয় কোথায়, শিবনাথ যে বলেছিল আসবে, বলছেন, কেশব আমার বড় প্রিয়। অথচ তিনি তো ব্রাহ্ম ভক্তদের 'কালীকাল্টে' কন্‌ভার্ট করার জন্য কিছুমাত্র ব্যগ্র নন। তিনি সর্বান্তঃকরণে কামনা করেছিলেন, এদের বিরোধ যেন লোপ পায়।[১৪]

আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস, এই দ্বন্দ্ব অপসারণে অদ্বিতীয় কৃতিত্ব পরমহংসদেবের।

সামাজিক দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে এতখানি সচেতন পুরুষ যে তার অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে অচেতন থাকবেন এ কখনই হতে পারে না। পক্ষান্তরে, আবার অন্য সত্যও সর্বজন-বিদিত—কামিনী-কাঞ্চনে পরমহংসের তীব্র বৈরাগ্য। তার থেকেই ধরে নিতে পারি, অর্থ-সমস্যা আপন সত্তায় (per se) তাঁর সামনে উপস্থিত হয় নি। যারা মুখ্যতঃ অর্থ কামনা করে রামকৃষ্ণদেব তো তাঁদের উপদেষ্টা নন। যাঁরা মুখ্যতঃ ধর্মজিজ্ঞাসু অথচ অর্থসমস্যায় কাতর তিনি তাঁদের সে দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। কাজেই পরোক্ষভাবে তিনি সমাজের অর্থনৈতিক প্রশ্নেরও সমাধান দিয়েছেন। যে যতখানি কাজে লাগাতে পেরেছে ততখানি উপকার পেয়েছে।

রামকৃষ্ণদেব বহুবার বলেছেন, 'কলিকালে মানবের অন্নগত প্রাণ'। এর অর্থ আর কিছুই নয়—এর সরল অর্থ, ইংরেজের শোষণনীতির শোচনীয় পরিণাম বাঙালীর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছে। অন্নাভাবে সে তখন এমনই কাতর যে অন্য কোন চিন্তার স্থান আর তার মস্তকে নেই। তবু যাঁরা ধর্মে অনুরক্ত তাঁরা বার বার পমমহংসদেবকে প্রশ্ন করেছেন, 'উপায় কি'?

পূর্বেই বলেছি তিনি ছিলেন বেদান্তবাদী। তা হলে তাঁর কাছ থেকে উত্তর প্রত্যাশা করতে পারি যে জগৎ মায়া মিথ্যা অনুমিত হলেই অর্থের প্রয়োজন আপনার থেকেই ঘুচে যাবে। কিন্তু তিনি বলেছেন, পাখীর মতো দাসীর মতো সংসারের কাজ করে যাবে, কিন্তু মন পড়ে রইবে ভগবানের পায়ের তলায়। অর্থাৎ কলিযুগে সমাজের সে সচ্ছলতা নেই যে তোমাকে অন্ন

---

১৪ এ বিষয়ে পরমহংসদেব কতখানি 'নাছোড়বান্দা' ছিলেন তার সব চেয়ে ভালো উদাহরণ অনুসন্ধিৎসু পাঠক পাবেন, অনিল গুপ্ত সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ডের ভাগে। পাঠক তখন 'নাছোড়বান্দা'র সত্যপ্রয়োগ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জোটাবে আর তুমি নিশ্চিন্তমনে জ্ঞানমার্গে আপন মুক্তির সন্ধান পাবে। কলির মানুষের কর্ম থেকে মুক্তি নেই।

ওদিকে যে সব ব্রাহ্ম ভক্তের অর্থাভাব ছিল না,—যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানের তপস্বী তাঁদের বার বার বলেছেন, ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে ডাকো। কলিযুগে ভক্তি ভিন্ন গতি নেই।

আর সকলকেই এ কথা বলেছেন, এই জন্মেই যারা সাধনার সর্বশেষ স্তরে পৌঁছতে চায়—রাখাল, নরেন্দ্রের মত যারা জন্মাবধি জীবন্মুক্ত তাদের ক'জন বাদ দিলে আর ক'টি প্রাণী সে স্তরে পৌঁছতে পারবে সে বিষয়ে তাঁর মনে গভীর সন্দেহ ছিল—তাদের হতে হবে নিরংকুশ জ্ঞানমার্গের সাধক। শুদ্ধ জ্ঞানের সাহায্যে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে, ব্রহ্ম ভিন্ন নিত্যবস্তু কিছুই নেই।

পূর্বেই নিবেদন করেছি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতা আমার নেই। এ কথা স্বীকার করেও যদি দম্ভভরে কিছু বলি, তবে বলবো, যে সাধক গীতোক্ত কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তির সমন্বয় করতে পেরেছেন তিনি সমগ্র পুরুষ—পরম পুরুষ। কোনো মহাপুরুষকে যদি দম্ভভরে যাচাই করতে চাই, তবে এই তিনটির সমন্বয়েই সন্ধান করবো। তার কারণ গীতাতে এই তিন পন্থা উল্লিখিত হওয়ার পর আজ পর্যন্ত অন্য কোন চতুর্থ পন্থা আবিষ্কৃত হয় নি। এ তিন পন্থার সমন্বয়কারী শ্রীকৃষ্ণের সহচর। তাঁর নাম শ্রীরামকৃষ্ণ।

* * *

যে পাঠক ধৈর্য সহকারে আমার প্রগল্‌ভতা এতক্ষণ ধরে শুনলেন তিনি কৌতূহলবশতঃ স্বতঃই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন, 'এ তো হল মানুষের সংসর্গে আগত সমাজে সমুজ্জ্বল রামকৃষ্ণদেব। কিন্তু যেখানে তিনি একা—তাঁর সাধনার লোকে তিনি কতখানি উঠতে পেরেছিলেন? সোজা বাঙলায়, 'তিনি কি ভগবানকে সাক্ষাৎ দেখতে পেয়েছিলেন?'

এর উত্তরে বলবো, মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, এ প্রশ্নের উত্তর দেবার অধিকার আমাদের কারোরই নেই। এ প্রশ্নের উত্তর জ্ঞানবুদ্ধির অগম্য। রামকৃষ্ণের সমকক্ষ জনই এর উত্তর দিতে পারেন।

রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছনোর পরও কোনো কোনো মানুষ লোকহিতার্থে এ সংসারে ফিরে আসেন। যেমন নারদ শুকদেবাদি'। এ কথা ভুললে চলবে না।

স্পষ্টত দেখতে পাচ্ছি, এ-কথাটি স্বামী বিবেকানন্দের মনে গভীর দাগ কেটে গিয়েছিল। লোকহিতার্থে তিনি যে বিরাট শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন নির্মাণ করে যান, এরকম সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান প্রভু তথাগতের পর এযাবৎ কেউ নির্মাণ করেন নি।

* * *

এইবারে শেষ প্রশ্ন দিয়ে প্রথম প্রশ্নে ফিরে যাই।

পরমহংসদেব গীতার তিন মার্গের সমন্বয় করেছিলেন। প্রকৃত হিন্দু সেই চেষ্টাই করবে। কিন্তু তিনি যে ধুতিখানাকে লুঙ্গীর মত পরে আল্লা-আল্লাও করেছিলেন এবং আপন ঘরে টাঙানো খ্রীষ্টের ছবির দিকে তাকিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থাকতেন সে কথাও তো জানি। এসবের প্রতি তাঁর অনুরাগ এল কোথা থেকে? বিশেষতঃ যখন একাধিকবার বলা হয়েছে, অ-হিন্দু মার্গে চলবার সময় পরমহংসদেব কায়মনোবাক্যে সে-ই মার্গকেই বিশ্বাস করতেন।

অনেকের বিশ্বাস চতুর্বেদে বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাস অর্থাৎ পলিথেইজমের বর্ণনা আছে। কিন্তু ম্যাক্সমুলার দেখিয়েছেন ঋগ্বেদের ঋষি যখন ইন্দ্রস্তুতি করেন তখন তিনি বলেন,—'হে ইন্দ্র, তুমিই ইন্দ্র, তুমি অগ্নি, তুমিই বরুণ, তুমিই প্রজাপতি, তুমিই সব।

আবার যখন বরুণমন্ত্র শুনি, তখন সেটিতেও তাই—'হে বরুণ, তুমিই বরুণ, তুমিই ইন্দ্র, তুমিই প্রজাপতি, তুমিই সব।' অর্থাৎ ঋষি যখন যে দেবতাকে স্মরণ করেছেন তখন তিনিই তাঁর কাছে পরমেশ্বররূপে দেখা দিয়েছেন। এ সাধনা বহু-ঈশ্বরবাদের নয়। এর সন্ধান অন্য দেশে পাওয়া যায় না বলে ম্যাক্সমুলার এর নূতন নাম করেছিলেন 'হেনোথেয়িজম'।

পরমহংসদেব বেদোক্ত এই পন্থায় বরণ করেছিলেন অর্থাৎ সনাতন আর্যধর্মের প্রাচীনতম শ্রুতিসম্পন্ন পন্থাই বরণ করেছিলেন। তিনি যখন বেদান্তবাদী তখন বেদান্তই সব কিছু, আবার যখন আল্লা আল্লা করেছেন তখন আল্লাই পরমাত্মা।

এই করেই তিনি সর্বধর্মের রসাস্বাদন করে সর্বধর্ম সমন্বয় করতে পেরেছিলেন।

কোনো বিশেষ শাস্ত্রকে সর্বশেষ, অভ্রান্ত, স্বয়ংসম্পূর্ণ শাস্ত্র বলে স্বীকার করে তিনি অন্য সব কিছুর অবহেলা করেন নি।

অনেকের বিশ্বাস, হিন্দু আপন ধর্ম নিয়েই সন্তুষ্ট, অন্য ধর্মের সন্ধান সে করে না।

বহু শতাব্দীর বিজয়-অভিযান ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে এ যুগের হিন্দু সম্বন্ধে এ কথা হয়তো খাটে। তাই পরমহংসদেব আপন জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, সনাতন আর্যধর্ম এ পন্থা কখনো গ্রাহ্য করে নি।

সত্য সর্বত্র বিরাজমান, ঋগ্বেদের এই বাণী, শ্রীরামকৃষ্ণে তারই প্রতিধ্বনি। সর্বত্র এর অনুসন্ধানে সচেতন থাকলে বাঙালী পরমহংসদেবের অনুকরণ অনুসরণ করে ধন্য হবে। বাকিটুকু দয়াময়ের হাতে।

পুষ্পধনু

রস কি?

অর্থাৎ যখন কোনো উত্তম ছবি দেখি, কিম্বা রসের সঙ্গীত শুনি, অথবা ভালো কবিতা পড়ি, কিংবা নটরাজের মূর্তি দেখি, তখন যে রসানুভূতি হয় সে রস কি, সৃষ্ট হয় কি প্রকারে?

এ রসের কাছাকাছি একাধিক রস আছে। গোয়েন্দা কাহিনী পড়ে, ধাঁধার উত্তর বের করে, মনোরম সূর্যোদয় দেখে, প্রিয়াকে আলিঙ্গন করে যে সব রসের সৃষ্টি হয় তার সঙ্গে যে পূর্বোল্লিখিত রসের কোনোও মিল নেই সে কথা জোর করে বলা চলে না। এমন কি,—শোনা কথা—বার্ট্রান্ড রাসল্

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নাকি বলেছেন, গণিতের কঠিন সমস্যা সমাধান করে তিনি যে আনন্দ অনুভব করেন সেটি নাকি হুবহু কলারসের মতই। কিন্তু এ সব রসে এবং অন্যান্য রসে পার্থক্য কিসে আলোচনায় এবেলা মেতে উঠলে ওপারে পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। আমার জ্ঞানও অতিশয় সীমাবদ্ধ, প্রকাশশক্তি ততোধিক সীমাবদ্ধ। (তাহলে অবশ্যই প্রশ্ন উঠবে, আমি আদৌ লিখতে যাচ্ছি কেন? উত্তরে সবিনয় নিবেদন, বহুদিন সাহিত্য রচনা করার ফলে আমার একটি নিজস্ব পাঠকগোষ্ঠী জমায়েৎ হয়েছেন ; এঁদের কেউই পণ্ডিত নন—আমিও নই—অথচ মাঝে-মধ্যে এঁরা কঠিন বস্তুও সহজে বুঝে নিতে চান এবং সে কর্ম আমার মত বে-পেশাদারী—নন-প্রফেশনালই—করতে পারে ভালো। রচনার গোড়াতেই এতখানি ব্যক্তিগত সাফাই হয়তো ঠিক মানানসই হল না, তবু পণ্ডিতজন পাছে আমার উপর অহমিকা দোষ আরোপণ করেন তাই সভয়ে এ ক'টি কথা কইতে হল)।

রস কি সে আলোচনা অল্প লোকেই করে থাকেন। আলংকারিকের অভাব প্রায় সর্বত্রই। কারণ রসের প্রধান কার্যকারণ আলোচনা করতে হলে অন্তত দুটি জিনিসের প্রয়োজন। একদিক দিয়ে রসবোধ, অন্যদিক দিয়ে রসকসহীন বিচার বিবেচনা যুক্তি তর্ক করার ক্ষমতা। তাই এর ভিতর একটি দ্বন্দ্ব লুকনো রয়েছে। যারা রসগ্রহণে তৎপর তারা তর্কের কিচিরমিচির পছন্দ করে না, আর যারা সর্বক্ষণ তর্ক করতে ভালবাসে তারা যে 'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠতি অগ্রে' হয়ে রসিকজনের ভীতির সঞ্চার করে সে তো জানা কথা।

সৌভাগ্যক্রমে এদেশে কিন্তু কখনো আলংকারিকের অনটন হয় নি। ভরত থেকে আরম্ভ করে, দণ্ডিন মম্মট ভামহ হেমচন্দ্র অভিনবগুপ্ত ইত্যাদি ইত্যাদি অন্তহীন নির্ঘণ্ট বিশ্বজনের প্রচুর ঈর্ষার সৃষ্টি করেছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনেছি, তাঁকে যখন রাস্‌ল্‌ প্রশ্ন শোধান, রস কি, হোয়াট ইজ আর্ট, তখন তিনি এঁদের স্মরণে রাস্‌ল্‌কে প্রচুর নূতন তত্ত্ব শোনান। অন্য লোকের মুখে শুনেছি, রাস্‌ল্‌ রীতিমত হকচকিয়ে যায়।

বিদেশী আলঙ্কারিকদের ভিতর জর্মন কবি হাইনরিষ হাইনের নাম কেউ বড় একটা করে না। কারণ তিনি অমিশ্র অলংকার নিয়ে আলোচনা করেন নি। জর্মন কবিদের নিয়ে আলোচনা করার সময় মাঝে মাঝে রস কি তাই নিয়ে তিনি চিন্তা করেছেন, এবং রস কি তার সংজ্ঞা না দিয়ে তুলনার মারফৎ, গল্পচ্ছলে সব কিছু অতি মনোরম ভাষায় প্রকাশ করেছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ যে রকম কোনো কিছু বলতে গেলে সংজ্ঞা নিয়ে মাথা ফাটাফাটি না করে গল্প বলে জিনিসটা সরল করে দিতেন অনেকটা সেইরকম!

বাগদাদের শাহ্‌ ইন্‌-শাহ্‌ দীনদুনিয়ার মালিক খলীফা হারুন-অর্‌-রশীদের হারেমের সর্বশ্রেষ্ঠা, সুন্দরী, খলীফার জিগরের টুকরো, চোখের রোশনী রাজকুমারীটি ছিলেন 'স্বপনচারিণী', অর্থাৎ ঘুমের ঘোরে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতেন।

গভীর নিশীথে একদা তিনি নিদ্রার আবেশে মৃদু পদসঞ্চারণে চলে গিয়েছেন প্রাসাদ-উদ্যানে। সখীরা গেছেন পিছনে পিছনে। রাজকুমারী নিদ্রার ঘোরে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে সম্পূর্ণ মোহাবস্থায় ফুল আর লতা-পাতা কুড়োতে আরম্ভ করলেন আর মোহাবস্থায়ই সেগুলো অপূর্ব সমাবেশে

www.BanglaBook.org

সাজিয়ে বানালেন একটি তোড়া। আর সে সামঞ্জস্যে প্রকাশিত হয়ে গেল একটি নবীন বাণী, নূতন ভাষা। মোহাবস্থায়ই রাজকুমারী তোড়াটি পালঙ্কের সিথানে রেখে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

ঘুম ভাঙতে রাজকুমারী দেখেন একটি তোড়া যেন তাঁর দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। সখীরা বললেন, ইটি তাঁরই হাতে তৈরী। কিছুতেই তাঁর বিশ্বাস হয় না। এমন কি ফুলপাতার সামঞ্জস্যে যে ভাষা যে বাণী প্রকাশ পেয়েছে সেটিও তিনি সম্পূর্ণ বুঝতে পারছেন না—আবছা আবছা ঠেকছে।

কিন্তু অপূর্ব সেই পুষ্পস্তবক। এটি তাহলে কাকে দেওয়া যায়? যাঁকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। খলীফা হারূন্-অর্-রশীদ। খোজাকে ডেকে বললেন, 'বৎস, এটি তুমি আর্যপুত্রকে (খলীফাকে) দিয়ে এসো।'

খোজা তোড়াটি হাতে নিয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে, 'ও হো হো, কী অপূর্ব কুসুমগুচ্ছ! কী সুন্দর গন্ধ, কী সুন্দর রঙ! হয় না, হয় না, এ রকম সঞ্চয়ন সমাবেশ আর কোনো হাতে হতে পারে না।'

কিন্তু সে সামঞ্জস্যে যে বাণী প্রকাশিত হয়েছিল সে সেটি বুঝতে পারলো না। সখীরাও বুঝতে পারেন নি।

খলীফা কিন্তু দেখা মাত্রই বাণীটি বুঝে গেলেন। তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে গেল। দেহ শিহরিত হল। সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হল। অভূতপূর্ব পুলকে দীর্ঘ দাড়ি বেয়ে দরদরধারে আনন্দাশ্রু বইতে লাগলো।

এতখানি গল্প বলার পর কবি হাইনরিষ হাইনে বলেছেন, 'হায় আমি বাগদাদের খলীফা নই, আমি মহাপুরুষ মুহম্মদের বংশধর নই, আমার হাতে রাজা সলমনের আঙটি নেই, যেটি আঙুলে থাকলে সর্বভাষা, এমন কি পশু-পক্ষীর কথাও বোঝা যায়, আমার লম্বা দাড়িও নেই, কিন্তু পেরেছি, পেরেছি, আমিও সে ভাষা সে বাণী বুঝতে পেরেছি।'

এস্থলে গল্পটির দীর্ঘ টীকার প্রয়োজন। কিন্তু পূর্বেই নিবেদন করেছি সে শক্তি আমার নেই। তাই টাপেটোপে ঠারেঠোরে কই।

রাজকুমারী=কবি ; ফুলের তোড়া=কবিতা ; ফুলের রঙ পাতার বাহার= তুলনা অনুপ্রাস, খোজা=প্রকাশক-সম্পাদক-ফিলিম-ডিস্ট্রিবুটর (তাঁরা সুগন্ধ সুবর্ণের রসাস্বাদ করতে পারেন, কিন্তু 'বাণীটি' বোঝেন না) ; এবং খলীফা =সহৃদয় পাঠক!

মরহুম মৌলানা

মরহুম (স্বর্গত) মৌলানা আবুল-কালাম মহী-উদ্দীন মোহম্মদ অল্ আজাদ্ সম্ভ্রান্ত বংশের যোগ্য সন্তান। এ বংশের পরিচয় এবং বিবরণ বাদশা আকবরের আমল থেকে পাওয়া যায়।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় এঁর পিতা জড়িয়ে পড়েন। দিল্লীর উপর ইংরাজের বর্বর অত্যাচার আরম্ভ হলে পর তিনি তাঁর অন্যতম ভক্ত রামপুরের নবাবের সাহায্যে মক্কাশরীফে গিয়ে আশ্রয় নেন। সেখানে তিনি এক আরব কুমারীকে বিবাহ করেন। আবুল কালাম এই বিবাহের সার্থক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সন্তান।

তাঁর মাতৃভাষা আরবী, পিতৃভাষা উর্দু। পরবর্তী যুগে তিনি ফার্সী এবং তুর্কীতেও অসাধারণ পাণ্ডিত্য সঞ্চয় করেন। ইংরিজি থেকেও তিনি সে সঞ্চয়ে সাহায্য গ্রহণ করেছেন। তবে এদেশে ফেরার পর তিনি উর্দু সাহিত্যের এমনি একনিষ্ঠ সাধক ও প্রেমিক হয়ে যান যে শেষের দিকে আরবী বা ফার্সীতে নিতান্ত বাধ্য না হলে কথাবার্তা বলতেন না।

তাঁর বয়স যখন দশ তখন তাঁর পিতা ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। সমগ্র ভারতবর্ষেই তাঁর বহু শিষ্য ও ভক্ত ছিলেন। এই কলকাতা শহরেই তাঁর প্রচুর অনুরাগী শিষ্য ছিলেন এবং তাঁদেরই অনুরোধে তিনি এখানে স্থায়ী বাসভবন নির্মাণ করেন। পুত্র আবুল কালাম এখানেই তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তাঁর পরলোকগমনের পর বেতারে যে একাধিকবার বলা হয়, তিনি মিশরের অল আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন সে সংবাদ ভুল। উপরন্তু মৌলানা সাহেব নিজেকে সব সময়ই কলকাতার অধিবাসী ও বাঙালী বলেই পরিচয় দিয়েছেন। বাঙলা তিনি বলতেন না, কিন্তু বাঙলা কথোপ-কথনের মাঝখানে তিনি উর্দুতে প্রশ্নোত্তর করতেন এবং কিছুক্ষণ পর কারোরই খেয়াল থাকতো না যে তিনি অন্য ভাষায় কথা বলছেন।

চৌদ্দ বছর বয়সেই তিনি লিসান উল্-সিদ্‌ক্ (সত্য-বচন) নামক কাগজের সঙ্গে সংযুক্ত হন এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর খ্যাতি ভারতবর্ষের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ে। চব্বিশ বৎসর বয়সে তাঁর 'অল্ হিলাল' (অর্ধচন্দ্র) পত্রিকা ইংরেজের মনে ভীতির সঞ্চার করতে আরম্ভ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর তাঁর কাগজে ইংরেজের শত্রু তুর্কী এবং মুসলিম বিশ্ব-আন্দোলনের অকুণ্ঠ প্রশংসা করার ফলে তাঁকে অন্তরীণ হতে হয়। মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মহাত্মা গান্ধী ও অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত হন এবং সে আন্দোলনের সঙ্গে সাদ্ জগলুল্ পাশার মিনারের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং গাজী মুস্তাফা কামাল পাশার তুর্কীর নবজাগরণের সঙ্গে সেতু নির্মাণ করেন।

এর পরের ইতিহাস ভারতীয় মাত্রই জানেন।

শ্বেত সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ এবং বিশ্ব-মুসলিম প্রেম মৌলানা আজাদের পরিবারে অবিচ্ছিন্ন অংশরূপে গণ্য করা হত। তিনি জন্মগ্রহণ করেন মক্কায়—যেখানে হজ্ উপলক্ষে বিশ্বের তাবৎ মুসলিম প্রতি বৎসর সম্মিলিত হয়ে প্রাচ্য ভূমি থেকে কি করে শ্বেতাঙ্গ ও শ্বেত-স্বৈরাচার দূরীভূত করা যায় তার পরিকল্পনা করতো এবং ভারত, মালয়, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশকে আপন আপন কর্তব্য ও জিম্মাদারী ভাগ করে দেওয়া হত। এ-পরিকল্পনা কোনো বিশেষ দেশে সীমাবদ্ধ ছিল না বলে একে ন্যাশনালিজম না বলে প্যান্-ইস্‌লামিজম্ (বিশ্ব-মুসলিম-সংহতি) নামে পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্রই সুপরিচিত ছিল। দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত মৌলানা এ-মন্ত্রই অহরহ শুনেছিলেন।

কলকাতা আসার সঙ্গে সঙ্গেই মৌলানার পরিবর্তন আরম্ভ হয়। এ-কথা সত্য যে বিশ্ব-মুসলিমের প্রতি তাঁর দরদ কখনো শুকিয়ে যায় নি, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাঁর জীবনের সব চেয়ে বড় উৎসাহ ও উদ্দীপনার উৎস হয়ে উঠল স্বদেশ-প্রেম। উর্দু ভারতবর্ষের ভাষা। তাঁর মাতৃভাষা আরবীকে তাঁর জীবনাদর্শ

www.BanglaBook.org

এবং রাজনৈতিক সাধনার মাধ্যমরূপে গ্রহণ না করে তিনি সর্বান্তঃকরণে বরণ করে নিলেন উর্দুকে। এ বড় সহজ কুরবাণী বা আত্মবিসর্জন নয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগেই শুধু নয়, আজও দেখতে পাই বহু লোক স্বার্থলাভের জন্য স্বদেশী ভাষা বর্জন করে বিদেশী ভাষার সাধনা করেন এবং আমাদের মত বাঙালী তাঁদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে না বলে আমাদের প্রতি রুষ্ট হন।

এবং সব চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি, এই উর্দু গ্রহণের জন্য জীবনসায়াহ্নে মৌলানাকে আবার অকরুণ কটূবাক্য শুনতে হলো সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মণ্ডলীর কাছ থেকে। হিন্দী ভাষা কেন রাতারাতি ভারতবর্ষের তাবৎ ভাষার কণ্ঠ রুদ্ধ করে 'জাতীয় ভাষা' রূপে জগদ্দল প্রতিমার মত ভারতের মন্দিরে মন্দিরে পূজা পাচ্ছেন না, অপেক্ষাকৃত অনুন্নত শিশু ভাষাগুলোকে কেন কচি কচি পাঁঠার মত তাঁর সামনে বলি দেওয়া হচ্ছে না, তার কারণ অনুসন্ধান করে তাঁরা আপন 'বুদ্ধি'তে আবিষ্কার করলেন 'হিন্দী-বিদ্বেষী' 'হিন্দী-ভাষাকা কট্টর দুশ্‌মন্‌ মৌলানা আজাদকে। যেহেতু মৌলানা উর্দুভাষী তাই তিনি শিক্ষামন্ত্রীরূপে হিন্দীর প্রচার এবং প্রসার কামনা করেন না—এই হল তখন তাঁদের 'যুক্তি'। হিন্দী যে দুর্বল, কমজোর ভাষা সে-কথা স্মরণ করবার অস্বস্তিকর প্রয়োজন কেউ বোধ করলেন না। পণ্ডিত নেহরুও যে উর্দুভাষী এ-কথা বলতে তাঁরা সাহস পেলেন না—এ-কথা বললে উভয়ের হৃদ্যতা বেড়ে যাবে যে!

মাত্র একবার মৌলানা লোকসভায় তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন। এবং যাঁরা সেদিন এই সভায় ছিলেন তাঁরা সবাই দেখেছিলেন মৌলানার আবেগময়ী আন্তরিক বক্তৃতার ফলে প্রতিপক্ষ কি রকম লজ্জায় অধোবদন হয়েছিলেন—শত্রু-মিত্র কারো দিকেই মুখ তুলে তাকাবার সাহস পর্যন্ত সেদিন তাঁদের আর হয় নি।

জগলুল্‌ পাশা, কামাল আতাতুর্কের সঙ্গে মৌলানার পত্র বিনিময় সব সময়ই ছিল, কিন্তু মৌলানা ক্রমে ক্রমে তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে। সে ইতিহাস লেখবার শক্তি আমার নেই; আমি শুধু এস্থলে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, মক্কা শরীফের প্যান-ইসলামী বালক যৌবনে পরিপূর্ণ জাতীয়তাবাদী হয়ে গেল। মৌলানার যে সব বিপক্ষ দল একদা মুসলিম জাহানের স্বপ্ন দেখতেন তাঁরা পর্যন্ত আজ কঠিন অভিজ্ঞতার স্বাদ পেয়ে বুঝতে পেরেছেন, সে স্বপ্ন গেছে—এখন তাঁরা পুরো পাকিস্তানী হয়ে গিয়ে জাতীয়তাবাদের আদর্শই বরণ করেছেন। দুঃখ এই, তাঁরা এই আদর্শটি কয়েক বৎসর আগে বরণ করে নিলেই তাঁদের মঙ্গল, আমাদের মঙ্গল, সকলেরই মঙ্গল হত।

এস্থলে কিন্তু আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করা উচিত।

স্বরাজলাভের পর মৌলানা তাঁর জাতীয়তাবাদ বিশ্ব-মানবের কল্যাণে নিয়োগ করেছিলেন। দেশ পর্যটন মৌলানা অত্যন্ত অপছন্দ করতেন, কিন্তু বিশ্বজনের সঙ্গে সক্রিয় যোগস্থাপনার জন্য তিনি কয়েক বৎসর পূর্বে পাকিস্তান ইরান হয়ে ইয়োরোপে যান—পূর্বে বহুবার বহু দেশে নিমন্ত্রিত হয়েও যান নি। এবং সব চেয়ে বড় কথা, জাতিসম্মেলন (ইউ. এন. ও.) এবং তার ভিন্ন ভিন্ন শাখার যে প্রতিনিধি ভারতে এসেছেন তাঁরা তাঁদের সর্বোত্তম সখারূপে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চিনতে শিখলেন মৌলানা আজাদকে। তাঁরা আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, যে-মৌলানা ইংরেজের বিরুদ্ধে তিক্ততম লড়াই করেছেন আজীবন, তাঁর ভিতর সে তিক্ততা আর নেই। ইংরেজ হোক মার্কিন হোক আর রুশই হোক, যে জন বিশ্ব-কল্যাণের জন্য সম্মুখীন হয়, তার বহু দোষ থাকলেও সে আজাদের বন্ধু-জন। এবং আরো আশ্চর্য! ইংরেজ দেখে মৌলানা ইংরেজী না বলেও ইংরেজের মিত্র, রাশা দেখে, তার ভাষা না জেনেও অন্যের তুলনায় মৌলানা রাশাকে চেনেন অনেক বেশী। তিনি তাদের সংগে কথা বলতেন উর্দুতে কিন্তু সে উর্দু তো উর্দু নয়, সে উর্দু বিশ্বপ্রেমের সর্বজনীন ভাষা, কিম্বা বলবো, বিশ্বপ্রেমের ভাষা উর্দুর মাধ্যমে স্বপ্রকাশ হল। একদা তিনি আরবী বর্জন করে উর্দু গ্রহণ করে-ছিলেন; তখন তিনি উর্দু বর্জন করে অন্য এক ভাষা গ্রহণ করেছেন, যার নাম-করণ এখনো হয় নি, কারণ সে ভাষাতে কথা বলতে আমরা এখনো শিখি নি।

অথচ তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁরগ নির্দেশ অনুযায়ী চলতো তিনখানি ত্রৈমাসিক। প্রথমখানি আরবীতে—আরবভূমির সংগে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপনা ও প্রাচীন যোগ দৃঢ়তর করার জন্য, দ্বিতীয়খানা ফার্সীতে—ইরান ও আফগানিস্থানের জন্য; তৃতীয়খানা ইংরিজিতে—বৌদ্ধ জগতের সংগে যোগস্থাপনা করার জন্য (বৌদ্ধভূমি এক ভাষায় আশ্রিত নয় বলে তিনি মাধ্যমরূপে ইংরিজি গ্রহণ করেছিলেন)। এই তিনটি পত্রিকাই ইণ্ডিয়ান্ কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশন্স দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয় এবং মৌলানা ছিলেন তার প্রধান। শুধু প্রধান বললেই যথেষ্ট বলা হয় না—কোন্ দেশে ক'খানা পত্রিকা যাবে সেটুকু পর্যন্ত তাঁর নির্দেশানুযায়ী হত। আজ ভাবি, এ-সব কটি পত্রিকার নীতি-নির্দেশ, মানরক্ষা, তাদের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে এমন সর্বগুণ মেশানো আরেক পণ্ডিত পাওয়া যাবে কোথায়? ভারতবর্ষের ভিতরে, বাইরে?

বস্তুত আসলে এ-লোকটি হৃদয় এবং এবং মস্তিষ্কের অন্তস্তলে ছিলেন পণ্ডিত। স্বাধীন মক্কা ত্যাগ করে পরাধীন ভারতে না এলে তিনি যে রাজ-নীতির চতুঃসীমানায় যেতেন না, সে কথা আমি স্থিরনিশ্চয় জানি। স্বাধীনতা লাভের পরও তিনি জ্ঞানমার্গেই ফিরে যেতেন কিন্তু দেশে তখন (এবং এখনো) উপযুক্ত লোকের অভাব। মৌলানা কখনো কর্তব্যে অবহেলা করতে চাইতেন না: এমন কি যখন তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষ মুখর হয়ে উঠতেন, এবং আমরা ভাবতুম তিনি পদত্যাগ করলেই পারেন, তখনো তিনি কর্তব্যবোধের দায়েই আপন কাজ করে যেতেন—লোকনিন্দার তোয়াক্কা-পরোয়া না করে। পূর্বেই বলেছি, মাত্র একবার তিনি হিন্দীওলাদের কর্কশ-কণ্ঠে ব্যথিত হয়ে আপন কাহিনী নিবেদন করেছিলেন। এ অবসরে আরেকটি ঘটনা মনে পড়লো। মেঠো কিন্তু কিঞ্চিৎ হাস্যরসে মেশানো।

বিরুদ্ধ দল শিক্ষা-দফতরের বিরুদ্ধে দুনিয়ার তাবৎ অভিযোগ-ফরিয়াদ জটলা করে শেষটায় বললে, 'শিক্ষা দফতরের দ্বারা কিছুই হবে না—তাদের মগজের বাক্সটি (ব্রেন-বক্স্টি) একদম ফাঁপা।'

মৌলানা স্পর্শকাতর লোক—পণ্ডিতগণ সচরাচর তা হন। উষ্মা প্রকাশ করে তিনি কিন্তু দাঁড়ালেন হাস্যমুখে। বার কয়েক ডান হাত দিয়ে মাথার ডান দিক চাপড়ে বললেন, 'না জী, এখানে তো আছে', তারপর হাত নামিয়ে নিয়ে

www.BanglaBook.org

দীর্ঘ আগুলফলম্বিত আচকানের ডান পকেটে থাবড়া মারতে মারতে বললেন, 'এখানে নেই, এখানে কিছুই নেই।' অর্থাৎ মগজে মাল যথেষ্ট আছে, কিন্তু পকেটে কিছুই নেই। তার আরো সরল অর্থ, কেবিনেট শিক্ষাবিভাগকে যথেষ্ট পয়সা দেয় না।

পূর্বেই বলেছি, মৌলানা আসলে পণ্ডিত। কর্তব্যের তাড়নায় তিনি প্রবেশ করেছিলেন রাজনৈতিক মল্লভূমিতে অতি অনিচ্ছায়। তাঁর সে পাণ্ডিত্যের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিতে আমার কুণ্ঠা বোধ হচ্ছে, কারণ তাঁর সে পাণ্ডিত্য-সায়রে সন্তরণ করার মত শক্তি আমার নেই।

আরবী এবং সংস্কৃত জ্ঞানচর্চায় বহু সাদৃশ্য রয়েছে। তার প্রধান মিল, উভয় সাহিত্যের পণ্ডিতগণই অত্যন্ত বিনয়ী। কারো কোনো নূতন কিছু বলার হলে কোনো প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের সাহায্যে তাঁরা সেটি প্রকাশ করেন। লোকমান্য টিলক গীতার ভাষ্য লিখে সপ্রমাণ করলেন, কর্মযোগই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগ এবং এদেশ থেকে ইংরেজকে বিতাড়নই সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম; মহাত্মা গান্ধী তাঁর গীতাভাষ্য দিয়েই প্রমাণ করতে চাইলেন যে অহিংসাই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, এবং শ্রীঅরবিন্দ গীতাপাঠ লিখে প্রমাণ করতে চাইলেন যে জ্ঞানযোগের দ্বারা চিত্তসংযম আত্মজয় করতে পারলেই স্বাধীনতা লাভ অনিবার্য। মৌলানা আজাদ তাঁর কুরান ভাষ্য দিয়ে বিশ্ব-মুসলিমকে মুক্ত করতে চাইলেন তার যুগ-যুগ সঞ্চিত অন্ধসংস্কার এবং ক্রিয়াকাণ্ডের সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে। এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে অতি কৌশলে তিনি তাকে তার কর্তব্য কোন্ দিকে সেইটে সহজ সরল ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন।

এ ভাষ্য তিনি অনায়াসেই আরবীতে লিখতে পারতেন, এবং আরবী ভাষার মাধ্যমে তিনি পাঠকসংখ্যা পেতেন উর্দুর তুলনায় অনেক, অনেক বেশী। দ্বিতীয়ত, কুরান আরবী ভাষায় লেখা এবং তাবৎ বিশ্ব-মুসলিম আরবীতেই তার ভাষ্য লিখে আসছে (গীতার ভাষ্য যে রকম এক শতাব্দী পূর্বেও সংস্কৃতেই রচিত হয়েছে)। তৃতীয়ত, মুসলিম-জাহানের কেন্দ্রভূমি মক্কার ভাষা আরবী, চতুর্থত, সে ভূমি আজাদের জন্মস্থল—আপন জন্মস্থলে যশ প্রতিষ্ঠা করতে চায় না কোন্ পণ্ডিত?

এ সমস্ত প্রলোভন উপেক্ষা করে মৌলানা তাঁর তফ্‌সীর ভাষ্য লিখলেন উর্দুতে। মক্কাতে জন্ম নিয়েছিল তাঁর দেহ, কিন্তু তাঁর চৈতন্য এবং হৃদয় গ্রহণ করেছিল তাঁর পিতৃ-পিতামহের ভূমি ভারতকে স্বদেশরূপে। তাই তিনি স্বদেশবাসীর জন্য তাঁর ভাষ্য লিখলেন উর্দুতে (টিলকও ইচ্ছা করলে তাঁর ভাষ্য সংস্কৃতে লিখতে পারতেন, কিন্তু লিখেছিলেন মারাঠীতে)। পরবর্তী যুগে আজাদ-ভাষ্য আরবীতে অনূদিত হয়, এবং তখন আরবভূমিতে সে ভাষ্যের যে জয়ধ্বনি উঠেছিল তা শুনে ভারতীয় মাত্রই না কী গর্ব কী শ্লাঘা অনুভব করেছিল। পাকিস্তানীরাও এই পুস্তক নিয়ে গর্ব অনুভব করেন। তাঁরা পাকিস্তান যাবার সময় তাজমহল ফেলে যাওয়ার মত কিন্তু এ ভাষ্য ভারতে ফেলে যান নি। ১৯১৭-এর পরের আজাদ-ভাষ্য লাহোর শহরে লক্ষাধিক সংখ্যক ছাপা এবং বিক্রি হয়েছে।

পাণ্ডিত্য ও সাহিত্য সচরাচর একসঙ্গে যায় না। কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে মুগ্ধ হয়েছি মৌলানার সাহিত্য রসবোধে, সাহিত্যসৃষ্টি দেখে।

www.BanglaBook.org

মৌলানার সঙ্গে লোকমান্য টিলকের বহু সাদৃশ্য বর্তমান, কিন্তু টিলকের চরিত্রে ছিল দার্ঢ্য, মৌলানার চরিত্রে ছিল মাধুর্য। টিলককে যদি বলা হয় কট্টর কঠিন শৈব, তবে মৌলানাকে বলতে হয় মরমিয়া মধুর বৈষ্ণব। কারণ মৌলানা ছিলেন সুফী অর্থাৎ ভক্ত রহস্যবাদী (মিসটিক্)। তাঁর সাহিত্যের উৎস ছিল মাধুর্যে, এবং কে না জানে মধুর রসই সর্বশ্রেষ্ঠ রস।

তাই তাঁর চেহারায় ছিল লাবণ্য, কুরাণ-ভাষ্যের মত পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তকে মাধুর্য, এবং তাঁর বক্তৃতায় অদ্ভুত অবর্ণনীয় সরলতার সৌন্দর্য।

কিন্তু তাঁর সে সরল সৌন্দর্যবোধ তার পরম প্রকাশ পেয়েছে তাঁর রম্য রচনাতে। উর্দুতে এরকম রচনা তো নেই-ই, বিশ্বসাহিত্যে এরকম সহৃদয় রসে ভরপুর লেখা খুঁজে পাই নে। তার সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়া বক্ষ্যমাণ অক্ষম লেখকের সাধ্যাতীত।

তবে এই শোকের দিনে একটি সান্ত্বনার বাণী জানাই। সাহিত্য আকাদেমি এ পুস্তকের বাংলা অনুবাদকর্মে লিপ্ত হয়েছেন। কিন্তু এর সঙ্গে একটি সাবধানবাণীও শুনিয়ে রাখি। সে অনুবাদে বাঙালী পাবে কাশ্মীরী শালের উল্টো দিকটা। পাবে মূল্যের অসম্পূর্ণ পরিচয়, এবং হয়তো পাবে, অসম্পূর্ণের উল্টো সম্পূর্ণ পরিচয় পাবার আকাঙ্ক্ষা। তাই যদি হয়, তবে হয়তো কোনো কোনো বাঙালীর অনাদৃত উর্দু ভাষা শেখার ইচ্ছাও হতে পারে। আমাদের সে প্রচেষ্টা হয়তো শোকদুঃখের অতীত অমর্ত্যলোকে মৌলানা আবুল কালাম মহীউদ্দীন আহ্‌মদ অল-আজাদকে আনন্দ দান করবে।

নসরুদ্দীন খোজা (হোকা)

ইস্তাম্বুল থেকে রয়টারের খবরে প্রকাশ, রসিক এবং মূর্খচূড়ামণি নসরুদ্দিন্ খোজার সপ্তশত জন্মদিবস মহা আড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়েছে।

ইংরিজি বর্ণমালার কল্যাণে 'খোজা' কিন্তু বাঙলায় 'হোকা' রূপে আত্ম-প্রকাশ করেছেন। অধুনা তুর্কী ভাষা ইংরিজি (লাতিন) হরফে লেখা হয় বলে তার রূপ hoca; কিন্তু তুর্করা 'এচ' অক্ষরের নীচে একটি অর্ধচন্দ্র বা উল্টো প্রথম বন্ধনী দেয় এবং তার উচ্চারণ অনেকটা স্কচ 'লখ্', জর্মন 'বাখ' বা ফার্সী 'খবরে'র মত,—কিন্তু 'হ' ভাগটা বেশী এবং 'সি' অক্ষরের উপরে হুক্ দেয়—এবং তার উচ্চারণ হয় পরিষ্কার 'জ'। ঠিক সেই রকম রসিদ শব্দ (আসলে আরবী) 'খারিজ' তুর্কী ভাষায় haric লেখা হয়, অবশ্য 'হ'-এর নিচে পূর্বোল্লিখিত অর্ধচন্দ্র এবং 'সি'-র উপরে হুক্ দেয়। 'পররাষ্ট্রনীতি' তাই তুর্কীতে 'সিয়াসত খারিজ'।

রয়টারের টেলিগ্রামে এই অর্ধচন্দ্র ও হুক্ বাদ পড়াতে 'খোজা' হোকা হয়ে গিয়েছেন। খাজা নাজিমুদ্দীনের 'খাজা' ও আগা খানের 'খোজা' (সম্মানিত) সম্প্রদায়ের নামও একই শব্দ—এটি আমাদের সম্পূর্ণ অজানা নয়।

এই ধ্বনি পরিবর্তনে আমাদের রাগত হওয়ার কারণ নেই। ক্রিকেটার মাঁকড়ের নাম যখন আমরা হামেশাই 'মনকদ', 'মানকদ' অনেক কিছুই লিখে থাকি, এবং ফড়্‌কর্-কে 'ফাদকর', 'ফদকর' লিখি, এমন কি এই কলকাতা শহরেই গোখলে-কে 'গোখেল' লিখি এবং উচ্চারণ করি তখন রসিকবর খোজা যে হোকা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়ে আমাদের ধোঁকা দেবেন তাতে আর আশ্চর্য কি?

খোজার জন্মদিন যে-বাইশ তারিখে উদ্‌যাপিত হচ্ছিল সেইদিনই ইস্তাম্বুল থেকে রয়টার আরেকটি তার পাঠিয়েছেন : তাতে খবর এসেছে যে ঐদিন পাঁচশ' বছর পরে তুর্কীতে এক সুপ্ত অগ্নিগিরি জেগে উঠে হা-হা করে হেসে উঠেছে।[১]

তা হলে বোঝা গেল মা ধরণীর পাকা দু'শ বছর লেগেছে খোজার রসিকতার মর্ম গ্রহণ করতে ; তাই বোধ হয় হাসতে হাসতে তাঁর নাড়িভুঁড়ি এখন ভূগর্ভ থেকে ছিঁড়ে বেরিয়েছে!

এদেশে আরবী এবং ফার্সী চর্চা একদা প্রচুর হয়েছিল। আকবর বাদশাহের আমলে ইরানের এমনই দুরবস্থা যে সেখানকার পনেরো আনা কবি দিল্লী ধাওয়া করেছিলেন। আকবরের সভাকবি আব্দুর রহিম খানাখানা নিজেই গণ্ডা গণ্ডা ইরানী কবি পুষেছিলেন, আর স্বয়ং আকবর যে কবি 'আমি' 'তুমি' মিল দিয়ে 'কবিতা' রচনা করতো তাকে পর্যন্ত নিরাশ করতে চাইতেন না।

ভারতবর্ষের ফার্সী নাম হিন্দ বা হিন্দুস্তান। 'হিন্দ' শব্দের অর্থ কালো। তাই এক কবি তাঁর দৈন্যের কালরাত্রি ইরানে ফেলে পূর্বাচল ভারতবর্ষ রওয়ানা হওয়ার সময় লিখলেন,

দুর্ভাবনার কালিমা ত্যজিয়া
চলিনু হিন্দুস্তান
কালোর দেশেতে কালো আমি কেন
করিতে যাইব দান?

তাই এক ইয়োরোপীয় ঐতিহাসিক ইরানের ঐ যুগকে শব্দার্থে 'ইণ্ডিয়ান সামার' বলেছেন। কারণ এর পরই ইরানী সাহিত্যের পতন আরম্ভ হয়।

তুর্কী ভাষার কিছুটা চর্চাও এদেশে হয়েছিল, কারণ বাবুর, হুমায়ুন এঁদের সকলেরই মাতৃভাষা তুর্কী। শেষ মোগল বাদশা-সালামৎ বাহাদুর শাহের হারেমেও কথাবার্তা তুর্কী ভাষাতেই হত এবং তুর্কী সাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট না হলেও অন্যতম অত্যুৎকৃষ্ট কেতাব বাবুর বাদশার আত্মজীবনী। কিন্তু এ তুর্কী ভাষা মুস্তাফা-কামালের টার্কির ওসমানলী তুর্কী নয়, বাবুরের ভাষা চুগতাই (বা জগতাই) তুর্কী। কোরমা, দোলমা এবং লড়াই-হাতিয়ারের মত কিছু শব্দ চুগতাই তুর্কী থেকে বাঙলাতে এসেছে। ওদিকে মোগল দরবার ফার্সীকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন বলে তাঁদের তুর্কী এদেশে প্রচার ও

---

1. VOLCANIC ERUPTION AFTER FIVE CENTURIES

Istambul July 22—Mount Soutlubiyan in the Kars Province of Turkey has burst into what is believed to be Turkey's first volcanic eruption since the 15th century. A spokesman at the office of the Governor of Kars said the eruption of rock and smoke had caused anxiety and excitement among people living nearby, but there had been no serious damage yet.

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রসার লাভ করে নি। যদিও প্রাচীন বাঙলাতে 'তুক" বলতে মুসলমান বোঝাতো এবং তামিল ভাষাতে মুসলমান বোঝাতে হলে এখনও 'তুরুক্কম্' শব্দ ব্যবহার করা হয়। বাঙালী বেকার এখনো চাকরির সন্ধানে 'তুর্কী নাচন' নাচে।

আমরা ইংরিজী ফরাসী পড়ি, রাশান কথাসাহিত্যও আমাদের অজানা নয়, স্পেন পর্তুগাল দেনমার্কের লোক এদেশে এসেছিল এবং আরো অনেকেই,—কিন্তু আশ্চর্য ওসমানলি তুর্কী ভাষা এবং সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের কণামাত্র পরিচয় নেই। আমার জানামতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে পাবনা জেলার কবি ইসমাঈল হুসেন শিরাজী (নজরুল ইসলাম এঁর কাছে একাধিক বিষয়ে ঋণী বলে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন) তুর্কীকে সাহায্য করার জন্য একটি মেডিকেল মিশন নিয়ে সে-দেশে গিয়েছিলেন এবং তুর্কী রাজনীতি, সমাজ, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে বাঙলায় একাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তুর্কীর সভাকবি হামিদ পাশার সঙ্গে সে সময়ে তাঁর হৃদ্যতা হয়, কিন্তু তুর্কী-সাহিত্যের সঙ্গে বাঙলার পরিচয় করিয়ে দেবার পূর্বেই ইংরেজের চাপে তাঁকে দেশে ফিরে আসতে হয়।[২]

তুর্কীর বাইরে ইরান, আফগানিস্থান, উজ্‌বেক, আজারবাইজান, তথা গ্রীস, বুলগারিয়া, রুমানিয়া ইত্যাদি দেশে নস্‌রুদ্দীন খোজা সুপরিচিত। ইরানের স্বর্ণযুগের একাধিক সুরসিক কবির উপর তাঁর প্রভাব সুস্পষ্ট। বল্কানের বাইরে ইয়োরোপে তিনি জর্মনিতে সব চেয়ে বেশী ভক্ত পাঠক পেয়েছেন। ইংরিজী এনসাইক্লোপিডিয়াতে তাঁর নাম নেই, জর্মন সাইক্লোপিডিয়া আকারে ইংরিজীর অর্ধেক হওয়া সত্ত্বেও সেটাতে তাঁর সম্বন্ধে কয়েক ছত্র আছে। আর একাধিক অনুবাদ জর্মন ভাষাতে তো আছেই। অবশ্য আজকের দিনের রুচি দিয়ে বিচার করলে তাঁর বহু জিনিস শুধু কুটনীরসাশ্রিত লাতিনেই অনুবাদ করা যায়!

খোজার জীবনী নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করার উপায় নেই। কারণ তাঁর জীবন ও তাঁর হরেক রকমের রসিকতা এমনই জড়িয়ে গিয়েছে যে তার জট ছাড়ানো অসম্ভব। তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত দু'আনা পরিমাণ কিংবদন্তী বিশ্বাস করলে আমাদের কালিদাস সম্বন্ধে প্রচলিত সব ক'টাই বিশ্বাস করতে হয়। এমন কি তিনি পাঁচশ' না সাতাশ বছর আগে জন্মেছিলেন সেই সমস্যারই চূড়ান্ত সমাধান এযাবৎ হয় নি। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে খোর্তো গ্রামে তাঁর জন্ম, সম্ভবত ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এবং আক্‌শেহিরে তাঁর মকবরাহ্ বা

---

২ 'সুপ্রভাত' পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্রকে (ইনি 'সুপ্রভাতিনী' সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দের মেসোমশাই কৃষ্ণকুমার মিত্রের বড় মেয়ে) শিরাজী একটি কবিতা ও ছবি পাঠালে পর তিনি (কুমুদিনী) লেখেন, "আপনার কবিতা ও ছবি পাইয়া আমি পরম পুলকিত হইয়াছি। আপনার কবিতাটি 'সুপ্রভাতে' প্রকাশিত হইবে। তুরস্কের নারীদিগের অতীত ও বর্তমান অবস্থা, স্বদেশের কার্যে ও উন্নতিতে তাহাদের সাহায্যদান, তাহাদের শিক্ষা ও স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি সম্বন্ধে লেখা শীঘ্রই অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন। ভারতবর্ষ হইতে যে সকল যুবক আহতদিগের সেবার জন্য তথায় গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের কার্যের বিবরণ লিখিবেন।"

বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃঃ ৫৭।

www.BanglaBook.org

সমাধিসৌধ দেখানো হয়। ইনি যে সুপণ্ডিত এবং সুকবি ছিলেন সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই, কারণ ধর্মশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি না থাকলে 'ইমাম' (ইংরিজীতে অন্ততপক্ষে বিশপ) হওয়া যায় না। অন্যান্য একাধিক ব্যাপারেও তিনি সমাজের অগ্রণীরূপে তুর্কী এবং তুর্কীর বাইরে সুপরিচিত ছিলেন।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে তাঁর নামে প্রচলিত গল্পের কটি তাঁর নিজস্ব ও কটি উদার শিরনি বুধোর দর্গায় সে-বিচার অসম্ভব। দেশবিদেশের পণ্ডিতগণ হার মেনে বিক্রমাদিত্যের নামে প্রচলিত গল্প যে 'বিক্রমাদিত্য সাইক্‌ল্' খৈয়ামের নামে চলিত-অচলিত চতুষ্পদী 'খৈয়াম চক্র' নামে অভিহিত করেছেন ঠিক সেই-রকম এখন খোজার নামে লিখিত, পঠিত, শ্রুত গল্পকে 'খোজা চক্র নাম দিয়ে দায়মুক্ত হয়। কিন্তু গল্পগুলো বিশ্লেষণ করে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে তার অনেকগুলোই আরবভূমি প্রাচীন ইরান ও ভারতবর্ষ থেকে গিয়েছে। সিরিয়াক এবং প্রাচীন বল্কানেও এর অনেকগুলো প্রচলিত ছিল। অবশ্য এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে সে সব বাদ দিলেও খোজার তহবিলে প্রচুর হাস্যরসের উপাদান উদ্বৃত্ত থেকে যায়। এবং তার চেয়েও বড় কথা—সুখে-দুঃখে, উৎসবে-ব্যসনে, মসজিদে-সরাইয়ে, বাজারে-বৈঠকখানায় খোজা যে ভাবে তাঁর গল্পে, আচরণে, ইঙ্গিতের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেছেন তারই একটি অতি সুস্পষ্ট হাস্যময়, সদানন্দ, দরদী ছবি তুর্কীদের বুকের ভিতর আঁকা। আজ যদি বেহশ্‌ৎ থেকে ফিরিশ্‌তা (দেবদূত) ইস্তাম্বুলে নেমে বিশ্বজনের কাছে সপ্রমাণ করে যান যে ইমাম নস্‌রুদ্দীন্ খোজা নামক কোনো ব্যক্তি এ ধরায় জন্মগ্রহণ করেন নি তবুও তুর্কীর লোক অচঞ্চল চিত্তে সেই তসবীরই ধারণ করবে, বিদেশীর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার কয়েক লহমার ভিতরেই খোজার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেবে এবং যদি সেখানে একাধিক তুর্ক উপস্থিত থাকে, এবং আপনি যে খোজাকে চেনেন না সে-কথা বুঝতে পারে তবে আপসে পাল্লা লেগে যাবে কে কত বেশী খোজার গল্প বলতে পারে। এদেশে যেমন বিস্তর রবীন্দ্রভক্ত আছেন যাঁরা প্রত্যেক ঋতু পরিবর্তন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির রূপরসগন্ধস্পর্শ বিবর্তন রবীন্দ্রনাথের কোনো না কোনো গান, বা একাধিক গান দিয়ে প্রকাশ করতে পারেন, ঠিক তেমনি জীবনের সুখ-দুঃখ, বিপদ-আপদ, দুর্ঘটনা, লটারি লাভ—সব কিছুই খোজার কোনো না কোনো গল্প দিয়ে রসরূপে প্রকাশ করা যায়। কারণ খোজা শুধু এলোপাতাড়ি রসসৃষ্টি করে যান নি—তার মারফতে খোজার পরিপূর্ণ জীবনদর্শন বা 'ভেল্টআনশাউঙ' পাওয়া যায়।

খোজার গল্প তিন রকমের। সহজেই অনুমান করা যায় তিনি যেখানে চালাকি করে অন্যকে বোকা বানাচ্ছেন, কিম্বা মারাত্মক উত্তর দিয়ে প্রতিপক্ষকে নিরস্ত্র করেছেন তার সংখ্যাই বেশী। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এন্তের গল্প আছে যেখানে তিনি একটি পয়লা নম্বরের ইডিয়েট, গড্ডলস্য কুষ্মাণ্ড। এবং তৃতীয় শ্রেণী থেকে বোঝা যায় না, তিনি বোকা না আমরা বোকা।

যেমন মনে করেন, খোজাকে অমাবস্যার রাতে শুধানো হল পূর্ণিমার চাঁদ গেল কোথায়? খোজা একগাল হেসে উত্তর দিলেন, "তাও জানো না, পূর্ণিমার চাঁদকে প্রতি রাত্রে ফালি ফালি করে কেটে নেওয়ার পর এখন সেগুলো গুঁড়ো

www.BanglaBook.org

করে আকাশের তারা করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।'

খোজা বোকা বনতে চান, না বানাতে চান?

অবশ্য খোজার গীতিরস বা লিরিকরস অসাধারণ ছিল। এই কবিত্বময় ব্যাখ্যাটি দিয়ে তিনি যে গীতিরস সৃষ্টি করতে চান নি, বা যে-সব কবি অসম্ভব অসম্ভব তুলনা দিয়ে কাব্যরস সৃষ্টি করতে চান তাদের নিয়ে মস্করা করতে চান নি এ-কথা বলা কঠিন। কারণ আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রেও আছে,—

'প্রিয়ে, আকাশে চন্দ্রের মুখ দেখে
মনে হল তোমার মুখ,
তাই আমি চাঁদের পিছনে পিছনে ছুটছি।'

এ ধরনের তুলনাকে 'অসম্ভব তুলনা' বলে আলঙ্কারিক দণ্ডিন্ কাব্যাদর্শে নিন্দা করেছেন। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যে এতে হাস্যরসের অবতারণা হওয়া বিচিত্র নয়। কথা নেই, বার্তা নেই, একটা লোক যদি চাঁদের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ খোয়াই-ভাঙা মাঠ-ময়দান ভেঙে ছুটতে আরম্ভ করে আর বলতে থাকে 'ঐ আমার প্রিয়া, 'ঐ আমার প্রিয়া', তাহলে পাড়ার ডন্ জোয়ানদেরও হেসে ওঠা অসম্ভব নয়।

তবু না হয় মেনে নেওয়া গেল, চাঁদকে গুঁড়ো করে খোজা ইচ্ছা করেই বোকা বনেছেন। কিন্তু এখন যেটা বলছি সেটাতে খোজা কি?

দোস্তের বাড়ির দাওয়াতে খোজা খেলেন এক নতুন ধরনের মিশরী কাবাব। অতি সযত্নে এক টুকরো কাগজে লিখে নিলেন তার রেসিপি কিংবা পাকপ্রণালী কিংবা যাই বলুন। ততোধিক সযত্নে, ব-তরীবৎ সেটি রাখলেন জোব্বার ভিতরে গালাবিয়ার বুকপকেটে। রাস্তায় বেরিয়েই গেলেন তাঁর প্যারা কসাইয়ের দোকানে। আজ সন্ধ্যায়ই গিন্নীকে শিখিয়ে দেবেন কি করে এই অমূল্যনিধি রাঁধতে হয়। আর খাবেনও পেট ভরে। বন্ধুর বাড়িতে মেকদারটা একটু কম পড়েছিল। গোশ্ৎ কিনে খোজা রাস্তায় নামলেন।

হঠাৎ চিল এসে ছোঁ মেরে মাংস নিয়ে হাওয়া।

খোজা চিলের পিছনে ছুটতে ছুটতে আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে চিলকে বলতে লাগলেন, 'আরে কোরছ কি? শুধু মাংসটা নিয়ে তোমার হবে কি? রেসিপিটা যে পকেটে রয়ে গেছে। কী উৎপাত! দাঁড়াও না।'

কিন্তু এভাবে গল্পের পর গল্প বলতে থাকলে খোজার সম্পূর্ণ গ্রন্থি বিকল করে দিতে হয়। সম্পাদক আপত্তি জানাবেন।

এবারে তাহলে যে ধরনের গল্পের জন্য খোজা সুপ্রসিদ্ধ তারই একটি নিবেদন করি।

কথিত আছে, একদা খোজা জন্মভূমি তুর্কীর প্রতি বিরক্ত হয়ে দেশত্যাগ করে ইরান দেশে চলে যান। এতে আশ্চর্য হবার মত কিছুই নেই। কারণ খোজা ছিলেন কাণ্ডজ্ঞানহীন পরোপকারী—আমাদের বিদ্যাসাগরের মত দাগা খাওয়া বিচিত্র নয়।

তা সে যাই হোক,—লোকমুখে ইরানের রাজা সে খুশ-খবর শুনে বেএক্তেয়ার। তড়িঘড়ি লোকলশ্করসহ উজীর-ই-আলাকে পাঠিয়ে দিলেন খোজাকে পরম যত্নসহকারে রাজদরবারে নিয়ে আসতে। খোজা আসামাত্র

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তখ্‌ৎ-ই-সুলেমান ত্যাগ করে বাদশা তাঁকে আলিঙ্গন করে পাশে বসালেন। মাথায় সোনার তাজ পরিয়ে দিলেন, গায়ে কাশ্মীরী শাল জড়িয়ে দিলেন, কোমরবন্ধে দমশ্‌কী তলওয়ার ঝুলিয়ে দিলেন। চতুর্দিকে জয়জয়কার।

সভাভঙ্গের পর বাদশা নিভৃতে ইতি-উতি করে, আশ-কথা পাশ-কথা কাড়ার পর অতি সন্তর্পণে তাঁর জাগীরের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। খোজা কর-জোড়ে 'সে কি শাহ ইন-শাহ্‌, আপনার যে পূত পবিত্র... ইত্যাদি[৩] বলে তিনি নিবেদন করলেন, রাজসম্মানই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট।

বাদশাহ বিস্তর চাপাচাপি করার পর খোজা বললেন, 'হুজুরের যখন নিতান্তই এ হেন বাসনা তবে হুকুম জারী করে দিন কাল সকাল থেকে যারা বউকে ডরায় তারা আমাকে একটি করে ডিম প্রতি সকালে দেবে।'

দীন-দুনিয়ার মালিক বাদশা তো তাজ্জব। 'ওতে আপনার কি হবে? আমি খবর পেয়েছি, আমি দান-খয়রাতে দাতাকর্ণ।'

খোজা এলবুর্জ পাহাড়ের মত অচল অটল। তবে তাই সই। ইরানী ভাষায় বলতে গেলে আলোচনার কার্পেট তখন রোল্‌ করে গুটিয়ে ঘরের কোণে খাড়া করে রেখে দেওয়া হল।

পরদিন ফজরের নমাজের সময় থেকেই হৈ-হৈ রৈ-রৈ। এস্তেক রাজবাড়িতেও মমলেট-অমলেট নেই। কি ব্যাপার? যাদের বাড়িতে মুর্গী নেই তারা ফজরের আজানের পূর্বে ছুটেছে বাজারপানে। ডিম কিনে ধাওয়া করেছে খোজার ডেরার দিকে।

সেখানে ডাঁই ডাঁই হুদো হুদো আণ্ডার ছয়লাপ! আণ্ডার নবীন ব্রহ্মাণ্ড। পাইকিরী ব্যবসায়ীরা চতুর্দিকে বসে!

সাতদিন যেতে-না-যেতে খোজা ঢাউস তেতলা হাওয়া-মঞ্জিল হাঁকালেন। পক্ষাধিককাল মধ্যেই বোখারার কার্পেট, সমরকন্দের রেশমী তাকিয়া, মুরাদাবাদী আতরদান, গোলাপ-পাশ, বিদরী আলবোলা, রাজস্থানের গোলাপী মার্বেলের ফোয়ারা, সরণ-দীপের (স্বর্ণদ্বীপ সিংহল) হাতির দাঁতের চামর, ব্যজনী!

বাদশা তো আজব তাজ্জব মানলেন।

কুলোকে বলে, দু'একজন অমিতবীর্য সাহসী শের-দিল রুস্তম নাকি ডিম নিয়ে যায় নি দেখে তাদের (অথবা তার) স্ত্রী নাকি শুধিয়েছিল, 'ওঃ! তুমি বুঝি আমাকে ডরাও না?' তারপর আর দেখতে হয় নি!

ইরানের বাদশা খুশীতে তুর্কীর খাস খলীফাকে ছাড়িয়ে গেছেন।

এমন সময় রাজার মস্তকে বজ্রাঘাত। খোজা তিন-মাসের ছুটি চান,— দেশ থেকে বউ-বাচ্চা নিয়ে আসবেন বলে। খোজা মারাত্মক একদারনিষ্ঠ। রাজা আর কি করেন, অতি অনিচ্ছায় ছুটি দিলেন, অবশ্য তিন মাস রিট্রেঞ্চ করে দু'মাসের তরে। যাবার সময় বললেন, 'দোস্ত! দেরি করবেন না, আপনার বিরহে আমার— বাদশার গলা পড়িয়ে এল। তবুদিনে তাঁদের সম্পর্ক আর

---

৩ ইরানে বাদশার সামনে কোন্‌ মন্ত্র দিয়ে নিবেদন আরম্ভ করতে হয়, তার পুরো বিবরণের জন্য 'দেশে-বিদেশে' অধ্যায় পশ্য।

www.BanglaBook.org

রাজা-প্রজায় নয়—দোস্তীতে এসে দাঁড়িয়েছে।

দু'মাসের কয়েক দিন পূর্বেই খোজা রাজসভায় পুনরায় উপস্থিত। রাজা পরমানন্দে রাজোচিত ভাষায় শুধালেন, 'তবে কি পুণ্যশ্লোকা বেগম-সাহেবা স্ব-ভবনে অবতীর্ণ হয়েছেন?'

খোজা বললেন, 'হ্যাঁ হুজুর! তবে কি না, ভবনটি তাঁর উপর অবতীর্ণ হলেই হত আরো ভালো।'

তদ্দণ্ডেই সভাভঙ্গের হুকুম হল। বাদশা নিয়ে গেলেন খোজাকে অন্দরমহলে।

'শতেক বছর পরে বঁধুয়া আসিল ঘরে—'

বাদশার তখন ঐ হাল। দোস্তের সঙ্গে নিভৃতে দুহুঁ দুহুঁ হয়ে কুহু কুহু করবেন।

দু-পাত্র শিরাজী খেয়ে বাদশা খোজার কাছে ঘেঁষে বললেন," 'দোস্ত! রাজ্যের আর সকলের সঙ্গে আমার রাজা প্রজার সম্বন্ধ। তারা আমার কাছ থেকে চায়; আমি তাদের দি। কিন্তু আপনি আমার দোস্ত—আপনার সঙ্গে দোস্তীর সম্পর্ক। দোস্ত যখন দেশে ফেরে তখন দোস্তের জন্য—' বাদশা গলা সাফ করে বললেন, 'এই, ইয়ে, মানে, কোনো কিছু একটা সওগাত আনে। আপনি তো আনেন নি।'

বলে বাদশা খ্যাঁক খ্যাঁক করে বিশ্রী রকমের হাসতে লাগলেন।

না-হক্ক বেইজ্জৎ হলে মানুষ যে রকম বেদনাতুর কণ্ঠে ককিয়ে ওঠে, খোজা সেইরকম বললেন, 'জাঁহাপনা কুল্লে দুনিয়ার ইমান-ইনসাফের মালিক, এ সংসারে আল্লা-তালার ছায়া (জিল্লুল্লা)—আমার উপর অবিচার করবেন না। এনেছি, আলবৎ এনেছি। দেশে পৌঁছে সক্কলের পয়লা হুজুরেরই সওগাত সংগ্রহ করেছি। আজ সঙ্গে আনি নি। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হয়। কাল সন্ধ্যায় নিয়ে আসবো।'

একেই বলে দোস্ত্!

উদ্‌গ্রীব হয়ে রাজা শুধালেন, 'কি? কি? আমার যে তর সইছে না। আঃ, জীবনে এই প্রথম কিছু-একটা পেলুম।'

খোজা বললেন, 'নিজের আনা সওগাতের প্রশংসা করতে বাধছে, কিন্তু সত্যি হুজুর—অপূর্ব, অতুলনীয়। একটি অপরূপ সুন্দরী তুর্কী তরুণী আপনার জন্য এনেছি হুজুর।'[৪]

---

৪ ইরানে তুর্কী রমণীর বড়ই কদর।

'হে তরুণী হে তুরস্কী, হে সুন্দরী সাকি
এমনি হৃদয় মুগ্ধ করিয়াছ তুমি,
তব কপোলের ঐ কৃষ্ণ তিল লাগি
বোখারা সমরকন্দ দিতে পারি আমি।'

অনুবাদটি ভালো নয়। কিন্তু হাফিজের এই কবিতাটি এতই বিখ্যাত যে, তার একাধিক ইংরিজী অনুবাদ আছে—

"If that unkindly Shirazi Turk
would take my heart in her hand

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঝংকারের জন্য ফার্সীটা শুনুনঃ

'অগর্ আন্ তুর্ক-ই শিরাজী
বদস্ত আরদ্ দিল-ই মারা
ব্-খাল-ই হিন্দো ওণ বখ্শম্
সমরকন্দ্ ওয়া বুখারারা।'[৫]

কথিত আছে এ দোঁহা লিখে হাফিজকে তিমুর লেনের সামনে বিপদে পড়তে হয়েছিল। সেটা বারান্তরে হবে।

তারপর খোজা উচ্ছ্বসিত হয়ে সেই তরুণীর রূপবর্ণনা আরম্ভ করলেন, একেবারে আমাদের বিদ্যাপতি স্টাইলে, নখ্ থেকে শির পর্যন্ত—যাকে বলে নখশির বর্ণন। 'ওহো হো হো,—একটি তন্বঙ্গী চিনার গাছ হেন! কী দোলন, কী চলন!'

বাদশা বললেন, 'আস্তে।'

কিন্তু খোজাকে তখন পায় কে, তিনি মৌজে। গলা চড়িয়ে বললেন, 'চিকুর কেশ তো নয়, যেন অমা-যামিনীর স্বপ্নজাল—আর্দ্র, স্নিগ্ধ, মৃগনাভি সম।'

উৎসাহের তোড়ে খোজা তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন। যেন রাজকবি দরবারের সবাইকে শুনিয়ে কবিতা পাঠ করছেন।

বাদশা ব্যাকুল হয়ে খোজার জোব্বা টেনে কাতর কণ্ঠে বললেন, 'চুপ্, চুপ্, আস্তে আস্তে—পাশের ঘরে বেগম-সায়েবা রয়েছেন।'

ঝুপ্ করে বসে পড়ে খোজা বিনয়নম্র কণ্ঠে বললেন, 'হুজুর, কাল সকাল থেকে একটি করে আন্ডা পাঠিয়ে দেবেন। আমার পাওনা।'

এইখানেই খোজা-কাহিনী শেষ করলে ঠিক হত। কিন্তু তাহলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। তিনি পরলোকগমনের পূর্বে যে শেষ রসিকতাটি করে গিয়েছেন, সেটি বাদ পড়ে যায়। কারণ সেটি আজও প্রথম দিনের মত তাজা, অতিশয় নব—ফার্সীতে যাকে বলে 'তাজা ব্-তাজা, নৌ-ব-নৌ', দ্বিতীয়ত, আন্ডার গল্পটি আমি শুনেছি আমার সর্ব-কনিষ্ঠা ভগিনী লুৎফুন্নিসার কাছ থেকে। আমার মত তার পায়েও চক্কর আছে। সে শুনেছে, লাহোর না পেশাওয়ার কোথায় যেন। এর থেকে এটাও বোঝা যায়, খোজার গল্প মুখে মুখে কতখানি ছড়িয়ে পড়েছে। এখন বাঙলা দেশেও পৌঁছল। সপ্তদশ

I'd give Bukhara for the mole upon
her cheek, and Samarkand."

কিম্বা

"Sweet maid, if thou wouldst charm my sight;
And bid these arms thy neck infold;
That rosy cheek, that lily hand
Would give thy poet more delight
Than all Bokharas vaunted gold.
Than all the gems of Samarkhand."

৫। সত্যেন দত্তের অনুবাদ আছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অশ্বারোহী গাঁজা ; দশ বাদ দিয়ে সপ্ত শতাব্দীতেই হয়।

এবারে শেষ গল্প। এটাতে আপনি আমি সবাই আছি।

যেমন মনে করুন, দৈবযোগে আপনি পৌঁচেছেন আক্‌শেহিরে। স্বভাবতই আপনার মনে বাসনা, দিলে ইরাদা জাগবে খোজার গোরস্তান দেখবার জন্য। একাই বেরিয়ে পড়ুন ; কিচ্ছুটি ভাবনা নেই, সবাই রাস্তা চেনে।

সেখানে গিয়ে দেখবেন, সামনে এক বিরাট দেউড়ি—প্রবেশদ্বার। কোথায় লাগে তার কাছে ফতেহ্‌-পুর-সিক্রিতে আকবর বাদশার বুলন্দ-দর্‌ওয়াজ্‌। একেবারে শিশু। তা না হয় হল, কিন্তু অবাক হবেন দেখে যে বন্ধ দরজায় এক বিরাট তিন মণ ওজনের তালা!

গোরস্থানে আছেই বা কি, যাবেই বা কি? এই ভারতবর্ষেই লুটতরাজের ফলে যা কিছু ইমারৎ বেঁচে আছে, সেগুলো হয় কবর নয় মসজিদ—ওসবে লুটের কিছু নেই বলে। তিন মণী তালা দিয়ে খোজার দেহরক্ষা—অন্যার্থে—করা হচ্ছে, মিশরী মমীর মত? কিন্তু ইসলামে তো হেন ব্যবস্থা নেই।

নাচার হয়ে তালাটা বন্ধ দোরে বার কয়েক ঠুকলেন, এদিক ওদিক গলা বাড়িয়ে চেল্লাচেল্লি করলেন।

তখন দরাজ-দেউড়ির একপাশ দিয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে বেরিয়ে এল পাহারা-ওলা। আপনাকে সবিনয় নিবেদন করবে, 'কি হবে ঐ বিরাট তালা খুলে। ওটা কখনো খোলা হয় নি। চলুন পাঁচিল ডিঙিয়ে যাই।'

মানে?

একশ' ফুট উঁচু দেউড়ি—চতুর্দিকের পাঁচিল উঁচুতে এক ফুট হয় কি না হয়!

মানে?

খোজার আখেরী-শেষ মস্করা। উইলে এইভাবে তৈরী করবার আদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন।

বলতে চেয়েছিলেন, 'এ জীবনে আমরা সামনের দিকটা আগলাতেই ব্যস্ত। ইতিমধ্যে আর সব দিক দিয়ে যে বেবাক কিছু চলে যায়, তার খবর রাখি নে।'

* * *

আমি আক্‌শেহির যাই নি। কাজেই হলফ খেয়ে বলতে পারবো না, খোজার দর্গা এই পদ্ধতিতে নির্মিত কি না। যদি না হয় তবে বুঝবো খোজা আরো মোক্ষম রসিক। বিন-খর্চায় আমাদের এখনো হাসাচ্ছেন আর বোকা বানাচ্ছেন।

নজরুল ইসলাম ও ওমর খৈয়াম

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, রাজমহল, শ্রীরামপুর, হুগলী এবং পরবর্তী যুগে কলকাতায় অনেকখানি আরবী-ফার্সীর চর্চা হয়েছিল বটে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এ চর্চা খুব ছড়িয়ে পড়তে পারে নি। তার প্রধান কারণ অতি সরল—ইসলাম পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে পূর্ব বাংলার মত ছড়িয়ে পড়তে পারে নি, কাজেই

www.BanglaBook.org

অতি সহজেই অনুমান করা যায়, চুরুলিয়া অঞ্চলে পীর-দরবেশদের কিঞ্চিৎ সমাগম হয়ে থাকলেও মৌলবী-মৌলানারা সেখানে আরবী-ফার্সীর বড় কেন্দ্র স্থাপনা করতে পারেন নি।

তদুপরি নজরুল ইসলাম ইস্কুলে সুবোধ বালকের মত যে খুব বেশী আরবী-ফার্সী চর্চা করেছিলেন তাও মনে হয় না। ইস্কুলে তিনি আদৌ ফার্সী (আরবীর সম্ভাবনা নগণ্য) অধ্যয়ন করেছিলেন কি-না, সে সম্বন্ধেও আমরা বিশেষ কিছু জানি নে। শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ নিশ্চয়ই অনেক কিছু বলতে পারবেন।

তারো পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেওয়ার ফলে তিনি যে এ সব ভাষায় খুব বেশী এগিয়ে গিয়েছিলেন তাও তো মনে হয় না। পল্টনের হাবিলদার যে জাব্বা-জোব্বা পরে দেওয়ানা-দেওয়ানা ভাব ধরে হাফিজ-সাদীর কাব্য কিম্বা মৌলানা রুমীর মসনবী সামনে নিয়ে কুঞ্জে কুঞ্জে ছন্নছাড়ার মত ঘুরে বেড়াবে তাও তো মনে হয় না। এমন কি রঙীন সদরিয়ার উপর মলমলের বুটিদার অঙ্গরখা পরে হাতে শিরাজীর পাত্র নিয়ে সাকীর কণ্ঠে ফার্সী গজল আর কসীদাগীত শুনছেন, এও খুব সম্ভবপর বলে মনে হয় না। কসম খেয়ে এ বিষয়ে কোনো কিছু বলা শক্ত তবে এটা তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, কাব্যে যদ্যপি 'খাকী' এবং 'সাকী' চমৎকার মিল, তবু বাস্তব জীবনে এ দুটোর মিল এবং মিলন সচরাচর হয় না।

তবু নজরুল ইসলাম মুসলিম ভদ্রঘরের সন্তান। ছেলেবেলায় নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ আলিফ, বে, তে করেছেন, দোয়া-দরুদ (মন্ত্র-তন্ত্র) মুখস্থ করেছেন, কুরান পড়াটা রপ্ত করেছেন ; পরবর্তী যুগে তিনি কুরানের শেষ অনুচ্ছেদ 'আমপারা' বাঙলা ছন্দে অনুবাদ করেন—হালে সেটি প্রকাশিত হয়েছে। সে পুস্তিকাতে তাঁর গভীর আরবী জ্ঞান ধরা পড়ে না—ধরা পড়ে তাঁর কবি-জনোচিত অন্তর্দৃষ্টি এবং আমপারার সঙ্গে তাঁর যে আবাল্য পরিচয়। বিশেষ করে ধরা পড়ে, দরদ দিয়ে সৃষ্টিকর্তার বাণী (আল্লার 'কালাম') হৃদয়ঙ্গম করার তীক্ষ্ণ এবং সূক্ষ্ম প্রচেষ্টা।

এরই উপর আমি বিশেষ করে জোর দিতে চাই। ফার্সী তিনি বহু মোল্লা-মৌলবীর চেয়ে কম জানতেন, কিন্তু ফার্সী কাব্যের রসাস্বাদন তিনি করেছেন তাঁদের চেয়ে অনেক বেশী। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই অনেক সংস্কৃত ব্যাকরণ-বাগীশদের চেয়ে কম সংস্কৃত জানতেন, কিন্তু তিনি লিরিকের রাজা-মেঘদূত-খানা জীবন এবং কাব্য দিয়ে যতখানি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, ততখানি কি কোনো পণ্ডিত পেরেছেন? বহু লোকই বাংলা দেশের মাটি নিখুঁতভাবে জরিপ করেছে, কিন্তু ঐ মাটির জন্য প্রাণ তো তারা দেয় নি। কানাইলাল, ক্ষুদিরাম ভালো জরিপ জানতেন এ কথাও তো কখনো শুনি নি।

কাজী রোমান্টিক কবি। বাংলা দেশের জল-বাতাস, বাঁশ-ঘাস যে রকম তাঁকে বাস্তব থেকে স্বপ্নলোকে নিয়ে যেত, ঠিক তেমনি ইরান-তুরানের স্বপ্ন-ভূমিকে তিনি বাস্তবে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন বাংলা কাব্যে। ইরানে তিনি কখনো যান নি, সুযোগ পেলেই যে যেতেন, সে কথাও নিঃসংশয়ে বলা যায় না (শুনেছি, পণ্ডিত হয়েও মাক্সমুলার ভারতবর্ষকে ভালবাসতেন এবং তাই বহুবার সুযোগ পেয়েও এদেশে আসতে রাজী হন নি।) কিন্তু ইরানের

www.BanglaBook.org

গুল-বুল্‌বুল, শিরাজী-সাকী তাঁর চতুর্দিকে এমনই এক জানা-অজানার ভুবন সৃষ্টি করে রেখেছিল যে গাইড-বুক, টাইম-টেবিল ছাড়াও তিনি তার সর্বত্র অনায়াসে বিচরণ করতে পারতেন। গুণীরা বলেন, প্রত্যেক মানুষেরই দুটি করে মাতৃভূমি—একটি তাঁর আপন জন্মভূমি ও দ্বিতীয়টি প্যারিস। কাজীর বেলা বাঙলা ও ইরান। কীটস বায়রনের বেলা যে রকম ইংল্যান্ড ও গ্রীস।

আরবভূমির সঙ্গে কাজী সায়েবের যেটুকু পরিচয়, সেটুকু প্রধানতঃ ইরানের মারফতেই। কুরান শরীফের 'হারানো ইউসুফের' যে করুণ কাহিনী বহু মুসলিম অমুসলিমের চোখে জল টেনে এনেছে তিনি কবিরূপে তার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন ফার্সী কাব্যের মারফতে।

দুঃখ করো না, হারানো য়ুসুফ
কাননে আবার আসিবে ফিরে।
দলিত শুষ্ক এ মরু পুনঃ
হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে॥
ইউসুফে গুম্‌গশ্‌তে বাজ্‌ আয়দ্‌ব্‌ কিনান্‌
গম্‌ ম্‌ খুর।
কুল্‌বয়ে ইহ্‌জান্‌ শওদ্‌ রুজি গুলিস্তান্‌
গম্‌ ম্‌-খুর॥

কাজী সায়েবের প্রথম যৌবনের রচনা এই ফার্সী কবিতাটির বাংলা অনুবাদ অনেকেরই মনে থাকতে পারে। 'মেবার পাহাড়, মেবার পাহাড়ে'র অনুকরণে 'শাতিল আরব শাতিল আরব' ঐ যুগেরই অনুবাদ।

কোনো কোনো মুসলমান তখন মনে মনে উল্লসিত হয়েছেন এই ভেবে যে, কাজী বিদ্রোহী লিখুন আর যা-ই করুন, ভিতরে ভিতরে তিনি খাঁটি মুসলমান। কোনো কোনো হিন্দুর মনেও ভয় হয়েছিল (যাঁরা তাঁকে অন্তরঙ্গ ভাবে চিনতেন তাঁদের কথা হচ্ছে না) যে কাজীর হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতি বোধ হয় বাঙলার জন্য নয়—তাঁর দরদ বুঝি ইরান-তুরানের জন্য। পরবর্তী যুগে—পরবর্তী যুগে কেন, ঐ সময়েই কবিকে যাঁরা ভালো করে চিনতেন, তাঁরাই জানতেন, ইরানী সাকীর গলায় কবি যে বার বার শিউলির মালা পরিয়ে দিচ্ছেন তার কারণ সে তরুণী মুসলমানী বলে নয়, সে সুন্দরী ইরানের বিদ্রোহী কবিদের নর্ম সহচরী বলে—ইরানের বিদ্রোহী আত্মা কাব্যরূপে, মধু-রূপে তার চরম প্রকাশ পেয়েছে সাকীর কল্পনায়।

সে বিদ্রোহ কিসের বিরুদ্ধে?

এস্থলে কিঞ্চিৎ ইতিহাস আলোচনার প্রয়োজন।

ইরানী ও ভারতীয় একই আর্যগোষ্ঠীর দুই শাখা। দুই জাতির ইতিহাসেই অনেকখানি মিল দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইরানীরা যে রকম দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে একদিকে মিশর প্যালেস্টাইন, অন্যদিকে গ্রীস পর্যন্ত হানা দিয়েছিল, ভারতীয়েরা সে রকম করে নি। দ্বিতীয়তঃ বিদেশী অভিযানের ফলে ইরানভূমি যে রকম একাধিকবার সম্পূর্ণ লণ্ডভণ্ড হয়েছে, ভারতবর্ষের ভাগ্যে তা কখনো ঘটে নি। এ সব কারণেই হোক বা অন্য যে-কোন কারণেই হোক ইরানীরা সভ্যতার প্রথম যুগ থেকেই সে এক উগ্র স্বাজাত্যাভিমানের সৃষ্টি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করে। ভারতবর্ষ যেখানে শান্তভাবে বিদেশীর ভালো-মন্দ দেখে-চিনে নিজেকে মেলাবার, পরকে আপন করার চেষ্টা করেছে, ইরান সেখানে আদৌ সে চেষ্টা করে নি এবং শেষটায় যখন বাধ্য হয়ে সব কিছু নিতে হয়েছে তখন করেছে পরবর্তীকালে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

গ্রীস-রোমের কাছে পরাজিত হওয়া এক কথা, আর প্রতিবেশী 'অনুন্নত' 'অর্ধসভ্য' আরবদের কাছে পরাজিত হওয়া আরেক কথা। তদুপরি গ্রীক রোমানরা ইরানে যে সভ্যতা এনেছিল, তাতে গরীব-দুঃখীর জন্য নতুন কোনো আশার বাণী ছিল না। যে নবীন ধন-বণ্টন পদ্ধতি দ্বারা হজরৎ মুহম্মদ আরব দেশের আপামর জনসাধারণকে ঐক্যসূত্রে গ্রন্থন করতে সক্ষম হয়েছিলেন তার বাণী এসে পৌঁছল ইরানে। ফলে মুহম্মদ সাহেবের পরবর্তীগণ যখন একদিন অন্যান্য জাতির মত দিগ্বিজয়ে বেরোল তখন ইরানী শোষক সম্প্রদায় দেখে মর্মাহত ও স্তম্ভিত হল যে, ইরানের জনসাধারণ আরবের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হল না। তারপর আরবরা বিজিত দেশের ধর্মজগতে যে সাম্যবাদ ও অর্থের ক্ষেত্রে যে ধনবণ্টন পদ্ধতি প্রচার করলো, তাতে আকৃষ্ট হয়ে ইরানের জনসাধারণ মুসলমান হয়ে গেল। জ্ঞানাভিমানী ও ধর্মযাজক সম্প্রদায়ও শেষ পর্যন্ত ঐ ধর্ম গ্রহণ করল। তখনকার মত ইরানী সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রায় লোপ পেয়ে গেল।

কিন্তু বিদ্রোহ লুপ্ত হল না।

সেটা দেখা দিল প্রায় চারশ' বছর পরে ফিরদৌসী মহাকাব্য 'শাহনামা'তে। রাষ্ট্রভাষা আরবীকে উপেক্ষা করে ফিরদৌসী গাইলেন প্রাক-মুসলীম যুগের ইরানী বীরের কাহিনী, রাজার দিগ্বিজয়, প্রেমিকের বিরহ-মিলন গাথা—নবীন অথচ সনাতন সেই ফার্সী ভাষায়। যে ফার্সী কাব্য-সাহিত্য পরবর্তী যুগে বিশ্বজনের বিস্ময় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়, তার প্রথম সার্থক কবি ফিরদৌসী।

এই নূতন ভাষাতে, নবীন প্রাণে উন্মত্ত হয়ে যে সব কবি কাব্যের সর্ববিষয়বস্তু নিয়ে নব নব কাব্যধারার প্রবর্তন করলেন তার কাছে পরবর্তী যুগের ইউরোপীয় রেনেসাঁসও এতখানি সর্বমুখী বলে মনে হয় না। দু'শ বছর যেতে না যেতেই বিশ্বের কাব্যজগতে ইরান তার অদ্বিতীয় আসন সৃষ্টি করে নিল।

এ'দের মধ্যে সত্য বিদ্রোহী কবি ওমর খৈয়াম।

* * *

ইরানে ইসলাম প্রচারিত হওয়ার ফলে শিক্ষিত তথা পুরোহিত সম্প্রদায়ের ভিতর বিভিন্ন আন্দোলনের সৃষ্টি হল। তার প্রথম ঃ

(১) যাঁরা মুসলিম শাস্ত্রের চর্চা করে যশস্বী হলেন। ভাবলে আশ্চর্য বোধ হয়, ইরানীরা আরবীর মত কঠিন ভাষা আয়ত্ত করে সে শাস্ত্রে এতখানি বুৎপত্তি অর্জন করলো কি করে? মুসলমানদের মনুর নাম ইমাম আবু হানীফা। পৃথিবীর শতকরা আশীজনেরও বেশী মুসলমান আজ নিজকে হানফী অর্থাৎ আবু হানীফার মতবাদে বিশ্বাসকারী বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু তাতে আশ্চর্য হবার মত কীই বা আছে? শ্রীশ্রীশংকরাচার্য তো শুনেছি ভারতবর্ষের দক্ষিণতম কোণের লোক, এবং তাঁর ধমনীতে যে অত্যধিক আর্যরক্ত

www.BanglaBook.org

ছিল তাও তো মনে হয় না, অন্ততঃ একথা তো অনায়াসে বলা যেতে পারে যে, আর্য উত্তর ভারতের তুলনায় মালাবারে সংস্কৃত-চর্চা ছিল অনেক কম। তবু যে তিনি শুধু তাঁর মাতৃভূমি মালাবারে বৌদ্ধদের পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাই নয়, আর্য উত্তর ভারতেও তিনি তাঁর বিজয় পাতাকা উড্ডীয়মান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইরানী আবু হানীফার মতবাদও একদা ইসলামের জন্মভূমি মক্কা-মদীনা তথা আরব দেশ জয় করতে সক্ষম হয়েছিল। এরকম উদাহরণ পৃথিবীতে আরো আছে।

(২) যাঁরা ক্রিয়াকাণ্ড, টীকা-টিপ্পনী, মন্ত্রতন্ত্রে সম্পূর্ণ আস্থা না দিতে পেরে 'রহস্যবাদ' বা সূফীতত্ত্বের প্রচার এবং প্রসার করতে লাগলেন ; এঁরা ভগবানের আরাধনা করেন রসের মাধ্যমে এবং বাঙলার বৈষ্ণব তথা 'মরমিয়া'দের সঙ্গে এঁদের তুলনা করা যেতে পারে।

মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা
কাজ নাই সখি, তাঁদের কথায়
বাহিরে থাকেন তাঁরা।

* * *

ঐ চাহনিতে বিশ্ব মজেছে
পড়িয়াছে কত অশ্রুধার
পাগল করিল এ প্রমত্ত আঁখি
কুলমান রাখা হৈল ভার।

এ ধরনের কবিতা সূফী ও বৈষ্ণবদের ভিতর এতই প্রচলিত যে, কোন্‌টি সূফী কোন্‌টা বৈষ্ণব ধরে ওঠা অসম্ভব। যদি বলি,

প্রেম নাই, প্রিয় লাভ আশা করি মনে
রাধিকার মত ভ্রান্ত কে ভব-ভবনে।

তবে চট করে কেউ আপত্তি করবেন না। অথচ আসলে আছে,

প্রেম নাই, প্রিয় লাভ আশা করি মনে
হাফেজের মত ভ্রান্ত কে ভব-ভবনে।

('সদ্ভাব-শতক' কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের অনুবাদ)

বৈষ্ণবদের সঙ্গে এঁদের আরো বহু মিল আছে। এঁদের সূফীবাদ পরবর্তী যুগে তথাকথিত 'তুর্কী'রা গ্রহণ করে। বাঙলা দেশে প্রথম যে মুসলমানরা আসেন তাঁদের আমরা 'তুর্ক', 'তুরুক্' নাম দি (প্রাচীন বাঙলার 'মুসলমান' শব্দের প্রতিশব্দ 'তুর্ক'—তামিলে এখনো 'তুরুক্কম্') এবং তাঁদের চক্রাকারে নৃত্য করে আল্লার নাম জপ ('জিকর'—যার থেকে বাঙলা 'জিগির' শব্দ এসেছে) করা দেখে 'তুর্কী-নাচন-নাচা' প্রবাদটি এসেছে। বৈষ্ণবদের মত এঁরাও জপ করতে করতে 'হাল' ('দশা') প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন, ও মুখ দিয়ে তখন প্রচুর ফেনা বেরয়। পূর্ব ইয়োরোপে এই নাচ দেখে ইয়োরোপীয়রা এদের নাম দিয়েছিল "ডানসিং দরবেশ"। ইংরিজীতে কথাটা এখনো চালু আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে অত্যধিক বাগাড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন, কারণ আউল-বাউল, ভাটিয়ালি-মুর্শীদীয়া গীত যাঁরাই শুনেছেন, তাঁরাই এই ফার্সী, সূফী ভক্তিবাদের কিঞ্চিৎ গন্ধ স্পর্শ পেয়েছেন।

www.BanglaBook.org

(৩) দার্শনিক সম্প্রদায়। আর্যগোষ্ঠীর দুই সম্প্রদায়—ভারতীয় ও গ্রীকরাই প্রধানত দর্শনের চর্চা করেছেন।

মাহমুদ বাদশার সভাপণ্ডিত 'ভারতবর্ষ' পুস্তকের (প্রাচীন তথা অর্ধাচীন ভারতের বহুমুখী কার্যকলাপ, চিন্তা, অনুভূতির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত হতে চান তাঁদের পক্ষে এ পুস্তক অপরিহার্য ; বস্তুতঃ বর্তমান লেখক ব্যক্তিগত ভাবে এ পুস্তককে 'মহাভারতে'র পরেই স্থান দেয়) লেখক পণ্ডিত অলবীরুনী মুক্তকণ্ঠে বলেছেন, 'দর্শনের চর্চা করেছেন গ্রীক এবং ভারতীয়েরা—আমরা (অর্থাৎ আরবী লেখকেরা) যেটুকু দর্শন শিখেছি তা এঁদের কাছ থেকেই।' কথাটা মোটামুটি সত্য, যদিও পণ্ডিতজনসুলভ কিঞ্চিৎ বিনয় প্রকাশ এতে রয়েছে, কারণ আরবরা গ্রীকদর্শনের আরবী অনুবাদ দিয়ে দর্শন-চর্চা আরম্ভ করেছিলেন সত্য কিন্তু পরবর্তী যুগে আভিচেন্না (বু আলী সিনা), আভেরস্ (আবু রুশ্‌দ্) ও গজ্‌জালী (অল-গাজেল—এঁর 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি' প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বাঙলায় অনূদিত হয়ে রাজশাহীতে প্রকাশিত হয়) বহু মৌলিক চিন্তা দ্বারা পৃথিবীর দর্শনভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু স্মরণ রাখা ভালো, এঁদের দর্শন শঙ্কর দর্শনেরই ধর্মাশ্রিত এবং যে-স্থলে কুরানের বাণীর সঙ্গে গ্রীক দর্শনের দ্বন্দ্ব বেধেছে সেখানে তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন সে-দ্বন্দ্বের সমাধান করার এবং সময়ে সময়ে তখন তাঁরা নিওপ্লাতোনিজম অর্থাৎ ভারতের উপনিষদসম্মত অন্তর্দৃষ্টির উপর নির্ভর করেছেন। এদের বিশেষ নাম 'মুতকল্লিমুন' এবং পরবর্তী যুগে এদেশের রাজা রামমোহন তাঁর বিশ্বদর্শন (ভেল্টানশাউউঙ) নির্মাণে এঁদের পরিপূর্ণ সাহায্য নিয়েছেন।

(৪) ঐতিহাসিক ও কবিগোষ্ঠী। ইতিহাস-চর্চায় আরবদের দক্ষতা সর্বজনমান্য, তবে ইরানীরাও এ-শাস্ত্র তাঁদের কাছ থেকে শিখে নিয়ে এর অনেক উন্নতিসাধন করেন। কিন্তু আমরা যে যুগের আলোচনা করছি তখনো ইরানীদের কাছে ইতিহাস ও পুরাণের পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে ধার দেয় নি। ফিরদৌসীর 'শাহনামা' (রাজবংশ) কাব্যের রাজা-মহারাজা, নায়ক-নায়িকারা অধিকাংশই কবিজনসুলভ কল্পনাপ্রসূত—অন্তত তাঁদের কীর্তিকলাপ তো বটেই। কিন্তু সব চেয়ে লক্ষ্য করার বিষয়, প্রাক-ইসলামী এই সব অগ্নিউপাসক নায়ক-নায়িকাদের নিয়ে ফিরদৌসীর কী গগনচুম্বী গরিমা দম্ভ এবং সময় সময় আস্ফালন। এ যেন বিজয়ী আরবদের বার বার শুনিয়ে শুনিয়ে বলা, 'কালনেমির বিরূপাবর্তনে আজ আমাদের পতন ঘটেছে বটে, কিন্তু এই কাব্যে দেখ, আমরা একদিন সভ্যতার কত উচ্চ শিখরে উঠেছিলুম। সেদিকে একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখো। ওখানে তোমরা কখনো পৌঁছও নি, পৌঁছবেও না।' এ সুর কেমন যেন আমাদের চেনা-চেনা মনে হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই ইংরেজকে শুনিয়ে শুনিয়ে বার বার এই গান গেয়েছে। ('অন্য জাতি দিগ্‌বসন পরিত যখন। ভারতে ঋগ্বেদ পাঠ হইত তখন।')। কিন্তু, আফসোস, শাহনামার মত মহাকাব্যের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে নি। হেমচন্দ্র ও ইকবালকে ফিরদৌসীর আসনে বসানো কঠিন এবং অন্যান্য কবিরা যে 'নির্লজ্জতা' দেখালেন ('নির্লজ্জতা' শব্দটি ভেবেচিন্তেই কুটেশনের ভিতর ফেললুম, কারণ কাব্যে রসস্বরূপে

www.BanglaBook.org

প্রকাশ পেলে চরম নির্লজ্জতাও পাঠকের মনে বিদ্রোহ সঞ্চার করতে পারে না। আমাদের দুই মাইডিয়ার হীরো পবননন্দন ভীমসেন ও হনুমান যে সব দম্ভ এবং আস্ফালন করেছেন তা স্বকর্ণে শুনতে হলে 'রাম রাম' বলতে হত, কিন্তু কাব্যে পাঠ করে আনন্দাশ্রু বিগলিত হয়, মনে হয়, ঐ সময়ে, ঐ অবস্থায় এ বাক্য ছাড়া অন্য কিছুই এঁদের মুখে মানাতো না, বলতে ইচ্ছে করে, 'ধন্য ধন্য যুগ্মকবি যাঁরা দম্ভকে বিনয়, লজ্জাকে শ্লাঘায় পরিণত করতে পারেন!') সেটা ঢাকবার প্রয়াস আজও ইরানে-তুরানে সহজেই চোখে পড়ে। সকলেই জানেন, মুসলমান ধর্মে মদ খাওয়া মানা আর সেই মদও যদি খাওয়া হয় তন্বঙ্গী তরুণী সাকীর সঙ্গে—যার সঙ্গে 'বে-থা' হয়েছে কিনা সে সম্বন্ধেও কবিরা বড় মারাত্মক স্মৃতিশক্তিহীন—তায় আবার ঝরণা তলায়, নির্জনে, সাঁঝের ঝোঁকে, যখন কিনা 'মগরিবের আইন ওক্‌তে' নামাজ পড়ার কথা, আল্লা-রসুলের নাম স্মরণ করার আদেশ—এবং মনে মনে আওড়ানো,

"মত্ত মাতাল ব্যসনী আমি গো আমি কটাক্ষ বীর"

তা হলে অবস্থাটা কি রকমের হয়?

কথা সত্য, মোল্লারা সুবো-শাম ভালো ভালো কেতাবপুঁথি পড়েন, কিন্তু মাঝে-মধ্যে, নিতান্ত কালে-কস্মিনে দু'একখানা কাব্যগ্রন্থের পাতাও তো তাঁরা ওলটান। কবি হাফিজ অবশ্য বিস্তর ঢলাঢলির পর ওকীবহাল হয়ে অভয় বাণী বলেছিলেন,

"মোল্লার কাছে কোরো না কিন্তু মোর পিছে অনুযোগ,
তারো আছে, জেনো, আমারি মতন, সুরামত্ততা রোগ।"

তবুও, এ-কথাও তো অজানা নয় যে, মোল্লারাই নীতিবাগীশ সাজে আর পাঁচ-জনের তুলনায় বেশী।

এবং কার্যত দেখা গেল তারা এবং তাদের চেলাচামুণ্ডর দল ঝোপে-ঝাপে বসে আছে, শরাব-কবাব জান-কী-সাকী সুদ্ধ কবিদের বমাল গ্রেপ্তার করার জন্য।

কবিরা এবং বিশেষ করে আমাদের মত তাঁদের গুণগ্রাহীরা উচ্চকণ্ঠে তখন বললেন, এ-সব কবিতা রূপকে নিতে হয়। মদ্য অর্থ ভগবদ প্রেম, সাকী অর্থ যিনি সে প্রেম আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেন, অর্থাৎ পীর, গুরু, মুরশীদ, পয়গম্বর। এবং এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, হাফিজ, আত্তার, এমন কি ওমর খৈয়ামের বহু কবিতার কোনো অর্থই করা যায় না, যদি সেগুলো রূপক দিয়ে অর্থ না করা হয়। কিন্তু বাদবাকিগুলো?

আমাদের পদাবলীতেও তাই। এবং বিস্তর সব পদ আছে যাতে মর্ত্য আর অমর্ত্য প্রেম এমন ভাবে মিশে গিয়েছে যে, দুটোকে আদৌ আলাদা করা যায় না—সমস্ত হৃদয়-মন এক অদ্ভুত অনির্বচনীয় রসে আপ্লুত হয়ে যায়।

তোমার চরণে আমার পরাণে
লাগিল প্রেমের ফাঁসী
সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া
নিচয় হইলাম দাসী

মর্ত্য প্রেমই যদি হবে তো 'পরাণে' 'পরাণে' প্রেমের ফাঁসী লাগবে। 'পরাণে'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর 'চরণে' প্রেমের বাঁধ বেঁধে দিয়ে কী এক অপূর্ব অতুলনীয় ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়েছে—যার অনুভূতি এ-জগতে আরম্ভ, আর পরিপূর্ণতা লাভ করবে সেই অমর্ত্যলোকে, 'ব্যর্থ নাহি হোক এ-কামনা।'

কিন্তু মাঝে মাঝে মনে দ্বিধা জাগে, সর্বত্রই কি রূপকের শরণাপন্ন হতে হবে? যথা:

অদ্যাপ্য-শোক-নব-পল্লব-রক্তহস্তাং
মুক্তাফল প্রলয়চুম্বিত-চুচুকাগ্রাম্।
অন্তঃস্মিতেন্দুসিত পাণ্ডুর গণ্ডদেশাং,
তাং বল্লভাং রহসি সংবলিতাং স্মরামি॥

বিদ্যাপক্ষে

অশোক-পল্লব নব সম পাণিতলে।
কুচাগ্র শোভিত হয়েছে মুক্তাফলে॥
অন্তরে ঈষৎ হাস গণ্ডে বিকসিত।
শরতের চন্দ্র যেন ত্রিলোক-মোহিত॥
নির্জনেতে বসি করি সদা সম্ভাবনা।
প্রাণাধিকা প্রেয়সীকে নিতান্ত কামনা॥
তথাপি বিদ্যার নাহি পাই দরশন।
বিদ্যা তন্ত্র মন্ত্র করি ত্যজিব জীবন॥

দ্বিতীয়ার্থ কালীপক্ষে

রুধির-খর্পর হস্তে দিবানিশি যার।
রক্তবর্ণ করতল হয়েছে শ্যামার।
উচ্চ পয়োধরপরি বান্ধিত কাঁচলী।
হীরক জড়িত হারে শোভে মুক্তাবলী॥
অন্তরে গভীর হাস্য ঈষদ্ধাস্য কালে।
কিরণে আছয়ে গণ্ড পাণ্ডুবর্ণ ভালে॥
অন্তর জগতে দেখি আলোক বিরাজে।
কি শোভা প্রকাশে কুলকুণ্ডলিনী মাঝে॥
স্ববল্লভ-সংবলিতা বিশ্বের কারিণী।
নিদানে গর্জনে স্মরি তারে গো তারিণী॥

(চৌরপঞ্চাশৎ, ভারতচন্দ্র, বসুমতী সংস্করণ, পৃঃ ৮)

পূর্বোল্লিখিত এই সব তাবৎ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ওমরের বিদ্রোহ।

* * *

গিয়াসউদ্দীন আবুল ফৎহ্ ওমর ইবন্ ইব্রাহিম অল-খৈয়াম ইরানদেশের নিশাপুর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মদিন কিংবা সন ঠিকমত জানা যায় নি, এমন কি তাঁর মৃত্যুর সনও মোটামুটি ১১২৩ খ্রীষ্টাব্দ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খৈয়াম শব্দের অর্থ তাম্বু নির্মাতা। এ ওজনের শব্দ বাঙলায় আরো আছে। 'কত্তাল' থেকে বাঙলা কোতয়াল, এবং 'খম্মার' থেকে 'খোঁয়ারী' ভাঙা) শব্দ এসেছে। রান্নার মশলা-বিক্রেতা অর্থে বক্কাল শব্দও একদা বাঙলাতে সুপ্রচলিত ছিল—আরবীতে শব্দটির অর্থ 'মুদী' বা 'মশলা-বিক্রেতা'। ত্রিবর্ণের মূল ধাতুতে—যথা 'দ-খ-ল' 'দখল করা' 'ক-ত-ল' 'কোতল করা' দ্বিতীয় ব্যঞ্জন-বর্ণকে দ্বিত্ব করে তাতে দীর্ঘ 'আ'-কার যোগ করলে যে কর্তাবাচক শব্দ উৎপন্ন হয় তার অর্থ 'ঐ কর্ম সে পুনঃ পুনঃ করে থাকে।' তাই 'খম্মার' অর্থ 'যে ঘন ঘন মদ খায়' (বাঙলায় তাই সে সকালবেলা খম্মারী বা খোঁয়ারী ভাঙে) অর্থাৎ 'পাইকারী মাতাল', 'মদ খাওয়া তার ব্যবসা'। 'কতল করা যার ব্যবসা সে কোতায়াল ('কত্তাল'), 'জল্লাদ'ও ঐ অর্থে ব্যবহার হয়। 'খয়য়াম' অর্থ 'যে পুনঃ পুনঃ তাম্বু নির্মাণ করে'—'তাম্বু নির্মাণকারী'। বাঙলায় 'খইআম', 'খইয়াম বা 'খৈয়াম' লিখলে মোটামুটি মূল উচ্চারণ আসে। অবশ্য 'খ'-র উচ্চারণ বাঙলা মহাপ্রাণ 'খ'র মত নয়—আমরা বিরক্ত হলে যে রকম 'আখ'এর 'খ' অক্ষরটি উচ্চারণ করে থাকি অর্থাৎ ঘৃষ্টা কণ্ঠ্যব্যঞ্জন। স্কচের 'লখ' ও জর্মনের 'বাখ' এর 'খ'-এর মত। আসামীতে 'অহমিয়া'র 'হ' অনেকটা সেই রকম।

কিন্তু কবি ওমর তাঁবুর ব্যবসা করতেন না। ওটা তাঁর বংশের পদবী মাত্র। আজকের দিনের কোনো সরকার যে-রকম রাইটারজ বিল্ডিঙে চীফ সেক্রেটারী (সরকার) নন কিংবা কোনো ঘটকপদবীধারী যে-রকম সমাজে কুলাচার্যের কর্ম করেন না। ওমর কিন্তু তাঁর পরিবারের এই উপাধিটি নিয়ে তিক্ত ব্যঙ্গ করতে ছাড়েন নি—

জ্ঞান-বিজ্ঞান ন্যায়-দর্শন সেলাই করিয়া মেলা
খৈয়াম কত না তাম্বু গড়িল : এখন হয়েছে বেলা
নরককুণ্ডে জ্বলিবার তরে। বিধি-বিধানের কাঁচি
কেটেছে তাম্বু—ঠোক্কর খায়, পথ-প্রান্তের ঢেলা।

(লেখকের এমেচারী অক্ষম অনুবাদে রসিক পাঠক অপরাধ নেবেন না। অন্য কারো অনুবাদ না পেয়ে বাধ্য হয়ে মাঝে-মধ্যে এ ধরনের 'অনুবাদ' ব্যবহার করতে হয়েছে।)

এস্থলে উল্লেখ প্রয়োজন রুবাঈ জাতীয় শ্লোকে প্রায়শঃ প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ ছত্রে মিল থাকে—তৃতীয় ছত্রান্ত স্বাধীন। ইরাণী আলঙ্কারিকরা বলেন, তৃতীয় ছত্রে মিল না দিলে চতুর্থ ছত্রের শেষ মিলে বেশী ঝোঁক পড়ে এবং শ্লোক সমাপ্তি তার পরিপূর্ণ গাম্ভীর্য ও তীক্ষ্ণতা পায়। কথাটা ঠিক, কারণ আমরাও তেতাল বাজাবার সময় তৃতীয়ে এসে খানিকটা কায়চুপি করলে সম মনকে ধাক্কা দেয় আরো জোরে। পাঠককে এই বেলাই বলে রাখি, তৃতীয় ছত্রে মিলহীন এই জাতীয় শ্লোক পড়ার অভ্যাস করে রাখা ভালো। নইলে নজরুল ইসলামের ওমর-অনুবাদ পড়ে পাঠক পরিপূর্ণ রসগ্রহণ করতে পারবেন না। কারণ কাজী আগাগোড়া ক ক খ ক মিলে ওমরের অনুবাদ করেছেন। কান্তি ঘোষ করেছেন বাঙলা রীতিতে, অর্থাৎ ক ক খ খ।

ভাগ্যক্রমে ওমরের জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। পাকাপাকি শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে যে তিনি গণিতশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন

www.BanglaBook.org

এবং অবসর কাটাবার জন্য দৈবেসৈবে চতুষ্পদী লিখতেন...তাঁর নামে প্রচলিত গজল, মসনবী বা অন্য কোনো শ্রেণীর দীর্ঘতর কবিতা আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। এইটুকু সংবাদ ছাড়া বাদবাকী কিংবদন্তী। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যাঁর জন্মের তারিখ কেন, সন পর্যন্ত জানা নেই, যাঁর পরলোক গমনের সন পর্যন্ত পণ্ডিতদের গবেষণাধীন, তাঁর সম্বন্ধে যে প্রচুর কিংবদন্তী প্রচলিত থাকবে তাতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই।

তবে তিনি যে উত্তম গুরুর কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন সে-বিষয়ে পণ্ডিতগণ একমত। স্মরণ রাখা ভালো যে, ছাপাখানার প্রচলন না হওয়া পর্যন্ত অল্প লোকই গুরুর সাহায্য বিনা উচ্চাশিক্ষা লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন।

কথিত আছে, বিখ্যাত পণ্ডিত ইমাম মুওয়াফফকের কাছে একই সময়ে তিনজন অসাধারণ মেধাবী ছাত্র শিক্ষালাভ করেন। এঁদের ভিতর খেলাচ্ছলে চুক্তি হয় যে, এঁদের কোনো একজন পরবর্তী জীবনে প্রভাবশালী হতে পারলে তিনি অন্য দু'জনকে সাহায্য করবেন। এঁদের একজন কালক্রমে প্রধান মন্ত্রী বা নিজাম-উল্-মুল্ক-এর পদ প্রাপ্ত হন। খবর পেয়ে দ্বিতীয় বন্ধু হাসনবিন্ সব্বাহ তাঁর কাছে এসে তাঁর পূর্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দিয়ে উচ্চ রাজকর্ম চান। বন্ধুর কৃপায় আশাতীত উচ্চপদ পেয়েও হাসন তাঁকে সরিয়ে নিজে প্রধান মন্ত্রী হবার জন্য ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। কিন্তু শেষটায় ধরা পড়ে বাদশার হুকুমেই রাজপ্রাসাদ থেকে বহিষ্কৃত হন। হাসন প্রতিশোধ নেবার জন্য এক গুপ্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে গোপন আততায়ী দিয়ে অনেক লোককে হত্যা করিয়ে প্রচুর অর্থ ও প্রতিপত্তি অর্জন করেন। ক্রুসেডের একাধিক খ্রীষ্টান নেতা এইসব গুপ্তঘাতকের হস্তে প্রাণ দেন। এরা ভাঙ জাতীয় একপ্রকার হশীশ্ সেবন করতো বলে এদের নাম হয়েছিল "হশীশীয়ুন' এবং ইংরাজি 'এ্যাসাসিন'—গুপ্তঘাতক—এই শব্দ থেকেই অর্বাচীন লাতিন তথা ফরাসীর মাধ্যমে এসেছে। অনেকে বলেন, পরবর্তীকালে নিজাম-উল্-মুল্ক যে গুপ্তঘাতকের হস্তে প্রাণ দেন, সেও হাসন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এদের সম্বন্ধে লেখকের 'অরিজিন অব দি খোজা' পুস্তক লেখকের বাল্য রচনা ব'লে দ্রষ্টব্যের মধ্যে ধর্তব্য নয়।

ওমরকে যখন নিজাম-উল্-মুল্ক উচ্চপদ দিতে চাইলেন তখন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে নির্জনে অনটনবিহীন জীবনযাপনের সুবিধাটুকু মাত্র চাইবেন এ তো জানা কথা। যে ব্যক্তি স্বর্গ-সুখ বলতে বোঝে,

> সেই নিরালা পাতায় ঘেরা বনের ধারে শীতল ছায়,
> খাদ্য কিছু, পেয়ালা হাতে, ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়।
> মৌন ভাঙি মোর পাশেতে গুঞ্জে তব মঞ্জু সুর—
> সেই তো সখি স্বপ্ন আমার, সেই রমণী স্বর্গপুর।
>
> (কান্তি ঘোষ)

কিংবা—

> আমার সাথে আসবে যেথায়—দূর সে রেখে শহরগ্রাম
> এক ধারেতে মরু তাহার, আরএকদিকে শষ্প শ্যাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাদশা-নফর নাইকো সেথা—রাজ্য-নীতির চিন্তা-ভার।
মামুদ শাহ?—দূরে থেকেই করব তাঁকে নমস্কার।

(কান্তি ঘোষ)

তার রাজপদ নিয়ে কি হবে? নিজাম-উল-মুল্ক বিচক্ষণ লোক ছিলেন, বুঝতে পারলেন, ওমরের খ্যাতি-প্রতিপত্তি প্রত্যাখ্যান মৌখিক বিনয় নয় এবং তাঁর জন্য সচ্ছল জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করে দিলেন। কবিও কখনো তাঁর মত পরিবর্তন করেন নি। বস্তুতঃ তাঁর কাব্যের মূল সুর ঐটিই।

কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর ডাক পড়লো রাজদরবারে—পঞ্জিকা সংশোধন করে দেবার জন্য। ইরানীদের 'নওরোজ' বা নববর্ষ আসে বসন্ত ঋতুতে, কিন্তু বহু শত বৎসর লীপ ইয়ার গোনা হয় নি বলে তখন আর নববর্ষ বসন্ত ঋতুতে আসছিল না। ওমর ঐ কর্মটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করে দিলেন।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, কবিরূপে যে ব্যক্তি বিশ্বজগতে বিখ্যাত তিনি আসলে ছিলেন বৈজ্ঞানিক। শুধু তাই নয়, ফিটস্‌জেরাল্ডের মাধ্যমে ইয়োরোপে প্রচারিত হবার পূর্বেই ওমরের বিজ্ঞানচর্চা ফ্রান্সে অনূদিত হয়ে সেখানে তাঁর খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। বর্তমান লেখক এসব লেখা দেখবার সুযোগ পায় নি, তাই এনসাইক্লোপিডিয়ার 'কোনিক সেক্‌শন্' অনুচ্ছেদ থেকে ইয়োরোপে ওমরের বৈজ্ঞানিক যশ সম্বন্ধে উদ্ধৃতি দিচ্ছিঃ

"Greek mathematics culminated in Apollonius. Little further advance was possible without new methods and higher points of view. Much later, Arabs and other Muslims absorbed the classical science greedily; it was the Persian Poet Omar Khayyam, one of the most prominent mediaeval mathematicians, with his remarkable classification and systematic study of equations, which he emphasized, who blazed the way to the modern union of analysis and geometry. In his "Algebra" he considered the cubic as soluble only by the intersection of conics, and the biquadratic not at all."

শেষ ছত্রটির বাঙলায় অনুবাদ মূল ইংরিজি, এমন কি আধুনিক বাঙলা কবিতার চেয়েও শক্ত হয়ে যাবে বলে গোটা টুকরোটাই অতি অনিচ্ছায় ইংরিজিতেই রেখে দিতে বাধ্য হলুম। বৈজ্ঞানিক পাঠক বিনা অনুবাদেই এটি বুঝতে পারবেন, প্রাঞ্জল অনুবাদেও আমাদের মত বৈজ্ঞানিকের কোনো লাভ হবে না।

ইরানের অধিকাংশ গুণীই একমত যে, ওমর তাঁর জীবনের প্রায় সব সময়-টুকুই কাটিয়েছেন বিজ্ঞানচর্চায় এবং অতি অল্প সামান্য সময় 'নষ্ট' করেছেন কাব্যলক্ষ্মীর আরাধনায়। তাই দীর্ঘ কবিতা লেখবার ফুরসৎ তাঁর হয়ে ওঠে নি—এমন কি রুবাঈগুলোও গীতিরস দিয়ে রসিয়ে করবার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন নি।

গণিত এবং বিশেষ করে জ্যোতিষচর্চার ফল ওমরের কাব্যে পদে পদে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ গ্রহ-নক্ষত্র যে অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক নিয়মে চলে তার থেকেই তিনি দৃঢ় মীমাংসায় উপনীত হন যে মানুষেরও কোনো প্রকারের স্বাধীনতা

www.BanglaBook.org

নেই, তার কর্মপদ্ধতি স্বেচ্ছায় নিয়ন্ত্রণ করার কোনো অধিকারই সে পায় নি। তাই—

প্রথম মাটিতে গড়া হয়ে গেছে শেষ মানুষের কায়
শেষ নবান্ন হবে যে ধান্যে তারো বীজ আছে তায়।
সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাতে লিখে রেখে গেছে তাই,
বিচার-কর্ত্রী প্রলয় রাত্রি পাঠ যা করিবে ভাই।

(সত্যেন দত্ত)

পৃথ্বী হ'তে দিলাম পাড়ি, নভঃগেহে মনটা লীন—
সপ্ত-ঋষি যেথায় বসি ঘুমিয়ে কাটান রাত্রি দিন।
বিদ্যাটা মোর উঠলো ফেঁপে কাটলো কত ধাঁধার ঘোর—
মৃত্যুটা আর ভাগ্যলিখন—ওইখানে গোল রইল মোর।

(কান্তি ঘোষ)

কিন্তু এস্থলে আমি ওমর-কাব্যের মল্লিনাথ হবার দুরাশা নিয়ে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত হই নি। ওমরের নামে প্রচলিত প্রায় ছ'শটি রুবাইয়াৎ ইরানী বটতলাতেও পাওয়া যায়—পার্টিশনের পূর্বে কলকাতার ফার্সী বটতলা তালতলা অঞ্চলেও পাওয়া যেত। তার অতি অল্পই অনুবাদ করেছেন ফিটস্‌জেরাল্ড এবং সেই ছ'শ'র কটি কবিতা ওমরের নিজস্ব, তাই নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বাক্‌-বিতণ্ডা এখনো শেষ হয় নি—আমার বিশ্বাস কখনো হবে না। সেই ছ'শ' চতুষ্পদীর টীকা পড়ার উৎসাহ ও ধৈর্য রসিকজনের থাকার কথা নয়—পণ্ডিতের থাকতে পারে। আমি রসিকের সেবা করি।

তাই আমিও ওমরের সামান্যতম ঐতিহাসিক পটভূমি নির্মাণ করার চেষ্টা করছি এবং তাও শুধু ওমরের বিদ্রোহী মনোভাব দেখাবার জন্য—কারণ ঐখানেই নজরুল ইসলামের সঙ্গে তিনি সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন।

ওমরের প্রধান বিদ্রোহ ধর্মগুরুদের বিরুদ্ধেঃ—

খাজা! তোমার দরবারে মোর একটি শুধু আর্জি এই
থামাও উপদেশের ঘটা, মুক্তি আমার এই পথেই।
দৃষ্টি-দোষে দেখছ বাঁকা আমার সোজা সরল পথ,
আমায় ছেড়ে ভালো করো, ঝাপসা তোমার চক্ষুকেই।

(কাজী সাহেবের অনুবাদ)

O master! grant us only this, we prithee!
Preach not! But mutely guide to bliss,
we prithee!
"We walk not straight"—Nay,
it is thou who squintest!
Go, heal thy sight, and leave us in peace,
we prithee!

(কোর্ণের অনুবাদ)

পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক রাজা-রাজড়ার শৌর্যবীর্য নিয়ে যে সব কবি ফিরদৌসীর ন্যায় আস্ফালন করে বর্তমানের আনন্দকে অবহেলা করতেন তাঁদের সম্বন্ধে বলছেন—

www.BanglaBook.org

ভাগ্য-লিপি মিথ্যা সে নয়—ফুরোয় যা' তা ফুরিয়ে যাক্,
কৈকোবাদ আর কৈখ্‌সরুর ইতিহাসের নামটা থাক।
রুস্তম আর হাতেম-তায়ের কল্পকথা—স্মৃতির ফাঁস—
সে-সব খেয়াল ঘুচিয়ে দিয়ে আজকে এস আমার পাশ।
(কান্তি ঘোষ)

দরবেশ-সুফীরা করতেন কৃচ্ছ্রসাধন এবং যোগচর্চা। পূর্বেই নিবেদন করেছি, তাঁরা নৃত্যের সঙ্গে চিৎকার করতেন নাম-জপ, তাঁদের বিশ্বাস, ঐ করেই ভগবদ্‌প্রেম এবং চরম মোক্ষ পাওয়া যায়।

দ্রাক্ষালতার শিকড় সেটি তার না জানি কতই গুণ—
জড়িয়ে আছেন অস্থিতে মোর দরবেশী সাঁই যাই বলুন—
গগনভেদী চীৎকারে তাঁর খুলবে নাকো মুক্তিদ্বার,
অস্থিতে এই মিলবে যে খোঁজ সেই দুয়ারের কুঞ্চিকার।
(কান্তি ঘোষ)

কিন্তু সব চেয়ে বেশী চতুষ্পদী তিনি রচনা করেছেন দার্শনিক এবং পণ্ডিতদের বিরুদ্ধে। সেখানে তিনি জ্যোতির্বিদ ওমরকেও বাদ দেন নি।

অস্তি-নাস্তি শেষ করেছি, দার্শনিকের গভীর জ্ঞান
বীজগণিতের সূত্র-রেখা যৌবনে মোর ছিলই ধ্যান ;
বিদ্যারসে যতই ডুবি, মনটা জানে মনে (মানে?) স্থির—
দ্রাক্ষারসের জ্ঞানটা ছাড়া রসজ্ঞানে নেই গভীর।

অর্থহীন, অর্থহীন, সমস্তই অর্থহীন। তাই ওমরের বার বার কাতর রোদন, দরদী ফরিয়াদ—

হেথায় আমার আসাতে প্রভু হন নি তো লাভবান
চলে যাবো যবে হবেন না তিনি কোনো মতে গরীয়ান।
এ কর্ণে আমি শুনি নি তো কভু কোনো মানবের কাছে
এই আসা-যাওয়া কি এর অর্থ—খামকা পোড়েন টান।
(লেখক)

তাই ওমরের শেষ মীমাংসা—একবার মরে যাবার পর তুমি আর এখানে ফিরে আসবে না। অতএব যতটুকু পারো, যতক্ষণ পারো দর্শন-বিজ্ঞান-সাঁই-সুফীদের ভুলে গিয়ে সাকী সুরা নিয়ে নির্জন কোণে আনন্দ করো।

মৃত্যু আসিয়া মস্তকে মোর আঘাত করার আগে
লে আও শরাব—লাও ঝটপট—রাঙানো গোলাপী রঙে।
হায়রে মূর্খ! সোনা দিয়ে মাজা তোর কি শরীর খানা—?
গোর হয়ে গেলে ফের খুঁড়ে নেবে—? ও ছাই কি কাজে লাগে।
(লেখক)

কিন্তু একটা জিনিস ভুল করলে চলবে না। ওমর খাঁটি চার্বাকপন্থী এবং ঐ জাতীয় লোকায়তীদের মত নন। ধার কর্‌ে ঘি খাও, কারণ দেহ ভস্মীভূত হলে ঋণ তো আর শোধ করতে হবে না, অর্থাৎ ইহসংসারে কিংবা পরলোকে অন্য কারো প্রতি তোমার কোন নৈতিক দায়িত্ব—মরাল রেসপন-সিবিলিটি নেই—এ তত্ত্বেও ওমর বিশ্বাস করতেন না। তাই তাঁর একমাত্র উপদেশ—

www.BanglaBook.org

কারুর প্রাণে দুখ্ দিও না, করো বরং হাজার পাপ,
পরের মনে শান্তি নাশি বাড়িও না আর মনস্তাপ।
অমর-আশিস্ লাভের আশা রয় যদি, হে বন্ধু মোর,
আপনি স'য়ে ব্যথা, মুছো পরের বুকের ব্যথার ছাপ।
(নজরুল ইসলাম)

গুণীরা বলেন, 'কুরানই কুরানের সর্বশ্রেষ্ঠ টীকা।' তরুণদের আমি প্রায়ই বলি ; 'রবীন্দ্রনাথের রচনাই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ টীকা—ঐ কাব্যই বার বার অধ্যয়ন করো, অন্য টীকার প্রয়োজন নাই।' ওমরই ওমরের সর্বশ্রেষ্ঠ মল্লিনাথ এবং কাজীর অনুবাদ সকল অনুবাদের কাজী।

ত্রিমূর্তি (চাচা-কাহিনী)

বার্লিন শহরের উলান্ড স্ট্রীটের উপর ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে 'হিন্দুস্থান হৌস' নামে একটি রেস্তোরাঁ জন্ম নেয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর যা স্বভাব, রেস্তোরাঁর সুদূরতম কোণে একটি আড্ডা বসে যায়। আড্ডার চক্রবর্তী ছিলেন চাচা—বরিশালের খাজা বাঙাল মুসলমান—আর চেলারা গোসাঁই, মুখুয্যে, সরকার রায় এবং চ্যাংড়া গোলাম মৌলা, এই ক'জন।

চাচার ন্যাওটা শিষ্য গোসাঁই বললেন 'যা বলো, যা কও, চাচা না থাকলে আমাদের আড্ডাটা কি রকম যেন দড়কচ্চা মেরে যায়। তা বলুন, চাচা, দেশের —না, দ্যাশের—খবর কি? কি খেলেন, কি দেখলেন, বেবাক কথা খুলে কন।'

চাচা বরিশাল গিয়েছিলেন। তিন মাস পরে ফিরে এসেছেন। বললেন, 'কি খেলুম? কই মাছ—এক-একটা ইলিশ মাছের সাইজ ; ইলিশ মাছ—এক-একটা তিমি মাছের সাইজ ; আর তিমি মাছ—তা সে দেখি নি। তবে বোধ হয়, তাবৎ বাখরগঞ্জ ডিসটিক্‌টাই তারই একটার পিঠের উপর ভাসছে। ঐ যেরকম সিন্দবাদ তিমির পিঠটাকে চর ভেবে তারই পিঠের উপর রশুই চড়িয়েছিল।'

বাকি কথা শেষ হওয়ার পূর্বে সক্কলের দৃষ্টি চলে গেল দোরের দিকে। দুটি জর্মন চ্যাংড়া একটি চিংড়িকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকল। ভারতীয় রান্নার ঝালের দাপটে জর্মনরা সচরাচর হিন্দুস্থান হৌসে আসতো না। পাড়ার জর্মনরা তো আমাদের লঙ্কা-ফোড়ন চড়লে পয়লা বিশ্বযুদ্ধের ডিসপোজেলের গ্যাসমাস্‌ক পরতো। তবে দু'একজন যে একেবারেই আসতো না তা নয়—'ইণ্ডিশে রাইস-কুরি' অর্থাৎ ভারতীয় ঝোল-ভাতের খদ্দের জর্মনি হাঙ্গেরি সর্বত্রই কিছু কিছু পাওয়া যায়।

আলতো ভাবে ওদের উপর একটা নজর বুলিয়ে নিয়ে আড্ডা পুনরায় চাচার দিকে তাকাল। চাচা বললেন, 'খাইছে! আবার সেই ইটারনেল্ ট্রায়েঙ্গল্!'

পাইকিরি বিয়ার খেকো সুধি রায় বললে, 'চাচা হরবকতই ট্রায়েঙ্গল্ দেখেন। এ যেন ঘামের ফোঁটাতে কুমীর দেখা। দ্য ত্রো নিয়ে কি কেউ কখনো

www.BanglaBook.org

বেরয় না?'

রায়ের গ্রাম সম্পর্কে ভাগ্নে, সতেরো বছরের চ্যাংড়া সদস্য লাজুক গোলাম মৌলা শুধালে, 'মামু, দ্য ত্রো কারে কয়?'

রায় বললেন, 'পই পই করে বলেছি ফরাসী শিখতে, তা শিখবি নি। ডি, ই দ্য ; টি, আর, ও, পি ত্রো—পি সাইলেণ্ট। অর্থাৎ একজন অনাবশ্যক বেশী —One too many। এই মনে কর্, তুই যদি তোর ফিয়াঁসেকে—এ কথাটাও বোঝাতে হবে নাকি?—নিয়ে বেরোস আর আমি খোদার-খামোখা তোদের সঙ্গে জুটে যাই, তবে আমি দ্য ত্রো। বুঝলি?'

গোলাম মৌলা মাথা নিচু করে সেই বার্লিনের শীতে বরাব্বর লজ্জায় ঘামতে লাগলো।

আড্ডার লটবর লেডি-কিলার পুলিন সরকার মৌলাকে ধমক দিয়ে বললে, 'তুই লজ্জা পাচ্ছিস কেন রে বুড়বক্? লজ্জা পাবেন রায়। ডাণ্ডা-গুলি খেলার সময় গুলিকে ভয় দেখাস্ নি ডাণ্ডাকে না ছোঁবার জন্য? তখন কি বলিস? ভাগ্নে-বৌ দুয়ারে—কোণা কেটে ফালদি যা। বরঞ্চ সুযিা রায় যদি তাঁর ম্যাডামকে নিয়ে বেরোন, আর তুই যদি সঙ্গে জুটে যাস, তবু কিন্তু তুই দ্য ত্রো নস্। রাধা কেষ্টর কি হন জানিস তো?'

গোলাম মৌলা এবার লজ্জায় জল না হয়ে একেবারে পানি।

গোসাঁই বললেন, 'চাচা, আপনি কিন্তু যেভাবে ঘন ঘন মাথা দোলাচ্ছেন তাতে মনে হচ্ছে, আপনি একদম শোয়ার, এ হচ্ছে দুটো-হুনো-একটা-মেনীর ব্যাপার। তা কি কখনো হওয়া যায়?'

চাচা বললেন, 'যায়, যায়, যায়। আকছারই যায়। অবশ্য প্র্যাক্‌টিস থাকলে।'

আড্ডা সমস্বরে বললে, 'প্র্যাক্‌টিস!'

চাচা বললেন, 'হ। এবারে দেশে যাবার সময় জাহাজে হয়েছে।'

গল্পের গন্ধ পেয়ে আড্ডা আসন জমিয়ে বললে, 'ছাড়ুন চাচা।'

চাচা বললেন, 'এবার দেখি, জাহাজ ভর্তি ইহুদির পাল। জর্মনি, অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া থেকে ঝেঁটাই করে সবাই যাচ্ছে শাংহাই। সেখানে যেতে নাকি ভিজার প্রয়োজন হয় না। কি করে টের পেয়েছে, এবারে হিটলার দ্যবড়াতে আরম্ভ করলে নেবুকাডনাজারের বেবিলোনিয়ান ক্যাপার্টিভিটি নয়, এবারে স্রেফ কচু-কাটার পালা। তাই শাংহাই হয়ে গেছে ওদের ল্যাণ্ড অব মিলক্ এণ্ড হানি, ননীমধুর দেশ।

আমার ডেক-চেয়ারটা ছিল নিচের তলা থেকে ওপরে সিঁড়ির মুখের কাছে। ডাইনে এক বুড়ো ইহুদি আর বাঁয়ে এক ফরাসী উকিল। ইহুদি ভিয়েনার লোক, মাতৃভাষা জর্মন, ফরাসী জানে না। আর ফরাসী উকিল জর্মন জানে না, সে তো জানা কথা। ফরাসী ভাষা ছাড়া পৃথিবীতে অন্য ভাষা চালু আছে সে তত্ত্ব জাহাজে উঠে সে এই প্রথম আবিষ্কার করলে। এতদিন তার বিশ্বাস ছিল, পৃথিবীর আর সর্বত্র ভাঙা-ভাঙা ফরাসী, পিজিন ফ্রেঞ্চই চলে—বিদেশীরা প্যারিসে এলে যে রকম টুকিটাকি ফরাসী বলে ঐ রকম আর কি।

www.BanglaBook.org

তিনজনাতে তিনখানা বই পড়ার ভান করে এক একবার সিঁড়ি দিয়ে উঠনে-ওলা নামলে-ওলা চিড়িয়াগুলোর দিকে তাকাই, তারপর বইয়ের দিকে নজর ফিরিয়ে আপন আপন সুচিন্তিত মন্তব্য প্রকাশ করি।

একটি মধ্যবয়স্কা উঠলেন। জর্মন ইহুদি বললে, 'হাল্‌ব্‌-উন্‌ট্‌হাল্‌ব্‌—অর্ধাং হাফাহাফি।' ফরাসী বললে 'অ' প্যো আঁসিয়েন্‌—একটুখানি এনশেণ্ট।' জর্মন আমাকে শুধালে, 'ফ্রেঞ্চি কি বললে?' কি বললে?' আমি অনুবাদ করলুম। জর্মন বললে, 'চল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ হবে। তা আর এমন কি বয়স—নিষ্‌ট্‌ভার—নয় কি?' ফরাসী আমাকে শুধালে, 'ক্যাস্‌ কিল্‌ দি—কি বললে ও?' উত্তর শুনে বললে, 'ম' দিয়ো—ইয়াল্লা—চল্লিশ আবার বয়স নয়! একটা কেথীড্রেলের পক্ষে অবশ্য নয়। কিন্তু মেয়েছেলে, ছোঃ!'

এমন সময় হঠাৎ একসঙ্গে তিনজনের তিনখানা বই ঠাস করে আপন উরুতে পড়ে গেল। কোর্ট মার্শালের সময় যে রকম দশটা বন্দুক এক ঝটকায় গুলি ছোঁড়ে। কি ব্যাপার? দেখ্‌ তো না দ্যাখ্‌ সিঁড়ি দিয়ে উঠলো এক তরুণী!

সে কী চেহারা! এ রকম রমণী দেখেই ভারতচন্দ্রের মুণ্ডুটি ঘুরে যায় আর মানুষে দেবতাতে ঘুলিয়ে ফেলে বলেছিলেন, 'এ তো মেয়ে মেয়ে নয়, দেবতা নিশ্চয়।'

ইটালীর গোলাপী মার্বেল দিয়ে কোদা মুখখানি, যেন কাজল দিয়ে আঁকা দুটি ভুরুর জোড়া পাখিটি গোলাপী আকাশে ডানা মেলেছে, চোখ দুটি সমুদ্রের ফেনার উপর বসানো দুটি উজ্জ্বল নীলমণি, নাকটি যেন নন্দলালের আঁকা সতী অপর্ণার আবক্কুরেখা মুখের সৌন্দর্যকে দু'ভাগ করে দিয়েছে, ঠোঁট দুটিতে লেগেছে গোলাপ ফুলের পাপড়িতে যেন বসন্তের মৃদু পবনের ক্ষীণ শিহরণ।

চাচা বললেন, 'তা সে যাক্‌ গে। আমার বয়েস হয়েছে। তোমের সামনে সব কথা বলতে বাধো-বাধো ঠেকে। কিন্তু সত্যি বলতে কি, অপূর্ব, অপূর্ব।'

দেখেই বোঝা যায়, ইহুদি—প্রাচ্য প্রতীচ্য উভয় সৌন্দর্যের অদ্ভুত সম্মেলন।

জর্মন এবং ফরাসী দুজনাই চুপ। আম্মো।

আর সঙ্গে সঙ্গে দুটি ছোকরা জাহাজের দু'প্রান্ত থেকে চুম্বকে টানা লোহার মত তার গায়ের দু'দিকে যেন সেঁটে গেল। স্পষ্ট বোঝা গেল, এতক্ষণ ধরে দু'জনাই তার পদধ্বনির প্রতীক্ষায় ছিল।

জাহাজে প্রথম দু'একদিন ঠিক আঁচা যায় না, শেষ পর্যন্ত কার সঙ্গে কার পাকাপাকি দোস্তী হবে। কোন্‌ মসিয়ো কোন্‌ মাদাম্‌য়াজেলের পাল্লায় পড়বেন, কোন্‌ হ্যার্‌ কোন্‌ ফ্রাউ বা ফ্রলাইনের প্রেমে ডুবুডুবু খাবেন, কোন্‌ মিসিস কোন্‌ মিস্টারের সঙ্গে রাত তেরোটা অবধি খোলা ডেকে গোপন প্রেমালাপ করবেন। এ তিনটির বেলা কিন্তু সবাই বুঝে গেল এটা ইটার্নাল্‌ ট্রায়েঙ্গল। আমি অবশ্য গোসাঁইয়ের মত প্রথমটায় ভাবলুম, হার্মলেস ব্যাপারও হতে পারে।

মেয়েটা ফরাসিস, ছেলে দুটোর একটা মারাঠা, আরেকটা গুজরাতি বেনে!

www.BanglaBook.org

প্যারিস থেকেই নাকি রঙ্গরস আরম্ভ হয়েছে। বোম্বাই অবধি গড়াবে। উপস্থিত কিন্তু আমাদের তিনজনারই মনে প্রশ্ন জাগলো, আখেরে জিতবে কে?

শুনেছি, এহেন অবস্থায় দুজনাই স্পানিয়ার্ড হলে ডুয়েল লড়ে, ইতালীয় হলে একজন আত্মহত্যা করে, ইংরেজ হলে নাকি একজন অন্যকে গম্ভীর ভাবে স্টিক বাও করে দু'দিকে চলে যায়, ফরাসী হলে নাকি ভাগা-ভাগি করে নেয়।

প্রথম ধাক্কাতেই গুজরাতি গেলেন হেরে। মারাঠা চালাকি করে ডবল পয়সা খর্চা করে দু'খানি ডেক-চেয়ার ভাড়া করে রেখেছিল পাশাপাশি। বেনের মাথায় এ বুদ্ধিটা খেললো না কেন আমরা বুঝে উঠতে পারলুম না। মারাঠা নটবর সেই হুরীকে নিয়ে গেল জোড়া ডেক-চেয়ারের দিকে—স্যর ওয়ালটর রেলে যে রকম রানী ইলিজাবেথকে কাদার উপর আপন জোব্বা ফেলে দিয়ে হাত ধরে ওপারের পেভমেণ্টে নিয়ে গিয়েছিলেন।

দু জনা লম্বা হলেন দুই ডেক-চেয়ারে। বেনেটা ক্যাবলাকান্তের মত সামনে দাঁড়িয়ে খানিকটা কাঁই-কুঁই করে কেটে পড়লো!

আমার পাশের ফরাসী বলল, 'ইডিয়ট!' জর্মন শুনে বললে, 'নাইন, আখেরে জিতবে বেনে।' 'এ্যাপসিব্‌ল্!' 'বেট্?' 'বেট্!' 'পাঁচ শিলিঙ?' 'পাঁচ শিলিঙ?'

আন্ডার দিকে ভালো করে একবার তাকিয়ে নিয়ে চাচা বললেন, বিশ্বাস করো আর নাই করো, আস্তে আস্তে জাহাজের সবাই লেগে গেল এই বাজি ধরাধরিতে। বুকিরও অভাব হল না। আর সে বেট্ কী অদ্ভুত ফ্লাক্‌চুয়েট করে। কোনোদিন ভোরে এসে দেখি জর্মনটা গুম হয়ে বসে আছে—যেন জাহাজ একটা কনস্যান্ট্রেশন ক্যাম্প—আর ফরাসীটা উল্লাসে রিং রিং করে পল্‌কা নাচ নাচছে। ব্যাপার কি? পাক্কা খবর মিলেছে, আমাদের পরীটি কাল রাত দু'টো অবধি মারাঠার সঙ্গে গুজুর-গুজুর করেছেন। বেনে মনের খেদে এগারোটাতেই কেবিন নেয়। ফরাসী এখন সক্কলের গায়ে পড়ে থ্রি টু ওয়ান্ অফার করছে। সে জিতলে পাবে কুল্লে এক শিলিং, হারলে দেবে তিন শিলিং। নাও, বোঝ ঠ্যালা! আর কোনোদিন বা খবর রটে, বেনের পো জাহাজের ক্যাম্বিসের চৌবাচ্চায় হুরীর সঙ্গে দু'ঘণ্টা সাঁতার কেটেছে—মারাঠা জলকে ভীষণ ডরায়। ব্যস, সেদিন বেনের স্টক স্কাই হাই!

ইতিমধ্যে একদিন বেনের বাজার যখন বড্ড ঢিলে যাচ্ছে তখন ঘটলো এক নবীন কাণ্ড। হুরী ও মারাঠা তো বসতো পাশাপাশি কিন্তু লাইনের সর্বশেষ নয় বলে হুরীর অন্য পাশে বসতো এক অতিশয় গেরেস্থালী ভালো মানুষ নিগ্রো পাদ্রী। সে গিয়ে তার ডেক-চেয়ারের সঙ্গে বেনের ডেক-চেয়ারের বদলা-বদলির প্রস্তাব করেছে। বেনে নাকি উল্লাসে ইয়াল্লা বলে আকাশ-ছোঁয়া লম্ফ মেরেছিল। বেটিঙের বাজার আবার স্টেডি হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠলো, এ বেটিঙের শেষ ফৈসালা হবে কি প্রকারে? বহু বাক্‌বিতণ্ডার পর স্থির হল, যেদিন হুরী মারাঠা কিংবা বেনের সঙ্গে তার কেবিনে ঢুকবেন সেদিন হবে শেষ ফৈসালা। যার সঙ্গে ঢুকবেন তার হবে জিত।

www.BanglaBook.org

দু'একজন রুচিবাগীশ আপত্তি করেছিলেন কিন্তু ফরাসী উকিল হাত-পা চোখ-মুখ নেড়ে বুঝিয়ে দিল, 'C'est, c'est, এটা, এটা হচ্ছে একটা লিগাল ডিসিশন, একটা আইনত ন্যায্য হক্কের ফৈসালা। চলাচলির কোনো কথাই হচ্ছে না।'

রেসের বাজি তখন চরমে। কখনো বেনে, কখনো মারাঠা। সেই যে চণ্ডুখোর গল্প বলেছিল, পাখিকে গুলি মেরে সঙ্গে সঙ্গে শিকারী কুকুরকেও দিয়েছে লেলিয়ে। তখন বুলেটে কুকুরে কী রেস্—কভী কুত্তা, কভী গুলি, কভী গুলি, কভী কুত্তা।

এমন সময় আদন বন্দর পেরিয়ে আমরা ঢুকলাম আরব সাগরে। আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আঠারো হাজার টনের জাহাজকে মারলে মৌসুমী হাওয়া তার বাইশ হাজারি টনের থাবড়া। জাহাজ উঠলো নাগর বেনাগর সবাইকে নিয়ে নাগরদোলায়। আর সঙ্গে সঙ্গে সী সিক্‌নেস! বমি আর বমি! প্রথম ধাক্কাতেই মারাঠা হল ঘায়েল। রেলিঙ ধরে পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি বের করার চেষ্টা দিয়ে টলতে টলতে চলে গেল কেবিনে। বেনের মুখে শুকনো হাসি, কিন্তু তিনিও আরাম বোধ করছেন না। পরদিন সমুদ্র ধরল রুদ্রতর মূর্তি। এবারে হুরী পড়ে রইলেন একা। তাঁর মুখও হরতালের মত হলদে। তার পরের দিন ডেক প্রায় সাফ। নিতান্ত বরিশালের পানি-জলের প্রাণী বলে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে কোনোগতিকে আমি টিঁকে আছি আর কি! খাবার সময় পেটে যা যায় সে-সব রিটার্ন টিকিট নিয়ে মোকামে পৌঁছবার আগেই ফিরি-ফিরি করছে। হুরী নিতান্ত একা বলে ফরাসী বন্ধু তাকে আদর করে ডেকে এনে আমাদের পাশে বসালো।

সে রাত্রে জাহাজ খেলো ঝড়ের মোক্ষমতম থাবড়া। ফরাসী গায়েব। হুরী এই প্রথম ছুটে গিয়ে ধরলো রেলিঙ। আমিও এই যাই কি তেই যাই। তবু ধরলুম গিয়ে তাকে। হুরী ক্ষীণকণ্ঠে বললে, "কেবিন।" আমি ধরে ধরে কোনোগতিকে তাকে তার কেবিনের দিকে নিয়ে চললুম! দুজনাই টলটলায়মান। আমার কেবিনের সামনে পৌঁছতেই ঝড়ের আরেক ধাক্কায় খুলে গেল আমার কেবিনের দরজা। ছিটকে পড়লুম দুজনাই ভিতরে। কী আর করি? তাকে তুলে ধরে প্রথম বিছানায় শোয়ালুম। তারপর কেবিন-বয়কে ডেকে দু'জনাতে মিলে তাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে গেলুম তার কেবিনে। বাপ্‌স্!'

চাচা থামলেন। একদম থেমে গেলেন।

আড্ডায় সবাই একবাক্যে শুধালে, 'তারপর?'

চাচা বললেন, 'কচু, তারপর আর কি?'

তবু সবাই শুধায়, 'তারপর?'

চাচা বললেন, 'এ তো বড় গেরো। তোরা কি সাইমেক্‌স্ বুঝিস নে? আচ্ছা, বলছি। ভোর হতেই বোম্বাই পৌঁছলুম। ডেকে যাওয়া মাত্রই সবাই আমাকে জাবড়ে ধরে কেউ বলে ফেলিসিতাসিয়োঁ, মসিয়ো, কেউ বলে কন্‌গ্রাচুলেশনস্, কেউ বলে গ্রাতুলিয়েরে—দুচ্ছাই, এ সব কে? কিন্তু কেউ কিচ্ছুটি বুঝিয়ে বলে না।'

শেষটায় ফরাসী উকিলটা বললে, 'আ মসিয়ো, কী কেরদানিটাই না

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখালে। ওস্তাদের মার শেষ রাতে। মহারাষ্ট্র গুজরাত দু'জনাই হার মানলে। জিতলে বেঙ্গল! ভিভ্‌লা বাঁগাল! লং লিভ বেঙ্গল!'

'আমি যতই আপত্তি করি কেউ কোনো কথা শোনে না।'

আর শুধু কি তাই? ব্যাটারা সবাই আপন আপন বাজির টাকা ফেরত পেল—বেনে কিংবা মারাঠা কেউ জেতে নি বলে। কিন্তু আমার দশ শিলিং স্রেফ বেপরোয়া মেরে দিলে। বলে কি না, আমি যখন ঘোড়ায় চড়ে জিতেছি, আমার বাজি ধরার হক্ক নেই। টাকাটা নাকি তছরূপ হয়ে যায়।'

খানেকক্ষণ চুপ থেকে চাচা বললেন, 'কিন্তু সেই থেকে আমার চোখ বলে দিতে পারে ইটার্নেল ট্রায়েঙ্গল কোথায়।'

এমন সময় দুই জর্মন ছোকরায় লেগে গেল মারামারি। সেটা থামাতে গিয়ে আড্ডা সেদিন ভঙ্গ হল।

মামুদোর পুনর্জন্ম

সংস্কৃত ভাষা আত্মনির্ভরশীল। কোনো নূতন চিন্তা, অনুভূতি কিংবা বস্তুর জন্য নবীন শব্দের প্রয়োজন হলে সংস্কৃত ধার করার কথা না ভেবে আপন ভাণ্ডারে অনুসন্ধান করে, এমন কোনো ধাতু বা শব্দ সেখানে আছে কি না যার সামান্য অদলবদল করে কিংবা পুরনো ধাতু দিয়ে নবীন শব্দটি নির্মাণ করা যায় কি না। তার অর্থ অবশ্য এ নয় যে, সংস্কৃত কস্মিনকালেও বিদেশী কোনো শব্দ গ্রহণ করে নি। নিয়েছে কিন্তু তার পরিমাণ এতই মুষ্টিমেয় যে, সংস্কৃতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষা বলাতে কারো কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়।

প্রাচীন যুগের সব ভাষাই তাই। হীব্রু, গ্রীক, আবেস্তা এবং ঈষৎ পরবর্তী যুগের আরবীও আত্মনির্ভরশীল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বয়ংসম্পূর্ণ।

বর্তমান যুগের ইংরিজি ও বাঙলা আত্মনির্ভরশীল নয়। আমরা প্রয়োজন মত এবং অপ্রয়োজনেও ভিন্ন ভিন্ন ভাষা থেকে শব্দ নিয়েছি এবং নিচ্ছি। পাঠান-মোগল যুগে আইন-আদালত খাজনা-খারিজ নূতনরূপে দেখা দিল বলে আমরা আরবী ও ফার্সী থেকে প্রচুর শব্দ গ্রহণ করেছি। পরবর্তী যুগে ইংরিজি থেকে এবং ইংরিজির মারফতে অন্যান্য ভাষা থেকে নিয়েছি, এবং নিচ্ছি।

বিদেশী শব্দ নেওয়া ভালো না মন্দ সে প্রশ্ন অবান্তর। নিয়েছি, এবং এখনো সজ্ঞানে আপন খুশীতে নিচ্ছি এবং শিক্ষার মাধ্যমরূপে ইংরিজিকে বর্জন করে বাঙলা নেওয়ার পর যে আরো প্রচুর ইউরোপীয় শব্দ আমাদের ভাষায় ঢুকবে, সে সম্বন্ধেও কারো কোনো সন্দেহ নেই। আলু-কপি আজ রান্নাঘর থেকে তাড়ানো মুশকিল, বিলিতি ওষুধে প্রায় সকলেই খান, ভবিষ্যতে আরো নূতন নূতন ওষুধ খাবেন বলেই মনে হয়। এই দুই বিদেশী বস্তুর ন্যায় আমাদের ভাষাতেও বিদেশী শব্দ থেকে যাবে, নূতন আমদানিও বন্ধ করা যাবে না।

www.BanglaBook.org

পৃথিবীতে কোনো জিনিসই সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়। অন্তত চেষ্টা করাটা অসম্ভব নাও হতে পারে। হিন্দী উপস্থিত সেই চেষ্টাটা করছেন—বহু সাহিত্যিক উঠে পড়ে লেগেছেন, হিন্দী থেকে আরবী, ফার্সী এবং ইংরিজি শব্দ তাড়িয়ে দেবার জন্য। চেষ্টাটার ফল আমি হয়তো দেখে যেতে পারবো না। আমার তরুণ পাঠকেরা নিশ্চয়ই দেখে যাবেন। যদি ফল ভালো হয় তখন তাঁরা না হয় চেষ্টা করে দেখবেন। (বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ স্বচ্ছন্দে লিখেছেন, 'আব্রু দিয়ে, ইজ্জৎ দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে।' নজরুল ইসলাম 'ইনকিলাব',—'ইনক্লাব' নয়—এবং 'শহীদ' শব্দ বাঙলায় ঢুকিয়ে গিয়েছেন। বিদ্যাসাগর 'সাধু' রচনায় বিদেশী শব্দ ব্যবহার করতেন না, বেনামীতে লেখা 'অসাধু' রচনায় চুটিয়ে আরবী-ফার্সী ব্যবহার করতেন। আর অতিশয় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম পণ্ডিত হরপ্রসাদ আরবী-ফার্সী শব্দের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা 'আহাম্মুখী' বলে মনে করতেন। আলাল' ও 'হুতোম'-এর ভাষা বিশেষ উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল ; সাধারণ বাঙলা এ-স্রোতে গা ঢেলে দেবে না ব'লে তার উল্লেখ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন এবং হিন্দীর বঙ্কিম স্বয়ং প্রেমচন্দ্র হিন্দীতে বিস্তর আরবী-ফার্সী ব্যবহার করছেন।)

এস্থলে আরেকটি কথা বলে রাখা ভালো। রচনার ভাষা তার বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে। শঙ্করদর্শনের আলোচনায় ভাষা সংস্কৃতশব্দবহুল হবেই, পক্ষান্তরে মোগলাই রেস্তোরাঁর বর্ণনাতে ভাষা অনেকখানি 'হুতোম'-ঘ্যাঁষা হয়ে যেতে বাধ্য। 'বসুমতী'র সম্পাদকীয় রচনার ভাষা এক—তাতে আছে গাম্ভীর্য, 'বাঁকা চোখে'র ভাষা ভিন্ন—তাতে থাকে চটুলতা।

* * *

বাঙলায় যে সব বিদেশী শব্দ ঢুকেছে তার ভিতরে আরবী, ফার্সী এবং ইংরিজিই প্রধান। সংস্কৃত শব্দ বিদেশী নয় এবং পর্তুগীজ, ফরাসিস, স্প্যানিশ শব্দ এতই কম যে, সেগুলো নিয়ে অত্যধিক দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণ নেই।

বাঙলা ভিন্ন অন্য যে-কোনো ভাষার চর্চা আমরা করি না কেন, সে ভাষার শব্দ বাঙলাতে ঢুকবেই। সংস্কৃত চর্চা এদেশে ছিল ব'লে বিস্তর সংস্কৃত শব্দ বাঙলায় ঢুকেছে, এখনো আছে ব'লে অল্পবিস্তর ঢুকছে, যতদিন থাকবে ততদিন আরো ঢুকবে ব'লে আশা করতে পারি। ইস্কুল-কলেজ থেকে যে আমরা সংস্কৃত চর্চা উঠিয়ে দিতে চাই নে তার অন্যতম প্রধান কারণ, বাঙলাতে এখনো আমাদের বহু সংস্কৃত শব্দের প্রয়োজন, সংস্কৃত চর্চা উঠিয়ে দিলে আমরা অন্যতম প্রধান খাদ্য থেকে বঞ্চিত হব।

ইংরিজীর বেলাতেও তাই। বিশেষ ক'রে দর্শন, নন্দনশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ইত্যাদি জ্ঞান এবং ততোধিক প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানেরও শব্দ আমরা চাই। রেলের ইঞ্জিন কি ক'রে চালাতে হয়, সে সম্বন্ধে বাঙলাতে কোনো বই আছে ব'লে জানি নে, তাই এসব টেক্‌নিকল শব্দের প্রয়োজন যে আরো কত বেশী সে সম্বন্ধে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা এখনো আমাদের মনের মধ্যে নেই। সুতরাং ইংরিজী চর্চা বন্ধ করার সময় এখনো আসে নি।

একমাত্র আরবী-ফার্সী শব্দের বেলা অনায়াসে বলা যেতে পারে যে, এই দুই ভাষা থেকে ব্যাপকভাবে আর নূতন শব্দ বাঙলাতে ঢুকবে না। পশ্চিম

www.BanglaBook.org

বাঙলাতে আরবী-ফার্সীর চর্চা যাবো যাবো করছে, পূর্ব বাঙলায়ও এ সব ভাষার প্রতি তরুণ সম্প্রদায়ের কৌতূহল অতিশয় ক্ষীণ ব'লে তার আয়ু দীর্ঘ হবে ব'লে মনে হয় না এবং শেষ কথা, আরব-ইরানে অদূর ভবিষ্যতে যে হঠাৎ কোনো অভূতপূর্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা আরম্ভ হয়ে বাঙলাকে প্রভাবান্বিত করবে তার সম্ভাবনাও নেই।

কিন্তু যে সব আরবী-ফার্সী শব্দ বাঙলাতে ঢুকে গিয়েছে তার অনেকগুলো যে আমাদের ভাষাতে আরো বহুকাল ধরে চালু থাকবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং দ্বিতীয়ত কোনো কোনো লেখক নূতন বিদেশী-শব্দের সন্ধান বর্জন করে পুরনো বাঙলার—'চণ্ডী' থেকে আরম্ভ করে 'হুতোম' পর্যন্ত—অচলিত আরবী-ফার্সী শব্দ তুলে নিয়ে সেগুলো কাজে লাগাবার চেষ্টা করছেন। কিছুদিন পূর্বেও এই এক্সপেরিমেন্ট করা অতিশয় কঠিন ছিল কিন্তু অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে বাধ্য হয়ে পুরনো বাঙলা পড়তে হয়—তারা এই সব শব্দের অনেকগুলো অনায়াসে বুঝতে পারবে ব'লে অচলিত অনেক আরবী-ফার্সী শব্দ নূতন মেয়াদ পাবে।

এই পরিস্থিতির সামনে জীবন্মৃত এসব শব্দের একটা নূতন খতেন নিলে ভালো হয়।

* * *

সংস্কৃত, গ্রীক, বাঙলা আর্য ভাষা, আরবী, হিব্রু সেমিতি ভাষা। ফার্সী, উর্দু, কাশ্মীরী, সিন্ধীও আর্য ভাষা, কিন্তু এদের উপর সেমিতি আরবী ভাষা প্রভাব বিস্তার করেছে প্রচুর। উত্তর ভারতের অন্যান্য ভাষাদের মধ্যে বাঙলা এবং গুজরাতিই আরবী ভাষার কাছে ঋণী, কিন্তু এই ঋণের ফলে বাঙলার মূল সুর বদলায় নি। গুজরাতির বেলাও তাই।

হীব্রু এবং আরবী সাহিত্যের ঐশ্বর্য সর্বজনবিদিত। ঠিক সেই রকম প্রাচীন আর্য ভাষা ফার্সী তার ভগ্নী সংস্কৃতের ন্যায় খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বেই সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল। আরবরা যখন ইরান জয় করে তখন তারা ইরানীদের তুলনায় সভ্যতা-সংস্কৃতিতে পশ্চাৎপদ। কিন্তু তারা সঙ্গে আনলো যে ধর্ম সেটি জরথুস্ত্রী ধর্মের চেয়ে প্রগতিশীল, সর্বজনীন এবং দুঃখীর বেদনা উপশমকারী। ফলে তাবৎ ইরান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো এবং আপন ভাষা ও সাহিত্য বর্জন করে আরবীকে রাষ্ট্রভাষা ও সংস্কৃতির বাহনরূপে স্বীকার ক'রে নিল। আরবী ভাষা ও সাহিত্যে তাই ইরানীদের দান অতুলনীয়।

চারশত বৎসর পরে কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হল। ইরানীদের আপন ভাষা তখন মাহমুদ বাদশার উৎসাহে নবজন্ম লাভ ক'রে নব নব সাহিত্য-সৃষ্টির পথে এগিয়ে চললো। বাল্মীকি যে রকম আদি এবং বিশ্বজগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, ফিরদৌসীও এই নব ইরানী (ফার্সী) ভাষার আদি এবং শ্রেষ্ঠ কবি। আরবী থেকে শব্দ এবং ভাবসম্পদ গ্রহণ ক'রে ফার্সী সাহিত্য যে অভূতপূর্ব বিচিত্র রূপ ধারণ করলো তা আজও বিশ্বজনের কাছে বিস্ময়ের বস্তু। রুমী, হাফিজ, সাদী, খৈয়াম আপন আপন রশ্মিমণ্ডলে সবিতাস্বরূপ। সেমিতি আরবী এবং আর্য ফার্সী ভাষার সংঘর্ষের ফলেই এই অনির্বাণ হোমানলের সৃষ্টি হল।

পরবর্তী যুগে এই ফার্সী সাহিত্যই উত্তর ভারতে ব্যাপকরূপে প্রভাব

www.BanglaBook.org

বিস্তার করলো। ভারতীয় মস্তব-মাদ্রাসায় যদিও প্রচুর পরিমাণে আরবী ভাষা পড়ানো হয়েছিল তবু কার্যত দেখা গেল ভারতীয় আর্যগণ ইরানী আর্য সাহিত্য অর্থাৎ ফার্সীর সৌন্দর্যে অভিভূত হলেন বেশী। উর্দু সাহিত্যের মূল সুর তাই ফার্সীর সঙ্গে বাঁধা—আরবীর সঙ্গে নয়। হিন্দী গদ্যের উপরও বাইরের যে প্রভাব পড়েছে সেটা ফার্সী—আরবী নয়।

একদা ইরানে যে রকম আর্য ইরানী ভাষা ও সেমিতি আরবী ভাষার সংঘর্ষে নবীন ফার্সী জন্মগ্রহণ করেছিল, ভারতবর্ষে সেই সংঘর্ষের ফলে সিন্ধী, উর্দু ও কাশ্মীরী সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। কিন্তু আরবীর এই সংঘর্ষ ফার্সীর মাধ্যমে ঘটেছিল বলে কিংবা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, ভারতবর্ষীয় এ তিন ভাষা ফার্সীর মত নব নব সৃষ্টি দিয়ে ঐশ্বর্যশালী সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারলো না। উর্দুতে কবি ইকবালই এ তত্ত্ব সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন ও নূতন সৃষ্টির চেষ্টা করে উর্দুকে ফার্সীর অনুকরণ থেকে কিঞ্চিৎ নিষ্কৃতি দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

* * *

বাঙলা আর্যভূমি, কিন্তু এ ভূমির আর্যগণ উত্তর ভারতের অন্যান্য আর্যের মত নন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার স্থান এখানে নয়। তাই মাত্র কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি।

(১) বাঙলা দেশকে যখনই বাইরের কোনো শক্তি শাসন করতে চেষ্টা করেছে তখন বাঙালী বিদ্রোহ করেছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আপন স্বাধীনতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। পাঠান যুগে বাঙলা অতি অল্পকাল পরাধীন ছিল এবং মুগল যুগেও মোটামুটি মাত্র জাহাঙ্গীর থেকে আওরঙজেব পর্যন্ত বাঙলা দিল্লীর শাসন মেনেছে।

(২) অন্যান্য আর্যদের তুলনায় বাঙালী কিছুমাত্র কম সংস্কৃত চর্চা করে নি, কিন্তু সে-চর্চা সে করেছে আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে। আদিশূর থেকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সকলের বহু চেষ্টাতেও বাঙালী উত্তর ভারতের সঙ্গে স্ট্রীম-লাইন্ড্ হয়ে সংস্কৃত পদ্ধতিতে সংস্কৃত বর্ণমালার উচ্চারণ করে নি এবং বাঙলাতে সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণ করার সময় তো কথাই নেই।

(৩) বাঙালীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টি তার পদাবলী কীর্তনে। এ সাহিত্যের প্রাণ এবং দেহ উভয়ই খাঁটি বাঙালী। এ সাহিত্যে শুধু যে মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ বাঙলায় খাঁটি কানুরূপ ধারণ করেছেন তাই নয়, শ্রীমতী শ্রীরাধাও যে একেবারে খাঁটি বাঙালী মেয়ে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ভাটিয়ালির নায়িকা, বাউলের ভক্ত, মুর্শীদীয়ার আশিক ও পদাবলীর শ্রীরাধা একই চরিত্র একই রূপে প্রকাশ পেয়েছেন।

বাঙালীর চরিত্রে বিদ্রোহ বিদ্যমান। তার অর্থ এই যে, কি রাজনীতি, কি ধর্ম, কি সাহিত্য, যখনই যেখানে সে সত্য শিব সুন্দরের সন্ধান পেয়েছে তখনই সেটা গ্রহণ করতে চেয়েছে ; এবং তখন কেউ 'গতানুগতিক পন্থা' 'প্রাচীন ঐতিহ্য'-এর দোহাই দিয়ে সে প্রচেষ্টায় বাধা দিতে গেলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। এবং তার চেয়েও বড় কথা,—যখন সে বিদ্রোহ উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হতে চেয়েছে, তখন তার বিরুদ্ধে আবার বিদ্রোহ করেছে।

এ বিদ্রোহ বাঙালী হিন্দুর ভিতরই সীমাবদ্ধ নয়। বাঙালী মুসলমানও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এ কর্মে পরম তৎপর। ধর্ম বদলালেই জাতির চরিত্র বদলায় না।

* * *

পাঠান আমলে বাঙলা দেশে আরবী-ফার্সীর চর্চা ব্যাপকভাবে হয় নি। সেযুগে বাঙলাতে লিখিত সরকারী দলিলপত্রে পর্যন্ত আরবী-ফার্সী টেক্‌নিকল শব্দ প্রায় নেই। মহাপ্রভু এবং তাঁর শিষ্যদের কেউ কেউ মুসলমান ধর্মের সঙ্গে সুপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও সে যুগের বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফার্সী শব্দ অতি অল্প।

খাস পাঠান যুগে তো কথাই নেই, মোগল যুগের প্রারম্ভেও কবি আলাওল যে কাব্য রচনা করেছেন তাতে সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্যই লক্ষণীয়—

উপনীত হৈল আসি যৌবনের কাল।
কিঞ্চিৎ ভুরুর-ভঙ্গে যৌবন রসাল॥
আড় আঁখি বঙ্ক-দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে হয়।
ক্ষণে ক্ষণে লাজে তনু যেন শিহরয়॥
সম্বরয় গিম-হার কটির বসন।
চঞ্চল হইল আঁখি, ধৈরয-গমন॥
চোররূপে অনঙ্গ অঙ্গেতে আসে যায়।
বিরহ বেদনা ক্ষণে ক্ষণে মনে ভায়॥

এ ধরনের কাব্য তখন মুসলমানদের ভিতর কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল তার বর্ণনা পাই অন্য এক কবির কাছ থেকে। সৈয়দ সুলতান বলেন,

আপনা দীনের বোল্ এক না বুঝিল।
পরস্তব-সকল লৈয়া সব রহিল॥

(দীন=ধর্ম ; পরস্তব=পরধর্ম কীর্তন। এর পূর্বেই মুসলমানরা পদাবলী কীর্তন রচনা আরম্ভ করেছেন এবং কাজী ফয়জউল্লার 'গোরক্ষবিজয়' মুসলমানদের ভিতর লোকপ্রিয় হয়ে গিয়েছে।)

মুসলমানরা আপন ধর্মচর্চা না করে 'হিন্দুয়ানী' কাব্য নিয়ে মেতে আছে দেখে মুসলমান মোল্লা-মৌলবীগণ তারস্বরে আপন প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং আরবী-ফার্সীতে ধর্মচর্চা করবার জন্য বার বার কড়া ফতোয়া জারী করেছেন।

তখন সৈয়দ সুলতান বললেন, 'আমরা বাঙলা ছাড়বো না ; কিন্তু মুসলমান শাস্ত্রচর্চাও করবো। তাই বাঙলাতেই মুসলমান শাস্ত্রচর্চা হবে।'

আরবী-ফার্সী ভাষে কিতাব বহুত।
আলিমানে বুঝে, না বুঝে মূর্খসুত॥
যে সবে আপন বুলি না পারে বুঝিতে।
পাঁচালী রচিলাম করি আছয়ে দূষিতে॥
আল্লায় বলিছে, 'মুই যে-দেশে যে-ভাষ,
সে-দেশে সে-ভাষে কইলুম রসুল প্রকাশ॥'

(আলিমান=আলিমগণ=পণ্ডিতগণ ; রসুল=আল্লার প্রেরিত পুরুষ, পয়গম্বর।)

অতি মোক্ষম জবাব। সৈয়দ সুলতান কুরানের বচন উদ্ধৃত করে সপ্রমাণ করলেন, বাঙলাতেই বাঙালী মুসলমানের শাস্ত্রচর্চা করা ফর্‌জ্—অবশ্য করণীয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সৈয়দ সুলতান কিন্তু আটঘাট বেঁধে পয়গম্বর সাহেবের বাণী বাঙলাতে প্রকাশ করেছেন। নিতান্ত যে কটি আরবী শব্দ ব্যবহার না করলেই নয়, তিনি মাত্র সেগুলোই ব্যবহার করেছেন এবং প্রচলিত হিন্দু ধর্মের মাধ্যমেই ইসলাম প্রকাশ করেছেন।

তোমার সবের মুই জানো হিতকারী।
ইমান-ইসলামের কথা দিলাম প্রচারি॥
যেরূপে সৃজন হইল সুরাসুরগণ।
যেরূপে সৃজন হইল এ তিন ভুবন॥
যেরূপে আদম ইবা সৃজন হইল।
যেরূপে যতেক পয়গম্বর উপজিল॥
বঙ্গেতে এসব কথা কেহ না জানিল।
নবী-বংশ পাঁচালীতে সকল শুনিল॥

এস্থলে দ্রষ্টব্য, হিন্দু মুসলমান উভয়কে মুসলমান ধর্ম বোঝাতে গিয়ে কবি এমন সব বস্তুর উল্লেখ করেছেন যা মুসলমান ধর্মে নেই। 'সুর' 'অসুর' কল্পনা ইসলামে নেই। 'তিন ভুবন' ইসলামে নেই, আছে 'দুই ভুবন'। তাঁর পুস্তকের নাম 'নবীবংশ' ও হিন্দু 'হরিবংশে'র অনুকরণ—আরবীতে এই ধরনের নাম নেই।

এমন কি তিনি পয়গম্বর হজরৎ মহম্মদকে 'অবতার' আখ্যা দিয়ে মোল্লাদের মতে পাপ করেছেন ; কারণ মুসলিম শাস্ত্রমতে আল্লা মনুষ্যদেহ গ্রহণ ক'রে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন না, তিনি মানুষদের একজনকে বেছে তাঁকে তাঁর মুখপাত্র করেন। সৈয়দ সুলতান কিন্তু বলছেন,

মুহম্মদ রূপ ধরি নিজ অবতার।
নিজ অংশ প্রচারিল হইতে প্রচার॥

আর সব চেয়ে বড় তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন সৈয়দ সাহেব, এই দুইটি ছত্রে—

যারে যেই ভাষে প্রভু করিল সৃজন।
সেই ভাষা তাহার, অমূল্য সেই ধন॥

এই দুটি ছত্রে যে কত বড় সত্য নিহিত আছে, সে তত্ত্ব কি আমরা আজও বুঝতে পেরেছি? এই সৈয়দ সুলতানকে তখনকার দিনের মোল্লা-মৌলবীরা 'ইসলামের ঐক্য নষ্ট হয়ে যাবে', 'আরবীর মর্যাদা লোপ পাবে' এই সব ভয় দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁকে 'মুনাফিক' অর্থাৎ 'ভণ্ড' অর্থাৎ 'ধর্মধ্বংসকারী' আখ্যা দিয়ে 'ফতোয়া' পর্যন্ত জারী করেছেন। সাহসী কবি কিন্তু অকুণ্ঠ ভাষায় তাঁর মাতৃভাষা বাঙলার জয়গান গেয়ে গেছেন। এ লোক যদি প্রকৃত বাঙালী না হয়, তবে বাঙালী কে?

সে শুভবুদ্ধি, সে সাহস কি আজও আমাদের হয়েছে? কেউ বলে 'রাষ্ট্রের অখণ্ডতার জন্য হিন্দী গ্রহণ করো', কেউ বলে 'ইংরেজী বর্জন করলে আমরা বর্বর হয়ে যাব।' হায়, বাঙলার পদমর্যাদা কেউ স্বীকার করে না।

যখন দ্বন্দ্ব নেই, সংঘাত নেই, তখন মাতৃভাষার গৌরবগান গেয়ে লম্ফ-ঝম্প করে সবাই ; কিন্তু যুগসন্ধিক্ষণে, নানা প্রলোভন-বিভীষিকার সম্মুখে মাতৃভাষাকে নিজের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা বলতে পারাতেই প্রকৃত সাহস, প্রকৃত জ্ঞান উপলব্ধির লক্ষণ। সৈয়দ সুলতানের দুইশত বৎসর পরে ইংরিজী ভাষা

www.BanglaBook.org

বাঙালীকে প্রলোভন দেখিয়েছিল আরেকবার। কিন্তু মুসলমান সুলতানের ন্যায় খৃষ্টান মাইকেল তখন উচ্চকণ্ঠে বাঙলার জয়গান গেয়েছিলেন।

সৈয়দ সুলতানের অনুকরণকারীরা কিন্তু তাঁর মত বিচক্ষণ ভাষাবিদ ছিলেন না: ফলে বাঙলাতে যে পরিমাণে আরবী-ফার্সী শব্দ প্রবেশ করতে লাগল তাতে ভাষার বৈশিষ্ট্য বিপন্ন হতে লাগল। ইতিমধ্যে—মোগল যুগের শেষের দিকে—উর্দুভাষাও বাঙলা দেশে প্রবেশ করেছে। তাই তখন যে বাঙলা পাচ্ছি তার উদাহরণ—

বিশ্বনাথ বিশ্বাসে বুঝায়ে বলে বাছা।
দুনিয়ামে এসাভি আদমী রহে সাঁচা॥
ভালা বাওয়া কাহে তেরা মৃত্যুকাল কাছে।...
রাত দিন যৈসা তৈসা সুখ দুঃখ হোয়ে॥
জানা গেল বাত যাওয়া জানা গেল বাত।
কাপড়া লেও আওর আও মেরা সাথ॥

যুক্তি নয়, অজুহাত হিসেবে বলা যেতে পারে, আকবরের আমল থেকে বহুল ফার্সী শিক্ষাদানের ফলে বাঙলা দেশে তখন প্রচুর লোক বিস্তর আরবী-ফার্সী শব্দ দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে। এটা কিন্তু কোনো সৎযুক্তি নয়। কারণ আজ আমরা দৈনন্দিন জীবনে বিস্তর ইংরিজী শব্দ ব্যবহার করি: তাই ব'লে সাহিত্যসৃষ্টির সময় বে-এক্তেয়ার হয়ে যত্র-তত্র ভুরি ভুরি ইংরিজী শব্দ ব্যবহার করি নে।

কিন্তু সত্য কবি পথভ্রষ্ট হন না। তার প্রকৃত নিদর্শন আমরা পাই, চট্টগ্রামের মহিলা কবি 'শ্রীমতী রহীম্নুনিসা'র (আশা করি 'শ্রীমতী' লেখাতে কেউ আপত্তি করবেন না, কারণ তিনি নিজেই তাঁর কাব্যে আপন পরিচয় দেবার সময় লিখেছেন—

"স্বামী আজ্ঞা শিরে পালি লিখি এ ভারতী।
রহিমুনিচা নাম জান আদ্যে ছিরীমতী॥")

এই মহিলা কবির সন্ধে হালে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন সুপণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, পূর্ববঙ্গের বাঙলা-একাডেমির প্রথম ডাইরেক্টর (বাঙলা-একাডেমী পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, পৌষ ১৩৬৩, পৃঃ ৫৩)। তাঁর মতে '১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই রহীমুন্-নিসা আবির্ভূতা হয়েছিলেন।' ইনিও সৈয়দ সুলতানের মত সৈয়দ বংশের মেয়ে এবং পরিবারে প্রচুর আরবী-ফার্সীর চর্চা থাকা সত্ত্বেও সুস্থ, সবল এবং মধুর বাঙলায় কবিতা রচনা ক'রে গিয়েছেন।

এঁর হাতের লেখা খুব সম্ভব সুন্দর ছিল। তাই বোধ করি তাঁর স্বামী তাঁকে কবি আলাওলের 'পদ্মাবতী' নকল করতে আদেশ দেন —

শুন গুণিগণ হই এক মন।
লেখিকার নিবেদন।
অক্ষর পড়িলে টুটী পদ হৈলে
শুধারিঅ সর্ব্বজন॥
পদ এই রাষ্ট্র হেন মহাকষ্ট
পুথি সতী পদ্মাবতী।

www.BanglaBook.org

আলাওল মণি, বুদ্ধি বলে গুণী,
বিরচিল এ ভারতী॥
পদের উকতি বুঝি কি শকতি,
মুই হীন তিরী জাতি।
স্বামীর আদেশ মানিয়া বিশেষ
সাহস করিল গাঁথি॥

রহীমুন্নিসার স্বরচিত কাব্য অল্পই পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে তাঁর একটি 'বারমাস্যা' বড়ই করুণ এবং মধুর। পূর্ববঙ্গের কবিরা সচরাচর প্রিয়বিরহে বারমাস্যা রচনা করেছেন—রহীমুন্নিসা ভ্রাতৃশোকে তাঁর বারমাস্যা রচনা করেছেন।

আশ্বিনেতে খোয়াময় কান্দে তরুলতাচয়
ভাই বলি কান্দে উভরায়।
আমার কান্দনি শুনি বনে কান্দে কুরঙ্গিণী
জলে মাছ কান্দিয়া লুকায়॥
(খোয়া=কুয়াশা)

অন্য এক স্থলে 'কন্যাহারা জননী'র, শোকাতুরার ক্রন্দন প্রকাশ করেছেন অতুলনীয় সরল বাঙলায়—

নয়া সন নয়া মাস ফিরে বারে বার
মোর জাদু গেল ফিরি না আসিল আর॥

এঁর রচনায় সত্যই মধুর কবি-প্রতিভা 'বারেবার' ধরা পড়ে। পাঠককে মূল প্রবন্ধটি পড়তে অনুরোধ জানাই।

* * *

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বন্দ্ব প্রধানতঃ ইংরিজীর সঙ্গে। এবং সেই দ্বন্দ্ব বিদ্রোহরূপ ধারণ করলো পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলনে ১৯৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দে। আবার জয়ী হল—কিন্তু এবারে তার জয়মূল্য দিতে হল বুকের রক্ত দিয়ে—কিন্তু আরু, ইজ্‌জৎ, ইমান দিয়ে নয়। পাকিস্তান হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব বাঙলার লোক বাঙলাতে আরেক দফে আরবী-ফার্সী শব্দ আমদানি করে ভাষাকে 'পাক' করতে প্রলোভিত হল না!

তাই এই প্রবন্ধের নাম দিয়েছি 'মামদো'র পুনর্জন্ম। 'মামদো'রই যখন কোনো অস্তিত্ব নেই, তখন তার পুনর্জন্ম হবে কি প্রকারে? পূর্ব বাঙলার লেখকদের স্কন্ধে আরবী-ফার্সী শব্দের মামদো ভর করবে, আর তারা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে আরবী-ফার্সীতে অর্থাৎ 'যাবনী মেশালে' কিচিরমিচির করতে আরম্ভ করবে, বিজাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করবে—যার মাথামুণ্ডু পশ্চিম বাঙলার লোক বুঝতে পারবে না, সে ভয় 'স্বপ্ন, মায়া, মতিভ্রম'।

দিল্লী স্থাপত্য

যাঁরা এই শীতে প্রথম দিল্লী যাচ্ছেন কিংবা যাঁরা পূর্বে গিয়েছেন কিন্তু পাঠান-মোগলদের দালান-কোঠা, এমারত-দৌলত দেখবার সুযোগ ভালো করে পান নি, এ-লেখাটি তাঁদের জন্য। এবং বিশেষ করে তাঁদের জন্য যাঁদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্থাপত্য দেখে অভ্যাস নেই বলে ঐ রস থেকে বঞ্চিত। লেখাটিতে কিঞ্চিৎ মাস্টারি মাস্টারি' ভাব থেকে যাবে বলে গুণীজনকে আগের থেকেই হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি তাঁরা যেন এটি না পড়েন।

কোনো-কালে যে ব্যক্তি গান শোনে নি সে যদি হঠাৎ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুনে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য না করে তা হলে চট করে তাকে বেরসিক বলা অন্যায়। বাঙলা দেশে এখানে-ওখানে ছিটেফোঁটা স্থাপত্য আছে বটে, কিন্তু একই জায়গায় যথেষ্ট পরিমাণে নেই বলে স্থাপত্যের যে ক্রমবিকাশ এবং সামগ্রিক রূপ তার রস বুঝতে সাহায্য করে তার সম্পূর্ণ অভাব। বিচ্ছিন্নভাবে যে বিশেষ একটি মন্দির, মসজিদ বা সমাধি রসসৃষ্টি করতে পারে না, তা নয়। তাই তুলনা দিয়ে বলতে পারি, জগতের কোনো সাহিত্যের সঙ্গে যদি আপনার কিছুমাত্র পরিচয় না থাকে, তবে সাধারণত ধরে নেওয়া যেতে পারে যে উটকো একখানা ফরাসী উপন্যাসের রস আপনি গ্রহণ করতে পারবেন না। রসবোধের জন্য ঐতিহাসিক ক্রম-বিকাশজ্ঞান অপরিহার্য কিনা এ প্রশ্ন নন্দনশাস্ত্রের অন্যতম কঠিন প্রশ্ন। সে গোলকধাঁধার ভিতর একবার ঢুকলে আর দিল্লী যাবার পথ পাবেন না,—আর 'দিল্লী দূর অস্ত্' তো বটেই।

কবিতা, সঙ্গীত, স্থাপত্য, ভাস্কর্যের মূল রস একই—ইংরিজীতে যাকে বলে ঈসথেটিক ডিলাইট। কিন্তু এক রসের চিন্ময় রূপ (যথা কাব্যের) যদি অন্য রসের মৃন্ময় রূপে (যথা ভাস্কর্য, স্থাপত্যে) টায় টায় মিলছে না দেখেন তবে আশ্চর্য হবেন না। এদের প্রত্যেকেই মূল রস প্রকাশ করে আপন আপন ভাষায়', নিজস্ব শৈলীতে এবং আঙ্গিকে। একবার সেটি ধরতে পারলেই আর কোনো ভাবনা নেই। তার পর নিজের থেকেই আপনার গায়ে রসবোধের নূতন নূতন পাখা গজাতে থাকবে, আপনি উড়তে উড়তে হঠাৎ দেখবেন তাজমহলের গম্বুজটিও আপনার সঙ্গে আকাশপানে ধাওয়া করেছে—নীচের দিকে তাকিয়ে দেখবেন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল যেন ক্রমেই পাতালের দিকে ডুবে যাচ্ছে।

স্থাপত্যের প্রধান রস—প্রধান কেন, একমাত্র বললেও ভুল বলা হয় না, অন্যগুলো থাকলে ভালো, না থাকলে আপত্তি নেই—তার কম্পজিশনে, অর্থাৎ তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, যেমন ধরুন, গম্বুজ, মিনার, আর্চ (দেউড়ি), ছাদ (কিয়োস্ক্, পেভিলিয়ন্), ভিত্তি এমনভাবে সাজানো যে দেখে আপনার মনে আনন্দের সঞ্চার হয়। তুলনা দিয়ে বলতে পারি, সঙ্গীতেও তাই। কয়েকটি স্বর—সা, রে, গা, মা, ইত্যাদি এমনভাবে সাজানো হয় যে শোনামাত্রই আপনার মন এক অনির্বচনীয় রসে আপ্লুত হয়।

এই সামঞ্জস্য যখন সর্বাঙ্গসুন্দর হয়, তখনই স্থাপত্য সার্থক। এবং স্থাপত্যের এই অনিন্দ্য সামঞ্জস্য যদি কাব্যে কিংবা উপন্যাসে পাওয়া যায় তবে বলা হয়, কাব্যখানিতে আরকিটেক্‌নিকাল্ মহিমা আছে—মহাভারতে আছে, ফাউস্টে আছে এবং উয়োর অ্যান্ড পীসে আছে ; ক্রীতদাস উত্তম উপন্যাস কিন্তু এ গুণটি সেখানে অনুপস্থিত। লিরিক বা গীতিকাব্যে যদিও কম্পজিশন থাকে—তা সে যতই কম হ'ক না কেন তাতে আরকিটেক্‌টনিকাল্ বৈশিষ্ট্য থাকে না।[১]

---

১ 'আধেক ঘুমে নয়ন চুমে' গানটি সার্থক, এবং এই নীতির প্রকৃষ্টতম উদাহরণ।

www.BanglaBook.org

স্থাপত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তারপর গুণীরা বলেন, এবং সার্থক স্থাপত্যে স্থপতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর নিখুঁত সামঞ্জস্য করার পর সেগুলোকে অলঙ্কার সহযোগে সুন্দর করে তোলেন। অধম একথা সম্পূর্ণ স্বীকার করে না। কিন্তু এ গোলকধাঁধায়ও সে ঢুকতে নারাজ। দিল্লীর দিওয়ান-ই-খাস ও দিওয়ান-ই-আমে অলঙ্কারের ছড়াছড়ি, তুগলুক যুগের স্থাপত্যে অলঙ্কার প্রায় নেই—পাঠক দিল্লী দেখার সময় এই তত্ত্বটি সম্বন্ধে সচেতন থাকবেন[২]। অথচ দুইই সার্থক রসসৃষ্টি।

এই সামঞ্জস্য যদি খাড়াই চওড়াই—অর্থাৎ মাত্র দুই দিক—নিয়ে হয় তবে সেটা ছবি। শুধু সামনের দিক থেকে দেখা যায়। তিন দিক নিয়ে—তিন ডাইমেনশনাল—হলে সেটা ভাস্কর্য কিংবা স্থাপত্য। কিন্তু অনেক সময় মূর্তির পিছন দিকটা অবহেলা করা হয় বলে সেটাকে শুধু সামনের দিক থেকে দেখতে হয়। গড়ের মাঠের যে সব মূর্তি ঘোড়-সওয়ার নয় সেগুলো পিছন থেকে দেখতে রীতিমত খারাপ লাগে (বস্তুত এই সমস্যা সমাধানের জন্যই অনেক নিরীহ লোককে ঘোড়ায় চড়ানো হয়েছে) এবং বাসট্‌গুলো পিছন থেকে রীতিমত কদাকার বলে সেগুলোকে দেওয়ালের গায়ে ঠেলে দেওয়া হয়—যাতে করে পিছন থেকে দেখবার কোনো সম্ভাবনাই না থাকে। বিদ্যাসাগরের মূর্তিটি জলের কাছে রয়েছে বলেই ঐ সমস্যাটির সমাধান হয়েছে—জলে সাঁতরাতে সাঁতরাতে মূর্তির পিছন দিকে তাকাবে ক'জন লোকে?

কিন্তু স্থাপত্যের বেলা সেটি হবার জো নেই। স্থাপত্য এমন হবে যে সেটাকে যেন সব দিক থেকে এবং বিশেষ করে যে-কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়। কোনো জায়গা থেকে যদি, ধরুন, মনে হয়, দুটো মিনার এক হয়ে গিয়ে কেমন যেন দেউড়িটাকে ঢেকে অপ্রিয়দর্শন করে তুলেছে তবে বুঝবেন স্থপতি আর্টের কোনো একটা সমস্যার ঠিক সমাধান করতে পারেন নি বলেই এস্থলে তাল কেটেছেন, অর্থাৎ রসভঙ্গ করেছেন।

মসজিদ মাত্রেরই একটা খুঁত, ঠিক এই কারণে থেকে যায়। শাস্ত্রের হুকুম মসজিদের পশ্চিম দিক যেন বন্ধ থাকে, যাতে করে নমাজীদের সামনে কোনো বস্তু তার দৃষ্টিকে আকর্ষণ না করতে পারে। ফলে বাধ্য হয়ে স্থপতিকে পশ্চিম দিকে দিতে হয় খাড়া পাঁচিল। এটার সঙ্গে আর বাদবাকি তিন দিক কিছুতেই খাপ খাওয়ানো যায় না বলে, মসজিদ শুধু তিন দিক থেকে দেখা যায়। ধর্মতলার টিপ্‌পু সুলতানের মসজিদ কিছু উত্তম রসসৃষ্টি নয়—দক্ষিণী ঢঙের গম্বুজগুলোই যা দেখবার মতো—কিন্তু পাঠক সেটাকে একবার প্রদক্ষিণ করলেই সমস্যাটা বুঝে যাবেন। দিল্লীর পুরনো মসজিদে-মসজিদে পাঠক দেখবেন, স্থপতি কত রকম চেষ্টা করেছেন এই সমস্যা সমাধানের।

সমাধি, রাজপ্রাসাদ, বিজয়স্তম্ভ সম্বন্ধে শাস্ত্রের কোনো বাধাবন্ধক নেই। তাই সেগুলোতে এ অপরিপূর্ণতা থাকা মারাত্মক। সচরাচর থাকেও না।

পূর্বেই নিবেদন করেছি সার্থক স্থাপত্য যে-কোনো জায়গাতে, যে-কোনো

---

২ 'তুলসীর মূলে যেন সুবর্ণ দেউটি উজলিল দশ দিক' এবং 'পিকবরবর নব-পল্লব মাঝারে' দুটিই সার্থক। প্রথমটিতে অলঙ্কার নেই। অলঙ্কারের বাড়াবাড়ি হলে কাব্য দুর্বল হয়ে পড়ে। মেঘদূতের তুলনায় যে রকম গীত-গোবিন্দ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখা যায়। কিন্তু তবু প্রশ্ন ওঠে, সব চেয়ে ভালো কোন্ জায়গা থেকে দেখা যায়? উচ্চাঙ্গ মোগলস্থাপত্য মাত্রেই স্থপতি এর নির্দেশ নিজেই দিয়ে গিয়েছেন। স্থাপত্যে পৌঁছবার বেশ কিছুটা আগে যে প্রধান তোরণদ্বার (দেউড়ি—গেটওয়ে) থাকে—এরই উপর নহবৎখানা—তার ঠিক নীচে দাঁড়ালেই স্থাপত্যের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন। সাধারণত ছবি এ-জায়গা থেকেই ভালো ওঠে। আর যদি নিজের রসবোধ তার সঙ্গে সংযোজন করতে চান, তবে একটু পিছিয়ে গিয়ে দেউড়ির আর্চসুদ্ধ ছবি তুললে তাতে 'ঈসথেটিক ইফেক্ট' আসবে—যদিও মূল স্থাপত্যের কিছুটা হয়ত তাতে করে কাটা পড়বে।

এ সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু আমার মনে হয় স্থাপত্য দেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গত সে আলোচনা তোলাই সঙ্গত।

* * *

দিল্লীর স্থাপত্য তার রাজবংশানুযায়ী ভাগ করা যায়।

॥ ১ ॥ দাস-বংশ

কুতুব মিনার, কুওওতুল-ইসলাম মসজিদ, ইলতুতমিশের সমাধি। (কুওওতুল-ইসলাম মসজিদের আঙিনায়—সেহ্ন্—চন্দ্ররাজা নির্মিত একটি শতকরা নিরানব্বই ভাগের লৌহস্তম্ভ আছে। এটি ও মসজিদের থামগুলো হিন্দু-যুগের।)—সব কটি কুতুবের গা ঘেঁষে।

॥ ২ ॥ খিলজী-বংশ

আলাউদ্‌দীন খিলজী নির্মিত 'আলা-ই-দরওয়াজা'—কুতুবের গা ঘেঁষে। আলাউদ্‌দীন কিংবা তাঁর ছেলের ('দেবল-দেবীর' বল্লভ) তৈরী মসজিদ—দিল্লী-মথুরা ট্রাঙ্ক রোডের উপর (নিউ দিল্লী থেকে মাইল খানেক) নিজামউদ্‌দীন আউলিয়ার[৩] দরগার ভিতর[৪]।

॥ ৩ ॥ তুগলুক-বংশ

গিয়াসউদ্‌দীন তুগলুক[৩] নির্মিত আপন সমাধি—কুতুব থেকে মাইল তিনেক দূরে তাঁর-ই নির্মিত তুগলুকাবাদের সামনে। তুগলুকাবাদ।

ফিরোজ তুগলুক নির্মিত হাউজ খাস—দিল্লী থেকে কুতুব যাবার পথে রাস্তার ডান দিকে। ফিরোজ নির্মিত ফিরোজশাহ-কোট্‌লা,—দিল্লী এবং নয়াদিল্লীর প্রায় মাঝখানে (অন্যান্য দ্রষ্টব্যের ভিতর এখানে আছে একটি অশোকস্তম্ভ ; ফিরোজ এটাকে দিল্লীতে আনিয়ে উঁচু ইমারত বানিয়ে তার উপরে চড়ান)।

৩, ৪ 'দৃষ্টিপাতে' উল্লিখিত 'দিল্লী দূর অস্ত্' কাহিনীর নায়কদ্বয়। গিয়াসের ছেলে 'পাগলা' রাজা মহম্মদ তুগলুকের তৈরী 'আদিলাবাদ'-এর ভগ্নাবশেষে বিশেষ কিছু দেখবার নেই। মুহম্মদ এবং নিজামউদ্দীনের মিত্র কবি-সম্রাট আমির খুসরো ('দেবলা-দেবীর' প্রেমের কাহিনী ইনিই প্রথম ফার্সীতে লেখেন) এবং প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরনীর কবর নিজামউদ্দীনের দরগার ভিতর।

৫ ইলতুৎমিশের কন্যা সম্রাজ্ঞী রিজিয়ার যে কবর দিল্লীতে আছে সেটি সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা সন্দেহ প্রকাশ করেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

॥ ৪ ॥ সৈয়দ এবং লোদীবংশ

লোদী গার্ডেন্‌স্‌—নয়াদিল্লীর লোদী এস্‌টেটের গা ঘেঁষে—ভিতরে আছে, (ক) মুহম্মদ শাহ সৈয়দের কবর, (খ) সিকন্দর লোদীর তৈরী মসজিদ এবং মসজিদের প্রবেশগৃহ, (গ) অজানা কবর এবং (ঘ) সিকন্দর লোদীর কবর।

ইসা খানের কবর—হুমায়ুনের কবরের বাইরে। যদিও পরবর্তী যুগের, তবু লোদীশৈলীতে তৈরী।

॥ ৫ ॥ মোগল-বংশ

বাবুর কিছু তৈরী করার সময় পান নি। কেউ কেউ বলেন, পালম এ্যারপোর্টের সামনে যে দুর্গের মতো সরাই এটি তাঁর হুকুমে তৈরী। এতে দ্রষ্টব্য কিছুই নেই।

হুমায়ুনও এক পুরনো কিলা (ন্যাশনাল স্টেডিয়ামের পিছনে) ছাড়া কিছু করে যেতে পারেন নি। পুরনো কেল্লারও কতখানি তাঁর, কতখানি শের শা'র, বলা শক্ত। কেল্লার ভিতরে মসজিদটি কিন্তু শের শা'র তৈরী এবং এর শৈলী পাঠান মোগল থেকে ভিন্ন। সাসারামে শেরের কবর সৈয়দ-লোদী শৈলীতে।

হুমায়ুনের বিধবার—আকবরের মাতার—তৈরী হুমায়ুনের কবর। নিজামউদ্‌দীন আউলিয়ার দরগার সামনে, দিল্লী-মথুরা রোডের ওপাশে।

আকবরের কীর্তি-কলা আগ্রাতে—সেকেন্দ্রা ফতহ্‌-পুর সিক্রী, আগ্রা দুর্গ। ঐ সময়ে তৈরী দিল্লীতে আছে আৎকা খান, আজিজ কোকলতাশ, আব্দুর রহীম খানখানা ও আদ্‌হম্‌ খানের কবর।

শাহাজাহান—দিল্লী দুর্গ বা লাল কিলা। তার-ই সামনে চাঁদনী চৌকের কাছে জাম-ই মসজিদ।

ঔরঙ্গজেব—লাল কিলার ভিতর মোতী মসজিদ।

ঔরঙ্গজেবের ভগ্নী রৌশনারার নিজের তৈরী সমাধি—রৌশনারা-গার্ডেনসের ভিতর।

ঐতিহাসিক মাত্রেই জানেন, ঔরঙ্গজেবের পরের বাদশাদের অর্থ ও প্রভাব দুই-ই কম ছিল বলে এঁরা প্রায় কিছুই করে যেতে পারেন নি। যেটুকু আছে তাতে আলঙ্কারিক সৌন্দর্য যথেষ্ট বটে, কিন্তু স্থাপত্যের লক্ষণ প্রায় নেই—স্থপতি সে-চেষ্টা করেনও নি। এর ভিতর উল্লেখযোগ্য জাহানারা, মুহম্মদ শাহ বাদশাহ রঙ্গীলা, এবং দ্বিতীয় আকবরের (ইনি রাজা রামমোহনকে 'রাজা' উপাধি দিয়ে বিলেত পাঠিয়েছিলেন) কবর। তিনটিই নিজামউদ্‌দীনের দরগার ভিতরে। মোগল স্থাপত্যের 'শেষ নিশ্বাস' সফ্‌দর্‌-জঙ্গের সমাধি ও তৎসংলগ্ন মসজিদ—কুলোকে বলে এটার মার্বেল আব্দুর রহীম খানখানার কবর থেকে চুরি করা। ইমারতটি যদিও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ তবু তার সৌন্দর্য নিম্নশ্রেণীর, রুচির বিলক্ষণ অধোগতি এতে স্পষ্ট ধরা পড়ে। ছবিতে হুমায়ুনের কবর, তাজমহল, এমন কি আৎকা খানের ছোট কবরটির সঙ্গে তুলনা করলেই পাঠক আমাব বক্তব্য বুঝতে পারবেন। আৎকা খানের কবরটি আমার বড় প্রিয় স্থাপত্য। দিল্লীর লোক এ-কবরটির খবর রাখে না, কারণ এটি নিজামউদ্‌দীন দরগার এক নিভৃত কোণে পড়ে আছে।

দিল্লীতে তিনটি বড় দরগা পড়ে আছে। প্রথমটি কুৎবউদ্‌দীন বখতিয়ার কাকীর। ইনি কুৎবউদ্‌দীন আইবকের গুরু ছিলেন। অনেকের ধারণা আইবক

www.BanglaBook.org

গুরুর স্মরণে কুতুব মিনার নির্মাণ করেছিলেন। দরগাটি কুতুব মিনারের কাছেই এবং 'কুতুব-সাহেব' নামে পরিচিত।

দ্বিতীয়টি নিজামউদ্‌দীন আউলিয়ার এবং তৃতীয়টি নাসিরউদ্‌দীন চিরাগ দিল্লীর। দরগাটি দিল্লী থেকে মাইল তিনেক দূরে।

প্রথমটির পত্তন দাস আমলে, দ্বিতীয়টির খিলজি আমলে এবং তৃতীয়টির তুগলুক আমলে। সেই যুগ থেকে শেষ-মোগল পর্যন্ত এসব দরগাতে বহু ভক্ত নানা ইমারত গড়েছেন বলে অল্পের ভিতর সব স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু চোখ কিছুটা না বসা পর্যন্ত এসব জায়গায় গবেষণা করা বিপজ্জনক।

কুতুব মিনার পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মিনার। ইংরেজ পর্যন্ত একথা স্বীকার করেছে। আশ্চর্য মনে হয় যে, এর পূর্ববর্তী নিদর্শন এদেশে নেই, ইরান-তুরানেও নেই। বহু স্থপতির বহু এক্সপেরিমেণ্টের সম্পূর্ণ ফায়দা উঠিয়ে তাজ নির্মিত হল—কিন্তু মিনারের ক্ষেত্রে কুতুব প্রথম এবং শেষ এক্সপেরিমেণ্ট। এ ধরনের বিজয়স্তম্ভ পূর্বে কেউ করে নি; কাজেই গুণীজনের বিস্ময়ের অবধি নেই যে, হঠাৎ স্থপতি এ সাহস পেল কোথা থেকে? কানিংহাম, ফার্গুসন, কার স্টিফেন, সার সৈয়দ আহমদ অনেক ভেবে-চিন্তেও এর কোনো উত্তর দিতে পারেন নি।

কুতুব পাঁচতলার মিনার। প্রথম তলাতে আছে 'বাঁশী' ও 'কোণে'র পর-পর সাজানো নকশা। দ্বিতীয় তলাতে শুধু বাঁশী, তৃতীয় তলাতে শুধু কোণ; চতুর্থ ও পঞ্চম তলাতে কি ছিল জানার উপায় নেই, কারণ বজ্রাঘাতে সে দুটি ভেঙে যাওয়ায় ফিরোজ তুগলুক (যিনি 'অশোক স্তম্ভ' দিল্লী আনেন; ইনি যেমন নিজে সোৎসাহে ইমারত বানাতেন ঠিক তেমনি অকাতরে অন্যের ইমারত মেরামত করে দিতেন—দিল্লীর অতি অল্প রাজাতেই এই দ্বিতীয় গুণটি পাওয়া যায়) সে দুটি মার্বেল দিয়ে মেরামত করে দেন। পঞ্চমটিতে নাকি আবার সিকন্দর লোদীরও হাত আছে। মিনারের মুকুটরূপে সর্বশেষে (যেখানে এখন আলো জ্বালানো হয়) কি ছিল সে সম্বন্ধে রসিকজনের কৌতূহলের অন্ত নেই।[৬] দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা মিনারকে স্থপতি কি রাজমুকুট পরিয়েছিলেন —সেখানেও তিনি তাল রেখে শেষরক্ষা করতে পেরেছিলেন কিনা, তাঁর যে অদ্ভুত কল্পনা-শক্তি মিনারের সর্বাঙ্গে স্বপ্রকাশ সে-কল্পনাশক্তি দিয়ে তিনি দর্শককে কোন্ দূরলোকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, কে জানে?

ইমারত তৈরি করা কত সোজা! কারিগরের হাতে সেখানে কত অজস্র মালমশলা! গম্বুজ, থাম, আর্চ, ছত্রি, মিনারেট, ছজ্জা (ড্রিপস্টোন); কার্নিস; ব্র্যাকেট কত কী! তার তুলনায় একটা সোজা খাড়া স্তম্ভে সৌন্দর্য আনা কত

৬ গেল শতকের গোড়ার দিকে এক ইংরেজ মেজরের হাতে কুতুবের মেরামতির ভার পড়ে। ব্যালকনি (গ্যালারির) রেলিঙগুলো ছিল বলে তিনি সেখানে চারপাপাড়ির নিজস্ব নকশা দিয়ে রেলিঙ বানান—নীচের হানিকুম্ অর্থাৎ মৌমাছির চাকের নকশা মূল স্থপতির —এবং মাথায় 'নিজস্ব' কল্পনাপ্রসূত একটা মুকুট পরান। সেইটে দেখে দিল্লী-ওলারা সত্রাসে তারস্বরে চিৎকার করেছিল। বহু বৎসর পরে লর্ড কার্জন সেই মুণ্ডুটি কেটে নীচে নামিয়ে দূরে সরিয়ে রাখেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শক্ত! এখানে শিল্পী সফল হয়েছেন শুধু সেটাকে কয়েকটি তলাতে বিভক্ত করে, সামঞ্জস্য রেখে প্রতি তলায় তাকে একটু ছোট করে করে, গুটিকয়েক ব্যালকনি লাগিয়ে দিয়ে এবং মিনারের গায়ে কখনো 'বাঁশী', কখনো 'কোণে'র নকশা কেটে। 'প্রপর্শনে'র এরকম চূড়ান্ত পৃথিবীর আর কোনো মিনারে পাওয়া যায় না।

আর তার গায়ের কারুকার্যও অতি অদ্ভুত। বাঁশী এবং কোণের উপর দিয়ে সমস্ত মিনারটিকে কোমরবন্ধের মতো ঘিরে রয়েছে সারি সারি লতা-পাতা, ফুলের মালা, চক্রের নকশা। এগুলো জাতে হিন্দু এবং এর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে এক সারি অন্তর অন্তর আরবী লেখার সার—সেগুলো জাতে মুসলমান। কিন্তু উভয় খোদাইয়ের কাজই যে হিন্দু শিল্পী করেছেন সে বিষয়ে কণামাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। গোটা মিনারটির পরিকল্পনা করেছে মুসলমান, যাবতীয় কারুশিল্প করেছে হিন্দু—ভারতবর্ষে মুসলমানদের সর্বপ্রথম সৃষ্টি-কার্যে হিন্দু-মুসলমান মিলে গিয়ে যে অদ্ভুত সাফল্য দেখিয়েছিল সে-মিলন পরবর্তী যুগে কখনো ভঙ্গ হয় নি, কভু বা মুসলমানের প্রাধান্য বেশী, কোনো ইমারতে হিন্দুর প্রাধান্য বেশী। আট শত বৎসর একসঙ্গে থেকেও হিন্দু-মুসলমান চিন্তার ক্ষেত্রে, রাজনীতির জগতে সম্পূর্ণ এক হয়ে যেতে পারে নি, কিন্তু কলার প্রাঙ্গণে (স্থাপত্য, সঙ্গীত এবং নৃত্যে) প্রথম দিনেই তাদের যে মিলন হয়েছিল আজও সেটি অটুট আছে।

কুতুবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আর কোনো মিনার কখনো মাথা খাড়া করে নি। দীর্ঘ আট শতাব্দী ধরে বহু বাদশা বহু ইমারত গড়েছেন কিন্তু 'কুতুবের চেয়েও ভালো মিনার গড়বো' এ সাহস কেউ দেখান নি। যে ইংরেজ দিল্লীতে সেক্রেটারিয়েট, রাজভবন গড়ে, কলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বানিয়ে নিজেকে অতুল বিড়ম্বিত করেছে সেও বিলক্ষণ জানতো কুতুবের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কোনো স্থপতির কর্ম নয়।[৭]

আলাউদ্দীন খিলজীর মত দুঃসাহসী রাজা ভারতবর্ষে কমই জন্মেছেন। একমাত্র তিনিই চেয়েছিলেন, কুতুবের সঙ্গে পাল্লা দিতে। তাই কুতুবের দ্বিগুণ ঘের দিয়ে তিনি আরেকটি মিনার গড়তে আরম্ভ করেন—বাসনা ছিল মিনারটি কুতুবের দ্বিগুণ উঁচু হবে। ইমারত মাত্রেরই একটা অপটিমাম্ সাইজ আছে—অর্থাৎ যার চেয়ে বড় হলে ইমারত খারাপ দেখায়, ছোট হলেও খারাপ দেখায় (সর্ব কলাতেই এ সূত্র প্রযোজ্য : কিন্তু স্থাপত্যের বেলা এটা অন্যতম মূলসূত্র)—কাজেই আলাউদ্দিনের চূড়া ডবল হলে ফল কি ওতরাতো বলা কঠিন। তা সে যা-ই হোক, মিনারের কাঠামোর কিছুটা শেষ হতে-না-হতেই ওপারের ডাক খিলজীর কানে এসে পৌঁছল, যে-পারে খুব সম্ভব মিনার হাতে নিয়ে লাঠালাঠি চলে না।

আপন মহিমায় নিজস্ব ক্ষমতায় যে স্তম্ভ দাঁড়ায় তার নাম মিনার, এবং

---

৭ অক্টরলনি মনুমেণ্টে কোনো কলাপ্রচেষ্টা নেই বলে সেটাকে কুতুবের সঙ্গে তুলনা করা অন্যায়—সেটাকে চটকলের চোঙার সঙ্গে তুলনা করা যায়। বড়বাজারের দালান কোঠার সঙ্গে কেউ তাজের তুলনা করে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মসজিদ, সমাধি কিংবা অন্য কোনো ইমারতের অঙ্গ হিসাবে যে মিনার কখনো থাকে, কখনো থাকে না, তার নাম মিনারেট—মিনারিকা। কুতুবের পর পাঠান মোগল বিস্তর মিনারেট গড়েছে ; কিন্তু সেগুলোও কুতুবের কাছে আসতে পারে না। তাজের মিনারিকা ভুবনবিখ্যাত ; কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি শিল্পী সেখানে নতমস্তকে হার মেনে নিয়ে সেটাকে সাদামাটার চরমে পৌঁছিয়ে খাড়া করেছেন। পাছে লোকে তাঁর মিনারিকার সঙ্গে কুতুবের তুলনা করে লজ্জা দেয় তাই তিনি সেটাকে গড়েছেন এমন ন্যাড়া করে যে দর্শকের মন অজান্তেও যেন কুতুবকে স্মরণ না করে। না হলে যে-তাজের সর্বাঙ্গে গয়নার ছড়াছড়ি তার চারখানা মিনারিকা-হস্তে 'নোয়াটুকু'র চিহ্ন নেই কেন? ওদিকে দেখুন, হুমায়ুনের সমাধি-নির্মাতা ছিলেন আরও ঘড়েল—তিনি তাঁর ইমারতটি গড়েছেন মিনারিকা সম্পূর্ণ বর্জন করে।

দিল্লী-আগ্রার বহু দূরে, কুতুবের আওতার বাইরে, গুজরাতের রাজধানী আহমদাবাদে আমি একটি মিনারিকা দেখেছি যার সঙ্গে কুতুবের কোনো মিল নেই এবং বোধ হয় ঠিক সেই কারণেই তার নিজস্ব মূল্য আছে। রাজা আহমদের—এঁরই নামে আহমদাবাদ—বেগম রানী সিপ্রির মসজিদে একটি মধুরদর্শন মিনারিকা বহু ভূপর্যটকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। গুজরাত এবং রাজপুতানার মেয়েরা তাদের বাহুলতা মণিবন্ধে যে বিচিত্র-আকার, বিচিত্র-দর্শন অসংখ্য বলয়-কঙ্কণ পরে এ মিনারিকা যেন সেই কমনীয়তায় অনুপ্রাণিত। রাজেশ্বরী সিপ্রি যেন তাঁরই অনুপম হাতখানি নভোলোকের দিকে তুলে ধরেছেন ভুবনেশ্বরের ললাটে তিলক পরিয়ে দেবেন বলে।

কুতুবের সঙ্গে সঙ্গে—আসল কুতুব তৈরী হয় প্রথম তলা থেকে নমাজের আজানের জন্য—নির্মিত হয় কুওওতুল ইসলাম মসজিদ। এ মসজিদে এখন দর্শনীয় তার উন্নতদর্শন তোরণ (আর্চ) এবং স্তম্ভগুলি। ভারতীয় কারিগর তখনো জোড়ের পাথর (কী-স্টোন) তৈরী করে তার গায়ে চৌকো পাথর লাগিয়ে আর্চ বানাতে শেখে নি বলে[৮] আর্চের সঙ্গে জোড়া বাকি ইমারত ভেঙে পড়েছে ; কিন্তু রসের বিচারে এ আর্চটি এখনো অতুলনীয়। এর শান্ত গাম্ভীর্য, আপন কৌলীন্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত ঋজু অবস্থিতি নিতান্ত অরসিক জনেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। পরবর্তী যুগে বহু জায়গায় বিস্তর আর্চ নির্মিত হয়েছে, কিন্তু এর প্রসাদগুণ এখনো অতুলনীয়।

এবং এর গায়ে যে হিন্দু কারুকার্য তার সুনিপুণ দক্ষতা, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ

---

৮ ইঞ্জিনিয়ারিঙ স্থাপত্যের অংশ বটে কিন্তু বিশুদ্ধ স্থাপত্য-বস্তু আস্বাদনের সময় তার স্থান অতি নীচে। আর্চ, ডোম বানাতে 'কী-স্টোন' ইত্যাদি ইঞ্জিনিয়রী ব্যাপার পাঠক চেম্বার অভিধান দেখেই বুঝে নিতে পারবেন। এসব স্থাপত্যের পশ্চাতে কী অদ্ভুত ইঞ্জিনিয়ারিঙ স্কিল আছে তার আলোচনা আমি আদপেই করি নি। যেমন, কুতুবের আসল কেরামতি যে এত অল্প গোড়া (বেস্) নিয়ে এত উঁচু মিনার অন্য কোথাও হয় নি। অদ্ভুত ভারসাম্যই (ব্যালান্স্) তার কারণ। এ যেন বাজিকর হাতের আঙুলের ডগায় বিশগজী বাঁশ খাড়া করে রেখেছে। ইঞ্জিনিয়ারী হিসেবে কণামাত্র ভুল থাকলে কুতুব হুড়মুড়িয়ে পড়ে যেত।

www.BanglaBook.org

এবং মন্দাক্রান্তা গতিচ্ছন্দ দেখে যেন শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। যেন অজন্তা ইলোরার চিত্রকর শিলাকর দুজনে মিলে প্রাণের আনন্দে এর প্রতিটি রেখা প্রতিটি বক্র প্রতিটি চক্র এঁকে চলেছে। এদের নিশ্চয়ই বলা হয়েছিল যে মুসলমান স্থাপত্যে পশুপক্ষী আঁকা বারণ। সেইটে মেনে নিয়ে কী আশ্চর্য নৈপুণ্যে 'শেষনাগ' মতিফকে এরা সাপ না বানিয়েও সাপ এঁকেছে সেটা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় কলার সঙ্গে এরা কুরানের হরফও খোদাই করেছে সমান দক্ষতা নিয়ে। উভয়ের সংমিশ্রণ অপূর্ব, রস-সৃষ্টি অসামান্য।

কুওওতুল ইসলাম মসজিদের থামগুলো হিন্দু বৌদ্ধ ও জৈন মন্দির থেকে নেওয়া। এদের গায়ে দর্শক বিস্তর পশুপক্ষী, বুদ্ধ এবং তাঁর শিষ্য এবং অন্যান্য দেব-দেবীর নানা মূর্তি দেখতে পাবেন। মসজিদ গড়ার সময় এগুলোর গায়ে পলস্তরা লাগিয়ে মূর্তিগুলি ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। পলস্তরা খসে যাওয়াতে এখন আবার দেখা যাচ্ছে।

এভাবে প্রতিটি ইমারত নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তা হলে দশ-ভলুমি কেতাব লিখতে হয়—এবং সেগুলো কেউ পড়বে না। আমার উদ্দেশ্য—বাকি ইমারতগুলো দর্শক যেন নিজে আরো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন।

যেমন, কুওওতুল ইসলামের গম্বুজ রসের ক্ষেত্রে নগণ্য—তার পরের ইমারত ইলতুৎমিশের সমাধিতে সেটা ভেঙে পড়ে গিয়েছে—খিলজী যুগে সেটা সুন্দর হতে আরম্ভ করেছে, তুগলুক যুগে গম্বুজ রীতিমত রসসৃষ্টি করে ফেলেছে, সৈয়দ-লোদী যুগে সে পৃথিবীর আর দশটা গম্বুজের সঙ্গে পাল্লা দিতে আরম্ভ করেছে, হুমায়ুনের গম্বুজকে তো কেউ কেউ তাজের চেয়েও ভালো বলেছেন, আর তাজের তন্বঙ্গ গম্বুজ, শুনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ। দেখলে পরে তার ক্ষীণ কটিকে নাকি জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে।

কিংবা আর্চের উত্থান-পতন দেখুন। কিংবা দেখুন ছত্রির আবির্ভাব ক্রমবিকাশ। হুমায়ুনের কবর ও তাজের ছাতের উপরকার ছত্রির মতো ছত্রি পৃথিবীর আর কোথাও পাবেন না। স্থাপত্যে ছত্রির ব্যবহার মুসলমানেরা এদেশে এসে শিখল। তাই এদেশের স্থাপত্যের স্কাই-লাইন ইরান তুরানের স্থাপত্যকে এ-বাবদে অনায়াসে হার মানায়।

কিংবা দেখুন, ভিতরকার কারুকার্য, যার পরিসমাপ্তি তাজের 'মর্মরস্বপ্নে'।

দাস-যুগের শেষের দিকে মুসলিম জিওমেট্রিক ডিজাইনের বাড়াবাড়ি হয়েছিল, খিলজি-যুগে আবার ভারসাম্য ফিরে পেল।

তুগলুক যুগে পাবেন দার্ঢ্য—শক্তিশালী স্থাপত্যের পরিপূর্ণতা। অলঙ্কার এখানে বাহুল্যরূপে বর্জিত। দেয়াল ঢালু—যেন পিরামিডের ঢঙে ট্যারচা করে একে আরও মজবুত করার চেষ্টা হয়েছে, গম্বুজও শক্তির পরিচায়ক। লাল পাথর কালো শেলট (তখনো কালো মার্বেল এ-দেশে আসেনি) এবং মর্মরের ধবল এই তিন রঙের খেলা নিয়েই স্থপতি এখানে অলঙ্কারহীন দৃঢ়তার একঘেয়েমি ভেঙেছেন। গিয়াসউদ্দীন তুগলুকের কবর এরই প্রকৃষ্টতম

www.BanglaBook.org

উদাহরণ।

সৈয়দ-লোদী বংশদ্বয়ের অর্থ ও প্রতিপত্তি দুই-ই ছিল সামান্য। তাই এঁদের কলা-প্রচেষ্টা ছোট ইমারতের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। ওদিকে ইরান-তুরানের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল বলে সেদিক থেকে নব নব অনুপ্রেরণাও আসছিল না। ফলে তাদের স্থাপত্যে হিন্দু প্রাধান্য বেশী এবং ছোট ইমারতের অলঙ্কারের প্রয়োজন বড় ইমারতের চেয়ে বেশী। কম্পজিশনেও এই প্রথম হিন্দু প্রভাব স্পষ্ট হয়ে এল। বস্তুত এই আটকোণওলা ইমারত এবং আট দিকের ঘেরা বারান্দা বৌদ্ধস্তূপ এবং তার প্রদক্ষিণচক্রের কথাই মনে করিয়ে দেয়। হিন্দুরা স্তম্ভ-নির্মাণে চিরকালই দক্ষ, ছত্রিও তাদেরই সৃষ্টি। হিন্দু ছজ্জা (ড্রিপস্টোন—এগিয়ে আসা কার্নিসের মত) ছাতের বৃষ্টি ছড়িয়ে দেবার জন্য এদেশে প্রয়োজন—ইরানে দরকার নেই বললেও চলে—সে-সব এসে এখানে ইমারতের সৌন্দর্য বাড়িয়েছে। তুগলুক প্রভাব এখানে অতি সামান্য—কেবলমাত্র ট্যারচা স্তম্ভে কিছুটা পাওয়া যায়। সৈয়দ-লোদী স্থাপত্য দেখে মানুষ হতবাক হয় না সত্য, কিন্তু এর এমন একটা কমপেক্টনেস্ বা ঠাস-বুনুনি আছে যা অন্য স্থাপত্যে বিরল। অল্প দিয়ে রসসৃষ্টিতে সৈয়দ-লোদী প্রথম না হলেও প্রধানদের একজন।

মোগল-যুগ আরম্ভ হল হুমায়ুনের কবর দিয়ে। সেখানে ইরান-তুরানের প্রাধান্য। কিন্তু ছবি এবং পদ্মফুলের ডিজাইন এখানে প্রচুর এবং কারুকার্যেও হিন্দু প্রাধান্য বেশী। সিক্রিতে ইরানী ভাব এত কমে গিয়েছে যে, কোনো কোনো ইমারতে কার প্রাধান্য বেশী কিছুতেই স্থির করা যায় না। সেকেন্দ্রার গম্বুজ শেষ করার পূর্বেই আকবর ইহলোক ত্যাগ করেন—তাই বলা শক্ত সম্পূর্ণ সমাধি মনে রসের কোন্ ভাবের উদয় করে দিত। দিওয়ান-ই-খাস্ ও আম্ যে অলঙ্কারের চূড়ান্তে পৌঁছে গিয়েছে সে সত্য তো পৃথিবীর সবাই স্বীকার করে নিয়েছে। এতদিন বলা হত, পাঠান স্থাপত্যে স্থপতি ও স্বর্ণকার একজোটে কাজ করেছেন। দিওয়ান-ই-খাস্ ও আম্ দেখে লোকে বলল, এইবার এসে জহুরীও যোগ দিয়েছেন।

মোগল-কলা এত বিচিত্র ও ভিন্নমুখী যে, তাকে গুটিকয়েক সূত্রে ফেলা প্রায় অসম্ভব। তবে স্থাপত্যের বিকাশ দেখতে হলে সব চেয়ে উত্তম পন্থা হুমায়ুনের কবর ও তাজ দুটি মিলিয়ে দেখা। দুটোর গম্বুজ মিলিয়ে দেখুন, ছত্রিগুলো কার ভালো (এখানে বলা উচিত হুমায়ুনের ছত্রিগুলো নীল ছিল ; এখন উঠে গিয়ে কালো হয়ে গিয়েছে—তাই আগে ছিল গম্বুজ মর্মরের সাদা, পুরো ইমারত লাল পাথরের আর ছত্রিগুলোর গম্বুজ নীল ; তাজে তিনই মার্বেলের); হুমায়ুনের ভিত্তিতে এক সার আর্চ (তার ভিতর দিয়ে নীচে যাওয়া যায়), তাজে তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে মাত্র ; গুলদস্তাজ (মিনারিকারও ছোট মিনারিকা যার শেষ হয় অর্ধস্ফুট পদ্মকোরকে) দুই ইমারতেই এক রকম ; নির্মাণকালে হুমায়ুনে ছিল লাল-সাদা-নীলের সামঞ্জস্য, তাজ শুভ্র-ধবল এবং সবচেয়ে বড় পার্থক্য—হুমায়ুনে মিনারিকা নেই, তাজের চার কোণে চারটি। আপনার কোন্‌টি ভালো লাগে? আর এই শৈলীর অধঃপতন দেখতে হলে দেখুন সফদরজঙ্গের কবর—ওয়েলিংডন অ্যারোড্রামের কাছে।

www.BanglaBook.org

স্পষ্ট দেখছি হুমায়ুনে দার্ঢ্য, তাজে মাধুর্য।

তার কারণ, অনেক ভেবে আমি মন স্থির করেছি, হুমায়ুনের সমাধি নির্মাণ করেছেন তাঁর বিধবা—স্বামীর জন্য। তাই তাতে পৌরুষ সমধিক। তাজ নির্মাণ করেছেন বিরহকাতর স্বামী—প্রিয়ার জন্য। তাই সেটিতে লালিত্য বেশী।

বেজো না চরণে চরণে

বিখ্যাত সাহিত্যিকদের কাছে নাকি নবীন সাহিত্যিকরা তাঁদের লেখা নিয়ে গিয়ে চাঁইদের সার্টিফিকেট চান। বেচারীদের বিশ্বাস, চাঁইরা উত্তম সার্টিফিকেট দিলে সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতি-প্রতিপত্তি পেয়ে যাবেন।

চাঁইদের কেউ-কেউ সার্টিফিকেট দেন, কেউ লেখককে অন্য চাঁইদের কাছে পাঠিয়ে দেন, কেউ বা অসুখের ভান করে দেখাই করেন না। এ বাবদে পূজনীয় রাজশেখরবাবু রাজকীয় পন্থাটি বের করে আরামসে দিন কাটাচ্ছেন। তিনি সবাইকে অকাতরে সার্টিফিকেট দেন—এমন কি মাঝে-মধ্যে না চাইলেও দেন। তাঁর বয়স হয়েছে। শেষের কটি দিন শান্তিতে কাটাতে চান। সোজাসুজি 'দেব না' বললে তাঁকে আর বাঁচতে হবে না, এবং 'দেব-দিচ্ছি' 'দেব-দিচ্ছি' করে টাল-বাহানা দেবার মতো শক্তিও তাঁর নেই। রবীন্দ্রনাথ অমিতবীর্য পুরুষসিংহবৎ ছিলেন, উমেদওয়ারদের ঠেকাবার মতো তাঁর সেক্রেটারিও ছিলেন —তবু তিনিও অকাতরে সার্টিফিকেট দিতেন। প্রাণের প্রতি তাঁর অহেতুক কোনো মায়াও ছিল না—'মরণ রে তুহুঁ মম শ্যাম সমান' এ গান তিনি রচেছেন অল্প বয়সেই—তবু তিনি 'না-চাইতে যারে দেওয়া যায়' ভাবখানা মুখে মেখে পিলপিল করে সার্টিফিকেট বিলোতেন। আমাকে পর্যন্ত তিনি একখানা দিয়েছিলেন—অবশ্য সাহিত্যের জন্য নয়, চাকরির জন্য। আমি তাঁর 'কৃতী ছাত্র' এ ধরনের বহুবিধ আগড়ম-বাগড়ম লিখে তিনি আমাকে শ্যামাপ্রসাদবাবুর কাছে পাঠিয়েছিলেন। শ্যামাপ্রসাদবাবু বিচক্ষণ লোক ; তিনি আমাকে চাকরি দেন নি। অন্যত্র চেষ্টা করার জন্য সার্টিফিকেটখানা ফেরত পেলুম না—কারণ চিঠিখানা ছিল নিতান্ত প্রাইভেট এবং পার্সনাল। শ্যামাপ্রসাদবাবু সার্টিফিকেটের মূল্য না দিলেও রবিবাবুর হাতের লেখা চিঠির মূল্য জানতেন। চিঠিখানা সযত্নে শিকের হাঁড়িতে তুলে রেখে দিয়েছিলেন।

এবং যাঁরা কিছুতেই সার্টিফিকেট দিতে রাজী হন না, তাঁদের দু-একজনকে আমি চিনি। এবং এ কথাও বিলক্ষণ জানি, তাঁরা যে-সব বইয়ের সার্টিফিকেট দেওয়া দূরে থাক, গালি-গালাজ পর্যন্ত করেছেন তারই অনেকগুলো বাজারে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছে। রাজশেখরবাবুর 'দুই সিংহ' গল্পে আছে কোনো লেখক তাঁর বই কিছুতেই বিক্রি হচ্ছে না দেখে কোনো এক বাঘা সাহিত্যিককে ঘুষ দিয়ে লিখিয়ে নেয়, বইখানা অতিশয় অশ্লীল এবং কদর্য। ফলে নাকি সে বইয়ের প্রচুর কাটতি হয়েছিল।

কিন্তু এ-সব শোনা কথা, কিংবা কাল্পনিক। রবিবাবু টাকের ওষুধের প্রশংসা করাতে ওষুধের বিক্রি বেড়েছিল কি না তার সঠিক স্টাটিস্‌টিক্‌স্

www.BanglaBook.org

এখনো দেখি নি। উল্টোটাও সঠিক জানবার উপায় নেই। এ যেন আব-হাওয়ার পূর্বাভাসের মতো। বেতারে আলিপুর বললে, 'সন্ধ্যায় বৃষ্টি হবে'। আপনি অবিশ্বাস করে ছাতা না নিয়ে বেরুলেন। ফিরলেন ভিজে ঢোল হয়ে। তবেই দেখুন, এমনি লক্ষ্মীছাড়া দফ্‌তর যে, অবিশ্বাস করেও নিষ্কৃতি নেই, বিশ্বাস তো করা যায়ই না।

* * *

কিন্তু একখানা বই পড়ে আমি এ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ হদিস পেয়েছি।

বইখানার নাম 'লিমিট অব্ আর্ট'। চল্লিশ টাকা দাম। ঢাউস মাল। কপিকল দিয়ে শেলফ্ থেকে ওঠাতে নাবাতে হয়।

কবিতার চয়নিকা। গ্রীক-লাতিন থেকে আরম্ভ করে, ফরাসী-জর্মন-ইংরিজী-স্প্যানিশ-রুশ তাবৎ ইয়োরোপীয় ভাষা থেকে কবিতা সঞ্চয় করে এ-চয়নিকাটি নির্মাণ করা হয়েছে।

গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক সবিনয় নিবেদন করেছেন, তিনি এ-চয়নিকার মাধুকরী করার সময় নিজের ব্যক্তিগত রুচির উপর নির্ভর করেন নি। তবে কি তিনি বন্ধুবান্ধবদের রুচির উপর নির্ভর করেছেন? তাও নয়। তিনি লিখেছেন বিখ্যাত প্রখ্যাত কবিরা যে-সব অন্যান্য কবির কবিতার প্রশংসা করেছেন তাই দিয়ে তিনি এ-'সঞ্চয়িতা' নির্মাণ করেছেন। যেমন মনে করুন, বায়রন বলেছেন, 'পেত্রার্কের এ ছত্র কটি কী চমৎকার, কী অনির্বচনীয়!' চয়নিকাকার সেই কবিতাটি তুলে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার বায়রনের প্রশস্তিটিও তুলে দিয়েছেন। ঠিক এইভাবেই, শেকস্‌পীয়র আছেন গ্যোটের প্রশংসা-সহ, কীট্‌স আছেন শেলির তারিফযুক্ত, এবং আরো বিস্তর চেনা-অচেনা কবি।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, এর চেয়ে আর উত্তম ব্যবস্থা কি হতে পারে?

কিন্তু বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, এ-রকম রদ্দি, ওঁচা কবিতার সঙ্কলন আমি জীবনে কোনো ভাষাতে কখনো দেখি নি।

এবং শুধু তাই নয়, পৃথিবীর সর্বোত্তম বেশ কয়েকটি কবিতা তাতে বাদ পড়েছে। তুলনা দিয়ে বলতে পারি, একবার এই বঙ্গভূমিতেই এ-ঘটনা ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথের কোন্ কোন্ কবিতা বাঙালী পাঠকের ভালো লাগে তারই ভোট নিয়ে একখানি 'চয়নিকা' রচিত হয়েছিল। তাতে এত বেশী ভালো কবিতা বাদ পড়ে গিয়েছিল, এবং অপেক্ষাকৃত কাঁচা লেখা ঢুকে গিয়েছিল যে এর পর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যে চয়ন করেন সেটিই 'সঞ্চয়িতা' এবং বাজারে সেইটেই চালু। এ স্থলে পাঠক অবশ্য বলবেন, 'রাস্তার লোকের ভোট নিয়ে কি আর উত্তম কবিতা-সঞ্চয়ন হয়? ওদের কীই বা বুদ্ধি, কীই বা রুচি।' অতএব যে বিদেশী চয়নিকা দিয়ে আরম্ভ করেছিলুম সেইটেতেই ফিরে যাই।

অর্থাৎ ভালো ভালো কবি কর্তৃক নির্মিত সঞ্চয়নও উত্তম হল না কেন?

তার প্রধান কারণ, সাধারণ এবং সুরুচিসম্পন্ন পাঠক কবিতা পড়ে কিংবা গান শুনে যদি আনন্দ পায় তবেই সে বলে, কবিতা কিংবা গানটি ভালো। অর্থাৎ তার কাছে যে-কোনো বস্তু রসোত্তীর্ণ হলেই হল। কিন্তু কবি যখন অন্য কবির কবিতা পাঠ করেন তখন তাঁর নজর যায় কবিতার গঠন, ভাষা, ছন্দ,

www.BanglaBook.org

মিল—এক কথায় আঙ্গিকের দিকে। কবিতাটি রচনা করতে গিয়ে কবিতাকার কি কি মালমশলা নিয়ে আরম্ভ করেছেন, তাঁকে কোন্ কোন্ বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে সেগুলো তিনি কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন কি না পাঠক-কবির দৃষ্টি থাকে প্রধানতঃ সেই দিকে। কিংবা মনে করুন, আপনি আমি যখন গান শুনি তখন গানটি মিষ্ট এবং মর্মস্পর্শী হলেই হল। পক্ষান্তরে আকছারই দেখবেন, বদখদ গলা নিয়ে, বিদকুটে মান্ধাতার আমলের একটা সম্পূর্ণ অজানা রাগ ধরলে এক হাড়-চিমসে গাওয়াইয়া। তবলচীও বাজাতে লাগলো এমন এক তাল যে তার কোথায় সম, কোথায় ফাঁক কিছুই মালুম হচ্ছে না। আপনি বিরক্তিতে উঠি-উঠি করছিলেন, এমন সময় দেখেন হঠাৎ মহ্ফিলের অন্য গাওয়াইয়া শ্রোতারা 'আহা, আহা, ক্যাবাৎ ক্যাবাৎ' বলে অচৈতন্যি প্রায়! কি হল? ব্যাপারটা কি? না এই ওস্তাদস্য ওস্তাদ এক অ্যাসন অতি-অতি কোমল এমন এক কঠিনস্য কঠিন জায়গায় লাগিয়ে দিয়ে অ্যাসা এক পানিপথ নাকি জয় করেছেন যা পূর্বে নাকি কেউ কখনো করতে পারে নি—না, তানসেন নাকি মাত্র দু'বার পেরেছিলেন, ওস্তাদ আব্দুল করীম কুল্লে একবার! ব্যস, হয়ে গেল।

অবশ্য সব পাঠক-কবি কিংবা শ্রোতা-গাওয়াইয়াই যে শুদ্ধমাত্র আঙ্গিক এবং টেক্নিকল স্কিলের দিকে এক-চোখা দৈত্যের মতো তাকিয়ে থাকেন সে কথা বলছি না—তবে ঐ হল গিয়ে নিয়ম, এবং পূর্বোল্লিখিত 'লিমিট্ অব্ আর্ট' ঐ পর্যায়ের বই।

সমসাময়িক লেখক যখন অন্য লেখকের লেখা পড়েন তখন আরেক মুশকিল। দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটা খোলসা করি।

এই মনে করুন, গৌরকিশোর ঘোষ রম্য-রচনা লিখে দেশে নাম করে ফেলেছেন। আমারও বাসনা গেল, ঐ লাইনে যখন খ্যাতি আছে, পয়সাও থাকতে পারে, তখন আমিই বা বাদ যাই কেন? গৌরকিশোরের লেখার অনুকরণে আমিও কয়েকটি রম্য-রচনা লিখে নিয়ে গেলুম তাঁর কাছে। তিনি দেখলেন, তাঁর এক নবীন শাকরেদ্ জুটলো, তাঁর অনুকরণ এবার একটা 'স্কুল' 'ঘরানা' গড়ে উঠতে চললো। আমার রচনা যে আদপেই 'রম্য' হয় নি, এমন কি এরে 'রচনা'ও কওয়া যায় না সেদিকে তাঁর নজরই গেল না। তিনি সার্টিফিকেট দিলেন, 'তোফা লেখা, খাসা লেখা, বেড়ে লেখা!' আমিও খুশী। অবশ্য এ-সার্টিফিকেট আমি এখনো কাজে লাগাই নি। সাহিত্যিকের সার্টিফিকেট হাল-পাঠকের পানি পাবে কি না সে বাবদে আমার মনে এখনো খোঁকা রয়ে গেছে।

পক্ষান্তরে ফরাসী কবি-সম্রাট মলিয়ের নাকি তাঁর তাবৎ কৌতুকনাট্য পড়ে শোনাতেন তাঁর নিরক্ষরা বাড়িউলীকে। বাড়িউলী সে-সব রসিকতা শুনে হাসতো, তিনি সে-সব রসিকতার মাত্রা বাড়িয়ে দিতেন, যেগুলো শুনে গম্ভীর মূর্তি ধারণ করতো সেগুলো তিনি নির্মমভাবে কেটে দিতেন। অথচ আজ তো গুণীমূর্খ সবাই তাঁর নাট্য দেখে আনন্দ লাভ করে। এই কয়েকদিন মাত্র হল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কৃত তাঁর বাঙলা অনুবাদ কলকাতার রসিক সমাজকে যা হাসালো তা দেখলে স্বয়ং মলিয়েরই অবাক হতেন।

তবে কি ঐ বাড়িউলী অতিশয় সুরসিকা ছিলেন? এ-পর্যন্ত কেউ

www.BanglaBook.org

তো তা বলেন নি। তবে কি ওঁকে না শুনিয়ে সে-যুগের নামকরা সমঝদারকে শোনালে মলিয়েরের কাব্য আরো রসোত্তীর্ণ হত? বলা অসম্ভব।

* * *

যে নল চালিয়েছিলুম, সে তবে এখন এসে খাড়া হল কোথায়, পাকড়ালো কাকে? অর্থাৎ হরে-দরে দাঁড়ালো কি?

আমার বিশ্বাস এ-নল কোথাও দাঁড়াবে না। এ-আলোচনায় কস্মিন-কালেও কোনো হদিস পাওয়া যাবে না।

তবে যদি শোধান, আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস কি, তবে আমি নবীন লেখককে অকুণ্ঠ ভাষায় বলবো, সার্টিফিকেট কুড়োতে যেয়ো না। ওতে কানাকড়ির লাভ নেই। ঐ যে পাঠক-সম্প্রদায় নামক কিম্ ভূত কিম্ আকার জীব আছে সে যে কখন কার প্রতি সদয়, কার প্রতি নির্দয়, কখন কাকে আশা-গাছের শাখায় চড়ায়, আর কখন কাকে নির্মমভাবে জিল্‌ট্ করে তার হদিস কেউ কখনো পায় নি।

অবশ্য আপনি যদি ভবিষ্যৎ যুগের পাঠকের জন্য লেখেন তবে আপনার কোনো ভাবনা নেই। তবে সে-কথাটা পুস্তকের অবতরণিকায় বলে দিলেই সাধু আচরণ হয়। এ বছরের তাজা মাছকে আসছে বছরের শুঁটকি বলে চালানোটা জোচ্চুরির শামিল। পঞ্চাশ বছর পরে যে র মাল মেচ্যোর লিক্যোর হবে সেটা আজ বাজারে ছাড়া ধাপ্পা। তার জন্য আজ যে-লোক সার্টিফিকেট দেয় সেও ধাপ্পাবাজ।

* * *

হালে আকাশে এক নয়া চিড়িয়ার উদয় হয়েছে।

নিজের সার্টিফিকেট নিজে লিখে, কিংবা/এবং চেলা-চামুণ্ডাদের সামনে নিজের লেখার গুণকীর্তন করতে গিয়ে পয়েণ্ট বাংলে বিজ্ঞাপন লিখিয়ে নিয়ে কিংবা/এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের অন্যান্য লেখাতে সে লেখা সম্বন্ধে দারুণ-দারুণ রেফরেন্‌স্ ঝেড়ে সব-কিছু প্রকাশককে দিয়ে বিজ্ঞাপনরূপে ছাপিয়ে দেওয়া।

এ সিস্টেমের সঙ্গে 'আধুনিক বাঙলা কবিতা'র বেশ মিল আছে। বাঙলা ভাষায় লেখা দেখে পড়তে গিয়ে মালুম হল যে কিছুই মালুম হচ্ছে না—এ ভাষায় শব্দরূপ, ধাতুরূপ কৃৎ তদ্ধিত আপনি কিছুই জানেন না। অর্থাৎ বন্ধু বাঙলা ভাষার মুখোশ পরে অজানাজন এসে মেরেছে চাক্কু।

প্রকাশকের মুখোশ পরে এখানে আসে লেখক—হাতে চাক্কু! পাঠক, সাবধান!!

রবীন্দ্রনাথ কি যেন গেয়েছেন, দুখের বেশে এসেছ বলে তোমাকে ডরাবো না? এ তার উল্টো পিঠ: মিত্রের বেশে এসেছ বলে তোমারেই যত ভয়।

এ সিস্‌টেম পাঠক-ব্যাঙ্কারের চালানো জুয়ো-ভূমি মণ্টে কার্লোর ব্যাঙ্ক ভাঙতে পারবে কি না, সেই খবরের প্রত্যাশায় আছি। এযাবৎ তো কোনো সিস্টেম পারে নি।

আর যা করুন, করুন, কিন্তু পাঠকসাধারণকে আহাম্মুখ ঠাউরে আপন আহাম্মুখির পচা ডিম হাটের মধ্যিখানে ফাটাবেন না!!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইভান সের্গেভিচ তুর্গেনেফ

গত ৩রা সেপ্টেম্বর ইভান তুর্গেনেফের ৭৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ-উপলক্ষে বহু দেশ তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে আপন আপন সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়েছেন। কলকাতা বেতার কেন্দ্র পর্যন্ত সেদিন তাঁকে স্মরণ করেছেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, আজ এঁর, কাল ওঁর কত লোকের মৃত্যুবার্ষিকী, জন্ম-বার্ষিকী নিত্য নিত্য হয়ে যাচ্ছে, সেগুলোর হিসেব রাখতে যাবে কে?

যার যে রকম খুশী, এর বেশী কিছু বলা যায় না।

তাই জানি, আমরা যখন গোরস্তানে যাই, তখন খুঁজি আপন প্রিয় ও পরিচিতজনের কবর। যখন কোনোও নূতন লাইব্রেরিতে ঢুকি তখন খুঁজি আপন প্রিয় লেখকের বই। তাই তুর্গেনেফের শতবার্ষিকী না হয়ে ৭৫তম মৃত্যুদিনও আমার ও আমার মতো বয়স্কদের মনে দোলা লাগিয়েছে। তরুণরা লাইব্রেরীতে যে-রকম নূতন বইয়ের সন্ধান নেয়, ক্ল্যাসিক্‌স্ পড়ে না, ঠিক তেমনি তারা তুর্গেনেফ কিংবা হাইনের শতাব্দীপ্রয়াণও স্মরণ করে না ; তারা স্মরণ করে র‍্যাঁবো কবে হেঁচেছিলেন, ভেরেন কবে কেশেছিলেন।

তা তারা করুক। কিন্তু যখন দেখি অপেক্ষাকৃত বয়স্ক এবং তথাকথিত শিক্ষিত লোকও সদম্ভে বলে বেড়াচ্ছেন র‍্যাঁবোর কাছে রবি ঠাকুর শিশু, মাইকেলের অমিত্রাক্ষর উডেন্ (কাষ্ঠরস) এবং সম্পাদক-মণ্ডলীও সেগুলো পরম শ্রদ্ধাভরে ছাপাচ্ছেন তখন এঁরা যে তুর্গেনেফকে স্মরণ করবেন না সে তো জানা কথা। শুধু তাই নয়, এখন আপনার আমার পক্ষে তুর্গেনেফ কিংবা সত্যেন দত্তকে স্মরণ করতে হলে লণ্ডনে রঙিন হওয়ার মতো রীতিমতো সঙ্কট-সঙ্কুল—রাষ্ট্রভাষায় যাকে বলে খতরনাক্—স্কন্ধোপরি যুগ্ম-শিরের প্রয়োজন!

আমি মুসলমান। আমার শাস্ত্রে আছে বিধর্মীর ভয়ে আল্লা রসুলকে বর্জন করা মহাপাপ। আমার সাহিত্যধর্মে গুরু-মুর্শীদ হয়ে আছেন রবি ঠাকুর, হাইনে, তুর্গেনেফ, মাইকেল। আজ এঁদের অস্বীকার করতে পারব না—র‍্যাঁবো-এলিয়ট সম্প্রদায় যতই শক্তিশালী হন না কেন।

এবং আমার মনের গোপন কোণে একটা অহেতুক ক্ষীণ আশা আছে যে তুর্গেনেফ-প্রীতিতে আমি একেবারে একা নই। 'বুড়ো রাজা প্রতাপ রায়ে'র মতো 'বরজলালে'র হাত ধরে আমাকে একাকী সভাস্থল ত্যাগ করতে হবে না। প্রতাপ রায়ের সমকালীন শ্রোতা সে-সভাতে আর কেউ ছিল না। আমার কিন্তু এখনও অনেক মুরুব্বী আছেন। তাঁরা তুর্গেনেফ সম্বন্ধে আমার চেয়ে ঢের ভালো লিখতে পারেন, কিন্তু লেখেন না, কারণ তাঁরা জানেন, পাগলাগারদে সুস্থ লোকের লক্ষণ দেখানো পাগলামি, ভেক যেখানে রব ছেড়েছে সেখানে কোকিলের পক্ষে মৌনতাই শ্রেয়—'ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিল জলদাগমে।

তুর্গেনেফের মন্দ ভাগ্য সম্বন্ধে তিনি নিজেই সচেতন ছিলেন। তিনি থাকতেন বিদেশে—জার্মানী এবং ফ্রান্সে—এবং সেখানে বসে বসেই তিনি জানতে পেতেন কী ভাবে ক্রমে ক্রমে তিনি দস্তেফ্‌স্কি, তলস্তয় এমন কি কবি

www.BanglaBook.org

নেক্রাসফেরও বিরাগভাজন হয়েছেন। 'বিরাগভাজন' বললে বোধ করি কমই বলা হল। তুর্গেনেফ শেষের দিকে রীতিমতো এঁদের বিদ্বেষভাজন হয়েছিলেন।

বিদ্বেষ আসে হিংসা থেকে। এঁদের সবাই বড় লেখক। জীবিতাবস্থায়ই এঁরা দেশে প্রচুরতম সম্মান পেয়েছিলেন। তবে দূর-দেশবাসী প্রবাসী নিরীহ ('নিরীহ' কেন সে কথা পরে হবে) তুর্গেনেফ তাঁদের ক্রোধের কারণ হয়েছিলেন কেন?

এ-তত্ত্বটি বুঝতে পারলেই জানা যাবে লেখক হিসাবে তুর্গেনেফের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মাহাত্ম্য কোন্‌খানে?

দস্‌তেফ্‌স্কি ও তলস্তয় জানতেন সৃষ্টির ক্ষেত্রে এঁদের আপন মাহাত্ম্য কোন্‌খানে। দস্‌তেফ্‌স্কি তাঁর প্রতি চরিত্রের গভীরতম অন্তস্তলে পৌঁছে গিয়ে তার সুখদুঃখ, তার দুর্বলতা মহত্ত্ব, তার প্রচেষ্টা এবং ভাগ্যে দ্বন্দ্ব, সমাজপ্রবাহের খরস্রোতের বিরুদ্ধে তার উজান চলার আপ্রাণপ্রয়াস, কিংবা সে-স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে ভেসে যেতে যেতে তাকে প্রাণভরে অভিসম্পাত—এ সব-কিছু লোহার কলম দিয়ে পাথরের উপর খোদাই করতে পারেন, ভাস্করের মতো দৃঢ়পেশী সবল হস্তে। প্রত্যেকটি চরিত্র তাঁর হাতে যেন দৈত্যের হাতে প্রজাপতি। চোখে এক্‌স্‌রে, বুকে অসীম করুণা। তাঁর লেখা পড়ে মনে হয়, একটা বিরাট এঞ্জিন আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। খেলার এঞ্জিন যত তেজেই এগিয়ে আসুক না কেন, জানি, ভালো করেই জানি, সামান্য কড়ে আঙুলটি তার সামনে ধরলেই সে থেমে যাবে, কিন্তু দস্‌তেফ্‌স্কির এঞ্জিন পিঁপড়ের গতিতে এলেও তার সামনে যা পড়বে তার আর উদ্ধার নেই। অরসিকতম পাঠকেরও সাধ্য নেই, তাঁর বর্ণনা পড়ে তিনি যা বলতে চেয়েছেন, তা না শুনে বা বুঝে থাকতে পারে! কিংবা বলব, কুমির যে-রকম ছাগলের বাচ্চার ঠ্যাং কামড়ে ধরে ডুব দেয় নদীতে, দস্‌তেফ্‌স্কি সে-রকম পাঠককে নিয়ে ডুব দেন মানব-চরিত্রের অতল সায়রে। এবং আশ্চর্য, সেখানে মণি-মুক্তার সঙ্গে সঙ্গে যে ক্লেদ-পঙ্ক দেখি তার প্রতিও তো ঘৃণা হয় না। মাতাল বাপের উচ্ছৃঙ্খলতায় সরলা কমারী রাস্তার বেশ্যা হয়ে বাপকে মাতলামোর পয়সা যোগাচ্ছে—কই, লোকটাকে তো খুন করতে ইচ্ছে করে না। তার অসহায় অবস্থা দেখে শুধু ভগবানকে শোধাতে ইচ্ছে করে, 'একে বিবেকহীন পাষণ্ডরূপে জন্ম দিলে না কেন? এরও তা হলে কোনো দুঃখ থাকত না, আমরাও অকরুণ হৃদয়ে তাকে খুন করতে পারতুম। কিন্তু এ সব বোঝে, এ তো সব-কিছু জানে। তবে এই ঝঞ্ঝা-ঝড়ের ঘূর্ণিবায়ুর মাঝখানে মানুষকে তুমি প্রজাপতির মত সৃষ্টি করলে কেন?' কিংবা হয়ত অতখানি চিন্তা করার শক্তিই পাঠকের থাকে না। মোহ্যমান হয়ে যায় পাঠক সেই বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতার সামনে—সমস্ত জীবন বয়ে বেড়ায় তার অনপসরণীয় স্মৃতি।

তলস্তয়ের রঙ্গমঞ্চ ভুবন-জোড়া বিরাট। তার পাত্রপাত্রীদের নাম ভুলে যাই, কিন্তু চেহারা ভুলি নে। তারা রঙ্গমঞ্চে নাচছে যে যার আপন কোণে আপন আপন মণ্ডলী বানিয়ে। প্রত্যেকের আপন নৃত্য সামঞ্জস্য রেখেছে তার মণ্ডলীর সঙ্গে, মণ্ডলী সামঞ্জস্য রেখেছে আর আর মণ্ডলীর সঙ্গে—কখনও বা দুই কিংবা তিনটি মণ্ডলী একে অন্যকে ভেদ করে মিশে এক হয়ে গিয়ে

www.BanglaBook.org

আবার আলাদা হয়ে যাচ্ছে—আর সব কটি মণ্ডলীর এ-কোণে ও-কোণে যে-কটি ছন্নছাড়া আপন মনে নাচছে তাদেরও সঙ্গে নিয়ে গড়ে তুলেছে সেই বিরাট ভুবন। বাস্তব জীবনেও আমরা এ-রকম ভুবনের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাই নে। তলস্তয় কতখানি পেয়েছিলেন কে জানে কিন্তু তাতে কীই বা যায় আসে। তাঁর কল্পনার ভুবন আমাদের বাস্তব ভুবনের চেয়ে ঢের বেশী প্রত্যক্ষ, অঙ্গে অঙ্গে প্রাণবন্ত।

তলস্তয় কখনও কবিতা রচনা করেছিলেন কি না জানি না, কিন্তু তিনি কবি। তাঁর ভানুমতী দণ্ড দিয়ে তিনি যে-রকম আমাদের কল্পনার অতীত বস্তু সৃষ্টি করতে পারেন ঠিক তেমনি আমাদের নিত্যকার চেনা বস্তু—যে বস্তু বহুদর্শনের ফলে তার বৈশিষ্ট্য তার নবীনতা হারিয়ে ফেলেছে—তিনি সামনে তুলে ধরেন সেই চেনা রূপেই, অথচ মনে হয়, 'কী আশ্চর্য, একে এত দিন ধরে লক্ষ্য করি নি কেন?' এর সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও জেনে যাই যে, একে আর কখনও ভুলব না। তাই তাঁর পাত্রপাত্রী দেশে কালে সীমাবদ্ধ নয়। দস্তেফ্স্কির চাষা কভাস ভদ্কা না খেলেও সে রুশ চাষা; তলস্তয়ের চাষা অন্তহীন স্তেপের উপর দিয়ে ভেঙে চলেছে বরফের পাথর, সরাইয়ে ঢুকে সে তার চামড়ার ছেঁড়া ওভারকোট স্টোভের পাশে শুকোতে দেয়, আইকনের সামনে বিড় বিড় করে সে মন্ত্র পড়ে ডান হাতের তিন আঙুলে ডাইনে থেকে বাঁয়ে ক্রস্ করে, কিন্তু বার বার ভুলে যাই সে বাঙালী চাষা নয়। অবাক হয়ে ভাবি, বসিরুদ্দি, পাঁচু মোড়ল, নিজ্নি নভ্গরদের দিকে চলেছে কেন?

মহাভারতের পরেই ওয়ার অ্যাণ্ড পীস্!

তুর্গেনেফ দস্তেফ্স্কির মতো প্রত্যেক চরিত্রের গোপনতম অন্ধকারে বিদ্যুল্লেখা দিয়ে আলোকিত করতে চান না। তার কারণ বোধ হয় তুর্গেনেফ নখ্ শির, আপাদমস্তক ভদ্রলোক। কোনো ভদ্রলোক পরিচিত অপরিচিত কারও গোপন চিঠি পড়ে না—হাতে পড়লেও, কারও হাতে ধরা পড়ার ভয় না থাকলেও। ঠিক তেমনি তার চরিত্রের গোপন দুর্বলতা তার অজানাতে সে জানতে চায় না, প্রকাশ করতে তার মাথা কাটা যায়—সে তো দুশমনের কাজ, গোয়েন্দার ব্যবসা। ভদ্র তুর্গেনেফ তাঁর নায়ক-নায়িকার দিকে তাকাত শিশুর মতো সরল চোখে; তারা কথাবার্তায়, আচার-ব্যবহারে যতখানি আত্মবিকাশ করে তাতেই তিনি সন্তুষ্ট, তাঁর পক্ষে সেই যথেষ্ট। শার্লক হোমসের মতো আতশী কাঁচ দিয়ে তিনি তার জুতোর দাগ পরীক্ষা করেন না, পোয়ারোর মতো তাকে ক্রস-এগজামিনেশনের ঠেলায় কোণ-ঠাসা করে অট্টহাস্য করে ওঠেন না, 'ধরেছি, ধরেছি, তোর গোপন কথা কতক্ষণ লুকিয়ে রাখবি, বল্!'

অথচ শিশুর কাছে কেউ কোন জিনিস গোপন রাখে না। কবি মাত্রই শিশু। তার চোখে ছানি পড়ে নি। প্রতি মুহূর্তে সে এই প্রাচীন ভুবনকে দেখে নবীন রূপে।

রুশদেশে পুশ্কিনের পর যদি কোনো কবি জন্মে থাকেন, তবে তিনি তুর্গেনেফ। তলস্তয় কবি সৃষ্টিকর্তা হিসেবে, আবিষ্কর্তা রূপে, আর তুর্গেনেফ কবি অন্য অর্থে। পৃথিবীতে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু কুৎসিত, কিংবা যার দিকে কারও দৃষ্টি যায় না এ সব-কিছু তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর

www.BanglaBook.org

কবিত্ব দিয়ে। তিনি অন্য কবির মতো অবাস্তবকে বাস্তব করেন না, বাস্তবকে অবাস্তব করেন না। বাস্তব অবাস্তব দুই-ই তাঁর কবি-মনের স্পর্শ পেয়ে আপন আপন সীমা ছাড়িয়ে তৃতীয় সত্তায় পরিণত হয়। ঘৃত-প্রদীপ শুষ্ক কাষ্ঠ দুই-ই তাঁর কবিত্বশিখার পরশে আগুন হয়ে জ্বলে ওঠে। কিংবা বলব শীতের শিশির যেমন তার শুভ্র পেলব আস্তরণ দিয়ে মধুর করে দেয় সদ্য-ফোটা ফুলকে, শুকনো পাতার অঙ্গ থেকে ঘুচিয়ে দেয় তার সর্ব কর্কশতা। ওপারের ঝাউবন, এপারের কাশ ঘাস, সর্বোচ্চ শাল বকায়ন থেকে আরম্ভ করে রাস্তার পাশের নয়ানজুলি—সবাই যেন সূক্ষ্ম মসলিনের অঙ্গাভরণ পরে সৌন্দর্যের গণতন্ত্রে কৌলীন্য পেয়ে গিয়েছে।

এই কবিত্বপ্রতিভাকেই হিংসা করতেন দস্তয়েফ্‌স্কি, তলস্তয়, নেক্রাসফ ত্রিমূর্তি। নেক্রাসফ স্বয়ং কবি কিন্তু তিনি জানতেন যে-জিনিসের পরশ পেয়ে শুকনো গদ্য গান হয়ে নেচে ওঠে সেইটির পূর্ণ অধিকার আছে একমাত্র তুর্গেনেফের। আঙ্গিকের উপর এ-রকম অখণ্ড অধিকার ত্রিমূর্তির কারও ছিল না। তাঁদের কোনো বিশেষ রচনা হয়ত তুর্গেনেফের রচনা অপেক্ষা উচ্চাঙ্গের কিন্তু তুর্গেনেফ তাঁদের শ্রেষ্ঠতর রচনাকে তাঁর আঙ্গিকের স্পর্শ দিয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম রচনা করে দিতে পারতেন। দস্তয়েফ্‌স্কি তলস্তয় যেন লিখেছেন কবিতা। তুর্গেনেফ যে-কোনো মুহূর্তে তার যে-কোনো একটিকে সুর লাগিয়ে গানের রূপ দিয়ে দিতে পারতেন। আর তুর্গেনেফের প্রত্যেকটি রচনা যেন গান, তার গায়ে আর হাত দেবার উপায় নেই—তা সে গানের মূল্য কবিতার চেয়ে কম হক আর বেশীই হক।

সে-যুগে ভাষা, ছন্দের রাজা ছিলেন ফ্রান্সের ঔপন্যাসিক ফ্লবের। তাঁর শিষ্য এবং মানসপুত্র মপাসাঁ তখনও গুরুর মজলিসে আতরদান, গোলাপ পাশ এগিয়ে দেন। তুর্গেনেফ ফ্লবেরের বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ বন্ধু। ফ্লবেরকে চিঠি লেখার সময় মপাসাঁ লেখেন 'গুরুদেব', তুর্গেনেফকে লেখার সময় লেখেন 'গুরু এবং সখা'। ফ্লবেরের আকস্মিক মৃত্যুতে মপাসাঁ যখন শোকে অভিভূত হয়ে অন্ধের মতো এদিক ওদিক হাতড়াচ্ছেন তখন তুর্গেনেফ শেষবারের মতো দেশের কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়েছেন রুশে। মপাসাঁ তাঁকে চিঠি লিখে খুঁজেছেন সান্ত্বনা। লিখেছেন, 'জীবনের সব কটি আনন্দের দিনও তো আমার এই দুঃখের দিনটার ক্ষতিপূরণ করতে পারছে না।'

তার তিন বছর পর গত হলেন তুর্গেনেফ।

এবারেও হয়ত তিনি কোনো সাহিত্যিক বন্ধুকে চিঠি লিখে সান্ত্বনা খুঁজে-ছিলেন। তখনকার দিনের ফ্রান্সের সব বিখ্যাত সাহিত্যিকদের সঙ্গেই তুর্গেনেফ, ফ্লবের, মপাসাঁর বন্ধুত্ব ছিল। ভিক্তর হুগো, এদমোঁ দ গঁকুর, এমিল জোলা, আলফঁস দদে এঁদের কাউকে হয়ত তিনি লিখেছিলেন, কিন্তু আমার মনে হয়, ফ্লবের গত হলে শোক নিবেদন করা যায় তুর্গেনেফকে, কিন্তু তুর্গেনেফ গত হলে লেখা যায় আর কাকে? রুশিকমের মৃত্যু-সংবাদ রবীন্দ্র-নাথকে জানিয়ে হয়ত সান্ত্বনার বাণী চাওয়া যায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গত হলে বাঙালী জানাবে কাকে?

মপাসাঁ এর অনেক আগেই ফ্রান্সের বিখ্যাত পত্রিকায় তুর্গেনেফ সম্বন্ধে প্রশস্তি লিখেছিলেন। এবারে তিনি যেটি লিখলেন, সেটি বড়ই করুণ।

www.BanglaBook.org

মপাসাঁর পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাবলীতে এ-দুটি থাকার কথা কিন্তু আজ যখন মপাসাঁকেই লোকে স্বীকার করতে চায় না—যদি বা করে তাও তাঁর তথাকথিত অশ্লীল গল্পের জন্য—তখন তাঁর প্রবন্ধ পড়তে যাবে কে? তবু বলি আনাতোল ফ্রাঁসের রম্য-রচনাকে যদি সত্য ও সুন্দরের অভূতপূর্ব অনির্বচনীয় সঙ্গম বলে ধরা হয়, তবে সে-দুটির উৎস খুঁজতে হবে মপাসাঁর রচনায়। তাঁর ছোটগল্পের সর্বত্র-পরিচিত শৈলীতেই সেগুলো লেখা। ছোট ছোট শব্দ, ছোট ছোট বাক্য আর তার মাঝে মাঝে অকস্মাৎ দীর্ঘায়তন দীর্ঘকলেবর উদ্দাম উত্তাল শৈল-ধারার মতো দ্রুতগামী বাক্য-বিন্যাস। মন্দাক্রান্তার পাঁচটা হ্রস্বের পর দুটো দীর্ঘ এলে যে-রসের সৃষ্টি হয়।

এর অনুবাদ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। সারাংশ নিবেদন করি।

"রুশ দেশের মহান ঔপন্যাসিক ইভান তুর্গেনেফ ফ্রান্সকে আপন দেশ-রূপে বরণ করেছিলেন। এক মাস অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করার পর তিনি গত হয়েছেন।

"এ-যুগের অত্যাশ্চর্য লেখকদের তিনি অন্যতম। সঙ্গে সঙ্গে সাধু, সৎ, অকপট ও বন্ধুবৎসল সমাজের তিনি ছিলেন সর্বাগ্রণী। এরকম লোকের দেখা মেলে না।

"তাঁর বিনয় ছিল আত্মাবমাননার কাছাকাছি; কাগজে তাঁর সম্বন্ধে কেউ কিছু লিখলে তিনি তা একেবারেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। একাধিক-বার তাঁর সম্বন্ধে উচ্চ প্রশস্তি সংবলিত রচনা তাঁকে যেন মর্মাহত করেছে; কারণ তিনি কিছুতেই স্বীকার করতে রাজী হতেন না যে, শুদ্ধ সাহিত্য ভিন্ন অন্য কোনো বিষয় নিয়ে রচনা লেখা হক। সাহিত্য কিংবা কলা-সমালোচনাকে পর্যন্ত তিনি প্রগল্‌ভ বাক্যবিন্যাস বলে মনে করতেন। একবার কোনো এক সাহিত্য-সমালোচক তাঁর একখানা বই সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর জীবন নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করাতে তিনি রীতিমত আহত হয়েছিলেন। তাঁর সে বেদনা-বোধে ছিল লেখকের ব্রীড়া—শুদ্ধ বিনয় তার কাছে নতমস্তক হয়।

"আজ গত হয়েছেন এই মহান পুরুষ; তাঁর সম্বন্ধে সামান্য কিছু নিবেদন করি।

"প্রথমবার তাঁকে দেখি গুস্তাফ ফ্লবেরের পার্টিতে।

"দরজা খুলতে ঘরে ঢুকলেন দৈত্য বিশেষ। রূপালী মাথা—রূপকথায় যাকে বলে রজতশির। লম্বা-লম্বা সাদা চুল, রূপালী চোখের পল্লব আর বিরাট সাদা দাড়ি—সত্যই যেন খাঁটি রূপোর অতি মিহিন তার দিয়ে তৈরী। ঝকঝক চকচক করছে, প্রতিটি রশ্মিকণা যেন তার উপর থেকে ঠিকরে পড়ছে। আর সেই ধবলিমার মাঝখানে শান্ত সুন্দর মুখচ্ছবি। কটা চোখ যেন একটু বড্ড বেশী ধারালো। সত্যই যেন বরুণদেবের শির—চতুর্দিককে ধবল জলের ঢেউ তুলেছেন—কিংবা আরও ভালো হয় যদি বলি অনন্তদেব, বিশ্বপিতার মুখচ্ছবি।

"অতি দীর্ঘ দেহ—বিরাট, কিন্তু দেহে মেদচিহ্ন নেই। আর সেই বিশালবপু, অতিকায় পুরুষটির চলাফেরা নড়াচড়া একেবারে শিশুটির মতো—বড় ভীরু-ভীরু ভাব। অতি মিষ্ট মৃদু কণ্ঠে কথা বলেন, কেমন যেন মনে

www.BanglaBook.org

হয়, পুরু জিভ শব্দের ভার যেন সইতে পারছে না। কখনও কখনও কথা বলতে বলতে একটু আটকে যান, যেন ঠিক মনের মতো কথাটি ফরাসীতে কি হবে সেটা খোঁজেন আর প্রতিবারেই চমৎকার ঠিক শব্দটি খুঁজে পান। এই সামান্য থমকে যাওয়াটা তাঁর বচনভঙ্গীতে লাবণ্য এনে দিত।

"গল্প বলতে পারতেন অতুলনীয় মধুর ভঙ্গীতে। সামান্যতম ঘটনাকে তিনি সেই ভঙ্গীর পরশ লাগিয়ে রসের স্তরে তুলে নিতে পারতেন। তাঁর অসাধারণ প্রতিভার মূল্য আমরা ভালো করেই জানতুম কিন্তু আসলে তিনি সর্বজনপ্রিয় ছিলেন অন্য কারণে। তাঁর চরিত্রের শিশুর মতো সরলতা ছিল সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ; এক দিক দিয়ে এই প্রতিভাবান ঔপন্যাসিক পৃথিবী পরিক্রমা করেছেন, তাঁর যুগের তাবৎ গুণী-জ্ঞানীকে তিনি চিনতেন, মানুষের পক্ষে যা পড়া সম্ভব তার সব কিছুই তাঁর পড়া ছিল, ইয়োরোপের সব ভাষা আপন মাতৃভাষার মতো বলতে পারতেন অথচ অন্য দিক দিয়ে তাঁর আর পাঁচ-জন বন্ধুবান্ধবের কাছে যা কিছু অতিশয় সামান্য সাধারণ তারই সামনে তিনি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে অবাক মানতেন, ভাবতেন এটা হল কী করে?

"সাহিত্য বিচারের সময় তিনি আমাদের পাঁচজনের মতো সব কিছু বিশেষ গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ হয়ে বিশেষ দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখতেন না। পৃথিবীর তাবৎ সাহিত্য তাঁর খুব ভালো করে পড়া ছিল বলে সর্বসাহিত্যের সমন্বয় করে তারই বিরাট পটভূমিতে তিনি পৃথিবীর এক প্রান্তে প্রকাশিত একখানা বই তুলনা করতেন অন্য প্রান্তে প্রকাশিত অন্য ভাষায় লিখিত আরেকখানা বইয়ের সঙ্গে। তাই তাঁর সমালোচনা আমাদের কাছে তার বিশেষ মূল্য পেত।

"তাঁর বয়েস হয়েছিল, তাঁর সাহিত্য-জীবন প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল অথচ সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর অভিমত ছিল আধুনিকতম এবং সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল। প্লটের প্যাঁচ আর থিয়েটারী কৌশলে ভর্তি উপান্যাস তিনি দু চোখে দেখতে পারতেন না, তিনি বলতেন, কিছু না, শুদ্ধমাত্র জীবন হবে উপন্যাসের উপাদান—তাতে প্লটের কলাকৌশল থাকবে না, থাকবে না অসম্ভব অসম্ভব কীর্তিকাহিনী।

"তাঁর মতে উপন্যাস আর্টের সর্বাধুনিক রূপ। গোড়ার দিকে রূপকথার ছলাকলা তাতে ব্যবহার করা হত এবং উপন্যাস এখনও তার থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পায় নি। নানা রকম রোমান্টিক আর আকাশ-কুসুম কল্পনা উপন্যাসকে এতদিন ধর্মভ্রষ্ট করেছে। এখন আস্তে আস্তে মানুষের রসবোধ শুদ্ধ হতে চলেছে। এখন ওসব শস্তা ছলাকলা বর্জন করে উপন্যাসকে করতে হবে সরল, তাকে জীবনের আর্ট রূপে তুলে ধরতে হবে, যাতে করে এক-দিন সে জীবনের ইতিহাসরূপে গণ্য হতে পারে।

"আজ তাঁর প্রতিভাপ্রসূত কাব্যসৃষ্টির বিশ্লেষণ করা যাবে না—যদিও জানি তাঁর সৃষ্টি রুশ সাহিত্যের সর্বোচ্চ সৃষ্টির সমপর্যায়ে স্থান পেয়েছে। তাঁর প্রিয়তম বন্ধু মহাকবি পুশ্‌কিন্, লেরমন্তফ এবং ঔপন্যাসিক গগলের সৃষ্টির পাশাপাশিই তাঁর রচনার স্থান। রুশ দেশ যাঁদের সৃষ্টি চিরকৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ রাখবে ইনি তাঁদেরই একজন। ইনি রুশকে দিয়েছেন চিরঞ্জীব সম্পদ,

www.BanglaBook.org

অমূল্য নিধি। ইনি দিয়েছেন এমনই সম্পূর্ণ আর্ট, এমন সব সৃষ্টি যার বিস্মরণ অসম্ভব ; তিনি দিয়েছেন এমন এক গৌরব যে-গৌরবের মূল্য বিচার অসম্ভব, যার আয়ু অন্তহীন এবং রুশ দেশের অন্য সর্বগৌরব সে অনায়াসে অতিক্রম করে যায়। এঁর মতো লোকই দেশের জন্য এমন কিছু করে যান যার কাছে প্রিন্স্ বিসমার্ক তুচ্ছ ; পৃথিবীর সর্বভূমির সর্বমহাজনের কাছে এঁরা নমস্য হন।"

গাঁজা

কিংবা গুলও বলতে পারেন। সদাশয় ভারত সরকার যখন আমাকে কিছুতেই 'পদ্মশ্রী' 'পদ্মবিভূষণ' জাতীয় কোনো উপাধিই দিলেন না, এবং শেষ পর্যন্ত শিশির ভাদুড়ী পেয়েও সেটি বেয়ারিং চিঠির মতো ফেরত দিলেন তখন হাজরা রোডের রক্‌ফেলাররা (অর্থাৎ যাঁরা রকে অন্তত এক লক্ষ গুল মেরে লক্ষপতি রক্‌ফেলার হয়েছেন) সাড়ম্বরে আমাকে 'গুলম্‌গীর' উপাধি দিলেন।

হালের কথা। বর্ষার ছদ্মবেশ পরে শরৎ নেমেছেন কলকাতার শহরে। বাড়ির আঙিনায় হাঁটুজল, রাস্তায় কোমর। সেই জল ভেঙে ভিজে জগঝম্প হয়ে তাবৎ 'ফেলাররাই' উপস্থিত, এসেই বসলেন টেলিফোনটি মাঝখানে রেখে। তারপর সবাই আপন আপন আপিস-আদালত কারখানা-শুঁড়িখানাতে খবর পাঠালেন, 'কী ভয়ংকর জল দাঁড়িয়েছে রাস্তায়! বাড়ি থেকে বেরনো সম্পূর্ণ অসম্ভব। নৌকো ভাড়ার চেষ্টা করছি। আপিসে আজ না আসতে পারলে কয়েকটা ভিজিটার ফিরে যাবে। সর্বনাশ হবে। কি করি বলুন তো?'

মশাদার এরকম সকরুণ বেদনার গন্ধঢালা আপিস-প্রীতি এর পূর্বে আমি কখনো দেখি নি। রকে আসতে তাকে বুক ভেজাতে হয়েছে, এখন তার চোখ ভেজা অথচ তার বাড়ি থেকে যেদিকে আপিস সেদিকে যেতে হাঁটু পর্যন্ত ভেজাতে হয় না।

আমাদের রকটি সংমিশ্রিত ; অর্থাৎ দু-চারটি চিংড়ি সদস্যও আছেন। আবার ফণি-কাকার বয়স ষাট পেরিয়েছে, গুড়গুড়ির বয়স পাঁচ পেরোয় নি। এরা মাঝে-মধ্যে থাকলে আমাদের একটু সামলে-সুমলে কথা কইতে হয়।

মশাদার প্যাঁচটা দেখে টেটেন মারলে ডবল প্যাঁচ। অজন সেনকে বললে, 'অজনদা, আমার আপিসকে ঝপ্ করে একটা ফোন করে দিন তো, আমি আপিসে বেরিয়ে গিয়েছি, পৌঁচেছি কিনা!'

অজনদা আরো তৈরী মাল। নম্বর পেয়ে খবরটা দিয়ে কি একটা শুনে আঁতকে উঠে বললে, 'কী বললেন? পৌঁছয় নি? বলেন কি মশাই? বড় দুশ্চিন্তায় ফেললেন তো!'

নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

অজনদার নিজের কোনো ভাবনা নেই। তার আপিসে মাত্র একটি কল। সেটা সে প্রায়ই আপিস ছাড়ার পূর্বে বে-কল করে আসে।

এবারে আমরা শান্ত মনে সমাহিত চিত্তে কর্তব্য-কর্মে মন দিলাম।

অজন বুঝিয়ে বলে, 'আলম অর্থাৎ দুনিয়া জয় করে পেলেন বাদশা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আওরঙ্গজেব ঐ আলমগীর নাম। সেই ওজনে আপনি গুলম্‌গীর।'

আমি বললুম, 'হাসালি রে হাসালি! এ আর নূতন কি শোনালি? প্রথম আমি পীরস্তানে ছিলুম গুল্‌-ই-বকাওলী, তারপর লন্‌ডনে নেমে হলুম ডিউক অব গুলস্টার, তারপর ফ্রান্সে হলুম দ্য গুল, তারপর পাকিস্তানে হলুম গুল মুহম্মদ, এখানে এসে হলুম গুলজারিলাল নন্দ। তা ভালো ভালো। গুলম্‌গীর! বেশ বেশ।'

বড়দা উপর থেকে রকে নামেন কচিৎ-কস্মিন। বললেন, 'ল্যাটে—ল্যাটে বুঝলেন।' বড়দার মুখ হামেহাল পানের পিকে ভর্তি। তারই মহামূল্যবান এক ফোঁটা পাছে বরবাদ হয়, সেই ভয়ে তিনি আকাশের দিকে মুখ তুলে স্বর্গের দিকে ঠোঁট দুটি সমান্তরাল করে সেই দুটিকে মুখের ভিতরের দিকে বেঁকিয়ে দিয়ে 'ত', 'দ'-কে 'ট', 'ড', করে কথা বলেন—অল্পই।

তার এসব কল-কায়দা করা সত্ত্বেও আমরা তখন পাখা, খবরের কাগজ হাতের কাছে যা পাই তাই দিয়ে মুখ ঢাকি। আমি স্বয়ং ছাতা ব্যবহার করি।

অজনদা বললে, 'এবারে আপনি আপনার উপাধি-প্রাপ্তির সম্মানার্থে একটি সরেস গুল ছাড়ুন তো, চাচা।'

মশা বললে, 'কিংবা গাঁজা।'

আমি বললুম, 'যদি ছাড়ি গাঁজার গুল?'

ঘেণ্টু বললে, 'চাচাকে নিয়ে তোরা পারবি নে রে, ছেড়ে দে।' ঘেণ্টুর পাড়াদত্ত নাম ঘণ্টু। আমি নাম দিয়েছি ঘেণ্টু। যবে থেকে আমার চর্মরোগ হয়েছে। ঘেণ্টু চর্মরোগের জাগ্রতা দেবী। বিশ্বেস না হলে চলন্তিকা খুলে দেখুন।

আমি বললুম, 'তবে শোন।। কিন্তু তার পূর্বে টেটেনকে সাবধান করে দিচ্ছি, সে যেন আমার গাঁজার গুল নিয়ে কোনো সোসিয়ো-পোলিটিকো-ইকনমিক-স্টাটিসটিকস সঞ্চয় না করে। সে আজকাল ঐ নিয়ে মেতেছে।'

টেটেন নানাবিধ কেস পড়ছিল। বললে, 'আপনি কিস্‌সুটি জানেন না, চাচা। আপনার জানা নেই, এ সংসারে মিথ্যাবাদী আছে এবং তার চেয়ে বড় মিথ্যাবাদীও আছে এবং সর্বশেষে স্টাটিস্‌টিশিয়ানদের কথা ভুলবেন না। ওদের মাল নিয়েই তো সরকার গুল মারে। নিত্যি নিত্যি কাগজে দেখতে পান না? আমি আপনার দোরে যাব কেন?'

'তবে শোন্‌' নিশ্চিন্ত হয়ে বলি।

'পার্টিশেনের বছর খানেক পরের কথা। আমার মেজদা ওতর বাংলার কোথায় যেন কি একটা ডাঙর নোকরি করেন। তাঁর সঙ্গে দেখা। আমরা এখন দুই ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন দেশের অধিবাসী। কিন্তু আমাদের ভিতর কোনো ঝগড়া-কাজিয়া নেই। এই অ্যাদ্দিন বাদে নেহরুজী আর আইয়ুব খান সায়েব সেটা বুঝতে পেরে আমাদের শুভ-বুদ্ধি এক্কেয়ার করেছেন। তা সে যাক গে।

হিন্দুস্থানের বিস্তর দরদ-ভরা তত্ত্বতাবাশ করে মেজদা শুধলে, "তোদের দেশে গাঁজার কি পরিস্থিতি?"

আমি একগাল হেসে বললুম, "স্বরাজ পেয়ে বাড়তির দিকে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মেজদা আশ্চর্য হয়ে শুধালে, "সে কি রে! কোথায় পাচ্ছিস? আমি তো চালান দিতে পারছি নে!"

আমিও অবাক। শেষটায় বোঝা গেল, দাদা ছিলিম মেরে শিবনেত্র হওয়ার সত্যিকার গাঁজার কথা বলছে। আমি কি করে জানবো? আমি পাষণ্ড বটি, —দাদা ধর্মভীরু, সদাচারী লোক।

বললে, "শোন।

পার্টিশেনের ফলে মেলা অচিন্তিত প্রশ্ন, নানা ঝামেলা মাথা চাড়া দিয়ে খাড়া হয়ে উঠলো এবং তারই সর্বপ্রধান হয়ে উঠে দাঁড়ালো গঞ্জিকা-সমস্যা।

গাঁজার এত গুণ আমি জানতুম না। শুনতে পেলুম, স্বয়ং জাহাঙ্গীর বাদশা নাকি গাঁজা খেয়ে উভয়ার্থে অচৈতন্য হয়েছিলেন। সেটা নাকি তুজ্‌ক্‌-ই-জাহাঙ্গীরীতে আছে। গাঁজা ছাড়েন শেষটায় তিনি মনের দুঃখে। এর দাম অতি শস্তা বলে সেটা পোষায় না রাজা-বাদশাদের রাজসিক জাত্যভিমানে। সে কথা যাক।

আমার এলাকায় পৃথিবীর বৃহত্তম গাঁজার চাষ এবং গুদোম। ভারতে গাঁজার চাষ প্রায় নেই। আমি এসব তত্ত্ব জানতুম না—সমস্ত জীবন কাটিয়েছি আসামে, বরঞ্চ চায়ের খবর কিছুটা রাখি: এসব গুহ্য রহস্যের খবর দিয়ে গাঁজা ফার্মের ম্যানেজার আমাকে একদিন দুঃসংবাদ দিলে, সে বছরের গাঁজা গুদোমে পচে বরবাদ হব-হব করছে। ইণ্ডিয়াতে চালান দেবার উপায় নেই—অথচ সেখানেই তার প্রধান চাহিদা।"

আমি শুধলুম, "কেন? তুমি নিজে খাও না বলে অন্য লোকেও খাবে না? এ তো বড় জ্বলুম।"

দাদা বললে, "কী জ্বালা! আমি শ্রীঘরবাস পছন্দ করি নে; তাই বলে আমি জেল তুলে দিয়েছি নাকি? সাধে কি বলি তুই একটি চাইল্‌ড্‌ প্রডিজি —ওয়াণ্ডার চাইল্‌ড্‌—চল্লিশ বছরে তোর যা জ্ঞানগম্যি হল, আল্লার কুদরতে পাঁচ বছর বয়েসেই সেটা তুই অর্জন করে নিয়েছিলি।"

আমি চটে গিয়ে বললুম, "আর তুমি বিয়াল্লিশে।" দাদা আমার চেয়ে দু' বছরের বড়।

দাদা বললে, "তোর রসবোধ নেই। ঠাণ্ডা হ।"

রক্‌ফেলারদের দিকে তাকিয়ে বললুম, 'এসব মাইনর বর্ডার ইন্সিডেণ্ট আমাদের ভিতরে কালে-কস্মিনে হয়, কিন্তু মিটমাট হয়ে যায় "আকাশ-বাণী", "ঢক্কা-ডিংডমে" পৌঁছবার পূর্বেই।'

অজনদা শুধোলে, 'ঢক্কা-ডিংডমটা কি চাচা?'

'ডিংডম্‌ মানে জগঝম্প, বিরাট ঢাক, যার থেকে ইংরিজি "টম্‌টম্‌", "টমটমিং" শব্দ এসেছে। অর্থাৎ ঢাকার বেতার কেন্দ্র।' তারপর শোন:

দাদা বললে, "ভয়ংকর পরিস্থিতি। ভারতের ষাট হাজার সন্ন্যাসী নাকি রাষ্ট্রপতির কাছে সই, হাতের টিপ দিয়ে আবেদন জানিয়েছেন, গাঁজার অভাবে তাঁদের নানাবিধ কষ্ট হচ্ছে, আত্মচিন্তার ব্যাঘাত হচ্ছে—"

আমি গোশ্‌শা করে বললুম, "দেখো দাদা, পিতা গত হওয়ার পর অগ্রজ পিতৃতুল্য। কিন্তু তুমি যদি আমাদের সন্ন্যাসীদের নিয়ে মস্করা করো—"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাধা দিয়ে দাদা বেদনাতুর কণ্ঠে বললে, "দেখ ভাই, তুই কখনো দেখেছিস যে আমি কাউকে নিয়ে—"

এবারে আমি বাধা দিয়ে বললুম "থাক্ থাক্। তুমি বলো।" দাদার ঐ গলাটা আমি বড়ই ডরাই। ওটা দাদা ব্যবহার করে পঞ্চাশ বছরে একবার। দাদার বয়স তখন বিয়াল্লিশ।

দাদা তো আমাকে মাফ করবার জন্য তৈরী। চশমার পরকলা দুটো পুঁছে নিয়ে বললে, "পূর্বেই বলেছি, পার্টিশেনের ফলে বিস্তর অভাবিতপূর্ব সমস্যা দেখা দিল—এটা তারই একটা। পার্টিশেনের পূর্বে সান্তাহারের গাঁজা যেত হরিদ্বারে অক্লেশে, বাঙালোরের বিয়ার আসত ঢাকায় লাফিয়ে লাফিয়ে। এখন মধ্যিখানে এসে দাঁড়ালো এক দুশমন। জিনীভাতে কবে কে আইন করেছিল বিশ্বজনের কল্যাণার্থে—কল্যাণ না কচু—তার সারমর্ম এই: আপন দেশে তুমি সার্বভৌম রাজা, যা খুশী করতে পারো, যত খুশী ততো আফিঙ ফলিয়ে বিক্রি করতে পারো, গাঁজা চালাতে পারো—কিন্তু ভুলো না, আপন দেশের চৌহদ্দীর ভিতর। এক্স্পোর্ট করতে গেলেই চিত্তির। তখন জিনীভার অনুমতি চাই। যেমন মনে কর, ফিনল্যাণ্ড জিনীভার মারফতে তোদের কাছে চাইলে দু'মণ আফিঙ—ওষুধ বানাবার জন্য। জিনীভা সন্দেহে গোয়েন্দা লাগাবে জানবার জন্যে, সত্যি ওষুধ বানাবার জন্য ফিনল্যাণ্ডের অতখানি প্রয়োজন কি না, কিংবা ওরি খানিকটে আক্রা দরে বাজার বিক্রি করে, দেশের লোককে আফিঙখোর বানিয়ে দু'পয়সা কামিয়ে নিতে চায়। কারণ কোনো কোনো দেশ নাকি বিদেশের ওষুধ বানানেওলাদের সঙ্গে ষড় করে ওষুধের অছিলায় বেশী বেশী হশীশ, ককেইন রপ্তানি করে সে-সব দেশের বহু লোকের সর্বনাশ করেছে। আইনগুলো আমি পড়ে দেখি নি, তাই ঠিক ঠিক বলতে পারবো না—নির্যাসটি জানিয়েছিল গাঁজা ফার্মের ম্যানেজার। এখন নাকি জিনীভার পারমিশন চাই, সেটা পেতে কতদিন লাগবে তার ঠিকঠিকানা নেই, কতখানি পাঠানো যাবে তার স্থিরতা নেই।

ইতিমধ্যে উপস্থিত হল আরেক সংকট।

গেল বছরের গাঁজাতে গুদোম ভর্তি। এদিকে হাল বছরের গাঁজা ক্ষেতে তৈরী। তুলে গুদোমজাত করতে হবে। নূতন গুদোম এক ঝটকায় তৈরী করা যায় না—শেষটায় হয়তো জিনীভা কোনো পারমিটই দেবে না, কিংবা এত অল্প দেবে যে বেবাক ব্যবসাই গুটোতে হবে। নয়া গুদোমের কথাই ওঠে না।

তখন নানা চিন্তা, বহু ভাবনা, ততোধিক কর্তৃপক্ষকে আলোচনা করে স্থির করা হল, "গেল বছরের গাঁজা পোড়াও—"

আড্ডার কেউই গঞ্জিকা-রসিক নয়। তবু সবাই—টেটেন ছাড়া—এক কণ্ঠে হায় হায় করে উঠলো। খাই আর না-ই খাই, একটা ভালো মাল বরবাদ হতে দেখলে কার না দুঃখ হয়! রায়টের সময় পার্ক সার্কাসের মদের দোকানে বোতল ভাঙা হচ্ছে দেখে এক টেম্পারেন্স্ পাদ্রীকে পর্যন্ত আমি শোক করতে দেখেছি।

স্টাটিস্টিশিয়ান টেটেন বললে, 'আপনারা এতে এমন কি নূতন শোক পাচ্ছেন? মার্কিনরা যে দু'দিন অন্তর অন্তর অঢেল গম লিট্রিলি অ্যাণ্ড

www.BanglaBook.org

মেট্‌ফরিক্স দরিয়ায় ভাসিয়ে দেয় সে বুঝি জানেন না?' টেটেনই আমাদের মধ্যে ইংরিজিতে এম-এ। ওর উচ্চারণ আমাদের বুঝতে কষ্ট হয়।

সবাই হ্যাঁ হ্যাঁ বলার পর আমি গল্পের খেই ধরে এবং সিগারেট ধরিয়ে বললুম, 'তারপর দাদা বললে, "গুদোমেতে নূতন মাল পোরা হবে। ম্যানেজারকে বললুম, আমি অমুক দিন যাবো, সেদিন পুরনো মাল পোড়ানো হবে। কারণটা তাকে আমি আর বললুম না। সেই যে—তুই জানিস নাকি? বড়দা তোকে বলেছেন, তিনি যখন জাপানী বোমার সময় ট্রেজারি অফিসার ছিলেন তখন হুকুম এল জাপানী বোমা পড়লে, ব্যাপক বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিলে ট্রেজারির তাবৎ করেন্‌সি নোট পুড়িয়ে ফেলবে! ভাইজাগা না কোথাকার এক সুবুদ্ধিমান একটি মাত্র বোমা পড়ামাত্রই সরকারকে খবর দিলে সে সব নোট পুড়িয়ে ফেলেছে। তারপর দু'বছর বাদে তাজ্জবকী বাৎ, বাজারে সেসব নোটের দর্শন পাওয়া যেতে লাগল। পোড়ায় নি। সরিয়ে ফেলেছিল। আমার তাই ভয়, গাঁজার বেলাও ঐ যদি হয়।

আগেভাগে দিনক্ষণ দেখে, অর্থাৎ টুর প্রোগ্রাম যথা-যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়ে বেরলুম গাঁজা পোড়াতে।"

আমি আঁৎকে উঠে বললুম, "কি বললে?"

দাদা ঈষৎ চিন্তা করে বললে, "হ্যাঁ, তা তো বটেই। 'গাঁজা পোড়ানো' কথাটার অর্থ 'গাঁজা খাওয়া'ও হয়। তাই শুনেছি, ছোকরা নাতির হাতে সিগারেট দেখে যখন ঠাকুরদা গম্ভীর কণ্ঠে তাকে বললে, 'জানিস, সিগরেট মানুষের সব চেয়ে বড় শত্রু'—সে তখন শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল, 'তাই তো ওকে পোড়াতে যাচ্ছি।'

মোকামে পৌঁছে দেখি বিরাট ভিড়। বিশখানা গাঁয়ের বাছাই বাছাই লোক জমায়েত হয়েছেন সেখানে গাঁজা পোড়ানো দেখবেন বলে। আমি তো অবাক। বাঁশ-পাতা পোড়ানো আর গাঁজা-পাতা পোড়ানোতে এমন কি তফাৎ যে দুনিয়ার লোক হদ্দমুদ্দ হয়ে জমায়েত হবে? তা সে যাক্‌ গে।

হুদো হুদো গাঁজা ওজন করে হিসেব মিলিয়ে ডাঁই ডাঁই করে মাঠের মধ্যিখানে রাখা হল। তারপর চোখের জল মুছতে মুছতে ম্যানেজারই মুখাগ্নি করলে। সে-ই তার জনক—একে দিয়ে তার বহু পয়সা কামাবার কথা ছিল।

সেদিন বাতাসটা ছিল একটু এলোমেলো। গাঁজার ধুঁয়ো ক্ষণে এদিকে যায়, ক্ষণে ওদিকে যায়। আর তখন দেখি অবাক কাণ্ড! পাতা পোড়াবার সময় যে দিকে ধুঁয়ো যায় মানুষ সে দিক হতে সরে যায়। আজ দেখি উল্টা বাৎ। জোয়ান-বুড়ো, মেয়েমদ্দে—হ্যাঁ, কয়েকটি মেয়ে-ছেলেও ছিল—ছোটে সেদিকে।

আর সে কী দম নেওয়ার বহর! সাঁই সাঁই শব্দ করে সবাই নাভিকুণ্ডলী পর্যন্ত ভরে নিচ্ছে সেই নন্দন-কাননের পারিজাত-পাপড়ি পোড়ানোর খুশবাই—অন্তত তাদের কাছে তাই। আমার নাকে একবার একটুখানি ঢোকাতে আমি তো কেশে অস্থির। আর ওরা ফেলছে কী পরিতৃপ্তির নিশ্বাস—'আঃ, আঃ!' কেউ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে, কোমরে দু'হাত রেখে, আকাশের দিকে জোড়া মুখ তুলে নাসারন্ধ্র স্ফীত করে নিচ্ছে এক-একখানা দীর্ঘ দম, আর ছাড়ছে দীর্ঘতর 'আঃ—!' শব্দ। কেউ বা মাটিতে বসে ক্যাবলাকান্তের মতো মুখ হাঁ ক'

www.BanglaBook.org

আস্য মার্গ দিয়ে যৌগিকধূম্র গ্রহণ প্রশস্ততর মনে করছে।

হঠাৎ হাওয়া ওলটালো। তখন পড়িমড়ি হয়ে সবাই ছুটলো সেদিকে। আমি, ম্যানেজার, সেরেশ্‌তাদার ততোধিক পড়িমড়ি হয়ে ছুটলুম অন্য দিকে। দু'একটি চাপরাসী দেখি মনস্থির করতে পারছে না। তাদের আমি দোষ দিই নে।

ভেবে দেখ্‌, পৃথিবীতে এ ঘটনা ইতিপূর্বে আর কখনো হয়েছে? গাঁজা তো আর কোথাও ফলানো হয় না। তারই মণ মণ পুড়িয়ে একচ্ছত্র গঞ্জিকাযজ্ঞ। চতুর্দিকে গরীব দুঃখী বিস্তর। এক ছিলিমের দম বাজারে কিনতে গেলে এদের দম বেরিয়ে যায়। আর এখানে লক্ষ লক্ষ তাওয়া পোড়ানো হচ্ছে আকাশ বাতাস টৈটম্বুর করে। হয়ত ধরণীর সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই শেষ যজ্ঞ।

আমি তো সায়েন্সের ছাত্র ছিলুম। তোদের কোনো এক ঔপন্যাসিক নাকি সদর রাস্তায় মদের পিপে ফেটে যাওয়ার বর্ণনা দিয়েছে। আমি তার ট্রেলার হরস্কোপে দেখেছি। কিছু না। ধুলোখেলা। সেখানে সবাই করছে মালের জন্য হুটোপুটি একই দিকে। এখানে বিরাট জিরগা-জলসার জনসমাজ দিক-নির্ণয় যন্ত্রের অষ্টকোণ চষে ফেলছে—ধুঁয়ো যখন যেদিকে যায় সেদিকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে উল্টোদিকে ছুটছি আমরা কয়েকজন। রবীন্দ্রনাথ নাকি 'জাগ্রত ভগবানকে' ডেকেছিলেন তাঁকে 'জনসমাজ-মাঝে' ডেকে নেবার জন্যে! আমি পরিত্রাহি চিৎকার ছাড়ছি, অবশ্য মনে মনে —আল্লাতালা যেন এই আমামুস্নাস, এই 'জনসমাজ' থেকে আমাকে তফাৎ রাখেন।"

আমি ততক্ষণে হাসতে হাসতে প্রায় কেঁদে ফেলেছি। দাদা আমার গম্ভীর রাশভারী প্রকৃতির লোক, চোখে-মুখে কোনো রকম ভাব প্রকাশ করে না, অবশ্য দরদী লোক বলে মাঝে মাঝে ঠোঁটের কোণে মৃদু হাস্য দেখা যায়—যা-ই হোক, যা-ই থাক, আমার মতো ফাজিল-পঞ্চানন নয়। কোটপাতলুন তুর্কী টুপী পরা সেই লোক খনে এদিক খনে ওদিক ধাওয়া করছে, টুপির ফুম্না বা ট্যাসেল চৈতনের মতো খাড়া হয়ে এদিক ওদিক কম্প্রমান—এ দৃশ্যের কল্পনা মাত্রই বাস্তবের বাড়া।

দাদা বললে, 'তুই তো হাসছিস। আমার তখন যা অবস্থা। শেষটায় দেখি, মাথাটা তাজ্জিম্‌ তাজ্জিম্‌ করতে আরম্ভ করেছে। এত হুটোপুটি সত্ত্বেও খিলুতে খানিকটে ধুঁয়ো ঢুকে গিয়েছে নিশ্চয়ই। তারপর মনে হল বেশ কেমন যেন ফুর্তি ফুর্তি লাগছে, কি রকম যেন চিত্তাকাশে উড়ুক্কু উড়ুক্কু ভাব। তারপর দেখি, ম্যানেজারটা আমার দিকে কি রকম বেয়াদবের মতো ফিক্‌ ফিক্‌ করে হাসছে। ওর তা হলে হয়েছে। কিংবা আমার। অথবা উভয়ের।

আর এস্থলে থাকা নয়।

টলটলায়মান, পড়পড়ায়মান হয়ে জীপে উঠলুম। সেও এক বিপদ। দেখি দুখানা জীপ। দুটোই ধুঁয়োটে কিন্তু হুবহু একই রকম। কোনটায় উঠি? শেষটায় দেখি আমার পাশে আমারই মতো কে একজন দাঁড়িয়ে। হুবহু আমারই মতো, তার টুপির ফুম্নাটি পর্যন্ত। দুজনাতে দুই জীপে উঠলুম।"

আমি বললুম, "দুটো জীপ না কচু!"

দাদা বললে, "বুঝেছি, বুঝেছি, তোকে আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। শান্ত হয়ে শোন্‌। তারপর গাড়ি যায় কখনো ডাইনে ঢাকা, আর কখনো বাঁয়ে

www.BanglaBook.org

মতিহারী। তবে কি ড্রাইভারটা—? সে তো সর্বক্ষণ আমারই পিছনে ছিল। তারপর দেখি সেই অন্য জীপটাও ঢাকা মতিহারী করছে একদম পাশে পাশে থেকে। ওমা! তারপর দেখি চারটে জীপ। সেও না হয় বুঝলুম। কিন্তু তারপর, মোশয়, সে কী কাণ্ড! চারখানাই উড়তে আরম্ভ করল।"

আমি শুধালুম "উড়তে!"

"হ্যাঁ, উড়তে। জীপটাই তো ছিল ঠায় দাঁড়িয়ে। ধুঁয়ো খেয়েছিল আমাদের চেয়েও বেশী।

হাওয়ায় উড়তে উড়তে ঘুমিয়ে পড়লুম। এবং শেষ পর্যন্ত বাঙলোয় পৌঁছলুম।

ভাগ্যিস বেশী ধুঁয়ো মগজে যায় নি। আপন পায়েই ঘরে ঢুকলুম।

সামনেই দেখি তোর ভাবী। আমার দিকে একদৃষ্টে তাকালেন। বাপ্‌স্‌! তারপর অতি শান্ত কণ্ঠে—কিন্তু কী কাঠিন্য কী দার্ঢ্য সে কণ্ঠে—শুধালেন, 'আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?'

"আমি কিছু বলি নি।" দাদা থামলেন।'

আমি আড্ডাকে বললুম, 'আমার ভাবী সাহেবা অতিশয় পুণ্যশীলা রমণী, পাঁচ বেকৎ নামাজ পড়েন, রোজা রাখেন, তসবী টপকান। শমসুল্‌-উলেমার মেয়ে।'

রক শুধালে, 'ওটার মানে কি চাচা?'

আমি বললুম, 'পণ্ডিত-ভাস্কর। তোদের মহামহোপাধ্যায়ের অপজিট্‌ নাম্বার।'

রক শুধালে, 'তারপর?'

আমি বললুম, 'তদনন্তর কি হল জানি নে। বৌদি দাদার হাল থেকে কতখানি আমেজ করতে পেরেছিলেন তাও বলতে পারি নে, কারণ ঠিক সেই সময়ে ভাবী সায়েবা তাঁর স্পিশিলাটি চারপরতি পরোটা ও দেখতে বজ্রের মতো কঠোর খেতে কুসুমের মতো মোলায়েম শব্‌ডেগ নিয়ে ঢুকলেন। আমরা খেতে পেলুম বটে কিন্তু কাহিনীটি মারা গেল।'

মশাদা বললে, 'বিলকুল্‌ গুল।'

আমি পরম পরিতৃপ্তি সহকারে বললুম, 'সাকুল্যে। তাই না বলেছিলুম, গাঁজার গুল। অর্থাৎ গুলের রাজা গুলমগীর। তোরা আমাকে আজ ঐ টাইটিলটি দিলি না?'

হরিনাথ দে'র স্মরণে

বহু ভাষা শিখতে পারলে বহু সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় হয়। তার মারফতে অনেক সভ্যতা, বিস্তর সংস্কৃতির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হয়—এ সব কথা ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি।

উপস্থিত দেখতে পাচ্ছি, বাঙালী ছেলেকে বাধ্য হয়ে অন্তত তিনটে ভাষা শিখতে হয়—বাঙলা, ইংরিজী এবং সংস্কৃত (কিংবা আরবী অথবা ফার্সী)।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়ত তাকে হিন্দীও শিখতে হচ্ছে, কিংবা অদূরভবিষ্যতে শিখতে হবে। এ অবস্থায় আমি যদি প্রস্তাব করি, আরো গুটি দুই শিখলে হয় না? তাহলে ছেলেদের হাতে আমার প্রাণ বিপন্ন হবার সমূহ সম্ভাবনা—বাঙলা দেশে না থাকলেও এ খবরটি আমি বিলক্ষণ রাখি। বিশেষতঃ এই পুজোর বাজারে,—মানুষ যখন বলির পাঁঠার সন্ধানে থাকে।

তাই হট্টগোল আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই আমি নিবেদন করছি, এ প্রস্তাবটি শুধু তাদেরই জন্য, যারা বুঝে গিয়েছে যে সংস্কৃতে তারা বিদ্যাসাগর হতে পারবে না, ওটাকে নিতান্ত পরীক্ষা পাশের জন্য যেটুকু সম্মান দিতে হয় তাই দেবে, বাঙলা তো মাতৃভাষা, এবং ইংরিজীর চর্চা ততটুকুই করবে যতটুকু পাশের পর চাকরির জন্য নিতান্তই প্রয়োজন। এই সংজ্ঞা থেকেই সুচতুর পাঠক বুঝে যাবেন যে, আমি মোটামুটি থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার ছেলেদের কথাই ভাবছি। অর্থাৎ এরা ক্লাসে (সেভেন-এটে) যে রকম পড়ি-মরি হয়ে তিনটে ভাষার পিছনে ছুটতো এখন আর তা করে না। বিশেষতঃ গোটা পাচেক ইয়ার্লি আর খান-দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাস করে এরা ভাষা না শিখে কি করে তার পরীক্ষা পাস করতে হয় সে 'বিদ্যায়' বিলক্ষণ রপ্ত হয়ে গিয়েছে।

এতখানি বলার পরও যদি কেউ লেমনেডের বোতল খোঁজে তবে আমার দ্বিতীয় নিবেদন, গোটা দুই ভাষা শিখলে চাকরি জোটার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। হল? এখন তবে আশা করতে পারি, পাঠক বোতলটি আমার মাথায় না ফাটিয়ে সেটার ভিতরকার জিনিস বরফের সঙ্গে মিশিয়ে আমাকে খাওয়াবার চেষ্টা করবেন।

দয়া করে সেটিও করবেন না ; কারণ আমি যে প্রস্তাব করতে যাচ্ছি সেটা লটারির টিকিট কাটার চেয়ে মাত্র এক চুল ভালো—এই যা। ইংরিজীতে একেই বলে 'চেঁজিং দি ওয়াইল্ড গীজ্'—কিন্তু চাকরির বাজারে বাঙালী ছেলের সামনে যখন কোনো 'গুজ'ই নেই তখন আশা করতে পারি সে ঘরের না খেয়ে বনের হাঁস তাড়া করতে আপত্তি করবে না। বুঝিয়ে বলি।

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ভাষা শেখার কোনো অর্থকরী মূল্য এদেশে ছিল না। স্বরাজ লাভের পর অবস্থাটা বদলেছে। আমরা নানা দেশে আমাদের রাজপ্রতিনিধি, রাজদূত, হাই-কমিশনার, কন্সাল-জেনারেল, কন্সাল, ট্রেড-কমিশনার এবং তাঁদের দফ্‌তরের জন্য কাউনসেলর, প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় সেক্রেটারি, মিলিটারি আতাশে, ট্রেড আতাশে, প্রেস আতাশে, কোয়ানী, দোভাষী ইত্যাদি পাঠাচ্ছি এবং দিল্লীর পরদেশী দফ্‌তর বা ফরেন অফিসেও ভাষা জাননে-ওলা লোকের প্রয়োজন হয়। তা ছাড়া বেতার-কেন্দ্র ফরাসী, ইরানী, ফার্সী, কাবুলে-ফার্সী, আরবী, পশতু, সুহেলী, শুখালী; বর্মী; ইন্দোনেশী ও চীনা ভাষায়ও প্রোগ্রাম দেন। আমাদের ফৌজী ইস্কুলেও অনেক ভাষা শেখানো হয়।

এই তিনটি প্রতিষ্ঠানে যে গণ্ডায় গণ্ডায় চাকরি খালি পড়েছে তা নয়, তবু আমার ব্যক্তিগত ধারণা উপযুক্ত ভাষাজ্ঞান থাকলে যোগ্য লোককে এ তিনটি প্রতিষ্ঠান খাতির করবে। আর পূর্বেই নিবেদন করেছি, আমার এ প্রস্তাব তাদেরই জন্য, যারা চাকরির বাজারে একটুখানি রিস্‌ক্, রীতিভর ঝুঁকি নিতে রাজী আছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি যে খবরটি দিলুম সেটি কিছুমাত্র নূতন নয়। কারণ প্রায়ই বেকার ছেলেরা এসে আমাকে অনুরোধ জানায় তাদের ফ্রেঞ্চ জর্মন শিখিয়ে দিতে। (এখানেই লক্ষ্য করে রাখুন 'ফ্রেঞ্চ-জর্মনই' বলে, অন্য কোনো ভাষার নাম তোলে না।) আমার সময়ের অভাব, দ্বিতীয়তঃ আমি বাঙলাটাই ভালো করে জানি নে—কাজেই ফরাসী-জর্মনের কথাই ওঠে না, তাই তাদের কিঞ্চিৎ সদুপদেশ দিয়ে বিদেয় দি।

এদের প্রশ্ন করে দেখলুম, এরা জানে না (ক) কোন্ ভাষার চাহিদা বাজারে কতখানি, (খ) কোন্ ভাষা শক্ত আর কোন্‌টা নরম, (গ) ভাষা শিখতে হয় কি করে এবং আরো অনেক কিছুই জানে না।

আমি দোষ দিচ্ছি নে। জানবার সুযোগ দিলে তো তারা জানবে। আর যদি জানতই তবে আজ আমি এ বিষয়ে লিখতে যাবো কেন?

আমাকে এক উত্তম ব্যবসায়ী বলেছিল, 'জিনিস বেচা সোজা, কেনা শক্ত।' আমি তো তাজ্জব। বলে কি? তখন বুঝিয়ে বললে, 'বাজারে ঠিক যে জিনিসের চাহিদা তাই দিয়ে যদি আমি আমার দোকান সাজিয়ে রাখি তবে সন্ধ্যে হতে-না-হতেই দোকান সাফ হয়ে যাবে। তাই বললুম, বেচা সহজ। কিন্তু আড়তদারদের কাছ থেকে যদি বে-আক্কেলের মতো বে-চাহিদার মাল কিনি তবে সেগুলো দোকানে পচবে, দোকান উঠে যাওয়ার পরও। তাই বললুম, 'কেনা শক্ত।'

এস্থলেও সেই নীতি প্রযোজ্য। অর্থাৎ প্রথম দেখতে হবে, আপনি কি মাল কিনবেন, অর্থাৎ কোন্ ভাষা শিখবেন।

সবাই বলে 'ফ্রেঞ্চ জর্মন'। এ যেন কথার কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফ্রেঞ্চ ভুবন-বিখ্যাত ভাষা। এককালে ফ্রেঞ্চ না জেনে কূটনীতি মহলে যাওয়া বিনা পৈতেয় ব্রাহ্মণভোজে যাওয়ার মতো ছিল। এখনো পৃথিবীর যে কোন দেশের পাসপোর্টে দেখতে পাবেন দুটি ভাষাতে সব কিছু ছাপা, প্রথমটি তার আপন ভাষা এবং দ্বিতীয়টি ফরাসী। কিন্তু এসব হচ্ছে ঊনবিংশ শতকের কথা। আপনি যদি সেই শতকের চাহিদা মেটাতে চান, তবে মেটান। আপনি যদি একশ' বছরের পুরানো বিজ্ঞাপন-মাফিক চাকরির জন্য দরখাস্ত চান তো করুন।

তাই প্রথম দেখতে হবেঃ—এখন, এই মুহূর্তে চাহিদা কি এবং চাহিদার গতিটা কোন্ দিকে, অর্থাৎ আপনি ভাষাটাষা শিখে দুতিন বছরের যখন বাজারে নামবেন তখন চাহিদাটা কি হবে?

ভাষার প্রাধান্য তার লোকসংখ্যা থেকে বিচার করা ভুল। দৃষ্টান্তস্বরূপ চীনা ভাষা নিন। ইংরিজী, রাশান, চীনা এ তিন ভাষায় কথা বলে পৃথিবীর সব চেয়ে বেশী লোক এ কথা সত্য, কিন্তু চীনা ভাষায় লোকসংখ্যা যত বেশীই হোক না কেন তারা সবাই মাত্র একটি রাষ্ট্রের অধিবাসী। কাজেই ঐ রাষ্ট্রে আমাদের থাকবে মাত্র একটি এম্বেসি। পক্ষান্তরে জর্মন ভাষার অবস্থা বিবেচনা করুন। জর্মন বলা হয় জর্মন রাষ্ট্রে (উপস্থিত সেটিও আবার দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত), অস্ট্রিয়া রাষ্ট্রে এবং সুইটজারল্যাণ্ডে। এই তিন দেশে আমাদের তিনটি রাজদূতাবাস আছে। তা ছাড়া জর্মন বলা হয়, উত্তর ইটালির টিরোল, ফ্রান্সের আলসেস-লরেন ও বেলজিয়ামের অয়পেন অঞ্চলে। এসব অঞ্চলে যদি কখনো

www.BanglaBook.org

রাজনৈতিক গোলমাল আরম্ভ হয় এবং আপনাকে তার রিপোর্ট লিখতে সেখানে যেতে হয় তবে জর্মন ছাড়া এক পা-ও এগুতে পারবেন না। এবং সর্বশেষ কথাঃ জর্মনী, অস্ট্রিয়া, সুইটজারল্যান্ড বেচে তৈরী মাল, ভারত বিক্রি করে কাঁচা মাল। এসব দেশের সঙ্গে আমাদের ব্যবসা দ্রুতগতিতে বাড়তেই থাকবে ; বিস্তর কনসুলেট ও ট্রেড-কমিশন ক্রমে ক্রমে ওসব জায়গায় আমাদের খুলতে হবে।[১] কিন্তু চীন ও ভারত সমগোত্রীয়, দুজনেই বেচে কাঁচা মাল, অতএব 'বৈবাহিক' বৈষয়িক কাজ আমাদের চলে না।

আমরা যে স্বার্থ নিয়ে এ আলোচনা করছি তার দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখতে গেলে রাষ্ট্রীয় শক্তি ও ভাষার গুরুত্ব বিচার অবান্তর। সোভিয়েত রাশা বিরাট রাষ্ট্র কিন্তু ঐ দেশে আছে এবং বহুকাল ধরে থাকবে আমাদের একটি মাত্র রাজদূতাবাস। রাশা আবার মারাত্মক রকমের কেন্দ্রপ্রাণ রাষ্ট্র—মস্কোর নাম বদলে তাকে 'সেণ্টার' নাম দেবার প্রস্তাব ঐ কারণেই একবার হয়েছিল—তাই তার উপরাষ্ট্র যথা, তুর্কোমানিস্থান উজবেকিস্থানে যে আমাদের রাজদূত আস্তানা গাড়বেন তার আশু সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি নে। অবশ্য উত্তম সাহিত্যরস আস্বাদনের জন্য রাশানের মতো ভাষা পৃথিবীতে বিরল।

পক্ষান্তরে রাষ্ট্রশক্তি হিসেবে আরবরা আজ পৃথিবীতে উঁচু আসনে বসে না। তার প্রধান কারণ, তারা নানা রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এবং ঠিক ঐ কারণেই আমাদের দৃষ্টিবিন্দু থেকে তাদের প্রাধান্য বেড়ে গেল। উপস্থিত আরব জাতি এই কটি রাষ্ট্রে বিভক্তঃ—ইরাক, সিরিয়া (শাম) লেবানন, হাদ্রামৃৎ, ট্রানস্‌জর্ডন, সউদী আরব, ইয়েমেন, মিশর, সুদান, টুনিসিয়া, আলজিরিয়া, মরক্কো, লিবিয়া। তা ছাড়া কুয়েৎ, বাহ্‌রেইন, ওমান ইত্যাদি। এদের সব কটি স্বাধীন নয়, কিন্তু ভগবানের আশীর্বাদে আমরা যেদিন অ্যাংলো-আমেরিকান আড়কাটির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আড়তদারের কাছ থেকে সোজা পেট্রল কেনবার দুই নম্বরের 'স্বরাজ' পাব সেদিন আরবের আনাচে-কানাচেও আমাদের কনসুলেট বসাতে হব। উপস্থিত, আমার যতদূর জানা, মিশর, সউদী আরব, ইরাকে আমাদের রাজদূতাবাস আছে। এদের সংখ্যা বাড়বে বই কমবে না।

কিন্তু রাষ্ট্রগুলোর এসব 'মেল' খুটিয়ে খুটিয়ে মেলাতে গেলে আমরা পুজোর বাজার পেরিয়ে শ্যামা পুজোয় পৌঁছে যাব। তাই সংক্ষেপে, বলি, আমার মনে হয়, স্বার্থের জন্য উপস্থিত স্প্যানিশ-ই সব চেয়ে প্রয়োজনীয়।

---

১ এখানে এম্বেসি হাই কমিশন, লিগেশন ইত্যাদির পার্থক্য সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলে দেওয়া ভালো। এই তিনটিই রাজনৈতিক যোগাযোগ এবং কূটনৈতিক কাজকর্ম চালায়। এম্বেসি এবং হাই-কমিশন পদমর্যাদায় একই--বৃটিশ ক্রাউনের আওতায় থাকলে এম্বেসির নাম হাই-কমিশন—লিগেশন পদমর্যাদায় ছোট। কনসুলেটের কাজ ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজন মতো একাধিক কনসুলেট থাকতে পারে—কিন্তু একাধিক এম্বেসি হয় না,—এবং সে-স্থানে কনসুলেট-জেনারেলও থাকে। ট্রেড কমিশন কনসুলেটের চেয়ে জাতে ছোট—অনেকটা এক্সপেরিমেণ্টাল পোস্ট-অফিসের মতো। ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়লে তার পদ-বৃদ্ধি হয়। কোনো কোনো দেশে আমাদের কনসুলেট না থাকলে, সেখানকার এম্বেসি-হাই-কমিশন-লিগেশন ঐ কাজও করে থাকে। এই সব তাবৎ প্রতিষ্ঠান আমাদের ফরেন অফিসের তাঁবেতে থাকে।

www.BanglaBook.org

আপনি বলবেন, ঐটুকু দেশ স্পেন—তার 'ভাঙা নৌকায়' আমাদের কতখানি 'সোনার ধান' ধরবে!

আমি স্পেনের কথা আদপেই ভাবছি না। আমি ভাবছি দক্ষিণ আমেরিকার কথা। সেখানে ডজনখানেক সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র। তাদের ভাষা স্প্যানিশ—হিস্পানী। ওদের গুটিকয়েকে আমাদের রাজদূতরা বেশ কিছুকাল হল ডেরা গেড়ে বসছেন। আমার বিশ্বাস সব কটাতে না হোক, বাকী অনেকগুলোতেই ক্রমে ক্রমে আমাদের রাজদূতাবাস বসবে। অতএব আমার সলা যদি নেন তবে স্প্যানিশ শিখুন।

ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে অধমের জ্ঞান অতিশয় অপ্রচুর। তবু বলবো, ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমে ক্রমে এদেরই সঙ্গে আমাদের বাড়বে। সংক্ষেপে তার কারণটা বলি ;—আমেরিকা ইয়োরোপ এবং রাশা তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, বলতে গেলে তাদের সম্পূর্ণ অর্থনীতি যুদ্ধ-প্রস্তুতির চর্তুদিকে এমনি কেন্দ্রীভূত করেছে যে তারা কিনতে চায় যুদ্ধের জন্য তাদের যে সব মালের দরকার এবং বেচতে চায় যুদ্ধের জন্য যার প্রয়োজন নেই। আর যুদ্ধ যদি লেগে যায় তবে আপনার অর্ডারগুলো তারা শিকেয় তুলে রাখবে, আপনার কাঁচা মাল বন্দরে বন্দরে পচবে। দক্ষিণ আমেরিকা এসব আওতার বাইরে। ওদের সঙ্গে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বেড়েই যাবে—আমাদের তৃতীয় 'স্বরাজ' লাভের পর। দশটা রাজদূতাবাস যদি তিনশটা চাকরি দিতে পারে তবে ব্যবসা-বাণিজ্য দেবে তিন হাজার কিংবা ত্রিশ হাজার। আর চাকরি ছেড়ে দিয়ে যদি ভাষার জোরে ব্যবসা চালান তবে তো আর কথাই নেই।

এস্থলে আরেকটি তত্ত্ব এবং তথ্যপূর্ণ ইঙ্গিত দি। ভাষা শেখার সময় গোড়ার দিকে সমগোত্রের ভাষা শিখে তাড়াতাড়ি ভাষার সংখ্যা বাড়িয়ে নেবেন। উদাহরণস্থলে বলি আপনি বাঙালী, আজ যদি আপনাকে নিছক ভাষার সংখ্যাই দেখাতে হয় তবে আপনার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে অসমীয়া এবং উড়িয়া নিয়ে। এ দুটি ভাষা বাঙলার এত কাছাকাছি যে আপনাকে বেগ পেতে হবে অতি কম। তারপর শিখবেন, হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী, গুরুমুখী। ঠিক ঐ রকমই পর্তুগীজ ইটালিয়ান ও ফ্রেঞ্চ ভাষা স্পেনিশ ভাষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আপনার বাঙলা জানা থাকলে অসমীয়া শিখতে কত দিন লাগার কথা? না হয় তারই ডবল ধরুন স্পেনিশ শেখা হয়ে গেলে পর্তুগীজ, কিংবা ফরাসিস্ শিখতে। ঠিক সেই রকম জর্মন ফ্লেমিশ এবং ডাচ পড়ে অন্য গোত্রে। একদা ব্রসেল্‌স্ শহরে আমি একখানা ফ্লেমিশ খবরের কাগজ কিনে পড়ে দেখি মোটামুটি বস্তুবাটা ধরে ফেলতে পেরেছি—অল্পস্বল্প যা জর্মন জানি তার-ই কৃপায়। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। আপনি অসমীয়া শিশুশিক্ষা কখনো পড়েন নি। একখানা অসমীয়া বই নিন। দেখবেন বারো আনা পরিমাণ অনায়াসে বুঝতে পারছেন। কিংবা বেতারে যখন 'অসমীয়া বার্তার' শোনেন তখন কি তার মোটা-মুটি অর্থ ধরতে পারেন না?

তাই এই অনুচ্ছেদের গোড়াতে ভাষার সংখ্যাবৃদ্ধির যে কথা তুলেছিলুম সেটাতে ফিরে যাই। অর্থাৎ গুরুর সাহায্যে যদি বিদ্যায়তনে আপনি স্পেনিশ আরম্ভ করেন তবে মাস দুই যেতে-না-যেতেই বাড়িতে কারো সাহায্য ছাড়া পর্তুগীজ কিংবা ফরাসী আরম্ভ করে দেবেন। ব্যাকরণখানার দু-দশপাতা

www.BanglaBook.org

ওলটাতে-পালটাতেই দেখবেন একসঙ্গে দুটো ভাষা আয়ত্ত করা কিছুমাত্র কঠিন কর্ম নয়। গোড়ার দিকে কিছুটা গুবলেট হয়ে যাবে সন্দ নেই। কিন্তু কিছুদিন পরে যদি সেটা কাটিয়ে উঠতে না পারেন তবে বুঝবেন ঐদিকে ভগবান আপনার প্রতি সদয় নন, তখন না হয় লেগে যাবেন মানুষ মারার ব্যবসাতে—যাকে অজ্ঞজন বলে ডাক্তারি, কিংবা রেলকলিশনের পরিপাটি ব্যবস্থা করাতে—যাকে অজ্ঞজন নাম দিয়েছে ইঞ্জিনিয়ারি। কিন্তু নিবেদন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ম্যাট্রিক বড় কঠিন পরীক্ষা। আপনি যদি সেটা পাস করে থাকতে পারেন তবে গোটাতিনেক ভাষা শিখতে পারবেন না কেন?

গোত্রবিচারে ফিরে যাই।

১। লাতিন গোত্র—স্পেনিশ, ফরাসিস্, পর্তুগীজ, ইটালিয়ান।

২। জর্মন গোত্র—জর্মন, ডাচ, ফ্লেমিশ।

৩। স্কান্ডিনেভিয়ান গোত্র—নরউইজিয়েন, সুইডিশ।

৪। তুর্কী গোত্র—তুর্কী (ওসমানলি তুর্কী, অর্থাৎ টার্কির ভাষা,—তুর্কমানিস্থানের ভাষা, জগতাই তুর্কী। প্রথমটা মুস্তফা কামালের মাতৃভাষা, দ্বিতীয়টা বাবুর বাদশার)—হাঙ্গেরিয়ান ও ফিনিশ কিন্তু এক হলেও শাখাতে বর্ণ-বৈষম্য প্রচুর।

৫। রাশান গোত্র—রাশান, পলিশ, ল্যাটাভিয়ান, স্লোভাক ইত্যাদি।

৬। ইরানী গোত্র—ইরানী ফার্সী ও কাবুলী ফার্সী—পার্থক্য সামান্য।

৭। আরবী গোত্র—আরবী, হীব্রু, ইন্ডিশ (অধুনা প্যালেস্টাইনে প্রচলিত প্রাচীন হীব্রুর অর্বাচীন রাষ্ট্রভাষা), আহ্‌মেরিক (আবিসিনিয়ান ভাষা)।

৮। চীনা গোত্র—চীনা, জাপানী, কোরিয়ান ইত্যাদি।

৯। এছাড়া টিরেটো-বর্মন গোত্রের বর্মী ইত্যাদি। মালয়, থাই, ইন্ডোনেশিয়ন ইত্যাদি।

অজানাতে এবং জানাতেও ছোট এবং বড় কোনো কোনো ভাষা বাদ পড়ে গেল। তাই নিয়ে শোক করবেন না। উপস্থিত এগুলো শিখে নিন। তা হলে অন্যগুলোর খবর আপনার থেকেই জানা হয়ে যাবে।

এর ভিতর সহজ ১ এবং ৬নং গোত্রের ভাষা, তার চেয়ে কঠিন ২ এবং ৩নং গোত্রের ভাষা, তার চেয়ে কঠিন ৫ নম্বরের গোত্র, তার চেয়েও কঠিন ৭নং, পারতপক্ষে ৮ নম্বরের পাড়া মাড়াবেন না (অবশ্য জাপানী তেমন শক্ত নয়), ৪ আর ৯ নম্বরের খবর জানি নে, তবে খুব শক্ত হওয়ার কথা নয়।

দুই গোত্রের দুটো ভাষা একসঙ্গে শেখা যে খুব কঠিন তা নয়, তবে তার জন্য সৎপ্রতিষ্ঠান ও সৎগুরু প্রয়োজন। এই দুইটির বড়ই অভাব—এই দুঃসংবাদটি যতক্ষণ পারি চেপে গিয়েছিলুম : আর পারা গেল না। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে এই সুসমাচারটিও বিতরণ করছি যে ভারতবর্ষের কোথাও এমন সুব্যবস্থা নেই যে তার পাল্লায় পড়ে আপনি হেরে যাবেন। এই যে আমাদের রাজধানী দিল্লী শহর, সেখানকার লোক কেন্দ্রের চাকরি বাবদে হামেহাল তেজ-নজর ওকীবহাল সেখানে যে দু'একটি প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলো অতিশয় রদ্দী অথচ টাকা লুটছে এন্তের। ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি, কলকাতায় নাকি গোটাদুত্তিন প্রতিষ্ঠান আছে সেখানে বিদেশী ভাষা শেখানো হয়। খোঁজ করলে দেখবেন, খুড়ো-জেঠার আমল থেকে বাড়িতে দু'চারখানা মার্লবর পড়ে

www.BanglaBook.org

আছে, কিন্তু ইংরিজী ছাড়া কোনো বিদেশী ভাষা কেউ শেখেন নি। আমিও ভূ-ভারতে এমন প্রাণীর সংস্পর্শে আসি নি যিনি ঐসব প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে কলকাতাতে বসে কোনো বিদেশী ভাষা শিখেছেন। তবে ইদানীং অবস্থা একটু ভালো হয়েছে।

অধমের শেষ সাবধান বাণীঃ সব কটা আণ্ডা একই ঝুড়িতে রাখবেন না—কুল্যে শিনির্ একই দরগায় উজোড় করে দেবেন না। তার সরল অর্থ বি-এ এম-এ পাস অবহেলা করে হঠাৎ তেরিয়া হয়ে বিদেশী ভাষার পশ্চাদ্ধাবন করবেন না। এসব পড়াশুনো বি-এ, এম-এ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চালাবেন—আণ্ডাটা সিকিটাক কমিয়ে দিয়ে ফুটবল দেখাটা একটু মুলতুবী রেখে দিয়ে। একদম ছেড়ে দিতে বলবো কেন, তওবা, তওবা, তাহলে আপনার বাঙালীত্বই যে উপে যাবে। ভাষা শিখে পরীক্ষা দিয়ে যদি সেদিকে নোকরি না জোটে তবে বি-এ, এম-এ পাস করে যা করতেন তাই করবেন। তা হলে অন্তত আমার গলায় গামছার ফাঁস লাগিয়ে বলতে পারবেন না, 'তবে রে—, তোর কথায় না—ইত্যাদি।'

অনুকরণ না হনুকরণ?

আগে-ভাগেই বলে রাখছি, এ-লেখা সমালোচনা নয়।

সমালোচনা লেখবার মতো শক্তি—দুষ্টলোকে বলে, শক্তির অভাব—আমার এবং আমার মতো অধিকাংশ লোকের নেই। গল্পছলে নিবেদন করিঃ—

প্রতি রববারে এক বঁড়শে সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি মাছ ধরে। বড় মাছের শিকারী, তাই ফাতনা ডোবে কালেকস্মিনে, আকছার রববারই যায় বিন্-শিকারে। তারই একটু দূরে আরেকটা লোক প্রতি রববারে এসে বসে, এবং তামাম দিনটা কাটায় গভীর মনোযোগের সঙ্গে ওর মাছধরা দেখে দেখে। দু'জনায় আলাপ-পরিচয় নেই। মাস তিনেক পর শিকারী লোকটার 'আলসেমি' দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার পর একটু বিরক্তির সুরে শুধালে, 'ওহে, তুমি তাহলে নিজেই মাছ ধরো না কেন?'

লোকটা আঁৎকে উঠে বললে, 'বাপস! অত ধৈর্য আমার নেই।'

সমালোচনা লেখার ধৈর্য আমার নেই।

আর কি-ই বা হবে সমালোচনা লিখে? কটা সুস্থ লোক সমালোচনা পড়ে? কটা বুদ্ধিমান মাছ টোপ গেলে? আলগোছে তফাতে থেকে সমালোচক প্রবন্ধে একটু-আধটু ঠোক্কর দেয় অনেককেই—অর্থাৎ রোক্কা পয়সা ফেলে মাসিকটা যখন নিতান্তই কিনেছে তখন পয়সার দাম তোলবার জন্য একটু-আধটু খোঁচাখুঁচি করে। ফলে, চারের রস যত না পেল বঁড়শির খোঁচাতে তার চেয়ে বেশী জখম হয়ে "দুত্তোর ছাই" বলে তাস-পাশাতে ফিরে যায়।

সমালোচকরা ভাবেন, পাঠকসাধারণ বোকার পাল। ওরা তাঁদের মুখে ঝাল চেখে বই কেনে। তা হলে আর দেখতে হত না। মারোয়াড়ীরা সস্তায় রাবিশ পাণ্ডুলিপি কিনে পয়সা দিয়ে উৎকৃষ্ট সমালোচনা লিখিয়ে রাবিশগুলো

www.BanglaBook.org

খুচকারী (অর্থাৎ খুচরোর লাভে, পাইকারীর পরিমাণে) দরে বিক্রি করে ভুঁড়ি বাড়িয়ে নিতো—ফাও হিসেবে দেশে নামও হয়ে যেত, 'সৎসাহিত্য' তথা 'সমালোচক'দের পৃষ্ঠপোষকরূপে।

আমার কথা যদি চট করে বিশ্বাস না করতে পারেন তবে চিন্তা করে দেখুন, আপ্তবাক্য নিবেদন করছি, 'পয়সা দিয়ে সমালোচনা লেখানো যায়, পয়সা দিয়ে কবিতা লেখানো যায় না।' না হলে আমেরিকায় ভালো কবির অভাব হত না। সমালোচকের অভাব সেখানে নেই এবং বর্ণে গন্ধে তাঁরা অস্মদ্দেশীয় সমালোচকদেরই মতো।

পলিটিশিয়ানরাও ভাবেন প্রোপাগাণ্ডিস্ট (অর্থাৎ সমালোচক)-দের দিয়ে নিজ পার্টির প্রশংসা কীর্তন করিয়ে নিয়ে বাজিমাৎ করবেন। কিন্তু ভোটার—ভোটার যা পাঠকও তা—আহাম্মুখ নয়, যদিও সরল বলে সত্য বুঝতে তার একটু সময় লাগে। না হলে আওয়ামীরা মুসলিম লীগকে কস্মিনকালেও হটাতে পারতো না।

আমিও মাঝে-মধ্যে সমালোচনা পড়ি, কারণ আমিও আর পাঁচজন পাঠকের মতো পয়সা ঢেলেই কাগজ কিনি। তবে আমার ধরন স্পানিয়ার্ডদের রুটি খাওয়ার মতো। শুনেছি, স্পানিয়ার্ডরা বছরের পয়লা দিন গির্জায় উপাসনা সেরে এসে এক টুকরো রুটি চিবোয়—কারণ প্রভু যীশুখৃষ্ট তাঁর প্রার্থনায় বলেছেন, 'আর আমাদের অদ্যকার রুটি দাও।' খানিকটে চিবিয়ে থু থু করে ফেলে দিয়ে বলে, 'তওবা, তওবা, সেই গেল বছরের রুটিরই মতো যাচ্ছেতাই সোয়াদ।' তারপর বছরের আর ৩৬৪ দিন সে খায় কোর্মা-কালিয়া কটলেট-মমলেট। আমি সমালোচনার শুকনো রুটি বছরের মধ্যে চিবুই মাত্র একটি দিন এবং প্রতিবারই হৃদয়ঙ্গম হয়, সমালোচনার স্বাদ-গন্ধ সেই গেল বছরের মতো—এক বছরে কিছুমাত্র উন্নতি করতে পারে নি।

কথাটা যে ভাবে বর্ণনা করলুম, তাতে পাঠকের ধারণা হওয়া বিচিত্র নয় যে, এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। কিন্তু মোটেই তা নয়। অভিজ্ঞতাটা পাঠক-সাধারণ মাত্রেরই নিদারুণ নিজস্ব। অবশ্য সমালোচকদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁরা একে অন্যের সমালোচনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মনোযোগ সহকারে পড়ে থাকেন। কেন পড়েন? জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য? রাম রাম! শুধুমাত্র দেখবার জন্যে কে তার মতে সায় দিয়েছে, কে দেয় নি এবং সেই অনুযায়ী দল পাকানো, ঘোঁট বাড়ানো, শক্তি সঞ্চয় করে রুটিটা আণ্ডাটা—থাক্।

অবশ্য সমালোচকদের সমালোচনা করার কুবুদ্ধি যদি আমার কখনো হয় —এতক্ষণ যা করলুম সেটা তারই সেতার বাঁধা মাত্র—তা হলে সেটা আপনাদেরই পাতে নিবেদন করবো। তবে ধর্মবুদ্ধি তখনো আপনাদের সাবধান করে দেবে, ও লেখাটা না পড়তে।

* * *

মূল বক্তব্যে আসি। ইদানীং আমি বাঙলার বিভিন্ন জায়গা থেকে, এবং বাঙলার বাইরে থেকেও কয়েকখানা চিঠি পেয়েছি। এঁরা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন, "কি প্রকারে ভালো লেখক হওয়া যায়?"

প্রথমটায় উল্লসিত হয়েছিলুম। যাক, বাঁচা গেল। বাঙলা দেশ তা হলে স্বীকার করেছে, আমি ভালো লেখক। এবারে তা হলে কলকাতা-দিল্লীতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গিয়ে কিঞ্চিৎ তম্বির করলেই দু চারটে প্রাইজ পেয়ে যাব, লোকসভার সদস্য-গিরি, কলচেরল ডেলিগেশনের মেম্বরী এ-সবও বাদ যাবে না। বিদেশ যাবার সুযোগও হয়ে যাবে—বিলেত দেখার আমার ভারী শখ, অর্থাভাবে এতদিন হয়ে ওঠে নি। ইংরিজীটা জানি নে, এতদিন এই একটা ভয় মনে মনে ছিল। এখন বুলগানিন, চু-এন-লেইয়ের কল্যাণে সেটাও গেছে। এঁরা ইংরিজী না জেনে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু হায়, এত সুখ সইবে কেন? আমার গৃহিণী নিরক্ষরা—টিপসই করে হালে আদালতে তালাকের দরখাস্ত করেছেন। তালাকটা মঞ্জুর না হওয়া পর্যন্ত আমার সঙ্গেই আছেন। তাঁর কাছে চিঠিগুলো পড়ে নিজের মূল্য বাড়াতে গিয়েছিলুম। তিনি করলেন উল্টো অর্থ। সেটা আরো সরল। ব্যবসাতে যে দেউলে হয়েছে, তারই কাছে আসে লোক সলার সন্ধানে; ফেল-করা ছেলে পাস-করার চেয়ে ভালো প্রাইভেট ট্যুটর হয়।

এর উত্তর আমি দেব কি? গৃহিণী যে কটা গল্প জানেন সব কটাই আমার সঙ্গে টায়-টায় মিলে যায়। মনে হয় আমার পূজ্যপাদ শ্বশুর-শাশুড়ী ছেলেবেলা থেকে তাঁকে এই তালিমটুকুই শুধু দিয়েছেন, স্বামীর গোদা পায়ের গোদটি কি প্রকারে বারে বারে দেখিয়ে দিতে হয়। অবশ্য তার জন্য যে বিশেষ তালিমের প্রয়োজন হয় সেটা অস্বীকার করলেও চলে। ওটা তাদের বিধিদত্ত জন্মলব্ধ অশিক্ষিতপটুত্ব। যে-সব সমালোচকদের কথা পূর্বে নিবেদন করেছি, তাদের বেলাও এই নীতি প্রযোজ্য।

ব্রাহ্মণীর আপ্তবাক্য আমি মেনে নিয়েছি। তিনি তালাকের দরখাস্তটি উইথড্র করেছেন—শুনে দুঃখিত হবেন।

* * *

শঙ্করাচার্য দর্শনরণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়ে বলেছিলেন, 'সাংখ্যমল্লকে আহ্বান করো। সেই মল্লদের অধিপতি। তাকে পরাজিত করলে অন্যান্য সফরী-গোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধ করে অযথা কালক্ষয় করতে হবে না।' আমি শঙ্কর নই। তাই সব চেয়ে সরল প্রশ্নটির উত্তর দেবার চেষ্টা করব।

প্রশ্নটি এই: 'মপাসাঁর ছোট গল্প অপার আনন্দ দেয়, কিন্তু তাঁর অনুকরণকারীদের গল্প এত বিস্বাদ কেন? অপিচ, মপাসাঁ ছোট গল্প লেখার যে কাঠামো তৈরি করে দিয়ে গিয়েছেন তার অনুকরণ না করে গল্প লিখিই বা কি প্রকারে?'

যাঁরা সঙ্গীত আয়ত্ত করবার চেষ্টা করেছেন তাঁরাই জানেন, ওস্তাদ যেভাবে গান গান তারই হুবহু অনুকরণ করতে হয় ঝাড়া দশটি বছর ধরে। ভারতনৃত্য শিখতে গেলে মীনাক্ষীসুন্দরম্ পিল্লের নৃত্য অনুকরণ করতে হত ততোধিক কাল। স্যাকরার শাগরেদকে কত বছর ধরে একটানা গুরুর অনুকরণ করে যেতে হয়, তার ঠিক ঠিক খবর আমার জানা নেই। ভারতবর্ষে এই ছিল রেওয়াজ।

সাহেবরা এ দেশে এসে বললে, 'এত বেশী অনুকরণ করলে নিজস্ব সৃজন-শক্তি (অরিজিনালিটি) চাপা পড়ে যায়। ফলে কোনো কলার আর উন্নতি হয় না।' কথাটা হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এর মধ্যে অনেকখানি সত্য লুকনো আছে।

www.BanglaBook.org

কিন্তু তার বাড়াবাড়িতে কি হয়, সেটাও তো নিত্য নিত্য স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। গুণীজনের উচ্চাঙ্গ সৃষ্টি অধ্যয়ন না করেই আরম্ভ হয়ে যায় 'এপিক' লেখা, দু'কদম চলতে না শিখেই ডান্‌স্‌ 'কম্পোজ' করা, আরো কত কী, এবং সর্বকর্মে নামঞ্জুর হলে সমালোচক হওয়ার পন্থা তো সব সময়েই খোলা আছে। সেই যে পুরনো গল্প—শহর-পাগলা ভাবতো, সে বিধবা মহারানী ভিক্টোরিয়ার স্বামী। পাগলা সেরে গেছে এই রিপোর্ট পাওয়ার পর পাগলাগারদের বড় ডাক্তার তাকে ডেকে পাঠিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে শুধালেন, 'তা তুমি খালাস হওয়ার পর করবে কি?' সুস্থ লোকের মতো বললে, 'মামার বড় ব্যবসা আছে, সেখানে ঢুকে যাবো।' 'সেটা যদি না হয়?' চিন্তা করে বললে, 'তা হলে আমার বি-এ ডিগ্রী তো রয়েছেই—টুইশনি নেব!' তারপর এক গাল হেসে বললে, 'অত ভাবছেন কেন, ডাক্তার? কিছু না হলে যে কোনো সময়ই তো আবার মহারানীর স্বামী হয়ে যেতে পারবো।' সমালোচক সব সময়ই হওয়া যায়।

তৃতীয় দল অন্য পন্থা নিলে। ওস্তাদদের হুবহু নকল তারা করলে না—তাতে বয়নাক্কা বিস্তর। আবার বিন্‌-তালিমের 'অরিজিনালিটি' পাঠকসাধারণ পছন্দ করে না। উপায় কি? তাই তারা ওস্তাদদের কতকগুলো বাছাই বাছাই জিনিস অনুকরণ করলে এবং শুধু অনুকরণই না, বাছাই বাছাই জিনিসগুলোর মাত্রা দিলে বাড়িয়ে।

চার্লি চ্যাপলিন একবার নাম ভাঁড়িয়ে গোপনবাসের জন্য গেছেন চিলির এক অজানা শহরে। বেড়াতে বেড়াতে দেখেন, দেয়ালের গায়ে বিজ্ঞাপন 'সোমবার রাত্রে শহরের কনসার্ট ঘরে চার্লি চ্যাপলিনের নকল করার প্রতিযোগিতা হবে। ভ্যাগাবন্ড চার্লির বেশভূষা পরিধান করে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে স্টেজের ইস্‌পার উস্‌পার হতে হবে চার্লি ধরনে। সর্বোৎকৃষ্ট অনুকরণের পুরস্কার পঁচিশ টাকা।'

চার্লি ভাবলেন, এখানে তো কেউ তাঁকে চেনে না, দেখাই যাক না, প্রতিযোগিতায় ছদ্মনামে কি হয়।

ছাব্বিশ জন প্রতিযোগীর ভিতর চার্লি হলেন তেরো নম্বর।

তার সরল অর্থ, ঐ ছোট শহর, ধেড়ধেড়ে ডিহি গোষ্ঠীপুরে বারোজন ওস্তাদ রয়েছেন যাঁরা চার্লিকে হাতে-কলমে দেখিয়ে দিলেন চার্লির পার্ট কি করে প্লে করতে হয়।

চার্লি শিরে করাঘাত করে বলেছিলেন, 'হে ভগবান, আমার অভিনয় যদি এই বারো জনের মতো হয় তবে আমি আত্মহত্যা করে মরবো।'

ব্যাপারটা হয়েছে, চার্লি যেখানে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা দিয়ে হৃদয়ের গভীর অনুভূতি প্রকাশ করেন এরা সেটাকে দশগুণ বাড়িয়ে দিয়ে মস্করাতে পরিণত করেছেন, চার্লি যেখানে চোখের জলের রেশ মাত্র দেখিয়েছেন এঁরা সেখানে হাউমাউ করে আসমান-জমিন ফাটিয়ে আড়াই ঘাটি চোখের জল ফেলেছেন, চারুকলার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে চার্লি যেখানে অখণ্ড সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রশান্ত শিব সৃষ্টি করেছেন সেখানে তাঁরা প্রত্যেক অঙ্গে ফাইলেরিয়ার গোদ জুড়ে বানিয়ে তুলেছেন এক একটি বিকট মর্কট।

ঘোরায়া উপমা দিতে হলে বলি, ভেজাল সরষের তেলেরই বড় বেশী সোনালী

www.BanglaBook.org

ঝাঁঝ—মারাত্মক তুখোড়।

রবীন্দ্রনাথের 'দোদুল-দোলা', 'ব্যাকুল বেণু', 'উদাস হিয়াকে', 'দোলাতর', 'বেণুতর' করে নিত্য নিত্য কত না নব নব মস্করা হচ্ছে। কিন্তু তবু চার্লি বেঁচে গেছেন। কারণ আর যা-ই হোক মার্কিন মুল্লুক পরশু দিনের গড়া নবীন দেশ। ভেজালে এদের অভিজ্ঞতা আর কতটুকু? প্রাচীন চীনের কাহিনী শ্রবণ করুন।

একদা চীন দেশে এক গুণীজ্ঞানী, চরিত্রবলে অতুলনীয় বৌদ্ধ শ্রমণের আবির্ভাব হয়। যেমন তাঁর মধুর সরল শিশুর মতো চলাফেরা-জীবনধারা, তেমনি তার অদ্ভুত বচনবিন্যাস। বুদ্ধের কীর্তিকাহিনী তিনি কখনো বলতেন বলদৃপ্ত কণ্ঠে, কখনো সজল করুণ নয়নে—তথাগতেরই মতন তখন তাঁর সৌম্যবদন দেখে, আর উৎসাহের বচন শুনে বহু শত নরনারী একই দিনে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতো। ক্রমে ক্রমে তাঁর মাতৃভূমির সর্বত্র বৌদ্ধধর্মের জয়ধ্বনি বেজে উঠলো। বুদ্ধের জীবনাদর্শ বহু পাপীতাপীকে ধর্মের মার্গ অনুসরণে অনুপ্রাণিত করলো।

দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করার পর তাঁর মৃত্যুক্ষণ কাছে এল। তাঁর মন কিছু শান্ত, তাঁর চিত্ত নিষ্কম্প প্রদীপশিখাবৎ। শুধু একটি চিন্তাবাত্যা ক্ষণে ক্ষণে তাঁর মুমূর্ষু প্রদীপশিখাকে বিতাড়িত করছে। শিষ্যেরা বুঝতে পেরে সবিনয় জিজ্ঞেস করলে, সেবাতে কোন ত্রুটি হচ্ছে কিনা।

গুরু বললেন, 'না। ইহলোক ত্যাগ করতে আমার কোনো ক্ষোভ নেই। আমার মাত্র একটি ভাবনা। আমার মৃত্যুর পর আমার কাজের ভার কে নেবে?'

শিষ্যেরা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। তাঁর চরিত্রবল কে পেয়েছে, তাঁর বক্তৃতাশক্তি কার আছে যে এ-কঠিন কাজ কাঁধে তুলে নেবে?

গুরু দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

এমন সময় অতি অজানা এক নূতন শিষ্য সামনে এসে বললে, 'আমি এ ভার নিতে পারি।'

গুরুর বদনে প্রসন্নতার দিব্য জ্যোতি ফুটে উঠলো। তবু ঈষৎ দ্বিধার কণ্ঠে শুধালেন, 'কিন্তু বৎস, তোমাকে তো আমি চেনবার অবকাশ পাই নি। তুমি কি সত্যই এ কাজ পারবে? ঐ দেখো, আমার দীর্ঘদিনের শিষ্যেরা সাহস না পেয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। আচ্ছা দেখি, তুমি অমিতাভের জীবনের যে কোনো বিষয় নিয়ে একটি বক্তৃতা দাও তো!'

বিস্ময়! বিস্ময়!—সেই শিষ্য তখন গলা খুলে, গাধার মতো—হুবহু গাধার মতো, চেঁচিয়ে উঠলো। কিছু না, শুধু গাধার মতো চেঁচালে।

সবাই বাক্যহীন নিস্পন্দ।

ব্যাপার কি?

গুরুর মাত্র একটু সামান্য ত্রুটি ছিল। তিনি বক্তৃতা দেবার সময় অন্য বক্তাদের তুলনায় একটু বেশী চিৎকার করে কথা বলতেন। ভুঁইফোঁড় শিষ্য ভেবেছে ভালো করে চেঁচাতে পারাতেই উত্তম বক্তৃতার গূঢ় রহস্য। ঐ কর্মটি সে করতে পারলে তাবৎ মুশকিল হবে আসান। তাই সে চাঁচানোর চ্যাম্পিয়ন রাসভরাজের মতো চেঁচিয়ে উঠেছে।

আমার গুরুদেবের পিতৃতুল্য অগ্রজ সত্যদ্রষ্টা প্রাতঃস্মরণীয় ঋষি দ্বিজেন্দ্র-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নাথ বলেছেন,

'To imitate-এর বাঙলা, অনুকরণ।
To ape-এর বাঙলা, হনুকরণ।'

এস্থলে রাসভকরণ।

ফরাসী-বাঙলা

রবীন্দ্রনাথ নাকি কোনো এক স্থলে খেদ করেছেন, আমরা ইয়োরোপের যে-টুকু চিনলুম সেটা ইংরেজের মারফতে।

তিনি ঠিক কি বলেছিলেন মনে নেই বলে অপরাধ মেনে নিবেদন করি, ইংরেজ বরঞ্চ চেষ্টা করেছে আমরা যেন ইয়োরোপকে না চিনতে পারি।

ইংরেজ যখন এদেশে রাজত্ব করতো তখন দু'টি প্রচারকর্মে মেতে থাকতে সে বড় আনন্দ পেত। তার প্রথম, বিশ্বজনকে জানানো যে, ভারতীয়েরা ড্যাম নিগার, কালা আদমী, তাদের কোনো প্রকারের কল্‌চর্‌ নেই। দ্বিতীয়, ভারতীয়দের জানানো, ইংরেজ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাত এবং তাই (আ ফর্তেরিয়ার) ইয়োরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ নেশন তো বটেই। প্রমাণস্বরূপ শেক্‌স্‌-পিয়রের নাম করলে।

আমরা তখন আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে যাচাই-পরখ করে দেখলুম, কথাটা ঠিক ; শেক্‌স্‌পিয়রের মতো কবি পৃথিবীতে কম,—নেই বললেও চলে। ইংরেজীতেই পড়লুম, ফরাসী-জর্মন-ওলন্দাজ-দিনেমার সবাই এ-কথা স্বীকার করেছে। তাই আমরা ইংরেজের বাদবাকী দাবীগুলোও সুড়সুড় করে মেনে নিলুম। ঘড়েল মিথ্যে সাক্ষী—কনফিডেন্‌স্‌ ট্রিক্‌স্‌টার—এইভাবেই সরল জনকে আপন সব পচা মাল পাচার করে দেয়।

ইংরেজ কিন্তু এ-কথা বলতে ভুলে গেল, উপন্যাসে তার টলস্টয় নেই, গল্পে তার মপাসাঁ নেই, চিত্রকলায় তার রাফায়েল নেই, ভাস্কর্যে তার মাইকেল এঞ্জেলো নেই, দর্শনে কান্ট নেই, নৃত্যে পাভলোভা নেই, ধর্মে লুথার নেই, সঙ্গীতে বেটোফেন নেই।

বিশেষ করে বেটোফেনের কথাই তুললুম।

ইংরেজ জাত সুর-কানা। তাই সে বেটোফেনের নাম করে না। তাই ইংরেজের বাড়িতে সঙ্গীত-চর্চা নেই। যদি থাকতো তবে এ-দেশের বড় সায়েবদের বাড়িতেও সে-চর্চা আসন পেত। আমরাও ইউরোপীয় সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচিত হতুম। ইংরেজ চর্চা করলে এবং আমাদের শেখালে—জ্যাজ্‌ যেটা তার খুড়তুতো ভাই মার্কিন শিখলে তাদের গোলাম নিগ্রোদের কাছ থেকে।

অতি অবশ্য আমাদেরও দোষ আছে। আমাদের ছেলেমেয়েরা হাজারে হাজারে ফ্রান্স্‌-জর্মনী-ইতালী-রুশে যায় নি বটে, কিন্তু শতে শতে তো গিয়েছে। তাদের মধ্যে যে ক'জন ইয়োরোপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন তাঁদের সংখ্যা এক হাতের এক আঙুলে গোনা যায় (এবং

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আশ্চর্য, যে মহাজন আমাদের সঙ্গে ফরাসী সাহিত্যের ঘনিষ্ঠতম পরিচয় ঘটিয়ে দিলেন তিনি কখনো ফ্রান্সে যান নি—তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

'দেশ' পত্রিকার এ সংখ্যা ফরাসিস্ সাহিত্য নিয়ে। অতএব সেই বিষয়-বস্তুর ভিতরেই নিজেকে সীমাবদ্ধ করি।

ইংরিজী ভাষা গম্ভীর এবং জটিল কিন্তু তার প্রসাদগুণও আছে। ফরাসী চটুল ও রঙীন। অতিশয় গম্ভীর বিষয় আলোচনা করার সময়ও ফরাসী কেমন যেন একটুখানি তরল থেকে যায়। পক্ষান্তরে রসিকতা করার সময়ও ইংরিজী তার দার্ঢ্য সম্পূর্ণ বর্জন করতে পারে না। চার্লস ল্যাম, এমন কি জেরম্ কে জেরম্ পর্যন্ত যে ভাষা ব্যবহার করেছেন সেটা ধ্রুপদ। উড্হাউসে আমরা সর্বপ্রথম চটুলতা পাই।

কিন্তু এহ বাহ্য। ফরাসী ভাষার সর্বপ্রধান গুণ তার স্বচ্ছতা, তার সরলতা। ফরাসীরা নিজেই বলেন, 'যে বস্তু স্বচ্ছ (ক্ল্যার, ক্লিয়ার) নয় সে জিনিস ফরাসী নয়।' আমাদের দেশে আজকাল যে দুর্বোধ্য অবোধ্য পদ্য বেরয় সে 'মাল' প্রথম যখন ফ্রান্সে বেরতে আরম্ভ করল তখন গুণী আনাতোল ফ্রাঁস বলেছিলেন, 'যে মধুর ললিত বয়সে মানুষ অবোধ্য জিনিস ভালোবাসে আমার সে বয়স পেরিয়ে গিয়েছে ; আমি আলো ভালোবাসি।' তাই আরেক গুণী শেষ কথা বলেছেন, 'স্বচ্ছতা, স্বচ্ছতা পুনরপি স্বচ্ছতা।'

ফরাসী চটুলতা হয়ত অনেকেই অপছন্দ করতে পারেন কিন্তু ফরাসী স্বচ্ছতা বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্যে যদি আসতো তবে আর কিছু না হোক, আমাদের মনন-সাহিত্য যে অনেকখানি লোকপ্রিয় হত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। শ্রীযুত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যদি আরো একটুখানি ফরাসী আওতায় আসতেন তবেই ঠিক বোঝা যেত তাঁর দেবার মতো সত্যিই কিছু ছিল কিনা। এ বিষয়ে বরঞ্চ বলবো, শ্রীযুত অন্নদাশঙ্করের লেখা অনেকখানি ফরাসিস্।

শব্দতত্ত্ব এবং ভাষাতাত্ত্বিকেরা ঠিক ঠিক বলতে পারবেন কিন্তু সাধারণ পাঠক হিসাবে আমার নিবেদন, বাঙলা ভাষার উপর ফরাসী ভাষার (language) প্রায় কোনো প্রভাবই পড়ে নি। বাঙলাতে কটি ফরাসী শব্দ ঢুকেছে সে কথা প্রায় পাঁচ আঙুলে গুনেই বলা যায়। অবশ্য এইটেই শেষ যুক্তি নয় ; আমরা বাঙলাতে প্রচুর আরবী এবং ফার্সী শব্দ নিয়েছি বটে কিন্তু ঐ দুই ভাষার প্রভাব আমাদের উপরে প্রায় নেই। কিন্তু অন্য কোনো বাবদেও ফরাসী ভাষার প্রভাব বাঙলার উপর আমি বড় একটা পাই নি।

সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমার ব্যক্তিগত দৃঢ়বিশ্বাস ইনি ফরাসী সাহিত্যের যতখানি চর্চা করেছেন ততখানি চর্চা বাঙলা দেশে তো কেউ করেনই নি, অল্প ইংরেজ জর্মন ইতালিয়ই—অর্থাৎ অফরাসিস—করেছে। ছোট গল্প, উপন্যাস, নাট্য, কবিতা, ভ্রমণ-কাহিনী, কত বিচিত্র বস্তুই তিনি ফরাসী থেকে অনুবাদ করে বাঙলায় প্রচার করেছেন। এই যে ইংরিজী এবং ফরাসী পাশাপাশি জাতের ভাষা—সেই ইংরিজীতেই পিয়ের লোতির লেখা 'ভারত ভ্রমণ' অনুবাদ করতে গিয়ে ইংরেজ অনুবাদক হিমসিম খেয়ে গিয়েছেন অথচ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদে মূল ফরাসী যে ঠিক ঠিক ধরা পড়েছে তাই নয়, প্রাচ্য দেশীয় আবহাওয়াও সম্পূর্ণ বজায় রয়েছে।

www.BanglaBook.org

এই জ্যোতিরিন্দ্রের বাঙলা ভাষাতেই ফরাসী ভাষার কোনো প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় না।

* * *

বরঞ্চ ফরাসী শৈলীর (style) প্রভাব বেশ কিছুটা আছে।

বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকরা পাকাপাকি ভাবে বলতে পারবেন বাঙলার কোন্ লেখক সর্বপ্রথম ফরাসীর সঙ্গে বাঙলার যোগসূত্র স্থাপনা করেছিলেন ; আমি শুধু সার্থক সাহিত্যিকদের কয়েকজনের কথাই তুলবো।

মাইকেলের সার্থক সৃষ্টিমাত্রই গম্ভীর—সংস্কৃত এবং লাতিনের ক্লাসিকাল গুণের সঙ্গে তিনি তাঁর বীণার তার বেঁধে নিয়েছিলেন। ওদিকে তিনি আবার অতি উত্তম ফরাসী জানতেন—নূতন ভাষা তিনি যে কত তাড়াতাড়ি শিখতে পারতেন, সে কথা আজকের দিনের ভাষার 'ব্যবসায়ী'রা কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না—কিন্তু সে 'রঙীলা ঘরানা' তাঁর ভাষার উপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারে নি।[১] তাই কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি নে তিনি লা ফঁতেনের ধরনে 'ফাব্‌ল্' (ফেব্‌ল্) রচনা করলেন কেন? লা ফঁতেন তাঁর অনেক গল্প নিয়েছেন ঈশপের গম্ভীর গ্রীক থেকে, কিন্তু লিখেছেন অতি চটুল ফরাসী কায়দায়। অথচ তাঁরই অনুকরণে যখন মাইকেল বাঙলাতে 'ফাব্‌ল্' রচনা করেছেন তখন তিনি গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলছেন,

'রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে—'

দুই সুর একেবারে ভিন্ন। অথচ মাইকেলের প্রায় সব ক'টি 'ফাব্‌লে'র উৎস লা ফঁতেন।

প্রহসনেও তাই। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-র মূলে মলিয়ের। অথচ শৈলীতে গম্ভীর।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা পূর্বেই নিবেদন করেছি। যদিও তাঁর ভাষাতে ফরাসী প্রভাব নেই তবু তিনি অনুবাদের মারফতে যে শৈলী এবং বিষয়বস্তুর অবতারণা করে গেলেন তার প্রভাব বাঙলা সাহিত্যের দূর-দূরান্ত কোণে পৌঁছে গিয়েছে এবং আরো বহুদিন ধরে পৌঁছবে।

তোয়েফিল গতিয়ে, এমন কি বাল্‌জাক্‌ও মপাসাঁর পূর্বে কয়েকটি সার্থক ছোট গল্প লিখেছেন কিন্তু আজ শুধু ফরাসিস না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্বীকার করে, মপাসাঁই ছোট-গল্পের আবিষ্কর্তা। তিনিই প্রথম দেখিয়ে দিলেন, দীর্ঘ উপন্যাস না লিখেও পাঠককে কি প্রকারে কাহিনী-রসে আপ্লুত করা যায় ('কণ্ঠহার' গল্প নিয়ে সাত-ভলুমী 'জাঁ ক্রিস্তফ' লেখা যায়)। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জন্য ডস্‌তেয়ফ্‌স্‌কির মতো ভলুম না লিখেও সূত্ররূপে সেই রস পাঠকের মনে সঞ্চারিত করা যায়।

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, ছোটগল্প-লেখক রবীন্দ্রনাথ যবে থেকে জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুরের মারফতে মপাসাঁকে চিনতে শিখলেন তবে থেকেই তাঁর গল্প ঋজু কাঠামো নিয়ে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে আত্মপ্রকাশ পেল (অবশ্য প্রথম থেকেই তাঁর গল্পে থাকতো প্রচুর গীতরস এবং পরবর্তী যুগে তিনি এক

---

১ বরঞ্চ গৌর বসাককে লেখা চিঠিগুলোতে প্রচুর ফরাসী ফ্রিভলিটি পাবেন।

www.BanglaBook.org

মিস্‌টিক নবরসে ছোট গল্পকে এক নবরূপ দান করেন।

* * *

দান্তে, শেক্‌স্‌পিয়র, গ্যোটে, কালিদাস কেউই পৃথিবীর সুদূরতম সাহিত্যকে এতখানি প্রভাবান্বিত করতে পারেন নি মপাসাঁ যতখানি করেছেন। এটম্‌ বম্‌ হয়ত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আবিষ্কার কিন্তু বাইসিক্‌ল ও সেলাইয়ের কল যে রকম গ্রামে গ্রামে পৌঁচেছে এটম্‌ বম্‌ শেক্সপিয়র সে রকম সাহিত্যে সাহিত্যে নব নব সৃষ্টির অনুপ্রেরণা দিতে পারেন নি।[২]

অথচ আজো যখন কোনো মানুষের জীবনে কোনো এক অদ্ভুত বিচিত্র অভিজ্ঞতা আসে সে তখন তার প্রকাশ দেবার চেষ্টা করে ছোট গল্পের মাধ্যমে, অর্থাৎ মপাসাঁর কাঠামো নিয়ে। ইংরেজ, জর্মন, রুশ, বাঙলা এ-সব অর্বাচীন সাহিত্যের কথা বাদ দিন, অতিশয় প্রাচীন চীন আরবীর মতো ক্লাসিকাল সাহিত্যেও আজকের দিনে মপাসাঁ ছোট গল্পে আদি গল্পগুরু বাল্মীকি। সবাই তাঁরই রাজেন্দ্র সঙ্গমে, দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে'।

* * *

বাঙলা সাহিত্যে মপাসাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য প্রভাত মুখোপাধ্যায়। তিনি ফরাসী জানতেন কি না শৈলী-আলোচনায় সে প্রসঙ্গ অবান্তর। তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তস্য শিষ্য রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন এবং এঁদের মাধ্যমে মপাসাঁর শরণ নিয়েছিলেন। বাঙলা দেশের কোনো গল্পলেখকই প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের মতো মপাসাঁর এত কাছে আসতে পারেন নি। মপাসাঁর মতো প্রভাতের ছিল সমাজের নানা শ্রেণী, নানা চরিত্র, নানা পরিস্থিতি নিয়ে নবীন নবীন গল্প গড়ে তোলার অসীম ক্ষমতা। মপাসাঁর মতো তিনিও কয়েকখানি উপন্যাস লিখেছিলেন। সেখানেও দু'জনের আশ্চর্য মিল। ঔপন্যাসিক রূপে মপাসাঁ ফ্রান্সে বিশেষ কোনো সম্মান পান নি; বাঙলা দেশে প্রভাত মুখোপাধ্যায়েরও সেই অবস্থা।

এ প্রসঙ্গে সর্বশেষ নিবেদন, প্রভাত-পরবর্তী যুগের সব বাঙালী গল্প-লেখকই মপাসাঁর অনুকরণ করেছেন প্রভাতের মাধ্যমে।

* * *

এই সময়ে 'ভারতী'কে কেন্দ্র করে শক্তিশালী এক নূতন কথাসাহিত্যিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়। এ গোষ্ঠী অহরহ অনুপ্রেরণা পেত জ্যোতিরিন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। এঁদের ভিতর সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য সত্যেন্দ্র দত্ত, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি গাঙ্গুলী ও সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এঁরা প্রধানত ফরাসী সাহিত্য থেকে অনুপ্রেরণা সঞ্চয় করে বাঙলা দেশে এক নূতন ফরাসিস 'গুলস্তান' বানাতে আরম্ভ করলেন। এঁদের একটা মস্ত সুবিধে ছিল এই যে, এঁরা রবীন্দ্রনাথের গড়া আধুনিকতম বাঙলার সম্পূর্ণ ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সে সুযোগ পান নি বলে তাঁর ভাষা ছিল বিদ্যাসাগরী। এঁরা রবীন্দ্রনাথের সাবলীল ভাষা ব্যবহার করাতে তখনকার দিনের বাঙালী পাঠকের মর্মন্বারে দরদী আঘাত হানতে পেরেছিলেন।

---

২ হেমচন্দ্র কিন্তর শেক্‌স্‌পিয়র অনুবাদ করেছিলেন, কিন্তু বাংলাতে আজ পর্যন্ত কেউ শেক্‌স্‌পীয়রের অনুকরণ করেন নি।

www.BanglaBook.org

সবচেয়ে 'তাজ্জব ভেল্কিবাজী' দেখালেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। তাও আবার কাব্যে। এক ভাষার কবিতা যে অন্য ভাষাতে তার আপন রূপরসগন্ধস্পর্শ নিয়ে এরকম ভাবে প্রকাশ পেতে পারে এর কল্পনাও বাঙালী পাঠক এর পূর্বে কখনো করতে পারে নি। সত্যেন্দ্রনাথের পূর্বে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, হেম বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, এমন কি রবীন্দ্রনাথও বিদেশী কবিতার অনুবাদ করেছিলেন কিন্তু এক 'সদ্ভাবশতক' ছাড়া অন্য কোনো বই জনপ্রিয় হতে পারে নি। স্বামী বিবেকানন্দ নাকি বলেছেন, অনুবাদ মাত্রই কাশ্মীরী শালের উল্টো দিকের মতো ; মূল নকশার সন্ধান তাতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আর-সব সৌন্দর্য উল্টো পিঠে ওতরায় না। সত্যেন্দ্রনাথ দেখিয়ে দিলেন, ওতরায়, এবং মাঝে মাঝে উল্টো দিকটাও মূলের চেয়ে বেশী মূল্য ধরতে জানে।

যাঁরা সত্যেন্দ্র দত্তের অনুবাদ মূলের সঙ্গে মিলিয়ে পড়েছেন তাঁরাই আমার কথায় সায় দেবেন। অন্যতম বিখ্যাত অনুবাদক কান্তি ঘোষ বহুবার একথা বলেছেন। তিনি নেই। তাই আজকের দিনের সবে-ধন নীলমণি নরেন্দ্র দেবকে আমি সাক্ষী মানছি।

তোয়েফিল গতিয়ে, রঁসার ল্যাকঁৎ দ্য লিল্, ভেরলেন্, বদলের, য়ুগো (Hugo), শেনিয়ে, মিস্সাল, ভেরেরেন্, ভালমোর, বেরাজেঁ—কত বলবো?—কত না জানা-অজানা কবির কত না কবিতা দিয়ে তিনি তাঁর কুম্ভ 'তীর্থ সলিল' পূর্ণ করলেন, কত দেশের কত 'তীর্থরেণু' বাঙালীর কপালে ছুঁইয়ে দিলেন।

ঋগ্বেদে আছে, হে অগ্নি, তুমি আমাদের পুরোহিত, কারণ তুমি আমাদের সর্ব আহুতি দেবতাদের কাছে নিয়ে যাও। সত্যেন্দ্রনাথ বহু দেশের বহু কবির পুরোহিত।

* * *

কথাসাহিত্যেও ঐ সময়ে প্রচুর ফসল ফললো। গতিয়ে, য়ুগো: মেরিমে, দোদে, মপাসাঁ, দুমা, বাল্জাক্ ইত্যাদি বহু লেখকের বহু ছোট গল্প এবং উপন্যাসও বাঙলায় অনূদিত হল। এ গোষ্ঠীর কার্যকলাপ বাঙলা সাহিত্যে কতখানি স্থায়ী মূল্য ধরে তার বিচার একদিন হবে ; উপস্থিত বলতে পারি এঁরা বাঙলা সাহিত্যে যে ফরাসী উদারতার আমন্ত্রণ জানালেন তার ফলে পরবর্তী যুগের অনেক বাঙালী লেখক গোড়ার থেকেই সংকীর্ণতামুক্ত হয়ে সাহিত্যের আরাধনা করতে পেরেছিলেন। হঠাৎ একদিন বাঙলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের ফলে এঁদের লোকপ্রিয়তা ক্রমে ক্রমে কমে গিয়ে একদিন সম্পূর্ণ লোপ পায়। কিন্তু শরতের মোহ কেটে যাওয়ার পর আজ পর্যন্ত কেন যে কেউ এঁদের হেমন্তের সফলতা সন্ধান করে না সে এক আশ্চর্যের বস্তু।

* *

বাঙলায় ফরাসী সাহিত্য প্রসঙ্গে শুধু প্রমথ চৌধুরী সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ একটি প্রবন্ধ লিখতে হয়। ইনিই একমাত্র বাঙালী সাহিত্যিক যাঁকে সর্বার্থে ফরাসিস আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। একমাত্র এঁরই ভাষাটিতে 'ঈভনিং ইন্ প্যারিসে'র খুশবাই পাওয়া যায়। এঁর শৈলী ফরাসী শ্যাম্পেনের মতো বুদ্বুদিত, ফেনায়িত। এমন কি এঁর বিষয়বস্তুও মাঝে মাঝে ফরেসডাঙার ধুতি পরে মজলিসে এসে বসে। বাংলা সাহিত্যে বহু পণ্ডিত, বহু দার্শনিক, বহু

www.BanglaBook.org

কলাবিদ এসেছেন, কিন্তু একমাত্র এঁকেই সত্য বিদগ্ধ জন বলা যেতে পারে। এবং সে বৈদগ্ধ্য ফরাসী বৈদগ্ধ্য।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ফরাসিদের সঙ্গে বাঙালীর চারি চক্ষের মিলন ঘটিয়েছিলেন ; প্রমথনাথে দুই সাহিত্যের গভীরতম প্রণয়ালিঙ্গন।

এঁর সাহিত্যসৃষ্টি হয়ত বাঙলাদেশ একদিন ভুলে যাবে কিন্তু এই বাঙালী ফরাসিস্ চরিত্রকে বাঙালী কখনো ভুলবে না।

প্রমথনাথের শেষ বয়সে ভারতী গোষ্ঠীর মুমূর্ষু অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে ফরাসী পণ্ডিত সিলভা লেভি এদেশে আসেন। তাঁর চতুর্দিকে তখন এক ফরাসী পণ্ডিতমণ্ডলীর সৃষ্টি হয়। এঁদের প্রধান ফণী বোস[৩], প্রবোধ বাগচী, মণি গুপ্ত, শশধর সিংহ, বিধুশেখর ভট্টাচার্য, ক্ষিতিমোহন সেন। এঁদের কেউই প্রচলিতার্থে সাহিত্যে নামেন নি কিন্তু এঁদের মাধ্যমে আমরা এদেশে সর্বপ্রথম ফরাসী পাণ্ডিত্যের সন্ধান পাই। এতদিন আমরা জানতুম, ইয়োরোপীয় 'প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব' বলতে বোঝায় ইংরেজ। এঁরাই প্রথম দেখিয়ে দিলেন, ফরাসিস্ ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে রাজত্ব না করেও ভারতীয় শাস্ত্রের চর্চা করেছে প্রচুর।[৪] বিশেষ করে আমাদের চিত্রকলা সঙ্গীতাদি। প্রবন্ধের গোড়ার দিকেই বলেছি সাহিত্য ছাড়া অন্য রসে ইংরেজ বঞ্চিত। ফরাসীরা সেখানে যথার্থ গুণী। মণি গুপ্তের অনুবাদে বাঙালী তার সন্ধান পাবে। শান্তা দেবী এই সময়েই বিশ্বভারতীতে ফরাসী শেখেন।

এই গোষ্ঠীর বাইরে আর দু'জন পণ্ডিতের নাম করতে হয়। মহম্মদ শহীদুল্লা এবং সুনীতি চট্টোপাধ্যায়। দিলীপ রায় আর কালিদাস নাগও এই যুগের লোক।

* * *

কিন্তু আমাদের জোড়া কুতুব-মিনার? বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথ? তা হলে দীর্ঘতর প্রবন্ধ লিখতে হয়। এ যুগের ঋষি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, imitation-এর বাঙলা অনুকরণ ; aping-এর বাঙলা কি? 'হনুকরণ'। যাঁরা ফরাসীর 'হনুকরণ' করেন তাঁদের উল্লেখ আমি এ প্রবন্ধে করি নি। পদস্খলন সকলেরই হয়। পূর্বোল্লিখিত লেখকদের কেউ কেউ হয়ত অজানাতে মাত্রাধিক্য করেছেন কিন্তু এ-দুটি লোক সম্বন্ধে অধম নিঃসংশয়।

বঙ্কিম কিঞ্চিৎ ফরাসিস্ জানতেন। কিন্তু তিনি ইংরিজীর মাধ্যমে কঁৎ-কে চিবিয়ে খেয়েছিলেন। পূর্বসূরীগণের প্রসাদাৎ কঁৎ ফরাসী তর্কালোচনায় যে শুভবুদ্ধির (rationality-র) চরমে পৌঁছেন, বঙ্কিম সেই শাণিত অস্ত্র নিয়ে হিন্দুধর্ম রণাঙ্গনে প্রবেশ করেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তার বিস্তর আলোচনা অসম্ভব। তাই এই আক্ষেপ দিয়েই বঙ্কিমালোচনা শেষ করি, হায়, তাঁর এই

---

৩ ইনি যৌবনেই দেহত্যাগ করেন, কিন্তু এঁর রচনা তখনই বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

৪ পরবর্তী যুগে ভিন্‌টারনিৎস জর্মন পাণ্ডিত্যের সঙ্গে এবং তুচ্চি ইতালীর পাণ্ডিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটান। এঁদের সবাই এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে, বিশ্বভারতীতে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শুভবুদ্ধির অনুসরণ আর কেউ করলে না কেন? যে লোক ইস্তেক দয়া-সাগরের খেলাফে তলোয়ার খাড়া করেছিল তার অনুকরণ অনুসরণ, এমন কি 'হনুকরণ'ও কেউ করলো না কেন?

রবীন্দ্রনাথের উপর মপাসাঁর ছায়া পড়েছিল সে-কথা পূর্বেই বলেছি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহকর্মীরূপে তিনি ফরাসী কবিতানাট্য এমন কি 'শারাদ'ও পড়েছিলেন। তারই ফলে

Celui qui me lira, dans les
siecle, un soir,
Troublant mes vers—

ইত্যাদি ইংরিজীতে শব্দে শব্দে অনুবাদঃ

One who will read me, after centuries, one evening, turning over my verses—

'আজি হতে শতবর্ষ পরে' হয়ে বেরল। কিন্তু প্রথম কয়েক ছত্রের পরেই রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে চলে গিয়েছেন।

ঠিক সেই সময় মেটারলিঙ্কের 'নীলপাখি' যে কাঠামোতে[৫] লেখা রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর', 'অরূপরতন' সেই কাঠামো নিয়ে, কিন্তু উভয় নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচনে এবং রসনির্মাণে রবীন্দ্রনাথ মেটারলিঙ্ককে অনেক পিছনে ফেলে গিয়েছেন। এবং সর্বশেষ নাটকদ্বয় 'মুক্তধারা' এবং 'রক্তকরবী'র কাঠামোও রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ নিজস্ব—ভাষা, শৈলী, রসনির্মাণ পদ্ধতি রাবীন্দ্রিক তো বটেই।

আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম, অরবিন্দ ঘোষ (ইনি উত্তম ফরাসী জানতেন)—এঁদের মতো প্রতিভাবান লেখকের রচনাতে এঁর প্রভাব, ওঁর ছায়াপাতের অনুসন্ধান করে কোনো লাভ নেই। হীনপ্রাণ লেখক সর্বক্ষণ ভয়ে মরে, ঐ বুঝি লোকে ধরে ফেললে, সে অমুকের কাছে থেকে ধার নিয়েছে: তাই সে মহাজনদের বাড়ির ছায়া মাড়ায় না। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ নিজেরাই এত বড় মহাজন যে, তাঁরা যত্রতত্র অনায়াসে বিচরণ করেন। ক্ষুদ্রতম লেখকের বাড়িতেও পাত ফেলতে তাঁদের কণামাত্র ভয় নেই। তাঁদের ঘানিতে যাই ফেল না কেন, স্নেহঘন হয়ে বেরিয়ে আসবে।

এইবারে শেষ প্রশ্নঃ ফরাসীর উপর বাঙলা কোনো প্রভাব ফেলতে পেরেছে কি?

রলাঁ যেরকম বহু বাঙালী লেখককে প্রভাবান্বিত করেছেন, ঠিক তেমনি তিনিও বাঙালী গুণী-জ্ঞানীদের সন্ধান রাখতেন। ব্রাহ্ম আন্দোলন, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান এবং এঁদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অকৃত্রিম। বহু ফরাসী এঁরই মারফতে বাঙলাদেশ সম্বন্ধে অনেক কিছু চিনতে শিখেছে।

পূর্বেই বলেছি, লেভির সঙ্গ পেয়ে বাঙালী গুণী ফরাসী পাণ্ডিত্যের চর্চা করেছিল। লেভি নিজে করলেন উপনিষদ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ পেয়ে তাঁরই সাহায্যে করলেন 'বলাকা'র ফরাসী অনুবাদ। আজ যদি শুনি, পাণিনি

৫ 'লোয়াজো ব্লু' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাঙলায় অনুবাদ করেন।

www.BanglaBook.org

কোনো এক চীনা কবির রচনা সংস্কৃতে অনুবাদ করেছিলেন তা হলে যে-রকম আশ্চর্য হব।

শ্রীমতী আঁদ্রে কারপেলেজ ফরাসীতে একখানা সঞ্চয়িতা বের করেন। তার নাম 'ফ্যাই দ্য ল্যাঁদ'—'লীভ্‌জ্‌ অব্‌ ইণ্ডিয়া'। এই চয়নিকায় বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য নিয়েই আলোচনা ছিল প্রধানত। দুর্ভাগ্যক্রমে বইখানা আমার হাতের কাছে নেই।

এবং নেই, শান্তিনিকেতনে ফরাসী ভাষার প্রাক্তন অধ্যাপক ফের্না বেনওয়ার রচনাবলী। অমিয় চক্রবর্তীর সহযোগিতায় তিনি 'মুক্তধারা'র ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন 'লা মাশিন' (দি মেশীন) নাম দিয়ে। এর পরবর্তী যুগে বাঙলা সম্বন্ধে আরো বিস্তর লেখা ফরাসীতে প্রকাশ ও প্রচার করেছিলেন।

এবং মারাত্মক নেই, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ফরাসী প্রেসের অভিমত, অভ্যর্থনা, অকুণ্ঠ প্রশংসা। রবীন্দ্রনাথ যতবার ফ্রান্সে গিয়েছেন, যখনই তাঁর চিত্রকলার প্রদর্শনী হয়েছে, ফ্রান্স তখনই বাঙলাদেশ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তাকে স্বীকার করেছে। প্যারিসে স্বীকৃতি পাওয়া সহজ কর্ম নয়। এ-সব প্রেস্‌-কাটিংস্‌ অনুসন্ধিৎসু পাঠক শান্তিনিকেতন লাইব্রেরীতে পাবেন। সে এক বিরাট ব্যাপার!

অর্থাৎ হাতের কাছে কিছুই নেই—'ঢাল নেই তলোয়ার নেই'—

তাই আর কেউ বলার পূর্বেই স্বীকার করে নিই, এ লেখা সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ।

চার্লি চ্যাপলিন

আমার ছেলেবেলায় বায়স্কোপও ছেলেমানুষ ছিল। হরেক রকম ফিলিম তখন আসতো ; ছোট, বড়, মাঝারি—এখনকার মতো স্টাণ্ডার্ডাইজ্‌ড নয়। সেনসর বোড-ফোর্ডও তখন শিশু, এখনকার মতো 'জ্যাঠা' হয়ে ওঠে নি—'এটা অশ্লীল', 'ওটা কদর্য', 'সেটা বড় কর্তাদের নিয়ে মস্করা করেছে' বলে দেশের দশের রুচি মেরামত করার মতো হরিশ মুখুজ্যে দি সেকেণ্ড হয়ে ওঠে নি। কাজেই হরেক রুচির ফিলিম তখন এদেশে অক্লেশে আসতো এবং আমরা সেগুলো গোগ্রাসে গিলতুম। তার ফলে আমাদের চরিত্র সর্বনাশ হয়েছে, এ কথা কেউ বলে নি। এবং আজ যে সেনসর বোর্ডের এত কড়াকড়ি, তার ফলে এযুগের চ্যাংড়া-চিংড়িরা যীশুখেষ্ট কিংবা রামকেষ্ট হয়ে গিয়েছে এ মস্করাও কেউ করে নি। তবু শুনেছি সেনসর বোর্ডের বিশ্বাস, বিস্তর ছবি ব্যান্‌ করলে শেষটায় ভালো ছবি বেরবে। তাই যদি হয়, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একটা সেনসর বোর্ড লাগাও না কেন? কাকা-মামা-শালাদের চাকরি তো হবেই এবং সুবো-শাম হুদোহুদো বই ব্যান্‌ করার ফলে তাঁরা দিন ইয়া দাড়িগোঁফ সমেত আরেকটি সমুচা রবিঠাকুর বেহেশৎ থেকে টুকস্‌ করে ঢস্‌কে পড়বেন—এই যেরকম হাওড়া ইস্টিশানের কল থেকে প্ল্যাটফর্ম টিকিট মিন্‌স্‌-ফর্সেপ্‌সে বেরিয়ে আসে।

www.BanglaBook.org

আমি মাঝে মাঝে ভাবি, এরা কার রুচি রিফর্ম করতে চায়? আমার? সাবধান! পাড়ার ছোঁড়ারা আমায় মানে (ওরাই আমাকে মাঝে-মধ্যে বায়স্কোপে নিয়ে যায়), শুনলে ক্ষেপে উঠবে। বোর্ডেরও প্রাণের ভয় আছে। তবে কি টাঙাওলা বিড়িওলাদের? ওঃ! কী দম্ভ! ওদের রুচিতে ভণ্ডামি নেই। ঐটে পেলে আমি বর্তে যেতুম।

কিন্তু সে কথা থাক্। এই সেনসরিং ব্যাপারটা দেশে-বিদেশে কি প্রকারে সমাধান হয় সে সম্বন্ধে আরেকদিন সবিস্তর আলোচনা করবো। ইতিমধ্যে ছোটা হিটলারদের স্মরণ করিয়ে রাখি বড়া হিটলাররা জার্মানিতে 'অল কোয়ায়েট' ফিলিম ব্যান্ করেছিল।

সেই যুগে হঠাৎ দেখা দিলেন মহাকবি চার্লি চ্যাপলিন—ভগবান তাঁকে দীর্ঘায়ু করুন।

সাহিত্য বলুন, সঙ্গীত বলুন, চিত্রকলা বলুন, ভাস্কর্য বলুন, এরকম একটি তাজমহলের-সামনে-দাঁড়িয়ে-নটরাজ পৃথিবীতে আর কখনো উদয় হয় নি। এঁর প্রতিভা অতুলনীয়। বাগ্দেবী এঁর কণ্ঠে, উর্বশী পদযুগে, এঁর দক্ষিণ হস্তে বিষ্ণুর চক্র (গ্রেট ডিক্টেটর), বাম হস্তে দাক্ষিণ্যের বরাভয় (সিটি লাইট)। ইনি বিশ্বকর্তা (মর্ডার্ন টাইমস), ইনি নীলকণ্ঠ (মসিয়ো ভেরদু)। 'অতি বড় বৃদ্ধ' বলেই ইনি 'সিদ্ধিতে নিপুণ' এবং লগ্ন এলে শংকরের মতো নবীন বেশে সজ্জিত হতে জানেন (লাইম লাইট)।

রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করে শরৎচন্দ্র একদা বলেছিলেন, 'তোমার দিকে চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের অন্ত নাই।' সেই রবীন্দ্রনাথ সিন্ধুপারের হিস্পানী বিদেশিনীকে দেখে মুগ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন,

'সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে
দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে।'

চার্লির দিকে তাকিয়ে সর্বক্ষণ এই দোহাটি মনে পড়ে।

সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসেবে জগদ্বিখ্যাত হওয়ার পর টলস্টয় একখানি প্রামাণিক অলঙ্কার-শাস্ত্রের গ্রন্থ লেখেন। পুস্তকের প্রথম এবং শেষ প্রশ্ন, 'হোয়াট ইজ্ আর্ট?' অর্থাৎ 'রস কি?' মধুর সঙ্গীত শুনে, উত্তম কাব্য পাঠ করে, দেবীর মূর্তি দেখে আমরা যে আনন্দরসে নিমজ্জিত হই সে বস্তুটি কি?

তার সংজ্ঞা দেওয়ার পর টলস্টয় বলেন, গুটিকয়েক উন্নাসিককে যে রস আনন্দ দান করে সে রস হীন রস। আচণ্ডাল, (আ-সেন্সর বোর্ড?)[১] জনসাধারণকে যে কাব্য আনন্দ দেয় সেই কাব্যই প্রকৃত কাব্য, উত্তম কাব্য। যথা, মহাভারত। পণ্ডিত-মূর্খ, বৃদ্ধ-বালক, পাপী-পুণ্যবান সকলেই এ কাব্য শুনে আনন্দ পায়।

অবশ্য সব পাঠক যে একই কাব্যে একই বস্তুতে আনন্দ পাবে এমনটা নাও হতে পারে। বালক হয়ত কাব্যের কাহিনী বা প্লট শুনে মুগ্ধ, বলদৃপ্ত যুবা

১। পাঠক ভাববেন না, আমি কলকাতা বা দিল্লীর বোর্ডের কথা ভাবছি। আমি সর্ববিশ্বের জীবিত ও মৃত সর্ব বোর্ডের কথা ভাবছি। শ' যেরকম 'কুইন্জ্ রীডার অব প্লেজ'-এর স্মরণে আপন মন্তব্য বিশ্ব-বোর্ডের উদ্দেশে লিখেছিলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়ত কর্ণার্জুনের যুদ্ধবর্ণনা শুনে বীর রসে লুপ্ত, বুদ্ধ হয়ত শ্রীকৃষ্ণে অর্জুনের আত্মসমর্পণ দেখে ভক্তিরসে আপ্লুত, এবং উদারচরিত সর্বরসে রসিকজন হয়ত প্রতি ঝঙ্কারে প্রতি মীড়ে প্রকৃত কাব্যরসে নিমজ্জিত।

তা হলে প্রশ্ন, মানুষের বর্বর রুচিকে কি মার্জিত করা যায় না? হয়ত যায়, কিংবা হয়ত যায় না, কিন্তু চেষ্টা আলবৎ করা যায়। সে চেষ্টা ভরত, দণ্ডিন, মম্মট, আরিস্ততেল, রবীন্দ্রনাথ, ক্রোচে করেছেন, কিন্তু এঁদের গলা কেটে ফেললেও এঁরা কোনো বোর্ডের মেম্বার হতে রাজী হতেন না। মানুষের রুচিপরিবর্তন এঁরা করিয়েছেন—কোনো বোর্ড কখনোই কিছু পারে নি।

বর্তমান যুগে চার্লি সেই রসই সর্বজনকে উপহার দিয়েছেন। এ যুগের সাহিত্যে, কাব্যে, ভাস্কর্যে, রঙ্গমঞ্চেও কুত্রাপি কেউই চার্লির বৈচিত্র্য, বিস্তার, গভীরতা, সর্বজনমর্মস্পর্শদক্ষতা দেখাতে পারেন নি। এ যুগে শার্লক হোমস পৃথিবীর সর্বত্রই সম্মান পেয়েছেন, কিন্তু মানুষের কোমলতম স্পর্শ-কাতরতাকে তিনি তার চরম মূল্য দিতে পারেন নি; ওমর খৈয়ামও প্রকৃত ধর্মভীরুকে বিচলিত করতে পারেন নি।

চার্লিকে বিশ্লেষণ করি কি প্রকারে?

তাঁর সৃষ্টি, কিংবা তিনি নিজে, এই যে 'লিট্‌ল্ ম্যান্', সামান্য জন, যেন পাড়ার জগা, টম্, ডিক্ · হ্যারি; 'কেউ-কেটা' তো নয়ই একেবারে, 'কেউ-না' কি করে সকলকে ছাড়িয়ে এক অসাধারণ জন হয়ে সকলের হৃদয়ে এমন একটি আসন গ্রহণ করলো যে আসন পূর্বে শূন্য ছিল এবং যেখানে আর কেউ কখনো আসতে পারবে না?

কোনটা ছেড়ে কোনটা বলি?

ভ্যাগাবণ্ড চার্লি একটি শুকনো ফুল দেখতে পেয়ে সেটি তুলে নিয়ে শুঁকতে লাগল। ঝাঁট-দিয়ে-ফেলে-দেওয়া ফুল—তার ফুল্ল যৌবন গেছে, সে পথ-প্রান্তে অবহেলিত, পদদলিত। সামান্য যেটুকু গন্ধ তখনো তার অঙ্গে সুষুপ্ত ছিল চার্লি তাই যেন তার 'সহৃদয়' নিশ্বাস দিয়ে জাগিয়ে তুলে বুক ভরে নিচ্ছে। এ ফুল কি কখনো বিশ্বাস করতে পেরেছিল যে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে—রবীন্দ্রনাথের কবি যে রকম আত্মহত্যার পূর্বমুহূর্তে রাজকন্যার বরমাল্য পেল—সে তার চরম সম্মান পাবে?

এমন সময় রাস্তার দুষ্ট ছোঁড়ারা মোকা পেয়ে পিছন থেকে চার্লির ছেঁড়া পাতলুনের ভিতর হাত ঢুকিয়ে শার্টে দিল টান। চচ্চড় করে ছিঁড়ে গেল পাতলুনের অনেকখানি—এই তার শেষ পাতলুন, এটাও গেল—আর বেরিয়ে এল ছেঁড়া শার্টের শেষ টুকরো।

আস্তে আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে ভ্যাগাবণ্ড চার্লি ছোঁড়াদের দিকে তাকালে। তারা তখন 'শুভকর্ম' সমাধান করে ছুটে পালাচ্ছে।

তখন ভ্যাগাবণ্ডের চোখে কী বেদনাতুর করুণ ভাব!

ভিয়েনা, বার্লিন, প্যারিস-প্রাগে আমি বিস্তর থিয়েটার প্রচুর অপেরা দেখেছি, কাব্যে সাহিত্যে টন মণ করুণ রসের বর্ণনা পড়েছি, কিন্তু ভ্যাগাবণ্ডের সে করুণ চাউনি এদের সবাইকে কোথায় ফেলে কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে চলে যায়।

আর সেই নীরব চাউনিতে বলছে, 'কেন, ভাই, তোরা আমাকে জ্বালাস?

www.BanglaBook.org

আমি তো তোদের সমাজের উজীর নাজির হতে চাই নে। কুকুর বেড়ালটাকে পর্যন্ত আমি পথ ছেড়ে দিয়ে কোনো গতিকে দিন গুজরান করছি। আমায় শান্তিতে ছেড়ে দে না, বাবারা!' তারপরে যেন দীর্ঘনিশ্বাস—হে ভগবান!

এখানেই কি শেষ? তা হলে চার্লি দস্তয়েফ্‌স্কির মতো সুধু মাত্র করুণ রসের রাজা হয়ে থাকতেন।

অন্ধ ফুলওয়ালী মিষ্টি হেসে চার্লিকে একটি তাজা ফুল দিতে যাচ্ছে। তাকে? চার্লিকে? অবিশ্বাস্য!

আইনস্টাইন একবার কোনো শহরের বড় স্টেশনে নেমে দেখেন বিস্তর লোক তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে—যেন তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে চায়। বিনয়ী আইনস্টাইন শুধু পিছনের দিকে তাকান আর ডাইনে বাঁয়ে সরে যান। নিশ্চয়ই তাঁর পিছনে কোনো ডাকসাইটে কেষ্টবিষ্টু আসছেন, সবাই এসেছে তাঁকেই বরণ করতে, আইনস্টাইন শুধু আনাড়ির মতো মধ্যিখানে বাধার সৃষ্টি করছেন।

কই? কেউ তো নেই? রাস্তা একদম ভোঁ ভোঁ—কলকাতার রেশনশপের গুদামের মতো। এরা এসেছে আইনস্টাইনের জন্যই।

আমাদের ভ্যাগাবণ্ডটিও পিছনে তাকালে। এক্‌স্‌ট্রিমস মীট্‌। আইনস্টাইন খ্যাতির সর্বোচ্চ ধাপে, চার্লি নিম্নতম মাপে।

ফুল পেয়ে চার্লির মুখের ভাব। স্মিত হাস্যে মুখের দুই প্রান্ত দুই কানে ঠেকে গিয়েছে, শুকনো গাল দুটো ফুলে গিয়ে উপরের দিকে উঠে চোখ দুটো চেপে ধরেছে, চোখের কোণ থেকে রগ পর্যন্ত চামড়া কুঁচকে গিয়ে কাকের পায়ের নকশা ধরেছে, সে চোখ দুটো কিন্তু বন্ধ—আমার যেন মনে হল ভেজা-ভেজা, ঠিক বলতে পারবো না, কারণ আমার চোখও তখন ঝাপসা হয়ে গিয়েছে।

সর্বক্ষণ ভয় হচ্ছিল, এইবার না চার্লি ভ্যাক্‌ করে কেঁদে ফেলে!

কে বলে সংসারে শুধু অকারণ বেদনা, নিদারুণ লাঞ্ছনা! পকড়্‌কে লে আও উস্কো। এলিসের রানীর হুকুম, 'অফ্‌ফ্‌ফ্‌ উইদ্‌ হিজ্‌ হেড্‌।'

মানুষের কলিজায় চার্লি পুকুর খোঁড়েন কি করে? দুঃখ, সুখ, করুণা, কৃতজ্ঞতা এসব রস আমাদের কলিজার গভীরতম প্রদেশে চার্লি সঞ্চারিত করেন কোন্‌ পদ্ধতিতে?

এক ইরানী কবি বলছেন, 'সব জিনিসের হদ্দ—অর্থাৎ সীমা জানাটাই প্রকৃত সৃষ্টিকর্তার লক্ষণ।'

অর্থাৎ তাঁর বর্ণনায়, তাঁর অভিনয়ে চার্লি বাড়াবাড়ি করেন না। কারণ কে না জানে, একঘেয়েমির চূড়ান্তে পৌঁছয় মানুষ যখন ভ্যাচর-ভ্যাচর করে সব কিছু বলতে চায়, সামান্যতম জিনিস বাদ দিতে চায় না।

তাই অভিনব গুপ্ত, আনন্দবর্ধন বলেছেন, 'ধ্বনি দিয়ে প্রকাশ করবে।' ধ্বনি বলতে তাঁরা ব্যঞ্জনা, ইঙ্গিত, সাজেস্টিভ্‌নেস অনেক কিছুই বুঝেছেন।

যথা ঃ

কুলটা রমণী পথিককে বলছে, 'হে পথিক, এই ঘরে রাত্রিকালে আমার বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ী শয়ন করেন, ঐ ছোট ঘরে আমি একা থাকি, আমার

www.BanglaBook.org

স্বামী বিদেশে। তুমি এখন যাও।'

ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

অর্থাৎ চার্লি যেটুকু অভিনয় করেন, সে তো করেনই ; সঙ্গে সঙ্গে আমরা সকলেই অনেকখানি অভিনয় করে নিই।

হালে চার্লি সুখবর দিয়েছেন, তিনি আবার সেই 'লিটল ম্যান', সেই ভ্যাগাবণ্ডকে পুনর্জন্ম দেবেন। তাঁর যা বলবার তিনি তারই মারফতে শোনাবেন। শুনে আমরা উল্লসিত হয়েছি। 'মঁসিয়ো ভের্দু', 'লাইম-লাইট' উৎকৃষ্ট অতুলনীয় রসসৃষ্টি কিন্তু আমরা সেই ভ্যাগাবণ্ডকে বড্ড মিস্ করছি।

চার্লি ভ্যাগাবণ্ডকে বর্জন করেছিলেন কেন?

হয়ত ভেবেছিলেন সব কথা ঐ একই জনের মারফতে বলা চলে না। আমাদের ভ্যাগাবণ্ডের পক্ষে সবাইকে তো বিষ খাইয়ে খাইয়ে—'বিজনেস্ ইস্ বিজনেস্' বলে এলোপাতাড়ি বিধবাহনন করা যায় না—তাই ভের্দুর সৃষ্টি।

ঠিক এই কারণেই কোনান ডয়ল শার্লক হোমসকে মেরে ফেলে প্রফেসর চ্যালেঞ্জার সৃষ্টি করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথও তাই গদ্য কবিতা ধরেছিলেন। এই উদাহরণটাই ভালো।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পদে পদে দেখলেন তাঁর কবিতায় পদে পদে মিল এসে যাচ্ছে, ছন্দ এসে যাচ্ছে। যাবেন কোথায়? পঞ্চাশ বছরের অভ্যাস। নাচার হয়ে মিলগুলো লাইনের শেষে না এনে মাঝখানে ঢুকিয়ে দিতে লাগলেন—শাক ঢাকা দিয়ে মাংস খাওয়ার মতো।

শেষটায় বললেন, 'দূত্তোচ্ছাই! যাই ফিরে ফের মিল ছন্দে।' রবীন্দ্রনাথের গবিতা নিকৃষ্ট নয়, রবীন্দ্রনাথের গবিতা উত্তম কবিতা, এই বাঙলা দেশে একমাত্র তিনিই সার্থক 'গবি', কিন্তু সোজা কথা—তিনি বুঝে গেলেন যে কবিতার মিল ছন্দ বজায় রেখেও তাঁর যা বক্তব্য তা তিনি বলতে পারবেন। ফিরে গেলেন কবিতায়।

চার্লি যখন ভের্দু করছেন, তখন আমরা পদে পদে দেখতে পাচ্ছি তাঁর পিছনে ভ্যাগাবণ্ডকে। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করছেন তাকে লুকোবার জন্যে—রবীন্দ্রনাথ যে রকম মিল লুকোবার চেষ্টা করেছিলেন গবিতায়—কিন্তু আমরা তাকে বার বার দেখতে পাচ্ছি। বার বার মনে হয়েছে, 'আহা এ জায়গায় যদি আমাদের ভ্যাগাবণ্ডটি থাকতো তবে সে সিচুয়েশনটা কি চমৎকারই না এক্স্প্লয়েট করতে পারতো!'

চার্লিও সেটা বুঝেছেন। যে ভ্যাগাবণ্ডকে এতদিন একটু খানি জিরিয়ে নিলেন, তাকে চার্লি আবার ঘরের ভিতর থেকে টেনে আমাদের চোখের সামনে তাকে দিয়ে বাউণ্ডুলেপনা করাবেন।

সুসংবাদ!!

ফিল্মের ভাষা

থিয়েটারের কপাল মন্দ, পাঠান-মোগলের আপন দেশে ওটার রেওয়াজ নেই। তাই পাঠান রাজারা এদেশে জমে বসার পর গাইয়ে-বাজিয়েদের ডেকে পাঠালেন, পটুয়াদেরও ডাক পড়লো, নাচিয়েরাও বাদ গেল না আর এমারৎ বানানে-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওলাদের তো কথাই নেই। সংস্কৃত যদি তখন এ-দেশের চালু এবং সহজ ভাষা হত তাহলে সংস্কৃত নাটাও যে বাদশার দরবারে কদর পেত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ হিন্দী কদর পেয়েছিল এবং এ-দেশে বাঙলা কদর পাওয়ার ফলে পরাগল খান, ছুটি খানের মহাভারত লেখা হয়েছিল।

সংস্কৃতে লেখা আমাদের নাট্য ঠিক মুসলিম আগমনের শুরুতে এদেশে কতখানি চালু ছিল বলা কঠিন। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা বলেন, সংস্কৃত তখন মৃত ভাষা, ওসব নাট্য তখন প্রায় উঠে গিয়েছে। আমি কিন্তু কিঞ্চিৎ ভিন্ন মত পোষণ করি।

পূর্বেই স্বীকার করেছি, পাঠান আমলে সংস্কৃত মৃত ভাষা, কিন্তু সংস্কৃত নাটক তো সম্পূর্ণ সংস্কৃতে লেখা হয়। তুলনা দিয়ে কথাটা পরিষ্কার করি।

শেক্‌স্‌পিয়র জানতেন, তিনি রাজা-রাজড়া এবং শিক্ষিতজনদের জন্যই আপন নাটক লিখছেন। কিন্তু অন্য একটি তত্ত্বও বিলক্ষণ জানতেন যে তাঁদের সংখ্যা কম, এবং বেঞ্চি গ্যালারি ভরভরাট ক'রে নাটকটাকে জম-জমাট করে তোলে টাঙাওলা-বিড়িওলার দল। কাজেই তাঁর নাটকে ওদেরই মতো চরিত্র ওদেরই ভাষায় কথা কয়, বিশেষ করে ভাঁড়টি সব সময়ই রাজা-প্রজা দু'দলকেই খুশী করতে জানে।

ঠিক সেই রকম গুপ্ত যুগের কালিদাসও জানতেন যে, তাঁর যুগের 'টাঙাওলা', 'বিড়িওলা' সংস্কৃত বোঝে না, অথচ রাজা-রাজড়ারা নাটক চান সংস্কৃতে। ওদিকে তিনি শেক্‌স্‌পিয়রের মতো বুঝতেন যে, জনসাধারণকে খুশী না করে কোনো নাটকই বক্‌স্‌-আপিস ভরতে পারে না। গোলাপফুল খাপসুরৎ জিনিস। কিন্তু পাতা-কাঁটা ওটাকে খাড়া করে না ধরলে ওটা শুধু শূন্যে শূন্যে ঝুলতে পারে না। তাই তিনি তাঁর নাটকে ব্রাহ্মণ আর রাজা ছাড়া আর সবাইকে দিয়ে কথা কওয়াতেন তখনকার দিনের চালু ভাষা প্রাকৃতে। আর শুধু কি তাই? রাজার সংস্কৃতে শোধানো প্রশ্নের উত্তর দাসী যখন প্রাকৃতে দিত তখন কালিদাস তার উত্তরের ভিতর রাজার প্রশ্নটি এমনভাবে জড়িয়ে দিতেন যে সংস্কৃত না-জাননেওলা শ্রোতাও দুই পক্ষের কথাই পরিষ্কার বুঝে যেত। দাসীর তুলনা দিয়েই যদি জিনিসটা বোঝাতে হয় তবে বলতে হবে, এ-যেন 'বাঁদীকে ঠেঙিয়ে বিবিকে সোজা রাখা'র মতো রাজা এবং প্রজা উভয় দর্শককে সোজা রাখা।

তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কালিদাসের নাটক সর্বজনপ্রিয় ছিল।

তার পর প্রশ্ন উঠতে পারে, ঠিক মুসলমান আগমনের প্রাক্কালে জন-সাধারণ কি কালিদাসের আমলের প্রাকৃত বুঝতো? এ-প্রশ্নের উত্তর দেবার মতো এলেম আমার পেটে নেই। তবে তার একশ' বছর পেরোবার পূর্বেই আমীর খুসরো যে-হিন্দী ব্যবহার করেছেন সে-হিন্দী অনেকটা ঐ প্রাকৃতের মতোই। এবং এখানে আরো একটি কথা আছে। জনসাধারণ ততদিনে কালিদাসের নাটক দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে, এবং নিরক্ষর দর্শক একটা ফিলিম তিন বার দেখবার পর যে কতখানি মনে রাখতে পারে সে-কথা শিক্ষিত জন জানেন না। আমার এক চাকর (বস্তুত এই গণতন্ত্রের ইন্‌কিলাবী যুগে 'মানিব' বলাই ভালো) পাড়াতে নয়া ছবি এলেই একটানা সাত দিন ধরে সেই ছবি দেখতে যেত। আমি

www.BanglaBook.org

অবাক হয়ে ভাবতুম, নাগাড়ে সাতদিন ধরে একই ছবি দেখে কি করে? পরে তার গুনগুনোনি থেকে বুঝলাম, ছবির চৌদ্দখানা গানই সে রপ্ত করতে চায় এবং করে ফেলেছেও। অনেক হিন্দী গানের বিস্তর কথা না বুঝতে পেরেও! অবশ্য আমার এ-মন্তব্যে ভুল থাকতেও পারে। কারণ আমি এ-জীবনে তিনখানা হিন্দী ছবিও দেখি নি এবং অন্য কোনো পুণ্য করি নি বলে এই পুণ্যের জোরেই স্বর্গে যাবো বলে আশা রাখি। তবে বলা যায় না, সেখানে হয়ত হিন্দী ছবি দেখতে হবে! কারণ এই ইরানী কবি মহাপ্রলয়ের পরে যে শেষ বিচার হবে তারই স্মরণে অনেকটা এই ভয়ই করেন,—

"শেষ-বিচারেতে খুদার সমুখে দাঁড়াবো তো নিশ্চয়,
মানুষের মুখ আবার দেখিব। এইটুকু মোর ভয়।"
"মরা ব্ রুজ-ই কিয়ামৎ গামী কি হস্ত্ ঈন্ অস্ত
কি রু-ই মরদুমে আলম্ দু বারা বায়দ দীদ।"[1]

যদি প্রশ্ন শোধান সে কি করে হয়?—তুমি হিন্দী ফিলিম্ বর্জন করার পুণ্যে স্বর্গে গেলে, সেখানে আবার তোমাকে ঐ 'মাল'ই দেখতে হবে কেন? তবে উত্তরে নিবেদন, কামিনীকাঞ্চনসুরা বর্জন করার ফলে আপনি যখন স্বর্গে যাবেন তখন কি ইন্দ্রসভায় ঐগুলোরই ছড়াছড়ি দেখতে পাবেন না?

তখন যদি আপনি এক কোণে মুখ গুমড়ো করে বসে থাকেন তবে কি সেটা খুব ভালো দেখাবে?

থাক্। কোথা থেকে কোথা এসে পড়লুম! মূর্খকে চটালে এই তো বিপদ! আবোল-তাবোল বকে।

মোদ্দা কথা এই, পাঠান-মোগল যুগে নাট্যাভিনয় রাজানুকম্পা পেল না বলে আমরা এখানো তার খেসারতি ঢালছি। এবং দ্বিতীয় কথা—নাট্যে, ফিলিমে ভাষা জিনিসটাকে অবহেলা করলে ক্ষতি হয়। এমন কি যদিও বহু গুণী বলে থাকেন, 'সাইলেন্স্ ইজ গোল্ডেন' তবু সাইলেণ্ট ফিলিম চললো না। বাঙলা ফিলিম যখন সে সাইলেন্স্ ভাঙলো তখন থেকে আজ পর্যন্ত যে ভাষা সে বললে তারই দিকে এ-প্রবন্ধের নল চালনা।

সাতশ' বছর পরে ইংরেজ আমলে হল ঠিক তার উল্টো। কলাজগতে ইংরেজের প্রধান সম্পদ তার থিয়েটার। শেক্স্পিয়রের মতো নাট্যকার নাকি পৃথিবীতে নেই। ইংরেজ বললে, 'চালাও থিয়েটার।' কিন্তু প্রশ্ন, কে করবে থিয়েটার?

ইতিমধ্যে বাঙালী বিলেত যেতে আরম্ভ করেছে। সেখানে একাধিক নেশার সঙ্গে সে থিয়েটারের নেশাটাও রপ্ত করে এল।

বাঙলা গদ্য এবং পদ্য তখন দুই-ই বড় কাঁচা।

আর জনসাধারণের ভাষা? তারও মা-বাপ নেই। একদিকে শেষ মোগলের ফার্সী উর্দুর শেষ রেশ, অন্যদিকে সুতোনুটি-গোবিন্দপুরের ঐতিহ্যহীন

1. The only thing which troubles me about the Resurrection day is this,

That one will have to look once again on the faces of mankind.

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্ল্যাঙ—দুয়ে মিলে তার যা চেহারা সেটা কিছুদিন পরে পাওয়া যায় হুতোমের নকশায়। অন্যদিকে বিদ্যাসাগরের অতি ভদ্র অতি মার্জিত ভাষা।

এ-যুগের নাটকের ভাষা তাই শব্দতত্ত্বের স্বর্গভূমি। কিন্তু নাটকে যে স্বচ্ছন্দ ভাষার প্রয়োজন তার বড়ই অভাব। সব নাট্যকারই যেন ঠিক মানানসই ভাষাটির জন্য চতুর্দিকে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন।[২]

মাইকেলের পৌরাণিক নাট্যে বিদ্যাসাগরী ভাষা ; তাঁর 'একেই কি বলে সভ্যতা'তে কলকাতার স্ল্যাঙ ; 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'তে গ্রামাঞ্চলের একাধিক ভাষা ; এবং দীনবন্ধু মিত্রের ভাষাতে বিদ্যাসাগরী ও গ্রাম্য দুই-ই।

নীলদর্পণ সে-যুগের বাঙলার বেদনা প্রকাশ করেই যে বিখ্যাত হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার মনে হয়, বিদ্যাসাগরী ভাষা ও মুসলমান চাষার ভাষা এ-দুয়ের সম্মেলনও তার জন্য অনেকখানি দায়ী। অবশ্য শুধুমাত্র ভাষার বাহার যদি শুনতে চান তবে 'বুড়ো শালিকের' মতো নাটক হয় না। হিন্দু গৃহস্থ, হিন্দু চাকর, মুসলমান চাষা, চাষার বউ, হিন্দু দাসী এদের সকলের আপন আপন ভাষার সূক্ষ্মতম পার্থক্য মাইকেল যে কী কৃতিত্বের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন তার তুলনা বাঙলা সাহিত্যে কোথাও নেই। নাটক হিসেবে এ-বই উত্তম—সাহিত্য হিসেবে ভাষার বাজারে এ-বই কোহিনূর।

অবাঙালীর জন্য পার্শী থিয়েটার কবে প্রতিষ্ঠিত হয় আমি ঠিক জানি নে, কিন্তু বিস্তর বাঙালীও সেখানে যেত ও উর্দু-গুজরাটীতে মেশানো নাটক বুঝতে যে তাদের বিশেষ অসুবিধে হত না সে-তথ্য কিছু অজানা নয়। 'ছি ছি এত্তা জঞ্জাল' জাতীয় জনপ্রিয় বাঙলা-উর্দুতে মেশানো খিচুড়ি ঠাট্টা ব্যঙ্গের ভাষা কিছুটা হুতোম আর কিছুটা পার্শী থিয়েটারের কল্যাণে।

ইতিমধ্যে ভাষাসমস্যার অনেকখানি সমাধান হয়ে যায় বঙ্কিমের কল্যাণে। বঙ্কিমের ভাষানির্মাণে কোন্ কোন্ উপাদান আছে সে-কথা আজ ইস্কুলের ছেলে পর্যন্ত জানে। ডি. এল. রায় শ্রেণী এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন।

এইখানে এসে আমাদের সবাইকে—বিশেষ করে রবীন্দ্র-শিষ্যদের একটু বিপদে পড়তে হয়। রবীন্দ্রনাথের চলতি ভাষা যে তাঁর ছোটগল্প উপন্যাসের মাধ্যমে আমাদের দৈনন্দিন কথ্য ভাষাকে প্রভাবান্বিত করেছে সে-কথা আমরা সবাই জানি, এবং তার প্রভাব যে আমাদের রঙ্গমঞ্চেও পড়েছে সেও প্রতি মুহূর্তে কানে বাজে। কিন্তু আমার মনে হয় তাঁর নাটকের ভাষা এত বেশী মার্জিত, এত বেশী সূক্ষ্ম যে নাট্যশালার আটপৌরে কাজ তা দিয়ে চালানো যায় না। তাই বোধহয় তাঁর নাটকের মূল্য সাহিত্য হিসেবে যত না সম্মান পেয়েছে এবং পাবে, নাট্য হিসাবে ততখানি পায় নি, পাবে কিনা সন্দেহ।

* * *

২ শুনেছি সর্বপ্রথম নাকি এক রাশান এদেশে থিয়েটার করেন। তিনি তখন ইংরেজের পৃষ্ঠপোষকতা কতখানি পেয়েছিলেন, তার প্রভাব পরবর্তী যুগের বাঙলা থিয়েটারে কতখানি পড়েছিল, এ-সব প্রশ্ন ভাষার বিচারে অবান্তর।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গোড়ার দিকে ফিলিমের কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। করাণ সে তখন ভাষণ না করে শোভা বর্ধন করতো। টকি আসার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাশীল চিত্র-চালককেই মনস্থির করতে হল টকির ভাষা ও উচ্চারণ হবে কি? এ-মুশকিলের একটা অতি সহজ সমাধান আছে। শরৎবাবুর 'নিষ্কৃতি' করতে হলে তাঁর ডায়ালগের ভাষা দিলেই হল। এর আর ভাবনা কি?

মুশকিল আসান অত সহজে হয় না। প্রথমত কোনো কোনো বর্ণনা ডায়ালগে প্রকাশ করতে হয়; তখন উপায়? সেটা তৈরি করে দেবে কে? সে-কলম আছে কার? রবীন্দ্রনাথের বারোটি গান নিয়ে যখন দম্ভী লেখকেরা মাঝখানে মাঝখানে 'আপন' গদ্য জুড়ে দিয়ে কিমাপিয়ার (ক'পের) করেন, এবং দুই পাকা গানের মাঝখানে সেই কাঁচা বাঙলা শুনতে হয় তখন মনে হয়, না, থাক্ বাবা, বাড়ি যাই?

কিন্তু সেইটেই প্রধান শিরঃপীড়া নয়। আসল বেদনা অন্যখানে। বইয়ের লেখা ডায়ালগ আর সিনেমায় উচ্চারিত কথাবার্তা এক জিনিস নয়। বই বন্ধুজনের সঙ্গে পড়ে শোনানো যায়—তার পাল্লা অদ্দুর অবধি। নাট্যে, পর্দায় সেটা অত্যধিক 'সাহিত্যিক'। অবশ্য নিছক ফিলিমের জন্য লেখা রাবিশের কথা এখানে হচ্ছে না।

অন্যদিকে সিনেমার ভাষাতে যদি কোনো সাহিত্যিক মূল্যই না থাকে তবে সে ইস্থেটিক পর্যায়ে উঠতে পারবে না। এই হল আমাদের দু-মুখো সাপ, ডিলেমা, প্যারাডক্স্—যা খুশি বলতে চান বলুন।

প্রথম যখন মানুষ পাথরের বাড়ি তৈরি করতে শিখল তখন পূর্বতর যুগের কাঠের বাড়ির অনুকরণে পাথরের বাড়ি তৈরি করতো; বাঙলা দেশে ইঁট চালু হওয়ার পর প্রথমটায় সে খড়ের চাল অনুকরণ করেছে; বেতারের বয়স হয়েছে —এখনো সে নাটক করার সময় 'থিয়েডারে'র (থিয়েটারের নয়) অনুকরণ করে —ফিলিম কেন অনুকরণ করতে যাবে?

রুদ্দসী

"শ্যামার নামের মন্ত্রগুণে
উতলা নগররক্ষী আমন্ত্রণ শুনে
রোমাঞ্চিত; সত্বর পশিল গৃহ মাঝে
পিছে বন্দী বজ্রসেন নতশির লাজে
আরক্ত কপোল। কহে রক্ষী হাস্য ভরে,
'অতিশয় অসময়ে অভাজন 'পরে?
অযাচিত অনুগ্রহ।"

ওঃ ভাষার কী জেল্লায়! 'অতিশয় অসময়ে অভাজনে অযাচিত অনুগ্রহ—' 'অ'-য়ে 'অ'-য়ে ছয়লাপ! তাও ইন্স্পেক্টর জেনারেল্ অব্ পুলিসের মুখে!

গল্পটি সকলেরই জানা। রবীন্দ্রনাথ এটি কণেবর জাতক থেকে নিয়েছেন। আজকের দিনের ভাষায় বলতে গেলে রাজ্যপালের মেয়ের আঙটি হারিয়েছে। তুমুল কাণ্ড। স্বয়ং আই জি যখন চোর ধরে গবর্নমেণ্ট হৌসের দিকে যাচ্ছেন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তখন মনে করুন মাতাহারি তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তিনি কি তখন 'উতলা' এবং 'বোমাঞ্চিত' হবেন না? তাঁর মুখে কি তখন খৈ ফুটবে না, চোখ দুটো পলকা নাচ নাচবে না! অবশ্য সামান্য 'অ' দিয়ে কবিত্বের প্রকাশ —রবীন্দ্রনাথ অতি মোলায়েম ইঙ্গিত দিয়েছেন যে পুলিস এর বেশি আর কি কবিত্ব করবে? তবে কিনা রবীন্দ্রনাথ যখন কবিতাটি লিখেছিলেন সেদিনের তুলনায় আজকের পুলিস বড্ড বেশী লেখা-পড়া করে আপন সর্বনাশ টেনে আনছে।

আমার অবস্থা হয়েছিল বজ্রসেনের। সে চোর।

আমি তখন বোম্বায়ে। আমার এক বন্ধু ব্যাঙ্কার। নাম জভেরী—অর্থাৎ জহুরীর গুজরাটী সংকরণ। এক বাঙালী 'ফিলিম-এস্টারে'র শাদী। তিনি তাঁর ব্যাঙ্কার জভেরীকে নেমন্তন্ন করেছেন। জভেরী ব্যাচেলর; আমার সঙ্গে চম্ করে। স্টার সেটি জানতেন। লক্ষ্ণৌয়ে প্রতিপালিত বঙ্গরমণী এটিকেট-দুরুস্ত হয়, যত না প্রয়োজন তার চেয়েও বেশী। বিবেচনা করি আমারও নিমন্ত্রণ ছিল—কিন্তু কসম খেতে পারবো না।

রোশনাই বাদ্যি বাজনা যা ছিল তা এমন কিছু মারাত্মক খুনিয়া ধরনের নয়। কন্যা কুরূপা হলে এসবের প্রয়োজন। ইংরিজীতে বলে, লিলি ফুলকে তুলি দিয়ে রঙ মাখাতে হয় না!—আজকের দিনের ভাষায় লিপস্টিক্-রুজ্ মাখাতে হয় না। যাঁরা আছেন এবং যাঁরা আসছেন তাঁদের এক এক জনই এক ধামা লিলি—না, দু-ই ধামা।

দরিদ্র আবুহোসেন ঘুম ভাঙতে দেখে, সে সুন্দরীদের হাটে। কুজনে গুঞ্জনে গন্ধে অনুমান করলে সে খলীফা হরুন-অর্-রশীদের হারেমের ভিতর। সাক্ষাৎ পরীস্তান।

আর আমি? অধুনা মৃত ভাস্কর এপ্স্টাইন আমাকে 'বৃদ্ধ নিগ্রো'র মডেল করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সুন্দরীরা আমাকে অবহেলা করেন নি। তাঁরা ভেবেছিলেন, আমিও বুঝি ফিলিম স্টার—'সুটিঙে'র ('শুটিঙ্' সাদা-মাটা সিনেমা বাবদে অজ্ঞজনের শুদ্ধ উচ্চারণ!) ড্রেস না ছেড়েই দাওয়াতে এসেছি।

আমি ভাল করেই জানি, আপনারা সব স্টারদেরই চেনেন, কিন্তু সবাইকে একসঙ্গে দেখেছেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ। তদুপরি আরেকটি ছোট্ট কথা আছে। তারকার তুলনা দিয়েই নিবেদন করি। অরুন্ধতী আকাশের ক্ষুদ্রতম তারকা। কিন্তু তিনি বশিষ্ঠের পাশে বসে যখন সপ্তর্ষির সাতটি তারকার একজন হয়ে দেখা দেন তখন মনে হয় ইনি না থাকলে সপ্তর্ষির একটি তারাই মিথ্যা হতেন।

শাদী মজলিসে তাই ক্ষুদ্রতম তারকাটিও চিত্তহারিণী হয়ে দেখা দিয়েছিলেন।

এলেন, মনে করুন,—নামগুলো একটু উল্টেপাল্টে দিচ্ছি—শমশাদ বানু লায়লা। পরনে সাটিনের পাজামা। পায়ের কাছে একটি ঘের অন্তত দু'হাত। স্বচ্ছন্দে যে-কোনো বঙ্গসন্তানের তিনটি পাজামা বা পাঁচটি পাতলুন হতে পারে। শমশাদ বানুর কোমরটি বঙ্গরমণীর কাঁকনের সাইজ। তাই কোমর থেকে পর্দার মতো ফোল্ডে ফোল্ডে সে পাজামা নেমে আসাতে বোঝা গেল না

www.BanglaBook.org

তিনি মাডাম পম্পাডুয়ের ফ্রক পরেছেন, না ভাওয়ালের জমিদারবাড়ির লুঙ্গী পরেছেন, না ইরানী বেদেনীদের তাম্বু-পানা ঘাঘরা পরেছেন। আসলে নাকি একে লক্ষ্ণৌই বড়া মুরী পাজামা বলে। তা সে যে নামই হোক আমার মনে হল আমি যেন খাসিয়া পাহাড়ে মুশমই জলপ্রপাতের সামনে দাঁড়িয়ে। বিজলির আলো প্রতি ফোল্ড বেয়ে যেন গলা রুপোর মতো ঝরনাধারায় পায়ের কাছে নেমে এসে শততরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে। সহজ ভাষায় বলতে গেলে শমশাদ বানু লায়লা যেন আস্বচ্ছ দুগ্ধকুণ্ডে কটিতটটি ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

এর সঙ্গে সে-যুগে লম্বা কুর্তা পরা হত। ইনি পরেছেন কঞ্চুলিকা বা চোলী। আমি মাত্র একবার সেদিকে তাকিয়েছিলুম।

মোগল বাদশা মারা গেলে যে ছেলে রাজা হত সে অন্ধদের চোখ চোখেরই সুরমা পরার শলা দিয়ে কানা করিয়ে দিত। আমার দুটি চোখই যেন কানা হয়ে গেল। ও রকম কিংখাব আমি দেশ-বিদেশের কোনো জাদুঘরেও দেখি নি। সোনা রুপোর জমি দিয়ে সে কিংখাবে এমনই কারুকার্য করা হয়েছে যে কিংখাবের একটি টানা-পোড়েনের রেশমী সুতোও দেখা যাচ্ছে না।

ঘাঘরাটি ছিল যেন শীতল ঝরণা : এ যেন সাক্ষাৎ অগ্নিকুণ্ড।

চোলীর হেথাহোথা দু-একটি মুক্তো গাঁথা। যেন বহ্নি নির্বাপিত করার জন্য ক্ষুদ্র হিমিকার নিষ্ফল প্রয়াস।

দু'কাঁধ বেয়ে নেমে এসেছে বুল্‌বুল্‌-চশ্‌ম্‌ ওড়না।

সেই ছেলেবেলায় দাদীমাকে বুল্‌বুল্‌-চশ্‌ম্‌ শাড়ি পরতে দেখেছি। আর আজ তার-ই ওড়না। অতি সূক্ষ্ম মসলিনের এখানে ওখানে দুটি দুটি করে বুলবুলের চোখের (চশ্‌ম্‌) মতো ফুটো করে সে দুটি অতি ফাইন মুগা সিল্ক দিয়ে বোতামের ফুটোর মতো কাজ করা হয়। এ রমণীর রুচি আছে। ক্ল্যাসিক্‌স্‌ পড়ে। বুলবুল-চশ্‌ম্‌ কালিদাসের যুগের, তার মূল্য ইনি জানেন।

আশ্চর্য! এলো খোঁপা! গান্‌মেটল রঙের কৃষ্ণনীল চুলের খোঁপাটি কাঁধে শুয়ে আছে যেন কৃষ্ণকরবীর স্তবক শুভ্র ফুলদানিতে ঘুমিয়ে আছে।

* * *

হঠাৎ দেখি এক চোখ-ঝলসানো সুন্দরী, বিধবার থান পরে! ইনি বিয়ের পরবে কেন? আমাদের দেশে তো কড়া বারণ। তখন আবার দেখি তার হাতে ফেনা-ভর্তি শ্যাম্পেনের গেলাস। নাঃ, ইনি সদ্য স্টুডিয়ো থেকে শুটিঙ অর্ধসমাপ্ত রেখে এসেছেন।

আরো অনেকেই ছিলেনঃ বেবাক বর্ণনা দিতে হলে রামায়ণ পুজো সংখ্যাটা আমাকেই লিখতে হয়। খর্চায় পুষাবে না—সম্পাদক জানেন।

ইতিমধ্যে কৃষ্ণলাল জভেরী এসে আমাকে নিয়ে চললেন সেই তারকা যজ্ঞশালার প্রান্তদেশে অনাদৃতা ঊর্মিলার অবস্থা থেকে টেনেহিঁচড়ে অন্য প্রান্তে। কি ব্যাপার? জভেরী উত্তেজনার মাঝখানে ইংরেজী ভুলে গিয়ে গুজরাটীতে কি যেন 'সুসু' করলে। কে যেন আমাকে ইণ্টারভ্যু দেবে। আমি বেকার। বিধি তবে দক্ষিণ। অন্য প্রভাতের সবিতা প্রসন্নোদয় হয়েছেন। আম্মো ইস্টার হব।

www.BanglaBook.org

শমশাদ বানু লায়লা মৃদু হাস্য করলেন। ফিল্‌ম্‌-স্টারের ধবধবে সাদা দাঁত নয়। গোলাপীর চেয়েও গোলাপী রঙের অতি ক্ষীণ একটি ফিল্‌ম্‌—ফিল্‌ম্‌স্টারের দাঁতের উপর। কি সুন্দর! তাই বুঝি কালিদাস তাঁর নায়িকার দাঁতের সঙ্গে রাঙা অশোকের তুলনা দিয়েছেন—শুভ্র বন-মল্লিকার সঙ্গে দেন নি। আগেই বলেছি, ইনি ক্ল্যাসিক্‌ল্‌। পানের রস গ্রহণ করতে জানেন। অন্য পান কিন্তু জানেন না। হাতে লেমন-স্কোয়াশ।

শুধালেন, 'আপনি দার্শনিক?'

আমি জভেরীকে ধমক দিয়ে বললুম, 'জভেরী!'

জভেরী ভীরু। বললে, 'আমি কিচ্ছু বলি নি।'

আমি বীবী সাহেবাকে চালাকি করে শুধালুম, 'আমাকে কি এতই বিজ্ঞ মনে হয়?'

'বুদ্ধু মনে হয়। বিজ্ঞ মনে হয় ফিল্মস্টারকে, ব্যাঙ্কারকে, পোকার খেলাড়ীকে।'

বাধ্য হয়ে বললুম, 'না। আমি দার্শনিক নই। আমি দর্শনের শত্রু ধর্ম নিয়ে নাড়াচাড়া করি।'

শমশাদ বানুর মুখে তৃপ্তির চিহ্ন ফুটলো।

এত দিনে আমার নীরস শাস্ত্রচর্চা ধন্য হল।

বললেন, 'সে তো আরো ভালো। আমি তাই খুঁজছিলাম। আচ্ছা বলুন তো—' বলে তিনি যেই একটু থেমেছেন, আমি তাড়াতাড়ি বললুম, 'বীবী সাহেবা, এই জায়গা কি ধর্ম-চর্চার পক্ষে প্রশস্ত?'

অবহেলার সঙ্গে বললেন, 'নয় কেন? পাপীরাই তো ধর্মচর্চা করবে। ধার্মিকদের তো ওসব হয়ে গিয়েছে। তেলো মাথায় ব্রিলেণ্টাইন? সে-কথা থাক্‌। আমি শুধোতে চাই, কেউ যদি মরে যায় (আমার মনে হল শমশাদ কেমন যেন একটু শিউরে উঠলেন) তবে আমি মরে গেলে তাঁকে দেখতে পাবো কি?'

আমি শুধালুম, 'কোন্‌ ধর্মমতে?'

'সে আবার কি?'

'আমি "তুলনাত্মক ধর্মশাস্ত্র" চর্চা করি।'

'তার মানে?'

'এই মানে ধরুন, পৃথিবীতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান মেলা ধর্ম আছে। আমি প্রত্যেক ধর্মের জন্ম, যৌবন, বর্তমান অবস্থা,—কে কি বলে তাই পড়ি। যেমন প্রত্যেক দেশের ইতিহাস হয়, তেমনি প্রত্যেক ধর্মেরও ইতিহাস হয়।'

একটু অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, 'আমি অতশত বুঝি নে। আমি ফিল্‌মে কাজ করি, আমি পণ্ডিত নই। আমি জানতে চাই, এত সব ধর্ম পড়ার পর এ-বিষয়ে আপনার ব্যক্তিগত, পার্সনাল মতটা কি?'

মহা ফাঁপরে পড়লুম। বললুম, 'আমি কখনো ভেবে দেখি নি। মুসলমান ধর্ম বলে—'

বাধা দিয়ে বললেন, 'থাক। আপনি তাহলে একটি আস্ত চিনির বলদ। ধর্ম বয়ে বেড়াচ্ছেন—কখনো কাজে লাগান নি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি বললুম, 'ধর্ম কি মশলা বাটার জিনিস! নামাজের কার্পেট দিয়ে কি মানুষ বিছানা বাঁধে?'

অতি শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'না। কিন্তু নামাজের কার্পেটে মানুষ নামাজ পড়ে; ওটা শিকেয় তুলে রাখে না।'

আমি বললুম, আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়াতে ফিল্‌ম্‌-স্টারদের সম্বন্ধে আমার ধারণা বদলে গেল। আপনি নিশ্চয়ই বিস্তর লেখাপড়া করেছেন।'

'কী আশ্চর্য! এ তো কমন্‌সেন্‌সের কথা। এটা না থাকলে প্রডুসার, ডিরেক্টর, এডমায়ারার, লাভারের দল আমাকে কুটিকুটি করে ফেলতো না! ওসব কথা থাক্‌! আপনি আমার কথার উত্তর বেশ চিন্তা করে দিন।' তারপর জভেরীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওহে জভেরী, ও'কে একটা শ্যাম্পেন দাও না?'

আমি মাথা নেড়ে বললুম, 'থাক্‌। আপনার পাল্লায় পড়ে আমার বিশ বছরের নেশা কপ্পুর হয়ে গেছে। আড়াই ফোঁটাতে আর কি হবে, লায়লীবানু!'

একটু হেসে বললেন, 'আপনার মুখে "লায়লী" বেশ মিষ্টি শোনায়।'

সব্‌বোনাশ! সব্‌বোনাশ!! এ যে ডবল এটাক! পিনসার মুভমেণ্ট!

ওড়নাটি ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে চেয়ারে যে ভাবে চেপে বসলেন তাতে বুঝলুম যে এ'র গায়ে কাবুলী রক্ত আছে। উত্তর না নিয়ে উঠবেন না।

মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, চোখ দুটি বন্ধ—বড় শান্ত প্রশান্ত, নিস্তব্ধ ভাব। ঐ বেশ পরা না থাকলে মনে হত তপস্বিনী, কঠোর ব্রতচারিণী সুফী রমণী।

আমি আস্তে আস্তে বললুম, 'আমার মনে হয়—', থামলুম। কোনো উত্তর নেই।

কিছুক্ষণ পর ফের বললুম, 'আমার মনে হয়—'

অল্প একটু 'উঁ' শুনতে পেলুম।

'—যে পুণ্যবান লোকের কোনো কামনা আল্লাতালা অপূর্ণ রাখেন না।'

* * *

আমি জানি, চতুর্দিকে তখন হৈ-হুল্লোড়। কিন্তু আমার মনে হল যেন আমি মরুভূমির মাঝখানে দুপুর রাত্রে জেগে উঠেছি। দিবাভাগের অসহ্য তাপে দগ্ধ সর্ব কাফেলার মানুষ উটা গাধা ঘোড়া সবাই অকাতরে ঘুমুচ্ছে। আকাশের নৈস্তব্ধ্যকেও যেন মরুভূমির নৈঃশব্দ্য হার মানিয়েছে। কোথা থেকে এল এ শান্তি, এ বিধান? তাকিয়ে দেখি, লায়লার মুখ থেকে।

তৎক্ষণে জভেরী শ্যাম্পেন নিয়ে ফিরেছে।

লায়লা উঠে বললেন, 'আপনার কথা ঠিক।'

তারপর জভেরীকে রাজেশ্বরীর কণ্ঠে বললেন, 'তুমি থাকো। আমি এ'কে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।'

গাড়িতে একটি কথাও হয় নি।

আমি নামবার সময় তাঁকে 'আদাব আরজ, খুদা হাফিজ' বললুম। তিনি সযত্নে আমার ডান হাত আপন দু'হাতে ধরে মৃদু চাপ দিলেন। সে চাপে ছিল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বন্ধুত্ব, সহৃদয়তা। ফিল্ম্-স্টারের হাতের চাপ আমি এর আগে, এখন এবং এর পরেও কখনো পাই নি।

মধ্যরাত্রি অবধি খাটে শুয়ে শুধু শান্তি অনুভব করেছিলুম।

রাত তিনটেয়, বোধহয়, একবার ধড়মড় করে জেগে উঠে ফের শুয়ে পড়েছিলুম।

* * *

সকালে উঠে দেখি, জভেরী ব্যাঙ্কে চলে গিয়েছে।

তারপর দেখি, পূর্ব রাত্রির প্রসন্নতা মন থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

কী যেন এক অজানা অস্বস্তির ভাব সর্ব দেহমন অসাড় বিকল করে দিয়েছে।

ফোন বাজল। জভেরী চিৎকার করে কি বলছে।

'শোনো, কাল রাত তিনটেয় শমশাদ আত্মহত্যা করেছে। দুটো চিঠি রেখে গিয়েছে। একটা পুলিসকে, একটা তোমাকে। তোমার চিঠিটার নকল যোগাড় করেছি। লিখেছে, 'মাই ডিয়ার এম, তোমার কথাই ঠিক। আমি চললুম। দেখা যখন তাঁর সঙ্গে হবেই তখন আর দেরি করে লাভ কি? আমি জানি আত্মহত্যা পাপ। আমার সব পুণ্যের বদলে এটা মাফ হয়ে যাবে।'

এখন মনে পড়ছে সন্ধ্যার সময় জভেরী বাড়ি এসে আমার হাত থেকে ফোন নামিয়েছিল।

এ-জীবনে এই প্রথমে ধর্মোপদেশ দিয়েছিলুম। আর এই শেষ॥

ছুছুন্দর কা সিরপর চামেলি কা তেল

লিঙ্গোয়াফোন রেকর্ডের কথা অনেকেই শুনেছেন। এ রেকর্ডগুলোর সাহায্যে দিশী-বিদেশী যে-কোনো ভাষা অতি চমৎকার রূপে শেখা যায়। রেকর্ড-গুলোতে বড় বড় ভাষা এবং উচ্চারণবিদরা গোড়ার দিকে খুব সহজ ভাষায় কথাবার্তা বলেছেন, ক্রমে কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে শেষের রেকর্ডগুলোতে এমনি বেগে বলেছেন যে, সেটা আয়ত্ত করতে পারলে আপনি সে ভাষায় নিজেকে ওকীবহাল বলে পরিচয় দিতে পারবেন। প্রথম একখানা রেকর্ড নিয়ে বার বার সেটা শুনতে হয়। তারপর প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতার সঙ্গে সঙ্গে গলা মিলিয়ে, সামনে পাঠ্যপুস্তকের দিকে চোখ রেখে উচ্চারণ করে যেতে হয়। পাঠ্যপুস্তকে আবার 'অনুশীলন'ও থাকে। সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোও করতে হয়। 'কী' দেওয়া আছে। তাই দিয়ে ভুলগুলো মেরামত করে নিতে হয়।

বুদ্ধি-শুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন নেই। শুধু গাধার খাটুনি আর সহিষ্ণুতা বা নিষ্ঠা কিংবা বলতে পারেন 'লেগে থাকা'র প্রয়োজন।

আমার অভিজ্ঞতাপ্রসূত ব্যক্তিগত সুদৃঢ় বিশ্বাস, পৃথিবীর বেশীর ভাগ জিনিস শেখার জন্য আক্কেল-বুদ্ধির প্রয়োজন অতি সামান্য। আসলে প্রয়োজন গাধার খাটুনি। বাঙলায় বা অন্য যে-কোনো ভাষাতে শব্দ-ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি করতে হলে বুদ্ধির প্রয়োজন কোথায়? 'পদ্ম' শব্দের প্রতিশব্দ 'কমল',

www.BanglaBook.org

'সরোজ', 'পঙ্কজ' শিখতে হলে কাউকে মাইকেলের মতো মেধাবী হতে হয় না, প্রয়োজন হয় ঐ কর্মে রোজ লেগে থাকার। কারো মুখস্থ হয় এক দিনে, কারো লাগে তিন দিন। তফাৎ ঐটুকু মাত্র। স্বয়ং মাইকেলই নাকি বলেছেন, জিনিয়াসের ৯৯% পার্সপরেশন, অর্থাৎ মাথার ঘাম পায়ে ফেলা, আর মাত্র এক পার্সেন্ট ইন্‌সপিরেশন অর্থাৎ বিধিদত্ত প্রতিভা।

শুধু মাত্র মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মাইকেলের মতো কাব্য রচনা করা যায় না। কিন্তু নিছক খাটুনির জোরে যে কোনো ভাষার অন্ততঃ এতখানি আয়ত্ত করা যায় যে, দেশের ৯৯% লোক তাকে ঐ ভাষায় পণ্ডিত বলে মেনে নেয়।

এবং এই সোনার বাঙলার ৯৯% লোক খাটতে রাজী নয়। রেওয়াজ না করেই সে গাওয়াইয়া হয়ে যায়, নিত্য নবীন নাচ 'কম্পোজ' করতে থাকে।

কিন্তু সে-কথা থাক। পরনিন্দা বা আপন নিন্দা—আমিও তো বাঙালী বটি—করে আমি পুজোর বাজারে রসভংগ করতে চাই নে। তাই মূল কথা আরম্ভ করি।

এই লিংগোয়াফোন রেডর্ক পত্তনের প্রথম যুগে বার্নার্ড শ' চারটি বক্তৃতা দেন। সেগুলো কিনতে পাওয়া যায়। অতি সুস্পষ্ট উচ্চারণে সুমধুর ভাষণ। ব্যংগকৌতুক, রস-সৃষ্টি, আর তথ্য-পরিবেশ তো আছেই।

কথাপ্রসংগে তিনি বলছেন,

"...হয়ত তুমি চালাক ছেলে। আমাকে শুধালে, তা হলে কি আমি সব সময় একই ধরনে কথা বলি?

"আমি সংগে সংগেই স্বীকার করে নিচ্ছি, আমি করি নে। কেউই করে না। এই তো এই মুহূর্তে আমি হাজার হাজার গ্রামোফনওয়ালাদের সামনে কথা বলছি. এদের অনেকেই আমার প্রত্যেকটি শব্দ, প্রত্যেকটি কথা প্রাণপণ বোঝবার চেষ্টা করছে। বাড়িতে আমি আমার স্ত্রীর সংগে যে রকম বেখেয়ালে কথা কই, এখন যদি তোমাদের সংগে সেরকম ধারা কথা কইতে যাই, তা হলে এ রেকর্ডখানা কারো এক কড়ির কাজে লাগবে না; আর এখন তোমাদের সংগে যে রকম সাবধানে কথা বলছি, সেরকম যদি স্ত্রীর সংগে বাড়িতে বলি তা হলে তিনি ভাববেন আমার বদ্ধ পাগল হতে আর বেশী বিলম্ব নেই।

"জনসাধারণের সামনে আমাকে বক্তৃতা দিতে হয় বলে আমাকে সাবধান থাকতে হয় যে, বিরাট হলের হাজার হাজার লোকের শেষ সারির শ্রোতাও যেন আমার প্রত্যেকটি কথা পরিষ্কার শুনতে পায়। কিন্তু বাড়িতে রেকর্ডফ্রেন্টের সময় আমার স্ত্রী আমার থেকে মাত্র দু'ফুট খানেক দূরে বসে আছেন। তাই বেখেয়ালে এমন ভাবে কথা বলি যে, তিনি আমার কথার উত্তর না দিয়ে প্রায়ই বলেন, 'ও-রকম বিড়বিড় করো না; আর দেখো, কথা বলার সময় অন্য দিকে ঘাড় ফিরিয়ো না। তুমি যে কি বলছো আমি তার কিছু শুনতে পাচ্ছি নে।' এবং তিনি যে সব সময় সাবধানে কথা বলেন তাও নয়। আমাকেও মাঝে মাঝে বলতে হয়, "কি বললে?"[১] আর তিনি সন্দেহ করেন যে, আমি ক্রমেই

---

১ এখানে শ' ইচ্ছে করেই 'আই বেগ ইয়োর পাডন' কিংবা 'এক্সকিউজ মি' বলেন নি। ইংগিত রয়েছে যে, বাড়িতে স্ত্রীকে আমরা পোশাকী আদবকায়দা দেখাই নে।

www.BanglaBook.org

কালা হয়ে যাচ্ছি. অবশ্য তিনি সেটা আমাকে বলেন না। আমি সত্তর পেরিয়ে গিয়েছি—কথাটা হয়ত সত্যি।

"কিন্তু এ-বিষয়ে কণামাত্র সন্দেহ নেই যে, রাজরাণীর সঙ্গে কথা বলার মতো আমি যেন আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা কই এবং তাঁরও বলা উচিত যেন তিনি রাজার সঙ্গে কথা বলছেন। তাই উচিত; কিন্তু আমরা তা করি নে।

"আমাদের আদব-কায়দা দু'রকমের—একটা পোশাকী, অন্যটা ঘরোয়া। কোনো অপরিচিতের বাড়িতে গিয়ে যদি দরজার ফাঁক দিয়ে ওদের কথাবার্তা শোনো—অবশ্য আমি আদপেই বলতে চাই নে যে এরকম অভদ্র আচরণ তোমার পক্ষে আদৌ সম্ভব—কিন্তু তবু, ভাষা শেখার অত্যধিক উৎসাহে তুমি যদি কয়েক মুহূর্তের তরে এরকম অপকর্ম করে শোনো, পরিবারের লোক বাইরের কেউ না থাকলে আপোসে কি ধরনে কথা বলে এবং পরে যদি ঘরে ঢুকে ওদের কথা শোনো, তাহলে তোমার সামনে ওদের কথা বলার ধরন দেখে রীতিমত অবাক হয়ে যাবে। এমন কি আমাদের ঘরোয়া কায়দা-কেতা পোশাকী কায়দার মতো উত্তম হলেও—আসলে আরো ভালো হওয়া উচিত—তাদের মধ্যে সব সময়ই পার্থক্য থাকে এবং সে পার্থক্য অন্য সব কায়দা-কেতার চেয়ে কথাবার্তাতেই বেশী।

"মনে কর ঘড়িটাতে দম দিতে ভুলে গিয়েছি : ওটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে! কাউকে তা হলে জিজ্ঞেস করতে হয়, ক'টা বেজেছে? অপরিচিত কাউকে জিজ্ঞেস করলে বলবো, 'কটা বেজেছে, বলতে পারেন?' সে তখন প্রত্যেকটি কথা পরিষ্কার শুনতে পায়, কিন্তু যদি স্ত্রীকে ঐ কথাই শুধাই তবে তিনি সর্বসাকুল্যে শুনতে পান 'কটা বেচ্ছে?' তাই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট : কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞেস করলে ওরকম বললে চলবে না। তাই এখন তোমাদের সামনে কথা বলছি স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার চেয়ে অনেক বেশী সাবধানে! কিন্তু লক্ষ্মীটি, ওঁকে সেটি বলো না।"

* * *

শ' কথাগুলি বলেছেন প্রধানত উচ্চারণ সম্বন্ধে। কারণ তিনি রেকর্ডের মারফতে বিদেশীকে ভালো ইংরেজী উচ্চারণ শেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই নীতি যে 'আমরা সর্বত্রই একই উচ্চারণে কথা বলি নে', ভাষা সম্বন্ধে আরো বেশী প্রযোজ্য। শব্দ, ইডিয়ম, প্রবাদ ইত্যাদি আমরা সকলের সামনে একই ভাবে বাছাই করে প্রয়োগ করি নে।

শ্বশুর মশায়ের সামনে ঘাড় নীচু করে, হাত-পা দিয়ে বায়ু সমুদ্র মন্থন করা কিছুক্ষণের মত স্থগিত রেখে বলি,

'আজ্ঞে, রামবাবু বললেন, ঐ ব্যাপার নিয়ে আমি যেন দুশ্চিন্তা না করি।

পিতাকে বলি, 'রামবাবু বললে, যাও ও-কথা তোমাকে ভাবতে হবে না।

রকের ইয়ারকে বলি, 'শলা রেমোটা কি বললে জানিস্? বললে, "যা যা ছোঁড়া, মেলা ডেঁপোমি কত্তি হবে না; আপন চরকায় তেল দে গে যা।"'

শ' সর্বোচ্চ উদাহরণ দিয়েছেন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে। সেটা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। তিনি যে তাঁর স্ত্রীকে সমঝে চলতেন, এমন কি ডরাতেনও সে-কথা কারো অজানা নেই। আর ডরায় না কে? 'পঞ্চতন্ত্র' পড়ে দেখুন—

www.BanglaBook.org

বিষ্ণুশর্মার লেখাটা নয়, অন্য একজনের। লাইব্রেরী থেকে ধার করে নয়, কিনে। লোকটা অন্নাভাবে আছে।

তাই প্রশ্ন উঠবে, উপরের যে রিপোর্টটি পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করছে, সেটি যদি বউয়ের কাছে নিবেদন করি, তবে সেটা কি রূপ নেবে?

সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে, বউ কি শুনতে চান। তিনি যদি শুনতে চান, 'রামবাবু ঐ কাজের ভারটা আপন কাঁধে তুলে নিয়েছেন, আপনাকে তাই নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না, তাহলে তো আপনি নিষ্পরোয়া হয়ে গিয়ে তেরিয়া মেরে চড়াকসে বলবেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ গিন্নী, যা কয়েছো।" আমি যতই বলি, "রামবাবু, আপনাকে কিচ্ছুটি চিন্তা করতে হবে না। আমি সব বোঝা কাঁধে নিচ্ছি", তিনি ততই আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বলেন, "না ভায়া, ও কাজ আমার—তোমাকে দেখতে হবে না।" কি আর করি? ওঁর হাতেই সব ছেড়ে দিয়ে এলুম।'

আর যদি গিন্নী উল্টোটা আশা করে থাকেন? অর্থাৎ আপনি যদি মিশনে ফেল মেরে এসে থাকেন? তাহলে? তাহলে ঈশ্বর রক্ষতু।

গলা সাফ করে ইদিক-উদিক তাকিয়ে কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, "—"

আবার বলছি তখন ঈশ্বর রক্ষতু। আমি আর কি বলবো। চল্লিশ বছর হল বিয়ে করেছি। এখনো সে ভাষা শিখতে পারি নি।

মূল কথায় ফিরে যাই।

এ তো হল কথাবার্তায়। সাহিত্যে এ জিনিসটি আরো প্রকট।

সেখানে কাকে উদ্দেশ্য করে লিখছেন সেটা তো আছেই, তার উপরে আছে বিষয়বস্তু।

কালীপ্রসন্ন সিংহ যখন মহাভারতের অনুবাদ করেছেন তখন ব্যবহার করেছেন সংস্কৃতশব্দবহুল ভাষা, কারণ বিষয়বস্তু এপিক, গুরুগম্ভীর। 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় তিনি ব্যবহার করেছেন 'রকে'র ভাষা। কারণ সেখানে বিষয়বস্তু 'বেলেল্লাপনা', অতএব চটুল এবং সেই কারণেই 'মেঘনাদবধে'র ভাষা এক, 'একেই কি বলে সভ্যতা'র ভাষা অন্য। 'কৃষ্ণচরিত্রে'র ভাষা এক, 'কমলাকান্তে'র ভাষা অন্য।

এমন কি ধরুন, বিষয়বস্তুও এক, কিন্তু সেখানে পরিবেশ এবং পাত্র ভিন্ন বলে ভাষাও ভিন্ন হল: 'পারস্য ভ্রমণে' রবীন্দ্রনাথ কথা বলছেন এ দেশের অভিজাত সম্প্রদায়, গুণীজ্ঞানীদের সঙ্গে—তাই তার ভাষা এক এবং 'মরুতীর্থ হিংলাজে'র পাত্রপাত্রী অতি সাধারণ জন—এমন কি রিফ্‌র‍্যাফ্‌—তাই তার ভাষা অন্য; 'মরুতীর্থ' 'পারস্যে'র চেয়ে ভালো না মন্দ সে-কথা উঠছে না। দুটোই রসসৃষ্টি, কিন্তু দুটো আলাদা জিনিস।

অর্থাৎ বিষয়বস্তু—কন্‌টেন্‌ট্‌—তার শৈলী এবং ভাষা—স্টাইল—নির্বাচন করে। সেখানে উল্টোপাল্টা করলে রসসৃষ্টি হয় না।

'বঙ্কিমের ভাষার অনুকরণ করবে'—ছেলেবেলা থেকেই সে উপদেশ শুনেছি এবং ধরে নিয়েছি সে ভাষা 'রাজসিংহ', 'দুর্গেশনন্দিনী'র ভাষা।

ঐ ভাষা দিয়ে পাড়ার কানাই-বলাইয়ের কাহিনী লিখতে গেলে ফর্ম ও কন্টেন্টের যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তার ফলে বারে বারে তাল কাটে। শরৎ

www.BanglaBook.org

চাটুজ্জের প্রথম যৌবনের লেখাতে তার নিদর্শন প্রচুর পাওয়া যায়। প্রৌঢ় বয়সে তিনি তাঁর আপন ভাষা পেয়ে বিষয়বস্তুর সঙ্গে তাল রেখে অদ্ভুত তবলা শোনালেন।

এমন কি 'গোরা', 'যোগাযোগ', 'শেষের কবিতা'র ভাষা দিয়ে 'কচিসংসদ' লেখা যায় না।

তাই রবীন্দ্রনাথ বা বঙ্কিমের অনুকরণ (ইমিটেশন) সহজেই হনুকরণ (এপিং) হয়ে যেতে পারে।

আর্ট না অ্যাক্সিডেন্ট

আর্ট বলতে আমরা আজকাল মোটামুটি রস-ই বুঝি। তা সে কাব্যে, চিত্রে, ভাস্কর্যে, সঙ্গীতে যে কোনো কলার মাধ্যমেই প্রকাশিত হোক না কেন।

এখন প্রশ্ন আর্ট বা রসের সংজ্ঞা কি? সে জিনিস কি? তাঁর সঙ্গে দেখা হলে তাকে চিনব কি করে? অন্যান্য রস থেকে তাকে আলাদা করব কি করে? সরেস আর্ট কোন্‌টা আর নিরসই বা কোন্‌টা?

প্রাচীন ভারত, গ্রীস এবং চীন—এই তিন দেশেই এ নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে এবং অধুনা পৃথিবীর বিদগ্ধ দেশ মাত্রেই এ নিয়ে কলহ-বিসংবাদের অন্ত নেই। বিশেষ করে যবে থেকে 'মডার্ণ আর্ট' নামক বস্তুটি এমন সব 'রস' পরিবেশন করতে আরম্ভ করলে যার সঙ্গে আমাদের কণামাত্র পরিচয় নেই। এলোপাতাড়ি রঙের পোঁছকে বলা হল ছবি, অর্থহীন কতক-গুলো দুর্বোধ শব্দ একজোট করে বলা হল কবিতা, বেসুরো বেতালা কতক-গুলো বিদঘুটে ধ্বনির অসমন্বয় করে বলা হল সঙ্গীত। বলছে যখন তখন হতেও পারে, কিন্তু না পেলাম রস, না বুঝলাম অর্থ, না দিয়ে গেল মনে অন্য কোনো রসের ব্যঞ্জনা বা ইঙ্গিত। তাই বোধহয় হালের এক আলঙ্কারিক মডার্ণ ভাস্কর্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, যখন ভাস্কর এক বিরাট কাঠের গুঁড়ি নিয়ে তার উপর ছ'মাস ধরে প্রাণপণ বাটালি চালানোর পর সেটাকে কাঠের গুঁড়ির আকার দিতে পারেন, এবং নিচে লিখে দেন "কাঠের গুঁড়ি—তখন সেটা 'মডার্ণ ভাস্কর্য'।

ইতিমধ্যে এই মডার্ণ আর্টের বাজারে একটি নূতন জীব ঢুকেছেন এবং সেখানে হুলস্থূল বাধিয়ে তুলেছেন—এর নাম অ্যাক্সিডেন্ট, বাঙলায় দুর্ঘটনা, দৈবযোগ, আকস্মিকতা যা খুশী বলতে পারেন।

এঁর আবির্ভাব হয়েছে সুইডেনের মতো ঠাণ্ডা দেশে—সেখানে মানুষ ঠাণ্ডাভাবে ধীরে-সুস্থে কথা কয়, চট করে যা-তা নিয়ে খামখা মেতে ওঠে না।

* * *

সুইডেনের মহাসম্মানিত ললিত-কলা অকাদেমির বিজ্ঞ বিজ্ঞ প্রফেসর, কলারসিক গুণীজ্ঞানীরা অকস্মাৎ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কর্ণমূলের পশ্চাদ্দেশ কণ্ডুয়ন করতে লাগলেন। তাঁদের মহামানবর প্রেসিডেন্ট তো খুদাতাল্লার হাতে সব-কিছু ছেড়ে দিয়ে সোজাসুজি বলেই ফেললেন, 'কি করি, মশাইরা, বলুন। কে জানত শেষটায় এ-রকমধারা হবে? আজকাল নিত্য নিত্যি এত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সব নয়া নয়া এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট হচ্ছে যে, কোন্‌টা যে এক্‌সপেরিমেণ্ট আর কোন্‌টা যে অ্যাক্‌সিডেণ্ট কি করে ঠাওরাই? আমরা ভেবেছি, চিত্রকর ফাল্‌স্ট্রোম্‌ আর্টের ক্ষেত্রে একটা অভিনব নবীন পন্থা আবিষ্কার করতে পেরেছেন এবং তাই ভেবে ঐ ছবিটাও এগ্‌জিবিশনের অন্যান্য ছবির পাশে টাঙিয়ে দিয়েছি—'

ওদিকে আর্টিস্ট ফাল্‌স্ট্রোম্‌ রেগে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সর্বত্র চেঁচামেচি করে বলতে লাগলেন, তাঁকে লোকচক্ষে হীন করার মানসে দুষ্ট লোক কুমতলব নিয়ে এই অপকর্মটি করেছে।

অপকর্মটি কি?

ফাল্‌স্ট্রোম্‌ ছবি আঁকার সময় একখানা ম্যাসনাইটের টুকরোয় মাঝে মাঝে তুলি পুঁছে নিতেন। কাজেই সেটাতে হরেক রকম রঙ লেগে থাকার কথা। ঐ সময়ে সুইডিশ ললিত-কলা আকাদেমি এক বিরাট মহতী এক্‌জিবিশনের ব্যবস্থা করেন—'স্বতঃস্ফূর্ত কলা (স্পণ্টানিস্‌মুস বা Spontaneous art) ও তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ' এই নাম দিয়ে সে চিত্রপ্রদর্শনীতে সুইডেন তথা অন্যান্য দেশের স্পণ্টানিস্‌মুস কলার উত্তম উত্তম নিদর্শন তাতে থাকবে। (ক্যুবিজম, দাদাইজমের মতো স্পণ্টানিয়েজম-ও এক নবীন কলাসৃষ্টি পদ্ধতি—আমি অবশ্য এখানে সে প্রশ্ন তুলছি নে যে সার্থক কলাসৃষ্টি মাত্রই স্পণ্টেনিয়াস বা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে থাকে,—বিশেষ পদ্ধতিকে এ নাম দিলে তাকে চেনবার কি যে সুবিধে হয় বোঝা কঠিন।)

এখন হয়েছে কি, আর্টিস্ট ফাল্‌স্ট্রোম্‌ তাঁর অন্য ছবি যাতে করে ডাকে যাবার সময় জখম না হয় সেই উদ্দেশ্যে ঐ রঙবেরঙের ম্যাসনাইটের টুকরোখানা তাঁর ছবির উপর রেখে চিত্রপ্রদর্শনীতে পাঠিয়েছিলেন। আকাদেমির বড় কর্তারা ভাবলেন, এটাও মহৎ আর্টিস্টের এক নবীন মহান কলানিদর্শন এবং পরম শ্রদ্ধাভরে সেই ম্যাসনাইটের টুকরোটির নিচে আর্টিস্টের স্বনামখ্যাত নামটি লিখে ঝুলিয়ে দিলেন আর্টিস্টের অন্য ছবির পাশে!

ব্যাপারটা যখন ধরা পড়ল তখন আর্ট সমালোচকরা কি যে করবেন ঠিক করতে না পেরে চুপ করে গেলেন আর সুইডেনবাসী আপনার আমার মতো সাধারণজন মুখ টিপে হাসলে যে বাঘা বাঘা পণ্ডিতেরা ঐ 'স্বতঃস্ফূর্ত' রসিকতাটা ধরতে না পেরে ফাঁদে পা ফেলেছেন বলে।

কিন্তু এইখানে ব্যাপারটার গোড়াপত্তন মাত্র।

সুইডেনের কাগজে কাগজে তখন সমালোচনা আরম্ভ হল, এই নিয়েঃ একখানা উটকো কাঠ জাতীয় জিনিসের উপর এলোপাতাড়ি রঙের ছোপকে যদি পণ্ডিতেরা আর্ট বলে মেনে নিতে পারেন তবে তাঁদের ঢাকঢোল-পেটানো এই মহাসাধনার 'মডার্ন আর্টে'র মূল্যটা কি?

* * *

ওইভিন্দ ফাল্‌স্ট্রোম্‌ সুইডেনের নাম-করা তরুণ চিত্রকর। তিনি সম্প্রতি এই 'স্বতঃস্ফূর্ত কলা-মার্গে' প্রবেশ করেছেন এবং কলা নির্মাণের ক্রমবিকাশে তিনি ইতিমধ্যেই তাঁর ঢং একাধিকবার আগাপাস্তলা বদলিয়েছেন। সুইডেনে এখন এই 'কনক্রীট', 'স্থূল', বা 'বাস্তব' মার্গের খুবই নামডাক; এঁরা নিজেদের অনুভূতি স্বতঃস্ফূর্ত অনব্যবহিত ভাবে রঙের মারফতে প্রকাশ করেন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—সে প্রকাশে কোনো বস্তু বা কোনো-কিছুর প্রতিকৃতি থাকে না, কোনো-কিছু রূপায়িত করে না, ছবির নাম পর্যন্ত থাকে না—এবং দর্শক তাই দেখে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে, সরাসরি আর্টিস্টের অনুভূতি বুঝে গিয়ে তার অর্থ করে নেয়,—কিংবা ঐ আশা করা হয়।

এই হল মোটামুটি তার অর্থ—অর্থাৎ অর্থহীন জিনিসকে যদি অর্থ দিয়ে বোঝাতে হয় তবে যে 'অর্থ' দাঁড়ায়।

ফালস্ট্রোম্ চিত্রপ্রদর্শনীতে দু'খানি ছবি পাঠাতে চেয়েছিলেন, এবং পূর্বেই বলেছি, সে দুখানি ছবি যাতে করে পোস্টাপিসের চোট না খায় তাই সঙ্গে সেই ম্যাসনাইটের টুকরো দিয়ে সেগুলোকে প্যাক্ করে তিনি চলে যান গ্রামাঞ্চলে ছুটি কাটাতে। এদিকে আকাদেমির বাঘ-সিঙ্গিরা ছবি তিনখানা (আসলে অবশ্য দুখানা) ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার নিরীক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে বাছাই করে নিলেন দু'খানা,—এবং তার মধ্যে মনোনীত হয়ে গেল তুলি পোঁছার সেই ম্যাসনাইটের পট্টি! ক্রিটিকদের কারোরই কাছে ঐ ম্যাসনাইটের 'অঙ্কিত' তুলিপোঁছা রঙ-বেরঙ করা জিনিসটির স্টাইল বা বিষয়বস্তু অদ্ভুত বা মূল্যহীন ঠেকে নি। তার অর্থ, একদিকে চিত্রকরের 'ন্যায়ত' 'ধর্মসঙ্গত' আঁকা ছবি ও অন্যদিকে তাঁর তুলি পোঁছার এলোপাতাড়ি রঙের ছোপ—এ দুয়ে কোনো পার্থক্য নেই।

তাই লেগেছে হুলস্থূল তর্কবিতর্ক, 'সে আর্ট তবে কি আর্ট যেখানে "ভুল" জিনিস অক্লেশে খাঁটি আর্ট বলে পাচার হয়ে যায়?'

এরা ধরা পড়ল কি করে? ফালস্ট্রোম্ ছুটি থেকে ফিরে একদিন স্বয়ং গিয়েছেন চিত্রপ্রদর্শনী দেখতে। সেখানে ঐ ম্যাসনাইট ছবি'র কাণ্ড দেখে যখন ভুলটা ধরা পড়ল তখন কোথায় না তিনি বিচক্ষণ জনের মতো চুপ করে থাকবেন—তিনি উল্টে আরম্ভ করলেন তুলকালাম কাণ্ড!

ফলে জ্ঞানগর্ভ পণ্ডিতমণ্ডলী, তীক্ষ্ণচক্ষু কলাসমালোচকদের দল, ঝানু ঝানু আর্টসংগ্রহকারিগণ, সরলচিত্ত সাধারণ দর্শক এবং সর্বশেষে নিজেকে আর তামাম ঐ 'স্বতঃস্ফূর্ত-কলা-পন্থী'কে বিশ্বজনের সম্মুখে তিনি হাস্যাস্পদ করে ছাড়লেন।

এর কয়েক বছর পূর্বে এক বিদগ্ধ বিদূষক চিড়িয়াখানার শিম্পাঞ্জীর 'আঁকা' একখানি 'ছবি' ঐ রকম এক চিত্রপ্রদর্শনীতে পাঠিয়ে শহরের লোককে বোকা বানিয়েছিল—তখনও কেউ ধরতে পারেন নি, ওটা বাঁদরের মস্করা।

কিন্তু প্রশ্ন, এই ধরনের তামাশা চলবে কতদিন ধরে? এই স্যুপ্রিমাটিস্টের দল, কিংবা অন্য যে-কোনো নামই এদের হোক—এরা আর কতদিন ধরে আপন ব্যবহার দিয়ে ইচ্ছা-অনিচ্ছায় প্রকাশ করবেন যে এদের আর্ট কোনো কিছু সৃজন করার দুরূহ শক্তিসাধনায় আয়ত্ত নয়, আকস্মিক দৈবদুর্বিপাকে বা অ্যাক্সিডেন্ট বা ঘটনাচক্র এঁদেরই মতো উত্তম উত্তম ছবি আঁকতে পারে, শ্রেষ্ঠ গান গাইতে পারে, সার্থক কবিতা রচনা করতে পারে—এতদিন যা শুধু সরস্বতীর বরপুত্রেরাই বহু সাধনার পর করতে পারতেন?

এই প্রশ্নটি শুধিয়েছেন এক সরলচিত্ত, দিশেহারা সাধারণ লোক—সুইডেনের কাগজে।

উত্তরে আমরা বলি, কেন হবে না? এক কোটি বাঁদরকে যদি এক কোটি

www.BanglaBook.org

পিয়ানোর পাশে বসিয়ে দেওয়া হয়, এবং তারা যদি এক কোটি বংশপরম্পরা ওগুলোর ওপর পিড়িং পাড়াং করে তবে কি একদিন একবারের তরেও একটি মনোমোহন রাগিণী বাজানো হয়ে যাবে না? সেও তো অ্যাক্সিডেন্ট!

আমার ব্যক্তিগত কোনো টীকা বা টিপ্পনী নেই। মডার্ণ কবিতা পড়ে আমি বুঝি না, আমি রস পাই না। সে নিয়ে আমার কোনো খেদ নেই। পৃথিবীতে যে অতশত ভালো জিনিস রয়েছে যার রসাস্বাদন আমি এখনো করে উঠতে পারি নি, ওগুলো আমার না হলেও চলবে।

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন

আমরা যারা বাল্য বয়স থেকে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের স্নেহচ্ছায়ায় বড় হয়েছি এবং আশ্রমবাসী সকলেই যাঁকে সেদিনও পর্যন্ত এখানকার সর্বজনপূজ্য আচার্যশ্রেষ্ঠ রূপে পেয়ে সঙ্কটের সর্বশ্রেষ্ঠ কাণ্ডারী ও আনন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকারী জেনে মনে মনে গভীর পরিতৃপ্তি অনুভব করতাম, আজ তাদের শোক সবচেয়ে বেশী।

ভারতবর্ষের সর্বত্র এবং ভারতের বাইরে তাঁকে অসংখ্য লোক কত না ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। হয়ত তাঁদের অনেকেই আমাদের চেয়ে তাঁকে পূর্ণতররূপে দেখেছেন, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের এবং সমগ্রভাবে আশ্রমের সত্তাতে যে আঘাত লেগেছে তার কঠোরতা আজ এই প্রথম আমরা বুঝতে আরম্ভ করলুম। এতদিন আমাদের এমন একজন ছিলেন যিনি বিশ্ব-ভারতীর কর্ম থেকে বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন সত্য, কিন্তু তারপরেও সেদিন পর্যন্ত তিনি আশ্রমবাসীদের সর্বাগ্রণীরূপে আমাদের মধ্যে ছিলেন। আশ্রমের দৈনন্দিন সমস্যাতে তাঁকে জড়িত করা হত না, কিন্তু তিনিই ছিলেন গুরুতর সমস্যাতে আমাদের সর্বোত্তম পথপ্রদর্শক।

এখানকার শিক্ষাভবনের (অর্থাৎ ইস্কুলের) শিক্ষকরূপে তিনি কর্মজীবন আরম্ভ করেন—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যে স্কুলের প্রধান শিক্ষক সেখানে তাঁর এই কর্মভার গ্রহণ যে উভয়ের পক্ষেই পরম শ্লাঘার বিষয়, সে-কথা দুজনেই জানতেন। পরবর্তীকালে উত্তরবিভাগ বা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে তিনি অধ্যাপক হলেন ও সর্বশেষে বিশ্বভারতী রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার পর তিনি উপাচার্যরূপে আশ্রম পরিচালনা করেন। "উপাচার্য" শব্দ এখানে প্রয়োগ করাতে কেউ যেন ভুল না বোঝেন। এটি একটি রাষ্ট্রীয় অভিধা—বস্তুত তিনি আচার্যোত্তম ছিলেন। আমি বলতে পারি পৃথিবীর যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে আচার্য রূপে পেলে ধন্য হত।

এবং এই তাঁর একমাত্র কিংবা সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় নয়।

বস্তুত এরকম বহুমুখী প্রতিভাবান ব্যক্তি সর্বদেশেই বিরল। কেউ তাঁকে জানেন সংস্কৃত শাস্ত্রের পণ্ডিত রূপে, কেউ অধ্যাত্মগীয় সন্তদের প্রচারক রূপে, কেউ রবীন্দ্রপ্রতিভার সম্যক রসজ্ঞ ও টীকাকার রূপে, কেউ চৈনিক-ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের লুপ্ত গৌরব উদ্ধারপ্রয়াসী গবেষক রূপে, কেউ বাউল-ফকীরের গূঢ় রহস্যাবৃত তত্ত্বজ্ঞানের উন্মোচকরূপে, কেউ শব্দতত্ত্বের অপার বারিধি অতি-

www.BanglaBook.org

ক্রমণরত সন্তরণকারী রূপে, কেউ সুখ-দুঃখের বৈদিকার্থে পুরোহিত রূপে, কেউ এই আশ্রমের অনুষ্ঠানাদিকে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যানুযায়ী রূপ দিবার জন্য উপযুক্ত মন্ত্র আহরণে রত ঋষি রূপে,—আমরা তাঁকে চিনেছি গুরুরূপে।

বিনয়বশত প্রকৃত গুণীজন তাঁর গুণ আচ্ছাদিত রাখেন, কিন্তু শিষ্যের কাছে তাঁর সর্বগুণ উন্মোচন করে দেন। তিনি সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন, অলঙ্কারশাস্ত্র তাঁর নখাগ্রদর্পণে ছিল এবং ভরতমম্মটসম্মত প্রাচীনতম আলঙ্কারিক সূত্র তিনি অতি সাধারণ, অতিশয় গ্রাম্য গীতিকাতে আরোপণ করে সে যে রসোত্তীর্ণ হয়েছে সে-কথা বার বার সপ্রমাণ করতে জানতেন। বৈদ্যসন্তান বৈদ্যরাজও ছিলেন। রন্ধনশাস্ত্রে তাঁর অনুরাগ ছিল। অভিনয়ে তিনি সুদক্ষ নট। ভারতের ঐক্যানুসন্ধানের পর্যটক রূপে চৈতন্য ও বিবেকানন্দের পরেই তাঁর নাম করতে হয়।

তাঁর আরো বহু গুণ ছিল। তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া আমার শক্তির বাইরে। আজ সেদিন নিশ্চয়ই নয়। এই এখন আমার কানে ভেসে আসছে ক্ষিতিমোহনের বিহারক্ষিতি শালবীথিকায় তাঁর স্মরণে শোকতপ্ত আমবাসিগণের সশ্রদ্ধ 'আগুনের পরশমণি' বৈতালিক গীতি।

* * *

চিত্রে নন্দলাল। সঙ্গীতে দিনেন্দ্রনাথ। শাস্ত্রে বিধুশেখর। শব্দতত্ত্বে হরিচরণ। শিক্ষকতায় জগদানন্দ। রসে ক্ষিতিমোহন।

শুনেছি বিশ্বভারতী এঁদের সম্বন্ধে প্রামাণিক পুস্তক প্রকাশ করবেন। তার ভিতরই পাওয়া যাবে বিশ্বভারতীর নাতিসম্পূর্ণ ইতিহাস। এ কর্মে সংখ্যাতীত শিষ্যের সহযোগিতার প্রয়োজন। আমি শুধু সেটুকু বলতে পারি যা স্বচক্ষে দেখেছি।

শাস্ত্র এবং রসালোচনায় রবীন্দ্রনাথের দুই বাহু ছিলেন বিধুশেখর এবং ক্ষিতিমোহন।

সকলেই আশা করেছিলেন কাশীর শাস্ত্রী ক্ষিতিমোহন সংস্কৃত চর্চায় যশস্বী হবেন। কিন্তু তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করে দিলেন বাঙলার জনবৈদগ্ধ্য চর্চায়। আজ আর মধ্যযুগের সন্তরা যে পৃথিবীর সর্বসন্তদের সমকক্ষ এ কথা নিয়ে কেউ তর্কাতর্কি করে না, এ দেশের আউল-বাউলরা যে সাধনার গভীরতম অতলে পৌঁছে প্রাচীন যুগের মুনি-ঋষিদেরই ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন করেছিলেন সে-কথাও কেউ অস্বীকার করে না,—এখন কি কোনো কোনো অর্বাচীন ঐ বিষয়ে বিরাট গ্রন্থ লিখে এখন সপ্রমাণ করতে চায় যে, সে ক্ষিতিমোহনকেও ছাড়িয়ে গেছে, তাঁর 'অসম্পূর্ণ' জ্ঞান 'সম্পূর্ণতর' করে দিয়েছে! বিরাটকায় ক্ষিতিমোহনের স্কন্ধে দাঁড়িয়ে বামনও হয়ত একটু বেশী দূর অবধি দেখতে পায় অস্বীকার করি নে, কিন্তু সে বামন ক্ষিতি-অতিকায়ের বিরাট মস্তিষ্ক আর বিরাটতর হৃদয় পাবে কোথায়! তবে আজ এই বিতর্কমূলক প্রস্তাব (অবশ্য আমার কাছে নয়) উত্থাপন করব না—আজ শোকের দিন।

এবং সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, ক্ষিতিমোহন আউল-বাউল গান নিয়ে আলোচনা করার সময় যে পদ্ধতি অবলম্বন করলেন সেটি সম্পূর্ণ শাস্ত্রচর্চা পদ্ধতি। অর্থাৎ উপনিষদ বা গীতার টীকা লেখার সময় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত যে

www.BanglaBook.org

রকম অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পাঠোদ্ধার করেন, অন্যান্য শাস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করেন, ঐ সব শাস্ত্রের মূল উৎসের অনুসন্ধান করেন, ঠিক সেই পদ্ধতিতে তিনি আউল-বাউলের 'শাস্ত্র' অধ্যয়ন করে, টীকা লিখে তাদের জীবনদর্শন অধ্যাত্মদর্শন লোকচক্ষের সামনে তুলে ধরলেন।

এই কর্মে লিপ্ত হয়ে ক্ষিতিমোহন দেখতে পেলেন, আউল-বাউলের মূল উৎস যে শুধু বেদ উপনিষদ গীতা ভক্তিবাদে রয়েছে তা নয়, তার সঙ্গে মিলে গিয়েছে মুসলিম সূফীবাদ। তিনি তারই অনুসন্ধানে সূফীবাদের এমনই গভীরে পৌঁছলেন যে, বহু সুপণ্ডিত সূফী পর্যন্ত আশ্চর্য হলেন যে, সূফী আবহাওয়ার এত দূর থেকে এই লোকটি একে আপন প্রাণ-নিঃশ্বাসে ভরে নিল কি করে? রামমোহনকে যদি বলা হয় জবরদস্ত মৌলবী, এঁকে তাহলে বলতে হয় 'খবরদস্ত'—বা 'খবর্-দার-সূফী'। পূব বাঙলার অনাদৃত মুসলিম চাষীকে ক্ষিতিমোহন ছেলেবেলা থেকেই অন্তরঙ্গভাবে চিনতেন—তিনি প্রমাণ করলেন তার আধ্যাত্মিক সাধনা কুরান ও সূফীবাদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত এবং আশ্চর্য প্রাণশক্তিবলে সে তার চতুর্দিকের ভিন্ন সাধনাও আপন করে নিতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, হিন্দু সাধকের কাছে সে ঋণীও বটে, উত্তমর্ণও বটে। এবং সর্বশেষে সপ্রমাণ করলেন, হিন্দু মুসলমান সাধনার মিলন হয়েছে এই 'চাষাভুষো'দের কল্যাণেই—মৌলভী ভশ্‌চাষে যে ভাবনা-সাধনার আদান-প্রদান অতি অল্পেই হয়েছে সেটা পরিস্ফুট হয়ে উঠল।

গণসাধনার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা গভীরতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হিন্দু ক্রিয়াকর্মের দিকে আকৃষ্ট হলেন। 'মেয়েলী' বলে আমরা যে সব পালপার্বণ ব্রতপূজা অবহেলা করে আসছিলুম সেগুলো একটি একটি করে বিশ্লেষণ করে তিনি দেখাতে লাগলেন যে, এগুলোর ভিতরও অতি প্রাচীন ঐতিহ্য লুকোনো রয়েছে, এর অনেকগুলোই চলে যায় আমাদের ধর্মানুসন্ধানের প্রাচীনতম যুগে। সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ করলেন যে, আমাদের অনেকগুলোই আবার আমাদের প্রতিবেশী অনার্যদের কাছ থেকে নেওয়া।

সে এক বিপরীত দর্পণ! আমরা যে সব পালপার্বণকে ভেবেছিলুম অতিশয় খানদানী 'আর্য', ক্ষিতিমোহন প্রমাণ করলেন তার অনেকেই 'অনার্য' এবং তথাকথিত 'অনার্য' ক্রিয়াকর্মের মূল রয়েছে নৈকষ্য আর্য সাধনার গভীরে।

এর সব-কিছুই প্রেমী গবেষককে নিয়ে যায় ভারতবর্ষের ধর্মকর্মশাণিত দর্শনচর্চায়—কারণ একমাত্র দর্শনশাস্ত্রই বহুর বাহ্যরূপ উন্মোচন করে অন্তরের ঐক্য দর্শন করাতে পারে। সেখানে তিনি পেলেন জ্ঞানী দ্বিজেন্দ্রনাথের[১] উপদেশ এবং সহযোগিতা—গুণী রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য যে তিনি অহরহ পেতেন সে

---

১ এই ঋষি সম্বন্ধে বাঙলা সাহিত্যে প্রায় কোনো আলোচনাই হয় নি। এ যুগে এঁর ভগবৎ-উপলব্ধি তুলনাহীন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি অদ্বিতীয় দার্শনিক ছিলেন। ক্ষিতিমোহনের সঙ্গে এঁর যোগ হওয়াতে উভয়েই প্রচুর লাভবান হয়েছিলেন। নিম্নে ক্ষিতিমোহনকে লিখিত দ্বিজেন্দ্রনাথের একখানি চিঠি ক্ষিতিমোহনের পুত্র শ্রীমান ক্ষেমেন্দ্রের অনুমতি নিয়ে উদ্ধৃত করছি:

"হিরাক্লিটসের প্রকল্পিত অগ্নিব্রহ্মবাদের গোড়ার বৃত্তান্ত সম্বন্ধে আপনার বিচারে যাহা

www.BanglaBook.org

জানা কথা পূর্বেই নিবেদন করেছি। এরই ফলে তিনি আবিষ্কার করলেন যে, আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন ক্রিয়াকাণ্ড, যোগ তন্ত্রের রহস্যবাদ ও দর্শনের মূল তত্ত্বে রয়েছে একই নির্দ্বন্দ্ব সত্য।

এই সত্যের ভানুমতী-দণ্ড হাতে নিয়ে ক্ষিতিমোহন প্রবেশ করলেন হীনযান, মহাযান এবং তারই ভিন্ন ভিন্ন তান্ত্রিক যান, নেপাল-তিব্বত-চীনের ভিন্ন ভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মজগতের ভিতর। সেই এক সত্য কখনো বৌদ্ধদর্শনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিন্তাধারায়, তন্ত্রের বিকৃত কর্মকাণ্ডের পিছনেও সেই সত্য ভস্মাচ্ছাদিত, সেই সত্যই চর্যাপদে, সেই সত্যই পূর্ববঙ্গের লোকসঙ্গীতে, পশ্চিমবঙ্গের আউল-বাউলের গানে কখনো স্বপ্রকাশ, কখনো শাস্ত্রানধিকারীর উৎপাতে লুক্কায়িত—কখনো সরলতম ভাষায় স্বচ্ছ, কখনো রহস্যাবৃত রূপকে আস্বচ্ছ কুহেলিকাঘন।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, এতে আর নূতন কথা কি? আমরা তো চিরকালই স্বীকার করে এসেছি, সর্বধর্মেই সত্য সমাহিত।

সত্যই কি আমরা তা জীবনে স্বীকার করেছি? ধর্মের বাহ্যরূপে যে বিকট প্রভেদ অহরহ দেখতে পাচ্ছি, সে কি যুগ যুগ ধরে আমাদের ভিতর দ্বন্দ্ব-কলহের সৃষ্টি করে নি? না হলে চৈতন্য, রামমোহন, রামকৃষ্ণের কি প্রয়োজন ছিল?

দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ এবং ক্ষিতিমোহন এঁদের মতো ধর্মসংস্কারক ছিলেন। এঁদের প্রধান কর্ম ছিল, যুগ যুগ সঞ্চিত আমাদের ঐতিহ্যের ধন যার প্রায় সব-কিছুই আমরা দৈনন্দিন জড় অভ্যাসের ফলে সম্পূর্ণ অবহেলা করে বসে আছি, সাধনাবিহীন মন্ত্রতন্ত্রই সর্বপাপহর বলে বিশ্বাস করে বসে আছি, মুখে 'সর্বভূতে নারায়ণ', কর্মে সে 'নারায়ণকে ডোম-চণ্ডালের কলুষতায় ভয়ে সমাজ থেকে দূরে ঠেলে রেখেছি, স্বর্ণেপর্ণে, ধর্মে-অধর্মে প্রভেদ করার শক্তি প্রায় হারিয়ে ফেলেছি—এই নিদারুণ অবস্থায় আমাদের দৃষ্টি সেই সত্যের দিকে আকৃষ্ট করা যে-সত্য আমাদের হাতের কাছেই আছে,—লালন ফকীরের ভাষায়—

"হাতের কাছে—পাইনে খবর
খুঁজতে গেলেম দিল্লী শহর—।"

যাকে চাইলেই পাওয়া যায়।

সত্য বলিয়া মনে হয়, তাহা আমাকে ব্যক্ত করিয়া বলুন, এইটে আমি লিখিতে ইচ্ছা করি।

প্রবর্তিত না বলিয়া প্রকল্পিত বলিলাম এইজন্য যেহেতু হিরাক্লিটসের মত জনসাধারণের মধ্যে প্রচারযোগ্য নহে—তাহা একটা তত্ত্বজ্ঞানের সিদ্ধান্ত মাত্র। 'প্রকল্পিত' অপেক্ষা আরো বেশী সংগতমাফিক বিশেষণ আমাকে দিতে পারেন তো ভালো হয়।

'অগ্নিরন্ধ্র-বাদ' হয় কিনা? এরূপ একটি কথা চলিতে পারে কিনা—তাহাতে কি বুঝায়?

'প্রকল্পিত' ইহার পরিবর্তে মনোভিমত, প্রস্তাবিত, উপনস্ত—এ তিনটির কোনোটি খাটে না। যেহেতু তাহা শুধু মনোভিমত বা প্রস্তাবিত বা উপন্যস্ত নহে। কাশীর পণ্ডিতেরা এরূপ স্থলে কিরূপ তান্ত্রিক ভাষা ব্যবহার করেন?

এই বিষয়ে উচিতানুচিত আমাকে লিখিয়া পাঠান।"

www.BanglaBook.org

ক্ষিতিমোহনের প্রধান কর্ম ছিল, সমাজের তথাকথিত নিম্নতম সম্প্রদায়েও যে সে সত্য যুগপৎ লুক্কায়িত ও উদ্ভাসিত আছে, তারই দিকে তথাকথিত শিক্ষিত জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। মধ্যযুগের সন্তদের নিয়ে তিনি তাঁর সাধনা আরম্ভ করে নিচের দিকে নেমে এলেন আউল-বাউল এবং সেখানে যে সব মণিমুক্তা পেলেন, তাদের প্রাচীনত্বের সন্ধানের উপরের দিকে গেলেন বেদ-উপনিষদে। এই অবিচ্ছিন্ন তিন লোকে তাঁর গমনাগমন গতিধারা ছিল অতিশয় স্বতঃস্ফূর্ত আয়াসহীন। এটা পণ্ডিতজন-দুর্লভ—ধর্মলোকে বিধিদত্ত স্পর্শ-কাতরতা না থাকলে এ জিনিস সম্ভবে না।

ক্ষিতিমোহন পথ প্রদর্শন করার পর আরো অনেকেই আউল-বাউল নিয়ে চর্চা করেছেন, কিন্তু সৎসত্ত্বেও ক্ষিতিমোহন একক।

তার কারণ ক্ষিতিমোহনের এমন একটি গুণ ছিল যা এ যুগে আর কারও ছিল না—আমার অভিজ্ঞতায় পৃথিবীর কুত্রাপি আমি এ গুণটি দ্বিতীয় জনে দেখি নি।

কঠিনতম জিনিস সরল ভাষায় মধুর রূপে প্রকাশ করার অলৌকিক 'খুদাদাদ'-বিধিদত্ত-ইন্দ্রজাল-শক্তি।

ক্ষিতিমোহন লিখেছেন যতখানি, বলেছেন তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী। কারণ তিনি জানতেন পুস্তক সর্বগামী নয়, লিখিত অক্ষরের শক্তি সীমাবদ্ধ।

বিদ্যালয়ের অজাতশ্মশ্রু বালক থেকে আরম্ভ করে শুভ্রকেশ বৃদ্ধ, অভ্যাগত-রবাহূত সকলকে, সভাস্থলে, বন্ধু-সমাগমে, ট্রেনে-জাহাজে, হিমালয়ের চটিতে, নর্মদার পারে পারে, দেশে-বিদেশে তিনি যেখানেই থেকেছেন, যেখানেই গিয়েছেন, সেখানেই তিনি এই অভূতপূর্ব বাচনভঙ্গী দ্বারা তাঁর বক্তব্য নিবেদন করে সকলকেই মুগ্ধ করেছেন। শত শত লেখক হাজার হাজার গম্ভীর পুস্তক লিখেও যা করতে সক্ষম হবেন না, কথকসম্রাট ক্ষিতিমোহন একাই তা করে গেছেন তাঁর খুদা-দাদ্ এই সওগাতের দৌলতে।

সবিনয় নিবেদন করছি, আচার্য ক্ষিতিমোহনের বহুমুখী কর্ম এবং চিন্তাধারার সম্যক বিশ্লেষণ আমার সীমাবদ্ধ শক্তির বাইরে। যেটুকু আছে তাও শোকাচ্ছন্ন। তবু আশ্রমবাসী, তাঁর শিষ্যরূপে তাঁরই স্মরণে তাঁর অসংখ্য অনুরাগী পাঠক ও শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে এই কথা কয়টি নিবেদন করি।

আমার অক্ষমতার রচনাও তাঁর স্নেহাশীর্বাদ লাভ করত। পুণ্যলোক থেকে আগত তাঁর সে আশীর্বাদ থেকে আমার এ দীন শ্রদ্ধাঞ্জলি অকিঞ্চন গুরু-দক্ষিণা বঞ্চিত হবে না—এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

—দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত—

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

শরদিন্দু অম্নিবাস

রচনাবলী

তৃতীয় খণ্ড

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩

www.BanglaBook.org

সুচীপত্র

ভূমিকা	·সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	[ক]
টুনি মেম		
টুনি মেম		১
এক পুরুষ		২০
কবিরাজ চেখফ		৫৯
॥ দুলালী ॥		৬৫
(দুলালীর সমালোচনা)		৭৬
আন্তন চেখফের "বিয়ের প্রস্তাব"		৮০
উল্‌টা-রথ		৯৪
ও-ঘাটে যেও না বেউলো		১০০
সুখী হবার পন্থা		১০৪
বিষের বিষ		১০৮
রাজহংসের মরণগীতি		১১২
হিটলার		১১৯
নব হিটলার		১২২
শাঁসালো জর্মনি		১২৬
দশের মুখ খুদার তবল		১২৯
হাসির অ-আ, ক-খ		১৩২
হাসি-কান্না		১৩৮
রসিকতা		১৪১
নানাপ্রশ্ন		১৪৫
জাতীয় সংহতি		১৫০
ভারতীয় সংহতি		১৫৩
ভাষা		১৫৫
ভ্যাকিউয়াম		১৫৭
ধর্ম		১৬১
ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা		১৬৩
ধর্ম ও কম্যুনিজম		১৬৬
এক ঝাণ্ডা		১৬৯
"রাঁধে মেয়ে কি চুল বাঁধে না?"		১৭২
ওয়ার এম	...	১৭৫
দ্য গল্		১৭৮

www.BanglaBook.org

তলস্তয় ১৮২
প্রিন্স গ্রাবিয়েলে দা'নুনদ্‌জিয়ো ১৮৫
খৈয়ামের নবীন ইরানী সংস্করণ ১৮৯
"ঢেউ ওঠে পড়ে কাঁদার/সম্মুখে ঘন আঁধার" ১৯৩

রাজা উজীর

হিটলারের প্রেম ২০১
পূর্ণ প্রেম ২১০
গেলীর প্রবেশ ২১৪
গেলীর আত্মহত্যায় হিটলারের শোক ২৩২
লক্ষ মার্কের বরমান ২৩৮
কন্‌রাট আডেনাওয়ার ২৪৪
বিদ্রোহী ২৫৬
প্রোটকল ২৬০
পপ্‌লারের মগডালে ২৬৯
হাতে কমণ্ডুলু, মাথায় তুর্কী টুপি ২৭৬
ভূতের মুখে রাম নাম ২৭৯
শিলা জলে ভাসি যায়/বানরে সঙ্গীত গায় ২৮৩
'অভাবে শয়তানও মাছি ধরে খায়' ২৮৮
"—ন্যাংটাকে ভগবানও ডরান—" ২৯১
ল্যাটে ২৯৫
আঁদ্রে জিদ ২৯৮
আড্ডা ৩০১
পাসপরট্ ৩০৫
আড্ডা—পাসপরট্ ৩০৮
'ঈসট্ ইজ্ ঈসট্ অ্যানড্—' ৩১৪
বিষবৃক্ষ ৩১৭
'দুঃখ তব যন্ত্রণায়' ৩২০
'সাঙ্গ হয়েছে রণ—' ৩২৫
জেরূসলম ৩২৮
সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর ৩৩২
রোদন-প্রাচীর—ক্লাগে-মাত্তার ৩৩৫
অল্পে তুষ্ট ৩৩৯
ভঙ্গ বনাম কুলীন ৩৪৯
অর্থমর্থম্ ৩৫৩
আবার আবার সেই কামান গর্জন! ৩৫৮
প্রেম ৩৭২

গ্রন্থ-পরিচয় ৩৭৫

www.BanglaBook.org

টুনি মেম

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

টুনি মেম

বেশী দিনের কথা নয়, হালের। পড়িমড়ি হয়ে শেয়ালদায় আসাম লিঙ্কে উঠেছি। বোলপুরে নাববো। কামরা ফাঁকা। এককোণে গলকম্বলে মান-মুনিয়া দাড়িওলা একটি সুদর্শন ভদ্রলোক মাত্র। তিনি আমার দিকে আড়নয়নে তাকান, আম্মো।

একসঙ্গেই একে অন্যকে চিনতে পারলুম।

আমি বললুম, 'খান না রে?'

সে হাঁকল, 'মিতু না রে?'

যুগপৎ উল্লম্ফন, ঘন ঘন আলিঙ্গন। পাঠশালে পাশাপাশি বসতুম। তারপর এই তিরিশটি বছর পরে দেখা। প্রথম উচ্ছ্বাস সমাপ্ত হলে জিজ্ঞেস করলুম, 'তুই এ রকম বদ্‌খদ দড়ি-দাড়া রেখেছিস কেন?'

খানটা ঐ পাঠশালার যুগেও ছিল হাড়ে টক শয়তান। প্রশ্ন শুধোলে ইহুদিদের মত পাল্টা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে, উত্তরটা এড়িয়ে যায়। শুধোলে, 'দাড়া কারে কয়?'

'হাঁড়ি বড় সাইজের হলে হাঁড়া হয়, গাড়ি গাড়া। দাড়ি হিন্দী উর্দুতে স্ত্রীলিঙ্গ!—কিন্তু দাড়া পুংলিঙ্গ। তোরটা দাড়ি নয়, দাড়া।'

অবশ্য অস্বীকার করিনে, তাকে দেখাচ্ছিল গত শতাব্দীর ফরাসী খানদানীদের মত। খানের রং প্যাটপেটে ফর্সা। গায়ে প্রচুর পাঁঠার রক্ত। শুধালুম, 'তা তোর পাকিস্তান ছেড়ে এই না-পাক দেশে এসেছিস কি করতে?'

'আজমীরের খাজা মুঈন-উদ্‌-দীন চিশতীর কাছে মানত করেছিলুম, বাবার আশীর্বাদে আল্লা যদি আমাকে এস্ পি-তে প্রোমোশন করেন তবে বাবার দরগা দর্শনে যাব, ভালো-মন্দ যা আছে তাই দিয়ে শীনী চড়াবো। সেই সেরে ফিরছি। এই নে প্রসাদী-গোলাপের পাপড়ি।'

আমি মাথায় ছুঁয়ে বললুম, 'ও! তুই বুঝি পুলিসে ঢুকেছিলি?'

বললে, 'হ্যাঁ, সাব-ইন্‌স্‌পেকটার হয়ে।'

আশ্চর্য হয়ে শুধালুম, 'বলিস কি রে? আর এরই মধ্যে এস্ পি!'

প্রসাদীর পাপড়ি মাথায় ঠেকিয়ে বললে, 'খাজা মুঈন-উদ্‌-দীন চিশতীর দোওয়া আর হিন্দুদের কৃপায়!'

'হিন্দুদের কৃপায়!'

'হ্যাঁ ভাই, তেনাদেরই কেরপায়। তেনারা যদি পূব বাঙলার পুলিসের ডাঙর ডাঙর নোকরি ছেড়ে ঝেঁটিয়ে পশ্চিম বাঙলা আর আসামে না চলে যেতেন তা হলে আমি গণ্ডায় গণ্ডায় প্রোমোশন পেতুম কি করে? তারা থাকলে হয়তো অবিচার করে আমাকে দু'একটা না-হক প্রোমোশন দিত, কিন্তু একদম দিনকে রাত, রাতকে দিন তো করা যায় না। আর তুই তো বিশ্বাস করবি নে—তুই চিরকালই সন্দেহপরায়ণ, যে কটি হিন্দু রয়ে গেল তারা গণ্ডায় গণ্ডায় না হোক জোড়ায় জোড়ায় প্রোমোশন পেয়েছে। জানিস, মণ্ডল সিভিল সার্জন হয়েছে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি ভিরমি যাই আর কি। গাড়ল ফোড়াটি পর্যন্ত কাটতে জানতো না।

খান বললে, 'সব তো শুনলি। তোর বইও আমি দু'চারখানা পড়েছি। আচ্ছা বল তো, এসব বানিয়ে বানিয়ে লিখিস, না কিছু কিছু দেখা-শোনার জিনিস, অভিজ্ঞতার বস্তু?'

'কিছুটা বানিয়ে, কিছুটা অভিজ্ঞতা থেকে।'

'তাজ্জব! আমি তো ভাই বিস্তর খুন-খারাবী দেখলুম। এক-একটা এমন যে, আস্ত একখানা উপন্যাস হয়। কিন্তু তারই রিপোর্ট লিখতে গেলে আমার তালুর জল আর নিবের কালি শুকিয়ে যায়। কি করে যে তুই লিখিস।'

আমি বললুম, 'আমাকেও যদি সুদ্ধমাত্র ফ্যাক্টের ভিতর নিজেকে সীমাবদ্ধ করে লিখতে হত তাহলে আমার রিপোর্টটা হত তোর চেয়েও ওঁচা। কল্পনা এসে উৎপাত করতো। তা সে কথা যাক্ গে। আমার দিনকাল বড্ডই খারাপ যাচ্ছে—প্লটের অপর্যাপ্ত অনটন। সম্পাদক মিঞা আবার গল্পই চান, 'ইলসট্রেট' করবেন। বল না একটা।'

দাড়ির ভিতর দিয়ে আঙুল চালাতে চালাত বললে, 'কোন্‌টা বলি, কেসগুলো তো মাথার ভিতর আব-জাব করছে। আচ্ছা দাঁড়া, ভেবে নি।'

এমন সময় সিগনেল অভাবে ট্রেন খামোকা মাঝপথে দাঁড়ালো। খান বাইরের দিকে তাকিয়ে বললে, 'এরা কি জাত রে?'

তাকিয়ে দেখি, মিশকালো সাঁওতাল মেয়ে—তার উপর মেখেছে প্রচুর তেল। শাড়ির উপর বেঁধেছে গামছা, উত্তমাঙ্গে চোলিফোলি কিছু নেই, নিটোল দেহ, সুডোল ইত্যাদি ইত্যাদি। শেষেরটা বোঝা গেল পরিষ্কার, কারণ হাত দুটি যতদূর সম্ভব উঁচু করে পলাশ ফুল পাড়বার চেষ্টা করছিল খোঁপায় গুঁজবে বলে। হলদে পলাশ। এ অঞ্চলে লালের তুলনায় ঢের কম। কি জানি, মেয়েটা হয়তো ভেবেছে, লাল কালোর চাইতে হলদে কালোর কনট্রাস্টে খোলতাই বেশী।

বললুম, 'সাঁওতাল। হ্যাঁ, আমাদের দেশে অতদূর ওরা পৌঁছয়নি। কিংবা হয়তো ছিল এককালে। কাল যে-রকম হিন্দু পূব বাঙলা ছেড়ে চলে এল, এরা হয়তো পরশু।'

খান দেখি, আমার কথায় বিশেষ কান দিচ্ছে না। আপন মনে কি যেন ভাবছে। ওস্তাদ গাওয়াইয়া যে রকম গান শুরু করার পূর্বে হঠাৎ কেমন যেন আনমনা হয়ে যান। তখন বিরক্ত করতে নেই।

গাড়ি ছাড়লো। একটু কাছে এসে বললে, 'ঐ কালো মেয়ে আরেকটি মেয়ের কথা আমার স্মরণে এনে দিল। তার রঙ ছিল এর চেয়েও কালো। কিন্তু সে কী কালো! সব রঙের অভাবে নাকি কালো হয়! হ্যাঁ তাই; কোন রঙই সাহস করে তার শরীর চড়াও করতে পারেনি। আমি তাকে দেখেছিলুম তার শারীরিক মানসিক চরম দুরবস্থায়। তবু চোখ ফেরাতে পারিনি। হিন্দুরা কেন যে "কালী" "কালী" করে তখন বুঝতে পেরেছিলুম।'

গাড়ি বর্ধমানে এসে থামলো। বর্ধমানে আমি গত সাত বছর ধরে অর্ডার দিয়ে কখনও কেলনারের কাছ থেকে চা-আণ্ডা পাইনি। কাজেই ফ্লাস্ক সেফটিস সেক প্রথমেই ভাঁড়ের চা কিনে রাখলুম। বিস্তর ছুটোছুটি করে কিছু-কিঞ্চিতের যোগাড় হল। স্থির করলুম, বোলপুরে খানকে একটা পুর পাক্কা খানা তুলে দেব। সেখানকার গোসাঁই আমাকে নেক-নজরে দেখে।

www.BanglaBook.org

গাড়ি ছাড়তে খান বললে, 'আমি তখন আক্রুগড়ে। এস্ আই—আমরা বাঙলায় লিখি এছাই। রোজ থানায় বসে ভাবি, ইয়া আল্লা, চাকরির এ দুস্তর দরিয়া পেরিয়ে কবে গিয়ে এমন মোকামে পৌঁছব যেখানে হরহামেশা পয়সাটা আধলাটার হিসেব না করতে হয়। ঘুষ খেতে তখনও শিখিনি—'

আমি শুধালুম 'এখন শিখেছিস? তা—'

বললে, 'হ্যাঁ, তবে সে অন্য ধরণের। পরে তোকে বুঝিয়ে বলবো।'

আক্রুগড় বড় মনোরম জায়গা। অনেকটা শিলঙের মত উঁচু-নিচুতে ভর্তি, টিলাটালার টক্কর। কোন্ এক সায়েব নাকি মালয় না কোথা থেকে কৃষ্ণচূড়া এনে এখানে পুঁতে দেয়। এখন শহরটা আগাপাস্তলা তাই দিয়ে ভর্তি। শহরটা এমনিতেই সবুজ; তার উপর এল গোলমোরের কালো সবুজ আর তার মাঝখানে ফুটে ওঠে বাড়িগুলোর পোড়া লালের টাইলের ছাদ।

চতুর্দিকে অজস্র চা-বাগান আর তেলের খনি। সায়েব-সুবো, বেহারী মারওয়াড়িতে শহরটা গিসগিস করছে। আর খাস আসামীদের তো কথাই নেই—তারা বড় নম্র, বড় সরল। আক্রুগড়ের বটতলাতে চার আনা দিয়ে মিথ্যে সাক্ষী পাওয়া যেত না। আমাদের দেশে আকছারই যা যায়। এখন কি অবস্থা তা অবশ্য জানি না।

বড়কর্তা বলেছিলেন, কিছু একটা জবরদস্ত নূতন না করতে পারলে কুইক প্রোমোশন হয় না। জবরদস্ত নূতন করবেটাই বা কি? এখানে খুনখারাবী হয় অত্যল্প। উঠোনই নেই তো আমি নাচি কি করে?

তাই থানায় বসে বসে পুরনো দিনের খাতাপত্র দেখি, ফাইল পড়ি। সেইটেই একদিন লেগে গেল কাজে। পরে বলছি।

আমার চেনা এক রাজমিস্ত্রী আমায় রাস্তায় দাঁড় করিয়ে একদিন বললে, মোল্লাবাজারের পিছনে উঁচু টিলার উপর যে খালি বাঙলো আছে তার বাবুর্চীখানার ভিত মেরামত করতে গিয়ে সে একটা লাশ আবিষ্কার করেছে—ঠিক লাশ নয়, কঙ্কালই বলা যেতে পারে—পচা ছেঁড়া কম্বল জড়ানো।

রক্তের সন্ধান পেয়ে বললুম, ''তুমি ওখানে যাও। হঠাৎ যেন আবিষ্কার করেছ এই ভাব করে আমাকে খবর পাঠাও।''

তা না হলে পরে প্রমাণ করতে হবে, ওটা সত্যই সেখানে ছিল, বাইরের থেকে এনে কেউ চাপায়নি।

জিনিসটা যে খারাবী, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বাবুর্চীখানার নীচে কম্বলে জড়ানো পোঁতা কঙ্কাল! এখানে কস্মিনকালেও কোনও গোরস্তান ছিল না—টিলার ঢালুর দিকে কতটুকু জায়গা যে, ওখানে মানুষ গোরস্তান বানাতে যাবে। তাছাড়া এটা নিশ্চয়ই খুনের ব্যাপার। শুধু খারাবী নয়, খুন-খারাবী।'

আমি বললুম, 'সাক্ষাৎ শার্লক হোম্‌স।'

শুধোলে , 'সে আবার কে?'

আমি প্রথমটায় হকচকিয়ে পরে সামলে নিয়ে বললুম, 'তুমি এগোও; আমি আর রসভঙ্গ কববো না।'

বললে, 'প্রথম রক্তের সন্ধান পেয়ে আমি যেন হন্যে হয়ে উঠলুম। সমস্ত রাত ঘুম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হল না। মাথার ভিতর ঘুরছে, কতরকম নরহত্যার ছবি, যেন স্বয়ং পাঁচকড়ি দে সেগুলো এঁকে যাচ্ছেন, আর দীনেন্দ্রকুমার রায় আপন হাতে রঙ গুলে দিচ্ছেন। বেবাক লালে লাল।'

আমি বললুম, 'রসভঙ্গ করতে হল। অপরাধ নিসনি। হোম্‌স হল বিলিতী অরিন্দম।'

খান বললে, 'তাই বল। কিন্তু তুই ভাবিস নে, তোকে একটা রগরগে খুনের কাহিনী শোনাতে যাচ্ছি মাত্র। এতে আছে বড় দুঃখের কথা। বড় বিষাদ বেদনা। স্বর্গ আমি দেখিনি, কিন্তু স্বর্গচ্যুত হতভাগ্য একজনকে আমি দেখেছি। সে দৃশ্য আর কারও দেখবার দরকার নেই।

কি বলছিলুম? হ্যাঁ। ভোর হতে-না-হতেই আমি থানায় এসে উপস্থিত। কিন্তু মূর্খের মত আমি রাজমিস্ত্রীকে বলে রাখিনি, সে কখন আসবে। সে যদি এসে ফিরে যায়; কিংবা কেসটা হাতছাড়া হয়ে যায়!

আজ হাসি পায়। রাতদুপুরে এখন যদি জমাদার এসে খবর দেয়, পদ্মার চরে ডাকাতিতে পাঁচটা চরুয়া আর তিনটে ডাকাত মারা গিয়েছে, আমি তা হলে পাশবালিশ জাবড়ে ধরে বলি, "যা-যা, দিক্ করিসনি!"

রাজমিস্ত্রী হেলে দুলে বেলা প্রায় বারোটায় এলেন—আমাকে অষ্ট ঘণ্টা দগ্ধানোর পর।

যেন সদ্য এইমাত্র ফার্স্ট ইনফর্মেশন পেয়েছি, এরকমধারা মুখের ভাব করে দুটি "কন্‌স্টবল" সঙ্গে নিয়ে অকুস্থলের দিকে রওনা দিলুম। গিয়ে দেখি অত্যন্ত কুস্থান, অর্থাৎ অকুস্থানই বটে।'

আমি বললুম, 'ঐ মলো। অকুস্থান হয়েছে আরবী "ওয়াকেয়া", অর্থাৎ "ঘটনা" আর "স্থান" নিয়ে।'

খান বললে, 'থাক্ থাক্, আর বিদ্যে ফলাতে হবে না। অকুস্থলের হালটা ভালো করে শোন।

তিন বছর ধরে বাঙলোটায় বসতি ছিল না বলে বাবুর্চীখানার দোরজানালা চুরি গিয়েছে, ঘরটা পড়ো-পড়ো। কে এক নূতন সায়েব আসবে বলে ওটার ভিত মেরামত করতে গিয়ে বেরিয়েছে একটা কঙ্কাল, পচা কম্বলে জড়ানো। মাথার চুল ছাড়া আর সব পচে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছে। আমি নয়া শিকারীর মত সন্তর্পণে এগোলুম বলে খুলির ভিতর মাটির মধ্যে পেয়ে গেলুম একটা বুলেট—তখন ভালো করে তাকিয়ে দেখি, খুলির পিছনের দিকে একটা ঐ সাইজের গর্ত।

আব্রুগড়ে গণ্ডায় গণ্ডায় স্পেশ্যালিস্ট নেই যে, আমায় তদ্দণ্ডেই বাতলে দেবে ব্যাপারটা কি, অন্তত এই যে কঙ্কাল, এর লাশটা কবে মাটিতে পোতা হয়েছিল। শহরের অ্যাসিস্টেন্ট সার্জন আমাদেরই জেলার ধীরেন সেন। তাঁকে ধরে এনে শুধালুম। বললেন, অন্তত তিন বছর। বিচক্ষণ লোক। রায়টা দিলেন কঙ্কাল উপেক্ষা করে, কম্বলটা উত্তমরূপে পরখ করে।

তা হলে প্রশ্ন, তিন বছর পূর্বে ঐ বাঙলোয় থাকতো কে—যার সময় ঘটনাটা ঘটেছিল?

খবর পাওয়া গেল, আইরিশম্যান পেট্রিক ও'হারা সায়েব। সে এখন কোথায়? জেলে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কেন? সে-কথা জেনে কি পুলি-পিঠের নেজ গজাবে?

আমার মন খনে এদিকে ধায়, খনে ওদিকে ধায়। বন্ধ ঘরে আগুনে লাগলে মানুষ যেমন মতিচ্ছন্ন হয়ে খনে এ-দরজায়, খনে ও-দরজায় ধাক্কা দেয়—কোনও একটাও ভালো করে একাগ্রমনে খোলবার চেষ্টা করে না—আমার হল তাই। কোনও একটা ক্লু পাঁচ মিনিটের তরেও ঠিকমত ফলো আপ করতে পারি নে।

এখন জ্ঞানগম্যি হয়েছে ঢের। এখন বুদ্ধি হয়েছে বলে বুঝেছি যে, এসব রহস্য সমাধান বুদ্ধির কর্ম নয়। রুটিনের ঘানিতে সব-কিছু ফেলে দিতে হয়। তেল বেরিয়ে আসবেই আসবে, সমস্যা সমাধান হবেই হবে।

যে-কাজ আজ পাঁচ মিনিটে করতে পারি, তখন লেগেছিল এক হপ্তা। ততদিনে প্রশ্নগুলো মোটামুটি সামনে খাড়া করে নিয়েছি :

(১) লোকটা কে?

(২) এটা খুন তো?

(৩) কে খুন করলে?

(৪) কার বন্দুকের গুলি?

কঙ্কাল থেকে মানুষ সনাক্ত অসম্ভব না হলেও বড়ই কঠিন। তন্ন তন্ন করেও আঙটি-টাঙটি, বাঁধানো দাঁত, ডেন্টিস্টের কোনও প্রকারের কেরদানী কিছুই পাওয়া গেল না। ব্লাঙ্কো!

আমি তো এ-শহরে এসেছি মাত্র কয়েক মাস হল, কিন্তু পুরনো বাসিন্দাদের কেউ কেউ নিশ্চয়ই কিছু-না-কিছু জানে, কিন্তু অহমিয়ারা সরল হলেও এ-তত্ত্বটি বিলক্ষণ জানে যে, পুলিসের ঝামেলাতে খোদার খামোখা জড়িয়ে পড়তে নেই। ব্লাঙ্কো!

ইতিমধ্যে রিপোর্ট পৌঁছল, খুলির ভিতর যে বুলেট পাওয়া গিয়েছিল, সেই বুলেটই খুলির ফুটোটার জন্য দায়ী।'

আমি বাঁকা হাসি হেসে বললুম, 'মারাত্মক আবিষ্কার। এ তো কানাও বলতে পারে। আর ঐ দেখ, তোর কৃষ্ণসুন্দরী আর একপাল সাঁওতালী। ওদের বসতির দিকে এগোচ্ছি এখন।'

গাড়ি তখন খানা জংশনে 'লুপ' লাইনে ঢুকবে বলে ধীরে ধীরে চলছিল।

খান অনেকক্ষণ ধরে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, 'নাঃ, টুনি মেমের পায়ের নখের কণাও এরা হতে পারে না।'

আমার অভিমান হল। সাঁওতালী আমাদের প্রতিবেশী মেয়ে।

লক্ষ্য না করেই খান বললে, 'বুলেটে যে খুলি ফুটো করেছে, তা তো তুই বুঝিস, আমিও বুঝি, কিন্তু আদালত কি বুঝবে? তারা প্রমাণ চায়। হুঁঃ, আদালত তো আদালত! অডিটের বেলা জানো না কি হয়? পেনশন্ নেবার জন্য তুমি সার্টিফিকেট দাখিল করলে যে, তুমি এপ্রিল মাসে জীবিত আছ। অডিট শুধালে, "কিন্তু মার্চ মাসের সার্টিফিকেট কই? আপনি যে মার্চ মাসে জীবিত ছিলেন, তার প্রমাণ কিং না হলে যে মার্চ মাসের পেনশন্টা পাবেন না।" '

আমি বললুম, 'সেটা কিন্তু ঠিক। দিল্লীর যাদুঘরে কেন্দ্রের এক মন্ত্রী বিদেশী ভিজিটরকে ছোট্ট একটি শিশুর খুলি দেখিয়ে বললেন, "ইটি শঙ্করাচার্যের খুলি।" ভিজিটর অবাক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়ে শুধালে, "তাঁর খুলি এত ছোট ছিল?" মন্ত্রী গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "এটা তাঁর শিশুবয়সের খুলি। দুটো কিংবা ছটা খুলি যখন হতে পারে, তখন দুটো কিংবা ছটা জীবন হবে না কেন? তা হলে একটা মার্চ মাসে গ্যাপ পড়াটাই বা বিচিত্র কি? ওসব কথা থাক্, তারপর কি হল বল।'

'তখন অনুসন্ধান করতে লাগলুম খুনটা হয়েছে ও'হারা সায়েব এই বাঙলোয় থাকাকালীন, না তার পরে কেউ খুন করে লোকটাকে নির্জন পোড়ো বাড়িতে পুঁতে গেছে?

ও'হারা জেলে। দীর্ঘ মেয়াদে।

থানার পুরনো ফাইল কাগজপত্র ঘেঁটে যা আবিষ্কার করলুম, সেও বিচিত্র। সায়েব ছটা ইংরেজ পরিবারকে চকোলেটের ভিতর বিষ ঠেসে তাই খাইয়ে মারবার চেষ্টা করেছিল। প্রমাণের অভাব হয়নি। আব্রুগড় থেকে প্রায় ষাট মাইল দূরের এক ছোট্ট ডাকঘর থেকে ও'হারা পাঠিয়েছিল ছটি রেজেস্ট্রি পার্শেল ছজন ইংরেজের নামে—পোস্ট মাস্টার সেই মর্মে সাক্ষী দিয়েছিল।

এঁদের দুজন থাকতো আব্রুগড়ে, বাকিরা কাছে-পিঠের চা-বাগানে। একই সঙ্গে একই জিনিস খেয়ে সবাই মর-মর হয়েছিল বলে সিভিল সার্জন বুদ্ধি করে সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলে যে চকোলেটের মধ্যে গড়বড় সড়বড় আছে। তাই তারা সে-যাত্রা রক্ষা পায়। কেউ মরেনি।

কিন্তু ছটা কেন, একটা পরিবার—একটা পরিবারই বা কেন—একজন লোককে খুন করার চেষ্টা করলেও দীর্ঘ মেয়াদের জন্য শ্রীঘর! ও'হারা আলিপুরে।'

ইতিমধ্যে বীরভূমের খোয়াইডাঙা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। খান বললে, 'এদের সঙ্গে আমাদের সবুজ সিলেটের কোনও মিল নেই বটে কিন্তু তবু এর রুক্ষ শুষ্ক একটা কঠোর সৌন্দর্য আছে।' তারপর মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, কি যেন বলছিলুম। মনে পড়েছে। হঠাৎ আমার মাথায় এক নূতন বুদ্ধির উদয় হল। ও'হারা যখন আইরিশম্যান তখন তার বন্দুক থাকাটা অসম্ভব নয়। খবর নিয়ে জানতে পারলুম, ছিল। আমি জানতুম কারও দীর্ঘ মেয়াদের জেল হলে তার বন্দুক সরকারী তোষাখানায় জমা দেওয়া হয়। সেটা সেখানে পাওয়া গেল। বিশেষজ্ঞরা বললেন, খুলির মাথায় যে বুলেট পাওয়া গেছে, সেটা নিঃসন্দেহে ঐ বন্দুক থেকে ছোঁড়া হয়েছে।

যাক। এতক্ষণে এক কদম এগোলুম কিন্তু সব চেয়ে বড় প্রশ্ন যে লোকটা খুন হয়েছে সে কে?

কলকাতায় যখন কলেজে পড়তুম তখন আমাদের হস্টেলে রামানন্দ চাটুজ্যে একবার জর্নালিজম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে আসেন। মেলা কথা কওয়ার পর তিনি শেষ করেন এই বলে যে, যে-কোনও জ্ঞান, যে-কোনও খবর, তার মূল্য যত সামান্যই হোক না কেন, কোনও না কোনও দিন জর্নালিজমের কাজে সেটা লেগে যেতে পারে।

পুলিসের কাজেও দেখলুম তাই। সেই যে আমি অবসর সময়ে থানায় বসে বসে পুরনো ফাইলের কাসুন্দি ঘাঁটতুম তাই লেগে গেল কাজে।

থানায় থানায় একখানা খাতাতে লেখা থাকে কে কবে নিরুদ্দেশ হল—অবশ্য যদি আত্মীয়স্বজন খবর দেয়। বিরাট দেশ ভারতবর্ষ—কত লোক কত রকমে 'কপ্পুর' হয়ে

www.BanglaBook.org

যায়, কে বা রাখে তার খবর। তবু মনে পড়ল তিন বছর আগে এক বিহারী মজুর নিখোঁজ হয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, কঙ্কালটা জড়ানো ছিল একটা চেক্ কম্বলে, এ ডিজাইনটা বিহারীদের ভিতর খুবই পপুলার!

যে পাড়াতে সে থাকতো সেখানে জোর অনুসন্ধান চালালুম। অবশ্য ছদ্মবেশে। চায়ের দোকানে আশকথা পাশকথা কওয়ার পর একে ওকে তাকে শুধোই, সেই বিহারী রামভজনের কি হল?

যা খবর পাওয়া গেল সেটা আমাকে আরও কয়েক কদম এগিয়ে দিলে। তার নির্যাস :—

"রামভজনের বউ টুনি মেম—"

আমি আশ্চর্য হয়ে বাধা দিয়ে বললুম, 'বিহারী মজুরের বউ মেম হয় কি করে?'

খান বললে, 'সেই কথাই তো হচ্ছে। টুনি ও'হারা সায়েবের বাঙলোয় কাজ করতো। পরে সায়েবের রক্ষিতা হয়ে যায়। তাই বিহারীরা তার নাম দেয় "টুনি মেম"।

রামভজন নাকি একদিন তার দেশের ভাই-বেরাদরকে বলে, সে দেশে চলে যাচ্ছে; যা জমিয়েছে তাই দিয়ে খেত-খামার করবে। হয়তো তারও বাড়া আরেকটা কারণ ছিল। সামনাসামনি না হোক আড়ালে-আবডালে অনেকেই টুনি মেমকে নিয়ে মস্করা-ফিস্কিরি করতো। অতি অবশ্যই বোঝা যাচ্ছে, রামভজনকে বাদ দিয়ে নয়।

এবং শেষ খবর, টুনি মেম আর তার স্বামীকে স্টেশনে নিয়ে যাবার সময় নাকি ওদের দুজনকে ও'হারার বাঙলোর গেটের সামনে দেখা যায়।'

আমি শুধালুম 'তারপর?' কৌতূহল তখন আমার মাথায় রীতিমত চাড়া দিয়ে উঠেছে।

আমাকে হতাশ করে খান বললে, 'ব্লাঙ্কো। মাস তিনেক পর যখন রামভজনের পরিচিত নূতন মজুররা আব্রুগড়ে এল—ওরা কিস্তিতে কিস্তিতে আসছে যাচ্ছে হামেশাই—তখন তারা বললে, রামভজন আদপেই দেশে পৌঁছয়নি। আব্রুগড়ের কেউ বললে, টুনি মেমের বেহায়াপনায় তিরিবিরক্ত হয়ে সন্ন্যাস নিয়েছে, কেউ বললে, দার্জিলিং না কোথায় যেন চা-বাগানে কাজ নিয়েছে।'

'আর টুনি মেম?'

'সে তখন ও'হারার রক্ষিতা। কিন্তু 'রক্ষিতা" বললে হয়তো ও'হারা ও টুনি মেম দুইজনারই প্রতি অবিচার করা হয়। ও'হারা টুনি মেমকে রেখেছিল রাণীর সম্মান দিয়ে আর টুনি মেম ও'হারাকে ভালোবেসেছিল লায়লী যে-রকম মজনূনকে ভালোবেসেছিলেন। কিন্তু এ-সব আমি পরে জানতে পেরেছিলুম।

আমি তখন মনে মনে সমস্ত ব্যাপারটার একটা আবছা আবছা ছবি এঁকে ফেলেছি।

টুনি মেম স্বামীকে স্টেশনে নিয়ে যাবার পথে ও'হারার বাঙলোয় নিয়ে যায়। শীতকাল ছিল বলে রামভজন তার সেই চেক কম্বলখানা গায়ে জড়িয়ে নিয়েছিল। তার পর যে-কোনও কারণেই হোক ও'হারা তাকে গুলি করে মেরে বাবুর্চীখানার ভিতর ভিতর পুঁতে ফেলে। যে-লোক ছ'টা পরিবারের খুনের চেষ্টা করতে পারে তার পক্ষে এটা ধুলো-খেলা।

চায়ের দোকানে তদন্ত শেষ হলে পর একদিন থানা থেকে সরকারীরূপে চায়ের দোকানে যে সবচেয়ে বেশী ওকীবহাল ছিল তাকে ডেকে পাঠালুম। সে বললে কসম খেয়ে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোন কিছু তার পক্ষে বলা অসম্ভব তবে রামভজনের ঐ রকম একখানা চেক কম্বল ছিল।

তাহলে মোদ্দা কথা দাঁড়াল এই, ও'হারা যদি রামভজনকে খুন করে থাকে তবে তার একমাত্র সাক্ষী টুনি মেম।

টুনি মেম কোথায়?

খবর পেলুম ও'হারার জেল হওয়ার পর টুনি মেম বড় দুরবস্থায় পড়ে। শেষটায় কোন পথ না পেয়ে ও'হারা সাহেবের বাবুর্চীর সঙ্গে উধাও হয়ে যায়।

এইবার সত্যি আমার সামনে যেন পাথরের পাঁচিল খাড়া হল। বহু অনুসন্ধান করেও কিছুমাত্র হদিস পেলুম না, খানসামা আর টুনি মেম গেল কোথায়।

তখন মনে মনে চিন্তা করলুম, সায়েবদের এই যে বাবুর্চী ক্লাসের লোক, এরা বাঙালী হিন্দু-মুসলমানদের বাড়িতে চাকরি পায় না। পুডিং-পাডিং রোস্টোমোস্টো দুনিয়ার যত সব অখাদ্য এরা রাঁধে, শুয়ার গোরুর ঘ্যাঁট এরা যেসব বানায় সেগুলো দূর থেকে দেখেই শেষ বিচারের দিন স্মরণ করিয়ে দেয়—খায় কোন্ বঙ্গ-সন্তানের সাধ্যি! অতএব এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, ও'হারার বাবুর্চী নিশ্চয়ই অন্য কোন সায়েবের চাকরি নিয়েছে।

তোকে পূর্বেই বলেছি, আব্রুগড়ের চতুর্দিকে মাইলের পর মাইল জুড়ে চা-বাগান আব-জাব করছে। আমি প্রতি উইক-এন্ডে আজ এটা কাল সেটায় তদন্ত করতে লাগলুম। পরনে খানসামা বাবুর্চীর পোশাক। সবাইকে শুধোই, বাবুর্চীর চাকরি কোথাও খালি আছে কিনা। আরও শুধাই, আমার এক ভাই নাম ভাঁড়িয়ে এক কুলী রমণীর সঙ্গে বসবাস করছে—আসল কারণ অবশ্য আমি ও'হারার খানসামাটার নাম আবিষ্কার করতে সক্ষম হইনি—আমাদের মা তার জন্য বড্ড কান্নাকাটি করছে—তার খবর কেউ জানে কি না?

বাগানের পর বাগান ব্লাঙ্কো ড্র করেই যাচ্ছি আর আমার রোখও সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যাচ্ছে।

শেষটায় আল্লার কুদরৎ, পয়গম্বরের মেহেরবানী, আর মুর্শীদের 'দোয়ার' তেরস্পর্শ ঘটে গেল।

এক চা-বাগিচার কম্পাউন্ডার শুধু যে খবরটা দিলে তাই নয়, বাঁকা হাসি হেসে বললে, "ও টুনি মেম! দেখে এসো গে তোমার বউদি কী সুখেই না আছেন।"

আমি মেলা তর্কাতর্কি না করে ধাওয়া করলুম ম্যানেজার সায়েবের বাঙলোর দিকে। সেখানে গিয়ে শুনি, বাবুর্চী পরশু দিন থেকে উধাও, তার 'বউ' কুলী লাইনের একটা কুঁড়েঘরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

সে এক অবর্ণনীয় দৃশ্য।

পড়ি পড়ি এই পড়ি, ত্রিভঙ্গ মুরারী-গোছ অতিশয় জরাজীর্ণ একখানা ছন বাঁশের তৈরী কুঁড়েঘর। ঝাঁপের তৈরী দরজাখানা পাশের মাটিতে পচ্ছে।

ভিতরের দৃশ্য আরও মারাত্মক। স্যাঁতসেঁতে নয়, রীতিমত ভেজা মাটির ভিত। হেথায় গর্ত, হোথায় গর্ত। আল্লার মালুম গর্তে সাপ না ইঁদুর আছে। এক কোণে একটা ভাঙা উনুন। কবে যে তাতে শেষ রান্না হয়েছিল ছাই দেখে অনুমান করতে পারলুম না। তারই পাশে একটা সানকি গড়াগড়ি দিচ্ছে। দু'একটা ভাত শুকিয়ে কাঠ হয়ে তলানিতে গড়াচ্ছে। তারই পাশে মলমূত্র। নোংরা দুর্গন্ধে ঘরটা ম-ম করছে।

দেয়ালে হেলান দিয়ে একটি হাড্ডিসার বছর তিনেকের ছেলে চোখ বন্ধ করে ধুঁকছে।

www.BanglaBook.org

ছেলেটিকে কিন্তু তবুও যে কী অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিল সেটা আমার চোখ এড়ায়নি। কেউ না বললেও আমি চট্ করে বলে দিতে পারতুম ইটি ও'হারার সন্তান। শুনেছি স্বর্গের দেবশিশুরা অমর, কিন্তু এই মরলোকে এসে যদি তাঁদের কাউকে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতে হত তবে বোধ হয় তার চেহারা এরকমই দেখাতো।

আমি যে গলা খাঁকরি দিয়ে ঘরে ঢুকলুম সে একেবারের তরে চোখও খুলল না। সে শক্তিটুকুও তার গেছে।'

অল্পক্ষণের জন্য নীরব থেকে খান বললে, 'বহু বৎসর পুলিসে কাজ করে করে আমি এখন সঙ্গ-দিল—পাষাণহৃদয়। তখন সবে পুলিসে ঢুকেছি—আমি ওদিক থেকে চোখ ফেরালুম।

সে আরও নিদারুণ দৃশ্য। একটা বছর দেড়েকের বাচ্চা তার মায়ের সায়া ধরে টানাটানি করছে। তারও সর্বাঙ্গে অনাহারের কঠিন ছাপ। ভালো করে কাঁদতে পর্যন্ত পারছে না। আর সে কী বীভৎস গোঙরানো—থেকে থেকে হঠাৎ অনাহারের দুর্বলতা যেন তার গলা চেপে ধরে আর কক্ করে গোঙরানো বন্ধ হয়ে যায়। তখনকার নীরবতা আরও বীভৎস।

চ্যাটাইয়ের উপরে শুয়ে টুনি মেম। পরনে মাত্র একটি সায়া—শতচ্ছিন্ন, বুক ঢেকে একখানা গামছা—জরাজীর্ণ। হাত দুখানা বুকের উপর রেখে চোখ বন্ধ করে—কি জানি জীবন-মরণ-অনশন কিসের চিন্তা করছে।

স্পষ্ট দেখতে পেলাম, আসন্ন-প্রসবা।

ক্ষণতরে পুলিসের কর্তব্য ভুলে গিয়ে আমার ভিতরকার মানুষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চেয়েছিল। আমি সবলে তার কণ্ঠরোধ করে পুলিসের কর্তব্যে মন দিলুম। অর্থাৎ এ-রমণী যেন টের না পায় আমি পুলিস। ও'হারার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ যোগাড় করতে এসেছি।

তাই খানসামার ভাইয়ের পার্ট প্লে করে চিৎকার চেঁচামেচি আরম্ভ করলুম, "কোথায় গেল লক্ষ্মীছাড়াটা আপন বউকে ফেলে"?'

খান আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'জানিস মিতু, এত দুঃখের ভিতরেও মেয়েটি আমার দিকে একবার তাকিয়েছিল। কারণটা বুঝতে পেরেছিস? জানিস তো, আমার সিলেটীরা যদি কুলী-রমণী গ্রহণ করি তবে সে হয় রক্ষিতা, কিংবা লোকে বলে খানকি-নটীর বেলেল্লাপনা, কুলী রমণীকে স্ত্রীর সম্মান সেও দেয় না, আর পাঁচজনের তো কথাই নেই। তাই এত দুঃখের ভিতরও বিবাহিত স্ত্রীর সম্মান পেয়ে তার চোখেমুখে তৃপ্তির ভাব ফুটে উঠেছিল।

আমি ক্রমাগত চিৎকার করে যাচ্ছি, "কোথায় গেলেন আমার পরাণের ভাই? আচ্ছা আমার খবর নিস নে, নিসনি, কিন্তু হতভাগার মা যে কেঁদে কেঁদে দেশটা ভাসিয়ে দিলে তার পর্যন্ত তোয়াক্কা করলে না! এদিকে আবার বউ-বাচ্চা পোষবার ভয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে!"

আমার চেঁচামেচি শুনে কুঁড়েঘরের সামনে একপাল কুলী মেয়েমদ্দ জমায়েত হয়ে গিয়েছে। আমি দোরে দাঁড়িয়ে বললুম, "তোমাদের মধ্যে কেউ রাজী আছ, এদের জন্যে রান্নাবান্না করে দিতে, ঘর সাফসুতরো করতে, আর বেচারী বউটার সেবা-টেবা করতে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এখ্খুনি তাকে পাঁচ টাকা দিচ্ছি। মাসের শেষে ফের পুরো মাইনে পাবে। আর এই আরও দু'টাকা হাঁড়িকুড়ি চালডালের জন্য।"

সবাই চেঁচিয়ে বললে, "মুন্নি, মুন্নি!"

মুন্নি এগিয়ে এল। পুরনো ময়লা ছেঁড়া শাড়ি পরা। পরে জানতে পারলুম, এই গরিব বিধবা একমাত্র মুন্নিই যতখানি পারে টুনি মেমেদের দেখভাল্ করেছে। সেও নিঃসম্বল, কীই বা করতে পেরেছে! কিন্তু জানিস মিতু, দুর্দিনে দুটি দরদের কথাই বলে কটা লোক!

আর জানিস্, সেই মুন্নি আমাকে মৃদুকণ্ঠে কি বললে? বললে, "আমাকে মাইনে দিতে হবে না সায়েব। ওদের জন্যে যা রান্না করবো তার থেকে দু'মুঠো আমাকে খেতে দিলেই হবে।"

এর পরও যে খুদাতালায় বিশ্বাস করে না তাকে চড় মারতে ইচ্ছে করে।

মুন্নিকে বললুম, "এই নাও আট আনা। তাড়াতাড়ি গিয়ে মুড়ি-মুড়কি যা পাও নিয়ে এসো।"

চায়ের কথা বললুম না। ঐ একটিমাত্র জিনিস চা-বাগানে ফ্রী। বিস্তর কুলী বিন্ দুধ-চিনি সুদ্ধমাত্র চায়ের লিকার খেয়ে ক্ষিদে মারে।

পাঁচজন সাধারণ মানুষের স্বভাব, কেউ বিপদে পড়লে এগিয়ে এসে সাহায্য না করার, কিন্তু তখন যদি এরই একজন বুকে হিম্মৎ বেঁধে সাহায্য করতে আরম্ভ করে তখন অনেকেই তার পিছনে এসে দাঁড়ায়।

একজন ইতিমধ্যে বসবার জন্য আমাকে একটা মোড়া এনে দিয়েছে। আমি বললুম, "আমি একটা চারপাই কিনতে চাই। বেচবে?"

চারপাই বলতে-না-বলতে এসে গেল। ভিজে ভিত্ থেকে উদ্ধার পেয়েও কিন্তু টুনি মেমের মুখের ভাব বদলালো না।

তোকে বলেছি—হার্ড-বয়েল্ড পুলিসম্যান আমি তখনও হইনি, এমন কি অতিশয় সফ্ট-বয়েল্ডও না, তাই এই পুলিসের ভণ্ডামি করতে আমার বাধো-বাধো—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'এইবারে তুই আরম্ভ করলি সত্যি সত্যি মিথ্যে ভণ্ডামি। ভুলে গেছিস নাকি, ইস্কুলে আসবার সময় কাঁধে করে মা-হারা একটা কাঠবেড়ালিকে সঙ্গে নিয়ে আসতিস? মাস্টারমশাই সেটার জন্য চোটপাট করাতে "গফ্ট" ইস্কুল ছেড়ে নবাবী তালবের ওপরে "রাজার ইস্কুলে" ট্রেনসফার নিলি?'

খান যেন আদৌ শুনতে পায়নি। বললে, 'আসন্নপ্রসবা রমণী পুরুষের চিত্তহারিণী হয় না। কিন্তু তোকে কি বলবো, মিতু, ওরকম সুন্দরী মেয়ে আমি জীবনে কখনও দেখিনি।

অনাদর, অবহেলা এবং সর্বোপরি অনাহার তাকে ম্লান করে দিয়েছে সত্য কিন্তু খাঁটি সোনার উপরকার ময়লা কতক্ষণ থাকবে! একে দু-দিন খেতে দিলে দুটি মিষ্টি কথা বললে এ তো চোখের সামনে কদম গাছের মত বেড়ে উঠবে, সর্বাঙ্গে সৌন্দর্যের ফুল ফোটাবে। এই তো এখ্খুনি যখন মুড়ি এল আর ছেলেটি এই প্রথমবার প্রসন্ন নয়নে তার দিকে তাকালো, তখন তার মায়ের সৌন্দর্য যেন সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠলো।

গয়ার কালো পাথরে কোঁদা মূর্তিটি যেন টুনি মেম। হিন্দুদের যে সুন্দর সুন্দর কালো পাথরের মূর্তি আছে সেগুলো সুন্দর আমি জানি, কিন্তু কালো বলে আমার মন কখনও সাড়া দেয়নি। টুনি মেমকে দেখে বুঝলুম, মরা কালো পাথর জ্যান্ত টুনির রঙের সঙ্গে

www.BanglaBook.org

পাল্লা দিতে গিয়ে কী মারই না খেয়েছে!

আমি তো তেমন ফর্সা নই, আমি মজেছিলুম টুনির রঙ দেখে। আর ও'হারা তো আইরিশম্যান। সে যে পাগল হবে তাতে আর আশ্চর্য কি! গৌরী শ্রীরাধা কেন কৃষ্ণ-লীন হয়েছিলেন টুনি মেমকে দেখে বুঝতে পারলুম। তা সে যাক গে, তোকে আর কি বোঝাব। দেখাবার হলে দেখাতাম। ঐ একটি মেয়ে এ-রঙ নিয়ে জন্মেছিল। তার আগেও না, পরেও না।

ইতিমধ্যে মুন্নি খিচুড়ি চড়িয়েছে। ঘরটা পরিষ্কার করা হয়েছে। একটা টেমি টিম টিম করে জ্বলছে। আমি কিছুক্ষণের জন্য বিদায় নিলুম।

বাগানের ছোটবাবু মুসলমান। তাকে সার্টিফিকেট দেখাবার ছল করে আমার পুলিসের পরিচয় দিলুম। খাওয়া-দাওয়া করলুম কিন্তু তাঁর বাবুর্চীর সঙ্গে, পাছে কোনও সন্দেহের উদ্রেক হয়।

রাত ন'টার সময় টুনি মেমের ঘরে ফিরে দেখি মুন্নি তাকে আরও চারটি খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছে। আমাকে বললে, "ক'দিন ধরে কিছুই জোটেনি, সায়েব; আজ হঠাৎ খাবেই বা কী করে! তবু বলছি, পেটের বাচ্চার জন্য দুটি খেতে।"

টুনির পরনে শাড়ি। সেদিকে তাকাতে মুন্নি বললে, "আট আনা পয়সা দিয়ে মুদির দোকান থেকে ছাড়িয়ে এনেছি।"

আমি বললুম, "খুব ভালো করেছ।"

মুন্নি আপন কাঁথাখানা নিয়ে এসেছে। সেটা চেটাইয়ের উপর পেতে বাচ্চা দুটিকে নিয়ে শুয়ে পড়ল।

আমি মোড়াটা চারপাইয়ের পাশে এনে বসলুম। টুনি সেই আগের মত শুয়ে আছে। হাত দু'খানা বুকের উপর।

আমি উঠি উঠি করছি এমন সময় টুনি চোখ বন্ধ রেখেই কোনও প্রকারের ভূমিকা না নিয়ে বললে, "আপনি সব কিছু জানতে চান—না?"

আমি হকচকিয়ে উঠলুম। কিন্তু তার পরের কথাতেই আশ্বস্ত হলুম। বললে, "কি করে এ অবস্থায় পৌঁছলুম!"

খান বললে, উত্তেজনা ঔৎসুক্যে আমি তখন অর্ধমৃত। "না, না, না, তোমার এখন শরীর দুর্বল, তুমি—" ঐ ধরনের কিছু একটা বলা-না-বলার মত কি যেন একটা অর্ধপ্রকাশ করেছিলুম।

টুনি বললে, "আমি আপনাদের ভাষায় কুলী। আপনারা মানুষ বলেই গণ্য করেন না, অথচ জানেন, আমি একদিন রাজরানীর সম্মান পেয়েছিলুম।"

খান বললে, 'বিশ্বাস করবি নে, মিতু, ঠিক এইরকম ধরনের মার্জিত ভাষায় কথা বলেছিল। আমি তো অবাক!'

আমি বললুম, "আম্মো।'

খান বললে, 'সেটা পরে পরিষ্কার হল। তোকে সব বলছি, টুনি মেম যা বলেছিল।

বললে, "অনেক অপমান নির্যাতন সয়েছি। হেন অপমান নেই যা আমায় সইতে হয়নি—মুখ বুজে। নূতন অপমান আর কি হতে পারে? তাই মনে হচ্ছে আমার যাবার সময় বুঝি ঘনিয়ে এল।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। বাচ্চা দুটো ঘুমিয়ে পড়েছে। মুন্নির নাক অল্প অল্প ডাকছে। টেমিটা বাতাসে এদিক-ওদিক নাচছে।

টুনি বললে, "ও'হারা সায়েবের বোন এসেছিল বিলেত থেকে এ-দেশের হাতী গণ্ডার দেখবে বলে। তারই আয়া হয়ে আমি ওবাড়িতে ঢুকি। মেম চলে যাওয়ার পরও তিনি আমায় ছাড়লেন না।

"আপনি মুরুব্বী, আপনাকে সব কথা বলতে আমার বাধছে। তবু যে বলছি, তার কারণ আপনি এসেছেন আমার ত্রাণ-কর্তা, আমার বন্ধুরূপে। আপনাকে না বলবো তো বলবো কাকে? আর এ যে আমার বুকের উপর বোঝা হয়ে চেপে বসে আছে। এ-বোঝা না নামিয়ে তো আমার নিষ্কৃতি নেই। আপনি শুনুন।

"আমাদের প্রণয় হয়েছিল। আমি স্বীকার করছি, স্বামী বর্তমান থাকতে পরপুরুষের দিকে তাকানোই পাপ, প্রণয় সে তো মহাপাপ। তার জন্য যে সাজা পরমাত্মা আমায় দেবেন তার জন্য আমি তৈরী।

"কিন্তু ভাবো দিকিন ভাই সায়েব, আমি কুলী-কামিন্। আমি কালো, কিন্তু প্রতিবেশিনীরা বলতো, আমার সর্বাঙ্গ নাকি চুম্বক, পুরুষকে টানে। টানতো নিশ্চয়ই—বিশেষ করে ছোঁড়ারা যখন হ্যাংলার মত আমার দিকে তাকাতো তখনই সেটা বুঝতে পারতুম। কিন্তু ওরা কি চায়, সেটা আমি আরও ভালো করেই বুঝতে পারতুম। আমাকে রক্ষিতা করে রাখবার সাহসও এদের ছিল না। যাক, এসব কথা আর খুলে বলার প্রয়োজন নেই।

"তখন যদি কেউ আমাকে রানীর সম্মান দেয় তখন সে প্রলোভন জয় করা কি সহজ পরীক্ষা? সায়েব আমাকে প্রথম দিন থেকেই ইংরেজী পড়াতে শুরু করলে, বললে, 'তোমাকে আমি আমার মনের মত করে গড়ে তুলবো।' ভালোবাসলে মানুষ কি না করতে পারে। কিংবা হয়তো পূর্বজন্মে আমি কোন পাঠশালা-মক্তবের আঙ্গিনা ঝাঁট দিয়ে সেবা করেছিলুম বলে এ জন্মে তাঁরই পুণ্যের ফলে আমার লেখা-পড়া যে গতিতে এগিয়ে চললো সেটা দেখে স্বয়ং সায়েবই অবাক।"

এতক্ষণ পরে টুনি মেম আমার চোখের দিকে তাকালো। বোধ হয় দেখে নিল এসব সূক্ষ্ম জিনিস বোঝবার স্পর্শকাতরতা আমার কতখানি আছে? আফ্টার অল্, সে তো আমাকে জানে খানসামার ভাই খানসামা হিসেবে!

আমার চোখে কি দেখল কে জানে। আজও আমার কাছে রহস্য।

কিন্তু বলে যেতে লাগলো ঠিক সেই ভাবেই।

বললে, "বিদ্যাবুদ্ধি কতখানি হয়েছিল বলতে পারি নে, কিন্তু একটা জিনিস আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। আমরা, কুলী-মজুররা যে ভালোবাসি, একে অন্যের প্রতি আমাদের যে টান হয়, সেটাকে আমি নিন্দা করছি নে, কিন্তু সায়েবের পাশে বসে প্রেমের ভালো ভালো গান আর কবিতা পড়ে পড়ে আমি এক নূতন ভাবে তাকে ভালোবাসতে লাগলুম, আর সে যে আমাকে কত দিক দিয়ে কতখানি ভালোবাসে সেটাও দিনের পর দিন আমার কাছে পরিষ্কার হতে লাগলো।"

টুনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল তাকে থামাই। কিন্তু সে তখন আপনমনে যেন কথা বলছে। আবার কখনও বা সংবিতে ফিরে চোখ দুটি মেলে আমার দিকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাকিয়ে আমাকে লক্ষ্য করে আপন কথা বলে যায়।

"সায়েবের মত এরকম মানুষ আমি আর দেখিনি। সামান্য কয়েক ঘণ্টা দিনে কাজ করতো চা-গাছের সার নিয়ে, আর তার জন্য পেত কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। আর খরচ করতো বেহুঁশের মত। আমি কিছু বললে হেসে উত্তর দিত, যত খুশি যে যখন কামাতে পারে তখন যত খুশি খরচ করবে না কেন?

এই তো আমার স্বামীকে দশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল—"

খান বললে, আমি তখন উত্তেজনার চরমে। এইবারে জানতে পারবো, সেই টাকা নিয়ে টুনি মেমের স্বামী দেশে ফিরে গিয়ে খেতখামারের প্ল্যান করছিল কি না? সে টাকা পেয়েছিল কি? না ও'হারা ডবল ক্রসিং করছিল! রামভজন গুলি খেল কি করে, কেন, কার হাতে? কিন্তু হঠাৎ কেন জানি নে, টুনি মেম কথার মোড় ফিরিয়ে নিল। আমি শুধু লক্ষ্য করলুম; টুনির মুখ কেমন যেন ঈষৎ বিকৃত হয়ে গেল। পাছে সে সন্দেহ করে বসে, আমি কি মতলব নিয়ে এসেছি, তাই আমিও ঐ ব্যাপারটার উপর চাপ দিলুম না। মনকে সান্ত্বনা দিলুম, এতখানি যখন বলেছে, পরে মোকা পেলে বাকিটুকু পাম্প করে নেব।

কারণ স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি, টুনি মেম তো সাধারণ কুলী-কামিন্ নয়ই, সে অসাধারণ বুদ্ধিমতী মেয়ে এবং সব চেয়ে বড় কথা, সে ভীষণ শক্ত মেয়ে। খুদাদাদ্ (বিধিদত্ত) চরিত্রবল তার নিশ্চয়ই ছিল, তার উপর এত বেশী তুফান-ঝড় এত বেশী বিচিত্র ভাগ্যবিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে মার খেয়ে খেয়ে আজ এই স্যাঁতসেঁতে কুঁড়েঘরে এসে পৌঁছেছে যে এখন সে নির্ভয়—তার আর যাবে কি, তার আর হারাবার মত কি আছে যে সে তারই ভয়ে আপন গোপন কথা ফাঁস করবে? সে যদি নিজের থেকে কিছু না বলে তবে আমার চতুর্দশ পুরুষের সাধ্য নেই যে আঁকশি দিয়ে তার পেটের কথা বার করি। এই এক ফোঁটা দুব্‌লা পাতলা মেয়ে, পুলিসের এক ফুঁয়ে সে কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে উড়ে যাবে, কিন্তু আমি এ-তত্ত্বটাও জানি যে সে ভাঙবে না, তার দার্ঢ্য অবিশ্বাস্য।

টুনি মেম বললে, "কিন্তু সায়েব ছিল পাগল। আমি ভেবে-চিন্তেই বলছি, সায়েব ছিল পাগল। দুটো জিনিসে যে তার পাগলামি কত বিকট রূপ ধারণ করতে পারতো সে যারা দেখেছে তারাই বলতে পারবে।"

তারই স্মরণে টুনি মেম যেন আঁতকে উঠলো। বললো, "বেশ ভালমানুষের মতো দিব্যি দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে, আমাকে আদর-সোহাগ করার অন্ত নেই, সারা সকালটা হয়তো কাটলো ক্যাটালগ দেখে বিলেত থেকে আমার জন্য কি সব আনাবে বলে, তারপর হঠাৎ আরম্ভ হয়ে গেল একটানা মদ খাওয়া। চললো দিনের পর দিন। কাজকর্ম তো বন্ধ বটেই, নাওয়াখাওয়ারও খোঁজ নেই। একটুখানি সুবিধাবস্থায় পেয়ে যদি বললুম, 'দুটি মুখে দাও', তবে সে কাতর স্বরে হয় বলতো, 'নেশা কেটে যাবে', নয় বলতো, 'মুখ দিয়ে কিছুই নামবে না।' ঘুম আর মদ, মদ আর ঘুম। আমার জাতভাইরা এদেশে এসে মদ খেতে শেখে। তাদের কেউ কেউ খায়ও প্রচুর। ও জিনিস আমার সম্পূর্ণ অজানা নয়, কিন্তু ওরকম বেহদ মদ কাউকে আমি খেতে দেখিনি, শুনিনি। সে তখন মানুষ নয়, পশুও নয়, যেন কিছুই নয়।

"আমি তার পা জড়িয়ে ধরে বলেছি কতবার—তুমি যদি ঐ মদটা না খেতে তবে আমি নির্ভয়ে বলতে পারতুম, আমার মত সুখী পৃথিবীতে কেউ নেই। সুস্থ অবস্থায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থাকলেও সেও আমার পা জড়িয়ে ধরে প্রতিজ্ঞা করতো, আর কখনও খাবে না। কী লজ্জা! যাকে আমি মাথার মণি করে রেখেছি, সে দেবে হাত আমার পায়ে! অবশ্য এ কথাও ঠিক, আস্তে আস্তে তার এই মদের বান কমতির দিকে চললো। আমার আনন্দের সীমা নেই। কিন্তু আমার কপালে এত সুখ সইবে কেন?' ''

খান দম নিয়ে বলল, 'দেখ মিতু, এর পর বহুকাল চা অঞ্চলে কাজ করার ফলে বিস্তর সায়েবকে প্রচুর কালো মেয়ে নিতে দেখেছি, এবং ছেড়ে যেতেও দেখেছি, কাচ্চা-বাচ্চা থাকলে তাদের মিশনারির কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা আমাকেও মাঝে মাঝে করতে হয়েছে, —এসব ওদের ডালভাত। কিন্তু টুনি মেম স্বতন্ত্র।'

আমি বললুম, 'সে আর তোকে বলতে হবে না। তার পর কি হল, তাই বল। বোলপুর আর বেশী দূর নয়।'

খান বললে, 'টুনির কাহিনীও শেষ হতে চললো। শোন্! টুনি বললে, ''আমার দ্বিতীয় দুঃখ ছিল, সায়েবের অসম্ভব রাগ। ঐ মদেরই মত। বেশ দিন কাটছে, হাসিখুশির মানুষ সায়েব। হঠাৎ কোনও আরদালি বা বেয়ারা একটা কিছু বললে, আর সায়েব রেগে পাগলের মত বন্দুক হাতে নিয়ে তাকে করলে তাড়া। আমি কতবার যে ছুটে গিয়ে তার পায়ে জড়িয়ে ধরে তাকে ঠেকিয়েছি তার হিসেব নেই। তবু বুঝতুম, যদি মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় এ-রকম ধারা করতো। তা নয়। সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থায়। আমার নিজের কোনও ভয় ছিল না, কারণ আমার উপর সে একবার মাত্র রেগে গিয়ে পরে এমনই লজ্জা পেয়েছিল যে আমার মনে আর কোনও সন্দেহ ছিল না যে সে আমার উপর রাগবে না। কিন্তু চাকরবাকরকে নিয়ে হত মুশকিল। আমার স্বামীকে—''

খান থামলো। আমি তেড়ে বললুম, 'ঐ রাগের মাথায় খুন করেছিল নাকি?'

খান বললে, 'ভাই, এবারেও আমাকে প্রলোভন সম্বরণ করতে হল। ঠিক যখন আমার মনে হল, এবারে টুনি আসল কথায় আসবে ঠিক তখন সে আবার তার কথার মোড় ঘোরাল। আমি নাচার। আবার মনকে সান্ত্বনা দিলুম, এই নিয়ে দু'বার হল; তিনবারের বার নিশ্চয়ই বলবে। কিন্তু টুনি পাড়লো অন্য কথা। বললে, ''ঐ রাগই আমার সর্বনাশ করলো।'' তারপর আমাকে শুধালে আমি এদেশে অনেকদিন ধরে আছি কি না? আমি বললুম, না, ভাইয়ের সন্ধানে হালে এসেছি। তখন টুনি বললে, ''তাহলে জানতে, যা সবাই জানে। ঐ নিয়ে মোকদ্দমা হয়েছিল।

''সায়েব ক্লাবে বড় একটা যেত না। একদিন ফিরে এল চিৎকার করতে করতে বদ্ধ মাতালের মত, অথচ মদ খায়নি। পাগলের মত শুধু চেঁচাচ্ছে, 'আমাকে অপমান, এত বড় সাহস! আমাকে অপমান, এত বড় সাহস! আমি দেখাচ্ছি, আমি কি করতে পারি। আমি কাউকে ছাড়বো না। আমি দেখাচ্ছি আমি কি করতে পারি।' আমি চেষ্টা করেছিলুম সায়েবকে ঠাণ্ডা করতে কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারলুম না। টাকা নিয়ে মোটরে করে ফের বেরিয়ে গেল।

''ত্রিসংসারে আমার কেউ নেই। তাই নিয়ে আমি কখনও দুঃখ করিনি। আমার সায়েবকে পেয়েই আমি খুশি ছিলুম, আমি সুখী ছিলুম, কিন্তু রাত যখন ঘনিয়ে এল আর সায়েব ফিরল না তখন যে আমি কি করি, কার কাছে গিয়ে সাহায্য চাই, কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলুম না। এর পূর্বে সায়েব আমাকে কখনও একা ফেলে যায়নি। একা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থাকতে আমার ভয় করে না। কিন্তু সে রাত্রে কেমন যেন এক অজানা ভয় এসে আমাকে অসাড় করে দিল। সে রাত্রিটা আমার কি করে কেটেছিল আজ আর বলতে পারবো না।

"পরদিন সায়েব সন্ধ্যের দিকে ফিরে এল। আমি তাকে হাত ধরে নিয়ে যেতে চাইলুম বাথরুমের দিকে। সে কিন্তু আমাকে দু-হাতে শূন্যে তুলে নিয়ে বসালো উঁচু একটা চেয়ারের উপর। নীচে আমার পায়ের কাছে ছোট্ট একটি মোড়ার উপর বসে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে আমার দিকে। সায়েব এ ভাবে প্রায়ই আমাকে বসাতো, আর একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো। আমার বড় লজ্জা করতো। আমি কে, আমি কি?

"ভাই সায়েব, তুমি কিছু মনে করো না, আমাকে সব কথা বলতে দাও।

"ঠিক তার চারদিন পর পুলিস তাকে ধরে নিয়ে গেল।

"কুকুর-বেড়ালকেও মানুষ এরকম লাথি মেরে বাড়ি থেকে খেদায় না। আমি সায়েবের রক্ষিতা, আমার তো কোনও হক নেই। পুলিস বাড়ি তালাবন্ধ করে সিল-মোহর মেরে চলে গেল। আমি এক বস্ত্রে বাঙলোর বারান্দা থেকে বাগানের বকুলতলায় এসে বসে রইলুম। সেখানে সায়েব আমার জন্য একটা সিমেন্টের বেদী বানিয়েছিল।

"যে চাকর নফর সেদিন সকালবেলা পর্যন্ত আমার পা চেটেছে, তারাই এখন আমাকে লাথিঝাঁটা মারলো। চাকরি গেছে যাক কিন্তু ঐ 'কুলী মেম'টাকে যতখানি পারি অত্যাচার-অপমান করে তার দাদ তুলে নিয়ে যাই।

"আমি একটি কথাও বলিনি।

"মোকদ্দমাতে সব কথা বেরুল। সবাই জানে। সেই যেদিন সায়েব ক্লাবে গিয়েছিল সেদিন ক্লাবের কয়েকজন মুরুব্বী তাকে নাকি আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলে, অনেক চা-বাগিচার ইংরেজ ছোকরা দিশী মেয়ে রাখে কিন্তু আমার সায়েব আমাকে নিয়ে খোলাখুলি যে মাতামাতি করছে সেটা ইংরেজ সমাজের পক্ষে বড়ই কেলেঙ্কারির ব্যাপার।

"আমি জানতুম, আমার সায়েব এ-সব চা-বাগিচার সায়েবদের ঘেন্না করতো। কতবার তাকে বলতে শুনেছি যে-সব নেটিভদের উপর সায়েবরা ডাণ্ডা মেরে বেড়ায়, তারা শিক্ষাদীক্ষার কোনও সুযোগই পায়নি, তাই তারা আজ মজুর, আর ঐ সায়েবরা আপন দেশে সব সুযোগ পেয়েও নিতান্ত অপদার্থ হতভাগা বলে কিছুই করে উঠতে পারেনি। আপন দেশে মজুরের কাজ করতে হলে যেটুকু ধাতুর প্রয়োজন সেটুকু এসব লক্ষ্মীছাড়াদের নেই বলে তারা এদেশে এসে নেটিভদের উপর দাবড়ে বেড়ায়।

"তোমাকে বলেছি, ভাইয়া, আমার সায়েব অপমানিত বোধ করে রেগে একেবারে পাগলের মত হয়ে যেত। সে নাকি তখন যে কটা সায়েবকে হাতের কাছে পেয়েছে তাদের গালে ঠাস ঠাস করে চড় কষিয়েছে আর চিৎকার করে একই কথা বার বার বলেছে, 'আমি তোমাদের মত ভণ্ড ছোটলোক নই! আমি যাকে নিয়েছি তাকে আমি আমার স্ত্রীর সম্মান দিয়েই রেখেছি।' এখানে বলে রাখি, ভাই সায়েব, এরা সবাই জানতো কথাটা সত্যি। আরুগড়ের পাদ্রী সায়েব আমাদের বিয়ের মন্ত্র পড়তে নারাজ জেনে সায়েব ঠিক করেছিল, কলকাতায় আমাদের বিয়ে হবে।"

খান অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললে, তিনবারের বারও ঘোড়া জল খেল না। কারণ আমি তখন থাকতে না পেরে টুনিকে শুধালুম, তার স্বামী সম্বন্ধে যখন কোনও খবর নেই তখন তাদের বিয়ে হত কি করে? অবশ্য আমি ভাবখানা করেছিলুম যেটা ওটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অমনি একটা কথার কথা, যেন নিছক একাডেমিক প্রশ্ন! আজও বুঝতে পারিনি টুনি মেম আমাকে সন্দেহ করেছিল কিনা। টুনি শুধু বললে, সায়েব নাকি তাকে বলেছিল, সে কলকাতার উকিলদের কাছ থেকে তাদের সম্মতি আনিয়েছে, তবে সেটা নাকি খুব পরিষ্কার নয়। চুলোয় যাক্ গে সে-সব কথা, আমার ইচ্ছে শুধু জানবার তার স্বামীর নিখোঁজ হওয়া সম্বন্ধে সে কি জানে কিন্তু সেই যে ও'হারার বদমেজাজীর কথা বলার সময় সে তার স্বামীর কথার আভাস দিয়েছিল, এবারে সেটুকুও না।'

আমি বললুম, 'ঐ কথাটুকু আমিও তো জানতে চাই।'

খান বললে, 'টুনি জল খেয়ে নিয়ে খেই তুলে বললে, "সায়েবকে ক্লাব বাড়ি থেকে জোর করে বের করে দেওয়া হয়। সেদিন বাড়ি ফিরে সায়েব আমাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখেছিল—সে তো বলেছি—তারপর মোকদ্দমায় বেরুল, সায়েব পঞ্চাশ-ষাট মাইল দূরের একটা ছোট্ট পোস্টআপিসে গিয়ে যে ছজন সায়েব তার গায়ে হাত তুলেছিল তাদের নামে ছ'প্যাকেট বিষ-মাখানো চকলেট বিজ্ঞাপন হিসাবে পাঠায়। আচ্ছা, বল তো ভাইয়া, আমি যে বলেছিলুম সায়েবের মাথায় ছিট ছিল সেটা কি ভুল বলেছি? এটা কি ধরা পড়তো না? পাঁচটা পরিবারের লোক যদি একসঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়ে আর—সায়েবলোগের ব্যাপার—সঙ্গে সঙ্গে সিভিল সার্জনকে ডাকা হয় তবে কি মূল ধরা পড়বে না? পার্সেলের উপর যে পোস্ট অফিস থেকে সেগুলি এসেছিল তার খেই ধরে পুলিস দু'দিনের ভিতর ধরে ফেলল যে সে-ই পার্সেলগুলো পাঠিয়েছিল। পোস্টমাস্টার আদালতে তাকে সনাক্ত করলে।"

খান মন্তব্য করে বললে, "টুনি মেমের নরম আর শক্ত দুটো দিকই দেখতে পেলুম তার পরের কথাতে। বললে, "মানুষ মারা পাপ, আর ভাবো দিকিনি ঐ সব পরিবারের ছোট্ট ছোট্ট কাচ্চাবাচ্চাগুলো। আবার পাঠিয়েছিল একটা ছোট ডাকঘর থেকে। ধরা পড়তে কতক্ষণ। কিন্তু একথাও তোমাকে বলছি, ভাইয়া, আমি ঘুণাক্ষরেও সায়েবের এই দুর্বুদ্ধির কথা অনুমান করতে পারলে তার সামনে গলায় দড়ি দিতুম।

"আদালতে সায়েব একটি কথাও বলেনি।

"শুধু শহরময় ছড়িয়ে পড়লো, সায়েব নাকি হাজতে যাবার সময় তার উকিলকে বলেছিল, সে তার 'স্ত্রী'র ন্যায্য সম্মান রাখবার চেষ্টা করেছে মাত্র। একথা শুনে শহরের লোক কি বলেছিল জানিনে, কিন্তু ঐ আমি আমার শেষ সম্মান পেলুম।

"সেই সম্মানের উঁচু আসন থেকে আরম্ভ হল আমার পতন।

"আমি তখন যাই কোথায়? দেশের দশের চোখে আমি সায়েবের রক্ষিতা। রক্ষিতাকে রক্ষা করনেওলা যখন আর কেউ নেই তখন সে যাবে কোথায়? যাবার জায়গা নয়, মরার জায়গা একটা আছে। বেশ্যাপাড়া। কিংবা মরতে পারি ফাঁস দিয়ে। কিন্তু—"

টুনি মেম খানিকক্ষণ চুপ করে বললে, "কিন্তু তখন সায়েবের বাচ্চা আমার পেটে। তার প্রাণ নিই কি করে?"

খান বললে, 'এর পর টুনি মেম কি করে ধাপের পর ধাপ নামতে নামতে সেই জাহান্নমের রদ্দি কুঁড়েঘরে এসে পৌঁছল তার বর্ণনা দেয়নি। তুই সেটা যে রকম খুশি কল্পনা করে নিতে পারিস।'

আমি বললুম, 'অ্যাম স্যাডিস্ট নই। আমি বীভৎস রসে আনন্দ পাই নে। তারপর কি

www.BanglaBook.org

হল তুই বলে যা।'

খান বললে, 'টুনি সে রাত্রে আর কিছু বলেনি। তার ক্লান্তি দেখে আমিও আর খোঁচাখুঁচি করিনি।

ওদিকে আমার বসের সঙ্গে কথা ছিল, টুনিকে আবিষ্কার করতে পারলে যেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে টেলিগ্রাম করে জানাই। অতি অনিচ্ছায় পরের দিন তাঁকে কোড টেলিগ্রাম করে জানালুম। গেলুম স্টেশনে তাঁকে রিসীভ করতে।

সন্ধ্যাবেলা তিনি নামলেন পুলিসের য়ুনিফর্ম পরে। আমি অবাক হয়ে বললুম, "স্যার, করেছেন কি? টুনি বড় শক্ত মেয়ে। পুলিসকে সে একটি কথাও বলবে না। এমন কি আপনি চাকর নফরের বেশ পরলেও ধরে ফেলতে পারে।"

খেলাম উৎকট ধমক। বললেন, "রেখে দাও ওসব জ্যাঠামো। এই ঘোষালবান্দা ঘড়েল ঘড়েল খুনীদের পেটের নাড়ির 'কির্‌মি' বের করেছে একশ' সাতান্ন বার, আর আজ তুমি এলে শোনাতে, কি করে এক ফোঁটা ছুঁড়ির ঠোঁটের কথা বের করতে হয়। চল, তোমাকে হাতেকলমে দেখিয়ে দিচ্ছি।" আমি তাঁকে বহুৎ বোঝাবার চেষ্টা করলুম। খেলুম গণ্ডা তিনেক ধাঁতানি। কীই বা করি আমি? তিনি দুঁদে অফিসার। পাঠান আসামীকে তিনি খুন কবুল করাতে পেরেছেন বলে তাঁর খুশ-নাম ছিল—পাঠানকে "বেইমান" বলে অপমান করলে সে রেগেমেগে সব-কিছু ফাঁস করে দেয়, এই অজানিত প্যাঁচটি জানতেন বলে। আমি চুপ করে গেলুম।

গট্ গট্ করে মিলিটারি বুটে পাড়া সচকিত করে তিনি ঢুকলেন টুনি মেমের কুঁড়েঘরে। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে রইলুম।

তারপর, মশাই, আরম্ভ হল দুঁদে পুলিসের যত রকম কায়দা-কেতা ফন্দিফিকির সন্ধি-সুড়ুক তার নির্মম প্রয়োগ। দুনিয়ার ভয়-প্রলোভন, মৃদু ইঙ্গিত, কটু সম্ভাষণ সব-কুচ্ চালালেন ঘড়েল পুলিস-কর্তা।

কিন্তু সেই যে পুলিস দেখে টুনি মেম মুখ বন্ধ করেছিল সে মুখ আর সে খুললে না। ঝাড়া ছ'টি ঘণ্টা পুলিস সায়েব তাঁর চেষ্টা দিয়ে ঘেমে নেয়ে বেরুলেন সেই কুঁড়েঘর থেকে ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে। টুনি মেম একটা হ্যাঁ-না পর্যন্ত বলেনি।

আমার লজ্জাটুকু পুলিসকর্তা রাখলেন না। আমি তাঁকে অনুরোধ করেছিলুম তিনি যেন প্রকাশ না করেন যে আমার কাছ থেকে সব কিছু জানতে পেরে তিনি তার সন্ধান পেয়েছেন। আমি যে খানসামার ভাই সেই খানসামার ভাইই থেকে যাই। কিন্তু টুনি মেমের নীরবতার পাঁচিলে মাথা ঠুকে ঠুকে পুলিসকর্তা ঘায়েল হয়ে গিয়ে সেকথাটাও প্রকাশ করে দিলেন। এমন কি তিনি আমাকে ভিতরে ডেকে পাঠালেন। যেতে বলা—বস্ যে।

টুনি একবার আমার দিকে এক লহমার তরে তাকিয়েছিল।

কি বলবো, মিতুয়া, সে দৃষ্টিতে ঘৃণা তাচ্ছিল্য কি ছিল, কিছুই বলতে পারবো না। শুধু মনে হয়েছিল রহস্যময় সে দৃষ্টি।'

খান বললে, 'তার পরদিন প্রসবের সময় টুনি মেম এই দুঃখের সংসার ত্যাগ করলো।'

এটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। আমি অবাক হয়ে বললুম, 'সে কি?'

'হুঁ।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি শুধালুম, 'তাহলে ঐ যে লোকটা খুন হয়েছিল তার কোন হিল্যে হল না?'

খান অনেকক্ষণ কোন উত্তরই দিলে না। শেষটায় বললে, 'সে যাক্ গে। এর পরও আমি বহু রহস্যের সমাধান করতে পারিনি—সে নিয়ে আমার শোক নেই। আমি শুধু এখনও টুনি মেমের শেষ চাউনির কথা ভাবি। সে চাউনিতে কি ছিল?

দুর্দশার চরমে বাচ্চা দুটো যখন ক্ষুধায় কাতরাচ্ছে তখন আমি এসে তাদের চোখের জল মুছে দিলুম, টুনি তখন নিশ্চয়ই সৃষ্টিকর্তাকে তার সর্ব দেহমন নিয়ে ধন্যবাদ জানিয়েছিল—তিনি যে তার ডুবুডুবু ভাঙা নৌকোখানিকে পারে এনে ভিড়ালেন। আমাকে সে দেখেছিল তাঁরই দূতরূপে, তাঁরই ফিরিশতারূপে। তারপর হঠাৎ দেখে, আমি দেবদূত নই, আমি শয়তান। তার দুর্দিনে যেসব চাকর-বাকর তাকে লাঞ্ছিত অপমানিত করেছিল আমি তাদের চেয়েও অধম। আমার মতলব ছিল তার বাচ্চা দুটোকে খাইয়ে-দাইয়ে তাকে খুশী করে, তার জীবনের চরমধন তার "স্বামীকে" ঝোলাবার জন্য প্রমাণ সংগ্রহ করা।'

এর পর আর কোনও কথা হয়নি। গাড়ি বোলপুরে এসে থামল।

চেল্লাচেল্লিতে ম্যানেজার গোসাঁই স্বয়ং এসে খানকে ডবল খানা দিলে। গাড়ি যখন চলতে আরম্ভ করেছে তখন আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল টুনি মেমের বাচ্চা দুটোর কথা। চেঁচিয়ে খানকে শুধালাম, 'ওদের কি হল?' খান শুনতে পেল না। হাসিমুখে শুধু হাত নাড়লে।

এক পুরুষ

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিক।

বিদ্রোহ শেষ হয়ে গিয়েছে। আজকের দিনের যুদ্ধে যাকে ইংরেজিতে বলে 'মপিং অপ্', যেন স্পঞ্জ দিয়ে মেঝের এখান ওখান থেকে জল শুষে নেওয়া—তাই চলেছে। আজ এখানে ধরা পড়ল জন দশেক সেপাই, কাল ওখানে জন বিশেক। কাছাকাছি কামান থাকলে পত্র-পাঠ বিদ্রোহীগুলোকে তাদের মুখের সঙ্গে বেঁধে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিংবা ফাঁসি। গাছে গাছে লাশ ঝুলছে, যেন বাবুই পাখির বাসা।

পাঁচ শ' দু-আস্‌পা (দ্বি-অশ্ব) অর্থাৎ এক হাজার ঘোড়া রাখার অধিকারী বা মনবসদার গুল বাহাদুর খান বর্ধমানের কাছে এসে মনস্থির করলেন, এখন আর সোজা পাঁহী সরকারী রাস্তায় চলা নিরাপদ নয়। তিনি অবশ্য আপদ কাটাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেননি। তিনি ততক্ষণে বুঝে গিয়েছেন গদর (মিউটিনি) শেষ হয়ে গিয়েছে—তাঁরা হেরে গিয়েছেন। তিনি কেন, তাঁর সেপাইরা আশা ছেড়ে দিয়েছিল, তিনি নিজে নিরাশ হওয়ার বহু পূর্বেই। সলাহ্‌পরামর্শ করার জন্য তিন রাত্রি পূর্বে যে জলসা বসেছিল তাতে তারা অনুমতি চায়, অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করে গরিব-গুরবো ফকীর-ফুকরো সেজে যূথভঙ্গ হয়ে যে যার আপন শহরের দিকে রওয়ানা হবে। এলাহাবাদ, কনৌজ, ফররুখাবাদ, লক্ষ্ণৌ, মলীহাবাদ, মীরাট—যার যেখানে ঘর।

গুল বাহাদুর খান বলেছিলেন, সেটা আত্মহত্যার শামিল। পথে ধরা পড়বে, আর না পড়লেও বাড়িতে পৌঁছানোর পর নিশ্চয়ই। তাঁর মনের কোণে, হয়তো তাঁর অজানতে,

www.BanglaBook.org

অবশ্য গোপন আশা ছিল বেঁচে থাকবার। সুদ্ধ মাত্র বেঁচে থাকবার জন্য নয়,—তাঁর বয়স বেশী হয়নি, হয়তো আবার নূতন গদর করার সুযোগ তিনি এ জীবনে পাবেন। কিন্তু যখন দেখলেন, সেপাইদের শিরদাঁড়া ভেঙে গিয়েছে—আজকের দিনের ভাষায় যাকে বলে 'মরাল' টুটে গিয়েছে—তখন তিনি তাদের প্রস্তাবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। শেষরাত্রে আধোঘুমে অনুভব করলেন, সেপাইরা একে একে পায়ে চুমো খেয়ে বিদায় নিলে—তিনি আগের দিন মগরিবের নামাজের পর অনুরোধ করেছিলেন, বিদায় নেওয়া-নেওয়ির থেকে তাঁকে যেন রেহাই দেওয়া হয়।

শুনলেন, সেপাইরা চাপা গলায় একে অন্যকে শুধোচ্ছে, কাজটা কি ঠিক হল, বাড়ি পৌঁছানোর আশা কতখানি, সেখানে পৌঁছেই বা কিস্মতে আছে কি, এ রকম সর তাজ্ (মাথার মুকুট) সর্দার পাবো কোথায়?

গুল বাহাদুর খানের কিন্তু কোনও চিত্তবৈকল্য হয়নি। তাঁর কাছে এরা সব নিমিত্ত মাত্র। তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাঁর প্রাণের একমাত্র গভীর ক্ষুধা—জাহান্নমী শয়তান ইংরেজকে এ দেশ থেকে তাড়িয়ে শাহানশাহ বাদশা সরকার-ই-আলা বাহাদুর শাহের প্রাচীন মুগলবংশগত শান্‌শৌকৎ, তখ্‌ৎদৌলৎ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। আজ যদি এই সেপাইদের দিল্ দেউল হয়ে গিয়ে থাকে তো গেছে। এরা তো আর কিছু কাপুরুষ নয়। কিন্তু এরা কাকের মত একবারই বাচ্চা দিতে জানে। একবার তারা চেষ্টা দিয়েছিল। সফল হতে পারেনি। দু'বার চেষ্টা দেওয়া তো এদের কর্ম নয়। তাই নিয়ে আফসোস্ করে কি ফায়দা! খুদা যদি বাঁচিয়ে রাখেন, আল্লার যদি মেহেরবানী হয় তবে আবার নয়া সেপাই জুটবে, নয়া দামামা পিটিয়ে জেগে উঠবে—তার আশা তিনিই করতে পারেন, এরা করবে কি করে?

গদর আরম্ভ হয়েছিল এলোপাতাড়ি কিন্তু পরে দিল্লীতে লালকেল্লার তসবীখানাতে যে মন্ত্রণাসভা বসেছিল সেখানে স্থির হয়, গুল বাহাদুরকে পাঠানো হবে বাঙলা দেশে। সেখানকার বাগ্‌দীরা এককালে ছিল বাদশাহের সেপাহী। ইংরেজ তাদের বিশ্বাস করতো না বলে ইংরেজ ফৌজে তাদের স্থান হয়নি। শুধু তাই নয়, ইংরেজ তাদের অন্য কোনও রকম কাজ তো দিলই না, উল্টে হুকুম করলে তারা যদি আপন জমি নিজে চাষ না করে তবে সে জমি কোম্পানি বাজেয়াপ্ত করবে। বাগ্‌দীদের আত্মসম্মানে লাগে জোর ঘা। যে তলোয়ার দিয়ে সে দুশমনের কলিজা দু'টুকরো করে দেয়, তাই দিয়ে সে খুঁড়বে মাটি! তার চেয়ে সে তলোয়ার আপন গলায় বসিয়ে দিলেই হয়, কিংবা মোকা পেলে দুশমনের গলায়—

গুল বাহাদুরকে বাঙলাদেশে পাঠানো হয়, এই বাগ্‌দী ডোমদের জমায়েৎ করে এক ঝাণ্ডার নীচে খাড়া করবার জন্য।

আফসোস্, আফসোস্! হাজার আফসোস্! একটু, আর একটু আগে আরম্ভ করলেই তো—গুল বাহাদুর নিজের মনেই বললেন, 'থাক্ সে আফসোস্। এখন বর্তমানের চিন্তা করা যাক্।'

বাগ্‌দীদের সাহায্যেই তিনি যোগাড় করলেন ধীরু মামাবলী। তিনি এখন বৃন্দাবনের বৈষ্ণব। বাঙলা জানেন না, জানেন হিন্দী। আসলে সেটাও ঠিক জানেন না। তিনি ছেলেবেলা থেকে বাড়িতে বলেছেন দিল্লীর উর্দু, মক্তবে শিখেছেন ফার্সী, আর বলতে পারেন দিল্লীর আশেপাশের হিন্দীর অপভ্রংশ হরিয়ান। কিন্তু তাই নিয়ে অত্যধিক

www.BanglaBook.org

শিরঃপীড়ায় কাতর হবার কোনও প্রয়োজন নেই। এই রাঢ় দেশে কে ফারাক করতে যাবে, দিল্লীর হরিয়ানা থেকে বৃন্দাবনের ব্রজভাষা।

দাড়িগোঁফ কামাতে গিয়ে একটুখানি খটকা বেধেছিল, এক লহমার তরে। তারপর মনে মনে কান্নার হাসি হেসে বলেছিলেন, 'তা কামাবো বইকি, নিশ্চয়ই কামাবো। লড়াই হেরেছি, তলওয়ার ফেলে দিয়েছি, পালাচ্ছি মেয়েছেলের মত—এখন তো আমাকে মেয়েমানুষ সাজেই মানায় ভালো।'

শেষটায় হঠাৎ অট্টকণ্ঠে চেঁচিয়ে বলেছিলেন, 'ইয়াল্লা, আমি কি গুনা করেছিলাম যে এ সাজা দিলে?'

ক্রুশবিদ্ধ যীশুখ্রীষ্টও মৃত্যুর পূর্বে চিৎকার করে বলেছিলেন, 'হে প্রভু, তুমি আমাকে বর্জন করলে কেন?'

বাগ্‌দীরা তাঁর হাহাকার হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিল। তেঁতুলতলায় শুইয়ে দিয়ে ভাঙা-ভাঙা হিন্দীতে সান্ত্বনা দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল।

দুপুররাতে চাঁদের আলো মুখে পড়াতে ঘুম ভাঙলো। দেখলেন, ঘুমিয়েও ঘুমোননি। ঘুমন্ত মগজও তাঁর জাগ্রত অবস্থার শেষ হাহাকারের খেই ধরে মাথা চাপড়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তার সান্ত্বনাও খুঁজে পেয়েছে। কি সান্ত্বনা? গুল বাহাদুর, এ কি তোমার ফাটা কিস্মৎ, না তোমার বাপ-ঠাকুর্দার ভাঙা কপাল? মনে নেই, দেওয়ান-ই খাসের যেখানে লেখা,

"অগর ফিরদৌস বররুয়ে জমীন অস্ত
ওয়া হমীন অস্ত হমীন অস্ত হমীন অস্ত।"
"ভূস্বর্গ যেখানে খুশী বলো, মোর মন জানে
এখানে, এখানে দেখো তারে, এই এখানে।"

তারই সামনে নাদির কর্তৃক হৃতসর্বস্ব, লাঞ্ছিত, পদদলিত বাদশা মুহম্মদ শাহ কপালে করাঘাত করে কেঁদে উঠেছিলেন,

'শামাতে আমাল-ই-মা সুরুতে নাদির গিরিফ্‌ৎ।'
'কপাল ভেঙেছে, আমারই কর্মফল
নাদির মূর্তিতে দেখা দিল।'

তখন কি তোমার পিতামহ তাঁর নুন-নিমকের মালিক শাহিনশার সে দুর্দৈব দাঁড়িয়ে দেখেননি? বাদশার খাস আমীর সর্‌-বুলন্দখান, হাজার দু-আস্‌পা মনসবের মালিক তোমার পিতামহ তখন কি করতে পেরেছিলেন? আলবত্তা, হাঁ, হাবেলীতে ফিরে এলে তাঁর জননী তাকে শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলেন, 'দাড়িগোঁফ কামিয়ে ফেল, আর তলওয়ারখানা শাহিনশাকে ফেরত দিয়ে এসো।'

তারপর দীন দুনিয়ার মালিক আকবর-ই-সানী (দ্বিতীয় আকবর) যখন ইনিয়ে বিনিয়ে বিলাতের বাদশার কাছে দরখাস্ত পেশ করলেন তাঁর তনখাহ্‌ বাড়িয়ে দেবার জন্য—মেথর যে-রকম জমাদারের কাছে তনখা বাড়াবার জন্য আর্জি পেশ করে—তখন সে বেইজ্জতী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন তোমার বাপ। শোনোনি যে বাঙালীন্ বাবু [১] সে দরখাস্ত

১ রাজা রামমোহন রায়।

www.BanglaBook.org

নিয়ে বিলায়েত গিয়েছিলেন তিনি পর্যন্ত নাকি তার জবান, ঢং আর শৈলী দেখে শরম বোধ করেছিলেন।

তাই বলি তুমি এত বুক চাপড়াচ্ছ কেন?

তাঁদের তুলনায় তোমার মনসবই (পদমর্যাদা) বা কি, বাদশাহ তোমাকে চেনেনই বা কতটুকু? নানাসায়েব, লছমীবাঈ এঁরা সব গায়েব হয়েছেন, আর তুমি তাঁতী এখন ফার্সী পড়বে! হয়েছে, হয়েছে, বেহদ হয়েছে। গিদড়ের গর্দানে লোম গজালেই সে শের-বাবর হয় না।

আল্লা জানেন, এসব তত্ত্বকথা চিন্তা করে গুল বাহাদুর খান কতখানি সান্ত্বনা পেয়েছিলেন। পরবর্তী জীবনেও তাঁর আচার-ব্যবহার থেকে অনুমান করা যেত না, তিনি তাঁর কপালের গর্দিশ কতখানি বরদাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বড় রাস্তা থেকে নেমে ডান দিকে মোড় নিয়ে, ফের বাঁ দিকে পুরো পাক খেয়ে তিনি পেরলেন অজয় নদ। উঁচু পাড়ি বেয়ে উঠেই দেখলেন, সমুখে দিকদিগন্ত প্রসারিত খরদাহে দগ্ধ সবিতার অগ্নিদৃষ্টিতে অভিশপ্ত চিতানল—ভস্মীভূত প্রান্তর।

অবাঙালী তো কথাই নাই, এ দেশের আপন সন্তানও এই তেপান্তরী মাঠের সামনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে। এর নাম 'বাঙলা' রেখেছে কোন্ কাষ্ঠরসিক!

কিন্তু গুল বাহাদুর শিউরে ওঠেননি; তাঁর জীবন কেটেছে দিল্লী আগ্রার চারদিকের খাকছার দেশ দেখে দেখে। সেরেফ উনিশ-বিশের ফারাক।

তাবৎ তেপান্তরের ওপারেও লোকালয় থাকে। সাহারার মত মরুভূমি পেরিয়েও বেদুয়িন যখন ওপারে ডেরা পাততে পারে তখন এই তেপান্তরের পরেও নিশ্চয়ই বসতি আছে। কিন্তু সেখানে থাকে কী সর্বহারা লক্ষ্মীছাড়ারাই। যাদের প্রাণ ছাড়া আর কিচ্ছু দেবার নেই শুধু তারাই তো পারে এ রকম ডাকডাকিনীর মাঠে পা ফেলতে!

ভালোই। ভালোই হল। এই তেপান্তরই তাঁর ও ইংরেজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইবে অচল অভেদ্য দুর্গবৎ। সেই হতভাগ্যদের সঙ্গেও তাঁর বনবে ভালো, hail fellow well-met. 'এক বাথানের গরু'।

গুল বাহাদুর বললেন, 'শুক্‌র্, অলহমদুলিল্লা।'

মাঠে ফেললেন পা।

॥ দুই ॥

সংসারের অধিকাংশ লোক না গোলাম না বাদশাহ। বাদবাকীর কেউ আদার কেউ চেলা। ওদের কেউ কেউ জন্মায় হুকুম দেবার জন্য, আর কেউ কেউ সে হুকুম তামিল করার জন্য। ভাগ্যচক্রে অবশ্য কখনও হুকুম-দেনেওলাও জন্মায় হুকুম-লেনেওলা হয়ে। তখনো কিন্তু তার গোত্র বুঝতে অসুবিধা হয় না। সে তখন বাদশা হয়ে জন্মালে উজীরের হুকুমমত ওঠ-বস করে, উজীর হলে সর্বক্ষণ তাকিয়ে থাকে কোটালের দিকে—তার আদেশ কি। আবার উল্টোটাও হয় ঠিক ঐ রকমই। সে পাইক হয়ে জন্ম নিয়েও ফৌজদারকে হামেহাল বাতলে দেয় তার কর্তব্য কোন্ পথে।

দুঁদে জমিদারের জেল হলে সে তিন দিনের মধ্যেই চোর-ডাকাত নিয়ে কয়েদীখানায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দল খাড়া করে, সপ্তাহের মধ্যেই জেল সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট তার কথায় হাঁচে, তার হুকুমে কাশে। মোকা পাওয়া মাত্রই উপরওয়ালাকে জানায়, 'অমুক কয়েদীর কন্ডাকট্ ভেরি ভেরি গুড; অ্যামনেস্টির সময় একে অনায়াসে খালাস দেওয়া যেতে পারে।' জমিদার বেরিয়ে গেলেই সে তখন খালাসী পায়।

গুল বাহাদুরের জন্ম হয়েছিল হুকুম দেবার জন্য। নামাবলী গায়ে দিয়েই আসুন আর রাইডিং বুট পরেই আসুন, ডোমের দল তাকে চট করে চিনে ফেলল। পিঠে থাবড়া খেয়েই ঘোড়া চিনতে পারে ভালো সোওয়ার কে?

তেপান্তরের মাঠের প্রত্যন্ত প্রদেশে, গ্রাম যেখানে শুরু, সেখানে এক পোড়ো বাড়িতে আশ্রয় নিলেন গুল বাহাদুর। চালের ভিতর দিয়ে আসমান দেখা যায়। রাতে আকাশের তারা তাঁর দিকে মিটমিটিয়ে তাকায়, দিনে কাঠবেরালী। ঘরের কোণের গর্ত থেকে একটা সাপ মাথা তুলে তার দিকে জুল জুল করে তাকিয়ে ছিল। গুল বাহাদুর বলেছিলেন, 'তশরীফ নিকালিয়ে', 'আত্মপ্রকাশ করতে আজ্ঞা হোক'। গদরের সময়ে তিনি নিমকহারামী দেখেছেন প্রচুর। সাপ তো তাঁর নুননিমক খায়নি যে তাঁকে কামড়াতে যাবে।

ডোমরা তাঁর ঘর মেরামত না করে দিলে গুল বাহাদুর কদাচ এই গর্ত বন্ধ করতেন না।

চিকনকালা গ্রামে আসার পরদিন গুল বাহাদুর গিয়েছিলেন গ্রামের ভিতর একটা রোঁদ মারতে—দিল্লীর চাঁদনীচৌকে যাওয়ার মত। এক জায়গায় দেখেন ভিড়। তিনি ভিতরে যাওয়ার উপক্রম করতেই ডোমরা তড়িঘড়ি পথ করে দিলে। একটা ছেলে গাছ থেকে পড়ে পা মচকিয়েছে। তার মা হাঁউমাউ করে আসমান ফাটিয়ে টুকরো টুকরো করে জমিনের উপর ফেলেছে।

গুল বাহাদুর বরিশাল গান্ ফাটিয়ে বললেন, 'চোপ!'

মার কথা দূরে থাক সুরে ডোমিস্থান সে হুঙ্কারে কে কার ঘাড়ে পড়বে ঠিক নেই। এই যে খুদাতালার এত বড় দুনিয়া, তার আধেকখানাই তো ঐ তেপান্তরী মাঠ, সেখানেও যেন তারা পালাবার পথ পাচ্ছে না। হুঙ্কার তারা বিস্তর শুনেছে, নামাবলীও বিস্তর দেখেছে, কিন্তু নামাবলীর তলা থেকে এ রকম অট্টরব! নিরীহ গোপীযন্ত্র থেকে গদরের কামান ফাটে নাকি!

'চোপ্' বলে গুল বাহাদুরের হাত গোঁপের দিকে উঠেছিল। তখন মনে পড়ল তিনি গোঁপ কামিয়ে ফেলেছেন।

গুল বাহাদুর ছেলেটার পায়ে হাত বুলোতে লাগলেন।

কে এক ওলন্দাজ না অন্য জাতের আর্টিস্ট্ বলেছেন, 'যারা এচিং কিংবা অন্য কোনও প্রিন্টিঙের কাজ করে তাদের হাতের তেলো হবে রাজকুমারীর মত কোমল, পেশী হবে কামারের মত কট্টর। প্লেট থেকে ফালতো রঙ তোলার সময় রাজকুমারীর মখমলী তেলো দিয়ে আলতো আলতো করে তুলবে রঙ, আর প্রিন্ট করার সময় দেবে কামারে পেশীর জোরে মোক্ষম দাবাওট্!

গুল বাহাদুর তাঁর মোলায়েম তেলো দিয়ে ছোঁড়াটার গোড়ালি বুলোতে বুলোতে হঠাৎ পাটা পাকড়ে ধরে কামারের পেশী দিয়ে দিলেন হ্যাঁচকা ঝাঁকুনি। ছেলেটা আঁতকে উঠে রব ছাড়লে, 'কক্!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তিনি বললেন, 'ঠীক্ হৈ, বেটা, আরাম হো যায়েগা। ফির বন্দর জৈসা কুদেগা!'

এতক্ষণ ছেলেটার পা'টা উরু থেকে কাঠের মত শক্ত হয়ে উপর-নিচ করছিল না; এবারে গুল বাহাদুর সেটাকে কব্জা-ওলা বাক্সের ডালার মত উপর নিচু করলেন। তারপর মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তীন্ দন্ সোলাকে রাখবে।'

'রাখবে' শব্দটা বর্ধমান অঞ্চলে তাঁর বাঙলা শেখার প্রচেষ্টার ফল। ডোমরা বুঝলে। 'সোলাকে'ও বুঝলে—'শুইয়ে', 'তীন' তো সোজা 'তিন' কিন্তু 'দন্'-টা কি চীজ্?

গুল বাহাদুরকে গদরের সময় জাত-বেজাতের সেপাইয়ের সঙ্গে কথাবার্তা কইতে হয়েছিল। তিনি তাই শিখে গিয়েছিলেন, বিদেশী কোনও শব্দ না বুঝতে পারলে তাকে শোনাতে হয় ঐ শব্দের সম্ভব অসম্ভব যাবতীয় প্রতিশব্দ। যেমন 'ইনসান' বললে যদি না বোঝে তবে বলতে হবে 'আদমী', তারপর 'মানস' 'লোগ' 'বেটা' 'বাচ্চা' ইত্যাদি। একটা না একটা বুঝে যাবেই।

গুল বাহাদুর বললেন, 'তীন্ দন্, তীন্ শাম, তীন্ রোজ।'

এক ডোম চিৎকার করে বললে, 'বুঝেছি গো, বুঝেছি। তিন দিন, তেরাত্তির।'

জীবনের দীর্ঘতর অংশ চিকনকালা গ্রামে কাটিয়ে গুল বাহাদুর বীরভূমী ডোমী ভাষা শিখেছিলেন, কিন্তু শেষদিন পর্যন্ত তাঁর হিন্দুস্থানী হ্রস্ব দীর্ঘ স্বর থেকে তিনি নিষ্কৃতি পাননি। তাঁর 'দিন' শোনাতো 'দন', 'কিতাব' 'কতাব', 'হিন্দু' 'হন্দু', 'বিলকুল' 'বল্‌কল্' —বাগ্দীদের কানে।

অঙ্গারখার দামন্ (চাপকানের নিম্নাঞ্চল) ওঠাতে গিয়ে গোঁপে তা দিতে যাবার মত তাঁর খেয়াল হল, তিনি ধুতি উত্তরীয়ধারী!

সেদিন সন্ধ্যায় তিনি আঙ্গিনায় পলাশতলায় চ্যাটাইয়ের উপর শুয়ে। আসমানে দেখেছেন মীজান্ (দাঁড়িপাল্লা, মধ্যিখানে তিনটে তারা কাঁটার মত, দু'দিকে ভার—আমাদের কালপুরুষ)। তখড় খেয়াল গেল, অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, সবই আগের থেকে উদয় হয়েছেন। মনে মনে বিড় বিড় করতে লাগলেন, মীজান, অকরব, কওস, সম্বুলা, জদী, দলো, হুৎ—!

দিল্লীতেও তিনি ছাতের উপরই থাকতেন বেশীর ভাগ।

ঠাকুরদা শখ করে বানিয়েছিলেন যমুনার উপর একখানি চক-মেলানো বাড়ি। বাড়িখানি ছোট কিন্তু উচ্চতায় সে বাড়ি ও-পাড়ার সব বাড়ি ছাড়িয়ে উঠেছিল। আজকের দিনের ভাষায় একেই বলে বাড়ি হাঁকানো। বৃদ্ধ বয়সেও ঠাকুরদার চোখের জ্যোতি ক্ষীণ হয়ে যায় নি। নাতিকে কোলে বসিয়ে বলতেন, ঐ দেখো, ঐ দেখো, ঐ দূরে, যমুনার ওপারে শাহদারা, গাজীয়াবাদ, নাতি দেখতো ওপারে শুকনো মাঠ খাঁ খাঁ করছে, আর তার মাঝে মাঝে ঝোপ-ঝাড়। কুৎবউদ্দীন আইবক থেকে আরম্ভ করে বাবুর, হুমায়ুন, রফীউদ্দৌলা মুহম্মদ শাহ সবাই গিয়েছেন ওপারে হরিণ শিকার করতে। বুড়ো বাদশাহের হরিণ-শিকারের বয়স গেছে—তিনি এখন লাল কেল্লার ছাতের উপর থেকে ওড়ান ঘুড়ি। শাহজাহদারা এখনও যান, তিনিও বহুবার গিয়েছেন।

বাহাদুর শাহ ভালো কবিতা লিখতে পারতেন। অবশ্য সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি জওক ও গালিবের তুলনায় তাঁর রচনা নিম্নাঙ্গের। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর কবিতায় এমন একটা সরল সহৃদয়তার গুঞ্জন থাকতো যেটা কারও কান এড়িয়ে যেত না। এবং তাঁর মধ্যে ছিল

www.BanglaBook.org

এমন একটা সদগুণ যেটা জওক কিংবা গালিব কারোরই ছিল না। জওক গালিবের মধ্যে হামেশাই হত লড়াই। তৎসত্ত্বেও একে অন্যের প্রশংসা করতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হতেন না। শোনা যায় শ্রেষ্ঠতর কবি গালিব নাকি এক মুশায়েরাতে (কবি সম্মেলনে) জওকের কোন কবিতার দু'ছত্র শুনে তাঁকে সর্বসমক্ষে বার বার কুর্নিশ করতে করতে বলেছিলেন, 'আপনার এ দুটি ছত্র আমাকে বকশিশ দিন; আমি তার বদলে আমার সমস্ত কাব্য আপনাকে দিয়ে দেবো।' কিন্তু এঁদের কাব্যের চিকন কাজ বাদশাহ বাহাদুর শাহ যতখানি অনুভব করতে পারতেন এঁরা একে অন্যের ততখানি পারতেন না। বাহাদুর শাহ ছিলেন সে যুগের—সে যুগের কেন তাবৎ উর্দুযুগের—সবসে বঢ়িয়া সমজদার।

বদর আমলের ইংরেজরা তাঁর কাব্যপ্রেমকে নিয়ে কত যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ঠাট্টামস্করা করেছে তার অন্ত নেই। তাদের রাজদরবারেও পোইট লরিয়েট নামক একটি প্রাণী পোষা হয়। তাদের কুরান-পুরাণে আছে, গ্রেট ন্যাশানাল অকেশনে তিনি টপ্পা-ফপ্পাভী লিখতে পারেন, ঐ সব অকেশনে দর্জী-ওস্তাদরা যে রকম রাজা রাণীর পাতলুন-ব্লুসার্জ বানায়, কিংবা বলতে পারেন হটেন্‌টট্‌দের রাজদরবারে পালপরবে যে রকম পোষা বাঁদর দু'চক্কর 'নাচভী লেচে ল্যায়।'

আসলে তাদের রাজারা দেবসেনাপতি, অসুরমর্দন, রুদ্রাত্মজ কার্তিকের বংশ-অবতংস। তারা তীব্রতম চিৎকারে আকাশ বাতাস সসাগরা পৃথিবী (যে রাজত্বে সূর্য অস্তমিত হন না) প্রকম্পিত করে শিকার করেন খ্যাকশ্যালী। দি লর্ড বি থ্যান্‌ক্‌ট—তাদের কাণ্ডজ্ঞান আছে।

তাবৎ ইংরেজই অগা, ও-কথা বলা বোধহয় অন্যায় হবে। কারণ পরবর্তী যুগের এক ইংরেজই দুঃখ করে বলেছেন, 'যে সব গাড়লরা গদরের সময় ভারতবর্ষ শাসন করতো তাদের সামনে শেলি কিংবা কীটস এলে যে সম্মান বা অসম্মান পেতেন কবি বাহাদুর শাহ সেই সব গবেটদের কাছে সেই মূল্যই পেয়েছেন। এবং সে সব সম্বন্ধীরা এই মামুলী খবরটুকুও জানতো না যে, তাদের দুই নম্বরের মাথার মণি ওয়ারেন হেস্টিংসও কবিতা লিখতেন এবং ইংরেজ লেখক জোর গলায় বলেছেন সে কবিতা বাহাদুর শাহের কাব্যের তুলনায় অতিশয় নিকৃষ্ট এবং ওঁচা।

গুল বাহাদুরের মনে পড়ল, গদর শুরু হওয়ার মাত্র কয়েক মাস আগে নওরোজের রাতে যে মুশায়েরা বসেছিল তাতে সভাপতির আসন নিয়েছিলেন বাদশা সালামৎ বাহাদুর শাহ। সেই শেষ মুশায়েরা!

থাক্, থাক্ কি হবে ভেবে?

ভাববোই বা কেন? আমার অতীতকে আমি আঁকড়ে ধরে থাকবো না, আর ভবিষ্যৎকেও আমি আলিঙ্গন করতে ভয় পাবো না।

রাজত্ব বধূরে যেই করে আলিঙ্গন,
তীক্ষ্ণধার অসি'পরে সে দেয় চুম্বন।

কি ভয় তাতে? আমার রথ চলবে এগিয়ে, পথের পতাকা পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে কাঁপবে অতীতের স্মরণে। তাই বলে কি আমার এগিয়ে চলা বন্ধ হবে?

বরঞ্চ বলবো নবজন্ম লাভ, অবশ্য আমি জাতিস্মর।

এই তো সেই আকাশ। এ-আকাশ আর দিল্লীর আকাশে তো কণামাত্র তফাৎ নেই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এ-আকাশ তো আমার। হেসে মনে পড়লো ফিরদৌসীর একটি দোঁহা। সম্পত্তির ভাগাভাগির সময় একজন অন্য বখরাদারকে বললে,

আজ্ ফর্শ-ই-খানা তা ব্ লব্-ই বাম্ আজ আন্-ই-মন্
আজ্ বাম্-ই খানা তা ব্ সুর্ইয়া আজ্ আন্-ই-তো
মেঝের থেকে ছাতটুকু তাই নিলেম কুল্লে আমি
ছাতের থেকে আকাশ তোমার সেইটে তো ভাই দামী।

প্রথম যখন দোহাঁটি পড়েছিলেন তখন তাঁর মনে হয়েছিল এ কি কাষ্ঠ-রসিকতা। আজ হৃদয়ঙ্গম হল, এ শ্লেষ নয়, বিদ্রূপ নয়—ছাত থেকে আকাশই মূল্যবান—সেখানেই মুক্তি, সেখানেই নির্বাণ।

ঐ তো আকাশের তারা। তাঁর পেয়ারা ঘোড়ার জিনের সামনের উঁচু দিকটা ঠিক এই রকমই পেতলের স্টাড দিয়ে তারার মত সাজান ছিল। এ তো কিছু অজানা সম্পদ নয়। দার্শনিক গজ্জালীও তাঁর 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি' (কিমিয়া সাদৎ) গ্রন্থে বলেছেন, 'আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে দেখো, আর আপন অন্তরের দিকে তাকাও—বুঝতে পারবে সৃষ্টির মাহাত্ম্য।'

দুই-ই অলঙ্ঘ্য নিয়ম অনুসারে চলে। শুধু হৃদয়ের আইন বোঝা কঠিন। স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়ে ভাবি, স্বেচ্ছায় করছি—তারারাও হয়তো তাই ভাবে।

তরল অন্ধকার। এ অন্ধকার বুকের উপর দুঃস্বপ্নের মত চেপে বসে না। এর চেয়ে অনেক বেশী মসীকৃষ্ণ দেখাচ্ছে পলাশের ডালগুলো। তারা আঁকাবাঁকা শাখা দিয়ে অন্ধকারের গায়ে এঁকেছে বিচিত্র আলিম্পন। গাছের শক্ত ডাল, অশরীরী অন্ধকার, দূরদূরান্তের তারার দেয়ালি—সবাই একসঙ্গে মিলে গিয়ে পেলব মধুর স্পর্শ দিয়ে শান্তি এনে দিচ্ছে গুল বাহাদুরের দগ্ধ ভালে। এইটুকু তাঁর চোখের মণিতে ধরা দিয়েছে সে সন্ধ্যার অনন্ত আকাশ থেকে পলাশের ডগাটুকু পর্যন্ত। যমুনার পারে প্রাসাদের উপরে এরা তাঁকে যেমন করে সোহাগ জানাতো ঠিক তেমনি তারা এসে ধরা দিল ছেঁড়া চ্যাটাইয়ের উপর শায়িত ফকীর গুল বাহাদুরের কাছে।

কৃতজ্ঞ গুল বাহাদুর তাঁর দীর্ঘ দুই হাত তাদের দীর্ঘতম প্রসারণে উচ্চ বিস্তার করে আসমানের দিকে তুলে মোনাজাৎ করলেন,

তোমার আমার মাঝখানে, বিভু, নাই কোনও বাধা আর
তোমার আশিষ বাহিয়া আনিল তরল অন্ধকার।

॥ তিন ॥

আরব্য রজনীর গল্পে আছে, কোথায় যেন দমস্কস্ না বাগদাদ শহরে, এক ঝুড়ি আণ্ডা সামনে নিয়ে বসে অন্-নশ্ শার স্বপ্ন দেখছিল। স্বপ্ন না, দিবা-স্বপ্ন। ঐ ডিমগুলোই তার সাকুল্য সম্পত্তি। এক ডিম বিক্রি করে মুনাফা দিয়ে সে কিনবে আরও ডিম। তারই লাভে পুষবে মুরগী। তারই লাভে সে যাবে হিন্দুস্থান, সদাগরী করতে। তারই লাভে সে হয়ে যাবে শেষটায় শহরের সবচেয়ে মাতব্বর আমীর। তখন প্রধানমন্ত্রী—ওজীর-ই-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আলু—যেচেসেধে তাঁর মেয়েকে দেবেন তার সঙ্গে বিয়ে! তারপর আরও অনেক কিছু হবে। হয়ে হয়ে একদিন এই এমনি খামোখা তার রাগ হয়েছে বেগম সায়েবার উপরে। তিনি অনেক সাধাসাধি করছেন তার মান ভাঙাবার জন্য। অন্-নশ্ শার মানিনী শ্রীরাধার মত অচল অটল। বরঞ্চ হঠাৎ আরও বেশী ক্ষেপে গিয়ে মারলেন বেগম সায়েবাকে এক লাথ। হায়রে, হায়! এতক্ষণ ছিল শুদ্ধমাত্র খেয়ালের পোলাও খাওয়া,—দিবা-স্বপ্ন—এখন অন্-নশ্ শার মেরে দিয়েছে সত্যিকার লাথি। সেটা পড়ল সামনে-রাখা ডিমের ঝুড়ির উপর। কুল্লে আণ্ডা ভেঙে ঠাণ্ডা।

এ-গল্প কখনও ফ্রক্ পরে ইংলন্ডে কখনও দাড়ি রেখে আফগানিস্থানে সর্বত্রই প্রচলিত আছে। এবং সর্বযুগের সর্বদেশের প্র্যাকটিকেল পাণ্ডারা বেচারী অন্-নশ্ শারকে নিয়ে কতই না ব্যঙ্গোক্তি করেছেন। সেও লজ্জায় রা-টি কাড়ে না।

কিন্তু এ কথাটা কেউ ভেবে দেখে না যে এ-সংসারে অহরহই প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়ে যাঁরা বৃহত্তম ভুবনে চলে যেতে জানে তাঁদের সবাই অন্-নশ্ শার—ঐ শেষ লাথিটুকু বাদ দিয়ে। যারা আপন নাকের ডগার বাইরে তাকাতে জানে না তারাই দৈনন্দিন দৈন্যে শেষদিন পর্যন্ত নাকানি-চুবোনি খায়। দিবা-স্বপ্ন আলবাৎ দেখতে হয়—কিন্তু শেষ লাথিটুকু বাদ দিয়ে। গুল বাহাদুর ঠেকে শিখেছেন। গদরের আণ্ডা বিক্রী হওয়ার পূর্বেই তাঁরা স্বাধীনতার উজীরকুমারীকে লাথি মেরে বসিয়েছিলেন। তিনি সাবধান হয়ে গিয়েছেন। এখন আর কুঁড়েঘরে বসে বালাখানা-রাজপ্রাসাদের স্বপ্ন নয়, গদরের খেয়ালী পোলাও নয়। এখন দেখতে হবে নাকের ডগা ছাড়িয়ে ত্রিশ গজ দূরের স্বপ্ন মাত্র—সাংসারিক সচ্ছলতার স্বপ্ন।

তার প্রথম আণ্ডা এল অযাচিত, অপ্রত্যাশিত ভাবে।

ডোমেরা এসে সভয়ে তাঁকে নিবেদন জানালে, শিবু মোড়ল যায় যায়। মরার আগে বাবাজীর চরণ-ধূলি চায়।

গুল বাহাদুর পড়লেন বিপদে। ওপারে যাওয়ার সময় মুসলমান সে সব তওবা-তিল্লা করে থাকে—অনেক হিন্দুদের প্রায়শ্চিত্ত কিংবা জৈনদের পর্যুসনের মত—সেগুলো তিনি কোনওমতে সামলে নিতে পারেন, কিন্তু হিন্দুধর্মের তিনি জানেনই বা কতটুকু? তাঁর আমলে দিল্লীর হিন্দুরা তো শিক্ষা-দীক্ষায়, সংস্কৃতি-সভ্যতায় পুরো-পাক্কা মুসলমান বনে গিয়েছে। তারা পরে চোস্‌ৎ চুড়িদার পাজামা, লম্বা শেরওয়ানী, মাথায় দুকল্লী কিস্তি টুপী আর মশাইরায় হাঁটু গেড়ে বসে বয়েৎ আওড়ায়—'মক্কা-মদীনার মালিক, ইয়া আল্লা, আমাকে ডেকে নাও নবীর নূর হজরত মুহম্মদের পদপ্রান্তে।'

বরন্দাবন্ (বৃন্দাবন)-কে কন্‌জ্ গলিয়াঁমে (কুঞ্জ গলিতে) কিসনজী (শ্রীকৃষ্ণ) কভি কভি বান্‌সরী (বাঁশরী) বজাওৎ (বাজান), এই তো হিন্দুধর্ম বাবদে তাঁর এলেম! ঐটুকু জ্ঞানের ন্যাজ তিনি শিবু মোড়লের হাতে তুলে দিয়ে তাকে নির্ভয়ে বৈতরণীতে নামতে ভরসা দেবেন কি প্রকারে?

ধরা পড়ার ভয় আছে, অথচ না গিয়েও উপায় নেই। গুল বাহাদুর মনে মনে বললেন, 'চুলোয় যাক্ গে। এ রকম ভয়ে ভয়ে কাটাবো আর কতদিন!' মৃত্যু যে অহরহ মানুষের চুলের ঝুঁটি পাকড়ে ধরে আছে সেটা স্মরণ করে কটা লোক? কিংবা বলা যায়, গুল বাহাদুর ভাবলেন, গায়ে গু মেখে বসে থাকলেই কি আর যম ছেড়ে দেবে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শিবু মোড়লের ইঙ্গিতে সবাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল—মায় তার ছ'বচ্ছরের ছেলেটাও। অবাক ইশারায় গুল বাহাদুরকে তক্তপোষের একদম কাছে ডেকে নিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বললে, 'আমার ছেলেটাকে তুমি মানুষ করো। সব তোমাকেই দিলুম।'

গুল বাহাদুর ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছেন। ছেলেটার ভার কাঁধে তুলতে তাঁর কণামাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু তিনি যে আসলে মুসলমান।

মোড়ল বললে, 'আমার অনেক শত্রু; ছেলেটাকে মেরে ফেলবে।'

দুশ্চিন্তার ভিতরও গুল বাহাদুরের মনে পড়লো, হজরৎ মহম্মদের পূর্বেও আরবরা ছিল বর্বর। তারাও নির্ভয়ে অনাথকে মেরে ফেলে তার টাকাকড়ি উট তাম্বু কেড়ে নিত। তাই হজরতের নবধর্ম স্থাপনার অন্যতম প্রধান ভিত্তি ছিল অনাথের রক্ষা। মনে পড়ল, স্বয়ং আল্লা হজরতকে 'মধ্যদিনের আলোর দোহাই, নিশির দোহাই, ওরে' বলে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে তিনিও অনাথরূপেই জন্ম নিয়েছিলেন,—

'অসহায় যবে আসিলি জগতে তিনি দিয়েছেন ঠাঁই,
তৃষ্ণা ও ক্ষুধা আছিল যা সব মুছায়ে দেছেন তাই।
পথ ভুলেছিলি, তিনিই সুপথ দেখিয়ে দেছেন তোরে
সে-কৃপার কথা স্মরণ রাখিস্। অসহায় শিশু, ওরে,
দলিস্‌নে কভু। ভিখারী-আতুর বিমুখ যেন না হয়
তাঁর করুণার বারতা যেন রে ঘোষিস্ জগৎময়।'

এ তো আল্লার হুকুম, রসুলের আদেশ। মানা-না-মানার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তোমার ঘাড় মানবে।

কিন্তু তিনি যে মুসলমান। ডোম হোক আর মেথরই হোক, মোড়লের ছাবালের মুখে তিনি জল তুলে দেবেন কি প্রকারে? গুল বাহাদুর চুপ।

শিবু তার লাল ঘোলাটে চোখ মেলে তাঁর দিকে তাকালে কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'গোসাঁই, তুমি গোসাঁই নও, সে-কথা আমি জানি। তুমি কি, তাও আমি জানি। কিন্তু আর কেউ জানে না। জানার দরকারও নেই।'

'কি করে জানলে?' এ প্রশ্ন গুল বাহাদুর শুধালেন না। তিনি পল্টনের লোক; বললেন, 'আমি মুসলমান, জানো?'

শিবুর শুকনো মুখ খুশীতে তামাটে হয়ে উঠলো। গুল বাহাদুরের হাতখানা আপন হাড্ডিসার দু'হাতে তুলে নিয়ে বললে, 'বাঁচালে, গোসাঁই, তরালে আমাকে।' তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'মুসলমানেরই এক দর্গায় মানত করে মা পেয়েছিল আমাকে। আমি পেয়েছি আনন্দীকে। পীর সৈয়দ মুরতুজার ভৈরবীর নাম ছিল আনন্দী।'

মুসলমান পীরের দরগায় যে হিন্দু বন্ধ্যা সন্তানের আশায় যায়, এ দৃশ্য গুল বাহাদুর বহুবার দেখেছেন দিল্লীতে নিজাম উদ্‌দীন আউলিয়ার দরগায়। কিন্তু পীরের আবার ভৈরবী হয় কি করে, আর ভৈরবীই বা কি চীজ, আনন্দী শব্দটাও হিন্দু হিন্দু শোনায়, এ সব গুল বাহাদুর কিছুই বুঝতে পারলেন না। কে জানে মুসলমানি ধর্ম বাঙলা দেশে এসে কি রূপ নিয়েছে।

'বাচ্চাকা ভালা বোলনা-চোলনা, বহুড়ীকা ভালা চুপ'—বাচ্চার ভালো বক্‌বকানো, কনের ভালো চুপ—ভালো সেপাইও বহুড়ীর মত চুপ করে শুনে যায়, গুল বাহাদুর চুপ

www.BanglaBook.org

করে শুনে যেতে লাগলেন।

মোড়লের দম ক্রমেই ফুরিয়ে আসছিল। তাই আশকথা-পাশকথা সম্পূর্ণ বর্জন করে শুধু তার ইচ্ছাগুলো বলে যাচ্ছিল, বিষয়-আশয় বোঝবার বয়স হলেই তাকে মামার বাড়ি বিষ্টুপুরে পাঠিয়ে দিয়ো। সেখানে তার জমিজমা এখানকার চেয়ে ঢের বেশী।'

গুল বাহাদুর পুরনো কথায় ফিরে গিয়ে শুধালেন, 'তোমার ছেলে আমার সঙ্গে থাকলে মুসলমান হয়ে যাবে না?'

মোড়ল বললে, 'না। আমরা জাতে ডোম। মুসলমানের হাতে খেলেও আমাদের জাত যায় না, আমরা মুসলমানও হই নে। থাক্ অতশত কথা। তুমি নিজেই জেনে যাবে। শোনো, আর যা করতে হয় করো, ছেলেটাকে কিন্তু লেখাপড়া শিখিয়ো না, ওকে ভদ্রলোক বানিয়ো না।'

'সে কি!'

'না, ভদ্রলোক বানিয়ো না। আর শোনো, জলের কলসীর তলায় মাটির নীচে কিছু টাকা আছে। তোমাকে দিলুম।'

গুল বাহাদুরের আবার মনে পড়ল, হজরত তাঁর যৌবন আরম্ভ করেছিলেন, এক বিধবার ব্যবসায়ে কর্মচারীরূপে। বললেন, 'টাকা ব্যবসাতে খাটাবো। তোমার ছেলে পাবে মুনাফার আট আনা।'

মোড়ল বললে, 'যা খুশী করো, কিন্তু লগ্নীর ব্যবসা করো না।'

গুল বাহাদুরের মুখ লাল হয়ে উঠল। ভদ্র মুসলমান সুদের ব্যবসা করে না।

মোড়ল বললে, 'আর শোনো, খুশ বিরামপুরের ঘোষালদের মেজোবাবুর সঙ্গে আলাপ করো। তোমারই মত। কিন্তু সাবধানে। আর শোনো, তোমারই মত আরেকজন আশ্রয় নিয়েছে বর্ধমানের কাছে, দামোদরের ওপারে—'

এবারে গুল বাহাদুর আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। তবু উত্তেজনা চেপে রেখেই তাড়াতাড়ি শুধালেন, 'কোন্ গ্রামে?'

মোড়ল তখন হঠাৎ চলে গিয়েছে ওপারে, যেখানে খুব সম্ভব গ্রামও নেই শহরও নেই।

গুল বাহাদুর দু'হাত দিয়ে ধীরে ধীরে মোড়লের চোখ দুটি বন্ধ করে দিলেন। মনে মনে আবৃত্তি করলেন,

'ইন্না লিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহি রাজিউন।'

আল্লার কাছ থেকে এসেছি, আর তাঁর কাছে ফিরে যাব।'

কাফেরের মৃত্যু-সংবাদ শুনলে কট্টর-মোল্লারা উল্লাসভরে এ-মন্ত্র উচ্চারণ না করে বলে ওঠে ভিন্ন মন্ত্র—

ফী নারি জাহান্নামা।

একমাত্র ইংরেজের মৃত্যু-সংবাদ শুনলে গুল বাহাদুর মন্ত্রটি একশ'বার আবৃত্তি করতেন। আল্লার একশ' নাম—মানুষ তার নিরনব্বুই জানে—সেই নিরনব্বুই নামের উদ্দেশ্যে নিরানব্বুই বার আর শয়তানের উদ্দেশ্যে একবার!

দাহ-কর্ম শ্রাদ্ধ, তাও আবার ডোমের, এসব কোন-কিছুই গুল বাহাদুর জানতেন না, জানবার চেষ্টাও করলেন না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব-কিছু দেখলেন। তবে তাঁর গম্ভীর আঁট-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাট মূর্তি আনন্দীর হাত ধরে না দাঁড়িয়ে থাকলে হয়তো ঝগড়াঝাঁটি হতে পারতো। মোড়লের মরে যাওয়ার পর বাড়ির সামনে যে ভিড় জমেছিল তার দিকে একবার তাকিয়েই তিনি বুঝতেই পারলেন, শাহ-ইন-শাহ্ বাহাদুর শা'র দরবারে যদি দৈবপাকে চিকনকালা গ্রামের মাতব্বরদের কুর্নিশ জানাবার অনুমতি লাভ হত তবে তাতে দুই নম্বর হত কে? পয়লা নম্বর তো চলে গিয়েছেন, দুই নম্বর হতেন ঝিঙে সর্দার। ভিড়ের মধ্যে ঝিঙের দিকে আঙুল দিয়ে ইশারা করে ভারী গলায় হুকুম দিলেন, 'ইধর আও।'

ঝিঙে ভয়ে ভয়ে, লোকলজ্জায় কিছুটা বুক ফুলিয়ে, এগিয়ে এল—ভিড় রাস্তা করে দিলে। ঝিঙের সঙ্গে শিবুর সদ্ভাব ছিল না।

গুল বাহাদুর বললেন, 'সব-কিছু চালাও।'

ঝিঙে গলে গেল। তার মনে কোনও সন্দ ছিল না, শিবু গত হলেই সে হবে গাঁয়ের মোড়ল। মধ্যিখানে বাদ সাধলে এই লক্ষ্মীছাড়া বাবাজী। শিবু নিশ্চয়ই মরার সময় এ-ব্যাটাকে বিষিয়ে গেছে। তা হলে এটা হল কি করে? থাক্ এখন, পরে জানা যাবে।

ঝিঙে ডবল উৎসাহে সব-কিছু সামলালে। বেশীর ভাগ ব্যবস্থা শিবু মরার আগেই করে গিয়েছিল।

শ্মশান থেকে ফিরে এসে ঝিঙে সর্দার শিবু মোড়লের দাওয়ায় গুল বাহাদুরের কাছে এসে বসলো। গাঁয়ের দু'চারজন তাদের কথাবার্তা শোনবার জন্য এগিয়ে এলে ঝিঙে দিলে তাদের জোর ধমক। তারা গুল বাহাদুরের দিকে আপিল-নয়নে তাকালে কিন্তু তাঁর কোনও ভাব-পরিবর্তন না দেখে আস্তে আস্তে সরে পড়লো।

তখন তিনি অতি শান্তকণ্ঠে, ধীরে ধীরে বললেন, 'মোড়ল, ধমক না দিয়েই যেখানে কাজ চলে সেখানে ধমকের কি দরকার! কিন্তু সে তুমি বোঝো। আমি বলবার কে? আমি তো এদের চিনি নে। এদের কি করে সামলাতে হয় তার খবর রাখো তুমি।'

'মোড়ল' সম্বোধন ঝিঙে একেবারে পানি হয়ে গেল—জল তো হয়ে গিয়েছিল আগেই। হাত জোড় করে বললে, 'দেবতা, অপরাধ হয়েছে। কিন্তু ওদের থাকতে বললে না কেন?'

গুল বাহাদুর প্রথমেই লক্ষ্য করলেন ঝিঙে তোতলা। তোতলাকে মোড়ল বানানো কি ঠিক? তখন মনে পড়লো; একাধিক পেগম্বরও ছিলেন তোতলা।

ঝিঙের কথার উত্তরে বললেন, 'তুমি মুরুব্বী, একটা হুকুম দিয়েছ। আমি উল্টো কথা বললে তোমার মুখ থাকতো কি?'

ঝিঙে কিন্তু শিবুর মতো বিচক্ষণ লোক না। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে শুধালে, 'শিবু তোমাকে বলে যায়নি আমাকে মোড়ল না করতে?'

গুল বাহাদুর বললেন, 'না।'

শিবুর মত বিচক্ষণ নয় ঝিঙে, কিন্তু সে শিবুর চেয়ে অনেক বেশী ঘড়েল। ভাবখানা করলে, 'ওঃ! শিবু যদি বলতো তবে তুমি আমায় ডাকতে না।'

গুল বাহাদুর বললেন, 'শোনো, সদ্দার, সব-কথা বলে যাবার ফুর্সৎ পায়নি। পেলেও যে তোমার কথা বলতো, তাও তো জানি নে। আর ওর বলাতে না-বলাতে কিছু আসে যায় না। সে গেছে, এখন গাঁ চালাবো আমরা। ওর ইচ্ছে বড়, না গাঁ-চালানো বড়? ও যদি বলে যেত, আনন্দী গাঁ চালাবে, তাহলে তোমরা কি সেটা মানতে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গুল বাহাদুরের মনে পড়লো হজরত মুহম্মদও ইহলোক ত্যাগ করার সময় মুসলমাননের জন্য কোন খলীফা নিয়োগ করে যাননি। গুল বাহাদুর আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন, তবে কি অনুন্নত সম্প্রদায়ে এই ব্যবস্থাই বেশী কার্যকরী? তবে কি বংশগত রাজ্যাধিকার পরবর্তী যুগের সৃষ্টি? তারপর মনে পড়লো, ঐতিহাসিক ইবনে খলদূন তাঁর পৃথিবীর ইতিহাসে এই নিয়ে কি যেন এক দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। ভাবলেন, দেখতে হবে। তারপর মনে পড়লো, এখানে তো বই-পত্র কিছুই নেই। যাক্ গে এ-সব কথা।

ঝিঙেকে বললেন, 'কানাবুড়ী বাতাসীকে বলো সে এ-ভিটেয় থাকবে।'

ঝিঙে অবাক। বাতাসীর মত অথর্ব-অচল ঝগড়াটে সাড়ে ষোল আনা অন্ধ এ তল্লাটে দুটি নেই। তার গলাবাজির চোটে দুঁদে মোড়ল শিবুও তার তল্লাটে মাড়াতো না।

ঝিঙে গুল বাহাদুরের মতলব আদপেই বুঝতে পারেনি। তিনি জানতেন, শিবুর যে কিছু লুকানো টাকা আছে সেটা সকলের অজানা নাও হতে পারে। রাত্রে ভিটে খোঁড়ার জন্য চোর আসতে পারে। বাড়ির ত্রিসীমানায় আসতে না আসতে বুড়ী চিৎকার করে করে পাঁচখানা গাঁয়ের লোক জড়ো করে ফেলবে। অন্ধের শ্রবণ-শক্তি চক্ষুষ্মানের চেয়ে বেশী। দিল্লীর জামি মসজিদের দেউড়িতে এক অন্ধ শুধু গলা শুনে হাজার লোকের জুতো সামলায়। মাদ্রাসায় ছোঁড়াদের কেউ মজা দেখবার জন্য অন্যের গলা নকল করলে অন্ধ দু'জোড়া জুতো বাড়িয়ে দিয়ে বলতো, 'এই নাও তোমার জোড়া, আর এই নাও যার নকল করেছিলে।' লোকে বলতো, আগ্রাতে শুকনো পাতা ঝরে পড়লে এ অন্ধ দিল্লীর চাঁদনি চৌকে বসে শুনতে পায়। বাতাসী অতখানি কেরদানী হয়তো দেখাতে পারবে না, কিন্তু দুটি বেগুন বাঁচাবার জন্য যে বেটি সমস্ত রাত দাওয়ায় বসে কাটায় তার চেয়ে ভালো পাহারাওলা পাওয়া যাবে কোথায়? এখন কয়েক রাত তো পাড়া-প্রতিবেশীরা কান খাড়া রেখে ঘুমুবে—শিবুর ভিটেতে খোঁড়াখুঁড়ির শব্দ হচ্ছে কি না শোনবার জন্যে। কয়েকটা রাত যাক, তারপর তিনি সুবিধে-মত তার ব্যবস্থা করবেন।

কিছুক্ষণের ভিতরেই শোনা গেল পাড়ার শেষপ্রান্ত থেকে বাতাসীর চিৎকার। চিকনকালা গ্রামটাকে সে বেতারকেন্দ্র বানিয়ে বিশ্বভুবনকে জানাচ্ছে, শিবু গেছে বেশ হয়েছে, আগে গেলেও কেউ মানা করতো না, বাতাসী তো নয়ই, কিন্তু এ কি গেরো, সে কেন সামলাতে যাবে শিবুর গোয়াল খামার, ঐ দিকধিড়িঙে মিনসে বাবাজীটা আছে কি করতে, তাকেই তো শিবু ঘটিবাটি চুলোহাড়ি সব-কিছু দিয়ে দিয়েছে, মরে যাই, আর লোক পেল না, কোথাকর হাড়হাভাতে শতেক খোয়ারী—আরও কত কি।

গলার শব্দ কিন্তু এগিয়ে আসছে শিবুর বাড়ির দিকেই।

মোগল শাসনেও চার্জ দেওয়া-নেওয়া নামক মস্করাটা চলতো। গুল বাহাদুর সে-মস্করাটা বাতাসীর সঙ্গে করার প্রয়োজন বোধ করলেন না। তাঁর ঘাড়েও তো মাথা মাত্র একটা। সেটা তো চায় ইংরেজ। বুড়ীকে দিয়ে চলবে কেন?

আনন্দীকে হাতে ধরে নিয়ে বললেন, 'চলো।'

যেতে যেতে আনন্দী বললে, 'দাদু, বাবা আমাকে বলেছিল, বাতাসী পিসিকে বাড়ি নিয়ে আসতে। সে তো বলছে, আসবে না।'

গুল বাহাদুর ভারি খুশি হলেন। প্রথমত শিবু যে আহাম্মুখ ছিল না, তার শেষ প্রমাণও পাওয়া গেল বলে এবং তার চেয়েও বড় কথা, ছ'বছরের আনন্দীর বুঝ-সমঝ আছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখে। বাপকা ব্যাটা না হলেও তার ঘোড়া তো নিশ্চয়ই। জোর গলায় হেসে বললেন, 'কুছ পরোয়া নহী, দাদু, ও বেটি সবকুছ সমহালেগী', তারপর বললেন, 'সম্‌হ লেগা।' মনে মনে বললেন, 'দুচ্ছাই ভাষা, স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গে ফারাক নেই।' তারপর বললেন, 'সেই তো ভালো। এরা তো আর দিল্লী দরবারে মুশায়েরা করতে যাবে না যে ভাষাতে পঁয়ষট্টি রকমের বয়নাক্কার প্রয়োজন। ঐ করেই তো আমাদের সব গেল।' তারপর মনে পড়লো, কই, তাই বা কেন? মাহমুদ বাদশা তো তাঁর সভাপণ্ডিত ফিরদৌসীর সঙ্গে বয়েৎ-বাজী করতেন। তাঁর রাজত্ব তো যায়নি। বাহাদুর শা গালিবের সঙ্গে করলেই বা কি দোষ! ফার্সীর কথাতে তখন মনে পড়লো, সে ভাষাতেও তো পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গের তফাৎ নেই। বিরক্ত হয়ে তখন বললেন, 'কী আশ্চর্য! চলছি ডোম বস্তির মধ্যিখান দিয়ে, আর স্বপ্ন দেখছি গজনীর। অন্‌-নশ্‌ শারও এর চেয়ে ভালো। আমাকে এখন দেখতে হবে, ছেলেটার পেটে ক্রিমি।'

গুল বাহাদুর পড়েছেন এ বাবদে বিপদে। ক্রিমির নুস্‌খা (প্রেসক্রিপ্‌সন) তিনি দু'মিনিটেই লিখে দিতে পারেন। কিন্তু সেটা লিখতে পারেন উর্দু কিংবা ফার্সীতে। এবং তার জন্য যেতে হবে ইউনানী দাওয়াখানায়, হেকিমের কাছে। এ তল্লাটে তো এসব জিনিস থাকার কথা নয়। আর বোষ্টম বাবাজী লিখবেন, ফার্সী নুস্‌খা! যদিও গুল বাহাদুর জানতেন, বৃন্দাবন অঞ্চলের বাবাজীরা ফার্সীতে ইউনানী নুস্‌খা বিলক্ষণ লিখতে জানেন।

গুল বাহাদুরের ভুল নয়। চৈতন্যদেব ইসলামী শাস্ত্রের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি একাধিকবার ইসলামী শাস্ত্র দিয়েই মোল্লাদের কাছে প্রমাণ করেন যে তাঁর প্রচলিত ধর্ম ইসলামের মৌলিক সিদ্ধান্তের সম্মতি পায়।

আনন্দী বললে, 'দাদু, ঐ দেখো হলদে পলাশ।'

ততক্ষণে তাঁরা গ্রামের বাইরে চলে এসেছেন। আর একটু দূরেই গুল বাহাদুরের 'রাজপ্রাসাদ'।

দূরদূরান্তে চলে গেছে লাল খোয়াই। বাঁ দিকের উঁচু ডাঙা ভেঙে ভেঙে চলেছে খোয়াইয়ের অগ্রগতি। গুল বাহাদুরের আপন দেশ দোয়াবে প্রকৃতির হাত থেকে মানুষ অহরহ অনুর্বর জমি সওগাত পাচ্ছে চাষের জন্য, আর এখানে খোয়াইয়ের খাঁই আধা-বাঁজা আধা-ফসলের জমির উপর। খোয়াইটা চলে গিয়েছে কতদূরে প্রকাণ্ড একটা লাল সাপের মত এঁকেবেঁকে। মাঝে মাঝে ডাঙার ফালিটুকরো এসে যেন সাপের খানিকটা গতিরোধ করছে। ফের যেন অজগরের গ্রাসটা আরো দূরে এগিয়ে গিয়েছে।

সূর্যাস্তের শেষ রশ্মিটুকুও যেন এ খোয়াই শুষে নিতে জানে। খোয়াইয়ের শুরু থেকে সূর্যাস্তের মোকাম পর্যন্ত গাছপালার কোনও বালাই নেই। পাতার আড়াল থেকে বিকেলের আলোটুকু এখানে এসে কোনও কালো কেশে পড়ে না। সাঁওতালিনীরাও সন্ধ্যের পরে ভয়ে ঘর থেকে বেরোয় না।

কিন্তু মাধুর্য আছে—সে মাধুর্য রুদ্রের।

কিয়ামতের (মহাপ্রলয়ের) যে বর্ণনা কুরান শরীফে আছে সেটিও রুদ্রমধুর, আশ্চর্য! আল্লাতালা মানুষের মনে ভয় জাগাবার জন্য কিয়ামতের বর্ণনা দিয়েছেন কুরানে, কিন্তু তার প্রকাশ দিয়েছেন কাব্যরসের মারফতে। কেন? সোজা কথা। ঐতিহাসিক যখন লড়াইয়ের খবর লিপিবদ্ধ করে কত হাজার লোক মরলো তার বর্ণনা দেয়, তাতে তো

www.BanglaBook.org

মানুষ ভয় পায় না। কারণ তাতে কাব্যরস নেই। ভয় অনুভূতিবিশেষ। সেটা জাগাতে হলে কাব্যরসের প্রয়োজন। ইতিহাসের শুকনো ফিরিস্তি থেকে মন করে জ্ঞান সঞ্চয়, তাতে ভয় সঞ্চার হয় না।

এই রুদ্র-রসই এখন ওঁর বাহাদুরের জন্য প্রশস্ত।

ভাগ্যিস তাঁকে পুব-বাংলার ঘনশ্যাম, কচিসবুজ, শিউলিভরা, শিশিরভেজা, পানাঢাকা বেতেসাজা পুব-বাংলায় আশ্রয় নিতে হয়নি!

গাঁয়ের শেষ গাছ পেরিয়ে এসে তাঁর খেয়াল গেল আনন্দী যেন কি একটা বলেছে। শুধালেন, 'কি বললে, দাদু?'

পিছনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে, 'ঐ যে, হলদে পলাশ!'

পলাশ হলদে হতে পারে, বেগুনী হতে পারে, সবুজও হতে পারে, এই হল গুল বাহাদুরের ধারণা। কিন্তু তাঁর মনে তবু ধোঁকা লাগলো। গাঁয়ের ভিতর দিয়ে আসবার সময় দু'চারটে ফুলগাছ তাঁরা পেরিয়ে এসেছেন, কিন্তু আনন্দী কিছু বলে নি। এখনই বা বলছে কেন? এ-গাছটার তেমন তো কিছু জৌলুসও নয়। মাত্র গোটা পাঁচ গুচ্ছে ফুল ফুটেছে। গাছটাও বেঁটে। যেন থাবড়া মেরে চেপটে দেওয়া। এর তুলনায় গাঁয়ের ভিতরকার শিমুলে তো ডালে ডালে ফুল ছিল অনেক বেশী। বললেন, 'পলাশ—উয়ো তো ফুল। হলদে—পিলা। তো ক্যা হল?'

আনন্দী কেমন যেন একটু ভয়ে ভয়ে বললো, 'সব পলাশ লাল, এটা হলদে।' বলে সে আঙুল দিয়ে গাঁয়ের ভিতরকার উঁচু উঁচু গাছের লাল পলাশ দেখিয়ে দিলে।

এতক্ষণে বীরভূমের বৃক্ষ-বৃত্তান্ত বাবদে আকাট আগা গুল বাহাদুরের খেয়াল হল, 'তাই তো, আর সব পলাশ লাল, এটা হলদে।'

উদ্ভিদতত্ত্বে এই তাঁর প্রথম পাঠ। আনন্দীর কাছে। বললেন, 'চলো দুটি ফুল পেড়েই নিই।'

ছ'বছরের ছেলে আনন্দীর উল্লাসের অন্ত নেই। বাপ যদিও বলেছিল, 'বাবাজীকে ডরাসনি' তবু তার মন থেকে ওঁর সম্বন্ধে ভয় কাটেনি। একে তো গম্ভীর লোক, তার উপর ঐ যে দুশমনের মত বদ্‌মেজাজী ঝিঙেও যার পায়ের কাছে ভয়ে কাঁচুমাচু—তার সঙ্গে সাহস করে কথা কওয়া যায় কি প্রকারে। তবে তার শিশুবুদ্ধি শিশুযুক্তিতে একটা ভরসা ইতিমধ্যেই পেয়ে গিয়েছিল। সেটা কি? বাবাজীও বাতাসী বুড়িকে ডরায়। দ্বিতীয় ভরসা পেল এখন। যখন বললে, 'চলো দুটো ফুল পাড়ি।' তার বাপ তাকে ভালোবাসত। তার সম্বন্ধে আনন্দীর কোনও ভয় ছিল না, কিন্তু তাকেও ফুল কুড়োতে বললে ঘাড় বাঁকিয়ে বলতো, 'যা যা, খেলা করগে যা।'

ফুল পাড়তে পাড়তে গুল বাহাদুরের মনে পড়ল, 'গুল' অর্থাৎ 'ফুল' আর প্রাচীন ফার্সীতে 'অগ্' অর্থ 'জল'। 'গোলাপী' আর 'জোলাব' একই শব্দ। আরবী ভাষায় 'গ' আর 'প' নেই বলে আরবীতে 'গোলাপ' লেখা হয় 'জোলাব'। বিরেচক অর্থে। ছেলেটাকে তাই খাওয়ালেই হবে। কিন্তু এই অজ জায়গায় গোলাপ পাওয়া যাবে কি?

আনন্দীকে শুধালে বহুদূরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বোঝালে ওখানে পাওয়া যায়। কিন্তু যে-ভাবে ইশারা করলে তাতে সে দূরের গ্রাম হতে পারে, বেহেশ্‌তের গুল-ই-স্তান, ফুলের বাগানও হতে পারে।

www.BanglaBook.org

॥ চার ॥

এতক্ষণে গুল বাহাদুর আসলে ভাবনা নিয়ে চিন্তা করার ফুর্সৎ পেলেন। ছেলেটা নিশ্চিন্ত চেহারায় ঘুমুচ্ছে দেখে তিনি ফিরে গেলেন সকালবেলাকার ঠেলে-রাখা সমস্যাগুলোতে।

শিবু মোড়ল বুঝতে পেরেছে তিনি বৈরাগী নন, তিনি যে মুসলমান সেটা জানতো না। কিন্তু আর কেউ বুঝতে পেরেছে কি? আর ঐ ঘোষালই বা কে? সেই বর্ধমানের ওপারের লোকটাই বা ওখানে এল কোথা থেকে? তাকেই বা খুঁজে পাওয়া যায় কি করে?

অনেক চিন্তা করেও তিনি কোনও হদিস পেলেন না। এমন কি ঘোষাল পদবী যে ডোমের হয় না, ওটা ব্রাহ্মণের পদবী এবং অতএব কাঁছে-পিঠে ব্রাহ্মণ পরিবার আছে, অর্থাৎ শিক্ষা-সভ্যতার পত্তনও আছে, এইটুকু পর্যন্ত গুল বাহাদুর বিচার করে ধরতে পারলেন না।

তবে শিবু যখন বলেছে সাবধান, তখন তার অর্থ তাড়াহুড়ো করলে বিপদের সম্ভাবনা। আর এখন তো বর্ধমান যাওয়ার কোনও কথাই ওঠে না। এ দেশের আচার-ব্যবহার এ ক'মাসে শিখেছেন কতটুকুই বা? ডোমেদের ভাল করে চিনে নিতে পারলে পরে ডোম সেজে চলাফেরা করা যাবে। তার আগে শিখতে হবে ওদের ভাষা। এযাবৎ তাতেও তো খুব বেশী উন্নতি হয়নি।

আর এই ডোমেদের নিয়ে তিনি করবেন নূতন গদর! দেশ কী, রাজা কারে কয়, ইংরেজ যে শয়তান ভিন্ন অন্য কোনও প্রাণী নয়—এ-সব খবর তো এরা কিছুই রাখে না। পেটের ধান্দায় এদের কাটে সুবো-শাম। খুব যে তারা শান্ত এ-কথা বলা চলে না, কিন্তু জীবন-মরণ পণ করে দিনের পর দিন লড়াই চালিয়ে যাবার মত ধাতু কি এদের শরীরে আছে?

কিন্তু থাকবেই না কেন? গজনীর মাহমুদ, ঘোরের মুহম্মদের আমলে গ্রামাঞ্চলের পাঠানরা কি এদের চেয়ে বেশী সঙ্গীন জঙ্গীলাট ছিল? কিংবা বাবুদের আমলে ফরগনা বদখশানের আশপাশের গামড়িয়ারা? কিংবা হাতের কাছের মারাঠারা? একবার কি একটা সামান্য গুজোব রটাতে এই দিল্লীবিজয়ী বীরের দল দিল্লী থেকে যেন পালাবার পথ পায়নি। ঐতিহাসিক খাফী খান ব্যঙ্গ করে লিখেছেন তখন দিল্লীর এক বুড়ী নাকি একাই তিনজন মারাঠাকে নিরস্ত্র করেছিল। ঐতিহাসিক খুশ-হাল চন্দ্‌ও বলেছেন, ডাঙ্গা নাকি তখন হাতিয়ার তলোয়ার ফেলে দিয়ে ছোট বাচ্চার মত 'মাগো, ওমা' বলে শহর ছেড়ে পালাচ্ছিল। কিন্তু এসব কাহিনীর বিশ্বাস করা যায় কতটুকু? দিল্লী একদিন এদের হাতে খেয়েছিল মার। সেই বেইজ্জতী ঢাকবার জন্য পরবর্তী যুগে হয়তো তিলকে তাল বানিয়েছে।

তা বানাক আর নাই বানাক, এরাই তো একদিন সাহস করে আবদালীর মুকাবেলা করেছিল। অবশ্য লড়াইয়ের আগে রাত্রে মারাঠা সেনাপতি ভাবসাহেব আপন রোজ-নামচায় লিখেছিলেন, 'আমাদের পেয়ালা পূর্ণ হয়েছে। কাল অবশ্য মৃত্যুর মুখোমুখি হতে যাচ্ছি। আমরা মারাঠারা তো কখনও সম্মুখযুদ্ধ লড়িনি; আমাদের রণকৌশল, শত্রুকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অতর্কিতে আক্রমণ করে তার যথাসম্ভব ক্ষতি করে পালিয়ে যাওয়া—বার বার। সর্বশেষে তার সর্বস্ব লুঠ করা।'

এ সব-কিছু ভাবসাহেব সত্যই লিখেছিলেন কিনা, সে-কথা গুল বাহাদুর জানতেন না। তবে এ কথা জানতেন, মারাঠারা সম্মুখসংগ্রাম সব-সময়ই এড়িয়ে চলে।

কিন্তু একথাও অতি অবশ্য ঠিক, ভাবসাহেব অবশ্য মৃত্যু জেনেও আবদালীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধই লড়েছিলেন। কেন লড়েছিলেন? পেশওয়ার হুকুমে। হুকুমে। তাঁর প্রতি আনুগত্য বশ্যতার দরুন। তাঁর নুন-নেমক খেয়েছি। সে নুনের শেষ কড়ি শোধ না করে দেশের লোকের সামনে মুখ বের করবো কি করে? কিন্তু দিল্লীর বাদশার প্রতি বাঙালী ডোমের কি আনুগত্য, কি বশ্যতা?

তবে কি এদের তাতাতে হবে বাবুর কিংবা মাহমুদের মত লুঠতরাজের লোভ দেখিয়ে? তার সরল অর্থ, দিল্লীর বাদশাহ খেদমৎ করতে গিয়ে তারা করবে দিল্লী লুঠ! এ তো চমৎকার ব্যবস্থা!

তখন বড় দুঃখে তাঁর মনে পড়লো, গদরের সিপাহীরও বেপরোয়াভাবে যততত্র লুঠতরাজ করেছে। যাদের জন্য স্বাধীনতার সংগ্রাম লড়েছে, লুঠ করেছে তাদেরই। কি মূল্য সে স্বাধীনতার!

গুল বাহাদুরের মাথা গরম হয়ে উঠলো। সুরাহীর জল ঢেলে মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবলেন, 'যারা গদর ইন্‌কিলাব করে তারা অতশত ভাবনা-চিন্তা করে না। তিমুর নাদির বিজয় অভিযান আরম্ভ করার পূর্বে বু আলী সিনা কিংবা আবু রুশদের দর্শন আর তর্ক শাস্ত্রের কেতাব-পুঁথি নিয়ে বিনিদ্র যামিনী যাপন করেন না।'

ইংরেজ এ-দেশের দুশমন, এ-দেশের বাদশার দুশমন। তাকে খেদাতে হবে। কি ভাবে তাড়াতে হবে তার জন্য মোল্লা-মৌলবীর কাছ থেকে ফতোয়া আনবার প্রয়োজন নেই। তাহলে পাড়ার পদী পিসির কাছেও যেতে হয়। তিনি ইতু-ঘেঁচুর পুজো-পাটা করে দিন-ক্ষ্যাণ বাৎলে দেবেন—তবে হবে অভিযান শুরু! তওবা, তওবা!! শয়তানের খুন পিনেওলা তলোয়ারকে পয়মন্ত করতে হবে চড়ুই পাখীর ন্যাজের পালক দিয়ে!

কিন্তু একটা জিনিস সর্বক্ষণ গুল বাহাদুরের মনে পীড়া দিচ্ছিল। এই যে ছদ্মবেশ পরে আত্মগোপন করে থাকাটা, এভাবে কাপুরুষের মত কতদিন প্রাণ বাঁচিয়ে থাকতে হবে? দেশ স্বাধীন করার জন্য একটা বড় আদর্শ সামনে ধরেছি বলে এই নীচ আচরণ সর্বক্ষণ হজম করে চলতে হবে? ডোমকে তাতানোর জন্য লুঠতরাজের লোভ কেউ দেখালে সেটা না হয় বরদাস্ত করে নিলুম কিন্তু নিজে একটা নীচ আচরণ করবো—এ-ঢোঁক গিলে হজম করি কি করে? তাও একদিন নয়, দু'দিন নয়—কত বছর ধরে কে জানে?

চুলোয় যাক্ গে অত ভয়। চুলোয় যাক্ গে শিবুর হুঁশিয়ারীর পরামর্শ। আমি বেরবো ঘোষালের সন্ধানে।

কিন্তু ইতিমধ্যে একটা কাজে ডুব না মারলে চিন্তা করে করে পাগল হয়ে যাব যে। কাজও এসে হুড়মুড়িয়ে পড়লো তাঁর ঘাড়ে।

শিবুর খেতখামারি ছিল সামান্যই কিন্তু গুল বাহাদুরের পক্ষে ঐটুকুই যথেষ্ট। সে সব সামলাতে গিয়ে তিনি প্রবেশ করলেন এক নূতন ভুবনে। এটা ধরলে ওটা হাতছাড়া হয়ে যায়, ছাগল-দুটোকে সামলাতে গাইটা না-পাত্তা হয়ে যায়। মরাইয়ের ইঁদুর মারতে হলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেরাল পুষতে হয়, বেরালকে পেট ভরে খেতে দিলে সে আবার ইঁদুর মারার প্রয়োজন বোধ করে না। পচা গোবরের গন্ধে মাথা তাজ্জিম তাজ্জিম করে, অথচ সে গোবরের বরবাদ হবে তাও প্রাণ সইতে পারে না।

ইতিমধ্যে ঝিঙে এসে খবর দিলে, একপাল সাঁওতাল কোশখানেক দূর নদী-পারে আস্তানা গেড়েছে। ওদের দিয়ে একটা নূতন আবাদ করানো যায় কিনা।

গুল বাহাদুর লম্ফ দিয়ে উঠলেন। এ একটা কাজের মত কাজ বটে। এ-বিষয়ে তাঁর কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতাও আছে। ভাওলপুর না পাটিয়ালা কোথা থেকে একপাল মেয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিল পালমে যেখানে বাবুর শাহের পাথরের তৈরী সরাঈ—তারই পিছনে। তাঁরই চাচা দানিশ্‌মন্দ খান তাদের দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন একটা সুন্দর আবাস। চাচার সঙ্গে থেকে তিনি তখন শিখেছিলেন অনেক কিছু। আজ দেখা যাবে চাচাকা ভাতিজা সে এলেমের কিছুটা স্মরণ রেখেছে কিনা।

কিঞ্চিৎ অর্থের প্রয়োজন। শিবুর কলসীর তলায় পাওয়া গিয়েছে শ' আড়াই টাকা। এত টাকা শিবু পেল কোথায়? তবে কি গুপ্তী ডাকাতি করতো? তা আসুক সে টাকা জাহান্নাম থেকে। ঐ দিয়ে আরম্ভ করা যাবে অক্লেশে। তারপর বরাৎ। আল্লা ভরোসা।

প্রথম দিনের কাজ শেষ করে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে গুল বাহাদুর আনন্দীকে সেলাম করে বললেন, 'হুজুর, আজ থেকে আপনি জমিদার। আপনাকে সমঝে চলতে হবে।'

জমিদার হওয়ার রৌদ্ররস আনন্দী জানে না কিন্তু সে চালাক ছেলে। গুল বাহাদুরের মেজাজ আজ খুশ দেখে সে কোলের কাছে ঘেঁষে এসে বললে, 'দাদু, আমাকে কেঁদুলীর মেলায় নিয়ে যাবে?'

গুল বাহাদুরের প্রাণ-যমুনায় তখন আনন্দের উজান তরঙ্গ লেগেছে। আনন্দী তখন শয়তানের জন্মভূমি বেলেত যেতে চাইলেও তিনি তখন ঘিনপিত বাদ দিয়ে সেখানে তাকে নিয়ে যেতেন। শুধালেন, 'সে কোথায়?'

বললে, 'অন্নেক দূরে। ঐ হোথা অজয় দিয়ে।'

শীতের শেষে অজয়ের পারে কেঁদুলীর মেলা। বাঙলাদেশের হাজার হাজার বাউল সেখানে জমায়েৎ হয়ে তিন রাত ধরে আউল-বাউল-কেত্তন গান গায়। কেনাকাটাও হয় প্রচুর।

সেখানে গুল বাহাদুরের আরেক অভিজ্ঞতা।

এই যে হাজার হাজার ষণ্ডামার্কা লোক দিনরাত্তির ধেই ধেই করে নাচ করছে খাচ্ছে দাচ্ছে ঘুমুচ্ছে কোনও কিছু করছে কম্মাচ্ছে না, সমাজের তোয়াক্কা করে না, ধর্মের নামে অকাতরে গরীব-দুঃখীর অন্নে ভাগ বসাচ্ছে, দরকারে অদরকারে এক অন্যে কামড়াকামড়ি পর্যন্ত করছে—এ তামাশা তৈরী করলো কোন্ মহাজন? কার আদেশে এরা এসব করে, কার হুকুমে গৃহী এদের সব-কিছু যোগায়? এর কি অর্থ, কি মূল্য?

অথচ গুল বাহাদুরের চট করে মনে পড়া উচিত ছিল যে মুসলমান পীর দূরবেশরাও ঠিক এই কর্মই করে থাকে, তাঁরই হীরের টুকরো দিল্লী শহরে—নিজামউদ্দীনের দরগায়, মেহেরৌলীর কুৎব্‌সাহেব, নাসিরউদ্দীন চেরাগ-দিল্লীর আস্তানায়। সেখানেও তো বাউণ্ডুলে খোদার খাসীরা ঠিক এদেরই মত ধেই ধেই করে নৃত্য করে। যীশুখ্রীষ্টের ভাষায় 'তারাও

www.BanglaBook.org

সুতো কাটে না, মেহন্নতও করে না।' এবং তাই শুধু নয়, এখানকার এই বাউলদের ভিতর আছে মুসলমানও।

ছেলেবেলা থেকে আপন ধর্মে যে সব জিনিস গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে, সেগুলো একটু ভিন্ন বেশে দেখা দিলেই মানুষ চমকে ওঠে। তারপর হুঁশ হয়, দুটোই হুবহু এক বস্তু। এ-ও যা, ও-ও তা। কালীঘাটের পাঁঠা কাটাতে আর ইদগার পাশে গোরু জবায়ে তফাৎ কী? গুরুকে মাথায় তুলে তাকে অবতার বলা, আর পীরের পায়ে চুমো খেয়ে তাকে আল্লার নূর বলে অ'ত্মতৃপ্তি পাওয়া একই, একই, সম্পূর্ণ একই জিনিস।

গুল বাহাদুরের মনে যখন এ চৈতন্যের উদয় হল তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'তাজ্জব মুল্লুক হিন্দুস্তান। এই এদের আমরা যুগ যুগ ধরে শিরতাজ, মাথার মুকুট করে পরে আসছি আর এদের মনের কোণে কণামাত্র উদ্বেগ নেই এদেশের লোকের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান নিয়ে। এদের কাছে আমরা সব মায়াবদ্ধ জীব (ফানী দুনিয়ার ক্রিমি), আমরা মরলেই কি, বাঁচলেই কি! ইয়া আল্লা মেহেরবান! তোমার কেরামতি বুঝে ওঠা ভার। এ-সংসার থেকে মুক্তি পাওয়াই যদি মানব-জীবনের চরম আদর্শ হয় তবে এ-সংসারে তুমি তাকে পাঠালে কেন?'

হঠাৎ খেয়াল গেল, আনন্দী বাউলদের অনুকরণে ধুতিটাকে লুঙ্গির মত কোমরে বেঁধে এক হাত উপরের দিকে তুলে অদৃশ্য এক-তারা ধরে নাচছে। দিলেন এক ধমক। শিবুর কথামতো একে 'ভদ্রলোক' না হয় নাই বানালুম, কিন্তু একে কখনও বৈরাগী হতে দেব না।

'কি রে আনন্দী, কি রকম আছিস্?'

গলা শুনে পিছনে তাকিয়ে দেখেন—বাঙালী বাবু। লম্বা লিকলিকে চেহারা, গৌরবর্ণ, সরু বাঁকা নাক, বাদামী—প্রায় নীলরঙের দুটি হাসি-হাসি চোখ, উপরের ঠোঁটটি চাপা—নিচেরটি ডপকী ছুঁড়িদের মত একটু পুরুষ্টু এবং রস-ভর-ভর, পানের লাল না এমনিতেই লাল ঠিক বোঝা গেল না, এক মাথা কোঁকড়া বাবরী চুল কিন্তু একেবারে রুক্ষশুষ্ক, পরনে কটকি জুতো, ধুতি মেরজাই আর কাঁধের উপর বীরভূমি কেটের চাদর।

বললেন, 'এই যে বাবাজী, ঝিঙের মুখে তোমার কথা শুনলুম।'

গুল বাহাদুর অচেনার আগমনে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। বললেন, 'বসুন।' মনে মনে ভাবলেন, 'ঝিঙের মুখে? তবে কি শিবু কিছু বলেনি!'

গদরের সেপাইদের মধ্যে একে অন্যকে পরিচয় দেবার জন্য গোপন সঙ্কেত ছিল হাতের কড়ে আঙুল দিয়ে শরীরের কোন এক জায়গায় কেমন যেন আনমনে আস্তে আস্তে চক্কর কেটে যাওয়া—তারা যে গোল চাপাটি দিয়ে খবর পাঠাতো তারই অনুকরণে। গুল বাহাদুর মাটিতে বসে তাঁর আপন হাঁটুর উপর যেন বেখেয়ালে চক্কর আঁকতে লাগলেন।

বাবুটি চমকে উঠে আপন হাঁটুতে একটা চক্কর এঁকেই উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'চল।'

দুজনা নদীপাড়ের বটগাছ-তলায় বসলেন।

পূর্ণিমা রাত্রি। সামনে, উঁচু পাড়ির অনেক নিচে অজয়ের ক্ষীণধারা। তার গতিবেগ প্রায় নেই। যেন মরা অজগর সাপ শুয়ে আছে। চাঁদের আলোতে তার আঁশ যেন চিক্‌চিক্ করছে। দু'একটি মেয়েছেলে সেই আঁশ যেন আঁজলা আঁজলা করে মাথায় মাখছে। তাদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কালো চুল থেকে ছোট ছোট ঝরণা চিক্‌চিক্‌ করে পড়ছে। জলের ওপারে বিরাট বালুচরের আরম্ভ। তারপর কাশের ঝোপ, নিচু পাড়, যাত্রীদের আস্তানা সব-কিছু চাঁদের আলোতে ম্লান কুয়াশার হিমিকার গ্লানিতে মিশে গিয়েছে। মেলার কোলাহলকে শান্ত নদীর নৈস্তব্ধ্য এখানে গ্রাস করে ফেলেছে।

গুল বাহাদুর বললেন, 'জিন্দাবাদ বাহাদুর শাহ!'

'জিন্দাবাদ বাহাদুর শাহ! জিন্দাবাদ কুমার সিং!'

কুমার সিং?

॥ পাঁচ ॥

অনেকক্ষণ ধরে দুজনাই চুপ। একে অন্যের সঙ্গে এই তাদের প্রথম পরিচয়, কিন্তু বাহাদুর শাহ আর কুমার সিং যেন তাদের হাতে হাত, বুকে বুক মিলিয়ে দিলেন, যেন কত দিনকার পরিচয়। দীর্ঘ বিরহের পর মিলন হলে মানুষ যেমন একে অন্যের নিঃশব্দ সঙ্গসুখ প্রথমটায় শুষে নেয়, এদের বেলা তাই হল।

একবার কথা আরম্ভ হলে সে-সুখ যেন ক্ষীণ হয়ে আসে।

গুল বাহাদুর বললেন, 'সব খতম!'

'সব খতম। কিন্তু আবার সব শুরু।'

দুজনায় আবার চুপ।

গুল বাহাদুর বললেন, 'আমি দিল্লী থেকে এসেছি। আমার নাম—'

'থাক! নামের প্রয়োজন হলে পরে শুধিয়ে নেব। আমি ঘোষাল।'

গুল বাহাদুর বললেন, 'বুঝেছি।'

আশ্চর্য হয়ে ঘোষাল শুধালে, 'কি করে?'

'শিবু বলেছিল। আমার কথা, আপনাকে বলেনি?'

'না। বোধ হয় সময় পায়নি।'

গুল বাহাদুর আফসোস্‌ করে মনে মনে ভাবলেন, 'এরকম একটা বিচক্ষণ লোক চলে গেল। বেঁচে থাকে শুধু গাধা-খচ্চরগুলো।'

ঘোষাল বললেন, 'শোনো আমার কথা সব বলি।'

এবার ঘোষাল অতি বিশুদ্ধ উর্দুতে আপন বক্তব্য আরম্ভ করলেন।

'আমি ছোটবেলায় যাই বেহারে। সেখানে অনেক জায়গায় কাজকর্ম করি—এমন কি ইংরেজের সঙ্গেও। শিউরে উঠো না। পরে বুঝবে। ওদের সঙ্গে কাজ না করলে আমি কখনও এ রকম গভীরভাবে বুঝতে পারতাম না, এরা কি বজ্জাৎ, কি ধড়িবাজ। কিন্তু সেকথা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করার দরকার এখন নেই। তুমি ফার্সীতে যে-সব বই পড়েছ, আমিও পড়েছি সেগুলোই। আমরা ব্রাহ্মণ কিন্তু আমাদের বংশে বহুকাল ধরে চলে আসছে ফার্সীর চর্চা। কিন্তু ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলুম ইতিহাস চর্চার ফলে নয়। আমার পূর্বপুরুষেরা পাঠানদের হয়ে মোগলদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন পূর্ব-বাঙলায়। হেরে গিয়ে এখানে এসে আশ্রয় নেন বীরভূমে। জাহাঙ্গীর, শাহ্‌জাহান, ঔরঙ্গজেব—ব্যস্‌—মাত্র এই

www.BanglaBook.org

তিন বাদশার আমলে বাঙলা পরাধীন ছিল, অর্থাৎ দিল্লীর হুকুম মাফিক চলেছে। তারপর আমরা আবার সরকারী কাজ করেছি। তারপর এল ইংরেজ। পলাশী থেকে এই একশ' বছর আবার আমরা বাড়ি থেকে বেরোইনি।'

গুল বাহাদুর অনেক কিছুই জানতেন না। এই ন'মাস ধরে তিনি চিনেছেন শুধু ডোম আর সাঁওতালদের। এদেশেও ব্রাহ্মণ আছে, এ কথা তিনি মোটামুটি জানতেন। কিন্তু তারা যে গদরে লড়ে এ খবর তাঁর জানা ছিল না। দিল্লীর ব্রাহ্মণেরা পরে চুড়িদার পাজামা, লম্বা শেরওয়ানী, আর মাথায় কিস্তিটুপি। তারা করে পুরুতের কাজ। বিয়ে-শাদীতে এসে মন্ত্র-ফন্ত্র পড়ায়—তাও সে-মন্ত্র কাগজে লিখে আনে ফার্সী হরফে। তারা আবার লড়াই করে কি করে? লড়াই তো করে রাজপুতরা, মারাঠারা, ক্ষত্রিয়রা। তা সে যাক গে। তাঁর মনে তখন লেগেছে আর এক ধোঁকা। শুধালেন, 'তোমরা কি শুধু বাঙলার স্বাধীনতা চাও? বাহাদুর শাহকে শাহ-ইন-শাহ বলে মানো না?'

ঘোষাল বললেন, 'ঐ তো আরম্ভ হয়ে গেল, হিন্দুস্থানবাসীদের ঝগড়া-কাজিয়া। এ-সব কথা পরে হবে। উপস্থিত দেখতে পাচ্ছো না, আমাদের ভিতরে মিল বেশী, অমিল কম। যদি খুশী হও, তবে না হয় মেনেই নিলুম তোমার বাহাদুর শাহকে। কুমার সিংহকে তো মেনেছিলুম। তোমাকেও মানছি। সবাইকে মেনে নেব—দরকার হলে এবং হবেও। তুমি কি মনে করো, আমরা জিতলে সেই পুরনো মোগলাই রাজত্ব আসবে—বাহাদুর শাহকে বাদশা করতে পারলেও? না বাবাজী, দেশের হাওয়া বদলাচ্ছে। বাবুর বাদশার মত রাজত্ব বাহাদুর কোনও করেননি, আর কখনও কেউ পারবে না।'

গুল বাহাদুর শোধালেন, 'আপনারা হেরে গেলেন কেন?'

ঘোষাল হাতঝোড় করে বললেন, 'ঐ একটি প্রশ্ন শুধিয়ো না। এর উত্তর দিতে গেলে আবার নূতন করে সেই মর্মন্তুদ পীড়ার ভিতর দিয়ে যেতে হয়, যা ভুলতে পারা একটা জীবনের কর্ম নয়। কোন্ কোন্ ভুল না করলে আমরা জিতে জেতুম সে প্রশ্নও তুলো না। আমি নিশ্চয়ই জানি, সে ভুলগুলো না করলে পরে অন্য ভুল করতুম। না বাবাজী, গলদের মূল উৎস কোথায় ছিল তখনও বুঝতে পারিনি, এখনও পারিনি। আমরা এখানে পাথর চাপা দিয়েছি তো ওদিক দিয়ে জল বেরিয়েছে, সেখানে পাথর চাপা দিয়েছি তো অন্য দিক দিয়ে বেরিয়েছে। সর্বাঙ্গে ঘা, মলম লাগাই কোথায়?'

'এখন তবে কর্তব্য কি?'

ঘোষাল সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'বিলকুল কোনও ধারণা নেই। এখনও মনে মনে জমা-খরচ মিলোচ্ছি। তুমি এসেছো, ভালই হয়েছে। দিল্লী ফিরে যাচ্ছ না তো?'

প্রশ্নটা যেন নিতান্তই ভদ্রতার খাতিরে জিজ্ঞেস করা হোল। ঘোষাল জানতেন এর উত্তর কি? গুল বাহাদুরও কোনও কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করলেন না।

ঘোষাল বললেন, 'ছদ্মবেশটা মন্দ ধরনি। বাঙলাটাও শুধু যে মন্দ শিখছো তাও নয় কিন্তু ডাহা ডোম-ডুমে। এই বেলা ওটাতে লেখা-পড়াও আরম্ভ করে দাও। নিজেই করে নিতে পারবে। কোন ভাবনা নেই। ওতে সাহিত্য বলে কোনও বালাই নেই। আশ্চর্য, সাতশ' না আটশ' বছর ধরে বাঙলাতেই বই লেখা আরম্ভ হয়েছে অথচ এক গণ্ডা কবি বেরোয়নি যাদের ইরানী কবিদের সামনে দাঁড় করানো যায়। ফার্সীতে তিনশ' বছর যেতে-না-যেতেই ফিরদোসী, হাফিজ, সাদী, রুমী, আত্তার, নিজামী, আরও কত কে?'

www.BanglaBook.org

গুল বাহাদুর মৃদু আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'বাঙালীরা হয়তো মনে করে, তাদের কবি হাফিজ সাদীর চেয়ে বড়।'

ঘোষাল তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, 'তা করতে পারে। সাঁওতালরা হয়তো মনে করে, তাদের তীর ধনুক নিয়ে বন্দুক কামানের সঙ্গে লড়া যায়।'

তুলনাটার ঢপ দেখে গুল বাহাদুর একটু হাসলেন।

ঘোষাল বললেন, 'হাসলে? তা হাসো। আমারও বলার বিশেষ হক্ক নেই। আমিও তেমন কোনও চর্চা করিনি। কিন্তু জানো, সাতশ' বছর বাঙলা চর্চা করার পর তারা গদ্য লিখতে আরম্ভ করেছে এই মাত্র সেদিন। পঞ্চাশ বছরও হয়নি। ঐ যে রাজা রামমোহন রায়—'

গুল বাহাদুর চমকে উঠে বললেন, 'কে?'

'রাজা রামমোহন রায়। চেন নাকি?'

গুল বাহাদুর বললেন, 'হ্যাঁ, আমার পিতার কাছে শুনেছি, বাদশা দুসরা আকবরের চিঠি নিয়ে তিনি বিলেত গিয়েছিলেন। আমি তো শুনেছি, উনি জানতেন আতি উত্তম ফার্সী এবং আরবী।'

ঘোষাল বললেন, 'তা তিনি জানতেন। এদেশের মুসলমান পণ্ডিতরা তাঁকে নাম দিয়েছেন ''জবরদস্ত মৌলবী।'' তারপর একটু অবজ্ঞার সুরে বললেন, 'লোকটা মৌলবীই বটে। ধর্ম সম্বন্ধে বই লেখে। ফার্সীতে একটা লিখেছে। আমার কাছে বোধ হয় এখনও আছে। কিন্তু ধর্মে আমার রুচি নেই। তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু তাজ্জব কী বাৎ, লোকটা দেশের সবাইকে ইংরিজি শেখাতে চায়।'

'সে কি?'

'আশ্চর্য! আরবী ফার্সীর রস চেখেছে, শুনেছি ইবরানী সুরয়ানী ইস্তেক (হিব্রু, সিরিয়াক্) জানে—তার পর এই রুচি! ইংরেজ ব্যাটারা তো পায়খানা থেকে ফিরে জল পর্যন্ত—থাক্ গে। জানো, বাবাজী, এক ব্যাটা ইংরেজের সঙ্গে আমাকে একদিন নিতান্ত বাধ্য হয়ে হাত-নাড়ানাড়ি করতে হয়েছিল। হাতে যেন এখনও গন্ধ লেগে আছে। বেসন দিয়ে কত মেজেছি, ঝামা দিয়ে তার চেয়েও বেশী ঘষেছি।'

বলে ডান হাতখানা অতি সন্তর্পণে নাকের ইঞ্চি তিনেক সামনে ধরে দু'বার শুঁকে বলে উঠলেন, 'তৌবা তৌবা! এখনও গন্ধ বেরুচ্ছে!'

গুল বাহাদুর সহানুভূতির সুরে বললেন, 'আমিও পাচ্ছি। তা ঐ অপকর্ম করতে গেলেন কেন?'

'সাধে? ঐ করে তো সম্বন্ধীকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আর পাঁচজনের চোখের আড়াল করলুম।' ঘোষাল চুপ করে গেলেন।

গুল বাহাদুর শোধালেন, 'তারপর?'

ঘোষাল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উদাস সুরে বললেন, 'তারপর কে কোথায় যায় সে তো আল্লাই জানেন। কেউ যায় বেহেস্তে, কেউ যায় দোজখে, কেউ যায় বৈকুণ্ঠে, কেউ যায় কৈলাসে!'

'সে আবার কোথায়?'

'বাবাজী, ধরা পড়ে যাবে। বৈকুণ্ঠটা কোথায় সেটা অন্তত তোমার জানা উচিত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাবাজীরা মরে গেলে বৈকুণ্ঠ যায়—নামাবলীর কার্পেট পেতে তারি উপরে বসে। আরব্য রজনীতে যেরকম আছে। কিন্তু থাক ওসব। ধর্মে আমার রুচি নাই—তোমাকে তো বলেছি।'

অনেকক্ষণ পর গুল বাহাদুর শোধালেন, 'ইংরেজ মেরেছেন, ইংরেজ আপনাকে তালাশ করছে না?'

'তা করছে, কিন্তু আমি ইংরেজ মারলুম কখন?'

গুল বাহাদুর আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'এই যে বললেন!'

'তাজ্জব বাৎ শোনালে! আমি বেটাকে নিয়ে গেলুম যেখানে তার বরাতে লেখা ছিল যাবার। তারপর আমাদের সেপাইরা তাদের কাজ করলে। আমি কি জল্লাদ?'

'আপনি তবে কি করতেন?'

'আমি? আমার কাজ ছিল তাপ্পা, রিপুকর্ম। আজ বন্দুক নেই, যোগাড় করো। কাল বারুদ নেই, ঠ্যালা সামলাও। পরশু খোরাক নেই, আমার নাভিশ্বাস। আরও কত কি? লুঠের মাল বখরা করা, গাঁয়ের লোককে মিথ্যে দিব্যি-দিলাশা দিয়ে তাতানো, চিঠি জাল করা—'

'সে আবার কি?'

'ইংরেজের গুপ্তচর আমাদের সেপাইদের ভিতর জাল চিঠি পাচার করলে, যেন সে-চিঠি কুমার সিং ইংরেজকে লিখেছেন আত্মসমর্পণ করে, অবশ্য তাঁর ধনপ্রাণ যেন রক্ষা হয় এই শর্তে। আমি তখন পাল্টা চিঠি জাল করাতুম, ইংরেজ আত্মসমর্পণ করেছে এই মর্মে সেটা চালিয়ে দিতুম আমাদের সেপাইদের ভিতর। কিন্তু ইংরেজ সেপাইদের ভিতর ভিতর এরকম জালিয়াতি আমরা করতে পারিনি অতখানি বাড়িয়া ইংরাজি লেখা জাল করনেওলা আমাদের ভিতর কেউ ছিল না।'

গুল বাহাদুর বললেন, 'তাই বোধহয় রাজা রামমোহন আমাদের ইংরিজি শেখাতে চান।'

ঘোষাল গোস্সাভরে বললেন, 'কচু হবে ইংরিজি শিখে। যেন ইংরিজি চিঠি জাল করতে পারলেই আমরা গদর জিতে যেতুম। যেন কাঠবেরালির ধুলো না হলে—যাগ্ গে—ওসব কেচ্ছা তুমি জানো না।'

চাঁদ অনেকখানি ঢলে পড়েছে। বাউলদের গীতও ঝিমিয়ে এসেছে। নদীর জলের রুপোলি ঝিকিমিকি লোপ পেয়েছে, কিংবা সরে গিয়েছে। ওপার থেকে পাড়ি দিয়ে একটা দমকা হাওয়ার দীর্ঘশ্বাস দুজনার ভিতর দিয়ে চলে গেল। কিংবা হয়তো ওঁদেরই দীর্ঘশ্বাস, হায় হায় আফসোস্।

গুল বাহাদুর বললেন, 'যাক্। তবু ভালো। আমি তো শুনেছিলুম, কুমার সিং সত্যি আত্মসমর্পণ করে ইংরাজকে চিঠি লিখেছিলেন। সেগুলো তাহলে জাল!'

ঘোষাল হেসে বললেন, 'সব-কটা জাল হতে যাবে কেন? কিছু সত্যিও ছিল।'

গুল বাহাদুর আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'সে কি?'

'নিশ্চয়। যখন দেখলুম, ইংরেজ চিঠি চালাচ্ছেই তখন আমরাও ইংরেজকে দু-চারখানা লিখে পাঠালুম। নানারকম ভুল খবর দিয়ে। নিছক ধাপ্পা মারার জন্য। ঝাঁসীও তাই করেছিলেন।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কিন্তু এতে করে যে পরে দেশের লোকের মনে ভুল ধারণা হল, কুমার সিং সত্যি সাহস হারিয়ে ফেলেছিলেন। সে ভুল ধারণা সরাবে কে?'

'দেখ বাবাজী, গদর জিতলে এ ভুল ধারণা থাকতো না। আর হারলে তো গাল খাবই। তখন কাজ ছিল লড়াই জেতা। তার জন্য যা প্রয়োজন তাই করেছি। হেরে গিয়েছি সেইটে হল সবচেয়ে বড় গাল। তার উপরই এ-বদনাম তো বোঝার উপর শাকের আঁটি। এবং তার চেয়েও বড় কথা, "পকড়ে তলওয়ার দামনকো সম্হালে কোঈ"? তলোয়ার নিয়ে হামলা করার সময় রক্তের ছিটে পড়ার ভয়ে কেউ তো কুর্তার অঞ্চল সামলায় না—অর্থাৎ একবার মনস্থির করবার পর ছোটোখাটো চিন্তা করতে নেই।'

গুল বাহাদুর বললেন, 'সে তো বিলকুল ঠিক। কিন্তু ইংরেজ আপনার সন্ধান পাবে কি না সেও কি ঐ পর্যায়ের?'

ঘোষাল বললেন, 'প্রায় তাই। কিন্তু আসলে কি জানো, বাবাজী, বেঁচে থাকার উপর আমি খুব বেশী দাম দিই নে। এই গদরে চলে গেল মানুষগুলো, আর বেঁচে রইল যারা, তাদের আমি দোষ দিই নে, কিন্তু তাদের নিয়ে আমি করবো কি? ঝড়ে মোটা আমগুলো ঝরে পড়ে সে তো জানা কথা। আমি নিজে অত্যন্ত সামান্য প্রাণী কিন্তু ঐ মহাজনদের সম্পর্কে এসে আমি কয়েক দিনের জন্য কি যে হয়ে গিয়েছিলুম তোমাকে বোঝাই কি প্রকারে? আমি যেন রোগা-পটকা হাড্ডিসার গঙ্গাযাত্রায় জ্যান্ত মড়া হয়ে যাচ্ছিলুম উদ্ধারণপুরের ঘাটে। আমার ঘাড়ে এসে করলে ভর এক উড়োনচণ্ডী দানো। আমি উঠলুম লম্ফ দিয়ে, মড়ার খাটিয়া ছেড়ে, আর তারপর সে কি তিড়িং বিড়িং ভূতের নৃত্য করলুম ক'দিন। তখন আমি সব জানি, সব পারি। ঐ আনন্দী ছোঁড়াটা তখন যদি আমাকে আবদার করতো, "দাদু, বেহেস্ত থেকে এনে দাও না আমাকে খুদাতালার কুর্সীখানা", আমি তা হলে একগাল হেসে বলতুম, "রঃ! ডাঁড়া! এনে দিচ্ছি, এ আর এমন কি চাইলি?" তারপর দিতুম এক আকাশ-ছোঁয়া লম্ফ। স্বপ্নে যে-রকম মানুষ মিন-পাখনায় পায়ের কড়ে আঙ্গুলে অল্প একটু ভর দিলেই হুশ করে উড়ে গিয়ে ঠুকে যায় তার মাথা চাঁদের বুড়ীর চরকাতে।

'জানো বাবাজী, এ যেন স্বপ্নের মাঝে সম্ভব-অসম্ভবের সীমানা পেরিয়ে আল্লার পায়ের কাছে ফেরেশ্তা বনে যাওয়া। আর আমার চতুর্দিকে কুমার সিং আর তার সঙ্গী-সাথী। কী সব বাঘ, কী সব সিংহ! আমরা যেন সবাই অন্ধ-প্রদীপ। আপন আপন সেজে পলতের মতো পড়ে ঘুমুচ্ছিলুম! এল কুমার সিংয়ের দীপ্ত-দীক্ষা। তাঁর আলো আমাদের এক-একজনকে স্পর্শ করে, আর আমরা প্রদীপশিখার মত জ্বলে উঠি। আবার আমাদের শিখা জ্বালিয়ে দেয় অন্য প্রদীপ। তাই বলছিলুম, এ তো দীপ্ত-দীক্ষা—এ তো পরশদীক্ষা নয়, সে তো সামান্য জিনিস। পরশপাথরের স্পর্শ লেগে লোহা হয় সোনা কিন্তু সে সোনা তার পরশ দিয়ে অন্য লোহাকে সোনা করতে পারে না,—তাই তার নাম স্পর্শ-দীক্ষা, তার মূল্য আর কি?

'সে কী দেয়ালি জ্বালিয়েছিলুম আমরা!'

'আর আজ, অন্ধকার অন্ধকার—সব অন্ধকার!'

হঠাৎ বলা-নেই, কওয়া-নেই, ঘোষাল দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে হাঁটুতে মাথা গুঁজে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মতো ইনি ওলাওঠার দেবী কিংবা বীবী। কিন্তু আর সব দেবী যখন হিন্দুর মৌরশী পাট্টা, তখন ইনিই বা মুসলমানী হয়ে বীবী খেতাব নিলেন কেন?

গুল বাহাদুর জানতেন না, বাঙলাদেশ তাজ্জব দেশ। ভাগ্যিস তিনি তখনও দখিন বাঙলায় যাননি। সেখানে তাহলে আলাপ পরিচয় হত জলের দেবতা বদর পীরের সঙ্গে, বড়মেঞা ওরফে বাঘের দেবতা গাজী পীরের সঙ্গে।

এই ঘোষালের সঙ্গেই আলাপ করে তিনি যত না শিখলেন তথ্য, তার চেয়েও বেশী প্রশ্ন। যথা—

এ দেশের খানদানীরাও কিছু কিছু তাহলে গদরে যোগ দিয়েছিল, কিন্তু প্রশ্ন, সে কি শুধু বাঙলাদেশের বাইরে? দেশের ভিতর অন্য খানদানীদের মতিগতি তা হলে কি? তারা যদি ইংরেজকে এ-দেশ থেকে খেদাতে না চায় তবে তো কোনও কিছু করা অসম্ভব, কারণ তারা যদি নেতৃত্ব না নেয় তবে ডোম-চাঁড়ালেরা কি আপন হিম্মতে নয়া গদরের তাজা ঝাণ্ডা উঁচু করতে পারবে? তারপরের প্রশ্ন, এই খানদানী অর্থাৎ বামুন এবং চাঁড়ালদের ভিতর কি অন্য কোনও সম্প্রদায় নেই? দিল্লীতে যে রকম ব্রাহ্মণ আর বেনের মাঝখানে আছে ক্ষত্রিয়রা? আর দিল্লীর ব্রাহ্মণ আর এখানকার ঘোষাল ব্রাহ্মণেই বা মিল কোথায়? দিল্লীর বামুনরা তো করে স্রেফ পুরুতগিরি, এ বামুন তো একদম 'আগখুর' অর্থাৎ আগুনগিলনেওলা। কিন্তু মারাঠী ব্রাহ্মণ, পেশওয়ারাও তো পুরুতগিরি করে না। তবে কি তারা হাতিয়ার নেয়, না শুধু আড়ালে বসে কল-কাঠি নাড়ে?

আনন্দীর গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে গুল বাহাদুর ভাবলেন, এসব জাত-বেজাত আর তাদের ফ্যাচাঙ-ফেউ শিখতেই তো যাবে একটা আস্ত জীবন। তা আর কি করা যায়, অন্য কোনও পন্থা যখন আর নেই। আরব্য উপন্যাসের জিনও তো বোতলের ভিতর বন্ধ হয়ে কাটিয়েছিল তিনশ' না চারশ' বছর। পরমাত্মার কৃপায় তবু তো তিনি মুক্ত—অন্তত বোতলের জিন্নির তুলনায়।

দূরের শালবনের ফাঁকে কে যেন ছোট্ট একটি আগুন জ্বালিয়েছে। না, সূর্যঠাকুর ঘুম ভেঙে চোখ কচলে কচলে লাল করে ফেলেছেন? আকাশে চাঁদের আলো কখন মিললো, সূর্যের আলো দেখা দিল তিনি লক্ষ্যই করেননি। পুব থেকে একটুখানি ঠাণ্ডা বাতাস এগিয়ে চলেছে পশ্চিমপানে দেবতার পায়ে পেন্নাম করতে। কিন্তু এ দেবতা বড়ই জাগ্রত বদমেজাজী পীর! ভক্তকে অভ্যর্থনা জানান ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করে। পূর্ব-বাঙলা থেকে বেরিয়ে-আসা এই তীর্থযাত্রী পূরবিয়া-হাওয়াকে তিনি আদর করে গায়ে মাখেন না, উল্টে ছেড়ে দেন পচ্‌ছিমিয়া গরম বাতাস। আল্লাওয়ার্দী খানের আমলে মারাঠা দস্যুর মত তারা পশ্চিম দিগন্ত থেকে আসে ঝড়ের মত হু হু করে, ঘোড়ার খুরে ওলট পাথর শুকনো পাতার হাজারো দ' জাগিয়ে দিয়ে। একেবারে আকাশজোড়া নিরন্ধ্র তমসাঘন, সূর্যাচ্ছাদিত একচ্ছত্রাধিপত্য।

দানিশপুর গাঁ ডাইনে রেখে চিকনকালা যেতে হয়। সে-গাঁয়ের বাইরে আসতে-না-আসতেই গাড়ির উপর হুড়মুড়িয়ে এসে পড়ল চৌষট্টি পবন মারাঠাদের চৌষট্টি হাজার হর্স-পাওয়ার নিয়ে।

সামাল সামাল বলতে-না-বলতেই, গোরু গাড়োয়ান, গুল বাহাদুর খান কারও কোনও খবরদারী হুঁশিয়ারীদের তোয়াক্কা না করে গাড়ি ঢুকলো দানিশপুর গাঁয়ের ভিতর। তারপর

www.BanglaBook.org

বাঁ দিকে চক্কর খেয়ে শিমুল পলাশ মহুয়ার আড়ালের এক আঙ্গিনায় গিয়ে ছিটকে ফেলে দিলে আনন্দী, গুল বাহাদুর, গণি মিয়া মায় দুটো গোরুকে একে অন্যের ঘাড়ে। মায়ের সুপত্তুর যে রকম বস্তা বস্তা চাল ডাল নুন চিনি আঙ্গিনায় আছাড় মেরে হুঙ্কার দিয়ে কয়, 'দেখো, মা, তোমার জন্যে কি এনেছি।' কোথায় লাগে এর কাছে পঞ্চপাণ্ডবের দ্রৌপদীকে বাড়ি এনে মাতা কুন্তীকে আনন্দ সংবাদ জানানো!

চতুর্দিকে আকাশ বাতাসে তখন লাল ধুলো-বালির ভূতের নৃত্য। ঝড়টা এমনি অসময়ে এবং অতর্কিতে এসে আক্রমণ করেছে যে ধূর্ত বায়সকুল পর্যন্ত আশ্রয় নেবার ফুর্সত পায়নি। সেই ঝড়ের তীব্র সিটির শব্দের ভিতরও ক্ষণে ক্ষণে ভেসে উঠছে তাদের তীক্ষ্ণ মরণাহত আর্তরব।

গুল বাহাদুর সব-কিছু ভুলে উল্লসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'শাবাশ, শাবাশ! একেই বলে আক্রমণ; একেই বলে হামলা। বিলকুল বে-খবর এসে বে-এক্তেয়ার করে দিল দুশমনকে।'

গোরু দুটো গাড়ি থেকে খালাস করে আনন্দীকে কোলে করে আঙ্গিনার অন্য প্রান্তরে কুঁড়েঘরের দাওয়াতে উঠতেই গুল বাহাদুরের চোখে পড়ল আরেক ঝড়। ঝড়েরই বেগে ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গিনায় এল এক রমণী। শাড়ির এক অংশ কোমরে বাঁধা, দীর্ঘতর অংশ সোজা উঠে গেছে আকাশের শূন্যে, মাথার চুলও উঠেছে আকাশের দিকে তালগাছের সক্কলের উঁচু পাতাটার মতো ঢপ নিয়ে। তার বগলে একটি ছোট্ট ছাগলের বাচ্চা। এই লালচে অন্ধকারের ভিতরও গুল বাহাদুরের নজরে পড়লো ছাগল-বাচ্চাটার দুটো ভয়ার্ত চোখ। আর, আর তার পাশে, একে অন্য থেকে বেশ দূরে আরও দুটি লাল-কালো চোখ। মেয়েটি আসমান থেকে শাড়ি নামিয়ে বুক ঢাকার চেষ্টা না করে সোজা উঠলে ঘরের দাওয়ায়। ঝটাৎ করে শিকলি খুলে ঘরের ভিতর ঢুকে এক লহমার তরে দরজা ফাঁক করে ধরলো। এহেন প্রলয় নৃত্যের ওক্তে 'আপ যাইয়ে', 'আপ বৈঠিয়ে' বলে কে? পেছন থেকে গণির বেধড়ক ধাক্কা খেয়ে গুল বাহাদুর পড়লেন মেয়েটার উপর। সে চোট না সামলাতে পেরে পড়ে যাচ্ছে দেখে তাকে জাবড়ে ধরলেন দু হাত দিয়ে হাঁটু জড়িয়ে। মেয়েটা 'আ মর মিনষে' ঐ ধরনের কি যেন একটা বললে। ইতিমধ্যে গণি মিয়া কোনও গতিকে দরজাতে হুড়কো দিয়ে ফেলেছে।

ভিতরে ঘোরঘুট্টি অন্ধকার। শুধু চালের সঙ্গে যেখানে মাটির দেয়াল লেগেছে তারই ফাঁক দিয়ে কেমন যেন একটা লাল আভা দেখা যাচ্ছে—গাঁয়ে আগুন লাগলে রাতের বেলা অন্ধকার ঘরে যে-রকম বাইরে আগুনের আভাস পাওয়া যায়, বিদ্যুৎ ঝলমল করে উঠলে সক্কলের মুখের উপর সোনালী আবীর মাখিয়ে দেয়।

একটা মোড়া ঠেলে দিয়ে রমণী বললে, 'বসো গোসাঁই।' গণি এক কোণে চ্যাটাইয়ের উপর বসেছে। আনন্দী গুল বাহাদুরের হাঁটু জড়িয়ে ধরে ভীত নয়নে এ-দিক ও-দিক তাকাচ্ছে।

গুল বাহাদুর দিল্লী শহরে বিস্তর খাপসুরৎ রমণী দেখেছেন। খাঁটি তুর্কী মেয়ের ড্যাবডেবে চোখ, খানদানী পাঠান মেয়ের ধনুকের মত জোড়া ভুরু, নিকষ্যি কুলীন ইরাণী তন্বঙ্গীর দোলায়িত দেহসৌষ্ঠব, এমন কি প্রায় অমিশ্র আর্যকন্যা ব্রাহ্মণকুমারী সরল বুদ্ধিদীপ্তশান্তসৌন্দর্য তিনি বহুবার দেখেছেন, কিন্তু আজ যে রমণী তাঁর সামনে আধা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আলো-অন্ধকারে দাঁড়িয়ে, তার লাবণ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ সৌন্দর্য ছ'শ বছরের মিশ্রণের সওগাত। এর গায়ের রঙ এদেশের কচি বাঁশপাতার সবুজ দিয়ে আরম্ভ, তাতে মিশে গিয়েছে পাঠান-মোগলের কিঞ্চিৎ তাঁবা-হলুদের রঙ। চুল ইরাণীদের মত কালো হয়ে গিয়ে যেন নীলের ঝিলিক পড়েছে। কিন্তু তার আসল সৌন্দর্য তার আটসাঁট গড়নে—সাঁওতাল মেয়ে দেখে যেমন মনে হয় এর দেহ তৈরী হয়েছে গয়ার কালো পাথর দিয়ে। পেটে পিঠে কোনও জায়গায় এক চিমটি ফালতো চর্বি নেই। আলগোছে কোমরে জড়ানো এর শাড়ির আঁচল কোমরটিকে যা ক্ষীণ করে দিয়েছে দিল্লীর তন্বঙ্গী তার ইজের-বন্ধ কষে বাঁধলেও এ ক্ষীণ কটি পেত না।

প্রথম তরুণ বয়সে গুল বাহাদুর যখন সবে বুঝতে আরম্ভ করেছেন যুবতীর দেহে কি রহস্য লুক্কায়িত রয়েছে, তখন তাঁর এক ইয়ার তাঁকে একখানা চিত্রিত ইউসুফ-জোলেখার বই দিয়েছিল। পাতার পর পাতা উল্টে সে বইয়ে তিনি দেখেছিলেন শিল্পী কি ভাবে প্রতি পাতায় জোলেখার সৌন্দর্য ধীরে ধীরে উদ্ঘাটন করেছেন। প্রতি ছত্র, প্রতি রঙ তাঁর অঙ্গে অঙ্গে তখন কি অপূর্ব শিহরণ এনে দিয়েছিল। রোমাঞ্চ-কলেবরে কাটিয়েছিলেন অর্ধেক যামিনী।

আজ ঠিক সেই রকম বিদ্যুতের প্রতিঝলক যেন মেয়েটির সৌন্দর্য পাতার পর পাতা খুলে তাঁর মুগ্ধ আঁখির সামনে তুলে ধরছিল। আর চতুর্দিকে তখন ঝঞ্ঝা-বাত্যার প্রলয় নর্তন। তারই মাঝখানে এই কমলিনীর ক্ষণে ক্ষণে আত্মবিকাশের মন্দমধুর প্রস্ফুরণ।

কিন্তু আজ আর প্রথম তারুণ্যের সেই রোমাঞ্চ শিহরণ গুল বাহাদুরের দেহে মনে হিল্লোলিত হল না। আজ এই সৌন্দর্যের পট পরিবর্তন তিনি গভীর তৃপ্তির সঙ্গে গ্রহণ করলেন—শান্ত মনে, সমাহিত চিত্তে।

বিদ্যুতালোকে গুল বাহাদুরের চোখে চোখ পড়তে রমণী শুধালো, 'কি দেখছ গোসাঁই?'

অতিশয় অনাবশ্যক প্রশ্ন। কণ্ঠে লজ্জা দেবার কিংবা পাওয়ারও কোনো রেশ নেই। এমন সময় আকাশ থেকে কক্কড় করে নামলো শুকনো দেশের ভরাট অকাল বৃষ্টি। গুল বাহাদুরকে কোনও উত্তর দিতে হল না।

মেয়েটি মাটিতে বসে দু' হাতে হাঁটু জড়িয়ে গুল বাহাদুরের মুখের দিকে আবার তাকালো। চিবুক যে জোড় হাঁটুর উপর রাখবে তার যেন উপায় নেই। মাঝখানে সুবিপুল মৃন্ময় মর্ম-বিগ্রহ যুগল।

হঠাৎ রমণী দু' বাহু তুলে খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে গুল বাহাদুরকে শুধালো, 'গোসাঁই, তোমার বয়স কত?'

যেন প্রশ্নের জন্য তৈরী ছিলেন। কিন্তু উত্তর না দিয়ে পাল্টে শুধালেন, 'কোন্ বয়স?'

রমণী হেসে উঠলো। বললো, 'সে আবার কি? বয়স আবার কত রকমের হয়?'

গুল বাহাদুর বললেন, 'অনেক রকমের হয়। আমার বয়স তেইশ।' গদরের নৈরাশ্য এই নাতিদীর্ঘ তেইশকে যেন দীর্ঘ তেইশে সম্প্রসারিত করে দিয়েছে।

এবারে রমণী খল খল করে হেসে উঠলো। 'ইয়া আল্লা, ইয়া রসুল, তোমার বয়স তেইশ। আমার-ই তো এক কুড়ি হয়!'

গুল বাহাদুর চমকে উঠলেন। এ মেয়ে কি মুসলমান? শুধালেন, 'তোমার নাম কি?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে বললো, 'তোমার যেমন অনেক রকমের বয়স, আমার তেমনি অনেক নাম। লোকে বলে "মিছার মা"।'

'সে আবার কি?'

'বুঝলে না? আমি সাচ্চা মা নই, তাই আমি মিছার মা।'

বৃষ্টি নেমেছে দেখে গণি মিয়া গাড়ি-গোরুর খবর নিতে বাইরে যাচ্ছিল। এতক্ষণ সে কোন কিছুতে কান দেয়নি। এবারে একটুখানি দাঁড়িয়ে গুল বাহাদুরের দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমাকে যা-তা বলছে, বাবাজী। ওর নাম আসলে মিঠার মা।'

মিঠার মা গণির দিকে তাকিয়ে রাগত কণ্ঠে বললে, 'হ্যাঁরে গণ্যা, আমি যা-তা বলি? আমি মিছার মা না তো কি? আল্লার কিরে কেটে ক' তো?'

গণি বাইরে যেতে যেতে বললে, 'তা তুই নিকে করে বাচ্চা বিয়োলেই পারিস।' গুল বাহাদুরকে বললে, 'আসলে ওর নাম মোতী।'

গুল বাহাদুর ভাবলেন, 'এ-নাম যে দিয়েছে সে আর যাই হোক্ মিছের বাপ নয়—সত্যি নামই দিয়েছে। কিন্তু এর জাত কি তার হদিস গুল বাহাদুর তখনও পেলেন না।

কিন্তু এক মুহূর্তেই পাওয়া গেল। তাও অনায়াসে।

আনন্দী বললে, 'দাদু, জল খাব।'

মোতী শুনতে পেয়েছে। ভাবখানা যেন শুনতে পায়নি।

গুল বাহাদুর বললেন, 'মিঠার মা, একে একটু পানি খেতে দাও।'

মোতীর মুখ শুকিয়ে গেল। একটু শুকনো হাসি হেসে বললে, 'আমি যে মুসলমান।'

গুল বাহাদুর বললেন, 'তুমি পানি দাও।'

মোতী চীনে মাটির বাটিতে করে আনন্দীকে জল দিলে। সঙ্গে দুটি বাতাসা। গুল বাহাদুরের কাছে এসে বললে, 'এ তো তোমার ছেলে নয়, ঠাকুর। কার ছেলের জাত মারছো?'

এই জাত মারামারিতে গুল বাহাদুর একটু বিরক্ত হয়েছিলেন। বললেন, 'শিবু মোড়লের ছেলে। ও জাত—'

আনন্দের চোটে আনন্দীকে জড়িয়ে ধরে মোতী বললে, 'কোজ্জাব মা, তুই শিবুর ব্যাটা? তাই! কি খাবি বল্?'

মিঠার মা ভারী খুশি। অচেনাজন চেনা লোককে যখন চেনে তখন আর সে অচেনা নয়। আসলে তাও নয়—চেনা-অচেনার পার্থক্য মিঠার মা কখনও করেনি। মোতী খুশি হয়েছে, কথা কইবার মতো দুজনারই একজন চেনা লোক পাওয়া গেল বলে। গুল বাহাদুরকে বললে, 'ওর কথা আর তুলো না, গোসাঁই, ওর মত হতচ্ছাড়া হাড়হাভাতে এ মুল্লুকে দুটো ছিল না। ক' বছরের কথা? আমার সোয়ামী রেখেছে রোজা, জষ্ঠি মাসের গরমে। ইফতারের জন্য আমি করেছি শরবৎ। র র, থাম্ থাম্ বলতে না বলতে শিবু মেরে দিল বেবাক ঘটি। ওর আবার জাত। ওর জাত মারে কে?'

তারপর গুল বাহাদুরের প্রায় গা ঘেঁষে বসে ফিস্ ফিস্ করে বলতে আরম্ভ করলো, যেন কতই না লুকনো কথা, 'ওর জাত ছিল সোনা বাঁধানো। এক ঘটি তেঁতুলের শরবৎ ঢাললে তার জেল্লাই বাড়ে বই কমে না। আর আসলে ছিল, আমারই মত বদ্ধ পাগল। জানো আমার

www.BanglaBook.org

বিয়ের দিনে এক জালা তাড়ি খেয়ে এসে জুড়ে দিল কান্না। আমার বাবা নাকি তাকে বলেছিল আমার সঙ্গে তার বিয়ে দেবে। সবাই হেসে গড়াগড়ি। শেষটায় আমার মামা বললে, "তা মোড়ল, বিয়ে করবে তো তোমার পাটরানীকে খবর দাও, তিনি এসে বাঁদী বরণ করে নিয়ে যাবেন!" যেই না শোনা অমনি শিবু জল। নেশা কেটে পানি হয়ে গেল। শিবুর বউ ছিল এ তল্লাটের খাণ্ডার। মারমুখী বঁটিদা। তারপর শিবু গলায় ঢোল ঝুলিয়ে শুরু করল নাচতে। পাঁচখানা গাঁয়ের লোককে সেদিন যা হাসিয়েছিল। বিয়ের পর আকছারই আসতো আমাদের বাড়িতে। "কই গো নাগর" বলে আমার সোয়ামীর হাত থেকে হুঁকো কেড়ে নিয়ে একদমে দিত ছিলিম ফাটিয়ে। আসলে ও খেত বড়তামাক।'

গুল বাহাদুরের দুঃখ আরও বেড়ে গেল। এরকম একটা গুণরাজ খান চলে গেল! আর কেউ যেতে পারলো না?

মোতী আরও গলা নামিয়ে বললে, 'কিন্তু জানো ঠাকুর, আমার সোয়ামী চলে যাওয়ার পর একদিনও এ বাড়িতে আসেনি। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াত। একদিন বাঁধের কাছে ধরা পড়ে গেল। তখন আমায় মনের কথা বললে। ওরা দুজনে নাকি কোম্পানীর সঙ্গে লড়তে যাবার মতলব করেছিল। তারপর শিবু কোথায় উধাও হয়ে গেল। ফিরে এসে বেশী দিন বাঁচলো না। কিন্তু ওসব কথা আর কেউ জানে না।'

বাইরে আস্‌মান-ফাটা বরসাৎ নেমেছে, হাওয়ায় মাতামাতি বন্ধ হয়ে গিয়ে চাল দিয়ে জলের ধারা ঝালরের মত ঝুলে পড়ছে। গণি মিয়া দাওয়ায় বসে আছে গালে হাত দিয়ে। বাইরে জলের ধারার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল মিঠার মা তার বড় ডাগর চোখে—শুকনো চোখে।

হঠাৎ হেসে উঠে বললে, "লোকে যে আমায় পাগলী বলে, ভুল বলে না। তুমি পায়ের ধুলো দিয়েছ এ বাড়িতে, আর আমি একবার জিজ্ঞেসবাদও করছিনে, তোমার সেবার কি হবে?"

গুল বাহাদুর তাড়াতাড়ি বললেন, 'তার জন্যে তুমি চিন্তে করো না, মিঠের মা। গাড়িতে চিঁড়ে মুড়ি আছে। না হয় তুমিই কিছু দেবে।'

অবাক হয়ে মোতী শুধালে, 'তুমি জাত মানো না?'

একটুখানি ভেবে নিয়ে গুল বাহাদুর বললেন, 'আমার ধর্মে জাত মানামানি বারণ।'

মোতী প্রথম একটু অবাক হয়ে তাকাল। তারপর বললো, 'বুঝেছি। খুউব যারা উঁচুতে উঠে যায়, তারা বোধ করি ওসব আর মানে না। আমার বাপের বাড়ির গাঁয়ের গাঁয়ে বামুনরা থাকতো। ভয়ঙ্কর-জাত-বামুন। আমার বাবা বলতো, তাদের কেউ কেউ নাকি জাত মানতো না! বাবার হাতে তামাক খেত।'

গুল বাহাদুরের জানবার ইচ্ছে হল এই ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারটা মোতী কোন্ চোখে দেখে। শুধালেন, 'এ জিনিসটে কি ভালো?'

মোতী তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, 'কি জানি—ভালো না মন্দ। যার যেমন খুশি। আমাদের পীর সাহেবও তাঁর বীবীর হাতে ছাড়া খান না। ভালোই করেন নিশ্চয়ই। তিনি যা জায়গা-বেজায়গায় নিত্যিনিত্যি আড়াই কুড়ি দাওয়াত পান, ওসবের সিকিটাক খেলেও দেখতে হত না। ঐ হোথায় বাসা বাঁধতে হত। সেখানে আবার বাবুর্চীখানা নেই।' বলে মিটমিটিয়ে হাসতে লাগল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গুল বাহাদুর বুঝতে না পেরে বললেন, 'কোথায়?'

ডান হাতে আঁচল দিয়ে মুখ চেপে, বাঁ হাতে খোলা দরজা দিয়ে কোথায় যেন দেখিয়ে দিলে। গুল বাহাদুর তবু বুঝলেন না।

'গোরস্তান, গো, গোরস্তান। ঐ যেখানে মিছার বাপও ঘুমুচ্ছে।'

গুল বাহাদুর মরমী, দরদী লোক নন—অন্তত এই তাঁর বিশ্বাস। তবু শুকনো মুখে বললেন, 'কেন তুমি এ দুঃখের কথা বার বার তুলছ মিঠার মা?'

মোতী যেন আশ্চর্য হয়ে গেল। দু'হাত জুড়ে বললে, 'মাপ করো, গোসাঁই, কিন্তু দুঃখের কথা বললো কে? ও তো ওখানে বেশ আরামে ঘুমুচ্ছে। আর যাবার সময় ও তো ভারি হাসি মুখে গিয়েছে। চোখ বুজলো, কিন্তু মুখের হাসিটুকু মিলালো না। জিজ্ঞেস করো না, এই গাঁয়ের পাঁচজনকে, যারা তাকে গোসল করালে কাফন পরালে।'

'থাক।'

'হ্যাঁ, থাক। দাঁড়াও, আনন্দীর গায়ে একটা কাঁথা চাপা দিয়ে আসি।'

তারপর দুজনেই অনেকক্ষণ চুপচাপ।

গুল বাহাদুর মাঝে মাঝে খোলা দরজা দিয়ে দেখছিলেন, জল ধরার কোনও চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে কি না। মোতী লক্ষ্য করে বললে, 'সে আশা ছেড়ে দাও আজ। জল ধরলেও বেরতে পারবে না। এ গাঁ ও গাঁর মাঝখানে যে খোয়াই তার ভিতর বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পরও জল যা তেড়ে বয় তাতে হাতী ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আর কতশ' ''দ''। একবার একটাতে মজে গেলে বিনা মেহন্নতে বেরিয়ে যাবে এক ঝটকায় ঐ দূরের অজয়ে, তবে জানটা আর সঙ্গে যাবে না। না, থাক্। ওসব কথা তুমি ভালোবাসো না। আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়। সামলে-সুমলে কথা বলতে হয়।'

গুল বাহাদুর বললেন, 'তুমি তো কিছু খেলে না।'

'আমি তো দিনের বেলা খাই নে।'

'সে কি? তামাম বৎসর রোজা রাখো নাকি?'

'ঐ দুই ঈদের ছটা দিন বাদ দিয়ে। তবু দেখো তো গতরখানা।'

ছাড়পত্র পাওয়ার পূর্বেও গুল বাহাদুর অনেকবার সীমা লঙ্ঘন করেছেন, তবু নতুন করে 'গতরখানা' দেখে খুশিই হলেন। কোনও প্রকারের সহানুভূতি জানাবার প্রয়োজন বোধ করলেন না। বললেন, 'কার ওজন কতখানি তাই মাপবার জন্য ভগবান দুঁড়ি-পাল্লা নিয়ে স্বর্গে বসে থাকেন না।'

মোতী বললে, 'হক্ কথা। কিন্তু আমাদের একটা মুর্শীদীয়া গীত আছে ঐ নিয়ে। শুনবে?' বলেই গুন গুন করে ধরলে—মিষ্টি গলায় কিন্তু কেমন যেন কান্না-ভর-ভর সুরে—

দীপ নাই শলিতা নাই,
জ্বলে শখের বাতি
কইয়ো গিয়া মুরশীদের ঠাঁই,
জ্বলে দিবা জ্বলে রাতি
কইয়ো গিয়া ও ভাই—

ঘুরে ফিরে, এখানে ধরে, ওখানে ছেড়ে, আবার নূতন করে ধরে মোতী অনেকক্ষণ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ধরে গানটি গাইল। সমস্ত প্রাণ দিয়ে। ঝরঝর বারিধারা যে রকম সহজ পথে আকাশ থেকে নেমে আসে, এর গানও হৃদয়ের উৎস থেকে নেমে এসে ছড়িয়ে পড়লো চতুর্দিকে। রসকষহীন গণি মিয়া পর্যন্ত সরে এসে চৌকাঠের কাছে বসেছে।

গুল বাহাদুর গানের পুরো অর্থ বুঝতে পারলেন না, কিন্তু রস পেতে খুব যে অসুবিধে হল তা নয়। বাচ্চারা যে রকম গল্প শোনার সময় ভাষার দৈন্য কল্পনা দিয়ে পুষিয়ে নিয়ে পুরো রসই পায়, নূতন ভাষা শেখার সময় বয়স্ক লোকও তাই করতে পারে, যদি যে ইতিমধ্যে কল্পনা-শক্তি হারিয়ে না ফেলে থাকে। 'জ্বলে শখের বাতি' বলার সময় মোতীর দেহ যেন আরও সুন্দর হয়ে দেখা দিচ্ছিল, আর 'দীপ নাই শলিতা নাই' গাঁইবার সময় মোতীর চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, গুল বাহাদুরও সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলেন।

তবু বললেন, 'বুঝিয়ে বলো।'

'এতে আবার বোঝাবার কি আছে! গুরুকে খবর পাঠাচ্ছি, মহব্বৎ দরদের তেল শলতে নেই ভিতরে, তবু দেহের বাতি জ্বলছে। তা আবার খামোখা দিনের বেলাও জ্বলে। তাই তো তোমাকে বলছিলুম, "গতরটার পানে চেয়ে দেখো"।'

গুল বাহাদুর মনে মনে বললেন, 'দেশের প্রতি ভালোবাসা, আত্মোৎসর্গ করার তেল শলতে তৈরী করেই আমরা জ্বালিয়েছিলুম গদরের প্রদীপ। সে মিথ্যা, মায়া ফানী।'

কিন্তু মোতীর এই সুন্দর দেহ! এর ভিতর সুন্দর হিয়ার প্রদীপ নেই—অসম্ভব, সম্পূর্ণ অসম্ভব।

বললেন, 'মোতী, সবই ভগবানের দান। তাচ্ছিল্য করতে নেই। রোজা ভালো জিনিস, কিন্তু তারও বাড়াবাড়ি করতে নেই। মীরাবাঈয়ের ভজন তুমি শুনেছ,

'নিত্য নাহিলে হরি যদি মিলে
জল-জন্তু আছে ঢের
কামিনী ত্যাজিলে হরি যদি মিলে
তবে হরি খোজাদের।'

মোতী গদগদ কণ্ঠে বললে, 'এ তো ভারী মধুর, গোসাঁই। আমি কখনও শুনিনি।'

যমুনার পারে রাজপুতানার এক বৈরাগী মীরার ভজন গাইত। গুল বাহাদুর আনমনে তার গান শুনেছেন, মাঝে-মধ্যে, কিন্তু সে গান যে তাঁর মনের মধ্যে বাসা বেঁধে আছে, তা তিনি নিজেই জানতেন না। ভক্তিরস, ভাবালুতা গুল বাহাদুর কখনও খুব নেকনজরে দেখেননি। বাড়াবাড়ির ভয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আজ তবে চলি, মিস্তের মা। খোয়াইয়ের জলটা আমার দেখবার ইচ্ছে আছে। গণি আর আনন্দী রইল। কাল সকালে গাড়িতে করে পাঠিয়ে দিয়ো।'

মোতী বাধা দিল না। গোঁয়ারদের নিয়ে তার জীবনের কেটেছে অনেকখানি—তার বাপ-ভাইরা ছিল এক একটি দুঁদে গোঁয়ার।

শিমুলতলায় এসে শুধু গম্ভীর কণ্ঠে বললো, 'আচ্ছা গোসাঁই, একটা কথার উত্তর দেবে? এই গণির স্বভাব-চরিত্র কি তা তুমি জানো না। সে আমার বাড়িতে থাকলে তোমার কোনও আপত্তি নেই। সে আমাকে নিয়ে যা-খুশি করুক। কিন্তু তুমি থাকলেই আস্‌মান মাথার উপর ভেঙে পড়ে। কেন বলো তো। ছোটজাতে ছোটজাতে যা-খুশি করুক—নয় কি?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সত্যি বলতে কি, গুল বাহাদুর পরিস্থিতিটা এভাবে চিন্তা করে দেখেন নি। কিন্তু মোতীর কথাগুলো এমনি সোজাসুজি তাঁর কানের ভিতর দিয়ে মগজের উপর ঠনাঠন হাতুড়ী পিটিয়ে দিল যে তাঁকে চিন্তা করে কথাগুলো বুঝতে হল না। প্রথমটায় থ মেরে দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'তোমায় সত্যি বলছি, আমাকে বিশ্বাস করো, আমি অতখানি চিন্তা করে এ-ব্যবস্থা করিনি। বোধ হয়, এ ব্যবস্থা আমাদের অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর তুমি যে কারণটা দেখালে সেটাও হয়তো ঠিক, কিন্তু আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো তবে বলবো, আমি ভদ্রলোক সাধারণ লোক সকলের সঙ্গে মিশেছি এবং এ-বাবদে আমি গণি মিয়াদের ঢের-ঢের বেশী বিশ্বাস করি। এদের হ্যাংলামো অনেক কম। গরীবের সুন্দরী মেয়েকে মোকায় পেলে "ভদ্রলোক"-এর মাথায় বদ-খেয়াল চাপবেই। ভদ্রলোকের মেয়ে হলেও তাই—তবে সেখানে একটু লাইয়ের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। তাই দেখো, ভদ্রলোকের মেয়েকেও আমরা চাকর-বাকরের হেপাজতিতে রাখা পছন্দ করি।—আর—'

'থামলে কেন? বলো।' কঠিন গলা একটু মোলায়েম হয়েছে বলে মনে হল।

'আর গণি ভালো-মন্দ কিছু একটা করতে গেলে তাকে যে রকম ঠাস করে তুমি চড় মারতে পারবে, আমাকে কি—'

ধমক দিয়ে বললে, 'থাক্। কে কাকে চড় মারতো কে জানে!' বিকেল বেলার বৃষ্টিশেষের কনে-দেখার আলো সবটুকু মুখে মেখে এতক্ষণ-গোপনরাখা তার সবচেয়ে মিষ্টি গলায় বললে, 'তবে এসো ঠাকুর।'

* * *

জলের তোড় গুল বাহাদুর অতি উত্তমরূপেই দেখলেন। বাদশা মুহম্মদ তুগলুক যে রকম দিল্লীর জাহানপানা শহরে সাততলা মঞ্চের উপর বসে তাঁর হাজার হাজার সৈন্যস্রোত বয়ে যেতে দেখতেন অর্থাৎ একটা উঁচু ঢিপির উপর বসে জলের তোড়; স্রোতের দু' উঁচু উঁচু ঢিপির উপর রাগী ঢেউয়ের ছোবল তাবৎ বস্তুই দেখলেন, এবং তার চেয়ে উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করলেন, মোতীর—মিছরি মা'র কথা গল্প নয়। এর যেখানে হাঁটুজল সেখানেও দাঁড়ায় কার সাধ্য?

সন্ধ্যের সময় আবার বৃষ্টি নামলো। ষোড়শীর রাত কিন্তু মেঘে মেঘে সব অন্ধকার। সমস্ত রাতটা কাটাতে হল ঢিবির উপর।

অভিসম্পাত দিতে দিতে বললেন, 'মহাজনগণ বলেছেন, মেয়েদের বুদ্ধিতে চলো না। হক্ কথা। কিন্তু না চললে কি হয় তাও বেশ টেরটি পেলুম। ওদের কথা শুনলে বিপদ, না শুনলে আরও বিপদ। এ জাতটাই বজ্জাৎ।'

॥ ছয় ॥

কৌতূহল চেপে না রাখতে পেরে পাণ্ডোরা খুলে ফেললে কৌটাটি, আর অমনি তার থেকে পিল পিল করে বেরোতে লাগলে দুঃখ, দৈন্য, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, আরও কত কী—আর তারই চোখের সামনে ছড়িয়ে পড়লো ভুবনময়! পাণ্ডোরা ভয়ে ভয়ে ভিরমি যাব-যাব করছে তখন সর্বশেষ বেরলো—আশা। তারই জোরে মানুষ সব দুঃখদৈন্য সয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আত্মহত্যার দৃঢ় দড়িতে নিজেকে না ঝুলিয়ে দিয়ে ঝুলতে থাকে সেই আশার ক্ষীণ সুতোটিতে।

সুলেমান যখন তাঁর স্বাধিকার-প্রমত্ত জিন্‌কে শাস্তি দিয়ে বোতলে পুরে, সমুদ্রে ফেলে দেন তখন তাকে পাণ্ডোরার শেষ দৌলতটি নিতে বাধা দেননি। সেই তাঁর চরম করুণা। জিন্নি যদি বোতলের ভিতর বন্দীদশার প্রথম প্রহরেই জানতে পেত তাকে ক'শ বছর ধরে বোতলের ভিতর প্রহর নয়—শতাব্দী গুনতে হবে, সে নিশ্চয়ই থ্রম্বসিসে মারা যেত।

গুল বাহাদুর যদি চিকনকালাতে আশ্রয় নেবার দিন জানতে পেতেন, তাঁকে ক'যুগ ওখানে কাটাতে হবে, তাহলে তিনি নামাবলীতে ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়তেন। পাণ্ডোরার যে ক্ষীণ অংশটি নিয়ে তিনি নামাবলী গায়ে দিয়েছিলেন, সেটি ওঁরই মত এত জরাজীর্ণ হয়ে গিয়েছে যে ওটিকে আর পরা চলে না।

কিন্তু
কেশের আড়ালে জৈছে
পর্বত লুকাইয়া রৈছে

ঠিক তেমনি তাঁর দিন-আনি-দিন-খাই-য়ের আড়ালে আশা-নিরাশা সবকিছুই ঢাকা পড়ে গিয়েছিল বলে সেটা দিব্য যেন ক্লোরফর্ম কিংবা আফিঙের কাজ করে যাচ্ছিল। পরম ধার্মিকজনও যখন দিনযামিনী এটা-সেটার চিন্তায় মশগুল থেকে শেষের দিনের কথা সম্বন্ধে অচেতন হয়ে যেতে পারে, তখন সামান্য প্রাণী গুল বাহাদুর যে পলাশতলায় খাটিয়ার উপর শুয়ে বছরের পর বছর কাটিয়ে দেবেন তার আর বিচিত্র কি?

কালটাও ছিল ধীরমন্থর। কারও সঙ্গে দেখা করতে হলে তোড়জোড় করতেই লেগে যেত তিন মাস। বিয়ের আলাপ পাকাপাকি করতে নিদেন তিন বছর। এমন কি মরার সময় গঙ্গাযাত্রায় বেরিয়ে সেখানে দিনসাতেক না কাটালে মুরুব্বীরা রীতিমত বেজার হতেন। অত তাড়া কিসের রে বাপু? দু-পাঁচ দিন হরিনাম শুনাব, চন্দন বেটে ধীরেসুস্থে সর্বাঙ্গে হরিনাম ছাপা হবে, ইষ্টিকুটুম খবর পেয়ে ঘরসংসার গুছিয়ে-গাছিয়ে দেখা করতে আসবে, শুনতে পাবি কবে যাবি, ক'দিন আর আছিস তাই নিয়ে চাপা গলায় আলোচনা হচ্ছে, বাজী ধরা হচ্ছে;—তা না, চললি হুট করে যেন ডাক পড়ার পূর্বেই হাড়-হাবাতে আপন হাতে আসন পেতে বসে গেল যজ্ঞির দাওয়াতে। কিংবা যেন বাসরঘরে পাঁচজনের সামনে হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে ফেললি কনে বউয়ের ঘোমটাখানি। কিংবা তারও বেশী।

হিসেব করো দিকিনি গুল বাহাদুর, শান্ত মনে—শুদ্ধ-বুদ্ধ চিত্তে। ক'বছর হল? দশ, বিশ, ত্রিশ? পিছনের দিকে না সামনের দিকে? তুমি বসে আর তারা সামনে দিয়ে চলে গেল, না তুমি তাদের সঙ্গে ছুটে চলেছ, না পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছ? না তুমি কাজের মাঝখানে এমনি যোগসাধনার তুরীয় ভাব অবলম্বন করেছিলে যে কাল, না কাল কেন, হেন স্বয়ং মহাকালই ধূর্জটির জটার ভিতর প্রথম উর্বশীর মত বেশ খানিকটা নেচে কুঁদে, তারপর গঙ্গার মতন এদিক ওদিক পথ না পেয়ে বিষ্ণুর মতন উত্তম ডানলোপিলোর বিছানাতে অনন্ত শয়নে নেতিয়ে পড়েছেন?

কে জানে কি হয়? যেখানে বছরে একদিনও স্মরণ করতে হয় না আজ কোন্ তারিখ, সেখানে একটা বৎসরই একদিন। আর যেখানে দিনে বত্রিশবার স্মরণ করতে হয়, আজ অমুখ তারিখ, সেখানে একটা দিনই এক বৎসর। কে জানে সময় কোন্ দিক দিয়ে যায়?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দশ, বিশ, ত্রিশ বৎসর।

এই মোতীর সঙ্গেই আবার দেখা হতে লেগে গেল দেড় মাস।

সকাল থেকেই পূবের আকাশে মেঘ জমে উঠেছে—সাঁওতাল দেশের সাঁওতালী মেয়ের গায়ের রঙ মেখে। মেঘের পর মেঘ জমেই উঠছে। যেন আকাশের ভরা গেলাসে পর্জন্য এক এক ফোঁটা করে জল ঢালছেন আর দেখছেন, এইবার উছলে পড়ল কি না। ক্ষণে ক্ষণে কালো মেঘের উপর দিয়ে খেলে যাচ্ছে বিদ্যুতের ঝলমলানি। যেন ঐ সাঁওতালনীরই শ্যামবদনে টগর-ফুলের সফেদ হাসি। কিংবা যদি ইন্দ্রপুরীতেই ফিরে যাই তবে মনে হবে, মেঘের কালো টানার উপর উর্বশী বিদ্যুতের রুপোর পোড়েন টানছেন, বাসররাতের কাঁচুলির কিংখাপ বুনতে। নাঃ! এ সব তুলনাই অতি কাঁচা। মোক্ষম তুলনাটির চড় বিশ্বসাহিত্যের গালের উপর মেরে দিয়ে গিয়েছেন রাজা শূদ্রক। বিদ্যুৎ যেন শ্যামাম্বু নীলকণ্ঠের গলা জড়িয়ে গৌরীর শুভ্রধবল বাহুলতা।

গৌরী ভুজলতা যত্র বিদ্যুল্লেখেব রাজতে

হায় রে শূদ্রক! একটু টেনে সামলে উপমাগুলো ছাড়লে না কেন হে পৃথ্বীরাজ, কাব্যসম্রাট? এ যুগের মধ্যমজনকেও যে একদিন রসসৃষ্টি করে নিদ্ধ সঞ্চয় করতে হবে সেটা কি তিনি খেয়ালই করলেন না? রাজা হলেই কি এ রকম দান করতে হয়? তাই দেশের রাজা হাতিমতাই অন্নদান করে হয়েছিলেন অন্নরাজ, কিন্তু তিনিও তো বীচির ধান খাইয়ে ভবিষ্যৎ বংশীয়দের নিরন্ন করে যাননি। উপমার বেলা শূদ্রক শেষে নবান্নের বীচিও যে খতম করে গেলেন।

তা যাক্। কিন্তু দয়াদাক্ষিণ্য, স্নেহ-প্রেম, বিশেষ করে আসঙ্গলিপ্সা—এ জগৎ থেকে এখনও লোপ পায়নি।

গুল বাহাদুর দেখলেন, তেপান্তরী মাঠ যেখানে ফালি হয়ে বাঁ দিকে ঢুকেছে, তারই অপর প্রান্তে, মেঘের আড়াল থেকে কে যেন বেরিয়ে এসে একটা উঁচু ঢিবির উপর ক্ষণিকের তরে দাঁড়ালে। মাঠ-ঘাট জনহীন। বৃষ্টি নামি-নামছি, নামি-নামছি করছে। এ অবেলায় লোকটার আহম্মুখী দেখে গুল বাহাদুর ভুরু কোঁচকালেন।

আধা আলো-অন্ধকারে বেলা কতখানি গড়িয়েছে ঠাহর হচ্ছে না। ঘরে ঢুকে গুল বাহাদুর আনন্দীকে শুধালেন, 'কি খাবে আনন্দী?' দিল্লীতে 'তুই' 'তু' শব্দটা প্রায় উঠে গিয়েছে।

আনন্দীর আটপৌরে পোশাকী একই মেনু। বললে, 'খিচুড়ি আর আলুর দম।' ঐ একটি মাত্র রান্না যার সঙ্গে দিল্লীর রান্নার কিঞ্চিত ঐক্যসখ্য আছে—গরমমশলার কৃপাতে—অবশ্য আনন্দীর অজানতে। গুল বাহাদুর সাজ-সরঞ্জামের চতুরঙ্গ বাহিনী তোড়জোড় করতে যোগাড় করতে লাগলেন। আনন্দী কখনও আয়ের আদর পায়নি। পাওয়ার মধ্যে পেয়েছে বাপের ধাঁতানি। সেও এটা সেটা যোগান দিতে লাগল।

বৃষ্টি নামবার আগে আরও কিছুটা জল এনে রাখলে ভালো হয় ভেবে গুল বাহাদুর ঘর থেকে বেরিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। দাওয়ার এক প্রান্তে খুঁটিতে হেলান দিয়ে মোতী বসে।

'তুমি!'

নিরুত্তর।

'কখন এসেছ? ডাকলে না কেন?'

www.BanglaBook.org

দেওয়ালের থেকে চোখ না ফিরিয়েই বললে, 'তুমি আমাকে টিপির উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভিতরে চলে গেলে কেন?'

গুল বাহাদুর হেসে বললেন, 'তাজ্জব কী বাত! অতদূর থেকে আমি তোমাকে চিনবো কি করে? আমি ভাবলুম—'

'দত্যি, দানো, মামদো! তোমাদের কাছে সব মুসলমানই মামদো, না?'

গুল বাহাদুর বিরক্ত হয়ে ভাবলেন, 'এ কী জ্বালা! হিন্দু নই, তবু হিন্দু অপরাধের হিস্যে আমাতেও অর্সায়?'

গম্ভীর মুখে বললেন, 'তোমাকে আমি বলিনি, আমার ধর্মে জাত মানামানি বারণ। চলো ভিতরে, ঐ দেখ বৃষ্টি আসছে।'

এবারে মারাঠা সৈন্যের অতর্কিতে আক্রমণ নয়। দূরদিগন্ত থেকে হেলেদুলে বিলম্বিত তালে এগিয়ে আসছে আকাশ-জোড়া পাতাল-ছোঁয়া শ্যামসুন্দর মেঘ-বৃষ্টি। এই রকম অগণিত করীযূথ সমাবৃত গাঙ্গেয় চমূ অগ্রসর হচ্ছে শুনেই আলেক্ষান্দর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সমীচীন গণনা করেছিলেন।

এবারে মোতী খিলখিল করে হেসে উঠলো। কিছুতেই থামতে চায় না। যেন পেটের ভিতর হামানদিস্তে দিয়ে কেউ পাথর কুটছে! সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গে দুলে-দুলে ফুলে-ফুলে কাঁপন। গায়ের বসন যেন সে কাঁপন সামলাতে না পেরে পড়ে যেতে চায়। কার যেন বিরহ-বেদনায় কনকবলয়ভ্রংশ, অর্থাৎ বাজু-বন্দ খোল খোল যাউত হয়েছিল, আজ হাসির হররায় এ রমণীর বসনাঞ্চলপ্রান্ত বিস্রস্ত। এবং স্মরণ রাখা কর্তব্য, গ্রামাঞ্চলে অঞ্চল প্রায়শ উপকণ্ঠিত থাকে না।

চোখের জল মুছতে মুছতে বললো, 'ঠাকুর, তুমি মস্করা-ফিস্কিরি একেবারে বুঝতে পারো না। ওদিকে কথা কও পাকা পাকা। তুমি একটি আস্ত মেড়া।' তারপর গম্ভীর হয়ে বললে, 'আল্লা করুন, তুমি ঐ রকম মেড়াই থাকো।' আল্লার স্মরণে ডান-বাহু উঁচুতে তুলে আঁচল দিয়ে ঘোমটা টানলে। আজান শুনলে বাঙালী মুসলমান মেয়ে যে রকম করে থাকে।

ওদিকে তখন বৃষ্টির মোটা মোটা ফোঁটা গুল বাহাদুরের ধুলো-ভরা আঙ্গিনায় হরিন্নুটের বাতাসা ছড়াতে আরম্ভ করেছে।

গুল বাহাদুর নিজের অপ্রতিভ ভাব কাটাবার জন্য গলা একটু শক্ত করে বললেন, 'ভিতরে চলো।'

মিঠের মা মিশ্রির মিঠা। শক্ত। বললে, 'জোর করে টেনে নিয়ে যাবে নাকি?' সঙ্গে সঙ্গে হাত দু'খানি এগিয়ে দিয়ে বললে, 'নাও।' এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে উঠি-উঠি ভাব। টান দিলেই সুড়সুড় করে ভিতরে চলে যাবে।

গুল বাহাদুর দ্বিধায় পড়লেন। কি আর করেন? সুরটি যতদূর পারেন মমতাময় করে বললেন, 'মেহেরবানি করো।' 'মেহেরবানি' কথাটার আমেজ উর্দু এবং বাঙলাতে এক নয়। সে-কথা না জেনেও আশা করলেন, মুসমানের মেয়ে সুরটি ধরতে পারবে।

মোতী গুনগুন করে গান ধরে ভিতরে গেল। বুঝলো গুল বাহাদুরের হার হয়েছে, কিন্তু এ-লোকটা নিজে যখন বুঝতে পারেনি যে তার হার হয়েছে, তখন সে জেতাতে কি আনন্দ? আর হেরে যাওয়ার দুঃখের ছাপ যদি তার মুখের উপর পড়তো তাহলেই কি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মোতী আনন্দ পেত?

এবারে গুল বাহাদুরকে শুনিয়ে একটু উঁচু গলায় গাইলে,

ও মুর্শীদ তোমার লগে নাই তো অভিমান
আইলে আও, যাইলে যাও, ঠেলে মারো টান
ও মুর্শীদ নাই তো অভিমান।
বাচ্চারে যে ঠ্যালা মারলে কান্দ্যা পড়ে মায়ের কোলে
যতো মারো বাঁচ্যা উঠে তত পরাণখান।
ও গুরু নাই তো অভিমান।
তুলাধুনা কর‍্যা, মৌলা, ফেলাও না ফের জান।
করো না খান্ খান্।
জানুক না জাহান্।
মস্তান ফকিরে কয় হেন আমার মনে লয়
গুরুর মনে হৈল ভয়, পায়ে দিল স্থান।
ও মুর্শীদ গেল অভিমান।

এবারে গুল বাহাদুরের গীতটি বুঝতে কোন অসুবিধা হল না। কিন্তু খটকা লাগলো 'অভিমান' শব্দটি নিয়ে।

মোতী বললে, 'এতে আবার মুশকিল কোথায়? এই মনে করো আনন্দী যদি তোমার উপর রাগ করে খিচুড়ি আলুরদম না খেয়ে শুতে যায় তবে সে তোমার উপর অভিমান করল।'

গুল বাহাদুর বললেন, 'সে তো হল রাগ।'

মোতী বললে, 'তা নয়। যদি সে তখন তোমার ভাতে ছাই মিশিয়ে দেয় তবে হবে রাগ।'

এবারে গুল বাহাদুর অনেকখানি বুঝতে পেরে বললেন, 'ওঃ, তাই তুমি আমার উপর অভিমান করে বাইরে বসে ছিলে?'

মোতী উত্তর দিলে না।

গুল বাহাদুর শোধালেন, 'এ গীত তুমি কাকে শোনালে?'

মোতী নির্ভয়ে উত্তর দিলে, 'তোমাকে, মুর্শীদকে, আর কাকে?'

'তোমার মুর্শীদ কে?'

মোতী হেসে উঠলো। বললো, 'আজ দেখি, তুমি অনেক কথাই শুধাচ্ছো। কেন, হিংসে হচ্ছে নাকি? হ্যাঁ, আছে একজন। কিন্তু সে বড্ড বুড়ো। সব রসকষ শুকিয়ে গিয়েছে। আমার দিকে ফিরেও তাকায় না।'

গুল বাহাদুর বললেন, 'ছিঃ, গুরুকে নিয়ে কি এ ধরনের মস্করা করতে আছে?'

মোতী বললে, 'মস্করা কিসের? এই তো আমার সব। আমার জান ভরে দেবে মহব্বৎ দিয়ে সে তো সব গীতেই আছে। আর আমার শরীরটা? সে বুঝি কিছু নয়? গুরু আমার সব আশা পূর্ণ করবে না?'

গুল বাহাদুর নিরাশ হয়ে বললেন, 'তুমি সব সময় যেন হেঁয়ালিতে কথা কও। তোমার আশা যদি পাপে ভরা হয় তবে সেটাও গুরু পূর্ণ করবেন নাকি?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মোতী চিন্তা না করেই বললে, 'নিজেই জানি নে কি চাই। কখনও ইচ্ছে করে মা হয়ে ছেলে কোলে নিতে, কখনও বা স্বামী পেতে ইচ্ছে করে, আর কখনও মনে হয় দুচ্ছাই, এসব দিয়ে কি হবে? তার চেয়ে একটি নাগর পেলে হয়। ঐ যে রকম তোমাদের রাধা ঠাকুরাণী কেষ্ট-মুরারিকে পেয়েছিলেন। রসের সায়রে সুবো-শাম ডুবে থাকবো। আমার শরীর ওর শরীরে মিশে যাবে।'

গুল বাহাদুর হাসিমুখে বললেন, 'যাক বাঁচালি। মনের কেষ্টকে দিলের হরি বানিয়ে পড়ে থাকা। কোন বদনাম হবে না।'

অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মোতী বললে, 'ছোঃ! বদনাম! ডপকী রাঁড়ী। নিকে করি নে। একলা পড়ে আছি। আমার বদনাম তো লেগেই আছে। নাগর নিলে তার আর বাড়বে কি? মড়ার গোরের উপর এক মণও মাটি শ' মণও মাটি। আমি তাকে সাঁজ-সকাল কোলে নিয়ে দাওয়ায় বসবো—হাটে যাবার পথের পাশে।'

গুল বাহাদুর ভাবলেন, মেয়েটা বদ্ধ পাগল। তারপর ভাবলেন, কিন্তু এরকম সাদা যার দিল তার আর ভাবনা কি? এর ভিতর বাহির দুইই সাফ। বললেন, 'এসব খেয়ালী পোলাও খেয়ে তুমি খুব সুখ পাও, না? কিন্তু যততত্র বলে বেড়িয়ো না।'

মিঠার মা সেদিকে খেয়াল না দিয়ে শুধালে, 'তোমার সম্বন্ধে বেবাক বাৎ আমার শুনতে ইচ্ছে করে, কিন্তু বাবাজীদের তো ঘর-গেরস্তীর কথা শোধানো বারণ। তবে যদি অভয় দাও তয় একটি কথা শুধাই।'

গুল বাহাদুর হেসে বললেন, 'নির্ভয়ে জিজ্ঞেস করো। আমার কিচ্ছুটি লুকোবার নেই।' তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল গোঁফে চাড়া দেবার। কিন্তু গোঁফ তো আর নেই।

'তোমার বিয়ে-শাদী হয়নি?'

'না।'

'কারোতে মজোনি?'

'না। তবে লক্ষ্ণৌ থেকে একবার একটি বাঈজী এসেছিল। যেমন নাচতে পারতো, তেমনি গান জানতো, তেমনি ছিল চেহারাটি। তাকে বড় ভালো লেগেছিল।'

'তারপর কি হল?'

'কিছুই হল না। আমি অন্য কাজে জড়িয়ে পড়লুম। তারপর এখানে চলে এলুম।'

'ও। কোনও কেলেঙ্কারি করে ভেক নাওনি?'

বোষ্টমদের প্রতি গুল বাহাদুরের কোনও অহেতুক প্রেম ছিল না, কিন্তু তারা 'কেলেঙ্কারি' করলেই শুধু ভেক নেয়, এ ইঙ্গিতটা তাঁর ভালো লাগল না।

বললেন, 'কুল্লে বোষ্টমরা পাষণ্ড?'

'অত রাগো কেন? আমাদের মুসলমান পীরসায়েবদের দেখোনি? তাঁরা যে তাঁদের চতুর্দিকে আগুন জ্বালিয়ে রাখেন?'

'সে আবার কি?'

'ঐ, আমার মতো গোটা দশেক খাপসুরৎ ডপকী ছুঁড়ির মধ্যিখানে বসে ভাবখানা করেন, "হেরো, হেরো, আগুন আমারে ছোঁয় না"।'

'তারপর?'

'তারপর আবার কি, তারপর বিস্তর ঘি গলে যায়।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গুল বাহাদুর খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'আচ্ছা, তুমি অতশত বলছ-কইছ, শুনছ-শোনাচ্ছ কেন বলো তো? আসলে তোমার মতলবটা কি খুলে বলো তো?'

মোতী গালে হাত দিয়ে বসে ভাবছিল। বললে, 'মতলব কিছুই নয় গোসাঁই। আমি ভেবেছিলুম, তুমি নষ্টামি করে বেরিয়ে এসেছো। তোমাকে আমার ভালো লেগেছে। তোমার সঙ্গে নষ্টামি করে আমি নষ্ট হব। এই আমার শরীর, এই আমার দিল। ওগুলো যখন কোনও কাজেই লাগলো না, তখন না হয় ভেঙেই দেখি, কি হয়। তা আর হলো না। তুমি বড় সরল, বড় সাদা। তোমার সঙ্গে বনলো না।'

গুল বাহাদুর আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'ওটা মিথ্যে কথা। তোমার সবই ভালো। আমি অনেক দেখেছি, আমি ঠিক ঠিক বলতে পারি। অবশ্য আমার সঙ্গে বনলো কিনা সে অন্য কথা।'

মোতী আপত্তি জানিয়ে বললে, 'আমার যদি সবই ভালো তবে তাই হোক ঠাকুর। এবারে তোমাকে শেষ প্রশ্ন শুধাই। তোমার সংসারে মন বসলো কেন, সেইটে আমায় বলো।'

গুল বাহাদুর বললেন, 'সংসারে আমার রত্তিভর অরুচি হয়নি, মোতী। আসলে আমি শিবুর মতো গদরের সেপাই। তোমার স্বামীর যা হওয়ার কথা ছিল। লড়াইয়ে হেরে গা-ঢাকা দিয়েছি। ভেক নিয়েছি যাতে করে দুশমন চিনতে না পারে—আমি মুসলমান।'

* * *

লেখকের নিবেদন :

এখানেই 'এক পুরুষ' শেষ।

বইখানা 'তিন পুরুষ'-এ সমাপ্ত করার বাসনা ছিল; কিন্তু আমার গুরুই যখন 'তিন পুরুষ' লিখতে গিয়ে এক পুরুষে সমাপ্ত করে সেটিকে 'যোগাযোগ' নাম দিলেন তখন যাঁর কৃপায় 'মূক বাচাল হয়' তাঁরই কৃপায় এস্থলে 'বাচাল মূক হল'।

কবিরাজ চেখফ

উত্তম গুরুর সদুপদেশ পেলেই যদি সার্থক লেখক সৃষ্টি হতেন তবে ইহ-সংসারে আমাদের আর কোনও দুর্ভাবনা থাকতো না। কারণ আমার বিশ্বাস, এতাবৎ বহুতর গুরু অপ্রচার পুস্তকে নানাবিধ সদুপদেশ দিয়ে গিয়েছেন, এবং সদুপদেশতিয়াষী তথা সাহিত্যযশা-ভিলাষীরও অনটন এই বঙ্গদেশে নেই।

আমি সার্থক সাহিত্যিক নই, তবে কিছুটা লোকায়ত ('জনপ্রিয়' বললে বড্ড বেশি দম্ভভাষণ হয়ে যায়) বটি। ট্রেনে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর তিনি সোল্লাসে বলেছিলেন, 'আপনার লেখা পড়লেই পাঁচকড়ি দের কথা আমার মনে আসে।'

আমি সাতিশয় শ্লাঘা অনুভব করেছিলুম। আমি জানি আপনারা পাঁচজন পাঁচকড়িকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখেন না। যদিও শুধোই, বুকে হাত দিয়ে উত্তর দিন তো, পনেরো বছর বয়সে পাঁচকড়ি পড়ে আপনার পঞ্চেন্দ্রিয়-স্তম্ভন হয়নি? আপনার চৈতন্যকে এরকম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ একাগ্রমনা করতে পেরেছেন ক'জন লেখক? এবং স্বয়ং গীতা বলেন, চৈতন্যকে সর্বপ্রথম নিষ্কম্প প্রদীপশিখার ন্যায় একাগ্র করে তবে ধ্যানলোকে প্রবেশ করবে। স্বয়ং পতঞ্জলিও বলেন, ধ্যানের বিষয়বস্তু অবান্তর। তা সে যাক্। আসল কথা সে বয়সে পাঁচকড়ি আপনাকে এমনি একাগ্রমনা করে দিয়েছিলেন যে আপনি তখন দেশকালপাত্র ভুলে গিয়েছিলেন। এবং এটা যে আর্টের অন্যতম লক্ষণ সেটি সর্বজনবিদিত। তা হলে আজ আপনি পাঁচকড়ির নামে নাক সেঁটকান কেন? পাঁচকড়ি পড়ার পূর্বে সাত বছর বয়েসে আপনি রূপকথা পড়েছিলেন, আজ পড়েন না, কিন্তু তাই বলে তো আপনি ওর পানে তাকিয়ে বাঁকা হাসি হাসেন না, কেন?

টলস্টয় বলেন, যে বই সর্বযুগে সর্ববয়সের লোক পড়ে আনন্দ পায় সেই বইই উত্তম বই। সে রকম বই ইহসংসারে অতিশয় বিরল। টলস্টয় মহাভারতের নাম করেছেন। আমরা সম্পূর্ণ একমত। (তিনি তাঁর নিজের বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস 'যুদ্ধ ও শান্তি'র নিন্দা করেছেন। আমরা একমত নই)।

অতি অল্প লেখককেই টলস্টয় আর্টিস্ট বা সৃষ্টিকর্তা রূপে স্বীকার করেছেন। চেখফ তাঁদের একজন।[১] তাঁকে তিনি বলেছেন রিয়েল আর্টিস্ট—

পাঠক সেটি পরে সবিস্তর শুনতে পাবেন।

চেখফের দিকে তাকিয়ে আমার বিস্ময়ের অন্ত নেই।

প্রথম ছবি দেখি, রুশের এক গণ্ডগ্রামে ঘরের ছেলে চেখফ গাঁয়ের পাঁচজন মাতব্বরের চালচলন কথাবার্তার ভঙ্গির অনুকরণ করে বাড়ির পাঁচজনকে হাসাচ্ছে। আবার সঙ্গে সঙ্গে সে ক্লাসের সর্দার পড়ুয়াও বটে।

তার পরের ছবি দেখি মস্কোতে। গরীব পরিবারে। একটা ছোট্ট ঘরে মা কচুঘেঁচু রাঁধছেন, বাবা অর্থাভাবের কথা চিন্তা করে আপন মনে গজ্ গজ্ করছেন, ভাইবোনেরা কিচিরমিচির করছে, আর মেডিকেল কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র চেখফ—বয়স উনিশ—তারই এককোণে, হট্টগোল সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, খস্ খস্ করে পাতার পর পাতা ফার্স লিখে যাচ্ছেন। তিনি জানেন, খুব ভালো করেই জানেন, রসিকতাগুলো কাঁচা, কিন্তু তার চেয়েও ভালো করেই জানেন, খবরের কাগজের গ্রাহক রামাশামা এ ধরনের রসিকতাই পছন্দ করে, সম্পাদক মশাইও সেই মালই চান। লেখা শেষ হল। রান্না তখনও শেষ হয়নি। চেখফ ছোট ভাইকে বললেন, লেখাটা নিয়ে যা তো অমুখ পত্রিকার আপিসে। দু'পাঁচ টাকা যদি দেয় তবে কিছু কাবাব-টাবাব কিনে আনিস। কচুঘেঁচু গেলার সুবিধে হবে।

এর পাঁচ বছর পর চেখফ মেডিকেল কলেজ পাস করলেন।

কিন্তু ভালো করে প্র্যাকটিস করা চেখফের আর হয়ে উঠলো না। ইতিমধ্যে রুশদেশ জেনে গিয়েছে, চেখফের সার্জিকাল ছুরির চেয়ে তাঁর কলমের ধার বেশী। তবু সরকার

---

১ টলস্টয় চেখফকে এত গভীর ভাবে ভালোবাসতেন যে একদিন টলস্টয়ের বাড়ি ইয়াসানা পলিয়ানাতে যখন তিনি আর গর্কি বসে গল্প করছেন তখন চেখফ বাগানের অন্য প্রান্ত দিয়ে চলে যাচ্ছেন দেখে টলস্টয় গর্কিকে বলেন, 'জানো গর্কি, চেখফ যদি মেয়েছেলে হত তবে আমি ওকে বিয়ে না করে থাকতে পারতুম না।' যাঁরা বর্তমান লেখকের অত্যধিক বাগাড়ম্বর অপছন্দ করেন, তাঁরা বাকী প্রবন্ধ না পড়ে সোজা চেখফের দুলালী গল্পের অনুবাদে চলে যাবেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাঁকে পাঠালেন সাখেলিন দ্বীপের কয়েদীদের সম্বন্ধে মেডিকেল তদন্ত করতে। সে রিপোর্ট তিনি এমনই বুকফাটানো জোরালো ভাষায় লিখেছিলেন যে তারই ফলে সরকার কয়েদীদের জন্য বহু সুব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। এ রিপোর্টখানা আমি কিছুতেই সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি। আমার বড় বাসনা ছিল দেখবার, সাহিত্যিক যখন মেডিকেল রিপোর্ট লেখে তখন তার কলম কি ভাবে চালায়? সংযত করে? যাতে করে লোকে না ভাবে সাহিত্যিক তার হৃদয়-উচ্ছ্বাস দিয়ে তথ্যের দীনতা ঢাকতে চেয়েছে—কেসে পয়েন্ট না থাকলে উকীল যে রকম গরম লেকচার ঝাড়ে আর টেবিল থাবড়ায়। কিংবা তাঁর জোরদার কলম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে? কিংবা উভয়ের অভূতপূর্ব সংমিশ্রণে? রবীন্দ্রনাথ যখন সভ্যতার সংকট লিখেছিলেন তখন তাঁর লেখনে কতখানি রাষ্ট্রদর্শন আর কতখানি কবির তীব্র হৃদয়-বেদনার পরিপূর্ণ প্রকাশ!

তারপর একবার লেগে যায় রুশ দেশে জোর কলেরা। সেই এক বছর চেখফ ডাক্তারি করেন প্রাণপণ। ব্যস।

খাস পশ্চিমের লোক বয়েস হওয়ার পর বিয়ে-শাদী করে কস্মিনকালেও বাপ-মায়ের সঙ্গে বসবাস করে না। ভিন্ন সংসার পাতে। রুশদের বোধ হয় কিছুটা প্রাচ্যের আমেজ ধরে।

কিছুটা প্রতিষ্ঠা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই চেখফ গ্রামাঞ্চলে কিঞ্চিৎ জমিজমা ও ছোট্ট একটি বসতবাড়ি কিনলেন। বাপ-মায়ের সঙ্গে সেখানে ছটি বৎসর চেখফ বড় আনন্দে কাটালেন। চেখফের সমগোত্রীয় আরেকজন অতিশয় দরদী লেখক, আলফঁস দোদেও ঠিক ঐরকমই মোটামুটি ঐ সময়েই অসুরের মত খেটে পয়সা রোজগার করে গরীব বাপ-মাকে গ্রাম থেকে এনে প্যারিসে আরামে রেখেছিলেন। জীবনের এই ছটি বৎসর চেখফের বড় শান্তি আর আনন্দের মধ্যে কাটে। এর পরই দেখা দিল তাঁর শরীরে ক্ষয়রোগের চিহ্ন এবং বাকি জীবনের অধিকাংশ তাঁকে কাটাতে হয় ক্রিমিয়ার স্বাস্থ্যনিবাসে, সমুদ্রপারে। চেখফের বয়স তখন একচল্লিশ। তাঁর ক্ষয়রোগের কথা জেনেশুনেও তাঁরই নাট্যের অসাধারণ সুন্দরী এক অভিনেত্রী তাঁকে বিয়ে করেন। তিন বৎসর পর খ্যাতির মধ্যগগনে চেখফ-ভাস্কর অস্ত গেল। দাম্পত্য জীবনে সুখ বলতে তাঁর স্ত্রী পেয়েছিলেন স্বামীকে সেবা করার আনন্দ। অভিনেত্রীদের চরিত্র সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা কয়। তাই বলে নেওয়া ভালো, চেখফের স্ত্রী বিধবা হওয়ার পর বাকি জীবন নির্জনে অতিবাহিত করেন। মডার্ন গল্প উপন্যাসের পাঠক-পাঠিকারা বোধ হয় তাজ্জব মানবেন। চেখফের বিধবা তখন যুবতী। রুশে বিধবা বিবাহ নিন্দনীয় তো নয়ই, যুবতী, বিধবা পুনরায় বিবাহ না করলে তাকে 'আহাম্মুখ' আখ্যা দেওয়া হয়। মা হওয়ার গৌরব থেকে তিনি নিজেকে বঞ্চিত করলেন। তিনি ত্যাগ ও প্রেমের নিষ্ঠায় বিশ্বাস করতেন। এ কথাটা বলতে হল চেখফ-চরিত্র বোঝাবার জন্য। তিনি নিশ্চয়ই এমনই গভীর প্রেম দিয়ে তাঁর স্ত্রীর জীবন উদ্দীপ্ত করে দিয়েছিলেন যে সেই দীপ্ত দীক্ষায় প্রজ্বলিত তাঁর প্রেম-প্রদীপ চেখফের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নির্বাপিত হল না। তারই অনির্বাণ বহ্নিতে তাঁর ভবিষ্যতের পথ আলোকিত হয়ে রইল।

চেখফের জীবন সংক্ষিপ্ত ও আদৌ ঘটনাবহুল নয়। যে কটি ছবি আমাদের চোখের সামনে আসে সেগুলিই মধুর। শুধু শেষের চিত্রটি বড় করুণ। রঙ্গমঞ্চ থেকে চিরতরে বিদায় নিয়ে আজীবন বিলাসে লালিতা এই যে অসাধারণ গুণবতী রমণী তাঁর স্বামীর প্রাণরক্ষার জন্য কন্টিনেন্টের খ্যাতনামা স্বাস্থ্যনিবাস থেকে স্বাস্থ্যনিবাস, এক ধন্বন্তরী

www.BanglaBook.org

থেকে অন্য ধন্বন্তরীর পদপ্রান্তে পাগলিনীর মত ছুটোছুটি করলেন, আপন হৃদয়াবেগ শান্ত মুখের আড়ালে লুকিয়ে রেখে, কত না বিনিদ্র যামিনী স্বামীর শয্যাপার্শ্বে কাটালে, অসীম ধৈর্যে মিশ্রিত অক্ষয় সেবায় ক্ষয়রোগীর প্রতিটি পীড়িত মুহূর্তের যন্ত্রণাভার লাঘব করলে—এ ছবিটি একাধিক রুশ লেখক এঁকেছেন।

টলস্টয়ের বৃদ্ধ বয়সে চেখফের তিরোধান তাঁর বুকে বড় বেজেছিল—চেখফকে তিনি কতখানি স্নেহ করতেন সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। গর্কি তখন লেখেন চেখফ সম্বন্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ। ইয়াসানা পলিয়ানাতে এই ত্রিমূর্তির আলোচনা, হৃদ্যতার আদান-প্রদান সম্বন্ধে অত্যন্ত মনোরম একাধিক প্রবন্ধ রুশ ভাষায় বেরিয়েছে। চেখফ স্বয়ং তাঁর 'নোটবুকে' কিছু কিছু লিখে গিয়েছেন। টলস্টয়ের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অকৃত্রিম। অবশ্য সে-শ্রদ্ধা তাঁকে মোহাচ্ছন্ন করতে পারেনি। মাত্র অল্প কিছুদিনের জন্য তিনি টলস্টয়ের 'নীতিমূলক' (স্টরি উইথ এ মরাল) গল্পের অনুকরণ করেছিলেন। কিন্তু রিয়েল আর্টিস্ট (টলস্টয়ের ভাষায়) তো বেশীদিন অন্যের পথে চলতে পারে না—তা সে পথ যতই শান বাঁধানো প্রশস্ত হক না কেন।

গর্কি তাঁর নাট্যরচনায় চেখফের অনুকরণ করেছেন। এস্থলে পাঠক-পাঠিকার স্মরণার্থে উল্লেখ করি,

টলস্টয় : জন্ম ১৮২৮ মৃত্যু ১৯১০
চেখফ : ,, ১৮৮৬ ,, ১৯০৪
গর্কি : ,, ১৮৬৮ ,, ১৯৩৬

চেখফ আমাকে এমনই মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছেন যে তাঁর সম্বন্ধে আমি এক যুগ ধরে লিখে যেতে পারি। তাঁর প্রতিটি গল্পে টীকা লিখতে লিখতেই আমার বাকী জীবন কেটে যাবে। অথচ এই প্রবন্ধ শেষ করতে হবে, এবং কি উদ্দেশ্য নিয়ে এটা লিখছি সেটি ভুললেও চলবে না।

পূর্বেই বলেছি, বঙ্গসাহিত্যে আমি যশস্বী লেখক নই, কিন্তু পপুলার বটি। সেই কারণেই বোধ হয়, আমি কিছু অনুরোধ পেয়েছি, পত্র-লেখকদের জানাতে, কোন্ কোন্ লেখক পড়লে তাঁরা লাভবান হবেন। বিদায় নেবার প্রাক্কালে নিবেদন, ছোট গল্প দিয়েই সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ করা প্রশস্ত এবং সম্মুখে চেখফের ফোটোগ্রাফ টাঙিয়ে নিয়ে। এমন কি যাঁরা পরবর্তীকালে উপন্যাস লিখবেন তাঁরাও চেখফ চেখে, শুঁকে, সর্বাঙ্গে মেখে, উপকৃত হবেন। এ প্রবন্ধটি তাঁদের উদ্দেশ্যে লেখা।

কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি, রুশ সাহিত্যে চেখফের অনুকরণ করেছেন অনেকেই কিন্তু 'টলস্টয়-ঘরানা', 'ডস্টয়েফস্কি ঘরানা'র মত 'চেখফ-ঘরানা' কখনও নির্মিত হয়নি। তার কারণ চেখফকে অনুকরণ করা অসম্ভব।

তবে সে উপদেশ দিচ্ছি কেন?

কারণ অসম্ভবের চেষ্টা করলেই সম্ভবটা হাতে আসে, সম্ভব হয়।

* * *

চেখফের আছে কি?

অদ্ভুত সহানুভূতি। সমবেদনা। সহানুভূতি সমবেদনা বললে কমই বলা হয়। মপাসাঁর 'বুল্ দ্য সুইফ্' ('চর্বির গোলা', 'এ বল অব্ ফ্যাট') যখন ঘোড়া-গাড়িতে ফিরে অঝোরে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাঁদছে তখন মপাসাঁও সঙ্গে সঙ্গে কাঁদছেন, কিন্তু চেখফ যখন তাঁর কোচম্যানের দুঃখের কাহিনী বলেন তখন মনে হয় তিনি স্বয়ংই যেন সেই কোচম্যান।

গল্পটির প্লট এতই সরল যে কয়েক ছত্রে বলা যায়। এক ছ্যাকড়া গাড়ির কোচম্যান শহরে গাড়ি খাটায়, একমাত্র ছেলে থাকে গ্রামে। হঠাৎ খবর পেলে তার সে জোয়ান ছেলে মারা গিয়েছে। বুড়োর তিন কুলে কেউ নেই যাকে সে তার দুঃখের কাহিনী বলে। পেটের ধান্দায় বেরোতে হয়েছে গাড়ি নিয়ে। উঠেছে এক সোয়ারি। বুড়ো কোচম্যান আস্তে আস্তে আলাপচারী জমিয়ে যখন তার পুত্রশোকের কাহিনী বলতে যাবে, তখন ঘাড় ফিরিয়ে দেখে সোয়ারি ঘুমিয়ে পড়েছে। থামতে হল। তারপর উঠলেন এক জেনরেল। 'জলদি চলো, জলদি চলো' আর ধমকের চোটে সে তার কাহিনী আরম্ভ করেও শেষ করতে পারলো না। তারপর উঠল জনাতিনেক ছাত্র। তাদের হৈ-হল্লার মাঝখানে বুড়ো কোন পাত্তাই পেল না। তার পর উঠলেন আর এক ভদ্রলোক—ভারী দরদী। তাঁকে যখন দুঃখের কাহিনী বলতে বলতে পুত্রের মৃত্যু-সংবাদটা দেবে ঠিক তখনই তিনি বলে উঠলেন, 'থ্যাংক গড্। ঐ আমার বাড়ি। পৌঁছে গিয়েছি।' বলা হল না। রাত তখন ঘনিয়ে এসেছে। বুড়ো বাড়ি ফিরল। ঘোড়াটাকে দানা দিয়ে ডলাই-মলাই করতে করতে আপন মনে বিড় বিড় করতে লাগল, 'তোকে কি আর আমি ভালো করে ডলাই-মলাই করতে পারি, বাছা। বুড়ো হাড়ে আর কি আমার তাগৎ আছে? থাকতো আমার ছেলে! তাকে তো তুই চিনিস নে। হ্যাঁ, তার ছিল গায়ে জোর। হ্যাঁ, সত্যি বলছি। সে যদি থাকতো আজ, তবে বুঝিয়ে দিত ডলাই-মলাই কারে কয়।' ঘোড়াটা আপন খেয়ালে গর্‌গর্ করে নাক দিয়ে শব্দ ছাড়লো। কেমন যেন দরদ ভরা—অন্তত বুড়োর তাই মনে হল।

তখন—তখন? বুড়ো ঘোড়াটাকে তার শোকের কাহিনী বলে দিল।'[১]

যতবার গল্পটি পড়ি চোখে জল ভরে আসে—এখন আরও বেশী, কারণ আমার বয়েস ঐ কোচম্যানেরই কাছাকাছি...আর মনে হয়, কে বলে চেখফ ডাক্তার ছিলেন, কে বলে তিনি রূপসী অভিনেত্রী বিয়ে করেছিলেন, কে বলে তিনি টলস্টয়ের বন্ধু? তিনি নিশ্চয় ছিলেন ঐ কোচম্যান।

অনুকরণ করুন এই গল্পটির। কিংবা আরম্ভ করুন অন্যভাবে।

যেমন মনে করুন আপনার প্রিয়া সর্বাংশে আপনার চেয়ে গুণবান একটি 'লভার' পেয়ে ড্যাং ড্যাং করে চলে গেলেন তার সঙ্গে। আপনি ঘন ঘন 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে' পড়ে হৃদয়বেদনায় মালিশ করছেন, কিন্তু কোনও ফায়দা ওৎরাচ্ছে না। হঠাৎ মনে পড়ল আপনার এক বান্ধবীর এক বান্ধবী আছেন এবং তাঁর সঙ্গে পরিচিত আরেক ভদ্রলোকও আপনার বন্ধু। আপনি ভাবলেন, 'তাঁদের কাছে গিয়ে আমার দুঃখের কাহিনী কই।' দুজনেই বড় দরদী। দুজনাই আপনার আপসাআপসি সাতিশয় মনোযোগ সহকারে শুনলেন। কিন্তু হায়, শেষটায় দেখলেন, ওদের দুজনারই পাকা রায়, আপনাকে কলার খোসাটির মত রাস্তায় ফেলে দিয়ে আপনার প্রিয়া অতিশয় বিচক্ষণার কর্ম করেছেন!

এটা আপনি ব্যঙ্গ করে লিখতে পারেন, হাস্যরসে ভর্তি করে লিখতে পারেন, দু' ঘটি

১ গল্পটির প্লট আমার ঠিক ঠিক মনে নেই; তবে হরেদরে এই।

www.BanglaBook.org

চোখের জল করুণ রসে ঢেলে বানিয়ে লিখতে পারেন, যৌনবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ দিয়েও লিখতে পারেন—কিন্তু আপনি চেখফ হবেন তখনই যখন পাঠক পড়ে মনে করবে এটি একান্ত আপনারই অভিজ্ঞতা। অথচ আপনার এই নিদারুণ অভিজ্ঞতা আদপেই হয়নি, আমার কাছে প্লটটি শুনে, এবং চেখফের কোচম্যানের গল্পটি পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে লিখেছেন মাত্র।

এবারে টেকনিকাল দিক।

এখানে এসে সর্ব আলঙ্কারিকের ওয়াটারলু।

রস কি, এস্থলে কথাসাহিত্যে কি সে-বস্তু যা আমার মনে কলারসের সঞ্চার করে—সেখানে যদি বা কোনও গতিকে সংজ্ঞাবদ্ধ বর্ণনা করা যায়, তবু করা যায় না রসসৃষ্টি হয় কোন্ উপাদানে, কোন্ প্রক্রিয়ায়!

কাজেই আমি সামান্য দুটি নির্দেশ দেব।

প্রথম বাকসংযম। 'সে বলে বিস্তর মিছা যে বলে বিস্তর'—বলেছেন ভারতচন্দ্র। এ-স্থলে 'সে রচে নিরস রস যে বলে বিস্তর।'

এখানে চীনা চিত্রকরদের কথা স্মরণে আনবেন। পাঁচটি আঁচড়ে আঁকা বাঁশের মগডালে একটি পাতা—আপনি স্পষ্ট শুনতে পেলেন পাতাটি ফর ফর করছে। তিনটে আঁচড়ে আঁকা একটি উড়ন্ত হাঁস। আপনি দেখতে পেলেন যেন নীলাকাশে শরতের সাদা মেঘ—ভালো করে তাকানোই যায় না, চোখ ঝলসে দেয়।

তার অর্থ উড়ন্ত হাঁস আঁকার সময় চিত্রকর সম্পূর্ণ হাঁস আঁকেন না। ঠিক কোন্ কোন্ জায়গায় বিন্দু ও বক্ররেখা (পইন্ট কার্ভ) দিলে পাঠকের মন নিজেই বাকিটা এঁকে নেবে, পাঠকের চোখ নিজেই বাকিটা দেখে নেবে ঠিক সেই সেই জায়গায় চিত্রকর তুলি ছুঁইয়েছেন।

চেখফও ঠিক তাই করতেন। কয়েকটি পইন্ট ও কার্ভ—শব্দের মারফতে—এমনই ভাবে এঁকে দিয়েছেন যে সম্পূর্ণ ছবিটি চোখের সামনে জ্বলজ্বল করতে থাকে। শুধু তাই নয়, এমনই সূক্ষ্ম দানাওলা ফিলমে তোলা ফটোগ্রাফ যে যার যেমন কল্পনার লেন্স্ সে তেমনি বিরাট আকারে সেটিকে এনলার্জ করতে পারে। কোচম্যান চেষ্টা করেছিল তিন না চার টাইপের সোয়ারির কাছে তার হৃদয়বেদনা প্রকাশ করার; আপনি দেখতে পাবেন যে তাবৎ মস্কো শহরের লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়দুয়ারে শির হেনে হেনে হতাশ হচ্ছে। আর সেই দরদী ঘোড়ার গর্‌র্‌র্ শব্দ যে শুধু জানতে পাবেন তাই নয়, শুনতে পাবেন সে যেন বহু আবেগ থেকেই কোচম্যানকে বলছে, 'কেন তুমি আজেবাজে লোকের কাছে এসব দুঃখের কথা বলতে যাও? কে বুঝবে তোমার হৃদয়বেদনা? সবাই আপন আপন স্বার্থ নিয়ে মগ্ন। বলো আমাকে। হাল্কা হবে।' তারপর হয়তো আপন মনে বলছে, 'জানি তো সবই। কিন্তু হায় করি কি? এ যে ভগবানের মার।'

গুণীরা বলেন সর্বনিম্নে জড়জগৎ, তারপর তৃণজগৎ, তারপর পশুজগৎ—সর্বোচ্চে মানুষ। চেখফের গল্পটি পড়ার পর মত পালটাতে হয়।

এস্থলেই ক্ষান্ত হোক আমার অক্ষম লেখনীর ক্ষীণ প্রচেষ্টা।

এইবার পড়ুন চেখফের একটি গল্পের বাঙলা অনুবাদ। অনুবাদটি করেছেন আমারই অনুরোধে আমার সখা মৌলানা খাফী খান। 'যদ্দৃষ্টং' এবং 'প্রিয়াঙ্গী'র লেখক।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

॥ দুলালী ॥

ওলেঙ্কা অবসরপ্রাপ্ত অ্যাসেসর প্লেম্‌ইয়ান্নিকভের মেয়ে। সে ভাবনায় ডুবে বসেছিল উঠোনের সামনে ছোট্ট বারান্দাটিতে।

গরম, মাছিগুলো আঠার মত লেগে আছে, বিরক্ত করছে। একটু বাদেই যে সন্ধ্যে হবে সে কথা ভাবতে ভালোই লাগছে। পূব দিক থেকে ঘন কালো মেঘ এসে জমা হচ্ছে, সেই সঙ্গে থেকে থেকে ভিজে হাওয়ার আমেজ আসছে।

উঠোনের মধ্যিখানে আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল কুকিন্। লোকটি থিয়েটারের ম্যানেজার, প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলায় এক বাগানে একটি আনন্দমেলার আসর জমায়—নাম 'তিভলি প্রমোদ উদ্যান'। থাকে ওলেঙ্কাদের বাড়ির একপাশে ভাড়া নিয়ে।

কুকিন্ হতাশ হয়ে বলল, "আবার! আবার এল বৃষ্টি! রোজ বৃষ্টি, রোজ, যেন আমাকে নাকাল করার জন্যেই নামে! গলায় দড়ি দিই না কেন? সর্বস্ব গেল। দিন দিন লোকসান আর লোকসান!"

দু হাত জুড়ে ওলেঙ্কার দিকে ফিরে কুকিন্ আবার বলতে লাগল, "এই তো জীবন আমাদের, ওল্‌গা সেম্‌ইয়নভ্‌না। দু চোখ ফেটে জল আসে। খেটে মরি, যতদূর সাধ্য চেষ্টা করি, সারারাত জেগে ভাবি কী করে জিনিসটাকে উঁচুদরের করে তোলা যায়। হয় কী? এদিকে দেখ, লোকগুলোকে—আহাম্মুখ, বর্বর।

"আমি ওদের দেখাই সেরার সেরা ছোট ছোট অপেরা, কথা-ছাড়া শুধু ভঙ্গী দিয়ে বোঝানো নাটক, অপূর্ব অপূর্ব ভ্যারাইটি আর্টিস্ট। কিন্তু ওরা কি ও জিনিস চায়? বোঝে তার মর্ম? ওরা শুধু চায় হৈ-হুল্লোড়! ওদের দেখাতে হয় রদ্দি চীজ।

"আবার ইদিকে দেখ আবহাওয়াখানা! প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় বৃষ্টি। ১০ই মে থেকে শুরু হল, চলছে রোজ, গোটা মে-জুন মাসটাই! দর্শকের দেখা নেই, অথচ বাগান-ভাড়াটা? সেটি ঠিক ধরে দিতে হয়। আর গাইয়ে-বাজিয়েদের মাইনেটা?"

পরদিন সন্ধ্যের দিকে আবার দেখা দিল মেঘ। হি হি করে হেসে উঠল কুকিন্। বললে, "এসো, এসো বৃষ্টি। দাও ভাসিয়ে আমার প্রমোদ উদ্যান। সব ডোবাও, তারপর আমাকেও ডোবাও। আমার ইহলোক পরলোক দুইই মজুক! মামলা করুক আমার আর্টিস্টরা আমার নামে, পাঠাক জেলে—সাইবীরিয়ার নির্বাসনে—ফাঁসিকাঠে! হাহা হাহাঃ।"

তার পর দিন আবার ঐ।

ওলেঙ্কা চিন্তিত মুখে, নীরবে কুকিনের কথাগুলি শুনত। মাঝে মাঝে তার চোখে জল এসে পড়ত। এত উতলা হয়ে উঠত তার মন কুকিনের দুর্ভাগ্যে যে শেষ অবধি সে ওর প্রেমেই পড়ে গেল।

কুকিন্ মানুষটি বেঁটে, রোগা। মুখখানা ফ্যাকাশে। চুল আঁচড়ে রগের ওপর টেনে নামানো। সরু গলায় কথা কয়, মুখ একপাশে বেঁকিয়ে। চেহারায় চিরকেলে নৈরাশ্যের ছাপ। তবু সে ওলেঙ্কার মনে গভীর এবং অকৃত্রিম একটি ভাব জাগিয়ে তুলল।

ওলেঙ্কা সর্বদাই কারও না কারও প্রেমে অভিভূত হয়ে থাকত। প্রথমে ছিল বাবা।

www.BanglaBook.org

এখন তিনি রুগ্‌ণ; অন্ধকার একখানা ঘরে সারাদিন আরামকেদারায় বসে তাঁর দিন কাটে। শ্বাসকষ্টে কাতর।

তারপর সে ভালোবাসলো তার এক খুড়িমাকে। তিনি থাকতেন ব্রিয়ানস্কে, দু বছরে একবার করে আসতেন। তার আগে, যখন সে ইস্কুলে পড়ত, তখন তার প্রেমপাত্রী ছিল তার ফরাসী শিক্ষিকা।

ওলেঙ্কা মেয়েটি শান্ত, সহৃদয়—বড় ভালো স্বভাবের। চোখ দুটি ভীরু নিরীহ। নিটোল স্বাস্থ্য। তার টলটলে, লালচে গাল দুখানি, ধপধপে সাদা নরম তুলতুলে ঘাড়ের উপর ছোট্ট কালো তিলটি, আর সরল স্নিগ্ধ যে হাসিটি ফুটে উঠত তার মুখে খুশীর কোনও কথা শুনলেই, তা দেখে ছেলেরা ভাবত "মন্দ নয় তো মেয়েটি"। বেশ হাসতও। আর মেয়েরা তার সঙ্গে কথা কইতে কইতে হঠাৎ তার হাতখানি ধরে বলে উঠত, কথার মধ্যিখানে, আনন্দের উচ্ছ্বাসে, "ও দুলালী!"

জন্ম থেকে যে বাড়িতে ওলেঙ্কার বাস, তার বাবার উইল অনুযায়ী সেটি তারই প্রাপ্য। বাড়িখানা ছিল শহরের একটু বাইরের দিকে। জিপ্‌সী রোডের উপর। প্রমোদ উদ্যান "তিভলি" থেকে বেশী দূরে নয়। সেখানে যখন সন্ধ্যেবেলায় বা রাত্রে বাজনা বাজত, বাজি ফুটত, ওলেঙ্কার মনে হত যেন যুদ্ধ বেধেছে কুকিনের সঙ্গে তার নিয়তির। কুকিন্ লড়ছে তার প্রধান শত্রু নিঃসাড় দর্শকগুলোর সঙ্গে। অমনি ওলেঙ্কার মন গলে যেত। ঘুমোতে ইচ্ছে করত না। ভোররাত্রে কুকিন্ যখন বাড়ি ফিরত, তখন ওলেঙ্কা তার শোবার ঘরের জানলায় আস্তে আস্তে টোকা দিত, আর পরদার ফাঁক দিয়ে শুধু তার মুখখানা আর কাঁধের একটুখানি দেখিয়ে তার দিকে চেয়ে হাসত, নরম হাসি।

কুকিন্ বিয়ের প্রস্তাব করল, বিয়ে হয়ে গেল। তারপর দেখল, বেশ ভালো করে, ওলেঙ্কার ঘাড়খানি আর তার সুন্দর মোটা-সোটা কাঁধ দুটি। দেখে বলে উঠল, "দুলালী।"

কুকিন্ খুশী হল, তবে তার বিয়ের দিন এবং রাত্রেও বৃষ্টি হল, তাই মুখের নিরাশ ভাবটা বদলালো না।

দুজনের বনে গেল বেশ। ওলেঙ্কা টিকিট বিক্রির দিকটা দেখত, হিসেব রাখত, মাইনে-পত্তর দিত। তার ছলাকলাবর্জিত হাসিটিতে কখনও টিকিটঘর, কখনও খাবার দোকানটি, কখনও রঙ্গমঞ্চের দুটি পাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

বন্ধুদের সে বলতে আরম্ভ করলে, পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার মধ্যে যা প্রধান সর্বাধিক প্রয়োজনীয় এবং উল্লেখযোগ্য বস্তু হল নাট্যশালা—প্রকৃত আমোদ একমাত্র এরই মধ্য দিয়ে পাওয়া যেতে পারে। এর দ্বারাই মানুষ হয়ে উঠতে পারে ভদ্র এবং মানবতাবোধসম্পন্ন।

"কিন্তু লোকে কি তা বোঝে?" বলত ওলেঙ্কা। "ওরা চায় হৈ-হুল্লোড়। কাল আমরা দেখালাম 'উল্টোপাল্টা ফাউস্ট'—বক্সগুলোর প্রায় সব কটিই খালি রইল। কিন্তু যদি ভানিচ্‌কা আর আমি দেখাতাম ওঁচা একটা কিছু, দেখতে লোকে লোকারণ্য হয়ে যেত রঙ্গালয়। কাল ভানিচ্‌কা আর আমি দেখাচ্ছি 'নরকে অর্ফেউস্'—নিশ্চয়ই এসো কিন্তু।"

কুকিন্ থিয়েটার সম্বন্ধে অভিনেতাদের সম্বন্ধে যাই বলত ওলেঙ্কা তারই পুনরাবৃত্তি করত। কুকিনের মতই সেও দর্শকদের অজ্ঞতা এবং রসবোধের অভাবকে ঘৃণা করত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মহড়ায় আসত ওলেঙ্কা, অভিনেতাদের ভুল শোধরাত, বাজিয়েদের গতিবিধির দিকে চোখ রাখত। খবরের কাগজে যদি খারাপ কিছু মন্তব্য করা হত তবে সে কেঁদে ফেলত, যেত সম্পাদকের কাছে, কৈফিয়ৎ চাইত।

অভিনেতারা তাকে ভালোবাসত, ডাকত "ভানিচ্‌কা" আর আমি, "দুলালী" বলে। ওলেঙ্কার ওদের জন্য কষ্ট হত, মাঝে মাঝে টাকা ধার দিত অল্প-স্বল্প, ঠকালে গোপনে চোখ মুছত, স্বামীর কাছে নালিশ করত না।

শীতের মরসুমেও ওদের গেল ভালোই। মিউনিসিপ্যালিটির থিয়েটারখানা ওরা ভাড়া নিল, নিয়ে অল্পদিনের মেয়াদে ভাড়া দিল উক্রাইন-দেশী একটা দলকে, এক জাদুকরকে, স্থানীয় একটি নাটুকে সঙ্ঘকে।

ওলেঙ্কা হয়ে উঠল আরও গোলগাল, মুখে ফুটল কায়েম একটা খুশীর জৌলুস, কুকিন্‌ হয়ে গেল আরও রোগা, মুখ হল আরও হল্‌দে। ভয়ানক লোকসানের বুলি তার মুখে লেগেই রইল, যদিও শীতের বাজারে ব্যবসা তার মোটেই খারাপ চলেনি।

কুকিন্‌ রাত্রে কাশে। ওলেঙ্কা ফলের রসের সঙ্গে ফুল মেড়ে তাকে খাওয়ায়, বুকে তেল মালিশ করে, নিজের নরম শালগুলো দিয়ে তার গা ঢাকে।

বলে, "কী মিষ্টি তুমি মণি।" চুলে হাত বুলিয়ে দেয়। বলে, অন্তর থেকেই, "আমার সুন্দর, আমার বুকের ধন।"

শীতের শেষে কুকিন্‌ গেল মস্কো, নতুন একটা দল নিয়ে আসতে। ওলেঙ্কা কুকিন্‌ বিহনে ঘুমোতে পারে না। সারারাত জানালার ধারে বসে তারার দিকে চেয়ে থাকে। ঘরে মোরগ না থাকলে মুর্গী যেমন সারারাত অস্বস্তিতে কাটায়, জেগে থাকে, ওলেঙ্কারও তেমনি হয়।

মস্কোয় কুকিন্‌ আটকা পড়ে গেল। চিঠি দিল ওমাসে ইস্টারের আগেই সে ফিরবে। তিভলির কাজকর্ম বুঝিয়ে লিখল।

যে সময় কুকিনের ফেরার কথা সেই সময়েই একদিন, দিনটা সোমবার, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, হঠাৎ দরজায় অলুক্ষণে রকমের একখানা ঘা পড়ল। সে কী আওয়াজ। যেন কেউ ঢাক পিটছে। দড়াম দড়াম দমাদ্দাম। রাঁধুনী মেয়েটা ঘুম-চোখে খালি পায়ে থৈ থৈ জল ভেঙে ছুটল বেড়ার দরজা খুলতে।

দরজার ওধার থেকে হেঁড়েগলায় কে বলল, "দরজাটা খোলো তো, তোমার নামে তার এসেছে।"

ওলেঙ্কা আগেও পেয়েছে টেলিগ্রাম তার স্বামীর কাছ থেকে, এবারে কেমন যেন সে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। থর্‌-থর্‌ কাঁপা হাতে টেলিগ্রাম খুলে সে পড়ল।

"ইভান্‌ প্যেত্রোভিচ আজ হঠাৎ মারা গেল আগ্‌রা বিদেশ সাপেক্ষ মঙ্গলবার শেষকৃত্য।"

ঠিক এই ছিল টেলিগ্রামে, "শেষকৃত্য" আর অবোধ্য কথাটা "আগ্‌রা"। টেলিগ্রামে সই নাটুকে দলের বড়কর্তার।

ওলেঙ্কা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, "আমার মণি, ভানিচ্‌কা, মণি আমার, প্রিয়তম। কেন দেখা হলো আমাদের? কেন তোমায় জানলাম, ভালবাসলাম? তুমি তো ছেড়ে গেলে আমাকে, এখন তোমার দুঃখিনী ওলেঙ্কা কার পানে চাইবে?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মঙ্গলবার কুকিন্‌কে ভাগান্‌কোভো গোরোস্থানে কবর দেওয়া হল। ওলেঙ্কা বাড়ি ফিরে এলো বুধবার, এসেই বিছানায় আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগল, এমন চেঁচিয়ে যে রাস্তা আর আশেপাশের বাড়ির উঠোন থেকে সে কান্না শোনা গেল।

পাড়াপড়শীরা ক্রুসের চিহ্ন এঁকে বুকে মাথায় কাঁধে আঙুল ছোঁয়াল আর বলল, "বেচারী দুলালী, ওল্‌গা সেম্‌ইয়নভ্‌না। আহা, দুঃখে বুকটা ফেটে যাচ্ছে বাছার।"

তিন মাস বাদে একদিন গির্জা থেকে ফিরছে ওলেঙ্কা। শোকে দুঃখে জ্বর-জ্বর। ঘটনাচক্রে বাবাকায়েভ্‌ কাঠগোলার গোমস্তা ভাসিলি আন্দ্রেয়িচ্‌ পুস্তভালভ, সেও ফিরছিল গির্জা থেকে, তারই সঙ্গে হেঁটে এল। পুস্তভালভের মাথায় কেতাদুরস্ত সাদা টুপী, পরনে সাদা ওয়েস্টকোট—তার ওপর ঝুলছে সোনার ঘড়ি চেন। লোকটিকে দেখে মনে হয় না ব্যবসায়ী, দেখায় জমিদারের মতো।

সে বললে গম্ভীর সুরে, "যা কিছু ঘটে ওল্‌গা সেম্‌ইয়নভ্‌না, সে সব ঘটে তাঁরই আদেশে।" স্বরে সমবেদনার রেশ। "প্রিয়জনদের কেউ যদি চলে যায়, তবে তার কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা। বুক বেঁধে মাথা নত করে তা আমাদের মেনে নিতে হবে।"

ওলেঙ্কাকে বাড়ির দরজা অবধি পৌঁছে দিয়ে পুস্তভালভ বিদায় নিল। ওলেঙ্কা সারাদিন ধরে শুনল তার গম্ভীর গলার আওয়াজ। চোখ যখন জুড়ে এল, স্বপ্নে দেখল তার কালো দাড়ি। বড় ভালো লাগলো তাকে ওলেঙ্কার।

পুস্তভালভের মনে বোধ হয় ওলেঙ্কা একটা দাগ ধরিয়ে দিল, কারণ দুদিন না যেতেই একটি আধবয়সী মহিলা, যাকে ওলেঙ্কা প্রায় চেনেই না, এল তার সঙ্গে কফি খেতে, আর খেতে বসেই পুস্তভালভের গল্প জুড়ে দিল। বলল, অতি চমৎকার শক্তপোক্ত লোকটি, বিয়ের বয়সী যে কোনও মেয়ে ওকে বিয়ে করে সুখী হবে। তিন দিন বাদে পুস্তভালভ নিজেই এল। রইল বেশীক্ষণ নয়, মিনিট দশেক হবে, কথা বলল অল্পই, কিন্তু ওলেঙ্কা তার প্রেমে পড়ে গেল—এতদূর যে সারারাত তার ঘুম হল না, জ্বরের মত জ্বালায় জ্বলল, এবং সকাল হতে সেই আধবয়সী মহিলাটিকে ডেকে পাঠাল। কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল, তাড়াতাড়ি বিয়েও হয়ে গেল।

বিয়ের পর দুজনের বনিবনা খুব ভালো হল। নিয়মিত পুস্তভালভ কাঠগোলায় বসত দুপুরের খাওয়া অবধি, তারপর যেত কাজে বেরিয়ে, ওলেঙ্কা এসে বসত তার জায়গায়, আপিসে বসে সন্ধ্যে অবধি বিল তৈরী করত, আর অর্ডার মাফিক মাল চালান দিত।

খদ্দেরদের এবং পরিচিত লোকদের ওলেঙ্কা শোনাতো, "কাঠের দর যা বছর শতকরা কুড়ি টাকা হিসেবে বাড়ে। আগে আমরা কাঠ নিতাম এখান থেকেই, কিন্তু এখন ভাসিচ্‌কাকে প্রতি বৎসর যেতে হয় মগিলেভ্‌ অঞ্চলে, কাঠের বন্দোবস্ত করতে। আর ভাড়া কী!" তাজ্জব হয়ে গাল হাত দিয়ে ওলেঙ্কা বলতো, "যা খরচা গাড়িভাড়ার!"

তার মনে হত সে কাঠের ব্যবসায় আছে যুগ যুগ ধরে; কাঠ জীবনের সর্বপ্রধান এবং সার বস্তু। গার্ডার, কড়ি, বরগা, তক্তা, বাটাম, বাক্সের কাঠ, ল্যাথ, পীস্‌ স্ল্যাব কথাগুলো তার কাছে বড় আদরের মনে হত, শুনে মনকেমন করত। রাত্রে সে স্বপ্ন দেখত পাহাড়প্রমাণ বোর্ড আর তক্তা, অসংখ্য গাড়িভর্তি কাঠের গুঁড়ি সার বেঁধে কোন্‌ দূর দেশে যাত্রা করেছে, ৮ ইঞ্চি চওড়া ২৮ ফুট লম্বা কড়িকাঠের একটা দল খাড়া দাঁড়িয়ে ধেয়ে চলেছে কাঠগোলার দিকে, কড়িতে কড়িতে, গার্ডারে স্ল্যাবে ঠোকাঠুকি হচ্ছে, শুকনো

www.BanglaBook.org

কাঠে কাঠে খটাখটির বোদা আওয়াজ হচ্ছে, সবাই পড়ে যাচ্ছে, আবার উঠছে, এর ওর ঘাড়ে চেপে স্তূপের মতো জমা হচ্ছে...

ঘুমের মধ্যে চেঁচিয়ে ওঠে ওলেঙ্কা। পুস্তভালভ আদর করে বলে, 'ওলেঙ্কা, কী হল দুলালী? মাথায় কাঁধে বুকে ক্রুসচিহ্ন ছোঁয়াও!"

যে ধারণাই তার স্বামীর হত ওলেঙ্কারও তাই হত। পুস্তভালভ যেই বলত ঘরে বড় গরম, অথবা ব্যবসায়ে মন্দা পড়েছে, ওলেঙ্কারও মনে হত তাই। আমোদ-প্রমোদ পুস্তভালভের ভালো লাগত না, ছুটির দিন কাটাত বাড়ি বসে। ওলেঙ্কাও তাই করত।

বন্ধুবান্ধবেরা বলত, "তুমি সবটা সময় কাটাও বাড়িতে বা আপিসে। থিয়েটরে সার্কাসে যাওয়াও তো উচিত।"

মুরুব্বিয়ানার সুরে ওলেঙ্কা বলে, "ভাসিচ্‌কা, আর আমি থিয়েটরের ধার মড়াই না। আমরা খাটিয়ে লোক, ওসব ছ্যাবলামির দিকে আমাদের মন নেই! কী হয় ওসব থিয়েটর দিয়ে?"

প্রতি শনিবার সন্ধ্যাবেলায় আর ছুটির দিনে সকাল সকাল তারা গির্জায় যেত, পাশাপাশি হেঁটে ফিরত, দুজনেরই মুখে ফুটে থাকত উপাসনার আবেগ। দুজনেরই অঙ্গে লেগে থাকত মনোরম সুবাস। ওলেঙ্কার রেশমী পোশাক থেকে বেরোত একটা খুশী-খুশী খস্‌খস্‌ শব্দ।

বাড়িতে তাদের খাদ্য ছিল চা, মিষ্টি রুটি, আর রকম রকম জ্যাম। তারপর কিমার 'পাই'। রোজ দুপুরবেলা তাদের বাড়ির সামনের উঠোনে, গেটের বাইরে, রাস্তায়, সুরুয়ার ভুরভুরে গন্ধ ছড়াতো, ভেড়ার বা হাঁসের ঝলসানো মাংসের কিংবা উপবাসের দিনে মাছের। যে-ই যেত ওবাড়ির পাশ দিয়ে, তারই খিদে পেয়ে যেত।

আপিসে সামোভারে চায়ের জল সর্বদাই চড়ানো থাকত—খদ্দের এলে দেওয়া হত চায়ের সঙ্গে কড়াপাকের পিঠে।

সপ্তাহে একদিন করে তারা যেত স্নানাগারে, ফিরতো একসঙ্গে টকটকে রাঙাবরণ হয়ে।

ওলেঙ্কা বলত বন্ধুদের, "সত্যি, ঈশ্বরের কৃপায় আমরা সব দিক থেকে বেশ ভালোই আছি। যেমন সুখে-স্বচ্ছন্দে আছি ভাসিচ্‌কা আর আমি, তেমনি যদি সবাই থাকত তো বেশ হত!"

পুস্তভালভ যখন কাঠ কিনতে মগিলেভে যেত, ওলেঙ্কার ভীষণ মনকেমন করত। সারারাত সে জেগে কাটাত, কাঁদত।

মাঝে মাঝে স্মিরনিন্‌ তার সঙ্গে দেখা করতে আসত। স্মিরনিন ছিল সৈন্যদলের পশু-চিকিৎসক। সে ওলেঙ্কারদেরই বাড়ির একপাশটা ভাড়া নিয়ে থাকত। তার অল্প বয়স। সে এসে গল্প-সল্প করত, তাস খেলত, ওলেঙ্কার মনটা ভুলে থাকত।

স্মিরনিনের নানা কথার মধ্যে ওলেঙ্কার সব চেয়ে বেশী ভালো লাগত তার ঘরের খবর। স্মিরনিন্‌ বিবাহিত, আর একটি ছেলে আছে। তবে স্ত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্ক চুকে গেছে, কারণ পরপুরুষের সঙ্গে প্রেম। বৌকে সে দুচক্ষে দেখতে পারে না, তবু মাস মাস টাকা পাঠায় চল্লিশ রুবল্‌, তার ছেলের খোরপোশ বাবদ। এসব শুনে ওলেঙ্কা মাথা নাড়ে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ওর জন্য বড় দুঃখ হয় তার মনে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যাবার সময় ওলেঙ্কা স্মিরনন্‌কে মোমবাতি হাতে করে সিঁড়ি অবধি পৌঁছে দেয়। বলে, "ভগবান করুন, তোমার যেন কোনও বিপদ-আপদ না হয়। তুমি যে রইলে এতটা সময় আমার সঙ্গে, তার জন্য ধন্যবাদ। স্বর্গের রাণী মেরী তোমাকে অটুট স্বাস্থ্যে রাখুন।"

তার স্বামীর যেমন চারিদিকে বিবেচনা করে গম্ভীরভাবে কথা কইবার ধরন, ওলেঙ্কা তারই অনুকরণ করে। ডাক্তার সিঁড়ির নিচেকার দরজা দিয়ে বেরোচ্ছে, তখন ওলেঙ্কা তাকে ডেকে ফেরায়, আর বলে, "দেখ ভ্লাদিমির প্লাতোনিচ, স্ত্রীর সঙ্গে তোমার মিটমাট করে ফেলাই উচিত; তাকে ক্ষমা করো, ছেলের মুখ চেয়ে। ছেলেটি হয়তো সবই বোঝে।"

পুস্তভালভ যখন ফিরে এল, ওলেঙ্কা তাকে ঘোড়ার ডাক্তারের দুঃখময় জীবনের সমস্ত কাহিনী শোনাল—গলা খাটো করে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, মাথা নাড়ল। দুজনেই বলাবলি করতে লাগল ছেলেটির বিষয়ে। বলল, নিশ্চয়ই ছেলেটির বাবার জন্য মন-কেমন করে। তারপর দুজনেরই মনে যেন কেমন করে এলো একই কথা, তার দাঁড়ালো এসে গৃহবিগ্রহের সামনে। প্রার্থনা করলো মাটি অবধি নুয়ে, ভগবান যেন তাদের সন্তান দেন।

এমনিভাবে পুস্তভালভ পরিবার ছটি বছর কাটাল, পরম শান্তিতে, বিনা আড়ম্বরে, ভালোবেসে, পরস্পরের সঙ্গে মিল সম্পূর্ণ বজায় রেখে। তারপর একদিন, শীতকালে, ভাসিলি, আন্দ্রেয়িচ্ আপিসে বসে গরম চা খাওয়ার পর মাথায় টুপি না এঁটে বেরিয়ে গেল কিছু কাঠ চালান দিতে। তার ঠাণ্ডা লেগে গেল, অসুখ করল। সব চেয়ে বড় বড় ডাক্তার তার চিকিৎসা করলেন, কিন্তু রোগ কিছুতেই সারল না। চার মাস ভোগের পর পুস্তভালভ মারা গেল। ওলেঙ্কা আবার বিধবা হল।

স্বামীর গোর দিয়ে ওলেঙ্কা ফুঁপিয়ে কান্না শুরু করল, "কার কাছে যাব আমি, ওগো তোমাকে ছেড়ে কী করে থাকব আমি অভাগী দুঃখিনী? ওগো তোমরা সবাই আমাকে দেখ'সে।"

কালো শোকবস্ত্র পরে ওলেঙ্কা চলাফেরা করে। মাথায় টুপি নেই, হাতে দস্তানা পরে না। চোখের জলের ধারার নকশায় তৈরি সাদা ঝালর অঙ্গে ধরে। বাইরে বেরোয় কদাচিৎ; যদিও বা যায় কোথাও তো সে গির্জায় কিংবা স্বামীর কবর দেখতে। বাড়িতে বাস করে যেন সন্ন্যাসিনী।

ছটি মাস কেটে যাবার পর সে বিধবার বেশ ছাড়ল। তার ঘরের জানলায় খড়খড়ি উঠতে আরম্ভ করল। কখনো-সখনো তাকে বাজারের পথেও দেখা যেতে লাগল, সকালের দিকে রাঁধুনীর সঙ্গে। কি যে সে করে, বাড়িতে কি করে তার দিন কাটে তা নিশ্চয় করে কেউ জানল না, তবে আন্দাজ একটা করা গেল। দেখা যেত, ওলেঙ্কা বাগানে বসে চা খাচ্ছে ঘোড়ার-ডাক্তারটির সঙ্গে, ডাক্তার ওলেঙ্কাকে খবরের কাগজ পড়ে শোনাচ্ছে। এসব দেখে লোকে অনুমান একটা করে নিত।

আরও একটা ঘটনা ঘটল। ডাকঘরে ওলেঙ্কার একটা চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হল। তাকে সে বললে, "আমাদের এই শহরে গোরু-ঘোড়ার কি হয় না হয় দেখবার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই, তাই এত ব্যামো। প্রায়ই শোনা যায় দুধ খেয়ে মানুষের অসুখ করে, গোরু-ঘোড়ার ছোঁয়াচ লেগে এটা হয়, সেটা হয়। গৃহপালিত পশুর স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে, যেমন মানুষের জন্য, ঠিক তেমনি নজর রাখা উচিত।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পশুর ডাক্তারটির মনে যা ধারণা ওলেঙ্কার বক্তব্যও তাই। সকল বিষয়েই ডাক্তারের যা মত তারও আজকাল সেই মত। স্পষ্টই দেখা গেল, কোন একটা আকর্ষণ বিনা ওলেঙ্কার একটি বৎসরও কাটে না। আর, এবারে সে নতুন করে খুঁজে পেয়েছে আনন্দ একেবারে তার নিজের বাড়িরই একপাশে।

মেয়েটি আর কেউ হলে তার নিন্দা হত, কিন্তু ওলেঙ্কার সম্বন্ধে কেউ কুকথা ভাবতে পারত না—সবটাই তার এত সহজ স্বাভাবিক। কি ডাক্তার কি সে—কেউই খুলে বলেনি যে আগে তাদের মধ্যে যে সম্পর্কটা ছিল তা বদলেছে। বরং ওটা ওরা ঢেকে রাখতেই চেষ্টা করত, কিন্তু পারত না, কারণ ওলেঙ্কার কথা গোপন রাখার ক্ষমতা ছিল না।

যখন ডাক্তারের সহকর্মীরা তার সঙ্গে দেখা করতে আসত, ওলেঙ্কা তাদের চা ঢেলে দিতে দিতে বা যাবার সময় তুলত জীবজন্তুর মড়কের কথা। কিংবা বলত পশুদের কোন ব্যায়রাম অথবা সরকারী কসাইখানার বিষয়। ডাক্তার বেজায় অপ্রস্তুত হয়ে পড়ত। বন্ধুরা চলে যেতেই সে ওলেঙ্কার হাত চেপে ধরে ফোঁস করে উঠত, "বার বার তোমাকে মানা করেছি যা তুমি বোঝ না তা নিয়ে কথা না বলতে। আমরা পশু-চিকিৎসকেরা যখন আলাপ-আলোচনা করি, দয়া করে তুমি তার মধ্যে এসে পড়ো না। সত্যি ভারি রাগ হয়।"

ওলেঙ্কা স্তম্ভিত হয়ে তার দিকে তাকাত, চোখ কপালে তুলে জিজ্ঞেসা করত, "তা হলে কী বিষয়ে কথা বলব, ভলদচ্‌কা?" তারপর জলভরা চোখে সে ডাক্তারকে জড়িয়ে ধরত, ডাক্তারকে দিব্যি দিত রাগ না করতে। তারপর দুজনেরই খোশমেজাজ ফিরে আসত।

এ আনন্দ বেশি দিন রইল না। ডাক্তার তার সৈন্যদলের সঙ্গে কোথায় গেল, একেবারের মতো। গোটা দলটাই বদলি হয়ে গেল দূর দেশে—হয়তো বা সাইবীরিয়াতেই। ওলেঙ্কা একা পড়ে গেল।

এবারে সে একেবারেই একলা পড়ে গেল। তার বাবা অনেকদিন আগেই মারা গেছেন, তাঁর সেই আরামকেদারাটা পড়ে আছে চিলেকোঠায় গুদোমে, ধূলোয় ভর্তি, একটা পায়া ভাঙা। ওলেঙ্কা রোগা হয়ে গেল, তার চেহারায়ও আর সে শ্রী রইল না। রাস্তায় দেখা হলে আর তার দিকে কেউ আগের মত চাইত না, হাসত না। বোঝা গেল তার জীবনের সব চেয়ে ভালো দিনগুলো চলে গেল। সে দিন রইল পিছনে পড়ে, এখন যে জীবন শুরু হল তা আলাদা, অনিশ্চিত, তার কথা ভাবতেও বুক কেঁপে ওঠে।

সন্ধ্যেবেলায় বারান্দায় বসে ওলেঙ্কা শুনত 'তিভলি'তে বাজনা বাজছে, বাজি ফুটছে, কিন্তু তা শুনে তার কোন কথাই মনে হত না। ফাঁকা উঠোনটার দিকে সে নির্লিপ্ত চোখে চেয়ে থাকত, কোন কথা ভাবত না, চাইত না কিছুই। দিন ফুরিয়ে গেলে ওলেঙ্কা পড়ত, স্বপ্নে দেখত ফাঁকা উঠোনটা। খাওয়া-দাওয়া করত, যেন অনিচ্ছায়।

সব চেয়ে বড় আর বিশ্রী ব্যাপার হল যে তার আর কোন রকম মতামত রইল না। চোখে পড়ত নানা জিনিস, বুঝত কি হচ্ছে না হচ্ছে, কিন্তু কোন কিছু সম্বন্ধেই একটা মতামত তার মনে গড়ে উঠত না। কি নিয়ে কথা বলা যায় তাও সে বুঝত না।

কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার—মতামত না থাকা। ধরো দেখছ একটি বোতল অথবা বৃষ্টি, কিংবা দেখছ চাষী চলেছে গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে, কিন্তু বোতল, বৃষ্টি বা চাষী কি নিমিত্ত, কী তাদের তাৎপর্য—কিছুই বলতে পারছ না, হাজার রুপিয়া কবুল করলেও নয়!

www.BanglaBook.org

যখন তার কুকিন্ ছিল অথবা পুস্তভালভ কিংবা পরে তার কাছে থাকত পশুর ডাক্তারটি—তখন ওলেঙ্কা সব কিছুই বুঝিয়ে দিতে পারত, যা চাও তারই সম্বন্ধে একটা মত দিতে পারত। কিন্তু এখন তার মনটা ফাঁকা উঠোনটার মতো। বড় কষ্টমাখা, বড় বিস্বাদ এ জীবন।

শহরটা একটু করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। খোলামেলা রাস্তা জিপ্‌সী রোড্ হয়ে উঠল শহুরে সড়ক। যেখানে ছিল তিভলির বাগানগুলো আর কাঠের গোলা, সেখানে বাড়ির সারির ফাঁকে ফাঁকে গুলিঘুঁজি গজিয়ে উঠল। কী তাড়াতাড়ি কেটে যায় সময়!

ওলেঙ্কার বাড়িটা শ্রীহীন হয়ে পড়ল। ছাতে মরচে ধরল, কুঁড়েঘর এক পাশে ঝুলে পড়ল, সারা উঠোনটা ভরে গেল লম্বা ঘাস আর বিছুটির ঝোপে। ওলেঙ্কার নিজেরও বয়স হল, চেহারায় সে লাবণ্য আর রইল না।

গ্রীষ্মকালে সে বসত বারান্দাটায়, মন শূন্য, নিরানন্দ, বিরস। শীতে সে বসত জানলার ধারে, তাকিয়ে থাকত বরফের দিকে। কখনও বসন্তের বাতাসে অথবা হাওয়ায় ভেসে আসা গির্জার ঘণ্টাধ্বনিতে স্মৃতির বন্যা জেগে উঠত, তখন তার মন গলে যেত, চোখে জল ভরে আসত—কিন্তু তাও মুহূর্ত-স্থায়ী, সেটা চলে গেলেই আবার ফিরে আসত সেই শূন্যতা, জীবনের উদ্দেশ্যের সেই অনিশ্চয়তা।

কালো বেড়ালের বাচ্চা ব্রিস্কা তার গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াত, ঘড়র ঘড়র শব্দ করত, কিন্তু ওসব বেড়ালী আদরে ওলেঙ্কার মন সাড়া দিত না। ওর কি ঐটুকুই দরকার? সে চাইত এমন ভালোবাসা যা তার সমস্ত আত্মা, তার মনকে দখল করবে, মনে জন্ম দেবে ধারণার, জীবনে আনবে গতিমুখ, পড়ন্ত বয়সের রক্তে এনে দেবে উষ্ণতা।

কালো বেড়ালবাচ্চাটাকে ওলেঙ্কা তার কোল থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলত, "যা এখান থেকে, যা! এখানে কী তোর? এখানে কিচ্ছু নেই।"

এমনি ভাবে চলত দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, কোনও মত নেই, অমত নেই, আনন্দের ছিটেফোঁটা নেই। রাঁধুনী মাভ্‌রা যা বলত, ওলেঙ্কা তাই মেনে নিত।

একদিন জুলাই মাস, গরম পড়েছে, সন্ধ্যের দিকে, গরুগুলো যখন ঘরে ফিরছে সারা উঠোনে ধুলো উড়িয়ে—সেই সময় কে যেন আচম্‌কা দরজায় ঘা দিল। ওলেঙ্কা নিজেই গেল ফটক খুলতে, খুলে যা দেখল তাতে সে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল—দরজায় দাঁড়িয়ে পশুর ডাক্তার স্মিরনিন্। তার চুলে পাক ধরেছে, পরনে বেসামরিক পোশাক।

এক মুহূর্তে ওলেঙ্কার সব কথা মনে পড়ে গেল। সে নিজেকে সামলাতে পারল না, কেঁদে ফেলল। একটি কথাও না বলে সে স্মিরনিনের বুকে তার মাথা রাখল। এত ওলোট-পালোট হয়ে গেল তার মন যে, কখন যে স্মিরনিন্‌কে ঘরে নিয়ে গিয়ে সে তার সঙ্গে চা খেতে লাগল তা সে বুঝতেই পারল না।

আনন্দে সে কেঁপে উঠল, মুখে কথা ফুটল, "ওগো ভ্লাদিমির প্লাতনিচ্, কী জন্যে এলে এখানে?"

স্মিরনিন্ বলল, "আমি এসেছি এখানে থাকব বলে। সৈনিকের চাকরি আমার শেষ হয়েছে। এবারে এখানেই বসবাস করে নিজে রোজগার করবার চেষ্টা দেখব; তা ছাড়া ছেলেটিও বড় হল, তাকে উচ্চশিক্ষা দিতে হবে। আর জানো, স্ত্রীর সঙ্গে মিটমাট করে ফেলেছি।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওলেঙ্কা বললে, "কোথায় সে?"

"হোটেলে, আমার ছেলের সঙ্গে। আমি বেরিয়েছি একটা আস্তানা খুঁজতে। ভাড়া নেব।"

"সে কি কথা গো! আমার বাড়িটা নাও। ভাড়া! একটি পয়সা ভাড়া নেব না।" ওলেঙ্কার মন আবার চঞ্চল হয়ে উঠল, সে কাঁদতে শুরু করলে। বলল, "তোমরা এখানে থাকো। আমার পক্ষে বাড়ির একটা ধারই যথেষ্ট। ওঃ কি আনন্দ যে হচ্ছে আমার!"

পরদিনই তারা ছাতে দু-এক পোঁচ রঙ আর দেওয়ালে চুনকাম করতে লেগে গেল। ওলেঙ্কা কোমরে হাত দিয়ে উঠোনটার চারিদিক ঘুরে কাজের খবরদারী করতে লাগল। সেই পুরনো দিনের হাসি আবার তার মুখে ফুটে উঠল। মনে হল যেন লম্বা একটানা ঘুমের পর তার শরীর তাজা হয়ে প্রাণ ফুটে উঠেছে।

পশুর ডাক্তারের স্ত্রী এল। রোগা মেয়েটি, সাদাসিদে ছোট করে ছাঁটা চুল, মুখে একটা খামখেয়ালী ভাব। সঙ্গে তার ছোট ছেলেটি, সাশা, বয়স প্রায় দশ, কিন্তু সে-আন্দাজে মাথায় খাটো। ফুলো ফুলো গালে টোল, উজ্জ্বল নীল চোখ। উঠোনে ঢুকেই সে বিড়ালটার পিছনে ছুটতে আরম্ভ করল, সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল খিল খিল হাসি—খুশী মনের ফুর্তির।

ছেলেটি জিজ্ঞেস করল, "মাসি, এটা কি তোমার বেড়াল? ওর যখন বাচ্চা হবে আমাকে দিও। মা ইঁদুর দেখে ভয়ানক ভয় পায়।"

ছেলেটির সঙ্গে ওলেঙ্কার গল্প শুরু হল। চা খাওয়াল সে ছেলেটিকে। হঠাৎ তার বুকটা ভরে উঠল। মধুর একটা ভারে তার বুক কনকন করতে লাগল—ছোট্ট ছেলেটি যেন তার নিজের।

সন্ধ্যেবেলায় সে যখন খাবারঘরে তার পড়া তৈরি করতে বসল, ওলেঙ্কা তার দিকে চেয়ে রইল। মন মুখ তার স্নেহমমতায় ভরে উঠল। সে বলতে লাগল, নিচু গলায়, "আমার দুলাল, আমার মানিক, কত বুদ্ধি তোমার—কী সুন্দর দেখতে তুমি!"

ছেলেটি জোরে জোরে পড়তে লাগল, বই দেখে, "দ্বীপ একটি ভূখণ্ড, সম্পূর্ণরূপে জলবেষ্টিত।"

ওলেঙ্কা পুনরাবৃত্তি করল, "দ্বীপ একটি ভূখণ্ড।"

বহুদিনের ফাঁকা মন থেকে একটা কথা না বলে সে আজ এই প্রথম একটি মত প্রকাশ করল যাতে তার বিশ্বাস আছে।

এইবারে তার নিজস্ব মতামত গড়ে উঠতে আরম্ভ করল। রাত্রে খাবার সময় সে সাশার বাবা-মাকে শোনাতে লাগল যে, হাইস্কুলে ছেলেপিলেদের যা পড়ানো হয় তা কী রকম শক্ত। অবশ্য শুধু কারিগরীর কাজ শেখানোর চেয়ে উচ্চশিক্ষা ভালো, কারণ তার দ্বারা সমস্ত পথই খুলে যায়—চাও তুমি ডাক্তার হতে পারো...ইঞ্জিনীয়ার হতে পারো...

সাশা হাইস্কুলেই যেতে শুরু করল। তার মা খারকভে তার বোনের বাড়ি গেল, গিয়ে আর ফিরল না। বাবা তার পশুর পাল দেখতে বেরোত, কখনও কখনও এক নাগাড়ে বাইরে থাকত। ওলেঙ্কার মনে হত সবাই সাশাকে ছেড়ে চলে গেল, কেউ তাকে চায় না, না খেয়ে ছেলেটি মরে যাচ্ছে। ওকে সে সরিয়ে আনল নিজের পাশটিতে ছোট একটি কামরায়। সেখানেই তার থাকবার বন্দোবস্ত করে দিল।

ছ মাস হয়ে গেল। সাশা থাকে তার পাশেই। রোজ সকালে ওলেঙ্কা যায় সাশার ঘরে।

www.BanglaBook.org

সাশা তখনও শুয়ে, গালের তলায় হাতটি রেখে গভীর ঘুমে অচেতন, নিঃশ্বাস নিঃশব্দে উঠছে পড়ছে। ওলেঙ্কার মনে কষ্ট হয় সাশার ঘুম ভাঙাতে। তবু বলে, আস্তে আস্তে, "সাশেনকা, উঠে পড়ো সোনা। ইস্কুলে যাবার সময় হল।"

সাশা ওঠে, পোশাক পরে প্রার্থনা সেরে খেতে বসে। খায় তিন গ্লাস চা, দুটো বড় কড়া কেক, মাখন-মাখানো আধখানা ছোট রুটি। ঘুম তখনও তার পুরোপুরি কাটেনি, তাই মেজাজটি তখনও ধাতস্থ হয়নি।

ওলেঙ্কা বলে, "সাশেনকা, গল্পটা তোমার কিন্তু ভালো তৈরী হয়নি।"

এমনভাবে চেয়ে থাকে সে তার দিকে, যেন ছেলেকে সে বিদায় দিচ্ছে দূর যাত্রার পথে।

"তোমার জন্য আমি ভেবে মরি। প্রাণপণ চেষ্টা করো সোনামণি, ভালো করে পড়াশুনো করো। মন দিয়ে মাস্টারদের কথা শুনো।"

সাশা বলে, "আঃ, আমাকে ছেড়ে দাও দিকি।'

তারপর হেঁটে রওনা হয় স্কুলে।

ছোট মূর্তিটি পথে চলেছে, মাথায় মস্ত একটা টুপি, কাঁধে একটা ঝুলি। ওলেঙ্কা নিঃশব্দে পিছু পিছু যায়। ডাকে, "সাশেনকা—আ।"

সাশা যেই পিছন ফিরে তাকায় ওলেঙ্কা ওর হাতে গুঁজে দেয় একটি খেজুর বা কারামেলের একটি টুকরো।

স্কুলের গলি এসে পড়ে। সাশেনকার বিশ্রী লাগে, লম্বা মোটা-সোটা একটি মহিলা তার পিছু পিছু আসছেন, দেখে তার লজ্জা করে। পিছন ফিরে সে বলে, "মাসি, বাড়ি ফিরে যাও। এখন আমি একা যেতে পারব।"

ওলেঙ্কা থামে, কিন্তু তার চোখ সরে না। স্কুলে ঢোকার পথটিতে ছেলে পৌঁছে চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত সে তার দিকে তাকিয়েই থাকে। আঃ, কী ভালোই বাসে সে ছেলেটিকে। মায়ার ফাঁদে সে আগেও পড়েছে, কিন্তু কেউই তাকে এমন করে বাঁধতে পারেনি। আজ তার মায়ের মন জেগে ওঠে যত আনন্দে, যেমন করে তাঁর আত্মাটাকে একেবারে বিলিয়ে দিয়েছে, তেমন কখনও হয়নি আগে। এই ছোট্ট ছেলেটি তার নিজের নয়, তবু তার গালের টোলটি, মাথার টুপিটার জন্য সে তার জীবন দিতে পারে, আনন্দে, মমতায়, জলভরা চোখে। কেন? কেন তা কে বলতে পারে?

সাশাকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে ওলেঙ্কা শান্ত মনে বাড়ি ফিরে যায়। মনভরা তার তৃপ্তি, প্রশান্তি, ভালোবাসা। গেল ছ মাসে বয়স যেন তার কমে গেছে, মুখে উজ্জ্বল আনন্দ। লোকে তাকে দেখে খুশী হয়, বলে, 'সুপ্রভাত গো ওল্‌গা সেম্‌ইয়নভনা, দুলালী, কেমন আছ দুলালী?"

সে বলে, "ইস্কুলে আজকাল এত শক্ত পড়া দেয়!" বাজারে ঘুরে কেনাকাটার ফাঁকে ফাঁকে সে বলতে থাকে, "ঠাট্টা নয়। কাল প্রথম ঘণ্টায় ওকে পড়া দিয়েছে একটা গল্প মুখস্থ, লাতিন থেকে একটা তরজমা আর একটি সমস্যাপূরণ। ঐটুকু একটা ছেলের পক্ষে এটা বড্ড বাড়াবাড়ি, বাস্তবিকই।"

তারপর সে আরম্ভ করে মাস্টারদের কথা, পড়ার কথা, পাঠ্য বইগুলোর কথা—সাশা যা বলে ঠিক তাই বলে।

www.BanglaBook.org

তিনটের সময় ওরা একসঙ্গে খায়। সন্ধ্যেবেলায়, মাস্টাররা যে বাড়ির পড়া দেন তা ওরা পড়ে একসঙ্গে, একই সঙ্গে কাঁদে। সাশাকে বিছানায় শুইয়ে ওলেঙ্কা প্রার্থনায় আর ক্রুসচিহ্ন আঁকায় অনেকক্ষণ লাগিয়ে দেয়। তারপর সে নিজে শুতে যায় আর স্বপ্ন দেখে সেই দূর, অস্পষ্ট ভবিষ্যতে, যখন সাশার পড়া শেষ হয়েছে, সে ডাক্তার বা এঞ্জিনীয়ার—তার মস্ত একটা বাড়ি, ঘোড়াগাড়ি। বিয়ে হয়েছে, ছেলে মেয়ে হয়েছে...এই কথাই ভাবতে ভাবতে সে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমন্ত চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে পড়তে থাকে। পাশে কালো বেড়ালটা শুয়ে আওয়াজ করে...ঘড়র...ঘড়র।

হঠাৎ দরজায় জোরে ঘা পড়ে। ওলেঙ্কার ঘুম ভেঙে যায়। ভয়ে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, বুক ধড়াস ধড়াস করতে থাকে। আধ মিনিট বাদে আবার ঘা।

ওলেঙ্কার সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপতে থাকে। সে ভাবে, "খারকভ্ থেকে এসেছে তার। সাশার মা তাকে চেয়ে পাঠিয়েছে। হা ভগবান!"

সমস্ত আশাভরসা তার উবে যায়, মাথা হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে, মনে হয়, তার মত অভাগিনী জগতে আর কেউ নেই।

কিন্তু আরও এক মুহূর্ত কেটে যাবার পর সে কার যেন গলা শুনতে পায়; কিছু নয়, পশুর ডাক্তার ক্লাব থেকে ঘরে ফিরল।

ওলেঙ্কা মনে মনে বলে, "যাক। ধন্য ভগবান!" ক্রমে ক্রমে তার বুকের ওপর থেকে ভারটা সরে যায়। আশ্বস্ত হয়ে সে ফিরে যায় বিছানায়, আর সাশার কথা ভাবে। পাশের ঘরে ঘুমোয় সাশা আর মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে ওঠে ঘুমের ঘোরে, "দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা! এই, ওকি, মারামারি নয়!"

* * *

গল্পটি চেখফের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। কেউ কেউ বলেন, দি বেস্ট্ শর্ট স্টরি অব চেখফ। আবার কেউ কেউ বলেন, পৃথিবীর সর্বোত্তম শ্রেষ্ঠ গল্প।

কেন?

তারই টীকা করেছেন স্বয়ং টলস্টয়। এরকম একটা ঘটনা এই বাংলাদেশেই ঘটেছিল। প্রভাত মুখুয্যে একটা ছোট গল্প লিখেছিলেন। তার মূলে বক্তব্য ছিল, হিন্দুর 'নীচ' জাতির একটি ছেলে অপমানিত বোধ করে খ্রীষ্টান হবে বলে মনস্থির করলে। তখন দেখে, খ্রীষ্টানদের ভিতরও জাতিভেদ রয়েছে। নেটিভ খ্রীষ্টানদের জন্য আলাদা ক্লাব, এমন কি ধর্মমন্দির—চার্চ সেও আলাদা, এবং সবচেয়ে অবিশ্বাস্য মৃত্যুর পরও জাতিভেদ যায় না : গোরার জন্য ভিন্ন গোরস্থান, নেটিভের ভিন্ন গোরস্থান। গল্পটা পড়ে রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ, সে যুগের ঋষিপ্রধান দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একটি সমালোচনা লেখেন—'ডাঙায় বাঘ জলে কুমীর।' হিন্দুর বর্ণাশ্রম সমস্যা নিয়ে এরকম প্রামাণিক প্রবন্ধ এর পূর্বে বা পরে কখনও লিখিত হয়নি। 'হরিজন' আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার বহু বহু পূর্বে।

টলস্টয়ের টীকা পড়ে পাঠক বুঝবেন, আমরা সাধারণ পাঠক, কত সহজেই গল্পটির মূল বক্তব্য মিস করে যেতে পারি। অনবদ্য এই টীকাটি।

টীকাটি প্রকাশিত হওয়ার পর চেখফ সর্বসাধারণকে অনুরোধ জানান তাঁর গল্পটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন টীকাটি পড়েন এবং প্রকাশকদের অনুরোধ করেন, তাঁরা যেন সব সময়ই গল্পটির সঙ্গে টীকাটিও ছাপেন। ইটিও অনুবাদ করেছেন সখা খাফী খান।

www.BanglaBook.org

দুলালী ("দুশেচকা")র সমালোচনা
তলস্তয়

বাইব্‌লের গণনাপুস্তকে একটি গল্প আছে, তার অর্থ অতি গভীর। গল্পটিতে বলা হয়েছে, ইস্‌রাএলীরা যখন মোআবের রাজ্যসীমায় এসে উপস্থিত হল, মোআবীয়দের রাজা বালাক্ তখন নবী বালআমকে ডেকে পাঠালেন ইস্‌রাএলীদের অভিসম্পাত দেবার জন্য; কাজটি সেরে দিলে বালাক্ বালআমকে বহু পুরস্কার দেবেন। তার লোভে বালআম বালাকের কাছে গেলেন এবং তাকে নিয়ে উঠলেন পর্বতে। সেখানে একটি বেদী তৈরী করা হল, গোবৎস ও মেঘ উৎসর্গ করা হল অভিশাপের উদ্যোগে। বালাক্ রইল অভিশাপের প্রতীক্ষায়, কিন্তু বালআম ইস্‌রাএলের লোকদের অভিসম্পাত না দিয়ে তাদের আশীর্বাদ করলেন।

২৩ পরিচ্ছেদ ১১ চরণ : "বালাক্ বালআমকে কহিল, তুমি আমার প্রতি এই কি করিলা? আমার শত্রুগণকে শাপ দিতে তোমাকে আনিলাম, কিন্তু দেখ তুমি তাহাদিগকে সর্বতোভাবে আশীর্বাদ করিলা।"

তাহাতে সে উত্তর করল, পরমেশ্বর আমার মুখে যা কথা দেন, সাবধান হইয়া তাহাই কহা কি আমার উচিত নহে?

১৩ : "পরে বালাক্ কহিল, আমি মিনতি করি, অন্যস্থানে আমার সহিত আসিয়া সেখানে থাকিয়া আমার নিমিত্ত তাহাদিগকে শাপ দেও।"

কিন্তু আবার শাপ না দিয়ে বালআম আশীর্বাদ করলেন। তৃতীয় বারেও তাই।

২৫ পরিচ্ছেদ ১০ম চরণ, তখন বালআমের প্রতি বালাকের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল, সে আপনা হস্তে হস্তের আঘাত করিল এবং...বালআমকে কহিল, শত্রুগণকে শাপ দিতে আমি তোমাকে আনিলাম, কিন্তু দেখ তুমি তিন বার সর্বতোভাবে তাহাদের আশীর্বাদ করিলা।

১১ : "অতএব তুমি এখন স্বস্থানে পলায়ন কর; আমি তোমাকে অতিশয় সম্মানিত করিব ভাবিয়াছিলাম কিন্তু দেখ পরমেশ্বর তোমায় সম্মান পাইতে নিবৃত্ত করিলেন।"

তখন বালআম পুরস্কার লাভ না করেই প্রস্থান করলেন, কারণ তিনি বালাকের শত্রুদের অভিসম্পাতের পরিবর্তে দিলেন আশীর্বাদ।

বালআমের যা হয়েছিল প্রকৃত কবি ও রসস্রষ্টাদের প্রায়ই তা হয়। বালাকের পুরস্কার জনপ্রিয়তার লোভে কিংবা ভ্রান্ত ধারণার বশে কবি দেখে না যে তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে দেবদূত, গাধাও যাকে দেখতে পায়।[১] চায় সে অভিশাপ দিতে, কিন্তু অহো! সে দেয় আশীর্বাণী।

---

১ বালাকের আমন্ত্রণে বালআম যখন যাত্রা শুরু করে তখন তার পথ আটকে দাঁড়িয়েছিল য়িহুহের দূত। বালআম তাকে দেখতে পায়নি, কিন্তু যে গাধার পিঠে চড়ে সে আসছিল সে পেয়েছিল দেখতে—অনুবাদক।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঠিক তাই হল খাঁটি কবি এবং রসস্রষ্টা চেখফের মনোহর এই 'দুলালী'' গল্পটি লেখবার বেলায়।

লেখক নিশ্চিত চেয়েছিলেন কৃপার পাত্রী এই জীবটিকে উপহাস করতে। হৃদয় দিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করেছিলেন দুলালীকে—যে প্রথমে কুকিনের দুশ্চিন্তার বোঝা কাঁধে তুলে নেয়, তারপর কাঠ কেনা-বেচার বিষয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তারপর পশুর ডাক্তারের আওতায় এসে গরু-মহিষের ব্যামোকেই পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুতর ব্যাপার বলে ঠিক করে আর শেষে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ব্যাকরণের প্রশ্ন এবং মস্ত টুপি পরা ছোট্ট বাচ্চাটির ভালোমন্দ নিয়ে।

কুকিন্ পদবীটি উদ্ভট, তার অসুখ, যে টেলিগ্রামে তার মারা যাবার খবর জানানো হল তাও উদ্ভট, কাঠের ব্যাপারী আর খানদানী ঠাট পশুর ডাক্তার, এমন কি ছোট্ট ছেলেটি, সবাই, সবই উদ্ভট, কিন্তু দুলালী, তার অন্তর, যাকেই সে ভালবাসে তারই মধ্যে তার সমস্ত সত্তার নিবেদন—এ উদ্ভট নয়, অনির্বচনীয় পবিত্র।

আমার বিশ্বাস, ''দুলালী'' গল্পটি লেখার সময়ে লেখকের—হৃদয়ের নয়—মনে ছিল একটি অস্পষ্ট মূর্তি, নব্য নারীর, স্বয়ং পুরুষের সমকক্ষ, মানসিক উৎকর্ষসম্পন্ন, শিক্ষিতা, সমাজহিতব্রতে স্বয়ং-নিযুক্ত দক্ষতায় পুরুষের তুল্য কিংবা আরও সুদক্ষ, নারীসমস্যা কথাটা যে তুলেছে এবং তোলে।

''দুলালী'' লিখে লেখক দেখাতে চেয়েছিলেন মেয়েদের কী হওয়া উচিত নয়। জনমত বালাক্-চেখফকে বলেছিল, দুর্বল, একান্ত অনুগত, অনুন্নত, পুরুষসেবায় নিয়োজিত স্ত্রীদের অভিশাপ দাও। চেখফ পর্বতে উঠলেন, বেদীর উপর গোবৎস এবং মেষ রেখে দেওয়া হল, কিন্তু যখন তাঁর মুখ খুলল, তখন যাদের শাপ দিতে এসেছিলেন তাদের তিনি শোনালেন আশীর্বচন।

অনবদ্য স্বচ্ছ পরিহাসের রসে লেখা অপরূপ এই গল্পটি : তবু, এর কোনও কোনও অংশ পড়তে গিয়ে আমি অন্তত আমার চোখের জল সামলাতে পারি নি। মন ভিজেছে—কুকিন্, যা কিছু নিয়ে কুকিন্ মেতে থাকে, কাঠ-ব্যবসায়ী, পশুর ডাক্তার এসবের প্রতি দুলালীর একান্ত অনুরাগ ও অভিনিবেশের বিবরণ পড়ে; আরও বেশী যখন সে একা, আর তার ভালোবাসার কেউ নেই—তখন তার যে যন্ত্রণা, তার বিবরণ আর সবার শেষে, নারীর মাতৃত্বের যে অনুভূতি তার নিজের জীবনে সে পায়নি তার সমস্ত শক্তি এবং অপরিসীম প্রেম যখন সে নিয়োগ করে ভবিষ্যতের মানব মস্ত বড় টুপি-পরা ইস্কুলের ছেলেটির মধ্যে, তার বিবরণ পড়ে।

লেখক মেয়েটিকে ভালোবাসালেন উদ্ভট এক কুকিন্‌কে, নগণ্য এক কাঠ-ব্যবসায়ীকে, কাঠখোট্টা এক পশুর ডাক্তারকে, কিন্তু প্রেমের পাত্র একটা কুকিনই হোক আর একটি স্পিনোজা পাস্কাল বা শিলারই হোক, প্রেমাস্পদ ঘন ঘন বদলাক—যেমন দুলালীর বেলায়—অথবা চিরকাল একই থাক, প্রেম তাতে কিছু কম পবিত্র হয় না।

কিছুদিন আগে আমি 'নোভোয়ে ভ্রেম্‌ইয়া' কাগজে নারী সম্বন্ধে চমৎকার একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম। প্রবন্ধটিতে লেখক নারীদের সম্বন্ধে অতি চতুর এবং বড় গভীর একটি মতবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ''মেয়েরা আমাদের দেখাতে চেষ্টা করছে যে যা কিছু আমরা পুরুষেরা পারি, তারাও পারে। এ নিয়ে আমার বিবাদ নয়; আমরা মানতে রাজি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যে পুরুষেরা যা পারে মেয়েরাও তার সবই পারে, হয়তো পুরুষের চেয়ে ভালোই পারে। কিন্তু মুশকিল এই যে, মেয়েরা যা পারে পুরুষদের কীর্তি তার ধারেকাছেও যেতে পারে না।''

ঠিক, কথাটি যে সত্য তাতে সন্দেহ নেই। এবং এটি যে শুধু শিশুর জন্মদান, লালন-পালন ও বাল্যশিক্ষার ক্ষেত্রেই সত্য তাই নয়। পুরুষ সেই সর্বাধিক উন্নত শ্রেষ্ঠ কার্যটি সাধন করতে পারে না যার দ্বারা মানুষ ঈশ্বরের নিকটতম সন্নিধানে আসতে পারে—এই কীর্তি—প্রেম, প্রেমাস্পদে একনিষ্ঠ আত্মনিয়োগ। এটি শ্রেষ্ঠ নারী পেরেছে, পারে এবং পারবে—অতি উত্তমভাবে এবং সহজ স্বাভাবিক উপায়ে। কী হত এই জগতের যদি মেয়েদের এই ক্ষমতাটি না থাকতো এবং যদি এর প্রয়োগ তারা না করতো!

মেয়ে ডাক্তার, টেলিগ্রাফের কেরানী, নারী বৈজ্ঞানিক, মেয়ে উকীল, লেখিকা—এ সব না থাকলেও আমাদের চলতো, কিন্তু যারা মানুষের মধ্যে যা সর্বোত্তম তাকে ভালোবাসে এবং সেইটিকে অগোচরে তার মধ্যে সঞ্চালিত, উদ্বুদ্ধ করে তার সহায় হয়, সেই মা, সহায়িকা, সান্ত্বনাদাত্রী—তারা না থাকলে জীবনটা বিপরীত একটা ব্যবহার হয়ে উঠতো। যীশুখ্রীষ্টের কাছে কোনও মগ্‌দলীনি আসত না, সাধু ফ্রান্সিসের সঙ্গে ক্লারা থাকত না, ডিসেম্বরের বিদ্রোহীদের সঙ্গে তাদের পত্নীরা সাইবীরিয়ায় যেত না, দুখবরদের স্ত্রীরা যে তাদের স্বামীদের সত্যের জন্য আত্মদানের পথ থেকে না সরিয়ে দিয়ে বরং সেই পথেই তাদের প্রবৃত্ত করেছিল, তাও হত না। থাকত না সেই হাজার হাজার অজানা মেয়েরা—নারীকুলশ্রেষ্ঠা এরা—অজ্ঞাতেরা চিরকালই যা হয়—যারা সান্ত্বনা দেয় মদ্যপ, দুর্বল, উচ্ছৃঙ্খল জনকে, প্রেমস্নিগ্ধ সান্ত্বনার প্রয়োজন যাদের সবার চেয়ে বেশী। এ প্রেম যাতেই প্রযুক্ত হোক্, কুকিনে বা খ্রীষ্টে, এইটেই নারীর প্রধান, মহীয়সী, অনন্যালভ্যা শক্তি।

কী প্রচণ্ড বোঝার ভুল, এই সব তথাকথিত নারীসমস্যা—যার কবলে পড়েছে শুধু মেয়ে নয়, পুরুষদেরও বেশীর ভাগ। অর্বাচীন যে কোনও ধারণার কবলে এরা পড়বেই।

''মেয়েদের মন চায় নিজেদের উন্নতি।'' এর চেয়ে ন্যায় যুক্তিসঙ্গত কথা আর কী হতে পারে?

কিন্তু স্বভাবগুণে মেয়েদের কাজ পুরুষের কাজ থেকে ভিন্ন। অতএব মেয়েদের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের আদর্শ এবং পুরুষের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের আদর্শ এক হতে পারে না। মেনে নেওয়া যাক যে মেয়েদের আদর্শ কী তা আমরা জানি না। যাই হোক সেটা, এটা নিশ্চিত যে সেটা পুরুষের চরম উৎকর্ষের আদর্শ নয়। অথচ নারীজাতির পথকণ্টক এই শৌখীন নারী আন্দোলনের সমস্ত উদ্ভট কার্যকলাপের লক্ষ্য হচ্ছে ঐ পুরুষালী আদর্শে পৌঁছানো।

আমার মনে হয়, এই ভুল বোঝার প্রভাব চেখফের উপর পড়েছিল ''দুলালী'' লেখবার সময়।

বালআমের মতো তিনি চেয়েছিলেন অভিশাপ দিতে, কিন্তু কাব্যদেবতা তাঁকে নিষেধ করলেন, আদেশ দিলেন আশীর্বাদ করতে। আশীর্বাদই তিনি করলেন এবং অজ্ঞাতে এমন অপূর্ব প্রভামণ্ডিত করলেন এই মাধুরীময়ী প্রাণীটিকে যে সে চিরকালের মতো একটি দৃষ্টান্ত হয়ে রইল—যে নিজে আনন্দ চায় এবং নিয়তি যাকেই তার সান্নিধ্যে আনে তাকেই আনন্দ দিতে চায়, এমন একটি নারী যে কী হতে পারে তার।

www.BanglaBook.org

গল্পটি যে এত অপরূপ তার কারণ, এর পরিণতি পূর্বকল্পিত নয়।

আমি বাইসিকেল চালাতে শিখেছিলাম একটা হলঘরে। সেটা এত বড় যে তার মধ্যে একটা সৈন্যবাহিনী কুচকাওয়াজ করতে পারে। অপর প্রান্তে একটি মহিলা শিখছিলেন বাইসিকেল চড়া। আমি ভাবলাম, হুঁশিয়ার থাকব, ওঁর উপর চোখ রাখলাম। চেয়ে থাকতে থাকতে ক্রমেই আমি ওঁর দিকে এগিয়ে পড়তে লাগলাম। উনি বিপদ দেখে তাড়াতাড়ি পিছু হটতে আরম্ভ করলেন। তবু আমি গিয়ে পড়লাম ওঁর ঘাড়ের উপর, ধাক্কা মেরে বাইসিকেল থেকে তাঁকে ফেলে দিলাম—অর্থাৎ যা চেয়েছিলাম তার উল্টোটাই করে বসলাম—শুধু এই কারণে যে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল মহিলাটির উপর।

চেখফেরও তাই হল, বিপরীত মুখে। উনি চেয়েছিলেন দুলালীকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে, কিন্তু তাঁর কবির দৃষ্টি তার উপর নিবদ্ধ থাকায় তিনি দিলেন তাকে তুলে।

এই টীকাটি পড়ার পর আর কার কি বলবার থাকে?

[চেখফ বলেছিলেন, এর চেয়ে বড় সম্মান আমি আমার জীবনে আর কী আশা করতে পারি!]

সত্যেন্দ্রনাথ যখন একদিন দেখলেন, কবিগুরু তাঁর একটি বাঙলা কবিতা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ইংরিজিতে অনুবাদ করেছেন (অর্থাৎ নিজের সৃজনীকর্ম মুলতুবী রেখে) তখন তাঁর হৃদয়ে কী শ্লাঘার উদয় হয়েছিল তার কি কল্পনাও আমরা করতে পারি।

ধন্য 'দুলালী'র প্রেম। তা সে যাকেই বাসুক না, যতবারই বাসুক না কেন। রমণীর এই প্রেমই তো জগৎকে শ্যামল করে রেখেছে।

কিন্তু আমার মনে একটি প্রশ্নের উদয় হয়। সহৃদয় পাঠক আমার দম্ভ ক্ষমা করবেন। 'দুলালী' যখন ভানিচ্‌কাকে ভালোবাসছে তখন যদি হঠাৎ ভাসিলিকে দেখে তার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে হৃদয়হীনার মত হৃদয় খান খান করে তার প্রেমকে পদদলিত করে (ইংরিজিতে যাকে বলে তাকে 'জিল্‌ট' করে) ভাসিলিকে বরণ করতো তখনও 'দুলালী'র সে-প্রেম ধন্য?

ঠাকুর-দেবতার কার্যকলাপ আমাদের সমালোচনার বাইরে। এই যে কেষ্টঠাকুর রাধাকে জিল্‌ট্ করে মথুরা গিয়ে একাধিক প্রণয় এবং শুধু তাই নয়, রাধার কানের কাছে ঢাকঢোল বাজিয়ে বিয়ে করলেন, সেগুলোও ধন্য? অথচ আমাদের হৃদয় তো পড়ে রইল শ্রীরাধার রাঙা পায়ে। শত শত বৎসর ধরে এই বাঙলাদেশে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিরা আপন আপন বিরহবেদনা আপন আপন পদদলিত প্রেমের নিবিড়তম পীড়া তুলে দিলেন রাধার মুখে। তাই দিয়ে 'মাথুর' আর সেই জিনিসই পদাবলীর হৃদয়খণ্ড,—মেরুদণ্ড—যে নামেই তাকে ডাকা যাক। পৃথিবীর ইতিহাসে এর তুলনা আমি পাইনি : শত শত বৎসর ধরে হাজার হাজার কবি (এবং সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়, তার ভিতর নাকি প্রায় শ'তিনেক বিধর্মী মুসলমান কবি! ভাবলে আশ্চর্য বোধ হয়, এই অভাগিনী জিলটেড

আন্তন চেখফ : 'The Darling and other short stories', রুশ কন্‌স্ট্যান্স গার্নেটের তরজমা, London, Chatto & Windus, 1918।

www.BanglaBook.org

রাধার প্রেমে কী যাদুমন্ত্র লুকনো ছিল যে শত শত বিধর্মী কবিকেও তাঁর সামনে নতমস্তক হতে হল!) আপন আপন হৃদয়বেদনা—যার মূল্য বিশ্বাসঘাতক, প্রেমঘ্ন নিরতিশয় স্বার্থপর, নীচ দয়িত দিল না—নিজের মুখে প্রকাশ না করে সর্ব বৈভব নত নমস্কারে রেখে দিল পাগলিনী শ্রীরাধার অধরোষ্ঠে। তার হয়তো একমাত্র কারণ, উপনিষদ বলেছেন, 'তাকে ত্যাগ করে ভোগ করবে। শ্রীরাধা প্রেম দিয়ে আনন্দ পেতে চাননি, মাতৃত্বের বিগলিত মধুরিমা, যশোদার মতো বিশ্বজয়ী পুত্রের গৌরবও তিনি কামনা করেননি। তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করে ভোগ করলেন। এ ভোগ 'দুলালী'র ভোগ নয়। এ শচীপতি ইন্দ্রের ভোগ নয়, শ্মশানবাসী নীলকণ্ঠের বৈরাগ্য। কিন্তু আশ্চর্য, রবীন্দ্র-সৃষ্টিতে পদদলিত প্রেমের উদাহরণ নেই। যাঁর জন্য তাঁর বিরহবেদনা তাঁর শত শত গানে প্রকাশ পেয়েছে তিনিও কবিকে ভালোবাসেন—তাঁর 'প্রেমের বেদনা'তে কবির 'মূল্য আছে'—শুধু তিনি চলে গেছেন দূরে রবিপ্রেম কখনও লাঞ্ছিত হয়নি। সে অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না।

কিন্তু এ তো একটা দিক। আমার মূল প্রশ্ন এখনও পাঠকের কাছে রইল, অতি ঘরোয়া ভাষায় শুধোই, এই যে আমাদের সোসাইটি লেডি, আজ মুখুয্যেকে জিল্‌ট্ করে কাল সেনকে, পরশু সেনকে জিল্‌ট্ করে ঘোষকে—তাঁর প্রত্যেক প্রেমের জয়ধ্বনি গাইবেন টলস্টয়?

সর্বশেষে পুনরায় বিস্ময় মানি চেখফের এই গল্পটির সামনে। বিস্ময় মানি টলস্টয়ের টীকার সম্মুখে। আমাদের মত জড় পাষাণ-হৃদয়কে বিগলিত করে বইয়ে দিল শত শত প্রশ্নধারায়।

৩রা জুলাই, ১৯৬৩

আন্তন চেখফের "বিয়ের প্রস্তাব"
অনুবাদকের টিপ্পনী

আন্তন চেখফের রচনায় রাশার যে-যুগের বর্ণনা পাওয়া যায়, তার সঙ্গে আমাদের জমিদার-যুগের প্রচুর মিল দেখতে পাই। সেই কারণেই বোধ হয় আমাদের শরৎচন্দ্র প্রচুর রাশান উপন্যাস, ছোট গল্প অতিশয় মনোযোগ সহকারে পড়েছিলেন। শরৎচন্দ্র অসাধারণ শিল্পী, তাই তাঁর পরিণত বয়সের লেখাতে অন্যের প্রভাব খুঁজতে যাওয়া নিষ্ফল। তবে যদি কোন সাহিত্য তাঁকে অনুপ্রাণিত করে থাকে, তবে সেটা রুশ সাহিত্য। তাঁর 'দত্তা'র সঙ্গে এ-নাটিকার কোন মিল নেই, কিন্তু দুটিতেই আছে একই জমিদারির আবহাওয়া।

চেখফ যে যুগের বর্ণনা দিয়েছেন সে সময় একই লোককে ভিন্ন ভিন্ন জন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ডাকত। যেমন এই নাটিকার নাম নাতালিয়া স্তেপানভনা চুবুকফ। অতি অল্প পরিচয়ে লোক তাকে ডাকবে মিস চুবুকফ বলে। যাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়েছে, তারা ডাকবে নাতালিয়া স্তেপানভনা। (স্তেপানভনা = স্তেপানের মেয়ে)। যাদের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় তারা ডাকবে শুধু নাতালিয়া, এবং যারা নিতান্ত আপন জন তারা ডাকবে নাতাশা। এখনও বোধ হয় এই রীতিই প্রচলিত আছে, তবে যে স্থলে মিস চুবুকফ বলা হত আজ বোধ হয় সেখানে কমরেড চুবুকফ বা চুবুকভা বলা হয়।

www.BanglaBook.org

পাত্র-পাত্রীগণ :

স্তেপান স্তেপানভিচ্ চুবুকফ—জমিদার।
নাতালিয়া (ডাকনাম নাতাশা) স্তেপানভ্না চুবুকফ—ঐ জমিদারের কন্যা; বয়স ২৫।
ইভান ভাসিলিয়েভিচ্ লমফ—চুবুকফের প্রতিবেশী জমিদার, স্বাস্থ্যবান হৃষ্টপুষ্ট লোক, কিন্তু সমস্তক্ষণ ভাবেন তিনি বড্ডই অসুস্থ (হাইপোক্রোন্ড্রিআক)।

ঘটনা চুবুকফের জমিদারীতে।

[চুবুকফের ড্রইংরুম। চুবুকফ এবং লমফ : ঈভনিং ড্রেস এবং সাদা দস্তানা পরে লমফের প্রবেশ]

চুম্বক : [লমফের দিকে এগিয়ে গিয়ে] এস, এস, বন্ধুবর! এ যে একেবারে অপ্রত্যাশিত, ইভান ভাসিলিয়েভিচ্! কিন্তু বড় আনন্দ হল, বড়ই আনন্দ হল [হ্যান্ডশেক্]। সত্যি একেবারে তাক লাগিয়ে দিলে, ভায়া। কি রকম আছো?

লমফ : ধন্যবাদ। আর আপনি কি রকম আছেন?

চুবুকফ : মোটামুটি আমাদের ভালোই যাচ্ছে, বাছা—তোমাদের প্রার্থনা আর-যা-সব-কি-সব তো রয়েছে। বসো, বসো। জানো, এরকম করে পুরনো দিনের প্রতিবেশীকে তোমার ভুলে যাওয়া উচিত নয়? বড় খারাপ, বড্ডই খারাপ। কিন্তু বলো দিকিনি, এত সব ধড়াচুড়ো পরে কেন? পুরোপাক্কা ফুল ডিনার ড্রেস, হাতে দস্তানা আর-যা-সব-কি-সব? কারও সঙ্গে পোশাকী দেখা করতে যাচ্ছো নাকি, না অন্য কিছু ভায়া?

লমফ : আজ্ঞে না, শুধু আপনাদের সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি।

চুবু : তবে ফুল ডিনার ড্রেস কেন ভায়া? মনে হচ্ছে তুমি যেন নববর্ষে পোশাকী মোলাকাৎ করতে এসেছ!

লমফ : ব্যাপারটা হচ্ছে (চুবুকফের হাত ধরে)...আমি কি না, আমি এসেছি আপনার কাছ থেকে একটা অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে, স্যার—শুধু আশা করছি আপনি বিরক্ত হবেন না। আপনার কাছ থেকে এর আগেও আমি সাহস করে কয়েকবার সাহায্য চেয়েছি এবং আপনিও, সব সময়েই, বলতে কি...কিন্তু মাফ করুন, আমার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আমি একটুখানি জল খাই। [জলপান]

চুবু : [নেপথ্যে] টাকা ধার চাইতে এসেছে নিশ্চয়ই। দেব না। [লমফকে] কি হয়েছে, বলো না ভায়া।

লমফ : দেখুন স্যার...কিন্তু মাফ করুন, স্যার...আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে...দেখতেই পাচ্ছেন...মানে কি না, আপনিই একমাত্র লোক যিনি আমায় সাহায্য করতে পারেন, যদিও সত্যি বলতে কি, আমি এযাবৎ আপনার জন্য এমন কিছু করতে পারিনি যার জন্য আপনার কাছ থেকে সাহায্য প্রত্যাশা করতে পারি, সত্যি, আমার সে হক্ক আদপেই নেই...

চুবু : কী বিপদ! অত সুতো ছাড়ছ কেন ভায়া! বলেই ফেল না, কি হয়েছে বলো।

লমফ : বলছি, বলছি, এখ্খনি বলছি...ব্যাপারটা হচ্ছে এই, আমি আপনার মেয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নাতালিয়া স্তেপানভ্‌নাকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।

চুবু : (সোল্লাসে) ইভান ভাসিলিয়েভিচ্‌! প্রাণের বন্ধু আমার! ফের বলো তো, কি বললে। আমি ঠিক ঠিক শুনতে পাইনি।

লমফ : অতিশয় সবিনয় নিবেদন জানাচ্ছি...

চুবু : (বাধা দিয়ে) সোনার চাঁদ ছেলে! আমি যে কী খুশী হয়েছি, আর-যা-সব-কি-সব। নিশ্চয় নিশ্চয়, আর-যা-সব-কি-সব। [লমফকে আলিঙ্গন ও চুম্বন] ঠিক এই জিনিসটিই আমি বহুকাল ধরে চাইছিলুম [এক ফোঁটা চোখের জল] তোমাকে আমি চিরকালই আপন ছেলের মত স্নেহ করেছি। ভগবান তোমাদের হৃদয়ে একে অন্যের জন্য প্রেম দিন, তোমাদের মনের মিল হোক, আর-যা-সব-কি-সব। সত্যি বলতে কি, আমি সব সময়েই চেয়েছিলুম...কিন্তু আমি এখানে বেকুবের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করছি কি? আমাকে কেউ যেন আনন্দের ডাঙশ মেরেছে—আমার মাথায় কিচ্ছু আসছে না! আহা, আমার সমস্ত হৃদয় ঢেলে—আমি গিয়ে নাতাশাকে ডাকছি, আর-যা-সব-কি-সব—

লমফ : স্যার, উনি কি বলবেন আপনার মনে হয়? তিনি সম্মতি দেবেন, আশা করতে পারি?

চুবু : কি বললে? নাতাশা যদি রাজী নাও হতে পারে! অবাক করলে! আর তোমার চেহারাটাও চমৎকার নয়? ধরো বাজি, ও তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে, আর-যা-সব-কি-সব। আমি এখুনি তাকে বলছি গে।

[নিষ্ক্রমণ]

লমফ : [একা] আমার শীত-শীত করছে...আমার সর্বাঙ্গ কাঁপছে, যেন পরীক্ষার হলে যাচ্ছি। আসল কথা হচ্ছে, মন স্থির করা। বেশী দিন ধরে শুধু যদি ভাবতেই থাকো, এর সঙ্গে ওর সঙ্গে শুধু আলোচনা করে, গড়িমসি গড়িমসি করতে থাকো, আর কোন এক আদর্শ রমণীর জন্য, কিংবা খাঁটি সত্য প্রেমের জন্য পথ চেয়ে থাকো, তবে তোমার কখ্‌খনো বিয়েই হবে না। উহুহুহু, কী শীত করছে আমার! নাতালিয়া স্তেপানভ্‌না সংসার চালায় চমৎকার, লেখাপড়ি করেছে আর দেখতেও খারাপ নয়...এর বেশী আমার কীই বা চাই? কিন্তু আমি ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হয়ে পড়েছি। মাথাটা তাজ্জিম মাজ্জিম করছে। [জলপান] কিন্তু আমার আইবুড়ো হয়ে থাকা চলবে না। পয়লা কথা, আমার বয়েস পঁয়ত্রিশ পেরিয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় : আমাকে মেপেজুকে ছকে কাটা জীবন চালাতে হবে...আমার বুকের ব্যামো রয়েছে, ভিতরটা সর্বক্ষণ ধড়ফড়...আমি কত সহজেই রেগে কাঁই হয়ে যাই আর কত সহজেই উত্তেজনার চরমে পৌঁছে যাই...এই তো, এই এখ্‌খনি আমার ঠোঁট কাঁপছে আর ডান চোখের পাতাটা নাচছে...কিন্তু সব চেয়ে বিপদ হল আমার ঘুম নিয়ে। বিছানায় যেই শুয়েছি আর চোখ দুটো জুড়ে আসছে অমনি কি যেন কি একটা আমার বাঁ পাশটায় ছোরা মারে। এক্কেবারে ছোরা মারার মত! আর সেটা সরাসরি আমার কাঁধের ভিতর দিয়ে গিয়ে মাথা অবধি পৌঁছে যায়...আমি খ্যাপার মত লাফ দিয়ে উঠি, খানিকটা পায়চারি করি, ফের শুয়ে পড়ি...কিন্তু যেই না আবার ঘুমে চোখের

www.BanglaBook.org

পাতা জড়িয়ে এল আর অমনি আবার পাশের দিকটায় সেই ছোরার ঘা—আর ঐ একই ব্যাপার নিদেন কুড়িটি বার...

[নাতালিয়ার প্রবেশ]

নাতালিয়া : ও, আপনি! অথচ বাবা বললেন : যাও খদ্দের মাল নিতে এসেছে। কি রকম আছেন, ইভান ভাসিলিয়েভিচ্?

লমফ : আপনি কি রকম, নাতালিয়া স্তেপানভ্না?

নাতালিয়া : কিছু মনে করবে না, আমার এপ্রন পড়া রয়েছে, ভদ্রদুরুস্ত জামাকাপড় পরিনি বলে। আমরা মটরশুঁটির খোসা ছাড়াচ্ছিলুম রোদ্দুরে শুকোবার জন্যে। এতদিন আমার সঙ্গে যে বড় দেখা করতে আসেননি? বসুন না...[দুজনেই বসলেন] দুপুরবেলা এখানে খাবেন?

লমফ : না। অনেক ধন্যবাদ। আমার খাওয়া হয়ে গিয়েছে।

নাতালিয়া : সিগারেট খাবেন না? এই তো দেশলাই...আজকের দিনটা চমৎকার, কিন্তু কাল এমনি জোর বৃষ্টি হল যে মজুররা সমস্ত দিন কিছুই করতে পারলো না। জানেন, আমরা কাল ক'গাদা খড় তুলতে পেরেছি? বিশ্বাস করবেন না, আমি সব খড় কাটিয়ে নিয়েছিলুম, আর এখন তো আমার প্রায় দুঃখ হচ্ছে—ভয় হচ্ছে, সব খড় পচে না যায়। হয়তো অপেক্ষা করলে ভালো হত। কিন্তু এসব কি? আমার মনে হচ্ছে আপনি ধড়াচুড়ো করেছেন। এ তো নতুন দেখলুম। আপনি কি বল্ নাচ কিংবা অন্য কিছু একটায় যাচ্ছেন? হ্যাঁ, কি বলছিলুম, আপনি বদলে গেছেন—ভালো দেখাচ্ছে আগের চেয়ে।...কিন্তু, সত্যি, আপনি ধড়াচুড়ো পরেছেন কেন?

লমফ : [উত্তেজিত হয়ে] ব্যাপারটা কি জানেন, নাতালিয়া স্তেপানভ্না...আসলে কি জানেন, আমি মনস্থির করেছি, আপনাকে...মন দিয়ে শুনুন...আপনি নিশ্চয় আশ্চর্য হবেন, হয়তো বা রাগ করবেন, কিন্তু আমি...[নেপথ্যে] আমি শীতে জমে গেলুম।

নাতালিয়া : কি বলুন তো! [একটু থেমে] বলুন।

লমফ : সংক্ষেপেই বলি। আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন, শ্রীমতী নাতালিয়া স্তেপানভ্না, যে আমি বহুকাল ধরে আপনাদের পরিবারের সান্নিধ্য পেয়ে কৃতকৃতার্থ হয়েছি—ছেলেবয়েস থেকে, সত্যি বলতে কি। আমার যে পিসিমার কাছ থেকে, তিনি গত হলে পর তাঁর জমিদারী পেয়েছি, তিনি আর পিসেমশাই দুজনাই আমার পিতা এবং স্বর্গত মাতাকে গভীর সম্মানের চক্ষে দেখতেন। লমফ আর চুবুকফ পরিবারের বরাবরই বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল, এমন কি ঘনিষ্ঠতাও ছিল, বলা চলে। তা ছাড়া, আপনি জানেন, আমার জমিদারী আপনাদের জমিদারীর একেবারে গা ঘেঁষে। আপনার হয়তো মনে পড়বে আমার ভলোভী মাঠ আপনাদের বার্চ বনের লাগাও।

নাতালিয়া : মাফ করবেন, কিন্তু এখানে আমাকে বাধ্য হয়ে আপনার কথা কাটতে হল। আপনি যে বলেছেন, 'আমার' ভলোভী মাঠ...কিন্তু ওটা কি সত্যি আপনার?

লমফ : হ্যাঁ, আমার...

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নাতালিয়া : তাই নাকি! এর পর আর কি চেয়ে বসবেন! ভলোভী মাঠ আমাদের, আপনার নয়।

লমফ : না। ওটা আমার, নাতালিয়া স্তেপানভ্‌না।

নাতালিয়া : এটা আমার কাছে নূতন খবর বলে ঠেকছে। ওটা আপনার হল কি করে?

লমফ : তার মানে আমি তো সেই ভলোভী মাঠের কথা বলছি যেটা আপনাদের বার্চ বন এবং পোড়া-বনের মাঝখানটায়...

নাতালিয়া : হ্যাঁ, সেইটের কথাই তো হচ্ছে...ওটা আমাদের।

লমফ : না, আপনি ভুল করেছেন নাতালিয়া স্তেপানভ্‌না, ওটা আমার।

নাতালিয়া : পাগলামি ছাড়ুন ইভান ভাসিলিয়েভিচ্! ওটা কদিন ধরে আপনাদের হয়েছে?

লমফ : ক'দিন ধরে মানে? যতদিন ধরে আমার মনে পড়ে—ওটা তো চিরকালই আমাদের।

নাতালিয়া : আমাকে মাফ করতে হচ্ছে, আমি একমত হতে পারছি নে।

লমফ : কিন্তু আপনি ইচ্ছে করলেই দলিলপত্রে জিনিসটা স্পষ্ট দেখতে পাবেন। একথা অবিশ্যি সত্য যে ভলোভী মাঠের স্বত্ব নিয়ে একসময় মতবিরোধ হয়েছিল কিন্তু এখন তো কুল্লে দুনিয়া জানে, ওটা আমার। তা নিয়ে তর্কাতর্কি করার এখন আর প্রয়োজন নাই। আপনাকে জিনিসটা বুঝিয়ে বলছি—আমার পিসির ঠাকুরমা আপনার প্রপিতামহের রায়তদের ঐ মাঠটা বিনা খাজনায়, অনির্দিষ্টকালের জন্য ভোগ করতে দেন; তার বদলে ওরা তাঁর ইঁটের পাঁজা পোড়াবার ব্যবস্থা করে দেয়। আপনার প্রপিতামহের চাষারা প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরে ওটা লাখেরাজ ভোগ করে করে অভ্যস্ত হয়ে গিয়ে মনে করে ওটার স্বত্ব ওদেরই। কিন্তু দাসপ্রথা উঠে যাওয়ার পর যখন নূতন বন্দোবস্ত হল...

নাতালিয়া : আপনি যা বলছেন সেটা আদপেই ও রকম ধারা নয়। আমার পিতামহ এবং প্রপিতামহ জানতেন যে তাঁদের জমিদারীর হদ্দ পোড়া-বন অবধি—কাজেই ভলোভী মাঠ আমাদের সম্পত্তির ভিতর পড়ল বইকি। তা হলে সেটা নিয়ে খামখা তর্ক করছেন কেন? আমি সত্যি আপনার কথার মাথা-মুণ্ডু বুঝতে পারছি নে। হক কথা বলতে কি, আমার বিরক্তি বোধ হচ্ছে।

লমফ : আপনাকে আমি দলিল-দস্তাবেজ দেখাব নাতালিয়া স্তেপানভ্‌না!

নাতালিয়া : না। আমার মনে হচ্ছে, আপনি মস্করা করছেন কিংবা আমাকে চটিয়ে মজা দেখছেন...বাস্তবিক, এটা একটা তাজ্জব ব্যাপার। জমিটা প্রায় তিনশ বছর ধরে আমাদের স্বত্বে, আর আজ হঠাৎ একজন বলে উঠল, ওটা আমাদের নয়, মাফ করবেন, ইভান ভাসিলিয়েভিচ্, আমি আমার আপন কানকে বিশ্বাস করতে পারছি না। অবশ্য আমি ঐ জমিটার কোনও মূল্যই দিই নে। কত আর হবে—পনেরো একরটাক, তিনশ' রুবলের বেশী ওর দাম হবে না, কিন্তু ওটা নিয়ে এই নাহক অবিচার আমার পিত্তি চটিয়ে দেয়। আপনি যা খুশী বলতে পারেন, কিন্তু আমি অন্যায় অবিচার বরদাস্ত করতে পারি নে।

লমফ : আপনাকে মিনতি করছি, আমার সব কথা শুনুন। আপনার প্রপিতামহের চাষারা আমার পিসির ঠাকুরমার ইঁট পোড়াবার ব্যবস্থা করে দেয়—একথা

www.BanglaBook.org

আমি পূর্বেই আপনাকে নিবেদন করেছি। আমার পিসির ঠাকুরমা তার বদলে ওদের অনুগ্রহ দেখাতে গিয়ে...

নাতালিয়া : ঠাকুদ্দা, ঠাকুমা, পিসি আমার মাথায় ওসব কিছুই ঢুকছে না। মাঠটা আমাদের, ব্যস!

লমফ : ওটা আমার!

নাতালিয়া : ওটা আমাদের! আপনি ঝাড়া দুদিন ধরে তর্ক করুন, যদি সাধ যায় পনেরোটা ধড়াচুড়ো সর্বাঙ্গে চড়ান, কিন্তু তবু ওটা আমাদেরই, আমাদেরই, আমাদেরই!...আপনার জিনিস আমি চাইনে, কিন্তু যে জিনিস আমার সেটা... আমি হারাতে চাই নে...আপনার যা ইচ্ছে তাই ভাবতে পারেন।

লমফ : ও মাঠ আমি চাই নে, নাতালিয়া স্তেপানভ্না. কিন্তু এটা হচ্ছে ন্যায়-অন্যায়ের কথা। আপনি যদি চান তবে ওটা আমি আপনাকে উপহার দিতে পারি।

নাতালিয়া : কিন্তু ওটা যদি বিলিয়ে দিতে হয় তো সে হক্ক তো আমার—কারণ ওটা তো আমার জিনিস। আপনাকে খোলাখুলি বলছি, ইভান ভাসিলিয়েভিচ্, আমার কাছে সব-কিছু বড্ডই আজগুবী মনে হচ্ছে। এতদিন অবধি আমরা আপনাকে ভালো প্রতিবেশী বলেই মনে করেছি, আমাদের বন্ধুরূপেই আপনাকে গণ্য করেছি। গেল বছরে আমরা আপনাকে আমাদের গম-মাড়াইয়ের কলটা দিলুম; ফলে আমাদের আপন গম তুলতে তুলতে নভেম্বর হয়ে গেল। আর এখন আপনি আমাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার আরম্ভ করলেন যেন আমরা রাস্তার বেদে। আমাকে উপহার দিচ্ছেন আমার নিজের জমি! কিছু মনে করবেন না, কিন্তু এটা কি প্রতিবেশীর আচরণ? আমি বলবো, এটা রীতিমত বেয়াদবী—যদি শুনতে চান...

লমফ : আপনি বলতে চান, আমি তছরুপ করি! আমি কখনও অন্যের জিনিস চুরি করিনি, ম্যাডাম, আর কেউ এ কথা বললে আমি কিছুতেই সেটা বরদাস্ত করবো না...[দ্রুতগতিতে জগের কাছে গমন ও জলপান] ভলোভী মাঠ আমার!

নাতালিয়া : কচু! ওটা আমাদের!

লমফ : ওটা আমার!

নাতালিয়া : ডাহা মিথ্যে! আপনাকে আমি প্রমাণ করে দিচ্ছি। আজই আমি আমার লোকজনকে ঐ মাঠে ঘাস কাটতে পাঠাচ্ছি।

লমফ : কি বললেন?

নাতালিয়া : আমার লোকজন আজই ওখানে কাজ করবে।

লমফ : আমি ওদের লাথি মেরে খেদিয়ে দেব।

নাতালিয়া : আপনার সে মুরদ নেই।

নাতালিয়া : আপনার সে মুরদ নেই।

লমফ : [বুক আঁকড়ে ধরে] ভলোভী মাঠ আমার! এই সামান্য কথাটা বুঝতে পারছেন না? আমার!

নাতালিয়া : দয়া করে চ্যাঁচাবেন না। আপন বাড়িতে বসে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে আপনার দম বন্ধ হয়ে যাক, কিন্তু এখানে বাড়াবাড়ি করবেন না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লমফ : আমার বুকের ভিতর যদি ওরকম মারাত্মক ব্যথা আর ধড়ফড়ানি না থাকতো, ম্যাডাম, রগ দুটো যদি দপদপ না করতো, আমি তা হলে আপনার সঙ্গে অন্য ভাবে কথা বলতুম। [চিৎকার করে] ভলোভী মাঠ আমার!

নাতালিয়া : আমাদের!

লমফ : আমার!

নাতালিয়া : আমাদের!

লমফ : আমার!

[চুবুকফের প্রবেশ]

চুবুকফ : ব্যাপার কি? তোমরা চ্যাঁচাচ্ছ কেন?

নাতালিয়া : বাবা, তুমি এই ভদ্রলোককে একটু বুঝিয়ে বলো না, ভলোভী মাঠ কার—ওঁর, না আমাদের!

চুবু : [লমফকে] মাঠটা আমাদের, বাবা।

লমফ : মাফ করবেন, স্যার; ওটা আপনাদের হল কি করে? আপনি অন্তত হক্কের বিচার করবেন। আমার পিসির ঠাকুরমা আপনার ঠাকুরদার চাষাদের জমিটা কিছুদিনের জন্য লাখেরাজ ভোগ করতে দেন। চাষারা প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরে সেটা ভোগ করে। ফলে আস্তে আস্তে ওদের বিশ্বাস হয়ে যায় ওটা ওদেরই। কিন্তু পরে যখন নূতন বন্দোবস্ত হল...

চুবু : কিছু মনে করো না, বাবা...তুমি ভুলে যাচ্ছো যে ঐ জমিটার স্বত্ব আর-যা-সব-কি-সব নিয়ে ঝামেলা ছিল বলেই চাষারা তোমার ঠাকুরমাকে কোনও খাজনা দেয়নি, আর-যা-সব-কি-সব...আর এখন গাঁয়ের কুকুরটা পর্যন্ত জানে যে ওটা আমাদের—হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই। তুমি নিশ্চয়ই জরিপের ম্যাপগুলো দেখোনি!

লমফ : কিন্তু আমি আপনাকে প্রমাণ করে দেখাব, জমিটা আমার!

চুবু : সে, বাছা, তুমি পারবে না।

লমফ : নিশ্চয় পারবো।

চুবু : কিন্তু চ্যাঁচাচ্ছো কেন, লক্ষ্মীটি! চ্যাঁচালেই কি কোনও জিনিস প্রমাণ হয়? তোমার যা হক্কের মাল তা আমি চাইনে, কিন্তু যে জিনিস আমার সেটা ছাড়বার বাসনা আমার কণামাত্র নেই। ছাড়বো কেন? অবশ্য আখেরে যদি তাই দাঁড়ায়, অর্থাৎ তুমি যদি ঐ জমি নিয়ে ঝগড়া-কাজিয়া আরম্ভ করতে চাও, আর-যা-সব-কি-সব, তা হলে আমি বরঞ্চ আমার চাষাদের ঐ জমিটা বিলিয়ে দেব, কিন্তু তোমাকে না। এই হল পাকা কথা।

লমফ : আমি তো বুঝতে পারলুম না। পরের সম্পত্তি বিলিয়ে দেবার কি হক্ক আপনার?

চুবু : আমার কি হক্ক আছে না আছে সেটা স্থির করার ভার দয়া করে আমার হাতে ছেড়ে দাও। আর শোনো, ছোকরা, আমি ওরকম ধরনের কথা বলা, আর-যা-সব-কি-সব শুনতে অভ্যস্ত নই...আমার বয়েস তোমার ডবল, তবু তোমায় অনুরোধ করছি ওরকম মাথা গরম করে আর-যা-সব-কি-সব ওরকম ধারা আমার সঙ্গে কথা কয়ো না...

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লমফ : না, আপনারা ভেবেছেন আমি একটা আস্ত গাড়ল আর আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করছেন। আমার জমি বলছেন আপনাদের আর তারপর আশা করছেন আমি সুবোধ ছেলেটির মত শান্ত কণ্ঠে আর পাঁচজনের মত কথাবার্তা বলবো। ভালো প্রতিবেশী এরকম কথা বলে না, স্তেপান স্তেপানভিচ্ মশাই! আপনি প্রতিবেশী নন, আপনি পরের জমির বেদখলকারী!

চুবু : মানে? কি বললে?

নাতালিয়া : বাবা, এখ্খুনি মজুরদের মাঠে ঘাস কাটতে পাঠাও।

চুবু : [লমফকে] আপনি আমাকে কি বলছিলেন, স্যর?

নাতালিয়া : ভলোভী মাঠ আমাদের আর ওটা আমি ছাড়ব না, ছাড়ব না, ছাড়ব না।

লমফ : সে আমরা দেখে নেব। আমি আদালতে সপ্রমাণ করে ছাড়ব ও মাঠ আমার।

চুবু : আদালতে? আপনি আদালতে যান না, স্যর, আর-যা-সব-কি-সব। যান না, যান। আমি আপনাকে বিলক্ষণ চিনি—এতদিন ধরে শুধু অপেক্ষা করেছিলেন আদালতে যাবার জন্য, একটা মোকা পাওয়ার, আর-যা-সব-কি-সব। তুচ্ছ জিনিসি নিয়ে মাতামাতি করা—ঐ তো তোমাদের স্বভাব। তোমাদের পরিবারের সব কজনই মামলাবাজীতে ওস্তাদ! সব কটা।

লমফ : দয়া করে আমার পরিবারের লোককে অপমান করবেন না। লমফগুষ্টির সবাই ভদ্রসন্তান, আপনার কাকার মত তহবিল তছরূপের দায়ে কাউকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়নি।

চুবু : লমফ পরিবারের সব কটা বদ্ধ-পাগল!

নাতালিয়া : সব কটা—সাকুল্যে!

চুবু : তোমার ঠাকুরদা ছিলেন পাঁড় মাতাল, আর তোমার ছোট মাসি নাতাসিয়া মিহাইলভনা—হ্যাঁ, হ্যাঁ, একদম খাঁটি কথা—এক রাজমিস্ত্রির সঙ্গে পালিয়ে যায়, আর-যা-সব-কি-সব।

লমফ : আর আপনার মা ছিলেন কুঁজো! [হাত দিয়ে বুক চেপে ধরে] আমার বুকের সেই বেদনাটা চিলিক মারছে...সব রক্ত আমার মাথায় উঠে গেছে...হে ভগবান জল, জল!

চুবু : তোমার বাবা ছিলেন জুয়াড়ি আর পেটুকের হদ্দ।

নাতালিয়া : তোমার পিসি ছিলেন একটি সাক্ষাৎ নারদ—গাঁ উজাড় করবে ওঁর জুড়ি মেলা ছিল ভার!

লমফ : আমার বাঁ পা-টা অবশ হয়ে গিয়েছে...আর আপনার পেটে জিলিপির প্যাঁচ...ও, আমার বুকটা গেল, আর সবাই জানে, নির্বাচনের আগে আপনি... আমার চোখের সামনে বিজলি খেলে যাচ্ছে...আমার টুপিটা গেল কোথায়?

নাতালিয়া : এসব ছোটলোকমি! ধাপ্পাবাজি! নোংরামিতে চূড়ান্ত!

চুবু : আর তুমি কুচুটে, ভণ্ড, ছোটলোক! হাঁ, তা-ই।

লমফ : হ্যাট পেয়েছি...ও আমার বুকের ভিতরটা...কোন্ দিক দিয়ে বেরুবো? দরজাটা কোথায়? ও, আমি আর বাঁচবো না...আমার পা যে আর নড়ছে না।

[দরজা পর্যন্ত গমন]

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চুবু : [লমফকে পিছন থেকে চেঁচিয়ে] আমার বাড়িতে আর কখ্খনো পা ফেলবে না।

নাতালিয়া : আদালতে যান! আমরাও দেখে নেব!

[টলতে টলতে লমফের প্রস্থান]

চুবু : জাহান্নমে যাক! [উত্তেজনার সঙ্গে পায়চারি]

নাতালিয়া : এ রকম একটা ছোটলোক দেখেছ কখনও? এর পরও লোকে বলে প্রতিবেশীর উপর ভরসা রাখতে!

চুবু : আস্ত একটা সং! বদমাইশ!

নাতালিয়া : পিচেশ! অন্যের জমি বেদখল করে উল্টে দেয় গালাগাল?

চুবু : সৃষ্টিছাড়া ব্যাটা চক্ষুশূল—জানো, ব্যাটার বেয়াদপী কতখানি? এখানে এসেছিল প্রস্তাব পাড়তে, আর-যা-সব-কি-সব! বিশ্বাস হয় তোমার? প্রস্তাব করতে?

নাতালিয়া : কিসের প্রস্তাব?

চুবু : হ্যাঁ, ভাবো দিকিনি, এসেছিল তোমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে!

নাতালিয়া : বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে? আমাকে বিয়ে করতে? আমাকে আগে বললে না কেন?

চুবু : তাই তো ধড়াচূড়ো করে এসেছিল! বাঁদর! খাটাশ!

নাতালিয়া : আমাকে বিয়ে করতে? বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে? ও! [চেঅরে পতন—গুঙরে গুঙরে] ওকে ডেকে নিয়ে এস। ওকে ডেকে নিয়ে এস। ও!—ডেকে নিয়ে এস।

চুবু : কাকে ডেকে নিয়ে আসবো!

নাতালিয়া : শিগগির করো, জলদি যাও। আমি যে ভিরমি যাব। ওকে ডেকে নিয়ে এস। [ছন্নের মত আর্তরব]

চুবু : কি বলছো! কি চাও তুমি? [দু হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে] এ কী অভিসম্পাত! আমি বন্দুকের গুলিতে মরব। আমি নিজের হাতে ফাঁস পরবো। সবাই মিলে আমার সর্বনাশ করেছে।

নাতালিয়া : আমি মরে যাচ্ছি। ওকে ডেকে নিয়ে এস।

চুবু : বাপ্‌স্! যাচ্ছি, যাচ্ছি। ও রকম হাউমাউ করো না। [ধাবমান]

নাতালিয়া : [একা, গুঙরে গুঙরে] আমরা কি করে বসেছি! ওগো, ওকে ডেকে নিয়ে এস, ফিরিয়ে নিয়ে এস।

চুবু : [দ্রুতপদে প্রত্যাবর্তন] এখ্খুনি আসছে ও—আর-যা-সব-কি-সব। জাহান্নমে যাক ব্যাটা। আখ্! তুমি ওর সঙ্গে নিজে কথা বলো; আমার দ্বারা হবে না, পষ্ট বলে দিলুম।

নাতালিয়া : [গুঙরে গুঙরে] ওকে ডেকে নিয়ে এস!

চুবু : [চিৎকার করে] ও আসছে, আসছে, তোমায় বলছি তো। হে ভগবান, আইবুড়ো মেয়ের বাপ হওয়া কী গর্হিত কর্ম! আমি আমার গলায় দা বসাব। হ্যাঁ, আলবৎ। আমি আমার গলাটা কেটে ফেলব। আমরা লোকটাকে গালাগাল দিয়েছি, অপমান করেছি, লাঁথি মেড়ে বাড়ি থেকে খেদিয়ে দিয়েছি—আর এসবের মূলে তুমি—তুমিই করেছ এসব।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নাতালিয়া : না, তুমি।

চুবু : ও! এখন দোষ আমার! আর কি শুনতে হবে তারপর?

[লমফের প্রবেশ]

লমফ : [অবসন্ন] আমার বুক ভীষণ ধড়ফড় করছে...আমার পা অবশ হয়ে গিয়েছে...বাঁ পাশটায় অসহ্য যন্ত্রণা...

নাতালিয়া: আমাদের মাফ করুন, ইভান ভাসিলিয়েভিচ্, আমরা ঝোঁকের মাথায়...আমার এখন মনে পড়ছে, ভলোভী মাঠ সত্যিই আপনার।

লমফ : আমার বুকটায় যেন হাতুড়ি পিটোচ্ছে...মাঠটা আমার...আমার দুটো চোখ করকর করছে...

নাতালিয়া : হ্যাঁ মাঠটা আপনার, আপনারই...বসুন [উভয়েরই উপবেশন] আমাদেরই ভুল হয়েছিল।

লমফ : আমার কাছে এটা ন্যায়-অন্যায়ের কথা...জমিটার আমি কোনও মূল্য দিই নে, কিন্তু ন্যায়ের মূল্য আমি দিই...

নাতালিয়া : সত্যিই তো ন্যায়-অন্যায় বোধের কথা...ওসব বাদ দিন...অন্য কথা পাড়ুন।

লমফ : বিশেষত আমার কাছে যখন প্রমাণ রয়েছে। আমার পিসিমার ঠাকুরমা আপনার বাবার ঠাকুরদার চাষাদের...

নাতালিয়া : হয়েছে, হয়েছে, ওসব কথা তো হয়ে গিয়েছে...[স্বগত] কি করে আরম্ভ করবো বুঝতে পারছি নে, [লমফকে] আপনি কি শিগগিরই শিকারে বেরুচ্ছেন?

লমফ : ভাবছি, নবান্নের পরই বন-মোরগ শিকারে বেরবো...মনে পড়ল, আপনি কি শুনেছেন, আমার কি মন্দ কপাল...আমার ট্রাইয়ার বেচারী—আপনি তো ওকে চেনেন—ওর পা খোঁড়া হয়ে গিয়েছে।

নাতালিয়া : আহা, বেচারা! কি করে হল?

লমফ : আমি ঠিক জানি নে...বোধ হয় পায়ের থাবা মচকে গিয়েছে, কিংবা হয়তো অন্য কুকুর তাকে কামড়ে দিয়েছে...[দীর্ঘনিশ্বাস] আমার সবচেয়ে ভালো কুকুর, টাকার কথা না হয় বাদই দিলুম। জানেন, মিরনফকে একশ' পঁচিশ রুবল দিয়ে ওকে কিনি।

নাতালিয়া : বড্ড বেশি দিয়েছিলেন, ইভান ভাসিলিয়েভিচ্।

লমফ : আমার তো মনে হয়, সস্তাতেই পেয়েছি। ওর মত কুকুর হয় না।

নাতালিয়া : বাবা তাঁর ফ্লাইয়ারের জন্য পঁচাশি রুবল দিয়েছিলেন। আর ফ্লাইয়ার আপনার ট্রাইয়ারের চেয়ে ঢের ঢের ভালো।

লমফ : ফ্লাইয়ার ট্রাইয়ারের চেয়ে ভালো? কি যে বলছেন! [হাস্য] ফ্লাইয়ার ট্রাইয়ারের চেয়ে ভালো!

নাতালিয়া : নিশ্চয়ই ভালো। অবশ্য স্বীকার করছি, ফ্লাইয়ার বাচ্চা—এখনও পুরো বয়েস হয়নি—কিন্তু যেমন বুদ্ধি তেমনি আর সব দিক দিয়ে। ভলচানিয়েৎস্কিরও এমন একটা কুকুর নেই।

লমফ : মাফ করতে হল, নাতালিয়া স্তেপানভ্না, কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন, ও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থ্যাবড়া-মুখো, আর থ্যাবড়া-মুখো কুকুর কখ্খনো ভালো করে কামড়ে ধরতে পারে না।

নাতালিয়া : থ্যাবড়া-মুখো? এই প্রথম শুনলুম!

লমফ : আপনাকে পাকা কথা বলছি, ওর নিচের চোয়াল উপরের চোয়ালের চেয়ে ছোট।

নাতালিয়া : বটে? আপনি মেপে দেখেছেন নাকি?

লমফ : হ্যাঁ। শিকার তাড়া করতে অবশ্য সে ভালো, কিন্তু কামড়ে ধরার বেলা ওটাকে দিয়ে বিশেষ কিছু হবে না।

নাতালিয়া : প্রথমত, আমাদের ফ্লাইয়ার খানদানী কুকুর। হার্নেস আর চিজল ওর বাপ-মা। আর আপনার ট্রাইয়ারের গায়ে এমনই পাঁচমেশালি রঙ যে বলাই যায় না, ওটা কোন্ জাতের কুকুর। বিশ্রী চেহারা, বুড়ো-হাবড়া হয়ে গিয়েছে...

লমফ : ও বুড়ো হয়েছে বটে, কিন্তু ওর বদলে আমি আপনাদের পাঁচটা ফ্লাইয়ারও নেব না—স্বপ্নেও না। ট্রাইয়ার যাকে বলে সত্যিকার কুকুর, আর ফ্লাইয়ার... কিন্তু এ নিয়ে তর্ক করাটাই বেকুবি...আপনাদের ফ্লাইয়ারের মত কুকুর প্রত্যেক শিকারীরই গণ্ডায় গণ্ডায় আছে। ওর জন্য পঁচিশ রুবল দিলেও বড্ড বেশী দেওয়া হয়।

নাতালিয়া : সব কথা প্রতিবাদ করার শয়তান আজ আপনার ঘাড়ে চেপেছে, ইভান ভাসিলিয়েভিচ্। প্রথম আরম্ভ করলেন ভলোভী মাঠের উপর খামকা হক্ক বসিয়ে, আর এখন বলছেন, ট্রাইয়ার ফ্লাইয়ারের চেয়ে সরেস। কেউ কিছু বিশ্বাস করে না বললে আমার ভারী বিরক্তি বোধ হয়। যা বলেন, যা কন, আপনি খুব ভালো করেই জানেন, ফ্লাইয়ার আপনার—কি যেন ওর নাম—ঐ বোকা ট্রাইয়ারের চেয়ে শতগুণ ভালো। তা হলে খামকা উল্টোটা বলছেন কেন?

লমফ : আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, নাতালিয়া স্তেপানভ্না, আপনি ভাবছেন আমি কানা কিংবা আহাম্মুখ। আপনি কি কিছুতেই বুঝবেন না যে আপনাদের ফ্লাইয়ার থ্যাবড়া-মুখো?

নাতালিয়া : মিথ্যে কথা।

লমফ : ওটা থ্যাবড়া-মুখো!

নাতালিয়া : [চিৎকার করে] মিথ্যে কথা!...

লমফ : আপনি চ্যাঁচাচ্ছেন কেন, ম্যাডাম?

নাতালিয়া : আপনি আবোল-তাবোল বকছেন কেন? পিত্তি একেবারে চটে যায়। ট্রাইয়ারকে গুলি করে মারার সময় হয়ে গিয়েছে, আর আপনি ওটাকে ফ্লাইয়ারের সঙ্গে তুলনা করছেন!

লমফ : মাফ করবেন, আমি আর এ আলোচনা করতে পারবো না। আমার বুক ধড়ফড় করছে।

নাতালিয়া : আমি লক্ষ্য করেছি, যে শিকার সম্বন্ধে যত কম বোঝে সে-ই শিকার নিয়ে তর্কাতর্কি করে বেশী।

লমফ : মাদাম, দয়া করে চুপ করুন...আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে।... [চিৎকার করে]

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চুপ করুন।

নাতালিয়া : আমি চুপ করবো না, যতক্ষণ না আপনি স্বীকার করছেন, ফ্লাইয়ার ট্রাইয়ারের চেয়ে শতগুণে সরেস!

লমফ : শতগুণে নিরেস। ওর এত দিনে মরে যাওয়া উচিত ছিল—ঐ আপনাদের ফ্লাইয়ারের কথা বলছি। ও, আমার মাথাটা...আমার চোখ দুটো...আমার কাঁধটা...

নাতালিয়া : আর আপনাদের ঐ হাবা ট্রাইয়ারটা—আমাকে তার মৃত্যু-কামনা করতে হবে না; ওটা তো আধমরা হয়েই আছে।

লমফ : [কেঁদে কেঁদে] চুপ করুন। আমার বুকটা যে ফেটে যাচ্ছে।

নাতালিয়া : আমি চুপ করবো না।

[চুবুকফের প্রবেশ]

চুবু : এখন আবার কি?

নাতালিয়া ; আচ্ছা বাবা, তুমি খোলাখুলি বলো তো, ধর্ম সাক্ষী করে বলো তো—কোন্‌টা সরেস—আমাদের ফ্লাইয়ার, না ওঁর ট্রাইয়ার?

লমফ : স্তেপান স্তেপানভিচ্, স্যর, আপনার পায়ে পড়ছি, মাত্র একটি কথা আমাদের বলুন, ফ্লাইয়ার থ্যাবড়া-মুখো, কিংবা থ্যাবড়া-মুখো নয়? হ্যাঁ কি না?

চুবু : হলেই বা? যেন তাতে কিছু এসে যায়! যাই বল, যাই কও, ওর মত কুকুর তামাম জেলাতেও একটা নেই, আর-যা-সব-কি-সব।

লমফ : কিন্তু আমার ট্রাইয়ার ওর চেয়ে সরেস। নয় কি? ধর্ম সাক্ষী করে বলুন?

চুবু : ও রকম মাথা গরম করো না, বাছা আমার, বুঝিয়ে বলছি আমি...তোমার ট্রাইয়ারের বিস্তর সদগুণ আছে, কেউ অস্বীকার করবে না—জাতে ভালো, পাগুলো জোরদার, গড়ন চমৎকার, আর-যা-সব-কি-সব। কিন্তু হক্ কথা শুনতে চাও, বাছা, তবে বলি ওর দুটো মারাত্মক খুঁৎ আছে—সে বুড়ো হয়ে গিয়েছে আর তার প্যাঁচা-নাক।

লমফ : মাফ করবেন, আমার বুক ধড়ফড় করছে...কিন্তু আসলে ব্যাপারটা কি সেইটে দেখা যাক...আপনার হয়তো স্মরণ থাকতে পারে, আমরা যখন মারুস্‌কিনের মাঠে শিকার করতে গিয়েছিলুম, আমার ট্রাইয়ার কাউন্টের স্পটারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমানে সমানে ছুটেছিল, আর আপনাদের ফ্লাইয়ার নিদেনপক্ষে পাকি আধটি মাইল পিছনে পড়ে ছিল।

চুবু : কাউন্টের শিকারী তাকে চাবুক মেরেছিল বলে সে পিছিয়ে পড়ে।

লমফ : সেইটেই তার প্রাপ্য! আর সব কটা কুকুর খেঁকশিয়ালকে তাড়া লাগাচ্ছিল আর ট্রাইয়ার জ্বালাতন করতে লাগলো ভেড়াগুলোকে।

চুবু : বাজে কথা। শোনো বাছা, আমি বড্ড সহজে চটে যাই, তাই তোমায় অনুরোধ করছি, এ আলোচনাটা থাক। লোকটা ফ্লাইয়ারকে চাবুক মেরেছিল, কারণ মানুষের স্বভাব অন্যের কুকুরের প্রতি হিংসুটে হওয়া...হ্যাঁ, পরের কুকুরকে কেউ দুচক্ষে দেখতে পারে না। আর আপনিও স্যর, ওর ব্যত্যয় নন। হ্যাঁ, যেই দেখলে আর কারও কুকুর তোমার ট্রাইয়ারের চেয়ে সরেস, ব্যস, অমনি জুড়ে

www.BanglaBook.org

দিলে কিছু একটা...আর-যা-সব-কি-সব...দেখলে, আমার-সব মনে থাকে।

লমফ : আমারও।

চুবু : [ভেংচিয়ে] আমারও!

লমফ : বুক ধড়ফড় করছে...আমার পা অবশ হয়ে গিয়েছে...আমি কিছুই...

নাতালিয়া : [ভেংচিয়ে] বুক ধড়ফড় করছে! কী রকম শিকারী মশাই, আপনি? আপনার উচিত শিকারে না গিয়ে আগুনের পাশে শুয়ে শুয়ে আরশুলা মারা। বুক ধড়ফড় করছে, হুঁঃ!

চুবু : হ্যাঁ, হক্ কথা বলতে কি, শিকারে-টিকারে বেরোনো আদপেই তোমার কম্ম নয়। বুকের ধড়ফড়ানি, আর-যা-সব-কি-সব, নিয়ে ঘোড়ার পিঠে ঝাঁকুনি খাওয়ার চেয়ে তোমার পক্ষে বাড়িতে বসে থাকাই ভালো। অবশ্য তুমি যদি সত্যই শিকার করতে যেতে তাহলে কোনও কথা ছিল না, কিন্তু তুমি তো যাও নিছক তর্কাতর্কি করার জন্য, আর অন্য পাঁচজনের কুকুরগুলোর সামনে পড়ে তাদের বাধা দেবার জন্য, আর-যা-সব...আমি বড্ড সহজেই চটে যাই, কাজেই এ আলোচনা বন্ধ করাই ভালো। তুমি আদপেই শিকারী নও, ব্যস্!

লমফ : আর আপনি—আপনি বুঝি শিকারী? আপনি তো যান কাউন্টকে নিছক তেল মালিশ করার জন্য, আর পাঁচজনের বিরুদ্ধে ঘোটালা পাকাবার জন্য...ওঃ! আমার বুকের ব্যথাটা! আসলে আপনি কুচুটে।

চুবু : কি? আমি—কুচুটে? [চিৎকার করে] চুপ করো।

লমফ : কুচুটে!

চুবু : ভেড়ে, বখা ছোকরা!

লমফ : বুড়ো-হাবড়া! ভণ্ড!

চুবু : চুপ করো, না হলে আমি একটা নোংরা বন্দুক দিয়ে তোমাকে তিতির মারার মতো গুলি করে মারবো। ফক্কিকার কোথাকার!

লমফ : দুনিয়াসুদ্ধ জানে—ও, ফের আমার হার্টটা!—আপনাকে আপনার স্ত্রী ঠ্যাঙাতো! আমার পা-টা...আমার মাথাটা...চোখের সামনে বিদ্যুৎ খেলছে!...আমি পড়ে যাব...আমি পড়ে যাচ্ছি...

চুবু : আর যে মাগী তোমার বাড়ি চালায় সে তোমাকে চেপে রেখেছে বুড়ো আঙুলের তলায়।

লমফ : ও, ও, ও! আমার হার্টটা ফেটে গিয়েছে। আমার কাঁধটা যে আর নেই...আমার কাঁধটা কোথায়?...আমি মরলুম। [আরাম-চেআরে পতন] ডাক্তার! (মূর্ছা)

চুবু : ভেড়ে! বকা! ফক্কিকার। আমি জোর পাচ্ছি নে। [জলপান] ভিরমি যাচ্ছি নাকি!

নাতালিয়া : শিকারী, হুঁ! ঘোড়ার উপর কি রকম বসতে হয়, তাই জানেন না আপনি! [পিতাকে] বাবা, কি হল ওর? বাবা, দেখ বাবা, [চিৎকার করে] ইভান ভাসিলিয়েভিচ্! ইনি মরে গেছেন।

চুবু : আমি মূর্ছা যাচ্ছি...আমর দম বন্ধ হয়ে আসছে। বাতাস, আমাকে বাতাস দাও!

নাতালিয়া : ইনি মারা গেছেন। [লমফের আস্তিন ধরে টানাটানি] ইভান ভাসিলিয়েভিচ্!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইভান ভাসিলিয়েভিচ্! আমরা কি করে বসলুম! ইনি মারা গেছেন। [আর্ম-চেআরে পতন] ডাক্তার! ডাক্তার! [ছন্নের মত কখনও ফোঁপানো, কখনও হাসি]

চুবু : ব্যাপার কি? কি হয়েছে? তুমি কি চাও?

নাতালিয়া : [গোঙরাতে গোঙরাতে] মারা গেছেন...উনি মারা গেছেন।

চুবু : কে মারা গেছে? [লমফের দিকে তাকিয়ে] সত্যি ও মারা গেছে! হে ভগবান, জল জল! ডাক্তার! [লমফের ঠোঁটের কাছে এক গ্লাস জল ধরে] জল খাও! না, ও জল খাচ্ছে না...তাহলে মারাই গেছে, আর-যা-সব-কি-সব...হায়, হায়, আমার কী পোড়া কপাল! আমি আমার মগজের ভিতর দিয়ে গুলি চালিয়ে দিলুম না কেন? এর অনেক আগেই আমার গলাটা কেটে ফেললুম না কেন? আমি কিসের জন্য অপেক্ষা করছি? আমাকে একখানা ছোরা দাও। বন্দুক দাও। [লমফ একটু নড়লো] মনে হচ্ছে, সেরে উঠছে...একটু জল খাও তো, বাছা! হ্যাঁ, ঠিক...

লমফ : আমার চোখের সামনে বিদ্যুৎ খেলছে...কুয়াশা না কি...আমি কোথায়?

চুবু : তুমি যত শিগগির পারো বিয়ে করে ফেলো আর জাহান্নামে যাও...ও রাজী আছে [দুজনের হাত মিলিয়ে দিয়ে] ও রাজী আছে, আর-যা-সব-কি-সব, আমি তোমাদের আশীর্বাদ—আর-যা-সব—করছি। শুধু আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও।

লমফ : এ্যাঁ? কি? [দাঁড়িয়ে উঠে] কে?

চুবু : ও রাজী আছে। আবার কি হল?...চুমো খাও আর জাহান্নামে যাও!

নাতালিয়া : [গোঙরাতে গোঙরাতে] উনি বেঁচে আছেন...হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি রাজী...

চুবু : এসো চুমো খাও, একজন আরেক জনকে।

লমফ : এ্যাঁ, কাকে? [নাতালিয়াকে চুম্বন] আমার কী আনন্দ! মাফ করবেন, ব্যাপারটা কি? ওঃ! হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি...আমার হার্ট...বিদ্যুৎ...আমি কি সুখী, নাতালিয়া স্তেপানভ্না...[নাতালিয়ার হস্ত চুম্বন] আমার পা-টা যে অবশ হয়ে গেল...

নাতালিয়া : আমি...আমিও বড় সুখী...

চুবু : ওঃ! পিঠের থেকে কী বোঝাটাই না নামলো! আহ্!

নাতালিয়া : কিন্তু যাই বলো, তোমাকে এখন স্বীকার করতেই হবে, ট্রাইয়ার স্কাইয়ারের মত অত ভালো না।

লমফ : সে ভালো।

নাতালিয়া : সে খারাপ।

চুবু : এই লাও! পারিবারিক সুখ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, শ্যাম্পেন নিয়ে আয়।

লমফ : সে সরেস!

নাতালিয়া : ওটা নিরেস, নিরেস, নিরেস!

চুবু : [চিৎকার করে দুজনার গলা চাপবার চেষ্টাতে] শ্যাম্পেন! শ্যাম্পেন নিয়ে আয়!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শেষ চিন্তা

উল্‌টা-রথ

অবতরণিকা।

কত না কসরৎ, কত না তকলীফ বরদাস্ত করে কত চেষ্টা দিলুম, দেশে নাম কেনবার জন্য,—আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পিছন পানে তাকিয়ে দেখি সব বরবাদ, সব ভণ্ডুল। পরের কথা বাদ দিন, নিতান্ত আত্মজনও আমার লেখা বই পড়ে না। গিন্নীকে—না, সে কথা থাক, তাঁর সঙ্গে ঘর করতে হয়, ওঁয়াকে চটিয়ে লাভ নেই। অথচ আমার জীবনে মাত্র একটি শখ ছিল, সাহিত্যিক হওয়ার। আপনাদের মনের বেদনা কি বলবো—তবে হ্যাঁ, আপনারাই হয়তো বুঝবেন, কারণ সিনেমায় দেখেছি, নায়িকা যখন 'হা নাথ, হা প্রাণেশ্বর, তুমি কোথায় গেলে?' বলে হন্যে-পারা স্ক্রীনে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি টাট্টু ঘোড়ার মত ছুটোছুটি লাগান তখন আপনারা হাপুস-হুপুস করে অশ্রুবর্ষণ করেন (যে কারণে আমি হলের ভিতরেও রেনকোট্ খুলি নে), তাই আপনারা বুঝবেন।

যখন দেখি প্রখ্যাত সাহিত্যিক উচ্চাসনে বসে আছেন, তাঁর গলায় মালার পর মালা পরানো হচ্ছে, খাপসুরৎ মেয়েরা তাঁর অটোগ্রাফের জন্য হদ্দমুদ্দ হচ্ছে, তাঁর জন্য ঘন ঘন বরফজল শরবৎ আসছে, সভা শেষে হয়তো আরও অনেক কিছু আসবে তখন আমার কলিজার ভিতর যেন ইঁদুর কুরকুর করে খেতে থাকে, আমার বুকের উপর যেন কেউ পুকুর খুঁড়তে আরম্ভ করে। সজল নয়নে বাড়ি ফিরি। পাছে গিন্নী অট্টহাস্য করে ওঠেন তাই দোরে খিল দিয়ে বইয়ের আলমারির সামনে এসে দাঁড়াই—তাকিয়ে থাকি আপন মনে আমার, বিশেষ করে আমার নিজের পয়সায় মরক্কো লেদারে বাঁধানো সোনার জলে আমার নাম ছাপানো আমার বইয়ের দিকে।

আমার মাত্র একজন বন্ধু—এ সংসারে। কিন্তু আর কিছু বলার পূর্বে আগেভাগেই বলে নিই, ইনিও আমার বই পড়েননি। তিনি এসে আমায় একদিন শুধোলেন, 'ব্রাদার, ''আমিয়িলের জুর্নাল'' পড়েছ?'

'সে আবার কি বস্তু? বই-ই হবে। না? তা সে কি আমার বই পড়েছে যে আমি তার বই পড়বো?'

'আহা চটো কেন? জল্লাদ যখন কারও গলা কাটে তখন তার মানে কি এই যে, সে লোকটা আগে জল্লাদের গলা কেটেছিল? অভিমান ছাড়ো। আমার কথা শোনো। এই আমিয়েল সায়েব প্রফেসর ছিলেন। তার বাড়া আর কিছু না। যশ প্রতিপত্তি তাঁর কিছুই হয়নি। নিঃসঙ্গ জীবনে নির্জনে তিনি লিখলেন তাঁর জুর্নাল।'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'জুর্নাল-জুর্নাল করছো কেন? উচ্চারণ হবে ''জার্নেল''। উচ্চারণ সম্বন্ধে আমি বড্ডই পিটপিটে।'

বন্ধু বললেন, 'কী উৎপাত! ওটার উচ্চারণ ফরাসীতে ''জুর্নাল''। এসেছে ''ডায়ার্নাল'' থেকে, সেটা এসেছে লাতিন ''দিয়েস'' থেকে—যেটা সংস্কৃতে ''দিবস''। ফরাসীতে তাই ''দিন দিন প্রতি দিন'' নিয়ে যখন কোনও কথা ওঠে তখন ঐ ''জুর্নাল''

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শব্দ ব্যবহার হয়। তাই দৈনিক কাগজ ''জুর্নাল'', আবার প্রতিদিনের ঘটনা লিখে রাখলে সেটাও ''জুর্নাল'' অর্থাৎ ''ডাইরি''। ফার্সীতে ''দিন''কে বলে ''রোজ'', তাই প্রতিদিনের ঘটনার ''নাম'' যেখানে লেখা থাকে সেটা ''রোজনামচা''। আবার—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'হয়েছে, হয়েছে।'

'সেই আমিয়েল লিখলেন তাঁর জুর্নাল। মৃত্যুর পর সে-বই বেরোতে সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর বসত শহর জিনীভাতে হয়ে গেলেন লেখক হিসেবে প্রখ্যাত। বছর কয়েকের ভিতর তামাম ইউরোপে। ইস্তেক তোমাদের রবি ঠাকুর সে বয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তাই বলি কিনা, তুমি একখানা জুর্নাল লেখো।'

আমি শুধালুম, 'তুমি পড়বে?'

বন্ধু উঠে দাঁড়ালেন। ছাতাখানা বগলে চেপে বললেন, 'চললুম, ভাই। শুনলুম পাড়ার লাইব্রেরিতে পাঁচকড়ি দে'র কয়েকখানা অপ্রকাশিত উপন্যাস এসেছে। পড়তে হবে।'

ভালোই করলেন। না হলে হাতাহাতি হয়ে যেত।

কিন্তু বিশ্বাস করবেন না, তার সেই মোস্ট সাজেশনের পর থেকে এই জুর্নালের চিন্তাটা কিছুতেই আমি আমার মগজ থেকে তাড়াতে পারছি নে। যে রকম অনেক সময় অতিশয় রদ্দি একটা গানের সুর মানুষকে দিবারাত্তির হন্ট করে। এমন কি ঘুম থেকে উঠে মনে হয় ঘুমুতে ঘুমুতেও ঐ সঙ্গে গুনগুন করেছি।

কিন্তু জুর্নাল লিখতে যাওয়ার মধ্যে একটা মস্ত অসুবিধে রয়েছে—আমার।

সংস্কৃতে শ্লোক আছে :—

শীতেহতীতে বসনমশনং বাসরান্তে নিশান্তে
ক্রীড়ারম্ভং কুবলয়দৃশং যৌবনান্তে বিবাহম্।

শীতকাল গেলে শীত-বস্ত্র পরিধান
আহার গ্রহণ যবে দিন অবসান
রাত্রিকাল শেষ হলে প্রেম আলিঙ্গন।
বিবাহ করিতে সাধ যাইলে যৌবন।

(কবিভূষণ পূর্ণচন্দ্র)

একশ' বছর বয়সে আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখে অন্তর্জলি অবস্থায় সাততলা এমারৎ বানাবার জন্য কেউ টেন্ডার ডাকে না।

জুর্নাল লেখা আরম্ভ করতে হয় যৌবনে। তাহলে বহু বৎসর ধরে সেটা লেখা যায়। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলে পর পাঠক তার থেকে লেখকের জীবনক্রম-বিকাশ, তাঁর সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব পড়ে পরিতৃপ্ত হয়।

আজ যদি আমি জুর্নাল লিখতে আরম্ভ করি তবে আর লিখতে পারবো কটা দিন? তাই কবি বলেছেন, এ যে যৌবনান্তে বিবাহম্!

তাহলে উপায় কি?

তখন হঠাৎ একটি গল্প মনে পড়ে গেল।

এক বেকার গেছে সায়েব বাড়িতে। কাচুমাচু হয়ে নিবেদন করলে, 'সায়েব, আপনার এখানে যে কি ভয়ে ভয়ে এসেছি, কী আর বলবো! এক পা এগিয়েছি কী তিন পা পেছিয়েছি!' সায়েব বললে, 'ইউ গাগা, তাহলে এখানে পৌঁছলে কি করে?' বেকারটি আদৌ গাগা—অর্থাৎ যে বদ্ধ পাগল শুধু 'গাগা' করে গোঙরায়—ছিল না। বরঞ্চ বলবো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাজির-জবাব—অর্থাৎ সব জবাবই তার ঠোঁটে হাজির। বললে, 'হক কথা কয়েছেন, হুজুর। আমিও তাই মুখ করলুম আপন বাড়ির দিকে। এক পা এগুই তিন পা পেছোই। করে করে এই হেথা হুজুরের বাঙলোয় এসে পৌঁছে গেলুম।'

তাই যখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, জুর্নাল লেখার মত দীর্ঘ দিনের ম্যাদ যমরাজ আমায় দেবেন না তখন ঐ কেরানীর মত পিছন ফিরলে কি রকম হয়? অর্থাৎ বিগত দিনের জুর্নাল? সেই বা কি করে হয়? পোস্ট-ডেটেড চেক্ হয়, কিন্তু প্রি-ডেটেড দলিল করার নামই তো জাল। আজ আমি তো আর লিখতে পারি নে :—

> জন্মাষ্টমী ১৩১১
> আজ আমার জন্ম হল। মা তখন তাঁর বাপের বাড়িতে।
> হায়, আমাকে দেখবার কেউ ছিল না। কী হতভাগ্য আমি!

পুলিসে ধরবে না তো!

বিবেচনা করি আপনারা ক্লাসিক্স্ পড়েছেন—ঋগ্বেদ, মেঘনাদ, হ-য-ব-র-ল ইত্যাদি। শেষোক্তখানাতে এক বুড়ো ত্রিশ না চল্লিশ হতে না হতেই বয়েসটা ঘুরিয়ে দিতো। তখন তার বয়স যেত 'কমতি'র—ফটকা বাজারে যাকে বলে 'মন্দি' বা 'বেয়া'র—দিকে। তখন তার বয়েস হত ত্রিশ, ঊনত্রিশ, আটাশ করে করে আট হয়ে গেলে ফের 'বাড়তি' বা 'তেজী'র দিকে চালিয়ে দিয়ে নয়, দশ, এগারো করে বয়েস বাড়াত।

কিন্তু এ কৌশল রপ্ত করার জন্য মুষ্টিযোগটা শিখি কার কাছ থেকে? হ-য-ব-র-ল সৃষ্টিকর্তা ওপারে যাবার সময় তাঁর ব্যাটা বাবাজী সত্যজিৎকে কি এটা শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন? তাতেই বা কি? বাবাজী তো তারও আগে ওঁরই কাছ থেকে শিখে নিয়েছেন, 'গেছোদাদা' হওয়ার পন্থাটি—আমি যদি তাঁর সন্ধানে যাই মতিহারি তখন তিনি ছিকেষ্টপুর। আমি ফিলাডেলফিয়ায় তো তিনি ভেরমন্টে। উঁহু, হল না।

ইরানের কবি অন্য মুষ্টিযোগ বাৎলেছেন—তাঁর বৃদ্ধ বয়সে :

"আজ এ নিশীথে প্রিয়া অধরেতে চুম্বন যদি পাই।
জোয়ান হইব; এ জীবন তবে গোড়া হতে দোহরাই॥"
'শবী আগর আজ লবে ইয়ার বোসে এ তলবম
জওয়ান শওম জসেরো জিন্দেগী দু বারা কুনম্॥'

পাড়ার ছোঁড়ারা ঢিল ছুঁড়বে।

আমার গুরু রবীন্দ্রনাথ তাহলে কি বলেন?—

'শিশু হবার ভরসা আবার
জাগুক আমার প্রাণে,
লাগুক হাওয়া নির্ভাবনার পালে,
ভবিষ্যতের মুখোশখানা
খসাব একটানে,
দেখব তারেই বর্তমানের কাছে।'

তারপর তিনি কি করবেন?

'জমিয়ে ধুলো সাজিয়ে ঢেলা
তৈরী হবে আমার খেলা—'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সর্বনাশ! এই বৃদ্ধ বয়সে যদি সক্কলের সামনে তাই করি তবে ডাঃ ঘোষ আমাকে রাঁচি পৌঁছিয়ে দেবেন।

মোদ্দা কথায় তা হলে ফিরে যাই। আমাকে খামাখা মেলা বকর বকর করাবেন না। অবশ্য আমার মা বলতেন, আমার দোষ নেই। আমাকে টিকা দেবার সময় ডাক্তার ছুরি আনেনি বলে একটা গ্রামোফোনের নীড্‌ল্ দিয়ে টিকা দিয়েছিল।

তাহলে একটা মাস চিন্তা করতে দিন। সামনে হোলি। গায়ে রঙ মাখাবো। মনেও।

স্লিস্টলার অর্থ নিম উকীল। উকীলের কাছে যাবার পূর্বে আমার একটি ঘটনার কথা মনে পড়লো। সেটি হয় তো পূর্বেও কোনও-কোথাও উল্লেখ করেছি। তাই সেটি আবার বলছি। কারণ মানুষ বিশ্বাস করতে ভালোবাসে যা সে পূর্বেও একাধিকবার শুনেছে—নয়া কথা তার ভালো লাগে না। তাই দেখুন—এটাও আমি আরেকবার বলেছি—একই প্লট নিয়ে ক'গণ্ডা ফিলিম নিত্যি নিত্যি বেরুচ্ছে তার হিসেব রাখেন?

ঘটনাটি সংক্ষেপে এই :

নরক আর স্বর্গের মধ্যিখানে মাত্র একটি পাঁচিলের ব্যবধান। নরক চালায় শয়তান, আর স্বর্গ চালান সিন্ট পীটার। পাদ্রীসায়েবের মুখে শোনা, তাঁরই হাতে থাকে স্বর্গদ্বারের সোনার চাবি।

পাঁচিলটি ঝুরঝুরে হয়ে গিয়েছে দেখে পীটার একদিন শয়তানকে ডেকে বললেন, দেয়ালটা এজমালি। তাই এটার মেরামতি আমি করবো এক বছর, তুমি করবে আর বছর। আসলে তোমারই করা উচিত প্রতি বছর। কারণ তোমার দিকে সুবো-শাম জ্বলছে আগুনের পেল্লাই পেল্লাই চুলো। তারই চোটে দেয়াল হচ্ছে জখম। আর আমার দিকে সর্বক্ষণ বয় মন্দমধুর মলয় বাতাস। দেয়াল বিলকুল জখম হয় না।

বিস্তর তর্কাতর্কির পর স্থির হল, ইনি এ বছর আর উনি আর বছর দেয়াল মেরামত করবেন। শেষটায় বিদায় নেবার সময় শয়তান ঘাড় চুলকে বললে, 'দাদা, কিছু যদি মনে না করো, তবে এ বছরটায় তুমিই মেরামতিটা করাও। একটু অভাবে আছি।'

পীটার মাই ডিয়ার লোক। রাজী হয়ে গেলেন।

তারপর এক বছর যায়, দু'বছর যায়, পাঁচ বছর যায়, দেয়াল পড়ো-পড়ো—শয়তানের সন্ধান নেই। পীটার রেজেস্ট্রি করে চিঠি লিখলেন। ফেরত এল। উপরে লেখা, 'মালিক না পাইয়া ফেরত।' পীটার তখন একাধিকবার শয়তানের বাড়ি গিয়ে কড়া নাড়লেন। ভিতর থেকে তীক্ষ্ণ বামাকণ্ঠ বেরলো—'কত্তা বাড়ি নেই।' পীটার বাড়ির সামনে 'লটকাইয়া শমন জারী' করলেন। কোনও ফায়দা ওৎরালো না।

এমন সময় পীটারের বরাৎজোরে হঠাৎ শয়তানের সঙ্গে রাস্তায় মোলাকাৎ। শয়তান অবশ্য তড়িঘড়ি পাশের গলিতে গা-ঢাকা দেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু এঞ্জেলদের ডানা থাকে। ফুড়ুৎ করে উড়ে গিয়ে পার্ফেক্ট ল্যান্ডিং করে দাঁড়ালেন তার সামনে। খপ্ করে হাত ধরে বললেন, 'বড় যে পালিয়ে বেড়াচ্ছ? দেয়াল মেরামতির কী হবে?'

শয়তান গাঁইগুঁই টালবাহানা আরম্ভ করলে। পীটার চেপে ধরলেন, 'পাকা কথা দিয়ে যাও।'

তখন শয়তান শেষ কথা বললে, 'কিছু মনে করো না ভাই, কিন্তু আমি আমার উকিলদের সঙ্গে পরামর্শ না করে কোনও পাকা কথা দিতে পারবো না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিরাশ হয়ে পীটার শয়তানের হাত ছেড়ে দিয়ে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে, বাড়ি ফেরার মুখ করে বললেন, 'ঐখানেই তো তোর জোর। সব কটা নিয়ে বসে আছিস। আমার যে একটাও নেই।'

আমার উকিল অবশ্য নরকে যাবেন না। তিনি বলেন, 'নরক নেই, স্বর্গ আছে।'

আমি বললুম, 'সে কি কথা! লোক হয় দুটোতেই বিশ্বাস করে, নয় একটাতেও না।'

উকিল বললেন, 'ঐখানেই তো ভুল। তোমরা দর্শনের কিছুই জানো না। বুঝিয়ে বলছি। স্বর্গ জিনিসটের কল্পনা আমি করতে পারি। খাসা জায়গা, না গরম না ঠাণ্ডা। তোমাদের পরশুরামই তো বলেছেন, ঝোপে-ঝাপে চপ কাটলেট ঝুলছে। পাড়ো আর খাও, খাও আর পাড়ো। হুরী-পরীদের সঙ্গে দু'দণ্ড রসালাপ করো, কেউ কিছু বলবে না। অতএব স্বর্গ আছে। কিন্তু এই পৃথিবীর চেয়ে বেদনাময় জায়গা আমি কল্পনাই করতে পারি নে। অতএব সেটা নেই। যে জিনিস আমি কল্পনাই করতে পারি নে সেটা থাকবে কি করে?'

যুক্তিটা আমার কাছে কেমন যেন ঘোলাটে মনে হল। তবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করতে গিয়ে মুনিঋষিরা যে-সব যুক্তি দেন তার চেয়ে অবশ্য বেশী ঘোলাটে নয়। কিন্তু সে-কথা থাক। ওটা নিয়ে আমার শিরঃপীড়া নয়। কথায় বলে, বিপদে পড়লে শয়তানও মাছি ধরে ধরে খায়—আমার উকিলটি নরকে না গেলেও শয়তান তার বাঁ হাতের তেলোতে জল রেখে তাতে ডুবে আত্মহত্যা করবে না। বরঞ্চ একটা উকিলকে যদি কোনোগতিকে স্বর্গরাজ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারে তা হলেই তো চিত্তির। ক্লাইভ তো আর গণ্ডায় গণ্ডায় জন্মায় না! এক ক্লাইভে যা করলে, তার ধকল আমরা এখনও কাটাচ্ছি। দ্যাখ তো না দ্যাখ, সেন্ট পীটারের পেটের ভাত চাল হয়ে যাবে, তন্দুরী মুর্গী ডানা গজিয়ে পেটের ভিতর ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ করতে থাকবে।

আমার শিরঃপীড়া :—আমি যদি প্রি-ডেটেড চেক সই করি, অর্থাৎ শুঁটকিকে তাজা মাছ বলে পাচার করি, অর্থাৎ প্রাচীন দিনের ডায়ারি নবীন বলে চালাই তবে কি আমি ভেজালের ভিটকিলিমিতে ধরা পড়বো না?

উকিল পরম পরিতোষ সহকারে বললে, 'কিচ্ছু ভয় নেই। তবে যা লিখবে তার ন'আনার বেশী যেন সত্য কথা না হয়। মিথ্যে লিখতে হবে নিদেন সাত আনা। নূতন আইন।'

আমার মিথ্যে বলতে কণামাত্র আপত্তি নেই। লেখক মাত্রই মিথ্যেবাদী এবং মিথ্যেবাদীকেও সংজ্ঞা দিতে গিয়ে গুণীরা বলেছেন, 'যে-লোক দুর্ভাগ্যক্রমে লেখক হওয়ার সুযোগ পেল না,—হতাশ-প্রেমিকের মত হতাশ-লেখক।' তবু অবাক হয়ে বললুম, 'সে কি কথা?'

উকিল বললে, 'ক্যারেট্ কারে কয় জানো? ২৪ ক্যারেটে খাঁটি সোনা হয়। এখন আইন হয়েছে, চৌদ্দ ক্যারেটের বেশী সোনা দিয়ে গয়না গড়ানো চলবে না। বাকি দশ ক্যারেটের বদলে দিতে হবে খাদ।'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'আমি কি স্যাকরা যে আমাকে এ-আইন শোনাচ্ছেন!'

উকিল আমার দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকালে। যেন আমি 'ফিয়ারলেস নাদিরা' বা কাননবালার চেয়েও খাপসুরৎ। নিজের চেহারার প্রতি ভক্তি বেড়ে গেল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বললে—এবারে অতিশয় শান্তকণ্ঠে—'সোনা ভারতবাসীর চোখের মণি, জিগরের টুকরো, কলিজার খুন। তাই দিয়ে যখন আরম্ভ হয়েছে, তখন সর্বত্রই এটা ছড়াবে। যাও, আর মেলা বকর বকর করো না। আর শোনো, তোমার মাথায় যা মগজ তা দিয়ে পুঁটি মাছেরও একটা টোপ হবে না। তুমি নির্ভয়ে লেখো। কেউ পড়বে না। তুমিও পড়বে না—অর্থাৎ ধরা পড়বে না।'

আঁতে ফের লাগল। তবে খুব বেশী না। আমার আঁতে গণ্ডারের চামড়ার লাইনিং। তা সে যাক্ গে। আইন বাঁচিয়ে লিখব।

* * *

আমার শত্রু চতুর্দিকে। বরঞ্চ আমাকে 'অজাতশত্রু' না বলে 'অজাতমিত্র' বলা যেতে পারে। তারা যে আমার কী বদনাম করে বেড়াচ্ছে তার লেখাজোখা নেই। না, ভুল বললুম। পাড়ার ছোঁড়াদের কাছে আছে। 'তৃষ্ণার্ত' ছাত্রদের বিয়ারদার সমিতিতে চাঁদা দিইনি বলে তারা সেগুলো জিগির বা স্লোগান রূপে ব্যবহার করে। মহরমের 'হায় হাসান, হায় হোসেন' রোদন রব এর তুলনায় অট্টহাস্য।

তারই একটা—আমি নাকি অতিশয় সুপুরুষ। আপনারা অবশ্য এ-কথা শুনে সরল চিত্তে শুধোবেন, 'এটা আবার কুৎসা হল কি প্রকারে?'

ঐ তো! ছোঁড়াদের পেটে কী এলেম তা তো আপনারা জানেন না। সূক্ষ্ম তালেবরদের দুষ্টবুদ্ধি। বেদে নাকি আছে, 'স নে বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুক্ত'—তার এক অর্থ নাকি, 'দেবতা শুভ বুদ্ধি দ্বারা আমাদের সংযুক্ত করুন—এক করুন।' অশুভ বুদ্ধি যে আরও কত বেশী সংযুক্ত করে, ঋষি সেটা জানতেন না। কারণ আমাদের বঁড়শে ব্যালার বুদ্দু খানসামা লেনের ছোঁড়াদের ঐক্য তিনি দেখেন নি।

তাহলে আরও বুঝিয়ে বলি! রবীন্দ্রনাথের লেখাতে আছে, এক হাড়কিপ্টেকে শিক্ষা দেবার জন্য পাড়ার ছোঁড়ারা কাগজে মিথ্যে মিথ্যে ছাপিয়ে দেয়, তিনি নাকি অমুক চ্যারিটি ফান্ডে বিস্তর টাকা খয়রাৎ করেছেন। আর যাবে কোথা? চ্যারিটি না করে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাড়ির সামনে চ্যারিটি ম্যাচের ভিড়।

হুবহু ঐ একই মতলব।

তখন স্থির করলুম, একটা ফটো তুলে এই 'উল্টো-রথে'র সঙ্গে ছাপিয়ে দেব। শুনলুম, কালীঘাটের কাছে 'ফোটো ফ্ল্যাসে'র নাকি বাসটিং বিজিনেস—ফেটে পড়ার উপক্রম। গিয়ে দেখলুম, কথাটা খাঁটি, ছাব্বিশ ক্যারেট খাঁটি। আমার ছবি তুলতে গিয়ে তাদের তিনখানা লেন্স্ বার্স্ট্ করলো। আমার শ্যাটারিঙ সৌন্দর্য সইতে না পেরে।

সেই নব্বুই বছরের থুরথুরে ফারসী বুড়ীর কাছে বাজ পড়াতে গিয়ে ভিরমি যান। হুঁশ ফিরে এসে বিড়বিড় করে বলেছিলেন, 'বাজের কি দোষ? আমি যে বড্ড বেশী এ্যাট্রাক্টিভ্।'

ফোটো হল না। অইল পেন্টিং-ওলা বলেন, 'কালো হলেও চলতো, তা সে যত মিশই হোক্ না। কিন্তু এ যে, বাবা, খাজা রঙ। কালো কষ্টির উপর পিলা মসনে। তার উপর কলাইয়ের ডালের পিছলপারা, না-সবুজ না-নীল না-কিচ্ছু। আমার প্যালেট লাটে।'

সেই থেকে ভাবছি কি করি?

www.BanglaBook.org

তা হলে আবার একটা মাস ভাবতে দিন।

কিন্তু তাতেই বা কি? দশ ঘণ্টা বাতি জ্বালিয়ে রাখার পর সেটা নিভিয়ে দিলে ঘরে যে অন্ধকার, এক মিনিট জ্বালিয়ে রাখার পর নিভিয়ে দিলেও সেই অন্ধকার।

এক মাস চিন্তা করলেই বা কি, আর এক মিনিট চিন্তা করলেই বা কি?

ওঘাটে যেও না বেউলো

আমার 'উল্টা-রথ' তৈরী হচ্ছে। নিশ্চিন্ত থাকুন। পাকা লোক লাগিয়েছি। খাস মার্কিন। ওরা গ্রেতা গার্বো থেকে আরম্ভ করে ড্যাক্ অব উইনজার—আলকাপোনি থেকে শুরু করে আর্চবিশপ অব নটিংহাম সক্কলেরই কোরা কাপড় ধুয়ে কেচে মলমল করে তুলতে জানে। ওটা বেরোলে আর কেউ 'জীবনস্মৃতি' পড়বে না।

ইতিমধ্যে—ইতিমধ্যে কেন—বহুদিন ধরেই আমি বহু লোকের কাছ থেকে বহু পাণ্ডুলিপি পেয়েছি। প্রেরকদের কেউ কেউ চান আমি যেন তাবৎ বস্তু পড়ে সেটি মেরামত করে দি। কেউ কেউ অল্পতেই সন্তুষ্ট। বলেন, আমার মতামত জানাতে। আর কেউ বা সরাসরি শুধান, সার্থক-সাহিত্য কি প্রকারে সৃষ্টি করতে হয়?

উপদেশ-নির্দেশ দিয়ে, রিপুকর্ম-মেরামতি করে যদি লেখক গড়া যেত তাহলে এই যে শান্তিনিকেতন, যেখানে রবীন্দ্রনাথ প্রায় চল্লিশ বৎসর ঐ সব কর্ম লেখক এবং শিক্ষক উভয়রূপেই করে গেলেন, এখান থেকে বেরিয়েছেন ক'টি সার্থক সাহিত্যিক? আমি তো একমাত্র প্রমথনাথ বিশীর নাম জানি। পক্ষান্তরে শরৎ চাটুয্যে তো কারও কাছ থেকে এক রত্তি সাহায্য পাননি। তাঁর মত সার্থক লেখক ক'জন? উত্তরে সবাই বলবেন, উনি এক্‌সেপশন—ব্যত্যয়। আমি বলবো, সার্থক সাহিত্যিক হওয়া মানেই ব্যত্যয়।

কিন্তু তৎপূর্বে প্রশ্ন, আপনি সাহিত্যিক হতে চান কেন?

টাকা রোজগার করতে? হয় না, তা এদেশে হয় না।

অনুসন্ধান করে দেখুন, এই বাঙলা দেশে ক'জন লোক একমাত্র কলমের জোরে মোটামুটি সচ্ছল অবস্থায় আছেন। অধিকাংশই কোনও না-কোনও ধান্দায় নিযুক্ত থেকে মাসের শেষে পাকা মাইনে পান। লেখার আমদানি ঘুষের মত। কখন আসে কত আসে তার উপর কণামাত্র নির্ভর করা যায় না। ঘুষের টাকা থাকেও না।

অর্থাৎ কপালজোরে হয়তো মাসতিনেক আপনি প্রায় পাঁচশ' টাকা করে মাসে কামালেন—এর বেশী এদেশে আশা করবেন না—কিন্তু তার উপর নির্ভর করা চলবে না। পাঠকের মতিগতি কোন্ দিন কোন্ দিকে মোড় নেবে তার কোনও স্থিরতা নেই। আপনাকে তবু লিখে যেতে হবে, নূতন বই তৈরী করতে হবে। তা দিয়ে যদি ভাঁটার টান ঠেকাতে পারেন। ইতিমধ্যে আপনার পুঁজি ফুরিয়ে এসেছে, অর্থাৎ যে অভিজ্ঞতার 'মূলধন' নিয়ে লেখার 'ব্যবসা' আরম্ভ করেছিলেন সেটি তলানিতে এসে ঠেকেছে। নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবেন কি করে? বয়েস হয়ে গিয়েছে—বন্ধ প্রেমের হাট। লোটাকম্বল নিয়ে ঘোরাঘুরিও করতে পারেন না—কোমরে বাত।

এই অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের ব্যাপারে আরেকটা জিনিস মনে পড়লো—সে বড় মজার।

www.BanglaBook.org

ইয়োরোপে যে কোনও চিত্রকরের বাড়িতে নিত্য নূতন রমণী মডেল হয়ে আসছে। তারা বিবসনা হয়ে 'পোজ্' দেয়। কেউ কিচ্ছু বলে না। ওটা নাকি ওদের দরকার। চিত্রকরদের সবাই যে ভীষ্মদেব, শুকদেব ঠাকুর নন সে-কথাও সবাই জানে। বস্তুত কোনও চিত্রকর যদি একটুখানি শুকদেবীয় হন তবে তাঁর তাবৎ জীবনীকার সেটা চিৎকার করে বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়ে দিয়ে আমাদের কানে তালা লাগিয়ে দেন। বাদবাকিদের কেউ গাল-মন্দ করে না। ঐ যে বললুম, ওটা নাকি ওদের দরকার।

এদেশে গুরুমহারাজদের এ-অধিকার আছে। ভৈরবী, নর্মসখীরূপে এঁরা গুরুমহা-রাজদের সাধন-সঙ্গিনী হন। এ প্রথা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত।

কিন্তু যদি ইয়োরোপের পাদ্রীসাহেব ভৈরবী ধরেন তবে তাঁকে তিনদিনও সমাজে টিকতে হবে না। এদেশের গেরস্তপাড়ায় কোনও আর্টিস্টকে মডেলসহ বাস করতে দেবে না।

আমি কোনও ব্যবস্থার নিন্দা বা প্রশংসা করছি নে। সাহিত্যিক হিসেবে সে অধিকার আমার নেই। এর বিচার করবে সমাজ। সমাজ গুরু চায়, চিত্রকর চায়, সাহিত্যিক চায়। সমাজই স্থির করবে, কার কোন্‌টাতে অধিকার। সমাজ ভুলও করে। সোক্রোতেসকে বিষ, খৃষ্টকে ক্রুশ দেয়।

এটা কিছু নূতন কথা নয়। সামান্য একটি আলাদা উদাহরণ দি। বৈজ্ঞানিকদের সাধ্যি নেই জাহাজ জাহাজ টাকা যোগাড় করে এটম বম বানাবার। মার্কিন সমাজের সর্বপ্রধান মুখপাত্র রোজোভেল্ট দেশের টাকা বৈজ্ঞানিকদের পায়ে ঢেলে দিয়ে বললেন, ওটা আমার চাই। বৈজ্ঞানিকরা তৈরী করে দিলেন। ওটা জাপানে ফেলা হবে কিনা, সেটা স্থির করলেন ট্রুমান—বৈজ্ঞানিকদের হাতে সে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত করার ভার দেওয়া হয়নি। তাঁদের মতামত চাওয়া হয়েছিল মাত্র। এবং শুনলে আশ্চর্য হবেন, বৈজ্ঞানিকদের অধিকাংশই বিপক্ষে মত দিয়েছিলেন।

দার্শনিকদের বেলাও তাই। কেউ হয়তো প্রামাণিক বই লিখে প্রমাণ করলেন, ঈশ্বর নেই। কিন্তু তাঁর সাধ্য কি সে বই ইস্কুলে ইস্কুলে কলেজে কলেজে পড়ান! সেটা স্থির করবে সমাজ। কিংবা মনে করুন, বুদ্ধদেব বলেছেন ঈশ্বর নেই। সেটা সিংহল, বর্মার ইস্কুলে পড়ানো হয়। এদেশে পড়াতে গেলে সমাজ আপত্তি করবে।

কিংবা এই ফিল্মের কথাই নিন। প্রডুসার ডিরেক্টর দর্শক তো স্থির করেন না, কোন্ ফিল্ম দেখানো চলবে আর কোন্‌টা চলবে না। স্থির করে সমাজ—সেন্সার বোর্ডের মারফতে। কিন্তু সে আলোচনা উপস্থিত মুলতুবী থাক। আপনি কেন সাহিত্যিক হতে চান, সেই কথায় ফিরে যাই।

তা হলে কি আপনি সাহিত্য সৃষ্টি করে খ্যাতি-প্রতিপত্তি সঞ্চয় করতে চান?

প্রতিপত্তি হবে না। সে-কথা গোড়া থেকেই বলে রাখি।

আমি সামান্য লেখক। 'দেশে-বিদেশে' বইখানা প্রাইজ পেয়েছে। আমি তাই নিয়ে গর্ব করছি নে, ঈশ্বর আমার সাক্ষী। নিতান্ত এই প্রতিপত্তির কথা উঠলো বলে সে-কথাটা বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে। আমার বন্ধুবান্ধব এবং আপনাদের মত সহৃদয় পাঠক কেউ কেউ বলেন, 'কাবুলে তো ছিলে মাত্র দু বছর। তবু বইখানা মন্দ হয়নি। জর্মনিতে তো ছিলে অনেক বেশী। সে-দেশ সম্বন্ধে ঐ রকম একখানা বই লেখ না কেন?' আমি ভাবলুম,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রস্তাবটা খুব মন্দ নয়। মোটামুটি একটা খসড়াও তৈরী করলুম। কিন্তু বিপদ হল হিটলারকে নিয়ে। বিপদ হল ১৯৩৯-৪৪-এর যুদ্ধ নিয়ে। আমি ১৯৩৮-এর পর সেখানে আর যাইনি। আর আজ হিটলার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাদ দিয়ে জর্মনি সম্বন্ধে লেখা, এ যেন মুরারজী দেশাইকে বাদ দিয়ে চৌদ্দ ক্যারেট গোল্ডের কথা লেখা।

তাই মনে করলুম, আরেকবার না হয় হয়েই আসি। কুড়ি বছরের বেশী হতে চললো, বিদেশ যাইনি। হার্টও ট্রাবল দিচ্ছে। জর্মন ডাক্তাররা যদি কিছু একটা ভাল ব্যবস্থা করে দেয়। পাবলিশারদের বললুম, কিছু টাকা আগাম দিতে। যাঁদের অনুরোধ করলুম তাঁরা সোল্লাসে টাকা পাঠালেন—এঁরা সজ্জন।

এবারে ফরেন্ এক্স্চেঞ্জ বা বিদেশী মুদ্রার পালা।

উত্তর এল, ফেলেট্ 'নো'—তিন না চার লাইনে, ঠিক মনে নেই।

কোথায় রইল প্রতিপত্তি? কোথায় রইল খ্যাতির মূল্য? আমি যেতে চাইছিলুম নিজের টাকায়—সরকারের টাকায় নয়। বলুন তো, ক'জন বাঙালী লেখক নিজের টাকায় (অবশ্য সেই আগাম টাকা নেওয়ার ফলে নির্ভর করতে হবে আমার চাকরির মাইনের উপর) বিদেশ যেতে পারে? যে পারলো সেও সুযোগ পেল না।

পাঠক ভাববেন না, আমি কর্তৃপক্ষকে দোষ দিচ্ছি। মোটেই না। তাঁরা তো আমার দুশমন নন। তাঁরা যা ন্যায্য মনে করেছেন তাই করেছেন।

আমি বলতে চাই, কোথায় রইল লেখকের প্রতিপত্তি! আমি চেয়েছিলুম, কুল্লে দু হাজার টাকার বিদেশী মুদ্রা। আমার প্রতিপত্তির মূল্য তা হলে দু-হাজার টাকাও নয়। অবশ্য এতে আমার দুঃখিত হওয়া অত্যন্ত অনুচিত। স্বয়ং যীশুখৃষ্টকে ধরিয়ে দিয়েছিল তাঁর শিষ্য জুডাস্ ত্রিশটি মুদ্রার বিনিময়ে!

ঈষৎ অবান্তর হলেও বলি, তবু আমি গিয়েছিলুম। জানেন তো, নেড়ের গোঁ। পকেটে ছিল পঞ্চাশ না ষাটটি জর্মন মুদ্রা। সেখানে চললো কি করে? ওঃ! সেখানে আমার কিঞ্চিৎ প্রতিপত্তি আছে। তবে কি জর্মনরা খুব বাঙলা বই পড়ে? মোটেই না। তবে? আমার প্রতিপত্তি অন্য বাবদে—এবং সেটা এ-স্থলে সম্পূর্ণ অবান্তর। ধরে নিন, আমি সার্কাসের দড়ির উপর নাচতে পারি—না, সেটা বিশ্বাস হল না, আমার কোমরে বাত বলে?—তা হলে ধরুন, আমি হত্তনের পঞ্জাকে হত্তনের গোলাম বানাতে পারি!

এই তো গেল প্রতিপত্তির কথা। এবারে খ্যাতি। আমার খ্যাতি অত্যল্প, তাই আমার কথা তুলবো না। আমার ইয়ার পাহাড়ী সান্যালের (ওঃ! বলতে গর্বে বুকটা কি রকম ফুলে উঠেছে!) খ্যাতি সম্বন্ধে তো আপনাদের কোনও সন্দেহ নেই। তাকে গিয়ে শুধোন, সে কি আরামে আছে। অত্যন্ত গোবেচারী লোক—অন্তত আমার ভেদ্দুর জানা—দুটি পয়সা কামিয়ে, কোনও ভালো হোটেলে ইয়ার বক্সীসহ একটুখানি মুর্গী-কারি খেয়ে পান চিবোতে চিবোতে—তার পানের ঝাঁপিটি দেখেছেন তো—বাড়ি যাবে। শুধোন গিয়ে তাকে, হোটেলে বসা মাত্রই আকছারই তার কি অবস্থা হয়।

অটোগ্রাফ, ফটোগ্রাফ, গুষ্টির পিণ্ডিগ্রাফ কি চায় না লোকে তার কাছ থেকে! গোড়ায় আমি জানতুম না। আমার এক ভাগ্নের জন্য চাইলুম অটোগ্রাফ। সে যা করুণ নয়নে তাকালে—ভাবখানা 'এট্ টু ব্রুটি'!—যে আমার দয়া হল। তাড়াতাড়ি বললুম, না, না থাক।

www.BanglaBook.org

বেশ কিছুদিন তাকে দেখিনি। তার কারণ অবশ্য, আমার নিবাস মফস্বলে। শহরে গিয়েছি। রেস্ত কম। তাই বসেছি তন্দুরী মুর্গীর হোটেলে একলা-একলা। মুর্গীটা খেয়ে প্রায় শেষ করেছি এমন সময় গলকম্বল মানমুনিয়া দাড়ি সমেত সমুখে দাঁড়ালেন এক মহারাজ। আমার মুখে বোধ হয় কিঞ্চিৎ বিরক্তি ফুটে উঠেছিল। লোকটাও রস্টিক,—হোটেলে এত টেবিল খালি থাকতে আমার সামনের চেয়ারখানায় ধপ করে বসে পড়বেন কেন?

শুধোলে, কেমন আছ ভাই?'

আরে! এ যে পাহাড়ী। দাড়ি-ফাড়ি নিয়ে এ্যাদ্দিন বাদে খাঁটি পাহাড়ী বনলে। বললুম, 'খুলে কও।'

কাতর কণ্ঠে বললে, 'আর কি উপায়, বলো!'

আমি দরদী গলায় বললুম, 'বড্ড পাওনাদার লেগেছে বুঝি?'

পাহাড়ী খাসা উর্দু বলে। সেও বলে বেড়ায়, আমি ভালো উর্দু বলতে পারি। এই করে আমার নিজের জন্য বেশ একটা সুনাম কিনে ফেলেছি।

পাহাড়ী বললে, 'তওবা, তওবা। ওয়াস্তাগ্ ফিরুল্লা। পাওনাদার হলেও না হয় বুঝতুম। আর সে কি আমার নেই? এস্তের। কিন্তু তারা ভদ্রলোক। খাবার সময় উৎপাত করে না।'

বুঝলুম, মামেলা ঝামেলাময়। বললুম, 'তা তুমি এক কাজ করো না কেন? এডমায়ারারদের কেউ ধরলে বলো না কেন, ''আজ্ঞে হ্যাঁ, মিলটা ধরেছেন ঠিকই। তবে আমি পাহাড়ী সান্যাল নই, আমি তার ছোট ভাই, আমার নাম জংলী সান্যাল''। দাড়িটাই অবশ্য 'জংগলী'র ইন্সপিরিশন জুটিয়েছিল।

ঠাণ্ডা সাঁস লেকর—অর্থাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে—পাহাড়ী ফরাসীতে বললে, 'সা না ভা পা, শের—না, ডিয়ার সে হয় না।'

আমি বললুম, 'কেন? তুমি কি আডোনিসের মত খাবসুরৎ।'

তেড়ে বললে, 'কামাল কীয়া, ইয়ার। নামে কি আপত্তি? তা নয়। একবার তাই করেছিলুম। ফল কি হল, শোনো। এই হোটেলেই, হ্যাঁ, এই হোটেলেই একদিন বসে আছি, একলা। এমন সময় কে এক অচেনা লোক এসে শুধালে, ''আপনি কি পাহাড়ী সান্যাল?'' আমিও তোমারই মত—গ্রেট মেন থিঙ্ক এলাইক—এক গাল হেসে বললুম, ''আজ্ঞে, মিলটা ধরেছেন, ঠিকই, তবে আমি পাহাড়ী সান্যাল নই, আমি তাঁর ছোট ভাই।'' লোকটা খানিকক্ষণ ইতিউতি করে বললে, ''কি করি বলুন তো! ম্যানেজারবাবু আমাকে তাঁর কাছে পাঠালেন তিনশ' টাকা দিয়ে যেতে। তাঁকে পাই কোথায়?'' তারপর আমি তাকে যতই বোঝাই আমিই পাহাড়ী সান্যাল, সে আর মানতে চায় না।'

আমি ভেবে বললুম, 'তা তো বটেই। আমিই সে অবস্থায় মানতুম না।'

সোৎসাহে বললে, 'ইয়েহ্।' তারপর আরও ঠাণ্ডা সাঁস লেকর বললে, 'ভাই, সে টাকাটা আর কখনও পাইনি। ম্যানেজার লোকটা ছিল ভালো। অন্তত আমার টাকাটা শোধ করে লাটে উঠতে চেয়েছিল—আমি কি আর জানি। পরদিন সেখানে গিয়ে দেখি সব ফর্সা।'

হ্যাঁ! একটা কথা বলতে ভুলে গেলুম। আমার মুর্গীর বিলটা পাহাড়ীই দিয়েছিল। কিন্তু এটা বলে কি পাহাড়ীর দুশমনী করলুম না? এ যাবৎ তো লোকে শুধু অটোগ্রাফ চাইত, এখন যদি—?

www.BanglaBook.org

আরেকটি কথা। আমাদের এত দোস্তী কেন? সে আমার বই পড়ে না, আমি তার অভিনয় দেখি না। একেবারে খাঁটি হল না কথাটা। আমি 'বড়দিদি' দেখেছি—সে বোধ হয় 'দেশে-বিদেশে'র পাঁচ পাতা পড়েছে।

পাঠক সর্বশেষে অবশ্য শুধোবেন, আমি এত বাখানিয়া আপনাদের সাহিত্যিক হতে বারণ করছি কেন। তার কারণ সোজা। আমার বিশ্বাস একমাত্র জিনিয়াসরাই আমার লেখা পড়ে। অর্থাৎ আপনারা। বাজারে নামলে আমার রুটি মারা যাবে বলে।

আচ্ছা, আমার কথা ছাড়ুন। স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র কি বলেছেন,

অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কিং কিং ন ক্রিয়তে ময়া।
বানরীমিব বাগ্‌দেবীং নর্তয়ামি গৃহে গৃহে॥

ওরে পোড়া পেট, কত না কিছুই করি আমি তোর তরে।
বাঁদরীর মত সরস্বতীরে নাচাচ্ছি ঘরে ঘরে॥

(লেখকের অনুবাদ)

পেটের জন্যই হোক, আর খ্যাতির জন্যই হোক, সরস্বতীকে বানরের মত নাচাবেন না। আপনারা বলবেন, 'এটা তো বড় সিরিয়াস কথা হয়ে গেল। সে-ই তো চেষ্টা করছি গত চৌদ্দ বছর ধরে। সিরিয়াস কথা হেসে হেসে বলার।

কিন্তু পারলুম কই? এখন আবার বৃদ্ধ বয়সে ধাতই বা যায় কি করে?

উম্র সারী তো কটী ইশকে বুতাঁ মে, মোমিন!
আখেরী ওয়ক্ত মেঁ ক্যা খাক মুসলমাঁ হোংগে?

'সমস্ত জীবন তো কাটালে মিথ্যা প্রতিমার প্রেমে,
হে মে মিন!
এই শেষ সময়ে আর কি ছাই মুসলমান হব?'

বরঞ্চ লেখা বন্ধ করাই ভালো। উৎসও শুকিয়ে এসেছে।

সুখী হবার পন্থা

সুখী হবার পন্থা? সর্বনাশ! সে পন্থাটা এ অধমের যদি জানাই থাকতো তবে—যাক্ গে। ইতিমধ্যে একটা গল্প মনে পড়লো। এক ছোকরার বিয়ে করার বড় শখ। কিন্তু কিছুতেই হয়ে উঠছে না। ওদের পরিবারে একমাত্র শ্রীহনুমানের পুজো হয়—অন্য কোনও দেবতা সেখানে কস্কে পান না---তাই ত্রিসন্ধ্যা তাঁরই পুজো করে আর কাকুতি-মিনতি করে, 'হে ঠাকুর, আমার একটি বউ জুটিয়ে দাও।' ওদিকে এরকম ঘ্যানর ঘ্যানর শুনে হনুমানের পিত্তি চটে গিয়েছে। শেষটায় একদিন স্বপ্নে দর্শন দিয়ে হুঙ্কার দিলেন, 'ওরে বুদ্ধু, বউ যদি জোটাতে পারতুম, তবে আমি নিজে বিয়ে না করে confirmed bachelor হয়ে রইলুম কেন?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাই বলছিলুম, সুখী হবার পন্থাটা যদি আমার জানাই থাকতো তবে আমি এই টক্ দিতে যাব কেন? স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে আমি যে টক্ দিচ্ছি সেটা হয় আপনাদের আনন্দ দেবার জন্য, নয় অর্থাগমের জন্য, কিংবা উভয়তঃ। আপনাদের আনন্দ দেবার ইচ্ছাটা তৃষ্ণা বিশেষ এবং বুদ্ধদেব সেটাকে তন্‌হা অর্থাৎ তৃষ্ণা বলেছেন, এবং এই তন্‌হা থেকেই সর্ব দুঃখের উৎপত্তি। এই তন্‌হাজনিত দুঃখ নিবারণই সুখ। আমাদের শাস্ত্রেও আছে, 'ভারাদ্যপগমে সুখীসংবৃতোহহমিতিবৎ, দুঃখাভাবনে সুখিত্বপ্রত্যয়াৎ।' বাংলা কথায়, আমার ঘাড়ে বোঝা ছিল, সেটা নেবে যেতেই বললুম, আহা কি আরাম, এসো ক্ষুদিরাম : আহা কী সুখ, ঘুচে গেছে দুখ। অর্থাৎ দুঃখের অভাবই সুখ বলে প্রতীয়মান হয়। তাই পরদুঃখকাতর ফরাসী গুণী ভলতের এক অন্ধ মহিলাকে সান্ত্বনা দিয়ে চিঠি লেখেন, Nous avons un grand sujet a traitor : it sagit de bonheur on du monis d'etre le moins malheureux qu'on peut dans ce monde.

আমাদের আলোচনার বস্তু বিপুলাকার এবং মহত্ত্বপূর্ণ : প্রশ্ন এই, 'সুখী হওয়া যায় কিসে, অন্ততপক্ষে এ সংসারে অল্পতর দুঃখী হওয়া যায় কি প্রকারে?'

এটাকে আরও সোজা করে বলি। এক ক্ষ্যাপা ক্রমাগত মাথায় হাতুড়ি ঠুকছে। আমি শুধালুম, 'ওরে পাগল, মাথায় হাতুড়ি ঠুকছিস কেন?' এক গাল হেসে বললে, 'যখন ঠুকি না, তখন কী আরাম!' সেই সংস্কৃত প্রবচনেই ফিরে এলুম, 'ঘাড়ের বোঝা নেবে যাওয়াতে কী আরাম!' মহাকবি হাইনেকে আমি বড্ডই শ্রদ্ধা করি, কিন্তু এস্থলে তিনি যেটা বলেছেন, সেটা আমাদের পাগলের হাতুড়ি পেটার চেয়ে অনেক ফিকে। তিনি বলেছেন, 'কড়া ঠাণ্ডার রাতদুপুরে লেপের তলা থেকে পা বের করতে বেজায় শীত লাগলো। ফের পা দু'খানা ভিতরে টেনে নিয়ে বললুম, 'আঃ, কী সুখ!'

কিন্তু এরকম নেতিবাচক সুখ—অর্থাৎ দুঃখের অভাবে সুখ—এটাতে সবাই সন্তুষ্ট নন্। তাই অনেকেই সুখ বলতে কি বোঝেন সেটা স্পষ্ট ভাষায় বলে গেছেন। সর্বপ্রথমই অবশ্য মনে পড়ে ওমর খৈয়াম। কান্তি ঘোষ অনুবাদ করেছেন,

সেই নিরালা পাতায় ঘেরা
বনের ধারে শীতল ছায়া
খাদ্য কিছু পেয়ালা হাতে
ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়।
মৌন ভাঙ্গি মোর পাশেতে
গুঞ্জে তব মঞ্জু সুর
সেই তো সখী স্বর্গ আমার
সেই বনানী স্বর্গপুর।

শুনতে বেশ লাগে, কিন্তু অনুবাদটা আক্ষরিক নয়। বরঞ্চ সত্যেন দত্তের

সে বিজনে মোর পার্শ্বে বসিয়া
গাহো গো মধুর গান
বিজন হইবে স্বর্গ, আমার
তৃপ্তি লভিবে প্রাণ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফিট্‌জিরাল্ডেও তাই আছে

Beside me singing in the wilderness
And wilderness is paradise enow!

কান্তিবাবুর 'বিজন ছায়া' নয়, উল্টে বলা হয়েছে, মরুপ্রান্তরেও তুমি, সখী, যদি থাকো তবে সেই স্বর্গ।

• এইবারে মূল ফার্সীটা শুনুন :

গর দস্ত্ দহদ্ খগজ-ই গন্দুমে নানী—
ওয়াজ ময় দোমনীজ গোসফন্দি রানী—
ওয়া আনাগেহ মন্ ওয়া তো নিশস্তে দর ওয়ারানী
এ্যায়শী বুদ আন না হদ্দ-ই-হর সুলতানী—

ফার্সী ফিরিস্তিতে খৈয়াম চেয়েছেন, 'ভালো গমের উত্তম রুটি; দুই মণ মদ ধরে এরকম একটি পাত্রভরা মদ্য—হ্যাঁ বিশ্বাস করুন, ফার্সীতেই আছে 'দো মণী' এবং যে ফিট্‌জিরাল্ড নিতান্ত গদ্যময় ভেবে অনুবাদ করেননি—আছে 'একখানা আস্ত দুম্বার ঠ্যাং।' এবং সর্বশেষে বলেছেন, 'তখন যা সুখ, সেটা কদাচ কখনও কোনও সুলতানের ভাগ্যে জোটে কিনা সন্দেহ।'

এগুলো আমাদের জানা নয়। কারণ আমাদেরই মহর্ষি চার্বাক সুখী হওয়ার নির্ঘণ্ট আরও সস্তায় সেরেছেন, তিনি বলেছেন,

যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ
ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ!

অর্থাৎ ঋণ করেও ঘি খাও। ফেরত তো দিতে হবে না, কারণ এ দেহ ভস্মীভূত হবে, পুনর্জন্ম তাই হতে পারে না, পুনরাগমনং কুতঃ? এখানে কিন্তু খৈয়ামের সঙ্গে তাঁর তফাৎ। খৈয়াম বার বার বলেছেন, পরের মনে কষ্ট দিয়ে সুখী হওয়া যায় না।

কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিই বলবেন—যদিও আমি আদপেই চিন্তাশীল নই এবং আমি খৈয়ামের ফিরিস্তিতেই সুখী—কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিই বলবেন, এ আবার কি সুখ? লোক-ব্যবহারেও দেখা যায়, 'আমি যে-সে সুখ চাই নে।'

সামান্য একটি মেয়েছেলে। বহু যুগ পূর্বে তাঁর স্বামী যখন তাঁকে বিস্তর ধন-দৌলত দিয়ে বনে যেতে চাইলেন তখন তিনি তাচ্ছিল্য করে বলেছেন, 'যেনা হং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্!' যা দিয়ে আমি অমৃত হব না, পাব না, সে দিয়ে আমার কি হবে?

দেখুন দিকি, মেয়েছেলের কী বায়নাক্কা! সুখ পেয়েও সুখী হতে চায় না—অথচ দেখুন চীনেরা কী সুবুদ্ধিমান। লিং য়ুটাঙ বলেছেন, 'রাত্রের অন্ধকারে ঘরের ভিতর ঘুমিয়ে আছি। চতুর্দিকে আমার মহামূল্যবান প্রাচীন পাণ্ডুলিপি। হঠাৎ শুনি একটা ইঁদুর কুট্‌কুট্ করে সেগুলো কাটছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। এমন সময় আমি আমার বেড়ালটা হুঙ্কার দিয়ে ম্যাও করে উঠেছে—আহ্—কী সুখ।'

কিন্তু না,—ভারতবর্ষ অমৃত চেয়েছে। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, 'সুখের খেলায় বেলা গেছে, পাইনি তো আনন্দ।' আনন্দটা তবে কি? অমৃত। চণ্ডীদাসও বলেছেন, 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু, অনলে পুড়িয়া গেল।' এবং সুখের পরও শ্রীরাধা চেয়েছিলেন অমৃত, অমিয়া, তাই 'অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অমৃতের অত্যুত্তম বর্ণনা পেয়েছি আমি একটি শ্লোকে।

কেচিদ্ বদন্তি অমৃতোস্তি সুরালয়েষু,
কেচিদ্ বদন্তি বনিতাধরপল্লবেষু,
ব্রুমো বয়ং সকল শাস্ত্র বিচারদক্ষা,
জম্বীরনীরপূরিত মৎস্যখণ্ডে॥

আহা-হা! কেউ কেউ বলেন অমৃত আছে সুরালয়ে—মদের দোকানে। কেউ কেউ বলেন, না, অমৃত বনিতার অধর-পল্লবে। আর আমরা—আসলে 'আমি' এখানে সম্মানার্থে বহুবচন আমরা, কারণ আমি সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি—সকল শাস্ত্র বিচারদক্ষা—আমরা বলি জম্বীরনীর পূরিত—অর্থাৎ নেবু, জম্বীর, জামীর—সিলেটিতে—নেবু—নেবুর রসে পূরিত—ভর্তি—মৎস্যখণ্ডে! সোজা বাংলায় মাছের উপর কষে ঠেসে নেবুর রস—সেই অমৃত।

এ কবি শুধু কবি নন্—মহর্ষি, দিব্যদ্রষ্টা—কী করে সেই যুগেই জানলেন, বাঙলাদেশে এমন দিন আসবে যেদিন শুধু লক্ষপতিরাই শ্বশুরবাড়ি এলে মাছ কিনবেন। আর ইতরজনা—আমরা মাছের কাঁটাটি পর্যন্ত পাবো না, সধবার একাদশী ভাঙবার জন্যে!

আরেকটি কথা। কালিদাস ভবভূতি পড়ে আমেজ করতে পারি নে, এঁরা কোন্ প্রদেশের লোক। কিন্তু যে গুণী জম্বীরনীরপূরিত মৎস্যখণ্ডকে অমৃত বলে সে নিশ্চয়ই বাঙালী। মাছের তত্ত্ব কি বিহারী, মারওয়াড়ী, গুজরাতি ব্রাদাররা জানেন?

সুখ বলুন, আনন্দ বলুন, অমৃত বলুন, সেটা পাবো কোথায়? একটি মাত্র পথ নির্দেশ করি।

মহাকবি গ্যোটে বলেছেন,

দূরে দূরে তুমি কেন খুঁজে মরো?
সুখ তো আছে হাতের কাছে,
শিখে নাও শুধু তারে ধরিবারে,
সুখ সে তো রয় সদা কাছে কাছে।

Willst du immer weiter schweifen
Sieh, das Gute lieght so nah,
Lerne nur das Gluck ergreifen,
Denn das Gluck ist immer da!

আর আমাদের প্রতিবেশী বাঙালী লালন ফকীর বলেছেন,

হাতের কাছে পাইনে খবর
খুঁজতে গেলাম দিল্লী শহর!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিষের বিষ

আগা আহমদের প্রাণ অতিষ্ঠ। এক ফোঁটা মেয়ে তার বউ মালিকা খানমটা, ফুঁ দিলে উড়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু সেই যে সাতসকাল ভোরবেলা থেকে ক্যাটক্যাট্ আরম্ভ করে তার থেকে আগা আহমদের নিষ্কৃতি নেই। 'মিনষে', 'হাড়হাভাতে', 'ড্যাকরা'—হেন গাল নেই যেটা আগা আহমদকে দিনে নিদেন পঞ্চাশবার শুনতে হয় না। আর গয়নাগাঁটি নিয়ে গঞ্জনা—সে তো নিত্যিকার রুটি পনীর। এবং সেই সামান্য রুটি পনীরটুকুও যদি ভালো করে আগা আহমদের সামনে ধরতো তবুও না হয় সে সব-কিছু চাঁদপানা মুখ করে সয়ে নিত, কিন্তু সে রুটিও অধিকাংশ দিন পোড়া, এবং পনীরের উপরে যে মসনে পড়েছে সেটা চেঁচে দেবার গরজও বীবীজানের নেই। আগা আহমদ দিনমজুর; খিদে পায় বড্ডই।

ব্যাপারটা চরমে পৌঁছল বিয়ের দশ বছর পর একদিন যখন আগা আহমদ কি একটা খুঁজতে গিয়ে আবিষ্কার করলো, মালিকা খানম নিজের খাবার জন্য লুকিয়ে রেখেছে মুরমুরে রুটি, ভেজা-ভেজা কাবাব, টনটনে সেদ্ধ ডিম এবং তেল-তেলে আচার!

সে রাত্রে আগা আহমদ খেল না। বউ ঝঙ্কার দিয়ে বলল, 'ও আমার লবাব-পুত্তুর রে—রুটি পনীর ওঁয়ার রোচে না। কোথায় পাব আমি কাবাব আণ্ডা আমার আগাজানের জন্যে—'

সেই কাবাব আণ্ডা! যা বউ নিজে খেয়েছে!

স্থির করলো ওকে খুন করবে। নূতন করে তালাক দিয়ে লাভ নেই। অন্তত একশ' বার দেওয়া হয়ে গিয়েছে। মালিকা খানম মুখ বেঁকিয়ে আপন কাজে চলে যায়। ওরা থাকে বনের পাশে—পাড়া-প্রতিবেশীও কেউ নেই যে মালিকা খানমকে এসে বলবে, 'তোমার স্বামী যখন তোমাকে তালাক দিয়েছে তখন তারপর ওর সঙ্গে সহবাস ব্যভিচার।' আর থাকলেই বা কি হত? কেউ কি আর সাহস করে আসত? আগা আহমদের মনে পড়ল গত পনেরো বছরের মধ্যে কেউ তাদের বাড়িতে আসেনি।

শুয়ে শুয়ে সমস্ত রাত ধরে আগা আহমদ প্ল্যান করলো, খুন করা যায় কি প্রকারে।

সকালবেলা বনে গিয়ে খুঁড়লো গভীর একটা গর্ত। তার উপর কঞ্চি কাঠ ফেলে উপরটা সাজিয়ে দিল লতাপাতা দিয়ে।

বিকেলের ঝোঁকে বউকে বললে, 'গা-ম্যাজম্যাজ করছে। একটু বেড়াতে যাবে?'

বউ তো খল খল করে হাসলে চোঁচা দশটি মিনিট। তারপর চেঁচিয়ে উঠলো, 'কোজ্জাবো মা—মিনষের পেরাণে আবার সোয়াগ জেগেছে!'

আগা আহমদ নাছোড়বান্দা। বহু মেহন্নৎ করে গা-গতর খাটিয়ে করে গর্তটা তৈরী করেছে।

বউ রাজী হল। বেড়াতে নিয়ে গেল বনে। কৌশলে বউকে স্টিয়ার করে করে গর্তের কাছে নিয়ে গিয়ে দিল এক মোক্ষম ধাক্কা। তার পর তার বাঁশ-কঞ্চি লতাপাতা সহযোগে গর্তটি উত্তমরূপে ঢেকে দিয়ে আগা আহমদ তার পীরমুরশীদকে 'শুক্‌রিয়া' জানাতে জানাতে বাড়ি ফিরল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রান্না করতে গিয়ে বাড়িতে অনেক-কিছুই আবিষ্কৃত হল। হালুয়া, মোরব্বা, তিন রকমের আচার, ইস্তেক উত্তম হরিণের মাংসের শুঁটকি। পরমানন্দে অনেকক্ষণ ধরে আমাদের আগা রান্নাবান্না সেরে আহারাদি সমাপন করলে। ক্যাটক্যাটানি না শুনে না শুনে আজ তার চোখে নিদ্রা আসবে—এ-কথাটা যত বার ভাবে ততই তার চিত্তাকাশে পুলকের হিল্লোল জেগে ওঠে।

পরদিন কিন্তু আগা আহমদের শান্ত মনের এক কোণে কালো মেঘ দেখা দিল। হাজার হোক্—তার বউ তো বটে। তাকে ওরকম মেরে ফেলাটা—? বিয়ের সময় হজরৎ মুহম্মদের নামে সে কি শপথ নেয়নি যে তাকে আজীবন রক্ষণাবেক্ষণ করবে? কিন্তু ওদিকে আবার সেই দুশমনটাকে ফের বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসতে তো মন চায় না।

এ অবস্থায় আর পাঁচজন যা করে আগা আহমদও তাই করলে। 'যাক্ গে ছাই, গিয়ে দেখেই আসি না, বেটী গর্তের ভিতর আছে কি রকম। সেই দেখে মনস্থির করা যাবে।'

গর্তের মুখে পাতা সরাতেই ভিতর থেকে পরিত্রাহি চিৎকার! 'আল্লার ওয়াস্তে রসুলের ওয়াস্তে আমাকে বাঁচাও।' কিন্তু কী আশ্চর্য! এ তো মালিকা খানমের গলা নয়। আরও পাতা সরিয়ে ভালো করে তাকিয়ে আগা আহমদ দেখে—বাপ রে বাপ, এ্যাব্বড়া কালো-নাগ, কুলোপানা-চক্কর গোখরো সাপ! সে তখনো চেচাঁচ্ছে, বাঁচাও বাঁচাও, 'আমি তোমাকে হাজার টাকা দেব, লক্ষ টাকা দেব, আমি গুপ্তধনের সন্ধান জানি, আমি তোমাকে রাজা করে দেব।'

সম্বিতে ফিরে আগা আহমদের হাসিও পেল। সাপকে বললে, 'তুমি তো কত লোকের প্রাণ নির্ভয়ে হরণ করো—নিজের প্রাণটা দিতে এত ভয় কিসের?'

ঘেন্নার সঙ্গে সাপ বললে, 'ধাত্তর তোর প্রাণ! প্রাণ বাঁচাতে কে কাকে সাধছে! আমাকে বাঁচাও এই দুশমন শয়তানের হাত থেকে। এই রমণীর হাত থেকে। তারপর ডুকরে কেঁদে উঠে বললে, 'মা গো মা, সমস্ত রাত কী ক্যাটক্যাট কি বকাটাই না দিয়েছে। আমি ড্যাকরা, আমি মদ্দা মিনষে হয়ে একটা অবলা—হ্যাঁ অবলাই বটে—নারীকে কোনও সাহায্য করছি নে, গর্ত থেকে বেরোবার কোনও পথ খুঁজছি নে, আমি একটা অপদার্থ, ষাঁড়ের গোবর। আমি—'

আগা আহমদ বললে, 'তা ওকে একটা ছোবল দিয়ে খতম করে দিলে না কেন?'

চিল-চ্যাঁচানি ছেড়ে সাপ বললে, 'আমি ছোবল মারব ওকে! ওর গায়ে যা বিষ তা দিয়ে সাত লক্ষ কালনাগিনী তৈরী হতে পারে। ছোবল মারলে সঙ্গে সঙ্গে ঢলে পড়তুম না? সারাতো কোন্ ওঝা? ওসব পাগলামি রাখ। আমাকে তুমি গর্ত থেকে তোলো। তোমাকে অনেক ধনদৌলত দেব। পশুপক্ষী সাপ-বিচ্ছুর বাদশা সুলেমানের কসম।'

রূপকথা নয়, সত্য ঘটনা বলে দেখা গেল মালিকা খানমেরও অনেকখানি পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে—এক রাত্রি সর্পের সঙ্গে সহবাস করার ফলে। কারণ এতক্ষণ ধরে একটিবারও স্বামীকে কোনও কড়া কথা বলেনি। এটা একটা রেকর্ড, কারণ ফুলশয্যার রাত্রেও নাকি সে মাত্র তিনটি মিনিট চুপ করে থেকেই ক্যাটক্যাটানি আরম্ভ করে দিয়েছিল।

মালিকা খানম মাথা নিচু করে বললে, 'ওরা গুপ্তধনের সন্ধান জানে।'

আমাদের আগা আহমদের টাকার লোভ ছিল মারাত্মক। সাপকে সুলেমানের তিন কসম খাইয়ে গর্ত থেকে তুলে নিল। বউকেও তুলতে হল—সেও শুধরে গেছে জানিয়ে

www.BanglaBook.org

অনেক করে কসম কেটেছিল।

সাপ বললে, 'গুপ্তধন আছে উত্তর মেরুতে—বহু দূরের পথ। তার চেয়ে অনেক সহজ পথ তোমাকে বাৎলে দিচ্ছি। শহর কোতয়ালের মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরবো আমি। কেউ আমাকে ছাড়াবার জন্য কাছে আসতে গেলেই মেয়েকে মারতে যাবো ছোবল। তুমি আসা মাত্রই আমি সুড়সুড় করে সরে পড়বো—তোমাকে দেবে বিস্তর এনাম, এস্তের ধন-দৌলত। কিন্তু খবরদার, ঐ একবার। অতি লোভ করতে যেয়ো না।'

ভূতের মুখে রাম নাম?
সাপের দ্বারা ভালো কাম?

শহরে এমনই তুল-কালাম কাণ্ড যে তিন দিন যেতে-না-যেতে সেই বনের প্রান্তে আগা আহমদের কানে পর্যন্ত এসে পৌঁছল কোতয়াল-নন্দিনীর জীবনমরণ সমস্যার কথা। তিন দিন ধরে তিনি অচৈতন্য। গলা জড়িয়ে কাল-নাগ ফোঁস ফোঁস করছে। কোতয়াল লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে। তবু সাপুড়েরাও নাকি কাছে ঘেঁষছে না, বলছে উনি মা-মনসার বাপ।

প্রথমটা তো আগা আহমদকে কেউ পাত্তাই দেয় না। আরে, ওঝা-বদ্যি হদ্দ হল এখন ফার্সী পড়ে আগা! কী বা বেশ, কী বা ছিরি!

কোতয়ালের কানে কিন্তু খবর গেল,

বন থেকে এসেছে ওঝা
পেটে এলেম বোঝা বোঝা।

ছবি-চেহারা দেখে তিনিও বিশেষ ভরসা পেলেন না। কিন্তু তখন তিনি শ্মশান-চিকিৎসার জন্য তৈরী—সে চিকিৎসা ডোমই করুক, চাঁড়ালও সই।

তারপর যা হওয়ার কথা ছিল তাই হল। 'ওঝা' আগা আহমদ ঘরে ঢোকা মাত্রই সেই কাল-নাগ কোথা দিয়ে বেরিয়ে গেল কেউ টেরটি পর্যন্ত পেল না। কোতয়াল-নন্দিনী উঠে বসেছেন, তাঁর মুখে হাসি ফুটেছে। ভীষণ-দর্শন কোতয়াল সাহেবের চেহারা প্রসন্ন বদান্যতায় মোলায়েম হয়ে গিয়েছে। আগাকে লক্ষ টাকা তো দিলেনই; সঙ্গে সঙ্গে তাকে করে দিলেন তাঁর বাড়ির পাশের বনের ফরেস্ট্ অফিসার। এইবার আগা দুবেলা প্রাণভরে বাচ্চা হরিণের মাংস খেতে পারবে।

আগা সুখে আছে। সোনাদানা পরে মালিকা খানমও অন্য ভুবনে চরছেন—ক্যাটক্যাট করে কে? তা ছাড়া এখন তার বিস্তর দাসীবাঁদী। ওদের তম্বিতম্বা করতে করতেই দিন কেটে যায়। কর্তাও বৈঠকখানায় ইয়ার-বক্সী নিয়ে।

ওমা! এক মাস যেতে না যেতে খবর রটলো, উজীর সাহেবের মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরেছে একটা সাপ। কোন্ সাপ?—সেই সাপটাই হবে, আর কোন্‌টা?

এবারে দশ লাখ টাকার এনাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাইক-বরকন্দাজ পেয়াদা-নফর ছুটেছে আগা আহমদের বাড়ির দিকে,

হাতের কাছে ওঝা
সহজ হল খোঁজা।

কিন্তু আগা আহমদের বিলক্ষণ স্মরণে ছিল, কাল-নাগ খবরদার করে দিয়েছে অতি লোভ ভালো না,—সাপ সরাতে একবারের বেশী না যায়। সে যতই অমত জানায়, ইয়ার-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বক্সী ততই বলে, 'হুজুরের কী কপাল! বাপ-মার আশীর্বাদ না থাকলে এমনধারা কখনও হয়!'

আগাকে জোর করে পাল্কিতে তুলে দেওয়া হল।

এবারে সাপ জুলজুল করে তার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমার খাঁই বড্ড বেড়েছে—না? তোমাকে না পই পই করে বারণ করেছিলুম, একবারের বেশী আসবে না। তবু যে এসেছ? তা সে যাক্ গে—তুমি আমার উপকার করেছ বলে তোমাকে এবারের মত ছেড়ে দিলুম। কিন্তু এই শেষ বার। আর যদি আসো, তবে তোমাকে মারবো ছোবল। তিন সত্যি।'

দশ লাখ টাকা এবং তার সঙ্গে পাঁচশ' ঘোড়ার মনসব পেয়েও নওয়াব আগা আহমদের দিল-জান সাহারার মত শুকিয়ে গিয়েছে। মুখ দিয়ে জল নামে না, পেটে রুটি সয় না। কাল-নাগ আবার কখন কোথায় কি করে বসে আর সে ছোবল খেয়ে মরে! স্থির করলো, ভিন্ দেশে পালাবে।

ঠিক সেই দিনই স্বয়ং কোতয়াল সাহেব এসে উপস্থিত। বিস্তর আদর-আপ্যায়ন, হস্তচুম্বন-কণ্ঠালিঙ্গন। কোতয়াল সাহেব গদগদ্ কণ্ঠে বললেন, 'ভাই নওয়াব সাহেব, তোমার কী কপাল! তামাম দেশের চোখের মণি, দিলের রোশনী, রাজকুমারীর প্রাণ উদ্ধার করে তুমি হয়ে যাবে দেশের মাথার মুকুট। চলো শিগ্‌গির্!' সেই হারামজাদা কাল-নাগ এবার জড়িয়ে ধরেছে শাহাজাদীর গলা।'

নওয়াব আগা আহমদ জড়িয়ে ধরলেন কোতয়ালের পা। হাউহাউ করে কেঁদে নিবেদন করলে সে কোন্ ফাটা বাঁশের মধ্যিখানে পড়েছে।

কোতয়ালদের হৃদয় মাখন দিয়ে গড়া থাকে না। ব্যাপারটা বুঝে নিতেই শহরদারোগাকে হুকুম দিলেন, 'চিড়িয়া বন্ধ করো পিঞ্জরামে।'

পাল্কিতে নওয়াব আগা আহমদ। দু পাশের লোক তার জয়ধ্বনি জিন্দাবাদ করছে। এক ঝরোকা থেকে কোতয়াল-নন্দিনী অন্য ঝরোকা থেকে উজীর-জাদী তাঞ্জামের উপর পুষ্পমাল্য বর্ষণ করলেন।

আগা আহমদ মুদ্রিত নয়নে মুর্শীদমৌলার নাম আর ইষ্টমন্ত্র জপছে।

স্বয়ং বাদশা তাকে হাতে ধরে রাজকুমারীর দোরের কাছে নিয়ে এলেন।

আগা আহমদ ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

কাল-নাগ হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, 'আবার এসেছিস, হতভাগা? এবারে আর আমার কথার নড়চড় হবে না। তোর দুই চোখে দুই ছোবল মেরে ঢেলে দেব আমার কুল্লে বিষ!'

আগা আহমদ অতি বিনীত কণ্ঠে বললে, 'আমি টাকার লোভে আসিনি। তুমি আমাকে অগুনতি দৌলত দিয়েছো। তুমি আমার অনেক উপকার করেছ তাই তোমার একটা উপকার করতে এলুম। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলুম, শুনলুম তুমি এখানে। ওদিকে সকালবেলা বীবী মালিকা খানম আমাকে বলেছিলেন তিনি রাজকুমারীকে সেলাম করতে আসছেন। বোধ হয় এক্ষুনি এসে পড়বেন। তুমি তো ওঁকে চেনো—হেঁ, হেঁ—তাই ভাবলুম তোমাকে খবরটা দিয়ে উপকারটাই না কেন করি। তুমি আমার—'

'বাপ রে, মা রে' চিৎকার শোনা গেল। কোন্ দিক দিয়ে যে কাল-নাগ অদৃশ্য হল আগা আহমদ পর্যন্ত বুঝতে পারলো না।

www.BanglaBook.org

এর পর আগা আহমদ শান্তিতেই জীবনযাপন করেছিল।

গল্পটি নানা দেশে, নানা ছলে, নানা রূপে প্রচলিত আছে। আমি শুনেছিলুম এক ইরানী সদাগরের কাছ থেকে, সরাইয়ের চারপাইতে শুয়ে শুয়ে।

কাহিনী শেষ করে সদাগর শুধোলেন, 'গল্পটার "মরাল" কি, বলো তো?'

আমি বললুম, 'সে তো সোজা। রমণী যে কি রকম খাণ্ডারনী হতে পারে তারই উদাহরণ। এ-দুনিয়ার নানা ঋষি নানা মুনি তো এই কীর্তনই গেয়ে গেছেন।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর সদাগর বললেন, 'তা তো বটেই। কিন্তু জানো, ইরানী গল্পে অনেক সময় দুটো করে "মরাল" থাকে। এই যে-রকম হাতীর দুজোড়া দাঁত থাকে। একটা দেখাবার, একটা চিবোবার। দেখাবার "মরাল"-টা তুমি ঠিকই দেখেছ। অন্য "মরাল"-টা গভীর :—খল যদি বাধ্য হয়ে, কিংবা যে-কোনও কারণেই হোক, তোমার উপকার করে তবে সে উপকার কদাচ গ্রহণ করবে না। কারণ খল তারপরই চেষ্টায় লেগে যাবে, তোমাকে ধনেপ্রাণে বিনাশ করবার জন্য, যাতে করে তুমি সেই উপকারটি উপভোগ না করতে পারো।'

অবশ্য তোমার বাড়িতে যদি মালিকা খানমের মত বিষ থাকে অন্য কথা।

কিন্তু প্রশ্ন, ক'জনের আছে ও-রকম বউ?'

রাজহংসের মরণগীতি

॥ এক ॥

জর্মনির চরম শত্রু ফ্রান্সের একাধিক লেখক সবিস্ময়ে স্বীকার করেছেন যে, এমন দিন আসবে, যেদিন রণবিদ্যার চর্চাশীল ব্যক্তি মাত্রেই যে রকম ফ্রিডরিক দি গ্রেট ও নেপোলিয়ানের রণকলা অক্ষরে অক্ষরে অধ্যয়ন করে থাকেন ঠিক তেমনি হিটলারের রণকলাও অধ্যয়ন করবেন।

আমরা রণচর্চা করি না; তৎসত্ত্বেও আমাদের মনেও এ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্নের উদয় হয়। যেমন, যে হিটলার দুবৎসরের ভিতর ইংলিশ চ্যানেল থেকে প্রায় মস্কো অবধি রাজ্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তিনি যখন তিন বৎসরের ভিতর তাঁর মাটির তলার আশ্রয় ('বুংকার') থেকে খবর পেলেন যে, বিজয়ী রুশ-সেনা সে আশ্রয় থেকে মাত্র পঁচিশ গজ দূরে, আর চব্বিশ ঘণ্টার ভিতরই, রক্তলোলুপ কেশরীর মত তাঁর বুংকারে এসে প্রবেশ করবে, তখন তাঁর মনে কি চিন্তার উদয় হয়েছিল? সঞ্জয় যখন বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে খবর দিলেন যে, দুর্যোধনের পরাজয় ঘটেছে, তখন তাঁর ব্যালাডের (আমার বিশ্বাস, চারণদের মুখে গীত এই ব্যালাডকে কেন্দ্র করেই ধীরে ধীরে মহাভারত রচিত হয়) ধুয়ো ছিল, 'যখন অমুকটা ঘটল, তখন আমরা জয়াশা করিনি, যখন তমুকটা ঘটল, তখনও আমরা জয়াশা করিনি',—এবং মূল ধুয়ো ছিল, 'আমরা জয়াশা করিনি তখনও আমরা জয়াশা করিনি।' হিটলারের বেলাও কি তাই ঘটেছিল? কারণ তাঁর পরাজয়ও তো

www.BanglaBook.org

একদিনে হয়নি—তিনি কি দিনে দিনে বুঝতে পেরেছিলেন, 'এখন আর জয়াশা নেই', 'এখন আর জয়াশা নেই', না তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দুরাশা পোষণ করে কোন অলৌকিক পরিবর্তনের আশা করেছিলেন?—দুর্যোধন যেরকম উরুভঙ্গের পরও জয়াশা করে অশ্বত্থামাকে পঞ্চপাণ্ডবের গোপন নিধনের জন্য পাঠিয়েছিলেন?

আরও ছোটখাটো কত প্রশ্নই না মনে উদয় হয়।

যেমন মনে করুন, হিটলার যখন পোল্যান্ড থেকে ফ্রান্স, ওদিকে নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যান্ড, বেলজিয়াম জয় করে ফেলেছেন, বাঙলা কথায় একমাত্র রুশ চাড়া এমন কোনও শক্তি ইউরোপে আর নেই যে তার মোকাবেলা করতে পারে এবং পরাজিত ইংলন্ড আপন দ্বীপে ফিরে গিয়ে এমনি ক্লান্ত যে, জখমগুলো পর্যন্ত চাটতে পারছে না, তখন হিটলার ইংলন্ড অভিযানে বেরোলেন না কেন? স্বয়ং চার্চিল স্বীকার করেছেন, তখন হিটলার সে অভিযান করলে ইংলন্ড অনায়াসে জয় করতে পারতেন।

এসব প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন বহু ঐতিহাসিক, বহু জঙ্গীলাট, বহু কূটনীতিবিদ্, এমন কি হিটলারের বহু সাঙ্গোপাঙ্গ। তাঁর সেনাপতিরা পর্যন্ত এ সম্বন্ধে হাজার হাজার না হোক, শত শত পুস্তক লিখেছেন।

কিন্তু আমাদের মনে তবু কৌতূহল জাগে, স্বয়ং হিটলার কি ভেবেছিলেন? অবশ্য তাঁর উত্তরই যে শুদ্ধ হবে, এমন কোনও কথা নেই। আমাদের বন্ধুবান্ধব যখন পরীক্ষায় ফেল করবার পর দফে দফে ফেল মারার কারণ দর্শায়, তখন আমাদেরই দু-একজনা তার অনুপস্থিতিতে আমাদের প্রকৃত কারণ দর্শিয়ে দেয়, আর তখন আমরা অনেক স্থলেই ওদেরই বিশ্বাস করি বেশী—সর্বস্থলে না হোক, অনেক স্থলেই 'স্পেকটেটর সীজ মোর অব দি গেম।'

তবু মনে বড়ই কৌতূহল হয়, নেপোলিয়ন কি ভেবেছিলেন, হিটলার কি ভেবেছিলেন?

অধুনা তারই খানিকটে উত্তর মিলেছে।

১৯৪১-৪২-এর শীতে হিটলার গৌরবের মধ্যগগনে। ফ্রান্স পদানত—তিনি মস্কো লেলিনগ্রাদের দরজায় সদম্ভে ধাক্কা দিচ্ছেন। আত্মপ্রসাদে পরিপূর্ণ হিটলার তখন লাঞ্চ-ডিনার খাওয়ার পর সমবেত ইয়ারবক্সীদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন—জর্মন মনের উপর বহিরাগত খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব, ভারতবর্ষের রাজনীতিতে নেহেরু না সুভাষ, বর্ণসঙ্করের কুফল, কুকুর মনিবের খাটের নিচে শোবে না অন্য কোথাও,—বস্তুত আকাশ-পাতালে হেন বস্তু নেই, যা নিয়ে তিনি তখন আলোচনা করেননি। 'আলোচনা' বলে ভুল করলুম—আসলে ইয়ার-দোস্ত দু'একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে না করতেই হিটলারের পঞ্চমুখ পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী শোনাতে আরম্ভ করতো। এ যেন নব গীতা—শুধু আমাদের গীতাতে প্রশ্ন করেন একা অর্জুন, এখানে অর্জুন একাধিক।

হিটলারের সেক্রেটারি মার্টিন বরমান তখন হিটলারের অনুমতি নিয়ে ঘরের এক কোণে স্টেনো রাখতে আরম্ভ করলেন। তাঁর টাইপ করা কাগজের উপর তখন বরমান তাঁর মন্তব্য ও মেরামতি করে দিলে পর শেষ সরকারী কপি তৈরি হত।

হিটলার যুদ্ধে জয়ী হলে পর এগুলো কি ভাবে প্রকাশিত হত, আদৌ প্রকাশিত হত কি না, সেকথা বলা কঠিন। যুদ্ধের পর যখন চতুর্দিকে লুঠতরাজ, তখন এ-হাত সে-হাত ঘুরে শেষটায় সে পাণ্ডুলিপি প্রথম জর্মানে ও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি অনুবাদে—

www.BanglaBook.org

"হিটলারজ টেবিল-টক্" নামে প্রকাশিত হয়। প্রায় সাতশ' পাতার বই।

হিটলার 'মাইন কাম্‌ফ' কিংবা বক্তৃতায় তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন বিশ্বজনের সম্মুখে সরকারীভাবে, কিন্তু এই টেবিল-টক্ ঘরোয়া। এতে হিটলার-মনের অন্য একটা দিক দেখতে পাওয়া যায়।

হিটলারের অনুচরবর্গ বলেন, যখন পরাজয় আরম্ভ হল, তখন হিটলার যে-কোনও কারণেই হোক তাঁর জেনারেল, কর্নেল, ইয়ার-বক্সীদের সঙ্গে খানা খাওয়া বন্ধ করে দিয়ে খেতে লাগলেন, নিরামিষ রান্নায় সিদ্ধহস্তা তাঁর পাচিকা এবং তাঁর মহিলা-টাইপিস্টদের সঙ্গে। তাই ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত 'টেবিল-টক্' প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল।

১৯৪৫-এর ফেব্রুয়ারি মাসেই হিটলারের কাছে না হোক তাঁর শত্রু-মিত্র বহুজনের কাছেই স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আর জয়াশা নেই। তাঁর সেক্রেটারি বরমান অন্তত সে-সম্ভাবনাটার আতঙ্ক ভালোভাবেই অনুভব করেছিলেন। খুব সম্ভব, তাঁরই অনুরোধে হিটলার ফের 'টেবিল-টক্' দিলেন। কিন্তু এগুলোকে আর 'টক্' বলা চলে না। তাঁর শেষ বাণী, তাঁর শেষ 'টেস্টামেন্ট' বললেই ভালো বলা হয়।

এগুলোও এ-হাত সে-হাত ঘুরে ঘুরে প্রথম প্রকাশিত হয় ফ্রান্সে ১৯৫৯-এ; ইংরিজিতে ১৯৬১-তে। এ-দেশে এসে পৌঁচেছে দিন কয়েক হল।

চটি বই, কিন্তু তা হলেও এর ভিতর মানব-মনের অদ্ভুত দ্বন্দ্ব, জয়াশা নিরাশা এবং সর্বশেষে আর্তকণ্ঠে বিশ্বজনের প্রতি অভিসম্পাতসহ ভবিষ্যদ্বাণী—এ সবই রয়েছে কর্কশ হতে কর্কশতর ভাষায়।

তবে একথা ঠিক, আর কিছু না হোক, তাঁর ভবিষ্যদ্বাবাণীগুলো প্রায় অক্ষরে অক্ষরে ফলছে।[১]

॥ দুই ॥

প্রথম প্রশ্ন ফ্রান্সের পরাজয়ের পর হিটলার সঙ্গে সঙ্গে ইংলন্ড আক্রমণ করলেন না কেন? পূর্বেই বলেছি, এ বিষয়ে নানা মুনি নানা মত দিয়েছেন : এবারে হিটলারের মুখে শুনুন :

'জুলাইয়ের (১৯৪০) শেষের দিকে, অর্থাৎ ফ্রান্সের পরাজয়ের এক মাস পরে আমি হৃদয়ঙ্গম করলুম, শান্তি আবার আমাদের মুঠোর বাইরে চলে গেল। তার কয়েক সপ্তাহ পরেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে শরৎ-হেমন্তের ঝড়-ঝঞ্ঝার পূর্বে আমরা ব্রিটেন অভিযান করতে পারবো না, কারণ আকাশযুদ্ধে আমরা সম্পূর্ণ বিজয়ী হতে পারিনি। তার সরল অর্থ আমরা ভবিষ্যতেও আর কখনও ব্রিটেন অভিযানে সক্ষম হব না।'

(টীকা: হিটলার এবং গ্যোরিঙের চাল ছিল, ইংলন্ডের উপর বেধড়ক বোমা বর্ষণ করলে ইংলিশ জঙ্গী বিমান আকাশে উঠবে জর্মন বিমারু বিমান নিধন করবার জন্য। তখন সেগুলোকেও বিনাশ করা হবে। ফলে আকাশে ইংলন্ডের আর কোনও আধিপত্য থাকবে না বলে তখন সহজেই সমুদ্রপথে ব্রিটেন অভিযান সম্ভবপর হবে। ইংরেজ এই

1. The Testament of Adolf Hitler, (February-April 1945, The Hitler Borman Documents, Cassell, London, pp. 115).

www.BanglaBook.org

চালটি বুঝতে পেরে, বরঞ্চ বেধড়ক বোমার মার খেল, কিন্তু জঙ্গী বিমান আকাশে তুললো অত্যল্পই—বাকিগুলো বাঁচিয়ে রাখলো হিটলারের সমুদ্র অভিযানের জাহাজগুলোকে ঘায়েল করার জন্য।)

হিটলার পুনরায় অন্যত্র বলেছেন,

'ইংলন্ড-অভিযান ও ফলে যুদ্ধ শেষ করে শান্তি স্থাপনের আশা ত্যাগ করেছিলুম। কারণ ইংলন্ডের মূর্খ নেতারা কিছুতেই ইয়োরোপে আমাদের একছত্রাধিপত্য স্বীকার করে নিত না—যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে আমাদের সঙ্গে বৈরীভাবাপন্ন শক্তিশালী একটি রাষ্ট্রও (অর্থাৎ রুশ) বেঁচে থাকতো। যুদ্ধের তা হলে শেষই হত না—চলতেই থাকতো। এবং ইংরেজের পিছনে মার্কিন এসে জুটে তার কর্মতৎপরতা বাড়িয়ে তুলতো। মার্কিনের আবার যুদ্ধ করার জন্য সব বলই প্রচুর, যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণে তারাও আমাদেরই মত প্রচুর এগিয়ে যেত; ইংলন্ড থেকে কন্টিনেন্ট দূরে নয় (অর্থাৎ মার্কিন-ইংরেজ তৈরী হয়ে যাওয়ার পর তারাও কন্টিনেন্টে নেমে আমাদের আক্রমণ করতে পারবে)—এ সমস্ত কারণে আমাদের পক্ষে ইংলন্ড অভিযান করে এক সুদীর্ঘ কালব্যাপী লড়াইয়ের দয়ে মজে যাওয়া মোটেই সমীচীন হত না। কারণ স্পষ্ট দেখতে পারছো, সময়—কাল, ক্রমেই আমাদের বিরুদ্ধ পক্ষের সাহায্য করে যেত বেশী। ইংলন্ডের শেষ আশা ছিল রুশ—কারণ রুশ আমাদেরই মত শক্তিশালী—এবং তাকে খাড়া করানো আমাদের বিরুদ্ধে। এই রুশকে ঘায়েল করতে পারলেই ইংরেজ বুঝতো যে তার আর আশা নেই, এবারে সন্ধি করতেই হবে।'

হিটলার এস্থলে পরিষ্কার বুঝিয়ে বললেন, কেন ইংলন্ড আক্রমণ না করে তিনি রুশ আক্রমণ করেন।

এ যুক্তিগুলো কতখানি বাস্তব তার বিচার রণ-পণ্ডিতেরা করবেন। ঈষৎ অবান্তর হলেও অন্য একটি যুক্তির কথা এস্থলে উল্লেখ করি, কারণ সেটি জানা থাকলে ভারতের ইতিহাস বুঝতে অনেকখানি সুবিধা হয়।

একাধিক রণ-পণ্ডিত বলেছেন, হিটলার এমন দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যার সঙ্গে সমুদ্র ও সমুদ্রাভিযানের যোগসূত্র বা ঐতিহ্য ছিল না। অস্ট্রিয়াকে ইংরেজ, স্পানীয় বা আরবের মত ম্যারিটিম নেশন বলা চলে না। তাই ইংলন্ড অভিযানের সব-কিছু তৈরী করেও[১] হিটলার শেষ মুহূর্তে কিন্তু-কিন্তু করে থেমে গেলেন।

অর্থাৎ জলাতঙ্ক না থাকলেও হিটলারের সমুদ্রাতঙ্ক ছিল—অন্তত সমুদ্র-প্রীতি যে ছিল না সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। অবশ্য মানতে হবে এইটেই সর্বপ্রধান কারণ নয়।

পাঠান মোগল বংশের রাজাদেরও হিটলারের অবস্থা ছিল। এঁরা এসেছিলেন ল্যান্ড-লক্‌ট দেশ থেকে। সমুদ্রের সঙ্গে তাঁদের কণামাত্র সম্পর্ক ছিল না। আমার যতদূর জানা

১ যাঁরা হিটলার-সখা ফোটোগ্রাফার হফ্‌মানের বই 'হিটলার উয়োজ মাই ফ্রেন্ড' পড়েছেন তাঁরাই জানেন, ইংলন্ড অভিযানের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হওয়ার পর কথা ছিল, এক বিশেষ সন্ধ্যায় রাত দশটায় হিটলার অভিযান আরম্ভের ফাইনাল অর্ডার দেবেন। হিটলার হফ্‌মান ও অন্যান্য সাঙ্গোপাঙ্গের সঙ্গে রাত বারোটা অবধি গালগল্প করে শুতে গেলেন। কোন অর্ডারই দিলেন না। অভিযান নাকচ হল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আছে, মোগলদের ভিতর প্রথম আকবরই গুজরাত জয় করে চাক্ষুষ সমুদ্রদর্শন করেন। 'আকবর-নামার' ইংরিজী অনুবাদক সেই সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে সমুদ্র আকবরের মনে কোনও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারেনি। তাও আকবর প্রভৃতি বাদশারা যদি সমুদ্রপারে কিংবা অদূরে রাজধানী করতেন তা হলেও না হয় কিছুটা হত। তাঁরা থাকতেন আগ্রা-দিল্লীতে যেখানে সমুদ্রের লোনা হাওয়া পর্যন্ত পৌঁছয় না।

ফলে এদের বিপুল ঐশ্বর্য জনবল থাকা সত্ত্বেও আমাদের নৌবহর তৈরী হল না।

হোয়াট এ ট্র্যাজেডি! এঁরা যদি নৌবহর তৈরী করতেন, তবে পর্তুগীজ ইংরেজ এদেশে যে এক রত্তি পাত্তা পেত না তাই নয়, আমাদের পণ্যসম্ভার আমাদের জাহাজে করে দুনিয়ার বন্দরে বন্দরে ঘুরে বেড়াত। আজ আমরা মার্কিন ইংরেজদের সঙ্গে পাল্লা দিতুম। এবং পরম পরিতাপের বিষয়, আজও আমাদের মন সমুদ্র-সচেতন নয়—রাজধানী সেই দিল্লীতে যে।

অথচ আমরা সবাই জানি, সমুদ্র-যাত্রায় ভারতের খ্যাতি একদা ছিল।

সে দীর্ঘ কাহিনী তুলবো না। মহাভারতের মাত্র সামান্য একটি কথার উল্লেখ করি। শান্তিপর্বে ভীষ্ম রাজ্যচর্চা সম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দেবার জন্য প্রজাপতিকৃত লক্ষ অধ্যায়যুক্ত এক বিরাট শাস্ত্রের উল্লেখ করে বলেছেন, "ঐ বিরাট শাস্ত্রে...নৌকা নিমজ্জনাদি দ্বারা নৌকার পথরোধ...সবিশেষ কীর্তিত হইয়াছে (শান্তিপর্ব)।" অর্থাৎ কয়েক বৎসর পরে অ্যান্টনি ইড়ন সুয়েজ কানালের মধ্যে জাহাজ ডুবিয়ে যে-ভাবে খালের মুখ বন্ধ করলেন! এ সংসারে নূতন কিছুই নয়।

নৌবহর বাবদে ভারতের তখনই সর্বশক্তি গেছে যখনই কেন্দ্রীয় সরকার নৌশক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ, কারণ তখন তাঁরা বাঙলা এবং গুজরাত প্রদেশকে নৌবহর তৈরী করার জন্য অর্থ দিতেন না—এর মূল্য জানেন না বলে, সেকথা পূর্বেই বলেছি। অথচ ঐ সময়ে, যেমন মনে পড়ে তীমুর-অভিযানের পর আকবর-জাহাঙ্গীর পর্যন্ত বাঙলা গুজরাত স্বাধীন। নৌবহরের মূল্য জানেন বলে গুজরাতের স্বাধীন সুলতান মাহমুদ বেগড়া থেকে আরম্ভ করে শেষ সুলতান বাহাদুর শাহ পর্যন্ত সকলেই নৌবহর রেখেছেন এবং একাধিকবার নৌসংগ্রামে পর্তুগীজদের বেধড়ক মার মেরেছেন। গুজরাতের শেষ স্বাধীন বাদশা বাহাদুর শাহ মারা যান, তিনি যখন হুমায়ুন এবং শের শা'র ভয়ে পর্তুগীজদের সঙ্গে সন্ধি করতে তাদের জাহাজে যান। পর্তুগীজদের দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে তিনি সমুদ্রে ঝাঁপ দেন—পর্তুগীজরা বৈঠার ঘায়ে তাঁকে খুন করে।

বাঙলাও যখন স্বাধীন তখন পর্তুগীজদের সঙ্গে লড়েছে। যদিও তারা সুন্দরবন অঞ্চল ছারখার করেছে, তবু বাঙলায় গোয়া দমন দিউ-এর মত রাজ্য স্থাপন করতে পারেনি।

আকবর থেকে আওরঙজেব পর্যন্ত বাংলা-গুজরাত আর্তকণ্ঠে বার বার চিৎকার করে কেন্দ্রের হুজুরদের জানিয়েছে, পর্তুগীজরা সর্বনাশ করছে। আমাদের পণ্যসম্ভার হারমাদদের ভয়ে বিদেশে রপ্তানি হতে পারছে না। বাধ্য হয়ে জলের দরে পর্তুগীজদের বেচে দিতে হচ্ছে। আমরা যখন স্বাধীন ছিলুম তখন আমাদের আপন টাকা দিয়ে নৌবহর গড়েছি। এখন কুল্লে টাকা চলে যায় কেন্দ্রে। দয়া করে টাকা দিন, নৌবহর গড়ি।

কিন্তু কেবা শোনে কার কথা! হুজুররা হিটলারের চেয়ে অধম ল্যান্ড লক্‌ট্ দেশের লোক, এবং এখন থাকেন দিল্লীতে। নৌবহরের মূল্য কি বুঝবেন?

www.BanglaBook.org

ইতিহাস থেকে আমরা শিক্ষালাভ করি। আজও যদি কেন্দ্রে বাঙলাদেশকে বাণিজ্য-নৌবহর তৈরী করবার জন্য বিশেষ মোটা টাকা না দেয়, তবে বুঝব ইতিহাস বৃথাই পড়ছি।

১৯৪১।

॥ তিন ॥

হিটলার আত্মহত্যা করার এক মাস পূর্ব পর্যন্ত বার বার করুণ আর্তনাদ করে বলেছেন, এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমি চাইনি, আমি চাইনি, আমি চাইনি। আমি চেয়েছিলুম জর্মনির জন্য তার বেঁচে থাকার মত (লেবেন্‌স্‌রাউম) 'দুই বিঘে জমি'। জমিটা আসবে চেকোশ্লোভাকিয়া, পোলান্ড ও উক্রানিয়া থেকে। তাতে ইংলন্ডের কি, ফ্রান্সেরই বা কি? আমি তো ফ্রান্স কিংবা তার উপনিবেশে হাত দিতে চাইনি। ইংরেজকেও শতবার বলেছি, তার বিশ্বজোড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিও কণামাত্র লোভ আমার নেই। রুশরা বর্বর, তারা বিশ্বশান্তির শত্রু। তারা পশ্চিমাঞ্চল দখল করে নিতে পারলে তার শক্তিক্ষয় হয়ে যাওয়ায় সে বিশ্বশান্তি নষ্ট করতে পারবে না; জর্মনরাও খেয়ে-পরে বাঁচবে, ফ্রান্সের উপনিবেশ বা ব্রিটেনের বিশ্বরাজ্যের দিকে হ্যাংলার মত তাকাবে না।

কিন্তু ফরাসী-ইংরেজ চায় না, আমরা খেয়ে-পরে বাঁচি। তারা বোঝে না, রুশ বিশ্বশান্তির কত বড় দুশমন। তাই যুদ্ধ করলো তারা। আমি যুদ্ধ করিনি।

এবং এই ফ্রান্স, ব্রিটন ও মার্কিনের পিছনে রয়েছে বিশ্ব ইহুদি সম্প্রদায়। আমি যেদিন (জানুয়ারি ১৯৩৩) জর্মনির কর্ণধার হলুম সেদিন থেকেই ইহুদিরা আমার ও জর্মনির বিনাশ চেষ্টায় তৎপর হয়ে উঠলো। আমিও তাদের একাধিকবার স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলুম, তারা যদি জর্মনকে নিধন করার জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আহ্বান করে তবে আমি তাদের সমূলে নির্মূল করবো। বেদরদ হৃদয়ে। মানুষ যেরকম ছারপোকা মারার সময় দয়া-মৈত্রীর কথা ভাবে না।

(ন্যুরনবের্গ মকদ্দমায় গ্যোরিঙ, কাইটেল, রিবেনট্রপ ও অধুনা আইসম্যান যখন বলেন ইহুদি-নিধন ইত্যাদি ব্যাপারে স্বয়ং হিটলার সম্পূর্ণ স্বাধীন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন, তখন তাঁরা কণামাত্র অতিরঞ্জন করেননি।)

যুদ্ধের কারণ সম্বন্ধে হিটলারের এইটেই মোটামুটি বক্তব্য।

দুনিয়ার কুল্লে অশান্তি, বিশ্ব-জোড়া লড়াই এ সব-কিছুর জন্য একমাত্র ইহুদি সম্প্রদায়ই দায়ী—এ কথা একমাত্র গোঁড়া নাৎসি ভিন্ন কেউ স্বীকার করবে না, (অবশ্য আরবরা প্যালেস্টাইন হারিয়ে যাওয়ার ফলে করতে পারে, কিন্তু তাদের সরকারও ইহুদিদের আপন ভিন্ন ভিন্ন আরব রাষ্ট্র থেকে ব্যাপকভাবে তাড়াবার চেষ্টা করেনি—নিধন করার তো কথাই ওঠে না) কিন্তু আমাদের মনে তবু প্রশ্ন জাগে, সত্যই ইহুদিরা কতখানি শক্তি ধরে, বিশ্বযুদ্ধের জন্য তারা কতখানি দায়ী? আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস-এর সদুত্তর কেউ কখনও পাবে না—উপস্থিত শুধু এইটুকু বলতে পারি সুদ্ধমাত্র টাকার জোরে প্যালেস্টাইনের মত একটা রাজ্যস্থাপনা করা ইহুদি ভিন্ন আর কেউ কখনও করতে পারেনি।

এখানে আরেকটি অপেক্ষাকৃত সামান্য ব্যাপারের উল্লেখ করি।

সকলেরই বিশ্বাস ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ম্যুনিকে ফরাসী-ইংরেজ যখন অকাতরচিত্তে

www.BanglaBook.org

চেকোশ্লোভাকিয়ার অংশবিশেষ হিটলারের হাতে তুলে দেন, তখন এদের মান-মর্যাদা উচ্ছন্ন যায়, এবং হিটলারের পরিপূর্ণ বিজয় ও বিশ্বজোড়া আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ হয়। এই জয়ে গোটা জর্মনির জনসাধারণ তখন এমনি উল্লসিত, হিটলারের জয়গানে এমনি মুখরিত যে জর্মনির ভিতরে যেসব জর্মন হিটলারের পতনের গোপন ষড়যন্ত্র করছিলেন তাঁরা পর্যন্ত নিরাশ হয়ে তাঁদের চক্রান্ত কিছুদিনের জন্য মুলতুবী রাখেন।

এই ম্যুনিক-ব্যাপারে হিটলারের মত কি?

তিনি খাপ্পা হয়ে বলেছেন :

'সেই কট্টর ক্যাপিটালিস্ট বুর্জুয়া চেম্বারলিন যখন তার ভণ্ডামির ছাতাখানা নিয়ে সর্ব তকলীফ বরদাস্ত করে সেই সুদূর বের্গহফে (হিটলারের নিবাস) হিটলারের মত হঠাৎ-নবাবের (আপস্টার্ট) সঙ্গে পরামর্শ করতে এল, তখন সে বিলক্ষণ জানতো যে তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আমাদের বিরুদ্ধে নির্মম যুদ্ধ চালানো। আমার সন্দেহ মোচনের জন্য সে তখন যা খুশি তাই বলবার জন্য তৈরী। বের্গহফে আসার তখন তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, কোনও গতিকে সময় পাওয়া (অর্থাৎ যুদ্ধটা মুলতুবী করা)। আমাদের তখন উচিত ছিল ১৯৩৮-এই যুদ্ধ আরম্ভ করে দেওয়া। কিন্তু তারা (চেম্বারলেন সম্প্রদায়)—সেই নির্বীর্য কাপুরুষের দল—আমরা তখন যা চাইলুম তাই দিতে লাগলো। এ অবস্থায় গায়ে পড়ে যুদ্ধ আরম্ভ করা যায় কি প্রকারে (অর্থাৎ জর্মনির জনসাধারণ বলতো ইংরেজ ফরাসী যখন আমাদের সব খাঁই-ই মিটিয়ে দিচ্ছে তখন আমরা খামকা লড়াই করতে যাব কেন)? তাই আমরা ম্যুনিকে অতি সহজ ও দ্রুত লড়াই জেতার সুযোগ হারালুম। যদিও আমরা তখন যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলুম না, তবু শত্রুর চেয়ে বেশী প্রস্তুতি আমাদের ছিল। ১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বরেই আমাদের পক্ষে প্রশস্ততম সময় ছিল।'

মুসসোলীনির মধ্যস্থতায় যে ম্যুনিকপর্ব সমাধান হয়েছিল সে কথার উল্লেখ হিটলার করেননি। এস্থলে আরেকটি কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য—১৯৩৯-এ হিটলার পোলান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধারম্ভের পূর্বে বলেন, 'আশা করি এবারে আবার হঠাৎ কোনও বদমায়েশ (শুয়াইন-হুন্ট) ম্যুনিকের মত শেষ মুহূর্তে এসে সব-কিছু না ভণ্ডুল করে দেয়।'

এবারে শেষ প্রশ্ন।

যুদ্ধ হারার জন্য তিনি কাকে দায়ী করলেন?

ইতিপূর্বেই আমাদের জানা ছিল, ন্যুরেনবের্গের মকদ্দমার সময় যে-সব দলিল-পত্র পেশ করা হয় তাতে হিটলারের উইলটিও ছিল। এ উইলের সত্যতা সম্বন্ধে শত্রু-মিত্র কেউই কোনও প্রকারের সন্দেহ প্রকাশ করেননি। এটি তিনি তৈরী করেন আত্মহত্যা করার কয়েক ঘণ্টা পূর্বে। জর্মনির জনসাধারণের উদ্দেশ্যে এটি লিখিত।

এ উইলে হিটলার নৌসেনার প্রশংসা করেছেন (বস্তুত তিনি মৃত্যুর পূর্বে নৌবহরের বড় কর্তাকেই তাঁর পদে বসিয়ে যাবার জন্য অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, এবং সবচেয়ে বিস্মিত হয়েছিলেন নাকি বড় কর্তা স্বয়ং) যে বিমান বহরের অকৃতকার্যতার জন্য অন্তত অংশত তাঁকে পরাজয় মানতে হল তারও প্রশংসা করেছেন এবং স্পষ্ট ভাষায় নিন্দা করেছেন তাঁর 'ব্লিৎসক্রীগ' করনেওলা ল্যান্ড-আর্মির জেনারেল ফীল্ড্-মার্শালদের। সাধারণ সৈনিকের উচ্চ প্রশংসা তিনি করেছেন, কিন্তু তাঁর সর্ব ক্রোধ আর্মি আপিসারদের উপর।

www.BanglaBook.org

তারাই তাঁর সর্বনাশ করেছে। তারা তাঁর হুকুম অমান্য করেছে। তারা প্রতিক্ষণে পরাজয় মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছে। তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পদে পদে সপ্রমাণ করেছে, তারা যেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ লড়ছে। অর্থাৎ নূতন যুগে নূতন লড়াইয়ে যে নূতন কায়দায় লড়তে হবে সেটা তারা আদপেই বুঝতে পারেনি।

হিটলারের যদি সুকুমার রায় পড়া থাকতো তবে নিশ্চয়ই বলতেন, এ যেন 'ছায়ার সঙ্গে কুস্তি করে গাত্রে হল ব্যথা!' সোজা বাংলায়, জাঁদরেলরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ছায়ার সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লড়েছেন!

তা হলে প্রশ্ন : পোলান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যান্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে সম্পূর্ণ জয় করে মস্কোর চৌকাট পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল কারা? ওই জেনারেলরাই তো!

তবে?

১৯৫১।

হিটলার

এই গত রবিবারের 'আনন্দবাজারে'ই দেখি, আমাদের শিবুদা হিটলারকে নিয়ে একখানা 'পান্' ছেড়েছেন। 'হের হিটলার নাকি নিজের গোঁফ কামিয়ে ছদ্মবেশে বহাল তবিয়েতে আর্জেন্টিনায় বিরাজ করছেন।' এর উপর শিবুদার 'পান্'—'তাঁর গোঁ গেছে, এখন গোঁফও গেল।'[১]

আমি কিন্তু পানটার দিকে নজর দিচ্ছি না। আমার নজর ঐ তত্ত্ব কথাটির দিকে যে হিটলার এখনও বেঁচে আছেন।

সত্যি নাকি?

আমি এবার জর্মনিতে বেশী লোককে এ প্রশ্ন শুধোইনি। তার কারণ আমি নিজে যখন নিঃসংশয় যে হিটলার বেঁচে নেই তখন এ বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে আমার লাভ কি? যে দু-একজনকে শুধিয়েছিলাম তারাও নিঃসংশয়—বেঁচে নেই।

তা হলে প্রশ্ন, তিনি যে বেঁচে আছেন এ-গুজবের উৎপত্তি কোথায়?

হিটলার মারা যাওয়ার মাস তিনেক পর বার্লিনের কাছে শহর পৎসদামে মিত্রশক্তির এক বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে নাকি স্তালিন বলেন, তাঁর বিশ্বাস, হিটলার মারা যাননি, গা-ঢাকা দিয়ে আছেন। এর কিছুদিন পর রাশান এনসাইক্লোপীডিয়ার নূতন সংস্করণের প্রকাশ

---

১ হিটলার গোঁফ কামালেই যে তাঁর পক্ষে সেইটেই সর্বশ্রেষ্ঠ ছদ্মবেশ এই নিয়ে ১৯৩৩-৩৪ই একটি কাঁচা রসিকতা চালু ছিল। একদা হিটলার গ্যোরিঙ, গ্যোবেলস ও র‍্যোম ছদ্মবেশে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া ঠাহর করার জন্য বেরোলেন। হিটলার গোঁফ কামালেন, গ্যোরিঙ সিভিল ড্রেস পরলেন, গ্যোবেলস কথা বন্ধ করে দিলেন ও র‍্যোম একটি প্রিয়দর্শন তরুণী সঙ্গে নিলেন। এস্থলে বলে দেওয়া প্রয়োজন গ্যোরিঙ বড্ড বেশী য়ুনিফর্ম ভালোবাসতেন, গ্যোবেলস প্রপাগান্ডা চীফ বলে সমস্তক্ষণ বকর বকর করতেন আর র‍্যোম সমরতিগামী অর্থাৎ হোমোসেকসুয়েল ছিলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয় এবং তাতে বলা হয়, হিটলার অদৃশ্য হয়েছেন—তিনি যে মারা গেছেন এ-কথা রুশ কর্তৃপক্ষ সরকারীভাবে অস্বীকার করলেন। ইতিপূর্বে দুনিয়ার সর্বত্র কত রকমের যে গুজব রটল তার ইয়ত্তা নেই। আর্জেন্টাইন সউদী আরব কোনও জায়গাই বাদ পড়লো না, যেখানে হিটলার নেই। এমন কি এক কাষ্ঠরসিক প্রকাশ করলেন, তিনি প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের মাঝখানে বিরাজ করছেন! সে যুগে স্পুটনিক জাতীয় কোনও কিছু আবিষ্কৃত হয়নি। না হলে হয়তো বলা হত, তিনি চন্দ্রলোকে বাস করছেন। তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। চন্দ্রের লাতিন নাম লুনারিস—যা থেকে লুনাটিক—উন্মাদ শব্দটা এসেছে এবং অনেকেই বিশ্বাস করেন যে পরাজয়ের চরম অবস্থায় হিটলার নাকি উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন—তবে বদ্ধ উন্মাদ নয়, মুক্ত উন্মাদ। তাই আপন আদি বাসভূমে চলে গেছেন।

তা সে যাই হোক, ইংরেজ ভাবলে, হিটলারকে নিয়ে পৃথিবীতে না এক নূতন লীজেন্ড সৃষ্টি হয়—১৯১৮ সালে জর্মনিতে যে-রকম এক লীজেন্ড চালু হয় যে জর্মন সৈন্যবাহিনী যুদ্ধে হারেনি, ঘরশত্রু বিভীষণ (অর্থাৎ ইহুদি, সোশাল ডেমোক্রেট, কম্যুনিস্ট—যার যাকে অপছন্দ) যদি তার 'পিছন থেকে পিঠে ছোরা' না মারতো। হিটলার স্বয়ং এ লীজেন্ডের প্রচুরতম 'সদ্ব্যবহার' করেন। ইংরেজের তাই ভয় হল, হিটলারকে কেন্দ্র করে নয়া এক লীজেন্ড যেন সৃষ্ট না হয় যার জোরে এক নব-নাৎসি আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে খাড়া হয়ে ওঠে। অতএব উত্তমরূপে তদন্ত করা হোক, হিটলার বেঁচে আছে কি নেই।

এ কাজের ভার এক অতিশয় যোগ্য ব্যক্তির উপর পড়ে। ট্রেভার রোপার সাহেব খুব সম্ভব অক্সফোর্ডের অধ্যাপক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি সেনাবাহিনীর ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ বা গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করতেন।

দীর্ঘদিন ধরে অতি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তিনি তদন্ত চালান। সেই তদন্তের রিপোর্ট পাঠক পাবেন তাঁর লেখা 'লাস্ট ডেজ অব হিটলার' পুস্তকে। অতি উপাদেয় সে পুস্তক। এক দিক দিয়ে খাঁটি ঐতিহাসিকের মত প্রতিটি ঘটনা প্রতিটি সাক্ষীর বক্তব্য তিনি যাচাই করেছেন অতিশয় সন্তর্পণে, অন্য দিক দিয়ে তিনি সে সব তথ্য পরিবেশন করেছেন প্রকৃত ক্রিয়েটিভ আর্টিস্টের মত সরল ভাষায়, মনোরম শৈলীতে। পাঠকের কৌতূহল বাড়িয়ে বাড়িয়ে তাকে কি করে উৎকণ্ঠিত উদ্‌গ্রীব অবস্থায় পৌঁছিয়ে সর্বশেষে সর্বাঙ্গসুন্দর সমাপ্তিতে রসসৃষ্টি করতে হয়, ঐতিহাসিক হয়েও ট্রেভার রোপার এই কৌশলটি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে নিয়েছেন। বস্তুত এরকম রোমাঞ্চকর পুস্তক আমার জীবন অল্পই পড়েছি।

কোনও কোনও অরসিক অবশ্য বলেছেন, বইখানা লুরিড, অর্থাৎ রগরগে, কিংবা বলতে পারেন, পুস্তকে বীভৎস রসের প্রাধান্য। এটা অবশ্য রুচির কথা, তবে আমার বিশ্বাস, বিষয়বস্তু নিজের থেকেই তার রসরূপ নির্ণয় করে। প্রকৃত ক্রিয়েটিভ আর্টিস্ট সে-স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়। সে যেন নিতান্ত মিডিয়াম ভিন্ন অন্য কিছু নয়। রানী চন্দ যেভাবে ঘরোয়া লিখেছেন। এস্থলে অবশ্য অবণ ঠাকুরের স্থলে ঘটনা-প্রবাহই তার রসরূপ নির্ণয় করে দিয়েছে।

তৎসত্ত্বেও বহুতর লোক বিশ্বাস করতে নারাজ হলেন যে, হিটলার গত হয়েছেন। এঁরা যে সব আপত্তি তুললেন, ট্রেভার রোপার তাঁর বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে সেগুলোকে দফে দফে হালুয়া করে ছেড়েছেন। ভদ্রলোক ব্যঙ্গ করতেও জানেন। তাঁর বক্তব্য অনেকটা এই : শীতকালে যখন য়ুরোপের লোক গরম জায়গায় যেতে চায় তখন দেখা হয়ে গেল

www.BanglaBook.org

যাঁরা—এঁদের অধিকাংশই খবরের কাগজের রিপোর্টার—ট্রেভার রোপারের রায়ে সায় দিচ্ছেন না, তাঁরা বলছেন হিটলারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে আর্জেন্টিনায়, এবং গ্রীষ্মকালে বলেন, তাঁর খোঁজ পাওয়া গিয়েছে (গ্রীষ্মে শীতল, মনোরম) সুইটজারল্যান্ডে! ট্রেভার রোপার বলেননি, কিন্তু ইঙ্গিত করেছেন,—অতএব পত্রিকার পয়সায় শীতে গরম জায়গা এবং গরমে শীত জায়গায় দিব্য কয়েকটা দিন পরমানন্দে কেটে গেল।

তবে এ-কথা বলা যেতে পারে যে, বইখানাকে কেউ সিরিয়াসলি চ্যালেঞ্জ করেননি। এবং ট্রেভার রোপার তাঁর সর্বশেষ শিরোপা পেলেন রাশার কাছ থেকে। হালে রাশান এন্‌সাইক্লোপীডিয়ার যে নূতন সংস্করণ বেরিয়েছে তাতে বলা হয়েছে হিটলার মৃত।

শুধু এই বই নয়, হিটলারের সঙ্গে যাঁরা তাঁর 'বুংকারে' (বোমারু বিমানের বোমা থেকে আত্মরক্ষার্থে নির্মিত ভূগর্ভস্থ আশ্রয়গৃহ) শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ছিলেন তাঁদের জীবিতজন মাত্রই পরবর্তীকালে বই লিখেছেন, বিবৃতি দিয়েছেন অথবা খবরের কাগজে মাসিক প্রবন্ধাদি লিখেছেন। এঁদের সকলে মিলে একজোট হয়ে হিটলারের মৃত্যুর একটা মিথ্যা কাহিনী রচনা করে নানা ঘড়েল পুলিস, রিপোর্টার ইত্যাদির ক্রস এগজামিনেশনে পাস করে এখনও সেটা আঁকড়ে ধরে আছেন—এটা অবিশ্বাস্য। আরও নানাবিধ আছে এবং ট্রেভার রোপার সেগুলো সবিস্তার আলোচনা করছেন। হালে শায়রার (Shirer) নামক একজন মার্কিন কর্তৃক লিখিত হিটলারের রাজত্ব সম্বন্ধে বিরাট একখানা বই বেরিয়েছে এবং ইতিমধ্যে তার জর্মন অনুবাদও হয়ে গিয়েছে। বইখানা মোটের উপর ভালোই। কিন্তু ওভার-সিম্‌প্লিফিকেশনের দোষে দুষ্ট। শায়রার ও হিটলারের অন্যান্য জীবনী-লেখকগণও ঐক্যনাদে স্বীকার করেন, হিটলার মৃত।

কিন্তু হিটলার জীবিত না মৃত সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা এই, জর্মন জনগণ হিটলার সম্বন্ধে কি ভাবে, আবার যদি অন্য রঙ ধরে আরেক হিটলার দেখা দেন তবে সে তার অধুনালব্ধ গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা বর্জন করে পুনরায় গড্ডলিকাস্রোত বওয়াবে কিনা? এবং ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত সে যে এক বিরাট অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে গেল সে সম্বন্ধে তার মতামত কি?

যাদের বয়েস পঁচিশ-ত্রিশের চেয়ে কম তাদের জিজ্ঞেস করে কোনও লাভ নেই, কারণ যুদ্ধের বিভীষিকা তাদের কারও কারও কিছুটা মনে আছে বটে, কিন্তু হিটলারের চিন্তাধারা কর্মপদ্ধতি আপন বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করার মত বয়েস তাদের তখনও হয়নি। যাদের বয়েস তাদের চেয়ে বেশী তারা একদম চুপ; কোনও কিছু বলতে চায় না। এবং যে ভয়ে মুখ খোলে না তা নয়, কারণ আমি যাদের চিনি তাদের অধিকাংশই ছিলেন সোশাল ডিমোক্রেট, কিংবা ক্যাথলিক সেন্টার (আজ আডেনাওয়ার যার দলপতি) এবং হিটলার-বৈরী। ১৯৩৭/৩৮-এ বরঞ্চ এঁরা ফিসফিস করে আমার কানে কানে হিটলার-রাজ্যের তীব্রতম নিন্দা করেছেন। কিন্তু আজ আর কোনও জর্মনই অতীত নিয়ে আলোচনা করতে চায় না। এ যেন একটা দুঃস্বপ্নের মত কেটে গিয়েছে, এটাকে নিয়ে আর আলোচনা করে লাভ কি?

আমার কোনও পাঁড় নাৎসি বন্ধু ছিল না, একজন মোলায়েম নাৎসির সঙ্গে বেশ কিছুটা হৃদ্যতা হয়েছিল। তার সন্ধান পেলুম না। তার আমার দুজনার অন্য এক বন্ধু বললে—খুব সম্ভব মারা গিয়েছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তবু আমি প্রাচীন পরিচয়ের একাধিক জর্মন মিলিত হলে কথার মোড় ঐদিকে ঘোরাতুম। তাতে কোন লাভ হত না। পাঁচ মিনিটের ভিতর সবাই যুদ্ধ বাবদে আপন আপন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে শুরু করত। তাতে আর যা হোক, হিটলার দর্শনের উপর নূতন কোনও আলোকপাত হত না।

একদা যারা কট্টর নাৎসি ছিল তাদের বৃহৎ অংশ নিশ্চয়ই নাৎসিবাদ ত্যাগ করেছে কিন্তু বেশ কিছু নাৎসি এখনও গোপনে ঘাপটি মেরে বসে আছে চিন্তার জগতে : বাইরে অবশ্য আর পাঁচজনের মত তারাও দরকার হলে হিটলারের নিন্দা করে, কারণ নাৎসি-উইচ-হান্টিং অর্থাৎ ডি-নাৎসিফিকেশন এখনও শেষ হয়নি (এই তো মাস তিনেক পূর্বে ইয়োরোপ-বিখ্যাত এক শহরপ্ল্যানার জর্মনকে ধরা হয়েছে—সে নাকি ১৯৪৫ সালে প্রায় ত্রিশজন ইটালিয়ান মজুরকে গুলি করে মারার আদেশ দেয়)।[১] এরা পুনরায় এক নূতন হিটলারের পিছনে জড়ো হবে সে সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আমার মনে হয়, গুরুবাদ জিনিসটা একবার শিকড় গাড়লে সমূলে সম্পূর্ণ বিনাশ পায় না—হিটলারকে জর্মনি যেভাবে পূজা করেছে, আমাদের চরম কর্তাভজারাও এতখানি করেনি।

উপস্থিত এদের কথাও কেউ শুনবে না—অবশ্য সাহস তাদের এখনও হয়নি, হতে হতে বেশ কিছুদিন লাগবে। কারণ জর্মনি এখনও অবসন্ন। রাজনৈতিক উত্তেজনা তার যথেষ্ট হয়ে গিয়েছে।

নব-হিটলার

আত্তিলা, চেঙ্গিস, নাদির যখন রক্তের বন্যায় পৃথিবী ভাসিয়ে দিয়েছেন তখন অসহায় মানবসন্তান কাতরকণ্ঠে রুদ্রকে স্মরণ করে তাঁর দক্ষিণ মুখের কামনা করেছে, কিংবা হয়তো ভগবানকে অভিসম্পাত দিয়েছে। কিন্তু সাহস করে এ আশা করতে পারেনি, ভবিষ্যতের আত্তিলা-নাদিরকে ঠেকানো যায় কি প্রকারে?

আজ কিন্তু মানুষের চিন্তা, এমন কী ব্যবস্থা করা যেতে পারে যাতে করে আবার যেন আরেকটা হিটলার দেখা না দিতে পারে? কারণ এই 'সুসভ্য' বিংশ শতাব্দীতে হিটলার যে রক্তপাত করে গেলেন, তার সামনে খুব সম্ভব চেঙ্গিস নাদির হার মানেন। তাই আমি

---

১ ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে জর্মনিতে একটি কেন্দ্রীয় বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। এর একমাত্র কাজ পাঁড় নাৎসিদের ধরে সাজা দেওয়া। এর পূর্বে জর্মনির ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সেখানকার সাধারণ বিচারালয়ে এদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চলতো। এদের প্রধান অসুবিধা, যুদ্ধ শেষ হওয়ার কয়েক মাস পূর্বে থেকেই ঘড়েল নাৎসিরা 'খাঁটি', 'অকৃত্রিম' সরকারী পাসপোর্ট জাল নামে তৈরী করিয়ে নেয়। এবং এখন আপন বাসভূমি থেকে—জর্মনিতেই গা-ঢাকা দিয়ে বসবাস করছে। দ্বিতীয় অসুবিধা : একাধিক পরদেশী রাষ্ট্র তাদের দেশে আশ্রয়প্রাপ্ত নাৎসিদের ধরে ধরে জর্মনিকে ফেরত দেয় না।

হালে জর্মনির বেতার কেন্দ্রের প্রশ্নে এই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের চীফ জাস্টিস বলেন, এই প্রতিষ্ঠান কবে গুটনো হবে তার স্থিরতা নেই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যে হিটলার নিয়ে আলোচনা করি সেটা কিছু একাডেমিক ইন্‌ট্রেসট্ নয়—অর্থাৎ 'অমাবস্যার অন্ধকার অঙ্গনে অন্ধের অনুপস্থিত অসিত অশ্বডিম্বের অনুসন্ধান,'[১]—সমস্যাটা শত লক্ষ্য নিরীহ মানুষের জীবনমরণ নিয়ে!

হিটলারকে আমি যে বিশেষ করে বেছে নিয়েছি তার দুটি কারণ আছে। প্রথমত তিনি এমন সব কীর্তিকর্ম করে গেছেন যা আত্তিলা চেঙ্গিসের পক্ষে সম্ভব হয়নি। (সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে বোধ হয় রুদ্রের 'নবমাবতার' হিটলারের পর 'দশমাবতার' চীনের গোকুলে বাড়ছেন—নেফার সংবাদ থেকে আমার এই অনুমানটি হয়েছে।) এখানে সামান্য একটি উদাহরণ দি। পাঠককে আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—অপরাধ নেবেন না—এটা অন্ধের অশ্বডিম্বের অনুসন্ধান নয়। চেঙ্গিস-নাদির যখন কোনও শহর দখল করে পাইকারী কচু-কাটার হুকুম দিতেন তখন দেখা যেত তাঁদের সৈন্যরা তলোয়ার দিয়ে যুবা-বৃদ্ধ-শিশুর গলা কেটে কেটে শেষটায় হয়রান হয়ে গিয়ে ক্ষান্ত দিত, শুধু তাই নয়, যুদ্ধের উত্তেজনাহীন আপন-জীবনমরণ-সমস্যাবিহীন এরকম একটানা কচুকাটা কেটে কেটে তাদের এক অদ্ভুত মানসিক অবসাদ দেখা যেত, যার ফলে নিষ্ঠুর রক্তপিপাসু—পিপাসারও তো একটা সীমা আছে—বর্বরও নিস্তেজ হয়ে যেত। এ তত্ত্বটি বুঝতে হিটলারের বেশী সময় লাগেনি। হিটলার, হিমলার, হাইড্রিষ...আইস্‌ম্যান[২] গোড়ার থেকে লক্ষ্য করলেন যদিও বাছাই বাছাই ব্ল্যাক-কোট পল্টনের পর-পীড়ন-উল্লাসী (স্যাডিস্ট)-দের উপর ভার দেওয়া হয়েছিল বালবৃদ্ধবনিতা ইহুদিদের গুলি করে মারার—তারাও শেষ পর্যন্ত মানসিক অবসাদের স্নায়বিক জটিলতায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়! তখন হিটলার হিমলার বের করলেন এক নয়া কল—যে কল চেঙ্গিস-নাদিরের পক্ষে আবিষ্কার করা সম্ভব ছিল না, কারণ সে যুগে বিজ্ঞান তার বাল্যাবস্থায়। বিরাট একখানা এ্যারটাইট ঘরে ইহুদিদের ঢুকিয়ে দিয়ে ছাতের উপর থেকে ভেন্টিলেটারপনা ছিদ্র দিয়ে ছোট্ট একটিন বিষে-ঠাসা গ্যাস ফেলে দেওয়া হত—দশ মিনিটেই ঘরের সব-কুছ বিলকুল ঠাণ্ডা। এতে করে যে গ্যাসের টিনটা ফেলল তার কোনও মারাত্মক স্নায়বিক 'ঝামেলা' হওয়ার কথা নয়।

হালে আইস্‌ম্যান সম্বন্ধে একখানা বাঙলা বই পড়েছিলুম। তাতে লেখক বলেছেন, পাঁচ লক্ষ ইহুদির প্রাণহরণের হিটলার সম্প্রদায় দায়ী। পাঁচ লাখ নয়, হবে পঞ্চাশ লাখ। ফাইভ মিলিয়ন পাঁচ লাখ নয়। হয়তো লেখক আশ্চর্য হয়ে ভেবেছেন, পঞ্চাশ লাখ কি করে হয়—এত অসংখ্য লোক মেরে ফেলা অসম্ভব—পাঁচ লাখই হবে। আমরাও আশ্চর্য হই। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। একাধিক সহানুভূতিশীল এবং একাধিক

---

১ আমার শব্দগুলো ঠিক মনে নেই তবে শোপেনহাওয়ার দর্শনচর্চার বর্ণনা দিতে গিয়ে বোধ হয় মোটামুটি এই বলেছেন :

The search of a blind man in a dark night for a black cat—which is not there.

২ পাঠক ভাববেন না, পরবর্তী যুগে ইহুদিরা আর কাউকে না পেয়ে চুনোপুঁটি আইস্‌ম্যানকে বলির পাঁঠা (স্কেপ-গোট্) বানিয়ে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত করেছিল। ১৯৫৪-৫৫ সালে যখন আইস্‌ম্যান দক্ষিণ আমেরিকায় অজ্ঞাতবাসে তখন জর্মন এন্‌সাইক্লোপীডিয়ার ইহুদি অনুচ্ছেদে তাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। গ্রন্থকর্তাগণ অবশ্য যদি জানতেন যে আইস্‌ম্যান তখনও জীবিত তা হলে হয়তো নামটা উল্লেখ করার আগে আরেকবার চিন্তা করে নিতেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিরপেক্ষ জন বহু গবেষণার পর যে-সব গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন তার থেকে দেখা যায়, আমেরিকার প্রকাশিত হিসেবে পঞ্চাশ লক্ষ আটাত্তর হাজার, প্যারিসের হিসেবে পঞ্চাশ লক্ষ ত্রিশ হাজার, লন্ডনের হিসেবে চল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার। অন্য আরেক হিসেবে পঞ্চাশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার। নাৎসিরা যে-সব কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলতে পারেনি সেগুলো ন্যুরনবের্গের মকদ্দমায় মিত্রপক্ষ পেশ করেন। সেগুলো থেকে অনায়াসে চল্লিশ লক্ষের হিসেবে পৌঁছনো যায় (আত্মহত্যা, অনাচার ও অকালরোগে যারা মরেছে তাদের হিসেব এতে বা অন্যান্য হিসেবে ধরা হয়নি)।

তাই আমি হিটলারকেই বেছে নিয়েছি। আমাদের সম্মুখে প্রশ্ন—এই বিরাট নরমেধ যজ্ঞ কি আবার অনুষ্ঠিত হতে পারে? কিংবা বিরাটতর?—এটম বমে যখন হাত বাড়ন্ত নয়? সে সম্ভাবনা যদি থাকে তবে আগেভাগে সময় থাকতে এমন কোনও এক কিংবা একাধিক ব্যবস্থা তার বিরুদ্ধে কি গ্রহণ করা যায়?

চোখের সামনেই তো দেখতে পাচ্ছি, আরেক হিটলার খাড়া হয়ে উঠেছেন। এবং ইনি হিটলারেরও বাড়া। হিটলার মেরেছেন প্রধানত ইহুদিদের এবং শেষের দিকে যুদ্ধে পরাজয়ের বিভীষিকার সম্মুখীন হয়ে হন্যে হয়ে গিয়ে জর্মন জাতকে—১৩/১৪ বছরের বালকরাও বাদ যায়নি—পাঠিয়েছেন রণক্ষেত্রে, জয়ের আশা যখন সমূলে নির্মূল হয়ে গিয়েছে তখনও। আর এক চৈনিক নব হিটলার গোড়ার থেকেই পাঠাচ্ছেন লক্ষ লক্ষ চীনা যুবককে লস্ অব ম্যান পাওয়ারের কোন চিন্তা বিবেচনা না করে। আমাদের অফিসাররাই বলেছেন, ওরা নেমে আসে একেবারে পিঁপড়ের মত। অফটার অল্ হাউ মেনি আর ইউ গোয়িং টু কিল্, হাউ মেনি ক্যান ইউ কিল্! আমি শুনেছি কোরিয়াতেও চীনেরা এইভাবে নেমে এসেছিল। শুনেছি প্রথম সারির হাতে বন্দুক থাকে, দ্বিতীয় সারির হাতে তাও না। শত্রুপক্ষ প্রথম সারিকে কচুকাটা (মো ডাউন—আমি শব্দার্থে 'কচুকাটা' বলছি, কারণ এদের ফ্রন্ট লাইনে পাঠানো হয়েছে, শুধু বন্দুক দিয়ে মেশিনগানের মোকাবেলা করতে, তাতে করে সামান্য একটি ঘাঁটি দখল করতে কত হাজার আপন সৈন্য অযথা মারা গেল বিলকুল তার কোনও পরওয়া না করে) করে ফেললে দ্বিতীয় সারি সেই সব বন্দুক তুলে নিয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে কচুকাটা হয়। কোরিয়াতে নাকি একটা সুরক্ষিত ঘাঁটি থেকে শ'তিনেক মার্কিন সেপাই—এখানেও মেশিনগান বনাম রাইফেল—চীনাদের কচুকাটা করতে করতে শেষটায় তাদের প্রায় নার্ভাস ব্রেকডাউন হতে চললে কমান্ডার আদেশ দেন, ঘাঁটি ত্যাগ করে পিছনে হটে যেতে। অর্থাৎ যেখানে লস্ অব ম্যানপাওয়ার সম্বন্ধে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যুযুধান নব-হিটলার অগ্রসর হতে চান সেখানে তাঁর উপস্থিত জয় হবে, কিন্তু আখেরে সমূলস্তু বিনশ্যতি—কিন্তু অগণিত আপনজন ও বিস্তর পরজনকে মৃত্যু, অনাহার, মহামারীর কবলে তুলে ধরে ও বহু বহু গৃহে শোকের ঝঞ্ঝা বইয়ে দিয়ে।

হিটলারের একাধিক সেনানায়ক শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করার পর বলেন, 'যেদিন আমি স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করলুম, লস্ অব জর্মন মেনপাওয়ার হিটলার আর হিসেবে নেন না, সেদিন থেকেই আমি আত্মসমর্পণের চিন্তা আরম্ভ করি।' স্তালিনগ্রাদে পাউলুস তাই করেছিলেন—যদিও হিটলারের কড়া হুকুম ছিল কচুকাটা হয়ে মরার। স্পেব কলকারখানা, পুল ধ্বংস করতে নারাজ হয়েছিলেন ও মোডেলের মত একাধিক সেনানায়ক আত্মহত্যা বরণ করেন।

www.BanglaBook.org

মৃত্যুর আটাশদিন পূর্বে হিটলার কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী করেন। চীন যে একদিন মারমূর্তি ধারণ করবে সেটা তিনি জানতেন। তবে ভারতবর্ষ আক্রমণ করবে এ তত্ত্বটা তাঁর জানা ছিল না। তিনি বলেছিলেন—From the point of view of both justice and history they (চীনারা) will have exactly the same arguments, or lack of arguments to support their invasion of the American continent as had the Europeans in the sixteenth century. Their vast and undernourished masses will confer on them the sole right that history recognizes—the right of starving people to assuage their hunger provided always that their claim is well-backed by force.

হিটলারের এই শেষ ভবিষ্যদ্বাণী। এরপর তিনি কিছু বলে থাকলে সেটা আমাদের কাছে পৌঁছয়নি।

হিটলারের সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ একমত নই। তিনি মনে করেছিলেন, রুশ এবং মার্কিনে লড়াই লাগবে। ফলে আমেরিকা ছারখার হবে। তখন চীনারা সে দেশ দখল করবে। সেই দখল করার ভিতর অন্যায় বা অধর্ম কিছু নেই। কারণ ইতিহাস মাত্র একটি সত্য স্বীকার করে—ক্ষুধিত পঙ্গপালের মত যে জনসমাজ কাতর সে যত্রতত্র বেদখলী করে ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করার হক্ক ধরে।

অর্থাৎ হিটলারের মতে ইতিহাস ধর্ম এবং অধর্মের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করে না। আমরা করি। শাস্ত্রে আছে—

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

অধর্ম দ্বারা বুদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া যায়, মঙ্গল দেখা যায়, শত্রু (সপত্ন = প্রতিদ্বন্দ্বী, সপত্নী এরই স্ত্রীলিঙ্গ এবং বাঙলায় চলিত) পরাজিত হয়, কিন্তু সমূলে বিনাশ পেতে হয়।

এই তত্ত্বকথাটি অভিজ্ঞতাপ্রসূত—আ পস্তেরিয়োরি—এবং অভিজ্ঞতা থেকে নীতিসূত্র বের করা ইতিহাসের কর্ম, অথবা ইতিহাসের দর্শন (ফিলজফি অব হিস্ট্রী) এটি করে।

হিটলার ফ্রান্স হল্যান্ড ইত্যাদি এমন কি রুশের বহুলাংশ জয় করতে ভদ্র, মঙ্গল দেখেছিলেন, সপত্নগণকে পরাভূত করেছিলেন, কিন্তু বিনাশ যখন এল তখন সেটা সর্বস্ব সমূলে উৎপাটন করলো।

এর আরেকটি গৌণ অর্থ আছে। আমরা যে ছোটখাটো পাপ-অবিচার করে থাকি তার জন্য এই পৃথিবীতেই অল্পস্বল্প সাজা পাই—কারণ আমরা হিটলার কিংবা মাই সায়েবের মত ডাঙর প্রাণী নই। আমাদের বিনাশ সমূলে হয় না। কিন্তু ওদের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা।

ভারতবর্ষের ইতিহাস আদ্যন্ত গৌরবময় নাও হতে পারে, কিন্তু আমরা ক্ষুধার তাড়নায় বা অন্য কোনও কারণেই স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়ে পররাজ্য আক্রমণ করিনি।

বড়া হিটলার, ছোটা হিটলারের ডরাবার কারণ নেই।

কিন্তু বারুদ শুকনো রাখতে হবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এ রকম ধন-দৌলতের ছড়াছড়ি আমি এ-জীবনে কখনও দেখিনি।

ত্রিশ-বত্রিশ বছর ধরে ইয়োরোপ যাওয়া-আসা করছি। সব-কিছু দেখেশুনে মনে হয়েছে, ধনদৌলত এবং তার বণ্টন-ব্যবস্থা সুইটজারল্যান্ডেই সব চেয়ে ভালো। ১৯২৯/৩০ সালের কথাই ধরুন। ইংলন্ডের তখন প্রচুর কলনি, বিস্তর দৌলত বিদেশ থেকে আসছে। সুইটজারল্যান্ডের কলনি নেই; সে পয়সা কামায় মালপত্র রপ্তানি করে। কিন্তু ইংলন্ড বেশী ধনী হওয়া সত্ত্বেও তার সে ধনের অনেকখানি চলে যায় গুটিকয়েক পরিবারের হাতে, কিন্তু সুইটজারল্যান্ডে সে ধনের ভাগ-বাঁটোয়ারা হয় অনেক বেশী ধর্মানুমোদিতরূপে। সে-দেশেও লক্ষপতি কোটিপতি আছে, কিন্তু দেশের অধিকাংশ ধনের হিস্যা পায় আপামর জনসাধারণ।

ফ্রান্স খুব ধনী দেশ নয়। কিন্তু সন্তুষ্ট, পরিতৃপ্ত দেশ।

আর জর্মনি যেন জুয়াড়ীর দেশ। কখনও তার সামনে হুদোহুদো টাকা আর কখনও সে লাটে উঠি-উঠি করছে। কখনও রেস্তোরাঁকাবারে গমগম করছে, কখনও রাস্তায় রাস্তায় মেয়ে-মদ্দ কাজের সন্ধানে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এমনই যখন তার দুর্দিন প্রায় চরমে, তখন, ১৯২৯ সালে, প্রথম আমি জর্মনি যাই। তার দুরবস্থা চোখে পড়ল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষ্য করলুম যে, এরা একদিন রীতিমত ধনী ছিল। ঘরের আসবাবপত্র সেই প্রাচীন দিনের খানদানী মজবুত চালে তৈরী এবং রুচিসঙ্গত। ওয়ালপেপার পর্দা, টেবলক্লথ পুরানো হয়ে এসেছে বটে কিন্তু স্পষ্ট দেখা যায় এগুলো দামী এবং একদা এরা বিদেশীর চোখ ঝলসে দিয়েছে। ১৯২৯-এ কিন্তু রিপুকর্মের পালা।

আর ১৯৬২তে দেখি—দাঁড়ান একটা গল্প মনে পড়ে গেল।

বাঙলায় যখন বলি, 'অমুক কাকের ছানা কিনেছে'—তার অর্থ সে দু'হাতে পয়সা ওড়াচ্ছে। জর্মনে বলা হয়, সে জানালা দিয়ে পয়সা ছুঁড়ছে।

এ দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী সম্বন্ধে নানা রকমের আহাম্মুখের কেচ্ছা শুনতে পাওয়া যায়। জর্মন ভাষাভাষী দেশগুলোতে আহাম্মুখের রাজার নাম পল্‌ডি।

ল্যান্ডলেডির সঙ্গে রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে পল্‌ডি দেখে এক দুদিনের চ্যাংড়া ছোকরা জব্বর দামী একখানা স্পোর্টস মোটর হাঁকিয়ে যাচ্ছে। পল্‌ডি শুধোলে, 'কে ও?' ল্যান্ডলেডি বললে, 'রেখে দিন ওর কথা। বাপ মরেছে। ছোকরা লটার টাকা পেয়েছে। এখন জানলা দিয়ে পয়সা ছুঁড়ছে।'

পল্‌ডি বেজায় উত্তেজিত হয়ে বার বার শুধোয়, 'কোথায় থাকে সে? ঠিকানা কি?'

এবারে জর্মন গিয়ে দেখি, সবাই জানলা দিয়ে টাকা ছুঁড়ছে। কুড়োবার লোক নেই।

এইটুকু বললেই যথেষ্ট, জর্মনির কুত্রাচ কোনো রেল স্টেশনে আর পোর্টার, মুটে নামক নিরতিশয় প্রয়োজনীয় প্রাণীটি নেই। আমারই চোখের সামনে আমারই আড়াই-মণী ইয়া লাস ভাতিজা নামল এক ঢাউস সুটকেস নিয়ে। মুটে নদারদ্। ওপারে যেতে হবে

www.BanglaBook.org

ওভারব্রিজের উপর দিয়ে। বাবাজী সুটকেস টানছে আর বলছে, 'দুটো সুটকেসে ভাগাভাগি করে নিয়ে এলে তবু না হয় ব্যালান্‌স্‌ড হয়ে চলতে পারতুম।' বাবাজী ওপারে যখন পৌঁছলেন তখন পিঠের ঘাম কোটের বাইরে চলে এসেছে—হামবুর্গে সে সন্ধ্যায় টেম্পারেচার ছিল পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মাঝামাঝি। ধকল কাটাতে বাবাজীকে খেতে হয়েছিল তিন লিটার বিয়ার। অবশ্য জর্মনিতে বিয়ার সস্তা।

আর দাসী-চাকরাণী? তবে শুনুন।

সবসুদ্ধ আটটি পরিবারে ডিনার লাঞ্চের নিমন্ত্রণ খেয়েছি—কারও বাড়িতে দাসী দূরে থাক, একটি হেলপিং হ্যান্ডও দেখতে পাইনি। কেন নেই, সেই প্রশ্ন শুধোলে পর আমার অধ্যাপকের বিধবা বললেন, মেড্? তা রাখা যায় বই কি। চার শ পাঁচ শ টাকা মাইনে। তাঁকে একখানা ঘর দিতে হবে—রেডিয়োটা অবশ্য তিনি নিজেই আনবেন। সিনেমায় ক'দিন যাবেন, ছুটি ক'দিন দিতেই হবে সেটাও আগেভাগে ঠিক করে নেওয়া হবে, পাকাপোক্ত। তারপর তিনি নেমে এলেন ঘরের কাজে—নখে ঝাঁ-চকচকে নেলপালিশ, এইমাত্র লাগানো হয়েছে, এখনও পেন্টের গন্ধ বেরুচ্ছে। তাই কাজ করেন অতি সন্তর্পণে, পাছে বার্নিশে জখম লাগে। খানিকক্ষণ বাদে দেখবে তিনি নেই। বীবী আপন কামরায় গেছেন সিগারেট খেতে। সেটা দিনে ক'বার হয়, না হয়, সে তোমার কপাল! তার উপর মোটা দড় কাজ তিনি করবেন না—যেমন মনে করো জানালার শার্সিগুলো জল দিয়ে ধুয়ে পোঁছা। তার জন্যে সপ্তাহে একবার করে তোমাকে অন্য লোক আনতে হবে। কি হবে অত সব বয়নাক্কার ভিতর গিয়ে!

* * *

ট্যাক্সিওয়ালাকে শুধোলুম,'ওটা কি হে?' দেখি হামবুর্গের মত শহরে—যেখানে কিনা প্রতি ইঞ্চি জমি মহামূল্যবান—সেখানে এক জায়গায় হাজারখানেক মোটর গাড়ি দাঁড়িয়ে।

বললে, 'সেকেন্ড-হ্যান্ড কার্। একটা কিনবেন? মাত্র হাজার থেকে আরম্ভ। গত বছর, জোর আগের বছরের মডেল। টিপ্‌টিপ্ কন্ডিশন। ট্যাঙ্ক পেট্রলে ভর্তি। দুটি কথা কইবেন সাঁ করে তেড়ে হেঁকে বেরিয়ে যাবেন।'

বলতে না বলতে সে ঢুকে গেছে ঐ মোটরের মেলায়। ওর কথা ঠিক। গাড়িগুলো যেন কাল-পরশু কেনা। আমি শুধোলুম, 'তা গাড়িগুলো এই খোলা-মেলায় জলঝড় খাচ্ছে?'

বললে, 'ঐ তো, স্যর, রগড়। হামবুর্গে গাড়ি পাবেন সহজে—গারাজ পাবেন খুব যদি কপালের জোর থাকে।' তারপর শুধোলে, 'আপনার দেশে হাল কি রকম?'

আমি বললুম, 'আমাদের দেশের অনেক লোক পূর্বজন্মে বিশ্বাস করে।' —পূর্ব-জন্মটা কি চীজ্ সেটা তাকে বুঝিয়ে বলতে হল। শেষ করলুম এই বলে, 'সেই পূর্ব-জন্মে যদি অশেষ পুণ্য করে থাকো, তবে এ-জন্মে তোমার কপালে মোটর থাকলে থাকতেও পারে। মোটরই যখন নেই তখন গারাজের তো কথাই ওঠে না।'

পরের ঘটনা, কিন্তু এই সুবাদে বলে ফেলি। এর কিছুদিন পর গিয়েছি সেই বন্ শহরে যেখানে ছাত্রজীবনের কয়েক বৎসর কাটিয়েছিলুম। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে যেতে দেখি, সামনে অগুনতি মোটর। আমার সতীর্থ—এখন নামজাদা স্নিস্টার—সঙ্গে ছিল। শুধোলুম, পরবটরব আছে নাকি রে? হ্যার আডেনাওয়ার এলেন নাকি? তিনি না কাছে-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পিঠে কোথায় যেন থাকেন?

শুধোল, 'কেন?'

'ঐ যে অত মটোর গাড়ি।'

'সে তো স্টুডেন্টদের।'

বলে কি! ত্রিশ-বত্রিশ বছর পূর্বে বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ'তিনেক অধ্যাপকদের ক'জনার মোটর গাড়ি আছে আমরা আঙুলে বলতে পারতুম। আর আজ!

হামবুর্গে ফিরে যাই।

আমার এক প্রবীণ বন্ধু ছিলেন আমার চেয়ে বছর পনেরো বড়। তিনি যুদ্ধের পর গত হন। উঠেছিলুম তাঁরই বিধবার বাড়িতে। তাঁরই এক মেয়ে কথায় কথায় বললে, 'জানেন, আজকাল এ দেশে অনেক ছেলেমেয়ে স্টুডেন্ট থাকাকালীনই বিয়ে করে ফেলে। কর্তাগিন্নী চললেন মোটর হাঁকিয়ে কলেজে—যেমন মনে করুন মেডিকেল কলেজ। পিছনের সীটে একটি বাচ্চা, কোলে আরেকটি। কলেজে পৌঁছে ছোটটি রাখলেন ধাইয়ের জিম্মায়, অর্থাৎ ক্রেশে। বড়টা গেল বাগানে খেলতে।'

ওদের খেলার জন্য নাকি স্পেশাল বাগান আছে। সত্যি আছে কিনা সেটা আমি চেক্ আপ্ করার সুযোগ পাইনি। তবে এ-কথা সত্য, এখন বেশ-কিছু ছেলেমেয়ে পাঠ্যাবস্থাতেই বিয়ে করে।

বললুম, 'আগে তো এরকম ছিল না, এখনই বা হল কি করে?'

বললে, 'আগে বাপ-মায়ের এত টাকা ছিল কোথায় যে ছেলেকে বলবে "তুই বিয়ে কর্। নাতি পোষার পয়সা আমার আছে।" আমিও বলি, সেই যখন বিয়ে করবেই একদিন তখন শুকিয়ে শুকিয়ে পুঁইডাঁটাটি হয়ে যাবার কি প্রয়োজন?'

আমার মনে পড়ল এক বিয়েতে স্বর্গতা ইন্দিরা দেবী একটা জোয়ান ছোকরাকে বললেন, 'দেখ দিকিনি, ছেলেটা কি রকম বুদ্ধিমানের মত বিয়ে করে ফেলল। তোরা যে পিত্তি না চটিয়ে খেতে পারিস্ নে।'

কিন্তু এস্থলে বলে রাখা ভালো, জর্মনিতে কোনও ছেলেই বিয়ে করে বউ নিয়ে বাপের সঙ্গে থাকে না—ভিন্ন বাসা বাঁধে।

অতএব বাপ দুটো সংসার পুষবে। এন্তের টাকা না থাকলে পারে কেডা?

কিন্তু ইতিমধ্যে আমার মাথার ভিতর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। তবে কি এই ভারতবর্ষে বাল্যবিবাহে আমরা পৌঁচেছিলুম এই পদ্ধতিতেই—ধাপে ধাপে? কারণ জানি, অতি প্রাচীন যুগে এদেশে বাল্যবিবাহ ছিল না। তারপর বোধ হয় হঠাৎ একদিন ধনদৌলত বেড়ে যায়—আজ যে-রকম জর্মনিতে। তখন আমরাও ছেলেছোকরাদের বিয়ে দিতে লাগলুম, তারা নিজের পায়ে দাঁড়াবার পূর্বেই। আস্তে আস্তে, ধাপে ধাপে করে গৌরীদান!

এ পৃথিবীতে নূতন কিছুই নেই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দশের মুখ খুদার তবল

ইংরেজ খায় জব্বর একখানা ব্রেকফাস্ট। শুধু তাই নয়, অনেক ইংরেজ ঘুম থেকে উঠে বেড-টীর সঙ্গে খায় একটি কলা কিংবা আপেল এবং একখানা বিস্কুট।

তারপর ব্রেকফাস্ট। দীর্ঘ সে ভোজন; আমি সংক্ষেপে সারি। যদি সে ইংরেজ ঈষৎ মার্কিন-ঘেঁষা হয়, তবে সে আরম্ভ করবে গ্রেপ ফুট দিয়ে। তারপর খাবে পরিজ কিংবা কর্নফ্লেক, মেশাবে এক জগ্ দুধের সঙ্গে, কেউ কেউ আবার তার সঙ্গে দেবে চাকতি-চাকতি কলা এবং চিনি। ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়ে যাবে তবলা বাদ্য, অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে টোস্ট-মাখন খাওয়া। শেষ সময় পর্যন্ত এই তবলা বাদ্য বন্ধ হবে না। তারপর ভোজন-রসিক খাবেন কিপারস (মাছ) ভাজা—অনেকটা লোনা ইলিশের ফালির মত—তারপর খাবেন এ্যাব্বড়া এ্যাব্বড়া দুটো আণ্ডা ফ্রাই (আকারে এ-দেশী চারটে ডিমের সাইজ) তৎসহযোগে বেকন—আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, টোস্ট-মাখনের তবলা কখনও বন্ধ হবে না—এবং এর পর টেনে আনবে মার্মলেডের বোতল। খাবে নিদেন আরও খানচারেক টোস্ট ঐ মার্মলেড সহ। এবং চা কিংবা কফি তো আছেই। বাপ্স!

ফরাসী-জর্মন ব্রেকফাস্টে খায় যৎসামান্য রুটি মাখন আর কফি। খানদানী ফরাসী মাখনও খায় না—বলে, ফরাসী রুটির যে আপন উত্তম সোয়াদ আছে সেটা মাখনের স্পর্শে বরবাদ হয়ে যায়।

লাঞ্চের বেলা ইংরেজ খায় যৎকিঞ্চিৎ। ফরাসী-জর্মন করে গুরুভোজন।

রাত্রিবেলা ইংরেজ করে গুরুভোজন। জর্মন খায় অত্যল্প। রুটির সঙ্গে সসিজ, কিংবা চীজ এবং ফিকে পানসে চা। যা সব খাবে সাকুল্যে মালই ঠাণ্ডা, শুধু চা-টাই গরম।

এবারে গিয়ে দেখি হইহই রইহই কাণ্ড ডিনারের বেলায়ও। অবশ্য সবকিছুই ঠাণ্ডা খাওয়ার ঐতিহ্য সে এখনো ছাড়েনি।

এবারে দেখি পাঁচ রকমের সসিজ, তিন রকমের চীজ এবং ট্যুবের খাদ্যের ছড়াছড়ি। আমরা যে রকম ট্যুব থেকে টুথপেস্ট বের করি, এরা তেমনি বের করতে থাকে কোনও ট্যুব থেকে মাস্টার্ড, কোনওটা থেকে টমাটো সস, কোনওটা থেকে মাছের পেস্ট। শুনেছি, দেখিনি, মাংসের পেস্ট ভর্তি ট্যুবও হয়। কোনও জিনিসের অভাব নেই। দামের পরোয়া করো না, যত পার খাও।

রাস্তায়ও দেখি, আগে যে রাস্তায় ছিল একখানা খাদ্যদ্রব্যের দোকান (লেবেন্স্ মিটেল গেশেফ্ট্—কলোনিয়াল ভারেন) এখন সেখানে চারখানা। কারও বাড়িতে যাওয়া মাত্রই সে কোনও কথা না বলেই বের করে উত্তম রাইন মজেল (ওক্ রেনিশ) তাজা বিয়ার—ইস্তেক স্কচ্ হুইস্কি, মার্কিন সিগারেট।

বড় আনন্দ হল এসব দেখে—থাক না বেচারীরা প্রাণভরে। এই সে সেভন ডেজ ওয়ান্ডার—তিনদিনের ভেল্কিবাজি—এ যে কখন বিনা নোটিসে বন্ধ হয়ে যাবে কে জানে। অতএব খাও-দাও ফুর্তি করো। হেসে নাও, দুদিন বই তো নয়।

www.BanglaBook.org

এ তত্ত্বটি জর্মনরাও বিলক্ষণ জানে।

হামবুর্গে আমি যে পাড়ায় থাকতুম সেটা শহরতলীতে। অন্যত্র যেমন, এখানেও পাড়ার 'পাব'টি ঐ অঞ্চলের সামাজিক কেন্দ্রভূমি। দেশের লোকে কি ভাবে, কি বলে, পাবে না গিয়ে জানার উপায় নেই। গুণীজ্ঞানীরা কি ভাবেন, সেটা জানা যায় অনায়াসে—বই, খবরের কাগজ পড়ে। কিন্তু পাবের গাহকরা গুণী-জ্ঞানী নয়; তারা বই লেখে না, লেকচার ঝাড়ে না। অথচ এরাই দেশের মেরুদণ্ড।

এখানে কায়দাম ফিক একে অন্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় না। পাশের লোকটির সঙ্গে গালগল্প জুড়ে দিলুম।

বললুম, 'যুদ্ধের পর ঠিক এই যে প্রথম এলুম তা নয়। বছর দুই পূর্বে এসেছিলুম মাত্র দুদিনের তরে। কোনও একটা পাবে যাবার ফুরসৎ পর্যন্ত হয় নি। এবারে তার শোধ নেব।'

শুধোল, 'কিরকম লাগছে পরিবর্তনটা?'

আমি বললুম, 'অবিশ্বাস্য! এত ধন-দৌলত যে কোনও জাতের হতে পারে, আমি কল্পনাও করতে পারিনি।'

লোকটি হেসে বললে, 'তা তোমরাও তো এককালে খুব ধনী ছিলে। সেদিন আমি খবরের কাগজে একটা ব্যঙ্গ-চিত্র দেখছিলুম তোমাদের তাজমহলের সামনে দাঁড়িয়ে এক মার্কিন টুরিস্ট তার স্ত্রীকে বলছে, ফ্যান্‌সি! এসব জিনিস তারা এমেরিকান "এড্" ছাড়াই তৈরী করেছিল।'

আমি বললুম, 'রাজরাজড়া ধনী ছিলেন নিশ্চয়ই—আজ যেরকম সউদী আরব, কুয়েৎ, বাহরেনে শেখরা জলের মত টাকা ওড়ায়—কিন্তু আর পাঁচজনের সচ্ছলতা কি রকম ছিল অতখানি আমি জানি নে।'

আমাদের কথায় বাধা পড়লো। দেখি এক বৃদ্ধ আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে বিয়ারের গেলাস, পরনে মোটামুটি ভালো স্যুটই, তবে ফিটফাট বলা চলে না। ফিসফিস করে যেভাবে কথা আরম্ভ করলে তাতে মনে হল, এখনও বুঝি নাৎসি যুগের গেস্তাপো গোয়েন্দার বিভীষিকা সম্পূর্ণ লোপ পায়নি। নাঃ, আমারই ভুল। হামবুর্গে যখন বেধড়ক বোমা ফেলে তখন কি জানি কি করে তার গলার সুর বদলে যায়। এ তত্ত্বটা জানা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তার ফিসফিসিনিতে বলা কথাগুলো কেমন যেন উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রে উচ্চারিত নিদারুণ ভবিষ্যদ্বাণী বলে মনে হচ্ছিল।

ডান হাত তুলে ধরে গেলাস দিয়ে জানলার দিকে নির্দেশ করে শুধোলে, 'কি দেখছ?'

আমি বললুম, 'এস্তের মোটর গাড়ি।'

আবার সেই ফিসফিস। বললে, 'এদের কজন সত্যি সত্যি মোটর পুষতে পারে জানো? শতেকে গোটেক। তোমার দেশের কথা বলছিলে না, রাজরাজড়ারা ধনী ছিল বাদবাকিদের কথা বলতে পারছো না। এখানেও তাই। এই যে মোটর দাবড়ে বেড়াচ্ছেন বাবুরা, এঁদের ক'জন মোটরের পুরো দাম শোধ করেছেন কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু আমি জানি, সব ইন্‌স্টল্‌মেন্টের ব্যাপার। জী লেবেন য়্যুবার ঈরে ফেরহেল্টনসে—দে আর লিভিং বিঅন্ড দেয়ার মীনস্—আনে সিকি, ওড়ায় টাকা।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি বললুম, 'সেকথা বললে চলবে কেন? কট্টর অবজেকটিভ বিচারেও বলা যায়, তোমাদের ধনদৌলত বিস্তর বেড়েছে।'

বুড়ো অসহিষ্ণু হয়ে বললে, 'কে বলেছে ধনদৌলত বাড়েনি। বেড়েছে নিশ্চয়ই। আলবৎ বেড়েছে। কিন্তু প্রথম কথা, যা বেড়েছে তার তুলনায় খরচ করছে অনেক বেশী। এবং দ্বিতীয় কথা, এ ধনদৌলতের পাকা ভিত নেই। ১৯১২-১৯১৪-এ আমাদের যে ধনদৌলত ছিল তার ছিল পাকা বুনিয়াদ।'

আমি বললুম, 'তাতেই বা কি ফায়দা হল? ইনফ্লেশন এসে সে পাকা বুনিয়াদও তো ঝুরঝুরে করে দিয়ে চলে গেল।'

বুড়ো শুধু মাথা নাড়ে আর বার বার বলে, 'জী লেবেন য়্যুবার ঈরে ফেরহেল্টনিসে, জী লেবেন য়্যুবার ঈরে ফেরহেল্টনিসে—কামায় সিকি, ওড়ায় টাকা।'

বুড়ো আমাদের ছেড়ে বারের দিকে এগোলো খালি গেলাস পূর্ণ করার জন্য।

আমি যার সঙ্গে প্রথম কথা আরম্ভ করেছিলুম, সে এতক্ষণ হাঁ-না কিছুই বলে নি। এবারে নিজের গেলাসের দিকে তাকিয়ে বললে, 'বুড়োর কথা একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নয়। তবে তুমি যে এই ইনফ্লেশনের কথা তুললে না, সেইটেই হচ্ছে আসল ভয়। ইনফ্লেশনের বন্যা এসে একদিন সব-কিছু ভাসিয়ে দিয়ে চলে যায়, তারই ভয়ে সবাই টাকা খরচ করছে দু'হাতে। এমন কি যে কড়ি এখনো কামানো হয়নি সেটাও ওড়াচ্ছে।'

আমি বললুম, 'যে কড়ি এখনও কামানো হয়নি, সেটা ওড়াবে কি করে?' তারপর বললুম, 'ওঃ! বুঝেছি! ধার করে!'

বললে, 'ঠিক ধার করে নয়। কারণ ধার করলে সে পয়সা একদিন না একদিন ফেরত দিতে হয়। না দিলে পাওনাদার বাড়ি ক্রোক করে। কিন্তু ইন্‌স্টল্‌মেন্টের কেনা জিনিসে সে ভয়ও নেই। বড় জোর যে জিনিসটা কিনেছে সেটা ফেরত নিয়ে যাবে।'

ইতিমধ্যেই সেই ফিসফিস-গলা বুড়ো ফিরে এসেছে। বললে, 'টাকা ধার পর্যন্ত নেওয়া যায়। আমি রোক্কা টাকার কথা বলছি, ইন্‌স্টল্‌মেন্টের কথা হচ্ছে না। টাকা শোধ না দিলে যদি ক্রেক করতে আসে, তবে লাটে তুলবে কি? বাড়ির তাবৎ জিনিসই তো ইন্‌স্টল্‌মেন্টে কেনা। সেগুলো তো ক্রোক করা যায় না।'

আমি বুড়োকে বললুম, 'আপনি সব-কিছু বড্ড বেশী কালো চশমার ভিতর দিয়ে দেখছেন।'

বুড়ো বললে, 'আমি কি একা? আমাদের প্রধানমন্ত্রী আডেনাওয়ারও তো ঐ পরশু দিন দেশের লোককে সাবধান করে দিয়েছেন, "এ সুদিন বেশীদিন থাকবে না। হুঁশিয়ার, সাবধান!" পড়োনি কাগজে?'

আমি বললুম, 'অতশত বুঝি নে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সবাই খাসা ফূর্তিতে আছে। ঐটেই হল বড় কথা।' তারপর যার সঙ্গে প্রথম কথা বলতে আরম্ভ করেছিলুম, তাকে শুধোলুম, 'তোমাদের শহরের মধ্যিখানে যে হাজার খানেক সেকেন্ড-হ্যান্ড কার ফর সেল্ দেখলুম, সেগুলো কি ইন্‌স্টল্‌মেন্টে কেনা ছিল, আর কিস্তি খেলাপ করেছে বলে বাজেয়াপ্ত হয়ে ঐখানে গিয়ে পৌঁছেছে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বললে, 'নিশ্চয়ই তার একটা বড় অংশ।' বুড়ো আবার মাথা দোলাতে দোলাতে বললে, 'তোমাকে বলিনি, জী লেবেন য়্যুবার ঈরে ফেরহেল্টনিসে! কামায় সিকি, ওড়ায় টাকা!'

* * *

সুবুদ্ধিমান পাঠককে সাবধান করে দিচ্ছি, আমি অর্থনীতি জানি নে, এসব মতামতের কতখানি ধোপে টেকে, বলতে পারবো না। আমি যা শুনেছি, সেইটেই রিপোর্ট করলুম। এবং আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, এসব 'পাবে' শুম্পেটার, কেইনস্ শাখ্ট্ আসেন না। আসে যেদো মেদো। কিন্তু ভুললে চলবে না, কথায় বলে, দশের মুখ খুদার তবল।

হাসির অ-আ, ক-খ

॥ এক ॥

হাসির অ-আ, ক-খ।

হাসির 'চুটকিলা' (উইট্, হিউমার এনেকডোট) নিয়ে যে-সব সঙ্কলন বেরোয়, সেগুলো বেশীরভাগ আপনার আমার মত সাধারণ জনই করে থাকে। অবশ্য এদের নির্মাতারা, অর্থাৎ যারা সব উইট্ বা রসিকতা প্রথম পাঁচজনকে হাসিয়ে কিংবা একজনকে চটিয়ে আর পাঁচজনকে হাসিয়ে নির্মাণ করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই ওয়াইল্ডের মত বিখ্যাত সাহিত্যিক, কিংবা হুইল্লারের মত চিত্রকর নন। আবার এ কথাও অতি সত্য যে, বেশীরভাগ চুটকিলাই অতি সাধারণ জনই করে থাকে—সাহিত্যে, কাব্যে, দর্শনে, এমন কি সমাজেও তাঁরা বিখ্যাত নন। পাড়ার চায়ের দোকানে যে-লোক রসিয়ে গল্প বলে, কারও কথার উত্তরে হাসির জবাব দিয়ে আর পাঁচজনকে হাসিয়ে মারে, সে-লোকটি দোকানের বাইরে হয়তো কোনও কিছুতেই সার্থক হয়নি—হয়তো বা পাড়ার মুরুব্বী তাকে "বিশ্ব-বকাটে" পদবী দিয়ে বসে আছেন, কারণ চায়ের দোকান থেকে ছেলের মারফৎ খু গৃহিণী তার কয়েকটি রসিকতা তাঁর কানে এসে পৌঁছেছে, এবং হয়তো বা তাঁরই মত দু-একটি মুরুব্বীকে নিয়েই।

অথচ পৃথিবীর অধিকাংশ চুটকিলা নির্মাণ করেছে এরাই। লোকমুখে ঘুরে ফিরে এ-দেশ ও-দেশ হয়ে হয়ে বিশ্বময় এরা ছড়িয়ে পড়ে। বরঞ্চ ওরই মত যে লোকসঙ্গীত মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে, তাদেরও নির্মাতার সন্ধান কোনও কোনও স্থলে পাওয়া যায়, কিন্তু এদের বৃহৎ অংশের মূল অনুসন্ধান কেউ করে না, কারও কোনও লাভও নেই।

লোকসঙ্গীত, রূপকথার মত এই সব হাসির চুটকিলার সৃষ্টিকর্তা প্রধানত জনগণ। অবশ্য গুণী, জ্ঞানী, রসিক সাহিত্যিকরাও এতে আপন আপন মৃদুহাস্য, অট্টাহাস্য, বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ মিশিয়ে দিয়েছেন।

তা ছাড়া এমন সব ঘটনাও ঘটে, যা দেখে বা শুনে মনে হাস্যরসের উদ্রেক হয়। যারা ঘটনাটা দেখলো বা শুনলো, তাদের কারও একজনের সামান্যতম রসবোধ থাকলে এবং

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে ঘটনাটি 'ব্রডকাস্ট' করলেই হল। যেমন আইনস্টাইনের গৃহিণী ছিলেন অতিশয় সরলা নারী।[১] কী-এক পরব উপলক্ষে, স্বামী অসুস্থ বলে, তিনি নিমন্ত্রিত হয়ে একা গেছেন আমেরিকার বিশাল এক ল্যাবরেটরিতে। সেখানে দৈত্য-দানবের মত ভীষণদর্শন বিরাট বিরাট যন্ত্রপাতি। বিমূঢ়ের মত এটা-সেটা দেখতে দেখতে একজন কর্তাব্যক্তিকে তিনি শুধোলেন, 'এগুলো—এগুলো দিয়ে কি হয়?' কর্তাব্যক্তি বিগলিত হয়ে সুমধুর মৃদুহাস্য হেসে মুরুব্বীর সুরে বললেন, 'কেন ম্যাডাম, এই সব যন্ত্রপাতি দিয়েই তো আপনার স্বনামধন্য স্বামীর থিয়োরি সব সপ্রমাণ করা হয়।' ম্যাডাম তো 'দশ হাত বরফপানিমে'। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'কিন্তু—কিন্তু আমার স্বামী তো এসব টোকেন পুরনো খামের উল্টো দিকে।'

এ গল্প বানানোর ভিতর কারও কোনও কেরদানী নেই।

এই রকম দুনিয়ার যত রকমের হাস্যরসের উপাদান থাকতে পারে, তারই একটি সঙ্কলন প্রকাশ করেছেন জর্মনির এক উত্তম সাহিত্যিক। পূর্বেই বলেছি, সাধারণত এরকম সঙ্কলন করে থাকেন আপনার আমার মত সাধারণ জন, তাই সঙ্কলনগুলো অসাধারণ হয় না। এটা অবশ্য একটা paradox. পূর্বে যখন বলেছি, পৃথিবীর বেশীর ভাগ চুটকিলাই নির্মাণ করে সাধারণ জন, তখন তার সঙ্কলন করবে সাধারণ জন—এ তো বাঙলা কথা। কিন্তু এইখানেই প্যারাডক্স্। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মধু তার নিজ মূল্য নাহি জানে।" এক ইরানী কবিও বলেছেন, 'যে-শুক্তি মুক্তার জন্ম দিয়েছে আপন প্রাণরস দিয়ে, সে-শুক্তিকে তো মুক্তার মূল্য বিচারের সময় ডাকা হয় না—ডাকা হয় জহুরীকে।' কিংবা বলতে পারি, নেপোলিয়নের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনী যে তাঁর জননীই লিখবেন, এমন কোনও কথা নয়।

বর্তমান পুস্তকের নাম, 'আ বে ৎসে ডেস লাখেনসা',—হাসির অ-আ ক-খ (এক্স ওয়াই জেড—যদি কখনও বেরোয়, তবে 'দেশে'র পাঠককে জানাব।) লেখকের নাম জিগিসমুন্ট ফন্ রাডেকি। ল্যাট্‌ভিয়ার রাজধানী রিগা শহরে এঁর জন্ম ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে। পড়াশুনা করেন সেন্ট পিটার্সবুর্গে, পরে এঞ্জিনীয়ারিং পাস করে জর্মনিতে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়টা কাটান তুর্কিস্থানে এঞ্জিনীয়ার রূপেই। সাহিত্য-রস কিন্তু বরাবর ছিল। ওদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বার্লিনে আসার পর তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে অভিনেতা চিত্রকর এবং সাহিত্যিকরূপে। উত্তম ইংরেজী জানেন। জি. কে. চেস্টারটনের ইনি পরম ভক্ত এবং হিলের বেলকের উৎকৃষ্ট জর্মন অনুবাদ তিনি করেছেন—যদিও জর্মনিতে অনুবাদকরূপে তাঁর সর্বোত্তম খ্যাতি রুশ ঔপন্যাসিক গগলের বই জর্মনে তর্জমা করার ফলে।

এঁর জীবনীকার বলেন, রাডেকির বীণায় প্রচুর কোমল এবং অতিকোমল। তার প্রতিটি ধ্বনিতে তত্ত্ব-দার্শনিকের ক্ষীণ মধুর স্মিতহাস্য।

---

১ এঁর সরল হৃদয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথও আমাদের ছেলেবেলায় কিছু কিছু শুনিয়েছেন। বারান্তরে সে-কথা হবে।

www.BanglaBook.org

জর্মন, ফরাসী, রুশ, ইংরিজী তথা ইয়োরোপীয় ক্লাসিক্‌স্ নখাগ্রদর্পণে এবং বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন বলে বহু বৎসর ধরে সঞ্চিত এঁর সঙ্কলন হাসির 'অ-আ, ক-খ' সত্যিই যেন হাস্যরসের কনসার্ট। ব্যালাকত্তাল থেকে আরম্ভ করে ডুগডুগি পিয়ানো কোনও যন্ত্রই বাদ যায়নি।

পাঠক হয়তো অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। ভাবখানা, দু'একটা গল্পই শোনাও না। তার থেকেই তো এঁর পরিচয় পাওয়া যাবে। সেখানেই তো মুশকিল। আমার বিশ্বাস গোটা সঙ্কলনটি আপনি যদি পড়েন, তবে আপনি খুশী হবেন, যে-কোনও লোক খুশী হবে। কিন্তু আমি যেগুলো বাছাই করে দেব, সেগুলো আপনার পছন্দ না-ও হতে পারে। আপনার সঙ্কলন আমার পছন্দ না-ও হতে পারে। সঙ্কলনের সঙ্কলন বিপদসঙ্কুল। তবু চেষ্টা দিতে ক্ষতি নেই এবং গুণীরা যখন 'অরুন্ধতী ন্যায়ের' অর্থাৎ 'চেনা জিনিস থেকে অচেনা জিনিসে' যাবে বলে উপদেশ দিয়েছেন তখন আপনার আমার পরিচিত শার্লক হোমস্ দিয়েই বিসমিল্লা করি :

মরুভূমিতে শার্লক হোমস্ (অবশ্য আমার জানামতে হোমস্ কখনও কোনও মরুভূমিতে যাননি—বর্তমান লেখক)। ১৯১৭ সালের হেমন্তকাল। কয়েক মাস ধরে এক ইংরেজ রেজিমেন্ট প্যালেস্টাইনের দুরন্ত গরমে মরুভূমিতে থানা গেড়েছে। মদ্যাদি তো প্রায় নেই-ই, জলও কম, আর খাবার সময় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সেই এক কর্নড্ বীফ! শেষটায় এমন হল যে, শব্দটা শুনলেই জোয়ানদের বমি আসে।

এলেন এক সন্ধ্যায় এক নূতন অফিসার। রান্নাঘরে ঢুকে তদারক তদন্ত করছেন, যাকে বলে ইন্সপেকশন—শুঁকলেন, চাখলেন এবং সর্বশেষে অতিশয় বিজ্ঞের মত অভিমত প্রকাশ করে বললেন, 'হুম...আজ ডিনারে তা হলে কর্নড্ বীফ!'

জোয়ানদের সবাই চুপ—কেউ একটি রা-ও কাড়লে না। ছুঁচ পড়লেও শোনা যায়। শেষটায় এক কোণ থেকে কোন্ এক কক্‌নির ব্যঙ্গের গলা শোনা গেল, 'আ মরি! ওয়াটসন!'

একটু সূক্ষ্ম রসিকতা। এ যেন 'এ কথা বলার জন্যে তো ভূতের দরকার হয় না হুজুর।' আস্ত না হলেও ওয়াটসন যে একটি হাফ-গবেট ছিলেন, সেটা হোমস্‌পিয়াসীদের জানা। এটি প্রধানত তাঁদের জন্যই। আসছে বারে নিবেদন করব হরেকরকম্‌ই। পূর্বোক্ত আইনস্টাইন-গৃহিণীর গল্পটি রাডেকির সঙ্কলন থেকেই নেওয়া।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

॥ দুই ॥

সিগিসমুন্ট্ ফন রাডেকি তাঁর হাস্যরস সঙ্কলনের পুস্তিকায় একটি ক্ষুদ্র অবতরণিকা দিয়েছেন। সে অবতরণিকায় আর পাঁচজন মোকা-বেমোকা-উদাসীন জর্মনের মত তিনি পাণ্ডিত্য ফলাতে যাননি। জর্মনদের যে পাণ্ডিত্য ফলাবার ব্যামোটা আছে সে-বিষয়ে স্বয়ং জর্মনরাই সচেতন। ভিন্ন ভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা যেরকম হক্ক না-হক্ক গল্প বানাই—মারোয়াড়ীদের পয়সার লোভ, পূর্ববঙ্গবাসীদের খামোখা চটে যাওয়া নিয়ে—ইয়োরোপীয়েরাও সে রকম করে থাকে। গ্যোরিঙ যখন ন্যুরনবের্গ মোকদ্দমার জন্য সেখানকার হাজতে, তখন তিনি মার্কিন মনস্তত্ত্ববিদ্ ডাঃ কেলিকে নিম্নের চুটকিলাটি বলেন :

একজন ইংরেজ—একটা আস্ত ইডিয়ট। দুজন ইংরেজ একত্র হলে সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্লাবের পত্তন। তিনজন হলে নূতন এক সাম্রাজ্য জয়।

একজন ইতালিয়ান—উত্তম গাইয়ে। দুজন হলে ডুয়েট। তিনজন হলে রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন। (এটা যে কি রকম খাঁটি কথা সেটা গত বিশ্বযুদ্ধে বার বার সপ্রমাণ হয়েছে।)

একজন জর্মন, পণ্ডিত।[১] দুজন জর্মন—একটা রাজনৈতিক দল সৃষ্টি করে বসবে। তিনজন হলে যুদ্ধ ঘোষণা।

অন্যান্য জাতও গ্যোরিঙের গল্পে স্থান পেয়েছে কিন্তু সেগুলো নিয়ে উপস্থিত আমাদের প্রয়োজন নেই। তা সে যাই হোক, রাডেকি তাঁর অবতরণিকায় অহেতুক পাণ্ডিত্য ফলাননি।

'ইহ সংসারে আমাদের কত জিনিসেরই না অভাব, এবং তাই নিয়ে একমাত্র মানুষই রোদন করে কিন্তু ঐ অভাবের ক্ষতিপূরণ হিসাবে একমাত্র মানুষই হাসতে জানে। মানুষের যে দেহাতীত সত্তা আছে সে-ই আমাদের দেহ থেকে অশ্রুজল ঝরায় এবং সে-ই আমাদের দেহের দু পাশ এবং ভুঁড়ি দুলিয়ে হাসায়। কিন্তু এই পৃথিবীতে সে জিনিস কি, যা হাস্যকৌতুক রসের সৃষ্টি করে?'

প্রশ্ন শুধিয়ে উত্তরে রাডেকিই বলছেন, 'সব, সব কিছুই...। যেমন সব কিছুই কাঁদাতেও পারে। তারা, ফুল, পশুপক্ষী এদের নিজেদের সত্তা দিয়ে কৌতুকরস সৃষ্টি করে না, কিন্তু মানুষের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ামাত্রই এগুলো কৌতুকরসের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে—কারণ এই মানুষই বিশ্ব-সংসারের হাসি এবং কান্নার কেন্দ্র। কারণ এই মানুষ নির্মিত হয়েছে অর্ধেক পশু থেকে এবং অর্ধেক চৈতন্য দিয়ে। এই যে কাদামাটি আর

---

১ রবীন্দ্রনাথও প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন, 'জার্মান পণ্ডিতের কেতাবে তত্ত্বজ্ঞানের যে-সকল চরম সিদ্ধান্ত আছে তাহাকে ঔষধের বটিকা বলিতে পার কিন্তু মৌমাসিক শুশ্রূষা তাহার মধ্যে নাই।' এস্থলে সম্পূর্ণ অবান্তর নয় বলে উল্লেখ করি, রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে 'জর্মন' লিখতেন—যদিও এখানে 'জার্মান' লিখেছেন। হালে জনৈক পত্রলেখক 'জর্মন' লেখার জন্য আমাকে বিদ্রূপ করেছেন বলে এ-কথাটি বলতে হল। 'জর্মন' লেখার অন্য কারণও অবশ্য আছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জর্মন, ফরাসী, রুশ, ইংরিজী তথা ইয়োরোপীয় ক্লাসিক্‌স্ নখাগ্রদর্পণে এবং বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন বলে বহু বৎসর ধরে সঞ্চিত এঁর সঙ্কলন হাসির 'অ-আ, ক-খ' সত্যিই যেন হাস্যরসের কনসার্ট। ব্যালাকত্তাল থেকে আরম্ভ করে ডুগডুগি পিয়ানো কোনও যন্ত্রই বাদ যায়নি।

পাঠক হয়তো অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। ভাবখানা, দু'একটা গল্পই শোনাও না। তার থেকেই তো এঁর পরিচয় পাওয়া যাবে। সেখানেই তো মুশকিল। আমার বিশ্বাস গোটা সঙ্কলনটি আপনি যদি পড়েন, তবে আপনি খুশী হবেন, যে-কোনও লোক খুশী হবে। কিন্তু আমি যেগুলো বাছাই করে দেব, সেগুলো আপনার পছন্দ না-ও হতে পারে। আপনার সঙ্কলন আমার পছন্দ না-ও হতে পারে। সঙ্কলনের সঙ্কলন বিপদসঙ্কুল। তবু চেষ্টা দিতে ক্ষতি নেই এবং গুণীরা যখন 'অরুন্ধতী ন্যায়ের' অর্থাৎ 'চেনা জিনিস থেকে অচেনা জিনিসে' যাবে বলে উপদেশ দিয়েছেন তখন আপনার আমার পরিচিত শার্লক হোমস্ দিয়েই বিসমিল্লা করি :

মরুভূমিতে শার্লক হোমস্ (অবশ্য আমার জানামতে হোমস্ কখনও কোনও মরুভূমিতে যাননি—বর্তমান লেখক)। ১৯১৭ সালের হেমন্তকাল। কয়েক মাস ধরে এক ইংরেজ রেজিমেন্ট প্যালেস্টাইনের দুরন্ত গরমে মরুভূমিতে থানা গেড়েছে। মদ্যাদি তো প্রায় নেই-ই, জলও কম, আর খাবার সময় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সেই এক কর্নড্ বীফ! শেষটায় এমন হল যে, শব্দটা শুনলেই জোয়ানদের বমি আসে।

এলেন এক সন্ধ্যায় এক নূতন অফিসার। রান্নাঘরে ঢুকে তদারক তদন্ত করছেন, যাকে বলে ইন্সপেকশন—শুঁকলেন, চাখলেন এবং সর্বশেষে অতিশয় বিজ্ঞের মত অভিমত প্রকাশ করে বললেন, 'হুম...আজ ডিনারে তা হলে কর্নড্ বীফ!'

জোয়ানদের সবাই চুপ—কেউ একটি রা-ও কাড়লে না। ছুঁচ পড়লেও শোনা যায়। শেষটায় এক কোণ থেকে কোন্ এক কক্‌নির ব্যঙ্গের গলা শোনা গেল, 'আ মরি! ওয়াটসন!'

একটু সূক্ষ্ম রসিকতা। এ যেন 'এ কথা বলার জন্যে তো ভূতের দরকার হয় না হুজুর।' আস্ত না হলেও ওয়াটসন যে একটি হাফ-গবেট ছিলেন, সেটা হোমস্‌পিয়াসীদের জানা। এটি প্রধানত তাঁদের জন্যই। আসছে বারে নিবেদন করব হরেকরকুম্বা। পূর্বোক্ত আইনস্টাইন-গৃহিণীর গল্পটি রাডেকির সঙ্কলন থেকেই নেওয়া।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

॥ দুই ॥

সিগিসমুন্ট্ ফন রাডেকি তাঁর হাস্যরস সঙ্কলনের পুস্তিকায় একটি ক্ষুদ্র অবতরণিকা দিয়েছেন। সে অবতরণিকায় আর পাঁচজন মোকা-বেমোকা-উদাসীন জর্মনের মত তিনি পাণ্ডিত্য ফলাতে যাননি। জর্মনদের যে পাণ্ডিত্য ফলাবার ব্যামোটা আছে সে-বিষয়ে স্বয়ং জর্মনরাই সচেতন। ভিন্ন ভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা যেরকম হক্ক না-হক্ক গল্প বানাই—মারোয়াড়ীদের পয়সার লোভ, পূর্ববঙ্গবাসীদের খামোখা চটে যাওয়া নিয়ে—ইয়োরোপীয়েরাও সে রকম করে থাকে। গ্যোরিঙ যখন ন্যুরনবের্গ মোকদ্দমার জন্য সেখানকার হাজতে, তখন তিনি মার্কিন মনস্তত্ত্ববিদ্ ডাঃ কেলিকে নিম্নের চুটকিলাটি বলেন :

একজন ইংরেজ—একটা আস্ত ইডিয়ট। দুজন ইংরেজ একত্র হলে সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্লাবের পত্তন। তিনজন হলে নূতন এক সাম্রাজ্য জয়।

একজন ইতালিয়ান—উত্তম গাইয়ে। দুজন হলে ডুয়েট। তিনজন হলে রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন। (এটা যে কি রকম খাঁটি কথা সেটা গত বিশ্বযুদ্ধে বার বার সপ্রমাণ হয়েছে।)

একজন জর্মন, পণ্ডিত।[১] দুজন জর্মন—একটা রাজনৈতিক দল সৃষ্টি করে বসবে। তিনজন হলে যুদ্ধ ঘোষণা।

অন্যান্য জাতও গ্যোরিঙের গল্পে স্থান পেয়েছে কিন্তু সেগুলো নিয়ে উপস্থিত আমাদের প্রয়োজন নেই। তা সে যাই হোক, রাডেকি তাঁর অবতরণিকায় অহেতুক পাণ্ডিত্য ফলাননি।

'ইহ সংসারে আমাদের কত জিনিসেরই না অভাব, এবং তাই নিয়ে একমাত্র মানুষই রোদন করে কিন্তু ঐ অভাবের ক্ষতিপূরণ হিসাবে একমাত্র মানুষই হাসতে জানে। মানুষের যে দেহাতীত সত্তা আছে সে-ই আমাদের দেহ থেকে অশ্রুজল ঝরায় এবং সে-ই আমাদের দেহের দু পাশ এবং ভুঁড়ি দুলিয়ে হাসায়। কিন্তু এই পৃথিবীতে সে জিনিস কি, যা হাস্যকৌতুক রসের সৃষ্টি করে?'

প্রশ্ন শুধিয়ে উত্তরে রাডেকিই বলছেন, 'সব, সব কিছুই...। যেমন সব কিছুই কাঁদাতেও পারে। তারা, ফুল, পশুপক্ষী এদের নিজেদের সত্তা দিয়ে কৌতুকরস সৃষ্টি করে না, কিন্তু মানুষের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ামাত্রই এগুলো কৌতুকরসের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে—কারণ এই মানুষই বিশ্ব-সংসারের হাসি এবং কান্নার কেন্দ্র। কারণ এই মানুষ নির্মিত হয়েছে অর্ধেক পশু থেকে এবং অর্ধেক চৈতন্য দিয়ে। এই যে কাদামাটি আর

---

১ রবীন্দ্রনাথও প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন, 'জার্মান পণ্ডিতের কেতাবে তত্ত্বজ্ঞানের যে-সকল চরম সিদ্ধান্ত আছে তাহাকে ঔষধের বটিকা বলিতে পার কিন্তু মানসিক শুশ্রূষা তাহার মধ্যে নাই।' এস্থলে সম্পূর্ণ অবান্তর নয় বলে উল্লেখ করি, রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে 'জর্মন' লিখতেন—যদিও এখানে 'জার্মান' লিখেছেন। হালে জনৈক পত্রলেখক 'জর্মন' লেখার জন্য আমাকে বিদ্রূপ করেছেন বলে এ-কথাটি বলতে হল। 'জর্মন' লেখার অন্য কারণও অবশ্য আছে।

www.BanglaBook.org

সৃষ্টিকর্তার মুখের ফুঁ দিয়ে তৈরী মানুষ—তার হাসি এবং কান্না অতি সাধারণ সরল,—আর গভীর মনোবেদনায় যখন মানুষ কাঁদে তখন তার সে রোদন সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্যায়ের। হাসির বেলাও তাই। মানুষ যখন ফুর্তিতে থাকে তখন সে হাসে কিন্তু কৌতুকরসের সৃষ্টি হওয়াতে মানুষ অকস্মাৎ যে অট্টহাস্য করে ওঠে সে হাসি ভিন্ন। কিন্তু ফুর্তিতে থাকলেই যে কৌতুকের সৃষ্টি হয় এমন কোনও কথা নয়। সেখানে মানুষ হাসে সে ফুর্তিতে আছে বলে, আর এস্থলে তার উল্টোটা—এস্থলে মানুষ হেসে ফুর্তি পায়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এখানে রাডেকির সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত নন। তিনি বলছেন, 'সুখে (অর্থাৎ যখন ফুর্তিতে আনন্দে আরামে—লেখক) আমরা স্মিতহাস্য হাসি, কৌতুকে আমরা উচ্চহাস্য হাসিয়া উঠি। একটি আন্দোলনজনিত স্থায়ী, অপরটি সংঘর্ষজনিত আকস্মিক।' এবং তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরেকটি তত্ত্বও যোগ দিয়েছেন—আমি বোধ করি, যে কারণ-ভেদে একই ঈথরে আলোক ও বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তাহা আবিষ্কৃত হইলে তাহার তুলনায় আমাদের সুখহাস্য ও কৌতুক-হাস্যের কারণ বাহির হইয়া পড়িবে।'[১]

আর বর্তমান লেখক শুধোয় তাহলে বেদনাজনিত অট্টহাস্যও কি ঐ একই পর্যায়ে পড়বে? কিংবা দেখবো, আকাশের জল, চোখের জল আর গোলাপের জল একই কারণে ঝরছে?

মূল কথায় ফিরে যাই। রাডেকি বলেছেন, 'একদা সর্ব প্রকারের কাব্যই আবৃত্তি করা হত কিংবা গাওয়া হত। এর বহু পরে মানুষ এগুলো লিখে রাখার প্রয়োজন অনুভব করলো। এবং এরও পরে ছাপাখানায় সে কৃষ্ণমৃত্যু প্রাপ্ত হল (আমরা বলবো মা কালী কালির চরণাশ্রয় পেল) এবং আজ সে শুধু মানুষের চিত্তাকাশেই জাগরিত হতে পারে। একমাত্র কৌতুকরসই এখনও মুখে মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছাপাখানায় সে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয় না। এ যেন কলকল উচ্চহাস্যে এগিয়ে চলেছে পাহাড়ের ঝরণা—মাঝে মাঝে এক পাশে গুটিকয়েক পাথরের মাঝখানে যে সে স্তব্ধ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে সেই হল তার ছাপায় প্রকাশিত রূপ, কিন্তু সে অতি সামান্য এবং তার উদ্দাম গতিবেগকে কণামাত্র ব্যাহত করে না। এবং অন্য সর্ব কাব্যকলা যেমন যেমন ছাপার গোরস্তানে নীরব হতে লাগল সঙ্গে সঙ্গে কৌতুক-কথিকা এগুলো নিজের ভিতর সংহরণ করে তাদের পুনর্জীবন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে লাগলো। তাই কৌতুক-কথিকা চুটকিলা, কখনও বা কথক ঠাকুরের রূপকথা, কখনও বা বিষ্ণু শর্মার উপকথা, দশছত্রের উপন্যাস, কাহিনী, কবিতা এমন কি রোমাঞ্চকর নাট্য। সংবাদপত্রের শক্তি এ ধরে এবং কয়েকটি শব্দের সাহায্যে ক্ষুরধার যখন

---

১ পঞ্চভূত, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড ৬১৭। পঞ্চভূত পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৩০৪ সালে। তারপর ১৩২৮ এবং ১৩৩৩-এর মাঝামাঝি কোনও সময়ে "আমরা হাসি কেন?" এই নিয়ে বিশ্বভারতীর সাহিত্য সভায় আলোচনা করেন। তার অনুলেখন আমার কাছে ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অন্যান্য আরও বহু অনুলেখনের সঙ্গে এটিও কাবুল বিদ্রোহের সময় হারিয়ে যায়। সে-সভায় ক্ষিতিমোহন সেন উপস্থিত ছিলেন। তাঁর পাণ্ডুলিপিতে কিংবা হয়তো ঐ সময়কার "শান্তিনিকেতন" পত্রিকায় এর অনুলেখন পাওয়া যাবে।

ইতিমধ্যে জনৈক লেখক একটি অত্যুত্তম প্রবন্ধে প্রমাণ করেছেন, হাস্যের কারণ সম্বন্ধে আঁরি বের্গসঁ ও রবীন্দ্রনাথ প্রায় একমত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লেখাটি বের্গসঁর পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তখন এক লহমায় নাট্যশালার বাতাবরণ সৃষ্টি করতে পারে। সে একাধারে রাজদূত, লোকদূত, চারণ এবং নাট্যকার। কৌতুক-কথিকা হাস্যগাথা রচনা পেশাদারের একচেটিয়া নয়, বরঞ্চ বলতে হবে এটি পাঞ্চজন্য রসসৃষ্টি। ''হাস্যরস-লেখক বলতে যা বোঝায় তাঁদের মত একটি ছত্র না লিখেও মানুষ তার জীবনে হাস্যরস সঞ্চয় করতে পারে ও সৃষ্টি করতে পারে—'' জ্যাঁ পল বলেন।'

লোকমুখে এই হাস্যরস সৃষ্টির ঐতিহ্য বেঁচে রইল কি করে?

রাডেকি বলেন, 'সমাজের বাঙ্ময় রূপ নিত্য প্রয়োজনীয়। স্ফুট বাক্য দ্বারা মানুষ আপন মনের চিন্তা হৃদয়ের অনুভূতি প্রকাশ করে, আপন অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়। তার লীলাভূমি—রাজনৈতিক সভা-সমিতি, থিয়েটার, বারোয়ারী পুজো ইত্যাদি। কিন্তু সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত আত্মচেতনা প্রকাশ পায় তখনই যখন রামাশ্যামা সবাই সমান অংশীদার হয়ে হাস্যকলার সৃষ্টি করে' (এস্থলে বর্তমান লেখকের টীকা—শুধু তাই নয়, চুটকিলা-ভূমিতে গণতন্ত্রের এমনই কট্টরতা যে অতিসাধারণ জনও আকছারই ছোট্ট একটি টিপ্পনী কেটে গেরেমভারী মাতব্বরজনকে ডিগবাজী খাইয়ে দেয়)। তারপর রাডেকি এ-অনুচ্ছেদ শেষ করেছেন এই বলে :—'হাস্যরস মানুষে মানুষে যোগসূত্র স্থাপন করে।'

আমি সম্পূর্ণ একমত নই। হাসির চেয়ে কান্না, আনন্দের চেয়ে বেদনাই আমাদের একে অন্যকে কাছে টানে বেশী। এ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হতে পারে। কিন্তু এস্থলে একটি সামান্য উদাহরণ দিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হবে। বৈঠকখানায় বসে শুনতে পেলুম, বাড়ির বউ-ঝিরা রান্নাঘরে কাজ করতে করতে হঠাৎ একসঙ্গে হেসে উঠলো। আমি সঙ্গে সঙ্গে হাসির হিস্যাদার হতে কিংবা কারণ অনুসন্ধান করতে হন্তদন্ত হয়ে বাড়ির ভিতর ছুটে যাই নে। কিন্তু সবাই যদি একসঙ্গে ডুকরে কেঁদে ওঠে তবে অবশ্যই যাই।

এ বড় অদ্ভুত সমস্যা। দুঃখ-বেদনা আমরা দেখতে চাই নে, কিন্তু কাব্যে ঠিক সেই জিনিসটেই আমরা খুঁজি।

কৌতুক-হাস্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথও 'পঞ্চভূতে' লিখেছেন, 'রামায়ণের সীতা বিয়োগে রামের দুঃখে আমরা দুঃখিত হই, ওথেলোর অমূলক অসূয়া আমাদিগকে পীড়িত করে, দুহিতার কৃতঘ্নতাশরবিদ্ধ উন্মাদ লিয়রের মর্মযাতনায় আমরা ব্যথা বোধ করি—কিন্তু সেই দুঃখ-পীড়া বেদনা উদ্রেক করিতে না পারিলে সে সকল কাব্য আমাদের নিকট তুচ্ছ হইত।' এতখানি বলার পর রবীন্দ্রনাথ সূত্র দিচ্ছেন, 'বরঞ্চ দুঃখের কাব্যকে আমরা সুখের কাব্য অপেক্ষা অধিক সমাদর করি।' আমরা সম্পূর্ণ একমত। তবে তিনি যে কারণ দিয়েছেন—'কারণ, দুঃখানুভব আমাদের চিত্তে অধিকতর আন্দোলন উপস্থিত করে'—সেখানে সবাই একমত নাও হতে পারেন।

আজ যে বাঙলা দেশে রাজশেখরের এত খ্যাতি তার কারণ 'গড্ডলিকা' 'কজ্জলী' নয়—তার কারণ তাঁর 'চলন্তিকা', রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ, হয়তো বা তাঁর প্রবন্ধাবলী। যদিও আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর হাস্যরস অতুলনীয়, কিন্তু তাঁর অন্যান্য সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করার মত—তা সে শ্রেষ্ঠতর কিংবা নিকৃষ্টতরই হক—লেখক বাঙলা দেশে আছে। চলন্তিকার চেয়ে ভালো অভিধান ইংরিজীতে আছে কিন্তু হাস্যরসিক রাজশেখর জেরম কে জেরম, উডহাউসের বহু বহু ঊর্ধ্বে।

তা সে যাক্। কিন্তু এই যে রবীন্দ্রনাথ বললেন, এবং আমরাও স্বীকার করলুম,

www.BanglaBook.org

'দুঃখের কাব্যকে আমরা সুখের কাব্য অপেক্ষা অধিক সমাদর করি'—তাই যদি হয় তবে ফিলিমওয়ালারা কেন বলেন ট্রাজেডি অচল, দর্শক কমেডি দেখতে চায় এবং শুধু এ-দেশে নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই নাকি অল্পবিস্তর তাই।

তার কারণ বোধ হয় এক হতে পারে যে শিশুর রূপকথা কখনও ট্রাজেডিতে সমাপ্ত হয় না, এবং যেহেতুক সিনেমা-দেখানেওয়ালারা ত্রিশ বছর বয়সেও শিশুমন ধরেন তাই তাঁরা ট্রাজেডি পছন্দ করেন না। কিন্তু এস্থলে সে আলোচনা কিঞ্চিৎ অবান্তর।

* * *

রাডেকি তাঁর অবতরণিকায় আরও অনেক মধুর এবং জ্ঞানগর্ভ কথা বলেছেন। এবং শেষ করেছেন এই বলে, 'হাস্যকথিকার (চুটকিলার) প্রাণরস কিন্তু ঐ বস্তু শব্দের মাধ্যমে বলাতে—ছাপাখানার মারফতে নয়।' তুলনা দিয়ে বলেছেন, 'প্রথমটা যেন উচ্ছল প্রাণরসে সঞ্চারিত উড়ন্ত প্রজাপতি—ছাপাখানার মাল যেন পিন দিয়ে বেঁধা কাঁচের বাক্সের ভিতর মৃত প্রজাপতি।'

রাডেকি অবতরণিকা শেষ করেছেন তাই এই বলে, 'আমি হালে একটি চমৎকার রসিকতার গল্প শুনতে পেলুম। তদ্দণ্ডেই সেটি লিখে নিলুম। পরে সেটি ছাপায় প্রকাশিত হল! যিনি সেই গল্পটি বলেছিলেন সে কথক সেটি পড়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেশ হয়েছে—কিন্তু স্বরলিপি কই?'

অর্থাৎ এ যেন কেউ রবীন্দ্রসঙ্গীত না গেয়ে আবৃত্তি করে শোনাল। স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকী। তিনি নাকি এরই কাছাকাছি অন্য একটি তুলনা দিয়েছেন। অনুবাদ যেন কাশ্মিরী শালের উল্টো পিঠ। ডিজাইনটা বোঝা যায় কিন্তু অন্য সব কিছু লোপ পায়।

হাসি-কান্না

তরুণ লেখককে সাবধান করে দি, তিনি যদি ইহজগতে অজরামর যশ অর্জন করতে চান তবে যেন তিনি হাস্যরসের বেসাতি না করে ঢালেন অঢেল করুণ রস। আর বাঙালীর হৃদয়ের উপর যদি 'জগরনটের' মত তিনি মোক্ষম আসন চেপে বসে থাকতে চান তবে যেন সেটিকে চেপটে, থেৎলে, নিংড়ে, একদম সমূচহ তিক্তের চেয়েও তেতো করে পরিবেশন করেন। দেবদাস রক্তবমি করছে আর গাড়োয়ানকে বার বার শুধাচ্ছে আর কত বাকি, কিংবা অরক্ষণীয়ার 'সাজ' দেখে বাচ্চা বলছে, 'পিসিমা সং সেজেছে'—ছাড়ুন এ-রকম কিছু মাল, আর দেখতে হবে না, আপনি আমাদের ঢিহি শ্রীরামপুর সেকেন্ড বাইলেন কম্বল বিতরণী সভা থেকে যাত্রা আরম্ভ করে 'ভায়া, মদ্দেরা কালীবাড়ি প্রসাদ-বিতরণী সমিতি হয়ে নাক বরাবর পৌঁছে যাবেন পদ্মশ্রী আকাদেমি প্রাইজে। কেউ ঠেকাতে পারবে না। আহা, বাঙালী বড্ডই কোমল হৃদয়। শুনেছি, এক বাঙালী ছোকরা লন্ডনে বাসকালীন তিনটি বছর মাত্র অবশ্যকর্তব্য ব্যারিস্টারি ডিনারটি খাবার জন্য—ভুল বললুম, খাবার জন্য নয়, নিছক এটেন্ড করার জন্য—হস্টেল থেকে বেরতো; ফিরে এসে ফের ধুতি গেঞ্জি পরে লেপের তলায় ঢুকে দেবদাস পড়তো আর তার তলায় যতখানি সম্ভব ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে কেঁদে কুমড়ো-গড়াগড়ি দিত।

www.BanglaBook.org

আল্লা রসুলের কসম খেয়ে আমি মুসলমানের ব্যাটা বাঙালী মুসলমান ফের বলবো, রাজশেখরের খ্যাতি-প্রতিপত্তির কারণ তাঁর 'গড্ডলিকা' 'কজ্জলী' নয়। তাঁর খ্যাতির কারণ 'চলন্তিকা' এবং রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ। অথচ চলন্তিকার চেয়ে বহুগুণে শ্রেয় অভিধান ইংরিজী জর্মনে আছে, ইংরিজীতে গ্রীক কাব্যের অনুবাদ করে একাধিক লেখক রাজশেখরকে আগের থেকেই ছাড়িয়ে বসে আছেন। অথচ হাস্যরসে রাজশেখরের যে কৃতিত্ব তার সঙ্গে তুলনা করি কার সঙ্গে। সেরভান্তেস, মলিয়ের, জেরম, উডহাউস কেউই কাছে দাঁড়াতে পারেন না। গ্রীক সাহিত্যের কথা আর তুলছি নে, সেখানে আছে ব্যঙ্গ, সেটায়ার,—বিশুদ্ধ হাস্যরস নয় এবং সেগুলোও রাজশেখরের কাছে আসতে পারে না। এটা ডবল কসম খেয়ে বলছি।

বাঙলা কথা শুনুন। আপনাকে একটা সোনার মোহর দিলে আপনি খুশী হবেন, কিন্তু ভুলে যাবেন দুদিন বাদেই। ওদিকে কেউ যদি পাঁচ টাকা হাওলাত নিয়ে শোধ না করে তবে সে কলিজার ঘা দগদগ্ করবে বহু-বহুকাল অবধি। শারীরিক স্তরে নেবে বলতে পারি, আপনাকে কেউ সুড়সুড়ি দিয়ে হাসাতে চাইলে আপনি বিরক্ত হবেন কিন্তু কেউ যদি শরীরে পিন ফোটায় তবে মারমুখো হবেন।

আরেকটি কথা; করুণ রস বুঝতে হলে বিদ্যেবুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন নেই। হাস্যরসের বেলা ভাষাজ্ঞান (বিশেষ করে 'পান্' বোঝবার বেলা) ভিন্ন ভিন্ন সমাজের আচার ব্যবহার, অনেক-কিছুই জানতে হয়। যেমন মনে করুন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই ছোট হাস্যরসের চুটকিলাটি।

একটি ছোট্ট মেয়ে ঠিকমত হাঁটতে পারছে না দেখে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কড়ে আঙুলটি বাড়িয়ে দিলেন, সে যেন ওটা ধরে সোজা হয়ে চলে। মেয়েটি খপ করে তাঁর গোটা হাত ধরে নিলে। রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, 'দেখলে, মেয়েকে একটি আঙুল দিয়েছি কি না, সে তখ্খুনিই পাণিগ্রহণ করতে চায়।' এস্থলে পাণিগ্রহণের অর্থ যদি কেউ না জানে তবে সে বুঝতেই পারবে না, এর রস কোথায়।

এরই পিঠ-পিঠ একটি মার্কিন রসিকতা আছে, কিন্তু অতখানি সূক্ষ্ম নয়। তারা বলে, 'গিভ এ ডেম এন ইঞ্চ...এ্যান্ড শী উয়োন্টস টু বী এ রুলার।' 'মেয়েছেলেকে এক ইঞ্চি (লাই) দিয়েছ, কি সে অম্নি রুলার হতে চায়।' এখানে রুলারের যে দুটো অর্থ আছে সে তত্ত্ব যদি শ্রোতার জানা না থাকে তবে সব গুড় বরবাদ।

এদেশে উত্তম ক্লাস রসিকতা করে গেছেন আরেকটি ব্যক্তি। তাঁর নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—পুণ্যশ্লোক, সায়ংসন্ধ্যা স্মরণীয়। তিনি তাঁর ঠাট্টা-মস্করা প্রধানম 'কস্যচিৎ ভাইপোস্য' নিয়ে করেছেন বলে অনেকেই এ-তত্ত্ব জানেন না। তাঁর একটি গল্প অতুলনীয় —দুর্ভাগ্যক্রমে বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাবলী হাতের কাছে নেই। মোটামুটি যা বলেছেন তা এই, অমুককে আমি নদীয়ার চাঁদ উপাধি দেওয়ার পর শুনিতে পাইলাম অন্য অমুককে ইহার পূর্বেই নদীয়ার চাঁদ উপাধি দেওয়া হইয়া গিয়াছে। আমি মহা ফাঁপরে পড়িলাম—কারণ আকাশে একসঙ্গে দুইটি চাঁদ কখনই দেখা যায় না। এক্ষণে এই উপাধি লইয়া দুইজনে হাতাহাতি গুঁতাগুঁতি হউক তাহা আমি চাহি না। বিদ্যাবুদ্ধিতে অবশ্য দুইজনই একই প্রকার (অর্থাৎ দুটোই আস্ত পাঁঠা—লেখক)। অতএব, স্থির করিয়াছি আকাশের চাঁদটি লইয়া, সেইটিকে দুই ভাগ করিয়া, দুইজনকে দুইটি অর্ধচন্দ্র দিয়া বিদায় করিব।

www.BanglaBook.org

অর্ধচন্দ্র এস্থলে কেউ যদি শুধু 'ক্রেজন্ট্ মুন' অর্থে নেন তা হলেই তো চিত্তির!

এ-পৃথিবীতে ধর্ম নিয়ে যত হই-চই হয়েছে—অর্থাৎ ধর্ম যে রকম সম্মান পেয়েছে সে রকম গালাগাল খেয়েছেও সে বিস্তর—অন্য কোনও প্রতিষ্ঠান নিয়ে অতখানি হয়েছে বলে জানি নে। কাজেই ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের অনেকখানি খুঁটিনাটি না জানলে তাদের নিয়ে একে অন্যকে যে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছে সেগুলো ঠিকমত রসিয়ে রসিয়ে চাখা যায় না।

প্রথম একটি ক্ষুদ্র উদাহরণ দি।

"মোল্লার দৌড় মসজিদ তক্।" শ্রীযুক্ত সুশীল দে এটিকে 'বাঘে মোষে (রাজায় রাজায়) যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়', এরই সমার্থে ধরেছেন। শ্রীযুত দে তাঁর 'বাংলা প্রবাদ' গ্রন্থখানা রচনা করে আমাদের যে কী উপকার সাধন করেছেন সেটি অবর্ণনীয়; কাজেই আমি যদি এস্থলে আমার জানা অন্য অর্থটি নিবেদন করি তবে তাঁর পাণ্ডিত্য-জ্যোতি কিছুমাত্র ম্লান হবে না।

মোল্লাকে কড়া কথা শোনালে বা তার উপর চোটপাট করলে সে তো আর জমিদার নয় যে, সঙ্গে সঙ্গে তার দাদ নেবে। সে বেচারা ছুটে যায় মসজিদে। সেখানে গিয়ে আল্লার কাছে সে তার ফরিয়াদ জানায় ও অপরাধীর সাজা কামনা করে। কিন্তু কথায় বলে, 'শকুনির শাপে কি গরু মরে' (সুশীল দে, ৭৮১১)—অপরাধীর কিছুই হয় না। মোদ্দা কথা তা হলে দাঁড়ায়, মোল্লার আর কী মুরদ! সে ঐ মসজিদ তক্ ছুটে গিয়ে চেল্লাচেল্লি মাত্রই করতে জানে; তাতে কারও ক্ষয়ক্ষতি হয় না।

ঠিক ঐ রকম শাক্ত-বৈষ্ণবের ঝগড়াঝাঁটি জানা না থাকলে নিচেরটা বুঝবেন কি করে?

(শাক্ত-বৈষ্ণব উভয়ের কাছে সবিনয় ক্ষমা-ভিক্ষা করতঃ)

বৈষ্ণব : আচ্ছা ভাই, তোমরা তো বলো, 'যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা'—তবে পাঁঠাটাকে যখন বলি দাও তখন তার ভিতরের 'শক্তিটাকে' কি বলি দেওয়া হয় না? লক্ষ্য করোনি পাঁঠার কী অসাধারণ প্রাণশক্তি—লম্ফঝম্প!

শাক্ত : না, ভাই, তা নয়। পাঁঠাকে যখন ধরে বেঁধে হাড়িকাঠে পুরি তখন সে নির্জীব। তখন আর তার শক্তি কই? আছে শুধু চৈতন্য। তখন শুধু ওইটুকুকেই বলি দি।

এ বছরে প্রতিটি লেখার সময় স্বামীজীর কথা মনে পড়ে। তিনি যে শুষ্ককাষ্ঠ অরসিকজন ছিলেন না সেইটে এই সুবাধে মনে পড়ল। নিম্নের রসিকতাটি ঈষৎ দীর্ঘ কিন্তু জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে দীর্ঘতর শুনতেও কারও আপত্তি থাকার কথা নয়।

(মুসলমানদের শীয়া সম্প্রদায়ের কাছে গোস্তাকীর বেহদ্ মাফ চেয়ে)

'লক্ষ্ণৌ শহরে মহরমের বড় ধুম। বড় মসজিদ ইমামবাড়ায় ঝকমক রোশনির বাহার দেখে কে। বেসুমার লোকের সমাগম। হিন্দু-মুসলমান, কেরানী য়াহুদি ছত্রিশ বর্ণের স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা, ছত্রিশ বর্ণের হাজারো জাতের লোকের ভিড় আজ মহরম দেখতে। লক্ষ্ণৌ শীয়াদের রাজধানী। আজ হজরত হাসান-হোসেনের নামে আর্তনাদ গগন স্পর্শ করছে—সে ছাতি-ফাটানো মর্সিয়ার কাতরানি কার না হৃদয় ভেদ করে? হাজার বৎসরের প্রাচীন কারবালার কথা আজ ফের জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এই দর্শকবৃন্দের ভিড়ের মধ্যে দূর গ্রাম হতে দুই ভদ্র রাজপুত তামাশা দেখতে হাজির। ঠাকুর সাহেবদের —যেমন পাড়াগেঁয়ে জমিদারের হয়ে থাকে—বিদ্যাস্থানে ভয়েবচ।

www.BanglaBook.org

সে মোসলমানি সভ্যতা, কাফ-গাফের বিশুদ্ধ উচ্চারণ সমেত লস্করী জবানের পুষ্পবৃষ্টি, আবা কাবা চুস্ত পায়জামা তাজ মোড়াসার রঙ্গ-বেরঙ্গ শহরপসন্দ ঢঙ অতদূর গ্রামে গিয়ে ঠাকুর সাহেবদের স্পর্শ করতে আজও পারেনি। কাজেই ঠাকুররা সরল সিধে, সর্বদা শিকার করে জমামরদ কড়াজান আর বেজায় মজবুত দিল্।

ঠাকুরদ্বয় তো ফাটক পার হয়ে মসজেদের মধ্যে প্রবেশোদ্যত, এমন সময় সিপাহী নিষেধ করলে। কারণ জিজ্ঞাসা করায় জবাব দিলে যে, এই যে দ্বারপার্শ্বে মুরদ্ খাড়া দেখছ, ওকে আগে পাঁচ জুতা মার তবে ভিতরে যেতে পাবে। মূর্তিটি কার? জবাব এলো —ও মহাপাপী ইয়েজিদের মূর্তি। ও হাজার বৎসর আগে হজরত হাসান-হোসেনকে মেরে ফেলে; তাই আজ এ রোদন, শোকপ্রকাশ। প্রহরী ভাবলে, এ বিস্তৃত ব্যাখ্যার পর ইয়েজিদ মূর্তি পাঁচ জুতার জায়গায় দশ তো নিশ্চিত খাবে। কি কর্মের বিচিত্র গতি! উল্টা সমঝলি রাম—ঠাকুরদ্বয় গললগ্নীকৃতবাস ভূমিষ্ঠ হয়ে ইয়েজিদ-মূর্তির পদতলে কুমড়ো-গড়াগড়ি আর গদগদ স্বরে স্তুতি—"ভেতরে ঢুকে আর কাজ কি? অন্য ঠাকুর আর কি দেখব? ভালা বাবা অজিদ্ দেবতা তো তুঁহি হ্যায়, অস্ মারো শারোকো কি অভিতক্ রোবত। (ধন্য বাবা ইয়েজিদ্, এমনি মেরেচো শালাদের—কি আজও কাঁদছে!!')।[১]

রস তো পেলেনই, কিন্তু পাঠক স্বামীজীর গল্প বলার টেকনিকটি লক্ষ্য করুন।

রসিকতা

হাসতে হয়, না হেসে উপায় নেই। এমন কি যারা 'হাতুড়ি আর কাস্তে'র নিচে বসে আছে, তারাও হাসে। তবে প্রাণখুলে নয়, কিংবা 'পাবে' বসে বেপরোয়া গাল-গল্প গুল-গ্যাস ছাড়বার মাঝে মাঝে নয়। সন্তর্পণে টাপে-টোপে। এই কিছুদিন পূর্বেই লৌহ-যবনিকার অন্তরালে একটি রসের গল্প মুখে মুখে ফিরতে ফিরতে এই হেথা বাঙলা দেশে পৌঁছেছে—অবশ্য একে বাঁচিয়ে, ওকে এড়িয়ে।

এক কম্যুনিস্ট আরেক কম্যুনিস্টকে সোল্লাসে খবর দিলে, 'জানিস ভাই, "প্রাভদা" কাগজ সব চেয়ে সেরা পলিটিকাল রসিকতার জন্য একটা প্রাইজ দেবে কাগজে ঘোষণা করেছে।'

দ্বিতীয় কম্যুনিস্ট : (অধিকতর সোল্লাসে) 'পয়লা প্রাইজ কত কমরেড?'

প্রথম কম্যুনিস্ট : 'কুড়ি বচ্ছর সাইবেরিয়া নির্বাসন।'

---

১ বেসুমার = অগুন্তি; আদমশুমারী তুলনীয়। মর্সিয়া = শোকগীতি। কাফগাফের উচ্চারণ = কাফ আরবী বর্ণমালার অক্ষর। আরব ইহুদী ছাড়া অন্যের পক্ষে উচ্চারণ কঠিন। গাফ উচ্চারণ সহজ। তবে কাফ-গাফ সংযুক্তভাবে সমষ্টি অর্থে ব্যবহার হয়। জবান = ভাষা। আবা কাবা = ঝোলা জামা। চুস্ত = টাইট। তাজ মোড়াসা = বাঁধা তৈরী পাগড়ি। শহরপসন্দ = শহরের সকলেই যে বস্তু পছন্দ করে। জম মরদ = জওয়ান মর্দ। ইয়েজিদ = আজকাল এজিদই লেখা হয়, কিন্তু ইয়েজিদ মূল উচ্চারণের অনেক নিকটবর্তী।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'নির্বাসন' না 'উইন্টার স্পোর্টস্ অ্যান্ড হলিডে' আমার সঠিক মনে নেই। তবে নিখরচায় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এর থেকে অবশ্য পাঠক মনে করতে পারেন, রুশ-চীনে বুঝি মানুষ মুখ বন্ধ করে আছে। যেমন হিটলার আমলে জর্মনিতে একটি রসিকতা বেশ প্রসার লাভ করেছিল। এক জর্মন আরেক জর্মনকে শুধোলে, 'তুই নাকি ভাই, ডেন্‌টিস্‌ট্রি পড়া ছেড়ে দিয়েছিস? কেন?'

'কি আর হবে? দাঁতের চিকিৎসা করবো কি করে? কেউ যে মুখ খুলতে আদৌ রাজী হয় না।'

তা নয়। লোকে মুখ খোলে। কারণ যে কর্তাব্যক্তিরা রুশ-চীনের ফুটন্ত জলের কাৎলির উপরে বসে আছেন তাঁরাও জানেন, মাঝে মাঝে ঢাকনাটা একটু ফাঁক না করে দিলে তাঁদেরও উড়িয়ে নিয়ে যাবে। তবে এঁরা মোটামুটি ঠিক করে নিয়েছেন, কোন্ ধরনের রসিকতা একটুখানি বরদাস্ত করে নিতে হয়, আর কোন্ ধরনের রসিকতা 'হারাম' বিধান দিয়ে সাইবেরিয়া ব্যবস্থা করতে হয়—চীন দেশে, শুনেছি, নেফা অঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, গুলি খেয়ে মরবে, নয় শীতে জমে গিয়ে।

সব চেয়ে বরদাস্ত করা হয়, বাসস্থানের অভাব, আহারাদির অনটন, বাধ্য হয়ে অর্ধ-দিগম্বর বেশ ধারণ সম্বন্ধে। কারণ চোখের সামনে এগুলো এমনই জাজ্বল্যমান, সবাই কিছুটা মনের ভার নামাক—একটা নূতন অক্টোবর রেভলুশন অদ্যকার কর্তাব্যক্তিদের পক্ষে আরামদায়ক অভিজ্ঞতা নাও হতে পারে। এবং বাসস্থান-আহারাদির অনটন সম্বন্ধে পোলান্ড-রুমানিয়ার কাষ্ঠ-রসিকেরা বলে, 'সোশালিস্ট রাজ্যের বর্তমান ক্ষণস্থায়ী অভাব-অনটন ভবিষ্যতের চিরস্থায়ী অভাব-অনটনের পথে পথে বিজয়স্তম্ভ।'

ভবিষ্যতে কি রকম হবে তাই নিয়ে বলা হয়, আরও তিনটি ফাইভ ইয়ার প্ল্যান চিন্ময় থেকে মৃন্ময় রূপ ধারণ করার পর এমনই সুদিন আসবে যে, সক্কলের আপন আপন সলুন মোটরগাড়ি, এমন কি আপন আপন হেলিকপ্টার থাকবে। সেই সময় মস্কোর উপরে শূন্যমার্গে আপন হেলিকপ্টারে দুই কমরেডের দেখা। একজন আরেকজনকে শুধালে, 'কোথায় চললি কমরেড?'

'তুই যদি আমার পিছু না নিস তবে বলছি। অতি গোপনীয় সূত্রে খবর পেয়েছি, কৃষ্ণসাগরের পারে ওডেসার রেশন শপে আড়াই আউন্স মাখন পাওয়া যেতে পারে। সেখানে যাচ্ছি।'

এ তো হল ভবিষ্যতের কথা। আর বর্তমান দিনে?

হঠাৎ বাড়ি ফিরে কমরেড দেখেন তাঁর স্ত্রী উপপতির সাথে রসকেলিতে মত্ত। হুঙ্কার দিয়ে স্বামী বললে, 'এই বুঝি প্রেম করার সময়! ওদিকে যে রেশন শপে এক ঘণ্টা ধরে নেবু বিক্রি হচ্ছে!'

সত্যই তো। প্রেম তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না, কিন্তু নেবু কিছু আর নিত্যি-নিত্যি মেলে না।

এই মর্মে আরেকটি চুটকিলা আছে।

গৃহবণ্টন বিভাগের কর্তা বললেন, 'কি বললেন কমরেড, আপনার স্ত্রীর ফ্ল্যাটখানা পছন্দ হচ্ছে না? তা আর এমন কি? আমার উপদেশ নিন। স্ত্রী বদল করুন। ঢের কম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাঙ্গামায় পাবেন। ফ্ল্যাট পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা!'

কিংবা বাড়ি বাবদে :—

ক্লাস টিচার শুধোলেন, 'লেলিনের যে ছবিখানা দিলুম সেটি কোথায় টাঙিয়েছো?'

'আজ্ঞে কোথাও না।'

'কেন?'

'আজ্ঞে চার দেয়াল ঘেঁষে চারটি পরিবার বাস করে। আমরা থাকি মধ্যিখানে। আমাদের তো দেয়াল নেই।'

কিংবা ধরুন—এটা নাকি চীন দেশের—মন্ত্রী মশায় বেতারে বক্তৃতা দিচ্ছেন, '১৯৬০-এ আমরা আগের চেয়ে ১১০ গুণ বিজলি বাড়াতে পেরেছি। ১৯৬১-তে ৬০ গুণ। এ বছরে দু'শ গুণ—দাঁড়ান, কি হল? আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে, কমরেড স্টুডিয়ো অ্যাসিস্টান্ট, একটি মোমবাতি নিয়ে আসো দিকিনি।'

তবে কোনও কোনও বাবদে বর্তমানে যে অবস্থা অনেকখানি ভালো সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ গল্পটাও হলদে, না লাল জানি নে। এক কমরেড রিপোর্ট লিখছেন, 'পূর্বের চেয়ে এখন অবস্থা অনেক ভালো। আগে গৃহিণী যখন জামা-কাপড় কাচতেন, আমাকে তখন সাহায্য করতে হত। এখন সে দুর্দিন গেছে। এখন স্ত্রী বলেন, তোমার পাতলুন আর শর্টটা দাও তো। আর তুমি বিছানায় গিয়ে চাদর ঢাকা দাও।'

[এই স্ত্রীকে সাহায্য করার ব্যাপার নিয়ে মার্কিন মুল্লুকে অন্য পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। গত যুদ্ধে বহু মার্কিন কাপড় কাচা, বাসন মাজা, রান্না করা, আরও পাঁচটা কাজ শিখে এসে বাড়িতে যখন দেখে স্ত্রী আনাড়ির মত কাজ করছে তখন তারা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে বাৎলে দেয় কিভাবে কর্মগুলো সুষ্ঠুরূপে করতে হয়। ফলে বউরা তাদের খাটিয়ে মারতে শুরু করে। সেটা পরের পুরুষেও সংক্রামিত হয়। হালে যখন মার্কিন দেশে প্রস্তাব পাড়া হয়, ওভার প্রোডাকশন হচ্ছে বলে সকলকে হপ্তায় দু'দিন করে ছুটি দেওয়া হবে, তখন বিস্তর মার্কিন তারস্বরে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে, 'বউরা খাটিয়ে মারবে। তার চেয়ে আপিসের কলম পেষা ঢের ভালো।' এরা বলে, নিগ্রো-দাসত্ব উঠে যাওয়ার পর এটা নাকি এক নূতন ধবল-দাসত্ব।]

কম্যুনিস্ট দেশে নাকি রাজনৈতিক কারণের গ্রেফতারি হয় অতি ভোরবেলা—এদেশে যে রকম ১৯৪৭-এর আগে হত, আর হিটলারী জর্মনিতে তো নিজে দেখেছি। এ ব্যাপার নিয়ে নাকি ঠাট্টা-মস্করা খুব বেশী বরদাস্ত করা হয় না।

ভোর পাঁচটার সময় বাড়িওলা ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে ঘণ্টা বাজিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলছে, 'কমরেড, অযথা ভয় পাবেন না। আমি শুধু বলতে এসেছি, বাড়িতে আগুন লেগেছে মাত্র।' কিংবা,

'কি বললে? ইভান ইভানোভিচ মারা গিয়েছে? কই, আমি তো তার গ্রেফতার হওয়ার খবরটা পর্যন্ত পাইনি।' কিংবা খবরের কাগজে শোকসংবাদ কলমে পিতামাতা প্রকাশ করলেন, 'আমাদের স্বর্গস্থ সৃষ্টিকর্তা তাঁর অসীম করুণায় আমাদের কন্যাকে কল্যাণতর লোকে নিয়ে গিয়েছেন।' আপন সোশ্যালিস্ট দেশকে অপমান করার জন্য দুজনাই পরের দিন গ্রেফতার হন।

সবচেয়ে বিপজ্জনক হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক রসিকতাই সবচেয়ে বেশী আদর পায়। পূর্বেই প্রাভদা প্রসঙ্গে তার একটি নিবেদন করেছি। এগুলো সচরাচর তৈরী হয়

www.BanglaBook.org

কতকগুলো বিশেষ বিষয়বস্তু নিয়ে; পার্টির দুর্নীতি, বড়কর্তাদের বিলাসব্যসন (হালে চীনও খুশ্চফকে গালাগালি দিয়েছে এই বলে যে, তাঁর দুখানা আপন মোটরগাড়ি আছে), ধর্মবিশ্বাসে অসহিষ্ণুতা, স্বাধীনচিন্তার নিপীড়ন, চাষাদের বেগার খাটানো, উপরাষ্ট্র-ধর্ষণ ইত্যাদি। যারা কম্যুনিজমে বিশ্বাস করে না কিংবা কম্যুনিস্টদের কার্যকলাপে দুর্নীতি সহ্য করতে পারে না, তাদের আত্মাভিমান রক্ষা করার একমাত্র উপায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের শরণ নেওয়া।

এক কয়েদী আরেক কয়েদীকে, 'তোর কি মাথা খারাপ? আদালতে কেন স্বীকার করলি, কালোবাজারে চিনি কিনেছিস?'

দ্বিতীয় কয়েদী, 'কি করি বল। সরকার পক্ষের উকিলই যে আমাকে চিনি বেচেছিল।' কিংবা শিক্ষামন্ত্রীকে 'পাগল' বলার অপরাধে একজনের কুড়ি বছরের জেল হয়। পাঁচ বছর হয় সরকারী কর্মচারীকে অপমান করার জন্য, বাকি পনেরো বছর রাষ্ট্রের গোপন খবর প্রকাশ করে দেবার জন্য। কিংবা,

রুশ কর্মী কথায় কথায় বললে, 'আমি সব চেয়ে ভালোবাসি কম্যুনিস্ট পার্টির মেম্বারদের জন্যে কাজ করতে।' সরকারী কর্মচারী প্রশংসা করে বললেন, 'বড় আনন্দের কথা। তা আপনি কি কাজ করেন?' 'আজ্ঞে, আমি গোর খুঁড়ি।'

কিংবা,

চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে প্রাপ্ত :—

খবরের কাগজের হকাররা রাস্তায় চেঁচাচ্ছে, 'রুশেরা চাঁদে পৌঁছে গেছে, রুশেরা চাঁদে পৌঁছে গেছে।' রাস্তায় একাধিক উল্লসিত কণ্ঠস্বর, 'সবাই? সবাই?'

কিংবা,

ট্রামগাড়ির কন্ডাক্টর : 'এগিয়ে চলুন, মশাইরা, এগিয়ে চলুন।'

'আমরা "মশাইর" নই, আমরা কমরেড।'

'মস্করা ছাড়ুন। কমরেডরা ট্রামগাড়ি চড়েন না, তাঁরা চড়েন আপন আপন মোটরগাড়ি।'

কিন্তু পূর্বেই বলেছি, এসব রসিকতা করতে হয় টাপেটোপে নিতান্ত আপনজনের মাঝখানে। নইলে :—

তিন বৃদ্ধ পার্কের বেঞ্চিতে চুপচাপ বসে। তার মধ্যে দুজন ওয়াক্ থুঃ ওয়াক্ থুঃ বলে থুথু ফেলছে। তৃতীয়জন বললে, 'দয়া করে কোনও প্রকারের রাজনৈতিক আলোচনা আরম্ভ করবেন না। নইলে আমাকে গোয়েন্দা বিভাগে খবর দিতে হবে।'

ইংরিজীতে বলে, 'নীরবতা হিরণ্ময়।'

ইহুদিরা আসলে প্রাচ্যদেশীয় বলে বহু শত বৎসর ইয়োরোপে থাকার পরও তাদের রসিকতায় বিদ্রূপ ও তিক্ততা থাকে অনেক বেশী। ওদিকে হিটলার যে রকম একদা ইহুদিদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছিলেন, তার দশ ভাগের এক ভাগ না হলেও কম্যুনিস্ট দেশে ইহুদি নির্যাতন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে—অনেক দিন। ইহুদিরাও বাধ্য হয়ে বাইরের দিক দিয়ে যত দূর সম্ভব গা বাঁচিয়ে চলে ও 'অন্তরে অন্তরে অন্তরীণ' হয়ে থাকে।

'চতুর পোলিশ ইহুদি মূর্খ পোলিশ ইহুদির সঙ্গে কিভাবে আলাপ করে?'

'নিউ ইয়র্ক থেকে, টেলিফোনযোগে।' কিংবা,

www.BanglaBook.org

সরকারী কর্মচারী ইহুদিকে বললেন, 'কমরেড লেভি, আপনি ফর্মে লিখেছেন, আপনার কোনও আত্মীয় বিদেশে বসবাস করে না। ওদিকে আমরা খবর পেয়েছি, আপনার আপন ভাই ইসরায়েলে বাস করে।'

'তা তো করেই। সে আছে আপন দেশে, আমিই তো আছি বিদেশে।'

সবচেয়ে কম শুনতে পাওয়া যায় 'বড় পাণ্ডাদের' নিয়ে রসিকতা। তার কারণ উৎপীড়িত জনেরাও অতি অল্প দিনের অভিজ্ঞতায়ও বুঝে যায়, যাকে নিয়ে রসিকতা করা হয়, গৌণভাবে তারই বিজ্ঞাপন করা হয় মাত্র। এ কথাটা উভয় পক্ষই বিলক্ষণ জানে বলে হিটলারের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ গ্যোরিঙ তাঁর সম্বন্ধে বাজারে রসিকতা চালু হওয়া মাত্রই সেটি সংগ্রহ করে রাখতেন এবং এ ধরনের রসিকতা নিজেই যে শুধু বলে বেড়াতেন তাই নয়, অন্য সকলকেও নয়া নয়া রসিকতা বানাবার জন্য টুইয়ে দিতে কসুর করতেন না।

রুশ দেশও ব্যত্যয় নয়। তাই খ্রুশ্চফ্ ইত্যাদিকে নিয়ে রসিকতার বাড়া-বাড়ি নেই তবু দু-একটি যা শুনতে পাওয়া যায় সেগুলো উপাদেয়। তারই একটি দিয়ে শেষ করি।

শীর্ষ সম্মেলন শেষ করে নিকিতা খ্রুশ্চফ্ ও পুলিসকর্তা (আসলে গোয়েন্দা বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ) সাখারফ্ একসঙ্গে উড়োজাহাজে করে দেশে ফিরছেন। সাখারফ্ বললেন, 'কেনেডির অলঙ্কারগুলো লক্ষ্য করেছিলি? একদম সাচ্চা।'

নিকিতা বললেন, 'না কই, দে তো।'[১]

নানাপ্রশ্ন

যতই বয়েস বাড়ছে, কোথায় না মনের ভিতর যে-সব প্রশ্ন জাগে তার সংখ্যা কমবে, উল্টে তার সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। এই তো কয়েকদিন পূর্বে বাঙলায় লেখা কয়েকখানি মুসলমানি কেতাব বা পুঁথি হাতে পড়লো। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর কাব্য। বিষয়বস্তু ফার্সী, যদিও নায়ক-নায়িকা কোনও কোনও মূল কাব্যে আরবদেশের—ফার্সীর মাধ্যমে বাঙলা দেশে এসে পৌঁছেছেন। সঙ্গে এনেছেন ইরানী মেজাজ। সেটা মধুর,—আরবী কাব্যের মূল সুর দার্ঢ্য।

বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়, যে সব কবি বাঙলায় এ-সব কাব্য 'স্বাধীন অনুবাদ' করেছেন এঁদের অনেকেই উত্তম ফার্সী জানতেন। কেউ কেউ ভালো আরবী ও সংস্কৃত জানতেন, এবং প্রায় সকলেই তখনকার দিনের প্রচলিত বাঙলা কাব্যের ভাষা জানতেন। ছন্দও হয় পয়ার নয় ত্রিপদী। এমন কি কবিদের একজন পয়ার লিখতে লিখতে এমনই আনন্দে নিমগ্ন হয়ে গেছেন যে একঘেয়েমি কাটাবার জন্য যে মাঝে মাঝে ত্রিপদী ভী আমদানি করতে হয় সে বাৎ বেবাক ভুলে গেছেন এবং কাব্য সমাপ্তির পর যখন কানে জল গেল তখন কুছ্ কুছ্ ত্রিপদী-ভী[২]-বগ্‌হার দিয়ে কবি-ধর্মের ইমান দুরস্ত রাখলেন।

---

১ 'ভেল্টভখের' (ৎসুরিষ) ১৪৫২ সংখ্যার সাহায্যে লেখা।

২ ইনি অবশ্য অনেক পরের কবি।—সুকুমার সেন, ইসলামি বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ১১০, ১১১ পশ্য।

www.BanglaBook.org

তাই প্রশ্ন, সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে যাঁরা বাংলা কাব্যে বিদেশী সুর আনলেন, তাঁরা উত্তম ফার্শী এবং আরবী শব্দ বাঙলাতে আমদানি করলেন না কেন?

দর্শনের অনুশাসনে, যে প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে তোমার কণামাত্র ধারণা নেই, যে উত্তর কোন্ দিক দিয়ে আসতে পারে না আসতে পারে সে সম্বন্ধে তুমি কণামাত্র কল্পনা করতে পারো না, সে প্রশ্ন প্রশ্নই নয়, সে প্রশ্ন বাতিল ইনভ্যালিড। তাই আমার মনে যে কাল্পনিক 'উত্তর' এসেছে সে দুটির ইঙ্গিত দিই।

প্রবন্ধান্তরে বলেছি, বাঙলা দেশ চিরকালই বিদ্রোহী। এ-দেশ মুসলমান আগমনের পর থেকে সুভাষ বসু পর্যন্ত একমাত্র জাহাঙ্গীর থেকে আওরঙ্গজেবের আমলে কেন্দ্রের অর্থাৎ দিল্লী-আগ্রার হুকুম তামিল করেছে। বস্তুত পাঠান মোগল প্রায় সব বাদশাকেই এ-দেশে আসতে হয়েছে 'বিদ্রোহ দমন করতে'—আমরা অবশ্য বলবো, আমাদের স্বাধীনতা হরণ করতে। বিশেষত বাঙলার স্বাধীন পাঠান রাজাদের আমলের তো কথাই নেই। তখন বাংলা দেশ চীনের সঙ্গে রাজদূত বিনিময় করছে, প্রতিবেশী জৌনপুরী রাজাদের সঙ্গে কখনও লড়াই করছে, কখনও আশ্রয় দিচ্ছে, এবং জনশ্রুতি যে, বাঙলা দেশে স্বাধীন রাজা ইরানের কবি হাফিজকে বিস্তর সওগাৎ পাঠিয়ে দাওয়াৎ করেছেন এদেশে। অবশ্য নৌপথে।

এখানেই হয়তো রহস্যদ্বারের গুপ্ত কুঞ্চিকা।

স্থলপথে ইরান যাবার কথাই ওঠে না। মাঝখানে জৌনপুর, দিল্লী, লাহোর, কান্দাহার, হিরাত কত না স্বাধীন রাজত্ব! একে অন্যের সঙ্গে লড়ছে হরবকৎ। নিরীহ কবি, চিত্রকর, গায়কের তো কথাই ওঠে না, ইরান-তুরানের ভাগ্যান্বেষী যোদ্ধারা পর্যন্ত মেরে কেটে হয়তো দিল্লী অবধি দু-একজন এসে পৌঁছেছে, 'দিল্লী দূর অস্ত্' বরঞ্চ 'দিল্লী নজ্‌দীক্ মীশওদ' (দিল্লী কাছে এল), কিন্তু 'বাঙলা দূর অস্ত্' শুধুই নয় 'দূরান্তর অস্ত'।

এদিকে বাঙলার স্বাধীন সুলতানদের মাতৃভাষা ফার্সী নয়, ফার্সী তাদের কোর্ট লেনগুইজ মাত্র—এমন কি স্টেট লেনগুইজও নয়—যত দিন যাচ্ছে ততই তাঁরা সে ভাষা ভুলে যাচ্ছেন, ওদিকে ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে বিদেশাগত নূতন কবি নূতন লেখক সে ভাণ্ডারের মাল নিয়ে আসছেন না, রাজদরবারেই যখন ফার্সী দিনের পর দিন শুকিয়ে আসছে তখন জনসাধারণে সে-ভাষা প্রচলিত ও প্রসারিত হবে কি করে?

দু-চারজন পণ্ডিতদের কথা সব সময়ই আলাদা। রামমোহন হীব্রু জানতেন, হরিনাথ দে না জানি কটা বিদেশী ভাষা সে-সব দেশে না গিয়ে এমন কি সে-সব ভাষার পণ্ডিতদের সংস্পর্শে না এসেও শিখতে পেরেছিলেন। অবশ্য স্বাধীন বাঙলায় তাঁর চেয়ে অনেক বেশী আলিম ফাজিল ছিলেন কিন্তু এঁদের প্রায় সকলেরই ছিল 'কাফিরদের' ভাষা বাঙলার প্রতি গভীর অশ্রদ্ধা (ঐ যুগের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদেরও বাঙলার প্রতি বিশেষ কোনও শ্রদ্ধা ছিল না)। এঁরা বাঙলায় কাব্য এমন কি ধর্মালোচনা করতেও কড়া নারাজ করতেন। কিন্তু যেখানে স্টেটের খানিকটা উৎসাহ পাওয়া যাচ্ছে সেখানে ওটাকে কিছুটা উপেক্ষা করা যায়। তাই দৌলত কাজী, আলা-ওল সৈয়দ সুলতান ইত্যাদি কবিদের আবির্ভাব।[১] পূর্বেই

১ 'সৈয়দরা' নিজেদের মহাপুরুষ মুহম্মদের বংশধর বলে দাবী করেন। মুসলমান ধর্মে যদিও সৈয়দদের বিশেষ কোনও সম্মান দেখাবার নির্দেশ নেই তবু কার্যত এঁরা অনেকটা ব্রাহ্মণদের সম্মান পান। তার কারণ অবশ্য অংশত এই যে এঁদের ভিতরই ইসলামী শাস্ত্রচর্চার প্রচলন ছিল

www.BanglaBook.org

বলেছি এঁরা ফার্সী জানতেন উত্তম কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ তত্ত্বটিও বিলক্ষণ অবগত ছিলেন যে তাঁদের পাঠকমণ্ডলী, কি মুসলমান কি হিন্দু কেউই বিদেশী আরবী ফারসীর সঙ্গে সুপরিচিত নন। কাজেই আসল উদ্দেশ্য সমাধান হবে না আদপেই।

(এর সঙ্গে আজকের দিনের একটি তুলনা দিতে পারি। খবরের কাগজে মাঝে মাঝে দেখি, কোনও পশ্চিমবঙ্গবাসী ঢাকার কোনও উটকো খবরের কাগজ থেকে আরবী-ফার্সী মিশ্রিত বাঙলা উদ্ধৃত করে আর্তরব ছাড়ছেন, এত বেশী আরবী-ফার্সী শব্দ যদি ঢাকার লেখকরা ব্যবহার করেন তবে এক নূতন ভাষার উদ্ভব হবে এবং বঙ্কিম-রবির বাঙলা 'দ্বিখণ্ডিত' হয়ে যাবে। এঁরা যদি অনুগ্রহ করে ঢাকার নিত্যকার খবরের কাগজ পড়েন, লেখকদের সাহিত্য রচনা পড়েন তবে দেখতে পাবেন ঢাকা সেই বাঙলাই লিখেছে কলকাতা যে বাঙলা লেখে—দু-চারটি 'আব্বা', 'আম্মা', 'ফজরের নামাজে'র কথা হচ্ছে না, তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী আরবী-ফার্সী শব্দ আলাল হুতোমে আছে—এবং তার কারণ দৌলত কাজী, আলাওলের বেলায় যা হয়েছিল তা-ই। ঢাকার উত্তম ফার্সী জাননেওয়ালা লেখকও বোঝেন যে তিনি ফার্সী জানলে কি, তাঁর পাঠকের অধিকাংশই যে ফার্সী জানেন না। এস্থলে অবশ্য মডার্ন কবিদের মত যাঁরা মনে করেন, যত দুর্বোধ্য লেখা যায় ততই 'সুবোধ পাঠক' প্রশংশা করবে বেশী, তাঁদের কথা হচ্ছে না।)

আকবরের আমলেই প্রথম অবস্থার পরিবর্তন আরম্ভ হয়। কিন্তু তার আগে আমার আরেকটি প্রশ্ন আছে।

ইংরিজি শব্দ যখন প্রথম বাঙলাতে ঢুকতে আরম্ভ করে তখন লেখা হয়েছিল 'লভ', 'কালেজ' ইত্যাদি; আজ আমরা লিখি 'লাভ' 'কলেজ'। আজ আবার দেখতে পাই, 'স্যুটিং' 'শুটিং', 'হাসপাতাল', 'হাঁসপাতাল' একই শব্দ দুই বা তিন রকমে লেখা হচ্ছে। তার উপর জুটেছে এসে আরেক আপদ। ছেলে-ছোকরারা ফরাসী, জর্মন ভাষাতে ওকীব-হাল হয়ে উঠেছে, 'পারি' 'পারী' এমন কি দু-আঁসলা 'প্যারি' পর্যন্ত দেখা দিচ্ছে,—'প্যাঁসনে', 'পাঁশনে' আরও কত কী?

দৌলত কাজী ইত্যাদি লেখকগণ মাত্রাধিক আরবী-ফারসী শব্দ বে-এক্তেয়ারভাবে গ্রহণ করেননি সত্য কিন্তু কিছু পরিমাণে তো করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তখন তাঁরা আমাদেরই মত এলোপাতাড়ি যাঁর যা খুশী করেছিলেন, না কতকগুলো সুস্পষ্ট আইন বেঁধে নিয়ে সেগুলো যতদূর সম্ভব মানাবার চেষ্টা করেছিলেন?

যেমন মনে করুন এ যুগের মরমিয়া কবি হাসন রাজা গাইলেন,

"মম আঁখি হৈতে পয়দা আসমান জমিন,
কানেতে করিল পয়দা মুসলমানী দিন।"

এখানে 'দিন'-কে যদি বাঙলা 'দিবস' অর্থে নেওয়া হয় তবে ছত্রটির কোনও ব্যাখ্যা করা যায় না। আসলে শব্দটি আরবী 'দীন' অর্থাৎ ধর্ম। অর্থ দাঁড়ালো 'আমার কানে এসে

বেশী। এবং ঠিক যেরকম, ব্রাহ্মণরাই শাস্ত্র বানায় এবং শাস্ত্র ভাঙ্গে তারাই—রামমোহন বিদ্যাসাগরের কথা স্মরণ করুন—ঠিক সেই রকম ধর্ম, সমাজ-সংস্কার, সাহিত্য-সৃষ্টিতেও সৈয়দের ভাঙা-গড়ার সাহস বেশী। হিন্দুর বৈষ্ণব পদাবলী রচনায় যে মুসলমান কবি সম্মানের সর্বোচ্চ আসন পেয়েছেন তাঁর নাম সৈয়দ মোর্তুজা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মুসলমানী ধর্মের খবর পৌঁছিল বলে সে ধর্ম তার অস্তিত্ব পেল, যেরকম আমি যখন আঁখি মেলে চাইলুম তখনই দ্যুলোক ভূলোকের সৃষ্টি হল।' কট্টর আদর্শবাদীর (আইডিয়ালিস্ট স্কুল) মত হাসন রাজা বলেছেন, 'ত্রিলোকের চিন্ময় মৃন্ময় জগৎ তাদের অস্তিত্বের জন্য আমার চিত্ত ও পঞ্চেন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করছে। আমি না থাকলে এসবের অস্তিত্ব নেই।'

পুনরায় বলেছেন,

"আমা হইতে আসমান জমিন, আমা হইতে সব
আমা হইতে ত্রিজগৎ, আমা হইতে রব।"

এখানে 'রব' আওয়াজ এই অর্থে নিলে সদর্থ হয় না। আরবী 'রব' শব্দের অর্থ 'ভগবান'। হাসন রাজা বলতে চান, 'আমার চৈতন্য যদি ভগবানের অস্তিত্বের কল্পনা না করতো তবে তাঁর স্বয়ম্ভু অস্তিত্বই হত না।'

॥ দুই ॥

টকির কল্যাণে আমরা একটা জিনিস সম্বন্ধে সচেতন হয়েছি, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। টকি আসার পূর্বে আমরা ভাবতুম, আমরা রকে বসে বেহারী মুটের সঙ্গে সে উচ্চারণে হিন্দী কথা বলি, সেইটেই অতি বিশুদ্ধ হিন্দী উচ্চারণ, এবং ক্লাসে মাস্টার মশাই যে ইংরিজি উচ্চারণে টেনিসন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ পড়েন সেই উচ্চারণই অক্সফর্ড কেমব্রিজে চালু।

পৃথিবীর সর্ব আর্য ভাষা এমন কি সেমিতি ভাষাতেও একটি ধ্বনি কথায় কথায় আসে, কিন্তু বাঙলায় (এবং ওড়িয়া, আসামীতে) নেই। ইংরিজিতে 'the'-র 'ই' উচ্চারণ; ফরাসীতে 'le'-র 'e'; জর্মনের 'gegeben'-এর তৃতীয় 'e' উচ্চারণ; আরবী ফার্সী, হিন্দী, গুজরাতী, মারাঠীতে 'কলম' শব্দে 'ক' এবং 'ল'-এর মধ্যে 'ল' এবং 'ম'-এর মধ্যে যে উচ্চারণ আছে, সেটি বাঙলাতে নেই।

সোজা কথায় হিন্দীর 'আমি' বা 'আমরা' বলতে যে হম শব্দটি আছে তার 'হ' এবং 'ম'-এর মাঝখানে যে ধ্বনিটি আছে সেটা আমাদের কেউ শুনেছেন 'অ' এবং তাই লিখেছেন 'হম্' এবং অধিকাংশই শুনেছেন 'আ' এবং তাই লিখেছেন 'হাম'। এ যুগে সচেতন হয়ে আমাদের অনেকেই লিখতে আরম্ভ করেছেন 'হ্যম'। (উপস্থিত আমরা এই ধ্বনিটির নাম দিলুম 'অস্পষ্ট স্বর')।

দৌলত কাজী, আলাওলের সামনে সর্বপ্রথম এই 'অস্পষ্ট ধ্বনি' নিয়েই এল সমস্যা। কলম জবরদস্ত, মক্কা, মদিনা ধরনের অসংখ্য আরবী ফার্সী শব্দে আছে এই অস্পষ্ট ধ্বনিটি; এটাকে প্রকাশ করেন কোন্ চিহ্ন দিয়ে? 'কলম' না 'কালাম', না 'কল্যম' (আজকে পূর্বোল্লিখিত 'হ্যম'-এর মত)?

আলাওলরা অনেকেই সংস্কৃত জানতেন, এবং এটিও জানতেন যে সংস্কৃতে এ ধ্বনিটি আছে বটে, কিন্তু বাঙালী উচ্চারণ করে 'অ' রূপে। যেমন সংস্কৃতে 'কমল' শব্দের 'ক' এবং 'ম'-এর মাঝখানে আছে সেই 'অস্পষ্ট স্বর', কিন্তু বাঙালী সেই অস্পষ্ট ধ্বনির পরিবর্তে 'কমল' উচ্চারণ করে 'অ' দিয়ে, অর্থাৎ বাঙলা শব্দ 'ঘর' উচ্চারণ করতে যে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'অ' উচ্চারণ করি সেই 'অ' দিয়ে।

তাই তাঁরা মনে মনে আন্দেশা করলেন, সংস্কৃতের 'কমল' এবং আরবী-ফার্সীর 'কলমে' যখন একই উচ্চারণ তখন এই ধ্বনি প্রকাশের সময় বাঙলায় কোনও পরিবর্তন না করাই ভাল। অবশ্য তাঁরা 'কলম' না লিখে 'কালাম' লিখতে পারতেন (আজকে যে রকম কেউ কেউ 'হদিস' না লিখে 'হাদিস' লেখেন, 'বরকৎ' না লিখে 'বারাকৎ' লেখেন) কিন্তু তা হলে বিপদ হত যে, দীর্ঘ আ-কার-যুক্ত 'কালাম' নামক যে ভিন্ন শব্দ আছে সেটার অর্থ 'বাণী'—আবুল কালাম আজাদ-এর অর্থ 'বাণীর পিতা, যিনি স্বাধীন') সেটাতে এবং 'লেখনী'তে (অর্থাৎ 'কলম'-এ) যে পার্থক্য আছে সেটা আর লেখাতে দেখানো যেত না।'

অবশ্য তাঁরা 'কালাম' (কলমের জন্য, এবং 'কালাম' বাণীর জন্য) লিখতে পারতেন কিন্তু সেটা করতে গেলে অন্যান্য নানা বিপদের সম্মুখীন হতে হয়—এবং সে দীর্ঘ আলোচনার জন্য এ-স্থলে স্থানাভাব।

এই আইন তাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু বাঙালী কি ভাবে 'অ' এবং 'আ' উচ্চাবণের ভিতর পার্থক্য করে সে-সম্বন্ধেও বিলক্ষণ সচেতন ছিলেন বলে একটি ব্যত্যয় তাঁরা করে দিয়েছিলেন। আরবী ফার্সী শব্দের আদ্যক্ষরে 'আলিফ', 'আয়েন', বা 'হে' থাকলে সেখানে 'আ' ব্যবহার করেছেন—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। তাই 'অল্লা' 'অহমদ' না লিখে লিখেছেন 'আল্লা', 'আহমদ'; 'অব্দুলে'র বদলে 'আব্দুল' এবং 'হমিদে'র 'হসেনে'র পরিবর্তে 'হামিদ' 'হাসেন'।

দ্বিতীয় সমস্যা ছিল দীর্ঘ হ্রস্ব নিয়ে। সংস্কৃত 'দিন' এবং 'দীন' উচ্চারণে, 'কুল' এবং 'কূল' উচ্চারণে আমরা কোনও পার্থক্য করি না, এমন কি সংস্কৃত পড়ার সময়ও না। তাই তাঁরা স্থির করলেন যে, বাঙালাতে আরবী-ফার্সী শব্দ লেখার সময় তাঁরা সব শব্দই হ্রস্ববর্ণ দিয়ে লিখবেন। কাজেই আরবী 'ধর্ম' অর্থে 'দীন' শব্দ যদিও দীর্ঘ উচ্চারণে আছে তবু তাঁরা বাঙলাতে দিন-ই লিখলেন, এবং ঠিক সেই মত 'নূর' 'রসূল' না লিখে 'নুর' 'রসুল' লিখলেন।

তৃতীয় সমস্যা, সংস্কৃতে শ, ষ, স-এর তিনটি ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ। আমরা বাঙলাতে তিনটিকেই এক উচ্চারণ 'শ' অর্থাৎ 'sh'-এর মত করে থাকি। শুধু সংযুক্তের বেলা এবং অন্যান্য কোনও কোনও স্থলে ইংরিজি 's'-এর উচ্চারণ, অর্থাৎ খাঁটি সংস্কৃত 'স'-এর উচ্চারণ করে থাকি। মস্তক, পুস্তক, আস্তে, শ্রাবণ, প্রশ্ন ইত্যাদিতে আমরা 'শ' উচ্চারণ না করে 'স', অর্থাৎ 'sh' না করে 's' করে থাকি। আরবী-ফার্সীতে আছে চার রকমের ঐ ধরনের উচ্চারণ। মুসলমান আদি-লেখকেরা বাঙলা উচ্চারণপদ্ধতি মেনে নিয়ে একটি 'স' দিয়েই সব কারবার চালাবার চেষ্টা করেছেন। তবে পুব বাঙলায় ছ অক্ষর 'স'-এর মত উচ্চারিত হয় বলে মাঝে মাঝে (পরবর্তী যুগে এবং আধুনিক কালে আকছারই) 'ছ' এসে 'স'-এর স্থান নিয়েছে।

এ আলোচনার সর্বশেষে কিন্তু নির্ভয়ে একটি কথা বলা যেতে পারে। মুসলমান আদি-লেখকেরা বাঙলা উচ্চারণকে পরিপূর্ণ সম্মান দিয়ে ছাড়ই রীতিনীতি মেনে নিয়েছিলেন। উদ্ভট বিদকুটে বানান লিখে নূতন নূতন ধ্বনি আমদানির বন্ধ্যাগমন করেননি। আরবী-ফার্সী শব্দের বাঙলা বানানে প্রথম ভূতের নৃত্য আরম্ভ হল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন ১৯৩৬ সালে বাঙলা বানান নিয়ন্ত্রণ ও সরল করতে চাইলেন। কিন্তু সে আলোচনা

www.BanglaBook.org

অতিশয় দীর্ঘ হয়ে পড়বে, আমার জ্ঞানও অতিশয় সীমাবদ্ধ এবং তদুপরি আমার বিলক্ষণ জানা আছে, এ আলোচনায় অধিকাংশ পাঠকেরই কোনও উৎসাহ নেই। তবু যে আমি করছি, তার কারণ, বাঙলা বানানের অরাজকতার মাঝখানে একথাও সত্য যে বাঙলার একাধিক তরুণ নানা ভাষার দিকে আকৃষ্ট হওয়ার ফলে নানা শব্দ ও ধ্বনির প্রতি মনোনিবেশ করেছেন। তাঁরা যদি এসব বিষয়ে গবেষণা করেন তবে আমার 'নানা প্রশ্নে'র কিছুটা উত্তর আমি হয়তো পাব।

এটা অবশ্য একেবারে সম্পূর্ণ নূতন নয়। গত শতাব্দীর শেষের দিকে বানানের অরাজকতা দূর করার জন্য সাহিত্য-পরিষদ (?) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে (?) অনুরোধ করেন, তিনি ঐ সম্বন্ধে নির্দেশ দেন। আমার যতদূর জানা আছে, তিনি সে কার্য শেষ করে উঠতে পারেননি। আমার এ মন্তব্যে ভুল থাকতে পারে, কারণ সমস্ত জিনিসটা আমার আবছা-আবছা মনে আছে।

শেষ প্রশ্ন :—

বাঙলা বাক্যগঠন, পদবিন্যাস অর্থাৎ সিনটেক্‌স্ এল কার অনুকরণে?

ফার্সীতে বলি, চুন (যখন) পাদশা (বাদশা) মরা (আমাকে) দীদন্দ (দেখলেন) উনহা (উনি) গুফতন্দ (বললেন) তু (তুই) কুজা (কোথায়) মীরওয়ী (যাচ্ছিস্)?

হুবহু একই সিনটেক্‌স্?

ফার্সী থেকে?

এবং সবশেষে প্রশ্ন :—

আমরা যে গোটা গোটা বাঙলা লেখার সময় এবং সাইন-বোর্ডে বাঙলা অক্ষরের কোনও জায়গায় মোটা কোনও জায়গায় সরু করি সেটা এল কোথা থেকে? ফার্সী লেখার কলম (—আমাদের প্রাচীন লেখনী বা লোহার স্টিলো না—) ব্যবহার করেছিলুম বলে?

জাতীয় সংহতি

মনে নানা প্রশ্নের উদয় হয়।

এই যে ফার্সী নামক ভাষা এটি সাতশ' বছর ধরে ভারতের রাষ্ট্রভাষা ছিল। যদিও পাঠান ও মোগল কারোরই মাতৃভাষা ফার্সী ছিল না। শেষ বাদশা বাহাদুর শা বাদশার অন্তঃপুরেও তুর্কী বলা হত। যদিও রাজদরবারে ফার্সী চলতো, কিন্তু কবিসম্মেলনে প্রধানত উর্দু।

ইংরেজও প্রথম একশ' বছর এ দেশে ফার্সী দিয়েই কর্ম চালায়। ১৮৪০-এর কাছাকাছি একদিন তারা ফার্সী নাকচ করে দিয়ে ইংরিজি চালালে। যে হিন্দু কায়স্থরা একদা অত্যুত্তম ফার্সী শিখে পদস্থ রাজকর্মচারী হতেন, তাঁরা ৫০/৬০ বছরের ভিতর ফার্সী বেবাক ভুলে গিয়ে ইংরিজির মাধ্যমে রাজকর্ম চালিয়ে যেতে লাগলেন। অনেকের মুখে শুনি, কলকাতা হাইকোর্টে নাকি এখনও তাঁদের প্রাধান্য অতুলনীয়। বাদবাকি ভারতবর্ষে এখন কজন লোক ফার্সী জানেন সেটা বের করতে হলে দিনের বেলাও লণ্ঠন নিয়ে বেরুতে হয়। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই কথা হচ্ছে—অবশ্য এই দুই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সম্প্রদায়েরই যাঁরা উর্দুর শক্ত গোড়াপত্তন করতে চান তাঁরা ফার্সী শেখেন—বাঙালী যেমন আপন বাঙলাকে জোরদার করতে হলে সংস্কৃত শেখে।

যে ফার্সী প্রায় সাতশ' বৎসর ধরে ভারতবর্ষে দাবড়ে বেড়াল, হাজার বছর ধরে তুর্কীস্থান থেকে তাইগ্রীস নদ অবধি রাজত্ব করলো (লাতিনের মতই ফার্সীকে সে যুগের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা বলা যেতে পারে) সেই ফার্সীই পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর ভারতবর্ষে লোপ পেল!

ইংরিজি মাত্র একশ' বছর রাজত্ব করেছে। তার লোপ পেতে কত দিন লাগবে?

শ্রদ্ধেয়া বিজয়লক্ষ্মী সেদিন বলেছেন, 'ইংরিজি আমাদের লিগেসি, ওটা আমরা ছাড়ব কেন? তাঁর পুণ্যশ্লোক স্বর্গীয় পিতা মোতীলাল ফার্সীকে তাঁর লিগেসি মনে করতেন। ইংরেজ আমলে একদা দিল্লীর বিধানসভায় দুই ইংরেজ একে অন্যকে প্রচুর অহেতুক প্রশংসা করলে পর মোতীলালজী বললেন, 'ফার্সীতে একটি সুন্দর প্রবাদ আছে : "মন্ তোরা হাজী মীগোইম্, তো মরা কাজী বগো!" অর্থাৎ আমি তোমাকে হাজী বলে সম্বোধন করবো, আর তুমি আমাকে কাজী বলে সম্বোধন করো—অথচ ইনিও মক্কাতে গিয়ে হজ করেননি, উনিও কাজী বা ম্যাজিস্ট্রেট নন।' সেই ফার্সী ভাষার লিগেসি গেছে,—ইংরিজির কবে যাবে?

পাঠক ভাববেন না, আমি ইংরিজি তাড়াবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছি। আদপেই না। নিজের স্বার্থেই আমি চাই, ইংরিজি থাকুক—এই বৃদ্ধ বয়সে কোথায়, মশাই, হিন্দীর 'গাড়ি আতী হৈ, জাহাজ জাতা হৈ' লিঙ্গ মুখস্থ করে করে হিন্দী যাঁদের মাতৃভাষা তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিতে যাব! যে কটা দিন বেঁচে থাকবো, ইংরিজি ভাঙিয়েই খাব। সে কথা হচ্ছে না। কথা হচ্ছে, আমি আপনি চাইলে না চাইলেও ইংরিজির ভাগ্যে যা আছে তা হবেই।

আরেকটি উদাহরণ নিন। এ-বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ ওকীবহাল নই—যা শুনেছি তাই বলছি। ইংলন্ডে নাকি নরমান বিজয়ের ফলে ফরাসী রাষ্ট্রভাষা হয়ে যায়, এবং তামাম ইংলন্ডের লোক নাকি পড়িমড়ি হয়ে ফরাসী শেখে। কবি চসারের সামনে নাকি সমস্যার উদয় হয়, তিনি ফরাসী না ইংরিজিতে কাব্য রচনা করবেন? (ভাগ্যিস ইংরিজিতে করেছিলেন, কারণ ফরাসী লিখে কোনও ইংরেজ যশ অর্জন করেছেন বলে শুনিনি; এদেশে যেমন আটশ' বছর ফার্সী চর্চার পর এক আমীর খুসরৌই কিছুটা নাম করতে পেরেছেন—তাও তাঁর মাতৃভাষা ছিল ফার্সী)।

নরমান বিজয় খতম হওয়ার পরও ইংরেজ আপ্রাণ চেষ্টা করেছে অন্তত ফরাসী লিগেসি যেন মকুব না হয়ে যায়। কোটি কোটি পৌণ্ড খর্চা করে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে ফরাসী শিখিয়েছে, কাচ্চা-বাচ্চার জন্য ফরাসী গভার্নেস রেখেছে, ছুটিছাটা পেলেই প্যারিস পানে ধাওয়া করেছে। আর তার ভাষার ভাই মার্কিনও ফরাসী মস্তিতায় কিছুমাত্র কম নয়। শুনেছি, মার্কিনী ইংরিজিতে নাকি প্রবাদ আছে, 'সাধু মার্কিনেরই মৃত্যুর পর প্যারিস-প্রাপ্তি হয়—' সেই তার স্বর্গপুরী, মুসলমানের বেহেশৎ, হিন্দুর কৈলাস-বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তির মত।

ফরাসী শেখানোর বাজে খর্চা যাঁরা কমাতে চান তাঁরা নাকি হালে হাতে-কলমে সপ্রমাণ করেছেন যে, লন্ডনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে শিক্ষিত ইংরেজকে ফরাসীতে প্রশ্ন শুধোলে

www.BanglaBook.org

শতেকে গোটেক ফরাসীতে উত্তর দিতে পারে, কি না পারে।

শুনেছি ব্রিজ দিয়ে নাকি ফ্রান্স-ইংলন্ডে যোগ করে দেওয়া হবে। হায় রে কপাল! যখন ভাষার সেতু ছিল, তখন লোহার সেতু ছিল না; এখন লোহার সেতু হচ্ছে তো ভাষার সেতু নেই!

আরেকটি উদাহরণ দিই। খ্রীষ্টধর্ম ইয়োরোপে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হবার পর খ্রীষ্টভক্তগণের বাসনা হল, খ্রীষ্টধর্মের কল্যাণে সমস্ত ইয়োরোপে যে এক নবীন ঐক্য দেখা দিয়েছে সেটা যেন লোপ না পায়। তাই তাঁরা আপ্রাণ লাতিন আঁকড়ে ধরে রইলেন। পাছে সেই ঐক্য লোপ পায়, তাই দেশজ অনুন্নত ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ পর্যন্ত করতে দেওয়া হত না (মুসলমানরাও বহুকাল কোরাণের ফার্সী কিংবা উর্দু, বাঙলা অনুবাদ করতে দিতে চাননি, ঐ একই কারণে)। লুথারের অন্যতম প্রধান সংস্কার ছিল জর্মন ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ প্রচার। ফলে শেষ পর্যন্ত ফরাসী লাতিনের স্থানটি কেড়ে নিল —এই সেদিন পর্যন্ত জর্মনভাষী ফিড্রিক দি গ্রেট ফরাসী কবি ভলতেয়ারকে নিমন্ত্রণ করে তাঁর অতি-কাঁচা ফরাসী কবিতা মেরামত করিয়ে নিতেন—এবং সর্বশেষে ইয়োরোপের সর্বভাষা আপন আপন দেশে মাথা খাড়া করে দাঁড়ালো। ইস্তেক ডেনিশ, ফিনিশ পর্যন্ত। লাতিন-ফরাসী সংহতি গেল। অনেক পর্যটকের মুখে শুনতে পাবেন—সে আসন এখন ইংরিজি নিচ্ছে। শুনে হাসি পায়। হোটেলবয়রা কিছুটা ইংরিজি বলতে পারে বইকি, যেমন মাদুরার হোটেলবয়ও কিঞ্চিৎ হিন্দুস্থানী কপচায়, কিন্তু প্যারিস কিংবা ভিয়েনার রাস্তায় ঐসব দেশবাসীর সঙ্গে ইংরিজিতে দু'দণ্ড রসালাপ করবার চেষ্টা দিন না, দেখুন না ফলটা কি হয়।

আমি যদি বলি, সমস্ত ইয়োরোপে যতখানি ইংরিজি বলা হয়, তার তুলনায় ভারত পাকে বেশী হিন্দুস্থানী বলা হয়, তবে ভুল বলা হবে না—অবশ্য বই পড়ার কথা হচ্ছে না, সেটা নির্ভর করে জনসাধারণে শিক্ষার বিস্তৃতির উপর।

অর্থাৎ ইংরিজি ও লাতিন সংহতি এনে দিতে পারবে না।

কিন্তু সব চেয়ে চমৎকার উদাহরণ আরব-আফ্রিকা ভূখণ্ডে। ইরাক থেকে আরম্ভ করে সিরিয়া, লেবানন, মিশর, তুনিস, আলবজজরিয়া, মরক্কো, এদিকে কুয়েইত, বাহরেন, মক্কা-মদিনা, ইয়েমেন, জর্ডন, সর্বত্রই আরবী প্রচলিত। লেবানন বাদ দিলে এদের প্রতিটি রাষ্ট্রে চৌদ্দ আনা পরিমাণ লোক মুসলমান এবং উত্তর আফ্রিকার কিছু বের্‌বের্‌ কপ্তীক ও নিগ্রো রক্ত বাদ দিলে সকলের ধমনীতেই প্রায় আভেজাল সেমিতি রক্ত।

কিন্তু কোথায় সেই আরব সংহতি?

প্রাচীন দিনের কাহিনীতে ফিরে যাব না। এই আপনার আমার চোখের সামনেই দেখতে পেলুম, ইরাক সে-সংহতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে, কুয়েইত জাতভাই কাসেমের হাত থেকে বাঁচবার জন্য বিধর্মী (কারও কারও মতে 'কাফের') ইংরেজকে দাওয়াত করে খানা খাওয়ালে, এবং পরশু না তরশু দিন সিরিয়াও নাহেরের মিশরীদের গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিলে। এমন কি সিরিয়ার মসজিদে মসজিদে নাকি মোল্লারা নাসেরকে অভিসম্পাত দিচ্ছেন, নাসের নাস্তিক, টিটোর সঙ্গে কোলাকুলি করে, তারই আশকারায় মিশরের টেলিভিশন অশ্লীল ছবি, অর্ধনগ্না রমণী দেখায়!

এক ধর্ম, এক রক্ত, এক ভাষা। এক ভাষা, বিশেষ করে বললুম, কারণ সিরিয়া,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইরাক, মিশরের কথ্য ভাষাতে প্রচুর পার্থক্য থাকলেও ওসব জায়গায় কোনও উপভাষা সৃষ্টি হয়নি—সেই এক হাজার বছরের পুরনো ক্লাসিকাল আরবীই সর্বত্র চলে। তবু আর মিলন হয়ে উঠছে না।

* * *

কাজেই সংহতির সন্ধানে অন্যত্র যেতে হবে। গুজরাতী, বাঙালী, হিন্দু, মুসলমান, সবাই মিলে হিন্দী কপচালেই যে রাতারাতি আমাদের জাতীয় সংহতি গড়ে উঠবে, এ-দুরাশা যেন না করি।

রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী বলেই বলছি তা নয়, আমার মনে হয়, তিনিই এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশী পরিষ্কার চিন্তা করেছেন।

ভারতীয় সংহতি

ভারতীয় সংহতি তবে কোথায়?

এস্থলে নিবেদন করে রাখি যে আমার ধারণার সঙ্গে অল্প লোকেরই ধারণা মিলবে ও যাঁদের সঙ্গে মিলবে তাঁরা এবং আমিও এ-দুরাশা পোষণ করি না যে বিংশ শতাব্দীর লোক আজ অথবা অদূর ভবিষ্যতে আমাদের বক্তব্য কান দিয়ে শুনবে।

বেদ উপনিষদ নমস্য কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষেই এসবের চর্চা অতি কম। এমন কি পণ্ডিতদের মুখে শুনেছি, গীতা পর্যন্ত এদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বিশেষ প্রচলিত ছিল না।

আপনি ভারতবর্ষের যে কোনও গ্রামে যান না কেন, তা সে মালাবারে আসামে পাঞ্জাবেই হোক—সেখানকার লোকনাট্য চারণ গানে সর্বত্রই মহাভারত রামায়ণ বিরাজিত। জনপদবাসীর রসাস্বাদনের প্রধান উৎস রামায়ণ মহাভারত। আমি একবার মালাবারের গ্রাম্য কথাকলি দেখতে এবং শুনতে গিয়ে তিন মিনিটেই বুঝে যাই, হনুমান সভাজনকে সালঙ্কার বর্ণনা করছেন, তিনি কি করে লঙ্কায় উপস্থিত হলেন, নগর পরিদর্শন করলেন, লঙ্কার কদলীবনে কি প্রকারে লঙ্কাকাণ্ড ঘটালেন, অবশেষে রাবণের অনুচর তাঁর পুচ্ছটিতে অগ্নিসংযোগ করলে তিনি কি প্রকারে গৃহ থেকে গৃহান্তরে লম্ফপ্রদান করে নগরীতে ব্যাপকভাবে বহ্নি প্রজ্বলিত করলেন। মালায়ালম ভাষার এক বর্ণও না জেনেও আমি স্বচ্ছন্দে গল্পটি উপভোগ করলুম।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যাঁরাই পরিভ্রমণ করেছেন তাঁরাই জানেন, রামায়ণ মহাভারত ভারতীয় জীবনের কতখানি গভীর অতলে প্রবেশ করেছে।

এবং এই নাট্যনৃত্য উপভোগ করে শুধু হিন্দু না, মুসলমানও। কারণ ভারতীয় হিন্দু মুসলমানের মাতৃভাষা এক। বাঙ্গলার মুসলমানের মাতৃভাষা যেমন বাঙলা, গুজরাতী মুসলমানের মাতৃভাষাও গুজরাতী। লক্ষ্ণৌয়ের মুসলমানের মাতৃভাষা যেমন উর্দু, হিন্দুরও তাই—এখন অবশ্য হিন্দী ক্রমে ক্রমে উর্দুর জায়গা দখল করে নিচ্ছে। মাতৃভাষায় আমোদ-আহ্লাদ করাটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা—শুনেছি দেশবিভাগের পরও 'হরহর মহাদেব' ফিল্ম ঢাকাতে সে বক্স আপিস ভরলে তাতে সিনেমার মালিকগণ বিস্মিত হন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু অমিলও আছে।

ধর্মজগতে হিন্দু ভীষ্ম-কর্ণকে আদর্শ বলে ধরে নেয়, মুসলমান নেয় না। গোব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা করবার কোনও কারণও মুসলমানের নেই। অবশ্য আউল-বাউল মুর্শিদীয়া মিস্টিকগণের গানে কিছুটা রামায়ণ-প্রীতি পাওয়া যায়, কিন্তু ভারতীয় মুসলমান ব্যাপকভাবে সেটা গ্রহণ করেনি।

* * *

রামায়ণ-মহাভারতের উৎস থেকে সঞ্জীবনী-সুধা আহরণ করে হিন্দু সংহতি পুনর্জীবিত করা যায়—অবশ্য যদি সাহিত্যিক, সমাজপতি, রাজনৈতিক নেতাদের এ পন্থায় আস্থা থাকে এবং সে কর্মে নিজেদের নিয়োগ করেন, বিনোবাজী যে রকম করেছেন, কিন্তু যদি ভারতীয় সংহতির কথা তোলা যায় তবে সমস্যাটা কঠিন হয়, কারণ ভারতবর্ষে মুসলমান খ্রীষ্টান পার্শী গারো নাগা আদিবাসীও আছেন। জৈনদের কথা তুলছি নে, কারণ একমাত্র উপাসনা পদ্ধতি বাদ দিলে তাঁরা সর্বার্থে হিন্দু।

সর্বপ্রথম প্রশ্ন, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য কোন্ জায়গায়? রসের ক্ষেত্রে যে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ সে-কথা পূর্বেই নিবেদন করেছি।

এখন যা বলতে যাচ্ছি, সেটি আমার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা থেকে।

ছেলেবেলা থেকেই আরব দেশাগত দু'একটি আরব মুসলিমের জীবনযাত্রা ও চিন্তাপদ্ধতির সঙ্গে আমার পরিচয়। পরবর্তী যুগে আরব দেশে থাকবার আমার সুযোগ হয়েছিল।

এঁদের ধর্মবিশ্বাস সরল। এঁরা বিশ্বাস করেন, আল্লাতালা এই বিশ্ব মানুষের আনন্দের জন্য সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু পাছে স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত লাগে তাই তিনি ধর্মের সৃষ্টি করেছেন। সেই ধর্মে কতকগুলি বস্তু ও আচরণ আল্লা বেআইনী বলে হুকুম দিয়েছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে, আল্লাতালা হুকুম দিয়েছেন, তুমি একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারো, যদি সকলকে সমান সম্মান সমান প্রেমের চোখে দেখতে পারো। না পারলে তোমার পক্ষে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা অন্যায়:

আরব ভূমি তথা অন্যান্য মুসলিম ভূখণ্ডে তাই যদি কেউ বৃদ্ধ বয়সেও পুনরায় ভার্যা গ্রহণ করে তবে তাই নিয়ে লোকনিন্দা হয় না। সমাজ ভাবে, সে একাধিক স্ত্রীকে সমান চোখে দেখতে পারবে কিনা, সে দায়িত্ব তার স্কন্ধে।

কিন্তু ভারতবর্ষের মুসলমান অর্থাগম হলেই দ্বিতীয় দারা গ্রহণ করে না। তার ভিতরে কেমন যেন একটা ত্যাগের আদর্শ আছে। তার বক্তব্য, 'আল্লাতালা আমাকে এটা সেটা অনেক কিছুই উপভোগ করতে দিয়েছেন সত্য কিন্তু আমি চেষ্টা করে দেখি না, আমার এগুলো না হলে চলে কিনা?'

এ-কথা বলা আমার আদৌ উদ্দেশ্য নয় যে কোরানে ত্যাগের আদর্শ নেই। বিস্তর আছে। বস্তুত জকাৎ (বাধ্যতামূলক দান-ক্ষয়রাত) ইসলাম সৌধের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ এবং নিতান্ত দীন-দুঃখী ছাড়া সকলকেই কিছুটা দান করতে হয়। তদুপরি সূফী এবং সাধুসন্ত সম্প্রদায় তো চূড়ান্ত ত্যাগের আদর্শই বরণ করে নেন। উপস্থিত এঁদের কথা হচ্ছে না। আমার বক্তব্য ভারতীয় মুসলিম যতখানি ত্যাগের আদর্শ বরণ করেছে—সে শুধু ধনদৌলতের বেলায়ই নয়, আমোদ-আহ্লাদ পারিতোষ-আনন্দের আভ্যন্তরীণ জগতেও—

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অন্যান্য মুসলিম ততখানি করেনি।

এই ত্যাগের মন্ত্র ভারতবর্ষে বহুকাল ধরে প্রচলিত।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা—অর্থাৎ তাকে ত্যাগের দ্বারা ভোগ করতে হবে।

* * *

এস্থলে ঈষৎ অবান্তর হলেও ত্যাগ সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ নিবেদন আছে।

যার কিছু নেই, উপার্জন করার কোনও ক্ষমতা নেই, তার মুখে 'ত্যাগ ত্যাগ' শোভা পায় না। বিশেষত এই বিংশ শতাব্দীতে। যখন অক্ষম জন সর্বদায়িত্ব এড়িয়ে 'ত্যাগে'র অছিলা ধরে সোশাল সার্ভিসের নাম করে আশা করেন, সমাজ তাঁকে পুষবে, এবং ভালো ভাবেই পুষবে, কারণ তিনি 'সর্বস্ব' (!) 'ত্যাগ' করেছেন, তখন আমার মন বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে (এরই অন্য উদাহরণ মহাত্মা গান্ধী বলেছেন—'শক্তিহীনের ক্ষমা ক্ষমা নয়)। সোজা কথা বিড়লা-টাটার দৌলত তাঁরাই ত্যাগ করতে পারেন,—আমি পারি নে, কারণ ও দৌলত আমার নয়।

ওদিকে আবার উপনিষদ বলেছেন, 'মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনম্!' অন্যের ধনের উপর লোভ করো না।

অর্থাৎ চাষা, মজুর, সাহিত্যিক, মাস্টার আপন আপন পরিশ্রম দ্বারা অর্থ উপার্জন করতে পারে, অন্যের ধনের প্রতি লোভ না করেও।

সেই ধন অর্জন করে ত্যাগের মাধ্যমে তাকে উপভোগ করতে হবে।

এই আদর্শ হিন্দু-মুসলমান দুয়েরই আছে, এবং বহু যুগ ধরে জীবনে উপলব্ধি করেছে বলে এই দৃঢ়ভূমির উপর জাতীয় ঐক্য গঠিত হতে পারে। তাহলে আর কোনও দ্বন্দ্ব থাকবে না।

শুধু তাই নয়, তা হলে ভারতবর্ষ যে শুধু শক্তিশালী রাষ্ট্র বলেই গণ্য হবে তা নয়, সে ভদ্রতম সম্ভ্রান্ততম রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃত হবে।

ভাষা

আমার আর একটি প্রশ্ন আছে :

এই যে লাকসমবার্গের মত ক্ষুদে রাষ্ট্র কিংবা জনবিরল ফিনল্যান্ড, কিংবা এ-ধরনের ছোট-বড় নানারকমের রাষ্ট্র রয়েছে, কোন্‌খানে দেশটা সে দেশের আপন ভাষায় না চালিয়ে অন্য কোনও বিজাতীয় ভাষায় চালানো হচ্ছে?

সুইজারল্যান্ডের লোক তিন অঞ্চলের তিন ভাষায় কথা বলে। জর্মন, ফরাসী এবং ইতালীয়। রোমান্‌শ ভাষায় এত কম লোক কথা বলে যে সেটার কথা না হয় নাই তুললুম। এদের সকলের পক্ষে দিশীই হোক আর বিদেশীই হোক—কাজ চালাতে যে বিস্তর সুবিধা হত সে বিষয়ে কি সন্দেহ? কত পয়সা খরচ করে তিন-তিনটে ভাষায় সরকারী-বেসরকারী বিস্তর জিনিস ছাপাতে হয়, তিন ভাষায় লোকে বক্তৃতা দেয় বলে পার্লামেন্টের কাজ দ্রুতগতিতে এগোয় না, এক অঞ্চলের জিনিস অন্য অঞ্চলে বেচতে হলে তার জন্য আলাদা বিজ্ঞাপন, আলাদা এজেন্ট রাখতে হয়, এবং আরও কত যে ঝামেলা তার ইয়ত্তা

www.BanglaBook.org

নেই। কিন্তু ওরা হাসিমুখে সব-কিছুই মেনে নিয়েছে।

তার কারণ মাত্র একটি, এবং সে-কারণ পৃথিবীর সর্বত্রই প্রযোজ্য।

মাতৃভাষা ছাড়া আর অন্য কোনও ভাষায় কাজ চালানো যায় না।

অবশ্য আজ যদি বাঙলা দেশ চালানোর জন্য একজন রাজা, তাঁর জনা পঁচিশ মনসবদার এবং একটি পুরুষ্টু সৈনদল থাকলেই যথেষ্ট হত—তাহলে ইংরিজি হিন্দী যে-কোনও ভাষা দিয়েই অল্পায়াসেই কাজ চালিয়ে নেওয়া যেত। যেমন ধরুন একটা চা-বাগানের ইংরেজ ম্যানেজার, গুটিকয়েক কেরানীতে ইংরিজির মারফতে দিব্য কাজ চালিয়ে নেয়। কিন্তু আজ পৃথিবীর অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে, আজ বাঙলা দেশের গ্রামে গ্রামে সাড়া পড়ে গিয়েছে যে রাষ্ট্রের প্রতি প্রত্যেক গ্রামবাসীর যেমন কর্তব্য আছে, তেমনি কতকগুলো হক্ক এবং দাবিও আছে। এরা প্রত্যেকেই যে শহরে এসে মন্ত্রী হতে চায় তা নয়, কিন্তু আস্তে আস্তে এদের মনে একটি ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে গা-গতর খাটানোর পর যদি দু'মুঠো না খেতে পায় তবে রাষ্ট্র অবিচার করছে।

গণতন্ত্রের সামনে এই বড় পরীক্ষা।

এবং আমি এর উপরই সবচেয়ে বেশী জোর দিতে চাই।

গ্রামবাসীর সক্রিয়, সতেজ এবং দরদী সহযোগিতা না পেলে বাঙলার কোনও ভবিষ্যৎ নেই।

কিন্তু প্রশ্ন, নেতারা, সমাজপতিরা এদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করবেন কোন্ ভাষার মাধ্যমে? ইংরিজির কথা পূর্বেই আলোচনা করেছি; এইবার হিন্দীতে আসি।

প্রথমেই একটা সাফাই গেয়ে নিই। আমি হিন্দী-প্রেমী এবং ঐ ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে আমার বহুদিনের পরিচয়। হিন্দী বাঙলার বুকের উপর চেপে বসে একদিন 'হিন্দী ইম্‌পিরিয়ালিজ্‌ম' কায়েম করবে এ দুর্ভাবনা আমার মনের কোণেও আসে না। বস্তুত স্বরাজ-লাভের পর কলকাতা তথা বাঙলা দেশে হিন্দী প্রচারের যেটুকু ব্যবস্থা হয়েছে তাতে আমি আদৌ সন্তুষ্ট নই—এর চেয়ে ঢের ব্যাপকতর চেষ্টার প্রয়োজন হবে—কিন্তু সে-কথা পরে হবে, উপস্থিত ফের গ্রামে ফিরে যাই।

গ্রামে গ্রামে পাঠশালে পাঠশালে হিন্দী শেখাতে হলে যে কতখানি রেস্তোর প্রয়োজন হবে সেটা একবার শিক্ষামন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে দেখুন। এ নিয়ে দীর্ঘ বাগাড়ম্বর করতে চাই নে—জিনিসটা এতই সরল এবং স্বতঃসিদ্ধ।

দ্বিতীয়ত, যে দেশের লাখের মধ্যে একজন গ্রামবাসীও আপন প্রদেশের বাইরে যায় না, তার পক্ষে ভিন্ন ভাষা শেখার প্রয়োজন নেই।

সবসুদ্ধ মিলিয়ে দেখা গেল, নেতারা তা হলে এঁদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করবেন বাঙলার মারফতেই।

কিন্তু নেতারা যদি পরিপুষ্ট হন হিন্দী চর্চা করে, তাহলে ইংরেজ আমলে যা হয়েছিল তারই পুনরাবৃত্তি হবে—তাঁরা জানতেন ইংরিজি, শ্রোতারা জানত বাঙলা, দুজনার চিন্তা-জগৎ, অনুভূতি ক্ষেত্র ভিন্ন। শেষটায় নেতারা যে অতিকষ্টে বাঙলা শিখে কাজ চালালেন, সে তো চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেলুম।

ওদিকে ভারতীয় ঐক্য, জাতীয় সংহতি তো চাই। এই যে প্রদেশে প্রদেশে দ্বন্দ্ব, একই প্রদেশের ভিতর সংখ্যালঘুর উপর সংখ্যাগুরুর অবিচার, এ তো ক্রমাগতই বেড়ে চলছে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এর বিরুদ্ধে তো কিছু-একটা করা চাই।

এর সরল সহজ রাস্তা নেই।

ভাষা এক না করেও সংহতি হয়—যেমন সুইজারল্যান্ডে, বেলজিয়ামে আছে—এবং ভাষা এক হলেও সংহতি না হতে পারে—যেমন নাসের, কাসেম, মক্কার বাদশা, কুয়েতের শেখ সক্কলেরই ভাষা আরবী কিন্তু এদের ভিতর দ্বন্দ্ব-কলহের অন্ত নেই। এই যে এত ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সংযুক্ত আরবরাষ্ট্র (UAR) করা হল তার সূতিকাগৃহ তো শ্মশান-শয্যায় পরিণত হতে চলল।

মহাত্মাজীকে এক ইংরেজ সাংবাদিক শুধিয়েছিল, 'তোমরা আপসে এত লড়ো কেন?' মহাত্মাজী বলেন, 'ইংরেজ লড়ায় বলে।' ফের প্রশ্ন—'ইংরেজ লড়তে চাইলেই তোমরা লড়ো কেন?' উত্তর হল, 'আমরা মূর্খ বলে!'

সেই হল মুখ্য কথা! আমরা মূর্খ!

এখন তো আর ইংরেজ নেই, কেউ ওস্কাচ্ছে না, আমরা তবু লড়ে মরছি!

তাহলে প্রশ্ন—এই মূর্খতা ঘুচাই কি করে?

বিদ্যাদান করে, ধর্মবুদ্ধি জাগ্রত করে, রাষ্ট্রের প্রতি তার কর্তব্য সম্বন্ধে তাকে সচেতন করে।

এইখানেই অধীনের সবিনয় নিবেদন—সেটি মাতৃভাষার মারফতেই করতে হবে, অন্য কোন পন্থা নেই, নেই, নেই।

ভ্যাকিউয়াম

কবি এবং বৈজ্ঞানিকে প্রায়ই বিরোধ উপস্থিত সে-কথা আমরা জানি। কবি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, 'অহো-হে! কী সুন্দর সূর্যোদয়।' বৈজ্ঞানিক গম্ভীর কণ্ঠে টিপ্পনী কাটলেন, 'হস্তীমূর্খ! সূর্যের আবার উদয়, অস্ত কি? পৃথিবীটা ঘুরে যাওয়াতে মনে হল সূর্যোদয় হয়েছে।'

কিন্তু কোনও কোনও স্থলে উভয়েই এক মত পোষণ করেন।

কবি গাইছেন,

'কে বলে সহজ, ফাঁকা যাহা তারে
সহজ কাঁধেতে সওয়া
জীবন যতই ফাঁকা হয়ে যায়
ততই কঠিন বওয়া॥'

বৈজ্ঞানিকও উচ্চকণ্ঠে বলেন, 'প্রকৃতি শূন্যতাকে ঘৃণা করে'—

'নেচার এবরজ ভ্যাকিউয়াম।'

ধর্মের উচ্ছেদ যাঁরাই কামনা করেন তাঁরাই এ তত্ত্বটি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারেন। প্রাচীন যুগের চার্বাকপন্থী বা তার পরবর্তী যুগের মক্কার কাফিরদের কথা হচ্ছে না। এ যুগের কথা বললেই এ যুগের লোক সাড়া দেয়। এ যুগে ধর্মের প্রধান শত্রু টোটেলিটেরিয়ান স্টেট, একচ্ছত্র রাষ্ট্র—'জগদ্দল রাষ্ট্র' বললে জিনিসটা আরও পরিষ্কার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়। তা সে রাষ্ট্র ফাসিস্টই হোক আর কম্যুনিস্টই হোক।

হিটলার বা স্তালিনের ভাবখানা অনেকটা এই : 'কী! আমার রাষ্ট্রে আমি ভিন্ন অন্য কার মুরদ যে আমার কথার উপর কথা কইতে যাবে? আপন রাষ্ট্রের প্রতি, ভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতি—অবশ্য আখেরে সেটাও আমি দখল করবো—তোমার আচরণ, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, কলা-দর্শনে তোমার আদর্শ ঠিক করে দেব আমি।' এ যেন বাইবেল বর্ণিত যেহোভার তীব্র তীক্ষ্ণ আদেশ, 'আমা ভিন্ন তোর অন্য কোনও উপাস্য দেবতা থাকবে না।'

এর বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ উঠলো সেটা প্রধানত ধর্ম নামক প্রতিষ্ঠান থেকে। শিল্পী-দার্শনিকের সে রকম কোনও প্রতিষ্ঠান নেই। আর বৈজ্ঞানিক অর্থনৈতিক পণ্ডিতেরা জীবনদর্শন চিন্তা করেন কমই। গবেষণার ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা পেলেই তাঁরা সন্তুষ্ট। আইন-আদালত নিয়ে যাঁদের কারবার তাঁরা গোড়ার দিকে কিছুটা আপত্তি জানান বটে, কিন্তু দেশের ডিক্টেটর একবার জোর করে, ভয় দেখিয়ে, যে করেই হোক—যদি 'আইনত' পাস করিয়ে নিতে পারেন যে তিনিই সর্ব আইনের মূলাধার, তা হলে এদের আর আইনত কোনও আপত্তি থাকতে পারে না। মিলিটারির বেলায়ও হুবহু তাই। ডিক্টেটর যখন দেশের সর্বোচ্চ সামরিক উর্দি পরে তাঁর সেনাবাহিনীর সামনে এসে দাঁড়ান তখনই সেনানায়করা শপথ নেন যে তাঁর কোন আদেশ তাঁরা ভঙ্গ করবেন না। সকলেই জানেন, হিটলারকে নিধন করার জন্য বড় বড় সেনাপতিরা যখন ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেন তখন তাঁদের প্রধান অন্তরায় ছিল এই শপথ।

শেষ পর্যন্ত যখন অকথ্য অত্যাচার, নির্যাতনের ফলে ধর্ম ভূগর্ভে আশ্রয় নেয়, তখন ধর্মবৈরী ডিক্টেটররা সম্মুখীন হয় পূর্ববর্ণিত ঐ 'ভ্যাকিউয়ামে'র সম্মুখে। এতদিন ধরে ধর্ম মানুষের জীবনে বৃহৎ এক অংশ জুড়ে বসে ছিল, এখন ধর্ম চলে যাওয়াতে সে জায়গাটা যে ফাঁকা হয়ে গেল সেটা পূর্ণ করা যায় কি প্রকারে?

হিন্দুর ধর্মজীবনে বাধ্যবাধকতা অত্যল্প (তাও ব্রাহ্মণের); তার বাধ্যবাধকতা সামাজিক জীবনে। মুসলমান এবং খ্রীষ্টানের ঠিক তার উল্টোটা। তারা সমাজে স্বাধীন। কিন্তু ধর্মে প্রচুর বাধ্যবাধকতা।[১] ডিক্টেটর বনাম ধর্মে যে দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয় এবং এখনও চলেছে, সেটা প্রধানত খ্রীষ্টান দেশেই সীমাবদ্ধ বলে আমরা সেইটে নিয়ে আলোচনা করব। তবে এ দেশের হিন্দু পাঠকেরা খ্রীষ্টধর্মের চেয়ে ইসলামের সঙ্গে বেশী পরিচিত বলে তার থেকেও কিছু কিছু দৃষ্টান্ত নেব।

খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলামের সর্বপ্রথম মূল সিদ্ধান্ত—ইমান। অর্থাৎ তোমার বিশ্বাস—faith কি? তুমি যদি বলো, ঈশ্বর নেই—জৈন ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা যে রকম বলে,—কিংবা বলো, ঈশ্বর আছেন বটে কিন্তু দেবদেবীও আছেন অসংখ্য কিংবা বলো যীশুতে বিশ্বাস না করেও মোক্ষলাভ সম্ভবে—তা হলে তুমি শুধু পাপী না, তুমি অখ্রীষ্টান (খ্রীষ্টান দৃষ্টিবিন্দু থেকে 'কাফির') হয়ে গেলে। ডিক্টেটররা এ সবেতে যে খুব বেশী আপত্তি করেন

১ স্বামী বিবেকানন্দ তাই আমেরিকা থেকে তাঁর শিষ্যদের একাধিক চিঠিতে লেখেন, হিন্দুর ধর্ম ও খ্রীষ্টানদের সমাজ নিয়ে নূতন হিন্দু-জীবন গড়তে হবে। বঙ্কিমও এই ধরনের মন্তব্য করেছেন। তিনি বিদ্যাসাগরকে বহু-বিবাহনিরোধ ব্যাপারে বলেছেন, এ জিনিস খারাপ, ধর্ম দিয়ে প্রমাণ করেই বা লাভ কি? হিন্দু চলে সামাজিক লোকাচার মেনে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তা নয়, তাদের আপত্তি, তুমি যখন বলো, কর্তব্য নির্ধারণার্থে তুমি ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের উপর নির্ভর করো, তখনই তাদের আপত্তি। হিটলার স্তালিন বলেন, তোমার কর্তব্য নির্ধারণ করে দেব আমি। বাইবেল কুসংস্কারাচ্ছাদিত, বুর্জুয়ানির্মিত, প্রলেতারিয়া-শোষক গ্রন্থ। আসল কেতাব 'মাইন কাম্‌পফ' কিংবা 'ডাস্ কাপিটাল'। বিশ্বাসী খ্রীষ্টান যে রকম স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেন না, যীশু কোনও ভুল করে থাকতে পারেন, বিশ্বাসী কম্যুনিস্ট ঠিক তেমনি কিছুতেই স্বীকার করবেন না, মার্ক্স-লেনিন প্রচারিত ডাইলেক্টিক্যাল মোটিরিয়ালিজ্‌মে কোনও ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকতে পারে।

কিন্তু এই ইমান বা faith ভিতরকার জিনিস—ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। ইমান চলে গিয়ে ভ্যাকিউয়াম সৃষ্ট হল কিনা, হলপ করে কিছু বলা যায় না।

আসল শিরঃপীড়া ধর্মের ক্রিয়াকর্ম নিয়ে। সেখানে যে ভ্যাকিউয়াম তৈরি হয় সেটা ভরাট করা যাবে কি দিয়ে?

আবালবৃদ্ধ নরনারী যায় রবিবারে চার্চে। বুড়োরা যাক্—মরুক গে, কিন্তু জোয়ানদের নিয়ে করা যায় কি? ঠিক ঐ সময়েই লাগিয়ে দাও—কুচকাওয়াজ, মার্চ। হিটলার-পন্থীরা দাঁড়াও চক্রাকারে। নেতা মাঝখানে দাঁড়িয়ে তীব্রকণ্ঠে চিৎকার করবে, 'হাইল (জয়তু!)' জোয়ানরা সমস্বরে তীব্রতর কণ্ঠে উত্তর দেবে—'হিটলার!' ফের 'হাইল!' ফের 'হিটলার!' ফের 'হাইল!' ইত্যাদি। টকটকে লাল মুখ যতক্ষণ না নীল হয়ে যায়। গির্জাতেও তো ঐ রকমই হয়। পাদ্রীসাহেব মন্ত্রোচ্চারণ করেন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে, বিশ্বাসীরা উত্তর দেন দুই-চারিটি শব্দে কিংবা শুধু 'আমেন' (তথাস্তু) বলে।

ক্রিসমাস, ইস্টারের উপাসনা জব্বর ভারী রকমের। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পার্টি-ডে ন্যুরন্‌বের্গে। সপ্তাহব্যাপী মোচ্ছব। ঝাড়া চারটি ঘণ্টা হিটলার দক্ষিণ বাহু উত্তোলিত প্রসারিত করে দাঁড়ানেল বেদী—থ্যাড়ি—প্ল্যাটফর্মের উপর। বিশ্বাসী দল ঝাঁকে ঝাঁকে তাঁর সামনে দিয়ে মার্চ পাস্ট করলেন। কী উত্তেজনা, কী উৎসাহ! বিদেশাগত 'কাফির' (অর্থাৎ এখনও যে নাৎসী-ধর্ম গ্রহণ করেনি) তো বে-এক্তেয়ার—ইস্তেক জর্মনীর দুশমন ইংরেজের রাষ্ট্রদূত হেন্ডারসন। অবশ্য পাঁড় কাফির এসব পরবে আসে না—যেমন ফরাসী রাষ্ট্রদূত মসিয়ে ফ্রাঁসোয়া পঁসে! তিনি ফাঁড়া এড়াবার জন্য ঐ সময় ছুটি নিয়ে চলে যেতেন স্বদেশে, জমিদারী তদারক করতে।...রুশ দেশেও এসব 'পরব' হয়।

ধর্মের আরেক অঙ্গ কৃচ্ছ্রসাধন—উপবাস। প্রবর্তিত হল 'আইন-টপ্‌ফ্—গরিস্ট।' সপ্তাহে একদিন খাবে শুধু এক পদের খানা। মাংস, আলু, ফুলকপি, চর্বি সবসুদ্ধ মিলিয়ে ঘ্যাঁট। 'অর দ্যভ্‌র' দিয়ে আরম্ভ করে 'সেভরি' পর্যন্ত অষ্টাদশপদী খানা মানা। (কিন্তু বিপদে পড়লে আমরা, ধর্মভীরুজনও, 'ডুবে ডুবে জল খাই', ঠিক তেমনি প্রচুর নাৎসী প্রেসার কুকারের মত একটি পাত্রে তিন খোপে তিন রকমের খাদ্য রান্না করে খেল—কারণ বলা হয়েছে, 'আইন-টপ্‌ফ্'—অর্থাৎ 'এক হাঁড়িতে' রান্না খাদ্য এক হাঁড়িতেই তো রান্না হয়েছে, আপত্তি আর কি? হিটলারের কর্তাভজা শিষ্য পার্টি সেক্রেটারি আরেক কাঠি সরেস। হিটলার 'মীটলেস্' তিনি 'কাটলেস্'। অর্থাৎ নিরামিষাশী হিটলারের সঙ্গে নিরামিষ ঘ্যাঁট খেয়ে হুজুরের সম্মুখে 'ধর্মরক্ষা' করে আপন ঘরে গিয়ে খেতেন তিনখানা শুয়ারের 'কাটলেস্', (কটলেট্)!

খ্রীষ্টান যায় জেরুজালেমে যীশুর কবর দেখতে, মুসলমান যায় পীরের দর্গা জিয়ারৎ

www.BanglaBook.org

করতে, বৌদ্ধ যায় তথাগতের অস্থিদন্তের আধার দেখতে—(হিন্দুর ও বিষয়ে কিঞ্চিৎ অসুবিধা, কারণ সে মৃতদেহ দাহ করে) এসব তীর্থযাত্রায় প্রচুর পুণ্য।

এদের সবাই হার মানে রুশের কাছে। হাজার হাজার নরনারী নাকি দুরন্ত শীতে রেড স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে থাকে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা—লেলিন-স্তালিনের 'মামি' দেখবে বলে। আর 'মামি' যে কাস্কেট। বা গোরস্তানের চেয়ে হৃদয়-মনের উপর বেশী দাগ কাটবে তাতে কি সন্দেহ?

এ বিষয়ে কম্যুনিস্টরা আমাদের হারিয়েছেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু অন্তত আরেকটি রিচুয়ালে তারা সর্বাগ্রণী :—

ক্যাথলিক যারা তারা পাদ্রীর সামনে আপন পাপ স্বীকার করে (কন্‌ফেশন), জৈন-বৌদ্ধ বর্ষশেষের পর্যুষণে আপন আপন দুষ্কৃতি স্বীকার করে, মুসলমান সর্বজনসমক্ষে আল্লার কাছে তওবা করে ক্ষমা চায়।

রুশদেশের দেশদ্রোহীরা ধরা পড়লে এই কনফেশনের ধুন্দুমার লেগে যায়। কে কত বেশী বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাই নিয়ে লেগে যায় কাড়াকাড়ি। সবাই সমস্বরে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে চিৎকার করে, 'না না, আমি সবচেয়ে পাপী, আমি সর্বনিকৃষ্ট।'

এ সম্বন্ধে একটা চুটকিলও হালে শুনেছি, রুশ প্রত্যাগত জনৈক বাঙ্গালীর কাছ থেকে।

আর পাঁচটা দেশের মত রুশও পণ্ডিতগোষ্ঠী পাঠালে মিশরে প্রত্নতত্ত্বের চর্চা করতে। খুঁড়তে খুঁড়তে তাঁরা একটি 'মামি' পেয়ে গেলেন। খ্রুশ্চফ খুশী হয়ে শুধোলেন, 'ওটা কত দিনের পুরনো?' পণ্ডিতেরা নিরুত্তর। খ্রুশ্চফ শাসালেন, 'চব্বিশ ঘণ্টা ম্যাদ। উত্তর না দিতে পারলে সাইবেরিয়া।' পরদিন সব পণ্ডিত ম্যাদ-শেষের পূর্বেই হাজির। চোখেমুখে খুশী উপচে পড়ছে। খ্রুশ্চফ বললেন, 'হুঁ?' পণ্ডিতেরা সমস্বরে : 'চার হাজার দু'শ বৎসর।' 'বেশ, কি করে জানলে?' পণ্ডিতেরা ঐক্যতানে, 'মামি স্বীকার করেছে (কন্‌ফেশন)।'

* * *

এরকম প্রচুর উদাহরণ আমি টায়-টায়, দফে দফে, প্রো ফর্মা দিতে পারি। কিন্তু রচনাটি ইতিমধ্যেই আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় বেসামাল হয়ে গিয়েছে।

সর্বশেষে নিবেদন :

'হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা যেন মনে না করেন, আমি ঐসব ধর্মের কর্মকাণ্ড (রিচুয়ালের) এবং নাৎসী-কম্যুনিস্টদের কর্মকাণ্ড সব কটাকে একই মূল্য দিই। কম্যুনিস্টরাও যেন বিরক্ত না হন যে আমি তাঁদের 'বিজ্ঞানসম্মত' 'র‍্যাশনাল' কর্মকাণ্ড 'ধর্মের আফিঙে' মাখানো কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করে তাদের প্রতি অবিচার করেছি। আমি শুধু প্যারালেল দেখিয়েছি।

এস্থলে সেই ফরাসী প্রবাদবাক্য স্মরণ করি :—'প্লু সা চাঞ্জ, প্লু সে লা মেম শোজ্।' 'যতই সে বদলায়, ততই তাকে আগের মত দেখায়।'

কিন্তু এহ বাহ্য।

ধর্ম তবে কি?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ধর্ম

প্রথমেই প্রশ্ন উঠবে, আজকের দিনে ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামায় কে, ওটার কী-ই বা প্রয়োজন? প্রশ্নটির ভিতরে অনেকখানি সত্য লুকানো আছে।

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ধর্ম তাঁর রাজত্ব ভাগ-বাঁটোয়ারা করে প্রতিদিনই ভিন্ন ভিন্ন রাজপুত্রকে বিলিয়ে দিচ্ছেন। একদা গঙ্গাস্নান পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত হত বলে সেটি ধর্মের আদেশ রূপে মেনে নেওয়া হত, কিংবা বলা যায়, ধর্মের আদেশ বলে সেটি পুণ্য বলে বিবেচিত হত। এখন সেটা ডাক্তারই "স্ট্রংলি রেকমেন্ড" করেন, এবং অধুনা বিজ্ঞানও নাকি সপ্রমাণ করেছে, গঙ্গাজলে কতকগুলো বিশেষ গুণ আছে যেগুলো অন্য জলে নেই। ধর্ম এখানে বৈদ্যের হাতে এ পুণ্যকর্ম করার আদেশ ছেড়ে দিয়েছেন, কিংবা বলা যায়, বৈদ্য সেটা কেড়ে নিয়েছে। আর কিছুটা কেড়ে নিয়েছে ম্যুনিসিপ্যালিটি— কোনও কোনও দেশে ম্যুনিসিপ্যালিটিই ফরম্যান জারি করে, বাড়ি বানাবার সময় প্রতি কখানা ঘর পিছু একটি বাথরুম রাখতেই হবে। না হলে প্ল্যান মঞ্জুর হবে না। আহারাদিতেও তাই। ডাক্তারই বলে দেয় কোন্‌টা খাবে, কোন্‌টা খাবে না—অর্থাৎ কোন্‌টাতে পুণ্য আর কোন্‌টাতে পাপ। এবং আকছারই তিনি ধর্মের বিরুদ্ধে অনুশাসন দেন। যেমন খেতে বলেন চিকেন-সুপ—হিন্দুধর্মে, অন্তত বাঙলা দেশের হিন্দুধর্মে সেটা পাপ।

দান করা মহাপুণ্য। ধর্মের সনাতন আদেশ। কিন্তু আজকের দিনে আপনি আমি এ-অনুশাসন মেনে চলি আর নাই চলি, সরকার কান পকড়কে তার ইনকাম এবং অন্যান্য বহুবিধ ট্যাক্স তুলে নেবেই নেবে এবং সভ্যদেশে তার অধিকাংশই ব্যয় হয় দীন-দরিদ্রের জন্য। (আজ যে মুরারজীভাই দিবারাত্র "অস্তি নাস্তি ন জানাতি দেহি দেহি পুনঃপুনঃ" করছেন তাতে আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু তিনি যদি সে পয়সা দু হাতে খরচা করে যুদ্ধের জন্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বাড়ান—সঙ্গে সঙ্গে বেকার-সমস্যা অনেকখানি ঘুচবে, বেকার-সমস্যা ঘুচলো বলে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে—তিনি যদি কঞ্জুষি করেন, তবেই হবে আমাদের চরম বিপদ—কিন্তু এটা অর্থনীতির একটা উৎকট সমস্যা এবং হিটলারই সর্বপ্রথম এর সমাধান করেন দু হাতে পয়সা খরচ করে; পক্ষান্তরে অন্যান্য দেশের প্রাচীন-পন্থী অর্থমন্ত্রীরা তখন দেশের দুরবস্থা দেখে আকুল হয়ে, পাছে ভবিষ্যতে আরও কোনও নূতন বিপদে পড়তে হয় সেই ভয়ে সরকারের খরচা প্রাণপণ কমিয়ে "রিজার্ভ ফান্ড" নামক দানবের ভুঁড়ি মোটার চেয়ে মোটা করতে থাকেন। তাদের দেখাদেখি ব্যাঙ্কার সাহুকাররাও ক্রেডিট দেওয়া বন্ধ করে কিংবা কমিয়ে দেয়। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য আরও কমতে থাকে এবং সৃষ্ট হয় "দুষ্টচক্র"—ভিশাস সার্কল। সরকার ব্যাঙ্কার টাকা দেয় না বলে দেশের উৎপাদন শক্তি বাড়ে না, আর দেশের উৎপাদন শক্তি বাড়ে না বলে সরকার খাজনা ট্যাক্সো পায় আরও কম এবং তারস্বরে চিৎকার করে, "আরও ছাঁটাই করো, আরও ছাঁটাই করো।")[১]

১ এ রকম ক্রাইসিসের সময় আরও একটা মজার ব্যাপার ঘটে। ঐ সময় বড় বড় প্রাচীন

www.BanglaBook.org

এই পরিস্থিতি হতে পারে বলেই ধর্ম প্রাচীন দিনে তার একটা ব্যবস্থা করেছিল। দোল-দুর্গোৎসবে দান। এতে মহাপুণ্য।

বহুকাল পূর্বে আমি বাচ্চাদের মাসিকে একটি অনুপম প্রবন্ধ পড়ি। অসাধারণ এক পণ্ডিত সেই প্রবন্ধ লিখেছিলেন। দুর্গোৎসবের সময় প্রতিমা নির্মাণ থেকে আরম্ভ করে জমিদারকে অন্ন, বস্ত্র, ছত্র, তৈজসাদি, পাদুকা, খট্‌, অলঙ্কার—দুনিয়ার কুল্লে জিনিস দান করতে হত। এতে করে চাষা, জোলা, ছাতাবানানেওলা, কাঁসারি, কামার, মুচি, মিস্ত্রি—বস্তুত গ্রামের যাবতীয় কুটিরশিল্প এক ধাক্কায় বহু-বিস্তর বিক্রি করে রীতিমত সচ্ছল হয়ে যেত। শুধু তাই নয়, কাঁসারি দু পয়সা পেত বলে সে ছাতা কিনত, ছাতাওয়ালার চার পয়সা হল বলে সে শাঁখা কিনত—ইত্যাদি ইত্যাদি, আদ্‌ ইনফিনিতুম্‌। এবারে আর "নষ্টচক্র" বা "ভিশাস সারক্ল" নয়—এখন যাকে বলে স্পায়ারেল মুভমেন্ট—"চক্রাকারে স্বর্গ-বাগে!"

তারপর লেখক দুঃখ করেছিলেন, আজ যদি বা জমিদার পুণ্য-সঞ্চয়ার্থে পূর্ব-বর্ণিত সর্বদানই যথারীতি করেন তবু মূল উদ্দেশ্য সফল হয় না। বস্ত্র এসেছে বিলেত থেকে (তখনকার দিনে দিশী কাপড় অল্পই পাওয়া যেত), ছত্র রেলি ব্রাদার্সের, বাসনকোসন অ্যালুমিনিয়মের এবং অন্যান্য আর সব জিনিসের পনেরো আনা এসেছে হয় বিদেশ থেকে, নয় দেশেরই বড় বড় শহর থেকে (শাঁখা জাতীয় মাত্র দু-একটি জিনিস আপন গ্রামের কিংবা গ্রামের বাইরের কুটিরশিল্প থেকে)। মোদ্দা মারাত্মক কথা—জমিদারের গ্রাম এবং কিংবা আর পাঁচখানা গ্রাম নিয়ে যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতাগোষ্ঠী (ইউনিট) সে কোনও সাহায্যই পেল না। আখেরে দেখা যাবে কোনও কুটিরশিল্পই ফায়দাদার হল না, হল শিল্পপতিরা—দিশী এবং বিদেশী।

এবং লাওৎসে বলেছেন—অবশ্য বর্তমান চীনা সরকার সেটা মানে না—যখনই দেখতে পাবে বড় শহরে বড় বড় ইমারত তখনই বুঝতে হবে, এগুলো গ্রামকে শুষে রক্তসঞ্চয় করেছে। পতন অনিবার্য।

ধর্ম এখন পুণ্যের দোহাই দিয়ে দানের কথা জমিদারের সামনে তোলে না—আর জমিদারকে সে পাবেই বা কোথায়? হয়তো তিনি শহরে থাকেন কিংবা সরকারের নূতন নীতির ফলে লোপ পেয়েছেন। তা সে যাই হোক, এ কথা তো ভুললে চলবে না, দান মাত্রই দান, "পেরসে", পুণ্য নয়। গ্রাম পোড়াবার জন্য কেউ যদি দেশালাই চায় তবে আমি তো তাকে দেশালাই দান করে পুণ্যসঞ্চয় করি নে!

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যখন ব্যাঙ্কের কাছে আরও ক্রেডিট চায় তখন ব্যাঙ্ক ভাবে, "এদের বিস্তর টাকা দিয়েছি—আর কত দেব? এত কালের বড় ব্যবসা—নিশ্চয়ই টিকে যাবে।" ব্যাঙ্কার তখন ছোট ব্যবসাকে টাকা দেয়, পাছে তারা দেউলে হয়ে যায় এবং ব্যাঙ্কের আগের দেওয়া সব টাকা মারা যায়। ফলে বিপদ কাটার পর দেখা যায় অনেক প্রাচীন, ধনশালী ব্যবসা দেউলে হয়ে গিয়েছে, আর ছোট ব্যবসাগুলো টিকে গেছে। অবশ্য এর একটা নৈসর্গিক—অতএব দুর্বোধ্য—কারণও থাকতে পারে। মহামারীতে বাড়ির রোগা-পটকাটাই যে মরে এমন কোনও কথা নয়। অনেক সময় তাগড়াটাই মরে। হয়তো মা রোগা-পটকাটারই যত্ন বেশী করেছিল বলে! ব্যাঙ্কার বড় ব্যবসাকে যে রকম যত্ন না করে করেছিল ছোটটার!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শিল্পের উন্নতির জন্য অর্থব্যয় করলেই যে দান হত তা নয়। জামি মসজিদ নির্মাণ করে শাহ্-জাহান নিশ্চয়ই পুণ্যসঞ্চয় করেছিলেন, কিন্তু তাজ বানাতে—অর্থাৎ খাসপেয়ারা বেগম সাহেবের জন্য গোর বানাতে—কোনও পুণ্য আছে বলে ইসলাম ফতোয়া দেয় না। তাই বোধ হয় পাশে মসজিদ বানিয়ে দিয়ে একটুখানি পুণ্যের ছোঁয়াচ লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

শুধু যে রাজা-বাদশা-জমিদারই এ সব পুণ্যকর্ম করতেন তাই নয়। বছর কুড়ি পূর্বে আমি মোটর-বাসে করে সিলেট থেকে সুনামগঞ্জ যাওয়ার পথে "পাগলা" গ্রামের কাছে এসে দেখি এক বিরাট মসজিদ। ড্রাইভার বললে, এক জেলে হাওর-বিলের ইজারা নিয়ে বিস্তর পয়সা জমানোর পর এ মসজিদ গড়িয়েছে।[১]

এই বীরভূমে যে শান্তিনিকেতন গড়ে উঠেছে তার পরোক্ষ কারণে কিছুটা পুণ্য কিছুটা স্বার্থ আছে। মহর্ষিদেব এখানে আশ্রম গড়ার সময় সর্বপ্রথম জলের চিন্তা করেছিলেন। কুয়ো তো খোঁড়াবেন, সে তো পাকা কথা, কিন্তু যদি সেটা শুকিয়ে যায়? শান্তিনিকেতনের অতি কাছে ভুবনডাঙা। রাইপুরের জমিদারবাবু ভুবনমোহন সিংহ সেখানে খাদের মাটি খনন করে নীচু জমির উপরে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটি উঁচু বাঁধ (দীঘি) পূর্বেই তৈরী করে দিয়েছিলেন। (মতান্তরে এটি রাইপুরের ঘোষালদের—এরা সিংহ পরিবারের পুরোহিত—ব্রহ্মত্র ছিল।) এই পুণ্য-স্বার্থে মেশানো বাঁধের উপর ভরসা রেখে মহর্ষিদেব এখানে আশ্রম গড়েন।[২]

এখন আর কেউ বাঁধের জন্য ধর্মের দোহাই দেয় না। এখন অন্য পন্থা। গত নির্বাচনের সময় এই বীরভূমেরই একটি গ্রাম তিনজন প্রার্থীকে বলে—সরকারের সাহায্যে বা অন্য যে কোনও পন্থায় যে প্রার্থী তাদের গ্রামে ছটি টিউবওয়েল করে দেবে তাকে তারা একজোটে দেবে ভোট!

ভাবি, কোন্ শ্রাদ্ধের—না, কোন্ বাঁধের জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়! ধর্ম তারই সঙ্গে ভেসে যায়।

ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা

শুধু এ-দেশে নয়, সব দেশেই ধর্ম তার তালুক-মুলুক হারায় যখন তাদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে যায়। আসলে কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটা তার প্রকৃত পরিচয় বাতলায় না। ধর্মনিরপেক্ষ আমরা 'সেকুলার' শব্দের আক্ষরিক অনুবাদ হিসাবে নিয়েছি,

---

১ ঈষৎ অবান্তর হলেও এই নিয়ে একটি সমস্যার কথা তুলি। রোজার মাসে অসুস্থ ছিল বলে একজন লোক উপবাস করতে পারেনি। এখন ঈদ পরবের পর সে রোজা রাখতে যাবে, এমন সময় সে মসজিদ (কিংবা কুয়ো, কিংবা পান্থশালা—এ সবকে "সবীল-আল্লা" "ঐশ মার্গ", 'যে পথ আল্লার দিকে নিয়ে যায়' বলা হয়) বানাতে চাইলে তখন প্রশ্ন, সে উপবাস করা মুলতুবী রেখে মসজিদ বানাবে কি না? ভারতের মুসলমান যে "মানবধর্মশাস্ত্র" মানেন তাঁর মতে, রোজা পরে রাখবে। এ অনুশাসন যিনি দিয়েছেন তিনি আসলে ইরানী।

২ অঘোর চট্টোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতন আশ্রম, পৃঃ ৯ ও পরবর্তী।

www.BanglaBook.org

এবং সেই সেকুলার শব্দের অন্য অর্থ 'প্রোফেন'—'হিরেটিক্যাল'ও বলা যেতে পারে। অর্থাৎ সেকুলার শিক্ষাপদ্ধতি ধর্মবৈরী এমন কি ধর্মঘ্নও হতে পারে।

কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, ধর্মনিরপেক্ষ বিদ্যায়তন ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে না। করলে বরঞ্চ ভালো হত। ধর্ম তাহলে কোনও কোনও ক্ষেত্রে হয়তো বা জিতে যেত। কিন্তু সে সুযোগ ধর্ম পায় না—তার জয়াশা অতি অত্যল্প হলেও। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, সে ধর্মকে তাচ্ছিল্য করে, অবহেলা করে, এমন কি তার অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকার করে না। তার ভাবখানা অনেকটা এই :—ধর্ম বাদ দিয়ে শিক্ষাদীক্ষা সব কিছুই হয়, ছাত্রেরা পরীক্ষা পাসের পর যদি কাজকর্ম করে দু-পয়সা কামাতে পারে—তবে ধর্ম অপ্রয়োজনীয় অবান্তর।

এক ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞানিক যখন আঁক কষে ম্যাপ এঁকে বুঝিয়ে দিলেন সৌরজগৎটা কি ভাবে চলে তখন কে এক ধার্মিকজন শুধালো, 'কিন্তু তোমার সিস্টেমে তো ভগবান নেই।'—উত্তরে বৈজ্ঞানিক বলেছিলেন, 'ওঁকে বাদ দিয়েই যখন সিস্টেমটা নিটোল ত্রুটিহীন, তখন তাঁকে লাগাবার কি প্রয়োজন?' কিন্তু ঐ বৈজ্ঞানিকটি ব্যক্তিগত জীবনে কিঞ্চিৎ ধর্মভীরু ছিলেন বলে আস্তে আস্তে যোগ করলেন, 'কিন্তু দরকার হলে তাঁকে টেনে আনতাম বইকি।' সে দরকার অদ্যাবধি হয়নি। সেকুলার শিক্ষাপদ্ধতি ধর্মের সেই কাল্পনিক প্রয়োজনীয়তাটুকু স্বীকার করে না।

বেদের বড় বড় দেবতা ইন্দ্র বরুণ, এঁরা যে লোপ পেলেন তার কারণ এ নয় যে কোনও বিশেষ যুগে এঁদের অস্তিত্ব অস্বীকার করে ধর্ম-সংস্কারকগণ জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। আসলে মানুষ আস্তে আস্তে দেখতে পেল, প্রকৃতি তার নিয়ম অনুযায়ী চলছে। বৃষ্টি-বর্ষণ, ফসল উৎপাদন, গোধনবৃদ্ধি ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজন এঁদের না ডেকেও সমাধান হয়। তবে বিশ্বাসীজনের কথা স্বতন্ত্র। দীর্ঘদিনব্যাপী অনাবৃষ্টি হলে এখনও তাঁরা হোমযজ্ঞাদি করে থাকেন, বিশ্বাসী মুসলমান এখনও মোকদ্দমা জেতার জন্য মৌলা আলীর দর্গায় গিয়ে ধর্না দেয়।[১] ভলটেয়ারকে কে যেন শুধিয়েছিল, 'মন্ত্রোচ্চারণ করে এক পাল ভেড়া মারা যায় কি না?' তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'অবশ্যই যায়। তবে প্রচুর পরিমাণে আর্সেনিক খাইয়ে দিলে সন্দেহের আর কোনও অবকাশই থাকে না।'

তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে, ইন্দ্র বরুণ চলে যাওয়ার পরে কালী হনুমান এলেন কি করে? কুরান হদীসে যখন স্পষ্ট লেখা রয়েছে, আল্লা, মানুষকে তার ন্যায্য হক্কাহক্ক (হক্+ন+হক্, অ+হক্) ইন্সাফের সঙ্গে বিতরণ করেন, মধ্যস্থতা করার জন্য উকিল ধরে কোনও লাভ নেই, তখন মানুষ নৌকা ছাড়ার পূর্বে বদরপীর কিংবা পুত্রলাভের জন্য সোনা গাজীর শরণাপন্ন হয় কেন?

উত্তরে পণ্ডিতেরা বলেন, অনার্যদের স্বধর্মে আকর্ষণ করার জন্য আর্যরা অনার্যদের অনেক দেবদেবীকে আপন ধর্মে স্থান করে দেন। অনার্যরা অনুন্নত। তারা ঐসব দেবীর

---

১ দক্ষিণ মিশরে ক্রমাগত কয়েক বৎসর বৃষ্টি না হওয়াতে একবার বিশেষ প্রার্থনার ব্যবস্থা করা হয়। শহরের কাজী (চীফ জাস্টিস) সে নামাজের ইমাম (প্রধান) হবেন। ইনি ছিলেন মারাত্মক ঘুষখোর। নামাজে যাবার পথে হঠাৎ বৃষ্টি নামলো। কাজী যখন আল্লাকে শুকরীয়া (ধন্যবাদ) জানাবার জন্য মিম্বরে (পুল্‌পিটে) উঠলেন তখনই, সঙ্গে সঙ্গে, বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল। টীকাকার বলছেন, 'টিটকারির ভয়ে কাজী মসজিদের পিছনের দরজা দিয়ে পালালেন।'

www.BanglaBook.org

সহায়তায় তখনও বিশ্বাস করে। যারা করে করুক, ক্ষতিটা কি? বদর পীর মৌলাআলীর বেলাও তাই। এবং সবচেয়ে মোক্ষম 'যুক্তি'—পুরুত মোল্লাদেরও তো খেয়ে বাঁচতে হবে। পরমে ব্রহ্মণি যোজিত চিত্তঃ তো আর পূজাপাটা করেন না, আল্লাকে যে-সাধক নূর বা জ্যোতিরূপে অনুভব করে আপন ক্ষীণ জ্যোতি-শিখা তার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন—'কোণের প্রদীপ মিলায় যথা জ্যোতিঃসমুদ্রেই'—তিনি তো আর মোল্লা ডেকে শীর্ণি চড়ান না।' তাই ঘেঁটু-মনসা মৌলাআলী সোনা গাজীর দরকার। সত্যপীর তো আরও শহর-পসন্দ, জনপদবল্লভ—উভয় ধর্মেরই বিশ্বাসীজনকে পাওয়া যায়। মোল্লা পুরুত দুজনারই সুবিধা।

সম্পূর্ণ অবান্তর নয় বলে এস্থলে আরেকটি প্রশ্ন তুলি। তবে কি আজ আর বেদাধ্যয়নের কোনও প্রয়োজন নেই? অবশ্যই আছে। ঋষি কবিরূপে বেদে যে মধুর এবং ওজস্বিনী ভাষায় তাঁর উপলব্ধি প্রকাশ করেছেন সেটি বড়ই মূল্যবান। বুদ্ধি দিয়ে যেটা বুঝেছি সেইটে কবিমনীষীর প্রসাদাৎ তখন হৃদয় দিয়ে অনুভব করে সম্যক অনুপ্রাণিত হই। অনুভূতির হৃদয়াবেগ তখন ধ্যানলোকে অগ্রসর হওয়ার শক্তি সঞ্চারিত করে।

এরই তুলনায়—যদিও এর চেয়ে অনেক নিম্নস্তরের—একটি উদাহরণ দিই। তিক্ত অভিজ্ঞতার পর বুদ্ধি দিয়ে বুঝলুম, দুরাশা করে শুধু বঞ্চিত হতে হয়। তখন যদি কেউ এসে আবৃত্তি করে—

'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়, তাই ভাবি মনে।'

তখন কেমন যেন সেই নিরাশার মাঝখানেও অনেকখানি সান্ত্বনা লাভ করি।

ফ্রান্স যখন অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প, তখন 'মাসে ইয়েজ' গীতি কী অভূতপূর্ব অনুপ্রেরণাই না তাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত করেছিল।

অনেকখানি দাগা খাওয়ার পর যখন মাইকেল 'আশার ছলনা'র কথা ভাবছেন তখন যদি কুরান শরীফের 'ঊষস্' সুরা পড়তেন তবে কি অনেকখানি সান্ত্বনা পেতেন না?

৯৩ অধ্যায়
ঊষস্
(অদ্—দুহা)
মক্কায় অবতীর্ণা
(একাদশ পংক্তি)

আল্লার নামে আরম্ভ—তিনি করুণাময়, দয়ালু।

ঊষালগনের আলোর দোহাই,
নিশির দোহাই ওরে,
প্রভু তোরে ছেড়ে যাননি কখনো
ঘৃণা না করেন তোরে।
অতীতের চেয়ে নিশ্চয় ভালো
রয়েছে ভবিষ্যৎ
একদিন তুই হবি খুশী লভি
তাঁর কৃপা সুমহৎ।
অসহায় যবে আসিলি জগতে
তিনি দিয়েছেন ঠাঁই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তৃষ্ণা ও ক্ষুধা দুঃখ যা ছিল
মুছায়ে দেছেন তাই।
পথ ভুলেছিলি তিনিই সুপথ।
দেখায়ে দেছেন তোরে।
সে কৃপার কথা স্মরণ রাখিস।
অসহায় জন, ওরে—
—দলিস নে কভু। ভিখারী-আতুর
বিমুখ যেন না হয়।
তাঁর করুণার বারতা যেন রে
ঘোষিস জগৎময়॥

সত্যেন দত্তের অনুবাদ

সত্যেন দত্তের অনুবাদে আরম্ভ, 'মধ্য দিনের আলোর দোহাই নিশির দোহাই ওরে।' অথচ আরবীতে 'অদ্-দুহা' অর্থ 'উষা'। ইংরেজি অনুবাদের সর্বত্রই 'আর্লি আওয়ার অব দি মর্নিং'। হয়তো সত্যেন দত্ত ভেবেছিলেন আরবের মধ্যাহ্নসূর্য অতুলনীয়। আল্লা যদি কোনও নৈসর্গিক বস্তুকে সাক্ষী ধরে দোহাই দেন, তবে তিনি মধ্যাহ্ন-সূর্যকেই নেবেন। আমাদের মনে হয় উষা নেওয়া হয়েছিল এই অর্থে যে, রাত্রির অন্ধকার যতই সূচীভেদ্য এবং নৈরাশ্যজনক হক না কেন, উষার আলো প্রভাসিত হবেই হবে। আল্লা এস্থলে বলেছেন, সেটা যে রকম সত্য, আমার বাক্যও তেমনি ধ্রুব।

যাঁরা কুরান শরীফকে 'মেটাফরিকালি' ও 'সিম্বলিকালি' (অর্থাৎ দ্বিতীয় 'পক্ষে') রূপকে ব্যাখ্যা করেন (যেমন পরবর্তী ওমর খৈয়ামের মদকে ভগবৎপ্রেম অর্থে ধরেন, কিংবা ভারতচন্দ্র চৌরপঞ্চা শিকা 'কালী-পক্ষে'ও অনুবাদ করেছেন) তাঁরা বলেন এখানে 'প্রভাতসূর্য' (উষস্, অদ্-দুহা) হজরৎ মুহম্মদের (দ) প্রেরিত-পুরুষ রূপে আগমনের সূচনা করেছে। পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলমান কিন্তু কুরান শরীফকে এ রকম রূপক অর্থে নেন না।

ধর্ম ও কম্যুনিজম্

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে রুশে প্রলেতারিয়ারাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এক মহতী সভার অনুষ্ঠান হয়। সভার আলোচ্য বিষয়বস্তু—কিংবা কর্মসূচী-এজেন্ডাও বলতে পারেন—ছিল মাত্র একটি। ভগবান আছেন কি নেই? বিস্তর তর্কাতর্কির পর স্থির হল, জনমত নেওয়া হক, প্লেবিসিট্ করো।

আজকের দিনের ভাষায় আমরা যাকে বলি 'বিপুল ভোটাধিক্যে' ভগবানের পরাজয় হল। 'বিপুল' কেন,—ভগবান অতিকষ্টে পেলেন শতকরা মাত্র একটি ভোট । ভগবান থাকলেও বোঝা গেল তাঁর পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট অতিশয় রদ্দী, তাঁর 'মাথুর' সত্যসত্যই মথুরা চলে গিয়েছেন; জীপ, মাইক ইত্যাদির সুব্যবস্থা তাঁর ছিল না : তাঁর টাউটরা উভয়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পক্ষের পয়সা খেয়ে শেষটায় ভোট দিয়েছে গণ্ডার আণ্ডা ফেলে দুশমন কাফিরদের সঙ্গে। তবুও হয়তো তিনি আরও দু-চারখানা বেশী ভোট পেতেন, যদি পোলিং বুথের একটু দূরে সামান্য কামুফ্লাজ করে কিঞ্চিৎ ধান্যেশ্বরী গমরাজ ভদ্‌কার ব্যবস্থা রাখতেন। এসব কোনও তরীবৎ না করে আজকের দিনে ভোটের আশা! হুঁঃ! তাঁর ডিপজিটও মারা যায়। সে নিয়ে অবশ্য তাঁর কোনও ক্ষোভ নেই। কারণ তাঁর ম্যানিফেস্‌টোতে ছিল তিনি ধর্মাচারিগণকে মৃত্যুর পর স্বর্গরাজ্যে নেবেন। অর্থাৎ পোস্ট-ডেটেড্ চেক অন এ নন-একজিস্‌টিং ব্যাঙ্ক! তবে এস্থলে নিছক সত্যের খাতিরে আমাদের স্বীকার করতেই হবে : গডের দুশমনরাই যে শুধু এই জিগির তুলেছিল তা নয়, এর কম-সে-কম পঁচিশ বছর আগে প্রাতঃস্মরণীয় আস্তিক স্বামী বিবেকানন্দ নিউইয়র্কে বসে তাঁর শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লিখেছিলেন, 'অন্ন! অন্ন! যে ভগবান এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখবেন—ইহা আমি বিশ্বাস করি না।'

তা সে যাই হোক, ভগবান দশচক্রে ভূত হয়ে রুশ থেকে বিদায় নিলেন।

'উন্মাদ, উন্মাদ, বদ্ধ উন্মাদ!' পাঁড় আস্তিকেরা অবশ্য বলবেন, 'ভোট দিয়ে ভগবানের অস্তিত্ব অথবা তদ্বিপরীত প্রমাণ করার চেষ্টা বাতুলতা। এ সেই পুরনো লোকসঙ্গীত স্মরণ করিয়ে দেয়,

ফুলের বনে কে ঢুকেছে
সোনার জহুরী
নিকষে ঘষলে কমল
আ মরি আ মরি॥

আত্মার উপলব্ধির চরম কাম্য ঈশ্বর। তিন কোটি গাধা-গরু-খচ্চর একজোট হয়ে ম্যাঁ, ম্যাঁ, না, না করলেই কি তিনি লোপ পেয়ে যাবেন!'

আমি কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ধর্মের বিরুদ্ধে রুশের এই সশস্ত্র সংগ্রাম পছন্দ করি। সংগ্রামে পরাজিত, এমন কি নিহত হলে আপাতদৃষ্টিতে ধার্মিকজনের পরাজয় হয় বটে, কিন্তু তাতে করে ধর্ম লোপ পান না। তাই যখনই হিন্দুরা তারস্বরে চিৎকার করেন, 'ধর্ম গেল', 'ধর্ম গেল', কিংবা মুসলমানরা জিগির তোলেন 'ইসলাম ইন ডেনজার', তখন অধমের নিবেদন, পৃথিবীর তাবৎ হিন্দু লোপ পেলেও হিন্দুধর্মের এতটুকু সত্য বিনষ্ট হবে না, তাবৎ মুসলমান মারা গেলেও শব্দার্থে লুপ্ত হবেন না। 'ইসলামে'র শব্দার্থ, 'সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছার সম্মুখে আত্মসমর্পণ করা।' শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনকে সর্বধর্ম ত্যাগ করে তাঁরই শরণ নিতে আদেশ করছেন, তখন ঐ অর্থেই করেছেন। 'সর্বধর্ম' বলতে আজকের দিনে আমরা বুঝি different ideals, different values। আমাদের ভুল বিশ্বাস, ভিন্ন ভিন্ন 'আদর্শ' বুঝিবা একে অন্যকে contradict করে ও সবাই সত্য। তা নয়, সত্য এক। সত্যে দ্বন্দ্ব থাকতে পারে না। তাই বিদ্যাপতির ভাষায় কৃষ্ণলাভ করে শ্রীরাধা বললেন, 'দশদিশ ভেল নিরদ্বন্দ্ব'।

তাই সত্য নিরূপণার্থে দ্বন্দ্বের প্রয়োজন হয়তো হয়। কিন্তু অবহেলা ভয়ঙ্কর জিনিস।

আমার মাঝে মাঝে মনে প্রশ্ন জাগে, রোমকরা যদি প্রথম খ্রীষ্টানদের অত্যাচার না করে অবহেলা করতো, মক্কাবাসিগণ যদি মহাপুরুষ ও তাঁর সঙ্গীদের নির্যাতন না করতো, তাহলে কি হত?

www.BanglaBook.org

ঊনবিংশ শতাব্দীর স্কুল-কলেজে হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মকে অবহেলা করা হল। গোড়ার দিকে যখন খ্রীষ্টানরা হিন্দুধর্মকে চ্যালেঞ্জ করে, তখন বস্তুত হিন্দুধর্মের পুনর্জীবন লাভ হয়। ঐ চ্যালেঞ্জের ফলে হিন্দুদের ভিতর আরম্ভ হল আত্মজিজ্ঞাসা—যে সতীদাহ, বহুবিবাহ, অবরোধ-প্রথা নিয়ে হিন্দু শত শত বৎসর ধরে আপনমনে কোনও চিন্তাই করেননি, তাই নিয়ে আরম্ভ হল তীব্র আলোড়ন আন্দোলন। আজকের দিনের ছেলে-ছোকরারা যে-রকম রাজনীতি, সাহিত্য ও ফুটবল নিয়ে মাথা ফাটাফাটি করে, ঠিক সেইরকম প্রায় একশ বছর ধরে চললো ধর্ম এবং সমাজ নিয়ে আলোচনা। রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট কণ্ঠে বললেন, 'সমাজে যে সব অনাচার প্রচলিত আছে, এর পিছনে ধর্মের সম্মতি নেই।' তাই নিয়ে চললো কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে জোর আলোচনা, প্রচুর আন্দোলন।

পক্ষান্তরে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়—যেখানে দেশের সর্বোৎকৃষ্ট হৃদয় এবং মন একত্র হয়, সেখানে যদি ধর্ম অবহেলিত হয়, সেখানে যদি ধর্ম নিয়ে তর্ক আলোচনা না হয়, তাহলে শহরের গলিতে গলিতে এবং গ্রামে গ্রামে পুরুত-মোল্লারা পেয়ে যান প্রায় অবারিত রাজত্ব—উর্দুতে বলে, তখন তাদের 'দোনো হাত ঘি মে ঔর গর্দান ডেগ্‌মে'—ডেগ্‌চির ভিতর মাথা ঢুকিয়ে তারা তখন পোলাও খায়। ধর্মের নামে তখন সমাজে জমে ওঠে কুসংস্কারের স্তূপ। বিবেকহীন রাজনৈতিকরা নেয় তার চরম সুযোগ। বারোয়ারি পূজার নাম করে তহবিল তছরুপাৎ, মা-দুর্গা চেহারা নেন ফিল্ম স্টারের কিংবা পূজাকমিটি-সেক্রেটারির লেটেস্ট গার্ল ফ্রেন্ডের। আমার চোখের সামনে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে নামলেন এক মহিলা। পেটকাটা ব্লাউজ, শাড়িখানা যেন রবারের তৈরী, সর্বাঙ্গে সেঁটে আছে—তাকাতে লজ্জা করে, লিপস্টিক-রুজের কথা বাদ দিন—কী আপদ, আপনারা জানেন, আমি কোন্ টাইপ মীন করছি—ইনি বাড়ির মহিলাদের নিয়ে মিলাদ শরীফ পরব করতে এসেছেন! পরে বন্ধুর স্ত্রীর কাছে শুনলাম, দোয়াদরূদ পড়ার সময় মাথায় ঘোমটা টানার যে প্রয়োজন, সেটা নাকি ঐ মহিলা করে উঠতে পারছিলেন না, শাড়ি ছোট, বার বার খসে পড়ছিল, বার বার হাত ওঠাচ্ছিলেন বেয়াড়া ঘোমটা দুরস্ত করতে। শেষটায় নাকি সক্কলের দৃষ্টি পড়ে রইল মোল্লানীর হাত-কসরৎ দেখার দিকে।

শুনেছি রুশের সংবিধানে নাকি আছে, 'ধর্মনিরপেক্ষ কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করার অধিকার সর্ব কম্যুনিস্টের আছে।' ফলে ঐ সময়কার একখানা রুশভাষায় লিখিত ইংরেজী শিক্ষার দ্বিতীয় সোপানের পাঠ্যপুস্তকে নিম্নলিখিত কথোপকথন :

প্রথম ছাত্র : ঈশ্বর নেই।

দ্বিতীয় ছাত্র : ওটা একটা বুর্জোয়া কুসংস্কার—ভূতেরই মতো ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কাবুলে থাকাকালীন স্নিয়েশকফ নামক একটি পরিবার—বাপ, মা, ছেলে—তিনজনাই আমার কাছে ইংরেজী পড়ত। যখন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ঐ জোয়ারটি এল, তখন স্নিয়েশকফ একটু লজ্জা পেয়ে বললেন, 'এটা থাক।' ব্যাপারটা ১৯২৭ সালের। তখনও কম্যুনিস্ট রেভলুশন হার্ডবইলড এগ্ হয়নি। জোয়ানদের সকলেই 'ইকনে'র সামনে বিড় বিড় করে বড় হয়েছে। আমি বললুম, 'থাকবে কেন? আমি তো বৌদ্ধধর্মের বই পড়ি সেখানেও ঈশ্বরকে অস্বীকার করা হয়।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তারপরে ১৯৪১/৪২ সনে রুশ যখন হিটলারের হামলায় যায়-যায়, কখন স্তালিন খুলে দিলেন বেবাক চার্চ, বিস্তর মঠ, নিমন্ত্রণ করলেন মিত্র ইংলন্ডের ডাঙর পাদ্রীকে। আবার গির্জায় গির্জায় প্রার্থনা উঠলো, 'হে ঈশ্বর, হোলি রাশাকে ("হোলি"?—তওবা, তওবা) বাঁচাও।'

সেই অরণ্যের মত জনসমাগম, ধর্মোচ্ছ্বাস দেখে স্তালিন খুশী হয়েছিলেন, না পাঁড় কম্যুনিস্টের যা হওয়া উচিত—ব্যাজার হয়েছিলেন, জানি নে। হয়তো বা বিষাদে হরিষ, কিংবা হরিষে বিষাদ। কে জানে!

আমার মনে হয়, ১৭ থেকে ৪১ পর্যন্ত যদি ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা না করে তাকে অবহেলা করা হত, তবে বোধ হয় ঠিক এতটা হত না।

.

এক ঝাণ্ডা

বহু শক্তিকামী জন, দেশ যখন স্বাধীন, তখন রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন না। কারণ সে সময় রাজনীতির ক্ষেত্রে নানা মুনির নানা মত, নানা পাণ্ডার নানা দল। এসব ঝামেলার ভিতর ঢুকতে হলে প্রথমত দরকার গণ্ডারের মত চামড়া, দ্বিতীয়ত বিপক্ষকে নির্মমভাবে হানবার মত ক্ষমতা, তৃতীয়ত দেশের নেতা হওয়ার মত এলেম এবং তাগদ আমার আছে—এই দম্ভ। যাঁদের এ-সব নেই, তাঁরা হয়তো আপন গণ্ডির লোককে তাঁদের মতামত জানান, বড়জোর কাগজে লিখে সেগুলো প্রকাশ করেন, কিন্তু দৈনন্দিন রাজনীতি যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলেন।

কিন্তু এমন সময়ও আসে, যখন তাঁরা এক ঝাণ্ডার নিচে এসে দাঁড়ান। সেদিন এসেছে।

পরাধীন জাতের একমাত্র রাজনীতি স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদান করা। স্বাধীন জাতি আক্রান্ত হলে তার একমাত্র রাজনীতি আক্রমণকারীকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা। সে বিতাড়িত না হওয়া পর্যন্ত সে দেশের অন্য কোন রাজনীতি থাকতে পারে না। বিধানসভা, রাজ্যসভা, ট্রেড ইউনিয়ন, এমন কি পাড়ার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানে তখন বিরুদ্ধ পক্ষ বলে কিছু থাকতে পারে না। দেশের লোক যাকে নেতা বলে মেনে নিয়েছে তাকে তখন প্রশ্নজালে উদ্ব্যস্ত না করা, কিংবা গুরুগম্ভীর মাতব্বরী ভর্তি উপদেশ দিয়ে তাঁর একাগ্র মনকে অযথা চঞ্চল না করা। যদি সে নেতার প্রতি দেশের আস্থা চলে যায়, তবে তাঁকে তাড়াবার জন্য গোপনে দল পাকাতে হয় না। দেশের সর্বসাধারণ তখন ধিক্কার করে ওঠে ও সে সময় তাঁকে সরে দাঁড়াতে হয়। ১৯৪০-এ চেম্বারলেন যেরকম মানে মানে সরে দাঁড়ালেন।

এটা শুধু সম্ভব, যেখানে গণতন্ত্র আছে। ডিক্‌টেটরদের স্বৈরতন্ত্রে এ ব্যবস্থা নেই। সেখানে গেস্তাপো, ওপগু বজ্রহস্তে জনসাধারণের কণ্ঠ রুদ্ধ করে রাখে—যতদিন পারে। তারপর একদিন মুস্‌সলিনিকে মরতে হয় গুলি খেয়ে এবং মাথা নিচের দিকে করে ঝুলতে হয় ল্যাম্পপোস্ট থেকে, হিটলারকে মরতে হয় আত্মহত্যা করে।

রবীন্দ্রনাথ একস্থলে বলেছেন, 'আমি যে আমার ভগবানে বিশ্বাস করি তার কারণ তাঁকে অবিশ্বাস করার স্বাধীনতা তিনি আমাকে দিয়েছেন'—ঠিক ঠিক কথাগুলো আমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মনে নেই বলে পাঠক অপরাধ নেবেন না।

আমি যে পণ্ডিতজীর নেতৃত্বে বিশ্বাস করি, তার কারণ তাঁকে অবিশ্বাস করার অধিকার তিনি আমাকে দিয়েছেন। তিনি গণতন্ত্র, ব্যক্তি-স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন বলেই সে-স্বাধীনতা আমাকে দিয়েছেন। তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন বলেই আপনাকে, আমাকে, আর পাঁচজনকে বিশ্বাস করেছেন—আমরা যে-রকম তাঁকে বিশ্বাস করেছি। আমাদের একান্ত প্রার্থনা, আমরা যেন তাঁর সে বিশ্বাস-ভঙ্গ না করি। শত্রু দেশ থেকে বিতাড়িত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরই ভাষায় বলি, "আরাম হারাম হ্যায়!"

আমার দুঃখের অবধি নেই, শেষ পর্যন্ত চীনদেশ আমাদের আক্রমণ করল! প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে জাপান যখন চীন আক্রমণ করে, তখন ভারতবাসীমাত্রেই মর্মাহত হয়েছিল। সদয় পাঠক এস্থলে আমাকে একটি ব্যক্তিগত ঘটনার উল্লেখ করতে অনুমতি দিন। আমি তখন জর্মনিতে পড়াশুনা করি। সে সময় আমাকে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিতে হয়। প্রসঙ্গক্রমে চীন-জাপানের কথা ওঠে! আমি বলেছিলুম, 'এই যে অর্বাচীন জাপান সংস্কৃতি, ঐতিহ্যে তার পিতামহ চীনের বুকে বসে তার দাড়ি ছিঁড়ছে, এর চেয়ে অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস আর কি হতে পারে!' পরদিন দুই বয়স্ক চীনা ভদ্রলোক আমার বাড়িতে এসে উপস্থিত—এঁরা দুজনেই আপন দেশের অধ্যাপক। জর্মনি এসেছিলেন ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক জন আমার দু'হাত চেপে ধরে বললেন, 'জাপান শক্তিশালী জাতি। অক্ষম চীনের প্রতি দরদ দেখিয়ে তার বিরাগভাগজন হতে যাবে কে? আপনি কাল সন্ধ্যায় যা বললেন, সে শুধু ভারতবাসীই বলতে পারে।' অন্য জনের চোখ দিয়ে হঠাৎ ঝরঝর করে জল বেরিয়ে এসেছে। আমি জানতুম, চীনা ভদ্রসন্তান অত্যন্ত সংযমী হয়, সহজে আপন অনুভূতি প্রকাশ করে না, কিন্তু এখানে এ কী করুণ দৃশ্য! আর আমি পেলুম নিদারুণ লজ্জা। আমি পরাধীন দেশের জীবনমৃত অর্ধ-মনুষ্য। আমার কী হক্ক এসব বিষয় নিয়ে মতামত প্রকাশ করবার!

আজ জানতে ইচ্ছে করে, এই দুই অধ্যাপক এখনও বেঁচে আছেন কি না! থাকলে তাঁরা কি ভাবছেন!

কিন্তু এ-সব কথা বলার প্রয়োজন কি? ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনের যে কত যুগের হার্দিক সম্পর্ক, সে তো ইস্কুলের পড়ুয়া জানে। শুধু এ-দেশ নয়, চীন দেশেও। কারণ চীন দেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি আছে; আজ যদি চীনের টুথব্রাশ-মুস্টাশ্‌হীন নয়া হিটলাররা সে-ঐতিহ্য অস্বীকার করে বর্বর অভিযানই কাম্য মনে করেন, তবে যে-সব সভ্য-ভূমিতে এখনও ঐতিহ্য সংস্কৃতির মর্যাদা আছে, তারা চীনের এই অর্বাচীন আচরণ দেখে স্তম্ভিত হবে। অবশ্য এ-আচরণ সম্পূর্ণ নূতন নয়। রুশ দেশ যখন প্রথম কম্যুনিজম ধর্ম গ্রহণ করে তখন সে-দেশও তার গগল, পুশকিন, তুর্গেনিয়েভ, চেখফকে 'বুর্জুয়া', 'শোষক', 'প্রগতিপরিপন্থী' বলে দেশ থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছিল, কিন্তু কিছুদিন যেতে-না-যেতেই দেখতে পেল, কূপমণ্ডুক হয়ে থাকতে চাইলে অন্য কথা, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—মানবসভ্যতার যে চিরন্তন দেয়ালী উৎসব চলছে, তাতে যদি রুশ তার ঐতিহ্যের প্রদীপ নিভিয়ে বসে থাকে তবে সে অন্ধকার কোণ থেকে কেউ তাকে টেনে বের করবে না। তাই আজ আবার রুশ দেশ বিনা বিচারে তার সাহিত্যিকদের পুস্তক ছাপে—সেগুলোতে সে যুগের অনাগত কম্যুনিজমের জয়ধ্বনি থাক আর নাই থাক।

www.BanglaBook.org

তাই যখন কম্যুনিজম গ্রহণ করার পর চীন বললে, 'পৃথিবীতে হাজার রকমের ফুল ফুটুক'—তখন আমরা মনে করেছিলুম, অপরের প্রতি সহিষ্ণুতার ঐতিহ্য স্মরণ করেই চীন এ-কথা বলেছে, কিয়ৎকালের জন্যে রুশ আপন ঐতিহ্য অস্বীকার করে যে মূর্খতা দেখিয়েছিল, তার থেকে সে শিক্ষালাভ করেছে, এবং এখন লাওৎসে কনফুৎস এবং বৌদ্ধ-ঐতিহ্যের সঙ্গে কম্যুনিজম মিশে গিয়ে এক অভিনব সমাজ-ব্যবস্থা, ধন-বণ্টন পদ্ধতি দেখা দেবে। তার সঙ্গে আমাদের মনের মিল হওয়ার সম্ভাবনা কম, কিন্তু সে এক্সপেরিমেন্ট যে বিশ্বজনের কৌতূহল আকর্ষণ করবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

কিন্তু 'এই হাজার রকমের ফুল ফুটুক' যে নিতান্ত মুখের কথা, সেটা তিন দিনেই ধরা পড়ে গেল। আমরাই যে শুধু ধরতে পেরেছি তাই নয়, চীনা আক্রমণের পরের দিনই এক সুইস কাগজে একটি ব্যঙ্গচিত্র বেরোয়। ছবিতে জনমানবহীন বিরাট বিস্তীর্ণ এক বরফে ঢাকা মাঠে মাত্র একটি ফুল ফুটেছে। তার নীচে লেখা 'ভারতবর্ষ'। তারই পাশে দাঁড়িয়ে চু এন লাই। পাশে যে সখা দাঁড়িয়ে, তাকে বলছেন, 'এ-ফুলটি আমি তুলে নেব।'

অত সহজ নয়।

একদিন জাপান তার উত্তমর্ণ চীনকে আক্রমণ করেছিল। আজ চীন তার উত্তমর্ণ ভারতকে আক্রমণ করেছে।

চীন দেশ কখনও কোনও ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেনি। লাওৎসে, কনফুৎস যে জীবনদর্শন প্রচার করেছেন, তাতে আছে কি করে সাধু, সৎ জীবন যাপন করা যায়, কিন্তু ইহলোক পরলোকে মানুষের চরম কাম্য কি এই পঞ্চভূত পঞ্চেন্দ্রিয়াশ্রিত মরদেহ চৈতন্যের ঊর্ধ্বলোকে কি আছে, কি করে সেখানে তথাগত হওয়া যায়, এ সম্বন্ধে তাঁরা কোনও চিন্তা করেননি।

অথচ বুদ্ধের বাণী যখন মৃদু কাকলি রবে চীন দেশে পৌঁছল, তখন থেকেই বহু চীনা এদেশে এসেছেন। ইৎসিং, ফা-হিয়েন, য়ুয়ান চাঙ, আরও সামান্য কয়েকটি নাম আমরা সকলেই জানি, কিন্তু এঁরা ছাড়া এসেছেন আরও বহু বহু চীনা শ্রমণ। বিশেষ করে য়ুয়ান চাঙের ভ্রমণ-কাহিনী পড়লে আজও মনে হয় যেন পরশু দিনের লেখা! বৌদ্ধ শ্রমণ যেমন যেমন ভারতের নিকটবর্তী হতে লাগলেন, তখন তাঁর হৃদয়মনে কি উত্তেজনা, ভারতবর্ষে পৌঁছে তার প্রতিটি তীর্থ দর্শন করে তিনি কী রকম রোমাঞ্চ কলেবর! কামরূপের রাজা যখন তাঁকে পাহাড়ের উপরে নিয়ে গিয়ে পূবদিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন, ঐ আপনার মাতৃভূমি, পঁচিশ মাইল হয় কি না হয়, তখন বৃদ্ধ শ্রমণ চিন্তা করেছিলেন, কত না বিপদের সম্মুখীন হয়ে, কত না ঘোরালো পথে তাঁকে তথাগতের জন্মভূমিতে আসতে হয়েছে।

ভারতের রাজা হর্ষবর্ধন তাঁকে সসম্মানে সখারূপে গ্রহণ করেছিলেন।

আজ যদি চীন সে সখ্য ভুলতে চায়, ভুলুক।

ভারতও তার রুদ্র রূপ দেখাতে জানে।

জয় হিন্দ্।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"রাঁধে মেয়ে কি চুল বাঁধে না?"

চীনেদের ঠেঙিয়ে বের করতে হবে, এ তো বাঙলা কথা। কিন্তু 'রাঁধে মেয়ে কি চুল বাঁধে না?'—এর অর্থটি সরল। যে মেয়ে রাঁধছে তার যদি খোঁপাটি তখন ঢিলে হয়ে যায়—তবে সে কি রাঁধতে রাঁধতেই চুল বাঁধে না? রান্না বড়ই প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান, কিন্তু চুল বাঁধাটা এমন কিছু মারাত্মক অপরিহার্য শুভকর্ম নয় যে, তদভাবে বাড়িসুদ্ধ লোক মারমুখো হয়ে চেলি নিয়ে বাড়ির বউয়ের দিকে তাড়া লাগাবে। তবু বাড়ির বউ জানে, রাঁধতে হয়, চুলও বাঁধতে হয়।

অর্থাৎ চীনাকে ঠ্যাঙাবার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আরও পাঁচটা কাজ আছে। সেগুলো আপাতদৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় মনে না হলেও দেশসুদ্ধ লোকের কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনে লিপ্ত হয়ে শিবনেত্র হয়ে যাওয়ারও কোনো অর্থ হয় না। অবশ্য এ কথা সত্য, যুদ্ধের বাজারে কোন্‌টা যে 'রাঁধা' অর্থাৎ অত্যাবশ্যক আর কোন্‌টা যে 'চুল বাঁধা' অর্থাৎ দোহার, এ দুটোতে আকছারই ঘুলিয়ে যায়। ধড়িবাজ মেয়ে যে চুল বাঁধার ছল করে রান্নার গাফিলি করে এটা জানা কথা এবং কট্টর গিন্নী যে বেধড়ক রান্নার তোড়ে খাটাশের মত চেহারা বানিয়ে তোলেন সেও জানা কথা।

এ দুটোর তফাত করবেন দেশের কর্তাব্যক্তিরা। আমার শাস্ত্রাধিকার নেই। তবে কিঞ্চিৎ অতি সামান্য অভিজ্ঞতা আছে। একবার আমি অতিশয় অনিচ্ছায় এক খণ্ড যুদ্ধের মাঝখানে তুচ্ছ উলুখড়েরও জীবন যে কি মর্মান্তিক নিদারুণ হতে পারে তার প্রীহাতঙ্কী—পীতাতঙ্কের সঙ্গে ঘুলিয়ে ফেলবেন না, ওটা আমার নেই—অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলুম। সে দুর্দিনে পেটের ভাত জুটছিল না বলে ভয়ের চোটে সেটা শুকিয়ে চাল হতে পারেনি। তার বর্ণনা পুস্তাকাকারে ছাপিয়েও ছিলুম। তবে আপনারা সেটি পড়েছেন বলে মনে হয় না—বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট তো তাই বলে।

দ্বিতীয়বার আমি স্যানা হয়ে গিয়েছি—কথায় বলে, 'একবার ঠকলে ঠকের দোষ, দুবার ঠকলে তোমার দোষ।' সন ১৯৩০ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত উভয় পক্ষের যুযুধানকে উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ করার পর যখন আমার প্রীহা দ্বিতীয়বার উলুখড় হতে কবুল জবাব দিল, তখন নিরপেক্ষ স্থল অকুস্থলে পরিণত হওয়ার পূর্বেই আমি আমার যুবতী স্ত্রী নিয়ে পলায়ন করি ('য পলায়তি স জীবতি'—কে বলে আমি সংস্কৃত জানি নেই)।

দেশে ফিরেই কানটি সেঁটে দিলুম বেতারের লাউড্‌স্পীকারের সঙ্গে। জর্মন কি বলছে না বলছে সে তো ইংরেজ এই কালা আদমীকে সদয় হয়ে শোনাবে না। তারপর মস্কো বেতার। সেটা যখন হিটলার গুঁড়িয়ে দিল তখন কুইবিশেয়ফ। সেটাও যখন দাঁতমুখ খিঁচিয়েও শোনা যায় না, তখন রুশদেশেরই ছোট্ট বেতার কেন্দ্র আজারবাইজান—ভাগ্যিস তারা ফার্সিতেও খবর প্রচার করত।

যুদ্ধের পর হালের বলদ নৌকোর পাল বিক্রী করে যুদ্ধ বাবদে জর্মন এবং ফরাসী বই কিনেছি দেদার। ইংরিজি বই এদেশে পাওয়া যায়। চুরি করে চালিয়ে নিই।

মোকা পাওয়ামাত্রই দুবার জর্মন ঘুরে এসেছি। ১৯৫৮ এবং এই গ্রীষ্মের ১৯৬২-তে।

www.BanglaBook.org

এবং জোর গলায় পরিষ্কার করে ফের বলতে হল, প্রধানত মিশেছি নিম্নমধ্যশ্রেণী এবং ফ্যাক্টরিতে যারা কাজ করে তাদের সঙ্গে—তাদেরই মিলনকেন্দ্র ক্লাইপেতে, লকালে বা বিয়ারখানায়, যা খুশি বলতে পারেন। বড়লোকদের সঙ্গে মিশেছি অল্পই। তবে বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে ইচ্ছায়, কিছুটা অনিচ্ছায় মিশতে হয়েছে খানিকটা। ক্রুপ্ স্টীনেসদের সঙ্গে মেশবার কোনও সুযোগই হয় নি। আমার লেখা গোগ্রাসে না গিলে আস্তে আস্তে পড়লেই এ কথাটা পাঠক মাত্রই বুঝতে পারবেন। জর্মনি সম্বন্ধে আমার যা জ্ঞান-গম্যি তার ৯০ নঃ পঃ বিয়ারখানা থেকে সংগৃহীত, বাকিটা বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি থেকে। তাদের সক্কলেরই মোটরগাড়ি ছিল কিন্তু দাসী, হাউস-টখটর, এমন কি হেল্পিং হ্যান্ডও ছিল না।

এর থেকে আমার যা সামান্য অভিজ্ঞতা হয়েছে, তারই জোরে দু'একটি কথা নিবেদন করি।

এই 'চুল বাঁধার' কথা ধরা যাক্।

১৯৩৯-এ হিটলার যখন লড়াইয়ের জিন্ বোতল থেকে বের করে আসমানে ছেড়ে দিলেন তখন যুদ্ধ বাবদে তাঁরও অভিজ্ঞতাও ছিল কম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি করপরেল রূপে লড়েছিলেন সত্য, কিন্তু তাতে করে তো 'অল আউট ওয়োর' সম্বন্ধে ওকীব হাল হয়ে যাওয়ার কথা নয়। তাই তিনি ভাবলেন, সর্বপ্রথম উচিত-কর্ম হচ্ছে, বিলাসব্যসন ত্যাগ করা। তাই বন্ধ করে দাও হেয়ার ড্রেসিং সলুনগুলো।

এস্থলে একটুখানিক সবিস্তর বুঝিয়ে বলতে হয়, জর্মনির শহুরে মেয়েরা এই ড্রেসিং সলুনের উপর কতখানি নির্ভর করে। এবং আজকের চেয়ে ১৯৩৯ সালে নির্ভর করত আরও অনেক বেশী। তখনও পার্মানেন্ট ওয়েভ-এর জোর রেওয়াজ। সলুনওলী প্রথম চুলে ঢেউ খেলিয়ে দিয়ে পরিয়ে দেয় এক মুকুট, চালিয়ে দেয় ইলেক্‌ট্রিরি যন্ত্র। এসবের মারপ্যাঁচ আমি বুঝি নে। তবে মুকুট খোলার পর দেখা যায়, দিব্য ঢেউ-খেলানো চুল হয়ে গিয়েছে। নূতন করে গোড়ার দিকের চুল বেশ খানিকটে না গজানো পর্যন্ত এ ঢেউ লোপ পায় না।

যারা সলুনে ঢেউ-খেলানো চুলের মাথা বানিয়ে নিয়ে আসে, তাদের মস্তকে হল বজ্রাঘাত—হিটলারের এই হুকুম শুনে। শহরের বহু বহু মেয়ে আপন চুলের তদারকি নিজে করতে পারে না। এক মাসের ভিতরই দেখা গেল মাথায় মাথায় বাবুইয়ের বাসা। কিন্তু কার ঘাড়ে দুটো মাথা যে হুজুর হিটলারের কাছে এর প্রতিবাদ জানায়! সবাই গিয়ে কেঁদে পড়লেন ফ্রাউ গ্যোবেল্‌সের পায়ে। এভা ব্রাউন, রীফেনটালের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পূর্বে হিটলার প্রায় প্রতিদিন গ্যোবেল্‌সদের বাড়ি যেতেন। শেষ দিন পর্যন্ত হিটলারের উপর ছিল তাঁর অসাধারণ প্রতিপত্তি—স্বৈরতন্ত্রের সর্বাধিনায়কের উপর যতখানি হতে পারে। (তাই ফ্রাউ গ্যোবেল্‌স্ যখন জানতে পারলেন হিটলার আত্মহত্যা করবেন, তখন তিনি বললেন, 'ফ্যুরার-হীন পৃথিবীতে বেঁচে থেকে কি লাভ, আমিও আত্মহত্যা করব', এবং তিনি তাই করেও ছিলেন।)

ফ্রাউ গ্যোবেল্‌স্ হিটলারের সামনে গিয়ে বললেন, 'মাইন ফ্যুরার (প্রভু আমার)! আপনি কি চান যে আপনার জওয়ানরা রণক্ষেত্র থেকে ছুটিতে ফিরে এসে দেখুক কতকগুলো উস্কোখুস্কো চুলওলী খাটাশীদের?'

হিটলার আইন নাকচ করে দিলেন।

www.BanglaBook.org

তাই বলছিলুম রাঁধে মেয়ে কি চুল বাঁধে না?

* * *

এখন প্রশ্ন, কোন্ কোন্ কর্ম স্থগিত রাখতে হবে, আর কোন্ কোন্ কর্ম আরও জোরসে চালাতে হবে। পূর্বেই এ-প্রশ্নের আভাস দিয়েছি এবং এখনও বলছি, আমি সমাজপতি নই, কাজেই আমি এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম। তবে একটা কথা বলতে পারি, বুক ঠুকে বলতে পারি—আমরা যেন হাসতে ভুলে না যাই। অর্বাচীন চীনের আচরণে ব্যথিত হয়ে আমাদের শিবুদা (শিবরাম চক্রবর্তী) যদি মশকরা করতে ভুলে যান তবে আমি হাসতে হাসতে তাঁকেই জবাই করব।

এই হাসতে পারাটা গণতন্ত্রের প্রধান লক্ষণ। পণ্ডিতজী চীনকে বিশ্বাস করে যে ঠকেছেন তাই নিয়ে সুবে বিলেত-মার্কিন পশ্চিম ইয়োরোপ হাসছে। কত না কার্টুন ব্যঙ্গচিত্র বেরোচ্ছে। আমরা প্রাণ খুলে হাসতে পারছি নে সত্য কিন্তু শীতকালে ঠোঁট ফেটে গেলে লোক যে রকম হাসে সে রকম হাসছি তো সত্য। কারণ একা পণ্ডিতজী তো চীনকে বিশ্বাস করেননি, আপনি আমি রামা-শ্যামারাও করেছিলুম। এখন সবাই আমাদেরই নিয়ে হাসছে। এ অবস্থায় আমাদের চটে যাওয়াটা অতিশয় অরসিকের কর্ম হবে। আমরাই শুধু দুনিয়ায় পাগলামি, দুষ্টামি দেখে হাসব, আর আমাদের সরলতা আমাদের ভালো-মানষামী দেখে অন্য লোকের হাসি আমরা সইব না, এটা কোনও ভালো কথা নয়।

এই তো সেদিন একটা রসিকতা পড়ছিলুম।

পূর্ব জর্মনির এক কুকুর পশ্চিম জর্মনির মামাতো ভাইয়ের বাড়িতে কয়েকটা দিন কাটাতে এসেছে। অতিথিবৎসল দাদা শুধোলে, 'তোকে কি খেতে দেবো বল দিকিনি, ভাইয়া! গুটিকয়েক সরেস, তাজা খাজা হাড্ডি চিবুবি?'

পূর্ব জর্মনির কুকুর বললে, 'না, থ্যাঙ্কু! আমাদের ওদিকে মেলাই খাবার রয়েছে! তোদের চেয়ে অনেক ভালো!'

দাদা শুধোলে, 'তবে, তবে কিছু একটা চাটবি? জল? শরবৎ? দুধ? মদ?'

'না, ওসবে আমার দরকার নেই। বাড়িতে ঢের রয়েছে।'

'তাহলে চল্, আমার ঘরে একটু জিরিয়ে নে।'

'কিচ্ছু দরকার নেই। আমার দিব্য সুন্দর ঘর রয়েছে বাড়িতে।'

বড়দা তখন চটে গিয়েছে। হুঙ্কার ছেড়ে বললে, 'তবে এখানে মরতে এসেছিস কেন? তোর যখন সবই রয়েছে?'

'ও দাদা! এখানে যে প্রাণভরে ঘেউ ঘেউ করা যায়। আমি ঘেউ ঘেউ করব।'

* * *

ঐ হল লৌহ-যবনিকার ওপারের দেশের আইন। সেখানে আপন আপত্তি-অজুহাত চেঁচিয়ে জানানো বারণ। সেখানে আইনকানুন সর্বনেশে। আমরা এদিকে যত খুশি ঘেউ ঘেউ করতে পারি—কিন্তু হাসতে যেন না ভুলি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওয়ার এম্

রাজা প্রজাগণকে কহিলেন,

'দেখ, আমার রাজ্যে শত্রুভয় উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা ফলিত[১] বংশের[২] ন্যায় অচিরাৎ বিনষ্ট হইবে। শত্রুগণ আত্মবিনাশের নিমিত্তই আমার রাজ্যে আক্রমণ করিতে অভিলাষ করিতেছে। এক্ষণে এই ঘোরতর ভয়াবহ আপদ সমুপস্থিত হওয়াতে আমি তোমাদিগকে পরিত্রাণার্থ অর্থ প্রার্থনা করিতেছি। উপস্থিত ভয় নিরাকৃত হইলে তোমাদিগকে পুনরায় প্রদান করিব।[৩] আর শত্রুগণ যদি বলপূর্বক তোমাদের ধন গ্রহণ করে, তাহা হইলে তোমরা কদাচ উহা পুনঃপ্রাপ্ত হইবে না। বিশেষত অরাতিগণ রাজ্য আক্রমণ করিলে তোমাদের পুত্রকলত্রাদিও বিনষ্ট হইবে। তাহা হইলে তোমাদের অর্থ আর কে ভোগ করিবে! তোমরা আমার পুত্রের ন্যায়, আমি তোমাদের সমৃদ্ধি দর্শনে যারপরনাই পরিতুষ্ট হইয়া এই আপৎকালে রাজ্যরক্ষার্থে তোমাদিগের নিকট অর্থ প্রার্থনা করিতেছি। তোমরা যথাশক্তি ধন উৎপাদনপূর্বক[৪] রাজ্যের উপদ্রব নিবারণ কর। বিপদকালে ধনকে প্রিয় বোধ করা অত্যন্ত অকর্তব্য।'

রাজ্যপালন সম্পর্কে যুধিষ্ঠির কর্তৃক ভীষ্মকে প্রশ্ন করায় ভীষ্মের উত্তর। মহাভারত,

---

১. ২. ফলবান্ বংশের—বাঁশের ফল হইলে বাঁশ মরিয়া যায়। অনুবাদকের টীকা। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ। 'বসুমতী'।

৩ আজকের দিনের 'উয়োর-বনড, ডিফেন্স্ সার্টিফিকেট্'।

৪. ধন উৎপাদনের একমাত্র পন্থা, প্রোডাক্শন্ বাড়ানো। অর্থাৎ ইন্ডাসট্রিয়াল ও এগ্রিকালচরল তৈজসপত্র বাড়ানো। না হলে শুধুমাত্র ধনে সর্ব সমস্যার সমাধান হয় না। কথিত আছে, বর্বর মঙ্গলরা যখন প্রবল প্রতাপশালী আব্বাসী খলিফার রাজধানী বাগ্‌দাদ দখল করে খলিফাকেও বন্দী করতে সক্ষম হল, তখন মঙ্গল সেনাধ্যক্ষ খলিফাকে নিমন্ত্রণ করলেন। ভোজনের জন্য খলিফার সামনে রাখলেন থালা থালা সোনা-জহরৎ। নিজের সামনে রাখলেন উত্তম উত্তম আহারাদি। খেতে খেতে খলিফাকে শুধোলেন, 'হুজুর, খাচ্ছেন না কেন?' হুজুর চুপ করে রইলেন। পুনরায় সেই প্রশ্ন। পুনরায় 'নো রিপ্লাই'। তৃতীয় বারে নিরুপায় হয়ে খলিফা বললেন, 'এগুলো তো খাবার জিনিস নয়।' মঙ্গল বললেন, 'সে কি হুজুর, আপনার রাজত্ব জয় করবার পর আপনার ধনাগার বোঝাই পেলুম এই সব সোনা-জহর। ভাবলুম এগুলো বুঝি আপনি খান। অন্য কোনও কাজে লাগাননি তাই।'

অর্থাৎ, শুধু ধন দিয়ে সব-কিছু হয় না।

তাহলে ধনী লোকের বাড়িতে ডাকাতি হত না।

হিটলার কি আদর্শ নিয়ে শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন সেটা জানবার আমাদের প্রয়োজন নেই, কিন্তু সম্পূর্ণ দেউলে রাষ্ট্রকে তিনি কি করে জোরদার করলেন সেটা জানা উচিত। তিনিও বলেছিলেন, 'আমার ব্যাঙ্কে সোনা-জহর নেই। বয়ে গেল। আমি চাই জোয়ান মেয়েমদ্দ। যারা উৎপাদন করতে পারে। আপন বাহুবলে। আমি রাজা, তখন সেগুলো কিনব।' তাই ভীষ্মদেব ধন উৎপাদনের আদেশ দিয়েছিলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শান্তিপর্ব, সপ্তাশীতিতম অধ্যায়। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদে তৃতীয় খণ্ড, ৪৫০ পৃঃ।

যুদ্ধ কাম্য নয়। একথা সত্য, যুদ্ধের সময় অনেকেই আপন শৌর্য, বীরত্ব দেখিয়ে আপন জাতকে গৌরবান্বিত করেন, কিন্তু শেষ বিচারে দেখা যায়, যুদ্ধে অমঙ্গলের অংশই বেশী।

তাই যখন কোনও জাতিকে বাধ্য হয়ে সংগ্রামে নামতে হয়—আজ আমরা যে-রকম নেমেছি—তখন তাকে খুব ভালো করে, অতিশয় সুস্থ মস্তিষ্কে আবেগ-উচ্ছ্বাসরহিত হৃদয়ে চিন্তা করে নিতে হয়, তার উদ্দেশ্য কি? সে কি চায়? একে বলা হয় ওয়ার এম্।

তার খানিকটা নির্ভর করে বিপক্ষের মতলবটা কি, সে কি চায়—তার ওপর।

চীন প্রাচ্যদেশের জনবলে বলীয়ান মহারাষ্ট্র। কিন্তু জন থাকলেই ধন হয় না। চীন গরিব দেশ। তাই গত দশ-বারো বৎসর ধরে সে আপ্রাণ চেষ্টা করছে, কি করে সে আপন ধনদৌলত বাড়াতে পারে। প্রধানত রুশের সাহায্যে।

ইতিমধ্যে এই নয়া কম্যুনিস্ট জাত অর্থাৎ চীন—খানদানী কম্যুনিস্ট জাত অর্থাৎ রুশকেও খানদানিত্বে এক কাঠি ছাড়িয়ে যেতে চাইল। এটা পৃথিবীর ইতিহাসে আকছারই হয়েছে। পূর্ববাংলায় মুসলমানরা বলে, 'নয়া মুসলমান গোরু খাওয়ার যম হয়।' অর্থাৎ শ্মশানের চাঁড়াল যদি হঠাৎ দৈবযোগে পৈতে পেয়ে যায় তবে তার বাড়িতে যা সন্ধ্যা-আহ্নিকের ঘটা লাগে তা দেখে জাত ব্রাহ্মণ পরিত্রাহি রব ছাড়ে। চীন বেশ কড়া গলায় রাশাকে বললে, 'তুমি যেভাবে মার্কিনিংরেজের সঙ্গে দহরম-মহরম করছ সেটা মার্কস্-লেনিনবাদের বিশ্ব-কম্যুনিজম আশু আনয়ন করার বিপক্ষে যায়। তুমি শান্তি চাইছ; এ করে এখনকার মত শান্তি পাচ্ছ বটে, কিন্তু চিরন্তন শান্তি আসবে একমাত্র বিশ্ব-কম্যুনিজমের ফলরূপে। তার জন্য দরকার আপন "ধর্মে"—অর্থাৎ কম্যুনিজমে—বিশ্বাস। তার অর্থ শান্তির মারফতে ইহসংসারে কোনও প্রকারের প্রগতি হয় না। সর্ব প্রগতি যুদ্ধের মাধ্যমে। অতএব মার্কিনিংরেজ যেখানে বলবে "শান্তি চাই", তুমি সঙ্গে সঙ্গে বলবে "যুদ্ধ চাই"। এই করে আসবে বিশ্ব-কম্যুনিজম।

রুশ বললে, 'হক্ কথা। কিন্তু মার্কস-লেলিনের আমলে অ্যাটম বম্ ছিল না। এখন যদি যুদ্ধ চালাই তবে আখেরে যে সব-কিছু লণ্ডভণ্ড ছারখার হয়ে যাবে। বেঁচে থাকবে কে?'

এখানে এসে চীন কিছু বলে না। কারণ চীন জানে, রুশ ইংলন্ড আমেরিকার জনসংখ্যা ৯৯ পার্সেন্ট মরে গেলেও তার আপন দেশে থাকবে লক্ষ লক্ষ লোক। কারণ তার জনসংখ্যা সক্কলের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশী। তারাই তখন পৃথিবীর রাজত্ব করবে।

এটা কিছু নূতন তত্ত্ব নয়। ১৯৩৮-এ ইংরেজ-ফরাসী চেয়েছিল হিটলারে-স্তালিনে লড়াই লাগিয়ে দুই ব্যাটাই মরে; তাঁরা পরমানন্দে বিশ্ব-সংসারটা চষে বেড়াবেন।

কট্টর কম্যুনিস্ট বিশ্বাস করে যে, যারা কম্যুনিজমে বিশ্বাস করে না তারা সবাই এক গোয়ালের গরু। তার কাছে মার্কিন যা ভারতবাসীও তা। ইংরিজীতে কথায় কথায় বলে যে আমার স্বপক্ষে নয় সে আমার শত্রু—নিরপেক্ষ বলে কোনও জিনিস নেই। কাজেই আমরা যে ভারতীয়েরা চীনের শত্রু-মিত্র কিছুই নই, আমরাও তার শত্রু—আমাদের একমাত্র 'অপরাধ' আমরা কম্যুনিস্ট নই—অথচ ধর্ম জানেন, আমরা কম্যুনিস্টদের প্রতি যতখানি সহনশীল, চেকোশ্লোভাকিয়া কিংবা পোল্যান্ড অতখানি হবে না। যদি আজ পূর্ণ স্বাধীনতা পায় তবে কম্যুনিস্টদের ঠেঙিয়ে ঠাণ্ডা করে দেবে। এই যে পশ্চিম জর্মনি

www.BanglaBook.org

গণতান্ত্রিক দেশ, সেও কম্যুনিস্টদের বরদাস্ত করে না।

খুশ্চভ এ তত্ত্বটি ভালো করেই জানেন। তাই তিনি ভারতকে শত্রুর চোখে দেখেন না। তাঁর বিশ্বাস তিনি এবং অন্য কম্যুনিস্টরা যদি আমাদের দিকে চোখ রাঙায়—আক্রমণ দূরে থাক—তবে আমরা পুরো পাক্কা ক্যাপিটালিস্ট হয়ে গিয়ে মার্কিনকে আমাদের দেশে বিমানঘাঁটি বানাতে দেব, এবং শেষ হিসেবের দিন তার হয়ে রুশের বিরুদ্ধে লড়ব।

চীন যখন রাশাকে আমাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন করতে পারলো না, এবং শুধু তাই নয়, রুশ যখন চীনের বাড়াবাড়ি বরদাস্ত না করতে পেরে তার সর্ব সাহায্য বন্ধ করে দিল—শুনতে পাই রাশানরা চীন ত্যাগ করার ফলে তাদের তৈরী কারখানাগুলো চালকের অভাবে খাঁ খাঁ করছে—তখন চীন বললে, 'এটার একটা ইস্‌পার-উস্‌পার করতে হবে। আমি ভারত আক্রমণ করে দেখি রুশ তখন কি করে? সে তো আর কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অকম্যুনিস্ট রাষ্ট্র—অর্থাৎ ভারতকে সাহায্য করতে পারবে না!'

এইটে চীনের গৌণ ওয়ার এম্—যুদ্ধের উদ্দেশ্য।

মুখ্য ওয়ার এম্ তবে কি?

পোল্যান্ড-রুশের বিরুদ্ধে হিটলারের ওয়ার এম্ ছিল, (১) ওদের সৈন্যবাহিনীকে সমূলে ধ্বংস করা, (২) ওদের নেতৃস্থানীয় কমিসারদের নিধন করা—তারা যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করুক আর নাই করুক, অর্থাৎ কোলডব্লাডেড মার্ডার। (৩) তাদের রাজত্বে জর্মনদের বসতি স্থাপনা করে তাদের দিয়ে দাসের কাজ করানো।

রুশভেল্ট ঠিক অতখানি চাননি। তবে তিনিও জর্মনদের কাছ থেকে শর্তহীন আত্মসমর্পণ চেয়েছিলেন—আন্‌কন্ডিশনাল সারেন্ডার। অর্থাৎ তিনি নাৎসী গুণ্ডা ও জর্মন জনসাধারণের মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখেননি। চার্চিল এটা পছন্দ করেননি—তিনি চেয়েছিলেন নাৎসী রাষ্ট্রের পতন ও গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—ঐ ছিল তাঁর ওয়ার এম্।

চীন আমাদের সমূলে ধ্বংস করে এ-দেশে চীনা চাষাভূষোর বসত করতে চায় নি কিন্তু চীনের অন্যতম ওয়ার এম্ ছিল এদেশে কম্যুনিস্ট রাজ বসানো। চীন আশা করেছিল সে ভারতে হামলা দেওয়া মাত্রই এ-দেশের কম্যুনিস্টরা দেশের জনসাধারণকে তাতিয়ে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র বসাতে পারবে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, সেটা হল না। এমন কি অনেক খাঁটি কম্যুনিস্ট, চীনের এ আচরণে অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছেন এবং অনেকেই পণ্ডিতজীর ঝাণ্ডার নীচে এসে দাঁড়িয়েছেন—আর খুশ্চভ-পন্থীরা তো রীতিমত উষ্মা প্রকাশ করেছেন।

স্মরণ রাখা উচিত, চীনাদের এ ওয়ার এম্ উপস্থিত মূলতবী থাকলেও সেটাকে সে কখনও বর্জন করবে না। আমাদের তার জন্য হুঁশিয়ার হয়ে থাকতে হবে—হয়তো বা বহু বৎসর ধরে।

আমার মনে হয় চীন চায় আমাদের পঙ্গু করে রাখতে। প্রাচ্য দেশের দুই বিরাট ভূখণ্ড চীন এবং ভারত। ভারত কম্যুনিস্ট না হয়েও দেশের ধনদৌলত বাড়াতে চেয়েছে, আর চীন কম্যুনিজমের মাধ্যমে। এবং চীন যে বিশেষ সফল হয়নি এ কথা বিশ্বসুদ্ধ সবাই জেনে গিয়েছে। পক্ষান্তরে আমরা যে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছি সেও জানা কথা। আখেরে তা হলে আমরাই প্রাচ্য দেশগুলোর নেতৃস্থানীয় হব। চীনের কর্তারা এটা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছেন না।

তাই তাঁদের মতলব আমরা যেন আমাদের ধনদৌলত বাড়ানো বন্ধ করে বন্দুক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কামানের দিকে মন দিই। তাই নিয়ে চীনের কোন আশঙ্কা নেই, কারণ চীন বিলক্ষণ জানে, আমাদের বন্দুক-কামান যতই বাড়ুক না কেন, আমরা কখনও চীন আক্রমণ করবো না। মাঝের থেকে বন্ধ্যা বন্দুক-কামানের সেবা করে আমাদের ধনদৌলত বৃদ্ধি ক্ষান্ত হবে।

দুঃখের বিষয়, আমাদের বন্দুক-কামান বাড়াতে হবে।

কিন্তু আমাদের ওয়ার এম্ চীনার বিনাশ-সাধন নয়। আমাদের ওয়ার এম্ অত্যন্ত লিমিটেড—সঙ্কটকালে আক্রমণকারীকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা। এবং ভবিষ্যতে যেন সে দম্ভ-ভরে পুনরায় আক্রমণ করার সাহস না পায়। তার জন্যে বেশ কয়েক বৎসর ধরে বন্দুক-কামান বানাতে হবে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গরিব-দুঃখীর মুখে অন্ন তুলে দেবার জন্য আমাদের ধনদৌলতও বাড়াতে হবে।

তাই বলছিলুম, রাঁধবো এবং চুলও বাঁধবো।

দ্য গল্

একপাল কাকের মধ্যিখানে ডাণ্ডা ছুঁড়ে মারলে যা হয়, কয়েক দিন পূর্বে ইউরোপোমেরিকায় তাই হয়ে গেল। বারোয়ারী বাজার, বারোর হাট, যুক্তহট্ট—যা খুশি বলুন—তারই দিকে তাগ করে জেনেরাল শার্ল দ্য গল্ ইংরেজকে জল-চল করার বিরুদ্ধে যে ডাণ্ডাখানি হালে ছুঁড়লেন, তারই ফলে ইউরোপোমেরিকায় তো কা-কা রব উঠেছেই, এদেশেও কা-কা রব ছাড়িয়ে উঠছে স্বস্তির প্রশ্বাস। এ অধম অর্থনীতির খবর রাখে যতখানি নিতান্ত না রাখলেই নয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও সবিনয়ে বলবো, যত দিন যাচ্ছে ততই অর্থবিদ 'পানডিট'দের প্রতি ভক্তি আমার কমছে।[১] মূল বক্তব্য থেকে সরে যাচ্ছি, তবু এই সুবাদে নিবেদন, এদেশের কর্তারা যে ভয়ে আঁতকে উঠেছিলেন, ব্রিটন্ বারোর বাজারে ঢুকে পড়লে ভারতীয় মাল অনায়াসে ব্রিটেনে ঢুকতে পারবে না, আমার হৃদয় সে ভয়ে কম্পিত নয়। বস্তুত আমি কাফেরের মত বলবো, এই বিলিতী তথাকথিত সুখ-সুবিধেই আমাদের সর্বনাশ করছে। দুনিয়ার সর্বত্র আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নিজের মাল চালাবার চেষ্টা করছি নে। আমাদের লক্ষ্মীছাড়া ক্যাপিটালিস্টরা ইংরেজের হাতে সর্বস্ব সঁপে দিয়ে লক্ষ্মীলাভ করছেন। কিন্তু ওঁদেরই বা দোষ দিই কেন? স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বার বার এ নির্জন প্রান্তরে আমি চিন্তা করছিলুম, তাঁর সব কিছুই তো অল্পস্বল্প বুঝি, তাঁর 'রাজযোগ' আমার নিত্যপথপ্রদর্শক,—কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় কথা, বড় কাজ কি ছিল? যে সিদ্ধান্তে পৌঁছলুম সেটি জড়ত্বনাশ। চিন্তায়, অনুভূতিতে এবং কর্মে আমরা জড় হয়ে গিয়েছি। বিশেষ করে কর্মে। গীতায় আছে, কর্মেই আমাদের

---

১ হিটলার এঁদের নিয়ে বড় মস্করা করতেন। তিনি বলেছেন, "আমি যখন দেশের ভার কাঁধে নিয়ে বেকার-সমস্যা সমাধান করার জন্য কাজ আরম্ভ করলুম তখন দাড়িওলা অর্থবিদ অধ্যাপকরা ভল্যুম ভল্যুম কেতাব লিখে সপ্রমাণ করলেন, দেশের সর্বনাশ হবে। যখন সমাধান করে ফেললুম, তখন ফের ভল্যুম ভল্যুম কেতাব বেরোলো যাদের মূল বক্তব্য, "বলেছিলুম, তখনই বলেছিলুম, এই সমস্যার এই সমাধানই বটে"। কেইনস্, শাখ্ট, শুমপেটার কজন?

www.BanglaBook.org

অধিকার, ফলে নেই। আমরা গীতার উপর আরেক কাঠি সরেস হয়ে গেলুম। বললুম, 'কর্মেও আমাদের অধিকার নেই।'

'এতকাল উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে নানা জাতের বুলবুলি এসে বেবাক ধান খেয়ে গেল, কারও হুঁস[১] ছিল না। জগতে যারা হুঁশিয়ার[২] এরা তাদের কাছে ঘেঁষতে চায় না, পাছে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। কিন্তু তারা অকস্মাৎ এদের অত্যন্ত কাছে ঘেঁষে, এবং প্রায়শ্চিত্তও করে না। শিরোমণি-চূড়ামণির দল পুঁথি খুলে বলেন, বেহুঁশ[৩] যারা তারাই পবিত্র, হুঁশিয়ার যারা তারাই অশুচি, হুঁশিয়ারদের প্রতি উদাসীন থেকো, 'প্রবুদ্ধমিব সুপ্তঃ''।'

সুপ্তি তবু ভালো। তার থেকে জাগৃতি আছে। কিন্তু জড়ত্বের কোনও ম্যাদ নেই।

এই জড়ত্বেরই অন্য শব্দ ক্লৈব্য।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, ''ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ।''

পণ্ডিতজীও তাই উদ্বিগ্ন হয়ে বার বার বলছেন—'আমরা যেন কমপ্লেসেন্‌সের স্রোতে গা ঢেলে না দিই—ক্ষণতরে চীন এদেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে বলে।' কমপ্লেসন্‌স্ জড়ত্বেরই ভদ্র নাম।

আমাদের ছাত্রেরা গাইডবুক মুখস্থ করে পাস করে, আমরা—অধ্যপকেরা—ত্রিশ বৎসর পূর্বে কলেজে যা শিখেছিলুম তাই পড়িয়ে কর্তব্য সমাধান করি, আমাদের ধার্মিকজন কোনও এক গুরুতে আত্মসমর্পণ করে ধর্মজীবন পালন হল বলে আশ্বস্ত হন, যে-বই লিখে আমাদের সাহিত্যিক বিখ্যাত হন তিনি বার বার সেইটেরই পুনরাবৃত্তি করেন, আমাদের ফিল্ম-পরিচালকেরা একই প্লট সাতান্ন বার দেখান, এবং যে ব্যবসায়ীদের কথা নিয়ে এ-অনুচ্ছেদ আরম্ভ করেছিলুম—একই বাজারে বছরের পর বছর মাল পাঠিয়ে পরমানন্দে শয্যায় গা এলিয়ে দেন। 'নব নব সঙ্কটের অভিযানে' পদক্ষেপ করার জন্য যে বিধিদত্ত প্রাণশক্তি আমাদের রয়েছে সেটা জড়ত্বের বল্মীকে আচ্ছাদিত।

আমাদের 'জীর্ণ আবেশ' 'সুকঠোর ঘাতে' কাটাবার জন্য স্বামীজী এনেছিলেন 'জড়ত্ব-নাশা মৃত্যুঞ্জয় আশা'।

আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, স্বামীজীর উদ্দাম অফুরন্ত স্বতশ্চল প্রাণশক্তি দেখে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ভয় পেয়ে বললেন, 'এ আমি কি গড়লুম!' তাই সে 'ভুল শোধরাবার' জন্য তাঁকে তাড়াতাড়ি নিজের কাছে টেনে নিলেন। শঙ্করাচার্যকে যে-রকম টেনে নিয়েছিলেন, চৈতন্যকে যে-রকম।

* * *

আশা করি কেউ ভাববেন না দ্য গল্‌কে আমি চৈতন্য স্বামীজীর পর্যায়ে তুলছি : কিংবা আমি দ্য গলে মালা পরাবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছি। স্বল্পবিস্তর নিবেদন করি।

ইংরেজের যে-রকম রাজকীয় সেন্ডহার্স্ট সামরিক বিদ্যালয়, ফরাসীর তেমনি স্যাঁ

১. ২. ৩. বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী ষড়বিংশ খণ্ডের ১৩১ পৃঃ থেকে আমি উদ্ধৃত করছি। কেউ বলতে পারেন রবীন্দ্রনাথ 'হুঁস', সঙ্গে সঙ্গে 'হুঁশিয়ার' এবং 'বেহুঁশ' লিখলেন কেন? খনে 'স' খনে 'শ'? স্পষ্টত একই মূল থেকে তিনটি শব্দ তো এসেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সীর। দ্য গল সেখানে শিক্ষালাভ করেন। ছাব্বিশ বছর বয়সে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি জর্মনদের কাছে বন্দী হন। এই সময় বন্দী অবস্থায় তিনি জর্মন ভাষা শিখে নেন। হালে তিনি জর্মানগণ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে ঐ দেশ ভ্রমণের সময় একাধিক শহরে জর্মন ভাষায় বক্তৃতা দেন। ইতিপূর্বে ফ্রান্সের কোনও রাষ্ট্রপতি জর্মনিতে যাননি—নেপোলিয়নের কথা বাদ দিন, তিনি গিয়েছিলেন বিজেতারূপে—তার উপর ইনি বলেছেন তাদেরই মাতৃভাষা, জর্মনরাতর। তাদের হর্ষধ্বনি বেতারে শুনেছি।

কিন্তু পুরানো কথায় ফিরে যাই।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে তিন ফরাসী বীর দেশের সম্মান পেতেন। ফক, জফ্‌র এবং পেতাঁ। প্রথম দুজন মারা যাবার পর পেতাঁই ফ্রান্সের রক্ষণ বিভাগের সর্বদায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, উত্তম অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত প্রাকার নির্মাণই ফ্রান্স সংরক্ষণের জন্য প্রশস্ততম—ফলে কোটি টাকা খরচা করে তৈরী হলো মাজিনো লাইন—বহুশত বৎসর পূর্বে চীনারা যে-রকম দেওয়াল গড়েছিল।

দ্য গল্ ছিলেন পেতাঁর সহকর্মী। কিন্তু পদে পদে তিনি পেতাঁর সঙ্গে দ্বিমত। তিনি বার বার বলেছেন, এরকম পাঁচিল তুলে জড়ভরতের মত পিছনে বসে থাকলে আত্মরক্ষা হয় না। পেতাঁ তাঁর কথায় কান দেননি।

তারপর যখন ১৯৪০-এ ফ্রান্স নির্মমভাবে পরাজিত হল তখন সবাই বুঝলো প্রাচীন যুগের দেওয়াল বাঁধার জড়ত্ব সত্য সংরক্ষণ নয়।

এইখানেই দ্য গলের মাহাত্ম্য!

॥ দুই ॥

ফরাসী বিদ্রোহ শেষ হলে পর এক ফরাসী নাগরিক জনৈক নামজাদা জাঁদরেলকে শুধোয়, 'মসিয়ো ল্য জেনারেল, এই যুগান্তকারী বিদ্রোহে আপনার কঁত্রিবিউসিয়োঁ—"অবদান"—কি ছিল?' মসিয়ো ল্য জেনারেল গোঁফ মোচড়াতে মোচড়াতে সপ্রতিভ মৃদু হাস্য হেসে বলেছিলেন, 'পৈতৃক প্রাণটি বাঁচাতে সক্ষম হয়েছি।'

বাস্তবিকই তখন ঘড়ি ঘড়ি কর্ণধার বদল, এবং এক এক কর্ণধার প্রাক্তন অন্য কর্ণধারের কর্ণকর্তন করেই সন্তুষ্ট নন, কানের সঙ্গে মাথাও চান।[১] হালে ইরাকে যা।

১৯১৮ এবং ১৯৪০-এর মাঝখানের সময়টাতে একই ধুন্ধুমার। তবে মাথা কাটাকাটি আর হত না। শুধু 'মন্ত্রিসভার পতন' নিয়েই উভয় পক্ষ সন্তুষ্ট হতেন। এবং এ-সব পতন সর্বক্ষণ লেগে থাকত বলে ১৯৩৮-এ এক ফরাসী কাফেতে চুকুশ চুকুশ করতে করতে বলেছিল, 'এই প্যারিসেই অন্তত হাজারখানেক প্রাক্তন মন্ত্রী আছেন। একটু কান পাতলেই শুনতে পাবে, পাশের টেবিলে কেউ বলেছে, "ক'ৎ জেতে-য়্যা মিনিস্‌ৎর্"—আমি যখন

---

১ ম্যাট্রিকের বাঙলা পরীক্ষায় একটি ছেলে লিখেছেন,

নৃপতি বিম্বিসার
নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইলা
পদ নাক কান তাঁর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মন্ত্রী ছিলুম—ইত্যাদি।' তারপর সেই ফরাসী আমাকে সাবধান করে দেয়, আমি যেন বেশী দিন ফ্রান্সে না থাকি; বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ হয়তো একদিন ক্যাক করে পাকড়ে নিয়ে মন্ত্রী বানিয়ে দেবে। তাঁর উপদেশ আমি পুরোপুরি নিইনি। তবে কাফেতে বসে প্রায়ই অজানা জনকে বলতুম, 'ক'ৎ জেতে ল্য মিনিস্‌ৎর্—আমি যখন মন্ত্রী ছিলুম—ইত্যাদি।' আশ্চর্য কারও চোখে অবিশ্বাসের আমেজ দেখিনি। ফরাসী কলনী আলজেরিয়া থেকে কালা আদমী ভী মসিয়ো ল্য মিনিস্‌ৎর্ হতে আপত্তি কি?

তা সে কথা থাক্।

আসল কথা হচ্ছে, দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝখানে ইংরিজি, ফরাসী, জর্মন ইতালিয়ানে বিস্তর বই বেরোয়, ইয়োরোপের ভবিষ্যৎ কি তাই নিয়ে। এতদিন পর আমার আর ঠিক মনে নেই, তবে বোধ হয় মাদাম তাবুই লিখিত একখানা বই বাজারে বেশ নাম কেনে।

ইংরিজি অনুবাদে তার নাম ছিল, 'পেরফিডিয়াস আল্‌বিয়েন অর্ আঁতাঁৎকর্দিয়াল?' —'বিশ্বাসঘাতক ইংরেজ কিংবা তার সঙ্গে দোস্তী?'

বৈঠে মেরেছি সমস্ত রাত; ভোরবেলা দেখি, বাড়ির ঘাটেই নৌকা বাঁধা। ব্যাপার কি? যে-দড়িতে নৌকা বাঁধা ছিল সেটা খুলিনি।

এও তাই। দ্য গল্ আবার ফিরে এসেছেন যেখানে মাদাম তাবুই আপন সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। এই লক্ষ্মীছাড়া ইংরেজকে বিশ্বাস করে তার সঙ্গে পাকাপাকি কোনও দোস্তী করা যায় কি না? পূর্বেই বলেছি, দুই যুদ্ধের মাঝখানে ফ্রান্সে এতই ঘন ঘন মন্ত্রিসভার পরিবর্তন হত যে, ভেবেচিন্তে ইংরেজের সঙ্গে কোনও একটা চুক্তি—আঁতাঁৎ—করা, কিংবা আরো মনস্থির করে না-করা, কোনটাই করা যেত না। মাদাম তাবুইয়ের বিশ্লেষণ—যতদূর মনে পড়ছে—একটু অন্য ধরনের ছিল। তিনি বলেছিলেন, উভয় দেশেরই দুর্ভাগ্য যে আমরা কোনও পাকাপাকি সমঝাওতায় আসতে পারছি না। তার কারণ, আমাদের এখানে যখন গরমপন্থীরা (কনজারভেটিভ) মন্ত্রিসভা গড়চেন, তখন বিলেতে নরমপন্থীরা (লিবরেল অথবা লেবার), এবং আমরা যখন নরম তখন ওরা গরম।

তা সে যে-কোনও কারণেই হক, দুই যুদ্ধের মাঝখানে কোথায় না ফরাসী-ইংরেজ একজোট হয়ে বিশ্বশান্তির জন্য লীগ অব নেশন্‌স হক, কিংবা অন্যত্রই হক পাকা বুনিয়াদ গড়ে তুলবে, না আরম্ভ হল দু-জনাতে খ্যাচা-খেঁউ। এর উদাহরণ তো মাদাম তাবুই প্রচুর দিয়েছেন। তাঁর বই বেরোনোর পরের শেষ উদাহরণ আমরা দিই। হের হিটলার যখন সগর্বে সদম্ভে রাইনল্যান্ডকে সমরসজ্জায় সাজাতে আরম্ভ করলেন তখন ফ্রান্স আর্তকণ্ঠে সেদিকে ইংরেজের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। ভের্সাইয়ের চুক্তি অনুযায়ী কথা ছিল, জর্মন এ কর্মটি করতে পারবে না, এবং সে চুক্তির বরাত ফরাসী ইংরেজ, বিশেষ করে ইংরেজের উপর ছিল। ইংরেজ সে আর্তরব শুনে সাড়া তো দিলই না, উল্টে দেখা গেল সে গোপনে গোপনে হিটলারের সঙ্গে একটা নৌচুক্তি করে বসে আছে। ইংরেজের দৃষ্টিভঙ্গী এস্থলে বোঝা কঠিন নয়—তা আপনারা সেটাকে 'বিশ্বাসঘাতকতা' 'পারফিডি' বলুন আর নাই বলুন। তার শক্তি জলে। হিটলার যদি তাকে কথা দেয়, সে সেখানে লড়ালড়ি করবে না, তবে চুলোয় যাক রাইনল্যান্ডের সমরসজ্জা।

তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এল। ফ্রান্স গেল। ব্রিটেন যায়-যায়। প্রথমবারের মত এবারও মুশকিল-আসান মার্কিন সবাইকে বাঁচালে।

www.BanglaBook.org

কোথায় না এখন এ-দুজাত শিখবে একজোটে কাজ করতে, যাতে করে ফের না একটা লড়াই লাগে, উল্টে দ্য গল্ লেগে গেলেন ইংরেজকে বাদ দিয়ে ইয়োরোপের উপর সর্দারী করতে!

দ্য গলের বিশ্বাস, ইংরেজ তার সর্বস্ব বেচে দিয়েছে মার্কিনের কাছে। তাই মার্কিন ইংরেজের কাঁধে ভর করে ইয়োরোপে নেবে সেখানে সর্দারী করতে চায়। পক্ষান্তরে ফ্রান্স, লা ফ্রাঁস, তুজুর লা ফ্রাঁস। বাঙলা কথায়, সভ্যতা-ঐতিহ্য-বৈদগ্ধ্যের মক্কামদিনা ফ্রাঁস। ইয়োরোপ তথা তাবৎ দুনিয়ার কেউ যদি সর্দারী করার হক্ ধরে তবে যে ফ্রাঁস।

তাই তিনি করতে চাইলেন জর্মনির সঙ্গে দোস্তী। তা তিনি করুন। খুব ভালো কথা। দোস্তী ভালো জিনিস।

তারপর তিনি হাত বাড়ালেন খ্রুশ্চফের দিকে। সেও ভালো কথা। আমরা—অন্তত আমি—রাশার শত্রু নই।

ইংরেজ চাইলে, চতুর্দিকে এত সব দেদার দোস্তী হচ্ছে, সে-ই বা বাদ যায় কেন? বারোয়ারী বাজারে সে-ই বা ঢুকবে না কেন?

দ্য গল্ মারলেন ইংরেজের গালে চড়।

এখন কি হবে?

আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি, ফ্রান্স যে সর্দারী করতে চাইছে তার মত কোমরে জোর তার নেই। জর্মনির সঙ্গে তার দোস্তীও বেশীদিন টিকবে না। কারণ জর্মনি চায়, পূর্ব-পশ্চিম জর্মনির সম্মেলন। রাশা তার প্রতিবন্ধক। দ্য গলকে একদিন তার বোঝাপড়া করতে হবে। তখন হয় জর্মনি না হয় রাশাকে হারাতে হবে! তখন কোথায় রইল ইয়োরোপের উপর সর্দারী?

তলস্তয়

"কবিগুরু, তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।" রবীন্দ্রজীবনের সপ্ততি বৎসর পূর্ণ হলে শরৎচন্দ্র এ কথাটি বলেছিলেন। সমস্ত বাংলা দেশ তখন জয়ধ্বনি করে এই বিস্ময়ে আপন বিস্ময় প্রকাশ করেছিল।

কবিগুরু তলস্তয়ের[১] মৃত্যু-সংবাদ যখন রুশ সাহিত্যের তখনকার দিনের শরৎচন্দ্র গর্কির কাছে পৌঁছল, তখন তিনি তাঁর শোকলিপি শেষ করার সময় লিখেছিলেন, 'তাঁর দিকে তাকিয়ে—যে আমি ঈশ্বর বিশ্বাস করি নে—মনে মনে বলেছিলুম, এই লোকটি ঈশ্বরের মত (গড্ লাইক)"।'

প্রতি ধর্মেই একটি প্রশ্ন বার বার উঠেছে। ভগবান যখন মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনা করতে চান, তখন তা করেন কোন্ পদ্ধতিতে? ভারতীয় আর্যরা উত্তরে বলেছেন, স্বয়ং ভগবান তখন মানুষের মূর্তি ধরে অবতাররূপে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধ এবং মহাবীর হয়তো নিজেরা এই মতবাদকে স্বীকৃতি দিতেন না, কিন্তু বহু বৌদ্ধ এবং

BanglaBook.org

১ লেয়ো নিকোলায়েভিচ তলস্তয়। জন্ম—ইয়াস্নায়া পলিয়ানা (তুলা) ৯.৯.১৮২৮; মৃত্যু আস্তাপভো (তামবভ) ২০.১১.১৯১০।

www.BanglaBook.org

জৈন ওঁদের পূজা করেন অবতাররূপে এবং হিন্দুরাও বুদ্ধকে অবতারের আসনে বসাতে কুণ্ঠিত হননি।

সেমিতি জগতে বিশ্বাস, ভগবান তখন মানুষের মধ্যে একজনকে বেছে নিয়ে তাঁকে তাঁর 'প্রফেট', 'পয়গম্বর', 'রসুল', 'প্রেরিত পুরুষ' নাম দিয়ে নবধর্ম প্রচার করতে আদেশ দেন। ইহুদী এবং মুসলমানদের বিশ্বাস, এঁরা কখনও কখনও অলৌকিক দৈবশক্তির আধার হন, কখনও হন না।

খ্রীষ্টের আসন মাঝখানে। তিনি কখনও বা ঈশ্বরের পুত্ররূপে, কখনও ঈশ্বররূপে, কখনও বা সুদ্ধমাত্র 'প্রেরিত পুরুষ' রূপে অর্ঘ্য পেয়ে থাকেন। ইসলাম তাঁকে অলৌকিক শক্তিধারী ('মুআজিজা বা মিরাকল' করার অধিকারী) পয়গম্বররূপে স্বীকার করে। খ্রীষ্ট যে অবতাররূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন, তার পিছনে হয়তো প্রাচীন ভারতীয় আর্যধর্মের প্রভাব আছে।

এ তথ্য প্রমাণ করা সহজ নয়, কিন্তু হিটাইটদের আমল থেকেই পূর্ব ভূমধ্যসাগর তটাঞ্চলে আর্যপ্রভাব বিস্তৃত ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

ভারতবর্ষে যে দুজন অবতার সর্বজননমস্য, তাঁরা শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ।

রামচন্দ্র রাবণকে শাসন করে দুষ্কৃতির বিনাশ করেন ও পুণ্যাত্মা জনের মনে সাহস বাড়িয়ে দেন। এবং এই সত্য ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে অস্ত্রধারণ করতে বিমুখ হননি। পরবর্তী যুগে বোধ করি প্রশ্ন উঠেছিল যে, সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রাণনাশ কি নিতান্তই অপরিহার্য? এ যুগে তাই দেখতে পাই মাইকেল যখন সীতাকে দিয়ে রামের বর্ণনা করাচ্ছেন তখন বলছেন, 'মৃগয়া করিতেন কভু প্রভু; কিন্তু জীবননাশে সতত বিরত।'

কৃষ্ণ অবতীর্ণ হবার পূর্বে হয়তো প্রশ্নটা আরও সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ লক্ষ্য বা আদর্শ (এন্ড) মহান হলেই কি যা খুশি সে পন্থা (মীন্‌স) অবলম্বন করা যায়? মহাভারতে তাই কি শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্রধারণ করছেন না, কিন্তু অবশ্য অর্জুনকে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য পরামর্শ দিচ্ছেন?

এরপর বুদ্ধদেব। তিনি সর্ব অবস্থাতেই জীবননাশ করতে মানা করেছেন। কিন্তু রামকে যেরকম এক রাষ্ট্রের অধিপতিরূপে অন্য রাষ্ট্রের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কৃষ্ণকে যেরকম অধর্মচারী রাষ্ট্ররাজ দুর্যোধনের মোকাবেলা করতে হয়েছিল, বুদ্ধদেবকে সেরকম কোনও রাষ্ট্রের বৈরভাবের বিরুদ্ধে সম্মুখীন হতে হয়নি। সমাজের ভিতর ব্যক্তিগত জীবনে প্রাণনাশ না করেও প্রাণধারণ করা অসম্ভব নয়, কিন্তু যদি বর্বর প্রতিবেশী রাষ্ট্র এসে লুণ্ঠন, নরহত্যা, ধর্ষণ ও অন্যান্য পাপাচারে লিপ্ত হয়, তবে কি আক্রান্ত নৃপতি ক্ষমা ও মৈত্রী নীতি অবলম্বন করে নিষ্ক্রিয় তুষ্ণীম্ভাব দ্বারা রাজধর্ম প্রতিপালন করবেন?

বুদ্ধদেবের পর খ্রীষ্ট যখন সে যুগের অধর্মাশ্রিত রাষ্ট্র গঠন প্রেম ও মৈত্রী দ্বারা পরিবর্তিত করতে চাইলেন, তখন দ্বন্দ্ব বাধলো সে রাষ্ট্রের স্তম্ভদ্বয় ধনপতি ও ধর্মাধিকারীদের সঙ্গে। তিনি অস্ত্র ধারণ করতে অসম্মত হন। ক্রুশের উপর তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। (পাঠক কিন্তু ভাববেন না, তাই বলে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে বাধা পড়ে গেল—বস্তুত খ্রীষ্টান মাত্রেরই বিশ্বাস প্রভু যীশু ক্রুশে জীবন দেওয়াতেই তাঁর বাণী জনগণের সম্মুখে জাজ্বল্যমান হল, তাঁর জীবনদানের ফলেই আমরা জীবনলাভ করলুম, কিন্তু এ প্রস্তাবনা আমাদের বর্তমান আলোচনায় অবান্তর।)

www.BanglaBook.org

এরপর ঐ সেমিতি জগতেই হজরৎ মুহম্মদ। মক্কাতে যতদিন ছিলেন, ততদিন তিনি অস্ত্রধারণ করেননি। মক্কার রাষ্ট্রপতিরা যখন তাঁকে মেরে ফেলা সাব্যস্ত করলেন, তখন তিনি মদিনার নাগরিকদের আমন্ত্রণে সেখানে গিয়ে তাদের দলপতি হবেন—তারা অস্ত্রধারণে পরাঙ্মুখ ছিল না।[১]

আপন ধর্মকে উচ্চতর আসনে বসানোর জন্য কোনও কোনও অমুসলমান ধর্মযাজক হজরৎ মুহম্মদকে রক্তলোলুপ উৎপীড়করূপে অঙ্কিত করেছেন (যেন অন্যের পিতার নিন্দাবাদ না করে আপন জনকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা যায় না।) কিন্তু তার চেয়েও বেশী ক্ষতি করেছে লুণ্ঠনকারী বর্বর নামে মুসলমানরা তুর্ক অভিযানকারীরা (এস্থলে ফিরোজ, আকবরের কথা হচ্ছে না)। বার্নার্ড শ মুহম্মদ-চরিত মন দিয়ে পড়েছিলেন বলে তাঁর কাল্পনিক কথোপকথনে এ সম্বন্ধে একটি মন্তব্য করেছেন। মুহম্মদকে দিয়ে বলাচ্ছেন, "I have suffered & sinned all my life through an infirmity of spirit which renders me incapable of slaying. " *

বস্তুত নানাদিক দিয়ে দেখতে গেলে হজরৎ মুহম্মদ শ্রীরাম এবং শ্রীকৃষ্ণের মাঝখানে আসন নেন (এঁরা গীতা ও কুরান দিয়ে গিয়েছেন) এবং মোদ্দা কথা এই দাঁড়ায় যে, রাষ্ট্র যখন তাঁর বিরুদ্ধারণ করল, তখন তিনি যুদ্ধ করতে পরাঙ্মুখ না হয়ে 'শর সংহরণে' প্রস্তুত রইলেন। মহাপুরুষ মুহম্মদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পূর্ণতম বিকাশ দেখতে পাই বিরুদ্ধাচরণকারীর সম্মুখে সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করার সময়।

এরপর তেরশত বৎসর ধরে কেউ আর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তাবের উত্থাপন করেনি। পাণ্ডা পুরোহিতদের টিকা-টিপ্পনীর ভিতর খ্রীষ্টের বাণী নানা বিকৃত রূপ ধারণ করল—পাদ্রী সায়েবরা প্রতি যুদ্ধে পরমোৎসাহে বন্দুক কামান মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা পূত-পবিত্র করে যুদ্ধে পাঠালেন।

এযুগে তলস্তয়ই পুনরায় খ্রীষ্টকে আবিষ্কার করলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে সমাজে তথা সাহিত্যে[২] সম্পূর্ণতম খ্যাতি অর্জন করার পর তিনি করলেন

---

১ বার্নার্ড শ খ্রীষ্ট মুহম্মদের এক কাল্পনিক কথোপকথনের বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর অতুলনীয় ভঙ্গীতে।

* "Who is to be the judge of our fitness to live? said Christ. "The highest authorities, the imperial governors, and the high priests find that I am unfit to live; Perhaps they are right."

"Precisely the same conclusion was reached concerning myself", said Muhammad. "I had to run away and hide until I had convinced a sufficient number of athletic young men, that their elders were mistaken about me : that, in fact, the boot was on the other leg."

Bernard Shaw, The Black Girl in Search of God, P. 57.

২ যাঁরা নোবেল প্রাইজের নাম শুনলেই চৈতন্য হারান তাঁদের বলে দেওয়া ভালো যে, ঐ প্রাইজ যদিও ১৯০১ খ্রীঃ থেকে দেওয়া আরম্ভ হয়, ও তলস্তয় ১৯১০-এ গত হন, তিনি এটি পাননি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঊনবিংশ শতাব্দীর তথাকথিত ইউরোপীয় সভ্যতা-বৈদগ্ধ্যের মূলে কুঠারাঘাত। তার অর্থনীতি, সাহিত্য, সমাজ এবং বিশেষ করে ধর্ম—এগুলোর পিছনে যে কত বড় ভণ্ডামি লুকানো রয়েছে, সেটা দেখাতে গিয়ে তিনি যে দার্ঢ্য, মেধা ও কঠোর সত্যনিষ্ঠা দেখালেন, তার সামান্যতম বর্ণনা দেওয়াও আমার পক্ষে অসম্ভব। 'ওয়র এন্ড পীস' তিনি লিখেছিলেন হীরার কলম নিয়ে সোনার কালি দিয়ে—আর তাঁর জীবনের এই চরম উপলব্ধি তিনি লিখলেন দধীচির অস্ত্র-নির্মিত দমশ্ কী তলওয়ার দিয়ে আপন বুকের রক্ত মাখিয়ে।

'রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ মহাপাপ' তাঁর এ-বাণী 'দুখবর' সম্প্রদায় মেনে নিয়েছিল এবং বহু দুখবরণ করার পর তলস্তয়েরই সাহায্যে নির্বাসন স্বীকার করে মাতৃভূমি ত্যাগ করে। শেষ পরীক্ষা সেখানে হয়নি।

রুশ রাষ্ট্র তলস্তয়কে কখনও সম্মুখযুদ্ধে আহ্বান করেনি বলে বলা অসম্ভব, তাঁকে শেষ পর্যন্ত ক্রুশবরণ করতে হত কিনা। তবে একথাও ঠিক, আপন আদর্শের চরম মূল্য দেবার জন্য তিনি আত্মজন পরিত্যাগ করে পথপ্রান্তের অবহেলায় প্রাণত্যাগ করেন।

তলস্তয়-কাহিনী এখানেই হয়তো শেষ, কিন্তু সেই চিরন্তন কাহিনী আরও এগিয়ে গিয়েছে এবং কখনও শেষ হবে কিনা জানি নে।

গাঁধীকে বহু অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলন তলস্তয়। তিনিই এই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম, যিনি বিদেশী পাপী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র সংগ্রাম করে জয়লাভ করেন।

এবার এটম বোমা তৈরী হচ্ছে।

প্রিন্স গ্রাবিয়েলে দা'মুন্‌দ্‌জিয়ো

গ্রীকের উত্তরাধিকারী লাতিন। লাতিন তার অনুপ্রেরণা, প্রাণরস, কলাসৃষ্টির আদর্শ ও তাকে মৃন্ময় করার পদ্ধতি সব কিছুই নিয়েছে গ্রীক থেকে। বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্যও সংস্কৃতের এতখানি পদাঙ্ক অনুগমন করেনি। বরঞ্চ বলবো উর্দুর সঙ্গে ফার্সীর যে সম্পর্ক, লাতিনের সঙ্গে গ্রীকের তাই। অহমিয়ারা যদি রাগ না করেন তবে বলবো, বাঙলা ও অহমিয়ার মধ্যে ঐ সম্পর্কই বিদ্যমান, যদিও বাঙলার মৃত্যু হওয়ার পর অহমিয়া তার উত্তরাধিকারী হয়নি—বাঙলা তার উৎকর্ষের এক বিশেষ চরম স্তরে পৌঁছনোর পর অহমিয়া তার রস-সৃষ্টিতে বাঙলা সাহিত্যকে তার আদর্শরূপে ধরে নেয় (এখানে বুরুঞ্জী বা দলিলদস্তাবেজের গদ্যের কথা হচ্ছে না)।

বহুশত বৎসর ধরে লাতিন পাশ্চাত্ত্যভূমির সর্ব চিন্তা সর্ব অনুষ্ঠির মাধ্যম ছিল। এমন কি লাতিনের উত্তরাধিকারী ইতালীয়, ফরাসী, স্প্যানিশ ইত্যাদি ভাষা পূর্ণ সমৃদ্ধি পাওয়ার পরও—এমন কি এত শতাব্দীতেও, ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা যখনই চেয়েছেন যে তাবৎ ইয়োরোপ তাঁদের রচনার ফললাভ করুক তখনই তাঁরা আপন আপন মাতৃভাষা—জর্মন, ফরাসী ইত্যাদি না লিখে লিখেছেন লাতিনে। ইবন খলদূনের (ইনি মার্কসের বহু পূর্বে ইতিহাসের অর্থনৈতিক কারণ অনুসন্ধান করেছিলেন) আরবী পুস্তকের অনুবাদক মাতৃভাষা ব্যবহার না করে খলদূনের 'মোকদ্দমা'—'প্রলেগমেনন' অনুবাদ করেছেন লাতিনে। এ শতাব্দীতেও জলালউদ্দীন রুমীর ফার্সী থেকে ইংরিজিতে তর্জমা করার সময়

www.BanglaBook.org

ইংরেজ তথাকথিত অশ্লীল অংশগুলো অনুবাদ করেছেন লাতিনে—উদ্দেশ্য অবশ্য ছিল অপ্রাপ্ত বয়স্কের হাতে এ বই পড়লে তারা যেন বুঝতে না পারে।

খাস লাতিনের জন্মভূমি ও লীলাস্থল যদিও ইতালীতে এবং ইতালীয় সাহিত্যের অতি শৈশবাবস্থায়ই দান্তের মত অতুলনীয় মহাকবির আবির্ভাব, তবু কার্যত দেখা গেল লাতিনের অন্য উত্তরাধিকারী ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য যেন তাকে ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। তার অন্যতম কারণ অবশ্য এই হতে পারে যে, ইতালীয়রা তখন শুধু সাহিত্য নয়, সঙ্গীত, চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারুশিল্পেও আপন সৃজনীশক্তির বিকাশ করছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্যারিস ক্রমে ইয়োরোপের কলাকারদের মক্কা হয়ে দাঁড়ায়। ঐ সময় রুশের তুর্গেনিয়েফ, জর্মনির হাইনে, পোলান্ডের শঁপা, এমন কি ইতালীর রসসীনি—এঁরা সকলেই প্যারিসে বসবাস করতেন।

এর পরই ফরাসীতে যাকে বলা হয় ফ্যাঁ দ্য সিয়েক্‌ল্‌—'শতাব্দীর সূর্যাস্ত'।

দা'ন্নুন্‌দ্‌জিয়ো খ্যাতিলাভ করেন ঐ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে—কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকাররূপে এবং কর্মযোগী—ফিউমের 'রাজা'রূপে তিনি খ্যাতির চূড়ান্তে ওঠেন ১৯১৯-এ, অর্থাৎ আমাদের শতাব্দীতে। আরবী ভাষায় এঁদের বলা হয় 'জু অল্‌ করনেন'—'দুই শতাব্দীর অধিপতি'।

বহু রাগরঙ্গে রঞ্জিত বৈচিত্র্যপূর্ণ এঁর জীবন। ইস্কুলে থাকাকালীন তিনি তাঁর প্রথম কবিতার বই প্রকাশ করে রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরে রোমে এসে ছোট গল্প, উপন্যাস, নাট্য তিনি ক্ষেত্রেই তিনি অতুলনীয় বলে স্বীকৃত হলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি পদাতিক, নৌবাহিনী ও বিমানবহরে সর্বত্রই সমান খ্যাতি অর্জন করেন। বিশেষ করে বিমান পরিচালনায়। আজ যেটাকে স্ট্যান্ট্‌ ফ্লাইং বলা হয়, তার প্রধান পথপ্রদর্শক দা'ন্নুন্‌দ্‌জিয়ো। অমর খ্যাতির জন্য তাঁর এমনই অদম্য প্রলোভন ছিল যে, তার জন্য তিনি সর্বদাই প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তারপর মিত্রশক্তি যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ফিউমে বন্দরকে ইতালী থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইলেন, তখন কবি দা'ন্নুন্‌দ্‌জিয়ো তাঁর রুদ্রতম রূপ ধারণ করলেন। ফিউমে বন্দর দখল করে তিনি সেখানে এক রাজ্য স্থাপন করে নিজেকে 'অধিপতি' রূপে ঘোষণা করলেন। কবি, সৈনিক, নেতা তিন রূপেই তিনি স্বপ্রকাশ হলেন। মাত্র ১৫ মাস তিনি সেখানে 'রাজত্ব' করেছিলেন বটে, কিন্তু ইতালীর লোক আজও তাঁকে 'ফিউমের বীর', জাতির গর্বরূপে স্বীকার করে।

প্রেমের জগতেও দা'ন্নুন্‌দ্‌জিয়ো অভূতপূর্ব কীর্তি রেখে গেছেন। লোকে বলে, তিনি নাকি একসঙ্গে পাঁচটি রমণীর সঙ্গে প্রেম করতে পারতেন। একসঙ্গে পাঁচসেট প্রেমপত্র লিখেছেন (কু-লোকে বলে, সেক্রেটারীকে ডিক্‌টেট করতেন) এবং প্রত্যেক সেটই একেবারে অরিজিনল, অন্যান্য সেট থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাঁর অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস 'লে ভেজীনি দেল্লে রকে' 'পিরিনুমারীত্রয়'-এ। সেখানে উপন্যাসের নায়ক কিছুতেই মনস্থির করতে পারছেন না তিন নায়িকা, আনাতোলিয়া, ভিয়োলান্তে, মাসসিমিল্লা, কাকে তিনি বরণ করবেন। এ উপন্যাসটি পড়ে আমার মনে হয়েছিল, তাঁর পক্ষে একই সময়ে এই তিনজনকে তিন ধরনের প্রেমপত্র লেখা মোটেই অসম্ভব নয়। কারণ এই তিন বোনের চরিত্র তিনি এমনই অদ্ভুত কৃতিত্বের সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন, দৃঢ় রেখায় অঙ্কন করেছেন যে, প্রত্যেকটি চরিত্র আপন মহিমায় স্বপ্রকাশ। তার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সঙ্গে খাপ খাইয়ে তিন ধরনের প্রেমপত্র লেখা চারুশিল্পী দা'ন্নুন্‌দ্‌জিয়োর পক্ষে অসম্ভব তো নয়ই, খুবই সহজ বলতে হবে।

দা'ন্নুন্‌দ্‌জিয়ো চরিত্র বুঝতে ভারতবাসীর খুব অসুবিধা হয় না। কিছুদিন পূর্বেও আমরা পরাধীন ছিলুম। আমরা যদি হটেনটট বা বন্টুর মত ঐতিহ্য-সভ্যতা-সংস্কৃতিহীন জাত হতুম, তা হলে আমাদের অপমানবোধের বেদনা এতখানি নির্মম হত না। ফ্যাঁ দ্য সিয়েক্‌লে ইতালী স্বাধীন বটে, কিন্তু সে তখন তার গৌরবময় নেতার আসন ছেড়ে দিয়েছে ফ্রান্স, জর্মনি, ইংলন্ডকে। এমন কি যে অন্নবস্ত্র সমস্যা তাকে তখনও (এখনও) কাতর করে রেখেছে—সেটাকে ঐতিহ্যহীন সুইটজারল্যান্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে ততদিনে সমাধান করে ফেলেছে। জাত্যাভিমানী স্পর্শকাতর ইতালীয় মাত্রই যখন দেখত প্রতি বছর হাজার হাজার ইংরেজ, ফরাসী, জর্মন তার প্রাচীন কীর্তিকলা দেখবার জন্য রোম নেপল্‌স্ ভেনিস পরিক্রমা করে, গ্যোটে বায়রন কেউই বাদ যান না[১] এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখে ছিন্নবস্ত্র, নগ্নপদ আপন ইতালীয় ভ্রাতা, এঁদের কাছে ভিক্ষা চাইছে, তখন ঐতিহ্যচেতন ইতালিয়ার মরমে মরাটা কি হৃদয়ঙ্গম করাটা আমাদের পক্ষে খুবই কঠিন? দা'ন্নুন্‌দ্‌জিয়ো তাঁর দেশকে ভালোবাসতেন শুধু তার পূর্ব গৌরব, প্রাচীন ঐতিহ্যের জন্যই নয়, তাঁর সদাজাগ্রত পঞ্চেন্দ্রিয় অহরহ তাঁকে সচেতন রাখতো দেশের অপূর্ব নৈসর্গিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে। ভেনিস দেখে বহু দেশের বহু কবি আপন মাতৃভাষায় তার প্রশস্তি গেয়েছেন, কিন্তু দা'ন্নুন্‌দ্‌জিয়োর উপন্যাস 'ইল ফুয়োকো'—'অগ্নিশিখা', 'ফ্রেম অব লাইফে'—তাঁর যে বর্ণনা এবং দরদবোধের পরিচয় পাওয়া যায়, সে জিনিস ইতালীয় সাহিত্যে অতুলনীয় তো বটেই, অন্য সাহিত্যেও আছে কিনা সন্দেহ—অন্তত আমার চোখে পড়েনি।

ইয়োরোপে রেনেসাঁস যাঁরা আনয়ন করেন, তাঁদের শেষ প্রতিভূ দা'ন্নুন্‌দ্‌জিয়ো মাঝখানে কত শত বৎসরের ব্যবধান, তবু তাঁর লেখা পড়ে মনে হয়—এবং যাঁরা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন তাঁরা বলেছেন তাঁর কথাবার্তা শুনে মনে হত—তিনি কি স্বচ্ছন্দে রেনেসাঁস সৃষ্টিকর্তা অতিমানবদের মধ্যে বিচরণ করেছেন। ওদিকে তিনি নিজেও মনে

---

১ এবং এ যুগে—

ইটালিয়া

কহিলাম, "ওগো রাণী,
কত কবি এল চরণে তোমার উপহার দিন আনি।
এসেছি শুনিয়া তাই,
ঊষার দুয়ারে পাখির মতন গান গেয়ে চলে যাই।"
রবীন্দ্রনাথ, পূরবী॥

পক্ষান্তরে ইতালীয় কবি ফিলিকাজা গেয়েছেন—

ইতালি, ইতালি! এত রূপ তুমি
কেন ধরেছিলে, হায়!
অনন্ত ক্লেশ লেখা ও ললাটে
নিরাশার কালিমায়।
সত্যেন দত্তের অনুবাদ

(Italia, Italia, o tu cui feo la sorte)

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করতেন যে, তিনি প্রাচীন গ্রীক ক্লাসিক্‌সের পরবর্তী পুরুষমাত্র। একটি ফোয়ারার বর্ণনা দিতে গিয়ে দা'ন্নুন্‌দ্‌জিয়ো সে ফোয়ারার পাথরের খোদাই কতকগুলি লাতিন প্রবাদ তুলে দিয়েছেন। লাতিন অনেকখানি পড়া না থাকলে এরকম একটি অনবদ্য সঙ্কলন অসম্ভব।

কর ত্বরা, ওগো,
তোল ফুলগুলো
ভরা মধু গন্ধে।
পলাতকা ঐ
মুহূর্তগুলির
পরা নীরিবন্ধে॥

PRAECIPITATE MORAS,
VOLUCRES CINGATIS,
UT HOBAS NECTITE FORMOSAS, MOLLIA SEATA, ROSAS

Hasten, hasten ! Weave garland of fair roses to girdle the passing hours.

সেই ফোয়ারার জল নিচের আধারে জমেছে; সে বলছে :—

জীবন সলিল
পান করিবে কি?
এ যে বড় মধুভরা—
আঁখিজলে করো
লবণসিক্ত
তবে হবে তৃষা-হরা॥

FLETE HIC OPTANTES NIMIS ESS ACQUA DULCIS AMANTES SALSUS, UT APTA VEHAM, TEMPERE HUMOR EAM.

Weep here, ye lovers who come to slake your thirst. Too sweet is the water. Season it with the salt of your tears.

গ্রীক এবং লাতিন থেকে তিনি নিয়েছিলেন তাঁর ভাষার অলঙ্কার। আজ যদি বাংলাতে কেউ পদে পদে কালিদাস শূদ্রকের মত উপমা ব্যবহার করতে পারেন এবং সে তুলনাগুলো হয় এ যুগের বাতাবরণেই—কারণ দা'ন্নুন্‌দ্‌জিয়ো ক্লাসিক্‌সে নিমজ্জিত থাকা সত্ত্বেও নিশ্বাস নিতেন বর্তমান যুগের আবহাওয়া থেকে—তা হলে তাঁর সঙ্গে দা'ন্নুন্‌দ্‌জিয়োর তুলনা করা যাবে। এ যুগের লেখকদের মধ্যে প্রধানত নীৎশে, শোপেনহাওয়ার, দস্তেয়ফস্কি এবং সুরকারদের মধ্যে ভাগ্‌নার তাঁর উপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

তাই এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে 'অতিমানব', 'সুপারম্যান' বা 'য়্যুবারমেনশে'র যে ধারণা ফিষটে দিয়ে আরম্ভ হয় এবং কার্লাইল, মাদজীনি হয়ে নীৎশেতে পৌঁছয়—যার সাহায্যকারী ছিলেন ট্রাইশকে, কীপলিং, হাউস্টন, চেম্বারলেন এবং বের্গসোঁ—দা'ন্নুন্‌দ্‌জিয়ো এঁদেরই একজন। এঁরা সকলেই যে সুপারম্যান চেয়েছেন তা নয়, কেউ কেউ চেয়েছেন সুপাররেস—শ্রেষ্ঠ জাতি, যেমন হিটলার চেয়েছিলেন 'হেরেন-ফল্‌ক্' 'প্রভুর জাত'—কেউ কেউ চেয়েছেন সুপারস্টেট।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাস্‌ল্ বলেন, 'তবু ফিষটে, কার্লাইল, মাদ্‌জীনিতে মুখের মিষ্টি কথায় কিছুটা নীতির দোহাই আছে, কিন্তু নীৎশেতে এসে তাও নেই।'[১] সেখানে উলঙ্গ রুদ্ররূপে 'সুপারম্যানে'র আপন শক্তিসঞ্চয়ই সর্বপ্রধান কর্তব্য, 'স্বধর্ম'। হিটলারের গ্যাস চেম্বার তারই এক কদম পরে।

আমার মনে হয়, দা'ন্নুন্‌দ্‌জিয়ো এসব কট্টরের সমধর্মী নন। তাঁর ভিতরকার আর্টিস্টই বোধ হয় তাঁকে সে বর্বরতা, নৃশংসতা থেকে বাঁচিয়েছে। পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে যে রসিক প্রতি মুহূর্তে পঞ্চভূতকে নিঃশেষে শোষণ করেছে, যার রচনার প্রতিটি ছত্রে প্রতিটি শব্দে রূপরসগন্ধস্পর্শ ধ্বনির সমাবেশ, তুলনাব্যঞ্জনা মধুরতম সামঞ্জস্য যার অব্রণ-নিটোল সুডৌল নির্মাণপদ্ধতিতে সে সৃষ্টিকর্তাকে কোনও বিশেষ পর্যায়ে ফেলা যায় না।

দা'ন্নুন্‌দ্‌জিয়োর সৃষ্টিতে আমি যদি কোনও ত্রুটি লক্ষ্য করে থাকি তবে সেটা মাধুর্যের অতিরিক্ততায়—'কাদম্বরীতে' যে-রকম।[২]

খৈয়ামের নবীন ইরানী সংস্করণ

গিয়াস্-উদ্-দীন আবু-ল ফৎহ্ ওমর ইব্‌ন্ ইব্রাহীম অল খৈয়াম প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যে সুপরিচিত। তাঁকে নিয়ে ইরানের ভিতরে বাইরে সর্বত্র আজও পূর্ণোদ্যমে নানাপ্রকারে গবেষণা চলছে। এবং অত্যধিক গবেষণার মন্থনে যে বিষ ওঠে, তাও দেখা দিয়েছে। কোনও কোনও জর্মন গবেষক বলেন, 'খৈয়াম নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক ছিলেন, কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু সে খৈয়াম কোনও কবিতা রচনা করেননি।' জনৈক রুশ গবেষক বলেন, 'কিন্তু খৈয়ামের ঠিক পরবর্তী যুগের ইতিহাসে যে এই বাক্যটি পাচ্ছি—"তিনি খুরাসানের কবিদের অন্যতম"—এটার অর্থ কি?' তাই বোধ হয় জনৈক ভারতীয় পণ্ডিত—তাঁর যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বললেও অত্যুক্তি হয় না—মাত্র নয়টি রুবাইয়াৎ[৩] (চতুষ্পদী) ওমরের বলে নিঃসন্দেহে স্বীকার করেছেন। অথচ পার্টিশনের পূর্বেও কলকাতার তালতলায় যে বটতলা সংস্করণ খৈয়ামের রুবাইয়াৎ পাওয়া যেত তাতে থাকতো প্রায় বারোশটি।[৪] তবে অতিশয় এক-নজর ফেললেও ধরা পড়ে, এর শত শত রুবাইয়াৎ ইরানের একাধিক কবির কাব্যসঙ্কলনে—বিশেষত হাফিজের—ওদেরই নামে চলেছে। কোনও কোনও রুবাঈ (রুবাইয়াতের একবচন) তো পাওয়া যায় দু-তিন চার

---

১ বার্ট্রান্ড রাস্‌ল্—দি এনসেস্ট্রী অব ফ্যাসিজ্‌ম।

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, 'দেবপ্রিয়' 'বিধিদত্ত' 'সকলের সেরা জাতের' ধারণা পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ইহুদীরাই সৃষ্টি করে। সে ধারণার দলিলে বাইবেল ভর্তি। খ্রীষ্ট তার প্রতিবাদ করেন।

২ প্রিন্স গ্রাবিয়েলে দা'ন্নুন্‌দ্‌জিয়ো—১২ মার্চ, ১৮৬৩—১লা মার্চ, ১৯৩৮।

৩ তাপসী রাবেয়া নাম এদেশে অজানা নয়। তার অর্থ 'চতুর্থ কন্যা'। 'রুবাইয়াৎ', 'রাবেয়া' ইত্যাদি শব্দ আরবী, 'আরবাৎ' অর্থাৎ 'চার' থেকে এসেছে।

৪ ইরানে ১৪০১ পর্যন্ত পাওয়া যায়। ১২০৮ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ খৈয়ামের মৃত্যুর প্রায় ৮৮ বৎসর পরে লিখিত এক পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায় ২৫১টি—এটি এখন অক্সফর্ডে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিংবা ততোধিক কবির কাব্যে। এক জর্মন পণ্ডিত তাই এক বিরাট নিঘণ্টু (কনকরডেন্স, ক্রস্‌রেফরেন্স সম্বলিত কার্ড ইনডেক্স—যা খুশি বলুন) নির্মাণ করেছেন। খৈয়ামের নামে প্রচলিত প্রত্যেকটি রুবাঈ কোন্ কোন্ কবির কাব্যেও আছে তারই পরিপূর্ণ ফিরিস্তি। টাইমটেবিলের মত কলামের পর কলাম গেঁথে গেঁথে পাতার পর পাতা।

আমাদের মত সাধারণ পাঠক ভীত হয়ে সে রণাঙ্গন পরিত্যাগ করে।

কিন্তু আমাদের দলটি নিতান্ত ছোট নয়। এমন কি, আশ্চর্যের বিষয়, খুদ খৈয়ামের দেশে ইরানেও আমাদের মত বিস্তর নিরীহ পাঠক আছেন, যাঁরা কোন্ রুবাঈটি খাঁটি আর কোন্‌টা মেকী তাই নিয়ে কালক্ষেপ করতে চান না।

এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, ফিট্‌স্‌জেরাল্ড যে কটি রুবাইয়াৎ অনুবাদ করেছেন তার কতগুলো ওমরের নয়। তৎসত্ত্বেও ইরানে তাঁরই উপর নির্ভর একটি খৈয়াম সংস্করণ বেরিয়েছে।

কিন্তু এই সংস্করণের আরও বৈশিষ্ট্য আছে।

এদেশে ফরাসী জর্মন শেখার প্রতি অনেকের উৎসাহ দেখা দিয়েছে। খৈয়ামের এই ইরানী সংস্করণে আছে : ১) ফিট্‌স্‌জেরাল্ডের ইংরিজি অনুবাদ ২) সেই অনুবাদের যতটা কাছাকাছি পাওয়া যায় তারই ফার্সী মূল (ফিট্‌স্‌জেরাল্ড অনেক সময় ভাবানুবাদ করেছেন বলে বলা কঠিন, ঠিক কোন্ ফার্সী রুবাঈটি অনুবাদ করেছেন, আবার এমনও দেখা যায়, একাধিক রুবাইয়াৎ থেকে তিন-চারটি ছত্র যোগাড় করে ইংরিজি একটি কোয়াট্রেন 'সৃষ্টি' করেছেন), ৩) ফরাসী অনুবাদ—কখনও মূল ফার্সীর অনুবাদ অর্থাৎ ফিট্‌স্‌জেরাল্ড যে স্বাধীনতা নিয়েছেন অনুবাদক তা নেননি, আর কখনও বা ফিট্‌স্‌জেরাল্ডের ইংরিজি থেকে ফরাসী অনুবাদ, ৪) জর্মন অনুবাদ—একাধিক জর্মন অনুবাদ থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে, এবং ফিট্‌স্‌জেরাল্ডের অনুকরণ এরা প্রায়ই করেন নি, ৫) আরবী অনুবাদ সরাসরি ফার্সী থেকে, তবে অনেক স্থলেই স্বাধীন। অনুবাদ করেছেন এক আরব কবি যদিও তিনি জাতে ইরানী।

এ ছাড়া সঙ্কলনে কয়েকটি মূল্যবান অবতরণিকাও একাধিক ভাষায় সংযোজিত হয়েছে। বিখ্যাত জর্মন ফার্সীবিদ্ রোজেন, ফিট্‌স্‌জেরাল্ড, আরব পণ্ডিত আদীব অলতুগা, ইরানী পণ্ডিত হিদায়ৎ ও সঈদ নফীসী (ইনি কয়েক বৎসর ভারতে বাস করে গেছেন) এঁদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা পড়ে খৈয়ামপ্রেমী পাঠক মাত্রই মুগ্ধ হবেন। অবশ্য ফিট্‌স্‌জেরাল্ডের অবতরণিকা পড়া হয় 'পুরাতত্ত্ব' হিসেবে।

আমরা যখন ফরাসী বা জর্মন কোনও নূতন ভাষা শিখতে যাই তখন আমাদের হাতে দেওয়া হয় যে পাঠ্যপুস্তক তাতে থাকে ঘরের আসবাবপত্রের নাম, পিতা-মাতা-ভ্রাতার প্রতিশব্দ, স্টেশন, টিকিট, প্ল্যাটফর্ম, খাদ্যাদি বাগানের সাজসরঞ্জামের যাবতীয় জিনিসপত্র এদের নাম, লিঙ্গ ইত্যাদি ইত্যাদি। এতে বয়স্ক পড়ুয়ারা এবং আমরা সচরাচর একটু বয়েস হওয়ার পরেই এ-সব ভাষা আরম্ভ করি—তায় অল্পই মনের খোরাক। লাগে একঘেয়ে—শিখে যাই গতানুগতিক ভাবে। আমি জানি একেবারে গোড়ার থেকে মন এবং হৃদয়েরই খাদ্য দেওয়া যায় না—কিন্তু কিছুটা শেখার পরেই তো মৃন্ময় বিষয়বস্তু থেকে চিন্ময়ে চলে যাওয়া অসম্ভব নয়। বয়স্কদের জন্য এরকম পাঠ্যপুস্তক বিদেশে আমি

www.BanglaBook.org

দু'একখানা দেখেছি। এস্থলে আমার মূল বক্তব্য এই, আট বছরের বাঙালী ছেলে ফরাসী শিখতে চাইলে তার পাঠ্যপুস্তক হবে একরকম, আঠারো বছরের কিশোর শিখতে চাইলে হবে অন্যরকম।

যাদের কিছুটা ফরাসী বা জর্মন, অথবা উভয়েরই কিছুটা শেখা হয়ে গিয়েছে—আর খৈয়ামে আসক্তি থাকলে তো কথাই নেই—তাঁরা এই সঙ্কলনটি পড়ে আনন্দ তো পাবেনই, ভাষা-শিক্ষার কাজও অনেকখানি দ্রুত এগিয়ে যাবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা ওমরের সবচেয়ে পরিচিত চতুষ্পদীটি নিচ্ছি :...

ফার্সীতে আছে—

গর দস্ত দহদ জ্ মগজে গন্দুমে নানী
ওজ্ মৈ দোমনী জ্ গুসফন্দী রানী
ও আনগে মন ও তো নিশসস্তে দর ওয়রানী
ত্রয়েশী বুদ ওয়া আন নহদ-হর সুলতানী

Here with a Loaf of Bread beneath the Bough
A Flask of wine, a Book of Verse–and Thou
Beside me singing in the Wilderness–
And Wilderness is Paradise enow.

Pour celui qui possede un morceau de bon pain
Un gigot de mouton. un grand flacon de vin.
Vivre avec une belle au milieu des ruines,
Vaut mieux qu d'un Empire etre le souverain

Wein, Brot, ein gutes Buch der Lieder :
Liess ich damit selbst unter Truemmern mich nieder,
Den Menschen fern, bei Dir allein,
Wuerd'ich gluecklicher als ein koenig sein.[১]

---

১ বাঙলায় :

বনচ্ছায়ায় কবিতার পুঁথি পাই যদি একখানি,
পাই যদি এক পাত্র মদিরা আর যদি তুমি রাণী,
সে বিজনে মোর পার্শ্বে বসিয়া গাহো গো মধুর গান
বিজন হইবে স্বর্গ আমার তৃপ্তি লভিবে প্রাণ॥

সত্যেন দত্ত

সে নিরালা পাতায় ঘেরা বনের ধারে শীতল ছায়া
খাদ্য কিছু, পেয়ালা হাতে ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়
মৌন ভাঙি মোর পাশেতে গুঞ্জে তব মঞ্জু সুর
সেই ত সখী স্বর্গ আমার, সেই বনানী স্বর্গপুর।

কান্তি ঘোষ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মূল ফার্সীতে আছে :

হাতে (দস্ত) যদি থাকে
গমের মগজের (মগ্‌জ্‌) রুটি (নান)
দুই মনী (দো মনী) মদ ও
ভেড়ার একখানা ঠ্যাঙ (রান্‌),
তোমাতে আমাতে যেখানে বসেছি
সেটি যদি ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণও হয়
(তবুও) আনন্দ (আয়েস) যা হবে
সে সুলতানের রাজত্বের (হদ্‌) চেয়েও বেশী।

ইংরিজিতে দেখা যাচ্ছে, ভেড়ার ঠ্যাঙ বাদ পড়েছে (বোধ হয় অনুবাদক এটাকে বড্ড গদ্যময় মনে করেছেন), কবিতার বই যোগ করা হয়েছে, প্রিয়ার সঙ্গীতও বাড়ানো হয়েছে; সুলতানের রাজত্বের বদলে স্বর্গপুরী। কিন্তু একটা জিনিস আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। প্রথম ছত্রে আছে, 'বিনীৎ দ্য বাও'—পরে আবার সেটাই 'উইলডারনিস' হয় কি করে? সত্যেন দত্ত বুদ্ধিমানের মত 'বিজন' ব্যবহার করেছেন, 'উইলডারনিস' ও 'বনচ্ছায়া' দুই-ই বিজন। কান্তি ঘোষ উইলডারনিস বর্জন করে দ্বন্দ্বমুক্ত হয়েছেন।)।

ফরাসীতে আছে ভালো রুটি, ভেড়ার ঠ্যাঙ ও তবে মদের পাত্রকে গ্রাঁ (grand ফরাসীতে বিরাট অর্থে) বলা হয়েছে, 'দু মনী' বাদ পড়েছে এবং ফার্সীতে যেখানে সুদ্ধ 'তুমি' আছে, সেটা ফরাসীতে সুন্দরী তরুণী (belle) হয়ে গিয়েছে। অনুবাদ মোটামুটি আক্ষরিক।

জর্মনে মদ (Wein), রুটি (Brot) আর কবিতার বই (Buch)। দুম্বা বাদ পড়েছে, তবে 'বাও' নেই—আছে ফার্সীর সরল অনুবাদ 'ভগ্নাবশেষ মধ্যে' (Truemmern)।

ইরানী চিত্রকর চতুষ্পদীটি বর্ণে অলঙ্কৃত (ইলস্ট্রেট) করার সময় যুবক-যুবতীকে বসিয়েছেন ভাঙাচোরার মাঝখানে বিধ্বস্ত প্রাসাদের অবশিষ্ট একটি দেউড়ির কাছে। দূরের পটভূমিতে আবছা-আবছা দেখা যাচ্ছে, সপারিষদ সুলতান বসেছেন সিংহাসনে, সম্মুখে গায়িকা—কিন্তু সমস্তটাই যেন কোন প্রেতলোকের আবহাওয়াতে ভাসছে।

চিত্রকর ফিট্‌স্‌জেরাল্ডের প্রভাবে পড়েছেন—কিঞ্চিৎ। যুবক-যুবতীর সম্মুখে দুম্বার ঠ্যাঙ আছে, মদের পাত্রও আছে, তবে সেটা বিরাট নয়, 'দু মনী' তো নয়ই এবং সেটি ইটালিয়ান পদ্ধতিতে খড় দিয়ে প্যাঁচানো—ইরানে সে-রেওয়াজ আছে বলে জানতুম না—কিন্তু যুবকের হাতে দিয়েছেন একখানি পুস্তিকা—ফিট্‌স্‌জেরাল্ডের ফিরিস্তিমাফিক —তবে তরুণী সে-মাফিক গান গাইছেন না। পায়ের কাছে আমাদের খোয়াই-ডাঙার বুনো ফুল। তেরঙা ছবি, রেজিস্ট্রেশন খারাপ।

আমাদের কৈশোর-যৌবনে বহু তরুণ-তরুণী ফিট্‌স্‌জেরাল্ডের ওমর প্রায় কণ্ঠস্থ করে রাখতেন। সে রেওয়াজ এযুগেও হয়তো সম্পূর্ণ লোপ পায়নি। যেটুকু স্মরণে রয়েছে তারই উপর নির্ভর করে ফরাসী-জর্মন অনুবাদ পড়লে ভাষাশিক্ষা দ্রুততর হবে, পাঠক আনন্দও পাবেন। হয়তো বা তারই ফলে আমরা আরেকখানা খৈয়ামের বাঙলা অনুবাদ পাবো।

পুস্তকে পঁচাত্তরটি চতুষ্পদীর জন্য পঁচাত্তরখানা তিনরঙা ছবি তো আছেই, তার উপর

www.BanglaBook.org

এদিক ওদিক সর্বত্র ছড়িয়ে আছে কারুকার্য, আব্‌ছা তুলিতে আঁকা নানা প্রকারের অর্ধসুপ্ত চৈতন্যের স্বল্প প্রকাশ—কাব্য পড়ে চিত্রকরের প্রতিক্রিয়ার রূপ। ছবিগুলি রবি বর্মা স্টাইলে আঁকা—তবে তার চেয়ে ঢের কাঁচা। একটি ব্যাপারে কিন্তু সর্বচিন্তাশীল দর্শকই সন্তুষ্ট হবেন—জামাকাপড়, বাড়িঘর, গাছপালা, আসবাবপত্র প্রায় সবই খাঁটি ইরানী। অবশ্য বিদেশী প্রভাব কিছুটা যে পড়েনি তা নয়, তবে সে সামান্য। বিদেশী—বিশেষ করে ইয়োরোপীয় চিত্রকর—যে রকম নিছক কল্পনার উপর নির্ভর করে কিম্‌ভূত বদখৎ 'হাঁসজারু' তৈরী করেন, তিনি তার থেকে স্বভাবতই মুক্ত। এবং তাঁর ছবিতে যে এক নূতন পরীক্ষার প্রচেষ্টা রয়েছে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েই চিত্রকর ভাঙা-ভাঙা ইংরিজিতে উপক্রমণিকায় লিখেছেন :

"At the end, I hope the Patrons of art find this gift amusing and this could be an Ideal Ideas (sic) for the young artists, and the old and experience (sic) artists could forgive some of the scenes which lacking the Proper Techniques (sic). I wish they call them to my attention, I'll be most greatful (sic)"...Akbar Tajvidi.

এ পুস্তক সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু মনোরম আলোচনা করা যেত, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ছিল, এটির সঙ্গে শুধু আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া।[১]

The quatrains of Abolfath Ghiat-e-Din Ebrahim KHAYYAM of Nishabur, Published by Tahir Iran Co, 'Kashani Bros' Teheran, Lalezar-Istanbul Sq.

"ঢেউ ওঠে পড়ে কাঁদার সম্মুখে ঘন আঁধার"

খাচ্ছে, দাচ্ছে, বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, কখনও হতাশ হয়, কখনও বা খুশী, বউ বাপের বাড়ি গেল তো মুখে ব্যাজার ভাব, এমন সময়ে চ্যারিটি ম্যাচের একখানা টিকিট ফোকটে পাওয়াতে সে বেদনা না-পাত্তা ঘুচে গেল—এই নিয়ে আমরা পাঁচজন আছি। সৃষ্টিকর্তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, এই আমরাই পৃথিবীতে ম্যাজরিটি। আমাদের বেদনা সামান্য, সেটা ঘুচতেও বেশীক্ষণ লাগে না।

অথচ মুনিঋষি পীর-প্যাকম্বর বলেন, 'তোমরা অমৃতের সন্তান, অমৃতের সন্ধান করো।' একফোঁটা একটি মেয়েও নাকি বিস্তর ধনদৌলত পাবার পর বলেছিল, 'যা দিয়ে আমি অমৃত হব না, তাতে আমার কি প্রয়োজন!'

চাকরি বজায় রাখার জন্য আমাকে সমস্ত জীবন ধরে দুনিয়ার তাবৎ ধর্মের, (বেশী না, আল্লার দয়ায় মাত্র সাতটি) বিস্তর বই পড়তে হয়েছে। কিন্তু আমি এখনও বুঝে উঠতে পারিনি, এই আমরা সাধারণ পাঁচজন তো অমৃত না পেয়েও দিব্য বেঁচে আছি, ওর পিছনে ছুটোছুটি করার আমাদের কী প্রয়োজন! আর বাঙলা কথা বলতে কি, আমার নিতান্ত ব্যক্তিগত মত, তখন ঐ অমৃতটা আমাদের ঘাড়ে চাপানেই অন্যায়। অন্তত একটি

১ খৈয়াম ও নজরুল ইসলাম কৃত তাঁর অনুবাদ নিয়ে আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি।

www.BanglaBook.org

মহাপুরুষ—আমাদের মতে—এ খাতায় একটি মুক্তো জমা রেখে গেছেন; তিনি বলেছেন, 'শুয়োরের সামনে মুক্ত ছড়িয়ো না।' তাই সই। গালাগালটা বরদাস্ত করে নিলুম। আর, মহাপুরুষ একথাটা বলার সময় ক্ষণেকের তরে আমার দিকে একবার তাকিয়ে ছিলেন তো? তাতেই হয়ে যাবে। 'মোক্ষ' নামক 'অমৃত' বলে কোনও পদার্থ যদি থাকে তবে ঐ একটি চাউনিতেই সকলং হস্ততলং। অবশ্য সে অমৃতের জন্য কোনও অসম্ভব ভবিষ্যতে যদি আমার প্রাণ আদৌ কাঁদে!

রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ এঁরা দেখতে মানুষের মত বটেন, কিন্তু আসলে এঁরা মানুষ নন। নইলে বলুন দেখি, তুমি কবি, দু পয়সা তোমার আছে, পদ্মায় বোটে ভাসতে তুমি ভালোবাসো, কী দরকার তোমার ইস্কুল করার আর তার খাঁই মেটাবার জন্যে বৃদ্ধ বয়সে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দিল্লী, বোম্বাই চষার? কিংবা বিবেকানন্দ। অসাধারণ জিনিয়স। পঁচিশ হতে না হতেই প্রাচীন অর্বাচীন দিশী-বিদেশী সর্বশাস্ত্র নখাগ্রদর্পণে! কী দরকার ছিল সেই সুদূর আমেরিকায় গিয়ে—শেকস্‌পীয়ারের ভাষায়—টু টেক্ আর্মস্ এগেন্‌সট্ এ সী অব ট্রাবল্‌স্?[১] কি দরকার ছিল অরবিন্দের নির্জনে ধ্যানে ধ্যানান্তরে ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বতর লোকে ব্রহ্মের কাছ থেকে অমৃতবারি আহরণ করে নিম্নে, তারও নিম্নে এসে এই ভস্মীভূত ভারতসন্তানকে পুনর্জীবিত করার?

এঁদের কথা বাদ দিলুম। এঁরা আমাদের মতন নন।

কিন্তু—এখানেই একটা বিরাট কিন্তু।

এই যে আমরা রামাশ্যামা, আমাদের ভিতর বিবেক-রবি নেই, কিন্তু তাই বলে আমাদের সক্কলেরই কি ওঁদের চেয়ে স্পর্শকাতরতা কম? ওঁদের মত কীর্তি আমরা রেখে যাই না, তাই বলে বেদনাবোধ কি আমাদের সক্কলেরই ওঁদের চেয়ে কম? বরঞ্চ বলবো, বিধি-প্রসাদাৎ, কিংবা আপন সাধনবলে তাঁরা চিত্তজয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে বেদনাবোধ তাঁদের ভেঙে ফেলতে পারেনি। কিন্তু আমাদের কেউ কেউ যেন টুকরো টুকরো হয়ে যায়। যেন জীবন্ত অবস্থায়ই হঠাৎ তাদের জীবন-প্রদীপ নিবে যায় আর চোখের সামনে সে যেন শূন্যে বিলীন হয়ে যায়। যেন বিরাট নবাব-বাড়ি আধ ঘণ্টার ভিতর চোখের সামনে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেল। আমরা যে ক'টি অকর্মণ্য গাছ তার চতুর্দিকে ছিলুম—যাবার সময় আমাদেরও ঝলসে দিয়ে গেল।

হয়তো ঠিক অতখানি না। আমার এক অতি দূর সম্পর্কের ভাগ্নে ছিল। ডিগডিগে লম্বা পাতলা, কাঁচা সোনার বর্ণ, ভারী লাজুক। বিধবা মায়ের এক ছেলে। তাঁর মানা না শুনে পড়াশুনো করতে এসেছে শহরে। সে-গাঁয়ের আর কোনও ছেলে কখনও বাইরে যায়নি। এর বোধ হয় উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল। ছেলেটি কিন্তু তোৎলা। হয়তো সেই কারণেই বেশী লাজুক।

এক মাসও যায়নি। ইন্‌স্‌পেক্টর এসেছেন ইস্কুল দেখতে। তাঁকে শুধিয়েছেন একটা প্রশ্ন। উত্তরটা সে খুব ভালো করেই জানে। কিন্তু একে তো তোৎলা, তার উপর উত্তর

---

১ ইদানীং রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ নিয়ে তুলনাত্মক আলোচনা হচ্ছে। অন্য কেউ দেখিয়ে না দিয়ে থাকলে আমি একটি মিল দেখাই। দুজনেই প্রথমেই আমেরিকা গিয়েছিলেন ভারত-সেবার জন্য অর্থ আনতে। দুজনাই নিরাশ হয়েছিলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জানে বলেই হয়ে গেছে বেজায় নার্ভাস্। 'তোৎ তোৎ' করে আরম্ভ করতে না করতেই ইন্‌স্‌পেক্টর তার দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি ফেলে চলে গেলেন এগিয়ে।

ব্যাপারটা হয়েছিল বেলা তিনটেয়।

রাত সাতটায় পাওয়া গেল তার লাস! গাছ থেকে ঝুলছে।

ভাবুন তো, ইস্কুল থেকে ফিরে যাবার পথে, তার মায়ের স্নেহের আঁচল থেকে দূরে, সেই আপন নির্জন কক্ষে ঘণ্টা তিনেক তার মনের ভিতর কী ঝড় বয়ে গিয়েছিল? অপমানের কালনাগিনীর বিষ যখন তার মস্তিষ্কের স্নায়ুর পর স্নায়ু জর্জর করে করে শেষ স্নায়ু কালো বিষেই রূপান্তরিত করেছে তখনই তো সে দড়িগাছা হাতে তুলে নেয়। সে তখন সহ্য-অসহ্যের সীমার বাইরে চলে গিয়েছে। আচ্ছা, সে কি তখন তার বিধবা মায়ের কথা একবারও ভাবেনি? কিন্তু দয়াময়, আমাকে মাফ করো, আমি বিচারকের আসনে বসবার কে?

অতি গরিব মধ্যবিত্ত ঘরের মৌলিক কায়েত, আমার প্রতিবেশী হাতে যেন স্বর্গ পেল যখন তার সাদা-মাটা মেয়েকে বিয়ে করলে এক 'মহাবংশের' ঘোষ—বিনা পণে। ছেলেটি গরিব এই যা দোষ কিন্তু ভারী বিনয়ী আর বড়ই কর্মঠ। প্রেসের কাজ জানে। আমরা হিন্দু মুসলমান সবাই শতহস্ত তুলে তাকে আশীর্বাদ করেছিলুম।

বিয়ের কিছুদিন পরে কি জানি কি করে ধরে নিয়ে এল এক পার্টনার। খুললো ছোট্ট একখানা প্রেস। হ্যান্ডবিল বিয়ে-শ্রাদ্ধের চিঠি ছাপায়, কখনও বা মুন্সেফী আদালতের ফর্ম ছাপাবারও অর্ডার পায়। জল নেই, ঝড় নেই, দুই দুপুরই বরাবর, সর্বত্রই তাকে দেখা যায় প্রুফের বোন্দা বগলে। হেসে বলে, 'এই হয়ে এল।' অর্থাৎ শিগ্‌গিরই ব্যবসাটা পাকা ভিতে দড় হয়ে দাঁড়াবে। একটু যাকে দরদী ভাবতো তাতে বলতো, 'মাকে নিয়ে আসছি।' গরিব মা গাঁয়ে থাকে। হয়তো বা গতর খাটিয়ে দুমুঠো অন্ন জোটায়।

দশ বৎসর পরে দেশে ফিরেছি। বাড়ি পৌঁছবার পূর্বেই রাস্তায় সেই ছোকরা—না, এখন, বুড়োই বলতে হবে, অকালে—দেখি উল্টো দিক থেকে আসছে, পরনে মাত্র শতচ্ছিন্ন গামছা। বগলে ছেঁড়া খবরের কাগজের বোন্দা। ছন্নের মত চেহারা। আমার কাছ থেকে সিগরেট চাইলে। আমি তো হতভম্ব। তার স্ত্রী আমার ছোট-বোনের ক্লাসফ্রেন্ড। আমি তার মুরব্বী। সিগরেট দিলুম। সেটা ধরিয়ে আমার দেশলাইটা ফেলে দিলে নর্দমায়। এক গাল হেসে বললে, 'মাকে নিয়ে আসছি।' মনটা বিকল হয়ে গেল। দশ বৎসর পর আমার শহর এই দিয়ে আমায় ঘরে তুলছে?

বোন বললে, 'প্রেস যখন রীতিমত পয়সা কামাতে আরম্ভ করেছে তখন তার পার্টনার তাকে দিলে ফাঁকি। একটা আদালত পর্যন্ত লড়েছিল। তারপর পয়সা কোথায়? পাগল হয়ে গেছে।'

তবু এখনও তার 'মাকে শহরে এনে পাকা বাড়িতে তুলছে।' মা কবে ভূত হয়ে গিয়েছে। গাঁয়ের আর পাঁচটা বিধবা যেরকম দুঃখ-দুশ্চিন্তায় মরে।

আর মাধবী? আমার বোন শ্বশুরবাড়ি থেকে এলে সে তাকে দেখতে আসে। আমি তখন মুখোমুখি হওয়ার ভয়ে বৈঠকখানায় আশ্রয় নিই।

আর যে আত্মহত্যা করল না, পাগলও হল না, তার অবস্থা যে আরও খারাপ।

সরকার আমাকে অনর্থক একটা টেলিফোন দিয়েছিল। তবে সেটা কাজে লাগতো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তেতলার একটি মেয়ের। আমরা যৌবনে যে সুযোগ পেলুম না তা যদি ঐ মেয়েটি পেয়ে থাকে তবে, আহা, ভোগ করুক না সে আনন্দ—তার ইয়ংম্যান প্রায়ই তাকে ফোন করে।

তারপর হঠাৎ মাসাধিক কাল কোনও ফোন নেই। ভাবলুম, আমি যখন আপিসে তখন বোধ হয় ফোন করে। তারপর একদিন বাথরুমের দরজায় দমাদ্দম ধাক্কা আর আমার চাকরের ভীত কণ্ঠস্বর। তাড়াতাড়ি খুলে দেখি, তেতলার মেয়েটি মেঝেতে পড়ে—ভিরমি গেছে—পাশে টেলিফোনের রিসীভার।

সন্ধ্যাবেলা আমার লোকটা বললো, 'ভিরমি কাটাতে বেশীক্ষণ লাগেনি, তবে কিছু খেলেই সঙ্গে সঙ্গে বমি হয়ে যাচ্ছে।'

আমার ঘরে এসে টেলিফোন করতো বলে আমি ইচ্ছে করেই কোনও কৌতূহল দেখাইনি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও খবরটা কানে এসে পৌঁছল। এসব ব্যাপার পাড়াতে জানাজানি হয়ে যায়। মেয়েটির পরিবারের ডাক্তারও আমার ভালো করে চেনা। ইংরিজিতে বললেন, 'He walked out on her to another girl !'

কেমন যেন চোখের সামনে দেখতে পেলুম, ঐ ভিরমি-যাওয়া মেয়েটার উপর পা দিয়ে যেন সেই ছেলেটা পার হয়ে আরেকটা মেয়ের হাত ধরে চলে গেল। Walk on তো তাই মানে হয়! না?

আজ আর মনে নেই—কতদিন ধরে মেয়েটা কিছু খেলেই বমি করতো।

দু বছর তাকে দেখিনি। তারপর একদিন সিঁড়িতে দেখা। আগেকার মতই সেই সাজগোজ করেছে। মনে হল চীনে ফানুস দেখছি, কিন্তু প্রদীপটি নিবে গেছে।

ঐ বেদনাই তো সবচেয়ে বড় বেদনা।

মা যখন বাচ্চাকে মারে তখন সে বার বার ঐ মায়ের কোলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে আশ্রয়ের জন্য—যেখান থেকে আঘাত আসছে সেখানেই। আশ্চর্য, কিন্তু আশ্চর্য হবার কীই বা আছে, কারণ মারুক আর যাই করুক, অজানার মাঝেও অবুঝ জানে সে তার মা-ই। কিন্তু যখন দয়িত walk out on her, তখন বেচারী আশ্রয় খুঁজবে কোথায়? সে দয়িত তো এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন লোক, সম্পূর্ণ ভিন্ন সত্তা। এতদিন ধরে তার সামান্যতম বেদনা যখনই কোনও জায়গা থেকে এসেছে—বাপ মা সমাজ যেখান থেকেই হোক—তখনই ছুটে গিয়ে বলেছে তার দয়িতকে। ঐ বলা-টুকুতেই পেয়েছে গভীর সান্ত্বনা। আর আজ? আজ তার সেই শেষ নির্ভর গেল। বরঞ্চ পাষাণ-প্রাচীরের উপর বল ছুঁড়লেও সেটা ফিরে আসে। কথা বললেও প্রতিধ্বনি আসে। কিন্তু এখন শূন্যে, মহাশূন্যে সব বিলীন। (অবশ্য মডার্নরা বলবেন, 'ওসব রোমান্টিক প্রেম আজ আর নেই। আজ এক মাস যেতে না যেতেই সবাই অন্য লাভার পেয়ে যায়।' তাই হোক্, আমি তাই কামনা করি। আমার সর্বান্তঃকরণের আশীর্বাদ তাদের উপর।)

ধর্মের সমুখে উপস্থিত হলুম এই তিনটি মাত্র দৃষ্টান্ত নিয়ে। কেউ বলেন, 'এসব মায়া। তুমিও নেই, আমিও নেই, এই পৃথিবীও নেই, তথাপি কেন শোকাতুর হও।' কেউ বলেন, 'লীলা। ঈশ্বরে সর্বস্ব সমর্পণ করো। সান্ত্বনা পাবে।' কেউ বলেন, 'মনই সর্ব দুঃখের উৎপত্তিস্থল। সেই চিত্তের বৃত্তি নিরোধ করো। তাতেই শান্তি।' আরও অনেক মত আছে।

আমি নতমস্তকে সব কটাই মেনে নিচ্ছি। মা-ঠাকুরমারা এসবে বিশ্বাস করতেন, কিংবা আরও ভালো হয় যদি বলি, ধর্ম তখন সজীব ছিল, সে তখন সে-বিশ্বাস জাগাতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারতো—তাই তাঁরা শাস্তি পেয়েছেন।

কিন্তু ধর্ম কেন আমার সেই ভাগ্নেকে চিত্তবল দিল না আত্মহত্যা না করার জন্য, প্রেসের পাগলকে রুখলো না সেই দারুণ দুর্দৈব থেকে, প্রতিবেশীর মেয়েকে দিল না শক্তি সইবার—ফের স্বাভাবিক সুস্থ সবল হওয়ার? শুধু তাদেরই দোষ? ধর্মের আত্মশক্তি কমে যায়নি কি? কিংবা দোষ উভয়ের?

কম্যুনিজম তাই বুঝি। সে বলে রাষ্ট্রই সব। তোমার ব্যক্তিগত শোক কিছুই না। তুমি বেশী গম ফলাও, বেশী কামান বানাও রাষ্ট্ররক্ষার জন্য। সব ভুলে যাবে। কম্যুনিস্টরা এ 'ধর্মে' বিশ্বাস করেন কিনা তা জানিনে কিন্তু এ-কথা জানি, রাষ্ট্র এ বিশ্বাস তাদের হৃদয়-মনে দৃঢ় করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। অন্য ধর্মেরা করে?

* * *

আমরা কয়েকজন মিলে চা খাচ্ছিলুম। নানা রকম দুঃখ সুখের কথা হচ্ছিল। আমাদের মধ্যে একজন অল্পবয়সী বড্ডই স্পর্শকাতর ডাক্তার। হঠাৎ বললে, 'জানেন, আলী সাহেব, আমাদের হাসপাতালে একটি চার বছরের ছেলে বড্ড ভুগে খানিকটা সেরে বাড়ি গিয়েছিল, আজ আবার ফিরে এসেছে। ও সারবে না। আমি যখন ইনজেক্‌শন তৈরী করছিলুম তখন আমার গা ঘেঁষে যেন করুণা জাগাবার জন্য বললে, "দাত্তার, দিয়ো না, বদ্দো লাগে"।

হে ধর্মরাজগণ, এ শিশুকে কি দিয়ে কে বোঝাবে?

দুপুর রাতে যখন তার ঘুম ভেঙে যায়, ইনজেক্‌শনের ভয়ে শিউরে উঠে চেয়ে দেখে, এই বিশাল পুরীতে কেউ নেই, তার কেউ নেই—তখন?

হয়তো বা বিজ্ঞান পারবে। বিজ্ঞান একদিন তাকে সরিয়ে দেবে। না পারলেও হয়তো তাকে কোনও প্রদোষ-নিদ্রায় (আমি এসব জিনিস জানি না, তবে twilight sleep না কি যেন একটা আছে এবং আশা, সেটা আরও উন্নতি করবে) ঘুম পাড়িয়ে দেবে। হাসপাতালে গিয়ে দেখব, সে ঘুমিয়ে আছে, পুতুলটি বুকে চেপে ঘুমিয়ে আছে, নন্দনকাননের অপ্সরীদের আদর পেয়ে তার মুখে মিঠে হাসি।

জয় বিজ্ঞানের!

কিন্তু বিজ্ঞানের কাছে তো জীবনের কোনও comprehensive philosophy নেই যা ভাগ্নেকে রাখবে, প্রতিবেশীর মেয়েকে নর্মাল করে তুলবে।

হে ধর্মরাজগণ, বিজ্ঞানের সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করে, তাকে আশীর্বাদ দিয়ে এবং আপন আত্মশক্তি দৃঢ়তর করে আমাদের বাঁচাও।

আমি জানি, আমার জীবনে সে দিন আমি দেখে যেতে পারবো না।

এই নির্জন প্রান্তরে এ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত থেকে থেকে 'নিশির ডাকে'র মত শুনতে পাবো, 'দাত্তার, দিয়ো না, বদ্দো লাগে—দেখতে পাবো সেই প্রদীপহীন চীনা ফানুস॥

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাজা উজীর

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

হিটলারের প্রেম

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ১লা মে জর্মনির জনসাধারণ পেল তার মোক্ষমতম শক্—যেন দেশবাসী আবারবৃদ্ধবনিতার মস্তকে স্বয়ং মুষ্টিযোদ্ধা ক্রে একখানি সরেসতম ঘুঁষি মেরে তাদের সবাইকে টলটলায়মান পড়পড়ায়মান করে দিলেন। ঘুঁষিটা এল হামবুর্গ বেতারকেন্দ্র থেকে—ইতিমধ্যে মিত্রশক্তি আকাশ থেকে জর্মনির বৃহৎ বৃহৎ বেতার-কেন্দ্রগুলো, বিশেষ করে শর্টওয়েভের—প্রায় সবগুলোকেই খতম করে দিয়েছেন।

বেতারে তখন সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হচ্ছিল। সেই অনুষ্ঠান ক্ষণতরে বন্ধ করে বলা হল, 'আপনারা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খবরের জন্য তৈরী থাকুন।' কিছুক্ষণ পরেই বেতারে ঘোষিত হল, 'আমাদের ফ্যুরার আডল্‌ফ্ হিটলার ইহলোক ত্যাগ করেছেন।'

এরপর যে শক্‌টা পেল সেটা তাদের খুলি ভেঙে দিল না বটে, কিন্তু মাথার মগজ দিলে ঘুলিয়ে। যেন অমলেট্ বানাবার কল ব্রেন-বকস্‌টার মধ্যিখানে তুর্কিনাচন লাগিয়ে দিলে।

হিটলার মৃত্যুর চল্লিশ ঘণ্টা পূর্বে শ্রীমতী এফা ব্রাউন নাম্নী—তাবৎ জর্মনদের কাছে অজানা অচেনা এক কুমারীকে বিয়ে করেছিলেন। সমস্ত জর্মনি যেন বুদ্ধিভ্রষ্ট-জনের মত একে অন্যকে শুধালো, সে কি! গত বারোটি বৎসর ধরে যে ফ্যুরারের ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল, সে তো সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ছবি। যিনি সুখময় নীড় নির্মাণ করেননি, বল্লভার সন্ধান করেননি, এমন কি বংশরক্ষা করে উত্তরাধিকারীরূপে কাউকে স্বহস্ত-নির্মিত ফ্রেডারিক দ্য গ্রেটের সিংহাসন বিনিন্দিত সহস্রায়ু রাইষের (নাৎসি রাজ্যের) সিংহাসনে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে চাননি। অথচ তিনি কী ভালোই না বাসতেন শিশুদের,—যখনই জনসাধারণের সঙ্গে মেশবার সুযোগ পেয়েছেন, তখনই দেখেছি তিনি কী হাসিমুখে শিশুদের আদর করে বাহুতে তুলে নিয়েছেন, তাদের মাতাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। দেশের শ্রেষ্ঠা নর্তকী, অভিনেত্রী, গায়িকা, সুন্দরীদের জন্মদিনে তাঁদের বাড়িতে দিশী-বিদেশী বিরল ফুলের স্তবক পাঠিয়েছেন। প্রোপাগান্ডা মন্ত্রী গ্যোবেল্‌স আমাদের বেতারে কতশত বার বলেছেন, 'এই সন্ন্যাসীর হৃদয়কন্দরে কিন্তু নিভৃতে বিরাজ করেন সৌন্দর্যের দেবতা। এ তপস্বী সেই বিশ্বকল্পনাময়ী চিন্ময়ীর উপাসক। সে চায়, নিভৃতে নির্জনে একা মনে তাকেই রঙে রেখায় ফুটিয়ে তুলতে, তোমাদের গৃহ সুন্দরতররূপে নির্মাণ করে তারই প্রতিষ্ঠা করে তোমাদেরই গৃহ মধুময় করে তুলতে। কিন্তু হায়, তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল না। জর্মনির ভাগ্যবিধাতা তাঁর স্কন্ধে তুলে দিলেন বিরাট বিশাল রাইষের গুরুভার। তাকে বিরাটতর, বিশালতর এবং সর্বোপরি তাকে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে নির্মাণ করার গুরুভার। এবং সে রাষ্ট্র এমনই প্রাণবন্ত, দীর্ঘজীবী হবে যে এযাবৎ পৃথিবীতে যে-সকল সর্বশক্তিমান রাষ্ট্র আপন নাম ইতিহাসে রেখে গেছে তাদের সবারই হতে হবে আমাদের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের তুলনায় বালখিল্যবৎ—এ রাষ্ট্রের পরমায়ু হবে সহস্র বৎসর—থাউজেন্ড-ইয়ার-রাইষ।'

আরও অনেক কথা বলেছেন ফ্যুরার সম্বন্ধে, অনেক ছবি এঁকেছেন আডল্‌ফ্

www.BanglaBook.org

হিটলারের তিনি, একের পর এক বিজয়মুকুট পরে ফ্যুরার যখন মস্কোর দ্বারপ্রান্তে—যেন রাশার মৃত্যুদূত এসেছে তার আত্মাকে শয়তানের অতল গভীরে চিরতরে বিলীন করে দিতে—তাঁর সে বিজয়-গর্বিত ছবি; এবং তারপর যখন পরাজয়ের পর পরাজয় দ্রুততর গতিতে চারিদিক থেকে বজ্রমুষ্টিতে তাঁকে ধরতে গেছে তখনও চিরাশাবাদী গ্যোবেলস তাঁর বীণাযন্ত্র ভেঙে ফেলেননি, উচ্চতর কণ্ঠে গেয়ে উঠেছেন তাঁর প্রভু, ফ্যুরারের প্রশস্তি-সঙ্গীত। সেখানে ফ্যুরার কৃচ্ছ্রসাধন-রত যোগী। তিনি সর্বসুখ বিসর্জন করে, সর্বধ্যান নিয়োজিত করে নির্মাণ করেছেন সেই ব্রহ্মাস্ত্র (প্রায় শব্দার্থ, প্রথমা বিজয়িনী victory one, অনুজা বিজয়িনী V II)—এবারে দধীচির অস্থি নিষ্প্রয়োজন (অর্থাৎ অন্য কোনও মিত্রশক্তির সাহায্যে জয়লাভ নয়, কারণ ইতিমধ্যে তাঁর মিত্র ইতালী ও জাপান তাদের অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ রণাঙ্গনেও কোনও বিজয়চিহ্নের আভাস দেখতে পাচ্ছে না। তিনি এই বার্লিন নগরী ত্যাগ করবেন না। এই ধ্যানপীঠের সম্মুখে এসেই শত্রুসঙ্ঘ হবে অবলুপ্ত, লীন হবে মহাশূন্যে।

এবং বিশ্বের ইতিহাসে এই অতুলনীয় 'ধর্ম' প্রচারক বক্তা, জনগণমনজয়ের বীর গ্যোবেলস প্রায় প্রতিবারই তাঁর ভাষণ শেষ করতেন এই বলে, 'বিশ্বের ইতিহাসের এই সর্বোত্তম আত্মত্যাগ বিশ্ববিধাতা কর্তৃক লাঞ্ছিত হবে না।' (কানে কানে বলি, গ্যোবেলস ছিলেন নিরঙ্কুশ নাস্তিক; বরঞ্চ তাঁর প্রভু হিটলার অন্তত অদৃশ্য অজ্ঞেয় অন্ধ নিয়তিতে—'শিক্‌জাল'—বিশ্বাস করতেন)।

আজ হিটলার চিতাশয্যায় (বস্তুত তাঁর ও পত্নী এফার দেহ তাঁরই সর্বশেষ আদেশানুসারে দেশাচারানুযায়ী গোর না দিয়ে পেট্রল দিয়ে পোড়ানো হয়) প্রবেশকালের প্রাক্কালে বিবাহ করলেন তাঁর 'রক্ষিতা'কে—যার সঙ্গে তিনি লোকচক্ষুর অগোচরে সর্ববিলাসবৈভবে পরিপূর্ণ সুসজ্জিত শৈলাবাসে কাটিয়েছেন কত না ক্লান্তিহীন দিবস, নিদ্রাহীন রভস যামিনী, বৎসরের পর বৎসর, অন্তত চৌদ্দটি বৎসর, অর্থাৎ নেতৃত্ব গ্রহণ করার প্রায় দু-বছর আগের থেকে!

কই, গ্যোবেলসের অঙ্কিত সেই বিলাসবিমুখ জিতেন্দ্রিয় সর্বত্যাগী রাইষের মঙ্গল কামনায় ধ্যানমগ্ন তপস্বীর সঙ্গে তো বেতারে প্রচারিত, একগুণকে শতগুণে বর্ধিত করে বিজয়ী মার্কিন সেনা—উপস্থিত তারা জর্মনিতে থানা গেড়ে তার উপর সার্বভৌম রাজত্ব করছে—এবং তাদের অভ্যাসার্জিত 'কেলেঙ্কারি কেচ্ছা' বর্ণনের সুমেরু শিখরে তথাগত তথাকথিত জার্নালিস্টের প্রকাশিত জর্মন এবং ইংরিজি ভাষাতে প্রচারিত দৈনিক, সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হিটলারের ছবি আদৌ মিলছে না।

বের্ষটেশগাডেনে হিটলারের শৈলাবাস ছিল দশাধিক বৎসর ধরে [illegible] 'ধার্মিক' নাৎসি, এমন কি মধ্যপন্থী সরলহৃদয় লক্ষ লক্ষ জর্মনেরও পুণ্যতীর্থভূমি। হিটলার সচরাচর থাকতেন নিরস বিরস বৈশ্যভূমি বার্লিনে; সম্মুখে কৃষ্ণকঠিন প্রস্তর-নির্মিত অপ্রিয়দর্শন বস্তুতান্ত্রিক রাজবর্ত্ম চতুর্দিকে অভেদ্য পাষাণপ্রাচীর, পাষাণতর হৃদয়নির্মিত, বদনমণ্ডলে সর্বপ্রকারের অনুভূতি-প্রকাশবর্জিত, শীতল কৃষ্ণধাতুতে নির্মিত অস্ত্রহস্তে রক্ষীদল, পাত্র-অমাত্যের স্বতশ্চল শকটের যন্ত্রীরব-বিঘোষ নিনাদ, সদাই ফ্যুরারের পরিদর্শনের জন্যে বিকটতম শব্দ করে দ্রুতগতিতে গমনাগমনরত দৈত্যসম পর্বতপ্রমাণ ট্যাঙ্কবর্মপরিহিত সাঁজোয়া যান, আরও কত না নবীন নবীন বৃহৎ বৃহৎ মারণাস্ত্র, এবং ফ্যুরার-ভবনের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রশস্ত মর্মর সোপান বেয়ে উঠছেন নামছেন অভিজাত শ্রেষ্ঠতর মুকুটমণি রাজদূতরাজি—তাঁদের বেশভূষার দিকে তাকালে অন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কা। বেশের উত্তমার্ধ স্বর্ণাস্তরণে এমনই অলঙ্কৃত—যে তার পটভূমি চীনাংশুক, পট্টবস্ত্র, না কিংখাপে নির্মিত সে-তত্ত্ব নির্ণয় করা অসম্ভব। প্রত্যেকেরই সেই স্বর্ণাস্তরণের উপর হীরকখচিত ভিন্ন ভিন্ন মহার্ঘ্য ধাতুনির্মিত সারি সারি মেডেল—বিজয়-লাঞ্ছন—মনে হয় তার যে-কোনও একটা সারির উপর দিয়ে দ্রুতগতিতে একটিবার আঙুল চালিয়ে নেওয়া মাত্রই বেজে উঠবে যেন জলতরঙ্গে স্বরসপ্তক।

মানুষের ভক্তি যতই গভীর হোক, সেটা অতল নয়—গভীরতম মহাসমুদ্রেরও তল আছে। যতই গগনচুম্বী হোক গৌরীশঙ্কর নয়—এবং তিনিও চুম্বন করেন মহাঊর্ধ্বের পদরেণুকণা অভ্রংরাশিমাত্র। কাজেই সেই ভক্তি বার্লিনের ঐ মারণাস্ত্র 'যক্ষপুরী'কে পুণ্যতীর্থভূমিতে পরিণত করতে পারেনি।

তারা ছুটে আসতো, বের্ষটেশগাডেনে। তার পরিবেশ, তার বাতাবরণ, চতুর্দিকে দীর্ঘশির অভিজাত শ্যামল বনস্পতি উচ্চতায় সেই সব বনবৃক্ষের তুলনায় সহস্রগুণে উচ্চ পর্বত, মেখলাকার শৈলমালা, তাদের অনেকেই শীতে-গ্রীষ্মে তুষারাবৃত, আর শীতকালে হিটলার ভবনের চতুর্দিকে হয়ে যায় ধবল বরফাচ্ছন্ন। গ্রীষ্মের দীর্ঘদিনে বনস্পতিরাজি নিরবচ্ছিন্ন বন্য বিহঙ্গ-সঙ্গীতে পরিপূর্ণ।

লক্ষ লক্ষ নরনারী শোভাযাত্রা করে লাইন বেঁধে হিটলারের সামনে দিয়ে গৃহীর সরলতামাখা—অর্থাৎ কর্কশ মিলিটারি কেতায় নয়—'মার্চ পাস' করতো—হিটলার বিদেশাগত লয়েড জর্জ, জন স্যামুয়েল, অ্যান্টনি ইডেন জাতীয় অভ্যাগতদের আপ্যায়নে বা চপেটাঘাত প্রদানে অত্যধিক তৎপর না থাকলে পর।[১] নইলে এমনিতে দৈনন্দিন গেরস্তালি জীবনে হিটলার ছিলেন আদর্শ অতিথিসেবক, এবং এসব অপরিচিত লক্ষ লক্ষ অতি সাধারণ তীর্থযাত্রীদের প্রতি মাত্রাধিক সদয়। হিটলারের সেই বাড়ি নূতন জমিতে গড়া হয়েছিল বলে তখনও ছায়া দেবার মত বিস্তৃত ও দীর্ঘ বৃহৎ বৃক্ষ একটিও ছিল না। সেই কঠোর রৌদ্রে (উঁচু পাহাড়ের উপর রোদ বড় কড়া হয়) কখনও কখনও তিনি

---

১ আমার আশ্চর্য বোধ হয় এইসব ডিপ্লোমেটেরা সেই নরঘাতন হিটলারের সম্মুখে তখন কী বেহদ্ বেহায়া, বেশরম, বেইজ্জৎ বাঁদর-নাচ, আবার বলছি, কোমরে ছিটের ঘাগরা পরে বাঁদর-নাচ নেচেছেন! পরে এঁদের অনেকেই বলেছেন,—শিশুর মত গদ্‌গদ্ সরল কণ্ঠে—'আমরা তখন জানতুম না, মাইরি, লোকটা ও-রকম একটা আস্ত নর-পিশাচ!' বটে! ন্যাকামিরও জায়গা পাওনি? তোমরা fool তো বটেই, তদুপরি knave! তোমরা বুকে হাত দিয়ে বলো, তোমরা জানতে না, হিটলার রাজাসনে বসার প্রথম দিনই কম্যুনিস্টদের উপর কী অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ করে, তারপর ইহুদিদের নিয়ে, তারপর ২০শে জুলাই ১৯৩৪-এ তাঁর দক্ষিণকর্মীদের—রোম, এর্নস্ট, হাইন্‌ৎস (আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস এরা ছিল নির্দোষী)—mass murder without any trail (শব্দার্থে নির্বিচারে পাইকারী হারে খুন), তোমরা তো তখন বিতস্ব বাজিয়ে নৃত্য করেছ! কণ্টক কণ্টকে নাশ! মুখে যতই ধানাই-পানাই করো, ইহুদিদের প্রতি তোমাদের মনোভাব অন্তত আমার অজানা নয়।

আর যদি এ-সব না জানতে তবে নিজেদের 'ডিপ্লোমেট' বলে পরিচয় দাও কেন? রাস্তার মেৎরানী আর তোমাতে তাহলে কি তফাৎ!

www.BanglaBook.org

পুরোপাক্কা দু-ঘণ্টা ধরে হিটলারি হাইল সেলুটে ডান হাত সম্মুখদিকে প্রসারিত করে স্কন্ধাবধি উত্তোলিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতেন—পুরো প্রসেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত। একদিন তাঁর সখা ওস্তাদের ওস্তাদ ফোটোগ্রাফার হফ্‌মান (এঁর নামটি মনে রাখবেন, পাঠক, ইনি হিটলারের প্রেম-মঞ্চে বিদূষক—বিশুদ্ধ সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রানুযায়ী তিন অঙ্ক নাটিকার শেষের দুই অঙ্কে অভিনেতা মাত্র তিনজন,—নায়ক, নায়িকা ও বিদূষক হফ্‌মান) হিটলারকে শুধোন, তিনি কি করে পুরো দু-ঘণ্টা ধরে এরকম হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন! হিটলার উত্তরে বলেন, নিছক মনের জোরে।

দ্বিতীয় 'শকে'র পর এই সব লক্ষ লক্ষ তীর্থ-প্রত্যাবর্ত ও 'ভগবান' হিটলারের শ্রীমুখ-দর্শনপ্রাপ্ত নরনারী বিহ্বল, সামান্য দুটি অসংলগ্ন বাক্য সংযোজিত করতে সম্পূর্ণ অক্ষম, কর্তাভজাদের ন্যায় গুরু কাণ্ডারীতে যারা সর্ব প্রত্যয় সর্ব আত্মোৎসর্গ করে আপন আপন নোঙর ভবনদীতে অবহেলায় বিসর্জন দিয়ে বসেছিল, তারা তখন কি ভেবেছিল?

এই গম্ভীর 'মার্চ পাস', হিটলারের সৌম্যস্মিত বদন (অবশ্য তাঁর টুথব্রাশ মুস্টাশ বাদ দিয়ে—এফা ব্রাউনও ছিলেন এটির জন্মবৈরী—কিন্তু ভক্তের কাছে তো 'বিটকেল গোঁপো গুরু ট্যারা চোখে চায়। তথাপি সে মোর গুরু নিত্যানন্দ রায়।') স্বস্তিবাচক আশীর্বাদসূচক, অভয়মুদ্রায় উত্তোলিত দক্ষিণ বাহু—তাঁর পিছনের পূত শান্ত সজ্জন ভবন, সেখানে গুরু অহোরাত্র জর্মন-মঙ্গল-কামনায় অহরহ তপস্যামগ্ন—তার পিছনে ছিল এত বড় ধাপ্পা! একটা রক্ষিতা রমণী নিয়ে সঙ্গোপনে ঢলাঢলি! তার জন্য অতিশয় সযত্নে জর্মনির সর্বশ্রেষ্ঠরও শ্রেষ্ঠ সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে নির্মিত হয়েছে ঐ বাড়ির একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ আস্ত wing!

মার্কিনরা মেতে উঠেছে, এবং রুচিবিহারী একাধিক জর্মন যোগ দিয়েছে সেই ভূতের নৃত্যে (আমি দোষ দিচ্ছি নে, জর্মন তখন চরমতম দৈন্যপঙ্কে এমনি নিমগ্ন যে বেটাবেটির দু'মুঠো অন্ন যোগাড় করার জন্য অনেক কিছু করতে সে প্রস্তুত—আমার আপন দেশের দৈন্য কি আমি চোখ মেলার সঙ্গে সঙ্গে দেখিনি, পরে বুঝিনি? এখন ঘাড় ফেরাই) হিটলারের ব্যক্তিগত জীবনের অন্তরঙ্গতম গোপন কথা বের করে রগরগে পর্নোগ্রাফ ছেড়ে টু ক্রোর পাইস্ কামাতে।

আর জর্মনি খায় শকের পর শক্। অবশ্য তখন জর্মনির এমনই দুরবস্থা যে প্রেস নেই, নির্জলা মিথ্যার বিরুদ্ধেও প্রকৃত সত্য দিবালোকে প্রকাশ করার উপায় নেই। এবং সমূহ বিপদও তাতে আছে! লেখককে যে কোনও মুহূর্তে বিন্-ওয়ারেন্টে, যদিও সে নাৎসি ছিল না—ধরে নিয়ে যাবে denazitication (of delousing) কোর্টে[১] এবং অন্য কিছু

১ এরা যখন মার্কিন জেল থেকে মুক্তিলাভ করলো, ততদিনে অধিকাংশ জর্মনিতে আপন আধা-স্বাধীন সরকার, মায় আদালতসুদ্ধ বসে গেছে। এই আদালত এদের এবং অন্য বহু লোককে ধরে আবার আরম্ভ করলে denazitication (অর্থাৎ দেশকে ভূতপূর্ব নাৎসি-মুক্ত করা) মোকদ্দমা—গণ্ডায় গণ্ডায়। এনারা আবার ওঁয়াদের চেয়ে এক কাঠি সরেস। কারণ জজদের অনেকেরই সামনে এসে দাঁড়ালেন এমন সব নাৎসি যাঁদের হাতে বিচারকরা নাৎসি-রাজত্বে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। (অবশ্য লাঞ্ছিত হওয়ার সময় তাঁরা জজ ছিলেন না, কিংবা ডিসমিস হয়েছিলেন। এঁরা নিলেন তাঁদের পূর্ণ প্রতিহিংসা—জেল, নাগরিকাধিকার লোপ এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হল বহু লোকের—

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাক্ষীসাবুদ না নিয়ে, তুমি যে পাঁড় নাৎসি ছিলে সেইটে মার্কিন জংলী পদ্ধতি 'প্রমাণ' করে পাঠিয়ে দেবে শ্রীঘরে (অবশ্য তখন সেই বীভৎস খাদ্যাভাবের করাল কালে জেলে ভালো হোক, মন্দ হোক দু'মুঠো জুটতো)।

কিন্তু সুইটজারল্যান্ডের বৃহত্তম অংশের ভাষা জর্মন। বহু নাৎসি কন্‌সানট্রেশন ক্যাম্প এবং জেলমুক্ত নাৎসিবৈরী লেখক সেখানে গিয়ে আপন আপন বই বের করতে লাগলেন। তখন পরিপূর্ণ সত্য জানার ফলে জর্মনরা ধীরে ধীরে আপন আপন শক্‌মুক্ত হতে লাগল। এঁদের অনেকেই যদ্যপি হিটলার-যুগে মানব-দুর্লভ সাহস দেখিয়ে নাৎসি-বিরোধিতা করার ফলে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প ও জেল বরণ করেন, (এবং সেখানে প্রায় সকলেই অসহ্য যন্ত্রণাভোগের পর মারা যান) আজ তাঁরা সত্য বলতে গিয়ে অনেক স্থলে নাৎসি-বিরোধী এবং মিথ্যা হিটলার কেলেঙ্কারি প্রচারের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছেন।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার হিটলারের প্রাইভেট লাইফ সম্বন্ধে অনেক তথ্য ও তত্ত্ব বেরুলো, যেগুলো nosy American and peeping British—and some French thrown in the bargain for good measure—বহু পরিশ্রম করেও বের করতে পারেনি।

তারই অন্যতম, হিটলারের প্রেম সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য বেরুলো যা দিয়ে প্রকৃত সত্য আজ হয়তো কিছুটা নিরূপণ করা যেতে পারে। এই যে মৃত্যুর চল্লিশ ঘণ্টা পূর্বে

এমন কি যাদের মার্কিন কোর্ট কোনও প্রমাণ না পেয়ে বেকসুর ছেড়ে দিয়েছিল। আবার উল্টোটাও হল। যেখানে জজ নির্বাচিত হলেন কোনও প্রচ্ছন্ন নাৎসি, তখন তিনি পাঁড় নাৎসিদের অনেককেও ছেড়ে দিলেন কিংবা দিলেন মোলায়েমতম সাজা। তারপর হল আরেক ফার্স। জর্মন আইনে নিয়ম (এ আইন রোমান আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত—ব্রিটিশ আইন তা নয়) কোনও অপরাধের বিশ বৎসর পরে সন্দেহযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনও মোকদ্দমা হতে পারে না। হিটলার আত্মহত্যা করেন ৩০ এপ্রিল ১৯৪৫। মোটামুটি বলা যেতে পারে হিটলার নির্বাচিত নবীন চ্যান্‌সেলর মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করলেন ৮ই মে। অতএব লেগে গেল ধুন্দুমার। তা হলে ৮.৫.৬৫ তারিখে দেশে-বিদেশে লুক্কায়িত খুনিয়া খুনিয়া সব নাৎসি 'অজ্ঞাতবাস' থেকে বেরিয়ে আবার নবীন নাৎসি সঙ্ঘ তৈরী করবার চেষ্টা করবে। হয়তো বা এই কুড়ি বৎসরে যারা নাৎসিদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত কড়াকড়ি ব্যবস্থা করেছিল তারা প্রাণ দেবে গুপ্ত নাৎসি ঘাতকের হাতে, অন্ততপক্ষে গোপনে অপমানিত লাঞ্ছিত এবং প্রহৃত হবে। কারণ এদের অনেকেই ছিলেন পয়লা নম্বরী নাৎসি যেমন হিটলারের সেক্রেটারি মার্টিন বর্‌মান্, এবং ইহুদী নিধনের গ্যাসঘর তথা কনসানট্রেশন ক্যাম্পের চোপদার (ন'টি ল্যাজওলা চাবুক মারনেওলা), কমাণ্ডান্ট, কয়েদীদের উপর মারাত্মক (এদের ৯৫% মারা যায়) সব ব্যারামের experiment করনেওলা ডাক্তার, অথবা পাঁড় নাৎসি সম্পূর্ণ বিবেকহীন আইন বাবদে পরিপূর্ণ নাৎসি কর্তাদের মেহেরবানীতে নিযুক্ত জজ যারা কারও বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ (নাৎসি) মোকদ্দমা আনা মাত্র আসামীকে অপমানিত লাঞ্ছিত করে—মুক্ত অথবা গুপ্ত আদালতে হয় ফাঁসির হুকুম, নইলে চোদ্দ বছরের জেল। এদের অনেকেই বা অজ্ঞাতবাস থেকেই বেনামীতে নাৎসিবৈরীদের শাসিয়েছে।

তাই বহু আন্দোলনের পর—এমন কি ক্যাবিনেটে এ-বাবদে দ্বিধা ছিল যে, যদ্যপি ৮.৫.৪৫-এর পর কোনও নাৎসি-রাজ ছিল না, এবং ফলে তারপর কোনও নাৎসি অপরাধ হয়নি—এবং বিশ বৎসর পর সব খতম হওয়ার কথা। তবু—আরও দশ না কুড়ি বছর ধরে (আমার ঠিক মনে নেই) পূর্ব নাৎসিরা ধরা পড়লে মোকদ্দমা চলবে।

www.BanglaBook.org

১৪/১৫ বছরের রক্ষিতাকে হিটলার বিয়ে করলেন, সেটা কেন? সত্যই কি তিনি তাঁকে গভীরভাবে ভালবাসতেন, যাকে আমরা বাংলায় প্রেম বলতে পারি, কিংবা এফা কি নিম্নস্তরের হাপ্‌গেরস্ত (দেমি মঁদেন), তাঁর সঙ্গে হিটলার কি প্ল্যাটনিক প্রেম করেছিলেন (when ''just nothing happens''), তাদের যৌন-জীবন কি সম্পূর্ণ নরম্যাল ছিল, হিটলার পারভার্স ছিলেন না কি না, এফাকে যদি সত্যই ভালবাসতেন তবে তাঁকে বহু পূর্বেই বিয়ে করলেন না কেন?—এবং জর্মনির জনসাধারণ বিশেষ করে মাতারা তো চাইতেনই যে ফ্যুরার হোন আর যাই হোন, ফ্যুরার হলেই তো আর দেহ পাষাণ হয়ে যায় না (এটা বিদ্যাসাগরের নকল; তিনি বলেছেন, ''বিধবা হইলে তো তার 'দেহ' পাষাণে পরিণত হয় না'', তার পূর্বের সমাজসংস্কারকরা বলতেন, ''বিধবা হইলেই তো আর 'হৃদয়' পাষাণে পরিণত হয় না''), অতএব তাঁরও বিয়ে করে স্বাভাবিক জীবনযাপন করা উচিত। এস্থলে বলা বাহুল্য, সেটা পূর্বেই বলেছি যে এফার সঙ্গে হিটলারের প্রকৃত সম্পর্ক এতই মাত্রাধিক মিলিটারি টপ্ সীক্রেটের মত তিনি লুকিয়ে রাখতেন, এবং তাঁর নিত্য সঙ্গীদের এবং চাকর-বাকরদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন যে তাঁরাও প্রাণের ভয়ে এ বিষয়ে ঠোঁট সেলাই করে রাখতেন। এবং সর্বশেষে প্রশ্ন, এফাই কি তাঁর প্রথম প্রেম, না এ বিষয়ে তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতাও ছিল? সেইটেই আজকের বিষয়বস্তু।

ন্যুর্‌ন্‌বের্গের মোকদ্দমার সময় (মিত্রপক্ষ বনাম নাৎসি রাইষের প্রধান প্রধান প্রতিভূ, যেমন হিটলারের পরের সম্মানিত জন ফিল্ড মার্শেল গ্যোরিঙ—হিটলার হঠাৎ মারা গেলে হিটলারের ফরমান অনুযায়ী তিনিই 'ফ্যুরার' হতেন; তাবৎ জঙ্গী বিভাগের বড়কর্তা—হিটলারের পরেই—কাইটেল, তার পরের জন য়োড়ল্ ইত্যাদি ইত্যাদি সর্বসুদ্ধ ডজন দুই) আদালতের সামনে প্রাগুক্ত প্রশ্নগুলো আসামীরা দোষী না নির্দোষ সে বিচারে 'অল্পে'র চেয়ে 'বিস্তর' অবান্তর ছিল বলে সেগুলো আদালত সাতিশয় সংক্ষেপে সারেন। (অথচ পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ কেন—কোটি কোটি লোক বললেও আমি সংখ্যাটাকে অস্মদ্দেশীয় গঞ্জিকা-নির্গত বলে পত্রপাঠ বাতিল করে দেব না—জানতে চেয়েছিল হিটলারের 'প্রেম' সম্বন্ধে এবং আজও জর্মনির ভিতরে বাইরে বিস্তর লোক এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন।) সৌভাগ্যক্রমে মার্কিনরা তাঁদের দেশের রীতি অনুযায়ী তাঁদেরই গুটিকয়েক সর্বোত্তম সাইকিয়াট্রিস্টকে সঙ্গে এনেছিলেন। আসামীদের একাধিকজন হিটলার ও এফাকে অন্তরঙ্গভাবে চিনতেন—হিটলারের বের্ষটেশগাডেনের বাড়ি বের্গহফে এঁরা হিটলারের অতিথিরূপে একাধিকবার গিয়েছেন এবং নিতান্ত বাইরের (বেগানা) লোক না থাকলে তাঁরা হিটলার ও এফার সঙ্গে খেয়েছেন, বেড়াতে গিয়েছেন, পিকনিক করেছেন, বাড়ির প্রাইভেট ফিল্ম শো প্রায় প্রতি সন্ধ্যায়ই একসঙ্গে বসে দেখেছেন।

তাই মার্কিন ডাক্তাররা মোকদ্দমায় অবান্তর হিটলারের যৌনজীবন সম্বন্ধে আপন আপন কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য এঁদের শুধিয়েছেন অনেক প্রশ্ন। যেমন ডাক্তার গিলবার্টের প্রশ্নের উত্তরে গ্যোরিং বেশ বিরক্ত হয়ে বলেছেন, 'Of course he was normal like any one of us', অর্থাৎ হিটলার ছিলেন এ-সব বাবদে আর পাঁচজনের মতই নরম্যাল।

সেই সময়ই জর্মন জনগণ—অবশ্য প্রধানত জর্মন সাক্ষীদেরই মারফতে—একটি তরুণীর কথা জানতে পায়, নাম গেলী (Angelika—এবং Geli এঁর ডাকনাম) রাউগল্।

আমার ব্যক্তিগত মতে হিটলার ভালোবেসেছিলেন ½+১+½ (হাফ প্লাস ওয়ান প্লাস

www.BanglaBook.org

হাফ) অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে দুবার।

প্রথম হাফটা সচরাচর রোমান্টিক 'কাফ্ লভ্', অর্থাৎ বাছুরের মত করুণ নয়নে তাকানো, ম্যা-ম্যা রব ছাড়া—যার অর্থ গোপনে অজস্র অশ্রুবর্ষণ করা, এবং সব চেয়ে বড় কথা বাছুর যে-রকম শিং গজাবার সময় যত্রতত্র ঢুঁ মেরে নিজের মস্তকদেশই জখম করে, বেশী চ্যাংড়ার বেলাও অবিচারে যত্রতত্র 'প্রেমে পড়ে' নাস্তানাবুদ হওয়া।

কিন্তু হিটলারের কাফ্ লভ্ প্রচলিত প্যাটার্ন নকল করেনি—এমন কি তাঁর প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বাল্যজীবনের একমাত্র জীবনী-লেখক হিটলারের অতি প্রিয় একমাত্র বাল্যসখা—তিনি যা লিখেছেন সেখানে অনেকগুলো লক্ষণ দেখা যায় যেগুলো স্পষ্ট প্রমাণ করে, এ স্থলের নায়ক কিন্তু অসাধারণ প্রেমিক। আমি আজ সে কাহিনী কীর্তন করবো না, আমার উদ্দেশ্য সেই কাহিনী কিঞ্চিৎ শুনিয়ে দেওয়া যেটাকে হিটলারের ম্যুনিক যুগের (১৯২০ থেকে ১৯৩৩) সর্বঅন্তরঙ্গ জন—সংখ্যায় অতিশয় কম—এক বাক্যে হিটলারের 'ওয়ান এন্ড গ্রেট লভ্' বলেছেন—'গ্রেটেস্ট' বলেননি কারণ তাহলে অন্যগুলো অর্থাৎ যেগুলোকে আমি উপরে প্রথম 'হাফ' ও দ্বিতীয় 'হাফ' রূপে চিহ্নিত করেছি, ও ঐ একমাত্র গ্রেট লভের সঙ্গে একাসন না পেলেও একই শ্রেণীতে বসবার অনর্জিত সম্মানলাভ করে। কিন্তু সেই কাহিনীর নান্দী গাইবার পূর্বে, পাঠকের কৌতূহল কিঞ্চিৎ প্রশমিত করার জন্যে উল্লেখ করি, হিটলার তাঁর প্রথম প্রেমের নায়িকাকে চার বৎসর ধরে প্রায় প্রতিদিন রাস্তায় অন্তত দুবার করে দুরু-দুরু বুকে ক্রস করেছেন, হ্যাট তুলে ভিয়েনার ভদ্রজনসম্মত পদ্ধতিতে গভীরতম বাত করেছেন—তিনি (জীবনী-লেখক—সে মহিলা এখনও জীবিতা এবং বিধবা, এখন বয়স প্রায় পঁচাত্তর—তাই ছদ্মনামে তাঁর 'পরিচয়' দিয়েছেন) যেদিন মৃদু হাস্য সহকারে প্রতিনমস্কার করেছেন সেদিন অষ্টাদশবর্ষীয় হিটলার।

'আশার বাতাসে করি ভর ফিরে যেত আডল্ফ্ কুটিরে'

আর যেদিন প্রিয়া সঙ্গের আর্মি-অফিসার উমেদার নাগরের প্রতি ঈষৎ সম্মোহিত বলে হিটলারের প্রতি ভ্রূ-কুঞ্চিত করতেন সেদিন হিটলার—ইংরিজিতে যাকে বলে 'saw red', অর্থাৎ তিনি মহাপ্রলয় ডেকে এনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিনষ্ট করার জন্য সেই শিঙাটি খুঁজছেন। বাল্যবন্ধু বলছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সে কী চীৎকার! অভিসম্পাত দিচ্ছে সবাইকে, আর বিশেষ করেই ঐ হতভাগ্য আর্মির পাপাত্মা অফিসারদের।[১] বন্ধু বলছেন,

---

১ ঐ সময় থেকেই হিটলার আর্মি-অফিসারদের ঘৃণা করতে আরম্ভ করেন বললে হয়তো অত্যুক্তি তথা 'বিনা যুক্তিতে সমস্যাকে অত্যধিক সরল করে ফেলা'র—ওভার-সিমপ্লিফিকেশন—অকর্ম করা হবে। তবে এ-কথা সত্য, পরবর্তীকালে জর্মন আর্মি ছিল তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় প্রতিষ্ঠান—except the army officers, এবং এটাও বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য যে আত্মহত্যা করার ঠিক ২২ ঘণ্টা পূর্বে তিনি তাঁর জীবনের যে সর্বশেষ পত্র লেখেন সেটি আর্মির সর্বপ্রধান কর্তা—অবশ্য তাঁর পরে—কাইটেল্‌কে। সে চিঠির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জর্মন আর্মি অফিসারমণ্ডলীকে, আমাদের ভাষায় যেন পৈতে ছিঁড়ে, 'উচ্ছন্ন যাও, উচ্ছন্ন যাও' বলে ব্রহ্মশাপ দেওয়া। সে পত্রে তিনি বলেন, 'গত (প্রথম) বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পাই, এ যুদ্ধের জর্মন অফিসারগণের সঙ্গে যুদ্ধের অফিসারদের কোনও তুলনাই হয় না। এ যুদ্ধ সম্মুখযুদ্ধে সংগ্রামকারী জোয়ানদের কর্মসিদ্ধির তুলনায় তুচ্ছ।'

www.BanglaBook.org

১৪/১৫ বছরের রক্ষিতাকে হিটলার বিয়ে করলেন, সেটা কেন? সত্যই কি তিনি তাঁকে গভীরভাবে ভালবাসতেন, যাকে আমরা বাংলায় প্রেম বলতে পারি, কিংবা এফা কি নিম্নস্তরের হাপ্‌গেরস্ত (দেমি মঁদেন), তাঁর সঙ্গে হিটলার কি প্ল্যাটনিক প্রেম করেছিলেন (when ''just nothing happens''), তাদের যৌন-জীবন কি সম্পূর্ণ নরম্যাল ছিল, হিটলার পারভার্স ছিলেন না কি না, এফাকে যদি সত্যই ভালবাসতেন তবে তাঁকে বহু পূর্বেই বিয়ে করলেন না কেন?—এবং জর্মনির জনসাধারণ বিশেষ করে মাতারা তো চাইতেনই যে ফ্যুরার হোন আর যাই হোন, ফ্যুরার হলেই তো আর দেহ পাষাণ হয়ে যায় না (এটা বিদ্যাসাগরের নকল; তিনি বলেছেন, ''বিধবা হইলে তো তার 'দেহ' পাষাণে পরিণত হয় না'', তার পূর্বের সমাজসংস্কারকরা বলতেন, ''বিধবা হইলেই তো আর 'হৃদয়' পাষাণে পরিণত হয় না''), অতএব তাঁরও বিয়ে করে স্বাভাবিক জীবনযাপন করা উচিত। এস্থলে বলা বাহুল্য, সেটা পূর্বেই বলেছি যে এফার সঙ্গে হিটলারের প্রকৃত সম্পর্ক এতই মাত্রাধিক মিলিটারি টপ্ সীক্রেটের মত তিনি লুকিয়ে রাখতেন, এবং তাঁর নিত্য সঙ্গীদের এবং চাকর-বাকরদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন যে তাঁরাও প্রাণের ভয়ে এ বিষয়ে ঠোঁট সেলাই করে রাখতেন। এবং সর্বশেষে প্রশ্ন, এফাই কি তাঁর প্রথম প্রেম, না এ বিষয়ে তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতাও ছিল? সেইটেই আজকের বিষয়বস্তু।

ন্যুর্‌ন্‌বের্গের মোকদ্দমার সময় (মিত্রপক্ষ বনাম নাৎসি রাইষের প্রধান প্রধান প্রতিভূ, যেমন হিটলারের পরের সম্মানিত জন ফিল্ড মার্শেল গ্যোরিঙ—হিটলার হঠাৎ মারা গেলে হিটলারের ফরমান অনুযায়ী তিনিই 'ফ্যুরার' হতেন; তাবৎ জঙ্গী বিভাগের বড়কর্তা—হিটলারের পরেই—কাইটেল, তার পরের জন য়োড্‌ল্ ইত্যাদি ইত্যাদি সর্বসুদ্ধ ডজন দুই) আদালতের সামনে প্রাগুক্ত প্রশ্নগুলো আসামীরা দোষী না নির্দোষ সে বিচারে 'অল্পে'র চেয়ে 'বিস্তর' অবান্তর ছিল বলে সেগুলো আদালত সাতিশয় সংক্ষেপে সারেন। (অথচ পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ কেন—কোটি কোটি লোক বললেও আমি সংখ্যাটাকে অস্মদ্দেশীয় গঞ্জিকা-নির্গত বলে পত্রপাঠ বাতিল করে দেব না—জানতে চেয়েছিল হিটলারের 'প্রেম' সম্বন্ধে এবং আজও জর্মনির ভিতরে বাইরে বিস্তর লোক এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন।) সৌভাগ্যক্রমে মার্কিনরা তাঁদের দেশের রীতি অনুযায়ী তাঁদেরই গুটিকয়েক সর্বোত্তম সাইকিয়াট্রিস্টকে সঙ্গে এনেছিলেন। আসামীদের একাধিকজন হিটলার ও এফাকে অন্তরঙ্গভাবে চিনতেন—হিটলারের বের্ষটেশগাডেনের বাড়ি বের্গহফে এঁরা হিটলারের অতিথিরূপে একাধিকবার গিয়েছেন এবং নিতান্ত বাইরের (বেগানা) লোক না থাকলে তাঁরা হিটলার ও এফার সঙ্গে খেয়েছেন, বেড়াতে গিয়েছেন, পিকনিক করেছেন, বাড়ির প্রাইভেট ফিল্ম শো প্রায় প্রতি সন্ধ্যায়ই একসঙ্গে বসে দেখেছেন।

তাই মার্কিন ডাক্তাররা মোকদ্দমায় অবান্তর হিটলারের যৌনজীবন সম্বন্ধে আপন আপন কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য এঁদের শুধিয়েছেন অনেক প্রশ্ন। যেমন ডাক্তার গিলবার্টের প্রশ্নের উত্তরে গ্যোরিং বেশ বিরক্ত হয়ে বলেছেন, 'Of course he was normal like any one of us', অর্থাৎ হিটলার ছিলেন এ-সব বাবদে আর পাঁচজনের মতই নরম্যাল।

সেই সময়ই জর্মন জনগণ—অবশ্য প্রধানত জর্মন সাক্ষীদেরই মারফতে—একটি তরুণীর কথা জানতে পায়, নাম গেলী (Angelika—এবং Geli এঁর ডাকনাম) রাউগল্।

আমার ব্যক্তিগত মতে হিটলার ভালোবেসেছিলেন ½+১+½ (হাফ প্লাস ওয়ান প্লাস

www.BanglaBook.org

হাফ) অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে দুবার।

প্রথম হাফটা সচরাচর রোমান্টিক 'কাফ্ লভ্', অর্থাৎ বাছুরের মত করুণ নয়নে তাকানো, ম্যা-ম্যা রব ছাড়া—যার অর্থ গোপনে অজস্র অশ্রুবর্ষণ করা, এবং সব চেয়ে বড় কথা বাছুর যে-রকম শিং গজাবার সময় যত্রতত্র ঢুঁ মেরে নিজের মস্তকদেশই জখম করে, বেশী চ্যাংড়ার বেলাও অবিচারে যত্রতত্র 'প্রেমে পড়ে' নাস্তানাবুদ হওয়া।

কিন্তু হিটলারের কাফ্ লভ্ প্রচলিত প্যাটার্ন নকল করেনি—এমন কি তাঁর প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বাল্যজীবনের একমাত্র জীবনী-লেখক হিটলারের অতি প্রিয় একমাত্র বাল্যসখা—তিনি যা লিখেছেন সেখানে অনেকগুলো লক্ষণ দেখা যায় যেগুলো স্পষ্ট প্রমাণ করে, এ স্থলের নায়ক কিন্তু অসাধারণ প্রেমিক। আমি আজ সে কাহিনী কীর্তন করবো না, আমার উদ্দেশ্য সেই কাহিনী কিঞ্চিৎ শুনিয়ে দেওয়া যেটাকে হিটলারের ম্যুনিক যুগের (১৯২০ থেকে ১৯৩৩) সর্বঅন্তরঙ্গ জন—সংখ্যায় অতিশয় কম—এক বাক্যে হিটলারের 'ওয়ান এন্ড গ্রেট লভ্' বলেছেন—'গ্রেটেস্ট' বলেননি কারণ তাহলে অন্যগুলো অর্থাৎ যেগুলোকে আমি উপরে প্রথম 'হাফ' ও দ্বিতীয় 'হাফ' রূপে চিহ্নিত করেছি, ও ঐ একমাত্র গ্রেট লভের সঙ্গে একাসন না পেলেও একই শ্রেণীতে বসবার অনর্জিত সম্মানলাভ করে। কিন্তু সেই কাহিনীর নান্দী গাইবার পূর্বে, পাঠকের কৌতূহল কিঞ্চিৎ প্রশমিত করার জন্যে উল্লেখ করি, হিটলার তাঁর প্রথম প্রেমের নায়িকাকে চার বৎসর ধরে প্রায় প্রতিদিন রাস্তায় অন্তত দুবার করে দুরু-দুরু বুকে ক্রস করেছেন, হ্যাট তুলে ভিয়েনার ভদ্রজনসম্মত পদ্ধতিতে গভীরতম বাত করেছেন—তিনি (জীবনী-লেখক—সে মহিলা এখনও জীবিতা এবং বিধবা, এখন বয়স প্রায় পঁচাত্তর—তাই ছদ্মনামে তাঁর 'পরিচয়' দিয়েছেন) যেদিন মৃদু হাস্য সহকারে প্রতিনমস্কার করেছেন সেদিন অষ্টাদশবর্ষীয় হিটলার।

'আশার বাতাসে করি ভর ফিরে যেত আডল্‌ফ্ কুটিরে'

আর যেদিন প্রিয়া সঙ্গের আর্মি-অফিসার উমেদার নাগরের প্রতি ঈষৎ সম্মোহিত বলে হিটলারের প্রতি ভ্রূ-কুঞ্চিত করতেন সেদিন হিটলার—ইংরিজিতে যাকে বলে 'saw red', অর্থাৎ তিনি মহাপ্রলয় ডেকে এনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিনষ্ট করার জন্য সেই শিঙাটি খুঁজছেন। বাল্যবন্ধু বলছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সে কী চীৎকার! অভিসম্পাত দিচ্ছে সবাইকে, আর বিশেষ করেই ঐ হতভাগ্য আর্মির পাপাত্মা অফিসারদের।[১] বন্ধু বলছেন,

---

১ ঐ সময় থেকেই হিটলার আর্মি-অফিসারদের ঘৃণা করতে আরম্ভ করেন বললে হয়তো অত্যুক্তি তথা 'বিনা যুক্তিতে সমস্যাকে অত্যধিক সরল করে ফেলা'র—ওভার-সিম্প্লিফিকেশন—অকর্ম করা হবে। তবে এ-কথা সত্য, পরবর্তীকালে জর্মন আর্মি ছিল তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় প্রতিষ্ঠান—except the army officers, এবং এটাও বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য যে আত্মহত্যা করার ঠিক ২২ ঘণ্টা পূর্বে তিনি তাঁর জীবনের যে সর্বশেষ পত্র লেখেন সেটি আর্মির সর্বপ্রধান কর্তা—অবশ্য তাঁর পরে—কাইটেল্‌কে। সে চিঠির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জর্মন আর্মি অফিসারমণ্ডলীকে, আমাদের ভাষায় যেন পৈতে ছিঁড়ে, 'উচ্ছন্ন যাও, উচ্ছন্ন যাও' বলে ব্রহ্মশাপ দেওয়া। সে পত্রে তিনি বলেন, 'গত (প্রথম) বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পাই, এ যুদ্ধের জর্মন অফিসারগণের সঙ্গে যুদ্ধের অফিসারদের কোনও তুলনাই হয় না। এ যুদ্ধ সম্মুখযুদ্ধে সংগ্রামকারী জোয়ানদের কর্মসিদ্ধির তুলনায় তুচ্ছ।'

www.BanglaBook.org

বুর্জুয়া সম্প্রদায়ের প্রতি হিটলার অতি বাল্য বয়স থেকে সমস্ত সত্তা দিয়ে নিকৃষ্টতম ঘৃণা প্রকাশ করতেন—এবং বিশেষ করে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির সম্রাট-সেনাবাহিনীর অফিসারদের এবং তাদের উদ্ধত ভাব, দাম্ভিক আচরণের প্রতি—যত্রতত্র সর্বোত্তম সর্বোৎকৃষ্ট বস্তু, আদর-আপ্যায়ন যেন তাঁদেরই সর্বপ্রথম প্রাপ্য, যেন স্বর্গ থেকে স্বয়ং সেন্ট পীটার স্বহস্তে তাঁদের জন্যে সে শাহ্-ইন্-শাহী ফরমান লিখে দিয়ে নিজেই ধন্য হয়েছেন—এই ভাব।[১]

পুষ্পোৎসবের প্রভাতে হিটলার তাঁর সর্বোত্তম সজ্জা পরে পথপার্শ্বে অপেক্ষা করছেন, তাঁর প্রিয়ার জন্যে, তিনিও আসবেন শব্দার্থে পুষ্পরথে, পুষ্পাভরণ পরিধান করে। সময় যেন কিছুতেই কাটতে চায় না। অবশেষে তিনি এলেন। হিটলার হ্যাট তুলে অন্যদিনের তুলনায় প্রচুরতর সসম্ভ্রম অভিবাদন জানালেন। সেই ভিড়ের মধ্যেও প্রিয়া তাঁকে লক্ষ্য করে তাঁর হাতের পুষ্পগুচ্ছ থেকে একটি ফুল তুলে নিয়ে তাঁর দিকে ছুঁড়ে ফেলে প্রসন্ন

---

১ হিটলারের খাস চাকর—valet—ছিলেন জনৈক হাইন্‌ৎস লিঙে। ইনি হিটলারের জামাকাপড় দুরুস্ত রাখা, ওষুধপত্র হামেহাল হাজির রাখা এসব শত কাজ তো করতেনই—এমন কি ইভ্‌নিং ড্রেস পরার সময় বো-টিও তিনিই বেঁধে দিতেন। কিন্তু তাঁর সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ—এবং গরিমাময় কর্মও বটে—জর্মনির ফ্যুরার ও তার প্রিয়া এফার বিছানা তৈরী করা। একদা তিনি দুজনকে এমন অবস্থায় পান—হিটলার ব্যত্যয়-বিহীন অভ্যাসমত মাত্র সেই এক দিন দোরে চাবি দিতে ভুলে গিয়েছিলেন—যে তাঁর চাকরি যাবার যোগাড় হয়েছিল। এই কর্মের জন্যে তাকে বাছাই করা হয় হিটলারের অতিশয় খাস সেনাবাহিনীর (এস্ এস্ = শুৎস্‌স্টাফেল) সর্বশ্রেষ্ঠ এক হাজার সৈন্য থেকে। প্রভুকে পূর্ণ দশটি বছর সেবার পর যখন হিটলার মিত্রশক্তির নিপীড়নে বার্লিনে প্রায় অবরুদ্ধ হতে যাচ্ছেন তখন অবশ্য মৃত্যু থেকে নিষ্কৃতি দেবার জন্য হিটলার তাঁকে ডেকে আপন পরিবারে চলে যাবার অনুমতি দেন। প্রভুভক্ত লিঙে যাননি। ফলে হিটলারের শেষ পর্বের আত্মহত্যার বুলেট শব্দ পর্যন্ত তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুনতে পান, তাঁর মৃতদেহ চিতাস্থলে বয়ে নিয়ে যেতে, চিতাতে অগ্নিসংযোগ করতে সাহায্য করেন। এফাও এঁকে বড়ই বিশ্বাস করতেন এবং প্রাণের কথাও খুলে বলতেন।

হিটলারের ভূগর্ভস্থ, বিরাটতম বোমার আক্রমণেও নিরাপদ 'বুঙ্কার' তিনি প্রভুর শবদাহ শেষ না হওয়া পর্যন্ত পরিত্যাগ করেননি। সে কর্ম সমাধান করে তিনি যখন রুশ সেনানী ভেদ করে—রাশানরা তখন বুঙ্কার থেকে তিনশ গজ দূরে—মার্কিন অধিকৃত এলাকায় আপন পরিবারের সঙ্গে মিলিত হবার চেষ্টা করেন তখন বার্লিনেই রুশদের হাতে বন্দী হন। পূর্ণ দশটি বৎসর তিনি ঐ দেশের ডাকসাইটে সব কারাগারে—(কিছুকালের জন্য সাইবেরিয়া বাস করে তিনি বিশ্ববন্দীমণ্ডলীতে যেন সোনার তাজ পেয়েছেন! বহু যন্ত্রণা ভোগ করে ১৯৫৫-এ পশ্চিম বার্লিনে ফিরে আসেন। এসেই তিনি হিটলার সম্বন্ধে প্রচলিত বহুবিধ গুজোব বিনাশার্থে একখানা চটি বই লেখেন। তার এক স্থলে আছে, বিদেশের কোনও হোমরা-চোমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁর পদলেহন করার পর তিনি অতিশয় সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেন, 'দেখলে লিঙে (ইনি কোনও কোনও সময় অভ্যাগতের জন্য পানাদি নিয়ে যেতেন—লেখক), তোমরা কি রকম গত যুদ্ধের সামান্য এক জোয়ানের (হিটলার কর্পোরেল ছিলেন) সামনে হাঁটু নিচু করছ। আর বিদেশী কোনও জঙ্গীলাট হলে তো কথাই নেই। বস্তুত হিটলার প্রকৃত মহান পুরুষদের মত এসব 'বুর্জুয়া স্নব'দের উপেক্ষা না করে তাদের 'সাষ্টাঙ্গ প্রণামে' পরিতৃপ্ত হতেন—যেন তাঁর তরুণ বয়স ও যৌবনকালের আহত আত্মাভিমান সান্ত্বনাপ্রলেপ পেয়ে বেদনা দাগটা (তখনও!) লাঘব করে দিত। লিঙে সম্বন্ধে আমি 'হিটলারের শেষ দশ দিন' নামক প্রবন্ধে, 'দু-হারা' গ্রন্থে ঈষৎ সবিস্তার লেখবার সুযোগ পেয়েছিলুম।

www.BanglaBook.org

মৃদু হাস্য করলেন।

সপ্তম স্বর্গে আরোহণ করে—বরঞ্চ বলা ভালো 'সে মহালগনে' তিনি সপ্তম স্বর্গেও যেতে সম্মত হতেন না—হিটলার বাড়ি ফিরলেন।

এই চার বৎসরের ভিতর হিটলার ঐ তরুণীটির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তাঁর সখার কাছে, তিনিও যতখানি পারেন উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু হিটলার তাঁর কোনও উপদেশ, কিংবা নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী কোনও কৌশলই হাতে-কলমে ফলপ্রসূ করার চেষ্টা দেননি! এ বড় আশ্চর্যের কথা। এ নিয়ে প্রাগুক্ত জীবনীকার বিস্তর গবেষণা, বিস্তর চিন্তা করেছেন, কিন্তু এস্থলে তার স্থানাভাব এবং ঈষৎ অবান্তর বলে বর্জন করতে অনিচ্ছায় বাধ্য হলুম। শান্তি-সময় ও সুযোগ পেলে চেষ্টা করবো। কারণ যদিও দুজনাতেই কোনও কথা হয়নি, পত্র-বিনিময় পর্যন্ত হয়নি, তবু ঘটনাটি সত্যই চিত্তাকর্ষণ করে—কারণ হিটলার তাঁর স্বর্গীয় প্রেমের অভিব্যক্তি, প্রিয়াকে এক শুভদিনে দাম্পত্য বন্ধনে বন্ধন করার শুভেচ্ছা, সবই বন্ধুকে বলতেন। গৃহনির্মাণের স্কেচ আঁকাতে হিটলার সেই তরুণ বয়সেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন (ফ্যুরার রূপে পরবর্তী জীবনে তিনি শতকর্মের মাঝখানে, এমন কি আত্মহত্যার কয়েক দিন পূর্বেও বহু অভূতপূর্ব বিরাট প্রাসাদ, সৈন্যদের জন্য য়ুনিফর্ম, মেডেল, নৌবহরের জন্য সাবমেরিন ইত্যাদি নানা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর স্কেচ করেছেন এবং প্রায় সব স্কেচই কর্মে পরিণত করা হয়েছিল) এবং তাই বিবাহের পর যে ভবনে কপোতকপোতী বাস করবেন তার অসংখ্য স্কেচ আঁকতেন হিটলার সমস্ত দিন ধরে।

হিটলার যখন স্কেচের উচ্চতম নভলোকে উড্ডীয়মান তখন কিন্তু তাঁর সখা, জীবনী-লেখক প্রখর ব্যবসায়-বুদ্ধিধারী—তাঁর পিতাও ব্যবসায়ী—ঘোর বস্তুতান্ত্রিক গুস্তাফ্—এক কথায় স্বপ্নলোকনিবাসী ডন কুইক্সোটের যেমন হুবহু উল্টো কড়া সংসারী তামসিক সাঙ্কো পান্জা, এস্থলে হিটলারের সাঙ্কো পান্জা ভিন্ন গোত্রের বসওয়েল, স্কেচের পাশে দাঁড়িয়ে বলতো, 'ঃঃ! সবই বুঝলুম, কিন্তু সেই বস্তুটি টাকা!' তিনি জানতেন হিটলারের বৃদ্ধা মাতার অতি ক্ষুদ্র পেনশন ভিন্ন সে পরিবারে একটি কানাকড়িও আমদানি ছিল না।

হিটলার স্বপ্নভঙ্গে বিরক্ত হয়ে বলতেন, 'আখ্, তোমার শুধু টাকা, টাকা!'[১]

কিন্তু এ কাহিনী এখানেই থাক। আমি শুধু ভাবি, কবিসম্রাট দান্তের কথা।

---

১ আসলে কিন্তু এই সখা অতিশয় সদাশয় ভদ্র নির্লোভ ব্যক্তি। ওঁদের বয়েস যখন প্রায় কুড়ি (১৯১০/১১ গোছ) এবং একসঙ্গে একই কামরায় ভিয়েনায় বাস করতেন তখন হিটলার দৈন্যপঙ্কে নিমজ্জিত হতে হতে শেষটায় এমন অবস্থায় পৌঁছলেন যে অপেক্ষাকৃত বিত্তশালী সখা গুস্তাফকে বিব্রত না করার জন্যে—হিটলার আমৃত্যু ছিলেন এমনই অত্যাভিমানী, touchy, যেটাকে নিশ্চয়ই morbid বলা চলে—একদিন সখাকে কিছু না বলে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেলেন। তার প্রায় ২৫ বৎসর পর হিটলার লোকচক্ষের সম্মুখে রাজনৈতিক নেতারূপে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছেন, তখন গুস্তাফ্ খবরের কাগজ মারফৎ তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানতে পারলেন। তারপর ১৯৩৩-এ যখন হিটলার চ্যান্সেলর হলেন তখন দীর্ঘ ২৩ বছর পর গুস্তাফ্ তাঁকে চিঠি লিখলেন। উত্তরও পেলেন। ১৯৩৪-এ হিটলার অস্ট্রিয়া দখল করে যখন বিজয়ী বীরের মত লিন্ৎসে পৌঁছলেন তখন দুই সখাতে দেখা হল। গুস্তাফ্ ছোট্ট সরকারী চাকরি করতেন এবং অল্পেই সুখী ও সন্তুষ্ট ছিলেন বলে হিটলারের big offer তিনি গ্রহণ করলেন না।

www.BanglaBook.org

তাঁর প্রিয়া বেয়াত্রিচে সখীজনসহ রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে শুধু একবার মাত্র প্রেম-বিহ্বল কবির দিকে স্মিতহাস্য করেছিলেন। আরেকবার পুষ্পের জন্য বিখ্যাত ফ্লরেন্স্ (flora) নগরীর পুষ্পোৎসবে যখন সবাই সবাইকে পুষ্পোপহার দিচ্ছে, এমন কি অচেনা জনকেও, তখন—হয়তো—কিছুমাত্র না ভেবেচিন্তেই প্রেমোন্মাদকে একটি ফুল এগিয়ে দেন। ব্যস্! আর তো কিছু জানবার উপায় নেই। তাই বোধ হয়, তথ্য যেখানে যত কম, কিংবদন্তী সেখানে, সেই অনুপাতে তত বেশী? সেই শত শত কিংবদন্তীর মাঝখানে একটি সত্য প্রোজ্জ্বল : দান্তের সুপ্ত কবিসত্তা তাঁকে সচেতন করে দিয়ে বলল, 'তোমার প্রেমে আর এই নগরীর শত শত প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমে পার্থক্য কোথায়?' বিনয়ভরে যেন সেই পরমাত্মার সম্মুখে মস্তক নত করে দান্তে রচনা করলেন তাঁর 'স্বর্গীয় কাব্য' (দভীনা কম্মেদিয়া = ডিভাইন কমেডি)।

দান্তে আপন জন্মের নগর থেকে বিতাড়িত হন—রাজনীতির জুয়াখেলাতে হেরে গিয়ে। হিটলার স্বেচ্ছায় (বা অনিচ্ছায়) স্বদেশ অস্ট্রিয়া ত্যাগ করে জর্মনি গিয়ে সেখানে পূর্ণ বারোটি বৎসর 'রাজমুকুট' পরার পর নিজ হাতে আপন প্রাণ নিলেন। আমি শুধু ভাবি হিটলার যদি রাজনীতিতে দান্তের মত নিষ্ফল হতেন তবে হয়তো তিনিও তাঁর বেয়াত্রিচেকে কাব্যলক্ষ্মীর স্বর্ণমন্দিরে অজরামর করে রেখে যেতেন, অবশ্য নরদানব হিটলার নিশ্চয়ই দান্তের ইন্‌ফেরনো (নরক) অধ্যায়টা লিখতেন বেশী ফলাও করে। কিংবা হয়তো কাব্যলক্ষ্মীর জন্য নবীন মন্দির নির্মাণ করে—স্থাপত্যেই হিটলারের সর্বাধিক প্রতিভা ছিল, এ সত্য তাঁর শত্রুমিত্র সবাই স্বীকার করেন।

পূর্ণপ্রেম

ভিয়েনাতে সর্বপ্রচেষ্টায় পরিপূর্ণ নিষ্ফলতা অর্জন করে হিটলার দেশত্যাগ করে চলে গেলেন জর্মনির বাভারিয়া প্রদেশের প্রধান নগর ম্যুনিকে। সেখানেও তিনি বেকার, এমন সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ লেগে গেলে তিনি স্বেচ্ছায় জর্মন সৈন্যবাহিনীতে জওয়ান রূপে প্রবেশ করলেন। যুদ্ধশেষে ম্যুনিকে ফিরে এসে জওয়ানদের কী যেন এক কালচারাল বা ঐ জাতীয় অস্পষ্ট কি এক ট্রেনিং দেবার জন্য নিযুক্ত হলেন। এই সময়ে তিনি আবিষ্কার করলেন, সরস্বতী তাঁর রসনায় বিরাজ করেন তাঁকে একদিন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বক্তারূপে

তবে প্রতি বছর দু'একবার হিটলারের নিমন্ত্রণে প্রধান প্রধান সঙ্গীতের জলসা-উৎসবে একসঙ্গে যেতেন। বস্তুত হিটলারের সর্বজীবনীকার একবাক্যে বলেছেন, গুস্তাফই একমাত্র হিটলার-সখা যিনি তাঁদের বন্ধুত্ব পৌণ্ড শিলিঙে পরিবর্তিত করেননি। জলসাতে যে যেতেন তার একমাত্র কারণ এক জলসাতেই আপন ছোট শহরে তাঁদের প্রথম পরিচয় হয়—সঙ্গীতই ছিল উভয়ের প্রাণতুল্য প্রিয়। গুস্তাফের ভদ্র আত্মবিসর্জন কতখানি, পাঠক এরথেকেই বুঝতে পারবেন যে তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন সঙ্গীত, কিন্তু সে পথে সুযোগ না পেয়ে একটি ছোট্ট দফতরে চাকুরি নেন। হিটলার তাঁকে বলেন, 'যেখানে খুশী বলো, আমি সরকারী সঙ্গীতালয়ে তোমাকে প্রধান সঙ্গীতচালক করে দিচ্ছি। তুমি পাবে, সবসময়, সর্বাবস্থায় আমার প্রটেক্‌শন্!' গুস্তাফ্ সে লোভও সম্বরণ করেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জনসমাজের অভিনন্দন গ্রহণ করাবার জন্য। এই সময় ম্যুনিক শহর রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাবাত্যায় বিক্ষুব্ধ। অসংখ্য রাজনৈতিক দল, এবং রাস্তায় রাস্তায় গণবিক্ষোভের কোলাহল। হিটলার এরই একটার সদস্য হলেন। যে দলের সভ্যসংখ্যা দশ হয় কি না হয়! ১৯১৯ থেকেই তিনি এই দল (National Sozialictiche Deutsche Arbeitspartei) —এরই প্রথম শব্দের Na এবং দ্বিতীয় শব্দের zi নিয়ে বিপক্ষ বা নিরপেক্ষ দলের অজানা কে একজন Nazi—নাৎসি নামকরণ করে) গড়ে তুলতে আরম্ভ করলেন, অচিরে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করলেন, এবং বাভারিয়া প্রদেশের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক কম্যুনিস্টবৈরী রূপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দুসরা জঙ্গীলাট, পয়লা নম্বর হিন্ডেনবুর্গের (ইনি পরবর্তী যুগে জর্মনির প্রেসিডেন্ট হন) সহকর্মী জেনারেল এরিষ লুডেনডর্ফের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিন-চার বৎসর যেতে না যেতে পার্টির সভ্যসংখ্যা আশাতীতরূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় হিটলারের এতখানি শক্তিসঞ্চয় হল যে, তিনি সবলে বাভারিয়া প্রদেশের তদানীন্তন রাষ্ট্রপ্রমুখদের অপসারণ করে প্রদেশের রাজ্যভার গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন—এই বিশ্বাস তাঁর দৃঢ় হল। এই উদ্দেশ্যে লুডেনডর্ফকে পুরোভাগে নিয়ে এই ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি সদলবলে প্রধান রাজকার্যালয়ের দিকে অগ্রসর হলেন। রক্ষীরা গুলি ছোঁড়াতে সমস্ত দল পালালো, স্বয়ং হিটলার কিঞ্চিৎ আহত হলেন (কিন্তু বন্দুকের গুলিতে নয়), কিছুদিন পর, রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে পাঁচ বছরের জেল হল। কিন্তু ইতিমধ্যে এবং বিশেষ করে কারাবাসের সময় তিনি ম্যুনিক তথা বাভারিয়া প্রদেশের সর্বত্র এমনই জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছিলেন, (এবং তথাকার সরকার ইতিমধ্যে কম্যুনিস্টদের শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্তি দেখে, রীতিমত শঙ্কিত হয়ে 'কণ্টক দ্বারা উৎপাটনার্থে') হিটলারকে অল্প কিছুদিন যেতে না যেতেই, অর্থাৎ ১৯২৩ সালেরই ডিসেম্বর মাসে এবং শুভেচ্ছার প্রতীক রূপে বড়দিনের অল্প কয়েকদিন পূর্বে কারামুক্ত করে দিলেন।

হিটলার নবোদ্যমে ইতিমধ্যে নেতার অভাবে দ্বিখণ্ডিত পার্টিকে দিনে দিনে শক্তিশালী করে তুলতে লাগলেন।

রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে হিটলার সম্বন্ধে কোনও কিছু বললে সেটা যথেষ্ট বোধগম্য হয় না বলে সংক্ষেপে কয়েকটি বৎসরের বর্ণনা দেওয়া হল।

এখন প্রশ্ন ইতিমধ্যে হিটলার আর কাউকে প্রেম নিবেদন করেছিলেন কিনা। ভিয়েনায় এসে হিটলার কিছুদিন তাঁর বন্ধুর মারফতে উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাঁর প্রিয়ার (লেখক ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন 'স্তেফানি') খবর নিতেন। তারপর সেই বন্ধু, গুস্তাফ্‌ও ভিয়েনায় এসে একই কামরায় বাসা বাঁধলেন। স্তেফানি হিটলারের তুলনায় বহু উচ্চবংশের কন্যা। পাত্র হিসাবে হিটলারের চেয়ে অযোগ্যতর পাত্র তখন বোধ হয় লিন্‌ৎস শহর খুঁজলেও দ্বিতীয়টি পাওয়া যেত না। ম্যাট্রিক ক্লাসে ওঠার পূর্বেই সে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে, জাতে প্রায় মজুর শ্রেণীর, অর্থসম্বলে প্রায় 'ধনুর্গুণ ভক্ষণে'র অবস্থা। হিটলার ভিয়েনা থাকাকালীন স্তেফানির বিয়ে হল সুযোগ্য বরের সঙ্গে। হিটলার সে খবর কখন পেয়েছিলেন—আদৌ পেয়েছিলেন কিনা, কারণ বন্ধু গুস্তাফ্‌ তাঁর সঙ্গে তখন ভিয়েনাতে এবং এঁদের দুজনার পরিবারের কেউই স্তেফানিকে চিনতেন না—এ সম্বন্ধে সব ঐতিহাসিকই নীরব।

কারণ তখন হিটলার বিরাট ভিয়েনা শহরের ঘূর্ণাবর্তে প্রায় বিলীন হবার উপক্রম।

www.BanglaBook.org

তাঁর প্রিয়া বেয়াত্রিচে সখীজনসহ রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে শুধু একবার মাত্র প্রেম-বিহ্বল কবির দিকে স্মিতহাস্য করেছিলেন। আরেকবার পুষ্পের জন্য বিখ্যাত ফ্লরেন্স্ (flora) নগরীর পুষ্পোৎসবে যখন সবাই সবাইকে পুষ্পোপহার দিচ্ছে, এমন কি অচেনা জনকেও, তখন—হয়তো—কিছুমাত্র না ভেবেচিন্তেই প্রেমোন্মাদকে একটি ফুল এগিয়ে দেন। ব্যস্! আর তো কিছু জানবার উপায় নেই। তাই বোধ হয়, তথ্য যেখানে যত কম, কিংবদন্তী সেখানে, সেই অনুপাতে তত বেশী? সেই শত শত কিংবদন্তীর মাঝখানে একটি সত্য প্রোজ্জ্বল : দান্তের সুপ্ত কবিসত্তা তাঁকে সচেতন করে দিয়ে বলল, 'তোমার প্রেমে আর এই নগরীর শত শত প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমে পার্থক্য কোথায়?' বিনয়ভরে যেন সেই পরমাত্মার সম্মুখে মস্তক নত করে দান্তে রচনা করলেন তাঁর 'স্বর্গীয় কাব্য' (দভীনা কম্মেদিয়া = ডিভাইন কমেডি)।

দান্তে আপন জন্মের নগর থেকে বিতাড়িত হন—রাজনীতির জুয়াখেলাতে হেরে গিয়ে। হিটলার স্বেচ্ছায় (বা অনিচ্ছায়) স্বদেশ অস্ট্রিয়া ত্যাগ করে জর্মনি গিয়ে সেখানে পূর্ণ বারোটি বৎসর 'রাজমুকুট' পরার পর নিজ হাতে আপন প্রাণ নিলেন। আমি শুধু ভাবি হিটলার যদি রাজনীতিতে দান্তের মত নিষ্ফল হতেন তবে হয়তো তিনিও তাঁর বেয়াত্রিচেকে কাব্যলক্ষ্মীর স্বর্ণমন্দিরে অজরামর করে রেখে যেতেন, অবশ্য নরদানব হিটলার নিশ্চয়ই দান্তের ইন্ফেরনো (নরক) অধ্যায়টা লিখতেন বেশী ফলাও করে। কিংবা হয়তো কাব্যলক্ষ্মীর জন্য নবীন মন্দির নির্মাণ করে—স্থাপত্যেই হিটলারের সর্বাধিক প্রতিভা ছিল, এ সত্য তাঁর শত্রুমিত্র সবাই স্বীকার করেন।

পূর্ণপ্রেম

ভিয়েনাতে সর্বপ্রচেষ্টায় পরিপূর্ণ নিষ্ফলতা অর্জন করে হিটলার দেশত্যাগ করে চলে গেলেন জর্মনির বাভারিয়া প্রদেশের প্রধান নগর ম্যুনিকে। সেখানেও তিনি বেকার, এমন সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ লেগে গেলে তিনি স্বেচ্ছায় জর্মন সৈন্যবাহিনীতে জওয়ান রূপে প্রবেশ করলেন। যুদ্ধশেষে ম্যুনিকে ফিরে এসে জওয়ানদের কী যেন এক কালচারাল বা ঐ জাতীয় অস্পষ্ট কি এক ট্রেনিং দেবার জন্য নিযুক্ত হলেন। এই সময়ে তিনি আবিষ্কার করলেন, সরস্বতী তাঁর রসনায় বিরাজ করেন তাঁকে একদিন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বক্তারূপে

তবে প্রতি বছর দু'একবার হিটলারের নিমন্ত্রণে প্রধান প্রধান সঙ্গীতের জলসা-উৎসবে একসঙ্গে যেতেন। বস্তুত হিটলারের সর্বজীবনীকার একবাক্যে বলেছেন, গুস্তাফই একমাত্র হিটলার-সখা যিনি তাঁদের বন্ধুত্ব পৌণ্ড শিলিঙে পরিবর্তিত করেননি। জলসাতে যে যেতেন তার একমাত্র কারণ এক জলসাতেই আপন ছোট শহরে তাঁদের প্রথম পরিচয় হয়—সঙ্গীতই ছিল উভয়ের প্রাণতুল্য প্রিয়। গুস্তাফের ভদ্র আত্মবিসর্জন কতখানি, পাঠক এর থেকেই বুঝতে পারবেন যে তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন সঙ্গীত, কিন্তু সে পথে সুযোগ না পেয়ে একটি ছোট্ট দফতরে চাকুরি নেন। হিটলার তাঁকে বলেন, 'যেখানে খুশী বলো, আমি সরকারী সঙ্গীতালয়ে তোমাকে প্রধান সঙ্গীতচালক করে দিচ্ছি। তুমি পাবে, সবসময়, সর্বাবস্থায় আমার প্রটেক্শন্!' গুস্তাফ্ সে লোভও সম্বরণ করেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জনসমাজের অভিনন্দন গ্রহণ করাবার জন্য। এই সময় ম্যুনিক শহর রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাবাত্যায় বিক্ষুব্ধ। অসংখ্য রাজনৈতিক দল, এবং রাস্তায় রাস্তায় গণবিক্ষোভের কোলাহল। হিটলার এরই একটার সদস্য হলেন। যে দলের সভ্যসংখ্যা দশ হয় কি না হয়! ১৯১৯ থেকেই তিনি এই দল (National Sozialictiche Deutsche Arbeitspartei) —এরই প্রথম শব্দের Na এবং দ্বিতীয় শব্দের zi নিয়ে বিপক্ষ বা নিরপেক্ষ দলের অজানা কে একজন Nazi—নাৎসি নামকরণ করে) গড়ে তুলতে আরম্ভ করলেন, অচিরে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করলেন, এবং বাভারিয়া প্রদেশের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক কম্যুনিস্টবৈরী রূপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দুসরা জঙ্গীলাট, পয়লা নম্বর হিন্ডেনবুর্গের (ইনি পরবর্তী যুগে জর্মনির প্রেসিডেন্ট হন) সহকর্মী জেনারেল এরিখ লুডেন্ডর্ফের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিন-চার বৎসর যেতে না যেতে পার্টির সভ্যসংখ্যা আশাতীতরূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় হিটলারের এতখানি শক্তিসঞ্চয় হল যে, তিনি সবলে বাভারিয়া প্রদেশের তদানীন্তন রাষ্ট্রপ্রমুখদের অপসারণ করে প্রদেশের রাজ্যভার গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন—এই বিশ্বাস তাঁর দৃঢ় হল। এই উদ্দেশ্যে লুডেন্ডর্ফকে পুরোভাগে নিয়ে এই ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি সদলবলে প্রধান রাজকার্যালয়ের দিকে অগ্রসর হলেন। রক্ষীরা গুলি ছোঁড়াতে সমস্ত দল পালালো, স্বয়ং হিটলার কিঞ্চিৎ আহত হলেন (কিন্তু বন্দুকের গুলিতে নয়), কিছুদিন পর, রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে পাঁচ বছরের জেল হল। কিন্তু ইতিমধ্যে এবং বিশেষ করে কারাবাসের সময় তিনি ম্যুনিক তথা বাভারিয়া প্রদেশের সর্বত্র এমনই জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছিলেন, (এবং তথাকার সরকার ইতিমধ্যে কম্যুনিস্টদের শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্তি দেখে, রীতিমত শঙ্কিত হয়ে 'কণ্টক দ্বারা উৎপাটনার্থে') হিটলারকে অল্প কিছুদিন যেতে না যেতেই, অর্থাৎ ১৯২৩ সালেরই ডিসেম্বর মাসে এবং শুভেচ্ছার প্রতীক রূপে বড়দিনের অল্প কয়েকদিন পূর্বে কারামুক্ত করে দিলেন।

হিটলার নবোদ্যমে ইতিমধ্যে নেতার অভাবে দ্বিখণ্ডিত পার্টিকে দিনে দিনে শক্তিশালী করে তুলতে লাগলেন।

রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে হিটলার সম্বন্ধে কোনও কিছু বললে সেটা যথেষ্ট বোধগম্য হয় না বলে সংক্ষেপে কয়েকটি বৎসরের বর্ণনা দেওয়া হল।

এখন প্রশ্ন ইতিমধ্যে হিটলার আর কাউকে প্রেম নিবেদন করেছিলেন কিনা। ভিয়েনায় এসে হিটলার কিছুদিন তাঁর বন্ধুর মারফতে উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাঁর প্রিয়ার (লেখক ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন 'স্তেফানি') খবর নিতেন। তারপর সেই বন্ধু, গুস্তাফ্‌ও ভিয়েনায় এসে একই কামরায় বাসা বাঁধলেন। স্তেফানি হিটলারের তুলনায় বহু উচ্চবংশের কন্যা। পাত্র হিসাবে হিটলারের চেয়ে অযোগ্যতর পাত্র তখন বোধ হয় লিন্‌ৎস শহর খুঁজলেও দ্বিতীয়টি পাওয়া যেত না। ম্যাট্রিক ক্লাসে ওঠার পূর্বেই সে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে, জাতে প্রায় মজুর শ্রেণীর, অর্থসম্বলে প্রায় 'ধনুর্গুণ ভক্ষণে'র অবস্থা। হিটলার ভিয়েনা থাকাকালীন স্তেফানির বিয়ে হল সুযোগ্য বরের সঙ্গে। হিটলার সে খবর কখন পেয়েছিলেন—আদৌ পেয়েছিলেন কিনা, কারণ বন্ধু গুস্তাফ্‌ তাঁর সঙ্গে তখন ভিয়েনাতে এবং এঁদের দুজনার পরিবারের কেউই স্তেফানিকে চিনতেন না—এ সম্বন্ধে সব ঐতিহাসিকই নীরব।

কারণ তখন হিটলার বিরাট ভিয়েনা শহরের ঘূর্ণাবর্তে প্রায় বিলীন হবার উপক্রম।

www.BanglaBook.org

কিন্তু এস্থলে তাঁর স্থাপত্য শিক্ষালয়ে প্রবেশ করতে অক্ষম হওয়া, তাঁর নিদারুণ দৈন্য, পাবলিক লাইব্রেরি থেকে অবিচারে নানা জাতের বই এনে সেগুলো গোগ্রাসে ভক্ষণ—এর কোনওটাই আমাদের বিষয়বস্তু নয়। আমরা জানতে চাই, ওয়াইন-উইমিন-সং—মদ্যমৈথুনসঙ্গীত—এই তিন বস্তুতে যে রাজসিক প্রিয়দর্শন ভিয়েনা নগর প্যারিসের সঙ্গে পাল্লা দিত, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে তো বহু পূর্বে সে প্যারিসকে ছাড়িয়ে গিয়েই ছিল, সেই ভিয়েনাতে নারী সম্প্রদায়ের সঙ্গে হিটলারের কোনও সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল কিনা।

গুস্তাফ্ দৃঢ়কণ্ঠে বলছেন, যতদিন হিটলার তাঁর সঙ্গে বাস করেছেন ততদিন ওদিকে তাঁর কণামাত্র উৎসাহও তিনি কখনও দেখেননি। বস্তুত দীনবেশে সজ্জিত হলেও কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনরত সন্ন্যাসীর চোখেমুখে যে দীপ্তি পথিকজনেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ভিয়েনার ভদ্র, দেমি মঁদেন, গণিকাদের চোখেও সেটা ধরা পড়তো হিটলারকে দেখে। এবং তরুণ হিটলারের দিকে কটাক্ষনয়নে তাকিয়ে বিশেষ ইঙ্গিতও দিত। সাদামাটা, কিঞ্চিৎ ঈর্ষান্বিত গুস্তাফ্ সেদিকে হিটলারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, তিনি তাঁর বাহু ধরে অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলতেন, 'চলো চলো গুস্‌ৎল্, বাড়ি চলো।'

পূর্বেই বলেছি তারপর তিনি উধাও হলেন।

সেই ১৯০৮ থেকে ১৯১৯/২০ পর্যন্ত যে যা-কিছু লেখেন তার পনের আনা কাল্পনিক। অবশ্য ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে হিটলার যখন জওয়ানরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে, তাঁর সম্বন্ধে সে সময়কার খবর সরকারী কাগজপত্রে রয়েছে, কিন্তু সেগুলো আমাদের কাছে অবান্তর।

বস্তুত এ-কথা প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, ১৯০৮ থেকে ১৯২৫/২৬ পর্যন্ত কোনও রমণী তাঁর উপর কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি।[১]

পরিচয় হয়েছিল তাঁর বহু রমণীর সঙ্গে—একে ভিয়েনায় তাঁর যৌবনের বেশ কিছুকাল কেটেছে, যে-ভিয়েনা রমণীজাতিকে খাতির করতে তার সঙ্গে প্রেমে পড়ার জন্য সর্বক্ষণ সচেতন, কিংবা 'অচৈতন্যি' দুটোই বলতে পারেন, এক কথায় ভিয়েনা গ্যালান্ট নগর—তদুপরি ১৯২২ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত তিনি ম্যুনিকের রাজনৈতিক আকাশে অন্যতম জ্যোতিষ্মান গ্রহ, কম্যুনিস্টদের মোকাবেলা করতে পারেন একমাত্র তিনি

---

১ এমন কি পরবর্তী কালে এফা ব্রাউনও না।

এস্থলে আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ করি। ১৯৪১-এর গ্রীষ্মকালে হিটলারের সেনাদল যখন বীরবিক্রমে জয়ের পর জয় লাভ করে মস্কোপানে এগিয়ে চলেছে তখন তিনি প্রতিদিন লাঞ্চ-ডিনারের পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করতেন। ১৯৪২/৪৩-এর শীতে স্তালিনগ্রাদের পরাজয়ের পর জেনারেলদের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি শুধু তাঁর মহিলা সেক্রেটারি স্টেনোদের সঙ্গে খেতেন। এফার হেডকোয়ার্টার্সে আসার অনুমতি ছিল না। হিটলার সময় পেলে বের্ঘটেশগাডেনের বাড়ি বের্গহফে তাঁর সঙ্গে মিলিত হতেন, কিন্তু ঐ ১৯৪১/৪২ এক বা দেড় বৎসর তিনি যে-সব গালগল্প করেছেন সেটি লিখে রাখা হয়েছিল স্টেনোদের খাতা। প্রকাশিত হয়েছে 'হিটলারস্ টেবিল-টক্' শিরোনামায়। প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠার কেতাব। এ-পুস্তকের বহুস্থলে পাওয়া যায় রমণীজাতি সম্বন্ধে তাঁর অভিমত। কিন্তু ভিয়েনা বাসকালীন কিংবা ১৯২৫/২৬ পর্যন্ত তিনি যে কোনও রমণীকে কাছের থেকে চিনতে পেরেছেন, এর কোনও ইঙ্গিত নেই। অবশ্য এ-দ্বারা কোনও কিছু নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা যায় না।

www.BanglaBook.org

রাস্তাঘাটে নাৎসি আর কম্যুনিস্ট দলে প্রায় প্রতিদিন মারামারি হয় এবং উভয় পক্ষে কয়েকটা গুপ্ত প্রকাশ্য খুনও হয়ে গিয়েছে—এ সবার নেতা তো বীর্যবান না হয়ে যায় না। তদুপরি মহিলাদের প্রতি কি প্রকারে ব্যবহার করতে হয়, তাদের প্রতি ব্যবহার্য সব আদবকায়দা-অটিকেট-গ্যালানট্রি তিনি জানেন—ভিয়েনাতে অবশ্যই তার বেশীর ভাগ তিনি দেখে শিখেছিলেন, কিন্তু হিটলারের মত অসাধারণ জিনিয়াসের পক্ষে সেইটে যথেষ্টর চেয়েও ঢের বেশী। এবং সর্বশেষ কথা, তাঁর যে একটা ম্যাগনেটিক চার্ম—চৌম্বিক আকর্ষণ শক্তি ছিল সেটা তো জর্মন ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বহু বিদেশী রমণীও বলেছেন।

আমি পূর্বেই নিবেদন করেছি, হিটলার জীবনে প্রেম হাফ প্লাস ওয়ান প্লাস হাফ।

স্তেফানির প্রতি তাঁর প্রেম প্রথম হাফটা, শেষ হাফটা এফা ব্রাউন, যাঁকে তিনি শেষ মুহূর্তে বিয়ে করেন এবং সেই সূত্রে পৃথিবীর বহুলোক এ প্রেমের খবর পায়। কিন্তু আমরা এস্থলে যে দৃষ্টিবিন্দু—অর্থাৎ প্রেমের পরিপ্রেক্ষিতে—হিটলারকে দেখছি, সেভাবে কেউ দেখেননি, লেখেননি। হয়তো সেই হাফটি এস্থলে আগে বর্ণনা করে মাঝখানের ফুল ওয়ানটিতে গেলে ভাল হত, পাঠক পুরো পার্সপেকটিভ পেতেন, কিন্তু শেষটায় অনেক চিন্তা করে দেখলুম বিশেষ কারণ না থাকলে এ ধারার খেলাতে কালানুক্রমিক অগ্রসর হওয়াই প্রশস্ত (সিনেমার ফ্লাশবেক কিংবা ফ্লাশ ফরওয়ার্ড টেকনিক অবশ্য আজকাল বড়ই জনপ্রিয়)। দ্বিতীয়, এফার সঙ্গে হিটলারের সর্বশেষ প্রেম ১৯৩৯—৪৫-এর যুদ্ধাদি দ্বারা এতই বিক্ষুব্ধ যে বহু অবান্তর নরনারীকে সেখানে টেনে এনে প্রবন্ধের কলেবর বাড়াতে হয়। তৃতীয়ত, অনেকেই সে-প্রেম সম্বন্ধে অল্পবিস্তর পড়েছেন বলে স্বল্পপরিসর প্রবন্ধে মূল ঘটনাগুলো শুধু আবার তাঁরা শুনতে পাবেন মাত্র—অর্থাৎ সে প্রেম বর্ণাতে হলে পূর্ণ পুস্তকের প্রয়োজন।

এস্থলে নিবেদন করা কর্তব্য মনে করি, রমণীর প্রতি পুরুষের একনিষ্ঠ প্রেম এদেশের এবং ওদেশের বহু কাব্যকাহিনীতে আছে কিন্তু বাস্তবে যদ্যপি যে কোনও কারণেই হোক (কুলীন প্রথার কথা তথা শ্রীকৃষ্ণ বা দশরথের কথা এস্থলে স্মরণে আনছি নে) আমরা আজ এদেশে একদারনিষ্ঠাতাকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখি, ইয়োরোপে বহুকাল যাবৎ একই রমণীকে আজীবন পুজো করার বিশেষ মূল্য দেয়নি। অতএব পাঠক যেন স্তেফানির কথা স্মরণে এনে হিটলারের সর্বমহৎ, সর্বগ্রাহী প্রেমকে তার যথোপযুক্ত সম্মান দিতে কুণ্ঠিত না হয়।

ঠিক কোন্ সালে সে প্রেমের সূত্রপাত হয় সে কথা তাঁর অন্তরঙ্গতম ব্যক্তিও জানেন না—যদিও আমার সুদৃঢ় অচল বিশ্বাস, বয়সে পরিণত হওয়ার পর তিনি কারুর সঙ্গেই অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব স্থাপন করেননি, ফোটোগ্রাফার হফ্‌মান ছিলেন তাঁর একমাত্র নিত্যালাপী বিদূষক—তবে নিশ্চয়ই ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্বে।

ইতিমধ্যে হিটলারের একটি বিশিষ্ট স্বভাবের উল্লেখ না করলে সে প্রেমের যথার্থ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব।

পূর্বেই নিবেদন করেছি মোটামুটি ১৯২৭, পাকাপাকি বলতে গেলে তার দু'তিন বছর আগের থেকেই হিটলার ম্যুনিকাঞ্চলে এমনই প্রখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন যে তিনি যেখানে যেতেন সেখানেই তাঁর চতুর্দিকে ভিড় জমে যেত। দিনের পর দিন বিশাল জনতার সামনে তিনি ওজস্বিনী বক্তৃতা দ্বারা দেশের দুঃখদৈন্যের নিদারুণ বর্ণনা দিচ্ছেন, বিশেষ করে শিশু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পুত্রকন্যার জন্য আহার বসন সংগ্রহার্থে মা-জননীদের কঠোর সংগ্রাম (মেয়েরা দু'হাত দিয়ে মুখ চেপে কাঁদলেও তার সম্মিলিত ধ্বনি হিটলারকে কখনও কখনও পুরো দু-তিন মিনিট বক্তৃতা বন্ধ করতে বাধ্য করতো) এবং সমসাময়িক রাষ্ট্রনায়কের ক্লৈব্য তথা পাপাচার (করাপশান) নিয়ে তাঁর সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ—এবং সর্বোপরি তাঁর আত্মবিশ্বাস, তাঁর আশাবাদ যে তিনিই মেসায়া (কল্কি, যিনি পুনরায় পৃথিবীতে ধর্মস্থাপনা করবেন) তিনিই ভের্সাঈ ডিকটাট্ (ডিকটাট্ ডিক্টেশন থেকে, অর্থাৎ ক্রীতদাসদের প্রতি যে কোনও অন্যায় পশুবলপ্রযুক্ত অলঙ্ঘ্য আদেশ, যে আদেশ পালন না করলে আদিষ্ট ব্যক্তিকে সবংশে নির্বংশ করা হবে এবং জর্মন রাষ্ট্র থেকে সমূলে উৎপাটিত করা হবে) ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে জর্মনিকে পুনরায় সার্বভৌম এবং ধীরে ধীরে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নেশানরূপে পরিণত করবেন।[১]

ব্যক্তিগত জীবনেও হিটলার আর কাউকে আমল দিতেন না। প্রায় প্রতিদিনই তিনি তাঁর প্রিয় তিনটে কাফের একটাতে কয়েকজন বন্ধুসহ বসতেন। কিন্তু আমরা যাকে বলি আড্ডা মারা, কিংবা গালগল্প করা—যে কর্মে ভিয়েনা বাঙালীর চেয়েও এক কাঠি সরেস—এবং যে ভিয়েনায় হিটলার প্রথম যৌবন কাটান—সেটি হত না। হিটলার ভিয়েনাতে অনেক কিছু শিখেছিলেন, শুধু এই সমাজনন্দন আচরণটি রপ্ত করতে পারেননি। সর্বক্ষণ তিনিই কথা বলতেন, একমাত্র তিনিই।

এসব মণ্ডলীতে মহিলাদের নিরঙ্কুশ 'প্রবেশ নিষেধ' না হলেও তাঁদের মাত্র দু'একজন আহ্বান পেতেন অতিশয় কালেভদ্রে। হিটলার ভিয়েনার কায়দায় তাঁদের হস্তচুম্বন করতেন (যদিও জর্মনিতে তখন সেটা বিলকুল আউট্ অব্ ডেট্), তাঁদের সুখ-সুবিধার প্রতি নজর রাখতেন, সামান্য হাঁ, হুঁ কিংবা অতি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করতে দিতেন, কিন্তু একটা দিকে তিনি কঠোর কঠিন দৃষ্টি রাখতেন, কোনও রমণী যেন ভ্যাচর ভ্যাচর করতে আরম্ভ না করে—তা তিনি যত বুদ্ধিমতীই হোন, মাদাম পম্পাডুর। ইজাবেলা ডানকান, মাদাম দ্য স্তাল যেই হোন না কেন।

গেলীর প্রবেশ

সম্পূর্ণ অচিন্তনীয়, অবিশ্বাস্য—অতিপ্রাকৃত বা মিরাক্‌ল্‌ই বলা যেতে পারে।

নিতান্ত একটা চিংড়ি (চ্যাংড়ার স্ত্রীলিঙ্গ) মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এলেন হিটলার তাঁর অন্যতম কাফেতে। অতি ভদ্রভাবে সে সবাইকে নমস্কারাদি করলে। সে তো স্বাভাবিক। কিন্তু তাজ্জব কি বাৎ। পাঁচ মিনিট যেতে না যেতে তাবৎ কথাবার্তা সে-ই বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে—ওদিকে এতই বিবেচনা ধরে যে, একে কথা বলতে দেয়, ওকেও কথা বলতে দেয়, কাউকে অস্বাভাবিক আড়ষ্ট হতে দেয় না—সবাই, ইংরিজিতে যাকে বলে ভেরি মাচ্

---

১ হিটলারের বক্তৃতা দেবার ভঙ্গি ও বিষয়বস্তু নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ লেখা যায়—লেখক তাঁর বহু বক্তৃতা শুনেছে। এ বাবদে একটি অত্যুত্তম—সর্বোৎকৃষ্ট বললেও অত্যুক্তি হয় না—পরিচ্ছেদ লিখেছেন জর্নলিস্ট মার্কিন মাউরার তাঁর 'জর্মনি পুট্‌স্ দি ক্লক ব্যাক্' পুস্তিকায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অ্যাট ঈজ—কিন্তু সব মন্তব্য, সব আলোচনা ঘুরে ফিরে যায় ঐ মেয়েটির কাছে।

আর অতিপ্রাকৃত, মিরাক্‌ল্ হল এই যে, স্বয়ং হিটলার চেয়ারে আরামসে হেলান দিয়ে সুমধুর পরিতৃপ্তির মৃদুহাস্য বদনমণ্ডলে ছড়িয়ে দিয়ে বসে আছেন।

হিটলারকে যখনই তাঁর চেয়ে বয়সে বড় মুরুব্বীস্থানীয় পার্টি-মেম্বরেরা শুধোতেন, 'বয়েস তো হল, বিয়ে-শাদীর কথা—'

হিটলার বাধা দিয়ে বলতেন, 'জর্মনি আমার বধূ!'

ঠাট্টাছলে বললেও এর ভিতর যে অনেকখানি সত্য লুক্কায়িত আছে সে তত্ত্বের কিছুটা সে-সব মুরুব্বীরা জানতেন। নইলে এ-জাতীয় প্রশ্ন ব্যক্তিগত জীবনে দ্বিরদরদ-নির্মিত শিখরবাসী হিটলারকে জিজ্ঞেস করবে কে? কারণ তাঁরা এবং পার্টির অন্য সবাই জানতেন, হিটলার জাত-ব্যাচেলার। তা সে ভিয়েনীজ কেতায় সুন্দরীদের সামনে যতই গ্যালানট্রি, শিভালরি দেখান না কেন, রমণীদের কথা উঠলে টেবিলে দু-হাত রেখে, সুমুখের দিকে ঝুঁকে যতই সিরিয়াসলি তিনি কোথায় কোন্ সুন্দরী রমণী দেখেছেন, যে-বেভেরিয়াকে তিনি এত ভালোবাসেন যে আপন মাতৃভূমি ত্যাগ করে এখানে এসে স্থায়ী আবাস নির্মাণ করেছেন সেই বেভেরিয়া মায় তার ম্যুনিক সুন্দরীর ব্যাপারে যে ভিয়েনার কাছেই আসতে পার না—এসব নিয়ে যত ধানাইপানাই তিনি করুন না কেন, পার্টির উঁচু মহলের প্রায় সবাই জানতেন যে হিটলারের পক্ষে কোনও সুন্দরীকে নিয়ে পার্টির অতি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর কিছুটা ঢলাঢলি বরঞ্চ সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়, কিন্তু বিয়ে করে বউ কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে ঘর বাঁধবার মত মানুষ হের হিটলার নন। মাঝে মাঝে তাঁকে এ মন্তব্যও করতে শোনা গেছে : 'সুন্দরীদের ভালোবাসবো না—সে কি? আমি কি এতই রসকষবর্জিত আকাট! যা বলুন, যা কন্, আপনারা তো জানেন, আমার সত্তার অন্তস্তলে যে পুরুষ লুকানো আছেন তিনি আর্টিস্ট! এবং আমি ফুলও ভালোবাসি কিন্তু তাই বলে কি আমাকে বাগানের মালী হতে হবে?' প্রায় এ সত্যটিই চার্লস ল্যাম্ বলছেন, 'আমার ঘরে ফুল নেই কেন, শুধোচ্ছেন? আমি কি ফুল ভালোবাসি নে? নিশ্চয় বাসি। আমি শিশুদেরও ভালোবাসি—তাই বলে তাদের মুণ্ডুগুলো কেটে ঘরের ভিতর ফুলদানীতে সাজিয়ে রাখি নে।' আর এ বিষয়ে পরিপূর্ণ সত্যের শেষ শব্দটি বলতে হলে বাঙলা প্রবাদেরই শরণাপন্ন হতে হয়—'বাজারে যখন দুধ সস্তা তখন গাই পোষার কি প্রয়োজন?'

পূর্বেই বলেছি, সত্যকার অন্তরঙ্গ বন্ধু হিটলারের কেউ ছিল না। তবু মোটামুটি যাঁকে বলা যেতে পারে তিনি তাঁর ফটোগ্রাফার হফ্‌মান। এঁকে তিনি এই প্রসঙ্গে খাঁটি বৈষয়িক তত্ত্বকথাটি বলেন, 'জর্মনিকে গড়ে তোলা আমার জীবনের একমাত্র কাম্য, আদর্শ। একবার আমার জেল হয়েছে, আবার যে কোনও মুহূর্তে আমার ছ' বছরের জেল হতে পারে। তখন বউ-বাচ্চা বাইরে, আমি গরাদের ভিতর। এটা কি খুব বাঞ্ছনীয় পরিস্থিতি?'

তবু বেশীর ভাগই এই নবাগতা সুন্দরী, ব্লন্ডিনী, মধুরভাষিণী, আত্মসচেতন অথচ বিনয়ী মেয়েটিকে দেখে (এবং বিশেষ করে লক্ষ্য করে যে হিটলার কফি-চক্রের চক্রবর্তীর সম্মানিত আসন সানন্দে তাঁকে ছেড়ে দিয়েছেন) ভাবলেন, তবে কি হিটলারের 'জর্মনি আমার বধূ' নীতিটি পরিবর্তন করার সময় এসেছে?

মেয়েটির নাম আঙেলিকা রাউবাল। হিটলারের সৎবোনের মেয়ে—ভাগ্নী। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে কিঞ্চিৎ অসুবিধা আছে সত্য কিন্তু তেমন কোনও অলঙ্ঘ্য

www.BanglaBook.org

আপ্তবাক্যপ্রসূত নিষেধ নেই।[১] মেয়েটির মা বিধবা, সামান্য যে পেনসেন পায় তাতে দুই কন্যাসহ জীবনযাপন সহজ নয়; এদিকে যে ছোট বৈমাত্রেয় ভাই আডল্‌ফকে, তার বহু দোষ—তার মারাত্মক গোটা তিনেক পূর্বেই নিবেদন করেছি—থাকা সত্ত্বেও, তাকে ছেলেবেলা থেকেই গভীরভাবে স্নেহ করেছেন, সেই আডল্‌ফ্, এখন সচ্ছল হওয়ার দরুণ আপন জন্মভূমি অস্ট্রিয়ার কাছেই—সীমান্তের লাগোয়া অঞ্চলে ম্যুনিক থেকে একশ মাইল দূরে বের্ষটেশগাডেনে বাড়ি কিনে তাঁকে অনুরোধ করেছে সীমান্তের এপারে এসে সে বাড়ির জিম্মা নিতে। বেচারা আডল্‌ফকে বেশীর ভাগ সময় কাটাতে হয় ম্যুনিক শহরে রাজনীতি নিয়ে, সময় পেলে ঐ গ্রামের নূতন বাড়িতে গিয়ে যেন একটুখানি আরাম পায়। তদুপরি এ তথ্য সর্বজনবিদিত যে আঙেলিকা রাউবালের মা, হিটলারের এই সৎবোনটি যেমন বাড়ি চালাতে জানে, অতিথি-সজ্জনের সেবা করাতে নিপুণা, তেমনি পাচিকা রূপে সমস্ত নগরীতে অতুলনীয়া।[২] স্বভাবতই সঙ্গে নিয়ে এলেন দুই মেয়েকে। এদের বড়টিই আঙেলিকা বা গেলী।

মেয়েটি অসাধারণ সুন্দরী ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এর সম্বন্ধে এবং মামা আডল্‌ফের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক ছিল সে সম্বন্ধে একাধিক লেখক আপন আপন মতামত দিয়েছেন। এর ভিতর দুজন দুই মত পোষণ করেন, এবং পঁয়ত্রিশ বছর পর আজ সত্য

---

১ এই ভারতের অন্ধ্র অঞ্চলে হিম্পুসমাজে আপন সহোদরা ভগ্নীর মেয়েকে বিয়ে করা খুবই স্বাভাবিক, ও নিত্য নিত্য হয়। বস্তুত প্রথমেই মামাকে কন্যাদানের প্রস্তাব করতে হয়—যেন ন্যায্য হক্ক তারই। সে রাজী না হলে অন্যত্র তার বিয়ে হয়।

২ হিটলার-পরিবারের কুলুজীটি দিশী-বিদেশী কোনও ঘটক-ঠাকুরেরই অমলানন্দের কারণ হবে না। প্রথমত হিটলারের (Hitler, Hiedler, Huetler, Huettler—আমাদের দেশের অল্পশিক্ষিত চাষাদের মত হিটলারের ঠাকুর্দারা নানাভাবে এ নাম বানান করেছেন; স্বয়ং হিটলারের পিতা—তাঁর জন্ম জারজরূপে—সে কথা পরে হবে, গোড়াতে Hiedler এবং পরে Hitler বানান করেছেন) পিতা এবং মাতা উভয়েই দুই ভাই, অর্থাৎ হিটলার পদবী এমন দুজনার বংশগত, এবং এই কারণে হিটলারের পিতা যখন তাঁর মাতাকে বিয়ে করেন তখন চার্চের পক্ষ থেকে বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ ফ্যুরার আডল্‌ফ হিটলারের পিতামহ বিবাহ করেন Maria Anna Schicklgruber-কে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে, কিন্তু তার পাঁচ বৎসর পূর্বে Schicklgruber একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন কুমারী অবস্থাতেই ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুন। এই পুত্রই ফ্যুরার আডল্‌ফ হিটলারের পিতা। এবং যেহেতু নবজাত শিশুর মাতা বিবাহিত নয় তাই রীতি অনুযায়ী তাকে দেওয়া হয় মাতা-মাতামহের পারিবারিক নাম Alois Schicklgruber। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, বিয়ের পরও পিতা তাঁর পুত্রের নাম Hiedler (তিনি এভাবেই বানান করতেন)—এ পরিবর্তন করার মেহন্নৎটুকু আপন স্কন্ধে তুলে নেননি। অবশ্য একথা যেমন প্রমাণ করা যায় না, তেমনি বাতিলও করা যায় না যে Alois সত্যই ফ্যুরারের পিতামহ Johann Georg Hiedler-এর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কিনা, তবে সে অঞ্চলের সাধারণজনের বিশ্বাস ছিল Alois-এর জন্ম Johann Georg-এর ঔরসেই। Alois-এর মাতা Maria ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মারা যেতেই Johann Hiedler অন্তর্ধান করেন। ত্রিশ বৎসর পর তিনি পুনরায় দেখা দিলেন এবং তিনজন সাক্ষী ও নোটারির (উকিলের) সামনে শপথ নিলেন যে, Alois Schicklgruber তাঁহারই ঔরসজাত পুত্র বটে। ঐদিন থেকে তাঁর নাম হল Alois Hitler (বা Hiedler)। ইনিও একাধিক দিক দিয়ে দেখতে গেলে তাঁর পিতারই মত। এদিক ওদিক বিস্তর ঘোরাঘুরির পর বিয়ে করেন

www.BanglaBook.org

নিরুপণ করা অসম্ভব। তবে দুজনাই একমত যে ঐ গেলী-ই হিটলারের 'ওয়ান গ্রেট লাভ্'। এঁদের একজন হিটলারের ফোটোগ্রাফার বন্ধু হাইনরিষ হফ্‌মান। হিটলারের মৃত্যুর দশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি হিটলার সম্বন্ধে একখানা বই লেখেন। বইখানার নাম 'হিটলার উয়োজ মাই ফ্রেন্ড' (ইংরিজি অনুবাদ)। বলা বাহুল্য যে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দেও তিনি সব কথা প্রাণ খুলে বলতে পারেননি, তবে এ-কথা সত্য, সব তত্ত্ব—গ্যাস চেম্বারে ইহুদী পোড়ানো ইত্যাদি—জেনে-শুনেও তিনি হিটলারদের নিন্দার চেয়ে প্রশংসাই করেছেন বেশী—তবে এ কথাও বলে রাখা ভালো, রাজনৈতিক ব্যাপারে হফ্‌মানের কোনও চিত্তাকর্ষণ ছিল না,—ঐ বিষয়, যুদ্ধবিগ্রহ, কনসানট্রেশন ক্যাম্প ইত্যাদি নিয়ে দুই বন্ধুতে আলোচনা হত খুবই কম। ফটোগ্রাফার হলেও হফ্‌মান উত্তম উত্তম ছবির কদর ও সন্ধান জানতেন, এবং হিটলারেরও রুচি ছিল স্থাপত্য, চিত্রে ও ভাস্কর্যে। দুজনার আলাপ-আলোচনা হত আর্ট নিয়ে।

অন্যজনের নাম পুৎসি হান্‌ফ্‌স্টেঙেস। এঁর বইয়ের নাম 'আনহার্ড উইটনেস'। হিটলার যখন ম্যুনিকে তাঁর দল গড়ে তুলতে আরম্ভ করেন তখন উভয়ের পরিচয় হয়। পুৎসি বিত্তশালী খানদানী ঘরের ছেলে বলে তিনি হিটলারকে নানাভাবে সাহায্য করতে সক্ষম হন। হিটলার ফ্যুরার হওয়ার পরও বেশ কিছুকাল তিনি 'দরবারে' আসা-যাওয়া করতেন, এবং প্রায়ই নিভৃতে হিটলারকে পিয়ানো বাজিয়ে শোনাতেন। শেষ পর্যন্ত তিনি 'দরবারে'র কূটনৈতিক মারপ্যাঁচে হেরে যান এবং সুইটজারল্যান্ডে পালিয়ে গিয়ে সেখানেই ঘর বাঁধেন। ইনি তাঁর পুস্তকে হিটলার এবং গেলী উভয়েরই বিরুদ্ধে প্রচুর বিষোদ্গার

শুল্ক বিভাগের এক পালিতা কন্যা Anna Glasl-Hoerer-কে। এ বিয়ে সুখের হয়নি। এবং এঁকে তালাক দেওয়ার পূর্বেই Alois 'বন্ধুত্ব' করেন কুমারী Franziska Matzelsberger-এর সঙ্গে। ফলে একটি পুত্রসন্তান হয়। এর নামও Alois। ইনিও জারজ; পরে আইনতঃ পিতার নাম পান। এঁর পিতা তাঁর মাতা Franziska-কে বিয়ে করেন তাঁর তালাকপ্রাপ্ত প্রথম স্ত্রী Anna Glasl-Hoerer-এর মৃত্যুর পর। বিয়ের তিন মাস পর Franziska একটি কন্যাসন্তান প্রসব করেন (এঁর নাম Angela এবং ইনিই পরবর্তীকালে হিটলারের নতুন বাড়ি দেখাশুনো করার ভার নেন ও সঙ্গে নিয়ে আসেন কন্যা, হিটলারের প্রেয়সী Angelica, ডাকনাম Geli)। কিন্তু Angela-র জন্মের এক বৎসর পরে Franziska ক্ষয়রোগে মারা যান। এর চার বৎসর পর ফ্যুরার আডল্‌ফ হিটলারের পিতা Alois Hitler বিয়ে করেন তাঁর ঠাকুদ্দার ভাইয়ের নাতনী শ্রীমতী Klara Poetzl-কে, ৭ই জানুয়ারি ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। এ বিয়ের চার মাস দশ দিন পরে জন্মান ফ্যুরারের সর্বজ্যেষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা Gustav এবং বাল্যকালেই মারা যান, এবং তার পরের কন্যা Idaও অল্পবয়সে মারা যান। ফ্যুরার আডল্‌ফ হিটলার তৃতীয় সন্তান (পিতার তৃতীয় বিবাহের)। তাঁর ছোট ভাই Edmund এ পৃথিবীতে মাত্র ছ' মাস ছিল। সর্বশেষ সন্তান—পঞ্চমা—Paula ফ্যুরারের মৃত্যুর পর, কয়েক বৎসর আগে পর্যন্ত চিরকুমারী অবস্থায় Salzburg-এ বাস করতেন। এই পাউলা একবার ভ্রাতার (হিটলার তখন ফ্যুরার) বাড়িতে তাঁকে দেখতে আসেন, কিন্তু দীর্ঘদিন (হিটলারের হিসেবে) থাকেন বলে ভ্রাতা আডল্‌ফ তাঁকে আর কখনও নিমন্ত্রণ জানাননি।

সৎভাই (পিতার ২য় বিবাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র Alois) ঝরলিনে মদ বেচতেন। তাঁর সম্বন্ধে হিটলার কখনও একটি বর্ণও উচ্চারণ করেননি। তাঁর ছোট বোন Angela বেশ কয়েক বৎসর পরে হিটলারের গ্রামের বাড়ি চালানোর পরে ঝগড়া করে চলে যান, এবং এক ইঞ্জিনিয়ারকে বিয়ে করেন। হিটলার এমনই চটে যান যে বিয়েতে কোনও উপহার পর্যন্ত পাঠাননি।

www.BanglaBook.org

করেছেন। তার মতে গেলী অতিশয় সাধারণ আর পাঁচটা মেয়ের মত ফ্লার্ট করার জন্য আকুল, ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রসিদ্ধ ইংরেজ ঐতিহাসিকরা হিটলার সম্বন্ধে আপন আপন বই লেখার পর, এই দুজনার বই বেরিয়েছে এবং ইংরেজ ঐতিহাসিকদের ধারণা হফ্‌মানের কাছাকাছি।

তা সে যা-ই হোক, এ-কথা সত্য হিটলার তাঁর ভাগ্নীকে নিয়ে কাফেতে যেতেন এবং আগে কাজের চাপে সিনেমা, থিয়েটার, অপেরায় অল্প যেতেন—এখন গেলীর চাপে সেগুলো বেড়ে গেল। কিন্তু আসলে হিটলার সব চেয়ে বেশী ভালোবাসতেন গেলীকে মোটরে করে নিয়ে পিকনিক করতে—ম্যুনিকের চতুর্দিকে পিকনিকের জন্য অত্যুৎকৃষ্ট স্থল বিস্তর। পাহাড়, উপত্যকা, হ্রদ, নদী, বনফুলে ভর্তি মোলায়েম ঘাসের ঢালু মাঠ, মহান বনস্পতি—কোনও বস্তুরই অভাব নেই। হফ্‌মান পরিবার প্রায়ই সঙ্গে যেতেন।

সোজা বাংলায় বলতে গেলে হিটলার এই কুমারীকে যেন দেবতার আসনে বসিয়ে পূজো করতেন। এবং তাই লোকজনসমক্ষে তিনি কখনও বে-এক্তেয়ার হয়ে এমন কোনও আচরণ করেননি যা মুগ্ধ প্রণয়ী ইয়োরোপে মাঝে মাঝে করে থাকে। গেলীর কণ্ঠস্বর মিষ্ট ছিল,—হিটলার সে স্বর তালিম দিয়ে অপেরার জন্য গেলীকে তৈরি করতে চাইলেন এবং উপযুক্ত গুরু নিয়োগ করলেন। পুৎসি বলেন অন্য কাহিনী। তিনি বলেন, মেয়েটা ছিল অত্যন্ত বাজে ফ্লার্ট টাইপের। অপেরার উপযুক্ত কণ্ঠস্বর প্রস্তুত করতে হলে যে রেওয়াজ এবং বিশেষ করে যে কঠোর অধ্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা ছিল, গেলীর চরিত্রে তার কণামাত্র উপাদান ছিল না। প্রায়ই গুরুকে ফোন করে রেওয়াজ নাকচ করে দিত এবং এই ফাঁকে ফ্লার্ট করার তালে লেগে যেত। পুৎসির মতে শেষ পর্যন্ত গানের ক্লাস সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

তবে এ-কথা সর্ববাদিসম্মত যে ভিয়েনায় যে গুরুর কাছে গেলী সর্বপ্রথম গান গাইতে শেখা আরম্ভ করে সে তাঁর কাছে ফিরে যেতে চাইতো। জনশ্রুতি এ-কথা বলে, সেখানে নাকি গেলীর দয়িত বাস করতো।

এবং ঠিক এইখানেই ছিল হিটলারের ঘোরতর আপত্তি। শুধু তাই নয়, যদিও গেলীকে খুশী করার জন্যে হিটলার সব কিছুই করতে রাজী ছিলেন—যেমন গেলীর সঙ্গে টুপি-জুতো কিনতে যাওয়ার মত পীড়াদায়ক মারাত্মক একঘেয়ে ঘন্টানিও তিনি বরদাস্ত করে নিতেন (হিটলার নিজেই বলেছেন, গেলীর সঙ্গে হ্যাট টুপি কাপড় কিনতে যাওয়ার চেয়ে কঠিনতর অগ্নিপরীক্ষা ত্রিসংসারে আর নেই। আধঘণ্টা একঘণ্টা ধরে সে দোকানের মেয়েকে দিয়ে বস্তার পর বস্তা কাপড় নামাবে, তার সঙ্গে সে সব নিয়ে প্রাণ ঢেলে দিয়ে আলোচনা করবে এবং শেষ পর্যন্ত কিছুটা না কিনে গট গট করে বেরিয়ে চলে যাবে অন্য দোকানে। হিটলার ততক্ষণ বোধ হয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বা বসে বসে আঙুলের নখ কামড়াতেন, কিন্তু যা-ই করুন আর নাই করুন, তার পরের বারও বাছুর ছানাটির মত গেলীর সঙ্গে কেনা-কাটা করতে যেতেন ঠিকই) কিন্তু একটা বিষয়ে তিনি অচল অটল। তাঁর অনুমতি ভিন্ন গেলী যার-তার সঙ্গে আলাপচারী করতে পারবে না। এমন কি পরিচিতজনের সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কিও চলবে না। এবং এই ফরমান্ যে কত সুদূরপ্রসারী সেটা স্বয়ং গেলীও জানতো না।

গেলী অবশ্যই জানতো হিটলার তাকে ভালোবাসেন, তার প্রেমমুগ্ধ, সে প্রেম যে কত

www.BanglaBook.org

অতল গভীর সে-সম্বন্ধে বেচারীর কোনও ধারণাই ছিল না। একদিন সেটা সে বুঝতে পারলো রীতিমত ভীতশঙ্কিত হয়ে।

হিটলারের পার্টির সদস্যগণ যে যে কাজই করুন না কেন, সমাজে তাদের যে-স্থানই হোক না কেন, পার্টির ভিতর একটা প্রশংসনীয় সাম্যবাদ ছিল। হিটলারের মোটর ড্রাইভার এমিল মরিস ছিল প্রাচীন দিনের পার্টি-মেম্বার। সে একদিন কাঁপতে কাঁপতে হফ্‌মানের সামনে এসে বললে, সে গেলীর সঙ্গে ঠাট্টা-ঠুট্টি করছিল, এমন সময় হঠাৎ হিটলার ঘরে ঢুকে রাগে-জিঘাংসায় যেন সর্ব আত্মকর্তৃত্ব হারিয়ে চিৎকারের পর চিৎকারে মরিসকে গালাগাল দিতে আরম্ভ করেন। মরিস তো রীতিমত ঘাবড়ে গিয়ে ভাবলো, হিটলার যে কোনও মুহূর্তে পিস্তল বের করে গুলি চালাতে পারেন। ঘটনাটি হফ্‌মানকে বলার সময় সে তখন ভয়ে কাঁপছে।

হফ্‌মানের মতে গেলী ছিল পূত, পবিত্র, পুষ্পটির মত। তিনি বলেন, অপরাধ তার দিক দিয়ে নিশ্চয়ই কিছু ছিল না। কিন্তু মরিসটি ছিলেন ঈষৎ নটবর। কিন্তু সেও যে ফ্যুরারের ভাগ্নীর সঙ্গে বাড়াবাড়ি করবে সেটা অবিশ্বাস্য। করতে গেলে তার বহু পূর্বেই মরিসের বন্ধুবান্ধব তাকে এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন করে দিত।

হিটলারের শত্রুর অভাব কোনও কালেই ছিল না। এমন কি তাঁর প্রধান শত্রু কম্যুনিস্ট দলের কিছু কিছু সদস্য পার্টির আদেশানুযায়ী নাৎসি মেম্বারশিপ নিয়ে হিটলারের কার্যকলাপ লক্ষ্য করে যথাস্থানে তাদের রিপোর্ট পাঠাতো। এদের তো কথাই নেই, আরও কেউ কেউ বলেন, সমস্ত ব্যাপারটা এতখানি ধোয়া তুলসীপাতা ছিল না।[১] তা সে যাই হোক, হিটলার আত্মকর্তৃত্ব ফিরে পেলেন বহুকাল পরে—ইতিমধ্যে মরিস গা-ঢাকা দিয়ে থাকতো, হঠাৎ সামনে পড়ে গেলে তুলকালাম কাণ্ড লেগে যেত।

ইতিমধ্যে আরেকটা কাণ্ড ঘটে গেল। হিটলার প্রোপাগাণ্ডা-সফরে বেরুলে গেলী মায়ের কাছে, হিটলারের গ্রামের বাড়িতে চলে যেত। বোধ হয় তারই কোনও এক সময়ে হিটলার প্রিয়া গেলীকে একখানা চিঠি লেখেন—সেটাতে নাকি যৌনসম্পর্ক সম্বন্ধে হিটলার অতিশয় প্রাঞ্জল—শত্রুপক্ষের অভিমতে—অশ্লীল ভাষায় আপন কাম্য আদর্শ যৌনসম্পর্ক সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করেন। যৌনবিজ্ঞানীরা বলেন, অত্যাচারী শাসকদের (টাইরেন্ট) অনেকেই নাকি মাজোকিস্ট হয়ে থাকেন—অর্থাৎ স্বাভাবিক যৌনসঙ্গমের পরিবর্তে উলঙ্গ রমণী সে স্থলে পুরুষকে তীব্র কশাঘাত করে, কিংবা তলায় সূক্ষ্ম লোহা লাগানো রাইডিং বুট পরে পুরুষের স্কন্ধোপরি ঘন ঘন বুটাঘাত করে, তবেই নাকি পুরুষ তার যৌনানন্দ পায়।[২] শত্রুপক্ষের মতে হিটলারের চিঠি মাজোকিস্ট-দর্শন বিবৃত করেছিল। সে চিঠি নাকি দুর্ভাগ্যক্রমে পড়ে যায় অন্য লোকের হাতে। অতি কষ্টে, বহু অর্থ নিয়ে (বলা হয় পার্টি-ফান্ড থেকে) এক ক্যাথলিক পাদ্রী—ইনি তাঁর ইহুদি-বিদ্বেষ নাৎসি

---

১ হিটলারের প্রখ্যাত জীবনী-লেখক বুলক্ বলেন—'She (Hitler) discovered that she (Geli) had allowed Maurice to make love to her', ইংরিজিতে to make love হয়তো একাধিক অর্থ ধরে।

২ লন্ডন পুলিস নাকি বেশ্যাবাড়িতে হামলা চালালে মাঝে মাঝে চাবুক, লোহার গুলিওয়ালা রাইডিং বুট, ইত্যাকার যন্ত্রণাদায়ক সাজসরঞ্জাম পায়, বেশ্যাদের বক্তব্য, 'খদ্দের ভদ্রলোক'। তিনি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পার্টিতে যোগ দিলে কার্যে পরিণত করতে পারবেন এই আশায় পার্টিতে যোগ দেন—তারই বিনিময়ে চিঠিখানা কিনে নেন। (কথিত আছে, ৩০ জুন ১৯৩৪-এ হিটলার যখন বিনা বিচারে এক তথাকথিত 'বিদ্রোহী' দলের নেতা রোম্, হাইন্‌ৎস ইত্যাদিকে গুলি করে মারবার আদেশ দেন তখন সেই মোকায় আরও জনা চারশ'র সঙ্গে এই ফাদার স্টেম্‌প্‌ফলেকেও খুন করা হয়। তাঁর দোষ তিনি ঐ চিঠির সারমর্ম স্বমস্তিষ্কে সীমাবদ্ধ না রেখে দু-একজন অন্তরঙ্গ পার্টি-মেম্বারকে বলে ফেলেন। হিটলার-সখা হফ্‌মান অবশ্য এ চিঠির উল্লেখ করেননি, বরঞ্চ স্টেম্‌প্‌ফলে ও অন্যান্য নাৎসি নেতা নিহত হওয়ার কয়েকদিন পর হিটলারের সঙ্গে যখন দেখা করতে যান তখন তাঁকে দেখা মাত্রই নাকি হিটলার বলে ওঠেন, 'জানো হফ্‌মান, শুয়োরের বাচ্চারা আমার প্যারা ফাদারকেও খুন করেছে!' অবশ্য এ-কথা সত্য যে, জুন ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে হিটলারের আদেশে যে পাইকারি খুন 'জুন পার্জ' বা 'জুন মাসের জোলাপ' হয়—এ লেখক তখন জার্মানিতে ও ধুন্ধুমারের যতখানি আর পাঁচটা রাস্তার নাগরিক দেখতে পেয়েছিল, সেও পেয়েছে, কিন্তু সব কিছু শেষ হয়ে যাওয়ার পর হিটলার জাতির সম্মুখে যখন আপন সাফাই গেয়ে বক্তৃতা করলেন, তখন আর পাঁচজন নাগরিকের মত সে সেটা বিশ্বাস না করে অবিশ্বাস করেছিল এবং পরবর্তী ইতিহাস-উদ্ঘাটন লেখককেই সমর্থন করে—তখন গ্যোরিং, হিমলার আদেশদাতা হিটলারকে না জানিয়ে, পরে মিথ্যে অভিযোগ এনে, আপন আপন ব্যক্তিগত শত্রুও খতম করেন। কোনও কোনও ঐতিহাসিক বলেন, ফ্যুরারের গোপনীয় কেলেঙ্কারি বাবদে যখন ফাদার এতই অসতর্ক তখন এ মোকায় তাঁকে সরিয়ে ফেলাই ভালো—এই উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁকেও খুন করা হয়। কিন্তু এই 'পার্জ' বা জোলাপ গেলী-প্রেমের ছ' বছর পরের কথা, আমরা ১৯২৮-এ ফিরে যাই)।

তা সে চিঠি আদৌ হিটলার লিখেছিলেন কিনা সে তর্ক উত্থাপন না করলেও জানা যায়, ঐ সময়ে পার্টি-সদস্যদের ভিতর কানাঘুষা আরম্ভ হয়। কারণ ইতিমধ্যে হিটলার আরও ভালো রাস্তায় বৃহৎ ভবন কিনে সেখানে গেলীর জন্য রাজরাণীর মত আবাস নির্মাণ করে সেইটাকে আপন স্থায়ী আবাস-বাটি করেছেন, গেলীকে যত্রতত্র সর্বত্র সঙ্গে নিয়ে যান, এবং নিতান্ত সরল পার্টি-সদস্যও দু-চারবার লক্ষ্য করলেই বলতো, নিশ্চয়ই ফ্যুরার এ মেয়েতে মজেছেন। তা তিনি মজুন, কিন্তু একে বিয়ে করলেই তো পারেন। নইলে শত্রুপক্ষ যে বলছে হিটলার রক্ষিতা পোষণ করেন, দু কান কাটার মত স্বভবনে তার সঙ্গে বাস করেন, তিন কান কাটার মত সগর্বে সদম্ভে তাকে নিয়ে সর্বত্র—এমন কি পোলিটিকাল পার্টি মিটিঙেও—যাতায়াত করেন, এবং আপন ভাগিনীর—তা হোক না সে সৎবোনের মেয়ে—ভবিষ্যৎটি যে ঝরঝরে করে দিচ্ছেন সে বিষয়ে তাঁর কোনও

স্ত্রীকে এসব করতে আদেশ দিতে পারেন না—স্বাভাবিক লজ্জাবশত। তাই এ ধরনের লোক আমাদের কাছে আসেন। আমরাও সাজসরঞ্জাম তৈরী রাখি। স্ত্রীলোক মাজোকিস্টও আছে, এবং যেসব রমণী স্বামী মারপিট করলে চিৎকার করে, কিন্তু যৌনানন্দ পায়, তাদের 'নরমতর' মাজোকিস্ট বলা হয়। অনেকের মতে অনেক রমণী বাড়িতে এমন সব কাজ করে থাকে বা করে না (যেমন ঘর ঝাঁট দিল না রান্না করলো না, বা স্বামীর গামছাখানা লুকিয়ে রাখলো) যাতে করে স্বামী তাকে ঠ্যাঙায়!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিবেকদংশন নেই; আর এতদিন ধরে প্রচার যে, হিটলারের মত সর্বত্যাগী, জিতেন্দ্রিয় পুরুষ আর হয় না, তিনি যে ঊনচল্লিশ বছর বয়সেও দারগ্রহণ করেননি তার একমাত্র কারণ, দারাপুত্রপরিবার দেশের জন্যে তাঁর আত্মোৎসর্গে অন্তরায় হবে বলে। জিতেন্দ্রিয় না কচু!

এই কেলেঙ্কারিতে পার্টির কতখানি ক্ষতি হচ্ছিল বলা কঠিন, এ কথা সত্য যে নাৎসি পার্টির ভ্যুরটেম্‌বের্গ অঞ্চলাধিপতি মুরুব্বী, পার্টির এক অতি প্রাচীন সদস্য যখন হিটলারের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করলেন তখন তিনি রাগে ক্রোধে চিৎকার করে তাঁকে পার্টি থেকে স্রেফ খেদিয়ে দিলেন।

এদিকে হিটলারের কড়া পাহারা গেলীর উপর। হফ্‌মানের মতে তিনি আদৌ জানেন না যে গেলী অন্যজনকে অতি গভীরভাবে ভালোবাসে—ভিয়েনায় নাকি দয়িতের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। এবং এ কথাও সত্য, গেলী বার বার সঙ্গীতচর্চা করার জন্য তার প্রাচীন গুরুর কাছে ভিয়েনায় যেতে চায়—এবং হিটলারের কবুল জবাব, 'নাইন' অর্থাৎ নো। যে ম্যুনিকের সহস্র সহস্র নরনারী হিটলারের উচ্ছ্বসিত ভক্ত, সেই হিটলার যখন গেলীর পদপ্রান্তে তাঁর প্রণয় রাখলেন তখন আর কিছু না হোক, এত বড় সর্বজনপ্রশংসিত একটা গ্রেটম্যানের বশ্যতা গেলীকে নিশ্চয়ই মুগ্ধবিহ্বল করেছিল। (প্রেমের প্রতিদান দিক আর না-ই দিক) এবং হয়তো হিটলার সেই বিহ্বলতাকেই প্রণয়ের প্রতিদান হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন। হফ্‌মানের মতে হিটলারের 'গ্রেট লভ্' ছিল স্বার্থপর প্রেম—অনেক মুনিঋষিরাও বলেন, 'গ্রেট লভ্ কখনও নিঃস্বার্থ হতে পারে না, সে 'লাভার' অন্য সকলের প্রতি হয়ে যায় হিংসাপরায়ণ, তার বুভুক্ষা অসীম। বার্নার্ড শও বলেছেন, 'গ্রেট লভ্' সামলে-সুমলে অল্প মেকদারে ধীরে ধীরে প্রকাশ করতে হয়। নইলে দয়িতার দম বন্ধ হয়ে আসে। যেন কোনও 'ম্যানিয়াক' প্রেমোন্মাদ তাকে অষ্টপ্রহর আলিঙ্গনাবদ্ধ করে নিরুদ্ধনিশ্বাস করে তুলছে।

ম্যুনিকের বছরের সব চেয়ে বড় নাচের পরব এগিয়ে আসছে। প্রাণচঞ্চলা গেলী কেন, নিতান্ত অর্থাভাব না হলে, কিংবা প্রেমিকও দরিদ্র হলে, ম্যুনিকের কোনও তরুণী সে নাচ বর্জন করে? প্রথমটায় হিটলার তো কানই দেয় না। আর গেলীও ছাড়বে না। শেষটায় বাধ্য হয়ে হিটলার রাজী হলেন, কিন্তু শর্ত রইল দুটি। সঙ্গে যাবেন দুই গার্জেন এবং দুই গার্জেনদের প্রতিজ্ঞা করতে হল যে রাত এগারোটার ভেতর গেলীকে ফের বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে।

সেই ডান্‌সের জন্য যে পারে সেই নতুন হালফেশানের ফ্রক তৈরী করায়। ম্যুনিকের সর্বশ্রেষ্ঠ ডিজাইনার-দর্জি ডাঁই ডাঁই অতি অরিজিন্যাল ডিজাইন রেখে গেল। হিটলার এক নজর বুলিয়েই সব কটা নামঞ্জুর করে দিলেন। এগুলো বড্ড বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে—বড্ড বেশী সালঙ্কার—যদ্যপি ফ্রক হিসাবে অত্যুৎকৃষ্ট। গেলী যাবে সাধারণ ইভনিং ড্রেস পরে।

তাই হল। স্বয়ং হফ্‌মান ও তাঁর চেয়ে বুড়ো পার্টির প্রাচীন সদস্য আমান্ গেলীর 'চরিত্ররক্ষকস্বরূপ' তাকে মধ্যিখানে নিয়ে গেলেন নাচের মজলিশে। এক্ষেত্রে তরুণীরা প্রায় সর্বদাই আপন আপন লভারের সঙ্গে এ নাচে কেন—সব নাচেই যায়।

এবং ফিরতে হবে রাত ১১টায়। বলে কি? মাথা খারাপ!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হফ্‌মান বলেছেন—এবং এ লেখকও আপন একাধিক অভিজ্ঞতা থেকে অসংকোচে সায় দেবে—এ-সব নাচে ফুর্তি-ফার্তি ফষ্টি-নষ্টি এমন কি কিঞ্চিৎ বেলেল্লাপনা আসলে আরম্ভ হয় রাত বারোটার পর। আমার মতে জমে প্রায় দু'টোয় এবং নাচ ভাঙে ছ'টায়।

অনুমান করা কঠিন নয় যে গেলী অত্যধিক আপ্যায়িত বা সন্তুষ্ট হয়নি। নাচের মাঝে মাঝে ফাঁকে ফাঁকে কপোত-কপোতীরা জোড়ায় জোড়ায় ফোটোগ্রাফ তোলায়। গেলীর যথেষ্ট কাষ্ঠরস ছিল। সে-ও ছবি তোলালে ঐ দুই প্রহরী 'ডালকুত্তা'র মাঝখানে। কপোত-কপোতীর এক হাতে থাকে সফেন শ্যাম্পেন গ্লাস, অন্য হাতে গোটাপাঁচেক বেলুনের সুতো, মাথায় ঐ বলডান্‌সেই কেনা রঙ-বেরঙের ফুল্‌স্ ক্যাপ, গাধার টুপি ইত্যাদি। গেলী ছবি তোলালে এমন কায়দায় যেন মনে হয় ফাঁসির আসামীকে তার দুই জল্লাদ তাকে ফাঁসিকাঠে নিয়ে যাবার সময় প্রেস ফোটোগ্রাফার যে ভাবে ছবি তোলে।

হফ্‌মান বিরক্তির সঙ্গে কাঁটায় কাঁটায় এগারোটার সময় হিটলারের গচ্ছিত মহামূল্যবান গেলীকে মালিকের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন।

পরদিন সকাল বেলা সাড়ম্বরে 'সরকারী' কায়দায় গেলী ফোটোগ্রাফখানা মামাকে উপহার দিলেন। হিটলার এসব নাচ এককালে বিস্তর না হোক অল্পবিস্তর নিশ্চয়ই দেখেছিলেন। তাঁর মত তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি যে ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ না করাই ভাল।

বৈমাত্রেয় মামা হলেও গেলী পেয়েছিল হিটলারের একটি মহৎ গুণ; সে তার পেটের কথা কাউকে বলতো না। যে-পুৎসি হান্‌ফ্‌স্টেঙেল তাঁর পুস্তকে হিটলার ও গেলীর বিরুদ্ধে প্রচুরতম বিষোদগার করেছেন তিনি সে সময়ে নিত্য নিত্য হিটলারের বাড়িতে আসতেন, এবং গেলীর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল। তৎসত্ত্বেও তিনি তাঁর পুস্তকে গেলীকে দিয়ে রামগঙ্গা কিছুই বলাতে পারেননি। শুধু একবার নাকি তিনজনা যখন একসঙ্গে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন হিটলার কি একটা রূঢ় মন্তব্য করলে, পুৎসি শুনতে পেলেন গেলী দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুট কণ্ঠে বললে, "ব্রুট"—পশু।

গেলীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল হফ্‌মান পরিবারের প্রতি এবং সমস্ত ম্যুনিক শহরে ঐ পরিবারের কর্ত্রী এর্না হফ্‌মানের সঙ্গে তার ছিল অন্তরঙ্গতা। কিন্তু তিনিও শেষ পর্যন্ত আগাপাস্তলা কিছুই বুঝে উঠতে পারেননি, স্বামীকেও বোঝাতে পারেননি। পুৎসি তাঁর বিষোদগারের সময় গেলীর যত নিন্দাই করে থাকুন না কেন, এর্না পাঁচজনকে যা বলেছেন তার থেকে বোঝা যায়, তিনি, এর্না নিজে আর্টিস্ট ছিলেন বলে শুধু যে গেলীর অপূর্ব সৌন্দর্য দেখে মজেছিলেন তাই নয়, তার মানসিক ও চারিত্রিক একাধিক বিরল সৎগুণ তাঁকে সত্যই মুগ্ধ করেছিল। এমন যে বয়স্কা বান্ধবী যাঁর কাছে সান্ত্বনা পাওয়া যায়, বিপদে আপদে উপদেশ পথনির্দেশ চাওয়া যায় পাওয়া যায় তাঁর কাছেও গেলী তার সুখ-দুঃখের কথা বলত না। শুধু একদিন মাত্র, কেমন যেন আত্মহারা হয়ে সে স্বীকার করে যে, সে যখন ভিয়েনায় ছিল তখন কোনও একজনকে গভীরভাবে ভালোবেসেছিল। সামান্য এই, এতটুকু বলার পর সে হঠাৎ থেমে গেল, যেন সম্বিতে ফিরে এসে বুঝতে পারল, বড্ড বেশি বলা হয়ে গিয়েছে, তাই সঙ্গে সঙ্গে বললে, 'আর যা আছে, সেটা আছেই। আপনিও কিছু করতে পারবেন না, আমিও কিছু করতে পারবো না। অতএব অন্য কথা পাড়ি।' এর্না দুঃখিনী গেলীকে অনেক সান্ত্বনা দিলেন, সর্বপ্রকারে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতি

www.BanglaBook.org

দিলেন—এর্না বাস্তবিকই দৃঢ় চরিত্রের রমণী ছিলেন, অনেকের জন্য অনেক কিছু করেছিলেন, নাৎসি পার্টিতে যোগ দেননি, এবং যদিও হিটলারকে সমীহ করে চলতেন তবুও অন্যান্য বাবদে দু-একবার তাঁকেও খাঁটি অপ্রিয় সত্য কথা শোনাতে কসুর করেননি—কিন্তু গেলী তার শামুকের খোল থেকে বেরুতে রাজী হল না। পরবর্তী ঘটনা থেকে মনে হয়, সে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল, সে যা চায় হিটলার তার ঘোরতর বিরোধী এবং এই নিরীহ হফ্‌মান দম্পতি এখনও হিটলারের স্বরূপ চেনে না, হিটলার তাঁর মর্জিমাফিক যে সব সম্ভব-অসম্ভব কার্য করতে ও করাতে পারেন সে সম্বন্ধে এঁদের কণামাত্র ধারণা নেই—হিটলারের যে-'স্বরূপ' সে তার প্রতিদিনের সান্নিধ্যে সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হয়েছিল।

সেদিন এর্না শুধু এইটুকু জানতে পেরেছিল যে গেলী ভিয়েনায় একজন আর্টিস্টকে ভালোবাসে, কিন্তু সে কে, তাদের দুজনার মধ্যে কি আদান-প্রদান হয়েছে গেলী যদি তার ভালোবাসার প্রতিদান পেয়ে থাকে তবে উভয়ের বিবাহের প্রতিবন্ধকই বা কি—এ-সব হফ্‌মানরা জানতে পারেননি, পরে অন্য কেউও জানতে পারেনি।

এদিকে গেলীর মুখ সদ্য প্রফুল্ল, মামার বুড়া-বুড়া প্রাচীন দিনের পার্টি সদস্যরা তার উপর বড়ই প্রসন্ন, মামার বানানো সেই কাঁটাজালের ভিতরও তার বিধিদত্ত সরসতা লোপ পায়নি। পুৎসি এটাকেই ঘৃণা করে বলেছেন, 'ককেটরি'—এর বাংলা প্রতিশব্দ কি? ঢলাঢলি না? কি জানি! হফ্‌মান বলেন, তাঁর মনে সন্দেহ নেই যে এটা ছিল বাহিরের মুখোশ। এই প্রাণবন্ত, প্রকৃতিদত্ত সদাচঞ্চলা, আনন্দে হাসিতে যে কোন মুহূর্তে কারণে অকারণে শতধা হয়ে ফেটে যাওয়া যার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য, তার চতুর্দিকে বিধিনিষেধের কাঁটার জাল! ম্যুনিকের মত স্বাধীন শহরে—যেখানে নর-নারী কি রকম অবাধে মেলামেশা করে সেটা এদেশে বসে কল্পনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব—গেলী কারও সঙ্গে কথা কইতে পারবে না মামার অজান্তে, কারও সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে পারবে না মামার পরিষ্কার অনুমতি ভিন্ন, এমন কি ঐ বয়সের আর পাঁচটা মেয়ে যে সামাজিকতা করে থাকে, লোকাচারসম্মত ভদ্রতা-সৌজন্য করে পাঁচজনের সাহচর্য সঙ্গসুখ পায়—এর কোন একটা সে করতে পারে না, মামাকে না জানিয়ে, মামার অনুমতি ছাড়া।

সেই 'ডালকুত্তা' শব্দটা হফ্‌মান তিক্ততার সঙ্গে নিজেই ব্যবহার করেছেন—দুটিকে নিয়ে ডান্‌সে যাওয়ার ফার্সের পরের দিন হফ্‌মান আর সহ্য না করতে পেরে হিটলারকে বললেন, 'আপনি গেলীর চতুর্দিকে যে পাঁচিল খাড়া করে তুলেছেন তার ভিতর মেয়েটার যে দম বন্ধ হয়ে আসছে। যে নাচে কাল রাত্রে তার ফুর্তি করার কথা ছিল, সেটা শুধু তার অবরুদ্ধ জীবনের তিক্ততা তিক্ততর করে তুলেছিল।'

হিটলার উত্তরে বললেন, 'আপনি জানেন, হফ্‌মান, গেলীর ভবিষ্যৎ আমার কাছে এমনই প্রিয়, এমনই মূল্যবান যে তাকে সর্বক্ষণ চোখে চোখে রাখা আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করি। এ-কথা খুবই সত্য আমি গেলীকে ভালোবাসি এবং আমি তাকে বিয়েও করতে পারি, কিন্তু বিয়ে করা সম্বন্ধে আমার মতামত কি আপনি ভালো করেই জানেন, এবং আমি যে কদাপি বিয়ে করবো না বলে দৃঢ় সিদ্ধান্ত করেছি সে-কথাও আপনি জানেন। তাই আমি এটাকে আপন ন্যায়সম্মত অধিকার বলে ধরে নিয়েছি যে যতদিন না গেলীর উপযুক্ত বর এসে উদয় হয় ততদিন পর্যন্ত সে যার সঙ্গে পরিচয় করতে চায় এবং

www.BanglaBook.org

যারা তার পরিচিত তাদের উপর কড়া নজর রাখা। আজ গেলী যেটাকে বন্ধন বলে মনে করছে সেটা প্রকৃতপক্ষে বিচক্ষণ আত্মজনের সুচিন্তিত সতর্কতা। আমি মনে মনে দৃঢ়তম সংকল্প করেছি গেলী যেন জোচ্চোরের হাতে না পড়ে বা এমন লোকের পাল্লায় না পড়ে যে গেলীকে দিয়ে আপন ভবিষ্যৎ গুছিয়ে নেবার অ্যাড্‌ভেঞ্চারের তালে আছে।'

হফ্‌মান এস্থলে যোগ দিচ্ছেন, হিটলার অবশ্য জানতেন না গেলী গোপনে গোপনে ভিয়েনাবাসী এক তরুণকে মনপ্রাণ দিয়ে গভীর ভালোবাসে।

হিটলার গিয়েছিলেন ম্যুনিকের বাইরে—গেলীকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মায়ের কাছে—আবার যাবেন দূর হামবুর্গে, মাঝপথে কয়েক ঘণ্টার জন্য ম্যুনিকে থামবেন এবং গেলীকে গ্রাম থেকে আনিয়েছেন। হামবুর্গের দীর্ঘ সফরে সহযাত্রী হওয়ার জন্য তিনি পূর্বেই হফ্‌মানকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এস্থলে হফ্‌মানের বিবরণী মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর (অর্থাৎ ম্যুনিক সমাজে হিটলার গেলীকে পরিচয় করিয়ে দেবার চার বৎসর পর—কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গেলীকে ম্যুনিক সমাজে উপস্থিত করেন, তাহলে হবে সাত বৎসর পর, কিন্তু এ বাবদে আমি হফ্‌মানকেই বিশ্বাস করি, এবং এসব ঐতিহাসিকদের বই বেরিয়েছে হফ্‌মানের বই বেরুবার পূর্বেই) হফ্‌মান এলেন হিটলারের বাড়িতে। গেলী মায়েরই মতো ভালো ঘরকন্না করতে জানত, তাই সে তখন হিটলারের স্যুটকেস গুছিয়ে দিচ্ছে। হিটলার সখাসহ যখন সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নামছেন, তখন উপরের তলার রেলিঙের উপর ভর করে, নিচের দিকে ঝুঁকে গেলী বলতে লাগল, 'ও রেভোয়া মামা অ্যাডল্‌ফ, ও রেভোয়া, হ্যার হফ্‌মান!' হিটলার দাঁড়ালেন, তারপর উপরের দিকে তাকিয়ে আবার সিঁড়ি বেয়ে দোতলার দিকে চললেন। হফ্‌মান বাইরে এসে পেভমেন্টে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

হিটলার এলে পরে মোটরে উঠে দুজনা চললেন উত্তর দিকে ন্যুর্‌ন্‌বের্গ পানে। শহর থেকে বেরুবার সময় হিটলার বন্ধু হফ্‌মানকে বললেন, 'কেন জানি নে আমার মনটা যেন অস্বস্তিতে ভরে উঠেছে।'

হফ্‌মান বিবেচক লোক। তিনি নিজেই ঠাট্টা করে বলেছেন, 'অনেকেই আমাকে আড়ালে হিটলারের কোর্টজেস্টার (গোপালভাঁড়) বলত, এবং হয়তো সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়।' তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'এ সময়কার দখিনা ''ফ্যোন'' বাতাসটা সকলেরই বুকের উপর চেপে বসে সবাইকে মনমরা করে দেয়।' কিন্তু হিটলার চুপ করে রইলেন, এবং দীর্ঘ ন্যুর্‌ন্‌বর্গের রাস্তা ড্রাইভ করার পর সেখানকার পার্টি-মেম্বারদের প্যারা হোটেলে উঠলেন।

পরের দিন ন্যুর্‌ন্‌বের্গ শহর ছেড়ে যখন তাঁরা বায়রট্‌ শহরের দিকে এগুচ্ছেন তখন হিটলার ড্রাইভিং সীটের সামনের ছোট্ট আয়নাটিতে লক্ষ্য করলেন, আরেকখানা মোটর দ্রুততর বেগে ক্রমশই তাঁদের গাড়ির কাছে এগিয়ে আসছে। নিরাপত্তার জন্য হিটলারের হুকুম ছিল কোনও গাড়ি যেন তাঁর গাড়ি ওভারটেক না করতে পায়, কারণ ঐ সময় দুটো গাড়িই কিছুক্ষণ পাশাপাশি চলে বলে অন্য গাড়ি থেকে হিটলারের উপর গুলি চালানো কঠিন নয়। হিটলার সোফার শ্রেক্‌কে সেই আদেশ দিতে যাচ্ছেন সেই সময় তিনি লক্ষ্য করলেন, যে-গাড়ি পশ্চাদ্ধাবন করছে সেটা ট্যাক্সি এবং ড্রাইভারের পাশে হোটেলের

www.BanglaBook.org

উর্দিপরা একটি ছোকরা ক্ষিপ্তের ন্যায় দু হাত নাড়িয়ে তাঁদের থামবার জন্য সঙ্কেত করছে। শ্রেক্ গাড়ি দাঁড় করালে ছেলেটি উত্তেজনায় হাঁফাতে হাঁফাতে বললে, 'হ্যার হেস (ইনি তখন এবং ১৯৪১-এ যখন অ্যারোপ্লেনে করে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে লন্ডন যান তখনও হিটলারের পরেই তাঁর স্থান ছিল) ম্যুনিক থেকে ট্রাঙ্ককল করে অত্যন্ত জরুরী বিষয় নিয়ে হিটলারের সঙ্গে কথা বলতে চান। তিনি ফোনে না পৌঁছনো পর্যন্ত হেস লাইন ছাড়বেন না।' দুই বন্ধু মোটর ঘুরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে চললেন ন্যুরন্‌বের্গ পানে।

গাড়ি ভাল করে থামতে না থামতেই হিটলার লাফ দিয়ে মোটর থেকে বেরিয়ে ছুটে ঢুকলেন হোটেলের ভিতর এবং তারপর টেলিফোনের বাক্সে (বুথে)—বুথের দরজা পর্যন্ত তিনি বন্ধ করেননি। পিছনে পিছনে ছুটে এসেছেন হফ্‌মান এবং টেলিফোন বুথের দরজা খোলা বলে হিটলারের প্রত্যেকটি শব্দ শুনতে পেলেন।

'এখানে হিটলার—কি হয়েছে?' উত্তেজনায় হিটলারের গলা খসখসে কর্কশ হয়ে গিয়েছে। 'হে ভগবান! এ কী ভয়ঙ্কর!' অপর প্রান্ত থেকে কি একটা খবর শুনে তিনি চিৎকার করে উঠলেন, এবং তাঁর কণ্ঠস্বরে পরিপূর্ণ হতাশা। তারপর দৃঢ়তর কণ্ঠে বলতে লাগলেন, এবং সে কণ্ঠস্বর শেষটায় প্রায় চিৎকারের পর্যায়ে পৌঁছল, 'হেস! আমাকে উত্তর দাও—হাঁ কিংবা না—মেয়েটা এখনও বেঁচে আছে তো?...হেস, তুমি অফিসার, সেই অফিসারের নামে দিব্যি দিচ্ছি—আমাকে সত্য করে বলো—মেয়েটা বেঁচে আছে, না মরে গেছে?...হেস! ...হেস!' এবারে হিটলার তীব্রতম কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন। মনে হল তিনি অপর প্রান্ত থেকে কোনও সাড়া পাচ্ছেন না। হয় লাইন কেটে গেছে, নয় হেস উত্তর দেবার দুর্বিপাক এড়াবার জন্য রিসীভার হুকে রেখে দিয়েছেন। হিটলার টেলিফোন বুথ থেকে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এলেন, তাঁর চুল নেমে এসে কপাল ঢেকে ফেলেছে (এ কথাটা তাঁর খাস চাকর লিঙে একাধিকবার বলেছে যে, হিটলার তাঁর মাথার চুল কিছুতেই বাগে রাখতে পারতেন না—অল্পেতেই সেটা কপাল ঢেকে ফেলত), তাঁর চাউনি ছন্নের মত, তাঁর চোখ দুটো যে উজ্জ্বল হয়ে ঝকঝক করছে সেটা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক।

শ্রেকের দিকে মুখ করে বললেন, 'গেলীর কি যেন একটা কি ঘটেছে। আমরা ম্যুনিক ফিরে যাচ্ছি। গাড়ির যা জোর আছে তার শেষ আউন্‌স্ পর্যন্ত কাজে লাগাও। গেলীকে জীবিত অবস্থায় আবার আমাকে দেখতেই হবে।'

'টেলিফোনের বুথ থেকে ছেঁড়া ছেঁড়া টুকরো টুকরো যে সব কথা ভেসে এসেছিল তার থেকে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলুম, গেলীর কিছু একটা হয়েছে, কিন্তু ঠিক ঠিক কি সেটা বুঝতে পারিনি, এবং হিটলারকে জিজ্ঞেস করার মত সাহসও আমার ছিল না।'—বলছেন স্বয়ং হফ্‌মান।

হিটলারের উন্মাদ উত্তেজনা যেন সংক্রামক। শ্রেক্ চেপে ধরেছে অ্যাকসিলারেটর। মোটরের মেঝে পর্যন্ত তার গাড়ি তীব্র আর্তনাদ করে ছুটে চলেছে ম্যুনিকের দিকে। হফ্‌মান মাঝে মাঝে মোটরের ছোট্ট আর্শিতে দেখছেন হিটলারের চেহারা—ঠোঁট দুটো চেপে তিনি উইন্ডস্ক্রীনের ভিতর দিয়ে সম্মুখপানে তাকিয়েও যেন কিছু দেখছেন না। আমাদের মধ্যে একটি মাত্র বাক্য বিনিময় হল না—কে যার বিমর্ষ চিন্তা নিয়ে ডুবে আছে আপন মনের গহনে।

অবশেষে আমরা তাঁর বাড়িতে পৌঁছলুম এবং সেই ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ জানতে পেলুম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চব্বিশ ঘণ্টা আগে গেলী মারা গিয়েছে। সে তার মামার অস্ত্রভাণ্ডার থেকে একটি ৬.৩৫ পিস্তল নিয়ে হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি জায়গায় গুলি করেছে। ডাক্তারের মতে যদি সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা হত তবে হয়তো তাকে বাঁচানো অসম্ভব হত না। কিন্তু সে দরজা বন্ধ করে গুলি ছুঁড়েছিল, কেউ সে শব্দ শুনতে পায়নি এবং ধীরে ধীরে রক্তক্ষরণে সে ইহলোক ত্যাগ করেছে।

ইতিমধ্যে পোস্টমর্টেম, করোনারের তদন্ত সব কিছু হয়ে গিয়েছে এবং পুলিস মৃতদেহ ফেরত দিয়েছে। ডাক্তারের রিপোর্ট থেকে বোঝা গেল, হিটলারের বিদায়ের অল্প পরেই গেলী আত্মহত্যা করে। সে দেহ এখন আনুষ্ঠানিক ভাবে সুসজ্জিত করে কবরস্থানে রাখা হয়েছে—তিন দিন পর গোর হবে—এ সময় আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব মৃতকে শেষবারের মত দেখে নেন এবং আত্মার সদ্গতির জন্য আপন আপন প্রার্থনা জানান।

গেলীর মা ইতিমধ্যে বের্ষটেশগাডেন থেকে এসে গেছেন। পার্টির মুরুব্বীদের একাধিকজন ও হিটলার-ভবনের বন্ধু প্রাচীন দিনের 'গৃহরক্ষিণী' ফ্রাউ ভিন্‌টারও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। গেলীর মা নির্বাক অশ্রুধারে সিক্ত হচ্ছিলেন।

* * *

'গৃহরক্ষিণী' ফ্রাউ ভিন্‌টার যা বললেন তার সারমর্ম এই, হিটলার বাড়ি ছাড়ার পূর্বে সিঁড়ি দিয়ে আব্বুর দোতলায় উঠেছিলেন—এর বর্ণনা আমরা হফ্‌মান মারফৎ আগেই দিয়েছি—গেলীকে আরেকটু আদর করার জন্য, কারণ তিনি সেদিন ম্যুনিক ফিরেছিলেন এবং সেদিনই আবার ন্যুরন্‌বের্গ হয়ে হামবুর্গ চলে যাচ্ছিলেন বলে গেলীর প্রতি যথেষ্ট যত্নবান হতে পারেননি। সেই অনিচ্ছাকৃত অবহেলাটা যেন খানিকটা দূর করার জন্য তিনি উঠে গেলীর গালের উপর হাত দিয়ে আদর করতে করতে কানে কানে সোহাগের কথা কইছিলেন কিন্তু গেলী যেন কোনও সান্ত্বনা মানতে চায়নি, তার রাগও পড়েনি।

দুজনার চলে যাওয়ার পর গেলী ফ্রাউ ভিন্‌টারকে বলে, 'সত্যি বলছি, আমার ও মামার মধ্যে কোনও জায়গায় মিল নেই (নাথিং ইন্ কমন্)।'

ফ্রাউ ভিন্‌টার কিন্তু এ-কথা বললেন না, হফ্‌মানও নীরব, যে সেদিনই হিটলারে গেলীতে তুমুল কথা-কাটাকাটি হয়, এবং সেপ্টেম্বর মাসে অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত না হলে—এবং সেদিন আদৌ হয়নি—অনেকেরই জানলা খোলা থাকে বলে একাধিক প্রতিবেশী সে কলহের উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনতে পান। শাইবার প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা বলেন (Shirar : The Rise & Fall of the Third Reich; Aufstieg und Fall des dritten Reiches 1960/61) যে, গেলী ভিয়েনা গিয়ে গলা সাধবার জন্য আবার অনুমতি চাইছিল, এবং হিটলার পূর্বের ন্যায় কণ্ঠে অসম্মতি জানাচ্ছিলেন।

এই ব্যথাটা অস্বাভাবিক অপ্রত্যাশিত নয়, কারণ গেলীর মৃত্যুর পর তার ঘরে ভিয়েনার গুরুর উদ্দেশে তার লেখা একখানা অর্ধসমাপ্ত চিঠি পাওয়া যায়। যেটাতে সে গুরুকে জানাচ্ছে, সে আবার ভিয়েনায় এসে তাঁর কাছে কণ্ঠসঙ্গীত শিখতে চায়।

ফ্রাউ ভিন্‌টার আরও বললেন যে, মিত্রসহ হিটলার চলে যাওয়ার পর গেলী তাঁকে বলে যে সে এক বন্ধুর (বা বান্ধবীর) সঙ্গে সিনেমায় যাচ্ছে, এবং তার জন্য যেন রাত্রের কোনও খাবার তৈরী করা না হয়। সে রাত্রে তিনি তাই গেলীকে আবার দেখতে না পেয়ে বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা করেননি। গেলী ব্রেকফাস্ট খেত ভোরেই, এবং সে যখন তার অভ্যাসমত

www.BanglaBook.org

ঐ সময়ে ব্রেকফাস্ট করতে এল না, তখন ফ্রাউ ভিন্‌টার তার ঘরে গিয়ে টোকা দিলেন। কোনও উত্তর না পেয়ে তিনি চাবির ফুটো দিয়ে ভিতরের দিকে তাকাবার চেষ্টা দিলেন, কিন্তু চাবি ফুটোতে লাগানো এবং ঘর ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে তিনি তাঁর স্বামীকে ডাকেন। তিনি দরজা ভেঙে যখন ভিতরে ঢুকলেন, তখন সম্মুখে ভয়ানক দৃশ্য। গেলী এক ডোবা রক্তে পড়ে শুয়ে আছে, তার পিস্তলটা সোফার এক কোণে। ফ্রাউ ভিনটার তৎক্ষণাৎ গেলীর মাকে খবর দেন, এবং হেস্ ও পার্টির কোষাধ্যক্ষ শ্বার্ৎসকে জানান।

অনেকেই এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু হফ্‌মানের আত্মচিন্তা এস্থলে বিশেষ মূল্য ধরে। তিনি বলেছেন, 'হিটলার কি গেলীর আত্মহত্যার প্রকৃত কারণ জানতেন? তিনি যে শহর ছাড়ার সময় বলেছিলেন, "কেন জানি নে, আমার মনটা যেন অস্বস্তিতে ভরে উঠছে" সেটা কি ইন্দ্রিয়াতীত কোনও অনুভূতিসঞ্জাত অস্বস্তিবোধ, অথবা কি গেলীর কাছ থেকে শেষ বিদায় নেবার সময় এমন কিছু একটা ছিল যেটা তাঁর দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল?'

তার চেয়ে যে জিনিস হফ্‌মানের কাছে একেবারেই দুর্বোধ্য ঠেকেছিল সেটা এই : ফ্রাউ ভিন্‌টার বলেন, হিটলার এবং তিনি চলে যাওয়ার পর গেলী অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে নুয়ে পড়ে। এ তথ্যটা বুঝতে তাঁর কোনও অসুবিধা হল না, কিন্তু তারপর ফ্রাউ ভিন্‌টার যা বললেন সেটা তাঁর বিচার-বিবেচনাকে দিল একদম ঘুলিয়ে। ফ্রাউ ভিন্‌টার বার বার জোর দিয়ে বললেন, 'গেলী, হিটলার—একমাত্র হিটলারকেই ভালোবাসতো; বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা, গেলীর বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকিটাকি মন্তব্য ফ্রাউ ভিন্‌টারকে দৃঢ়নিশ্চয় করেছিল হিটলারকেই গেলী ভালবাসে। হফ্‌মান বলছেন, 'কিন্তু আমার যতদূর জানা এবং ভালো করেই জানা—গেলী ভালোবাসতো অন্য একজনকে।'

এর সঙ্গে তাহলে আরেকটি তথ্য জুড়তে হয়, হফ্‌মানের ফোটো কর্মশালায় তার কিছুদিন পূর্বে হিটলার শ্রীমতী এফা ব্রাউনের সঙ্গে পরিচিত হন[১], যে এফাকে তিনি মৃত্যুর অল্প পূর্বে বিয়ে করেন, এবং হফ্‌মানের মতে তাঁদের বন্ধুত্ব নিবিড়তর হয় বেশ কিছুকাল পরে এবং গেলী মামাকে লেখা এফার একখানা চিঠি দৈবযোগে মামার কোটের পকেটে পেয়ে যায়। তাহলে বলতে হবে, ফ্রাউ ভিন্‌টারের রহস্য সমাধান হয়তো সম্পূর্ণ ভুল নাও হতে পারে।

একটা কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। যদিও সেটা পরের এবং অনেক দিন ধরে চলছিল। গেলীর মা এমনিতেই এফা ব্রাউনকে পছন্দ করতেন না, এবং গেলীর মৃত্যুর পর সে অপছন্দটা পরিপূর্ণ ঘৃণায় গিয়ে পৌঁছল। হফ্‌মান এবং অন্যান্যরা তাঁকে যতই বোঝাবার চেষ্টা করতেন তিনি ততই অকুণ্ঠ ভাষায় জোর দিয়ে বলতেন, তাঁর মনে কণামাত্র দ্বিধা নেই সে, তাঁর মেয়ে হিটলারকেই ভালবাসতো এবং ঐ এফা ব্রাউনের অস্তিত্ব ও হিটলারের উপর তার প্রভাব গেলীকে গভীরতর নৈরাশ্যে নিমজ্জিত করে দেয়,

BanglaBook.org

১ শাইরার বলেন, হিটলার ও ব্রাউনের পরিচয় হয় গেলীর মৃত্যুর এক বা দুই বৎসর পরে। কিন্তু এ বিষয়ে হফ্‌মানের বক্তব্যই অধিকতর বিশ্বাস্য।

www.BanglaBook.org

এবং এইটেই গেলীর অকাল মৃত্যুর অন্যতম প্রধানতম কারণ।

* * *

এদেশের জোরালো গোটা দু-তিন দল তাদের বেপরোয়া আপন আপন দৈনিক নেই বলে বহু কেলেঙ্কারি-কেচ্ছা অনায়াসে চাপা পড়ে। ইয়োরোপের অধিকাংশ দেশে অবস্থাটা ভিন্ন প্রকারের। বিশেষত ভাইমার রিপাবলিক যুগে—এই খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দশকে, হিটলার চ্যানসেলার না হওয়া পর্যন্ত (১৯৩৩) জর্মনিক খবরের কাগজে কাগজে নরক ছিল গুলজার, বিশেষত জর্মনরা যখন ইংরিজী খবরওলাদের 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই' 'থীভ্‌স্ এগ্রীমেন্টে' আদৌ বিশ্বাস করে না। তাই ম্যুনিকের খবরের কাগজগুলোর অস্বাভাবিক মৃত্যু যেন মৌচাকের উপর ঢিলের মত হয়ে এসে পড়ল। আর কাফে কাফে বারেতে বারেতে গুজোবগুঞ্জরণের তো কথাই নেই। এমন কি নাৎসি পার্টির ভিতরও নানা মুনি নানা মত দিতে লাগলেন। যারা সরাসরি দুশমন তাদের একদল বেশ জোর গলায় বললে, 'নাৎসি পার্টি তার প্রভাব ও ক্ষমতা প্রয়োগ করে অটপসি আদৌ করাতে দেয়নি, কারোনারের সামনে যাকিছু ঘটেছে তার সমস্তটাই আগাগোড়া থাড্ডো কেলাসী থিয়েডারের ফার্স,' এবং এক দল বললে, 'তাই হবে, কারণ এটা আত্মহত্যা নয়, আসলে খুন, এবং খুনী স্বয়ং হিটলার। তিনি হামবুর্গ পানে রওয়ানা হয়েছিলেন সত্য কিন্তু সেটা ছিল ফাঁদ পাতার মত। সন্ধ্যার সময় ফের বাড়ি ফিরে আসেন, এবং গেলীকে অন্য পুরুষের সঙ্গে এমন অবস্থায় পান যে তখন হিটলারের মত হিংস্র প্রাণীর মাথায় যে খুন চাপবে তাতে আর বিচিত্র কি?' অন্য দলের বক্তব্য, 'না, পরপুরুষ ছিল না, শুধু গেলীর ভিয়েনা যাওয়ার ইচ্ছে নিয়ে কথা-কাটাকাটি এমনই চরমে পৌঁছয় যে হিটলার আত্মকর্তৃত্ব সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেন এবং উন্মাদাবস্থায় গেলীকে খুন করেন।' আবার কেউ কেউ বললেন, 'না, খুন করেছেন হিমলার। পার্টির মুরুব্বীরা যখন দেখলেন যে হিটলারের খোলাখুলি বেলেল্লাপনার ঠেলায় পার্টির ইজ্জৎ যায়-যায় (যদিও আমি যতদূর জানি জনসমাজে গেলীর সঙ্গে হিটলারের আচরণ ছিল ভদ্র, সংযত, ইংরিজিতে যাকে বলে 'করেক্‌ট্'; অন্যপক্ষের বক্তব্য আমরা যদি মিনিমাম্‌টাও নিই সেটাও যথেষ্ট খারাপ, কারণ এ-কথা তো আর মিথ্যে নয় যে, 'তুমি মেয়েটাকে ভালোবাসো এবং তাকে নিয়ে একই বাড়িতে বাস করো, আর তার মাকে রেখেছ দূরে গাঁয়ের বাড়িতে যখন তুমি তাঁকেও অনায়াসে এখানেই রাখতে পারতে—'), ওদিকে হিটলার ছাড়া যে পার্টি দুদিনেই কাত হয়ে যাবে সেটাও অবিসংবাদিত সত্য, তখন তাঁরা পার্টি বাঁচাবার জন্য হিমলারের উপর গেলীকে সরাবার ভার দিলেন। কর্মটি করেছেন হয় স্বয়ং তিনি বা তাঁর কোনও গুণ্ডাকে দিয়ে (পার্টিতে যে গুণ্ডার অভাব ছিল না সে তথ্যটি সবাই জানতেন, এবং না থাকলে নাৎসি পার্টি যে রাস্তায় কম্যুনিস্টদের ঠেলায় একদিনও টিকতে পারতো না সেটা আরও সত্য)। ইত্যাকার নানাপ্রকারের গুজোবে তখন জর্মনি মুখর হচ্ছে, কারণ গেলীর মৃত্যুর পূর্বেই নাৎসি পার্টি এমনই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে রাস্তার উপর কারণে অকারণে যাকে তাকে চ্যালেঞ্জ করে, এবং কম্যুনিস্টদের কাউকে একা পেলে তাকে পেটাতেও কসুর করে না; প্রতিদিন আবার কানে আসছে, এই বুঝি প্রেসিডেন্ট হিন্ডেনবুর্গ নাৎসি নেতা হিটলারকে ডেকে পাঠাবেন, হয় আপন মন্ত্রিসভা গড়ে প্রধানমন্ত্রী—চ্যানসেলর হতে,

www.BanglaBook.org

কিংবা কোয়ালিশন সরকার নির্মাণ করতে।

আমি তখন ম্যুনিকে বাস করলেও জর্মনিতে এবং প্রতিদিন লাঞ্চ-টেবিলে বন্ধুদের আলোচনা, কথা-কাটাকাটি শ্রবণই ছিল আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমাদের রীডিং রুম ম্যুনিক তথা জর্মনির সব বড় বড় শহরের প্রধান প্রধান খবরের কাগজ রাখতো, তদুপরি আমাদের কেউ না কেউ ম্যুনিক আসা-যাওয়া করছে, আর একজন তো খাস ম্যুনিকবাসী —সে শহরের বিরাট ম্যাপ খুলে হিটলারের বাড়ি, তিনি যে যে কাফেতে যান, সবগুলো পিন্ ডাউন করতে পারতো! কাজেই আমাদের লাঞ্চ-টেবিলে গুজবেরও অনটন ছিল না। কিন্তু এটাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যে এতদিন পরে আজ আমি তার অধিকাংশই ভুলে গিয়েছি। তবে ঘটনার প্রায় কুড়ি বৎসর পর থেকে যখন হিটলার সম্বন্ধে নানাপ্রকার পুস্তক বেরুতে আরম্ভ করলো (গেলী আত্মহত্যা করে ১৯৩১-এ; হিন্ডেনবুর্গ হিটলারকে ডেকে পাঠান তার তিন সপ্তাহ পরে এবং আলাপচারী যে নিষ্ফল হয় তার একমাত্র কারণস্বরূপ নাৎসিরা বলেন, হিটলার গেলীর মৃত্যুশোক তখনও সম্পূর্ণ সামলে উঠতে পারেননি বলে সমস্ত চিন্তাশক্তি একাগ্রচিত্তে ব্যবহার করতে পারেননি—ঘন ঘন আনমনা হচ্ছিলেন; ১৯৩৩-এর জানুয়ারি মাসে হিটলার চ্যানসেলর হন, ১৯৩৯-এ তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ করেন, ৩০ এপ্রিল ১৯৪৫-এ তিনি আত্মহত্যা করেন; ইংরিজিতে প্রচলিত এ্যালন বুলক লিখিত ঐ ভাষায় হিটলারের 'স্ট্যান্ডার্ড' জীবনী বেরোয় ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে, হফ্‌মানের ১৯৫৪/৫৫ খ্রীষ্টাব্দে, এবং অধুনা ১৯৬১—প্রকাশিত শাইরারের ১১৭৪ পৃষ্ঠার যে বিরাট বই বাজারে নাম করেছে তাতে কোনও মৌলিকতা নেই এবং আমার মনে হয় তিনি হফ্‌মানের বইখানা হয় পড়েননি, নয় একপেশে বলে খারিজ করেছেন। বলা বাহুল্য বুলক, শাইরার এবং শতকরা ৯০ খানা বই রাজনৈতিক তথা যুদ্ধবিদ্ হিটলারকে নিয়ে আলোচনা করে বলে তার মধ্যে প্রেম অল্প স্থানই পায়, এবং তারও অধিকাংশ পান এফা ব্রাউন, গেলী সত্যিই এখনও 'কাব্যের উপেক্ষিতা'!) তখন দেখে বড় আশ্চর্য বোধ হল যে তখনকার দিনে যেসব গুজোব আমরা স্রেফ গাঁজা বলে উড়িয়ে দিয়েছিলুম তার অনেকগুলোই এসব পুস্তকে রীতিমতো সম্মানের আসন পেয়েছে, এবং যেগুলোকে আমরা সত্য বা সত্যের নিকটতম বলে স্বীকার করে নিয়েছিলুম সেগুলোর উল্লেখ পর্যন্ত নেই!

অবশ্য এ-কথা উঠতে পারে যে, হফ্‌মানের মতে হিটলার গেলীর আত্মহত্যার জন্য নিতান্ত পরোক্ষভাবে দায়ী, আদৌ যদি তাকে দায়ী করা হয়, তিনি গেলীকে কড়া শাসনে রাখতেন (হিটলারের সাফাই 'আজ গেলী যেটাকে বন্ধন বলে মনে করছে সেটা বিচক্ষণ আত্মজনের সুচিন্তিত সতর্কতা') আবার ওদিকে বলেছেন, 'গেলী ছিল হিস্টিরিয়াগ্রস্ত, সদাই আত্মহত্যার জন্য মুখিয়ে থাকা টাইপের একদম খাঁটি উদাহরণ। তার প্রকৃতি ছিল বেপরোয়া, জীবনের মুখোমুখি হত সে প্রতিদিন নিত্য নূতন সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে—এসব ভাবলে তো কিছুতেই বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না যে সে আপন জীবন আপন হাতে নিতে নিজেকে বাধ্য অনুভব করলো।'

হফ্‌মান কৃত তাঁর সখা হিটলারের জীবনী হয়তো অনেকেই সন্দেহের চোখে দেখবেন, ভাববেন, রাজনৈতিক এবং গ্যাস-চেম্বারের প্রবর্তন ও সফলীকরণ-কর্তা হিটলারকে তিনি

www.BanglaBook.org

সমর্থন করতে না পেরে—অবশ্য এটা সবাই স্বীকার করেছেন যে আর্ট ভিন্ন অন্য কোনও বিষয় নিয়ে তিনি অতি দৈবেসৈবে হিটলারের সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং আরও সত্য যে হিটলার, বিশেষ করে গ্যোবলসের শত চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি ডাঙরতম সরকারী চাকরি বা পার্টিতে কোনও গণ্যমান্য আসন নিতে নারাজের চেয়ে নারাজ সম্পূর্ণ নারাজ ছিলেন, অতএব রাজনৈতিক হিটলারকে দোষী বা নির্দোষী প্রমাণ করার হাত থেকে তিনি (সানন্দে) অব্যাহিত পেয়েছেন—তিনি 'মানুষ হিটলার'কে অযথা অপবাদ থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এ-নেমকহালালী প্রশংসনীয়, কিন্তু সে কর্ম করতে গিয়ে তিনি কতখানি সত্যবাচন করেছেন সেটা অনেকের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করবে।

আমি তাঁকে মোটামুটি বিশ্বাস করেছি, এবং দৈনন্দিন জীবনে হিটলার যেখানে 'ছোট লোক' সেখানে পুৎসি হান্‌ফ্‌স্টোভেলের—হিটলারের বিরুদ্ধে তাঁর বহুস্থলে অহেতুক বিষোদ্‌গার সত্ত্বেও—অনেক কথা মেনে নিয়েছি।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে আমার মনে হয়েছিল এবং এখনও মনে হয়, হিটলার জানতেন এবং ভাল করেই জানতেন যে গেলী ভিয়েনার এক আর্টিস্টকে গভীরভাবে ভালোবাসতো (আমার মনে হয় হফ্‌মান যে বলছেন, হিটলার সে খবরটি জানতেন না, এটা তাঁর ভুল এবং গেলীর ভিয়েনা যাবার জন্য উৎসাহ এবং মামাকে পীড়াপীড়ি সেখানে যাবার অনুমতির জন্য)। এ বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই যে গেলী বরাবরই ম্যুনিকের রাজসিক বাসভবন, অতি সাধারণ মেয়ের জন্য সমাজে সর্বোচ্চ আসন, ম্যুনিকের সর্বজন সম্মানিত মামার 'গরবে গরবিনী' হওয়া, সেই গ্রেট মামার প্রেমনিবেদন তারই পদপ্রান্তে, সে মামা আবার তার কথায় কথায় ওঠ-বস করেন, সর্বোত্তম থিয়েটার অপেরায় সর্বশ্রেষ্ঠ আসনাধিকার, এক কথায় বলতে গেলে ম্যুনিকের মত সুখৈশ্বর্য, সর্বপ্রকারের বিলাস, চিত্তহারিণী আমোদ-প্রমোদ দিতে সক্ষম—এসব ছেড়ে ভিয়েনাতে তাকে থাকতে হত সাধারণ—অবশ্য অপেক্ষাকৃত বিত্তশালিনী—ছাত্রীর মত। এ দুয়ের আশমান জমীন ফারাক। শুধু সঙ্গীতে পারদর্শিনী হওয়ার জন্য এত বড় সুখসম্মান বিসর্জন? আমার বিশ্বাস হয় না। পুৎসি যখন কটুবাক্য ব্যবহার করে বলেন, 'মেয়েটা পয়লা নম্বরের স্ফূর্তিবাজ ফ্লার্ট, কণ্ঠসঙ্গীত উচ্চতম পদ্ধতিতে আয়ত্ত করতে হলে যে অধ্যবসায় ও ফূর্তিফার্তি বিসর্জন অবশ্য প্রয়োজনীয় সে-দুটো গেলীর ছিল কোথায়?' তখন আমার মনে হয় গেলীর মন পড়ে থাকতো ভিয়েনায়, যেখানে সে অধ্যবসায়ের সঙ্গে রেওয়াজ করবে ও সন্ধ্যায় পাবে তার আর্টিস্ট দয়িতের কাছে অনুপ্রেরণা, যদি সেখানে দৈন্যেও বাস করতে হয়, সেটা সে ভাগাভাগি করবে তারই সঙ্গে; তার তুলনায় ম্যুনিকে মামার সঙ্গে বাস করে, মনে মনে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ থেকে উৎকৃষ্টতম বিলাসভোগ শতগুণে নিকৃষ্ট। ভিয়েনার ছাত্রজীবনের স্বাধীনতা, তরুণ-তরুণীর সঙ্গে সম্মিলিত আনন্দোল্লাস নিশ্চয়ই ম্যুনিকের বন্দীশালা এবং প্রতি সন্ধ্যায় কাফেতে মামা এবং তার বুড়োহাবড়া ভারিক্কি-ভারিক্কি রাজনৈতিক পার্টি-মেম্বারদের সঙ্গে বসে প্রসন্নতা এমন কি উল্লাসের ভান করার চেয়ে শতগুণে শ্রেয়, কিন্তু সেইটেই তত্ত্বকথা নয়—তত্ত্বকথা ঐ দয়িতের সঙ্গ-সুখ। সঙ্গীতই যদি বড় কথা হবে তবে ম্যুনিক কি অজ পাড়াগাঁ? ম্যুনিকে ঠিক সে সময়ে হয়তো কোনও 'মেস্ত্রো' 'ওস্তাদের ওস্তাদ' ছিলেন না, কিন্তু গেলী যে ভিয়েনাতে কোনও মেস্ত্রোর কাছে

www.BanglaBook.org

সঙ্গীতাধ্যয়ন করেছিল এ-কথা তো কেউ বলেনি। না, সঙ্গীত তার শেষ বচসার এবং সবশেষে নিরুপায় হয়ে আত্মহত্যার কারণ নয়।

হফ্‌মান বুঝতে পারেননি, কিংবা বলতে ভুলে গেছেন—সেটা পরবর্তী যুগের সহচরগণ বার বার উল্লেখ করেছেন—হিটলার ঝাণ্ডু ঝাণ্ডু সুপক্কতম রাজনৈতিকদের পেটের কথা টেনে বের করার কৌশলটিতে সুপটু ছিলেন। আর এ তো চিংড়ি ভাগ্‌নি! হয়তো মামা তাঁর প্রেম নিবেদন করার পূর্বেই আবেগ-বিহ্বল তরুণী মামার সহানুভূতি ও আনুকূল্য পাবার আশায় পূর্বাহ্ণেই সব কিছু বলে বসে আছে। কিংবা হয়তো হিটলার যখন লক্ষ্য করলেন, গেলী তাঁর প্রেমের উপযুক্ত প্রতিদান দিচ্ছে না তখন সেটা চেপে দিয়ে আঁকশি চালিয়ে বের করলেন গেলীর পেটের কথা—বরঞ্চ বলা উচিত হৃদয়ের ব্যথা। এবং তারই বা কী প্রয়োজন? সেই ১৯৩১ সালেই তাঁর পার্টির অসংখ্য স্পাই ছিল ভিয়েনায়—যে নগরে তিনি নিজে যৌবনের একাংশ রাস্তায় রাস্তায় স্বহস্তে অঙ্কিত পিকচার পোস্টকার্ড ফেরি করেছেন—নইলে ১৯৩৪-এ, এ ঘটনার মাত্র আড়াই বৎসর পরে তিনি তাঁর পার্টির লোকের দ্বারা ভিয়েনা শহরের জনসমাগমে পরিপূর্ণ দফতরে অস্ট্রিয়ান প্রধানমন্ত্রী ডলফুস্‌কে খুন করলেন কি প্রকারে? এবং তার চার বৎসর পরে একটিমাত্র গুলি না চালিয়ে ভিয়েনা দখল করলেন কি কৌশলে? তার তুলনায় একটি সাদামাটা ছাত্রী ভিয়েনাতে কি ভাবে জীবন-যাপন করেছিল সেটা বের করা তো অতি সহজ। ভিয়েনাতে সে-যুগে বিস্তর প্রাইভেট ডিটেকটিভও ছিল।

আমার মনে হয়—বিশ্বাস করুন আর নাই করুন—বুদ্ধিমতী গেলী তার মামার চরিত্রের একটা দিক আবিষ্কার করতে পেরেছিল তখনই, যেটি বিশ্বমানব আবিষ্কার করে স্তম্ভিত হল পুরো পনেরোটি বৎসর পরে, এবং তাও সম্ভব হত না, যদি যুদ্ধে হিটলার পরাজিত না হতেন এবং ফলে গ্যাসচেম্বার ইত্যাদি আবিষ্কৃত না হত। সে তত্ত্বটি—হিটলার কী অবর্ণনীয় নিষ্ঠুর দানব!—এই তত্ত্বটি গেলী আবিষ্কার করে এক বিভীষিকার সম্মুখীন হল। হিটলার যে কোনও মুহূর্তে, কারও সুখদুঃখের কথা মুহূর্তমাত্র চিন্তা না করে তার দয়িতকে নিষ্ঠুরতম পদ্ধতিতে খুন করাতে পারেন। আজ যদি কেউ বলে, এই ভয় দেখিয়েই ব্ল্যাকমেল করে হিটলার গেলীকে ১৯২৭ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত তাঁর ম্যুনিকের বাড়িতে—আপাতদৃষ্টিতে স্বাধীন কিন্তু বস্তুত পরাধীনের চেয়েও পরাধীন ভাবে—আটকে রেখেছিলেন, তবে সেটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য মনে হবে কেন? এবং হয়তো ঐ চার বৎসর ধরে তাকে বাধ্য হয়ে 'রক্ষিতার লীলাখেলা'ও খেলতে হয়েছিল। হফ্‌মান বলেছেন, গেলীর চরিত্রবল ছিল দৃঢ় এবং সে ছিল 'স্পিরিটেড গার্ল'। ম্যুনিক থেকে অস্ট্রিয়ার পথ কতখানি? আর বের্ষটেশগাডেনের বাড়ি থেকে তো অস্ট্রিয়ান সীমান্ত আরও কাছে। পায়ে হেঁটে ওপারে যাওয়া যায়। বস্তুত হিটলার সেই কারণেই বেছে বেছে ঐ জায়গাটিতেই বাড়ি কিনেছিলেন। এপারে, অর্থাৎ রাজনৈতিক বাতাবরণ বড় গেলী উষ্ণ হয়ে পড়লে, কাউকে না জানিয়ে, বনের ভিতর দিয়ে দিয়ে অক্লেশে ওপারে যেতে পারবেন বলে—অঞ্চলটাও অস্বাভাবিক নির্জন এবং ঐ যুগে পাসপোর্টের কড়াকড়ি তো ছিল না, এসব জায়গায় যারা নিত্য নিত্য ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে এপার-ওপার করতো তাদের তো পাসপোর্ট আদৌ থাকতো না।

www.BanglaBook.org

এমন অবস্থায়ও 'স্পিরিটেড' গেলী গ্রামে থাকাকালীন ওপারে চলে গিয়ে ভিয়েনা যেতে পারলো না?—সেখান থেকে ভিয়েনাও তো রেলে মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ। না, তা নয়। অমতে যাওয়ার মানেই হত, দয়িতের অবশ্য মৃত্যু। এবং পরে সে নিজেও হয়তো কিড্‌ন্যাপ্‌ট্‌ হতে পারতো। তাই সে আপন কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে বলেছিল, হফ্‌মানের স্ত্রীকে : 'Well that's that! And there's nothing you or I can do about it, So let's talk about something else.' এ কথোপকথনের উল্লেখ আমি পূর্বেই করেছি।

হয়তো আমার নিছক কল্পনা। কিন্তু আমার মনে হয় গেলী দিনের পর দিন অভিনয় করে গেছে (যেটা হফ্‌মান ঠিক ধরতে পেরেছিলেন, কিন্তু পুৎসি বুঝতে না পেরে 'ঢলাঢলি' বলেছেন), যদি শেষ পর্যন্ত মামার মন গলানো যায়। যখন দেখল কোনও ভরসাই নেই তখন করেছিল শ্মশান-চিকিৎসা—পুরোপুরি ঝগড়া, যেটা একাধিক প্রতিবেশী শুনতে পেয়েছিল, এবং হয়তো বা—হয়তো বা আত্মহত্যার ভয়ও দেখিয়েছিল এবং হয়তো তার চোখে-মুখে তখন এমন ভাব ফুটে উঠেছিল যে চতুর—শঠ—হিটলার বুঝেছিলেন, এ ভয় দেখানোটা নিতান্ত শূন্যগর্ভ নয়, এটা আর পাঁচটা হিস্টেরিক (এবং হফ্‌মান বলেছেন, গেলী আদপেই হিস্টেরিক ছিল না) মেয়ের মত নিতান্ত অর্থহীন প্রলাপ নয়। তাই বোধ হয় ম্যুনিক শহর থেকে বেরোবার সময় সখাকে বলেছিলেন, "কেন জানি নে আমার মনটা যেন অস্বস্তিতে ভরে উঠেছে, 'I don't know why, but I have a most uneasy feeling' তাই তাঁর পরবর্তী বিষণ্ণতা। পথিমধ্যে টেলিফোনের কথা শুনেই যেন বুঝতে পেরেছিলেন, এ টেলিফোনে থাকবে গেলী সম্বন্ধে দুঃসংবাদ।

এ অনুমান যদি সত্য হয় তবে বলতে হবে গেলী যে ভয় দেখিয়েছিল সেটা শূন্যগর্ভ, ফাঁকা আওয়াজ ছিল না। সে সেটা কাজে পরিণত করেছিল প্রথমতম সুযোগেই।

গেলীর আত্মহত্যায় হিটলারের শোক

হিটলারের চরিত্রবল ছিল অসাধারণ এবং তাঁর ভেঙে পড়াটাও ছিল অসাধারণ। তবে যে দুটো ভেঙে পড়ার কারণ ইতিহাসের জানা আছে, তার শেষটা আত্মহত্যা করার কয়েক দিন আগের থেকে—তাঁর খাসচাকর (ভ্যালে) লিঙে সেটির কিছুটা বর্ণনা দিয়েছেন, এবং আর একটা, গেলীর মৃত্যুর পর। দুটো একই প্রকারের।

প্রথম দুদিনের খবর কেউ ভালো করে লেখেননি, তবে তখনকার দিনের অন্যতম প্রধান নাৎসি নেতা গ্রেগর স্ট্রাসার পরে বলেন যে, এ দুদিন তিনি এক মুহূর্ত হিটলারের সঙ্গ ত্যাগ করেননি, পাশে তিনিও আত্মহত্যা করেন।[১]

BanglaBook.org

১ বোধহয় তারই কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ স্ট্রাসারকে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুন 'জোলাপে'র (এটার উল্লেখ আমরা একাধিকবার করেছি) সময় মেরে ফেলা হয়।

www.BanglaBook.org

এরপর তাঁর সঙ্গে ছিলেন, একমাত্র সাক্ষীরূপে, আমাদের পূর্বপরিচিত হফ্‌মান। এবার তাঁকে অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ ভিন্ন গত্যন্তর নেই। এটা সত্যই ওয়ান ম্যান্‌স্ স্টোরি। তিনি বলছেন, ম্যুনিকে ফেরার পর দুদিন পর্যন্ত হিটলারকে আমি আদৌ দেখতে পাইনি। তাঁর স্বভাব আমি ভালো করেই জানতুম এবং বর্তমান শোচনীয় পরিস্থিতিতে আমি উত্তমরূপেই হৃদয়ঙ্গম করেছিলুম যে, তিনি হয়তো নির্জনে একা একা থাকাটাই বেশী পছন্দ করবেন—আমিও তাই তাঁর পাশ ঘেঁষিনি। তারপর হঠাৎ মাঝরাতে টেলিফোনের ঘণ্টা বাজলো। নিদ্রাজড়িত অবস্থায় আমি গেলুম উত্তর দিতে।

হিটলারের গলা। 'হফ্‌মান, এখনও জেগে আছ কি? কয়েক মিনিটের তরে আমার এখানে আসতে পারো কি?' হিটলারেরই গলা বটে কিন্তু কেমন যেন অদ্ভুত অচেনা। সে কণ্ঠস্বর ক্লান্ত আর সর্ব অনুভূতি গ্রহণে জড়ত্বে চরমে গিয়ে পৌঁচেছে। পনেরো মিনিট পরেই আমি তাঁর কাছে পৌঁছলুম।

দরজা তিনি নিজেই খুলে দিলেন। অভ্যর্থনাসূচক কোনও কথা না বলে নীরবে তিনি আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন—তাঁকে দেখাচ্ছে বিরস, যেন সর্ব আত্মজন-বিবর্জিত। বললেন, 'হফ্‌মান, আমাকে তুমি সত্যিকার একটি মেহেরবানি করবে কি? আমি এ বাড়িতে আর টিকতে পাচ্ছি নে, যেখানে আমার গেলী মরে গেছে, ম্যুলার টেগার্নজে হ্রদের উপর তার সেন্ট কুইরীনের বাড়ি আমাকে থাকতে দিতে চেয়েছে; তুমি আমার সঙ্গে আসবে? গেলীর কবর না হওয়া পর্যন্ত সে কটা দিন আমি সেখানেই থাকতে চাই। ম্যুলার কথা দিয়েছে, সে ও-বাড়ির চাকর-বাকর সব কটাকে ছুটি দিয়ে ওখান থেকে সরিয়ে দেবে। একমাত্র তুমিই সেখানে থাকবে আমার সঙ্গে। আমাকে এ অনুগ্রহটা তুমি করবে কি?' তাঁর কণ্ঠস্বরে ছিল সনির্বন্ধ মিনতির অনুনয়; বলা বাহুল্য, আমি তৎক্ষণাৎ সম্মতি জানালুম।

সেন্ট কুইরীন বাড়ির প্রধান ভৃত্য বাড়ির চাবিটা আমার হাতে তুলে দিল। বিস্ময় এবং সহানুভূতির দৃষ্টি দিয়ে শোকাঘাতে ভেঙে-পড়া হিটলারের দিকে একবার তাকিয়ে সে চলে গেল। সোফার শ্রেক্ আমাদের সে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেওয়ার পর তাকেও ফেরত পাঠানো হল। চলে যাওয়ার আগে সে কোনও গতিকে সুযোগ করে আমাকে কানে কানে বলে গেল, সে হিটলারের রিভলবার সরিয়ে নিয়েছে, কারণ তার ভয় পাশে নৈরশ্যের চরমে পৌঁছে তাঁর আত্মহত্যা করার প্রলোভন হয়। এবারে রইলুম সুদ্ধ মাত্র আমরা দুজন—আর একটিমাত্র জনপ্রাণী নেই। হিটলার উপরের ঘরে আর আমি ঠিক তার নীচের ঘরটায়।

সে-বাড়িতে হিটলার আর আমি—মাত্র এই দুজন। আমি তাঁকে তাঁর ঘর দেখিয়ে বেরিয়ে যেতে না যেতেই তিনি দু হাত পিছনে নিয়ে এক হাতে আরেক হাত ধরে পাইচারি করতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। আমি জিজ্ঞেস করলুম, তাঁর খেতে ইচ্ছে করছে কিনা। একটিমাত্র শব্দ না বলে তিনি শুধু মাথা নাড়িয়ে অসম্মতি জানালেন। আমি তবু এক গেলাস দুধ আর কিছু বিস্কুট উপরে নিয়ে তাঁর ঘরে রেখে এলুম।

আমি আপন কামরার জানলার কাছে দাঁড়িয়ে শুনছিলুম উপরের পাইচারির তালে তালে ওঠা ভারী শব্দ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চললো সেই পাইচারি,—একবারও ক্ষান্ত দিল না, একবারও জিরুলো না। রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে এল—আমি তখনও শুনছি তাঁর একটানা পাইচারি, ঘরের এ প্রান্ত থেকে ঐ প্রান্ত, ফের ঐ প্রান্ত থেকে এ প্রান্ত। সেই

www.BanglaBook.org

একটানা শব্দের মোহে আমি অল্প কিছুক্ষণের জন্য তন্দ্রাচ্ছন্নই হয়ে গিয়েছিলুম। হঠাৎ কি যেন আমাকে আচমকা ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দিয়ে সম্পূর্ণ সচেতন করে দিল। পাইচারি বন্ধ হয়ে গিয়েছে, আর যেন মৃত্যুর নীরবতা চতুর্দিকে বিরাজ করছে। আমি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালুম। তবে কি করছেন হিটলার এখন...? অতি সন্তর্পণে এবং মৃদু পদক্ষেপে আমি যেন লুকিয়ে উপরের তলায় গেলুম। ওঠবার সময় কাঠের সিঁড়ি অল্প অল্প ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ করলো। আমি দরজায় পৌঁছতেই—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আবার পাইচারিটা আরম্ভ হল। বুকের বোঝা যেন অনেকটা হাল্কা হয়ে গেল; আমি চুপিসাড়ে আপন ঘরে ফিরে এলুম।

এবং এইভাবে চললো সমস্ত দীর্ঘরাত ধরে সেই পাইচারি—ঘণ্টার পর ঘণ্টা অন্তহীন দীর্ঘ ঘণ্টা। আমার মন চলে গেল আমাদের বিগত একাধিকবার এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-পরিপূর্ণ টেগের্নজে হ্রদের কোলে লালিত বাড়িতে আসার স্মরণে। তখন সব কিছু কতই না সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল।

গেলীর মৃত্যু আমার বন্ধুর গভীরতম সত্তাকে নাড়া দিয়ে কাঁপিয়ে তুলেছে। তবে কি তিনি নিজেকে তার জন্য দায়ী অনুভব করছিলেন? তিনি কি অনুতপ্ত আত্ম-অভিযোগ দিয়ে আপন সত্তাকে কঠোরতম যন্ত্রণা দিচ্ছিলেন? তিনি এখন করবেনই বা কি? এ ধরনের অনেক প্রশ্ন আমার আমার মাথার ভিতরে ক্রমাগত হাতুড়ি পেটাচ্ছিল, আর আমি খুঁজে পাচ্ছিলুম না একটারও উত্তর।

ঊষার প্রথম আবির্ভাব অন্ধকার আকাশকে আলোকিত করে তুলছিল, এবং আমি আমার জীবনে ঊষাগমনের জন্য হৃদয়ের ভিতর কখনও এতখানি কৃতজ্ঞ অনুভব করিনি। আমি আবার উপরে গিয়ে তাঁর দরজায় মৃদু করাঘাত করলুম। কোনও উত্তর এল না। আমি ভিতরে গেলুম কিন্তু হিটলার আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে বিস্মৃতিতে নিমগ্ন হয়ে আমাকে লক্ষ্যমাত্র করলেন না। দেহের পিছনে এক হাত দিয়ে অন্য হাত ধরে, সুদূর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে কিন্তু কোনও জিনিস না দেখে, তিনি তাঁর অন্তহীন পাইচারি চালিয়ে যেতে লাগলেন। যন্ত্রণায় তাঁর মুখের রঙ পাঁশুটে, ক্লান্তিতে সেটা ঝুলে পড়েছে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি চেহারাটাকে করে দিয়েছে বিসদৃশ, চোখ দুটো ডুবে গিয়েছে কোটরের গভীরে, সেগুলোর নিচের অংশ কালো ছায়ায় কৃষ্ণমসীলিপ্ত আর ঠোঁট দুটো একটা আরেকটা চেপে ধরে এঁকেছে যেন তিক্ত অভিশপ্ত একটি রেখা। দুধ আর বিস্কুট স্পর্শ করা হয়নি।

চেষ্টা করেও সামান্য একটা কিছু খাবেন না তিনি, প্লীজ? আমি শুধালুম। আবার কোনও উত্তর এল না, শুধু সামান্য একটু মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালেন। আমি মনে মনে ভাবলুম, অন্তত অল্প কিছু একটা ওঁকে খেতেই হবে, নইলে তিনি যে হুমড়ি খেয়ে ভিরমি যাবেন। আমি ম্যুনিকে আমার বাড়িতে ফোন করে শুধালুম, স্পাগেত্তি[১] কি করে রাঁধতে হয়? হিটলারের অন্যতম প্রিয় খাদ্য এটি। সেখান থেকে পাকশালীর যে দিকনির্দেশ পেলুম বর্ণে বর্ণে সেই অনুযায়ী আমি রন্ধনকলায় আমার নৈপুণ্য আছে কিনা সেই পরীক্ষাতে প্রবেশ করলুম। আমার নিজের মতে ফলটা ভালোই ওৎরালো। কিন্তু আবার

BanglaBook.org

১ ইতালিয়দের স্টেপলফুড্—আমাদের ভাতের মত নিত্য খাদ্য। মাক্কারনী, স্পাগেত্তি, ভেরমিচেল্লি ইত্যাদি। সবই ময়দার তৈরী, অনেকটা মুসলমানদের সেঁওইয়ের মত। রান্না করা হয় নানা পদ্ধতিতে, তার শত শত রেসিপি (পাকপ্রণালী) আছে।

www.BanglaBook.org

আমার ভাগ্য বাম। যদিও এই ধরনের স্পাগেত্তি তাঁর প্রিয় খাদ্য, যদিও আমি আমার রন্ধন-নৈপুণ্য প্রশংসা-প্রশংসায় সপ্তম স্বর্গ অবধি তুলে দিয়ে তাঁকে অনুনয়-বিনয় করলুম, চেষ্টা দিয়েও অতি অল্প একটুখানি মুখে দিতে—আমার মনে হল আমি যা কিছু বলেছি, সে তাঁর দুপাশ দিয়ে চলে গেছে, তিনি তার এক বর্ণ শোনেননি।

ধীরে মন্থরে দিনটা তার সীমান্তের দিকে এগিয়ে চলল, তারপর এল আরেকটা রাত্রি, সেটা আগেরটার চেয়েও বিভীষিকাময়। আমি আমার সহ্যশক্তি, আত্মকর্তৃত্বের শেষ সীমানায় পৌঁছে গিয়েছি। জেগে থাকা আমার পক্ষে এখন প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে; ওদিকে উপরে সেই পাইচারি চলেছে তো চলেছে অবিরাম, আর তার শব্দ যেন কেউ তুরপুন দিয়ে আমার খুলি ফুটো করে ভিতরে ঢোকাচ্ছে। যেন এক ভয়াবহ উত্তেজনা তাঁকে তাঁর পায়ের ওপর রেখে চলেছে এবং কিছুই তাঁকে ক্লান্ত করতে পারে না।

তারপর এল আরেকটা দিন। আমি নিজেই তখন যে কোনও মুহূর্তে আপন সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় জড়নিদ্রায় অভিভূত হয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতে পারি। আমার নড়াচড়া আমার কাজকর্ম করা সব কিছু যন্ত্রচালিত বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত অন্ধশক্তির প্রকাশ মাত্র। কিন্তু মাথার উপর পদধ্বনি কক্‌খনো থামেনি।

সন্ধ্যা ঘনানোর পর আমরা শুনলুম, গেলীর গোর হয়ে গিয়েছে, এবং হিটলারের সে-গোরের দিকে তীর্থযাত্রারম্ভ করতে কোনও অন্তরায় নেই। সেই রাত্রেই আমরা রওয়ানা দিলুম। নিঃশব্দে হিটলার ড্রাইভার শ্রেকের পাশে বসলেন। আমার উপরে যে অসহ্য চাপ আমাকে ধরে রেখেছিল সেটা যেন হঠাৎ ছিঁড়ে দু-টুকরো হয়ে গেল আর আমি গাড়ির ভিতর সেই অবসাদজনিত অঘোর নিদ্রায় ঘণ্টাখানেক কিংবা ঘণ্টা-দুই ঘুমিয়ে নিলুম। ভোরের দিকে আমরা ভিয়েনা পৌঁছলুম, কিন্তু এই সমস্ত দীর্ঘ চলার পথে হিটলার একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করেননি।

আমরা সোজা নগরের ভিতর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে কেন্দ্রীয় গোরস্থানে পৌঁছলুম। এখানে এসে হিটলার একা গোরের দিকে গেলেন। সেখানে পেলেন তাঁর নিজস্ব দুই এডিকং শ্বার্থস এবং শাউব—তারা সেখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আধঘণ্টার ভিতরই তিনি ফিরে এলেন এবং গাড়ি ওবের-জাল্‌ৎস্‌বের্গে চালিয়ে নিতে হুকুম দিলেন।

গাড়িতে উঠতে না উঠতেই তিনি কথা আরম্ভ করলেন। উইন্ডস্ক্রীনের ভিতর দিয়ে তিনি স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে যেন আত্মচিন্তা করছিলেন, কিন্তু স্পষ্ট কথা বলে বলে। 'আচ্ছা! তাই সই!' বললেন তিনি। 'আরম্ভ হোক তবে এখন সংগ্রাম—যে সংগ্রাম শিরোপরি কৃতকার্যতার বিজয়মুকুট পরবেই পরবে, পরতে বাধ্য।' আমরা সকলেই বিধির এক বিরাট আশীর্বাদপ্রাপ্ত স্বস্তি অনুভব করলুম।...

এরপর হিটলার ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাঁর বক্তৃতাসফরে। আজ এখানে কাল সেখানে, এমন কি একই দিনে দু'তিন ভিন্ন ভিন্ন নগরে বক্তৃতা দিয়ে যেতে লাগলেন। সেগুলো আগের চেয়ে যেন শ্রোতাদের করে দেয় অনেক বেশী আত্মহারা, যেন তাদের চিন্তাধারাকে তিনি হুকুম দিয়ে বাধ্য করছেন তারা যাবে কোন্ পথে এবং শ্রোতাকেও বক্তৃতা দিয়ে আপন মতে টেনে আনার শক্তি যেন তাঁর বেড়ে গেছে শতগুণে। হফ্‌মান বলছেন, এই শহর থেকে শহর ছুটোছুটি, প্রথম জর্মনির সব চেয়ে শক্তিশালী মোটর মেৎসেডেজে করে, পরে আপন অ্যারোপ্লেনে (অনেকেই বলেন রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডার জন্য ইওরো-

www.BanglaBook.org

আমেরিকায় হিটলারই সর্বপ্রথম নিজস্ব হাওয়াই জাহাজ ব্যবহার করেন—এই ব্লিৎস্ প্রোপাগান্ডা যেন পরবর্তী যুগের ব্লিৎস্ক্রীগের পূর্বাভাস!); সেখানে বিরাট বিরাট জনসভা, শ্রোতাদের চিৎকার করতালি, মিটিঙ শেষে উন্মত্ত জনতার প্ল্যাটফর্ম আক্রমণ—ফ্যুরারকে কাছের থেকে দেখবার জন্য—এসব হট্টগোল ধুন্ধুমারের ভেতর হিটলার যেন গেলীর শোক নিমজ্জিত করে দিতে চাইছিলেন।

এর তিন সপ্তাহ পরে প্রেসিডেন্ট হিন্ডেনবুর্গ আলাপ-আলোচনার জন্য হিটলারকে ডেকে পাঠান, সে কথা পূর্বেই বলেছি। যাঁরা বলেন, সে আলোচনার নিষ্ফল হওয়ার কারণ গেলীর শোকে হিটলার এমনই মোহাচ্ছন্ন ছিলেন তাঁর দাবী তিনি যথোপযুক্ত ভাষা ও দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ করতে পারেননি, ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। আমি বরঞ্চ হফ্মান যা বলেছেন তার সঙ্গে একমত। আমার মনে হয়, তখনও হিন্ডেনবুর্গ তাঁর চিরপরিচিত প্রাচীনপন্থী আপন চক্রের ভিতরকার নেতাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাশ হননি। তখনও হিটলারের 'সময় হয়নি।'

* * *

গেলীর জীবন, তার মৃত্যু, তার স্মৃতি সব কিছু ধর্মে উদাসীন হিটলারকে যেন এক নূতন অনুষ্ঠানবেষ্টিত সংস্কার-বিশ্বাসী করে তুললো। তিনি স্বহস্তে গেলীর কামরা চাবি দিয়ে বন্ধ করে দিয়ে হুকুম দিলেন, একমাত্র গৃহরক্ষিণী ফ্রাউ ভিন্টারেরই সেখানে প্রবেশাধিকার। বহু বৎসর ধরে তিনি প্রতিদিন গেলীর প্রিয় ফুল তাজা ক্রিসেনথিমাম সে ঘরে রাখতেন। বের্ষটেশগাডেনের বাড়িতে এবং পরবর্তী যুগে ফ্যুরার যখন দেশের সর্বাধিকারী (তিনি প্রথমে চ্যানসেলর বা প্রাইম মিনিস্টার রূপে রাজ্যভার গ্রহণ করেন, এবং বছর দেড়েক পর প্রেসিডেন্ট গত হলে তিনি সে পদ পূর্ণ না করে নিজেই গ্রহণ করে পরিপূর্ণ ডিকটেটর—নিরঙ্কুশ নেতা—ফ্যুরার হন) তখন রাজভবনে গেলীর ছবি বিরাজ করতো সর্বত্র। বৎসরে দুই দিন—তার জন্মদিন আর মৃত্যুদিন রুচিসম্মত আড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হত। সর্বোৎকৃষ্ট চিত্রকর ও ভাস্করদের দেওয়া হল গেলীর নানা অবস্থায় তোলা নানাবিধ ফটোগ্রাফ। সেগুলোর উপর নির্ভর করে উত্তম উত্তম ওয়েলপেন্টিং ও মূর্তি নির্মিত হল। জর্মনির অন্যতম উৎকৃষ্ট শিল্পী তখনকার দিনের সর্বোৎকৃষ্টদের একজন—গেলীর একটি অনবদ্য ব্রোনজ্ মূর্তি নির্মাণ করেন। এদের একটা না একটা হিটলারের প্রতি বাসভবনে সর্বোচ্চ সম্মানের স্থানে রাখা হত।

এর প্রায় তেরো বৎসর পর এই আর্টিস্টদের অন্যতম ৎসিক্‌লার যখন যুদ্ধে পরাজয় মনোবৃত্তি প্রকাশের ফলে নাৎসি গেস্তাপো পুলিসের হাতে ধরা পড়ে দীর্ঘ কারাবাসের পর মুক্তির আশা সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে গিয়েছেন তখন তিনি যে একদা গেলীর ছবি এঁকেছিলেন (যদিও কারও কারও মতে তিনি আর্টিস্ট হিসাবে ছিলেন অতিশয় মামুলী) সে কথা হিটলারকে স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি তাঁকে তদ্দণ্ডেই মুক্তি দেন।

হফ্মানের বিশ্বাস, গেলীর সঙ্গে হিটলারের যদি পরিণয় হত তবে হিটলারের জীবন এরূপ শোচনীয় পরিসমাপ্তি পেত না। তাঁর মতে শতধাবিভক্ত জর্মনিকে একাঙ্গ করে তাকে নবজীবনরস দিয়ে তিনি পুনরুজ্জীবিত করতেন নিশ্চয়ই, কিন্তু জর্মনির বাইরে যে সব বিবেচনাহীন অভিযানে বেরুলেন সেখানে পারিবারিক শান্তি এবং তৃপ্তি—হিটলার যেটাকে অসীম মূল্য দিতেন—তথা গেলীর তীক্ষ্ণবুদ্ধি হিটলারের উপর তার অসীম প্রভাব

www.BanglaBook.org

তাঁকে সংযত করে নিরস্ত করতো—তাঁর অন্তিম নিঃশ্বাস বীভৎসতাময় পরিবেশে ত্যাগ না করে শান্তিতেই ফেলতে পারতেন।

হফ্‌মান বলেন, তারপর যখনই গেলীর কথা উঠেছে, হিটলারের চোখ জলে ভরে যেত। এবং একাধিক পরিচিতজনকে হিটলার স্বয়ং বলেছেন, জীবনে ঐ মাত্র একবারই তিনি ভালোবেসেছিলেন।

* * *

গেলীর মৃত্যুর চৌদ্দ বৎসর পর, হিটলার আত্মহত্যা করার প্রায় দেড়দিন পূর্বে, এফা ব্রাউনকে বিয়ে করেন এবং তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহল পৃথিবীবাসীর এখনও যায়নি। কিন্তু তার বর্ণনা এর সঙ্গে যায় না।

আমি হিসেব করে দেখেছি, হিটলারের জীবনে তিনটি দুর্দৈব দেখা দেয়। প্রথম দুটিতে তিনি প্রায় ভেঙে পড়ে নিঃশেষ হয়ে যেতেন—পাঠক আদৌ ভাববেন না, গ্যাস-চেম্বার নির্মাতার জন্য কোনও দিকে কোনও প্রকারের স্পর্শকাতরতা থাকে না, (তাহলে কসাইয়ের ছেলে মরলে সে কাঁদতো না) এবং এঁরা অসাধারণ জীব বলে যে সব স্থলে তাঁদের স্পর্শকাতরতা হয় অসাধারণ সূক্ষ্ম, তাঁদের বেদনানুভূতি প্রায় অনৈসর্গিক তীব্র—তৃতীয়বারের ঘটনা সকলেই জানেন। সেবারে তিনি নিষ্কৃতি পাননি। আত্মহত্যা ছাড়া তখন তাঁর আর অন্য কোনও গতি ছিল না। প্রথম দুর্দৈব তাঁর মাতার মৃত্যু। হিটলার তখন বালক, কিন্তু সেই বালকই তার মাকে যা সেবা করেছে সেটা অবর্ণনীয়, অবিশ্বাস্য—শুধু বলা যেতে পারে, স্বর্গজাত ভক্তি-প্রেমরস যেন ঐ মাত্র একবার পৃথিবীতে হিটলার-জননীর মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে অবতীর্ণ হয়েছিল। তাঁর বাল্যবন্ধু তখনকার দিনের হিটলার ও মাতার মৃত্যুর পর তাঁর অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। এরকম বর্ণনা আমি আর কোথাও পড়িনি। সেবারে তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত মাতার শয্যাপার্শ্বে টুলের উপর বসে বসে কাটিয়েছিলেন দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, সেবা করেছেন সমস্ত হৃদয় ঢেলে দিয়ে।

দ্বিতীয় দুর্দৈব—গেলীর আত্মহত্যা।

তৃতীয়বারে—এবং শেষবারের মত—তিনি সুযোগ পেলেন সেই পাইচারি করার।

তাঁর খাস চাকর লিঙে তার বর্ণনা দিয়েছেন। শুধু লিঙে দেখেছিলেন কাছের থেকে বলে তন্ন তন্ন করে বর্ণনা দিতে পেরেছেন, আর হফ্‌মান নিচের তলা থেকে শুনতে পেয়েছিলেন শুধু।

কিন্তু হায়, তাঁর শেষ পদচারণার পূর্বেই তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। তাঁর শরীরের সম্পূর্ণ বাঁ দিকটা সমস্তক্ষণ কাঁপে (পার্কিনসন ব্যাধি কিংবা সেন্ট ভাইরাসের নৃত্য রোগ), বাঁ হাতটা এত বেশী স্বেচ্ছায় স্বাধীন ভাবে ঘন ঘন ওঠে নামে যে পাইচারি না করার সময়ও সেটাকে প্রায়ই তিনি ডান হাত দিয়ে চেপে ধরে শান্ত করার চেষ্টা দিতেন। বাঁ পা-টাকে ঘষ্টে ঘষ্টে টেনে টেনে তাঁকে চলাফেরা করতে হয়, আর দু চোখের উপর কখনও বা ফিল্‌মের মত বাষ্পাভাস, আর কখনও বা অস্বাভাবিক তীব্র, উজ্জ্বল জ্যোতির মত।

এই বেদনাদায়ক অবস্থায় যখন সাধারণ জন শুয়ে বসেও শান্তি পায় না, তখন হিটলার দু হাত পিছনে নিয়ে সজোরে ডান হাত দিয়ে বাঁ হাত চেপে ধরে বাঁ পা টেনে টেনে—যেন কোনও জড়পদার্থ তিনি আপন দেহ দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন—আরম্ভ করলেন সেই প্রাচীন দিনের পাইচারি। মাঝে মাঝে দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে তার ওপর

www.BanglaBook.org

মুষ্ট্যাঘাত করেন—কারাবাসী-জন যে রকম করে থাকে; তবে কি তিনি শহরের চতুর্দিকে শত্রুসৈন্য বেষ্টিত হয়ে কারাবন্দীর অনুভূতিই অনুভব করেছিলেন?—কিন্তু হায়, এখন তিনি শক্তিহীন জরাজীর্ণ। প্রহরের পর প্রহর, দিনের পর দিন পদচারণা করার দৈহিক শক্তি তাঁর আর নেই। তাই মাঝে মাঝে বসেন চেয়ারের উপর—আর শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকেন দেয়ালের দিকে—ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

কিন্তু এখন আর কি প্রয়োজন পদচারণের?

সেদিন গেলীর মৃত্যুর পর উত্তেজিত হয়ে তুমি আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলে এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাইচারি করে সে উত্তেজনা বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলে। এবারে সে ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অন্ধকার! শত্রুর হাতে অসীম যন্ত্রণা, অশেষ অপমানের পর হয়তো ফাঁসি। এবারে তোমার আত্মহত্যার পালা।

তবু পদচারণ করো, হিটলার!

একদা গেলী চলে যাওয়ার পর করেছিলে অস্থির পদক্ষেপ, এবার গেলীর সঙ্গে পুনর্মিলনের প্রাক্কালে অবশ দেহ টেনে টেনে!

লক্ষ মার্কের বরমান

সম্প্রতি জর্মন সরকার ঘোষণা করেছেন যে কেউ যদি এমন খবর দিতে পারে যার সাহায্যে মার্টিন বরমান নামক লোকটাকে গ্রেপ্তার করা যায় তবে তাঁকে এক লক্ষ জর্মন মার্ক পুরস্কার দেওয়া হবে।

তাই নিয়ে একখানি মাসিক পত্রিকা ফলাও করে উক্ত হ্যার বরমান সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। পত্রিকাখানি চৌদ্দটি ভাষায় প্রকাশিত হয় এবং শতাধিক দেশে পড়া হয় বলে পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দম্ভ করে থাকেন। প্রবন্ধ-লেখক তাই বলেছেন, হয়তো বা আপনিই রবমানকে ধরার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন, কারণ হিটলারের মৃত্যুর পর বরমান কোথায় যে উধাও হয়ে গিয়েছেন কেউ জানে না। সর্বশেষে প্রবন্ধ-লেখক বরমানের একটি বর্ণনা দিয়েছেন যাতে করে আপনি তাঁকে অল্পায়াসে বা অনায়াসে চিনে নিতে পারেন।

আমরা বরমান সম্বন্ধে যেটুকু জানি, তাতে মনে গভীর সন্দেহ হয়, লেখক বরমানের যে বর্ণনা দিয়েছেন সে অনুযায়ী চললে তাঁকে আদৌ চিনতে পারবেন কিনা,—বরঞ্চ হয়তো তাঁকে পালাবার সুযোগ দেওয়া হবে বেশী।

ইতিমধ্যে আরেকটা কথা বলে রাখি, উক্ত পত্রিকার ভারতীয় সংস্করণ বলেছেন, এক লক্ষ জর্মন মার্ক যে আপনি পাবেন তার ভারতীয় মূল্য এক লক্ষ টাকা। আমরা যতটুকু জানি, তার মূল্য অন্তত এক লক্ষ দশ হাজার টাকা—সাদা বাজারেই। এই হল প্রবন্ধটির বিসমিল্লাতে গলদ। এর পর অন্য সব গলদে আসছি। তার পূর্বে বরমানটির পরিচয় কিঞ্চিৎ দিই।

হিটলারের জীবনের শেষের দু বৎসর বরমান ছিলেন তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি। তার পূর্বেই তিনি নাৎসি সেক্রেটারি হয়ে গিয়েছিলেন। নাৎসি পার্টিই যে জর্মনি চালাতো

www.BanglaBook.org

সে-কথা সবাই জানেন—অন্য কোনও পার্টির অস্তিত্ব পর্যন্ত বেআইনী বলে গণ্য হত—এবং হিটলার ছিলেন তার সর্বময় কর্তা। এবং তার পরেই বরমান।

আইনত হিটলার হঠাৎ মারা গেলে কিংবা কোনও কারণে কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেললে তাঁর জায়গায় বসার কথা ছিল গ্যোরিঙের। ওদিকে নাৎসি পার্টির সশস্ত্র বাহিনীর (এস্ এস্) বড়কর্তা ছিলেন হিমলার। তিনি আবার ছিলেন দেশের সামরিক বেসামরিক সর্ব রিজার্ভ ফোর্সের অধিপতি এবং সর্ব কনসানট্রেশন ক্যাম্প ছিল সম্পূর্ণ তাঁরই-জিম্মায়। শেষের দিকে গ্যোরিঙ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন এবং দেশের আপামর জনসাধারণ জানতো, হিটলারের হঠাৎ কিছু একটা হয়ে গেলে হিমলারই দেশের ফ্যুরার—লীডার—বা নেতা হবেন। আইষমান যা কিছু করেছেন সেসব হিমলারের হুকুমেই।

তা ছাড়া ছিলেন গ্যোবেলস। যদিও তিনি প্রোপাগান্ডা মিনিস্টার কিন্তু তিনি হিটলারের বিশেষ প্রিয় আমীর ছিলেন। শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ও হিমলার যদি হিটলারের সঙ্গে দেখা করতে চাইতেন তবে বরমানও সেটা ঠেকাতে পারতেন না। বিশেষ করে গ্যোবেলস্‌কে। বরমান সেটি জানতেন, এবং হিমলারকে যদিও তিনি শেষ পর্যন্ত কোণঠাসা করে এনেছিলেন তবু গ্যোবেলস্‌কে ঠেকাতে পারবেন না জেনে তাঁর সঙ্গে একটা চুক্তি (ওয়ার্কিং এরেঞ্জমেন্ট—মুডস ভিভেন্ডি) করে নিয়েছেন।

এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, হিটলারের জীবনে শেষের বছরখানেক বরমান ছিলেন সর্বেসর্বা। হিটলারের তাবৎ হুকুম তাঁর মারফতে বেরুতো। তাঁর ইচ্ছেমত তিনিও হিটলারকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নিতেন। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী খ্রীষ্টধর্মের এমনই কট্টর শত্রু ছিলেন যে তাঁরা খ্রীষ্টানদের দমাবার জন্যে যে-সব ব্যবস্থা করতে চাইতেন তার দু-একটা হিটলারের মত ধর্মদ্রোহীর মনেও বিরক্তির সঞ্চার করেছিল।[১]

এ বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই, গ্যোরিঙের পতনের জন্য বরমানই দায়ী। এমন কি হিটলারের বিনানুমতিতে তিনি হুকুম পাঠান যেন গ্যোরিঙকে গুলি করে মারা হয়। কিন্তু নাৎসি রাজ্য পতনের দিন আসন্ন দেখে যে-কাপ্তানের উপর যে আদেশ দেওয়া হয়েছিল তিনি সেটা অমান্য করেন।

হিটলারের মাত্র একটি খাস দোস্ত ছিলেন। চক্রান্ত করে বরমান তাঁকেও প্রায় ছমাস ধরে হিটলারের কাছ থেকে দূরে রাখেন। হিটলারকে বলেন, তিনি সংক্রামক টাইফুসে ভুগছেন। হিটলারের মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে তিনি কোনও গতিকে হিটলারের সাক্ষাৎ পান—শেষবারের মত। চক্রান্ত ধরা পড়ে। হিটলার কিন্তু বরমানকে কিছুই বললেন না। বরঞ্চ দোস্ত হফ্‌মানকে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন দয়া করে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন না করেন।[২]

---

১ "অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস" বলতে হবে, নাৎসি সাম্রাজ্য পতনের প্রায় এক বৎসর লুকিয়ে থাকার পর বরমানের স্ত্রী এক ক্যাথলিক পাদ্রির সাহায্য নেন, এবং মৃত্যুর পূর্বে আপন ডজনখানেক ছেলেমেয়েকে তাঁরই হাতে সঁপে দেন। এবং "নির্মমতম পরিহাস"—তাঁর বড় ছেলে ক্যাথলিক পাদ্রী হয়েছে।

২ এই দোস্ত হফ্‌মানকেই হিটলার পাঠিয়েছিলেন মস্কোতে, রিবেনট্রপের সঙ্গে, নাৎসি-কম্যুনিস্ট চুক্তি সই করার সময়—স্তালিন কি রকম লোক সে তত্ত্ব পর্যবেক্ষণ করার জন্য।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই যে এত শক্তিশালী বরমানকে লোকে খুঁজে পাচ্ছে না, কেন? আইষমান তাঁর অনেক নিচের নিচে কর্মচারী ছিলেন। তাঁকেও ইহুদীরা ধরতে পেরেছে। এঁকে পারছে না কেন?

যে বিখ্যাত মাসিকপত্রের উল্লেখ করে এ প্রবন্ধ আরম্ভ করেছি সেখানে এ প্রশ্নটির উল্লেখ নেই। যদিও হিটলার-বরমান নিয়ে যাঁরাই আলোচনা করেন তাঁদের সবাই এর উত্তর জানেন।

তার একমাত্র কারণ বরমান পাবলিসিটি বা খ্যাতি চাইতেন না। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল শক্তি, ক্ষমতা—মানুষের জীবনমরণের উপর অধিকার আয়ত্ত করা।

হেস্, গ্যোরিঙ, গ্যোবেলস, হিমলার, রিবেনট্রপ, এমন কি হিটলারের আমীর-ওমরাহ চুনোপুঁটিরাও কাগজে-কাগজে যখন আপন আপন ফোটোগ্রাফ ছাপাচ্ছেন, যততত্র ভাষণ দিচ্ছেন, বেতারে তরো-বেতরো বক্তৃতা ঝাড়ছেন, মোকা-বেমোকায় কেতাব ছাপাচ্ছেন, পরব্-পার্টি ডে-তে চোখ-ঝলসানো য়ুনিফর্ম পরছেন, তখন বরমান হিটলারের ছায়ায় দাঁড়িয়ে—তাও বাড়ির বাইরে জনসমাজে না—কলকাঠি নাড়ছেন, দিনের পর দিন আপন শক্তি বাড়িয়ে যাচ্ছেন। বড় বড় জেনারেল সিভিলিয়ানরা যখন ডাঙর ডাঙর মেডেলের জন্য হিটলারের সামনে হুটোপুটি করছেন তখন বরমান তাঁর স্ত্রীকে লিখেছেন—'এ কী পাগলামি!'[১]

তাই জর্মন-অজর্মন সাধারণজন তাঁকে চিনতো না। তখনকার দিনে এবং আজও তাঁর ফোটোগ্রাফ দুষ্প্রাপ্য ছিল এবং আছে।

হিটলার যখন তাঁর খ্যাতির মধ্যগগনে অর্থাৎ স্তালিনগ্রাদের পরাজয় তখনও তাঁকে স্বীকার করে নিতে হয়নি, সে সময় খানাপিনার পর হিটলার ইয়ারবক্সীদের সঙ্গে গালগল্প করতেন। অবশ্য হিটলারই কথা বলতেন বেশী। বরমান তখন ব্যবস্থা করেন যে দুজন শর্টহ্যান্ড এককোণে বসে সেগুলো যেন লিখে নেন। পরে বরমান সেগুলো কেটেছেঁটে ধোপদুরস্ত করে দিতেন। এগুলো হিটলারের মৃত্যুর পর তাঁর 'টেব্‌ল্-টক' (table talk)

হিটলারের মৃত্যুর পর ইনি "হিটলার উয়োজ মাই ফ্রেন্ড' নামক একটি পুস্তক লেখেন। ইনিই হিটলারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন তাঁর ফোটোগ্রাফ ল্যাবরেটরির অ্যাসিসটেন্ট শ্রীমতী এফা ব্রাউনের সঙ্গে। আত্মহত্যা করার চল্লিশ ঘণ্টা পূর্বে হিটলার এফাকে বিয়ে করেন—পনেরো বছরের 'বন্ধুত্বে'র পর। এফাও একই সঙ্গে আত্মহত্যা করেন। উভয়কে একই চিতায় পোড়ানোর পর একই কবরে দেওয়া হয়। রাশানরা স্কেলিটনগুলো খুঁড়ে বের করে।

১ বরমান এতই গোপনে থাকতেন যে তাঁর সম্বন্ধে কেউই সবিস্তার কিছু লিখতে পারেননি। ন্যুরনবের্গ মকদ্দমায় সবাই তাঁর বিরুদ্ধে গায়ের ঝাল ঝেড়েছেন বটে কিন্তু তথ্য বিশেষ কিছু দিতে পারেননি। এ ছাড়া আছে : ১) 'বরমান লেটার্স'—স্ত্রীকে লেখা বরমানের পত্রগুচ্ছ। স্ত্রীর মৃত্যুর পর এগুলো প্রকাশিত হয়েছে। ২) ট্রেভার-রোপার লিখিত 'লাস্ট ডেজ্ অব্ হিটলার'। ৩) প্রাগুক্ত হফ্‌মান লিখিত, 'হিটলার উয়োজ মাই ফ্রেন্ড। ৪) গেরহার্ড বল্ট্ কৃত 'ডি লেৎসতেন টাগে ড্যার রাইষ্‌স্‌কান্‌ৎস্‌লাই' (অর্থাৎ 'জর্মন প্রধানাবাসের শেষ কটি দিন')। এই বল্ট্ হিটলার ভবন (মাটির গভীরের এ্যার রেড শেলটার বা 'বুঙ্কার') ত্যাগ করেন হিটলারের মৃত্যুর মাত্র ছাব্বিশ ঘণ্টা পূর্বে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রূপে প্রকাশিত হয়েছে। প্রাগুক্ত বিশ্ববিখ্যাত মাসিকের প্রবন্ধ-লেখক বলেছেন, বরমান যে এ ব্যবস্থা করেছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল so that he could know and fulfil Hitler's every whim. এ উদ্দেশ্যও হয়তো তাঁর ছিল কিন্তু এই টেব্‌ল্-টক পড়লেই বোঝা যায় সেটা অত্যন্ত গৌণ। আসলে বরমান মনে করতেন হিটলার যা করেন যা বলেন তার চিরন্তন ঐতিহাসিক মূল্য আছে এবং পরবর্তী যুগের নাৎসী তথা বিশ্ববাসীর জন্য অমূল্য নিধি। নিধি হোক আর না-ই হোক—এ-কথা সত্য, যারা হিটলারকে ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে চিনতে চান তাঁদের পক্ষে হিটলারের স্বরচিত 'মাইন কাম্‌পুঁফ্' পুস্তকের পরেই এর স্থান। এসব ১৯৪১-৪২-এর কথা।

১৯৪৫ সালে হিটলার যখন আসন্ন পরাজয়ের সম্মুখীন তখন বরমান হিটলারকে দিয়ে আবার কথা বলিয়ে নেন। এ-কথা সত্য, আত্মহত্যার কুড়ি-বাইশ ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত হিটলার জয়াশা সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে পারেননি। তবু এই শেষ talk-গুলোতে হিটলার যেন আপন মনে চিন্তা করেছেন, কেন তাঁর পরাজয় হল? এবং শুধু তাই নয়, পরাজয় যদি নিতান্তই হয়ে যায় তবে ভবিষ্যতে ইয়োরোপ-আমেরিকার কি অবস্থা হবে, তখন জর্মন রাজনীতি কোন্ পন্থা অনুসরণ করবে সে সম্বন্ধেও হিটলার ভবিষ্যৎবাণী করে গিয়েছেন। আশ্চর্য, তার অনেকগুলোর আজ ফলে যাচ্ছে। চীন যে চিরকাল জড় হয়ে পড়ে থাকবে এটা তিনি স্বীকার করেননি। বরঞ্চ বলেছেন, চীনের কোটি কোটি লোক ঐ দেশে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে না। তবে তাঁর বিশ্বাস ছিল, চীন আমেরিকা পানে ধাওয়া করবে (তার পূর্বে রুশ-মার্কিনে যুদ্ধ হয়ে আমেরিকা ছারখার হয়ে যাবে); চীন যে ভারতপানে ধাওয়া করবে সে ভবিষ্যৎবাণী তিনি করেননি।

বলতে গেলে এই টেব্‌ল্-টক্‌ও বরমানেরই 'অবদান'।

কিন্তু এহ বাহ্য।

প্রাগুক্ত প্রবন্ধ-লেখক বলেছেন, 'বরমান মদ এবং কফি খেতেন না, পাতলা চা খেতেন এবং ক্বচিৎ কখনো মাংস খেতেন (drinking neither alcohol nor coffee, just weak tea, and eating sparingly of meat)'!

অর্থাৎ কাল যদি আপনি কলকাতায় (প্রবন্ধ-লেখক বলেছেন, he could be in Canada or Mexico—even in India), কিংবা কেউ যদি আর্জেন্টাইনে দেখে একটা লোক ঢাউস গেলাস-ভর্তি বিয়ারের সঙ্গে বিরাট একটা কট্‌লেট্ খাচ্ছে তবে তার বরমান হবার সম্ভাবনা নেই।

বস্তুত বরমান মাংস খেতেন প্রচুর। মদের তো কথাই নেই।

তবে প্রবন্ধ-লেখকের এ ভুল ধারণা এল কোথা থেকে?

সকলেই জানে হিটলার মাছ মাংস মদ খেতেন না। তিনি যখন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে খেতে বসতেন তখন তাঁর সামনে থাকতো নিরামিষ, এবং অন্যদের জন্য মাছ মাংস মদ। অবশ্য কেউ যদি হিটলারের মত নিরামিষ খেতে চাইত তবে তাকে সানন্দে তাই দেওয়া হত।

হিটলার-সখা হফ্‌মান—যাঁর পুস্তকের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি—বলছেন, 'গ্যোরিঙও এসব খানাতে প্রায়ই উপস্থিত থাকতেন না। তিনি বলছেন, "আহারাদির ব্যাপারে প্রভুর সঙ্গে আমার রুচির অমিল।" এবং এসব নিরামিষ অন্য কেউ কখনও খেতে চায়নি। এক বরমান ছাড়া। প্রভুকে খুশী করার জন্য সেই কর্তাভজাটা তার সঙ্গে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঐ 'কচুঘেঁচু' খেত। এবং তারপর আপন কামরায় গিয়ে—সেটা কাজেই ছিল—পরমানন্দে শুয়োরের চপ্ (বিরাট মাংসের টুকুরো—এর সঙ্গে আমাদের আলুর চপের কোনও মিল নেই) বা বাছুর মাংসের কট্‌লেট্ গবগব করে গিলতো।[১]

প্রাগুপ্ত প্রবন্ধ-লেখক তাঁদেরই উপর নির্ভর করেছেন যাঁরা বরমানকে শুধু বাইরের থেকে দেখেছেন। তাই কবি বলেছেন, বাহ্যদৃশ্যে 'ভোলো না রে মন।'

প্রশ্ন উঠতে পারে, হফ্‌মান আর বরমানে ছিল আদায় কাঁচকলায়। তাই তিনি দুশমনী করে এসব নিন্দে রটিয়েছেন। কিন্তু ভুললে চলবে না, যখন হফ্‌মানের বইখানি প্রকাশিত হয় তখন বরমানের প্রাইভেট সেক্রেটারি, স্টেনো, চাকর, প্রাপ্তবয়স্ক একাধিক ছেলেমেয়ে স্বাধীন ভাবে জর্মনিতে চরে বেড়াচ্ছেন। তাঁদের কেউই কোনও আপত্তি জানাননি।

এবার মদের ব্যাপার।

হিটলারের খাস চাকর (ভ্যালে) লিঙে দশ বৎসর রুশদেশে কারাবাস করে, ১৯৫৫ সালে খালাস পেয়ে দেশে ফিরে হিটলার সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছেন। হিটলার নাকি প্রায়ই তাঁকে বলতেন, 'দেখো লিঙে, রাত্রে আপন ঘরে তুমি যত খুশী মদ খেয়ে যেমন খুশী মাতলামো করো, আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু সমাজে সাবধানে খেয়ো।' বরমানও তাই সাবধানে মদ খেতেন।

আমার এই প্রবন্ধের দুই নম্বর ফুটনোট যে চার নম্বরের লেখকের নাম উল্লেখ করা তিনি বল্‌ট্।

পূর্বেই বলেছি হিটলার আত্মহত্যা করার ছাব্বিশ ঘণ্টা পূর্বে তিনি হিটলার আর সাঙ্গোপাঙ্গদের ভূগর্ভ-নিবাস (বুঙ্কার) ত্যাগ করে প্রাণ বাঁচান। এই ভূগর্ভনিবাস বহু কামরায় বিভক্ত ছিল। তারই একটাতে থাকতেন তিনি আর তাঁর সহকর্মী লরিংহফেন্। হিটলারের আত্মহত্যার দুতিন রাত্র পূর্বে ভোরের দিকে তাঁর সহকর্মী তাঁকে জাগিয়ে বলেন, 'কান পেতে শোন্ কি সব হচ্ছে।' পাশের কামরায় তিন ইয়ার—বরমান, জেনারেল বুর্গডর্ফ আর জেনারেল ক্রেব্‌স্[২] মদ্যপানের সঙ্গে তর্কাতর্কি করছেন। রাশানরা তখন বার্লিনে ঢুকে গিয়েছে এবং কয়েকদিনের ভিতর যে তাদের জীবনমরণ সমস্যা দেখা দেবে সেটা জানতে পেরে বিশেষ করে বুর্গডর্ফের আত্মগ্লানি দেখা দিয়েছে এবং তার জন্য

---

১ "Goering too was a rare guest. Hitler's culinary confections, he declared was not to his taste. But the lick-spittling Borman dutifuly consumed raw carrots and leaves in his master's company—and then he would retire to the privacy of his own room and devour with relish his pork chop or a fine Wiener Schnitzel (calf cutlet) Hoffmann, P. 202.

২ অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস, হিটলারের মৃত্যুর দুদিন পরে যখন বুঙ্কার রাশান সৈন্য দ্বারা অধিকৃত হয় তখন বুর্গডর্ফ এবং ক্রেব্‌স্ আত্মহত্যা করেন, বরমান পালান। গোড়ায় তাঁর সঙ্গে পলায়মান যাঁরা পরে বন্দী হন তাঁরা বলেন, বরমান রাশান দ্বারা নিহত হন। পরে নানা সন্দেহের অবকাশ দেখা দিল। তাই আজ জর্মন সরকার এক লক্ষ মার্ক পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। তাঁর পলায়ন সম্বন্ধে সবিস্তর বর্ণনা, তিনি বেঁচে আছেন কিনা সে সম্বন্ধে সব চেয়ে ভালো আলোচনা পাঠক পাবে, ট্রেভার-রোপার লিখিত পুস্তকে, পৃঃ ২২১।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তিনি প্রধানত নাৎসি ও তার কর্তা বরমানকে দায়ী করছিলেন। বরমান আত্মপক্ষ সমর্থন করতে করতে বলছেন, 'এস, দোস্ত, আরেক পাত্তর হয়ে যাক'—বুর্গডর্ফ অধিকাংশ সময়ই মত্তাবস্থায় থাকতেন।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। বল্‌ট্‌ তার পর ঘুমিয়ে পড়েন।

দুপুরের দিকে বল্‌ট্‌ তাঁর সহকর্মীর সঙ্গে গেলেন মিলিটারি কনফারেন্‌স্‌ রুমে—বুঙ্কারের ক্ষুদ্র-পরিসর কামরাগুলোর মধ্যে এইটেই ছিল সব চেয়ে প্রশস্ত। সেখানে গিয়ে দেখেন, হিটলার, এফা এবং গ্যোবেলস বসে আছেন, আর সামনের তিনখানা সোফাতে হিটলারের তিন ওমরাহ—বরমান, বুর্গডর্ফ, ক্রেব্‌স্‌—লম্বা হয়ে, পা ফাঁক করে সর্বাঙ্গে কম্বল জড়িয়ে, সোফার ফাঁকা জায়গাগুলো কুশন (তাকিয়া-বালিশ) দিয়ে ভর্তি করে ঘড়ঘড় করে প্রচুর নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছেন।

পূর্বরাত্রির এবং সেই সকালের অত্যধিক সুমিষ্ট দ্রাক্ষারস পানের ধকল কাটিয়ে তখনও তাঁরা জেগে উঠতে পারেননি। মদ্যপানশেষে তিনি ইয়ার একসঙ্গে শোবার জন্য এই বড় ঘরটাই বেছে নিয়েছিলেন। বল্‌ট্‌ বলছেন, গ্যোবেলস তাঁর দিকে এগুতে গিয়ে এঁদের নিদ্রাভঙ্গ না করার জন্যে প্রায় সার্কাস খেলোয়াড়ের মত তাঁদের পা বাঁচিয়ে এক রকম ডিঙিয়ে এলেন। তাই দেখে এফা একটু মৃদু হাস্য করলেন।' (পৃঃ ৮১, ৮২)

এর পরও যদি প্রাগুক্ত প্রবন্ধ-লেখক বলেন বরমান মদ খেতেন না তাহলে আমরা সত্যিই নিরুপায়।

অবশ্য একথা ঠিক যে বরমান যতক্ষণ না হিটলার ঘুমিয়ে পড়েন ততক্ষণ সচরাচর মদ খেতেন না। পাছে হিটলার ডেকে পাঠান। এমন কি স্বয়ং বরমানই তাঁর স্ত্রীকে লিখছেন (ফেব্রুয়ারি মাসে—হিটলার আত্মহত্যা করেন ৩০ এপ্রিল ১৯৪৫, অপরাহ্ণ সাড়ে তিনটেয়; হিটলারের ভ্যালে—খাস চাকর—লিঙের মতে ৩·৫০), 'ভাগ্যিস কাল রাত্রে এফার জন্মদিন পরবে আমি মদ্যপান করিনি, কারণ রাত সাড়ে তিনটেয় হিটলার আমাকে ডেকে পাঠালেন; আমি তাই সাদা চোখেই তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা কইতে পারলুম।'

প্রাগুক্ত প্রবন্ধ-লেখক বলেছেন, 'বরমান হাল্কা চা খেতেন।'

সেও সর্বজনসমক্ষে, হিটলারকে খুশী করার জন্য যেমন তিনি 'কচুঘেঁচু' খেতেন তেম্নি। কারণ, আর সবাই যখন মদ্যপান করতেন তখন হিটলার ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাল্কা চা খেতেন,—চীনারা, রুশোরা, কাবুলীরা যে রকম করে থাকে।

বরমান যে মদ্যপান করেন সে-কথা হিটলারের অজানা ছিল না। বস্তুত বুঙ্কারের অনেকেই শেষের দিকে পরাজয় আসন্ন জেনে সুরাতে দুশ্চিন্তা ভোলবার চেষ্টা করছিলেন। সখা হফ্‌মান যখন হিটলারকে এপ্রিলের মাঝামাঝি শেষবারের মত দেখতে আসেন তখন তাঁর জন্য স্যাম্পেন অর্ডার দিয়ে হিটলার এই মন্তব্য করেন।

* * *

এ প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য আমার এ নয় যে প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন করে বরমানকে ধরিয়ে দিতে সাহায্য করি। তদুপরি বরমানের এই বঙ্গদেশে আগমন অসম্ভব। ধরা পড়লে ভারত সরকার তাঁকে পয়লা প্লেনেই জর্মনি পাঠিয়ে দিতে কোন আপত্তি করবেন না। তিনি থাকবেন ঐ সব দেশেই যে সব দেশ আসামী বদলের চুক্তি জর্মনির সঙ্গে করেনি—অর্থাৎ নাৎসিদের প্রতি এখনও যাদের কিছুটা দরদ আছে। অবশ্য বরমান তার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রাপ্য শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পান সেটাও আমার উদ্দেশ্য নয়।

আমার উদ্দেশ্য, এই সব চোদ্দ আর বাইশ ভাষায় প্রকাশিত মার্কিন কাগজগুলোকে যেন বঙ্গসন্তান চোখ-কান বন্ধ করে বিশ্বাস না করেন। বিশেষ করে যখন তারা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নানা প্রকারের উপদেশ দেয়।

কন্‌রাট আডেনাওয়ার

চার্‌চিল নাকি একদা বলেছিলেন, বিসমার্‌কের পরবর্তী যুগে জর্মনিতে মাত্র একটি রাষ্ট্রবিদ (স্টেট্‌সম্যান, রাষ্ট্রনির্মাতা) জন্মেছেন—তিনি কন্‌রাট্‌ আডেনাওয়ার।

এ প্রশস্তি আডেনওয়ারের পক্ষে অবশ্য আনন্দদায়িনী (এবং আমরাও চার্‌চিলের সঙ্গে একমত), যদ্যপি এ তথ্যটি সর্বজনবিদিত যে স্বয়ং আডেনওয়ার ইংরেজ জাতটাকে আদৌ নেকনজরে দেখতেন না।

চার্‌চিলের মন্তব্যে কিন্তু একটা স্থূলাঙ্গুলির রূঢ় ইঙ্গিত রয়ে গিয়েছে।

তিনি বলতে চান, বিসমার্‌ক এবং আডেনাওয়ারের মাঝখানে রাজনীতির (স্টেট্‌সম্যানশিপের) শস্যশ্যামল ভূখণ্ড নেই, আছে সাহারার মরুভূমি। অর্থাৎ বহু বহু বৎসর ধরে জর্মন দেশে রাষ্ট্রনির্মাতার বড়ই অভাব। বিসমার্‌কের জন্ম ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে, রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হন ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ও মৃত্যু ১৯৯৮। যদি ধরা হয়, তিনি রাজনীতি সংগ্রামে নামেন ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তা হলে বলতে হয় প্রায় একশ বছর ধরে জর্মনিতে একমাত্র রাষ্ট্রপিতা ছিলেন বিসমারকই। জর্মনির মত চিন্তাশীল তথা শক্তিশালী দেশের পক্ষে এই শতাব্দীতে মাত্র একজন রাষ্ট্রস্রষ্টা—এ যেন অবিশ্বাস্য। জর্মনি না কান্‌ট্‌, হেগেল, কার্ল মার্কসের দেশ! তাঁদের পরিকল্পনা কেউই বাস্তবে পরিণত করতে পারলো না?

এবং হিটলার?

এর উত্তর সুদীর্ঘ, কিন্তু সংক্ষেপে সারি। যে-ডিক্‌টেটারের মৃত্যুকালে তাঁর দেশের অধিকাংশ ভস্মস্তূপে পরিণত, যাঁর সংগ্রামনীতির ফলে লক্ষ লক্ষ সৈন্য দেশেবিদেশে নিহত হয়েছে; যুদ্ধে বোমারু আক্রমণে আরও লক্ষ লক্ষ আহত রক্তাক্ত নরনারী চিৎকার করছে—তাঁকে নিশ্চয়ই অতিমানব, নরদানব সবই বলা যেতে পারে; শুধু বলা যায় না—রাষ্ট্রনির্মাতা, পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থার যুগযুগ-ধাবিত যাত্রীর 'চিরসারথি' তাঁকে কিছুতেই বলা যায় না।

বিনষ্ট রাষ্ট্রের ভস্মস্তূপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যে লোক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয় তাকে রাষ্ট্রনায়ক, রাষ্ট্রনির্মাতা বলা চলে না।

এমন কি কোনও রাষ্ট্রাদর্শও তিনি রেখে যেতে পারেননি যেটা ভবিষ্যদ্বংশীয়রা মৃন্ময় করে তুলতে পারে। তাঁর রাষ্ট্রাদর্শ :—পররাজ্য জয় করে সে দেশের 'বর্বর' (উন্‌টর্‌মেন্‌ষ্‌) জনসাধারণকে দাসস্য দাস রূপে পরিণত করে—যে সুপরিকল্পিত পৈশাচিক শোষণ-সংহার পদ্ধতি দর্শনে আন্‌কল্‌ টম পর্যন্ত গোরশয্যায় চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান হবেন—আপন দেশের বিলাসব্যসনের জন্য অধিকতর শূকরমাংস, সূক্ষ্মতর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চীনাংশুক, অগণিত স্বতশ্চলশকট সংগ্রহ—সাতিশয় বস্তুতান্ত্রিক জড়ত্বের চরম আরাধনা।

এ-প্রসঙ্গে তাই বলে নিতে পারি যদিও এটা সর্বশেষের কথা, হিটলার বারো বৎসরে যে জর্মনিকে বিনাশ করেন, আডেনাওয়ার তাঁর ১৯৪৯—১৯৬৩ ব্যাপী 'রাজত্ব'কালে সেটি পুনর্নির্মাণ করেন। শুধু পুনর্নির্মাণ নয় এবং চৌদ্দ বৎসরও নয়, আডেনাওয়ার দশ বৎসরেই জর্মনিতে যে সুখসমৃদ্ধি গড়ে তুললেন সেটা হিটলারের ভস্মস্তূপে দাঁড়িয়ে ১৯৪৫ সালে বাতুলতম আশাবাদীও কল্পনা করতে পারেনি। এবং বলতে কি, এহ বাহ্য, তিনি দিলেন এমন ধন যার উল্লেখ করে খ্রীষ্ট একদা বলেছিলেন—শুধু রুটি খেয়েই মানুষ জীবনধারণ করে না। সে-কথা পরে হবে, আগেই বলেছি।

* * *

কলন[১] শহরের নাম বিশ্ববিখ্যাত। আর কিছু না হোক পৃথিবীর সর্বত্রই Eau de Cologne জিনিসটি পাওয়া যায়, এবং আজকের দিনে ও দ্য কলন্ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই নির্মিত হয়। কলন শহর যে 'কলন-জলে'র (Eau = Water, de = of, Colojne = Coloyne = koeln) আবিষ্কারক তাও নয়, কিন্তু কলনের ও দ্য কলন্ই এখন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কলন-জল।

কলন জর্মনির অন্যতম বৃহৎ নগর। এর গির্জাটি স্থাপত্যশিল্পের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন। গম্ভীর এবং মধুর উভয় রস এই বিরাট গির্জাতে সম্মিলিত হয়েছে। দূর-দূরান্ত হতে গির্জার শিখরদ্বয় পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এ নগরের সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি তার ওবার্বুরগার্মাইস্টার বা প্রধান লর্ড মেয়ার। কলন শহরের উপর তাঁর প্রভাব অসীম। বস্তুত তাঁকে কলনের 'রাজা' বললে কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলা হয় না। ভাইমারের পূর্ববর্তী যুগে কলনের লর্ড মেয়ার প্রতি পরবে কাইজার কর্তৃক নিমন্ত্রিত হতেন।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আডেনাওয়ারের জন্ম এই কলন শহরে। আইন অধ্যয়ন করার পর তিনি এ শহরের লর্ড মেয়ারের দফতরে ঢোকেন এবং ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বয়ং ওবার্বুগার্মাইস্টার নিযুক্ত হন। ১৯৩৩ পর্যন্ত তিনি ঐ পদে থেকে তাঁর আপন শহরের সেবা করেন। এ-রকম একাগ্র সেবা তাঁর পূর্বে বা পরে কোনও মেয়রই করেননি। ১৯৩৩-এ হিটলার জর্মনির প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েই তাঁকে সরাসরি ডিসমিস করে দেন।

আডেনাওয়ারের দীর্ঘ একানব্বুই বৎসরের জীবনকে যদি দুই পর্যায়ে ভাগ করা যায় তবে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তার প্রথম পর্যায় সমাপ্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ের আরম্ভ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং সমাপ্তি ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে।

জর্মনি, হিটলার তথা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্বন্ধে যাঁদেরই কৌতূহল আছে তাঁদের সকলের মনেই প্রশ্ন জাগবে হিটলার এঁকে ডিসমিস করলেন কেন? নাৎসি আন্দোলন যখন ১৯২৯-৩০ খ্রীষ্টাব্দে সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তখন আডেনাওয়ার তার উপর কি কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি?

BanglaBook.org

১ এখানে রোমান জাত একটা কলনি স্থাপন করে ও নেরোর (যিনি রোম পুড়িয়েছিলেন) মা, মহারানী (Colonia) Claudia Ara Agrippinensisএর Colony (Colonia) নাম দেয়। এই Colonia থেকে ফরাসী ইংরিজি Cologne, জর্মনে Koeln.

www.BanglaBook.org

জীবনের প্রথম পর্যায়ে, অর্থাৎ ১৯৩৩ অবধি আডেনাওয়ার প্রকৃত পলিটিশিয়ান বলতে যা বোঝায় তা ছিলেন না। লর্ড মেয়ারের পদ ছাড়াও তিনি কাইজারের রাজত্বে ও পরবর্তী ভাইমার রিপাবলিকে একাধিক সর্বোচ্চ আসন গ্রহণ করেন বটে কিন্তু কখনও রাইষটাগ বা জর্মন পার্লামেন্টের সদস্য হওয়ার জন্য জনসমাজের সম্মুখে প্রার্থী হয়ে দাঁড়াননি। তিনি ক্যাথলিক সেন্টার পারটির সদস্য ছিলেন এবং সে দলের উপর তাঁর প্রভাব ছিল প্রচুর কিন্তু সেটা প্রধানত তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের বলে ও প্রখ্যাত কলন শহরের লর্ড মেয়ারের পদমহিমায়। এবং ক্যাথলিক সেন্টার পারটির প্রতি হিটলারের ছিল ক্রোধ ও ঘৃণা।

কিন্তু ১৯২৯-৩০ থেকে ১৯৩৩ অবধি ক্ষমতালাভের জন্য যখন নাৎসি পারটি শহরে গ্রামে, রাস্তায় রাস্তায়, মদের দোকানে লড়াই চালাচ্ছে তখন যে-সব নাৎসিবিরোধী রাজনৈতিকদের নাম শোনা যায়, যেমন ফন পাপেন, হুগেনবুর্গ, শ্লাইষার, ব্রুনিঙ, ট্যালমান, টরগ্‌লার, শ্রোডার—এদের ভিতর আডেনাওয়ারের নাম নেই। ১৯৭৪ পৃষ্ঠা জুড়ে শ্রীযুক্ত শাইরার 'নাৎসি আন্দোলনের উদয়াস্ত' সম্বন্ধে যে বিরাট গ্রন্থ লিখেছিলেন তাতে আডেনাওয়ারের নাম নেই।

অথচ আডেনাওয়ার ছিলেন ধর্মভীরু লোক—হিটলার যে ধর্মমাত্রকেই এবং বিশেষ করে খ্রীষ্টধর্মকে, জর্মন টিউটন চরিত্রের সর্বনাশা শত্রুরূপে ঘৃণা করতেন সে তত্ত্ব তিনি কখনও গোপন রাখার প্রয়োজন বোধ করেননি।[১] হিটলারের করাল ছায়া যে ক্যাথলিক গির্জা ক্রমেই ছেয়ে ফেলেছে সেটা আডেনাওয়ারের দৃষ্টি এড়ায়নি।

কিন্তু আডেনাওয়ার ছিলেন ধর্মভীরু, শিক্ষিত, বিদগ্ধ নাগরিক।

একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। কলন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে; নেপোলিয়ানের নেতৃত্বে যখন ফরাসী সেনা জর্মনিতে ঢুকলো তখন সারা জর্মনির শিক্ষাদীক্ষার উপর নামলো দুর্দিনের অন্ধকার। বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে কলন বিশ্ববিদ্যালয়েরও দরজা বন্ধ হয়ে গেল ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে।

আপ্রাণ চেষ্টা করে, লর্ড মেয়ারের সর্ব প্রভাব সর্ব কর্তৃত্ব বিস্তার করে কন্‌রাট আডেনাওয়ার ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে কলনে পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। ১২৩ বৎসর পরে।

বন্ শহর কলনের অতি কাছে। বন্-এর বিশ্ববিদ্যালয় বিখ্যাত। আডেনাওয়ার বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন এবং পরবর্তীকালে তিনি বন্-কলনের পথে রোনডরফে তাঁর আবাস নির্মাণ করেন। এখান থেকেই তারো পরবর্তীকালে—হিটলারের পতনের পর—তিনি মোটরে করে রাজধানী বন্-এ রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীর কর্তব্য সমাধান করতে যেতেন।

---

১ হিটলারের বিশ্বাস ছিল, ইহুদী ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নির্বীর্য কাপুরুষের আশ্রয়স্থল খ্রীষ্টধর্ম ইয়োরোপের সর্বনাশ করেছে, এবং এ ধর্ম ইয়োরোপে ছড়ানোর পিছনে রয়েছে ইহুদীদেরই (!) এক অভিনব কৌশল। আবার হিটলার মনে করতেন খ্রীষ্টজন্মের পূর্বে যে সব রোমান সৈন্য প্যালেস্টাইনে মোতায়েন ছিল খ্রীষ্ট তাদেরই কোনও একজনের জারজ সন্তান।

www.BanglaBook.org

সেই ১৯২৯-৩০ খ্রীষ্টাব্দে, বস্তুত প্রায় ষাট বছর ধরে বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছাত্রদের কাছে তিনি ছিলেন সুপরিচিত।[১] বন্-এর এত কাছে একটি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় খোলাতে বন্-এর কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা হয়নি, কারণ বন্-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আডেনাওয়ারের সখ্য ছিল অবিচল। বস্তুত উত্তর রাইন অঞ্চলের (বন-কলন-ড্যুসেল্‌ডরফ্) প্রায় সব রকমের কৃষ্টি আন্দোলন তথা ক্যাথলিক ধর্মজীবন এবং তার প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে আডেনাওয়ার তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

হিটলারের জন্মভূমি যদিও অস্ট্রিয়ায়, তবু তিনি বেভেরিয়ার ম্যুনিক শহর বেছে নিয়েছিলেন তাঁর রাজনৈতিক কর্মকেন্দ্ররূপে। সেখানে বিরাট বিরাট মিটিঙে হিটলার লম্বা লম্বা লেকচার ঝাড়তেন, রাস্তায় রাস্তায় কম্যুনিস্টদের ঠ্যাঙাবার ব্যবস্থা করাতেন, এমন কি গুম্ খুন করাতেও তাঁর বাধতো না এসব পাঠক মাত্রই জানেন।

বেভেরিয়া প্রদেশের পরেই হিটলারের জনপ্রিয়তা ছিল উত্তর রাইনের কয়লা ও লোহা ব্যবসার জায়গা রূর অঞ্চলে—এবং কলনের পাশে এই উত্তর রাইনের ড্যুসেল্‌ডরফ্ শহরে বিশ্বপ্রপাগান্ডা সরদার ডকটর গ্যোবলসের জন্ম। রূরের গা ঘেঁষে কলন শহর এবং এই অঞ্চলের সব চেয়ে বড় নগর। গ্যোব্‌ল্‌স স্বভাবতই চাইতেন তাঁর বাড়ির পাশের কলন শহরে যেন প্রভু হিটলারকে উৎকৃষ্ট আসন তৈরী করে দিতে পারেন—হিটলারের কাশী যদি হয় ম্যুনিক তবে কলন হবে বৃন্দাবন।

কিন্তু বাদ সাধতেন আডেনাওয়ার। পূর্বেই বলেছি, ওবারবুল্‌গার্-মাইস্টারের ক্ষমতা অসীম। তাই নামমাত্র আইন বাঁচিয়ে তিনি কলন অঞ্চলে এমন সব কলা-কৌশল করে রাখতেন যে হিটলার এমন কি রাইনের ছেলে স্বয়ং গ্যোব্‌ল্‌সও সেখানে সুবিধে করে উঠতে পারতেন না।

নাৎসি পারটির ক্ষমতা সঞ্চয় করে উদ্দেশ্য সফল করাতে বাধা দিয়েছিল প্রধানত দুইটি সঙ্ঘ : ক্যাথলিক এবং দ্বিতীয়ত প্রটেস্‌টানট্ যাজক সম্প্রদায়। কিন্তু ক্যাথলিক সম্প্রদায় প্রটেসটানট্‌দের তুলনায় শতগুণে সংঘবদ্ধ এবং পোপকে কেন্দ্র করে তাদের বিশ্বজোড়া প্রতিষ্ঠান। হিটলারও বার বার তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গকে বলেছেন, 'ঐ ক্যাথলিকদের সমঝে চলো—প্রটেস্‌টান্‌ট্‌রা এমনিতেই টুকরো টুকরো হয়ে আছে, তাদের খানখান করা এমন কিছু কঠিন কর্ম নয়।'

---

১ ঐ সময়ে আমি বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করি ও আডেনাওয়ারের খ্যাতি প্রতিপত্তি সম্বন্ধে সতীর্থদের কাছ থেকে বহু প্রশস্তি শুনতে পাই। তাঁর সম্বন্ধে যে-সব সংবাদ খবরের কাগজে ও লোকমুখে এসে পৌঁছত সেগুলো ১৯৩৩ পর্যন্ত যাচাই করে নেওয়া যেত। ঐ বছরে হিটলার ক্ষমতা গ্রহণ করার ফলে প্রেসের স্বাধীনতা লোপ পায়। কাজেই যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত হিটলার-বৈরীদের সম্বন্ধে কোনও পাকা খবর পাওয়া যেত না। যুদ্ধের পর শ্রীযুত ভাইমার আডেনাওয়ার সম্বন্ধে একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ লেখেন। সেখানা যোগাড় করতে পারিনি বলে আমার জানা তথ্য ও তত্ত্ব যাচাই করে নিতে পারছি নে। বিশেষ করে ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত আডেনাওয়ার গোপনে নাৎসিদের বিরুদ্ধে কি কি করেছিলেন সে-সব খবর নিশ্চয় এই বইয়ে আছে। আডেনাওয়ারের মৃত্যুর পর থেকে কলন রেডিয়ো মাঝে মাঝে ঐ বই থেকে কিছু কিছু পড়ে শোনায়। এ প্রবন্ধে আমি তার সাহায্য নিয়েছি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কলন শহরে পোপের অন্যতম আর্চবিশপের বিরাট প্রতিষ্ঠান। আডেনাওয়ার সেখানে সুপ্রীম লর্ড মেয়ার। ক্যাথলিক রাজনৈতিক দলের উপর তাঁর প্রচুর প্রভাব—যদিও পূর্বেই বলেছি, তিনি সে রাজনৈতিক দলের টিকিট নিয়ে ভোটমারে কখনও নামেননি। তাঁর জীবনের প্রথম পর্যায় কেটেছে ম্যুনিসিপাল বা করপোরেশন পলিটিক্‌সে। ক্যাথলিক সংগঠনের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তিনি নাৎসিদের প্রচারকর্মে বাধা দিলেন কলন তথা উত্তর রাইনের সর্বত্র। অথচ হিটলার তাঁকে ধরা-ছোঁওয়াতে পান না, কারণ তিনি রাজনৈতিক কোনও দলের নেতা, এমনি কি চারআনী সক্রিয় নিষ্ক্রিয় কোনও মেম্‌বারও নন। তিনি যদি ভোটমারে নামতেন তবে তাঁকে ভোটে হারিয়ে বিপর্যস্ত অপদস্থ করা যেত। নাৎসি ডন কুইক্‌সট্‌ তলওয়ার হানবার মত ড্র্যাগন খুঁজে পায় না—পায় উইন্‌ড্‌মিল্‌!

গ্যোব্‌ল্‌স্‌-এর প্রচারকর্মের একটা প্রধান উর্বরা জমি ছিল ইস্কুল-কলেজ-য়ুনিভারসিটি। কলনের অধিকাংশ স্কুল ক্যাথলিকদের তাঁবুতে—সেকুলার ভাইমার রিপাবলিক জর্মনির শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে সেকুলার করে তুলতে পারেনি কিংবা হয়তো সত্য সত্য তা করতে চায়নি—সেখানে আডেনাওয়ারের ধর্মবল অর্থবল দুইই রয়েছে। আর য়ুনিভারসিটির তো কথাই নেই। সোয়াশ' বছরের হারানো মানিক তার বিশ্ববিদ্যালয় ফের ফিরে পেয়েছে—আডেনাওয়ারের তপস্যায়, তখনও পুরো দশ বছর হয়নি। এটাকে কলনবাসী বাঁচিয়ে রাখবে সর্বপ্রকার কট্টরপন্থীর র‍্যাডিকাল ছোঁয়াচ থেকে। গ্যোব্‌ল্‌স কলনের কলেজে কস্কে পেতেন না।

ওদিকের বেকার সমস্যায় দিন দিন তার চরম সঙ্কটের দিকে দ্রুতপদে এগিয়ে চলেছে—এবং সবচেয়ে বেশী মার খাচ্ছেন রূর কয়লাখনির শ্রমিক দল। তাই দেখা যায়—হিটলারের খাস পাইলট তাঁর পুস্তকে এর বর্ণনা দিয়েছেন—[১] হিটলার প্রচারকর্মের জন্য প্লেনে উড়ে যাচ্ছেন রূরের এসেন্‌ শহরে। পাশেই বিরাট কলন। কিন্তু তিনি সেটি বাদ দিয়ে চলে যাচ্ছেন বন্‌-এর কাছে তাঁর প্রিয় গোডেসবের্গে নামক গণ্ডগ্রামে (এখন শহর এবং এখানেই পরবর্তী যুগে হিটলার প্রাথমিক কথাবার্তা বলেন চেম্‌বারলনের সঙ্গে—চেকোস্লোভাকিয়ার সুডেটেন বাবদে)। নিশ্চয়ই হিটলারের এই কলন বর্জনে প্রতিবারই গ্যোব্‌ল্‌স লজ্জায় মাথা নিচু করেছেন। তাঁর সান্ত্বনা এইটুকু—এসেন্‌ তথা রূর তাঁর প্রতিবেশী, সেখানে তিনি প্রতিবারই হিটলারকে রাজাসনে বসাতেন।

* * *

হিটলার চ্যান্‌সেলার হয়েই আডেনাওয়ারকে ডিসমিস করলেন। এটা হবে আমরা জানতুম। কারণ নাৎসিরা বহুদিন ধরে তাঁর নিন্দা-কুৎসা গেয়ে বেড়াচ্ছিল। তার একটা : 'আডেনাওয়ার তনখা টানেন বিরাট (রীজে)! তাঁর মাইনে ঢের ঢের কম হওয়া উচিত।' এবং সব চেয়ে মজার কথা, হিটলার যাঁকে লর্ড মেয়ার করলেন তিনি তাঁর মাইনে এক পাই তক না কমিয়ে টানতে লাগলেন। আডেনাওয়ার যে তনখা নিতেন সেইটেই। এই মহাশয়ের নাম ছিল 'রীজে' (বাঙলায় আমরা বলব 'বিরাট' বাবু)। তখন

BanglaBook.org

১ বাত্তর, "হিটলার'জ্‌ পাইলট"।

www.BanglaBook.org

কলন-বন্-এ একটা শিবরামীয় পান্ চালু হল—'অডেনাওয়ার নিতেন বিরাট তনখা; এখন (মিস্টার) বিরাট নিচ্ছেন আডেনাওয়ার-তনখা!'

* * *

হিটলার কিভাবে জর্মনিকে বিশ্বযুদ্ধের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন এবং তার অবশ্যম্ভাবী শেষ ফল যে দেশের সর্বনাশ, সে সত্য আডেনাওয়ার দিব্যদৃষ্টি দিয়েই দেখেছিলেন কিন্তু শান্ত-সমাহিত-স্বভাব ও আচরণ সম্পন্ন আডেনাওয়ার জানতেন, চীনা ঋষি লাওৎসের মতই জানতেন, জর্মন-নিয়তি রহস্যাবৃত তারই কোনও এক মানববুদ্ধির অগম্য 'কারণে'। জর্মনির উপর যে টর্নাডো বন্ধামুক্ত করেছেন, সে যেন

"লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দীশালা হতে
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে"

তার সামনে দাঁড়ালে সেটাকে বন্ধ করা তো দূরের কথা, তিনিও মহাশূন্যে বিলীন হবেন। এটা ফরাসী সম্রাটের 'আপ্রে মোয়া ল্য দেলুজ' ('আমি মরে যাওয়ার পর বন্যা') নয়, এটা 'দেলুজ পুর শাঁকা আ ল্যাসতাঁ ('বন্যা এখনই, এবং সবাইকে নিয়ে যাবে ভাসিয়ে, কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে'!)

বরঞ্চ বন্যার পর ফের ঘরবাড়ি তুলতে হবে, খেতখামার করতে হবে—শিবের তাণ্ডব শেষ হলে অন্নপূর্ণার আবাহন।

পরাজয় যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল, বুদ্ধিভ্রষ্টের ন্যায় হিটলার ততই অবিচারে, নির্বিচারে—শত্রুজন, নিরপেক্ষজন, এমন কি মিত্রজনকেও 'মরণ-থানায়' (কন্সান্ট্রেশন ক্যাম্পে) পাঠাতে লাগলেন—হ্যাঁ, ইব্রাহিম তাঁর প্রিয় পুত্রকে, আগামেম্নন্ তাঁর প্রিয় কন্যা এফিগেনিকে দেবতার তুষ্টির জন্য বলি দিয়েছিলেন—কিন্তু আডেনাওয়ারের অদৃষ্টে 'মরণ-থানার' দুর্দৈব লেখা ছিল না। যুদ্ধের শেষের দিকে তাঁকে কিছুদিন কারাগারে, পরে তাঁর আপন গৃহে নজরবন্দী করা হয়েছিল মাত্র। কিন্তু তিনি শত্রুনির্বিশেষে এতই অসংখ্য জনের উপকার করেছিলেন যে তাঁরা কলাকৌশলে ছলে (হিটলারকে) বলে আডেনাওয়ারকে কারামুক্ত করেন।

"সাঙ্গ হয়েছে রণ,
অনেক যুঝিয়া অনেক খুঁজিয়া শেষ হল আয়োজন"
"The fight is ended !
Cries of loss bewilder the sky"

১৯৪৫ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে জর্মনি 'বে-এক্তেয়ার' আত্মসমর্পণ করল। ঐ বছরেই জুলাই মাসে প্রখ্যাত ইংরেজ লেখক স্টিভ্ন্ স্পেনডারকে বিট্রিশ সরকার পাঠালে জর্মনিতে, সেখানকার ঝড়তিপড়তি ইনটেলেকচুয়েলদের চিন্তাধারার সম্বন্ধে খবর নিতে। সে-কর্ম সমাধান করে তারই বিবরণী তিনি প্রকাশ করেন 'ইয়োরোপীয়ান উইটনিস' নামক পুস্তকে।[১]

১ . Stephen Spender, European Witness, 1946. মাসখানেক পূর্বে যখন কেলেঙ্কারি-কেচ্ছা বেরলো যে মারকিন গুপ্তচর বিভাগ "Encounter" কাগজকে গোপনে অর্থসাহায্য করে, তখন তিনি কাগজের সম্পাদকপদ ত্যাগ করেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বীভৎস বই। কলনের রাস্তার পর রাস্তা, দুদিকে একটি মাত্র বাড়ি নেই—ধ্বংসস্তূপ, ভগ্নস্তূপ। তার তলায় এখনও হাজার হাজার মড়া পচছে গলছে। শহর-জোড়া দুর্গন্ধ থেকে নিষ্কৃতির উপায় নেই। একরকম ক্ষুদে সবুজ পোকা এই সব হাজা-পচা লাশ থেকে জন্ম নিয়েছে এবং শহরময় এমনই ঘন স্তরে ছেয়ে আছে যেন মনে হয় লন্ডনের ধুঁয়াশা। হাত দিয়ে মুখের সামনে থেকে তাড়াতে গেলে মুখে লেগে গিয়ে পিছলে আঠার মত চোখেমুখে সেঁটে যায়।

লড়াইয়ের শুরুতে কলনে বাস করতো প্রায় আট লক্ষ লোক। তারা ক' হাজার বাড়ি, ভিলা ফ্ল্যাটে বাস করতো তার হিসেব স্পেন্ডার দেননি। শুধু বলেছেন মাত্র তিনশ' খানা (!) তখনও বাসের উপযোগী। "Actually there are a few habitable buildings left in Cologne, three hundred in all (!)"

এ শহর তথা গোটা দেশের আর আর শহর গড়ে তুলবে কে, কারা?

দুষ্ট হোক শিষ্ট হোক যে-সব নাৎসি একদা নরওয়ে থেকে ইটালি, আতলান্তিক থেকে ককেশাস পর্যন্ত অধিকার করেছিল তারা কৃতবিদ্য, করিৎকর্মা, অভিজ্ঞ—নির্মাণ-ধ্বংস উভয় কর্মেই সিদ্ধহস্ত। তাদের কিছু মারা গেছে, অধিকাংশ মিত্রশক্তির শিবিরে শিবিরে বন্দী, কিছু পলাতক, অনেক আন্ডারগ্রাউন্ড।

হিটলারের বৈরপক্ষের অধিকাংশ অন্যলোকে। হিটলার তার ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। আডেনাওয়ার গোত্রের নির্মাণতৎপর নেতা অতিশয় বিরল,—মুষ্টিমেয়।

আডেনাওয়ার ভগ্নস্তূপের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। একদা চার্চিল যেরকম লন্ডনের ভাঙাচোরার মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন—যদিও সে বিনাশ কলনের সংস্রাংশও ছিল না।

এখানে আমাকে একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিতে হবে। এটি পড়ে নিলে আডেনাওয়ারের চরিত্রগুণটি পাঠকের সামনে স্পষ্ট রেখায় ধরা দেবে। বিশেষত স্পেন্ডারের মত লোক যখন এ ছবিটি এঁকেছেন।

দু দফে অনুবাদ করে লাভ নেই, এবং বিবেচনা করি এ প্রবন্ধের পাঠক অন্তত আমার চেয়ে ভালো ইংরিজি জানেন।

এটা যুদ্ধবিরতির দু'তিন মাস পরের কথা। স্পেন্ডার বলছেন :—

Adenauer is a prominent Catholic in the Rheinland, who was Mayor of Cologne before Hitler came to power. It is now with a special personal emotion that he takes up the restoration of that Cologne which was a broken trayload of crokery when it was taken out of his hands. When he was last Lord Mayor he was in his fifties, he is now a man of seventy. He has an energetic, though somewhat insignificant appearance; a long lean oval face, almost no hair, small blue active eyes, little button-nose and a reddish complexion. He looks remarkably young and he has the quietly confident manner of a successful and attentive young man.

'There are two aspects of reconstruction which we consider of equal importance', he said, 'one, the material rebuilding of the city. But just as important is the creation of a new spiritual life. You can't have failed to

www.BanglaBook.org

notice that the Nazis have laid German culture just as flat as the ruins of the Rheinland and the Ruhr. Fifteen years of Nazi rule have left Germany a spiritual desert, and perhaps it is more necessary to draw attention to this than to the physical ruins, for the spiritual devastation is not so apparent. There is hunger and thirst now for spiritual values in Germany. This is especially true of Cologne because here, in the past, we have had such a significant spiritual life and activity. Here it is possible to-day to do a great deal. Only the best should be our aim. We should have in Cologne the best education, the best books, the best newspapers, the best music.'

The point that Adenauer came back to again and again—his whole position rested on it—was that the German were really starving spiritually, and that it was therefore of the utmost importance to give their minds and souls some food.

এ বই যখন আমি পড়ি তখনও স্বাধীনতা পাইনি।

সে দুর্দিনে কি কেউ কল্পনা করতে পেরেছিল, দশ-বারো বৎসর যেতে না যেতেই তিনি কলন তথা সারা জর্মনিতে এমন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, শিল্পোন্নতি, আত্মচর্চা, ধর্মজীবনে নব জাগরণ এনে দেবেন, যে হিটলার তাঁর গৌরবের মধ্যগগনেও সুদ্ধমাত্র সাংসারিক দিক দিয়েও এতখানি উন্নতি করতে পারেননি?

কেউ কল্পনা করতে পারবে না, এ তত্ত্বটা আডেনাওয়ার জানতেন বলেই স্পেন্ডারকে বিদায় দেবার বেলা তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, 'The imagination has to be provided for.'

কবিগুরুর কথা মনে পড়ে, স্বদেশী আন্দোলনের সময় ও পরবর্তী অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি বার বার বলেছেন, 'আত্মার দিকটা অবহেলা করো না।' অধিকাংশ রাজনৈতিকরা তখন মুচকি হেসে বলতেন, 'আগে তো ইংরেজকে খেদাই।'

ইংরেজ তো বহুকাল হল গেছে। তবে?

আসলে আমাদের 'imagination', চরিত্র, আত্মা দেউলে।

এর পরের ঘটনাবলী হালে কাগজে কাগজে বেরিয়েছে। সেগুলো সংক্ষেপে সারি।

যুদ্ধশেষের পরই মার্কিন সেনাপতি আডেনাওয়ারকে কলনের লর্ড মেয়র করে দিল। কিছুদিনের মধ্যেই পূর্বের চুক্তি অনুযায়ী মার্কিনরা কলন ইংরেজের হাতে দিয়ে সরে পড়ল। যে-ইংরেজ সেনাপতির হাতে কলনের ভার পড়লো তিনি ছিলেন একটি আস্ত গণ্ডমূর্খ গাড়োল। আডেনাওয়ারকে নগর পুনর্নির্মাণ বাবদে এমন সব সর্বনেশে অবাস্তব জঙ্গীলাটী অর্ডার দিতে লাগলেন যে পরাজিত জর্মনির নগণ্য সরদার আডেনাওয়ার বিজয়মদে মত্ত 'প্রভুর' আদেশ পালন করতে কিছুতেই সম্মত হলেন না। এই নয়া হিটলার তখন তাঁকে স্রেফ ডিসমিস করে দিলেন। বিবেচনা করি সিপাহী বিদ্রোহের আমল হলে তাঁকে বাহাদুর শা'র মত বাকী জীবন জেলে কাটতে হত।

অনেকের বিশ্বাস, সেই যে আডেনাওয়ার ইংরেজের উপর চটে গেলেন, তার পর

www.BanglaBook.org

তিনি জর্মনির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গড়তে লাগলেন মার্কিন ফরাসীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে—ইংরেজিতে যাকে বলে 'কাট্ হিম ডেড',—ইংরেজকে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গেলেন।

জর্মনির নব সংবিধান নির্মাণের জন্য যে বৈঠক বসল বছর তিন পরে ১৯৪৮ সালে তিনি হলেন প্রেসিডেন্ট। ১৯৪৯-এ যে নবীন রাষ্ট্র নির্মিত হল তার প্রথম প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হলেন আডেনওয়ার। কিন্তু তখন বিশ্ববাসীর মনে প্রশ্ন, জর্মনির জন্মবৈরী ফ্রান্স কি এ রাষ্ট্রকে স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্যরূপে স্বীকার করবে?

আডেনাওয়ার আজীবন ফ্রান্সের প্রতি ভ্রাতৃভাব পোষণ করতেন। তিনি হাত এগিয়ে দিলেন ফ্রান্সের দিকে। যে-ফ্রান্স চিরকাল জর্মনিকে অবিশ্বাস করেছে সে পর্যন্ত বুঝে গেল যুগের পরিবর্তন হয়েছে। দস্তী দ্য গল্ আলিঙ্গন করলেন বৃদ্ধ আডেনাওয়ারকে। ইংরেজ মর্মাহত হল। জর্মন ফরাসীকে বিভক্ত রেখে, অর্থ-সংগ্রহার্থে দু দলকে লড়িয়ে দিয়ে, সে দাবড়াতো ইয়োরোপময়।

জর্মনি ইয়োরোপ আমেরিকার জাতিসমাজে আসন পেল।

যে জর্মন জনসাধারণকে বিশ্বজন নরাধম দানব বলে ধরে নিয়েছিল তারা ভদ্রজনরূপে স্বীকৃত হল।

পশ্চিম ইয়োরোপ তথা আমেরিকা যে-সব অর্থনৈতিক, সামরিক, রাজনৈতিক সন্ধিচুক্তি তৈরী করছিল তার সর্বোচ্চ স্তরের সব কটিতেই জর্মনি আসন পেল।

এবং আমরা—যারা—এ দেশে বাস্তুহারা সমস্যা নিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত অবিশ্বাস্য বলে মনে করি যে আডেনাওয়ারদের নেতৃত্বে পশ্চিম জর্মনি স্থান করে দিল তার আপন শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে, পূর্ব জর্মনি থেকে থেকে আগত এক কোটি বিশ লক্ষ বাস্তুহারাকে—তাদের জীবনমানে ও পশ্চিম জর্মনির জীবনমানে আজ আর এতটুকু পার্থক্য নেই, আমি স্বচক্ষে ১৯৫৮ এবং পুনরায় ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে দেখে এসেছি। কোনও লক্ষ্মীছাড়া দণ্ডকারণ্যে গিয়ে বাস্তুহারাদের বাস্তুভিটে-ঘুঘু-রূপ ধারণ করতে হয়নি।

এবং বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়, এই, আপাতদৃষ্টিতে নৈরাশ্যপূর্ণ গুরুভার আডেনাওয়ার এগিয়ে গিয়ে আপন স্কন্ধে তুলে নিলেন তাঁর জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে, রাষ্ট্রজনকরূপে, তেয়াত্তর বৎসর বয়সে।

এ যুগকে সমসাময়িক জর্মন ইতিহাসে বলা হয়, 'আডেনাওয়ার এ্যারা'—'আডেনাওয়ার যুগ'।

এবং এ যুগের এখনও শেষ হয়নি। বিসমার্ককে বিতাড়িত করার পর কাইজার তাঁর রাজনীতি সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিলেন, ৮৭ বছর বয়সে বৃদ্ধ (?) অবসর গ্রহণ করার পর যে দুজন চ্যান্সেলার পর পর নিযুক্ত হলেন তাঁরাও বৃদ্ধের কর্মাদর্শ কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছেন।[১]

অবসর গ্রহণের পর তিনি বৃহৎ তিন খণ্ডে লেখেন তাঁর জীবনস্মৃতি। তৃতীয় খণ্ড প্রেসে পাঠানোর কয়েক সপ্তাহ পর তিনি গত হন।

মৃত্যুর আটদিন পূর্ব পর্যন্ত তাঁর কর্মক্ষমতা অটুট ছিল। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কীজিংগার

১ জর্মানগণ বৃদ্ধ আডেনাওয়ারকে ভক্তি ও ভালবাসা সহ ডাকনাম দেয় 'ড্যার আলটে (ওল্ড ম্যান), তাঁর পরের চ্যানসেলারকে সহাস্যে ডাকনাম দেয় 'ড্যার ডিকে' (ফ্যাট ম্যান)।

www.BanglaBook.org

আডেনাওয়ারের শোকসভাতে বলেন, 'কয়েক দিন পূর্বেও র‍্যোনডর্‌ফ্‌ গ্রামে যান, ''বৃদ্ধের'' কাছ থেকে পথনির্দেশ গ্রহণ করতে।'[১] এই শেষ দর্শনের সময় তিনি কীজিংগারকে বিভক্ত জর্মনি সম্বন্ধে দুঃখপ্রকাশ করেন। শেষ কথা বলেন, 'আজ যে ধুলো আর কুয়াশাতে পৃথিবী ঢাকা সেটা যখন পরিষ্কার হবে তখন যেন কেউ না বলে, আমি আমার কর্তব্য করিনি।'

* * *

বিশ্বজন সম্পূর্ণ একমত যে :—

১) আডেনাওয়ার পদদলিত জর্মনিকে লুপ্ত-আত্মসম্মানবোধ এনে দেন ও ইওরোমেরিকার রাষ্ট্রসমাজে তার জন্য গৌরবের আসন নির্মাণ করেন,

২) চিরবৈরী ফ্রান্সের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনা করেন,

৩) এক কোটি বিশ লক্ষ বাস্তুহারাকে পরিপূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।

তিনি মাত্র একটি আশা সফল করতে পারেননি :—

দ্বিখণ্ডিত জর্মনিকে একত্র করতে পারেননি।

* * *

এস্থলে আমি শুধু দুইটি বিষয় উল্লেখ করবো :—

হ্যার ভাইমার স্বর্গত আডেনাওয়ারের উত্তম জীবনী লিখেছেন। আর পাঁচখানা বিদেশী বইয়ের মত এটিও আমার পক্ষে যোগাড় করা সম্ভব হয়নি—বিদেশী মুদ্রা ও বিদেশী পুস্তক-বিক্রেতাদের 'কৃপায়'।

জর্মন বেতার এই উৎকৃষ্ট পুস্তক থেকে একাধিক অনুচ্ছেদ পড়ে শোনায়।

তারই একটিতে আছে, আডেনাওয়ারের পুত্র উক্ত লেখককে বলেন, 'আমার পিতার মাথার উপর যখন সমস্ত জর্মনির দায়িত্ব তখন আমার মা গত হন। সঙ্গে সঙ্গে পিতা তাঁর দৈনন্দিন রুটিন আমূল পরিবর্তন করে দিলেন, যাতে করে আমরা আরও বেশি সময় ধরে তাঁর সঙ্গলাভ করতে পারি। এর পর থেকে সফরে গেলে আমাদের জন্য প্রতিটিবার সওগাৎ আনতে কখনও তাঁর ভুল হত না।'

আডেনাওয়ার আপন দেশকে বঞ্চিত করেননি, পরিবারের প্রিয়জনকেও বঞ্চিত করেননি।

যে উচ্চকাঙ্ক্ষা স্বার্থপরতা তথা আত্মম্ভরিতার বিকৃত রূপ ধারণ করে, সে কখনওই কোনও প্রকারের ত্যাগ বরণ করতে পারে না, কিন্তু যে উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আদর্শবাদ অঙ্গাঙ্গী বিজড়িত সেখানে প্রকৃত মহাপুরুষ সামান্য শিশুটির দাবির মূল্যও দিতে জানেন। 'রাজকার্য', 'সমাজসেবী', 'রাষ্ট্রের আহ্বান'—এসব গালভরা কথার দোহাই দিয়ে যারা

---

১ আডেনাওয়ার গত হন ভারতীয় সময় অনুযায়ী বিকেল ৫-৫১ মিনিটে। যে জর্মন বেতার ভারতের জন্য প্রোগ্রাম দেয় সেটি আডেনাওয়ারের প্রিয় কলনেই অবস্থিত—সে ভারতের প্রোগ্রাম আরম্ভ করে বিকেল ৬-৫০ মিনিটে। আমি তখনই খবরটা শুনি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এর পর, পর পর কয়েকদিন সন্ধ্যায় কালবৈশাখীর দরুন হয় বিজলি বন্ধ হয়ে যায় বলে, নয় রিসেপশন খারাপ ছিল বলে ল্যুবকে, গার্‌স্টেনমায়ার তথা চ্যানসেলার কীজিংগারের বক্তৃতা ভালো করে বোঝা যায়নি। ২৫ এপ্রিল গোরের দিনও আবহাওয়া খারাপ ছিল।

www.BanglaBook.org

তিনি জর্মনির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গড়তে লাগলেন মার্কিন ফরাসীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে—ইংরেজিতে যাকে বলে 'কাট্ হিম ডেড',—ইংরেজকে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গেলেন।

জর্মনির নব সংবিধান নির্মাণের জন্য যে বৈঠক বসল বছর তিন পরে ১৯৪৮ সালে তিনি হলেন প্রেসিডেন্ট। ১৯৪৯-এ যে নবীন রাষ্ট্র নির্মিত হল তার প্রথম প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হলেন আডেনওয়ার। কিন্তু তখন বিশ্ববাসীর মনে প্রশ্ন, জর্মনির জন্মবৈরী ফ্রান্স কি এ রাষ্ট্রকে স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্যরূপে স্বীকার করবে?

আডেনাওয়ার আজীবন ফ্রান্সের প্রতি ভ্রাতৃভাব পোষণ করতেন। তিনি হাত এগিয়ে দিলেন ফ্রান্সের দিকে। যে-ফ্রান্স চিরকাল জর্মনিকে অবিশ্বাস করেছে সে পর্যন্ত বুঝে গেল যুগের পরিবর্তন হয়েছে। দস্তী দ্য গল্ আলিঙ্গন করলেন বৃদ্ধ আডেনাওয়ারকে। ইংরেজ মর্মাহত হল। জর্মন ফরাসীকে বিভক্ত রেখে, অর্থ-সংগ্রহার্থে দু দলকে লড়িয়ে দিয়ে, সে দাবড়াতো ইয়োরোপময়।

জর্মনি ইয়োরোপ আমেরিকার জাতিসমাজে আসন পেল।

যে জর্মন জনসাধারণকে বিশ্বজন নরাধম দানব বলে ধরে নিয়েছিল তারা ভদ্রজনরূপে স্বীকৃত হল।

পশ্চিম ইয়োরোপ তথা আমেরিকা যে-সব অর্থনৈতিক, সামরিক, রাজনৈতিক সন্ধিচুক্তি তৈরী করছিল তার সর্বোচ্চ স্তরের সব কটিতেই জর্মনি আসন পেল।

এবং আমরা—যারা—এ দেশে বাস্তুহারা সমস্যা নিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত অবিশ্বাস্য বলে মনে করি যে আডেনাওয়ারদের নেতৃত্বে পশ্চিম জর্মনি স্থান করে দিল তার আপন শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে, পূর্ব জর্মনি থেকে থেকে আগত এক কোটি বিশ লক্ষ বাস্তুহারাকে—তাদের জীবনমানে ও পশ্চিম জর্মনির জীবনমানে আজ আর এতটুকু পার্থক্য নেই, আমি স্বচক্ষে ১৯৫৮ এবং পুনরায় ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে দেখে এসেছি। কোনও লক্ষ্মীছাড়া দণ্ডকারণ্যে গিয়ে বাস্তুহারাদের বাস্তুভিটে-ঘুঘু-রূপ ধারণ করতে হয়নি।

এবং বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়, এই, আপাতদৃষ্টিতে নৈরাশ্যপূর্ণ গুরুভার আডেনাওয়ার এগিয়ে গিয়ে আপন স্কন্ধে তুলে নিলেন তাঁর জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে, রাষ্ট্রজনকরূপে, তেয়াত্তর বৎসর বয়সে।

এ যুগকে সমসাময়িক জর্মন ইতিহাসে বলা হয়, 'আডেনাওয়ার এ্যারা'—'আডেনাওয়ার যুগ'।

এবং এ যুগের এখনও শেষ হয়নি। বিসমার্ককে বিতাড়িত করার পর কাইজার তাঁর রাজনীতি সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিলেন, ৮৭ বছর বয়সে বৃদ্ধ (?) অবসর গ্রহণ করার পর যে দুজন চ্যান্সেলার পর পর নিযুক্ত হলেন তাঁরাও বৃদ্ধের কর্মাদর্শ কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছেন।[১]

অবসর গ্রহণের পর তিনি বৃহৎ তিন খণ্ডে লেখেন তাঁর জীবনস্মৃতি। তৃতীয় খণ্ড প্রেসে পাঠানোর কয়েক সপ্তাহ পর তিনি গত হন।

মৃত্যুর আটদিন পূর্ব পর্যন্ত তাঁর কর্মক্ষমতা অটুট ছিল। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কীজিংগার

---

১ জর্মানগণ বৃদ্ধ আডেনাওয়ারকে ভক্তি ও ভালবাসা সহ ডাকনাম দেয় 'ড্যার আলটে (ওল্ড ম্যান), তাঁর পরের চ্যানসেলারকে সহাস্যে ডাকনাম দেয় 'ড্যার ডিকে' (ফ্যাট ম্যান)।

www.BanglaBook.org

আডেনাওয়ারের শোকসভাতে বলেন, 'কয়েক দিন পূর্বেও র‍্যোনডর্‌ফ্‌ গ্রামে যান, ''বৃদ্ধের'' কাছ থেকে পথনির্দেশ গ্রহণ করতে।'[১] এই শেষ দর্শনের সময় তিনি কীজিংগারকে বিভক্ত জর্মনি সম্বন্ধে দুঃখপ্রকাশ করেন। শেষ কথা বলেন, 'আজ যে ধুলো আর কুয়াশাতে পৃথিবী ঢাকা সেটা যখন পরিষ্কার হবে তখন যেন কেউ না বলে, আমি আমার কর্তব্য করিনি।'

* * *

বিশ্বজন সম্পূর্ণ একমত যে :—

১) আডেনাওয়ার পদদলিত জর্মনিকে লুপ্ত-আত্মসম্মানবোধ এনে দেন ও ইওরোমেরিকার রাষ্ট্রসমাজে তার জন্য গৌরবের আসন নির্মাণ করেন,

২) চিরবৈরী ফ্রান্সের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনা করেন,

৩) এক কোটি বিশ লক্ষ বাস্তুহারাকে পরিপূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।

তিনি মাত্র একটি আশা সফল করতে পারেননি :—

দ্বিখণ্ডিত জর্মনিকে একত্র করতে পারেননি।

* * *

এস্থলে আমি শুধু দুইটি বিষয় উল্লেখ করবো :—

হ্যার ভাইমার স্বর্গত আডেনাওয়ারের উত্তম জীবনী লিখেছেন। আর পাঁচখানা বিদেশী বইয়ের মত এটিও আমার পক্ষে যোগাড় করা সম্ভব হয়নি—বিদেশী মুদ্রা ও বিদেশী পুস্তক-বিক্রেতাদের 'কৃপায়'।

জর্মন বেতার এই উৎকৃষ্ট পুস্তক থেকে একাধিক অনুচ্ছেদ পড়ে শোনায়।

তারই একটিতে আছে, আডেনাওয়ারের পুত্র উক্ত লেখককে বলেন, 'আমার পিতার মাথার উপর যখন সমস্ত জর্মনির দায়িত্ব তখন আমার মা গত হন। সঙ্গে সঙ্গে পিতা তাঁর দৈনন্দিন রুটিন আমূল পরিবর্তন করে দিলেন, যাতে করে আমরা আরও বেশি সময় ধরে তাঁর সঙ্গলাভ করতে পারি। এর পর থেকে সফরে গেলে আমাদের জন্য প্রতিটিবার সওগাৎ আনতে কখনও তাঁর ভুল হত না।'

আডেনাওয়ার আপন দেশকে বঞ্চিত করেননি, পরিবারের প্রিয়জনকেও বঞ্চিত করেননি।

যে উচ্চকাঙ্ক্ষা স্বার্থপরতা তথা আত্মম্ভরিতার বিকৃত রূপ ধারণ করে, সে কখনওই কোনও প্রকারের ত্যাগ বরণ করতে পারে না, কিন্তু যে উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আদর্শবাদ অঙ্গাঙ্গী বিজড়িত সেখানে প্রকৃত মহাপুরুষ সামান্য শিশুটির দাবির মূল্যও দিতে জানেন। 'রাজকার্য', 'সমাজসেবী', 'রাষ্ট্রের আহ্বান'—এসব গালভরা কথার দোহাই দিয়ে যারা

---

১ আডেনাওয়ার গত হন ভারতীয় সময় অনুযায়ী বিকেল ৫-৫১ মিনিটে। যে জর্মন বেতার ভারতের জন্য প্রোগ্রাম দেয় সেটি আডেনাওয়ারের প্রিয় কলনেই অবস্থিত—সে ভারতের প্রোগ্রাম আরম্ভ করে বিকেল ৬-৫০ মিনিটে। আমি তখনই খবরটা শুনি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এর পর, পর পর কয়েকদিন সন্ধ্যায় কালবৈশাখীর দরুন হয় বিজলি বন্ধ হয়ে যায় বলে, নয় রিসেপশন খারাপ ছিল বলে ল্যুবকে, গার্‌স্‌টেনমায়ার তথা চ্যানসেলার কীজিংগারের বক্তৃতা ভালো করে বোঝা যায়নি। ২৫ এপ্রিল গোরের দিনও আবহাওয়া খারাপ ছিল।

www.BanglaBook.org

শিশু, বৃদ্ধ, আতুর-অকর্মণ্য জনকে অবহেলা করে, তাদের আদর্শবাদ-এর অস্থিমজ্জা তাদের আপন স্বার্থপরতার উচ্চাকাঙ্ক্ষা দিয়ে গঠিত।

শিষ্যসমাবৃত হয়ে প্রভু যীশু ইহজীবনের উচ্চতম আদর্শ, পরজীবনের চরম কাম্য নিয়ে যখন আলোচনা করছেন, উপদেশ দিচ্ছেন, তখনও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি যে শিশুরা তাঁর কাছে আসতে চায়। আদেশ দিলেন—'শিশুদের আসতে দাও আমার কাছে।'

শিষ্যেরা যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন, "Who is the greatest in the Kingdom of heaven ?"

And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them.

* * *

হিটলারের আত্মহত্যার কাহিনী আমি অন্যত্র লিখেছি। তাঁর আত্মহত্যার পর কি হয়েছিল সেটা তার চেয়ে কিছুমাত্র কম বিস্ময়জনক বা কৌতূহলোদ্দীপক নয়, বিশেষত নরদানব মারটিন বরমান তার সঙ্গে বিজড়িত আছেন বলে। কিন্তু সে কাহিনী ভিন্ন এবং এখানেও আমি মাত্র সেইটুকুরই সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করবো যেটুকু আডেনাওয়ারের ব্যক্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করার জন্য নিতান্তই প্রয়োজন।

হিটলার যে সময়ে আত্মহত্যা করেন (বেলা ১৫-৩০/৪৫, ৩০শে এপ্রিল ১৯৪৫), সে সময়ে রুশবাহিনী মাত্র কয়েকশ' গজ দূরে তাঁর বাসভবনের চতুর্দিকে ব্যূহ নির্মাণ করেছে। এ ব্যূহ ভেদ করে মার্কিন অধিকৃত অঞ্চলে পৌঁছবার চেষ্টা করেন তাঁর নিতান্ত অন্তরঙ্গ সাঙ্গোপাঙ্গ এবং কর্মচারীবৃন্দ যাঁরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেননি। এঁদের ভিতর ছিলেন সেক্‌রেটারি বরমান, দুই মহিলা স্টেনো, পাচিকা, খাসচাকর লিঙে, দেহরক্ষীদল, সার্জন, শোফার ইত্যাদি ইত্যাদি। এঁদের অন্যতম হিটলারের খাস পাইলট বাওর—সৈন্যবাহিনীতে তাঁর র‍্যাঙ্ক ছিল জেনারেলের। ইনি পালাবার সময় শুধু ধরা পড়েন তাই নয়, মেশিনগানের গুলিতে একখানা পা এমনই জখম হয় যে পরে সেটা কেটে ফেলতে হয়।

দীর্ঘ দশটি বৎসর রাশার খ্যাত কুখ্যাত বহু প্রকারের জেল, সেল্, বন্দী শিবিরে অবর্ণনীয় কষ্টযন্ত্রণা ভোগ করার পর ইনি মুক্তি পান। পূর্বেই বলেছি দেশে ফিরে একখানা বই লেখেন যার নাম, "হিটলা'রজ পাইলট"। পূর্ণ দশটি বৎসর বাওর এবং অন্যান্য জর্মন বন্দীরা কী নিদারুণ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত দেশে ফিরতে সক্ষম হন তার বর্ণনা দেবার মত কল্পনাশক্তি, স্পর্শকাতরতা, কলমের জোর আমার কিছুই নেই। যে নিপীড়নে মানুষ হাঙারস্ট্রাইক করে, ছুটে গিয়ে দেয়ালে মাথা ঠুকে আত্মহত্যার চেষ্টা দেয় তার বর্ণনা দিয়েছেন বাওর। আমার কাছে যেটা নিদারুণতম বলে মনে হয় সেটা—পরিপূর্ণ নৈরাশ্যের তমিস্র অন্তহীন রজনী—'এ বন্দীদশা থেকে ইহজন্মে আমার মুক্তি নেই'।

এবং আমার মনে হয়, তার চেয়েও 'কষ্টের বিকৃত হ্রাস বৃদ্ধির বিকট ভঙ্গি' যদি কিছু থাকে তবে সেটা ঐ 'অন্ধকারের ছলনার ভূমিকা'। কি সে ছলনা? মাঝে মাঝে খবর গুজোব রটে, বন্দীদের হয়তো বা মুক্তি দেওয়া হবে। আলেয়ার আলো দপ করে জ্বলে ওঠে ক্ষণতরে—আবার সেই সুদীর্ঘ নিরন্ধ্র অমানিশা।

জর্মনিতে চিরকালই দুটি দল। একদল পূর্বপন্থী—রাশার সঙ্গে মৈত্রী কামনা করে।

www.BanglaBook.org

আডেনাওয়ার পশ্চিমপন্থী, রুশবৈরী। বিশেষত যে রুশ হাজার হাজার যুদ্ধবন্দী জর্মনদের দশ বৎসর পরেও কিছুতেই মুক্তি দেবে না।

রুশ 'ঘোড়া-বিক্‌কিরী'র ব্যবসা করতে চায়। যুদ্ধবন্দী বাওর ইত্যাদি 'ঘোড়া'র বদলে সে চায় আডেনাওয়ার কর্তৃক রুশকে রাষ্ট্রহিসাবে স্বীকৃতিদান, এবং পূর্ব জর্মনিকেও সে পশ্চিম জর্মনির সঙ্গে সম্মিলিত হবে দেবে না। হয়তো এটা অন্যায় নয়। হিটলার রুশ দেশে যা করে গেছেন তার বদলে এ তো সামান্য। কিন্তু আডেনাওয়ার তো আর হিটলারের প্রিয়পুত্র যুবরাজ প্রিন্‌স অব্‌ ওয়েলস রূপে পিতার সিংহাসনে বসেননি যে হিটলারের সর্ব অপকর্মের জন্য তার 'মূল্য' দেবেন। বরং হিটলার তাঁকে করেছিলেন লাঞ্ছিত অপমানিত কারারুদ্ধ।

এবং তার চেয়েও বক্র পরিহাস—যে নাৎসি পারটির মারফৎ তিনি আডেনাওয়ারকে কারারুদ্ধ করেছিলেন সেই পারটিরই বহু গণ্যমান্য সদস্য, জাঁদরেল, অ্যাডমিরাল, হিটলারের আপন বয়স্যসখা রয়েছেন এই যুদ্ধবন্দীদের ভিতর। আডেনাওয়ারকে নতিস্বীকার করতে হবে এদেরও মুক্তির জন্য! এবারে শুনুন বাওর কি বলছেন : "But the-then the much-abused (অর্থাৎ নাৎসি কর্তৃক অপমানিত-লেখক) Adenauer came to Moscow, and our camp was wild with rumours. Our hopes rocketed from zero to feverpoint–and then fell back again. This Latter was when Bulganin publicly proclaimed that we were the scum of the earth, and that our crimes had robbed us of human semblance. We cautiosuly but closely followed the course of Adenauer's hard-fought negotiations, and we could sense that even the Russians respected the determination and integrity of the old man." ('বৃদ্ধ' সাদরে বলা হল—লেখক)

সৃষ্টিকর্তার লীলা বোঝে কে? একদিন সত্য সত্যই খবর এল বাওরাদি অনেকেই মুক্তিলাভ করবেন। একদল বন্দী যাবেন মস্‌কো থেকে পশ্চিম জর্মনির ম্যুনিক—যেখানে বাওরের মা-বউ আছেন। এ-মুক্তি যাত্রার বর্ণনা দিতে গিয়ে বাওর বলছেন, 'the memory of the journey is like a film that keeps breaking off.' প্রতিটি জর্মন গ্রামের ভিতর দিয়ে ট্রেন যাবার সময় উল্লাসে উত্তেজিত জনতা ছুটে আসছে ট্রেনের দিকে, বাচ্চাদের হাতে রঙিন ফানুসের জ্বলন্ত মোমবাতি, গির্জায় গির্জায় চলেছে অবিরত হর্ষোল্লাসের ঘণ্টাধ্বনি। নার্সরা ছুটে আসছে খাবার নিয়ে—

থাক্‌। আমার কলম অতি সাধারণ; এসবের সার্থক বর্ণনা দিতে পারেন যাঁদের লেখনী অসাধারণ, কিংবা বাওরের মত লোক যাঁরা লেখক নন কিন্তু অভিজ্ঞতা আছে।

এবং এর করুণ দিকটা বাওর চেপে গেছেন। যেসব পিতা মাতা জায়া এসেছিল আপন আপন আত্মজনের প্রত্যাশায়—যদিও তাদের বলা হয়েছে যে, সেসব আত্মজনের অনেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত, কিংবা মিসিং, কিংবা মুক্তি পাবে কিনা স্থির নেই—এবং যারা ফিরেছে তাদের নাম উচ্চকণ্ঠে পড়া শেষ হয়ে গেলে যখন বুঝলো তাদের আত্মজন ফেরেনি, তখন—।

* * *

আডেনাওয়ারের কীর্তিকলাপ একদিন হয়তো বিশ্বজন ভুলে যাবে, কিন্তু বহু বহু জর্মন

www.BanglaBook.org

পরিবার কি বংশপরম্পরা স্মরণে আনবে না—কে তাদের পিতা, পিতামহ, বা প্রপিতামহকে একদা ফিরিয়ে এনেছিল তার বিস্মৃতপ্রায় সুখনীড়ে, দারাপুত্র পিতামাতার মাঝখানে? যার অবশ্যম্ভাবী গোর ছিল সুদূর সাইবেরিয়ার অন্তহীন তুষারাস্তরণের নিম্নে, সে কার দৈববলে হঠাৎ একদিন ফিরে এসে মুছে দিল জননী জায়ার আঁখিবারি!

জুন, ১৯৬৭॥

বিদ্রোহী

ইংরেজ কবি পার্সি বিশ্ শেলির মধ্য-শব্দটি আমরা উচ্চারণ কবতুম বিশী, কারণ অন্তে রয়েছে 'e' অক্ষরটি এবং তাই আমরা বাল্যবয়সে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীর সঙ্গে ইংরেজ কবি শেলির সাদৃশ্য দেখতে পেতুম। তিনি মোলায়েম প্রেমের কবিতা লিখতেন, কিন্তু ওদিকে তিনি আবার ছিলেন মাহমুদ বাদশার মত প্রতিমাবিনাশধর্মী—এ সংসারে যত প্রকারের false idols, false ideals, অন্ধবিশ্বাস, ভক্তিভরে কুমড়ো গড়াগড়ি, যা-কিছু বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভর করে না—তার বিরুদ্ধে ছিল বিশীদার জিহাদ। তাই তিনি কবিতাগুলিকে পরাতেন প্রাচীন আসামের ছদ্মবেশ। নজরুল ইসলাম তখন সবে ধূমকেতুর মত আত্মপ্রকাশ করেছেন। বিদ্রোহী কাজীকবি পরশুরাম হলে (ক্ষত্রিয়, ফিরিঙ্গি বিনাশার্থে তাঁর অবতরণ) প্রমথনাথ তাঁরই অনবচ্ছিন্ন পূর্ববর্তী বামনাবতার। তাই তিনি অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সেই হয়ে যান বারনারড শ'র প্রতি আসক্ত। এখনও আরও একটি সাদৃশ্য পাঠক পাবেন। বারনারড শ' ছিলেন প্রতিমাবিনাশী। তাঁর আদর্শ চরিত্র, সেই ব্ল্যাক গার্ল ওলড টেসটামেনটের দেবতাগুলোকে তার ডাণ্ডা দিয়ে ক্রমাগত ভেঙে যাচ্ছে আর খুঁজে বেড়াচ্ছে শাশ্বত ভগবানকে।

প্রমথনাথ তাঁর ডাণ্ডা—নব্‌কেরি নিয়ে আক্রমণ করতেন—প্রধানত বাঙালীর জড়ত্বকে। শান্তিনিকেতন আশ্রমও রেহাই পেত না।

এটা এল কোথা থেকে!,

আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের চতুর্দিকে যে-সব অন্ধস্তাবক সম্প্রদায় রবীন্দ্রনাথকে প্রায় কর্তাভজাদের গুরুর আসনে বসাতে চাইতেন তার বিরুদ্ধে ছিল কিশোর প্রমথর ঘোরতর 'উষ্মা'। এদেরও ছাড়িয়ে যেতেন বাইরের থেকে—প্রধানত কলকাতা থেকে—আসতেন যে-সব স্তাবক সম্প্রদায়। এঁদের কেউ কেউ বিলিতি ডিগ্রীধারী, জামাকাপড় চোস্তদুরুস্ত—কাঁধে ক্যামেরা ঝোলানো।

এদেরই মুখ দিয়ে ডি এল রায় বলিয়েছিলেন, কবিগুরুর উদ্দেশে:

'মর্তভূমে অবতীর্ণ কুইলের কলম হস্তে
কে তুমি হে মহাপ্রভু নমস্তে নমস্তে!'

কিন্তু এর পর-পরই রায় করলেন ভুল; রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে বলালেন ঝুট কথা :

'আমি একটা উচ্চ কবি, এমর্সনারা উচ্চ,
শেলি ভিক্টোর য়্যুগো মাইকেল আমার কাছে তুচ্ছ!'

এরকম ধারণা রবীন্দ্রনাথ তো পোষণই করতেন না—বলা দূরে থাক্। তিনি ছিলেন শেলির ভক্ত। বস্তুত তিনি বার বার আমাদের পড়িয়েছেন শেলির কবিতা। আমার বিশ্বাস,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রবীন্দ্রনাথই বিশীদাকে শেলির প্রতি অনুরক্ত হবার পথ দেখিয়ে দেন।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথ এই অন্ধস্তাবকদের নিয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁর ধৈর্যচ্যুতি যখন ঘটলো তখন দুর্ভাগ্যক্রমে একাধিক সত্য গুণগ্রাহীকেও তাঁর কাছ থেকে অযথা কটুবাক্য শুনতে হল। ইরাণী কবি তাই বলেছেন :

দাবানল যবে দগ্ধদাহনে বনস্পতিরে ধরে
শুষ্কপত্রে, আর্দ্রপত্রে তফাৎ কিছু না করে।

পাঠকের স্মরণে আসতে পারে রবীন্দ্রনাথের অপ্রিয় সত্যভাষণ—যখন তাঁর নোবেল পুরস্কার পাওয়া উপলক্ষে কলকাতা থেকে বহুলোক শান্তিনিকেতনে এসে তাঁকে অভিনন্দন জানান। আমার যতদূর জানা, বালক প্রমথনাথ সে-সভায় উপস্থিত ছিলেন।

কিন্তু এহ বাহ্য। অন্ধস্তাবকদের চিনতে আমাদের বেশী সময় লাগেনি। কারণ এঁদের কেউ কেউ—বিশেষত বিলেতফের্তারা, শর ভাষায় উয়েল শেভ্‌ড্ এন্ড উয়েল সোপ্‌ড্, আসতেন আমাদের মত ডর্মিটারীবাসী নিরীহদের উপর ফপরদালালী করতে। তখন অনেক ক্ষেত্রেই ধরা পড়ে যেত, শব্দসমন্বয় দ্বারা যে আলিম্পন সৃষ্ট হয়ে লিরিক উচ্ছ্বসিত হয় সে রসে তাঁরা বঞ্চিত, রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুর এবং কথা কি রকম অদ্ভুত অদ্ভুত এক্সপেরিমেন্টের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে অভূতপূর্ব সমন্বয়জনিত রসসৃষ্টি করেছে যে বিষয়ে পরিপূর্ণ জড়ভরত। এঁদের কেউ কেউ ছিলেন আবার পয়লা-নম্বরী ব্লাফমাস্টার। তিনি যে অন্ধস্তাবক নন সেইটে বোঝাবার জন্য একজন আমাকে বলেন, "পূব হাওয়াতে দেয় দোলা, মরি মরি—এই 'মরি মরিটা' কেমন যেন বস্তা-পচা বলে মনে হয় না।" আমি বিস্ময়ে নির্বাক। অতি মহৎ কবিই যে হ্যাকনিড ক্লিশের নূতন ব্যবহার করে নবীন রস সৃষ্টি করেন এ তত্ত্বটা ফিরিঙ্গি-মার্কা গ্র্যাড়ুয়েট জানে না? আমার তো মনে হত, এস্থলে 'মরি মরি' ভিন্ন অন্য কিছুই মানাতো না।

কিন্তু বিশীদা ছিলেন কালাপাহাড়। আশ্রমের সে সময়কার ভাষায় এদের হুট্ করে দিতে তাঁকে অতিমাত্রায় বেগ পেতে হত না। তাঁকে দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হত আশ্রমের ভিতরকার অন্ধস্তাবকদের নিয়ে। বিশেষ করে বিচারসভায় অর্থাৎ আশ্রম পরিচালনার ব্যাপার নিয়ে।

শান্তিনিকেতনের বয়স তখন কত? একুশ-বাইশের মত। এত অল্প সময়ের মধ্যে কোনও ট্রাডিশন, ঐতিহ্য, আচার নির্মিত হতে পারে না। বিশেষত গুরু রবীন্দ্রনাথই করে যাচ্ছেন নানা প্রকারের এক্সপেরিমেন্ট। একবার ভেবে দেখলেই হয়, আশ্রম প্রবর্তনের সময় ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণে একই পংক্তিতে ভোজন করতো না, কিছুদিন পরে একজন কায়স্থ শিক্ষক আসছেন শুনে কর্তৃপক্ষ সন্ত্রস্ত, ব্রাহ্মণ শিষ্য এই অব্রাহ্মণ গুরুর পদধূলি প্রতি প্রাতে নেবে কিনা! তারই পনেরো বৎসর পর আমি যখন পৌঁছলুম তখন সে-সব সমস্যা অন্তর্ধান করেছে। ইতিমধ্যে মৌলানা শওকৎ আলী সাধারণ ভোজশালয়ে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ ব্রাত্য সকলের সঙ্গে একই পঙক্তিতে ভোজন করে গেছেন।

তবু হিন্দু মন সর্বক্ষণ খুঁত খুঁত করে আচারের সন্ধানে। সে চায়, সর্ব সমস্যার সামনে সে যেন নজীর দেখাতে পারে, 'এটা পূর্বে এ রকম পদ্ধতিতে হয়েছে, অতএব এবারেও সেই রকম হওয়া উচিত—এটা এ রকম হয়নি, অতএব এবারে হবে না', তাতে করে নবাগত ছাত্রের অসুবিধা হোক আর না-ই হোক। মুসলমান যে এ বাবদে দুর্দান্ত প্রগতিশীল

www.BanglaBook.org

পরিবার কি বংশপরম্পরা স্মরণে আনবে না—কে তাদের পিতা, পিতামহ, বা প্রপিতামহকে একদা ফিরিয়ে এনেছিল তার বিস্মৃতপ্রায় সুখনীড়ে, দারাপুত্র পিতামাতার মাঝখানে? যার অবশ্যম্ভাবী গোর ছিল সুদূর সাইবেরিয়ার অন্তহীন তুষারাস্তরণের নিম্নে, সে কার দৈববলে হঠাৎ একদিন ফিরে এসে মুছে দিল জননী জায়ার আঁখিবারি!

জুন, ১৯৬৭॥

বিদ্রোহী

ইংরেজ কবি পার্সি বিশ্ শেলির মধ্য-শব্দটি আমরা উচ্চারণ করতুম বিশী, কারণ অন্তে রয়েছে 'e' অক্ষরটি এবং তাই আমরা বাল্যবয়সে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীর সঙ্গে ইংরেজ কবি শেলির সাদৃশ্য দেখতে পেতুম। তিনি মোলায়েম প্রেমের কবিতা লিখতেন, কিন্তু ওদিকে তিনি আবার ছিলেন মাহমুদ বাদশার মত প্রতিমাবিনাশধর্মী—এ সংসারে যত প্রকারের false idols, false ideals, অন্ধবিশ্বাস, ভক্তিভরে কুমড়ো গড়াগড়ি, যা-কিছু বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভর করে না—তার বিরুদ্ধে ছিল বিশীদার জিহাদ। তাই তিনি কবিতাগুলিকে পরাতেন প্রাচীন আসামের ছদ্মবেশ। নজরুল ইসলাম তখন সবে ধূমকেতুর মত আত্মপ্রকাশ করেছেন। বিদ্রোহী কাজীকবি পরশুরাম হলে (ক্ষত্রিয়, ফিরিঙ্গি বিনাশার্থে তাঁর অবতরণ) প্রমথনাথ তাঁরই অনবচ্ছিন্ন পূর্ববর্তী বামনাবতার। তাই তিনি অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সেই হয়ে যান বারনারড শ'র প্রতি আসক্ত। এখনও আরও একটি সাদৃশ্য পাঠক পাবেন। বারনারড শ' ছিলেন প্রতিমাবিনাশী। তাঁর আদর্শ চরিত্র, সেই ব্ল্যাক গার্ল ওলড টেসটামেনটের দেবতাগুলোকে তার ডাণ্ডা দিয়ে ক্রমাগত ভেঙে যাচ্ছে আর খুঁজে বেড়াচ্ছে শাশ্বত ভগবানকে।

প্রমথনাথ তাঁর ডাণ্ডা—নব্‌কেরি নিয়ে আক্রমণ করতেন—প্রধানত বাঙালীর জড়ত্বকে। শান্তিনিকেতন আশ্রমও রেহাই পেত না।

এটা এল কোথা থেকে!,

আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের চতুর্দিকে যে-সব অন্ধস্তাবক সম্প্রদায় রবীন্দ্রনাথকে প্রায় কর্তাভজাদের গুরুর আসনে বসাতে চাইতেন তার বিরুদ্ধে ছিল কিশোর প্রমথর ঘোরতর 'উষ্মা'। এদেরও ছাড়িয়ে যেতেন বাইরের থেকে—প্রধানত কলকাতা থেকে—আসতেন যে-সব স্তাবক সম্প্রদায়। এঁদের কেউ কেউ বিলিতি ডিগ্রীধারী, জামাকাপড় চোস্তদুরুস্ত—কাঁধে ক্যামেরা ঝোলানো।

এদেরই মুখ দিয়ে ডি এল রায় বলিয়েছিলেন, কবিগুরুর উদ্দেশে:

'মর্তভূমে অবতীর্ণ কুইলের কলম হস্তে
কে তুমি হে মহাপ্রভু নমস্তে নমস্তে!'

কিন্তু এর পর-পরই রায় করলেন ভুল; রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে বলালেন ঝুট কথা :

'আমি একটা উচ্চ কবি, এমর্সনরা উচ্চ,
শেলি ভিক্টোর য়্যুগো মাইকেল আমার কাছে তুচ্ছ!'

এরকম ধারণা রবীন্দ্রনাথ তো পোষণই করতেন না—বলা দূরে থাক্। তিনি ছিলেন শেলির ভক্ত। বস্তুত তিনি বার বার আমাদের পড়িয়েছেন শেলির কবিতা। আমার বিশ্বাস,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রবীন্দ্রনাথই বিশীদাকে শেলির প্রতি অনুরক্ত হবার পথ দেখিয়ে দেন।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথ এই অন্ধস্তাবকদের নিয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁর ধৈর্যচ্যুতি যখন ঘটলো তখন দুর্ভাগ্যক্রমে একাধিক সত্য গুণগ্রাহীকেও তাঁর কাছ থেকে অযথা কটুবাক্য শুনতে হল। ইরাণী কবি তাই বলেছেন :

দাবানল যবে দগ্ধদাহনে বনস্পতিরে ধরে
শুষ্কপত্রে, আর্দ্রপত্রে তফাৎ কিছু না করে।

পাঠকের স্মরণে আসতে পারে রবীন্দ্রনাথের অপ্রিয় সত্যভাষণ—যখন তাঁর নোবেল পুরস্কার পাওয়া উপলক্ষে কলকাতা থেকে বহুলোক শান্তিনিকেতনে এসে তাঁকে অভিনন্দন জানান। আমার যতদূর জানা, বালক প্রমথনাথ সে-সভায় উপস্থিত ছিলেন।

কিন্তু এহ বাহ্য। অন্ধস্তাবকদের চিনতে আমাদের বেশী সময় লাগেনি। কারণ এঁদের কেউ কেউ—বিশেষত বিলেতফের্তারা, শর ভাষায় উয়েল শেভ্‌ড্ এন্ড উয়েল সোপ্‌ড্, আসতেন আমাদের মত ডর্মিটারীবাসী নিরীহদের উপর ফপরদালালী করতে। তখন অনেক ক্ষেত্রেই ধরা পড়ে যেত, শব্দসমন্বয় দ্বারা যে আলিম্পন সৃষ্ট হয়ে লিরিক উচ্ছ্বসিত হয় সে রসে তাঁরা বঞ্চিত, রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুর এবং কথা কি রকম অদ্ভুত অদ্ভুত এক্সপেরিমেন্টের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে অভূতপূর্ব সমন্বয়জনিত রসসৃষ্টি করেছে যে বিষয়ে পরিপূর্ণ জড়ভরত। এঁদের কেউ কেউ ছিলেন আবার পয়লা-নম্বরী ব্লাফমাস্টার। তিনি যে অন্ধস্তাবক নন সেইটে বোঝাবার জন্য একজন আমাকে বলেন, "পূব হাওয়াতে দেয় দোলা, মরি মরি—এই 'মরি মরিটা' কেমন যেন বস্তা-পচা বলে মনে হয় না।" আমি বিস্ময়ে নির্বাক। অতি মহৎ কবিই যে হ্যাকনিড ক্লিশের নূতন ব্যবহার করে নবীন রস সৃষ্টি করেন এ তত্ত্বটা ফিরিঙ্গি-মার্কা গ্র্যাড়য়েট জানে না? আমার তো মনে হত, এস্থলে 'মরি মরি' ভিন্ন অন্য কিছুই মানাতো না।

কিন্তু বিশীদা ছিলেন কালাপাহাড়। আশ্রমের সে সময়কার ভাষায় এদের হুট্ করে দিতে তাঁকে অতিমাত্রায় বেগ পেতে হত না। তাঁকে দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হত আশ্রমের ভিতরকার অন্ধস্তাবকদের নিয়ে। বিশেষ করে বিচারসভায় অর্থাৎ আশ্রম পরিচালনার ব্যাপার নিয়ে।

শান্তিনিকেতনের বয়স তখন কত? একুশ-বাইশের মত। এত অল্প সময়ের মধ্যে কোনও ট্রাডিশন, ঐতিহ্য, আচার নির্মিত হতে পারে না। বিশেষত গুরু রবীন্দ্রনাথই করে যাচ্ছেন নানা প্রকারের এক্সপেরিমেন্ট। একবার ভেবে দেখলেই হয়, আশ্রম প্রবর্তনের সময় ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণে একই পংক্তিতে ভোজন করতো না, কিছুদিন পরে একজন কায়স্থ শিক্ষক আসছেন শুনে কর্তৃপক্ষ সন্ত্রস্ত, ব্রাহ্মণ শিষ্য এই অব্রাহ্মণ গুরুর পদধূলি প্রতি প্রাতে নেবে কিনা! তারই পনেরো বৎসর পর আমি যখন পৌঁছলুম তখন সে-সব সমস্যা অন্তর্ধান করেছে। ইতিমধ্যে মৌলানা শওকৎ আলী সাধারণ ভোজনালয়ে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ ব্রাত্য সকলের সঙ্গে একই পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করে গেছেন।

তবু হিন্দু মন সর্বক্ষণ খুঁত খুঁত করে আচারের সম্বন্ধে। সে চায়, সর্ব সমস্যার সামনে সে যেন নজীর দেখাতে পারে, 'এটা পূর্বে এ রকম পদ্ধতিতে হয়েছে, অতএব এবারেও সেই রকম হওয়া উচিত—এটা এ রকম হয়নি, অতএব এবারে হবে না', তাতে করে নবাগত ছাত্রের অসুবিধা হোক আর না-ই হোক। মুসলমান যে এ বাবদে দুর্দান্ত প্রগতিশীল

www.BanglaBook.org

তা নয়, সেও ইনোভেশনকে ডরায় এবং তাকে বলে 'বিদাৎ', কিন্তু ইসলাম মাত্র ১৩০০ বছর পুরনো বলে অতখানি লোকাচার দেশাচারের দোহাই দেয় না।

প্রমথনাথ বিশী ছিলেন এই ট্র্যাডিশন নামক প্রতিষ্ঠানটির দুশমন। বিচার সভা তথা অন্যান্য স্থলে তিনি প্রিসীডেনসের দোহাই শুনতে চাইতেন না। তাঁর বক্তব্য—এবং সেটা সব সময়ই উত্তেজিত কণ্ঠে, পঞ্চমে, তদুপরি তাঁর কণ্ঠস্বরটি ঠিক আব্দুল করীম খানের মত নয়—শুনে আমার মনে হত, তাঁর নীতি;—নূতন সমস্যা যখন এসেছে তখন তার নূতন সমাধান খুঁজতে হবে—এবং যুক্তিবুদ্ধি প্রয়োগ করে—পূর্বে হয়নি, তাই এখন হবে না এটা কোনও কাজের কথা নয়। অবশ্য তিনি যে সব সময় 'রেশনালিটি এবাভ্ অল' সচেতন ভাবে ভলতেরের মত নীতিরূপে গ্রহণ করতেন তা নাও হতে পারে। এমন কি গুরু রবীন্দ্রনাথের মতের বিরোধিতাও তিনি করেছেন। এই নিয়ে বোধ হয় গুরুশিষ্যে মনোমালিন্যও হয়েছে। তবে নিশ্চয় চিরস্থায়ী তো নয়ই, দীর্ঘস্থায়ীও নয়।

প্রমথনাথ জাত সাহিত্যিক। শান্তিনিকেতনে যখন ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে কলেজ স্থাপিত হল—সাধারণ জন একেই বিশ্বভারতী বলে, যেন গোড়ার ইস্কুলটি বিশ্বভারতীর সোপান নয়—তখন রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রণ জানালেন বিশ্বাচার্যদের। তাঁরা এসে পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ করলেন, প্রধানত প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা (এবং সর্বপ্রধানত ইন্ডলজি)—চীন, তিব্বতী ভাষাও বাদ গেল না, এবং লাতিন, ফরাসী, জর্মন ইত্যাদি ইউরোপীয় ভাষা চর্চা। সবাই সেই দয়ে মজলেন। বাঘা বাঘা পণ্ডিত যেমন বিধু শাস্ত্রী, ক্ষিতি শাস্ত্রী, সাহিত্যিক অমিয় চক্র, এস্তেক ক্ষিতিমোহনের সহধর্মিণী 'ঠানদি'—কেউ ফরাসী, কেউ জর্মন, কেউ চীনা, কেউ বা তিব্বতী শিখছেন মাথায় গামছা বেঁধে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নোটবই হাতে নিয়ে লেভির ক্লাসে শিখছেন একাক্ষরপারমিতার ঠিকুজি আর অহিবুধনিয় সংহিতার কুলজি।

শুধু শ্রীপ্রমথ নিশ্চল নির্বিকার। তিনি বেঙ্গল লিতেরাতোর পার একসেলাঁস (litterateur par excellence) বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক। তাঁর কোন প্রয়োজন রজত কাঞ্চন'? এমন কি সংস্কৃত ব্যাকরণ ঘাঁটতেও তিনি নারাজ। হরিবাবু ইস্কুলে যেটুকু শিখিয়ে দিয়েছেন তারই প্রসাদাৎ তিনি কালিদাস শুদ্রক পড়ে নেবেন'খন। শুনেছি লক্ষ্ণৌয়ের খানদানী ঘরের ছেলেকে উর্দু ভিন্ন অন্য কোন ভাষা বলতে দেওয়া হয় না—পাছে বিজাতীয় ভাষা বলতে গিয়ে উর্দুর তরে বিধিনির্মিত তার মুখের ডৌল অন্য ধ্বনির খাতিরে এডজাসটেড হয়ে বিকৃত হয়ে যায়!

বিশ্বভারতীর উত্তর-বিভাগকে (কলেজকে) এহেন নিরঙ্কুশ বয়কট করার পিছনে বিশীদার হৃৎ-কন্দরে সেই 'বিদ্রোহ' ভাব ছিল কিনা হলফ করে বলতে পারিবো না।

কিন্তু বি. এ. এম. এ. তো পাস করতে হয়; নইলে গ্রাসাচ্ছাদন হবে কি প্রকারে?

অতিশয় অনিচ্ছায় তিনি কলকাতার কলেজে ঢুকলেন। তাঁর কলেজ-জীবন সম্বন্ধে আমি বিন্দুবিসর্গ পর্যন্ত জানি নে। এই মর্মান্তিক অধ্যায় তিনি বোধ হয় তাঁর জীবন-পুঁথি থেকে ছিঁড়ে ফেলেছেন। তবে আমি নিঃসন্দেহ, প্রকৃতি-প্রতিষ্ঠান-প্রসাদাৎ তিনি তাঁর কলেজ-জীবনের ন'সিকে কাটিয়েছেন চায়ের দোকানে, মেসের রকে এবং ইহলোক পরলোকের সর্ববিশ্ববিদ্যালয়কে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ্য অভিসম্পাত অনবরত দিতে দিতে। এবং আমি তার চেয়েও নিঃসন্দেহে, এম. এ. পাস করার পর তিনি বঙ্গভাষাসাহিত্য ও তজ্জড়িত তত্ত্ব ও তথ্য ব্যতিরেকে বিশ্ববিদ্যালয়ার্জিত—সাতিশয় ও বিতৃষ্ণা ও চরম

www.BanglaBook.org

জুগুপ্সাসহ অর্জিত—'জ্ঞানগম্যি' শেষনাগের মত, প্রাগুক্ত অহিবুধনিয় সংহিতার অহির বাৎসরিক ত্বকবর্জনন্যায় অক্লেশে পরম পরিতোষ সহকারে ত্যাগ করেছেন—চিরকালের তরে। লোকে যখন শুধোয়, কালচার কি—উত্তরে গুণীজন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়লব্ধ 'জ্ঞানগম্যি' বিস্মৃত হওয়ার পর যেটুকু অবশিষ্ট থাকে সেই কালচার। কিন্তু, প্রমথনাথের কালচার অত্যন্ত কনসানট্রেটেড—নির্যাসেরও নির্যাস। মাত্র একবার, তাও অযত্নে ডেসটিল করা গৌড়ী (rum) বা মধ্বী (mead, meth) খেয়েই মানুষ হয় গড়াগড়ি দেয় নয় ল্যাম্পপোস্ট ধরে চুমো খায়—যেন লঙ লস্ট ব্রাদার। রাজা জহানগির খেতেন 'ডবল ডেসটিল্ড এরেক'। প্রমথনাথের ক্বয়ারিতে পাক বড় কড়া—শতগুণে কড়া।

কিন্তু সেই বিদ্রোহীর কি হয়?

শ'র 'কৃষ্ণও' একদিন হৃদয়ঙ্গম করলো, 'এলোপাতাড়ি লাঠির বাড়ি ধুপুস-ধাপুস মারাতে' কোনও তত্ত্ব নেই। নিছক 'বর্বরস্য শক্তিক্ষয়'। প্রমথ তাই প্রমথেশের মত ধ্যানতাণ্ডবে সম্মেলন করছেন।

কিন্তু বিদ্রোহী থাকবেই।

কেন?

প্রমথর প্রিয় কবি শেলি। তাঁর প্রিয় এবং শ্রেষ্ঠ নায়ক প্রমিথিয়ুস আন্‌বাউন্ড। তিনি দেবাদিদেব দ্যোঃ পিতর, জুপিটারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বর্গলোক হতে অগ্নি নিয়ে এসে মানবসন্তানকে উপহার দেন—যার জন্য তাবৎ সভ্যতাসংস্কৃতির সৃষ্টি। প্রমথগণ ধূর্জটির অনুচর বা 'ইয়েস-মেন' বটেন কিন্তু প্রমথগণ অগ্নিবাহ রূপেও পরিচিত —এঁরা মরীচির পুত্র ও সপ্ত পিতৃগণের প্রমথ। তাই প্রমথ অগ্নির পুত্র। অপরঞ্চ গ্রীক পুরানে আছে প্রমিথিয়ুস নলের (reed,—এবং স্যাকরারা এখনও নল ব্যবহার করে, তথা অগ্ন্যস্ত্র অর্থে নালাস্ত্র, নালিকও ব্যবহৃত হয়) মাধ্যমে পৃথিবীতে অগ্নি আনয়ন করেন। এবং আমাদের কাহিনীতে আছে, নলরাজ ইন্ধন প্রজ্বালনে সুচতুর ছিলেন।[১] এবং এই নলের বিরুদ্ধ দেবতারা যে-রকম লেগেছিলেন (প্রমিথিয়ুসের বিরুদ্ধে জুপিটার) অন্য কারও বিরুদ্ধে না; আমার পুরাণাদির জ্ঞান অতিশয় সীমাবদ্ধ, তাই শপথ দিতে পারছি না, অন্য কোনও মানবীর স্বয়ংবরে দেবতারা সপত্নরূপে অবতরণ করেছিলেন কিনা—দময়ন্তীর বেলা যে রকম করেছিলেন। এবং নলের অন্য নাম প্রমন্থ।[২]

প্রাচীন গ্রীকেরা প্রমিথিয়ুস শব্দের অর্থ করতেন : পূর্বে (প্র) + মতি, চিন্তাকারী (methe), কিন্তু অধ্যাপককুল প্রমিথিয়ুস নিয়েছেন সংস্কৃত 'প্রমন্থ' = অরণি বা সমিধ অর্থে; যে দণ্ড মন্থন, ঘর্ষণ করে অগ্নি জ্বালানো হয়। দ্বিতীয়টিই শুদ্ধ। কারণ metheus— থেকে মথ, মন্থ। নইলে th = থ-এর অর্থ হয় না।

প্রমিথিয়ুস, নল—প্রমথ কখনও বিদ্রোহ করেন, কখনও বশ্যতা স্বীকার করেন। আমাদের প্রমথ শেষ পর্যন্ত কি করেন তার জন্য অত্যাধিক অসহিষ্ণু না হয়ে বলি।

শতং জীব, সহস্রহং জীব।

---

১ 'তিনি (নল) এক মুষ্টি তৃণ গ্রহণপূর্বক সূর্যদেবকে ধ্যান করিবামাত্র ঐ তৃণে সহসা হুতাশন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।' দময়ন্তী সকাশে সৈরিন্ধ্রী কেশিনীর প্রতিবেদন। বন পর্ব

২ এ তত্ত্বটি আমার গুরু আমাকে বলেন কিন্তু আমি এটি কোথাও পাইনি। কেউ জানাতে পারলে বাধিত হব।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রোটকল

শ্রীল শ্রীযুক্ত জলসা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

মহাত্মন,

স্বভাবতই সর্বপ্রথম প্রশ্ন উঠবে, উপরিস্থ পদ্ধতিতে আপনাকে সম্বোধন করবার হক্ক আমার আছে কিনা? অর্থাৎ এটিকেটে বাধে কিনা? আরও সরল আন্তর্জাতিক পরিভাষা ব্যবহার করতে হলে বলবো, আমার এ আচরণ 'প্রোটকল'-সম্মত কিনা।

ভয় নেই। আমি শব্দতত্ত্ব নিয়ে অযথা মাথা ফাটাফাটি করবো না। সামান্যতম যেটুকু নিতান্তই না হলে চলে না তারই দিকে আপনার তথা পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। ভোজনারম্ভে তিক্তবস্তুর ন্যায় যৎসামান্য।

কোনও কোনও শব্দের পরিধি পরিব্যাপ্তি দিন দিন বেড়ে যায়—কোনওটার আবার কমে। এই ধরুন না, 'কনটাক্ট' শব্দটি একদা বোঝাত নিতান্ত স্থূল ভাবে শারীরিক সংস্পর্শে আসা।

সে আমলে যদি কেউ লিখত 'উপমন্ত্রী সুশীলাবালা দাসী গত রাত্রে শ্রীযুক্ত নটবর নায়ককে কনটাক্ট্ করেছেন' তবে সেটা প্রায় অশ্লীলতার পর্যায়ে পড়ে যেত। আজ স্বচ্ছন্দে বলি, 'প্রাচীর নব্যন্যায় অধুনা প্রতীচীর এপিস্-টমলজির কন্টাক্টে আসাতে উভয়ই উপকৃত হয়েছেন।' অবশ্য তার অর্থ কি, আল্লায় মালুম।

প্রোটকল শব্দটির বেলাও তাই হয়েছে। একদা গ্রীক ভাষাতে বোঝাতো;—যেমন ধরুন, আপনার একখানা টাইম-টেবিল আছে। হঠাৎ ইশ্টিশানে পেয়ে গেলেন, হ্যান্ড-বিল-পারা একখানা নোটিশ। তাতে ট্রেনের সময় পরিবর্তনের নবীন ফিরিস্তি রয়েছে। আপনি সেটি আপনার টাইম-টেবিলের যথাস্থানে গঁদ দিয়ে সেঁটে দিলেন। তখন এই কাগজের টুকরোটি পেয়ে গেলেন পৈতে। হয়ে গেলেন প্রোটকল। গেরেমভারী নাম। এ-পাড়ার মেধো হয়ে গেলেন ভিন্‌পাড়ার মধুসূদন।

সরকারি না-হক্ক ট্যাকশো যে রকম বাড়তে বাড়তে পর্বতপ্রমাণ হয়ে যায় এ শব্দটিও আড়াই হাজার বছর ধরে বাড়তে বাড়তে তার 'তনু'টিকে অদ্যকার 'বপু' করে তুলেছে। বেশ এক যুগ পূর্বে এটিকেটের মহানগরী প্যারিসে পররাষ্ট্র বিভাগ বা ফরেন আপিসে একটি ভিন্ন বিভাগ খোলা হয়েছে; তার নাম 'প্রোটকল বিভাগ'। একটা পুরো-পাক্কা আস্ত ডিপারট্‌মেন্ট্।

রাজ্যচালনার কোন্ গুরুভার এঁদের স্কন্ধে সমর্পিত হয়েছে?

বহুবিধ। এমন কি আমার মত লোক না পারলেও আপনি এদের সাহায্য তলব করতে পারেন। অবশ্য কলকাতাতে এরকম পুরো-পাক্কা প্রোটকল্ বিভাগ আছে কিনা, আমি সঠিক জানি নে। ধরুন আছে। আরও ধরুন, আপনি, সম্পাদক মশাই, কোনও পারটিতে নর্থ পোলের কনসাল জেনরেলের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। কথায় কথায় বেরিয়ে গেল তিনি ভারতীয় ফিলমে বড়ই ইনটেরসটেড। পরিচয় নিবিড়তর হল। ইতিমধ্যে তিনি আপনাকে একটি খাসা ডিনারও খাইয়ে দিয়েছেন। সেটি রিটার্ন্ করতে হয়। কনসাল্

www.BanglaBook.org

বিপত্নীক। একটি অবিবাহিত মেয়ের বয়স একুশ—অর্থাৎ 'সোসাইটি করা'র বয়স হয়েছে। অন্য মেয়েটি পল্টনের কেপটেনকে বিয়ে করেছেন। তিনি একা এসেছেন কলকাতায়, বাপের কর্মস্থলে। ওদিকে আপনি সাউথ পোলের কনসুলেট জেনরেল শার্জে দাফেরকেও ঐ দিনই নিমন্ত্রণ করেছেন। তাঁর ভাগিনী ও এক কন্যাও সঙ্গে আসছেন। কন্যাটির স্বামী ছিলেন। তিনি স্বামীর কাছ থেকে সেপারেশন নিয়ে পিতার সঙ্গে বাস করেন। ডিনারে আরও ইনি উনি তিনি আসবেন।

এইবারে আমরা আসছি—ইংরিজিতে যাকে বলে—থিক্ অব্ দ্য বেট্‌ল-এ অর্থাৎ মূল সমস্যায়। আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন প্রিসীডেনস বস্তুটি সাংঘাতিক। আপনি ড্রইংরুমে ককটেলাদি পান করার শেষের দিকে যখন বাটলার এসে আপনার স্ত্রীর সামনে বাও করবে তখন তিনি মুচকি হাসবেন প্রধান অতিথির দিকে। সেই মসিরো ল্য কন্‌স্যুল জেনরেল যেন পবনে ভর করে আপনার স্ত্রীকে এসে দান করবেন তাঁর দক্ষিণ বাহু। তারই উপর 'নির্ভর' করে দুজনাতে এগোবেন খানা-কামরার দিকে। এরপর যাবেন আপনি। কিন্তু দক্ষিণ বাহু দান করবেন কাকে? সাউথ পোলের শার্জে দাফেরের স্ত্রীকে, না নর্থ পোলের অবিবাহিতা কন্যাকে, না কেপটেনের স্ত্রীকে, না কর্নেলের তালাকপ্রাপ্ত মহিলাকে?...এবং তারপর আসবেন কোন্ জোড়া, তারপর, ইত্যাদি।

তাই আপনি সুবুদ্ধিমানের মত পূর্বাহ্নেই ফোন করেছেন, শ্যাফ্ দ্য প্রোটকলকে—অর্থাৎ প্রোটকলের বড় কর্তাকে। অতি অমায়িক লোক। তদুপরি আপনি সম্মানিত কাগজের তারই মত শ্যাফ্, বড় কর্তা। কে কতখানি সম্মান পাবেন, তাদের দফতর ফিষ্টি দিলে আপনার প্রিসীডেনস কি—অর্থাৎ কার আগে কার পরে আপনি খানা-কামরায় ঢুকবেন—তার প্রোটকলে আপনার নাম উঁচুর দিকে। অতএব একগাল হেসে বলবেন,—'সে কি মসিয়ো—(ভুললে চলবে না, আন্তর্জাতিক প্রোটকলের ভাষা এখনও ফরাসিস্!) —আপনি অতখানি আঁবায়াসে (এমবারাস্ট্) হচ্ছেন কেন? এ যে একেবারে ডিমের খোসায় কালবৈশাখী। আপনি তো আর অফিশিয়াট ডিপ্লোমেটিক ডিনার দিচ্ছেন না। কি বললেন? না, না, না—পারদোঁ, আমি আপনার ব্যান-কুয়েটটাকে মোটেই হেনস্থা করছি নে। তবু বলছি, ওটা তো—'

ঐ আনন্দেই থাকুন, সম্পাদক মশাই, ওঁকে বিশ্বাস করেছেন কি মরেছেন।

যতই 'ঘরোয়া' 'বাড়ির ব্যাপার' 'ফেমিলি ওয়ে' বলে নেমন্তন্ন করুন না কেন,—এবারে খাঁটি দিশী তুলনা দিচ্ছি—সেখানে যদি মাছের মুড়োটা আপনার দিদির শ্বশুরকে না দিয়ে দেওয়া হয় আপনার ভাগ্নের শ্যালাকে, তদুপরি উনি কুলীনাগ্র্য কুলীন, আর কালো ছোকরা মৌলিকস্য মৌলিক, তা হলে ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াবে? আমি বলছি না, শ্বশুরমশাই বাড়ি ফিরে এ্যাট হিজ আরলিএস্ট কনভিনিয়েন্স্ আপনার দিদির পিঠে—ছি, ছি, তিনি আবার বৌমা—দু ঘা, না না, তা বলছি নে।

প্রোটকলের শ্যাফ্ সবিশেষ অবগত আছেন যে আপনি তার স্তোকবাক্য সিরিয়সলি নেননি। তিনিই বলবেন।

'সে তো হল। কিন্তু ঐ যে বললেন সাউথ পোলের ডিভোর্স কন্যা—স্বামী ছিলেন কর্নেল—তিনি এখন কি নামে পরিচয় দেন? ঠিক ডিভোর্স তো হয় নি—হয়েছে সেপারেশন।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'সেটা কি ইমপরটেন্ট?'

'ভেরি, ভেরি। মহিলাটি যদি স্বামীর নাম ত্যাগ করে পুনরায় তাঁর মেডেন (কুমারী) নাম, অর্থাৎ তাঁর পিতার নাম গ্রহণ করে থাকেন তবে তিনি পাবেন সেই পরিবারের র‍্যাঙ্ক, নইলে পাবেন কর্নেলের বিবাহিতা স্ত্রীর র‍্যাঙ্ক। তার পর দেখতে হবে—'

ততক্ষণে আপনার মাথাটি তাজ্জিম মাজ্জিম করছে। ভাবছেন, এবারে আর ডিমের খোসাতে টর্নাডো নয়, আপনার কানের টিম্‌পেনামে চলেছে মহাবেগে যুগ্ম রুশমার্কিন নির্মিত স্পুটনিক।

আম্মো ভাবছি আজ যদি ডাচেস অব উইনজর তৃতীয় বারের মত যদি, মানে, ইয়ে হয়ে যান তবে তাঁর নাম কি হবে? শুনেছি, হালে নাকি তিনি লন্ডনে 'জলচল' হয়ে গেছেন। ড্যুককে বয়ের পূর্বে মিসেস সিমসন অবস্থাতে তিনি রজবাড়িতে দাওয়াৎ খেয়েছেন—যদ্যপি রাজমাতা মেরি সে দাওয়াৎ বর্জন করেন। তাঁর সে 'বামনাই' নাকি প্রোটকল-নিন্দিত অপকর্ম হয়েছিল। ঈশ্বরেচ্ছায় তিনি দেহরক্ষা করেছেন। এখন প্রশ্ন, ডাচেস যদি আরেকটা ডিভোর্স নেন তবে তিনি লন্ডনে সাধনোচিত ধাম পাবেন কিনা, অর্থাৎ বকিংহম ধামে নিমন্ত্রিত হবেন কিনা?

হাসছেন? হাসবার জিনিস মোটেই নয়। চাকরি যেতে পারে। রুটি মারা যেতে পারে।

নিন্ হিটলারের যে কোনও প্রামাণিক জীবনী। পড়ুন ঘটনাটা। হিটলার গেছেন ইতালি—স্টেট ভিজিটে। সঙ্গে গেছেন ফরেন আপিসের শ্যাফ্ দ্য প্রোটকল। শ্যাফ্‌টি সাতিশয় খানদানী ঘরের ছেলে। পোষা বেরালটাকে আগে দুধ দিতে হয়, না কুকুরটাকে হাড্ডি—সে প্রোটকল তিনি সাত বছর বয়সেই পারিবারিক কাস্‌লে যুক্তিতর্কসহ সপ্রমাণ করে দিয়েছিলেন।

ইতালির রাজা সর্বান্তঃকরণে ঘেন্না করতেন হিটলারকে—অবশ্য অনুভূতিটা ছিল উভয়পক্ষীয়, সাতিশয় 'বরাবরেষু'! রাজা পাতলেন ফাঁদ, হিটলারকে অপদস্থ করার জন্য। শেষ মুহূর্তে কি একটা হয়ে গেল রদবদল। যার ফলে হিটলার উপস্থিত হলেন কি এক পররে সিভিল ড্রেস পরে, যেখানে আর সবাই য়ুনিফর্মে। কিংবা উল্টোটা।

বিশ্বসংসার জানে হিটলার ছিলেন অত্যন্ত বদ-মেজাজী লোক—যদিও একথাও সত্য যে মিষ্টি ব্যবহার করতে চাইলে তিনি পারমিট-প্রার্থী মেবারবাসীকে তিন লেনথে হারাতে পারতেন—দুষ্টলোকে বলে, তিনি তখন মেঝেতে শুয়ে পড়ে কারপেট চিবুতে আরম্ভ করতেন—তাঁকে নাকি বলা হত The Carter-Eater!

প্রোটকল শ্যাফ্ বরখাস্ত হয়ে প্রথমতম ট্রেনে নামল বরাবর আপন গাঁয়ে। হিটলার তাঁর মুখদর্শন পর্যন্ত করেননি।

অবশ্য এর সরস দিক নিয়েও একাধিক কাহিনী আছে। বাল্যকালে হিটলার যে অস্ট্রিয়ার নগণ্য প্রজা ছিলেন সেই বিরাট অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরির মহিমান্বিত সম্রাট ছিলেন কাইজার ফ্রানৎস য়োজেফ। তাঁর 'ভাব-ভালবাসা' ছিল সুন্দরী অভিনেত্রী শ্রীমতী শ্রাটের সঙ্গে! তিনি প্রায়ই কাইজারকে বলতেন, 'আপনি স্টেজের উপর গিরার্ডির রসিকতা শুনে হাসতে হাসতে কাত হয়ে পড়েন। স্টেজে আবার রসিকতা করার সুযোগ পান গিরার্ডি কতটুকু? পাব্-এ, বার-এ স্টেজে মজলিসে তিনি যা একটার পর একটা ছেড়ে যান তার তুলনায় কেউ কখনও করতে পেরেছেন বলে কোনও কিংবদন্তী পর্যন্ত এই বিরাট ভিয়েনা

www.BanglaBook.org

শহরে নেই।' তাই গিরার্ডিকে কফি পানে নিমন্ত্রণ করা হল। কাইজার তো এলেন বিরাট প্রত্যাশা নিয়ে। ওদিকে কী আশ্চর্য! গিরার্ডির কোটের বোতাম ওপরবাগে উঠতে উঠতে যেন তাঁর ঠোঁট দুটোকেও বোতামিত করে দিয়েছে! নিজের থেকে কথা কন না আদৌ, প্রশ্ন শুধোলে মহা সসম্ভ্রমে যেটুকু বলেন সেটি তার গোঁপের ছাঁকনিতেই আটকা পড়ে যায়।

কফি পান খতম হতে চলেছে। শেষটায় থাকতে না পেরে হতাশ কাইজার ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বললেন, 'মাই ভেরি ডিয়ার গিরার্ডি! আপনার মজলিস-জমানো কথার ফুলঝুরি সম্বন্ধে আমি কত মুখে কতই না বেহদ্দ তারিফ শুনেছি—আর এ কি?'

রুমাল দিয়ে মাথার ঘাম মুছতে মুছতে একেবারে গ্রাম্য ভাষায় গিরার্ডি বললেন, 'কফি খাইতে বইয়া দ্যাহেন্ না!'

বেচারি গিরার্ডি প্রোটকলকে কনসল্ট করে কফি খেতে এসেছিলেন!

তাঁর শেষ বাক্যটি ঠিক প্রোটকলসম্মত কিনা সে নিয়েও আমার মনে ধোঁকা আছে।

একদম হালের ঘটনায় চলে আসি।

এই গত ৯/১০ই জুন তারিখে আরব রাষ্ট্রগুলো এবং ইজরাএল সকলেই যখন অস্ত্রসম্বরণ (সীস ফায়ার) করতে রাজী হয়ে গেছেন তখন রাশা ইউনাইটেড নেশনের সিকুরিটি কৌনসিলে বিশেষ জরুরী সভা ডাকার জন্য প্রস্তাব পাঠালে; তার অভিযোগ, ইজরাএল সীস ফায়ার করেনি—ক্রমাগত সিরিয়ার ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সীটিং বসলো সকাল ন'টা-দশটায়। এদেশে তখন রাত বারোটা। মিটিঙে বসানো মাইকের মারফত তার প্রত্যেকটি বাক্য ভইস অব আমেরিকার নিউজ রুমে আসছে। সেইটে ফের বেতারিত হয়ে রিলের পর রিলের মারফত ভারতে পৌঁচচ্ছে। অধমের অনিদ্রা ব্যাধি আছে।

এই সিকুরিটি কৌনসিলের কর্মপদ্ধতি অতিশয় ছিমছাম। যে যার বক্তব্য বলে যান সাধারণত অতিশয় শান্ত-কণ্ঠে। কেউ কাউকে বাধা দিয়ে আপন কথা বলতে চায় না—অতি দৈবসৈবে কেউ যদি কখনও করে তবে বার বার মাফ চেয়ে, ও বাধাপ্রাপ্ত বক্তাও সঙ্গে সঙ্গে থেমে যান। চেল্লাচেল্লি হৈ-হুল্লোড়ের কথাই ওঠে না।

প্রেসিডেন্ট গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "আমি এখন সোভিয়েত রাশিয়ার মহামান্য ('ডিস্‌টিংগুইসট' শব্দটি প্রতিবার প্রতি মেম্বারের উল্লেখ করবার সময় ব্যবহার করাটা প্রোটকলানুযায়ী নিরঙ্কুশ বাধ্যতামূলক) ডেলিগেটকে "ঘরের ফ্লর" ছেড়ে দিচ্ছি।' অর্থাৎ তখন ঘরের ফ্লর—মেঝেটাতে দাঁড়িয়ে কথা বলার হক্ক সোভিয়েত ডেলিগেটের। অবশ্য তিনি ফ্লর গ্রহণ নাও করতে পারেন।

মহামান্য রাশান ডেলিগেট দাঁড়িয়ে বললেন, 'স্পাসিব'—কিংবা 'ব্লাগোদারিয়ু ভাস'ও বলে থাকতে পারেন। অর্থ একই; 'থ্যাঙ্ক্যু। অর্থাৎ তিনি ফ্লর গ্রহণ করলেন।

তারপর এখন যে বিবৃতি নিবেদন করছি সেটা স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে। 'সন্দেশপিচেশ' পাঠক আমার অত্যল্পই। তাঁরাও ঐ সময়কার খবরের কাগজ পড়ে চেক-অপ করে নিতে পারবেন, তাঁদের হাত দিয়ে আমি দা-কাটা তামাক অর্থাৎ সাতিশয় স্থূল ভুল—খেয়েছি কিনা। কিন্তু আমি অতি সংক্ষেপে সারছি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রুশ : 'থ্যাঙ্কু, মিঃ প্রেসিডেন্ট! আমি বলতে চাই, এই সম্মানিত কৌনসিল আরব এবং ইজরাএল উভয়কে আদেশ দিয়েছে সীস-ফায়ার মেনে নিতে। সিরিয়ার মহামান্য ডেলিগেট বলেছেন, সীস-ফায়ার মেনে নেওয়া সত্ত্বেও ইজরাএল সিরিয়ায় অনুপ্রবেশ করে। ট্যাঙ্ক সাঁজোয়া গাড়িসহ ক্রমাগত রাজধানী দিমিশকের (ডিমেস্‌কাস্‌, দামা, ডামাস্‌কুস) দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, বোমারু বিমান অনবরত রাজধানীর উপর বোমাবর্ষণ করছে। আমি প্রস্তাব করি, কৌনসিল সর্বসম্মতিক্রমে ইজরাএলের এ আচরণের নিন্দা করুক। ধন্যবাদ, মিঃ প্রেসিডেন্ট!'

(বক্তৃতা শেষ করে কোনও কোনও সদস্য ভবিষ্যতে তাঁর বক্তৃতার কি ভাষ্য হবে না হবে সে বাবদে তাঁর অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার দাবী জানান। পক্ষান্তরে বক্তব্য স্পষ্ট 'হ্যাঁ' 'না' বা নিতান্ত দ্ব্যর্থহীন হলে সে অধিকার যে রাখছেন না, সে-কথাও বলে দেন। এটার প্রয়োজন এই কারণে যে কৌনসিলের বাহান্ন রঙের নানান চিড়িয়া নানান বুলি কপচান। অনুবাদ নিয়ে পরে তাই নানা হক্ক না-হক্ক তর্ক ওঠে)।

প্রেসিডেন্ট বললেন, 'আমি এখন ইজরাএলের মহামান্য ডেলিগেটকে ফ্লর ছেড়ে দিচ্ছি।'

ইজরাএল ডেলিগেট : 'আমার মহামান্য সরকার যখন সীস-ফায়ারের স্বীকৃতি দেন তখন তিনি স্পষ্ট বলেন, ''আমরা সীস-ফায়ার মানবো, কিন্তু শর্ত (অন কন্ডিশন) যে আরবরাও তাই মানবে।'' অতএব সীস-ফায়ারটা ম্যুচুয়াল করতে হবে। ইতিমধ্যে আমার মহামান্য সরকার তাঁর সেনাবাহিনীতে সীস-ফায়ারের হুকুম দিয়েছেন।'

এ উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে হয়তো বা রুশ ডেলিগেট নিন্দাসূচক প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে পারেন। সে-সম্ভাবনা দেখে প্রেসিডেন্ট ফের রুশকে ফ্লর দিলেন।

রুশ : (অতি সামান্য অসহিষ্ণু কণ্ঠে) 'মিঃ প্রেসিডেন্ট! এ তো বড় তাজ্জবকী বাত! এই ''ম্যুচ্যুয়াল সীস-ফায়ার'' রহস্যটা কি? মহামান্য ইজরাএল ডেলিগেট কি বলতে চান, প্রথমে, পয়লা, সিরিয়া সীস-ফায়ার করবে, তবে ইজরাএল অস্ত্রসংবরণ করবেন? তদুপরি, মিঃ প্রেসিডেন্ট, 'ম্যুচুয়াল' শব্দটাই আমাদের অনুশাসনে নেই। এবং আসল তত্ত্ব, ইজরাএলই আক্রমণ করেছে প্রথম। সীস-ফায়ার করতে হবে তাকেই প্রথম। আচমকা ঐ ম্যুচুয়াল শব্দ আমদানি করে ইজরাএল কথার মারপ্যাঁচ (কজিস্‌ট্রি) আরম্ভ করে মূল সত্য এড়িয়ে যাচ্ছেন কেন? (তারপর অতি সামান্য ব্যঙ্গের সুরে—লেখক) এরপর বুঝি সফিস্‌ট্রি আরম্ভ হবে! (কথার প্যাঁচে সত্য গোপন ও মিথ্যা ভাষণের ভদ্র নাম সফিস্‌ট্রি—রুশ সদস্য ফেদেরেন্‌কো 'কজিস্‌ট্রি' ও 'সফিস্‌ট্রি' দুটো শব্দই ব্যবহার করেছিলেন যৎসামান্য ব্যঙ্গের সুরে—কারণ ইজরাএল সদস্য যে সত্যিসত্যিই পাঁকাল মাছের গা মোচড়ানো আরম্ভ করে দিয়েছেন সেটা ততক্ষণ শুভাশুভ্র সকলের কাছেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে—লেখক)। মিঃ প্রেসিডেন্ট! আমি আদৌ অবিশ্বাস করছি নে যে, ইজরাএল সরকার তাঁর সেনাবাহিনীকে সীস-ফায়ারের হুকুম দিয়েছেন, কিন্তু মহামান্য ইজরাএল সদস্য বলুন তারা সেটা মেনে নিয়েছে কিনা, তিনি বলুন, তারা সিরিয়ায় ক্রমাগত আরও অনুপ্রবেশ করছে কিনা? থ্যাঙ্কু মিঃ প্রেসিডেন্ট।'

প্রেসিডেন্ট : 'আমি মহামান্য ইজরাএলের ডেলিগেটকে ফ্লর দিচ্ছি।'

www.BanglaBook.org

এরপর কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর শোনা গেল ফের প্রেসিডেন্টের কণ্ঠস্বর : 'আমি মহামান্য বুলগেরিয়ার ডেলিগেটকে ফ্লর দিচ্ছি।' স্পষ্ট বোঝা বেল মহামান্য ইজরাএল 'ফ্লর গ্রহণ' করলেন না। প্রোটকলানুয়ায়ী প্রেসিডেন্ট তাঁকে হুকুম দিতে পারেন না।

বুলগেরিয়া (ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে—বস্তুত একমাত্র ইনিই কিঞ্চিৎ উত্তেজনা দেখান—যদিও সর্বভদ্রতা বজায় রেখে। ইজরাএল কথা বলেছে স্বভাবতই বিজয়ীর গর্বিত কণ্ঠে, সিরিয়া করুণ ফরিয়াদভরা সুরে—আর ইজরাএলের জয়ে খুশীতে ডগমগ মার্কিন তথা তার ফেউ ইংরেজ করেছে, হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ) : মিঃ প্রেসিডেন্ট! ইজরাএল উত্তর দিচ্ছেন না কেন? আমি শুধু জানতে চাই, ইজরাইল বাহিনী এখন কোথায়? সিরিয়াতে? "হ্যাঁ, কি "না" তিনি যদি না বলেন তবে আমরা ভেবে নিয়ে জেনে যাবো।' (ডিলেমাটি সুন্দর "If Israel speaks, we shall speak; if Israel does not speak we shall know,"—লেখক)

প্রেসিডেন্ট পুনরায় ইজরাএলকে ফ্লর দিলেন। খানিকক্ষণ চুপচাপ।

প্রেসিডেন্টের গলা : 'আমি মালির মহামান্য ডেলিগেটকে ফ্লর দিচ্ছি।'

এর থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, 'ইজরাএল ফ্লর গ্রহণ করেননি, করতে চানও না। এরপর বোধ হয় কর্মসূচীতে মালি রাষ্ট্রের নাম ছিল।

মালি : 'মিঃ প্রেসিডেন্ট! আমরা সবাই এখানকার সদস্য। এক সদস্য যদি অন্য সদস্যের কাছে কিছু জানতে চান তবে আপনি তাঁকে সেটা শুধোচ্ছেন না কোন্ বিধি অনুসারে? থ্যাঙ্ক্যু! (বা ঐ ধরনের)

প্রেসিডেন্ট : 'আমি সম্মানিত মালি সদস্যের কাছে জানতে চাই, আমি যে সম্মানিত ইজরাএলী সদস্যকে সম্মানিত রুশের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো তা কোন্ বিধি অনুয়ায়ী?' মালি কোন উত্তর দিতে চান কিনা ঠাহর হল না। কারণ ইতিমধ্যে রুশ সদস্য ফ্লর চাইলেন। প্রেসিডেন্ট সসম্মানে তাই দিলেন।

রুশ : 'মিঃ প্রেসিডেন্ট! সভার কাজ সুষ্ঠুরূপে চালাবার জন্য আমরা ওয়ার্কিং এরেঞ্জমেন্ট মেনে নিয়ে থাকি। সেই অনুযায়ী যে কোনও সদস্য যে কোনও খবর যে কোনও সদস্যের কাছে চাইতে পারেন। এই তো আমরা সভার সদস্য সেক্রেটারি জেনারেল উ থান্তকে অনুরোধ করলুম সিরিয়া থেকে তাজা খবর আনিয়ে দিতে। তিনি দিলেন।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

তৎসত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট সম্মানিত ইজরাএলী সদস্যকে প্রশ্নটি শুধোলেন না। তিনি কিন্তু একাধিক বার তাঁকে সসম্মানে ফ্লর ছেড়ে দিলেন। ইজরাএল ফ্লর গ্রহণ করলেন না।

তবেই বুঝুন, সম্পাদক মশাই, প্রোটকলের ঠেলা কী চীজ।

কিন্তু চিন্তা করলে দেখতে পাবেন : প্রেসিডেন্ট—থুড়ি, সম্পাদক মশাই (ক্ষণতরে ভাবছিলুম, আমি বুঝি সেকুরিটি কৌনসিলে পৌঁছে গিয়েছি।) এটা কিছু নতুন তত্ত্ব নয়। আমি প্রাচীনপন্থী পদি পিসির অপজিট পুংলিঙ্গ। যা নাই ভারতে—! খুলে বলি।

সেকুরিটি কৌনসিলের কার্যকলাপ যখন আমি সরাসরি বেতার শুনছি তখন ক্ষণে ক্ষণে মনে হচ্ছিল এই রকমই একটি ধুন্ধুমার যেন আমি সশরীরে কোথাও দেখেছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ—ঐ ধুন্ধুমার কথাটাই সব মনে করিয়ে দিল। যে মধুকৈটভ-নিধন শ্রীবিষ্ণুকে

www.BanglaBook.org

আর্যভদ্রগণ সায়ংপ্রাতঃ স্মরণ করেন সেই বিষ্ণু তথা অন্যান্য দেবাদিকে প্রচণ্ড নিপীড়ন আরম্ভ করে মধুকৈটভের পুত্র ধুন্ধুমার এবং অবশেষে নৃপতি কুবলাশ্ব কর্তৃক নিহত হয়। মহাভারতের আপ্তবাক্যমধ্যে সেটি লিপিবদ্ধ আছে।

ধুন্ধুমার স্মরণ করিয়ে দিলে সেই সভা, যেখানে দ্রৌপদী লাঞ্ছিতা হয়েছিলেন। আমি জাতিস্মর। আমি সে-সভায় উপস্থিত ছিলুম তখনকার দিনের পি-টি-আই চীফ রিপোর্টার মূলগায়েন সঞ্জয়ের দোহার রূপে।

পৃথিবীর সুদীর্ঘ ইতিহাসে দুইটি নিরপরাধ ব্যক্তি যেভাবে আত্মসমর্থন করেছেন তার তুলনা আজও ইহসংসারে অলভ্য। ঐতিহাসিক যুগে সোক্রাতেস, তার বহু পূর্বে দ্রৌপদী।

কিন্তু অবিস্মরণীয় তত্ত্ববাক্য :—সোকরাতেস জাত দার্শনিক, পাঁড় তার্কিক। তিনি যে আত্মপক্ষ সমর্থনকালে শাণিত শাণিত তর্কবাণে অ্যাথিন্‌স্ নগরীর নভোমণ্ডল দিবাভাগে তমসাচ্ছন্ন করে দেবেন তাতে আর বিচিত্র কি? সেকুরিটি কৌনসিল প্রসঙ্গে পূর্বেই নিবেদন করেছি রুশ প্রতিনিধি ফেদেরেনকো ইজরাএলকে 'সফিস্‌ট্' আখ্যা দিতে চেয়েছিলেন। সোকরাতেস এই সব সফিস্‌ট্‌দেরই নগরীর মুক্ত হট্টে বাক্যেতর্কে নিত্য নিত্য অম্লতক্র পান করাতেন। তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থন অত্যাশ্চর্য অবিস্মরণীয় হলেও সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য নয়।

কিন্তু একবস্ত্রা যাজ্ঞসেনী আত্মসমর্থনহেতু দুর্যোধনের সভামধ্যে যে যুক্তিজাল বিস্তার করে কতিপয় সূচ্যগ্র তীক্ষ্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন তার সম্মুখে তদানীন্তন ভারতের গুণীজ্ঞানী শূরবীর সমন্বিত সর্ববৃহৎ সভা নিরঙ্কুশ নিরুত্তর। অসূর্যম্পশ্যা কৃষ্ণা যে আইনকানুন প্রোটকল সম্বন্ধে কতখানি অনভিজ্ঞা ছিলেন তা তাঁর সভামধ্যে রোদনের সময়ই ধরা পড়েছে : 'হায়, আমি স্বয়ংবরকালে রঙ্গমধ্যে ক্রমাগত ভূপালগণের নেত্রপথে একবার নিপাতিত হইয়াছিলাম, ইতিপূর্বে যাঁহারা আর আমাকে দেখেন নাই, এক্ষণে আমি তাঁহাদেরই সম্মুখে সভামধ্যে উপস্থিত হইয়াছি, যাহাকে পূর্বে বায়ু ও আদিত্য পর্যন্ত দেখিতে পান নাই...' (আমরা বলি) তিনি যে সোক্রাতেসের মত সেকালের কোন প্রটো-আকাডেমির সদস্যা ছিলেন না অথবা ডক্টরেট অব্ জ্যুরিসপ্রুডেন্স পাস করেননি সে বাবদে আমারা স্থিরনিশ্চয়, দৃঢ়প্রত্যয়। তাই পাঞ্চালীর ডিফেন্‌স্ আমাদের কাছে 'ঘৃত-লবণতৈলতণ্ডুলবস্ত্রইন্ধনসমস্যাহীন কলিকাতা মহানগরীর' মত সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

এ যেন সেকুরিটি কৌনসিলের ঠিক উল্টো পিঠ। হেথায় তাবৎ সভ্য কা কা রবে চিৎকার করছে ডিসটিংগুইশ্‌ট্ ইজরাএল প্রতিনিধি নিশ্চুপ, নীরব। অথচ তাঁর জিভে ফোস্কা পড়েনি, তাঁর টনসিলে বাত হয়নি। সভায় ৯৫ নয়া পয়সা মেম্বরে কোনও প্রোটকল খুঁজে পাচ্ছেন না যেটা গজাঙ্কুশের মত প্রয়োগ করে ইজরাএলের দাঁতকপাটি খুলতে পারেন।

আর হেথায় দ্রুপদতনয়া বারংবার একটিমাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন, ধর্মরাজ দ্যূতক্রীড়ায় 'অগ্রে আমাকে কি নিজেকে বিসর্জন করেছেন?' (ইজরাএলকেও মাত্র একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল 'ইজরাএলি বাহিনী এখন কোথায়?') যুক্তিটি অতি সুস্পষ্ট। ধর্মরাজ যদি নিজেকে স্টেক্ করে আগেভাগেই খুইয়ে ফেলে দুর্যোধনের দাস হয়ে গিয়ে থাকেন তবে যেহেতু দাসের কোন সম্পত্তিতে অধিকার থাকতে পারে না, অতএব 'দাস'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণাকে স্টেক করতে পারেন না (দাস হবার পূর্বেও তিনি মাত্র ২০% মালিক—কিন্তু এ ল'পইনট্ বোধ হয় তখন ওঠেনি)।'[১]

তা সে যা-ই হোক, ঐ একটিমাত্র প্রশ্নের উত্তরই তিনি পাচ্ছেন না। এবং হা অদৃষ্ট! কোনও প্রোটকলও খুঁজে পাচ্ছেন না যার চাপে তিনি সভাসদদের মুখ খোলাতে পারেন। বরঞ্চ ভীষ্ম যে প্রোটকল উত্থাপিত করলেন তার মোদ্দা : ডিস্‌টিংগুইশ্‌ট্ দ্রুপদতনয়া তাঁদের প্রশ্ন শুধিয়েছেন (ইংরিজিতে এস্থলে বলে 'বার্কিং আপ দি রং ট্রী')। তাঁর উচিত তাঁর স্বামী ধর্মরাজকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা। তিনিই বলতে পারেন, কৃষ্ণা 'জিতা বা অজিতা'।

কিন্তু বিদুর যে জিনিসের আশ্রয় নিলেন, সেটাকে প্রীসিডেনস, নজীর বা হদিস বলা যেতে পারে, ঠিক প্রোটকল নয়। তাঁর মতে মহর্ষি কশ্যপ দৈত্যকুলের প্রহ্লাদকে অনুশাসন দেন 'হে প্রহ্লাদ, যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়াও প্রশ্নের প্রত্যুত্তর না দেয় এবং যে সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষ্য দান করে তাহারা সহস্র সংখ্যক বারুণ-পাশ দ্বারা বন্ধন পায়।'[২] অর্থাৎ silence সর্বাবস্থায় golden নয় (অবশ্য এস্থলে gold is silent, কারণ সভাসদদের প্রায় সকলেই দুর্যোধনের gold পেয়ে silent !)।

কিন্তু এ নজীর ধোপে টিকল না। মহাভারতকার বলছেন, বিদুরের বাক্য কর্ণগোচর করিয়া সভাস্থ পার্থিবরা কিছুই প্রত্যুত্তর করিলেন না!!!

কিন্তু এ সব চুলচেরা বাগ্‌বিতণ্ডার মূলে কে?

দ্রৌপদী যে প্রশ্ন শুধিয়েছিলেন সেটা তো কেউ সেকেন্ড করবে। নইলে সেটা উলট্রা ভিরেস, নাকচ।

নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁকে সেকেন্ড করে বসল দুর্যোধনের ছোট ভাই চ্যাংড়া অর্বাচীন বিকর্ণ! তিনি স্পষ্ট গলায় বললেন, 'যাজ্ঞসেনী যাহা কহিয়াছেন কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর ইঁহারা আসিয়া এ বিষয়ে কিছু বলুন।' তারপর তিনি যখন দেখলেন, 'সভাসদবর্গের কোনও ব্যক্তিই সাধু অসাধু কিছুই কহিলেন না' তখন হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ করিয়া নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, অর্থাৎ অনেক যুক্তিতর্ক দেখিয়ে রায় দিলেন, 'এইসকল বিচার করিয়া দেখিলে দ্রৌপদীকে জয়লব্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।'

সর্বনাশ! আজকের দিনের ভাষায় বলতে গেলে এ যেন নিতান্ত চ্যাংড়া ঘানা বা মালি রাষ্ট্র সেকুরিটি কৌনসিলে বলে বসল, 'এই সকল বিচার করিয়া দেখিলে (অর্থাৎ যেহেতু ইজরাএলই প্রথম আক্রমণ করেছে) সাইনাইকে ইজরাএলের) প্রাচীন দিনের ভাষায় দুর্যোধনের) জয়লব্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।'

ধুন্ধুমার লেগে গেল সভায়, মহাভারতের ভাষায় 'সঙ্কুলরবে' (একসুরে) 'তুমুল

---

১ ইসলামে দাস যেমন আইনত পূর্ণ নাগরিক নয় (সেখানেও সে কোনও কিছু স্টেক করতে পারে না) ঠিক তেমনি সে কোনও আইনভঙ্গ করলে (চুরি, ডাকাতি) তার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হয় না। খেসারতি দিতে হয় মুনিবকে।

২ জ্বর-জ্বালাদি রোগকেও 'পাশ' বলে ধারণা করা হত বলে অথর্ববেদে ঋষি পাশমুক্তির জন্য বরুণদেবকে আহ্বান জানাতেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিনাদ' উঠলো সভাস্থলে। এখানে আমার বলা উচিত যে, বিদুরাদি কেউ কিছু বলার পূর্বেই বিকর্ণ আপন রায় দিয়ে বসে আছেন। তাঁর ভয় হয়েছিল, প্রবীণরা নীরবতা দিয়ে দ্রুপদনন্দিনীর প্রশ্নটি পিষে ফেলবেন—'নীরবতা' যে শুধু মাত্র 'হিরণ্ময়' তাই নয়, সরব প্রশ্নকে নিধন করার মরণাস্ত্রও বটে।

অনেকেই বিকর্ণের পক্ষে সায় দিচ্ছেন দেখে কর্ণ 'ফ্লর' গ্রহণ করলেন। বললেন, 'হে বিকর্ণ' এই সভায় বহুবিধ বিকৃতি দৃষ্ট হইতেছে বটে—'

আমরাও বলি, 'সেই কথাই কও।' 'বিকৃতি' মানে প্রোটকল-সম্মত নয়!

কর্ণ বললেন, 'তুমিই কেবল বালস্বভাবসুলভ অসহিষ্ণুতায় অধৈর্য হইয়া স্থবিরোচিত বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। তুমি দুর্যোধনের কনিষ্ঠ, পর্ব বিষয়ে যথাবৎ অভিজ্ঞ হও নাই—'

এইবারে কর্ণ মারলেন পেরেকটার ঠিক মাথার উপর মোক্ষম ঘা। এই পর্ব বস্তুটি কি? কারণ মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের যে নির্ঘণ্ট আছে তার প্রথমটার মতে বিকর্ণের নম্বর আট, দ্বিতীয়টির মতে উনিশ।

আর 'পর্ব' অর্থই হচ্ছে 'নির্দিষ্ট'—আমাদের 'পরব' মাত্রই হয় নির্দিষ্ট দিন ক্ষ্যাণে। তাই 'পর্ব'ই হচ্ছে প্রোটকল। যা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে, যার থেকে নড়চড় নেই। বিকর্ণ সেই প্রোটকল ভঙ্গ করেছেন। কিন্তু তাঁর ও দ্রৌপদীর কার্যোদ্ধার অংশত হয়ে গেছে। ওদিকে আবার কর্ণ স্বয়ং করে বসেছেন প্রোটকলে গলদ!

কারণ সভারম্ভেই মিঃ প্রেসিডেন্ট দুর্যোধন প্রোটকল ধার্য করে দিয়েছেন—কর্ণ যাকে 'পর্ব' বলেছেন—যে, 'কৌরবগণ দ্রৌপদীর সমক্ষে তাহার প্রশ্নের উত্তর করুন।' অর্থাৎ তিনি ফ্লর দিয়েছেন কুরু সদস্যদের। অপিচ কর্ণ আইনত (ডে জুরে) রথচালক শ্রেণীর লোক—আজকের ভাষায় 'শোফার সর্দারজী ক্লাস' | যদ্যপি প্রকৃতপক্ষে (ডে ফাক্টো) তিনি কুন্তীনন্দন প্রথম পাণ্ডব;] কিন্তু সদস্যগণ সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বলে এ-বিবেচনা এস্থলে উঠতে পারেনি, কস্মিনকালে ওঠেওনি। তিনি ফ্লর গ্রহণ করতে পারেন না। তবে বিকর্ণ যে প্রোটকল ভঙ্গ করেছেন সেটা হয়তো তিনি দেখিয়ে দিতে পারেন—কারণ পইন্ট্ অব্ অরডার সভাসীন যে-কোনও সদস্য যে-কোন সময়ে তুলতে পারেন। কিন্তু তারপর কর্ণ যখন বললেন, 'দ্রৌপদী ও পাণ্ডবগণের যাহা কিছু আছে সে সমুদয়ই শকুনি ধর্মত জয় করিয়াছেন' তখন তিনি বিলকুল আউট অব্ প্রোটকল কারণ প্রেসিডেন্ট রুলিং দিয়েছেন, উত্তর দেবেন কৌরবরা।

অতএব দ্রোণ যে ফ্লর গ্রহণ করেননি সেটাও অতিশয় করেক্ট্। কারণ তিনি ও অন্যান্য কৌরবেতররা অবগত আছেন ব্যাপারটা বহুলাংশে কুরুপাণ্ডবের ঘরোয়া ব্যাপার। যে শকুনি সর্বস্ব জয়লাভ করেছেন তিনিও তাঁর হক্কের দাবী করে ফ্লর চাননি।

বস্তুত সভাপতিরূপে ডিস্টিংগুইশ্ট্ প্রেসিডেন্ট মিঃ দুর্যোধনের আচরণ অক্ষরে প্রোটকলসম্মত। তিনি কুরুকুলকে ফ্লর দিয়েছেন কিন্তু কী ভীষ্ম বিদুর কাউকে কিছু বলার জন্য কোনও চাপ দিচ্ছেন না।

অবশেষে তুমুল বাগ-বিতণ্ডার পর প্রেসিডেন্ট দুর্যোধন স্পষ্ট দেখতে পেলেন যে কুরুকুলের কেউই আপন সুচিন্তিত অভিমত দিচ্ছেন না, যাজ্ঞসেনী যে 'জিতা' সে রায় দূরে থাক (কর্ণের রায়ের মূল্য নেই, এবং দুঃশাসন তখন 'প্রতিহারী' বা 'বেলিফ' বা সভার 'মারশাল'; এবং তিনিও সুদ্ধমাত্র দ্রৌপদীকে অপমানার্থে 'দাসী দাসী' বলে সম্বোধন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করছেন, যুক্তিতর্ক দ্বারা শকুনির লিগেল-রাইট্ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেননি। তখন তিনি যে রুলিং দিলেন সেটাও অতিশয় ন্যায্য। তিনি জানতেন যে যদিও তিনি আইনত প্রেসিডেন্ট, তবুও এ-তত্ত্ব অনস্বীকার্য যে কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম কুরুকুলের সর্বোচ্চ আসন ধরেন। তিনি যখন স্পষ্ট বলেছেন, স্বয়ং ধর্মরাজ এর মীমাংসা করুন তখন এ-সিদ্ধান্ত এক হিসাবে তাবৎ কুরুবংশের সিদ্ধান্ত। এবং যেহেতু দুর্যোধন সভারম্ভেই বলেছেন কুরুকুল উত্তর দেবেন তখন যুক্তিযুক্তভাবেই শেষ উত্তর দিলেন, কুরুকুলের সিদ্ধান্ত; ধর্মরাজ উত্তর দেবেন। কিন্তু ধর্মরাজ যখন ফ্লর গ্রহণ করলেন না, তখন তিনি দ্রৌপদীকে বললেন, (ধর্মরাজ যখন ফ্লর নিচ্ছেন না তখন প্রোটকলানুযায়ী তাঁর কনিষ্ঠেরা ফ্লর পাবেন—হুবহু যেরকম অপর পক্ষে বিকর্ণ পেয়েছিলেন, 'হে যাজ্ঞসেনী, ভীষ্ম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবের মত-ই আমার মত।'

এবং এঁরাও ফ্লর গ্রহণ করলেন না। অর্থাৎ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন না।

এখানেই সভা শেষ।

সম্পাদক মহাশয়, যতই চিন্তা করি, পুনরায় মহাভারত অধ্যয়ন করি, পুনরায় চিন্তা করি, তখন দেখি, সেই অতি প্রাচীনকালে আমরা কতখানি ন্যায়-ধর্ম ও প্রোটকল মেনে সভা চালাতুম! যদি দুঃশাসনের অনার্যাচরণের কথা তোলেন তবে বলবো সেটা অবশ্যই নিন্দনীয়, দুর্যোধন কর্তৃক দ্রৌপদীকে 'উরুমধ্য' প্রদর্শন অনুচিত কিন্তু সেগুলো 'ইনট্রিগেল পার্ট অব দি প্রসীডিংস অব দ্য মিটিং' নয়, 'সভার কর্মসূচীর অন্তর্গত অবর্জনীয় অংশ' নয়। দুঃশাসন ও দুর্যোধন শুধু অতিশয় রূঢ় পদ্ধতিতে দেখাতে চেয়েছিলেন, তাঁদের মতে দ্রৌপদী জিতা। সভার কার্যকলাপে প্রোটকল আদৌ লাঞ্ছিত হননি।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, সম্পাদক মহাশয়, সে-যুগে ফিলিম ছিল না, তার মাসিক ছিল না, তস্য সম্পাদক ছিলেন না। কাজেই তাঁকে কি ভাবে সম্বোধন করতে হয় সে-বাবদে কোনও প্রোটকল খুঁজে পেলুম না। তবু খুঁজছি, কারণ 'দুধ' না পেলেও 'পিটুলি' পাব নিশ্চয়!!

পপ্‌লারের মগডালে

দুই মহা 'চাণক্যে' বিশ্রম্ভালাপ হচ্ছিল। নিদাঘের মধ্যরাত্রি আসন্ন। প্রচুর সুরা পান হয়েছে। ফলে সর্বাঙ্গ দিয়ে অজস্র স্বেদ ও তজ্জনিত বাষ্প বিনির্গত হচ্ছে। এমতাবস্থায় সেই স্টীম থেকে যে স্পিরিট বেরুচ্ছে সেটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সামান্যতম স্পর্শ পেলেই দপ করে জ্বলে উঠবে বলে চাণক্যদ্বয় সিগার ধরাচ্ছেন না।

ইতিমধ্যে একজন গভীরতম চিন্তায় নিমজ্জিত থাকার পর দ্বিতীয়জনকে প্রশ্ন করলেন, "একটা সমস্যা নিয়ে আমি অত্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি, মাইঃ! ভেবে ভেবে কোনও কূলকিনারা পাচ্ছি নে। মার্শাল থেকে শুমপেটার হয়ে কেইনস রবিন্‌স সবাইকে চষেছি—বেকার বেকার। তা আপনার কাছে তো কিছুই অজানা নেই—"

"হুম।"

"এই ডাক-বিভাগটা চলে কি প্রকারে? অত অঢেল টাকা পয়সা কোথায়? ভাবুন দিকিনি, বিরাট বিরাট মাইনের ডাঙর ডাঙর আপিসাররা রয়েছেন, দশাসই সব আপিস

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দপ্তর, অগুনতি ভ্যান, লম্বা দৌড়ের রেলগাড়ি হলেই তার আধখানা জুড়ে ডাকের জন্য খাস ব্যবস্থা—এ তো আর ফোকটেমুফতে হয় না! হ্যাঁ, মানলুম, তারা কোটি কোটি টাকার ডাকটিকিট বেচে। কিন্তু ওটাকে তো আর ব্যবসা বলা চলে না। ১০ পয়সার ডাকটিকিট বেচে ১০ পয়সায়, ১৫ পয়সার টিকিট বেচে ১৫ পয়সায়, কুড়ির কুড়ি পয়সায়ই। এক কানাকড়িও তো মুনাফা নেই ওতে,—যা দর তাতেই বিক্রি! লাভ রইল কোথায়? তা হলে ডাক-বিভাগটা চলে কি করে?''

''অতি হক কথা কয়েছেন, আমিও সানন্দে স্বীকার করছি। টিকিট বিক্রি করে ডাক-বিভাগের রক্তিভর মুনাফা হয় না। যে দাম আছে, তাতেই সে বিক্রি করতে বাধ্য। কিন্তু জানেন তো, দাদা, বড় বড় মুনাফার ব্যবসা মাত্রেই লাভের পথটা থাকে লুকানো—যেদিকে সরল জনের নজর যায় না, তার মনে কোনও সন্দেহই হয় না। আচ্ছা! এইবারে দেখুন, সমস্যাখানার রহস্য। পনেরো গ্রাম ওজনের খামের জন্য পোস্টাপিস চায় পনেরো পয়সা টিকিট—নয় কি? এইবারে আপনাকে আমি শুধোই—হক্ক কথা কন। প্রত্যেকখানি চিঠির ওজনই কি টায়-টায় পনেরো গ্রাম? হাজারখানার ভিতর একখানারও হয় কি না হয়—এ তো কানায়ও দেখতে পায়। একটার ওজন হয়তো বারো গ্রাম, কোনওটার আট, কোনওটার বা তেরো। এইবারে বুঝলেন তো, এই যে তফাতটা—এই যে ফারাকটুকু, এর থেকেই ডাকবিভাগের নিরেট লাভ—ঐ দিয়ে তার দিব্যি চলে যায়।''

পাঠক ভাবছেন, আমি অর্থশাস্ত্রের জটিলতম সমস্যায় কণ্টকিত এই প্রস্তাবটি উত্থাপিত করলুম কেন? আমিও তাই ভাবছি। বস্তুত আমি মেহতা-চৌধুরী-জনসুলভ এই পঞ্চতন্ত্র কাহিনীটি যখন শ্রবণ করে কৃতকৃতার্থ হই তখন, কিংবা আমার বাতুলতম মুহূর্তেও আমি ওহেন সম্ভাবনার কণামাত্র আভাস পাইনি যে, ইটি একদিন আমার কাজে লাগবে।

লেগেছে। টায়-টায় না হলেও হরেদরে। সর্ব কাহিনী, তাবৎ উপমাই দাঁড়ায় তিন্ ঠ্যাঙের উপর ভর করে। চার পায়েই যদি দাঁড়ায়, তবে তো সব হুবহু একই বস্তু হয়ে গেল। উপমা রূপক, প্রতীক হতে যাবে কেন?

বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ দেখি, এক দরদী সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় বিকট চিৎকার করে চিল্লি দিয়ে কেঁদে উঠেছেন, বিদেশী পুস্তক বিক্রেতাদের জন্য। হায় হায় হায়, এদের কি হবে? এরা কোজ্জাবে, মা!

কান্নার বহর দেখে মনে হল, এঁরা যেন ফুটপাথের পুরনো বই বিক্কিরীওলাদের চেয়েও বিকটতর বিপাকে পড়েছেন। এদের দুরাবস্থা (প্রেস! হ্যাঁ, আমি আকার দিয়ে দুরাবস্থাই লিখছি) দেখে সেই সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলছেন।

আম্মো দরদী। কিন্তু এই ডুকরে-ওঠা, চিল-চ্যাঁচানো মড়া-কান্না শুনে আমার হৃদয়ে 'মিলক অব হ্যুমেন কাইন্ডনিস' না বয়ে লেগে গেল সেথায় অন্য ধুক্কুর। খাঁটি মড়া-কান্না আমি বিলক্ষণ চিনি। আমার বসত-বাসা শ্মশানের লাগোয়া।

* * *

মহাকবি হাইনরিষ হাইনের মরমিয়া প্রেমের গীতি কবিতা সম্বন্ধে একাধিকবার লেখবার সুযোগ আমি পেয়েছি। ইনি সাক্ষাৎ চণ্ডীদাস। পাঠককে শুধোই, 'সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু', 'তোমার চরণে আমার পরাণে লাগিল প্রেমের ফাঁসি' শুনে কি তোমার কখনও মনে হয়েছে, এ কবি '...চিঠির' মত (এ-মাসিকের বিরুদ্ধে আমার ব্যক্তিগত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোনও ফরিয়াদ নেই—অস্মদ্দেশে শত্রু মিত্র উভয় ভাবেই পুজো করার পদ্ধতি ঐতিহ্যসম্মত) কিংবা কংগ্রেস কম্যুনিস্টের মত কটুকাটব্য কস্মিনকালেও করতে পারে?

তাই যখন বিঘ্নসন্তোষী, পরশ্রীকাতর একপাল (লুমপেন-পাক) ফেউ লাগলো হাইনের পিছনে তখন তিনি কোনও উত্তর দিলেন না। সবাই ভাবলে, যার মুখ দিয়ে সদাই মধু ঝরে সে আবার এসব বেতালা বদখদ বেত্তমীজী বাতের কীই বা জবাব দেবে। ভুল ভুল! সব্বাই করলেন ক্ষ-তে গলদ।

একদিন তাঁর হল ধৈর্যচ্যুতি।

কি যেন একটা—আমার ঠিক স্মরণে আসছে না—ভ্রমণ-কাহিনী না কি যেন কিসে মোলায়েম প্রাকৃতিক বর্ণনা দিতে দিতে তিনি বললেন, সবাই জানেন, আমি সাতিশয় সাধারণ কবি, তাই আমার খাঁইও অতিশয় সাধারণ। কবি মানুষ, দয়াময় ভগবান যদি নদীপারে আমাকে একখানা কুঁড়েঘর দেন, তা হলেই আমার দিব্যি চলে যাবে। আর ঘরের তৈরি সাদামাঠা কিঞ্চিৎ রুটি—শহুরে বান, ক্রোআঁশা[১] কিসসুটি না—আর ঘরেই তৈরি মাখা পরিমাণ মাখম, ব্যস। তদুপরি দয়াময় ভগবান যদি আমাকে আরও খুশী করতে চান, তবে তিনি যেন ঐ নদীপারে উঁচাসে উঁচা একসারি পপ্‌লার লাগিয়ে দেন। সর্বশেষে, তাঁর অসীম করুণাবশে যদি দয়াময় আমাকে পরিপূর্ণ কৈবল্যানন্দ দিতে চান, তবে তিনি যেন আমার পিছনে যারা লেগেছে ঐ দুশমনদের পপ্‌লারের মগডালে ফাঁসি দেন। অন্তবিহীন আনন্দরসে ভরপুর হৃদয় নিয়ে, কুটিরের দাওয়ায় বসে আমি তখন উপরপানে তাকিয়ে দেখব, সাতিশয় মনঃসংযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করবো, আহা কী রমণীয় দৃশ্য! দুশমনদের পাগুলো মৃদুমন্দ পবনে দুলছে—দোদুল দোলায় হিল্লোল লাগিয়ে।[২] হ্যাঁ, আলবৎ প্রভু যীশুখ্রীষ্ট আদেশ দিয়েছেন[৩]। শত্রুকে ক্ষমা করবে, তাকে প্রেম দেবে। নিশ্চয় করব, নিশ্চয়ই দেব—আমার সর্বসত্তা উজাড় করে, কিন্তু ঐ যে বললুম, ওদের ফাঁসি হয়ে যাবার পর।"

* * *

কিন্তু যে গল্পটা দিয়ে আরম্ভ করেছিলুম সেটা গেল কোথায়?

যাঁরা বিদেশী বই বেচনেওলাদের তরে ঘটি ঘটি অশ্রু বর্ষণ করছেন তাঁদের একজনের ভাবখানা অনেকটা : পাঁচ শিলিঙের বই যদি তারা তারই ন্যায্য এক্সচেঞ্জে ভারতীয় টাকায় বেচে, তবে তাদের মুনাফা রইল কোথায়? এক ডলারের দাম সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা (কথার কথা কইছি, আমি সঠিক ভাও জানি নে), যদি সাত টাকা পঞ্চাশেই বেচে, তবে

---

১ ক্রোআঁশা = ক্রেসেন্ট—অর্ধচন্দ্রের ন্যায় দুধেমাখম তৈরি ফ্রিনসি রুটি। তুর্করা ভিয়েনা যুদ্ধে পরাজিত হলে পর, ভিয়েনাবাসী, তুর্কদের পতাকা-লাঞ্ছন অর্ধচন্দ্র আকারে রুটি বানিয়ে তাদের জয় সেলেব্রেট করে। আজ যদি ইস্টবেঙ্গল একটি কেকের উপর মার্শপেনের "বাগান" বানিয়ে সেটা খায়—অনেকটা সেই রকম! আমি কিন্তু মোহনবাগানী।

২ যাঁরা আর্ট হিস্ট্রির চর্চা করেন, তাঁদের স্মরণে আসবে গোয়ার ছবি, যেখানে গাছে ঝোলানো শত্রুকে পর্যবেক্ষণ করছেন এক অফিসার—টেবিলে কনুই রেখে হাতে আরামসে মাথা রেখে। বস্তুত এ ছবি বেরোবার (১৮১০-১৩) কয়েক বছর পরই হাইনে তাঁর প্রবন্ধ লেখেন।

৩ হাইনে ইহুদি। ইহুদিরা খ্রীস্টকে স্বীকার করে না।

www.BanglaBook.org

লাভ রইল কোথায়—ঐ সেই ডাকটিকিট বিক্রির মত!

তিনি তারপর আরেক ঘটি এক্‌স্‌ট্রা চোখের জল ফেলে বলছেন, তাদের কত খরচা। চিঠি লিখতে হয় (মরে যাই!), ডাকমাশুল দিতে হয় (ও বাছারে!) এবং তারপর আর কি সব ধানাইপানাই করেছেন আমার মনে নেই। কিন্তু এইবারে অসহিষ্ণু পাঠক, ক্ষণতরে মেহেরবানী করে তুমি নিচের মোক্ষম তত্ত্বটি মনোযোগ সহকারে পড়ো।

উপরের উল্লিখিত ঐ একজনই না, যাঁদের হাত দিয়ে বিলিতি বইওলারা তামাক খাচ্ছেন তাঁদের কেউই তো বলছেন না (কিংবা আমার হয়তো চোখে পড়েনি)—অন্তত সেই সরল বিপ্রসন্তান (ইনি পণ্ডিত তথা বিপ্র—এ দুয়ের সংযোগে মানুষ বড় সরল, neif হয়) বলেননি—

বিলিতি বইওয়ালা কত কমিশন পায়?

আমানউল্লার মাতা রাণীমার আদেশে তাঁর বন্দী চাচা নসরউল্লাকে খুন করা হয়। সর্বত্র খবর রটলো, কফি খেয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

সংবাদদাতা বিলকুল ভুলে গেলেন মাত্র একটি সামান্যতম তথ্য পরিবেশন করতে। কফিতে ছিল সেঁকো বিষ।

এঁনারা সেই সেঁকো বিষ অর্থাৎ কমিশনটির বাৎ বেবাক ভুলে যাচ্ছেন।

কত কমিশন পায়? জানি নে। তবে বঙ্গসন্তানদের ধারণা ২৫% ৩০%-এর বেশী হবে না, কারণ বাঙলা পুস্তক বিক্রেতা সচরাচর এর বেশী পায় না (হালে জনৈক প্রখ্যাত পুস্তক-বিক্রেতা গুদোম সাফ করার জন্য শতকরা ৪০/৫০ দিচ্ছেন বলে—পাঠক পরম পরিতোষ পাবেন, ওর মধ্যে আমার বইও ছিল—বাঙলা বইয়ের বাজারে ধুন্ধুমার লেগে যায়)। তাই প্রশ্ন, যে স্থলে বাঙালী প্রকাশক দু' হাজার বই ছাপিয়ে শতকরা ২৫/৩০ কমিশন দেয়, সে স্থলে মার্কিন ইংরেজ এক ঝটকায় পঞ্চাশ হাজার এক লক্ষ ছাপিয়ে কত দেয়? কুইক টার্নঅভার নামক একটি বস্তুও আছে। শুনেছি এরা ষাট পার্সেন্ট পর্যন্ত দেয়। আমি বলতে যাচ্ছিলুম আশী। তা বলবো না কেন? তোমরা যখন এই জীবনমরণ ভাইটাল তত্ত্বটি চেপে যাচ্ছ। দেখাও না কাগজপত্র। আমি অবশ্য বিশ্বাস করবো না। তোমরা সব পারো।

ঈশ্বর সাক্ষী, স্বরাজ লাভের পর থেকে সরকার বিস্তর বিস্তর আইন পাস করেছেন—আমি চাঁদপানা মুখ করে সব সয়েছি, রা-টি কাড়িনি। কিন্তু সরকার যখন এই কমিশন ব্যাপারের গুহ্য, সযত্নে লুক্কায়িত কমিশন তত্ত্বটি জানতেন বলে হুকুম দিলেন, "বাপধনরা যখন দশ টাকার বই চার টাকায় পাচ্ছ তখন আর লাভ করতে যেয়ো না, শিলিঙের দাম ১.০৫, এক পাঁচেই বেচো, কিনছ তো অষ্ট গণ্ডা পোহা দিয়ে—" তখন উল্লাসে নৃত্য করে উঠলুম। আহা হাহা হা! কী আনন্দ, কী আনন্দ!

সস্তায় বই পাব বলে? মোটেই না। বই এমনিতে পাব না, অমনিতেও পাব না। ডিভ্যালুয়েশনের পূর্বেও পাইনি, এখনও পাব না। শুনবেন, কেন? বছর দুই ধরে আমি ধন্না দিচ্ছি, কয়েকখানা ফরাসী ও জর্মন বইয়ের জন্য (হিটলারের জীবনীটি সম্পূর্ণ করবো বলে। যুদ্ধের কয়েকটা বছর বাদ দিয়ে ১৯৩৪ থেকে ১৯৬৪ অবধি আমি এ-বিষয়ে বই কিনেছি—কয়েক হাজার টাকার)। সম্প্রতি কলকাতার বইয়ের বাজারে এক ঝাণ্ডু শ্রী—রায় (ইনি এম-এ, সুশিক্ষিত সুপণ্ডিত) আমাকে জানালেন, আমি যদি প্রত্যেক বইয়ের—অর্থাৎ একই বইয়ের—পাঁচখানা করে কপি কিনি (!), তবে বিলিতি বইয়ের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বুকসেলার আমাকে আমার প্রার্থিত বই আনিয়ে দিতে পারবেন। তাঁর 'যুক্তি', একসঙ্গে পাঁচখানা বই না কিনলে বুকসেলার কমিশন পান না!

এ প্রস্তাবটি এমনই উন্মাদের বাতুলতা যে, কোনও পাঠকই এটা বিশ্বাস করবেন না। একই বইয়ের পাঁচখানা করে কপি নিয়ে আমি করবো কি? পঞ্চবীর-পতিগর্বিতা দ্রৌপদীর পাঁচটি স্বামীই যদি একই রবর স্ট্যাম্পের পঞ্চলাঞ্ছন, পাঁচ এ্যানকোর হতেন তবে তিনিও যে খুব সন্তুষ্ট হতেন না, অনুমান করা যায়। পাঁচ কেন, দুটো হলেই চিত্তির। আমার শোনা মতে এক রমণীর বিয়ে হয়, যমজ ভাইয়ের একজনের সঙ্গে। ভাশুর ভাদ্রবধূ উভয়ই সন্ত্রস্ত। শেষটায় সাবধানী ভাশুর আরম্ভ করলেন টিকিটিতে পুজোর সময় একটি জবা ফুল বেঁধে নিতে। শয্যায় পদ্মনাভকে স্মরণ না করা পর্যন্ত ক্ষণে ক্ষণে চৈতনপ্রত্যন্তে হাত বুলিয়ে চেক অপ করে নিতেন, ফুলটি স্থানচ্যুত হয়নি তো! কাহিনীটি শুনে 'ইন্দ্রজিৎ' শিব্রামীয় একখান 'পান' ছেড়ে মন্তব্য করলেন, 'টিকিতে ফুল! তাহলে স্বামী নিয়ে fooling বন্ধ হল।"

পাঁচখানা বই—একই বই (পাঁচখানা ভিন্ন ভিন্ন বই নয়, যে-ব্যবস্থাতে তো আমি হরবকৎ রাজী)—না কিনলে নাকি বাবুরা কমিশন পান না!

তবে আইস পাঠক, শৃণ্বন্তু বিশ্বে—

কারণ বিশ্বজোড়া ছড়িয়ে-পড়া একটি মাসিক থেকে (জুলাই, ১৯৬৮) বিজ্ঞাপনটি তুলে দিচ্ছি :

"Published in England at Rupees 105.00 you have the chance of buying them (the book is in six volumes)—under our NO-RISK money-back guarantee for a mere Rs. 72.00—a saving of 30% on the published price."

অস্য বিগলিতার্থ—সাদামাটা খদ্দের হিসাবেই তুমি ৩৫% কমিশন পাবে; এবে শুধোই—অনাথা, অবলা বিলিতি বুকসেলাররা কত পাবেন? যে দিশী কোম্পানি বোম্বায়ে বসে, বিলেত থেকে প্রাগুক্ত বই আনিয়ে এ-দেশে বিক্রি করছেন, তিনি বুঝি আলা খয়রাতি হাসপাতাল খুলেছেন। তা হলে সাধু! সাধু!! সাধু!!!

বিস্ময়ে অধম নির্বাক! তবু অতি কষ্টে ক্ষীণ কণ্ঠে চিঁ চিঁ করে বলছি অবিশ্বাস্য, অবিশ্বাস্য, স্বপ্ন নু মায়া নু মতিভ্রম নু—আপনাকে শ্রীরায়ের তন্বী মাফিক একই বইয়ের পঞ্চগব্য খেতে হবে না,—হল না—পাঁচ ঢালা গোবর খেতে হবে না—একই বইয়ের পাঁচ কপি কিনতে হবে না।

এস্থলে আরেকটি নিবেদন—বিলিতি পুস্তক-বিক্রেতার বিরুদ্ধে আমার পুঞ্জীভূত বহুবিধ আক্রোশ আছে, গত পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে জমে উঠেছে বেরতর বিতৃষ্ণা এবং আমি তাই আদৌ নিরপেক্ষ নই, আমি প্রাইভেট এবং পাবলিক প্রসিকিউটর উভয়ই—দিশি পুস্তক বিক্রেতা ২৫% কমিশন পেয়ে, রোক্কা টাকা ঢেলে বই কিনে নিয়ে যায় আপন রিস্‌কে; সে-বই বিক্রি না হলে তার পুরোপুরি সমূচহ লোকসান। প্রকাশক বই ফেরত নেবে না। বিলিতি বাবুরা অর্ডার নিয়ে, কোনও কোনও স্থলে পুরো দাম বায়না পকেটস্থ করে করে বইয়ের জন্য বিদেশে অর্ডার দেন। সিকি কানাকড়ির রিস্‌ক নেই। এ যে কত বড় ঈশ্বর-প্রতিশ্রুত স্বর্গরাজ্য সে জানে বিক্রেতা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

* * *

এবারে একটি ব্যক্তিগত নিবেদন; একমাত্র তাঁদেরই উদ্দেশে—যাঁরা আমার অক্ষম লেখনীপ্রসূত মন্দ-ভালো পড়েন। তাঁরাই বলুন, এই যে প্রায় কুড়ি বৎসর ধরে আমি লিখছি, কখনও দলাদলিতে ঢুকেছি? কখনও কাউকে আক্রমণ করেছি? এমন কি আমি যখন আক্রান্ত হয়েছি, তখন আত্মপক্ষ সমর্থন করেছি? হ্যাঁ, দু'একবার বাদ-প্রতিবাদে নেমেছি, যখন দেখেছি কোনও নিরীহ, বেকসুর, অখ্যাত লেখক আক্রান্ত হয়েছেন কোনও 'বুলি' দ্বারা, যিনি তাঁর নামের পেছনে জুড়ে দিয়েছেন তাঁর সবকটা ডিগ্রীর ফিরিস্তি যাতে করে সাধারণ পাঠক, প্রাগুক্ত নিরীহ লেখক এবং সম্পাদক স্তম্ভিত, বিস্মিত এবং সর্বোপরি আতঙ্কিত হন—সেই নিরীহের পক্ষ সমর্থন করে। তখন সেই ফিরিস্তি-পুচ্ছধারী হামলা করেছেন আমার প্রতি। আমি তদ্দণ্ডেই নিরুদ্দেশ, কারণ, আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করার কোনও প্রয়োজনবোধ করিনি, সেকথা পূর্বেই সবিনয় নিবেদন করেছি। ইতিমধ্যে সেই নিরীহ কিছুটা সান্ত্বনা পেল যে এ-দুনিয়ায় অন্তত আরেকটা মূর্খ আছে, যে তার মতে সায় দেয়।

কেন নামিনি? আমার কলমে বিষ নেই?

কিন্তু এবারে নামতে হল। ১৯২১ সালে যখন সর্বপ্রথম জর্মন ফরাসী পাঠ্যপুস্তক কিনতে গিয়েছি, তখন বিলিতি বই বিক্রি করতো শুধু বিলিতিরা, এবং তারা কান পাকড়কে নিয়েছে ঢালাও হিসেবে এক শিলিঙের জন্য এক টাকা। তখন বোধ হয় শিলিঙের দাম ছিল দশ আনা। এটা নিশ্চয়ই 'দুর্নীতি' নয়। সেই সবল বিপ্রসন্তান বলেছেন, 'এতদিন পর্যন্ত বই-এর ব্যবসার মধ্যে দুর্নীতি ছিল না বললেই হয়।' মোক্ষম তত্ত্ব এবং তথ্য। কারণ সে যুগে, এবং এই পঞ্চদিনতক সরকার পুস্তকের ব্যাপারে কোনও নিরিখ, প্রাইস-শেড়ুল বা কেনা-বেচার সময় এক শিলিঙের জন্য কত ভারতীয় মুদ্রা নেবে তার কোনও আইন করে দেননি (controlled price)। কাজেই 'দুর্নীতির' কোনও প্রশ্নই ওঠেনি। কিন্তু সাধারণ গেরস্ত এ নীতিটি মানবে কি? তুলনা দিয়ে শুধোই, আজ মাছের বাজারে আর কন্ট্রোল নেই; মাছওলা যদি কাদা চিংড়ির জন্য দশ টাকা কিলো চায় তবে তো সেটা 'দুর্নীতি' নয়—মানবে গেরস্ত? দমদমা তো মানছে না! তাদের উপর এ-বৃদ্ধের আশীর্বাদ রইল।

তখন কলকাতায়, বিলিতি বইয়ের ব্যবসাতে প্রাক্তন 'সুনীতিতে' টেটম্বুর টাকার হরিনুট দেখে সে-বাজারে নামলেন 'লেটিভ'রা।

কিন্তু সেই ১৯২১ থেকে ১৯৬৬-র ইতিহাস লিখতে হলে তো এক কিস্তিতে হবে না। তবে লিখব।[১]

---

১ এস্থলে নিবেদন, বার্ধক্যজনিত অসুস্থতা তথা দুর্বলতাবশত আমাকে মাঝে মাঝে পত্রিকায় 'পঞ্চতন্ত্র' বন্ধ করতে হয়। সাতিশয় শ্লাঘা সহকারে স্বীকার করছি, তখন কোনও কোনও পাঠক সম্পাদকও আমার কাছে কৈফিয়ত চেয়ে কখনও মিঠে কখনও কড়া চিঠি লেখেন। (যে সব বিচক্ষণ জন আমার লেখা অপছন্দ করেন, তাদের সান্ত্বনার্থে বলি, I am a fool; এবং প্রবাদ আছে "One fool raiseth a hundred")। কাজেই পরের কিস্তির গ্যারান্টি দিতে পারি না বলে আমি সন্তপ্ত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এ-সুবাদে সদাশয় সরকারকে আবার বলি তোমার রেশনের চাল অখাদ্য, তুমি ভেজাল কালোবাজার ঠেকাতে পারছ না, বিদেশ গিয়ে দু'মাসের জন্য রিসার্চ করে আমার দুখানা বই শেষ করার জন্য কুল্যে দু হাজার মার্ক চেয়েছিলুম তুমি দাওনি, বিদেশী বই কেনার জন্য তুমি ক্রমাগত একসচেঞ্জ কমাচ্ছ (এবং যা দিচ্ছ সেও ছুতোর-কামারের টেকনিকাল বই আর পাঠ্য পুস্তকের জন্য—আমার কাজে লাগে না), ফলে মৃত্যুর পূর্বে আমাকে তুমি বিদেশী বইয়ের দুর্ভিক্ষ লাগিয়ে অন্নহীনবৎ মারছ—আমি রাত্তিভর প্রতিবাদ করিনি, করছি না, করবোও না। কিন্তু তুমি যে সেই বিদেশী বইয়ের দাম কন্ট্রোল করছ, তার জন্য আমি তোমাকে দু হাত তুলে আশীর্বাদ করি। শঙ্কর তোমাকে জয়যুক্ত করুন।

ভেবো না আমি স্বার্থপর। আমি পাব না, এমনিতে না, অমনিতেও না। তুমি অঢেল হার্ড কারেন্‌সি ছেড়ে দিলেও না, না ছেড়ে দিলেও না। কেন, তার ইঙ্গিত বক্ষ্যমাণে দিয়েছি। বারান্তরে সবিস্তর।

হায়! কোথায় সেই কুটির আর সামনের সুদীর্ঘ পপলার গাছ! সরকার না একবার বলেছিলেন, তাঁরা কালোবাজারীদের ল্যাম্পপোস্টে ঝোলাবেন! পপলার গাছ অনেক ভালো। অনেক দূর থেকে দেখা যায়।

হ্যাঁ, আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল। যদ্যপি আমি বৃদ্ধ এবং শঙ্কর খেদ করেন, 'বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্ন' আমি কিন্তু 'তরুণে আরক্ত'। তাদের প্রতি এই সুবাদে একটি সদুপদেশ দিই; দুষ্টেরা তোমাদের বিদেশী ভাষা শেখার জন্য উপদেশ দেবে; সরল কনস্যুলেটগুলো তাদের জন্য ব্যবস্থা করবে এবং করছে। কিন্তু অমন কম্মটি কোরো না। বিদেশী বই না কিনতে পারলে বিদেশী ভাষা শিখে তোমার লাভ? এ যেন একগোচ্ছা চাবি নিয়ে বাড়িময় ঘুরে বেড়াচ্ছ—সিন্দুক কিন্তু একটাও নেই! এ যেন রশি নিয়ে হাওয়ায় কোমর বাঁধার মত বন্ধ্যাগমন। এবং পারলে বাঙলাটাও শিখবে না। বলা তো যায় না, সে-বাজারেও কোনদিন কি হয় না হয়! হয়তো একই বই পাঁচ কপি কেনবার জন্য সাত টাকা চাইবেন। আগের থেকে সাবধান হওয়া বিচক্ষণের কর্ম। কেন, নিরক্ষরদের দিন কাটে না এদেশে? টিপসই দিয়ে চালাবে।

আমি ভালো করেই জানি, এ প্রবন্ধ ইংরিজিতে লিখলে ধুন্ধুমার লেগে যেত। কারণ, তাহলে হয়তো বিদেশী পুস্তক বিক্রেতাদের চাঁই, বোম্বাইবাসী শ্রীল শ্রীযুক্ত সদানন্দ বিটকল এটি পড়তেন (শুনেছি, বোম্বাইওয়ালারা নাকি এ বাবদে কলকাতাকে কল্কে দেয় না—বড় আনন্দ হল)। যাঁরা বাঙলা জানেন, তাঁরা যদি হুহুঙ্কার সচিৎকার 'যুদ্ধং দেহি' বস্ত্র ছেড়ে আসরে নামেন তবে আমি প্রস্তুত।

শুধু দয়া করে পরের হাত দিয়ে তামাক খাবেন না।[১]

সুপণ্ডিত বিপ্রসন্তানকে ডোবাবেন না। অবশ্য তাঁর যদি ব্যবসাতে শেয়ার থাকে তো আলাদা কথা। আমার বিশ্বাস তাঁর নেই।

---

১ যেসব ভারতীয় বিদেশী বইয়ের ব্যবসা করেন, তাঁদের সম্বন্ধে একটি আপ্ত বাক্য প্রযোজ্য। শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে এসেছেন এক সদ্য বিলেত-ফের্তা—ইভনিং জ্যাকেট, বয়েলড শার্ট গরে। অতি কষ্টে পিঁড়িতে বসতে বসতে বললেন, 'মুশকিল, বাঙলাটা ভুলিয়া গেইছি।' রবিঠাকুর নাকি শুনে বললেন, 'সত্যি মুশকিল হে ভড়, ইংরিজিটাও শিখলে না; বাঙলাটাও ভুলে গেলে!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর সরকার যদি শেষটায় কন্ট্রোল তুলে নেন—মাছের বেলা যা হয়েছে—তা হলে আম্মো শেয়ারের সন্ধানে বেরুব। টাকা নিয়ে কথা, মশাই। তার আবার সুনীতি দুর্নীতি কি?

ঝুলবই না হয় একদিন পপলারের মগডালে। ক্রুশবিদ্ধ ক্রাইস্টের দু দিকে আরও কে যেন দুজন ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিল।

হাতে কমণ্ডলু, মাথায় তুর্কী টুপি

প্রবাসের লোক বড়ই অনাড়ম্বর। তাই স্যুটের বড়ফাট্টাই নিয়ে সেকানে মস্করা জমে ভালো।

স্যুট বাবদে একদা মহামুশকিলে পড়েছিলেন লর্ড কার্জন।

আমি জানি আমার নগণ্যতম—অর্থাৎ আমার প্রিয়তম পাঠকও প্রত্যয় যাবেন না যে, লর্ড কার্জনের মত বিলেতের খানদানী পরিবারের নিকষ্যি কুলীন স্যুটের মত ডালভাত—সরি, আই মীন বেকন-আণ্ডা—নিয়ে গর্দিশে পড়তে পারেন। টাকাকড়ির অভাব এমনিতেই ছিল না, তদুপরি বিয়ে করেছিলেন মার্কিন কোটিপতির দুহিতা—নিশ্চয়ই শ্বশুরবাড়িতে আসার সময় (আবার ভুল করলুম, মার্কিনিংরেজ মেয়ে শাদি করে শ্বশুরবাড়ি যায় না, স্বামীকে সেখান থেকে ছোঁ মেরে শিকার করে ঘর বাঁধে অন্য মোকামে) পিতাকে উত্তমরূপে দোহন করেই এসেছিলেন। তাই স্বীকার করে নিচ্ছি গল্পটি অন্য কারও বাবদে হতে পারে এবং ডিটেলে ভুল থাকবে এস্তের। কিন্তু আমার নিপীড়িত কর্মক্লান্ত স্মৃতিশক্তি তবু যেন ক্ষীণ কণ্ঠে বার বার অভিমানভরে বলছে, এটা লর্ড কার্জন অব্ কিডলস্টনেরই কাহিনী— কার্জনের মুসলমানপ্রীতি দেখে অনেকেই বলতেন লর্ড কার্জন অব্ খিদিলস্তান।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুর্কীকে কচুকাটা করা হল সেভ্‌র্-এর সন্ধিচুক্তিতে (তখনই এ-দেশে খেলাফত আন্দোলনের দানা বাঁধে), কিন্তু ঐ সময় উদয় হল মুস্তফা কামাল পাশার, (পরে আতা ত্যুরক) এবং তিনি সে সন্ধিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে খেদিয়ে বার করে দিলেন গ্রীকদের তুর্কী থেকে। তখন আবার নয়া করে সন্ধিপত্র তৈরী করতে হবে। ইউরোপময় হাহাকার রব উঠেছে, 'বর্বর' মুসলমান তুর্ক 'সুসভ্য' খ্রীষ্টান গ্রীকদের তাড়িয়ে দিয়েছে তার 'হক্‌কের' (বে-) দখলী জমি থেকে—নূতন সন্ধিতে এটা মানা চলবে না (ফ্যাতাঁকাঁপ্লি নয়)। তাই নয়া সন্ধিটা যাতে চোস্ত-দুরস্ত হয় সেজন্য লজ্জায় বৈঠকে পাঠানো তামাম ইওরোপের কুটিলস্য কৌটিল্য মহামান্য কার্জনকে।

গণ্ডা দশেক স্যুটকেশ ট্রাঙ্ক নিয়ে নামলেন পরমপ্রতাপান্বিত কার্জন লজান শহরে। দুনিয়ার রিপোর্টার জড় হয়েছে তাঁর অবতরণভূমিতে।

মালপত্র যখন নামছে তখন দেখা গেল, সেই বাহুল্য ভাজা লগেজের সঙ্গে আলাদা করে অতি সন্তর্পণে নামানো হল একখানি ছোট্ট ফুট-স্টুল—লর্ড কার্জন মিটিং-মাটিং সর্বত্রই এই জিনিসটার উপর পা না রেখে দু'দণ্ড বসতে পারেন না। ঐটে দেখা মাত্রই এক ঠোঁট-কাটা ফরাসী সাংবাদিক টিপ্পনী কাটলে—"ভোয়ালা ল্য ত্রোন দ্য দামা!" (Voila le trone de Damas!)—"ঐ হেরো, দামাস্কাসের সিংহাসন"—অর্থাৎ নয়া মাহমুদ

www.BanglaBook.org

কার্জনের 'চলচৌকি' পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন নগর (স্থান পরিবর্তন না করে একটানা এক জায়গায় আছে) দমস্কের সমতুল্য।...তা সে যাক্ গে, এটা ঈষৎ অবান্তর।

তুর্কীর পক্ষ থেকে এসেছেন জেনারেল ইসমেৎ পাশা (পরে প্রেসিডেন্ট ইনেন্যু)।

জোর কনফারেন্স, জোরালো উপ-কনফারেন্স, সাবকমিটি আরও কত কী। কার্জন বজ্রনির্ঘোষে—থানডারিং—লেকচার ঝাড়লেন টেবিল থাবড়ে। ইসমেৎ দিব্য ইংরিজি বোঝেন,—ভান করলেন বোঝেন না, তদুপরি তিনি কানে খাটো। থানডারিং লেকচারের প্রতিটি তাঁর কানের কাছে অনুবাদ করে দিতে হয়—থান্ডার ততক্ষণে ঠাণ্ডা। গরমাগরম উত্তর দিতে হল। সেপাই ইসমেৎ পারবেন কেন অরেটর কার্জনের সঙ্গে? তবু চললো লড়াই।[১]

সন্ধ্যেবেলা এঁরা সবাই একটুখানি আমোদ-আহ্লাদ করে নিতেন। আজ এখানে ডিনার, কাল সেখানে ডান্স, পরশু জীনিভা হ্রদে নৈশভ্রমণ।

এক সন্ধ্যায় কার্জনের ভ্যালে তাঁকে যথারীতি অত্যুত্তম ডিনার স্যুট পরিয়ে দিয়ে, সাদা বো-টি নিখুঁত বেধে দিলে পর সদাশয় লর্ড বললেন, "আজ আর তুমি আমার জন্যে জেগে থেকো না; ফিরতে অনেক রাত হবে। আমি কোনও রকমে ম্যানেজ করে নেবো'খন।" এ যে কত বিরাট সদাশয়তা সেটা সাধারণ পাঠক বুঝতে পারবেন না। এসব লর্ডরা ভ্যালে-র সাহায্য বিনা জামা-কাপড় পরতে তো পারেনই না—আর বো বাঁধার বেলা তো ৯৯% স্রেফ ঘায়েল—ছাড়তে পর্যন্ত পারেন না।

ভ্যালেটি ছিল কার্জনের চেয়েও খানদানী—অবশ্য তার আপন ভ্যালে সম্প্রদায়ে। বো বাঁধাতে তার ছিল বিশ্ব রেকর্ড। ১১ সেকেন্ডে সে যা বো বাঁধতো, মনে হত, একদম মেশিনে তৈরী, রেডিমেড বো। অন্য লোক এ স্থলে সে সন্দেহ এড়াবার জন্য বো-টি একটু ট্যারটা করে নেয়। খানদানী কার্জনের বেলা অবশ্য এ সন্দেহ করতে যাবে কে? বহু বৎসর পরে হিটলারের ভ্যালে লিঙে এর কাছাকাছি অর্থাৎ ১২ সেকেন্ডে আসতে পেরেছিলেন। লিঙে তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, হিটলার প্রতিবার চোখ বন্ধ করে এক, দুই গুনতেন এবং লিঙের বো বাঁধা হলে সোল্লাসে বলতেন, "লিঙে, এবার কেল্লা ফতে করেছ—মাত্র বারো সেকেন্ড!"...উপস্থিত এ বো অনুচ্ছেদ থাক।

কার্জন তো গেলেন ব্যানকুয়েটে wined and dined হতে—সঙ্গে 'ত্রোন দ্য দামা' বা 'দিমিশ্‌কের ময়ূর সিংহাসন' বগলে করে নিয়ে গিয়েছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে ইংরেজী এন্‌সাইক্‌লপীডিয়া, ফরাসী লিত্রে, জর্মন ব্রকহাউস—চরম পরিতাপের বিষয়—সবাই নীরব। বিবেচনা করি নিমন্ত্রণ-কর্তাই সেটি সাপ্লাই করেছিলেন। কিন্তু সে রাত্রে কিসে যেন কি হয়ে গেল, কার্জন অসুস্থ বোধ করতে লাগলেন এবং রাত দশটা-এগারোটার মধ্যেই হোটেলে ফিরে এলেন।

হোটেলে ঢুকতেই দেখেন বিরাট হল জুড়ে লেগেছে ধুন্ধুমার নৃত্য—সে রাত্রে সে হোটেলে ছিল গ্যালা ড্যান্স। তারই এক পাশ দিয়ে পেরিয়ে গিয়ে তাঁকে উঠতে হবে লিফ্‌টে। যেতে যেতে হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়ালেন—কে ঐ লোকটি? বড্ডই যেন চেনা-

BanglaBook.org

১ কার্জন-ইসমেতের দ্বন্দ্বযুদ্ধে ইসমেতের শেষ পর্যন্ত নিরঙ্কুশ জয় হলে পর সাংবাদিকরা তাঁকে অভিনন্দন জানাতে আসেন। অতিশয় সবিনয় তিনি নিবেদন করেন, "না, না, আমার আর কী কীর্তি! আমি কালা—আল্লাকে অসংখ্য শোকরীয়া ধন্যবাদ।"

www.BanglaBook.org

চেনা মনে হচ্ছে। উৎকৃষ্টতম স্টাইলের নিখুঁত ফুল ডিনার-ড্রেস পরে সাতিশয় রুচিসম্মত পদ্ধতিতে নাচছে একটি সম্ভ্রান্তবংশীয়া যুবতীর সঙ্গে।

সর্বনাশ! ও গড!! এ যে তাঁরই ভ্যালে!! নাচছে তাঁরই ইভনিং ড্রেস পরে।

আহা, সদয় সহৃদয় পাঠক, তুমিও আমার সঙ্গে সবেদন কণ্ঠ যোগ দিয়ে বলবে, আহা, বেচারী ভেবেছিল কত্তার ফিরতে যখন দেরি হবে তখন সে-ই বা দুচক্কর নেচে নেয় না কেন?

কিন্তু এ যে ডবল মহাপাপ—খাস বিলেতে নিশ্চয়ই, এ স্থলে ডবল ফাঁসির চেয়েও কড়া আইন আছে।

তুলনা দিয়ে কি প্রকারে বোঝাই? কোনও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ যদি হঠাৎ কোন এক পরিচিতের বাড়িতে গিয়ে দেখেন তাঁরই এক চেনা চাঁড়াল তাঁরই গরদ পরে বামুন সেজে পূজোর ঘণ্টা বাজিয়ে ধুমধাম লাগিয়েছে আর বউ-ঝিরা তাকে টিপটিপ করে পেন্নাম করছে তা হলে তাঁর মনের অবস্থাটা কোন্ রস দিয়ে বর্ণাতে হয়?

* * *

কার্জন হুকুম জারি করলেন, ব্যাটাকে যেন অতি ভোরের ট্রেনে চাপিয়ে দেওয়া হয়—নাক বরাবর লন্ডন। একটা ঠিকে ভ্যালে যেন তদ্দণ্ডেই যোগাড় করা হয়।

এখানেই শেষ? আদৌ না। এ তো সবে শুরু।

পরদিন সকালে কার্জন খাটে শুয়ে শুয়ে দেখেন, ঠিকে ভ্যালে ওয়ার্ডরোবের দরজা খুলে তার সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে ঘাড় চুলকোচ্ছে। অচেনা, নয়া ঠিকে—কার্জনও দরদী-দিল আদমী শুধোলেন, "কি হল?"

কাঁচুমাচু হয়ে বললে, "হুজুর, সঠিক ঠাহর হচ্ছে না। পাতলুনগুলো গেল কোথায়!"

লম্ফ মেরে কার্জন গিয়ে দেখেন, সত্যিই তো, পাতলুনগুলো গেল কোথায়? আছে বটে অনেকগুলো, কিন্তু স্ট্রাইপ্‌ট্ অর্থাৎ ডোরাকাটা পাতলুনগুলো কোথায়? সেগুলোর যে এক জোড়াও নেই। আর সেই পরেই তো তিনি যাবেন দুপুরের কনফারেন্সে। খাঁটি ফুল মর্নিং ড্রেস। সামনের দিকে ট্যারচা করে কাটা হাঁটুঝুল কোট, সেই কাপড়েরই তৈরী ম্যাচ করা কিংবা ফেনসি ওয়াসকিট—এই ওয়াসকিটেই সাদা পাইপিং লাগাবেন কিনা তাই নিয়ে জীবনমরণ সমস্যায় পড়েছিলেন আমার সুবন্ধু স্যার সিরিল হবজন-জবসন ফর্বস-রবার্টসন লন্ডনে—এবং তাঁর সঙ্গে সাদায় কালোয়, কিংবা ঈষৎ ধূসর রঙের ডোরাকাটা স্ট্রাইপ্‌ট্ ট্রাউজারজ—তার তো কোন চিহ্নই নেই।

সর্বনাশ! এখন উপায়?

গাঁইয়া পাঠক—যতই ধানাইপানাই করি না কেন, আম্মো এখনও ভাই—তুমি বলবে, কেন, অন্য পাতলুন পরে গেলে হয় না? নিশ্চয়ই হয়। যান না আপনি নিচে কপ্পিন, উপরে দুশালা-শাল, মাথায় তুর্কী টুপি, হাতে কমণ্ডলু নিয়ে আধুনিকদের ব্যুফে লানচ পার্টিতে টালিউডে—কে বারণ করছে? সে কথা থাক্।

কিন্তু ব্যাটা ভ্যালের চুরি করারই যদি মতলব ছিল তবে কোর্ট-ওয়েসকিট ম্যাচিং-টাই-কলার পেটেন্ট-লেদার জুতো মায় স্প্যাটস এগুলো ফেলে গেল কেন? এস্তেক ডাইমন্ড পিনও যথাস্থানে রয়েছে। উঁহু, তা নয়। নিশ্চয়ই সুদ্ধমাত্র তাঁকে রাম-ইডিয়েট বানাবার জন্য।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঝাড়ো টেলিগ্রাফ। পাক্‌ড়ো রাসকেলকো কঁহী ভী হোয় টেরেন্ মে—চাহে প্যারিস, চাহে লনদন!

সে না-হয় হল। কার্জনের রোআবে বাঘের দুধের অর্ডার আকছারই যায় টেলিগ্রামে। কিন্তু স্ট্রাইপ্‌ট্ ট্রাউজারজ তো আর বাঘের দুধ নয়, বাঘিনীরও দুধও নয়। আপাতক সে বস্তু মেলে কোথা? ওদিকে প্লেনারি কনফারেন্সের সময় যে ঘনিয়ে আসছে। হে ভগবান! প্রতি মুহূর্তের এ কী গব্বযন্ত্রণা!

* * *

এমন সময় করিডোরে শতকণ্ঠে বাইশটে ভাষায় চিৎকার হই-হল্লোড়।

পাওয়া গেছে! পাওয়া গেছে! কোথায়? কোথায়?

যে মেয়েটি ভ্যালে, চাকরবাকরদের কুটুরিগুলোতে তাদের বিছানাপত্র ঝেড়েঝুড়ে দেয়, সে কার্জনের ভ্যালের তোশক ঝাড়তে গিয়ে দেখে তার নিচে পরিপাটিরূপে টান-টান করে সাজানো চার জোড়া স্ট্রাইপ্‌ট্ পাতলুন। আমরা, গরিব দুঃখীরা যাদের বাধ্য হয়ে মাঝেমধ্যে স্যুট পরতে হয়, তারা জানি, পাতলুনের ক্রীজ দুরস্ত করার জন্য এর চেয়ে মহত্তর মুষ্টিযোগ নেই।

কিন্তু সর্বজ্ঞ কার্জনের সেদিন নবীন জ্ঞানসঞ্চয় হল।[১]

ভূতের মুখে রাম নাম

যে কোনও ভদ্রসন্তান স্তম্ভিত হবে। প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ঝাড়া দশটি মিনিট গা-গা রব ছাড়বে। অপেক্ষাকৃত রোগাপটকা ভিরমি যাবে। খবরটা এমনই অবিশ্বাস্য।

মানুষের তৈরী বেঙ্গল ফ্যামিনের সময় এক অজানা কবি রচেন,

দেখো না আজব হ্যায়,
এ হেন ভূতের পায়
স্বস্তিবাচন
করা নিবেদন।
এ যেন প্রেতের গায়
উম্‌দা উম্‌দা আতর মাখানো ভুরভুরে খুশবায়।
এ যেন দুখিনী মায়
Amcryর কাছে শিশুটির তরে
ভিক্ষার চাল চায়।

খবরটা এর চেয়েও বিৎকুটে।

ফ্রান্‌সের বিখ্যাত ঔপনাসিক ফ্লোবেরের[২] বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস মাদাম বভারি ফ্রান্‌সে

---

১ কাহিনীটি যিনি আমাকে সর্বপ্রথম বলেন তাঁর মতে লিটন স্ট্রেচিই নাকি ইটি সক্কলের পয়লা লিপিবদ্ধ করেন। আমি ভিন্ন ভিন্ন কীর্তন শুনেছি।

২ উচ্চারণ ফ্লো, তারপর ব্যার। ফ্ল্যোবার লিখলে সাধারণ বাঙালী ফ্ল্যোব্‌ব্যার পড়ে বসতে পারে; সেটা হবে ভুল। ঐটে বাঁচাবার জন্য পূর্বসুরিগণ লিখতেন ফ্লোবারের বা ফ্লোবের।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এখন থেকে ছাপা যাবে, বেচা যাবে বটে কিন্তু বিজ্ঞাপন দেওয়া তথা বইয়ের দোকানে পেটি রেখে খদ্দের আকৃষ্ট করা বেআইনি!

কেন?

বইখানা এ্যামরাল, ইমরাল (immoral) অর্থাৎ দুর্নীতিপূর্ণ, এক কথায় অশ্লীল। বইখানা লিখতে ফ্লোবেরের লেগেছিল পূর্ণ চারটি বৎসর—কিঞ্চিৎ অধিক—১৮৫২ থেকে ১৮৫৬। প্লটটি নিয়ে চিন্তা করেছিলেন তার পূর্বে তিনটি বৎসর। এই ছোট বইখানা লিখতে ফ্লোবারের এতখানি সময় লাগলো কেন? তার প্রথম কারণ, তিনি ছিলেন মাত্রাধিক পিটপিটে পারফেক্শনিস্ট। বাস্তব জগতের পরিবেশ যেমন তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন, (অন্য উপন্যাসে একটি রোমান ভোজের নিখুঁত বর্ণনা দেবার জন্য তিনি নাকি প্রাচীন ক্ল্যাসিক্স ঘাঁটেন কেউ বলে ছ'মাস, কেউ বলে দুবছর)[১] ঠিক তেমনি তাঁর স্বপ্নলোক কাগজকলমে মৃন্ময় করার সময় তিনি চাইতেন সেটা যেন বাস্তবের চেয়েও বাস্তব হয়, এবং সর্বশেষ প্রত্যেকটি বাক্য, প্রত্যেকটি সেন্টেন্স যতক্ষণ না তার নিখুঁত ভারসাম্য পায়, তার প্রত্যেকটি শব্দ অন্য শব্দগুলোর সঙ্গে মিলে গিয়ে যতক্ষণ না উন্নয়নাতীত হয়, নিটোল সুডৌল না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি পরের সেন্টেন্সে যেতেন না, কিংবা বলবো, যেতে পারতেন না, যেন আগের সেন্টেন্স্ তাঁকে জোর করে আঁকড়ে ধরে বলছে, আমাকে পরিপূর্ণতায় পৌঁছে দিয়ে তবে তুমি এগোও।'

এমন দিন বহুবার গেছে, যে দিন ফ্লোবের মাত্র একটি ছত্রের বেশী লিখতে পারেননি! এটা কিংবদন্তী নয়। নইলে চারশ' পাতার বই লিখতে চারটি বৎসর লাগবার কথা নয়। এবং স্মরণ রাখা উচিত, ফ্লোবের যখন কোনও বই লিখতে আরম্ভ করতেন, তখন সেইটে নিয়েই অষ্টপ্রহর মেতে থাকতেন। পেটের ধান্দা তাঁর ছিল না, তাঁর দেখভাল করার জন্য লোকের অভাব ছিল না, তিনি চিরকুমার, প্রতিদিন নিয়মিতভাবে লেখার টেবিলে বসতেন, বাড়ি ছেড়ে পারতপক্ষে রাস্তায় পর্যন্ত নামতেন না, অথচ চল্লিশ বৎসর সাধনার ফলস্বরূপ তিনি লিখেছেন মাত্র খান-আষ্টেক বই।

মোটামুটি ভালো বই হলেই আমরা সেটাকে বলি 'রসোত্তীর্ণ', খেয়াল না করেই বলি 'পীস অব আর্ট', কিন্তু সত্য সত্য যদি কোনও একখানি বইকে শব্দার্থে পীস অব আর্ট বলতে হয় তবে সে মাদাম বভারি। এর সর্বোৎকৃষ্ট পরিচিতি লিখেছেন ফ্লোবেরের পুত্রপ্রতিম প্রিয়শিষ্য মোপাসাঁ। তাঁর ভুবনবিখ্যাত 'নেকলেস' গল্পে পাঠক ফ্লোবেরের প্রভাব দেখতে পাবেন। বস্তুত বভারি বেরুবার পর সে যুগের ফরাসী কৃতী লেখকদের বড় কেউই এর প্রভাব থেকে নিষ্কৃতি পাননি। একমাত্র এরকম বইকেই পীস অব আর্ট বলা চলে। সিপাহী বিদ্রোহের বছরে এই 'কাব্য' প্রকাশিত হয়—আজও নবীন লেখক নবীন পাঠক এ-পুস্তকের শরণ নেন।

মোপাসাঁ তাঁর গুরু সম্বন্ধে দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন। আজও যাঁরা ফ্লোবের নিয়ে

---

১ এদেশের উপন্যাসে প্রায়ই পড়ি, বিলিতি বড়সাহেব বা বিলেতফের্তা ন'সিকে এটিকেট-দুরস্ত সাহেব 'জুতো মস্ মস্ করে চলে গেলেন।' জুতো জোড়া মস্ মস্ করলে এদেশের ট্যাশসাহেবও সেটা ভেজাছালার উপর রাতভর পেতে রাখে। সামান্যতম মস্ করলেও বন্ধুজন মস্করা করে বলে, 'দাম দাওনি বুঝি! বেচারী যে চিৎকার করে করে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আলোচনা করেন তাঁরা এ দুটি প্রবন্ধের বরাত না দিয়ে পারেন না।[১] এ ছাড়াও তিনি কাগজে-কলমে ফ্লোবেরের মৃত্যুর পর তাঁর হয়ে একাধিক লড়াই দিয়েছেন। এসব উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য আইস, পাঠক, প্যারিস যাই।

কিন্তু প্যারিসের বর্ণনা দেবার মত কোথায় আমার বীর্যবল, কীই বা অধিকার! তাই আমার যেটুকু দরকার সেটুকু নিবেদন করি।

সেই ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে প্যারিস যত না কাজ করেছে তার চেয়ে বেশী চেঁচিয়ে দুনিয়া ফাটিয়েছে, লিবেরতে (liberty), লিবেরতে, তুজুর (চিরন্তন) লা লিবেরতে। সে চিৎকারে মোহাচ্ছন্ন হয়েছেন গোটে থেকে শুরু করে মিশর-ইন্ডিয়া পেরিয়ে চীন দেশের সুন ইয়াট সেন পর্যন্ত। ক্রমে ক্রমে তার বিকৃত রূপ দেখা দিল তার সামাজিক জীবনে তার আমোদ-আহ্লাদে। পুরীর নুলিয়ারা যে বহ্বাড়ম্বর পরিপূর্ণ বহ্বাভরণ পরিধান করে সমুদ্রে নামে, কিংবা আমাদের জেলেরা মাছ ধরার সময়, সেই পরে মেয়েরা প্যারিসে নৃত্যাদি আরম্ভ করলেন। এবং শুধু যে আপন-ভোলা নটরাজের জটার বাঁধন খুলে যায় তাই নয়, দিব্য সচেতন অবস্থায়—যাক্ গে, পূর্বেই বলেছি, যতখানি 'জ্ঞাতাস্বাদো বিপুল-জঘনাং' হলে পর প্যারিস বর্ণনের শাস্ত্রাধিকার জন্মে, আমার ততখানি নেই।

এই বাতাবরণের মাঝখানে ফ্লোবের এতই সংযত সমাহিত যে, আজকের দিনের 'মডার্ন'রা তাঁকে রীতিমত চেঁচিয়ে গালাগাল দেবেন, কাপ্রুস তোমার গাহঃ নেই (কাপুরুষ! তোমার সাহস নেই—পাঠক 'সামবাজারের সসীবাবুর' মত 'স'-গুলো উচ্চারণ করবেন!)।

বইখানা পত্রিকায় কিস্তিতে কিস্তিতে বেরিয়ে পুস্তকাকারে ছাপা হবে এমন সময়

---

১ প্রবন্ধ দুটি বেরোয় মোপাসাঁর চিঠি-চাপাটির (করেস্‌পঁদাস্) সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকাকারে। এ-পুস্তকে পাঠক পাবেন মোপাসাঁর অন্যান্য রচনা সংগ্রহ। গল্প-লেখক মোপাসাঁর খ্যাতি 'ব্যাল লাৎরিস্‌ৎ' ('রম্যরচনা' তথা প্রবন্ধ -লেখক) মোপাসাঁকে এমনই ম্লান করে দিয়েছে যে, ফ্রান্সের বাইরে কেউ মোপাসাঁর এসব লেখার সন্ধান বড় একটা করে না। এ পুস্তকে পাঠক পাবেন, বালজাক, জোলা, তুর্গেনিফ (একাধিক), সুইনবার্ন এবং অন্যান্য সম্বন্ধে প্রামাণিক প্রবন্ধ। এবং সব চেয়ে কৌতূহল-উদ্দীপক—পাঠক এতে পাবেন, মোপাসাঁ কোন্ আকস্মিক যোগাযোগের ফলে কথাসাহিত্যে প্রবেশ করেন। জোলার গ্রামের বাড়িতে একদিন গল্প বলার আর্ট, এবং সে আর্টের রাজা তুর্গেনিফ ও মেরিমে (চারু বাঁড়য্যে এঁর বই 'কলবাঁ' 'আগুনের ফুলকি' নাম দিয়ে প্রায় ৪৫ বৎসর হল অনুবাদ করেন), সম্বন্ধে কথা উঠলে জোলা প্রস্তাব করেন, সে-মজলিশের সবাইকে একটি একটি করে গল্প বলতে হবে। গল্প বলেন জোলা, হ্যেসমান্‌স সেয়াঁ, এনিক এবং সব চেয়ে বড় কথা মোপাসাঁ স্বয়ং। সেই তাঁর প্রথম গল্প। সেটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় অন্যান্য গল্প-লেখকদের রচনাবলী সংগ্রহের সঙ্গে। যেহেতু জোলার বাড়িতে মেদাঁতে গল্পগুলো বলা হয়, চয়নিকার নাম হয় 'মেদাঁর সোয়ারে'। সঙ্গে সঙ্গে রাতারাতি মোপাসাঁ ফ্রান্সে বিখ্যাত হয়ে যান। ফ্লোবের তখনও বেঁচে। আন্তরিক অভিনন্দন ও অকুণ্ঠ প্রশংসা জানালেন তরুণ লেখককে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, জোলার চাপে না পড়লে কি হত! কারণ এর পূর্বে মোপাসাঁ নিজেই জানতেন না, কথাসাহিত্যে তিনি কী অভূতপূর্ব সৃজনীশক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মোপাসাঁর চিঠি-চাপাটি ও প্রবন্ধাবলীর পরিচয় আমি অন্যত্র অতি সংক্ষেপে দিয়েছি। এ বাবদে দুটি সংকলন আছে এবং যেহেতু এ-দুটির ইংরিজি অনুবাদ আমার চোখে পড়েনি, তাই পুনরুল্লেখ প্রয়োজন বোধ করি :

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘটলো বিপর্যয়।

আল্লায় মালুম কোন্ শুকদেব ঠাকুরের সুপরামর্শে—তখনও তো দ্য গল্ জন্মান নি—ফরাসী সরকার লাগিয়ে দিলেন ফ্লোবেরের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা। ফরাসী সরকারের শিক্ষা বিভাগ—মিনিস্ট্রি অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকশন, ওই সময় থেকেই বোধ হয় প্যারিসের যদো-মেধো ওর নাম দেয়, মিনিস্ট্রি অব পাবলিক ডিস্‌ট্রাক্‌শন।

ফ্লেবেরের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি নাকি বভারি পুস্তকের মাধ্যমে দেশের দশের নীতিধর্মের সর্বনাশ করছেন! সোজা বাংলায় তাঁর বইখানা অশ্লীল, কদর্য!!

'অশ্লীল' শব্দটা এ-কথা শুনে হেসে উঠলো না তো?

সেই যে-রকম ঢাকাতে সোয়ামি কম ভাড়া হাঁকলে রসিক কুট্টি কোচম্যান ফিসফিস করে বলে, 'আস্তে কন, কত্তা, ঘোড়ায় হাসবো!'

এবং কার মুখে এই অভিযোগ?

প্যারিসের মুখে! তাজ্জব, তাজ্জব! গুজব, গুজব!!

প্যারিসীনির পরনে তখন কি? A la নুলিয়া নয় তো?

তাই বলছিলুম,

এ যেন প্রেতের গায়
শানেল আর উ (h) বিগাঁ মাখানো
ভুরভুরে খুশবায়!

কিংবা রাষ্ট্রভাষা :

আরে তেরা লড়কেকা
আজব তরেহ্ কা খেল
ছুচ্ছুন্দর কা সিরপর
চামেলী কা তেল!

("তোর ছেলেটার আজব কীর্তি! ছুঁচোর গায়ে মাখিয়েছে চামেলির তেল।" কি রকম চামেলি? 'বাদল শেষে করুণ হেসে, যেন চামেলি কলিয়াঁ!')

পাঠক ভাবছেন, আমি রগড় দেখে, the utter absurdity of it ভূতের মুখে রামনাম শুনে বে-এক্তেয়ার হয়ে উচ্ছ্বসিত গঞ্জিকা বিলাস করছি?

আদৌ না। আর করলেও আমি আছি সৎসঙ্গে, ইন গুড কামপনি!

মোপাসাঁ মোকদ্দমার সাতাশ বৎসর পরে মস্‌করা করে বলেন, "সরকারী পক্ষের উকীল যে-ভাবে ফ্লোবেরকে আক্রমণ করে বজ্রনির্ঘোষ 'বক্তিমে' ঝাড়েন, একমাত্র সেই কারণেই তাঁর নাম মার্কা-মারা (marque) হয়ে থাকবে। কিন্তু হুঁশ, উকিল মসিয়োটি

* 1. Rene Dumesnil, chroniques, Etudes, Correspondance de Guy de Maupassant, publiees pour la premiere fois avec de de nombreux documents inedits, Gruend, Paris, 1938.

2. Artine Artinian & Edouard Maynial, Correspondance inedite de Guy de Maupassant Wapler, Paris, 1951.

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মোকদ্দমার আরম্ভের প্রাক্কালে তাঁর নাম—Pinard-টি—বদলালেন না কেন?"[৪]

পিনার এক রকম মদ।

মোপাসাঁর বক্তব্য : বক্তিমে ঝাড়বি ঝাড়। হামলা করবি, কর। কিন্তু দোহাই ধর্মের, সাদা চোখে কর। পিনার—হুঁ—শুঁড়ি এলেন শ্লীলতা বাঁচাতে! এ যে দুঃশাসন এল নুলিয়াকে জোব্বা পরাতে।

এর পরও মোপাসাঁ আরেকখানা সরেস মাল ছেড়েছেন। কিন্তু হায়, সেটা তুলে দিলে লালবাজার চোখ লাল করেই ক্ষান্ত হবে না!! দে উইল বি আফটার মাই রেড্ ব্লাড !!!

"শিলা জলে ভাসি যায়/বানরে সঙ্গীত গায়"

স্বাধীনতা বলুন, উচ্ছৃঙ্খলতা নাম দিন, প্যারিস একটি সৎ গুণের জন্য বিখ্যাত। সে চিরকালই স্বাধীন চিন্তা, তথা পীড়িত বিদ্রোহী জনকে আপন নগরে আশ্রয় দিয়েছে। জর্মন কবি হাইনের প্রগতিশীল মতবাদ কাইজার সহ্য করতে পারেননি বলে তাঁকে আশ্রয় নিতে হল প্যারিসে—এবং জীবনের বেশীর ভাগই তিনি কাটান সেখানে। আর এই বছর পঞ্চাশ পূর্বেই বীর সাবরকরকে ফ্রান্সভূমি থেকে ইংরেজ ধরে নিয়ে যায় বলে ফরাসী সরকার তারস্বরে প্রতিবাদ জানায়।[১]

এ শতকে আমাদের পক্ষে সব চেয়ে বড় আরামদায়ক তত্ত্ব-কথা ছিল এই যে, যেসব কূপমণ্ডুক দেশ কোনও বিশেষ ধরণের বই ছাপতে দিত না, সেগুলো ছাপা হত প্যারিসে। তার কিছুটা পাচার হত—যেমন ধরুন লেডি চ্যাটার্লি—ইংলন্ড, আমেরিকা, ভারত ইত্যাদিতে, আর বাদবাকিটা ফ্রান্সাগত ইংরিজি পড়নেওয়ালা টুরিস্ট গিলত গোগ্রাসে। তখনকার দিনে রোক্কা একটি টাকাতে উত্তম উত্তম গ্রন্থ পাওয়া যেত। এদেশে যারা বিলিতি বই বিক্রি করে, তারা চিরকালই ছিল শাইলকের বাবার বাবা (আশা করি শাইলক জীবিত থাকলে অপরাধ নেবেন না)। 'ওয়ান সিনার রেইজেৎ এ হানড্রেড'—'এক পাপীকে দেখে একশ জন পাপ পথে যায়' আমিও তাই তাদেরই

---

৪ ফ্লোবেরের মৃত্যুর পর জর্জ সান্ড্ (George Sand)-কে লিখিত তাঁর পত্রাবলীর ভূমিকারূপে মোপাসাঁ একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন; উদ্ধৃতিটি সেই প্রবন্ধ থেকে।

সান্ড্ সাঁড, সাঁদ—এ তিনটেই শাস্ত্রসম্মত। কিন্তু দিল্লীবাসীর সদম্ভপ্রদত্ত ফতোয়া যে ইটি স্যান্ড্—কোথাও নেই। সাদামাটা "a" হরফটির উচ্চারণ একমাত্র ইংরিজি ছাড়া কোনও ভাষাতেই এ্যা হয় না। অবশ্য ai, au, ae বা a-র উপর দুটি ফুটকি থাকলে (উমলাউট) ভিন্ন কথা।

১ সাবরকরকে যখন বন্দী করে ইংরেজ ভারতে পাঠাচ্ছে, তখন তিনি ফরাসী বন্দরে পালিয়ে গিয়ে ডাঙায় উঠেন। ইংরেজ সেলার তাড়া করলে সাবরকর ফরাসী পুলিসম্যানকে বোঝাতে পারলেন না যে, তিনি রাজনৈতিক বন্দী—ফরাসী ভাষা জানতেন না বলে। সাধারণ খুনী আসামী ভেবে পুলিস তাকে ইংরেজের হাতে সমর্পণ করে। পরে ইংরেজ বলে, ফরাসী পুলিস ফরাসী সরকারের প্রতিভূরূপে সাবরকরকে ইংরেজের হাতে যখন সমর্পণ করেছে, তখন পরে ফরাসী সরকারের আপত্তি করার কোনও হেতু নেই।...এ সব কিন্তু আমার শোনা কথা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনুকরণে, যত পারি এসব বই পাচার করে দেশে নিয়ে আসতুম। আমার পক্ষে প্রক্রিয়াটি কঠিন ছিল না। আমি তুলনাত্মক ধর্মতত্ত্বের ছাত্র। কস্টম কর্মচারী সে-যুগে সচরাচর হত গোয়ানীজ ক্যাথলিক। আমি ট্রাঙ্কের সর্বোচ্চ স্তরে রাখতুম একখানা ক্যাথলিক প্রেয়ার বুক এবং একটি মনোহর রোজারি—অর্থাৎ ক্যাথলিক জপমালা। ম্লেচ্ছ মুসলমানদের খ্রীষ্টপ্রীতি দেখে ক্যাথলিক কর্মচারী বে-এক্তেয়ার।

সেই প্যারিস মহানগরীতে শত বৎসর পূর্বে ডকে উঠলেন ফ্লোবের—মাদাম বোভারি বগলমেঁ। অভিযোগ! তিনি "ইমরাল" (দুর্নীতি প্রচারকারী), অশ্লীল কেতাব লিখেছেন। সরকার পক্ষের উকীল গাঁটের ছ পণ খেয়ে যে বক্তৃতা ঝাড়লেন, সেটা শুনে সকলেরই মনে হল, গাঁয়ের পাদ্রীকে বউবাচ্চাসহ খুন করে ঐ গাঁয়ের যে একটিমাত্র কুয়ো আছে, তাতে সে লাশগুলো ফেলে দিয়ে জল বিষিয়ে দিলেও বুঝি ফ্লোবেরের অপরাধ এর তুলনায় সোনার পাথর বাটিতে আকাশকুসুম সাজানোর মত হত।

মোপাসাঁ লিখলেন, "ধন্য ধন্য এডভোকেট জেনারেল পিনার! (শুঁড়ি মশাই—অবশ্য তিনি মীন করেছেন "শুঁড়ির শালা চামার!")। ফ্রান্সের ইতিহাসে তুমি অমর হয়ে রইলে!"

ফ্লোবের খালাস পেয়েছিলেন। আদালতের উপর জনমত হয়তো প্রভাব বিস্তার করেছিল। কারণ শুধু ফ্রান্স নয়, ফ্রান্সের বাইরেও তখন ঐ বই এমনই চাঞ্চল্য জাগিয়েছে যে, তার পূর্বে বা পরে এমনতরো কবার হয়েছে সেটা আঙুলে গুনে বলা চলে। গুণীরা বললেন, "যা বলো, যা কও, বইখানা নিঃসন্দেহে পীস অব আর্ট, শেফ দ্যভ্র, মাস্টারপীস।"

মোপাসাঁ অতিশয় সবিনয় লিখলেন, "সাহিত্যে নীতি? সে আবার কী চীজ? বেরুলুম সেই চীজের সন্ধানে যাঁরা মহামানব, যাঁরা সাহিত্যাচার্য তাঁদের কাছে। আরিস্তোফানেস, তেরেনৎস, প্লাউটস, আপুলেয়ুস, ওভিড, ভের্গিল, শেকসপীয়ার, রাবলে, বক্‌কাচ্‌চো, লা ফঁতেন, স্যাঁতামাঁ, ভলতের, জ্যাঁ জ্যাঁক রুসো, দিদেরো, মিরবো, গোতিয়ে, ম্যুসে[২] ইত্যাদি ইত্যাদি—একটিমাত্র উদাহরণও পেলুম না এঁদের কাছে।"

ফিরিস্তিটা উচ্চাঙ্গের সন্দেহ নেই। গ্রীক, লাতিন, ইতালীয়, ইংরেজ এবং সর্বোপরি ফরাসী—কারণ মোপাসাঁ স্বয়ং ফরাসিস—মহারথীরা এতে রয়েছেন। কিন্তু সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী, চীনা কোনও মহারথীর নাম তিনি করেননি। আরব্য রজনী পর্যন্ত না। কিন্তু আমার আশ্চর্য বোধ হয়, ওল্ড টেস্টামেন্টটির কথা মোপাসাঁর স্মরণে এলো না কেন? যদিও আশ্চর্য হবার বোধ হয় কোনও কারণ নেই। অধুনা আমি আঁদ্রে জিদ-এর "জুর্নাল" বা রোজনামচাখানা ফের উল্‌টে-পাল্‌টে দেখছিলুম, ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত।[৩]

---

২ Aristophanes, Terence, Plautas, Apleus, Ovid, Virgil, Shakespeare, Rabelais, Boccacio, La Fontaine, Saint Amant, Voltaire, J. J. Rousseau, Diderot, Mirabeau, Gautier, Mussec etc. etc.

ফরাসী জাতটা বিদেশী নাম বিকৃত করতে ওস্তাদ—অনেকটা বাঙালীর মত কিংবা বলতে পারেন, পরকে "আপনাতে" জানে।

৩ অধুনা এদেশে নাকি "তুলনাত্মক সাহিত্যচর্চা" পড়ানো হয়। এ চর্চাতে যাদের হাতখড়ি হচ্ছে, তাদের স্মরণ করিয়ে দি যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অনেক লোকই রোজনামচা লেখেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পুস্তকান্তের নিঘণ্টুতে দেখি, জিদ প্রায় ছ'শ জন লোকের নাম করেছেন। শতকরা আশিজন সাহিত্যস্রষ্টা। প্রাচ্যদেশীয় একজন লেখকের নামও তাঁর আত্মচিন্তায়, বন্ধু মিলনে, সাহিত্য পাঠে উল্লিখিত হয়নি। অথচ গুণগ্রাহী এই জিদই 'গীতাঞ্জলি'' অনুবাদ করেন। ইয়োরোপের প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবদের কথা হচ্ছে না; ম্যাক্সমুলার, লেভি, উইনটারনিৎস, সাষাও (অলবীরুনীর অনুবাদক) এঁদের কথা আলাদা, কিন্তু যাঁরা সাহিত্য-রস, কলাসৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করেন, তাঁদের অল্পজনই সে-সব বস্তুর জন্য অস্তাচলে বসে পূর্বাচলের পানে তাকান—গ্যোটে রোলাঁ (তিনিও সুন্দরের চেয়ে সত্যের সন্ধান করেছেন অধিকতর) বড়ই বিরল। প্রতিদিন বিরলতর হচ্ছে। কিছুদিন পরে অবশ্য এঁদের সম্বন্ধে আমরা আর কোনও খবরই পাব না। বিদেশী বই আসবে না। বিজলি বন্ধ হয়ে গেলে রেডিয়ো সেটের মত অবস্থা হবে আমাদের।

মূল কথায় ফিরে যাই : মোপাসাঁ লিখছেন, ''রীতিমত চটে যেতেন ফ্লোবের, যখন আর্ট সমালোচকরা সাহিত্যে ''নীতি'' ''সাধুতার'' দোহাই পাড়তেন। তিনি (ফ্লোবের) নিজেই বলেছেন, 'যবে থেকে মানব জাতির সৃষ্টি হয়েছে, সর্বমহান লেখকই তাঁদের সৃষ্টির মাধ্যমে এই সব ক্লীবদের 'সদুপদেশের' (উদ্ধৃতি চিহ্ন অনুবাদকের) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।'

(''Depuis qu'existe l'humanite, disait-il, tous les grands ecrivains ont proteste per leurs oeuvres contre ces conseils d'impuissants'')[৪]

গুরুদত্ত এই আপ্তবচনটি সসম্মান উদ্ধৃত করে মোপাসাঁ বলছেন, ''সুষ্ঠু, প্রতিষ্ঠিত সমাজজীবনের জন্য সুনীতি তথা সাধু আচরণ অপরিহার্য, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের তো কোন সম্পর্ক নেই। ঔপন্যাসিকের প্রধান লক্ষ্য, মানুষের প্রবৃত্তি পর্যবেক্ষণ করে সেগুলো বর্ণনা করা—তা তার প্রবৃত্তি সুপ্রবৃত্তিই হোক আর কুপ্রবৃত্তিই হোক। নীতিগর্ভ উপদেশ বিতরণ করা কিংবা অভিসম্পাত দেওয়া, অথবা তত্ত্বতথ্যের প্রচার করার জন্য জীবন উৎসর্গ করা তো তার কর্ম নয় (অর্থাৎ এসব প্রচারকর্মের 'মিশনারি'

এদের ভিতর একজন ফরাসী—জিদ, দ্বিতীয়জন জর্মন—য়্যুঙার (স্ট্রালুঙেন) এবং তৃতীয়জন স্যুইস—ফ্রিশ (টাগেবুখ)—যদিও যুদ্ধের পর লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তবু তার মূল Weltanschauuang যুদ্ধ ও তৎপরবর্তী ধ্বংসকে কেন্দ্র করে। এঁরা তিন দেশের সর্বোত্তম না হলেও তারই কাছাকাছি লেখক।...পাঠক সবিস্ময়ে লক্ষ্য করবেন, ফরাসী জিদ কী মৈত্রীর চোখে জর্মনদের এবং জর্মন য়্যুঙার ফরাসীদের শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন। এর সঙ্গে পাঠক আইজেনহাওয়ারের ক্রুসেড ইন ইয়োরোপ মিলিয়ে পড়লে উপকৃত হবেন।

এস্থলে উল্লেখ করা কর্তব্য মনে করি, শেষের ইংরিজি বই ভিন্ন বাকি তিনখানা বই আমি এদেশের বিদেশী-পুস্তকবিক্রেতাদের 'কেরপায়' পাইনি। ঈশ্বরাদেশে যারা পপলার গাছ পোঁতে, তাদেরই একজনের বদান্যতায়। তা সে যাক গে। কিন্তু এই সুবাদে আমি আমার বিশেষজ্ঞ পাঠকদে শুধোই—আমার বাস মফস্বলে—আচ্ছা আজ যদি কোনও বন্টু বা হটেনটট বিদেশী বই কিনতে চায়, তবে তাকেও কি এক্সচেঞ্জের জন্য পন্টকদের পায়ে তেল দিতে হয়? বোধ হয় না। কারণ তারা যে বর্বর। আর আমরা সভ্য। ''মহামানবের তীরে'' বাস করি।

৪ Dumesnil, Correspondance, পৃ: ১০৯।

www.BanglaBook.org

সে নয়)। এ জাতীয় উদ্দেশ্যমূলক কোনও গ্রন্থই আর্টের পর্যায়ে উঠতে পারে না।

তৎসত্ত্বেও কোনও সার্থক গ্রন্থ যদি সুশিক্ষা দানে সক্ষম হয়, তবে সেটা লেখক সেই উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রন্থ লিখেছিলেন বলে নয় (সেটা 'malgre l'auteur' 'inspite of the author', সেটা লেখকের ইচ্ছা—এমন কি অনিচ্ছাবশত নয়), তিনি যে-ভাবে ঘটনাগুলি বর্ণনা করেছিলেন, তার অন্তর্নিহিত শক্তির বলেই সে সেই সুশিক্ষা দানে সক্ষম হয়েছে।"

অর্থাৎ "আন্‌কল টমস্ ক্যাবিন" যদি দাসত্ব প্রথাকে নির্মম আঘাত দিয়ে থাকে, যদি এমিল জোলার 'জাঁ ক্যুজ' ('আই এক্যুজ'='আমি ফরিয়াদ জানাই')[৫] মিলিটারি স্বৈরতন্ত্রকে দ্বিখণ্ডিত করে থাকে, তবে তার কারণ, পুস্তকদ্বয় অনুভূতি সঞ্চারণে এমনই কৃতকার্য হয়েছিল যে, এগুলি তখন আর্টের সর্বোচ্চ পর্যায়ে আরোহণ করেছে!

মোপাসাঁ বিশুদ্ধ আর্ট, আর্টে শ্লীলতা-অশ্লীলতা নিয়ে আরও অনেক কিছু লিখেছেন, কিন্তু সেগুলো উপস্থিত থাক।

ছুঁৎবাই রোগে আক্রান্ত 'পদি পিসি' সব দেশেই আছেন—তবে ফ্লোবের-মোকদ্দমায় হেরে গিয়ে ফ্রান্সের পদি পিসিরা বড়ই মুষড়ে যান। বস্তুত ফ্লোবের-শতাব্দীর শেষের দিকে পেন্ডুলাম অন্য প্রান্তে চলে গিয়েছে। ফ্রান্সের যে মিনিস্ট্রি অব পাবলিক ইনসট্রাকশন একদা ফ্লোবেরের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করেছিলেন, তাঁরাই তখন আইন করেছেন, যে-সব পুস্তকে ভগবানের উল্লেখ থাকবে, মিনিস্ট্রি সেগুলো তাঁদের পাবলিক লাইব্রেরীর জন্য কিনবেন না। সে খবর শুনতে পেয়ে কট্টর জাত-নাস্তিক আনাতোল ফ্রাঁস উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন, "এ আবার কি রকমের লিবার্টি—যে লিবার্টি মানুষকে ভগবানের নাম প্রচার করতে দেয় না?"

বভারি মোকদ্দমার একশ' বছর পর আবার পেন্ডুলাম অন্য প্রান্তে গেছে। টপ্‌লেস ডাইনি পোড়াবার জন্য ফ্রান্সেই এখন সব চেয়ে পুলিসের দাপট, নাইটক্লাব টাইট দেওয়াতে এদের উৎসাহ-উত্তেজনার অন্ত নেই। আমাদের অবশ্য তাতে কিচ্ছুটি বলবার নেই।

কিন্তু একশ' বছর পূর্বে যে বভারির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করে মার খেল ফ্রান্স, সেই ফ্রান্সই চেষ্টা করছে এখন, আবার মাদাম বভারির সর্বাঙ্গে বোরকা চাপিয়ে তুর্কীপাশার হারেমবদ্ধ করতে! হিটলার যখন 'পবিত্র' জর্মন ন্যাশনালিজমের দোহাই কেড়ে ইহুদি বই পোড়াতে আরম্ভ করেন তখন এক মার্কিন গুণী বলেছিলেন, 'জর্মনী পুটস দি ক্লক ব্যাক!" ফ্রান্সে যে তারই পুনরাবৃত্তি! এ-ও এক নয়া নাৎসিবাদ।

দ্য গল্ লোকটিকে আমার খুব পছন্দ নয়। যদ্যপি গত যুদ্ধের সময় তাঁর আদর্শ এবং চার্চিলের আদর্শে কোন পার্থক্য ছিল না, তবু চার্চিল পদে পদে দ্য গলের দম্ভ দেখে অতিষ্ঠ হতেন। প্রধান অভিনেত্রী বা প্রিমা দন্নার মত তিনি এমনই অতি অল্পেতে ঠোঁট ফোলাতেন,

---

৫ বইখানা অবশ্য মোপাসাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। শুধু ফ্রান্সে নয়, সর্ব সভ্য বিশ্বে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। আমি বিশেষ করে এ-বইখানার যে উল্লেখ করলুম তার কারণ, প্রবাদে আছে "পেন ইজ মাইটিয়ার দ্যান সর্ড" "লেখনী তরবারি অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী"—এবং এই বইখানি তৎকালীন ফরাসী সেনাবাহিনীর স্বেচ্ছাচারী মদমত্ততাকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করে প্রবাদবাক্যটি সপ্রমাণ করে। আমার জানামতে এটি লেখনী তরবারিতে একমাত্র সরাসরি যুদ্ধ।

www.BanglaBook.org

গোসাঘরে আশ্রয় নিতেন[৬] যে, আইজেনহাওয়ারের মত মাথা ঠাণ্ডা মানুষ পর্যন্ত—যিনি কিনা মন্টীর মত দেমাকি লোককেও সামলাতে পেরেছিলেন—তাঁর এদিকটা লক্ষ্য করে লেখেন "We felt that his qualities were marred by hypersensitiveness and an extraordinary stubbornness in matters which appeared inconsequential to us. My own wartime contacts with him never developed that heat that seemed to be generated frequently in his meetings with many others."[৭]।

মোগল পাঠান হদ্দ হল ফার্সী পড়ে তাঁতী। চিতে বাঘের চিত্তির মুছতে লেগে গেছেন মঁসিয়ো ল্য জেনারেল শার্ল দ্য গল্। না হলেই তো 'চিত্তির'! তবে শুনেছি, এ রবির পিছনেও নাকি একটি বিরাট ছায়া আছে। তিনি নাকি মাদাম। তিনিই নাকি ফ্রান্সের নব জোয়ান অব আর্ক পদি পিসি।

এ-সুবাদে আমার মনে পড়লো, এমিল জোলারও নাকি কয়েকটি পদি পিসি দোস্ত ছিলেন। তাঁরা নাকি একাধিকবার বায়না ধরে তাঁকে বলেন, "ভাই, তুমি লেখো ভালো; কিন্তু তোমার কোন বই-ই নিঃসঙ্কোচে পুত্রকন্যার হাতে তুলে দেওয়া যায় না। একখানা 'ক্লীন' বই লেখো না কেন?"

জোলা ঢোঁক গিললেন।

সে বইয়ের সমালোচনা করতে গিয়ে আনাতোল ফ্রাঁস বলেন, মসিয়ো জোলা যখন শুয়ারটার মত কাদাতে গড়াগড়ি দেন তখন তিনি সেটি করেন বড়ই গ্রেসফুলি (অর্থাৎ প্রকৃত সমঝদার আর্টিস্টের মত), কিন্তু তিনি যখন বন্ধুজনের অনুরোধে পাখনা গজিয়ে দেবশিশুপারা স্বগ্‌গোপানে ওড়বার চেষ্টা করেন তখন সেই "এলোপাতাড়ি ড্যানার বাড়ি" দেখে হাসি সামলানো রীতিমত মুশকিল হয়—হি ডাজ ইট্ মোস্ট গ্রেস্‌লেস্‌লি। তারপর তিনি বলেন, আই প্রেফার মসিয়ো জোলা ওয়ালেইং ইন মাড্—মসিয়ো জোলার নর্দমাতে হুটোপুটি করাটাই আমি পছন্দ করি বেশি।[৮]

* * *

প্যারিস ড্যানা গজিয়ে ফেরেশতার মত বেহেশৎ পানে ওড়বার চেষ্টা করছে —ইয়াল্লা!!

---

৬ আজকের দিনের সম্মানিত মহিলারা যে খাস কামরায় অতিথি-অভ্যাগতকে "আপ্যায়িত" করেন তার নাম "বুদোআর"। শব্দটির ব্যুৎপত্তি নিয়ে সন্দেহ আছে। অনেকেই মনে করেন এই "ব্যুদর"="to Sulk"="অভিমান করা" থেকে এসেছে।

৭ ক্রুসেড ইন্ ইউরোপ, পৃঃ ৪৫৬।

৮ কাতরকণ্ঠে নিবেদন; দুনিয়ার কুল্লে বই—তা আমার জরুর যত কমই হোক—আমি যোগাড় করি কি প্রকারে? তাই অনেক স্থলেই স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু সরস্বতী সাক্ষী, সজ্ঞানে স্বেচ্ছায়, কারও প্রতি অধম অবিচার করে না। এসব মহাজনদের বচন খাঁটি সোনার মোহর, উদ্ধৃতির চাপে ব্যাঁকাট্যাড়া হয়ে গেলেও সোনা সোনাই থাকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'অভাবে শয়তানও মাছি ধরে খায়'

অভিজ্ঞতাজনিত বিজ্ঞতা আসে ল্যাটে। তখন ওটা আর কোন কাজে লাগে না। বিলকুল বেকার। কিরকম? প্রকৃতির নিয়ম : মাথায় বিপর্যয় টাক পড়ে যাওয়ার পর চিরুনি-প্রাপ্তি। ইরানী কবি একটু ঘুরিয়ে বলেছেন : বৃদ্ধ বয়সে অনুশোচনায় দাঁত কিড়মিড় করছি? কিড়মিড় করার জন্য, হায়, দাঁতও যে আর নেই।

ল্যাটে বুঝলুম, মাতৃভাষা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আর নিতান্তই যদি আরেকটি ভাষা শিখতে হয় তবে সেটি হবে, তোমার মাতৃভাষা যার কাছে সব চেয়ে বেশী ঋণী সেইটি শেখা : বাঙলার বেলা সংস্কৃত, ফার্সীর বেলা আরবী, ফরাসীর বেলা লাতিন। তার বেশী ভাষার পিছনে ছুটোছুটি করা নিছক আহাম্মুখি। মাসান্তে যে দু'একখানা বিদেশী বই কিনবে, তার আর উপায় রইল না। কেন? কলকাতাতে কি বিদেশী বই পাওয়া যায় না? পাওয়া যায় বই কি, এস্তের অঢেল। অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো তো দিবারাত্তির গান গাইছে। মুশকিল শুধু, আপনার পছন্দের গান গায় না।

ইতিমধ্যে আমি দুখানি চিঠি পেয়েছি। দুটি তরুণ আমার সদুপদেশ পাওয়ার পূর্বেই ফরাসী জর্মনে সার্টিফিকেট নিয়ে বসে আছে। তাদের সামনে **সমস্যা**, এখন এগোয় কি প্রকারে? তারা থাকে মফস্বলে—কি করে বলি, কলকাতার কোনও কোনও লাইব্রেরির লেনডিং সেকশন আছে, তাদের শরণাপন্ন হও, যখন জানি, কলকাতার খাস বাসিন্দার পক্ষেও কর্মটি সুকঠিন।

তখন হঠাৎ খেয়াল গেল, এরা মফস্বলে বাস করে। তার একটা মস্ত সুবিধে, ইলেকট্রিকের উৎপাত সেখানে নেই, কিংবা নগণ্য। বেতার যন্ত্রটির পুরো ফায়দা সেখানে ওঠানো যায়। কলকাতাবাসীও অবশ্য খানিকটে পারবে।

উপস্থিত বেতার খুললেই শর্টওয়েভে পাবেন, গাঁক গাঁক করে আপন পরিচিতি জানাচ্ছেন চীন (চীন আমাদের অতি কাছে বলেই তাকে পাওয়া যায় হরবকৎ, কিন্তু আমাদের কাজে লাগে অত্যল্পই), রুশ আমেরিকা (VOA = Voice of America), ব্রিটেন (B B C), এবং অস্ট্রেলিয়া। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের যেগুলো দরকার, যেমন ফ্রান্স, জর্মনি, ইতালি সেগুলো জোরদার নয় এবং আমাদের উপকারার্থে তারা ব্রডকাস্ট করে অল্প সময়।

এই বেতারের সাহয্যে পুস্তকের অভাব খানিকটা পুষিয়ে নেওয়া যায়।

এর পূর্বে দু'একটি কথা অবতরণিকা হিসেবে বলে নেওয়া ভালো।

ভারতবর্ষে যে নিরক্ষরতা দ্রুতগতিতে লোপ পাচ্ছে না, তার প্রধান কারণ এ নয় যে, গ্রামে গ্রামে আমরা পাঠশালা খুলতে পারছি নে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তার আসল কারণ, যারা পাঠশালা পাস করে বেরোয় তারা পুনরায় নিরক্ষর হয়ে যায়—পড়বার জন্য বই খবরের কাগজের অভাব। যে গ্রামে পঞ্চাশ বছর ধরে পাঠশালা আছে, সেখানে যে-কোনও সময়ে অনুসন্ধান করলে দেখতে পাবেন, মাত্র যারা দু-এক বছর হল পাস করে বেরিয়েছে তারাই এখনও লিখতে পড়তে আঁক কষতে পারে ("থ্রী আর"= রীডিং,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারেটি, বেকনিং)। বাদ্‌বাকিরা কিংবা তাদের অধিকাংশ পুনরায় নিরক্ষণ হয়ে গিয়েছে। এই বিষয় নিয়ে বছর কুড়ি পূর্বে আমি সপ্তাহের পর সপ্তাহ জোর প্রোপাগান্ডা-ক্যামপেন চালিয়েছিলুম; সুযোগ পেলে মৃত্যুর পূর্বে আরেকবার চালাবো—মা ফলেষু কদাচন মন্ত্র স্মরণ করে।

তাই বৎস, তুমি যে ফরাসী, জর্মন বা রুশ ভাষার সার্টিফিকেট পেয়েছ সেটা উত্তম কর্ম, কিন্তু যেটুকু শিখেছ সেও ভুলে যাবে, ঐ গ্রামের পড়ুয়ার মত পুস্তকাভাবে। তাই বলছিলুম, বেতার তোমাকে খানিকটে বাঁচাতে পারে।

তার পূর্বে কিন্তু একটি ভেরি ভেরি ইম্পরটেন্ট তত্ত্বকথা বলে নিই। এটা আমার নিজের উপদেশ নয়—পৃথিবীর যে-কোনও বেতার কেন্দ্র তোমাকে এই উপদেশ দেবে।

রুম অ্যারিয়েল শর্ট ওয়েভের জন্য সম্পূর্ণ বেকার না হলেও ছাতের উপর বাঁধা দীর্ঘ, দীর্ঘতম বাঁশের অ্যারিয়েলের তুলনায় নগণ্য। আমার উপদেশে যারাই কান পাতছ, তাদেরই বলি, যারা মফস্বলে থাকো তারা নেবে দীর্ঘতম বাঁশ (শহরে বোধ হয় এর একটা সীমা আছে, কিন্তু যেহেতু তুমি চোদ্দতলা বাড়িতে বাস করো না, সেটা তোমার উপরে প্রযুজ্য নয়) এবং নির্মাণ করবে সর্বোত্তম অ্যারিয়েল। এস্থলে বলে রাখা ভালো, তিন-চারশ টাকা সেট + আউটসাইড ব্যামবু অ্যারিয়েলে যে রিসেপশন পাবে, হাজার টাকা সেট + রুম অ্যারিয়েলে পাবে তার চেয়ে ঢের নিকৃষ্ট রিসেপশন। অবশ্য দামী সেটে যে রকম ধ্বনিকে—বিশেষ করে সঙ্গীতের বেলায় ইচ্ছেমত কড়া মোটা করা যায়, সস্তা সেটে সেটা করা যায় না। কিন্তু ভাষার বেলা—যাকে বলে স্পোকেন ওয়ার্ড—সস্তা সেটও + দীর্ঘতম আউটসাইড অ্যারিয়েল ১০০% কাজ দেবে। "আমার সেটা আরও দামী হলে আরও ভালো রিসেপশন হত" এটা ভুল ধারণা। যে-কোনও দিন সকাল সাতটা-আটটা গোছ সময় ১৩ মিটার ব্যান্ডে অস্ট্রেলিয়া শুনে নিয়ে (ঐ সময় ১৩ মিটার মোটামুটি নির্ঝঞ্ঝাট) অন্য বাড়িতে দামী সেট শুনে এসো—দেখবে তফাৎ নেই। পুনরায় সন্ধ্যে ৬-৩০-এ ১৩ মিটারে প্যারিসের ইংরেজির প্রোগ্রাম খানিকটা শুনে (প্রোগ্রাম মাত্র আধ ঘণ্টার, ৭টা থেকে ফরাসী ভাষাতে প্রোগ্রাম খানিকটা শুরু হয়ে যায়) দামী সেটের রিসেপশনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখো। প্যারিস দুবলা স্টেশন, তদুপরি ঐ সময় ১৩ মিটারে বিস্তর স্টেশন ঝামেলা লাগায়—গোটা তিনেক বি বি সি, একটা VOA, ভাটিকান, সুইজারল্যান্ড, পাকিস্তান, রুশ, হল্যান্ড, আরও কে কে আছেন—কাজেই তুমি যদি তখন প্যারিসের ইংরিজী প্রোগ্রাম পরিষ্কার বুঝতে পারো তবে আর চিন্তা কোরো না, তোমার সেট এবং অ্যারিয়েল দুই-ই ঠিক। অবশ্য বর্ষার অতি নিকৃষ্ট আবহাওয়া হলে দামী, সস্তা কোনও সেটেই, শহর মফস্বল কোনও জায়গাতেই হয়তো প্যারিস ধরতে পারবে না।

আপন দেশের ভাষা শেখাবার জন্য সব চেয়ে উৎসাহী ইংরেজ। কিছু দিন থেকে বাংলার মাধ্যমে পর্যন্ত ইংরিজী শেখাতে আরম্ভ করেছে। যারা ইংরেজীটা মোটামুটি জানো, তারা অ্যাডভান্স কোর্সটি শুনলে উপকৃত হবে।

প্যারিস একদা, বোধ হয়, ইংরিজীর মাধ্যমে ফরাসী শেখাতো। এখন সাড়ে ছটা থেকে সাতটা পর্যন্ত যে ইংরিজী প্রোগ্রাম দেয় তাতে তো সে আইটেম শুনিনি। তবু নিরাশ হবার কারণ নেই। প্রথম ১৮৩০ থেকে ১৯০০ অবধি (আমি সর্বত্রই ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম দিচ্ছি) মনোযোগ সহকারে ইংরেজী প্রোগ্রামটি বিশেষ করে সংবাদ—শুনে নেবে। তারপর

www.BanglaBook.org

সেই সংবাদই ফরাসীতে শুনতে পাবে ১৯০০ থেকে ১৯৩০-এর ভিতর কোনও এক সময়। ইংরেজীতে খবরটা বুঝে নিয়েছ বলে ফরাসীতে সেটি ধরতে সুবিধে হবে। মাসখানেক প্র্যাকটিসের পরও যদি না বুঝতে পারো তবে মেনে নিয়ো, যে ফরাসী জ্ঞানের পুঁজি নিয়ে প্র্যাকটিস আরম্ভ করেছিলে সেটা যথেষ্ট নয়। দুপুরেও প্যারিস ফরাসী প্রোগ্রাম দেয়—প্রধানত ইন্ডোচায়নার জন্য। তবে রিসেপশন সব সময় ভালো হয় না।

সুইজারল্যান্ডও ফরাসীতে প্রোগ্রাম দেয়। ইংরেজীতেও। আমাদের জন্য (অর্থাৎ ফর ফার ঈস্ট অ্যান্ড সাউথ ঈস্ট এশিয়া) তাদের স্টেশন খোলে ১৬৩০, ঐ ১৩ মিটার ব্যান্ডেই। ওরা কিন্তু ব্রডকাস্ট করে (১) জর্মন, (২) সুইস জর্মন, (৩) ফরাসী, (৪) ইতালীয়, (৫) ইংরেজী এবং কোনও কোনও দিন এস্‌পেরান্তোতেও। প্যারিসের বেলা যে প্রক্রিয়ার সুপারিশ করেছি এস্থলেও সেটি প্রযোজ্য। তোমাকে শুধু তক্কে তক্কে থাকতে হবে, কখন কোন্ ভাষায় প্রোগ্রাম দেয়।* এ ছাড়া রুশ, চীন, জাপান এরাও ফরাসীতে ব্রডকাস্ট করে, (বি বি সি-ও করে, কিন্তু এ দেশে শীতকালে রাত ঘনিয়ে এলে কখনও কখনও পাওয়া যায়—আসলে ওটা আমাদের উদ্দেশে বেতারিত হয় না—ওটা পূর্ব ইয়োরোপের জন্য, জর্মনের বেলাও তাই)।

কিন্তু সর্বোত্তম ব্যবস্থা অল ইন্ডিয়া রেডিওর ফরাসী প্রোগ্রাম শোনা। রাত ঘনিয়ে এলে ও বোধ হয় সন্ধ্যার দিকেও ইটি বেতারিত হয়। এটা শোনার সুবিধা এই, রিসেপশন মোটামুটি ভালো, কি কি খবর মোটামুটি দেবে সেটা আগের থেকে জানা আছে বলে বুঝতে সুবিধে হয়, এবং যে দু-চারটে কথিকা দেয়—যেমন রবীন্দ্রনাথ বা ভারত ইতিহাসের কিছু একটা—আমাদের কিছুটা জানা বলে ঐ একই সুবিধে, এদের উচ্চারণ সব সময় ১০০% খাঁটি হয় না—তবে আপনার আমার কাজের জন্য "যথেষ্টর চেয়েও প্রচুর"। এস্থলে উল্লেখ করি, যাঁরা কনভারসেশনাল আরবী এবং ফার্সী বুঝতে নিজেকে অভ্যস্ত করাতে চান তাঁরা যেন আকাশবাণীর আরবী ফার্সী প্রোগ্রাম শোনেন। এঁদের উচ্চারণ অত্যুৎকৃষ্ট। কিছুদিন আগেও মক্কার এক উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক ও মদিনাগতা তাঁর স্ত্রী অ্যানাউসার ছিলেন।

ধার্মিকজন মিশরে গৃহীত রেকর্ডে অত্যুত্তম কুরান পাঠও শুনতে পারেন।...রাজনৈতিক তথা প্রাকৃতিক আবহাওয়া ভালো থাকলে ফরাসী ইকোয়েটরিয়াল আফ্রিকার ব্রাজভিল শহরের উত্তম ফরাসী ব্রডকাস্ট এদেশে পাওয়া যায়। শীতকালে রাত ঘনিয়ে এলে ত্যুনিস আলজেয়ারস থেকেও মিডিয়াম ওয়েভে ফরাসী প্রোগ্রাম পাওয়া যায়। এবং রাত দশটা এগারোটা থেকে ভোরবেলা পর্যন্ত মন্তে কার্লো—ফরাসীতে। শীতকালে মিডিয়াম ওয়েভে ২০৫ মিটার (= ১৪৬৬ কি. সা.) ব্যান্ডে। আমার জানামতে এটিই ইয়োরোপের সব চেয়ে

---

* সব স্টেশনই কোনও না কোনও সময় আপন ঠিকানা দেয়। সে ঠিকানায় চিঠি লিখলে তারা প্রোগ্রাম ফ্রী পাঠায়। যারা ভাষা শেখায় তারা কেউ কেউ ফ্রী চটি পাঠাবইও পাঠায়, কোনও কোনও স্থলে পয়সা দিতে হয়। কখন কোন্ মিটারে কে ব্রডকাস্ট করে তার সবিস্তার বর্ণনা পাওয়া যায় World Radio Hanbdggk, Lindorffs, Allee 1, Hellerup, Denmark বইয়ে। দাম পাঁচ টাকার মত। এবং সকরুণ নিবেদন, আমাকে দয়া করে চিঠি লিখিবেন না। আমি অসুস্থ। সেক্রেটারি নেই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জোরদার মিডিয়াম ওয়েভ স্টেশন। এর জোর ৪০০ কি. ও.। ফরাসীটা সড়গড় হয়ে গেলে শীতকালে অনিদ্রায় এর প্রোগ্রাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরমানন্দে শোনা যায়। তবে কমার্শিয়াল বলে উৎপাতও আছে।...ওয়েস্ট বার্লিনও ৩০০ কি. ও. স্টেশন, কিন্তু কে জানি নে একে বড় জ্যাম করে।

জর্মনির যে বেতার স্টেশন বিদেশের জন্য বেতার ছাড়ে তার নাম ডয়েচশে ভেলে (Deutsche Welle) এবং তিনি কলোনে (Koeln-Cologne যেখান থেকে অডিকলোন আসে)। ভারতের জন্য এদের প্রোগ্রাম ১৮.২০ থেকে ০.১৫ পর্যন্ত, ১৯ এবং ১৬ মিটারে কিন্তু নিরেট জর্মন ভাষায়। তবে ইংরেজী, হিন্দী. উর্দু এবং ফের ইংরেজীতে ব্রডকাস্ট করে একবার সকালে ৮.৩০ থেকে ৯.১৫ পর্যন্ত এবং দুপুরে একটা থেকে মাঝে মাঝে ফাঁক দিয়ে রাত্রি প্রায় দশটা অবধি ওই সব ভাষায়। এরই যে কোনও একটা শুনে নিয়ে জর্মন প্রোগ্রাম শুনে নিলে ভালো হয়। কিছুদিন পূর্বে একটি তাজ্জব খবর পেলুম। জর্মনি মাসে দুই বৃহস্পতিবার দুপুর ১টা থেকে ১.৩৫ পর্যন্ত সংস্কৃতে ব্রডকাস্ট করবে! তবে ওয়েভ লেন্থটা জানি নে। আশা করছি, খুঁজে-পেতে পেয়ে যাব।...বর্ষাকালে এ দেশে জর্মনি ভালো পাওয়া যায় না। বরঞ্চ ১২.১৫ থেকে ১৫.০০ অবধি জর্মনি যে বেতার অস্ট্রেলিয়ার জন্য ২৫, ১৯, ১৬ মিটারে ছাড়ে তার ১৬টা ভালো পাওয়া যায়। জর্মনি একদা ইংরেজীর মাধ্যমে জর্মন শেখাতো—এখনও শেখায় কিনা অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

এ ছাড়া পূর্বোক্ত সুইজারল্যান্ড অনেকক্ষণ ধরে জর্মনে ব্রডকাস্ট করে। এককালে পূর্ব জর্মনিও (DDR) শুনতে পেতুম। দুপুরবেলা জাপানও উত্তম জর্মনে (১৯ মি.) এবং রাত ঘনিয়ে এলে মস্কো, বুখারেস্ট, প্রাগ, সোফিয়া ইত্যাদি শহরও ফরাসী জর্মনে ব্রডকাস্ট করে। এদের সকলেরই প্রায় এক সুর, কিন্তু আমাদের তাতে কিছুটি যায় আসে না। আমাদের ভাষা শেখা নিয়ে কথা।

দুঃখের বিষয়, ভিয়েনা—জর্মন ভাষার বড় কেন্দ্র—এখনও এক্সপেরিমেন্টাল স্টেজে, এবং ফরাসী কৃষ্টির বৃহৎ কেন্দ্র ব্রাসল্‌স্ আমি কখনও পাইনি।

মস্কো একদা অতি সযত্নে রুশ ভাষা শেখাতো। আরবী, ফার্সীতে যাঁদের দিল্‌চস্‌পী, তাঁরা অনায়াসে বাগদাদ, কাইরো এবং তেহেরান খুঁজে পাবেন। কাবুল ফরাসী ও ইংরেজীতে অল্পক্ষণের জন্য ব্রডকাস্ট করে। ফার্সী এবং পশতু প্রচুর।

আমি শুধু সেসব স্টেশনের কথাই উল্লেখ করেছি, যেগুলো এ দেশে মোটামুটি ভালোই পাওয়া যায় এবং বিদেশী ভাষা-জ্ঞান সড়গড় রাখতে সাহায্য করবে।

"—ন্যাংটাকে ভগবানও ডরায়—"

কি করে হঠাৎ একরাশ টাকা আমার হাতে এসে পৌঁছল, সেটা দফে দফে বুঝিয়ে বলা শক্ত। দরকারও নেই। মোটামুটি বলতে পারি, অনেকটা লটারি জেতার মত।

কিন্তু বিপদ হল, টাকাটা যাঁর মারফৎ এসেছিল, তাঁকে নিয়ে। তিনি লন্ডনের নিকটতম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উন্নাসিক এক দর্জী "দোকানে" কাজ করেন। সে দোকান নাকি রাজ-পরিবারের বাইরে কারও জন্য অর্ডার নেয় না। সেই কর্ম-প্রতিষ্ঠানে না আছে সাইনবোর্ড, না আছে টেলিফোন-কেতাবে তাদের নাম, নম্বর। তাদের প্রাইভেট নম্বর শুধু রাজ-পরিবার জানেন। অন্য লোকে সন্ধান পাবেই বা কি করে!

আমি বাস করতুম তাঁরই বাড়িতে। বাড়ির জেল্লাই কিছু কম নয়। বাকিংহাম প্যালেস পেরিয়ে হাইড পার্ক গেটে তাঁর ভবন। সে রাস্তাতেই থাকেন আর্টিস্ট এপ্‌স্টাইন (না রাটেন্‌স্টাইন, ঠিক জানি নে) ও চার্চিল সাহেব। আমি সেথায় আশ্রয় পেলুম কি করে? সেই খলিফের খলিফে গিয়েছিলেন হল্যান্ডে। সেখানকার রাজকন্যার বিয়ে হবে। বরের বিয়ে বেশভূষা তৈরি করতে। অতিশয় অনিচ্ছায়, দেশের আপন রাজার আদেশে। সেই বিদেশের রাজধানীতে পথ, হোটেলের নাম সব হারিয়ে যখন গা গা'র মত ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন আমি তাঁকে কিছুটা সাহায্য করতে পেরেছিলুম। ব্যস। হয়ে গেল। তিনি সেখান থেকে পকড়কে আমাকে লন্ডন নিয়ে এলেন। তদবধি তাঁর ভবনে বাস। অবশ্য স্বীকার করবো লোকটি ভদ্র। আমি অন্যত্র সস্তা জায়গায় থাকলে যে কড়ি গুনতুম, তিনি সেটি সপ্তারান্তে সহায্যে নিতেন। পাছে আমি লজ্জিত হই, আমি মুফতে আছি।

আমি বললুম, "কি ধরনের কাপড়ে স্যুটটি হবে সে বাবদে আমারও তো কিছু রুচি থাকতে পারে। দেখি, কাপড়ের নমুনা।"

পাগলামিতে হাতেখড়ি হচ্ছে হেন লোককে যেভাবে ডাক্তার প্রণব রায়ের মত লোক হ্যান্ডিল করেন, সেইভাবে সদানন্দ হাস্য হেসে বললেন, "বৎস, তোমাকে গুটিকয়েক প্রশ্ন শুধোই। তোমার যখন বিয়ে হয়, তখন গুরুজন তোমার ঐ রুচির কথা শুধিয়েছিলেন?"

সত্যের অনুরোধে আমাকে নিরুত্তর থাকতে হল।

"আর এ তো সামান্য স্যুট। অবশ্য তুমি কুতর্ক করতে পারো, সামান্য জিনিসেই বরঞ্চ আপন রুচিমাফিক জীবনানন্দ লাভ করা যায়। কিন্তু এ তো সামান্য জিনিস নয়, এ ব্যাপারটি অসামান্য। ভেরি ভেরি ইমপরটেন্ট। নইলে কও, এরই মেহেরবানীতে আমি বাড়ি গাড়ি হাঁকালুম কি প্রকারে? অতএব বুঝিয়ে কই।"

গভীর দম নিয়ে মিঃ সিরিল হজসন-জবসন ফবজ-রোবসন বললেন, "উপস্থিত নববসন্ত সমারম্ভ। তুমি এসব স্যুট পরবে নিদাঘের অন্তিম নিশ্বাস থেকে হেমন্তের শেষান্ত পর্যন্ত। এইবারে শোন বৎস, তত্ত্বকথা। শিশির বসন্ত নিদাঘ হেমন্ত প্রতি ঋতু অনুযায়ী বকিংহম প্রাসাদ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পরিচ্ছদ ধারণ করেন। কিন্তু প্রতি বসন্তে একই বর্ণনা, প্রতি শিশিরে একই সর্ষপবর্ণ—অর্থাৎ নুন-হলদে না, একই বর্ণনা একই বর্ণনা করা চলবে না।

প্রতি ঋতুর সমারম্ভে আমাদের একটি গুহ্যতম—টপমোস্ট-সীকরিট সভা বসে আসছে ঋতুর বর্ণ স্থির করার জন্য। যে বর্ণ স্থির করা হল, সেটা অত্যন্ত গোপনে রাখতে হয়। নইলে রাস্তার যেদো-মেধো সেই রঙের স্যুট ফরমাশ দিয়ে ঘোঁত ঘোঁত কর ঘুরে বেড়াবে। তা হলে ড্যুক অব এডেনবরা যখন অ্যাসকটে নামবেন—না, সেখানে হাঙ্গামা কম, প্রশ্ন শুধু ওয়েসকিট নিয়ে—"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "ওয়েস্টকিট কি?"

www.BanglaBook.org

"চ্যাংড়ারা হালফিল যাকে ওয়েস্টকোট বলে।"

আমি চুপ করে ভাবলুম, আমাদের দর্জীরা যখন 'ওয়াসকিট' বলে, তখন মোটামুটি শুদ্ধ উচ্চারণই করে, এবং 'লাট্-সাহেবে'র 'লাট্' উচ্চারণের মতই প্রাচীন শুদ্ধ উচ্চারণ। বললুম, তা "ওয়েসকিট্ নিয়ে দুর্ভাবনা কিসের?"

তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "তোমার ব্লাইন্ড স্পটগুলো যে খোদায় কোথায় কোথায় রেখেছেন বলা শক্ত। এদিকে শেক্স্পীয়র-বাইরন পড়েছ, অন্যদিকে মর্নিং স্যুটের ওয়েসকিটের মহিমা জানো না।"

আমি একগাল হেসে বললুম, "টায় টায় মিলে যাচ্ছে। ফ্রান্সের শ্যামপেন প্রভিনসের এক সমঝদার আমায় বলেছিল, 'তাজ্জব লাগে মসিয়ো, এদিকে আপনি মলিয়ের সারৎর পড়েছেন অন্য দিকে আপনি উত্তম মদ্য বর্দো বুর্গন্নের 'বুকে'র (gouquet) তফাত ধরতে পারেন না! তা সে যাক গে। স্যুটের রঙের কথা কি যেন বলছিলে!"

"হু" আসছে সীজনে সমঝদাররা যেসব রঙের উপর—রঙের উপর ঠিক, না রঙের শেডের উপর ন্যুয়াঁস-এর উপর কৃপা করবেন, সেই অনুযায়ী তোমার স্যুটগুলো তৈরি করা হবে।"

আমি শঙ্কিত হয়ে বললুম, "গুলো মানে? কটা?"

আপন ওয়েসকিটের সর্বনিম্ন বোতামটির উপর—ইটি কখনও খাঁজে ঢোকানো হয় না, যবে থেকে ড্যুক অব উইনজার ফ্যাশানটি প্রবর্তন করেন—হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, "তা, তা, গোটা বিশেক। আপাতক। পরে দেখা যাবে।"

এর পর আর শঙ্কার কোনও কথা ওঠে না। আমি বললুম, "যে টাকাটা ফোকটে পেয়েছিলুম সেটা গেল। উপস্থিত লণ্ডনে, একটা নাতিভদ্র লাউনজ স্যুটের কেমৎ নিদেন—£ 50/-/-, আড্ভালোরেম, আমাদের দিশী টাকায় প্রায় আটশ'—"

বাধা দিয়ে বললেন, "পাগোল! একটা সুস্থ (সোবার) স্যুটের দাম নিদেন £ 120/-/,-"

যখন পুনরায় চৈতন্যময় জগতে ফিরে এলুম তখন মিঃ (পরে তিনি সার হন) হজসন জবসন ফবজ-রোবসন আমার গলায় সাইফন থেকে সোডা-জলের সঙ্গে কড়া ব্রান্ডি মিশিয়ে তাই দিয়ে চোঁ—ওঁ—ওঁ—করে চাঁদমারী মারছেন—দমকলের লোক যে-রকম হৌজ দিয়ে আগুন মারে।

আমার কোনও কিছু বলার মত অবস্থা নয়। মিঃ হজসন (ইত্যাদি) বললেন, "আকছারই এরকম ধারা হয়। আমরা দমকল ডাকি নে। সাইফন দিয়ে কাজ চালাই। এই পশুদিনই ড্যুক অব কে—"

আমি ক্ষীণকণ্ঠে বললুম, "তা হলে আমার এই দিশী কোট-পেৎলুন বন্ধক দিয়ে দেশের টিকিট কাটতে হবে নাকি?"

সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "প্যাট কেম দি রিপ্লাই, খোকা বাজারে না, কিস্সুটি পাবে না। তবে হ্যাঁ, আলবত, ব্রিটিশ ম্যুজিয়াম পুর্না সব আয়কিওলজিকাল ক্যুরো কিনছে। অশোকের দাস্তানা, অর্জুনের পোর্টেবল অ্যাটম বম, দ্রৌপদীর প্রেসারকুকার-কম্-ফ্রিজ—। কিন্তু তুমি ভয় পচ্ছ কেন? আচ্ছা বল তো, পশুদিন রোদাঁর যে মূর্তিটি বিক্কিরি হল, তার পাথরের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দাম কত? বুঝতে পারলে তো প্রশ্নটা? স্রেফ পাথরের দাম? প্লেন মেটেরেলের দাম?''

আমি মিনমিনিয়ে বললুম, ''পাথরের দাম আর কত হবে? মার্বেল বটে। টাকা তিরিশেক।''

ওস্তাদ সোৎসাহে বললেন, ''ইয়েহ্! আর মূর্তিটি বিক্রি হল £ 50,000/-। এইবারে একটু চিন্তা করো। তোমাকে যে ডজন দুই স্যুট বানিয়ে দেব, বাজারে তার দাম হবে, নিদেন, হাজার তিনেক পৌণ্ড। কিন্তু মেটেরেলের দাম? স্রেফ উলের দাম কত হবে? বড়ীয়াহ সে বড়ীয়াহ? £ 50/-/- ? £ 100/-/? অর্থাৎ ১৪০০ টাকা? আমি আরটিস্ট, আমি রোঁদা।''

একটুখানি ভরসা পেয়ে বললুম, ''তা, তা, ডজন দুই, মানে কিনা, অতগুলো স্যুটের কি সত্যই দরকার?''

* * *

এর পর ওস্তাদ অত্যন্ত টেকনিকাল ভাষায় যে-কথা বলেন, সে আমি বুঝতে পারিনি, মনেও নেই। অতএব এখন যদি তাঁর ফিরিস্তি ঠিক ঠিক না দিতে পারি, তবে পাঠক অপরাধ নেবেন না।

তিনি হুড়হুড় করে বলে যেতে লাগলেন—

''মর্নিং স্যুট—স্ট্রাইপ্‌ট্ ট্রাউজারস—অরিজিনাল ওয়েসকিট—তার টপ-এন্‌তে সাদা সিল্কের পাইপিং দেব কি?—টাইয়ের উপরে ডাইমনড পিন্ না পার্ল দেবো—কোণভাঙা কলারের জন্য কোন্ কোম্পানি উত্তম? স্প্যাটার ডেশেজ!

''তার পর দেমি। পাতলুন যথা পূর্বং। কিন্তু কোটটা টেল নয়।

''সে না হয় হল। দুপুরের লাউন্‌জ স্যুটটি কি প্রকারের হবে?

''সন্ধ্যেয়? ডিনার জ্যাকেট? টেলস্?

''ইতিমধ্যে যদি গল্‌ফ খেলতে লোকটা গিয়ে থাকে?

''কিংবা সাঁতার কাটতে?

''কিংবা খেঁকশেয়াল শিকার করতে ঘোড়ায় চড়ে, জোড়্‌পুরী।

''কিংবা সে যদি অসুস্থ হয়ে তাবৎ দিন বিছানায় শুয়ে থাকে, তবে তার ড্রেসিং গাউন কি হবে?''

আমার মুখে বিরক্তি দেখে বললেন, ''এই যে তুমি এখন লাউনঞ্জ স্যুট পরে আছ, এ তো ইংরেজের ডাল-ভাত। এর উপর তার কি ধরনের ক'টা স্যুট দরকার হয় তার ফিরিস্তি দেওয়া বড়ই শক্ত। সে থাক। উপস্থিত তোমার সঙ্গে বিশুদ্ধ ভাষা বাবদে আলোচনা হোক। আচ্ছা বল তো স্মকিং কাকে বলে?''

''জানি নে।''

''তাহলে বানান করছি, smoking?''

''এরকম বিৎকুটে উচ্চারণ হতে যাবে কেন?''

''ফরাসীরা তাই করে। অবশ্যি যারা অল্পস্বল্প দুনিয়ার খবর রাখে তারা বলে স্মকিন্‌ন্। তা সে যাক গে, কিন্তু ফরাসীতে অর্থ হল ডিনার জ্যাকেট, টেল্‌জ্ না। আবার ইংরেজীতে স্মোকিং-জ্যাকিট অন্য জিনিস। অসকার ওয়াইল্‌ডের বড় প্রিয় ছিল, আর ছিল ফিনসি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওয়েসকিট—"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "ওয়াইলডের কথা কও, শুনতে রাজী আছি। কিন্তু তোমার এই বাহান্ন রকমের স্যুটের স্নবারিক দেমাক আমার আর বরদাস্ত হচ্ছে না।"

সিরিল বললেন, "বট্যে? তুমি যখন পাঁচ রকম 'ঔচে' (উচ্ছে) বর্ণনা দিতে দিতে স্নবারির চূড়ান্তে পৌঁছে গিয়ে বলো, ইংরেজ রাস্টিক, তেতোর কদর বোঝে না, তখন বাধা দিই? তুমি যখন বারো রকম অ্যামবল (অম্বল)—"

* * *

শ্রীযুক্ত নীরদ চৌধুরী যাই বলুন, যাই কন, জামাকাপড় বাবদে আমরা মুক্ত।

রাস্তা দিয়ে নাগা সন্ন্যাসী যখন যায়, তখন তো আমরা শুধোই নে, এটা হিন্দু না মুসলমান 'ড্রেস'!!

'ল্যাটে'

"রদাঁগৎ কাকে বলে জানো?"

"এক রকমের ফরাসী লম্বা কোট। প্রায় ফ্রককোটের কাছাকাছি। এর বেশি কিছু জানি নে, কখনও দেখিনি।"

"শব্দটা—রাদার, সমাসটা—কোত্থেকে এসেছে?"

আমার ইংরেজ বন্ধু সিরিল বেশভূষা বাবদে পয়লা নম্বরি, কিন্তু শব্দ, ভাষা এসব বাবদে তাঁর অণুমাত্র ইন্‌ট্রেস্‌ট্ নেই। তাই একটু উৎসাহ দেখিয়ে বললুম, "কোত্থেকে?"

"চেনার জো-টি নেই। ইংরেজী 'রাইডিং কোটে'র এই হল ফরাসী উচ্চারণ। শুধু তাই নয়, এতে আরও মজা। সেই রদাঁগৎ যখন ফের বিলেতে এল তখন তার ইংরিজী উচ্চারণ হয়ে গেল রেডিংগট এবং ফ্রান্সে নবজন্মপ্রাপ্ত এ-পোশাকে এদেশে আবার এক নবজন্ম লাভ করে হয়ে গেল মেয়েদের পোশাক—পুরুষ আর এটি এদেশে পরে না, অন্তত এ নামে পরিচিত পোশাকটি পরে না। কিন্তু রদাঁগৎ এখনও ফ্রান্সের ভারিক্কি পোশাক। তোমারও তো বয়স হতে চললো, আর যাচ্ছও ফ্রান্সে—"

আমি বললুম, "থাক, আমার সাদামাটা লাউনজ স্যুটেই চলবে।"

* * *

ফ্রান্সের একটি জায়গা দেখার আমার অনেককালের বাসনা।

বহু বৎসর পূর্বে আমরা একবার মার্সেলস বন্দরে নামি। সঙ্গে ছিলেন দেশনেতা স্বর্গত আনন্দমোহন বসুর পুত্র ডঃ অজিত বসু ও তাঁর স্ত্রী শ্রদ্ধেয়া মায়া দেবী।

বড়ই দুঃখের বিষয় এই গুণী, জ্ঞানী কর্মবীর অজিত বসু সম্বন্ধে কেউ কিছু লেখেননি। আসলে ইনি চিকিৎসক ছিলেন কিন্তু তাঁর জ্ঞানসাম্রাজ্য যে কী বিরাট বিস্তীর্ণ ছিল সেটা আমি আমার অতি সীমিত জ্ঞানের শিকল দিয়ে জরিপ করে উঠতে পারিনি।

তাঁর কথা আরেক দিন হবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তখনকার মত আমাদের উদ্দেশ্য ছিল জিনীভা যাওয়া। কিন্তু খবর নিয়ে জানলুম, সন্ধ্যার আগে তার জন্য কোন থ্রু ট্রেন নেই।

গোটা মধ্য এবং পশ্চিম ইয়োরোপ তিনি চিনতেন খুব ভালো করে। এবং বিখ্যাত শহর হলেই তিনি ইয়োরোপের ইতিহাসে সে শহর কি গুরুত্ব ধরে ধাপে ধাপে বলে যেতে পারতেন, কারণ তাঁর মত 'পুস্তক কীট' আমি দ্বিতীয়টি দেখিনি।

বললেন, " তার আর কি হয়েছে! চলুন, ততক্ষণে এ্যাক্স্ হয়ে আসি। মাইল আঠারো পথ।"

আমি বললুম, "সে কি? এ্যাক্স্-লে ব্যাঁ তো অনেক দূরে?"

তিনি হেসে বললেন, "আমার জানা মতে তিনটে এ্যাক্স্ আছে। উপস্থিত যেটাতে যেতে চাইছি সেটা আগা খানের প্যারা জায়গা এ্যাক্স্-লে-ব্যাঁ নয়—এটার পুরো নাম এ্যাক্স্ আঁ-প্রভাঁস!"

আমি বললুম, "প্রভাঁস? তাহলে এ জায়গাতেই তো আমার প্রিয় লেখক আলফস দোদে তাঁর 'লেটারজ্ ফ্রম মাই মিল' লিখেছিলেন, এখানকারই তো কবি মিস্ত্রাল যিনি নোবেল প্রাইজ পান—"

ডঃ বোস বললেন, "পুব বাঙলার যে লোকসাহিত্য আছে সেটা প্রভাঁসের আপন ফরাসি উপভাষায় রচিত সাহিত্যের চেয়ে কিছু কম মূল্যবান নয়। অথচ দেখুন, মিস্ত্রাল যে রকম একটা উপভাষা—একটা ডায়লেকটে, অবশ্য আজ এটাকে ডায়লেকট বলছি—কাব্য রচনা করে বিশ্ববিখ্যাত হলেন, নোবেল প্রাইজ পেলেন, ঠিক তেমনি পুব বাঙলায় কেউ সেই ভাষা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে, গর্ব অনুভব করে, মিস্ত্রালেরই মত পরিশ্রম স্বীকার করে, সেটিকে আপন সাধনার ধন বলে মেনে নিয়ে নূতন সৃষ্টি করে না কেন? জানেন, আমি বাঙাল?"

ইতিমধ্যে যান এসে গেছে।

এদেশের বর্ণনা আমি কি দেব? এ্যাক্স্ও নাকি দু-হাজার বছরের পুরনো শহর। কই, মেয়েগুলোকে দেখে তো অত পুরনো বলে মনে হল না! তাহলে বলতে হয়, শহরটা দু হাজার বছরের 'নূতন'।

পার্কের একটি বেঞ্চিতে বসে ভাবছিলাম, এই তো কাছেই তারাসকঁ শহর যাকে বিখ্যাত করে দিয়েছেন দোদে তাঁর তারতারাঁ দ্য তারাসকঁ লিখে।[১] তারই পাশে ছোট্ট জায়গাটি—মাইয়ান্ (জানি নে, প্রভাসাঁলে তার উচ্চারণ কি) যেখানে কবি মিস্ত্রাল তাঁর সমস্ত জীবন কাটালেন। তারই মাইল সাতেক দূরে বাস করতেন দোদে—ফঁভিয়েই গ্রামের কাছে। কবি মিস্ত্রালের বর্ণনা লিখে একাধিক ফরাসি লেখক নিজেদের ধন্য মেনেছেন। কিন্তু অপূর্ব দোদের বর্ণনাটি। —এক রববারের ভোরের ঘুম থেকেই উঠে দেখেন, বৃষ্টি আর বৃষ্টি, আকাশ ভেঙে বৃষ্টি। গোটা পৃথিবীটা গুমড়ো মুখ করে আছে। সমস্ত দিনটা কাটাতে হবে একঘেয়েমিতে। হঠাৎ বলে উঠলেন, কেন, তিন লীগ আর কতখানি রাস্তা? সেখানে থাকেন কবির কবি মিস্ত্রাল। গেলেই হয়।

BanglaBook.org

১ বছর চার পূর্বে বোধ হয় খগেন দে সরকার এর অনুবাদ "দেশে" প্রকাশ করেন।

www.BanglaBook.org

কিন্তু দোদে যেভাবে (তাঁর লেয়'-এ Letters de mon Moulin-এর ইংরেজী অনুবাদ কতবার কত লোক যে করেছেন তার হিসেব নেই, পাঠক অনায়াসে পুরনো বইয়ের দোকানে মূল অনুবাদ যোগাড় করতে পারবেন)[১] সেই জলঝড় ভেঙে পয়দল মিস্ত্রালের গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছলেন তার বর্ণনা আমি দেব কি করে? দোরে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনতে পেলেন কবি উঁচু গলায় কবিতা রচনা করে যাচ্ছেন—কী করা যায়?—নিরুপায়—ঢুকতেই হবে—

মিস্ত্রাল যেন লাফ দিয়ে তাঁর ঘাড়ে পড়লেন—"এ্যাঁ! তুই এসেছিস! আর ঠিক আজকেই! কী করে তোর মাথায় সুবুদ্ধিটা খেললো, বল দিকিনি।"

তারপর কি হল? বলবো না।

শুধু একটি কথার উল্লেখ করি।

খানিকক্ষণ পরে গির্জা থেকে ফিরে এলেন মিস্ত্রালের মা। বুড়ী বড়ই সরলা, রান্নাতে পাকা, কিন্তু হায়, প্রভাঁসাল ছাড়া কোনও ভাষা বলতে পারেন না। তাই কোনও 'ফরাসি' (যেন প্রভাঁসের লোক ফরাসি নয়!) ছেলের সঙ্গে খেতে বসলে তিনি তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতেন না—কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা তিনি রান্নাঘরে না থাকলে তো রসুইয়ের নিখুঁত তদারকি হবে না।

আরেকটি কথা। মিস্ত্রালের শোবার ঘরটি ছিল বড্ডই ন্যাড়া। ফরাসি একাডেমি যখন মিস্ত্রালকে তিন হাজার ফ্রাঙ্ক উপহার দিলে, তখন বুড়ী চাইলেন ঘরটিকে একটু 'ভদ্রস্থ' করতে।

'না, না, সে হয় না"—বললেন মিস্ত্রাল—"এ যে কবিদের কড়ি; এটা ছুঁতে নেই।" ঘরটি ন্যাড়াই থেকে গেল। দোদে বলেছেন, "কিন্তু যতদিন ঐ 'কবিদের কড়ি' ফুরোয়নি, ততদিন কেউ তাঁর বাড়ি থেকে রিক্ত হস্তে ফিরে যায়নি!"

বৃষ্টি হচ্ছিল না? না, আমি স্বপ্ন দেখছিলুম।

তবে কি আমি ডাঃ বসুর সঙ্গে বসে? না, সেও স্বপ্ন।

আমি এসেছি মিস্ত্রালের গ্রামে, বহু বৎসর পরে, সেই "রদাঁগৎ" পরে।

আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। শুধু একটি দুঃখ রয়ে গেল। যাঁকে এখানে আসার খবরটি পিকচার পোস্টকার্ডে জানালে খুশী হতেন তিনি এখন এমন জায়গায় যেখানে এখনও ডাক যায় না।

BanglaBook.org

১ এ লেখক দোদের একটি লেখা সম্প্রতি অনুবাদ করেছে। 'দু-হারা' গ্রন্থ পশ্য। কিন্তু আমার অনুবাদ থেকে মূল যাচাই করতে যাবেন না।

www.BanglaBook.org

আঁদ্রে জিদ

দুনিয়ার লোক হদ্দমুদ্দ হয়ে প্যারিস যায়, এবং প্যারিসের ধনীদরিদ্র সকলেরই কামনা, কি করে গ্রামাঞ্চলে একখানা কুটিরাবাস নির্মাণ করা যায়। প্যারিসের ফ্ল্যাটখানাও থাকবে এবং সেখানে মাঝে মধ্যে আসবেন থিয়েটার অপেরা দেখবার জন্য, বন্ধুজনের (বান্ধবী তো নিশ্চয়ই) সঙ্গে মিলিত হবার জন্য।

খাঁটি স্ট্যাটিস্টিক্স দেওয়া কঠিন,—ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি, যে কজন মহৎ ফরাসী লেখক আমার প্রিয় তাঁদের প্রিয় সকলেই জীবনের অধিকাংশ ভাগ কাটিয়েছেন 'মফস্বলে'। যাঁরা নিতান্তই কোনও না কোনও কারণে পেরে ওঠেননি—যেমন আলফাঁস দোদে—তাঁরা সুযোগ পেলেই ছুটে যেতেন গ্রামাঞ্চলে, কোনও সখার বাড়িতে।

প্রভাঁসের যে-জায়গাটিতে দোদে বার বার গেছেন সেখানে দিন পাঁচেক কাটানোর পর এক অপরাহ্ণে বসে আছি, যে-ইন্‌টিতে উঠেছিলুম (এসব 'ইন্' এমন গাঁইয়া যে এগুলো না হোটেল, না ডাক-বাংলো, না সরাই, না চটি—সব-কটিরই অল্প-বিস্তর সুবিধে অসুবিধে দুইই এগুলোতে পাবেন) তারই জানালার কাছে বাইরের দিকে তাকিয়ে। ঢেউখেলানো উঁচু-নিচু টক্কার ভর্তি জনপদ ধরিত্রীর দূরত্ব যেন আরও বাড়িয়ে দেয়—আপন দৃষ্টি যে কত দূরান্তে যেতে পারে সে সম্বন্ধে মানুষের আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং আশ্চর্য, সমুদ্র যদ্যপি দিগন্ত-বিস্তৃত, তার পারে বসে মানুষের এ-অভিজ্ঞতা হয় না।

ইন্‌কীপার, পাঁত্র (Patron), মালিক—যে নামে খুশী ডাকুন—কাছে এসে দাঁড়াতেই আমি প্রসন্ন বদনে বললুম "এ ব্যাঁ, আলর্—" এ শব্দগুলোর মানে অভিধানে পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই, যেমন "এই যে, হেঁহেঁ বেশ বেশ—শব্দগুলো নিশ্চয়ই কোনও না কোনও মানে ধরে কিন্তু আসলে এগুলো ফার্সী ভাষাতে যাকে বলে "তাকিয়া-ই-কালাস" অর্থাৎ "কথার তাকিয়া" অর্থাৎ যার উপর ভর করে কথাবার্তা আরাম পায়—জমে ওঠে।

তারপর বললুম, "বসবে না? একটা কিছু খাও।"

বললে, "এ ব্যাঁ, আমি আপনাকে 'দেরাঁজ' ('ডিসএরেঞ্জ' শব্দার্থে অর্থাৎ ডিসটার্ব বা বদার) করছি না তো?"

আমি প্রসন্নতর বদনে বললুম, "পা দ্য তু—বিলকুল না—।"

বললে, "মসিয়ো, আমি আদৌ 'নোজি' না। বিশেষত যখন দেখতে পাচ্ছি, আপনি যখন আপন মনে, মনের সুখে আছেন। ও লা লা—কাল সন্ধ্যায় আমাদের আড্ডাটি যা জমেছিল! আর আপনি যা হাসাতে পারেন—"

একদম গুল্। হাসাতে পারার মত তেমন কোনও স্টাক আমার নেই। আসলে ব্যাপারখানা হয়েছিল এই যে, আমাদের গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত কতকগুলো গল্প, গোপালভাঁড় ইত্যাদি আমি তাঁদের শুনিয়াছিলুম আপন ভাঙা ভাঙা ফরাসীতে। তাদের কাছে লেগেছে 'এপাঁতা' (ভয়ঙ্কর মজাদার) এবং অরিজিনাল। অবশ্য এসব গল্প যখন প্যারিস-লন্ডনেই পৌঁছায়নি তখন প্রভাঁসের 'পাণ্ডব-বর্জিত' আজ পাড়াগাঁয়ে যে অরিজিনাল মনে হবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাতে আর বিচিত্র কি? গোপালের দু'একটি রিসকে (risky আদিরসাত্মক) গল্প বলতেও ছাড়িনি, এবং তখন গাঁয়ের পাদ্রি সাহেবই—এবং তিনিই ছিলেন আসরের চক্রবর্তী—সব চেয়ে বেশী চোখের ঠার মেরে আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন।

বললে, "মসিয়ো, আমাদের গ্রামে কজন বিদেশী এসেছে সে আমি এক আঙুলে বলতে পারি—তাও তারা পাশের সেই সুদুর ল্যাঁদ (L Inde) থেকে। এখানে আপনি কি মধু পেলেন, বলুন তো?"

আমি বললুম, "তুমি তো বলেছিলে, তুমি কখনও প্যারিস তক্ দেখোনি। তোমাকে বোঝানো হবে শক্ত। তবে সংক্ষেপে বলতে পারি, এটা অনেকটা রুচির কথা। আপন দেশেও আমি গ্রামাঞ্চলে বেড়াতে, বাস করতে ভালোবাসি। তা ছাড়া এটা কবি মিস্ত্রালের দেশ।...আচ্ছা, অন্য লোক আসে না এখানে মিসত্রালের জন্মভূমি দেখতে?"

বেশ গর্বভরে বললে, "নিশ্চয়ই, তবে তারা সবাই ফরাসি—"

তারপর কি যেন মনে পড়ে যাওয়াতে হঠাৎ থেমে গিয়ে এবারে সে উৎসাহভাবে বললে, "ও লা লা। সে এক কাণ্ড।"

"দুই লেখকের লড়াই। সে হল গিয়ে ১৯৪৪-এর শেষের দিকের কথা। মার্কিনিংরেজ নরমাঁদিতে নেমে প্রায় সমস্ত ফ্রান্স দখল করে ফেলেছে, ঐ সময় কি কারণে, কি করে যেন দুই লেখক—হ্যাঁ খাঁটি ফরাসি—এসে উঠেছেন আমার এখানে। আর এই ঘরেই, আমরা কাল যেখানে দুপুর রাত অবধি কত আনন্দে হইহল্লোড় করলুম, এসে বসেছেন, সেই দুই লেখক; কিন্তু তাঁরা তাঁদের চতুর্দিকে যে আবহাওয়া নির্মাণ করলেন সেটি ঠিক তার উল্টো। এ্যাব্বড়া বড়া গেরেমভারী হাঁড়িপানা গম্ভীর এক জোড়া মুখ দেখে আমার গাঁইয়া খদ্দেররা তো আশ্রয় নিলে ঘরের অন্য কোণে।

"ওঁরা গুরুগম্ভীর আলোচনা করে যাচ্ছেন নিজেদের ভিতর—আমরা ওদিকে কান দিইনি। কিছুক্ষণ পরে তাঁদের গলা চড়তে লাগলো, তারপর আরম্ভ হল রীতিমত ঝগড়া। তারপর আরম্ভ হল আমাদের ঐ পাহাড়ী বকরীতে বকরীতে যে রকম লড়াই হয়।[১] তারপর বলদে বলদে। অবশ্য আমাদের বলদ প্রতিবেশী স্প্যানিশদের বলদের তুলনায় তেমন কিছু না।[২]

"কি নিয়ে ঝগড়া, মসিয়ো? জান কী নিয়ে—ছুঁড়ি নিয়ে? তা হলেও তো বাঁচতুম। সে তো হর-হামেশাই হচ্ছে। এ ঝগড়া সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস নিয়ে। বলি,

ঐ সময়—অর্থাৎ তখনও যুদ্ধ শেষ হয়নি, অবশ্য হিটলারের পরাজয় সম্বন্ধে তখন সবাই নিঃসন্দেহ—এক ফরাসী লেখক লিখেছেন, এই যে আমরা ফরাসিরা 'পাত্রি' (স্বদেশ), 'পাত্রি', 'লিবেরতে' 'লিবেরতে' বলে চেঁচাই তার মূল্য কতটুকু? তিনি নাকি তারপর লিখেছেন, ফরাসি চাষা যদি তার গম দু পয়সা বেশী দামে বিক্রী করতে পারে তবে সে থোড়াই পরোয়া করে দেকার্ত আপন জাতভাই ফরাসি না দুশমন জরমন।

"এই নিয়ে লেগেছে তুলকালাম ঝগড়া! এক লেখক বলছেন, যারা ফরাসি জাতের

BanglaBook.org

১ প্রভাঁসের বকরী সম্বন্ধে লিখেছেন স্বয়ং দোদে—Le Chevre de M. Seguin.

২ এও পাঠক পাবেন প্রাগুক্ত পুস্তকে।

www.BanglaBook.org

দেশপ্রেম নিয়ে এরকম বিদ্রূপ করে তাদের ফাঁসি হওয়া উচিত। অন্য লেখক বলছেন কথাটা টক হলেও হক। এবং যে ফরাসি লেখক একথা বলেছেন তিনি তো জর্মন বা তাদের 'দোস্ত' পেতাঁর সহযোগিতা করতে রাজী হননি। তাঁর সততা সম্বন্ধে যারা সন্দেহ করে তাদের হওয়া উচিত ফাঁসি। তখন প্রথম জন বললেন, 'আজ যদি আমাদের ক্লেমাসোঁ বেঁচে থাকতেন তবে ঐ যে ব্যাটা ফরাসি দেশপ্রেম নিয়ে মস্করা করেছে তাকে তাঁর নোংরা বন্দুকটা দিয়ে—পরিষ্কারটা দিয়ে নয়, সেটা দিয়ে তিনি বুনো শূয়ার মারেন—গুলি করে মারতেন।"

এতক্ষণ মালিক ভায়া যে গম্ভীর সুরে কথা বলছিলেন, তার থেকে আমার মনে হচ্ছিল যেন স্বয়ং ক্লেমাসোঁই লীগ অব নেশনসে প্রতিবেদন পাঠ করছেন।

এবারে হঠাৎ হেসে উঠে বললে, "তারপর যা হল, মসিয়ো, সে সত্যি যাকে বলে কু দ্য তেয়াৎর[৩]—নাটকীয় ব্যাপার—ইতিমধ্যেই যে আমাদের পাদ্রি সাহেব কখন এখানে এসে এক কোণে দাঁড়িয়ে এঁদের তর্কাতর্কি শুনছিলেন সেটা লক্ষ্যই করিনি।

"তিনি এগিয়ে গিয়ে বললেন "মসিয়ো, আমি আপনাদের দেরাঁজ করতে চাই নে; সামান্য একটি বিষয়ের উল্লেখ করে আপন পথে চলে যাব। আপনারা শহরে সজ্জন—শুনেছি, আপনারা বঁ দিয়োর (ভগবানের) অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। আমার শুধু বক্তব্য, আপনাদের একজন বলছিলেন, আজ ক্লেমাসোঁ বেঁচে থাকলে তিনি নাকি কাকে যেন গুলি করে মারতেন। এ-ভোওয়ালা মেসিয়ো—আজই সন্ধ্যায় এই কাগজখানা আমার কাছে এসেছে আমাদের কলোনি ট্যুনিস থেকে। তাতে প্রকাশিত হয়েছে একখানি চিঠি। ইটি লিখেছেন মসিয়ো ক্লেমাসোঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী—তার বয়স, এখন চুরাশি। তিনি লিখেছেন,—'শের মসিয়ো জিদ, আমি আমার জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে বহু বৎসর বাস করেছি। আমি বলতে পারি, আজ তিনি বেঁচে থাকলে আপনার পক্ষ নিতেন। তাঁকে কতবার বলতে শুনেছি, জমি! জমি!! শুধু জমি!! আর টাকা। ব্যস, মাত্র এ দুটো বস্তুই আমাদের চাষীরা চেনে!'

"পাদ্রি সায়েব বললেন, 'তা সে যাক! কিন্তু এটা কি বঁ দিয়োর মিরাকল নয়, যে আজই আমি এ কাগজখানা পাব, আজই আপনারা এ আলোচনা তুলবেন, আজই আমি সেই পত্রিকাটি পকেটে করে আজই এখানে আসবো—এবং আপনাদের দ্বন্দ্বের সমাধান করে দেব! ও রভোয়া মেসিয়ো! কাল রববার গির্জেয় দেখা হবে'।"

কাহিনীটি শেষ করে মালিক মিটমিটিয়ে হেসে বললে, "এই যে বিরাট ফ্রান্সভূমি—এদেশের কারও বিশ্বাস, প্রভাঁসের লোক বড় সরস, বিশ্বাসী ধর্মপ্রাণ। আর কারও বা বিশ্বাস তারা কুসংস্কার কুণ্ডে আকণ্ঠ নিমজ্জিত।...আপনার কি মনে হয়? আপনি তো এসেছেন ধর্মের দেশ L'Inde থেকে।"

আমি তার মিটমিটে হাসি থেকে তারই বিশ্বাস কোন্‌দিকে বুঝতে পারলুম না।[৪]

৩ Coup d'etat cout de palais তুলনীয়। আজকাল পৃথিবীর সর্বত্র নানারকম 'কু' (অনেক সময়ই কিন্তু সেগুলো শিব্রামীর 'সু'! হচ্ছে বলে এটা উল্লেখ করলুম।

৪ আঁদ্রে জিদ্-এর ডাইরি, Journal 1939-42, 1942-44, Appendice 200ff.

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আড্ডা

কি বললেন স্যার? বাড়ি বিক্রি করতে এসেছেন? আমি কিনবো? আমি! বাড়ি নিয়ে করবোটা কি আমি? জন্ম নিলুম হাসপাতালে, পড়াশুনো করলুম হস্টেলে, প্রেম করেছি ট্যাক্সিতে, বিয়ে হল রেজিস্টারের আপিসে। খাই ক্যানটিনে—কিংবা যারে কয় 'ভোজনং যত্রতত্র'—, সকালটা কাটে কর্তাদের তেলাতে, তেনাদের তরে বাজার করে দিতে...হাটে র‍্যাশনে, দুপুরটা আপিসে, মাঝে মিশেলে সিনেমা হলে—সন্ধ্যেটা। পটল তুললে শুইয়ে দেবে নিমতলায়। বাড়ি নিয়ে কি আমি গুলে খাব? তার চেয়ে বলি, আসলে আমার দরকার একটি আড্ডার। একটি অত্যুৎকৃষ্ণ আড্ডার। তার খবর দিতে পারেন? তবে বুঝবো, আপনি একটি তালেবর ব্যক্তি!

কথাটা ন'সিকে খাঁটি। অত্যুৎকৃষ্ণ 'কৃষ্ণ' যদি 'কিষ্ট' বা 'কেষ্ট' হয় তবে 'উৎকৃষ্ণ'ই বা হবে না কেন? আড্ডা প্রতিষ্ঠানটি হালফিল পুরো-হাতা ব্লাউজের মত ডাইয়িং ইনডাস্ট্রি—মৃতপ্রায়।

এহেন অবস্থায় অকস্মাৎ বিনামেঘে পুষ্পাঘাত! দিল্লী থেকে খবর এসেছে সদ্যভূমিষ্ঠ শিক্ষামন্ত্রী প্রতিজ্ঞা করেছেন, বাঙালীকে তিনি 'আড্ডাবাজ' করে ছাড়বেন!

দিল্লী থেকে আসা খবরের সঙ্গে আমি প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ি না—বয়স হয়েছে। খবরটা ফলাও করে প্রকাশিত হবে, সঙ্গে সঙ্গে দেমাঁতি (dementi) বেরুবে, ফের তস্য দেমাঁতি বেরুবে দলিল পত্রসহ, চোপরা-ভাটিয়া আফ্টার এডিট লিখবেন, পারলিমেনটে গোটা তিনেক মন্ত্রী নাকুনি-চুবুনি খাবেন, ঐ নিয়ে খানদানী আড্ডায় (আমাদের যৌবনে) তর্কাতর্কির ফলে গোটা তিনেক 'পেয়ারে' মুখ দেখাদেখি বন্ধ হবে—তবে আমি ব্যাপারটার মোটামুটি আবছা-আবছা ধুঁয়াশাপারা একটা 'উন্‌মান' ('অনুমান' নয়, তার আউটলাইন বড্ড ধারালো) করে নিই যে, ব্যাপারটা কি হয়ে থাকতে পারে। গোলনদাজদের কায়দা-করীনা নাকি এই দস্তুরেই হয়। প্রথম বোমা তাগ করবে লক্ষ্যবস্তু থেকে দূরে, পরেরটা কাছে, তারপর দুটোতে যোগ দিয়ে হাফাহাফি করে মোক্ষম মধ্যিখানে।

কিন্তু এ সংবাদখণ্ডটি নিয়ে কিঞ্চিৎমাত্র দেমাঁতি ডুয়েল হয়নি। দিল্লীর লালাজী, মিয়াসাহেবরা খবরটা পরিবেশন করা সত্ত্বেও ব্যাপারটির গুরুত্ব 'এহমীয়ৎ' সম্বন্ধে বিলকুল বে-খবর। 'আড্ডা'? সো ক্যা বলা? মজলিস, মহফিল, মুশাএরা, জলসা, বয়েৎ-বাজী—আলবৎ—লেকিন 'আড্ডা'? সো ক্যা আফৎ, গজব? ওদের আড্ডা ভিন্ন বাথানের গোরু—ওদের ভাষায় ভিন্ন ঝোপের চিড়িয়া—যেমন ওদের গোলাব জামুন আর আমাদের গোলাপ জাম।

তা সে যাই হোক যাই থাক, খবরটা যদি গুজোরব বা 'রাফওয়া' না হয় (হলে আগের থেকেই কলমে খৎ দিচ্ছি!) তবে বড় দুঃখের সঙ্গে শ্রীযুত ত্রিগুণা স্যানকে তাঁরই দ্যাশ করিমগঞ্জের একটি পদাবলী ঘেঁষা লোক-সঙ্গীত স্মরণ করিয়ে দেব :—

'দেখা হইল না রে, শ্যাম
আমার এই নতুন বয়সের কালে—'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রসরাজের স্মরণে শ্রীমতী বলছেন, 'ঠাকুর! তুমি নির্দয় নও; আমাদের সাক্ষাৎ একদিন না একদিন হবেই হবে। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার এই নূতন (নত্তুন) বয়সে যে দেখা হল না, সে-ই আমার মর্মবেদনা।'

'ডাক্তারেতে বলে যখন মরেছে এই লোক
তাহার তরে বৃথাই করা শোক
কিন্তু যখন বলে জীবন্মৃত
তখন শোনায় তিতো।'

খানদানী আড্ডা এখন জীবন্মৃত। তার নত্তুন বয়স বহু কাল হল গেছে। এখন আর তার "কোন্ গুণ আছে, 'তিন-গুণী'?"

আড্ডা সম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য সে আমি বহুবার বহু স্থলে নিবেদন করেছি। বহু সিন্ধু পেরিয়ে বহু দেশ ঘুরেছি আড্ডার সন্ধানে—পাপ মুখে কি করে বলি। গিয়েছিলুম লব্‌জো কপচাতে; আখেরে সর্বত্র সর্ব পরীক্ষাতে নাগাড়ে ফেল মেরে মেরে বিলক্ষণ বুঝে গেলুম, আমার যদি জ্ঞানগম্যি কখনও হয়—তা সে ঝুটাই হোক আর সাচ্চাই হোক—সেটা হবে 'আড্ডাতে'—শিক্ষামন্ত্রী যে তত্ত্বটি কনফারম করলেন এই অ্যাদ্দিন পরে।...ফের বহু সিন্ধু পেরিয়ে দেশে এসে দেখি, সেই আড্ডার 'বিন্দুটি' খরতাপে বাষ্পপ্রায়।

খানদানী আড্ডা যে জীবন্মৃত সে তথ্য তর্কাতীত। এই যে কলকাতা শহরে ঝাঁকে ঝাঁকে পাঁস্তলা-দস্তলা হামে হাল উঠছে তো উঠছেই এর ক'টাতে রক থাকে, বৈঠকখানা আছে? রক উঠেছেন ডাক-এ, আর বৈঠকখানার বদলে ড্রইংরুম। এদিকে ক্ষুদে একটি পেগটেবিলের উপর অতি পাতলা ডিমের খোলসপরা পরসেলেনের প্লেটে স্ন্যাক, অন্য দিকে ফঙ্গবেনে টিপয়ের উপর বেলজিয়াম কাঁচের ঢাউস ফ্লাওয়ার 'ভাজ'। সোফাতে আরামসে হেলানও দিতে পারবেন না, পাছে মাথার তেল লেগে সোফাভরণ চিটচিটে হয়ে যায়। বত্রিশটি দাঁতের মধ্যিখানে বেচারী জিভকে যে রকম অতিশয় সন্তর্পণে 'হাফিজ, খবরদার' হয়ে নড়াচড়া করতে হয় আপনাকেও করতে হবে তাই। তবে সান্ত্বনা, ভুগন্তি বাড়ির মালিকেরই সব চেয়ে বেশী। পাছে মহামূল্যবান কোনও জোড়াবাঁধা বস্তুর একটি ভেঙে যায়! বিলিতি মাল—এখন আর বাজারে পাওয়া যায় না।

গালগল্প যে একেবারেই হয় না, সে-কথা বলা যায় না। তাকে সোয়ারে, মাতিনে (ম্যাটিনি) কনভেরজাৎসিয়োনে[১] যা খুশি নাম দিতে পারেন, এমন কি আজকের দিনের ভাষায় সেমিনার বললেও দোষ নেই—কিন্তু একে আড্ডা নাম দিলে আমাদের মকিষ্যি কুলীন আড্ডার মেম্বারগণ একবাক্যে বলবেন, কঁহা আসমানকা তারা, আর কাঁহা পিঠকা (আসলে ভদ্রসমাজে মূল শব্দটা অচল) পাঁচড়া!'

গঙ্গাস্নান কমে যাচ্ছে কেন? পুণ্যবানরা নূতন নূতন ঘাট বানাচ্ছেন না তাই।

---

১ প্রথম দুটো শব্দ ফরাসী, তৃতীয়টি ইতালীয়। অর্থাৎ বাক্যালাপ করার তত্ত্বটি বরঞ্চ লাতিন জাত কিছুটা জানে। শুনেছি, অ্যাংলো সেক্‌শনদের এমন ক্লাবও নাকি আছে যেখানে কোনও মেম্বার কথাটি বলা মাত্র তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। একদা একজন মেম্বার নাকি আগুন লাগা মাত্রই 'আগুন আগুন' বলে চেঁচিয়ে ওঠাতে ক্লাববাড়ি রক্ষা পায়। তাঁকে অনেক ধন্যবাদ জানাবার পর (অবশ্য লিখিতভাবে) খাতা থেকে তাঁর নামটি কিন্তু কেটে দেওয়া হয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আড্ডা কমে গেল কেন? মডারনরা রক বানান না বলে। পাল্লায় পড়ে কেউ কেউ বা প্রাচীন দিনের আগোছালো বৈঠকখানাকে ড্রয়িংরুমের সাত চাপের কারবন কপি বানাচ্ছেন—দিল্লীতে বলে 'বুড়ো ঘোড়ার গোলাপী ন্যাজ' কিংবা 'বুড়ী দাদীমার হাতে বাহারে মেহদি'।

কিন্তু এহ নিরতিশয় বাহ্য।

গুহ্য সমস্যা অপিচ সরলতম প্রশ্ন : এই যে আমাদের মন্ত্রীবর তরুণদের আড্ডাবাজ করে তুলবেন বলে যমুনা পুলিনে দাশরথির শপথ গ্রহণ করলেন সেটা কি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে কিংবা প্রকৃত আড্ডাবাজের ন্যায় 'ধ্যত্তর তোর অগ্রপশ্চাৎ' হুঙ্কার ছেড়ে?

ঝাড়া আঠারোটি দিন আমাদের আড্ডাটি এই নিয়ে কুস্তি করেছে। নানা প্রশ্ন, বহুবিধ সপলিমেনটরি ততোধিক এফিডেভিট—সর্বশেষে এস্তের 'বুলু পেরিন্ট' (আমাদের মন্ত্রী মশাই-এ বস্তুটি বিলক্ষণ চেনেন) ডাঁই ডাঁই তৈরি হল, অবশ্য আড্ডাধারী মাত্রই জানেন, আমাদের হাইজাম্প লঙ-জাম্প মুখে মুখে।

প্রতি প্রস্তাবের বিরুদ্ধেই পাল্টা প্রস্তাব উঠেছিল; তবে একটি বিষয়ে সকলেই একমত হয়েছেন।

যদ্যপি মন্ত্রী মহাশয় এলেমদার ব্যক্তি তথাপি এ-হেন কঠিন গুরুভার তিনি যেন 'ভিক্ষুণীর অধম সুপ্রিয়া'র মত এজমালি বা বারো-ইয়ারী পদ্ধতিতে উত্তোলন করেন। বিগলিতার্থ;—তিনি যেন

১। একটি কমিশন নিয়োগ করেন।

এ-স্থলে আমার অতিশয় গোপনীয় একটি অভিজ্ঞতা থেকে জানাই, হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত জজকে আমি ব্যক্তিগতভাবে অন্তরঙ্গরূপে চিনি, যিনি একবার একটি আড্ডাবাজ ছোকরাকে অধ্যাপক পদের জন্য সুপারিশ করে জনৈক ভাইস্-চ্যানসেলারের কাছে হুট্ হয়েছিলেন। ভি সি যখন জিভ কেটে বললেন, 'ছোকরা পাঁড় আড্ডাবাজ' তখন তিনি জরডন জলে ধোয়া তুলসী পাতাপানা মুখ করে 'নাঈফ' উত্তর দিয়েছিলেন 'ঐ তো তার আসল এলেম।'

এঁকে কমিশনের চ্যারম্যান করতে পারলে সর্বরক্ষা—সকলং হস্ততলং!

২। ইতিমধ্যে দেখা গেল আরেকটি বিষয়ে আমাদের 'দশদিশি নিরদ্বন্দ্বা'—প্রকৃত আড্ডাপ্রাণ ব্যক্তিকে কাট্যা ফালাইলেও সে কোনও কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিতে যেতে পারবে না। হরহামেশা হাজামৎ করছি আমরা উইলসন জনসনের, আর আমরা যাব কমিশনের সম্মুখে!

আড্ডাযজ্ঞের আমরা অভিশপ্ত (পূত, যাই বলুন) ভস্ম। আমরা যেতে পারবো না, নীলকণ্ঠের চড়াই উতরাই পেরিয়ে জটার ভিতর গঙ্গার সন্ধানে।

তিনিই আসতেন। আমি যাঁর প্রতি দু লহমা পূর্বে ইঙ্গিত করেছি তিনিই আসবেন, স্বেচ্ছায় সানন্দে। শ্যামবাজার থেকে শুরু করে আড্ডা মেরে মেরে তিনি হেসেখেলে পৌঁছে যাবেন টালিগঞ্জে। রিপোর্ট যা লিখবেন সে এক অভিনব মেঘদূত! শ্যামবাজার-রামগিরি থেকে টালি-অলকা!

কিন্তু আমরা কমিশনকে বিভ্রান্ত বা প্রেজুডিস করতে চাই নে বলে অত্যধিক বাগবিস্তার থেকে নিরস্ত হচ্ছি। তবে একটি বিষয়ে তাবৎ গৌড়ভূমি যখন বিলক্ষণ

www.BanglaBook.org

সচেতন, সেটি যেন কমিশন বিস্মৃত না হন।

আড্ডা জীবন্মৃত কিনা, যদি হয় তবে তার অমরুতাঞ্জন সঞ্জীবনী সুধা কি সে নিয়ে তো কমিশন চিন্তা করবেনই—যথেষ্ট সুযোগ পাবেন, আজকাল প্রায়ই বিজলি ভ্রষ্টা রমণীর মত সাঁঝের ঝোঁকে চোখ মারতে মারতে আঁধারে গায়েব হয়ে যায়, তেমন আত্ম-অন্বেষণী, বিশ্বভাবনা ভিন্ন গতি কি?—কিন্তু আমরা আগেভাগেই বলে রাখছি;—

বঙ্গসন্তান চাহে না অর্থ, চাহে না মান, চাহে না জ্ঞান, সে চায় ডিগ্রী!

আড্ডাবাজরূপে সে যদি স্বীকৃতি পায় এবং উমেদার মাত্রেই জানেন—খানদানী আড্ডাতে সীট পাওয়াটাই কী কঠিন কর্ম—তবে সে ডিগ্রী না নিয়ে ছাড়বে না!

এবং ঐ সব বস্তাপচা পি-এচ ডি, ডিফিল, হনোরিস কাউজা, সুম্মা কুম লাউডে, দকত্যোর অ্যাস লেৎর, ফাজিল-অল-মুহদ্‌দিসীন, শমশীর-ই-জমশীদই আলিমান, সাংখ্যবেদান্তর্কচুঞ্চু—এসব উপাধি-খেতাব-ডিগ্রী বিলকুল না-পাশ।

তাহলে সে ডিগ্রীর নাম কি হবে?

এ-বাবদে ইহসংসারে সর্বাভিজ্ঞ মহাজনকে আমরা চিঠি লিখেছি।

ইনি স্ট্রাসবুরগ্ শহরের সরকারী উপাধিদাতা।

শহরের সদর দেউড়ি দিয়ে ঢুকলেন এক অশ্বারোহী—ইয়া মোচ, ইয়া তলওয়ার।

সামনেই সদররাস্তা-বুলভার জোড়া একটি টেবিলের পিছনে দাঁড়িয়ে ফ্রক-কোট, টপ-হ্যাট, আতশী-কাঁচের চশমা পরা এক—স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে—সরকারী কর্মচারী। আমাদের আই এ এস গোছ।

হুঙ্কারিলেন, 'তিষ্ঠ!'

'? ? ?'

'আপনি ডক্টরেট উপাধি ধরেন?'

অশ্বারোহী অবতরণ পূর্বক সবিনয় : 'আজ্ঞে না।'

গম্ভীর নিনাদ : 'এ শহরে ডকটরেট না থাকলে "প্রবেশ নিষেধ"।'

কাতর রোদন : 'তাহলে উপায়?'

মোলায়েম সান্ত্বনা : 'উপায় আছে বই কি। এই তো হেথায় টেবিলের উপর রয়েছে সর্ব গোত্রের উপাধিপত্র। আপনার দেশ?'

আশাভরা কণ্ঠ : 'এজ্ঞে, লুক্‌সেম-বুর্গ্।'

নুড়ি-চাপা ভিন্ন ভিন্ন ডাঁই থেকে একখানা করকরে কাগজ তুলে নিয়ে, আ-হা-সুন, আসুন, স্যর (বিতে শ্যোন, প্লীজ!)। দক্ষিণা : পঞ্চাশৎমুদ্রা।'

বিগলিত আপ্যায়িত কণ্ঠ : 'বিলক্ষণ, বিলক্ষণ (ডাংকে শ্যোন, মেসি, থ্যাংকংকস)। এই যে।'

অশ্বারোহী নগরকেন্দ্রে প্রবেশ করতে করতে ভাবলে, 'আমার এই অশ্বিনীটি আমার বিস্তর সেবা করেছে। এর জন্য একটা হনোরিস কাউজা ডকটরেট আনলে মন্দ হয় না।' ঘোড়া ঘুরিয়ে উপাধিদাতার কাছে এসে তার সদিচ্ছা জানালে। আই এ এস্ দুঃখ-ভরা কণ্ঠে বললেন, 'ভেরি ভেরি সরি, হের ডকটর! এ শহরে ডকটরেট দেওয়া হয় শুধু গাধাদের। ঘোড়ার জন্য কোনও ব্যবস্থা নেই।'

আমরা এঁরই উপদেশ চেয়ে পাঠিয়েছি। আমেন!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাসপরট্

গল্পটি পুব বাঙলার বিশেষ একটি জেলা সম্বন্ধে। মনে করুন তার নাম 'লোহাভরা'।

পূর্ব বাঙলার সাধারণ জন মাত্রেরই দৃঢ়তম বিশ্বাস 'লোহাভরা' জেলার লোকমাত্রই অতিশয় ধুরন্ধর। এদের কেউ একা বা দল বেঁধে ঢাকা স্টেশনে নামলে বিদগ্ধ, হাজির-জবাব কুট্টি পর্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে এদের রীতিমত সমঝে চলে। সর্বশেষে বলা হয়, ঐ জেলাতে কখনও দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সেখানে স্বয়ং শয়তান সে-জেলার যে প্রধান প্রতিভূ সে পর্যন্ত মাছি ধরে ধরে খায়—কারও গোলায় হাত দিতে হিম্মৎ পায় না।

তামাম পুব বাঙলার চাণক্য-মাকিয়াভেললি যে এদের সম্মুখীন হলে হুঁশিয়ারির খাতিরে তদ্দণ্ডেই তাঁদের কানাকড়িটি পর্যন্ত স্টেট ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে আসেন সে তত্ত্বটি লোহাভরাবাসী বিলক্ষণ অবগত আছে বলে তারা সহজে আপন বাসভূমির খবর দেয় না; লোহাভরার পার্শ্ববর্তী কোনও এক জেলার বাসিন্দা বলে পরিচয় দেয়।

* * *

পারটিশনের ফলে কলকাতা এবং ঢাকাতেও নানা নয়া নয়া সমস্যা দেখা দিল।

ঢাকা সেকরেটারিয়েটে খবর এল আমেরিকা থেকে—ভারতের বিস্তর জানোয়ার-দরদী মহাজনরা বাধা দিচ্ছেন, বাঁদর যেন মারকিন মুল্লুকে চালান না দেওয়া হয়, মারকিনরা নাকি ডাক্তারী এক্স্‌পেরিমেন্টের অছিলায় এদের উপর পাশবিক অত্যাচার (ভিভিসেকশন) করে। মারকিন ডাক্তাররা তাই ঢাকাকে অনুরোধ করেছেন, তাঁরা যদি ন্যায্যাধিক মূল্যেও মর্কট-সরবরাহ করেন। পশ্চিম ও পূব বাঙলার মর্কটে মর্কটে নাকি রত্তিভর ফারাক নেই এবং এরা কোনও প্রকারের মাইগ্রেশন সারটিফিকেট নিয়ে দেশত্যাগী হয়েছে বলে জানা যায়নি!

সংশ্লিষ্ট সেকরেটারি মহোদয়—তিনিই আমাকে সংক্ষেপে ইতিহাসটি কীর্তন করেন—তাঁর দফতরের ঝানু-ঝাণ্ডু এসিসটেনট তস্য এসিসটেনটদের এত্তেলা দিয়ে তাদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, 'এটা ফরেন ইক্‌স্‌চেনজের গুরুতর ব্যাপার!'

দফতর ভুশুণ্ডিরা এক বাক্যে উত্তর দিলেন : 'বাঁদর ধরার কৈশল অতিশয় প্যাচাঁল। এর স্পেশালিস্ট ছিলেন হিঁদুরা। তাঁরা ইন্ডিয়া চলে গেছেন।'

অনেক তর্কাতর্কির পর স্থির হল জেলায় জেলায় খবরের কাগজে যেন নিম্নোক্ত বিজ্ঞাপনটি ফলাও করে ছাপানো হয়;

বাঁদর! বাঁদর!! বাঁদর!!!

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, মারকিন-মুল্লুকের অনুরোধে এই দেশ হইতে জীবন্ত বাঁদর আমেরিকায় রফতানী করা হইবে। তজ্জন্য উপযুক্ত মূল্য দেওয়া হইবে।

স্বাক্ষর সেকরেটারি
সবুজপুরা, ঢাকা-১১।

আমি সচিব মহোদয়কে শুধালাম, 'উত্তম ব্যবস্থা। তার পর?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বললেন, 'যেই না বিজ্ঞাপনটি লোহাভরা জেলায় বেরিয়েছে অমনি দেখা গেল, তাবৎ জেলার লোক লুঙ্গি ফেলে ফেলে গুয়া গাছের ডগায় চড়ে বসে আছে। সবাই মারকিন মুল্লুকে যাবে। মুশকিল! জানেন তো, লোহাভরার লোকের যা কাত্তিকের মত চেহারা, তাতে কোন্‌টা বাঁদর কোন্‌টা মানুষ ঠিক ঠাহর করা—'

* * *

ইতিহাস-দার্শনিক শ্রীযুক্ত টইনবি বলেছেন, দেশকালপাত্রের যোগাযোগের ফলে নিত্য নিত্য প্যাটারন্‌ তৈরি হচ্ছে বটে, কিন্তু সেগুলো আকছারই প্রাচীন প্যাটার্‌নের পুনরাবৃত্তি মাত্র। তফাত ডীটেলে।

অতএব, যখন সবিশেষ অবগত আছি, উভয় বাঙলার দেশকালপাত্রে ফারাক যৎসামান্য তবে পূর্বোল্লিখিত পূর্ববঙ্গীয় প্যাটার্‌নের পুনরাবৃত্তি পশ্চিমবঙ্গে প্রতিভাসিত হবে না কেন? আমরা কিসে কম?

অবশ্য স্বীকার করছি ডীটেলে উনিশ-বিশ হওয়া বিচিত্র নয়।

এবং তাই হয়েওছে।

কারণে, কিংবা অকারণে, অথবা বলতে পারেন, কিসমতের মারে এদেশে পাশপরট্‌ যোগাড় করাটা ক্রমশ কঠিন হতে কঠিনতর হতে লাগলো, স্বরাজ পাওয়ার অল্প কিছুকালের মধ্যেই। শেষটায় হাল এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে তখন কেউ আর নিতান্ত বিপদে না পড়লে ঐ সাপের পায়ের সন্ধানে বেরুতো না। অবশ্য লক্ষপতি, কালোবাজারী, বিদেশে যার আচার-করা ফরেন কারেন্‌সি আছে তাদের কথা আলাদা। এসব কাহিনী দফে দফে বয়ান করার প্রয়োজন নেই। খবরের কাগজে অনেক খবর বেরোয় সাদা কালিতে ছাপা। সেগুলো পড়ার জন্য একটি তৃতীয় নয়নের প্রয়োজন—ইংরিজীতে যাকে বলে টু রীড বিটুইন দ্য লাইনজ। যাঁদের সেটা আছে—আমার নেই—তাঁরা আপনাকে অনায়াসে দু কলম শেখাতে পারেন। সে কথা থাক।

ইতিমধ্যে একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল।

লোকটার নিশ্চয়ই কোমরের জোর, কড়ির ওজন ও বুকের পাটা আছে, নইলে সরকারের সঙ্গে লড়তে যাবে কেন? ক'টা আদালতে হারার পর লোকটি সুপ্রীম কোরটে পৌঁছল জানি নে। সেখানে প্রধান বিচারপতি (তৎকালীন) শ্রীযুত সুব্বা রাও যা রায় দিলেন তার বিগলিতার্থ, কোনও ভারতীয় যদি আপন দেশ ছেড়ে বিদেশে যেতে চায় তবে তাকে ঠেকাবার এখ্‌তেয়ার ভারত সরকারের নেই। সেটা হবে সংবিধান-বিরুদ্ধ।

বাস্‌! আর যাবে কোথা!

আমাগো দ্যাশে কয়, একে তো ছিল নাচিয়ে বুড়ী তার উপর পেল্লা মৃদঙ্গের তাল।

পূব বাঙলার প্যাটার্‌নে এস্থলে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে গাছের মগডালে না চড়ে মেয়েমদ্দে আণ্ডাবাচ্চায় ধাওয়া করলে পাসপরট্‌ ফরমের জন্য। বাঁদরের জন্য ও-বস্তুর প্রয়োজন নেই—তাকে খাঁচায় পুরে প্লেনে ঢুকিয়ে দিলেই হল। মানুষের বেলা জাহাজের কাপতান, প্লেনের টিকিট বেচনেওয়ালা, ভূপৃষ্ঠে বর্ডারের উভয়পক্ষের পুলিস শুধোত, অভিজ্ঞান-পত্রটি কোথায়?

ইতিমধ্যে নাকি আরও দুজন জজ সাহেবের রায় বেরলো : আইনত নাকি পাসপরটের কোনও প্রয়োজনই নেই। এটা আমি বুঝতে পারিনি, কাজেই এটি নিয়ে তড়িঘড়ি

www.BanglaBook.org

আলোচনা করা আমার শোভা পায় না।[১] পয়লা তো ঝামেলাটা বুঝে নিই।

উপস্থিত একটি কথা বলে রাখি।

আইন অবশ্যই সর্বজনমান্য। কিন্তু কার্যত কি হয়?

আইনত (ডেজুরে) পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই তার নাগরিককে অবাধ চলাফেরা করার ক্ষমতা দেয়, কিন্তু কার্যত (ডে ফাকটো) কোনও দেশ দেয় বলে জানি নে।

এই তো হালের কথা। মার্কিন দেশে যে জোর গণতন্ত্রের রাজত্ব সে-কথা আমরা সবাই জানি। অন্তত সেই নিয়ে তাদের বড়-ফাটাইয়ের অন্ত নেই। দক্ষিণ কোরিয়া, ভিয়েৎনাম সর্বত্রই তাঁরা যে গণতন্ত্র তথা ব্যক্তি-স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিচ্ছেন একথা তাঁরা বিশ্ববাসীকে অহরহ শোনাচ্ছেন। সত্যি হতে পারে, মিথ্যা হতে পারে, কিংবা হয়তো মারকিনগণ নিজেদের এটা বোঝাবার চেষ্টা করছেন। এবারে সেই হালের কথাতেই আসি।

দার্শনিক বারট্রানড রাস্‌ল্ কিছুদিন হল স্থির করলেন, একটা বেসরকারী আদালত বসিয়ে সেখানে ভিয়েৎনামে 'মারকিন পাপাচারের' বিচার করা হবে। খোলা আদালতে যে বকম যে-কোনও মানুষ, হয় আসামী নয় ফরিয়াদি পক্ষে দাঁড়াতে পারে বা আদালতের দোস্ত (আমিকুস কুরিএ) হিসেবে নিরপেক্ষভাবে কথা বলার হক্ ধরে—রাসলের বেসরকারী বে-আইনী (বা অ-আইনীও বলতে পারেন) আদালতেও সেই ব্যবস্থা থাকবে।

এ আদালতে হাওয়া কোন্ দিকে বইবে সেটা ঠাহর করা জন্য হ্যামলেট নাটকের ভূতের প্রয়োজন হয়নি। তৎসত্ত্বেও মার্কিন জুজুর ভয়ে সব রাষ্ট্রই মুখে কাঁথা চাপলেন। অর্থাৎ সে আদালতের জন্য আসন দিতে (ভেনু) রাজী হন না—'তোমার আসন পাতবো কোথায়' হে অতিথি'—অবশ্য ভিন্নার্থে।

শেষটার সরল সুইডেন লাজুক কনেটির মত কবুল পড়লো—এবং আখেরে পস্তালো, কিন্তু সে কথা থাক।

সেই 'উয়োর ক্রাইমস ট্রিবুনালে' সাক্ষ্য দিলেন ৭ই মে তারিখে এক ভদ্রলোক—এঁর নাম রাল্‌ফ্ শ্যোমান। মারকিন নাগরিক, এবং রাসলের খাস নায়েব (পারসনাল সেকরেটারি)। ভিয়েৎনামে মারকিনদের 'পাশবিক অত্যাচারে'র দফে দফে বয়ান দিয়ে—যার সঙ্গে এ রচনার কোনও সম্পর্ক নেই—তিনি বলেন, তিনি স্বয়ং হানয় গিয়েছিলেন এবং অনুমান করেন, যেহেতু তিনি ঐ জায়গায় মারকিন সরকারের বিনানুমতিতে গিয়েছিলেন তাই সে-সরকার এক্ষণে তাঁর পাসপরট্ রদ করবে (অর্থাৎ বাতিল বা বাজেয়াপ্ত করে নেবে)।

যদি করে তবে সেটা আইনসঙ্গত কিনা, সেটা বিচার করার মত আইন জ্ঞান আমার কেন, বহু ধুরন্ধরেরও নেই।

(১) এই দেখুন না, কেন্দ্রীয় সরকার পাসপরট্ বাবদে যে আইন এতদিন মেনে চলতেন তারও একটা রেজোঁ দেৎর্ (raison detre) দিনের একটা ভিত ছিল

---

১ কাগজে রিপোর্ট বেরিয়েছে : "Giving their reasons the minority said that there was no compulsion of law that a passport must be obtained before leaving India." আমারই মত জনৈক সম্পাদক ব্যাপারটা বুঝতে পারেননি এবং ঐ নিয়ে সম্পাদকীয় লিখেছেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

(২) তিনজন মহামান্য জজ সেটা অস্বীকার করলেন (৩) অন্য দুজন মহামান্য জজ ঐ তিনজনের সঙ্গে একমত হলেন না। এদিকে পাসপর্ট্ দরখাস্তের বন্যায় হিল্লী দিল্লী যায়-যায়। সেটা ঠেকাবার জন্য সরকারকে বাধ্য হয়ে জারী করতে হয়েছে, (৪) অরডনন্স্—সাময়িক আইন। এ আইনের আয়ুষ্কাল মেরে কেটে ছ'মাস। ইতিমধ্যে সরকার এই অরডনন্স্টি মেজে ঘষে (৫) বিল রূপে পরিবর্তন করে পেশ করবেন পারলিমেনটের সমুখে।

তখন লাগবে ধুন্ধুমার, ইংরিজীতে যাকে বলে দ্য ফ্যাট উইল বি ইন দ্য ফায়ার। উপরের প্যারায় আমি পাঁচ রকমের দৃষ্টিবিন্দু পরিবেশন করেছিলুম—এবারে পারলিমেনটে জুটবে এসে আরও পাঁচশ!

আমার ঘাড়ে কি ৫০৬টি মাথা যে আমি রা'টি কাড়বো!

কিন্তু এখানেই শেষ নয়।

পারলিমেনটে বিস্তর বেদরদ ধোলাইয়ের পর ইস্ত্রি হয়ে বেরবেন বিলটি তখন আইনরূপে।

আমরা শঙ্খ বাজাবো হুলুধ্বনি দেব।

কিন্তু হায়, এ পোড়ার সংসারে শান্তি কোথায়? এই নয়া তুলতুলে তুলোয়ভরা তাকিয়া-পারা আইনটার উপর ভর করে যে দুদণ্ড জিরিয়ে নেবেন তারই বা মোকাফুরসৎ কোথায়?

আবার এক 'পাষণ্ড' হয়তো—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই—সে আইনকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রীম কোর্টে দাঁড়াবে।

এবং এবারও যদি মহামান্য বিচারপতি...?

তা হলে শুরুসে, ফিন্‌সে, সেই ঔড্র পদ্ধতিতে :—

ক-রে কমললোচন শ্রীহরি,

খ-রে খগ-আসনে মুরারি

গ-রে...!

আড্ডা—পাসপরট্

'এত দেরিতে যে?'

শোনো কথা! আড্ডাতেও আসতে হবে পাঙট্যুয়ালি?

'হ্যাঁ, সেই কথাই তো হচ্ছে। তুমি তো হামেশাই পাঙট্যুয়ালি অন-পাঙট্যুয়াল।'

আড্ডা প্রতিষ্ঠানের কাশীবৃন্দাবন কাইরো শহরে। এ সম্বন্ধে আমার গভীর গবেষণামূলক একাধিক গেরেমভারী প্রবন্ধ খানদানী অকসব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাত্মক বনেদী ত্রৈমাসিকে বেরুবার কথা ছিল, কিন্তু হঠাৎ কর্তাদের খেয়াল গেল যে আমার ঐ সাতিশয় উচ্চপর্যায়ের লেখাগুলো যদি একবার তাঁদের কাগজে বেরয় তবে সে-কাগজের মান বা স্ট্যান্ডার্ড চড়াকসে এমনি সুপুরি গাছের ডগায় উঠে যাবে যে আর পাঁচজন লেখক সে মগ্‌ডালে উঠতে পারবে না। অথচ পয়লা নম্বরী পাঠকমাত্রই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার উচ্চাঙ্গ লেখায় পেয়ে গেছেন তাজা রক্তের সন্ধান, হয়ে গেছেন ম্যানঈটার। সম্পাদকমণ্ডলী তখন আর পাঁচজনের লেখা বাসি মড়া পাচার করবেন কি প্রকারে! একবার ভাবুন তো, স্বয়ং কবিগুরু যদি কোনও সপ্তাহের দেশ পত্রিকায় 'ট্রামেবাসে', 'সুনন্দর জারনল' এবং 'পঞ্চতন্ত্র' সব কটাই লেখেন, তারপর আমাদের তিনজনের—এক কথায় সৈয়দ সুনন্দ করের কি হাল হবে? পচা ডিম ছুঁড়বে আমাদের মাথায় পাঠকগুষ্টি—কাগজ হয়ে যাবে বন্ধ। সম্পাদক, প্রকাশক, মুদ্রাকর, লেখক সবাইকে বসতে হবে রাস্তায়। আমাদেরও তো কাচ্চাবাচ্চা আছে। ডাল-ভাত যোগাতে হয়।

আমার অত্যুৎকৃষ্ট রচনার মূল্য অকসব্রিজের কর্তৃপক্ষ বুঝুন আর নাই বুঝুন—এটা কিন্তু ভুললে চলবে না তারা ইংরেজ। ইংরেজ ব্যবসা বোঝে। নেপোলিয়ন একদা বলেছিলেন 'নেশন অব শপ-কীপারজ্'—এখন বলা হয় 'নেশন অব শপলিফটারজ্'[১] (ভদ্রবেশী 'দোকান-লুটেরা')। ব্যবসা বোঝে বলেই তারা আমার 'লা-জবাব' প্রবন্ধগুলো ইনশিওর করে সবিনয়, সকাতর ফেরত পাঠায়—ছাপলে তারা, তাদের আণ্ডাবাচ্চারা বেবাক-আণ্ডাহীন হবে সেই কারণ দর্শিয়ে।

তখন করি কি?

কথিত আছে, একদা লন্ডনে এসে মার্কিন হেনরি ফোরড দাবড়ে বেড়াচ্ছিলেন খাসা রহিসী রোলস রইস। পঞ্চম জর্জ তাঁকে শুধোলেন, 'সে কি মিসটার ফোরড! আপনি বিজ্ঞাপনে বলেন ''ফোরড গাড়ি দুনিয়ার চীপেস্ট এবং বেস্ট গাড়ি'', তবে রোলস চড়েন কেন?' ফোরড বাও করে বললেন, 'আমার ম্যানেজারকে বহুবার বলেছি, আমাকে একখানা ফোরড গাড়ি দিতে। তার মুখে ঐ এক কথা—ফোরড গাড়ি তৈরি হতে না হতেই সঙ্গে সঙ্গে বিক্রী হয়ে যায়; সে খদ্দের সামলাবে না মালিককে গাড়ি দেবে। খদ্দের মোর ইমপরটেনট দ্যান মালিক। অতএব, হুজুর, বাধ্য হয়ে বাজারের সেকেনড বেস্ট্ মোটর—রোলস—কিনেছি।'

গল্পটি মিশরের পিরামিডের চেয়েও প্রাচীন—যে পিরামিডের দিকে পিছন ফিরে আমরা কাইরোর কাফেতে বসি। কিন্তু ক্ল্যাসিক্যাল কাহিনীর ভালে ঐ তো চন্দন-তিলক! নিত্য নিত্য নব নব ফাঁড়া গরদিশে সাক্ষাৎ মুশকিলআসান।

আমি জানতুম, অকসব্রিজ ত্রৈমাসিকের পরেই সেকেন্ড বেস্ট্ কাগজ 'দেশ'।

সেখানে পাঠালুম। ছাপা হয়ে গেল (সম্পাদক-ম্যানেজার হয়তো সোল্লাসে ভেবেছিলেন, ওটা পয়সা-কামানেওলা বিজ্ঞাপন), বই হয়েও বেরুলো। পাঠক সাবধান! চীনেবাদামের ঠোঙা কদাচ অবহেলা করবেন না। একমাত্র ঐ কাগজেই একখানা তাবাল্লোক মল্লিখিত কাইরোর কাফে আড্ডা সম্বন্ধে নিবন্ধগুলি পড়তে পায়।

---

১ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিবেদন : আশকথা পাশকথা (আড্ডার সেটা প্রাণধর্ম) না শুনে যে-সব বে-আড্ডাবাজ অথচ গুণী পাঠক মূল গল্পের খেই ছিনেজোঁকের মত আঁকড়ে ধরে রাখতে চান তাঁরা যেন ফুটনোটগুলো না পড়েন; কণামাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। অবশ্য তার অর্থ এও নয়, যে, মূল লেখা না পড়লে তাঁর সর্বনাশ হবে।

'শপ্-লিফটারজ্' কথাটা ইংরেজের উপর প্রথম আরোপ করেন ছদ্মনামধারী সরস লেখক 'সাকী'।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অতএব কাইরোর কাফে-আড্ডার সবিস্তর বর্ণনা নূতন করে দেব না। শুধু এইটুকু বলবো কাইরোর কাফের তুলনায় আমাদের আড্ডা, ইংরেজের ক্লাব, জরমনের পাব, কাবুলির চা খানা, ফরাসীর বিস্‌ৎরো—এস্তেক অবিমুক্ত ক্ষেত্র কাশীর জমজমাট ঘাট—সব শিশু, শিশু। বৈজ্ঞানিক বলেন, আমাদের জীবনের এক-তৃতীয়াংশ কাটে শয্যায়—নিদ্রায়। কাইরোর কাফে হাসবে—কুট্টির ঘোড়ার মত—আস্তে বলুন। তাদের জীবনযাত্রা একপ্রকার :—

সকাল ৬টা থেকে ১০টা কাফে = ৪ ঘণ্টা। ১০টা থেকে ১টা দফতর। ১টা থেকে ২টা কাফে = ১ ঘণ্টা। ২টা থেকে ৫টা দফতর, ৫টা থেকে ১২টা কাফে = ৭ ঘণ্টা। ১২টা থেকে ৬টা ভোর নিদ্রাযোগে গৃহবাস অতিশয় অনিচ্ছায়।

একুনে, সর্বসাকুল্যে কাফেতে ১২ ঘণ্টা। জীবনের এক-তৃতীয়াংশ না ঘণ্টা! হোলি রাশার সেই ফাটা ঘণ্টা যেটা কখনও বাজেনি।

কাইরো সজ্জনের জীবনের হাফ কাটে কাফেতে—অবশ্য বেটার হাফ-কে বাড়িতে রেখে! আর ছুটিছাটা, স্ট্রাইক—রাজা ফারুকের মেহেরবানীতে হরবকৎ লেগেই আছে[১]—লটারি উত্তোলন দিবসচয় যদি হিসেবে নেন তবে সেই প্রথম প্রবন্ধের প্রথম তত্ত্বে ফিরে যাই : বাড়ি নিয়ে কি গুলে খাব, পারেন তো দিন একটি নন্‌স্টপ্‌-আড্ডার সন্ধান। তাহলে অবশ্যই প্রশ্ন উঠতে পারে, কাইরোতে লোক বাড়ি বানায় কেন? মিশরবাসী তখন বিদেশীকে বুঝিয়ে বলে, প্রাচীন যুগে তারা আদৌ বানাতো না, বানাতো গোরের জন্য স্রেফ পিরামিড—চোখ মেললেই এখনও চতুর্দিকে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু কই সে-যুগের বাড়ি? বানানোর বদ অভ্যাস বাজে খরচা তারা শিখেছে হালে, ইংরেজের কাছ থেকে, তার 'হোম' নাকি তার আসল (অ্যান্ড হি ইজ দ্য টাইরেন্ট ইনসাইড)। আর বাড়ি বানানোটাই যদি এখন কিছু জব্বর মহৎকর্ম, বাবুইকেই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী বলা উচিত, ওর মত নিটোল, নিখুঁত বাড়ি বানিয়েছে আর কেউ? ছাত ধসে না, ট্যাকশো দিতে হয় না।—ইত্যাদি।[২]

তা সে থাকগে, কোন্ কথা থেকে কোন্ কথায় চলে এলুম, ঐ তো আড্ডার দোষ।

কাইরোর কাফে আমাকে বোঝাচ্ছিল, আমি পাঙট্যুয়াল, অর্থাৎ কথা দিয়ে থাকি ঘণ্টায় আসবো বলে, আর আসি কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ঘণ্টায় অর্থাৎ পাঙট্যুয়ালী...ইত্যাদি।

এরপর কাফে বলে কিনা, আমি নাকি অন্‌-পাঙট্যুয়ালও বটে!

সেটা কি প্রকারের?

টুটেনখামেন-এর আমল থেকে এদেশের অলিখিত আইন, মিটিং যদি ধার্য হয়ে থাকে সাতটায়, তবে শুরু হয় আটটায়, দিল-হামেশাই হচ্ছে। আমি নাকি উপস্থিত হই কাঁটায় কাঁটায় সাতটায়। এটা নাকি অন্‌-পাঙট্যুয়াল পাঙট্যুয়ালিটি।

সেটা নাকি স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার একচেটে কারবার। নীলনদে কখনও প্রচুর জল আসার

---

১ আমার কাইরো-কাফে আশ্রম ঐ সময়ে।

২ ভারতের বাইরের বেদে মাত্রেরই বিশ্বাস তাদের আদিমতম পিতৃভূমি ভারতবর্ষ। তা হতেও পারে। এবং তাদের আর একটি বিশ্বাস, ভারতবর্ষ আগাপাস্তলা বেদেদের দেশ, সবাই ঘুরে বেড়ায় সুতরাং কেউ বাড়ি-ঘরদোর বাঁধে না!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফলে কাফের সকলে গায়ে রেশমের স্যুট চড়ায়, কখন মাত্র কপ্লিনটুকু সম্বল : কখন সাহারায় ঝড়ের ঠেলায় ছ ফুট বালি জমে বাড়ির দেউড়ি বন্ধ হয়ে যাবে এবং তারই ফলে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক পরিস্থিতি—কাফেতে আসার জোটি নেই—এসবের হদীসান্বেসীরা নাকি পরবর্তীকালে আবহাওয়া দফতরের ডিরেকটার জেনরেল হয়।

ইতিমধ্যে আমাদের টার্ক—(তুর্কী বললে মানুষটাকে ভদ্র বলে মনে হয়)—ইংরিজি অর্থে টার্ক, সদস্য তওফীক এসে উপস্থিত।

পয়লা নম্বরের ধুরন্ধর এক গোঁয়ার। আমাকে শুধোলে 'কি বাবুজী, খানিকক্ষণ আগে তোমাকে দেখলুম এক আজব চিড়িয়ার সঙ্গে—ওহেন মাল কস্মিন্‌কালে বাবা, এই বহুতর চিড়িয়ার শহর কাইরোতেও দেখিনি! ব্যাপারটা কি?'

আমি বললুম, 'আর কও কেন? সেই কথাই তো এদের বোঝাতে যাচ্ছিলুম। সমস্ত বৈকালটা কেটেছে ব্রিটিশ কনসুলেটে—বুনো হাঁস ধরার চেষ্টা কখনও করেছ? তাইতেই হেথায় হাজিরাতে দেরি?'

'বুনো হাঁস! সে আবার কি?'

'নয় তো কি? কিন্তু আমার সঙ্গে যে চিড়িয়া দেখছিলে সে সম্পূর্ণ ভিন্ন চীজ। আমার দেশের লোক।'

কাফে অবাক। 'সে কি? আমরা তো জানতুম, তুমি কোথাকার সেই বাঙলা না, কি যেন বলে, সেই দেশের একমাত্র লক্ষ্মীছাড়া এসেছ এদেশে।'

'সে কথা পরে হবে। উপস্থিত শুধোই, বিদেশে-বিভুঁইয়ে কেউ কখনও পাসপর্‌ট্ হারিয়েছ?' সকলেই একসঙ্গে শিউরে উঠলেন, কারও কপালে ঘাম দেখা দিল, কেউ বা চোখ বন্ধ করে আল্লারসূলের নাম স্মরণ করছেন।

পাঠককে বুঝিয়ে বলি, এ সংসারে নানান ভয়াবহ অবস্থা আমরা দেখি, কাগজে পড়ি, —শ্রবণ বা স্বপ্নলব্ধ জ্ঞান না হয় বাদই দিলুম। কিন্তু এ সব ক'টাকে হার মানায় মাত্র একটি নিদারুণ দুর্দৈব—বিদেশে পাসপর্‌টি হারানো।

ছুটুন কনস্যুলেটে। তারা কানই দেবে না। লিখুন আপন দেশে। নো রিপলাই। কিংবা শুধোবে, পাসপর্‌টের নম্বর, ইস্যুর তারিখ গয়রহ জানাও। সেগুলো আপনি ডাইরিতে টুকে রাখেননি। আবার কনস্যুলেটে ধন্না। সঙ্গে নিয়ে গেছেন দু-পাঁচজন ভারতীয়। তাঁরা হলপ খেলেন, আপনি যে ভারতীয় সে বাবদে তাদের মনে কোনও সন্দেহ নেই। কনস্যুলেট বলবে, মাডাগাসকারের বিস্তর লোক ভারতীয় ভাষায় কথা কয়; তাই বলে তারা ভারতীয়? ইনডিয়ান নেশনালিটির প্রমাণ কোথায় যে আমরা নয়া পাসপর্‌ট দেব? বৈর করুন ব্যর্থ সারটিফিকেট, এবং প্রমাণ করুন সেটা আপনারই।

হাজারোগণ্ডার হাবিজাবী হেনাতেনা চাইবে। এবং তাদের চাওয়াটা সম্পূর্ণ ন্যায্যত হক্কতঃ। না চাইলে দুনিয়ার যত ভাগাবন্ড ভ্লাডিভসটক থেকে আলস্‌কা—এসে কিউ লাগাবে একখানা করকরে ঝাঁ চুকচুকে, সোঁদা সোঁদা গন্ধওলা ইনডিয়ান পাসপর্‌টের লোভে। এক ঝটকায় হয়ে যাবে ইনডিয়ান ন্যাশনাল, সঙ্গে সঙ্গে লন্ডনে গিয়ে মহারাণীর মোলাকাৎ চাইবে। যে বেচারাকে টারক তওফীক দেখেছিল পথিমধ্যে, সে সত্যি সিলেটের লোক।

আমি গিয়েছিলুম কনস্যুলেটে, প্যালেসটাইন যাবার জন্য অনুমতির ('ভিজার')

www.BanglaBook.org

সন্ধানে। সেই জরাজীর্ণ লোকটাকে জবুথবু হয়ে এক কোণে বসে থাকা অবস্থাতে দেখেই বুঝে গেলুম লোকটা সিলেটি।

এবং তাই। আমার মুখে সিলেটি শুনে ভ্যাক করে কেঁদে ফেললে। আমি একপাল লোকের সামনে মহা অপ্রস্তুত।

ব্যাপারটা সরল, কিন্তু পরিণামে হয়ে গেছে বেজায় জটিল। মাসখানেক পূর্বে আলেকজান্দরিয়া বন্দরের কিছু দূরে একটা জাহাজডুবি হয়—ঐ কোনও গতিকে বেঁচেছে, সম্পূর্ণ উলঙ্গাবস্থায়, গায়ের চামড়াও কিছুটা পুড়েছে। পাসপর্‌ট্‌ তো সাপের মণি—রত্তিভর ডকুমেন্ট তার কাছে নেই। আর ঐ একমাত্র 'সিলট্যা' ভিন্ন অন্য কোন ভাষার একটি শব্দও সে বুঝতে পারে না।

কুল্লে কাফে মাথা নেড়ে সায় দিলে, ব্যাপারটা সঙ্গীন।

ভ্যাগ্যিস, ডেপুটি কনসালটি ছিলেন আমার পরিচিত—অতিশয় অমায়িক খানদানী ইংরেজ ভদ্রলোক। আমার আপন কাজ শেষ হয়ে গেলে খালাসিটার কথা পাড়লুম। সায়েব মাথা নেড়ে বললেন, 'বিলকুল হুম্‌বগ্‌। আমি কলকাতায় কাজ করেছি পাঁচটি বৎসর। বাঙলা শুনলে বেশ বুঝতে পারি। ও যা বললে সে তো বাঙলা নয়।'

মনে মনে আমাকে বলতে হল, 'পোরা কপাল আমার।' সায়েবকে বললুম 'ওকে একটু ডাকলে হয় না?' সায়েব সদাশয় লোক, বললেন, 'আলবৎ।'

লোকটা আসামাত্রই আমি চালালুম তোড়সে সিলেটি। কিঞ্চিৎ কটুকাটব্যের কাঁচা লঙ্কা মিশিয়ে। উদ্দেশ্য তাকে একটু অতিশয় তাতিয়ে দেওয়া, নইলে যে রকম ন'সিকে ভিলেজ ইডিয়ট, পেটে বোমা মারলেও—। দাওয়াই ধরলো। কাঁইকুঁই করে বলে গেল অনেক দুঃখের কাহিনী—চোখে সাত দরিয়ার নোনাজল। মিনিট পাঁচেক চললো 'রসালাপ'। সায়েব খালাসীকে বললেন, 'টুম্‌ যাও।' আমাকে শুধোলেন, 'এও বাঙলা'? আমি বললুম, 'লন্ডনের সঙ্গে উত্তর স্কটল্যান্ডের ভাষায় যে মিল—এ বাঙলার মিল কলকাত্তারই সঙ্গে তার চেয়েও কম।'

এরপর সায়েব যা বললে, তার থেকে পরিষ্কার বুঝে গেলুম, লোকটি সত্যকার ডিপলমেট। বললেন, 'দু-একটা শব্দ যে একবারই বুঝতে পারিনি তা নয়। তবে কি জানো, ব্যাবু, ব্যাপারখানা আসলে কি? কোনও বিশুদ্ধ স্ট্যান্ডার্ড ভাষা—যেমন মনে করো প্যারিসের ফরাসী, কিংবা ধরো লন্ডনে প্রচলিত খানদানী ঘরের ইংরেজী—সেটা শেখা কিছু অত্যধিক কঠিন কর্ম নয়। হাজার হাজার রুশ, পোল, হাঙ্গেরিয়ান চোস্ত ইংরিজী বলে, খাসা ফরাসী কপচায়—কার সাধ্যি বলে কোন্‌টা কার মাতৃভাষা নয়—এবং প্রসঙ্গত বলি, এরাই হয় বেস্ট স্পাই। কিন্তু মশাই, বিশুদ্ধ গাঁইয়া ডায়লেকট রপ্ত করাটা বড়ই কঠিন, প্রায় অসম্ভব। লন্ডনের ক'টা খানদানী ইংরেজই বলতে পারে খাঁটি ককনি?'

সায়েবটি ছিল একটু দুঁদে টাইপ। খালাসিটার জন্মভূমির গ্রাম থানায় চিঠি না লিখে রেডটেপিজেমের মূর্ত প্রতীক 'এনকোয়ারি' না করেই আপন জিম্মায় ছেড়ে দিলে একখানা পাসপর্‌ট্‌।

নইলে ঐ হতভাগা ক'মাস ধরে কে জানে, হয়তো বারো বছর ধরে আপিসে দফতরে ধন্না দিত, রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করে বেড়াতো, খেত কি, মাথা গুঁজতো কোথায়?

আর ইতিমধ্যে যদি কোনও সমধিক কর্মনিষ্ঠ তথা অত্যুৎসাহী উৎকোচাশ্রয়ী মিশরী

www.BanglaBook.org

পুলিসম্যানের নজর পড়ে যেত? কাঁধে খাবলা মেরে শুধতো 'তুমি তো বিদেশী বলে মনে হচ্ছে হে—নিকালো বাসবর' (আরবীতে 'প' নেই বলে 'ব' আদেশ, এবং শব্দটি আরবরা ফরাসী থেকে নিয়েছে বলে শেষের 'টি' উচ্চারিত হয় না—একুনে পাসপর্‌ট্ উচ্চারিত হয় 'বাসবর', বা 'বাসাবর') তাহলে?

শ্রীঘর। তাতে যে আমাগো সিলট্যা মোতিমিয়ার খুব একটা ভয়ঙ্কর আপত্য (আপত্তি শব্দের সিলেটি রূপ) আছে তা নয়; জাহাজের কয়লাঘরের কারবালায় কারবার করছে যে লোক তার পক্ষে কাইরোয় কারাগার করীমা ব্‌বখশায় বর হাল-ই-মা—আল্লার কৃপা তার উপরে এসেছে।

কিন্তু ততোমধ্যে তার নয়া বাসবরের জন্যে যেটুকু ধর্না দেওয়া, তদবির করা সেটুকুনই বা করবে কে? অবশ্য আখেরে এস্থলে তদবির করা না করা—বরাবর বসুন্ধরা সর্বত্রই তদ্বির-ভোগ্যা নন—এখানে প্রকৃতি তার আপন গতি নেয়।

সাঁইমুরশীদ কবুল, আমি স্নব নই। কিন্তু আপনার আমার মত ক্ষীণকায় মধ্যশ্রেণীর ভদ্রসন্তানকে যদি বিদেশের জেলে ঠেসে দেয়, তবে টেঁসে যেতে কতক্ষণ? না হয় সপ্রমাণ হল, কাইরোর জেলকে আপনি হার মানিয়ে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু বেরনো মাত্রই তো আপনি সেই ক্রাইমটি ফের করে ফেলেছেন, বিদেশে বিনা পাসপর্‌টে আপনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

অবশ্য আপনি তর্ক তুলতে পারেন, মিশর সরকারই আপনাকে রাস্তায় নামিয়ে ক্রাইমটি করছে, সে-ই কাজের আপনি ইফেকট মাত্র। ততোধিক কুতর্ক করতে পারেন, আজ যদি মিশর সরকারের প্রতিভূ পুলিসম্যান আপনাকে চোদ্দতলা বাড়ির ছাদ থেকে পেভমেন্টে ফেলে দেয় তবে সেটা আত্মহত্যা নয়।

* * *

কাফেতে এ নিয়ে বিস্তর মাথা-ফাটাফাটি হয়।

একমাত্র তওফীক আফেন্দী চরম অবহেলাভরা সুরে পরম তাচ্ছিল্যসহ মাঝে মাঝে বলছিল 'যত সব!' কিংবা 'আদিখেত্তায় মানওয়ারী' অথবা ডিমের খোসায় কালবৈশাখী!

শেষটায় বললে, 'ছোঃ! আমার কাছে নিয়ে এলে না কেন?'

নিবেদন করলুম, 'জানি তুমি একদা ছিলে মুস্তাফা কামালের 'বিবেকরক্ষক', অধুনা ইসমেৎ ইনেনুর অমনিবাস এমবেসডর, কিন্তু তথাপি—'

বললে, 'যাঃ! এইটুকু মশা মারতে বাঘের উপরে টাগ!—না। তিনে দিতুম। কী আর এমন ক্লেওপাত্তার গুপ্তধন প্রয়োজন ঐ সাসিটুকুর জন্য?'

আমি অবাক হয়ে শুধোলুম, 'সে কি? পাসপর্‌ট্ কি ছোটর বেসাতি, যে—'

গম্ভীর কণ্ঠে বললে, 'দেখো, বৎস! তুমি আজহর মাদ্রাসার ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করো; না-ই বা জানলে এসব জাল-জচ্চুরির কায়দা-কেতা।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ঈস্ট ইজ ঈস্ট অ্যানড—'

ইজ্‌রাএল (ইসরাইল) নিমিত্ত মাত্র। অর্‌-রঈস জমাল্‌ আবদুন নাসিরও নিমিত্ত মাত্র। দুজনের পিছনে রয়েছে দ্বিধা বসুন্ধরা—যাকে আমরা এতদিন প্রাচী তথা প্রতীচী নামে চিনেছি। ইংরেজ ফরাসী গয়রহ বলেছে, অরিএনট এবং অকসিডেন্ট। জর্মনরা এ দুটো শব্দ ব্যবহার করে বটে, কিন্তু খাঁটি জরমনে বলা হয় মরগেন্‌লান্‌ট (উদয়াচল) ও আবেনটলান্‌ট (অস্তাচল—অবশ্য লান্‌ট=ভূমি, দেশ); আরবরা হুবহু ঐ রকমই মশরিক্‌ ও মগরিব[১] (মগরিব বলতে আবার দক্ষিণ আফরিকাকেও বোঝায়) বলে থাকে।

এই দুই ভূখণ্ড নিজেদের ভিতর প্রায় সম্মিলিত হয়ে একে অন্যের সম্মুখীন হয়েছে—যুদ্ধং দেহি।

এ-লেখা বেরুবার পূর্বেই হয়তো উভয় পক্ষ অস্ত্রসংবরণ করে নেবেন। কিন্তু এর শেষ অতি অবশ্যই এখানে নয়। এ শুধু আরম্ভ মাত্র।

প্রতীচীর শক্তিশালী যুযুধান বলতে উপস্থিত বুঝি জনসন, উইলসন[২] ও দ্য গল্‌। প্রাচীর ভীষ্ম কর্ণ বলতে বুঝি কসিগিন মাও।

ইজ্‌রাএলের পিছনে দাঁড়িয়েছেন মারকিন ও ইংরেজ। আরব রাষ্ট্রপুঞ্জের পশ্চাতে রুশ ও চীন।

দ্য গল্‌ ব্যত্যয়। অনেকটা শ্রীকৃষ্ণের মত। অনেকটা শ্রীকৃষ্ণেরই মত তিনি একটা শান্তিসভার প্রস্তাব পেশ করেছিলেন এবং সে প্রস্তাবের পশ্চাতে তাঁর কোনও অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু কূট কসিগিন সঙ্গে-সঙ্গেই অনুমান করে নিলেন যে ধড়িবাজ মারকিন ইংরেজ এই সভাটাকেই মুষলে পরিবর্তিত করে আরব বংশ ধ্বংস করতে চাইবে। তাই কসিগিন যা বললেন, যার ব্যঞ্জনা দিলেন, এবং যা বললেন না কিন্তু মীন করলেন তার সব কটা একুনে দাঁড়ায় : 'শান্তির প্রস্তাব তো উত্তম প্রস্তাব', কিন্তু প্রশ্ন, তুমি জনসন, এবং উনি উইলসন যে দুটি আপন আপন খাসা নৌবহর ভূমধ্যসাগরে রোঁদ মারিয়ে ফেরাচ্ছ, দুনিয়ার সর্বত্র ছড়ানো বাদবাকিগুলোকে নোঙর ভেঙে ফেলে ফুল ইস্টীমে ওদিক-বাগে ধাওয়া করতে হুকুম দিচ্ছ (মুখে যদিও বলছ, 'ওরা তো চলাফেরা করছে কবেকার সেই ঈসু করা প্রাচীন দিনের টাইম-টেবিল অনুযায়ী) তারা কি ওখানে

---

১ বাঙলা গরিব শব্দ ও মগরিব মূলে একই ধাতু থেকে। গরিব আরবীতে 'বিচিত্র' 'অদ্ভুত' অর্থ ধরে।

২ একদা এ দেশে বলা হত বাঙালীর জাত মারছে তিন 'সেন'এ মিলে। উইলসেন-এর হোটেলে বাঙালী খেত নিষিদ্ধ মাংস, কেশব সেন তাদের করে ফেলত 'বেহ্মজ্ঞেনী', আর ইস্টিসেনে বাহান্ন জাত-বেজাতের সঙ্গে মেলা-মেশা এড়ানো যেত না। এখন পৃথিবীর জাত মারার জন্য এসেছেন অন্য তিন সেন। মার্কিন জনসেন, ইংরেজ উইলসেন এবং কানাডার পিয়ারসেন। তৃতীয়োক্ত ব্যক্তিটি নিতান্তই চুনো পুঁটি। কিন্তু স্বয়ং জনসেন মুক্তকচ্ছ হয়ে এঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে এঁকে বেজাতে তুলেছেন, কিংবা বলবো এঁর জাত মেরেছেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আসছে ফেরেস্তাদের প্যাটারনে পিঠে ড্যানা গজিয়ে, হাতে হাপর যন্ত্র নিয়ে "হাল্লেলুইয়া" কীর্তন সহ যীশুদত্ত আপ্ত আপ্ত শান্তি সঙ্গীত গাইতে :

"অগ্রসর হও আজি খ্রীষ্টসেনাগণ.

সবে মিলি আইস—"

"থাক না, বাছারা, ওসব সান-ডে ইস্কুলের মোলায়েম মোলায়েম মধুরসের মোরব্বা! আর সেই যদি কইছ, ভূমধ্যসাগরে, ইজরাএলের ধারে ধারে, মিশরের বন্দরে বন্দরে মানওয়ারিদের কোনও প্রকারের ভালোমন্দ মতলব নেই তবে একটা সরল কর্ম করলেই তো হয়। বেচারী খালাসীমাল্লারাও লক্ষ্য-হস্ত তুলে তোমাদের আশীর্বাদ করবে আপন আপন দেশের বন্দরে দারাপুত্রপরিবার সহ সম্মিলিত হয়ে—যাক না এরা ফিরে আন্‌কল্ স্যামের সোনার দেশে, ডিফেনডার-অব-ফেৎ-রুল-ব্রিটানিয়ার অক্ষয় স্বর্গে—আহা! ন্যু ইয়রক সাউত্যামটনে ফুল কত না অজস্র, আসব কত না সুলভ, আর ললনারা কতই না উন্মুক্ত হৃদয় (পাঠক, আমি শব্দার্থে বলছি না!—খেয়াল থাকে যেন—লেখক)। শান্তি সম্মেলনে তো যাব, ওদিকে যারা তোমাদের দলে নয়, তাদের প্রত্যেকের পিছনে থাকবে ছোরা-হাতে একটি একটি করে মানওয়ারী গুণ্ডা (হিটলার রাইষটাগে এই ব্যবস্থা করাতেন গোড়ার দিকে, বিপক্ষ দল নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত)। ঐ আনন্দেই থাক।"

সরল পাঠক হয়তো এই বলে প্রশ্ন শুধোবেন, আমরা তো জানি, রুশরাও ইউরোপীয়, অকসিডেন্টাল, প্রতীচ্য জাত। আদৌ তা নয়। রুশ কেন, চেক পোল ইত্যাদিকেও অনেকে ইয়োরোপীয় ঈসটারন বলে থাকে। এই তো সেদিন জরমনির কন্‌স্টান্‌ৎস শহরে এক সাহিত্য সম্মেলন হয়—তাতে 'ঈসটে'র প্রতিভূ হয়ে আসেন এক চেক, অন্যজনা পোল্ বা রাশান। আর হিটলার তো যুদ্ধ লড়তে লড়তে বরাব্বর চিৎকার করে গেছেন, 'এ সংগ্রামে এক পক্ষে সভ্য ঐতিহ্যশীল ইউরোপীয়, অন্যপক্ষে বর্বর ঈসটার্ন্—রুশ।' মৃত্যুবরণের পূর্বে বলেন, 'আমি ছিলুম ইউরোপের শেষ আশা। কিন্তু সপ্রমাণ হল, প্রাচী আমার চেয়ে শক্তিশালী।'

সরল পাঠককে বোঝাই, তাঁরই মত সরল—অবশ্য ওদেশে বিরল—ইয়োরোপীয় মাত্রই একটি অতি বাস্তব, ধরা-ছোঁওয়ার জিনিস দিয়ে প্রতীচী প্রাচীর তফাত করে। জামার সামনের দিকটা পাতলুনের ভিতর যে গুঁজে দেয় সে ইয়োরোপীয়, যে বাইরে ঝুলিয়ে রাখে সে প্রাচ্যদেশীয়। রুশরা যখন তাদের খাঁটি দিশী পোশাক—বাতুশকা, স্তালিন যা পরতেন—গায়ে চড়ায় তখন তাদের কারুকার্য-করা শারটটি (ব্লাউজও বলা হয়) পাতলুনের উপরে ঝুলিয়ে দেয়, আমরা যে রকম পাঞ্জাবির সামনের দিকটা (দামন, অঞ্চল) ধুতির উপরে ঝুলিয়ে রাখি।[১] এখানে বুশ্-শারটের 'গুঁজো দেৎর' নিয়ে আলোচনা করাটা সমীচীন, কিন্তু তাহলে মূল বক্তব্য থেকে অনেক দূরে চলে যাব; তবে পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, উত্তম বুশ্-শারটের দামন ভিতরে গুঁজে টাই পরা যায়,

১ মধ্য বা পশ্চিম ইয়োরোপে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে বেরুলে একাধিক সজ্জন আপনার কানে কানে ফিসফিস করে বলবে, 'স্যার! শার্টটা গুঁজতে ভুলে গিয়েছেন।' তাঁর মনে হয়েছে, আপনি শৌচাগারের প্রয়োজনীয় কর্মটি করার পর দামনটি গুঁজতে ভুলে গেছেন—বুড়ো অধ্যাপকরা যে রকম ক্ষুদ্রতর কর্মের পর পাতলুনের বোতাম লাগাতে ভুলে যান।

www.BanglaBook.org

আবার বাইরে ঝুলিয়ে মিন্-টাই হওয়াও যায়।

মধ্য-প্রাচ্য উপলক্ষ মাত্র।

এক দিকে জনসন-উইলসন চালিত ইয়োরোপ—লক্ষ্য করেছেন চ্যাংড়া ডেন্‌মারক্ তক্ বাঁদর নাচ নেচে রুশের কাছে ধমক খেয়েছে?—অন্য দিকে রুশ-চীন চালিত এশিয়া, এবং আফরিকাও এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। অর্থাৎ এক দিকে সাদা, অন্যদিকে কালো—বা রঙিন বলতে পারেন। সাদার পাল এখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে, ইউরোপের বাইরের সবাইকে কলর্‌ড নাম দিয়ে কী থানডারিং ব্লানডারই না সে করেছে! পিলা চীন, কালা নিগ্রো, তাঁবাটে আরব, আধা-পিলা রুশ (ইংরেজাদির দৃঢ় সংস্কার, রুশের গায়ে প্রধানত মন্‌গোল-তাতার রক্ত) হয়েছে এক-জোট—ওদিকে মার্কিন নিগ্রো মুহম্মদ আলী (কেসিয়াস ক্লে) বলছে, মারকিনের হয়ে লড়তে তার বিবেকজাত ঘোরতর অধর্মবোধ রয়েছে—পিছনে রঙ-বেরঙের ভারতীয়-পাকিস্তানীও সায় দিয়ে মাথা নাড়ছে; এস্তেক যে, লেবানন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র—কারণ সে আধা ক্রিশ্চান আধা মুসলমান—যে কিনা এতদিন সর্বসংঘাতে গা বাঁচিয়ে 'দেহ রক্ষা' করেছে, সেও আব্দুন নাসিরের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। শুধু লক্ষ্য করার মত দেশ, জাপান। পশ্চিমের দ্য গলের মত ইনিও এতাবৎ নিরপেক্ষ। তা, এরকম দু'একটা ব্যত্যয় না থাকলে মাথাভরা চুলের প্রকৃত বাহার মালুম হয় না।

হাজার চার-পাঁচেক বছর পূর্বে ঠিক এই প্যাটার্‌নটিই ভারতবর্ষে রূপ নিয়েছিল—যার প্রতি ইঙ্গিত, যার সঙ্গে বর্তমান সমস্যা—প্যাটার্‌নের তুলনা আমি এই ক্ষুদ্র লেখায় এতক্ষণ দিলুম : বিরাট দেশ ভারতবর্ষ, নানা বর্ণ[১]—বিশুদ্ধ সংমিশ্রিত—নানা জাতি, নানা সভ্যতার লোক একদা কুরুক্ষেত্রে সমবেত হয়েছিল। এক দিকে দুর্যোধনের পশুবল; অন্য দিকে ধর্মরাজের ধর্মবল।

আজ সেই প্যাটার্‌নই বোনা হচ্ছে গোটা বিশ্বের নানা রঙের সুতো দিয়ে।

হয়তো শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ লাগবে না। কিন্তু সে 'শান্তি' দীর্ঘস্থায়ী হবে না।

তেইশ বৎসর পূর্বে—তখন স্বরাজ হয়নি—'আনন্দবাজারে' আমি একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করি—মারকিন-ইংরেজের এই বে-আদপী বেতমিজীকে 'ধবলদম্ভ' নাম দিয়ে। ইংরেজ যে-রকম একদা চীনকে 'পীতাতঙ্ক' (ইয়েলো পেরিল) নামে ডাকত, আজ বিশ্ব জুড়ে তারই পুনরাবির্ভাব!

হাজার পাঁচেক বৎসর পূর্বে হয় মহাভারত; আজ না-হোক, দুদিন বাদে হবে বিশ্বভারত।

BanglaBook.org

১ অনেকের বিশ্বাস, কৃষ্ণের যদুবংশ ছিল কালো, কৌরবেরা ছিলেন গোরা আর পাণ্ডবরা ছিলেন পাণ্ডু, অর্থাৎ পিলা, হলদে। পাণ্ডবরা নাকি আসলে তিব্বতের মঙ্গোলীয়ান। (Winternitz পশ্য। এ বাদ বা বিবাদে যোগ দেবার শাস্ত্রাধিকার আমার নেই)। মহাভারতের যুদ্ধ নাকি কৃষ্ণ-পাণ্ডু বনাম গোরা-কৌরব।

www.BanglaBook.org

বিষবৃক্ষ

নিতান্ত বাধ্য হয়ে আমাকে কিছু ব্যক্তিগত কথা বলতে হচ্ছে। আমি খবরের কাগজের সম্মানিত রিপর্টার নই। তাঁদের আপ্রাণ চেষ্টা, যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক (ইম্‌পার্‌সনাল) ভাবে আপন বয়ান পাঠকের সম্মুখে পেশ করা। তৎসত্ত্বেও তাঁরা মাঝে মাঝে কটুবাক্য শুনতে পান। পাঠকসাধারণ ভুলে যান, রিপর্টারও মাটির মানুষ, তারও ধর্মবুদ্ধি আছে, সেও অন্যায় অবিচারের সামনে কখনও-কখনও আত্মসংযম না করতে পেরে উত্তেজিত ভাষা ব্যবহার করে। ফলে কখনও বা কটুবাক্য শুনতে হয়, কখনও বা হাততালিও পেয়ে যায়। প্রকৃত রিপর্টার অবশ্য কোনওটারই তোয়াক্কা করে না। সে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে যদি দেখে যে, সে নির্ভয়ে সত্য প্রকাশ করতে পেরেছে।

রিপর্টার হওয়ার মত শক্তি আমার নেই। তদুপরি দৈনন্দিন যে-সব ঘটনা রিপর্টেড হচ্ছে, তার যদি কোনও ঐতিহাসিক মূল্য না থাকে, সে যদি আমাকে মানবসমাজের পতন-উত্থান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ চিন্তার খোরাক না যোগায় তবে সে জিনিসের প্রতি আপনার আমার মত সাধারণজনের চিত্ত আকর্ষিত হয় না।

যেমন ধরুন আরব-ইজরাএল দ্বন্দ্ব। কথার কথা কইছি, কাল যদি মার্কিন, ইংরেজ, ফরাসী, রুশ সবাই একজোট হয়ে একটা সমাধান করে দেন—যার চেষ্টা এখন প্রতিদিনই হচ্ছে—তবে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, উভয় পক্ষই যখন শান্ত হয়ে গেছেন তখন আমরাও নিশ্চিন্ত মনে আর পাঁচটা খবরের দিকে নজর বুলাই। আর রিপর্টারদের তো কথাই নেই। দুই প্রতিবেশী শান্তিতে আছে—এটা খবর নয়। দুই প্রতিবেশীতে খুনোখুনি হচ্ছে সেটা খবর। সংবাদ-সরবরাহ-ভুবনের আপ্তবাক্য—কুকুর মানুষকে কামড়ালে সেটা খবর নয়, মানুষ কুকুরকে কামড়ালে সেটা খবর।

অথচ আমি বিলক্ষণ জানি আরব-ইজরাএল সমস্যার প্রকৃত সমাধান যে কি, তার সন্ধান আজও পাওয়া যায়নি। নাসির বলছেন, আমি ইজরাএলকে সমূলে উৎপাটন করবো। ওদিকে ইজরাএল যেটুকু জমির উপর এখন রাজত্ব করেছেন তা নিয়ে যে তিনি একদম সন্তুষ্ট নন, সে কথাও তিনি গোপন রাখেন না। অ্যানটনি ঈডন-এর গোঁয়ার অভিযানের ফলে যখন ইজরাএল সৈন্য সবলে মিশরের সাইনাই (সিনাই, আরবীতে[১] সীনিন, সীনা) অধিকার করে তখন আনন্দে উল্লাসে কম্পিত, ভাবাবেগ দমনে অশক্ত ইজরাএল-প্রধান বেন গুরিয়ন যাজকসুলভ গম্ভীর কণ্ঠে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেন তার অর্থ, আমরা আমাদের ন্যায্য ভূমি অধিকার করেছি, এ-ভূমি আমরা আর কখনও পরিত্যাগ করবো না। তাঁকে পরিত্যাগ করতে হয়েছিল (এবং আজ সেখানে পুনরায় দুই দল সম্মুখীন হয়েছেন), কিন্তু তাঁর বাক্যের প্রথমার্ধ, অর্থাৎ সানহাই ইজরাএলের প্রাপ্য, এটা ইজরাইল-দৃষ্টিবিন্দু থেকে সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। রাজা সলমনের (আরবীতে সুলেমান)

১ ইহুদি আরব উভয়ের কাছেই এ গিরি পূতপবিত্র। কুরান শরীফে আল্লাতালা এর নাম নিয়ে শপথ গ্রহণ করেছেন। ৯৫ সুরা, ২য় ছত্র।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমলে ইহুদি রাজত্ব কতখানি বিস্তৃত ছিল সেটা পাঠক বাইবেলের পিছনে যে প্রাচীন যুগের ম্যাপ দেওয়া থাকে সেইটে দেখলেই কিছুটা বুঝতে পারবেন। আজ তার বৃহৎ অংশ লেবানন, সীরিয়া, জর্ডন, মিশরের দখলে। কিন্তু হায়, বিশ্বের আদালত ইজরাএলের আড়াই হাজার বছরের তামাদি এ দাবি মানবে না। প্রায় দু হাজার বছর ধরে ইহুদিরা তাদের পুণ্যভূমি প্যালেসটাইন ত্যাগ করে দলে দলে সেই সুদূর রুশ দেশ থেকে আমেরিকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু এ-কথাও সত্য, ইহুদিদের যাজক-সম্প্রদায় কখনওই আপন পুণ্যভূমিতে ফিরে যাবার স্বপ্ন দেখা বন্ধ করেননি। কারণ, স্বয়ং ইহুদির সদাজাগ্রত প্রভু য়াহবে ধর্মগ্রন্থ তোরাতে প্রতিজ্ঞা করেছেন, 'আমি তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাব, সেই দুগ্ধ-মধু'র দেশে।' এ-স্বপ্ন বাস্তবে দানা বাঁধতে আরম্ভ করে প্রধানত ঊনবিংশ শতাব্দিতে —এরই নাম জায়োনিজম এবং এর প্রধান কেন্দ্র ছিল জরমনিতে। মহাকবি হাইনে কিছুদিন বারলিনে এ আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন কিন্তু পরে সেটা ত্যাগ করেন; বস্তুত জায়োনিজমের গোড়াপত্তনের সময় থেকেই একদল শক্তিশালী ইহুদি এ আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। তাঁদের বক্তব্য ছিল : 'প্যালেস্টাইনে স্বাধীন ইহুদি রাজ্য নির্মাণের প্রস্তাব দূরে থাক, সেখানে ইহুদিদের জন্য কোনও ধরনেরই খাস 'ন্যাশনাল হোম' করা হবে ভুল। কারণ সে দেশ ছেড়েছি আমরা দু হাজার বছর পূর্বে, এখন (১৯২০ শতাব্দীতে) সেখানে শতকরা দশজন ইহুদিও বাস করে না, বাদবাকি শতকরা ৭০/৮০ মুসলমান ১৫/২০ খ্রীষ্টান (হিসেবটা খুবই মোটামুটি, কারণ সে-যুগে এ-অঞ্চলের তুর্কী শাসনকর্তারা আদমসুমারিতে বিশ্বাস করতেন না) এখানে শত শত বৎসর ধরে বাস করছে (এবং এঁরা না বললেও আমরা জানি, এই মুসলমান এবং খ্রীষ্টানদের অনেকেই গোড়াতে ইহুদি ছিল, পরে ধর্ম পরিবর্তন করে মুসলমান খ্রীষ্টান হয়। প্রভু যীশু স্বয়ং ইহুদি ছিলেন এবং তিনি যাঁদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দেন তার ৯৯% ছিলেন জাত-ইহুদি। পরবর্তী যুগে এঁদের অনেকেই হয়ে যান মুসলমান)। এঁদের অধিকাংশই চাষা, জেলে। এঁদের ভিটেমাটি কেড়ে না নিয়ে নবাগত ইহুদিদের বসাবে কোথায়?...তার চেয়ে বহুতর গুণে কাম্য আমরা, ইহুদিরা, যেন যে-সব দেশে বাস করি সেই সব দেশের পূর্ণ নাগরিক হয়ে যাই।' আমার যতদূর মনে পড়ছে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যখন লয়েড জরজ ইহুদির জন্য 'ন্যাশনাল হোমে'র খসড়া বানাচ্ছেন তখন ভারত-খ্যাত ইহুদি (?) মনটাগু এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং বার বার বলেন, এতে করে আখেরে ইহুদিকুলের অমঙ্গল হবে।

কিন্তু যুক্তিতর্ক এক জিনিস আর অনাগত যুগের সুখস্বপ্ন দেখা আর এক বিলাস। রাজকুমারী মীরাকে রাজসভার গুণীজ্ঞানীরা নিশ্চয়ই অত্যুত্তমরূপে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, বৃন্দাবনের পেভমেন্ট (!) সোনা দিয়ে গড়া নয়, যদ্যপি বর্ষারম্ভে মেঘাগমনে তথাকার আকাশ মেদুর হয় অতি অবশ্য, ঘন তমালদ্রুমরাজি জনপদভূমিকে শ্যামল করে রাখে নিঃসন্দেহেই, কিন্তু সেস্থলে বিষধর সর্পও ঠিক ওই সময়েই গোপগোপীদের প্রাণহরণ করে, তদুপরি—তদুপরি নিশ্চয়ই সভাসদরা বিস্তর তর্কাতর্কি যুক্তিতর্ক দ্বারা সপ্রমাণ করেছিলেন যে, ওই সাতিশয় অগণ্ড-গ্রাম রাজকন্যার বাসভূমি হওয়ার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, তথাপি তিনি স্বপন দেখছেন,

চাকর রহসূঁ বাগ লাগাসূঁ
নিতি উঠি দরশন্ পাসূঁ

www.BanglaBook.org

বৃন্দাবনকে কুঞ্জগলিমে
তেরী লীলা গাসূঁ!

পিস্তলের বুলেট দিয়ে যে-রকম ভূত মারা যায় না, যুক্তিতর্কের খাণ্ডার দিয়েও সুখস্বপ্ন খণ্ডবিখণ্ড করা যায় না।

স্বপ্ন দিয়ে তৈরী আর স্মৃতি দিয়ে গড়া মেলা ঝামেলার ভিতর রিপর্‌টার অনুপ্রবেশ করে খামখা হায়রান হতে চান না—তাই বলেছিলুম, আমি রিপর্‌টার নই, হবার মত এলেম ও হক্কও আমার নেই।

কিন্তু সেই ১৯২৯ থেকে আমি গণ্ডায় গণ্ডায় ইহুদিদের সংস্পর্শে এসেছি। বোম্বাই অঞ্চলে 'শনিবারের তিলী' নামে পরিচিত এ-দেশে অতি প্রাচীনকালে আগত ইহুদিদের সঙ্গে আমি বাস করেছি (ব্যক্তিগতভাবে আমি এঁদেরই ইহজগতের সর্বোত্তম ইহুদি বলে মনে করি), দিগ্বীজয়ী ইহুদি পণ্ডিতের কাছে হীব্রু শেখার নিষ্ফল প্রচেষ্টা আমি দিয়েছি (দোষ রাব্বির নয়, আমার), ইহুদির (তথা খ্রীষ্টান ও মুসলমানেরও) পুণ্যভূমিতে আমি বাস করেছি, জরডনের পাক পানিতে ওজু করেছি, গ্যালিলিয় হ্রদের অতিশয় সুস্বাদু মৎস আমি দিনের পর দিন দু বেলা পরম তৃপ্তি সহকারে ভক্ষণ করেছি, বস্তুত প্যালেস্টাইনের উত্তরতম সীমান্ত থেকে—যেখানে সীরিয়া আজ সৈন্য সমাবেশ করেছে—দক্ষিণতম সীমান্ত গির্জা অবধি, তথা পূর্বতম সীমান্ত (ট্রান্‌স্) জরডন থেকে পশ্চিমতম সীমান্তের খাস ইহুদি নগরী তেল আবিব ('বসন্তগিরি') পর্যন্ত অবাধে যাতায়াত করেছি।

* * *

পরম পরিতাপের বিষয় উপরের ছত্রের কালি শুকোতে না শুকোতে মর্মান্তিক দুঃসংবাদ এসেছে যে আরবে ইহুদিতে কোনও প্রকারের সমঝওতা সম্ভবপর হল না বলে সশস্ত্র যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

এ দুঃসংবাদের পর বিমূঢ় মুহ্যমান হয়ে আমার এ অক্ষম লেখনী আর এগোতে চায় না।

যদি ইজরাএল হারে তবে তার তিনদিকে আরব বেদুইন ও বাস্তুহারা আরব (প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার) যারা জরডন অঞ্চলে কেউ কুড়ি বৎসর ধরে, কেউ বা এগারো বৎসর ধরে তাঁবুতে তাঁবুতে দুঃখদৈন্যের জীবন কাটাতে কাটাতে এই মহালগ্নের অপেক্ষা করছিল তারা পঙ্গপালের মত সমস্ত ইজরাএলে ছেয়ে পড়ে বালবৃদ্ধনারী কাউকে নিষ্কৃতি দেবে না। হিটলারকে ছাড়িয়ে যাবে।

আর সম্মিলিত আরব জাতিপুঞ্জ যদি হেরে যায় তবে তাদের সে অবমাননা—ক্ষয়ক্ষতির চেয়েও—তাদের সে অবমাননা, তাদের আত্মসম্মান-বোধের পরিপূর্ণ পদদলিত বিনাশ—তাদের করে তুলবে নিষ্ঠুরের চেয়ে নিষ্ঠুর, সর্বনেশে ভবিষ্যতের প্রতিশোধকামী জিঘাংসু জীবন্ত প্রেতাত্মার মত।

মধ্যযুগের সেই নির্মম ক্রুসেডের মত এর প্রস্তুতি হবে পুনরায় শত বৎসর ধরে, পরিণাম হবে শত শত বর্ষব্যাপী।

প্রথম লেখনেই আরম্ভ করেছিলুম এই বলে যে, এ তো শুধু অবতরণিকা। মনে মনে দুরাশা করেছিলুম, এই বিষবৃক্ষের চারাটাকে বিশ্বমানবের শুভবুদ্ধি হয়তো বা উৎপাটিত করে দেবে; এখন দেখছি, এই শিশু বিষবৃক্ষ মহীরুহ হয়ে উঠবে একদিন—শত শত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বৎসর ধরে এ বিষবৃক্ষ পাবে উভয়পক্ষের ক্রোধোন্মত্ত প্রতিশোধ কামনার অপবিত্র শূকররক্তের উর্বরতাদায়ক খাদ্যনিষ্কর্ষ।

এ বিষবৃক্ষকে তখন আর সমূলে উৎপাটিত করা যাবে না।

যদি যায়, কিংবা বিধির আদেশে কোনও দৈবাগত ঝঞ্ঝায় সে ভূপাতিত হয় তবে সে মৃত্যু বরণ করার পূর্বে সঙ্গে নিয়ে যাবে অসংখ্য নরনারী বালবৃদ্ধকে নিষ্পিষ্ট করে তাদের প্রাণবায়ু॥

আরব-ইজরাএল যুদ্ধারম্ভ দিবস।

"দুঃখ তব যন্ত্রণায়"

আমাদের কৈশোরে রমা রলাঁ ছিলেন অতিশয় জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। বস্তুত এমনও একটা সময় গিয়েছে, যখন বাঙলা দেশে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় উপন্যাস বলতে রলাঁর জ্যাঁ ক্রিস্‌তফই বোঝাত।

সে-যুগে ঔপন্যাসিক ছাড়া অন্য কোনও রূপে রলাঁ আত্মপ্রকাশ করেছেন কিনা, সে সম্বন্ধে আমরা কোনও কৌতূহল প্রকাশ করিনি।

অথচ ইয়োরোপের ভাবুকজন মাত্রই রলাঁকে চেনেন আরও অন্য একটি রূপে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার বহু আগের থেকেই রলাঁ ইউরোপে ক্রমবর্ধমান উৎকট জাতীয়তাবাদ (শভিনিজিম) যে ভিন্ন ভিন্ন দেশকে অবশ্যম্ভাবী প্রলয়ঙ্করী যুদ্ধের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে সে-সম্বন্ধে সচেতন হয়ে যান এবং দেশবাসী ফরাসী তথা জরমনদের (রলাঁ ছিলেন জরমন সংগীতের আবাল্য একনিষ্ঠ ভক্ত) এ বিষয়ে নিরবচ্ছিন্ন সাবধানবাণী শোনান। বলা বাহুল্য, এহেন পরিস্থিতিতে সর্বত্র, সর্বকালে যা হয়ে থাকে, তাই হল। উভয় দেশই তাঁকে আপন আপন শত্রু বলে ধরে নিল।

বিশ্বযুদ্ধ লাগার সময় রলাঁ ছিলেন সুইজারল্যান্ডে। তিনি রেডক্রসে যোগ দিলেন এবং দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, প্রায় সমস্ত যুদ্ধকালটা ফ্রান্সের উদগ্র শভিনিজমের বিরুদ্ধে দৈনিক মাসিকে প্রচার-সংগ্রাম চালিয়ে যেতে লাগলেন। যুদ্ধশেষের সময় ভগ্নোৎসাহ ক্লান্ত রলাঁ খুঁজলেন শান্তির সন্ধান। ডুব দিলেন তাঁর স্বদেশের শত্রু জরমন জাতের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীতসৃষ্টিকার বেটোফেনের সংগীতের আরও গভীরে। বেটোফেন জরমন হয়েও জরমনদের বহু ঊর্ধ্বে—তাঁর সংগীত মানুষকে তুলে নিয়ে যায় নভঃলোকে, যেখানে ক্ষুদ্র-নীচ শভিনিজম পৌঁছতে পারে না। একদা তিনি তাঁরই মত মহামানব কবি গ্যোটেকে বলেছিলেন, 'আপনি আমি দেবদূত : আমাদের কাজ—মাটির মানুষকে স্বর্গলোকের দিকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া[১]।'

১ দুঃখের বিষয়, মূল পাঠটি আমার কাছে নেই। উভয় মহাপুরুষের পরিচয় হয় কারলস বাড-এ (চেক নাম Karlovy Vary)। ছোট গলির মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে উভয়ের দেখা হয় জনা দু-তিন রাজপুত্রের সঙ্গে। গ্যোটে সসম্মানে তাঁদের পথ ছেড়ে দেন। বেটোফেন পাগলা ষাঁড়ের মত সোজা চলতে থাকলে রাজপুত্ররা সবিনয় তাঁর জন্য পথ ছেড়ে দিয়ে এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে যান।

www.BanglaBook.org

রলাঁ যে বেটোফেনের আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেটাকে মডার্ন উন্নাসিক 'ইসকেপিজম, পলায়নী-মনোবৃত্তি' নাম দিয়ে সস্তায় কিস্তিমাত করবেন। কিন্তু ভুললে চলবে না, রলাঁ অবগাহন করতে নেমেছিলেন সুরগঙ্গায় ক্লান্ত দেহমন স্নিগ্ধ করে নিয়ে পুনরায় তাঁর কর্তব্য-কর্মে মনোনিবেশ করার জন্য। তিনি গঙ্গা নদীর মীন হয়ে ইস্‌কেপিজমের নদীগর্ভে বিলীন হতে চাননি।

* * *

আঁদ্রে জিদ-এর কপালে ছিল নিদারুণতর দুর্দৈব। তিনিও জাতি-ধর্ম-দেশের ঊর্ধ্বে বিরাজ করতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে রলাঁ যেরকম আশু দুর্যোগের পূর্বাভাস সুস্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন তিনিও তেমনি পেয়েছিলেন দ্বিতীয়ের পূর্বাভাস। যুদ্ধ লাগার পর তাঁকে যখন বেতারে প্রোপাগান্ডা করতে বলা হল, তিনি অসম্মতি জানালেন। দেশকে ভালোবাসতেন রলাঁ, জিদ উভয়েই, কিন্তু যে স্থূল পদ্ধতিতে অশ্রাব্য কটু ভাষণে যুদ্ধের সময় এক জাতি অন্য জাতিকে গালাগাল দেয়, স্পর্শকাতর বিশ্ব-নাগরিক এবং সর্বোপরি বিদগ্ধ কলাকার জিদ তার সঙ্গে সুর মেলাবেন কি করে! জিদ তাঁর জুরনালে (রোজনামচাতে) লিখছেন, ণঁ, দেসিদেমাঁ, জ্য ন্য পারলরে পা আ লা রাদিয়ো—'না, আমার স্থির সিদ্ধান্ত, আমি বেতারে বক্তৃতা দেব না।...খবরের কাগজগুলো এমনিতেই যথেষ্ট দেশপ্রেমের ঘেউ-ঘেউয়ে ভর্তি। নিজেকে যতই ফরাসী বলে অনুভব করি ততই আমার ঘেন্না করে।' এর পর জিদ বড় সুন্দর করে বলেছেন, তিনি নিজেকে যেভাবে ফরাসী মনে করে গর্ব অনুভব করেন, এই স্থূল পদ্ধতির সঙ্গে তো তার কোনও মিল নেই।

জিদের স্মরণে এল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময়কার কথা। তখন কিছু লোক এমনই হাস্যকর 'প্রচারকার্য' আরম্ভ করে যে, তখনকার দিনের অন্যতম খ্যাতনামা লেখক ল্যুসিআঁ জাক্ বলেন, 'চুপ করে থাকাটা কি তবে এমনই কঠিন?'—'সে দঁক্ সি দিফিসিল দ্য স্য ত্যার?'

তারপর জিদ বলছেন, 'কিন্তু হৃদয় যখন ফেটে পড়তে চায়, তখন নীরব থাকাটা যে বড়ই বেদনাময়।' এটা স্বীকার করে তিনি শেষ করেছেন এই বলে 'কিন্তু আমি তো চাই নে আজ এমন কিছু লিখতে, যার জন্য কাল আমাকে মাথা হেঁট করতে হয়'!

এই সময় জিদ পড়ছেন জরমন কবি ও ঔপন্যাসিক আইসেনডরফের বই 'নিষ্কর্মা';

অবিশ্বাস্য সব ঘটনা ঘটে যেতে লাগল জিদের চোখের সম্মুখে। অবিশ্বাস্য মনে হল বিশ্বজনের কাছে যে, নেপোলিয়নের দেশ ফ্রান্স মাত্র পাঁচ-ছয় সপ্তাহের একতরফা যুদ্ধের পর—বস্তুত ফ্রান্স একবার মাত্রও পুরো জোর হামলা করতে পারেনি!—বিজয়ী জরমনির পদতলে লুণ্ঠিত হল।

জিদ বলছেন, 'শত্রু যখন প্রচণ্ড শক্তিশালী, তখন তার কাছে পরাজিত হওয়াতে নিশ্চয়ই কোনও লজ্জা নেই; এবং আমিও কোনও লজ্জা অনুভব করি নে। কিন্তু যখন

গলির শেষে পৌঁছে বেটোফেন প্রতীক্ষা করেন গ্যোটের জন্য। তিনি পৌঁছলে পর রাজপুত্রদের প্রতি ইঙ্গিত করে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেন, 'এরা কারা? আপনি আমি দেবদূত—ইত্যাদি।' সমস্ত ঘটনাটিই হয়তো কিংবদন্তীমূলক। এর একাধিক 'পাঠ' (ভারসন) আমি কারলস বাডে বাসকালীন শুনেছি। তবে রলাঁও তাঁর বেটোফেন-গ্যোটে সম্বন্ধে পুস্তকে ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন।

www.BanglaBook.org

ভাবি আমরা কি-সব স্তোকবাক্যের উপর নির্ভর করে কর্তব্য-কর্ম অবহেলা করে পরাজয় ডেকে এনেছি—তখন যে গভীর বেদনা অনুভব করি সেটা ভাষাতে প্রকাশ করতে পারি নে, অস্পষ্ট মূর্খ আদর্শবাদ, প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে মোহাচ্ছন্ন অপরিচয়, অপরিণামদর্শিতা, মূর্খের মত অর্থহীন এমন সব বাগাড়ম্বর অন্ধবিশ্বাস—যার মূল্য আছে শুধু অপোগণ্ডের কল্পরাজ্যে।'

নিরঙ্কুশ পরাজয়ের পরের দিন জিদ লিখছেন :

'একমাত্র গ্যোটের সঙ্গে কথোপথনই আমাকে দুশ্চিন্তার এই মৃত্যুযন্ত্রণা থেকে কিঞ্চিৎ মুক্তি এনে দেয়'—

'Seules les Conversations avec Goethe parviennent a distraire un pea ma pensee de Pangoisse.'

পাঠক লক্ষ্য করবেন, 'গ্যোটের সঙ্গে কথোপকথন, 'Conversation with Goethe' (মূল জরমনে Gespraeche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens'.)

গ্যোটে সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক অত্যুত্তম 'জীবিত' জীবনী লিখেছেন গ্যোটে সখা এবং শিষ্য একেরমান (অনেকটা 'শ্রীম')। কথোপকথন হয়েছে গ্যোটে এবং একেরমানে। অথচ জিদ ইচ্ছে করে এমনভাবে বাক্যটি রচনা করেছেন যে মনে হয় তিনি, জিদ-ই, যেন স্বয়ং কথাবার্তা বলছেন জরমন মহাকবি ঋষি গ্যোটের সঙ্গে, ইঙ্গিত করছেন, তিনি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন ঋষির বাণী, তাঁর কণ্ঠস্বর। দুশ্চিন্তার বিভীষিকায় যে-টুকু সান্ত্বনা তিনি আদৌ পাচ্ছেন সেটি তাঁরই কাছ থেকে।

জিদ ঋষি নন—গ্যোটের মত। কিন্তু তিনি তখন ফ্রান্সের গ্রাঁম্যৎর্—গ্র্যানড্ মাস্টার—অর্থাৎ ফ্রান্সের পথদ্রষ্টা সাহিত্যসম্রাট। সেই ফরাসী সম্রাট সঞ্জীবনী সান্ত্বনা নিচ্ছেন—যে জরমনি নির্মমভাবে ভূলুণ্ঠিত করেছে পরিবিনী ফ্রান্সকে, তারই ঋষি কবির কাছ থেকে!

* * *

মিশরের আড্ডা সম্বন্ধে পক্ষাধিককাল পূর্বে যখন লিখি তখন কল্পনাও করতে পারিনি, এই মিশরেই দু-পাঁচদিনের ভিতর লেগে যাবে জীবনমরণ সংগ্রাম। সেই আড্ডাতে যিনি ছিলেন আমাদের 'কবিসম্রাট' তাঁর কবিতা পড়লে মনে হত তিনি যেন ইসলাম অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ববর্তী যুগের বেদুইন ভাট। কথায় কথায় 'বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন', 'ছুটছে ঘোড়া উড়ছে বালি' আর জাত ইহুদি ইব্রাহিমের পুত্র মিশররাজ ইউসুফ ও জোলেখার সাহারার উষ্ণশ্বাসভরা নীলনদের দুকূল-ভাঙা প্রেম।[১] আলট্রা মডারন কায়রো শহরের শিক্ পশ্ কাফের বাতাবরণে আমাদের কবিরাজ আহমদ ইবন শহরস্তানী অল্-মুকদ্দসী যখন তার সেই ফারাও যুগের প্রেমের কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতো তখন আমার মনে হত এ রস রোমানটিক, ক্লাসিক, এপিক, বৈদিক, প্রাগৈতিহাসিক সব কিছু ছাড়িয়ে গিয়ে সোজা বেআব্রুটিসে পৌঁছে গেছে। কবিও তাই চাইতেন।

১ আমরা যে গ্রন্থকে ওলড টেস্টামেন্ট বলি সেইটেই ইহুদিদের 'তৌরা' ইত্যাদি। সেসব গ্রন্থে বর্ণিত অনেক পয়গম্বর কুরানেও বর্ণিত হয়েছেন। ইউসুফ তাঁদের একজন। নজরুল ইসলাম হাফিজের অনুবাদ করেছেন :

দুঃখ করো না, হারানো ইউসুফ কিনানে আবার আসিবে ফিরে!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাদের মুকদ্‌দসী কিন্তু আর্‌ট্‌ কি, অলঙ্কার কাকে বলে, আর্‌ট্‌ অনুভূতিপ্রধান না তাতে অন্য কোনও মনোবৃত্তি চিত্তবৃত্তি প্রবেশ করতে পারে কিনা সে নিয়ে কোনও আলোচনা করতে চাইতো না, পারতোও না। এ কিছু নূতন তত্ত্ব নয়। মা-ঠাকুরমার রূপকথা শুনে আমরা, হ্যাঁ, বয়োবৃদ্ধরা পর্যন্ত বিমোহিত হয়ে ভাবি, রূপকথা কল্পনা করার, তাকে অনাড়ম্বর ভাষায় প্রকাশ করার রহস্যটা কোন্‌খানে। প্রশ্ন শুধিয়ে দেখি ঠাকুরমাও জানেন না। মুকদ্‌দসীর বেলাও হুবহু তাই।

শুধু একটি কথা মাঝে মাঝে মাথা দোলাতে দোলাতে বলতো, কবি হওয়ার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে হে, কবি হওয়ার একটা বিশেষ মূল্য আছে। সে মূল্য কিন্তু অর্থ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি কোনও-কিছুর মাপকাঠি দিয়েই বিচার করা যায় না। কোন্ এক ইরানী কবি নাকি পেয়েছিলেন লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা, দান্‌তে পেয়েছিলেন বেয়াৎরিচের কাছ থেকে একটি ফুল, কিংবা কি জানি, কার ঠোঁটের কোণে স্বীকৃতির একটুখানি স্মিতহাস্য, কি জানি—।'

* * *

কবি মুকদ্‌দসী বড় স্পর্শকাতর। সে আরব। ইহুদিদের কাছে তারা নির্দয়ভাবে লাঞ্ছিত অপমানিত হয়েছে। তাকে চিঠি লিখেছি, 'সখা তুমি ইহুদিকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হাইনরিষ হাইনে পড়ো।'

* * *

যে একেরমান গ্যোটের সঙ্গে কথোপকথনের বিবৃতি দিয়ে বিশ্ববিখ্যাত হন তিনি ছাত্রাবস্থায় গ্যোটিঙেন শহরে হাইনের বন্ধুত্ব লাভ করেন। এক জহুরিকে চিনতে অন্য জহুরির বেশীক্ষণ সময় লাগেনি। প্রথম দর্শনেই প্রেম হয়।

ছাত্রাবস্থাতেই হাইনের সরল মধুর কবিতা জরমনির সর্বত্র খ্যাতিলাভ করে। অতিশয় সাধারণ জন-দফতরের কেরানী, ম্যাট্‌রিকের মেয়ে, ছাপাখানার ছোকরা—তাকে যেন দু বাহু মেলে আলিঙ্গন করে নেয়। আর ওদিকে বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত আলঙ্কারিক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ফন্ শ্লেগেল তো তাকে প্রথম দিনই বিজয় মুকুট পরিয়ে দিয়েছিলেন।

ঘটনাটির বর্ণনা দিয়েছেন একেরমান; ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। তারপর সেটি লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে।

গ্যোটিঙেন থেকে ঘোড়ার গাড়িতে ঘণ্টাখানেকের পথ—লানট্‌ভের বিয়েরগারটেন। খোলামেলাতে বিয়ারের আড্ডা। রববার দিন গ্যোটিঙেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সেখানে এসে জালা জালা বিয়ার খায়, হইহুল্লোড় করে, আর নৃত্যগীত তো লেগেই আছে।

একেরমান, হাইনে এবং কলেজের আরও কয়েকজন ইয়ার বক্সী গেছেন সেখানে ফুর্তি করতে।

হাইনে আগের থেকেই মৌজে—বোধ হয় হামবুর্গের ব্যাঙ্কার কাকার কাছ থেকে বেশ কিছু পেয়েছেন।[১] তিনি ছেড়ে দিয়েছেন তাঁর আনন্দোল্লাসের লাগাম—বাক্যস্রোত ছুটেছে

---

১ টাকাকড়ি বাবদে হাইনে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ছিলেন অত্যন্ত বেহিসেবী। তিনি স্বয়ং এক জায়গায় লিখেছেন, কে বলে আমি টাকার মূল্য বুঝি নে? যখনই ফুরিয়ে গিয়েছে তখনই হাড়ে হাড়ে বুঝেছি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তুরুক সোওয়ারের মত। বিয়ার তাদের টেবিলে নিয়ে এসেছে পাব্-এর খাবসুরুত কোমলাঙ্গী তরুণী লটে (Lotte), হাইনে ফুর্তির চোটে জড়িয়ে ধরেছেন সুন্দরী লটেকে। কিন্তু একেরমান ও অন্যান্য ইয়াররা পূর্বাভিজ্ঞতা থেকে জানতেন, এই লটেটি বিয়ার-খানার আর পাঁচটা বার্-গার্লের মত ঢলাঢলির পাত্রী নয়। রাগে তার বাঁশীর মত নাকের ডগাটি হয়ে গেছে টুকটুকে রাঙা, চোখ দিয়ে বেরুচ্ছে আগুনের হল্কা, আর সে এমনই ধস্তাধস্তি আর পরিত্রাহি চিৎকার ছাড়তে আরম্ভ করেছে যে ইয়ারগোষ্ঠী কানে আঙুল দিয়ে চেপে ধরেছেন। হাইনে ওটা মস্করা হিসেবেই ভেবে নিয়েছিলেন গোড়ার দিকে, কিন্তু একটু পরেই কি যেন ভেবে অপ্রতিভ হয়ে চুপ মেরে গেলেন—যেন কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না।[১]

পরের সপ্তাহে একেরমানরা যখন হাইনেকে তুলে নিয়ে এলেন, তখন তিনি তাঁদের সঙ্গে যেতে কবুল নারাজ। শেষটায় একরকম গায়ের জোরে জাবড়ে ধরে তাঁকে গাড়িতে তুলতে হল।

কাফেতে আসন নিয়ে হাইনে মাথা হেঁট করে রইলেন চুপ। ঘাড় তুলে মেয়েটির দিকে তাকাবার মত সাহস পর্যন্ত তাঁর নেই।

কিন্তু কী আশ্চর্য! লটে স্বয়ং এসে উপস্থিত হাইনেদের টেবিলে। মধুর হাসি হেসে হাইনের কাঁধে হাত রেখে দাঁড়ালে। ইয়ার-দোস্তরা অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

লটে হাইনের দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমার উপর রাগ করবেন না, স্যর। আপনি অন্য ছাত্রদের মত নন। আমি আপনার কবিতা পড়েছি। কী সুন্দর! কী সুন্দর!! আপনার যদি ইচ্ছে যায়, তবে এই সব ভদ্রলোকের সামনাসামনি আমাকে আলিঙ্গন করতে পারেন —কিন্তু ঐসব মধুর কবিতা আপনাকে রচনা করে যেতেই হবে।'

বলেই লটে তার গাল বাড়িয়ে দিলে হাইনের দিকে।

আর হাইনে?—কে জানতো হাইনের মত সপ্রতিভ লোকও লজ্জায় লাল হয়ে যেতে পারেন—লজ্জায় লাল হয়ে তিনি চুমো খেলেন।

একেরমান বলেছেন, 'লক্ষ্য করলুম (নটবর) বন্ধু স্পিটা হিংসেয় একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে।'

* * *

হাইনের চোখ দুটি ভিজে গিয়েছে। মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'এ জীবনে এর চেয়ে সুখী আমি আর কখনও হইনি। এই আমি প্রথম হৃদয়ঙ্গম করলুম, কবি হওয়ার মূল্য আছে, কবি হওয়া সার্থক।'

* * *

সখা মুকদ্‌দসী, কবি হওয়া সার্থক!

BanglaBook.org

১ কনটিনেনটের ছাত্র-পাবে এ ঘটনা নিত্য নিত্য ঘটে। কেউ বড় একটা সিরিয়াসলি নেয় না। চেঁচামেচিটা অনেক ক্ষেত্রেই 'ন্যাকরা' বলে ধরা হয়।

www.BanglaBook.org

'সাঙ্গ হয়েছে রণ—'

রবীন্দ্রনাথ

এ-রণ সাঙ্গ হয়নি। সবে আরম্ভ মাত্র। কত শতাব্দী ধরে চলবে কেউ বলতে পারে না। কিংবা, কত হাজার বছর ধরে। 'হাজার বছর ধরে' বলছি ভেবেচিন্তেই। প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে প্যালেস্টাইনের ইহুদি জাত আপন রাষ্ট্র আপন স্বাধীনতা হারায়। সেই সময় থেকে ইহুদিরা পৃথিবীর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করে। ফলে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্যালেস্টাইনের ইহুদি জনসংখ্যা শতকরা পাঁচ থেকে দশের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। ১৯১৯/২০ থেকে পুনরায় ইহুদিদের বহু লোক প্যালেস্টাইনে ফিরে আসতে লাগলো। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে (ইহুদি গণনায় ৫৭০৮ সালে—অবশ্য এর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে) ইউনাইটেড নেশনসের অনুশাসনানুসারে প্রাচীন প্যালেস্টাইনের একাংশ নিয়ে ইজরাএল রাষ্ট্র (Erez Jissrael) গঠিত হয়। অর্থাৎ অন্তত আড়াই হাজার বছর লাগলো একটা মৃত রাষ্ট্রকে পুনরুজ্জীবিত করতে। তাই এ রাষ্ট্র যদি আবার লোপ পায় তবে হয়তো লাগবে আরও হাজার দুই তাকে পুনরায় প্রাণ দিতে। তাই গোড়াতেই বলেছি, এ সংগ্রাম হয়তো চলবে আরও কয়েক হাজার বছর ধরে।

কিন্তু প্রশ্ন, এ-রাষ্ট্র কি আবার লোপ পেতে পারে? অতি ক্ষুদ্র যে রাষ্ট্র এতগুলো বিরাট বিরাট আরব রাষ্ট্রকে চারদিনের ভিতর চূড়ান্ত পরাজয় দিল (বস্তুত এক ঘণ্টার ভিতরেই আরবশক্তির চোদ্দ আনা জঙ্গী বিমান নষ্ট হয়, এবং ফলে আরবরা কোনও যুদ্ধক্ষেত্রেই সামান্যতম সার্থক আক্রমণ চালাতে পারেনি) সে কি কস্মিনকালেও এদের কাছে পরাজিত হবে? অবিশ্বাস্য।

মাত্র একটি যোগাযোগের ফলে এ বিপর্যয় ঘটতে পারে। এবং উপস্থিত আরবরা যে সন্ধিপত্রেই দস্তখৎ করুক না কেন, তারা সেই মহালগনের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনবে।

সকলেই জানেন, আরব ইজরাএল দুই পক্ষই লড়েছেন পশ্চিমাগত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। কোনওদিন যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ লেগে যায় (এবারে আব্দুন নাসির তাই চেয়েছিলেন কিন্তু রুশ তাঁকে ডোবাল) তবে ইজরাএলের সর্ব সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যাবে—এমন কি খাদ্যশস্যও। মিশর ইরাক তখন লড়বে অনেকটা রুশ যে রকম হিটলারের সঙ্গে লড়েছিল। ইরাক জরডন হটে হটে যতদূর খুশি যেতে পারে, মিশরের বেলাও তাই। আরব বাহিনী হুবহু রুশদের মতই কোনও জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে নিজেদের কিছুতেই বিধ্বস্ত হতে দেবে না। এবারেও কোনও কোনও আরব রাষ্ট্র মিশরকে এই ট্যাকটিক বরণ করতে বলেছিল। কিন্তু নাসের জানতেন, ইজরাএল কালক্রমে যদি পরাজয়ের সম্মুখীনও হয় তবে মার্কিনিংরেজ শেষ মুহূর্ত তার পক্ষে নামবেই। আর ইতিমধ্যে প্লেন, তেল বোমার সাপলাই তো চালু থাকবেই। তাই ভবিষ্যতে আরব রাষ্ট্রপুঞ্জ শুধু তখনই ইজরাএল আক্রমণ করবে যখন গোড়াতেই দেখবে মার্কিনিংরেজ রুশ বা চীনের কিংবা উভয়ের সঙ্গে 'মরণ আলিঙ্গনে/কণ্ঠ পাকড়ি ধরেছে আঁকড়ি /দুইজনা দুইজনে। তখন ইজরাএলের সাহায্যের জন্য এরা কড়ে আঙুলটি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে পারবে না। ইজরাএল অবশ্যই তার প্রতি-ব্যবস্থা বছরের পর বছর করে যাবে, কিন্তু যুদ্ধবিশারদ তথা অর্থনৈতিক

www.BanglaBook.org

বিশেষজ্ঞরা বলেন : ক্ষুদ্র একটি রাষ্ট্র যার লোকবল যৎসামান্যেরও কম, যার প্রায় তাবৎ 'উপার্জন' বিশ্ব ইহুদি সংঘের দান-খয়রাত থেকে, যার আপন উৎপাদনী শক্তি প্রয়োজন মেটানোর চেয়েও ঢের ঢের কম তার পক্ষে এহেন অর্থনৈতিক পলিসি আত্মহত্যার শামিল। তাই আজ থেকে আরব ঠিক এইটেই কামনা করছে।

আর আরব সম্পূর্ণ নিরাশ হবেই বা কেন? ক্রুসেডের সময় আরবভূমির এক ক্ষুদ্রাংশ তিনশ' বছর ধরে লড়েছে পোপের নেতৃত্বে জমায়েত তাবৎ ইয়োরোপের সঙ্গে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরা হোলিল্যান্ড ত্যাগ করে ফিরে যান যাঁর যাঁর দেশে—পোপের কাতর ক্রন্দন, তীব্র অভিসম্পাত উপেক্ষা করে। ইহুদি যদি দু হাজার বছরের মড়া রাষ্ট্রের প্রাণ দিতে পারে, তবে আরবই বা তার মাত্র এক হাজার বছরের পুরনো রাষ্ট্রশক্তিকে প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে না কেন?

তা হলে প্রশ্ন, এ সমস্যার কি কোনও সমাধান নেই?

আছে হয়তো। কিন্তু যে-সমাধান এক পক্ষ কিছুতেই স্বীকার করবে না সেটাকে সমাধান বলি কি প্রকারে? তবু দেখা যাক।

যুদ্ধবিরতির সঙ্গে-সঙ্গেই মারকিনিংরেজের শুধু একটি চিন্তা : এই যে আরববলদের মড়াটা পড়েছে পায়ের কাছে এর কতটা অংশ পাব আমি—সিংহ-আন্‌কল-স্যাম, কতটা পাবে জনবুল-নেকড়ে, আর কতটা পাবে ইহুদিফেউ?—যদ্যপি বেচারী ফেউটাই এস্থলে করেছে লড়াই। কিন্তু সে ফালতো জমিজমা নিয়ে করবে কি? অত ইহুদি পাবে কোথায়? হাতের চেয়ে যে আঁব বড় হয়ে যাবে! আর সে যদি নিতে চায়, নিক। আমরা নেব সীনা, গুর্দা, কলিজা! শাঁসালো বস্তু। সেগুলো কি, এখুনি নিবেদন করছি।

বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, বি বি সি যুদ্ধবিরতির প্রথম খবর দেবার ঠিক আট মিনিট দশ সেকেন্ড পর একটি talk-টিপ্পনী বেতারিত করলে। বক্তা ইংরেজ ইহুদি কিনা জানি নে; তাকে ইহুদি বলে ধরে নিয়ে আমি ইহুদিজাতকে অপমান করতে চাই নে।

নাকি-নাকি ন্যাকা সুরে নিজের স্বার্থ যতখানি গোপন করা যায় তাই করে—এবং ইংরিজী ভাষা যে ভণ্ডামির জন্য প্রকৃষ্টতম ভাষা সে-কথা যে-হটেনটট্ সাত অবধি গুনতে পারে না সেও জানে—যা বললেন তার বিগলিতার্থ, 'এ-রকম লড়াই বড়ই খারাপ, বড়ই খারাপ। এরকম ফের হতে দেওয়া উচিত নয়, উচিত নয়। এই দেখুন না, এরই ফলে আরব জাত বন্ধ করে দিলে সুয়েজ খাল—বলুন তো আমাদের জাহাজ চলাচল করবে কি করে? আবার কসম খেয়ে বসলো, তেল বেচবে না আমাদের কাছে—ওঃ! আমাদের বাস্-কারখানা তা হলে চলবে কি করে! আর গালফ্-অব-আকাবা, শরম-উল্-শেখ সে তো বটেই বটেই। অতএব এ-হেন অঘটন যাতে পুনরায় না ঘটে তার জন্য (ক) সুয়েজ খাল আন্তর্জাতিক কনট্রলে নিয়ে নাও, (খ) তাবৎ আরবভূমির তেলেরও এমন ব্যবস্থা করো যাতে করে আসছে দুর্যোগে আরব জাত বস্তুটা নিয়ে ছিনিমিনি না খেলতে পারে এবং (গ)—কিন্তু 'গ'—অর্থাৎ গাল্‌ফ্ অব আকাবা সম্বন্ধে টীকাকারের উৎসাহ কম কারণ সেখানে প্রধান স্বার্থ ইজরাএলের। এর অর্থ কি? সুয়েজ খাল কনট্রলে এলে ইংরেজকে মাশুল বাবদ এক পৌণ্ডের জায়গায় দিতে হবে একটি ফার্দিং (ও! ফার্দিং বুঝি অধুনা দুর্লভ? তা সেটা দারুণ স্বার্থত্যাগ করে ফের টাঁকশালে বানাতে হবে বই কি! Oh Albion! Consider thy historical self-sacrifice!)। তেল কনট্রলে এলে হয় কোনও রয়েলটিই দেব না, নয় ঐ দু'একটা ফার্দিং থ্রোন টু দি অ্যারাব-বয়!

www.BanglaBook.org

লড়াই করে ম'লো ইজরাএল আর লুটের বেলা এলবিয়ন। এর ঠিক উল্টোটাকে বাঙলায় বলে—হায়, বাঙলা বড়ই নাঈফ শিশুর আধো-আধো ভাষা, ও নিয়ে আদৌ ভণ্ডামি করা যায় না—'খেলেন দই রমাকান্ত বিকারের বেলা গোবর্দ্ধন।' এস্থলে ইজরাএল আগেভাগেই বিকার করে বসে আছে, এবারে দই খাবেন গোবর্দ্ধন ইংরেজ মহাজন। তবে এর মধ্যে একটুখানি আশার আলো দেখা যাচ্ছে। অ্যাদ্দিন ইংরেজ 'বিজিনেস' বা শপ্-লিফটিং করেছেন অগা ভারতীয়দের সঙ্গে, শিশু নিগ্রোদের সঙ্গে, ক্যাবলাকান্ত আরবদের সঙ্গে, এবারে চাচা, নয়া ওঝার নয়া নয়া খেল। এরা আণ্ডা না ভেঙে মামলেট বানাতে পারে, দেখলে না, নেই নেই তো নেই, সেই নেই নেই থেকে দ্যাখ তো না দ্যাখ একটা নয়া চনমনে সমুচ্চহ রাষ্ট্র ইজরাএল পয়দা করে দিয়ে সপ্রমাণ করে ফেললে, তোমাদের আড়াই হাজার বছরের পুরনো পদার্থবিদ্যা দর্শনের স্বতঃসিদ্ধ something cannot come out of nothing আগাপাস্তলা ভুল, বিলকুল ভণ্ডুল। জানি তোমরা 'হর্স্ ডীল' বা 'ঘোড়া বিক্রি'র জন্য পাঠাবে তোমাদের ঝানু ঝানু স্কটস্ম্যানদের কিন্তু ওদের খোঁয়াড়েও আছে গণ্ডায় গণ্ডায় ঝাণ্ডু ঝাণ্ডু স্কটিশ জু—যারা ক্রমান্বয়ে চতুর্দশ পুরুষ স্কটল্যান্ডে জন্মমৃত্যু বিবাহ সেরে স্কটস্ম্যানদের চুষেছে এবং চুষে ভর্তি পকেটে হুইসিল দিতে দিতে পঙ্‌ক্তিদিন এই হেথা ইজরাএলে এসেছে। তোমরা যদি সুয়েজখালে 'নাও চল কইরা দু পয়সা কামাও তবে ইহুদি গোপাল সেখানে স্রেফ ঢেউ গুনে দু আঁজি।'

কিন্তু এ সবেতে কিছু যায় আসে না। সুয়েজ, শর্ম্ উশ্-শেখ, তেল এ সব নিয়ে আরব লেনদেন করতে হরবকৎ তৈরি। এস্তেক—আমার বিশ্বাস—ইজরাএলের চতুর্দিকের জমাজমি নিয়েও সে দরদস্তুর করতে রাজী আছে, কিন্তু তার একটি মাত্র শর্ত মেনে নিতে হবে।

সে শর্তটি : যে-সব আরব চাষা জেলেদের প্যালেস্টাইন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে ইজরাএল তৈরি করেছে তাদের ফিরিয়ে নিয়ে পূর্ণ নাগরিক অধিকার দিতে হবে।

ইহুদিদের প্যারিস তেল-আভিভ শহর হেসে গড়াগড়ি দেবে। তা কখনও হয়!

উত্তরে আরব বলে, 'কেন হবে না? তেরশ' বছর নয়, তারও বহুপূর্বের থেকে আরব ইহুদি পাশাপাশি বাস করেছে। পয়গম্বর হজরৎ মুহম্মদ ইহুদিদের বিশেষ সম্মানের চোখে দেখতেন। নিউ টেস্টামেন্টে পাই, ইহুদিরা প্রভু খ্রীষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করে মেরেছে এবং তারই ফলস্বরূপ যুগ যুগ ধরে খ্রীষ্টানরা তোমাদের অত্যাচার করেছে, এখনও কোনও কোনও দেশে করে—আর হিটলারের কথা তুলবো না, সে তো বিশ্বজন জানে। অথচ কুরান শরীফে স্পষ্ট বলা হয়েছে, প্রভু যীশু আদৌ ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যায়নি। যে কলঙ্ক থেকে আমাদের নির্ভুল আপ্তবাক্য কুরান শরীফ তেরশ' বছর পূর্বে তোমাদের বেকসুর মুক্তি দিয়েছে, সেই কলঙ্ক থেকে খ্রীষ্টানদের প্রতিভূ হিজ হোলিনিস পোপ তোমাদের মুক্তি দিয়েছেন বছর দুই হয় কি না হয়। গ্রীক অর্থডক্স, কপট্, লুথেরিয়ান ইত্যাদি চার্চ এখনও দেয়নি। অর্থাৎ প্রায় এক হাজার ন' শ' ত্রিশ বছর ধরে পৃথিবীর সর্ব খ্রীষ্টান তোমাদের অপরাধী ধরে নিয়ে যেখানে সেখানে ঠেঙিয়েছে। তোমাদের নামে কুৎসিত কেলেঙ্কারি কেচ্ছা রটিয়েছে যে, তোমরা তোমাদের এক বিশেষ পরবের দিনে একটি নিষ্পাপ খ্রীষ্টান শিশুর গলা কেটে তার রক্তপান করাটা অবশ্য কর্তব্য পুণ্য বলে স্বীকার করো।[১]

১ দুর্বল স্মৃতিশক্তির জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করে নিবেদন, চসার বোধ হয় ঐ ধরনের একটি

www.BanglaBook.org

খ্রীষ্টানদের এই ইহুদি বিদ্বেষের জন্য বিশেষ ইংরিজী শব্দ 'এন্‌টি সেমিটিজম'। এবং এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে ইংরিজী ভাষা জরমন থেকে নিয়েছে 'যুডেনহেৎসে', সুদূর রুশ থেকে নিয়েছে 'পগ্রম'। আরবীতে সে রকম কোনও শব্দ আছে, না আমরা তোমাদের উপর কখনও কোনও অত্যাচার করেছি? বস্তুত আমাদের নবী মদ খাওয়া এবং সুদ নেওয়া বারণ করে দেওয়াতে এ দুটো মুনাফার ব্যবসা তোমরা একচেটে চালিয়েছ তেরশ' বছর ধরে তামাম মধ্য প্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা জুড়ে। এই যে ১৯১৯ থেকে তোমরা মধ্যপ্রাচ্যের ইহুদিদের বার বার তোমাদের হোলি ল্যান্ডে নিমন্ত্রণ জানিয়েছ তাদের সবাই এসেছে?[২] এই গত যুদ্ধের সময়ও আমরা কোনও কোনও জায়গায় বিশেষ পুলিস মোতায়েন করেছি পাছে উত্তেজিত জনতা তাদের মারধোর করে। আর তোমাদের সঙ্গে লড়াই করে তো আমরা জেরুজালেম দখল করিনি। লড়াই হয়েছিল খ্রীষ্টানদের সঙ্গে। শত্রু যদি আমাদের কেউ থাকে তবে সে খ্রীষ্টান। অথচ এই খ্রীষ্টানদের সঙ্গে আমরা সম্মিলিতভাবে অক্লেশে লেবাননে রাষ্ট্র পরিচালনা করছি।

'তোমরাই বা আমাদের সঙ্গে একই রাষ্ট্রে বাস করতে পারবে না কেন?'

অসম্ভব! অসম্ভব! ইহুদি জানে সে আড়াই হাজার বছর ধরে ইজরাএলে যে নবীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুখস্বপ্ন গড়েছে সে রাজ্য দাউদ (ডেভিড) সুলেমানের রাজ্যের হুবহু ফোটোগ্রাফ। সে রাজ্য পূত-পবিত্র। তাতে কোনও বিধর্মী নেই। যারা ছিল তাদের বহু পূর্বেই নির্মূল করা হয়েছে। সলমনের গ্লরি তো তার বিধর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে নির্মিত হয়নি। এসব প্রস্তাব শুনলেই কানে আঙুল দিতে হয়।[৩]

তাই বলেছিলুম, আরব ইহুদি সমস্যার সমাধান কোথায়?

জেরূস্‌লম

আইস, সুশীল পাঠক, যুদ্ধবিগ্রহ তথা রাষ্ট্রপুঞ্জের বৈঠকে যে মেছোহাটার গালাগালি এবং দর কষাকষি হচ্ছে সেগুলো ভুলে গিয়ে পুণ্যভূমি জেরুস্‌লমে তীর্থ করতে যাই।

নিষ্পাপ বালকের কাহিনী লিখেছেন। ইহুদিরা নাকি তার গলা পুরোপুরি কেটে ফেলতে পারেনি বলে সে বেঁচে যায় ও তার করুণ কাহিনী খ্রীষ্টানদের সামনে বর্ণনা করে।

২ আসলে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইজরাএল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যখন ইহুদিরা সে রাজ্যের চাষীদের সঙ্গীনের খোঁচায় তাড়িয়ে দিয়ে, তাদের জমিতে বিদেশাগত জাতভাইদের বসালে তখন ইরাক, সিরিয়া ইত্যাদিতে (মিশর ও উত্তর আফরিকায় অপেক্ষাকৃত অনেক কম) আরবরা সেখানকার ইহুদি বাসিন্দাদের উপর দাদ তুলতে লাগলো। ফলে বাধ্য হয়ে এরা ইজরাএলে চলে যেতে লাগলো।

৩ অতীতের কোনও বিশেষ পূত পবিত্র যুগে ফিরে যাওয়ার স্বপ্ন দেখাটা ইহুদিদের একচেটে নয়। মুসলমানদের ওয়াহ্‌হাবী আন্দোলন এককালে তাই চাইত। অবশ্য তাদের প্রোগ্রামে বিধর্মীদের খেদাবার ব্যবস্থা নেই। কারণ তাহলে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করবার জন্য লোক পাবে কোথায়? শুনেছি স্বামী শ্রদ্ধানন্দও বৈদিক যুগ পুনরুজ্জীবিত করতে চাইতেন কিন্তু সেই ধর্মরাজ্যে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের 'শুদ্ধি' করে নেবার ব্যবস্থা ছিল ('ব্রাত্য' ব্যবস্থা তুলনীয়)। এটাকেই যখন 'বিজ্ঞান'সম্মত পদ্ধতিতে পেশ করা হয় তখন তার জিগির ''Back to nature!''

www.BanglaBook.org

অতি প্রাচীন নগর জেরূস্‌লম। খ্রীষ্টের দু'হাজার বছর পূর্বে জেরূস্‌লম মিশরীয়দের অধীনে ছিল। তখন তার নাম ছিল উরুসালিমমু ('শান্তিনিকেতন' ত্রাণদুর্গ)। পরবর্তী রোমানযুগে রাজা হাদ্‌রিআন এর নাম দেন অ্যালিয়া কাপিতলিনা। খ্রীষ্টের প্রায় দেড়শ' বছর পর থেকে ইহুদিরা দলে দলে, কখনও রোমানদের দাসরূপে কখনও বা স্বেচ্ছায় জেরূস্‌লম ত্যাগ করে।[১] ঐ সময় থেকে সে নগরী আর ইহুদি ধর্মের কেন্দ্রভূমি হয়ে রইল না। সপ্তম শতাব্দীতে দ্বিতীয় খলীফা ওমরের আমলে যখন মক্কামদীনার আরবরা এ নগর দখল করে তখন শহরের ৯৫% বাসিন্দা খ্রীষ্টান। এবারে প্রায় সকলেই ধীরে ধীরে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। মক্কামদীনা ত্যাগ করে যে সব আরব এখানে আসে তাদের সংখ্যা ১%-ও হবে না। যে ৯৫% মুসলমান হয়ে যায় তারা যুগ যুগ ধরে জেরূস্‌লম তথা প্যালেস্‌টাইনের (আরবীতে ফলস্‌তীন) আদিমতম বাসিন্দা (বস্তুত ইহুদিরা বাইরের থেকে এসে এদেশ জয় করে) এবং ইহুদি কর্তৃক যুগ যুগ ধরে নিপীড়িত হয়েও আপন ধর্ম ত্যাগ করেনি, পরবর্তী যুগে খ্রীষ্টান হয়ে যায় এবং সর্বশেষে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে বিজয়ী সেনাপতি ইংরেজ লর্‌ড অ্যালেন্‌বি যখন প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করেন[২] তখন সেখানে শতকরা ৮৫ মুসলমান, ১০ খ্রীষ্টান ও ৫ জন ইহুদি। সে ইহুদিরা ততদিনে ধর্ম ছাড়া সর্ব বাবদে আরব হয়ে গিয়েছে—হিব্রু ভাষা বলতে পারে না, বলে আরবী। একাধিকজন কবিতা লিখে আরবী সাহিত্যে সেরা লেখকদের মধ্যে স্থান পেয়ে গিয়েছেন।

প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাজত্ব কায়েম হয়ে 'ইজরেএল' (আরবীতে ইসরাঈল) নাম ধরার তেরো বছর পূর্বে, অর্থাৎ ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে আমি একদিন কুদ্‌স (জেরূস্‌লমের আরবী নাম) শহরের নাগরপ্রাচীরের বাইরে দূর যাত্রীর বাস্‌-স্ট্যান্‌ডে দাঁড়িয়ে আছি, তোরঙ্গটি মাটিতে রেখে। বাসনা, যাব ন্যাজরিথ (নাজরেৎ, আরবীতে অর্থাৎ বর্তমান যুগে প্রচলিত নাম 'অন-নসীরা'—আদি যুগের খ্রীষ্টানদের ঐ নাম থেকে 'ন্যাজরীন' নামে ডাকা হত। মুসলমানরা আজও ওদের 'নসারা' নামে পরিচয় দেয়) যেখানে প্রভু যীশু বাল্যকাল কাটান, মা মেরি (আরবীতে 'মরিয়ম') যে কুয়ো থেকে জল আনতে যেতেন সেটা নাকি তখনও আছে! আরও নাকি আছে, মা-মেরির বর জোসিফ-এর (আরবীতে ইউসুফ) ছুতোর কারখানা। ইনি যীশুর পিতা নন। কারণ প্রভুর জন্ম হয়েছিল কুমারী-গর্ভে, পবিত্র

---

১ পুণ্যনগরী জেরূস্‌লম যে ইহুদিদের একদিন ত্যাগ করে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়তে হবে সে কথা এর প্রায় ৮০০ বৎসর পূর্বে ইহুদি প্রফেটরা বার বার ভবিষ্যদ্বাণী করে ইহুদিদের সাবধান করেছেন; তারা কান দেয়নি; আচার-আচরণ বদলায়নি। এই 'বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ার' নামই 'ডিসপারসেল', গ্রীক 'দিয়াসপরা'।

২ ইংরেজ অ্যালেন্‌বি যখন জেরূস্‌লম প্রবেশ করেন তখন সে-খবর একজন অস্ট্রেলিয়ান সৈন্যকে দিলে পর সে রীতিমত শঙ্কিত হবে বলে, 'তাই তো! প্রভু খ্রীষ্টের জন্মকালে যে সব মেষপালককে দেবদূত সে-সুসমাচার জানান, তাদের বংশধরদের একটু হুঁশিয়ার করে দিলে হয় না যে—ইংরেজ ভেড়ার পালে ঢুকেছে—মতলবটা ভালো নয়।' 'শপ-লিফ্‌টার ইংরেজ 'শীপ্‌-লিফটিঙে'ও যে কিছু কম যান না সে তত্ত্ব আউসি বিলফুল জানতো। তার হুঁশিয়ারি কিন্তু পরবর্তী যুগে টায় টায় ফলেনি। ইংরেজ যখন দেখলে যে সে 'নেটিভদের' সঙ্গে পেরে উঠবে না, তখন তাদের পিছনে ইহুদিদের লেলিয়ে দিয়ে বাড়ি চলে গেল। আর ইহুদি যে শুধু ভেড়াগুলো মেরে দিলে তাই নয়, নেটিভদের জর্‌ডনের 'হে-পারে' (আমরা যেরকম বলি পদ্মার হে-পারে) খেদিয়ে দিলে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আত্মা দ্বারা। নিউ টেস্টামেনট ও কুরান শরীফ, দুই-ই এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি, মা-মেরির বর জোসিফ র‍্যাঁদা দিয়ে কাঠ পরিষ্কার করে কাঠে কাঠে জোড়া দিতেন। আর প্রভু যীশু মানুষের চরিত্র পরিষ্কার করে মানুষে মানুষে জোড়া দিতেন। যে স্যামারিটানদের প্রভু যীশুর গোষ্ঠী এবং তাঁর কট্টর ইহুদি সম্প্রদায়ের শিষ্যরা দু'চক্ষে দেখতে পারে না তিনি করেছেন তাদের প্রশংসা—গুড স্যামারিটান। এই স্যামারিটানরাও ইহুদি, কিন্তু যেসব ইহুদিরা ইজরাএল সৃষ্টি করেছে এদের সঙ্গে স্যামরিটানদের দ্বন্দ্ব চলেছে প্রায় তিন হাজার বছর ধরে। জেরুস্‌লমে প্রতিষ্ঠিত রাজা সলমনের (আরবীতে সুলেমান) মন্দির যে ইহুদির পরমেশ্বর য়াহভের (জেহোভা, ইলোহিম) পীঠস্থল একথা স্বীকার করেনি। আজ সেখানে নাবলুস শহর (বাইবেলের 'শেখেম') তারই পাশে গেরিজিম পাহাড়ের উপর ছিল তাদের আপন মন্দির।[১]

একদা এই স্যামারিটান জাতি সংখ্যায়, খ্যাতি প্রতিপত্তিতে মূল ইজরাএলিদের চেয়ে কোনও অংশে হীন ছিল না। তাবৎ ইহুদি যখন প্যালেস্‌টাইন পরিত্যাগ করে তখন শত অত্যাচার সহ্য করে দেশের মাটি কামড়ে ধরে এরা পড়ে থাকে। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে 'স্বগোত্রে' বিবাহের ফলে এদের সংখ্যা কমতে কমতে এখন মাত্র চারশতে এসে দাঁড়িয়েছে।

আমি যখন পুণ্যভূমিতে যাই তখন দেখি খবরের কাগজে একটা তর্কবিতর্ক চলেছে। যদ্যপি আজ খবর-প্রতিষ্ঠানগুলো বলছেন, স্যামারিটানদের সংখ্যা আনুমানিক প্রায় চারশ', আমাকে কিন্তু তখন বলা হয়েছিল প্রায় আশি। খবরের কাগজে আলোচনা হচ্ছে, এই স্যামারিটানদের 'প্রধান রাব্‌বি'-র (পণ্ডিত পুরোহিতের) একমাত্র জোয়ান ব্যাটা—ইনিই পরে প্রধান রাব্‌বি হবেন—'সোমত্ত' হয়েছেন, এখন তাঁকে বিয়ে করতে হবে। কিন্তু

---

১ এ জায়গাটায় ছিল জরডন এলাকায়। হালে ইজরাএল বাহিনী সেখানে পৌঁছে গেরিজিম মন্দিরের ভগ্নাবশেষের উপর ইজরাএলের জাতীয় পতাকা তুলতে গেলে স্যামারিটানদের সঙ্গে হাতাহাতি উপক্রম হয়। পরধর্ম বাবদে ইহুদিরা ঈষৎ অসহিষ্ণু এ তত্ত্বটি ইংরেজ জানতো বলেই ইজরাএল রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় (১৯৪৮) তারা খ্রীষ্টান মুসলিম গির্জা মসজিদে ভর্তি প্রাচীন জেরুস্‌লম (ইহুদিদের বিশেষ কোন স্থাপত্য এ শহরে আজ আর নেই, কারণ রাজা হাদরিয়ান শব্দার্থে এ নগরের উপর হাল চালিয়েছিলেন এবং ঐ সময়ই ইহুদিকুল শেষবারের মত জেরুস্‌লম পরিত্যাগ করে বলে পরবর্তী যুগে কিছু নির্মাণ করার সুযোগ পায়নি) ইজরাএলের শত মিনতিভরা কাতর রোদনে কর্ণপাত না করে মুসলমান জর্ডনরাজকে দিয়ে দেন। হালের যুদ্ধের ফলস্বরূপ ইজরাএল যখন প্রাচীন জেরুস্‌লম অধিকার করে তখন এ-যুগের ইংরেজ লেবার (অর্থাৎ ঐতিহ্যহীন অনভিজ্ঞ) সরকার কোনও উচ্চবাচ্য করেনি। কিন্তু স্যামারিটানদের মন্দিরে ইজরাএলের ব্যভিচারের খবর ইংলন্ডে পৌঁছনো মাত্রই নেবুচাদনেজ্জরের কানে জল গেছে। নিরাপত্তা পরিষদে চিৎকার করে ইংরেজের ফরিনমন্ত্রী ব্রাউন একাধিকবার বলেছেন. ইহুদিকে প্রাচীন জেরুস্‌লম ছেড়ে দিতেই হবে। এই প্রাচীন নগরের ভিতরে রয়েছে খ্রীষ্টের বিরাট—সত্যই অতি বিরাট—সমাধি। সৌধ (হোলি সেপালকর), গেৎসিমেনের বাগান যেখানে প্রভু যীশুর দেহ থেকে স্বেদের পরিবর্তে রক্ত বেরোয়, মাউন্ট অলিভ এবং ভিয়া দলরসা—যে পথ দিয়ে প্রভু ক্রুশ বহন করে বধ্যভূমিতে পৌঁছন। (মুসলমানদের হরমশরীফ, মসজীদ-উল-আকসা বাদ দিচ্ছি—এগুলোর জন্য ইংরেজের কোনও দরদ না থাকাই স্বাভাবিক)। ইজরাএলের 'সাতিশয় বিবেচক করুণ করে' এগুলো সঁপে দিতে ব্রাউন হিম্মৎ পাচ্ছেন না কিসের হাতে যেন কি সমর্পণ!

www.BanglaBook.org

হায়, কনে কোথায়? মাসীপিসীদের অর্থাৎ অগম্যাদের বাদ দিলে তিনি যে দুটি বধূকে বিয়ে করতে পারেন তাদের একটির বয়স ষাট এবং তিনি তারস্বরে চিৎকার করে বলেছেন—আমাদের আইবুড়ো জাতকুলীন বৃদ্ধরা যা বলে থাকেন—'তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে! এখন সাজবো কুনে বউ! কী ঘ্যান্না। কী ঘ্যান্না'। এবং তদুপরি দ্রষ্টব্য, এই বৃদ্ধাকে বিয়ে করলে বংশ রক্ষা হবে না, এবং এ স্থলে সেইটেই সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় বধূটি বোবাকালা ইডিয়েট। স্যামারিটানরা আড়াই হাজার বছর ধরে ইজরাএলিদের সঙ্গে বিয়েশাদী করেনি। এখনই বা করে কি প্রকারে? এসব গুল-গ্যাশ আমি শুনেছি প্রাচীন জেরূসলমের হেরোদ গেটের কাছের (এখানেই ভারতীয় হস্‌পিস্—সরাইখানা, চট্টি যা খুশী বলুন—অবস্থিত) কাফে—আড্ডাতে। এর শতকরা ৯৯% পাঠক বাদ দিতে পারেন। মোদ্দাটুক্ শুধু এই : যুবক রাব্‌বিপুত্রের জন্য বিবাহযোগ্যা বধূ সে-কুলে নেই।

অতএব স্থির হল, ঐ জাতশত্রু ইজরাএলি ইহুদিদেরই কোনও মেয়ে বিয়ে করো। হাজার হোক, ওরা তো ইয়াহভে মানে, ধর্মগ্রন্থ পেনটাটয়েশ স্বীকার করে। খ্রীষ্টান, মুসলমান তো আর বাড়িতে তোলা যায় না।

ন্যাজরিথ যাবার পথে পড়ে স্যামারিটানদের নাবলুস; নিশ্চয়ই দেখে যেতে হবে। নিঃসন্দেহে যারা অন্তত তিন হাজার বছর ধরে ভিটের মাটি (ওঃ! আর সে কী মাটি, বালি পাথরে ভর্তি!) কামড়ে ধরে পড়ে আছে, তারা দ্রষ্টব্য বইকি।

* * *

সে-আমলে প্যালেস্টাইনে চলতো তিন রকমের বাস্। আরব বাস্ ইহুদি বাস্ আর স্টেট বাস্। কাট্যা ফালাইলেও ইহুদি চড়তো না আরবের বাস্ এবং ভাইস্ ভার্সা। দু দলেই চড়তো স্টেট বাস্।

আত্মচিন্তায় নিমগন আমার সামনে এসে হঠাৎ দাঁড়ালো একখানা করকরে নতুন ট্যাক্সি। আরব ড্রাইভারের পাশে দেখি গোটা পাঁচেক মেল-ব্যাগ। পিছনের সীটে জাব্বা জোব্বা পরা ইয়া মানমনোহর গলকম্বল দাড়িওলা দুই রাব্‌বি। এক রাব্‌বি পিছনের দরজা খুলে বার বার বলে যাচ্ছেন, 'উঠে পড়ো, উঠে পড়ো'।

আমি ক্ষণে সালাম জানিয়ে, ক্ষণে জোড়-হাতে নমস্কার করে (এটা ভারতীয়দের পেটেন্ট মাল—বিদেশী মাত্রই চেনে!), ক্ষণে ডান হাত বুকের বাঁ দিকের উপর রেখে ঝুঁকে ঝুঁকে ক্ষীণ কণ্ঠে বললাম, 'ট্যাক্সিতে যাবার মত কড়ি আমার গ্যাঁটে নেই। আমি যাব বাস্-এ।'

দুই রাব্‌বি যা বলেছিলেন—আহা কী সুন্দর অত্যুৎকৃষ্ট বিদগ্ধ নাগরিক আরবী ভাষাতে—তার তাৎপর্য 'কী উৎপাত, কী জ্বালাতন! উঠে পড়ো, উঠে পড়ো। আমরা কি কানা! দেখতে পাচ্ছি নে, তুমি ভিনদেশী? আমরা তো ট্যাক্সিটার সাকুল্যে পিছন দিকটা ভাড়া নিয়েছি। উঠে পড়ো উঠে পড়ো। কী মুশকিল! আচ্ছা বাবু, তুমি বাস্-এ যে ভাড়া দিতে সে-ই না হয় আমাদের দেবে।' (এই বেলা বলে নি, পরে বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও সেটা তাঁরা নেননি।)

কিন্তু ইয়া আল্লা, বসি কোথায়! গোটা তিনেক মোরগামুরগী ক্যাঁক মাক করছে, দু তিন ঝুড়ি আলু-টমাটো-মটরশুঁটি-কপি, দু থালুই ডিম, আর কি কি ছিল খোদায় খবর।

রাব্‌বিরা বরাব্বর বলে যাচ্ছেন, 'হয়ে যাবে, হয়ে যাবে।'

এক রাব্‌বি কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললেন, 'মেয়ের শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছি। তাই এত সব।'

www.BanglaBook.org

আমি চোখের তারা কপালে তুলে বললুম, 'বলেন কি মশাই! এই তিনটে আণ্ডা, গোটা কয়েক মুরগীতেই আপনাদের দেশের কন্যাপক্ষ খুশী হয়ে যায়! তাজ্জব! তাজ্জব!! আমাদের মোশয়, সিনাই পর্বত প্রমাণ মাল নিয়ে গেলেও হালাদের মুখে হাসি ফোটে না।'

আমার জেবে একটা হাতির দাঁতের ডিম্বাকার নস্যির কৌটো ছিল। নস্যাভাবে সেটাতে রাখতুম মিশরীয় সুগন্ধি। সেইটা তুলে ধরলুম তাদের সামনে।

দুই রাব্‌বি আমাকে জাবড়ে ধরে চুমো খেতে লাগলেন।

বিস্তর কথাবার্তা হল। নাবলুস, ন্যাজরিথ গল্পের তোড়ে পেরিয়ে গিয়ে তখন পৌঁছে গিয়েছি গেলিলিয়ান লেক-এ।

দুই রাব্‌বি আমার মাথার উপর হাত রেখে বিস্তর মন্ত্র পড়ে গেলেন। তাঁদের আশীর্বাদের এক কণাও যদি সফল হয় তবে আমি ভারতবর্ষের রাজা হব।

সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর

সুইটজারল্যান্ডের রামগাড়ল হ্যার পল্‌ডি নাকি একদা একটা দাঁড়কাক পুষেছিল।

বন্ধু শুধালে, এ কী ব্যাপার। কাক আবার কেউ পোষে নাকি? বৈজ্ঞানিকসুলভ অর্ধমুদ্রিতনয়নে পল্‌ডি বললে, ঐ যে লোকে বলে দাঁড়কাক একশ বছর বাঁচে, সেটা ঠিক কিনা আমি হাতে-নাতে নিজে দেখে নিতে চাই।

মুচকি হাসুন, আপত্তি নেই। কিন্তু আমি নিজেই পল্‌ডির মতই বটি।

চিন্তা করুন তো এই যে ইহুদি জাত—বিস্তর ঘোরাঘুরি করে, হাজার দুই বছর ধরে এ-জাত, ও-জাত সে-জাতের কাছে মার খেয়ে খেয়ে গোলামী করে করে প্রথম আপন রাজ্য গড়ে তোলার সুযোগ পেল খ্রীষ্টজন্মের হাজারখানেক বছর পূর্বে রাজা সুলেমানের আমলে। কিন্তু হায়, তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সেই 'গ্লরি' খানখান হয়ে যেতে লাগল। কিন্তু তিনি ইহুদিদের সদাপ্রভু য়াহ্‌ভের জন্য যে 'বিরাট' মন্দির গড়েছিলেন তার স্মৃতি ইহুদিরা আজও প্রতি শনির স্যাবাৎ পরবে স্মরণ করে।[১]

তারপর খেল মার ফের ঝাড়া একটি হাজার বছর ধরে। আর বাবিলনের রাজা তো একবার প্রায় গোটা গোষ্ঠীটাকে ধরে নিয়ে গোলাম বানিয়ে রেখে দিলেন আপন দেশে। দু পুরুষ সেখানে কাটিয়ে কোনওগতিকে প্রাণ নিয়ে তারা ফিরলো ফের প্যালেস্টাইনে।

সুলেমানের হাজার বছর পর ফের তারা পেল আরেকটা চানস। প্রভু যীশুর জন্মের কয়েক বছর পূর্বে, রাজা হেরডের আমলে (এরই পুত্রের সামনে 'বিচারের' জন্য প্রভু যীশুকে পাঠানো হয়), আবার জেরূসলম তথা ইহুদি জাতের মুখে হাসি ফুটলো। ধনদৌলত তো বাড়লোই, তদুপরি সুসভ্য বাবিলনে তারা যে-সব জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হয় তারই কাঠামোতে ফেলে আপন প্রাচীন শাস্ত্রাদির নূতন নূতন টীকাটিপ্পনী

১ তিন হাজার বছর ধরে ইহুদিরা এই মন্দিরের গুণকীর্তন করে করে তার পরিধি ও ঐশ্বর্য এমনই বাড়িয়েছে যে বাস্তবের সঙ্গে আজ আর তার কোনও মিলই নেই। বাইবেল অনুযায়ীই দেখা যাচ্ছে, মন্দিরটির দৈর্ঘ্য ২০০ ফুট, প্রস্থ ৭০-এর একটু বেশী (বাইবেল, কিংজ ১; ৬ অধ্যায়)! এ যেন সেই—'লোক মরে লক্ষ লক্ষ কাতারে কাতার! গুনিয়া দেখিনু শেষে আড়াই হাজার!!'

www.BanglaBook.org

রচনা করলে। হেরড আবার নূতন করে য়াহ্‌ভের মন্দির গড়লেন।

কিন্তু এবারে যে দুর্দৈব এল, তার সঙ্গে পূর্বেকার কোনও অভিজ্ঞতারই তুলনা হয় না।

খ্রীষ্টজন্মের ৭০ বৎসর পর রোমানরা জেরূস্‌লম আক্রমণ করে শহর এবং দুর্গ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে য়াহ্‌ভের মন্দির পুড়িয়ে ছাই করে দিল; এক ইহুদি ঐতিহাসিকের ভাষায় Amid circumstances of unparalelled horror, Jerusalem fell. The temple was burnt and the Jewish State was no more.''

এই কি শেষ? হ্যাঁ, কিন্তু ইহুদি রাষ্ট্র লোপ পাওয়া সত্ত্বেও ইহুদিরা জেরূস্‌লম নগরে বসবাস করতে লাগল। ওদিকে তাদের উপর রোম সম্রাটের কুশাসন ক্রমে ক্রমে এমনই বেড়ে যেতে লাগল যে শেষটায় ১৩২ খ্রীষ্টাব্দে তারা রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো—অবশ্য স্মরণ রাখা কর্তব্য, ইহুদিদের অনেকেই এ রকম বছরের পর বছর ধরে বিদ্রোহী মনোভাব পোষণ করতে মানা করেছিলেন। আমরা জানি স্বয়ং খ্রীষ্ট রোমানদের বিপক্ষে বিদ্রোহ ঘোষণা করার পক্ষপাতী ছিলেন না।

এবারে রোমানরা যা করল তার সঙ্গে ৭০ খ্রীষ্টাব্দের মন্দির পোড়ানোরও তুলনা হয় না। হাদ্‌রিয়ানের আদেশে সমস্ত শহর পুড়িয়ে খাক করে দিয়ে তার উপর হাল চালানো হল। খুব সম্ভব হাদ্‌রিয়ানের উদ্দেশ্য ছিল, রাজা দায়ুদের গোর, সুলেমানের মন্দির এমনই নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া, যাতে করে পরবর্তী যুগে ইহুদিরা সেগুলো খুঁজে বের করে সমাধিসৌধ এবং নূতন মন্দির গড়ে তাদেরই চতুর্দিকে নবীন বিদ্রোহ, নবীন রাষ্ট্রের সূত্রপাত না করে।

এবং তার চেয়েও মারাত্মক হুকুম জারি হল : ইহুদি মাত্রেরই হাদ্‌রিয়ান নির্মিত নবীন জেরূস্‌লমে প্রবেশ নিষেধ। অর্থাৎ রোমান, খ্রীষ্টান, আরব, গ্রীক ও অন্যান্য নানা সম্প্রদায় নানা শেমিতি তথা মিশরীয়রা সেখানে স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে পারবে কিন্তু য়াহ্‌ভের উপাসকরা সেখানে প্রবেশাধিকারও পাবে না।

এর পরই ইহুদিরা ব্যাপকভাবে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়লো।

আজ ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দ। জেরূস্‌লমের উপর হাদ্‌রিয়ান হাল চালান ১৩২ খ্রীষ্টাব্দে, হেরডের মন্দির ধ্বংস হয় ৭০ খ্রীষ্টাব্দে। অর্থাৎ আজ ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়ী বীর রূপে যে ইহুদিরা জেরূস্‌লমে প্রবেশ করলো সেটা যথাক্রমে আঠারো বা উনিশশ' বছর পর। কিন্তু এই তৃতীয় পর্যায়ের কথা পরে হবে।

প্রথম পর্যায়ে রাজা সুলেমান যে ইহুদি-প্রাণাভিরাম মন্দির নির্মাণ করেছিলেন সেটা সম্ভব হয়েছিল প্রতিবেশী ফিনিশিয় রাজা টায়ার (বর্তমান লেবানন অঞ্চল)-অধিপতি রাজা হিরমের সাহায্যে। বস্তুত রাজা সুলেমান স্বাধীন হলেও তাঁর চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী হিরমকে তিনি অনেক প্রকারে সেবা করে সে সাহায্য পান। এচ জি ওয়েলস তো তাঁর ইতিহাসে তাচ্ছিল্যভরে বলছেন, ''There is much in all this (অর্থাৎ সুলেমানের সেবা) to remind the reader of the relations of some Central African chief to a European trading concern.''

অর্থাৎ অর্ধ বর্বর নীগ্র চীফ যে রকম শক্তিশালী ইয়োরোপীয়কে কাঁচা মাল সস্তা লেবার যুগিয়ে সভ্য জগতের এটা সেটা পায়, সুলেমানের বেলাও তাই। এবং তার পরই বলছেন, ''এবং বাইবেল পড়লেই দেখা যায়, সুলেমানের রাজ্য was a pawn between

www.BanglaBook.org

(হিরমের) Phoenicia and Egypt.'' এবং বাইবেলেই আছে সুলেমান তাঁর রাজ্যের উত্তরার্ধ হিরমকে দিয়ে দেন বা দিতে বাধ্য হন।[১]

পূর্বেই বলেছি, এর হাজার বছর পর দ্বিতীয় চান্‌স্ পান রাজা 'হেরড দা গ্রেট'।

ইনি আবার সংস্কার করে গড়ে তুললেন নব জেরূস্‌লম। সুদৃঢ় নগর প্রাচীর, বিরাট রাজপ্রাসাদ, নানা অট্টালিকা—এবং সব চেয়ে বড় কথা—সুলেমানের মন্দির নব মহিমা-মণ্ডিত করে গড়ে তুললেন। এ ছাড়া প্যালেস্‌টাইনের সর্বত্র প্রাচীন নগরী সংস্কার ও বহু নূতন নগর স্থাপনা করলেন। বস্তুত ইহুদিদের এ যুগকে দ্বিতীয় সত্যযুগ বলা যেতে পারে।

কিন্তু 'রাজা' হেরড ছিলেন সুলেমানের চেয়ে পরমুখাপেক্ষী। তিনি ছিলেন রোম সম্রাটের অধীনে পরাধীন রাজা। মিশর রাণী ক্লেওপাতরা-বল্লভ-রোমশাসক অ্যানটনির কৃপায় তিনি 'রাজা' উপাধি পান ও তাঁকে রোম সাম্রাজ্যের 'ক্লাএন্ট প্রিন্‌স' হিসাবে প্যালেস্‌টাইন শাসন করতে হত। অ্যানটনির আত্মহত্যার পর তিনি পান রোম রাষ্ট্রপ্রধান (কার্যত সীজার) অক্‌টাভিয়ানের পৃষ্ঠপোষকতা।

অতএব দেখা যাচ্ছে, প্রথম দফায় সুলেমান তাঁর গ্লরি গড়লেন ফিনিশিয় রাজা হিরমের সহায়তায়; তার এক হাজার বছর পর দ্বিতীয় দফেতে 'রাজা' হেরড ইহুদিকুলের গৌরব বৈভব পূর্ণ করে তুললেন রোম শাসকের সাহায্যে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, সেটাও বিনষ্ট হল ৭০ বছরের ভিতর ও তারপর কেটে গেল আরও দু হাজার বৎসর। এবারে তৃতীয় দফাতে, ১৯৬৭-এর জুন মাসে ইহুদি প্রবেশ করল বিজয়ী বীরের বেশে প্রাচীন জেরূস্‌লম নগরে। পুরোভাগে জঙ্গীলাট দায়ান। বিশ্ব ইহুদি উচ্চকণ্ঠে জয়ধ্বনি করে উঠলো ইনিই ''মাশীয়হ্।''—মিসায়া (Meesiah), খ্রীষ্টানের যীশু (খ্রীষ্ট শব্দের অর্থেও 'মিসায়া') মুসলমানের মসীহ = মাহ্‌দী, হিন্দুর কল্কি।

এবারে তৃতীয় দফাতে এ-'মশীয়হ্' এ-কল্কির পিছনে কে?

আন্‌কল্ স্যাম—জনসন!

* * *

কিন্তু এবারেও যদি ইহুদিরা ফের মারে তবে আগের এক হাজার, তারপর দু'হাজার সেই হিসেবে ফোর্থ চান্‌স পাবে চার হাজার বছর পরে।

লেখনারম্ভের পলডি হয়তো বা দেড়শ বছর পরমায়ু পেয়ে দাঁড়কাক একশ' বছর বাঁচে কিনা পরখ করে যেতে পারবে, কিন্তু 'ইওরস অবিডিয়ানটলি' এ অধম তো চার হাজার বছর বাঁচবে না! আল্লাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমেন॥

---

১ বাইবেল, কিংজ ১/২১। উত্তর গ্যালিলির এই অঞ্চলেই ইজরায়েল সিরিয়ার হালে সংঘর্ষ হয়। অনুর্বর প্রস্তরময় এই ভূমি কিন্তু বড় ঐতিহাসিক মূল্য ধরে। গ্যালিলি হ্রদের এই উত্তর তীরে যীশু তাঁর প্রথম ও প্রধান প্রচারকার্য আরম্ভ করে টিলার উপরে বসে 'সারমন অব দ মাউনট' ('ধন্য যাহারা আত্মাতে দীন-হীন, কারণ স্বর্গরাজ্য অহাদেরই') উপদেশ দেন। এখানেই তিনি সাতখানি রুটি ও ছোট্ট কয়েকটি মাছ দিয়ে চার হাজার লোককে খাওয়ান। এরই কাছে মগদলা গ্রাম, যেখান থেকে নর্তকী, পরে তাপসী মেরি মগডলীন (অক্‌স্‌ফরডের মডলিন কলেজ। maudlin tears; কেম্‌ব্রিজের মডলিন বানানে পিছনে অক্ষর আছে) যীশুর কাছে আসেন। পাঠক যদি অপরাধ না নেন তবে বলি, এখানেই আমি সর্বপ্রথম গ্যালিলি হ্রদের মাছ খাই। তার অপূর্ব স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে; ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে এ অঞ্চল সম্বন্ধে সবিস্তর লেখার বাসনা আছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রোদন-প্রাচীর—ক্লাগে-মাত্তার

প্রাচীরটা যে প্রাচীন সেটা দেখা মাত্রই বোঝা যায়। কত প্রাচীন, সেটা অবশ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ঐতিহাসিক গবেষণা না করে বলতে যাওয়াটা অবিবেচকের কর্ম হবে। তবে এ নগরে যারা বাস করে তারা ছেলেবেলা থেকেই চতুর্দিকের এত সব প্রাচীন দিনের ভগ্নাবশেষ দেখে আসছে যে তাদের চোখ যেন বসে গেছে; আপন অজানতেই অবচেতন মন জরাজীর্ণ পাষাণস্তূপের একটার সঙ্গে আরেকটা তুলনা করে করে যেন প্রাচীনত্ব নির্ণয়ের কতকগুলো সাদামাটা কাঁচা-পাকা সূত্র নির্ণয় করে ফেলে। এমন কি যে বিদেশী প্রাচীন ভগ্নস্তূপ অতি অল্পই দেখেছে—যেমন ধরুন মামুলী মারকিন—সে পর্যন্ত এখানে কিছু দিন থাকার পর এটা-ওটার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বেশ কিছুটা ওয়াকিফহাল হয়ে যায়—অবশ্য যদি 'গাঁইয়া' মারকিনের মত চোখে ফেটা কানে তুলো মেরে 'টুরিজম' কর্ম না করে।

মোটা দড়, ভারিক্কি প্রাচীর। প্রায় বিশ গজ উঁচু, অন্তত পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন গজ লম্বা। রোদে জলে পাথরের চাঁই তার মসৃণতা হারিয়ে খোওয়া খাওয়া হয়ে গিয়েছে কিন্তু পাথরে পাথরে যে জোড়া লাগানো আছে সেটা আজও যেন প্রথম দিনের মত মোক্ষম। রঙ প্রায় কালো।

কিন্তু আশ্চর্য, এ প্রাচীর যে এখানে কি করতে আছে সেটা কিছুতেই অনুমান করতে পারলুম না। অন্য প্রাচীরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সে কোনও চত্বর বা বাড়ির বেষ্টনী নির্মাণ করেনি। শহরের মাঝখানে না হয়ে যদি ফাঁকা মাঠে এটা দেখতুম তবে হয়তো বলতুম, এটা চাঁদমারির (টারগেট শ্যুটিঙের) দেয়াল। এখানে এটার—স্থাপত্যে যাকে বলে আরকিটেকচরল ফংশন কি?

একটি প্রৌঢ়া মহিলা—সর্বাঙ্গ লম্বা ভারী কালো জোব্বায় ঢাকা, মাথায় কপাল পর্যন্ত অবগুণ্ঠন, শুধু মুখের লালচে হলুদ রঙের আভা দূর থেকে দেখা যাচ্ছে—এক হাত উপরে তুলে দেয়ালে রেখেছেন, দেয়ালে হেলান দিয়ে, মাথাটিও দেয়ালের উপর কাত করে রেখে যেন কোনও গতিকে দাঁড়িয়ে আছেন। খানিকটে এগিয়ে যেতে দেখি, তাঁর দু চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরছে, আর ঠোঁট দুটি অল্প-অল্প কাঁপছে যেন, কেমন মনে হল, মন্ত্রোচ্চারণ করছেন। কোনও প্রিয়জনের স্মরণে? কিন্তু কই, কাছে-পিঠে কোথাও তো কোনও গোরস্তান নেই। আমি আর এগোলুম না। রোদ চড়তে আরম্ভ করেছে। বাঁদিকে মোড় নিতে হেরড গেটের কাছে ভারতীয় ধর্মশালার দিকে রওয়ানা হলুম।

একটা ছোট বাজারের ভিতর দিয়ে যেতে হয়।

প্রায়ান্ধকার রাস্তা—হাত ছয় চওড়া। দুদিকে দোকানের সারি—আর রাস্তার উপরটাও ঢাকা বলে মনে হয় গোধূলির অন্ধকার যেন নেমে আসছে। তবু ফলের দোকানে কী রঙের বাহার! সব চেয়ে চোখে পড়ে আমাদের কমলানেবুর তিনগুণ সাইজের জাফা অরেন্জ। মধুর মত মিষ্টি রসে টইটম্বুর। দুপুরে একটা খেলে সে-বেলা যেন অন্নে রুচি হয় না। দুটো খেলে গা বিড়োয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটা কিউরিওর দোকান। টুকিটাকি অলঙ্কার, তাবিজ, তসবী, রেকাবি, গেলাস, তীর, ধনু, আরও কত কি! কোনওটা নাকি পাঁচশ, কোনটা নাকি পাঁচ হাজার বছরের পুরনো! আমি অবশ্য জানতুম, এগুলোর ৯৯% কাইরোর কারখানায় তৈরি হয়। কোনও-কোনওটাতে এস্তেক সরকারী ক্ষুদে শীলমারা আছে : সরকারী মিউজিয়াম গ্যারান্টি দিচ্ছেন, এটা প্রাচীন দিনের কোনও পিরামিডে বা গোর খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছে। বলে আর কি হবে, মাল যেমন জাল, শীলও তেমনি।

সামনে দাঁড়িয়ে সেই জরমন টুরিস্ট্ ছোকরা। পরশুদিন আমি এদেশে এসেছি—ছোকরা বেশ কয়েক সপ্তাহ হল। আলাপ হয়েছে কাল সকালে, খ্রীষ্টের সমাধিসৌধে অর্থাৎ হোলি সেপাল্‌কর্-এ। অবাক হয়ে বললুম, 'এ কি ভায়া, এসব যে বিলকুল ডাড্—জাল মাল।'

একগাল হেসে বললে, 'আমার নোটও জাল।'

একসঙ্গে বাড়ির দিকে রওয়ানা হলুম।

খানিকক্ষণ পরে আমি সেই দেয়ালের ধারের মহিলাটির কথা পাড়লুম।

বললে, 'সে তো ক্লাগে-মাত্তার।'

জর্মন ভাষায় 'ক্লাগে' অর্থ 'লেমেনটেশন' অর্থাৎ 'বিলাপ' : 'মাত্তার' অর্থ 'প্রাচীর'। বিলাপ করার প্রাচীর। আমি বললুম, খুলে বলো।

পরম তাচ্ছিল্যভরে ঘোঁৎ করে উঠলো, ইহুদিদের কি যেন একটা কী, আমার ও নিয়ে কোনও শিরঃপীড়া নেই। ঐ যে, কে এক হিটলার, সে শিখেছে ইহুদিদের কাছ থেকে একটা মারাত্মক তত্ত্ব—ইহুদিরাই এ পৃথিবীতে সর্বপ্রথম বলে তারা বিশ্বেশ্বর য়াহ্‌ভের "নির্বাচিত সর্বোৎকৃষ্ট জাতি"—অন্যেরা বলতো, অমর ঈশ্বরের নির্বাচিত প্রিয় জাতি আমরা। ওনরা বিশ্বেশ্বরের! হিটলার ওদেরই কাছ থেকে এই অদ্ভুত, প্রলয়ঙ্করী, জাতে জাতে রক্তাক্ত সংগ্রামসৃষ্টিকারী বীজমন্ত্র শিখে নিয়ে বললে, "বটে! এত বড় মিথ্যে কথা! সার সত্য কিন্তু, হে বিশ্বজন, জেনে নাও :—আমরা, আর্যরা, এবং তাদের ভিতরও নীল চোখ, সোনালী চুলওলা নরড়িকরা ত্রিলোকের সর্বোৎকৃষ্ট জাত।" এবং এইখানেই হিটলার থামলো না; বললো, "এবং ইহুদিরা এ জগতে কাফরী নীগ্‌রোর মত উন্‌টর মেন্‌শ (মানব পর্যায়ের নিম্নস্তরের সৃষ্টি)-ও নয়। তারা ভার্‌মিন নরকের কীট! যথেষ্ট হয়েছে; আমি ওসব কোঁদলে নেই।'

* * *

নিরপেক্ষ ইতিহাস বলেন, হেরড দ্য গ্রেট খ্রীষ্টজন্মের মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে জেরূসলেমে যে বিরাট বিচিত্র য়াহ্‌ভের মন্দির নির্মাণ আরম্ভ করেন সেটা আকারে-প্রকারে সর্বভাবে হাজার বছর পূর্বেকার সুলেমানের টেম্‌পলের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ছিল।'[১] রোমানরা এ মন্দির ৭০ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে।

১ নির্মাণ আরম্ভ খ্রীঃ পূঃ ২০; নির্মাণ শেষ খ্রীষ্টাব্দ (খ্রীষ্টের পর) ৬২। কী ট্রাজেডি! যে মন্দির গড়তে লাগলো প্রায় ৮২ বৎসর সেটা ভাঙতে (প্রধানত লুট করতে—কারণ ইহুদি মন্দিরে তাদের 'কোষাকুষি' হয় বিরাট আকারের ও নিরেট সোনায় তৈরি) ৮২ ঘণ্টাও লাগেনি! প্রফেট নোআর (আরবী বাঙলায় নূহ) আরক্ বা নৌকা তুলনীয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'পরিপূর্ণ সম্পূর্ণ বিনষ্ট' করেনি। বিরাট মন্দির-চত্বরের চতুর্দিকে যে প্রাচীর একে পরিবেষ্টন করে ছিল তার একটি ক্ষুদ্র অংশ, কি কারণে জানি না, আজ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছে—এরই বর্ণনা দিয়ে এ-লেখা আরম্ভ করেছি।

কবে এ প্রথা, অনুষ্ঠান বা আচারটা আরম্ভ হয় সেটা বলা কঠিন। অন্তত ষোলশ' বছর তো হবে।

প্রতি শুক্রবারের বিকালে দেড়/দুই হাজার বছর ধরে ইহুদিরা এই দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে বিলাপ রোদন করছেন। অনেকক্ষণ ধরে যে দীর্ঘ মন্ত্রোচ্চারণ করেন সেটিতে বার বার যে-ধুয়া আসে (আমার যত দূর স্মরণে আসছে তারই উপর নির্ভর করে বলছি, কারণ বহু চেষ্টা করেও এই সুন্দর 'কিনোৎ' = ইংরিজি 'এলিজি' মন্ত্রটি যোগাড় করতে পারিনি) তার নির্যাস 'আমাদের সর্বগৌরব-মহিমার যে মন্দির ধ্বংস হয়েছে আমরা তারই স্মরণে এই বিজনে রোদন করি।'

যত দূর মনে পড়ছে রাব্‌বি—পুরোহিত সে 'গৌরব-মহিমার' কিছুটা বর্ণনা দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আর সবাই উপরের ধুয়াটি বলে। ফের রাব্‌বি আরও খানিকটা বর্ণনা দেন, ফের উপাসক-মণ্ডলী ঐ ধুয়ার পুনরাবৃত্তি করে। বিলাপের সঙ্গে সঙ্গে সকলের চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রুধারা বয়।

প্রতি শুক্রবারের বিকালে ইহুদিরা এই প্রাচীরের দিকে মুখ করে এই 'কিনোৎ' বিলাপ করে। অন্যান্য দিনও যে কোনও সময় দু'একজনকে কাঁদতে দেখা যায়। আমি যে মহিলাটিকে দেখেছিলুম ইনি তাঁদেরই একজন। আর ইহুদি পঞ্জিকা অনুসারে তাঁদের 'আব্' মাসের ৯ তারিখ মন্দির ধ্বংসের সাম্বৎসরিক কিনোৎ।

প্রাচীন জেরূসলমের যে অংশে এই প্রাচীরটি পড়েছে সেটি মন্দির ধ্বংসের বহু পূর্ব থেকে গত জুন মাস পর্যন্ত ছিল হয় রোমান না হয় খ্রীষ্টান নয় আরবদের অধীনে। গত জুন মাসে আরব-ইজরাএল যুদ্ধের সময় আরব শাসনকর্তা ও প্রজাকুল নগর ত্যাগ করে জরডন নদীর পূর্ব পারে চলে যায়।

বিজয়ী ইহুদী প্রধান সেনাপতি দায়ান ও পুরোহিত বংশজাত (লেভি) প্রধানমন্ত্রী এশকল্ দুই আড়াই হাজার বছরের পরাধীনতার পর 'বিলাপ প্রাচীর'-এর সামনে এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে হাজার হাজার ইহুদি। অতিশয় পরিতাপের বিষয়, সে মহোৎসব সমাধিত হল তার খবর এসেছে মাত্র কয়েক ছত্রে।

আমার মনে প্রশ্ন জাগে : এশকল্-দায়ান্ এরা কি সেই প্রাচীন দিনের কিনোৎ-বিলাপ করেছিলেন? করার কি প্রয়োজন? সুলেমান হেরডের মন্দির যেখানে ছিল সেখানে নূতন মন্দির গড়ে তুলে সর্ব গৌরব-মহিমা ফিরিয়ে আনলেই হয়—তাহলে অবশ্য শত শত শতাব্দীর প্রাচীন 'কিনোৎ' পরবটি মারা যায়। আজ যদি ভারতে সর্বকুল লোপ পায় তবে কি মনসা পূজা বন্ধ হয়ে যাবে?

কিন্তু যে জায়গায় প্রাচীন মন্দির ছিল সেখানে তেরশ' বছর ধরে যে মসজিদ!

হজরৎ মুহম্মদের পরলোকগমনের পর আরবদের দ্বিতীয় খলীফা হজরৎ ওমরের সময় ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বাইজেনটাইন খ্রীষ্টানদের হারিয়ে স্বয়ং ওমর জেরূসলমে প্রবেশ করেই প্রশ্ন করলেন, নবী সুলেমানের মন্দির ছিল কোথায়? সেখানে তখন শহরের তাবৎ ময়লা-আবর্জনা ভর্তি ভগ্নস্তূপ। খলিফা স্বয়ং স্বহস্তে ময়লা আর পাথর সাফ করতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লাগলেন। দেখাদেখি তাঁর সেনাপতিরা ও সৈন্যদল সে কাজে যোগ দিল। অত্যল্প সময়েই কর্ম সমাধান হলে পর ওমর সেখানে একটি মসজিদ উল্-আক্সা[১] সেটিও অতিশয় পুণ্যভূমি কারণ হজরৎ মুহম্মদকে তাঁর জীবিতাবস্থায় বেহেশ্‌তে আল্লার কাছে যখন নিশাভাগে নিয়ে যাওয়া হয় (সশরীর না শুধু আত্মা এ নিয়ে মতভেদ আছে) তখন তাঁকে আরবদেশ থেকে প্রথম এই মসজিদ উল্-আক্সা ভূমিতে নিয়ে আসা হয়েছিল।

৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ওমর যে সাদামাটা মসজিদ নির্মাণ করেন তার পরিবর্তে খলীফা আব্দুল মালিক আনুমানিক ৭০০ খ্রীষ্টাব্দে যে মসজিদ সেখানে নির্মাণ করলেন সেটি সত্যই অতুলনীয়। বিশ্ববিখ্যাত স্থপতিদের মতে পৃথিবীর আটটি স্থাপত্যকলার নিদর্শন উল্লেখ করতে হলে এটিকে বাদ দেওয়া যায় না। তবে এটি ঠিক মসজিদ নয়, এটাকে 'পুণ্যসৌধ' বলা চলে—আরবীতে এর নাম কুব্বৎ উস্‌সখ্‌রা (ডোম্ অব্ দ রক্)।

এ দুটি না ভেঙে তো সুলেমানের টেম্‌পল্ গড়া যায় না।

ইতিমধ্যে খবর এসেছে ইহুদিরা জেরূসলমে প্রবেশ করেই মসজিদ উল্-আকসার উপর ইহুদি পতাকা তুলে পূর্ণ এক দিবস সেটা সেখানে রাখে। অনেকেই এই ঝাণ্ডা ওড়ানোটাকে ইহুদির আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন স্বত্বাধিকার দাবী করার পূর্বাভাস মনে করে শঙ্কিত হয়েছেন। খ্রীষ্টান উইলসন শঙ্কিত হননি, এবং খ্রীষ্টান জনসন তো ইহুদির পিছনে রয়েছেনই। যা শত্রু পরে পরে। লেড়েতে শাইলকে লড়াই।

কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে ইহুদিরা চালে করলে একটা ভুল। দায়ান এশকল্ সম্প্রদায়ের জাতবৈরী আরেক ইহুদি সম্প্রদায়ের নাম স্যামারিটান। তাদেরও আড়াই হাজার বছরের পুরনো একটা ভাঙা মন্দির পড়ে আছে একটা টিলার উপর। ১৯৪৮ সালে প্যালেসটাইন বিভাগের সময় স্যামারিটানরা কিছুতেই দায়ান হিস্যায় পড়তে চায়নি। তারা জরডনের আরব হিস্যাতে যেতে চেয়েছিল এবং যায়। জুন মাসে আরব সেখান থেকে পালালে পর এ মন্দিরেও দায়ানরা 'দাবি'র ঝাণ্ডা ওড়াতে গেলে হাতাহাতির উপক্রম হয়—যদ্যপি সেস্থলে মাত্র তিন-চারশ' স্যামারিটান বাস করে (তাবৎ দুনিয়ায় এ সম্প্রদায়ের সাকুল্য সংখ্যাই মাত্র তিন থেকে পঁচিশ) তবু তারা সাহস করে এ 'গুণ্ডামি' রোকতে যায়।

তখন খ্রীষ্টজগৎ—মাইনাস জনসন—শঙ্কিত হল।

জেরূসলমে যে রয়েছে প্রভু যীশুর সমাধি মন্দির—এবং গণ্ডায় গণ্ডায় গির্জে। ক্যাথলিক, গ্রীক অর্থডকস্, আরমেনিয়ান, কপ্‌ট, হাবশী, সীরিয়ান, লুথেরিয়ান আরও কত জাত-বেজাতের (মুসলমানদের তো মাত্র দুটো—হরমশরীফ আর আকসা)। আজ ঝাণ্ডা ওড়ায়নি বটে কিন্তু মুসলমানের দুটো দখল করার পর ইহুদির হিম্মত বেড়ে যাওয়াতে যদি সে খ্রীষ্টানগুলোও—?

পোপ শঙ্কিত হন সর্বপ্রথম। তারপর উইলসেন। তিনি হুঙ্কারিলেন, 'বেরিয়ে যাও, প্রাচীন জেরূসলম থেকে।' দায়ান উত্তরিলেন, 'ইয়ারকি পায়া হৈ? যাব না।'

স্নাব্‌ড্ উইলসন চুপ-ed!!

BanglaBook.org

১ বছর চল্লিশেক পূর্বে হায়দরাবাদের নিজাম প্রায় পাঁচ লক্ষ (পাকা অঙ্কটি কেউ আমাকে বলতে পারেনি) মুদ্রা ব্যয় করে মসজিদটির আমূল সংস্কার করেন।

www.BanglaBook.org

অল্পে তুষ্ট

॥ ১ ॥

আমার পরিচিত জনৈক সমাজসেবী ভদ্রসন্তান রাত করে বাড়ি ফিরছিলেন। শর্ট ফট্ পাবার জন্য যে গলি ধরেছিলেন সেটা প্রায় বস্তি অঞ্চলের মাঝখান দিয়ে এসেছে। হঠাৎ শুনতে পেলেন, পরিত্রাহি চিৎকার—যা এ অঞ্চলে রাতবিরেতে আকছারই শোনা যায়। সমাজসেবীটি একটু কান পাততেই বুঝতে পারলেন, যুগ যুগ ধরে সমাজ স্বামীকুলকে যে হক দিয়েছে এস্থলে সে কুলেরই জনৈক বস্তি-সন্তান সেটি তার স্ত্রীর উপর কিঞ্চিৎ পশুবল সহ প্রয়োগ করছে। এস্থলে সুবুদ্ধিমান মাত্রই তিলার্ধ কাল নষ্ট করে না, কিন্তু আমাদের সমাজসেবীটি এ-কালের যারা 'সেবা'র নামে মস্তানী করে তাদের দলে পড়েন না। দরমার ঝাঁপ ধাক্কা মেরে খুলে হুঙ্কার ছাড়লেন, 'ব্যস, থামো। এসব কী বেলেল্লাপনা হচ্ছে! আমাদের পাব্‌লিক স্পিরিটেড ইয়ংম্যানটি নাটকের এর পরের দৃশ্যে অবশ্যই আশা করেছিলেন সেই অবলা মুক্তি পেয়ে তাঁর সামনে নতজানু হয়ে অঝোরে কৃতজ্ঞতাশ্রু ঝরাবে, এবং তিনিও তাঁর দক্ষিণ হস্ত দ্বারা অদৃশ্য বাতাসের একাংশ অবহেলে দ্বিখণ্ডিত করে, 'বিলক্ষণ বিলক্ষণ' (ইংরিজিতে যাকে বলে 'নটেটোলনটেটোল') বলতে বলতে আত্মপ্রসাদাৎ ডগমগ হয়ে বাড়ি ফিরবেন। ও হরি। কোথায় কি, স্বামী-স্ত্রী দুজনাই প্রথমটায় একটুখানি থতমতিয়ে তারপর বিপুল বিক্রমে হামলা করলে তাঁর দিকে। তিনি প্রায় পালাবার পথ পান না। ইতিমধ্যে বস্তির আরও দু-পাঁচজন জড়ো হয়ে গিয়েছে। সমাজসেবী সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন ওদেরও দরদ যুযুধান দম্পতির প্রতি।

এটা কিছু একটা উটকো ফ্যাচাং নয়। পরবর্তী যুগে আমি দেশবিদেশে—এস্তেক অতিশিক্ষিত মধ্য ও পশ্চিম ইয়োরোপেও এহেন কীর্তন একাধিকবার শুনেছি। দুজনার কাজিয়া মেটাতে গিয়েছ কি মরেছ। দুজনা একজোট হয়ে তোমাকে মারবে পাইকিরি কিল।

এ তো গেল সাদামাটা পশুবল প্রয়োগের বর্বরতা ঠেকাবার প্রচেষ্টা। কিন্তু যে স্থলে দুই পক্ষই সাতিশয় শিক্ষিত—বলতে কি, যেন দেশমাতৃকার উচ্চতম অনবদ্য শিক্ষিত সন্তান—এবং যা হচ্ছে সেটি মার্জিততম বাকযুদ্ধ, সেস্থলেও আপনি যদি ফৈসালা করে দিতে চান তবে ফল একই। উভয়পক্ষ একে অন্যের প্রতি নিক্ষিপ্ত আপন আপন বাক্যবাণ তন্মুহূর্তেই সংবরণ করে আপনাকে করে তুলবেন এজমালি চাঁদমারির টার্গেট।

এ তো হল সে-দুর্দৈবের কীর্তন যে-স্থলে আপনার নিজস্ব—আপন বিশ্বাস অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তৃতীয় মত আপনি পোষণ করেন না; আপনি সের্ফ উভয়পক্ষের যুক্তিতর্ক সুবিবেচনাসহ প্রণিধান করে সুলে-সুপারিশসহ একটা মধ্যপন্থা বাতলাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যেস্থলে আপনি তৃতীয় মত পোষণ করেন সেখানে—ঈশ্বর রক্ষতু!—আপনার অকালমৃত্যু অনিবার্য।

ভূমিকাটি আমার অনিচ্ছায় দীর্ঘ হয়ে গেল, কিন্তু প্রয়োজনাতীত বৃহল্লাঙুল নয়। কারণ ভবিষ্যতেও বহু-বহুবার বহু বাদানুবাদের সম্মুখে আমাকে ঠিক এইভাবেই সরকারী প্রাণ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

(আজকালের ফ্যামিলি প্ল্যানিঙের জমানায় ওটা আর পৈতৃক নয়, এ জন্মের পরও দুগ্ধাভাবে, অন্নাভাবে ওটা সরকারের হাতেই সমর্পিত) হাতে নিয়ে এগোতে হবে।

* * *

একদল গুণীজ্ঞানী বলছেন প্রত্যেক—আমি প্রত্যেক শব্দটির উপর বিশেষ জোর দিতে চাই—অধমের যা কিছু বক্তব্য সে ঐ প্রত্যেক (বা তাবৎ, কুল্লে) শব্দটি নিয়ে—ছাত্রটিকে শিখতে হবে নিদেন দুটি ভাষা। কেউ কেউ বলেন, সে শিখবে (ক) আপন মাতৃভাষা ও ইংরিজি, কেউ কেউ বলেন (খ) মাতৃভাষা এবং হিন্দী। এঁরা ইহলোকের তাবল্লোককে দোভাষী বানাতে চান—একেবারে শব্দার্থে নয় (ইহসংসারে কটা লোকের মাত্র একবারের তরেও প্রফেশনাল দোভাষীর প্রয়োজন হয়?), ভাবার্থে। তফাত এঁদের মধ্যে এইটুকু : একদল মাতৃভাষা ও তদুপরি ইংরিজি শেখাতে চান, অন্য দল ইংরিজির বদলে হিন্দী। (আর যাঁদের মাতৃভাষাই হিন্দী তাঁদের কি হবে? সেটা এখনও স্থির হয়নি। তাঁরাই স্থির করবেন। অবশ্যই। কই সে মরদ যার মাতৃভাষা হিন্দী নয় এবং তৎসত্ত্বেও সে হিন্দীভাষীদের সামনে কোনও 'বাৎ প্রস্তাবও' করবে? হায়, আপসোস! কেন হিন্দীভাষী হয়ে জন্মালুম না?)

এ তো গেল দোভাষীর দল।

অন্য দল ত্রিভাষী। এঁরা বলেন, অত ঝগড়া ফ্যাসাদের কী প্রয়োজন? বিদ্যার্থী তিনটে ভাষাই শিখবে। (গ) মাতৃভাষা, হিন্দী এবং ইংরিজি অর্থাৎ মাতৃভাষা শিখতেই হবে, তারপর কেউ বলছেন সেকেন্ড ল্যানগুইজ হবে হিন্দী, কেউ বলছেন, না, ইংরিজী, আর এই ত্রিভাষীর দল মাতৃভাষা তো খাবেনই তদুপরি ডুডুও খাবেন টামাকও খাবেন।

এই দোভাষী ও ত্রিভাষীতেই ঝগড়া।

এ ছাড়া আরও বহুবিধ আছেন। যেমন কেউ কেউ বলেন, ভারতীয় সংস্কৃতি, বৈদগ্ধ্য সভ্যতার প্রধান ভাণ্ডার সংস্কৃতে। সেই সংস্কৃতই যদি বিদ্যার্থী না শিখল তবে সে নিজেকে ভারতীয় বলে কোন্ মুখে? যে বেদ উপনিষদ ষড়দর্শন নিয়ে আমরা নিজে গর্ব অনুভব করি, বিশ্বজনের সামনে তুলে ধরি, সে-সবই তো সংস্কৃতে। এবং এই সংস্কৃতই একমাত্র বিদগ্ধ ভাষা যে-ভাষা একদা আসমুদ্রহিমাচল আর্য-অনার্য সকলকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে রেখেছিল। আজ যদি আমরা সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় আমাদের কারিকুলামে সংস্কৃতকে স্থান না দি এবং ফলে তার মৃত্যু ঘটে তবে ঐতিহ্যবিহীন হটেন্টটে ও ভারতীয়তে একদিন আর কোনও পার্থক্য থাকবে না। যুক্তিগুলো যে খুবই সত্য এবং গভীর তাৎপর্যপূর্ণ সে বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ সম্প্রদায় রণাঙ্গন থেকে ক্রমেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন। সংগ্রামে পরাজিত হওয়ার ফলে নয়। কারণ এঁদের বিরুদ্ধে কেউই সংগ্রাম ঘোষণা করে না—দেশের কর্তাব্যক্তিরা এঁদের সের্ফ অবহেলা করে, just by ignoring এদের hors de combat. রণাঙ্গন থেকে অপসারিত করেন। কারণ সংস্কৃত বাবদে এইসব কর্তাব্যক্তিদের বৃহত্তমাংশ ১০০% ignoramus। ...এরই পিঠ পিঠ মুসলমানরা বলেন, তাজমহল (কোনও মারকিন টুরিস্ট যখন তাজমহলের সামনে দাঁড়িয়ে কোনও ভারতীয় হিন্দুকে ঐ ইমারতের প্রশংসা করে অভিনন্দন জানায় তখন সে তো মুখ বাঁকিয়ে বলে না, 'না মশাই, এটা আমার দেশের মাটিতে আছে বটে কিন্তু আমার ঐতিহ্যগত সম্পদের অংশ নয়, এটা মোচলমানদের—ইউ আর বারকিং আপ দি রঙ্ ট্রী!'), মোগল চিত্রকলা,

www.BanglaBook.org

খেয়াল, ঠুংরি, ফারসীতে লিখিত ভুরি ভুরি ইতিহাসাদি অমূল্য গ্রন্থরাজি ভারতীয় সংস্কৃতির অংশবিশেষ—এদের সম্যক চর্চার জন্য ফারসী শেখানো উচিত, এবং ধর্মচর্চার জন্য যে আরবী ভাষা শিক্ষা ভিন্ন নান্য পন্থা বিদ্যতে সে তো স্বতঃসিদ্ধ। সংস্কৃতওলাদের মত এঁরাও বারোয়ারিতে কস্কে পান না—উপরে উল্লিখিত একই কারণে।...এর পরে আছেন জৈন ধর্মাবলম্বী। এঁদের ধর্মগ্রন্থ অর্ধমাগধীতে। পার্সীদের ধর্মগ্রন্থ প্রধানত আবেস্তার প্রাচীন পারসীকে। এদেশে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর সংখ্যা নগণ্য কিন্তু তাঁদের শাস্ত্রীয় ভাষা পালিকে নিরঙ্কুশ উপেক্ষা করলে আমরা 'বৃহত্তর ভারতে' মুখ দেখাতে পারবো না। আমার এ নগণ্য জীবনে যে দুটি বিদেশীর সঙ্গে আমি একই ডরমিটরিতে কিছুকাল বাস করি তাঁদের উভয়ই ছিলেন সিংহলের বৌদ্ধ শ্রমণ। শ্রমণ ধর্মপাল ও শরণাঙ্কর : এদেশে এসেছিলেন পালি ও সংস্কৃত অধ্যয়নের জন্য। এ ছাড়া শ্যামের রাজগুরুও বার্ধক্যে এসেছিলেন তথাগতের আপন দেশে নির্বাণ লাভার্থে। হিন্দুর বার্ধক্যে বারাণসীর ন্যায়। ...এবং আছেন খ্রীষ্টসম্প্রদায়, যদ্যপি বাইবেলের আদিমাংশ (পূর্ব মীমাংসা?) হীবরুতে ও নবীনাংশ (উত্তর মীমাংসা?) গ্রীকে, তথাপি খ্রীষ্টানদের সর্বজনমান্য বাইবেলের অনুবাদ 'ভুলগাতে' লাতিন ভাষায়। লাতিন ভিন্ন খ্রীষ্ট পাদরির শিক্ষাদীক্ষা অসম্পূর্ণ।

হালফিল বিজ্ঞানের জয়জয়কার! এ 'বিদ্যা' ষোল আনা রপ্ত করতে হলে নাকি জরমন ভাষা অবর্জনীয়।

অতি অবশ্য এখানে একটি কথা বলে রাখা উচিত। নিতান্ত কট্টর ভিন্ন কোনও মহামহোপাধ্যায়ই বিধান দেন না যে সর্ববিদ্যার্থীকে ঘাড়ে ধরে সংস্কৃত শেখাতে হবে, কট্টর ভিন্ন কোনও মোল্লা তাবল্লোকের কল্‌মা ধরে বিসমিল্লা শেখাতে চায় না। প্রাগুক্ত দোভাষী এবং ত্রিভাষীরা কিন্তু যেসব ভাষা শেখাতে চান, সেগুলো ঘাড়ে ধরে শেখাতে চান। অতএব এই ভাষার রেস্‌-এ সংস্কৃত ফারসী পালিওয়ালাদের উপস্থিত also ran বলে খারিজ করে দেওয়া যেতে পারে। আমি শুধু নির্ঘণ্ট নিরঙ্কুশ করার জন্য এদের উল্লেখ করলুম।

* * *

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত ত্রিগুণা সেন আসলে বৈজ্ঞানিক বটেন, কিন্তু হিউম্যানিটিজেও তাঁর আবাল্য অনুরাগ। তদুপরি তাঁর কমনসেন্‌স আছে। অতএব তিনি সার্থকনামা ত্রিগুণধারী সেন-এর বহুবচন সেন্‌স বা sense।

দোভাষী ত্রিভাষীদের সামনে আরেকটা জীবনমরণ সমস্যা : বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম কি হবে? ইংরিজী, হিন্দী, আঞ্চলিক ভাষা—তিনটেরই সমর্থক আছেন।

এই সুবাদে আঞ্চলিক ভাষার সমর্থন করতে গিয়ে শ্রীসেন বলেন (হুবহু বাক্যগুলো আমার মনে নেই বলে শ্রীসেন তথা পাঠকের প্রতি যদি অবিচার করে ফেলি তবে কোনও সজ্জন যেন আমার মেরামতী করে দেন, পৃথিবীর কোন্ সভ্য স্বাধীন দেশে মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়? শিক্ষামন্ত্রীর কথায় সায় দিয়ে আমাদের নিবেদন :—

একশ' বছরও হয়নি কবি হেম বাঁড়ুয্যে লিখেছিলেন—

"চীন ব্রহ্মদেশ অসভ্য জাপান
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেই জাপানেও কি কখনও জাপানী ভিন্ন অন্য কোনও ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়েছে? বস্তুত পাঠক প্রত্যয় যাবেন না, মাত্র কিছুদিন হল ক্যান্সার রোগের এক স্পেশ্‌লিস্‌ট্ আমাকে বলেন, ঐ রোগের গবেষণা জাপানে যা হয়েছে সেটা না জেনে সে সম্বন্ধে আপটুডেট হওয়া যায় না। এবং ওর সব কিছুই হয় জাপানী ভাষাতে।...কিন্তু অত দূরে যাবার কি প্রয়োজন? আফগানিস্তানের জনসংখ্যা কত? দেশটা কি খুবই মডার্ন? না তো। আমি যখন সে-দেশে পৌঁছই (১৯২৭) তখন সেখানে সবে প্রথমে কলেজের প্রথম বর্ষ আরম্ভ হব-হব করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অরুণোদয় হতে ঢের ঢের দেরি। অথচ পরের বছর যখন ঐ ফার্‌স্‌ট্ ইয়ার চালু হল তখন তার মাধ্যম হল ফারসী। কিন্তু বৃথা বাক্যব্যয়। পাঠক একটু অনুসন্ধান করলেই জানতে পারবেন ক্ষুদ্র ফিন্‌ল্যান্ডই বলুন আর বলিভিয়াই বলুন, শিক্ষার বাহন সর্বত্রই মাতৃভাষা।

* * *

এইবারে আমরা পৌঁছলুম রণাঙ্গনের কেন্দ্রভূমিতে।

এই যারা দোভাষী ত্রিভাষী—হয় ইংরেজী নয় হিন্দী কিংবা উভয়ই নিয়ে মাথা ফাটাফাটি করছেন তাঁদের শুধোই—শিক্ষামন্ত্রীর মন্ত্র এবং যন্ত্রের সঙ্গে টায় টায় গলা মিলিয়ে—'পৃথিবীর কোন্ সভ্য স্বাধীন দেশের কজন উচ্চশিক্ষিত লোক মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য একটি ভাষা—উত্তমরূপে না হোক মধ্যম বা অধম রূপেই—জানে?'

আমি জনপদবাসী বা নগরের অর্ধশিক্ষিতদের কথা তুলেছিনে। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে রীতিমত বি-এ পাস করেছে, তাদেরই কজন মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য আরেকটি ভাষা পড়তে পারে শুনলে বুঝতে পারে লিখতে পারে এবং মোটামুটি সাদামাটা কথাবার্তা বলতে পারে? বলা বাহুল্য, যারা কোনও বিদেশে বেশ কিছুকাল কাটিয়েছে তাদের কথা হচ্ছে না। সেস্থলে সম্পূর্ণ অশিক্ষিত লোকও বিদেশী ভাষা অনেকখানি রপ্ত করে ফেলে আপন আপন মেধা অনুযায়ী।

এ-দেশের কথাও হচ্ছে না। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি মাত্র সেদিন (যদ্যপি এই কুড়ি বৎসরেই আমরা কী তীব্র গতিতেই না ইংরিজির খোলস বর্জন করছি—এ বর্জনের জন্য কোনও মেহনৎ কেরামতি করতে হয় না, আমাদের চৌকশ গোঁপখেজুরে আলস্যই এর পরিপূর্ণ ক্রেডিট পায়।[১] এবং এই দেশেই প্রায় সাতশ' বছর ফরাসী ছিল স্টেট ল্যান্‌গুইজ—সেইটে একদম পালিশ করে তুলতে আমাদের একশ' বছরও লাগেনি।

ফরাসী দেশের উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির কত পারসেন্ট ইংরিজি বই পড়তে পারে? বলতে পারে? এক পারসেন্টও না। মারকিন উচ্চশিক্ষিত লোক—স্কুল-কলেজে আট বছর ফরাসী শিখেছে—ক' পারসেন্ট ফরাসী পড়তে বলতে পারে? ঠিক বি-এ পাসের পর? তার দশ বছর পর?

---

১ 'গোঁপখেজুরে'র গল্পটি অতি-প্রাচীন ক্ল্যাসিক পর্যায়ের। খেজুর গাছতলায় একটা লোক শুয়েছিল। একটা খেজুর কপালে পড়ে গড়াতে গড়াতে তার গোঁপে এসে ঠেকল। কিন্তু লোকটা এমনই হাড়-আলসে যে জিভ দিয়ে সেটা টেনে নিয়ে মুখে না পুরে অপেক্ষা করতে লাগল। দিনশেষে পদধ্বনি শুনে বিড়বিড় করে বললে, 'দাদা, এদিকে একটু ঘুরে যাবার সময় যদি দয়া করে তোমার পা দিয়ে ঐ খেজুরটা আমার মুখের ভিতর ঠেলে দাও! থ্যাঙ্কয়ু!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অর্থাৎ স্বাধীন দেশের শিক্ষিত লোককেও দোভাষী করা যায় না। ওটা একটা ফ্যাশান—ইস্কুল-কলেজে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুইজ পড়ানো।

পেটের ধান্ধায় অনেকে দোভাষী হয়—স্কুলে না গিয়েও। মারওয়াড়ি ব্যবসায়ী তামাম আসাম চষে খায়। ও! মারওয়াড়ের গ্রামে গ্রামে বুঝি সুবোশাম ইস্কুলে ইস্কুলে আসামী ভাষার দিগ্‌গজ পণ্ডিত বানানো হয়!

তাই বলি, দোভাষী ত্রিভাষী—এদেশের শিক্ষিত লোকও হবে না। থাকবে একভাষী। এবারে দোভাষী ত্রিভাষীর দল আপসের চুলোচুলি ভুলে গিয়ে একজোট হয়ে আমাকে—আমি, একভাষীকে—মারবেন পাইকিরি কিল। এখন বলুন, আমার ভূমিকাটি কি অতি দীর্ঘ হয়েছিল?

॥ ২ ॥

ব্যক্তি-বিশেষের বেলা পুরুষকারই যে রকম শেষ কথা নয়, একটা জাতি বা দেশের বেলাও তাই। আমরা যতই ভেবেচিন্তে পারলিমেন্টে তর্কাতর্কি করি, কাগজে কাগজে পাবলিসিটি দিয়ে আটঘাঁট বেঁধে একটা প্রোগ্রাম বা প্ল্যান চালু করি না কেন, শেষ পর্যন্ত তার ফল যে কি উতরাবে সে-সম্বন্ধে আগের থেকে দৃঢ়নিশ্চয় হওয়া যায় না। একটা দেশের ধর্ম, খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এগুলো এমনই বিরাট বিরাট ব্যাপার যে এগুলোকে মানুষ আদৌ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কিনা সে নিয়ে আমার মনে গভীর সন্দেহের উদয় হয়; মনে হয় কি যেন এক অদৃশ্য নিয়তি মানবসমাজকে শাসন করে চলেছে, তার উপর আমাদের কর্তৃত্ব যদি বা থাকে সে অতিশয় যৎসামান্য। তাহলে প্রশ্ন উঠবে, এসব বিষয় নিয়ে আমাদের কি তবে চিন্তা করবার কিছুই নেই? অন্ধ নিয়তিই সব? তার নাম অদৃষ্ট, কর্মফল, কিস্মৎ—যে নামেই তাকে ডাকুন।

হজরৎ মুহম্মদ একদিন বেদুইনদের সামনে পুরুষকার ও অদৃষ্ট সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার পর এক বেদুইন তাঁকে শুধালে, 'তবে কি, হজরৎ, উটগুলোকে আমরা দড়ি দিয়ে না বেঁধে আল্লার ভরসায় (কিস্মতের উপর) ছেড়ে দেব?' হজরৎ বললেন, 'না, দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে তারপর আল্লার উপর ভরসা রাখবে।' অর্থাৎ আমরা আটঘাঁট বেঁধে যতই প্ল্যানিং করি না কেন, সকালবেলা বেদুইনের মতই হয়তো দেখবো, উট হাওয়া, প্ল্যান ভণ্ডুল। কিন্তু তবু উট বাঁধতে হয়, প্ল্যানিং করতে হয়।

বৌদ্ধধর্মও নাকি বলেন, মানুষের জীবন নদীস্রোতে নিচের দিকে চলমান গাছের গুঁড়ির মত; ধাক্কাধাক্কি করে সেটাকে খানিকটে ডাইনে বাঁয়ে সরানো যায় কিন্তু স্রোতের উল্টোদিকে চালানো যায় না।

এবং কার্‌ল্ মার্কস্‌ও নাকি বলেছেন, ইতিহাসের নিয়তি নানা সামাজিক প্যাটার্ন্ পরিবর্তিত করতে করতে সর্বশেষে প্রলেতারিয়া-রাজ হামেশাই আনবে। মানুষ সজ্ঞানে আপন চেষ্টা দ্বারা তার গতি দ্রুততর করে দিতে পারে মাত্র।

অতএব তর্কবিতর্ক করি, চেষ্টা দিই :—কিন্তু জানি, শিক্ষার্থী আজ দোভাষীই হোক, আর ত্রিভাষীই বলুক—আখেরে সে একটি ভাষাই শিখবে, তাই দিয়ে জ্ঞানার্জন করবে, কাজকর্ম চালাবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাঠককে ফের বলছি, এখানে আমি বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা বলছি। অর্থাৎ জোর করে দেশের তাবৎ ইস্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীকে দুটো বা তিনটে ভাষা শেখাবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম। তারা নিছক পরীক্ষা পাস করার জন্য ভাষা শিখবে কিন্তু পরবর্তী জীবনে দ্বিতীয় বা/এবং তৃতীয় ভাষার চাবি দিয়ে ঐ সব ভাষার জ্ঞানভাণ্ডার খুলে ওই জ্ঞান জীবনে সঞ্চারিত করে চিন্তাধারাকে বহুমুখী করবে না—অথচ বিদেশী ভাষা শেখার প্রধান উদ্দেশ্য তো ওইটেই।

এবারে একটা উদাহরণ নিই।

নরমানরা ইংলন্ড জয় করে সেখানে চালালো ফরাসী ভাষা। শুধু যে রাজদরবারেরই ভাষা ফরাসী হয়ে গেল তাই নয়, শিক্ষাদীক্ষার বাহন, সংস্কৃতি বৈদগ্ধ্যের মাধ্যম, নাট্যশালা সঙ্গীতের ভাষা—সব কিছুই তখন ফরাসী এবং ফরাসীর মাধ্যমে তার জননী লাতিন। পাকা তিনশ'টি বছর চললো ফরাসী ভাষার একচ্ছত্রাধিপত্য। ইংরিজীতেও যে কোনও প্রকারের চিন্তা বা অনুভূতি প্রকাশ করা যায় সে-কথা দেশের ভদ্রজন সম্পূর্ণ ভুলে গেল। ফরাসী ভাষা নাকি আল্লাতালা স্বয়ং এমনই মধুর পরমপ্রিয় করে নির্মাণ করেছেন—ইত্যাদি ইত্যাদি (এদেশেও আমরা সংস্কৃতকে দেবভাষা খেতাব দিয়েছি এবং সন্ত তুকারাম তাই বক্রোক্তি করেছিলেন; "সংস্কৃত যদি দেবভাষা হয়, মারাঠী কি তবে চোরের ভাষা?")। পুরো তিনশ'টি বছর পর ইংলন্ডের রাজার মাতৃভাষা আবার হল ইংরেজী কিন্তু হলে কি হয় ফরাসী যদিও ক্রমে ক্রমে হটে যেতে লাগলো তবু দেখা যাচ্ছে এই সেদিন—১৭ শতাব্দী অবধি আইন-আদালতের ভাষা ছিল ফরাসী।[১]

ইংরিজী একদিন পদ পেল বটে, তাই বলে কি ফরাসী 'কর্তার ভূত' কাঁধ থেকে অত সহজে নামে? ইংলন্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত M. Ed রা বলতে পারবেন কবে বিলেত থেকে ফরাসী কমপাল্‌সরি সবজেক্টরূপে লোপ পেল। কিন্তু তারপরও, আজ অবধি, ঐ ফরাসী অপ্‌শনাল হিসেবে পড়াবার জন্য বিলেত প্রতি বৎসর কত খরচা করে?

এবং আজও ইংরেজ ফরাসীকে নিয়ে যতই মস্করা করুক না কেন, জেবে দুটো কড়ি

---

১ আইন-ব্যবসায়ীদের মত রক্ষণশীল প্রাণী ত্রিলোকে দুর্লভ। ইংরিজী অবহেলিত বা বিতাড়িত হলে এই বেহেশ্‌তী ভারতভূমি যে কোন্ দোজখে পরিণত হবে তারই কল্পনায় অধুনা শ্রীযুক্ত ছাগলা [ওটা ছাগলাই, স্যর, চাগলা নয়। পর পর পুত্রসন্তান মারা গেলে যে রকম আমরা 'এককড়ি' 'ফকির' 'নফর' নাম রাখি, গুজরাতীরা তেমনি 'ছাগলা' (ছাগল) 'মাঁকড়' (পিঁপড়ে, ক্রিকেটার), ঝিঁড়া (জিন্না, ছোট) রাখে] করুণ আর্তনাদ করে বলেছেন, 'এই একশ' বছর ধরে আইন ব্যবসা যে (পর্বতপ্রমাণ) আইনের কেতাবপত্র ইংরিজীতে রচনা করেছেন সেটা লোপ পাবে, তার ব্যবহার থেকে ভারতবাসী বঞ্চিত হবে। এর উপর দীর্ঘ মন্তব্য না করে শুধু বলবো, 'এদেশ থেকে ইংরিজীকে নিরঙ্কুশ বিতাড়িত করার জন্য এই একটি মোক্ষম যুক্তি পাওয়া গেল বটে!' এবং ছাগলা সম্প্রদায়কে সবিনয় প্রশ্ন : 'তবে কি প্রলয়াবধি এদেশে আইন বাহন ইংরিজীই থাকবে?' কারণ যত দিন যাবে, পর্বত যে 'পর্বততর' হতে থাকবে! মায়া যে 'মায়াতর মায়াতম' হতে থাকবে! অবশ্য আমি ইংরিজী বিতাড়নের জন্য হন্যে হয়ে উঠিনি, একটি বিশেষ স্বার্থান্বেষী সম্প্রদায়ের মত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জমামাত্রই হলিডে করার জন্য 'পরাণ ভয়ে হরিণে'র মত ছুট লাগায় প্যারিস পানে[১]—মনে আশা সেই সব কুকীর্তি করবে, যেগুলো আপন দেশে করা যায় না—সিম্‌প্‌লি নট ডান্। ইংরেজী সাহিত্য যে ফরাসী সাহিত্যের কাছে কতখানি ঋণী তার জরিপ করা আমার কর্ম নয়। শব্দবিদ না হয়েও বেপরোয়া আন্দাজে বলি, ইংরিজীর শতকরা নব্বইটি চিন্ময় শব্দ (অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট ভকাবুলারি) হয় ফরাসী, নয় ওরই মারফৎ লাতিন গ্রীক থেকে নেওয়া।

আরও কত শত বাবদে আজও ইংরিজী ভাষা, সাহিত্য, রান্নাবান্না (মেনুটা এখনও ৮০% ফরাসিস; বীফ, মাটন্, পর্‌ক্, ভীল, ভেন্‌জন্ = গরু, ছাগল, শুয়োর, বাছুর, হরিণের মাংস—সব কটা শব্দ ফরাসী থেকে এসেছে), আদবকায়দা (R. S. V. P. থেকে P. P. C.), মদ্যাদি (কন্যাক্ থেকে শ্যামপেন) ফরাসীর কাছে ঋণী—বস্তুত বিলেতে, আজও সভ্যতা ভদ্রতার কোন্ না বস্তু ফরাসী প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল বা আছে?

একদা কতিপয় শিক্ষাবিদ ইংরেজের মনে প্রশ্ন জাগলো, এই যে আমরা ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য শেখানোর জন্য আমাদের দেশে প্রায় হাজার বছর ধরে এত টাকা ঢেলেছি, দেখি তো, তার ফলটা কি হয়েছে? জনৈক ফরাসী ভদ্রলোককে নাবানো হল লন্ডনের রাস্তায়। যারই বেশভূষা আচার-আচরণ দেখে মনে হল লোকটি মার্জিত উচ্চশিক্ষিত তাকেই ফরাসী ভদ্রলোক ফরাসীতে শুধলো, 'আমি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি, বলতে পারেন, কোন্‌দিকে গেলে সব চেয়ে কাছের ট্যুব স্টেশনে পৌঁছব?' কথিত আছে, ৯৩ না ৯৭ নম্বরের ভদ্রলোক প্রশ্নটা বুঝতে পারলেন বটে কিন্তু ফরাসীতে উত্তর দিতে পারলেন না। ১০৩ না ১০৭ নম্বরের জন্য বুঝি কোনওগতিকে অতি ভাঙা-ভাঙা ফরাসীতে উত্তরটা দিলেন।

এরপর আরও নানা উদাহরণ, নানা যুক্তি দেখিয়ে প্রাগুক্ত গবেষকগণ অতিশয় ন্যায্য প্রশ্ন শুধিয়েছেন, তাহলে ঐ 'পোড়া'র ফরাসী শেখাবার জন্য এদেশে অত কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢালার কি প্রয়োজন?

* * *

এ বিষয়টি আরও সবিস্তর আরও উদাহরণ দিয়ে গুছিয়ে বলতে হয়। আমার শক্তি অতিশয় সীমাবদ্ধ। তদুপরি যখন জানি, যা হবার তা হবেই, তখন কেমন যেন উৎসাহের অভাবে কলমের কালি শুকিয়ে যায়। তবু লিখছি, এলোপাতাড়ি হাবিজাবি বিস্তর বেহুদা এক্‌স্‌পেরিমেন্ট করার পর মার খেয়ে খেয়ে যখন মাত্র একটি ভাষাই বাধ্যতামূলক করা যায় এ-তত্ত্বটি আবিষ্কার করবো, যা অন্যান্য স্বাধীন দেশে করে ফেলেছে, তখন কেউ যেন না বলে, এযুগের, অর্থাৎ আমাদের বর্তমান যুগের লোকের বিন্দুপরিমাণ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা শক্তি ছিল না।

---

১ এস্থলে বক্ষ্যমাণ রচনাটি যদি আমাকে কপালের গর্দিশবশত ইংরিজীতে লিখতে হত তবে 'পরাণভয়ে হরিণের ছোটা'টা হুবহু ফরাসী ইডিয়মে লিখতুম—Ventre a terre—অর্থাৎ with belly to ground; এমনি সামনের দিকে ঝুঁকে প্রাণপণ ছুটছে যে মনে হয় মানুষটার পেটটা বুঝি মাটি ছুঁয়ে ফেলেছে। (ফরাসী শব্দতাত্ত্বিকদের জন্য 'ভাঁৎর' ভেনট্রিলোকুইস্‌ট্, পেট থেকে যে কথা বের করে; 'তের' টেরেসট্রিয়াল = পার্থিব তুলনীয়।)

www.BanglaBook.org

ইংরিজী তো এদেশে প্রায় একশ' বছর ধরে কমপালসারি ছিল। ইংরিজী শিখলে আর্থিক সামাজিক উন্নতি হবে বলেই লোকে ইংরিজী শিখেছে। জ্ঞানার্জন করে চিত্তপ্রসারের জন্য ইংরিজী শিখেছে এ-কথা বললেও আমি বিশ্বাস করবো না। এখন বলুন ক'টা লোক অবসর সময় ইংরিজী বই পড়ে, ইংরিজী বই কেনে? এ তো সাধারণ জনের কথা, কিন্তু প্রত্যয় যাবেন না, আমার পরিচিত একটি ছোকরা ইংরিজীর লেকচারার সর্বক্ষণ বাঙলা বাঙলা করছে, রবীন্দ্রসাহিত্যে তার সুন্দর দখল, কৌতূহল প্রশংসনীয়। ওদিকে ইংরিজীর বেলা সেখানে পড়াশুনো করে আরও চৌকশ হবার কোনও চাড় নেই। জানে যেটুকু ইংরিজী রপ্ত আছে সেইটে ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে সে একদিন রীডার ও যথারীতি প্রফেসরও হবে।

এই সেমি-কমপালসরি সংস্কৃত, ফরাসী, আরবী (বা পালি লাতিন) নিন। সায়েনসে সীট পায়নি বলে, বা অন্য যে কোনও কারণেই হোক, প্রায় অনিচ্ছায় বি-এ পাশের সময় সংস্কৃত ছিল। হয়তো বা অনার্সও ছিল। তাদের ক'জনকে আপনি অবসর সময় সংস্কৃত (বা ফরাসী) পড়তে দেখেছেন, তার শেলফে নূতন কেনা সংস্কৃত বই দেখেছেন? ফারসী তো অতি সরল ভাষা—ক'জন ফারসী অনার্সওলা গ্রাজুয়েট ফারসী 'আউট-বুক' পড়ে?

অবশ্য যাঁরা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় দুই বা তিনটি ভাষা শেখেন—বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে, তাঁদের কথা সম্পূর্ণ আলাদা। অধ্যাপক সত্যেন বোস স্বেচ্ছায় ফরাসী জরমন শিখেছেন। এখনও ওই দুই ভাষায় বই পড়েন।

॥ ৩ ॥

অগুনতি দফে প্রশ্ন শুনতে হয়েছে, 'ইংরিজীতে ই চলবে তো? অন্য কোনও ভাষা না জানলেও চলবে—না? কনটিনেনটে তো সবাই ইংরিজী বোঝে,—না?'

হুঁ, বোজে। খুব বোঝে! তবে শুনুন। গল্পটি অবশ্য প্যারিস সংক্রান্ত নয়—যদিও খুদ প্যারিসেরই কোনও একটা মুদির দোকানে তেল নুন কেনার চেষ্টা করে দেখুন না ইংরিজীর মারফৎ—তবে এটি পৃথিবীর যে-কোনও জায়গা সম্বন্ধে প্রযোজ্য, সেটা পৃথিবী প্রদক্ষিণ না করেও বলা যায়।

প্রভাঁসের একটি দোকানের সামনে বেশ মোটা মোটা হরফে লেখা : 'ENGLISH SPOKEN'। এটার উদ্দেশ্য মারকিন ট্যুরিস্টকে আকর্ষণ করা। ইংরেজকে নয়, কারণ ফরাসী জাত বিস্তর মার খেয়ে খেয়ে ভালো করেই জানে, ইংরেজ কিপটেমিতে প্রায় তাকেও হার মানায় এবং জাতটার আগাপাস্তলা বেনেদের হাড্ডি দিয়ে তৈরি বলে দোকানের প্রত্যেকটি জিনিসের পাইকিরি ভাও, খুচরো দর, কমিশন, সেস, ট্যাক্স দফে দফে জানে। তা সে-কথা থাক গে।...এস্থলে ঢুকেছে এক মারকিন। খাজা মারকিন ড্রল (আড়) সমেত একাধিকবার মারকিন জবানে বলে গেল তার প্রয়োজন অথচ কাউনটারের পিছনে ফরাসী দোকানীউলী শুধু মিটমিটিয়ে মৌরী হাসি চিবোয়—মালি কাড়বার কোনও নিশানাই নেই। মারকিন বার বার একই কথা বলতে বলতে হঠাৎ বুঝতে পারলো, মাদাম তার কথার এক বর্ণও বুঝতে পারছে না। বিরক্ত হয়ে তখন সে সেই সাইনবর্ড-টার দিকে আঙুল তুলে বললে, 'তবে ওটা ওখানে ঝুলিয়েছ কি করতে? ইংরিজী যখন বোঝো না এক বর্ণও?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এবারে যেন মাদাম ব্যাপারটা বুঝেছে—নিশ্চয়ই এ ফার্‌স্ আকছারই হয়—একগাল হেসে তার ইংরিজীভাষা ভাণ্ডারের শেষ শব্দটি খরচা করে বললে, 'উই, উই, ইয়েস ইয়েস, "এঙলিশ স্পোকেন!" সারতেনলি। আওয়ার কস্‌তোমার্‌স্ স্পীক—উই নৎ স্পীক'—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, "ইংরিজী বলা হয়" বই কি! আমাদের খদ্দেররা বলেন। আমি বলি না।'

এটি মনে রাখবেন। আপনার অন্য কোনও কাজে না লাগলেও এটি দিয়ে ব্যাকরণের প্যাসিভ ভইস এবং তস্য প্রসাদাৎ কি কি সুখ-সুবিধে হয় সেটা বাচ্চাদের শেখাতে পারবেন। মাদাম তো আর নোটিশে বলেনি, 'উই স্পীক ইংলিশ', বলেছে 'ইংলিশ স্পোকেন'—এবং ইহসংসারে কে কোথায় ইংরিজী বলে কি না বলে, সেটা কুইনজ ইংলিশ না সাউথ ক্যারোলাইনার নিগার ইংলিশ সে খতিয়ান দেবার জিম্মেদারি তো বেচারী প্রভাসিনী দোকানউলীর নয়!

খোদ প্যারিসের মুদির কথা বলছিলুম। আপনি হয়তো বিরক্ত হয়ে বলবেন, 'তুমিও য্যামন! আমি কি প্যারিস যাচ্ছি ঘৃতলবণতৈলতণ্ডুলের জন্য!' এস্থলে আমাকে একটু কথা কাটতে হল! বলতে কি, আমার মনে হয়, এই সব বস্তু আপনি যদি প্যারিসে কিনে এদেশে চালান দিতে পারেন—অবশ্য অস্মদ্দেশীয় সদাশয় সরকার যদি তার উপর বেদরদ ট্যাক্‌শো না চাপান—তবে আপনার প্যারিস ভ্রমণের খরচটাই উঠে যাবে। আর ইতালির ব্রিন্‌দিসি, বারী অঞ্চলে চালের কিলো নিশ্চয়ই আড়াই/তিন টাকা নয়! সর্বোপরি অলিভ তেল! লাল হয়ে যাবেন, মোয়াই, লাল হয়ে যাবেন। ফ্রান্সের মার্সেই অঞ্চলের পাঁচসিকের তেল হেলায়—কালো বাজারে—নিদেন পঞ্চবিংশতি তঙ্কা! তা সে যাক্ গে! ইংরেজের সঙ্গে দু-শ' বছর ঘর করে আমি—সৈয়দের ব্যাটা—আমিও বেনে বনে গিয়েছি—প্যারিস পৌঁছে কোথায় না সন্ধান নেবো 'উবিগাঁ কোতি'র ভুরভুরে খুশবাই—তা না, ত্যালের কেলো, চেলের ভাও! লাও!

প্যারিসের—প্যারিসের কেন—পৃথিবীর পয়লা নম্বরী সর্ব হোটেলের ওয়েটার, 'রুমবয়', কাউন্টারের কেরানী এরা সবাই অল্প-বিস্তর ইংরিজী বলতে পারে। কিন্তু আপনি সে সব হোটেলে উঠবেন না—গ্যাঁটে আপনার অত রেস্তো নেই, থাকলে আমার লেখা পড়তেন না। আর যদি বলেন, না, আপনার সে রেস্তো আছে, তাহলে আর ভাবনা কি? আপনি কোন্ দুঃখে প্যারিস বার্‌লিনে কে কতখানি ইংরেজী বোঝে না তাই নিয়ে মাথা ঘামাবেন? রেখে দিন হাজার দুই আড়াইয়ের মাইনের একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি—সে নিদেন আধা ডজন কন্‌টিনেনটাল ভাষা ঝাড়তে পারে, আপনাকে দেখতে হবে না। স্বপ্নেই যখন খাচ্ছেন তখন পোলাওই খান, ভাত খাচ্ছেন কেন, আর সে পোলাওয়ে ঘি ঢালতেই বা কঞ্জুসি কচ্ছেন কেন? বরদার মহারাজাকে দিনের পর দিন অনায়াসে মিশরে চলাফেরা করতে দেখেছি। কবীন্দ্র রবীন্দ্র যখন প্রাগ বা বুডাপেশটে বক্তৃতা দিতেন তখন সেখানকার য়ুনিভারসিটির সব চেয়ে সেরা ইংরাজীবাগীশ অধ্যাপক হতেন তাঁর দোভাষী। এঁদের কথা আলাদা। আপনি যদি সে পর্যায়ের হন তবে আমার লেখা পড়ছেন কোন্ বদ্ বদ্‌কিসমতের গেরোতে?

পক্ষান্তরে দেখুন, জলপাইগুড়ি থেকে বেরিয়ে অন্ধ খঞ্জ শ্রীধামে পৌঁছয় না, কেদার-বদরীর পুণ্যসঞ্চয় করে না! ভারতীয় কত কালা বোবা কপর্দকহীন প্রতি বৎসর মক্কায় গিয়ে হজ করে! রাখে আল্লা, মারে কে!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চলে যাবে, প্যারিসে ইংরিজী জানা না থাকলেও চলে যাবে, জানা থাকলে অল্পস্বল্প সুবিধে হতে পারে। লন্ডনে যদি শতেকে একজন লোক ফরাসী বলে, তবে দ্বিতীয় যুদ্ধের পূর্বে প্যারিসের রাস্তায় হাজারে একজন ইংরিজী বলতো কিনা সন্দেহ। তাই আঁদ্রে মোরোয়া যিনি এই হালে গত হলেন, বা ল্যগুঈ কাজামাঁ্যা ফ্রান্স দেশের আজব চিড়িয়া, প্যারিসবাসী তাজ্জব মেনে শুধোবে 'ওরা ইংরিজী শিখেছিল! কি করতে? মরতে?'

জরমনিতে অবশ্য আপনার ইংরিজীজ্ঞান একটু বেশী কাজে লাগবে। যদ্যপি ওই দেশ ইংরেজের প্রতিবেশী নয়। তার অনেকগুলো কারণ আছে। তার একটা কারণ আমাদের মূল বক্তব্যের সঙ্গে বিজড়িত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জরমনির আপন ভূমির উপর কোনও সংগ্রাম হয়নি, অর্থাৎ কোনও বিদেশী সৈন্য সেখানে পদার্পণ করেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মারকিনিংরেজ লড়াই করতে করতে, কদম কদম এগোতে এগোতে জরমনির এক বৃহদংশ দখল করে সেখানে থানা গাড়ে এবং কয়েক বৎসর সেখানে বাস করে। গোড়ার দিকের মারকিনিংরেজ চালিত মিলিটারী শাসনকর্তাদের ভাষা তখন যে অতি সামান্যও বলতে পেরেছে সে-ই রেশন সহজে পেয়েছে, ফালতো রুটিটা আণ্ডাটাও তার কপালে নেচেছে। আমার এক জরমন সতীর্থ ধরা পড়ে মারকিন দল জরমন সীমান্তে প্রবেশ করা মাত্রই। ইংরেজী বলতে তার ভালো অভ্যাস ছিল বলে (তার জন্য আমি স্বয়ং কিছুটা দায়ী। আমাদের পরিচয়ের গোড়ার দিকে আমি জরমন জানতুম না বলে সে তার টুটিফুটি ইংরেজী চালিয়েছিল এবং পরবর্তীকালে আমার জরমন খানিকটে সড়গড় হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সে পুরনো অভ্যাস ছাড়েনি) মারকিনরা তাকে 'পত্রপাঠ' দোভাষীর—শব্দার্থে—নোকরি দিয়ে দেয়। ফলে তার বাচ্চাদের দুধের অভাব হয়নি, বৃদ্ধা রুগ্না শাশুড়ীর ওষুধপত্রের অভাব হয়নি। আর যে ভসভস করে অষ্টপ্রহর হাভানা সিগার ফুঁকেছে যা ইতিপূর্বে তার জীবনে কখনও জোটেনি। মার্কিন সৈন্য চলে যাওয়ার পর মনোদুঃখে সে ধূমপান সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছে। আমি তার জন্য গেল বারে বিড়ি নিয়ে গিয়েছিলুম। তার পুনরপি সেই মনস্তাপ। তবে আমি মাঝে-মধ্যে এখনও তাকে দু পাঁচ বাণ্ডিল পাঠাই। ভয়ে বেশী পাঠাতে পারিনে—জরমন কসটম্‌স আমাদের চেয়ে কম যান না।

১৯৪৪ থেকে জরমনির যা দুর্দিন গেছে বিশ্বের অর্বাচীন ইতিহাসে সেটা উল্লেখযোগ্য। মারকিনিংরেজ সেখানে থানা গাড়ার পর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কাকে না রেশনের সন্ধানে ছুটতে হয়েছে ওদের পিছনে? সবাই পড়িমরি হয়ে তখন শিখেছে ইংরিজী। কবে কোন্ ঠাকুদ্দা একবার বেখেয়ালে একখানা 'গাইডবুক টু ইংলিশ' কিনেছিলেন, এ আমলের ঠাকুদ্দা তারই গা থেকে সন্তর্পণে ধূলি ঝেড়ে এক-পরকলাওলা চশমা নাকে চড়িয়ে লেগে গেলেন ইংরিজী অধ্যয়নে—ছাপাখানা আবার কবে বসবে, চশমার দোকান কবে খুলবে কে জানে?

এর পর আর কি আশ্চর্য যে প্রথম ইস্কুল ফের খোলা মাত্রই আণ্ডাবাচ্চারা ইংরিজী শিখতে আরম্ভ করলো, তার তুলনায় আমাদের উনবিংশ সালের ইংরিজী শেখার প্রচেষ্টা ধূলির ধূলি।

একমাত্র পরাধীনতাই মানুষকে মাতৃভাষা ভিন্ন দ্বিতীয় ভাষা শেখায়। চোখের জলে নাকের জলে শেখায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই পরাধীনতাই পিঠ পিঠ আসে আর্থিক পরাধীনতা। আজ জগৎজোড়া মারকিনি ডলারের গরমাই। ইংরেজের তম্বী কমেছে, কিন্তু তিনিও আছেন। উভয়ের ভাষা মোটামুটি একই—ইংরিজী।

তাই আমরা আজ কল্পনাও করতে পারি নে ইংরিজী না শিখে গুষ্টিসুদ্ধ দোভাষী না হয়ে আমাদের চলবে কি করে?

এ-কথা খুবই সত্য, ইংরিজী নিরঙ্কুশ বর্জন করা অনুচিত।

কিন্তু দুনিয়াসুদ্ধ লোককে ঘাড়ে ধরে দোভাষী বানিয়ে সে-সমস্যার সমাধান নয়।

ভঙ্গ বনাম কুলীন

যে-ভাষার প্রশংসায় এক শ্রেণীর মহাজন অধুনা পঞ্চমুখ সেই ভাষায় একটি প্রবাদ আছে : 'হে গভীর-সঙ্কট-সঙ্কুল-অরণ্যের-পথভ্রান্ত-পথিক, অরণ্য ভেদ করে জনপদে না পৌঁছবার পূর্বে হর্ষধ্বনি কোরো না।' অধম, আপ্তবাক্যটি বিস্মরণ করে হর্ষোল্লাস করে বসেছি, এমন সময় দেখি, আমি গভীরতম অরণ্যে। সেই শ্রেণীর সজ্জনগণ এখন আরও প্রাণপণ লড়াই দিচ্ছেন, ইংরিজী যেন সর্বাবস্থায় কলেজাদিতে শিক্ষার মাধ্যমরূপে বিরাজমান থাকে। বোধ হয়, অধুনা শিক্ষামন্ত্রী যে প্রাদেশিক ভারতীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করে দেখবেন বলে মনস্থির করে বসেছেন, এ সংবাদ এঁদের বিচলিত করেছে।

এই শ্রেণীর একাংশ কোনও তর্কাতর্কি না করে তারস্বরে ইংরিজী ভাষা-সাহিত্য ও তার প্রসাদগুণ কীর্তন করেন। সে কীর্তনের ঢংটি বড়ই মজাদার। সর্বপ্রথম তাঁরা বলেন, যাঁরা বাংলা বা অন্য কোনও ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করতে চান তাঁরা অজ্ঞ; তাঁরা ভাষাতত্ত্বের মূল নীতিই জানেন না। যেহেতু এঁদের প্রবন্ধাদি ও ইংরিজী কাগজে ছাপা চিঠিতে এঁদের নাম থাকে তাই প্রথমেই মনে প্রশ্ন জাগে, এঁরা বুঝি সুনীতি চাটুয্যের গুরুসম্প্রদায়। কারণ এনারা যখন বলেন, আমরা লিনগুইস্‌টিক্‌ জানি না, তখন আমরা ধরে নিই, আমরা জানি আর নাই জানি, তেনারা অতি অবশ্যই জানেন। এবং লিনগুইস্‌টিক্‌স তো আর মাত্র একটি বা দুটি ভাষা শিখেই আয়ত্ত করা যায় না—অতএব এঁরা নিশ্চয় এন্তের, বিশেষ করে ইয়োরোপীয় ভাষা, বিলক্ষণ রপ্ত করার পর আমাদের 'অজ্ঞ' বলে আত্মপ্রসাদ অনুভব করছেন। কিন্তু কই, এঁদের নাম তো ভাষাবিদ্‌ পণ্ডিতদের নাম করার সময় কেউ বলে না। এঁরা তা হলে নিশ্চয় ইংরেজ কবির আদেশানুযায়ীতে :

অসংখ্য রতনরাজি বিমল উজল
খনির তিমির গর্ভে রয়েছে গভীরে।
বিজনে ফুটিয়া কত কুসুমের দল
বিফলে সৌরভ ঢালে মরুর সমীরে॥

'বিফলে' নয় 'বিফলে' নয়—আমরা সন্ধান পেয়ে গিয়েছি। এবং চুপিচুপি বলছি, তাঁরা যে-প্রকারের ঢক্কানিনাদ করছেন তার থেকে সন্দ হয়, তাঁরাও নিঃসন্দেহ ছিলেন, আবিষ্কৃত হবেনই।

আইস সুশীল পাঠক, এবারে আমরা সেই সব 'জেম্‌'দের জলুস দেখে হতবাক হই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

(ইংরিজীতে অবশ্য 'জেম্' বক্রোক্তিতে ব্যবহার হয়; যেমন কেউ যখন বলে, 'এই প্রেশাস ''জেম্''টি তুমি পেলে কোথায়?' তখন তার অর্থ 'এই আকাট পল্টকটিকে তুমি আবিষ্কার করলে কোত্থেকে?' আমি কিন্তু দোহাই ধর্মের, সেভাবে বলছি নে), এঁদের সৌরভ শুঁকে কৃতকৃতার্থ হই।

কেউ কেউ বলেন, বহু শতাব্দীর ভিতর দিয়ে ইংরিজি ভাষার বৃদ্ধি (গ্রোথ) অধ্যয়ন করলে রোমাঞ্চ হয় (এ থ্রিলিং স্টাডি)! অবশ্যই হয়! আমরা শুধোব, কোন্ ভাষার ক্রমবৃদ্ধির ইতিহাস পড়লে রোমাঞ্চ হয় না? তবে ইংরিজীর বেলা একটু বেশী হয়। কেন বেশী হয়? এই সম্প্রদায় বলেন, ইংরিজী তার শব্দসম্পদ আহরণ করছে অন্যান্য বহু ভাষা থেকে—যেমন লাতিন, গ্রীক, ফরাসী, হীব্রু, আরবী, হাঙ্গেরিয়ান, চীনা—এস্তেক হিন্দী-বাংলা থেকে। তবেই নাকি সম্ভব হয়েছে, এঁদের মতানুসারে—শেক্সপীয়র, মিলটন, ওয়ারড্স্ওয়ারথ্, টেনিসন ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিস্তর ভাষা থেকে এস্তের শব্দ নিয়েছে বলে ইংরিজীতে অত-শত উত্তম কবি—এ সিদ্ধান্তটি পরে আলোচনা করা যাবে।

এই যে থ্রিলিং স্টাডি সেটা সম্ভব হয়েছে ইংরিজী অন্যান্য ভাষা থেকে বিস্তর শব্দ নিয়েছ বলে। সাধু প্রস্তাব!...এস্থলে আমরা তাহলে এ তথ্যের আরেকটু পিছনে যাই—যথা, ইংরিজী অত বিদেশী শব্দ নিল কোথায়, কেন, কি প্রকারে? আমি কথা দিচ্ছি, এটা আরও থ্রিলিং হবে।

(১) কোনও দেশ পরাধীন হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তার ভাষাও পরাধীন হয়ে যায়। নরমান বিজয়ের পর ইংরিজী যে প্রায় তিনশ' বছর অবহেলিত অপাঙ্‌ক্তেয় ছিল সে কথা পূর্বেই বলেছি। এস্থলে বিজয়ী জাত যদি শিক্ষাদীক্ষা সভ্যতায় বিজিত জাতের চেয়ে সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ হয় তবে বিজিত ভাষা ক্রমে ক্রমে বিদেশী ভাষার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে যায়। তাই আজও ইংরেজ সব চেয়ে বেশী ঋণী ফরাসীর কাছে। এমন কি, যেসব গ্রীক লাতিন শব্দ নিয়েছে তার চোদ্দ আনা ফরাসীর মারফৎ।

হুবহু এই ঘটেছিল ইরানে, সে দেশে আরব বিজয়ের ফলে। তাদের শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যম হুবহু তিনশ' বছর ছিল আরবী। সে ভাষার প্রভাব ফারসীর উপর এতই প্রচণ্ড যে, আজ আরবী শব্দ বর্জন করলে ফারসী এক কদমও ('কদম' শব্দটাও আরবী) চলতে পারবে না। হুবহু তেমনি উর্দুর উপর (বা প্রাকৃত হরিয়ানার উপরও বলতে পারেন) ফারসীর প্রভাব পড়েছিল ও ফারসীর মারফৎ আরবীর।

পক্ষান্তরে ফ্রান্স বা জরমনির উপর কোন বিদেশী বেশী কাল রাজত্ব করেনি বলে ফারসী-জরমনে বিদেশী শব্দ—ইংরিজী যে রকম বে-এক্তেয়ার হয়ে গিয়েছে তার তুলনায় মুষ্টিমেয়।

(২) এর পর যদি সেই বিজিত জাত—এস্থলে ইংরেজ—বিধির লেখনে আপন দেশ ছেড়ে বাণিজ্য করতে বেরয়, সেই বাণিজ্য রক্ষা করতে গিয়ে রাজ্য জয় করতে আরম্ভ করে, এবং সর্বশেষে রাজত্ব করার ছলে ডাকাতি করে—চরকা পুড়োয়, আফিঙ গেলাবার জন্য সঙীন চালায়, শত্রু ঠেকাবার জন্য কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে, ড্রাই-আরথ পলিসি এক্তেয়ার করে, নিরন্ধ্রবাগ-আবদ্ধ অসহায় নর-নারীকে যারা পাশবিক হুহুঙ্কারবলে গুলি করে মারে, তারা দেশে ফিরে স্বয়ং সম্রাটের আশীর্বাদাভিনন্দনসহ সুপপ্লেট সাইজের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মেডেল পায়—তবে, তখনই, সেই 'বাণিজ্য' সেই 'রাজত্ব' সেই ডাকাতি—এক কথায় সেই রক্তশোষণ, সেই এক্‌স্‌প্লয়টেশনের চৌকশ সুবিধার জন্য সেই সব মহাপ্রভুরা বহু ভাষা শেখেন এবং তারই ফলে তাদের আপন ভাষাতে বেনোজলের মত হুড়হুড় করে বিদেশী শব্দ ঢোকে।

এস্থলে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার জিনিস, যে-বিজিত জাত ইতিপূর্বেই বিজয়ী জাতের কাছ থেকে অকাতরে শব্দ নিয়ে নিয়ে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে, তারাই পরবর্তীকালে অন্য জাতকে শোষণ করার সময় আরও অকাতরে শব্দ নিতে পারে। এদের তুলনায় ফরাসী-জরমন অনভিজ্ঞ বালখিল্য। তদুপরি এরা চেয়েছিল প্রধানত রাজত্ব করতে; 'বাণিজ্য' করতে নয়। এরা 'নেশন অব্ শপ্‌কীপার্‌জ' বা 'শপ্‌লিফ্‌টারজ' নয়। 'বণিকের মানদণ্ড' যখন 'পোহালে শবরী' দেখা দেয় রাজদণ্ডরূপে' তখন সে 'রাজদণ্ডে'র সর্বাঙ্গে বেনে-দোকানের কালিঝুলির চিত্র-বিচিত্র ছোপ আর সপসপে ভেজাল তেলের দুর্গন্ধ।

শুনেছি, কোনও কোনও আন্তর্জাতিক গণিকা বাইশটি ভাষায় অনর্গল কথা কইতে পারে। তাদের সেই ভাষাজ্ঞান নমস্য, কিন্তু পদ্ধতিটা গ্রহণ না করাই ভালো। ইংরেজের শব্দভাণ্ডার হয়তো বা নমস্য—আমি এস্থলে তর্ক করবো না, কিন্তু তার পদ্ধতিটা ঘৃণ্য। পাঠক এটা দয়া করে ভুলবেন না। যদ্যপি এস্থলে এটা ঈষৎ অবান্তর তবু মনে রাখবেন, প্রথম গোলাম হতে হবে, পরে ডাকাত হবেন, তবেই শব্দভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়। এবারে চরে খান্ গে—যার যা খুশী করুন। এবং স্বীকার করুন, এ স্ট্রাডি থ্রিলিংতর নয় কিনা?

কিন্তু দোহাই ধর্মের, পাঠক ভাববেন না, গোলামির কড়ি তথা লুটের মাল দিয়ে ভরতি ইংরিজী ভাষা ব্যবহার করতে আমি অনিচ্ছুক। ডাকাতির মোহরও মোহর, পুণ্যশীলের মোহরও মোহর। ফোকটে পেয়ে গেলে ব্যবহার করবো না কেন? মধুভাণ্ডের রস তো আগাপাস্তলা চোরাই মাল—সেটা জেনেও তো কবিগুরু সিলেটের কমলালেবুর জন্য ছোঁক ছোঁক করতেন। এটা তো তবু নির্দোষ উদাহরণ। শাহ-জাহানের হারেম ছিল ফেটে-যাওয়ার মত ভরতি। তথাপি তিনি মাঝে-মধ্যে বাজার থেকে রমণী আনতেন। অনুযোগ করাতে বলতেন, 'হালওয়া মিষ্টি, তা সে যে কোন দোকান থেকেই আসুক।' 'হালওয়া নীক অস্‌ত্,—অজ্ হর্ দুকান্ বাশ্‌দ'—না কি যেন বলে ফারসীতে।

কিন্তু প্রশ্ন, মিশ্রিত ভাষা হলেই বুঝি তিনি অতুলনীয় সর্বশ্রেষ্ঠ একচ্ছত্রাধিপতি? ফরাসী ভাষা লাতিনসম্ভূতা, এবং সে কিছু গ্রীক শব্দ নিয়েছে। ইটিকে প্রায় অবিমিশ্র ভাষা বলা চলে। তবে কেন মিশ্রিত ভাষার পদগৌরবদম্ভমদমত্ত 'সায়েব-লোগ' হামেশা হবে অবিমিশ্রা ফারসী ভাষার পিছনে পড়িমরি করে? আসলে ভঙ্গজ চৌষট্টি আসলা সর্বত্রই কুলীনের জন্য ছোঁক ছোঁক করে।

মিশ্র বলেই নাকি ইংরিজী শেক্সপীয়র, মিলটন পেয়ে ধন্য হয়েছে।

তা হলে হায় কালিদাস! তোমার কি গতি হবে, বাছা? তোমার শকুন্তলা, রঘুবংশ, মেঘদূতের পেটে বোমা মারলেও যে তাদের জবান থেকে বিদেশী লবজো বেরুবে না!

হায় হোমর, ইস্‌কিলস, আরিসতোফানেশ, ইউরিপিদেশ!

কিন্তু আশ্চর্য, ইংরেজ তো এখনও প্রতি বৎসর এঁদের কাব্য লক্ষ্য লক্ষ্য ছাপায়—নয়া নয়া অনুবাদ করে!

প্রাচীন যুগের আধা-মিশ্র আরবী ভাষায় কবিকুল, ওল্‌ড টেস্‌টামেন্‌টের সল্, দায়ুদ

www.BanglaBook.org

সলমনের 'সঙ অব্ সঙ্জ'—তোমরা তো বানের জলে ভেসে গেলে। দান্তের স্মরণে দীর্ঘনিঃশ্বাস দীর্ঘতর হল। সান্ত্বনা, চীন-জাপানের কবিদের সঙ্গে পরিচয় নেই। তাঁরা অন্-ওয়েপ্ট, অন্-অনর্ড, অন্সাঙ হয়ে রইলেন।

পাপমুখে কি করে আর বলি, এক পাল্লায় মিশ্রিত ভাষার কবি, অন্য পাল্লায় অবিমিশ্র ভাষার কবিকুল তুললে কোন্‌টা ওজনে ভারি হবে সে নিয়ে আমার মনে সন্দ আছে। অবশ্য প্রতিপক্ষ বলতে পারেন, ইংরিজী কাব্যে যে ভেরাইটি আছে অন্য কাব্যে নেই। উত্তরে বলি, ফরাসী গদ্যে যে ভেরাইটি আছে; ইংরিজী গদ্যে তো নেই। এবং অনেকে বলতে পারেন, 'বত্রিশভাজা'ই দুনিয়ার সর্বোত্তম খাদ্য নাও হতে পারে। 'সিংহের এক বাচ্চাই ব্যস!'

বি বি সি সম্প্রতি এক্‌সবারের মত পুনরাবৃত্তি করলেন, 'ইংরিজীই এখন পৃথিবীর সব চেয়ে চালু ভাষা।' অবশ্যই। কিন্তু কোন্ পদ্ধতিতে সেটা চালু হল—যার বয়ান এইমাত্র দেওয়া হল—সেটি বলতে ভুলে গেলেন। হয়তো বা সে-স্থলে সেটি অবান্তর ছিল। তারপর সগর্বে বললেন, 'হালের একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন—থুড়ি, সেমিনারে—দশটি প্রবন্ধ পড়া হয়; তার নটা ছিল ইংরেজীতে।

আমি বলি, 'অধুনা ডাক্তারদের একটি সেমিনারে দশটি প্রবন্ধ পড়া হয়। তার ন'টি ছিল ক্যানসার সম্বন্ধে', তবে নিশ্চয়ই ক্যানসারের গর্ব অনুভব করা উচিত।

পদ্ধতিটা কি সম্পূর্ণ অবান্তর?

ইংরেজ তার মিশ্রিত ভাষার প্রশংসা করে। তাই শুনে শুনে এদেশের অনেকেই ইংরেজের গলার সঙ্গে বেসুরো গলা মেলান। কিন্তু তর্কস্থলে একবার যদি ধরে নিই, ইংরেজের ভাষা যদি ফরাসীর মত অপেক্ষাকৃত ঢের ঢের অবিমিশ্র হত, তা হলে কে কি করতো? নিশ্চয়ই উচ্চতর কণ্ঠে বলতো, 'ভো ভো ত্রিভুবন! শৃণ্বন্তু বিশ্বে...ইত্যাদি ইত্যাদি...এই যে আমাদের ভাষা, সে কী নির্মল কী নির্ভেজাল! সে কোনও ভাষার কাছে ঋণী নয়, সে স্বয়ংপ্রকাশ। ওহো হো হো, সে কী পূত, পবিত্র—পর্বতনির্ঝরিণীর ন্যায় অপাপবিদ্ধ। আইস, ইহাতে অবগাহন করিবা!'

এতে আশ্চর্য হবার কি আছে? সে তার আপন রক্ত অমিশ্র রাখতে চায়, ইস্তক তার ঘোড়া, তার কুকুরটাকে পর্যন্ত দো-আঁসলা হতে দেয় না। এদেশের হুদো হুদো পকেট-ছুঁচোর-কেত্তনওলা মী লাট্‌রা আপন আপন রক্তের বিশুদ্ধতা (অবশ্য কিঞ্চিৎ নরমান বেআইনী ভেজাল আছে বইকি!) ভাঙিয়ে মারকিন মুল্লুকে পয়সাউলী শাদী করছেন। প্রত্যয় যাবেন না, এই হালে বি বি সি-তেই এক ইংরেজ চারচিলের বিদেশী মাতার প্রতি ইঙ্গিত করে (যদ্যপি মাতা অধিকাংশ মারকিনের মত গোড়াতে ইংরেজই বটেন) বলেন, 'হী উয়োজ নেভার কুআইট ওয়ান অব আস।' শুনেছি চারচিল পার্লামেন্টে তাঁর জীবনে মাত্র একবার হুট্ হয়েছিলেন, তাঁর বক্তৃতা চিৎকারে অসমাপ্ত থেকে যায়—তিনি যখন ড্যুক অব উইন্‌জারের মারকিন রমণী বিবাহ-প্রস্তাব সমর্থন করতে চান।

সব বাবদে ইংরেজ অবিমিশ্র থাকতে চায়—শুধু ভাষার বাবদে ব্যত্যয়!

আসলে ভাষাটা বর্ণসংস্কার হয়ে গিয়েছে যে! এখন এরই প্রশংসার আসমান ফাটাও!

আমরাও হক্কা হুয়া করি। দু-একটা নরস্‌মেন, গোটা-দুই ফরাসীও করেছে। কেউ কিছু বললে, ওদের দোহাই দেব।

www.BanglaBook.org

হিটলার পঞ্চাশ লক্ষ ইহুদি পোড়াল নরডিক্ রক্ত অমিশ্র রাখার জন্য।
ইংরিজী ভাষা নির্মিত হল কত পরাধীন জাতের রক্তশোষণের পিঠ পিঠ।

কিন্তু ইহসংসারের সর্বাপেক্ষা মিশ্রিত, বর্ণসংকর ভাষা কোন্‌টি—ইংরিজী যার একশ' যোজনের পাল্লায় আসতে পারে না? বেদেদের, জীপসিদের ভাষা। নর্‌থ-পোল থেকে সাউথ-পোল, পৃথিবীর নগণ্যতম ভাষার অবদানও এ-ভাষাতে আছে। বস্তুত, মূলত ইটি কোন্ দেশের ভাষা, আর্য সেমিতি না মঙ্গোলীয় জাতের, সেই তর্কেরই সমাধান হয়নি।

বিবেচনা করি, এ ভাষাতে আরও ডাঙর ডাঙর শেক্‌সপীয়র-মিলটন গণ্ডায় গণ্ডায়—'অসংখ্য রতন, ডেজার্ট-ফ্লাউয়ারের ন্যায়'—ঘাপটি মেরে আপসে আপসে আব্‌জাব করছেন!

একাধিক গুণী বলেন, বেদেদের ভাষা মূলে ভারতীয়। বৎস! আর কি চাই! কেল্লা ফতেহ্। আইস ভ্রাতঃ! সবে মিলি বেদেদের ভাষা শিখি॥

অর্থমর্থম্

বিশ্বের অন্যতম অসাধারণ লেখক, প্রত্নতাত্ত্বিক, যোদ্ধা টমাস এড্‌ওয়ার্ড লরন্‌স্ (Lawrence) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আরব জগতে যে সুখ্যাতি অর্জন করেন তার কিংবদন্তী আজও সে অঞ্চলে সুপ্রচলিত! সে-যুদ্ধের সময় তুর্কী রাষ্ট্রের পরাধীন আরব ভূমি তুর্কীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ মনোভাব দেখালে পর তাঁর উপর ভার পড়ে আরবদের গেরিল্‌লা ও সাবোতাজ্ কর্মে পাকাপোক্ত করে তোলার।...একদা তুর্কী থেকে বেরিয়ে একখানা হজযাত্রী ট্রেন মদীনা যাবে। ওটাকে বিস্ফোরক দিয়ে কি করে ওড়াতে হয় তারই তালিম দিচ্ছেন লরন্‌স্ আরবদের। আসলে নিরীহ যাত্রীবাহী গাড়ি চুরমার করতে তাঁর মন মানছিল না। কিন্তু 'নবগীতা'য় নাকি 'সান্ধ্যসংস্কৃতে' আছে 'রণে চ প্রেমে চ দাক্ষিণ্য নৈব নৈব চ।' এস্তের তোড়জোড় করে লরন্‌স্ তো রেল লাইনের তলায় বিস্ফোরক পোঁতার কায়দাকেতা আরবদের শেখালেন বিশেষজ্ঞের গাম্ভীর্য ও তাচ্ছিল্য সহকারে। তারপর সবাই বিস্ফোরকের আওতার বাইরে এসে আশ্রয় নিলেন মরুভূমির একটা বালির ঢিপির পিছনে। দেখা গেল, দূর থেকে আসছে খেলনার গাড়ির মত হেলে দুলে মান্ধাতার আমলের ধাপামার্কা যাত্রীগাড়ী। সক্কলের চোখ গাড়িটার উপর ডাকটিকিটের মত সাঁটা। এই এল—এই এল—এই এসে গেল—বিস্ফোরকের বিসুভিয়াসটার উপর—ঐযা—কোথায় কি! গাড়িখানা দিব্য ঝ্যাক ঝ্যাক করে কাশতে কাশতে ফাঁড়াটা মোলায়েমসে পেরিয়ে গেল। ...আরবরা 'বিশেষজ্ঞে'র দিকে আড়নয়নে তাকিয়ে মুচকি হেসেছিল কিনা বলতে পারব না। লরন্‌স্ বলেছেন, 'দ আরটিসট ইন মি ওয়োজ ফ্যুরিয়স্, দ ম্যান ইন মি ওয়োজ হ্যাপি।' ইংরিজীটা আমার হুবহু মনে নেই, কিন্তু এটা পরিষ্কার এখনও যেন কানে বাজছে, ভাষাটি তাঁর ছিল চমৎকার আর বলার ধরনটি সরেসেরও সরেস।...যেখানে লরন্‌স্ হুনুরির মত ফাঁদ পাতছেন সেখানে তিনি আর্‌টিস্‌ট 'পার-একসেলাঁস', সেখানে বেবাক বন্দোবস্ত বরবাদ ভণ্ডুল হলে ভিতরকার আর্‌টিস্‌ট সত্তা তো চটে যাবেই। কিন্তু সেই আর্‌টিস্‌টের পাশেই যে দরদী মাটির মানুষটি রয়েছে সে তো কতকগুলো নিরীহ

www.BanglaBook.org

বালবৃদ্ধকে খুন করতে চায়নি। সে তখন বগল বাজিয়ে নৃত্য করছে।

ঘটনাটি যে এতখানি ফুলিয়ে বললুম তার কারণ, এ ব্যাপারটা একটুখানি ভোল বদলে আমাদের জীবনে নিত্য নিত্য ঘটে। যেমন মনে করুন, আপনি উদ্ভিদ-বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ, তদুপরি শখের বাগান করেছেন বহু বহু বৎসর ধরে। আপনার প্রতিবেশী একটি আস্ত জানোয়ার—পাড়াটা অতিষ্ঠ করে তুলেছে। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আপনি একদিন দেখেন, পণ্টকটার প্রাণে শখ জেগেছে, কোত্থেকে একটি অতি সুন্দর কামিনীর চারা যোগাড় করে সেটা পুঁততে যাচ্ছে এমনভাবে যে, সজ্ঞানে চেষ্টা করলেও এর চেয়ে বেশী ভুল করা যায় না! জায়গাটা বাছাই করেছে ভুল, গর্ত যা করেছে এবং সেটাতে জল আর কাঁচা গোবর যা ঢেলেছে তাতে দিল্লীর মিঞা কুৎব্‌মিনার একবার পা হড়কে পড়ে গেলে কাগজে বেরুবে মিঞা কুৎব্ জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছেন। পূর্বেই বলেছি—না বলিনি?—ফাঁসুড়েটার আশু পঞ্চত্ব কামনা করে আপনি কালীঘাটে শির্নি মানত করেছেন।...কিন্তু তখন আপনি আর থাকতে পারবেন না। আপনার ভিতরে যে হুনুরি, যে আর্‌টিস্‌ট ঘুমিয়ে আছে সে মাথা চাড়া দিয়ে জেগে উঠে চিৎকার করে করে বলবে, 'ওরে ও আহাম্মুখ, কামিনী এ ভাবে পোঁতে?'—তারপর ইন্‌স্পাইট অব ইওর সেল্‌ফ্ অর্থাৎ আপনার ভিতরকার হুনুরি আপনার ভিতরকার দুশমন মানুষটাকে পরোয়া না করে তাকে বাৎলে দেবে চারা পোঁতার কায়দাকেতা!!!

ভূমিকাটি মাত্রাধিক দীর্ঘ হয়ে গেল; তা হবেই। কথায় বলে

বাইরে যাদের লম্বা কোঁচা
ঘরেতে চড়ে না হাঁড়ি।
খেতে মাখতে তেল জোটে না
কেরোসিনে বাগায় তেড়ি॥

কালোবাজারীকে আমি আমার দুশমন বলে বিবেচনা করি। কালোবাজারী মাত্রই ক্যাপিটালিস্‌ট; অবশ্য সর্ব ক্যাপিটালিস্‌টই কালোবাজারী নয়। কম্যুনিস্‌টরা আবার সর্ব ক্যাপিটালিস্‌টকেই দুশমন সমঝেন। অর্থাৎ কম্যুনিস্‌টরা আমার দুশমনের দুশমন। ফারসীতেও বলে,

'দোস্‌ৎনীস্ত (নাস্তি), দুশমন-ই-দুশমন অস্‌ৎ (অস্তি)'—দোস্ত নয়, কিন্তু আমার দুশমনের দুশমন!...

পূর্বেই বয়ান দিয়েছি, মানুষের ভিতরকার আর্‌টিস্‌ট দুশমনকেও সাহায্য করে আর আমি দুশমনের দুশমনকে করবো না? কারণ আমার ভিতরেও একটা আর্‌টিস্‌ট রয়েছে। আত্মশ্লাঘা? আদৌ না। কোন্ মানুষের রক্তে আর্‌টিস্‌টের ছোঁয়াচ বিলকুল লাগেনি বলতে পারেন? এমন কি আমরা যাকে অভদ্র ভাষায় মিথ্যুক বলি সেও তো বেচারা সুযোগ থেকে বঞ্চিত—ইংরিজীতে যেমন দড়কচ্চা-মারা গাছের বেলা এটার গ্রোৎ স্টান্‌টিড্'—ঔপন্যাসিক, কবি, এক কথায় আর্‌টিস্‌ট। নোট যে লোক জাল করে সেও সুযোগ-থেকে-বঞ্চিত রবিবর্মা।

অতএব আমি যখন কম্যুনিস্‌ট ভায়াদের সদুপদেশ দিই তখন সেটা দম্ভজনিত আত্মশ্লাঘা বশত নয়। অবশ্য তাঁরা সেটা নেবেন কিনা, সেটা নিতান্তই তাঁদের বিবেচ্য। এবং আমি মনের কোণে এ-আশাও পোষণ করি যে তথাকথিত ধর্মভীরুজনও এদিকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খেয়াল করলে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। অর্থনীতিবিদ শুমপেটার বলেছেন :—মারক্স যখন বিশ্বশ্রমিক সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন তখন অনুমান করতে পারেননি যে, পৃথিবীর যে-কোনও স্থলে প্রথম ইন্‌কিলাবের ফলস্বরূপ প্রথম প্রলেতারিয়া-রাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া মাত্রই অন্যান্য দেশের ক্যাপিটালিস্‌টরা সেটা দেখে তার থেকে লেস্‌ন্ ড্র করে নিজেদের সেই অনুযায়ী এড্‌জাস্‌ট্ করে নেবে, মানিয়ে নেবে।[১] অর্থাৎ এযাবৎ যে যে বেধড়ক শোষণনীতি চালিয়েছিল সেটাকে মডিফাই করে প্রলেতারিয়াকে কিছু পরিমাণে ব্যবসাতে হক্ক দিয়ে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শেয়ার, পেনশন, বেকারীর সময় ডোল, চিকিৎসার ব্যবস্থা, নানাবিধ ইনসিওরেন্‌স দিয়ে এমনই তার স্বার্থ নিজের স্বার্থে জড়িয়ে ফেলবে যে "একদিন সে দেখবে হি হ্যাজ মোর টু লুজ দ্যান মিয়ারলি ফেটারজ" অর্থাৎ ইন্‌কিলাব এনে সে অর্থনৈতিক পায়ের বেড়ি হাতের কড়ার দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শেয়ার ইনসিওরেন্‌সের সুবিধাও হারাবে। নবীন প্রলেতারিয়া রাষ্ট্র বিনা মেহন্নতে ফোকটে পয়সা কামানোটা বিলকুল বরদাস্ত করে না। ক্যাপিটালিস্‌ট্‌দের এই এড্‌জাস্‌ট্ করে নেওয়াটাকে শুমপেটার তুলনা করেছেন রোগের বীজাণুর সঙ্গে; তারা যে রকম প্রাণঘাতী ওষুধের ইনজেকশন খেয়ে খেয়ে কালক্রমে ওষুধের সঙ্গে নিজেদের এড্‌জাস্‌ট্ করে নেয় তারপর সহজে নির্মূল হতে চায় না।

প্রশ্ন উঠবে, আমি কি তবে কম্যুনিস্‌ট্ ভায়াদের লেলিয়ে দিচ্ছি ধর্মের পিছনে, আর ওদিকে ধর্মানুরাগীজনকে বলছি, 'সাধু, সাবধান!'?

পাঠক যদি অনুমতি দেন, তবে এ প্রশ্নের উত্তরটি আমি উপস্থিত মুলতবী রাখবো। কারণ শুধু এরই জন্য আমাকে পুরো এক কিস্তি 'পঞ্চতন্ত্র' লিখতে হবে। উপস্থিত যেটা লিখছি তাতে এর স্থান সঙ্কুলান হবে না।

* * *

কম্যুনিস্‌টরা একটা মোক্ষম তত্ত্ব-কথা বলেন যেটা সকলেরই বিচার করে দেখা উচিত। বস্তুত এ অধম এ-বাবদে গত ত্রিশ বছর ধরে চিন্তা করেছে, দলিল-দস্তাবেজ সন্ধান করেছে, ফের চিন্তা করেছে, এখনও করছে, উপকৃত হয়েছে ও হচ্ছে।

তাঁরা বলেন, 'পৃথিবীর ইতিহাসে যে-সব প্রগতিশীল আন্দোলন—ইন্‌কিলাব—যুগান্তকারী পরিবর্তন দেখতে পাই তার পিছনে থাকে অর্থনৈতিক কারণ—ইকনমিক্ কন্‌ডিশন্।'[২]

সকলেই স্বীকার করবেন, পৃথিবীতে সাতটি বড় বড় আন্দোলন—পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। তার ফলে সাতটি প্রতিষ্ঠান নির্মিত হয়, এবং তার পাঁচটি এখনও পৃথিবীতে

---

১ আমার বাড়ির সামনে দিয়ে গত সপ্তাহে বিড়িওলাদের মিছিল গেল—বিড়ির পুঁজিপতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে। তারা ইনকিলা-ই-ব দোহাই পেড়ে বলছিল 'ইনক্লাব জিন্দা-ই-বাদ।' শিক্ষিত লোককেও আমি 'ইনক্লাব' উচ্চারণ করতে শুনেছি। আসল উচ্চারণ ইন্‌কিলা-ই-ব—'লা'টা যতদূর চান দীর্ঘ করবেন। তারপর জিন্দাটি হুস্বে হুস্বে সারবেন। তারপর 'বাদ'টা বা-ই-দ্ যতদূর খুশী দীর্ঘ। অর্থাৎ ইন্/কলা-ই-ই-ব্॥ জিন্/দা/বা-ই-ই-দ॥

২ সর্ব ইনকিলাবের পিছনে যে অর্থনৈতিক কারণ থাকে সেটাই বিপ্লবের একমাত্র কারণ কিনা, কিংবা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণ কিনা, সে আলোচনা এস্থলে থাক।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নানা আলোড়ন সৃষ্টি করে।

সে-সাতটি সচরাচর 'ধর্ম' নামে পরিচিত। ধর্মের নাম শুনে পাঠক অসহিষ্ণু হবেন না। 'আগে কহি'।

তার তিনটির জন্ম এ-দেশে—হিন্দু (সনাতন) বৌদ্ধ, জৈন। এ তিনটি আর্যধর্ম। শেষের জৈনধর্ম এখন পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে আর প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। বৌদ্ধধর্মের রঙ্গভূমি বহু যুগ ধরে ভারতের বাইরে।

আর তিনটি আরব-প্যালেস্টাইন নিয়ে যে সেমিতি (সেমেটিক) ভূমি সেখানে : ইহুদি, খ্রীষ্টান ও 'মুসলমান ধর্ম' (ইসলাম)। এ-তিনটি সেমিতি ধর্ম। ইহুদিধর্মের বিশ্বাসীজন প্রায় দু হাজার বছর নিষ্ক্রিয় থাকার পর অধুনা সগৌরবে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছেন, '—বিশ্বলোক ভাবিছে বিস্ময়ে/যাহার পতাকা/অম্বর আচ্ছন্ন করে, এতকাল এত ক্ষুদ্র হয়ে/কোথা ছিল ঢাকা/'।

সপ্তমটির জন্মস্থল ভারত এবং সেমিতি ভূখণ্ডের মাঝখানে। এটিও খাঁটি আর্যধর্ম। প্রাচীন ইরানে এর জন্ম ও জরথুস্ত্রী বা জরথুস্ত্রের ধর্ম নামে পরিচিত। লোকমুখে এরা 'অগ্নি-উপাসক' আখ্যায় পরিচিত। ভারতবর্ষে এখন এই পারসীদের—একমাত্র না হলেও—প্রধান নিবাসস্থল। ইহুদিদের সাত শত বৎসর পূর্বে এঁরা রঙ্গভূমি থেকে বিদায় নেন। কিন্তু আজ যদি এঁরাও ইহুদিদের মত দুই সেন—মারকিন জনসেন আর ইংরেজ উইলসেনকে হাত করে প্রাচীন ইরানে অধুনা আফগানিস্তানে অবতীর্ণ হয়ে বল্‌খ্ (সংস্কৃতে হিল) বদখ্‌শান দখল করে 'আরিয়ানা' (আর্য) রাষ্ট্র প্রবর্তন করে তবে অন্তত আমরা আশ্চর্য হব না। বল্‌খ্ অঞ্চল রুশ সীমান্তের এ-পারে—মাঝখানে মাত্র আমুদরিয়া (নদী)—এবং এশিয়ার বুকের মধ্যিখানে। এখানে মারকিন-ইংরেজের একটি কলোনী বা ঘাঁটির বড়ই প্রয়োজন।...লাওৎসে, কন্‌ফুৎসর নীতিবাদ 'ধর্ম' নামে পরিচিত হয় না।

যে অর্থনৈতিক বাতাবরণের দরুন নবীন ধর্ম সৃষ্টি হয় তার অনুসন্ধান করতে গেলে ইসলাম নিয়ে আরম্ভ করাই প্রশস্ততম, কারণ এটি সর্বাপেক্ষা নবীন এবং ইসলামের পরে আর কোনও বিশ্বধর্ম জন্মগ্রহণ করেনি। তদুপরি আরবরা গোড়ার থেকে জাত-ঐতিহাসিক। তারা হজরৎ সম্বন্ধে যতখানি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লিখে গেছে তার তুলনায় খ্রীষ্ট বা বুদ্ধের জীবনী অনেক কাঁচা হাতে মহাপুরুষদের তিরোধানের প্রচুর সময়ের ব্যবধানে লেখা হয়েছে। ফলে তাঁদের ছবিগুলো আইডিআলাইজড—আরটিস্‌ট্ কল্পনার উপর নির্ভর করেছেন বিস্তর।[১]

---

১ আমি এস্থলে বুদ্ধ যীশুর একমাত্র চিন্ময় রূপের মধ্যেই (অর্থাৎ আমরা যে কল্পনার বা আইডিআলাইজড বর্ণনার বুদ্ধ যীশুর ধারণা করি) নিজেকে সীমাবদ্ধ করছি। ওয়েল্‌স্ মৃন্ময় দিকটা নিয়ে মন্তব্য করেছেন—

'Jesus was a penniless teacher, who wandered about the dusty sun-bit country of Judea, living upon casual gifts of food; yet he is always represented (অর্থাৎ ইয়োরোপীয় চিত্রে ভাস্কর্যে) as clean, combed and sleek in spotless raiment, erect and with something motionless about him as though he was gliding through the air.' এর পর ওয়েল্‌স্ দেখাচ্ছেন, এই মৃন্ময় ছবির উপরও চিন্ময় ছবির প্রভাব ফেলেছে—

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হজরৎ যখন মক্কায় একেশ্বরবাদ প্রচার করলেন তখন মক্কাবাসী সাড়ে তিনশ' দেবতা স্বীকার করতো। আরেকটি বাড়লে আপত্তিটা কি? আর নামাজ রোজাতেই বা কি? পুজোপাট তারাও করে, আর উপোসটাও স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যুত্তম প্রতিষ্ঠান।

কিন্তু যে-ই তিনি প্রচার করলেন ধনীর উপর ট্যাকশো বসিয়ে সে-ধন তিনি গরীবদের, 'হ্যাভনট'দের মধ্যে বিলিয়ে দেবেন তখনই লাগলো গণ্ডগোল। ওদিকে 'হ্যাভনট'রা জুটলো তাঁর চতুর্দিকে—টাকাকড়ি নয়া করে ভাগাভাগি হলে তারাই হবে লাভবান! ধনী আদর্শবাদী জুটলেন অত্যল্পই, মক্কাবাসীরা তখন স্থির করলো, একে খুন না করে নিষ্কৃতি নেই।

খ্রীষ্টের বেলাও তাই।

তিনিও তাঁর প্রচারকার্য আরম্ভ করেছিলেন সমাজের দরিদ্রতম স্তরের গরিব জেলেদের নিয়ে। অধ্যাত্ম জগৎ তথা নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে যে সব উপদেশ তিনি দিলেন সেগুলো আজও পূর্ণ জীবন্ত কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও বলছেন কেউ তোমার জামাটি অন্যায়ভাবে কেড়ে নিলে তাকে স্বেচ্ছায় জোব্বাটিও দিয়ে দিয়ো। এক পুণ্যশীল ধনীকে বলছেন, তোমরা সব-কিছু বেচে ফেলে গরিব দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দাও।

জেরূসলমের ইহুদি পুঁজিপতির দল তবু এসব গ্রাহ্য করেনি। ইতিমধ্যে সুলেমানমন্দিরের ভগ্নস্তূপের উপর রাজা হেরড দা গ্রেট নির্মাণ করেছেন এক বিরাট নবীন ঐশ্বর্যমণ্ডিত যাহভে-মন্দির। কিন্তু মন্দির হোক আর সিনাগগই হোক জাব-ইহুদি ওটাকে দুদিন যেতে না যেতেই ব্যবসায়ের কেন্দ্রভূমি করে তুলেছে। সেখানে চলেছে গরুবলদের কেনাবেচা এবং তার চেয়েও মারাত্মক সুদখোর ইহুদি মহাজনরা সেখানে চালিয়েছে টাকার লেনদেন, সর্‌রাফের (ক্ষুদে ক্ষুদে বাঙ্‌কারের) বাট্টা নিয়ে টাকাকড়ির বদলাবদলি। বস্তুত এই সব পুঁজিপতিরাই তখন পুণ্যভূমির অধিকাংশ তাদের টাকার জোরে কব্জায় এনে ফেলেছে।

ইহুদিভূমির প্রত্যন্ত-প্রদেশ থেকে সহস্র সহস্র শিষ্যশিষ্যা, বিশ্বাসী গ্রামবাসী অনুগতজনকে নিয়ে প্রভু যীশু সগৌরবে প্রবেশ করলেন জেরূসলমে। সেখানে গেলেন সেই সর্বজনমান্য মন্দিরে। ব্যবসায়ীদের কারবার দেখে তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন কিনা বলা কঠিন, তবে তাঁর আচরণ থেকে কিছুটা অনুমান করা যায়।

মহাজন, ক্রেতা-বিক্রেতাদের তিনি ঝেঁটিয়ে বের করে দিলেন মন্দিরের বাইরে। চতুর্থ সুসমাচার লেখক সেন্ট জন্ বলছেন (St. John) তিনি সুতোর দড়ি পাকিয়ে চাবুক বানিয়ে তাদের চাবকাতে চাবকাতে সেখান থেকে তাড়ালেন। টাকার থলেগুলো উজাড় করে ঢেলে দিলেন মাটিতে, ব্যাঙ্কারদের টেবিল করে দিলেন চিৎপাত। বললেন, 'শাস্ত্রে আছে : আমার ভবনের নাম হবে "উপাসনা ভবন"; আর তোরা এটাকে করে তুলেছিস "চোরের আড্ডা" (ডেন্ অব থীভ্‌জ্)।'

সেই সময়েই স্থির করলে পুঁজিপতি ও তাদের ইয়ার যাজকসম্প্রদায়—যীশুকে বিনষ্ট

'This alone has made him unreal and incredible to many people who cannot distinguish the core of the story from the ornamental and unwise additions of the unintelligently devout.'

বুদ্ধের সম্বন্ধেও তিনি অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। এ বাবদে হজরৎ অতিশয় সাবধান ছিলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করতে হবে, ক্রুশবিদ্ধ করে মারতে হবে।

* * *

ধনদৌলত-টাকাকড়ি।

অর্থমনর্থম্ বলেন গুণীজন। কিন্তু এও সত্য,—অর্থের সন্ধানে বেরুলে অর্থ (টাকাকড়ি) নাও পেতে পারেন, কিন্তু অর্থ পেয়ে যাবেন অর্থাৎ অর্থটা—মানেটা—বুঝে যাবেন। তাই অর্থমর্থমও বটে॥

আবার আবার সেই কামান গর্জন!

খুন করার পরই খুনীর প্রধান সমস্যা মড়াটা নিশ্চিহ্ন করবে কি প্রকারে? সমস্যাটা মান্ধাতার চেয়েও প্রাচীন। আমাদের প্রথম পিতা আদমের বড় ছেলে কাইন তাঁর ছোট ভাই আবেলকে খুন করেন। তাঁর সামনেও তখন ঐ একই সমস্যা, মৃতদেহটা নিয়ে করবেন কি? সাধারণ সাদামাটা বুদ্ধি খাটিয়ে তিনি সেটাকে পুঁতে ফেললেন মাটির ভিতর। কিন্তু মাটিকে আমরা মা-টিও বলি; তিনি সইবেন কেন এক পুত্রের প্রতি অন্য পুত্রের এ রকম নৃশংসতা। তাই পরমেশ্বর কাইনকে বললেন, 'এ তুমি করেছ কি? মাটির (মা ধরণীর) তলা থেকে তোমার ভাইয়ের রক্ত যে আমাপানে চিৎকার করছে।' অর্থাৎ মাটিতে পুঁতেও নিস্তার নেই। তাই পৃথিবীর একাধিক ভাষাতে এটা যেন প্রবাদ হয়ে গিয়েছে। সন্দেহবশত গোর খুঁড়ে লাস বের করে পোস্ট-মরটমের ফলে যখন ধরা পড়ে লোকটার অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল তখন ঐসব ভাষাতে বলা হয়, মৃতের রক্ত বা মা ধরণী মাটির তলা থেকে চিৎকার করছিল প্রতিশোধের জন্য।[১,২]

খুন-খারাবীর ইতিহাস যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই জানেন লাস গায়েব করার জন্য যুগ যুগ ধরে খুনী কত না আজব-তাজ্জব কায়দাকেতা বের করেছে। অবশ্য খুনী যদি ডাক্তার হয় (না পাঠক, ডাক্তার-বদ্যি-হেকিম 'চিকিৎসা'র অছিলায় যে 'খুন' করে তার কথা হচ্ছে না) তবে তার একটা মস্ত বড় সুবিধা আছে। বছর বিশেক পূর্বে বিলাতবাসী এক 'কালা-আদমী' সার্জন তার মেম বউকে খুন করে; বাথটাবে লাস ফেলে সেটাকে ডাক্তারি

---

১ মূল গল্পের ধারা অনেক ক্ষেত্রে ফুটনোটের আধিক্যবশত বাধা পায়। অধম কিন্তু ফুটনোট শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে দেয়—অর্থাৎ কোনও পাঠক যদি ফুটনোট আদৌ না পড়েন তবে তিনি মূল গল্পের (টেক্‌স্‌টের) কোনও প্রকারের সারবস্তু থেকে বঞ্চিত হবেন না। ফুটনোটে থাকবার কথা মূল গল্পের—বক্তব্যের—সঙ্গে সম্পর্কিত নানাপ্রকারের আশ-কথা পাশ-কথা, যেগুলো অত্যধিক কৌতূহলী পাঠক পড়েন যাতে করে কিঞ্চিত ফালতো জ্ঞান সঞ্চয় হয় কিংবা/এবং যাঁরা বইখানা পয়সা দিয়ে কিনেছেন বলে বিজ্ঞাপনতক্ বাদ দেন না। অন্যদের জন্য মিষ্টান্নই যথেষ্ট—অর্থাৎ আটপৌরে পাঠক টেক্‌স্‌ট্ পড়েই সন্তুষ্ট। ফুটনোটে এমন কিছু দেওয়া যেটা না পড়লে মূল কাহিনী বুঝতে অসুবিধা হয়—লেখকের পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ।

২ ভ্রাতৃহত্যার চিহ্নস্বরূপ সদ্যপ্রভু কাইনের কপালে একটি লাঞ্ছন এঁকে দেন। লেখকের 'প্রেম' অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

www.BanglaBook.org

কায়দায় টুকরো টুকরো করে কেটে ড্রইংরুমের চিমনিতে ঢুকিয়ে দিয়ে সমুচহ লাসটা পুড়িয়ে ফেলে। কিন্তু 'পাক প্রণালীতে' করলো একটা বেখেয়ালির ভুল। তখন ভর গ্রীষ্মকাল—ড্রইংরুমে আগুন জ্বালাবার কথা নয়। দু'একজন প্রতিবেশী ঐ ঘরের চিমনি দিয়ে যে ধুঁয়ো উঠছে সেটা লক্ষ্য করলো। ডাক্তারের বউ যে হঠাৎ গায়েব হয়ে যায়, সে যে মাঝে মাঝে ডাইনে-বাঁয়ে 'সাইড-জাম্প্' দিত, স্বামী-স্ত্রীতে যে ইদানীং আক্ছারই বেহদ্দ ঝগড়া-ফসাদ হত এসব তত্ত্ব পাড়াপড়শীর অজানা ছিল না। পুলিশ সন্দেহের বশে সার্চ করে চিমনিতে ছোট্ট ছোট্ট হাড় পেল, চানের টাব্‌টা যদিও অতিশয় সযত্নে ধোওয়া-পোঁছা করা হয়েছিল তবু সূক্ষ্ম পরীক্ষা করে মানুষের রক্তের অভ্রান্ত চিহ্ন পাওয়া গেল। ...মোদ্দা ডাক্তারকে ইহলোক ত্যাগ করার সময় মা ধরণীর সঙ্গে সমান্তরাল (হরাইজন্‌টাল) না হয়ে লম্বমান (পারপেন্ডিকুলার) হয়েই যেতে হয়েছিল।

অবশ্য ডাক্তারের ফাঁসি হওয়ার পর তার আপন লাস নিয়ে কোনও দুশ্চিন্তার কারণ ছিল না—কারোরই। যে সরকারী কর্মচারী—অশ্লীল ভাষায় যাকে বলে 'হ্যাঙম্যান'—ডাক্তারের গলায় প্রয়োজনাতীত দীর্ঘ প্রয়োজনাধিক দৃঢ় একটি নেক্‌টাই সযত্নে পরিয়ে ডাক্তারের পায়ের তলার টুলটি হঠাৎ লাথি মেরে ফেলে দেয় সে এই 'অপকর্ম'-টি করেছিল জজসাহেবের আদেশে, সামনে ঐ ডাক্তারেরই পরিচিত আরেক ডাক্তারকে এবং জেলারসাহেবকে সাক্ষী রেখে। শুনেছি, এদেশের সরকারী ফাঁসুড়ে আসামীর গলায় দড়ি লাগাবার সময় তাকে মৃদুকণ্ঠে বলে, 'ভাই, আমার কোনও অপরাধ নিয়ো না; যা করছি সরকারের হুকুমে করছি।' ইউরোপীয় ফাঁসুড়েদের এ-রকম ন্যায়ধর্মজাত কোনও সূক্ষ্মানুভূতি নেই। সেখানে ফাঁসুড়ে তার মজুরির উপর ফাঁসির দড়াটা বকশিশ পায় এবং সে সেটা ছোট ছোট টুকরো করে পাড়াপ্রতিবেশীর কাছে আক্রাদরে বেচে—ফাঁসির দড়ি নাকি বড্ড পয়মন্ত।

কিন্তু সরকার, রাজা বা ডিক্‌টেটর যেখানে বেআইনী খুন করে সেখানে এদের সামনেও সেই সমস্যাই দেখা দেয়। যখন পাইকিরি হিসেবে খুন করা হয় তখন দেখা দেয় আরও দুটি সমস্যা :

(১) যাদের খুন করা হবে তাদের মনে সন্দেহ না জাগিয়ে কি প্রকারে তাদের একজোট করা যায়?

(২) খুন করার জন্য অল্প খরচে অল্প সময়ে কি প্রকারে বিস্তর লোকের ভবলীলা সাঙ্গ করা যায়?

জরমন মাত্রই স্ট্যাটিস্টিকসের ভক্ত। একশ'টি মেয়েছেলের মধ্যে যদি নব্বুইটি কুমারী হয়, এবং দশটি গর্ভবতী হয় তবে তারা টরেটক্কা হিসেব করে বলে, এই একশ'টি মেয়ের প্রত্যেকটি নব্বুই পারসেন্ট্ অক্ষতযোনী কুমারী এবং দশ পারসেন্ট্ গর্ভবতী।

হিটলার এই ন্যায়শাস্ত্র অবলম্বন করে বললেন, 'নব্বুই পারসেন্ট্ তো ইহুদি—বাদবাকি দশ পারসেন্ট্ জিপ্‌সি, পাগল (বসে বসে শুধু খায়, লড়াইয়ের ব্যাপারে কোনও সাহায্যই করে না) ইত্যাদি। ঐ হল!—জিপ্‌সিও নব্বুই পারসেন্ট্ ইহুদি।' হিসেবে মিলে গেল।

দেখা গেল, হিটলারের তাঁবেতে ১৯৪১-৪২ সালে যে-সব রাষ্ট্র এসেছে এবং আসছে তাতে আছে প্রায় আশি লক্ষ ইহুদি—এখানে আমি জিপ্‌সি, পাগল, হিটলারবৈরী ফরাসী-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জরমন-রুশ ইত্যাদিকে বাদ দিচ্ছি। হিটলার ডাকলেন হিমলারকে। ইনি পুলিস, সেকুরিটি, ইনটেলিজেন্স, হিটলারের আপন খাস সেনাদল (এরা দেশের সরকারী সৈন্য বিভাগের অংশ নয়) কালো কুর্তীপরা এস এস এবং আরও বহু সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সর্বাধিকারী 'ফ্যুরার'। হিটলার এঁকেই হুকুম দিলেন 'চালাও, কৎল্-ই-আম্।' অর্থাৎ পাইকারি কচুকাটা! নাদির তীমুর যখন দিল্লীতে এই পদ্ধতির প্রবর্তন করেন তখন 'কৎল্-ই-আম্'ই করেছিলেন। 'আম'= সাধারণ (দিওয়ান-ই-আম তুলনীয়) আর 'কৎল'=কতল। অবশ্য নাদির-তীমুর কৎল্-ই-আম্ করেছেন প্রকাশ্যে। হিটলার হিমলার করলেন অতিশয় সঙ্গোপনে।[১] বস্তুত হিমলার ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গো যে সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন সেটা যেমন অভিনব এবং কুটিল, তেমনি ক্রূর এবং মোক্ষম। তদুপরি বাইরের থেকে তাবৎ ব্যাপারটা যেন করুণাময়ের স্বহস্তে নির্মিত নিষ্পাপ কবুতরটি; ভিতরে ছিল শয়তানের সাঙাৎ কালকুটেভরা বেইমান, অশেষ পাপের পাপী পঞ্চম পাতকী তার চেয়ে বেশী পাপী বিশ্বাসঘাতকী, কালনাগিনী। এ এক অভিনব সমন্বয় : বাইরে কবুতর, অন্তরে বিষধর।

পূর্বেই বলেছি, প্রথম সমস্যা : তাবৎ ইহুদি একত্র করা যায় কোন্ পদ্ধতিতে? এই মর্মে একটি গোপন সভা আহূান করলেন হিমলারের ঠিক নীচের পদের কর্তা হাইডেরিষ বার্লিনের উপকণ্ঠে তাঁর শৌখিন ভিলা ভানজেতে। এ-সভায় আইষমানকেও ডাকা হয়, যদিও পদগৌরবে তিনি এমন কিছু কেষ্টবিষ্টু ছিলেন না। কিন্তু হাইডেরিষ ছিলেন সত্যিকার 'আদম শনাস' মানুষের জৌরি—তিনি জানতেন আইষমান তালেবর ছোকরা, যতই ঝুট-ঝামেলার ঝকমারি ব্যাপার হক না কেন সেটার বিলিব্যবস্থা করে সব কিছু ফিটফাট করে নিতে সে পয়লা নম্বরী! সেই সুদূর স্তালিনগ্রাদ থেকে ফ্রান্সের পূর্ব উপকূল, ওদিকে নরওয়ে থেকে উত্তর আফরিকা অবধি সর্বত্র ছড়িয়ে আছে ইহুদিগোষ্ঠী। আইষমানের উপর ভার পড়লো আড়কাঠি হয়ে এদের কয়েকটি কেন্দ্রে জড়ো করা।

আইষমান সম্বন্ধে বাঙলাতেও বই বেরিয়েছে; কাজেই তাঁর সম্বন্ধে আমাকে বিশেষ কিছু বলতে হবে না। শুধু একটি কথা এখানে বলে রাখি; বাঙলা বইয়ে আছে আইষমান পাঁচ লক্ষ ইহুদির মৃত্যুর জন্য দায়ী। এটা বোধ হয় স্লিপ। পাঁচ লক্ষ নয়, হবে পাঁচ মিলিয়ান অর্থাৎ পঞ্চাশ লক্ষ।

শব্দার্থে ছলে বলে এবং কৌশলে আইষমান যে ভাবে ইহুদিদের জড়ো করে ছিলেন সেটা এত সুচারুরূপে আর কেউ সম্পন্ন করতে পারতো না এ-কথা তাবৎ নাৎসি, অ-নাৎসি সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন।

---

১ হিটলারের খাস 'ভালে' ছিলেন লিঙে। তিনি এতই বিশ্বাসী ভৃত্য ছিলেন যে হিটলার-প্রিয়া (পর-স্ত্রী) এফা ব্রাউনের বিছানা পর্যন্ত করে দিতেন। যুদ্ধ শেষে দশ বৎসর রুশদেশে বন্দীজীবন কাটিয়ে জরমনি ফিরে হিটলার সম্বন্ধে একখানি ২টি বই লেখেন। 'হিটলারের প্রেম' ও 'হিটলারের শেষ দশ দিবস' (পুস্তকাকারে প্রকাশিত) সম্বন্ধে এঁর পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয়েছে। লিঙেকে যখন পরবর্তীকালে শুধনো হয়, ইহুদি নিধন সম্বন্ধে বহু জরমন কিছুই জানতো না কেন, তিনি বলেন, হিটলার-হিমলার বহুবার সম্পূর্ণ একলা একলা গোপন সলাপরামর্শ করতেন। সে সময়ে সেখানে লিঙের চা-কফি নিয়ে যাওয়াও মানা ছিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনেকেই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা, ইহুদিদের প্রতি হিটলারের এই যে আক্রোশ এর তো তুলনা পাওয়া ভার। এর কারণটা কি?

এর উত্তর দিতে হলে তিনভলুমী কেতাব লিখতে হয়। খ্রীষ্টধর্ম প্রবর্তনের কিছুকাল পর থেকেই আরম্ভ হয় খ্রীষ্টান কর্তৃক ইহুদি নিপীড়ন এবং এরাই সর্বপ্রথম নয়—সেই খ্রীষ্টজন্মের হাজার তিন বছর আগে থেকে পালা করে মিশর, আসিরিয়া, ব্যাবিলনিয়া, রোমান সবাই এদের উপর অত্যাচার করেছে। মধ্যযুগে স্পেনে একবার এক লক্ষ ইহুদিকে খেদিয়ে আফরিকায় ঠেলে দেওয়া হয়, এবং হাজার হাজার ইহুদিকে স্রেফ ধর্মের নামে খুন করা হয়।

কিন্তু হিটলার তো খ্রীষ্টান কেন কোনও ধর্মেই বিশ্বাস করতেন না। পারলে তিনি এ সংসারে কোন ধর্মেরই অস্তিত্ব রাখতেন না।

হিটলার ইহুদিদের বিরুদ্ধে মাঝে-মিশেলে যুক্তিতর্কের অবতারণা করতেন কিন্তু সেগুলো আকছারই পরস্পরবিরোধী। একদিকে বলতেন, ইওরো-আমেরিকার অধিকাংশ ক্যাপিটাল ইহুদিদের হাতে—যত বেকার সমস্যা, যত রক্তাক্ত বিপ্লব, যত যুদ্ধ ইওরোপে হচ্ছে তার পিছনে রয়েছে ইহুদি পুঁজিপতি। আবার একই নিশ্বাসে বলতেন, যে রুশ-কম্যুনিজম ইওরোপের সভ্যতা সংস্কৃতি ধনদৌলত সমূলে বিনাশ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে তার আগাপাস্তলা ইহুদি প্ররোচনায়। অর্থাৎ ইহুদি একাধারে কম্যুনিস্ট এবং ক্যাপিটালিস্ট। এবং যাঁরা তাঁর একমাত্র 'বই' মাইন কাম্‌প্‌ফ্‌ফ্‌' ('মাই স্ট্রাগল'—এর ঠিক ঠিক অনুবাদ নয়—'আমার জীবন সংগ্রাম' বললে অনুবাদটা মূল জরমনের আরও কাছাকাছি আসে। মোদ্দা 'আমি আমার জীবন আদর্শ বাস্তবে পরিণত করার জন্য সর্বপ্রকার বাধা-বিপত্তি সর্ব দুশমনের সঙ্গে যে লড়াইয়ের পর লড়াই যুঝেছি তার ইতিহাস) পড়েছেন তাঁরা জানেন তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত দলিলপত্র পেশ করে কখনও সপ্রমাণ করেননি, করবার চেষ্টা দেননি। এর কারণটি অতিশয় সরল।

ইহুদি যে এ পৃথিবীর সর্ব দুঃখের কারণ এটা হিটলারের কাছে স্বতঃসিদ্ধ টেনেট অব ফেৎ (অন্যতম 'মৌলিক বিশ্বাস')। খ্রীষ্টান মুসলমান যে রকম যুক্তিতর্কের অনুসন্ধান না করে সর্ব সত্তা দিয়ে বিশ্বাস করে ইহসংসারের সর্ব পাপ সর্ব দুঃখ সর্ব অমঙ্গলের জন্য শয়তানটাই দায়ী, হিন্দু যেমন বিশ্বাস করে মানবজাতির সর্ব যন্ত্রণার জন্য তার পূর্বজন্মকৃত কর্মই দায়ী, ঠিক তেমনি হিটলার তাঁর সর্ব অস্তিত্ব দিয়ে বিশ্বাস করতেন বিশ্বভুবন জোড়া সর্ব অশিবের জন্য ইহুদি জাতটা দায়ী—অন্ধ খঞ্জ বৃদ্ধ অবলা শিশু ইহুদি, সব সব, সবাই দায়ী। তাঁর অন্তরঙ্গ জনকে তিনি অসংখ্যবার বলেছেন ইহুদিকুল ছারপোকা ইঁদুরের মত প্রাণী (ভারমিন)। ছারপোকা ধ্বংস করার সময় তো কোনও করুণা মৈত্রীর কথা ওঠে না, ইঁদুরের বেলাও কোন্‌টা ধেড়ে কোন্‌টা নেংটি সে প্রশ্নও অবান্তর।

এ-কথা সত্য আমরা ছারপোকা নির্বংশ করার সময় কোনও বাছবিচার করি নে; এবং যে কোনও প্রকারের প্রাণী হত্যা করলেই যে এদেশের কোনও কোনও সম্প্রদায় আমাদের 'খুনী' বলে মনে করেন সে তত্ত্বও আমাদের অজানা নয়। তৎসত্ত্বেও প্রশ্ন থেকে যায়, সত্যিই কি মানুষে ছারপোকাতে কোনও পার্থক্য নেই? ওদিকে আবার বহু খ্রীষ্টান সাধুসজ্জন ইহুদি ছারপোকাতে পার্থক্য করতেন বটে কিন্তু সেটা সামান্যই। আমি কাইন এবং আবেলের যে-বাইবেল কাহিনী দিয়ে এ নিবন্ধ আরম্ভ করেছি সেটিকে রূপকার্থে

www.BanglaBook.org

নিয়ে ঐসব সাধুসজ্জন কাইনকে ধরেন ইহুদিদের সিনাগ (ধর্ম প্রতিষ্ঠান) রূপে এবং আবেলকে খ্রীষ্ট চার্চরূপে—অর্থাৎ ইহুদি তার আপন ধর্মবিশ্বাস দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়ে যেখানে খ্রীষ্টানকে খ্রীষ্টধর্মকে পায় সেখানেই তাকে নিধন করে। ইহুদি ভ্রাতৃহন্তা, সে বিশ্বয়।... পাঠক স্বপ্নেও ভাববেন না, আমি হিটলারের ইহুদি নিধন সমর্থন করছি। আমি এ প্রবন্ধ লিখছি অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে এবং এস্থলে আমি শুধু তাঁর বিশ্বাসের পটভূমিটির প্রতি ইঙ্গিত করছি; তাঁর মত আরও বহু 'বিশ্বাসী' যে পূর্ববর্তী যুগেও ছিলেন তারই প্রতি ইঙ্গিত করছি।

তা সে যাই হোক, এইসব ইহুদিদের এক জায়গায় জড়ো করতে মোটেই বেগ পেতে হয়নি—ছারপোকাতে ইহুদিতে ঐখানেই তফাৎ, ছারপোকা এক জায়গায় জড়ো করতে পারলে তো আধেক মুশকিল আসান! গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে ইহুদি মুরুব্বীদের বলা হত, তাবৎ ইহুদি পরিবার যেন এক বিশেষ জায়গায় জড়ো হয়। তাদের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় কলনি পত্তন করা হবে। তারপর ট্রেনে মোটরে করে কানসানট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে তাদের দিয়েই একটা লম্বা নালা খোঁড়ানো হত। তারপর আদেশ হত, নালার প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াও। একদল এস এস ('ব্ল্যাক শার্ট'—হিটলারের খাস সেনাবাহিনী) পিছন থেকে গুলি করতো। অধিকাংশ ইহুদি গুলির ধাক্কায় সামনেব নালাতে পড়ে যেত। বাকিদের লাথি মেরে মেরে ঠেলে ঠেলে নালাতে ফেলা হত। সবাই যে সঙ্গে সঙ্গে মরে যেত তা নয়—সব সময় তাগ অব্যর্থ হয় না। এদের কেউ কেউ নালা থেকে হাত তুলে বোঝাবার চেষ্টা করতো তারা মরেনি—উদ্ধারলাভের জন্য চিৎকারও শোনা যেত। ওদিকে দৃকপাত না করে তাদের উপর নালার মাটি ফেলা হত এবং সর্বশেষে তার উপর স্টীমরোলার চালিয়ে দিয়ে মাটিটা সমতল করা হত।

নালা খোঁড়া, তার উপর ফের মাটি ফেলা এ-সব কাজের জন্য ইহুদিই যোগাড় করার জন্য কোনও বেগ পেতে হয়নি। একদল ইহুদিকে এই নিধনকর্মটি দাঁড় করিয়ে দেখানোর পর বলা হত তারা যদি গুলি করা ছাড়া অন্য সর্ব কার্যে সহায়তা করে তবে তারা নিষ্কৃতি পাবে। বলাই বাহুল্য এরা নিষ্কৃতি পায়নি। আখেরে ওরা ঐ একই পদ্ধতিতে প্রাণ হারায়—সাক্ষীকে ছেড়ে দেওয়া কোনও স্থলেই নিরাপদ নয়।

এইসব নিহতজনের অধিকাংশই বুড়োবুড়ী, ছেলেমেয়ে, কোলের শিশু এবং রুগ্ন অসমর্থ যুবক-যুবতী। সমর্থদের বন্দীদশায় একাধিক বড় বড় কারখানায় বেগার খাটার জন্য নিয়ে যাওয়া হত। আখেরে, অর্থাৎ ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে, যুদ্ধশেষের কিছুদিন পূর্বে এদেরও মেরে ফেলা হয়। যুদ্ধপূর্ব জরমনিতে ছিল ৫,৫০,০০০ ইহুদি। যুদ্ধশেষে রইল ৩০,০০০। পোলান্ডের সংখ্যা বীভৎসতর; যুদ্ধপূর্বে সেখানে ছিল তেত্রিশ লক্ষ, যুদ্ধশেষে মাত্র ত্রিশ হাজার। এবং আশ্চর্য এই, ত্রিশ হাজারের চোদ্দআনা পরিমাণ লোক আপন দেশ ছেড়ে পুণ্যভূমি ইহুদি স্বর্গ ইজরাএলে যেতে রাজী হয়নি। অনেকেই বলে, 'জরমনি আমার পিতৃভূমি (ফাটেরলান্ট্), এদেশ ছেড়ে আমি যাব কেন? যে পিতৃভূমিতে সে তার অধিকাংশ আত্মজন হারালো তার প্রতি এই প্রেম প্রশংসনীয় না কাণ্ডজ্ঞানহীন একগুঁয়েমির চূড়ান্ত—জানেন শুধু সৃষ্টিকর্তা!

আমি বর্ণনাটা সংক্ষেপে সারলুম, কারণ ইহুদি নিধনের এটা অবতরণিকা মাত্র—'চলি চলি পা পা' মাত্র। যেমন যেমন এস এস-দের নিধনকর্মে অভিজ্ঞতা বাড়তে লাগল

www.BanglaBook.org

হননকর্ম, তেমন তেমন সূক্ষ্মতর, বিদগ্ধতর ও ব্যাপকতর হতে লাগল।

ভিন্ন ভিন্ন ক্যাম্পের অধিকর্তা, যাঁরা গুলি মারার আদেশ দিতেন তাঁদের কয়েকজন যুদ্ধশেষে ধরা পড়েন। তাঁদের একজন ওলেনডর্ফ্। মিত্রশক্তি কর্তৃক জরমনির ন্যুর্ন্বের্গ শহরে সাক্ষ্যদানকালীন ওলেনডর্ফ্ আসামীপক্ষের উকিল আমেনের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'আমি এই পদ্ধতির সমর্থন করিনি।'

উকিল আমেন : 'কেন?'

ওলেনডর্ফ্ : 'এ পদ্ধতিতে নিহত ইহুদি এবং যারা গুলি ছুঁড়তো, উভয় পক্ষেরই মাত্রাহীন অসহ মানসিক যন্ত্রণা বোধ হত।

ইহুদিদের প্রতি কসাই ওলেনডর্ফের এই 'দরদ' অভিনব, বিচিত্র। এই কুম্ভীরাশ্রুর একমাত্র কারণ তিনি তখন নিজেকে ফাঁসিকাঠ থেকে বাঁচাতে আপ্রাণ চেষ্টা দিচ্ছেন।

কিন্তু এ-কথা সম্পূর্ণ সত্য, যে-সব এস এস সৈন্য গুলি ছুঁড়তো তাদের অনেকেই এই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার ফলে হঠাৎ সাতিশয় মন-মরা হয়ে যেত, মদ্য-মৈথুন ত্যাগ করতো, অবসর সময়ে সঙ্গীসাথী বর্জন করে এককোণে বসে বসে শুধু চিন্তা করতো। হিটলারের আদেশে তাদের গুলি ছুঁড়তে হবে—এ-কথা তাদের স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে। কাজেই তাঁর আদেশ লঙ্ঘনের কোনও প্রশ্নই উঠে না—বছরের পর বছর তারা ট্রেন্ড্ হয়েছে 'বশ্যতা'মন্ত্রে—অবিডিয়েন্স্ এবাভ অল, ফ্যুরারের আদেশে কোনও ভুল থাকতে পারে না, আপ্তবাক্যের ন্যায় তাঁর আদেশ অভ্রান্ত, ধ্রুব সত্য।

কিন্তু ঐ ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতাটাও তো নির্মম সত্য!

হাল বয়ান করে হিমলার-যমকে জানানো হল। ইস্পাতের তৈরি সাক্ষাৎ যমদূত-পারা ক্বচিৎ এস এস-এর নার্ভাস ব্রেক-ডাউনের খবর পেয়ে তিনি উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন কিনা সে খবর জানা নেই। তবে একটা 'কেলেঙ্কারি'র খবর অনেকেই জানতো : ইহুদি নিধন যজ্ঞের গোড়ার দিকে হিমলারের একবার কৌতূহল হয়, 'ম্যাস-মারডার'—'পাইকারি কচু-কাটা' দেখার! একশ' জন ইহুদি নারী পুরুষকে সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে গুলি চালানো হল। সে দৃশ্য দেখে স্বয়ং শ্রীমান হিমলার ভিরমি যাচ্ছিলেন। সঙ্গীরা তাঁকে ধরে দাঁড় করিয়ে রাখলো। স্বয়ং যম যদি মৃত্যু দেখে চোখে-মুখে পাঙাস মারেন তবে বাল্যখিল্য যমদূতেরা 'কোজ্জাবে' মা?[১] এবং আশ্চর্য! স্বয়ং হিটলারও চোখের সামনে রক্তপাত সহ্য করতে পারতেন না। এবং প্রাণীহত্যা আদৌ বরদাস্ত করতে পারতেন না বলে তিনি ছিলেন কড়া নিরামিষভোজী। মাংসাসীদের বলতেন 'শবাহারী'।

হিমলারের আদেশে দুখানা বিরাট মোটর ট্রাক তৈরি করা হল। দেখতে এমনি সাধারণ ট্রাকের মত, তবে চতুর্দিক থেকে টাইট ঢাকা এবং বন্ধ। শুধু বাইরের থেকে একটা পাইপ

---

১ এই একশ জনের ভিতর এক যুবতীকে দেখে হিমলার রীতিমত বিস্মিত হন। চেহারা, চুল, নাক আদৌ ইহুদির মত নয়। যে নরডিক্ (বিশুদ্ধতম আর্যরক্তের জরমন) জাত হিটলার হিমলার আদর্শ বলে ধরতেন তাদেরই মত ব্লনড চুল, নীল চোখ, ব্রিজহীন সোজা নাক ইত্যাদি। হিমলারের ডাকে সে এগিয়ে এলে হিমলার তাকে বললেন, 'তুমি ইহুদি নও।' গর্বিত উত্তর : 'না আমি ইহুদি।' তুমি বলো, তুমি ইহুদি নও, আমি তোমাকে নিষ্কৃতি দেব।' গর্বিততর কণ্ঠে, 'না, আমি ইহুদি।' তারপর দৃঢ় পদক্ষেপে ফিরে গিয়ে আপন জায়গায় দাঁড়ালো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভিতরে চলে গেছে। মোটর চালানোমাত্র বিষাক্ত গ্যাস ভিতরে যেতে থাকে, এবং দশ-পনেরো মিনিটের ভিতর অবধারিত মৃত্যু। ততক্ষণ অবধি ভিতর থেকে চাপা চীৎকার আর দরজার উপর ধাক্কা আর ঘুষির শব্দ শোনা যেত। প্রাচীন পাপী ওলেনডর্‌ফ্‌কে আদালতে শুধানো হল, 'ওদের তোমরা ট্রাকে তুলতে কি করে?'

ওলেনডর্‌ফ্‌ : 'ওদের বলা হত তোমাদের অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।'

কিন্তু এ পন্থাতেও এস এস-দের কেউ কেউ সেই প্রাচীন চিন্তাবসাদে ভুগতে লাগলো। ট্রাক থেকে বের করার সময় দেখা যেত মৃতদেহের মুখ বীভৎস রূপে বিকৃত। গাড়িময় রক্ত মলমূত্র। একে অন্যের শরীরে জামাকাপড়ে পর্যন্ত—। একে অন্যকে এমনই জড়িয়ে ধরে আছে যে লোহার আঁকশি আর ফাঁস দিয়ে ছাড়াতে শরীর ঘেমে উঠতো, মুখ চকের মত ফ্যাকাসে হয়ে যেত, মগজে ভূতের নৃত্য আর চিন্তাধারায় বিভীষিকা।

অকল্পনীয় এই খুনে গাড়ি দুটোর অভাবনীয় মৌলিক আবিষ্কারক ডক্টর বেকারকে জানানো হল। আসলে ইনি এস এস-এস-দের চিকিৎসক (এবং স্বয়ং এস এস)। ইনি কিন্তু আমাদের সেই স্ত্রীহন্তা ডাক্তারের মত নন। তিনি 'একমেবা' করেই প্রসন্ন। ইনি ভূমার সন্ধানে আবিষ্কারক হয়ে গিয়েছিলেন!

ঈষৎ বিরক্তির সুরে তিনি লিখলেন, 'আমি যে ''ব্যবহার পদ্ধতি'' লিখে দিয়েছিলুম (ঠিক যেভাবে তিনি ওষুধের প্রেসক্রিপশনে 'সেবন পদ্ধতি' ডাইরেকশন ফর ইউজ' লিখে থাকেন) সেভাবে কাজ করা হয়নি। অপ্রিয় কর্ম তড়িঘড়ি শেষ করার জন্য গ্যাসযন্ত্র পরিচালক গ্যাস ছাড়ার হ্যান্ডিলটা একধাক্কায় সর্বশেষ ধাপে নিয়ে যায়; ফলে ইহুদিরা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়। হ্যান্ডিল ধীরে ধীরে চালালে এরা আস্তে আস্তে এবং আপন অলক্ষ্যে মৃদুমধুর নিদ্রায় প্রথম ঘুমিয়ে শেষনিদ্রা আস্তে আস্তে এতে করে আরও কম সময়ে এদের মৃত্যু হয়। দরজায় ঘুষি, মলমূত্র ত্যাগ, বিকৃত মুখভঙ্গি, একে অন্যে মোক্ষম জড়াজড়ি—এসব কোনও উৎপাতই হয় না।'

অত্যুত্তম প্রস্তাব। কিন্তু তাহলেও তো বিরাট সমস্যার সমাধান কণা পরিমাণও হয় না। কারণ ফি ট্রাকে মাত্র পনেরো থেকে পঁচিশ জন প্রাণী লাদাই করা যায়। ওদিকে হিটলার হিমলার যে বিরাট সংখ্যার দিকে ঊর্ধ্বনেত্রে তাকিয়ে আছেন, এসব গাড়ি গণ্ডায় গণ্ডায় বানিয়েও তো সেখানে পৌঁছনো যাবে না। ঐ সময়েই রাশার কিয়েফ শহরের কাছে প্রায় চৌত্রিশ হাজার প্রাণীকে—এদের অধিকাংশই ইহুদি—মাত্র দু'দিনের ভিতর খতম করার হুকুম এল, এবং জরমন কর্মতৎপরতা সে কর্ম সম্পূর্ণ করলোও বটে। গ্যাসভ্যান দিয়ে এত লোক, অল্পসময়ে নিশ্চিহ্ন করা যেত না।

হিটলারের হিমলারের আদেশে জরমনির ভিতরে বাইরে—বিশেষ করে পোলানডে অনেকগুলো কনসানট্রেশন ক্যামপ্‌ (ক ক) নির্মাণ করা হয়। সর্ববৃহৎ ছিল আউশ্‌ভিৎস্‌-এ। তার বড়কর্তা ছিলেন শ্রীযুক্ত হয়েস্‌।[১] হিমলার তাঁকে ডেকে বললেন, 'ফ্যুরার (হিটলার) হুকুম দিয়েছেন, ইহুদিদের খতম করতে হবে, প্রথমত—খুব তাড়াতাড়ি, দ্বিতীয়ত—গোপনতম গোপনে।' কি পরিমাণ ইহুদিকে খতম করতে হবে তার মোটামুটি

১ ইনি হিটলারের ডেপুটি রুডল্‌ফ্‌ হেস (Hess) নন, যিনি সন্ধিপ্রস্তাব নিয়ে ইংলন্ডে যান। এঁর নাম Hoess।

www.BanglaBook.org

হিসেব হিমলার দিলেন। ইয়োরোপে তখন এক কোটি ইহুদি; অবশ্য বহু জায়গা হিটলারের তাঁবেতে নয় বলে অসংখ্য ইহুদিকে পাকড়াও করা যাবে না।

ইতিমধ্যে ছোটখাটো দু-চারটি ক ক-তে ইহুদি নিধন সমস্যার খানিকটে সমাধান হয়ে গিয়েছে। মাঝারি রকমের একটি নিরস্ত্র হলঘরে ইহুদিদের চাবুক মেরে মেরে ঢোকানো হয়। দরজা বন্ধ করে ছেড়ে দেওয়া হয় মনক্সাইড গ্যাস। আধঘণ্টার ভিতর এদের মৃত্যু হয়। কিন্তু এসব জায়গা ছ' মাসে আশি হাজারের বেশী প্রাণী নিশ্চিহ্ন করা যায় না। তা হলে তো হল না।

হয়েস্ খাঁটি জরমনদের মত পাকা লোক। কাজ আরম্ভ করার পূর্বে সব কটা ক ক দেখে নিলেন। (যুদ্ধশেষে হয়েস্ এক চাষা-বাড়িতে আশ্রয় নেন; সেখানে ধরা পড়েন। ন্যুরন্বের্গ শহরে গোরিঙ, হেস্, রিবেনট্রপ ইত্যাদির বিরুদ্ধে যখন মিত্রশক্তি মোকদ্দমা চালাচ্ছেন তখন হয়েস্ সাক্ষীরূপে যা বলেন তার নির্গলিতার্থ—)

'আমি ক ক-গুলো পরিদর্শন করে আদপেই সন্তুষ্ট হতে পারলুম না। প্রথমত মনক্সাইড গ্যাস যথেষ্ট তেজদার গ্যাস নয়, দ্বিতীয় চাবুক মেরে মেরে গ্যাস-ঘরে ঢোকাতে হলে বিস্তর লোকের প্রয়োজন, তৃতীয় সেই প্রাচীন সমস্যা লাসগুলোর সর্বোত্তম ব্যবস্থা কি হতে পারে?

কারণ ইতিমধ্যে দেখা গেল, গ্যাস-ভর্তি লাস পুঁতলে তারই ঠেলায় গোরের উপরের মাটি ফুলে ওঠে—কয়েকদিন অপেক্ষা করে তবে স্টীম-রলার চালানো যায়। তদুপরি লক্ষ লক্ষ লাসের 'বেশাতি'। অতখানি জায়গা কোথায়? আউশভিৎস জায়গাটি ছিল নিকটতম গ্রাম থেকে কয়েক মাইল দূরে, নির্জনে এবং কাছেপিঠে লোক চলাচলের কোন সদর রাস্তাও তার গা ঘেঁষে যায়নি। তবু কেউ সেদিক দিয়ে যাবার সময় সেই বিরাট প্রতিষ্ঠানের দেউড়ির উপরের দিকে তাকালে দেখতে পেত লেখা রয়েছে "স্নান প্রতিষ্ঠান", গেট দিয়ে দেখতে পেত, প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ পথের দু পাশে কাতারে কাতারে শৌখিন মরসুমী ফুলের কেয়ারি। দূর থেকে 'নৃত্যসম্বলিত' হাল্কা গানের কনসারট সঙ্গীত ভেসে আসছে। কে বলবে সেখানে পৃথিবীর অভূতপর্ব বিরাটতম নরনিধনালয়!

মেন রেল লাইন থেকে একটা সাইড লাইন করিয়ে নিলেন হের হয়েস্ তাঁর ক ক পর্যন্ত। যেদিন যে সংখ্যার নরনারী শেষ করা সম্ভব সেই সংখ্যার ইহুদি গরুভেড়ার মালগাড়ির ট্রাকে করে নিয়ে আসা হয়েছে পোলান্ড থেকে, হাঙগেরি থেকে, সুদূর রুশ থেকে। এদের খেতে দেওয়া হয়নি, ট্রাকে পানীয় জলের শৌচের ব্যবস্থা নেই, ট্রাক খোলা হলে দেখা যেত শতকরা আট থেকে দশজনা—বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে—মরে আড়ষ্ট হয়ে আছে। শীতকালে শুধু জমে গিয়েই এর সংখ্যা দেড়া হয়ে যেত।

এদের নামানো হত রেলকর্মচারীদের বিদেয় দেওয়ার পর।

ইহুদিদের বলা হয়েছে, এখানে এদের বিশেষ ওষুধ মাখানো জলে স্নান করিয়ে গা থেকে উকুন সরানো হবে (ডিলাউজিং)। তারাও দেউড়িতে দেখতে পেত লেখা রয়েছে 'স্নান প্রতিষ্ঠান'। ফুলের কেয়ারি, ঘনসবুজ লন, আর আবহাওয়া উত্তম হলে সেই লনের উপর বসেছে সুবেশী তরুণীদলের কনসারট। চটুল নৃত্য-সঙ্গীত শুনতে শুনতে তারা এগুতো রেসেপসনিস্ট্-এর কাছে। ইতিমধ্যে দুজন এস এস ডাক্তার ইঙ্গিত করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, কারা কর্মক্ষম আর কারা যাবে গ্যাস চেম্বারে। শতকরা পঁচিশ জনের মত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কর্মক্ষম যুবক-যুবতীকে আলাদা করে নিয়ে যাওয়া হত অন্য দিকে। যুবতী মা-দের কেউ কেউ আপন শিশু হতে বিচ্ছিন্ন হতে চায় না বলে আপন স্কারটের ভিতর লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করতো, কিন্তু হয়েস্ বলেছেন, এস এস-দের তারা ফাঁকি দিতে পারতো না। এদিকে যারা গ্যাস চেম্বারে যাবে তাদের বলা হয়েছে তাদের টাকাকড়ি, গয়না, ঘড়ি, মণিজওহর—মূল্যবান যাবতীয় বস্তু আলাদা করে রাখতে যাতে করে স্নানের শেষে যে যার মূল্যবান জিনিস ঠিক ঠিক ফিরে পায় (দেশ থেকে এদের নিয়ে আসার সময় তাদের বলা হয়েছে,—তারা ভিন দেশে নূতন কলনি [দণ্ডকারণ্য?] গড়ে তুলবে; আপন দেশে ফেরবার কোনও সম্ভাবনা নেই, তাই—হীরা-জওহর টাকাকড়ি সঙ্গে নিয়ে যেতে)। ওদিকে কনসারটে পলকা নৃত্যসঙ্গীত বেজেই যাচ্ছে, বেজেই যাচ্ছে। 'তামাশা'টা পরিপূর্ণ করার জন্য কোনও কোনও দিন এদের ভিতর আবার স্থানীয় নৈসর্গিক দৃশ্যের পিকচার পোস্ট কার্ড দেওয়া হত—আত্মীয়স্বজনকে পাঠাবার জন্য। তাতে ছাপা রয়েছে : 'আমরা মোকামে পৌঁচেছি এবং চাকরি পেয়েছি; এখানে খুব ভালো আছি; তোমাদের প্রতীক্ষা করছি।' ইতিমধ্যে কয়েকজন অফিসার হন্তদন্ত হয়ে বলতেন, 'একটু তাড়াতাড়ি করুন; নইলে পরের ব্যাচকে থামখা বসে থাকতে হবে যে!' তারপর সবাই সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় ঢুকতো সেই গ্যাস চেম্বারে।

হয়েস্ বলেছেন, 'ব্যাপারটা যে কি কখনই কেউই বুঝতে পারতো না তা নয়। তখন ধুন্ধুমার, প্রায় বিদ্রোহের মত লেগে যেত। তখন অন্যান্য ছোটখাটো ক ক-তে যে-রকম বেধড়ক চাবুক মেরে মেরে ঢোকানো হয় তাই করা হত।

একটা হল্-এ প্রায় দু-হাজারের মত লোক ঠাসা যেত।

এত লোককে একসঙ্গে শাওয়ার-বাথে ঢোকানো হল—তাই দেখে অন্তত তখন, অনেকেরই মনে বিভীষণ সন্দেহ জাগতো। কিন্তু ততক্ষণে 'টু লেট।' ফ্রিজিডেরের দরজার মত নিরন্ধ্র বিরাট দু পাট দরজা তখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দেয়ালের কাছে যারা দাঁড়িয়েছে তারা শাওয়ারের চাবি খুলে দেখে জল আসছে না।...এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আসতে লাগল অন্য জিনিস...দরজা বন্ধ করে দেওয়ার পর লন-এ উপস্থিত একজনের দিকে ইসারা দেওয়া হত। সঙ্গে সঙ্গে সেই এস এস সেখানে একটা পাইপ খুলে ছেড়ে দিত এক টুকরো নিরেট ক্রিসটেলাইজড 'সাইক্লন বী' গ্যাস।[১] এই বস্তুটি অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসামাত্রই মারাত্মকতম গ্যাসে পরিবর্তিত হয়ে পাইপের ভিতর দিয়ে উন্মুক্ত শাওয়ারের ছিদ্র দিয়ে বেরুতে থাকতো। এক নিশ্বাস নেওয়া মাত্রই মানুষ ক্লরফরম্ নেওয়ার মত সংজ্ঞা হারায়। যাদের নাকে তখন গ্যাস ঢোকেনি তারা তখন চিৎকার আর ধাক্কাধাক্কি করতো বন্ধ দরজার দিকে এগোবার জন্য, আর যারা দরজার কাছে তারা আপ্রাণ ঘুষি

১ কোন্ প্রকারের গ্যাস, কেমিকেল ইত্যাদি সম্বন্ধে এ-লেখকের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। জরমন এন্সাইক্লপীডিয়া বলেন Zyklon (ৎসাইক্লন) এক প্রকারের অতি মারাত্মক বিষাক্ততম প্রাসিক (হাইড্র সায়েনিক) এসিড। হয়েস্-এর উৎসাহে এক বৈজ্ঞানিক 'ৎসাইক্লন বী' Zyklon B আবিষ্কার করেন। এরই অন্য নাম Zyanwasserstoffkristalle; অর্থাৎ Zyankali Cyanide of Potassium, Wasserstoff = hydrogen॥ মূল ৎসাইক্লন ব্যবহার করা হত খাদ্যশস্যবিনাশকারী কীট পতঙ্গ ইঁদুর মারার জন্য। নামটা ব্যবসায়ে ব্যবহৃত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মারতো বন্ধ দরজার উপর। সেই মৃত্যুভয়ে ভীত প্রাণাতঙ্কে উন্মত্ত জনতা দরজার দিকে ঠেলে ঠেলে সেখানে মনুষ্য-পিরামিডের আকার ধারণ করতো।

মোক্ষম পুরু কাঁচের ছোট্ট একটি গবাক্ষের ভিতর দিয়ে 'করুণাসাগর' এস এস-রা (তিন থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যেই সব শেষ—আবহাওয়া ও মৃত্যোৎসর্গিত প্রাণীর উপর নির্ভর করতো সময়ের তারতম্য)। যখন দেখতো অচৈতন্য শরীরগুলো আর থেকে থেকে হ্যাঁচকা টান দিচ্ছে না, তখন ইলেকট্রিক পাম্প দিয়ে ভিতরকার গ্যাস শুষে নেওয়া হত। বিরাট দরজা খোলা হত।

গ্যাস মাস্ক্ (ছিদ্রহীন মুখোশ), রবারের হাঁটু-ছোঁয়া বুট পরে হাতে হোস পাইপ নিয়ে ঢুকতো একদল ইহুদি—পূর্বেই বলেছি এদের লোভ দেখানো হয়েছে, প্রয়োজনীয় কাজ করে দিলে এদের মুক্তি দেওয়া হবে।

দরজা খোলামাত্র লাশের পিরামিড, এমন কি যারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরেছে তারাও, মাটিতে পড়ে যেত না। একে অন্যকে তখনও তারা জাবড়ে আঁকড়ে ধরে আছে। নাকমুখ দিয়ে বেরোনো রক্ত, ঋতুস্রাবের রক্ত, মলমূত্র সব লাশ ছেয়ে আছে, মেঝেতেও তাই। ইহুদিদের প্রথম কাজ হত হোস দিয়ে সব কিছু সাফসুৎরো করা। তারপর আঁকশি আর ফাঁস দিয়ে মৃতদেহগুলো পৃথক পৃথক করা। এরপর লাশগুলোর হাত থেকে আংটি সরানো হত, ডেনটিস্ট্রা এসে সাঁড়াশি দিয়ে মুখ খুলে সোনার সোনা বাঁধানো দাঁত—দরকার হলে হাতুড়ি ঠুকে ঠুকে—বের করে নিত। মেয়েদের মাথার চুল দু-চারবার কাঁচি চালিয়ে কেটে নিয়ে বস্তায় পোরা হত—পরে কৌচসোফা এই দিয়ে তুলতুলে করা হবে এবং যুদ্ধের অন্যান্য কাজে লাগবে। সর্বশেষ ইহুদি 'জমাদাররা' স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের গোপনস্থলে 'পরীক্ষা' করে দেখে নিত হীরকজাতীয় মহা মূল্যবান কোন বস্তু লুকনো আছে কিনা।

ন্যুরন্বের্গ মোকদ্দমায় বলা হয় যে কোনও কোনও ক ক-তে লাসের চর্বি ছাড়ানো হত সাবান ইত্যাদি তৈরী করার জন্য, এবং কোনও এক বিশেষ ক ক-র প্রধান কর্মচারীর শৌখিন পত্নী মানুষের চামড়া দিয়ে ল্যাম্প্-শেড্ তৈরী করাতেন। কিন্তু এগুলো সপ্রমাণ হয়নি। অধমের নিবেদন, অনাহারে অত্যাচারে রোগব্যাধি তথা অসহ্য মানসিক ক্লেশে ইহুদিদের দেহে তখন যেটুকু চর্বি অবশিষ্ট ছিল, তা দিয়ে একটি কবরেজী বড়িও হয় না।

মণিমাণিক্য অলঙ্কারাদি জরমন স্টেট ব্যাঙ্কে পাঠানো হত। এ পদ্ধতিতে স্টেট ব্যাঙ্ক কি পরিমাণ মাল পেয়েছিলেন তার হিসাব যুদ্ধশেষে নির্ধারিত করা যায়নি। তবে ব্যাঙ্ক বেশীর ভাগ বিক্রি করে দেওয়ার পরও যা পাওয়া গিয়েছিল তাই দিয়ে যুদ্ধশেষে মারকিনরা তিনটে বিরাট বিরাট ভলট কাঁঠাল-বোঝাই করেছিল। এবং একখানা চিঠি থেকে কি পরিমাণ মাল যোগাড় করা হয়েছিল তার কিছুটা হদিস মেলে। স্টেট ব্যাঙ্ক সরকারী লগ্নী প্রতিষ্ঠানকে সে চিঠিতে লেখেন, 'এই দুসরা কিস্তিতে আমরা যা পাঠাচ্ছি তার মধ্যে আছে, ১৫৪ সোনার পকেট-ঘড়ি, ১৬০১ হোয়ার ইয়ারিং, ১৩২ ডায়মনড্ আংটি, ৭৮৪ রুপোর পকেট ঘড়ি, ১৬০ বিশুদ্ধ ও মিশ্রিত সোনার দাঁত, ইত্যাদি ইত্যাদি—অতি দীর্ঘ সে ফিরিস্তি। চিঠি লেখা হয় ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪২-এ এবং ইহুদি নিধন চালু ছিল 'ফুল্' (গ্যাস) স্টিমে ১৯৪৪-এর শেষ-পর্যন্ত—এবং তারপর মন্দগতিতে। মারকিনরা এখনও তাই ঠিক ঠিক 'মোট-জমা' প্রকাশ করতে পারেননি।

www.BanglaBook.org

কিন্তু এসব জিনিস থাক। যে-জিনিসটা জনৈক মারকিন অফিসারকে অত্যন্ত বিচলিত করেছিল (এবং আমাকেও করেছে) সেটা নিবেদন করার পূর্বে বলি, এই অফিসারটি রীতিমত হারড্ বয়েল্ড ঝাণ্ডু—বিস্তর লড়াই লড়েছেন, বীভৎস সব বহু বহু দৃশ্য দেখেছেন, গণ্ডায় গণ্ডায় গুপ্তচরকে তাঁর সামনে তাঁরই আদেশে গুলি করে মারা হয়েছে (যুদ্ধের সময় গুপ্তচর নিধন আন্তর্জাতিক আইনে বাধে না); সে-সবের ঠাণ্ডা-মাথা হিমশীতল বর্ণনা পড়ে মনে হয়, ওসব ক্ষেত্রে ভদ্রলোকের নেকটাইটি পর্যন্ত এক মিলিমিটার এদিক-ওদিক হয়নি কিন্তু তার 'ওয়াটারলু'-এর যুদ্ধের পর, আউশভিৎস দেখতে গিয়ে, টুরিস্ট্রূপে (এখনও ওটি সে-অবস্থাতেই রাখা আছে—পাঠক নেকসুট্ ট্রিপে সেটা দেখে নেবেন। আমি হিম্মৎ করতে পারিনি।) মারকিন অফিসার গ্যাস চেম্বার পোড়াবার জায়গা, বন্ধ চুল্লি খোলা চুল্লি সব—সব দেখলেন। সর্বশেষে গাইড নিয়ে গেল একটা গুদোম ঘরে যেখানে নিহত ইহুদিদের অপেক্ষাকৃত কম দামী জামা-কাপড়, জুতো-মোজা সারে সারে সাজানো ছিল।

তারই এক অংশে তিনি দেখতে পেলেন চল্লিশ হাজার জোড়া জুতো। ক্ষুদে ক্ষুদে। নিতান্ত কাঁচা-কচি শিশুদের।

এবারে আমরা যে-প্রসঙ্গ নিয়ে এ নিবন্ধ আরম্ভ করেছি সেখানে ফিরে যাই।

মারকিন মনস্তত্ত্ববিদ ডঃ গিলবারট্ আউশ্ভিৎস ক্যাম্পের কর্তা হয়েস্‌কে আশ্চর্য হয়ে শুধোন, 'এত অসংখ্য লোককে তোমরা মারতে কি করে?' হয়েস্ বাধা দিয়ে শান্তকণ্ঠে বললেন, 'আপনি তাবৎ জিনিসটাকে ভুল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছেন। মারাটা তো সহজ। মিনিট পনেরো লাগে কি না লাগে, দু হাজার লোককে মেরে ফেলতে (হয়েস্ বোধ করি জানতেন না যুদ্ধের শেষের দিকে এক জরমন ডাক্তার 'চমৎকার' একটি ইনজেকশন বের করেন, এবং মোদ্দা কথা তার দাম ফীনলের চেয়েও কম;—ঘাড়ের কাছে সে ইনজেকশন আনাড়িতেও দিতে পারে, শিকার খতম হয় মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ভিতর)। কিন্তু আসল সমস্যা লাশগুলো নিশ্চিহ্ন করা যায় কি করে। বিরাট বিরাট চুল্লি তৈরী করে এবং সেগুলো চব্বিশ ঘণ্টা চালু রেখেও আমরা ঐ সময়ের ভিতর দশ হাজারের বেশী লাশ নিশ্চিহ্ন করতে পারতুম না। মনে রাখতে হবে, চুল্লি থেকে মাঝে মাঝে হাড় আর ছাই বের করতে হত। হাড়গুলো মেশিনে গুঁড়ো করে ছাইসুদ্ধ পাশের নদীতে ফেলে দেওয়া হত (শুনেছি তো হাড়ের গুঁড়ো আর ছাই উত্তম সার—তবে জরমনরা এটা অরবাদ করতো কেন?—যেস্থলে চুল পর্যন্ত কাজে লাগানো হচ্ছে—লেখক)। মোটামুটি বলতে গেলে আমরা আউশভিৎসে ২৭ মাসে ২৪৩০০০০ (প্রায় সাড়ে চব্বিশ লক্ষ) লোক মেরেছি।'

আইসম্যান গর্ব করে বলেছিলেন, সব কটা ক ক-তে মিলে জীবসুদ্ধ পঞ্চাশ লক্ষ প্রাণী খতম করা হয়। হয়েস্ স্বীকার করেছেন, শত চেষ্টা সত্ত্বেও লাশ নিশ্চিহ্ন করার কাজটা গোপন রাখা যায়নি। অর্থাৎ গ্যাস চেম্বারে নিধনকর্মটি গোপন রাখা যায়, কিন্তু মাটিতেই পোঁতো আর পুড়িয়েই ফেল—সেটা কিন্তু গোপন রাখা যায় না। লাশ-পোড়ানোর তীব্র উৎকট গন্ধ, আর চিমনির চোঙ্গা থেকে যে ধুঁয়ো বেরুচ্ছে তার ছাই ছড়িয়ে পড়তো কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত চতুর্দিকের গ্রামে। তারা বুঝে যেত ঐ নিরীহ "স্নান-প্রতিষ্ঠান" কোন্

www.BanglaBook.org

'বিশ্বপ্রেমের খয়রাতী রাজকার্যে' লিপ্ত আছেন এবং শুধু সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করতো বাতাস যেন তাদের আপন বসতগ্রামের দিকে না যায়! এটা কিছু নূতন নয়। যুদ্ধের গোড়াতেই এই নিধনযজ্ঞ হিটলার আরম্ভ করেন জরমনির পাগলা-গারদগুলো দিয়ে—পাগলদের ভিতর অবশ্য কিছু ইহুদিও ছিল, কিন্তু অধিকাংশই খাঁটি জরমন। নামকে ওয়াস্তে একটা কমিশন বসলো—এত অল্পসংখ্যক পাগল রেহাই পেল, যদি আদৌ কেউ পেয়ে থাকে, যে সেটার কোনও উল্লেখ পর্যন্ত নেই—এবং পাগলদের কতকগুলো কেন্দ্রে জড়ো করে গ্যাস মারফৎ মেরে পুড়িয়ে দেওয়া হল। এটা স্রেফ খুন। জরমন আইনে নিকটতম তিনজন আত্মীয়ের অনুমতি ভিন্ন পাগলকে এক প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানে সরানো পর্যন্ত যায় না—নিধন করার (যাকে ভদ্রভাষায় বলা হয় 'মার্‌সি কিলিং'='অনন্ত যন্ত্রণা থেকে রেহাই দেবার জন্য দয়াবশত কাউকে হত্যা করা' কিংবা 'অনারোগ্য ক্যানসারের অসহ যন্ত্রণায় রোগী যখন বিষ খেতে চায় তাকে বিষ এনে দেওয়া।' ডাক্তারি আইনে একে বলা হয়—Euthanasia, গ্রীক সমাস) তো কোন কথাই ওঠে না। পাগলদের মেরে পুড়িয়ে ফেলার প্রধান কেন্দ্র ছিল হাডামার নামক গ্রামে। তারই পাশের লিম্‌বুর্‌গ্‌ শহর। সেখানকার বিশপ জরমনির আইনমন্ত্রীকে একখানা চিঠিতে জানান "ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত সেই বন্ধ বাসগুলো চেনে, যার ভিতরে করে পাগলদের হাডামারে নিয়ে যাওয়া হয় এবং এর কোনও একটাকে দেখলেই ছেলেরা বলে ওঠে—ঐ যাচ্ছে 'খুনের বাক্‌স্‌='মারডার বক্‌স্‌'। তাচ্ছিল্যভরে কথায় একে অন্যকে বলে, 'ক্ষেপলি নাকি?—যাবি নাকি হাডামারের বেকিং বক্‌সে (যাতে কেক বানানো হয়; এস্থলে পোড়াবার চুলি)?' হাডামারের চিমনি ছাড়ে ধুঁয়ো আর সেখানকার অধিবাসীরা are tortured with the ever present thought of depending on the direction of the wind. তবু এ কথা সত্য এসব খুন-খারাবী লাশ পোড়ানোর খবর দেশময় ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। যারা জানতো, তারা জানতো। অন্য কাউকে বলতে গিয়ে কেউ গেস্তাপোর ('গোপন পুলিস'—এদের প্রধানতম কর্ম ছিল রাজনৈতিক, অনেকটা রুশের 'ওগপু'র মত—এদের কাহিনী ক ক-এর চেয়েও বীভৎসতর) হাতে ধরা পড়লে তার কল্পনাতীত নানা অত্যাচার এবং এতেও যদি সে না মরে তবে সর্বশেষে তাকে কোনও একটা ক ক-তে সমর্পণ এবং সেখানে গ্যাস-চেম্‌বারে মৃত্যু। কাজেই হাডামার বা ক ক-গুলোতে কি হচ্ছে সে-সম্বন্ধে মুখ খুলে কেই রা-টি কাড়তো না। তাই ঐ আমলে একটা চুটকিলা রসিকতা সৃষ্ট হয়—

'তুই নাকি, ভাই, ডেনটিস্‌ট্রি পড়া ছেড়ে দিয়েছিস?'

'বাধ্য হয়ে ছাড়তে হল। কেউ যে মুখ খুলতে রাজী হয় না।'

লিমবুরগ্‌-এর বিশপের চিঠি পেয়ে আইনমন্ত্রী হিটলারের আপন আইন উপদেষ্টার কাছে এ-বাবদে অনুসন্ধান করলেন। আইন-উপদেষ্টা হিটলারের সেই চিঠি দেখালেন। আইনমন্ত্রী বললেন, 'এটা তো তাঁর নির্দেশ। এটা তো আইন নয়। আপনারা তা হলে এটাকে আইনের রূপ দিন, সেটাকে তারপর দেশে প্রবর্তিত করুন।' তা হলে তো চিত্তির! কারণ, জরমন পারলিমেন্ট আইন করার সর্বক্ষমতা সর্ব অধিকার হিটলারকে দিয়েছিল বটে, কিন্তু আইন মাত্রই সরকারী গেজেটে প্রকাশ করতে হয়। তারপর একবার এক বছর কেটে গেল, আইনমন্ত্রী কোন উত্তর পেলেন না। ইতিমধ্যে দেশের সব পাগল খতম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সমস্যাটার সুচারু সমাধান হয়ে গেল আপ্‌সে আপ্‌! কোনও কোনও দেশে যে রকম দুর্ভিক্ষের সমস্যা আপ্‌সে আপ্‌ সমাধান হয়ে যায় কয়েক লক্ষ লোক না খেয়ে মরে যাওয়ার পর।

লাখ তিরিশ বা পঞ্চাশেক ইহুদিকে যে ওপারে পাঠানো হল তার জন্যও কোনও 'আইন' বিধিবদ্ধভাবে তৈরী করা হয়নি। কিন্তু সে মামেলা নিয়ে কখনও কোনও লেখালেখি হয়নি,—ফরিয়াদ করবে কে?—হলেও সেটা লোকচক্ষুগোচর হয়নি। পবিত্র পিতা পোপের কাছে কোনও নিধনই অজানা ছিল না। তিনি থেকে থেকে বিশ্বজন তথা সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে হিটলারের কাছে 'এপীল' করতেন 'ক্রিস্‌টিয়ান চ্যারিটি' দেখাবার জন্য। এর বেশী তিনি কিছু করে উঠতে পারেননি।[১]

হিটলার ক ক-তে কত লক্ষ ইহুদি, রুশ, বেদে ইত্যাদিকে নিহত করেন সেই সংখ্যা নিয়ে যখন ন্যুরনবের্গ মোকদ্দমায় তুমুল তর্কাতর্কি হচ্ছে তখন আসামীদের একজন ছিলেন ফ্রানক্‌। (এঁরই আদেশে অসংখ্য ইহুদিকে আইসম্যানের হাতে সমর্পণ করা হয় এবং বিচারে ফাঁসি হয়। ঐ বিচারে উনিই একমাত্র আসামী যিনি নিজেকে 'দোষী' বলে স্বীকার করেন) সেই তর্কাতর্কির ভিতর আসামীদের কাঠগড়ার পিছনে যে মারকিন সান্ত্রী দাঁড়িয়েছিল সে শুনতে পেল (যে-সব মারকিন জোয়ান উত্তম জরমন জানতো তাদেরই এ-কাজে নিয়োজিত করা হত এবং এরা ভাবখানা করতো যেন জরমন বিলকুল বোঝে না—ফলে আসামীরা নিজেদের ভিতর এমন সব কথা বলে ফেলত যেগুলো সান্ত্রীরা ফরিয়াদি পক্ষের মারকিন উকীলকে জানিয়ে দিত। আমার মনে হয় এটা অত্যন্ত বেআইনী ব্যাপার। কিন্তু মারকিন 'আইনকানুন' যেন 'শিবঠাকুরের আপন-দেশে আইন কানুন সর্বনেশে।') ফ্রানক্‌ ফিসফিস করে তাঁর সহআসামী হিটলারের অন্যতম মন্ত্রী রোজন্‌বের্‌ক্‌কে বলছেন, 'এরা—অর্থাৎ মারকিনিংরেজসহ মিত্রশক্তি—চেষ্টা করছে, আউশ্‌ভিৎসে দৈনিক যে দু হাজার ইহুদি মারা হত তার কুল্লে গুনাহ্‌ কাল্‌টেনব্রুনারের উপর চাপাবার।[২] কিন্তু ঐ যে মার্‌কিনিংরেজের বোমাবর্ষণের ফলে ঘণ্টা দুয়েকের ভিতর

---

১ যুদ্ধের পর হিটলারের প্রতি পোপের আচরণ নিয়ে তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডা হয়—তামাম ইয়োরোপ আমেরিকা জুড়ে। পোপবৈরীরা তাঁকে যে পরিমাণে দোষী সাব্যস্ত করেছেন সেটা সাধারণত রাজনৈতিকের পক্ষে মারাত্মক হত। এঁরা স্মরণ করিয়ে দেন, ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার জরমন রাষ্ট্রের চ্যান্‌সেলর (সর্বাধিকারী) হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পোপ জরমনিতে অপিনি রোমান ক্যাথলিক চার্‌চ্‌ ও তস্য বিশ্বাসীগণকে নাৎসি নিপীড়ন থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে হিটলারের সঙ্গে একটি চুক্তি (কন্‌করডাট্‌) করেন। এতে করেই বিশ্বজন সমাজ মাঝে হিটলারের জল চল হয়ে যায়। তারপর আর সে 'পাগলা জগাই'-কে আর ঠেকায় কে? এই তাবৎ মামেলা নিয়ে মধ্য ইয়োরোপে ফিলিম এবং নাট্যও দেখানো হয়। ক্যাথলিক সমাজ স্বভাবতই অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। কলকাতাবাসীদের মনে থাকতে পারে, বহু বৎসর পূর্বে অংশতম পোপবিরোধী 'মারটিন লুথার' নামক একটি ফিলিম দেখবার সময় তথাকথিত ক্যাথলিকগণ ফিলিমটির বিরুদ্ধে রচিত ছাপা হ্যান্‌ড-বিল বিতরণ করেন, এবং সেটাকে বয়কট করার জন্য অনুরোধ জানান।

২ নাৎসি রাজত্বে ক্ষমতার ধাপগুলো ছিল : হিটলার—হিমলার—কাল্‌টেন্‌ব্রুনার—আইষম্যান্‌। হিটলার হিমলার আত্মহত্যা করেন—আইষম্যান তখন ফেরার। ফলে সব চাপ গিয়ে পড়ে কালটেনব্রুনারের উপর। এরও ফাঁসি হয়। নিষ্ঠুরতায় এর সমকক্ষ লোক পাওয়া কঠিন।

www.BanglaBook.org

হামবুর্গ বন্দরে ত্রিশ হাজার লোক মারা গেল তার কি? এদের বেশীর ভাগই তো ছিল শিশু এবং অবলা। তার পর ঐ যে জাপানে এটম্ বম্ ফেলে আশি হাজার লোক মারা হল তার কি? এই বুঝি ন্যায়, এই বুঝি ইনসাফ্?

রোজেন্‌বের্‌ক্ হেসে উত্তর দিলেন, আমরা যুদ্ধে হেরেছি যে।[১]

ইতিপূর্বে যে মনস্তত্ত্ববিদ মারকিন ডাক্তার গিলবার্‌টের উল্লেখ করেছি, তিনি এই কথোপকথনের উপর ফোড়ন দিয়ে বলেছেন, 'এ হল গে টিপিক্যাল নাৎসি যুক্তিপদ্ধতি।'

বট্যে? তা সে যাক্ গে—আমরা এস্থলে আউশ্‌ভিৎস হিরোশিমার তুলনামূলক আলোচনা করবো না।[২] শুধু একটি সামান্য খবর পাঠককে দিই।

হিরোশিমায় এটম বম ফাটানো হয় ৬ই অগস্ট ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে। এর পক্ষাধিক কাল পূর্বে মহাভারতের সঞ্জয়ের ন্যায় জাপান জয়াশা ত্যাগ করে যুদ্ধে নিরপেক্ষ দেশ সুইডেনের মারফৎ যুদ্ধবিরতি কামনা করে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠায় (এর মাসতিনেক পূর্বে হিটলারের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হিমলার তাঁর প্রভু হিটলারকে না জানিয়ে ঐ সুইডেনের মারফৎই মিত্রশক্তির নিকট সন্ধিপ্রস্তাব পাঠান, কিন্তু দুই মহাপ্রভুর কেউই খ্রীষ্টের উপদেশ মানতেন না বলে বামহস্তটি অর্থাৎ হিটলার খবরটা জানতে পান এবং আত্মহত্যার কয়েক ঘণ্টা পূর্বে হিমলারকে পদচ্যুত করেন) কিন্তু মারকিন তখন হন্যে হয়ে উঠেছে, নবাবিষ্কৃত এটম বম্ একটা ঘন-বসতিওলা শহরে ছাড়লে তার প্রতিক্রিয়া কি হয় সেটা জানবার জন্য। জাপানদত্ত সন্ধিপ্রস্তাব গ্রহণ করলে তো আর বোমাটার এক্সপেরিমেন্ট চালানো যায় না—অতএব, চালাও যুদ্ধ আরও কয়েকদিন, বোমা ফাটিয়ে দেখা যাক ক'হাজার লোক স্রেফ পুড়ে মরে, শহর কতটা ধ্বংস হয়। বলা নিতান্তই বাহুল্য—হিটলারের ক ক-তে গ্যাসে মৃত্যু ছিল সম্পূর্ণ যন্ত্রণাহীন, এটম বমে জাপানীরা জ্বলন্ত জামাকাপড় নিয়ে ছুটোছুটি করে মরেছে বহু সহস্র, এবং অসংখ্য জন মরেছে বোমার ফলে নানাবিধ অজানা অচেনা রোগের যন্ত্রণায় বৎসরের পর বৎসর জীবন্মৃত হয়ে। এবং কর্তারা একটা বোমা ফেলেই প্রসন্ন দক্ষিণং মুখং ধারণ করেননি। আমরাও জানি, এক সংখ্যাটাই বড্ডই অপয়া—নিদেন দুটো বাতাসা খেতে হয়।

স্পর্শকাতর পাঠক এতক্ষণে হয়তো কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণু হয়ে ভাবছেন, আমি এসব পুরনো কাঁসুন্দী ঘাটছি কেন। তবে কি আমি মডার্ন লেখকদের পাল্লায় পড়ে বীভৎস রসের অবতারণা করে শিঙ ভেঙে বাছুরের দলে ভিড়তে চাই? 'ঈশ্বর রক্ষতু!' আমার সে-রকম কোনও উচ্চাশা নেই। বরঞ্চ বলবো, মডার্নদের এই যে নূতন টেকনিক—আগেভাগে সব

---

১ রোজেনবের্‌ক্‌কে নাৎসী দলের 'চিন্ময় নেতা'='স্পিরিচুয়াল লীডার' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। তাঁর প্রখ্যাততম গ্রন্থ 'বিংশ শতাব্দীর মিথ' গ্রন্থে তিনি উঠে পড়ে লাগেন, আর্যরাই যে পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট জাতি সেইটে প্রমাণ করার জন্য।

২ হিরোশিমার এটম বম বর্ষণ বাবদে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী জাপানী চিকিৎসকের একটি বয়ান আমার হাতে এসে পৌঁচেছে—inspite of the sharks popularly and mistakenly known in Calcutta as Foreign Book-seller।

সুযোগ পেলে সেটি পাঠকের হস্তে সমর্পণ করবো। ডাক্তারটি বোমা পতনের ফলে আহত হয়ে কয়েক বৎসরের ভিতরই অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে মারা যান।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিছু বলে দিয়ে, কোনও প্রকারের সারপ্রাইজ এলিমেন্ট না রেখে পানসে মারা 'ধূসর' মারকা প্লট্ বিবর্জিত গল্প লেখা (এদের বক্তব্য; বাস্তব জীবনে সারপ্রাইজ নেই—আছে একঘেয়েমির ধূসরিমা, পান্তাভাতের পানসেমি, মরা ইঁদুরের পাঙাশ-মরা পেট)—এটা আমি রপ্তো করতে পারবো না।...আমার যেটা মূল বক্তব্য সেটাতে আসি সর্বশেষে।

এই মাস, অর্থাৎ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮, আজকের ঠিক ২০ বৎসর পূর্বে শ্রীযুত চেম্বারলেন ও ফরাসী প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়ে, দুজনাতে, গণতন্ত্রের প্রতিভূ হিসেবে চেকোশ্লোভাকিয়াকে হিটলারের করকমলে সমর্পণ করেন।

ওওগামি আরম্ভ হয় সেই সময় থেকে। ক ক তার শেষ।

আজ আবার এরা—গণতন্ত্র দেশের লক্ষ্মীছাড়া সব পলিটিশানরা—চেকশ্লভাকদের তাড়াচ্ছে।

অথচ, পাঠক, দেখো, চেক-শ্লভাকদের সাহায্য করার রত্তিভর ক্ষ্যামতা ওদের নেই।

তাই তারা জরমনির দুই লক্ষ সৈন্যকে তিন লক্ষ, না পাঁচ লক্ষে ওঠবার অনুমতি দিয়েছেন।

একদা যে রকম গণতন্ত্রের মুনিব চেম্বারলেন-দালাদিয়ে চেকশ্লভাকদের হিটলারের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন, আজ ঠিক তেমনি তাদের বংশধররা, চেক-শ্লভাকদের তাড়িয়ে দিয়ে, রুশদের হাতে ছেড়ে দেবেন।

আবার শুরু হবে ক ক।

গ্যাস চেম্বার!

শা-লা!

প্রেম

কি কায়দায় আলাপ হয়েছিল সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

ছোকরা আইন পড়ে।

একদিন বললে 'চ, একটা ইনট্রেসটিং মোকদ্দমা হচ্ছে।' এদেশের নিয়ম, আইন পরীক্ষা দেবার পূর্বে ছ'বার না দশবার—আমার সঠিক মনে নেই—আদালতে হাজিরা দিতে হয়, বোধ হয় সরকারী উকিলের অ্যাসিসট্যান্ট রূপে দু'চারবার কাগজপত্রও দুরস্ত করে দিতে হয়।

সুইস্ আদালত আদৌ ভীতি উৎপাদক নয়। কেমন যেন ঘরোয়া-ঘরোয়া ভাব।

অথচ মোকদ্দমাটা বেশ গুরুতর বিষয় নিয়ে।

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে এক যুবতী। সুন্দরী বলা চলে না, সাদামাটা, তবে দেখতে ভালই। এবং তার চেয়ে বড় কথা, মেয়েটি বেশ স্বাস্থ্যবতী। মুখের রঙটি যেন শিশিরে ভেজা। জানা গেল, মেয়েটি সুইস ইতালিয়ান।

দোস্ত ফিস্ ফিস্ করে বললে, 'জানিস তো, জাতে সুইস হলেও এই ইতালিয়ানরা একটু আনস্টেডি—' অর্থাৎ "উড়ুক্কু" ভাব ধরে।

প্রমট্রেমের ব্যাপার আদালত সংক্ষেপেই সারে। তবে এ-স্থলে বিবরণীটি নিশ্চয়ই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোনও রোমান্টিক ছোকরা পুলিস লিখেছিল। প্রেমটা হয়েছিল গভীরই। প্রতি ছুটির দিনে উইক-এন্ড, এমন কি কাজকর্মের ফাঁকে-ফিকিরে সিনেমা-কাবারে-সুইমিং পুল। বেশ স্ফূর্তিতে কেটেছে দিনগুলো—কোনও সন্দেহ নেই। এবং কোনও সন্দেহ নেই মেয়েটাই মজেছিল মরমে মরমে।

সরকারি উকিল গলাখাঁকরি দিয়ে বললেন, 'এবং খর্চাটা মেয়েটির কষ্টে জমানো টাকা থেকে।'

আমার কান ছিল বিবরণীর দিকে, চোখ মেয়েটির পানে। এতক্ষণ তার মুখে কোনও ভাবের পরিবর্তন হয়নি। এবারে তার ঠোঁটের কোণে যেন ঈষৎ অসহিষ্ণুতার ভাব দেখা গেল।...উকিল পড়ে যেতে লাগলেন, 'দুর্ভাগ্যক্রমে আসামী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। প্রকাশ, ছেলেটা প্রতিজ্ঞা করেছিল, আসামীকে বিয়ে করবে। আসামীর পিতামাতা ধর্মভীরু, সেও প্রতি রববারে গীর্জেয় যেত। আসামী অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে জানামাত্রই ছেলেটা পালায়।'

এবারে বিবরণী প্রথম পুরুষে—মেয়েটির বাচনিক।

'আমার এই বিপদে আমাকে সাহায্য করবার মত সে-শহরে কেউ ছিল না; জমানো কড়িও ফুরিয়ে গিয়েছে। তখন স্থির করলুম, গ্রামে ফিরে গিয়ে বাবা-মাকে সব খুলে বলবো। তাঁরা আঘাত পাবেন জানতুম, কিন্তু এছাড়া আমি অন্য পথ খুঁজে পেলুম না।

বাড়ি ফিরে যে অবস্থা দেখলুম তাতে বাবা-মাকে সব কিছু খুলে বলার সাহস আমার আর রইল না। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমার দু বছরের ছোট বোনটি—সেও শহরে গিয়েছিল কাজ নিয়ে, সেও ফিরে এসেছে পেটে বাচ্চা নিয়ে। তাকে কে দাগা দিয়েছে শুধোইনি। আমি কী কষ্টের ভিতর দিয়ে গিয়েছি সে শুধু আমিই জানি। সে বাবা-মাকে সব খুলে বলেছে। আমাকে বললে, তাঁরা বড় আঘাত পেয়েছেন, কিন্তু তাকে গ্রহণ করেছেন, বাচ্চাটাকেও মানুষ করবেন।

আমি তখন করি কি? দু'দুটো মেয়ে কুপথে গেল—অথচ তাঁরা কত যত্নেই আমাদের মানুষ করেছিলেন। আমি তাঁদের কি করে বলি, আমিও কুপথে গিয়েছি। আর দু'দুটো বাচ্চা তাঁরা পুষবেনই বা কি করে?

আমি স্থির করলুম, আমার বাচ্চাটাকে আমি বিসর্জন দেব। হাজার হোক, আমার ছোট বোন। তার হক্ক বেশী। আমি তাকে ভালোবাসি। আমি তাকে সাহায্য করতে চাই।—সে বেচারী একেবারে ভেঙে পড়েছে। আমিও যদি মুখে কলঙ্কের ছোপ মাখি তবে তার হয়ে পাঁচজনের সঙ্গে লড়াই দেব কি করে?

আমি মেয়েটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিলুম। সে যেন একেবারে পাষাণ হয়ে গিয়েছে।

এবারে সরকারী উকিল বললেন, 'নদীপারে নির্জনে আসামী বাচ্চা প্রসব করে তাকে জলে ফেলে দেয়।' তারপর একটু থেমে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, কিন্তু সেখানে আর কেউ ছিল না বলে প্রমাণ করা অসম্ভব না হলেও সুকঠিন, বাচ্চাটা মৃতাবস্থায় জন্মেছিল কি না।'

সমস্ত আদালত-ঘর নিস্তব্ধ, নীরব।

এইবারে প্রথম জজ মুখ খুললেন। সামনের দিকে শূন্য দৃষ্টি ফেলে শুধোলেন, 'বাচ্চাটা জন্মের সময় জীবিত না মৃত ছিল?'

মেয়েটি একবার মুখ তুলে তাকিয়ে ফের মাথা নিচু করলো। বললে, আমি সত্যই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শপথ করে বলতে পারবো না। আমি—আমার—আমি তখন সব-কিছু বুঝতে পারিনি।'

আশ্চর্য, জজ তো নয়-ই, সরকারী উকিল পর্যন্ত কোনও রকম জেরা বা চাপাচাপি করলেন না, প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করার জন্য। কারণ এটা তো আইনত স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বাচ্চা জ্যান্ত জন্মে থাকলে এটা খুন—হয়তো মারডার নয়, ম্যানস্লটার—আর মৃতাবস্থায় জন্মে থাকলে বা জন্মের পরেই যদি মরে গিয়ে থাকে তবে বাচ্চা প্রসবের কথা পুলিসকে জানায়নি বলে অপরাধটা কঠিন নয়—হাইডিং অব্ এভিডেন্স্, সত্য তথ্য নির্ধারণের প্রমাণ গোপন করেছে শুধু।

মোকদ্দমা এখানেই শেষ বলা যেতে পারে। কিন্তু জজ তবু একটা প্রশ্ন শুধোলেন, 'আচ্ছা, তুমি সেই ছেলেটার সন্ধান নিলে না কেন? তাকে বিয়ে করাতে বাধ্য করালে না কেন?'

কুণ্ডুলি পাকানো গোখরো সাপ যে রকম হঠাৎ ফনা তুলে দাঁড়ায় মেয়েটা ঠিক সেই রকম বলে উঠলো, 'কী! সেই কাপুরুষ—যে আমাকে অসহায় করে ছুটে পালালো! তাকে বিয়ে করে আমার বাচ্চাকে দেব সেই কাপুরুষের, সেই পশুর নাম!' তারপর দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললে। গোঙরানোর শব্দ কানে এল।

আমি তার মুখের দিকে আর তাকিয়ে থাকতে পারিনি।

প্রেম যে কী দ্বেষ, কী ঘৃণায় পরিণত হতে পারে তার বিকৃত মুখে দেখলুম—পূর্বেও দেখিনি, পরেও দেখিনি।

আমি বসেছিলাম একেবারে দরজার পাশে। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলুম।

দু'দিন পরে দোস্তের সাথে ফের দেখা।

বললে, 'ছোঃ, তুই বড্ড কাঁচা। পালালি?'

'কি সাজা হল?'

'চার মাস। কিন্তু জেলে যেতে হবে না। গাঁয়ের পাদ্রি সাহেবের কাছে প্রতি সপ্তাহে একবার করে হাজিরা দিতে হবে—গুড্ কনডাকটের রিপোরট দেবার জন্য। আদালত বললেন, 'সমস্ত পরিবার যে বদনামের পাবলিসিটি পেল, সে-ই যথেষ্ট সাজা—আর যার ফাঁসি হওয়া উচিত সে তো আদালতে নেই।'

প্রেম যে কী দ্বেষ, কী ঘৃণার—

শেষ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG